ভূমিকা

ছোটবেলায় আমার প্রিয় গ্রন্থছিল রামায়ণ। বলতে গেলে গল্পে সেই আমার প্রথম পাঠ। গল্পের রস যে কত গভীর হতে পারে, তা সেদিন চোখের জলের সঙ্গে যেমন করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম, তারপরে আর কোনও গ্রন্থ পড়ে তা করিনি।

এ তো গেল গল্পের দিক। গল্প যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণই তার রস। পরমুহূর্তেই গল্পের আবেদন হাল্কা হয়ে আসে। কিন্তু গল্পের উর্ধ্বে আর একটি তীব্রতর এবং গভীরতর আবেদন আছে যা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয় না। যা জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকে। যা জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা জীবনের অগ্রগতিতে সাহায্য করে। রামায়ণ সেই জাতীয় গল্প যা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়ে জীবনকে জাগ্রত করে, জীবনকে পুনর্জীবন দান করে।

বড় হয়ে দেখছি রামায়ণ শুধু অসার কবি-কল্পনা নয়। এই বর্তমান সংসার-জীবনেও হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাম সীতা রাবণ আপন মহিমায় বিরাজমান। অযোধ্যা আর লঙ্কা শুধু ভৌগোলিক নাম মাত্রই নয়—কলকাতা শহরের মধ্যেই তাদের অবস্থিতি। এই কলকাতায় এ-যুগেও সীতা-হরণ হয়। এ-যুগেও সীতার বনবাস হয়। এবং এই বিংশ-শতাব্দীতেও সীতার পাতালপ্রবেশ হয়।

অনেক দিনের কল্পনা ছিল রামায়ণের গল্প নিজের ভাষায় লিখবো। তা আর হলো না। হলো 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'

ইতি—

বিমল মিত্র

সূত্রপাত

এদিকটায় আগে বসতি ছিল না তেমন। এই মাঝেরহাট থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে বালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ থেকে বেলেঘাটা। বেলেঘাটা থেকে ছেড়ে ট্রেনটা পোড়ো জমি আর শুকনো খালের পাশ দিয়ে বালিগঞ্জে এসে দাঁড়াতো এক মিনিট, তারপর পাখাটা নিচু হলেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতো। ঘণ্টার শব্দ শুনেই গার্ডসাহেব সবুজ পাখা দেখিয়ে বাঁশি বাজিয়ে দিত। তারপর হুস হুস করে ট্রেনটা ছেড়ে দিত। দু'ধারের পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল-লাইন। কাঁকুলিয়ার কাছে এসে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর আর ডায়মণ্ডহারবার। আর একদিকে কালিঘাট-মাঝেরহাট হয়ে বজবজ স্টেশন। ট্রেনটা যাবে বজবজের দিকে। গার্ড সাহেব মাথাটা বাড়িয়ে একবার দেখে নিলে। পাখাটা নিচু হয়ে আছে। রাস্তা ক্লিয়ার। ইঞ্জিনটা একবার হুইস্‌ল বাজালো। দু'পাশের পায়ে চলা পথে তখন তরি-তরকারীর বাজরা মাথায় দিয়ে ব্যাপারীরা চলেছে বাজারে। বেগুনের ঝাঁকা, মাছের ঝাঁকা। শাকসব্জির ঝাঁকা। ছোট ছোট আশশ্যাওড়া গাছের ঝোপ। একটা লেভেল-ক্রসিং। সবুজ পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুমটিওয়ালা। পাখাটা নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। লোহার গেটটা বন্ধ। দু'পাশে সার সার গরুর আর মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে গিয়ে

—এ গেটম্যান, গেটম্যান!

এ-সব শোনা অভ্যেস আছে গুমটিওয়ালার। কুড়ি বছর চাকরি হয়ে গেল ভূষণের। চুল পেকে গেল কাজ করতে করতে।

—এ গেটম্যান, গেটম্যান!

লোকে অমন তাগাদা দেবেই। নতুন নতুন মোটরগাড়ি চড়ে সাহেবরা যাবে শহর থেকে শহরতলীতে। ওদিকে যাদবপুর, ওদিকে সাহেবদের ক্লাব আছে যোধপুর ক্লাব। সাহেব-মেমদের ভিড়। গাড়ির পর গাড়ি আসে। গাড়ির আর বিরাম নেই। ভোরবেলা থেকে শুরু করে বেলা একটা দুটো পর্যন্ত। তারপর আবার বিকেল থেকে শুরু হয়। দলের পর দল চলেছে। লাল লাল মুখ। দেখলে ভক্তি হয়। সোঁ সোঁ করে লাইন পেরিয়ে চলে যায় ঝড়ের বেগে। আর শনিবার হলো তো কথা নেই। ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে ওদিকে। দুপুর বারোটা থেকেই গাড়ির ভিড়। সেদিন আর নাওয়া-খাওয়া হয় না। একটু অসাবধান হলেই, একটু অন্যমনস্ক হলেই থার্টি-থ্রি আপ্‌ এসে যাবে হুড়মুড় করে। মোষের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে হৈ-চৈ বেধে যাবে। তখন হেড-আপিস থেকে ডি-টি-আই সাহেব এসে যাবে। বেলেঘাটা থেকে রেলের পুলিস এসে যাবে।

তখন হাতে হাতকড়া পড়ে যাবে, চাকরি নিয়ে টানাটানি।

—গেটম্যান তো বড় জ্বালালে দেখছি, ইঞ্জিনের দেখা নেই, এক ঘণ্টা আগে থেকে গেট বন্ধ করে রেখেছে—এই গেটম্যান···

ওসব কথা শুনতে গেলে গুমটিওয়ালার চাকরি করা চলে না। বাবুদের মেজাজ বিগড়েই আছে হামেশা। ওসব কথায় গুমটিওয়ালা যদি নিজের মেজাজ বিগড়োয় তো তাতে নিজেরই ক্ষতি। অমন কত বাবু দেখেছে, অমন কত সাহেবসুবো দেখা গেছে। চাকরি তো করতে হয় না তোমাদের বাপু। আছ তোফা। তোমাদের কী! পয়সা আছে ফুর্তি করতে বেরিয়েছ, ঘরে বউ আছে, মেয়েমানুষ আছে, কুকুর আছে, পেছনের বাক্সের মধ্যে মদের বোতল আছে. ক্লাবে যাবে আর গান গাইবে নাচবে রাত বারোটা পর্যন্ত। তারপর রাত পুইয়ে. শেষ রাত্তিরের দিকে ফিরে এই গেটম্যানের ওপর তম্বি। আমি তো তোমার চাকর নই বাপু। তোমার মাইনেও খাই না, তোমার ধারও ধারি না। তম্বি দেখাওগে তোমার বাড়ির চাকর-ঝিদের ওপর। আমরা সরকারী লোক। কোম্পানীর চাকর। কোম্পানীর খাই, পরি, কোম্পানীর ধার ধারি। কোম্পানী জুতো মারলে সে জুতো মাথা পেতে নেব। কোম্পানীর জুতো মারবার এক্তিয়ার আছে। হাজার বার এক্তিয়ার আছে। ডি-টি-এস যদি বলে—আমার বাগানটা কুপিয়ে দাও তো ভূষণ, আমি কুপিয়ে দেব। ডি-টি-আই যদি বলে—জুতোজোড়া একটু ঝেড়ে দাও তো ভূষণ, আমি জুতো ঝেড়ে দেব। তাঁরা হলেন গিয়ে মনিব। মনিবের হুকুম একশোবার শুনবো। তাঁরা হলেন মা-বাপ। রবিনসন সাহেব একবার এসেছিল লাইন দেখতে। সাত ফুট চেহারার লম্বা-জোয়ান চেহারা। আসল খাঁটী গোরা সাহেব। খাকী হাফ প্যান্ট পরা। কী সব ইংরিজী বলে—মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। কিন্তু দেবতার মত মানুষটা। ট্রলি করে এসেছিল। বালিগঞ্জ থেকে বেরিয়ে ট্রলি করে বজবজের দিকে যাবে। জমিদারি দেখতে বেরিয়েছে। কেমন সব কাজ হচ্ছে, কেমন সব চলছে, এই আর কি। সঙ্গে মেমসাহেব ছিল। আর ছিল একটা কুকুর। আগের দিন খবর পাওয়া গিয়েছে। ডি-টি-আই সাহেব খবর দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। বড়সাহেব আসছে! জাঁদরেল সাহেব, কুর্তা-টুর্তা পরে যেন রেডি থাকে সব। দাড়ি-টাড়ি যেন কামানো থাকে। কালো পাথা সবুজ পাখা—সব যেন সাবান দিয়ে কেচে ফর্সা করা হয়। গুমটি ঘরের আশেপাশে যেন জঙ্গল-ঝোপ না থাকে। সাহেব গুমটি ঘরের ভেতরে ঢুকে উঁকি মেরে দেখতে পারে। সব ময়লা-নোংরা জিনিস দূর করে দাও। বাতিগুলো মেজে-ঘষে সাফ করে ফেলো। বড়সাহেব আসবে, জাঁদরেল সাহেব। খুঁত দেখলে আর আস্ত রাখবে না। একেবারে বাঘের বাচ্চা।

সাবধান করে দিয়েছিল ডি-টি-আই সাহেব। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ওই রবিনসন সাহেব।

সাহেব নয়তো দেবতা। হাসি-হাসি মুখ। ট্রলির ওপর বসেছিল আর মোটা একটা চুরুট খাচ্ছিল। আর পাশেই ছিল মেমসাহেব। মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছিল ভূষণের। ট্রলি গুমটিতে থামতেও পারে, আবার না-ও থামতে পারে। রবিনসন সাহেবের যদি খেয়াল হয় তো সোজা চলে যাবে কালিঘাট পেরিয়ে একেবারে বজবজের দিকে। হে মা কালী, সাহেব যেন না নামে। হে মা মঙ্গলচণ্ডী, সাহেব যেন সোজা পশ্চিমদিকে চলে যায়। কোথায় কোন্ ফাঁকে খুঁত বেরিয়ে পড়বে গুমটি-ঘরের, আর রিপোর্ট হয়ে যাবে ভূষণ মালীর নামে। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি। কিম্বা জরিমানা হয়ে যাবে পাঁচ টাকা।

কিন্তু সাহেব নামলো।

ট্রলিটা এসে থামলো একেবারে গুমটি-ঘরের সামনে রেল-লাইনের ওপর।

গেট আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল ভূষণ। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল সবাইকে। ট্রলিটা এসে থামতেই গেট আবার খুলে গেল। আবার গরুরগাড়ি, মোষের গাড়ি সব পার হয়ে গেল। মোটরগাড়িগুলো হুস হুস করে বেরিয়ে গেল।

ভূষণ সোজা গিয়ে সাহেবের পায়ের কাছে খোয়ার ওপর ঢিপ্ করে একটা প্রণাম করলে।

সাহেবের সেদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু দেখলেন মেমসাহেব। আহা, মেমসাহেব নয় তো, যেন জগদ্ধাত্রী। যেমন রূপ তেমনি গড়ন। তেমনি চেহারা। ওই শুধু সিগারেটটা না-খেলেই যেন বেশি মানাতো। কিন্তু নেশা করেছেন, এখন আর উপায় কী! তবু মেমসাহেবকে যেন মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করেছিল। 'মা' বলে হয়ত ডাকতোই ভূষণ। মাকেও একটা প্রণাম ঠুকতে যাচ্ছিল—কিন্তু কুকুরটা তখন ভূষণের দিকে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এসেছে—

চেন-ছাড়া কুকুর। একটু ভয় পাবারই কথা। অবোলা জীব, কথা তো বোঝে না।

মেমসাহেব ডাকলেন—জিম্মি—জিম্মি—

ভাগ্যিস মেমসাহেব দেখেছিলেন, তাই বাঁচা গেল। নইলে খেয়েই ফেলতো কুকুরটা। মেমসাহেবের ডাক শুনেই কুকুরটা একেবারে ল্যাজ গুটিয়ে মেম-সাহেবের বুকে উঠে আদর করতে লেগেছে। সে-যাত্রা ভূষণ বেঁচে গেল বটে, কিন্তু বিপদ হলো আর একটা। বড়সাহেব তখন ডি-টি-আই সাহেবের সঙ্গে কী ইংরিজী কথা বলছে। লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে এটা দেখছে, ওটা দেখছে। গুমটি ঘরটার দিকে আঙুল দিয়ে কী সব দেখাচ্ছে। ছাদ দিয়ে জল পড়ে ভেতরে দেয়ালটায় ফাটল ধরেছে, একটা অশ্বত্থ গাছ উঠেছে গুমটির মাথায়। সব দেখাচ্ছে ডি-টি-আই সাহেব। পাশে একটা নর্দমা আছে, সেখানে বর্ষার সময় জল জমে। সেই বৃষ্টির জল পচে গন্ধ হয়। শরীর খারাপ হয় কোম্পানীর লোকদের। তারপর আছে সাপের ভয়। নাইট ডিউটির সময় কাজ করা বিপদ। ওই যে স্যার, ওদিকে দেখছেন জঙ্গল। পেছনে এই ঢাকুরিয়া

যাবার পথটা যা একটু শহরের মতন। একটা দুটো দোকানপাট আছে। সন্ধ্যে-বেলা টিম টিম করে একটু যা কিছু আলো জ্বলে তবু। যারা এ-রাস্তা দিয়ে যায়, তারা সবাই যায় মোটরে। ওদিকে যোধপুর ক্লাব, রেসকোর্স, গল্ফ ক্লাব—ওই জন্যেই এত গাড়ির ভিড় এ রাস্তায়।

ডি-টি-আই সাহেব তখন হাত-মুখ নেড়ে রবিনসন সাহেবকে বোঝাচ্ছিলেন। ভূষণ ইংরিজী বুঝতে পারে না—কিন্তু হাত-মুখ নাড়া দেখে আন্দাজ করতে পারে সব। এই যে বর্ষা আসছে সামনে, এ সময়ে এ-দিকটা একেবারে জলে ডুবে যাবে। এ নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স হয়েছে। লেভেল-ক্রসিংটা আজকের নয়। যখন প্রথম রেললাইনটা পাতা হলো, তখন এখানে শহরতলী ছিল না। পায়ে হাঁটা পথ ছিল একটা। তখন গুমটিও ছিল না, গেটও ছিল না। গুমটিম্যানও ছিল না। তিনটে অ্যাকসিডেন্ট হয় একই রাত্রে। গুডস্ ট্রেনে কাটা পড়ে মরে তিনজন লোক। তারা ভোরবেলা তাড়ি আনতে যাচ্ছিল। তখন তাড়ির কারবার ছিল পাশীদের। ঢাকুরের জঙ্গলে লম্বা লম্বা তালগাছের জঙ্গল। শুধু ঢাকুরেতেই নয়—ওই যে উত্তর দিকে জঙ্গল-ডোবা দেখছেন, ওখানে তালগাছ রয়েছে। আগের দিন ভোরবেলা ভাঁড় বেঁধে দিয়ে আসতো পাশীরা তালগাছের মাথায়। খুলে নিয়ে আসতো পরদিন দুপুর বেলা। দুপুরবেলার রসকেই বলে তাড়ি। আপনাদের দেশে যাকে মদ বলে, এদেশে তারই আর একরকম মদ হলো তাড়ি। তাড়িটা সস্তা। নেশা হয় ভালো। এধারের এই জঙ্গলের ভেতর বহু লোকের তাড়ির ব্যবসা আছে। এদের জন্যেই প্রথম রেল-কোম্পানীর গেট তৈরি করতে হয়। রাত-বিরেতে কখন কে এ-পথ দিয়ে যাবে ঠিক নেই। তখন থেকেই পাহারা বসাতে হলো।

তখন কলকাতা শহরটা আরো উত্তরে। চৌরঙ্গী পর্যন্ত এসে শহর ওইখানে আটকে গিয়েছিল। এদিকটায় লোক আসতো না। এখানে ছিল ডাকাতির আড্ডা। শহরে মানুষ খুন করে লাশ এনে ফেলে দিত এই জঙ্গলে। সে-লাশ পচে গন্ধ উঠতো। দু-তিন দিন কেউই টের পেত না। পচা ডোবা আর জঙ্গলের মধ্যে কে খোঁজ রাখবে কার। মাইলের পর মাইল পোড়ো জমি আর খানা-খন্দ। এদিকে খুন করলে ওদিকে টের পায় না কেউ। হঠাৎ একদিন হৈ-চৈ হল্লা ওঠে জঙ্গলের ভেতর। ওদিকের বসতির লোকদের কানে যায়। লাঠি দিয়ে ক্যানেস্তারার টিনে শব্দ করে। জঙ্গলের শুকনো ঝোপে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবু এদিকে আসতে সাহস পায় না কেউ। বলে—ডাকাতের জাঙ্গাল। ডাকাতের জাঙ্গালের দিকে সন্ধ্যের পর আর কেউ আসতে চায় না। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় এর মাইল চারেকের মধ্যে বসতি ছিল না। ইংরেজ কোম্পানীর শহরে যারা কাজকর্মে যেত, তারা ফিরতো দিনমানে। আর দিনমানেও একলা একলা ফেরা নিরাপদ ছিল না। ফিরতো দলবল নিয়ে। ওই হরিনাভি, বারুইপুর, সোনারপুর, ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের লোকেরা আসবার সময় লাঠিসোটা, মশাল,

সব সঙ্গে নিয়ে আসতো। ইংরেজ কাছারির কাজকর্ম সেরে বেলাবেলি ফিরে যেতে হবে তাদের। সামনে গরুর গাড়ি, পেছনে গরুর গাড়ি—মাঝখানে কিছু পায়ে-হাঁটা লোক। আর শুধু কি ডাকাত! ডাকাতের চেয়েও ভীষণ সব জন্তু-জানোয়ার ছিল। বাঘ থাকতো ওৎ পেতে। বড় বড় মাথা পর্যন্ত উঁচু হোগলা বন। সেই হোগলা বনের মধ্যে শুধু ডাকাত নয়, শুধু বাঘই নয়। ইয়া ইয়া সাপ। সাপের রাজত্ব ছিল চারিদিকে। সেকালে কে জানতো এখানেও একদিন বসতি গড়ে উঠবে! এখানেও একদিন কোম্পানীর রেললাইন বসবে। এখানেও একদিন হুস্ হুস্ করে সাহেব-মেমদের মোটরগাড়ি চলবে। এখানেও বিজলী বাতি, কলের জল, টিউবওয়েল, কলকারখানা বসবে। এখানেই, এই এখানেই একদিন লেক হবে। শহরের গণ্যমান্য লোক এখানে বেড়াতে আসবে হাওয়া খেতে।

যখন প্রথম রেল-লাইন হলো—সে-ও অনেকদিন আগের কথা। তুমি আমি কেউই তখন জন্মাই নি। ওই বেলেঘাটা থেকে লাইন এসে মিশলো বালিগঞ্জ ইস্টিশানে। প্রথমে ওই পর্যন্তই ছিল। তারপর একদিন বজবজে পেট্রল কোম্পানীর ট্যাঙ্ক বসলো। পেট্রল কোম্পানীর আপিস হলো সেখানে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন সবে নতুন গাড়ি আসতে শুরু করেছে। কয়েকজন সাহেবসুবো গাড়ি কিনলে। সেই গাড়ি শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় এধার থেকে ওধার। লোকে হাঁ করে চেয়ে দেখে। দিশী পাড়ার ছেলেমেয়েরা মোটরগাড়ির শব্দ শুনলেই দৌড়ে আসে গলির সামনে। ভিড় জমে যায় চারধারে। বুড়োরা আপিস যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ছেলেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চারটে রবাটের চাকা, তার ওপর একটা বাক্স মতন খাঁচা। মাথার চালটা ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায়। আবার দরকার হলে ঢেকে দেওয়াও চলে। রোদ-বৃষ্টি হলে চালটা তুলে দাও, তারপর গায়ে রোদ লাগাবার ইচ্ছে হলে খুলে ফেলো।

বি এন আর কোম্পানীর বেভারলি সাহেবই প্রথম গাড়ি কিনলে।

সেদিন আর কাজকর্ম হলো না আপিসে। সারা আপিস ভেঙে বাবুরা গাড়ি দেখতে এলো। চুঁচড়ো, রাণাঘাট, উলুবেড়ে থেকে যারা পায়ে হেঁটে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে আপিসে আসে, তারা হাঁ করে দেখতে লাগলো। প্রথমে শহরে একখানা-দুখানা গাড়িই ছিল। এধারে থেকে ওধারে গেলে পাড়াময় লোক জড়ো হতো। তারপর গাড়ি বাড়লো। নানা ধরনের, নানা রংএর গাড়ি। গাড়িতে নম্বর লাগাবার নিয়ম হলো। গাড়ির তলায় লোকজন চাপা পড়তে লাগলো। গাড়ির ভিড়ে রাস্তা চওড়া করতে হলো। শেষে টান পড়ল পেট্রলে। পেট্রল আসতো আগে জাহাজে করে। খিদিরপুর জেটিতে তেলের পিপে ভর্তি জাহাজ লাগতো। সেই পিপে সাবধানে নিয়ে যাওয়া হতো গুদাম-ঘরে। একবার সেই তেলে আগুন লেগে সে কী কাণ্ড! সারা জাহাজখানা পুড়ে ছাই

হয়ে গেল। বোমা ফাটার মত দমদাম আওয়াজ হতে লাগলো। কত লোক কুলি-কাবারি যে মারা গেল! আর তেল আসতো রেল-গাড়িতে। মালগাড়িতে ক্যানেস্তারার টিনে সিল্ করা তেল আসতো। এসে শালিমারের গুদামে ভর্তি হতো। তারপর সেই টিন কিনে নিয়ে গাড়ির ট্যাঙ্কে ঢালো। তখন আবার গাড়ি গড় গড় করে গড়িয়ে চলবে।

তারপর যেবার পাইপলাইন হলো বজবজে, সেইবার হলো এই লাইন। রেলের বড়সাহেবরা জমি জরীপ করতে এলেন। ইঞ্জিনীয়াররা এলেন। ওই বেলেঘাটা থেকে বন-জঙ্গল কাটতে কাটতে রেলের ইঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়াররা উঁচু-নিচু সমতল করে দিলে। দুপাশে তারের বেড়া লাগিয়ে দিলে। বন থেকে কত সাপ বেরুলো। সাপের কামড়ে মরলো কত লোক। বালিগঞ্জ ইস্টিশান হলো। বাবুদের কোয়ার্টার হলো। কুলিদের বস্তি হলো। জলের পাম্প বসলো। বেলেঘাটা থেকে মালগাড়িতে ভর্তি হয়ে এল লোহা-লক্কড়, এল স্ক্রু, এল নাটবল্টু, এল ফিস-প্লেট, এল হাতুড়ি, শাবল, কোদাল, সব। এই এখনকার তালগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লাইন পাততে পাততে চললো ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট। সিগন্যাল বসলো, টেলিগ্রামের পোস্ট বসলো, স্লিপার বসলো। তারপর এসে পৌঁছুলো এই এখেনে। এই ঢাকুরিয়া আর গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিংএর কাছে।

এই যেখান থেকে আমাদের গল্পের শুরু।

আসলে এ জায়গাটা গল্পের শুরুও বটে আবার গল্পের শেষও বটে।

শেষটাই আগে বলে নেওয়া ভালো। তাতে আগ্রহ বাড়ে। পড়বার ধৈর্য থাকে। নইলে শুরু থেকে শুরু করলে কে পড়বে মন দিয়ে। আজকাল, এই বাস্তবতার যুগে কার এত ধৈর্য! কে পড়বে এত বড় উপন্যাস। কবে কেমন করে নায়ক বড় হলো, কবে লেখাপড়া শিখলো, কবে বিয়ে-থা করলো, কবে মারা গেল—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত জানবার দায় নেই কারো। যেমন দায় ছিল না ভূষণ মালীর, যেমন দায় ছিল না ডি-টি-আই সাহেবের, আর যেমন দায় ছিল না রবিনসন সাহেবের। বড় থেকে ছোট সবাই কোম্পানীর চাকর। কেউ বড়-চাকর, আবার কেউ ছোট-চাকর। কোন্ দূর দেশ সেটা। স্কটল্যান্ড না ইংল্যান্ড কেউ জানে না। হয়ত লন্ডনের কিম্বা বার্মিংহামের কোন রোড-সাইড ইস্টিশানের কেবিনম্যান ছিল প্রথমে। তারপর কোম্পানীর দৌলতে এখানে এসে একেবারে এক লাফে ডি-টি-এস হয়ে বসেছে পায়ের ওপর পা তুলে। সঙ্গে জাহাজে করে এসেছে মেমসাহেব আর এসেছে একটা বাঘা কুকুর।

ডি-টি-আই সাহেব তো মন দিয়ে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু রবিনসন সাহেব কী বুঝছিল ভগবানই জানে।

শুনছি ওদিকটায় ওই উত্তরদিক বরাবর একটা লেক হবে। ওসব জঙ্গল

সাফ হয়ে যাবে শিগগির। ওদিকে আর জমি বিক্রী করছে না ক্যালকাটা করপোরেশন। ওদিকে সেই ভবানীপুর পর্যন্ত শহরের চেহারা একেবারে নাকি বদলে যাবে। ওদিকে খিদিরপুর, তারপর কালিঘাট, তারপর এদিকে কসবা, মাঝখানের এই জঙ্গলটা সাফ করে দিলে কলকাতা শহরের ভোল্ একেবারে পাল্টে যাবে স্যার। তখন ওই ঢাকুরের দিকেও বসতি হবে, লোক্যালিটি হবে। তখন এই রাস্তায় ট্রাফিক বেড়ে যাবে। এই আমাদের সরু লেভেল-ক্রসিং-এ আর কুলোবে না। বম্পাস্ সাহেব সেই রকম নোট দিয়েছে—এই দেখুন স্যার, ফাইল দেখুন! এই প্ল্যান্ এনক্লোজ করে দেওয়া আছে। প্ল্যান দেখলেই বুঝতে পারবেন এ-জায়গাটা ফিউচারে কত ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠবে। বম্পাস্ সাহেব লিখেছে—এখানে একটা স্টেশন করলে ভালো হয়। আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রাফিকও বাড়বে তাতে। ওদিকে বালিগঞ্জ আর পশ্চিমে কালিঘাট—এই তেরো ফারলং ডিসট্যান্স-এর মধ্যে একটা স্টেশন করে সাইডিং তৈরি করলে সেকশন্-ক্যাপাসিটিও বাড়ে—

রবিনসন সাহেব কথাটা বুঝতে পারলেন না। বাঁ হাতটা তেরছা করে নেড়ে বললেন—ইউ মিন্ আওয়ার রেলওয়ে স্টেশন?

ডি-টি-আই সাহেব বললেন—ইয়েস স্যার—

রবিনসন সাহেব খাস বিলিতি রোডসাইড স্টেশনের কেবিনম্যান ছিল। তাঁর সঙ্গে মেমসাহেব আছে, বিলিতি কুকুর আছে। আর ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছিল। টি-টাইমটা উত্তরে গেছে কাজ করতে করতে।

বললেন—ননসেন্স—

রবিনসন সাহেবের সেই জাঁদরেল গলায় 'ননসেন্স' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ সমস্ত আবহাওয়াটা একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলো। আর মেমসাহেব ছিল পেছনে। মেমসাহেবও হাউ-হাউ করে উঠেছে। ডি-টি-আই সাহেবও পেছন ফিরে হতবাক। রবিনসন সাহেবেরও এতক্ষণ কোনওদিকে খেয়াল ছিল না। কাজ করতে করতে নাওয়া-খাওয়া টি-টাইমও ভুল হয়ে যায় তাঁর। তিনিও ফিরে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ভূষণ মালী এতক্ষণ সাহেবদের পেছনে-পেছনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মাথামুণ্ডু সব শুনছিল। সেও দৌড়ে গেল পেছন দিকে।

পেছন দিকে মানে উত্তর দিকে। একটা কাঁটা ঝোপ, একটু পচা ডোবা মতন সেখানটা। ঠিক সেইখানে রবিনসন সাহেবের কুকুরটা মাটিতে পড়ে ছটফট্ ছটফট্ করছে। তখন তার গলা দিয়ে আর চেঁচাবারও ক্ষমতা নেই। ভূষণ দৌড়ে কাছে গেছে। কিন্তু তার আগেই মেমসাহেব সেই সিল্কের গাউন নিয়েই মাটিতে বসে কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়েছেন।

—জিম্মি, ডিয়ারি, জিম্মি—

ডি-টি-আই সাহেব, রবিনসন সাহেব দুজনেই এসে পড়লেন! কুকুরটার

দশা দেখে মেমসাহেব হাউ-মাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। রবিনসন সাহেবও মাটিতে বসে পড়ে কুকুরটাকে ধরতে যাচ্ছিলেন।

হঠাৎ ভূষণ মালী চেঁচিয়ে উঠেছে—সাপ, সাপ—

ডি-টি-আই সাহেবও রবিনসন সাহেবকে হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়েছে—স্নেক স্যার—স্নেক—

একটা কাল-কেউটে! যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে সাপটা ফণা তুলে দেখলে খানিকক্ষণ। তারপর আবার এঁকে বেঁকে নিঃশব্দে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভূষণ মালীর এখন আরো বয়েস হয়েছে। সেদিনকার সে-গুমটিও আর নেই। সে গুমটি ঘর, সেও নতুন গুমটি ঘর হয়েছে। ওখানে রাস্তা চওড়া হয়েছে। ইলেকট্রিক আলো হয়েছে। হাত দিয়ে আর গেট বন্ধ করতে হয় না। এখন বোতাম টিপলেই গেটটা আস্তে আস্তে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। গুমটিঘরে টেলিফোন হয়েছে। কেবিন থেকে হুকুম আসে টেলিফোনে। টেলিফোনে হুকুম পেলে তবেই গেট বন্ধ করতে হয়। সেই জলাও আর নেই তেমন। ঝোপ-ঝাড় অনেক সাফ হয়েছে, ওধারে পাকা বাড়ি হয়ে গেছে। রাত-বিরেতেও আলোয় ঝলমলে হয়ে থাকে জায়গাটা। গাড়ির যাতায়াত বেড়েছে। লোকের আনাগোনা বেড়েছে। ওধারে লেক হয়েছে। সাঁতার কাটবার পুকুর হয়েছে। সাহেবদের বাচ খেলবার ক্লাব হয়েছে। একটা মন্দির হয়েছে। বুদ্ধদেবের মন্দির। দেখতে দেখতে কত কি বদলে গেল। চোখের সামনে সারা সংসারটাই বদলে গেল। সে-পৃথিবীটা আর নেই। সেই চাকরির সুখও নেই আগেকার মত। সেই রবিনসন সাহেবও আর নেই! কুকুরটা মারা যাবার পরই সাহেবের কী যে হলো, সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল—আর এল না। ফিরে এল না সাপের ভয়ে না কুকুরের শোকে তা কেউ জানে না। সে-রকম সাহেব কিন্তু আর হলো না। অনেককে জিজ্ঞেস করেছে রবিনসন সাহেবের কথা। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। তার জায়গায় কত নতুন ডি-টি-এস এসেছে গেছে, কিন্তু সে-রকম ডি-টি-এস আর হয়নি। হেড-আপিস থেকে কেউ এলেই ভূষণ জিজ্ঞেস করে—রবিনসন সাহেব ফিরেছে হুজুর?

সবাই বলে—না—

তারপর জিজ্ঞেস করে—কেন, রবিনসন সাহেব তোমার কী করবে?

—না এমনি জিজ্ঞেস করছি

—রবিনসন সাহেবই বুঝি তোমায় চাকরি দিয়েছিল ভূষণ?

ভূষণ বলে—আজ্ঞে না হুজুর, রবিনসন সাহেবের কুকুরটাকে এখানে সাপে কেটেছিল কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি—

ভূষণ মালী শুধু একলাই গেটম্যান নয়। আসলে তিনজন গেটম্যান পালা করে ডিউটি করে। আটঘণ্টা করে ডিউটি। সমস্ত দিনের ডিউটি তিনজনের। তিন আষ্টে চব্বিশ। ভূষণ মালী ছাড়া মঙ্গল দেও আছে। আর আছে দেওকীনন্দন। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে। বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটা। তারপর রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা। এমনি ঘুরে ফিরে ডিউটি পড়ে। কাজ বেশি তেমন কিছু নয়। ওই কেবল গেট পাহারা দিয়ে পড়ে থাকা। ওইটেই আসল কাজ। তারপর বোতাম টিপলেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সে তেমন কিছু হাঙ্গামের ব্যাপার নয়। তিনজনের ডিউটি। পালা বদল করে কাজ করো। আপোষে মিলে মিশে কাজ। কারো শহরে কাজ থাকে তো আর একজনকে বলে গেলেই হলো। তার হয়ে ডবল ডিউটি করে দেবে। সকাল আটটা থেকে টানা রাত বারোটা পর্যন্ত একজনই ডিউটি করবে।

বালিগঞ্জ ওয়েস্ট কেবিন থেকে হুকুম হবে—থার্টি থ্রি আপ, লাইন ক্লিয়ার—

দেওকীনন্দন ফোন্ ধরে বললে—হাঁ—হুজুর—

কেবিনম্যানের টেলিফোনটা ছাড়তে গিয়ে হঠাৎ কী যেন একটা সন্দেহ হবে। বলবে—কে রে, দেওকীনন্দন?

—জী হাঁ—

কেবিনম্যান বলবে—কেন, এখন তো মঙ্গল দেও'র ডিউটি—মঙ্গল কোথায় গেল?

—হুজুর মঙ্গল কলকাতা গেছে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি, আমি ডবল ডিউটি করছি—

—আর ভূষণ? ভূষণের কোন্ ডিউটি?

দেওকীনন্দন বলে—ভূষণের সেকেন্ড নাইট হুজুর—রাত বারোটায় আসবে—

আসলে তিনজন গেটম্যান হলেও ভূষণের কথাই বেশি করে বলা। কারণ ভূষণের ডিউটিতেই ঘটনাটা ঘটেছিল। তখনও ছিল তার সেকেন্ড-নাইট ডিউটি। সেবার হলো কী, জেনারেল ম্যানেজার লাইন দেখতে বেরোবে। এমন বছরে একবার লাইন দেখা নিয়ম। সেদিন ইস্টিশান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। স্টেশন মাস্টার সেদিন কাচানো ইউনিফর্ম পরবে, মাথায় টুপি দেবে। মাল-গুদামে সাজানো-গোছানো থাকবে মালের বস্তা। সেদিন ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করবে প্ল্যাটফরম। একটু ধুলোবালি খুঁজে পাবে না কেউ কোথাও। স্টেশন মাস্টার নিজে বেরোবে দেখতে। আউটার সিগন্যাল ভালো করে চলছে কি না। কেবিনে উঠে লিভার টেনে টেনে দেখবে। জেনারেল ম্যানেজার যদি খুঁত পায় কোথাও তো রিপোর্ট হয়ে যাবে। পার্সোন্যাল ফাইলে দাগ পড়ে যাবে। চাকরির উন্নতির রাস্তা চিরকালের জন্যে বন্ধ। সুইপারকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দেবে, কেবিন-ম্যানকে ডেকে সাবধান করে দেবে। সবারই হর্তাকর্তা-বিধাতাপুরুষ আসছে।

কারো রেহাই নেই। সঙ্গে থাকবে সব ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা। চীফ ইঞ্জিনীয়ার থাকবে চীফ মেডিক্যাল অফিসার থাকবে। ট্রাফিক ম্যানেজার থাকবে, ডি-টি-এস থাকবে। আরো অনেকে থাকবে। একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন ভর্তি বড় সাহেবরা থাকবে। ট্রেনটা বেলেঘাটা ছাড়বে বেলা দেড়টায়। দুপুরবেলার খাওয়া খেয়ে বেরোবে সবাই! তারপর বালিগঞ্জে এসে পৌঁছোবে পৌনে দু'টোয়। বালিগঞ্জে হল্ট আছে আধঘণ্টা। আধঘণ্টার মধ্যে ইস্টিশানের যাবতীয় কাজকর্ম দেখা শেষ করে স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে দু'টো পনেরো মিনিটে। তারপর ঢাকুরিয়া। ঢাকুরিয়ার পর সোনারপুর। এমনি পর পর লাইন দেখতে দেখতে সোজা চলে যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সার্কুলার বেরিয়ে গেছে সাতদিন আগে থেকে। সারা সেকশানে শোরগোল পড়ে গেছে। যার যা অভাব অভিযোগ এই সময়ে বলবে বড় সাহেবদের। বছরে এই একটা সময়। এই সময়ে কারো প্রমোশন হয়, কারো জরিমানা হয়, কারো নিচু ধাপে নামতে হয়।

ভূষণ কেবিনবাবুকে জিজ্ঞেস করে——এস্‌পেশ্যাল এদিকে আসবে না হুজুর?

কেবিনম্যান বলে—নারে, তোরা বেঁচে গেলি এধাক্কা, ও ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবে প্রথমে, তারপর যাবে লক্ষ্মীকান্তপুর—

—আর বজবজ সেকশান?

কেবিনবাবু বলে—সে এখনও সার্কুলার পাইনি—

এদিকে কথা নেই বার্তা নেই, ঠিক ঝোপ্ বুঝেই কোপ। বর্ষাকাল নয় কিছু নয়। সকালবেলাও কিছু বোঝা যায়নি। একটু একটু কুয়াশা মতন ছিল। সকাল আটটার সময়ও অন্ধকার-অন্ধকার ভাব। যত বেলা বাড়তে লাগলো ততই অন্ধকার হতে লাগলো। বৃষ্টি তখনও পড়েনি, কিন্তু ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে জোরে। বেলেঘাটা স্টেশন তবু জমজমাট। ধোয়া-মোছা হয়েছে প্লাটফরম! জাঁদরেল-জাঁদরেল সাহেবরা এসে গাড়ি থেকে নামলো। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার আর আসে না। হাতঘড়ি, প্লাটফরমের ঘড়ি, সব ঘড়ি মিলিয়ে দেখা হলো। ঘড়ির বড় কাঁটাটা ছ'টার ঘর পেরিয়ে গেছে। এমন তো দেরি হয় না কখনও।

কিন্তু এসে পড়েছেন তিনি।

বালিগঞ্জের নর্থ কেবিন থেকে কেবিনম্যান ফোন তুলে ধরলে—হ্যাল্লো, কে? লাহিড়ী? কী হলো? জেনারেল ম্যানেজারের কী হলো? স্পেশ্যাল ক্যানসেলড্ নাকি?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ওই এসে গেছে, এই এখনি এল হে, বড় সাহেবদের কারবার, এই লাইন-ক্লিয়ার পেলাম—

, ট্রেন ছেড়ে দিলে। লেট করেই ছাড়লো। কিন্তু ড্রাইভার পাকা। আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস চালিয়েছে একদিন। এই সেবার ভাইসরয়ের স্পেশ্যালও

চালিয়েছে। ইঞ্জিনটাও মজবুত। মনের মত যন্ত্র পেয়েছে—সুতরাং হুস্ হুস্ করে দেখতে-না-দেখতে বালিগঞ্জ এসে পড়েছে। স্টেশনে তখন স্টেশন মাস্টার নিজে লালপাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চার বোগির স্পেশ্যাল। ঠিক মাপে মাপে দাঁড়িয়েছে ট্রেনটা। বালিগঞ্জ স্টেশনে নামবে সবাই। সব দেখা-শোনা করবে। মাল-গুদাম দেখবে। স্টেশন দেখবে। গাড়ি থেমে রইল কিছুক্ষণ। প্লাটফরমের ওপর জলের ছিটে দেওয়া হয়েছে—ধুলো যেন না ওড়ে।

স্টেশন মাস্টার অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গেলেন। আজ তিনি রেলের কোট পরেছেন, টুপি পরেছেন। পুরোদস্তুর স্টেশন মাস্টার।

কিন্তু কেউ নামে না।

কী হলো? হলো কী?

স্টেশন মাস্টার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। চীফ মেডিক্যাল অফিসার বড় ব্যস্ত। এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছেন। হাতে ওষুধের শিশি, গলায় স্টেথিসকোপ।

হঠাৎ তারপর আরো জোরে বৃষ্টি নামলো। অকাল বর্ষণ। অন্ধকার করে এলো। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে দুপুরবেলা। কাঁপুনি ধরে সারা গায়ে।

হঠাৎ সেন-সাহেব নামতেই স্টেশন মাস্টার এগিয়ে গেছেন সাহস করে।

বললেন—স্যার কী হলো, ইনসপেক্‌শান হবে না?

সেন-সাহেব পুরোন লোক। অনেকদিন আগে চাকরিতে যখন নতুন ঢুকেছিলেন, তখন আসতেন মাঝে মাঝে। বেশ সুন্দর চেহারা। বছর পনেরো আগেকার কথা। স্টেশন মাস্টার তখন সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে, অনেক ডুব-সাঁতার কেটে এখানে তখন সবে এসেছেন। একদিন এই সেন-সাহেবই এলেন ডি-টি-আই হয়ে। তখন জাঁদরেল সাহেব ছিল রবিনসন। রবিনসন সাহেবের নামে সারা লাইন কাঁপতো। এক-একদিন সকাল বেলা ডিউটিতে এসেছেন আর বাড়ি গেছেন রাত এগারোটার পর। কেবল স্টেটমেণ্ট চাই। ওয়াগনের হিসেব দাও। নানা ফাই, নানা ফরমাজ। হেড-আপিসের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই যে বালিগঞ্জ ইস্টিশানের দু'পাশে এই ভিড়—এসব কোথায় ছিল! গেটের ধারে গোটা দশেক দোকান শুধু। একটা দোকান ছিল—পরোটা আলুর দমের। পরোটা আর আলুর দম লোকটা করতো ভালো। বৈঠকখানার বাজার থেকে আলু-কপি বাজার করে নিয়ে আসতো। আর একটা মস্ত কাঠের পিঁড়ির ওপরে ঘি দিয়ে পরোটা বেলতো উবু হয়ে বসে। ইস্টিশানের পোর্টার গিয়ে এক-একদিন বলতো—দু'টো গরম পরোটা দেখি—

পরোটাওয়ালার নামটা এখন আর মনে পড়ে না।

—কার জন্যে পরোটা চাই—কে খাবে গো?

পোর্টার বলতো—মাস্টারবাবু, আমাদের নতুন মাস্টারবাবু—

মাস্টারবাবু তখনও কোয়ার্টার পায়নি এখানে। পরিবারও আনেনি। হোটেল থেকে রুটি-পরোটা খেয়ে দিন কাটছে। আর ওয়েটিংরুম-এর ভেতরে রাত্রে শোবার ব্যবস্থা। তা মাস্টারবাবুর নাম শুনে আর দাম নিতে চায় না বেটা। চেয়েছিল দু'খানা পরোটা। দিলে চারখানা। সঙ্গে একথাবা আলুর দম ফ্রি। দেখেই মজুমদারবাবু অবাক।

বললেন—কেন, দাম নিলে না কেন?

খালাসী বললে—দাম নেবে কেন হুজুর, দাম নেবার কি মুরদ আছে ওর,—

—কেন, মাল দেবে দাম নেবে না? দানছত্তোর খুলে বসেছে নাকি?

—হুজুর, পরোটার দাম নিলে ও কি আর বিনা-টিকিটে ট্রেনে চড়তে পারবে? বৈঠকখানা বাজার থেকে আলু আনে কপি আনে—কোনওদিন কি টিকিট কেটেছে ও? পরোটার দাম নিলে গলায় গামছা দিয়ে ওর টিকিট আদায় করবো না?

তখনকার কথা আলাদা। পেছনের ওই যেখানে এখন ট্রাম লাইন বসেছে, দিনরাত ঘড় ঘড় শব্দে কান পাতা দায়, ওইখানে শেয়াল ডাকতো। ওখান থেকে একেবারে সেই কালিঘাটের কেওড়াতলা শ্মশান-ঘাট পর্যন্ত শুধু জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে শুধু সরু-সরু পায়ে চলা মেঠো পথ। সন্ধ্যের পর ওদিকে যেতে ভয় করতো। সস্তায় কত জমি বিক্রী হয়ে গেল ওদিকে। টাকা থাকলে মজুমদারবাবু তখন যদি ধরে রাখতো তো আজ ভাবনা! সেই সময়ে স্যার সুরেন বাঁড়ুজ্জে এসেছিলেন জগবন্ধু ইনস্টিটিউশানে বক্তৃতা দিতে। তিনিই প্রথম বলেছিলেন—কালিঘাট থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ট্রাম চলবে শিগগির—

বালিগঞ্জ স্টেশনের কামরাটার মধ্যে তখন মজুমদারবাবুর সামনে কাজের পাহাড়। কোনওদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। টেবিল ভর্তি কাগজ-পত্র ফাইল। কোন্ কাজটা আগে করবেন তার ঠিক নেই। একগাদা ইনভয়েস, একগাদা ইনডেমনিটি বন্ড—চোখে নাকে তখন দেখতে পাচ্ছেন না। রবিনসন সাহেব জাঁদরেল লোক হোক মায়া-দয়া ছিল তাঁর। গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিংএ সেবার তাঁর কুকুরটাকে সাপে কামড়াবার পর আর এখানে থাকলেন না—রিটায়ার করে দেশে চলে গেলেন। সেই জায়গায় এল ঘোষাল-সাহেব। বাঙালী হলে কী হবে। একেবারে জাত-বদ্‌মাইশ। রোজ একজনের চাকরি না খেয়ে আর জলগ্রহণ করতো না ঘোষাল-সাহেব। হেড-আপিসে কতদিন দেখা করতে গিয়ে দেখেছে ঘোষাল-সাহেব চীৎকার করছে—গেট আউট—গেট আউট-

গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিং-এ একবার একটা লোক কাটা যায়। সাক্ষী দিতে হয়েছিল মজুমদারবাবুকে। সঙ্গে ছিল গেটম্যান ভূষণ। আর কেবিনম্যান করালীবাবু। তিনজনেই হেড-আপিসের ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিল। ঘোষাল সাহেবের ওপরই চাকরি নির্ভর করছিল তিনজনের। এক-কলমের খোঁচায় তিনজনের চাকরি চলে যেত।

উঁকি মেরে ঘোষাল সাহেবের ঘরের দিকে দেখতেই ঘোষাল-সাহেব চীৎকার করে উঠেছিল—গেট আউট, গেট আউট—

গেট আউট-ই ছিল ঘোষাল সাহেবের বুলি।

করালীবাবু বলেছিলেন—এত সাহেব মরে আর ঘোষাল সাহেব মরে না রে—

ভূষণ বললে—রবিনসন সাহেব বড় ভালো লোক ছিল হুজুর—রবিনসন সাহেবের মেমসাহেবও ভালো ছিল—সেই সাহেব থাকলে আজ আর ভাবনা—আমি তো মেমসাহেবের পা জড়িয়ে ধরতুম গিয়ে—

বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনেই একজন মেয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। বেশ সাজা-গোজা। চমৎকার চেহারা। সিঁথিতে সিঁদুর। সিল্কের শাড়ি পরনে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বললে—আপনারা এখানে গোলমাল করছেন কেন, ঘোষাল সাহেব রাগ করছেন—

মজুমদারবাবু এগিয়ে বলেছিলেন—আমরা ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলাম, গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর রান-ওভার কেস্‌টার জন্যে—

তিনি বলেছিলেন—তা যখন এনকোয়ারী হবে তখন আসবেন, এখন যান—বলে আবার ভেতরে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

করালীবাবু বললেন—এঁকে চিনতে পারলেন তো মাস্টার মশাই—

—না তো!

করালীবাবু মুচকি হাসলেন।

বললেন—আরে চিনতে পারলেন না—ইনিই তো সেই ইয়ে—ঘোষাল সাহেবের ইয়ে—

যাক গে, ওসব ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো। সেই একদিনের একটুখানি দেখা। বড় সাহেবদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে মাথাঘামানোর অভ্যেস মজুমদারবাবুর নেই। মজুমদারবাবুর নিজের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কে মাথা ঘামায় তার ঠিক নেই। চাকরি করতে এসেছেন পেটের দায়ে, চাকরিটা বজায় থাকলেই হলো। কবে সেই বালিগঞ্জের জঙ্গল কেটে তাঁরই চোখের সামনে শহর গজিয়ে উঠলো রাতারাতি তাও তিনি টের পাননি। কবে লেক হলো তাও জানতে পারেননি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে ওদিকপানে গিয়ে সব দেখে শুনে তো অবাক। সেই লেভেল-ক্রসিং আর চেনা যায় না। বুদ্ধদেবের মন্দির হয়েছে একটা। কত বাড়ি হয়ে গেছে। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। প্রথমে বালিগঞ্জে আসার পর একবার সাউথ্ কেবিন-ঘরে ঢুকেছিলেন—তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন লেভেল-ক্রসিংটা পর্যন্ত। তারপর ওদিকে আর যাবার প্রয়োজনই

হয়নি। ভূষণ দেখালে কোনখানটা রবিনসন সাহেবের কুকুরকে সাপে কামড়েছিল—কোনখানটায় মাটির ওপর বসেছিল মেমসাহেব। আহা সে-সব সাহেবই ছিল আলাদা। তারা দেবতার মত মানুষ ছিল, তাদের দরদ ছিল, বাবুদের বাড়ির খবর নিত!

করালীবাবু বলতেন—আমার মেয়ের বিয়ের সময় অস্‌বর্ন্‌ সাহেব কলা-পাতা পেতে লুচি খেয়ে গিয়েছিল, জানেন মাস্টার মশাই—আপনি তখন আসেন নি—

ভূষণ বলেছিল—রবিনসন সাহেবের মেমসাহেবকে দেখেছি হুজুর, আহা, কী চেহারা, যেন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ—

মজুমদারবাবু বলতেন—আমাদের সেন-সাহেবও লোক ভাল করালীবাবু—গরীবের ছেলে কি না, পরের দুঃখুটা বোঝে—

তা সেবার শেষ পর্যন্ত সেন সাহেবই বাঁচিয়ে দিয়েছিল সবাইকে।

ঘোষাল সাহেবের পাশের ঘরখানাই সেন-সাহেবের ঘর। সেন-সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—এখানে কী করছেন আপনারা—

মজুমদারবাবু বললেন—সেই রান-ওভার কেস্‌টা নিয়ে একবার ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি স্যার—

—আপনি কে?

মজুমদারবাবু বললেন—আমি বালিগঞ্জ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, আর এই হলো গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর গেটম্যান ভূষণ, আর এ হচ্ছে সাউথ কেবিনের কেবিনম্যান করালীভূষণ সরকার—আপনি যদি ঘোষাল সাহেবকে একটু বলে দেন স্যার।

—আপনারা ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন নাকি?

মজুমদারবাবু বললেন—দেখা কী করে করবো স্যার, ওঁর ঘর থেকে কে একজন বেরিয়ে এলেন, ওঁর পি-এ বোধহয়...

সেন-সাহেব বাধা দিয়ে বলেছিলেন—বুঝতে পেরেছি, আপনারা চলে যান, আমি চেষ্টা করে দেখি কী করতে পারি—বাড়ি যান এখন—

তা সেবার সেই সেন-সাহেবের জন্যেই বিপদটা কেটে গিয়েছিল। সেন-সাহেবের জেরার জোরে সেবার এনকোয়ারীতে খালাস পেয়ে গেলেন তিনজনেই। ভূষণ বাইরে এসে সেন-সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলে।

বললে—হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ হুজুর, আপনার মঙ্গল হবে হুজুর, ভগবান আপনাকে অনেক দেবে হুজুর—

সেন-সাহেব অতি কষ্টে পা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন—ছাড় ছাড় পা ছাড় ভূষণ, পা ছাড়, আমি কে, আমি কেউ না—

ছোকরা সাহেব, কিন্তু বাপের বেটা বটে। সেন-সাহেবের কাছে যে গেছে, সেন-সাহেবকে যে ধরতে পেরেছে তেমন করে, সে আর খালি হাতে ফেরেনি।

সাহেব বটে সেন-সাহেব। সারা লাইনময় সেন-সাহেবের প্রশংসা। ওদিকে রাণাঘাট, বনগাঁ, শিলিগুড়ি, ঢাকা, ময়মনসিং থেকে শুরু করে শেয়ালদ'র সব স্টাফ একবাক্যে সেন-সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যিই সাহেবের বয়েস কম, এখনও বেশি দিনের চাকরি নয়। সামান্য ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিল হেড-আপিসে। কিন্তু দেখতে দেখতে একদিন ডি-টি-আই হয়ে গেল। রবিনসন সাহেবের বড় পেয়ারের ডি-টি-আই। যেখানেই রবিনসন সাহেব যাবে, সঙ্গে যাবে ডি-টি-আই সেন-সাহেব। রবিনসন সাহেব চলে যাবার পর সেই পোস্টে এল ঘোষাল-সাহেব। কিন্তু বেশি দিন টিকলো না ঘোষাল-সাহেব।

করালীবাবু বললেন—শুনেছি—

মজুমদারবাবু বললেন—শুনেছি—

—আর শুনেছেন সেই মাগীটার কাণ্ড? সেই যে সিঁদুর পরা, সেই ফরসা মতন মেয়েটা, আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল—তার কী কাণ্ড শুনেছেন?

মজুমদারবাবু বললেন—কই না, শুনিনি তো কিছু—

তা না-শুনেছেন তো শুনে আর কাজ নেই। পরে সবই শুনতে পাবেন, পরে সবই জানতে পারবেন। শুধু আজ বলে নয়, এমন ঘটনা চিরকালই ঘটে। চিরকাল ধরেই ঘটে আসছে। লাইনের একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্যন্ত সেই প্রসঙ্গই চলতে লাগলো কদিন ধরে। একদিন লোহা ইঞ্জিন-কেবিন-ওয়াগন লাইন ক্লিয়ারের মধ্যেও আবার রোমান্সের মশলার গন্ধে কেরানীজীবন মুখর হয়ে উঠলো। বেশ রসিয়ে রসিয়ে পান চিবোতে চিবোতে শেয়ালদ'র কন্ট্রোলরুমে, কেবিন-ঘরে, প্লাটফরমে আলোচনা চলতে লাগলো। তারপর সেই ঢেউ এসে পৌঁছলো একেবারে গড়িয়াহাট। লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি ঘরে। তখন সেকেন্ড নাইট ডিউটি করছে ভূষণ...

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক।

তা কোথায় গেল সেই ঘোষাল-সাহেব, আর কোথায় গেল সেই সে-সব দিন। রবিন্‌সন সাহেব গেছে, ঘোষাল-সাহেবও গেছে! এখন এতদিন পরে সেই জায়গায় এসেছে সেন-সাহেব। কতদিন সেন-সাহেব ঢাকা না শিলিগুড়ি কোথায় বদলি হয়ে গিয়েছিল। এখন এসেছে ডি-টি-এস হয়ে। এই এতদিন পরে।

হঠাৎ এতদিন পরে সেই সেন-সাহেবকে দেখে মজুমদারবাবু এগিয়ে এলেন।

বললেন—কী স্যার, কেউ নামছেন না কেন?

সেন-সাহেব বললেন—না, স্পেশ্যাল যাবে না আজ, জেনারেল ম্যানেজারের শরীর খারাপ,—আপ-গাড়ির লাইন ক্লিয়ার দিতে বলুন—

অভাবনীয় কাণ্ড! এমন কাণ্ড ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। স্পেশ্যাল ট্রেন ফিরে গেল আবার। আবার ঢিলে-ঢালা কাজ। সারা লাইনময় খবর চলে গেল টেলিফোনে। ডায়মণ্ডহারবার লক্ষ্মীকান্তপুর সর্বত্র। ট্রেন ক্যান্‌সেল্‌ড্‌ হয়ে গেছে। জেনারেল ম্যানেজারের অসুখ। আবার থার্টি থ্রি আপ এল। আবার

টুয়েন্টিওয়ান আপ এল, আবার নাইনটিন আপ এল। ডাউন ট্রেনও আসতে লাগলো পর পর। আবার গড়িয়ে চললো চাকা। ওয়াগন আর ইঞ্জিন, লাইন ক্লিয়ার আর শান্টিং। আবার মার্শেলিং ইয়ার্ডে শান্টিং ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি শুরু হলো—

বেলেঘাটা থেকে কোন এল কেবিনে—স্পেশ্যাল কী হলো হে—ছেড়েছে?

বালিগঞ্জ থেকে উত্তর এল—না হে, লাইন ক্লিয়ার দিতে হবে ডাউন স্পেশ্যালের—

—কেন?

—স্পেশ্যাল ক্যান্‌সেল্‌ড।

—দুত্তোর কলা-কচুপোড়া খেলে যা—

বলে ঘচাং করে লিভারটা টেনে দিলে গায়ের জোরে।

স্পেশ্যাল চলে গেছে অনেকক্ষণ! স্পেশ্যালের সঙ্গে অন্য সবাই-ই চলে গেছে। চীফ মেডিক্যাল অফিসার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার—কেউ বাকি নেই।

মজুমদারবাবু হঠাৎ দেখে অবাক।

—স্যার, আপনি? আপনি ফিরে যাননি?

সেন-সাহেব যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বালিগঞ্জ প্লাটফরমের একেবারে শেষ প্রান্তে একা একা দাঁড়িয়েছিলেন।

বললেন—না, আমার এদিকে একটা কাজ ছিল—

মজুমদারবাবু আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তারপর আর কিছু জানেন না তিনি। তাঁর ডিউটি শেষ হয়ে যাবার পর তিনি বাড়ি চলে গেছেন। পরে শুনলেন সব ঘটনাটা। শুনেই চমকে উঠলেন।

সেই অন্ধকার চালু প্লাটফরমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখন সেন-সাহেব হঠাৎ যেন নিজেকে গোপন করতে চাইলেন। যেন কেউ না দেখতে পায় তাঁকে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। ওদিকে ঢাকুরিয়া স্টেশনের ফেসিং পয়েন্টের কাছে কয়েকটা তীব্র আলোর বিন্দু জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলছে। হঠাৎ তিনি নেমে পড়লেন লাইনের ওপর। বারো বছর নয় তো—যেন সেদিন। পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন চিঠিটা রয়েছে। চিঠিটা সঙ্গেই রয়েছে তাঁর। হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ যেন সেদিনের ঘটনা। এই তো সেদিন। এত শিগগির সেন-সাহেব বড় হয়ে গেছেন! কোথায় ছিল সব! কোথায় ছিল সব লুকিয়ে আত্মগোপন-করে! ওপাশে একটা লাইট ইঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করে শান্টিং করছে। তাঁকে এই অবস্থায় দেখলে আজ ড্রাইভার-ফায়ারম্যানরাও অবাক হয়ে যাবে। সেন-সাহেব এখানে! এই বালিগঞ্জের স্টেশন-ইয়ার্ডের ভেতরে অন্ধকার রাত্তিরে তিনি এসেছেন কী করতে! কেউ বিশ্বাস করবে না। কেউও কেউ বুঝতে পারবে না। কে-ই বা বুঝেছে। কে-ই বা বুঝতে চেয়েছে। সংসারে কেউ কাউকে বুঝতে পারে না।

তাঁকে সবাই বলে সেন-সাহেব। সেন-সাহেব নামই হয়ে গেছে তাঁর। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সেই দীপু হয়ে গেল কিনা সেন-সাহেব। হো হো করে হাসতে ইচ্ছে হলো সেন-সাহেবের।

একটা জামার জন্যে মা কতদিন এর কাছে ওর কাছে ধর্না দিয়েছে। সেই লক্ষ্মীদি, সেই কিরণ, সেই নির্মল পালিত, সেই প্রাণমথবাবু, সেই বিন্তিদি, ছিটে-ফোঁটা,...সবাই যেন এসে ভিড় করে দাঁড়ালো তাঁর চোখের সামনে। বৃষ্টিটা থেমে এসেছে একটু। স্লিপারগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে। কী যে হলো। কেন যে এমন হলো! কোথায় সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে একদিন ট্রেনটা ছেড়েছিল—তারপর অনেক কয়লা অনেক স্টীম খরচ করে করে আজ এতদূর চালিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও যেন ট্রেনটা আর চলবে না। কেন স্টেশনে এসে লাইন-ক্লিয়ারটা হাতে নিয়েই ড্রাইভার থেমে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়িয়ে দিলেন সেন-সাহেব—

—দীপু।

এক নিমেষে চমকে উঠেছেন সেন-সাহেব। হঠাৎ কেউ যেন তাঁকে ডাকলো। এই যে, এই যে আমি লক্ষ্মীদি! তোমাদের কত টাকা, কত গয়না। আমরা যে গরীব, আমার মা যে রাঁধুনীগিরি করে চালায়, আমার যে বাবা নেই। আমি কি তোমাদের সঙ্গে মিশতে পারি! সেই কালীঘাট মন্দির থেকে শুরু করে এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত যেখানে যত বাড়ি দেখি, যত লোক দেখি আমরা সকলের চেয়ে গরীব। আমরা আর কিরণরা তাই তো তোমাদের কাছে যেতে ভয় করি লক্ষ্মীদি। তোমরা যদি বকো। তোমরা যদি আমাকে ঘেন্না করো! আমার বড় অভিমান জানো! আমি যেদিন পেট ভরে ভাত খেতে পাই না, সেদিন আমি কাউকে বলি না সে-কথা। কাউকে আমি বলতে পারি না। বলতে আমার লজ্জা করে। সেদিন আমি হাসিমুখে ইস্কুলে যাই। খিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করে। রাখালরা বড়লোক, ওদের বাড়ি থেকে চাকর আসে ওর জন্যে খাবার নিয়ে। একটা কাঁসার গ্লাসে ঢাকা দেওয়া গরম দুধ, আর একটা বাটিতে দুটো রসগোল্লা।

রাখাল বলতো—এই দীপু খাবি?

তার চাকরটা আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে দেখতো।

আমি বলতাম—না, আমার পেট ভর্তি—

তোমরাও কেউ জানতে না, পাড়ার লোকরাও কেউ জানতো না। শুধু জানতাম আমি আর আমার বিধবা মা। মনে আছে যেবার সেই প্রিন্স্‌-অব্‌-ওয়েলস্‌ এল কলকাতায়, ইস্কুলের প্রত্যেক ছেলেকে একটা করে কমলালেবু, একটা কদমা আর একটা ছোট্ট লাল-কাগজে ছাপা ইউনিয়ন-জ্যাক দিয়েছিল। তখনও তোমরা আসোনি লক্ষ্মীদি, তুমিও আসোনি, সতীও আসেনি। মনে আছে আমি সেই কমলালেবু আর কদমাটা খেতে পারিনি। লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম মাকে দেখাবার জন্যে। রাস্তায় লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। সে হঠাৎ আমাকে

এক চড় মেরে দুটোই কেড়ে নিলে।

বললে—দে, আমাকে দে—

আমি বলেছিলাম—বা রে, ওটা আমি মাকে দেখাব বলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি সে—

কিন্তু তার গায়ের জোরের সঙ্গে আমি পারিনি সেদিন। সে কেড়ে নিয়েছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গিয়েছিলাম। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়েছিল। বুঝিয়েছিল—সংসারে সবাই লক্ষ্মণ নয়, সংসারে ভালো লোকও আছে। এমন লোকও আছে যারা কেড়ে নেয় না, যারা দেয়। প্রাণ ভরে দেয়। দিয়েই যারা সুখ পায়। মা-ই বুঝিয়েছিল—বড় হতে চেষ্টা করো তুমি—তখন সকলে তোমায় ভালোবাসবে, সকলে তোমায় শ্রদ্ধা করবে। তা হলেই সুখ পাবে, শান্তি পাবে। সেই দিন থেকে কেবল বড় হতেই চেষ্টা করেছি, ভালো হতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু সুখ?

কিন্তু মা'র কথা তো একেবারে মিথ্যে হয় না। সেই লক্ষ্মণ একদিন আবার আমার কাছেই এসেছিল। তখন লক্ষ্মণের অনেক বয়েস হয়েছে। আমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল সে। আমি চাকরি দিয়েছিলাম তাকে। এখনও ডেসপ্যাচ সেকশানে কাজ করছে সে। আমাকে এখন সে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আমাকে সেন-সাহেব বলে ডাকে।

তারপর সেই অন্ধকার ভিজে স্লিপারগুলোর ওপর চলতে চলতে দীপংকরের সব মনে পড়তে লাগলো আবার। এই বালিগঞ্জ স্টেশন, এই ঢাকুরিয়া, এই সোনারপুর, কালিঘাট, বজবজ—এখানে সবাই তাকে সেন-সাহেব বলেই জানে। যখন সবাই সেলাম করে, নমস্কার করে, তখন হাসি পায়। একদিন ওই ঘোষাল-সাহেবের মত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের চণ্ডীবাবুরাও তাকে গেট-আউট বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

স্পেশ্যাল থেকে নামবার সময় অভয়ংকর বলেছিল—এখন কোথায় চললে সেন, এই বৃষ্টির মধ্যে?

সত্যি, এই বৃষ্টিটাই কেমন যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলে। সব যেন নিমেষে ওলট-প্যালট করে দিলে। অভয়ংকর, রামমূর্তি সোম, সবাই স্পেশ্যাল ট্রেনের সঙ্গে আবার বেলেঘাটায় ফিরে গেল। নেমে পড়লো শুধু এই সেন-সাহেব। আজ এতদিন পরে কলকাতায় এসেছে। সেই কলকাতা। একদিন এই কলকাতার নাড়ির সঙ্গে যেন জড়িয়ে গিয়েছিল সে। আবার এতদিন পরে সেই কলকাতাতেই সেন-সাহেব ফিরে এসেছে। সামনে আউটার-সিগন্যালের লাল আলোর বিন্দুগুলো যেন মিট্-মিট্ করে চাইছে তার দিকে। যেন কী ইঙ্গিত করছে। এ কী পাগলামি তার। একখানা ট্যাক্সি করে সারা কলকাতাটাই তো ঘুরে বেড়াতে পারতো। সঙ্গে টাকা রয়েছে। বাড়িতে কাশী তার জন্যে আজ অপেক্ষা করবে না। সবাই জানে সেন-সাহেব স্পেশ্যাল ট্রেনের সঙ্গে ডায়মণ্ড-হারবার গেছে, তারপর সেখান থেকে যাবে লক্ষ্মীকান্তপুর। তারপর কাল রাত্রের আগে বাড়ি ফিরবে না আর। তবে? তবে কেন সে এই অন্ধকারে ভিজে পিছল স্লিপারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে? কোথায় চলেছে?

পকেটে হাত দিয়ে আবার দেখলেন সেন-সাহেব। চিঠিটা রয়েছে। চিঠিটা সঙ্গেই রয়েছে তার।

দীপঙ্কর সেন। ডি সেন। সেন-সাহেব।

অনেকগুলো নাম তার। সেই কবে প্রিন্স্-অব্-ওয়েল্স্ এসেছিল কলকাতায়। কবে সেই উপলক্ষে কমলালেবু আর কদমা বিলিয়েছিল—আর আজ। আজ যেন এত বছর পরে আবার আস্তে আস্তে সেই পুরনো দিনে ফিরে গেছে। সেন-সাহেব আবার এক মুহূর্তে দীপঙ্কর সেন হয়ে গেছে।

হেড-মাস্টার সুরেশবাবু ক্লাসে এলেন। আর সঙ্গে এল একজন বেয়ারা। হাতে তার একটা ঝুড়ি। কমলালেবু আর কদমা ভর্তি।

সুরেশবাবু একটা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন—

—লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার।

লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার উঠে সামনে দাঁড়াতেই বেয়ারা তার হাতে একটা কমলালেবু আর একটা কদমা দিলে। বুকের পকেটে এঁটে দিলে ইউনিয়ন-জ্যাকটা।

তারপর ডাক হলো—নির্মলচন্দ্র পালিত—

তারপর—চারুচন্দ্র ধর—

তারপর—বিমানচাঁদ মিত্র—

এমনি করে করে অনেক নাম উঠলো। যারা মাইনে দিয়ে পড়ে তাদের সকলের নাম ডাকার পর, ফ্রি-স্টুডেন্টদের পালা। ফ্রি-স্টুডেন্ট দু'জন মাত্র। একজন কিরণ।

—কিরণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কিরণও গিয়ে কমলালেবু আর কদমা নিয়ে বুকে ইউনিয়ন-জ্যাক এঁটে চলে গেল।

শেষ মাত্র একজন বাকি।

—দীপঙ্কর সেন—

সব ছেলে হো হো করে হেসে উঠেছে।

হেড-মাস্টার গম্ভীর গলায় চীৎকার করে উঠেছেন—স্টপ্—

একটা হাই-বেঞ্চির পায়ায় চটিটা লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ইনফ্যান্ট ক্লাসের ফ্রি-স্টুডেন্ট দীপঙ্কর সেন। রোল নাম্বার—এইটিন।

হেড-মাস্টার সুরেশবাবুর সঙ্গে সেই-ই তার প্রথম মুখোমুখি কথা বলা। ধরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—লেগেছে তোমার?

লেগেছিল অবশ্য খুব। কিন্তু মুখে বললে—না স্যার—

তারপর হাত বাড়িয়ে কমলালেবু আর কদমাটা নিয়ে চলে এল। আর

তারপরে রাস্তায় সে-দুটোও কেড়ে নিলে লক্ষ্মণ।

সেদিন ভালোই হয়েছিল যে পড়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। রাজার প্রসাদ নিতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিল। রাজ-প্রসাদ কি সকলের ভাগ্যে সহজে জোটে!

আর সেই নাম্বার টু। নির্মলচন্দ্র পালিত। ক্লাসের ফার্স্ট বয়!

নির্মলচন্দ্র পালিত ছিল হরিশ মুখার্জি রোডের ছেলে। ঠিক পুলিসের থানাটার সামনে বাড়ি। বিরাট বাড়ি। বাবা ছিল ব্যারিস্টার পালিত। কারো সঙ্গে মিশতো না। ইস্কুলের ছুটির সময় বাড়ির দারোয়ান এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। দারোয়ান নির্মলকে আগলে-আগলে নিয়ে যেত। কারোর সঙ্গে মিশতে দিত না। বিকেলবেলা বোনেদের সঙ্গে মোটরে চড়ে বেড়াতে যেত। হয় গড়ের মাঠের দিকে. নয়তো ঘোড়-দৌড়ের মাঠের দিকে। ইস্কুলে প্রাইজ পেত—

কতদিন তার সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছেও হয়েছিল।

কিরণ বলতো—ওরা খুব বড়লোক, জানিস দীপু—একদিন ওদের বাড়ি যাবি?

দীপঙ্কর বলতো—যদি ওর বাবা বকে?

কিরণ বলতো—যদি বকে তো বলবো নির্মলের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ি—

বিকেলবেলা কতদিন বেড়াতে বেড়াতে কিরণের হাত ধরে সামনের ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছে দীপঙ্কর। সামনে একজন দারোয়ান বসে আছে। কাঁচের জানালার ভেতরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। ওর বাবা সেখানে বসে বসে লেখা-পড়া করতো। দোতলা থেকে অর্গ্যান বাজাবার শব্দ আসতো। একটা মেয়ে অর্গ্যানের সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইত। মনে হতো ওদের অনেক টাকা, ওরা খুব সুখী। তারপর আস্তে আস্তে আবার দুজনেই ফিরে আসতো পাথরপটি ধরে সোজা ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে।

ক্লাসে দেখা হলে কিরণ বলতো—এই, তোদের বাড়ির সামনে আমি আর দীপু কাল গিয়েছিলাম—জানিস—

নির্মল জিজ্ঞেস করতো—কেন? কী করতে গিয়েছিলি?

কিরণ বলতো—এমনি তোর সঙ্গে দেখা করতে—

তারপর আবার বলতো—দেখা হলে তিনজনে বেশ বেড়াতম. আমরা রোজ বেড়াই, আমি আর দীপু—বেড়াতে বেড়াতে ভবানীপুরে হরিশ পার্কে চলে যাই, সেখান থেকে পোড়াবাজার, তুই একদিন যাবি আমাদের সঙ্গে?

নির্মল বলতো—না ভাই, আমার বাবা বকবে—

নির্মলের সঙ্গে আর কখনও ভাব করা হয়নি। সেভেন্থ্ ক্লাসেই সে চলে গেল সাউথ-সাবার্বানে। সত্যিই আর দেখা হয়নি। শুধু খবর পেয়েছে সেখানে গিয়েও সে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে। ফার্স্ট ছাড়া আর কখনও কিছু হয়নি সে জীবনে। রাজ-প্রসাদ তার জন্যেই অপেক্ষা করছে—এই কথাটাই সবাই বিশ্বাস করেছে। ইস্কুলের ছাত্ররাও বিশ্বাস করেছে, ইস্কুলের মাস্টাররাও বিশ্বাস করেছে।

তার বাবাও বিশ্বাস করেছে, তার বোনরাও হয়ত বিশ্বাস করেছে—

কিন্তু রাজ-প্রসাদ সে পায়নি!

সেই নির্মল পালিতই যে আবার তার জীবনের সঙ্গে একদিন জড়িয়ে পড়বে কে জানতো! সে অনেকদিন পরের কথা।

তখন দীপু ডি-টি-এস্ হয়েছে রেলের। ইয়ার্ডটা দেখে বেড়াচ্ছে। বিকেল বেলা। টোয়েণ্টি-ওয়ান আপ এসে গেছে। প্লাটফরমের ওপর ভীষণ ভিড়। লোকে লোকারণ্য। হঠাৎ একটা গোলমাল উঠলো। হৈ-চৈ, হাতাহাতি, মারামারি হবার উপক্রম।

কাছে যেতেই দেখে একটা লোককে ধরেছেন টিকিট-কালেক্টর দত্তবাবু। এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ। লোকটা টিকিট কাটেনি।

দত্তবাবু সেন-সাহেবকে দেখেই বললেন—দেখুন না স্যার, রোজ আসবে বিনাটিকিটে আবার চোটপাট—

সেন-সাহেব বললেন—কেন, চোটপাট কিসের, জি-আর-পিকে দিয়ে দিন না—

দত্তবাবু বললেন—দেখুন না, ভদ্রলোকের ছেলে এমনি রোজ আসে, প্রথম প্রথম কিছু বলিনি, আজ টিকিট চাইতেই একেবারে মারতে এসেছে—

লোকটার চেহারাটার দিকে আর একবার ভালো করে দেখলেন সেন-সাহেব। বললেন—কেন, টিকিট কাটেন না কেন? জানেন, টিকিট না কেটে ট্রেনে চড়া অপরাধ—

লোকটা বলে উঠলো—ওঃ ভারি নবাব এসেছে একেবারে, নবাবি তো সকলের ঘুচিয়ে দিয়েছি, এবার তোমার পালা, এবার তোমার পালা, যত কিছু বলি না বলে! দাঁড়াও, দিচ্ছি লাটসাহেবকে বলে তোমার চাকরি-করা ঘুচিয়ে—

তারপর পকেট থেকে নোট-বই বার করলে একটা।

পেন্সিল নিয়ে বললে—বল্, কী নাম তোর! কোথায় থাকিস, কী চাকরি করিস। কত মাইনে পাস—বাবার নাম কী?

দীপঙ্কর তো অবাক শুনে।

আবার লোকটা চীৎকার করে উঠলো—বল্—

দীপঙ্কর বোধ হয় রেগে একটা কাণ্ডই করে বসতো।

দত্তবাবুই হঠাৎ বললেন—দেখছেন তো, অথচ খুব বড়লোকের ছেলে স্যার—ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে—

ব্যারিস্টার পালিত! কোন্ ব্যারিস্টার পালিত! হরিশ মুখার্জি রোডের ব্যারিস্টার পালিত? দীপঙ্কর সেন যেন তখন সামনে ভূত দেখেছে।

বললে—তুমি ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে? তোমার নাম নির্মলচন্দ্র পালিত? হরিশ মুখার্জি রোডে তোমাদের বাড়ি ছিল? কী হয়েছে তোমার?

নির্মলের চোখ দুটো তখন লাল জবাফুলের মত।

নির্মল পালিত চীৎকার করে উঠলো—আবার ইয়ার্কি হচ্ছে! কী হয়েছে আমার! দেব লাটসাহেবকে বলে সকলকে ধরিয়ে, যত সব চোর জুটেছে। সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বিপিন পালকে ধরিয়ে দিয়েছি, এবার তোদেরও ধরিয়ে দেব—কাউকে ছাড়বো না—ওই গান্ধী বেটাকেও ধরাবো—বল্, তোর নাম বল্—

বলে খোলা নোটবুকে পেন্সিল উঁচিয়ে রইল।

দত্তবাবু বললেন—দেখলেন তো স্যার। বদ্ধ পাগল সেজেছে, টিকিট ফাঁকি দেবার মতলব—

সেদিন সেন-সাহেব নির্মলকে ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু বার বার মনে হয়েছিল এ কেমন করে হয়! এমন তো হবার কথা ছিল না। সেদিন তো এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি! সেদিন সেই ইনফ্যান্ট্ ক্লাসে কমলালেবু আর কদমা আর ইউনিয়ন-জ্যাক নেবার সময় সে তো দীপঙ্করের মত বেঞ্চির পায়ায় লেগে হোঁচট খায়নি। তবে রাজ-প্রসাদ পেলে না কেন নির্মল!

স্লিপারের ওপর পা পেতে পেতে চলবার সময় হঠাৎ মনে হলো যেন ভূমি-কম্প হচ্ছে। যেন মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কবেকার এই মাটি, কবেকার এই স্লিপার। কবে কোন্ বন থেকে কাঠ কেটে সাপ্লাই করেছে কোন্ কন্ট্রাক্টর। কবে কোন্ স্লিপার-কন্ট্রোলার ছেনির দাগ দিয়ে মার্কা মেরে পাস করে দিয়েছে! তবু এতদিন পরে আবার কাঁপে কেন! তবে কি নির্মল পালিত ঠিক কথাই বলেছে! সব চোর, সব ফাঁকিবাজ!

অনেকদিন আগে একবার এই এখানেই, এই কেবিনটার কাছেই একটা গ্যাং-ম্যান কাটা পড়েছিল। সেদিনও এনকোয়ারি করতে এসেছিলেন সেন-সাহেব। আজ এখন এই রাত্রে যেন আবার এনকোয়ারি করতেই বেরিয়েছে দীপঙ্কর। সমস্ত এনকোয়ারি হবে। জেরায় জেরায় সব ফাঁস করে দেবে! সব ফাঁকি ধরে ফেলবে আজ। কোথাও কিছু গোপন থাকবে না। আসামীকে খুঁজে বার করতেই যেন বেরিয়েছে আজ সে। এই বালিগঞ্জ, এই গড়িয়াহাট, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, এই ভবানীপুর, কালিঘাট, খিদিরপুর—কেউ বাদ যাবে না। সকলের বিচার হবে। এই কলকাতারও বিচার করবে যেন দীপঙ্কর সেন। ডি-টি-এস ডি সেন। সেন-সাহেব। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে যেদিন লর্ড ওয়েলেসলী প্রথম কমিটি বসালেন—সেই দিন থেকে জবানবন্দী চাই সকলের। যেদিন থেকে এই কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি হলো। লটারি হলো। লটারির টাকায় রাস্তা ঘাট বাজার হলো। সেই দিন থেকে। তখন কি এই বালিগঞ্জ স্টেশন ছিল? এই বেলেঘাটা, এই শেয়ালদা, এই হাওড়া? তখন কি রেল-লাইন হয়েছিল! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা থেকে সিমলায় গিয়েছিলেন হাঁটা-পথে। সময় লেগেছিল সাত মাস। সনাতনবাবুর এ-সব তথ্য মুখস্থ! মুখে মুখে কত কথা বলেন।

আর আশ্চর্য লোক বটে সনাতনবাবু।

সনাতনবাবু বলেন—আপনারা রেলে চাকরি করেন, আমি চাকরি না-করেও আপনাদের চেয়ে দেখছি বেশি জানি—

যখনি গেছে দীপঙ্কর তখনি দেখেছে সনাতনবাবুর মুখে কোনও বিকার নেই। যেন হলেও চলে, না-হলেও চলে। এ সংসারে কিছুরই যেন প্রয়োজন নেই তাঁর।

সতী বলতো—তুমি জানো না দীপু, ওঁর সঙ্গে কথা বলে শুধু সময় নষ্ট—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু উনি যে কথাগুলো বলেন, সেগুলোতে তো যুক্তি আছে—

সতী বলতো—ওঁর সঙ্গে একসঙ্গে ঘরকন্না যে কী তা তুমি বুঝবে না—

—কিন্তু ঘর তো করতেই হবে তোমাকে।

সতী বলতো—আমি অনেক পাপ করেছি দীপঙ্কর, তাই ওঁর সঙ্গেই একদিন আমাকে ঘর করতে হয়েছে—

—অমন কথা বলো না তুমি।

সতী কাঁদতো।

বলতো—তোমার কাছেও যদি না বলি তো কার কাছে বলবো বলো, কে শুনবে?

একদিন, অনেকদিন আগে ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে দীপঙ্কর প্রথম যখন চোখ মেলে দেখেছিল, তখন চারিদিকে শুধু অভাব-অভিযোগই তার নজরে পড়েছিল। দেখেছিল সমস্ত মানুষের বিরাট অভিযোগ আর অভাব-গুলো যেন মুখব্যাদান করে আছে বহুদিন ধরে। ভেবেছিল সকলের সব কামনা-বাসনা সব অভাব-অভিযোগ একদিন মিটবে হয়ত। ভেবেছিল মানুষের যারা নেতা, মানুষের যারা ভাগ্যবিধাতা, তারা হয়ত একদিন তার প্রতিকার করবে। তারা রাজা, তারা মন্ত্রী, তারা জজ, তারা ম্যাজিস্ট্রেট। তাদের হাতে একদিন মানুষ তাদের ভাগ্যের সব ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। তাদের ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করবার জন্যে তাদের মাথায় তুলে রেখেছিল। তারপর একটার পর একটা যুগ এসেছে আর যারা বলবান তারা আরো বলবান হয়েছে, আর যারা দুর্বল তারা আরো দুর্বল হয়েছে। দীপঙ্কর দেখেছে, শুধু তাদের জেনারেল ম্যানেজারই নয়, শুধু চীফ মেডিক্যাল অফিসার, শুধু চীফ ইঞ্জিনীয়ারই নয়, মানুষের যারা ভাগ্যবিধাতা শুধু তারাই নয়, ওই সনাতনবাবু, ওই মজুমদারবাবু, ওই লক্ষ্মণ সরকার, ওই নির্মল পালিত, চণ্ডীবাবু, অঘোরদাদু, হেড-মাস্টার থেকে শুরু করে ওই কেবিনম্যান কুরালী সরকার, ওই টিকিট কালেক্টর দত্তবাবু, ওই গেটম্যান ভূষণ—সবাই-ই যেন কোথায় অপরাধী! আর শুধু কি তারাই, আরো আছে। ওই দিল্লীতে যে সাহেবরা সিংহাসনে বসে

আছে, ওই গভর্নরস্‌ হাউসে যারা গদীতে বসে আছে, ওরাও অপরাধী। একজন লোকও যদি না-খেতে পেয়ে মারা যায়—তাহলে সমস্ত দেশের লোকই তো অপরাধী। ও সনাতনবাবু বললে কী হবে, ওই জন্যেই তো জেনারেল ম্যানেজারের অসুখ হলে স্পেশ্যাল ট্রেন ক্যানসেলড্‌ হয়ে যায়, ওই জন্যেই পোষাকুকুরকে সাপে কামড়ালে ডি-টি-এস দেশে ফিরে যায়, ওই জন্যেই প্রিন্স্‌-অব্‌ ওয়েল্‌স্‌ এখানে এলে ছেলেদের কমলালেবু আর কদমা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়, আর ওই জন্যেই তো ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত পাগল হয়ে যায়—ওদের জন্যেই তো......

হঠাৎ দীপঙ্কর কেমন যেন সচেতন হয়ে উঠলো।

এখন ক'টা রাত। সামনেই যেন একটা ডাউন ট্রেন আসছে। সেভেন্টিন্‌ ডাউন নাকি! এখন ক'টা বেজেছে? এত সকাল-সকাল তো সেভেনটিন্‌ ডাউন আসে না। রিস্টওয়াচটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে দীপঙ্কর। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না। চারিদিকে অতল অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই দূরে, অনেকদূরে একটা হেড্‌-লাইট দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের! সেভেন্টিন্‌ ডাউন! এত সকাল-সকাল আসছে আজ। এই ট্রেনটাই বালিগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোবার কথা কাল ভোর ছ'টার সময়, হঠাৎ সেটা বারো ঘণ্টা আগে এসে পড়লো নাকি!

কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেল দীপঙ্কর। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের ইনফ্যান্ট ক্লাশের ফ্রি-স্টুডেন্ট্‌ দীপঙ্কর সেন, রোল নাম্বার এইটিন্‌। সেদিনও ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে কিরণের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সে এখানে এসেছে। সেদিন টালিগঞ্জের সেই লোহার পুলটার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে আছে দেখতো—কেমন করে রেলগাড়ি চলে। কেমন করে হেড্‌-লাইট জ্বালিয়ে হু হু করে রেলগাড়ি ছুটে আসে। তারপরে কতবার রেলগাড়ি দেখেছে, রেলেতেই চাকরি করছে—ট্রেনে চড়েছে, ব্রেকভ্যানে চড়েছে, ইঞ্জিনে চড়েছে। কোনও তফাৎ নেই। কিন্তু আজ যেন এ-সেভেনটিন ডাউন অন্যরকম। মনে হলো, ও যেন উল্কাপিণ্ডের মত তার দিকেই ছুটে আসছে একদৃষ্টে। উনিশ শো বারো সালের আঠারোই মার্চ এই সেভেনটিন ডাউন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে একদিন যাত্রা শুরু করেছিল আর এতদিন বাদে এই এখন এই এত রাত্রে বুঝি এখানে এসে পৌঁছলো। অনেক লাঞ্ছনা, অনেক গঞ্জনা, অনেক পরিশ্রান্তি অতিক্রম করে এসেছে—অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি এড়িয়ে এতদিনে এসে পৌঁছেছে। সেই লর্ড ডালহৌসী, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড, লর্ড লিটন, লর্ড রেডিং পেরিয়ে একেবারে বর্তমানে। এই গড়িয়াহাটার লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটিঘরের একেবারে দরজায়—

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো গুমটিঘরের দেয়ালটায় ঠেস্‌ দিয়ে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে না? অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু আবছা-আবছা বোঝা যায়, একজন মানুষের ছায়ামূর্তি। আস্তে আস্তে ট্রেনটার দিকে মুখ করে

দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সেভেন্টিন ডাউন আরো কাছে এসে পড়লো। আরো জোরে শব্দ হচ্ছে। ইঞ্জিনের আর চাকার শব্দ। আর পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করেছে। তারপর সেভেন্টিন ডাউন আরো কাছে এসে পড়লো। আরো কাছে। আলোয় আলো হয়ে গেল জায়গাটা। গুমটিঘরের দেয়ালটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে-আলোয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা যেন দেয়াল ছেড়ে-ব্যালাস্ট্‌ পার হয়ে লাইনের ওপরে এসে দাঁড়ালো—

—কে?

এক মুহূর্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো আকাশে।

—কে? কে?

ঠিক সতীর মতনই চেহারা। ঠিক সতীর মতনই শাড়ি পরা। যে-শাড়িটা এই কিছুদিন আগেই কিনে দিয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু সতী কেন আসতে যাবে এখানে, এত রাত্রে! তবে কি লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদিই বা কেন এতদিন পরে আসতে যাবে এখানে?

—কে ওখানে? কে? সরে যাও—সরে যাও—

ছায়ামূর্তিটা মুখ ফেরালো। মুখ ফেরাতেই চেহারাটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে দীপঙ্কর।

—সরে যাও—কে? কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেছে দীপঙ্কর। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না। ট্রেনটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। আর সময় নেই। ব্যালাস্টের ওপর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে দীপঙ্কর—

—সরে যাও, ওগো সরে যাও—

আর সঙ্গে সঙ্গে সেভেনটিন ডাউন হুড়মুড় করে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

সাউথ কেবিনে টেলিফোন বেজে উঠলো।

করালীবাবু ছিলেন সেকেন্ড্‌ নাইট ডিউটিতে। সেভেনটিন্‌ ডাউন্‌ চলে গেলেই একটু ফাঁকা। তখন একটু চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে নেবেন ভেবেছিলেন। রিসিভারটা তুলে বললেন—আবার কী হলো? জ্বালালে দেখছি—

ওপাশ থেকে ভূষণ বললে—হুজুর অ্যাক্‌সিডেন্‌...

লাফিয়ে উঠেছেন করালীবাবু।

—বলিস কী, অ্যাক্‌সিডেন্ট? কিসের অ্যাক্‌সিডেন্ট? কার অ্যাক্‌সিডেন্ট?

—হুজুর, সেভেন্টিন্‌ ডাউন.....

—নাম ?

নামটা দরখাস্তের ওপর লেখা রয়েছে, তবু ভদ্রলোক নাম জিজ্ঞেস করলে।

—দীপঙ্কর সেন।

—কী নাম বললেন ?

কেরানীটি যেন একটু বিরক্ত হলো। একবার আপাদ-মস্তক দেখে নিলে।

মুখ ফিরিয়ে পাশের একজনকে বললে—শুনলে হে নামের বাহার, নাম নেই গোত্তর নেই, ট্যাম্‌গোপালের নাতি! বাপ-মা আর নাম পেলে না, খুঁজে খুঁজে এমন বিদ্‌ঘুটে নাম রাখে এক-একটা—তা যাক্‌গে, বানান কী ?

—ডি, আই, পি—এ......

—থাক, আর বলতে হবে না—বলে খস্‌ খস্‌ করে নামটা লিখলে।

বললে—ঠিকানা ?

দীপঙ্কর বললে—উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, পোস্ট কালিঘাট—

লোকটা সব লিখে নিলে। আপিসের কেতা-কানুন সব নিয়ম মাফিক করতে হবে।

—কত বয়েস হলো ? ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট আছে ?

লোকটার নানা বায়নাক্কা। অবশ্য চাকরি হয়েছিল সেদিন। ফরসা জামা-কাপড় পরে এসেছিল দীপঙ্কর। প্রথম দিন, একটু ভয়-ভয় করছিল বৈ কি! বিরাট লাল বাড়িখানার চেহারা দেখেই কেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়েছিল। ফরম্‌ ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তবু দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ। এখন ভাবলে খানিকটা হাসি পায়। একেবারে সবচেয়ে নিচু ধাপের চাকরি। তেত্রিশ টাকা মাইনে। অনেক টাকা! সব খরচা বাদ দিলেও পাঁচ সাত টাকা বাঁচে। বাড়ি ভাড়াটা লাগে না, এই যা রক্ষে।

—কার লোক আপনি ?

এতক্ষণে ভদ্রলোক একটু যেন ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলে।

—কার লোক আপনি ? রবিনসন্‌ সাহেবের ?

ভদ্রলোক কেমন হেসে উঠেছিল, অমায়িক ভঙ্গিতে।

—আরে বলুন না মশাই, আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেলেন, এখন আর বলতে দোষ কী! রবিনসন্‌ সাহেব পেছনে রয়েছে আর তেত্রিশ টাকায় ঢুকলেন ? সাহেবকে বলে পঞ্চাশ টাকায় স্টার্টিংটা করে নিতে পারলেন না ?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, রবিনসন্‌ সাহেবকে আমি চিনি না, নৃপেনবাবুকে চেনেন, নৃপেনবাবু আমায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন—

নৃপেনবাবু! নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের নৃপেনবাবু। নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁকে রোজই দেখা যেত রাস্তা দিয়ে আপিস যেতে। শীতের দিনে কালো গলাবন্ধ কোট আর লম্বা ফুল-প্যান্ট্‌ পরা। গ্রীষ্মকালে সুতীর জামা। হাতে একটা অ্যালুমিনিয়মের টিফিন কৌটো। হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতেন। সোজা গলি দিয়ে বেরিয়ে হাজরা রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে যেতেন আর দেখতে পাওয়া যেত না। এক একদিন দেখা যেত বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছেন। তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

প্রথমে মা-ই একদিন নিয়ে গিয়েছিল নৃপেনবাবুর কাছে।

নৃপেনবাবু বলেছিলেন—বি এ পাশ করেছ ?

দীপঙ্কর সবিনয়ে বলেছিল—হ্যাঁ—

মা তাড়াতাড়ি বলেছিল—প্রণাম করো, প্রণাম করো ওঁকে—

কথাটা আগেই শিখিয়ে দিয়েছিল মা। কিন্তু মনে ছিল না। দীপঙ্কর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাল। নৃপেনবাবুর পা দুটো ছিল একটা তক্তপোশ আর একটা টেবিলের সরু ফাঁকের মধ্যে। সেই তক্তপোশের ওপরে বসেই তিনি একটা গামছা পরে তেল মাখছিলেন। ডান হাতটা অতি কষ্টে ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে পায়ের ধুলো নেওয়া গিয়েছিল।

বললেন—থাক্‌ থাক্‌—

তারপর বললেন—এই সেদিন একটা এম-এ পাশ ছোকরা আমার কাছে এসেছিল কাজের জন্যে, বুঝলে দীপুর মা, তা বললাম তাকে, এম-এ তো পাশ করেছ বাপু কিন্তু তোমার দরখাস্তে যে চারটে ভুল ইংরিজী লিখেছ, বলে ভুল দেখিয়ে দিলাম. দেখে ছোকরা........তা যাক্‌গে, স্বদেশী-টদেশী করো না তো বাপু তুমি ?

মা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই খালি পিঠের উপর চড়াৎ চড়াৎ করে তেল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন—রবিনসন্‌ সাহেব যদি জানতে পারে তো শেষে আমার নিজের চাকরি নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে যাবে—স্বদেশী ভালো জিনিস, তবে গরীব লোকের ও-সব করলে তো পেট ভরবে না হে, স্বদেশী করতে কি আমারই সাধ যায় না ? ওসব ওদের পোষায়, ওই আনী বেসান্ট, তিলক, সি-আর-দাশ, মতিলাল নেহরুদের মত লোকদের পোষায়—ওরা হলো বড়লোকের ছেলে,...তা যাকগে, তাহলে ওই কথাই রইল—

বলে তিনি ভেতরের দিকে চলে যাবার উপক্রম করলেন।

মা এগিয়ে গিয়ে বললে—তাহলে—

নৃপেনবাবু বললেন—এনেছ ? তা এখন তো আমার আবার তেল-হাত—

মা বললে—তাহলে ভেতরে বৌদিকে দিয়ে আসি—

—না না, আচ্ছা ওইখানেই রাখো—বলে তক্তপোশের ওপরটা দেখিয়ে দিলেন।

দীপঙ্কর দেখলে—মা দু'টো দশ টাকার আর একটা পাঁচ টাকার নোট তক্তপোশের ওপর রেখে দিলে।

নৃপেনবাবু নোট-ক'খানা দেখে বললেন—কত? পঁচিশ?

মা বললে—হ্যাঁ, আপনি তো পঁচিশ টাকার কথাই বলেছিলেন—

—এই দেখ, পঁচিশ টাকা তো তোমাকে আমি গেল-বছর বলেছিলাম! তা তখন এলে পঁচিশ টাকাতেই হয়ে যেত, এখন যে বেটারা সব আরো সায়েনা হয়ে গিয়েছে। চাপরাশিদের আগে দু' টাকা করে দিলে হতো, এখন সব পাঁচ টাকা করে রেট করে দিয়েছে—আমি কী করবো?

মা বললে—আমি তো আর টাকা আনিনি দাদা—

নৃপেনবাবু বললেন—এই দেখ, একটা চাকরি খালি ছিল, এখন দিলে হতে পারতো, পরে তো আর ভেকেন্সি হবে না—

—তাহলে কত দিতে হবে?

নৃপেনবাবু বললেন—ওই পুরোপুরি এক মাসের মাইনে, তেত্রিশ টাকা।

—তেত্রিশ টাকা!

মা যেন হতাশ হয়ে পড়েছিল সেদিন। সোজাসুজি কাতর-দৃষ্টিতে নৃপেনবাবুর দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

নৃপেনবাবু বললেন—তা তুমি কি ভাবছো টাকাটা আমি নিজে নিচ্ছি!

মা বললে—না না তা ভাববো কেন—

নৃপেনবাবু বললেন—না, তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন টাকাটা আমি আমার নিজের পকেটে পুরছি! তবে তোমাকে হিসেব দিই, দু'টো চাপরাশি দশ টাকা, এস্টাব্লিশমেন্ট ক্লার্ক পাঁচ টাকা—কত হলো? পনেরো। ডাক্তারকে দিতে হবে দশ, ডাক্তারের চাপরাশিকে তিন, আর কম্পাউন্ডার পাঁচ। কত হলো হিসেব করো—ঠিক তেত্রিশ,—

মার মুখ দিয়ে তখনও কোনও কথা বেরোচ্ছে না।

নৃপেনবাবু বলতে লাগলেন—তারপরে আমার ডিপার্টমেন্টের চাপরাশি আছে, বাবুরা আছে, তাদের পান খাওয়ার জন্যেও লাগবে মোটামুটি আরো তিন টাকা, তা সে আমি না-হয় নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দেব, তার জন্যে আর তোমার ভাবতে হবে না—

তারপর তেলের বাটিটা নিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন—

মা বললে—তাহলে দাদা, আমি যত শিগ্গির পারি টাকাটা যোগাড় করে আনবো, আপনি দেখবেন চাকরিটা যেন খালি থাকে—

নৃপেনবাবু হাসলেন। বললেন—সে আর বলতে হবে না, কী কষ্ট করে তুমি

ছেলে মানুষ করেছ তা আর জানি না! কিন্তু আমি জানলে কী হবে, সাহেব-বেটারা তো বুঝবে না তা—

মা আসবার সময় বললে—তাহলে টাকাটা পুরো করেই আনব দাদা—

—হ্যাঁ এনো, তোমাকে তো হিসেব দিয়ে দিলুম, আর সেইদিন তুমিও দরখাস্ত একখানা এনো ওমনি—

দীপঙ্কর বললে—আসবো মামাবাবু—

চলেই আসছিল দীপঙ্কর। কিন্তু মা ইঙ্গিত করতেই আবার গিয়ে তেল-মাখা পা দু'টো ছুঁয়ে মাথায় ঠেকালো।

বাইরে এসে মা খুব রাগ করেছিল।

বলেছিল—এত করে তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম, তবু তোর একটু হুঁশ হয় না কেন, বুড়ো মানুষের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে কী এমন অপমান হয়! তাহলে আমি এই চিরকাল এমনি করে পরের বাড়ি ভাত রেঁধে বেড়াই, আর তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও—

আর শুধু নৃপেনবাবুই নয়। কোথায় কোথায় কত লোককে গিয়ে ধরতো মা। কোথায় কোন্ পাড়ায় কে পোর্ট কমিশনার্সে কাজ করে, কে রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করে, কে ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, কে মার্টিন বার্নের আপিসে, কে আরো কত অসংখ্য জায়গায়। সেই ইস্কুলে পড়ার সময় থেকে এইরকম শুরু হয়েছে। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলে এইরকম করে ভর্তি হয়েছে, তারপর কালিঘাট হাই ইস্কুলে। মা'র তদ্বির-তদারকে কোথাও মাইনে দিতে হয়নি তাকে। সব জায়গাতেই ফ্রি। ফ্রি স্টুডেন্ট। এই প্রথম চাকরির ক্ষেত্রে এসেই সব জায়গা থেকে এক সঙ্গে টাকার কথা উঠলো।

কালিঘাট ইস্কুলে মাত্র এক বছর পড়েছিল। তারপরেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল। ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলেই বলতে গেলে প্রথম হাতে খড়ি। মা একদিন সেখানেও এমনি করে নিয়ে গিয়েছিল।

হেড-মাস্টার প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—কী নাম?

কত আর বয়েস তখন! কাকে বলে স্কুল, কাকে বলে আপিস, কাকে বলে কলেজ, কাকে বলে চাকরি, কাকে বলে ইন্ডিয়া, কাকে বলে বেঙ্গল, কিছুই তখন জানতো না দীপঙ্কর।

মা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বললে—বলো, নাম বলো তোমার, বলো?

দীপঙ্কর বলেছিল—শ্রীমান দীপঙ্কর সেন—

—বাবার নাম?

দীপঙ্কর বলেছিল—ঈশ্বর হরগোবিন্দ সেন।

—দেশ কোথায়?

দীপঙ্কর বলেছিল—হুগলী জেলার বাটরা গ্রামে—

—এখানকার ঠিকানা কী?

দীপঙ্কর বলেছিল—উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, পোস্টাপিস কালিঘাট।

সেই প্রাণমথবাবুর কথা বহুদিন পর্যন্ত মনে পড়তো দীপঙ্করের। বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ। খদ্দর পরতেন আজীবন। পায়ে একটা সু-জুতো। গোড়ালির দিকটা দুমড়ে চটিজুতোর মতন করে পরতেন। মোটা সোটা মানুষ, এলোমেলো চুল, আলুথালু পোশাক, পান চিবোতেন দিনরাত।

খুব ছোটবেলায় মনে আছে এক-একদিন ইস্কুল ছুটি হয়ে যেত। কেন ছুটি হতো বোঝা যেত না। সকাল বেলা ইস্কুলে যেতেই যতীন দপ্তরী বলতো—আজ ইস্কুল হবে না, আজ ছুটি তোমাদের—

ইস্কুল হতো না বটে কিন্তু একেবারে তখুনি চলে আসাও যেত না।

সে-রকম ছুটি জীবনে অনেক এসেছে দীপঙ্করের কিন্তু তেমন আনন্দ কখনও হয়নি আর।

যতীন দপ্তরী অনেকগুলো প্যাকাটি এনে দিত সকলের হাতে। সকলে এক-একটা প্যাকাটি নিয়ে দাঁড়াত সার দিয়ে। ড্রিল-মাস্টার রোহিণীবাবু ইস্কুলের বাক্স থেকে অনেকগুলো তিন-রঙা ফ্ল্যাগ্ বার করে আনতেন। যতীন দপ্তরী সকলের প্যাকাটিতে একটা করে ফ্ল্যাগ পরিয়ে দিয়ে যেত। তারপর সবাই দু' সার হয়ে পাশাপাশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিণীবাবু চীৎকার করে বলতেন—সবাই রেডি হয়েছ তো—

সবাই রেডি হতো।

তারপর বজ্র-গম্ভীর গলায় রোহিণীবাবু চীৎকার করতেন—অ্যাটেন—শন্—

সকলেরই পা সোজা, বুক চিতিয়ে দাঁড়াত সবাই—

—রাইট টার্ন!

সবাই ডানদিকে ফিরতো।

—লেফট্ টার্ন।

এমনি অনেকক্ষণ ধরে ড্রিল চলতো ইস্কুলের সামনের উঠোনে। কিন্তু কষ্ট হতো না কারো। সবাই জানতো খানিক পরেই পুলিস আসবে, দারোগা আসবে। আর তার একটু পরেই ছুটি।

সত্যি সত্যিই একটু পরে পুলিস-দারোগা এসে পৌঁছুতো। তারা সবাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে হেড-মাস্টারের ঘরের দিকে চলে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীবাবু চীৎকার করতেন—কুইক মার্চ—

আর প্রায় দেড়শো ছেলে হাতে ফ্ল্যাগ উঁচু করে পুলিস-দারোগার পেছন-পেছন সোজা গিয়ে দোতলায় উঠতো।

ততক্ষণে যতীন দপ্তরী ফুলের মালা নিয়ে তৈরী।

রোহিণীবাবু চীৎকার করতেন—বন্দে-মাতরম—

সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের দেড়শো ছেলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করতো—বন্দে-মাতরম্—

একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। সমস্ত বাড়িটা গম্ গম্ করে উঠতো। সে যে কী আনন্দ। আর রোহিণীবাবু ফুলের মালাটা প্রাণমথবাবুর গলায় পরিয়ে দিতেন।

তখন হেড-মাস্টারও বলতেন—বন্দে-মাতরম্—

দীপঙ্কররাও একসঙ্গে বলতো—বন্দে-মাতরম্।

আর তারপর দারোগাবাবু হেড-মাস্টারকে নিয়ে যেত বাইরে। সেই বন্দে মাতরমের শব্দে তখনও সমস্ত নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তখন ছেলেদের ছুটি। ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলটা সেদিনের মত বন্ধ হয়ে যেত। আর তারপর মাস তিন-চারেকের মধ্যে আর প্রাণমথবাবুকে ইস্কুলে দেখা যেত না।

মা প্রথম-প্রথম অবাক হতো। তখনও হয়ত রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। অনেক লোকের রান্না মা'কে একলা করতে হতো।

বলতো—ওমা, তুই ফিরে এলি যে? ইস্কুল হলো না?

দীপঙ্কর বলতো—আজকে শুধু ড্রিল হয়েছে—

—কেন?

দীপঙ্কর বলতো—আজকে ছুটি, আজ প্রাণমথবাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে যে—

—কেন, পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে কেন হঠাৎ?

দীপঙ্কর নিজেই জানতো না তার জবাব কী দেবে! নিজেই জানতো না কেন মাঝে মাঝে হেড-মাস্টারকে ধরে নিয়ে যায় পুলিসে, কেন আবার ছেড়ে দেয়। কেন প্যাকাটিতে ফ্ল্যাগ এঁটে মার্চ করে 'বন্দে-মাতরম্' বলতে হয়। আর হেড-মাস্টারকে ধরে নিয়ে গেলে কেনই বা ছুটি হয় অমন করে।

আবার হয়ত একদিন দীপঙ্কর দেখে, প্রাণমথবাবু এসে গেছেন। আবার তিনি তাঁর নিজের ঘরে বসে আপিসের কাজ-কর্ম করছেন। সেই মোটাসোটা চেহারা, সেই এলোমেলো চুল, সেই আলুথালু পোশাক, সারা গায়ে খদ্দরের জামা-কাপড়। সারা মুখে পান। আর পায়ে সেই গোড়ালি দুমড়ানো সু জুতো।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি যেতে হতো। বাড়িতে না গেলে মা ভাবতো খুব। তবু যেদিন একটু বেড়াবার ইচ্ছে হতো, একটু ঘুরে ঘুরে যেত। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে উত্তরদিকে পাথরপটি। ওদিকে বাড়ি নয়, কিছুই নয়। তবু অনেক লোক, অনেক ভিড় বড় রাস্তায়। অনেক লোক দেখতে ভালো লাগতো। হঠাৎ দেখতো রিক্সা করে বাড়ি ফিরছেন অঘোরদাদু।

দীপঙ্কর হঠাৎ ডাকতো—অঘোরদাদু—

—কে রা মুখপোড়া?

—আমি দীপু অঘোরদাদু—

—থামা, থামা না মুখপোড়া রিক্সাওয়ালা, মুখপোড়া ছুটছে তো ছুটছেই—থামা না রে—

অঘোরদাদু বাড়িওয়ালা। অঘোর ভট্টাচার্যি ও-অঞ্চলের পুরোন বাসিন্দা। বুড়ো থুথুড়ো চেহারা। বয়েস যে কত তা দীপঙ্কর বুঝতে পারতো না। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটার মালিক। পাঁজির পাতায় একটা বুড়োর ছবি থাকে। হাতে লাঠি, কাঁধে চাদর, আর মাথায় টিকি। পাশে লেখা থাকে দক্ষিণ হস্তে ঐশ্বর্য, হৃদয়ে সুখ, বামহস্তে মৃত্যুবৎ, নেত্রদ্বয়ে সুখ, পাদদ্বয়ে পীড়া! কথাগুলোর মানে দীপঙ্কর বুঝতো না, কিন্তু ছবিটা দেখলেই কেবল অঘোরদাদুর কথা মনে পড়তো। ঠিক সেইরকম চেহারা অঘোরদাদুর। অঘোরদাদু সারাদিন রিক্সায় চড়ে যজমান বাড়ি চষে বেড়াতো। কোথায় চাউলপট্টি রোড, কোথায় গোয়ালটুলি সব জায়গায় যজমান ছিল অঘোরদাদুর। যজমানরা সব বড় লোক। কেউ কেউ দু'পায়ে দু'টো মোহর রেখে প্রণাম করতো। আবার কেউ কেউ শুধু দু'টো টাকা।

বলতো—আরে দেখ মুখপোড়ার কাণ্ড, আগে বাঁ-পায়ে হাত দিলি?—তোর মুখপোড়ার কিচ্ছু হবে না—

অঘোরদাদুও হুগলী-জেলার লোক। এক গ্রামের। কবে একদিন ন'দশ বছর বয়েসে চোদ্দটা তামার পয়সা আর-এক-কাপড়ে একটা গামছা সম্বল করে বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন, তারপর এই আজ সাত বিঘে জমির ওপর বাড়ি, আর অগাধ টাকার মালিক হয়েছেন। বাড়িটা পুরোন হয়ে গেছে। ইট বালি চুন খসে পড়ছে। ঘর-দোর সারানো হয় না। রাত্রিবেলা চামচিকে ঢোকে এক-একদিন। ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। তারপর আলো নিভোলে কখন ফুড়ুৎ করে বাইরে বেরিয়ে যায়। কখন অঘোরদাদু আসে, কখন বেরিয়ে যায় কারোর জানা নেই। বেলা হয়ত তিনটের সময়েই এসে হাজির। তখন এসে চীৎকার করবে—ও মেয়ে, কোথায় গেসে গো—মুখপোড়াগুলো গেল কোথায়—

অঘোরদাদুর কাছে সবাই-ই মুখপোড়া। রিক্সাওয়ালাও মুখপোড়া, দীপুর মা-ও মুখপোড়া, দীপুও মুখপোড়া। আর চন্নুনী, অঘোরদাদুর বাড়ির কাজ-কর্ম করতো চন্নুনী, সেই চন্নুনীও মুখপোড়া। স্ত্রী-পুরুষ সবাই মুখপোড়া। আর ছিটে, ফোঁটা, বিন্তী—নাতি-নাতনীরা সবাই-ই মুখপোড়া। যেন সারা পৃথিবীর সব মানুষের মুখগুলো একেবারে পুড়িয়ে দিয়ে ছেড়েছে অঘোরদাদু!

অঘোরদাদুকে কতদিন দেখেছে দীপঙ্কর একলা রাস্তা দিয়ে রিক্সা চড়ে চলেছে, মুখে কাকে যেন বিড় বিড় করে মুখপোড়া বলতে বলতে চলেছে। হয়ত ঘুমের মধ্যেও অঘোরদাদু চীৎকার করে উঠতো—মুখপোড়ারা মরে না, মুখপোড়ারা মরলে আমার হাড় জুড়োয়—

দাঁতগুলো সব কবে পড়ে গিয়েছিল অঘোরদাদুর। বাইরের অচেনা লোক হঠাৎ বুঝতে পারতো না কী বলছে বুড়োমানুষ।

এক-একদিন দীপঙ্কর গিয়ে হয়ত অঘোরদাদুকে বলেছে—অঘোরদাদু, তোমাকে এক ভদ্দরলোক খুঁজতে এসেছিল—

অঘোরদাদু চীৎকার করে উঠতো—কে ডেকেছিল? মুখপোড়াটা কে? মুখপোড়ারা বাড়িভাড়া নিতে এসেছিল?

—তা তো জানি না অঘোরদাদু—

—তা জানিস না তো, বলতে এসেছিস কেন র‍্যা মুখপোড়া, মুখপোড়াটা মরেও না, মুখপোড়াটা মরলে আমার হাড় জুড়োয়—

বলে মোটা লাঠিটা নিয়ে তাড়া করে আসতো অঘোরদাদু।

বলতো—বেরো বেরো মুখপোড়া—

আবার আদরও করতো দীপঙ্করকে। একদিন দেখা না হলেই অঘোরদাদু বলতো—মুখপোড়াটা গেল কোথায় গো—ও মেয়ে, বলি মুখপোড়াটা গেল কোথায়?

মা হয়ত তখন রান্না করছে। ভাতের ফ্যান গালতে গালতে বললে—কার কথা বলছেন বাবা? দীপু?

অঘোরদাদু বলতো—আবার কোন্ মুখপোড়ার কথা বলবো, সেই ছিঁচকে মুখপোড়াটা—

দীপু খেলে বাড়ি আসতেই মা বলতো—ওরে, তোর অঘোরদাদু একবার ডাকছিলেন তোকে—দেখ তো—কী বলছিলেন—

দীপঙ্কর উঠোনটা পেরিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেত। পশ্চিম-মুখো বারান্দা। মেঝেগুলোর সিমেন্ট উঠে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গিয়েছে। দেয়ালে চুনকাম হয়নি অনেকদিন। বারান্দা পেরিয়ে দোতলার দক্ষিণদিকে যেতেই বোধহয় অঘোরদাদু পায়ের শব্দ পেয়েছে। পেয়েই একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।

লাঠিটা উঁচিয়ে দীপঙ্করের মাথায় ঠকাস্ করে একটা বাড়ি মেরেছে।

বললে—মুখপোড়া আবার এসেছে, মুখপোড়া আবার চুরি করতে এসেছে, আমার ঘরে সোনা-দানা আছে, না রে মুখপোড়া, আমার ঘরে হীরে-জহরৎ আছে, না রে—বেরো মুখপোড়া বেরো বলছি—বেরিয়ে যা—

আবার একদিন অঘোরদাদু উঠোনের দিকে এগিয়ে এসে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বলে—মুখপোড়াটা গেল কোথায় গো, ও মেয়ে, বলি মুখপোড়াটা গেল কোথায়—

মা বলতো—দীপু আর যাবে না আপনার কাছে বাবা, আপনি ওকে লাঠি দিয়ে মেরেছেন—

অঘোরদাদু ফোগলা দাঁতে চীৎকার করে উঠতো—আমি মেরেছি মুখপোড়াকে? বলি আমি আবার কখন মারলুম মুখপোড়াকে?

—হ্যাঁ বাবা, আপনি লাঠি দিয়ে ওর মাথায় মেরেছেন, ওর মাথাটা ফুলে গেছে আমি দেখলাম—

অঘোরদাদু তখন আরো জোরে চীৎকার করে উঠতো—তা মুখপোড়া নাম বলে না কেন, নাম বলে না কেন মুখপোড়া, আমি ভেবেছি হয় ছিটে মুখপোড়া নয়তো ফোঁটা মুখপোড়া—! মুখপোড়া চোখে কি-দেখতে পাই আমি—

ছিটে আর ফোঁটা। অঘোরদাদুর দুই নাতি। ছিটে দিনরাত বিড়ি সিগারেট ফুঁকতো আর তবলা বাজাতো পাড়ায় পাড়ায়। অনেকদিন দীপঙ্কর দেখেছে ইস্কুল থেকে আসার পথে পাথরপটির বড় রাস্তার ধারে বিড়ির দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চুলের তেড়ি দেখছে একমনে। মুখে একটা বিড়ি।

ছিটে কখন রাত্রে বাড়ি আসতো ঠিক ছিল না। রাত কখনও একটা কি দুটো বাজতো। দীপঙ্কর তক্তপোশটার ওপর মা'র পাশে শুয়ে রয়েছে, হঠাৎ যেন কেমন একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তখন চারিদিকে সব নিস্তব্ধ। কালিঘাট বাজারের ঢোল বাজনার শব্দটাও থেমে গেছে তখন।

দীপঙ্কর ডাকতো—মা—

—কী বাবা?

—কীসের শব্দ হলো যেন মা—

—ও কিচ্ছু না, তুই ঘুমো!

দীপঙ্কর তবু শান্তি পেত না মনে।

বলতো—একটা শব্দ হলো যে, আমি শুনলুম—

মা বলতো—ও কিচ্ছু না, ছিটে ফিরলো—

কিন্তু ছিটে ফিরলে দরজা খুলে দেবার বালাই ছিল না কারো। যে-যত রাত্রেই আসুক মাকে দরজা খুলে দিতে হতো না। পশ্চিমদিকের জানালার দু' একটা গরাদ ভেঙে রাস্তা করা ছিল। ব্যবস্থা ছিটে আর ফোঁটা দু'জনেরই। সেইখান দিয়েই ঢুকে পড়তো ছিটে। আর ফোঁটা যে কখন ঢোকে কিংবা কখন ঢোকে না তার খবর কারো রাখবারই দরকার হতো না।

শুধু অঘোর ভট্টাচার্যি এক-একদিন তুমুল কাণ্ড করে বসতো।

শোনা যেত চীৎকার করছে অঘোরদাদু—মেরে ফেলবো মুখপোড়াদের, নির্ঘাৎ মেরে ফেলবো—বেরো মুখপোড়া—বেরো—

খড়ম পায়ে বুড়োমানুষ দোতলার বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে। কিন্তু চোখে তো দেখতে পায় না অঘোরদাদু। তাই ছিটের মাথায় মারতে গিয়ে লাঠিটা কখনও পড়ছে দেয়ালে, কখনও মেঝেতে। ছিটে-ফোঁটা ততক্ষণে কোথায় টুপ্ করে পালিয়ে গেছে, অঘোরদাদু জানতেও পারেনি।

কিন্তু তার অনেকক্ষণ পরে পর্যন্ত অদৃশ্য ছিটে-ফোঁটাকে উদ্দেশ করে গালাগালি দিতে শোনা যেত অঘোরদাদুকে।

কবে একদিন এই কালিঘাট জঙ্গল ছিল। আস্তে আস্তে কালী-মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা বসতি গড়ে উঠেছে এখানে। পুরোহিত এসেছে, যজমান এসেছে, ব্যাপারী এসেছে, ভিখিরী এসেছে। ওই ভূ-কৈলাস, ওই শাঁখারীপাড়া, কাঁসারীপাড়া, মনোহরপুকুর,—সব অঞ্চলগুলো কবে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে কালীমন্দিরের প্রয়োজনে তা কেউ খেয়াল করেনি। যেমন কলকাতা বেড়েছে, তেমনি এদিকের জঙ্গল-ডোবাও ক্রমে ক্রমে সাফ হয়েছে। দোকানী, মুদী, কুমোর, জোলা, সোনার বেনেরা এসেছে—আবার বেশ্যাও এসেছে। দোকানপাট খুলেছে। কারবার ফেঁদেছে। সেই যুগেই বোধ হয় অঘোর ভট্টাচার্যিও এসেছিলেন। কোন্ যজমানের সাত বিঘে জমি বাড়ি এখানে পড়ে ছিল, সেটা কুলগুরুকে দিয়ে পরলোকের কাজ পাকা করে যেতে চেয়েছিলেন। তারপর আদালত কাছারি হয়েছে আলিপুরে, উকীলমুহুরী এসে জুটেছে। তাদের উন্নতি হয়েছে যেমন যেমন, অঘোর ভট্টাচার্যিরও তেমন-তেমন উন্নতি হয়েছে। যজমানের মোটরগাড়ি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অঘোর ভট্টাচার্যিকেও দিয়েছে রিক্সা চড়বার পয়সা। অঘোর ভট্টাচার্যির চোখের সামনেই চাউলপটির শেখর চাটুজ্জেদের ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ হয়েছে। লখার মাঠের একাদশী বাঁড়ুজ্জেদের অবস্থা ভাল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অঘোর ভট্টাচার্যির একতলা থেকে দোতলা বাড়ি হয়েছে। কুলগুরুর প্রণামী হিসেবে অঘোর ভট্টাচার্যি পেয়েছে চালকলা, পেয়েছে নতুন গামছা, পেয়েছে গরদের জোড়, পেয়েছে কাঁসার থালা-বাটি-ঘড়া, খড়ম, খাট-বিছানা, আর পেয়েছে টাকা আর কখনও কখনও পেয়েছে সোনার মোহর।

এমনি করে যখন লোকজন এসেছে, জম-জমাট হয়েছে শহরতলী, তখন হয়েছে ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল, কালিঘাট হাই-ইস্কুল, তখন হয়েছে নকুলেশ্বরতলা, শেতলাতলা, সোনার কার্তিক। তখন হয়েছে মধুসূদন, সত্যনারায়ণ, গণেশ, ষষ্ঠী, জগন্নাথের মন্দির। তখন এসেছে প্রাণমথবাবু, রোহিণীবাবু, তখন এসেছেন সি আর দাশ, তখন এসেছেন সুভাষ বোস। তখন জন্মেছে কিরণ, নির্মল পালিত। তখন এখানে এসে পৌঁছেছে দীপুর মা, তখন এসেছে দীপঙ্কর, কালীঘাট হাই-ইস্কুলের ফ্রি স্টুডেণ্ট—দীপঙ্কর সেন, রোল নাম্বার এইটিন।

আর তখনই এসেছে লক্ষ্মীদি আর সতী।

কিন্তু লক্ষ্মীদি আর সতীর কথা এখন থাক।

তা ওরা যখন এল তখন দীপঙ্কর আরো বড় হয়ে গেছে। আরো বুঝতে শিখেছে। আরো দেখতে শিখেছে। বুঝেছে গরীব কাদের বলে, কাদের বলে

বড়লোক। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথাও তখন জানতে পেরেছে সে।

দীপঙ্কর দেখতো তাদের তক্তপোশের পাশে একটা লোহার সিন্দুক বহুদিন থেকে পড়ে আছে। লোহার সিন্দুকটা খোলাও হয় না, নড়ানোও হয় না।

দীপু এক-একদিন জিজ্ঞেস করতো—ও কীসের সিন্দুক মা, ওতে কী আছে?

কথাটা মা এড়িয়ে যেত।

বলতো—ও আমাদের নয়—

—আমাদের নয় তো কাদের মা?

মা বলতো—ও তোর অঘোরদাদুর—

অঘোরদাদুর সিন্দুক যে তাদের ঘরে কেন থাকে তা দীপু বুঝতে পারতো না। অনেক দিন ধরেই বুঝতে পারেনি। সিন্দুকটা একপাশে পড়ে থাকতো। আর তার ওপর হাঁড়ি-কড়া থাকতো। আর একটা মস্ত আধমণি লোহার তালা ঝুলতো সামনে। ভেতরে নিশ্চয় কিছু দামী জিনিস থাকতো। নইলে অত বড় তালা কেন!

পড়তে বসে দীপঙ্কর হেলান দিত সিন্দুকের গায়ে। কালো মরচে পড়া গা। কিন্তু কতদিন দেখেছে মা স্নান করে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে সূর্যিপ্রণাম করার পর সিন্দুকটাকেও একবার প্রণাম করেছে। তারপর এক একদিন হয়ত অঘোরদাদু এসে ঢুকতো ঘরের ভেতরে। হাতে একটা নতুন গামছার পুঁটলি। পুঁটলির ভেতরে কী আছে দেখা যেত না। কিন্তু হাতের মুঠোয় একটা মোটা চাবির গোছা ঝুলতো।

অঘোরদাদু বাইরে থেকে ডাকতো—ও মেয়ে, মুখপোড়াগুলো...

—এই যে বাবা—আমাকে ডাকছিলেন?

মা ঘোমটা দিয়ে এগিয়ে যেত বাইরে।

অঘোরদাদু বলতো—মুখপোড়াটা কী করছে রে?

মা বলতো—দীপুর কথা বলছেন? দীপু তো ইস্কুলে গেছে বাবা—

অঘোরদাদু তখন ঘরের ভেতরে ঢুকে বলতো—মুখপোড়াটার লেখাপড়া হবে, তুই দেখে নিস মেয়ে, মুখপোড়াটাকে একটু যত্ন করিস বাছা—মুখপোড়াটা তোর মানুষ হবে, আমার ছিটে-ফোঁটার মত মুখপোড়া হবে না—

বলতে বলতে সিন্দুকটার কাছে গিয়ে চাবি দিয়ে ভারী তালাটা খুলতো অঘোরদাদু। দীপুর মা তখন কাজের অছিলা করে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অঘোরদাদু আস্তে আস্তে গামছার পুঁটলিটা খুলে একটা একটা করে টাকা সবে ভেতরে রাখতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ দীপঙ্কর ইস্কুল থেকে এসে বই-খাতা রাখতে সোজা ঘরে ঢুকেই অবাক। অঘোরদাদুও জানতে পারেনি। কানেও ভাল শুনতে পায়না, চোখেও ভাল দেখতে পায় না অঘোরদাদু। দীপঙ্কর সিন্দুকটার ভেতরে চোখ দিতেই দেখলে অনেক টাকা, অনেক মোহর, অনেক গয়না ঝক্ ঝক্ করছে সেখানে।

দীপঙ্কর বলে উঠলো—এত টাকা অঘোরদাদু!

কথাটা কানে যেতেই অঘোরদাদু লাফিয়ে উঠেছে।

—কে রে মুখপোড়া, মুখপোড়া তুই এসেছিস আর জানাসনি মুখপোড়া আমাকে, বেরো—বেরো—বলতে বলতে সিন্দুকের ডালাটা তাড়াতাড়ি ঝপাং করে বন্ধ করতে গিয়ে অঘোরদাদুর হাতের ওপর সেটা পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠেছে।

—গেছি গেছি রে, মুখপোড়াটা কী করলে দ্যাখ্—ও মেয়ে, দ্যাখ্ মুখপোড়ার কাণ্ড—

মা দৌড়ে এসেছে ঘরে। এসেই ডালাটা তুলে ধরেছে। ডালাটা এতক্ষণ চেপে বসেছিল অঘোরদাদুর হাতের ওপর। মা দাদুর সেই হাতটার ওপর ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগলো ঘটি-ঘটি।

অঘোরদাদু বললে—আগে মুখপোড়া ডালাটা বন্ধ কর না মেয়ে—

তারপর সেই হাতটা ক্রমে ফুলে উঠলো। ক'দিন অঘোরদাদু আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। কিন্তু সেই দোতলার বারান্দা থেকেই মুখপোড়া বলে সারা পৃথিবীর লোককে গালাগালি দিতে লাগলো। কাউকে রেহাই দিলে না। কেউ রেহাই পেলে না অঘোরদাদুর গালাগালি থেকে। পৃথিবীর যত রিক্সাওয়ালা অঘোরদাদুর সঙ্গে পয়সা নিয়ে গণ্ডগোল করেছে, পৃথিবীর যত ভাড়াটে ভাড়া নিয়ে কথার খেলাপ করেছে, পৃথিবীর যত ঝি অঘোরদাদুর বাড়িতে ঝি-এর কাজ করেছে, যত যজমান অঘোরদাদুকে মোহর না দিয়ে টাকা দিয়েছে, সে-ক'দিন সেই সকলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলো অঘোরদাদু। সে-ক'দিন ছিটে, ফোঁটা, বিন্তীদের আর দেখা গেল না বাড়ির চৌ-সীমানার মধ্যে। চন্নুনীর মুখেও আর রা নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন থম্ থম্ করতে লাগলো সে-ক'দিন।

দীপঙ্কর সন্ধ্যেবেলা লেখাপড়া করছিল।

মা বললে—মুখ বুজে পড়ো বাবা, তোমার দাদুর শরীর খারাপ দেখছো না—

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদুর অনেক টাকা, না মা?

মা বললে—পরের টাকার দিকে নজর দিতে নেই দীপু—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু অঘোরদাদু আমাদের ঘরে টাকা রাখে কেন, মা?

মা বললে—এ-ঘরও তো অঘোরদাদুর ঘর, উনি যেখানে খুশি ওঁর টাকা রাখবেন—তাতে আমাদের কী!

দীপঙ্কর বললে—তোমারও টাকা আছে মা? তোমার টাকা তুমি কোথায় রাখো?

মা বললে—আমাদের টাকা নেই বাবা, তুমি যখন বড় হবে, চাকরি করবে, তখন তুমিও অনেক টাকা উপায় করবে, ওই রকম সিন্দুক করবে, তখন তোমার

টাকা হলেই আমার টাকা হবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার টাকা নেই কেন মা?

মা বললে—তুমিই তো আমার টাকা, তুমিই তো আমার সিন্দুক বাবা, তুমি মানুষ হও, আর আমার কিছুই চাই না—

অঘোরদাদুর বাড়িটা সাত বিঘে জমির ওপর। তার মধ্যে উত্তর দিকটার অংশ ভাড়া দেওয়া হতো। বাইরে মাঝে মাঝে একটা সাইন-বোর্ড টাঙানো থাকতো। সাইন-বোর্ড-এ মোটা মোটা অক্ষরে লেখা থাকতো 'বাটি ভাড়া'। সেই বাড়িভাড়ার সাইন-বোর্ড দেখে মাঝে-মাঝে অনেক ভদ্রলোক এসে খোঁজ করতো। যারা ভাড়া নিত তারা ঠেলাগাড়ি বোঝাই মালপত্র নিয়ে এসে উঠতো একদিন। কেউ থাকতো চার মাস, কেউ বা এক বছর। তারপর আবার একদিন উঠে যেত। বেশির ভাগ ভাড়াটেই উঠে যেত চন্নুনীর গালাগালির ঠেলায়।

হয়ত এ'টো এসে পড়েছে দক্ষিণের উঠোনে। কিংবা হয়ত মাছের কাঁটা কাকে মুখে করে এনে ফেলেছে, আর তারপরই চন্নুনীর গলাবাজি আরম্ভ হয়ে গেল।

সেই উঠোনের ওপর দাঁড়িয়েই কাপড়টা গাছ-কোমর বেঁধে আকাশকে উদ্দেশ করে চন্নুনী ঝগড়া করতে বসলো—

—গতরখাকী, শতেকখোয়ারীরা, চোকে ছানি পড়ুক তোদের, তোদের ক্যাওড়াতলায় চিতের তুলে দিয়ে আসি লো, মুদ্দফরাসে তোদের মুখে আগুন দিক, গতরখাকীদের গতরে পোকা পড়ুক, যে-মাছের কাঁটা বামুনের উঠোনে ফেললি লো, সেই কাঁটা তোদের গলায় ফুটুক, সেই কাঁটা গলায় ফুটে আবাগীরা রক্ত-বমি কর্......

এর পর যা বলতো চন্নুনী, তা আর কানে শোনা যেত না। সে শুনে কানে আঙুল দিতে হতো। কিন্তু দীপঙ্কর সে-সব কথার মানেও বুঝতো না, সে নিয়ে মাথাও ঘামাতো না তখন। কিন্তু ভারি হাসি পেত চন্নুনীর ঝগড়া করার অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে। সেই হাত-নাড়া, সেই আকাশের দিকে চোখ তুলে কথা বলা। সেই মাথা নাড়ানো, সেই কাপড়টা মাঝে মাঝে খুলে কোমরে জড়িয়ে নেওয়া, আঙুল মটকানো, মাটির ওপর দুম দুম করে পা দিয়ে মাড়ানো—সব কিছু।

অথচ আগের দিনই দীপঙ্কর দেখেছে ভাড়াটেদের ছোট ছেলেটিকে কোলে করে আদর করছে চন্নুনী। সে কী আদরের ঘটা!—চুমু খেয়ে গাল ব্যথা করে দিচ্ছে—তখন একমনে আদরই করছে চন্নুনী।

—মানিক আমার, আমার ধনটু, আমার মনটু, আমার যাদুগোপাল, আমার চাঁদুগোপাল, নানটুগোপাল......

কত যে আদর করছে তার আর সীমা নেই। তার অর্ধেক আদরের কেউ অনেই বোঝে না। পান খেয়ে মুখ লাল করে পাড়া মাতিয়ে তখন আদর করছে চন্নুনী।

কিন্তু এই ঝগড়ার পর দিনই আবার দেখা যেত একটা ঠেলা গাড়িতে

ভাড়াটেদের খাট আলমারি বাসন-কোসন উঠছে, আর তারপর ঘোড়ার গাড়ির জানালার পাখী বন্ধ করে ভাড়াটেদের বউ-ঝিরাও চলে যাচ্ছে অন্য বাড়িতে।

অঘোরদাদুর তখন পাড়া মাত করে চীৎকার করার পালা।

বলে—মুখপোড়া মাগী, হারামজাদী, মুখপোড়াদের তাড়িয়ে ছাড়লে! দেখ মুখপোড়াকে খ্যাঙরা মেরে দূর করে—মুখপোড়া ভাড়াটে তাড়ায়, মুখপোড়া আমারই খাবে আবার আমারই সর্বনাশ করবে—

তখন চন্নুনীর গলা বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। এত যে গলার ঝাল, সেই চন্নুনীও তখন মুখ বুজে উঠোন ঝাঁট দিতে বসে। সব গলার তেজ তার থেমে যায় এক নিমেষে। তখন আবার চন্নুনী যেন অন্য মানুষ।

অঘোরদাদু বলে—এবার যদি আর ঝগড়া করবি মুখপোড়াদের সঙ্গে, তবে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—

তখন আবার বাড়ির সামনে রাস্তার দিকের দেয়ালে 'বাটি ভাড়া'র সাইন বোর্ডটা ঝুলতে থাকে। আবার ভদ্রলোকরা এসে খোঁজ নেয়। আবার অঘোর-দাদুর সঙ্গে কথা বলে। আবার একদিন ঠেলাগাড়ি ভর্তি হয়ে খাট, আলমারি, বাসন-কোসন এসে থামে। ঘোড়ার গাড়ির জানালার পাখী বন্ধ করে আবার বাড়ির বৌ-ঝি'রা এসে নামবে। আবার রাস্তার ধারের 'বাটি ভাড়া'র সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ফেলা হয়।

যেদিন চন্নুনীর গালাগালি শুরু হতো, সেদিন মা ঘরের জানালা-দরজাগুলো বন্ধ করে দিত। বলতো—ওসব শুনো না তুমি—তুমি তোমার পড়ায় মন দাও—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—চন্নুনী কার সঙ্গে ঝগড়া করে মা?

মা বলে—ও-সব কথা তোমায় শুনতে হবে না—তোমায় বলেছি না—

—গৃতরখাগী মানে কি মা?

মা বলে—ছি, ওসব কথা কোনওদিন মুখে উচ্চারণ করবে না, যারা ছোটলোক, লেখাপড়া জানে না, তারাই ওইসব বলে—তুমি লেখাপড়া শিখবে, কত বড় হবে, কত মান-সম্মান হবে তোমার, কত টাকা উপায় করবে-

দীপঙ্কর বলতো—হ্যাঁ মা, আমি অঘোরদাদুর মত টাকা উপায় করবো?

মা বলতো—এখন তোমার ও-সব ভাববার দরকার নেই, তুমি লেখা-পড়া শিখে যাও, ও-সব আপনিই আসবে, তখন তোমারও বাড়ি হবে, তখন আর এই খারাপ জায়গায় থাকতে হবে না তোমাকে—

সত্যিই অনেক আশা ছিল মা'র। অনেক সাধ ছিল। মা'র ধারণা ছিল এই বাড়ি, এই কালিঘাট, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারলেই যেন তার ছেলে মানুষ হতে পারবে। শুধু কোনও রকমে কালিঘাট থেকে চলে যেতে পারলেই যেন সমস্ত পাপ, সমস্ত কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। মা ভাবতো যদি একটু ভবানীপুরে যাওয়া যেত, যদি আর একটু এগিয়ে বউবাজার কি শ্যামবাজারে যাওয়া যেত! মা ভাবতো সারা পৃথিবীর খারাপ

লোকগুলোই বুঝি এই কালিঘাটে এসে বাসা বেঁধেছে। যেন আর কোথাও খারাপ লোক নেই। এখানে যেন সবাই তার দীপুকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত। এই কালিঘাটের মন্দিরে যাবার রাস্তা, ওখানে দলে দলে সন্ধ্যের পর যারা লম্ফ জ্বালিয়ে বসে থাকে, ওই মন্দিরের আশে-পাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, সবাই যেন তার ছেলেকে ছন্নছাড়া করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মা তো জানতো না, পৃথিবীর সব পাড়ার সব ছেলেদের এই একই বিপদ। সেখানে ভবানীপুর নেই, সেখানে শ্যামবাজার নেই! মা তো জানতো না, শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সব ছেলেরা দল বেঁধে খারাপ হবে বলে পণ করে বসেছে। কত মা কত ছেলেদের রক্ষা করবে!

নইলে লক্ষ্মীদিদের বাড়ির জানালার ফুটো দিয়ে কেন সেদিন উঁকি দিয়েছিল দীপ কর! কেন সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি আসবার পথে নির্জন শেতলাতলার পাশে ভূত দেখেছিল দীপঙ্কর!

সেদিন আবার দীপঙ্কর দেখলে, অঘোরদাদু কালিঘাটের বড় রাস্তা দিয়ে রিক্সা করে আসছে।

দীপঙ্কর ডাকলে—অঘোরদাদু—

অঘোরদাদু চীৎকার করে উঠলো—কে র‍্যা মুখপোড়া?

তারপর রিক্সাওয়ালাটাকে বললে—থামা না রে মুখপোড়া, দেখছিস না কোন্ মুখপোড়া ডাকছে—কে র‍্যা তুই মুখপোড়া? কে?

দীপঙ্কর বললে—আমি অঘোরদাদু, আমি দীপু—

অঘোরদাদু যেন এতক্ষণে দেখতে পেলে।

বললে—ও মুখপোড়া তুই? আয় উঠে আয়—

তারপর রিক্সায় উঠে বসলো দীপঙ্কর। অঘোরদাদুর পায়ের কাছে নতুন গামছার একটা পুঁটলি। ভেতরে দু' একটা পাকা কলা উঁকি মারছে।

অঘোরদাদু বললে—মুখপোড়া নাম বলবি তো তোর, আমি কি চোখে কিছু দেখতে পাই?

দীপঙ্কর বললে—চোখে দেখতে পাও না তো তুমি পুজো করো কেমন করে অঘোরদাদু?

অঘোরদাদু মুখ খিঁচিয়ে উঠলো—দূর মুখপোড়া, পুজো কি করি আমি?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল! পুজো করে না তো কী করে অঘোরদাদু?

অঘোরদাদু বললে—তোর কাছে কি মিথ্যে বলে পাতক হবো রে মুখপোড়া, পুজো আমি করি না—

হঠাৎ অঘোরদাদুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। অঘোরদাদু

বলছে কী!

অঘোরদাদু বললে—ঠাকুরই আমি দেখতে পাই নে তো পুজো করবো কেমন করে! পুজো আমি করি না—

কথাগুলো যেন কান্নার মত শোনালো দীপঙ্করের কাছে। কই, অঘোরদাদুর গলার সেই ঝাঁঝ কোথায় গেল! তবে কি ঠাকুরপুজোর নাম করে অঘোরদাদু যজমান ঠকায়!

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি কী করো?

অঘোরদাদু বললে—কী করি দেখবি তুই? দেখবি?

দীপঙ্কর বললে—দেখবো অঘোরদাদু—

অঘোরদাদু বললে—চল্ মুখপোড়া, তোকে দেখাবো আজ, চল্—

রিক্সাটা গিয়ে দাঁড়ালো উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়ির সামনে। দীপঙ্কর আগে আগে নামলো, তারপর অঘোরদাদু এদিক-ওদিক হাতড়ে নতুন গামছার পুঁটলিটা তুলে নিলে। তারপর একহাতে দীপঙ্করের হাত ধরে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

রিক্সাওয়ালা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলো—বাবুজী, পয়সা?

খিঁচিয়ে উঠলো অঘোরদাদু।

বললে—মর মুখপোড়া—আমি তোর পয়সা নিয়ে বড়লোক হবো নাকি মুখপোড়া—নে—মুখপোড়া, নে—

ব'লে বাড়ির দরজার ভেতরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে একটা আনি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দীপঙ্করও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো। অঘোরদাদু চীৎকার করে ব'লে উঠলো—চন্নুনী, দরজাটায় খিল দিয়ে দে—

দীপঙ্কর শুনতে পেলে রিক্সাওয়ালাটা বাইরে তুমুল চীৎকার করছে। অঘোরদাদু সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছে, তারপর একে একে সব যজমানবাড়ি ঘুরে এই বিকেলবেলা ফিরে রিক্সাওয়ালাকে এক-আনি পয়সা ফেলে দিয়েছে। বাড়ির উঠোন দিয়ে ঢুকে ছোট রোয়াক। রোয়াকের ওপর উঠে ডান দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো অঘোরদাদু। দীপঙ্করও পেছনে পেছনে উঠতে লাগলো।

অঘোরদাদু বললে—আয় মুখপোড়া, আয়—

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদু, রিক্সাওয়ালাটা এখনও চেঁচাচ্ছে—

অঘোরদাদু বললে—দূর মুখপোড়া, ও চেঁচাচ্ছে তো তোর কী রে? তোর কী?

তারপর দোতলায় উঠে বারান্দা, বড় বড় ঘর। প্রত্যেকটি ঘর তালা-বন্ধ। তারপরে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে অঘোরদাদু নিজের ঘরের তালাটা খুললে। চাবিটা পৈতেয় আটকে রাখলে।

রেখে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

বললে—বল্ মুখপোড়া, কী বলছিলি বল্—বল্ তুই এবার—

দীপঙ্করের মনে পড়লো।

বললে—বলছিলাম, চোখে তুমি দেখতে পাও না তো পুজো করো কেমন করে?

অঘোরদাদু বললে—মুখপোড়া ঠাকুর কি দেখতে পাই যে পুজো করবো, পুজো আমি করি না মুখপোড়া—

—তাহলে পুজো করো না তো কী করো?

অঘোরদাদু বললে—কী করি তাই তো দেখাতে নিয়ে এলাম মুখপোড়া, দেখবি তুই, দেখবি মুখপোড়া?—ওই দেখ্—

বলে দরজার শেকলটা টেনে দরজাটা হাট করে খুলে দিলে অঘোরদাদু আর একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে দীপঙ্করের যেন হাঁপ ধরে উঠলো। ঘরের ভেতরটা প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠলো সব।

—দেখলি তো মুখপোড়া, দেখলি তো?

দীপঙ্করের চোখের সামনে তখন কেউ যেন আরব্য উপন্যাসের সিং-দরজাটা খুলে দিয়েছে। দীপঙ্কর দেখলে ঘরের মধ্যে যেন তাল তাল সোনা পাহাড় হয়ে আছে। চক্ চক্ করছে, ঝক্ ঝক্ করছে। তারপরে আরো স্পষ্ট হলো। দেখলে, অনেক ঘড়া, কাঁসার ঘড়া। ঘড়ার ওপরে ঘড়া। শুধু ঘড়াই নয়। ঘড়া, গাড়ু, থালা, গেলাস, বাটি, পিলসুজ। সব প্রণামীতে পেয়েছে অঘোরদাদু। সব ব্রাহ্মণের দান। কুল-পুরোহিতের দান। একটার ওপর আর একটা চাপানো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এতো ঘড়া ঘটি কী করবে অঘোরদাদু!

অঘোরদাদু মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—দূর মুখপোড়া, এত জিনিস নিয়ে লোকে কী করে? আমি বেচবো রে মুখপোড়া—অনেক বেচে ফেলেছি, এগুলোও বেচবো, বেচে অনেক টাকা হবে—

টাকা! দীপঙ্করের মনে পড়লো তাদের ঘরের সিন্দুকটার কথা। সেই সিন্দুকটার ভেতরেও অঘোরদাদুর অনেক টাকা, অনেক মোহর দেখেছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এত টাকা-কড়ি নিয়ে কী হবে তোমার অঘোরদাদু? কী করবে তুমি?

অঘোরদাদু রেগে গেল। রেগে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

বললে—টাকা-কড়ি দিয়ে কী হয় রে, মুখপোড়া! কী হয়? বড় হলে বুঝবি রে, কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—সব—

মনে আছে দীপঙ্কর ঘর ছেড়ে চলেই আসছিল।

অঘোরদাদু পেছন থেকে চীৎকার করে উঠলো—কোথায় গেলি রে মুখপোড়া। —কোথায় গেলি?

দীপঙ্কর আবার ফিরলো।

বললে—এই যে দাদু, আমি—

—প্রসাদ খাবি না? নৈবিদ্যি খাবি না মুখপোড়া?

দীপঙ্কর বললে—খাবো—দাও—

অঘোরদাদু ঘরের এক কোণে অনেক দিনের পুরোন নৈবেদ্যের থালা থেকে একটা সন্দেশ দিয়ে বললে—এই নে—

দীপঙ্কর সন্দেশ নিয়ে আবার চলেই আসছিল। হঠাৎ অঘোরদাদুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। চোখটা যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছে অঘোরদাদুর। কাঁদছে নাকি! না, চোখ খারাপ হয়েছে!

—খা, মুখপোড়া খা—

সে-প্রসাদ সেদিন মুখে দিতে পারেনি দীপঙ্কর। মুখে দিতে গিয়েই চমকে উঠেছিল। তারপর এক দৌড়ে সোজা চলে এসেছিল নিচেয়। মা তখন নিচের রান্নাঘরে রাঁধছিল। মাকে অনেক লোকের রান্না করতে হতো। এই অঘোরদাদু খেত, দুই নাতি ছিটে আর ফোঁটা খেত। আর খেত বিন্তি অঘোরদাদুর নাতনী। বিন্তি অত বড় বাড়িতে কোথায় কোন্ কোণে যে লুকিয়ে থাকতো দেখা যেত না। কখনও উঠোনে বসে অন্য মেয়েদের মত রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে চুল শুকোতে দিত না। সমস্ত বাড়িটার ওই পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে বিন্তি যেন পদ্মফুল হয়ে সকলের চোখের আড়ালে ফুটে ছিল।

এক একদিন বিন্তিদি রান্নাঘরে আসতো টিপি-টিপি পায়ে।

বলতো—দিদি ভাত হয়েছে?

মা বলতো—খিদে পেয়েছে বুঝি মা?

বিন্তি বলতো—হ্যাঁ—

মা বলতো—তা পাবেই তো, সকাল থেকে তো কিছু পেটে পড়েনি—কী খেয়েছিলে আজ সকালে?

বিন্তি বলতো—তুমিও তো কিছু খাওনি দিদি—

মা হাসতো। বলতো—আমি বিধবা মানুষ, আমি আবার কী খাবো, মুড়ি চিবোবে দুটো?

বিন্তি বলতো—আমার কাছে তো পয়সা নেই—

—আমার কাছে আছে পয়সা, দিচ্ছি, আনিয়ে দিচ্ছি—

দীপঙ্কর তখন পড়ছিল। মা তাড়াতাড়ি ঘরে এল। মায়ের একটা কাঠের ভাঙা বাক্স থাকতো তাকের ওপর। তার ভেতরে মার পয়সা-কড়ি থাকতো। আঁচলের চাবিটা দিয়ে বাক্সটা খুলে মা বললে—বাবা, মোড়ের দোকান থেকে এক পয়সার মুড়ি এনে দাও তো টপ্ করে?

দীপঙ্কর বলতো—কে খাবে মা?

মা বলতো—সব কথায় অমন কথা বলতে নেই, যা বলছি করো—

মুড়ির দোকান থেকে মুড়ি এনে দিতেই দেখতো অঘোরদাদুর নাতনী রান্নাঘরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। মা মুড়ির ঠোঙাটা বিন্তিকে দিতেই সে বললে—দীপুকে একটু দেব দিদি?

—না, না, ওকে দিতে হবে না, ও পান্তাভাত খেয়েছে একপেট—

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদুর ঘরে অনেক সন্দেশ আছে, খাবে বিন্তিদি?

বিন্তি অবাক হয়ে গেল। বললে—ও কী করে দেখলে বলো তো দিদি?

দীপঙ্কর বললে—আমি দেখেছি, অঘোরদাদু আমাকে দেখিয়েছে, অনেক ঘড়া আছে, ঘড়া ঘটি থালা বাটি, সব আছে—অনেক সন্দেশ আছে—দেখ, এই এতো সন্দেশ—

বলে হাত দুটো বড় ফাঁক করে দেখাল দীপঙ্কর।

বিন্তি অবাক হয়ে গেল। হেসে বললে—সত্যি, ও দেখেছে তো ঠিক! তুই সন্দেশ খেয়েছিস? দাদু সন্দেশ দিয়েছে তোকে?

মা বললে—তোমার দাদুর কথা আর বোলো না বাছা—

বিন্তি বললে—এত সন্দেশ দাদু কার জন্যে জমাচ্ছে বলো তো দিদি?

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদু বলেছে ওগুলো বেচে অনেক টাকা-কড়ি হবে—

বিন্তি বললে—তা অত টাকা-কড়ি দিয়েই বা কী হবে শুনি? কী বলো দিদি, টাকা-কড়ি তো আর মানুষের সঙ্গে যায় না, বলো—

দীপঙ্কর বললে—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায় তা জানো, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—

বিন্তিও অবাক হয়ে গেল। হেসে বললে—ওমা, কে শেখালে রে, ও কথা কে শেখালে তোকে? দীপু তো দেখছি খুব সেয়ানা হয়ে গেছে দিদি—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, কেনা যায়—

এমন সময় হঠাৎ বাইরে অঘোরদাদুর খড়মের আওয়াজ শোনা গেল।

—কই রে, ও মেয়ে মুখপোড়া কানেও কালা হয়ে গেছে, কোথায় গেলে গো, ও মেয়ে—

বিন্তি অঘোরদাদুকে দেখেই টুপ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছে।

মা বললে—বাবা, আপনি আপনার ঘরের চাবিটা একবার দেবেন তো, আমি পরিষ্কার করবো, আমি ঝাঁটা না ধরলে ও-ঘর আপনার পরিষ্কার হবে না, কোন্ দিন সারা বাড়িতে পোকা থক্ থক্ করবে—

ঘরের চাবির কথা শুনে অঘোরদাদু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো।

বললে—হ্যাঁ, ঘরের চাবি আমি তোমাদের দিই, আর মুখপোড়া ছিটে-ফোঁটা সব লুঠপাট করে নিক, মুখপোড়াদের জ্বালায় আমি বলে পৈতের চাবি রেখে শান্তি পাই না—মুখপোড়ারা.........

মা বললে—কিন্তু আপনি দীপুকে সন্দেশ দিয়েছিলেন, সে-সন্দেশে যে পোকা থক্ থক্ করছে একেবারে—

—পোকা! কেন, পোকা হবে কেন? পোকা অমনি হলেই হলো—

মা বললে—অত সন্দেশ, অত ফল-ফুলুরি কার জন্যে তুলে রাখেন আপনি বাবা? কার ভোগে লাগবে? কে খাবে?

অঘোরদাদু যেন হঠাৎ থমকে গেল। চিরকালের বাক্যবাগীশ অঘোরদাদু যেন হঠাৎ বড় বেকায়দায় পড়ল। এমন সহজ কথাটা তো এমন করে কখনও ভাববার দরকার হয়নি। যজমানরা চিরদিন যা দিয়ে এসেছে, তা তিনি সঞ্চয় করেছেন বলেই তো আজ এই বাড়ি হয়েছে, এই জমি, বাগান, সিন্দুক-ভর্তি টাকা, সব কিছু হয়েছে। সঞ্চয় না করলে তো অঘোরদাদু এতদিন ফতুর হয়ে যেত। আর তার দাঁড়াবার মতো একটা আশ্রয়ও থাকতো না! এই এত সঞ্চয় করেছিল বলেই তো এখনও বুকের বল আছে তার। এই যে এখন চোখে দেখতে পায় না, সবাই ঠকিয়ে নিতে চায় তাকে, টাকা না থাকলে কী হতো? খেত কী? যজমানরা কি আর আগেকার মতন দেয়! আগেকার মত ভক্তি কি আছে কারো? কিন্তু মা'র কথাতে সে-সব কিছুই বললে না। তার কথাতে সেই চিরাচরিত যুক্তি যেন নিরর্থক হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ যেন অঘোরদাদু বুঝতে পারলে, সত্যিই তো, কে খাবে। কার জন্যে এসব করছে? এত সঞ্চয় করছে? যজমানকে ফাঁকি দিয়ে, রিক্সাওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে, অঘোরদাদু তো দেবতাকেও ফাঁকি দিচ্ছে। অঘোরদাদু দেবতার নৈবেদ্য চুরি করছে কার জন্যে? কী লাভ হচ্ছে তার! কোথায় গেল তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা! অঘোরদাদু দেবতাকে ফাঁকি দিয়েছে, না দেবতা তাকে ফাঁকি দিয়েছে? কোন্‌টা সত্যি? সত্যিই তো তার কেউ নেই, এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে অঘোরদাদু কী পেয়েছে?

দীপঙ্কর এসব কথা তখন ভাবতো না। এত কথা ভাববার বয়স তখন তার নয়। কিন্তু সেদিন অঘোরদাদুকে যেন কেমন অন্যরকম লাগলো। যেন চিরকালের বাচাল অঘোরদাদুকে হঠাৎ বোকার মত দেখালো।

কিন্তু তা কেবল এক মুহূর্তের জন্যে।

তারপরেই হঠাৎ অঘোরদাদু চিৎকার করে উঠলো—পোকা হয়েছে, বেশ হয়েছে—তোদের কী রে মুখপোড়া, আরো পোকা হোক, আরো পোকা থক্ থক্ করুক, তবু কাউকে আমি খেতে দেব না! কাকে খেতে দেব শুনি? কে আছে আমার, কাকে পিণ্ডি গেলাবো? ওরা কি মানুষ, ওদের কি মানুষ বলিস তুই?

তারপর খড়ম খট্ খট্ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগলো।

বললে—আমি পোকাকে খাওয়াবো তবু ওদের দেব না, আমি কালিঘাটে গিয়ে ডালার দোকানে বেচবো, তবু ওদের দেব না—ওরা খেলে আমার কী লাভ

রে মুখপোড়া, বেচলে তবু টাকা হবে—এবার আমি ভাঙার দোকানে বেচে টাকা নেব—

এর অনেকদিন পরে অনেকবার এই কথাগুলো দীপঙ্করের মনে পড়েছে। অঘোরদাদু সরল সাদাসিধে মানুষ, তাই অমন করে সকলের সামনে কথাগুলো বলতো। কিন্তু পৃথিবীর চারদিকে চেয়ে সবাইকে দেখেই কেবল তার অঘোরদাদুর কথাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে সবাই-ই যেন অঘোরদাদু। কে কবে কাকে খেতে দিয়েছে! সেই মোগল বাদশা থেকে শুরু করে আলীবর্দি খাঁ, আলীবর্দি খাঁ থেকে সিরাজদ্দৌলা, লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কার্জন, তারপর লর্ড ডালহৌসী, লর্ড কারমাইকেল, লর্ড রীডিং, কে কবে কাকে খেতে দিয়েছে! হিন্দুরা কি মুসলমানদের খেতে দিয়েছে? মুসলমানরা কি হিন্দুদের খেতে দিয়েছে? যে যখন সুদিন পেয়েছে, তখনই অঘোরদাদু সেজে বসেছে। দুহাতে ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করেছে, আর লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখেছে। সবাই তাই করেছে, সবাই তাই-ই করবে!

কিরণ কিন্তু অনেক জানতো। কিরণও ছিল দীপঙ্করের মত ফ্রি স্টুডেণ্ট। কিন্তু কিরণ অনেক জায়গায় ঘুরতো। সেই ছোট বয়সেই সে একলা-একলা ভবানীপুর, লকারমাঠ, চেতলা, খিদিরপুর, বেহালা পর্যন্ত হেঁটে যেত। কোথাও তার যেতে বাকি ছিল না।

কিরণ বলতো—জানিস, যখন আমাদের দেশে স্বরাজ হবে, তখন সি আর দাশ রাজা হবে আমাদের—

দীপঙ্কর কিছু বুঝতো না, বলতো—স্বরাজ মানে?

কিরণ বলতো—তখন সব আমরা যা খুশি করবো, এই পুলিস-টুলিস থাকবে না, আমরা যা ইচ্ছে করবো, লাটসাহেব-টাহেব কিছু বলবে না আমাদের—লাটসাহেব হবে সি আর দাশ—তখন আমার বাবার অবস্থা ভালো হয়ে যাবে—আমাকে আর ভিক্ষে করতে হবে না—

দীপঙ্কর বলতো—আর প্রাণমথবাবু?

কিরণ বলতো—প্রাণমথবাবুও অনেকবার জেল খেটেছে, প্রাণমথবাবুও একটা ছোটলাট হবে—দেখে নিস্—

সেদিন কিরণই টেনে নিয়ে গেল হরিশ মুখার্জি রোডের ওপর হরিশ পার্কে। সেখানে মীটিং হবে। বিলিতি কাপড় পোড়ানো হবে। অনেক মজা হবে। কিন্তু কিরণের সঙ্গে মিশতে দিতে চাইত না মা।

মা বলতো—তোমাকে বলেছি না, ওর সঙ্গে মিশবে না—

কিরণের বাবার ছিল কী-একটা রোগ। গলার ভেতরে রোগ হয়েছিল। তাই মুখ দিয়ে কথা বেরত না শেষকালের দিকে। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের গলির ভেতরে একটা বস্তিতে ছিল কিরণের বাড়ি। কাউকে না জানিয়ে দীপঙ্কর ফিরে এক-একদিন বস্তির ভেতর গিয়ে দাঁড়াত। অঘোরদাদুর বাড়িটাও ছিল পুরোন, কিন্তু রাস্তার ওপর। পাকা বাড়ি। কিন্তু কিরণদের বাড়ি ছিল মাটির। গোল-পাতার চাল। কিরণদের উঠোনে ছিল একটা পেয়ারা গাছ। পেয়ারা পাড়তে অনেকদিন দীপঙ্কর ওদের বাড়ি গিয়েছে। দেখতো মাটির দাওয়ার ওপর কিরণের বাবা একটা মাদুর পেতে বসে ঝিমোচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কেমন একটা ঘড়-ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে। একটা ময়লা ছেঁড়া কাঁথা পাশে পড়ে আছে। ঠিক শীতকালে চামুনী যে-রকম কাঁথা গায়ে দিয়ে কাজ করতো, তেমনি কাঁথা একটা। চারদিকে মাছি উড়ছে। যখন কোনও অঙ্ক কষতে পারতো না দীপঙ্কর, তখন যেত কিরণের বাবার কাছে। কিরণের বাবা কোন্ ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার ছিল। নামজাদা অঙ্কের মাস্টার। মুখে-মুখে বড় বড় অঙ্কের উত্তর বলে দিতে পারতো।

কিরণ বাবার কাছে গিয়ে বলতো—বাবা, দীপুকে এই অঙ্কটা করে দাও না, বুঝতে পারছে না ও—

অঙ্কের বইটা আর শ্লেটটা এগিয়ে দিত কিরণ বাবার সামনে।

বড় বড় অঙ্ক সব। কালিঘাট ইস্কুলে তখন দুজনেই পড়ছে। এল-সি-এম, জি-সি-এম, বুদ্ধির অঙ্ক। তখন আরো শরীর খারাপ হয়েছে কিরণের বাবার। গলাটা আরো ফুলে উঠেছে। হাতের আঙুলগুলো ছোট হয়ে ফুলে উঠেছে। থু-থু করে চারদিকে উঠোনময় থু-থু ফেলছে। যন্ত্রণাও হচ্ছে হয়ত। যখন যন্ত্রণায় খুব কাতর হয়ে পড়ে, তখন পাশের কাঁথার ওপর চলে শুয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দটা আরো জোরে জোরে হয়। তখন কিরণের মা খানিকটা গরম জল এনে দেয় গেলাসে করে। ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা গরম জল খেয়ে নিলে তৃপ্তি হয়। তখন দুহাতে নিজের গলাটার ওপর হাত বুলোয়। কিন্তু কথা বেরোয় না মোটে। দেখতে পায়, শুনতে পায়, খেতে পারে, শুধু কথা বলতে পারে না। কথা না-বলতে পারার যে কী কষ্ট দীপঙ্কর সেই প্রথম দেখেছিল।

মা বার বার বারণ করে দিত—ওই কিরণদের বাড়ি যাও না তো খোকা?

দীপঙ্কর বলতো—না মা, তুমি বলার পর আর যাইনি মা আমি—

—হ্যাঁ, যেও না, রোগীর বাড়িতে যাওয়া খারাপ, যদি দেখ রোগীর থু-থু পড়ে আছে, তাও মাড়িও না, থু-থু মাড়ালেও রোগ হয়—

কিন্তু কিরণের বাবার কথা ভাবতে দীপঙ্করের খুব ভালো লাগতো। কত অঙ্ক জানে কিরণের বাবা, কত লেখাপড়া জানে। কত জ্ঞানী, কত গুণী, কত শিক্ষিত, মানুষটার দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন হাঁ করে দেখতো। তারাও গরীব তাদেরও অনেক অভাব, তার মা'রও বেশি টাকা নেই, সামান্য কাঠের বাক্সটার ভেতর দু-চারটে পয়সা বড়জোর থাকে। তবু খাবার জন্যে দীপঙ্করকে ভিক্ষে করতে হয় না কিরণের মতো।

কিরণের কিন্তু সত্যিই কোনও দুঃখ ছিল না।

কিরণ বলতো—দেখবি, আমরা অনেক বড়লোক হয়ে যাবো, বাবার অসুখও ভালো হয়ে যাবে, আমাকেও আর ভিক্ষে করতে হবে না—

কিরণ আরো বলতো—দেখিস তুই, আমার কথা ফলে কি না—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কী করে হবে?

কিরণ বলতো—আমি মস্ত বড় চাকরি পাবো, অনেক টাকা মাইনে হবে আমার—

দীপঙ্কর বুঝতে পারতো না তবু। জিজ্ঞেস করতো—লেখাপড়া না শিখেও চাকরি পাবি?

কিরণ বলতো—লেখাপড়া শিখতে হবে, কিন্তু মাইনে লাগবে না ইস্কুলের, স্বদেশী ইস্কুল হবে, সেই ইস্কুলে তখন পড়বো আমরা—

—মাইনে দিতে হবে না কেন?

কিরণ বলতো—স্বরাজ হয়ে গেলে আর মাইনে লাগবে কেন! তুই কিছু জানিস না, তখন ওই চৌরঙ্গীতে, আলীপুরে যেসব সাহেব-মেমদের বাড়ি আছে, ওই সব বাড়িতে আমরা থাকবো, বাড়ি ভাড়া লাগবে না—

—প্রাণমথবাবুকে আর পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে না?

কিরণ বলতো—আরে, প্রাণমথবাবুই দেখিস তখন একটা ছোটলাট-টাট হবে—এই সব চালাবে। আর ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের আমরা সব ছেলেরা একটা করে চাকরি নিয়ে নেব প্রাণমথবাবুকে বলে—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সত্যিই সেদিন বিশ্বাস করতো দীপঙ্কর। সকলের সব অভাব সব অভিযোগ, সব সমস্যার সমাধান হবে একদিন। একদিন অঘোরদাদুর বাড়ির উত্তর দিকে আবার ভাড়াটে আসবে। ভাড়াটেদের সঙ্গে আর ঝগড়া করবে না চন্নুনী, একদিন মাকেও আর অঘোরদাদুর বাড়িতে রান্না করতে হবে না। মা আবার ফরসা কাপড় পরে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে পারবে। দীপঙ্কর বিশ্বাস করতো একদিন চন্নুনীও আবার ভালো হয়ে যাবে। আর অঘোরদাদুও আবার চোখে দেখতে পাবে ভালো করে। চোখ দিয়ে দেখতে পাবে ঠাকুরকে, আর পুজো করতে পারবে। আর পুজোর নামে ঠাকুরের নৈবেদ্য নিয়ে এসে ঘরের ভেতরে জমিয়ে রাখবে না। সে-প্রসাদে আর পোকাও ধরবে না। তখন ছিটেও আর রাত করে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ফিরবে না, ফোঁটাও আর বাইরে রাত কাটাবে না আগেকার মত। আর বিন্তিদি? বিন্তিদিও উপোস করে থাকবে না সকাল থেকে। বিন্তিদিরও একটা ভালো জায়গায় বিয়ে হবে। সিঁথিতে সিঁদুর পরে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বেনারসীর ঘোমটায় মুখ ঢেকে শ্বশুরবাড়ি যাবে বরের সঙ্গে। আর প্রাণমথবাবু? প্রাণমথবাবু তো কতবার জেলে গিয়েছে। কত বছর জেল খেটেছে। কত কষ্ট সহ্য করেছে প্রাণমথবাবু, প্রাণমথবাবু হয়ত ছোটলাট সাহেব হবে, আর কিরণরা ভালো বাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিরণের বাবার অসুখ আবার ভালো হয়ে যাবে। গলার যন্ত্রণাটা কমে যাবে। একেবারে সেরে যাবে। আর কিরণের মা'কেও আর পৈতে কাটতে হবে না। কিরণকেও আর ভিক্ষে করতে হবে না—

ছোটবেলায় দীপঙ্করের অনেক বিশ্বাস ছিল। ছোটবেলায় বিশ্বাস করা সহজ বোধহয়। কিরণের সঙ্গে কতদিন বেড়াতে গিয়েছে কত দূর। কখনও ভবানীপুর, কখনও টালিগঞ্জ, কখনও খিদিরপুর। সেখানেও কত লোক। কত ছেলেমেয়ে সেখানেও রয়েছে দেখেছে। সেখানেও দেখেছে ঠিক ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মত গলি আর বাড়িগুলো। সেখানেও ছাদে শাড়ি ঝোলে, সেখানেও কার্তিক মাসে বাড়ির ছাদে বাঁশের মাথায় আকাশপ্রদীপ জ্বলে। সেখানেও সূর্য উঠলে আলো হয়, সন্ধ্যেবেলা সূর্যটা অস্ত গেলে অন্ধকার হয়ে আসে। সেখানেও কলের জল নিয়ে ঝগড়া বেধে যায় রাস্তায়, সেখানেও কালিঘাটের মত ভিখিরিরা হা করে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করে। টালিগঞ্জের পুলটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখেছে—কোথায় দূরে কালিঘাট স্টেশনের ওদিক থেকে একটা রেলগাড়ি হুড়-হুড় করে সামনে দিয়ে চলে যায়। ভেতরের লোকগুলোও ঠিক কালিঘাটের লোকদের মত। সেই রকম কোট, চাদর, শার্ট পাঞ্জাবি পরা। সেই একই রকম দাড়ি কামানো মুখ, একই রকম চাউনি। কোথা থেকে এসেছে সব, কোথায় যাবে আবার। পৃথিবীতে কত লোক আছে। এত লোক, এত শব্দ, এত ভিড়, এত নির্জনতা! এত বড় পৃথিবী। এত বড় যে, চোখে দেখা যায় না। টালিগঞ্জের পুলের ওপর থেকে রাসবাড়িটার চুড়োটা দেখা যায়। তারপর আরো দূরে টালিগঞ্জ, আরো দূরে টালিগঞ্জের দক্ষিণে—ও জায়গাটা কী? কী নাম ওর? তারপর যেখানে আকাশটা গিয়ে মিশেছে মাটির সঙ্গে, সেখানে কয়েকটা গাছ, ছাড়া ছাড়া গাছের মাথা, আর কয়েকটা বাড়ি—

টালিগঞ্জের পুল থেকে নেমে কিরণ বলতো—এখানে দাঁড়া একটু দীপু আমি ভিক্ষে করে নিই—

তখনও কয়েকটা পৈতে বিক্রি হয়নি। দীপঙ্কর একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াত আর কিরণ সোজা চলে যেত সামনে। অনেক লোক আপিস থেকে তখন আসছে। কিরণ সামনে গিয়ে পৈতেটা বাড়িয়ে ধরতো।

বলতো—ভদ্রলোকরা দয়া করে এক পয়সার পৈতে কিনে নিয়ে যান—ভদ্রলোকরা দয়া করে......

বেশ সুর করে ছড়া-কাটার মত গলায় কিরণ সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতো। কিরণের চেহারাটা দেখে দয়া হবার মত। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, আর-একটা হাফপ্যান্ট। মুখটা করুণ করে কিরণ একমনে চেঁচিয়ে যেত। দীপঙ্কর জানতো, ওই পৈতে বিক্রির পয়সাতেই ওদের চাল-ডাল-নুন-তেল সব কিনতে হয়। বাড়ি ভাড়া বাপের ওষুধ কিনতে হয়।

তা এক-একজন পৈতে কেনে। দরকার না থাকলেও অনেকে কেনে। গরীব ছেলেটার ওপর দয়া করে কেনে।

কিন্তু সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

এক ভদ্রলোক সোজা একটা দোয়ানি দিয়ে দিলেন কিরণকে।

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—ক'টা পৈতে নেবেন?

ভদ্রলোক বললেন—পৈতে আমি নেব না, আমার পৈতের দরকার নেই, আমি কায়স্থ—তোমার বাড়ি কোথায়?

কিরণ বললে—নেপাল ভট্চার্যি লেনে—

—তোমার বাবা কী করে?

কিরণ বললে—আমার বাবার কুষ্ঠ হয়েছে, এই পৈতে বিক্রি করে আমাদের চলে—

ভদ্রলোক আর কিছু না বলে চলে গেলেন। কিরণ বললে—আজকে আর পৈতে বিক্রি করবো না, চল্—

দীপঙ্কর তখন আবার কিরণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বললে—দেখি, ক' পয়সা হলো?

কিরণ গুণে দেখলে চার আনা মোট। বললে—এই, আলুর চপ্ খাবি?

দীপঙ্কর বললে—তোর মা যদি জানতে পারে!

কিরণ বললে—দোয়ানি তো রয়েছে একটা, ওটা দিয়ে খাবো—

তারপর সেই টালিগঞ্জ রোড ধরে সোজা এসে কেওড়াতলার কাছাকাছি একটা জায়গায় কিরণ থামলো।

বললে—এই দোকানটায় রোজ আমি খাই—

কিরণ আলুর চপ্ কিনলে। গরম গরম ভেজে তুলেছে সবে। মুখে যে সেদিন দীপঙ্করের কী অমৃত লেগেছিল সেই চুরি করা পয়সায় কেনা আলুর চপগুলো। জীবনে অনেকবার অনেক কিছু খেয়েছে, কিন্তু সেদিনকার সে-আস্বাদ আর যেন কখনও পেলে না। অন্ধকার তখন ভালো করে হয়নি। লোক চলাচল বেড়েছে রাস্তায়। ধুলোয় ধুলো হয়ে গেছে সারা গা। অনেক দূরে দূরে ঘুরে বেড়িয়েছে কিরণের সঙ্গে। কিন্তু আলুর চপগুলো যেন সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়ে দিলে।

কিরণের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। কিরণ তখনও ঠোঁট চাটছে।

কিরণ বললে—খুব ভালো আলুর চপ, না?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুই মাকে গিয়ে আলুর চপ্ খাওয়ার কথা বলবি?

কিরণ বললে—দূর, কষ্ট তো আছেই, আর ক'টা দিন কষ্ট করে নিই না, তারপর তো ভালো দিন আসছে রে। দেখবি আমি তোকে বলে দিলাম সব কষ্ট চলে যাবে আমাদের, তোকে তো বলেছি—

দীপঙ্কর বললে—কে বলেছে তোকে?

কিরণ বললে—কাউকে বলবি না বল্?

দীপঙ্কর বললে—না, কাউকে বলবো না—কে বলেছে বল্?

কিরণ বললে—আমাকে এক সাধু বলেছে; জানিস সাধুর কথা মিথ্যে হয় না, সোনার কার্তিকের ঘাটে সাধুটা এখনও আছে, তোকে নিয়ে যাবো একদিন—খুব ভালো সাধু, পয়সা নেয় না—

দীপঙ্কর বললে—আর কী কী বলেছে?

কিরণ বললে—সাধু বলেছে—আমাদের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, আমাদের অনেক টাকা হবে, আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে—

দীপঙ্কর বললে—ওষুধ দিয়েছে বুঝি সাধু?

কিরণ বললে—দূর, ওষুধ দেবে কেন, শুধু আমার হাত দেখে বলেছে—

দীপঙ্কর বললে—আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ভাই?

—কাউকে বলবি না বল্। তাহলে তোকে নিয়ে যাবো, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু—

দীপঙ্কর বললে—কবে নিয়ে যাবি?

কিরণ বললে—কালকে ইস্কুলের পর একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে তারপর সন্ধ্যের পর একসঙ্গে যাবো, সন্ধ্যেবেলা ভিড়টা কম থাকে—

সেই কথাই ঠিক রইল। ছোটবেলার সব ঘটনা। সে-শহরটা বদলে গেছে এতদিনে। সে-মনটাও বদলে গেছে। সেই চোখটাও বদলে গেছে। সেদিন মানুষের পৃথিবীকে যে-চোখে দেখেছিল দীপঙ্কর, সেই চোখটা কবে ক্ষীণ হয়ে এল, কবে তার ওপর আর একটা রং-এর ছোপ্ পড়লো, কিন্তু সব কথা-গুলো এখনো মনে আছে দীপঙ্করের। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন আস্তে আস্তে মানুষের পায়ে পায়ে আরো বিস্তৃত হয়েছে, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর ভেতরে-বাইরে অনেক মানুষ এসেছে-গেছে, তারপর ক্রমে ক্রমে শহর বেড়েছে দক্ষিণে উত্তরে পুবে, পশ্চিমে। তবু সব মনে আছে। যে-মানুষগুলো এখন ও-রাস্তায় থাকে তারা দীপঙ্করকে চেনে না। জানে না একদিন ওই রাস্তার ধুলোর সঙ্গে আরো একজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, একজন ওই শহরকেই ভালবেসেছিল। ওই শহরের মানুষদের সঙ্গে একাত্মা হয়ে বিশ্বাস করেছিল সকলের ভালো হবে। ভেবেছিল সকলের সব রোগ নিরাময় হবে, সকলের দারিদ্র্য ঘুচবে, সকলের আশ্রয় হবে, সংস্থান হবে। কিরণের মত সেই সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধুর কথাই দীপঙ্কর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করতে ভালো লেগেছিল। বিশ্বাস করে তৃপ্তি পেয়েছিল! কিন্তু কেন তার বিশ্বাস এমন করে ভাঙলো? কেন এত লোকের এত মহাজনের এত চেষ্টা, এত ত্যাগ, এত সাধনা ব্যর্থ হলো। তার জন্যে কার কাছে সে জবাবদিহি চাইবে? এই যে সেভেনটিন ডাউন্ এতকাল পরে এসে পৌঁছুলো গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিংএর ওপর, এর সব আয়োজন কি তবে মিথ্যে। ইস্কুলের বইতে যাঁদের জীবনী পড়েছে, সেই জর্জ স্টিফেনসন্ কি তবে রেলগাড়ি আবিষ্কার করেছিল এই জন্যে। ব্যাসদেব কি

অত মোটা মহাকাব্য লিখেছিল এই উদ্দেশ্যে! গ্যালিলিও কি প্রাণ দিয়েছিল এই কারণে! শাস্ত্র-বাক্য কি তবে মিথ্যে! একদিন এই শহরেই কত লোক পার্কে পার্কে মিটিং করেছে, বিলিতি কাপড় পুড়িয়েছে, জেলে গেছে, তারা যদি আজ কৈফিয়ত চায় হঠাৎ! তারা যদি আবার হঠাৎ বেঁচে ওঠে। বেঁচে উঠে যদি বলে—অয়মহম্ ভোঃ—

চলতে চলতে বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। এবার একটু আলাদা থাকতে হবে। নইলে কিরণের সঙ্গে তাকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। হয়ত অঘোরদাদু দেখে ফেলবে। কিংবা চন্নুনী। দেখে হয়ত মাকে বলে দেবে। কিরণের সঙ্গে তার দেখা করা নিষেধ। কিরণের ছায়াতেও পাপ। কিরণের বাবার যে কঠিন রোগ। কিরণ অস্পৃশ্য যে!

এবার দীপঙ্কর যাবে ডান দিকে। আর কিরণ বাঁয়ে। বাঁ দিকের গলির ভেতরে কিরণদের বাড়ি। হঠাৎ গলির মুখটার কাছে আসতেই আকাশ-বিদীর্ণ করা একটা আর্তনাদ যেন দুজনেরই কানে এসে বিঁধলো।

চমকে উঠেছে কিরণ। দীপঙ্করও চমকে উঠেছে!

—কী হলো রে?

কথা যেন আর বেরোচ্ছে না কিরণের মুখ দিয়ে! কিরণের যেন বাকরোধ হয়ে গেছে। দীপঙ্করও অজ্ঞাত এক আতঙ্কে যেন শিউরে উঠতে লাগলো।

কিরণ হঠাৎ বললে—মা কাঁদছে ভাই!

—তোর মা?

কিরণেরই মায়ের কান্না সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আর নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের আবহাওয়া যেন সেই আর্তনাদের স্পর্শে হঠাৎ অসাড় হয়ে এল।

কিরণ বললে—আমি যাই ভাই, বাবা বোধহয় মরে গেছে—

তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে আঙুল উঁচিয়ে মুখ কালো করে বললে—বাবা যদি মরে যায় তো সেই সাধু-বেটাকে আমি দেখে নেব—বলেই কিরণ দৌড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল!

দীপঙ্কর তখনও সেই রাস্তার মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন আর নড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই। সে যেন হঠাৎ বিকল হয়ে গেছে। সে-ও যদি যেতে পারতো কিরণের বাড়িতে! মৃত্যুকে দেখতো মুখো-মুখি। সামনা-সামনি দেখে নিত কঠিন বাস্তব মৃত্যুকে। এই সেদিনও সে দেখেছে কিরণের বাবাকে। মাদুরের ওপর সোজা হয়ে বসে ময়লা কাঁথা একটা গায়ে দিয়ে আছে। চোখগুলো ঝাপসা, নিরুদ্দেশ। যেন সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিযোগ আকণ্ঠ ঠেলে উঠছে ভেতরে ভেতরে। এবার কে অভিযোগ করবে, কে নির্বাক অভিযোগ করে সেই ঈশ্বরকে বিব্রত করবে!

একবার মনে হলো দীপঙ্করের, সে ছুটে যায় কিরণদের বাড়ি। তাদের

বাড়ি যাবে, তাদের অবস্থা ফিরে যাবে, তাদের সব অসুখ নিরাময় হয়ে যাবে—সেই সব আশ্বাসের ধূলিসাৎ হওয়াটা একবার নিজের চোখে দেখে আসে সে। অন্ততঃ দীপঙ্কর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে কিরণ খানিকটা সান্ত্বনাও পাবে! কিন্তু আবার ভয় হলো—মা যদি জানতে পারে!

সন্ধ্যে হবার উপক্রম হয়েছে। আস্তে আস্তে দীপঙ্কর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটার দিকে ফিরলো। বিকেলের পর থেকে এ-পাড়াটা জম-জমাট হয়ে ওঠে বেশি করে। ছেলেরা জটলা করে বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে। তখন বঙ্কুর দোকানে গরম বেগুনী আলুর চপ্ ভাজা শুরু হয়। তখন এক-একজন করে খদ্দের আসতে শুরু করে। তখন কুলপি-বরফওয়ালারা রাস্তা দিয়ে চীৎকার করতে করতে হেঁকে যায়। তখন বাড়িতে বাড়িতে উনুনে আগুন দেওয়া হয়। তখন উনুনের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সমস্ত পাড়াটা—

হঠাৎ অঘোরদাদুর বাড়ির সামনে আসতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল।

বাড়িটার সামনে তিনটে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলো। খাট, আলমারি, চেয়ার-টেবিল, বাসন-কোসন। দীপঙ্করের মনটা আনন্দে দশখানা হয়ে গেল। ভাড়াটে এসেছে অঘোরদাদুর বাড়ি! ভাড়াটে এসেছে আবার। আবার অঘোরদাদুর মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু আবার যদি চন্নুনী গালাগালি শুরু করে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগেকার মত!

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে বাড়িটার ভেতরে ঘরগুলোতে আবার আলো জ্বলছে। লোক-জনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ভেতরে। ভালোই হলো। এতদিন অন্ধকার-অন্ধকার ঠেকতো কেমন। উঠোনের কোণটায় মুখ ধুতে এসে সন্ধ্যেবেলা কেমন ভয়-ভয় করতো। এবার আর ভয় করবে না।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।

ভারি-ভারি আয়না, ভারি-ভারি খাট আলমারি। এবারকার ভাড়াটেরা খুব বড়লোক। এত ভালো আয়না অঘোরদাদুর নেই। অঘোরদাদুর চেয়েও এদের অনেক টাকা। চারজন মুটে মাথায় করে মাল বয়ে নিয়ে ভেতরে রেখে আসছে।

বাড়িতে আসতেই মা বললে—কোথায় ছিলি খোকা এতক্ষণ?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের বাড়িতে আবার ভাড়াটে এসেছে মা: দেখেছ—

মা বললে—তা তো হলো, কিন্তু তুই ছিলি কোথায় এতক্ষণ শুনি?

দীপঙ্কর বললে—এবার খুব বড়লোক ভাড়াটে মা, কী বড় বড় খাট, বড় বড় আয়না আলমারি সব,—অঘোরদাদুর চেয়েও বড়লোক। মা তুমি চন্নুনীকে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করে দিও মা—

সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসেও উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে ও-বাড়িতে আজ আলো জ্বলছে। অনেক লোকের কথাবার্তা কানে আসছে। রান্নার গন্ধ আসছে ও-বাড়ি থেকে। বেশ ভালো হলো! কেমন অন্ধকার দেখাতো এতদিন। এতদিন ও-দিকটায় চাইতে ভয় করতো। এবার আবার ওদের আলো পড়ে

উঠোনটা আলো হয়ে থাকবে।

রাত্তির বেলা বিছানায় শুয়ে হঠাৎ একটা শব্দে কেমন চমকে উঠলো দীপঙ্কর। একটা অদ্ভুত শব্দ। ঝুমুর-ঝুমুর ঝুম, ঝুম-ঝুম।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ও কিসের শব্দ মা?

সারাদিন খেটে-খুটে মা তখন চোখ বুজিয়েছে। বললে—কী জানি বাছা কিসের শব্দ!—তুই ঘুমো এখন—

এক সময় মা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লো। কিন্তু তখনও সেই শব্দটা হচ্ছে। যেন কেউ ঘুঙুর পরে নাচছে পাশের বাড়িতে। এত রাতে নাচছে কেন? কে নাচছে? ঠিক ভাড়াটেদের বাড়ির একতলার একটা ঘর থেকে শব্দটা আসছে। নাচের তালে তালে রাত্রের আবহাওয়াটা যেন দুলতে লাগলো। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে হলো একবার ছুটে দেখে আসি গিয়ে। কিন্তু একলা অন্ধকারে উঠতে ভয় হলো। রাত যেন অনেক হয়েছে—চারিদিকের বাড়িগুলোর আলোও হয়ত নিভে এসেছে।

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত দীপঙ্করের আর ঘুম এল না। সেই ঘুঙুরের শব্দের তরঙ্গে যেন দুলতে লাগলো সে। তারপর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন এক সময় আরো নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন ঘুঙুরের শব্দটা যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন ঠিক তার পাশে সরে এসেছে একেবারে, একেবারে তার বিছানার পাশে। একেবারে তার গা-ঘেঁষে কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে। আর তার চোখে নিঃশব্দে ঘুম নেমে এল। ঘুমে জড়িয়ে এল দু'চোখ......

হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ক্যাওড়াতলা শ্মশানের দিক থেকে একটা বিকট চীৎকার একেবারে সব স্বপ্ন যেন ভেঙে চুরমার করে দিলে। শিউরে উঠলো দীপঙ্কর।

কিরণের বাবাকে বোধহয় এতক্ষণে শ্মশানে নিয়ে গেল ওরা!

এতক্ষণ সে-কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে! কী আশ্চর্য! দীপঙ্করের মনে হলো কী আশ্চর্য! এতক্ষণ ঘুঙুরের শব্দটা তবে কি ভুল শুনেছে! তবে কি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ!

কতদিন আগেকার কথা। দেখতে দেখতে কতদিন কেটে গেল। অথচ মনে হয় এই যেন সেদিন। এই যেন সেদিন সে চাকরিতে ঢুকলো। নৃপেনবাবুর হাতে তেত্রিশটা টাকা দিয়ে এল মা। তারপর চাকরির চিঠি এল। আর তারপর থেকে দীপঙ্কর সেন একদিন হঠাৎ সেন-সাহেব হয়ে উঠলো। প্রথম প্রথম কেমন অবাক লাগতো! তারপর সহ্য হয়ে এল সব। গা-সওয়া হয়ে এল সমস্ত। সেই তেত্রিশ-টাকা যে কখন কেমন করে তের শো টাকায় গিয়ে উঠলো, সে-ও এক ইতিহাস। ইতিহাসই বৈ কি! মর্মান্তিক ইতিহাস। দীপঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত দেশের ইতিহাসটাও বদলে গেল। বদলে গিয়ে নতুন হয়ে গেল। কবে

একদিন লক্ষ্মীদি এসেছিল তার জীবনে হঠাৎ, সেই লক্ষ্মীদিও চিরস্থায়ী হয়ে গেল তার জীবনে। আর কবে একদিন সতী এসেছিল তার জীবনে, সেই সতীও তার জীবনে একেবারে চিরস্মরণীয় হয়ে গেল!

শুরু হয়েছিল সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে। সে-ইতিহাস শেষ হলো বুঝি এই গড়িয়াহাটার লেবেল-ক্রসিং-এ এসে।

প্রথম দিন সত্যিই দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারেনি। সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। সেই অঘোরদাদুর ভাড়াটেদের বাড়িতে ঝুম্ ঝুম্ করে ঘুঙুর বাজনার শব্দকে সেদিন তার স্বপ্নই মনে হয়েছিল। সমস্ত রাত যেন সেই স্বপ্নের মধ্যেই কেটেছে। সকালবেলা মার ডাকে ঘুম ভাঙলো।

মা ডাকলে—ওঠ্, ওঠ্ ও দীপু ওঠ্—বেলা হয়ে গেল যে—

দীপঙ্কর চোখ মেলে চাইলে চারিদিকে। সেই তো সেই অঘোরদাদুর উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতেই সে শুয়ে রয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই। বিছানা থেকে উঠেই সোজা উঠোনে এসে দাঁড়াল। তখন চন্নুনীর ঝাঁট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ছিটে-ফোঁটা কখন বাড়িতে এসেছে, কখন ঘুমিয়েছে, কিংবা হয়ত আসেওনি, ঘুমোয়ও নি—তা-ও কেউ জানে না। মা রান্নাঘরে রান্না চাপিয়েছে। দাওয়ার ওপর একটা শিল-নোড়া। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে এক-একবার বাটনা বেটে নিতে হয়, এক-একবার তরকারিও কুটে নিতে হয় বঁটিতে। বিংশ-শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি। বিরাট একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীতে। মানুষের জীবনের ঘাটা তখনও ভালো করে শুকোয়নি। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল—তারা কেউ কেউ ফিরে এসেছে মেসোপোটেমিয়া কিংবা ফ্রান্স থেকে। কেউ কেউ ফেরেনি। যারা ফিরেছে তারা পাড়ার রোয়াকে বসে যুদ্ধের গল্প শোনায়। হাঁ করে শোনে সবাই। কেউ কেউ চাকরি পেয়েছে। পুলিসের চাকরি কিংবা রেলের চাকরি। মোটা-মোটা মাইনের চাকরি দিয়েছে ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট। পাড়ায় তারা বুক ফুলিয়ে হাঁটে। ভাগ্যিস যুদ্ধে গিয়েছিল! থেমে না গেলে আরো লোক যুদ্ধে যেতে পারতো। তোফা আরাম সেখানে। মাছ মাংস ডিম পাঁউরুটি রোজ সকাল-বিকেলে। আর চা। পেটভরে যত ইচ্ছে চা খাও। কাজের মধ্যে কাজ প্যারেড করা। তা খেতে পেলে আর প্যারেড করতে কী!

বুড়োরা বলতো—আরে বাবা স্বরাজ-স্বরাজ করছিস্ যে, স্বরাজ হলে খাবি কী? ইংরেজরা যদি চলে যায় তখন কে তোদের দেখবে শুনি? জাপান যদি এক হুড়ো দেয় তো বাপ-বাপ বলে পালাবি তখন, তোদের মুরদ তো দেখা আছে—

নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের মধুসূদনদের রোয়াকে সকালবেলা আড্ডা বসে জোর। সেইখানে বেলা বারোটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। একখানা 'অমৃতবাজার' কাগজ নিয়ে আলোচনা হয়।

মধুসূদনের বড়দা বলতো—এই দেখলে কাকা সি আর দাশ কী বলেছে—

দুনিকাকা বলতো—আরে বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়, বলতে তো আর পয়সা খরচ নেই রে। বাঙালীদের ওই দোষেই সব, কেল্লা-ফতে করতে সবাই পারে! বারীন ঘোষের মত বোমা মেরে যদি স্বরাজ হতো তো আর ভাবনা ছিল না—ইংরেজ বেটারা ছিল তাই খেতে পাচ্ছিস তোরা, এই তোকে হক্-কথা বলে রাখলুম—

তারপরেই হঠাৎ আলোয়ানটা গা থেকে খসিয়ে ভেড়ে-মেড়ে ওঠে।

বলে—আচ্ছা, অত কথা থাক্, হঠাৎ যদি ইংরেজ-বাবাজীরা তল্পী-তল্পা গুটিয়ে চলে যায় তখন মিলিটারি কোথায় পাবি বল্ আর বন্দুক রাইফেল টোটা এ-সব কোথায় পাবি সেইটে তুই আমাকে আগে বোঝা—

এই আড্ডার সামনে দিয়েই দীপঙ্কর ইস্কুলে যেত। যেতে যেতে চীৎকার শুনে এক-একদিন দাঁড়িয়ে পড়তো সেখানে। কথা শুনতো। অনেক কথাই বুঝতে পারতো না। কিন্তু কেমন যেন মজা হতো। বড় বড় সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বড়রা। একদিন সে-ও বড় হবে। তখন হয়ত বুঝতে পারবে।

শশাঙ্কবাবু সেদিন ক্লাসে আসেননি। শশাঙ্কবাবু বাঙলার মাস্টার। দীপঙ্কর সামনের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল। প্রথম থেকেই কারো সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ হয়নি।

ফটিক বসেছিল পাশে। দীপঙ্কর ফটিককে বললে—এই জানিস, কিরণের বাবা মারা গেছে কাল—

ফটিক অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই কী করে জানলি?

আর কথা হলো না। হঠাৎ প্রাণমথবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। আবার বহুদিন পরে ইস্কুলে এসেছেন। সেই এক গাল পান মুখে। এলোমেলো খদ্দরের চাদর গায়ে, উস্কোখুস্কো চুল, আর পায়ে গোড়ালি দোমড়ানো জুতো—

প্রাণমথবাবু ঘরে আসতেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পেছনের বেঞ্চে যারা এতক্ষণ গোলমাল করছিল তারাও থেমে গেল।

প্রাণমথবাবু চেয়ারে বসে বললেন—কী পড়া আছে আজ তোমাদের?

দীপঙ্কর মনিটার। উঠে দাঁড়িয়ে একটা বই দিলে। বললে—বাঙলা ব্যাকরণ স্যার—

—ব্যাকরণ!

প্রাণমথবাবু বইখানা নিলেন। তারপর একটা দুটো পাতা উল্টে দেখে বইখানা আবার মুড়ে ফেললেন। কী যেন ভাবতে লাগলেন নিজের মনে আর পান চিবোতে লাগলেন। তারপর বললেন—শশাঙ্কবাবুর আজকে শরীর অসুস্থ, তাই আমি এসেছি। ব্যাকরণ তোমরা শশাঙ্কবাবুর কাছেই পোড়ো, আমি তোমাদের আর একটা জিনিস পড়াচ্ছি—

বলে খানিক চুপ করলেন। তারপর বললেন—ব্যাকরণ কাকে বলে? তুমি

বলতে পারো? তুমি? তুমি? তুমি?

সামনের ক'জনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সবাই হাঁ করে রইল। কেউ বলতে পারলে না।

প্রাণমথবাবুর পড়াবার কায়দাই ছিল আলাদা। যখনই তিনি কথা বলতেন সবাই চুপ করে শুনতো। কত জিনিস জানা যেত। অনেকক্ষণ ধরে তিনি অনেক কথা বলেন। দীপঙ্করের মনে হতো সে যেন গল্প শুনছে। প্রাণমথবাবুর পড়ানোর ধরণটাই ছিল গল্প বলার মত।

প্রাণমথবাবু আবার বললেন—তোমরা দাঁত মাজো?

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—হ্যাঁ স্যার—

—তোমরা চুলে তেল মাখো?

—হ্যাঁ স্যার!

—নখ কাটো?

—হ্যাঁ স্যার!

প্রাণমথবাবু বলতে লাগলেন—তাহলে এবার বুঝবে আমি কেন ও-কথা জিজ্ঞেস করেছি। তোমরা ওগুলো কেন করো? না ও-গুলো করলে শরীর সুস্থ হয়। তেমনি কতকগুলো নিয়ম আছে যা পালন করলে ভাষাও শুদ্ধ হয়, সেই নিয়মগুলো যে-সব বইতে লেখা থাকে তার নাম ব্যাকরণ—

যেটা এতদিন সকলের কাছে দুর্বোধ্য ছিল, হঠাৎ এতদিনে যেন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

হঠাৎ আবার এক সময়ে প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা স্বপ্ন দেখো?

সবাই এক সঙ্গে বললে—হ্যাঁ স্যার—

—আচ্ছা তুমি বলো তো, কী স্বপ্ন দেখেছ কাল?

ফটিক খানিক ভেবে বললে—আমি কাল কোনও স্বপ্ন দেখিনি স্যার—

—আচ্ছা তুমি দেখেছ?

এবার মধুসূদনের পালা। মধুসূদন উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি স্যার—

—তা হোক, শুনি কী রকম খারাপ?

মধুসূদন বললে—আমি স্যার দেখলুম যেন আমি মা-কালীর মন্দিরে গেছি প্রণাম করতে, হঠাৎ মনে হলো মা-কালী জ্যান্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, এগিয়ে এসে আমাকে খাঁড়া দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলেন—

—তারপর?

—তারপর স্যার আমি দেখতে লাগলাম আমার হাত-পাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে সামনে পড়তে লাগলো, আমার ধড়টাও পড়লো। আমার মুণ্ডটাও পড়লো—রক্তে ভেসে গেল সমস্ত মন্দিরটা, আর আমি সেই দিকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম—

—তুমি দেখতে গেলে? তারপর?

—তারপর মা-কালী বললেন—এবার আমার সঙ্গে আয়। আমি মা'র সঙ্গে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে একেবারে সোনার কার্তিকের ঘাটের কাছে চলে গেছি। মাও জলে নামলেন, আর আমি যেই জলে পা দিয়েছি, তখ্খুনি ঠাণ্ডায় কন্ কন্ করে উঠলো পা'টা, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও ব্যাখ্যা আছে। স্বপ্নেরও ব্যাকরণ আছে,—তোমরা বড় হয়ে সেই সব বই পড়লে এর ব্যাখ্যা পাবে—

তারপর আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের দিকে দেখালেন। বললেন—তুমি?

দীপঙ্কর এতক্ষণে সেই কথাই ভাবছিল। তাকেও যদি জিজ্ঞেস করেন প্রাণমথবাবু!

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে—আমি স্যার স্বপ্ন দেখেছি আমাদের পাশের বাড়িতে কারা ভাড়াটে এসেছে নতুন, হঠাৎ মনে হলো কানে একটা অদ্ভুত শব্দ এসে বাজছে—

—কীসের শব্দ?

দীপঙ্কর বললে—ঘুঙুরের শব্দ, মনে হলো যেন কেউ ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে, আমি অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইলাম, সমস্তক্ষণ ঘুঙুর বাজতে লাগলো, খুব মিষ্টি শব্দটা, যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়—

—তারপর?

—তারপর স্যার আমি আর থাকতে পারলুম না। ঘুঙুরের শব্দটা যেন আমায় টানতে লাগলো, আমি বিছানা ছেড়ে সেই রাত্তির বেলা উঠলুম, উঠে উঠোনটা পার হলুম, পার হয়ে যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দটা আসছে সেই দিকে গেলাম, তারপর পাশের ভাড়াটেদের বাড়ির একতলায় একটা জানালা আছে, সেই জানালাটা ফাঁক করে চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখি কি—

—কী দেখলে?

—দেখলুম স্যার, ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে আর খুব সেজেগুজে একটা ভাল্লুক তালে তালে নাচছে!

—ভাল্লুক?

—হ্যাঁ স্যার, আমি অবাক হয়ে ভাবছি এ ভাল্লুকটা কোত্থেকে এল, এমন সময় হঠাৎ ক্যাওড়াতলার শ্মশানে খুব জোরে একবার 'হরিবোলে'র চীৎকার হলো, আর আমার ঘুম ভেঙে গেছে—

প্রাণমথবাবু বললেন—এরও একটা ব্যাকরণ আছে, তা থাক, সে তোমরা পরে পড়বে বড় হয়ে, কিন্তু আরও এক রকম স্বপ্ন আছে, সেই স্বপ্নের কথা তোমাদের বলবো আমি আজ। সে-রকম স্বপ্ন তোমরা দেখ না, পৃথিবীর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরাই কেবল সেই সব স্বপ্ন দেখেন। সি আর দাশ, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু হলেন সেই সব মহাপুরুষ। এ'রা সব দেশকে স্বাধীন

করবার স্বপ্ন দেখেছেন—বড় হলে এঁদের লেখাও তোমরা পড়ে দেখ। এঁদের কারো কারো স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আবার কারো কারো এখনও হয়নি, কিন্তু এ-স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না। এ-স্বপ্ন একদিন ফলবেই। তোমরা বড় হয়ে যখন ইতিহাস পড়বে দেখবে আমাদের দেশে, সেই স্বপ্ন সফল করবার জন্যে কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, কত লোক ইংরেজদের জেলে জেল-খাটছে। উনিশ শো উনিশ সালের তেরোই এপ্রিল তারিখে জেনারেল ও'ডায়ার পাঞ্জাবে কেমন করে তিন্‌শো-জন লোককে গুলী করে মেরেছিল, কেন উনিশ শো একুশ সালে আকালী-বিদ্রোহ হয়েছিল, কেন মোপলা-বিদ্রোহ হয়েছিল মালাবারে, তোমরা সব বুঝতে পারবে তখন। আর এই যে আজ আমাদের বড়লাট......

হঠাৎ দেখা গেল টিপি টিপি পায়ে ঘরে ঢুকছে কিরণ।

কিরণ? আশ্চর্য! কিরণের বাবা মারা গেছে, আর কিরণ কিনা আজ ইস্কুলে এসেছে!

বাইরে ঢং করে ঘণ্টা বাজলো।

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এত দেরি যে?

কিরণ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার বাবার খুব অসুখ হয়েছিল স্যার—

—আচ্ছা বোসো—বলে উঠলেন প্রাণমথবাবু। তারপর দীপঙ্করের হাতে বই ফিরিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

প্রাণমথবাবু চলে যেতেই দীপঙ্কর কিরণের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে—কী রে তোর বাবা মারা যায়নি? আমি যে ফটিককে বলছিলুম তোর কথা—

কিরণ বললে—ভাই মিছিমিছি সাধুটার ওপর রাগ করে অনেক গালাগালি দিয়েছিলুম, আমার বাবা মরেনি রে—

—তবে তোর মা যে কাঁদছিল অমন করে?

কিরণ বললে—বাবা তো কথা বলতে পারে না, নাড়ি-টাড়ি একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল বাবার, মা ভাবলে বাবা বুঝি মরে গেছে—শেষে কবিরাজ এসে দেখলে, দেখে বললে বাবা বেঁচে আছে—

তারপর হাত নেড়ে বললে—আরে আমি জানতুম বাবা এখন মরবে না, বাবার অসুখ তো আর কদিন পরেই ভালো হয়ে যাবে, আমাদের অবস্থা খুব ভালো হয়ে যাবে, অনেক টাকা হবে আমাদের—

—কী করে জানলি?

কিরণ বললে—সেই সাধু আমাকে বলেছে যে, খাঁটি সাধু, জানিস, একেবারে খাঁটি হিমালয়ের সাধু—

ইস্কুলের ছুটির পর দীপঙ্কর বললে—আজ সেই সাধুর কাছে যাবি কিরণ?

কিরণ কী যেন ভাবলে। বললে—আজ তো হবে না ভাই, আজ যে পৈতে

বিক্রি করতে হবে, একটা পয়সা নেই মা'র হাতে, বাবার ওষুধ কিনতে সব ফুরিয়ে গেল কি না—ঠিক আছে কাল যাবো—

—ঠিক যাবি তো?

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে, তুই কিসের জন্যে যাবি সাধুর কাছে? তোর কিসের দরকার?

—এই এমনি!

সেদিন দীপঙ্কর এড়িয়েই গিয়েছিল কিরণের প্রশ্নটা। অবশ্য সত্যিই তো, সাধুর কাছে কিসের জন্যেই বা সে যাবে! তবু কিছু জানবার কি ছিল না তার সেদিন? মা'র দুঃখ কবে ঘুচবে! আর কতদিন পরের বাড়ি রান্না করতে হবে মাকে! আরো কত কথাই তো জানবার আছে তার! কবে বিন্তিদির ভাল-ঘরে ভাল-বরে বিয়ে হবে। কবে অঘোরদাদু আবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে, তখন দৃষ্টির অভাবে আর ঠাকুরের নৈবেদ্য চুরি করতে হবে না অঘোরদাদুকে। আর আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সাধুকে। সত্যিই কি টাকা দিয়ে সব কেনা যায়—সব কি কেনা যায় টাকা দিয়ে? সব কিছু?

সেদিন সন্ধেবেলা এক মনে পড়তে বসেছে দীপঙ্কর। মা রান্নাঘরে রান্না করছে। চন্নুনীও এতক্ষণ গলা ফাটিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করছিল, সে-ও বুঝি ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল এতক্ষণে। সন্ধের পর অঘোরদাদুর আর সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তখন নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে কী সব করে। আস্তে আস্তে বাতাসের ধোঁয়াগুলো কেটে যায়। তখন ঈশ্বর গাঙুলী লেনটাও যেন একটু ঝিমিয়ে আসে। কুলপি-বরফওয়ালার হাঁক, ঘুগনিদানাওয়ালার চীৎকারও থেমে আসে। তখন এক মনে পড়তে পারে দীপঙ্কর মন দিয়ে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মনে হলো যেন কালকের সেই শব্দটা আবার হচ্ছে—সেই ঘুঙুরের শব্দ।

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল দীপঙ্কর।

প্রাণমথবাবু বলেছিলেন এক-একজনের স্বপ্ন সত্যি হয়! এক-একজনের স্বপ্ন ফলে!

একবার ভাবলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে! কিন্তু মা তখনও রান্না করছে রান্নাঘরে। দীপঙ্কর ঘর ছেড়ে বাইরে এল। অঘোরদাদুর উত্তরের দিকের বাড়িটা ভাড়াটেদের। সে বাড়িটার একতলায় সব ঘরে আলো জ্বলছে। আর ঘুঙুরের শব্দটা যেন আসছে একতলারই একটা ঘর থেকে। তবে স্বপ্ন নয় ওটা! সত্যি ঘটনা!

আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল দীপঙ্কর। তারপর টিপি টিপি পায়ে একেবারে উঠোনের শেষ প্রান্তে গিয়ে হাজির। সেখানে একটা আমড়া গাছ। গাছের তলাটায় বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের তলায় দাঁড়ালে আর কেউ

দেখতে পাবার কথা নয়।

একতলার ঘরটার ভেতরে শব্দ হচ্ছে! সত্যিই কি ভাল্লুক নাচতে পারে! সত্যিই ভাল্লুক পুষেছে নাকি ওরা!

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর কাছে গিয়ে জানালার পাখীটা তুললে। তারপর উঁকি দিয়ে দেখলে ভেতরে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে—ভাল্লুক নয়, একটা মেয়ে—

মেয়েটা আঁটসাঁট করে শাড়ি পরেছে, মাথার খোঁপাটা এঁটে বেঁধে নিয়েছে। দু' পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, আর আপন মনে এঁকে বেঁকে হেলে দুলে নাচছে। সামনে একটা আয়না।

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। আপন মনেই আয়নার সামনে নাচছে মেয়েটা। কোনওদিকেই খেয়াল নেই। কখনও হাত দোলাচ্ছে, কখনও মাথা, কখনও পা। হাতের দোলানির সঙ্গে পায়ের তালগুলো মিলিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে, তারপর আবার শুরু করছে। বিন্তিদির মত বয়েস। তবে বিন্তিদির মত অত সুন্দর নয়। কিন্তু সেজেছে খুব ভালো। বিন্তিদি এত সাজ-গোজ করে না।

—কে? কে রে?

দীপঙ্কর একেবারে চমকে উঠেছে হঠাৎ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এপাশে ওপাশে চেয়ে দেখলে! কে যেন কী বললে! কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই! এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিল!

মেয়েটা তখনও নাচছে। দীপঙ্কর কিন্তু আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না সেখানে। অন্ধকার আড়াল থেকে বেরিয়ে আমড়া গাছের তলা দিয়ে উঠোন পার হয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকলো। তখনও ঝুম-ঝুম করে ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে ও-বাড়িতে—

পরের দিন সন্ধেবেলাই কিন্তু ধরা পড়ে গেল দীপঙ্কর।

অনেক পথ, অনেক বিপথ অতিক্রম করে আসার পর দীপঙ্করের মনে হয়েছে কেন কিসের প্রয়োজন ছিল এ সমস্তর। দীপঙ্করও তো অন্য আর পাঁচজনের মত সহজ সাধারণ জীবন কাটাতে পারতো! যেমন অভয়ঙ্কর, রামমূর্তি, সোম! ওরা তো চাকরি করছে, চাকরিতে উন্নতি করেছে, বিয়ে করেছে, ওদের সন্তান হয়েছে, সকাল বেলা অফিসে গিয়েছে, সন্ধেবেলা বাড়িতে ফিরে সংসার করেছে, সিনেমা দেখেছে! কোনও অভাব তো নেই ওদের। তবে দীপঙ্করের কেন এমন হলো! সেও চাকরিতে ঢুকেছিল একদিন! পাঁচজনের যা হয় না, তার তাই হয়েছে। অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে চাকরিতে! লোকে বলে সেন-সাহেব। সেন-সাহেব হয়ে কী হয়েছে! সেন-সাহেব হয়েও বার বার তার মনে হয়েছে নিজের

ভেতরটাতেও যেন তার নিজের আর শেষ নেই। বাইরের আলো বাতাসের সঙ্গে বাইরের অন্নজলের সঙ্গে কেন তার যোগ এমন নিবিড় হলো। কেন সেদিন সেই আমড়া গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে জানালা ফাঁক করে উঁকি দিয়েছিল? কিসের আকর্ষণ? সেই অত কম বয়েসে তার তো কোনও রকম আকর্ষণ থাকবার কথা নয়!

সত্যি, পরের দিনই সন্ধ্যেবেলা ধরা পড়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর।

সেদিনও কিরণ ইস্কুলে এসেছিল। ইস্কুলের পর দীপঙ্কর বলেছিল—এই সেই সাধুর কাছে আজ যাবি না?

কিরণ বললে—সাধুর কাছে তো সন্ধ্যেবেলা যাবো, বিকেলবেলা চল্ মিটিং শুনে আসি—

—কোথায়?

—হরিশ পার্কে।

হরিশ পার্কে সেদিন ছিল এক বিরাট মিটিং। পুলিসে-পুলিসে ভর্তি জায়গাটা। দীপঙ্করের কেমন ভয় করতে লাগলো প্রথমটা। তবু অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

কিরণ এ-সব দিকে রোজ পৈতে বিক্রী করতে আসে। তার কোনও ভয় নেই। বললে—আয়, ভেতরে আয়—

ভেতরে অনেক লোক তখন মাটিতে বসে পড়েছে। কংগ্রেসের মিটিং। দুটো নিচু-নিচু টেবিল। একটা কারবাইড্ গ্যাস বাতি। অন্ধকার হলে জ্বালানো হবে। দুজন ভদ্রলোক দুটো চেয়ারে বসে আছে। আধখানা পার্ক জুড়ে লোক জড়ো হয়েছে পাশেই দু'তিনটে চেয়ার। খবরের কাগজের লোক, পুলিসের রিপোর্টার বসে আছে কাগজ পেন্সিল নিয়ে।

মনে আছে দীপঙ্কর কারোর নাম জানতো না। কে প্রতাপ গুহরায়, কে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী—কে সুভাষ বোস কিছুই জানতো না।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সুভাষ বোস কোনটা রে?

কিরণ বললে—সুভাষ বোস আসেনি, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এসেছে, দেখ্ না, এমন বক্তৃতা দেবে তুই কেঁদে ফেলবি,—লণ্ঠন বায়োস্কোপও হবে—

শুধু বক্তৃতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন-লেকচার। একটা সাদা পর্দার ওপর ছবি পড়তে লাগলো। ঠিক যেন থামানো বায়স্কোপ। ছবিগুলো নড়ে না। কিন্তু বক্তৃতা দিলে সব বোঝা যায়। কেমন করে ইংরেজদের সোলজাররা এসে ভারতবর্ষ দখল করলো, কেমন করে ইংরেজরা তাঁতীদের আঙুল কেটে দিলে, চর-মাইনরের অত্যাচার, বজবজে শিখদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার। সমস্ত ছবির পর্দায় দেখানো হচ্ছে, আর জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা চলছে। সে কী বক্তৃতা। সমস্ত লোক চুপ করে শুনছে। একটার পর একটা নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে ভারতবর্ষ অন্যায় ভাবে দখল করেছে ইংরেজরা। ইংরেজরা কত পাজি, কত বদমাইশ, কত অত্যাচারী

তারই ছবি একটার পর একটা চলছে।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বললেন—আমরা মানুষ না পশু? আমরা গাছ না পাথর? কী আমরা? আমরা মানুষ নই, জানোয়ারও নই। জানোয়ার হলেও আমরা রুখে দাঁড়াতাম, প্রতিবাদ করতাম, প্রতিশোধ নিতাম। ওরা আমাদের গুলী করেছে, আর আমরা কী করেছি? আপনারা বলুন কী করেছি আমরা!

একজন বললে—আমরা ওদের খোশামোদ করেছি—

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বললেন—না, আমরা ইংরেজদের পা চেটেছি—

পাশের একটা লোক বললে—ঠিক ঠিক—

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা চললো আবার। তখন আশ্বিন মাস। মাদারী-পুরের রাস্তা দিয়ে মিস্টার ক্যাটেল যাচ্ছেন। সাহেব জুট মিলের ম্যানেজার। পাশ দিয়ে একটি কলেজের ছেলে মাথায় ছাতা দিয়ে চলেছে। দেখে সাহেবের নীল রক্ত টগবগ্ করে ফুটতে লাগলো! কী, এত বড় আস্পর্ধা, সাহেবের সামনে ছাতি মাথায় দিয়ে যাওয়া! কালা নিগর, তার এত সাহস?

সাহেব বললে—ছাতা বন্ধ করো—

ছেলেটাও অবাক হয়ে গেছে, বললে—কেন, ছাতা বন্ধ করবো কেন?

সাহেব বললে—আমার হুকুম—

ছেলেটি বললে—তুমি কে হে যে তোমার হুকুম?

সাহেব বললে—দেখবে আমি কে? এই দেখ—

বলে ছেলেটিকে ধরে বেদম প্রহার। ছেলেটা আধমরা হয়ে পড়ে রইল সেখানে। সাহেব চলে গেল।

মামলা হলো কোর্টে। বিচার হলো। জজ রায় দিলে—ছেলেটিরই দোষ! সে সাহেবকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ক্যাটেল সাহেব নির্দোষ! তারপর স্টেপল্টন্ সাহেব নিজে এলেন তদন্ত করতে। তিনি বিচার করে বললেন—অনন্তমোহন দাস আর তার তিনজন সঙ্গীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এনে পঁচিশ ঘা করে বেত মারা হবে। বন্ধুগণ, আমরা যদি মানুষ হতুম তো আমাদের পিঠেও সে বেতের দাগ পড়তো! আমরা গাছ-পাথর তাই আমরা সেই ইংরেজদের পা চাটি, আর এরা? এই যারা আমার পাশে বসে ইলিশিয়াম রো'র জন্যে রিপোর্ট লিখছে—এদের আর কী বলবো—

বলে তিনি জুতোসুদ্ধ পা'টা মাটিতে ঠুকলেন।

আর হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, কয়েকজন পুলিস বাইরে কোথায় ছিল তারা দৌড়তে দৌড়তে লাঠি ঘুরিয়ে এল সভার মধ্যে। একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। লোকগুলো, যারা শুনছিল এতক্ষণ চুপ করে, তারা দৌড়তে লাগলো—

কিরণ হঠাৎ বললে—পালা দীপু—পালিয়ে চল্ শিগ্গির—

তারপর কোথায় রইল কিরণ, কোথায় রইল দীপঙ্কর, আর কোথায় রইল

হরিশ পার্ক। অন্ধকার ভালো করে হয়নি। কোন্ গলি দিয়ে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়লো। একেবারে হাজরা রোড। তারপর একটু এসেই হাজি কাশিমের বাড়িটা। বিরাট বাড়ি। সেইখান দিয়ে বেরিয়ে রামধনির পানের দোকানের পাশ দিয়ে একেবারে হাজি কাশিমের বাজারের কাছে গিয়ে পড়লো। টিপ্পু-সুলতানের বাড়ির মাথায় ছিল একটা বিরাট বটগাছ, সেই বটগাছের তলা দিয়ে একেবারে সোজা আগুনখাকীর পুকুরটা ঘুরে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর শেতলাতলার কাছে এসে পড়েছে। তখন যেন স্থির হয়ে ভাববার অবস্থা হয়েছে দীপঙ্করের। এদিকে কোনও উত্তেজনা নেই, এখানে এসে ভালো করে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। আশে-পাশে সামনে পেছনে কোথাও পুলিস নেই। দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে যেন দম ফিরে এল। কিরণটা কোথায় গেল! তার সঙ্গে সাধুর কাছে যাবার কথা ছিল। তাও হলো না। আস্তে আস্তে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর দিকে চলতে লাগলো দীপঙ্কর। বঙ্কুর দোকানে তখন তেলেভাজার ভিড় হতে আরম্ভ করেছে সবে। মধুসূদনদের বাড়ির রোয়াকে তখনও আড্ডা চলছে—

বাড়ির ভেতরে গিয়ে ডাকলে—মা—

মা তাকে দেখেই বললে—কোথায় ছিলি খোকা এতক্ষণ, আমি ভাবছি বসে বসে—

মা মুড়ি রেখে দিত বিকেলবেলা। সকালে-বিকেলে ছিল মুড়ি বরাদ্দ। কোনও কোনওদিন গ্রীষ্মকালে পান্তাভাত। তারপর আর বেরোন নয়। সন্ধ্যে হবার পর পড়তে বসা। কিন্তু পড়তে বসেও যেন মন থাকতো অন্যদিকে। কিরণটা কী করছে এতক্ষণ। হয়ত পুলিসের লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। নয়ত হাসপাতালে নিয়ে গেছে তাকে। এমনি অনেক কথা!

মা বলতো—হ্যাঁ রে, বই মুখে দিয়ে কী ভাবছিস্ বসে বসে?

তারপর আর একটু অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে মা যাবে রান্নাঘরে। সেখানে রান্না চড়াবে। তখন একলা-একলা ঘরের মধ্যে অঘোরদাদুর সিন্দুকটার গায়ে হেলান দিয়ে পড়তে বসবে দীপঙ্কর।

সেদিনও তাই করছিল। হঠাৎ মনে হলো যেন ঝুম ঝুম করে আবার সেই ঘুঙুরের আওয়াজ আরম্ভ হলো। ঠিক আগের দিনের মত। আশ্চর্য, সে কিনা ভেবেছিল ভাল্লুক। ভাল্লুক কী করে আসবে শহরের মধ্যে। আর ঘুঙুরই বা বাজবে কী করে। ভাল্লুক কি কেউ পোষে! কিন্তু নাচে কেন ওদের মেয়েটা! ছিটেদি তো নাচে না। আশেপাশের বাড়িতে কেউই তো নাচে না। কত মেয়ে আছে কত লোকের বাড়িতে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট, কালিঘাট রোড, টালিগঞ্জ রোড, শানগর, কত লোক আছে, কেউ নাচে না। তাহলে ওরা দীপঙ্করদের থেকে আলাদা। আলাদা ধরনের মানুষ ওরা। এর

আগেও তো কত লোক এসেছে, কেউ তো অমন করে নাচেনি। নাচলে নিশ্চয় টের পাওয়া যেত। অত বড় ধাড়ি মেয়ে নাচে কী করে? লজ্জা করে না?

রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীপঙ্কর। মা তখন খুব ব্যস্ত, উনুনে তরকারির কড়া চাপিয়েছে। চাপিয়ে ভাতের ফ্যান গালছে।

দীপঙ্কর বললে—মা—

মা বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে—লেখাপড়া ছেড়ে এখানে কেন এলি বলতো, লেখাপড়া চুলোয় গেল তোমার—এই তুমি বড় হবে, এই তুমি মানুষ হবে?

আর বলা হলো না। একবার ভেবেছিল মাকে জিজ্ঞেস করবে—ওরা কি আলাদা? ওই যারা নাচছে, ওরা কি আমাদের মত নয়? আমাদের মত বাঙালী আমাদেরই মতন কাপড় পরে, ভাত খায়, অথচ অন্যরকম দেখায় কেন ওদের? ওরা তো পরের বাড়ি ভাত রাঁধে না, ওদের তো কেউ বকে না?

মনে আছে সেদিন দীপঙ্কর যেন বুঝতে পেরেছিল সমস্ত কালিঘাটের লোক এক জাত, আর ওই ভাড়াটেরা আর-এক জাতের। আকর্ষণটা ঠিক বোধহয় সেইজন্যেই। আশে-পাশের লোকরা যারা এপাড়ার ওপাড়ায় থাকে, তারা তো অত দামী খাটে শোয় না, অত ভালো আলমারি তাদের নেই। যেন অনেক বড়লোকরা তাদের উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এ ভুল করে ভাড়াটে হয়ে এসেছে। ওদের চাকরটারও কেমন বাবু-বাবু চেহারা। চাকরটারও মাথায় বাহারে টেরি। হরিশ মুখার্জি রোডের ওদিকেই যেন ওদের মানাত। ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিতরা ওইদিকেই থাকতো। কিন্তু হঠাৎ এরা এত জায়গা থাকতে এই মধ্যবিত্ত পাড়ায় এল কেন। এখানে মানায় কিরণদের, এখানে মানায় দীপঙ্করদের, এখানে মানায় চন্নুনী, মধুসূদন, প্রাণমথবাবুদের। এখানে মানায় অঘোরদাদুদের, ছিটে, ফোঁটা, বিন্তিদিদিদের। বঙ্কুর তেলেভাজার দোকান এখানেই মানায়।

মধুসূদনের কাছেই খবর পেয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর।

মধুসূদন বলেছিল প্রথমে। বলেছিল—তোদের বাড়িতে কারা ভাড়া এল রে দীপু?

দীপঙ্কর বলেছিল—কই, জানি না তো—

মধুসূদন বলেছিল—হ্যাঁ রে, আমি আসবার সময় দেখে এলুম যে, বড় বড় খাট আলমারি নামছিল তোদের বাড়ির সামনে, আর ফরসা-ফরসা লোক নামছিল ট্যাক্সিগাড়ি থেকে—

একটু থেমে মধুসূদন বলেছিল—লোকগুলো খুব ফরসা, একেবারে মেম-সাহেবদের মত দেখতে—

মধুসূদনদের রোয়াকের আড্ডাতেও বেশ আলোচনা হয়েছিল।

দুনিকাকা বলেছিল—কে এল রে অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়িতে, নতুন ভাড়াটে

বুঝি ?

মধুসূদনের বড়দা বলেছিল—এ-পাড়ায় অমন লোক এল—ব্যাপারটা কী—এ যে হংস মধ্যে বক্ বাবা—

সত্যিই পাড়াময় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এ-পাড়ায় তো এমন ভাড়াটে আসে না কস্মিনকালে। এ-পাড়ার লোকেরা পুঁইশাকের খদ্দের, একটু পেঁয়াজ যদি হলো তো গরমমশলার আর দরকার হয় না এদের। কোনও বাড়িতে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালে এরা অবাক হয়ে যায়। খোঁজ নেয়, কে এল, কত টাকা মাইনে পায়! এরা পরের পরা ধুতি দেখলে হাত দিয়ে খোল্ পরীক্ষা করে দেখে, দর জিজ্ঞেস করে। এ কালিঘাট। ভবানীপুরও নয়, শ্যামবাজারও নয়। আদি গঙ্গার পুব কূলের এই জনপদ, বাহান্ন পীঠের আর একটা পীঠস্থান। এখানে তো অমন ভাড়াটে আসার কথা নয়। ওদিকে হরিশ মুখার্জি রোড, ওদিকে ল্যান্সডাউন রোড, তার আরো ওদিকে এলগিন রোড, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট—ও-সব বনেদী পাড়া। ওদিকে অঘোরদাদুর সব বনেদী যজমানরা থাকে। সেই বনেদী লোক এল কিনা উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এ।

আর একবার দীপঙ্কর ডাকলে—মা—

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না দীপঙ্কর। মা তখন ডাল সাঁতলাচ্ছে—

দীপঙ্কর উঠোনটা পার হয়ে শোবার ঘরের দিকে আসছে, হঠাৎ কানে গেল ঝুম্-ঝুম্ শব্দটা। থম্‌কে দাঁড়াল দীপঙ্কর! তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারটার দিকে এগিয়ে গেল। আমড়া গাছটার তলায় গিয়ে ভাবলো খানিকক্ষণ। বড়-লোকদের চেহারাই আলাদা! ওরা কেন এল এ-পাড়ায়। ওদের বাড়িতে যদি কোনও ছেলে থাকতো তো বেশ হতো। তার সঙ্গে এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো! কেন এল এ-পাড়ায় ওরা?

হঠাৎ মনে হলো যেন ঘুঙুরের শব্দটা থেমে গেল।

থামলো কেন?

দীপঙ্কর হঠাৎ সেই জানালাটার কাছে গিয়ে পাখীটা ফাঁক করলো একবার, তারপর উঁকি দিয়ে দেখলে ভেতরের দিকে—

—কে রে? কে রে ওখানে?

চম্‌কে উঠে সরে যেতে গিয়েই একটা লোক তার হাতটা ধরে ফেলেছে। দীপঙ্কর অন্ধকারের মধ্যেই চিনতে পারলে। সেই চাকরটা।

চাকরটা তার হাতটা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে খিড়কীর দরজাটা দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। দীপঙ্কর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। বললে—আমায় ধরছো কেন? বা রে! আমি কী করেছি?

চাকরটা ভেতরে গিয়েই বললে—চলো, চলো, রোজ রোজ দেখা হয় উঁকি মেরে—

দীপঙ্কর বললে—বা রে, আমি বুঝি রোজ দেখি, আমি তো ঘুঙুরের আওয়াজ শুনলাম, তাই—

ভেতরে যেন কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন বললে—রঘু, ধরে এনেছিস? নিয়ে আয় তো ধরে আমার কাছে, নিয়ে আয় তো দেখাচ্ছি আমি ওকে—

ভীষণ ভয় হয়ে গেল দীপঙ্করের। চাকরটার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু চাকরটার গায়ে জোর খুব। দু'হাতে তাকে ধরে রেখেছে। বললে—রোজ রোজ উঁকি মেরে দেখা হয়—এই দেখ দিদিমণি যেতে চাইছে না—

ভেতর থেকে দিদিমণি বললে—ওকে নিয়ে আয় আমার কাছে—

চাকরটা দীপঙ্করের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। পেছনটা একফালি উঠোনের মতন। তারপর দু' ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে রোয়াক। রোয়াকের ওপর উঠে সামনেই ঘর। ঘরের ভেতরে আলোর তেজ খুব। খুব দামী দামী পর্দা টাঙানো। দামী দামী পর্দা খাটানো হয়েছে বাড়িতে। চাকরটা ঘরের ভেতর নিয়ে যেতেই মেয়েটি বললে—ও এই-ই বুঝি! খুব কম বয়েস তো—কোথায় থাকো? কী নাম তোমার?

দীপঙ্করের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বললে—আমি কিছু করিনি, আমাকে শুধু শুধু ধরে নিয়ে এসেছে—

চোখ তুলে ভালো করে কাছাকাছি থেকে দেখলে দীপঙ্কর। চোখে সুরমার কাজল পরেছে। তখন জানালার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। নাচবার জন্যে সিল্কের শাড়িটা খুব আঁট করে পরেছে গায়ে। কানে দুল্ দুল্ করে দুলছে দুটো পাথরের দুল।

মেয়েটি কাছে এল আরো। বললে—কী নাম তোমার?

দীপঙ্কর সোজাসুজি মুখ তুলে চাইলে। চেহারাটা দেখে অনুমান করবার চেষ্টা করলে কতখানি শাস্তি তাকে পেতে হবে। কিন্তু চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা মুক্ততা ছিল। আশ্বাসও পাওয়া যায় না, আবার আতঙ্কও হবে না।

মেয়েটি বললে—বলো, তোমার নাম বলো? শিগ্‌গির বলো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি যদি আমার মাকে বলে দাও—

মেয়েটি হেসে ফেললে এবার। কী চমৎকার দাঁতগুলো! হাসি দেখে যেন খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল।

দীপঙ্কর বললে—আমার মাকে বলে দিলে আমার মা খুব বকবে—আমি আর করবো না, আমায় ছেড়ে দাও—

—হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি তোমায়, রঘু তুই বাইরে যা তো—

রঘু চাকরটা চলে গেল। এবার শুধু মেয়েটি আর দীপঙ্কর।

মেয়েটি বললে—বলো, তোমার মাকে বলে দেব না, কী নাম তোমার?

কোথায় থাকো? কী দেখছিলে উঁকি মেরে?

দীপঙ্কর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সত্যি বলছি আমি তোমাকে দেখছিলাম, আর কাউকে দেখিনি—

মেয়েটি খুব জোরে হেসে উঠলো। বললে—আরে পুটকে ছোঁড়াটার তো খুব শখ, আমাকে দেখছিলে! আমাকে দেখবার কী আছে, আমি বাঘ না ভাল্লুক—

দীপঙ্কর বললে—আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম কিনা—

—স্বপ্ন? কিসের স্বপ্ন? আমার স্বপ্ন দেখেছিলে?

মনে আছে দীপঙ্করের, তার সেদিনকার ব্যবহারের কথা মনে পড়ে সত্যিই পরে অনেকবার হাসি এসেছিল। ছোটবেলায় সত্যিই খুব বোকা ছিল দীপঙ্কর। তাছাড়া, সারা কালিঘাটে লক্ষ্মীদির মতন মেয়ে তো তখন দেখেনি। যারা ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের আশে-পাশে থাকতো তারা কেউই লক্ষ্মীদির মতন নয়। সব মেয়েরা যেমন করে কাপড় পরে, জামা পরে সে-রকম করে কাপড়-জামা পরতো না লক্ষ্মীদি। কেমন করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পরতো কাপড়টাকে, দেখতে খুব ভালো লাগতো!

লক্ষ্মীদি বলেছিল—কোথায় বাড়ি তোমাদের?

দীপঙ্কর বলেছিল—এই অঘোরদাদু, এই অঘোরদাদুদের বাড়িতেই আমরা থাকি—পর্শুদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম কে যেন ঘুঙুর পায়ে নাচছে, তারপর উঁকি মেরে দেখলুম, একটা ভাল্লুকের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা, আর সে খুব নাচছে—

—তা এত জিনিস থাকতে ভাল্লুকের স্বপ্ন দেখেছিলে কেন তুমি? আমি ভাল্লুক?

বলে লক্ষ্মীদি খুব হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—না, প্রাণমথবাবু বলেছিলেন, বড় হলে বই পড়লে সব বুঝতে পারবো, স্বপ্নর অনেক মানে আছে—

—প্রাণমথবাবু কে?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের হেড-মাস্টার—তিনি বলেছেন, যাঁরা বড় বড় লোক, মহাত্মা গান্ধী, সি আর দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁদের স্বপ্ন সত্যি হয়—তাই আমি দেখছিলুম আমার স্বপ্নটা সত্যি ফলে কি না—

তারপর একটু থেমে বললে—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর কখখনো করবো না—

লক্ষ্মীদি বললে—তোমাকে ছাড়ছি না এত সহজে—

তারপর ডাকলে—রঘু—

রঘু আসতেই লক্ষ্মীদি বলেছিল—দেখ তো রঘু, কাকাবাবু এসেছে কি না আপিস থেকে—

কে কাকাবাবু, কী রকম লোক কাকাবাবু কিছুই তখন জানতো না দীপঙ্কর। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল হয়ত কাকাবাবুকে বলে মার খাওয়াবে মেয়েটা। দীপঙ্কর বলেছিল—আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আমি আর কখখনো করবো না—আমার মা জানতে পারলে বকবে—

কিন্তু রঘু খবর নিয়ে এল—কাকাবাবু বাড়িতে এসেছে, চা খাচ্ছে—

মেয়েটি বললে—চলো, চলো, ওপরে চলো—

দীপঙ্কর বললে—আমার মা বকবে—

মেয়েটি বললে—দাঁড়াও তোমার কী করি আমি—দেখাচ্ছি—

বলে টানতে টানতে ভেতরের রোয়াক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিয়ে গেল। ওপরের বারান্দাটাও খুব সাজানো। সমস্ত ঘরের সামনে পর্দা ঝুলছে।

মেয়েটি দূর থেকেই ডাকলে—কাকাবাবু—

ভেতর থেকে উত্তর এল—কী হলো লক্ষ্মী—কী হয়েছে?

মেয়েটি বললে—এই দেখুন কাকাবাবু, চোরটাকে ধরে এনেছি—এই দেখুন—

বলতে বলতে মেয়েটি দীপঙ্করকে ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে।

বললে—দেখুন, গায়ে জোর আছে খুব—এই দেখুন—

বলে টেনে হিঁচড়ে একেবারে কাকাবাবুর সামনে হাজির করলে।

দীপঙ্কর দেখলে এক ভদ্রলোক টেবিলে বসে চা খাচ্ছিলেন। পাশে একটি মহিলাও বসে আছেন।

কাকাবাবু বললেন—ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও লক্ষ্মী,—আহা, লাগবে যে ওর—

লক্ষ্মীদি ছেড়ে দিলে। বললে—কী বদমাইশ ছেলে জানেন কাকাবাবু, আমাকে বলে কি না ভাল্লুক—

ভদ্রলোক বললেন—সে কি, তুমি ভাল্লুক বলেছো? লক্ষ্মীকে ভাল্লুক বলেছো?

মহিলাটি বললেন—ওমা, কী হবে, আমি তখনি তোমায় বলেছিলুম এত পাড়া থাকতে এখানে বাড়িভাড়া নিলে—

ভদ্রলোক দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি ভাল্লুক বলেছো লক্ষ্মীকে?

দীপঙ্কর বললে—আমি ভাল্লুক বলিনি, কখন আমি ভাল্লুক বললুম তোমাকে? বা রে—

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তুমি উঁকি মেরে কী দেখতে?

লক্ষ্মীদি একটা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো এতক্ষণে। দীপঙ্কর অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে চারিদিকে। কী চমৎকার সাজানো ঘর। আগে যারা ভাড়াটে ছিল, তারা এমন সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতো না ঘর!

লক্ষ্মী বললে—আমি কালকেই রঘুকে বলে রেখেছিলাম কাকাবাবু, যে

আজকে ঠিক সেই রোঁদ থাকে—আর যা ভেবেছিলাম—ঠিক আজকে এসেছে।

ভদ্রলোকের মুখখানা দেখে যেন খানিকটা ভরসা হলো দীপঙ্করের। বেশ ভদ্র-ভদ্র চেহারা।

ভদ্রলোকের স্ত্রী, তিনিও চা খাচ্ছিলেন। বললেন—আমি তখনি বললাম, এ-পাড়ায় বাড়ি নিও না—তুমি তো শুনলে না—

দীপঙ্কর বললে—আমায় ছেড়ে দিন, আমি আর কখনও করবো না—

ভদ্রলোক বললেন—বা রে, আমরা তোমায় মেরেছি না ধরেছি, সে অমন করছো তুমি? কী নাম তোমার?

দীপঙ্কর বললে—আমার নাম দীপঙ্কর সেন, আমি এই অঘোরদাদুর বাড়িতেই থাকি—

—ও, অঘোর ভট্টাচার্যি মশাই, তিনি তোমার কে হন?

—আমার কেউ হন না, তিনি আমাদের দেশের লোক, আমি আর আমার মাকে থাকতে দিয়েছেন ওঁদের বাড়িতে, আমার জামা-কাপড় দেন, আমাকে খুব ভালবাসেন—

ভদ্রলোক বললেন—তা ভালো তো, খুব কৃপণ লোক শুনেছিলাম, তা যাহোক, তুমি উঁকি মেরে দেখতে কেন রোজ?

দীপঙ্কর বললে—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম পরশুদিন, কে যেন আমাদের বাড়ির পাশে খুব নাচছে, ঝুম্ ঝুম্ করে ঘুঙুরের আওয়াজ হচ্ছে খুব, তারপর কালকে ইস্কুলে গিয়ে প্রাণমথবাবু, আমাদের হেড-মাস্টার—জিজ্ঞেস করলেন, কে কী স্বপ্ন দেখেছ—আমি বললুম স্বপ্নটা—

—তারপর? থামলে কেন, বলো?

দীপঙ্কর বললে—সে কথা বললে আপনারা রাগ করবেন—

ভদ্রলোক বললেন—না, রাগ করবো কেন, বলো না কী স্বপ্ন দেখেছিলে?

দীপঙ্কর বললে—ঘুঙুরের শব্দ শুনে কেমন যেন খুব ইচ্ছে হলো দেখে আসি কে নাচছে। আমি যেন ঘর থেকে উঠে উঠোন পেরিয়ে আপনাদের বাড়ির কাছে এলাম, এসে দেখি ঘুঙুরের শব্দটা একতলার একটা ঘর থেকে আসছে। মনে হলো উঁকি মেরে দেখি কে নাচছে। তারপর আস্তে আস্তে জানালার পাখীটা ফাঁক করতেই দেখি—

—বলো? থামলে কেন? কী দেখলে?

দীপঙ্কর বললে—দেখলাম একটা ভাল্লুক,—

—ভাল্লুক? ভাল্লুক নাচছে?

বলতে বলতে হেসে ফেললেন ভদ্রলোক হো হো করে। ভদ্রমহিলাটিও হঠাৎ হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক বললেন, বলো কী? লক্ষ্মীকে ভাল্লুক মনে হলো?

ভদ্রমহিলাও হাসতে হাসতে বললেন—ও মা, কী হবে, অমন সুন্দর চেহারা

বলে কি না ভাল্লুক—

দীপঙ্কর বললে—ও তো স্বপ্ন! স্বপ্ন কি সত্যি? স্বপ্ন সত্যি কি না সেইটে দেখবার জন্যেই আজ উঁকি মেরে দেখছিলাম, দেখলাম স্বপ্নটা সত্যি নয়। প্রাণমথবাবু বলেছেন, যারা মহাপুরুষ তাদের স্বপ্নই সত্যি হয়, আমি তো গরীবের ছেলে, আমার স্বপ্ন সত্যি হবে কেন?

ভদ্রলোক বললেন—মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে জানো, এবারে ক্লাসে কী হয়েছ?

দীপঙ্কর বললে—আমি স্ট্যাণ্ড্ করি প্রত্যেকবার—

—বাঃ ভেরি গুড্ কে পড়ায় তোমাকে?

দীপঙ্কর বললে—আমি নিজে নিজে পড়ি, আর অঙ্কটা বুঝিয়ে দেয় কিরণের বাবা, কিরণের বাবা খুব ভালো অঙ্ক জানে—

—তা তুমি লক্ষ্মীর কাছে অঙ্ক ইংরিজী বুঝে নিলে পারো—জানলে, লক্ষ্মী তোমাকে খুব ভালো ইংরিজী শিখিয়ে দিতে পারবে—লক্ষ্মী খুব ভালো ইংরিজী জানে।

লক্ষ্মীদি বললে—বা রে, আপনি তো কাকাবাবু বেশ, আমার সময় কোথায়, আমার নিজেরই পড়ার সময় হয় না, তারপর সেলাই আছে, নাচ আছে—

কাকাবাবু বললে—তা হোক মা, গরীব ছেলে, একটু দেখিয়ে দিলেই বা,—

দীপঙ্করের যেন হঠাৎ সাহস বেড়ে গেল। বললে—দেশে আগে আমাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, আমার বাবাকে ডাকাতে খুন করে ফেলেছিল, তখন থেকে আমার মা এই কলকাতায় এসে অঘোরদাদুর বাড়িতে ভাত রাঁধে, অঘোরদাদু না দেখলে আমরা কবে মারাই যেতুম—

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে, তুমি আসবে, লক্ষ্মীদি তোমার পড়া বুঝিয়ে দেবে।

লক্ষ্মীদি বললে—তা হলে আমার নিজের পড়া আর হবে না দেখছি কাকাবাবু—

ভদ্রলোক বললেন—তা সতী তো আসছে কলকাতায়, সতী এলে তো তাকেও তোমাকেই পড়াতে হবে—সেই সঙ্গে একেও পড়িয়ে দিও—

দীপঙ্কর বললে—ইংরিজীটাই শক্ত, অঙ্কটা আমি কিরণের বাবার কাছ থেকে জেনে নেব—

ভদ্রলোক বললেন—ইংরিজী অঙ্ক বাঙলা সবই বুঝিয়ে দেবে লক্ষ্মী—লক্ষ্মী খুব ভালো স্টুডেন্ট তা জানো, ও আমাকেও শেখাতে পারে—না লক্ষ্মী? ও এবার দশ টাকা স্কলারশিপ্ পেয়েছে—তোমার বাবা তোমার রেজাল্টের খবর শুনে খুব খুশী জানো লক্ষ্মী, লিখেছেন সতীকেও এখানে পাঠিয়ে দেবেন, একসঙ্গে থাকায় দু'বোনেরই লেখাপড়া হবে—

লক্ষ্মীদি বললে—একসঙ্গে লেখা-পড়া যা হবে তা আমিই জানি, সতীকে

তো আপনি দেখেন নি কাকাবাবু—

ভদ্রমহিলা বললেন—সতীকে খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম মনে আছে, তোর মতন ফর্সা হয়েছিল, না রে?

লক্ষ্মীদি বললে—সে সতী এখন আর নেই, এখন আর দেখে চিনতে পারবে না কাকীমা—এর মধ্যেই আমার মত বড় হয়ে উঠেছে—

হঠাৎ একজন চাকর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

কাকীমা বললেন—কী ঠাকুর, কী বলছো?

ঠাকুর বললে—খাবার হয়ে গেছে মা—দেব এখন?

কাকীমা বললেন—বলছো কী ঠাকুর এই সবে চা খেলুম, এখনি খাবো? তুমি দেখছি হাত খালি করতে পারলেই বাঁচো। একটু পরে, তোমায় খবর দেব'খন—

দীপঙ্কর বললে—আমার মা বড় ভাবছে, আমি যাই এবার—

কাকাবাবু বললেন—যাও, রাত হচ্ছে, লেখা পড়া করোগে—

দীপঙ্করের কী যে হলো—হঠাৎ যেন কৃতজ্ঞতায় তার সমস্ত মনটা ভরে উঠলো। মনে হলো, এত আদর, এত স্নেহ, এত সহানুভূতি যেন সে জীবনে কারো কাছে পায়নি। হঠাৎ সে ভদ্রলোকের পায়ের কাছে নিচু হয়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো। তারপর কাকীমাকেও প্রণাম করলে একটা।

এতদিন পরে সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে কেমন অবাক লাগে। কোনও সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে, কোনও সম্পর্ক ছিলও না কোনওদিন। কোনওদিন তাঁদের দেখেও নি দীপঙ্কর আগে। কিন্তু খুব ভাল লেগেছিল সেদিন। শুধু ভাল লাগা নয়, শুধু স্নেহের আশ্রয়ই নয়, একদিন সামান্য একটু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যখন পরের দয়ার ওপর নির্ভরতাই ছিল তার জীবনের একমাত্র সম্বল সেই সময়ে কেন যে তিনি অমন আত্মীয়তা পাতিয়েছিলেন কে জানে? তা না হলে কি এত করে জীবনকে দেখতে পেত দীপঙ্কর? এমন করে বুঝতে পারতো সংসারকে! এমন করে জানতে পারতো যে, জীবন শুধু জীবনই নয়, দুঃখ শুধু দুঃখই নয়, আনন্দ শুধু আনন্দই নয়—জীবনেরও একটা অন্য অর্থ আছে, দুঃখেরও একটা অন্য ব্যাখ্যা আছে, আনন্দেরও একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে!

আর লক্ষ্মীদি?

সত্যিই তো লক্ষ্মীদি এসেছিল বলেই তো সতী এসেছিল!

আর সতী এসেছিল বলেই দীপঙ্কর বুঝতে পেরেছিল জীবনেরও একটা অন্য অর্থ আছে! দুঃখেরও একটা অন্য ব্যাখ্যা আছে, আনন্দেরও একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে।

ঘরটা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল দীপঙ্কর। সত্যিই নতুন ভাড়াটেরা আসার পর দীপঙ্কর দেখতে পেলে সমস্ত বাড়িখানার চেহারাই যেন

পালটে গেছে। ভেতরে যে এত পরিবর্তন হয়েছে তা তো বাইরে থেকে ধরা যায় না। অঘোরদাদুর সেই ভাড়াটে বাড়িটার চেহারা রাতারাতি এমন করে বদলে দিয়েছে এরা। ফুলগাছের টব বসিয়েছে জানালার ধারে ধারে। দরজায় দরজায় পর্দা। চেয়ার, টেবিল, কৌচ, সোফা, আলমারি, আয়না—কোনও দিকে ফাঁক নেই কিছু। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল দীপঙ্কর! মা হয়ত এতক্ষণ ভাবছে। হয়ত খুঁজছে—দীপু কোথায় গেল।

হঠাৎ সিঁড়ির নিচে আসতেই পেছন থেকে কে যেন ডাকলে!

—এই ছোঁড়া শোন্—

পেছন দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। সেই মেয়েটি। লক্ষ্মী!

বললে—আমাকে ডাকছো?

মেয়েটি তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে সামনে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। এর চোখে তো এতক্ষণ এ-দৃষ্টি ছিল না।

বললে—কিছু বলবে আমাকে?

মেয়েটি বললে—আর যদি কখনও আমাদের বাড়ি আসিস্ তো তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব—

—বা রে, আমি কী করলুম?

হঠাৎ মেয়েটি তার কান ধরলে একেবারে। বললে—আবার তর্ক হচ্ছে?

কানটা খুব জোরে ধরেছিল মেয়েটা।

দীপঙ্কর বললে—আমি তো তর্ক করছি না,—

—ফের তর্ক, তুই আসতে পারবি না আর এ-বাড়িতে, এই বলে রাখলুম আমি—

দীপঙ্কর বললে—কাকাবাবু যে আসতে বললেন—

—কাকাবাবু বললেই বা, আমি বলে দিচ্ছি তুই আসবি না—

দীপঙ্কর এতক্ষণে মেয়েটির হাব-ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে—আচ্ছা আসবো না—

—হ্যাঁ, আর আসিস্ না!

বলে এক ঠেলা দিলে দীপঙ্করকে আর দীপঙ্কর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো সিঁড়ির তলায়। পড়েই মনে হলো মাথায় যেন খুব লেগেছে। উঠে দাঁড়িয়েই দেখলে মেয়েটি এগিয়ে আসছে তার দিকে আবার।

ভয়ে ভয়ে বললে—আমি আসবো না, আমি কথা দিচ্ছি লক্ষ্মীদি, আমি আর আসবো না—

মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠলো। কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।

বললে—লেগেছে তোর? খুব লেগেছে রে?

দীপঙ্কর বললে—তুমি আমায় ঠেলে ফেলে দিলে কেন? আমি তোমার কী করেছি যে ঠেলে ফেলবে?

মেয়েটি বললে—এমনি দেখছিলুম তুই ভয় পাস্ কিনা—

দীপঙ্কর বললে—আমি আর আসবো না তোমাদের বাড়িতে, কাকাবাবু বললেও আসবো না, আমাকে ছেড়ে দাও—

মেয়েটি হঠাৎ আদর করে বলতে লাগল—না রে, দেখলুম তুই ভয় পাস্ কিনা, তুই আসবি কিন্তু কাল, বুঝলি, আসবি, ঠিক আসবি—

বলে লক্ষ্মীদি চলে গেল। আর দীপঙ্কর অবাক হয়ে সেইদিকে চেয়েই অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে খিড়কীর দরজা দিয়ে উঠোনে পা দিলে। মাথাটা তখনও তার ব্যথা করছে।

কিরণ বললে—কাল কোথায় গেলি রে তুই তারপর? আমি অনেকক্ষণ খুঁজেলুম—

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি হাজি কাশিমের বাজারের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলুম তারপর আগুনখাকীর পুকুরটা ঘুরে টিপু সুলতানের বাড়িটার পাশ দিয়ে শেতলাতলা দিয়ে বাড়ি গিয়েছিলুম—

সত্যি সে-সব দিনকার বালিগঞ্জ এখন আর চেনা যায় না। তখন রাসবিহারী এভিনিউ-এর মোড়ের ওপর ছিল হাজি কাশিমের বাজার। তারপর ওই মোড়ের দক্ষিণ-পুব কোণে ছিল টিপু সুলতানের পোড়ো বাড়িটা। এখন সার-সার দোকান হয়েছে। দিনরাত গম্ গম্ করে ট্রাম আর বাসের শব্দে। কিন্তু তখন? তখন কালিঘাটও এরকম ছিল না, বালিগঞ্জও এখনকার মত ছিল না। টিপু সুলতানের বিরাট বাড়িটা ভূতের বাড়ির মত এই এধারের মোড় থেকে ওধারের আগুনখাকীর পুকুর পর্যন্ত খাঁ খাঁ করতো। পোড়ো বাড়িটার মাথায় বিরাট বিরাট বটগাছ গজিয়ে জায়গাটা যেন দিনের বেলায়ও থম্ থম্ করতো। ভয় করতো জায়গাটার কাছে গেলে। হঠাৎ দুপুরবেলা হাওয়া লেগে বটগাছটার পাতাগুলো সির্ সির্ করে একরকম শব্দ হতো। আর কখনও কখনও একটা তক্ষক সাপ কটর্-কট্ করে একটা বিকট শব্দে ডেকে উঠতো আর ওই সমস্ত পাড়াটা তখন কেমন ভয়াবহ হয়ে উঠতো। মোড়ের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ছিল টিকে পাড়া। টিকেওয়ালারা রাস্তার ওপরে লম্বা লম্বা কাঠের ওপর টিকে শুকোতে দিত। তার উত্তরে ছিল আশু কলুর সরষের তেলের দোকান। দুপুরবেলা কতদিন তেল কিনতে গিয়েছে মা, আর দীপঙ্কর গিয়ে বসতো ঘানিগাছের ওপর। ঘানিটা ঘুরতো—দু'চোখ ঢাকা গরুটা সেই ঘানিগাছটা নিয়ে দিনরাত ঘুরপাক খেত। কতদিন দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা বসে বসে ঘুরেছে দীপঙ্কর। সরষের তেল কেনা হলেও, সে-কথা তখন আর মনে নেই। তারপর সেই তেল

নিয়ে যখন বাড়িতে এসেছে তখন সে কী বকুনি মায়ের। আর ওই যে আশু কলুর দোকানের উত্তরে ছিল হাজি কাশিমের বিরাট বাড়িটা। ওই বাড়িটার পেছনে বিরাট একটা বাগান ছিল। অনেকদিন বাগানের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখেছে দীপঙ্কর। কত সাপ ছিল বাগানে, কত পাখি। তারা সব কোথায় গেল। যখন বাগানটা ভেঙে সদানন্দ রোড হলো সে-বাগানটা উঠে গেল। কত বাড়ি হলো আশে-পাশে। একেবারে অন্যরকম চেহারা হয়ে গেল পাড়াটার। ওদিকে, আরো ওদিকে আগুনখাকীর পুকুর পেরিয়ে দেখা যেত ধান-ক্ষেত। হাওয়া লেগে ধানের ডগাগুলো দুলতো, আর দীপঙ্করের মনে হতো যেন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন ছেড়ে কতদূরে চলে এসেছে সে। শুধু কি ধানক্ষেত? শুধু কি টিপু সুলতানের বাড়ি? শুধু কি টিকেপাড়া, শুধু আশু কলুর দোকান? কত বড় জগৎ ছিল তখন দীপঙ্করের! এখন মনে হয়, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন জগৎটা তার ছোট হয়ে এসেছে। কোথায় গেল সেই আটাশ নম্বরের বাগান? কিরণের সঙ্গে কতদিন গিয়েছে সেই বাগানে। কার বাগান, কে মালিক, কিছুই জানতো না। শুধু জানতো বাগানটার মাঝখানে একটা পুকুর ছিল। আর পুকুরের পাড়ে ছিল একটা জামরুল গাছ। বড় বড় জামরুল হতো গাছটায়। মুখটা সিঁদুরের মত লাল, আর গুড়ের মত মিষ্টি। বাগানটার পরেই মহারাজ সূর্য-কান্তের বাগান। সে-বাগানে ছিল লিচু গাছ একটা। বড় বড় লিচু, পেকে টস্ টস্ করতো। অনেকদিন গাছে উঠে লিচু খেতে খেতে অনেক দূরের দিকে চেয়ে দেখেছে। কোথায় যেন একটা রেলগাড়ির শব্দ হতো—পু-উ-উ-উ—ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্-ঝিক্। সেই শব্দটা সেই দুপুরবেলায় যে কী মিষ্টি লাগতো, পাকা জামরুল কি পাকা লিচুর চেয়েও যেন মিষ্টি ছিল সেই শব্দটা। তখন কি জানতো যে একদিন ওই রেল নিয়েই তার দিন কাটবে, ওই রেলেরই একটা লেভেল ক্রসিং-এ তার জীবনের রেলগাড়িটা এমন হুড়মুড় করে এসে পড়বে, ওই রেলগাড়িই একদিন তার জীবনের সব সমস্যার সমাপ্তি ঘটিয়ে দেবে—

একদিন কালিঘাট ইস্কুলের ইনফ্যান্ট্ ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল দীপঙ্কর।

সেই-ই প্রথম ইস্কুল। জীবনে সেই-ই প্রথম ইস্কুলে যাওয়া। সেই কদমা আর কমলালেবু নিয়ে সে-ইস্কুল থেকে একদিন চলে এসেছিল। বুকে এঁটেছিল ইউনিয়ন জ্যাক্। বহুদিন পর্যন্ত সেই ঘটনার কথাটাই মনে ছিল। সেই লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার, সেই চারুচন্দ্র ধর, সেই বিমানচাঁদ মিত্র, সেই কিরণকুমার চট্টোপাধ্যায়—। সেই নির্মলচন্দ্র পালিত! আর সেই দীপঙ্কর সেন, রোল নাম্বার এইটিন্।

সবাই রইল কালিঘাট ইস্কুলে। তারপর নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটে ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল হলো কিছুদিন পরেই।

মা বললে—ও ইস্কুলটা বড় দূরে, কাছের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব তোকে—

ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলে যেতে দীপঙ্করের বিশেষ খারাপ লাগেনি।

কিরণও তার সঙ্গে চলে এল নতুন ইস্কুলে। তবু ভালো যে, লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার এল না। সে রইল পুরোন ইস্কুলে। রাস্তায় লক্ষ্মণকে দেখলেই বড় ভয় হতো। কথা নেই বার্তা নেই, লক্ষ্মণ দীপঙ্করকে দেখলেই মাথায় চাঁটি মারতো।

হয়তো রাস্তা দিয়ে দীপঙ্কর চলেছে, হঠাৎ উল্টোদিক থেকে দেখা গেল লক্ষ্মণ আসছে—

লক্ষ্মণকে এড়াবার জন্যে দীপঙ্কর রাস্তার একপাশ ঘেঁষে সরে গেল। কিন্তু লক্ষ্মণ ততক্ষণে তার দিকেই এগিয়ে এসেছে।

এসেই বললে—কী রে, কোথায় চলেছিস্—

বলতে না বলতে তার মাথায় খট্ করে একটা চাঁটি মেরে আবার চলতে আরম্ভ করেছে।

এক-একবার কান্না পেত দীপঙ্করের। এত লোক থাকতে তার মাথায় কেন চাঁটি মারে সে! কী করেছে দীপঙ্কর! কিছুতেই কিছু ভেবে বার করতে পারতো না যে, তার ওপরে কেন লক্ষ্মণের এত রাগ! চোখে জল এসে পড়তো কতবার। অথচ কাঁদবার উপায় নেই। মা যদি জিজ্ঞেস করে কে তাকে মেরেছে, কেন তাকে মেরেছে? কী জবাব দেবে দীপঙ্কর? এক-একবার মনে হতো, হয়ত ভালো চুল ছাঁটা হয়নি বলে লক্ষ্মণ মারে, কিংবা ময়লা জামা-কাপড় পরে বলে মারে। কিন্তু না, ভালো চুল ছাঁটা হলেও লক্ষ্মণ মেরেছে, ফরসা জামা-কাপড় পরলেও মেরেছে। পরে ভেবে দেখেছে তাকে চাঁটি মেরে লক্ষ্মণ সুখ পেত বলেই মারতো, অন্য কোনও অপরাধের জন্যে মারতো না। কিন্তু তারপর স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে, কলেজ ছেড়ে অফিসে ঢুকেছে। তখনও লক্ষ্মণরা তাকে রেহাই দেয়নি। সারা পৃথিবীতে সেই এক লক্ষ্মণ বহু লক্ষ্মণ হয়ে বহুরূপে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ্মণদের হাত থেকে যেন মানুষের আর মুক্তি নেই।

সেদিন নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের মোড়ের কাছে আসতেই দীপঙ্কর দেখলে, সামনেই লক্ষ্মণ আসছে। তখন বিকেল হয়ে গেছে। রাস্তায় তখন জল দিচ্ছে নল দিয়ে। লক্ষ্মণকে দেখেই কেমন যেন বুকটা দুড়-দুড় করতে লাগলো দীপঙ্করের। আবার যদি মারে লক্ষ্মণ!

একটু পাশে সরে গেল দীপঙ্কর। কিন্তু লক্ষ্মণের কী যে হলো, সে-ও তার দিকে এগিয়ে এল।

সামনে এসেই লক্ষ্মণ বললে—কী রে, আমাদের ইস্কুল ছেড়ে দিলি কেন? আমার ভয়ে?

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না। ভয়ে ভয়ে একদৃষ্টে লক্ষ্মণের চোখের দিকে চেয়ে রইল।

লক্ষ্মণের আর কোনও দিকে খেয়াল নেই। কথাটা বলেই তার মাথায় একটা চাঁটি মারলে—

রোজ রোজ মার খেতে খেতে দীপঙ্করের যেন কেমন সাহস বেড়ে গিয়েছিল।

বললে—আমায় মারিস কেন রে তুই রোজ? রোজ কেন তুই মারিস আমাকে? আমি তো কী করেছি বল্ তো?

হঠাৎ দীপঙ্করের কাছ থেকে এ-রকম প্রতিবাদ যেন আশা করেনি লক্ষ্মণ। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললে—বেশ করবো মারবো, আমার খুশি মারবো—এই তো আবার মারছি, কী করবি তুই?

বলে সত্যিই আবার একটা চাঁটি মারলে মাথায়। এবার আরো জোরে। দীপঙ্কর মাথাটা সরিয়ে নিলেও লাগলো খুব। মাথাটা যেন ঝন্ ঝন্ করে উঠলো। বললে—আমি কিছু বলি না বলে তাই না!

লক্ষ্মণ আরো এগিয়ে এল বুকের কাছে। বললে—খুব যে সাহস হয়েছে তোর দেখছি—বড় সাহস, না—

বলে আবার মারলে মাথায়। মাথার চুলের একটা গোছা ধরে জোরে একবার টানলে।

বললে—এক ঘুঁষি মারবো নাকে, তখন ফুটুনি দেখিয়ে দেব—

—বা রে, আমি কখন ফুটুনি করলাম তোর সঙ্গে? তুই তো আমাকে মারলি প্রথমে!

লক্ষ্মণ এবার ফটাফট্ তার মাথায় ঘুঁষি মারতে আরম্ভ করেছে—

—ফের, ফের ফুটুনি? ফের ফুটুনি হচ্ছে? ফের?

কথা বলে আর মারে লক্ষ্মণ! মাথা তুলতে দেয় না একেবারে। ডাইনে বাঁয়ে, সামনে, পেছনে—মুখের চারদিকে মারতে লাগলো! দীপঙ্করের চোখে তখন সমস্ত সংসার ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাথা ঘুরছে বন্ বন্ করে—

মারে আর মুখে বলে—বড় ফুটুনি বেড়েছে তোর, না? দেখাচ্ছি তোর ফুটুনি—

মাথাটা বাঁচাতে গিয়ে দীপঙ্কর একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করতেই কী হলো, ধপাস্ করে রাস্তার ওপর পড়ে গেল আর লক্ষ্মণ তখন আরো সুবিধে পেয়েছে। দীপঙ্করের কানে, মুখে, মাথায় পটাপট্ কিল চড় ঘুঁষি মেরে চললো— । দীপঙ্করের মনে হলো যেন সে আর বাঁচবে না। লক্ষ্মণ যেন মেরে ফেলে তবে তাকে নিষ্কৃতি দেবে। সেই লক্ষ্মণের অত্যাচারে সেদিন যদি তার প্রাণ বেরিয়ে যেত তাহলে পৃথিবীর অনেক কিছুই তাকে আর দুটো চোখ দিয়ে দেখতে হতো না, হয়ত অনেক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকেও সে মুক্তি পেত, অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে সে অব্যাহতি পেত হয়ত! কিন্তু তাহলে সতীকে যে তার দেখা হতো না। সতীকে না দেখলে জীবনের সব কিছুই যে নিরর্থক হতো!

লক্ষ্মণের মার খেতে খেতে যখন দীপঙ্কর প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ এক কাণ্ড হলো।

মনে হলো পাশেই যেন কে এসে দাঁড়ালো।

দীপঙ্কর কোনও রকমে চোখ তুলে দেখলে সামনেই লক্ষ্মীদি—

ইস্কুলের গাড়ি থেকে নেমে লক্ষ্মীদি গলির ভেতরে আসছিল, আসতেই ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের চুলের মুঠি ধরে এক টান দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই এক চড়—

লক্ষ্মণও কেমন যেন ভড়কে গিয়েছিল। চড় খেয়েই মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মীদি ছাড়বার পাত্রী নয়, লক্ষ্মণের মাথায় কানে পিঠে দুম-দাম করে কিল বসিয়ে দিচ্ছে—

—এই স্টুপিড, কেন মারছিস রে ওকে? মারছিস কেন তুই?

আবার চড়, আবার ঘুঁষি! লক্ষ্মীদির গায়ে খুব জোর। লক্ষ্মীদি হাতের বইগুলো রাস্তার ওপর রেখে দিয়ে দুম-দাম করে কিল মারতে লাগলো লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণ পালাতেও পারে না, মারতেও পারে না। হঠাৎ এই আচমকা মার খেয়ে যেন সে দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দীপঙ্কর তখন উঠে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দূর থেকে দেখতে লাগলো। মনে হলো বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে—এতদিনে ঠিক জব্দ হয়েছে লক্ষ্মণ। যেমন তাকে মারা, তেমনি শিক্ষা হয়েছে—

অনেকক্ষণ মারার পর লক্ষ্মীদি বললে—আর যদি কখনও মারিস ওকে তো তোর চোখ কানা করে দেব, বেরো, বেরো এখান থেকে—যা—

এতক্ষণে দীপঙ্করের অনেকখানি সাহস ফিরে এল।

লক্ষ্মণ মুখ কাঁচুমাচু করে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উল্টো দিকে সোজা চলে গেল—

লক্ষ্মীদিও তখন রাস্তার ওপর থেকে তার নিজের বইগুলো কুড়িয়ে নিয়েছে।

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে বললে—আমাকে ও রোজ রোজ মারে লক্ষ্মীদি—রোজ এমনি করে মারে আমায়, আমি কিচ্ছু করিনি—শুধু শুধু মারে—

লক্ষ্মীদির মুখটা যেন গম্ভীর গম্ভীর।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—বেশ করেছ তুমি ওকে মেরেছ লক্ষ্মীদি—আমি কিছু করি না ওর—তবু মারে—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ দীপঙ্করের কান ধরে মাথায় দুম্‌ দুম্‌ করে মারতে লাগলো।

বললে—স্টুপিড্‌ কোথাকার, রোজ রোজ মারে ও আর তুই মার খাস? তুই ওকে মারতে পারিস না? তোর গায়ে জোর নেই? স্টুপিড গাধা কোথাকার, বোকার মতন আবার বলছিস্‌ রোজ রোজ মারে ও—তোকেও মারবো আমি—

বলে লক্ষ্মীদি আবার মারতে লাগলো।

দীপঙ্করের চোখ দিয়ে তখন সত্যি সত্যিই জল পড়ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্মণের কাছে মার খেয়ে যা হয়নি, লক্ষ্মীদির হাতে মার খেয়ে তার দ্বিগুণ কষ্ট হলো দীপঙ্করের।

দীপঙ্কর দু'হাতে মাথাটা ঢেকে বলতে লাগলো—আর মেরো না লক্ষ্মীদি

—আর করবো না আমি—আর মেরো না—

লক্ষ্মীদির তখন যেন সত্যিই রোখ চেপে গিয়েছে। আরো জোরে জোরে মারতে লাগলো মাথায়।

বললে—মাথা ভেঙে ফেলে দেব তোর স্টুপিড কোথাকার—লোকে মেরে যাবে আর তুই বসে বসে কাঁদবি, লজ্জা করে না তোর কাঁদতে—আবার কান্না হচ্ছে ছেলের—

তারপর বাড়ির কাছে আসতেই লক্ষ্মীদি বললে—যা, বাড়ি যা, আর কখ্‌খনো কাঁদবি না—বুঝলি, তাহলে বেটাছেলে হয়েছিস কী করতে—

বলে এক ঠেলা দিলে দীপঙ্করকে, আর তারপর লাফাতে লাফাতে লক্ষ্মীদি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

রাত্রিবেলা পড়তে বসে কিছুতেই পড়ায় যেন আর মন বসছিল না দীপঙ্করের। অঘোরদাদুর সিন্দুকটার গায়ে হেলান দিয়ে সামনে হিস্ট্রির বইটা নিয়ে অনেকক্ষণ চোখ চেয়ে থাকবার চেষ্টা করলে দীপঙ্কর। কিন্তু চোখ দুটো যেন ঢুলে আসছে ঘুমের ঘোরে। মনে হলো কেন ওরা এল এ-বাড়িতে? ওই ভাড়াটেরা! খালি মারে তাকে! আগেকার ভাড়াটেরা বেশ ছিল। দীপঙ্করের দিকে ফিরেও তাকাত না। চন্নুনী তাদের গালাগালি দিত, বেশ করতো। এদেরও গালাগালি দিলে বেশ হতো! এরাও থাকতো না তাহলে, উঠে যেত এ-বাড়ি থেকে। উঠে গেলেই ভালো হয়। ভারি তো নাচে! ও-রকম নাচ দীপঙ্করও নাচতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেই থেই করে নাচতে কে না পারে। স্বপ্নটাই ঠিক হয়েছিল—ভাল্লুকের স্বপ্নটাই ঠিক। ঠিক যেন ভাল্লুক-নাচ। পাথরপটির রাস্তায় অনেক ভাল্লুক-নাচওয়ালা আসে। লোকটা ডুগ্‌ডুগি বাজায় আর ভাল্লুকটা নাচে। আর চেহারা? চেহারাই বা কী এমন! ভারি তো সুন্দর! কিরণদিকে ওর চেয়ে ঢের সুন্দর দেখতে। কিরণদি তো কই তাকে কিছু বলে না। আর লেখাপড়া ও-রকম সবাই করতে পারে। আবার দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়েছে। ভালো মেমসাহেবদের ইস্কুলে পড়লে দীপঙ্করও স্কলারশিপ পেত।

কী একটা কাজে মা বুঝি ঘরে এল।

দীপঙ্কর বললে—মা—

মা বললে—কী বলছিস্‌, বল্‌—

দীপঙ্কর বললে—চন্নুনী আজকাল গালাগালি দেয় না কেন?

মা বোধ হয় ব্যস্ত ছিল খুব। বিরক্ত হলো কথাটা শুনে। বললে—যত উদ্ভুটে কথা তোর বাপু, কেন গালাগালি দিতে যাবে কেন! কাকে গালাগালি দেবে?

দীপঙ্কর বললে—এই যে নতুন ভাড়াটেরা এসেছে ওদের গালাগালি দেয়

না কেন চন্নুনী? গালাগালি দিলে ওরা বেশ উঠে যায়—

—পারিনে বাপু তোর সঙ্গে বক্ বক্ করতে—

বলে মা চলে গেল। দীপঙ্কর আবার হিস্ট্রির বইতে মন দেবার চেষ্টা করলে। কোথাকার কোন্ আলেকজান্ডার কোথাকার কোন্ পুরুকে কোথায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার কথা পড়ে কী লাভ হয় কে জানে! কেউ-ই সেদিন শশাঙ্কবাবুর ক্লাসে পড়া বলতে পারেনি। শশাঙ্কবাবু একটু গম্ভীর গম্ভীর লোক। প্রাণমথবাবুর মত নয়। প্রাণমথবাবুর ক্লাসটাই সবচেয়ে ভালো লাগতো দীপঙ্করের।

প্রাণমথবাবু ক্লাসে কত রকম গল্প বলেন।

প্রাণমথবাবু সেদিন ক্লাসে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আজকে কোন্ জায়গাটার পড়া আছে বলো তো তোমাদের?

মনিটর দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আলেকজান্ডার আর পুরু স্যার।

প্রাণমথবাবু বইটা মুড়ে পাশে রেখে দিয়ে বলেছিলেন—বলো তো পুরু কে?

ফটিক বললে—একজন রাজা স্যার—

প্রাণমথবাবু বললেন—বেশ, বেশ, কিন্তু রাজা মানে কী? তুমি বলতে পারো?

কিরণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

বললেন—তুমি? তুমি? তুমি?

একের পর এক অনেককে জিজ্ঞেস করলেন। কেউ-ই বলতে পারেনি সেদিন। রাজা মানে রাজা! রাজার আবার মানে কী! সবাই সেদিন সেই সহজ কথাটাই উত্তর দিতে পারেনি। সকলেই হাঁ করে চেয়ে ছিল প্রাণমথবাবুর দিকে।

প্রাণমথবাবু বললেন—রাজা কথাটার মানে জানো না বলে তোমাদের লজ্জার কোনও কারণ নেই, রাজা কথাটার মানে অনেকেই জানে না—অনেক রাজাও জানে না—তবে শোন—

তারপর কৌটো থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বললেন—একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে রাজাও ছিল না, প্রজাও ছিল না, দণ্ড ছিল না, দণ্ডদাতাও ছিল না! তার মানে সবাই সবাইকে ভালোবাসতো! সবাই সবাইকে ভালবাসলে আর শাস্তিদাতা কিম্বা শাস্তি কিছুরই দরকার হয় না—। কিন্তু এ-রকম অবস্থা বেশিদিন চললো না, আস্তে আস্তে মোহ এল—মানে ধর্ম লোপ হয়ে গেল পৃথিবী থেকে। ধর্ম যায় যায় অবস্থা, দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। কেউ আর যাগ-যজ্ঞ করে না—আর যজ্ঞের আহুতি না দিলে দেবতারা খাবেন কী? তখন তাঁরা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মাকে গিয়ে তাঁরা বললেন এখন উপায় কী? তখন ব্রহ্মা ঋষিদের বলে একজনকে রাজা তৈরি করে দিলেন—তাঁর নাম হলো পৃথু। সেই পৃথুই হলেন পৃথিবীর রাজা। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি রাজা

হবার পর আবার যাগ-যজ্ঞ হতে লাগলো, আবার ধর্ম ফিরে এল। তিনি প্রজা-রঞ্জন করতে পারতেন তাই তাঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। সেই 'রঞ্জন' কথাটা থেকেই রাজা নামটার সৃষ্টি হলো—

তারপর একটু সোজা হয়ে বসে বললেন—এখন বুঝলে তো যে রাজা কাকে বলে?

সবাই একসঙ্গে বললে—বুঝলাম স্যার—

—কিন্তু সব রাজাই পৃথুরাজার মত ভাল রাজা হয় না। এমন রাজাও আছে যারা প্রজা-রঞ্জন করে না, প্রজাদের খেতে-পরতে দেয় না—আমাদের দেশের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছ তোমরা!

সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল প্রাণমথবাবুর দিকে।

কিরণ মাঝখানে হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—স্যার, সি আর দাশ যখন রাজা হবে তখন ভালো রাজা হবেন?

—সি আর দাশ রাজা হবেন?

প্রাণমথবাবু অবাক হয়ে কিরণের দিকে চাইলেন।

বললেন—কে বললে?

কিরণ বললে—একজন সাধু বলেছে স্যার,—

—কে সাধু?

—খাঁটি সাধু স্যার, খাঁটি হিমালয়ের সাধু বলেছে দেশ স্বাধী হলে সি আর দাশ রাজা হবে, আর আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, আমাদের দেশের সকলের অবস্থা ভালো হবে, আমরা সবাই ভালো-ভালো জিনিস খেতে পাবো, দই, রাবড়ি, সন্দেশ, রাজভোগ—

প্রাণমথবাবু যেন একটু হাসলেন। ক্ষীণ একটু হাসির আভাস ফুটলো মুখে। বললেন—দেশ স্বাধীন হলে যে দেশের লোকের অবস্থা ভাল হবে তা বলতে আর সাধুর দরকার হয় না, যাক্ গে যে-কথা বলছিলাম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বই আছে তার নাম 'রাজা-রাণী', বড় হলে তোমরা পোড়ো সে-বই—। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের পৃথিবীর একজন মস্ত বড় কবি, একদিন দেখবে ঘরে ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো থাকবে,—তা সেই তাঁর নামই তোমরা শোননি?

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলেছিল—আমি রবি ঠাকুরকে দেখেছি স্যার—

—তুমি তাঁকে দেখেছ? কোথায় দেখলে?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের কালী-মন্দিরে স্যার—

—কালী মন্দিরে?

—হ্যাঁ স্যার, মন্দিরে পাঁঠা-বলি বন্ধ করতে—

মনে আছে দীপঙ্কর রোজ ভোর বেলা পাড়ায় পাড়ায় ফুল তুলে মন্দিরে দিয়ে আসতো। কুণ্ডুপুকুরের ধার দিয়ে গিয়ে মা-কালীকে, ভুবনেশ্বরীকে

গণেশকে, আরো যত মন্দির আছে, সব ঠাকুরকে। মা-ও এক-একদিন সঙ্গে থাকতো। মা প্রণাম করতো, দীপঙ্করও মা'র দেখা দেখি প্রণাম করতো। প্রণাম করে কী লাভ, কী লোকসান হয়েছে মনে নেই, কিন্তু প্রণাম করাটা তখন ছিল অভ্যেস। একদিন মা হঠাৎ বললে—ওই দেখ্, ও কে বল্‌তো?

দীপঙ্কর দেখেছিল সাদা দাড়ি ভর্তি মুখ, একজন লোক নাটমন্দির আর মায়ের মন্দিরের মধ্যেকার রাস্তায় প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটা হাতের ওপর আর একটা হাত বুকের কাছে রাখা। দু'চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়ছে—

—ও কে মা?

কোনও দিকে খেয়াল নেই লোকটার। সঙ্গে দু'চারজন ছেলে-মেয়ে। তারাও চেয়ে দেখছে ঠাকুরের দিকে। কী চমৎকার সব চেহারা, কী চমৎকার সব পোশাক তাদের। যেন পুতুলের মত গড়ন সব।

মা তখনও সেই দিকে চেয়ে দেখছিল।

—ও কে মা?

মা বললে—ওঁর নাম রবি ঠাকুর—

—রবি ঠাকুর কে মা?

—খুব ভালো ভালো পদ্য লেখেন।

সকালবেলা। মন্দিরে তখন ভিড় নেই। সেদিন আর কেউই হয়ত চিনতে পারেনি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু মা চিনেছিল ঠিক। মা'র অনেক বুদ্ধি ছিল। বাবা যদি না মারা যেত হঠাৎ তো মা আরো অনেক কিছু জানতে পারতো। মাকে আর অঘোরদাদুর বাড়িতে দিনরাত রান্না করতে হতো না! তা সেদিন মার সঙ্গে দীপঙ্করও সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, হঠাৎ—

—দীপুবাবু!

হঠাৎ নিজের নামটা কানে যেতেই দীপঙ্কর চমকে উঠলো। হিস্ট্রির বইটা রেখে ঘরের বাইরে এসে অবাক। রঘু—লক্ষ্মীদিদের চাকর রঘু!

রঘু বললে—তোমাকে কাকাবাবু ডাকছে দীপুবাবু

দীপঙ্কর আরো অবাক হয়ে গেল।

বললে—আমাকে? আমাকে কেন ডাকছে?

রঘু বললে—কাকাবাবু এখন আপিস থেকে এল, লক্ষ্মীদিদিমণি আমাকে বললে দীপুবাবুকে পাশের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয়—

দীপঙ্কর কী যেন ভাবলে। তাকে আবার কেন ডাকবে! আবার মারবে নাকি? সে কি দোষ করলো! লক্ষ্মীদিরই তো দোষ! লক্ষ্মীদিই তো তাকে মেরেছে। পর পর দু'দিন মেরেছে, তবু কিছু বলেনি দীপঙ্কর, কিছু বলবেও না কোনদিন। চোদ্দ বছর ধরে দীপঙ্কর কিছু বলবে না কাউকে! চোদ্দ বছর ধরে। চোদ্দ বছরের মধ্যে মাত্র বছরখানেক কেটেছে।

প্রাণমথবাবু বলেছিল—চোদ্দ বছর ধরে যদি আগাগোড়া তোমরা সত্যি কথা বলে যাও তো একদিন তোমরা যা বলবে সব সত্যি হবে—সব ফলে যাবে—

মধুসূদন বলেছিল—যদি বলি স্যার আমি রাজা হবো?

প্রাণমথবাবু বলেছিলেন—হবে, রাজাই হবে—তবে চোদ্দ বছর বরাবর সত্যি কথা বলে যাওয়া চাই—একটাও মিথ্যে কথা বলা চলবে না—

কিরণ বলেছিল—স্যার, যদি বলি আমার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাক্—

—হ্যাঁ, তাই-ই হবে!

—স্যার যদি বলি আমাদের মস্ত বড় বাড়ি হোক্—

—হবে, যা ইচ্ছে করবে, তাই-ই হবে—

সেইদিন থেকে কিরণ আর দীপঙ্কর ঠিক করেছিল চোদ্দ বছর ধরে তারা সত্যি কথাই বলে যাবে বরাবর। একদিনের জন্যেও একটা মিথ্যে কথা বলবে না। কিন্তু কিরণ রাখতে পারেনি তার কথা। ভিক্ষের পয়সা চুরি করে অনেকদিন বঙ্কুর দোকান থেকে আলুর-চপ্ বেগুনী কিনে খেয়েছে, বাড়িতে কিছু বলেনি—

রঘু বললে—চল দীপুবাবু—

দীপঙ্কর ভাবছিল মা'কে একবার বলে যাবে নাকি—। উঠোন দিয়ে একবার রান্নাঘরের দিকে মাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলও। কিন্তু দরকার নেই। মা হয়ত আবার অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে। তার চেয়ে এসেই বলবে সব মাকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী জন্যে ডাকছে তুই জানিস?

রঘু বললে—তা জানি না—

উঠোন পেরিয়ে বাইরের রাস্তা দিয়ে ওদের বাড়িতে ঢোকবার আসল পথ। রঘু আগে আগে চললো। দীপঙ্কর পেছন-পেছন গিয়ে ঢুকলো ভেতরে। ওদের উঠোনের রোয়াকে পা দিয়েই সিঁড়িটা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই ডান দিকে বসবার ঘর। ঘরের মধ্যে কাকাবাবু বসেছিলেন একদিকে, তার পাশেই লক্ষ্মীদি আর উল্টোদিকে কাকীমা।

—এই যে দীপুবাবু, আজকে রাস্তায় কী হয়েছিল তোমার!

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির দিকে চাইলে একবার। লক্ষ্মীদি মুখ টিপে টিপে হাসছে তখন।

—বোস, বোস তুমি আগে ওই চেয়ারটায়! এইবার বলো তো কী হয়েছিল। ঠিক সত্যি কথা বলবে, মিথ্যে বলবে না একটুও—

দীপঙ্কর গম্ভীর হয়ে বললে—আমি মিথ্যে কথা বলি না— এক বছর ধরে আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলি না—

—এক বছর ধরে সত্যি কথা বলে আসছো? মিথ্যে কথা মোটেই বলো না?

—না, আরো তের বছর ধরে সত্যি কথা বলবো!

কাকাবাবু শুনে যেন কেমন অবাক হয়ে গেলেন। কাকীমাও হেসে তাকালেন

কাকাবাবুর দিকে।

বললেন—ওমা, বেশ ছেলে তো!

লক্ষ্মীদি টিট্‌কিরী দিলে—একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমাদের—

কাকাবাবু থামিয়ে দিলেন লক্ষ্মীকে। বললেন—তুমি থামো লক্ষ্মী, এখন বলো তো তের বছর ধরে কেন সত্যি কথা বলবে?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের হেড-মাস্টারমশাই বলেছেন যদি চোদ্দ বছর ধরে আগাগোড়া সত্যি কথা কেউ বলে তো তার পরে সে যা বলবে সব সত্যি সত্যি ফলে যাবে।—

কথাটা শুনে কাকাবাবু হেসে ফেললেন, কাকীমাও হাসলেন, লক্ষ্মীদিও হেসে ফেললে।

কাকাবাবু বললেন—আর তুমি তাই সত্যি বলে বিশ্বাস করলে?

কত সরল কত সহজ কত স্বাভাবিক যে ছিল তখন দীপঙ্কর! এক-এক সময়ে দীপঙ্করের মনে হয়েছে হয়ত সেই দিনগুলোই ভালো ছিল। যে যা বলেছে সব বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে কিরণের বাবার অসুখ একদিন ভালো হয়ে যাবে, বিশ্বাস করেছে কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, বিশ্বাস করেছে সি আর দাশ একদিন দেশের রাজা হবে, আর বিশ্বাস করেছে চোদ্দ বছর সত্যি কথা বললে মুখের সব কথা ফলে যায়—আর আরো কত কথাই যে বিশ্বাস করেছে দীপঙ্কর! আজ এতদিন পরে মনে হলো সংসারে বিশ্বাস করাই হয়ত ভালো, নইলে বিশ্বাস করে সে কি শেষ পর্যন্ত কিছুই পায়নি? আর বিশ্বাস করেছিল বলেই কি তার সব কিছু হারিয়ে গেল?

কাকাবাবু বললেন—রাস্তায় যে-ছেলেটা তোমায় মারে, ও কে?

দীপঙ্কর বললে—ও আগে আমাদের ইস্কুলে পড়তো—

—কেন মারে তোমায়?

—তা জানি না, আমার হাতে যা থাকবে ও কেড়ে নেবে, কিছু না করলেও ও মারবে—

লক্ষ্মীদি বললে—তাই আমি আজ ওকে খুব মেরেছি কাকাবাবু, মুখ বুজে ও মার খাবে কেন? ও মারতে পারে না? ওর গায়ে জোর নেই?

দীপঙ্কর বললে—এখন যত পারে মারুক না, একদিন আমি ওর মারা ঘুচিয়ে দেব কাকাবাবু—

কাকাবাবু বলে—কী করে?

দীপঙ্কর বললে—আমি গরীব বলে এখন ও মারে, আমরা বড়লোক হলে ও আর মারবে না—আমার যখন খুব টাকা-কড়ি হবে তখন আর মারবে না ও—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদু বলেছে, টাকা-কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় টাকা-কড়ি দিয়ে—

কাকীমা বললেন—ছেলের বুদ্ধি তো খুব!

দীপঙ্কর বললে—অঘোরদাদু আমাকে বলেছে যে, টাকা থাকলে আমার যা খুশী কিনতে পারবো, ওই লক্ষ্মণও তখন আমায় খাতির করবে—

কাকাবাবু এতক্ষণ হাসছিলেন। এবার বললেন—সব ভুল দীপুবাবু, অঘোরদাদু তোমাকে ভুল শিখিয়েছে—টাকা থাকলেই সব কিছু কেনা যায় না সংসারে, যখন বড় হবে তখন বুঝবে টাকাটাই সব নয়—

—তবে যে অঘোরদাদু বললে? অঘোরদাদুও তো অনেক বড়—

কাকাবাবু বললেন—বুড়ো হলেই কি সবাই বড় হয়? অনেকে বুড়ো বয়েসেও ছেলেমানুষ থাকে যে! তোমার অঘোরদাদুও হয়ত সেইরকম, চাকরিতে ঢোকবার আগে আমারও সেই ধারণা ছিল জানো—এই ভুবনবাবুরই কথা ধরো না, লক্ষ্মীর বাবা ভুবনবাবু আমায় বলেছিলেন, বর্মার রাস্তায় টো টো করে একদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, পকেটে একটা পয়সা নেই, জানাশোনা লোক নেই একটা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায়—

পরে দীপঙ্করও শুনেছে সে কাহিনী।

সতীই একদিন বলেছিল। হাওড়া জেলার কোন্ এক অজ গাঁয়ের একটি ছোট ছেলে। নাম ভুবনেশ্বর মিত্র। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। টাকার অভাবে লেখা-পড়া হয় না। সারাদিন এর বাগানে ওর পুকুরে দিন কাটায়। তারপর কী খেয়াল হলো, একদিন বাড়ি ছেড়ে পালালো। পালালো যে কোথায় তা কেউ জানে না। হাতে একটা পয়সা নেই। কড়ি নেই। খিদিরপুরে তখন ডক তৈরি হচ্ছে। জাহাজ আর স্টীমারের ভিড় লেগে থাকতো ডকে। সেইখানে বুঝি কোন্ খালাসীর সঙ্গে ভাব করে একেবারে সোজা চলে গিয়েছিল বর্মা-মুলুকে। মানে মগের মুলুকে।

কাকাবাবু বললেন—আমি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকলুম, নতুন জায়গা, জীবনে কখনও বর্মায় যাইনি, একটা বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না, হঠাৎ আলাপ হলো ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে,—দেখি শহর থেকে সাত মাইল দূরে একটা জঙ্গলের ভেতরে কাঠের গুদাম, বড় বড় করাত-কল, হরদম কাজ হচ্ছে—বর্মি কুলিরা দিন রাত কাজ করছে—ভাবলাম কোনও সাহেব কোম্পানী হবে, সাহেব না হোক পাঞ্জাবী কি মাদ্রাজী-টাদ্রাজী হবে—কিন্তু সাইনবোর্ডটা পড়ে অবাক। দেখি মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—প্রোপ্রাইটার বি মিত্র। —বাঙালী; এই এতদূরে—

তখন ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় নেই। বাঙালী দেখেই আলাপ করবার ইচ্ছে হলো।

আমাকে দেখে তিনিও অবাক। আর তাঁকে দেখে আমিও অবাক।

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—বিয়ে করে ফেলুন মশাই—এতদূরে দেশ ছেড়ে এসেছেন, বউ নিয়ে আসতে হয়!—

আমি বললাম—পনেরো টাকা মাইনে, পাঁচ টাকা ওভারসীজ্ অ্যালাওএন্স—এই টাকায় সংসার চালাবো কী করে—

ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—ওর সঙ্গে ঘুষের টাকাটা জুড়ে দিন, দেখবেন তোফা চলে যাবে—

তারপর তোমার এই কাকীমাকে নিয়ে গেলুম।

লক্ষ্মী বললে—আমি তখন হয়েছি কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—তখন তুমি এই এক-ফুট্‌কে মেয়ে, আমি তোমায় কোলে নিয়ে বেড়াই—

—আর সতী?

—সতী তখন কোথায়, সতী তো এই সেদিন হলো। বর্ষাকাল, ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, আমি আপিসের কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা, একটা এন্‌কোয়ারী সারতে-সারতেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, আলো নিভিয়ে সবে শুয়েছি এমন সময় টেলিফোন। ভাবলাম এত রাত্তিরে আবার কে টেলিফোন করছে। টেলিফোনে কান দিয়েই বুঝতে পারলাম ভুবনেশ্বরবাবু—

বললাম—কী ব্যাপার, হঠাৎ কী হলো দাদা?

ওপাশ থেকে ভুবনেশ্বরবাবু বললেন—তোমাকে খবরটা জানানো ভালো, একটি মেয়ে হয়েছে আমার—

আমি তো লাফিয়ে উঠলুম। বললাম—কখন?

—এই এখন!

বললাম—তা হলে সন্দেশ খাওয়ান দাদা—একেবারে একটা নয় দুটো মেয়ে। ওর নাম সতী রাখুন, বড়র নাম লক্ষ্মী আর ছোটটার নাম সতী থাক, দুজনে মিলে সতীলক্ষ্মী হয়ে থাক—

কাকীমার দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো, তোমার মনে আছে সে-সব কথা?

কাকীমা বললেন—মনে নেই আবার? তুমি সেই রাত্তিরে আবার গেলে—

কাকাবাবু বললেন—তা যে-কথা বলছিলাম, চাকরির আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল টাকা দিয়ে বুঝি সবই কেনা যায়, কিন্তু সে-ধারণা বদলালো ভুবনেশ্বরবাবুর কাছে গিয়ে—তখন সবে তোমার কাকীমাকে নিয়ে গিয়েছি, হঠাৎ প্লেগ হলো আমার, সে কী দারুণ রোগ, বাড়ির চাকর-বাকর সব পালালো। একটা লোক নেই যে সেবা করে, তোমার কাকীমাও তখন নতুন, কাউকেই চেনে না, আমি তো অচৈতন্য অজ্ঞান অবস্থায় মরো-মরো, ভাবলাম সে-যাত্রা বুঝি বিদেশে-বিভূঁইয়েই মারা যাবো—

কিন্তু কোথাকার কে ভুবনেশ্বরবাবু, আমার সাতকুলের কেউ নয়, লক্ষপতি লোক, খবর পেয়েই একেবারে দৌড়ে এসেছেন। আর তারপর কোথায় ডাক্তার কোথায় ওষুধ—আমাকে কিছু ভাবতেই হলো না, সেই যে তিনি এলেন আমাদের বাড়িতে, আর যতদিন না আমি সেরে উঠলুম ততদিন রইলেন—সেই লক্ষপতি মানুষ নিজের কারবার ফেলে রেখে আমার রোগ নিয়ে পড়লেন। এ কে করে? আমার রোগ সারিয়ে কীসের স্বার্থ তাঁর? কী সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে! আমি তাঁর কে যে আমার জন্যে অত করতে যাবেন? নিজের টাকা সময় লোকজন সব দিয়ে আমাকে যে সারিয়ে তুললেন—এ কেন করলেন?

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন—তাহলেই বোঝ। টাকা দিয়ে অনেক কিছুই হয় সংসারে কিন্তু ভুবনেশ্বরবাবুর সেই সেবা-যত্ন কি টাকা দিয়ে যাচাই করার জিনিস?

লক্ষ্মীদিও কিছু কথা বললো না, কাকীমাও কিছু বললেন না। দীপঙ্করও চুপ করে রইল—

কাকাবাবু বলতে লাগলেন—তা যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে—আমি বলেছিলুম ভুবনেশ্বরবাবুকে, হলোই বা মেয়ে, লেখাপড়া শেখালে এই মেয়েরাও আপনার ছেলের চেয়ে বেশি দেখবেন—ভুবনেশ্বরবাবু লিখেছেন, জানো মা, তোমার রেজাল্ট শুনে খুব খুশী, লিখেছেন সতীকেও এখানে পাঠিয়ে দেবেন—সেখানে থাকলে লেখা-পড়া ভালো হবে না—

—তা হ্যাঁ, ভালো কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ঠাকুরকে বলে দিও তো, কাল আমি ভোর বেলা বেরোব—

কাকীমা বললেন—কালকে ভোর বেলা কেন?

—চাকরির ব্যাপার, জ্বালিয়ে খাচ্ছে একেবারে, এই দেখ না ছিলাম বর্মায়, বেশ আরামে ছিলাম, সস্তা-গণ্ডার দেশ, হঠাৎ অর্ডার হলো বদলির, আর এতদিনকার জায়গা ছেড়ে চলে আসতে হলো, হুকুম তামিল করার নামই তো চাকরি, তা না হলে আর দাসত্ব কাকে বলে! আবার হয়ত একদিন পাটনায় বদলি করে দেবে, হুকুম হলেই হলো—

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু উঠলেন। বললেন—যা বললুম মনে থাকবে তো তোমার দীপুবাবু, লক্ষ্মণ যদি আর কখনও তোমায় মারে, তুমি সহ্য করবে না, তুমিও মারবে, মারের প্রতিকার হচ্ছে মার, এ-সংসারে কান্নার দাম কেউ দেয় না, অভিমানেরও দাম কেউ দেয় না সংসারে—

—কিন্তু ওর গায়ে যে বেশি জোর!

কাকাবাবু বললেন—তাহলে তুমি আমাকে এসে বলে দেবে—

লক্ষ্মী বললে—আর হয়ত মারতে সাহস করবে না কাকাবাবু, আমি খুব মেরেছি ছেলেটাকে—

কাকাবাবু বললেন—বেশ করেছ—এ সংসারে মারই হচ্ছে মারের প্রতিকার—ও গান্ধী যাই-ই বলুক—

দীপঙ্কর আর বেশিক্ষণ থাকেনি সেদিন। মা হয়ত ভাবছে কোথায় গেল খোকা! কিন্তু কাকাবাবুর কথা শুনে সেদিন যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। তাহলে কার কথা ঠিক? অঘোরদাদু না কাকাবাবু! না প্রাণমথবাবুর কথা! না সেই কিরণের কাছে শোনা সোনার কার্তিকের ঘাটের হিমালয়ের সাধুর কথা! কে বেশি সত্যি! একবার মনে হলো কাকাবাবুর কথাই সত্যি! সেদিন টাকা থাকা সত্ত্বেও তো কাকাবাবু প্লেগে মারা যাচ্ছিলেন—কিন্তু ভুবনেশ্বরবাবু কেন তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন, কেন কীসের লোভে কাকাবাবুকে সারিয়ে তুললেন। কিন্তু আবার মনে হলো টাকা থাকলে তো এতদিনে কিরণের বাবা ভাল হয়ে যেত। কবে আবার সেরে উঠে ইস্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করতে পারতো! কিন্তু কাকাবাবুরও তো বয়েস হয়েছে, কাকাবাবুও তো অনেক দেখেছে! তবে কাকাবাবুর দেখা কি ভুল দেখা!

রোজ দেখতো কাকাবাবু কোটপ্যান্ট পরে অফিসে চলে যায়। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ে একেবারে কুণ্ডুপুকুরের কাছে। সেখান থেকে বাস-ট্রাম ধরে অফিসে চলে যায়। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অনেক লোকই অফিসে যায়—কিন্তু কাকাবাবুর অফিস যাওয়া যেন অন্যরকম। কোন সময়ের ঠিক নেই। এক-একদিন ভোর বেলা বেরিয়ে যায় আর ফেরে সেই অনেক রাতে। তখন এ-বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যাওড়াতলার দিক থেকে 'হরি-বোলে'র শব্দ আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসে—আর উঠোনে হাজি কাশিমের বাগানের ওধারে কোত্থেকে যেন শেয়াল ডেকে ওঠে দল বেঁধে। তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কালিঘাটে, মন্দিরে, পাথরপটিতে, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটে আর কেউ জেগে থাকে না। অঘোরদাদুও বোধহয় তখন বড়া-বটি-গাড়ুর একপাশে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু ওদের বাড়িতে—ওই লক্ষ্মীদিদিদের বাড়িতে তখনও এক-একদিন আলো জ্বলে। তখনও চাকর-ঠাকুরের গলা শোনা যায়। তখন হয়ত কাকাবাবু অফিস থেকে ফেরে! কী রকম অফিস! এত রাত পর্যন্ত কাজ হয় এ-কেমন অফিস! কাকাবাবু কোন্ অফিসে কাজ করে? কী কাজ?

কিন্তু আশ্চর্য, ওরা আসবার পর থেকেই চন্নুনী যেন কেমন শান্ত হয়ে এসেছে। গলাবাজি করে বটে, কিন্তু তেমন তেজালো গলাবাজি নয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে খুব ভাব করে নিয়েছে বোধহয়। সেদিন দুপুর বেলা গামছা ঢাকা দিয়ে এক কাঁসি ভাত নিয়ে আসছিল—

উঠোনে এসেই হঠাৎ আরম্ভ হলো—আ মোলো যা, মুখে আগুন তোদের, অবেলায় পেটে দুটো দেব, তা-ও তোদের সয় না লো—

দীপঙ্কর দেখতে পেয়ে বললে—কাকে গালাগালি দিচ্ছ চন্নুনী—?

—এই দেখ না বাছা, নোলা দেখ বেটীদের, গতরখাকীরা গন্ধে গন্ধে উঠে এসেছে—

দীপঙ্কর দেখলে চন্নুনীর পোষা বেড়াল দুটো পায়ে পায়ে মুখ উঁচু করে চলেছে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি ওদের গালাগালি দাও না কেন চন্নুনী? ওই নতুন ভাড়াটেদের? ওদের খুব গতরখাকী বলে গালাগালি দিতে পার না? ওদের বাড়ির মেয়েটা আমায় খুব মারে—

চন্নুনী বলেছিল—আহা, মা-হারা মেয়ে বাপকে ছেড়ে বিদেশে রয়েছে—গালাগালি দেব কোন্ আক্কেলে বাছা? ওদের গালাগালি দিলে আমার ধম্মে সইবে ভেবেছ?

চন্নুনীর কাঁসিতে গামছায় ঢাকা তখন সরু-চালের ভাত, দু'খানা মাছের দাগা, ডাল তরকারী। চন্নুনী যেন আর সে-চন্নুনী নয়। ওরা যেন চন্নুনীকে কড়ি দিয়ে কিনে নিয়েছে। চন্নুনী যেন ওদের কেনা বাঁদী হয়ে গেছে। অঘোর-দাদুর কথাটাই সত্যি! অঘোরদাদুই ঠিক কথা বলেছে! টাকা দিয়ে সব কেনা যায়! টাকা দিয়ে লক্ষ্মণকেও কেনা যায়। দীপঙ্করেরা টাকা হলে লক্ষ্মণও আর মারবে না তাকে।

ওপর থেকে নেমে খিড়কির দরজাটার কাছে আসতেই হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল—

—এই, শোন্—

চাপা-গলার ডাক। দীপঙ্কর পেছনে চেয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল।

লক্ষ্মীদি! জায়গাটা অন্ধকার। আমড়া গাছের তলার ঠিক খিড়কির দরজাটার গায়ে একেবারে দীপঙ্করের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি আরো কাছে সরে এল। একেবারে মুখোমুখি!

বললে—লক্ষ্মী ভাই দীপু, একটা কাজ করবি আমার—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেছে। এত আদর করে কথা বলছে লক্ষ্মীদি তার সঙ্গে!

বললে—কী কাজ?

—এই চিঠিটা একজনকে দিতে পারবি?

লক্ষ্মীদির হাতে একটা খামে মোড়া চিঠি।

দীপঙ্কর বললে—কাকে?

—তুই ঠিক দিবি বল্?

—ঠিক দেব, তুমি দিয়ে দেখ—

—কাউকে বলবি না তো?

লক্ষ্মীদি এমন করে কোনওদিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। লক্ষ্মীদি যেন ঘেমে উঠেছে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে

—না, কাউকে বলবো না, তুমি দাও চিঠিটা, দিয়ে দেখ দিই কিনা—

—তাহলে একটা কাজ কর—

বলে লক্ষ্মীদি চিঠিটা তার জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলে।

বললে—কেউ দেখবে না তো? তোর মা দেখতে পাবে না তো?

দীপঙ্কর বললে—আমি লুকিয়ে রাখবো, তোমায় কথা দিচ্ছি কাউকে দেখাব না,—কাকে দিতে হবে বলো?

লক্ষ্মীদি গলা নিচু করে বলে—কুণ্ডুপুকুরের ধারে ঠিক মন্দিরের পশ্চিমে যে দরজাটা আছে ওইখানে একজন ছেলে দাঁড়িয়ে থাকবে—তার হাতে দিবি—

—কিন্তু কী রকম চেহারা?

—দেখবি সাদা প্যাণ্ট, সাদা সার্ট, পায়ে সাদা শু—আর হলদে কোট, কোটের বাটন্ হোলে একটা গোলাপ ফুল—ঠিক চিনতে পারবি তো?

—ক'টার সময়?

লক্ষ্মীদি বললে—কাল ঠিক ভোর সাতটার সময়—

দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, ওই সময়ে তো রোজ আমি ফুল দিতে যাই মন্দিরে, তুমি কিছু ভেব না, আমি দিয়ে দেব—কিছু বলতে হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—না—

কথাটা শুনে চলেই আসছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীদি ডাকলে।

বললে—শোন্ এদিকে—

দীপঙ্কর কাছে যেতেই লক্ষ্মীদি বললে—এই নে, এইগুলো তুই খাস্—

অন্ধকারের মধ্যেও দীপঙ্কর দেখতে পেলে একমুঠো চকোলেট। চকোলেট-গুলো লক্ষ্মীদি তার হাতে গুজে দিলে। গুজে দিয়ে লক্ষ্মীদি আবার চলে গেল। দীপঙ্কর খিড়কির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তারপর হাতের মুঠোটা আবার খুলে দেখলে। অনেকগুলো চকোলেট। মনোহারী দোকানে যেমন চকোলেট কাচের জারের মধ্যে থাকে সে-রকম নয়। তার চেয়েও ভালো। রাঙতা মোড়া, চৌকো চৌকো চকোলেট। একটা মুখে পুরে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু হঠাৎ যেন কী মনে হলো! থাক্, পরে খাব!

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। মা তার আগেই ডেকে দিয়েছে। দীপঙ্কর মুখে চোখে জল দিয়েই জামাটা গায়ে দিয়ে নিলে। তারপর পকেটে লক্ষ্মীদির চিঠিটা পুরে নিলে। হাজি কাশিমের বাড়ির পাশের বাগানে ফুল তুলতে হবে। বাগানের একটা দিকের পাঁচিল ভাঙা, সেইখান দিয়ে ঢুকে ভেতরে অনেক গাছ। গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, জবা কত রকম ফুল। ফুলের সাজিটা এক-একদিন ফুলে-ফুলে ভরে যায়। সেই ফুল নিয়ে দিয়ে আসতে হবে সবগুলো মন্দিরে। প্রথমে মা'র মন্দির, তারপরে মধুসূদনের মন্দির। তারপর সত্যনারায়ণ, গণেশ জগন্নাথ, ষষ্ঠী, তারপর সকলের শেষে নকুলেশ্বর আর সোনার কার্তিক। সব মন্দিরেই কিছু কিছু ফুল দিয়ে আসতে হবে। সব পূজারীরাই চেনে দীপঙ্করকে। গেলেই সবাই হাত বাড়ায়। বলে—দাও খোকা দাও—এদিকে দাও—

ফুল দিয়ে একটা করে নমস্কার করবে দীপঙ্কর।

মা শিখিয়ে দিয়েছিল। বলবে—ঠাকুর আমার যেন লেখা-পড়া হয়, আমার যেন ভালো হয়, আমার যেন মঙ্গল হয়—

বহুদিন পরে যখন দীপঙ্কর রেলের ডি-টি-আই হয়েছিল তখন গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিংএর গেটম্যান ভূষণ তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সেই কথাই বলেছিল—হুজুর, আপনি আমার মা-বাপ হুজুর, আপনার মঙ্গল হবে হুজুর, ভগবান আপনাকে অনেক দেবে হুজুর—

সেদিন হাসিই পেয়েছিল দীপঙ্করের। অনেকেই তো অনেক কিছু মঙ্গল-কামনা করেছে তার। লাইন-ময় লোক তার শুভ-কামনাই করেছিল। এক ডাকে সবাই তাকে সেন-সাহেব বলে চিনেছিল। সেই বালিগঞ্জ স্টেশনের মজুমদারবাবু। সাউথ কেবিনের করালীবাবু। তারপর কে নয়। অফিসের চাপরাসী দ্বিজপদ পর্যন্ত তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। দ্বিজপদ দেশ থেকে কোনও ভালো জিনিস আনলে আগে সেন-সাহেবকে দিয়ে তবে খেত। কী হলো তাতে! কী লাভ হলো তাতে তার! আর সেই চকোলেটগুলো! যে-চকোলেটগুলো লক্ষ্মীদি তার হাতে গুজে দিয়েছিল। সে-ও তো এক-রকমের ঘুষ! ঘুষ দিয়েই লক্ষ্মীদি কিনতে চেয়েছিল দীপঙ্করকে! কড়ি দিয়েই দীপঙ্করের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল! কিন্তু তা-ও কি চাপা ছিল! ও কি চাপা থাকার জিনিস!

—এই—

হঠাৎ পেছন ফিরে দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অত ভোরেও লক্ষ্মীদি ঘুম থেকে উঠে খিড়কির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

চাপা গলায় বললে—চিঠিটা নিয়েছিস ঠিক? ভুলিসনি?

দীপঙ্কর বললে—না, এই দেখ না, পকেটে রয়েছে আমার—

—থাক্ দেখাতে হবে না। তোর মাকে দেখাসনি তো?

—না—

—ঠিক বলছিস্?

দীপঙ্কর বললে—আমি মিথ্যে বলি না, চোদ্দ বছর মিথ্যে কথা বলবোও না—

লক্ষ্মীদি আবার বললে—তা চেহারাটা মনে আছে তো? সাদা প্যাণ্ট, সাদা সার্ট, সাদা শু, আর হলদে কোট, কোটের বাটন্ হোলে একটা গোলাপ ফুল—?

—মনে আছে—

বলে দীপঙ্কর ফুলের সাজিটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই সমস্ত কালিঘাটের যত লোক, সকলের চেয়ে যেন আলাদা ছিল ওই

কাকাবাবুরা। কত বাড়ি দেখেছে দীপঙ্কর। ছোটবেলার কত বাড়ির ভেতরে গিয়েছে। একেবারে অন্দরমহলে। কিরণদের বাড়ি, লক্ষ্মণদের বাড়ি। বিমান, ফটিক, রাখাল সকলের বাড়ি। কিন্তু কাকাবাবুদের বাড়ির সঙ্গে কারো মিলতো না। কালিঘাটে কারো বাড়িতে অমন ঠাকুর-চাকর ছিল না। কিরণদের তো ভিক্ষে করেই সংসার চলতো। পৈতে বিক্রী করে চাল-ডাল-আলু কিনতো ওরা। শুধু তাই নয়। মধুসূদনের বাড়ি গিয়ে দেখেছে মধুসূদনরা সব ভাই-বোন মিলে ভাত খেতে বসেছে। একটা বগি থালায় মধুসূদনের মা একগাদা ভাত ডাল মেখে নিয়েছে আর সব ভাইবোন গোল হয়ে বসেছে ঘিরে। একলা মধুসূদনের মা একের পর এক সবাইকে খাইয়ে দিচ্ছে! ফটিক থাকতো পাথরপটির গলিতে। ফটিকের মা মুড়ি ভাজতো। মুড়ি ভেজে রাস্তার দোকানে দিয়ে আসতো। সেই পয়সায় সংসার চলতো ওদের। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে বেরিয়ে কালী লেনের মধ্যে ছিল হালদারদের বাড়ি। তাদের বাড়ি যজমানরা আসতো, কুমারী পুজো হতো, ভোগ আসতো, প্রসাদ আসতো। কালীপুজোর সময় কতদিন মার সঙ্গে সে-বাড়ি গিয়েছে। তাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের দেখেছে। সে-বাড়ির চেহারাও এমন নয়। আর অঘোরদাদু! অঘোরদাদুরও তো অনেক টাকা। অঘোরদাদুর যে কত টাকা তা অঘোরদাদু নিজেই জানতো না। তবু অঘোরদাদুর বাড়িটা ছিল যেন লক্ষ্মীছাড়া। অঘোরদাদুকে দেখে সত্যিই সেই পাঁজিতে ছাপা বুড়োটার ছবির কথা মনে পড়তো। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে শুধু বিন্তিদিরই যা একটু লক্ষ্মীশ্রী ভাব।

বিন্তিদির গলার শব্দও শোনা যেত না সারাদিনের মধ্যে।

মা বলতো—এ কি কাপড় পরেছ মা, একটা ভালো শাড়ি পর না, আজ বছরকার দিন—

বিন্তিদি হাসতো মুখ বুজে।

মা বলতো—কেন, কাপড় নেই বুঝি? এত লাল পেড়ে কাপড়ের ডাঁই, সব কি যায় হালদারদের ডালার দোকানে? বাবার কী আক্কেলটা বলো তো—

বিন্তিদি ভয় পেয়ে যেত। বলতো—তুমি যেন আবার বোল না দাদুকে, দাদু ভাববে আমি বুঝি বলেছি তোমাকে—

মা বলতো—তোমারও কপাল মা—নইলে তোমারই বা এমন করে কপাল পুড়বে কেন?

সেদিন অঘোরদাদু বাড়ি আসতেই মা ধরলে।

বললে—বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—টাকা?

অঘোরদাদুর হাতে নতুন গামছার পুঁটলি। আর এক হাতে লাঠি। কপালে ফোঁটা। মাথায় দু'একটা গাঁদা ফুলের পাপড়ি। পায়ে খড়ম। একটু আগেই বাইরে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে পয়সা নিয়ে। হঠাৎ-বাড়ির ভেতরে ঢুকেই যেন আবার ভয় পেয়ে এক-পা পেছিয়ে গেল। এখানেও টাকা!

বললে—টাকা? মুখপোড়া টাকা এখন আমি কোথায় পাবো মেয়ে? আমার কি টাকার গাছ দেখেছ তুমি?

মা বললে—টাকার কথা বলছি না আপনাকে, আপনার টাকা আপনারই থাক, কিন্তু নাতনীটার তো বিয়ে দেবেন—না দেবেন না?

অঘোরদাদু এতক্ষণে যেন একটু আশ্বস্ত হলো। বললে—বিয়ে! তা মুখপোড়া বিয়েতেও তো টাকা লাগে! টাকা আমি কোথায় পাবো শুনি?

—তা টাকা লাগবে বলে বিয়ে দেবেন না? কী-রকম দাদামশাই আপনি! এত ধর্ম-কর্ম করেন, এটাও তো ধর্ম! পরকালে এর জন্যে তো জবাবদিহি করতে হবে আপনাকেই। আর তা যদি না পারেন তো গলায় কলসী বেঁধে মেয়েটাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিন গিয়ে, ল্যাঠা চুকে যাক—

অঘোরদাদু খানিকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

মা বলে—মেয়ের দিকে তো একবার চেয়েও দেখেন না—মেয়ের বয়েস হচ্ছে তা তো আপনি দেখতে পান না—আপনি না দেখলে কে দেখবে—

এবার রেগে ওঠে অঘোরদাদু। বলে—আমি? আমি কেন দেখতে যাবো মুখপোড়াকে—আমি কে? মুখপোড়া মাকে খেয়েছে, মুখপোড়া বাপকে খেয়েছে, এবার মুখপোড়া আমাকে খাবে নাকি? আমি পারবো না ও-সব—

—তা আপনি না পারলে কে পারবে?

—তার আমি কি জানি মুখপোড়া, আমি কি জানি তার—আমি কি ওর বাপ, নাকি আমি ওর মা? আমি কেউ না—

বলতে বলতে অঘোরদাদু খট্ খট্ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে গিয়েও গজ্ গজ্ করতে লাগলো—মুখপোড়ারা টাকা দেখেছে আমার, মুখপোড়ারা আমার টাকা দেখেছে—আমি বের করে দেব মুখপোড়াদের বাড়ি থেকে—বেরো বেরো মুখপোড়ারা, বেরিয়ে যা—বেরো সব—

সে গজ্-গজানি আর থামে না।

অঘোরদাদু ওপরে যেতেই বিন্তিদি বেরিয়ে এসেছে। এসে মার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো।

—দিদি—

মা বললে—তুই থাম তো বাছা, অত ভয় করলে চলে না, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস সহ্য করতে হবে না! সহ্য না করলে তুইই ভুগবি, কেউ তোর জন্যে কিছু করবে না—তুই একটু শক্ত হ' দিকিনি—

তারপর মা বলতে লাগলো—ও-রকম আমি অনেক দেখেছি, এক-কাপড়ে এত-টুকুন ছেলেকে নিয়ে আমি বিধবা মানুষ গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলুম, আমায় তো কত ভয় দেখিয়েছিল জ্ঞাতি-কুটুমরা, নই আমি তোর

এতন ভয় পেয়েছি তখন? ভয় পেলে আর এই ছেলেকে মানুষ করতে হতো না-

সত্যিই কী করে যে মা মানুষ করতো তাকে! পরের সংসারের সমস্ত কাজ করে মা কত দিক দেখেছে। কোথায় ইস্কুলের হেড-মাস্টারকে বলে ফ্রি করে দিয়েছে মা। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে চিড়িয়াখানায়। বাঘ-সিংহ-হাতী দেখিয়েছে। বাঁদরকে ছোলা খাইয়েছে। মা তাকে কত শিখিয়েছে। মা-ই তো তাকে কালিঘাট ব্যায়াম-সমিতিতে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল। আজ যদি মা বেঁচে থাকতো! দীপঙ্করের এক-একবার মনে হতো মা বেঁচে থাকলে কি তাকে দেখে খুশী হতো। মা কি তার পদমর্যাদা দেখে খুশী হতো! তার এই সেন-সাহেব হওয়াই কি মা চেয়েছিল। মা চেয়েছিল ছেলেকে মানুষ করতে। কিন্তু মানুষ কি সে হয়েছে? একেই কি মানুষ হওয়া বলে? এই চাকরিতে প্রমোশন? এই ডি-টি-আই, এই ডি-টি-এস?

মনে আছে একবার এক কাণ্ড হয়েছিল। কালিঘাট ইস্কুলের ছাত্র তখন সে। কালিঘাট ইস্কুলের ফ্রি-স্টুডেন্ট! ছেলেদের থিয়েটার হবে। মাকে বলে গিয়েছিল দীপঙ্কর ফিরতে একটু রাত হবে। থিয়েটার হলো 'বিসর্জন'। সন্ধ্যে ছ'টার পর সমস্ত ইস্কুলটা ভর্তি হয়ে গেল ছেলেদের ভিড়ে। দীপঙ্কর গিয়ে বসেছিল সকলের সামনে। কিরণও ছিল পাশে। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা থিয়েটারে পার্ট করবে। ঢং করে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ সিন্ উঠলো। ওঃ, সে এক জগৎ। দেখতে দেখতে কোথায় কত দূরে যে তলিয়ে গেল দীপঙ্কর। মনে হলো সে যেন আর নেই। সেই আলো, সেই ভিড়, সেই ঘণ্টার শব্দ, সেই কালিঘাট, সেই সব কিছু পেরিয়ে সে তখন আর এক জগতে গিয়ে হাজির হয়েছে।

কিরণ মাঝে মাঝে হাত-তালি দিচ্ছিল—

কিন্তু দীপঙ্করের সেসব দিকে খেয়ালই ছিল না। মনে হচ্ছিল প্রাণমথবাবু যেন একদিন এই কথাই বলেছিলেন তাদের ক্লাসে। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে রাজাও ছিল না, রাজ্যও ছিল না, দণ্ডও ছিল না; দণ্ডদাতাও ছিল না—কিন্তু ক্রমে একদিন মোহ এল, ধর্ম লোপ পেয়ে গেল পৃথিবী থেকে। দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে—

দীপঙ্করের মনে হলো আবার যেন সেই অবস্থা এসেছে। আবার যেন রাজা অত্যাচার শুরু করেছে পৃথিবীতে। এ-রাজা অন্যায় করে, এ-রাজা অত্যাচার করে, এ-রাজা হত্যা করে। কিন্তু এবার কে এর প্রতিকার করবে! কোথায় এখন প্রতিবিধান এর? দেবতারা এখন কোথায়? ব্রহ্মার কাছে কারা যাবে? কে সৃষ্টি করবে পৃথু রাজাকে? কোথায় সেই বিষ্ণুর অবতার?

থিয়েটার দেখতে দেখতে দীপঙ্করের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। মনে হলো অপর্ণার সঙ্গে যেন দীপঙ্করও কেঁদে উঠলো একসুরে। বললে—

মা তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা,—তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার!

সত্যিই তো, কে বিচার করবে! রাজা যদি অত্যাচার করে, কার কাছে বিচার-প্রার্থনা করবে? কোথায় সেই জগতের রাজা? বিন্তিদির বিয়ে যদি অঘোরদাদু না দেয় তো কে দেবে? কিরণের বাবার যদি অসুখ না সারে তো কার কাছে কিরণ প্রতিকার চাইবে? কোথায় সেই জগতের রাজা? কী করে তাঁকে দেখা যায়? কোথায় কোন্ রাজ্যে থাকেন তিনি? মা বলেছিল—মা'কে মন দিয়ে ডাকলে মা শুনতে পান। শুধু মা নয়, ওই গণেশ, ষষ্ঠী, ভুবনেশ্বরী, মধুসূদন যত ঠাকুর আছে কালিঘাটে সবাই শুনতে পান। কিন্তু ঠাকুরগুলোর চেহারাগুলো যেন কেমন লাগতো দীপঙ্করের। দেখতে মোটে ভালো নয়। সেবার সেই এক সাধু এসেছিল কালিঘাটে! সেই অনেকদিন আগে। কী বিরাট সাধু এসেছিল একটা। আগাগোড়া ন্যাংটো। সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল একশো উট, পঞ্চাশটা ঘোড়া, তিরিশটা হাতী। সমস্ত কালিঘাট ভেঙে পড়েছিল সেদিন সেই সাধুকে দেখতে। মা'র সঙ্গে দীপঙ্করও গিয়েছিল দেখতে। বাবার মন্দিরের চাতালের সামনে ঠিক নাট-মন্দিরের দক্ষিণে যেখানে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল সাধুটা—

একটা একটা করে পাঁঠা এনে হাড়িকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে বলি হচ্ছিল।

কত লোক সেই হাড়িকাঠে এসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তলার মাটিটা আঙুলে ছুঁয়ে জিভে ঠেকায়।

একটা পাঁঠা নিয়ে এসে যেই কামারটা বলি দিতে যাবে, ওমনি সাধুবাবা হাত তুলে থামতে বললে। সাধু কথা বলে না। তারপর নিজের গলাটা সেই হাড়িকাঠে লাগিয়ে সাধু কী ইঙ্গিত করলে।

সে কী কাণ্ড! সমস্ত জায়গাটা ভরে একটা গন্ গন্ শব্দ উঠলো। দীপঙ্করের ভয় হয়েছিল। যদি সত্যি সত্যিই গলাটা এবার কেটে দেয় সাধুর। যদি সত্যিই বলি দেয় সাধুকে! হঠাৎ কোথা থেকে পুলিস এল, দারোগা এল। তারা এসে কীসব বললে বোঝা গেল না। ভিড়ের চোটে তখন আর শোনা গেল না কিছু। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সমস্ত কালীবাড়ি। হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে মা শক্ত করে ধরে রইল দীপঙ্করের হাতটা!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল মাকে—পুলিস কী বললে মা

মা বলেছিল—পুলিস পাঁঠা বলি বন্ধ করে দেবে—

—কেন?

মা বলেছিল—ওদেরও তো প্রাণ আছে, ওদেরও তো লাগে—

—কিন্তু মা-কালী যে পাঁঠা খায়, মা-কালী কী খাবে তাহলে?

মা বলেছিল—মা-কালী তো ঠাকুর, ঠাকুর দেবতারা কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারেন।

মা সেদিন জানতো না। জানতো না যে দেবতার নাম করে যারা ঠকায়, দরকার হলে দেবতার নাম না করেও তারা ঠকাতে পারে। যারা সত্যিকারের অত্যাচার করতে জানে তাদের কোনও উপলক্ষ্যের অভাব হয় না। তাছাড়া কেউ দেবতার নাম করে অন্যায় করে, কেউ রাজার নাম করে অন্যায় করে, কেউ আবার দেশের নাম করেও অন্যায় করে। ও একই কথা। দেবতা হোক, রাজা হোক আর দেশই হোক, আসলে ওটা উপলক্ষ্যই। পাঁঠা নিরীহ জীব, তাই কিছু বলতে পারে না। কিন্তু মানুষও কি নিরীহ? অঘোরদাদু ঠাকুরের নামে যজমানদের ঠকায়, কিন্তু কোনও যজমানই তো তার জন্যে কোনওদিন প্রতিবাদ করেনি?

একদিন দীপঙ্কর অঘোরদাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা অঘোরদাদু, তুমি যজমানদের যে ঠকাও তা তারা কিছু বলে না?

অঘোরদাদু বোধ হয় সেদিন ভাল প্রণামী পেয়েছিল। মেজাজ খুশী ছিল তার। বললে—দূর মুখপোড়া, বলবে কেন? তারাও যে ঠকায়!

—কাদের ঠকায় তারা? ঠাকুরদের?

—দূর, দূর, আমার উকীল-যজমানরা ঠকায় মক্কেলদের, ডাক্তার-যজমানরা ঠকায় রোগীদের—

—আর মক্কেলরা কাদের ঠকায়? রোগীরা কাদের ঠকায়?

অঘোরদাদুর বুদ্ধি দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। অঘোরদাদু সব জানতো। মা'র চেয়েও বেশি জানতো। কাকাবাবুর চেয়েও বেশি জানতো। হয়ত প্রাণমথবাবুর চেয়েও বেশি জানতো। চোখে দেখতে পেত না অঘোরদাদু, কানেও শুনতে পেত না; কিন্তু আশ্চর্য, এতও জানতো!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে পৃথিবীতে সবাই-ই সবাইকে ঠকায় বলতে চাও?

অঘোরদাদু বলেছিল—হ্যাঁ রে হ্যাঁ মুখপোড়া—সবাই সবাইকে ঠকায়! আমি ঠকাই বিন্তিকে, বিন্তি ঠকায় ছিটেকে, ছিটে ঠকায় ফোঁটাকে—

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি কিন্তু কাউকে ঠকাবো না অঘোরদাদু—দেখো—

অঘোরদাদু বলেছিল—কেন রে মুখপোড়া, তুই ঠকাবি তোর মাকে, তোর মা আবার ঠকাবে আমাকে—

দীপঙ্কর বলেছিল—না অঘোরদাদু, আমি কোনওদিন কাউকে ঠকাবো না, তুমি দেখে নিও—

অঘোরদাদু রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—তবে মরগে যা তুই মুখপোড়া—না ঠকাতে পারলে তুই-ই মরবি, তুই-ই ভুগবি, আমার কী! আমার কাঁচকলা,

আমার কচুপোড়া—

কিন্তু কী আশ্চর্য! অঘোরদাদুর কথা এমন করে তার জীবনে ফলে যাবে কে ভেবেছিল! লক্ষ্মণ কি একাই তার ওপর অত্যাচার করেছিল! লক্ষ্মণ কি একাই তার রাজ-প্রসাদ কমলালেবু আর কদ্‌মা কেড়ে নিয়েছিল! লক্ষ্মণ কি পৃথিবীতে একজনই! এই এতদিন ধরে সংসারে বাস করে এল দীপঙ্কর, এতদিন ধরে এত দেখেশুনে এসে আজ এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং পর্যন্ত পৌঁছিয়ে কি একজন লক্ষ্মণেরই সাক্ষাৎ পেয়েছে!

একদিন সতী বলেছিল—তুমি মানুষ নও দীপু—তুমি মানুষ হলে.........

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু দেবতাও তো আমি নই সতী—

সতী বলেছিল—তাহলে তুমি কী?

দীপঙ্কর বলেছিল—তাহলে আমি কী বলো—তুমিই না হয় বলো?

সতী বলেছিল—তুমি পশু, তুমি একটা জানোয়ার দীপু, তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়, তুমি আর আমায় জ্বালিও না, তুমি চলে যাও এখান থেকে, তুমি বেরিয়ে যাও—

বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। আর দীপঙ্কর সেদিন সতীকে সান্ত্বনাও দেয়নি, আশ্বাসও দেয়নি। সতীকে সেই অবস্থাতেই সেখানে ফেলে দীপঙ্কর চলে এসেছিল।

অথচ সেই সতীই যখন প্রথম এসেছিল কলকাতায় সেদিন সে কী দুর্যোগ! সে কি বিপর্যয়ের দিন। তবু কী সুন্দর লেগেছিল দীপঙ্করের। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল! সতী খোঁপা বাঁধতো না। কোঁকড়ানো চুলগুলো বিছিয়ে থাকতো কাঁধটা জুড়ে। শাড়িটা কাঁধ থেকে ঝুলতো পিঠের ওপর। বড় সুন্দর দেখতে হতো! এই ঝাঁকড়া চুল নিয়েই ইস্কুলে যেত সতী। ওই কলেজে পড়বার সময়ও ওই চুলগুলো দেখবার জন্যে দীপঙ্কর কতবার পেছন থেকে চেয়ে থাকতো সতীর দিকে। চুলের যে অত বাহার হয় তা দীপঙ্কর আগে কখনও জানতো না। বিন্তিদির চুল ছিল না মোটে। মা বেঁধে দিত এক একদিন। কিন্তু সতীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন তার মাথার চুলে এসে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু লক্ষ্মীদি তো সতীরই বোন, আপন মায়ের পেটের বোন। সেই লক্ষ্মীদির কিন্তু অত চুল ছিল না। চেহারাটা দুজনের এক রকমই ছিল—তফাৎ যা কিছু ওই মাথার চুলের বাহারে।

লক্ষ্মীদি একদিন নিরিবিলিতে পেয়ে ডেকেছিল দীপঙ্করকে। সেদিন ইস্কুলের ছুটি। আমড়া গাছের ডালে একটা কাক অনেকক্ষণ কা-কা করে ডেকে চলেছে।

হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তেই দেখলে লক্ষ্মীদি। একতলায় খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে—

দৌড়ে কাছে গেছে দীপঙ্কর।

লক্ষ্মীদি বললে—আয় ভেতরে আয়—

ভেতরে যেতেই লক্ষ্মীদি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। লক্ষ্মীদি মাথায় বোধ হয় কী এক রকম গন্ধতেল মেখেছিল—খুব ভুর-ভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। দীপঙ্কর সোজা-সুজি চাইলে লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। কোনও অপরাধ করেছে নাকি সে। অমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ যে লক্ষ্মীদির!

লক্ষ্মীদি বললে—এই, তুই চিঠিটা দিসনি কালকে—

—কেন?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। দেয়নি মানে? ঠিক লোকের হাতেই তো বরাবর চিঠি দিয়ে এসেছে সে।

বললে—কেন? রোজ যার হাতে চিঠি দিই, তাকেই তো দিয়েছি, পায়নি সে?

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে চিঠি পায়নি কেন সে? আমাকে লিখেছে যে—

দীপঙ্কর বললে—বা রে, এতদিন ধরে এত চিঠি তোমার দিয়ে এলাম আর কালকের চিঠিটা দেব না? তুমি তো বেশ—

—তাহলে পায়নি কেন সে? কী করেছিস সে-চিঠি নিয়ে বল্?

লক্ষ্মীদির চোখে যেন রাগের ছায়া ফুটে উঠলো এতক্ষণে! অনেকদিন ধরে এমন রাগ করেনি লক্ষ্মীদি।

—বল্, কী করলি সে-চিঠিটা? কাকে দিয়েছিস? কোথায় রেখেছিস, বল্?

দীপঙ্কর বললে—বা রে, আমার ওপর তুমি রাগ করছো মিছিমিছি, আমি তোমার চিঠি নিয়ে কী করবো? এতগুলো চিঠি ঠিক লোককে দিয়েছি আর এ-চিঠিটা দেব না?

—তাহলে সে কি মিছে কথা লিখেছে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কি জানি?

—তুই জানিস না তো কে জানে? আমি তো তোর হাতে দিয়েই চিঠিটা পাঠিয়েছি—

—তা আমি কি তোমার চিঠি খেয়ে ফেলবো বলতে চাও?

—চিঠিটা কাকে দিয়েছিস, সত্যি বল্ লক্ষ্মীটি,—

হঠাৎ যেন আদর দেখাতে লাগলো লক্ষ্মীদি। একেবারে চিবুকে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলো।

বললে—আমি কিচ্ছু বলবো না, মারবো না, ধরবো না, কিচ্ছু করবো না, তুই বল্ না সে-চিঠি নিয়ে কী করেছিস? কোথাও হারিয়ে গিয়েছে বুঝি?

—ওমা, হারাবে কেন? আমি তো রোজ পকেটে করে নিয়ে যাই—পকেটে করেই তো চিঠিটা কাল নিয়ে গিয়েছিলুম—

—কিন্তু চিঠির তো পাখা নেই যে উড়ে পালাবে অমনি—জানিস সে-চিঠির মধ্যে কত কথা লেখা ছিল, সেটা যদি কারোর হাতে পড়ে? কেউ যদি দেখতে পায়?

দীপঙ্কর হঠাৎ যেন কেমন একটু সোজা হয়ে মাথা উঁচু করলো।

বললে—কিন্তু কেন তুমি চিঠি লেখ ওকে লক্ষ্মীদি? ও তোমার কে?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন থতমত খেয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললে—লোকটা রোজ সকালে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে তোমার চিঠির জন্যে, কেন, বাড়িতে আসতে পারে না? বাড়িতে সকলের সামনে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো না? আর এত তোমাদের কী কথা গো যে, রোজ রোজ চিঠি লিখতে হয়?

লক্ষ্মীদি অনেকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললে—তুই নিশ্চয়ই চিঠি পড়েছিস আমার—না?

দীপঙ্কর বললে—তোমার চিঠি আমি কেন মিছিমিছি পড়তে যাবো, আমার দায় পড়েছে তোমার চিঠি পড়তে—কিন্তু ও-লোকটা তোমাদের বাড়ি আসতে পারে না?

লক্ষ্মীদি বললে—ঠিক বলছিস তুই আমার চিঠি পড়িস না?

—সত্যি বলছি লক্ষ্মীদি, আমি তোমার একখানা চিঠিও পড়িনি!

—ঠিক বলছিস তো?

—বলছি আমি মিথ্যে কথা বলি না।

—কিন্তু তবে ও চিঠি পেলে না কেন?

লক্ষ্মীদি কেমন যেন ভাবনায় পড়লো। মনে হলো যেন আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবছে।

হঠাৎ বললে—পরশু সকালবেলা আর একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবি?

দীপঙ্কর বললে—কেন পারবো না।

—তাহলে যাবার আগে আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে যাস, কেমন?

দীপঙ্কর বললে—বেশ—

বলে দীপঙ্কর চলেই আসছিল, হঠাৎ লক্ষ্মীদি আবার ডাকলো—শোন্ দীপু—

দীপঙ্কর থমকে দাঁড়াল।

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি—

বলে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর খানিক পরেই আবার তর্ তর্ করে এক দৌড়ে নেমে এল। একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে সামনে।

বললে—এই নে।

হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীদি আবার এক মুঠো চকোলেট গুঁজে দিতে এল

দীপঙ্করের হাতে।

দীপঙ্কর হাতটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে বললে—কী?

লক্ষ্মীদি বললে—সেদিন যা দিয়েছিলুম,—

দীপঙ্কর বললে—তোমার ও চকোলেট আমি নেব না—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠলো যেন। বললে—কেন? নিবি না কেন? চকোলেট খাস্ না তুই?

দীপঙ্কর বললে—খাই, কিন্তু তোমার কাছ থেকে নেব না—

—কেন? আমি কী দোষ করলাম?

দীপঙ্কর বললে—সেদিনকার সে-চকোলেটও আমি খাইনি। তুমি যেমন দিয়েছ আমি তেমনি রেখে দিয়েছি—তুমি আমায় চকোলেট আর দিও না লক্ষ্মীদি।

—কেন? কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি চকোলেট না দিলেও আমি তোমার চিঠি দিয়ে আসবো—যতদিন দিতে বলবে ততদিন দেব—তুমি যে কাজ করতে বলবে সব আমি করবো—কিন্তু চকোলেট তুমি দিও না আমায়—তোমার পায়ে পড়ি—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন রে? কী হলো বল্ না?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ভাবো চকোলেট না দিলে আমি তোমার চিঠি দিয়ে আসবো না, না?

লক্ষ্মীদি বললে—তা চিঠি দিয়ে আসিস না, ভালোই তো—কিন্তু চকোলেট নিতে কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—না-দিয়েই দেখ না, চিঠি দিয়ে আসি কি না!

লক্ষ্মীদি হেসে কাছে সরে এল। দু'হাত দিয়ে দীপঙ্করের মুখটা ধরে আদর করতে করতে বললে—কেন রে? আমার কাজ করতে তোর এত ভালো লাগে কেন রে?

দীপঙ্কর মুখটা নিচু করে বললে—এমনি—

—কিন্তু আমি যে তোকে কত মারি? তবু আমার ওপর তোর রাগ হয় না?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিলে না। লক্ষ্মীদির বুকের ভেতর মুখ গুঁজে থাকতে খুব ভাল লাগছিল। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছিল লক্ষ্মীদির গা থেকে।

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—আর আমি তোকে মারবো না, জানিস—

বলে দীপঙ্করের হাতের মধ্যে চকোলেটগুলো গুঁজে দিলে।

বললে—আমি বলছি চকোলেটগুলো তুই নে, আমি দিচ্ছি, নিতে হয়—ছিঃ লক্ষ্মীটি—

দীপঙ্কর চকোলেটগুলো নিলে। এবার আর আপত্তি করলে না নিতে।

লক্ষ্মীদি বললে—পরশুদিন সকালবেলা চিঠিটা দিয়ে আসবি তো ঠিক?

দীপঙ্কর বললে—দেব—

লক্ষ্মীদি বললে—এবার যা তুই—

তারপর একটু থেমে বললে—মনে থাকে যেন পরশুদিন সকালবেলা—

বলেই লক্ষ্মীদি চলে গেল ওপরে। আর দীপঙ্কর খিড়কির দরজাটা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ উঠোনে। কাকটা তখনও অকারণে ডাকছে কা-কা করে। মা এখনও ঘুমোচ্ছে। আমড়া গাছটার ছায়ার তলায় খানিকক্ষণ দাঁড়াল দীপঙ্কর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল। গরমের দুপুরে সবাই দরজা বন্ধ ঘরে ঘুমোচ্ছে হয়ত, অঘোরদাদুও হয়ত বেরোতে পারেনি সেদিন। চন্নুনীও সকাল সকাল কাজ-টাজ সেরে নিয়ে হয়ত তার দরজা বন্ধ করে ঝিমোচ্ছে। বিন্তিদি তার একতলার ঘরটাতে কী করছে কে জানে। ছিটে-ফোঁটা এক সময়ে খেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়ে হয়ত আড্ডা জমাচ্ছে। হয় পাথরপট্টির কোনও তবলার দোকানে, নয়ত আরো দূরে বাজারের উত্তরে কোনও খোলার ঘরের বস্তিতে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দুপুরবেলার একটা নিজস্ব রূপ ছিল। এধারে ওধারে গোলপাতার চালা ঘর। অনেক দূরে নীল আকাশটার গায়ে কয়েকটা চিল উড়ছে ঘুরে ঘুরে —তাদের ছাদের মাথায় তখন একটা বাঁশের ডগায় একটা ঘুড়ি আটকে গিয়ে ঝুলছে। রাস্তা দিয়ে আর একটু পরেই বাসনওয়ালারা একে একে ঢং ঢং করে কাঁসি বাজাতে বাজাতে যাবে। তারপর আসবে কাঠি বরফ। তারপর আসবে রাস্তায় জল দেবার গাড়ি। তারপর ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজবে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকেল হয়ে যাবে কালিঘাটে।

কিন্তু অনেকক্ষণ সেই আমড়া গাছটার তলায় দাঁড়িয়েও দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। কেন লক্ষ্মীদি তাকে এত আদর করলে আজ। তার মুখটা ধরে তার চিবুকটা ধরে কত আদর করেছে। তখনও যেন বাতাসে লক্ষ্মীদির গায়ের মিষ্টি গন্ধটা লেগে রয়েছে। হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো দুপুরটা যেন অন্য দিনের মত নয়। এ-দুপুরটা যেন একটু বেশি মিষ্টি মিষ্টি। কাকটার ডাকও যেন আর তত কর্কশ নয়। নীল আকাশের একেবারে মাথায় যে চিলগুলো ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে তারাও যেন আর চিল নয়—দীপঙ্করের মনের সব ইচ্ছে। দীপঙ্করের মনের ইচ্ছেগুলোই যেন চিল হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড় চমৎকার লাগলো দীপঙ্করের সেই গ্রীষ্মের দুপুরটা। এমন তো কখনও হয় না। এমন তো হয় না কখনও। আমড়া গাছের তলাটায় ছায়া ছায়া রোদের নিচেয় দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর যেন বড় তৃপ্তি পেলে মনে। তারপর হঠাৎ গাছের দিকে চাইতেই দেখলে কাকটাও তার দিকে যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে। এতক্ষণ কা-কা করে ডাকছিল, এখন আর ডাকছে না। তার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন কী ভাবছে আপন মনে। ও-কাকটাও তার মত আজ একলা।

—এই আঃ আঃ আঃ—

হাতটা বাড়িয়ে ডাকতে লাগলো দীপঙ্কর।

কাকটা প্রথমটায় একটু চমকে উঠেছিল। পালিয়ে যাবার জন্যে পাখা-ঝাপটা দিচ্ছিল। কিন্তু কী ভেবে আবার থেমে গেল। আবার দীপঙ্করের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

দীপঙ্করের মনে পড়লো এই কাকটাই যেন সেদিন তার পাত থেকে ছোঁ মেরে ভাত নিয়ে গিয়েছিল। এই কাকটাই বোধ হয় অঘোরদাদুর ঘরে ঢুকে চাল-কলা-সন্দেশ খেয়ে যায় রোজ। ওই হাজি কাশিমের বাগানের কোণে কতকগুলো নারকোল গাছ আছে, ওইগুলোতেই বোধ হয় থাকে এই কাকটা। সেদিন এই কাকটাই বোধ হয় চিলেকোঠার ঘুলঘুলি থেকে পায়রার ডিম খেয়ে ফেলেছিল। বড় বদমাইশ কাক এটা। অনেক দিন দীপঙ্কর দেখেছে ওই কাকটার সঙ্গে একটা বাচ্চা কাক থাকে। গায়ে তার ভালো করে পালক ওঠেনি তখনও। মুখটা হাঁ করে কাঁ কাঁ করে চেঁচায়। আর কোথা থেকে এই ধাড়ি কাকটা একমুখ খাবার এনে বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দেয়। বাচ্চাটার মুখের ভেতরটা লাল টক টক করে। বোধ হয় বাচ্চাটা একেবারে কচি। তারপর একদিন সকালবেলা ফুল তুলতে গিয়ে দেখে বাগানে অনেকগুলো কাক একেবারে একসঙ্গে কা-কা করে চারদিক মাত করে তুলেছে। প্রায় একশো দু'শো তিনশো কাক জড়ো হয়েছে। প্রথমটায় দীপঙ্কর কেমন ভয় পেয়েছিল। এত কাক ভোরবেলা কিসের সভা বসিয়েছে। গাছের নিচু নিচু ডালের ওপর বসে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে কা-কা করছে সবাই। একবার এ-ডালে যাচ্ছে একবার ও-ডালে যাচ্ছে। হৈ-চৈ হল্লার অন্ত নেই।

প্রথমটায় বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। তারপর কাছে গিয়ে দেখলে একটা বাচ্চা কাক কাদার ওপর চিত হয়ে মরে পড়ে আছে। তার পালকগুলো চারদিকে ছড়ানো। চোখ খোবলানো। আহা, কে মারলে বাচ্চাটাকে। বাজ পাখী?

তারপর থেকে বাচ্চাটাকে আর দেখতে পায়নি দীপঙ্কর। এই ধাড়ি কাকটাই তারপর থেকে একলা এসে বসে আমড়া গাছটার ডালে, আর একলা একলা চেঁচায়। একলাই অঘোরদাদুর ঘরে ঢুকে চাল-কলা-সন্দেশ ছোঁ মারবার চেষ্টা করে, মা'র রান্নাঘরের এঁটো কাঁটায় মুখ দেয়। ভাতের থালা, মাছের আঁশের দিকে নোলা দেয়। মা কাকটাকে দেখলেই হাতটা উঁচু করে তাড়া করে—হুস্-স্-স্। কিন্তু কাকটা বেশি দূরে পালায় না। ওই আমড়া গাছটার ডালের ফাঁকে এসে বসে। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে আর সময়ে অসময়ে কা-কা করে ডাকে।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—এই আঃ আঃ আঃ—

কাকটার তখনও সন্দেহ যায়নি। ঘাড় কাত করে দেখতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর এক মুঠো চকোলেট নিয়ে সোজা ছড়িয়ে দিলে সামনের উঠোনে।

—খা তুই, সবগুলো খা, তোকে আমি এমনিই সব দিলাম, সব তোর, পেট ভরে খেয়ে নে—লক্ষ্মীদি যত চকোলেট দেবে সব তোকে দেব এবার থেকে—

আঃ আঃ।

কাকটা ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে উড়ে এসে নামলো উঠোনে।

—আমার চকোলেট দরকার নেই রে, লক্ষ্মীদির চিঠি এমনিই দিয়ে আসবো, চকোলেট দিলেও দিয়ে আসবো, না দিলেও দিয়ে আসবো, লক্ষ্মীদিকে যে আমার ভাল লাগে, এগুলো তুই খা, তুই খা এগুলো—

ভোর বেলা উঠতেই মা বললে—হ্যাঁ রে, এত ভোরে যাচ্ছিস, আজ আর না-ই গেলি—

দীপঙ্কর বললে—আমি দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আসবো মা—গলির ভেতর দিয়ে গিয়ে দিয়ে আসবো একদৌড়ে—

মা বললে—কিন্তু যা মেঘ করেছে, এখুখুনি বৃষ্টি নামবে—দেখিস—

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। যেন রাত চারটে বেজেছে মনে হচ্ছে—এমন অন্ধকার। এখান থেকে মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যায়। পুজো হচ্ছে চণ্ডীবাবুদের মন্দিরে। চণ্ডীবাবুদের বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল। তেমন জাঁক-জমক হতো না অন্য সময়। শুধু জন্মাষ্টমী হতো ঘটা করে। কিরণ আর দীপঙ্কর কত দিন জন্মাষ্টমীর দিন গিয়ে বাতাসা খেয়ে এসেছে। যে যেত তাকেই বাতাসা প্রসাদ দেওয়া হতো সেদিন।

যেদিন সেই কালিঘাট ইস্কুলে 'বিসর্জন' থিয়েটার দেখে ফিরছিল, তখন অনেক রাত। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভাঙলো। সেদিন এই চণ্ডীবাবুর বাড়ির পাশেই ভূত দেখেছিল দীপঙ্কর।

একেবারে আসল জ্যান্ত ভূত।

সংসারে বড় হয়ে অনেকবার অনেক ভূত দেখেছে দীপঙ্কর। কিন্তু সেদিন যে-ভূত দেখেছিল তার বোধহয় তুলনা হয় না।

তখনও 'বিসর্জন' থিয়েটারের সেই কথাগুলো যেন কানে বাজছে দীপঙ্করের। সেই প্রাণমথবাবুর গল্পটা যেন মনে পড়লো। সেই কোন সত্যযুগেরও আগে পৃথিবীতে রাজা ছিল না, দণ্ড ছিল না। সকলে ধর্ম আশ্রয় করে পরস্পরকে রক্ষে করতো। তারপর একদিন মোহ এল, লোভ এল, ক্রোধ এল। তার থেকে এল আসক্তি। লোকের কাণ্ডজ্ঞান চলে গেল। বেদ লোপ পেল। যাগযজ্ঞ আর কেউ করে না। দেবতারা তখন যজ্ঞের নৈবিদ্যি খেয়ে বেঁচে থাকতো। তারাও উপোসী হয়ে রইল।

এমন সময় দেবতারা সবাই ব্রহ্মার কাছে দরবার করলেন।

ব্রহ্মা বললেন—তোমরা বিষ্ণুর কাছে যাও—তিনি এর বিধান করবেন—

শেষে দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে।

বললেন—পৃথিবীর লোকেরা কেউ আর যজ্ঞ করে না, বেদ পড়ে না—আমরা

কী খেয়ে বাঁচি, আপনি এর বিধান করুন—

বিষ্ণু বললেন—তোমরা বাড়ি যাও—আমি এর বিধান করছি—

শেষ পর্যন্ত বিধান হলো। কী বিধান? না পৃথিবীতে একজন রাজা সৃষ্টি করলেন তিনি।

বললেন—এবার আর কোনও ভয় নেই, এবার এই রাজাই সমস্ত মানুষকে শাসন করবে। যারা দুষ্ট তাদের দমন করবে, আর যারা শিষ্ট তাদের পালন করবে—

এমনি করেই পৃথু রাজার সৃষ্টি হলো। পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এল। আনন্দ ফিরে এল। ধর্ম ফিরে এল। সব ফিরে এল। আবার সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো পৃথিবীর লোক।

কিন্তু হঠাৎ এক কান্ড ঘটলো আবার।

কিরণও থিয়েটার দেখে ফিরে আসছিল সঙ্গে সঙ্গে।

বললে—জানিস দীপু, ইংরেজরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা চলে গেলেই দেখবি বেড়ে আরামে থাকবো আমরা, তখন আর কিছু কিনতে টাকা লাগবে না দেখবি—

দীপঙ্কর বললে—কে বললে তোকে?

কিরণ বললে—আমি মিটিং-এ গিয়ে লেকচার শুনে এসেছি। সেদিন একজন বলছিল মিটিং-এ, এত সমুদ্র আছে আমাদের দেশের চারদিকে, আমরা সেই সমুদ্রের জল নিয়ে নুন তৈরি করবো আর খাবো—এখনকার মত নুন কিনতে আর পয়সা লাগবে না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু অত নুন নিয়ে কী হবে!

কিরণ বললে—নুনটাই তো আসল রে, আমি তো এক-একদিন শুধু নুন দিয়ে ভাত খেয়ে ইস্কুলে আসি, শুধু নুন আর ভাত, যেদিন নুন থাকে না সেদিন ভাত খেতে পারি না মোটে—

দীপঙ্কর বললে—তোর বাবা এখনও ভালো হয়নি?

কিরণ বললে—দাঁড়া না, আগে স্বরাজ হোক তবে তো—আর তো বেশি দেরি নেই—

কবে কেমন করে যে স্বরাজ হবে তা কিরণ জানতো না। শুধু পার্কে গিয়ে বক্তৃতা শুনতো আর এসে বলতো দীপঙ্করকে। আর বক্তৃতা শুনে এসেই গরম হয়ে উঠতো। টগবগ করে ফুটতো কিরণের রক্ত। কিরণ যেন ছটফট করতো কদিন ধরে। তার মুখে আর কোনও কথা নেই সে কদিন। রাগলে কিরণের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠতো কেমন। ফরসা চেহারা ছিল কিরণের। ময়লা জামা-কাপড়ে সে রংটা সব সময় ধরা যেত না। কিন্তু একটু ফরসা জামা-কাপড় পরলেই আবার যেন আরেকরকম হয়ে উঠতো তার চেহারা।

থিয়েটার দেখে ফেরার পথে অন্ধকার কালী লেনের মধ্যে দিয়ে আসছিল

সেদিন দুজনে। কালী লেনের গলিটা পেরিয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী ফার্স্ট লেন। সেইখানটা এসে কিরণ অন্যদিকে যাবে। আর দীপঙ্কর সোজা যাবে নিজের বাড়ির দিকে। রাস্তাটা নির্জন হয়ে গেছে। একটাও লোক দেখা যায় না।

কিরণ থামলো এবার।

বললে—এবার তুই ঠিক যেতে পারবি দীপু?

দীপঙ্কর বললে—পারবো।

—ভয় পাবে না?

দীপঙ্কর বললে—না, ভয় কিসের?

—তাহলে তুই যা, আমি বাড়ি যাই—

কিরণ চলে গেল। দীপঙ্কর সামনের দিকে একবার চেয়ে দেখলে। টিম্ টিম্ করে সামনের বাঁকের মুখে গ্যাসটা জ্বলছে। তারপর ওই গ্যাসটা পেরিয়েই তাদের বাড়ি। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। আবার নিজের মনেই তার মনে পড়তে লাগলো থিয়েটারের কথাগুলো। সে-ও যেন এ-সংসারে অপর্ণা হয়ে গেছে—সে বললে—

মা তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা,—তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার!

থিয়েটারের কথাগুলো পুরো মনে ছিল না। সত্যিই তো রাজারও তো রাজা আছে। জগতের রাজা। যে সব অপরাধের বিচার করে। সব অপরাধের শাস্তি দেয়, সব অপরাধ ক্ষমা করে! সেই জগতের রাজা যদি অন্যায় করে—কে তার বিচার করবে?

হঠাৎ মনে হল চন্ডীবাবুদের বাড়ির ঠিক পাশের বাগানেই যেন কী একটা নড়ে উঠলো।

—কী? ওটা কী?

জায়গাটা বেশ অন্ধকার। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এসেছে ঠিক বাগানটার কাছে! আর একটু এগোতে পারলেই এক দৌড়ে বাড়িতে যাওয়া যাবে। কিন্তু চলতে গিয়েও কেমন যেন চলতে পারলে না দীপঙ্কর! পা দুটো থেমে এল হঠাৎ। সমস্ত গা'টা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠলো। পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

—কী, ওটা কী ওখানে?

মনে হলো যেন একটা ভূত দাঁত বের করে তার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে হাসছে। সেই নিঃশব্দ হাসিটা যেন সমস্ত লেনটা

একেবারে মুখর করে তুললো। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের সমস্ত শরীর যেন বরফের মত হিম হয়ে গেল এক মুহূর্তে। দীপঙ্কর প্রাণপণে আর্তনাদ করতে চেষ্টা করলো সমস্ত শক্তি দিয়ে কিন্তু ছায়ামূর্তিটা সেই অন্ধকারের মধ্যেই আরো জোরে বিকট এক হাসি হেসে উঠলো। আর সেই নিঃশব্দ হাসির প্রতিধ্বনিতে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সমস্ত অন্ধকারের কালো পর্দাগুলো ছিঁড়ে একেবারে খান্ খান্ হয়ে গেল।

মা জেগেই ছিল। বাইরে শব্দ হতেই দরজাটা খুলে দিয়েছে।

—কে? খোকা এলি? এত রাত হলো যে?

কিন্তু দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে মা অবাক হয়ে গেছে। দীপঙ্করের মুখ যেন বোবা হয়ে গেছে। ঘাম ঝরছে সারা গায়ে। ঘরের ভেতরে ঢুকেই একেবারে মাকে জড়িয়ে ধরেছে দুহাতে।

—কী রে, কী হয়েছে রে তোর?

দীপঙ্কর বললে—মা, আমি ভূত দেখেছি—

ভূত!

মা যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। দীপঙ্করকে তক্তপোশের ওপর বসিয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগলো। থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল হঠাৎ এ কী হলো ছেলের!

জিজ্ঞেস করলে—থিয়েটার দেখেছিস?

দীপঙ্কর হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—থিয়েটার দেখে আসছি, হঠাৎ চণ্ডীবাবুদের বাড়ির কোণে দেখি একটা ভূত আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে মা—

মা হেসে উঠলো। বললে—দূর, কী দেখতে কী দেখেছিস—ভূত-টুত বাজে কথা—ভূত কোথায়? ভূত বলে কিছু নেই, এত বয়স হলো, এখনও তোমার ভূতের ভয়?

দীপঙ্কর বললে—না মা, আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—আমার দিকে চেয়ে ভূতটা হাসছিল যে—তুমি চলো তোমাকেও দেখিয়ে দিতে পারি—

—চল্ তাহলে—কোথায় তোর ভূত দেখি—

সেদিন সেই রাত্রেই মা দীপঙ্করকে নিয়ে বেরিয়েছিল। রাত তখন বারোটাও হতে পারে, একটাও হতে পারে। কালিঘাটের সব লোক তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর নিষুতি চারিদিকে। রাস্তায় জন-মানব নেই। চণ্ডীবাবুদের বাড়িটা তিরিশ নম্বর। তিরিশ্ নম্বর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। গলির মধ্যেই তিন-মহলা বাড়ি। চণ্ডীবাবুদের বাড়িতে জন্মাষ্টমীর মেলা দেখতে অনেকবার মার সঙ্গে গিয়েছে। বিরাট বাড়ি। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। রাসলীলা হয় ভেতরে পুজোর দালানের উঠোনে। লাল-নীল-সবুজ ডুম জ্বলে সখীদের হাতে। অষ্ট সখী, বিশাখা, রুক্মিণী কত রকম ঠাকুর। গলির মধ্যেই সেদিন তেলেভাজা পাঁপড় ভাজার দোকান বসে যায়। লোকে-লোকারণ্য হয়ে যায় উঠোনটা।

উঠোনের চারধারে কৃষ্ণলীলার সব পুতুল। কালীয়-দমন, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, কংসবধ, পুতনা-রাক্ষসী—কত রকমের পুতুল সব। সেই পুতুল দেখতে দেখতে দোলমঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াত। একটা ইলেকট্রিকের দোলনায় রাধা-কৃষ্ণ দুলছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটা করে বাতাসা-প্রসাদ দিত সেখানে।

পুজোর সময় বেশ ভিড় হতো চণ্ডীবাবুদের বাড়ি। কিন্তু অন্যসময়ে, রাস-বাড়িটা অন্ধকার থাকতো। লোকজন বেশি যেত না কেউ, ফাঁকা উঠোনটায় দু'চারজন বাড়ির ছেলে-মেয়ে বিকেল বেলা এক্কা দোক্কা খেলতো! একবার এই চণ্ডীবাবুই দীপঙ্করকে তাড়া করেছিলেন।

তখন আরো ছোট। ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলে পড়তো তখন। ভবানীপুরে তখন কোথায় একটা কী কাণ্ড হয়েছে। এই বিকেল ছ'টা নাগাদ। কিরণের সঙ্গে হরিশ পার্ক ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর গেছে। একেবারে পোড়াবাজারের কাছাকাছি। মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছিল। ফুটবল খেলা দেখে হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে ফিরছে। বিকেল তখন পাঁচটা কি ছ-টা। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো। যেন বোমা ফাটলো কোথাও।

একেবারে কানে তালা-ধরবার মত শব্দ হয়েছে। দীপঙ্করও চমকে উঠেছে। রাস্তার যে-যেখানে ছিল সবাই চমকে উঠেছে। সবাই দৌড়তে আরম্ভ করেছে এদিকে ওদিকে।

কিরণ বললে—পালিয়ে আয় দীপু—

বলেই দৌড়েছে কিরণ।

দীপঙ্করও পালিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় যে-যেখানে ছিল সব পালাতে শুরু করেছে। তারপর আর একটা বোমা ফাটলো। আর হঠাৎ দেখলে একটা লোক, একটা পুলিসের লোক সাইকেল চড়ে যাচ্ছিল, সে পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে। পেছনে আর একটা লোক যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে। তাকেও কে একটা গুলী মারলে, সে-ও পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে। আর ঠিক দীপঙ্করদের একেবারে সামনে। গল্ গল্ করে রক্ত পড়তে লাগলো তার গা থেকে! দেখে তখন জ্ঞান হারাবার অবস্থা দুজনেরই। দুজনেই তখন ছুটছে প্রাণপণে!

সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট থেকে দৌড়তে শুরু করেছিল দুজনে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল একেবারে হাজরা রোডের মোড়ের মাথায়। তখনও চীৎকার গণ্ডগোল চলছে—

কে একজন দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলে—বসন্ত চাটুজ্জেকে মেরে ফেলেছে—

—কে মেরেছে?

—স্বদেশীরা!

শুধু ওইটুকুই কানে গেছে তখন। কে বসন্ত চাটুজ্জে, কে মেরেছে তাকে, তাও শোনা হলো না। যে যেদিকে পারছে তখন ছুটছে। আর দাঁড়ানো হলো না সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে আবার দৌড়েছে। দৌড়তে দৌড়তে একেবারে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে এসে একটু সবে হাঁপ ছেড়েছে। হঠাৎ মনে হলো ওদিক থেকে একটা লোক যেন সাইকেল চড়ে আসছে। দেখেই কেমন আঁতকে উঠেছিল দুজনে। যদি তাদের ধরে ফেলে?

হঠাৎ কিরণ বললে—পালিয়ে আয় দীপু—

সামনেই এই চন্ডীবাবুদের রাস-বাড়ির লোহার গেটটা খোলা ছিল। কিরণ তার মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। দীপঙ্করও ঢুকেছে পেছন পেছন। ততক্ষণ সারা কলকাতায় খবরটা রটে গেছে, পুলিসের ডেপুটি-কমিশনার বসন্ত চাটুজ্জেকে স্বদেশীরা গুলী করে মেরেছে! চন্ডীবাবু বুড়োমানুষ। একটা চেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন উঠোনে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকলেন—রামধনি গেট্ বন্ কর্ দেও—

রামধনি কোথায় ছিল এতক্ষণ। সে দৌড়ে এসে গেট বন্ধ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দুজনে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

চন্ডীবাবু দেখতে পেয়েই উঠে এলেন।

বললেন—গেট্ আউট্, গেট আউট—গেট আউট—

মনে আছে সেই চন্ডীবাবুকে দেখে সেদিন কিরণ আর দীপঙ্কর সন্ধ্যের অন্ধকারে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে গলির বাইরে আবার বেরিয়ে এসেছিল। দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সেদিন আশ্রয় দেননি চন্ডীবাবু। ভাগ্যের হাতে তাদের ফেলে দিয়ে তিনি নিজে হয়ত নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য-বিধাতা তাঁকে শেষপর্যন্ত বাঁচতে দেন নি।

কিন্তু সে অনেক পরের ঘটনা।

আবার সেই চন্ডীবাবুর বাড়িতেই যেতে হবে। রাস্তার লোকজন বিরল হয়ে এসেছে। দীপঙ্করকে নিয়ে আবার তার মা সেই পথেই চললো। শেতলা-তলাটা পেরিয়ে একটা মোড় ঘুরেই চন্ডীবাবুর বাড়ি। বাড়িটার দক্ষিণে বাগান। চারদিক চেয়ে দীপঙ্করের তখনও ভয়-ভয় করছিল।

মা বললে—কিছু ভয় নেই, আমি তো রয়েছি—এসো—কই, কোথায় ভূত?

দীপঙ্কর যেন সামনে চোখ মেলে চাইতে পারলো। সেই অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যে যেন তখনও ভূতটা সেইরকম হাসছে। ঠিক সেই দাঁত বার করা হাসি হাসছে তেমনি আগেকার মতন।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ—ওই তো—

মাও দেখলে খানিকক্ষণ সেইদিকে চেয়ে। এপাশ ওপাশ থেকে ভালো করে নজর করে দেখতে লাগলো মা।

দীপঙ্কর বললে—দেখলে তো, আমি বলেছিলুম—

মা বললে—আচ্ছা, এদিকে এসো তো—

বলে চন্ডীবাবুর গেটের কাছে গেল। গেটের পাশেই দারোয়ানের ঘর। তারা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু গেটের ওপর গ্যাসবাতিটা জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। ঘরটার দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমে অসাড়। রাত্তিরে কে আর জেগে থাকবে তখন।

মা ডাকলে—রামধনি, ও রামধনি—

মা বললে—রামধনি একবার বাইরে শুনবে বাবা—

রামধনি বাইরে এল। বাইরে এসে বললে—কৌন্?

মা বললে—আমি দীপুর মা বাবা—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালবে বাবা? ওই বাতিটা একবার জ্বালতে পারো?

রামধনি পুরোন লোক। মা-ও পুরোন লোক। রামধনি সেই অন্ধকারেই চিনতে পারলে মাকে।

বললে—কে? দীপুর মা? কী চাই গো দীপুর মা?

মা বললে—তোমাদের বাগানের দিকের আলোটা একবার জ্বালো তো রামধনি, একটিবার জ্বাললেই হবেখন—

রামধনি আলোর সুইচটা টিপতেই বাগানের দিকটা আলো হয়ে গেল। মা দেখলে, দীপঙ্করও দেখলে। বাগানের লাউমাচার ওপর একটা বাঁশের লাঠির ওপর একটা সোলার টুপি বসানো। মুখে একটা মাটির কালো হাঁড়ি। আর গায়ে একটা ছেঁড়া শার্ট। হনুমান তাড়াবার জন্যে একটা মানুষের মূর্তি করা হয়েছে। হাওয়ায় টুপিটা দুলছে অল্প অল্প। জামাটার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ। আশ্চর্য, অদ্ভুত! দিনের বেলা কতবার ওখান দিয়ে গিয়েছে দীপঙ্কর। কখনও নজরে পড়েনি তো!

মা রামধনিকে বললে—এবার তোমার আলো নিভিয়ে দাও রামধনি—

তারপর দীপঙ্করকে বললে—দেখলে তো, ভূত কেমন আছে দেখলে তো তুমি?

সেদিন মা-ই সেই অত রাত্রে চাক্ষুষ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, ভূত বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে। ভূত বলতে লোকে যা বোঝে তা মানুষের অলীক কল্পনা শুধু। কিন্তু যত বড় হয়েছে দীপঙ্কর ততই বুঝেছে মা ঠিক জানতো না। এককালে হয়ত ভূত বলতে কিছু ছিল না সত্যি। কিন্তু আবার ভূত হয়েছে। আবার ভূত জন্মেছে পৃথিবীতে। আবার মানুষের সংসারে অসংখ্য ভূতের আমদানি হয়েছে। তাদের চেহারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সবই ঠিক মানুষের মত কিন্তু আসলে তারা মানুষই নয়। তারাই ভূত। মানুষ নাম নিয়ে তারাই মানুষের সমাজে ঘুরে বেড়ায়। আর দরকার হলে ভয়ও দেখায়। আবার দরকার হলে চোখের আড়ালে কখনও অদৃশ্যও হয়ে যায়। সে এক আশ্চর্য

অভিজ্ঞতা দীপঙ্করের।

সেদিন হাজি কাশিমের বাগান থেকে তাড়াতাড়ি ফুলটা তুলে নিয়েই দৌড়েছিল মন্দিরের দিকে। প্রথমে মায়ের মন্দির। মায়ের মন্দিরে কয়েকটা জবা ফুল দিতে হয়। তারপর সত্যনারায়ণ, তারপর গণেশ, তারপর জগন্নাথ, তারপর ষষ্ঠীতলা আর ভুবনেশ্বরী।

দীপঙ্কর বললে—একটু তাড়াতাড়ি নিন পণ্ডিতমশাই, খুব বিষ্টি আসছে—

সত্যিই আকাশ ছেয়ে মেঘ করেছিল। নাটমন্দিরের ছাদের মাথায় মেঘটা কালো করে এসেছে একেবারে। তারপর সেই চাতালের ওপর মাথাটা ঠেকিয়েই মন্দিরটা ঘুরে গলি দিয়ে কুণ্ডুপুকুরের দরজার দিকে যাবার রাস্তা। ওপাশে জুতো রাখবার জায়গা। পেঁড়ার দোকান। পেঁড়া তৈরি হয় ভেতরে। তারপরে পুবমুখো দরজাটা।

ততক্ষণে মন্দিরে বেশ ভিড় হতে শুরু করেছে। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। গাড়ি থেকে ফরসা ফরসা মাড়োয়ারী মেয়ে-পুরুষ খালি পায়ে নামছে। সঙ্গে পেছনে পেছনে ভিখিরিদের দল পেছু নিয়েছে। ফরসা পাতলা কাপড়, ফরসা টক্ টক্ করছে গায়ের রং। ওদের ভক্তি খুব। ওরা পাণ্ডাদের ভালো দক্ষিণে দেয়। ওদের দেখলে পাণ্ডারা বেশি খাতির করে। দীপঙ্করকে খাতিরই করে না মোটে। একটা পয়সাও প্রণামী দেয় না দীপঙ্কর। শুধু ফুল খেয়ে কি পেট ভরবে মা-কালীর?

হঠাৎ দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা টপ্ টপ্ করে পড়লো গায়ের ওপর।

দীপঙ্কর খিলেনটার নিচে এসে দাঁড়াল। মাথাটা ভিজবে না এখানে দাঁড়ালে। চিঠিটাও ভিজবে না। লক্ষ্মীদির চিঠিটাও পকেটে রয়েছে। ওখান থেকে যতদূর চোখ যায় ততদূর চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। বৃষ্টিটা পড়েই চলেছে। হয়ত ভদ্রলোক বৃষ্টির জন্যে আসতে পারছে না। কিংবা হয়ত মেঘলা দিনে ঠিক সময়টা আন্দাজ করা যাচ্ছে না! আজ কি একটু আগে এসে পড়েছে দীপঙ্কর? সাতটা কি বেজেছে? ও পাশের পেঁড়ার দোকানে একটা দেয়াল-ঘড়ি আছে। ঘড়িটা দেখলে হতো!

এপাশে মাথাটা বাঁচিয়ে দোকানের সামনে এসে ঘড়িটা দেখলে দীপঙ্কর। সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। আজ তো অন্যদিনের চেয়ে লেট হয়ে গেছে। এতক্ষণে তো এসে যাবার কথা! এমন সময়েই তো আসে সেই ভদ্রলোক। চমৎকার চেহারা কিন্তু লোকটার।

এক-একদিন সেই ভদ্রলোকই আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

দীপঙ্কর কাছে যেতেই ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

বলে—এসে গেছ খোকা?

দীপঙ্কর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিয়ে বলে—এই নিন—

তারপর দীপঙ্করের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে খামটা ছিঁড়ে পড়তে থাকে। দীপঙ্কর ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে দেখে সে-মুখটা যেন চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ কেমন লাল হয়ে ওঠে। মুখটা খুব ফরসা। সিল্কের দামী কোট-প্যাণ্ট পরা। সকালবেলাই ফিট্‌ফাট সাজগোজ করে আসে। চিঠি পড়তে পড়তে পকেট থেকে একটা সিগারেটের কৌটো বার করে—তারপর দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরায়। তারপর একটা লম্বা ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। একবার পড়া শেষ করে আবার পড়ে। আবার পড়ে। এত কী কথা লেখা থাকে লক্ষ্মীদির চিঠিতে কে জানে! দেরি হলে ভদ্রলোক আবার এক-একদিন ট্যাক্সি করে এসে নামে। নেমেই দীপঙ্করের দিকে দৌড়ে আসে। অনেক সময় চিঠিটা বার বার পড়ে পকেটে রাখে, তারপর আবার বার করে পড়ে। কতবার যে পড়ে চিঠিটা তার ঠিক নেই।

আর দীপঙ্কর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ফুলের সাজিটা হাতে নিয়ে।

শেষবারের মত সিগারেটটায় টান দিয়ে ভদ্রলোক বলে—গুড্ বয়—

বলে সোজা পুব দিকে হন্ হন্ করে হাঁটতে আরম্ভ করে।

তারপর দীপঙ্কর আস্তে আস্তে কুণ্ডুপুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে আবার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দিকে ফেরে। যতক্ষণ চিঠিটা দেয়, ততক্ষণ বেশ লাগে দীপঙ্করের। ভালো বাঙলা বলতে পারে না। কী জাত কে জানে! কিন্তু যেন অন্যরকম। যেন কারোর সঙ্গে মেলে না তার। কালিঘাটের কারোর সঙ্গেই মেলে না। মধুসূদনের রোয়াকে বসে যারা আড্ডা দেয়, ওই মধুসূদনের বড়দা, দুনিকাকা তাদের মতন নয়। ধর্মদাস ট্রাস্ট ইস্কুলের প্রাণমথবাবু রোহিণী-বাবু ওঁদের মতনও নয়। কিংবা হরিশ পার্কে মিটিং শুনতে গিয়ে যাদের দেখেছে তাদের মতও নয় লোকটা। লোকটা অনেকটা সায়েব-ঘেঁষা। আলিপুরের ওদিকে চিড়িয়াখানার দিকে যে-সব বড় বড় সাহেবদের বাড়ি আছে, ওদিককার লোকদের মত। চণ্ডীবাবুরাও বড়লোক, চণ্ডীবাবুদেরও দারোয়ান আছে, সরকার মুহুরি গোমস্তা আছে, কিন্তু তাদের বাড়ির ছেলেদের চেহারা এমন নয়। ভবানীপুরে কিছু কিছু লোকের ওই রকম চেহারা। পোড়াবাজারে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে ও-রকম লোকদের দেখেছে দীপঙ্কর। যেদিন সেই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার বসন্ত চাটুজ্জেকে খুন করে ফেলেছিল সেদিন দীপঙ্কর দেখেছিল ওইরকম চেহারার দুজন লোককে। কোট-প্যাণ্ট পরা নয়, আন্দির পাঞ্জাবী গায়ে। বেশ ফরসা টক্ টক্ করছে গায়ের রং। কোঁচানো ধুতি, হাতের আঙুলে সিগারেট। দুম্ দুম্ দুটো শব্দ হবার পরই লোক দুটো তাদের পাশ দিয়ে উড়ে-পাড়ার বস্তির দিকে চলে গিয়েছিল।

মনে আছে দীপঙ্কর সেদিন লক্ষ্মীদির চিঠিটা দিয়ে বাড়ি আসছিল, হঠাৎ দেখলে কিরণ দৌড়ে আসছে—

সামনে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—সর্বনাশ হয়েছে রে দীপু—

নিশ্চয় কিরণের বাবা মারা গেছে। দীপঙ্কর হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে।

—কেন? কী হলো?

কিরণের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তোর বাবা মারা গেছে নাকি? কখন?

কিরণ বললে—না, খবরের কাগজে বেরিয়েছে ভাই—সি আর দাশ মারা গেছে—কী হবে?

সি আর দাশ মারা গেছে? কী হবে? কিরণ যে বড় আশা করেছিল। আশা করেছিল সি আর দাশ রাজা হবে! কী হবে তাহলে। কিরণের মুখ যেন শুকিয়ে গেছে। কিরণ বোবার মত দীপঙ্করের দিকে চেয়ে রইল।

কিরণ বললে—সাধুটা যে বলেছিল সি আর দাশ রাজা হবে দেশের—

দীপঙ্কর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সেও হাঁ করে চেয়ে রইল কিরণের মুখের দিকে। সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে কিরণের চোখে। রাজাই যদি মরে যায়, তাহলে কী করে সকলের অবস্থা ভাল হবে। কী করে কিরণের বাবার অবস্থা ভাল হবে। তবে কি তাকে সারাজীবন পৈতে বিক্রী করতে হবে? সারা জীবন ভিক্ষে করতে হবে? তাহলে তাদের বাড়ি হবে কী করে? তাহলে স্বরাজ হবে কী করে? সেদিন কিরণ যেন তার সমস্ত সমস্যার কোনও সমাধান না খুঁজে পেয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করেছিল—ইস্কুলে যাবি না?

কিরণ বলেছিল—ইস্কুল আজকে ছুটি—কালকেও ছুটি—

তারপর একটু থেমে বললে—ক্যাওড়াতলায় কাল আনবে সি আর দাশকে দেখতে যাবি ভাই?

দীপঙ্কর বললে—যাবো, একসঙ্গে দুজনে যাবো—

কিরণ বললে—একটু সকাল সকাল যাবো বুঝলি—নইলে খুব ভিড় হবে ক্যাওড়াতলায়—

সেদিন বাড়ি এসেই প্রথমে গিয়েছিল লক্ষ্মীদির কাছে। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের মোড়ে মধুসূদনের রোয়াকের ওপর তখন তুমুল জটলা চলেছে। খবরের কাগজখানা তখন মাটিতে লুটোচ্ছে। পড়া হয়ে গেছে সব। সবাই হাত-পা নেড়ে তর্ক বাধিয়েছে।

দীপঙ্কর এক মিনিট দাঁড়াল সেখানে। নানা বয়সের লোক। দুনিকাকাই সকলের সেরা।

দুনিকাকা বলছে—মরে গেছে বেশ হয়েছে, ও-সব চরকা-ফরকা কেটে কী লাভ হতো ভাই, চরকা কেটে আয়ার্ল্যান্ড স্বাধীন হয়েছে? না চরকা কেটে

আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে? বল্, বুঝিয়ে দে আমাকে?

মধুসূদনের বড়দা বললে—গান্ধীরই সুবিধে হলো জানলেন দুনিকাকা, গান্ধীর কথায় প্রোটেস্ট করবার মত আর লোক রইল না কেউ—

পণ্টুদা দাঁড়িয়েছিল। বললে—ও গান্ধী-ফান্ধীর কম্ম নয় বুঝলে হে, ছিল একটা বাঙালী সে-ও চলে গেল। এখন বুঝতে পারছেন না আপনারা, পরে বুঝবেন—দাঁত থাকতে তো দাঁতের মর্যাদা বোঝে না লোকে—

ছোনেদাও দাঁড়িয়েছিল একপাশে। বললে—এখন ওই জে এম সেনগুপ্তই ভরসা। আমাদের সবে ধন নীলমণি—

পণ্টুদা কথাটা লুফে নিলে। বললে—আরে রাখ্ রাখ্, কার সঙ্গে কার তুলনা! সেই কথায় বলে না হাতী ঘোড়া গেল তল্......

মধুসূদনের বড়দা এক ফাঁকে বললে—দেখা যাক আমাদের সুভাষ বোসটা কী করে—

দুনিকাকা সবজান্তা মানুষ। তার এক-একটা কথার ফুৎকারে তা-বড় তা-বড় লোক নস্যাৎ হয়ে যায়। দুনিকাকা গোটা পৃথিবীটাকেই তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে ওস্তাদ, এক বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া। সেই দুনিকাকা বললে—ওরে যার নাম আরশোলা তারই নাম ছারপোকা, ও তোদের সুভাষ বোসই বল্ আর জে এম সেনগুপ্তই বল্, এক-একটা টিপুনিতেই সব কুপোকাৎ—

কিছুই বুঝছিল না দীপঙ্কর এ-সব কথার! এ-রকম আলোচনা তো বরাবরই হয়, বরাবরই হয়েছে। কিন্তু সি আর দাশ মারা গেছেন, কই, কেউ তো কাঁদছে না? কেউ তো কিরণের মত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েনি! কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর সেদিন!

চলেই আসছিল দীপঙ্কর সেখান থেকে। হঠাৎ ছোনেদা ডাকলে—এই দীপু শোন্ তো, শোন্ ইদিকে—

দীপঙ্কর কাছে যেতেই ছোনেদা বললে—এই, তোদের বাড়িতে কারা ভাড়াটে এসেছে রে?

দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদিরা—

—লক্ষ্মীদি! ও, যে মেয়েটা গাড়ি করে ইস্কুলে যায়, ইউনাইটেড মিশনারিতে পড়ে। দেখেছি বাসটা আসে বটে! তা ওর বাবা কী করে, শচীশবাবু কী করে?

দীপঙ্কর বললে—শচীশবাবু তো লক্ষ্মীদির বাবা নয়, ওর কাকা, ওর বাবা বর্মায় কাঠের কারবার করে, ওরা খুব বড়লোক।

—তা ওর কাকা কী করে জানিস তুই?

দীপঙ্কর বললে—আপিসে চাকরি করে।

আবার ছোনেদা জিজ্ঞেস করলে—কিসের আপিস?

দীপঙ্কর বললে—তা জানি না—

দুনিকাকা ছোনেদাকে জিজ্ঞেস করলে—তুই ঠিক জানিস?

ছোনেদ। বললে—আমি দেখেছি যে—আমি নিজের চোখে দেখেছি দুনিকাকা—

তারপর সবাই মিলে কী সব গুজ্‌ গুজ্‌ করতে লাগলো কাকাবাবুর কথা নিয়ে। দীপংকর বুঝতে পারলে না। তার কেবল মনে হলো, কই, কেউ তো সি আর দাশের মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সবাই তো ঠিক সেইরকম আগেকার মতই আড্ডা দিচ্ছে। কোথাও কিছু বদলায় নি তো!

দীপংকর এসেই লক্ষ্মীদির বাড়িতে ঢুকলো। নিচেয় বারান্দায় বসে কাকীমা কুটনো কুটতে বসেছেন। স্নান করা হয়ে গেছে। ভিজে চুল এলো করে পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছেন। দীপঙ্কর সামনে গিয়ে বললে—কাকীমা, লক্ষ্মীদি কোথায়?

কাকীমা বললেন—ওপরে পড়ছে, দেখগে যাও—

—শুনেছেন কাকীমা, সি আর দাশ মারা গেছেন?

—কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন কাকীমা অন্যমনস্ক হয়ে।

দীপংকর বললে—দার্জিলিঙে—ওঃ, কালকে যা ভিড় হবে না ক্যাওড়াতলায়—

কাকীমা যেমন তরকারি কুটছিলেন, তেমনিই কুটতে লাগলেন। দীপঙ্কর কত কথা বলে গেল, কোনও কথাই যেন কানে গেল না কাকীমার! কাকীমা ঠাকুরকে কালিয়ায় ক'টা আলু লাগবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। আশ্চর্য! এরা কি কেউ একবার ভাবছে না কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল বাঙালীদের! আশ্চর্য! আশ্চর্যই বটে! দীপংকর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরে কোণের সেই ঘরটায় কাকাবাবু তখন একমনে খবরের কাগজ পড়ছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। দীপঙ্করের পায়ের শব্দও পেলেন না। দীপংকর একেবারে সামনে গিয়ে ডাকলে—কাকাবাবু—

কাকাবাবু এতক্ষণে মুখ তুললেন। বললেন—ও, দীপুবাবু—

বলেই আবার খবরের কাগজে মন দিলেন।

দীপঙ্কর বললে—সি আর দাশ মারা গেলেন, কী হবে কাকাবাবু?

কাকাবাবু কাগজ পড়তে পড়তেই বললেন—কী বলছো?

দীপঙ্কর বললে—সি আর দাশ যে মারা গেলেন—কী হবে তাহলে কাকাবাবু?

কাকাবাবু সেইরকমভাবে কাগজের দিকেই চোখ রেখে বললেন—কী আর হবে, কিছুই হবে না—

—কিছুই হবে না?

কাকাবাবু সে-কথার আর কোনও উত্তর দিলেন না। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। দেখলে বড় বড় অক্ষরে কাগজের ওপর লেখা রয়েছে—

DESHBANDHU PASSES AWAY

A Bolt From The Blue

আর চারদিকে একটা মোটা কালো লাইন টানা রয়েছে। মধ্যখানে একটা ছবি দেশবন্ধুর। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে দেখলে ছবিখানার দিকে। চাদর গায়ে। খদ্দরের চাদর। মাথার ওপর একটা তালগাছের পাতায় খানিকটা দেখা যাচ্ছে। কী আশ্চর্য! কেউ কিছু বলছে না! এরা সবাই কিছু বলছে না কেন? সি আর দাশ মারা গেলে কিছুই আসবে যাবে না? কারও ক্ষতি হবে না কিছু? তাহলে প্রাণমথবাবু কেন বার বার সি আর দাশের কথা বলতেন! কেন কিরণ অমন করে কেঁদে ফেললে! তাহলে লক্ষ্মীদি অন্তত নিশ্চয়ই কাঁদছে এতক্ষণ!

লক্ষ্মীদির ঘরটায় উঁকি মেরে দেখলে দীপঙ্কর। নিজের পড়ার টেবিলে বসে একটা ছবি দেখছে। দীপঙ্করের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির ঘরে ঢুকলো। আস্তে আস্তে কাছে গেল। ছবিটার দিকে চেয়ে দেখলে! আশ্চর্য সেই লোকটার ছবি। যে-লোকটাকে রোজ চিঠি দিয়ে আসে দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের পায়ের আওয়াজ পেতেই লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। তাড়াতাড়ি হাতের ছবিটা শাড়ির তলায় লুকিয়ে নিলে।

বললে—কে রে? দীপু? চিঠিটা দিয়েছিস?

দীপঙ্কর কী বলবে ভেবে পেলে না। একটু থেমে বললে—লক্ষ্মীদি, সি আর দাশ মারা গেছেন শুনেছ?

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে চাইল দীপঙ্করের মুখের দিকে। তারপর বললে—শুনেছি, কিন্তু চিঠিটা দিয়েছিলি তো ঠিক!

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ দিয়েছি—

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, এই যে সি আর দাশ মারা গেলেন, এতে কিছু হবে না?

—কী হবে?

দীপঙ্কর বললে—এত বড় লোক মারা গেলেন, আর কিছুই হবে না?

লক্ষ্মীদি অন্যমনস্কের মত বললে—কী আবার হবে? সবাই-ই তো একদিন মারা যাবে।

কথাটা দীপঙ্করের ভাল লাগল না। সবাই-এর সঙ্গে কি সি আর দাশের তুলনা? সি আর দাশ কি আর সকলের সঙ্গে সমান? কেমন ভালো লাগলো না লক্ষ্মীদির কথাটা। কেউ বুঝছে না কী সর্বনাশটা হলো! পঞ্চাদা ঠিক বলেছে—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না লোক।

চলেই আসছিল দীপঙ্কর ঘর থেকে। হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা। বললে—তোমার একটা চিঠি আছে লক্ষ্মীদি—

চিঠি! লক্ষ্মীদি তড়াক করে একেবারে বাঘের মত লাফিয়ে উঠেছে যেন। বললে—চিঠি আছে তো বলিসনি কেন?—দে—

দীপঙ্কর পকেট থেকে চিঠিটা বার করে দিয়ে বললে—ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে—

চিঠিটা হাতে নিয়ে মাথাটা ছিঁড়ে একনিঃশ্বাসে পড়তে লাগলো লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিকে যে কী চমৎকার দেখাচ্ছে। হঠাৎ বড় সুন্দর মনে হলো লক্ষ্মীদিকে। সকালবেলা চান সেরে নিয়ে পড়তে বসেছে। একটা লাল রং-এর শাড়ি পরেছে। গলায় চিক্ চিক্ করছে সোনার হারটা। গলার অনেকখানি খোলা। ফরসা গলাটা নিটোল নিভাঁজ। বিন্তিদির গলা এমন খোলা নয়। ঢাকা থাকে শেমিজ দিয়ে। কিন্তু লক্ষ্মীদির জামাটা অনেকখানি খোলা। লক্ষ্মীদি অনেকক্ষণ মন দিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। এত কী কথা লেখা থাকে চিঠিতে। লক্ষ্মীদিই বা এত কী লেখে চিঠিতে রোজ রোজ! সেই লোকটাই বা সব কাজ ফেলে চিঠির জন্যে কেন রোজ দৌড়ে আসে কুণ্ডুপুকুরের ধারে। চিঠি পড়বার সময় তার মুখটাই বা অমন জ্বলজ্বল করে ওঠে কেন? কেন লাল হয়ে ওঠে কান দুটো। কেন ঘন ঘন সিগারেট খায়। সিগারেট খায় আর কেন বার বার পড়ে চিঠিগুলো।

লক্ষ্মীদি চিঠিটার দিকে চোখ রেখে নিজের মনেই যেন বললে—কাল তো যেতে পারবো না—

দীপঙ্কর বললে—কোথায় যেতে পারবে না লক্ষ্মীদি?

—না, তোকে বলছি না—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—দেখ্ দিকিনি কী মুশকিল, কাল তো যেতে পারবো না আমি—

দীপঙ্কর বললে—তোমায় কোথাও যেতে লিখেছে বুঝি লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—সে তুই বুঝবি না, সে একটা জায়গা আছে, কিন্তু কাল যে সতী আসছে—

—সতী! সতী আসছে?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, কাল যে সতীকে আনতে যেতে হবে, সতী আসছে কিনা কাল, বাবা চিঠি লিখেছেন—কাল বিকেল পাঁচটার সময় সতীর জাহাজ এসে পৌঁছবে যে—

সতী! সতীর কথা এত শুনেছে দীপঙ্কর যে সতীকে যেন তার দেখা হয়ে গিয়েছে। সতীকে দেখতে যেন আর তার বাকি নেই। অনেকদিন সতীর চেহারাটাও যেন সে চোখের সামনে দেখেছে। এত গল্প শুনেছে কাকাবাবুর কাছে, কাকীমার কাছে, লক্ষ্মীদির কাছে যে, সতী আর তার অচেনা নয়। সতী যেন লক্ষ্মীদির মতই একেবারে আপনার জন হয়ে গেছে দীপঙ্করের।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতী আসবে কাল আমাকে তো বলোনি তুমি আগে—

লক্ষ্মীদি বললে—আজই তো বাবার টেলিগ্রাম এল—

—কিন্তু কার সঙ্গে আসবে? সতী একলা আসতে পারবে?

লক্ষ্মীদি বললে—বর্মা থেকে আর একজনরা আসছে কলকাতায়, তাদের সঙ্গেই বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেখানে লেখা-পড়া ভালো হচ্ছে না, তাই—ওই দেখ্ছিস না, ওই বিছানা করা হয়েছে সতীর জন্যে, সতী শোবে ওইখানে—

এতক্ষণে নজর পড়লো দীপঙ্করের। ঘরের এক পাশে লক্ষ্মীদির শোবার খাট ছিল। ওপাশে আর একটা খাট রাখা হয়েছে।

সেদিন বাড়ি ফিরেও যেন অনেকক্ষণ ধরে সতীর কথাই মনে পড়ছিল দীপঙ্করের। তখনও দেখেনি দীপঙ্কর সতীকে, কিন্তু মনে হয়েছিল অন্তত বাড়ির মধ্যে একটা খেলার সঙ্গী পাবে সে। লক্ষ্মীদি বড়, বিন্তিদি বড়, ছিটে-ফোঁটা সবাই ওর চেয়ে বড়। কারো সঙ্গে খেলা যায় না। খেলতে গেলে সেই কিরণদের বাড়ি যেতে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার সতী আসবে, সতী তো তারই মতন ছোট! সতী তো তার চেয়েও ছোট—

মনে আছে সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমও হয়নি দীপঙ্করের। মনে আছে, সমস্ত রাতই যেন উস্খুস্ করেছিল বিছানায় শুয়ে।

আস্তে আস্তে মাকে ডেকেছিল—মা—

—কীরে, ঘুমোসনি এখনো?

দীপঙ্কর বললে—যদি সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয় আমাকে ডেকে দিও তো মা—

অথচ কেন যে সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে তার তা-ও জানা ছিল না। তবু মনে হয়েছিল যেন দেরি হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

ভোর হতে না হতেই উঠে পড়েছে দীপঙ্কর। হঠাৎ যেন তার মনে হলো—কই, ভোরবেলাটা ঠিক অন্যদিনকার মতই তো। কোনও তফাত নেই। অন্যদিন যেমনভাবে সূর্যটা ওঠে পূর্বদিকে, আর আমড়া গাছটার ডালে এসে রোদ লাগে, সেদিনটাও তো তেমনি। চন্নুনী ঠিক অন্যদিনকার মতই উঠোন ঝাঁট দিতে শুরু করেছে। আর কাকে লক্ষ্য করে যেন গালাগালি দিচ্ছে—শতেকখোয়ারীরা, তোরা মর্, তোরা রক্তবমি করে মর্, তোদের খাটে করে চিতেয় তুলে দিয়ে আসি ক্যাওড়াতলায়, যত ড্যাকরারা জুটেছে বাড়িতে, তোদের ছাদ্দে আমি পিণ্ডি চট্কাই, ওলো হাড়হাবাতে মাগী, তোর মুখে আমি......

আস্তে আস্তে উঠোনের কোণে গিয়ে মুখ ধুয়ে দীপঙ্কর ভাবলে, চন্নুনী হয়ত জানে না যে, সি আর দাশ মারা গেছেন।

দীপঙ্কর বললে—চন্নুনী শুনেছ?

—কী শুনবো বাছা, শোনবার কি আমার পিণ্ডি রেখেছে—শতেকখোয়ারীরা

আমার হাড়মাস ভাজা ভাজা করে ছেড়েছে, হতচ্ছাড়ীদের জ্বালায় কি আমার শোনবার সময় আছে বাছা, আবাগীদের মুখে আমি......

কোথা দিয়ে যে সকালটা কেটেছিল সেদিন। ভাত খেয়ে নিয়ে রাস্তায় যেতেই দেখলে দলে দলে লোক চলেছে ক্যাওড়াতলার দিকে। কিরণের বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে ডাকলে—কিরণ, কিরণ—

ভেতরে যাবার উপায় নেই। মা বারণ করে দিয়েছে। ততক্ষণে পার্কটা ভর্তি হয়ে গিয়েছে লোকে-লোকে। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে পার্কটায় ঢোকবার পথে অনেক ভিড়। রেলিংটা ভরে গেছে মানুষের মাথায়। সকাল সাড়ে ছ'টায় ট্রেনটা শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছবার কথা। তারপর সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে হাজরা রোড ধরে কালিঘাট রোড দিয়ে টালিগঞ্জ রোডে এসে পড়বে। ততক্ষণ গাছের ওপর সব লোক উঠে বসেছে। ছোট-বড় সব গাছেই মানুষ। দুপুর বারোটা বাজলো, একটা বাজলো—তবু দেখা নেই।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দেখলে—কিরণ!

—এই কিরণ! তুই এখানে! তোদের বাড়িতে গিয়ে কত ডাকলুম—

কিরণ বললে—তোর জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে চলে এলুম আমি—আর এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়ালে ভালো দেখা যাবে—

শেষে আড়াইটের সময় হঠাৎ মনে হলো যেন মানুষের একটা বিরাট ঢেউ সামনের দিকে এগিয়ে এল। আর সেই ঢেউ-এর আঘাতে সকলের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা এক মুহূর্তে যেন উদ্বেল হয়ে উঠলো। যেন বিরাট এক জন-সমুদ্রের তরঙ্গ সমস্ত মানুষের বেদনা-কাতর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে এক নিমেষে মুখর হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সব প্রতীক্ষার সমাধি হলো আর্ত চীৎকারে। যেন কেউ কোথাও নেই। কোনও সাড়া শব্দ নেই কারো। বড় নির্জন নিরিবিলি হয়ে গেল কলকাতা শহর। দীপঙ্করের মনে হলো সেই নিস্তব্ধতার প্রাচীর ভেঙে যেন একটা ফুলের পাহাড় এগিয়ে আসছে তার দিকে। শুধু ফুল আর ফুল। এত ফুলও ছিল পৃথিবীতে। দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করতে চাইলে। প্রাণভরে যেন চীৎকার করতে পারলেই খানিকটা তৃপ্তি পাওয়া যেত, যেন আর্তনাদ করতে পারলেই খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত।

ফুলের পাহাড়টা সামনে দিয়ে চলে গেল। তখনও দীপঙ্করের জ্ঞান নেই।

হঠাৎ কিরণের গলার শব্দে দীপঙ্করের যেন জ্ঞান ফিরে এল।

কিরণ বললে—ওই দেখ প্রাণমথবাবু—

সেই উস্কোখুস্কো চুল, এলোমেলো খদ্দরের জামা, সেই গোড়ালি দোমড়ানো জুতো! সেই পান চিবোচ্ছেন।

কিরণ বললে—ওই দেখ মহাত্মা গান্ধী রে—

একে একে অনেককে চিনিয়ে দিলে কিরণ। কিরণ সকলকে চেনে। সকলকে দেখেছে মীটিং-এ।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ অঘোরদাদু—

অঘোরদাদু যে অঘোরদাদু সে-ও এসে ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি নেই, তবু কী দেখতে এসেছে কে জানে। দেখা গেল ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত। তাদের ইস্কুল থেকে সাউথ সাবার্বানে চলে গেছে। সে-ও এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কমলালেবু খাচ্ছে, সঙ্গে আছে তাদের দারোয়ান। দেখা গেল ফটিককে। দেখা গেল লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার। সে-ও এসেছে কিনা এখানে! বাড়িতে গিয়ে শুনেছিল মা-ও এসেছিল নাকি বিন্তিদিকে নিয়ে। দুনিকাকাও ফতুয়া গায়ে দিয়ে এসেছে। ছোনেদা, মধুসূদনের বড়দা, পণ্টাদা সবাই দল বেঁধে এসেছে।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ, ছিটে এসেছে—

অঘোরদাদুর বড় নাতি ছিটে এসেছে। সিগারেট টানছে মুখে। কাপড়টা পরেছে লুঙ্গি করে। অনেক ভিড়। কেউ আর আসতে বাকি রাখেনি। কেবল কাকাবাবু, কাকীমা আর লক্ষ্মীদিই এল না। ওরা যেন অন্যদলের, ওরা যেন সকলের চেয়ে আলাদা—

হঠাৎ টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো একটু—

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট শিরীষ গাছের ডাল মড় মড় করে ভেঙে পড়লো মাটিতে। আর একপাল লোক সঙ্গে সঙ্গে হুড় মুড় করে পড়লো নিচেয়। আর সঙ্গে হৈ হৈ হল্লা উঠলো চারিদিক থেকে। বল হরি হরি বোল্......

সকাল থেকে সমস্ত দিনটা কেমন শোকাচ্ছন্ন হয়ে কাটলো যেন। যেন সমস্ত কলকাতার সমস্ত লোকের আত্মীয়-বিয়োগ হয়েছে। এখন আর সেদিনটার কথা কারো মনে নেই। সবাই ভুলে গেছে। সব কথা কি মানুষ মনে রাখতে পারে! সমস্ত রাতই ঘুম হয়নি দীপঙ্করের। সেদিন মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে ছিল। বাড়ি ফিরে গিয়েও যেন ভালো লাগেনি।

কিরণ রাস্তায় ফেরবার সময় বলেছিল—চল্ দীপু, সেই সাধুটার কাছে যাই, জিজ্ঞেস করে আসি বেটাকে

শ্মশান থেকে ফিরে কিরণের সঙ্গে দীপঙ্কর সেদিন সোজা গিয়েছিল সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধুর কাছে। কেন এমন হলো! সি আর দাশ যদি মারা গেল তো কী হবে তাহলে? এর উত্তর কেউ-ই দিতে পারেনি দীপঙ্করকে। দুনিকাকা, ছোনেদা, পণ্টাদা, কাকাবাবু, কাকীমা, লক্ষ্মীদি কেউই দিতে পারেনি। কারোর মনেই যেন লাগেনি শোকটা। অথচ এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের সামনে! সব শেষ হয়ে গেল ছাই হয়ে! চিতার ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে উঠলো। এত লোক, এত লোকের শোক কি তবে অর্থহীন?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সুভাষ বোস এল না কেন রে কিরণ!

কিরণ বললে—সদ্ভাব ঘোস যে জেলে, তুই জানিস না?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা হলে কী হবে ভাই?

কিরণ বললে—চল্ না সাধুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি সেইটে—

পাথরপটি পেরিয়ে মন্দিরের মুখোমুখি সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবার রাস্তা। দু'পাশে ডালার দোকান। পান্ডাদের যাত্রীনিবাস। পাথরে বাঁধানো রাস্তাটা। একটু আগে অল্প অল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিরণ সোজা টেনে নিয়ে চললো পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকেই গঙ্গা। গঙ্গার ওপরেই সোনার কার্তিকের ঘাট। কিরণ একটা গলি দিয়ে বাঁ দিকে ঢুকলো।

কিরণ বললে—সাধুর কাছে গিয়ে সাধুর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবি, জানলি—

—কেন?

—কেন আর, তাহলে সাধু খুব খুশী হবে, নমস্কার করলে কে না খুশী হয়—ওরাও তো মানুষ রে, নমস্কার করতে দোষ কী তোর, তাতে তো পয়সা লাগবে না—

তারপর কিরণ একটু থেমে বললে—পয়সাটাই হলো আসল জানিস দীপু, সাধুই হোক আর সাধু না-ই হোক—

—কিন্তু আমার কাছে তো পয়সা নেই—

কিরণ বললে—আমার কাছেও পয়সা নেই, পয়সা দিতে হলে সাধুর কাছে আসবো কেন—পয়সা লাগবে না বলেই তো সাধুর কাছে আসি—

—কিন্তু তাহলে? তাহলে ওরা খাবে কী? কী খেয়ে বাঁচবে?

কিরণ বললে—পয়সা দেবার লোক আছে অনেক, তারা সাধুদের খাওয়াতে পারলে বেঁচে যায়—। কিন্তু এ-সাধুটা সে-রকম নয়, এ শুধু গাঁজা খায়, এ হিমালয়ের সাধু কি না—আর কিছু খায় না—

কিন্তু ঘাটের সামনে গিয়ে কিরণ থমকে গেল। কিছু কথা বলতে পারলো না কিছুক্ষণ।

বললে—এই রে, বোধহয় হিমালয়ে চলে গেছে আবার—

—তা হলে?

কিরণ বললে—নাঃ, আমাদের কপালটাই খারাপ, কয়েকদিন পৈতে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম ভবানীপুরে, এদিকে আসতে পারিনি—নইলে টের পেতাম—

আবার ফিরতে হলো। আবার পাথরপটি দিয়ে বাড়ির দিকে আসতে হবে। কিরণ নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের ভেতর ঢুকে পড়লো। আর দীপঙ্কর গিয়ে ঢুকলো সোজা লক্ষ্মীদির বাড়ির মধ্যে। সতী এসেছে নাকি! সতীর তো আসবার কথা ছিল। সেই লক্ষ্মীদির বোন। আজই তো আসবার কথা। লক্ষ্মীদি বলেছিল। রান্নাঘরের ভেতরে উনুনে আগুন দেওয়া হয়েছে। একতাল আটা নিয়ে মাখছে ঠাকুর। রঘু ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। নতুন একটা খাট পাতা হয়েছিল সতীর জন্যে। সতী আর লক্ষ্মীদি এক ঘরে শোবে।

সিঁড়ির মুখেই লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মীদি নামছিল। দীপঙ্করকে দেখেই লক্ষ্মীদি বললে—কী রে দীপু, কী! এরকম চেহারা হয়েছে কেন তোর?

দীপঙ্কর বললে—শ্মশানে গিয়েছিলুম—আজকে সি আর দাশ মারা গেল কি না—

—ও, আমরাও তো এখন আসছি।

—কোথা থেকে?

লক্ষ্মীদি বললে—সতীকে আনতে গিয়েছিলুম—

দীপঙ্করের বুকটা কেমন যেন দুলে উঠলো।

বললে—সতী এসেছে নাকি? কই দেখি? কী রকম দেখতে, দেখি?

লক্ষ্মীদি হেসে বললে—না রে, আসেনি, জাহাজ ছাড়েনি সেখান থেকে, খুব ঝড় হয়েছিল কি না—

দীপঙ্কর যেন হতাশ হলো কথাটা শুনে। তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যেন অনেক আশা করেছিল সে। অথচ কিসের যে আশা, কেন যে আশা, সতী তার কে—তারই ঠিক নেই!

লক্ষ্মীদি নিচেয় নামতে লাগলো। দীপঙ্করও নিচে নামতে লাগলো পেছন পেছন।

পেছন থেকে হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কী রে? কী বলছিস?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতীকে বুঝি তোমার মতন দেখতে?

লক্ষ্মীদি ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ। বললে—ও মা, তুই বুঝি দিনরাত সতীর কথা ভাবিস্—?

কেমন লজ্জা হলো দীপঙ্করের। মুখটা নিচু করে বললে—না—

—তবে? সতীর কথা এত জিজ্ঞেস করিস কেন রে তুই?

কেন যে দীপঙ্কর সতীর কথা এত করে জিজ্ঞেস করে তা কি দীপঙ্করই জানতো? কিন্তু তার কেবল মনে হতো সতী যেমনই হোক, সে যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে চিঠি না পাঠায়। সতী যেন লক্ষ্মীদির মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করে না নাচে। সতী যেন এমন করে লক্ষ্মীদির মত পড়ার টেবিলে বসে অন্য কারুর ছবি না দেখে। সতী যেন আরো ভালো হয়। লক্ষ্মীদির চেয়ে সতী আরো ভালো হলে যেন ভাল হয়। সতী যেন সত্যিই সতীর মতন হয়!

সেদিন সেই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে কালীঘাট মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর সেই সেদিনকার কথাই ভাবছিল। সতী হয়ত আসবে না শেষ পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত হয়ত আসাই হবে না সতীর। অত দূর থেকে আসা কি সহজ! কোথায় বর্মা, কোথাকার কোন্ কাঠের কারবারী ভুবনেশ্বর মিত্র—তার ছোট মেয়ে সতী কি অতদূর পথ একলা আসতে পারবে! যদি আসে যেন এমন করে চিঠি না পাঠায় তার হাত দিয়ে। সে-ও যেন দীপঙ্করকে এত কষ্ট না দেয়। এমন করে চিঠির জন্যে ভোরবেলা বৃষ্টিতে না ভিজোয়—

এই বার লোকটা আসছে। সেই কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটা!

একটা ট্যাক্সি তীরের মত ছুটে আসছে কুণ্ডুপুকুরের দিকে। কিন্তু না, ট্যাক্সিটা কুণ্ডুপুকুরের ধার দিয়ে এসে ভেতরে গলির ভেতর ঢুকে গেল।

দীপঙ্কর আর একবার পোঁড়ার দোকানে গিয়ে ঘড়িটা দেখে এল! সর্বনাশ! আটটা বাজে! কখন সে পড়বে, কখন সে ইস্কুলে যাবে, কখন সে ভাত খাবে! বৃষ্টি তখন বেড়েছে আরো। আরো জোরে জল পড়ছে—

দীপঙ্কর সেই বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়ল। মায়ের মন্দির থেকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন অনেকদূর পথ। সমস্ত জামা প্যাণ্ট্ সব ভিজে একসা হয়ে গেল। ছুট্ ছুট্ ছুট্। ছুটতে ছুটতে একেবারে লক্ষ্মীদিদের বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছুলো তখন একেবারে চান করে উঠেছে। দরজাটা খোলা ছিল। সোজা ভেতরে গিয়ে লক্ষ্মীদিকে চিঠিটা দিয়ে আসতে হবে। বলতে হবে, সে ভদ্রলোক আসেনি। লক্ষ্মীদি হয়ত রাগ করবে খুব। যা রাগী মেয়ে! কিন্তু দীপঙ্করের দোষ কী! ভদ্রলোক যদি না আসে তো সে কী করতে পারে।

সিঁড়ির নিচে রান্নাঘরের দিকে কাকীমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রঘু একটা থালায় চাল ধুচ্ছে কলতলার সামনে।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে গেল। ওপরেও বারান্দায় কেউ নেই। ডানদিকে পাশাপাশি শোবার ঘর, পড়বার ঘর।

দীপঙ্কর উঁকি মেরে দেখলে ভেতরে।

—লক্ষ্মীদি!

সেখানেও কারো সাড়া শব্দ নেই। তার পাশের ঘরেও নেই। সমস্ত দোতলাটা যেন ফাঁকা মনে হলো। কেউ নেই দোতলায়। দীপঙ্করের গায়ের জামা ভিজে চপ্ চপ করছে। এ-ঘর ও-ঘর সমস্ত ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে বার বার। কোথায় গেল লক্ষ্মীদি! কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। অন্যদিন তো ওই বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়েন। সেই সি আর দাশ যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনও তো ওখানে বসেই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। লক্ষ্মীদির ঘরের ভেতরে সতীর খাটটাও সাজানো রয়েছে। দু'দিকের দেয়ালে লাগানো দুটো খাট! বিছানা-টিছানা সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো। শুধু ছোট টেবিলটার ওপর তিনটে চায়ের কাপ ডিশ খালি পড়ে আছে।

—লক্ষ্মীদি!

আবার ডাকলো দীপঙ্কর।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছাদে উঠলো। তেতলার ছাদে শুধু একখানা ঘর। ঘরখানায় কাকাবাবু শোন। সে-ঘরে গেলে সমস্ত কালিঘাটটা ছবির মতন নজরে পড়ে। ছোট ছোট বাড়ি, বস্তি, খড়ের চালা, মায়ের মন্দির, হালদারদের বাড়ি। চণ্ডীবাবুর বার বাড়ির চুড়োটা আরো অনেক কিছু। আর ওদিকে সেই টিপু সুলতানের ভূতুড়ে বাড়িটা—তার ওধারে আগুনখাকীর পুকুর—আর তার ওদিকে ঢালা ধানক্ষেত। সে ধানক্ষেত একেবারে সোজা দক্ষিণে রেল-লাইন পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে—

ওপরে উঠেই দীপঙ্কর কাকাবাবুর ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলে। ঘরের দরজা খোলা। অন্যদিন সব সময়েই ঘরটায় চাবি বন্ধ থাকে। ঘরের ভেতরেও লক্ষ্মীদি নেই। দরজার পাল্লাটা ধরে ঝুঁকে আবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখলে। খাটটার ওপর খবরের কাগজটা উল্টে রয়েছে। মনে হয়, একটু আগেই যেন ঘরে কেউ ছিল। সেল্ফের ওপর অনেকগুলো বই। অনেকগুলো কাগজপত্রের বাণ্ডিল। আর একটা ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কে একটা ছোট তালা ঝুলছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে মেঝের ওপর, বিছানার চাদরে আর দেয়ালের কুলুঙ্গিতে।

কোথায় গেল লক্ষ্মীদি!

আবার নিচেয় নেমে কাকীমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এত সকালে কাকাবাবুই বা কোথায় গেলেন। আর লক্ষ্মীদিই বা কোথায় গেল।

হঠাৎ মনে হলো ছাদের উত্তর-পূব কোণে লক্ষ্মীদি দাঁড়িয়ে আছে। দীপঙ্করের দিকে পেছন ফেরা। কাকাবাবুর দূরবীনটা চোখে দিয়ে অনেক দূরে কী যেন দেখছে। দীপঙ্করকে দেখতে পায়নি।

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর কাছে গেল।

তখনও দূরবীনে চোখ দিয়ে লক্ষ্মীদি একদৃষ্টে কী দেখছে।

হঠাৎ দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। চমকে পাশ ফিরে দীপঙ্করকে দেখে অবাক।

—তুই? তুই কখন এলি?

দীপঙ্কর বললে—আমি অনেকক্ষণ এসেছি—সব জায়গায় খুঁজেছি তোমাকে—

—চিঠি দিয়েছিস?

—না! তিনি আসেননি!

—আসেননি কিরে! আসেনি মানে? তাহলে চিঠি কাকে দিলি?

দীপঙ্কর বললে—কাউকেই দিইনি—এই নাও—

লক্ষ্মীদি চিঠিটা নিয়ে একটু দেখেই টুকরো টুকরো করে ছাদে ছড়িয়ে দিলে।

দীপঙ্কর বললে—এই দেখ না, চিঠিটা নিয়ে আটটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলুম

—তবু কেউ এল না—

—তা আর একটু দাঁড়ালি না কেন? আসবে না তো কোথায় যাবে!

—আমি তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল্ম—তারপর এমন বিষ্টি এল—এই দেখ না বিষ্টিতে একেবারে ভিজে গিয়েছি—

লক্ষ্মীদিও দেখলে দীপঙ্করের সর্বাঙ্গ ভেজা।

বললে—বৃষ্টি তো তখ্নি থেমে গেল, একটু পরেই রোদ উঠলো, আর একটু দাঁড়ালেই পারতিস্—

দীপঙ্কর বললে—এবার থেকে তুমি একটু বলে দিও লক্ষ্মীদি, যেন ঠিক সময়ে আসে—দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা ব্যথা করে যায়—

লক্ষ্মীদি বললে—অনেকদূর থেকে আসতে হয় কিনা, তাই একটু দেরি হয়—তা এবার আর দেরি হবে না, আমি বলে দেব—

দীপঙ্কর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—এটা দূরবীন, না লক্ষ্মীদি?

—হ্যাঁ বাইনোকুলার—

—দেখা যায়?

—দেখবি?

বলে লক্ষ্মীদি বাইনোকুলারটা দীপঙ্করের চোখে লাগিয়ে দিলে। তারপর বললে—দেখতে পাচ্ছিস?

দীপঙ্কর দেখলে। কোথায় কত দূরের জিনিস যেন একেবারে হাতের কাছে, একেবারে যেন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। সেই মায়ের মন্দির, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট, কিরণদের টিনের চালা, পাথরপটিতে ফটিকদের বাড়ি, মধুসূদনের বাড়ি, ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল, কত দূরের জিনিস সব হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠলো দীপঙ্করের সামনে।

হঠাৎ দীপঙ্কর দূরবীনটা লক্ষ্মীদির দিকে ফেরালো। লক্ষ্মীদিকে বরাবর সামনা-সামনিই দেখে এসেছে এতদিন। দূরবীন দিয়ে লক্ষ্মীদিকে কেমন দেখায় তাই দেখবার ইচ্ছে হলো।

—কী রে আমাকে দেখছিস্ নাকি?

দীপঙ্করের চোখের সামনে তখন সব ঝাপ্সা হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে এত ঝাপ্সা দেখাচ্ছে কেন লক্ষ্মীদি! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে—

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—আমি যে কাছের মানুষ রে—

—তা কাছের মানুষকে ঝাপ্সা দেখাবে কেন—তোমাকে আমি দূরবীন দিয়ে দেখবো না—বলে দূরবীনটা সরিয়ে নিলে চোখ থেকে।

—কেন?

—না—না, বড় খারাপ দেখায় তোমাকে, তোমাকে চেনাই যায় না একেবারে।

—তা তো চেনাই যাবে না, দূরবীন তো দূরের মানুষকেই দেখবার জন্যে।

কাছের জিনিস দেখতে কি দূরবীন লাগে!

কথাটা শুনে সেই অল্প বয়েসে কেমন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সত্যিই তো, লক্ষ্মীদি তার কাছের মানুষ। একেবারে মনের কাছাকাছি। কাছের মানুষ না হলে কি লক্ষ্মীদি তার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতো! তাকে এত বিশ্বাস করতো! আর তা ছাড়া কাছের মানুষকে দূরবীন দিয়ে দেখতে গেলেই তো যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কাছে এলেই যেন সব ঝাপ্সা ঠেকে। যেন বড় দূরে দূরে মনে হয়। অথচ লক্ষ্মীদিও যখন দূরে চলে গিয়েছিল—যখন একেবারে নাগালের বাইরে, তখনই মনে হয়েছিল যেন লক্ষ্মীদিকে ভালো করে কাছে পেয়েছে, স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে, সহজ করে বুঝতে পেরেছে।

দীপঙ্কর দূরবীনটা দিয়ে দিলে লক্ষ্মীদির হাতে—

বললে—আমাকেও দূরবীন দিয়ে দেখো না তুমি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—কেন রে?

—না আমাকেও ঝাপ্সা দেখাবে—

—ঝাপ্সা দেখালে আমিই ঝাপ্সা দেখবো, তাতে তোর কী?

—না, তাতে যে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না!

বলে আর দাঁড়াল না দীপঙ্কর। যেন লক্ষ্মীদির সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হলো তার। তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লো। পাশের দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতেই ঢুকতো হয়ত, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর গলিটার মুখে মনে হলো যেন কাদের একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। গলিতে আবার ট্যাক্সি এল কাদের বাড়িতে! নতুন কোনও ভাড়াটে এল নাকি। ভেতরে মেয়েরা বসে আছে। অনেক মালপত্র পেছনে বাঁধা।

ট্যাক্সি থেকে কে একজন নেমে এসে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে দেখতে আসছিল।

দীপঙ্করের কাছে এসেই জিজ্ঞেস করলে—এই, উনিশের একের বি কোন্ বাড়িটা রে?

—এইটেই তো, কাকে খুঁজছো?

—অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়ি,—

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই বাড়িটাই—

বলে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর ট্যাক্সির দিকে। পেছনের বসবার জায়গায় দুজন মেয়েমানুষ বসে ছিল। দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সতী নয় তো!

—এই ছোকরা, মালগুলো ধরতে পারবি?

বলে ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে। গরমের কোট প্যান্ট্ পরা। বেশ বয়েস হয়েছে। তারপর পেছনের মালগুলো ট্যাক্সিওয়ালা নামিয়ে দিলে। কয়লা

মেয়েটা ভেতর থেকে বললে—এত জায়গা থাকতে কোথায় বাড়ি নিয়েছে কাকাবাবু—আর জায়গা পেলে না—

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন—উনিশের একের বি চিনিস তো তুই ?

দীপঙ্কর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তাহলে, এই মালগুলো ওঠা তো—বেশি ভারি নয়, একটা বিছানা আর একটা সুটকেস—

মেয়েটি নামলো গাড়ি থেকে। বললে—আপনি না থাকলে বাড়িই খুঁজে পাওয়া যেত না—

পরনের কাপড়টা আর মাথার চুলের খোঁপাটা ঠিক করে নিলে একবার। এধারের ওধারের বাড়িগুলো দেখতে লাগলো চোখ মেলে। যেন যেদিকেই চাইছে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

বললে—এই জায়গায় দিদি আছে কী করে তাই ভাবছি—

ভদ্রলোক বললেন—এ কি আর তোমার বর্মা পেয়েছো—অত বড় বাগান—অত বড় সমুদ্র—

তারপর হঠাৎ বললেন—ওরে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন বাবা—মাথায় তোল্ না—বেশি ভারি নয়—

তারপর আর বেশি কথা না বলে বিছানাটা দীপঙ্করের কাঁধে তুলে দিলেন। বললেন—পারবি তো ?

দীপঙ্কর কাঁধের ওপর বিছানাটা আর হাতে সুটকেসটা নিয়ে বললে—পারবো—

—দেখিস, যা রোগা পট্‌কা চেহারা, পারলে হয়, ফেলে দিস্ নে যেন বাবা—

সামনে আগে আগে চলতে লাগলো দীপঙ্কর—আর পেছনে ভদ্রলোক আর মেয়েটি। দীপঙ্করের মনে হলো এ কেমন করে হলো। হঠাৎ কী যে হলো—সব ঘটনাটা কেমন বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। কিছু ভাববার কিছু বলবার অবসর ছিল না।

কাকাবাবুদের বাড়ির দরজা তখনও খোলাই ছিল।

—এই বাড়ি ?

দীপঙ্কর কাঁধ থেকে মালটা নামিয়ে বললে—হ্যাঁ—

মেয়েটি বললে—কত নিবি তুই ?

দীপঙ্কর হতবাক্ হয়ে গেছে। একবার মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। এর কথাই কি এতদিন শুনে এসেছে লক্ষ্মীদির কাছে! এই-ই কি সতী! এই রকম চেহারার কথাই তো শুনেছে, ঠিক এইরকম ফরসা, কোঁকড়ানো চুল,—

ভদ্রলোক বললেন—এক আনা পয়সা দিয়ে দাও ওকে—

দীপঙ্কর বললে—না, পয়সা দিতে হবে না—

ভদ্রলোক বললেন—কেন ? দুটো তো মাত্র হাল্‌কা জিনিস, ওর জন্যে চারটে পয়সা কি কম হলো ? এক গলা মাটি খুঁড়লে চারটে পয়সা আসে ? বড় যে নবাব হয়ে গেছ সব একেবারে, ও তো আমি নিজেই বয়ে আনতে পারতুম—

মেয়েটি বললে—ওই চার পয়সার বেশি আর দেব না—নে—

হাত বাড়িয়ে পয়সা চারটে দিতে গেল মেয়েটি।

দীপঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—এই জন্যেই বাঙ্গালীদের কিস্‌সু হয় না—ভারি তো দুটো হাল্কা জিনিস, তার জন্যে দুগণ্ডা পয়সা দিতে হবে নাকি—না নেয় না নেবে—বয়ে গেল—

মেয়েটি আবার বললে—নিবি তো নে—

দীপঙ্কর বললে—না—

ভদ্রলোক বললেন—তুমি আর খোশামোদ করো না সতী—ও থাক্—চার পয়সা ও কী করে [illegible] করে দেখি—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে এল। আর একটু দাঁড়ালেই হয়ত ওরা দেখতে পেত। ভিজে জামার হাতাটা দিয়ে চোখটা মুছে নিলে একবার।

হঠাৎ গায়ে এসে লাগলো যেন কী জিনিস। পেছন ফিরতেই দেখলে ভদ্রলোক চারটে পয়সা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। আর পয়সা চারটে তার গায়ে [illegible] মাটিতে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হলো। দীপঙ্করের মনে হলো যেন [illegible] অন্তরাত্মা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো। তা হলে সেই সতীও আর [illegible]র মতন হয়ে গেল! লক্ষ্মীদিও তাকে চকোলেট দিয়েছিল! সতীও কি লক্ষ্মীদির মতন! কোনও তফাৎ নেই! তাহলে সংসারে সবাই-ই কি [illegible]দাদু!

বাড়ি আসতেই মা দেখতে পেয়েছে। বললে—হ্যাঁ রে, এতক্ষণ লাগলো ফুল দিয়ে আসতে ?

তারপর কাছে আসতেই ভিজে জামাটা দেখে বললে—এই ভিজে জামা পরে কোথায় ছিলি এতক্ষণ, ইস্কুলে যাবি না ? খোল্ খোল্, ভিজে জামা খুলে ফ্যাল্। যদি জ্বর হয় তখন তো আমাকেই জ্বালাবি—না, তোকে আর ফুল দিয়ে আসতে হবে না—এবার থেকে আমি নিজেই যাবো—

জোর করেই মা জামাটা টেনে খুলে দিলে। গামছা দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিলে। নিজের মনেই মা বক্ বক্ করতে লাগলো অনেকক্ষণ—আমার যেমন কপাল, আমি যে এই সারাদিন রান্না করছি পরের বাড়িতে, চোখে দেখেও ছেলের জ্ঞান হয় না,—আর কবে জ্ঞান হবে, কবে বুদ্ধি-বিবেচনা হবে যে ছেলের—

মা'র কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের ভারি দুঃখ হতো। মা তো জানতো না দীপঙ্করের মনের ভেতর কত কথার কত ভাবনার পাহাড় জমেছিল তিলে তিলে। মা'র যেমন নিজের ভাবনা আছে, দীপঙ্করেরও যে তেমনি নিজের ভাবনা আছে কত। ঘরটার দাওয়ায় বসে বসে উঠোনের মাথার আকাশটাকে দেখেও কত ভাবনা উঠতো দীপঙ্করের মাথায়। কেন সকাল হলেই রোদ হয়, কেন সন্ধ্যে হলেই তারা ওঠে ওখানে। যে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে, সেই আকাশ থেকেই আবার কী করে আগুন ঠিকরে পড়ে দুপুর বেলা! শুধু কি তাই? ওই উঠোনের কোণে যে আমড়াগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় ওর পাতাগুলো কেমন সবুজ, কিন্তু সাদা হয়ে গেলেই কেন মাটিতে ঝরে পড়ে। আর সেই কাকটা। কাকটা রোজ আসে, রোজ এসে ওই গাছের ডালে বসে। কোথায় গেল সেই ওর লাল-মুখো বাচ্চাটা। হাজি কাশিমের বাগানে সেবার মরে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তারপর থেকেই ও যেন কেমন হয়ে গেছে। এঁটো ভাত পেলেই খেয়ে নিয়ে আবার ওই ডালে গিয়ে বসে। তারপর সন্ধ্যে হবার আগেই কোথায় চলে যায়! ওর বোধ হয় কেউ নেই পৃথিবীতে। পৃথিবীতে কেউ না-থাকা খুব কষ্টের বোধ হয়। সেদিন দীপঙ্কর সেই লক্ষ্মীদির দেওয়া চকোলেটগুলো ওকে দিয়েছিল, কাকটা গপ্ গপ্ করে সব খেয়ে নিয়েছিল। ও বেশ আছে, লজ্জাও নেই, অভিমানও নেই। সত্যিই বেশ আছে।

দীপঙ্কর ডাকে—আঃ আঃ আঃ—

কাকটা তেরছা দৃষ্টি দিয়ে দীপঙ্করের দিকে দেখে—ঘাড় কাত করে দেখে সত্যি তার হাতে কিছু খাবার আছে কি না। সত্যিই তাকে খেতে দিচ্ছে না স্তোকবাক্য শোনাচ্ছে—

মা একদিন দীপঙ্করকে নিয়ে প্রাণমথবাবুর কাছে গিয়েছিল দুপুরবেলা। ছুটির দিন। মা একটা ফরসা কাপড় বার করে পরেছিল। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের একেবারে শেষ প্রান্তে প্রাণমথবাবুর বাড়ি। এককালে খুব অবস্থা ভাল ছিল প্রাণমথবাবুর পূর্বপুরুষদের। এখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

মা বললে—আমি বৌদিকে বলে রেখেছি তোকে কিছু ভাবতে হবে না—

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি কিন্তু চাকরি করবো না মা—

মা বললে—চাকরি করবে না তো কী করবে শুনি, বসে বসে ভাত গিলবে?

দীপঙ্কর বললে—আমি পড়বো—

মা খুব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল—পড়তে মাইনে লাগবে না? মাইনে আমি কোত্থেকে দেব শুনি? অঘোরদাদু কদ্দিন খাওয়াবে দুজনকে! আমি তোমার মাইনে গুনতে পারবো না বাপু—এই বলে রাখলুম—আমার শরীরে আর বইছে না—

প্রাণমথবাবু বাড়ির ভেতরে খালি গায়ে তখন চরকা কাটছিলেন। চারিদিকে আলমারি। বই ভর্তি আলমারি।

বললেন—না দীপুর মা, ওর যখন পড়তে ইচ্ছে, তখন ওকে পড়াও তুমি—

মা বললে—কিন্তু দাদা, আপনি তো আমার অবস্থা জানেন, কোত্থেকে মাইনে গুনবো আমি—সেই এক মাস বয়েস থেকে আমি এতদিন টেনে টেনে চালালুম, এখন আমার নিজের শরীরেও আর বয় না, ওর একটা কিছু করে যেতে পারলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারি—

প্রাণমথবাবু পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন—তুমি ঢুকিয়ে দাও তো কলেজে, মাইনের কথা ভাবতে হবে না—

সত্যিই মাইনের কথা ভাবতে হয়নি মাকে আর। কলেজে পড়বার সময় মাইনে দিতেন প্রাণমথবাবু নিজের পকেট থেকে। প্রতি মাসের প্রথম দিকে গিয়ে হাজির হতো দীপঙ্কর। সকাল বেলা যেত। অনেক কাজের মধ্যেও প্রাণমথবাবু তাকে দেখেই বলতেন—এসেছ?

চাইতে হতো না, কিছু না, তাকে দেখেই ড্রয়ার থেকে ছ'টা টাকা দিয়ে দিতেন।

বলতেন—তোমার মা কেমন আছেন?

দীপঙ্কর বলতো—ভালো আছে স্যার—

—পড়াশুনো চলছে তো ঠিক? পঞ্চানন্ সিংহী মশায় কেমন আছেন?

পঞ্চানন সিংহ ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। দীপঙ্কর বলতো—ভালো আছেন স্যার—

—তাকে আমার কথা বলো, জানো? যদি কোনও অসুবিধে হয় তাঁকেও জানিও—

তারপর বলতেন—বড় হও, মানুষ হও, তোমাকে মানুষ হতে দেখলে আমি খুব খুশী হবো—

দীপঙ্কর বলতো—স্যার, পরের মাস থেকে আপনাকে আর টাকা দিতে হবে না—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—আপনি তো আমাকে অনেক সাহায্য করলেন, কেউ কারোর জন্যে এমন করে না—সামনের মাসে আমি একটা টিউশানি যোগাড় করবো ভাবছি—

—টিউশানি?

প্রাণমথবাবু কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ! বললেন—টিউশানি পেয়েছ?

—না পাইনি এখনও, তবে খুঁজলে পেয়ে যাবো। আজকাল কালিঘাটে অনেক নতুন-নতুন লোক এসেছে, দশ টাকার টিউশানি একটা যোগাড় করতে

পারবো—

প্রাণমথবাবু বললেন—দাঁড়াও—

প্রাণমথবাবুর গম্ভীর গলার আওয়াজে দীপঙ্কর যেন চমকে উঠলো। প্রাণমথবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন—হরিপদ—

হরিপদ আসতেই প্রাণমথবাবু বললেন—বাড়তি হিসেবের খাতাটা বার করে দে তো—

হরিপদ অনেক বই-খাতার মধ্যে থেকে একটা লাল খেরো-বাঁধানো খাতা টেনে বার করে দিলে।

প্রাণমথবাবু খাতাটা তুলে তারই একটা পাতা বার করে বললেন—পড়, পড়ে দেখ—

দীপঙ্কর পড়ে দেখলে। পড়ে কিছুই বুঝতে পারলে না। পাতা-ভর্তি অনেক লোকের নামের লিস্ট। প্রত্যেকের নামের পাশে টাকার অঙ্ক বসানো। কারোর নামের পাশে পাঁচ, কারোর নামের পাশে দশ, কারোর নামের পাশে দুই। এই রকম অনেক নাম, অনেক টাকা। তার নিজের নামও রয়েছে। তার নামের পাশে লেখা রয়েছে ছ' টাকা।

—বুঝলে কিছু?

—না স্যার!

প্রাণমথবাবু বললেন—তুমি একলাই টাকা পাও না, অনেকেই পায়. সবাই এসে নিয়ে যায়, কিন্তু তোমার মত টাকার দরকার নেই কেউ বলে না তো, এই আজ তুমিই প্রথম বললে শুনলাম—

দীপঙ্কর কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

প্রাণমথবাবু বললেন—তা আসলে এ-টাকা আমিও আমার পকেট থেকে দিই না তোমাকে। আমার অত টাকাও নেই। কলকাতার কিছু বড় বড় লোক গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে মাঝে মাঝে আমার হাতে কিছু টাকা দেয়, সেই টাকাই আমি কেবল তোমাদের হাতে তুলে দিই—তা আমার কাছ থেকে টাকা নিতে তোমার লজ্জা করার কোনও কারণ নেই, যতদিন তোমার দরকার তুমি নিয়ে যেও, তারপর যেদিন আর দরকার হবে না, সেদিন নিও না—

দীপঙ্কর এবারও কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ প্রাণমথবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—যাও এবার—

আর-এক মুহূর্ত দেরি না করে দীপঙ্কর রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। যেন সত্যিই লজ্জা হলো বেশিক্ষণ প্রাণমথবাবুর সামনে থাকতে! ইনিও তো মানুষ! পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে প্রাণমথবাবুও তো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু এমন মানুষই-বা ক'টা আছে পৃথিবীতে। দীপঙ্করের মনে হলো আসবার সময় প্রণাম করলেও যেন তাঁকে ছোট করা হতো! প্রাণমথবাবু যেন সমস্ত ভদ্রতা-অভদ্রতা, সমস্ত নিয়ম-কানুন, সমস্ত কেতা-দুরস্তের ঊর্ধ্বে।

যারা চকোলেট দেয়, যারা পয়সা দেয়, যারা সন্দেশ দেয়, সেই লক্ষ্মীদি, সতী, অঘোরদাদুদের কেউ নয় যেন প্রাণমথবাবু। অথচ প্রাণমথবাবুও তো দেবতা নন। সাধারণ, অতি সাধারণ কালিঘাট নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটেরই একজন মানুষ মাত্র। প্রাণমথবাবু তো তাদের মত টাকা-কড়ি দিয়ে, ঘুষ দিয়ে তাকে কিনতে চাননি। দীপঙ্করকে টাকা দিয়ে তিনিও সম্মান, লজ্জা, বিনয়, কৃতজ্ঞতা সবই তো দীপঙ্করের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। কিন্তু তা তো তিনি করলেন না!

মনে আছে প্রথম যেদিন প্রাণমথবাবুর কাছে মা নিয়ে গিয়েছিল, প্রাণমথবাবু একটা কথা বলেছিলেন।

চরকা কাটতে কাটতে বলেছিলেন—মহাভারত পড়েছ?

দীপঙ্কর বলেছিল—মা'র কাছে মহাভারতের গল্প শুনেছি, পড়িনি—

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা বলো তো পৃথিবীর চেয়ে বড় কী?

প্রশ্নটা শুনে কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। এই পৃথিবী, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চেয়ে বড় কী জিনিস থাকতে পারে এ-সংসারে! আর যদি পৃথিবীর চেয়েই বড় হবে তো সেটা পৃথিবীর মধ্যে ধরবেই বা কেমন করে। বাটি যত-টুকু, ততটুকুই তো তেল ধরবে তাতে। একসেরা বাটিতে তো আর দু সের তেল ধরতে পারে না!

প্রাণমথবাবু নিয়ম করে রোজ চরকা কাটতেন। সেই চরকায় কাটা সুতো দিয়ে নিজের কাপড় তৈরি করতেন। প্রাণমথবাবুর স্ত্রীও নিজে চরকা কাটতেন। স্বামী-স্ত্রী অদ্ভুত দুজনে। ছেলে-পুলে ছিল না। পরে অনেকেই চরকা কাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। চরকার যখন হুজুগ এসেছিল, তখন সবাই কেটেছে। পাড়ায় পাড়ায় চরকা ঘুরতো ঘর্‌ঘর্‌ করে। খদ্দর পরা একটা স্টাইল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সব হুজুগের মত একদিন খদ্দরের হুজুগও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু প্রাণমথবাবু সারাজীবন আর তা ছাড়লেন না। একেবারে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত।

প্রাণমথবাবু আবার বললেন—বলো, পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর চেয়েও বড় কী জিনিস, বলো?

মা বললেন—দাদা, আমি ভেতরে বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি—

—যাও—বলে প্রাণমথবাবু আবার চরকা কাটতে লাগলেন।

তারপর বলতে লাগলেন—মহাভারতে আছে একবার এক বক যুধিষ্ঠিরকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিল—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ জানি, বকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি বলে ভীম, অর্জুন সবাই মরে গিয়েছিল—শুধু যুধিষ্ঠিরই শেষ পর্যন্ত উত্তর দিতে পেরেছিল স্যার—

প্রাণমথবাবু জিজ্ঞেস করলেন—তা বলো তো কার হৃদয় নেই? কে জেগে

ঘুমোয়? জন্মের পরেও নিঃশ্বাস পড়ে না কার? কোন্ জিনিস বাতাসের চেয়েও বেগবান? তৃণের চেয়েও কোন্ জিনিস অধিক?

পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেলেন প্রাণমথবাবু।

দীপঙ্কর একটিরও উত্তর দিতে পারেনি।

প্রাণমথবাবু বললেন—ভীম অর্জুন নকুল সহদেবরা না-হয় মহাভারত পড়েন নি, তাই উত্তর দিতে পারেননি—কিন্তু আমরা তো মহাভারত পড়েছি, আমাদের তো উত্তরগুলো জানা উচিত—

দীপঙ্কর এবারও চুপ করে রইল।

প্রাণমথবাবু বললেন—বড় হয়ে মহাভারতটা পড়ো, বুঝলে? এখন পৃথিবীর চেয়ে বড় কী, এটা শোন—

দীপঙ্কর চেয়ে ছিল প্রাণমথবাবুর মুখের দিকে।

প্রাণমথবাবু চরকা থামিয়ে বললেন—পৃথিবীর চেয়ে বড় হলো জননী—বুঝলে—জননী—তোমার মা—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

—হ্যাঁ, জননী। তোমার মা'র কথাই ভাবো না, তুমি জানো না, কত কষ্ট করে তোমার মা তোমাকে মানুষ করেছেন। প্রতিদানে কিছুই চাননি। তুমি যখন ছোট ছিলে তোমার এই বিধবা মা, সেদিন তোমার জন্যে রাতের ঘুম, দিনের বিশ্রাম সব কিছু ত্যাগ করেছেন—আর তুমি? তুমি সেটা তোমার ন্যায্য পাওনা হিসেবে দাবি করেছ। আরো স্নেহ, আরো যত্ন, আরো সেবা দাবি করেছ!......

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এ-ছাড়াও আর একজন মা আছে তোমার, তার কথা তুমি কখনও ভেবেছ কী?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—আর একজন মা?

প্রাণমথবাবু বললেন—হ্যাঁ আর একজন মা। সে হচ্ছে তোমার জননী-জন্মভূমি—

বলতে বলতে যেন প্রাণমথবাবুর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। উত্তরে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-মাতৃভূমি পায়ের তলায় প্রসারিত, যে-মাতৃভূমি ক্ষুধায় অন্ন দেয়, রোগে ওষুধ দেয়, বস্ত্র, আশ্রয় সব যে দেয়, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় হেমন্তে শরতে বসন্তে যে প্রতিপালন করে, সেই জননী-জন্মভূমি যে পৃথিবীর চেয়েও বড়! তার মতন কে আছে পৃথিবীতে......

বলতে বলতে প্রাণমথবাবু থেমে গিয়ে আবার চরকা কাটতে লাগলেন।

মা ভেতর থেকে এসে হঠাৎ ডাকলে—খোকা—

দীপঙ্কর মা'র দিকে চাইলে।

মা বললে—ভেতরে এসো—মামীমাকে প্রণাম করো—

দীপঙ্কর উঠে ভেতরে গিয়ে দেখলে প্রাণমথবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন।

দুই পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে দীপঙ্কর প্রণাম করলে।

প্রাণমথবাবুর স্ত্রী আশীর্বাদ করলেন—মানুষ হও বাবা, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো—

এর পর প্রতিমাসেই দীপঙ্করকে যেতে হতো প্রাণমথবাবুর বাড়ি। প্রাণমথবাবুর কাছে গেলে দীপঙ্কর যেন অন্যরকম হয়ে যেত।

প্রাণমথবাবু বলতেন—আমার বাড়িতে অনেক বই আছে, তোমার যদি পড়বার ইচ্ছে হয় কখনও, আমার এখানে এসে পড়তে পারো, দেখবে বই-এর মতন বন্ধু পৃথিবীতে আর নেই—বই কখনও বঞ্চনা করে না—

মনে আছে প্রাণমথবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে মা বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল। দীপঙ্করকে তখন কলেজের দিকে যেতে হবে। ভর্তির ফরম নিয়ে এসে টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হবে কলেজে। মা কতদিন থেকে এক টাকা দু টাকা করে জমাচ্ছে। একটি পয়সা মা'র কাছে অমূল্য জিনিস। সেই কাঠের বাক্সটার ভেতরে একটি-একটি পয়সা রেখে মা জমাতো, পয়সা জমিয়ে টাকা করতো।

দীপঙ্কর যদি বলতো—একটা পয়সা দেবে মা?

মা জিজ্ঞেস করতো—পয়সা কী করবি?

দীপঙ্কর বলতো—চিনেবাদাম খাবো—

মা বলতো—বড় হয়ে অনেক চিনেবাদাম খেতে পারবে বাবা, অনেক ঘুগনিদানা খেতে পারবে, এখন এ-পয়সা তোমারই কাজের জন্যে জমাচ্ছি, তোমার পেছনেই কত টাকা খরচ হবে জানো—আর আমি তো এ-পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাবো না—

মা এক বিচিত্র উপায়ে পয়সা উপায় করতো। পাড়ার কোনও বড়লোকের বাড়ির বউ-এর জন্যে কাঁথা সেলাই করতে হবে, মাকে দিয়ে যেত ছেঁড়া কাপড়। মা হয়ত দু আনা পয়সা পেত সেই কাঁথা সেলাই করে। শুধু কাঁথা সেলাই নয়। চিঠি লেখা, জামা সেলাই করা, মুড়ি ভাজা, কত লোকের কত রকমের কাজ করে দিত মা। তার বদলে একটা কি-চারটে পয়সা মা পেত। সেই চারটে পয়সাই মা তুলে রাখতো কাঠের বাক্সের মধ্যে। প্রাণ ধরে মা খরচ করতো না। মা ভাবতো, দীপুর জন্যে থাক্, দীপুর লেখাপড়ার খরচ আছে, দীপুর জামা-কাপড়ের খরচ আছে, দীপুর কত খরচ আছে। সামনেই কত বড় জীবন পড়ে আছে দীপুর। দীপু মানুষ হবে, দীপু বড় চাকরি করবে, দীপু আর পাঁচজনের একজন হবে। দীপুর জন্য মা'র ভাবনার অন্ত ছিল না।

ঠিক হাজরা রোডের কাছে আসতেই কিরণের সঙ্গে দেখা। চোখ-মুখ বসে গেছে রোদ্দুরে। স্নান-খাওয়া হয়নি বোধহয় তখনও।

দীপঙ্করকে দেখেই কিরণ এগিয়ে এল। একগাল হেসে বললে—তোকেই তো খুঁজছিলুম দীপু—

দীপঙ্করের কাছে এসে বললে—খুব সুখবর আছে একটা রে

দীপঙ্কর বললে—কী খবর ?

কিরণ বললে—নির্মল পালিতকে মেম্বার করেছি আমাদের লাইব্রেরীতে জানিস—মাসে এক টাকা করে চাঁদা দেবে—আমাকে যেতে বলেছে—

সেই নির্মল পালিত! কালিঘাট ইস্কুল থেকে ফিফ্‌থ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে সাউথ সাবার্বণ ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। বরাবর ফার্স্ট হতো। একদিন দীপঙ্কর আর কিরণ গিয়েছিল আবার। তখন কিরণের বাড়ির বাইরের দিকে একটা চালাঘরে সবে লাইব্রেরী হয়েছে। অনেক বই যোগাড় হয়েছে। কিরণের বাড়িতে যত পুরোন পাঁজি ছিল, রামায়ণ-মহাভারত ছিল, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি ছিল, সব জড়ো করে কিরণ তার লাইব্রেরী করেছে। মেম্বারদের নাম লিখেছে একটা খাতায়। সকলকে চাঁদা দিতে হবে। তারপর লাইব্রেরীটা আরো বড় হলে তখন একটা বাড়ি করা হবে হাজার টাকা দিয়ে।

কিরণ বলতো—দেখবি তিন হাজার বই করে ফেলবো আমি আর ক'টা দিনে—

তারপর দীপঙ্কর আর কিরণ এর বাড়ি ওর বাড়ি বই ভিক্ষে করে নিয়ে আসতো। পড়ার বই আর কারো বাড়ি রইল না। যত বই বাড়িতে ছিল সব একদিন দিয়ে এল কিরণকে।

কিরণ বলতো—একদিন চাঁদার খাতাটা নিয়ে ঘুরতে হবে বাড়ি বাড়ি—

বই হলো, কিন্তু চাঁদা আর ওঠে না।

রাখাল ছিল চণ্ডীবাবুদের বাড়ির ছেলে। বড়লোক খুব। দুপুরবেলা বাড়ির দারোয়ান রামধনি টিফিনের সময় একটা কাঁসার গ্লাসে ঢাকা দেওয়া দুধ আনতো আর চারটে রসগোল্লা। ইস্কুলের দারোয়ান দুপুরবেলা গেট বন্ধ করে দিত। যে-ছেলেরা পয়সা পেত বাড়ি থেকে, তারা গেটের ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে আলু-কাবলি, ঘুগনিদানা, আমসত্ত্ব কিনতো। লটারির বিস্কুটও ছিল। একটা নম্বর-লাগানো থালার ওপর একটা কাঁটা ঘুরিয়ে দিত। কাঁটাটা ঘুরতে ঘুরতে যত নম্বরে এসে থামতো সেই ততগুলো বিস্কুট দিত এক পয়সায়। আর টিফিনের ঘণ্টা বাজবার একটু আগে থেকেই রামধনি এসে দাঁড়িয়ে থাকতো দুধের গ্লাস নিয়ে। জায়গাটা বেশ ছায়া-ছায়া। একটা মাধবীলতার গাছ গেটের ওপর উঠে ঢেকে দিয়েছিল জায়গাটা। মাধবীলতার শেকড়টাও অশ্বত্থ গাছের মত মোটা হয়ে গিয়েছিল।

রামধনি ডাকতো—এ-দাদাবাবু, এ-দাদাবাবু—

রাখাল মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারার ছেলে। হাফ প্যাণ্ট, শার্ট এঁটে বসে থাকতো ক্লাসে। টিফিনের ঘণ্টায় ইস্কুলের মাঠে লাট্টু ঘোরাতে সবাই ব্যস্ত তখন। কিংবা চোর-পুলিস। চোর-পুলিস খেলাটাই ছিল বেশি মজার। একজন চোর হতো, আর সবাই পুলিস হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতো। তারপর ছিল ঘুর্ণিফল। ঘুর্ণিফল খেলাও ছিল মজার।

রামধনি আবার ওধার থেকে ডাকতো—এ-দাদাবাবু, দাদাবাবু দুধ খেয়ে যাও—

শেষকালে যখন কিছুতেই খাবে না রাখাল, তখন রামধনি অ্যাসিস্টেণ্ট হেড-মাস্টারকে গিয়ে বলতো। অ্যাসিস্টেণ্ট হেড-মাস্টার ছিলেন রামরতনবাবু। ভারি কড়া লোক। বগলের তলা দিয়ে চাদরটাকে ঘুরিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখতেন। রামধনির কথা শুনেই দৌড়ে আসতেন। এসেই হাঁক দিতেন—এই ইস্টুপিড্—

রাখাল মুখ কাঁচুমাচু করে খেলা ছেড়ে এসে দাঁড়াতো।

রামরতনবাবু বলতেন—দুধ খাচ্ছো না কেন, দুধ খাও—

রাখাল আস্তে আস্তে রামধনির হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে চোঁ-চোঁ করে সব দুধটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলতো। তারপরে চারটে রসগোল্লা একটার পর একটা মুখে পুরে দিত। রসগোল্লাগুলো চিবোতে চিবোতে যেন দম আটকে আসতো রাখালের। দীপঙ্কর, কিরণ, ফটিক, বিমান, লক্ষ্মণ সরকার সবাই চেয়ে চেয়ে সেই রসগোল্লা খাওয়া দেখতো তার। রাখালের রসগোল্লা চিবানো দেখে মনে হতো সে যেন একমুখ নিমপাতা খাচ্ছে।

সবটা খাওয়া হয়ে গেলে রামরতনবাবু বলতেন—আর যেন কখ্‌খনো তোমার নামে কমপ্লেন না শুনতে হয় আমার—বুঝলে ?

রাখাল মুখ নিচু করে ঘাড় নাড়তো।

রামরতনবাবু আবার বলতেন—দুধ খেতে এত গোলমাল কর কেন বুঝতে পারি না, জানো দুধ এত পুষ্টিকর খাবার, দুধ খেলে শরীর ভালো হয়, আর শরীর ভালো হলে ব্রেনও ভালো থাকে, ব্রেন ভালো হলে তবে তো লেখাপড়া করতে পারবে—যাও—

বলে রামরতনবাবু চলে যেতেন।

তখন রাখাল নিজমূর্তি ধরতো। রামধনিকে বলতো—দাঁড়া, তোকে আজকে আমি কী করি। তুই যখন ঘুমোবি, তখন তোর টিকি কেটে দেব—

কথাটা বলতেই দীপঙ্কর, ফটিক, কিরণ, বিমান সবাই হো-হো করে হেসে উঠতো। তখন রাখাল একটা ছড়া কাটতো—

রামধনি পাঁড়ে
দই নেই ভাঁড়ে—
পাঁড়ের মাথায় লম্বা টিকি
টিকি নিয়ে খরচ লিখি—
টিকি কাটবো কচ্‌কচিয়ে—
পাঁড়ে মরবে ছট্‌ফটিয়ে।

এ সেই রাখাল। এক-একদিন রাখাল কিছুতেই আর রসগোল্লা খেতে

পারতো না। দীপুকে বলতো—এই দীপু, খাবি?

রামধনি দীপঙ্করের দিকে কটমট করে তাকিয়ে দেখতো।

দীপঙ্কর বলতো—না ভাই, আমার পেট ভর্তি আছে—

কিরণ সেই রাখালকেও মেম্বার করেছিল লাইব্রেরীর। এক আনা করে চাঁদা। মাসে মাসে দিতে হবে। বেশি দিলে ক্ষতি নেই। সেই পয়সায় বই কিনে বিরাট লাইব্রেরী হবে। তারপর যখন আরো পয়সা হবে লাইব্রেরীর, তখন একটা ঘর তৈরি করা হবে। তখন সবাই আসবে লাইব্রেরী দেখতে। মহাত্মা গান্ধী এলে তাঁকে ডেকে দেখানো হবে। জে এম সেনগুপ্ত আসবেন। ভালো ভালো বই সব থাকবে লাইব্রেরীতে।

রাখাল বললে—আমি তোদের অনেক বই দেব—আমাদের বাড়িতে অনেক বই আছে—

সত্যিই কিরণ গিয়ে বই নিয়ে এসেছিল। মোটা মোটা বাঁধানো বই সব। সবই ইংরিজী। তা ইংরিজী বইও থাক। ইংরিজী বইও থাকা দরকার।

রাখাল বললে—কাউকে বলিস নি যেন, র‍্যাপারের মধ্যে পুরে নিয়ে যা ভাই, দাদু দেখতে পেলে বকবে—

কিরণ র‍্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে বইগুলো এনেছিল। সমস্ত দিন কিরণ সেই লাইব্রেরীর মধ্যেই থাকতো। বইগুলো বার করে সাজিয়ে রাখতো। আলমারি নেই, টেবিল নেই, চেয়ার নেই, কিচ্ছু নেই। শুধু একটা মাদুর পাতা মেঝের ওপর। আর দেয়ালের গায়ে বইগুলো ইঁট পেতে সার সার করে দাঁড় করানো। অনেকদিন দীপঙ্কর গিয়ে দেখেছে কিরণ একলা চুপ করে বসে আছে ঘরের ভেতরে—

দীপঙ্কর বলতো—কীরে, একলা কী করছিস?

কিরণ বলতো—কেউ আসে না, কেউ না এলে আমি একলা কী করে লাইব্রেরী চালাবো বুঝতে পারছি না ভাই—

আশ্চর্য কিরণের ধৈর্য। বই আছে, মেম্বার নেই। কেউ আসে না লাইব্রেরীতে। সেই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে কারোর তেমন মাথাব্যথা নেই। সবাই তখন ফুটবল খেলতে গেছে পার্কে, কিম্বা হরিশ পার্কে গেছে, কিম্বা রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। তখন কিরণ একলা-একলা অন্ধকার ঘরে লাইব্রেরী করছে। লাইব্রেরী ঝাঁট দিচ্ছে, বইগুলোর ধুলো ঝাড়ছে, বইতে নম্বর দিচ্ছে, খাতায় নামগুলো লিখে ক্যাটলগ তৈরি করছে! কাজ তো একটা নয়!

কিরণ বললে—বোস্, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে—

দীপঙ্কর বললে—কী?

—আমাদের লাইব্রেরীর একটা নাম দিতে হবে ভাই, আমি একটা নাম ভেবেছি, নামটা কী রকম হয়েছে বলতো—দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী—

দীপঙ্কর বললে—খুব ভালো নাম হয়েছে—

কিরণ বললে—একটা সাইনবোর্ড টাঙাতে হবে—একটা টিন দিতে পারিস—চৌকো-মতন—আমি রং দিয়ে লিখে নেব—

সে টিনও শেষ পর্যন্ত যোগাড় হয়েছিল। অঘোরদাদুর উঠোনে একটা ক্যানেস্তারার টিন পড়েছিল বহুদিন ধরে। সেই টিন পিটিয়ে সোজা করে বাক্স রং-করার দোকান থেকে রং এনে ইংরিজীতে সাইনবোর্ড তৈরি হয়েছিল। শুধু সাইনবোর্ডই নয়, রবার স্ট্যাম্পও একটা এনেছিল কিরণ। প্রেসিডেণ্ট হয়েছিল দীপঙ্কর আর সেক্রেটারি হয়েছিল কিরণ।

কিরণই ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায় করতো। ক্লাসের সব ছেলের কাছ থেকে আদায় হলো চাঁদা। তারপর ক্লাসের বাইরে। মধুসূদনের বড়দা দিলে দু আনা। দুনিকাকাও দিলে দু আনা—

দুনিকাকা বললে—আবার লাইব্রেরী কেন রে বাবা, লাইব্রেরী করে কী হবে? লেখাপড়া করিস মন দিয়ে?

কিরণ বললে—আউট বুক পড়বো, তাই—

—কী আউট বুক পড়বি শুনি? আউট বুক মানে কি আগে বল্ দিকিনি? আউট বুক বানান্ কী বল্ দিকি আগে তোরা—

দীপঙ্কর একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিরণ বললে—বাইরের বই না পড়লে তো নলেজ হয় না—

—আবার নলেজ শিখেছে! নলেজ বানান্ করতে পারিস ছোঁড়া? নলেজ নিয়ে কি ধুয়ে খাবি সব? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হবি?

ছোনেদা বললে—আহা চাইছে দু আনা পয়সা, দিয়ে দাও না দুনিকাকা—

দুনিকাকা রেগে গেল। বললে—আরে, তুই বুঝিস না, দেখছিস পাড়ায় সি-আই-ডি ঘুরছে, স্বদেশী বই-টই যদি রাখে তো কোনদিন বিপদ হবে এমন। শেষ টেগার্ট সাহেব খবর পেলে মেরে তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেবে সকলকে—টেগার্ট সাহেবকে তো চেন না—

যাহোক, শেষ পর্যন্ত দুনিকাকা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দোয়ানি বার করে দিলে।

কিরণ একটা রসিদ দিতে যাচ্ছিল। দুনিকাকা বললে—আর রসিদ দিতে হবে না, শেষকালে নাম দেখে কোনদিন ইলিশিয়াম রোতে ধরে নিয়ে যাবে তখন চাকরিটি খতম—টেগার্ট সাহেবকে তো চেনো না—

সেই কিরণ! যখন ইস্কুলের সব ছেলেরা লেখাপড়া গল্প ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত, তখন কিরণ তার লাইব্রেরী নিয়ে মেতেছে। কিরণের বড় সাধ ছিল, দেশে স্বরাজ আসবে, সি আর দাশ তার দেশের রাজা হবে। বড় সাধ ছিল তার বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, তাদের অবস্থা ফিরবে। কিন্তু সি আর দাশ মারা যাবার পর

থেকেই কিরণ যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ লাইব্রেরীর ভূত ঢুকলো মাথায়। যখন সবাই নানান কাজে মত্ত, কিরণ তখন লাইব্রেরী নিয়ে দিন-রাত মাথা ঘামাচ্ছে। মানুষের সংসারে এমনি অবুঝ লোক বোধহয় দু-একটা থাকে। পৃথিবীতে এমনি বেহিসেবি লোক বোধহয় দু-একটা বাস করে। তারা কাজ করে মনে-প্রাণে, নিষ্ঠা নিয়ে কাজের চেষ্টাও করে। তারপর একদিন কোথায় থাকে তাদের কাজ, আর কোথায় থাকে তারা। সবাই যখন কাজের সাফল্যে একেবারে প্রথম সারিতে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আসল মানুষটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সেই বেহিসেবি কাজ-পাগল মানুষটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়, কেউ আর তার খোঁজও রাখে না। কেউ আর তার সন্ধানও নেয় না।

কিরণের সঙ্গেই আগে একবার নির্মল পালিতের বাড়িতে গিয়েছিল দীপঙ্কর।

চন্ডীবাবুদের মত ব্যারিস্টার পালিতও ছিলেন বড়লোক। কিন্তু অন্য ধরনের বড়লোক। চন্ডীবাবুরা বনেদী। গাড়ি ছিল, সরকার মুহুরী, গোমস্তা দারোয়ান, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, দোল-দুর্গোৎসব সবই ছিল। তাদের ছেলেরা রাখাল খেত দুধ আর রসগোল্লা। কিন্তু ব্যারিস্টার পালিত ছিল নতুন আমদানি। কবে একদিন হাইকোর্ট হয়েছিল কলকাতায়, পঞ্চায়েত উঠে গিয়ে ধর্মাধিকরণের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজের সাম্রাজ্যে। সেদিন উদ্দেশ্য যত সৎই থাক, আকাঙ্ক্ষা যত বিরাটই থাক, আর একদল মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে। সে-মানুষেরা কালিঘাটে যেত না, দোল-দুর্গোৎসবে যোগদান করতো না, তারা বাঙালী হয়েও থাকতো সায়েব পাড়ায়। তাদের বাড়িতে রান্না করতো বাবুর্চি-খানসামা, ছেলে মানুষ করতো আয়া, বাবাকে বলতো ড্যাডি, আর মাকে বলতো মাম্মি।

নির্মল পালিত ছিল সেই সমাজের। দারোয়ান ইস্কুলে নিয়ে এসে পৌঁছে দিত। আবার ছুটির সময় সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেত। ভালো করে ভাবও হয়নি নির্মলের সঙ্গে। বড়জোর মাঝে-মাঝে রাস্তায় পথে পার্কে দেখা হয়েছে। দেশবন্ধু যেদিন মারা যান, সেদিন দারোয়ানের সঙ্গে দেখেছে রাস্তায়। দেশবন্ধুও তো ব্যারিস্টার ছিলেন। ব্যারিস্টার পালিতের সম-ব্যবসায়ী। বোধহয় সেই কারণেই।

মনে আছে দীপঙ্করের কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল নির্মল পালিতের বাড়ি যেতে। এক-একটা বাড়ি থাকে, যার সামনে গেলেই ঢুকতে ভয় করে। নির্মল পালিতদের বাড়িটাও ঠিক তেমনি। সামনে একটু ঘেরা বাগান মতন। সেখানে একটা দারোয়ান বসে থাকে। অনেক সময় একটা কুকুরও বসে থাকে সামনে।

কিরণ বললে—চল্ ভয় কীরে, আমরা তো চোর নই—ভেতরে চল্—

আরো অনেক আগের কথা মনে আছে। কিরণদের লাইব্রেরী তখন সবে শুরু হয়েছে। চাঁদার জন্যে তখন যার-তার কাছে হাত পাতছে কিরণ। কিরণ একলা লাইব্রেরী গড়ে তুলবে। তার আর কোন দিকে জ্ঞান নেই। এসব সেই সময়ের কথা।

বাড়ির সামনে গিয়ে সেদিনও দীপঙ্কর থমকে দাঁড়িয়েছিল।

কিরণ অভয় দিয়েছিল। বলেছিল—ভয় কিরে, চল্—

দীপঙ্কর বললে—ভয় করছে ভাই, যদি তাড়িয়ে দেয়—

—কে তাড়িয়ে দেবে, আমি তো যাচ্ছি, আমার সঙ্গে চলে আয়—

বলে আগে আগে যেতেই কোথা থেকে এক দারোয়ান এগিয়ে এসে বললে—কোন্ হ্যায়—কেয়া মাঙ্‌তা ইধার?

দীপঙ্কর ভয় পেয়ে পালিয়েই আসছিল। কিরণও প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেই সামলে নিলে। তারপর দারোয়ানের সামনে মাথা তুলে বললে—নির্মলবাবু আছে? নির্মলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

—খোকাবাবু?

কিরণ বললে—হ্যাঁ, খোকাবাবু! খোকাবাবুর সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছি আমরা, খোকাবাবুর ক্লাসফ্রেন্ড আমরা—

দারোয়ান কিছু বুঝলো না। বললে—তব্ সাহেবকা পাস্ চলো—

কিরণকে নিয়ে দারোয়ান ঘরের দিকে যাচ্ছিল। কিরণ পেছনে ফিরে বললে—আয় না দীপু, চলে আয়—আমি তো আছি ভয় কী!

কিরণের অভয় পেয়ে দীপঙ্করও পেছন-পেছন গেল। গাড়ি-বারান্দার নিচে কী চমৎকার সাজানো। একটা কুকুর জিভ্ বার করে চেয়ে দেখছে। টবের ওপর বাহারি ফুলগাছ বসানো রয়েছে। একটা দাঁড়ানো দাঁড়ের ওপর একটা কাকাতুয়া। বসে বসে মাথা দুলিয়ে সব দেখছে। পাশেই একটা ন্যাংটো পরী। শ্বেত পাথরের তৈরি। পরীটা কাপড় সামলাতেই ব্যস্ত।

দীপঙ্কর আর কিরণ দারোয়ানের পেছনে-পেছনে গিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল।

দারোয়ান ঘরের দরজাটা খুলতেই কে একজন সাহেবি জামা-কাপড়-পরা লোক যেন চিৎকার করে উঠলো। মনে হয় নির্মলের বাবা, ব্যারিস্টার পালিত।

একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। কিরণ সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। দীপঙ্করও ভেতরে ঢুকলো। একজন বাঙালীবাবুর মতন লোক একেবারে হাঁ-হাঁ করে সামনে এগিয়ে এসেছে দরজার দিকে।

কিরণের সাহস আছে খুব বলতে হবে। বললে—নির্মল আছে?

হঠাৎ ব্যারিস্টার চেঁচিয়ে উঠলেন—Who are these urchins Babu?

বাবুটি নিজেই যেন এক মহা অপরাধ করে ফেলেছে। হন্তদন্ত হয়ে বললে—খোকা, তোমরা এখন যাও, তোমরা এখন যাও এখান থেকে—সাহেব রাগ করছেন—

দারোয়ান এতক্ষণে সুবিধে পেয়ে গেল। বললে—চলো, চলো, নিকালো—

কিরণ কিছুতেই দমবার পাত্র নয়। বললে—আমরা নির্মলকে খুঁজতে এসেছি—

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো! ব্যারিস্টার পালিত চিৎকার করে উঠলেন—Ask them to clear out......

ইংরিজি কি বাঙলা কী ভাষায় যে কথাটা বলা হোল, কিছু বোঝা গেল না। বোঝবার অবকাশও দিলে না কেউ। দারোয়ান ততক্ষণ তাদের দুজনকে বাইরে টেনে নিয়ে এসেছে। তারপর দীপঙ্কর আর কিরণ প্রায় একরকম গলাধাক্কা খেয়েই সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

দীপঙ্কর বলেছিল—আর কখখনো আসবো না ভাই নির্মলদের বাড়িতে—

কিরণ বলেছিল—আলবত আসবো, লাইব্রেরীর চাঁদা নিতেই হবে নির্মলের কাছ থেকে—

মনে আছে রাস্তায় এসে বাড়িটার দিকে ফিরে চেয়ে দেখেছিল দীপঙ্কর। কোথায় যেন একটা কর্কশ রুক্ষতা একটা মায়া-মমতাহীন কাঠিন্য মাখানো আছে বাড়িটাতে। এত সাজিয়েছে, এত ফুলের টব, এত কাকাতুয়া, এত ন্যাংটো পরী, তবু যেন কোথায় কী নেই, যেন সব থেকেও সব কিছু হারোনো। সব পেয়েও সব কিছু খোয়া যাওয়ার ছাপ লেগে আছে গায়ে। যেন কাকাতুয়া পাখিটার ওই মাথা ফোলানো গম্ভীর চেহারাটার মধ্যেই বাড়িটার আসল কথা লুকিয়ে আছে।

কিরণ সেদিন বলেছিল—ঠিক আছে, দেখবি, আমি ঠিক চাঁদা আদায় করবো, চাঁদা না দিয়ে ও যাবে কোথায়—

তা এতদিন পরে কিরণের কাছে নির্মল পালিতের নাম শুনে দীপঙ্কর কেমন যেন অবাক হয়ে গেল।

কিরণ বললে—নির্মলকে মেম্বার করেছি জানিস্ মাসে এক টাকা করে চাঁদা দেবে বলেছে—আমাকে যেতে বলেছে নির্মল, যাবি আজ?

দীপঙ্কর বললে—যদি ওর বাবা আবার তাড়িয়ে দেয়?

—দূর, ওসব ভয় করলে লাইব্রেরী করা চলে না! ওরকম লোকে কত তাড়িয়ে দেবে, কত গালাগালি দেবে। তাহলে আর কাজ হবে না কিছুই।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোর বাবা জানে, তুই ফেল করেছিস?

কিরণ বললে—জানলে আর কী করবে, কথা তো বলতে পারে না মোটেই, গলাটা আরো ফুলে গেছে বাবার—

—কিন্তু কী করবি তুই? আবার পড়বি?

কিরণ বললে—এবার পড়লে মাইনে লাগবে। আর ফ্রি তো করবে না, তা ছাড়া পড়েই বা কী হবে। ওই সংস্কৃত ধাতুরূপ আর ওই ইংরিজী ট্র্যানস্লেশন পড়ে কী-ই বা লাভ। আমি লাইব্রেরীতে বসে বসে অনেক বই পড়ে ফেলেছি—

—কী বই?

কিরণ বললে—এই ম্যাকসুইনী, ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডীর লাইফ-টাইফ সব পড়ে ফেলেছি, বুঝলি, আরো পড়বো। পড়ে পড়ে আমার অনেক জ্ঞান হয়েছে। তোরা সব কলেজে পড়, তোরা চাকরি-টাকরি কর, আমার ওসব হবে না—আমায় তো কেউ চাকরি দেবে না—আমি পড়বো কী জন্যে? কার জন্যে পড়বো? আর এটা সার জেনে গেছি যে, টাকা কোনওকালে হবে না আমার—

—কেন?

কিরণ বললে—দূর ভাই, আমি জেনে গেছি, জোর করে কেড়ে না নিতে পারলে কারো টাকা হয় না, এ দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত! কেড়ে নিতে না পারলে টাকাও হয় না, ও স্বরাজও হয় না—কেউ তোর মুখ দেখে তোকে টাকা দেবে না—পৃথিবীটা অত সোজা নয়—

দীপঙ্কর কিরণের কথা শুনে সেদিন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই কিরণও একদিন কত স্বপ্ন দেখেছে, কত আশা করেছে, কত ভালবেসেছে! হঠাৎ যেন তারই মুখে কথাগুলো অন্য রকম শোনালো। কিরণ যেন কেমন বদলে গিয়েছে। কোথায় গেল তার সেই সাধু? সেই খাঁটি হিমালয়ের সাধু? সোনার কার্তিকের ঘাটে বসে যে অনেক আশার কথা শুনিয়েছিল কিরণকে! কিরণের বাবার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, কিরণের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, কিরণের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে! সে সাধুই বা কোথায় গেল, সে কিরণই বা কোথায় গেল। কোথায়ই বা গেল সেই সি আর দাশ! কিরণের দিকে চেয়ে দীপঙ্করের মনে হলো, কিরণের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সেই ক'বছরে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী করে কেড়ে নিবি?

কিরণ বললে—মিথ্যে কথা বলবো, লোক খুন করবো, যা খুশী তাই করবো, সোজা মিষ্টি কথায় কিছু হবে না—

—তার মানে?

কিরণ বললে—তার মানে ওই সি আর দাশ, গান্ধী ওদের কথায় আর কিছু হবে না—কংগ্রেসের কথায় আর কিছু হবে না—কংগ্রেসের কথায় স্বরাজ হবে, না কলা হবে! ভজুদা আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে—

—কেন?

কিরণ বললে—সায়েবরা এত কষ্ট করে এদেশে এসেছে, এত বড় বাবসা-

বাণিজ্য কেঁদে বসেছে, সব আমাদের দিয়ে দেবে বলে? ভজুদা বলেছে সংসারে সব জিনিস কেড়ে নিতে হয়, ও বাড়িতেও যা সমাজেও তাই, দেশের বেলাতেও তাই! আয়ার্ল্যান্ড কেড়ে নিতে পেরেছিল তাই স্বাধীন হয়েছিল, আমেরিকা লড়াই করেছিল তাই স্বাধীন হতে পেরেছিল—জানিস্, বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—আমিও কেড়ে নেব সব—এবার থেকে পৈতে বেচবো না আর,—

—তাহলে কী করে চালাবি?

কিরণ বললে—সে আর একদিন বলবো তোকে সব, পয়সা উপায় করার সহজ উপায় আছে—ভজুদা সব শিখিয়ে দিয়েছে আমাকে—

—ভজুদা কে রে?

কিরণ বললে—আমার গুরু, তোকে একদিন আমার গুরুর কাছে নিয়ে যাবো, দেখবি তোর চোখ খুলে যাবে, জানিস, ভজুদা বলেছে আমরা যে গরীব লোক, সে ভগবানের দোষ নয়, মানুষের দোষেই আমরা গরীব। বড়লোকরাই আমাদের গরীব করে রেখেছে। সাহেবরাই তো বড়লোক! সাহেবদের যেমন করে হোক তাড়াতে হবে—তোকে একদিন নিয়ে যাবো ভজুদার কাছে, দেখবি সব প্ল্যান হচ্ছে আমাদের, এখন কিছু বলবো না—

নির্মলদের বাড়িটা এসে গিয়েছিল।

আবার সেই ব্যারিস্টার পালিতের বাড়িটা। সেই সামনে দারোয়ান বসে আছে। সেই সার-সার টবে ফুলগাছ সাজানো। সেই ঝুঁটি-ফোলানো কাকাতুয়াটা দাঁড়ানো দাঁড়ে বসে আছে। সেই ন্যাংটো পরীটা কাপড় সামলাতে ব্যস্ত।

আজ আর কিরণের ভয় নেই। কিরণ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে এই ক'দিনের মধ্যে। ম্যাট্রিকে ফেল করে কিরণ যেন সত্যিই অনেক শিখে গেছে। একদিনে যেন হঠাৎ সাবালক হয়ে উঠেছে কিরণ অথচ এই কিরণের সঙ্গেই কতদিন কত রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। কত অন্তরঙ্গ ছিল কিরণ তখন। মনে হতো কিরণ আর দীপঙ্কর যেন এক। এক তাদের সমস্যা, একই তাদের ভাগ্য! কিন্তু ভাগ্যবিধাতা তাকে ম্যাট্রিক ফেল করিয়ে যেন তাকে অনেক বড় করিয়ে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানী অনেক গুণী। দীপঙ্কর যেন কিরণের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে!

কিরণ সোজা হট্ হট্ করে সামনের গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো। আশ্চর্য! এমন বেপরোয়া তো কিরণ ছিল না আগে! এত সাহস কোথেকে পেলে কিরণ!

সেদিনকার সেই দারোয়ানই ঠিক তেমনি করে বসে ছিল।

কিরণ গিয়ে বললে—খোকাবাবু হ্যায়?

দারোয়ান উঠে দাঁড়াল। বললে—ঠাইরিয়ে—

বলে সোজা ভেতরে চলে গেল। কিরণ বললে—দেখলি তো! এই বেটাই সেদিন কীরকম তেরিয়া-মেরিয়া করেছিল মনে আছে তো?

সত্যি দীপঙ্করও দারোয়ানের ব্যবহারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ কী

হলো? এমন তো হবে আশা করেনি সে। খানিক পরেই নির্মল এল। একটা পা-জামা পরা। অনেকদিন পরে নির্মলকে দেখলে দীপঙ্কর। সামান্য-সামান্য গোঁফের রেখা উঠেছে মুখে। গলাটা একটু ভারি হয়েছে। সেই নির্মল পালিত! যেন চেনা যায় না ঠিক। যেন অনেক বদলে গেছে। একটা শার্ট পরেছে। চুল-গুলো আলুথালু।

নির্মল হাসলো। বললে—দীপু তুই? কত বড় হয়ে গেছিস রে? চেনাই যায় না তোকে?

দীপঙ্করেরও হঠাৎ যেন মনে হলো তাহলে শুধু নির্মলই নয়, সে-ও বদলে গেছে নাকি! সে-ও বড় হয়েছে নাকি!

নির্মল বললে—প্রথমটা তোকে চিনতেই পারিনি—

দীপঙ্কর বললে—তুই ফার্স্ট হয়েছিস?

নির্মল বললে—আমার তো ছ'টা মাস্টার ছিল—তোর কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছি কোনরকমে—

কিরণ মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—ওসব কথা থাক্ তোদের, আমার চাঁদাটার কী হলো বল্? দিবি না?

দীপঙ্কর ভাবছিল সেই নির্মল পালিত! তাকে চিনতে পেরেছে, তার সঙ্গে কথা বলেছে! তার মত গরীব ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাটাই তো যথেষ্ট! তার আবার এত খাতির! ওদের কি কম টাকা! ওদের কি কম প্রতিষ্ঠা! এক ডাকে সারা কলকাতার লোক ওর বাবাকে চিনবে। সেই তাঁর ছেলে! সেই ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হওয়া ছেলে। থাক্ না ছ'টা মাস্টার! ছ'টা মাস্টার কে রাখতে পারে? আর ছ'টা মাস্টার থাকলেই কি সবাই ফার্স্ট হতে পারে! তবু তো দীপঙ্কর লোককে বলতে পারবে যে ফার্স্ট বয় নির্মল পালিত তার বন্ধু! সেদিন ব্যারিস্টার পালিতের কাছে গালাগালি খাওয়ার সমস্ত অপমান যেন এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কিরণ বললে—বিলেত যাবার আগে আমাকে এক বছরের চাঁদাটা দিয়ে দিস্—আমার পাঁচ শো বই হয়ে গেছে আর সাত শো বই হলেই লাইব্রেরীটা একজনকে দিয়ে ওপন্ করাবো—

নির্মল বললে—কিন্তু তুই ফেল করলি কেন কিরণ?

কিরণ বললে—পাশ করলেই বা কী হতো? আমি তো আর পড়তে পারতুম না—অত টাকা কোথায় পাবো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুই বিলেত যাচ্ছিস!

নির্মল বললে—বাবার খুব ইচ্ছে—

নির্মল পালিত ফার্স্ট হয়েছে শুনে তবু কিছুটা আনন্দ হচ্ছিল দীপঙ্করের। কিন্তু তার বিলেত যাওয়াটা শুনে কেমন যেন পর মনে হলো নির্মলকে। মনে হলো নির্মলের সঙ্গে তাদের অনেক তফাত।

দীপঙ্কর বললে—বিলেত যেতে তো অনেক টাকা লাগে নারে?

নির্মল বললে—সে বাবা জানে, আমার কী!

কিরণ টাকাটা নিয়ে একটা রসিদ লিখে দিলে। এক টাকা চাঁদা। মাসে এক টাকা! ওদের কাছে কিছুই না। অমন কত টাকা কত দিকে খরচ হচ্ছে ওদের। ওটা ওদের গায়ে লাগে না। একটা টাকা ওদের কাছে সত্যিই কিছুই নয়। আশ্চর্য! কেমন অবলীলায় একটা টাকা দিয়ে দিলে।

গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। এই বাড়িতেই একদিন আরো ছোটবেলায় ঢোকবার জন্যে দূর থেকে কত লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে দীপঙ্কর। এই বাড়িতেই একদিন ঢুকে নির্মল পালিতের বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে দীপঙ্কর। এতদিন পরে নির্মলের সঙ্গে সেই বাড়ির গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে যেন বড় আনন্দ হলো দীপঙ্করের। যদি চাঁদা নাই-ই দিত, তবু কোনও দুঃখ ছিল না দীপঙ্করের। নির্মল পালিত তো তার সঙ্গে কথা বলেছে। নির্মল পালিত তো তাকে চিনতে পেরেছে। সেইটেই তো যথেষ্ট।

নির্মল হঠাৎ বললে—চা খাবি?

দীপঙ্কর বললে—চা?

নির্মল বললে—আমাদের চা-খাবার টাইম হলো কি না—আজকে দিদির দুজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করা হয়েছে আমাদের বাড়িতে—

কিরণ হঠাৎ বললে—দূর আমরা চা-টা খাবো না, চা হলো কুলীদের রক্ত—

নির্মল অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—কুলীদের রক্ত?

কিরণ বললে—হ্যাঁ, চা-বাগানের সাহেবরা কুলীদের পেটে বুটের লাথি মেরে পিলে ফাটিয়ে চা তৈরি করে। ওই চা-খাওয়া আর কুলীদের রক্ত খাওয়া সমান—

নির্মল অনেক বই পড়েছে। কিন্তু এসব কথা কখনও কোনও বইতে পড়েনি। কথাটা শুনে সে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিরণের দিকে। যেন নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার একটু। তারপর বললে—চা আমরা কিন্তু রোজ খাই যে—

কিরণ বললে—তোরা চা খেগে যা। আমরা খাই না, আমিও খাই না দীপুও খায় না—আর কখনও খাবেও না—দেখিসনি খবরের কাগজে বেরিয়েছে আসামে একটা সায়েব বুটের লাথি মেরে একটা কুলীর পেটের পিলে ফাটিয়ে দিয়েছে—

নির্মল বললে—আমি এখন যাই ভাই, টি-টাইম হয়ে গেল—দিদিরা বসে আছে—এক্ষুণি দিদির বন্ধুরা এসে পড়বে—

বলে নির্মল চলে গেল। কিরণ দীপুকে নিয়ে বাইরে এল।

দীপঙ্কর বললে—এই চা খেলি না কেন তুই? চা খেয়ে দেখতুম কেমন লাগে খেতে—

কিরণ বললে—দূর, লালচে রং,—গরম জলের মত—আমি খেয়েছি একবার—

নির্মল চলে যেতেই দীপঙ্কর আর কিরণ গেট খুলে বাইরে রাস্তায় আসছিল। হঠাৎ দেখলে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামলো বাড়ির সামনে। গাড়িটাকে দেখেই দারোয়ান কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে গেটটা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে সেলাম করলে। আর গাড়িটা এসে ঢুকলো গাড়ি-বারান্দার তলায়।

নির্মলদেরই গাড়ি। হঠাৎ দীপঙ্করের ভয় হলো। যদি গাড়ির ভেতরে নির্মলের বাবা থাকে। যদি নির্মলের বাবা দেখতে পায় তাদের। দেখতে পেয়ে সেদিনকার মত বকে আবার।

দীপঙ্কর বললে—পালিয়ে চল্ কিরণ—নির্মলের বাবা আসছে বোধহয়—আবার বকবে হয়ত—

কিন্তু না। দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল দেখে। নির্মল পালিতের বাবা নয়। ভেতর থেকে নামলো লক্ষ্মীদি আর সতী! আর নামতেই দারোয়ানটা সোজা হয়ে আবার সেলাম ঠুকলে দুজনকে।

লক্ষ্মীদি প্রথমে দেখতে পায়নি। সতী ছিল পেছনে। সেই ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলভর্তি মাথা। এক রকমেরই শাড়ি পরেছে আজ দুজনে। লক্ষ্মীদির চুল বেণী করে পিঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। দুজনেই তার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখতে পায়নি।

দীপঙ্কর বললে—চল্ কিরণ এখুনি দেখে ফেলবে—

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—কে রে ওরা?

দীপঙ্কর বললে—বাইরে রাস্তায় গিয়ে বলবো—

তাড়াতাড়ি হন্ হন্ করে রাস্তার দিকে যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে লক্ষ্মীদির গলার আওয়াজ এল—কে রে? দীপু না? এই দীপু শোন্—

দীপঙ্কর পেছন ফিরলো। লক্ষ্মীদি আর সতী সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দীপঙ্কর সামনে এগিয়ে গেল।

লক্ষ্মীদি সিঁড়ির দুটো ধাপ নেমে এসে জিজ্ঞেস করলে—দীপু? তুই এখানে কী করতে রে?

দীপঙ্করও যেন সত্যি-সত্যি অবাক হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীদি সামনে এসে দীপুর দুটো কাঁধে হাত দিয়ে বললে—পালাচ্ছিলি কেন আমাকে দেখে?

দীপঙ্করের মুখে কথা হারিয়ে গেছে। সে কী বলবে বুঝতে পারলে না। কেনই বা সে লক্ষ্মীদিদের দেখেও পালিয়ে যাচ্ছিল। কেন, কীসের ভয় লক্ষ্মীদিকে! লক্ষ্মীদি তো আর তাকে কোনদিন মারে না। তবে? তবে কি লজ্জা! সতীকে দেখে লজ্জা! অথচ সতী তো তাকে চেনেও না। হয়ত মনেও রাখেনি তাকে। সতীও তার দিকে চেয়ে ছিল। দিদি কার সঙ্গে কথা বলছে, তাই দেখছিল।

দীপঙ্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন থর থর করে কাঁপতে লাগলো। বললে—তোমরা?

লক্ষ্মীদি বললে—আমাদের আজ চায়ের নেমন্তন্ন আছে এখেনে—তা তুই আর আসিস না কেন রে?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো।

লক্ষ্মীদি সতীকে ডেকে বললে—এই এর কথাই বলেছিলুম তোকে—কেবল তোর কথা জিজ্ঞেস করতো, জানিস! তুই কেমন দেখতে, ফরসা না কালো, এই সব—দিনরাত কেবল তোর কথা জিজ্ঞেস করতো—নে এখন মিলিয়ে দেখ, মিলেছে কি না—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—এই তো আমার বোন সতী রে—তুই অত জিজ্ঞেস করতিস সব কথা, সতী বলতে এত অজ্ঞান, আর সেই সতী এল তুই একবারও দেখতে এলি না?

সতী যেন তখন সামনে ভূত দেখেছে। সিঁড়ির ধাপ দুটো টপকে একেবারে দিদির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—ওমা, কী সর্বনাশ, এই সেই দীপু! সেই উঁকি মেরে মেরে দেখতো তোমাকে!

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কেন, তুই কী ভেবেছিলি?

সতী সে-কথায় কান না দিয়ে হঠাৎ দীপুর হাত দুটো ধরে ফেললে। বললে—তুমি কিছু মনে করো না কিন্তু—

লক্ষ্মীদিও অবাক হয়ে গেল যেন। বললে—ওমা তুই চিনিস নাকি ওকে? তুই ওকে চিনলি কী করে?

সতী বললে—আমি বুঝতেই পারিনি লক্ষ্মীদি, আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলাম......

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমাকে চাকর ভেবেছিলে বলে আমি কিছু মনে করিনি সেদিন—

বলে একটু থামলো দীপঙ্কর।

সতী বললে—সত্যিই আমার বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছিল—জানো লক্ষ্মীদি সেদিন আমি এর মাথায় মোট বইয়ে নিয়ে এসেছিলাম—

দীপঙ্কর বললে—আর চারটে পয়সাও দিয়েছিলে—

সতী এবার হেসে ফেললে। বললে—পয়সা চারটে নিলে না দেখে আমি ভাবলাম কম দিয়েছিলাম বলে বুঝি নিচ্ছে না—সত্যিই আমি কী করে বুঝবো বলো, আমি তো চিনতাম না, কলকাতায় সেদিন প্রথম এসেছি কিনা—

লক্ষ্মীদি বললে—ওমা তোদের এত কাণ্ড ঘটে গেছে আমি তো কিছু জানতাম না—সেই জন্যেই বুঝি তুই আসতিস না আমাদের বাড়িতে, আমি তাই ভাবছিলাম দীপু আসে না কেন—

দীপঙ্কর বললে—না লক্ষ্মীদি, সেজন্যে নয়, তোমাদের কাজ করতে পেলে আমি তো বেঁচে যাই—

লক্ষ্মীদি বললে—সত্যি রে সতী, দীপু আমার সব কাজ করে দেয়—ও কিছু মনে করেনি—

সতী সত্যিই খুব লজ্জায় পড়েছিল। বললে—না, না, আমি তোমায় কোনও কাজ করতে দেব না, আর তোমায় আমার কোনও কাজ করতে হবে না তা বলে—

লক্ষ্মীদি বললে—নারে, ওকে কাজ করতে দিস তুই নইলে ও উঁকি মেরে দেখবে—

কথাটা বলে লক্ষ্মীদি হাসলো। দীপঙ্কর লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললে।

সতী বললে—কিন্তু ছি ছি সত্যিই আমার খুব লজ্জা করছে—

লক্ষ্মীদি বললে—ওর কাছে আবার লজ্জা কীসের রে তোর, ওকে আগে কত মেরেছি, ওর কাছে আমার কোনও লজ্জা-টজ্জার বালাই নেই—তা আসিস্ তুই আমাদের বাড়িতে, আসবি তো? কবে আসবি? কাল? আমার একটা কথা আছে তোর সঙ্গে—

সতী তখনও তার দিকে চেয়ে ছিল। আবার বললে—ছি ছি, আমার বড় লজ্জা করছে সত্যি! ছিঃ—

লক্ষ্মীদি তার হাত ধরে টানলে। বললে—রাখ তুই, ওকে আর লজ্জা করতে হবে না তোর—চলে আয়—ভারি তো এক ফোঁটা লজ্জার মানুষ—

বলে লক্ষ্মীদি সতীকে টেনে নিয়ে ওপরে চলে গেল।

রাস্তায় কিরণ তখনও সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দীপঙ্কর কাছে আসতেই কিরণ বললে—ওরা কে রে? খুব লাগ্‌দার চেহারা তো? কে ওরা?

দীপঙ্কর বললে—ওই আমাদের অঘোরদাদুর ভাড়াটেদের বাড়ির মেয়ে—

দীপঙ্কর অন্যমনস্কের মতন কিরণের সঙ্গে হাঁটছিল। কিরণের কথাগুলো ঠিক তার কানে যাচ্ছিল না যেন। তার হাতটা চেপে ধরেছিল সতী। লজ্জায় পড়েছে সত্যিই! চিনতে না পারলে কী করবে! সতীর তো দোষ নয়!

কিরণ আবার বললে—ওদের সঙ্গে বুঝি খুব রগড়া-রগড়ি তোর?

দীপঙ্কর অন্যদিকে চেয়ে বললে—না, সে-সব কিছু নয়—

—তবে? ওরা খুব বড়লোক বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—বোধহয়—

—কী করে ওদের বাবা?

দীপঙ্কর তখনও আপন মনে ভাবছিল। সত্যিই সতীর আর দোষ কী! চিনতে পারেনি বলেই তাকে পয়সা দিয়েছিল। চিনতে পারলে তো আর দিত না। সতী লক্ষ্মীদির মতন নয় একেবারে। কত লজ্জায় পড়েছে যে। বার বার আফসোস করেছে। দীপঙ্করেরই লজ্জা হতে লাগলো! লক্ষ্মীদি কি সব বলে দিয়েছে? সেই উঁকি দিয়ে দেখার কথাও বলে দিয়েছে? হয়ত আরো অনেক কথাই বলেছে। কে জানে!

কিরণ বললে—কী রে, কথা বলছিস্ না যে?

—কী বলবো?

—কী করে ওর বাবা?

দীপঙ্কর বললে—শুনেছি নির্মলদের চেয়েও বড়লোক ওরা, বর্মায় কাঠের ব্যবসা ওদের—

কিরণ লাফিয়ে উঠলো। বললে—তাহলে তো খুব ভালোই হয়েছে রে, কেল্লা মেরে দিয়েছি—একটা কাজ কর্ না—

—কী কাজ?

—তুই করবি কি না বল্ আগে?

দীপঙ্কর বললে—কী কাজটা বল্ না—

কিরণ বললে—তোর সঙ্গে অত রগড়া-রগড়ি, আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার করে দে না ওদের, মাসে দু'জনে এক টাকা করে চাঁদা দেবে আর বই পড়বে?

দীপঙ্কর সে-কথার কোনও উত্তর দিলে না। নির্মলদের সঙ্গে ওদের আলাপ হলোই বা কী করে! কখনও তো শোনেনি লক্ষ্মীদির মুখে। এমন করে যে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে তাও তো ভাবেনি দীপঙ্কর। যে ক'দিন সতী এসেছে সে-ক'দিন কতবার লোভ হয়েছে ওদের বাড়ি যাবার জন্যে! কেবল মনে হয়েছে একবার যদি লক্ষ্মীদি ডাকে! একবার যদি রঘুকে পাঠিয়ে দেয়। নিজে যেচে যেতে কেমন যেন লজ্জা করতো দীপঙ্করের। সকালে-বিকেলে আমড়া গাছতলার আশেপাশে ঘুর-ঘুর করেছে।

মা বলেছে—হ্যাঁরে, ওখানে ঘুর-ঘুর করছিস্ কেন রে? ওখানে তোর কী?

জানালার পর্দার ফাঁকে একটা মুখ দেখবার জন্যে অনেকবার উঠোনে ঘোরাঘুরি করেছে। কেউ এদিকে দেখে না। এ-বাড়ির দিকে চেয়ে দেখবার গরজ কারো নেই। শব্দ করে কাশলেও কেউ উঁকি দেয় না এদিকে।

মা বলেছিল—ঠাণ্ডা লাগিয়ে আবার সর্দি কাশি করো—জ্বর বাধাও—তখন আমারই জ্বালা—

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে তখন। কত ভাবনা তখন মা'র। কোন্ কলেজে পড়বে, কে খরচ যোগাবে, কোথা থেকে বই আসবে, সব ভাবনা মা ভাবছে তখন। কাকে ধরে কার কাছ থেকে ভিক্ষে করে ছেলের পড়ার খরচ চলবে এইসব ভাবনায় মা তখন অস্থির। আর পড়া ছেড়ে একটা চাকরিও যদি কেউ জুটিয়ে দেয় তা-ও মা ভাবছে। কে-ই বা চাকরি দেবে! মা তখন দুপুর-বেলা ঘরে চাবি দিয়ে বেরোয়। ছেলের ভবিষ্যতের জন্যে এর বাড়ি ওর বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের কাছে ধর্না দেয়। যদি কর্তাকে বলে কোনও অফিসে ঢোকানো যায়! আর ওদিকে দীপঙ্কর তখন ঘরের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। যদি লক্ষ্মীদি ডাকে! যদি একবারটি ডেকে পাঠায়। যদি সতীকে আর একবার দেখতে পায়!

তা সেই অত চেষ্টা, অত পরিশ্রমেও যা হয়নি তাই-ই হলো নির্মলদের বাড়িতে চাঁদা চাইতে এসে। ভাগ্যিস্ কিরণের সঙ্গে এসেছিল সে এখানে—এই নির্মলদের বাড়িতে, নইলে হয়ত দেখা হবার সুযোগই মিলতো না।

কিরণ সঙ্গে যেতে যেতে এক-সময়ে বললে—যাকগে, এক টাকা করে যদি না দিতে চায় তো আট আনা করেই দিতে বলিস্—না-হয় আট আনাতেই দু'জনকে মেম্বার করে নেওয়া যাবে—কী বল্—

তখনকার দিনে কিরণ সত্যিই লাইব্রেরী ছাড়া আর কিছু ভাবতোই না। দীপঙ্কর ফটিক মধুসূদন সবাই কলেজে ঢুকেছে। সকালবেলা খেয়ে দেয়ে তিন চারজনে দল বেঁধে কলেজে যেত। আর কিরণ, কিরণের সঙ্গে দেখা হলেই লাইব্রেরীর কথা বলতো।

কিরণ বলতো—তোরা লাইব্রেরীতে কেউ না এলে আমি একলা সামলাবো কী করে?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কত মেম্বার হলো এ-পর্যন্ত?

মেম্বার অনেকে হয়েছিল অবশ্য। সবাই শুধু চাঁদা দেওয়ার মেম্বার। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কিরণ বার বার তাগাদা দিয়ে চাঁদা আদায় করে আনতো। কেউ দু' আনা, কেউ এক আনা, আবার কেউ বা খালি এক পয়সা। ছোট ছোট ছেলেরা আধলাও দিয়েছে।

রাস্তায় হয়ত ভিক্ষে করছে কিরণ। ট্রাম রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সুর করে বলছে—ভদ্রলোকেরা দয়া করে পৈতে কিনে নিয়ে যাবেন, ভদ্রলোকেরা দয়া করে...

রাস্তার ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন দু'জন হয়ত কিনতো পৈতে। সাত আট পয়সার পৈতে বিক্রী হলেই চলে আসতো কিরণ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে, বেশিক্ষণ ভিক্ষে করতে ভালো লাগতো না। তাছাড়া, দীপঙ্কর ছিল ছোটবেলা থেকে কিরণের সর্বক্ষণের সঙ্গী। ক্লাসেরও সঙ্গী, ভিক্ষেরও সঙ্গী। বরাবর এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছে, এক সঙ্গে ভিক্ষে করেছে, এক সঙ্গে মিটিং শুনতে গেছে—হঠাৎ দীপঙ্কর পাশ করে যাওয়াতে কিরণ যেন বড় একলা পড়ে গিয়েছিল। চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসে থাকতো। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন মাদুরটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো।

বাড়িতে এসে মাকে পয়সাগুলো গুনে দিত।

বলতো—আজকে ন' পয়সার বিক্রি হয়েছে মা—এই নাও—

মা বলতো—তা হ্যাঁরে, আর হলো না?

কিরণ বলতো—আর পৈতে কিনলে না কেউ—

—কেন? তুই ভালো করে ধরলেই কেনে, একটু মুখ ফুটে বল্‌বি তো, বলবি তো যে, বাবার অসুখ, আমাদের সংসার চলে না—

—ওকথা শুনে শুনে ওদের কান পচে গেছে, বিশ্বাস করে না আর—

মা বলে—ভালো করে বলতে জানলেই বিশ্বাস করবে, তুই পারিস না ভালো করে বলতে?

কিরণ বলে—ও বিশ্বাস করলেও আর কেউ পৈতে কিনবে না।

—কেন? পৈতে ছিঁড়ে গেলেই তো কিনবে। বামুনেরা গলায় পৈতে না দিয়ে থাকবে নাকি?

কিরণ বেশি কথা বললে রেগে যেত। বলতো—পৈতে আজকাল কেউ পরে? বামুনরাও পৈতে পরা ছেড়ে দিচ্ছে—তুমি বাড়ির ভেতর থাকো, তুমি কী করে জানবে! বামুন-শুদ্দুর-বেনে সব এক হয়ে গেছে—ও সুতো গলায় ঝুলিয়ে কী হয়?

কিরণের মাকে কখনও জোরে কথা বলতে শোনেনি দীপঙ্কর। কিরণের মা কথাগুলো শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে যেত। হতবাক হয়ে যেত। বামুনরা পৈতে গলায় দেবে না? তাই কখনও হয়? তাহলে চন্দ্র-সূর্য উঠছে কেন? দিন-রাত্রি হচ্ছে কেন? বামুনরাই যদি ধর্ম না মানে তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে না? ধর্ম-কর্ম লোপ পাবে না? আজ এত বছর ধরে কিরণের মা ওই পৈতে বিক্রির পয়সায় সংসার চালিয়েছে, স্বামীর অসুখের খরচ চালিয়েছে, ছেলের লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছে, আর এখন সেই পৈতেই যদি না চলে?

হঠাৎ কিরণের বাঁ পকেটে পয়সার ঝন্ ঝন্ শব্দ হতেই মা যেন চমকে উঠেছে। বললে—ওই যে পয়সার শব্দ হলো, ওই তো পয়সা রয়েছে তোর কাছে—

কিরণ রেগে উঠতো। বলতো—ও কি তোমার পয়সা? ও তো আমার—

—তোর আবার পয়সা কোত্থেকে এল? তুই রোজগার করিস্?

—তা রোজগার করি না বলে কি আমার পয়সা থাকতে নেই—ও পয়সায় তুমি হাত দিতে পারবে না—

কিরণের মা তখন কিরণের জামার পকেটে হাত দিতে গেছে।

কিরণ লাফিয়ে উঠলো।

—খবরদার বলছি, ও পয়সায় হাত দিও না।

—তা কোত্থেকে অত পয়সা এল, তা তো বলবি—দেখছিস্ একটা পয়সার জন্যে আমি মাথা খুঁড়ে মরছি, আর তোর পয়সা থাকতে আমাকে দিবি না? পয়সা নিয়ে কি আমি নিজের পেটে পুরবো, আমার নিজের পেটের জন্যে আমি পয়সা-পয়সা করি! তোর জন্যেই তো পয়সার কথা বলি—পৈতে বেচে কটা পয়সা পাই দেখতে পাস্ না—

তারপর কিরণের দিকে চেয়ে বলে—কোথায় চললি আবার?—

কিরণ সে-কথার জবাব না দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

কিরণের মা ডাকলে—ওরে, তোর পয়সা নিয়ে আমি সগ্যে যাবো না, তোর

পয়সা তোরই থাকবে,—চাল বাড়ন্ত আজকে—ভাত করতে পারিনি চালের জন্যে—

কিরণ মুখ ফিরিয়ে বললে—ভাত না হয়ে থাকে খাবো না—আমি সেই রাত্তিরে বাড়ি আসবো—

—তা তোর কাছে পয়সা রয়েছে, দিয়ে যা না, না-হয় চাল কিনে আন এক সের—

কিরণ এতক্ষণে রেগে আগুন হয়ে গেল। বললে—এ কি আমার পয়সা যে চাল কিনে আনবো, তোমার সঙ্গে বাপু আমার কথা বলবার সময় নেই—

—তা তোর যদি পয়সা নয় তো তোর পকেটে রয়েছে কেন?

কিরণ বললে—তুমি মেয়েমানুষ তুমি এ-সব কী বুঝবে বল দিকিনি—লাইব্রেরীর চাঁদা আমার পকেটে থাকবে না তো কার পকেটে থাকবে শুনি? এ-সব গোনা-গুন্তি চাঁদার পয়সা, মেম্বারদের চাঁদার পয়সা, আমার নেবার জো আছে!

এতক্ষণ কিরণের বাবা দাওয়ায় বালিশের ওপর বুক রেখে সব বোধহয় শুনছিল। হঠাৎ যেন উস্‌খুস্ করতে লাগল। হাত দুটো নেড়ে কী যেন বলতে গেল। কেমন একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। আর তারপরেই বুক থেকে বালিশটা গড়িয়ে উঠোনের ধুলোর ওপর পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিরণের মা দৌড়ে গেছে।

কাছে গিয়ে বললে—একটু জল খাবে? জল দেব একটু গরম করে?

কিরণের বাবা কথা বলতে পারলে না। কেমন একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগলো। আর কিরণ তাড়াতাড়ি সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে সোজা বাইরে বেরিয়ে এল।

দীপঙ্কর এতক্ষণ সব দেখছিল, সব শুনছিল বাড়ির বাইরে থেকে। বাড়ির ভেতরে ঢোকা নিষেধ। কিরণের বাবার থুথু উঠোনময় ছড়ানো থাকে। ওতে রোগের বীজাণু থাকে। মা বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু বাইরে থেকে সব দেখতে দেখতে কেমন যেন হতবাক হয়ে গেল। কোথায় গেল সেই সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধু! আর কোথায় গেল সেই সি আর দাশ। কতদিন আগে কিরণ বিশ্বাস করতো তাদের সব দুঃখের একদিন অবসান হবে। সেই ছোটবেলাকার কিরণ তখন আরো বড়ো হয়েছে। দীপঙ্করও বড় হয়েছে আরো। সে-সব কথা আর তখন বলে না সে। তখন বুঝেছে লাইব্রেরীটাই হলো আসল কাজ, লাইব্রেরীটা গড়ে উঠলে সকলের সব দুঃখের অবসান হবে। সবাই, কলকাতার আর বাঙলাদেশের সব লোক যদি 'দি কালিঘাট বয়েস লাইব্রেরী'র মেম্বার হয়, তাহলে সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধু যা বলেছিল সেই সবই ফলে যাবে। সেই লাইব্রেরী হলেই লোকে সব শিখতে পারবে, সব শিখলেই তখন চোখ খুলবে। আর চোখ খুললেই স্বরাজ। স্বরাজ এলেই সকলের দুঃখ ঘুচবে। আর কী চাই!

বাইরে এসেই কিরণ বললে—কী ঝামেলা দেখেছিস্ দীপু—মন দিয়ে যে কাজ করব, বেশ মন দিয়ে যে লাইব্রেরীটা গড়ে তুলবো, তারও উপায় নেই। বাড়িতে ঢুকতে ভাল্লাগে না আর—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু ভাত না খেয়ে কী করে কাজ করবি? যদি ক্ষিধে পায়?

কিরণ বললে—ভাত না পেলাম তো বয়েই গেল—ডাব খাবো—

—ডাব?

কিরণ বললে—চল্ না, পেট ভরে যত ইচ্ছে ডাব খেয়ে নেব, সারাদিন আর ক্ষিদে পাবে না—

জায়গাটা দীপঙ্করও চিনতো না। সত্যিই অজস্র অসংখ্য ডাব। যত ইচ্ছে ডাব খাও। শুধু একটা কাটারি দরকার। কিম্বা ছুরি হলেও চলে। কালিঘাটের মন্দিরের পশ্চিমে সোনার কার্তিকের ঘাটে যাবার রাস্তার মোড়ে একটা ডাবের দোকান। ডাবের পাহাড় হয়ে আছে দোকানের সামনে। আগের দিন সংক্রান্তি না কী গেছে। শালপাতার ঠোঙায় সামনের রাস্তাটা ভর্তি। কোত্থেকে একটা কাটারি নিয়ে এল কিরণ।

বললে—দাঁড়া তুই—ভালো ভালো দেখে ডাবগুলো কাটি আগে—

রাস্তায় নর্দমা থেকে একটা বড় সাইজের ডাব তুলে নিয়ে কিরণ কাটারি দিয়ে কেটে দু'খানা করে ফেললে। ভেতরে সাদা পুরু শাঁস। জলটা খেয়ে কোনও খদ্দের ফেলে দিয়েছে ওখানে। সব শাঁসটা খেয়ে কিরণ বললে—লোক-গুলো কী বোকা দেখেছিস তো, আসল জিনিসটাই খায় না—তুই খাবি একটু?

শুধু একটা নয়। আরো অনেকগুলো। ডাব একে একে কেটে শাঁস খেলে কিরণ।

বললে—যেদিন বাড়িতে ভাত হয় না, সেদিন এখানে আয়েস করে ডাব খাই—এ খেলে শরীরের তেজ বাড়ে জানিস্—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেউ কিছু বলে না?

কিরণ বললে—কে আর কী বলবে রে, এ সব তো ময়লা-ফেলা গাড়িতে করে ধাপায় নিয়ে যায়—শুধু এই কাটারির জন্যে যা একটু অসুবিধে, বেটারা দিতে চায় না কাটারি, বলে—দাঁত পড়ে যাবে—এবার একটা কাটারি কিনলে নির্ভাবনা—

খাওয়ার ব্যাপারটা যেদিন প্রথম দেখেছিল দীপঙ্কর সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিল—তুই রোজ খাস্?

কিরণ বললে—খিদে পেলেই ডাবের দোকানে চলে আসি, আর মজাসে ডাব খাই—ভাত তো রোজ হয় না আমাদের বাড়িতে—

তারপর খানিক থেমে বললে—খাওয়াটার একটা যা হোক ব্যবস্থা করে

ফেলেছি, এবার কাপড়টার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই নিশ্চিন্তি, তা-ও আর বেশিদিন ভাবতে হবে না—

ততক্ষণে মুখটা মুছে বললে—এবার চল্—

বেশ নিশ্চিন্ত নির্বিকার মুখ। পকেটে গোটাকতক পৈতে, আর একটা পকেটে লাইব্রেরীর রসিদ বই, আর হাতে মেম্বারদের নামের খাতা। কোথায় কোথায় কত দূর দূর যেত কিরণ। আগে যেত পৈতে বেচতে, তারপর পৈতে বেচাও ছিল, লাইব্রেরীর মেম্বার যোগাড় করাও ছিল।

কিরণ বলতো—আমার সঙ্গে তোরও যাওয়া উচিত—তুই ঘুরলে একটু সুবিধে হয়। আসলে তুই হলি প্রেসিডেন্ট আর আমি তো মাত্র সেক্রেটারি—এক-একজন বলে কিনা প্রেসিডেন্ট আসে না কেন?

হাঁটতে হাঁটতে কিরণ অনেক দূরে টেনে নিয়ে যেত এক-একদিন। কোনও-দিন খিদিরপুর, কোনওদিন টালিগঞ্জ, কোনওদিন পোড়াবাজার। ক্লাসের সব জানাশোনা ছেলেদের মেম্বার করে ফেলেছিল কিরণ। রাখাল, নির্মল পালিত, বিমান মিত্তির সবাই। দুনিকাকা, পঞ্চাদা, মধুসূদন। শেষে প্রাণমথবাবুকেও মেম্বার করে ফেলেছিল।

শেষে একদিন বললে—এই তোর অঘোরদাদুকে মেম্বার করা যায় না?

দীপঙ্কর বললে—দূর—

—কেন, দোষ কী?

—না ভাই, শেষকালে লাঠিপেটা করবে—মুখপোড়া বলে গালাগালি দেবে—

কিরণ বললে—তুই অত ভীরু কেন, অত ভয় করলে প্রেসিডেন্ট হওয়া চলে? ওর তো অনেক পয়সা আছে—দু'আনা করে মাসে দিক না—

—না ভাই, আমি বলতে পারবো না।

কিরণ ভাবতো। তাহলে আর কে আছে?

—আচ্ছা, চন্নুনীকে মেম্বার করে নিলে হয় না?

শুধু চন্নুনী নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই কিরণ তার লাইব্রেরীর মেম্বার করবার জন্যে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল তখন। কিরণের মনে হতো ভালো কাজের জন্যে মেম্বার হতে কেন আপত্তি হবে। পয়সা তো চুরি করবে না কিরণ। একদিন এই লাইব্রেরীর নাম তো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তখন? তখন তো সবাই যেচে খোশামোদ করে মেম্বার হতে চাইবে। কিন্তু তার আগে? তার আগে দিন-রাত না খাটলে চলবে কেন! কলেজের সব ছেলেদের মেম্বার করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো কিরণ।

বলতো—তোদের কলেজে অত ছেলে, আর তুই একটাকেও মেম্বার করতে পারলি না—ধিক্ তোকে—

শেষে আর নাম খুঁজে পাওয়া যেত না। কিরণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে

দাঁড়াত। সুর করে বলতো—ভদ্রলোকেরা দয়া করে এক পয়সার পৈতে কিনে নিয়ে যাবেন—ভদ্রলোকেরা দয়া করে ......

কিরণের ফর্সা চেহারা, কিরণের খালি পা, ছেঁড়া জামা-কাপড় দেখে এক একজনের দয়া হতো বোধ হয়।

কাছে এসে বলতো—দেখি ভাই, কেমন পৈতে দেখি—

পৈতের ফেটি খুলে পাকিয়ে দেখে দু'একজন কিনতো। তারপর পৈতের পয়সা দিয়ে চলে যাবার সময় হঠাৎ কিরণ বলতো—আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হবেন স্যার—?

—লাইব্রেরী! ভদ্রলোকেরা অনেকেই চমকে উঠতো।

কিরণ উৎসাহ পেয়ে পকেট থেকে রসিদ বইটা বার করে দেখিয়ে বলতো—এই দেখুন স্যার, অনেকেই মেম্বার হয়েছেন, নতুন করেছি, পাঁচশো বই হয়ে গেছে। দয়া করে যদি মেম্বার হন,—আমিই সেক্রেটারি—আর ওই আমাদের প্রেসিডেণ্ট বসে আছে—ওই যে—

দূরে দীপঙ্করকে দেখিয়ে দিত কিরণ। দীপংকর তখন অনেক দূরে একটা গাছতলায় ইঁট পেতে তার ওপর বসে আছে।

ভদ্রলোক রেগে যেত। বলতো—এই বয়েসেই জোচ্চুরি ব্যবসা ধরেছ ছোকরা—জানো পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি তোমাদের এখুনি—

বলে আর কথা না বাড়িয়ে ভদ্রলোক চলে গেল।

দীপঙ্কর কাছে এল। বললে—কী বলছিল রে লোকটা?

কিরণ বললে—বলছিল পুলিসে ধরিয়ে দেবে! আমাকে পুলিসের ভয় দেখাচ্ছে! পুলিসের ভয় দেখালে আর লাইব্রেরীর সেক্রেটারী হওয়া যায় না—চল্, এবার অন্য মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই—এখানকার লোকগুলো বড় বদমাইশ ভাই।—

এক-একদিন এক-এক পাড়ায়। একদিন খিদিরপুরের মোড়ে ওই রকম। তখন বিকেল হয়েছে। কলেজের গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল কিরণ। বাইরে আসতেই কিরণ বললে—তোর এত দেরি হলো যে?

দীপংকর বললে—হিস্ট্রির ক্লাস ছিল—

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—আজকে মেম্বার করেছিস্ কাউকে?

দীপঙ্কর বললে—কেউ মেম্বার হতে চাইছে না ভাই—

—তুই ভালো করে বলতে পারিস না যে, তুই হলি প্রেসিডেণ্ট—! আর যে না-হতে চাইবে তাকে আমাদের লাইব্রেরীতে ধরে আনবি, দেখবি আমি ঠিক বুঝিয়ে-বাজিয়ে পটিয়ে নেব—জানিস, তোরা পাশ করলে কী হবে, একটু বুদ্ধি খরচ করতে হয়—

পাশ না-করার জন্যে সত্যিই কিরণের কোনও অনুশোচনা ছিল না। পাশ তো গাধাতেও করে। কিরণের মনে হতো, নিজের তার যা-ই হোক্, কিন্তু

আরো অনেক ছেলে আছে কলকাতায় যারা শুধু টাকার অভাবে পড়তে পায় না। কলেজের মাইনে, এগ্‌জামিনের ফি কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই। তাদের জন্যেই ছিল তার লাইব্রেরী। তার লাইব্রেরী থেকেই বই নিয়ে একদিন তারা পড়ে পাশ করবে। আর শুধু কি লাইব্রেরী। ছোট লাইব্রেরীই একদিন বড় লাইব্রেরী হবে। লাইব্রেরীর সঙ্গে থাকবে খেলার মাঠ, একসারসাইজের ক্লাব। সেখানে মনের চর্চার সঙ্গে শরীরের চর্চা হবে। শরীরটার কথা না ভাবলে চলবে না। শরীরটা চাই। দরকার হলে পুলিসকে ঠেঙাতে হবে।

তারপর চুপি চুপি বলতো—কাউকে বলিস্ নি, তোকেই শুধু বলছি, দরকার হলে আমাদের ক্লাব থেকে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসু সব শেখানো হবে, আর রিভলবার পিস্তল...সে-সব পরে—

—রিভলবার? পিস্তল? সে-সব কে দেবে?

কিরণ মুচ্‌কি হাসতো। বলতো—সে-সব তোর ভাবনা নেই, সব ভজুদা দেবে—হিমালয়ের ওপরে সব রেডি হচ্ছে—

—ভজুদা? ভজুদা কে রে?

কিরণ বলতো—তোকে ভজুদার কাছে একদিন নিয়ে যাবো, দেখবি কী ল্যার্নেড্ লোক, সব মুখস্থ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, নেপালী, বার্মিজ্ সব ভাষা শিখে একেবারে গুলে খেয়েছে ভজুদা—তোরা তো ম্যাট্রিক পাশ, তোদেরও ইংরিজী শেখাতে পারে—

ভজুদার কথা সেই-ই প্রথম কিরণের মুখ থেকে শোনে দীপঙ্কর। তখনও ভজুদাকে দেখবার সুযোগ হয়নি। কোথাকার কোন্ ভজুদা, কোথা থেকে এত ভাষা শিখলো, তা-ও জানতো না। কিন্তু তবু কিরণের মুখ থেকে তার কীর্তি-কাহিনী শুনে কেমন যেন ভয় হতো, রোমাঞ্চ হতো দীপঙ্করের। প্রাণমথবাবু শুধু জেল খাটে, কিন্তু ভজুদা? ভজুদা জার্মান ফ্রেঞ্চ নেপালী বার্মিজ ভাষা জানে। ভজুদা রিভলবার পিস্তল সব দিতে পারে। পুলিস কিছুছু তার টের পাবে না। হিমালয়ের ওপরে সব রেডি হচ্ছে।

কিরণ বললে—তোকে তাহলে খুলেই বলি দীপু, লাইব্রেরীটা আমাকে ভজুদাই করতে বলেছে—

—তুই ভজুদাকে চিনলি কী করে?

কিরণ বললে—সে-সব এখন তোকে কিছু বলবো না, ভজুদা বলেছে তোকে একদিন নিয়ে যেতে—

—আমাকে চেনে ভজুদা?

কিরণ রহস্যময় হাসি হাসলো একটা। 'পথের দাবি' পড়েছিস্?

—পথের দাবি?

কিরণ বললে—লজ্জার কথা! তুই হলি 'দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরীর' প্রেসিডেণ্ট আর তুই-ই 'পথের দাবি'র নাম শুনিস্‌নি? লজ্জার কথা, লোকে

বলবে কী, বল্ তো?

তারপর হাসি থামিয়ে কিরণ বললে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই 'পথের দাবি'—উপন্যাস—গভর্নমেণ্ট প্রেস্‌ক্রাইব করে দিয়েছে, সেই 'পথের দাবি' তো ভজুদাকে নিয়েই লেখা—

কেমন করুণার দৃষ্টি দিয়ে কিরণ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে। দীপঙ্কর কিছুই জানে না। লেখা-পড়া শিখে ম্যাট্রিক পাশ করলে কী হবে, দীপঙ্কর তো ভজুদাকে চেনে না। দীপঙ্কর তো জানে না, আড়ালে আড়ালে ভজুদারা কত কী কান্ড করছে। তোমরা পাশ করে কলেজে পড়ে চাকরি করবে। কিংবা বিয়ে-থা করে সংসারী হবে। আর কিরণরা? তারা আরো মহৎ কাজের জন্যে পৃথিবীতে এসেছে। তিরিশ টাকার চাকরি জুটলে অবশ্য আপাত অভাব মিটবে। দুবেলা ভাত হয়ত জুটবে, বাবার ওষুধ হয়ত জুটবে, মা'র শাড়িও হয়ত জুটবে। কিন্তু তাতেই কি দুঃখ ঘুচবে? তাতেই কি সবাই সুখী হবে? তাতেই কি সকলের ভাত, সকলের কাপড়, সকলের আশ্রয় জুটবে? চাকরি জুটলে আর কত হবে? এখন একবেলা খাচ্ছি, তখন হয়ত দুবেলা খাবো। একটা ছেঁড়া কাপড় পরছি, তখন হয়ত আস্ত কাপড় পরবো। কিন্তু অভাব আমার যা আছে, তাই-ই থাকবে—

—তাহলে কীসে অভাব ঘুচবে?

কিরণ বললে—সে ভজুদা তোকে সব বুঝিয়ে দেবে—তাই তো বলছি তার আগে তুই আমাকে কিছু মেম্বার যোগাড় করে দে লাইব্রেরীর—তখন দেখবি ভজুদা কী করে—

রাস্তায় চলতে চলতে অনেকদূরে চলে এসেছিল। খিদিরপুরের মোড়ের কাছে আসতেই কিরণ বললে—দাঁড়া তুই, এখানে একটু ভিক্ষে করে নিই—

দীপঙ্কর অনেকদূরে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ স্পষ্ট বিকেল হয়ে গেছে তখন। কতকগুলো ট্রাম সোজা খিদিরপুরের দিকে চলে যাচ্ছে। আর কতকগুলো যাচ্ছে কালিঘাটের দিকে। কয়েকটা জুতোর দোকান। মুসলমানদের রুটি মাংসের হোটেল। শিকে-ফোটানো গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে সার-সার। আর বিরাট একটা উনুনের সামনে মোটা-মোটা রুটি তৈরি করছে হাত দিয়ে। দীপঙ্করের খিদে পেতে লাগল। অনেকদিন মাংস খায়নি দীপঙ্কর। মাংস খেতে বেশ লাগে। মাংস হলে সেদিন চেয়ে চেয়ে ভাত নেয় দীপঙ্কর। মাংস আর ক'দিনই বা হয় অঘোরদাদুর বাড়িতে। যেদিন হয়ত অঘোরদাদুর যজমানরা প্রসাদ পাঠিয়ে দেয়, সেইদিনই মাংস হয়। তাছাড়া, মাংস অঘোরদাদুর বাড়িতে হয় না বড় একটা।

এদিকে কিরণ তখন গলাটা করুণ করে বলছে—ভদ্রলোকেরা দয়া করে পৈতে কিনে নিয়ে যাবেন—ভদ্রলোকেরা দয়া করে...

হঠাৎ অবাক হয়ে গেল দীপঙ্কর।

—এ কি, কাকাবাবু না?

রাস্তার ওপাশে হঠাৎ যেন কাকাবাবুর মত কাকে দেখা গেল। সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক রয়েছে। কিন্তু কাকাবাবুর এ-রকম চেহারা কেন? সেই কোট-প্যাণ্ট্ টুপি কোথায় গেল? এ যেন অন্যরকম চেহারা হয়ে গেছে আজ। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে একটা ছিটের কামিজ! একেবারে চেনাই যায় না। এই খিদিরপুরেই কাকাবাবুর আপিস নাকি? এ-রকম পোশাকে তো কখনও দেখেনি কাকাবাবুকে!

—কাকাবাবু?

এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথে পার হয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডাকলে দীপঙ্কর।

—কাকাবাবু!

কাকাবাবু ফিরলেন। সঙ্গের লোকগুলোও পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে তার দিকে।

—কাকাবাবু আপনি এখানে? আমি আপনাকে চিনতেই পারিনি একেবারে—এরকম জামা-কাপড়ে আপনাকে কখনও দিখিনি কিনা, আগে এইদিকেই আপনার আপিস বুঝি?

কী জানি, দীপঙ্করের মনে হলো, কাকাবাবুর মুখখানা যেন অন্যদিনের চেয়ে গম্ভীর-গম্ভীর। তার দিকে চেয়ে সে-রকম হাসলেন না আর। যেন প্রথমটায় চিনতেই পারলেন না। দীপঙ্কর কাছে আসতেও যেন অভ্যর্থনার ইঙ্গিত দেখা গেল না দু'চোখে। তবে কি কাকাবাবু নয়? তবে কি ভুল করেছে দীপঙ্কর!

—কাকাবাবু, আমি দীপু। অঘোরদাদুর বাড়িতে থাকি! এই কলেজ থেকে ফিরছি—

এতক্ষণে যেন চিনতে পেরেছেন!

বললেন—তুমি? দীপুবাবু? তা এখানে কী করতে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে দীপঙ্কর বললে—আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি কাকাবাবু। আপনার এ কীরকম জামা-কাপড়?

কাকাবাবু বললেন—এই এমনি...তা আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি দীপুবাবু, তুমি অনেকদিন আসোনি কেন আমাদের বাড়িতে? আসবে, বুঝলে? আসবে—তোমার সঙ্গে কথা আছে অনেক—তাহলে আমি এখন আসি কেমন—

কাকাবাবুর সঙ্গের লোকগুলোও তার দিকে এতক্ষণ যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল। কাকাবাবুর সঙ্গে তারাও চলে গেল। দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলো। দেখলে কাকাবাবু পাশের অন্ধকার একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন!

দীপঙ্কর হঠাৎ কাকাবাবুর এই ব্যবহারে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এখানে ও-রকম পোশাকে কাকাবাবু কী করছেন! সঙ্গের ও লোকগুলোই

না কে? অন্ধকার গলির মধ্যে সবাই ঢুকলো কেন? ওখানেই কাকাবাবুর আপিস নাকি? এ কীরকম আপিস, এ কীরকম চাকরি। এই সময়ে তো লোকের ছুটি হয়। এই সময়েই কাকাবাবু আপিসে ঢুকলেন নাকি আবার? কিন্তু দীপঙ্করকে এখানে দেখে তবে অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন? যেন ঠিক চিনতে পারলেন নি।

ওদিকের ফুটপাথে কিরণ তখনও সুর করে বলছে—ভদ্রলোকরা দয়া করে পৈতে কিনে নিয়ে যাবেন, ভদ্রলোকরা দয়া করে...

দীপঙ্করকে দেখেই কিরণ এগিয়ে এল। বললে—কী রে, কোথায় গিয়েছিলি? তোকে খুঁজছিলুম?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কত হলো আজকে?

কিরণ বললে—এগারো পয়সা হয়েছে—এতেই হয়ে যাবে—কিন্তু লাইব্রেরীর মেম্বার কেউ হতে চায় না—

দীপঙ্কর বললে—খুব খিদে পেয়েছে ভাই—পেট চোঁ চোঁ করছে—

কিরণ বললে—ডাব খাবি?

ডাব! আবার সেই ডাব! কিন্তু ডাব খেতেও তো অনেকদূর যেতে হবে।

দীপঙ্কর বললে—ডাব তো সেই মন্দিরের কাছে, কালিঘাটে—সে তো এখনও অনেকদূর—এদিকে ডাবের দোকান নেই?

কিরণ বললে—আছে—

—কোথায়?

কিরণ বললে—ডকের ধারে, একটা দোকান আছে, গাদা গাদা ডাব পড়ে থাকে নর্দমায়—

—কিন্তু কাটারি?

কিরণ বললে—একটা দোকানের সঙ্গে ভাব করেছি, একটা পয়সা দিলে কাটারিটা ধার দেয়—পয়সা আছে তোর কাছে?

দীপঙ্কর বললে—না—

—সে কি রে, তোরা কলেজে পড়িস, একটা পয়সাও পকেটে থাকে না তোদের?

দীপঙ্কর বললে—তোর কাছে তো পয়সা রয়েছে।

কিরণ বললে—পৈতের পয়সার তো হিসেব দিতে হবে মা'কে—

—কিন্তু লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সা রয়েছে, তার থেকে একটা পয়সা নিলে কী হয়?

কিরণ বললে—তা হয় না রে, ও তো আমার নয়, মাকেই বলে ও-পয়সা ছুঁতে দিই না—। ও-পয়সায় হাত দিতে পারবো না ভাই—লাইব্রেরীর পয়সা হচ্ছে পাব্লিকের পয়সা, ও আমি ছুঁতে পারবো না—

—তা হলে?

জীবনে কোথাও যখন কোনও হদিস্ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, ঠিক তখনি এক-এক সময়ে অকূলে কূল পাওয়া যায়। সেদিন দীপঙ্করের ঠিক তাই হলো। এমন যে হবে ভাবতেও পারা যায়নি। এমনভাবে যে দেখা হয়ে যাবে হঠাৎ তারও কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। দীপঙ্করও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আর তারপর কিরণও অবাক হয়ে গিয়েছিল কম নয়।

খিদিরপুরের সেই রাস্তার মোড়ের মাথায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেই স্যুটপরা চেহারা। সেই ফিটফাট সাজগোজ। সেই ফরসা লম্বা-চওড়া গড়ন। হন্ হন্ করে কোথায় চলেছেন! প্রথমে দীপঙ্কর দেখতে পায়নি। কিরণ দৌড়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। বললে—আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হবেন স্যার?

—লাইব্রেরী? কোন্ লাইব্রেরী?

—দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী, পাঁচশো বই আছে আমাদের, আরো বই কিনতে হবে অনেক, যদি কিছু সাহায্য করেন—বলে কিরণ ছাপানো রসিদ বইটা সামনে খুলে ধরলো।

বললে—এই দেখুন অনেকে চাঁদা দিয়েছে, চাঁদা কালেক্ট করে আমরা আরো বড় লাইব্রেরী করবো, এই দেখুন এই ভদ্রলোক দিয়েছেন এক টাকা, আর দেখুন এই ভদ্রলোক আট আনা—

—কালিঘাট? কালিঘাটে কোথায় তোমাদের লাইব্রেরী?

—নেপাল ভট্টাচার্যি লেন। এখন ছোট ঘর আছে, পরে বড় বাড়ি ভাড়া নেব—

—কালিঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন চেনো?

কিরণ এবার সাহস পেয়ে গেল। বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন? ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনেই তো আমাদের প্রেসিডেন্ট থাকে—ওইতো আমাদের প্রেসিডেন্ট, দীপঙ্কর সেন, উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—

উনিশের একের বি। নম্বরটা শুনে ভদ্রলোক যেন কেমন বিচলিত হলেন মনে হলো। চেয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্টের দিকে। দীপঙ্কর তখন দূরে থেকে কিরণের কাণ্ড দেখছিল। সামান্য ঝাপ্সা-ঝাপ্সা অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভালো করে দূরের মানুষকে চেনা যায় না। ভদ্রলোক তখন একেবারে দীপঙ্করের সামনে এগিয়ে এসেছে। বললে—দুড়্ দুড়্ তুমি? দীপু?

ভদ্রলোকের মুখে নিজের নাম শুনে দীপঙ্করও চমকে উঠেছে। ভালো করে চেয়ে দেখল দীপঙ্কর। যেন চেনা চেনা মনে হলো তার। যেন কোথায় দেখেছে অনেকবার। অনেকবার কথা বলেছে, কাছে এসেছে......

হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—আপনি? আপনি এখানে?

—আমাকে চিনতে পারছো তুমি? আমি মিস্টার দাতার, অনেকদিন পরে

তোমার সঙ্গে দেখা—

মিস্টার দাতার! এতদিন নামটাই জানতো না দীপঙ্কর। সেই কুণ্ডুপুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো দীপঙ্কর, আর লক্ষ্মীদির চিঠিটা নিয়ে ভদ্রলোকের হাতে দিত। চিঠিতে কী লেখা আছে, তাও জানতো না, চিঠি যাকে দিত তার নামও জানতো না। শুধু একবার দেখেছিল লক্ষ্মীদি ভদ্রলোকের একখানা ছবি নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে। দীপঙ্করকে দেখেই ছবিটা লুকিয়ে ফেলেছিল লক্ষ্মীদি। সেই সি আর দাশ যেদিন মারা যান। তারপর এতদিন নিয়ম করে চিঠি নিয়ে এসেছে। কত বর্ষা-বাদল, গ্রীষ্ম কেটে গেছে—দীপঙ্কর ম্যাট্রিক পাশ করেছে, মুখে অল্প অল্প গোঁফের রেখা উঠেছে—সে-ও অনেকদিন হয়ে গেল। তারপর একদিন সতী এসে হাজির হয়েছে—

মিস্টার দাতার হঠাৎ বললেন—তোমরা চা খাবে?

দীপঙ্কর কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই কিরণ বললে—চা তো আমরা খাই না—

—তবে অন্য কিছু? চপ্ কাটলেট কি সিঙ্গাড়া কচুরি?

কিরণ বললে—তা খেতে পারি, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে—

মিস্টার দাতার বললেন—তাহলে চলো, তোমাদের খাওয়াবো আমি—

একটা মিস্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন। শ্বেতপাথরের টেবিল, হাত ধোবার জায়গা, কাচের গেলাস, সব আছে। মিস্টার দাতার একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। দীপঙ্করেরাও বসলো। তারপর লুচি এল, সন্দেশ এল, পান্তুয়া এল। কলাপাতার করে দুজনের সামনে লুচি-মিষ্টি দিয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললে—আপনি খাবেন না?

দাতার বললেন—আমি এসব খাই না, আমি চা খাবোখন্—

কিরণের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। কিরণ তখন গোগ্রাসে গিলছে সব। এক-একটা লুচির ভেতর এক-একটা পান্তুয়া পুরে টপাটপ্ মুখে পুরে দিচ্ছে। কোনদিকে খেয়াল নেই তার। নিমেষে সমস্ত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দীপঙ্করের মনে হলো কিরণ যেন বড় নির্লজ্জের মত খাচ্ছে। বড় লজ্জা করতে লাগলো দীপঙ্করের। অচেনা লোক খাওয়াচ্ছে, একটু আস্তে আস্তে অনিচ্ছের সঙ্গে খেলেই তো মানায়। মিস্টার দাতার কী ভাবছে কে জানে।

কিরণের দিকে চেয়ে দাতার বললেন—আর খাবে?

কিরণ মাথা নাড়লে—হ্যাঁ—

—তুমি?

দীপঙ্কর বললে—না—

—লজ্জা করছে নাকি? লজ্জা কোর না, পেট ভরে খাও—

কিরণ বললে—আমার লজ্জা নেই, আমাকে যত দেবেন তত খাবো, আমি আজ চারদিন ডাব খেয়ে আছি—

—ডাব?

কিরণ বললে—হ্যাঁ, আজকে সকালে দশটা ডাব খেয়েছি, কালকে খেয়েছিলাম কুড়িটা—

দীপঙ্কর থামিয়ে দিলে। বললে—ওর বাবার অসুখ, খেতে পায়না রোজ, তাই ডাবের শাঁস খায় কিরণ—

মিস্টার দাতার যেন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। কী করে কিরণ, কী করে দীপঙ্কর। কেমন তাদের অবস্থা। কবে কীভাবে ভিক্ষে করে পড়াশোনা চালিয়েছে। তারপর কেমন করে টাকার অভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি। কেমন করে প্রাণমথবাবু প্রতি মাসে সাহায্য করেন দীপঙ্করকে। কত টাকা করে সাহায্য করেন, তা-ও জিজ্ঞেস করলেন।

কিরণ বললে—আমার নিজের কিছু সাহায্যের দরকার নেই, আপনি বরং আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হোন—মাসে মাসে এক টাকা করে দিন—আর কিছু চাই না—

মিস্টার দাতার বললেন—মাসে মাসে এক টাকা নয়—

—তাহলে আট আনা? কিন্তু আট আনার কম নিলে আর চলে না!

—না। আট আনা নয়! দু টাকা—দু টাকা করে আমি দোব—

কিরণ অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। দীপঙ্করও কেমন হতবাক হয়ে গেছে। কতটুকুই বা জানা-শোনা, কতটুকুই বা পরিচয়। সেই লক্ষ্মীদির চিঠি দিতে গিয়েই যা মুখচেনা। কখনও নামও জিজ্ঞেস করেনি তাঁর। কখনও অনাবশ্যক কৌতূহলও প্রকাশ করেনি। শুধু এক-একবার মনে হয়েছে ভদ্রলোক কে? কেন লক্ষ্মীদি তাকে চিঠি লেখে? কেন লক্ষ্মীদির বাড়িতে আসে না লোকটা, কেন এই লুকোচুরি! কেন লক্ষ্মীদি তার চিঠির কথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছে। কেউ জানতে পারলে দোষ কী? তবে কি কোনও অন্যায় করেছে! লুকিয়ে লুকিয়ে এই চিঠি দেওয়া অন্যায় বৈকি। বিন্তীদি তো কাউকে চিঠি দেয় না, বিন্তীদিকে তো কেউ দেখতেই পায় না। লক্ষ্মীদি কেন বিন্তীদির মতন নয়!

মিস্টার দাতার বললেন—আমার আপিসের ঠিকানাটা তুমি রাখো—

বলে একটা কার্ড দিলেন। দীপঙ্কর কার্ডটা নিয়ে দেখলে—লেখা রয়েছে—মিস্টার এস এস দাতার, চব্বিশ-বি বউবাজার স্ট্রীট।

দাতার বললেন—রোজ দুপুরে আমি আপিসে থাকি, আমার আপিসে এসে চাঁদা নিয়ে যেও তোমরা বরং—

তারপর একটু থেমে বললেন—আর তোমাদের অ্যাডমিশন-ফি আমি এখনি দিয়ে দিলাম পাঁচ টাকা—

পাঁচ টাকা! পাঁচ টাকার নোটটার দিকে চেয়ে কিরণ যেন হাত বাড়াতেও

ভুলে গেল। মিস্টার দাতার পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালেন একটা। সেই সিগারেট! সেই হুস-হুস করে ধোঁয়া টানা। অনেকদিন অনেকবার ওই সিগারেট খাওয়া দেখেছে দীপঙ্কর। লক্ষ্মীদির চিঠিটা পড়বার সময় ওই রকম জোরে জোরে সিগারেট টানতো। তারপর বলতো—ভেরি গুড্—

আগে লক্ষ্মীদির চিঠি নিয়ে গিয়ে দেবার সময় অনেকদিন রাগ হয়েছিল দীপঙ্করের। অনেকবার মনে হয়েছে সে যেন অন্যায় করছে, সে যেন দোষ করছে। কিন্তু এই আজ প্রথম দীপঙ্করের মনে হলো ভুল করেছিল সে। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করা তার ভুল হয়েছে। সত্যিই মিস্টার দাতার ভালো লোক। লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্মীদির সঙ্গে করুক ভাব, কাউকে বলবে না সে।

দাতার বলতে লাগলেন—তোমরা হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছো, আমার টাকা দেওয়া দেখে, কিন্তু একদিন তোমাদের মতন আমিও ছোট ছিলাম, আমারও অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে, অনেকদিন না-খেয়েও কেটেছে, অনেকদিন পকেটে একটা পয়সাও থাকতো না, কিন্তু পরে আমার অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি হয়েছিল—একদিন টাকার অভাবে পাগল হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েও গিয়েছিলাম—

কিরণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন—?

দাতার বললেন—বর্মায় পালিয়ে গিয়েছিলুম—

বর্মা! লক্ষ্মীদিদের দেশ তো বর্মায়! দীপঙ্কর যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করলে। তবে কি বর্মাতেই লক্ষ্মীদির সঙ্গে ভাব হয়েছে মিস্টার দাতারের। খেয়ে দেয়ে টাকা পেয়ে কিরণের তখন মহা ফূর্তি হয়েছে। পকেট থেকে পেন্সিল বার করে একটা রসিদ কেটে দিলে। পাঁচ টাকার রসিদ—

অ্যাডমিশন-ফি। তারপর মাসে মাসে দু টাকা করে চাঁদা।

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—আপনার ফুল নামটা কী লিখবো?

দীপঙ্কর রসিদটা এগিয়ে দিলে। তারপর মিস্টার দাতার বলতে লাগলেন—তোমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই, dont be disheartened boys. আমিও একদিন পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি উপোস করে, তুমি ডাব খেয়েছ, কুড়িয়ে কুড়িয়ে, আমি তা-ও পাইনি—কিন্তু হতাশ হইনি, আমি সব পেয়েছি এখন, লোকে যা চায় সব পেয়েছি—লোকে যা চায় না, তাও পেয়েছি—

কিরণ বললে—ভজুদাকে আপনি চেনেন?

—ভজুদা? Who is he? তিনি কে?

কিরণ বললে—ভজুদাও অনেক দেশ ঘুরেছে কিনা, সাতটা ভাষা জানে ভজুদা, ভজুদা নেপালী ভাষা জানে, বার্মিজ ভাষা জানে, ফ্রেঞ্চ জানে, ভজুদাও আমাকে বলেছে কষ্ট চিরকাল থাকে না, কষ্টের একদিন শেষ আছে, একদিন

সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের স্বরাজ আসবে, ইংরেজরা চলে যাবে, আমাদের দেশের লোকই আবার আমাদের দেশের রাজা হবে। ছোটবেলায় কালিঘাটের সোনার কার্তিকের ঘাটের এক সাধুও তাই বলেছিল আমাকে—

মিস্টার দাতার সব শুনে বললেন—ঠিক ঠিক, বর্মায় মস্ত বড় একজন টিম্বার মার্চেণ্ট মিস্টার বি মিত্র বলে একজন আছেন—তাঁরও লাইফ হিস্ট্রি তাই—এখন তিনি প্রচুর টাকার মালিক, প্রোমে এত বড় বিজনেস কারো নেই—

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—লক্ষ্মীদির বাবা?

মিস্টার দাতার বললেন—হ্যাঁ—

দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদির বোন সতীও এসেছে কলকাতায়—

মিস্টার দাতার বললেন—এসেছে?

বলে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ উঠলেন। বললেন—এবার আমি উঠবো, তোমরা বাড়ি যাও—ঠিক যেও কিন্তু আমার আপিসে—

মিস্টার দাতার উঠে গিয়ে দাম দিয়ে দিলেন খাবারের। অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল তাঁরও খাওয়াতে।

যাবার সময় হঠাৎ দীপঙ্করকে আড়ালে ডাকলেন। বললেন—শোন—

দীপঙ্কর কাছে গেল।

দাতার বললেন—তোমার সঙ্গে লক্ষ্মীদির দেখা হবে নাকি আজ?

—হ্যাঁ—বলুন না কী বলতে হবে!

—তাহলে কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বোল সেইখানে—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—সেইখানে কোথায়?

—সেইখানে বললেই বুঝতে পারবে তোমার লক্ষ্মীদি—আর কিছু বলতে হবে না। মনে থাকবে তো—কাল! কাল সকালে—

বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

কিরণ অনেকদিন পরে পেট ভরে খেয়েছে। পাঁচ টাকা চাঁদা পেয়েছে। এত চাঁদা আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। চণ্ডীবাবুরা এত বড়লোক, তাদের বাড়ির ছেলে রাখালও দেয়নি। ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মলও দেয়নি। দুনিকাকা, পুণ্যদা, মধুসূদনের বড়দা, কেউ-ই দেয়নি। বরং টিটকিরি দিয়েছে।

কিরণ বললে—লোকটা খুব ভালো রে দীপু—খুব ভালো লোক—কত খাওয়ালে আমাদের—এখন চারদিন আমার কিছু না খেলেও চলবে—

দীপঙ্করেরও মনে হলো লোকটা সত্যিই ভালো। কতটুকুই বা আলাপ, কী-ই বা সম্পর্ক! সামান্য কয়েকদিন চিঠি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছে। তাইতেই এত খাতির, এত আপ্যায়ন।

কিরণ পাঁচ টাকার নোটটা জামার পকেট থেকে বার করলে। বার করে ভালো করে দেখলে—যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না তার। পাঁচ টাকার নোট। কাগজটা পকেটে ভাঁজ করে রেখে বললে—পাঁচ টাকার নোটগুলো বেশ দেখতে, নারে?

তারপর বললে—তোর জন্যেই টাকা ক'টা পেলাম দীপু, তুই না থাকলে দিতই না—ও কে রে? তোকে চিনলে কী করে?

দীপঙ্কর তখন হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। টাকাটার দিকে চেয়েই মনে হলো একটা কথা। টাকা দিলে বলেই কি লোকটা ভালো? এতদিনের সব ঘৃণা, সব অপবাদ কি ওই পাঁচটা টাকাতেই উবে গেল? টাকার জন্যেই কি কিরণ তবে প্রশংসা করছে দাতারকে? টাকা আর খাওয়ানো! যদি টাকা না দিত, যদি না খাওয়াতো! যদি অন্য লোকের মত পুলিসে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখাতো! তাহলে? তাহলে অঘোরদাদু তো ঠিক কথাই বলেছে। টাকা দিয়েই তো সব কেনা যায়। সংসারের সব কিছুই তো টাকাতে কেনা যায়। স্নেহ, ভালবাসা, বিবেক, গয়না, চাল, ডাল, নুন, তেল, সব কিছু!

কিরণ বললে—কীরে, কথা বলছিস না যে—

পাশ দিয়ে একটা ট্রাম পুলের ওপর থেকে তখন সোঁ সোঁ করে নামছে। দীপঙ্কর অন্যমনস্ক ছিল—একেবারে তার গায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল ট্রামটা। দীপঙ্কর এক মুহূর্তে পাশে সরে দাঁড়াল। আর একটু হলেই একেবারে যেন চাপা পড়ে যেত সে।

দীপঙ্করের মা তখন রান্না চাপিয়েছিল। বিকেল বেলাটা একটু ফুরসত থাকে হাতে। তখন দীপু কলেজ থেকে আসে না। এখন বড় হয়েছে ছেলে, কিছু বলেও যায় না। কোথায় কোথায় যায়। সন্ধ্যে হয়ে আসে, তখন এসে হাজির হয়। তারপর হ্যারিকেন জেলে পড়তে বসে।

—ও মেয়ে, মেয়ে—

হঠাৎ এক-একদিন অঘোরদাদু নেমে আসে দোতলা থেকে। চোখে দেখতে পায় না অঘোরদাদু তখন। কিন্তু দেয়াল ধরে ধরে এসে দাঁড়ায় বাইরে।

বলে—ও মেয়ে, মেয়ে—মুখপোড়া কানেই শোনে না—

—কী বাবা? মা সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—আপনি এখন কী করতে এলেন বাবা? ভাত খাবেন?

—মুখপোড়াটা কোথায়? বলি গেল কোথায় মুখপোড়াটা?

মা বুঝতে পারে না। বলে—কে বাবা? কার কথা বলছেন?

—আবার কার কথা বলবো! মুখপোড়া আবার ক'টা আছে বাড়িতে শুনি?

—ছিটের কথা বলছেন? না ফোঁটা?

অঘোরদাদু রেগে গেল। বললে—আরে, সেগুলো কি মুখপোড়া? সেগুলো তো হারামজাদা—

—তাহলে কার কথা বলছেন? দীপু—?

—হ্যাঁরে মেয়ে, সেই তো আসল মুখপোড়া! মুখপোড়া পাশ করেছে আর

আমায় পেন্নাম করলো না যে, মুখপোড়া ভেবেছে কি! মুখপোড়া কি সাপের পাঁচ পা দেখেছে—? মুখপোড়া কি......বলতে বলতে অঘোরদাদুর ফোকলা দাঁতের মধ্যে কথাগুলো আটকে গেল।

—ওমা সে কি কথা, ও দীপু—

দীপু পড়তে পড়তে উঠে এল। মা বললে—তোর দাদুকে প্রণাম করিসনি তুই? সে তো অনেকদিন হলো পাশ করেছে বাবা, এখন কলেজে পড়ছে, ওর বই কেনবার জন্যে আপনি টাকা দিলেন, ওর জামা কিনে দিলেন—

দীপঙ্কর অঘোরদাদুর পায়ের কাছে ঢিপ্ করে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

অঘোরদাদু লাঠিটা নিয়ে চিৎকার করে উঠেছে।

—বেরো মুখপোড়া, বেরিয়ে যা—আমি কেউ নই মুখপোড়া, আমি কেউ নই তোর? আমাকে অপগেরাহ্যি?

বলতে বলতে এক-পা পেছিয়ে লাঠিটা বাগিয়ে ধরলে অঘোরদাদু।

মা বললে—আমারই ভুল বাবা, আমি কোথা থেকে পড়াবো, কোথায় টাকা পাবো, এই ভাবনাতেই অস্থির ছিলাম, তাই আপনাকে আর বলতে পারিনি—,

অঘোরদাদু তবু শান্ত হয় না। চিৎকার করে বলতে লাগলো—আমাকে অপগেরাহ্যি? আমারই বাড়িতে থেকে, আমারই খেয়ে, আমাকেই কলা দেখাবি মুখপোড়া—গুণে গুণে অতগুলো তুলসী দিলুম ঠাকুরকে, দাঁড়া দেখাচ্ছি তোর পাশ করা—দাঁড়া—

বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল অঘোরদাদু।

মা খুব রাগ করতে লাগলো। বললে—আমার না-হয় মনে ছিল না, আমার সাতটা ভাবনা মাথায় ঘুরছে, তোর তো খেয়াল করতে হয়—কী করিস বল্ তো সারাদিন—কেবল খাওয়া আর কলেজ যাওয়া—আর তোর কী কাজ শুনি?

চন্নুনী সকাল বেলা বাজারে যায়। হিসেব করে করে বুঝিয়ে দেয় মা। বলে—এই চার আনার মধ্যে সব আনতে হবে চন্নুনী—বুঝলে বাছা?

চন্নুনী ফোড়ন কাটে। বলে—চার আনায় কেমন করে আনি আমি, আমি তো গুণ্ জানিনেকো—

—ওর বেশি আমি দিতে পারবো না বাছা! বেশি লাগে তো বাবার কাছে চেয়ে নিয়ে যাও—আমি জানি না—

চন্নুনী জানতো। অঘোরদাদুর কাছে গিয়ে পয়সা চাইবার সাহস নেই তার। গজ্ গজ্ করতে করতে ঝুড়ি নিয়ে বাজারে চলে যেত। তারপর অনেক বেলা করে যখন আসতো, তখন উনুনের কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ গো চন্নুনী, এই এখন বাজার আনলে তুমি? কখন রান্না করবো আর কখন খেতে দেব শুনি?

শুকনো পুঁইশাক, চিংড়িমাছ, একফালি কুমড়ো, আধসের আলু, একটা বেগুন এমনি আরো ক'টা জিনিস এনে ফেলেছে তখন চন্নুনী।

উত্তরে চন্দনী বলতো—আমি আর পারবো নি গো বাজার করতে—

—তা পারবে না তো বাবাকে গিয়ে বলো তুমি—আমাকে বলে কি লাভ বাছা? আমি কে?

চন্দনী বলতো—তা সব কথায় তুমি বাবাকে দেখাও কেন বল তো দিদি। বলি তুমি কেউ নও? বলি তুমিও তো এ-বাড়ির লোক গো—

মা রেগে যেত। তাড়াতাড়ি তরকারিগুলো বঁটিতে কুটতে কুটতে বলতো—না, আমি এ-বাড়ির কেউ নই, কেউ নই, আমি এ-বাড়ির কেউ হতে যাবো কেন শুনি? আমার কপাল পুড়েছে, তাই তোদের বাড়ি এসে ভাত রাঁধছি—আমার ছেলে মানুষ হলে আমি এখানে আর ভাত রাঁধবো ভেবেছিস?

বিন্তী দরজার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো। যতক্ষণ মা'র সঙ্গে চন্দনীর কথা হতো, ততক্ষণ কিছু কথা বলতো না মুখে। যেন মহা অপরাধ করেছে সে এ-বাড়িতে মেয়ে হয়ে জন্মিয়ে। যেন মহা অন্যায় করেছে সে এখানকার সকলের চোখের সামনে বড় হয়ে। যখন ছোট ছিল বিন্তী, তখন এতটা বুঝতে পারেনি। এই কালিঘাটের আরো দশজন ছেলে-মেয়ের মত খোলা আকাশ আর ভাঙা ছাদের তলায় মানুষ হয়েছে। দেখেছে এক বৃদ্ধ অথর্ব সংসার-বিরাগী মাতামহ আর দুটি ভাইকে। ভাই দুটি কখন একে একে বাড়ি ছেড়ে বাইরের জগতে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। কখন নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে সমস্ত মন, কিছুই তার খেয়াল ছিল না। তারপর একদিন অত্যন্ত নিঃশব্দে টিপি টিপি পায়ে যখন যৌবন এসেছে, তখন ভয়ে আত্মগোপন করেছে একেবারে নিজের অন্তস্তলের অন্তঃপুরে। তার সেখানকার সে-বন্দিত্বের সংবাদ কেউ রাখেনি, রাখবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। এক জানতে পারতো চন্দনী। ছোটবেলা থেকে ওই চন্দনীই ছিল একাধারে সব। রান্না করেছে, খাইয়েছে, বাজার করেছে, আবার উঠোনও ঝাঁট দিয়েছে। ওই চন্দনীই ছিল তখন মায়ের মতন। কিন্তু চন্দনীও একদিন বুড়ী হয়ে গেল। চোখে ছানি পড়লো তার। সে-ও বুঝতে পারলে না মেয়েটার কথা। তখন এল দীপুর মা। তখন হঠাৎ যেন একটা আশ্রয় মিললো। হঠাৎ যেন একটা আশ্বাস মিললো তখন।

বলতো—দিদি—

তরকারি কুটতে কুটতে মা বলতো—কীরে? কিছু বলবি মা তুই?

আর কথা শোনা যেত না বিন্তীর। বিন্তীর মুখে তখন কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

মা আবার বলতো—কী বলছিলি বল্ না মা?

—তুমি চলে যাবে দিদি?

—ওমা, তুই বুঝি ভয় পেয়ে গেছিস ওমনি! দূর, আমি কোথায় যাবো বাছা, আমার সেই চুলোর ছাড়া আর যাবার জায়গা রেখেছে কী ভগবান! আমার দীপু আবার মানুষ হবে, আমি নাকি আবার তাই দেখবো! তুইও যেমন!

বিন্তীর মুখে তখনও কথা নেই—

মা বলতো—তোর কোন ভাবনা নেই মা, তোর একটা হিল্লে করে তবে যাবো, দেখিস—

বিন্তী যেন মনে-মনে বড় সান্ত্বনা পেত মা'র কথা শুনে। কিসের আশ্বাস, কিসের সান্ত্বনা, তা জানতো না, তা প্রকাশ করতেও পারতো না। কিন্তু তবু মনে হতো মা'র অভয় পেয়ে বিন্তীদি যেন বড় আশ্বস্ত হয়েছে। তারপর নিজের ঘরের দরজাটার সামনে বসে মা'র রান্না দেখতো।

যখন অনেক রাত হতো, মা বিন্তীর ঘরে গিয়ে বলতো—দরজা বন্ধ করে শুয়ো বাছা—দরজায় খিল লাগিয়ে দিও—যদি দরকার হয় তো আমাকে ডেকো মা—বুঝলে—

তারপর এক একদিন ছিটেকে খেতে দিয়ে মা বলতো—হ্যাঁ বাবা, তোমরা উপযুক্ত ভাই থাকতে ছোট বোনটার একটা বিয়ে দেবে না—এ কেমন কথা—

ছিটে-ফোঁটা কেউ-ই বাড়ির ব্যাপারে বড় থাকে না কোনওদিন। বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়ার সম্পর্ক তাদের। তা-ও অঘোরদাদুকে লুকিয়ে। অঘোর-দাদু যদি জানতে পারতো যে, ছিটে-ফোঁটা বাড়িতে খেতে আসে তো অনর্থ বাধাতো অনেকদিন আগেই।

খেয়ে নিয়ে আঁচিয়ে আবার বেরিয়ে যেত তারা।

একদিন ফোঁটাকেও ওই কথা বললে মা। বললে—তোমরা উপযুক্ত দাদা রয়েছ, তা বোনটার কথা তো তোমরা কেউ একবার ভাববে—

বাড়িতে শুধু খাওয়া। খেতেই আসে দু'ভাই। হয়ত খেতে আসবার আগে একেবারে গঙ্গায় স্নান করে বাড়িতে এসে ঢোকে।

খেতে খেতে ফোঁটা বললে—তা আমরা কী করবো দিদি—বুড়োটা বেঁচে থাকতে সে আমরা কী করবো—

—উনি বুড়ো মানুষ, ওঁর কি চোখ আছে, ওঁর কি খাটবার ক্ষমতা আছে—

—ক্ষমতা তো নেই, কিন্তু মুখের তেজ তো আছে ষোল আনা। শালা মুখের তেজের জ্বালায় বাড়িতে পর্যন্ত টিঁকতে দেয় না—

মা বলতো—বুড়ো হলে মানুষ ওই রকমই হয় বাবা, তা বলে কি রাগ করা চলে, এই যে খেতে পাচ্ছো দু'বেলা এও তো ওঁরই দৌলতে—উনি রোজগার করে আনছেন বলেই তো দুবেলা মুখে দিতে পাচ্ছো তোমরা!

—মাইরি আর কি! খেতে দেবে না মানে! বুড়োর বাপ খেতে দেবে—বুড়োর চোদ্দপুরুষ খেতে দেবে—খেতে না দিলে বুড়োকে দেখে নেব না একচোট—মাথায় থান ইঁট মারবো না—

এর পর আর বেশি কথা বলা চলে না। বেশি কথার মানুষও নয় ছিটে-ফোঁটা। খেয়ে উঠে আর এক মিনিট দাঁড়ায় না কেউ। উঠোনের কলের চৌবাচ্চায় আঁচিয়ে নিয়ে সোজা বাইরে চলে যায়। তারপর বাইরে গিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর সারা দিনের মধ্যে আর দেখা

পাওয়া যায় না তাদের।

তখন ছোট একটা পেতলের হাঁড়িতে আলোচালের ভাত একেবারে পুড়ে যাবার অবস্থা।

কলতলা থেকে মা ডাকে—ওমা বিন্তী, ওমা—বাবার ভাতটা পুড়ে গেল—নাবালি না—

অঘোরদাদুর ভাতটা মা আর নামায় না। ওটা নামাবার ভার বিন্তীর ওপর।

বিন্তী বলে—তুমি নামালেই পারতে দিদি—

—না বাছা, বামুনের ভাত উচ্ছিষ্ট করে পাতক হবো নাকি?

—তা আমাদের ভাত তুমি নামাও যে?

মা বলে—তোমরা হলে আমার মেয়ের মতন—চন্নুনীর হাতের ছোঁয়া খেয়ে মানুষ হয়েছ তুমি, আর আমার ছোঁয়া খেলে কী আর এমন দোষ!

তা এমনি করেই একদিন দীপুর মা এসে অঘোরদাদুর বাড়ির সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিয়েছিল। এমনি করে একদিন এ-বাড়ির ভাত রাঁধা থেকে শুরু করে বাজার করা, হিসেব রাখা, নাতি-নাতনি মানুষ করা, সব কাজের ভার এসে পড়েছিল দীপুর মা'র ওপর। অঘোরদাদু কখনও টাকা দিয়েছে, কখনও দেয়নি। কখনও ঝগড়া করতে হয়েছে মা'কে। কখনও তর্ক করতে হয়েছে মা'কে। অঘোরদাদুর কাছ থেকে বিন্তীর শাড়ি শেমিজ কেনার টাকাও যেমন আদায় করতে হয়েছে জোর করে, অঘোরদাদুর বাড়িঘর সারানোর টাকাও তেমনি আদায় করতে হয়েছে। বুড়ো টাকা খরচ করতে চায় না, অঘোরদাদুর কেবল মনে হয় সংসারে সবাই বুঝি তার টাকার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে। অঘোরদাদুর কাছে সংসারে সবাই-ই ছিল যেন অঘোরদাদু।

কিন্তু সেই অঘোরদাদুই বোধ হয় একদিন বুঝতে পেরেছিল সংসারে আর এক ধরনের মানুষও আছে। একদিন রাত্রে হঠাৎ চণ্ডীবাবুদের বাড়ি ডাকাতি হয়ে গেল। চণ্ডীবাবুদের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের গায়ের গয়না চুরি হয়ে গেল সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। রামধনি দরোয়ান গেটের পাশেই শুয়ে থাকতো, সে-ও টের পায়নি কিছু। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কুল-পুরোহিত এসে পুজো করে গিয়েছেন, আরতি হয়েছে, ভোগ হয়েছে, সেবা হয়েছে, ধূপ-ধুনো জ্বলেছে, কাঁসর-ঘন্টা বেজেছে। যা যা রোজ হয় তাই-ই হয়েছে। হঠাৎ পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল—ঠাকুরবাড়ির দরজার তালা ভাঙা। বিগ্রহের গলার পঞ্চাশ ভরি সোনার হাত আর মাথার মুকুটের সোনার মণিটা নেই। চণ্ডীবাবুরা বড়লোক। তাঁদের লোকসান গায়ে লাগে না অত—কিন্তু তারপর থেকে অঘোরদাদুর চোখের ঘুম, দিনের বিশ্রাম সব ঘুচে গেল। আশে-পাশে একটা কিছু আওয়াজ হলেই চিৎকার করেন—কে? কে রে? কে র‍্যা মুখপোড়া?

দীপঙ্কররা যখন কালিঘাটে এসেছিল, তখন এমন কালিঘাট ছিল না। ছোট ছোট খড়ের চালা আর সরু সরু গলি। গলি দিয়ে দিয়ে এখান থেকে একেবারে ওই মন্দিরে যাওয়া যেত এক মিনিটের মধ্যে। কার বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে, কার বাড়ির উঠোনের মধ্যে দিয়ে একেবারে এক নিমেষে চলে যাওয়া যেত ভবানীপুর পর্যন্ত। অঘোরদাদুর ছাদে উঠলে এদিকে ওদিকে কত গাছ দেখা যেত। রাত্রিবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে ঘরের জানালা দিয়ে দীপঙ্কর চোখ মেলে দেখতো—আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে অনেকগুলো দৈত্য যেন মাথাভর্তি জটা নিয়ে এদিক-ওদিক করছে। দিনের বেলায় নারকোল গাছগুলোই যে রাত্রিবেলা দৈত্য হয়ে উঠতো তা আর বোধ হয় মনে থাকতো না তখন।

—ও মেয়ে, মেয়ে—মুখপোড়া কানেও শোনে না।

অনেক রাত তখন। অঘোরদাদু খড়ম পায়ে একেবারে দীপুদের ঘরের সামনে এসে ডাকতে শুরু করেছে। দীপঙ্কর তখন ছোট—খুব ছোট। কোথাকার কোন্ হুগলী জেলার ব্যাটরা গ্রাম থেকে সবে এসে উঠেছে অঘোরদাদুর বাড়িতে। না আছে একটা আশ্রয়, না আছে একটু সম্বল।

অঘোরদাদু বললে—কিসের শব্দ হলো মেয়ে?

—কই কিছু শব্দ শুনিনি তো—কিসের শব্দ?

অঘোরদাদু বললে—শব্দ শোনোনি—তাহলে আমি শুনলুম যে,—

অঘোরদাদু ছট্‌ফট্ করতে লাগলো ক'দিন ধরে। রাতেও ঘুম নেই, দিনেও ঘুম নেই। যজমানবাড়িতে পুজো করতে যাওয়া হয় না সময়মত। ঘরের তালাটা বার বার টেনে টেনে বন্ধ করে। বাইরে গিয়ে রিকশায় উঠে আবার ফিরে আসে। আবার তালাটা টেনে টেনে দেখে। আবার বাইরে যায়। কোথাও গিয়েও শান্তি নেই মনে। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে তালাটা টেনে দেখে।

তারপর একদিন ডাকাতি হলো গঙ্গার ওপারে। ডাকাতরা ওপারে ডাকাতি করে এপারে কালিঘাটে শা'নগরে এসে সিন্দুক ভেঙে খালি করেছে।

তখন অঘোরদাদু আর ঠিক থাকতে পারলে না। আবার একদিন রাত্রে এল। ডাকলে—ও মেয়ে, মেয়ে,—

—কী বাবা?

—তুমি এই ঘরে এসে শোও বাছা, আমি আর পারিনে মুখপোড়াদের জ্বালায়—

—কিন্তু আপনি? আপনি কোথায় শোবেন?

তা সেই দিন থেকে তাই-ই ঠিক হলো। দীপঙ্করকে নিয়ে মা শুতে লাগলো অঘোরদাদুর ঘরে। মাকে লোহার সিন্দুকটা পাহারা দিতে হলো সেই দিন থেকে। আর সেই দিন থেকে অঘোরদাদু দোতলার ঘরটায় নিজের শোবার ব্যবস্থা করলে। কিন্তু তবু অঘোরদাদুর ভাবনা কমেনি। প্রথম প্রথম দিনের মধ্যে দশবার অঘোরদাদু এসে দেখে যেত। বলতো—মুখপোড়া তালাটা ঠিক আছে তো—?

বলে তালাটা টেনে টেনে দেখতো বার বার—

তারপর বলতো—ছিটেফোঁটা তোমার ঘরে কেউ আসে না তো মেয়ে—?

মা বলতো—না বাবা—

—এলে মুখপোড়াদের বাড়ি ঢুকতে দেবে না—এই বলে রাখলুম—বাড়িতে ঢুকতে দেবে না—খ্যাংরা মেরে দূর করে দেবে—

—তা ওরা খাবে কি বাবা? আপনি না খেতে দিলে ওরা খাবে কী? ওরাও তো আপনার নিজের নাতি—

অঘোরদাদু রেগে যেত। নিজের নাতি না কচুপোড়ার নাতি!—অমন নাতি আমার দরকার নেই, আমি অমন নাতির মুখ দেখতে চাইনে, মুখপোড়া নাতি-নাতনি আমার সগ্যে বাতি দেবে, বলি আমার পিণ্ডি চটকাবে মুখপোড়ারা—

মা এক একদিন বলতো,—তা আমার দীপুও তো একদিন বড় হবে, তখন? তখন দীপু যদি সিন্দুক ভাঙে বাবা—

অঘোরদাদু বলতো—তা টাকা বড় না ছেলে বড় রে মেয়ে—টাকার চেয়ে ছেলে বড় হলো তোর কাছে? খুব সাবধান মেয়ে, ছেলেকে বিশ্বাস করিসনি মেয়ে, মুখপোড়া ছেলে সব পারে, ছেলে তোর গলায় ছুরি বসাতে পারে। ও ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি জামাই-ভাগ্নে মুখপোড়াদের কাউকে বিশ্বাস করিসনি—

—তা হলে বিশ্বাস করবো টাকাকে?

—টাকাই তো সব রে মুখপোড়া। টাকা আছে বলে বেঁচে আছি যে রে মুখপোড়া! টাকা আছে বলে খেতে পাচ্ছি যে রে মুখপোড়া! টাকাই তো ধর্ম টাকাই তো জপ তপ রে মুখপোড়া, টাকাই তো ঠাকুর রে—

কথাগুলো দীপঙ্কর সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসতো অঘোরদাদুর। মা বোধ হয় বিশ্বাসও করতো কথাগুলো, আবার বিশ্বাস করতোও না বোধ হয়। একদিন টাকার জন্যেই তো দেশ ছাড়তে হয়েছে, গ্রাম ছাড়তে হয়েছে, " দ্বেরে ভিটে ছাড়তে হয়েছে মাকে। ওই টাকার জন্যেই তো মা একদিন রাত-দুপুরে বাটিরা ছেড়ে দীপুকে কোলে করে নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। ওই টাকার জন্যেই তো বাবাকে খুন করেছে ডাকাতেরা। অনেকদিন দুপুরবেলা অকারণে মা'র চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখেছে দীপঙ্কর। কোথাও কিছু নেই—মা চোখের জলটা আঁচলে হয়ত মুছে ফেলেছে। দীপঙ্কর প্রথম প্রথম কিছু বুঝতে পারতো না।

চন্নুনী বাজার থেকে কলাটা-মুলোটা আনলেই মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর জিজ্ঞেস করতো। দর শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতো বুক চিরে। বলতো—এই শুকনো একটা আমের কষি, তা-ও আবার পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে মেয়ে—

বলতো—এই দীপুদের বাগানে একবার ঘুরে এলে এক চুবড়ি আম—কেউ খাবার লোক নেই—

দীপু জিজ্ঞেস, করতো—সেখানে চলো না মা—

মা থেমে যেত। বলতো—ভগবান যদি দিন দেন তো যাস্ তুই, আমি আর দেখতে পাবো না সে-সব—

সে মর্মান্তিক গল্প শুনেছে একদিন মা'র কাছে। সকাল বেলা বাবা গিয়েছে কাছারিতে। জমি নিয়ে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সঙ্গে মামলা। মামলা চলছে দু বছর ধরে। মামলা নিয়ে উকিল-মুহুরি করতে হচ্ছে। কেবল সদর আর ঘর।

মা বলতো—জমি নিয়ে তোমার এত হেনস্থার দরকার কী! তুমি জমি ছেড়ে দাও ওদের—ও বড় নচ্ছার জিনিস—

বাবা বলতো—আমার জমি তা বলে ছেড়ে দেব? নইলে দীপু বড় হয়ে আমাকে দুষবে না!

হায়রে! সেই দীপুই আবার বড় হবে একদিন, সেকথা কি মা ভেবেছিল! সেই দীপুর ভবিষ্যতের জন্যেই মামলা, অথচ কোথায় রইল দীপু, আর কোথায় রইল সেই জমি! আর কোথায়ই-বা রইল সেই মানুষটা। সন্ধ্যে হয়ে গেল তখনও আসে না। রাত নিষুতি হয়ে গেল, তখনও আসে না। একবার মা'র সন্দেহ হল। দীপু তখন ঘুমোচ্ছে, আস্তে আস্তে মা দরজাটা খুলে একবার বাইরেটা দেখলে। সামনে একটা চালতা গাছ ছিল। সেই চালতা গাছের তলা দিয়ে কাছারি যাবার রাস্তা। মা একবার হাঁক দিলে। বউমানুষ, তবু যেন কোথা থেকে সাহস ফিরে এল বুকের মধ্যে।

ডাকলে—ও গোলাম, গোলাম মোল্লা—

গোলাম মোল্লা ছিল দীপুর বাবার ছিটে প্রজা। চাকরান জমি দিয়ে তাকে রেখেছিল দীপুর বাবা। কাঠ কেটে দিত, বাগানের আম-কাঁঠাল পেড়ে দিত। বাঁশ কেটে দিত। ফাই-ফরমাশ সবই করতো গোলাম মোল্লা। বিপদের দিনে সেই গোলাম মোল্লাকেই ডাকলাম প্রাণপণে।

গল্প শুনতে শুনতে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

সে এক দিন গেছে দীপুর মা'র জীবনে। মানুষটা সকালে খেয়ে দেয়ে কাছারি গেছে, তখনও এল না। এমন তো হয় না। তারপর পুবের বাঁশঝাড়ে একটা চাঁদ উঠলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও গোলাম মোল্লার সাড়া-শব্দ নেই।

মা আবার ডাকলে—ও গোলাম, গোলাম মোল্লা—গোলাম মোল্লা বাড়ি আছো?

মা জানতো গোলাম এলে আর ভাবনা নেই। যেমন করে হোক মানুষটার একটা খবর আনবেই আনবে। রাত বিরেতে একমাত্র গোলামই অসমসাহসের কাজ করতে পারে। তার প্রাণে ভয়-ডর বলে কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো গোলাম মোল্লার ঘরটার দিক থেকেই কে যেন ছুটে বেরিয়ে এল। আর হাতে তার যেন কী একটা চক্ চক্ করে উঠলো। চাঁদের আলোয় দীপুর মা দেখলো গোলাম মোল্লা একটা ধারালো কাটারি নিয়ে তার দিকেই ছুটে আসছে—

মা চিৎকার করে উঠলো—ও গোলাম, গোলাম নাকি? কে গো তুমি?

এক মুহূর্তের ব্যাপার। এক মুহূর্তের জন্যেই ভগবান বাঁচিয়ে দিলেন সেদিন। হয়ত দীপুর ভবিষ্যতের জন্যেই মা বেঁচে গেল। নইলে ছিট-প্রজা গোলাম মোল্লাই যে টাকা খেয়ে মাকে খুন করতে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল তখন? আর শুধু কি দীপুর মা, দীপুকেও হয়ত খুন করে ফেলতো সেদিন। টাকার এমনই খেলা। টাকায় সবাই বশ হয়। টাকার মতন নচ্ছার জিনিস আর সংসারে আছে কী?

গল্প শুনতে শুনতে দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করতো—মা, তারপর?

—তারপর কি আমার আর জ্ঞান আছে! দরজায় হুড়কো লাগিয়ে তোকে কোলে করে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম! রাতটা পোয়ালো, সকাল হলো, মানদা এল। গুপি পেয়াদা এল—আর, তারপর—

বলতে বলতে মা কান্নায় ভেঙে পড়তো। বলতো—শেষকালে আর চেনা যায়নি রে, সারা শরীর এমন খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। তোর বাবার হাতে চারটে আঙটি ছিল, সেগুলো দেখেই চিনতে পারলে সবাই—

তা দুদিন দু-রাতও কাটলো না। পুলিস-পেয়াদারা গাঁ ছেড়ে চলে যেতেই আবার শুরু হলো। দিনরাত দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে পড়ে থাকি আর ভগবানকে ডাকি। তা শেষকালে তা-ও ভয় করতে লাগলো। সারা গাঁয়ে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয় সবাই গাঁ-সুদ্ধু লোক যেন টাকা খেয়েছে জাঠ-শ্বশুরের। টাকা এমনই জিনিস রে দীপু, সম্পত্তি এমনই জিনিস। ওই জমি-জমা না থাকলে কিছুই হতো না। মানুষটাও অমন করে খুন হতো না, আমাকেও হাত পুড়িয়ে পরের বাড়ি এসে এই এমন করে রাঁধতে হতো না।

এসব অনেক দিনের কথা। অনেক দিন আগেই এসব গল্প শুনেছে দীপঙ্কর। ওই কিরণ, ওই প্রাণমথবাবু, ওই অঘোরদাদু, ওই চন্নুনী, বিন্তীদি, ওই ছিটে-ফোঁটার কাহিনীও দীপঙ্করের অন্তরাত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নিজের জন্মের সঙ্গে যে দুর্ভাগ্য তার সঙ্গী হয়ে আছে, তার থেকে মুক্তি পাবার স্বপ্ন দেখতো দীপঙ্কর, কিন্তু কিরণের মত অতটা বিশ্বাস করতে বুঝি তার ভয় হতো। বড় ভীতু দীপঙ্কর। কাউকে আঘাত দিতেও ভয় পেতো, কাউকে ভালবাসতেও তার ভয় হতো। মনে হতো কোনও কিছুকে খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই, কাউকে ঘাঁটিয়েও লাভ নেই। যে-যেমন আছে, সবাই তেমনি থাকুক। কারোর যেন কোনও ক্ষতি না হয়, কোথাও যেন কিছুর ব্যতিক্রম না হয়। অঘোরদাদু হোক কৃপণ, তার বিশ্বাসের যেমন কোনওদিন অমর্যাদা না করে দীপঙ্কর, অবিশ্বাসেরও তেমনি যথাযথ মূল্য যেন সে দেয়। লক্ষ্মণ সরকার তাকে চাঁটি মেরে যদি তৃপ্তি পায় তো পাক, তাতে তার কী এমন ক্ষতি! একটু না-হয় সহ্যই করবে, একটু না-হয় মুখ বুজে থাকবে, তাতে

কালিঘাটের নিয়মিত জীবনযাত্রার ধারায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটলেই হলো। অঘোরদাদু যেমন যজমানদের ঠকায়, তেমনিই ঠকিয়ে যাবে, মধুসূদনের রোয়াকে দুনিকাকারা যেমন পরনিন্দা করে, তেমনি পরনিন্দাই করবে। প্রাণমথবাবুও জেলে গিয়ে যদি দেশসেবা করতে চান তো করুন, কিরণ যদি মনে করে লাইব্রেরী করেই স্বরাজ আসবে তো মনে করুক। অথচ যা হবার তা হবেই। দীপঙ্কর ভেবে দেখেছে, কারোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের পরোয়া করে পৃথিবী তার নিজের পথ একটুকু ছাড়বে না। সে চলবেই। বরাবর যেমন করে চলে এসেছে, তেমনি করেই চলবে! আমড়া গাছে যে-কাকটা দিনের পর দিন চুপ করে খাবারের আশায় বসে থাকে তেমনি করেই বসে থাকবে। যতদিন বাঁচবে ততদিন। আর তার সঙ্গে দীপঙ্করও দিনের পর দিন নিজের পায়ে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এমনই সব চলছিল, হঠাৎ লক্ষ্মীদিরা আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আবার আশা করতে ভালো লাগলো দীপঙ্করের।

লক্ষ্মীদির চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে একজনকে দিয়ে আসার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ ছিল। লক্ষ্মীদির নাচ, লক্ষ্মীদির লেখাপড়া, লক্ষ্মীদির আদর, সব কিছুই। দীপঙ্কর ভেবেছিল, লক্ষ্মীদি যেন দীপঙ্করকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। তার ইস্কুল, কলেজ, লেখাপড়া, দেখাশোনা, ভাবা সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন এক নতুন উন্মাদনা এনে দিয়েছিল লক্ষ্মীদি! এতদিন জীবনকে যেন এদিক থেকে আস্বাদ করা হয়নি। কোন্ এক অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে চিঠি দিয়ে আসার মধ্যে দীপঙ্করের কিসের স্বার্থ কে জানে! কিন্তু তবু সে-কাজেও কত যেন উৎসাহ তার। বৃষ্টি মাথায় করে চিঠি দিয়ে আসার মধ্যে যেন কোনও স্বার্থসিদ্ধি আছে দীপঙ্করের। যেন চিঠিটা না দিয়ে আসতে পারলে তার মহা লোকসান হয়ে যাবে একেবারে।

আর তারপর একদিন সতী এল।

কিন্তু কী মর্মান্তিক তার আবির্ভাব। সেই সতী যদি এলই তার জীবনে, তবে প্রথম সাক্ষাতের দিনই কেন অমন করে আঘাত দিলে সে! সে-আঘাতের কথা অনেক দিন ভুলতে পারেনি দীপঙ্কর। অনেকদিন ভেবেছে দীপঙ্কর আর লক্ষ্মীদির কথা ভাববে না। কিরণ কতবার বলেছে—কীরে, ওদের মেম্বার করেছিস?

—কাদের?

—ওই তোদের বাড়ির ভাড়াটেদের মেয়েদের? যাদের সঙ্গে তোর অত ঝগড়া-রগড়ি?

কথাটা সেদিনই ভালো লাগেনি দীপঙ্করের। কিরণের কথাটার মধ্যে

ইঙ্গিতটাও ঠিক মুখরোচক নয়।

বললে—ওদের সঙ্গে আর আমার ভাব নেই—

কিরণ জিজ্ঞেস করেছে—কেন রে, কী হলো আবার?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, ওরা বড়লোক—

আসলে বড়লোক হওয়াটা ওদের বড় অপরাধ নয়। দীপঙ্করের মনে হতো, সে তো ওদের কাছে তার কলেজের মাইনে, বই কেনবার টাকা চাইতে যাচ্ছে না। যাবেও না কোনওদিন। তাদের টাকা নিয়ে তারাই থাকুক। যতদিন প্রাণমথবাবু আছেন.. ততদিন তিনিই দিয়ে যাবেন। কিন্তু যারা তাকে ছোট মনে করে তাদের সঙ্গে কী করে মিশতে পারে সে। সে তো সব বিষয়ে ছোট, সব বিষয়ে। শুধু অর্থের দিক দিয়েই নয়, সামর্থ্যের দিকেও বটে। আর শুধু সামর্থ্যের দিকেও নয়, অন্তরের দিক থেকেও। অর্থমূল্য দিয়ে যারা সব কিছুর বিচার করে, তাদের কাছে দীপঙ্করের কতটুকু মূল্য। ওরাও তো অঘোরদাদুর সমগোত্রীয়। দীপঙ্করকে ওরা করুণা করে। দীপঙ্কর গরীব বলেই ওরা সহানুভূতি দেখায়। দীপঙ্করকে হয়ত মানুষ বলেও মনে করে না। দীপঙ্করকে যদি মানুষ বলেই মনে করতো তাহলে তার হাত দিয়ে কি লক্ষ্মীদি চিঠি পাঠাতো। লক্ষ্মীদি তাকে যে বিশ্বাস করে, তার কারণ বিশ্বাসঘাতকতা করবার ক্ষমতাই যে নেই দীপঙ্করের।

কিরণ বলেছিল—বড়লোক বলেই তো বলছি রে—ভজুদা বলেছে বড়লোকদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, পটিয়ে-পাটিয়ে টাকা নিতে দোষ নেই—তুই একবার যা না, দেখ্ না কী বলে—

সেদিন অনেকবার ভাববার পর দীপঙ্কর গিয়েছিল। বলতে গেলে কিরণই পাঠিয়েছিল জোর করে—

সতী তখন ছিল না বাড়িতে। দীপঙ্কর জানতো সে সময়ে সতী থাকে না। বৃহস্পতিবার ছোট মেয়েটা আসে দেরি করে। লক্ষ্মীদির কলেজের গাড়িটা গলির মোড়ে এসেই একবার হর্ন বাজায়। দীপঙ্কর তৈরিই ছিল। লক্ষ্মীদি বাড়িতে ঢুকছিল, দীপঙ্কর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি ডাক শুনেই পেছন ফিরেছে। বললে—দীপু? কী রে?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে লক্ষ্মীদি।

—কথা আছে তো ভেতরে আয় না।

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে একলা বলবো—কারোর সামনে বলতে চাই না।

লক্ষ্মীদি হাসল। বললে—কেন রে! খুব গোপন কথা বুঝি?

—না, তোমার বোনের সামনে বলতে চাই না—

—কেন? সতী কী করলে তোর?

—তোমার ছোট বোন আমাকে দেখতে পারে না!

—কী করে বুঝলি তোকে দেখতে পারে না?

—কী জানি! তোমার সঙ্গে বেশি কথা বলি বলে হয়ত। কিন্তু আমি তাকে কিছুই বলিনি কোনওদিন, অথচ আমাকে দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। সেই জন্যে তো আগেকার মতন তোমাদের বাড়িতেও আসি না। অথচ তোমার কাছে শুনেছিলাম, তোমার বোন খুব ভালো—

—তা আমি বুঝি সতীর চেয়েও ভালো?

দীপঙ্কর হাসলো শুধু। কিছু বলতে পারলে না মুখ ফুটে। তারপরে লক্ষ্মীদি বললে—আয়, ভেতরে আয়, সতী এখন নেই বাড়িতে—কী কথা আছে তোর শুনবো—

ওপরে লক্ষ্মীদি পড়ার ঘরে গিয়ে বইগুলো রাখলে। জানালাটা খুলে দিলে। দীপঙ্কর ভাবছিল, কেমন করে লাইব্রেরীর চাঁদার কথাটা পাড়বে। একখানা রসিদ-বই দিয়ে দিয়েছিল কিরণ। 'দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'র রসিদ বই। রবার স্ট্যাম্প লাগানো। কথাটা পাড়তে কেমন দ্বিধা হচ্ছিল। দু টাকা চাঁদা চাইতেও কেমন লজ্জা হচ্ছিল। দু টাকা কি সোজা কথা। দু টাকা না হলে এক টাকা। কিরণ বলে দিয়েছিল—আর যদি এক টাকা না দিতে চায় তো আট আনা, আট আনাই সই—আট আনা দিতে চাইলেও ছাড়বি না—দুখানা করে বই পাবে দিনে—ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারবি তো, না হাঁদার মতন কেবল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবি?

লক্ষ্মীদি একটা শাড়ি আর শেমিজ নিয়ে বাইরে গেল। বললে—তুই বোস্, আমি আসছি—

কিরণ বলেছিল—যে-কোনও রকমে মেম্বার ওদের করতেই হবে বুঝলি—আর তুই যদি না পারিস তো আমাকে নিয়ে যাস্ সঙ্গে করে, আমি ঠিক মেম্বার করে নেব ওদের—সব্বাইকে মেম্বার করলাম আমি! রাখাল, নির্মল পালিত, সব্বাইকে তো আমিই মেম্বার করলুম—তাহলে তোকে প্রেসিডেন্ট করে লাভটা কী আমার—

লক্ষ্মীদি ঘরে এল। বললে—চা খাবি?

চা? দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যিই লক্ষ্মীদিকে বেশ দেখাচ্ছে। শাড়িটা বদলে পরেছে। পরে আয়নার সামনে গিয়ে পাউডার ঘষছে মুখে। চুলটা খোঁপাটা ঠিক করে নিচ্ছে। না, হঠাৎ সামলে নিলে দীপঙ্কর। কিরণের কথাটা মনে পড়লো। সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যাবে না সে। বড়লোক যারা, তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে, পটিয়ে-পাটিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। কিরণকে ভজুদা বলেছে।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ খাবো—

রঘু এক কাপ চা এনে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদি সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—আর এক কাপ নিয়ে আয় রে রঘু—দীপুও চা খাবে আজ—

রঘুও অবাক হয়ে গেছে। বললে—দীপুবাবু, চা খাও তুমি?

দীপঙ্কর বললে—খাই না, শুধু আজ খাবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথায় চা খাচ্ছে ও—

রঘু আবার চা দিয়ে গেল। কিরণ বলেছিল চা মানে কুলির রক্ত। কিন্তু হোক কুলির রক্ত। হয়ত কিরণ শুনলে রাগ করবে। 'দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'র প্রেসিডেন্ট হয়ে কেন সে চা খেলে? কিন্তু সেদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে এক টেবিলে পাশাপাশি বসে চা খেতে তার কত ভালোই যে লেগেছিল! পরে জীবনে অনেকবার এই তার প্রথম চা খাওয়ার কথাটা মনে পড়েছে। চা খাওয়ার জন্যে নয়—কিন্তু লক্ষ্মীদির আদরের জন্যেই চা খাওয়াটা তার স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল, সেদিন সে চা খায়নি, বিষ খেয়েছিল। সক্রেটিসের মতন হেম্‌লক্‌ খেয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু সক্রেটিসের মতন সে বলতে পারেনি— Be hopeful then, gentlemen of the jury, as to death; and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—চা কেমন লাগলো রে তোর দীপু?

দীপঙ্কর বললে—খুব ভালো লক্ষ্মীদি—

—তবে? তবে যে চা খাস না তুই?

দীপঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গে বসে খাচ্ছি বলে বোধহয় ভালো লাগছে এত—অন্য কারুর সঙ্গে খেলে হয়ত এত ভালো লাগবে না—

লক্ষ্মীদি হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই তো বেশ কথা বলতে শিখেছিস দেখছি— when my Daisy sits by me, I need no sugar in my tea—কী বল্‌?

একদিন চকোলেট দিয়েছিল লক্ষ্মীদি, সে অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিন সে চকোলেট দীপঙ্কর খেতে পারেনি। সেদিন সন্দেহ হয়েছিল তার। তারপর অনেকবার দেখেছে লক্ষ্মীদিকে, অনেকভাবে মিশেছে,—এখন আর সন্দেহ হয় না। দীপঙ্কর চায়ের শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত গলায় ঢেলে নিঃশেষ করে দিলে।

তারপর বললে—তোমার ছোট বোন এখুনি এসে পড়বে না তো?

—কেন রে? সতীকে তোর অত ভয় কেন বল্‌ তো?

দীপঙ্কর বললে—ভয় নয়; কেমন যেন আমাকে পছন্দ করে না মনে হয়—

—কেন? তোকে কিছু বলেছে?

দীপঙ্কর বললে—বলেনি কিন্তু আমার দিকে অমন করে চায় কেন? সেদিন ব্যারিস্টার পালিতের বাড়িতে দেখে তাই মনে হলো—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—বুঝেছি, সে আমার জন্যে—

—তোমার জন্যে? কেন? তোমার জন্যে আমাকে অপছন্দ করবে কেন?

লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। মুখটা যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি যেন হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি চোখ নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলো। দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারলে না। হঠাৎ কী এমন ঘটল, যার জন্যে অমন গম্ভীর হয়ে গেল লক্ষ্মীদি।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার লক্ষ্মীদি—?

—সে তুই বুঝবি না ভাই—বড় হলে বুঝতে পারবি—

দীপঙ্কর বললে—তুমি বলো না, আমি বুঝতে পারবো ঠিক—আমি তো এখন বড় হয়েছি—

—নারে, তুই বুঝবি না সব—

বলে লক্ষ্মীদি আবার দীপঙ্করের মুখোমুখি চাইলে। বললে—জানিস্‌, কেউ আমায় বুঝতে পারে না, আমার বাবাও আমাকে বোঝে না, সতীও আমাকে বোঝে না—মা বেঁচে থাকলে হয়তো বুঝতো—

বলে লক্ষ্মীদি টেবিলে মাথাটা ঠেকিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। তারপর লক্ষ্মীদির শরীরটা মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। দীপঙ্কর কী করবে, বুঝে উঠতে পারলে না। লক্ষ্মীদি কি কাঁদছে নাকি! কেমন অস্বস্তি লাগলো দীপঙ্করের। লক্ষ্মীদির এমন পরিচয় তো কখনও পায়নি দীপঙ্কর। লক্ষ্মীদি তাকে মেরেছে, লক্ষ্মীদি তাকে আদর করেছে, লক্ষ্মীদি তাকে চকোলেট দিয়েছে, কিন্তু লক্ষ্মীদি তো কখনও কাঁদেনি তার সামনে বসে।

দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি তবু মুখ তুললো না। তখনও ফুলে ফুলে উঠছে শরীরটা! তাহলে লক্ষ্মীদিরাও কাঁদে! এতদিন দীপঙ্করের ধারণা ছিল, কাঁদবার জন্যে পৃথিবীতে বুঝি অন্য মানুষ আছে। মা আছে। চন্নুনী, দীপঙ্কর নিজেও আছে। কিন্তু লক্ষ্মীদিরা যে অন্য জাতের মানুষ। এই এত টাকা, এত গুণ, এত নাচ—এরাও কাঁদে নাকি!

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—লক্ষ্মীদি, আমি আসি তাহলে—

লক্ষ্মীদি এবার মুখ তুললো। তাড়াতাড়ি চোখ দুটো মুছে নিলে আঁচল দিয়ে। একবার হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বড় ফ্যাকাশে দেখাল সে-হাসিটা। বললে—যাকগে, কিছু মনে করিস নি ভাই—যা বলেছি ভুলে যা তুই—

লক্ষ্মীদি বলে কি! ভুলে যাবে দীপঙ্কর! তার সেদিনকার জীবনের এত বড় ঘটনাটা সে ভুলে যাবে! তাহলে কেন সে দীপঙ্কর হয়ে জন্মেছে। কেন সে ছোটবেলা থেকে এত দুঃখ পেয়েছে। কেন তার জন্মের পর তার মাকে বিধবা হতে হয়েছে। বিধবা হয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোরদাদুর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কেন মানুষের আর প্রকৃতির কাছে সে এত ঋণী হয়ে রয়েছে। সকাল বেলার রোদ, দুপুর বেলার চিলের ডাক, আমড়া গাছের ডালের কাক,

হাজ কাশিমের ভাঙা বাগান, আগ্‌নখাকীর পুকুর আর পুকুরের ওধারের ধান-ক্ষেত কেন তাকে এতদিন আকর্ষণ করে এসেছে। হয়ত দীপঙ্করের ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়। হয়ত সেই জন্যেই মানুষের কাছে এত আঘাত পেয়েছে। হয়ত সেই জন্যেই মানুষের কাছে এত ভালবাসাও পেয়েছে। আঘাত আর ভালবাসা, ঘৃণা আর আদর, অপমান আর সম্মান—এই সমস্ত দিয়েই তো সে দীপঙ্কর হয়ে উঠেছে। কে তার নাম রেখেছিল, কে জানে! তার নামের সঙ্গে তার এই স্বভাবের দিক কি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

একদিন বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমার নাম কে রেখেছিল মা?

মা বলেছিল—কে আবার রাখবে, আমি!

—তা এত নাম থাকতে দীপঙ্কর নাম রাখতে গেলে কেন তুমি?

মা বলেছিল—ব্যাটরার ছোটতরফের মল্লিকবাবুদের নাতি হলো, তারা তার নাম রাখলে দীপঙ্কর—তা মানে তো বুঝিনি, তুই হলে তোর নামও রাখলুম দীপঙ্কর—

ছোট সংক্ষিপ্ত তার নামের ইতিহাস। কিন্তু সেদিন, সেই নাম দেবার সময় মা হয়ত ভাবতেও পারেনি যে, তার দীপঙ্কর, সারাজীবন তার নামের বার্তাবাহ হয়ে থাকবে। সে শুধু আলো জ্বালিয়েই যাবে, নিজের অন্ধকার ঘোচাবার জন্যে আলো জ্বালাবার কেউ-ই থাকবে না তার।

সেদিন লক্ষ্মীদির কাছ থেকে চলেই আসছিল দীপঙ্কর, কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মীদি আবার ডাকলে। বললে—শোন্—

দীপঙ্কর বললে—কী?

—কাউকে বলিসনি যেন, বুঝলি? তোকে ভালবাসি বলেই সব বলে ফেললাম, সতী যেন না জানতে পারে।

—কিন্তু তুমি তো আমাকে কিছুই বলোনি লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বললে—তোকে বলতে পারলেই ভালো হতো, হয়ত খানিকটা শান্তি পেতাম, জানিস্—তুই না থাকলে আমি বাঁচতাম না এখানে এমন করে—

—কিন্তু কী তোমার কষ্ট লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ সোজা হয়ে গুছিয়ে বসলো। বললে—শম্ভুকে তো তুই দেখেছিস—

—শম্ভু? শম্ভু কে লক্ষ্মীদি?

—ওই যে, তোর সঙ্গে তো শম্ভুর দেখা হয়েছে খিদিরপুরে, শম্ভু বলছিল যে আমাকে—

—মিস্টার দাতার?

—হ্যাঁ, যাকে তুই আমার চিঠি দিয়ে আসিস, জানিস আমার জন্যে ও সব করতে পারে, আমি বিষ খেতে বললেও বিষ পর্যন্ত খেতে পারে, আমার জন্যে ও কী-ই না করেছে! নিজের সংসার, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের

ব্যবসা-ট্যাবসা সব ছেড়ে দিয়েছে! আমি কলকাতায় এসেছি, ও-ও বর্মা থেকে সব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে—অথচ—

—অথচ?

লক্ষ্মীদি বললে—অথচ আমার কী-ই বা আছে বল্! ওর ওখানে কত বড় ব্যবসা, কত নাম, আমার জন্যেই ও সব ছাড়লো, আর আমি? আমি ওর তুলনায় কী? ওর তুলনায় আমি কতটুকু? আমি ওর জন্যে কতটুকু করতে পেরেছি? একদিন আমার খবর না পেলে ও কাঁদে জানিস—ওর ঘুম হয় না রাত্রে—

—কিন্তু.........

বলতে গিয়েও দীপঙ্কর কিছু বলতে পারল না। একটু দ্বিধা হলো। লক্ষ্মীদির চোখ তখনও জলে ছলছল করছে।

লক্ষ্মীদি আবার বলতে লাগলো—কত লোক ওকে কত বুঝিয়েছে, বলেছে—তুমি এক জাতের, লক্ষ্মী আর এক জাতের, তোমাদের মিল হয় না, হতে নেই! আমিও কত বোঝাই ওকে, কত বলি—কিন্তু কিছুতেই আমাকে ভুলতে পারে না। সেই সেখান থেকে ছুটে এসেছে—যেই খবর পেয়েছে, আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে, ও-ও পালিয়ে এসেছে এখানে—

দীপঙ্কর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে শুধু চুপ করে রইল বোবার মত।

তারপর বললে—তাহলে কী হবে এখন?

লক্ষ্মীদি বললে—আমিও তো ওকে তাই বলি—এখন কী হবে? আর আমারও এখন এমন হয়েছে, ওকে না দেখলে থাকতে পারি না—একদিন খবর না পেলে খারাপ লাগে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কাকাবাবু যদি জানতে পারে এসব?

লক্ষ্মীদি বললে—কাকাবাবু যে সব জেনে গেছে,—

—জেনে গেছে? আর কাকীমা?

—সবাই জেনে গেছে, সতীও জেনেছে, আমার বাবাও জেনে গেছে, তাই তো কাকাবাবুর সঙ্গে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে দূরে গেলে হয়ত সব ভুলে যাবো—তাই তো এত জায়গা থাকতে এই কালিঘাটে গলির মধ্যে এসে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। লক্ষ্মীদির যেন হঠাৎ আর-এক রূপ ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

লক্ষ্মীদি বললে—এই দেখ্ না, কাল দেখা হবার কথা ছিল কলেজের সামনে কিন্তু কলেজ আগে ছুটি হয়ে গেল, বাসে করে বাড়ি চলে এলাম, আর কথা হলো না—সারা রাত আমার ঘুম হয়নি, আমি জানি, তারও ঘুম হয়নি রাত্রে—

দীপঙ্কর বললে—কী করে জানলে ঘুম হয়নি তার?

লক্ষ্মীদি বললে—সে তুই বুঝবি না—জানা যায়—

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ ভেবে বললে—কিন্তু এটা কি ভাল কাজ করছো তুমি মনে করো লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বললে—এটা ভাল কাজ তা কি আমি বলেছি? আমি তো জানি এটা খারাপ—সেই জন্যেই তো লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে চিঠি পাঠাই, লুকিয়ে লুকিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি—

দীপঙ্কর বললে—তুমি আর চিঠি দিও না তাহলে—মিছিমিছি কী হবে সকলের মনে কষ্ট দিয়ে, তোমার বাবাও কষ্ট পাবেন শুনলে, কাকাবাবু কাকীমা সবাই কষ্ট পাবে—! তুমিও মনে সুখ পাবে না, দেখো—তোমার কষ্ট দেখলে আমারও কষ্ট হবে—

লক্ষ্মীদি উদাস হয়ে উঠলো। বললে—নারে, চিঠি না দিলে, দেখা না করতে পারলে আমি একদিনও বাঁচবো না—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে। কিছুতেই বুঝতে পারলে না এ কেমন জিনিস।

বললে—এই যে বাবার সঙ্গে তোমার এতদিন দেখা হয়নি—সে জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

লক্ষ্মীদি বললে—দূর, তুই সে বুঝবি নে, বাবার সঙ্গে দেখা না হলে কষ্ট হবে কেন?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার মা'র জন্যে খুব কষ্ট হয় সত্যি, মনে হয়, মাকে একদিন না দেখতে পেলে বোধহয় মরে যাবো—

লক্ষ্মীদি বললে—সে অন্যরকম কষ্ট, আর এ অন্যরকম—এর কষ্টের মধ্যে আনন্দও আছে যে—এ-আনন্দ মেশানো একরকম কষ্ট—

আনন্দ মেশানো কষ্ট! দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারলে না। অদ্ভুত লাগলো কথাটা।

লক্ষ্মীদি বললে—তা, এখন তুই যা দীপু, হয়ত সতী এখনি এসে পড়বে—

দীপঙ্কর খাবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—আজ তোকে অনেক কথা বললুম—কাউকে যেন বলিসনি, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার—বলবি না তো?

দীপঙ্করের কানে লক্ষ্মীদির কথাটা যেন ঢুকলো না। বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি চিঠিতে তোমরা এত কথা কী লেখো?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, তুই পড়িস নাকি?

—না, আমি পড়তে যাবো কেন?

—না, খবরদার পড়িস না যেন। তোকে আমি বিশ্বাস করি বলেই তোর হাত দিয়ে চিঠি পাঠাই, তোকে ছাড়া এ-বাড়িতে আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বলবি না তো কাউকে?

এ-কথাটাও যেন দীপঙ্করের কানে গেল না।

হঠাৎ বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি, তোমরা যখন দুজনে থাকো, তখন কী কথা বলো?

লক্ষ্মীদি বললে—ওমা, আমি যে-কথা বললুম, সে-কথা তোর কানে গেল না—যত অন্য কথা জিজ্ঞেস করছিস্—

দীপঙ্কর বললে—না বলবো না, কাউকে বলবো না—

—হ্যাঁ, বলিস নি—বলতে নেই—

দীপঙ্কর চলেই আসছিল। হঠাৎ লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁরে, তুই যে কী কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবি বলেছিলি? বললি আমাকে গোপনে বলবি?

সত্যিই তো! কী যেন একটা কথা বলবার ছিল! খুব জরুরী কথা! কিন্তু কিছুতেই মনে পড়লো না। কোন্ কথা বলতে এসেছিল সে। কী সে কথা, যা সকলের সামনে বলা যায় না?

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল শুনলুম—তা খিদিরপুরে গিয়েছিলি তুই কী করতে?

দীপঙ্কর বললে—কিরণ যে পৈতে বিক্রি করতে যায়—কিরণকে তুমি চিনবে না—আমার বন্ধু—কিন্তু মিস্টার দাতার সেদিন আমাদের খুব খাইয়েছে লক্ষ্মীদি, একেবারে পেট ভরে খাইয়েছে আমাদের দুজনকে—সন্দেশ রসগোল্লা রাজভোগ—

লক্ষ্মীদি বললে—ও ওইরকম—আমাকেও খাওয়ায়—আমার সঙ্গে তোর খুব চেনা আছে কিনা, তাই তোকেও খাইয়েছে—

—সে আমি বুঝতে পেরেছি, দেখেছে তো যে আমি কতদিন চিঠি দিয়েছি রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঘুম থেকে উঠেই গেছি চিঠি দিতে—তাই খাওয়ালে আর কি—মিস্টার দাতার খুব ভালো, জানো লক্ষ্মীদি—অনেক কথা বললে আমাদের, বললে গরীব বলে ভয় পাবার কিছু নেই মিস্টার দাতারও একদিন নাকি খুব গরীব ছিল—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই আর কতটুকু দেখেছিস ওর—আমি জানি ও কত ভালো—

—কিন্তু ওকে আসতে বলো না কেন এ-বাড়িতে? লুকিয়ে মেশো বলেই তো সবাই পছন্দ করে না—

—তা হয় না রে, অনেকবার অনেক চেষ্টা করেছে ও, আমার বাবাকে তো চিনিস না তুই—

কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্মীদি থেমে গেছে। বাইরের দিকে চেয়ে কী যেন দেখলে একবার।

দীপঙ্কর বললে—থামলে কেন, বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—বোধহয় সতী এল মনে হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি উঠে বাইরে দেখতে গেল সতী সত্যিই এসেছে কিনা। খানিক

পারে এসে আবার চেয়ারে বসলো। বললে—না, আসেনি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুমিও সতীকে ভয় করো বুঝি লক্ষ্মীদি—

—ভয় করবো কেন, কিন্তু ও জানে কিনা সব, সেই জন্যেই তো ওকে বাবা পাঠিয়েছে এখানে—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে আমি আর আসবো না তোমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীদি তাহলে সতী আমাকেও সন্দেহ করবে—

—না তোকে সন্দেহ করতে পারবে না, তুই ওর সঙ্গে খুব ভাব করিস, তাহলে তোকে কিছুতেই আর সন্দেহ করতে পারবে না—

—কিন্তু যদি জানতে পারে যে, আমি তোমার চিঠি নিয়ে দিয়ে আসি ওকে?

—জানবে কী করে? তুই না বললে সতী জানবে কী করে?

—যদি আমায় জিজ্ঞেস করে তাহলে?

—তুই বলবি তুই জানিস না।

—কিন্তু তাহলে যে মিথ্যে কথা বলা হয়!

লক্ষ্মীদি বললে—বলবি! মিথ্যে কথা বলবি! আমার জন্যে তুই একটা মিথ্যে কথাও বলতে পারবি না?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু মিথ্যে কথা কি বলা উচিত, তুমিই বলো—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে এই তুই আমাকে ভালবাসিস? এই তোর ভালবাসা? দেখ্ না মিস্টার দাতার আমার জন্যে সব ত্যাগ করেছে—

—কিন্তু মিথ্যে কথা যে আমি বলবো না প্রতিজ্ঞা করেছি!

—মিথ্যে কথা বললে ক্ষতি কী? কেউ তো জানতে পারছে না!

—কিন্তু চোদ্দ বছর মিথ্যে কথা না বললে শেষে যে অনেক লাভ—যা বলবো, তাই যে ফলে যাবে—

লক্ষ্মীদি বললে—যত বাজে কথা! ছোটবেলায় তোদের ইস্কুলের মাস্টার ভুল শুনিয়েছে—এখন বড় হয়েছিস, এখন ওসব ভুলে যা—একদিন তোকেও তো সংসার করতে হবে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, কত রকম লোক কত কী বলবে—মিথ্যে কথা না বলে বাঁচতে পারবি?

পরে অনেকদিন যখনই সেই দিনের ঘটনার কথাটা মনে পড়েছে দীপঙ্করের, তখনই মনে হয়েছে লক্ষ্মীদি সেদিন যে তাকে আদর করে জীবনে প্রথম চা খাইয়েছে, সে চা নয়, সে বিষ। সক্রেটিস-এর হেম্‌লক্ নয়, খাঁটি বিষ। সেই বোধহয় প্রথম লক্ষ্মীদিকেই সে ভালো করে ভালবেসেছিল—আর ভালবেসেছিল বলেই সেই বিষ খেতে পেরেছিল অমন করে! সে যে কী দ্বন্দ্ব! একদিকে তার জীবনের প্রতিজ্ঞা, আর একদিকে লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বলেছিল—তুই যদি সব বলে দিস, তাহলে কিন্তু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে দীপু—

—তুমি আমায় মিথ্যে কথা বলতে বোল না লক্ষ্মীদি, তোমার দুটি পায়ে

পড়ি!

—তাহলে তোর প্রতিজ্ঞাটাই বড় হলো? আর আমি কিছু নই, আমি কেউ নই তোর?

—অমন করে আমাকে বোল না তুমি লক্ষ্মীদি, আমার কষ্ট হয়!

—তাহলে আমি যদি মরে যাই, তোর খুব সুখ হবে তো?

—ছিঃ, ও-কথা বলতে আছে। তুমি যেন কী লক্ষ্মীদি! তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

লক্ষ্মীদি চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে কাছে সরে এল। দীপঙ্করও লক্ষ্মীদিকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্করের মুখের দিকে সোজা-সুজি চোখ রেখে লক্ষ্মীদি বললে—তুই যদি বলে দিস দীপু, তাহলে আমার মরা ছাড়া আর কোনও গতি থাকবে না—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি বলে দাও, আমি কী করবো!

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা ধরলে। বললে—তুই বুঝতে পারিস না যে, একথা বলতে নেই?

দীপঙ্কর ঘাড় নাড়লে। বললে—পারি!

—তাহলে?

দীপঙ্কর এবার চোখ নামালো। মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন আরো কাছে সরে এল তার। একেবারে গায়ের কাছাকাছি। তারপর সেই আগেকার মতন তার মাথায় হাত রাখলো। নিজের হাত দিয়ে তার চুলগুলো গুছিয়ে দিতে লাগলো।

বললে—তুই জানিস্ না দীপু, তোকে আমি কত ভালবাসি—

তারপর একটু থেমে বললে—এ কি তুই কাঁদছিস্?

হয়ত দীপঙ্করের চোখ একটু সজল হয়ে এসেছিল কিন্তু লক্ষ্মীদির কথায় আর তা বাধা মানলো না। একেবারে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে। লক্ষ্মীদি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

বললে—কাঁদে না, ছিঃ—আমি মরে যাবো বলেছি বলে কাঁদতে আছে? বলছি বলে কি আর সত্যি সত্যিই মরবো? কাঁদিসনি, তুই দেখছি ঠিক আমার মতোই সেণ্টিমেণ্টাল—এত সেণ্টিমেণ্টাল হলে চলে?

তারপর দুই হাতে দীপঙ্করকে বুকের মধ্যে রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলো—জীবনে এখন আরো কত জিনিস দেখতে হবে তোকে, সারা জীবনটাই পড়ে রয়েছে তোর, কত দেখবি, কত ঠকবি, কত শিখবি! দেখা শেখার কত বাকি রয়েছে তোর—এখনই এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন—কাঁদিস নি—

বলে লক্ষ্মীদি আঁচল দিয়ে দীপঙ্করের চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

বলতে লাগলো—লক্ষ্মীটি আমার, কাঁদে না, তোকে বিশ্বাস করি বলেই তোর হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতুম, সব কথা বলতুম তোকে, তোর কাছে আমার কোনও লজ্জা নেই, চুপ কর্, কাঁদিসনি লক্ষ্মী ভাইটি আমার—

তারপর ভালো করে মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তুই তো জানিস না আমার জীবনে আমি কত কষ্ট পেয়েছি। নিজের মা নেই যে তার কাছে মনের কথা বলবো, ছোটবেলা থেকেই ফাঁকার মধ্যে মানুষ, বাবা থেকেও নেই আমার, বাবা সারাদিন ব্যবসা নিয়ে মেতে আছে—এক পেয়েছিলাম ওকে—কিন্তু ওকেও আমার কাছ থেকে সবাই কেড়ে নেবে বলে ঠিক করেছে! জানিস কতবার আত্মহত্যা করবার কথা ভেবেছি, মরতে সত্যিই আমার কষ্ট হবে না, কিন্তু ওর কথা ভেবেই আমার মরা হয় না, ওর বড় কষ্ট হবে—ও বাঁচবে না তাহলে—

দীপঙ্কর ততক্ষণে একটু শান্ত হয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—কেমন, কথা রাখবি তো আমার? কাউকে বলবি না তো?

দীপঙ্কর বললে—না—

—এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা।

বলে লক্ষ্মীদি তার গালে আঙুল দিয়ে খুচরো আদর করলে একটু—

বললে—সতী জিজ্ঞেস করলেও মিথ্যে কথা বলতে পারবি তো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে চলে আসছিল। দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল তার যেন নেশা হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় সিদ্ধি খেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি। মনে হলো যেন টলছে সে। অথচ কেন তার এমন হলো, কিছু তো তার হয়নি! কিছুই তো সে খায়নি। শুধু চা খেয়েছিল সে এক কাপ! চায়ে কিছু ছিল নাকি! কিছু নেশার জিনিস! চা খেলে মানুষ বুঝি এমন করে টলে!

লক্ষ্মীদি তাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে আদর করে। হেমলক্ নয়, সত্যিকারের খাঁটি বিষ। প্রাণমথবাবু যা কিছু ক্লাসে শিখিয়েছিলেন সব যেন সে ভুলে গেছে, এক মুহূর্তের জন্যেও তা আর তার মনে পড়বে না।

লক্ষ্মীদি কাছে এসে কাঁধটা ধরলে। বললে—কী হলো রে তোর?

লক্ষ্মীদির ঝাঁকুনি খেয়ে কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বললে—লক্ষ্মীদি—

—বল্ না কী বলবি বল্?

—আচ্ছা, কাকাবাবু কোথায় কাজ করে?

—কাকাবাবু? কেন? হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—সবাই যে আমাকে জিজ্ঞেস করে! দুনিকাকা, ছোনেদা, পঞ্চাদা, মধুসূদনের বড়দা-টড়দা পাড়ার যত লোক সব্বাই জিজ্ঞেস করে কি না—

—তা এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই বুঝি তুই এসেছিলি?

দীপঙ্করের তখন মনে নেই কী করতে এসেছিল লক্ষ্মীদির কাছে। তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ, এই কথা জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলাম আমি—

—তা সেটা তো কাকাবাবুকেই জিজ্ঞেস করতে পারিস!

হ্যাঁ, তাও তো বটে! কাকাবাবুকেই তো সে-কথা জিজ্ঞেস করতে পারে দীপঙ্কর। আশ্চর্য, এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে এসেছিল নাকি! এই সামান্য কথাটার জন্যে একলা লক্ষ্মীদির ঘরে আসার তার কিসের দরকার ছিল? আসলে কী করতে সে এসেছিল, তাই-ই তো তার মনে নেই আর। আসলে লক্ষ্মীদির কাছে আসতে বোধহয় ভালো লাগতো তার। আসলে সতীকে এড়িয়ে লক্ষ্মীদিকেই সে চাইতো হয়ত।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতেই নজরে পড়লো ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এ বেলা পড়ে এসেছে। ডালপুরী, ঘুগনিদানাওয়ালা হাতে মস্ত একটা পুঁটলি ঝুলিয়ে হাঁকতে হাঁকতে চলেছে গলি দিয়ে। বাইরে পইঠের ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের মনে হলো এতদিনে যেন সে নিজেকে আবিষ্কার করলো। এতদিনে যেন সে নিজেকে চিনতে পারলো। লক্ষ্মীদি যেন তাকে চিনিয়ে দিলে। আর মনে পড়লো তাদের কলেজের প্রফেসরের কথাটা। লাইফ্ অফ্ সক্রেটিস্।

Be hopeful then, gentleman of the jury, as to death; and this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being.

দীপঙ্কর সত্যিই সেদিন চা খায়নি, বিষই খেয়েছিল!

কিরণ ঘুর-ঘুর করছিল গলির ওপারে। দীপঙ্করকে দেখেই দৌড়ে এল। বললে—কত দিলে রে? এক টাকা না আট আনা—?

দীপঙ্কর হতভম্বের মত চেয়ে রইল কিরণের দিকে। কিরণ যে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে-কথা ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর।

কিরণ বললে—কী রে? কী ভাবছিস? আমি দু' ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্যে! ভাবছিলাম বোধহয় পাঁচ টাকা আদায় করবি! তা বলেছিস তো যে, দু'খানা করে বই পাবে পড়তে—?

দীপঙ্কর বললে—বলিনি—

—বলিসনি? তাহলে কত টাকা চাঁদা দিলে? রসিদ-বইটা দেখি?

এতক্ষণে রসিদ-বইটার কথা মনে পড়লো দীপঙ্করের। পকেট থেকে বার করতেই কিরণ পাতা ওল্টাতে লাগলো। একটা পাতায় এসে বললে—এ কী রে? কিছু দেয়নি?

দীপঙ্কর বললে—আমি বলিনি ভাই, চাঁদার কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলুম—

—যাঃ চলে! চাঁদার জন্যে গেলি মেয়েটার পেছন-পেছন আর আসল কাজটাই ভুলে গেলি? তাহলে এতক্ষণ এই দু' ঘণ্টা ধরে কী করছিলি? রগড়া-রগড়ি?

দীপঙ্করের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে কিরণ বললে—না, দেখছি তোর দ্বারা কিছু হবে না, তোকে প্রেসিডেন্ট করবো না—এবার ইলেকশন করে আমি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী দুই-ই হবো—একটা সামান্য কাজ তোকে দিয়ে হবে না! আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায় করে করে লাইব্রেরী দাঁড় করাবো আর তুমি নামকো ওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে থাকবে, সে-সব চলবে না—

তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—তাহলে এতক্ষণ তোদের কী কথা হচ্ছিল, বল্? বল্ আমাকে—

দীপঙ্কর বললে—সেসব অন্য কথা!

—অন্য কথা মানে? অন্য কথা মানে কী? ও-মেয়েটার সঙ্গে তোর কিসের অন্য কথা থাকতে পারে? ওরা বড়লোক আমরা গরীব—গরীবদের সঙ্গে বড়লোকের মেয়েদের কী কথা থাকতে পারে শুনি?

দীপঙ্কর বললে—না রে লক্ষ্মীদি খুব ভালো মেয়ে, বড়লোকদের মত নয়—

—বড়লোক আবার বড়লোকদের মত না মানে কী? সব বড়লোক এক জাতের। ও আমার দেখা আছে। ভজুদা বলে, ইংরেজরা যা বড়লোকরাও তাই—ইংরেজরা যখন এখানে আসে তখন থেকে বরাবর বড়লোকদের শিখণ্ডি করে গরীবদের মাথায় হাত বুলিয়ে আসছে। ভজুদা তো মিথ্যে কথা বলবে না, ভজুদার মতন লার্নেড লোক মিথ্যে কথা বলতে পারে না, সব মুখস্থ, ইংরিজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, নেপালী, বার্মিজ সব ভাষা একেবারে গুলে খেয়েছে ভজুদা—

দীপঙ্করের যেন সে-সব কথা কানেও গেল না।

বললে—না রে, তুই জানিস না, লক্ষ্মীদির খুব কষ্ট—

—কষ্ট? কিসের কষ্ট? অত টাকা তবু কষ্ট?

—হ্যাঁ ভাই, ভীষণ কষ্ট, লক্ষ্মীদির কষ্ট দেখে আমারও কেমন মায়া হচ্ছিল—

কিরণ বললে—ছাই কষ্ট, আমাকেই দেখ্ না, আমার চেয়ে আর কার কষ্ট বেশি হতে পারে!

দীপঙ্কর বললে—আগে তাই-ই ভাবতুম ভাই, কিন্তু লক্ষ্মীদির জীবন আমাদের চেয়েও কষ্টের, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। বাইরে থেকে তো বেশ রঙিন শাড়ি পরে থাকে, বাসে করে কলেজে যায়, হাসে, গল্প করে, অনেক বড়লোক, লেখাপড়া শিখেছে, নাচ শিখেছে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে খুব দুঃখ কষ্ট আছে লক্ষ্মীদির জানিস—

—কী করে জানলি তুই?

দীপঙ্কর বললে—আমাকে বললে যে লক্ষ্মীদি—

—কী কষ্ট শুনিই না!

—ভাই, সে বলা যায় না—

কিরণ বললে—বলা যায় না মানে? কষ্টের একটা মানে থাকবে তো? যেমন খেতে পায় না, কিংবা লেখা-পড়ার টাকা নেই, কিংবা বাড়িতে কেউ দেখতে পারে না—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ ঠিক তাই—

—তা দেখতে পারে না কেন? কী দোষ করেছে তোর লক্ষ্মীদি?

দীপঙ্কর বললে—দোষ কিছুই করেনি, বলতে পারিস ভাগ্যের দোষ, ভাগ্যের জন্যে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তা ছাড়া মা নেই কিনা—

—তা মা কি সকলের চিরকাল থাকে? একদিন-না-একদিন মা তো মারা যাবেই! আসলে তোকে ওই সব বলে বুঝিয়েছে! নারীচরিত্র বোঝা বড় শক্ত—ভজুদা বলে...যাক্ তোকে এসব বলে কোনও লাভ নেই—মেয়েমানুষ তো, ওরা ও-রকম বলে ভোলাবার জন্যে—! ওই বলে তোকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আর তুইও যেমন বোকা তুইও ওই কথায় ভুলে চাঁদা চাইতে ভুলে গেলি—

দীপঙ্কর বললে—সেদিন যে সেই লোকটা তোকে পাঁচটা টাকা দিয়েছিল, সেটা কী করলি?

—সেই এস্ এস্ দাতার? সেটা রেখে দিয়েছি, একটা আলমারি কিনবো ও-টাকাটা দিয়ে, লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, নইলে মা দেখতে পেলে হয়ত ওই টাকা দিয়ে বাবার ওষুধ কিনে ফেলবে, মা'র হাতে একটা পয়সাও নেই ক'দিন ধরে, জানিস্—

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অনেকদূর চলে গিয়েছিল। কালিঘাটে তখন সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। অফিস-ফেরত লোকজন বাড়ির দিকে আসছে সবাই। এই সময়ে বঙ্কুর দোকানে তেলে-ভাজার ভিড় জমে। এই সময়েই এ-পাড়ায় কুলপি বরফওয়ালারা আসে, পাঁঠার ঘুগনিওয়ালারা আর একবার ঘুরে যায়। এই সময়ে চণ্ডীবাবুদের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে।

দীপঙ্কর বললে—কোথায় যাবি তুই এখন?

কিরণ বললে—কোথাও যাবো না এখন, এখন রাস্তায় ঘুরলে ক্ষিদে পাবে, তার চেয়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসি গিয়ে চল্—তুই প্রেসিডেন্ট অথচ তুই মোটে যাস্ না, মেম্বাররা সবাই জিজ্ঞেস করে আমাকে—

কিরণ লাইব্রেরীটাকে বেশ সাজিয়েছিল। খড়-কুটো দিয়ে বেশ একটা চালাঘর মতন করে নিয়েছিল। ছেঁড়া মাদুর একটা পেতে নিয়েছিল মেঝেতে। বইগুলো থাক্ থাক্ করে সাজিয়েছিল। কালিঘাটে বই-এর দোকান ছিল না। বই কিনতে যেতে হতো অনেকদূরে। সেই পূর্ণ থিয়েটারের সামনে চাউল-পটিতে। রায়চৌধুরী কোম্পানীর দোকান থেকে বই কিনতে হতো। নতুন বই আর ক'টাই বা। তবু কিনেছিল কিরণ দু'একটা। বিনয় সরকারের 'বর্তমান জগৎ', 'বুকার টি ওয়াশিংটনের জীবনী', 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর', জোনাথান-

সুইফ্‌টের 'গালিভার্স ট্রাভেলস্‌'। তারপর ছিল 'রবিনসন ক্রুসো', আর ছিল তারকনাথ দাশের 'India In World Politics', J. T. Sanderland-এর 'India In Bondage', একগাদা টাইমটেবিল, হোয়াইটওয়ে লেড্‌-ল'র ক্যাটালগ। আরো কত নাম-না-জানা বই। যেখানে যা কিছু পেয়েছিল সব যোগাড় করে এনেছিল কিরণ। অনেকদিন লাইব্রেরীর মধ্যে মাদুরের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে কিরণ কত স্বপ্ন দেখেছে। বলেছে—বুঝলি দীপু, ভজুদা বলেছে, বই পড়লে খুব নলেজ হয়—যত বই পড়বি তত নলেজ হবে—

কিরণ কত বই পড়তো আর গল্প করতো তখন। আয়ার্ল্যান্ড, ইটালী আর রাশিয়ার ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। বই পড়ে ভালো লাগলেই দৌড়ে আসতো দীপঙ্করের কাছে।

একেবারে লাফাতে লাফাতে আসতো কিরণ।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে যেত কিরণকে দেখে। বলতো—কী রে, হঠাৎ এত আনন্দ, কী হলো তোর?

কিরণের বাবা ভালো হয়ে গেছে কি? কিরণদের বাড়ি হয়েছে কি? কিরণের চাকরি হয়েছে কি? না, সে সব কিছুই না।

বলতো—না রে, মাইরি, ওঃ এমন একটা বই পড়ছি না, পড়লে তুইও চমকে যাবি—

—কী বই?

বইটা দেখাল কিরণ। বললে—ভজুদা দিয়েছে আমাকে পড়তে—এই দেখ্‌—

কী বই, কী নাম, কার লেখা তা আজ আর মনে নেই দীপঙ্করের। কোন্‌ ফরাসী লেখক। তারই জীবনী। যতদূর মনে পড়ে—Babeuf-এর জীবনী! কিরণের ভজুদা কোথা থেকে সব অদ্ভুত বই দিত পড়তে। সেসব বই আজকাল আর চোখেও পড়ে না।

কিরণ বললে—এইখানটা পড়ে দেখ্‌—কী চমৎকার লিখেছে—

সে কবেকার কোন্‌ যুগের কথা। ১৭৮৯ সালের একদিন ফরাসী দেশেও ঠিক এমনি অবস্থা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবীতে একদিন যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশে আর এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হলো। সেদিন সেখানকার অবস্থাও ছিল ঠিক এখানকার মত। সেখানকার অঘোরদাদুরাও ঠিক এমনি করে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে যজমান ঠকাতো। সেখানকার চন্নুনীরাও লেখাপড়া শিখতে না পেরে, কুশিক্ষা আর অশিক্ষার অন্ধকারে কুৎসিত গালাগালি দিয়ে জীবন কাটাতো। সেখানেও ছিল দুনিকাকা, সেখানেও ছিল পঞ্চাদা ছোনেদা, মধুসূদনের বড়দা। সেখানকার পাড়ার রোয়াকে বসে তারাও ঠিক এমনি করে আড্ডা দিত আর ফোড়ন কাটতো। সেখানেও সেই ফরাসী দেশেও ছিল কালিঘাটের মত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেখানকার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনেও রোদ ঢুকতো না, শিক্ষা ঢুকতো না, সভ্যতা ঢুকতো না সেদিন। সি আর

দাশ মারা যাবার দিন সেখানেও কোনও পরিবর্তন হতো না—সবাই ঠিক এমনি করেই নির্বিকার হয়ে থাকতো। হুজুগের সময় চরকা কাটতো আবার হুজুগ চলে গেলে চরকা ফেলে দিত। সেখানেও লক্ষ্মীদির মত মেয়েরা লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ছেলেকে চকোলেট দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শম্ভুদের কাছে চিঠি পাঠাতো। সেখানেও কিরণরা রাস্তায় রাস্তায় পৈতে বিক্রি করতো—আর দীপঙ্করের মায়েরা পরের বাড়িতে রান্না করতো আর ছেলে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতো। আর সেখানেও যারা বড়লোক, যারা ব্যারিস্টার পালিতের মত বড়লোক, যারা অঘোরদাদুর যজমানদের মত বড়লোক, সেই লখার মাঠের একাদশী বাঁড়ুজ্জে আর চাউলপটির শশধর চাটুজ্জের দল কড়ি দিয়ে সব কিনে ফেলতো—পাপ কিনতো, পুণ্য কিনতো, ধর্ম কিনতো, অধর্ম কিনতো; সেই সঙ্গে সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশ, কীর্তি, অমরত্ব সব কিনে ফেলতো!

কিরণ বললে—একেবারে হুবহু আমাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ঠিক, বল্‌?

সত্যিই মিলে যাচ্ছিল। সেখানেও চৌরঙ্গীপাড়ায় থাকতো বড়লোকরা। আলিপুরের বড় বড় বাড়িতে থাকতো সাহেবরা। বেলভেডিয়ারের বড়লাটের বিরাট বাড়িটা সারা বছর খালি পড়ে থাকতো—বছরে একবার ব্যবহারের জন্যে। সেই ক'দিনের ব্যবহারের জন্যে সারা বছর হাজারটা চাকর, হাজারটা মালি বসে বসে ঘর-বাগান পরিষ্কার রাখতো আর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের নর্দমার ধারে ময়লা উপচে পড়তো পাহাড় হয়ে, সে পরিষ্কার করবার লোক থাকতো না একটা। সেখানকার রাজাও থাকতো কোথাকার কোন্‌ প্রাসাদে। রাজার ছিল পনের হাজার চাকর আর রাণীর পাঁচশো—

কিরণ বললে—দেখেছিস্‌, ঠিক আমাদের বড়লাটের মতন মাইরি—একেবারে হুবহু—

দীপঙ্কর আরো পড়তে লাগলো। অদ্ভুত ঘটনা সব ঘটেছে সেখানেও। সেখানেও খেতে পেত না মানুষ ঠিক এখানকার মত। সেখানেও কিরণরা নর্দমার ডাব কুড়িয়ে পেট ভরিয়েছে আর সেখানকার অঘোরদাদুরা সন্দেশ এনে ঘরে পুরে পচিয়েছে। কিংবা ডাক্তার দোকানে বেচেছে।

—তারপর আরো আছে, আরো পড়ে দেখ্‌—

ছোটবেলার পড়া সেই ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পরে পড়েছে দীপঙ্কর, কিন্তু সেদিন কিরণই প্রথম পড়িয়েছিল দীপঙ্করকে। কিরণই দেখিয়েছিল পথ। সেই ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত সে এক বিচিত্র ইতিহাস। নেপোলিয়ান থেকে বিসমার্ক পর্যন্ত সে এক বিচিত্র উপন্যাস।

একটা লাইন দাগ দেওয়া ছিল। লাল পেন্সিলের দাগ।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানে দাগ দিয়েছে কে রে?

কিরণ বললে—ভজুদা—পড়ে দেখ্‌—

দীপঙ্কর পড়তে লাগলো। Babeuf বলছে—

When I see the poor without the clothing and without the shoes which they themselves are engaged in making, and contemplate the small minority who do not work and yet want for nothing, I am convinced that Government is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form—

—চমৎকার, কী বল্?

তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলে—conspiracy মানে কী রে?

দীপঙ্কর বললে—ষড়যন্ত্র।

কিরণ বললে—ঠিক বলেছে, আসলে বাইরে বাইরে সব বক্তৃতা করে আর লোক-দেখানি, বুঝলি—আসলে সব বড়লোকরা একজাতের, সব শেয়ালের এক রা—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু লক্ষ্মীদিরা অন্যরকম ভাই—

কিরণ বলতো—দূর, সব ষড়যন্ত্র ওদের—ওই লক্ষ্মীদিরাও যা তোর, ওই পালিতরাও তাই। তুই ফরসা মুখ দেখে ভুলে গেছিস্—দেখবি তোর কাকাবাবু চাঁদা দেবে না, কিছুতেই চাঁদা দেবে না—

কিন্তু না, সেদিন হঠাৎ পাড়াতেই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা। সন্ধেবেলা ঠিক সময়ে অফিস থেকে আসছেন। সেদিন কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছদ। কোট প্যাণ্ট পরেছেন, মাথায় সোলার টুপি। বললেন—এই যে দীপুবাবু—

দীপঙ্কর এগিয়ে গেল কাছে, বললে—আপনি এত সকাল-সকাল আসছেন আজ?

—তা আসবো না, কাজ না থাকলে বাড়ি আসবো না—

একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করে কাকাবাবু কী কাজ করেন, কোন্ অফিসে চাকরি করেন। কিন্তু তারপরেই মনে পড়লো চাঁদার কথাটা। বললে—কাকাবাবু আমাদের চাঁদা দেবেন?

—চাঁদা? কিসের চাঁদা?

—আমাদের লাইব্রেরীর—

—লাইব্রেরী করেছ নাকি তোমরা? বেশ বেশ, ভালো কথা—

কাকাবাবু খুব উৎসাহ দিলেন। কথাগুলো বলছিল দীপঙ্কর আর কিরণ এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কাকাবাবুর উৎসাহ পেয়ে কিরণ আর থাকতে পারলে না। বললে—কাকাবাবু আমি হচ্ছি লাইব্রেরীর সেক্রেটারী আর দীপু প্রেসিডেন্ট—

—তাই নাকি? বাঃ, খুব ভালো কথা তো, কোথায় লাইব্রেরী করেছ

তোমাদের?

অনেক খবর নিলেন কাকাবাবু। বই পড়া খুব ভালো জিনিস। কত ভালো-ভালো বই আছে পৃথিবীতে তার ইয়ত্তা নেই। সংসারে মানুষ হতে গেলে বই পড়া দরকার।

কাকাবাবু বললেন—তোমাদের লাইব্রেরীটা আমি দেখবো একবার দীপুবাবু—

কিরণ বললে—এখনি চলুন না—

দীপঙ্কর বললে—আমাদের পাঁচশো বই হয়ে গেছে, আরো বই কিনবো—আপনাকে চাঁদা দিতে হবে কিন্তু কাকাবাবু—

কাকাবাবু বললেন—তা দেব চাঁদা—কত দিতে হবে?

দীপঙ্কর হঠাৎ এ-কথার উত্তর দিতে পারলে না। যত টাকা দেবে ততই তো ভালো। এক টাকা চাইবে না দশ টাকা চাইবে তাই ভাবতে লাগলো দীপঙ্কর। কিরণ বাঁচিয়ে দিলে। বললে—আপনি দু' টাকা করে দেবেন কাকাবাবু—

কাকাবাবু বললেন—তা তাই দেব—

কিরণ বললে—আপনাকে দু'খানা করে বই দেব—

কাকাবাবু বললেন—তা তাই দিও—

কিরণ বললে—এখুনি চলুন না আমাদের লাইব্রেরীতে, একটু দেখবেন, আপনার উৎসাহ পেলে আমরা আরো বড় করতে পারবো লাইব্রেরীকে—আপনাদের সাহায্যের ওপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—আপনি চলুন না, একটু দেখবেন—

কাকাবাবু সেই অফিস-ফেরত অবস্থাতেই গেলেন লাইব্রেরীতে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে ঢুকে নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের গলির মধ্যে একেবারে বস্তির কাছে। দু'পাশে কাঁচা নর্দমা। অন্ধকার চারিদিকে। কিছু দেখা যায় না। অনেক দূরে গ্যাসের আলোর একটু রেখা এসে পড়েছে এখানে-ওখানে। তখনকার দিনের কালিঘাটের বস্তি। ভাঙা পাঁচিল, নোনাধরা ইঁট, আর কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে কাকাবাবুকে নিয়ে যেতে কেমন লজ্জা করছিল দীপঙ্করের!

কিরণ বললে—একটু টাকা হলেই আমরা অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নেব, এখন প্রথম স্টার্ট করেছি তাই......

কাকাবাবুর কিন্তু কিছুতেই বিকার ছিল না। বললেন—তাতে কী হয়েছে, ছোট থেকেই তো সবাই বড় হয়—

তারপর কিরণদের বাড়ির সামনে এসে খড়-কুটো দেওয়া চালাঘরটা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—এই বুঝি তোমাদের লাইব্রেরী?

সামনে সাইনবোর্ডটা ঝুলছিল।—বড় বড় হরফে লেখা 'দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ভেতরে যাওয়া যায় না?

কিরণ বললে—আমি আগে হারিকেনটা জ্বালি—আপনি মাথাটা নিচু করে আসবেন—

এতদিন পরে সেদিনকার সেই ঘটনাটা মনে পড়লো দীপঙ্করের। লজ্জাও হয়, হাসিও পায়। আবার দুঃখও হয়। কিন্তু তখন তো জানতো না দীপঙ্কর কেন অত আগ্রহ নিয়ে কাকাবাবু তাদের লাইব্রেরী দেখতে গিয়েছিলেন! কেন অফিস থেকে পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে এসেও সেই নোংরা বস্তির মধ্যে ঢুকেছিলেন! কতদিন আগেকার কথা। তখন কে জানতো একদিন এই কিরণের লাইব্রেরী দেখানোই কাল হবে। ওই লাইব্রেরীই একদিন কিরণের জীবনে বিপদ ডেকে আনবে।

কাকাবাবু বললেন—বাঃ, বেশ লাইব্রেরী, তুমিই বুঝি এই লাইব্রেরী করেছ?

কিরণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমিই হলাম সেক্রেটারি আর দীপু হলো প্রেসিডেন্ট—

হারিকেনের আলোয় দাঁড়িয়ে কাকাবাবু এক-একটা বই তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। মাটির দেয়াল আর নর্দমার গন্ধ। সেদিন, সেই নোংরা আবহাওয়া আর ভাঙা হারিকেনের ঝাপ্সা আলোয় দীপঙ্কর আর কিরণ কাকাবাবুর উৎসাহ দেখে অবাক হয়ে গেল। অনেকেই চাঁদা দিয়েছে, অনেকেই মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েছে। রাস্তায় ঘাটে অনেকে যেমন নিরুৎসাহ করেছে, তেমনি অনেকেই তো আবার উৎসাহও দিয়েছে। কিন্তু কাকাবাবুর মত উৎসাহ কেউ-ই দেয়নি। নিজে লাইব্রেরীতে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। কিরণ একেবারে বিগলিত হয়ে গেল কৃতজ্ঞতায়।

কিরণ বললে—কাকাবাবু, আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হোন্। আপনি প্রেসিডেন্ট হলে অনেক সুবিধে হবে আমাদের—

কাকাবাবু বললেন—এখানে কারা মেম্বার?

কিরণ বললে—সবাইকে মেম্বার করেছি কাকাবাবু, দুনিকাকা, পঞ্চাদা, ছোনেদা, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ডদের করেছি, ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত, চণ্ডীবাবুর নাতি রাখাল—

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—অঘোর ভট্টাচার্য মশাই?

দীপংকর বললে—উনি চোখে দেখতে পান না—

কিরণ বললে—আমি অঘোরদাদুকে বলতে গিয়েছিলাম—তা লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে এলেন—

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—সব মেম্বাররা আসে এখানে?

কিরণ বললে—কেউ আসে না কাকাবাবু, আমি একলা এইখানে আলো জেলে বসে থাকি—কেউ আসে না, দীপুও আসে না—

কাকাবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি আসবো এবার থেকে—

—আপনি প্রেসিডেন্ট হবেন?

কাকাবাবু বললেন—প্রেসিডেন্ট দীপুবাবুই থাক, আমি এমনি আসবো এখানে মাঝে মাঝে আর চাঁদা দেব—মেম্বার—

কিরণ বললে—আপনি এলে অনেক উৎসাহ পাব আমরা, জানেন কাকাবাবু, ভাল-ভাল বই সব পাওয়া যায়, কিন্তু পয়সার জন্যে কিনতে পারি না।

তারপর চাপা গলায় বললে, একজনের কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' আছে জানেন। পাঁচ টাকা দিলে আমাদের দেবে বলেছে—তার কাছে আরও অনেক বই আছে কাকাবাবু—টাকা হলে সব যোগাড় করতে পারতুম—

কাকাবাবুর উৎসাহ পেয়ে কিরণ গড় গড় করে আরো অনেক কথা বলে গেল। অনেক প্রাণের কথা সব কিরণের। কিরণ যেন একটা আপনার লোক পেয়ে গেছে হঠাৎ। যে-সব বই পড়তে পায় না সেই বই-এর সন্ধানও বলে গেল কিরণ। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, আন্দামানে বিশ বছর, বিপ্লবী বাঙলা—এমনি সব অনেক বই-এর নাম করে গেল কিরণ। ভারতবর্ষের পরাধীনতার যত ইতিহাস লেখা হয়েছে তার নিখুঁত তালিকা কিরণের মুখস্থ ছিল। কোথা থেকে এত বই-এর নাম সে যোগাড় করেছিল কে জানে। দীপংকরও অবাক হয়ে গেল কিরণের জ্ঞান দেখে। এত জানে কিরণ! কিরণ ম্যাট্রিক ফেল, তবু দীপঙ্করের চেয়েও জানে বেশি। সেদিন সেই লাইব্রেরী-ঘরে দাঁড়িয়ে কিরণের কথাবার্তা শুনে দীপংকর যেন হঠাৎ বড় ছোট হয়ে গেল। বড় ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। আবার একটু গর্বও হলো কিরণের জন্যে। কাকাবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল কিরণের জ্ঞান দেখে কাকাবাবুও যেন অবাক হয়ে গেছেন। শুধু স্বদেশী বই-ই নয়, বিনয় সরকারের 'বর্তমান জগৎ'টা পুরো মুখস্থ করে ফেলেছে কিরণ, 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর' বইটার গল্প গড়গড় করে সমস্ত বলে গেল কিরণ।

কাকাবাবু অবাক হয়ে শুনছিলেন। বললেন—তুমি এত পড়ো?

কিরণ বললে—পড়তে আমার খুব ভাল লাগে—

দীপঙ্কর বললে—জানেন কাকাবাবু, ওকে সারাদিন ভিক্ষে করতে হয় বলে ও ফেল্ করেছে, নইলে ও ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করতে পারতো—ওরা খুব গরীব তাই ওর লেখাপড়া হলো না—

কাকাবাবু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—হুঁ, বুঝতে পেরেছি—

দীপঙ্কর তখন খুব উৎসাহ পেয়ে গেছে। বললে—কিরণের সঙ্গেই আমার বেশি ভাব, ও আর আমি, আমরা দুজনে মিলেই এই লাইব্রেরী করেছি—

কিরণও চুপ করে থাকতে পারলো না। বললে—আমাদের দেশে মাত্র শতকরা সাড়ে পাঁচজন লোক নাম সই করতে পারে, লেখাপড়া জানে না কেউ, তাই দেশে দেশে, পাড়ায় পাড়ায় যত লাইব্রেরী হয় ততই তো ভাল। সেইজন্যেই আমরা এইটে করেছি—

কাকাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—এসব কথা তোমায় কে শেখালে—

কিরণ বললে—শেখাবে কেন কাকাবাবু, সবাই তো জানে, আজকাল এ-কথা

সবাই জেনে গেছে, ইংরেজরাই তো আমাদের শত্রু, এই যে সেদিন জালিয়ান-ওয়ালাবাগে এত লোক খুন হয়ে গেল, বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর হয়েছে, কত সব ছেলে জেল খাটছে, এ কিসের জন্যে বলুন, এও তো ইংরেজদের জন্যে? লাইব্রেরী করে সকলের মধ্যে এইটে বুঝিয়ে দিলে......

দীপঙ্কর বললে—এসব শিখিয়েছে ওর ভজুদা—

—ভজুদা কে?

কাকাবাবু আরো একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, বললেন—কে ভজুদা? খুব লার্নেড লোক মনে হচ্ছে!

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, খুব লার্নেড, আমার সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি, কিরণ চেনে, কিরণের সঙ্গে আলাপ আছে তাঁর—

কাকাবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—বেশ বেশ, খুব ভালো কথা, তোমাদের লাইব্রেরী দেখে খুব খুশী হলুম আমি—

মনে আছে কাকাবাবুর উৎসাহ দেখে দীপঙ্করেরও সেদিন খুব উৎসাহ এসেছিল। যে-কিরণকে সবাই তাচ্ছিল্য করে, যে-কিরণকে সবাই এত অবহেলা অবজ্ঞা করে, সেই কিরণকে বুঝতে পেরেছেন কাকাবাবু। সংসারে সবাই যা চায়, টাকা, সম্মান, চাকরি, সে-সব কিছুই চায়নি কিরণ। কিরণ চেয়েছিল শুধু লাইব্রেরী গড়ে তুলতে। চেয়েছিল একদিন তার 'কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'র নাম ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত কলকাতায়। একদিন মহাত্মা গান্ধী জে. এম সেনগুপ্ত কি তেমনি আর কেউ এসে উদ্বোধন করবেন তার লাইব্রেরী। কালিঘাটের নাম ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের নাম ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। সবাই বই পড়তে আসবে তার লাইব্রেরীতে—আর তারপর একদিন স্বরাজ আসবে। স্বরাজ শুধু কলকাতার নয়, স্বরাজ শুধু কালিঘাটেরও নয়, স্বরাজ আসবে সমস্ত মানুষের। বড়লোক, গরীবলোক, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের স্বরাজ!

দেরি হয়ে গিয়েছিল। কাকাবাবু বললেন—আমি এখন যাই, কেমন?

কিরণ বললে—আবার আসবেন কাকাবাবু?

—নিশ্চয়ই আসবো—

তারপর পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে দিলেন কিরণের হাতে। কিরণ টাকাটা নিয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এত সহজে কাকাবাবু এমন করে তাদের উৎসাহ দেবেন এ যেন তার কল্পনারও অতীত। কিরণের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। পেট ভরে খেতে পেলেও যেন কিরণ এত খুশী হতো না। কিরণ কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে যেন আনন্দে হতবাক হয়ে গেছে। তার চোখ দুটো আনন্দে সজল হয়ে এসেছে যেন—

যাবার সময় কাকাবাবু বললেন—আমার সঙ্গে একবার দেখা কোর দীপু—

—কবে কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—আজই, একটু পরে—

কাকাবাবু চলে গেলেন। কিরণ হারিকেনটা নিয়ে নর্দমা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। তারপর ফিরে এসে কিরণ হঠাৎ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই সেই লাইব্রেরী-ঘরের মাদুরের ওপর হঠাৎ নাচতে শুরু করলো। ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। চণ্ডীবাবুদের বাড়ি জন্মাষ্টমীর দিন যেমন করে সংকীর্তনের সময় সবাই নাচে তেমনি করে নাচতে লাগলো। হাত দুটো ওপরে তুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগলো। দীপঙ্করেরও আনন্দ হয়েছিল খুব—কিন্তু কিরণের আনন্দের তুলনায় সে কিছুই নয়। কিরণের তখন কোনও দিকে খেয়াল নেই। সে ঘরের মধ্যে উত্তাল উদ্দাম হয়ে নাচছে। খানিকক্ষণ দেখার পর দীপঙ্করের হাসি পেল। বললে—কিরণ—

কিরণের সেদিকে খেয়াল নেই। তখনও নাচছে। দীপঙ্করের মনে হলো, নাচতে নাচতে কিরণ যেন ভাঙা হারিকেনটার ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়বে। দীপঙ্কর কিরণকে ধরতে গেল।

বললে—কিরণ থাম্, থাম্ রে—

কিরণ দীপঙ্করকে দুই হাতে জাপটে ধরলো। কিরণ আনন্দের চোটে কী যে করবে তা যেন বুঝতে পারছে না।

—থাম্, কিরণ, ছাড়, ছাড় আমাকে—

দীপঙ্কর আবার বললে—লোকে পাগল বলবে, থাম্ তুই—

কিরণ বললে—কী করা যায় বল্ তো—কাউকে মারতে ইচ্ছে করছে—

—কেন রে?

কিরণের চোখে মুখে যেন একটা পাগলের দৃষ্টি। বললে—আমার এত আনন্দ হচ্ছে ভাই, আমি কী করবো বল্ তো—

দীপঙ্কর বললে—থাম তুই কিরণ, তোর মা দেখতে পেলে পাগল ভাববে তোকে—

—ভাবুক গে, আমি আজ খাবো না, আমি ঘুমোব না, আমি সমস্ত রাত নাচবো—তোর কাকাবাবু এত ভালো লোক ভাই? আগে বলিসনি কেন তুই? আমি মিছিমিছি ওদের বড়লোক বলে গালাগালি দিয়েছি—

কিরণের মুখের দিকে চেয়ে দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। মানুষ লটারিতে এক লাখ টাকা পেলেও এমন করে অধীর হয়ে ওঠে না। দীপঙ্কর জোর করে কিরণকে ধরে রাখলো। বললে—চুপ কর্, চুপ কর্ তুই—

মনে আছে সেদিন কিরণের আনন্দ দেখে দীপঙ্করও যেন নিজেকে বেশিক্ষণ সামলাতে পারেনি। কিন্তু সেদিন দীপঙ্করও জানতো না আর কিরণও জানতো না মানুষ সম্বন্ধে অত সহজে রায় দেওয়া উচিত নয়। অত সহজে রায় দিলে মানুষকেই হয়ত অবিচার করা হয়। কত লোকই তো চাঁদা দিয়েছে! সেই শম্ভু

জাতার, খিদিরপুরের রাস্তায় দেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে। পাঁচটা টাকা চাঁদা দিয়ে দিয়েছিল এককথায়, দোকানে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ রসগোল্লা রাজভোগ খাইয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো কিরণ এমন উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হয়ে ওঠেনি। আর যারা কিছুই দেয়নি, পুলিসে ধরিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল—তারা কি সবাই খারাপ লোক? কী দিয়ে বিচার হবে কে ভালো, কে খারাপ? টাকা দিয়ে? টাকা দিয়ে বিচার হবে মানুষের মনুষ্যত্বের? অঘোরদাদু যদি পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে দিত তো হঠাৎ কিরণের চোখে এক মুহূর্তে ভালো লোকে রূপান্তরিত হয়ে যেত কি? পরে অনেকবার অনেকরকম ভাবে ভেবেছে দীপঙ্কর—এর কোনও সদুত্তর পায়নি। মনে হয়েছে, কী সে মাপকাঠি, যা দিয়ে সে বিচার করবে মানুষকে!

কিরণ বললে—এবার 'পথের দাবী'টা কিনবো ভাই—

—যদি পুলিসে ধরে?

—টের পাবে কী করে? আমি বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবো, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াবো সবাইকে—

দীপঙ্কর বললে—তুই খে গে যা এখন। আমি বাড়ি যাই—

তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে বাইরে। কিরণ একাই বসে রইল লাইব্রেরীর মধ্যে। হয়ত আনন্দের আতিশয্যে কিরণ খাবেই না, হয়ত ঘুমোবেই না। সত্যিই তো, কে ভাবতে পেরেছিল কাকাবাবু এমন ক'রে তাদের লাইব্রেরীকে সাহায্য করবে। এমন করে লাইব্রেরীতে এসে তাদের উৎসাহ দিয়ে যাবে। আর কাকাবাবু যখন মেম্বার হয়েছে, লক্ষ্মীদিও হবে, আর সতীও হবে। সবাই হবে। তাহলে আর তাদের ভাবনা নেই। এবার টাকার ভাবনা নেই আর। টাকা হলে আরো আলমারি কিনবে তারা, আরো বই কিনবে! আরো নতুন করে বাড়ি হবে লাইব্রেরীর। এক হাজার টাকা দিয়ে একটা নতুন বাড়ি হবে—সেই বাড়ির সামনে বড় বড় করে লেখা থাকবে—"দি কালিঘাট বয়েজ্ লাইব্রেরী"। বহুদিন পরে, বহু বছর পরে, একশো দুশো হাজার বছর পরে কেউ যদি জানতে চায় কে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই লাইব্রেরীর? তখন দুজনের নাম করবে সবাই। প্রথম কিরণকুমার চ্যাটার্জি আর দুই—দীপঙ্কর সেন। সেই হাজার বছর পরে কালিঘাট আর এরকম কালিঘাট থাকবে না, কলকাতা আর এরকম কলকাতা থাকবে না। নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনও আর এ-রকম থাকবে না। শুধু থাকবে তাদের 'দি কালিঘাট বয়েজ্ লাইব্রেরী'। আর থাকবে তাদের দুজনের নাম। একজন লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট আর একজন সেক্রেটারি। দীপঙ্কর সেন আর কিরণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই ঘটনাটার কথা আর একদিন দীপঙ্করের মনে পড়েছিল।

প্রাণমথবাবুর বাড়িতে বসে বাল্মীকির রামায়ণখানা পড়তে পড়তে দীপঙ্কর এক জায়গায় থমকে গিয়েছিল।

একদিন তপোধন বাল্মীকি মুনিবর নারদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ভগবান্, এ-সংসারে এ সময় এমন কে আছেন যিনি বীর্যবান, গুণবান, চরিত্রবান, কান্তিমান, বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, প্রিয়দর্শন, ইন্দ্রিয়জয়ী, ক্রোধজয়ী, সর্বহিতকারী, পরোন্নতি-সহনশীল এবং লৌকিক ব্যবহারে দক্ষ?

মহাকবির এ-প্রশ্ন দীপঙ্করও ভেবেছে। কবেকার সেই যুগ। কবে সেই আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগেকার কথা। কেউ জানে না সে কোন্ যুগ। সেদিন সেই পৃথিবীর আদি যুগে ঋষিকবির মনে উদয় হয়েছিল এই প্রশ্নের। আশ্রমের বৃক্ষছায়ার তলায় বসে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন নারদকে। তখনও রামায়ণ লেখা হয়নি। তারপর ইক্ষ্বাকু বংশে রাম জন্মগ্রহণ করেছেন। একের পর এক যুগ এসেছে গেছে। কত লোক জন্মেছে, কত রাজা মহারাজা সম্রাট জন্মেছে, কত মহাপুরুষ কত মহাকবি জন্মেছে। তারপর এসেছে পাঠান, মোগল, ইংরেজ। সুতানুটি থেকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। রবিনসন সাহেব এসেছে, ঘোষাল সাহেব এসেছে। মোটর গাড়ি এসেছে, এরোপ্লেন এসেছে, রেডিও এসেছে। মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে পৃথিবী। সেই সুতানুটি থেকে গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত এতটুকু তিল ধারণের আর জায়গা নেই। দীপঙ্কর সেই একই প্রশ্ন করেছে। একই প্রশ্নের ভারে দীপঙ্কর কতদিন ম্রিয়মাণ হয়ে উঠেছে। তার সে প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

প্রাণমথবাবু বলেছিলেন—বাল্মীকির ওই-ই হলো আদর্শ, আদর্শ পুরুষের কথাই বলেছেন ওখানে মহাকবি—

কলেজের প্রফেসার অমলবাবু বলেছিলেন—ওটা হলো utopia—

কিন্তু তবু দীপঙ্করের কৌতূহল মেটেনি। এই মাটির পৃথিবীতে আদর্শ মানুষের সন্ধান পাওয়া কি এতই শক্ত? কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনও কি সে আদর্শ পূরণ করতে পারবে না? তাহলে এত উপদেশ, এত ব্রত, এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা কেন? কিন্তু তারও বহুদিন পরে যখন সনাতনবাবুকে প্রথম দেখলে দীপঙ্কর, মনে হয়েছিল সনাতনবাবুই হয়ত সেই আদর্শ পুরুষ। সনাতনবাবুকেও সেই একই প্রশ্ন করেছিল দীপঙ্কর। সনাতনবাবু বলেছিলেন—আমি?

একটু হেসে বলেছিলেন—আমাকে আপনি কতটুকু জানেন?

সত্যিই দীপঙ্কর কতটুকুই বা জেনেছিল প্রথমে। শুধু চেহারাটাই যা দেখেছিল দীপঙ্কর। চমৎকার সোজা স্বাস্থ্যবান উন্নত শরীর। সতীর পাশে সনাতনবাবুকে দেখে দীপঙ্কর সেদিন বড় আনন্দ পেয়েছিল। আনন্দও পেয়েছিল, দুঃখও পেয়েছিল। একেই তো বলে পুরুষ, বাল্মীকির বর্ণনার আদর্শ পুরুষ! সামনা-সামনি সনাতনবাবুকে দেখে তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যেন ছোট মনে হয়েছিল সেদিন।

তিনি বলেছিলেন—ওতে অহঙ্কার হয়, অহঙ্কার তো মানুষকে বড় করে না।

কিন্তু সেদিন নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের সেই লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে যদি আদর্শ পুরুষ কেউ থাকে তো সে কাকাবাবু। শুধু দীপঙ্করের নয়, কিরণেরও তাই মনে হয়েছিল। অন্ধকার গলি দিয়ে উনিশের একের বি'তে এসে দীপঙ্কর দেখলে, সদর দরজাটা তখনও খোলা রয়েছে। দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকলো। রঘু রোজকার মত রান্নাঘরের সামনে কী যেন করছে—

—কে?

—আমি কাকীমা, আমি দীপু—

—এখন যে হঠাৎ?

দীপঙ্কর বললে—কাকাবাবু আমাকে ডেকেছেন একবার—

—যাও ওপরে যাও, লক্ষ্মী সতী ওরাও আছে—বলে কাকীমা আবার কাজ করতে লাগলেন। সংসারের কাজ কাকীমা না করলেও চলে। তবু কাজ করতে যেন ভালো লাগে কাকীমার। একলা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

দীপঙ্কর বললে—জানেন কাকীমা, কাকাবাবু আমাদের লাইব্রেরী দেখে খুব খুশী হয়েছেন—

—তাই নাকি? বেশ তো—

—লাইব্রেরীর মেম্বারও হয়েছেন।

কাকাবাবুর মেম্বার হওয়ার কথাটা যেন সবাইকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল দীপঙ্করের। মনে হচ্ছিল লক্ষ্মীদি, সতী, পাড়ার সমস্ত লোক, এমন কি মা, অঘোরদাদুকেও বলে আসে সে।

দোতলায় লক্ষ্মীদির ঘরের ভেতর আলো জ্বলছিল। বোধ হয় সতীও আছে ভেতরে। এতক্ষণে সতীও নিশ্চয়ই এসেছে। এসে পড়তে বসেছে। একটু আগেই বিকেলবেলা লক্ষ্মীদি চা খেতে খেতে যে কথাগুলো বলেছে সে কথাগুলোও মনে পড়লো দীপঙ্করের। সত্যিই লক্ষ্মীদির বড় কষ্ট। বাইরে থেকে কষ্টটা কেউ দেখতে পায় না—কিন্তু দীপঙ্কর তো জানে কত কষ্ট। সবাই মিলে মিছিমিছি লক্ষ্মীদিকে দোষ দেয়। হয়ত সতীও দোষ দেয়। তাকে দেখতে পেলে সতীও হয়ত একদিন জিজ্ঞেস করবে। জিজ্ঞেস করবে—কেন সে এত ঘন ঘন লক্ষ্মীদির কাছে আসে।

টিপি টিপি পায়ে দীপঙ্কর তেতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

পাশের ঘরে লক্ষ্মীদি তার টেবিলে পড়ছে। কিন্তু সতী নেই। সতী কি তাহলে এখনও আসেনি।

দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বই থেকে মুখ তুলে দীপঙ্করকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। বললে

—কী রে, আবার কী করতে?

দীপঙ্কর বললে—জানো লক্ষ্মীদি, কাকাবাবু আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হয়েছেন—আমাকে ডেকেছেন এখন—

লক্ষ্মীদি চমকে উঠলো। যেন ভয় পেয়ে গেছে। বললে—কাকাবাবু ডেকেছে? কেন রে?

দীপঙ্কর বললে—তা জানি না—

লক্ষ্মীদি বললে—সতীর সঙ্গে তোর দেখা হয়নি? সতী যে তোদের বাড়ি গেছে!

—আমাদের বাড়ি? এই এখন? কী করতে?

—সতী বললে তোর মার সঙ্গে আলাপ করে আসবে—

দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। তাদের বাড়িতে গেছে সতী—তার মার সঙ্গে আলাপ করতে!

দীপঙ্কর বললে—আমি কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে এখুনি বাড়ি যাচ্ছি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি যা বলেছিলুম মনে আছে তো তোর?

—মনে আছে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি মনে করিয়ে দিলে আবার। বললে—যদি জিজ্ঞেস করে তুই আমার সম্বন্ধে কিছু জানিস কিনা, তুই বলবি তুই কিছু জানিস না,—বুঝেছিস তো? দেখিস, ভুলিসনি যেন?

—না, ভুলবো না।

—মিথ্যে কথা বলবি, বুঝলি?

ততক্ষণে দীপঙ্কর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। তেতলায় কাকাবাবুর ঘরে কাকাবাবু তখন জামা-কাপড় বদলে চেয়ারে বসে আপিসের কাজ করছিলেন বোধ হয়। দীপঙ্করের পায়ের আওয়াজ পেয়েই হাতের ফাইলটা সরিয়ে ফেললেন। তারপর সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন—বোস—

দীপঙ্কর চেয়ারে বসলো। কিন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। কাকাবাবুর মুখটা যেন অন্য দিনের মত নয়। একটু গম্ভীর। বললেন—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বলেই তোমাকে ডেকেছিলাম—

দীপঙ্কর বললে—আপনি চলে আসার পর কিরণ খুব নাচছিল—

—কেন?

—খুব আনন্দ হয়েছে ওর, আমারও আনন্দ হয়েছে কাকাবাবু খুব। আমাদের অনেক কষ্টের লাইব্রেরী, বিশেষ করে কিরণের। ও খুব ভালো ছেলে কাকাবাবু, নিজে না খেয়ে ওই লাইব্রেরী করেছে, লাইব্রেরী ওর ধ্যান জ্ঞান সব, ও রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও লাইব্রেরীর স্বপ্ন দেখে—

কাকাবাবু সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—তোমাকে কী

ডাকবো বলে ডেকেছি জানো—ওর সঙ্গে তুমি মিশো না—

হঠাৎ দীপঙ্করের সামনে বাজ পড়লো। যেন বিশ্বাস হলো না কাকাবাবুর কথাগুলো।

বললে—কেন, কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি বলছি, ওর সঙ্গে তুমি মিশো না—

—কিন্তু ও তো খুব ভালো ছেলে কাকাবাবু!

কাকাবাবু এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। দীপঙ্করের ভয় করতে লাগলো কাকাবাবুর চেহারা দেখে। এত গম্ভীর হতে দীপঙ্কর কখনও দেখেনি কাকাবাবুকে।

—কিন্তু কিরণ তো কোনও দোষ করেনি কাকাবাবু! জানেন, কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ ও! ওদের কত অভাব, এক-একদিন ভাতও জোটে না ওদের, ওর বাবা আজ আট বছর অসুখে ভুগছে। ওর মা পৈতে তৈরি করে, সেই পৈতে বিক্রি করে ওদের সংসার চলে, তবু চাঁদার একটা আধলা সংসার-খরচের জন্যে দেয় না—ওর মতন সৎ ছেলে......

—থামো!

কাকাবাবুর গলাটা বড় রুক্ষ কঠিন কর্কশ শোনালো।

বললেন—তোমার বয়েস কত দীপুবাবু? সেদিনের ছেলে তুমি। পৃথিবীর কতটুকু জানো? কতটুকু দেখেছ তুমি?

দীপঙ্কর কাকাবাবুর কথার কোনও জবাব দিতে পারলে না। তার সমস্ত মন যেন শিথিল হয়ে এল কাকাবাবুর কথায়।

কাকাবাবু আবার বলতে লাগলেন—মানুষের সবটা দেখা যায় না। বাইরে থেকে যা দেখা যায় সেটা আসল রূপ নয়। তোমার চেয়ে আমার অনেক বয়েস হয়েছে। অনেক ভালো জিনিস দেখেছি, অনেক মন্দ জিনিস দেখেছি—তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ওর সঙ্গে তুমি মিশো না—

কথাগুলো বলে কাকাবাবু চুপ করলেন। এবার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত যেন নিঃশেষ হয়ে গেল দীপঙ্করের। কাকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল শুধু।

কাকাবাবু বললেন—তোমার মা রয়েছেন, তাঁর কত কষ্ট দেখছো তো তুমি! কত কষ্ট করে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে তোমাকে মানুষ করে তুলছেন—সে কি কিরণের সঙ্গে মেশবার জন্যে? একদিন তোমাকেও দশজনের একজন হতে হবে না? না চিরকাল এমনি পরের অন্নদাস হয়ে থাকলেই জীবন সার্থক হবে?

এবারও দীপঙ্করের মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগাল না।

কাকাবাবু বললেন—আজ কিরণকে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে, একদিন এর চেয়েও আরো প্রিয় জিনিস তোমাকে ছাড়তে হবে, নিজের উন্নতির জন্যে দরকার হলে

তোমাকে সব ছাড়তে হবে—সংসার আর লাইব্রেরী এক জিনিস নয়, পৃথিবীও সেই আর আগেকার পৃথিবী নেই—বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ভাললাগারও রকমফের হবে, সেদিন বুঝবে আমার কথাই ঠিক, আমি যা বলছি অন্যায় বলিনি—

তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—এবার যাও—

দীপঙ্করের সাহস হলো না আর একটুও বসে থাকতে। আস্তে আস্তে উঠে সিঁড়ি দিয়ে দীপঙ্কর নামতে লাগলো নিচেয়। মনে হলো, এ কী হলো তার! কিরণকে ছাড়তে হবে! কিরণ কী দোষ করেছে! কিরণের মত বন্ধু হয় নাকি! কিরণ যে তার প্রাণের বন্ধু! প্রাণের বন্ধুর চেয়েও বড়। একদিন কিরণকে না দেখলে যে তার খারাপ লাগে! সেই ইনফ্যান্ট্ ক্লাস থেকে একসঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে এসেছে, তারপর পাশাপাশি বড় হয়েছে, কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী সে। তার মা পর্যন্ত তাকে কিরণের সঙ্গে মেশা বন্ধ করতে পারেনি। সেই কিরণকে ছাড়বে দীপঙ্কর! কিরণ দোষটা কী করলে? গরীব হওয়া কি দোষ? গরীব হওয়া কি অপরাধ! কিরণই তো বলেছিল মানুষ যে গরীব হয় তা মানুষই করে। মানুষই মানুষকে গরীব করে, বড়লোক করে! তবে কেন কাকাবাবু কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করলেন তাকে! কিরণের সঙ্গে যদি না মেশে দীপঙ্কর তো কার সঙ্গে মিশবে! বড়লোকরা কেন মিশবে দীপঙ্করের সঙ্গে! নির্মল পালিত কি মিশবে তার সঙ্গে? তার বাবা ব্যারিস্টার পালিত সাহেব কি ছেলেকে মিশতে দেবেন তার সঙ্গে! রাখালকেও তো চণ্ডীবাবু তাদের সঙ্গে মিশতে দেন না। যেটুকু মেশে তাও লুকিয়ে লুকিয়ে! তাহলে? তাহলে কী করবে সে?

দীপঙ্করের মনে হলো তার পায়ের তলার মাটিটা যেন হঠাৎ সরে যাচ্ছে। সমস্ত আকর্ষণের মূলটা যেন হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। তার পায়ের তলার ভিত্তি, মাথার ওপরের আশ্রয়, চারপাশের অবলম্বনগুলো যেন তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সে যেন তলিয়ে গেল অতল সীমাশূন্যতার মধ্যে! কেউ তার নেই, কেউ নেই তার! অথচ দু'দিন আগেও যেন এই সমস্ত কিছুকে সে নিজের বলে অনুভব করেছে। এই কাকাবাবু, এই লক্ষ্মীদি, এই কালিঘাট, এই ধর্মদাস ট্রাস্ট্ মডেল স্কুল, এই কালিঘাটের রাস্তা ঘাট সমস্ত কিছু যেন তার নিজস্ব ছিল। আকাশের মেঘটাও ছিল তার নিজস্ব, আকাশের সূর্যটাও ছিল তার নিজস্ব। আমড়া গাছের ডালের কাকটাও ছিল তার নিজস্ব, আবার নিজস্ব ছিল রাস্তার ঘেয়ো কুকুরটাও। কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করার প্রশ্ন নয়, কাউকে দুঃখ দেওয়া বা কারোর কাছ থেকে দুঃখ পাওয়ার প্রশ্নও নয়—এখানকার যা কিছু ভালো, এখানকার যা কিছু মন্দ, এই সংসারের যা কিছু ছোট, যা কিছু বড় সবাইকে নিয়েই তো দীপঙ্কর হয়ে উঠেছিল, সবাই-এর সঙ্গেই দীপঙ্কর তো একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ কাকাবাবুর কথায় যেন সেই অবিশ্রান্ত প্রবাহ-ধারায় এক ছেদ পড়লো হঠাৎ। দীপঙ্করের মনে হলো, সে যেন আর নেই। আর সব কিছু আছে! এই অঘোরদাদু, এই লক্ষ্মীদি, এই কালীমন্দির, এই ছিটে

কোটা সবাই-ই আছে, শুধু সে-ই হারিয়ে গেছে, তার এই ভুবন থেকে শুধু সে-ই যেন হারিয়ে গেছে। তাকে যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। চেষ্টা করলেও কেউ আর তার সন্ধান পাবে না।

—দীপু!

দোতলার বারান্দায় আসতেই লক্ষ্মীদি দেখতে পেয়েছে। ঘরের দরজার বাইরে এসে এতক্ষণ দীপঙ্করের জন্যেই হয়ত অপেক্ষা করছিল। কাছে এসে গলা নিচু করে বললে—এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল রে কাকাবাবুর সঙ্গে?

দীপঙ্করের চোখের দৃষ্টি যেন কেমন-কেমন। লক্ষ্মীদি কাঁধে হাত দিলে তার। বললে—কী হলো রে তোর?

দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদি, আমি এখন বাড়ি যাই—

—কেন, কী হলো তোর? কাকাবাবু এতক্ষণ কী বলছিল?

—আমি পরে বলবো তোমাকে সব লক্ষ্মীদি, আমি এখন বাড়ি যাই—

লক্ষ্মীদি কেমন অবাক হয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারলে না।

দীপঙ্কর বললে—তুমি কিছু মনে কোর না লক্ষ্মীদি, আমার কিছুছু ভালো লাগছে না, আমি বাড়ি যাই এখন—

বলে লক্ষ্মীদির হাত ছাড়িয়ে দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে লাগলো। আজ যেন দীপঙ্করের চোখে এ-বাড়িটা অচেনা ঠেকছে। একদিন এ-বাড়িটার সঙ্গে তার সমস্ত অন্তরাত্মা ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হতে আরম্ভ করেছিল, আর আজ যেন মনে হলো তার সব বন্ধন সব আকর্ষণ এক নিমেষে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। এখানে এ-বাড়িতেই শুধু নয়, এই সংসারে, এই পৃথিবীতেও যেন তার আর কোনও অধিকার নেই।

দরজাটা খোলাই ছিল। দীপঙ্কর সোজা রাস্তায় গিয়ে নামলো। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন এ-সময়ে নির্জন। অন্ধকারের মধ্যে নেমে দীপঙ্কর যেন এতক্ষণে সব স্পষ্ট দেখতে পেলে। স্পষ্ট দেখতে পেলে নিজেকে। এতক্ষণ কাকাবাবুর বাড়ির ভেতরে আলোর মধ্যে সব যেন অস্পষ্ট ঠেকছিল।

—কী আশ্চর্য! আরে, তুমি এখানে! আর তোমার মা যে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করছে!

সামনে সতী দাঁড়িয়ে। সতীও যেন বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল। দীপঙ্করকে সতীই প্রথমে দেখতে পেয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দীপঙ্করের কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। সতীর মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো মাথায় ফেঁপে রয়েছে। দীপঙ্কর একদৃষ্টে অন্যমনস্কের মত সেইদিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ যেন তার হুঁশ হলো। বললে—ও,—

বলেই নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। মনে হলো, না, সে নেই। সে কোথাও নেই। সে হারিয়ে গেছে। এই পৃথিবী থেকে সে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, কেউ তার সন্ধান পাবে না।

—এই, শোন—

সতীর গলার আওয়াজ পেয়ে দীপঙ্কর পেছন ফিরলে। তখনও সতী দাঁড়িয়ে আছে পৈঁঠের ওপর। সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল মাথার ওপর ফুলে রয়েছে—।

—এই, শোন একটু—

দীপঙ্কর মেশিনের মত আস্তে আস্তে সতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—আমাকে ডাকছো?

—হ্যাঁ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

দীপঙ্কর যেন বুঝতে পারলে না। সতীর কথাগুলো যেন অন্য কাউকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছিল। বললে—আমি? আমাকে বলছো?

সতী বললে—হ্যাঁ, তোমাকে বলছি না তো কাকে বলছি আবার? আর কে আছে এখানে?

বলে হাসলো সতী খিল খিল করে। আবার বললে—তোমাকেই তো বলছি—এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে কী করছিলে?

—বারে, কেন, তোমাদের বাড়িতে যেতে নেই?

দীপঙ্কর যেন আরো হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কাকাবাবুর বাড়িতে তার যাওয়া-আসা নিয়ে এতদিন তো কেউ কোনও প্রশ্নই করেনি। কেউ তো তার অধিকার-বোধ নিয়ে কোনও দিন তর্ক তোলেনি এমন করে। কাকাবাবুরা কি তার পর?

আবার বললে—কেন, ওকথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

সতী বললে—বলো না, এতক্ষণ কী করছিলে আমাদের বাড়িতে? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা। লক্ষ্মীদির কষ্টের কথা। লক্ষ্মীদির জীবনের কথা।

—বলো, কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আমার দিদির সঙ্গে?

দীপঙ্কর সোজাসুজি সতীর চোখের দিকে চোখ রাখলো। অন্ধকারের মধ্যে সতীর চোখের লেখা পড়তে চেষ্টা করলে দীপঙ্কর। সতী কি তাকে সন্দেহ করছে? ভালো করে লেখাগুলো পড়া যায় না। তবু দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে আরো। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের এখানটা এখন আরো নির্জন হয়ে আসছে। খোলা দরজার দিকে পিঠ করে সতী দাঁড়িয়েছিল আর দীপঙ্কর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে দেখছে। ভেতরের বারান্দার আলোটা এসে পড়েছে সতীর পিঠে, মাথার চুলে, আর শাড়ির আঁচলে।

—বলো না, চুপ করে রইলে কেন? আমার দিদির সঙ্গে কথা বলছিলে?

দীপঙ্কর মাথা নাড়লে। বললে—না—

—তবে কার সঙ্গে?

দীপঙ্কর বললে—কাকাবাবুর সঙ্গে—

কথাটা শুনে সতী যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো মনে হলো। বললে—তা এতক্ষণ বাড়ির বাইরে রয়েছ আর তোমার মা যে এদিকে তোমার জন্যে ভাবছে বসে বসে, বাড়ি যাও শিগগির—

বলে সতী হয়ত বাড়ির ভেতরে চলে যেত। কিন্তু দীপঙ্কর হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলো।

বললে—কেন, লক্ষ্মীদির সঙ্গে যদি গল্প করেই থাকি, তাতে কি দোষ হয়েছে?

সতী মুখ ফেরাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি কি বলেছি দোষ হয়েছে? লক্ষ্মীদির সঙ্গে যত ইচ্ছে গল্প করো না তাতে আমার কি? তবে ওরও তো লেখাপড়া আছে, তোমারও লেখাপড়া আছে, অত গল্প করা কি ভালো? তোমার মা বলছিল তুমি নাকি একদম লেখাপড়া কর না—

হঠাৎ যেন সতী অন্যরকম হয়ে গেল। যেন সে-সতী নয় আর।

দীপঙ্কর বললে—আমি তো লেখাপড়া করি!

—ছাই করো, আমি সব শুনে এলাম তোমার মা'র কাছে। পাড়ার এক কে ছোঁড়া আছে, ফেল-করা ছেলে, কেবল তার সঙ্গে দিনরাত মেশো, আমি সব শুনে এসেছি—

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি যে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে হঠাৎ?

—কেন যেতে নেই?

দীপঙ্কর বললে—না তা বলছি না, হঠাৎ আমাদের বাড়িতেই বা গেলে কেন, তাই জিজ্ঞেস করছি!

সতী এবার কথাটা শুনে একটু হাসলো। বললে—লক্ষ্মীদি ঠিকই বলেছে দেখছি—

—লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি কী বলেছে আমার সম্বন্ধে শুনি?

—বলেছে, দীপুকে বাইরে থেকে যা ভাবিস, ও তা নয়। ও খুব চালাক আছে—। তাই তো তোমার সঙ্গে ভাব করতেই তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম—

দীপঙ্কর বললে—আমার সঙ্গে ভাব করার তো খুব গরজ দেখছি তোমার!

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সতী বললে—সেদিনকার কথাটা বললাম তোমার মাকে—তোমার ঘাড়ে মাল বইয়ে নিয়ে এসেছিলুম, শুনে খুব হাসলেন তোমার মা—বললেন—ওই ছেলেকে নিয়েই হয়েছে আমার জ্বালা...তুমি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলো?

বলে আবার হাসতে লাগলো সতী। বিকেল বেলা লক্ষ্মীদির কাছে সতীর

সম্বন্ধে শোনা কথাগুলো আবার মনে পড়তে লাগলো দীপঙ্করের।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা সত্যি বলো তো তুমি কেন আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

—এমনি! কেন, যেতে নেই!

—না, সত্যি করে বলো, এতদিন এসেছো, এর আগে তো কোনওদিন যাওনি, হঠাৎ এতদিন থাকতে আজই-বা গিয়েছিলে কেন?

সতী বললে—কেন, তুমি চাও না, আমি যাই?

—না, সেকথা বলছি না, নিশ্চয় তোমার কোনও উদ্দেশ্য ছিল! কই, লক্ষ্মীদি তো যায়নি কখনও, কাকীমা তো যাননি, কাকাবাবুও তো যাননি—হঠাৎ তুমি কেন গিয়েছিলে?

—ওমা, তা আর কেউ না গেলে কি আমার যেতে নেই? আমি হয়ত ওদের মত নয়—ওদের থেকে আলাদা—

দীপঙ্কর মাথা নাড়লো। বললে—না, সেকথা বললে শুনবো না, তুমি মোটেই আলাদা নও—।

সতী তো অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল কথাটা শুনে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

দীপঙ্কর বললে—আসল কথা তা নয়, আসল কথাটা আমি জানি—

—আসল কথা কী?

দীপঙ্কর বললে—তুমি কী জন্যে আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, তা আমি জানি, তুমি না বললেও বুঝতে পারি—

সতী আরো অবাক। বললে—কী জানো তুমি শুনি? কী জন্যে আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম বলো তো দেখি—?

দীপঙ্কর বললে—সে আমি তোমায় বলবো না—

সতী আরো এগিয়ে সিঁড়ির দুটো ধাপ নেমে এল। বললে—শুনিই না, কী জানো তুমি?

দীপঙ্কর বললে—না, সে আমি কিছুতেই বলবো না তোমাকে—

দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন তার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখছে। যেন তার মনের কথাগুলো দেখতে চেষ্টা করছে। অনেক কাছে সরে এসেছে সতী, ঠিক সেই কারণেই বুঝি দীপঙ্কর আরো পেছিয়ে দাঁড়াল।

বললে—তোমরা ভাবো, আমি কিছু বুঝতে পারি না, না?

সতী বললে—বেশ তো, কে বলেছে আমরা ওই কথা ভাবি?

দীপঙ্কর বললে—তোমরা সবাই সেই কথা ভাবো! তুমি ভাবো, তোমার কাকাবাবু ভাবেন, কাকীমাও ভাবেন তাই। কিন্তু এটা জেনে রেখো আমার কাছ থেকে কোনও কথা আদায় করতে পারবে না। তোমরা আমার বাড়িতে গিয়ে

আমার মা'র সঙ্গে যতই ভাব করো, আর যতই বন্ধুত্ব করো, আমি কিছু বলবো না—

হঠাৎ দীপঙ্করের এই কথা শুনে সতী কী বলবে ভেবে পেলে না! বললে—তার মানে?

দীপঙ্কর বললে—না তার মানেও আমি বলবো না, তোমরা সকলকে কষ্ট দাও, সকলকে দুঃখ দাও কেবল—অথচ দুঃখ দিলে লোকে কত কষ্ট পায়, তা জানো না?

সতী কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—কার কথা বলছো?

দীপঙ্কর বললে—আমি কার কথা বলছি তা-ও বলবো না, কেন বলতে যাবো তোমাকে? তুমি কে? তুমি তো কেবল সন্দেহ করো—

—সন্দেহ করি? কাকে? কাকে সন্দেহ করি?

দীপঙ্কর বললে—যেন জানো না কাকে সন্দেহ করো, আবার মুখ ফুটে তোমাকে বলে দিতে হবে?

সতী যেন কী ভাবলে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বললে—কার কথা বলছো বলো তো? কে এসব কথা বলেছে তোমাকে? লক্ষ্মীদি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ আমি বলে দিই, আর তুমি সকলকে সব কথা বলে দাও—আমি কিছু বলবো না—

সতী একটু থেমে বললে—কিন্তু আমি সন্দেহ করি কাকে, তা বললে না তো?

—কাকে আবার? আমাকে! আমাকেই তুমি সন্দেহ করো! আমি জানি না মনে করো?

—তোমাকে সন্দেহ করি? তোমাকে সন্দেহ করতে যাবো কেন? কিসের জন্যে তোমাকে সন্দেহ করবো? কী করেছ তুমি?

—সে আমি বলবো না—বলে দীপঙ্কর সোজা নিজেদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর দীপঙ্করের মনে হলো আর-একটু দাঁড়ালেই যেন সতী তার কাছ থেকে সমস্ত কথা আদায় করে ফেলতো-

রাত্রে খেতে বসে মা বললে—কাল যেন কোথাও আড্ডা দিতে বেরিয়ো না, আমার সঙ্গে যেতে হবে এক জায়গায়—

তাকে নিয়ে মা'র সেই দুর্ভাবনার দিনগুলোর কথা এখনও আজো মনে আছে দীপঙ্করের। কী দিনই গেছে সেসব। ফরসা কাপড় সাবান দিয়ে কেচে, ছেঁড়া জামাটা সেলাই করে দিয়েছে, কোথাও নিয়ে যাবার আগে। শার্ট পরিয়ে, জুতো পরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে নিয়ে গেছে বাড়ি-বাড়ি! কোথায় কার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে আলাপ হয়েছে। নিজের দুঃখের কথা গল্প করেছে। ছেলের কথা বলেছে। ছেলের কথা বলতে বলতে মা'র মুখ ব্যথা হয়ে গেছে কতবার। কোথায় কোন্ হরিশবাবু চাকরি করেন সওদাগরী আপিসে। তাঁর বউএর সঙ্গে ভাব করে মা নিয়ে গেছে তাঁদের বাড়ি। হরিশবাবু, হরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী। কোথাকার কোন্ মার্চেণ্ট্ আপিসের বড়বাবু।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে অন্দরমহলে মা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। শিখিয়ে দিত—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে; যেন বলতে না হয়—

হরিশবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—চাকরি?

আড়াল থেকে মা বলতো—আপনি একটু চেষ্টা করলেই করে দিতে পারেন, কত লোকের উপকার করেছেন আপনি, বিধবার একটা উপকার করলে আজীবন মনে করে রাখবো—

হরিশবাবু বলেছিলেন—তা দিও একখানা দরখাস্ত আমার হাতে, দেখি কী করতে পারি—

শুধু হরিশবাবুই নয়, কোথা থেকে—সব কত নতুন নতুন লোকের সন্ধান আনতো মা। নতুন নতুন মুখ, নতুন নতুন পাড়া। সব জায়গাতেই মা'র হাত ধরে যেত দীপঙ্কর। সবাই ওই একই কথা বলতো—আচ্ছা, দিও একখানা দরখাস্ত, দেখি কী করতে পারি—

শুধু দরখাস্ত দিয়ে আসাই নয়, তারপর মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিয়েও আসতে হতো। চুপি চুপি করুণ মুখ করে দাঁড়াত গিয়ে দীপঙ্কর।

তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন—কী চাই?

দীপঙ্কর বলতো—আজ্ঞে, সেই দরখাস্ত একখানা দিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে—

তাঁরা রেগে যেতেন অনেকেই। বলতেন—তা দরখাস্ত দিয়ে গেলেই চাকরি হয়ে যাবে অমনি! দিনকালটা কি-রকম পড়েছে বুঝতে পারছো না? ছ' টাকা চালের মণ, আট আনা সের সরষের তেল, চাকরি কোত্থেকে আসবে? চাকরি কি গজাবে?

—আপনি যে মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন?

—মনে করিয়ে দিলেই চাকরি হয়ে যাবে অমনি! চাকরি কি গাছের ফল!

কারো কারো বাড়িতে মা গিয়ে মুড়ি ভেজে দিয়ে আসতো, বড়ি দিয়ে আসতো। বলতো—আমার ছেলের চাকরির কথাটা একবার কর্তাকে মনে করিয়ে দিও দিদি সময়মত—

এমনি করে মাসের পর মাস চলে যেত কিন্তু দরখাস্তের জবাবও আর আসতো না। দীপঙ্করের মা খাইয়ে-দাইয়ে ফরসা জামা-কাপড় পরিয়ে পাঠিয়ে দিত বার বার। দীপঙ্করও যেত। কিন্তু চাকরি আর হতো না। শেষে নৃপেনবাবুর খবর পাওয়া গেল। গঙ্গার ঘাটেই একজন কে বুঝি বলেছিল নৃপেনবাবুর কথা। সেখানেই নিয়ে গেল মা।

নৃপেনবাবু অনেক লোককে চাকরি করে দিয়েছেন। প্রথম দিনেই নৃপেনবাবু বলেছিলেন—চাকরি হওয়াটা তো শক্ত নয় দীপুর মা, মুশকিল হয়েছে সাহেবদের নিয়ে—

মা বলেছিল—আপনি পরোপকারী লোক, আপনি অনেকের চাকরি করে দিয়েছেন—

নৃপেনবাবু বলেছিলেন—দিন কাল বড় খারাপ দীপুর মা, যে দিনকাল পড়েছে, এখন চাকরি করে দেওয়া বড় শক্ত। এককালে কত লোককে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ,তখনকার সব সাহেব ছিল অন্যরকম, তারা পরের দুঃখ বুঝতো—এখন যে কী দিনকাল পড়লো, সরষের তেল বলে আট আনা সের, চালের দাম দেখ না, বাঁকতুলসী চাল ছ' টাকা মণ—কী খাবে লোকে?

প্রথম প্রথম এমনি অনেক কথা বলতেন। বার বার ঘোরাতেন। মা বাড়ির ভেতরে গিয়ে নৃপেনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতো। বলতো—তুমি একটু বলে দিও দিদি কর্তাকে, আর পারছি না আমি, আমার শরীরে আর বইছে না—

শেষে একদিন খোলাখুলিই বলে ফেললেন নৃপেনবাবু।

বললেন—তোমাকে খুলেই বলি দীপুর মা, এ তো আর মার্চেন্ট আপিস নয় তোমার, এ হলো গিয়ে সাহেবদের আপিস, এখানে একবার ঢুকতে পারলে আর চাকরি যায় না সারাজীবনে, তারপর কত সুবিধে, তুমি বিধবা মানুষ, ছেলের পাস নিয়ে কাশী, বৃন্দাবন, গয়া, শ্রীক্ষেত্র কত জায়গায় ঘুরতে পারবে, একটা পয়সা লাগবে না—কম সুবিধে?

—সেই সুবিধের জন্যেই তো আপনার কাছে আসা দাদা!

—তা দাদার তো আর আপিস নয় দীপুর মা। আমার যদি আপিস হতো তো আমি আজই হুকুম দিয়ে দিতাম এই এখ্খুনি দীপঙ্করকে চাকরি দিয়ে দাও—খাতায় নাম উঠে যেত সঙ্গে সঙ্গে আর মাসে মাসে তেত্রিশ টাকা মাইনে হয়ে যেত—তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করো না—। তাই তো বলছিলুম মুশকিল হয়েছে সাহেবদের নিয়ে—

মা বলতো—আপনি বললে আবার মুশকিল কী-হবে দাদা?

—আরে না, তুমি বোঝ না, সবাই তো আর তোমার-আমার মত সাধুপুরুষ নয়! তারা এসেছে সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এখানে কি শুধু মুখ দেখাতে? তারা হলো ঠাকুরের বাড়া—ঠাকুরকে যেমন নৈবিদ্যি দিতে হয়, সাহেবদেরও তেমনি ভেট্ দিতে হয়—

—ভেট্! কত টাকার ভেট্ দাদা?

নৃপেনবাবু বলেছিলেন—তা কম করেও পঁচিশ টাকার ভেট না দিলে সাহেব-ঠাকুরের পেট ভরবে কেন? এই ধরো দুটো মুরগী, কিছু ফল-ফুলুরী, একটা গিনি, নতুন-গুড়ের সন্দেশ, এক বোতল বিলিতী মদ—তারপর আছে বাবুদের চাপরাসীদের বখশিশ—সব মিলিয়ে টাকা পঁচিশেক পড়বে—

পঁচিশ টাকার কথা সেই-ই প্রথম বলেছিলেন নৃপেনবাবু! মা-ও কথা দিয়েছিল যেমন করে পারে যোগাড় করবে পঁচিশটা টাকা। পঁচিশটা টাকা হলেই একেবারে হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবে দীপঙ্কর। তারপর সারাজীবন যত পারো আয়েস করো। রেলের পাশ নিয়ে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াও, তীর্থ-ধর্ম করো। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। কারো বাবার সাধ্য নেই তোমার চাকরি খায়। সরকারী চাকরির ওই তো মজা! তারপর বছর-বছর তিন টাকা করে ইনক্রিমেণ্ট! কত বাবুয়ানি করবে করো না, কত নবাবি করবে করো না। কাজের মধ্যে সকাল দশটায় হাজরে দেওয়া, আর বিকেল পাঁচটায় আপিস থেকে মুক্তি! দুপুর বেলা আধ ঘণ্টা টিফিন-টাইম। তা তোমার ছেলের সঙ্গে একটা টিফিন-কৌটো দিয়ে দিও। একটা বেগুন ভাজা আর দুটো পরোটা দিয়ে দিও পুরে। আর চা খাওয়ার বদ্ নেশা যদি থাকে তো দু' পয়সায় একবাটি চা, তারও ব্যবস্থা আছে সেখানে—

—না, দীপু আমার চা খায় না দাদা—

—তা না খাক। সে তো পরের কথা। আগে চাকরি তো হোক। হলে মন্দিরে পুজো দিয়ে আসবে মা। ওই ষষ্ঠী, গণেশ, ভুবনেশ্বরী, নকুলেশ্বরতলা, সব জায়গার মানত করা আছে। সব দেব-দেবীকে কামনা জানানো আছে। কামনা পূরণ হলেই মা পুজো দেবে। এ যে মা'র কতদিনের সাধ। মা'র যে কতদিনের বাসনা। কিন্তু পঁচিশটা টাকা কেমন করে কোথা থেকে যোগাড় হয়।

বাইরে রাস্তায় এসে দীপঙ্কর বললে—ও চাকরি আমি করবো না মা—

—কেন? কেন করবিনে তুই?

—না মা, ঘুষ দিয়ে আমি চাকরি করবো না।

—ঘুষের কথা তো উনি বললেন না, সাহেবকে ভেট দিতে হবে! ঘুষ বলছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—ও একই কথা, ওর নামই ঘুষ!

মা বিরক্ত হলো। বললে—তবে তুই নিজে যাহোক করে একটা চাকরি যোগাড় করে নে, আমাকে যেন তাহলে কষ্ট করতে হয় না আর! আমি তাহলে আর তোমার চাকরির মধ্যে থাকবো না, আমার তো ভালোই, কিন্তু আমি আর সকাল-নেই বিকেল-নেই, এই রাঁধা-বাড়া করতে পারবো না বাপু—সেও বলে রাখছি—

দীপঙ্করও কিছু কথা বললে না আর। মা যেন রেগে গিয়ে আগে আগে চলতে লাগলো। কালীঘাট মন্দিরের কাছে আসতেই দীপঙ্কর বললে—মা—

মা কিছু কথা বললে না। যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগলো।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—মা—

—কী বল্?

—তুমি আমার ওপর রাগ করলে?

মা বললে—রাগ-ফাগ বুঝিনে বাপু, আমি জ্বলছি নিজের জ্বালায়, আর

ছেলের এখন মান-অভিমান জ্ঞান হয়েছে। বলি অত মান-অসম্মান জ্ঞান যদি তোর, তো মরতে আমার পেটে জন্ম নিলি কেন তুই? বড়লোকের বাড়িতে জন্মাতে পারলি না, যেখানে ফেলে-ছড়িয়ে দু-দশটা মানুষ হলেও কারু গায়ে লাগে না—

গজ্ গজ্ করতে লাগলো মা! বলতে লাগলো—অঘোরদাদু আর ক'দিন? বুড়ো মানুষ যদ্দিন আছে, তদ্দিন তবু খেতে পরতে পাচ্ছিস, তারপর? তারপর কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, কে খেতে দেবে তোমাকে? ওই বুড়ো মানুষ গালা-গালিই দিক আর যা-ই করুক, কে করবে অমন করে? উনি গেলে কী করে বাঁচবে, সেটা ভেবেছ একবার?

সারা রাস্তা-ই এমনি করে উপদেশ দিতে দিতে চললো মা। কথাগুলো বলতে বলতে মা'র গলা যেন বুজে আসছিল। বাড়িতে আসতেই দীপঙ্করের যেন কেমন অনুতাপ হলো।

বললে—মা—

মা রেগে বললে—কী? আবার ক্ষিদে পেয়েছে? আমার কাছে ক্ষিদের কথা আর বোল না তুমি, আমি আর খেতে দিতে পারবো না—! যেখান থেকে পারো তুমি এবার নিজে যোগাড় করে নাও—আমি খেতে দিতে পারবো না—এই বলে রাখলুম—

দীপঙ্করের যেন কান্না পেল। চোখ ফেটে জল আসতে লাগলো। হঠাৎ দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরল। বললে—মা, তুমি রাগ কোরো না, তুমি রাগ করলে আমার যে ভাল লাগে না মোটে—

—ভালো লাগে না তো না লাগুক, আমি তার কী জানি! আমি তার কী করবো, আমার যেমন কপাল, আমার মরণ হলেই বাঁচি—ছাড় আমাকে, ছাড় তুই, আমার কাজ আছে—ছাড়—

দীপঙ্কর কিছুতেই ছাড়বে না। তার মনে হলো যেন মাকে ছাড়লেই তার মা আর থাকবে না। তার মাকে হারালে সে বাঁচবে কি করে? কোথায় থাকবে? মা-ই তো তার সব!

বললে—মা তুমি মুখ গম্ভীর করে আছো কেন?

—তা গম্ভীর করবো না তো কি, হাসবো! আমার হাসারই কপাল বটে!

—না, তুমি একবার হাসো, না হাসলে তোমাকে ছাড়বো না আমি, তুমি হাসো একবার, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি হাসো মা—

মা দীপঙ্করকে ছাড়াতেও পারে না, দীপঙ্করও মাকে ছাড়বে না।

মা বললে—তোর লজ্জা করে না কথা বলতে দীপু? আমার দুঃখু তুই যদি বুঝতিস, তাহলে কি আমার এই হাল হয়! আমি তোর জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি, আর তুই কিনা আমাকে হাসতে বলছিস্! পোড়া মুখে হাসি আসে? হাসবার মুখ তুই রেখেছিস—?

মার মুখটা ধরে দীপঙ্কর সোজা তার দিকে টেনে নিয়ে বললে—তবু তুমি হাসো মা একবার, আমি দেখি—

দীপঙ্কর দেখতে লাগলো—মা যেন একবার হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু হাসতে গিয়ে হঠাৎ মা যেন কান্নায় ভেঙে পড়লো একেবারে, হঠাৎ দীপঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরে একেবারে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে। ছেলের মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে বলতে লাগলো—তুই কিনা আমায় হাসতে বলিস দীপু! হাসতে কি আমি চাই না রে! হাসতে যে আমার কত সাধ! আজ কত বছর ধরে একদিন হাসতে পারবো বলে মা'কে ডাকছি, সেই আমাকেই তুই হাসতে বলিস দীপু? আমার মত এমন করে সংসারে কেউ আর হাসতে চায় না যে দীপু—

বলতে বলতে মা'র চোখের জলগুলো টপ্ টপ্ করে দীপঙ্করের মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগলো। আর মা'র বুকের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে দীপঙ্করের মনে হলো, না থাক তার চাকরি, না থাক তার টাকা, কিছুই না থাক, তার তো মা আছে। মা মানেই তো সব, মা মানেই তো সব কিছু। সংসারে মা থাকলে আর কী চাই? যার মা আছে, তার আর কিসের দরকার! মা মানেই তো সংসার, সংসার মানেই তো মা। মা থাকা মানেই তো সব থাকা!

দীপঙ্কর বললে—আমি আর তোমাকে কষ্ট দেব না মা—তুমি চুপ করো—

এমনি করে কতদিন যে মা-ছেলেতে ঝগড়া হতো আর কতদিন যে ভাব হতো, তার ইয়ত্তা নেই। দীপঙ্করের মনে হতো, অঘোরদাদু যতই তাকে ভালোবাসুক, প্রাণমথবাবু যতই তাকে বিপদে সাহায্য করুন, কিরণ যতই প্রাণের বন্ধু হোক, মা'র মতন তো কেউ নয়। মা না থাকলে কোথায় সে আশ্রয় পেত? মা না থাকলে এই বিরাট পৃথিবীতে সে কী করতো?

সেদিন বাড়িতে যেতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মা, ওদের বাড়ির একটা মেয়ে এসেছিল বুঝি?

মা বললে—হ্যাঁরে, তুই যে ওদের বাড়িতে অতো যাস তা তো বলিস নি?

দীপঙ্কর বললে—ওরা খুব বড়লোক মা, কাকাবাবু খুব বড় চাকরি করে—

মা বললে—তা তুই এত যাস্, একটা কাজের কাজ তো করতে পারিস না, একবার শুধু মুখের কথা বললেই তোর একটা চাকরি হয়ে যায় শুনলাম—

—কেন? কে বললে তোমাকে? সতী বলেছে বুঝি?

অনেক দিন অনেক জায়গায় অনেক মানুষকে খোশামোদ করে করে মা যেন আশা ছেড়েই দিয়েছিল। একেবারে হতাশ হয়ে গিয়েছিল। অনেক দুঃখের বোঝা বয়ে বয়ে মা যেন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মা এতদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তারই নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় যে চাকরি এসে হাজির হবে তা হঠাৎ বিশ্বাস করতে হয়ত সাহস হয়নি মা'র।

মা বললে—কালকেই একবার বলিস বুঝলি?

—আমি বলতে পারবো না মা।

—তা পারবে কেন, তা-ও আমাকেই করতে হবে, পারবে কেবল কিরণের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে! ও ফেল করেছে, ওর সঙ্গে তোমার এত বেড়াবার দরকারটা কী!......কাল একবার যাবি, বুঝলি?

—তা সতী এসেছিল তোমার কাছে কী করতে মা?

মা বললে—তোর কথাই তো জিজ্ঞেস করছিল বার-বার। আমি বললাম—বাপ-মরা ছেলে, তোমরা তোমার কাকাবাবুকে বলে যদি একটা চাকরি-বাকরি করে দাও ওর তো গরীবের একটা উপকার হয়।

দীপঙ্কর তবু যেন খুশী হলো না শুনে। বললে—কিন্তু কী করতে এসেছিল কিছু বললে না?

—কী আবার করতে আসবে, পাশের বাড়িতে লোক বেড়াতে আসে না?

—কেন, ওর কাকীমা তো আসে না, লক্ষ্মীদি তো আসে না, সতীই বা একলা কেন এল?

—তা সবাই কি এক-রকম হয়? এ-মেয়েটা হয়ত আলাদা ধরনের, একটু মিশুকে স্বভাব!......এক-একজনের একটু মিশুকে স্বভাব তো থাকে, তেমনি এসেছিল—

দীপঙ্কর বললে—না মা, তা নয়, আসলে অন্য উদ্দেশ্য ছিল, তুমি বুঝতে পারোনি।

—ওমা, লোকের বাড়িতে লোকে বেড়াতে আসবে, তার আবার উদ্দেশ্য কী থাকবে! আর ওরা হলো বড়লোকের মেয়ে, বাপের টাকা আছে, আমাদের মত গরীব লোকের বাড়িতে বেড়াতে এসে ওদের কীই বা লাভ! এমনি সময় কাটাতে এসেছিল আর কি!

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—না মা, তুমি ভালো মানুষ তো সরল প্রকৃতির লোক, ধরতে পারোনি—আসলে একটা উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটার, আমি জানি—

—উদ্দেশ্য আবার কী থাকতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—ছিল একটা উদ্দেশ্য! তুমি সেসব বুঝতে পারবে না। ওরা খুব চালাক মেয়ে তো! তোমার কাছে তাই খুলে কিছু বলেনি—

—কিন্তু খুলে বলবার আছে কি তাই বল্?

দীপঙ্কর বললে—ওরা বর্মার মেয়ে, তা জানো তো! বর্মার মেয়েরা এখানকার মেয়েদের মত নয়, জানো! খুব চালাক, আর ওদের পেটে-পেটে বুদ্ধি—ওরা লোককে খুব কষ্ট দেয়! ধরো যদি জানতে পারে যে, তোমার একটা খুব ভালো হচ্ছে তো কিছুতেই তোমার ভালো হতে দেবে না—কেবল চাইবে কিসে তোমার খারাপ হয়! এই রকম ওরা। আর পেছনে পেছনে নজর রাখবে যেন কেউ তোমার ভালো না করতে পারে! আর কেবল সন্দেহ করবে সকলকে।

দীপঙ্করের মা ছেলের কথা কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

—তার মানে ওরা লোক ভালো নয়! বুঝতে পেরেছ?

—লোক ভালো নয়, কিসে বুঝলি তুই?

দীপঙ্কর বললে—আমি যে দেখেছি ওদের বাড়ি গিয়ে।

—তুই ওদের বাড়ি গিয়ে বুঝি কেবল এই সব দেখিস? লেখাপড়া নেই, একটা কাজের কাজ নেই, কেবল এই সব দেখিস তুই ওদের বাড়ি গিয়ে?

—তা দেখবো না! কে কীরকম লোক, তা আমি বুঝতে পারি না ভাবছো! আমাকে সন্দেহ করবে, আর আমি বললেই দোষ হয়ে যাবে? সেই জন্যেই তো এসেছিল আমাদের বাড়িতে—তা বুঝি জানো না—

—তোকে সন্দেহ করবে? তোকে সন্দেহ করতে যাবে কেন মিছিমিছি? কী করেছিস তুই?

দীপঙ্করের মা যেন আকাশ থেকে পড়লো। ছেলে বলে কী!

—তোকে কেন সন্দেহ করতে যাবে শুনি? আমি তো এতক্ষণ গল্প করলাম মেয়েটার সঙ্গে, সেসব তো কিছু মনে হলো না! এসব কথা তোকে কে বুঝিয়েছে? কে মাথায় ঢুকিয়েছে তোর এসব!

এতক্ষণ দরজার চৌকাঠের ওপর বসে বসে বিন্তীদি সব কথা শুনছিল। হঠাৎ বললে—দিদি—

মা বললে—কী মা, কী বলছো মা বিন্তী—

বিন্তীদি বললে—মেয়েটা খুব সুন্দর, না দিদি—

মা বললে—কার কথা বলছো মা?

বিন্তীদি বললে—ওই যে বিকেল বেলা এসেছিল—?

মা বললে—তুমিও তো সুন্দর মা, তুমি কি সুন্দর নও? তুমিও সুন্দর—

—না দিদি, ও আমার চেয়েও সুন্দর—

মা বললে—সাজলে-গুজলে তোমাকে ওর চেয়ে আরো সুন্দর দেখাবে, দেখো—তোমাকে সাবান ঘষে মুখে পাউডার মাখালে আরো ভালো দেখাবে—তখন সবাই তোমাকে সুন্দর বলবে—

—কিন্তু কেউ তো আমাকে সুন্দর বলে না!

—বলবে, বলবে, এই তো আমি বলছি তোমাকে—আর তাছাড়া সুন্দর বলবার লোক যখন আসবে তোমার, তখন বলবে—

বিন্তী কথাটা শুনে যেন খানিকটা লজ্জা পেলে। কিছুক্ষণ কিছু কথা বেরোল না মুখ দিয়ে—

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা মা, লক্ষ্মীদি বেশি সুন্দর না, সতী বেশি সুন্দর?

—বড় বোনকে তো দেখিনি, যেদিন যাবো ওদের বাড়িতে সেদিন দেখবো, সতী বলেছে, ওর কাকাবাবুর কাছে আমায় নিয়ে যাবে।

বিন্তী বললে—ভগবান টাকাও দিয়েছে, রূপও দিয়েছে ওদের, না দিদি?

মা বললে—তা তোমাকেও টাকা দিয়েছে ভগবান, তোমার দাদুর অনেক টাকা আছে, ওদের চেয়েও অনেক টাকা, তোমার বিয়ের সময় নাত-জামাইকে অঘোর-দাদু অনেক টাকা দেবে—তাই তো সিন্দুকের মধ্যে দাদু টাকা জমাচ্ছে অত—

বিন্তী আবার চুপ করে গেল।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—মা, তার চেয়ে তুমি ওদের বাড়ি যেও না!

—কেন রে, ওদের বাড়িতে গেলে দোষ কী!

—না, ওরা হয়ত তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে, তুমি হয়ত কী বলতে কী বলে ফেলবে, শেষকালে তখন মুশকিল হয়ে যাবে!

—কেন? কী জিজ্ঞেস করবে আবার?

দীপঙ্কর বললে—এই ধরো যদি জিজ্ঞেস করে ভোর বেলা উঠে মন্দিরে ফুল দিতে যাই কি না, ফুল দিতে যাবার সময় কারো সঙ্গে কথা বলি কি না, কারো জন্যে কিছু নিয়ে যাই কি না, এই সব নানান কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে!

মা অবাক হলো। বললে—তা ফুল দিতে যাবার সময় তুই আবার কার সঙ্গে কথা বলিস? কার জন্যে কী নিয়ে যাস? কী বলছিস মাথামুণ্ডু তুই?

—না, মাথামুণ্ডু কথাই তো ওরা জিজ্ঞেস করবে কি না!

—কে জিজ্ঞেস করবে?

দীপঙ্কর বললে—ওই মেয়েটাও জিজ্ঞেস করতে পারে। ওই সতী মেয়েটা। তাছাড়া কাকীমাও জিজ্ঞেস করতে পারে। আর কাকাবাবু তো আছেই। আসলে সবাই ওরা এক রকম, জানো—শুধু লক্ষ্মীদিই যা আলাদা—এত ভালো মেয়ে, তোমাকে কী বলবো মা। আর ভালো হলে যা হয়, তাই হয়েছে—

মা ছেলের কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—ভালো হলে কী হয়?

—ভালো হলেই সংসারে সবাই তাকে কষ্ট দেয়!

মা চাইল ছেলের মুখের দিকে। বললে—তোকে একথা কে শেখালে?

দীপঙ্কর বললে—একথা আবার কাউকে শেখাতে হয় নাকি! তুমি কি ভাবো, আমি কিছু জানি না? যে যত ভালো লোক, সংসারে সে-ই বেশি কষ্ট পায়, এ তো জানা কথা! এই তোমার কথাই ধরো না, তুমি ভালো মানুষ বলেই তো এত কষ্ট পাচ্ছো—পাচ্ছো না? সত্যি কিনা বলো?

মা বলে—তা তো পাচ্ছি—কী কষ্ট যে পাচ্ছি, তা ভগবানই জানেন—

—তবে? লক্ষ্মীদিও ঠিক তোমার মত মা। লক্ষ্মীদিকে দেখলেই আমার তোমার কথা মনে পড়ে। তোমারও যত কষ্ট, লক্ষ্মীদিরও তত কষ্ট! দুজনেই ঠিক একরকম—

মা কিছু বুঝতে পারলে না ছেলের কথা।

দীপঙ্কর বললে—অথচ তোমাকে দেখেও যেমন তোমার কষ্টটা কেউ বুঝতে পারে না, লক্ষ্মীদিকেও বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না—অথচ কী

কষ্ট যে লক্ষ্মীদির মা, কী বলবো।

মা বললে,—তা কষ্টটা কিসের ওর?

দীপঙ্কর বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বললে—সে তুমি বুঝবে না মা, নিজের ছোট বোন, নিজের বাবাই ওকে বুঝতে পারে না—তা তুমি-আমি তো পর! আমরা কী বুঝবো বল! আর তাছাড়া ভালোমানুষ হয়ে জন্মেছে যখন তখন কষ্ট তো পেতেই হবে—! সে-কষ্ট কে খণ্ডাবে বলো?

মা চুপ করে শুনছিল। সারাদিন খাটুনির পর মা'র চোখে বুঝি ঘুম জড়িয়ে আসছিল। অনেকক্ষণ কথা বলার পর দীপঙ্করের কেমন সন্দেহ হলো। ডাকলে—মা—

মা'র সাড়া নেই।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—মা—

মা'র তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছিল। বললে—তুই বল্ না, আমি শুনছি—তারপর কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—আমি বলছিলাম সংসারের ভালো লোকদের কথা। জানো মা, আমাদের বইতে আছে সক্রেটিস বলে একজন লোক ছিল গ্রীস দেশে—সে-ও ওই রকম খুব ভালো লোক ছিল, কিন্তু শেষকালে ভালো লোকদের যা দুর্দশা হয় তাই হলো।

—কি হলো?

—কী আবার হবে? কেউ তাকে দেখতে পারতো না। শেষে তাকে ধরে দেশের রাজা বিষ খাইয়ে দিলে।

—তারপর?

—এত ভালো লোক সেই সক্রেটিস, জানো মা, সেই বিষ তিনি নিজেই মুখে তুলে খেয়ে ফেললেন। আর মারা গেলেন। অথচ দেখ মা, সেই সক্রেটিস কী লিখে গেছেন জানো, লিখে গেছেন—ইংরিজীটা বললে তুমি বুঝতে পারবে না, লিখেছেন—যারা ভালো তাদের মৃত্যুই হোক আর তারা বেঁচেই থাকুক, ভগবান তাদের সব সময় সহায় হন—!

তারপর দীপঙ্কর আবার ডাকলে—মা—

কোনও সাড়াশব্দ নেই মা'র। সারা দিন পরিশ্রম করে মা ক্লান্ত হয়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপঙ্কর আর ডাকলে না। তখনও তার ঘুম আসছে না। দীপঙ্কর সেই অন্ধকারের মধ্যেই চোখ চেয়ে জেগে রইল। ওপরে দোতলার একটা ঘরে অঘোরদাদু তখন হয়ত অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। ছিটে-ফোঁটা রাতে খেয়ে আবার বেরিয়ে গেছে। কখন আসবে ঠিক নেই। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সেই ঘেয়ো কুকুরটা মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠছে। আর কেওড়াতলার শ্মশান থেকে মাঝে মাঝে বিকট আর্তনাদ কানে আসছে—বল হরি হরি বোল্—।

দীপঙ্কর তখনও জেগে ছিল। আস্তে আস্তে কাকাবাবুদের বাড়ির কোটখাটো

শব্দও ক্রমে বাতাসে মিলিয়ে গেল। তারপর শুধু নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আর কিছু দেখা গেল না। কবে কতদিন কত যুগ আগের কথা। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার চারশো উনসত্তর বছর আগের কথা। একদিন এথেন্স শহরে এক গরীবের ঘরে দীপঙ্করের মতই একটি ছেলে হলো। বাপ তার নাম রাখলে সক্রেটিস। ব্যাঁটরার ছোট তরফের বাবুদের বাড়িতে নাতির নামও রাখা হয়েছিল দীপঙ্কর। সে দীপঙ্করের কী হলো কেউ জানে না। কিন্তু আর এক দীপঙ্কর একদিন এসে হাজির হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে। সেদিন সেই আড়াই হাজার বছর আগেকার সেই ছেলেটি একদিন বড় হলো। মানুষ হলো। কিন্তু সে এক বিচিত্র মানুষ। তিনি বললেন— 'know thyself'; তিনি বললেন, 'নিজেকে জানো'। তিনি বললেন, 'It is not the gods but we ourselves who shape our destiny. তিনি বললেন, ঈশ্বর নয়, আমরাই আমাদের নিজেদের ভাগ্যবিধাতা।' তিনি বললেন, 'To a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being'. তিনি বললেন,—'যে ভালো ঈশ্বরই তার সহায়'।

তারপর কত মহাপুরুষ এসেছেন আমাদের সংসারে। বুদ্ধদেব এসেছেন, যীশুখৃষ্ট এসেছেন, মহম্মদ এসেছেন, চৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। উপনিষদ থেকে শুরু করে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত লেখা হয়েছে। হাজার হাজার বছর আর কোটি কোটি মানুষ এসেছে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কি একবারও ভেবেছিল ব্যাঁটরা গ্রামের দীপঙ্কর সেন সেই একই প্রশ্নের একই জিজ্ঞাসার সমস্যা নিয়ে উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোর ভট্টাচার্যির ভাঙা বাড়ির ছাদের তলায় শুয়ে শুয়ে একদিন বিনিদ্র রাত কাটাবে? আর সেদিনের সক্রেটিস? তিনিই কি ভেবেছিলেন তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরে সাউথ সাবার্বান কলেজের একটি ছাত্র প্রফেসারের বক্তৃতা শুনে এসে তার রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত করবে তাঁকেই স্মরণ করে? কেন সংসারে ভালো লোকরাই কষ্ট পাবে! ভালো লোকদের ওপরেই বিধাতাপুরুষের এ পক্ষপাতিত্ব কেন? কেমন করে নিজেকে জানবে সে। নিজেকে জানবার সে-মন্ত্র সে কোথায় পাবে! মানুষই যদি নিজের ভাগ্যবিধাতা, তবে ঈশ্বরের দরকার কী! আর ঈশ্বর যদি না থাকে তো কেন সে রোজ ফুল দিয়ে আসে মন্দিরে গিয়ে? পুজো করে সে কোন্ দেবতাকে? মা-কালী, সিদ্ধেশ্বরী, ষষ্ঠী, গণেশ, নকুলেশ্বর—ওরা তবে কে? সে ঈশ্বর কোথায় যে ইহকালেও রক্ষা করবে, পরকালেও রক্ষা করবে!—তার মা'র ভালোর জন্যে কোন্ দেবতার কাছে সে প্রার্থনা করবে? লক্ষ্মীদির মঙ্গলের জন্যে সে কোন্ ঈশ্বরকে ধ্যান করবে?

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো ঘরের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হলো।

অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্কর তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে। না, হয়ত

কিছু নয়। তার মনের ভুল। কেউ কোথাও নেই। তার ঘুম-না-আসা মনের হয়ত বিচিত্র বিলাস। এমন হয় মাঝে মাঝে। নিস্তব্ধতারও একটা শব্দ থাকে। এও বোধ হয় সেই রকম। আবার পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলে দীপঙ্কর।

আবার যেন খস খস করে কী-রকম শব্দ হলো একটা। মনে হলো মাকে ডাকবে নাকি!

কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করে মা ঘুমোচ্ছে। কেমন মায়া হলো দীপঙ্করের ডাকতে। হয়ত ছিটে ফিরলো বাড়িতে। কিম্বা ফোঁটা। হয়ত সেই গরাদ-ভাঙা জানালাটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকলো। এসে ঘুমোবে, তারপর সারা-রাত ঘুমিয়ে সকালবেলা অঘোরদাদুকে লুকিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে বাইরে।

দীপঙ্কর আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

শেষবারের মত পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে মনে মনে বলতে লাগলো দীপঙ্কর : অঘোরদাদু তোমাকে যতই ঠকাক ঠাকুর, যতই নৈবিদ্যি চুরি করুক, তুমি যেন অঘোরদাদুর কোনও খারাপ করো না। আর কাকাবাবু যতই বলুক—কিরণ খারাপ ছেলে নয় তুমি তো তা জানো ঠাকুর—তারও কোনও খারাপ কোর না। আর মা? মা তোমাদের ফুল না দিয়ে তোমাদের পুজো না করে জলগ্রহণ করে না—তারও কল্যাণ কোর তুমি ঠাকুর। আর সকলের শেষে লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদিকে আমি খুব ভালবাসি। লক্ষ্মীদিরও খুব কষ্ট, কেউ তাকে দেখতে পারে না—তাকেও তুমি দেখো ঠাকুর—তাকেও তুমি দেখো—

চন্নুনীর আর আগেকার সে ক্ষমতা নেই। তেমন গালাগালির গলাও যেন থেমে এসেছে। উঠোনের কোণের দিকে একটা চালার ভেতর শুয়ে শুয়ে চেঁচায়। বলে—হাড়হাভাতে মাগী, তোদের মুখে খ্যাংরা মারি, তোদের মুড়োয় আগুন জ্বালি, তোদের পিণ্ডি চটকে গয়ায় গিয়ে আমি তোদের......

তারপর হঠাৎ মাঝখানে থেমে গিয়ে বলে—দিদি, ও দিদি—

দীপঙ্করের মা ডাক শুনে কাছে যায়। বলে—কী হলো চন্নুনী, কী হলো তোর?

—গা-গতরে বড় ব্যথা দিদি, ব্যথায় গতর নাড়তে পারছি নে দিদি—

—তা এতক্ষণ যে গলা শুনছিলুম!

—কই, কখন আবার চেঁচালুম! আমার কথাই বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে, আমি আবার চেঁচাব—আ আমার পোড়া কপাল—

কখন অভ্যাসবশে গালাগালি দিয়ে ফেলে চন্নুনী, তার নিজেরও খেয়াল থাকে না মাঝে মাঝে। হঠাৎ ঘুমের ঘোরেও গালাগালি দিয়ে ফেলে। সেদিন উঠোন ঝাঁট দেওয়াও হয় না, সেদিন গোবর ছড়াও দেওয়া হয় না তার। সেদিন দীপঙ্করের মা'র কপাল ভাঙে। সেদিন একহাতে রান্নাও করতে হয় আর এক-

হাতে ঝাঁটাও ধরতে হয়। আবার উনুন নিকোন বাসন মাজা সবই করতে হয় মাকে। আর দীপঙ্করকে করতে হয় বাজার। বাজারে গিয়ে মাছ, আলু, পটল, বেগুন, নটে, কুমড়ো সবই কিনে আনতে হয়।

প্রথম প্রথম মা'র ভয় করতো। কখনও বাজার করেনি ছেলে, পারবে কিনা কে জানে! বাজার থেকে এলে হিসেব নিতে বসে।

বলে—পয়সার হিসেবটা দে—

হিসেবে মা খুব পাকা। হিসেব করে প্রত্যেকটি পাই পয়সা পর্যন্ত। তারপর বাকি পয়সাগুলো আঁচলে বেঁধে রাখে। পরের পয়সা। পরের পয়সার বড় জ্বালা। নিজের পয়সা হলে যেমন তেমন করে খরচ করলে চলে। কিন্তু বুড়ো মানুষ পয়সা-অন্ত প্রাণ। একটা পয়সা প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারেন না। ছোট বেলায় পয়সার মুখ দেখেন নি। একটা পয়সার অভাবে গঙ্গার জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে, গঙ্গার জল আঁজলা ভরে খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছে। সেই মানুষের আজ পয়সা হয়েছে। সেই মানুষের পয়সা, টাকা, মোহর, গয়না সব সিন্দুকে বোঝাই করে তার ঘরে রাখা হয়েছে। রাত্রে ঘুমিয়েও যেন শান্তি থাকে না, বাইরে গিয়েও ভাবনা ঘোচে না। বার বার ঘরের তালাটা টেনে দেখে যা। ঠিক আছে তো!

মা বলে—এই বেগুন দু পয়সা সের? বলিস কি তুই দীপু—এ যে দিনে ডাকাতি মা—

দীপঙ্কর বললে—কত করে বললুম, এক পয়সা সের করে দিতে, কিছুতেই দিলে না, আমি কী করবো—

অঘোরদাদু অবশ্য দর-দাম নিয়ে মাথা ঘামায় না। বরাদ্দ পয়সায় চলে গেলেই হলো! তা না হলে কিছু বলবে না মুখে। খড়ম পায়ে দিয়ে নিচে নেমে গপ্ গপ্ করে ভাতগুলো মুখে পুরে দেয়। ছাই খাচ্ছে, না ভস্ম খাচ্ছে তাও দেখবার দরকার নেই তার।

—ওমা, মাছটা মুখে দিলেন না বাবা, মাছটা আবার কা'র জন্যে রেখে দিলেন?

অঘোরদাদু চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো। বললে—মুখপোড়া মেরে মাছ দিয়েছে আমাকে? মুখপোড়া আমার পয়সা দেখেছ? পয়সা সস্তা হয়েছে আমার ?

অঘোরদাদু তখন থালা ছেড়ে হাত তুলেছে। বলে—খাবো না মুখপোড়া আমি, যে খাবে সে মুখপোড়া, সে হারামজাদা—

তখন মাকে শান্ত করতে হবে। বলবে—বাবা, ঘাট হয়েছে আমার, আমিই মাছ আনিয়েছি, চন্নুনীর তো অসুখ, তাই দীপুকে বাজারে পাঠিয়েছিলুম, দীপু মাছ এনেছে—

—মুখপোড়াটা আমার পয়সা দেখেছে বুঝি? কোথায় গেল সে মুখ-পোড়াটা? কোথায় গেল সে শুনি?

—দীপু তো খেয়ে কলেজ গেছে এখন, এলে পাঠিয়ে দেব।

তখন আবার ঠাণ্ডা হয় বুড়ো মানুষ। মাছটা খেয়ে যেন ভাল লাগে। চেটে চেটে রসিয়ে রসিয়ে খায় মাছটা।

বলে—মুখপোড়াকে এ-মাছ খেতে দিয়েছ? মুখপোড়াটা খেয়েছে?

মা বললে—না দিইনি, দেবখন ওবেলা—তার মাছ ঢাকা আছে—

অঘোরদাদু বলে—তা দেবে কেন, সব দেবে আমাকে, আমি মাছ খেয়ে মরি, আর তোমরা আমার পয়সাগুলো নিয়ে হরিরলুট খাও—এই বলে রাখলুম মেয়ে, আমি কোনও মুখপোড়াকে টাকা দিয়ে যাবো না, আমি টাকা নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দেব, রাস্তায় ছড়াবো, ভিখিরিদের দিয়ে দেব, তবু তোমাদের দেব না একটা আধলা—

বলতে বলতে রেগে রেগে হাত ধুয়ে, মুখ ধুয়ে আবার খড়ম খট্ খট্ করতে করতে ওপরে গিয়ে ওঠে। তারপর ওপরে উঠেও গজ্‌গজানির শেষ হয় না। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে সেই গজ্‌গজানি নিচে থেকে শোনা যায়। তারপর ছিটে এক সময় খেতে আসে, ফোঁটা এক সময়ে খেতে আসে। চন্নুনীর খাবারটা তার ঘরে দিয়ে আসতে হয়। তারপর দীপঙ্করের মা যখন খেতে বসে তখন হয়ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। ভাড়াটে বাড়ির ছায়াটা সরে সরে একেবারে এক ভিলতে হয়ে যায়। আমড়া গাছটার ডালে একটা কাক তখন হাঁ করে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বসে থাকে। এঁটো কাঁটাগুলো যখন মা আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তখন সে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। আর তখন আসে ঠুং ঠুং বাজনা বাজাতে বাজাতে বাসনওয়ালারা, তখন কলের মুখে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ শুরু হয়, আর তার একটু পরেই কলে জল আসে!

বাজার থেকে এসেই দীপু বললে—মা, আজকে কাকাবাবুদের বাড়ি যাচ্ছি—এখনই আসব।

—কলেজ যাবি না?

—যাবো, এই যাবো আর আসবো—

—চাকরির কথাটা বলতে বুঝি? একটু বলিস ভালো করে—

মা তখন রান্না করছিল। কড়ায় তেল চড়িয়েছিল। তেলের ওপরে আলুগুলো ছাড়তেই কেমন একটা কল্ কল্ শব্দ হলো। আর কিছু শোনা গেল না। দীপঙ্কর বাজারের ঝুলিটা রেখেই আঁশের হাতটা ধুয়ে নিলে। তারপর চটিটা পায়ে দিয়ে লক্ষ্মীদির বাড়ির দিকে গেল। কেমন যেন একটু তার ভয় করতে লাগলো মনে। অথচ সকাল বেলাও কিছু জানতো না। সকাল বেলা যথানিয়মে মন্দিরে মন্দিরে ফুল দিয়ে এসেছিল। তারপর এসে পড়তে বসবার কথা। হিস্ট্রি আছে সিভিক্স আছে, ইংরিজী আছে। কিন্তু চন্নুনীর অসুখ আজও কমেনি। বাজারে যেতে হয়েছিল দীপঙ্করকে সেদিনও। বাজারে হঠাৎ রঘুর সঙ্গে দেখা। রঘুও বাজার করছে।

রঘু বললে—দীপুবাবু—

দীপু বললে—রঘু, বাজার করছো বুঝি?

তারপর আবার জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি কী করছে!

রঘু বললে—কাল খুব ঝগড়া হয়ে গেছে দীপুবাবু—

—ঝগড়া? কার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, কে ঝগড়া করেছে?

—দুই বোনে। বড়দিমণি আর ছোড়দিমণিতে—

—কেন?

—তা জানিনে, বড়দিমণি রাগ করে খায়নি। কাকাবাবু খুব সাধাসাধি করলে, তবু খেলে না, কাকীমা সাধলে তবু খেলে না।

—কেন, ঝগড়াটা হলো কী নিয়ে? তা শোননি!

রঘু বললে—ও দু বোনের ঝগড়া তো নতুন নয়, ও সেখানেও ছিল, এখানেও হয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—তা দুটি তো মাত্র বোন, তা দুটিতেও ভাব নেই?

রঘু বললে—নাঃ—

—কিন্তু এক-এক সময় যে খুব ভাব দেখেছি, খুব হাসে দুজনে। আমি বাড়ি বসে পড়তে পড়তে শুনতে পাই।

রঘু বললে—তা ভাব হয়, কিন্তু ঝগড়াই হয় বেশি, ছোটবেলা থেকে তো আমি দেখে আসছি—

—কার দোষটা বেশি? লক্ষ্মীদির না সতীর? দুজনের মধ্যে কে ভালো, বলো তো রঘু?

—ভালো দুজনেই।

দীপঙ্কর বললে—দুজনেই ভালো?

—হ্যাঁ, দুজনেই ভালো।

—তবু তার মধ্যে লক্ষ্মীদি বোধহয় একটু বেশি ভালো, না?

রঘু বললে—না, দুজনেই বেশি ভালো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সতী, তোমার ছোড়দিমণি একটু সন্দেহ করে যে, লক্ষ্মীদিকে যারই ভালো লাগবে, তাকেই যে সন্দেহ করে?

—কিসের সন্দেহ করবে?

দীপঙ্কর আর সেসব নিয়ে বেশি আলোচনা করলে না রঘুর সঙ্গে। ওসব কথা ওর সঙ্গে আর বেশি আলোচনা না করাই ভালো। বাড়ির চাকর তো। হয়তো সব কথা জানে না। হয়তো বাইরে থেকে যা দেখেছে, তাই-ই জানে। লক্ষ্মীদির মনের কষ্টটা জানবে কী করে। লক্ষ্মীদি তো তাকে ছাড়া আর কাউকে বলেনি। লক্ষ্মীদির মনের কষ্টের কথা একমাত্র দীপঙ্করই জানে। লক্ষ্মীদি তো বাড়িতে আর কাউকে বিশ্বাস করে না।

—আচ্ছা, তুমি বাজার করো রঘু, আমি যাই—

বাড়িতে ঢোকবার মুখেও কেমন একটু ভয়-ভয় করছিল। তবে কি জানাজানি হয়ে গেছে? তবে কি সবাই জেনে গেছে? সতী হয়তো সব বলেছে লক্ষ্মীদিকে। দীপঙ্করের মনে হলো আজ যেন সে অপরাধীর মত ঢুকছে এ-বাড়িতে। এতদিন যেন সে সত্যিই অন্যায় করে এসেছে। জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে একজন, তাকে সে লক্ষ্মীদির চিঠিগুলো দিয়ে এসেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে কোনও কাজ করাই তো অন্যায়। আসলে তো দীপঙ্করেরই দোষ! সেই কতদিন থেকে এ-কাজ করে আসছে সে। অবশ্য লক্ষ্মীদির ভালোর জন্যেই করে এসেছে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, প্রতিদিন সে চিঠি দিয়ে এসেছে। এতদিন নিজের স্কুলের পড়ার ক্ষতি করে দিয়েছে, অপেক্ষা করেছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে, যখন মা ঘুমিয়ে পড়েছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন লক্ষ্মীদির কথাই ভেবেছে।

মা বলে দিয়েছিল—একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলবি, জানিস, বলবি নিজের দুঃখের কথা—না বললে লোকে বুঝবে কেন? তারপর আমি একদিন বলবো গিয়ে—

মা তো জানতো না, মা তো কল্পনাও করতে পারতো না এ-সব।

মা বলেছিল—নিজের কথা নিজে না বললে কি কেউ চাকরি দেয়? আমি ঘরে বসে থাকবো আর একজন হাতে তুলে দেবে চাকরি তা তো হয় না—

—কাকীমা! লক্ষ্মীদি কোথায়?

কাকীমা যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু গম্ভীর-গম্ভীর।

বললে—আছে ওপরে, যাও—

রঘু তখনও বাজার থেকে আসেনি। সকালবেলা সংসারে সবাই ব্যস্ত। কাকাবাবু আপিস যাবেন। রান্নাবান্না হচ্ছে। ঠাকুর উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে রান্না করছে। একতলার রোয়াক ধোয়া মোছা হয়ে গেছে। সিমেন্টের রোয়াকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দীপঙ্করের পা যেন আটকে যেতে লাগলো। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্তের দ্বিধা হলো। যদি লক্ষ্মীদির ঘরে সতী থাকে এ-সময়ে। সতী যদি লক্ষ্মীদির সঙ্গে তাকে কথা বলতে না দেয়! সতী যেরকম মেয়ে, হয়ত কথাই বলতে দেবে না। অত কথা কী, হয়তো ঘরেই ঢুকতে দেবে না! হয়ত বলবে—এখন এসেছ কেন? পড়াশোনা নেই আমাদের?

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েই আবার ফিরলো।

কিন্তু এতদূর এসে ফিরে যাবে নাকি! লক্ষ্মীদি তো তাকে ভালোবাসে! লক্ষ্মীদির কাছে সে যাবে, তাতে কার কী বলবার আছে। লক্ষ্মীদি তো বড় বোন। বড় বোনের কথার কোনও দাম নেই! বড় যে হয়, তার কথাই তো ছোট শোনে!

কাকীমা বোধহয় রোয়াক দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিলেন।

বললেন—কে, দীপু? ওখানে দাঁড়িয়ে আছ যে? ওপরে গেলে না?

দীপঙ্কর হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে পেলে।

বললে—আচ্ছা কাকীমা, একটা কথা বলবো?

—কী কথা, বল না!

দীপঙ্কর বললে—আপনি তো জানেন আমাদের কথা।

—তা তো জানিই!

—আমাদের অবস্থা খুব খারাপ! আপনি তো জানেন, আমার বাবাকে ডাকাতে খুন করে ফেলেছিল! আমার মা কত কষ্ট করে আমাকে মানুষ করছে। পরের বাড়িতে মাকে রান্না করতে হচ্ছে, তারপরে বলতে গেলে ভিক্ষে করেই একরকম চলছে আমার......

কাকীমা বললেন—হ্যাঁ, তা তো জানিই—তা কী বলবে বলো না?

—সেই কথাই বলতে এসেছিলাম! এ অবস্থায় আমার একটা চাকরি যদি হয় তো খুব উপকার হয় আমাদের, মানে তাহলে আর মাকে পরের বাড়ি রান্না করতে হয় না—

কাকীমা বললেন—তা তো বটেই, তা কাকে কী বলতে এসেছিলে?

দীপঙ্কর বললে—কাকাবাবু আমাকে একটা চাকরি করে দিতে পারেন না? কাকাবাবু তো বড় চাকরি করেন! কাকাবাবু যদি নিজের আপিসে ঢুকিয়ে দেন আমাকে তো খুব ভালো হয় আর কি—

কাকীমা বললেন—তা কাকাবাবু তো রয়েছেন ওপরে, কাকাবাবুকে গিয়ে বলে দেখ না!

—আমি নিজে যাব? কাকাবাবু রাগ করবেন না?

—না, রাগের কী আছে! তোমার চাকরির দরকার, তুমি বলবে, তাতে রাগ করবেন কেন?

দীপঙ্কর বললে—মা-ও আসবে বলতে, মা নিজেই কাকাবাবুকে বলবে, তার আগে আমি তবু একবার বলতে এসেছি আর কি—

—তা চলে যাও ওপরে, যাও না, গিয়ে বলগে—আমাকে যে কথাগুলো বললে, এই কথাগুলোই গিয়ে বলো গে!

—কাকাবাবু রাগ করবেন না?

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না কাকীমা!

—কী কাজ?

—আপনি এখন বুঝে বলে আছেন, নইলে আপনাকে আমি সব বুঝিয়ে বলতাম, আর তারপর আপনি সমস্ত বলতেন কাকাবাবুকে।

কাকীমা বললেন—তা বললেও হয়! নিজের কথা নিজে বলাই ভালো—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু চাকরির কথা বলতে আমার বড় লজ্জা করে কাকীমা, আপনাকে সব বলতে পারি, কিন্তু কাকাবাবুকে বলতে গেলে বড় লজ্জা হয় কাকীমা—

কাকীমা বললেন—লজ্জা করলে তো চলবে না তোমার, আর লজ্জা করলে কে তোমাকে চাকরি দেবে? তোমার তো কেউ নেই সংসারে যে, তোমাকে ডেকে চাকরিতে বসিয়ে দেবে। যাদের কেউ থাকে না, তাদের নিজেদেরই বলতে হয়—

—আচ্ছা, লক্ষ্মীদি কোথায়?

কাকীমা হাসলেন। বললে—তা লক্ষ্মীকে দিয়েও বলাতে পারো—বলে দেখ না—যাও—লক্ষ্মী তো আছে ওপরে—

বলে কাকীমা ভাঁড়ার ঘরে চলে গেলেন। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। ওপরে উঠেই লম্বা বারান্দা। বারান্দাটা খালি। কেউ নেই তখন ওখানে। বারান্দা পেরিয়ে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে কাকাবাবুর কাছে যেতে হবে। আস্তে আস্তে বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়েই দীপঙ্কর দেখলে লক্ষ্মীদির ঘরে আর কেউ নেই। একলা লক্ষ্মীদি দরজার দিকে পেছন ফিরে একমনে কী যেন পড়ছে।

দীপঙ্কর দরজার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি পেছন ফিরলো।

পেছন ফিরতেই দীপঙ্করের মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তখন আর ঘরের ভেতরে ঢোকবার সাহসও নেই।

সতী দীপঙ্করকে দেখেই বললে—এসো, ভেতরে এসো না—

দীপঙ্কর ভয় পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘর থেকে চলে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে। বললে—আমি এমনি এসেছিলাম—

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসো—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে যেতে যেতে বললে—আমি ভেবেছিলাম লক্ষ্মীদি বুঝি—

সতী বললে—বোস এই চেয়ারটায়—

দীপঙ্কর ভয়ে ভয়ে বসলো। পা দুটো কাঁপছিল তার। বললে—আমার এখুনি কলেজে যেতে হবে, আমি বরং যাই—

সতী বললে—লক্ষ্মীদির সঙ্গে তোমার কী দরকার ছিল?

—দরকার কিছু ছিল না, এমনি—

সতী বললে—দরকার না থাকলেও বুঝি তুমি আসো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, লক্ষ্মীদিই আমাকে আসতে বলে, লক্ষ্মীদি আমাকে আসতে বলে বলেই এসেছি—লক্ষ্মীদি বলে, কাকাবাবু বলেন, কাকীমা বলেন—সবাই আমাকে আসতে বলেছে, দরকার না থাকলেও আসতে বলেছে—। এখন আর তোমাদের বাড়িটা পরের বাড়ি বলে মনে হয় না আমার—

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি আসার আগে পর্যন্ত খুব ঘন-ঘন আসতাম, তুমি আসার পর থেকে আসা একটু কমিয়ে দিয়েছি—

—কেন?

দীপঙ্কর একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলে। বললে—এখন আমারও কাজ বেড়েছে, এখন লেখাপড়া বেড়েছে, এখন চাকরির খোঁজে চারদিকে যেতে হয়—তারপর সকালবেলা থেকে, আমার অনেক কাজ—তোমাদের মতন সারাদিন বইতে মুখ দিয়ে বসে থাকলে তো আমার চলে না। আমার বাজার করতে হয়, ভোর বেলা উঠেই আমাকে আবার মন্দিরে মন্দিরে ফুল দিয়ে আসতে হয়—

অনেকগুলো কাজের ফিরিস্তি দিতে পেরে দীপঙ্করের জড়তাটুকু যেন কেটে গেল।

সতী বললে—কাজ করা তো ভালোই—

দীপঙ্কর উৎসাহ পেয়ে গেল সতীর কথায়। বললে—আমার মা আমার চেয়েও বেশি কাজ করে। কাজ করতে করতে একেবারে ঘেমে নেয়ে ওঠে, বাড়িসুদ্ধ সকলের রান্না করতে হয়—তাছাড়া বাবা নেই তো আমার, আমার জন্যেও মা'র অনেক ভাবনা, সেই দু মাস বয়েস থেকে আমাকে মানুষ করে আসছে। মনে করে দেখ, আমি যখন শিশু আর কি, কথাও বলতে পারি না, তখন থেকেই মা বিধবা! সে যে কী কষ্ট, সে কেউ বুঝবে না। মা'র কাছে শুনেছি এক-একদিন ভাত খেতে পায়নি, শুধু মুড়ি খেয়ে মা কাটিয়েছে—

বলতে বলতে হঠাৎ বোধহয় খেয়াল হলো দীপঙ্করের। এসব কথা কাকে বলছে সে। বললে—যাকগে, এসব কথা তোমরা ঠিক বুঝবে না—

সতী বললে—না-না, বেশ লাগছে, বলো না—

দীপঙ্কর বললে—তোমরা এসব কল্পনাও করতে পারবে না, মানে, মা বলে, এক-একদিন ঘরে একটা কণাও চাল নেই, ওদিকে আমি ভাত খাবো বলে কাঁদছি—বলতে বলতে মা-ই অনেক সময় কেঁদে ফেলেছে—আর বলবে কি—

হঠাৎ থেমে গিয়ে দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো?

—কি কথা।

—আগে বলো, আমার কথার ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে?

সতী বললে—কেন, আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয়?

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—সন্দেহ তো তুমিই আমাকে করো—

—কেন, আমি তোমাকে সন্দেহ করতে যাবো কেন? আশ্চর্য তো—

দীপঙ্কর বললে—দেখ, তুমি নতুন এসেছ কলকাতায়, এখনও ভালো করে চেনো না আমাকে, লক্ষ্মীদিকে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, লক্ষ্মীদি জানে, আমি কাউকে কোনদিন কষ্ট দিইনি জীবনে, কাউকে কষ্ট দিতে আমার খুব দুঃখ হয়—কাউকে কষ্ট দিয়ে লাভটা কী? একে তো সব মানুষের হাজার-হাজার রকমের কষ্ট আছে, দুঃখকষ্টের শেষ নেই পৃথিবীতে। তার ওপর মানুষের দেওয়া কষ্ট কতখানি মর্মান্তিক বলো তো!

সতী বললে—তা তো বটেই—

দীপঙ্কর বললে—এই ধরো না আমাদের কথা, আমার বাবাকে ডাকাতে খুন করে ফেলেছিল। কেন? না আমার জেঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবার জমি-জমা নিয়ে মামলা চলছিল—

—সেসব তোমার মা'র কাছে শুনেছি—

দীপঙ্কর বললে—মা বলেছে বুঝি তোমাকে? তাহলেই ভেবে দেখ, আমার বাবা যদি খুন না হতো তো আজ আমাদের ভাবনা! তাহলে আমিও তোমাদের মত এইরকম বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম, এই রকম টেবিল-চেয়ার-খাট নিয়ে থাকতাম, বাড়িতে তোমাদের মত ঠাকুর, চাকর, ঝি সব থাকতো—সারাদিন আমার কাজ করতে হতো না—কেবল তোমাদের মত বসে বসে পড়তুম—

সতী বললে—তুমি কি মনে করো আমাদের কোনও কষ্ট নেই? একা শুধু তোমাদেরই কষ্ট?

দীপঙ্কর বললে—তা তোমার আবার কিসের কষ্ট? বেশ খাচ্ছো দাচ্ছো, লেখাপড়া করছো—

সতী বললে—কত রকম কষ্ট আছে আমার। সব কি সকলকে বলা যায়?

—কিন্তু আমার কষ্ট তো তোমাকে সব বললুম! আমার কষ্ট, আমার মা'র কষ্ট, আমাদের কষ্ট তো সব বললুম তোমাকে! আমি আমার সব কথা সকলকে বলতে পারি—লক্ষ্মীদিকেও আমি আমার সব কষ্টের কথা বলেছি, লক্ষ্মীদিও বলেছে তার সমস্ত কথা—

—লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদির কিসের কষ্ট?

সতী যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলো। যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো সতী দীপঙ্করের দিকে। বললে—লক্ষ্মীদি কোন্ কষ্টের কথা তোমায় বলেছে?

দীপঙ্কর হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল।

সতী বললে—উঠো না, বোস, লক্ষ্মীদি তোমায় কোন্ কষ্টের কথা বলেছে, বলো। আমি কিছু বলবো না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তার জন্যে তো তুমিও দায়ী!

—আমি? আমি দায়ী?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তুমিও দায়ী!

—আমি কিসে দায়ী বললে, বারে, কে বলেছে এসব কথা? লক্ষ্মীদি বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—কে বলেছে না-বলেছে সে কথা থাক, কিন্তু তুমি তো ঝগড়া করেছ। বড় বোনের সঙ্গে তোমার ঝগড়া করা কি উচিত হয়েছে? লক্ষ্মীদি না তোমার বড় বোন হয়?

সতী একটু গম্ভীর হয়ে গেল কথাটা শুনে। একটু পরে বললে—আমাদের

ঝগড়া হলে তোমার কানে কী করে যায়?

দীপঙ্কর বললে—আমি জানি, আমি সব জানতে পারি—

—কী করে তুমি জানতে পারো, তাই আমি জিজ্ঞেস করছি। লক্ষ্মীদি বলেছে?

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—ঝগড়া করে লক্ষ্মীদি যে খায়নি কাল রাত্রে, তাতে তোমার কষ্ট হয় না?

সতী অনেক কিছু ভাবতে লাগলো। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন ভাবছে—এ-ছেলেটা কেমন করে সব জানতে পারলে?

সতী জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আমাদের বাড়িতে ঝগড়া হলে—তোমার কানে কী করে যায়, তাই শুনি?

দীপঙ্কর বললে—তোমরা ঝগড়া করলে তাতে দোষ হল না, আর আমার কানে যেতেই দোষ?

সতী আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—বুঝেছি—

—কী বুঝেছ?

সতী সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমি, ঠিক-ঠিক বলবে—

—বলো—

সতী একবার পেছন দিকে দেখে নিলে। বললে—লক্ষ্মীদি চান করতে গেছে, এখনি হয়ত এসে পড়বে—তোমার বয়েস কতো?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন, আমার বয়েস জেনে তোমার কী হবে? তোমার বয়েস কতো?

সতী বললে—বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করেছি বলে বুঝি তোমার রাগ হয়ে গেল? পুরুষরা বেশি বয়েস পর্যন্ত ছেলেমানুষ থাকে বলেই তোমার বয়েস জিজ্ঞেস করেছি—

দীপঙ্কর বললে—না, তুমি যা ভাবছো আমি তা নই।

—কী নও?

—আমি আর ছেলেমানুষ নই। আমি সব বুঝতে পারি। আমি লক্ষ্মীদির কী কষ্ট, তা লক্ষ্মীদির মুখ দেখেই বুঝতে পারি, আর তোমাকেও আমি বুঝতে পারি। বলবো? কেন আমাকে দেখে তোমার রাগ হয়, তা-ও বুঝতে পারি। বাইরে থেকে মনে হয় আমি কিছুই বুঝতে পারি না, আমি বোকা, কিন্তু আমি খুব চালাক—

সতী বললে—তুমি যদি সবই বোঝ, তাহলে তোমাকে একটা কথা বলি—

—বল।

সতী বললে—আমাদের সংসারে এক মা না-থাকা ছাড়া আর কোনও দুঃখকষ্ট নেই। তা মা তো সকলের থাকে না! আমার বাবা অনেক টাকা উপার্জন

করেছেন নিজে মেহনত করে। বিরাট বাড়ি করেছেন, সম্পত্তি করেছেন—সব আমাদের দু বোনের। আমাদের কোনও ভাই নেই। আমরা ছেলের মতন মানুষ হয়েছি, কলেজে পড়েছি—

দীপঙ্কর চুপ করে শুনতে লাগলো।

সতী আবার বলতে লাগলো—যেখানেই মানুষ হয়েছি, সেখানেই লেখাপড়া করেছি, হয়তো সেখানেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতাম—কিন্তু একটা মুশকিল হলো— । সে মুশকিলটা না হলে দিদিও কলকাতায় আসতো না, আর দিদি না এলে আমাকেও আসতে হতো না—এসে এই—দাঁড়াও আমার কথাটা আগে শেষ হোক—এসে এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়ির ভেতর থাকতে হতো না—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী মুশকিল? মুশকিলটা কী?

—বলছি, আমার বাবা জীবনে কোনও পাপ করেন নি। একটা মিথ্যে কথা পর্যন্ত বলেন নি কখনও। কারোর কোনও ক্ষতি জানত করেন নি, নিজে সৎপথে থেকে সারাজীবন চলে এসেছেন। যখন গিয়েছিলেন সেখানে, তখন একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা, তারপর নিজের চেষ্টায় পয়সা উপার্জন করেছেন। বাবাকে না দেখলে ঠিক বাবাকে বোঝানো যাবে না। আমাদের চেহারা দেখে বাবার চেহারাটাও আন্দাজ করা যবে না। আমরা আর কীই-বা ফরসা! বাবার মত গায়ের রঙ আমরা কেউই পাইনি—! রোজ সকাল বেলা উঠে বাবা এক ঘণ্টা ধরে এখনও গীতা পড়েন, আহ্নিক করেন, জপ করেন—তারপর জলগ্রহণ করেন—

বাবার কথা বলতে বলতে সতীর মুখ চোখ যেন লাল টকটকে হয়ে এল।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তুমি বুঝি বাবাকে খুব ভালোবাসো?

সতী হাসলো। বললে—বাবাকে কে না ভালোবাসে? সেইজন্যেই তো তোমার বাবা নেই যখন শুনলুম, তখন খুব দুঃখ হলো আমার। এই যে এখানে আছি, বাবার চিঠি না পেলে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের তো মা নেই, বাবাই সব—

দীপংকর একমনে শুনছিল। বললে—আমার উল্টো—আমার মাই সব—

—তোমার মা'র কাছে তাই বলছিলাম, আমার বাবার চেহারা দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। এত ভালো আমার বাবা। কিন্তু সেই বাবার কাছেও থাকতে পারলাম না, এমনি কপাল আমাদের—

—কেন?

সতী বললে—সেই কথাই তো বলছি, শেষ জীবনে বাবা মনে বড় কষ্ট পেলেন। মা মারা যাওয়াতেও বাবা এত কষ্ট পাননি—বাবার সে-কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী কষ্ট? কষ্টটা কী?

সতী একটু থেমে এল। গলাটা তার যেন বুজে এল। তারপর একটু থেমে বললে—ওই আমার লক্ষ্মীদি—লক্ষ্মীদির জন্যে—

—লক্ষ্মীদির জন্যে?

সতী হঠাৎ মুখটা সামনে নিয়ে এল। গলাটা হঠাৎ নিচু করে বললে—তোমায় একটা কথা বলবো?

—কী কথা?

—এই কথা বলবার জন্যেই তোমার সঙ্গে কদিন ধরে দেখা করতে চাইছি। কলকাতায় আমি সেই জন্যেই এসেছি, তোমাদের বাড়িতেও আমি সেইজন্যেই গিয়েছিলুম...তুমি তো লক্ষ্মীদিকে খুব ভালবাসো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, খুব ভালবাসি! লক্ষ্মীদিও আমাকে খুব ভালোবাসে—

সতী বললে—হ্যাঁ, লক্ষ্মীদির চিঠিতেও আমি তাই বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার কথা অনেক লিখতো আমাকে। তুমি কী রকম করে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলে, মারলেও তুমি রাগ করতে না—

দীপঙ্কর বললে—তখন আসলে আমি সত্যিই ছোট ছিলুম, কিছু বুঝতুম না—

—আচ্ছা, এখন তো সব বোঝ, এখন তো তুমি বড় হয়েছ, এখন তো আর তুমি ছেলেমানুষ নও!

—না!

—তাহলে একটা কথা তোমায় বলবো, তুমি শুনবে?

দীপঙ্কর বললে—কী কথা?

—আগে বলো আমি যা বলবো, তা কাউকে বলবে না?

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—তবু কী কথাটা তুমি বলো না—

সতী আর একবার পেছন দিকটা দেখে নিলে। বললে—কাউকে বলবে না বলো?

দীপঙ্কর যেন ভাবনায় পড়লো। সবাই তাকে সব কথা গোপন করতে বলে। সংসারে সবাই-ই কি সবাইকে অবিশ্বাস করে! লক্ষ্মীদি অবিশ্বাস করে সতীকে, সতী অবিশ্বাস করে লক্ষ্মীদিকে! কাকাবাবুও কি অবিশ্বাস করে কাকীমাকে। তার বাবাও কি মাকে অবিশ্বাস করতো? আর কিরণ? কিরণও কি অবিশ্বাস করে দীপঙ্করকে। ছিটে, ফোঁটা, চন্নুনী, বিন্তীদি সবাই? আর অঘোরদাদু? অঘোরদাদুও যেমন অবিশ্বাস করে ঠাকুরকে, ঠাকুরও কি অবিশ্বাস করে এই সব মানুষকে।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। সতীর কথায় আবার জ্ঞান ফিরে এল।

সতী বললে—বলো, কাউকে বলবে না?

—লক্ষ্মীদিকেও বলবো না?

—না, কাউকে বলতে পারবে না।

দীপঙ্কর বললে—কী কথা, বলো?

সতী এবার যেন আরো সতর্ক হলো। আরো কাছে সরে এল। একেবারে মুখোমুখি—

বললে—আমার বাবার মুখ চেয়ে আমি বলছি, অনেক সহ্য করেছেন বাবা, কিন্তু এবার যদি কিছু ঘটে তো আর বাবাকে হয়ত বাঁচানো যাবে না। অন্তত বাবার কথাটা ভেবেও তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে আমাদের—

দীপঙ্কর এবার সত্যিই অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি সাহায্য করবো?

—হ্যাঁ, আমাদের সংসারের শান্তি, আমাদের বংশের সুনাম সব কিছু খানিকটা তুমি বাঁচাতে পারো—

এমন অদ্ভুত কথা দীপঙ্কর জীবনে কখনও শোনেনি এর আগে। সামান্য মানুষ সে। অখ্যাত, অবজ্ঞাত একজন মানুষ, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের একটা বাড়িতে পরের আশ্রয়ে মানুষ। তার এত ক্ষমতা! তার ওপর লক্ষ্মীদির সম্মান, সুনাম সব নির্ভর করছে! অন্তত খানিকটাও নির্ভর করছে। এ কেমন কথা!

সতী বললে—হ্যাঁ, তুমি পারো, আমি শুনেছি তুমি লক্ষ্মীদির কাজ করে দাও—

দীপঙ্করের মনে হলো সে যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে বড় সাবালক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর আর সংসারের কাছে এতদিন সে ছোট বলেই প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে কেবল। লক্ষ্মীদি এতদিন তাকে যে বিশ্বাস করে সব কথা বলেছে, তা-ও কেবল সে ছোট বলেই। এতদিন ছোট বলেই সবাই তাকে অগ্রাহ্য করে এসেছে। ছোট ছেলে বলেই এতদিন সবাই তাকে অনাদর করেছে, আবার কেউ-কেউ ছোট বলে তাকে স্নেহও করেছে। অঘোরদাদুর স্নেহ যে সে পেয়েছিল সে তো ছোট বলেই। বড় হলে সে আর তো তা পাবে না। ছিটে ফোঁটা বিন্তীদির মতন বয়েস হলে তাকেও অঘোরদাদু বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন তাকেও একদিন তার মা'র হাত ধরে আবার নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে। ছোট হওয়ার অসুবিধেও ছিল, কিন্তু সুবিধেও ছিল সামান্য। কিন্তু আজ মনে হলো বড় হওয়ার আর একটা দিকও আছে—এতদিনের অজানা দিক। মনে হলো—বড় হওয়া যেন বেশ ভালো। যেন বড় হলে বড়রা বড় বিশ্বাস করে, বড় ভালবাসে, বড় কাছে টানে।

সতী বললে—আমি জানি লক্ষ্মীদি তোমাকে খুব বিশ্বাস করে—করে না?

দীপঙ্কর বললে—করে—

সতী হঠাৎ বললে—তোমার হাত দিয়ে কারোর কাছে যদি কোনও চিঠিপত্র...

—দীপু!!!

হঠাৎ যেন বাজ পড়লো। দীপঙ্কর চমকে উঠেছে। সতীও যেন চমকে উঠলো এক নিমেষে! আর সামনেই লক্ষ্মীদি ঘরে ঢুকলো।

লক্ষ্মীদি চিৎকার করে উঠলো—আবার এসেছিস তুই?

দীপঙ্কর হাঁ করে চেয়ে রইল লক্ষ্মীদির দিকে। এখনি স্নান করে এসেছে লক্ষ্মীদি। ভিজে চুলগুলো পিঠে এলিয়ে পড়েছে। তখনও দু'একটা জলের ফোঁটা আটকে আছে কপালে, মুখে, চোখের পাতায়। লক্ষ্মীদির চেহারা দেখে দীপঙ্কর যেন ভয় পেয়ে গেল। এমন চেহারা তা কখনো দেখেনি লক্ষ্মীদির। এমন কেন হলো।

লক্ষ্মীদি যেন ফেটে পড়লো। বললে—কেন এসেছিস এখন, বল্‌?

দীপঙ্কর জড়োসড়ো হয়ে ভয়ে কুঁকড়ে এল যেন। বললে—কেন লক্ষ্মীদি? আমি কী করেছি?

—আবার কথা বলছিস্? কেন এসেছিস্ এখানে? কী করতে?

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না লক্ষ্মীদির কথাগুলো। কী অপরাধ করেছে সে এখানে এসে? কা'র কী ক্ষতি করেছে!

বললে—আমি কাকাবাবুর কাছে এসেছিলুম লক্ষ্মীদি—

—কাকাবাবুর কাছে, তা এখানে কেন? এ-ঘরে কেন?

—সতীকে পেছন থেকে দেখে আমি ভেবেছিলুম বুঝি তুমি......

—আবার মিথ্যে কথা! যা, বেরিয়ে যা বলছি, বেরিয়ে যা এখান থেকে, বেরো, যেখানে খুশি সেখানে যা, এখানে আসবি নে—

দীপঙ্কর কথাগুলো শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি! শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীদির মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনতে হলো তাকে? চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল তার। আর একবার সে লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চাইলে, তারপর সতীর মুখের দিকেও চাইলে একবার। আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে!

দীপঙ্কর আর একবার তবু জিজ্ঞেস করলে—আমি বেরিয়ে যাবো?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কতবার বলবো তোকে!

—আর কখনও আসবো না?

—না—

দীপঙ্কর শেষ পর্যন্ত ঘাড় নিচু করে দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছিল, হঠাৎ সতী তার হাতটা ধরে ফেললে। বললে—না, ও যাবে না।—

দীপঙ্কর ফিরে দেখলে সতী লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে বললে—না, ও যাবে না, কেন যেতে বলছো তুমি ওকে?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ যাবে, ওর হাত ছেড়ে দে তুই—কেন আসে ও এখানে? এত আসার কিসের দরকার?

দীপঙ্করের হয়েই সতী বললে—বেশ করে, ও আসে! ও এসেছে বলে

তোমার এত রাগ কেন?

লক্ষ্মীদি আরো রেগে গেল। বললে—আমি আবার বলছি সতী ওর হাত ছেড়ে দে তুই—

সতী বললে—না হাত ছাড়বো না ওর—

বলে দীপঙ্করকে বললে—দীপঙ্কর, তুমি থাকো তো এখানে, দেখি দিদি কী করে—

—ছাড়বি না?

বলে লক্ষ্মীদি এবার সামনে এগিয়ে এসে দীপঙ্করের অন্য হাতটা ধরে টানতে লাগলো। বললে—বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি—

একদিকে লক্ষ্মীদি টানতে লাগলো, আর একদিকে সতী টানতে লাগলো। দু'জনের টানাটানির মধ্যে দীপঙ্কর কেমন অসহায় হয়ে দু'জনেরই মুখের দিকে চাইলে। এ কী হলো! এ কী কাণ্ড তাদের দু'জনের।

লক্ষ্মীদি বললে—ওকে ছেড়ে দে বলছি সতী—

সতী বলছে—ছাড়বো না, ও যাবে না—

—হ্যাঁ যাবে, ওর ঘাড় যাবে—

বলে লক্ষ্মীদি দুই হাতে দীপঙ্করকে টানতে লাগলো। আর সতীও তার গায়ে যত শক্তি আছে তত জোরে তাকে টেনে ধরে রইল।

দীপঙ্কর শেষে সতীকে বললে—আমি যাই এবার—আমারও কাজ আছে—

সতী বললে—না তুমি যাবে না, কেন যাবে? যেতে পাবে না! কেন, লক্ষ্মীদি যা খুশি তাই করবে, লক্ষ্মীদির খুশিমত চলতে হবে নাকি আমাদের—? লক্ষ্মীদিই সব, আমি কেউ না? আমি যদি তোমার সঙ্গে কথাই বলে থাকি, তাতে লক্ষ্মীদির কেন রাগ হয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, আমি এখন যাই, আমার মা হয়ত ভাবছে খুব, আমার কলেজও রয়েছে—

সতী বললে—তাহলে বলো আবার আসবে তুমি?

দীপঙ্কর ভয়ে ভয়ে চাইল লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। লক্ষ্মীদি বললে—না, ও আসবে না! ওর সঙ্গে তোর কিসের দরকার অত শুনি? ওর সঙ্গে তোর কিসের অত ভাব? ওর মুখ থেকে তুই কী কথা আদায় করতে চাস? ও তোর মত নয়, ও কিছু জানলেও তোকে বলবে না, ওকে মেরে ফেললেও বলবে না ও—ওকে তুই চিনিস্ না—

হঠাৎ সতীর হাতটা একটু আল্‌গা হতেই দীপঙ্কর ছাড়া পেয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তখনও দু'জনের ঝগড়া চলছে। তারপর ভাবলে একবার কোথায় যাবে! এতক্ষণ যেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। খেয়াল ছিল না কে সে, কেন সে এসেছিল এ-বাড়িতে। হঠাৎ মনে পড়লো কাকাবাবুর কথা। কিন্তু

বাড়ির এই অবস্থার মধ্যে কাকাবাবুকে কি সে বুঝিয়ে বলতে পারবে! তার চেয়ে পরে বললেই হবে!

নিচে আসতেই কাকীমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন—কীরে? কী বললেন?

দীপঙ্করের যেন তখনও ভালো করে মানসিক ঘোর কাটেনি। কাকীমার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে পারলে না।

কাকীমা আবার জিজ্ঞেস করলেন—কীরে, অমন করছিস কেন? কাকাবাবুকে বলেছিলি?

—না।

—কেন? বলতে লজ্জা হলো?

দীপঙ্কর বললে—না—

—তা এতক্ষণ ওপরে কী করছিলি তবে? লক্ষ্মী বুঝি আবার ঝগড়া করছে সতীর সঙ্গে? সেই শুনছিলি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—কাকীমা—

বলে দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। দীপঙ্করের মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার চোখের সামনে ঘুরছে। একবার ভালো করে চোখ চেয়ে দেখলে চারদিকে। মনে হলো কিছুই যেন সে চিনতে পারছে না। সেই চেনা ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও যেন তার কাছে হঠাৎ বড় অচেনা ঠেকলো। আস্তে আস্তে সে নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো—

অনেক দিনের অনেক ঘটনা অনেক রকমভাবে দীপঙ্করকে ভাবিয়েছে, কাঁদিয়েছে, কখনও বা নতুন করে বাঁচিয়ে তুলেছে। যখন হতাশায় অসাড় হয়ে এসেছে দীপঙ্কর, তখন কোথা থেকে যেন কে এসে হঠাৎ সাহস যুগিয়েছে তাকে। কে এসে যেন তার প্রাণে বল যুগিয়েছে। সেসব দিনের প্রতিটি কথা দীপঙ্করের মনে আছে। প্রতিটি ঘটনা দীপঙ্করের মনে গাঁথা আছে। আর সেই কিরণ। কিরণের কথাই ধরা যাক্। কিরণের সঙ্গে কোথায় যেন তার আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল। কিরণের কোনও হতাশা ছিল না কোথাও। তার মত আশাবাদী যদি হতে পারতো দীপঙ্কর। অনেক পাওয়ার আনন্দে দীপঙ্কর যখন অধীর হয়ে উঠেছে, কিরণকে তখন দেখা যেত হতাশার চরম শিখরে দাঁড়িয়েও ও যেন উল্লাসে উন্মাদ হয়ে আছে। তবু এত তফাতের মধ্যেও কোথায় যেন দুজনের মধ্যে ভারি মিল ছিল। একদিন কিরণকে না-দেখতে পেলে দীপঙ্করের মনটা যেন কেমন করতো!

এক-এক সময়ে মনে হতো কিরণ যেন তার কাছে সকলের চেয়ে আপন, সকলের চেয়ে প্রিয়। কিরণের জন্যে যেন তার মাকেও সে ছাড়তে পারে। কিরণের

জন্যে যেন লক্ষ্মীদিকেও ছাড়তে পারে, কিরণের জন্যে যেন সতীকেও ছাড়তে পারে। কিরণের জন্যে কাকীমা কাকাবাবু অঘোরদাদু—সব, সব কিছুকেই যেন ছাড়তে পারে দীপঙ্কর। অথচ কোথায় গেল সেই কিরণ। অথচ কোথায় যে কেমন করে হারিয়ে গেল কিরণ।

কাকাবাবু যেদিন বলেছিলেন সেই কিরণকেই ছাড়তে, কাকাবাবু যেদিন সেই কিরণের সঙ্গেই মিশতে বারণ করেছিলেন, সেদিনকার কষ্ট দীপঙ্কর কাউকেই বোঝাতে পারবে না। কেউই বুঝবে না তার সেদিনকার কষ্টের কথাটা।

মা বলতো—কী হলো রে তোর, শরীর খারাপ?

দীপঙ্কর কিছু বলতো না। মনে হতো কিরণের সঙ্গে মিশতে না পারলে তার যেন বেঁচে থাকাই বৃথা। কলেজ থেকে বেরোবার সময় গেটের সামনে যাবার আগে বুকটা ভয়ে দুর-দুর করতো। যদি কিরণের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যদি তার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে গেটের সামনে। তখন কী বলে তাকে এড়াবে! কী বলে তাকে মিশতে বারণ করবে!

অনেকদিন গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যেন দীপঙ্করের পা-জোড়া আর চলতে চাইত না। একে একে সব ক্লাসের ছেলেরা চলে যেত বাড়ির দিকে। কলেজের সামনের বাগানের রাস্তা দিয়ে সার সার ছেলের দল আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে যেত। সামনেই ট্রাম-রাস্তা। সামনেই বাসগুলো চলছে হু হু করে। ওপারে হাজরা পার্কের সবুজ ঘাসগুলোর ওপর গিয়ে বসতো কেউ কেউ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতো দীপঙ্করের চোখের সামনে, মনে হতো সবাই আছে, শুধু যেন কিরণই নেই। সব যেমন ছিল, তেমনিই চলছে, শুধু কিরণই যেন নেই। তারপর আস্তে আস্তে চারদিকে অন্ধকার করে আসতো। একে একে গ্যাসের বাতিগুলো জ্বলে উঠতো রাস্তায়। ট্রামের ভেতরে, বাসের মাথায় আলো জ্বলে উঠতো। তখনও এক-একদিন দীপঙ্কর ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো। যদি কিরণ আসে। যদি কিরণ এসে ফিরে যায়! যদি এসে দীপঙ্করকে না দেখতে পায়!

হঠাৎ মনে হলো যেন কিরণ আসছে। খালি পা, ছেঁড়া ময়লা শার্ট, মাথার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। হন্ হন্ করে তার দিকে আসছে।

দীপঙ্করের বুকটা দুর-দুর করে উঠলো। কেমন করে কথাটা পাড়বে দীপঙ্কর তাই ভাবতে লাগলো। কাকাবাবু মিশতে বারণ করেছেন কিরণের সঙ্গে। সে-কথাটা কেমন করে বলা যায় মুখ ফুটে। দীপঙ্করের জীবনের পথ আলাদা, আর কিরণের আলাদা রাস্তা। কিরণ লাইব্রেরী করুক, কিরণ দেশ স্বাধীন করুক, কিরণ ভজুদার সঙ্গে মিশুক। কিন্তু দীপঙ্করকে বড় হতে হবে। দীপঙ্করের বড় হওয়া মানে বড় চাকরি করা, সংসার করা, মাকে শান্তি দেওয়া, বিশ্রাম দেওয়া। তাকে মানুষ হতে হবে। আর দশজন যেমন স্বাধীন হয়ে বাঁচে, তেমনি স্বাধীন হতে হবে। আপিসে যাবে, চাকরি করবে, মাইনে পাবে, মাইনে

এনে মা'র হাতে টাকাগুলো দেবে! তার চেয়ে বড় সুখ আর কী আছে পৃথিবীতে! সত্যিই তো, কাকাবাবু অন্যায় কিছু বলেন নি। কাকাবাবু তো তাকে ভালো পরামর্শই দিয়েছেন। কাকাবাবু, কাকীমা, লক্ষ্মীদি, সতী সবাই তো তার ভালোই চায়। তার ভালোর জন্যেই তো সবাই তাকে কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করে। কিরণের সঙ্গে মিশে তার কী লাভ হবে! কিরণ কি তার আদর্শ!

কিরণ কাছাকাছি আসতেই দীপঙ্কর গেটের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

অন্ধকার হয়ে এসেছে বেশ। কিরণ যেন তাকে দেখতে না পায়। কিরণ তাকে দেখতে না পেলেই চলে যাবে। তারপর? তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি চলে যাবে দীপঙ্কর। বাড়ি গিয়ে পড়তে বসবে। একবার বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে পারলে কিরণ আর দীপঙ্করকে ডাকতে সাহস করবে না। কিরণ জানে, কেউ তাকে পছন্দ করে না। কেউ তাকে চায় না। দীপঙ্করের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে লাগলো। মনে হলো একবার ডাকে—কিরণ—

কিন্তু নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর দেখলে কিরণ সেই অন্ধকারের মধ্যেই এসে কলেজের গেটের সামনে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে একবার। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়েই চারিদিকে চেয়ে চেয়ে যেন কী ভাবতে লাগলো। যেন মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে তার। হয়ত আজকেও তার খাওয়া হয়নি। আজকেও হয়ত ভাত খেয়ে কাটিয়েছে। শার্টের বুকপকেটের ভেতরে রসিদ বইটা থাকাতে একটু ফুলে উঠেছে পকেটটা। এদিক-ওদিক দেখে কিরণ আবার ফিরলো। হয়ত দীপঙ্করকে না দেখতে পেয়ে ফিরে গেল। হয়ত হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে আবার পৈতে বেচবে। কিম্বা 'কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'র চাঁদা আদায় করতে শুরু করবে।

দীপঙ্কর বেরিয়ে এসে ফুটপাথের ওপর দাঁড়াল আবার। একবার ভাবলে ডাকবে কিনা। ডাকলে কী দোষ হবে? ডাকলে তার এমন কিছু সর্বনাশ হবার কথা নয়।

দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়েই ডাকলে—কিরণ—

কিরণ শুনতে পেলে না। যেমন যাচ্ছিল—তেমনিই চলতে লাগলো।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—কিরণ—

কিরণ সেবারও শুনতে পেলে না। একবার মনে হলো দরকার নেই ডেকে। না শুনতে পেয়েছে ভালই হয়েছে। ক'দিন দেখতে না পেলেই ভুলে যাবে। কী হবে ডেকে। যখন মিশবে না দীপঙ্কর তখন কেন আবার তার সঙ্গে যেচে ঘনিষ্ঠতা করা। সত্যিই তো কিরণের পথ আরো দুরূহ, কিরণের জীবন আরো কষ্টের, কিরণের মত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না দীপঙ্কর। কিরণের মতন ভাত খেয়ে দিনের পর দিন কাটাতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ সমস্ত বুকটা যেন ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠলো। কিরণ না হলে কার সঙ্গে সে মিশবে? কিরণ না হলে কার সঙ্গে সে প্রাণের কথা বলবে?

—কিরণ, কিরণ!

কিরণ তখন অনেক দূরে চলে গেছে। ফুটপাথের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কিরণ যেন হারিয়ে যায়-যায়।

দীপঙ্কর প্রাণপণে ডাকলে—কিরণ, কিরণ—

শেষে দৌড়তে লাগলো দীপঙ্কর। ফুটপাথের লোকের গায়ে ধাক্কা লাগবার অবস্থা! হাত থেকে সিভিক্সের বইটা পড়ে গেল রাস্তায়। চটিটা পা-ফস্কে ছিট্কে চলে গেল ওপাশে—

দীপঙ্কর আর একবার জোরে ডাকলে—কিরণ, কিরণ রে—

রাস্তার লোকজন তার দিকে চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে। হাতে বই, সাবান-কাচা শার্ট গায়ে একটা ছেলে কাকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। কেউ কেউ সরে গিয়ে পথ করে দিলে।

—ও ভাই, তোমার পেন্সিল পড়ে গেল যে পকেট থেকে—

তাড়াতাড়ি পেন্সিলটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার দৌড়তে লাগলো দীপঙ্কর। তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে বলেই আমি কথা বলিনি কিরণ। আমি গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলুম ভাই! তুই আমাকে খুঁজছিলি আমি দেখতে পেয়েছি। তোর সঙ্গে আমি মিশবো কিরণ, তোকে আমি ভালোবাসি ভাই! আমি আর কারোর কথা শুনবো না। মা'র কথাও শুনবো না, কাকাবাবুর কথাও শুনবো না। সতী, লক্ষ্মীদি—কারোর কথাই শুনবো না। তুই আমার প্রাণের বন্ধু কিরণ।

দীপঙ্কর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিরণের গায়ের ওপর।

দীপঙ্কর কিরণের কাঁধে হাত দিয়ে বললে—তুই আমায় খুঁজছিলিস্ কিরণ?

কিরণ মুখ ফেরাল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা দেখে চমকে উঠলো দীপঙ্কর। দীপঙ্কর হাতটা সরিয়ে নিলে কাঁধ থেকে। বললে, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভেবেছিলাম......

ছেলেটা ভালো করে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—না—

বলে যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো। দীপঙ্কর নিজেই নিজের ব্যবহারে যেন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এতখানি উত্তেজিত হওয়া তার উচিত হয়নি সত্যি। কিরণ হয়ত তার কথা ভাবছেই না। কিরণ হয়ত অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত আছে। সত্যিই তার অনেক কাজ। অনেক কাজ সে করে বেড়ায়। অনেক ভাবনা আছে তার। তার বাবার অসুখ, তার অবস্থা, তার ভজুদা, তার লাইব্রেরী— কত কাজ তার। কত তার কাজ! দু'দিন দেখা না হলে কী হয়। সে হয়ত জানতেও পারছে না দীপঙ্করের কষ্টের কথা। কিরণকে দেখতে না পেলে দীপঙ্করের যে কত কষ্ট হয়, তা সে ভাবতেও পারছে না। আশ্চর্য।

হাজরা রোডের মোড়ের কাছটাতেই ভিড় বেশি। দোকানে আলো জেলেছে

দিয়েছে। দীপঙ্কর সেই মোড়ের মাথাতেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অনেক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন যেন ভালো লাগে। সমস্ত অচেনা লোক। অচেনা লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দীপঙ্করের খুব ভালো লাগে। কেউ তাকে দেখছে না, কেউ তাকে লক্ষ্যও করছে না। ছি ছি, ছেলেটা কী ভাবলে। ও-ও যেন কিরণের মত। কিরণের মতই যেন উপোস করে কাটায়। অন্তত চেহারা দেখে তাই-ই মনে হয়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর ভাবতে লাগলো এখন কোথায় যাবে সে। এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো। বাড়ি গিয়ে পড়তে বসাই উচিত। পড়তে বসলে সব ভুলে যায়। পড়বার সময় আর কিছু মনে পড়ে না। কিরণের কথাও মনে পড়ে না, লক্ষ্মীদির কথাও মনে পড়ে না। কাকাবাবুদের বাড়ির কথাও মনে পড়ে না।

হঠাৎ মনে হলো যেন ও-ফুটপাথে তাদের কলেজের প্রফেসার চলেছেন। অমলবাবু। হিস্ট্রি পড়ান। অমলবাবুর চেহারাটা দূর থেকে দেখলেও চেনা যায়। সাদা পাঞ্জাবির ওপর একটা চাদর গায়ে। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। ও-ফুটপাথ দিয়ে হন্ হন্ করে চলেছেন। একহাতে মোটা মোটা বই কয়েকখানা।

রাস্তাটা পার হয়ে সোজা ও-দিকের ফুটপাথে একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

—স্যার!

অমলবাবু থমকে দাঁড়ালেন! দীপঙ্কর হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাল।

—কে তুমি?

চশমার কাচ দিয়ে বেশ স্নেহাতুর দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন তার দিকে।

দীপঙ্কর বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল স্যার...

—কী কথা বলো!

দীপঙ্কর বললে—স্যার, সেদিন আপনি সক্রেটিসের কথা পড়িয়েছিলেন ক্লাসে...

—হ্যাঁ, সক্রেটিস্—

দীপঙ্কর বললে—আপনি বলেছিলেন Socretes, the wisest of men—আমি সে-সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো আপনাকে—কিছু মনে করবেন না স্যার—

—কী কথা?

দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করলে। তারপর বললে—স্যার আপনি বলেছিলেন To a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the Gods indifferent to him—কথাটা কি সত্যি?

অমলবাবু কথাটা শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

যেন দীপঙ্করকে আপাদ-মস্তক ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ রাস্তার মধ্যে একজন ছাত্রের মুখে এই প্রশ্ন শুনে তিনি যেন একটু অবাকই হয়ে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোন্ ইয়ারে পড়?

দীপঙ্কর বললে—সেকেন্ড ইয়ার স্যার—আমি কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না—আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাইও এই কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন চোদ্দ বছর যদি সত্যি কথা বলি তো তারপর যা বলবো সব সত্যি হবে—কথাটা ক'দিন থেকে মাথার মধ্যে খুব ঘুরছে—কথাটা কি সত্যি স্যার?

অমলবাবুর অবাক হওয়া যেন তখনও কাটেনি।

বললেন—তোমার নাম কী?

দীপঙ্কর বললে—দীপঙ্কর সেন।

—কোথায় থাকো?

—উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। কালিঘাট—

—ম্যাট্রিকে কী রেজাল্ট ছিল তোমার?

দীপঙ্কর বললে—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিলুম। ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি, সব বইও ছিল না আমার। অন্য ছেলেদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়তে হয়েছে। আমার বাবা নেই—

অমলবাবু যেন আরো আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বললেন—তাহলে তোমার পড়াশোনার খরচ কে দেয়?

—প্রাণমথবাবু। তিনিই মাসে মাসে কলেজের মাইনেটা দেন।

অমলবাবু কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর যেন আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন। দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। অমলবাবুর সঙ্গে সে-ও পেছন পেছন চলতে লাগলো।

এক সময়ে অমলবাবু বললেন—কী নাম বললে তোমার?

—দীপঙ্কর সেন।

তারপর একটু থেমে দীপঙ্কর বললে—আপনি হয়ত এখন খুব ব্যস্ত আছেন স্যার, আমি তাহলে আসি—

অমলবাবু বললেন—না, দাঁড়াও, তুমি একবার একটা কাজ কোর, আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে দেখা কোর—

—কখন স্যার?

—যখন ইচ্ছে—বলে অমলবাবু চলে যাচ্ছিলেন।

দীপঙ্করও চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ অমলবাবু আবার ফিরলেন। বললেন—দেখা কোর ঠিক—বুঝলে?

দীপঙ্কর বললে—যাবো স্যার—

দীপঙ্কর চলতে গিয়ে থেমে গেল। পেছন থেকে অমলবাবুর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। অদ্ভুত লোক তো! এতদিন ক্লাসে গিয়েছে, কখনও কোনও প্রফেসারের সঙ্গে কথা বলবার সাহসই হয়নি তার। কিন্তু আজ যে কী হলো, কিরণের কথা ভাবতে ভাবতেই কথাটা তার মনে পড়েছিল। সেদিন লক্ষ্মীদির বাড়িতে প্রথম চা খাওয়ার সূত্রেই কথাটা প্রথম মনে পড়ে। কিরণ চা খায় না। অথচ দীপঙ্করই প্রথম চা খেলে সেদিন। কী যে হলো তখন! লক্ষ্মীদিকে কেন সবাই কষ্ট দেয়। যে ভালোমানুষ তার তো কষ্ট পাওয়ার কথা নয়। মা এত ভালো—মাও তো কাউকে কষ্ট দেয়নি, কারোর কোনও ক্ষতি করেনি মা—তবু মা কেন এত কষ্ট পায়। কেন তাকে মানুষ করবার জন্যে এত খোশামোদ করতে হয় লোককে। আর কিরণ! কিরণও তো ভালো। অত ভালো ছেলে কিরণ—সেই কিরণই বা কেন অত কষ্ট পায়! তবে কি সক্রেটিসের কথা মিথ্যে!

সেই অন্ধকার রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লক্ষ্মীদির কথা আবার মনে পড়লো। কেন যে লক্ষ্মীদি সেদিন অত রেগে গিয়েছিল কে জানে! সে তো কাউকেই বলেনি কিছু। দাতারবাবুকে যে চিঠি দিয়ে আসতো, সে-কথাটা তো সতীকে সে একবারও বলেনি। কাউকেই সে বলবে না কোনও দিন। লক্ষ্মীদির প্রাণের কথা সে প্রাণ গেলেও কাউকে বলবে না। সতী হাজার চেষ্টা করলেও তার মুখ দিয়ে লক্ষ্মীদির কথা বার করতে পারবে না।

মনে আছে সেদিন দু'জনে তার হাত ধরে টানাটানি করার পর যখন দীপঙ্কর বাড়ি চলে এসেছিল তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ভাত খেয়ে কলেজে গিয়েছে, ক্লাসে লেকচার শুনেছে, ছুটির পর রাস্তায় ঘুরেছে, তবু কথাটা মোটে ভুলতে পারেনি দীপঙ্কর। সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসেছে নিজের মনে। কিন্তু তবু মনটা যেন নিজের বশে ছিল না। বার বার যেন সকালবেলার কথাটাই মনে পড়ছিল তার। তারপর রাত হয়েছে। মা ভাত বেড়ে দিয়েছে। ভাত খেতে বসেও যেন কথাটা ভুলতে পারছিল না! লক্ষ্মীদি কেন তাকে সতীর সামনে অমন করে বকলো!

মা বললে—কী ভাবছিস্ রে অত? কী হয়েছে রে তোর?

দীপঙ্কর বললে—আমার ক্ষিদে নেই মা আজকে—

—কেন? ক্ষিদে নেই কেন আবার? অন্য দিন যে ক্ষিদের জন্যে এত খাই-খাই করিস? আজকে কী খেয়েছিস তুই? ওই কিরণটা বুঝি ছাইভস্ম বেগুনি-ফুলুরি খাইয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলছি মা, কিছু খাইনি—কিরণের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি কতদিন—

সত্যি, একদিন দেখা হয়নি, তাইতেই যেন মনে হয়েছে কতদিন দেখা হয়নি কিরণের সঙ্গে। অথচ কাছেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেন—একবার গেলেই হয়! কিন্তু কাকাবাবু কথাটা বলার পর থেকেই যেন কেমন দ্বিধা হচ্ছিল। সত্যিই কি

কিরণের সঙ্গে মিশলে তার ক্ষতি হবে! কাকাবাবুরও তো বয়েস হয়েছে অনেক। কাকাবাবুরও তো অনেক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। কাকাবাবুও তো মস্ত বড় চাকরি করেন। অনেক টাকা মাইনে পান। কাকাবাবুও তো দীপঙ্করের শুভাকাঙ্ক্ষী। কাকাবাবুই বা অমন কথা বলতে যাবেন কেন!

খেয়ে উঠে আঁচাতে গিয়ে তখনও ভাবছিল দীপঙ্কর। উঠোনের কোণে আমড়া গাছটার তলায় হাত ধুতে ধুতে হঠাৎ যেন মনে হলো পেছন থেকে কে ডাকলে—দীপু—

চাপা গলার শব্দ।

দীপঙ্কর ফিরে চেয়ে দেখলে লক্ষ্মীদি। খিড়কীর দরজাটা অল্প ফাঁক করে লক্ষ্মীদিই তাকে ডাকছে।

দীপঙ্করের বুকটা আনন্দে যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো। এক দৌড়ে কাছে গেল দীপঙ্কর।

বললে—লক্ষ্মীদি তুমি?

—তুই কিছু মনে করিস্‌নি তো, আমি তোকে বকেছিলুম খুব...

দীপঙ্কর বললে—তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল লক্ষ্মীদি—তুমি আমায় অমন করে বকলে—

—তুই কিছু মনে করিস নি—তোকে বকে আমারও খুব কষ্ট হয়েছে—

দীপঙ্করের যেন কান্না পেতে লাগলো কথাগুলো শুনে। বললে—এখন আর আমার কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, তুমি বকলে তার জন্যে কষ্ট হয়নি, কিন্তু তুমি সতীর সামনে কেন বকলে আমায়?

লক্ষ্মীদি বললে—একটু আস্তে কথা বল্, সতী রয়েছে, টের পাবে—

তারপর গলা নিচু করে বললে—সতীকে তুই কিছু বলিস্ নি তো!

দীপঙ্কর বললে—না লক্ষ্মীদি, আমি কিছুছু বলিনি—

—ও তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

দীপঙ্কর বললে—জিজ্ঞেস করবার আগেই তো তুমি এসে পড়লে—

—ভালোই হয়েছে, একটা কাজ করতে পারবি?

দীপঙ্কর বললে—কী কাজ?

লক্ষ্মীদি বললে—একটা জিনিস দিতে হবে শম্ভুকে—

—কী জিনিস?

লক্ষ্মীদি আঁচলের মধ্যে থেকে একটা জিনিস বার করলে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা গেল না। দীপঙ্কর আরো ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে। মনে হলো কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস!

—এটা কী লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—একটা খেলনা, শম্ভুকে দিয়ে আসতে হবে—

খেলনা! দীপঙ্কর, অবাক হয়ে গেল। দাতারবাবু খেলনা নিয়ে কি করবে!

দীপঙ্কর বললে—কী খেলনা? দেখবো?

কাগজটা খুলতেই একটা পুতুল বেরিয়ে পড়লো। চমৎকার পুতুল একটা। হাত পা মুখ চোখ সব রয়েছে। গোলগাল মোমের পুতুল যেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এ পুতুল কী হবে লক্ষ্মীদি—?

লক্ষ্মীদি রেগে গেল। বললে—পুতুল নিয়ে যা ইচ্ছে সে করুক, তাতে তোর কী! তুই শুধু শম্ভুর হাতে দিয়ে আসবি—পারবি না?

—আর চিঠি?

লক্ষ্মীদি বললে—চিঠির দরকার নেই। তুই শুধু গিয়ে বলবি এটা লক্ষ্মীদি প্যাঠিয়ে দিয়েছে—বুঝলি? পারবি তো?

হঠাৎ মনে হলো পেছনের রোয়াকে যেন কার পায়ের শব্দ হলো। লক্ষ্মীদি টপ্ করে পুতুলটা নিয়ে নিজের আঁচলে লুকিয়ে ফেলেছে, তারপর সন্ত্রস্ত হয়ে যেন এদিক-ওদিক চাইলে কিছুক্ষণ। শেষে বললে—তুই যা দীপু, আমি নিজেই দিয়ে আসবোখন—

বলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল। আর দীপঙ্কর অবাক হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। রাত হয়েছে তখন বেশ। অন্ধকার চারিদিকে। আমড়া গাছের তলায় অন্ধকারটা আরো ঘন হয়ে এসেছে। দীপঙ্কর জলের ঘটিটা নিয়ে সেখানেই কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে গেল এক নিমেষে। সামান্য একটা পুতুল! সেই পুতুলটাই যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে সব গোলমাল করে দিলে। কার পুতুল, কে পুতুল খেলা করবে—তাও বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল সেদিন।

পুতুলটা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল কিনা তাও জানে না দীপঙ্কর।

পরের দিন লক্ষ্মীদি যখন কলেজে যাচ্ছিল, দীপঙ্কর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সদর দরজার সামনে। মনে হয়েছিল হয়ত তাকে দেখে লক্ষ্মীদি একবার ডাকবে। কিন্তু না, লক্ষ্মীদি জুতো পায়ে দিয়ে গট্ গট্ করে গিয়ে উঠলো গাড়িতে।

দীপঙ্করের মনে হয়েছিল একবার ডাকবে। কিন্তু ডাকতে গিয়েও গলাটা তার আটকে গিয়েছিল। দরকার নেই ডেকে। হঠাৎ সতী দেখে ফেলবে ভেবে আর ডাকা হয়নি, বাসটা হুহু করে ধুলো উড়িয়ে চলে গিয়েছিল সেদিন আর দীপঙ্কর সেইখানেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এক সময়ে বাড়ি চলে এসেছিল।

অমলবাবু তখন চলে গেছেন। রাস্তাটা পার হবার জন্যে দীপঙ্কর একবার এদিকে একবার ওদিকে দেখে নিলে। অসংখ্য লোকের ভিড়। কোথায় কত

কাজে চলেছে সবাই। কারো দিকে কারো চেয়ে দেখবার ফুরসত নেই। শুধু দীপঙ্করেরই কোনও কাজ নেই। শুধু কলেজ আর বাড়ি। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই তার। লক্ষ্মীদির বাড়িতেও যাবার উপায় নেই, কিরণদের বাড়িতেও যাওয়া বারণ। তাহলে আর কোথায় যাবে সে! কেউ নেই তার! তার কেউ নেই! দীপঙ্কর সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে হাজরা রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে একান্ত অসহায়ের মত ভাবতে লাগলো—কেউ নেই তার। সত্যিই তার কেউ নেই—

হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দীপঙ্কর দেখলে—সেই ছেলেটা। সেই যাকে কিরণ বলে ভুল করেছিল দীপঙ্কর। ছেলেটা যেন পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ তাকেই লক্ষ্য করছিল। দীপঙ্করের সেই দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটা কাছে এল।

বললে—আপনি কিরণকে চেনেন নাকি?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি চেনেন?

ছেলেটি বললে—আমি খুব ভালো করে চিনি, কিরণ আমাদের বন্ধু—

দীপঙ্কর ভালো করে আবার চেয়ে দেখলে ছেলেটির দিকে। কখনও তো দেখেনি তাকে আগে কোথাও!

বললে—কিরণ তো আমারও বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু—

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম তো দীপঙ্কর সেন?

—আপনি জানলেন কী করে?

দীপঙ্কর সত্যিই অবাক হয়ে গেছে এবার। তার নাম জানলো কী করে!

ছেলেটি বললে—প্রথমটায় আপনাকে আমি চিনতে পারিনি তখন, তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়লো। কিরণ আপনার কথা আমাদের কাছে খুব বলে—

একটু থেমে ছেলেটি আবার বললে—কিরণের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছে কবে?

দীপঙ্কর মনে করতে চেষ্টা করতে লাগলো। খুব বেশি দিন হয়নি। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো যেন এক যুগ। যেন বহু যুগ ধরে কিরণের সঙ্গে কথা হয়নি তার। বাড়ির সামনে গিয়েও একদিন কিরণের সঙ্গে দেখা করেনি। কিরণের সঙ্গে দেখা করতেই যেন ভয় করছিল তার।

ছেলেটি বললে—কিরণের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি, শুনে শুনে আপনাকে একেবারে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—

দীপঙ্কর কী বলবে। শুধু হাসলো একটু।

—কিরণ বলেছিল আপনাকে একদিন নিয়ে যাবে আমাদের ওখানে!

—কোথায়?

ছেলেটি বললে—কিরণ আপনাকে ভজুদার কথা বলেনি?

—হ্যাঁ, খুব বলেছে; আমি বলেছিলাম, একদিন কিরণের সঙ্গে যাবো, ভজুদার কাছে—

ছেলেটি বললে—এখন তো ভজুদা নেই কলকাতায়, ভজুদা নেপাল গেছে—

নেপাল! কত দূর নেপাল! দীপঙ্কর কল্পনায় যেন ভজুদাকে দেখবার চেষ্টা করলে। কোথায় নেপাল আর কোথায় কলকাতা! দীপঙ্করের কাছে ভজুদা যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠলো। ছোটবেলায় যখন প্রাণমথবাবু জেলে যেতেন, তখনও এমনি রহস্যময় মনে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এ জেল নয়—জেলের চেয়েও দূর নেপাল। জেলখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে তবে যেন নেপালে যেতে হয়।

—কবে ফিরে আসবেন?

ছেলেটি বললে—তার কোনও ঠিক নেই। কালও আসতে পারে, আবার দু বছর পরেও আসতে পারে—

দীপঙ্কর হতাশ হয়ে গেল। আগেই একদিন কিরণের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এলে হতো!

ছেলেটি বললে—ভজুদা এলে কিরণকে দিয়ে আপনাকে খবর পাঠাবো—

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কিরণ এখন কোথায়?

ছেলেটি অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি জানেন না? কিরণ তো বাড়িতে শুয়ে আছে, কিরণের খুব অসুখ যে—

অসুখ!

দীপঙ্করের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কিরণের অসুখ! দীপঙ্কর বললে—কিরণের অসুখ, তা তো জানতাম না আমি—

ছেলেটি বললে—হ্যাঁ, আজ সাত দিন ধরে বিছানায় পড়ে ছটফট করছে—খুব যন্ত্রণা হচ্ছে—কিছুতেই সারছে না—

দীপঙ্কর যেন অস্থির হয়ে উঠলো। বললে—তা হলে কী হবে? ওদের যে খুব অভাব! ওদের যে ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই! কী হবে—

যেন পাগলের মত দীপঙ্কর প্রলাপ বকতে লাগলো।

ছেলেটি বললে—আমি কালকে দেখতে গিয়েছিলাম—আবার যাবো একদিন—

দীপঙ্কর বললে—আমি জানতুম না ওর অসুখ হয়েছে—আমি এখ্খুনি যাচ্ছি—

বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। হাজরা রোডের মোড়টা কোনও রকমে পার হয়ে দীপঙ্কর যেন উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে লাগলো। কেউ তাকে বলেনি কিরণের অসুখের কথা! কী আশ্চর্য! দীপঙ্করের মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবী তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। সমস্ত সংসার যেন তাকে প্রবঞ্চনা করেছে। কিরণের অসুখের কথা কেউ তাকে জানাল না। কী আশ্চর্য! এত দিন সে বাড়ির কাছে রয়েছে, পাশাপাশি বাড়ি, আর সে-ই জানতে পারলো না। দীপঙ্কর যেন বিশ্বাসই করতে পারলো না কথাটা। কিরণ তার প্রাণের বন্ধু। কিরণ তার

মা'র চেয়েও আপনার জন। কিরণ তার লক্ষ্মীদির চেয়েও প্রিয়—সেই কিরণের অসুখের খবর সে অন্য ছেলের কাছে শুনলো। দীপঙ্করের মনে হোল—হোক এ ষড়যন্ত্র, তবু তারই দোষ! তারই তো দোষ!

দীপঙ্কর গলি দিয়ে সোজা রাস্তা বার করে চলতে লাগলো। যেন এতটুকু দেরি হলে আর কিরণকে দেখতে পাবে না সে। যেন এক মিনিট দেরি হলে কিরণকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। যেন দীপঙ্করের জগৎ থেকে কিরণ একেবারে হারিয়ে যাবে—নিঃশেষ হয়ে যাবে!

ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন তখন জমজমাট। বঙ্কুর তেলে-ভাজার দোকানে তখন খদ্দেরদের ভিড় খুব। কড়া তেল পোড়ার মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। মধুসূদনের রোয়াকে তখন আবার দুনিকাকা ফতুয়া গায়ে দিয়ে বসেছে। ছোনেদা, পঞ্চাদা, মধুসূদনের বড়দা আবার আসর জমিয়েছে। আবার ফোড়ন কাটছে সকালবেলাকার মত।

দুনিকাকা বলছে—রেখে দে তোর কংগ্রেস, কংগ্রেসকে খুব চেনা গেছে, বাবা—

ছোনেদা বললে—কিন্তু দুনিকা, কংগ্রেস যাহোক তবু কিছু লড়ছে, তা না হলে কে লড়তো শুনি? তুমি, না আমি?

দুনিকাকা তখন ক্ষেপে গেছে। বললে—কংগ্রেসের কথা আর বলিস নি ছোনে, তবে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো? বলি, চরকার সময় তোদের পাড়ার লীডার চরকা বেচে ক' হাজার টাকা প্রফিট করেছে বলবো? নামটা আর বললুম না—

—তুমি কেবল ওইটেই দেখ দুনিকা, আর এই যে হাজার হাজার ছেলে জেল খাটছে, সেটা তো দেখতে পাও না—

দুনিকাকা বলে—দ্যাখ্, ওসব অনেক দেখা আছে, ক'জন জেল খাটছে আর ক'জন তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে সব দুনিকাকার দেখা আছে, শালুক চেনাচ্ছে গোপাল ঠাকুরকে—! ছেলেগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে লীডাররা সব তো লেখাপড়ার দফা-রফা করে দিলে, শেষকালে যখন জেল থেকে বেরিয়ে চাকরির জন্যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে তখন তোদের লীডাররা খাওয়াতে আসবে? বল্, কী উত্তর দিবি, বল্?

আসর বেশ জম্‌জমাট হয়ে উঠেছে তখন।

মাঝে মাঝে এক-একদিন আসর আরো জম্‌জমাট হয়ে ওঠে। গান্ধী, জে এম সেনগুপ্ত, সাইমন কমিশন, নানা ব্যাপার নিয়ে মহা গোলমাল শুরু হয়। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কেউ কথার মধ্যে কথা বলে। তখন ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। একদল ইংরেজদের পক্ষে আর একদল স্বদেশীদের পক্ষে।

একদল বলে—এতদিন খেতে পরতে দিচ্ছে যারা, তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা মানেই নেমক্‌হারামি করা—

অন্যদল বলে—কী খেতে পরতে দিচ্ছে শুনি? কী কচুটা খেতে দিচ্ছে?

ছ'টাকা মণ চালের দর, আর টাকায় দু'সের দুধ—কী খেতেটা দিচ্ছে শুনি? খুব যে ইংরেজদের হয়ে ওকালতি করছো—

দুনিকাকা বলে ওঠে—তোদের কংগ্রেস রাজা হলে দেখবো কী খেতে দেয়—

—দেবেই তো, সবাই মিলে ইংরেজদের তাড়িয়ে দাও, তখন দেখবে কংগ্রেস চালের মণ এক টাকা করে দেবে, টাকায় চার সের দুধ করে দেবে—

দুনিকাকা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠতো—আর যদি তা না করতে পারে, তখন?

—না পারলে কংগ্রেসকে তাড়িয়ে দিও—! এই যে সাইমন কমিশন, এ কি আমাদের ভালো করবে বলতে চাও—?

হঠাৎ এই আলোচনার মধ্যে কে যেন দীপঙ্করকে দেখে ফেলেছে।

—এই দীপু, তুই কী শুনছিস্ রে? যা এখান থেকে—পালা—

দীপঙ্কর বললে—কেন, আমি পালাবো কেন? আমি কি কথা শুনছি আপনাদের? আমি তো কিরণদের বাড়ি যাচ্ছি—

দুনিকাকা বললে—ওই দ্যাখ্, ওরা আবার একটা লাইব্রেরী করেছে, পাড়ায় আর টিঁকতে দেবে না দেখছি, শেষকালে কোন্‌দিন ভাই টেগার্ট সাহেবের খপ্পরে পড়বো—

দীপঙ্কর বললে—না, আমি তো লাইব্রেরীতে যাচ্ছি না, কিরণের অসুখ করেছে তাই দেখতে যাচ্ছি—

বলে সেখানে আর দাঁড়াল না। দীপঙ্করের মনে হলো এরা যেন সবাই এক ধরনের লোক। সারা দিন আপিসে কাজ করে, আর সকালে সন্ধ্যেয় রোয়াকে বসে বসে কেবল আড্ডা দেয়। সেই ছোটবেলা থেকে এই রকম দেখে আসছে। এত দিকে এত কাজ হলো, এত দিকে এত কিছু বদলে গেল, এদের আর কোন পরিবর্তন হলো না। মনে হয় যেন আর কোন পরিবর্তন হবেও না। কিরণের মূল্য ওরা বুঝবে না—ওদের বোঝবার সে-ক্ষমতাই নেই—

গলির মুখে ঢোকবার সময় হঠাৎ রাখালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রাখাল বোধহয় লাইব্রেরী থেকে বেরোচ্ছে।

দীপঙ্করকে দেখে রাখালও দাঁড়িয়েছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিরণকে দেখতে গিয়েছিলি বুঝি? কিরণ কেমন আছে রে?

—কিরণ!

রাখাল কেমন অবাক হয়ে গেল। বললে—কিরণের কী হয়েছে? আমি তো বায়োস্কোপ্ দেখে আসছি—

দীপঙ্কর রাখালের চেহারার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। চণ্ডীবাবুর নাতি, বড়লোক ওরা। সিল্কের শার্ট পরেছে।

রাখাল বললে—খুব ভালো বায়োস্কোপ, বুঝলি দীপু, তুই দেখিস্—

—কী বায়োস্কোপ?

রাখাল বললে—'কৃষ্ণকান্তের উইল'—সেই অমৃতলাল বোসকে দেখেছিস তো, আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ্ ডিস্ট্রিবিউশনে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল সেই অমৃতলাল বোস কৃষ্ণকান্তের পার্ট করেছে ভাই—শেষকালে একটা মেয়েকে পিস্তল দিয়ে গুলী করে মারলে...

রাখাল আরো অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। সমস্ত গল্পটাই হয়ত বলতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু কিছুই দীপঙ্করের কানে যাচ্ছিল না যেন। মনে হল যেন রাখালের তুলনায় দুনিকাকারা অনেক ভালো। তবু তারা ভাবে। দিক আড্ডা, তবু তো দেশের কথা তারা ভাবে। কিন্তু রাখালরা বেশ আছে। কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই—। অনেক পয়সা ওদের। বাড়িতে দোল, দুর্গাপুজো, একটা-না একটা লেগেই আছে! আর সময় পেলেই বায়োস্কোপ দেখে। রসগোল্লা খেয়ে খেয়ে শরীরটাও মোটা করেছে।

দীপঙ্কর বললে—কিরণকে একবার দেখতে যাবি রাখাল?

—কী হয়েছে কিরণের?

দীপঙ্কর বললে—খুব অসুখ করেছে শুনলাম, একবার দেখতে চল্ না—

রাখাল বললে—এখন পারবো না ভাই যেতে, এখন বাড়িতে গিয়ে চান করবো, খুব ঘেমে গেছি—

রাখাল চলে গেল। দীপঙ্কর একলাই গলির মধ্যে ঢুকলো। কিরণের বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে। আহা, বাড়িতে মা ছাড়া তো আর দেখবার কেউ নেই। কে ওষুধ আনবে, কে পৈতে বিক্রী করবে, কে ডাক্তার ডাকবে। ডাক্তারের পয়সাই বা কে দেবে!

অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। দূরে, অনেক দূরে গলির মোড়ের তেলের বাতিটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। রাস্তার পাশে নর্দমাটা হাঁ করে রয়েছে। সেটা ডিঙিয়ে কিরণের লাইব্রেরী, লাইব্রেরীটা অন্ধকার। দীপঙ্কর লাইব্রেরীটার পাশ দিয়ে বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে কারো সাড়া শব্দ নেই! আহা, বোধহয় জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে আছে। জ্বর হলে যে কী কষ্ট তা দীপঙ্কর জানে। দীপঙ্করেরও একবার জ্বর হয়েছিল। কিন্তু, কিরণ যদি মরে যায়? যদি এই অসুখে ভুগে ভুগেই মরে যায়?

ভাবতেই দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন শিউরে উঠলো। দীপঙ্কর সেইখানে সেই খোলা দরজার সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়েই ডাকলে—কিরণ—

কিন্তু ডাকতে গিয়েও যেন গলার স্বর বেরোল না। বার বার চেষ্টা করেও যেন চিৎকার করে ডাকতে পারলে না দীপঙ্কর। মনে হলো মা তো তাকে কিরণদের বাড়ি যেতে বারণ করেছে! কিরণের বাবার থুথু পড়ে থাকে উঠোনে—সে-সব মাড়ানো তো উচিত নয়। রোগীর থুথু মাড়ালে অসুখ হয়। সত্যিই তো, মা তো অন্যায় বলেনি। মা'কে জিজ্ঞেস না করে তো কিরণদের বাড়ি

ঢোকা যায় না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো দীপঙ্কর। একবার মনে হলো দোষ কি যেতে। সে তো আড্ডা দিতে যাচ্ছে না। কিরণের অসুখ করেছে তাই দেখতে যাচ্ছে। অসুখের সময়, বিপদের সময়ে মানুষকে তো মানুষের দেখা উচিত। বিপদেই যদি না দেখলুম তো কবে দেখবো!

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। মাকে জিজ্ঞেস করে তবে যাওয়া ভালো। মা তো বারণই করেছে যেতে। মাকে বললে মা কি আর বুঝবে না? মা কি বারণ করবে! মা তো অবুঝ নয়! দীপঙ্কর ফিরলো আবার। মাকে জিজ্ঞেস করে তখন আসবে। কত আর দেরি হবে। যাবে আর আসবে। জিজ্ঞেস করেই চলে আসবে দীপঙ্কর। দীপঙ্করকে দেখলে কিরণও খুব খুশী হবে।

দীপঙ্কর গলি পেরিয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মধ্যে এসে পড়লো। আর এক দণ্ডে উনিশের একের বি'র মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু উঠোন থেকেই দেখলে অন্য দিনের চেয়ে যেন আলোটা একটু বেশি উজ্জ্বল। কেউ যেন এসেছে এ বাড়িতে। তাদের বাড়িতে এমন সময় কে আসবে। এ-সময়ে তো কেউ আসে না।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে তক্তপোশটার ওপর পা তুলে বসে আছে সতী। একপাশে বসে আছে বিন্তীদি। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা যেন কী সব কথা বলছে।

দীপঙ্করকে দেখেও যেন কেউ দেখলে না, শুধু সতী তার দিকে একবার চাইলে। মা-ও চেয়ে দেখলে। কিন্তু মাকে দেখে মনে হলো মা যেন কী নিয়ে খুব বিব্রত।

দীপঙ্করকে দেখিয়েই মা সতীকে বলতে লাগলো—তুমি তো এতদিন আছো মা, সব তো দেখছো, আমার কীসের ভাবনা বলো, আমার দীপু মানুষ হয়ে গেলেই আমি ঝাড়া হাত পা। কিন্তু ওই হয়েছে আমার শূল—

বলে মা বিন্তীদির দিকে দেখিয়ে দিলে।—ওর জন্যেই আমি কোথাও যেতে পারি না, কোথাও দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি না। আমি যদি মরে যাই তো ও-ও আমার পেছু নেবে, এমনি মেয়ের টান। মুখ ফুটে কিছু বলবেও না, বলতে জানেও না। সংসারে এত লোক থাকতে চিনেছে শুধু আমাকে—আমার সঙ্গে যেন ওর আর জন্মের সম্পর্ক—

বলে মা বিন্তীদির মুখের দিকে চেয়ে বললে—দেখ দেখ মেয়ের মুখখানার দিকে একবার চেয়ে দেখ, ও মুখ দেখলে মায়া হয় না? সেই ছোটবেলায় যখন এসেছিলুম দীপুকে কোলে নিয়ে, তখন ওই এতটুকু ছিল, তখন থেকেই ওই! নিজের মায়ের পেটের ভাইরা রয়েছে, দাদামশাই রয়েছে, তারা কেউ আপন হলো না, আমি কোথাকার কে—আমিই হলুম ওর আপন—

সতী জিজ্ঞেস করলে—তা দাদামশাই-এর এত টাকা, দাদামশাই নাতনির জন্যে কিছু টাকা দেবে না, এ কী রকম?

—ওই কথাটাই বলে কে মা? আমি সেই ঘুরে ঘুরে একটা পাত্র ঠিক করবো, আমিই দেখাবার বন্দোবস্ত করবো, তবে সব হবে! আমি মেয়েমানুষ এ-সব আমার করা কি ভালো দেখায়?

সতী জিজ্ঞেস করলে—ক'জন দেখতে আসবে?

মা বললে—পাত্রের বাবা আর কাকা—আর ঘটকমশাই—তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে মা, তুমি এসে একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে দিও মা, আমি জল-খাবারের ব্যবস্থা-টাবস্থা সব ঠিক করবো—ওকে একটু সাজিয়ে দিও মা তুমি—আমি তো সেকেলে মানুষ—

এতক্ষণে বিন্তীদি কথা বললে। বললে—হ্যাঁ ভাই, আমাকে তুমি সাজিয়ে দিও—নইলে ভালো দেখাবে না—

বড় করুণ সুরে কথাটা বললে বিন্তীদি। কিন্তু শুনে হেসে ফেললে সতী। বললে—কিন্তু আমার সাজানো তোমার পছন্দ হবে তো বিন্তীদি?

মা বললে—দেখলে তো, ও ওই রকম সরল সাদাসিধে—

বিন্তীদি সে-কথায় কান দিলে না। বললে—আমাকে তোমার মত করে সাজিয়ে দিও ভাই—

সতী হেসে বললে—আমি কি কলকাতার মেয়েদের মত সাজাতে পারবো?

বিন্তীদি বললে—খুব পারবে! এমন করে সাজাবে যাতে আমাকে ওদের পছন্দ হয়—

সতী আরো হেসে উঠলো। হঠাৎ বিন্তীদির গাল দুটো টিপে দিয়ে বললে—হবে হবে খুব পছন্দ হবে। তোমার মত চেহারা পছন্দ না-হয়ে পারে নাকি বিন্তীদি?

বিন্তীদি কিন্তু হাসলে না। বললে—সত্যি বলছো ভাই?

সতী বললে—সত্যি বলছি না তো কি মিথ্যে বলছি?

তবু যেন বিন্তীদির বিশ্বাস হলো না। বললে—সত্যি বলো তো, আমি তোমার মতন সুন্দরী?

সতী হেসে বললে—আমি সুন্দরী না ছাই—তুমি আমার চেয়েও সুন্দরী—

বলে সতী খুব জোরে হেসে উঠলো। মা বললে—দেখলে তো মা, ও মেয়ে ওই-রকম, মেয়ের মুখ দেখলে আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে মা—

তারপর মা কত কথা বলতে লাগলো। মার দুঃখের কথা, দীপঙ্করের কথা। সে-সব কথা দীপঙ্করের কাছে নতুন নয়। হাজার হাজার বার শুনেছে সে। হঠাৎ এক ফাঁকে দীপঙ্কর বললে—মা—

মা মুখ ফিরিয়ে বললে—কী? তোমার আবার কী?

দীপঙ্করের কথাটা বলতে যেন একটু সঙ্কোচ হলো। সতীও তার দিকে চাইলে। সতীর সামনে কথাটা বলতে কেমন যেন লজ্জা হচ্ছিল।

সতী বললে—আমার সামনে বলতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে তোমার?

মা বললে—না মা, তোমার সামনে বলতে আবার লজ্জা হবে কেন ওর, ওর ওইরকম, একটা কিছু বায়না ওর লেগেই আছে—তোমার কাকাবাবুকে বলে একটা চাকরি করে দাও না মা, আমি একটু নিশ্চিন্ত হই—

সতী বললে—একদিন আপনি চলুন না মাসীমা আমার সঙ্গে—কথাটা আপনিই বলবেন কাকাবাবুকে—

মা বললে—সেদিন তো ও গেল বলতে চাকরির কথা, এসে বললে—বলেনি—ওই মুখচোরা ছেলেকে নিয়ে আমি কী করি বলো তো মা—

সতী বললে—তাই নাকি, তুমি মুখচোরা বুঝি খুব? কিন্তু লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলতে তো খুব মুখ খুলে যায় ওর মাসীমা—

মা বললে—পরের বাড়িতে ওর খুব মুখ খোলে—! এখুনি কিরণদের বাড়িতে যেতে বলো তো সেখানে গিয়ে কথার খই ফুটবে—

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—মা, কিরণদের বাড়ি একবার যাবো, মা?

দীপঙ্কর মার হাতটা ধরলো। বললে—তুমি একবার যেতে বলো মা আমাকে, তুমি যেতে না-বললে যে আমি যেতে পারছি না—মানুষের অসুখের সময় যদি না দেখি তো কখন দেখবো মা! আমি যাবো আর আসবো মা, তুমি একবারটি বলো যেতে—

মা বললে—তা বলে এখনি যেতে হবে? এই রাত্তিরে? কাল সকালে গেলে হয় না?

—না মা, তার বড্ড অসুখ করেছে, ভীষণ জ্বর,—আমি যাচ্ছি, তুমি বলো—হ্যাঁ—

মা বললে—আচ্ছা যাও—কিন্তু বেশি দেরি করবে না—

—না মা, আমি যাবো আর আসবো—

বলে দীপঙ্কর লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মার অনুমতি পেয়েছে, আর তার কিছু যেন ভাববার নেই। কতদিন পরে কিরণদের বাড়ি যাবে সে। সেই ছোটবেলায় কতদিন সে গেছে ওদের বাড়ির ভেতরে, কতদিন ওদের পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খেয়েছে। কতদিন ওর বাবা তাদের অঙ্ক করে দিয়েছে। কতদিন ওর মা মুড়ি খেতে দিয়েছে—কতদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কিরণ পৈতে বিক্রি করেছে, আর সে পেছন পেছন গেছে, কতদিন টালিগঞ্জ পুলের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি চলা দেখেছে। সেই কিরণের অসুখ করেছে!

বাড়ির বাইরে লেনটার মধ্যে তখন তেলের বাতি জ্বলছে। বাতিটার

তলায় যেতেই কে যেন ডাকলে—এই—

দীপঙ্কর দাঁড়াল। পেছন ফিরে দেখলে সতী। সতীও তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

দীপঙ্কর আবার পেছিয়ে গেল। বললে—তুমি চলে এলে যে?

সতী সে কথায় কান না দিয়ে বললে—কিরণদের বাড়ি কোন্ দিকে—?

দীপঙ্কর বললে—কেন? তুমি কিরণকে চেন নাকি?

—না চিনি না, এমনি জিজ্ঞেস করছি! কিরণ বুঝি তোমার ক্লাস-ফ্রেন্ড?

—হ্যাঁ, তুমি আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হবে? আমরা একটা লাইব্রেরী করেছি, আট আনা করে চাঁদা, দুখানা করে বই পড়তে পাবে—হবে মেম্বার? কাকাবাবুও মেম্বার হয়েছেন! লক্ষ্মীদি তুমি—তোমরা দুজনেই মেম্বার হও না—তোমাদের যেতেও হবে না কিছু না, আমিই বই এনে দিয়ে যাবো, ভালো ভালো সব বই আছে লাইব্রেরীতে! এত ভালো বই সব যে, দেখে তুমি চমকে যাবে—

সতী হাসলো। বললে—কিরণ বুঝি তোমার খুব বন্ধু?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি লাইব্রেরীর মেম্বার হবে কিনা বলো না, মাত্র তো আট আনা করে চাঁদা, আর তোমরা তো খুব বড়লোক—আট আনা চাঁদা দিতে গায়ে লাগবে না—

সতী সে-কথার ধার দিয়ে গেল না। বললে—তুমি কিরণকে বেশি ভালোবাসো, না লক্ষ্মীদিকে বেশি ভালোবাসো বলো তো?

দীপঙ্কর বিরক্ত হলো। বললে—ও-সব কথা আমার ভালো লাগে না, তুমি লাইব্রেরীর মেম্বার হবে কিনা তাই বলো—

সতী বললে—তা ও-সব কথা ভালো লাগবে কেন? লক্ষ্মীদির কাজ করতে খুব ভালো লাগে, না?

—না, লক্ষ্মীদির কাজ আমি আর করি না!

—না, করো না! তবে সেদিন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদির সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল তোমার? আমি শুনিনি বুঝি কিছু?

—কবে? কখন কথা হচ্ছিল?

সতী বললে—মনে নেই? সেদিন রাত নটার সময় খিড়কির ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদি কী বলছিল তোমাকে? কী কাজ করতে পাঠাচ্ছিল? কোথায় যেতে বলছিল তোমাকে? বলো?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—কই? কোথাও তো পাঠায়নি আমাকে? কোথায় পাঠাবে আবার?

সতী বললে—মিথ্যে কথা বলো না তুমি! মিথ্যে কথা বললে পাপ হবে—

—আমি মিথ্যে কথা বলি না। যা তা বলো না তুমি!

—তাহলে লক্ষ্মীদি কী বলছিল তোমাকে, বলো?

দীপঙ্কর রেগে গেল। বললে—তোমার কি আর কোনও কাজ নেই? তোমার কি আর কোনও ভাবনা নেই? কেবল লক্ষ্মীদি কী করছে দিনরাত তাই ভাবো বুঝি তুমি? তোমার নিজের লেখা-পড়া, নিজের কাজ-কর্ম কোনো কিছুই নেই? কেন তুমি লক্ষ্মীদির পেছনে এত লাগো, শুনি?

সতী যেন প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল কথাগুলো শুনে।

দীপঙ্কর আবার বলতে লাগলো—লক্ষ্মীদির কোনও দোষ নেই জানো, লক্ষ্মীদি তোমার মতন অত পরের পেছনে লাগে না—লক্ষ্মীদির মত মেয়ে হয় না—আর তুমি কিনা তাকেই মিছিমিছি কষ্ট দাও এত—

—আমি কষ্ট দিই?—সতী যেন মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেলে কথাটা ভেবে।

—কষ্ট দাও না? কেন তুমি আমাকে সন্দেহ করো? আমি কী করেছি তোমার? আমি কি তোমাদের মত বড়লোক? আমার বাবা নেই, আমার মা কত কষ্ট করে আমাকে মানুষ করছে দেখতে পাও না? আমি ভিক্ষে করে লেখা-পড়া করছি তাও তুমি দেখতে পাও না? তোমাদের সঙ্গে আমার তুলনা? তোমরা বড়লোক আর আমি গরীব লোক! তোমরা ইচ্ছে করলে সব করতে পারো, আর আমাকে সব কাজের জন্যে পরের ওপর নির্ভর করতে হয়—তোমরা ইচ্ছে করলেই তো আমাকে কিনে নিতে পারো। তুমিই তো একদিন আমাকে কুলী মনে করে ঘাড়ে মোট বইয়েছিলে, তারপর চারটে পয়সাও আমার গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিলে—মনে নেই?

সতীর মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনও কথা বেরোল না।

দীপঙ্কর আবার বলতে লাগলো—তোমার কাকাবাবু আমাকে কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছেন। কেন, কিরণ কী দোষ করেছে? তার গরীব হওয়া ছাড়া আর তার কী দোষ, শুনি? তার মত গুণ তোমাদের আছে? তার এক কণা গুণ পেলেও তুমি বর্তে যেতে!

সতী এবার কথা বললে। বললে—কই, আমি তো তোমায় মিশতে বারণ করিনি কারো সঙ্গে?

—তুমি বারণ করোনি, কিন্তু কাকাবাবু তো বারণ করেছেন! তুমি আর তোমার কাকাবাবু তো একই! তোমার কাকাবাবু আর তুমি কি আলাদা?

—বা রে, তুমি তো বেশ মজার ছেলে! কাকাবাবুর দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে?

দীপঙ্কর বললে—দেব না? তোমারই তো কাকাবাবু! এখন কিরণকে যদি কথাগুলো বলি তো কীরকম কষ্ট পাবে বলো তো? তুমি ভেবে দেখ না—কষ্ট পাবে না?

—তা তো পাবেই!

—তবে? এতদিন আমরা এক সঙ্গে মিশেছি, ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা করেছি, এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি বরাবর—আর এখন হঠাৎ মেশা

বন্ধ করে দেব? আমার বুঝি কষ্ট হয় না? তার অসুখ করলেও দেখতে যেতে পারবো না?

সতী হাসলো। বললে—তা যাও না, কে তোমায় বারণ করছে?

দীপঙ্কর বললে—বেশ তো বলছো, তারপর হয়ত তুমিই গিয়ে কাকাবাবুকে বলে দেবে, আর কাকাবাবু রাগ করবেন খুব আমার ওপর, রেগে গিয়ে হয়ত আমাকে চাকরিই দেবেন না—

—না না আমি বলে দেব না—তুমি যাও, অসুখের সময়ে মানুষকে দেখা উচিত।

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলছো বলে দেবে না?

—না বলবো না, কথা দিচ্ছি! তা ছাড়া, তুমি কার সঙ্গে মিশছো না-মিশছো তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কাকাবাবুরও মাথাব্যথা নেই—

দীপঙ্কর কী যেন ভাবলে, বললে—তাহলে আমি যাই?

সতী বললে—যাও না, তোমার যেখানে খুশি তুমি যাবে, তাতে আমরা বাধা দেবার কে?

—আমি যদি রোজ রোজ যাই?

—তাতেও কিছু বলবো না।

—বেশ, তাহলে সেই কথা রইল কিন্তু—তুমি কিছুচ্ছু বলতে পারবে না কোনওদিন! লক্ষ্মীদির সঙ্গেও আমি যখন তখন মিশবো, লক্ষ্মীদি যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাবো—লক্ষ্মীদির সব কাজ করে দেব, তুমি কিন্তু কিছু বলতে পারবে না!

সতী বললে—বারে, লক্ষ্মীদির কথা তো আমি বলিনি—লক্ষ্মীদির কথা আলাদা—

—কেন লক্ষ্মীদির কথা আলাদা কেন?

—না, লক্ষ্মীদি যেখানে যেতে বলবে সেখানে যেও না, লক্ষ্মীদি যদি কাউকে চিঠি দিয়ে আসতে বলে তাহলেও তুমি দিয়ে এসো না!

—কেন?

সতী বললে—না, এখানে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব কথা বলা যায় না। তোমাকে তো সেদিন সব বলেছি! বর্মাতেও লক্ষ্মীদি তোমার মত একটা ছেলের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতো একজনকে—যাতে কেউ টের না পায়—

দীপঙ্কর কথাটা শুনে কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। অন্ধকার বাড়িটার ঠিক সদর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। দীপঙ্করের মনে হলো এতদিনে যেন সব ঘটনাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলছো?

সতী বললে—নিজের দিদির সম্বন্ধে মিথ্যে বলে আমার লাভ? আর নিজের দিদির কথা কখনও পরের কাছে এমন করে বলা যায়?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হলো?

সতী বললে—আমিও তখন সেই একই ইস্কুলে পড়তাম কিনা, একই হোস্টেলে থাকতাম দিদির সঙ্গে—তুমি তো বর্মায় কখনও যাওনি, নইলে সেখানে মেয়েদের ইস্কুল কী-রকম জানতে পারতে। বর্মা তো এখানকার মত নয়, সেখানকার মেয়েরা স্বাধীন—যে যার সঙ্গে মিশতে পারে—

—কিন্তু সে ছেলেটা কে? যার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতো লক্ষ্মীদি?

—সে একটা তোমারই মত ছেলে, পাশের বাড়িতে থাকতো, বাচ্চা ছেলে, সে কিছু বুঝতো না, লক্ষ্মীদি যা বলতো, তাই-ই সে করতো। তাকে চকোলেট দিত, লজেন্স দিত, দরকার হলে আরো সব জিনিস উপহার দিত—আর তার তো বয়েস কম ছিল তাই সে-ও বুঝতো না কী সর্বনাশ করছে সে দিদির—

—কেউ কিছু বলতো না?

সতী বললে—কেউ কী-ই বা বলবে! আর জানতে পারলে তো! আমি থাকতাম একই হোস্টেলে, আমিই বলে জানতে পারিনি—! ছেলেটাকে আমিও দেখেছি। আমাদের হোস্টেলে আসতো, লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলতো,—কিন্তু সে যে তলে তলে ওই কাজ করছে তা আমি কী করে সন্দেহ করবো?

—তলে তলে কী কাজ করতো ছেলেটা?

সতী বললে—লক্ষ্মীদির চিঠি নিয়ে একজনকে দিয়ে আসতো—

দীপঙ্করের নিজেকে যেন হঠাৎ বড় অপরাধী মনে হলো। সতীর মুখখানা অন্ধকারের মধ্যেও ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে।

বললে—চিঠিতে কী লেখা থাকতো সব?

সতী বললে—সে-সব তুমি বুঝবে না—ছেলে-মেয়েতে প্রেম হলে যে-সব কথা হয়, সেই সব কথা লেখা থাকতো—

প্রেম! কথাটা যেন সতীর মুখ থেকে অন্যরকম শোনালো।

দীপঙ্কর বললে—তা প্রেম করা মানে তো ভালোবাসা! ভালোবাসলে দোষটা কী?

সতী বললে—সে-সব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না—বাবা মা'র বিনা অনুমতিতে কোনও মেয়ের পক্ষে কোনও পুরুষের কাছে চিঠি লেখা বা কোনও ছেলেকে ভালোবাসা অন্যায়, শুধু অন্যায় নয় পাপ—বিশেষ করে বিয়ের আগে—তা সে-সব কথা থাক—তুমি ও-সব বুঝবে না,—

দীপঙ্কর বললে—না আমি বুঝবো, তুমি বল—

সতী বললে—না, এখন তুমি বুঝতে পারবে না—আরো বড় হয়ে বুঝবে—

—না, আমি বড় হয়েছি, তুমি বুঝতে পারো আর আমি বুঝবো না? আমি তো তোমার চেয়েও বড়, বল তুমি—

সতী বললে—না, ও-সব কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না—

মেয়েরা বয়েস না হলেও বোঝে—

দীপঙ্কর বললে—তা এত জিনিস বুঝতে পারি আর এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারবো না!

সতী যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—সামান্য ব্যাপার হলে আমি এত ভাবতুম না—তোমার নিজের দিদির ব্যাপার হলে তুমি একে সামান্য ব্যাপার বলতে না—বলতে কি?

দীপঙ্কর এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

সতী একটু থেমে বললে—নিজের দিদি বলেই বলছি, দিদি যদি কখনও তোমাকে কোনও চিঠি কাউকে দিয়ে আসতে বলে তুমি যেন দিও না—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু যে-লোকটাকে লক্ষ্মীদি চিঠি দিত সে কে? তার নাম কী?

—সে একজন বর্মার লোক, মারহাট্টি ছেলে, দিদি তাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল!

—কী নাম তার?

সতী বললে—তার নাম শম্ভু দাতার, বর্মায় ব্যবসা করতো! তার কাছ থেকে দূরে সরাবার জন্যেই বাবা কাকাবাবুর সঙ্গে দিদিকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলে—কিন্তু শুনেছি বর্মা থেকেও সে-ছেলেটা চলে গেছে! হয়ত কলকাতায় এসেছে—কী জানি! তাই তো আমাদের এত ভয়!

দীপঙ্কর বললে—তা তোমরা লক্ষ্মীদিকে বারণ করতে পারো না?

সতী বললে—বারণ করলে কি শোনে কেউ! সেইজন্যেই তো লক্ষ্মীদির পাত্র খোঁজা হচ্ছে, লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে গেলে বাবাও নিশ্চিন্ত হন, আমিও নিশ্চিন্ত হই—

—লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে যাবে?

সতী বললে—হ্যাঁ, অনেক পাত্র খোঁজা হচ্ছে,—

—কিন্তু লক্ষ্মীদি তো সুন্দরী, বিয়ে হচ্ছে না কেন?

—সুন্দরী হলেই কি বিয়ে হয়? তোমার বিন্তীদিও তো সুন্দরী, তা-ও বিয়ে হচ্ছে না কেন?

—বিন্তীদির বিয়ে হচ্ছে না টাকার জন্যে। অঘোরদাদু যে টাকা দেবে না—

সতী বললে—কিন্তু যার তার হাতে তো দেওয়া যায় না! আর সেই বর্মা থেকে পাত্র খোঁজাও তো সহজ নয়। আমার বাবা হয়ত এসে পড়বেন একদিন, একটা ভালো পাত্রের খোঁজ পেলেই এসে পড়বেন—

খবরটা শুনে দীপঙ্কর যেন কেমন চুপ করে রইল। লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে যাবে। লক্ষ্মীদিকে সিঁদুর পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে কেমন দেখাবে তাই যেন ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলো।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, তাহলে আমি আসি—অনেক দেরি হয়ে

গেল—

সতী বললে—যা বললুম তোমার মনে থাকবে তো?

—থাকবে। বলে দীপঙ্কর চলে যাচ্ছিল—সতী আবার বললে—যদি কোনওদিন কোনও চিঠি কি কোনও জিনিস কাউকে পাঠায় তো আমাকে বলে দিও—বুঝলে?

দীপঙ্কর সে-কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে গেলে তারপর তোমারও তো একদিন বিয়ে হয়ে যাবে।

সতী হাসলো এবার। বললে—তা একদিন হবে বৈ কি! কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

দীপঙ্কর বললে—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি—

তারপর একটু থেমে বললে—বিয়ে হয়ে গেলে তোমরা তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে?

সতী বললে—বিয়ে হলে সবাই-ই শ্বশুরবাড়ি যায়—তার আবার নতুনত্ব কী?

দীপঙ্কর বললে—তা তো বটেই—শ্বশুরবাড়ি তো যেতেই হবে! মোট কথা তোমরা চলে গেলে বাড়িটা আবার ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে আর কি! আবার নতুন ভাড়াটে আসবে, আবার দেয়ালের গায়ে 'টু-লেট' টাঙিয়ে দেবে অঘোরদাদু, আবার......

সতী বললে—আবার তাদের সঙ্গেও তোমার ভাব হবে—! তোমার ভাবনা কী!

—না, আর ভাব করবো না কারো সঙ্গে! কারোর সঙ্গে ভাব করবো না আর!

—কেন? রাগ হলো বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—না, এত ভাব করা ভাল নয়—

—কেন? ভাব করা দোষ কী?

দীপঙ্কর বললে—না, চলে যাবার সময় বড় কষ্ট হয়—

সতী আবার হেসে উঠলো। বললে—ওমা, কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, এরই মধ্যে তোমার কষ্ট হতে আরম্ভ করেছে—!

দীপঙ্কর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো। বললে—না না আমি তা বলিনি, আমি বলছিলুম যে, আগেও তো অনেক ভাড়াটে এসেছে, তাদের সঙ্গে আমার এত ভাব হয়নি! তোমরা এখানে ছিলে এতদিন, বেশ ভালো লাগতো—

সতী বললে—কাকে ভালো লাগতো? আমাকে, না লক্ষ্মীদিকে?

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হলো সতী যেন মুখ টিপে হাসছে। বললে—তোমাকে আর আমি এ-সব কথা বলবো না, সব কথাতেই ঠাট্টা—আমি যাই—

বলে দীপঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দেখলে সতী তখনও

পঁইঠের ওপর দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল দীপঙ্করের। আবার ফিরলো। তখন সতী নিজেদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে ডাকলে—সতী—

সতীও অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্করের ডাক শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে বাইরে এল।

বললে—কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম—আমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হবে তুমি?

সতী এ-কথার জন্যে বোধহয় তেমন তৈরি ছিল না। একটু দেরি হলো তার উত্তর দিতে।

দীপঙ্কর তার আগেই বললে—মাত্র তো আট আনা চাঁদা, আট আনা চাঁদাও দিতে পারবে না? দুখানা করে বই পাবে পড়তে—

সতী কী যেন ভাবলে। বললে—তা লাইব্রেরীটা তোমার না কিরণের?

দীপঙ্কর বললে—আসলে কিরণেরই লাইব্রেরী, কিরণই বেশি মাথা ঘামায় লাইব্রেরী নিয়ে, ওরই বেশি টান লাইব্রেরীর ওপর, ওই-ই হলো সেক্রেটারী কিনা—

সতী বললে—তাহলে মেম্বার হবো না—

—কেন?

সতী বললে—তোমার নিজের লাইব্রেরী হলে মেম্বার হতুম—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমিও তো আছি, আমিই লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট—

সতী বললে—তাহলে চাঁদা দেব—

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—বারে, বেশ তো কথা তোমার, আমি আর কিরণ কি আলাদা? আমাদের দুজনেরই তো লাইব্রেরী, আমরা দুজনে মিলেই তো গড়েছি ওটাকে—

সতী বললে—ও-সব জানি না, কিরণকে তো আমি চিনি না, আমি শুধু তোমাকে দেখেই চাঁদা দিচ্ছি—আমি তোমাকেই চিনি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কিরণ আমার চেয়েও ভালো ছেলে, জানো—অনেক ভালো ছেলে, কিরণের তুলনা হয় না—

—হোক ভালো, তোমার লাইব্রেরী হলে চাঁদা দেব—একটু দাঁড়াও, আমি পয়সা এনে দিচ্ছি—

দীপঙ্কর বললে—এখনই দেবে?

সতী বললে—তা এখনই দিতে পারি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু থাক্, এখন না, আমার কাছে এখন রসিদ-বই নেই,

কাল রসিদ-বই এনে বরং চাঁদা নিয়ে যাবোখন্—

সতী বললে—রসিদ পরে দিওখন্, এখন বরং চাঁদাটা নিয়ে যাও—

দীপঙ্কর হাসলো, বললে—কিন্তু যদি চাঁদাটা নিয়ে আমি পালিয়ে যাই?

সতীও হেসে ফেললে এবার। বললে—তোমার মুরোদ বোঝা গেছে, তোমার পালাবার ক্ষমতাই নেই—

—কেন? পালাতে পারি না আমি? তুমি ভাবো কী?

সতী বললে—আমি ঠিকই ভাবি! নইলে চাঁদা চাইবার নাম করে এই এত রাত্তিরে আর পেছন থেকে আমায় ডাকতে না—

কথাটা শুনে দীপঙ্কর সেইখানেই অন্ধকারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর সতী এক মুহূর্ত দেরি না করে ভেতরে অন্ধকারের মধ্যে তরতর করে মিলিয়ে গেল।

—কিরণ!

কিরণও অবাক হয়ে গেছে, দীপঙ্করও অবাক হয়ে গেছে। একটা তক্তপোশ। ময়লা লেপ-কাঁথা বালিশ তোশকের ভিড়ের মধ্যে কিরণ শুয়ে ছিল। ওষুধের শিশি কয়েকটা মেঝের ওপর রাখা। পাশেই একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। দীপঙ্করকে দেখেই কিরণ লাফিয়ে উঠলো। বললে—তুই এসেছিস্ দীপু?

কিরণ জড়িয়ে ধরলে দীপঙ্করকে। বললে—তোর মা বকবে না?

দীপঙ্কর বললে—আমি মাকে বলে এসেছি—

—তাহলে এত রাত করলি কেন? আর একটু আগে আসতে পারলি না? অনেক গল্প করা যেত!

দীপঙ্কর বললে—তুই শো, শুয়ে পড়—তোর কষ্ট হবে—এখন কেমন আছিস?

কিরণ হঠাৎ ডাকলে—মা, মা—শুনে যাও—

কিরণের মা দাওয়ায় বসে বসে পৈতে কাটছিল। কিরণের ডাকে ঘরে এল।

কিরণ বললে—এই দেখ মা, দীপঙ্কর এসেছে, আমি বলেছিলুম তোমাকে যে, আর কেউ না আসুক দীপু খবর পেলে নির্ঘাত আসবে! দীপু না এসে পারে না—

কিরণের মা বেশি কথার লোক নয়। বললে—না আসাই তো ভাল, রোগীর বাড়িতে কি আসা উচিত বেশি!

দীপঙ্কর বললে—আমি মাকে বলে এসেছি কিন্তু—মা বলেছে আমাকে আসতে! তা হঠাৎ যে এই সময়ে তোর অসুখ হলো?

কিরণ বললে—অসুখ হওয়া তো ভালো রে—অসুখ হওয়াই তো আমি

চাই, বেশ তেতো ওষুধ খেতে পারা যায়, উপোস করা অভ্যেস করা যায়—অসুখ হলে কষ্ট সহ্য করা শেখা যায়—

—সে কি? অসুখ হলে কষ্ট হয় না মানুষের? তুই বলছিস্ কী?

কিরণ হাসলো। বললে—দূর, তুই জানিস্ না, অসুখ না হলে কষ্ট সহ্য করা শিখবো কী করে? উপোস করা শিখবো কী করে?

ততক্ষণে কিরণের মা আবার বাইরে চলে গেছে। কিরণ বললে—আমি ডাক্তারবাবুকে বলেছি মিষ্টি ওষুধ মোটে দেবেন না, কেবল তেতো ওষুধ দেবেন!

—কেন?

কিরণ বললে—জেলখানাতে গিয়ে তো খুব কষ্ট দেবে আমাদের, তাই এখন থেকে কষ্ট সহ্য করা অভ্যেস করে রাখছি—তুইও কর্—এখন কষ্ট সহ্য করা থাকলে তখন আর গায়ে লাগবে না—কাকাবাবু সেদিন ডেকে তোকে কী বললে রে দীপু? খুব খুশী হয়েছে, না রে?

দীপঙ্কর তখন কিছু বলতে পারছে না। তার মনে পড়ে গেল কাকাবাবুর কথাগুলো। কেমন করে কিরণকে বলবে কথাগুলো—কেমন করে বলবে যে, কাকাবাবু কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিয়েছে দীপঙ্করকে!

কিরণ বললে—তোর কাকাবাবু যে এত ভালো লোক সত্যিই আমি জানতুম না ভাই—কী চমৎকার লোক! তার পরে তুই তো চলে গেলি, আর আমি নাচতে লাগলুম বুঝলি, সারা রাত নাচতে লাগলুম, কিছু খাইনি, ঘুমোইনি—কেবল নেচেছি—

তারপর একটু থেমে বললে—লেখা-পড়া জানা লোক তো, তাই লাইব্রেরীর কদর বোঝে ওরা,—তা কী বললে রে তোর কাকাবাবু?

দীপঙ্করের মুখে তখন কথা আটকে গেছে।

কিরণ বললে—খুব প্রশংসা করলে বুঝি? বল্ না—

দীপঙ্কর কিরণের মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিরণ বললে—জানি প্রশংসা করবেই, চেহারা দেখেই আমি লোক চিনতে পারি যে—! 'পথের দাবি' বইটা এনে কাকাবাবুকেই প্রথম পড়তে দেব—কাকাবাবুকেই প্রথম বলেছি তো বইটার কথা! শুনলি তো কত উৎসাহ দিলে, কত উপদেশ দিলে! এই রকম লোক পাড়ায় আর দু'একটা থাকলে আমার ভাবনা—! কী রে কথা বলছিস্ না কেন? বল্, কথা বল্?

তারপর হঠাৎ থেমে কিরণ বললে—হ্যাঁ, ভালো কথা, ওই মেয়ে দুটোকে মেম্বার করেছিস্?

দীপঙ্কর বললে—করেছি, কিন্তু তুই অত কথা বলিস্ নি, তোর অসুখ বেড়ে যাবে ভাই!

—করেছিস্? মেম্বার করেছিস্ তুই? দু'জনে কত দিলে?

—দু'জনে নয়, একজন!

কিরণ বললে—একজন কেন? দু'জনে হলো না? ভারি কিপ্‌টে আছে তো মেয়েগুলো—

দীপঙ্কর বললে—এখন শুধু ছোট মেয়েটা হয়েছে, ওই ধর নাম সতী! পরে বড় মেয়েটাকেও মেম্বার করে নেব—বড় মেয়েটাই বেশি ভালো, জানিস—তার নাম লক্ষ্মীদি! শুনলাম ওই বড় মেয়েটার এবার বিয়ে হয়ে যাবে ভাই—

—তাহলে বিয়ের আগেই মেম্বার করে নে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তখন কি আর পাত্তা পাওয়া যাবে? তখন ছেলেমেয়ে হয়ে সে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে!

দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বললে—বিয়ের পর কি অন্যরকম হয়ে যায়?

কিরণ বললে—তা হবে না? বিয়ের পর কি মনে করেছিস তোর সঙ্গে এইরকম রগড়া-রগড়ি থাকবে? দেখবি চিনতেই পারবে না তোকে। তখন নিজের বর নিয়ে মেতে থাকবে কিনা! তারপর, একবার ছেলেমেয়ে হতে আরম্ভ করলে আর বন্ধ হবে না। তখন ছেলেমেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ নিয়ে তোর কথা মনে রাখবার ফুরসুতই পাবে না একেবারে! তখন লাইব্রেরীর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবে—

দীপঙ্কর কিছু বলতে পারলে না মুখ দিয়ে। লক্ষ্মীদি অন্যরকম হয়ে যাবে? একেবারে অন্যরকম? অন্যরকম হয়ে গেলে চেহারাটা কী-রকম দেখাবে তাই-ই যেন সে কল্পনা করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু লক্ষ্মীদি কখনও অন্যরকম হতে পারে? লক্ষ্মীদি যে তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। আর ভালবেসে বিশ্বাস করে বলেই তো তার কাছে সব কথা বলে।

কিরণ বললে—ভজুদাকে তোর কথা বলেছি, জানিস্—ভজুদা তোকে একদিন নিয়ে যেতে বলেছে—

তারপর একটু থেমে বললে—আমাদের মত যত ছেলে দলে জোটে ততই ভালো, ভজুদার দলে কত ছেলে যে আছে আমাদের মত না, তার ঠিক নেই, সব হিমালয়ে তৈরি হচ্ছে, বুঝলি, ভজুদা একবার ডাকলেই সব হুড় হুড় করে নিচে নেমে চলে আসবে—

তারপর কিরণ একলাই বলে যেতে লাগলো। ক'টা আর ব্রিটিশ আছে ভারতবর্ষে, সব বাঙালী ছেলেরা যদি একবার রুখে দাঁড়ায়, তখন সব ব্রিটিশরা তো পাঁই পাঁই করে দৌড় দেবে নিজের দেশে। দেখছিস্ না, যত ভাল-ভাল বাড়ি, ভাল-ভাল গাড়ি, যত ভাল-ভাল জিনিস সব ওরা ভোগ করছে আমাদের ঘাড়ে চড়ে, আর আমরা নিজেদের দেশে ওদের গোলাম হয়ে বাস করছি। এই যে আমার বাবার অসুখ, সারছে না, ওষুধ পাচ্ছে না, এই যে তুই, পরের বাড়িতে তোর মা ভাত রেঁধে তোকে মানুষ করছে, তুই ভিক্ষে করে লেখাপড়া চালাচ্ছিস,

এর জন্য দোষী কে বল্‌তো? কখনও ভেবেছিস এসব কথা? কেন আমরা খেতে পাই না, আর ওদিকে কেন ওরা আরাম করে ফুর্তি করবে? কেন আমাদের দেশের লোক পুলিস হয়ে ওদের হুকুমে আমাদের মাথায় গুলী ছোঁড়ে? কেন চৌরঙ্গীতে অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর কালিঘাটে কেন এত নোংরা নর্দমা? কখনও ভেবেছিস্ এ-সব কথা? কী রে, কথা বলছিস্ না কেন? বল্ ভেবেছিস্?

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—লক্ষ্মীদি কিন্তু ভাই বিয়ে হলেও বদ্‌লাবে না—তুই দেখে নিস্—

কিরণ অবাক হয়ে গেছে। দীপঙ্করের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে বললে—তুই এখনও ওই কথা ভাবছিস্ নাকি?

দীপঙ্কর বললে—না, লক্ষ্মীদি তো ঠিক সাধারণ মেয়ের মত নয়!

—সাধারণ মেয়ের মত নয়?

দীপঙ্কর বললে—তুই তো দেখেছিস্, তুই-ই বল্—লক্ষ্মীদি কি সাধারণ মেয়ের মত?

কিরণ বললে—সাধারণ মেয়ে নয় তো কী? দুটো কান, একটা নাক—যা সব মেয়ের থাকে তাই-ই, আবার অসাধারণ কী আছে লক্ষ্মীদির মধ্যে?

দীপঙ্কর বললে—না, সব মিলিয়ে একটা লাবণ্য আছে না?

কিরণ বললে—ও বাবা, তুই আবার কবিত্ব করছিস্ যে! তুই দেখছি মুখ দেখে সব ভুলে গেছিস্—

দীপঙ্কর বললে—না ভাই, তুই জানিস না, বড় কষ্ট লক্ষ্মীদির, মনে করে দ্যাখ্ নিজের বাবা, নিজের বোন তারাও দেখতে পারে না লক্ষ্মীদিকে—কত ভীষণ কষ্ট বল্ দিকিন—

কিরণ রেগে গেল এবার। বললে—দেখ, আমার কাছে মেয়েদের গল্প আর করবিনি, মেয়েদের কথা ভাবাও পাপ, মেয়েদের সঙ্গে মেশাও পাপ—ভজুদা বলে, এই বয়েসে মেয়েদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যায়—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো বেশি মেলামেশা করি না ভাই—

—হ্যাঁ, ভালো কথাই বলছি, বেশি মেলামেশা করবি না,—ওতে কাজকর্ম সব পণ্ড হয়ে যায়—ওরা কাজ পণ্ড করবার যম—

—না আমি তো সব কাজকর্ম করি, লেখাপড়াও করি, বাজার করি। আর ওদের বাড়িতে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা কী জানিস্—ওই কাকাবাবুকে ধরে একটা চাকরি যোগাড় করা—

মনে আছে তখন দীপঙ্কর অন্তত সেই কথাটাই বলতো নিজের মনকে। ভালো তার লাগতো ওদের বাড়িতে যেতে, ভালো লাগতো লক্ষ্মীদিকে দেখতে, সতীকে দেখতে—কিন্তু আসলে সেটা যেন ছিল গৌণ। আসলে চাকরিই তো

তার দরকার ছিল। চাকরি হচ্ছিল না বলেই পড়া, চাকরি হচ্ছিল না বলেই লাইব্রেরী, চাকরি হচ্ছিল না বলেই আর সব কিছু।

মনে আছে সকাল হতো আর দীপঙ্করের মনটা ছটফট্ করতো সমস্ত ক্ষণ। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চেতনার স্পন্দনের সঙ্গে যেন ওই সতী আর লক্ষ্মীদি জড়িয়ে গিয়েছিল। কেন যে তাকে তারা অমন করে আপন করে নিয়েছিল, কেন যে তাদের জীবনের নাটকের সঙ্গে সেও ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গিয়েছিল, কেন যে সে তার জীবনের অতখানি আগ্রহ ওদের জন্যে ব্যয় করতো—কে তার কারণ বলে দেবে। কোথাকার মেয়ে দু'জন, কোথাকার কোন বর্মার ভুবনেশ্বর মিত্র, কোথায় তাঁর কাঠের ব্যবসা, কোথায় তাঁর বন্ধু শচীশবাবু—কে তাদের চিনতো যদি তারা উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে এসে বাড়ি ভাড়া না নিত। তাদের তো ভবানীপুরের ভদ্রপাড়ায় থাকবার কথা। তাদের তো বৌবাজারের শ্যামবাজারের বড়লোকদের পাড়ায় থাকবার কথা। কেন, কোন্ দুর্ভেদ্য কারণে তারা এসে থাকতে গেল কালিঘাটের নোংরা ঘিঞ্জী পাড়ায়, থাকতে গেল অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়িতে। তারা যদি না আসতো ওখানে তো কী ক্ষতি হতো তাদের? আর তাদের সঙ্গে পরিচয় না হলে দীপঙ্করেরই বা কী ক্ষতি হতো। ক্ষতি! ক্ষতির কথা মনে হলেই দীপঙ্কর কেমন শিউরে উঠতো! সতীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ক্ষতি যদি কিছু হয়েই থাকে—লাভ কি কিছুই হয়নি? লাভ কি কিছুই সে পায়নি জীবনে? আজ এতদিন পরে সেই পুরোন দিনের কথাগুলো ভাবতে গিয়ে দীপঙ্করের মনে হলো সেদিনকার সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোথায় যেন তার ভাগ্যদেবতার বিরাট একটা ষড়যন্ত্র ছিল। নইলে......

মনে আছে সেই রাত্রেই লক্ষ্মীদি তাকে আবার ডেকেছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত্রে দীপঙ্কর যখন উঠোনের কোণে আমড়া গাছটার তলায় ঘটি নিয়ে মুখ ধুচ্ছে, তখন। কিরণের কাছ থেকে ফিরতে তার রাত হয়ে গিয়েছিল। কিরণের সঙ্গে থাকলে তার সত্যিই সময়ের জ্ঞান থাকতো না।

কতবার দীপঙ্কর বলেছিল—আমি এবার আসি রে—

কিরণ বলেছিল—বোস্ না, বাড়িতে গিয়ে কী করবি এখন—এখানে আমার সঙ্গে কথা বললে তবু একটা কাজের কাজ হবে—

দীপঙ্কর বললে—তোর সঙ্গে মিশতে তোর সঙ্গে কথা বলতে তো আমার ভালই লাগে—কত যে ভাল লাগে তা তুই জানিস না—

—তা হলে উঠে যাচ্ছিস্ কেন?

দীপঙ্করের বলতে যেন কেমন একটু সঙ্কোচ হলো। বললে—সবাই যে বারণ করে ভাই তোর সঙ্গে মিশতে—

—কেন, আমি তোর কী সর্বনাশ করেছি? আমি তোর কী ক্ষতি করেছি? তুই-ই বল?

ক্ষতি! সত্যিই তো। সেদিনও দীপঙ্করের সামনে কিরণ সেই একই প্রশ্ন তুলেছিল। অথচ লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে হিসেব-নিকেশ করবার কথা তখন তো মনে আসেনি তার। কিরণ সত্যিই তার কিছু ক্ষতি করেছে কি? ক্ষতির কথা ভাবলেই দীপঙ্করের লাভের কথাটা মনে পড়ে। জীবনে ক্ষতির খতিয়ান কষতে গেলে বার বার তার মনে হয়েছে—সংসারে ক্ষতি বলতে বোধ হয় কিছুই নেই। ক্ষতির দিকটা কে যেন বরাবর লাভের অঙ্ক দিয়ে বিচিত্র উপায়ে পুষিয়ে দিয়েছে! কেমন করে পুষিয়ে দিয়েছে সে-কথা ভাবলেও যেন অবাক হয়ে যেতে হয়—

দীপঙ্কর বলেছিল—তুই যেন কিছু মনে করিস নি ভাই—

কিরণ বলেছিল—দূর, ও-সব মনে করলে আমার চলবে না—ও-রকম মেয়েলিপনা আমার নেই—মিশবি-মিশবি না-মিশবি না-মিশবি, আমার তাতে বয়ে গেল—

কিরণের কথাটা শুনে কেমন যেন মনে সেদিন কষ্ট হয়েছিল দীপঙ্করের বলেছিল—আমি না মিশলে তোর একটুও কষ্ট হবে না কিরণ? কিছুছু কষ্ট হবে না?

কিরণ সেই বিছানায় শুয়ে শুয়েই হেসেছিল। বলেছিল—কষ্ট? কষ্ট কেন হবে? আমার কষ্ট-ফষ্ট হয় না ভাই—তুই না মিশলে অনেক লোক আছে মেশবার—কোটি কোটি লোক আছে পৃথিবীতে। পৃথিবীটা কি এত ছোট ভেবেছিস? তুই না মিশলে কীসের কষ্ট? তুই যদি না মিশিস, তুই যদি মরেও যাস্ তাতেও আমার কষ্ট হবে না—

—হবে না? দীপঙ্কর অবাক হয়ে চেয়ে ছিল কিরণের দিকে।

—না, শুধু তুই কেন, আমার বাবা মরে গেলেও কষ্ট হবে না, আমার মা মরে গেলেও কষ্ট হবে না—আমার কারোর অভাবেই কোনও কষ্ট হবে না। আগে হতো কষ্ট! সি আর দাশ মরে যাবার দিন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল আমার কান্না পেয়েছিল—প্রথম প্রথম ছোটবেলায় বাবার কষ্ট দেখে আমার কান্না পেত, মা'র দুঃখ দেখলে আমার কান্না পেত, খেতে না পেলে আমার কান্না পেত—শেষকালে এখন বুঝতে পেরেছি কান্না মানে মেয়েলিপনা—

—সে কী রে?

—হ্যাঁ, কান্না পাওয়া মানে হেরে যাওয়া। এ-সংসারে যে কাঁদে সে হেরে যায়—

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনও কথা বেরোয় নি। কিরণের কথাগুলো শুনে কিরণকে যেন বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল—কিরণ যেন বড় হৃদয়হীন! বড় অকরুণ, বড় নির্মম।

কিরণ বলেছিল—নইলে আমার মতন অবস্থায় পড়লে যে-কোনও লোক গলায় দড়ি দিত, গঙ্গায় ঝাঁপ দিত—রেলের চাকার তলায় মাথা দিত জানিস—

কিন্তু অত সহজে হেরে গেলে তো চলবে না, অত সহজে আমি বেটাকে ছাড়ছি না—

—কোন্ বেটাকে?

কিরণ হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—এই জীবন বেটাকে! বেটা বড় পাজি নচ্ছার রে—

কিরণের হাসির সামনে দীপঙ্কর যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সেই সেদিনই প্রথম দীপঙ্কর জানতে পেরেছিল জীবনের রহস্য। মনে হয়েছিল যেন জীবনটাকে কিছু কিছু বুঝতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করতে পারছে, উপলব্ধি করতে পারছে।

—হ্যাঁ রে, ও বেটা যত দাও তত নেবে, বেটা বড় লোভী, ওর খাঁকতির শেষ নেই, বেটাকে যত খোশামোদ করবি তত বেটার পায়া ভারি হবে—! যত দিবি তত বলবে—আরো দাও—। যত কাঁদবি তত বলবে—আরো কাঁদো—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার বড় কষ্ট হয় ভাই, সব তাতে আমি বড় কষ্ট পাই—কাকাবাবু যখন তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করলে আমায়, তখন আমার খুব কষ্ট হলো ভাই—এত কষ্ট হলো সে তুই বুঝবি না কিরণ! এখন তোকেই জিজ্ঞেস করছি—আমি কাকাবাবুর কথা শুনবো, না তোর কথা শুনবো!

কিরণ বললে—যা তোর খুশি তাই করবি! আমাকে জিজ্ঞেস করছিস্ কেন? তুই আমার কথা না-শুনলে আমার কিছুছু কষ্ট হবে না—বড় জোর লাইব্রেরী উঠিয়ে দেব—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছে ভাই আমি তোর কথা শুনবো—

—তাহলে তাই-ই কর—তাহলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিস্ কেন?

—কিন্তু আবার মনে হচ্ছে কাকাবাবুর কথা না শুনলে যদি আমাকে চাকরি না দেয়? জানিস্, সবাই আমাকে তোর সঙ্গে মিশতে বারণ করে, আমার মা বারণ করে, কাকাবাবু বারণ করে, কাকীমা বারণ করে, লক্ষ্মীদি বারণ করে, সতী বারণ করে—ভাই, কেউ তোকে দেখতে পারে না—কেন যে দেখতে পারে না বুঝতে পারি না—

—ওঃ, বাঁচা গেল, তোর কথা শুনে আশা হলো এবার!

কিরণ সেই অবস্থাতেই উঠে বসলো বিছানার ওপর। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাসতে লাগলো পেট ভরে।

বললে—ওঃ, খুব ভালো হলো মাইরি। আর ভয় নেই—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে কিরণের মুখখানা যেন হঠাৎ বদলে গেল। হঠাৎ যেন বড় সুন্দর দেখাতে লাগলো কিরণকে। যেন সুস্থ হয়ে উঠলো কিরণ এক নিমেষে। বললে—আর ভয় নেই রে দীপু—আর ভয় নেই—কেল্লা মার দিয়া—

কিরণের এই হঠাৎ আনন্দে যেন দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল। কেউ দেখতে

পারে না শুনে এমন আনন্দ হবে কিরণের তাতো ভাবেনি দীপঙ্কর। দীপঙ্করের তো ভাবনাই হয়েছিল—কেমন করে কথাটা পাড়বে, কেমন করে কথাটা তুলবে প্রথমে। কিন্তু সব শুনে যে এমন লাফিয়ে উঠবে কিরণ তা তো ভাবেনি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর বললে—কিরণ, কিরণ—কী হলো রে তোর?

কিরণ বললে—আনন্দ হবে না, কী বলছিস্ তুই?

হঠাৎ ডেকে উঠলো—মা—মা—

কেমন যেন কিরণের ব্যবহার দেখে অবাক লাগলো দীপঙ্করের। কিরণের মা তখনও বাইরে দাওয়ার ওপর অন্ধকারে বসে পৈতে কাটছিল। ঘরে এল ডাক শুনে। বললে—কী? কী হলো আবার?

কিরণ বললে—মা, দীপু একটা খুব ভাল খবর এনেছে—শোন—

মাও কিছু বুঝতে পারলে না। দীপঙ্করও কিরণের কথা কিছু বুঝতে পারলে না।

মা বললে—কী খবর?

বলে দীপঙ্করের মুখের দিকে চাইলে। ছেলের চাকরির খবর? ছেলের টাকা পাওয়ার খবর? পৃথিবীতে টাকার খবর ছাড়া আর কী সুখবর থাকতে পারে! পৃথিবীতে টাকাই তো সব। টাকা থাকলেই তো সব থাকা হয়। টাকা ছাড়া আর কিছু আছে নাকি সংসারে!

—কী খবর বাবা দীপু? কিরণের চাকরির খবর?

কিরণ বললে—শোন না মা দীপু কী বলছে! সবাই নাকি আমাকে ঘেন্না করে, কেউ নাকি আমাকে দেখতে পারে না—ওঃ, এতদিন পরে তবু যা হোক অসুখটা একটু সারলো মা, আর ভাবনা নেই আমার—

মা যেন কেমন হতাশ হলো। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—শুনলে তো কথা ওর?

দীপঙ্কর কী বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। মা বলতে লাগলো—তোমরা দেখ দিকিনি কেমন! তোমার মা'র কপাল ভাল, অনেক পুণ্যি করেছিল তোমার মা, তাই তোমার মত ছেলে পেয়েছে। কেমন পাশ করলে তুমি, লেখাপড়া করছো, আবার চাকরিও পাবে! আর আমার যে কী কপাল!

বলে মা আবার বাইরে চলে গেল। বোধ হয় তার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

কিরণ বললে—মা তো সেকেলে মানুষ, লেখাপড়া জানে না তো, কেবল পৈতে কাটতে পারে—তাই শুনে কেঁদে ফেললে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু চাকরি তো একটা করতে হবে তোকে? চাকরি না করলে এ-সংসার চালাবি কী করে?

কিরণ বললে—এবার ঠিক চালাবো, দেখিস্, আর ভয় নেই—যখন কেউ

আমায় দেখতে পারে না, যখন সব্বাই আমাকে ঘেন্না করে, তখন চালাতে আর ভয় কীসের রে? প্রাণের টান যখন আর রইল না, চক্ষুলজ্জার বালাইও যখন আর রইল না—তখন আমাকে আর পায় কে রে? আমি তো এখন রাজা, যা খুশি তাই করবো—

বলতে বলতে কিরণ যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো।

বললে—আর কাকে পরোয়া করি আমি! লজ্জাও রইল না আর, ভয়ও রইল না আর—কেউ আর আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না, আমিও কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাবো না! ভালোই হলো—তুইও আমার সঙ্গে আর মিশিস্ নি—তুইও আর আসিস্ নি আমাদের বাড়িতে—তুইও আর আমার সামনে মুখ দেখাস্ নি—ভালোই হলো—ভালোই হলো রে দীপু—শুধু একটা কাজ করিস তুই—

কাজ! দীপঙ্কর বললে—কী কাজ? বল্ না তুই! আমি এখখুনি করব ভাই—তোর জন্যে আমি সব করবো। বল্, কী কাজ?

কিরণ বললে—সব করতে হবে না, একটা কাজ করলেই চলবে—সেই দাতারকে মনে আছে? সেই এস এস দাতার? তোদের ভাড়াটেদের মেয়েটার সেই চেনা লোকটা?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। এস এস দাতার! লক্ষ্মীদির শম্ভু?

বললে—হ্যাঁ, খুব মনে আছে! কী হলো তার?

—সেই অনেকদিন আগে, পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছিল, মনে আছে?

দীপঙ্কর বললে—খুব মনে আছে। কেন, কী হলো তার? দেখা হয়েছিল নাকি তোর সঙ্গে—

কিরণ বললে—না ভাই, সেই নোটটা অচল—

—অচল!

দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়লো। অচল নোট দিয়েছে তাদের! অত খাওয়ালে, অত খাতির করলে অত উপদেশ দিলে তাদের দু'জনকে! অত ভাল-ভাল কথা শোনালে। আসলে এমন জোচ্চোর? এমন বদমাইশ লোকটা! কী আশ্চর্য! আশ্চর্য হয়ে গেল দীপঙ্কর। পৃথিবীতে কি কাউকে বিশ্বাস নেই! সেই শম্ভু দাতার। তার জন্যে কতদিন দীপঙ্কর কত কী করেছে, কত বৃষ্টিতে ভিজেছে, কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'-পা ব্যথা করে ফেলেছে—সেই শম্ভু দাতার ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকালে!

দীপঙ্কর বললে—আমি কালকেই লক্ষ্মীদিকে খুব শুনিয়ে দেব ভাই—বলবো তোমার লোকটা ভালো নয়—ওর সঙ্গে তুমি মিশো না লক্ষ্মীদি, লোকটা বদমাইশ—এমন করে ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকালে আমাদের—

কিরণ হাসছিল। দীপঙ্কর বললে—তুই হাসছিস, আমার কিন্তু খুব রাগ হচ্ছে ভাই—! লক্ষ্মীদিটা কী? ওই রকম লোকের সঙ্গে মেশে লক্ষ্মীদি? ওই জন্যেই অত কষ্ট ওর, ওই জন্যেই তো কেউ দেখতে পারে না লক্ষ্মীদিকে, ওই

জন্যেই তো লক্ষ্মীদির বাবা ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে—দাঁড়া, আমি এখুনি যাচ্ছি, এখুনি গিয়ে বলবো—

বলে দীপঙ্কর উঠছিল। কিরণ থামিয়ে দিলে। তখনও হাসছে কিরণ।

দীপঙ্কর বললে—তুই তবু হাসছিস ভাই—কিন্তু আমার রাগ হচ্ছে খুব—

কিরণ বললে—তার চেয়ে এক কাজ কর; টাকাটা নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আয়—মিস্টার দাতার তো ঠিকানা দিয়েছিল আমাদের—

দীপঙ্কর বললে—না, লক্ষ্মীদির কাছেই এখুনি যাবো—লক্ষ্মীদিকে গিয়ে কথা শোনাবো, বলবো—তোমরা ভেবেছ আমরা গরীব বলে এমন করে ঠকাবে আমাদের? গরীব বলে আমরা মানুষ নই?

তারপর একটু ভেবে বললে—আচ্ছা দে, টাকাটা দে—টাকাটা লক্ষ্মীদিকেই গিয়ে ফিরিয়ে দেব—

বালিশের তলা থেকে কিরণ হাসতে হাসতে নোটটা বার করে দিলে। দীপঙ্কর নোটটা নিয়েই বাইরে চলে এল। অন্ধকার তখন খুব। নেপাল ভট্টাচার্যি লেনটা এখানে একেবারে সরু হয়ে বস্তির মধ্যে গিয়ে মিশেছে। অন্ধকারটা দীপঙ্করের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে এসে এসে এ-বাড়ির পথঘাট সব চেনা। তবু যেন কেমন ধাক্কা খেলে প্রথমটায়।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে—খোকা—

দীপঙ্কর পেছন ফিরলো। কাউকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু মনে হলো যেন ঝাপসা সাদা মতন কে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায়।

দীপঙ্কর বললে—কে?

সাদা চেহারাটা এবার এগিয়ে এল আস্তে আস্তে। বেশ ভারি গলা। অন্ধকারে স্পষ্ট চেনা যায় না। দীপঙ্করও একটু সামনে এগিয়ে গেল। একটু যেন স্পষ্ট হলো চেহারাটা তখন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। আন্দাজে মনে হলো লোকটা খুব ফরসা—ভয়ানক ফরসা। পাঞ্জাবী পরেছে, ধুতি পরেছে, চকচকে পাম্পশু পরেছে—। দীপঙ্কর সামনে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তবু চিনতে পারলে না। কে? লোকটা তাকে ডাকছে? না আর কাউকে?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আমাকে ডাকছেন?

—তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

বেশ ভারি গম্ভীর গলা। ভরাট জমজমাট গলার স্বর। আওয়াজ শুনে দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চমকে উঠলো।

বললে—কেন? আপনি কে?

লোকটা বললে—কোথায় গিয়েছিলে তুমি এত রাত্রে?

দীপঙ্কর বললে—কিরণ, আমার বন্ধু কিরণদের বাড়িতে—কিরণের খুব অসুখ কিনা তাই একবার দেখতে গিয়েছিলাম তাকে—

—তুমি রোজ যাও?

—না, কোনও দিন যাই না, আমাকে সবাই যেতে বারণ করে ওদের বাড়িতে—

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোথায় থাকো?

কোথায় থাকে দীপঙ্কর, কোথায় পড়ে, কী করে, বাড়ির ঠিকানা, বাড়িতে কে কে আছে, কোথায় দেশ—নানান্ কথা জিজ্ঞেস করলে লোকটা। কিন্তু কিছুতেই নিজের পরিচয় দিলে না। বিরাট চেহারা লোকটার। লোকটার সামনে দীপঙ্করের নিজেকে যেন বড় ছোট, বড় অকিঞ্চিৎকর মনে হলো। দীপঙ্কর উত্তর দিতে যেন বড় ভয় পেয়ে গেল। এত রাত্রে এখানে এই বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত খোঁজখবর নিচ্ছে কেন? এত করে জেরা করছে কেন?

লোকটা কথা বলতে বলতে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দিকে ফিরে এল। দীপঙ্করও পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। একটু যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো তার। লোকটা কে? ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের রাস্তায় আলোর তলায় আসতেই দীপঙ্কর চেহারাটা দেখে আরো ভয় পেয়ে গেল। কী ফরসা, ধপধপে ফরসা গায়ের রং। যেন ঠিক সাহেবদের মতন। সাহেবের মতন মাথার চুল লাল। আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছে, পাঞ্জাবির হাতা গিলে-করা। কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্পশু।

উনিশের একের বি, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়ির সামনেটায় আসতেই দীপঙ্করের যেন সাহস ফিরে এল বুকে। দরকার হলে দীপঙ্কর বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। আর কেউ তাকে ধরতে পারবে না, কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না।

দীপঙ্কর বাড়ির দরজার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

আর লোকটা সোজা চলতে লাগলো রাস্তাটা ধরে। রাস্তা ধরে এঁকে বেঁকে যেতে যেতে নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের ওপর পড়তেই আর দেখা গেল না তাকে। দীপঙ্কর খানিক সেই দিকে চেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মা বললে—হ্যাঁরে, এতক্ষণ কিরণদের বাড়িতে বসে কী করছিলি রে? দেখা করেই তো চলে আসতে হয়—

দীপঙ্কর বললে—অসুখ করেছে ওর, আর গিয়েই চলে আসতে পারি আমি—

সেদিন মা আর বেশি কিছু কথা বললে না। বিন্তীদির বিয়ের ব্যাপার নিয়েই বোধহয় ব্যস্ত ছিল। নিজের মনেই যেন অনেক আয়োজন করছে মা। কারা বুঝি কবে দেখতে আসবে। কোথায় তাদের বসাবে কোথায় তাদের খাওয়াবে, কী তাদের বলবে, কী পরাবে বিন্তীদিকে—এই সব অনেক ভাবনা মা'র। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির বাড়ির জানলাটার দিকে চেয়ে দেখলে। আলো

জ্বলছে লক্ষ্মীদির ঘরে। হয়ত পড়ছে—নিচের ঘরগুলোতেও আলো জ্বলছে। এখনও কেউ ঘুমিয়ে পড়েনি ও-বাড়িতে। অন্য এত সকাল-সকাল তো ওরা কোনওদিন ঘুমোয়ও না। কাকাবাবু আছে তেতলার ঘরটাতে। এখুনি একবার দৌড়ে ভেতরে গেলে হয়। গিয়ে শুধু বলে আসবে কথাটা। টাকাটাও ফেরত দিয়ে আসবে। দরকার নেই ও-টাকার। ও-টাকাটার ওপরেই যেন ঘেন্না ধরে গেছে দীপঙ্করের। কিন্তু সতী যদি থাকে! সতীর সামনে তো কথাটা বলা যাবে না লক্ষ্মীদিকে। এখন ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীদিও আছে, সতীও আছে। দু'জনেই এক ঘরে থাকে, এক ঘরে পড়ে, এক ঘরে শোয়। এখন যদি দীপঙ্কর গিয়ে হাজির হয়, তো হয়ত আবার সেদিনকার মত কাণ্ড হবে। দু'জনের মধ্যে আবার ঝগড়া বেধে যাবে দীপঙ্করকে নিয়ে। আবার লক্ষ্মীদি তাকে বকুনি দেবে, যা-ইচ্ছে-তাই বলবে, সতীর সামনেই দীপঙ্করকে অন্যায়ভাবে অপমান করে বসবে। তখন আর দীপঙ্করের মুখ থাকবে না কথা বলবার। তখন? তখন কী হবে?

শেষ পর্যন্ত ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল লক্ষ্মীদির সঙ্গে।

খেয়ে উঠে আমড়া গাছতলাটার আঁচাতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ্মীদির গলা শোনা গেল।

—এই শোন!

দীপঙ্কর যেন এই ডাকটাই আশা করছিল এতক্ষণ। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললে—লক্ষ্মীদি, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম—তোমাদের বাড়ির ভেতর তখন থেকে যাবো-যাবো করছিলাম—ভয়ানক দরকার ছিল!

—আমি লক্ষ্মীদি নই, আমি সতী!

যেন আকাশ ভেঙে হঠাৎ সামনে বাজ পড়লো। দীপঙ্করের হাত থেকে জলের ঘটিটা উঠোনের ইঁটের ওপর পড়ে ঝন্ ঝন্ করে একটা আওয়াজ হলো।

সতীর চেহারাটা তখন চোখের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। সতীর মুখটা যেন ভীষণ গম্ভীর। চেহারাটার দিকে চেয়ে দীপঙ্করের ভীষণ ভয় করতে লাগলো। দীপঙ্কর বলতে গেল—আমি ভেবেছিলাম......

সে-কথায় কান না দিয়ে সতী হঠাৎ বললে—লক্ষ্মীদি কোথায় গেছে জানো তুমি?

—লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি কোথায় গেছে? বাড়িতে নেই?

দীপঙ্করের চমকে ওঠা যেন তখনও শেষ হয়নি।

সতী বললে—না সকাল বেলা কলেজে গেছে, এখন রাত দশটা বেজে গেল, এখনও ফেরেনি—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেছে তুমি জানো কিছু?

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে এতক্ষণে কথা বেরোল। বললে—সত্যি বলছি আমি

তো জানি না কিছু—

—তাহলে গেল কোথায় লক্ষ্মীদি? নিশ্চয় তুমি জানো!

দীপঙ্কর বললে—কোথায় গেল তা আমি কী করে জানবো, বারে—যেখানে যায়, আমাকে কি বলে যায়? আমিই বরং লক্ষ্মীদিকে খুঁজছিলাম, লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা করবো ভাবছিলাম এখন—

সতী যেন কী ভাবতে লাগলো নিজের মনে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এমন করে তো লক্ষ্মীদি কখনও যায় না, এত রাত তো করে না কখনও—!

সতী এবার ভেতরেই চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্করই ডাকলো। বললে—শোন—

দীপঙ্কর দরজার ভেতরে এগিয়ে এল এবার। বললে—লক্ষ্মীদি যদি আজ আর না ফেরে তো কী হবে?

সতী বললে—সে তোমায় ভাবতে হবে না—

দীপঙ্কর আবার বললে—আমি একবার খুঁজতে যাবো?

সতী বললে—এত রাত্রে তুমি কোথায় খুঁজতে যাবে?

তাইতো! এত রাত্রে দীপঙ্কর কোথায়ই বা খুঁজতে যাবে! কোথায় গেলে লক্ষ্মীদিকে পাওয়া যাবে। কোথায়ই বা যাওয়া লক্ষ্মীদির পক্ষে সম্ভব! দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদির কলেজে গিয়ে একবার খোঁজ নেব আমি?

সতী বললে—না কলেজে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল, আজ লক্ষ্মীদি কলেজেই যায়নি।

—কলেজে যায়নি? সেকি? কলেজে যায়নি তো খেয়ে দেয়ে সকাল বেলা কোথায় গেল?

সতী বললে—সে তোমায় অত ভাবতে হবে না দীপু—কাকাবাবু খুঁজতে গেছেন—

বলে সতী ভেতরে চলে গেল। দীপঙ্কর সেখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াল। লক্ষ্মীদি কোথায় গেল তাহলে! কোথায় যেতে পারে! কোথায় যাওয়া সম্ভব লক্ষ্মীদির পক্ষে।

কলেজ যাবার পথে একবার নৃপেনবাবুর বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। মা-ই একবার যেতে বলেছিল। মাঝে মাঝে না মনে করিয়ে দিলে লোকে তো আর সেধে কারোর উপকার করে না। সংসার অত সোজা জায়গা নয়—সংসারের মানুষরাও অত সহজ নয়। বার বার বসতে হবে, বার বার খোশামোদ করতে হবে, বার বার দেখা করতে হবে, তবে যদি কাজ হয়।

নৃপেনবাবু চিনতে পারলেন তবু যা হোক। বললেন—এখন এলে? এখন যে আমার কথা বলবার সময় নেই হে—

দীপঙ্কর বললে—মা-ই আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে বললে কিনা—মা-ই পাঠালে আমাকে—

—তাহলে তোমার আর আসবার দরকার নেই, তোমার মা-কেই বরং পাঠিয়ে দিও একবার—

দীপঙ্কর চলেই আসছিল। নৃপেনবাবু আবার ডাকলেন। বললেন—ওহে ছোকরা, শুনে যাও—

ছোকরা ডাকটা বরাবর খারাপ লাগে দীপঙ্করের। তবু কাছে এগিয়ে গেল:

নৃপেনবাবু বললেন—তোমার মা'কে বোল, এখন তিন-চারটে পোস্ট খালি হয়েছে, দু-চার দিনের মধ্যেই লোক নেওয়া হবে—

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা তাই বলবো—

নৃপেনবাবু তবু ছাড়লেন না। বললেন—একটু তাড়াতাড়ি করতে বোল তোমার মাকে—বুঝলে, বাজার তো খারাপ, আর ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, তা তো জানো—

কথাগুলো ভালো লাগেনি দীপঙ্করের। সামান্য পঁচিশটা টাকা। নৃপেনবাবুর কাছে পঁচিশটা টাকা কী এমন বেশি! কিন্তু মা কোথা থেকে যোগাড় করবে। আর কোথাও করলেও ও-চাকরি করবে না দীপঙ্কর। ও-তো ঘুষ!

রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলেছে। বাসও চলেছে। নতুন নতুন সব বাস হয়েছে রাস্তায়। কোনওটার নাম 'উর্বশী' কোনওটার নাম 'মেনকা', কোনওটার নাম 'শকুন্তলা', সব মেয়েদের নাম। বাসের গায়ে মেয়েদের নাম দিলে কী বেশি ভিড় হয়! বাসগুলো হু-হু করে ট্রামের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর দীপঙ্কর হাঁ করে চেয়ে থাকে। এদিকে আরো লোকজন বেড়ে গেছে। আগে সন্ধ্যেবেলাটার দিকে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেত। তারপর ট্রাম লাইন হলো এদিকে। কাওড়াতলার দিক থেকে মস্ত চওড়া রাস্তা বেরোল সোজা। বড় বড় পুকুর বুজিয়ে ফেলা হলো। সেই রাস্তা টিকেপাড়ার মোড় ছাড়িয়ে হাজিকাশিমের বাজারটা বাঁয়ে রেখে একেবারে সোজা বালিগঞ্জের স্টেশনের দিকে গিয়ে পৌঁছলো। ধান ক্ষেত, মাঠ, ধোপাপাড়া, আগুনখাকীর পুকুর, টিপু সুলতানের বাড়ি—সব যেন রাতারাতি অন্য রকম দেখতে হয়ে গেল। অন্য রকম চেহারা! যখন প্রথম প্রথম রাস্তা তৈরি হতো দীপঙ্কর গিয়ে সামনে দাঁড়াত। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো কুলীদের—হ্যাঁগো, এখানে কী হবে?

কুলীরা বলতো—রাস্তা হবে, রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলবে—

দীপঙ্কর বললো—এদিকটাও শ্যামবাজার হয়ে যাবে নাকি?

এদিকটা শ্যামবাজার, বৌবাজার, শেয়ালদার মতন হলে কেমন দেখাবে সেইটেই যেন কল্পনা করতে চেষ্টা করতো দীপঙ্কর। তখন আর এই পচা পুকুর থাকবে না শেতলাতলার সামনে। তখন আর ভূতের ভয় করবে না। টিপু সুলতানের বাড়িটার সামনে দাঁড়ালে আগে ভয় করতো। বড় বড় অশ্বত্থগাছের

শেকড় সারা বাড়িটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল—ওখানে আলোয় আলো হয়ে যাবে একদিন। আশ্চর্য! কত ভুল ধারণাই ছিল একদিন দীপঙ্করের। একদিন ধারণা ছিল টিপু সুলতান বুঝি ওই বাড়িতেই ছিল এককালে। কিন্তু বড় হয়ে সে-ভুল ভাঙলো। টিপু সুলতান নয়, টিপু সুলতানের ছেলেরা থাকতো এই বাড়িতে। ছোটবেলায় কত ভুল ধারণাই যে থাকে মানুষের। বড় হয়ে সে-সব কথা ভাবলে হাসি পায়।

কুলীরা বলতো—এখান থেকে সরে যাও বাবু, ধুলো লাগবে গায়ে—

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত কত দিন কত রকমভাবে এইখানে কাটিয়েছে দীপঙ্কর। চোখের সামনে সেই রসা রোড, সেই বালিগঞ্জ, সেই টালিগঞ্জ কী হয়ে গেল—আর যেন চেনা যায় না কিছু।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও ভাঙবে?

তখন দীপঙ্কর ভাবতো ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও যদি কুলীরা ভেঙে ফেলে। যদি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও এমনি করে এদিককার মত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়! তখন কোথায় থাকবে দীপঙ্কর। কোথায় যাবে অঘোরদাদু, কোথায় যাবে বিন্তীদি! আর কোথায়ই বা থাকবে ছিটে-ফোঁটা। তখন আর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন অত সরু থাকবে না। নেপাল ভট্টাচার্যি লেনটার নর্দমাগুলোও বুজিয়ে দেবে। তখন কিরণরা কোথায় যাবে? কোথায় যাবে কিরণের বাবা-মা। ওর বাবার যে অসুখ। ওদের যে টাকা-পয়সা নেই—ওরা কোথায় থাকবে?

আর কাকাবাবুরা! ওদের পয়সা আছে, ওরা অন্য বাড়ি ভাড়া নেবে হয়ত। ওদের ভাবনা নেই, ওদের টাকা আছে, ওরা বড়লোক, ওরা উঠে যাবে ভবানীপুরে চাউলপটিতে—অঘোরদাদুর বড়লোক যজমানদের পাড়ায়। কিম্বা বৌবাজারে কিম্বা শ্যামবাজারে—ভদ্রলোকদের পাড়ায়। যেখানে রাস্তায় নর্দমা নেই, যেখানে দুর্গন্ধ নেই, নোংরা নেই—যেখানে বড়লোকরা থাকে—

সেদিন রাত্রিবেলা সতীর কাছে খবরটা পাবার পরই দীপঙ্কর কেন কেমন হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল!

মা জিজ্ঞেস করলে—কীরে, এখনও ঘুমোস্‌নি তুই?

দীপঙ্কর বললে—ঘুম আসছে না মা—

মা'র পাশেই বরাবর শোওয়া অভ্যাস। ছোটবেলা থেকে মা'র কাছেই শুয়ে এসেছে।

মা বললে—তা সারাদিন রোদ্দুরে রোদ্দুরে টো-টো করে ঘুরবি তো ঘুম আসবে কী করে?

দীপঙ্কর বললে—না মা, সেজন্যে নয়—

—তাহলে কী জন্যে ঘুম আসছে না? কলেজ থেকে সোজা বাড়িতে এলেই পারিস, কলেজ থেকে বেরিয়ে কোথায় যাস শুনি? ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে বুঝি টো-টো করে ঘুরে বেড়াস—

দীপঙ্কর বললে—না মা, কিরণের তো অসুখ, আর তোমাকে না বলে তো ওদের বাড়ি যাই-ই না আমি—তোমাকে জিজ্ঞেস করেই তো আজ গেলুম—

মা চুপ করে গেল। মা'র খুব বুদ্ধি। মা সব বুঝতে পারে। এমন মা পেয়েছিল দীপঙ্কর তাই আজো টিঁকে আছে, বড় হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে। দীপঙ্কর বললে—জানো মা, কী কাণ্ড হয়েছে?

—কী কাণ্ড রে?

দীপঙ্কর কথাটা কাউকে না বলে যেন থাকতে পারছিল না। এমন করে লক্ষ্মীদি চলে গেল—এমন করে সকলকে ভাবিয়ে তুললে! কথাটা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিল না। কিন্তু অন্য কোনও বিপদ-আপদও তো হতে পারে—রাস্তায় কত কী বিপদ হয়। নতুন বাস হয়েছে সব—'উর্বশী', 'মেনকা' 'রম্ভা'—কত রকম নাম সব—রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া বেড়েছে। কত লোক চলতে গিয়ে হঠাৎ চাপা পড়ে যায় গাড়ির তলায়। খুব সাবধানে রাস্তা চলতে হয় আজকাল। হাজরা রোডের মোড়টায় আগে অত ভিড়ই ছিল না। এখন ওখানে বাসগুলো থামে, হুড় হুড় করে লোক নামে তারপর বাসগুলো এসে থামে ঠিক কালিঘাট ট্রাম ডিপোর সামনে। ওখানেই বাসগুলো এসে থেমে যায়। আর যায় না। সব প্যাসেঞ্জার খালি হয়ে যায় ওখানটায়। এদিকে, ওদিকে, বালিগঞ্জের দিকে যেতে গেলে ওইখানে বাস থেকে নেমে হেঁটে যেতে হয়। গাদা গাদা বাস দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে। যদি কোনও বাসের ধাক্কায় মাটিতে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে থাকে। তারপর হয়ত কোনও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীদিকে। হয়ত সেখানেই অজ্ঞান হয়ে রয়েছে এখনও। কিম্বা হয়ত এখন এই রাত্রিবেলা, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, যখন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটাও নিঝুম হয়ে আছে—রাস্তার সেই ঘেয়ো কুকুরটাও আর ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে পাড়া মাত করে না—এখন হয়ত লক্ষ্মীদি একলাই শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

দীপঙ্করের যেন সারা রাতে আর ঘুম আসবে না।

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর উঠলো। মা ঘুমোচ্ছে। একটু শব্দ হলেই টের পাবে। ঘরের ভেতরে অঘোরদাদুর সিন্দুকটা রয়েছে। মা'র ঘুম খুব সজাগ। আলো জ্বাললে টের পাবে মা। দীপঙ্কর উঠে আস্তে আস্তে দরজা খুললে। আবার আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলে। কাকাবাবুদের বাড়িতে তখনও আলো জ্বলছে। আশ্চর্য ওদের বাড়িতে বোধহয় কারো ঘুম আসছে না। কেউ ঘুমোতে পারবে না আজকে। একবার মনে হলো গিয়ে জিজ্ঞেস করে কাউকে। আস্তে আস্তে খিড়কির দরজার দিকে গিয়ে টোকা মারতে পারে। রঘু নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে ওখানে। রঘু শব্দ শুনেই দরজা খুলে দেবে। জিজ্ঞেস করলে হয়—লক্ষ্মীদি ফিরেছে রঘু?

ওপরে যে-ঘরে লক্ষ্মীদিরা ঘুমোয়, সে-ঘরটাতেও আলো জ্বলছে। সতীর বোধহয় ঘুম আসছে না। ঘুম তো আসতেই পারে না। পাশে কাকীমার

ঘরটাতেও আলো জ্বালা। এত রাত পর্যন্ত কারোর ঘুম নেই। কিম্বা হয়ত কাকাবাবু এখনও ফেরেনি। এখনও হয়ত কাকাবাবু খুঁজে বেড়াচ্ছে লক্ষ্মীদিকে।

হঠাৎ যেন একটা কীসের শব্দ হলো। চমকে উঠেছে দীপঙ্কর।

—কে রে? কে রে তুই?

দীপঙ্কর পেছন ফিরতেই দেখলে ফোঁটা। ছিটে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু ফোঁটা বুঝি ফিরলো এখন। ফোঁটা অন্ধকারে পাঁচিল টপকেছে। পাঁচিল টপকে উঠোনে পড়তেই একটা ধপাং করে শব্দ হয়েছে।

—তুই অন্ধকারে এত রাত্তিরে কী করছিস রে ছোঁড়া?

মুখ দিয়ে যেন মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ফোঁটার। কাছে এল, ভালো করে দীপঙ্করের মুখের কাছে মুখ আনল।

—কী করছিস তুই এত রাত্তিরে?

দীপঙ্কর বললে—ঘুম আসছে না—

—ভাত খেইছিস?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

ফোঁটা বললে—বেড়ে আছিস্ তোরা মাইরি, বেড়ে—পরের ঘাড়ে চড়ে বেড়ে আরাম করে ফুর্তি করছিস্? যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। আমার শালার বাড়ি, আমার ঘর, আর আমিই শালা কেউ না—

ফোঁটা চলে যাচ্ছিল। ঘরের ভেতরে ফোঁটার ভাত ঢেকে রেখে দিয়েছে মা। ফোঁটা যাবে ভাত খাবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর ভোর হতে না হতেই আবার বেরিয়ে পড়বে। এই-ই নিয়ম ওদের। বরাবর ছিটে-ফোঁটাদের নিয়মই এই। দুপুরবেলা গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিয়ে বেলা তিনটেয় আবার এসে একফাঁকে খেয়ে যাবে।

কিন্তু কী যে হলো, খানিক দূরে গিয়েই আবার ফিরলো। ফিরে আবার একেবারে মুখ ঘেঁষে দাঁড়াল।

বললে—চার আনা পয়সা আছে তোর কাছে ভাই?

দীপঙ্কর সরে এল পেছনে। বললে—পয়সা তো নেই—

—ওমনি পয়সা নেই? চাইলেই পয়সা নেই ওমনি!

বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল ফোঁটা। কিন্তু আবার কী খেয়াল হলো—আবার ফিরলো।

বললে—একটা বিড়ি দে তো—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—বিড়ি আমি কোথায় পাবো?

ফোঁটা এবার নিজেই অবাক হয়ে গেছে। বললে—একটা বিড়িও দিতে পারবি না?

ফোঁটার মুখের দিকে চেয়ে দীপঙ্করের মনে হলো যেন আকাশ থেকে পড়েছে সে। যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না কথাটা।

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বিড়ি নেই আমার কাছে—

—তুই কীরে? আমাদের ঘাড়ে পড়ে খাচ্ছিস, দাচ্ছিস, আরাম করছিস আর সামান্য একটা বিড়ি দিয়েও উপকার করতে পারবি না?

যেন বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি তার। বলতে লাগলো—পয়সা নয়, আধলা নয়, এক পয়সায় আটটা বিড়ি,—বিড়ি তো লোকে দান-খয়রাতও করে—তুই আমাকে অবাক করলি মাইরি—

বলতে বলতে চলে গেল ফোঁটা।

যাবার সময় বলে গেল—আচ্ছা, দেখাচ্ছি তোকে, টের পাওয়াচ্ছি-

দীপঙ্কর যেন ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধ করতে গিয়েই খট্ করে একটা আওয়াজ হয়েছে আর মা চিৎকার করে উঠেছে—কে? কে?

—আমি মা, আমি।

একটু সামান্য শব্দ হলেই মা'র ঘুম ভেঙে যায়। মা উঠে পড়লো। বললে—কী করছিলি?

দীপঙ্কর বললে—বাইরে গিয়েছিলুম মা—

—বাইরে গেলি, তো আমাকে ডাকলি না কেন? আমি বলেছি না যে, বাড়ির বাইরে গেলে আমাকে ডেকে দিয়ে যাবি?

দীপঙ্কর বললে—আমি কোথাও যাইনি মা, শুধু উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম একটু—

মা বললে—তা এই এত রাত্তিরে আবার উঠোনে গিয়ে দাঁড়ানো কী?

দীপঙ্কর বললে—ঘুম আসছে না—

—ঘুম আসছে না তা উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালে ঘুম আসবে?

মা আবার আলো জ্বাললে। আলো জেনলে সিন্দুকের তালাটা দেখলে। তক্তপোশের তলাটা দেখলে। চারদিক দেখে তারপর আবার শুলো। বললে—দেখছিস ঘরে এতগুলো পরের টাকা রয়েছে, এমন করে দরজা হাট করে যেতে আছে? নৃপেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলি? তা যাবে কেন?

—গিয়েছিলুম।

—কী বললেন?

দীপঙ্কর বললে—বললেন তোমার মা'কে পাঠিয়ে দিও, দু-তিনটে চাকরি খালি আছে—আমি কিন্তু মা ও-চাকরি করবো না, তা বলে রাখছি—ঘুষ দিয়ে আমি চাকরি করবো না—

মা যেন একথা শুনতে পেলে না। বললে—দেখি, তোর অঘোরদাদুকে বলে, যদি কুড়িটা টাকা দেন, কুড়িটা টাকা দিলেই হয়ে যাবে, আমার কাছে পাঁচটা টাকা আছে—

আর তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো দীপঙ্কর হুঁশ ছিল না। মা'র ঘুম

আসবার আগেই দীপঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভোরবেলা মন্দিরে ফুল দিয়ে এসেই দীপঙ্কর সোজা কাকাবাবুদের বাড়ি গিয়েছিল। সামনেই প্রথমে দেখা হলো রঘুর সঙ্গে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলে—রঘু, লক্ষ্মীদি আসেনি?

রঘু বললে—আসেনি।

তাহলে সবাই ভাবছে তো খুব। জিজ্ঞেস করলে—কাকীমা কোথায়?

—ওপরে।

—কাকাবাবু?

—সবাই ওপরে, দোতলায়।

—আর সতী?

—সতী দিদিমণিও ওপরে, সবাই সতী দিদিমণির ঘরে বসে আছে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে গেল। কিন্তু উঠতে গিয়েও যেন পা উঠলো না। সত্যিই তো, এখন সবাই ভেবে অস্থির হচ্ছে, এই সময়ে সে গিয়ে বিরক্ত করবে। হয়ত কাকাবাবু অনেক রাত্রে ফিরেছেন। সমস্ত রাত ধরে এখানে সেখানে হাসপাতালে থানায়—সর্বত্র ঘুরে খোঁজ নিয়েছে। হয়ত খোঁজ পায়নি কিম্বা হয়ত খোঁজ পেয়েছে। আস্তে আস্তে ওপরের বারান্দায় গিয়ে উঠলো। উঠে কান পেতে রইল। লক্ষ্মীদির ঘরে যেন কাকাবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কাকীমার। মাঝে মাঝে সতীর কথাও শোনা যাচ্ছে—

—এখন তো তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করতে হয়! শেষকালে তিনি বলবেন, তোমরা ছিলে আর সময়মত আমাকে খবর দিতে পারলে না একটা! তখন?

কাকীমার গলা শোনা গেল এবার। কাকীমা বললেন—কিন্তু তিনি রইলেন সাত-সমুদ্দুর পারে, তাঁকে মিছিমিছি বিরক্ত করা কি ভাল হবে?

সতী বললে—বাবার কিন্তু খুব শরীর খারাপ, এ-খবর পেলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না কাকাবাবু—

কাকীমা বললেন—আর একটা দিন দেখ না—হয়ত এসে যাবে—

সতী বললে—কিন্তু কোথায়ই-বা যেতে পারে? আমি তো সব সময়েই পেছনে পেছনে আছি—যেখানে যেত লক্ষ্মীদি, সেখানেই আমি যেতাম পেছন পেছন—যার সঙ্গেই কথা বলতো, তার সঙ্গেই আমি ভাব করতাম, তার সঙ্গে ভাব করে জেনে নিতাম লক্ষ্মীদি কী বললে—

—তাই-ই কি সব সময়ে সম্ভব? তোমারও তো নিজের কাজকর্ম আছে, নিজের লেখাপড়া আছে, নিজের শরীর আছে, নিজের বিশ্রাম আছে—

—না কাকাবাবু, তবু আমি দিনরাত চোখ রাখতাম। আমি যে জানতাম

আগে থেকেই—সেখানেও, স্কুলে পড়বার সময় ওইরকম করতো কিনা। সে একটা ছেলে ছিল, তার হাত দিয়ে লুকিয়ে চিঠি পাঠাতো। শেষকালে আমিই তো ধরলাম একদিন—

কাকাবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি বলছেন—কিন্তু সে-ছেলেটা কোথায় গেল? সেই যে সেই একটা মারহাট্টি ছেলে ছিল সেখানে—কী যেন নাম শুনেছিলাম তার?

—সে তো বর্মায়, সে এখানে কী করে আসবে কাকাবাবু?

কাকীমা বললেন—সে তো ব্যবসা করতো ওখানে—শুনেছিলাম তো খুব বড়লোক! কাঠের ব্যবসা করতো—

সতী আবার বললে—বড়লোক হলে কী হবে কাকাবাবু—স্বজাতি তো নয়—আর তাছাড়া বাবা ওসব পছন্দ করেন না, আপনি তো জানেন! আর আমিও পছন্দ করি না কাকাবাবু ওসব। আমরা হচ্ছি হিন্দু, হিন্দু মেয়েদের স্বামী জন্মের আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে—হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক—কী বলো কাকীমা—

কাকীমা বললেন—সে তো বটেই, এখন কী করবে তাই বলো?

কাকাবাবু বোধহয় এতক্ষণ ভাবছিলেন। বললেন—এখানে লক্ষ্মী আর কোথাও যেত? কলেজ কি বাড়ি ছাড়া আর কোনও জায়গায় যেতে চেয়েছে কখনও?

সতীর গলা শোনা গেল এবার। সতী বললে—এখানে তো কোথাও যায়নি, আমি আসার পর বরাবর তো লক্ষ্মীদির সঙ্গেই সব জায়গায় গেছি—আর যাবেই বা কোথায়? এখানে তো আমাদের চেনা-শোনা কেউ নেই।

কাকীমা বললেন—সেদিন যে কোথায় গেলে তোমরা দুজনে—সেই অনেক-দিন আগে একদিন বিকেলবেলা?

—সে তো জয়ন্তীদের বাড়ি, জয়ন্তী পালিত, লক্ষ্মীদির ক্লাসে পড়ে, ব্যারিস্টার পালিত আছে হরিশ মুখার্জি রোডে—তাদের বাড়িতে—চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল—সেই তো একদিন মাত্র, তারপর তো আর কোথাও যাইনি—

দীপঙ্কর কান পেতে কথাগুলো শুনতে লাগলো। শুনতে শুনতে তার মনে হলো সে যেন অন্যায় করছে। তার হয়ত এসব শোনা উচিত নয়। ওদের ঘরের ভেতরের কাহিনী সব তার কি শোনা উচিত! সে তো বাইরের লোক, লক্ষ্মীদি তাকে যত ভালোই বাসুক, সতীর সঙ্গে তার যত ভাবই থাক, কাকাবাবু তার যত শুভাকাঙ্ক্ষীই হোন—তার তো এসব শোনা উচিত নয়!

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসছিল, হঠাৎ কাকাবাবুর গলা শোনা গেল।

কাকাবাবু বললেন—আর এই যে অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়িতে যারা থাকে—যার মা রান্না করে ওদের বাড়িতে, দীপুবাবু—

কাকীমা বললেন—আমাদের দীপু?

সতী বললে—না কাকাবাবু আমার প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল তাই—

দীপঙ্করের বুকটা দুর দুর করে উঠলো। তার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। তাকে নিয়েই আলোচনা করছে এবার ওরা।

সতী বললে—লক্ষ্মীদির চিঠিতে আমি ওর কথা শুনেছিলাম, শুনে প্রথমে আমারও সন্দেহ হয়েছিল—তারপর......

দীপঙ্কর এবার কান খাড়া করে শুনতে লাগলো। চারদিকে একবার দেখে নিলে। কেউ কোথাও দেখতে পাচ্ছে না তো তাকে। হঠাৎ যেন তার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সতী! সতীই একদিন চারটে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল তার দিকে। সতীকেই কত সন্দেহ করেছে সে! সতী বলতে লাগলো—তারপর দেখলাম, না, সে-সব মতলব নেই ওর—

কাকীমা বললেন—ও ছেলেটা ভালোই তো মনে হয়—

সতী আবার বললে—ও তো সকালে মন্দিরে যায় ফুল দিতে। তারপর নিজের বন্ধুবান্ধব, লাইব্রেরী আর নিজের লেখাপড়া নিয়েই থাকে—

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো একতলায় যেন কার পায়ের শব্দ হলো। রঘু হয়ত ওপরে উঠছে। এখন আর পালাবার উপায় নেই। সোজা এগিয়ে গিয়ে একেবারে লক্ষ্মীদির ঘরের সামনে দাঁড়ালো।

—এই যে দীপুবাবু, হঠাৎ?

কাকাবাবু সামনেই ছিলেন। কাকীমাও দেখলেন। সতীও দেখলে। সবাই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছেন একটু মনে হলো।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কখন এলে তুমি?

সতী বললে—ও বোধহয় লক্ষ্মীদিকে খুঁজতে এসেছে। কালকে বলেছি কিনা ওকে—

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি আসেনি?

মনে হলো সবাই যেন তার দিকেই চেয়ে রয়েছে। কেউ হয়ত উত্তর দিলে, কিন্তু কারো উত্তরই যেন তার কানে গেল না। মনে মনে সবাই যেন তাকে সন্দেহ করছে। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন বড় অস্বস্তিকর মনে হলো। তারপর কখন যে সে নিচে চলে এসেছে, কখন যে একেবারে সোজা বাড়ি চলে এসেছে, কখন যে খেয়ে দেয়ে কলেজে এসেছে, তার কোনও খেয়ালই ছিল না। কলেজেও যেন কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। আবার কখন ছুটি হয়েছে—কখন রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরেছে তারও খেয়াল ছিল না তার। হঠাৎ আবার যেন সম্বিত ফিরে পেলে দীপঙ্কর।

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো যেন ট্রামের মধ্যে দাতারবাবু বসে আছে। ঠিক দাতারবাবুর মতন চেহারা। সেই রকম কোটপ্যান্ট, নেকটাই পরা। সেই রকম সিগারেট খাচ্ছে। কিন্তু তবু যেন কেমন সন্দেহ হলো। যেন সেই

আগেকার চেহারা আর নেই। দু-একদিন দাড়ি কামানো হয়নি।

—দাতারবাবু দাতারবাবু?

দাতারবাবু শুনতে পেয়েছে। পেছন ফিরে দেখেই চিনতে পেরেছেন দীপঙ্করকে। চিনতে পেরেই যেন তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে পড়েছেন। কিন্তু ট্রাম থামতে থামতেও অনেক দূরে গিয়ে তবে থামলো। দাতারবাবু ফিরে এলেন খানিকটা, দীপঙ্করও এগিয়ে গেল।

—দাতারবাবু, আপনি এদিকে?

—তুমি? দীপু না?

দাতারবাবুর কোট-প্যান্ট যেন আর ঠিক আগের মত নেই। একটু যেন ময়লা-ময়লা। আগে যেন অনেক দেখতে ভালো ছিল দাতারবাবু। অনেক ফরসা, অনেক সুন্দর।

দীপঙ্কর বললে—আপনি বুঝি আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, আর আমিও তো এখানেই নামতাম, এখানে কাছেই আমার কাজ আছে একটা—তোমাদের লাইব্রেরী কেমন চলছে?

দীপঙ্কর বললে—আপনি সেই চাঁদা দিয়েছিলেন মনে আছে? সেই খিদিরপুরের রাস্তায়? আমাদের অনেক খাওয়ালেন? শেষে পাঁচটা টাকা দিলেন?

দাতারবাবু বললেন—খুব মনে আছে—তা তোমরা তো আর চাঁদা চাইতে গেলে না—আমি তোমাদের ঠিকানা দিয়েছিলুম—তোমার সেই বন্ধু কী যেন তার নাম—?

—কিরণ!

—হ্যাঁ, কিরণ কেমন আছে?

দীপঙ্কর বললে—তার খুব জ্বর হয়েছে, জানেন—ওরা খুব গরীব, ভারি ভালো ছেলে ও—

দাতারবাবু বললেন—তা হোক, গরীব হওয়া কি দোষের?

দীপঙ্কর বললে—দোষের নয়। কিন্তু গরীব বলে সবাই ঘেন্না করে আমাদের—চাকরির জন্যে যার কাছেই যাই, সবাই কেমন মুখ বেঁকিয়ে কথা বলে—ভালো করে কথাই বলতে চায় না—

দাতারবাবু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—ও-রকম আঘাত পাওয়া একটু ভালো দীপু, আঘাত না পেলে কি বড় হওয়া যায়?

—কিন্তু মাঝে মাঝে বড় দমে যাই যে—

দাতারবাবু বললেন—যত আঘাতই পাও, নিজের কাছে যেন কখনও ছোট হয়ো না দীপু—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—নিজের কাছে ছোট হয়ো না মানে?

দাতারবাবু বললেন—টাকার দারিদ্র্য একদিন ঘুচলেও ঘুচতে পারে, কিন্তু মনের দারিদ্র্যের আর ওষুধ নেই দীপু—ওর কোনও ক্ষমাও নেই, আমি অনেক আঘাত পেয়েছি জীবনে, অনেক ভালোবাসাও পেয়েছি, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কখনও ছোট করিনি—

দীপঙ্কর যেন নতুন কথা শুনলে দাতারবাবুর মুখ থেকে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো পাশ থেকে। কী লোক, কত ভালো লোক, অথচ বাইরে থেকে মানুষকে দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। বাইরের চেহারা দেখে মানুষকে বিচার করতে যাওয়ার মত ভুল বুঝি আর নেই। এত ভালো লোক! দাতারবাবুর তুলনায় দীপঙ্কর কতটুকু, কত সামান্য! তবু তো দেখতে পেয়েই ট্রাম থেকে নেমে পড়েছেন। কত কাজ, কত কাজের মানুষ দাতারবাবু, তবু দীপঙ্করের সঙ্গে কথা বলে তো সময় নষ্ট করছেন! এত ভালো লোক বলেই তো সবাই দাতারবাবুকে এত ভালবাসে—

দাতারবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

দীপঙ্কর বললে—কোথাও যাচ্ছি না, এমনি ঘুরছি—

দাতারবাবুও যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—এমনি ঘুরছো? কেন?

দীপঙ্কর বললে—ভাল লাগছে না, মাঝে মাঝে আমার এমনি কিছুই ভাল লাগে না—

তারপরে হঠাৎ বললে—আপনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন, লক্ষ্মীদি চলে গেছে—

দাতারবাবু চাইলে দীপঙ্করের দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন দাতারবাবু খবরটা বিশ্বাস করছে না। বললে—হ্যাঁ দাতারবাবু, ওদের বাড়িতে খুব ভাবনা-চিন্তা চলেছে, কাকাবাবু সারারাত ধরে কত জায়গায় খুঁজেছে,—এখনও পাওয়া যায়নি—

দাতারবাবু বললে—তুমিও সেই কথা ভেবে ভেবে ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ, দাতারবাবু, আমারও কাল থেকে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না—লক্ষ্মীদি যে কোথায় গেল! আমাকে খুব ভালবাসতো লক্ষ্মীদি—

একটু থেমে আবার বললে—মনে আছে আপনার, সেই আপনাকে চিঠি দেওয়া? সেই আপনি দাঁড়িয়ে থাকতেন কালীমন্দিরের সামনে, আর আমি চিঠি দিয়ে আসতাম? তখন থেকেই আমাকে ভালোবাসতো!

দাতারবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওরা কী বলছে সবাই, তোমার লক্ষ্মীদির বাড়ির লোকেরা?

—কী আবার বলবে? চারদিকে খোঁজাখুঁজি চালাচ্ছে—কাকাবাবু তো মস্ত বড় চাকরি করেন, অনেক জায়গায় জানাশোনা। যেদিন প্রথম বাড়িতে এল না লক্ষ্মীদি, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেছেন কাকাবাবু,—

—কেউ জানে না কোথায় গেছে?

—না, কেউ জানে না দাতারবাবু, আমি আজ সকালবেলা লক্ষ্মীদিদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি মোটে—

—কে বললে তোমায় খবরটা?

দীপঙ্কর বললে—সতী। ওর ছোট বোন—মেয়েটা ভালো, খুব ভালো, জানেন দাতারবাবু! লক্ষ্মীদির বাবা তো বর্মায় থাকে, খুব বুড়ো মানুষ, তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ, লক্ষ্মীদির এই কাণ্ড যদি তাঁর কানে যায় তো তিনি হার্ট ফেল করবেন—

দাতারবাবু যেন কথাটা শুনে কী ভাবতে লাগলেন।

দীপঙ্কর বললে—সতী মেয়েটা বাপকে ভালোবাসে খুব, জানেন—অথচ লক্ষ্মীদি বাবার কথা একদম শুনবে না—

দাতারবাবু বললেন—তা তুমি এখন বাড়ি যাবে তো?

—বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করছে না দাতারবাবু! লক্ষ্মীদি নেই তো তাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে বাড়িটা—কিছু ভালো লাগে না, বাড়িতে থাকতেই ভালো লাগে না! অথচ আগে কলেজ থেকেই বাড়িতে চলে যেতাম, লক্ষ্মীদির কাছে যেতাম। জানেন দাতারবাবু, লক্ষ্মীদি আমায় কত বকেছে, কত মেরেছে, কত চুল ধরে টেনেছে, তবু খুব ভালো লাগতো আমার—তবু লক্ষ্মীদিকে খুব ভালোবাসতুম আমি—

—আর ওর ছোট বোন, সতী?

দীপঙ্কর বললে—আগে সতীকে আমার মোটে ভালো লাগতো না দাতারবাবু, কিন্তু দুটো বোনই ভালো—আমরা ওদের তুলনায় কত গরীব, ধরুন পরের বাড়িতেই বলতে গেলে মানুষ হয়েছি আমি, কিন্তু তবু সতী আসে আমাদের বাড়িতে, আমার মাকে মাসীমা বলে ডাকে—অথচ আমার সঙ্গে কথা না বললেই পারতো! ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয়—বলুন?

মনে আছে দাতারবাবুর সঙ্গে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। যেন প্রথম একজন লোক পেয়েছে সব মনের কথা বলবার, সব প্রাণের কথা শোনাবার। দাতারবাবুর সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে দীপঙ্করের সেদিন মনে হয়েছিল, এমন সহানুভূতি নিয়ে কেউ বুঝি আগে তার কথা শোনেনি।

দীপঙ্কর বললে—এক-এক সময় কী ভয় হয় জানেন? ভয় হয়—ওরা যদি হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে উঠে যায়?

—উঠে যাবে কেন?

দীপঙ্কর বললে—না, চলে হয়ত যাবে না, কিন্তু চলে যেতেও তো পারে! লক্ষ্মীদির জন্যেই তো ওই রকম নোংরা জায়গায় বাড়ি ভাড়া করেছিল—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—তা বুঝি জানেন না? ওই রকম জায়গায় বাড়ি ভাড়া

নিয়েছিল কারণ লক্ষ্মীদি তাহলে আর কারো সঙ্গে মিশতে পারবে না—

—তা আমাকে যে সেই আগে আগে তোমার লক্ষ্মীদি চিঠি পাঠাতো তোমার হাত দিয়ে, সে-কথা আজও কেউ জানতে পারেনি?

দীপঙ্কর বললে—না, কেউ জানতে পারেনি, আমি কাউকেই বলিনি, লক্ষ্মীদি আমাকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল যে! বলে দীপঙ্কর দাতারবাবুর দিকে চাইল।

বললে—আমি মা'কেও বলিনি—অথচ মাকে আমি সব কথা বলি, জানেন! কিরণকেও বলিনি, কিরণকেও তো আপনি দেখেছিলেন! কিরণ আমার অত বন্ধু তবু বলিনি। আর সতী? লক্ষ্মীদির ছোট বোন? সে কত চেষ্টা করেছিল জানতে—কত আমার পেছনে-পেছনে লেগে থাকতো, কত আমাকে সন্দেহ করেছে—দিনরাত কেবল আমাকে জেরা করেছে—তবু বলিনি! কেন বলিনি জানেন? লক্ষ্মীদি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল বলে!

তারপর একটু থেমে বললে—ওরা যদি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যায়—তো খুব খারাপ লাগবে—!

—কিন্তু চিরকাল তো কেউ থাকে না!

দাতারবাবু যেন সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বললেন—একদিন নিজের বাপ-মা তারাই চলে যায়—তা এরা তো পর—

দীপঙ্কর বললে—পর বটে কিন্তু এতদিন মিশে মিশে প্রায় নিজের লোকের মত হয়ে গিয়েছিল ওরা, দাতারবাবু—ধরুন ওদের বাড়ি যখন-তখন গিয়েছি, যখন-তখন একেবারে লক্ষ্মীদির ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছি, ওদের বিছানায় শুয়েছি, কাকাবাবুর ঘরেও গিয়েছি—কেউ আমাকে কিছু বলেনি—

সত্যিই, সেই প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে নাচ দেখবার সময় থেকে সতীর আসার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত আর কোনও দূরত্ব ছিল না ওদের সঙ্গে। যখন কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, তখন দীপঙ্কর সোজা এসেছে লক্ষ্মীদিদের বাড়িতে। কতদিন ওদের বাড়িতেই খেয়েছে—শুধু ঘুমোবার সময়টা বাড়ি চলে গিয়েছে। খুব ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, কাকীমা খিচুড়ি রান্না করেছেন—সেদিন দীপঙ্করও একসঙ্গে বসে খেয়েছে। শুধু জানালা দিয়ে চীৎকার করে বলেছে—মা, আমি আজ এখানে খেয়ে নিচ্ছি—বাড়িতে খাবো না—। মা'র সঙ্গে সতীও গেছে কালীমন্দিরে পুজো দিতে। সঙ্গে গেছে দীপঙ্কর। কালীমন্দিরের সব পাণ্ডা সব ঠাকুরদের চিনতো দীপঙ্কর। সতী পাণ্ডাদের কাছ থেকে ডালা কিনেছে, গাঁদা ফুলের মালা কিনেছে, কিনে মন্দিরে পুজো দিয়েছে। গলায় আঁচল দিয়ে, পাথরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে—

মা বলতো—ভালো ঘর হোক, ভালো বর হোক মা, তোমার—

কী ভক্তিই ছিল সতীর তখন। প্রসাদটা নিয়ে কত ভক্তি করে মাথা উঁচু করে

মুখের মধ্যে পুরে দিত। মুখে পুরে দিয়ে হাতের পাতাটা মাথায় ঠেকাতো। দীপঙ্কর অবাক হয়ে যেত দেখে। সেই সতী, সেই কলেজে পড়া মেয়ের ভক্তি দেখে দীপঙ্করেরও কতদিন হাসি পেয়েছে।

সতী বলতো—মাসীমা, দীপু অত হাসছে কেন বলুন তো?

মা বকতো দীপঙ্করকে—কেন হাসিস্ তুই অত দীপু বল্ তো—?

দীপঙ্কর বলতো—হাসবো না? কলেজে-পড়া মেয়ের অত ভক্তি ভালো?

মা বলতো—হলেই বা কলেজে পড়া, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই—ঘর-সংসার তো করতে হবে, মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছো মা তুমি, তখন স্বামীর ঘর তোমাকে করতেই হবে—

সতী বলতো—আমার বাবাও তাই বলেন মাসীমা—বাবাও পুজো জপ্ তপ্ করেন, তারপর আপিসে যান—

মা আশীর্বাদ করতো সতীকে। বলতো—শিবের মত স্বামী পাবে মা তুমি, দেখো—তোমাকে এবার পুণ্যি-পুকুর করা শিখিয়ে দেব—

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সতী স্নান করে নিত। লক্ষ্মীদি তখনও ঘুমোচ্ছে। দীপঙ্কর গিয়ে দেখতো লক্ষ্মীদির বিছানার পাশে চায়ের কাপ জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেছে, আর লক্ষ্মীদি তখনও মশারির মধ্যে অজ্ঞান।

দীপঙ্কর গিয়ে ডাকতো—ও লক্ষ্মীদি, লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি আড়ামোড়া ভেঙে উঠতো। বলতো—কী রে, এত সকালে কী করতে?

—তুমি এখনও ঘুমোচ্ছ? এদিকে যে সাতটা বেজে গেছে? দেখ তো তোমার চা বরফ হয়ে গেল—

—রঘুকে ডাকতো দীপু আর এক কাপ চা দিয়ে যাবে!

শুয়ে শুয়েই লক্ষ্মীদি চা খেত। শুয়ে শুয়ে এক কাপ চা খাবার পর তখন যেন চোখের পাতা খোলবার ক্ষমতা হতো। তখন আস্তে আস্তে উঠে বসতো বিছানায়।

দীপঙ্কর বলতো—তুমি এত দেরি পর্যন্ত কী করে ঘুমোতে পারো লক্ষ্মীদি? তোমার ঘুম ভেঙে যায় না?

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করতো—সতী কোথায় রে?

দীপঙ্কর বলতো—সতী মা'র সঙ্গে গঙ্গায় গেছে—মন্দিরে পুজো দিয়ে তবে ফিরবে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—তুমি ঠাকুরদেবতা মানো না লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বলতো—দূর, ওসব মিথ্যে ভড়ং—ও করেও যা হয়, ও না-করেও তাই হয়—

—তা ঠাকুর-দেবতাকে নমস্কার তো আমি রোজ করি লক্ষ্মীদি, ঘুম থেকে

উঠে রোজ মন্দিরে গিয়ে ফুলও দিয়ে আসি আর প্রণামও করে আসি।

—করে তোর কী হয়?

—তা জানি না, কিন্তু করতে ভাল লাগে!

—সতীটা করে ওই সব। বলে—ওই সব করলে নাকি পুণ্যি হয়। পুণ্যি হয় না ছাই-পাঁশ হয়!

খানিক পরেই সতী এল। লক্ষ্মীদি বললে—আজকেও আবার বুঝি তুই গঙ্গা নাইতে গিছলি সতী?

সতী বললে—হ্যাঁ—

—ওসব ময়লা জলে নেয়ে কী লাভ হলো?

সতী বললে—লাভ আবার কী হবে, আমার ইচ্ছে হলো তাই গেলাম—

—তা বাড়িতে জল ছিল না?

—বাড়ির জলে তো রোজই নাই, একদিন না হয় গঙ্গাতেই নাইলাম। গঙ্গায় কি কেউ চান করে না?

লক্ষ্মীদি বলতো—করবে না কেন, তোর মতন যারা তারাই করে।

সতীও রেগে গেল। বললে—বেশ করি করি, তোমাকে তো গঙ্গায় নাইতে বলছি না—। আমি যদি মনে তৃপ্তি পাই, তাহলে ক্ষতি কী?

—তোকে এসব কে শিখিয়েছে বল্ তো?

সতী বলতো—কে আবার শেখাবে! এ কি শেখাতে হয় নাকি? মেয়েদের একটু ভক্তি-টক্তি থাকা ভালো তো!

—ছাই ভালো! তোর দেখছি কিছুছু হবে না!

সতী বলতো—না-হবে না-হবে, তোমার তো হবে! তুমি নিজের দিকটা সামলাও তো দিদি—আমি কী করি না-করি সে তোমায় দেখতে হবে না—

—তোর তো ভারি বাড় হয়েছে সতী! সক্কাল বেলাই ঝগড়া করতে এলি?

সতীও রেগে উঠলো। বললে—বা রে, আমি ঝগড়া করলুম না তুমি করলে?

—আবার আমার মুখের ওপর কথা বলছিস?

সতীও ঝাঁঝিয়ে উঠতো। বলতো—বেশ করবো, বল্‌বো! তুমি যখন-তখন আমার সঙ্গে অমন করো কেন বল তো?

লক্ষ্মীদি বলতো—আমি তোর সঙ্গে করি না তুই আমার সঙ্গে করিস?

সতী হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরলে। বললে—এই তো দীপু এখানে রয়েছে, একেই জিজ্ঞেস করো না কে আগে ঝগড়া করেছে—বলো তো দীপু, তুমিই বলো তো, তুমি তো গোড়া থেকেই দেখছো, আমার দোষ?

দীপঙ্কর মহা মুশকিলে পড়লো। কার পক্ষে সে যে রায় দেবে ঠিক করতে পারলে না।

কিন্তু লক্ষ্মীদিই বাঁচিয়ে দিলে দীপঙ্করকে। বললে—ওকে সাক্ষী মানবো

কেন রে? ও কে? ও কি সব জানে?

সতী বললে—হ্যাঁ সব জানে ও—তোমাকে আর জানতে বাকি নেই ওর—

লক্ষ্মীদি বললে—না, ও কিছুছু জানে না, কিছুছু জানে না ও—

—জানে সব জানে! তুমি কী রকম মেয়ে তা ও জানে, ওর সে-বুদ্ধি আছে। তুমি কাকে চিঠি দিতে সেখানে, কার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে মিশতে, কার সঙ্গে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলে......

—সতী!

হঠাৎ যেন লক্ষ্মীদি ফেটে পড়লো একেবারে। মনে হলো যেন এখনি লাফিয়ে উঠবে। লক্ষ্মীদি বললে—যত বড় মুখ নয় তোর তত বড় কথা! তুই আমার মুখের ওপর কথা বলিস্? এত আস্পর্ধা তোর?

সতীও কম যায় না। বললে—সত্যি কথা বলবো তাতে আবার ভয় কী?—ভয় কী শুনি? তুমি দোষ করতে পারো, আর আমার বলতেই দোষ? জানো না তোমার জন্যে বাবার কত কষ্ট? জানো না তুমি বাবার মনে কত কষ্ট দিয়েছ? জানো না সেদিন আমি না থাকলে বাবার কী হতো?

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো তার যেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। ও-সব কথা শোনাও যেন অন্যায় তার পক্ষে! দীপঙ্কর ঘর থেকে আস্তে আস্তে সকলের অলক্ষ্যে চলে আসছিল, হঠাৎ সতী ডাকলে—এই দীপু চলে যাচ্ছো কেন, থাকো এখানে, ভয় কী তোমার?

দীপঙ্কর থমকে দাঁড়াল। একবার চেয়ে দেখলে লক্ষ্মীদির দিকে।

লক্ষ্মীদি বললে—কথাগুলো ওর সামনে না-বললে বুঝি তোমার মনে শান্তি হচ্ছে না?

সতী বললে—তুমি যে আমার নামে বড় দোষ দিচ্ছিলে—এখন ও বুঝুক যে আমার দোষ না কার দোষ!

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু ও বুঝতে পারলে কি তোর সুখ হবে? ওকে পরের নিন্দে শুনিয়ে লাভ কী তোর শুনি? তাতে তোর ইজ্জত বাড়বে?

—দিদি, ইজ্জতের বড়াই আর কোর না তুমি! আমাদের বংশের ইজ্জত তুমি ডুবিয়ে দিয়েছ জানো?

লক্ষ্মীদি বলে উঠলো—তুই আর আমাকে ইজ্জত শেখাতে আসিস্ নি, বুঝলি! দীপুর সঙ্গে তোর এত ভাব কেন বলবো? দীপুদের বাড়ি তুই কেন এত যাস্ জানি না মনে করেছিস্—? দীপুর সঙ্গে তোর কেন এত মাখামাখি বল্ তো?

সতীর মুখখানায় হঠাৎ যেন কে সিঁদুর মাখিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে। সতীর মুখের দিকে চেয়ে দীপঙ্করের মনে হলো যেন হঠাৎ সে বড় হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। হঠাৎ দীপঙ্করের হাতখানা তার হাত থেকে খসে পড়লো। দীপঙ্করের সমস্ত শরীরটা কেমন সিরসির করে কেঁপে উঠলো।

লক্ষ্মীদি তখনও ছাড়লে না। বললে—পরের দোষ দেখবার আগে নিজের দোষটা দেখবার চেষ্টা করিস—বুঝলি সতী! তুই যেমন বাবাকে চিঠি লিখে লিখে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিস্, আমিও যদি তোর কথা লিখি? আমিও যদি লিখে দিই কাদের বাড়িতে যাস্ তুই, কার সঙ্গে তোর এত ভাব? তখন কী হবে?

সতী যেন ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে।

বললে—দিদি, তুমি এই কথা বলতে পারলে?

—কেন, আমি কি মিথ্যে বলছি? আমার কি চোখ নেই? দীপুর সঙ্গে তোর অত কিসের খাতির?

চমকে উঠলো সতী। বললে—দীপুর সঙ্গে আমার খাতির? তুমি বলছো কী?

—হ্যাঁ সত্যি কথাই বলছি। সবাই দেখতে পায়, সকলের চোখ আছে। তুই ওদের বাড়িতে যাস না? ওদের ঘরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকিস না? দীপুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গল্প করিস্ না?

দীপঙ্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপতে লাগলো। আর দাঁড়াতে পারলো না। সোজা বাইরে চলে এল দীপঙ্কর। একেবারে নিচেয়। কাকীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসতে লাগলেন দীপঙ্করকে দেখে। বললেন—আবার বুঝি ঝগড়া করছে ওরা?

আর তারপর সেইদিনই অনেক রাত্রে সতী তাকে খবরটা দিয়েছিল।

সকালবেলা যথারীতি কলেজে গিয়েছে দুই বোন। দীপঙ্করও কলেজে গিয়েছে। যেমন করে আর সব দিনগুলো কাটে, তেমনি করেই সে-দিনটাও কেটেছে। সমস্ত দিনটায় অন্যদিনের মত সকাল হয়েছে আর সন্ধ্যে হয়েছে। সন্ধ্যের পর দীপঙ্কর বাড়ি এসেছে, তারপর কিরণের বাড়ি গেছে, কিরণের সঙ্গে গল্প করেছে, গল্প করতে করতে রাত হয়েছে। তারপর খেয়ে উঠে যেই আমড়াগাছ-তলায় আঁচাতে গেছে হঠাৎ খবরটা দিলে সতী!

খবরটা পাবার পর থেকেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। যেন বাড়ি যেতে আর ইচ্ছেও করছে না। যেন সমস্ত বিস্বাদ হয়ে গেছে। এতদিনের জীবন, এতদিনের ভালো-মন্দ, এতদিনের আকাশ, এতদিনের বাতাস, এতদিনের পৃথিবী, সমস্ত যেন বিস্বাদ ঠেকছে। মনে হচ্ছে যেন কেউ নেই, কিছু নেই।

সকাল বেলা বাজার করতে গিয়ে পচা আলু নিয়ে এসেছিল দীপঙ্কর।

মা তরকারী কুটতে গিয়ে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বললে—বাজার করতেও শিখলি না তুই? এই পচা আলুগুলো কে খাবে বল তো?

ভোরবেলা মন্দিরে ফুল দিতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

কালীর মন্দিরে বুড়ো পাণ্ডা জিজ্ঞেস করলে—ফুল দিলে প্রসাদ নিলে-না?

রাত্তিরে খেতে বসে অর্ধেক ভাত ফেলে রেখে উঠে যাচ্ছিল, মা ডাকলে। বললে—ও কী রে, ভাত খেলি না?

কিরণের অসুখ, আর একবার কিরণের কাছে গেলেও হতো। পরের দিনটাও কেমন যেন ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল মনটা। সমস্ত কালিঘাট, সমস্ত শ্যামনগর, সমস্ত ভবানীপুরটা হেঁটে হেঁটে বেড়াতে লাগলো দীপঙ্কর। সেই পুরোন দিনগুলোর কথা মনে পড়তে লাগলো। কিরণের সঙ্গে ছোটবেলায় কতদিন মীটিং শুনতে এসেছে হরিশ পার্কে, কতদিন পুলিসের লাঠির ভয়ে পালিয়েছে, কতদিন কিরণের সঙ্গে পৈতে বেচতে গিয়েছে ওদিকে, কতদিন রাস্তায় রাস্তায় 'দি কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরী'র জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়িয়েছে। দু'দিন ধরে ঘুরে ঘুরে পায়ে ব্যথা ধরে গেল। যেখানে বালিগঞ্জের নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ওইদিকে গিয়েও কুলি-মজুরদের কাজ দেখতে লাগলো। কুলিরা চিনতে পেরেছে দীপঙ্করকে। দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বললে তাদের সঙ্গে। কোথায় থাকে তারা, কত করে পয়সা পায় রোজ। তারপর যখন সবাই বাড়ি চলে গেল দীপঙ্করও আবার বাড়ির দিকে এলো। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেন, সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল—আর তারপর সেই উনিশের একের বি বাড়িটা। বাড়িতে ঢুকেই মনে হতো যদি লক্ষ্মীদি ফিরে এসে থাকে। যদি হঠাৎ লক্ষ্মীদি আবার ফিরে এসে থাকে।

মা বললে—হ্যাঁ রে, ওদের বড় মেয়েটা কোথায় গেল হঠাৎ? তুই তো বলিস্ নি কিছু আমাকে।

বিন্তীদি বললে—কোন্ মেয়েটা দিদি?

মা বললে—তুমি এ-সব কথায় থেকো না মা,—

বিন্তীদি বললে—ওরা তো লেখা-পড়া জানা মেয়ে, না দিদি?

দীপঙ্করের মনে হলো যেন সমস্ত দোষটা তারই। লক্ষ্মীদির নিন্দে তারই নিজের নিন্দে। লক্ষ্মীদির লজ্জা যেন তার নিজেরই লজ্জা। লক্ষ্মীদির কলঙ্ক যেন তার নিজের কলঙ্ক। দীপঙ্করের মনে হলো সবাই যেন তাকেই দোষ দিচ্ছে। তারই যেন সব দোষ। তারই যেন সব দায়িত্ব। মা'র মুখের দিকে চাইতেও যেন তার লজ্জা হলো! মা তো জানে না যে দীপঙ্করই রোজ ভোর বেলা গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে একজনকে চিঠি দিয়ে আসতো। মা তো জানে না দীপঙ্করই দায়ী এর জন্যে। আর সতী! সতী প্রথম প্রথম সন্দেহই করতো শুধু। কিন্তু তার সন্দেহ কি একেবারে মিথ্যে! কেন সে চিঠি দিয়ে আসতো দাতারবাবুকে। কেন কাউকে বলে দেয়নি! যদি সময়মত বলে দিত তাহলে হয়ত লক্ষ্মীদি এমনি করে পালাতে পারতো না। সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে লক্ষ্মীদির অভাবে। লক্ষ্মীদি নেই, কিন্তু লক্ষ্মীদির অভাব যেন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেদিনও পড়ছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ মনে হলো পাশের ঘরে সতীর গলা শোনা গেল।

মা বলছে—তোমার মা থাকলে আর এমন হতে পারতো না মা—

সতী বললে—তা মা'কে তো আমিও ছোটবেলা থেকে দেখিনি মাসীমা—

—কিন্তু কোথায় গেল, একটা খোঁজ পাওয়া গেল না, তাই বা কী করে হয় মা? তোমার কাকাবাবু একবার পুলিসে খবর দিলে না কেন মা? উড়ে তো যেতে পারে না অত বড় জল-জ্যান্ত মেয়ে—

সতী বললে—কাকাবাবু তো সেইদিন থেকেই খুঁজছে—

মা বললে—তোমার বাবারই অন্যায় মা, অত বড় মেয়ে কেউ ঘরে পুষে রাখে—! এই দেখ না মা, বিন্তী আমার কে? কেউ না, কিন্তু ওই সোমত্থ মেয়ের জন্যে ভেবে ভেবে আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না—

তারপর আবার মা'র গলা শোনা গেল—ছেলে-মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের যে কী ভাবনা, সে আমি বুঝি—

দীপঙ্কর পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে কান খাড়া করে রইল।

—ওই যে দীপু আমার বড় হচ্ছে আর আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ছে—যতদিন ছোট ছিল ততদিন তেমন কিছু ভাবনা ছিল না—এখন ওর দিকে দেখলে আমার বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ করে ওঠে—

সতী হাসতে লাগলো। বললে—আপনার আবার বড় বেশি বাড়াবাড়ি মাসীমা—

—না মা, তুমি বুঝবে না, যখন তুমিও মা হবে তখন বুঝবে! ছেলে-মেয়ে নয়তো শত্রু সব—

সতী বললে—দীপু আপনার খুব ভাল ছেলে মাসীমা—

—ভালো তো তোমরা বলছো, কিন্তু খারাপ হতেই বা কতক্ষণ! কালিঘাট জায়গা তো ভালো নয়—ছেলে-মেয়ে মানুষ করা যে কী কষ্ট আমিই জানি!

অনেকক্ষণ আর কোনও কথা শোনা গেল না। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে উঠলো। উঠে পাশের ঘরে গেল। পেছন ফিরে বসে ছিল মা আর সতী। মা-ই প্রথম দেখতে পেয়েছে। বললে—তুই আবার পড়তে পড়তে উঠে এলি কেন দীপু? পড়া হয়ে গেল?

সতীও পেছন ফিরেছে।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি বাড়ি ফেরেনি?

মা বললে—তোমার ওসব খবরে দরকার কী শুনি? তোমার নিজের চরকায় কে তেল দেয় তার ঠিক নেই—তুমি এসেছ পরের খবর নিতে! দেখলে তো মা, শুনলে তো? ওর ভাবনা কে ভাবছে তাই বলে ঠিক নেই—যাও এখন পড়গে যাও, ভাত হলে খেতে ডাকবো—

দীপঙ্কর আবার নিজের ঘরে এসে বসলো। কিন্তু পড়তে গিয়েও কান

পড়ে রইল পাশের ঘরে।

সতী বললে—আমিও যাই মাসীমা—

—আর একটু বোস না মা, তুমি এলে তবু দুটো গল্প করতে পাই—

সতী বললে—আসতে তো ভাল লাগে মাসীমা, কিন্তু ক'দিন থেকে কিচ্ছু ভাল লাগছে না, কাকাবাবুরও খাওয়া-দাওয়া নেই, কাকাবাবু কাজ-কর্ম ছেড়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমারও কলেজ যাওয়া হচ্ছে না—

—সে আর কী করে হবে মা!

সতী বললে—দিদির সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করতুম, কিন্তু তবু তাও ভাল লাগতো মাসীমা! এখন যে কী হয়েছে বাড়িতে একদম ভালো লাগে না!

—বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে তো মা?

সতী বললে—কাকাবাবু তো রোজই বলছেন খবর দিতে, কিন্তু আমিই বলছি একটু সবুর করতে! হয়ত এসে পড়বে দু'একদিনের মধ্যে! মিছিমিছি দু'একদিনের জন্যে বাবার মনে কষ্ট দেওয়া!

মা বললে—এবার এলে বাবাকে বোল দিদির বিয়ে দিয়ে দিতে—আর তোমারও একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া ভালো মা, মেয়ে-মানুষের বেশিদিন আইবুড়ো থাকা ভাল নয়—এই দেখ না, বিন্তীর জন্যে আমি কত খোঁজ খবর নিচ্ছি—আর যখন তোমাদের দেবার-থোবার ক্ষমতা আছে—

সতী বললে—বাবার যে সময় নেই মাসীমা, নিজের পুজো আছে, ব্যবসা আছে, কখন কী করবেন?

মা বললে—ওমা, তা কাজকর্ম ব্যবসা আছে বলে মেয়েদের বিয়ে আটকে থাকবে? এ-ও তো একটা কাজ।

সতী চলে যাবার অনেকক্ষণ পরেও দীপঙ্কর কিছু পড়তে পারলে না। কিছুই মাথায় ঢুকলো না। কিছুতেই যেন পড়ায় মন বসছে না আর। কেউ জানে না, কেউ কল্পনাও করতে পারছে না দীপঙ্করের কথাটা। কী করে কল্পনা করবে। কেউ তো জানে না। লক্ষ্মীদির সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে কারো জানবার কথা নয়। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না! অথচ লক্ষ্মীদি কেন একবার জানিয়ে গেল না দীপঙ্করকে। জানিয়ে গেলেও তো পারতো। জানিয়ে গেলেও তো দীপঙ্কর কাউকে বলতো না। লক্ষ্মীদি বারণ করলে দীপঙ্কর কাউকেই বলতো না। দীপঙ্করকেই বা জানাল না কেন লক্ষ্মীদি। দীপঙ্করের কাছ থেকেই বা লুকোতে গেল কেন কথাটা!

, আগের দিনও লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়েছে দীপঙ্করের। আগের দিনও লক্ষ্মীদি হেসে কথা বলেছে। সতীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। কোনও তফাৎ বুঝতে পারেনি। আগের দিনও যেমন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, দেরি করে চা খায়, তেমনি দেরি করে চা খেয়েছে। ততক্ষণে সতীর স্নান হয়ে গেছে।

যেমন করে রোজ সেজে-গুজে কলেজে যায় তেমনি সেজেছে। তারপর বাস এসে গলির সামনে দাঁড়াতেই লক্ষ্মীদি বাসে গিয়ে উঠেছে। কলেজ যাবার আগে কাকীমা রোজই ভাতের সামনে এসে বসে। সতী খায়, লক্ষ্মীদি খায়।

কাকীমা বলে—হ্যাঁ রে আর দুটো ভাত দিতে বলবো! ওমা, উঠলি কেন? খা?

লক্ষ্মীদি বলেছে—আর খেতে পারবো না কাকীমা, পেট ভরে গেছে—

কাকীমা বলেছে—শেষকালে তোমার বাবা দেখলে বলবেন আমরা খেতে দিইনি বুঝি—

লক্ষ্মীদি বলেছে—না কাকীমা, আমি বরং এসে খাবো, দেরি হয়ে গেছে এখন—

—তা কার জন্যে দেরি হলো শুনি? আমার তো ভাত তৈরি হয়েছে কখন! কখন থেকে ডাকছি খেতে আয় খেতে আয়—

তখন আর অত কথার উত্তর দেবার সময় নেই লক্ষ্মীদির। সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই দেরি হয়ে যায়। তারপর স্নান করে সাজগোজ করতে করতেই বেলা হয়ে আসে। তখন লক্ষ্মীদির বই গুছোনোর পালা। এ-বইটা পায় তো ও-বইটা পায় না। এ-খাতাটা নিতে গিয়ে ও-খাতাটা ভুলে যায়। আর সতী! সতীর তখন সব শেষ হয়ে গেছে। সে পুজো সেরেছে, চা খাওয়া সেরেছে। একই সময়ে তার বাস আসে—। কিন্তু লক্ষ্মীদির বাস এসে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, অনেকবার হর্ন বাজায়, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে যায়—

সেদিন সতীর বাস আগে এসেছে। সতী খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে তৈরিই ছিল। বাস আসতেই সতী বেরিয়ে গেছে। যাবার সময় রোজকার মত বলে গেছে—আমি যাচ্ছি কাকীমা—

কাকীমাও রোজকার মত বলেছে—এসো মা—

তারপর লক্ষ্মীদির পালা। লক্ষ্মীদিও সময়মত বলেছে—আমি যাচ্ছি কাকীমা—

কাকীমা বলেছে—এসো মা—

তারপর দরজার কাছে এসে কাকীমা জিজ্ঞেস করেছে—আজ কখন আসবি তুই? ক'টার সময়? দেরি হবে?

—না কাকীমা, আজ সকাল-সকাল আসবো, চারটের মধ্যে—

বরাবর কলেজ যাবার আগে আর পরে কাকীমার সঙ্গে লক্ষ্মীদির দেখা হয়, কথা হয়। লক্ষ্মীদি আর সতীর জন্যে খাবার তৈরি করা থাকে। যে আগে আসে সে খেয়ে নেয়। তারপর গল্প করো, ছাদে বেড়াও, ঝগড়া করো, যা খুশি করো। কেউ কিছু বলতে যাবে না। এমনি করেই এতদিন চলছিল। এমনি

করেই এ-বাড়ির রোজকার কাজকর্ম সমাধা হচ্ছিল। কাকাবাবু বাড়ির কর্তা, তিনি কখন আপিসের কাজ করতে বাইরে বেরিয়ে যান, কখন আসেন, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কিন্তু লক্ষ্মী-সতীর একটা বাঁধা সময় আছে। বাঁধা সময়ে তারা যায় আবার একটা বাঁধা সময়ে তারা আসে। তাদের খাওয়ানো, তাদের খাবার যোগানো নিয়েই বেশির ভাগ ব্যস্ত থাকতে হয় কাকীমাকে। সারা কালিঘাটে যখন সবাই অন্য সব ব্যাপার নিয়ে মত্ত, তখন এ-বাড়িতে কাকীমা সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তিনটে বাজতে-না-বাজতেই কাকীমা উনুনে আগুন দেবার ব্যবস্থা করেছে, ঠাকুরকে তাগাদা দিয়েছে, রঘুকে তাগাদা দিয়েছে—। কলে জল এসে গেছে। এখনি মেয়েরা এসে পড়বে, এখনই খাইখাই করবে। বেশির ভাগ দিন লক্ষ্মীদিই আগে আসে। এসেই ডাকে—কাকীমা—

লক্ষ্মীদি সোজা চলে যায় ঘরে। বইগুলো টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে চিত হয়ে।

সতীও আসে একটু পরে। দু'জনের খাবার আসে। দু'জনেই খায়। দু'জনেই গল্প করে। কাকীমা শোনে। গল্প করতে করতে এদিকে রান্নাঘরে ডাক পড়ে কাকীমার। ঠাকুরের কাছে গিয়ে না দাঁড়ালে চলে না। লক্ষ্মীদি ঝাল খায়, সতী ঝাল খায় না। লক্ষ্মীদি লুচি খাবে, সতী খাবে রুটি। লক্ষ্মীদির সব গরম খাবার চাই, সতীর ঠাণ্ডা হলেও আপত্তি নেই। তারপর দু'জনেই পড়তে বসবে। তখন হয়ত এক-একদিন সতী পাশের বাড়িতে বেড়াতে যাবে। সতী বেশিক্ষণ একলা এক জায়গায় থাকতে পারে না। কথা না বলতে পারলে তার যেন দম আটকে আসে।

বলে—কাকীমা, আমি একটু আসছি ওদের বাড়ি থেকে—

—আবার এখন যাবি? খাবার হয়ে গেছে যে!

সতী বলে—আমি যাবো আর আসবো কাকীমা—একটু গল্প করে আসি—

এমনি করেই চলছিল ও-বাড়িতে। এমনি করেই দৈনন্দিন সংসারের চাকা ঘুরছিল। ঊনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটেদের বাড়িতে। কোথায় কোন্ সুদূর বর্মার কোন্ এক কোণ থেকে মাসে মাসে মনি-অর্ডার আসতো কাকাবাবুর নামে। ভুবনেশ্বর মিত্র টাকা পাঠাতেন দুই মেয়ের জন্যে। দুই মেয়ের পড়ার খরচ, দুই মেয়ের জামা-কাপড়ের খরচ। শুধু তাই নয়, আরো অনেক রকমের খরচ আছে। কলকাতায় একটা অন্ধগলির অন্ধকারের মধ্যে পুরে রেখে দিয়ে তিনি হয়ত ভেবেছিলেন কলঙ্কের ছোঁয়াচ থেকে তিনি বেঁচে যাবেন। ভেবেছিলেন, মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পক্ষে কলকাতাই হয়ত নিরাপদ হবে। আরো ভেবেছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে একদিন দুটি মেয়ের বিয়ে দেবেন। ততদিন হয়ত ক্ষতি হবে ব্যবসার, ততদিন হয়ত লোকসান হবে। কিন্তু লোকসান হলে উপায় কী! কাদের জন্যে পয়সা, কাদের

জন্যে ব্যবসা, কাদের ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয়! ভুবনেশ্বর মিত্রের ছেলে নেই, সুতরাং একদিন দুই জামাই-ই মালিক হবে তাঁর ব্যবসার, মালিক হবে তাঁর সমস্ত সঞ্চয়ের। তেমন জামাই দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে করতে হবে। লেখাশোনা কি অত সহজ! লেখাশোনা করার সময় পাওয়াও কি অত সহজ? সেই জন্যেই তো এতদিন লক্ষ্মী-সতীর বিয়ে আটকে আছে। তাই জন্যেই-তো তারা পড়ছে, লেখা-পড়া করছে। পরীক্ষায় পাশ করছে। আর নিরাপদে কলকাতায় আছে। বিশ্বাসযোগ্য অভিভাবকের কাছে রেখে তিনি তাই একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। কিন্তু কে জানতো এমন হবে! কে জানতো সেখানে সেই উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনেও এই দীপঙ্কর আছে, সেখানেও সে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠি দিয়ে আসবে একজনকে। আর লক্ষ্মীদিও একদিন হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

ক্রমে সতী ফিরে এল কলেজ থেকে। অন্য দিনকার মত নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলেছে। অন্য দিনকার মত কাকীমাও এসেছে কাছে। সতী জিজ্ঞেস করেছে—লক্ষ্মীদি আসেনি এখনও?

কাকীমা বলেছে—না, এইবার আসবে হয়ত—তুই খেয়ে নে—

খেয়ে নিয়ে সতী খানিকক্ষণের জন্যে মাসীমার সঙ্গে গল্প করতে পাশের বাড়িতে গেছে। ফিরে আসার পরও লক্ষ্মীদি এল না।

তারপর আরো দেরি হলো। আরো অন্ধকার হলো। গলির মোড়ে আরো গাড়ির শব্দ হলো। আরও হর্ন বজলো। কিন্তু লক্ষ্মীদি এল না। তারপর কাকাবাবুও এল এক সময়ে আপিস থেকে। কাকাবাবুও শুনলে। এমন দেরি তো করে না লক্ষ্মী। কোথায় গেল! কোথায় গেল তাহলে?

এসব কথা দীপঙ্কর পরে শুনেছে। সব শুনেছে সতীর কাছে। ওদের বাড়িতে যখন খোঁজাখুঁজি চলেছে, তখন দীপঙ্কর কিরণদের বাড়িতে। তখন কাকাবাবু বেরিয়ে গেছে খুঁজতে। লক্ষ্মীদির কলেজে গেছে, থানায় গেছে, কত জায়গায় গিয়েছে। তারপর দীপঙ্কর যখন খাওয়া-দাওয়ার পর উঠোনের কোণে আমড়াগাছ-তলায় হাত ধুচ্ছে তখনই প্রথম জানতে পারলে সে।

আর তারপর?

তারপর থেকে যেন কেমন হয়েছে দীপঙ্করের। ওরা হয়ত খাচ্ছে, ওরা হয়ত ঘুমোচ্ছে, কিন্তু দীপঙ্করের খাওয়াও নেই, ঘুমও নেই। কলেজে গিয়ে, রাস্তায় ঘুরে যেন আর ক্লান্তি আসে না। অথচ শান্তিও নেই তার।

মনে আছে সেদিন অনেকক্ষণ দাতারবাবুর সঙ্গে কথা বলে যেন হাল্কা হয়েছিল মনটা।

দাতারবাবু বলেছিল—এমন করে ঘুরে ঘুরে কী করবে, এবার বাড়ি যাও—

দীপঙ্কর বলেছিল—বাড়িতে যেতে ভাল লাগছে না—কেবল মনে পড়ে

লক্ষ্মীদির কথা—

—ভেবে আর কী করবে?

—না ভেবেই বা কী করবো!

দাতারবাবু বলেছিল—তা হোক, ভুলতে চেষ্টা করো—

তারপর কথাটা বলে দাতারবাবু চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দীপঙ্করের মনে পড়ে গেল। ততক্ষণে দাতারবাবু অনেকদূর চলে গিয়েছে। দীপঙ্কর চীৎকার করে ডাকলে—দাতারবাবু, দাতারবাবু—

যেতে যেতে দাতারবাবু পেছন ফিরে তাকাল। দীপঙ্কর কাছে গিয়ে বললে—আসল কথাটাই আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—

—কী কথা?

দীপঙ্কর বললে—সেই যে আপনি একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলেন, আমাদের লাইব্রেরীর চাঁদা? মনে আছে আপনার? সেটা অচল!

—অচল? কই, দেখি?

—আমার কাছে তো নেই, বাড়িতে আছে।

দাতারবাবু বললে—ঠিক আছে, তুমি সেটা আমাকে দেখিও, যদি অচল হয় তো আর একটা বদলে দেব! তুমি আমার আপিসে যেও, ঠিকানা তো তোমাদের কাছে আছে কেমন?

সেদিন নৃপেনবাবু কিন্তু খুব ভাল ব্যবহার করলেন। বললেন—তুমি আসো না কেন? মাঝে মাঝে আসবে, মাঝে মাঝে না এলে তোমার কথা মনে থাকবে কেন? হাজার-হাজার কাজের মধ্যে সব কথা কি মনে থাকে মানুষের—আপিসে একবার ঢুকলে বিশ্ব-সংসার ভুলে যেতে হয়—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—কতদূর লেখাপড়া করেছ?

—আজ্ঞে এইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছি—

নৃপেনবাবু হাসলেন। বললেন—এই দেখ, তোমরা বি-এ পাশ করেছ, অথচ আমরা সেকালের এণ্ট্রান্স—তোমাদের ইস্কুল-কলেজে আজকাল লেখাপড়াই তেমন শেখান হয় না সেকালের মত—সেকালে......

হঠাৎ যেন নৃপেনবাবু কেমন দয়ালু হয়ে উঠলেন রাতারাতি। মিষ্টি কথা বলতে লাগলেন। হাসি বেরোল মুখ দিয়ে। বললেন—তা আমাকে দরখাস্ত একখানা দিলে না তো তুমি? অত করে বললুম তোমাকে—?

দীপঙ্কর বললে—আজ্ঞে, আপনাকে তো দরখাস্ত দিয়েছি—তিনখানা দরখাস্ত দিয়েছি—

নৃপেনবাবু একটু রেগে গেলেন। বললেন—দেখছো কাজের লোক—হাজার কাজের মধ্যে ডুবে থাকি—সব কথা কি আমার মনে থাকে? তা তিনখানাই না

হয় দিয়েছ, তা বলে আর একখানা দিতে দোষ কী হে ছোকরা? দোষ কী?

সেদিন সত্যিই নৃপেনবাবু রেগে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি আর ক'দিন হে ছোকরা, এই তো আসছে মাসে রিটায়ার করছি, তখন? তখন কে তোমাকে চাকরি দেবে শুনি? কে তোমাকে আমার মত এত করে বলবে?

মনে আছে সত্যিই দীপংকর কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল নৃপেনবাবুর ব্যবহারে। মিছিমিছি নৃপেনবাবুর ওপর খারাপ ধারণা করেছিল দীপঙ্কর। এত ভালো লোক! অথচ দীপংকর ভেবেছিল নৃপেনবাবু বুঝি ঘুষ নিচ্ছেন। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলেন বুঝি নিজের জন্যেই। সারা রাস্তাটা দীপংকর ভাবতে ভাবতে এসেছিল। এমন করে সকলের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করাও তো অন্যায়। নিজের ওপরেই ঘেন্না হলো দীপংকরের। বড় সহজে দীপংকর একটা মানুষ সম্বন্ধে যত খারাপ ধারণা করে বসে, তেমনি বড় সহজে ভাল ধারণাও করে বসে। ওই যেমন কাকাবাবু! লক্ষ্মীদি আর সতীর কাকাবাবু! কাকাবাবু সম্বন্ধেও কত ভাল ধারণা করেছিল দীপংকর। ভাল আর মন্দ—দুটোর মধ্যে কত তফাৎ অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

বাড়িতে যেতেই মা বললে—তা এতক্ষণ বলতে হয় তো! বলেছেন সেই সকালবেলা আর তুই এখন বললি?

সত্যিই তো, যতদিন চাকরি আছে নৃপেনবাবুর ততদিনই ক্ষমতা। চাকরি থেকে রিটায়ার করলে সাহেবরা কি আর তার কথা শুনবে! মা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। নৃপেনবাবু সন্ধ্যেবেলা আপিস থেকে আসবেন, তার পরেই গিয়ে দেখা করতে হবে। কাপড়টা সাবান দিয়ে ফরসা করতে হবে। যাবার আগে মায়ের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে হবে। দেখো মা, চাকরিটা যেন হয় খোকার। অনেক আশার ধন আমার খোকা। অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছি আমার দীপুকে। পরের বাড়িতে রান্না করেছি, পরের মুখের খোঁটা শুনেছি, দোরে দোরে খোশামোদ করে বেড়িয়েছি। কেউ কথা রাখেনি, কেউ মুখ তুলে চায়নি। এবার আমার মুখ রেখো মা তুমি! আমি কারোর কোনও অনিষ্ট করিনি, কারো কোনও অমঙ্গল কামনা করিনি কখনও।

দীপংকর সন্ধ্যেবেলা বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে। কোথায় গেল সব। কোথায় গেল সবাই। কাকাবাবুদের বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। অন্ধকার চারিদিক। এমন সময় অন্য দিন আলো জ্বলতো ঘরে ঘরে। সব যেন কেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল। সব যেন কেমন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অথচ সকাল বেলা উঠেই মন্দিরে যাওয়া, তারপর বাজার থেকে এসেই একবার লক্ষ্মীদির কাছে যাওয়া। আর তারপর সেই দুই বোনের ঝগড়া। হোক ঝগড়া, তবু যেন বড় ভালো লাগতো। মা'রও যেন কিছু ভালো লাগে না। লক্ষ্মীদি না আসুক, সতী একবার করে রোজই আসতো তাদের বাড়িতে, রোজই একবার করে দেখা হতো। একদিন সব শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল যেন বড় হঠাৎ।

তখন শহরের অনেক কিছু বদলে গেছে। ওদিকে ট্রাম লাইনটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়েছে বালিগঞ্জ রেলের স্টেশনে। আর দুপাশে বড় বড় বাড়ি উঠেছে। বাসগুলো কালিঘাটের ট্রাম ডিপো ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে গিয়ে থামে। আরো অনেক দূরে গিয়ে শেষ হয়। কিন্তু তবু দীপংকরের মনে হয় যেন আরো অনেক দূরে গেলে ভালো হতো। যেখানে রাস্তার মোড়ে কিরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পৈতে বিক্রি করতো, সেখানে তখন আরো ভিড় হয়, আরো লোক ওঠা-নামা করে। কিন্তু তখন আর কিরণ পৈতে বিক্রি করতে যায় না। বিক্রি করার দরকারই হয় না তার। সে-সব দিন কোথায় গেল যে!

আগের দিন বিকেল বেলা বাড়িতে যেতেই দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে গেল। বাড়িতে লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে। হঠাৎ লুচি ভাজার গন্ধে অবাক হবারই কথা। ফর্সা কাপড় পরেছে মা। খুব ব্যস্ত। চন্নুনী যে চন্নুনী, সে-ও সাবান কাচা কাপড় পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বাটনা বাটছে।

উঠোনের পাশ দিয়ে যাবার সময় দীপংকর দেখলে তাদের ঘরের তক্তপোশের ওপর দু-তিনজন ভদ্রলোক বসে আছে। বেশ বৃদ্ধলোক সবাই। কাউকেই চিনতে পারলে না দীপংকর। সব অচেনা মুখ। তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে এসে রান্নাঘরের দিকে যেতেই নজরে পড়লো—সতীকে। সতী বিন্তীদিকে সাজিয়েছে। বিন্তীদিকে আর চেনাই যাচ্ছে না যেন।

দীপঙ্কর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দিকে যেন কারো ভ্রূক্ষেপই নেই।

দীপু রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ওরা সব কারা, মা?

মা'র সব কাজ বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। ঘটি নিয়ে হাত ধুচ্ছিল।

বললে—আজ এত দেরি করে আসতে হয় তোমার? জানো না, আজকে বিন্তীকে দেখতে আসবে সবাই—

—আমাকে তো তুমি বলোনি, বারে!

মা'র আর কথা বলা হলো না। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একজন বুড়ো লোক এলেন একেবারে রান্নাঘরের কাছে। বললেন—দিদি, ওঁরা তো আর থাকতে চাইছেন না—

মা বললে—সে কি, আমি যে খাবার-দাবার করলুম এত—যোগাড়-যন্তর করলুম এত, তা কি হয়—না, না, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ঘটক মশাই—না খেয়ে গেলে মনে কষ্ট হবে—

ঘটক মশাই বললেন—আমি বলেছি, কিন্তু কিছুতেই শুনছেন না—

—তা হলে আমি গিয়ে বলছি চলুন!

মা তাড়াতাড়ি থান-ধুতিটা ভালো করে গায়ে গুছিয়ে নিলে। রান্নাঘরের দরজাটায় শেকল দিলে। চন্নুনীকে বললে—দেখিস তো মেয়ে, কাকে না খায়—

মা গিয়ে সোজা ঘরের দিকে গেল। ঘটক মশাই বললেন—মেয়ে তো পছন্দ

হয়েছে বলেই মনে হলো, কিন্তু......

মা বললে—মেয়ে পছন্দ হোক আর না-হোক জল-খাবার খেতে আপত্তি কী?

ঘটক মশাই বললেন—অনেক দূর থেকে আসছেন ওঁরা, বলছেন ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—তা এ-সব কাজে একটু রাত হবে বৈকি, কলকাতা শহরে আর রাত কী!

বলতে বলতে মা সোজা গিয়ে দাঁড়াল একেবারে ঘরের সামনে। দু'জন ভদ্রলোক বসেছিলেন তক্তপোশের ওপর। মা'কে দেখে তাঁরা যেন কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। মা'র কিন্তু সত্যিই কোনও সঙ্কোচ, কোনও লজ্জা নেই।

মা বললে—ভট্টাচার্যি মশাই বলছিলেন আপনারা নাকি জলযোগ না-করেই চলে যাবেন—তা হবে না, আপনারা এসেছেন যখন এ-বাড়িতে, এ-বাড়িতে কষ্ট করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন খালিমুখে আপনাদের যেতে দেব না—তা সে যত দেরিই হোক—

একজন বললেন—জলযোগ আর একদিন করলেই হবে—সম্বন্ধ হোক, তখন জলযোগ করবো বৈকি।

মা বললে—কিন্তু আজ যে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি আপনাদের জন্যে—

আর একজন বললেন—তা হয় না মা, সম্বন্ধ হবার আগে আমাদের কোথাও জলগ্রহণ করবার রীতি নেই—

—রীতি না-হয় একদিন ভঙ্গই করলেন—আমি তো বেশি কিছু দিচ্ছি না—সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করেই চলে যাবেন—

ঘটক মশাই এতক্ষণে কথা বললেন—ইনিই হচ্ছেন পাত্রীর মাতৃতুল্য—

মা বললে—মা-হারা মেয়ে, আমি মানুষ করেছি আর কি, অঘোর ভট্টাচার্যি মশাই আমার গ্রামের লোক, আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন বাড়িতে, সেই থেকে আমিই মানুষ করেছি বিন্তীকে, যদি সম্বন্ধ করেন তো তখন জানতে পারবেন কেমন সোনার মেয়ে আমার—আমি নিজের মুখে কিছু বলতে চাই না—

ঘটক মশাই বললেন—আমিও তাই বলছিলাম এঁদের, ভট্টাচার্যি মশাই তো সংসারের কিছুই দেখেন না, সন্নিসী মানুষ, এই দীপুর-মা'ই সংসারের সব, নাতি বলুন, নাতনী বলুন, সবাই এঁর কাছে মানুষ, ভট্টাচার্যি মশাই কবে বনে চলে যেতেন সব ফেলে টেলে দিয়ে ইনি না থাকলে—এই দেখুন না, আজ তাঁর নাতনীকে আপনারা দেখতে এসেছেন, আর তিনি গেছেন যজমান-বাড়ি—ভট্টাচার্যি মশাই না হলে আবার যজমানদের যে একদণ্ড চলবে না কিনা—

একজন জিজ্ঞেস করলেন—তা একটা দিন তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না?

মা বললে—বাবা বড় অদ্ভুত মানুষ, আপনারা তাঁকে না দেখলে বুঝতে

পারবেন না—আমার পীড়াপীড়িতেই এই সম্বন্ধ হচ্ছে, তিনি বিবাগী মানুষ, কোনও দিকেই তাঁর খেয়াল নেই—অথচ সংসারে আপন বলতে ওই দুটি নাতি আর এই একটি নাতনী—তা নাতি দুজনের কথা ছেড়েই দিন, যা কিছু আছে তাঁর শেষকালে জামাই-ই পাবে—

—তা আর কেউ-ই নেই অঘোর ভট্টাচার্যি মশাই-এর?

মা বললে—আর কে থাকবে বলুন, আমি এই নাতনীটির বিয়ে হয়ে গেলেই চলে যাব, আমার এই ছেলে, এই ছেলের একটা কিছু হিল্লে হলেই আমিও চলে যাবো, তখন জামাই-ই সব! আর তা ছাড়া বাবাই বা ক'দিন আর, এখনই তো চোখে ভাল দেখতে পান না, সেদিন তো পড়ে গিয়ে পা ভেঙে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন—

মা'র কথাটা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ পাশে সতী এসে ডাকলে—মাসীমা—

মা পাশ ফিরেই সতীকে দেখে বললে—এই যে, কী মা? তুমি যে?

সতী বললে—বিন্তীদি খুব কাঁদছে মাসীমা, আপনাকে ডাকছে—

এত লোকের মধ্যে হঠাৎ যেন লজ্জায় পড়ে গেল মা। কী যে বলবে বুঝতে পারলে না হঠাৎ। এত আয়োজন, এত উদ্বেগ, সব যেন পণ্ড হয়ে যাবার উপক্রম। কত দিনের কত স্বপ্নের পরিকল্পনা। সকাল থেকে কত আয়োজন করেছে মা একলা। অঘোরদাদুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টাকা আদায় করেছে। বুড়ো কৃপণ মানুষ, সহজে কি টাকা বার করতে চায়। তাই সকালবেলা অঘোরদাদু অত হৈ-চৈ করছিল। তখন কলেজ যাবার তাড়াতাড়িতে কিছু বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। তার মনটাও ভাল ছিল না ক'দিন। লক্ষ্মীদির জন্যে কোথায় যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের। সেই দাতারবাবুর সঙ্গে কথা হবার পর অনেক কথা মনে পড়েছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। কাকাবাবুদের বাড়িতেও যেন সব বদলে গিয়েছিল সে ক'দিন। যেন সকাল-সকাল আলো নিভে যেত বাড়ির। বাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে দীপঙ্করের মনে হতো হয়ত লক্ষ্মীদি আবার বাড়িতে এসে গেছে। আবার বাড়ি এসে ঠিক তেমনি করে আবার কলেজ যেতে আরম্ভ করবে বাসে চড়ে। সতী একলাই কলেজ যেত। একদিন দাঁড়িয়ে ছিল দীপঙ্কর সতীর কলেজ যাবার সময়। সেদিন বোধহয় বাস আসতে দেরি করছিল।

দীপঙ্কর ডাকলে—এই শোন—

সতী পেছন ফিরে দেখলে দীপঙ্করকে। বললে—কী?

কিছু বলতে গিয়েও যেন কী বলবে ভেবে পেলে না দীপঙ্কর।

—ওমা, কী বলবে বলো না, চুপ করে রইলে কেন?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবার চিঠি এসেছে?

সতী বললে—হ্যাঁ, কেন?

—তোমার বাবার খুব কষ্ট হয়েছে তো শুনে?

—কী শুনে?

—লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার খবর শুনে?

সতী বললে—তোমার দেখছি লক্ষ্মীদির জন্যে আমাদের চেয়েও বেশি ভাবনা!

—কেন? তুমিও তো ভাবো! আর তাছাড়া ভাবা কি অন্যায়?

সতী বললে—বাবাকে এখনও খবর দেওয়াই হয়নি!

—তা হলে এখন আর খবর দিও না, বুঝলে, তিনি বিদেশে থাকেন, খুব কষ্ট পাবেন শুনে—হয়ত চলেই আসবেন এখানে! আর দু'দিন সবুর করো না, লক্ষ্মীদি হয়ত তার মধ্যে এসে যাবে আবার—

সতী যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—তার মানে? তুমি জানো বুঝি কোথায় গেছে লক্ষ্মীদি?

—না, সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না!

—তুমি নিশ্চয় জানো, বলো না, কোথায় গেছে লক্ষ্মীদি!

দীপঙ্কর বললে—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না? আমি জানলে তোমায় বলতাম না? আর লক্ষ্মীদি কি আমায় বলে যাবে?

সতী কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—এবার আমিও চলে যাবো—

দীপঙ্কর হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। বললে—চলে যাবে তুমি? কোথায়?

—লক্ষ্মীদি নেই, আর এখানে থেকে কী হবে। লক্ষ্মীদির জন্যেই তো কলকাতায় থাকা। বাবা শিগগিরই আসবেন লিখেছেন—

দীপঙ্কর বললে—তোমরা চলে গেলে বাড়িটা আবার অন্ধকার হয়ে যাবে—তখন আমরাও চলে যাবো—

—কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—তখন অন্য বাড়ি একটা ভাড়া নেব, আর আমারও একটা চাকরি খুঁজছে মা, তখন আর এ-বাড়িতে থাকবো না—আর, ততদিন বিন্তীদিরও একটা বিয়ে হয়ে যাবে—

সতী কিছু কথা বললে না। গলির মোড়ের দিকে চেয়ে দেখলে—হয়ত বাসটা এল কিনা তাই দেখলে।

দীপঙ্কর একটু থেমে বললে—মা বলছিল তোমারও নাকি বিয়ে হয়ে যাবে—

সতী হাসলো। বললে—তা বিয়ে তো হবেই, বিয়ে না হয়ে কি আইবুড়ো থাকবো নাকি চিরকাল—

দীপঙ্কর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে—না তাই বলছি—

তারপর যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা হলো। বললে—তোমার বাস আসতে তো আজ খুব দেরি হচ্ছে দেখছি—

—দেরি হোক না, আমি তো তোমায় আটকে রাখিনি?

দীপঙ্কর বললে—তা হলে আমি যাই, আমার আবার একটা কাজ আছে—

সতী আবার হাসলো। বললে—এতক্ষণ তো কাজের কথাটা মনে পড়েনি—

—না, সত্যিই কাজ আছে, আমি যাই—

দীপঙ্কর চলেই আসছিল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। কাছে এসে বললে—তোমার এ-মাসের চাঁদাটা তো দিলে না সতী?

—চাঁদা, কিসের চাঁদা?

দীপঙ্কর বললে—বাঃ, মনে নেই, আমি সেই তোমার কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে রসিদ দিয়ে গেলাম তোমাকে—?

—কিন্তু বই তো একটাও পাইনি!

—তা বই চাইলে না কেন! আমি তো তোমাকে রোজ দুখানা করে বই দিতে পারি—তুমিই তো চাইবে?

সতী বললে—কিন্তু কথা তো সেরকম ছিল না—কথা ছিল তুমি দিয়ে যাবে বই—

দীপঙ্কর বললে—আমার না-হয় মনে ছিল না—তা তুমিও তো মনে করিয়ে দিতে পারতে—

সতী বললে—আমি লক্ষ্মীদি হলে তখন আর মনে করিয়ে দিতে হতো না—তখন ঠিক মনে পড়তো তোমার—

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে সোজা চেয়ে দেখলে। বললে—লক্ষ্মীদির কথা আলাদা—

—কেন, লক্ষ্মীদির কথা আলাদা কেন?

—আলাদা হবে না? বলো তো কত কষ্ট দিয়েছ তোমরা লক্ষ্মীদিকে? সবাই মিলে কত কষ্ট দিয়েছ! তোমাদের জন্যেই তো লক্ষ্মীদি চলে গিয়েছে বাড়ি ছেড়ে!

—কীসের কষ্ট?—সতী যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

দীপঙ্কর কথাটা এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। বললে—সে আমি বলবো না তোমাকে—তুমি সব জানতে পারবে—

দীপঙ্কর ঘুরে দাঁড়াতেই সতী দীপঙ্করের হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলেছে। বললে—পালাচ্ছো যে বড়? বলতেই হবে কী কষ্ট দিয়েছি আমরা লক্ষ্মীদিকে—বলতেই হবে—

দীপঙ্কর বললে—বারে, হাত ছাড়ো না—

—না, বলো আগে, কী জানো তুমি!

—সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না—আমার শুধু মনে হলো বলেই বললাম—

সতী তখনও জোর করে ধরে আছে দীপঙ্করের হাতটা। বললে—তোমাকে ছাড়ছি না আমি, আমি বরাবর জানতাম, লক্ষ্মীদি তোমাকে সব বলেছে—

—কী বলেছে?

সতী বললে—চল তুমি কাকাবাবুর কাছে, কাকাবাবুর কাছে গিয়ে সব বলতে হবে—চল কাকাবাবুর কাছে—

বলে সতী জোর করে দীপঙ্করকে ভেতরের দিকে টানতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—আমি বলছি তো আমি কিছু জানি না, তবু কেন কাকাবাবুর কাছে যাবো—

দীপঙ্কর জোর করে নিজের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিতে চাইলে। সতীর গায়েও জোর কম নেই। সতীও টানতে লাগলো। বললে—আমি কিছুতেই ছাড়বো না—চলো তুমি, যেতেই হবে তোমাকে—

হঠাৎ কাকীমা শুনতে পেয়েছে। কাছে এসে বললে—কীরে, ওকে অমন করে টানছিস কেন রে, কী হলো রে সতী—

—দেখ না কাকীমা, দীপু বলছে লক্ষ্মীদি কীজন্যে চলে গেছে, ও জানে!

কাকীমা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—সে কী, তুমি জানো নাকি দীপু?

দীপঙ্কর বলে উঠলো—না কাকীমা, আমি কিছুছু জানি না, লক্ষ্মীদি চলে যাবার পর থেকে আমারই বলে কষ্ট হচ্ছে—এক-একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমারই ঘুম আসে না ভেবে ভেবে—আর তাছাড়া আমি জানলে আমি বলতাম না আপনাদের—?

কাকীমা বললে—সত্যিই তো, ও কী করে জানবে? ছাড় ওকে—

সতী তবু ছাড়বে না। বললে—কিন্তু দীপুর মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে ও জানে সব কাকীমা, সেই জন্যে ঘুরে ফিরে কেবল আমাকে দেখলেই লক্ষ্মীদির কথা বলে—

—তা লক্ষ্মীদির কথা বলতেও দোষ? লক্ষ্মীদির জন্যে মন-কেমন করতেও দোষ?

কাকীমা বললে—ছাড় সতী, ওর হাত ছেড়ে দে—দেখ দিদিদি ওর মা শুনলে কী ভাববে—

সতী বললে—মাসীমাকে গিয়ে আমি আজই বলে দিচ্ছি—

দীপঙ্কর এবার হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিলে। বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমার জিজ্ঞেস করাই দোষ হয়েছে—

কাকীমা কাছে এসে বললে—সত্যিই, বলো না দীপু, তুমি কিছু জানো? দেখছো তো আমরা সবাই কেমন ভাবছি মেয়েটার জন্যে, উনি তো ক'দিন ধরে চারদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান—দেখছো তো তুমি সব—বলো না, কোথায় গেছে লক্ষ্মী—আমরা কিছু বলবো না তাকে, কেউ জানতে পারবে না, কেউ বকবে না তাকে, তার বাবাকেও কিছু জানাবো না—এখনও জানানোও হয়নি—পাড়ার লোকরাও কেউ কিছু জানে না, যেমন থাকছিল এখানে, তেমনি থাকবে—কিছু বলবে না কেউ—

দীপঙ্কর বললে—সত্যি কাকীমা, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না—

সতী মিছিমিছি আমাকে সন্দেহ করছে—লক্ষ্মীদির যদি সত্যি কোথাও লুকিয়ে থাকবার মতলব থাকবে তো আমাকে বলে যাবে কেন? কেউ কি বলে কয়ে পালিয়ে যায়?

কাকীমার যেন এবারে সত্যিই বিশ্বাস হলো। সতীর দিকে ফিরে বললে—ও তো বলেছে ও জানে না, তা হলে কেন ওকে তুই অমন করছিলি, আর আমি তো গোড়া থেকেই বলে আসছি যে, দীপু ওর মধ্যে নেই, দীপু তেমন ছেলেই নয়—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে কাকীমা বললে—যাও, তুমি বাড়ি যাও—

দীপঙ্কর চলে আসছিল। সতী ডাকলে। বললে—চাঁদা নেবে না তুমি? চাঁদাটা নিয়ে যাও—

দীপঙ্কর পেছন ফিরলো। বললে—চাঁদা?

—হ্যাঁ, এ মাসের চাঁদাটা না-নিয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়? রাগ হলো বুঝি?

কাকীমা হাসলো। বললে—তুই আর ক্ষেপাসনি বাপু ওকে—না না তুমি বাড়ি যাও তো এখন দীপু—

দীপঙ্কর চলে যেতে যেতে বললে—যার চাঁদা দেবার ইচ্ছে হবে সে আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যাবে, আমি আর আসতে পারবো না—

সতী হয়ত একটা কিছু বলতো। কিন্তু হঠাৎ একটা ডাক-পিওন আসছিল বাড়ির দিকে। দীপঙ্কর পিওনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাদের বাড়িতে কখনও কোনও চিঠি আসে না। কিন্তু তবু পিওন দেখলেই কেমন আশা হয় একটা। পিওনটা কাছে আসতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—উনিশের একের বি'র কিছু চিঠি আছে?

—আছে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কার নামে?

—সতী মিত্র—

নামটা শুনেই দীপঙ্কর সতীর দিকে চাইলে। সতীও তখন চিঠিটা নেবার জন্যে সামনে এগিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়েই খামটার মুখ ছিঁড়ে ফেললে। কিসের চিঠি! কার চিঠি! লক্ষ্মীদির চিঠি নাকি! লক্ষ্মীদি লিখেছে? দীপঙ্কর হাঁ করে চেয়ে রইল সেই দিকে।

কাকীমা জিজ্ঞেস করলে—কার চিঠি রে সতী?

সতী চিঠিটা পড়তে পড়তে বললে—বাবার—

সতীর বাবার চিঠি! সতীর বাবার চিঠি! দীপঙ্করের যেন নড়বার ক্ষমতাও নেই আর। চিঠির মধ্যে কী লেখা আছে না জানলে তার যেন শান্তি হবে না। তবে কি লক্ষ্মীদির কথা সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কী হবে? লক্ষ্মীদির বাবার যে শরীর খারাপ! এ খবর শুনলে কি লক্ষ্মীদির বাবাকে আর বাঁচানো যাবে! কেন জানাতে গেল ওরা! আর দু-একদিন অপেক্ষা করলেই

পারতো! এমন কি লাভ হলো জানিয়ে! মিছিমিছি বুড়োমানুষকে কষ্ট দেওয়া।

কাকীমা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী লিখেছেন রে?

সতী বললে—বাবা কলকাতায় আসছেন—

—কবে?

কিন্তু ততক্ষণে গলির মোড়ে সতীর বাসটা এসে গেছে। সতী তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলে গেল।

কাকীমা আবার জিজ্ঞেস করলে—কবে আসছেন রে সতী?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সতী সোজা গিয়ে বাসে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হর্ন বাজিয়ে বাসটা চলে গিয়েছিল সোজা পুব দিকে—বালিগঞ্জের নতুন রাস্তার দিকে। দীপঙ্করও নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল তারপর।

সত্যি, বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল! সতীরা চলে যাবার পর থেকে যেন দীপঙ্করের মন বসতো না কোনও কাজেই। আগে অনেক ভাড়াটেই তো এসেছে অঘোরদাদুর বাড়িতে, কেউ চিরকাল থাকেনি। ভাড়াটেরা কখনও চিরকাল থাকে না। একদিন তারা চলেই যায়। সেই ছোটবেলা থেকে কতবার সে-ঘটনা দেখেছে দীপঙ্কর। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের সময় থেকে। তখনও এ-পাড়ার দক্ষিণে রাসবিহারী এভিনিউটা হয়নি। পুকুর আর ডোবা দিয়ে তখন জায়গাটা ভরা ছিল। এদিকে হাজিকাশিমের বাগানটাও একদিন ভেঙে নতুন বাড়ি উঠেছে। শিখদের গুরুদ্বার হয়েছে বড় রাস্তার ওপর। ঠিক পার্কটার পুব গায়ে। সত্যিই তো, কত বড় শহর তৈরি হচ্ছে ওদিকে। নতুন নতুন জমি, নতুন রাস্তা। ওইদিকেই ভাড়াটেরা উঠে যায়। নতুন ভাড়াটেরা ওইদিকেই নতুন বাড়ি খোঁজে। ওদিকে অত ভাল বাড়ি থাকতে এদিকে এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভেতর কে আসবে পচে মরতে। ভালোই তো! কিন্তু অমন করে চলে গেল কেন সতীরা। অত ভয়ানক কান্ড করে কেন যেতে হলো কাকাবাবুদের! সমস্ত পাড়ার লোক কেন অমন করে ওদের বিরুদ্ধে লাগলো!

তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে দীপঙ্কর, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেছে, সমস্ত রাত জেগে পড়তে পড়তে দিন-রাত কোথা দিয়ে কেটেছিল জ্ঞান ছিল না। প্রথমেই কেমন যেন বড় একলা-একলা মনে হলো। যেন কেউ নেই কোথাও দীপঙ্করের। কোনও কাজই নেই তার। মন্দিরে ফুল অবশ্য তখনও দিয়ে আসতে হয়, চন্নুনীর বদলে বাজারও করতে হয়, সংসারের অনেক কাজই করতে হয় দীপঙ্করকে। তবু যেন একলা-একলা সমস্তক্ষণ।

মনে আছে প্রথমদিনই গিয়েছিল বউবাজারে। দাতারবাবুর আপিসে। নম্বর খুঁজে খুঁজে যাওয়া কি সোজা কথা! প্রথমে ধর্মতলায় নেমে ট্রাম বদলে আবার অন্য ট্রামে ওঠা! দুপুরবেলা। রাস্তায় দুপুরবেলা ট্রাম ফাঁকা। একটা লোকও

নেই। একজন সামনের দিকে বেঞ্চিতে বসে ছিল, সে লোকটাও নেমে গেল চৌরঙ্গীর কাছে।

ট্রাম গাড়িতে তখন কেবল কন্ডাক্টার আর সে। হু হু করে রাস্তার এক পাশে ঘাসের ওপর দিয়ে ট্রামটা চলেছে ঝড়ের মত। একমনে অনেক কথা ভাবছিল দীপঙ্কর। কথা যে সত্যিই কী ভাবছিল এতদিন পরে তা আর মনে নেই ঠিক। কিন্তু মনে আছে বড় অন্যমনস্ক ছিল সে। পাঁচটা টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে দাতারবাবুকে। টাকাটা ইচ্ছে করে দেয়নি দাতারবাবু।

কিরণ বলেছিল—ওই পাঁচটা টাকা দিয়ে শরৎ চাটুজ্যের 'পথের দাবী' কিনবে—

কিন্তু দাতারবাবুর আপিসটা চিনতে পারলে হয়। কুড়ির-বি বউবাজার স্ট্রীটের দোতলার ওপর আপিস। ও-পাড়ায় অনেক আপিস। আপিসেরই পাড়া ওটা। একলা-একলা ট্রামে চড়ে চলতে গিয়ে দীপঙ্করের মনে হলো সে যেন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। অথচ এমনি করে রোজ সকালবেলা তাকে তো একদিন আপিসেই যেতে হবে। আর সকলের মত ভাত খেয়ে দৌড়তে দৌড়তে ছুটতে হবে। কী আশ্চর্য—সবাই বলবে দীপঙ্কর চাকরি করে। কত টাকা মাইনে পায়? তেত্রিশ টাকা। তা তেত্রিশ টাকাই কি কম নাকি! তারপর ফ্রি-পাশ পাওয়া যাবে। যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও রেলে চড়ে। সকালবেলা টিফিনের কৌটা নিয়ে আপিসে কোনওরকমে যেতে পারলেই হলো। তারপরে কাজ কিছুই নেই। কাজ থাকুক আর না-থাকুক মাস গেলে মাইনেটা ঠিক দিয়ে যাবে। কী আরামের চাকরি। এই পথ দিয়েই আপিসে যেতে হবে। পাড়ার আর সবাই যেমন আপিসে যায় তেমনি করে।

সমস্ত কলকাতাটা যেন বড় ফাঁকা। সত্যিই বড় ফাঁকা দেখাচ্ছে শহরটা। অন্তত ট্রামে যেতে যেতে দীপঙ্করের তাই মনে হয়েছিল সেদিন। সমস্ত দুপুরটা যেন বড় কঠোর বড় রুক্ষ বড় নিষ্ঠুর। এইটেই বুঝি পৃথিবীর আসল রূপ। যে-পৃথিবী রাত্রে শীতল হয়, রাত্রে শান্ত হয়, সে-পৃথিবীর সেই রূপটা যেন সাময়িক। আসলে এই জীবনটার মত এই দুপুরটাই হলো সব চেয়ে সত্যি। এ-জীবনে শান্তি কি পেয়েছে কখনও দীপঙ্কর? এ-জীবনে সান্ত্বনা কি পেয়েছে কখনও দীপঙ্কর? যদি পেয়েও থাকে সে কতটুকু? কতটুকু তার পরিধি, কতটুকু তার প্রসার? সমস্ত জীবনটাই যেন তার দুপুর—কলকাতার, এই এখনকার দুপুরের মত রুক্ষ কঠোর নিষ্ঠুর।

—টিকিট?

দীপঙ্কর যেন চমকে উঠলো! এই এতক্ষণ পরে টিকিট! টিকিট কাটার কথা মনেই ছিল না তার। পকেট থেকে পয়সা বার করে কন্ডাক্টারকে দিতেই একটা টিকিট কেটে দিলে সে। দুপুর বেলার টিকিট—তিন পয়সা। সস্তা দাম দুপুরবেলা। বিকেলবেলাই এই টিকিটের দাম পাঁচ পয়সা। গুনে গুনে নগদ

দু'আনা এনেছিল দীপঙ্কর। তিন পয়সা গেলে হাতে থাকবে পাঁচ পয়সা। কিন্তু কী যেন সন্দেহ হতেই পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। কই, দুটো পয়সা মাত্র আছে যে পকেটে! তাহলে?

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো দীপঙ্কর। বললে—টিকিট আমি একবার কেটেছি মশাই—

—কেটেছেন! কোথায় গেল টিকিট?

কণ্ডাক্টার হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগলো। কোথায় গেল টিকিটটা।

বললে—সত্যি বলছি, আমি টিকিট কেটেছি, আমার মনে পড়লো এখন—

কিন্তু কেটেছি বললে চলবে না, প্রমাণ তো দেখাতে হবে! কোথাও নেই। টিকিট যদি না কেটে থাকে সে তো বাকি পয়সা কোথায় গেল? উড়ে গেল নাকি? সমস্ত ট্রামখানার মধ্যে একলা দীপঙ্কর বসে বসে ঘামতে লাগলো! যদি দাতারবাবুর সঙ্গে না দেখা হয় তো ফিরবে কেমন করে? পয়সা কোথায় তার কাছে? সেকেণ্ড ক্লাসে এলেও তো আরো পয়সা লাগবে! ধর্মতলা থেকে লালবাজার পর্যন্ত না-হয় হেঁটেই যাবে—তারপর? তারপর ফেরবার সময়? সঙ্গে তো আর বেশি পয়সা নেই তার! কাছে শুধু একটা অচল পাঁচ টাকার নোট। সেটা দাতারবাবুকে ফেরত দিতে হবে। দরকার হলে বাধ্য হয়ে না হয় সেই নোটটাই ভাঙাতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু যদি দাতারবাবুর সঙ্গে দেখা নাই হয়?

হঠাৎ নজরে পড়লো। ট্রামের মেঝের ওপর তার টিকিটখানা পড়ে আছে। কুড়িয়ে দেখলে দীপঙ্কর।

বললে—এই দেখুন, এই তো আমার টিকিট—

কণ্ডাক্টার হাতে নিয়ে টিকিটটা ভাল করে দেখলে। অনেক পরীক্ষা করে বললে—কিন্তু এখন তো কাটা হয়ে গেছে আপনার টিকিট—

—তাহলে এ-টিকিটটা নিয়ে আমায় পয়সা ফেরত দিন!

—আর ফেরত হবে না, আমি যে টিকিট কেটে ফেলেছি—

তাহলে! দীপঙ্কর মহা সমস্যায় পড়লো। বললে—দেখুন, আমার কাছে ফিরে আসবার আর পয়সা নেই—আমাকে বড় বিপদে পড়তে হবে—

—তা আমি কী করবো? আমারও তো হেড-আপিসে হিসেব দাখিল করতে হবে—

কী আশ্চর্য! এমন ভাবে সবাই ঠকাবে তাকে। অথচ সে তো টিকিট কেটেছে ঠিক-ঠিক। কণ্ডাক্টার গিয়ে আবার দাঁড়াল দরজার কাছে। হু হু করে চলেছে ট্রামটা। ধর্মতলায় আসতেই দীপঙ্কর নেমে পড়লো। যেন তার ঘেন্না ধরে গেছে ট্রামের ওপর। এতটুকু উপকার করতে পারলো না লোকটা। লোকটা আসলে বদমাইশ। সে তো প্রমাণ পেলে যে সে টিকিট কেটেছে! তাহলে নতুন টিকিটটা ফেরত নিতে কী দোষ! যত সব বদমাইশ লোক রেখেছে ট্রাম কোম্পানী! নিজের

মনেই গজগজ করতে লাগলো দীপঙ্কর। কোথা দিয়ে যে বৌবাজারে যেতে হয় সে-রাস্তাটাও যেন ভুলে গেল দীপঙ্কর। সোজা ট্রাম রাস্তা ধরে গেলে আর রাস্তা ভুল হবার কথা নয়। সোজা রাস্তা দিয়ে গিয়ে ঘুরে ডান দিকে গেলেই লালবাজার। লালবাজারে পুলিসের থানাটা আছে। তারপর আর খানিকটা গেলেই বৌ-বাজারের পাড়া। দুপুর রোদ্দুরে বাড়িগুলোর ছায়ার তলা দিয়ে যেতে যেতে ভয়ানক রাগ হলো লক্ষ্মীদির ওপর। মনে হলো এই যা কিছু সবটুকুর জন্যে যেন লক্ষ্মীদিই দায়ী। লক্ষ্মীদি নেই বলেই তো এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সে! লক্ষ্মীদির জন্যেই তো এত হয়রানি সকলের কাছে। লক্ষ্মীদির কথা ভাবতে ভাবতেই তো পড়ায় ভাল করে মন বসে না তার। লক্ষ্মীদির জন্যেই তো সতী তাকে এমন সন্দেহ করে। লক্ষ্মীদি চলে গেছে বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে। সবাই বেঁচেছে। দীপঙ্করও বেঁচেছে। সতীও বেঁচেছে।

বিন্তীদিকে যেদিন দেখতে এসেছিল সেদিনকার কথাটাও মনে পড়লো।

সতী এসে একেবারে হাজির হয়েছিল ভদ্রলোকদের সামনে।

মা বললে—তুমি একেবারে ওদের সামনে এসে হাজির হলে? ওঁরা কী ভাবলো বলো তো মা—

ভদ্রলোকেরা তখন ঘটককে জিজ্ঞেস করছেন—ও মেয়েটি কে?

ঘটক মশাই বললে—ওই ভট্টাচার্যি মশাইএর ভাড়াটেদের মেয়ে—কলকাতার কলেজে পড়ে—

—ওঁরা কি ব্রাহ্মণ?

—না কায়স্থ।

কথাবার্তা শুনে দীপঙ্করের মনে হলো সতীকে যেন পছন্দ হয়ে গেছে ওঁদের। যেন কায়স্থ না হয়ে ব্রাহ্মণ হলে ওঁরা সতীকেই পছন্দ করতেন। সত্যি সেদিন কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল সতীকে! অথচ সতীই তার নিজের গয়না, নিজের স্নো-পাউডার, নিজের শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল বিন্তীদিকে। বেশ করে মনের মতন করে সাজিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে যত কিছু আছে তার সব দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল।

বিন্তীদি বলেছিল—আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই?

সতী বলেছিল—খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, দেখবে ঠিক পছন্দ হবে তোমাকে, দেখে নিও—

মা বলেছিল—তুমি মা তবু যা হোক সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে নইলে এত সব শাড়ি গয়না আমি কোথায় পেতাম—এখন ভালোয় ভালোয় পার হয়ে যায় মেয়ে, তো বুঝবো ওর ভাগ্য—

কিন্তু তারপরেই অঘটনটা ঘটলো।

মা বললে—আপনারা একটু বসুন, না-খেয়ে যাবেন না—আমি দেখে আসি—

ঘরের মধ্যে এসে মা বললে—কী মা, কাঁদছো কেন মা?

সতী বললে—এই দেখন না মাসীমা, আমি যত বোঝাই কিছুতেই থামে না—কেবল কাঁদছে, কে'দে কে'দে একেবারে পাউডার-স্নো সব ভাসিয়ে দিলে. আমি এত করে সাজালুম—

মা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে বিন্তীদির মুখ গাল মুছিয়ে দিলে।একেবারে অঝোরধারে কাঁদছিল বিন্তীদি তখনও।

মা বলতে লাগলো—ছি, আজকের দিনে কাঁদতে নেই, কী হয়েছে বলো তো মা! কী হয়েছে তোমার?

বিন্তীদি বললে—ওরা খাচ্ছেন না কেন? আমায় পছন্দ করেনি?

মা হেসে ফেললে। সতী পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সতীও হাসলে।

দীপঙ্কর বললে—সতীকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে, জানো মা—ওঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন সতীরা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ—

—তুই থাম্ তো!

তারপরেই মা সতীকে বললে—তা তুমিই বা ওদের সামনে একেবারে যেতে গেলে কেন বলো তো মা? চন্নুনীকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতে—

সতী বললে—কিন্তু কী কান্নাকাটি যে করছিল বিন্তীদি—আপনি তো তখন দেখেননি মাসীমা—এখন তো তবু থেমেছে একটু—

মা বললে—ছি মা বিন্তী, ওরা কী ভাববেন বলো তো? অমন ছেলেমানুষি করতে আছে?

—তাহলে ওঁরা খাচ্ছেন না কেন?

—খাবেন খাবেন, নিশ্চয়ই খাবেন! সেই কথাই তো ওঁদের বলতে গিয়েছিলাম—আর তুমিই তো গোল বাধালে যত—

তারপরে ভাল করে চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে মা বললে—তুমি কে'দো না, তুমি স্থির হয়ে বোস একটু, বিয়ে কি অত সহজে হয় মা, মেয়েমানুষের বিয়ের অনেক জবালা, তারপরে বিয়ে হয়ে গেলে তুমিও নিশ্চিন্ত আমিও নিশ্চিন্ত—

সেদিন শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকেরা সত্যিই খেলেন। রীতি না থাক, নিয়ম না থাক, মা'র পীড়াপীড়িতে কেউ আর না করতে পারলেন না। ব্রাহ্মণের মা-বাপ-মরা মেয়ে, এমনিতেই যত্ন-আত্তি পায়নি, তারপর তাঁরা না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবে মেয়ে। বিয়ে না হোক ক্ষতি নেই, সম্বন্ধ না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ি ব্রাহ্মণ এসেছেন, আর অত দূর থেকে এসেছেন—আর আয়োজন সামান্য যা-কিছু করেছেন তিনি, তাঁরা না খেলে কে খাবে? কেউ তো নেই সংসারে! আপনারা দয়া করে নিয়ে গেলে বুঝবেন মেয়ের গুণ! মুখ চড়েও কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। বাড়ি থেকে এক-পা বেরোয় না এমনি মেয়ের স্বভাব! এই যে আজকাল সব মেয়েরা রাস্তায়-ঘাটে বেরোয়, এ-মেয়ে তেমন নয়। ঘরে নিয়ে গেলেই বুঝবেন এ-মেয়ে কত লক্ষ্মী! এই মেয়ের টানেই আমি এখানে পড়ে আছি—নইলে কবে চলে যেতুম.....ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা!

ভদ্রলোকরা লুচি আর রসগোল্লা খেতে খেতে সব শুনতে লাগলেন। ঘটক মশাইও পেট ভরে খেতে লাগলেন—চেয়ে চেয়ে খেতে লাগলেন সব।

সবাই চলে যাবার পর মা বললে—আজ তুমি ছিলে বলেই সব হলো মা, নইলে কে যে সাজিয়ে গুজিয়ে দিত—

সতী বললে—আমি তাহলে এখন আসি মা......

—দাঁড়াও, ও দীপু, হারিকেনটা একটু ধর তো সতীকে, রাস্তাটা অন্ধকার—

বাড়ির সামনে অন্ধকার মতন। দীপঙ্কর হারিকেনটা নিয়ে সতীকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে এল।

দরজার কাছে এসে বললে—আজ তোমাকেই কিন্তু ওরা বেশি পছন্দ করেছিল, জানো সতী?

সতী বললে—আবার বুঝি তোমার বকুনি খাবার সাধ হয়েছে? মাসীমাকে বলে দেব?

—বারে, সত্যি কথা বলাও দোষ?

—কিন্তু বিন্তীদি কী মনে করলে বলো তো?

দীপঙ্কর বললে—না, কিন্তু বিন্তীদি তো অত সেজেছিল, তবু ওর চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালো দেখাচ্ছিল—সত্যি—

সতী কিছু বললে না। শুধু বললে—ছি—

—ছি কেন?

সতী বললে—ও-কথা বলতে নেই,—

—কেন, বলতে নেই কেন, শুনিই না?

সতী বললে—দেখছ না আমার এখনও বিয়ে হয়নি, বিয়ে না হলে ও-কথা বলতে নেই—

—কেন? ও-কথা বললে বিয়ে হয় না বুঝি?

সতী হেসে ফেললে হঠাৎ। বললে—তোমার দেখছি কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—লোকে শুনলে কী ভাববে বলো তো?

—কী ভাববে?

সতী বললে—লোকে ভাববে হয়ত তোমার সঙ্গে আমার অন্য রকম সম্পর্ক!

কী সম্পর্ক?

সতী হয়ত একটা উত্তর দিত, কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে মা'র গলা শোনা গেল। মা বললে—ও মা, তোমার শাড়ি গয়না-টয়নাগুলো নিয়ে গেলে না মা?

সতী সেখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে—কালকে ও-সব নিয়ে যাবো মাসীমা, আজ থাক—

দীপঙ্কর বললে—যাক গে, তোমাকে সুন্দর বলেছি বলে কিছু মনে করলে না তো?

—না, মনে আবার করবো কী? সুন্দর বললে তো সকলেরই ভালো লাগে—

তবে মুখের ওপর বললে একটু সন্দেহ হয়, এই আর কি—

—আর তা ছাড়া আমি তো একলা বলছি না, ও ভদ্রলোকরাও বলছিল যে—

সতী বললে—ওরা না-হয় অন্য কারণে বলছিল—কিন্তু তুমি কী জন্যে বলছো শুনি?

দীপঙ্কর বললে—সত্যি আমার কোনও স্বার্থ নেই—আমার আবার কিসের স্বার্থ থাকতে পারে, বলো?

—তাই দেখছিলাম বটে, তুমি কেবল আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে ছিলে—

দীপঙ্কর বললে—ভাবছিলাম তোমার বিয়ের বেলায় এত কষ্ট করতে হবে না, যে দেখতে আসবে তারই পছন্দ হয়ে যাবে—

সতী বললে—আমার বিয়ের জন্য তোমার দেখছি ঘুম নেই একেবারে—

দীপঙ্কর লজ্জা পেয়ে গেল। বললে—না না, আমি আর কিছু বলবো না, তুমি যাও—

—মাসীমাকে আমি কালকেই বলে দেব সব—যা যা বললে সব বলে দেব দেখো—

—কী বলবে?

সতী আবার হাসলো। বললে—মাসীমাকে বলবো আপনার ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে দিন শিগগির, সুন্দর মেয়ে দেখলেই তার সঙ্গে কেবল ভাব করবার জন্যে ছোঁক্ ছোঁক্ করে আপনার ছেলে—

—তাহলে আমিও বলতে পারি—

কড়ি দিয়ে কিনলাম

—কী বলতে পারো শুনি?

—আমিও কাকাবাবুকে বলতে পারি আপনার ভাইঝি ভদ্রলোকের ছেলে দেখলেই তাকে চাকর মনে করে—আর চাকর মনে করে তার গায়ে পয়সা ছুঁড়ে দেয়—

সতী থমকে দাঁড়াল এবার। একবার চাইলে দীপঙ্করের দিকে। তারপর বললে—আচ্ছা ঠিক আছে. আমি এ-কথাটাও বলে দেব মাসীমাকে—

—কী কথা বলবে?

—বলবো, আপনার ছেলে কেবল গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে—

বলে আর দাঁড়ায় নি সতী—একেবারে নিজের বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। দীপঙ্করও আর সেখানে তখন দাঁড়ায়নি। সোজা হারিকেন নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। সেদিন অভ্যাগতদের জন্যে অত যে আনন্দের আয়োজন তার সবটুকু যেন তারপর তার অন্যমনস্কতার মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মা'র পীড়াপীড়িতে ভদ্রলোকেরা জলযোগ করতে বাধ্য হয়েছিল—বিন্তীদির কান্নাও একটু থেমেছিল। কিন্তু সব আয়োজন-অনুষ্ঠানের মধ্যেও দীপঙ্করের মনে হয়েছিল অনুষ্ঠান যেন শুধু তাকে কেন্দ্র করেই। যেন বিন্তীদির কনে-দেখাটা উপলক্ষ মাত্র—আসলে বিন্তীদির এ-অনুষ্ঠান না হলে সতী তার গয়না-গুলো এমন করে খুলেও দিত না, আর গয়নাগুলো না খুললে সতীকে অমন সুন্দরও দেখাত না। আর তা না হলে দীপঙ্করও অমন করে সতীকে সুন্দর বলবার অবকাশ পেত না।

ঘরের জানালাটা খুলে দিতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে দীপঙ্কর স্পষ্ট দেখতে পেলে লক্ষ্মীদির ঘরের আলোটা জ্বলে উঠলো আর ঘরের মধ্যে যেন সতীর ছায়াটা নড়া-চড়া করতে লাগলো এদিক-ওদিক। আর খানিক পরেই ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিতেই দীপঙ্করের চোখে সব অন্ধকার হয়ে এসেছিল।

কিরণ বলেছিল—বিয়ে হবার পর কি আর তোকে চাঁদা দেবে ওরা—দেখবি তখন সব ভুলে যাবে—মেয়েমানুষরা বিয়ের পর আর কিছু মনে রাখে না—

দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো যদি কিরণের কথাই সত্যি হয়! তা হতেও পারে। কিরণ তো জানে অনেক। অনেক বেশি বোঝে কিরণ। কিরণের কথা সত্যি হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া মনে রাখলেই বা লাভ কী! মনে না রাখাটাই ভালো। এই আপিস পাড়াতেই একদিন কাজের মধ্যে সমস্তই ভুলে যেতে হবে। আগেকার সেসব দিনের কথাগুলোই কি মনে আছে দীপঙ্করের? সেই লক্ষ্মণ সরকার, সেই নির্মল পালিত, সেই ফটিক, সেই চণ্ডীবাবুদের বাড়ির—কী যেন নামটা...। আশ্চর্য এই কদিনের মধ্যে নামটাও আর মনে পড়ছে না। আর শুধু মানুষই বা কেন, জায়গাও কত বদলে গেল। ইতিহাস বদলায় আর ভূগোল বদলাবে না?

—হ্যাঁ মশাই, দাতারবাবুর আপিসটা এখানে কোথায়? এস. এস. দাতার? শিবশম্ভু দাতার?

কুড়ির-বি বৌবাজার স্ট্রীট! বৌবাজারের বড় রাস্তার ওপর ঠিক নয়। একটা ছোট গলির ভেতর—দোতলার ওপর উঠতে হয়। ঠিক নম্বরটা দেখে মিলিয়ে নিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো দীপঙ্কর। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে লোক উঠছে নামছে—তার পাশ ঘেঁষে সোজা যে-যার নিজের কাজে চলে যাচ্ছে। দুপুরবেলার আপিস-পাড়া। এদিকটায় চীনেদের বসতি। অনেক চীনেম্যান ঘোরাফেরা করছে আশেপাশে। খড়ম পায়ে, গেঞ্জি গায়ে বাড়ির সামনে সরু গলিতেই ঘর-বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে যেন।

—হ্যাঁ মশাই, দাতারবাবুকা আপিস কাঁহা মালুম হ্যায়?

হাঁ করে সবাই প্রশ্নটা শোনে। কেউ কেউ আবার তেমন আমলই দেয় না। দীপঙ্কর আসল নম্বরটার সামনে এসেই বার কয়েক দাঁড়াল। সাইনবোর্ডও নেই যে দেখে বুঝতে পারবে! দরজায় তালা বন্ধ। একটা রং-চটা দরজা। আশে-পাশের ঘরে লোকজন রয়েছে, কিন্তু ওই দরজাটাই বন্ধ একেবারে। দীপঙ্কর পাশের ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে। দু'একজন বাঙালী কাজ করছে।

—হ্যাঁ মশাই, এ আপিসটা কখন খুলবে?

—ও আর খুলবে না, ও বন্ধ হয়ে গেছে—

—বন্ধ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ—

দীপঙ্কর যেন হতাশ হয়ে পড়লো। এত কষ্ট করে খুঁজে বার করে এখন তাকে আবার ফিরে যেতে হবে! আর কাছে যে পয়সাও নেই ফিরে যাবার। মাত্র দুটো পয়সা রয়েছে পকেটে। যেমন করে হোক দাতারবাবুর সঙ্গে যে দেখা করতেই হবে। অচল পাঁচ টাকার নোটটাও বদলে নিতে হবে! কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে নিচে চলে এসেছিল দীপঙ্কর। আবার যদি কাল আসতে হয় তো আবার ক'টা পয়সা খরচ। সেই কালিঘাট থেকে এত দূরে আসা কি সম্ভব! পয়সাই বা দেবে কেন মা? জিজ্ঞেস করলে দীপঙ্কর বলবেই বা কী! দীপঙ্কর আবার উঠলো। আপিসটার খোলা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ল।

বললে—হ্যাঁ মশাই, শুনছেন?

ভদ্রলোক মাথা তুললো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, দাতারবাবুর বাড়ির ঠিকানাটা বলতে পারেন?

লোকটা এবার মনোযোগ দিয়ে চাইলে তার দিকে। বললে—কেন বলুন তো, কী দরকার তার সঙ্গে?

—এই একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলেন, সেটা অচল, বদলে নিতে এসেছি—

ভদ্রলোক বললে—সে আর বদল পাবেন না—

—আপনি বলুন না তাঁর ঠিকানাটা, নিশ্চয়ই বদলে দেবেন।

অনেক বোঝানোর পর ঠিকানাটা আন্দাজে বললে ভদ্রলোক। চীনেপাড়ার মধ্যে একটা একতলা বাড়িতে সামনের ঘরে থাকে দাতারবাবু। হলদে রং-এর বাড়ি, আলকাতরা মাখানো দরজা—দেখলেই চেনা যাবে।

—তবে এখন তো পাবেন না তাকে, দেখুন চেষ্টা করে যদি পান, এখন একটু গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ক'দিন!

ভদ্রলোকের মন্তব্যটা ভালো লাগলো না দীপঙ্করের। তাড়াতাড়ি আবার নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। সেই চীনেপাড়ার মধ্যে আরো ভেতরে ঢুকতে হলো। আশ্চর্য, এও যেন সেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের মত নোংরা। আসলে ভেতরে ভেতরে সব সমান। ট্রাম রাস্তায় দাঁড়ালে ভাবাই যায় না ভেতরে গলির মধ্যে এত নোংরা জায়গা আছে। হলদে রংএর একতলা বাড়ি, আলকাতরা মাখানো দরজা। দাতারবাবু এই রকম জায়গায় থাকে? অথচ দাতারবাবুর তো বর্মায় মস্ত বড় ব্যবসা ছিল। লক্ষ্মীদির কাছে শুনেছিল দীপঙ্কর, শুধু লক্ষ্মীদির জন্যেই সে-সব ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছে। টাকা-কড়ি ব্যবসাবাণিজ্য সমস্ত দাতারবাবুর কাছে তুচ্ছ। লক্ষ্মীদির জন্যে দাতারবাবু সব কিছু ছাড়তে পারে। অথচ সেই লক্ষ্মীদিই দাতারবাবুকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল। কিরণ ঠিকই

বলেছে—মেয়েরা সব ভুলতে পারে। মেয়েমানুষরা কিছু মনে রাখে না। দাতারবাবু লক্ষ্মীদির জন্যে অত স্বার্থত্যাগ করেছিল—আর লক্ষ্মীদি চলে যাবার সময় সেই দাতারবাবুর কথা একবার ভাবলেও না। দাতারবাবু সেই জন্যেই সেদিন রাস্তায় বলেছিলেন—ভেবে আর কী করবে? তুমি বাড়ি যাও।

না, আর বেশি ভাববে না দীপঙ্কর। দাতারবাবুও নিশ্চয়ই ভাবেন না। একদিন গরীব অবস্থা থেকে উঠেছেন—গরীব অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন একদিন তাঁরও অবস্থা ছিল দীপঙ্করের মত, কিরণদের মত। গরীব হওয়ার মধ্যে কোনও লজ্জা নেই। গরীব বলে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। দাতারবাবুরই কথা।

হলদে রং-এর একতলা বাড়ি, আলকাতরা মাখানো দরজা।

দীপঙ্কর সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লে।

প্রথমটা কোনও সাড়া এল না। তারপর আবার কড়া নাড়লে। ভেতরে ঝি-চাকর কেউ আছে নিশ্চয়। ভেতর থেকে খিল দেওয়া। যদি চাকর এসে বলে—দাতারবাবু বাড়ি নেই। যদি বলে আসতে রাত্তির হবে। রাত দশটা-এগারোটা হবে! ততক্ষণ কি বসে থাকা সম্ভব? কিন্তু দাতারবাবুর কাছে পয়সা না নিয়ে যে তার বাড়ি ফেরবারও উপায় নেই। দুটো পয়সা মাত্র পকেটে নড়ছে তার। থাকতেই হবে বসে। উপায় কী! রোজ রোজ আর আসা যায় না এদিকে। এদিকে এলেই তিনটে-তিনটে ছ'টা পয়সা খরচ। তারপর বিকেল তিনটের পর তিনটে পয়সায় আর হবে না। তিনটের পর থেকে আবার ট্রামের ভাড়া বেড়ে যায়। চীপ মিড-ডে-ফেয়ার চালু ওই বিকেল তিনটে পর্যন্ত।

ভেতর থেকে ঝি-এর গলা পাওয়া গেল।—কৌন্ হ্যায়?

দীপঙ্কর বললে—এক্ দফে দরওয়াজা খুলিয়ে না—হাম বহুত্ দূর সে আতা হ্যায়—

ভেতর থেকে শব্দ এল—বাবুজী আভি নেহি হ্যায় ঘরমে—

দীপঙ্কর বললে—হাম একঠো চিঠ্ঠি লিখ্কে রাখে গা—এক মিনিটকো ওয়াস্তে খুলিয়ে—

দরজা খুললো। খুলতেই দীপঙ্কর দু পা পেছিয়ে এসেছে! লক্ষ্মীদি!

—লক্ষ্মীদি তুমি?

লক্ষ্মীদিও কেমন যেন ভয় পেয়ে পেছিয়ে দাঁড়াল।

—দীপু, তুই?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির চেহারা দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ কী চেহারা হয়েছে লক্ষ্মীদির? এ কী পোশাক! মাথার সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর। লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে! কবে হলো! এত ময়লা কাপড় শেমিজ পরে আছে কেন? এ কী ঘর! এই ঘরে থাকে কেমন করে লক্ষ্মীদি! ঘরখানাতে যেন আলো ঢোকে না কোনও দিক দিয়ে। একটা তক্তপোশ পাতা রয়েছে একপাশে। ঘরময় একটা ভ্যাপসা ভিজে গন্ধ।

—তুই হঠাৎ?

দীপঙ্কর কী বলবে! তার যেন কথা হারিয়ে গিয়েছে। এমন করে এই অবস্থায় লক্ষ্মীদির দেখা পাবে তা তো ভাবতে পারেনি দীপঙ্কর, এখানে এই দাতারবাবুকে বাড়িতে। যে-দাতারবাবুকে দিনের পর দিন চিঠি দিয়ে এসেছে, যে-দাতারবাবুর সঙ্গে এই সেদিনও তার দেখা হয়েছে রাস্তায়। সেই দাতারবাবুর বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীদিকে দেখতে পেলে!

—আমি তো ভেবেছিলাম অন্য কেউ ডাকছে, তাই দরজা খুলতে দেরি করছিলাম।

দীপঙ্করের যেন তখন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। এ কি সত্যিই লক্ষ্মীদি, না আর কেউ?

—কী দেখছিস অমন করে তুই!

লক্ষ্মীদি যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে।

দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি এখেনে? আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি, কত ভাবছি তোমার জন্যে, রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ যে ঘুম ভেঙে যায় তোমার কথা ভেবে, কতদিন রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েছি তোমাকে ভাবতে ভাবতে—

লক্ষ্মীদি আবার হাসলো। বললে—তুই দেখছি এখনও ছেলেমানুষ আছিস—

লক্ষ্মীদির কথাগুলো যেন কানে গেল না দীপঙ্করের। লক্ষ্মীদিকে এখানে দেখে তার আনন্দ হয়েছে না দুঃখ হয়েছে তাও যেন সে ঠিক বুঝতে পারলে না। আনন্দও নয়, দুঃখও নয়, যেন একটা বিস্ময় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিরণের অসুখের সময় তার কথাগুলো শুনেও যেন এত আশ্চর্য হয়নি। প্রথম যেদিন লক্ষ্মীদিকে জানালার ফাঁক দিয়ে নাচতে দেখেছিল, সেদিনও এত আশ্চর্য হয়নি। সতী যেদিন তার গায়ে চারটে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেদিনও এত অবাক হয়নি।

লক্ষ্মীদি বললে—আয় বোস এখানে—বোস—

বলে লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাত ধরে তক্তপোশটার ওপরে বসিয়ে দিলে। দীপঙ্কর ঘরটার চারদিকে চেয়ে দেখলে। এত নোংরা ঘর। এত নোংরা ঘরে থাকে কী করে লক্ষ্মীদি! যে-লক্ষ্মীদি অত ফরসা, যে-লক্ষ্মীদি অত দামী দামী শাড়ি শেমিজ পরে, সেই লক্ষ্মীদি এখানে কী করে থাকে।

—এখানে আমি আছি কী করে জানতে পারলি রে তুই?

দীপঙ্কর বোবার মত লক্ষ্মীদির দিকে চাইলে। তার চোখ যেন ছলছল করে উঠলো।

—বাড়িতে ওরা কী বলছে রে সবাই? খুব খুঁজছে তো আমাকে?

দীপঙ্কর রেগে গেল। বললে—তুমি হাসছো লক্ষ্মীদি? হাসতে তোমার

লজ্জা করে না?

—কেন রে? হাসবো না কী করবো?

দীপঙ্কর বললে—আর আমি যে ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছি তোমার জন্যে, তোমার একবারও তা মনে পড়লো না? আমার পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না তোমার জন্যে, তা জানো? তুমি একটা খবরও দিতে পারলে না আমাকে?

লক্ষ্মীদি এবার কাছে সরে এল। দীপঙ্করের হাতটা ধরে নিজের কোলের ওপর রাখলে। বললে—সত্যিই তুই আমার জন্যে খুব ভাবনায় পড়েছিলি, না? কিন্তু কী করে তুই জানলি আমি এখানে আছি?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—দাতারবাবু কোথায়? তাঁকে খুঁজতেই তো এসেছি—

লক্ষ্মীদি বুঝতে পারলে না কিছু। দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দীপঙ্কর বললে—দাতারবাবু সেই যে পাঁচ টাকার নোটটা দিয়েছিল, সেটা অচল, সেটা বদলাতেই তো এসেছি—কদিন থেকে আসবো-আসবো ভাবছি, কিন্তু তোমার জন্যে ভেবে ভেবে কিছুতেই আসতে ইচ্ছে করছিল না—তুমি কী লক্ষ্মীদি? তোমার একটু মায়া হয় না?

লক্ষ্মীদি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—কিন্তু তুই তো জানিস না, আমি এদিকে কী বিপদে পড়েছি—

—তা তুমি একটা খবর দিলে না কেন আমাকে? আমি খবর পেলেই আসতুম—

—সে তুই কিছু করতে পারবি না রে, তোকে খবর দিয়ে আর কী লাভ হতো?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। লক্ষ্মীদি তার হাতটা ধরে যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ঘরটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। বেলা বোধ হয় পড়ে এল। বৌবাজারের একতলার ঘর, আলো-হাওয়া ঢোকবার পক্ষে বোধহয় অনুকূল নয় তেমন। দরজা জানালা যা আছে তাও লক্ষ্মীদি বন্ধ করে দিয়েছে।

—ওরাও ভাবছে, আমিও ভাবছি—তোমার জন্যে সবাই ভাবছে লক্ষ্মীদি। কাকাবাবু পুলিসের সব থানাতে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছেন, তোমার কলেজেও কেউ কিছু জানে না, তুমি যে কখন কেমন করে কোথায় গেলে কেউই জানে না—সতীও খুব ভাবছে। সতী সেদিন আমাকেই সন্দেহ করছিল, জানো? সতী ভেবেছে আমি জানি তুমি কোথায় আছো? শেষকালে আমার হাত ধরে টানাটানি, তখন কাকীমা এসে ছাড়িয়ে দিলেন—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি ভাবতেই পারিনি রে এমন হবে—

—কিন্তু তুমি চলে এলে কেন লক্ষ্মীদি? আগে তো বেশ ছিল, কেউ জানতে পারছিল না, কা কবার দরকার ছিল আমাকে বললেই আমি দাতারবাবুকে এসে

বলে যেতাম। এখন যদি কেউ টের পায় তুমি এখানে আছ?

—তুই বলে দিবি নাকি?

—না আমি বলবো না! কিন্তু তোমার বাবা তো আসছেন এখানে, এসে যদি তোমাকে খুঁজে বার করেন, তখন কী হবে বলো তো?

—বাবা আসছেন? কী করে জানলি তুই?

—তোমার বাবার চিঠি তো এল, আমি দেখলাম! সতীর নামেই তো চিঠি এল—সতীই তো বললে কাকীমাকে—

লক্ষ্মীদি কি যেন ভাবতে লাগলো নিজের মনে।

দীপংকর বললে—তার চেয়ে এক কাজ কর লক্ষ্মীদি—

—কী কাজ?

—তুমি বাড়ি ফিরে চলো! তোমার বাবা আসার আগেই ফিরে চলো, কেউ কিছু বলবে না। সতী আমাকে বলেছে, কেউ কিছু বলবে না—আর তা ছাড়া পাড়ার কেউ কিছু জানতেও পারেনি এখনও! তুমি যেমন থাকতে তেমনিই থাকবে—ও কথাও কেউ তুলবে না। তাই চলো লক্ষ্মীদি—দাতারবাবুকে একটা চিঠি লিখে রেখে দিয়ে আমার সঙ্গে চলো—

লক্ষ্মীদি কথাগুলো শুনেও কিছু বললে না।

দীপংকর বললে—চলো না, আবার যেমন ছিলে তেমনি হয়ে যাবে, বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেলে কে আর জানতে পারবে!

লক্ষ্মীদি বললে—না রে তা আর হয় না—

হঠাৎ লক্ষ্মীদির মাথার দিকে আবার নজর পড়লো।

বললে—তুমি ওই সিঁদুরের কথা বলছো তো? ও তেল দিয়ে ঘষলেই একেবারে সাদা হয়ে যাবে, ও কেউ বুঝতে পারবে না—

—দূর, ও-কথা বলিস নি, ও মুছতে নেই, আমি যে বিয়ে করেছি—

—কাকে?

দীপংকরের প্রশ্নটা যেন হঠাৎ নিজেরই কানে খট করে বাজলো! লক্ষ্মীদির দিকে আবার চেয়ে দেখলে দীপংকর। দেখেই যেন একটু সরে বসলো। মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন তাকে হঠাৎ বড় প্রবঞ্চনা করেছে। লক্ষ্মীদিকে হঠাৎ যেন বড় পর মনে হলো দীপংকরের। দীপংকর নিজের হাতটা লক্ষ্মীদির কাছ থেকে টেনে নিলে। এক মুহূর্তে লক্ষ্মীদির মুখখানা যেন বড় করুণ মনে হলো। যেন মায়া হয় লক্ষ্মীদিকে দেখে।

বললে—কেন তুমি এমন কাজ করলে লক্ষ্মীদি?

—কী কাজ?

—এই দাতারবাবুকে বিয়ে করা! এটা কি তোমার পক্ষে উচিত হয়েছে? কাউকে একবার জিজ্ঞেসও পর্যন্ত করলে না তুমি, আর একেবারে ঝপ করে এমন কাজ করে ফেললে? ভাবো তো, কেউ জানলো না, শুনলো না, কেউ সাক্ষী

পর্যন্ত রইল না আর বিয়ে হয়ে গেল? এই দেখ না, বিন্তীদিরও তো বিয়ে হবে, কত লোকজন এসে দেখে যাচ্ছে, তারপর দু পক্ষের পছন্দ হলে তবে বিয়ে হবে—এ তোমার কী-রকম বিয়ে বলো তো?

—কিন্তু বিয়ে তো এখন হয়নি, অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে—

—অনেক দিন আগে? কই, আমি তো কিছু টের পাইনি?

—হ্যাঁ, তুই সেই চিঠি দিয়ে আসতিস, তখনই বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের—কালিঘাটে গিয়ে বিয়ে করেছিলুম আমরা, এতদিন কেউ জানতো না—

দীপংকর কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। লক্ষ্মীদির সব কথাই জানে বলে একটা গর্ব ছিল দীপংকরের। আজ সেই গর্বটাও যেন চুরমার হয়ে গেল। নিজের পরাজয়টা যেন খুশি মনে মেনে নিতে পারলে না সে। নিজের ওপরেই তার মায়া হলো শুধু।

অনেকক্ষণ পরে দীপংকর বললে—তাহলে এখন কী করবে?

লক্ষ্মীদি বললে—সেই কথাই তো কদিন থেকে ভাবছি, তোর কথাও ভাবছিলাম, ভাবছিলাম তুই এলে ভাল হয়, তা তুই এসেছিস ভালই হয়েছে, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেছিরে এখানে এসে—

—বিপদ? তোমার বিপদ?

—হ্যাঁ, আমি যে কী করবো বুঝতে পারছি না।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—কেন, কী হলো তোমার লক্ষ্মীদি।

—তুই ভাই আমার একটা উপকার করতে পারবি?

দীপংকর বললে—নিশ্চয় পারবো, তুমি বলো না, কী উপকার করতে হবে?

—তাহলে শোন—

লক্ষ্মীদি গুছিয়ে বসলো। বললে—আমি যেদিন এখানে এলুম, সেদিনও জানি না যে এখানেই আমাকে থাকতে হবে এবার থেকে। আগের দিন সকাল বেলা শম্ভু চিঠি দিয়েছিল, তার খুব অসুখ করেছে—আমি পরের দিন কলেজে যাবার নাম করে এখানে চলে এলুম। দেখি শম্ভুর খুব জ্বর। জ্বর দেখে ডাক্তার ডাকতে গেলাম, ভাবলাম রোজকার মত বিকেল বেলা বাড়ি পৌঁছলেই হবে, কিন্তু দুপুরবেলা ওর জ্বর ভীষণ বাড়লো। আবার ডাক্তার ডাকতে যাবো, কিন্তু আমার সঙ্গে টাকা ছিল না—শম্ভুর বাক্সটার ভেতর হাত দিতে দেখলাম, টাকা নেই, ওর জামার পকেটে মনিব্যাগটাও দেখলাম, সেখানে দেখি মাত্র একটা টাকা পড়ে রয়েছে—কী করি.........

লক্ষ্মীদির কথা শুনতে শুনতে দীপংকর সেদিন যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গিয়েছিল। সেই বৌবাজার স্ট্রীটের একতলার ছোট ঘরটার মধ্যে যেন দীপংকর আর লক্ষ্মীদি একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছিল সেদিন। লক্ষ্মীদির বিপদ যেন দীপংকরেরই বিপদ হয়ে উঠেছিল। এমন করে লক্ষ্মীদি বিপদে পড়েছিল আর দীপংকর একটা খবরও পেলে না!

—তারপর?

তারপর কোথা দিয়ে যে সে-রাতটা কেটেছিল, সে-জ্ঞান ছিল না লক্ষ্মীদির। বিকেল হলো, সন্ধ্যে হলো, রাত হলো। রাত আটটা বাজলো, নটা বাজলো, দশটা বাজলো, এগারোটা বাজলো। তারপর এক সময়ে ভোরও হয়ে গেল। সারা রাত লক্ষ্মীদি দাতারবাবুর পাশে জেগে কাটিয়েছে, আর মাথায় জলপটি দিয়েছে। রাত্রে খাওয়া হয়নি। সমস্ত মাথাটা টন টন করছে ব্যথায়। তখন আর কোনও কথা কারো কথা ভাববার মত অবস্থা নেই। ভোরবেলা শম্ভু তখন চোখ চাইলে। বললে, একটু জল দাও। তখন আমার যে কী অবস্থা কী করে বোঝাবো তোকে!

—তা আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না তুমি?

লক্ষ্মীদি কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে। দীপঙ্কর উঠছিল। বললে—এই বোধহয় দাতারবাবু এসেছেন—

লক্ষ্মীদি বললে—না, দরজা খুলিস নি—

—কেন? কে দরজা ঠেলছে?

লক্ষ্মীদি বললে—সারাদিন ওই রকম দরজা ঠেলে লোকে—ও তোকে কিছু করতে হবে না—

—কিন্তু দাতারবাবুও তো হতে পারে—

—না শম্ভু নয়, শম্ভু বাড়িতে থাকে না—

—থাকে না?

দীপঙ্কর যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। দাতারবাবু বাড়িতে থাকে না তো কোথায় থাকে? লক্ষ্মীদি একলা এখানে থাকে নাকি?

লক্ষ্মীদি বললে—একলাই তো থাকি, বড় ভয় করে রে আমার এখানে—

—তা তুমি একলাই বা থাকো কেন? দাতারবাবু কোথায় গেল তোমাকে ফেলে? এখানে তোমাকে কে তাহলে দেখাশোনা করে? কে রান্না করে? কী করে চলে তোমার লক্ষ্মীদি?

বাইরে যে-লোকটা কড়া নাড়ছিল, সে বোধ হয় এতক্ষণে হতাশ হয়ে চলে গেল।

দীপঙ্কর বললে—দরজা খুললে না কেন লক্ষ্মীদি? ও কে? ওরা কারা?

—ওরা সব শম্ভুর পাওনাদার—

—পাওনাদার? টাকা পায় দাতারবাবুর কাছে? তা শোধ দিয়ে দিলেই হয়?

লক্ষ্মীদি বললে—সেই জন্যেই তো শম্ভু এখানে থাকে না। আপিসটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে, কারবার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে কিনা, যাদের যাদের টাকা দেবার কথা ছিল তারা সবাই কোর্টে নালিশ করেছে, ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে ওর নামে—বড় মুশকিলে পড়েছি রে, এখানে এসে পড়েছি আমি, এখন এখানে

থাকতেও পারি না, চলে যেতেও পারি না—কী করি বল তো তুই?

—তা তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলো না?

—তোর সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবো? ওরা কী বলবে শেষকালে? যদি বাবাকে জানিয়ে দেয়?

দীপঙ্কর বললে—কাউকে জানায়নি লক্ষ্মীদি, আমি ওদের বলেছিলাম যে, লক্ষ্মীদি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে—আর তা-ছাড়া এখানে তুমি একলা-একলা থাকবে কী করে? এখানে আছো কী করে তুমি? কী খাও? কে রাঁধে?

লক্ষ্মীদি বললে—খাই না তো—দুদিন শুধু খাবার খেয়ে আছি—

—বলো কি তুমি লক্ষ্মীদি! চলো তুমি, এখখুনি চলো আমার সঙ্গে আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনছি—

লক্ষ্মীদি চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—ভাবছো কি এত—ভাগ্যিস আমি এসেছিলাম দাতারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, তাই তো তোমার দেখা পেলুম।

—তুই কী করতে এসেছিলি বললি?

দীপঙ্কর বললে—সেই একটা নোট দিয়েছিলেন দাতারবাবু সেটা অচল, একদিন রাস্তায় দেখা হলো, বললেন, এখানে এলে আর একটা নোট দেবেন—তখন তুমি এখেনে চলে এসেছ—

লক্ষ্মীদি বললে—তখন থেকেই তো গোলমাল চলছে, এখানে নতুন ব্যবসা তো ওর, নতুন করে সব করতে হচ্ছিল, কত লোক ওকে ঠকিয়ে নিলে, অথচ বর্মার ওর অত বড় ব্যবসা ছিল। আমার জন্যেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এসেছে। মানুষটাকে দেখলে আমার নিজেরই কেমন খারাপ লাগে, মনে হয় আমিই ওর সর্বনাশের মূল, আমি না থাকলে ও বোধহয় একরকম করে কাটাতে পারতো—

—কিন্তু তোমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে দাতারবাবু থাকেই বা কোথায়?

—কোথায় কোথায় থাকে, হঠাৎ এক-একদিন অনেক রাত্তিরে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। দিনের বেলা আসতে সাহস হয় না। আমার কাছে একটা পয়সা ছিল না যখন চলে গেল—আমার হাতের চুড়িগুলো একটা একটা করে বেচে এ-কদিন চালিয়েছি—এই দেখ না চারটে চলে গেছে, আর এই কটা আছে মাত্র—

—কিন্তু দেনা শোধ করে দিলেই হয়! কত টাকা দেনা?

লক্ষ্মীদি বললে—সে অনেক টাকা, আমার এই হার কানের দুল সব ওকে দিয়ে দিয়েছি, এখনও অনেক টাকা বাকি আছে, সেই টাকার চেষ্টাতেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে—

লক্ষ্মীদির কথাটা শুনে দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো। বললে—কিন্তু টাকার যোগাড় যদি আর না হয়?

—না হলে আর কী করবো! শেষকালে যা হবার তাই হবে—

—কিন্তু ততদিন তুমি এখানে থাকবে কী করে? হাতের বাকি চুড়িগুলোও যখন ফুরিয়ে যাবে, তখন কী করবে?

লক্ষ্মীদি চুপ করে রইল। যেন কী করবে তা ভাববার ক্ষমতাও তার নেই।

দীপঙ্কর বললে—এ তোমার কী রকম বুদ্ধি বলো তো লক্ষ্মীদি? তোমার নিজের কথাটা তুমি একবারও ভাববে না? এতে কি দাতারবাবুরই ভালো হবে মনে করো?

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু বাড়িতে আমি কোন্ মুখে আবার যাবো!

—কেন? তুমি তোমার নিজের বাড়িতে যাবে তাতে কার কী বলবার আছে?

—কিন্তু আমি যে বিয়ে করে ফেলেছি—

—তা বিয়ে কি কেউ করে না? বিয়ে করেছ বলে কি কাকাবাবু কাকীমা তোমায় তাড়িয়ে দেবেন? তারা তো তোমার জন্যেই ভেবে ভেবে হয়রান। এই যে তুমি এতদিন বাইরে আছ, ওদেরও কি কম কষ্ট হচ্ছে ভাবছো?

লক্ষ্মীদি একথার কোনও উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর বললে—তাছাড়া তোমাকে এখানে রেখে আমিই বা কী করে যাই বলো তো? আমারও তো রাত্তিরে গিয়ে ঘুম হবে না—। আমিও তো শুয়ে শুয়ে কেবল তোমার কথাই ভাববো—

লক্ষ্মীদি বললে—তার চেয়ে তুই এখানে থাক না—থাকতে পারবি না এখানে?

—আমি?

দীপঙ্কর যেন মুশকিলে পড়লো হঠাৎ, বললে—আমি?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, থাক না, যে ক'দিন শম্ভু না আসে সে-ক'দিন তুই থাক না আমার সঙ্গে। তুই থাকলে আমার তবু একটু ভয় কমবে—চাঁদেদের ছেলে আছে একটা, সে-ই আমার খাবার এনে দেয় দোকান থেকে, সে-ই আমার গয়নাগুলো বেচে টাকা এনে দিয়েছে, তুই থাকলে তাকে আর বলতে হয় না—থাকবি?

—কিন্তু—

কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল দীপঙ্কর। একঘরে একসঙ্গে লক্ষ্মীদির সঙ্গে থাকা, কেমন যেন লোভ হলো দীপঙ্করের।

লক্ষ্মীদি বললে—এখানে তোর কোনও অসুবিধে হবে না, তুই থাক—তুই থাকলে আমার খুব উপকার হয় রে—

দীপঙ্কর কী বলবে ভেবে পেলে না। থাকতে যেন তার লোভও হচ্ছে।

—তোর মার কথা ভাবছিস বুঝি? তোর মাকে গিয়ে বলতে পারবি না যে লক্ষ্মীদির কাছে শুয়েছিলুম, তোর মা তো আমাকে চেনে—

—না লক্ষ্মীদি, তাহলে যে জানাজানি হয়ে যাবে সব, সবাই যে জেনে

ফেলবে। আর আমি যে বলেও আসিনি, জামা-কাপড় নিয়ে আসিনি কিছু—আমি থাকতে পারব না—তার চেয়ে তুমিই চলো।

—আমি যাবো?

লক্ষ্মীদি যেন নিজের মনেই কী সব ভাবতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—চলো না, তোমাকে এরকম করে একলা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না যে আমার। সারা রাত এইখানে এইরকম করে একলা পড়ে থাকবে? শেষকালে যদি কোন বিপদ-আপদ হয়?

লক্ষ্মীদি বললে—রাত্রে এক-একদিন খুব হৈ চৈ হয় বাইরে, জানিস, আমি একেবারে ঘুমোতে পারি না—

—তা দাতারবাবু যদি আর না আসে?

লক্ষ্মীদি বললে—নারে, সে আসবেই। আমাকে নিয়ে কী-রকম বিপদে পড়েছে বল তো? সেও তো আমাকে বলে বাড়ি চলে যেতে, কিন্তু আমিই বা কী করে যাই তাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে, বল্?

—কিন্তু তুমি এখানে থেকেই কি তাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে?

—তা তো পারবো না জানি, তবু বিপদের সময় তাকে ফেলে যাওয়া কি ভালো?

—তার চেয়ে এক কাজ করো না—

—কী কাজ?

দীপঙ্কর বললে—তার চেয়ে তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে বরং তোমার বাবাকে বলে টাকাকড়ি যোগাড় করে দাতারবাবুকে পাঠিয়ে দাও—তাতেই তো বেশি সাহায্য করা হবে—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু আমাকে কি কেউ বিশ্বাস করবে?

—কেন করবে না, তুমিও তো বাড়ির মেয়ে, নিজের বাবা কি নিজের মেয়েকে ফেলতে পারে?

লক্ষ্মীদি খানিকক্ষণ নিজের মনে কী ভেবে বললে—তা হলে তাই চল্—তোর সঙ্গেই বাড়ি চলে যাই—

দীপঙ্কর লাফিয়ে উঠলো, বললে—যাবে তুমি? তা হলে শিগগির চলো, সন্ধ্যে হয়ে আসছে—

—দাঁড়া দু'একটা জিনিস গুছিয়ে নিই, এ ক'দিন যে কী ভাবে কাটিয়েছি এখানে, একটা লোক নেই যে তার সঙ্গে দুটো কথা বলি! কতদিন ঘরটা যেন ঝাঁট দেওয়া হয়নি।

দীপঙ্কর বললে—এখন ও-সব থাক্ না লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি জামা-কাপড়গুলো গুছোতে গুছোতে বললে—এ-সব একেবারে ভূতের বাড়ি হয়েছে জানিস্—

—তা একদিনে কি আর পরিষ্কার হবে এ-সব। এ যেমন আছে থাক্ না।

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু এত নোংরা রেখে যাই কী করে বল্ তো!

—ঝি-টি কেউ নেই তোমার?

লক্ষ্মীদি বললে—একটা চাকর ছিল শম্ভুর, মাইনে দিতে পারেনি বলে সে-ও চলে গেছে কদিন হলো—আর ও তো বাড়ি আসছে না মোটে, এই দেখ না শালপাতার ঠোঙায় করে খাবার এনে দিয়েছিল ছেলেটা সে-গুলোই পড়ে আছে এখানে, বাইরে ফেলতেও ভয় করতো—ভাবতাম যদি কেউ দেখে ফেলে—

—জানো লক্ষ্মীদি ওরা কেউ জানে না যে দাতারবাবু এখানে কলকাতায় এসেছে, সবাই জানে এখনও বুঝি বর্মায় ব্যবসা করছে সে—

মনে আছে সেদিন লক্ষ্মীদি অনেক কথাই বলেছিল ওইটুকু সময়ের মধ্যে। কেবল দাতারবাবুর কথাই বলেছিল সারাক্ষণ।

—জানিস আমার জন্যেই ওর এই দুর্ভোগ। নিজের আত্মীয়-স্বজন, নিজের ব্যবসা, নিজের ভবিষ্যৎ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে শম্ভু—আর আমি ওর অসুখের সময়ে এখানে না এসে থাকতে পারি? সেই জন্যেই তো একদিন কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে ফেললাম! ভাবলাম চিরকাল তো আর টাকার কষ্ট থাকবে না ওর, আর টাকার কষ্টটাই কি সংসারে বড়?

দীপংকরের কেমন যেন লক্ষ্মীদির কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হলো—টাকাটা সত্যিই বোধ হয় বড় নয়।

—তুই-ই বল না, মনে সুখ না থাকলে টাকা থেকে কী হবে? এই কদিন এখানে আছি, শম্ভু যদি থাকতো এখানে তো আমার কোন কষ্ট হতো না—

সত্যিই তো, দীপঙ্কর ভাবলে, কষ্টের মধ্যে এত ময়লা শাড়ি পরেও লক্ষ্মীদি যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

—শম্ভু থাকতো না বলেই খুব ভয় করতো আমার, আর তা ছাড়া তো আমার আর কোনও ভাবনা ছিল না! এক-একটা করে সোনার গয়না বেচে দিয়েছি আর খেয়েছি। এইবার ভাবছিলাম যখন সব চুড়িগুলো ফুরিয়ে যাবে তখন কী করবো! তা এমন সময় ঠিক তুই এসে পড়লি।

—তা দাতারবাবু একবার খোঁজ নিতেও আসে না তোমার? একবার ভাবছে না কী করে তোমার চলবে?

লক্ষ্মীদি বললে—কী করে আসবে বল! অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে যে! সে-টাকাটা যোগাড় করতে না পারলে তো আর আসতে পারছে না! তবু তো মাঝে-মাঝে হঠাৎ এক-একদিন রাত্তিরে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে—

দীপঙ্করের সত্যিই ভয় হলো। বললে—কিন্তু সত্যি যদি টাকা যোগাড় না হয়! তা হলে কি পুলিস ধরবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তাই তো খুব ভয়ে ভয়ে আছি যে দীপু—কী যে হলো!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু সত্যিই যদি পুলিসে ধরে ফেলে তখন কী হবে! তুমি তখন কী করবে?

লক্ষ্মীদি জিনিসপত্রগুলো গুছোচ্ছিল, এ-কথার উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার কাছে এখন গাড়িভাড়ার পয়সা আছে তো লক্ষ্মীদি? আমার কাছে কিন্তু ট্রাম ভাড়ারও পয়সা নেই—আর একটা অচল পাঁচ টাকার নোট শুধু আছে—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ মুখ ফেরাল, বললে—তোর কাছে টাকা নেই!

দীপঙ্কর বললে—না—

লক্ষ্মীদি কী যেন ভাবলে খানিক। দীপঙ্কর বললে—আমি কালিঘাটে গিয়ে টাকা নিয়ে আসবো? এই যাবো আর আসবো—এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবো, তুমি একটু অপেক্ষা করো—

—কার কাছ থেকে নিয়ে আসবি?

—সতীর কাছ থেকে।

—না, দরকার নেই—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবো? মার কাছে শুধু একটাকা থাকে—

—না তারও দরকার নেই, আমার এই দু'গাছা চুড়ি আছে, এইটে বেচে তুই নিয়ে আয়—

লক্ষ্মীদি হাতের চুড়িটা খুলতে গেল। বললে—এইটে নে তুই—শম্ভুর সুদিন এলে আবার আমার চুড়ি হবে—

—তুমি তাহলে খালি হাতে থাকবে?

হঠাৎ বাইরে যেন আবার কে সজোরে কড়া নাড়তে লাগলো। দুজনেই চুপ করে রইল। সমস্ত ঘরটার মধ্যে দীপঙ্কর আর লক্ষ্মীদি যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। লোকটা কড়া নাড়ছে, আর বউবাজারের রাস্তার ট্রামের গুম গুম শব্দ আসছে ভেতরে। লক্ষ্মীদি আরো কাছে সরে এল। দীপংকরের মনে হলো যেন ভয় পেয়েছে খুব লক্ষ্মীদি। চারদিকে চাইতে লাগলো ভয়ে ভয়ে। অন্ধকার হয়ে এসেছে ঘরের ভেতর। উত্তর দিকের একটা ফাঁক দিয়ে একটু আগেও আলো আসছিল—সেটাও এখন আর নেই। দীপঙ্করেরও কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। যদি লোকটা দরজা ঠেলে ঠেলে শেষকালে ভেঙে ফেলে দরজাটা! যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে!

লক্ষ্মীদি বললে—কিছু না বললেই লোকটা চলে যাবে, রোজই এই রকম হয়—

সত্যিই তাই হলো। খানিকক্ষণ পরে শব্দটা থেমে গেল। বোঝা গেল, লোকটা চলে গেছে।

দীপঙ্কর বললে—না লক্ষ্মীদি, তোমাকে আর এখানে থাকতে দেব না—তুমি চলো এখুনি—

লক্ষ্মীদি কথা বললে না। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে লক্ষ্মীদির চোখ দুটো

কেমন ছলছল করছে।

লক্ষ্মীদি বললে—নারে, তুই-ই বরং যা, আমি এখানেই থাকি, আমার যা হবার হবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তুমি এখানে থাকবে কী করে? যদি কিছু হয় তোমার?

—কী আমার আবার হবে, কিছুই হবে না আমার—দেখিস্!

—তুমি এ-পাড়া চেনো না লক্ষ্মীদি, এখানে গুণ্ডারা থাকে, এরা তোমায় খুন করে ফেলতে পারে! এ বড় সর্বনেশে জায়গা, এখানে তুমি টিঁকতে পারবে না, আমি বলে দিচ্ছি—

লক্ষ্মীদি বললে—নারে, তুই জানিস না, আমার যাওয়া চলে না, আমার যাওয়া উচিত নয়।

—কেন? গেলে দোষ কী? সতীর ভয়ে যাচ্ছো না?

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—নারে, সে ভয় নেই, ভয় তোর দাতারবাবুর জন্যে! মানুষটা কোথায় কোথায় ঘুরছে, কী করছে, খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, এ-সময়ে আমি নিজের বাড়িতে আরাম করে থাকবো? সে-মানুষটা খেতে পাবে না, আর আমি আরাম করে থাবো?

—কিন্তু দুজনে কষ্ট পাওয়ার চাইতে তো একজনের কষ্ট পাওয়া ভালো! দাতারবাবু বেটা ছেলে, তিনি যা হোক করে চালিয়ে নেবেন, কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ এমন কষ্টের মধ্যে থাকতে পারবে কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—পারবো, খুব পারবো, সে যদি কষ্ট করতে পারে তো আমিও কষ্ট করতে পারবো—তুই চলে যা দীপু, আমি এখান ছেড়ে কোথাও যাবো না—

দীপঙ্কর বিপদে পড়লো। বললে—কিন্তু দাতারবাবুকে যদি শেষ পর্যন্ত পুলিসে ধরে নিয়ে যায়, তখন? তখন কী করবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তখনকার কথা তখন ভাববো—

—কিন্তু একবার সর্বনাশ ঘটে গেলে তখন কে তোমাকে বাঁচাতে আসবে বলো তো? কে তোমাকে দেখবে? কে তোমার কষ্ট বুঝবে শুনি? তোমার বাবা রইলেন সেই দূর দেশে, সতীও হয়ত চলে যাবে এখান থেকে—তখন কে তোমায় দেখবে?

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের দিকে চাইলে। বললে—কেন, তুই? তুই আমাকে দেখবি না?

—সেই আমার কথাই তো তুমি শুনছো না। সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে বার বার আমার সঙ্গে যেতে বলছি!

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তোর দাতারবাবু যদি কখনও আসে? মাঝে মাঝে এক-একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আসে সে। এসে শেষকালে যদি আমাকে না দেখতে পায়? দরজায় তালাবন্ধ দেখে যদি ফিরে যায়?

—কিন্তু যখন তোমার হাতের সোনার চুড়ি ফুরিয়ে যাবে, তখন কী করে থাকবে? কী খাবে শুনি?

—না হয় খাবো না—

—বাঃ, না-খেয়ে লোকে বাঁচতে পারে নাকি?

লক্ষ্মীদি বললে—পারে রে, পারে—তুই বিয়ে কর, বিয়ে করলে বুঝবি, স্বামীর জন্যে স্ত্রী না-খেয়েও থাকতে পারে—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে। এই কদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীদি এমন হয়ে গেছে। বললে—কিন্তু এ-ঘর তো তোমাদের ভাড়া নেওয়া, যখন বাড়িওয়ালা এক মাস পরে ভাড়া চাইতে আসবে, তখন? তখন কোত্থেকে ভাড়া দেবে? তখন ভাড়ার টাকা না দিলে যদি ঘর থেকে বার করে দেয়?

লক্ষ্মীদি বললে—তা তো বার করে দেবেই, ভাড়া না দিলে বাড়ির বার করে দেবে না?

—কিন্তু তখন তোমার কী হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—আমার মত যাদের স্বামী বাড়ি ভাড়া দিতে পারে না, তাদের যা হয়, আমারও তাই হবে—

—তবু তুমি আমার কথা শুনবে না?

লক্ষ্মীদি বললে—তুই বড় অবুঝ ছেলে দীপু—তোকে তো বার বার বলছি তা হয় না, আমার যাওয়া চলে না!

—তবে আমি চললুম!

—হ্যাঁ—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমার কথা কিছু যেন বলিস নি, বুঝলি?

দীপঙ্কর কোনও উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর চলেই যাচ্ছিল। লক্ষ্মীদি বললে—মাঝে মাঝে আসিস কিন্তু বুঝলি? যেন ভুলে যাসনি আমাকে—

তারপর হঠাৎ আবার ডাকলে। বললে—হ্যাঁরে, তোর কাছে ট্রাম ভাড়ার পয়সা আছে তো!

হঠাৎ মনে পড়লো দীপঙ্করের। দরজার কাছে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—তিনটে পয়সা কম আছে লক্ষ্মীদি, তোমার কাছে হবে?

তারপর একটু পরেই বললে—ঠিক আছে, না-হয় হেঁটেই যাই—

—অমনি রাগ হয়ে গেল ছেলের, দিচ্ছি পয়সা, নিয়ে যা—

দীপঙ্কর বললে—আমি তোমাকে কালকেই ফেরত দিয়ে যাবো পয়সাটা—

—সত্যিই দিস্ কিন্তু—বলে হাসলো লক্ষ্মীদি।

—আর তোর সেই পাঁচ টাকার নোটটা দাতারবাবু আর দিতে পারবে না এখন, বড় বিপদে পড়েছে, দেখতেই তো পাচ্ছিস—

—সেজন্যে তুমি ভেবো না, লক্ষ্মীদি! তোমাকে এই জায়গায় ফেলে রেখে

যেতেই মনটা কেমন করছে। আমার যদি টাকা থাকতো, আমি যদি চাকরি করতুম, আমি তোমাকে সব টাকা দিয়ে যেতুম—

দীপঙ্কর দরজাটা খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—সতীকে যেন আমার কথা বলিস নি, জানিস, কাকাবাবু কি কাকীমাকেও বলিস নি—

—না—বলবো না!

রাস্তার বাইরে তখন অন্ধকার। পাশেই ট্রাম লাইনের ওপর ট্রাম চলার ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। দীপঙ্করের পা যেন আর চলতে চাইছে না। বললে—দরজাটা বন্ধ করে দাও লক্ষ্মীদি, আসি আমি—খুব সাবধানে থাকবে!

লক্ষ্মীদি দরজার ভেতর থেকে বললে—বাবা যদি কলকাতায় আসে তো আমায় খবর দিস্—

—কেন? তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করবে নাকি?

লক্ষ্মীদি বললে—না, আমি দেখা করতে চাইলেও, বাবা আমার মুখ দেখবে না, আমি জানি—

হঠাৎ যেতে গিয়েও দীপঙ্কর আবার মুখ ফেরাল। বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কীরে?

—দাতারবাবুর কত টাকা দেনা?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? তুই দিবি? কিন্তু সে যে অনেক টাকা রে, অত টাকা তুই কোত্থেকে যোগাড় করবি?

—শুনিই না কত টাকা?

—সে প্রায় পাঁচ-ছ হাজার টাকা! ছ হাজার টাকা দিলেই আমরা আবার ছাড়া পেয়ে যাবো, আবার তোর দাতারবাবু নতুন করে ব্যবসা আরম্ভ করতে পারবে! আসলে তোর দাতারবাবুরও দোষ নেই, আমার জন্যেই ব্যবসার দিকে পুরো মন দিতে পারেনি আর কি! আর তাছাড়া, জানিস তো বাজার খুব খারাপ, তা তুই আর সে-সব জানবি কী করে?

—ছ হাজার টাকা?

দীপঙ্কর যেন নিজের মনেই অঙ্কটা উচ্চারণ করলে।

লক্ষ্মীদি বললে—কী ভাবছিস কী? তুই দিতে পারবি নাকি?

—তাই ভাবছি।

—তোর নিজেরই চাকরি নেই, তুই দিবি কী করে! দিলে তো উপকার হয়। কিন্তু অত টাকার জন্যে তোকে বলতেও সাহস হয় না। আর যদি দিতে পারতিস, তা হলে এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করে দিতে পারতাম—

দীপঙ্কর ভাবতে লাগলো।

—কী ভাবছিস? পারবি দিতে?

দীপঙ্কর বললে—ভাবছি অঘোরদাদুর কথাটা! অঘোরদাদু বলে—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, এখন দেখছি কথাটা মিথ্যে নয়—সেই অঘোরদাদুর অনেক টাকা আছে, জানো লক্ষ্মীদি, অনেক টাকা—

—তা অঘোরদাদুকে বলে দেখ না, যদি ধার দেয়?

—ধার দেবে না, বুড়ো খুব কেপ্পন, আমরা যে-ঘরে শুই, সেই ঘরেই একটা সিন্দুক আছে অঘোরদাদুর, তার ভেতরে সোনা, মুক্তো, রুপো, গিনি, অনেক আছে—লাখ লাখ টাকা আছে—

—টাকা তো অনেক লোকেরই আছে, সে আমাদের দেবে কেন?

দীপঙ্কর বললে—চাইলে কি আর দেবে অঘোরদাদু?

—তা তুই কি সিন্দুক ভাঙবি নাকি?

দীপঙ্কর নিজের মনেই কী ভাবতে লাগলো দু'এক মিনিট, তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললে—দেখি—

বলে হন্ হন্ করে সোজা ট্রাম-রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ভাল করে পকেটের পয়সা পাঁচটা গুনে দেখলে দীপঙ্কর। কম পড়লে বউবাজার থেকে সোজা কালিঘাট পর্যন্ত আবার হেঁটেই যেতে হবে। অন্ধকার চারদিকে। দোকানে দোকানে আপিসের ভেতরে আলো জ্বলে গেছে সব। লালদীঘির জলে আপিসের আলোগুলো এসে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে দীপঙ্কর ডালহৌসী স্কোয়ারটা পেরিয়ে একেবারে ধর্মতলার গিয়ে ট্রামে উঠবে। এইটুকুন বেশ হেঁটে যাওয়া যায়।

হঠাৎ যেন একটা বিকট শব্দে দীপঙ্করের কানে তালা ধরে গেল!

লোক-জন যে-যেদিকে পারছে দৌড়তে শুরু করেছে—

দীপঙ্কর হতভম্বের মত কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারলে না। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো হঠাৎ।

দীপঙ্করের মনে আছে সেদিনকার কথাটা স্পষ্ট। বোধ হয় ২৫শে আগস্ট ১৯৩০ সাল। সামনে দিয়েই কে যেন দৌড়তে লাগলো কার পিছু পিছু। দীপঙ্কর স্পষ্ট দেখতে পেলে সেই লোকটা—সেই ফরসা লোকটা। ধুতি পাঞ্জাবি পাম্পশু পরে ক'দিন আগেই দীপঙ্করকে কত কথা জিজ্ঞেস করেছিল—। অন্ধকার নেপাল ভট্টাচার্য লেনের ভেতর কিরণদের বাড়ি থেকে বেরোবার মুখেই ধরেছিল। ঠিক যেন সাহেবদের মত দেখতে। হঠাৎ সেই লোকটাই আজ খাকী কোটপ্যাণ্ট পরেছে, খাকী পোশাক পরে দৌড়চ্ছে—

চারদিক থেকে হঠাৎ পুলিস, পুলিসের গাড়ি এসে গেল। পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেল জায়গাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আশে-পাশে রাস্তার সমস্ত লোকজনদের লাঠি দিয়ে তাড়া করতে শুরু করেছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।

দীপঙ্কর এক দৌড়ে বাঁ-দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

হঠাৎ কে যেন তার হাতটা ধরে টানলে। মুখ ফিরিয়ে দেখতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেছে।

—কিরণ? তুই?

—শিগ্‌গির পালিয়ে আয়—শিগ্‌গির—

—কী হলো রে ওখানে? বোমা ফাটালে কে?

কিরণ দৌড়তে দৌড়তে বললে—টেগার্ট সাহেবকে খুন করেছি—পালিয়ে আয়—

—টেগার্ট সাহেব? পুলিস কমিশনার? ওই খাকী কোটপ্যাণ্ট্ পরা? আরে ও তো ধুতি পাঞ্জাবি পরে তোদের বাড়ির সামনে ঘুরছিল সেদিন—!

—চুপ কর—

মনে আছে দৌড়তে দৌড়তে দুজনে একেবারে গোলদীঘির কাছে এসে পড়েছিল তখন। দীপঙ্কর তখন হাঁফাচ্ছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

কিরণ বললে—তুই এবার বাড়ি যা দীপু, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি, একটা কাজ আছে আমার—

—কী কাজ?

—পরে সব বলবো, ভজুদা এসেছে—

—ভজুদা!

কিরণ বললে—কাল সন্ধেবেলা বাড়ি থাকিস্, তোকে ভজুদার কাছে নিয়ে যাবো—যা—

পরের দিন সকালবেলাই মধুসূদনের রোয়াকে বিরাট জটলা বসলো। দুনিকাকা এসেছে, মধুসূদনের বড়দা এসেছে, পঞ্চাদা, দলের সবাই হাজির, সবারই মুখ গম্ভীর।

দুনিকাকা খবরের কাগজটা নিয়ে আর ছাড়তে চায় না। বললে—এবার আর রক্ষে রাখবে না মাইরি, এবার আগুন জ্বলবে—দেখে নিস্—উঃ—কী সাংঘাতিক—

অন্য কারো মুখে কথা নেই। দীপঙ্কর উঁকি মেরে দেখলে—খবরের কাগজের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—ডালহৌসী স্কোয়ারে কলিকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত। মিস্টার টেগার্ট অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। বোমা নিক্ষেপকারী বলিয়া বর্ণিত অনুজা সেন গুরুতররূপে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এ সম্পর্কে ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসুকে পুলিস গ্রেফ্‌তার করিয়াছে।

সে এক অদ্ভুত যুগ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তখন প্রথম ভাঙন ধরতে শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় জটলা হয় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

অঢেল সময়। চায়ের দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসে থাকে ছেলেরা। গল্প করে, গালাগালি দেয়, আর স্বপ্ন দেখে। আর ওদিকে আর এক দল অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে ষড়যন্ত্র করে। সমস্ত বাঙলাদেশ যেন আগুন হয়ে উঠেছে। পুলিস যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ খুললেই কেবল বোমা আর পিস্তল। বাপ-মায়েরা ছেলেদের সাবধান করে দেয়। মাস্টার সাবধান করে ছাত্রকে। প্রতিবেশীরা সাবধান করে দেয় প্রতিবেশীকে। এক-একটা খবর বেরোয় আর সমস্ত লোক যেন চমকে ওঠে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। হিজলীর হত্যাকাণ্ড। যতীন দাস। রোজ একটা না একটা লেগেই আছে। আই-জি লোম্যান হত্যা, রাইটার্স বিল্ডিং-এ কর্নেল সিমসনের ওপর গুলি—

দুনিকাকা ভিড় দেখলেই চিৎকার করে উঠতো। বলতো—এই এখান থেকে যা তো বাবা সরে যা তো সব—

পঞ্চাদা বলতো—কী ডেঞ্জারাস্ কাণ্ড, দুনিকাকা, শেষকালে রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢুকে গুলি চালালে মাইরি—

মধুসূদনের বড়দা বলতো—দেখছি রোয়াকের আড্ডা এবার উঠিয়ে দিতে হবে দুনিকা—এবার সব পুলিসের নজর পড়ছে এদিকে—শেষকালে কোন্‌দিন আমাদের মত ছাপোষা লোককে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে—

দুনিকাকা বলতো—আমি আর আসছি না বাবা তোদের আড্ডায়, কোন্‌দিন কোন্ শর্মা দেখে ফেলবে তখন আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে—কিন্তু যা কাণ্ড চলছে ভাই, না-এসেও পারি না—উঃ—

—এই দীপঙ্কর, শোন্, শোন্ ইদিকে—.

পঞ্চাদা ডাকলে। দীপঙ্কর কাছে এল। পঞ্চাদা বললে—এই এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলি রে? বাড়ি যা, বাড়ি যা শিগ্‌গির—

দুনিকাকা বললে—ওরে তোদের ওই লাইব্রেরীটা তুলে দে বাবা, পাড়ার মধ্যে ও আগুনটাকে আর রাখিস্ নি—সমস্ত পাড়ায় একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। চাকরি হলো তোর?

সমস্ত প্রশ্নগুলো এড়িয়ে বাড়ির কাছে আসতেই আবার মনে পড়লো। সতী হয়ত বাড়িতেই আছে। সতী তো ইচ্ছে করলেই টাকাটা দিয়ে দিতে পারে। সতী যদি ইচ্ছে করে বাবার কাছে চাইলেই পেয়ে যাবে! ওদের কাছে ছ হাজার টাকা কী! কিছুই না। ছ হাজার টাকা পেলে এখনি দাতারবাবু নতুন করে আবার ব্যবসা আরম্ভ করতে পারে। লক্ষ্মীদির আবার সুখ হবে। লক্ষ্মীদি তাহলে আবার বেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

—কাকীমা!

কাকীমা পাশেই ছিলেন। বললেন—কে? দীপু? কাকাবাবু তো বাড়িতে নেই—

—কোথায় গেছেন?

—এখনি বাড়ি এসে আবার চলে গেছেন, আপিসের কাজে আসতে রাত হবে—

তারপর একটু থেমেই বললেন—তোমার মা আজকে সব বলে গেছেন তোমার কাকাবাবুকে—বলেছেন, তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করবেন—

আসল কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল দীপঙ্করের। বললে—আচ্ছা কাকীমা, লক্ষ্মীদির বাবার আসবার কথা ছিল, আসবেন না?

কাকীমা বললেন—না, তিনি আর এখন আসতে পারবেন না, তাঁর শরীর খুব খারাপ—

—শরীর খারাপ? লক্ষ্মীদির কথা শুনে শরীর খারাপ হয়েছে বুঝি?

কাকীমা বললেন—হ্যাঁ, সতী চলে যাচ্ছে।

—সতী চলে যাচ্ছে? বর্মায়? সতী আর পড়বে না এখানে?

কাকীমা নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আবার। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতী কোথায় কাকীমা?

—ওপরে, খুব মন খারাপ হয়ে গেছে ওর—যাও—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। সতী চলে যাবে! কথাটা সত্যিই যেন বিশ্বাস হয়নি সেদিন। অথচ ভুবনেশ্বরবাবুরই তো আসবার কথা ছিল কলকাতায়। এ কী হলো হঠাৎ। দীপঙ্করের মাথার ভেতরে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। লক্ষ্মীদির এই বিপদের সময়ে সতী চলে যাবে! তাহলে টাকা কেমন করে যোগাড় হবে! আর টাকা না পেলে যে দাতারবাবুর জেল হয়ে যাবে!

সতী দরজার দিকে পেছন ফিরে তখন ট্রাঙ্ক খুলে কী যেন করছিল। জুতোর আওয়াজ পেয়েই পেছন ফিরেছে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি চলে যাবে নাকি? কাকীমা বলছিলেন! সত্যি?

সতী বললে—হ্যাঁ—

—কবে?

সতী বললে—আর দু'চার দিনের মধ্যেই—

—কিন্তু তুমি চলে গেলে যে মহা মুশকিল হবে!

—মুশকিল?

সতী যেন কিছু বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে!

—আমি চলে গেলে তোমার কী মুশকিল হবে? বা রে—

দীপঙ্কর বললে—না, তুমি যেও না এত তাড়াতাড়ি—আর কিছুদিন অন্তত কলকাতায় থাকো—খুব মুশকিল হবে চলে গেলে—

—কেন? আমার আবার কী মুশকিল হবে?

—তোমার নয়, আমার মুশকিল! তুমি বিশ্বাস করো সতী, তুমি চলে যাও তো বড় মুশকিলে পড়বো আমি! আমার আর কোনও উপায় থাকবে না।

সতী দাঁড়িয়ে উঠলো। কিছুই বুঝতে পারলে না যেন। হাঁ করে চেয়ে রইল দীপঙ্করের মুখের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—আমার দিকে অমন করে চেয়ে দেখছ কী? এখন এই অবস্থায় বর্মায় গেলে তোমার চলবে না—

—তার মানে?

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে আমার, এই আমি বউবাজার থেকে আসছি—

—বউবাজার? বউবাজারে কী করতে গিয়েছিলে তুমি?

—সেই কথা বলতেই তো তোমার কাছে আসা। সেখানে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। আর একটু হলে আমাকেও আর দেখতে পেতে না তুমি—এতক্ষণ হয়ত দেখতে হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি কিংবা রাস্তায় মরে পড়ে আছি। অথচ আমি যে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছি এ-ও বলতে পার আমার ভাগ্য, নইলে কী যে হতো বলা যায় না—তুমি শোনোনি কিছু?

সতী বললে—শুনলাম ওখানে নাকি স্বদেশীরা বোমা ফেলেছে—কিন্তু তুমি বৌবাজারে গিয়েছিলে কেন?

দীপঙ্কর বললে—সেই কথা বলতেই তো তোমার কাছে এসেছি—শুনলাম তোমার বাবা নাকি কলকাতায় আসছেন না—

—না, বাবার শরীর খারাপ, তিনি আসতে পারবেন না—

—কাকীমা তাই বলছিলেন তোমার নাকি খুব মন খারাপ হয়ে গেছে?

সতী কিছু উত্তর দিলে না। আবার ট্রাঙ্কে কাপড়গুলো গুছোতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলো না, মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার!

সতী তবু উত্তর দিলে না। নিজের কাজই করতে লাগলো। দীপঙ্কর বললে—কাজটা না-হয় একটু পরেই করলে—এখন আমার কথাটারই উত্তর দাও না—

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে করতেই সতী বললে—উত্তর আমি কী দেব, উত্তর আমার নেই—

—উত্তর নেই মানে? নিজের মন খারাপ হয়েছে কি না তাও নিজে বুঝতে পারো না?

সতী যেন বিরক্ত হলো। বললে—কী যে তুমি বিরক্ত করছো কেবল—তুমি এখন যাও তো—তুমি যাও এখান থেকে—

দীপঙ্কর বললে—কেন? আমি চলে গেলে কি তোমার মন ভালো হয়ে যাবে?

—না তা বলছি না, এখন অনেক রকম ভাবনা রয়েছে মাথায়, এখন কিছু

ভাল লাগছে না আমার—

—তা ভালো লাগছে না কেন, বলবে তো?

সতী বললে—তা সব কথা তোমাকে বলতে হবে, এমন কড়ার আছে নাকি তোমার সঙ্গে? মানুষের মন-মেজাজ খারাপ হতে নেই? আর তাছাড়া, আমার যদি মন খারাপ হয়েই থাকে তো তাতে তোমার কী?

—বা রে, কী কথা থেকে কী কথা, আমি কি তাই বলেছি। আমি এসেছিলাম তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে—আমি একলা ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করা—

—কিসের পরামর্শ?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবা এলে অবশ্য ভালোই হতো, কিন্তু তিনি যখন এলেন না, তখন তুমিও কিছু সাহায্য করতে পারো। আমার নিজের জন্যে বলছি না, বলছি আর একজনের জন্যে—

—কে? কার জন্যে বলছো? কী সাহায্য?

দীপঙ্কর বললে—টাকা—

—টাকা?

—হ্যাঁ, কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

—কাকে?

দীপঙ্কর বললে—মনে আছে একদিন বহুকাল আগে তুমি যেদিন প্রথম এলে কলকাতায় তুমি আমাকে কারো বাড়ির চাকর মনে করে চারটে পয়সা দিতে গিয়েছিলে? তোমার সেদিন কোনও অন্যায় হয়নি। কিন্তু সেদিন মনে খুব কষ্ট হয়েছিল সতী! সেদিন রাত্রে ভাল করে ঘুমও হয়নি আমার! মনে একটু কষ্ট হলেই আমার ঘুম হয় না—কিন্তু...

—তা সে-কথা তোমার এখনও মনে আছে নাকি?

—মনের আর কী অপরাধ বলো না, সে বেচারী বড় নিরীহ জীব, কিন্তু নিরীহ জীব হলেও তারও তো ভাল-লাগা মন্দ-লাগা বলে একটা জিনিস থাকতে পারে!

সতী এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে—অত দিন আগের সব কথা আমার মনে নেই—আর তারপরে কত কী বদলে গেল, সে-আমিই আর আমি নেই, আর সে-তুমিই কি সেই-তুমি আছো?

—আমি সেই আমিই আছি সতী! নইলে সে-সব কথা আমার মনে রইল কী করে! বাইরেই শুধু বয়েস বেড়েছে, কিন্তু লক্ষ্মীদি আজ এখানে থাকলে তার কাছে শুনতে পেতে আমি সেই রকমই আছি কি না। লক্ষ্মীদি জানতো তুমি আসবার আগে থেকেই তোমার সম্বন্ধে আমার কী-রকম আগ্রহ ছিল! তাই লক্ষ্মীদিকে তোমার কথা বার বার জিজ্ঞেস করতাম বলে লক্ষ্মীদিও আমায় খুব ক্ষেপাতো—

সতী হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—হাসি নয়, সত্যি বলছি—এখন তুমি চলে যাচ্ছো এখন আর বলতে দোষ কী! ছোটবেলায় ভাবতাম, তুমি কলকাতায় এলে আমার তবু একটা খেলার সঙ্গী জুটবে—! চিরকাল আমার একটা দুঃখ ছিল আমার ভাই-বোন কেউ নেই বলে—

সতী বাধা দিয়ে বললে—তা এইসব কথা বলবার জন্যেই তুমি এখন এসেছ নাকি?

—না, তুমি চলে যাচ্ছো শুনলাম কি না, তাই পুরোন কথাগুলো সব মনে পড়ে গেল।—আসলে আমি তোমার কাছে এসেছি অন্য কারণে—

—কী কারণে?

দীপঙ্কর বললে—তুমি চলে যাচ্ছো শুনে তাই আরো ভয় হয়ে গেল—তোমার কাছে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি—আমার জন্যে নয়। আর একজনের জন্যে। তার ভীষণ বিপদ, সে-বিপদে একমাত্র তুমিই সাহায্য করতে পারো—কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হবে!

—তা আমারই তুমি টাকা দেখলে? টাকার জন্যে আর কাউকে পেলে না?

দীপঙ্কর বললে—টাকা তো কম-বিস্তর সকলের কাছেই আছে, কিন্তু অল্প টাকাতে যে হবে না, তাই তোমার কাছেই চাইছি, আর তুমি ছাড়া আমি আর কাকে বলবো? আমার নিজের থাকলে আমি তোমার কাছে চাইতাম না—

সতী কিছু কথা বললে না।

দীপঙ্কর বললে—দেবে? বড় উপকার হয় দিলে। টাকা না পেলে হয়ত বেচারী জেলে যাবে, আত্মহত্যা করবে—

—কে সে? তোমার কে হয়?

দীপঙ্কর বললে—দেবে তুমি? সত্যিই দেবে? আমার বিশেষ আপনার লোক। তার বিপদ আমার নিজের বিপদেরই সমান—

—কিরণ? তোমার সেই বন্ধু কিরণ নাকি? যে লাইব্রেরী করেছে?

দীপঙ্কর বললে—না, কিরণ আপনার লোক বটে, কিন্তু এ কিরণ-টিরণের চেয়েও আপন—আমি সেখান থেকেই সোজা তোমার কাছে আসছি—

সতী হাসলো আবার। বললে—অনেকদিন ধরেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে, তুমি একদিন একটা-না-একটা কিছু আমার কাছে চাইবেই; অন্তত তোমার হাব-ভাব দেখে আমার তাই আন্দাজ হয়েছিল—কিন্তু..

—কিন্তু কী?

—কিন্তু সেটা যে টাকা, তা সত্যিই আমি কল্পনা করতে পারিনি—

—তা টাকা ছাড়া তোমার কাছে আর কী চাইতে পারি? আর কী চাইবার সাহস আমার থাকতে পারে, বলো?

সতী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বসলো চেয়ারের ওপর। চোখটা নামিয়ে

বললে—শেষকালে তুমি টাকাই চাইলে?

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—টাকা চাওয়া অন্যায় হলো?

—অন্যায় নয়?

—কেন অন্যায় শুনি? চাকরি চাইতে অন্যায় হয় না, গয়না চাইতে অন্যায় হয় না, স্নেহ প্রেম ভালবাসা কিছু চাইলেই অন্যায় হয় না, আর সামান্য...

সতী থামিয়ে দিলে। বললে—থামো তুমি—

দীপঙ্কর বললে—কেন থামবো? টাকাও তো চাওয়ার মত একটা জিনিস! চেয়ে চেয়েই তো অঘোরদাদুর এত টাকা! কেউ চেয়ে টাকা নেয়, কেউ জিনিস বেচে টাকা নেয়—ও তো একই কথা! তাছাড়া, তোমার কাছে চাইব তাতে লজ্জা কী?

সতী বললে—তা আমিও তো তাই ভাবছি, তুমি আর কিছু চাইতে পারলে না?

—তা আর কী চাইবো বলো? তুমি না বললে আমি বুঝবো কী করে?

সতী উঠলো এবার চেয়ার ছেড়ে। উঠে হাসলো আবার। সতীর হাসিটা যেন কান্নার মতন। কান্নার মতই মুখটা করুণ হয়ে উঠলো। বললে—তোমাকে আর বোঝাতে হবে না দীপু, তুমি যাও এখন—তুমি বাড়ি যাও দিকি—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না যেন। বললে—বাড়ি যাবো?

—হ্যাঁ বাড়ি যাও, তোমায় কিছু বুঝতেও হবে না, তোমায় কিছু চাইতেও হবে না—

দীপঙ্কর হঠাৎ সতীর এই ব্যবহারে কেমন অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ মেয়ে ভালো করে কথা বলছিল, সে হঠাৎ এমন ব্যবহার করছে কেন?

বললে—তাহলে টাকা দিতে পারবে না তুমি?

সতী বললে—তুমি আর আমায় বেশি জ্বালিও না দীপু, তুমি যাও—

এতক্ষণে যেন আঘাত লাগলো দীপঙ্করের মনে। বললে—তা তো যেতে বলবেই, টাকা চাইলে সবাই অমন দূর-দূর করে দেয়, বোঝা গেল পৃথিবীতে টাকাটাই সব, একলা শুধু অঘোরদাদুরই বদনাম দেখছি—

সতী এবার সোজা-সুজি চাইলে দীপঙ্করের দিকে।

অনেকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

বললে—আমার কাছ থেকে টাকা পেলেই তোমার সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে?

সতীর চেহারা দেখে যেন ভয় পেয়ে গেল দীপঙ্কর। তবু ভয় পেলে চলবে না। টাকার লক্ষ্মীদির ভীষণ দরকার। টাকার অভাবে দাতারবাবুর জেল হয়ে যাবে।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ হবে—

—কত টাকা?

দীপঙ্কর বললে—তোমরা বড়লোক বলেই তোমার কাছে টাকা চেয়েছি...না—

নইলে...

সতী বললে—আমরা বড়লোক সেইটেই বুঝি তোমার চোখে পড়লো—আর বুঝি কিছু চোখে পড়তে নেই?

তারপর একটু থেমে বললে—যাক্ গে, কত টাকা তোমার চাই—বলো—

—অনেক টাকা সতী, এক টাকা দু টাকা নয়—অনেক টাকা—

—হোক অনেক টাকা! একশো? দুশো?...আমি বর্মায় গিয়ে বাবার কাছ থেকে চেয়ে টাকাই তোমায় পাঠিয়ে দেব...কত টাকা বলো শুনি?

দীপঙ্কর বললে—ছ হাজার—!

সতী চুপ করে রইল। একটু চমকেও উঠলো না টাকার অঙ্কটা শুনে!

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে—টাকাটা একটু বেশিই সতী, কিন্তু তোমাদের কাছে কিছুই নয়—আর আমি যদি কখনও চাকরি পাই, তোমার এ-টাকা আমি মাসে মাসে শোধ করে দেব—আমি কথা দিচ্ছি, আমার কথা তুমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারো, আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না—

—তুমি এখন যাও, আমি দেব টাকা!

—দেবে?

দীপঙ্কর আনন্দে আরো কাছে সরে এল।

—দেবে তুমি? সত্যি দেবে?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি দেব, যেমন করে পারি যোগাড় করে দেব, বাবার কাছে যদি না-ও পাই আমার নিজের গয়না বেচেও দেব—

দীপঙ্কর বললে—কবে দেবে? একটু তাড়াতাড়ি দিতে পারো না?

সতী তখনও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সতীর দিকে চাইতে যেন ভয় করছিল দীপঙ্করের। বললে—আজকে দিতে পারো না, কিম্বা কাল?

সতী বললে—আবার কথা বলছো? বলেছি না তুমি যাও এখান থেকে?

—কিন্তু কবে দেবে সেটা বলবে তো? আমার যে ভীষণ দরকার!

সতী বললে—আমি বর্মায় ফিরে গিয়ে তোমার নামে পাঠিয়ে দেব, তার আগে নয়—হলো তো? যাও এখন—

—কিন্তু, কবে যাবে তুমি সেখানে?

—খুব শিগ্গির! দু চারদিনের মধ্যেই।

—কিন্তু কাল যেতে পারো না? কাল গেলেই তো সেখানে আরো আগে পৌঁছুতে পারবে! তাহলে টাকাটা পাঠাতে পারবে—

সতী এবার সোজা চাইলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছো আমার কাছে? বলেছি তো টাকা আমি দেব তোমাকে—

—আচ্ছা, তাহলে আমি যাই?

—হ্যাঁ যাও, আর কখনও এসো না আমার কাছে—যাও এখন।

দীপঙ্কর নির্বোধের মত তবুও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

—তোমার পায়ে পড়ি দীপু, তুমি যাও, যাও তুমি—আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পুরোপুরি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারা গেল না। তবু সতী যখন বলেছে টাকা দেবে—তখন দেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আর একটু আগে পাওয়া গেলেই তো ভালো হতো! লক্ষ্মীদির হাতে তো মাত্র দু'গাছা চুড়ি আছে—তাতে আর ক'দিন চলবে! কতদিনই বা চালাতে পারবে তাতে! শেষে যদি সতী টাকা না পাঠায়! না পাঠালে তো পুরোপুরি সর্বনাশ হয়ে যাবে। দাতারবাবুরও জেল হয়ে যাবে। তখন লক্ষ্মীদি কোথায় থাকবে? তখন লক্ষ্মীদির সে-লজ্জা সে-অপমান কে ঢাকবে?

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতেই কাকীমা বললেন—কী দীপু, খুব মন খারাপ বুঝি সতীর?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ কাকীমা, খুব মন খারাপ হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বললে না—আমাকে তাড়িয়েই দিলে ঘর থেকে—

কাকীমা বললেন—আমিও তাই ওর সামনে যাচ্ছি না—চিঠিটা আসার পর থেকেই খুব মন-মরা হয়ে গেছে—

—কিন্তু কবে যাচ্ছে সতী? কিছু ঠিক হয়েছে?

—মঙ্গলবার!

দীপঙ্কর হিসেব করে দেখলে মনে মনে। বললে—এত দেরি? আর একটু আগে যেতে পারে না?

কাকীমা বললে—কেন? আগে গেলে লাভ কী? এই সেদিন এল, এর মধ্যে চলে যেতে কি ভাল লাগে কারো? আসলে যে কলকাতাটা ওর ভাল লেগে গিয়েছিল—ইচ্ছে ছিল আরো লেখা-পড়া করবে!

দীপঙ্কর বললে—না কাকীমা, ওর বাবার অসুখ, তিনি একলা আছেন, সতীর তাড়াতাড়ি সেখানেই চলে যাওয়া উচিত—

কাকীমা দীপঙ্করের কথাটা ভাল বুঝতে পারলেন না। তবু বললেন—তা তো উচিত—তবু ছেলেমানুষ তো, সেখানে একলা-একলা পড়ে থাকতে কি ভাল লাগে—সে তো কলকাতার মতন নয়, বন-জঙ্গলের দেশ, কেবল কাঠ আর করাত-কল, আমি তো ছিলুম সেখানে, আমি দেখেছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—আর তাছাড়া, দু বোনে একসঙ্গে পড়াশুনা করত, লক্ষ্মীর জন্যেই ওর এখানে আসা, সেই লক্ষ্মীই চলে গেল—!

—আচ্ছা কাকীমা, ধরুন লক্ষ্মীদি কোথাও খুব কষ্টে আছে, টাকার অভাব কিংবা অসুখই হয়েছে, এমন অবস্থায় যদি বাবাকে লেখে টাকা পাঠাতে তো টাকা পাঠাবেন না তিনি?

—তার মানে? লক্ষ্মীদি কোথায়?

—না, ধরুন যদি এমন অবস্থা হয় কোনও মেয়ের, তো বাপ কি সে-মেয়েকে

ফেলতে পারে?

কাকীমা কাছে সরে এলেন আরো। বললেন—লক্ষ্মী খুব কষ্টে আছে? দেখা হয়েছে নাকি তোমার সঙ্গে?

কথাটা বলেই দীপঙ্কর থতমত খেয়ে গিয়েছিল একটু। কাকীমার কথায় বললে—জানেন কাকীমা, অনেক ছেলে-মেয়ে লক্ষ্মীদির মতন রাগ করে বাড়ি থেকে তো চলে যায়, তারপর বিপাকে পড়ে আবার একদিন ফিরেও আসে, এমন তো দেখছি! লক্ষ্মীদিও সেই রকম হয়ত একদিন বাড়ি ফিরে আসতে পারে—তখন আপনারা জায়গা দেবেন না তাকে?

কাকীমা নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেললেন—তাই বলো, আমি ভাবলাম বুঝি তোমার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছে তার। আমিও তাই ভাবছিলাম, সে কি আর কলকাতায় আছে—অন্য কোথাও চলে গেছে নিশ্চয়ই। নইলে তোমার কাকাবাবু সারা কলকাতা চষে ফেলেও তো কোনও কূল-কিনারা পেলেন না!

দীপঙ্কর বললে—সেইজন্যেই তো বলছি সতীর একটু শিগ্‌গির-শিগ্‌গির বাবার কাছে যাওয়া উচিত—

—তা তো যাওয়াই উচিত, আমাদেরও আর এখানে সতীকে রাখতে ভরসা হয় না—বাবার কাছে চলে যাওয়াই ভালো—এখন তো সতীও বড় হচ্ছে—

—আচ্ছা আমি আসি কাকীমা! সতীকে একটু তাড়াতাড়ি পাঠাতে চেষ্টা করবেন বাবার কাছে!

বলে দীপঙ্কর বাইরে চলে গেল। পুরোপুরি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না দীপঙ্কর। তবু সতী যখন বলেছে টাকাটা দেবে—তখন দেবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আর একটু আগে কেন দিতে পারে না! আগে দিলেই তো ভালো হতো। লক্ষ্মীদির হাতে তো মাত্র দু'গাছা চুড়ি আছে! তাতে আর ক'দিন চলবে! ক'দিনই বা চালাতে পারবে তাতে! শেষে যদি সতী টাকা না পাঠায়! না পাঠালে যে লক্ষ্মীদির একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে! দাতারবাবুর যে জেল হয়ে যাবে! তখন? তখন লক্ষ্মীদি কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? তখন লক্ষ্মীদির সে-লজ্জা সে-অপমান কে ঢাকবে?

বাড়িতে ঢুকতে গিয়েই দীপঙ্করের আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়লো। কথাটা একদম মনে ছিল না।

আবার ফিরলো দীপঙ্কর।

টাকাটা তো পাঠাবে না-হয় সতী! কিন্তু কোন্ ঠিকানায় পাঠাবে! মনি-অর্ডার করে পাঠানোই ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনি-অর্ডারে ছ হাজার টাকা আসা দেখে মা-ও তো অবাক হয়ে যাবে! মা কেন, সবাই অবাক হয়ে যাবে! ডাক-পিওনও অবাক হয়ে যাবে! বলা নেই কওয়া নেই—ছ হাজার টাকা একেবারে দীপঙ্কর সেনের নামে এসে হাজির হলো! মা জিজ্ঞেস করবে—এ-টাকা কোত্থেকে পেলি রে? কে পাঠালে তোকে? সতী তোকে টাকা পাঠাবে কেন? এত

লোক থাকতে সতী তোকে টাকা পাঠালে কেন? হাজার কৈফিয়ত দাও, হাজার কথা বলো তখন। তখন বলতে হবে টাকাটা নিজের জন্যে নয়—লক্ষ্মীদির জন্যে! লক্ষ্মীদি কোথায়? কী হয়েছে তার? হ্যান্-ত্যান্ অনেক কথা অনেক ঝামেলা তখন পোয়াতে হবে তাকে! পঁচিশটা টাকার জন্যে মা নৃপেনবাবুকে ঘুষ দিতে পারছে না, পঁচিশটা টাকার জন্যে তার চাকরি হচ্ছে না, আর একেবারে ছ হাজার টাকা উড়ে এসে গেল!

দীপঙ্কর আবার সতীদের বাড়ির দরজায় গিয়ে উঠলো!

তার চেয়ে দরকার নেই। টাকাটা কিরণের বাড়ির ঠিকানায় পাঠালেই হয়। তাহলে আর কেউ-ই জানতে পারে না। সোজা কিরণের বাড়ির ঠিকানায় এসেই পিওন মনি-অর্ডার দিয়ে যাবে। কিরণকে আগে থেকে বলে রাখলেই হলো।

—কী গো দীপুবাবু, আবার ফিরলে যে!

দীপঙ্কর বললে—মা কাকীমা, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সতীকে, তাই আবার ফিরে এলুম—

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দীপঙ্কর আবার দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সতীকে গিয়ে ঠিকানাটা বলে আসা ভাল। অর্থাৎ কোন্ ঠিকানায় টাকাটা পাঠাবে। বাড়িতে দীপঙ্করের নামে পাঠানো যা আর দীপঙ্করের নামে কিরণের ঠিকানায় পাঠানোও তাই। পিওন এলেই কিরণ এসে তাকে খবর দেবে আর দীপঙ্কর গিয়ে নিয়ে আসবে টাকাটা। সেই ভাল, সেই ভাল। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর বদলে তেরো নম্বর নেপাল ভট্টাচার্যি লেন লিখলেই চলে আসবে!

সতী যদি জিজ্ঞেস করে—কিরণ তোমার টাকা যদি নিয়ে নেয়?

দীপঙ্কর বলবে—কিরণ সে-রকম ছেলেই নয়, কিরণকে তুমি চেনো না—কিরণরা সাহেব খুন করতে পারে, কিন্তু হাজার অভাবেও পরের টাকা নেবে না—নিলেও নিজের জন্যে নেবে না। আর তাছাড়া, নেবে কী করে? মনি-অর্ডার করবে তো আমার নামে—

কিন্তু সতীর ঘরের সামনে গিয়েই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল।

ট্রাঙ্কটা তেমনি খোলাই পড়ে রয়েছে। সতী তার বিছানার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে। মনে হলো যেন কাঁদছে সতী। ফুলে ফুলে উঠছে শরীরটা! হঠাৎ এমন মন-মরা হয়ে গেল সতী যে কাঁদবে তা বলে?

কাছে গিয়ে দীপঙ্কর ডাকলে—সতী,—একটা কথা বলতে এলাম, কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—

কথাটা বলে দীপঙ্কর একটু থামলো। সতী তবু মুখ তুললো না।

দীপঙ্কর আবার বললে—টাকাটা তুমি আমার ঠিকানায় পাঠিও না, বুঝলে? টাকাটা কোথায় পাঠাবে জানো—

তবু সতী মুখ তুলছে না।

দীপঙ্কর আবার বলতে লাগলো—টাকাটা তো তুমি মনি-অর্ডার করে পাঠাবে? তাহলে তুমি এক কাজ করো—তুমি টাকাটা উনিশের একের বি'র বদলে তেরো নম্বর নেপাল ভট্টাচার্যি......

হঠাৎ সতী উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস্ করে একটা চড় মারলে দীপঙ্করের গালে। সতীর চড়টা দীপঙ্করের গালের ওপর পড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। দীপঙ্করের মনে হলো তার গালটা যেন ফেটে রক্ত পড়ছে। আচম্কা চড় খেয়ে দীপঙ্কর এমনিতেই থতমত খেয়ে গিয়েছিল তার ওপর সতীর মুখের চেহারাটা দেখে আরো অবাক হয়ে গেল।

সতী বোধহয় পাগল হয়ে গেছে হঠাৎ। চিৎকার করে বলতে লাগলো—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখনি—বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে—বেরোও, দূর হও—

সতীর রুদ্রমূর্তি দেখে দীপঙ্করের আর কোনও কথা বলবার সাহস হলো না। খানিকক্ষণ সতীর দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সিঁড়ির কাছে কাকীমার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ওপরে উঠছিলেন। তিনি বললেন—কী দীপু, কী হলো?

দীপঙ্কর কাকীমাকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, কাকীমা আবার বললেন—সতী অমন বকছিল কাকে? কী হয়েছিল, কী?

দীপঙ্কর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কোনও কথার উত্তর না দিয়ে তর্ তর্ করে নিচে নেমে গেল। কাকীমার দৃষ্টি থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। আর তারপর এক নিঃশ্বাসে নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে।

বাড়িতে ঢুকে দীপঙ্কর ঘরের দিকে যেতেই দেখলে ঘরে তালা ঝুলছে। ঘরের দরজা বন্ধ! মা কোথায় গেল! উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলে। এমন সময় তো মা কোথাও যায় না। রান্নাঘরেও নেই। বিন্তীদির ঘরের ভেতর টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে। সে-ঘরেও উঁকি মেরে দেখলে। ঘরের ভেতর বিন্তীদি বসে বসে সলতে পাকাচ্ছে। তাহলে বোধহয় মা অঘোরদাদুর কাছে। বাজারের টাকা আনতে গেছে। দীপঙ্কর বারান্দা পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে গেল।

—কে র্যা মুখপোড়া? কে? কার পায়ের শব্দ শুনছি—

দীপঙ্কর গলার আওয়াজ পেয়েই ফিরে এল। অঘোরদাদু তখনও চিৎকার করছে—মুখপোড়া কথা বলে না, কে তুই? তুই কে রে মুখপোড়া—

নিচে আসতেই দেখে মা উঠোনে ঢুকছে। বেশ ফরসা থান পরেছে। কোথাও গিয়েছিল হয়ত। দীপঙ্করকে দেখেই মা বললে—তুই এখন এলি? কোথায় গিয়েছিলি সারাদিন? তোর জন্যে বসে বসে আমি বেরোতে পারি না কোথাও—

শেষে তালা দিয়ে বেরোলাম—

—তুমি কোথায় গিয়েছিলে মা!

—আবার কোথায়? নৃপেনবাবুর কাছে—তোমায় দিয়ে তো একটা কাজ হবার নয়, এইসব বলে কয়ে এলুম, বার বার না বললে কি কথা মনে থাকে কারো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুমি বুঝি আজ সতীদের বাড়ি গিয়েছিলে মা?

—তোমার চাকরির জন্যে কি আমার ঘুম আছে। সকলকেই তো বলছি,—যেখানে হয় একটা হলেই হলো, আমি আর পারছি না টানতে—

ক্রমে আরো রাত হলো। মা'র মুখে যেন দিন দিন ক্লান্তির ছাপ পড়ছে। দীপঙ্করের মায়া হলো মা'কে দেখে।

মা বললে—আমি আজ পালা-কীর্তন শুনতে যাবো—খুব সাবধানে থাকবে—বুঝলে—

দীপঙ্কর বললে—আমিও যাবো মা—

—তুমি গেলে কী করে চলবে! সারা রাত ঘর খালি পড়ে থাকবে নাকি? তোমাদের জন্যে কি আমি একটু ধর্মকর্মও করতে পারবো না—পরের বাড়ি খাটতে এসেছি বলে কি সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়েছি—

খাওয়া-দাওয়ার পর চন্নুনীকে নিয়ে মা বেরোল। যাবার সময় বিন্তীদিকে বলে গেল—খুব সাবধানে থাকবে মা, ঘরের হুড়কোটা বন্ধ করে দাও—আমি দেখে যাই—

বিন্তীদি ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিলে।

মা বাইরে থেকে বললে—হুড়কো দিয়েছ?

বিন্তীদি বললে—দিয়েছি দিদি—

মা বললে—এবার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো—রাত্তিরে যেন দরজা খুলো না—কেউ ডাকলেও খুলবে না—বুঝলে—

দীপঙ্করকেও বার বার সাবধান করে দিলে। সদর দরজাটা বন্ধ করে ঘরে গিয়ে হুড়কোটা বন্ধ করে যেন শোয় দীপঙ্কর। ছিটে-ফোঁটার ভাত-তরকারি যথাস্থানে ঢাকা আছে। রাত্রিবেলা যেন ঘর খোলা রেখে কোথাও না বেরোয়। বাড়িতে কেউ রইল না।

—চল্ চন্নুনী, চল্ বাছা—

মা চলে গেল। সদর দরজায় খিল দিয়ে দীপঙ্কর নিজের ঘরের দরজাতেও খিল তুলে দিলে। গালে হাত বুলিয়ে দেখলে দীপঙ্কর। যেন ফুলে উঠেছে জায়গাটা। সামান্য সামান্য ব্যথাও করছে। আর একটু দাঁড়ালেই হয়ত সতী আরো মারতো। কেন যে অমন ক্ষেপে গেল সতী হঠাৎ কে জানে! দীপঙ্কর তো কোনও অন্যায় করেনি। সতী তো এমন ছিল না আগে। প্রথম প্রথম

যেমনই হোক পরে তো কত হেসে কথা বলেছে। কত ভালো ব্যবহার করেছে দীপঙ্করের সঙ্গে। হয়ত মন খারাপ ছিল সত্যিই। লক্ষ্মীদির জন্যে মেজাজ আগে থেকেই খারাপ হয়ে ছিল, তারপর হঠাৎ আবার ফিরে যেতে হবে বর্মায়। মন তো খারাপ হবারই কথা। তার ওপর অতগুলো টাকা চেয়েছে। অতগুলো টাকা! কী যে হলো! সব যেন একাকার হয়ে গেল সংসারের। কোথায় সেই ছোটবেলাকার জীবন। এখন মনে হয় সেইটেই যেন ছিল ভাল। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল। সেই রোহিণীবাবু, সেই প্রাণমথবাবু। সেই ফটিক মধুসূদন নির্মল পালিত লক্ষ্মণ সরকার। সবাই-ই যেন বদলে গেছে। অঘোরদাদুও যেন বদলে গেছে ভেতরে ভেতরে। অঘোরদাদুও সেই আগেকার মত আর মুখপোড়া বলে যখন-তখন গালাগালি দেয় না। গালাগালি দেবার মত শরীরের ক্ষমতাই যেন আর নেই। বুড়োমানুষ রিক্সাটার ওপর বসে বসে ঝিমোয়—আর বিড় বিড় করে আপন মনে বকে যায়। এখন আর চোখে মোটে দেখতেই পায় না। এক-একদিন এক আনির বদলে ভুল করে সিকি দিয়ে দেয় রিক্সাওয়ালাকে। তারপর যখন ভুল ধরা পড়ে তখন হৈ-চৈ করে, চিৎকার করে। বলে—মুখপোড়া মেরে ফেললে আমাকে, মুখপোড়া খুন করে ফেললে একেবারে—

একটা সিকির শোকে অঘোরদাদু এক-একদিন খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না—

আর বিন্তীদি! এক-একদল বিন্তীদিকে দেখতে আসে আর খাবার খেয়ে চলে যায়। বলে—পরে খবর দেব। সেজে-গুজে দেখতে আসে। নানান রকম প্রশ্ন করে বিন্তীদিকে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন। রান্না করতে পারে কি না, সেলাই করতে পারে কিনা, গান গাইতে পারে কিনা। বিন্তীদি সত্যি কথাই বলে। সব কথার উত্তরে বলে—না। আর ভদ্রলোকেরা চলে গেলেই চুপি চুপি কাঁদে। নিঃশব্দে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। বলে—আমি যে মিথ্যে কথা বলতে পারি না দিদি—

আর কিরণ! কোথায় গেল সেই আগেকার কিরণ। এখন আর সেই লাইব্রেরীর বাতিক নেই। অন্য দলে মিশছে। এক-একদিন বাড়িতেই থাকে না। আর অখণ্ড পরমায়ু কিরণের বাবার। আরো ফুলে উঠেছে গলাটা। আরো কুঁজো হয়ে বসে থাকে দাওয়ার ওপর। দীপঙ্কর উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালেই কিরণের বাবা তার দিকে চেয়ে কেমন করে হাসে। অন্তত হাসবার চেষ্টা করে। হাসলে আরো ভয় করে দীপঙ্করের। আর সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয় সেই আগেকার মত। আর কেবল থুতু ফেলে।

কিরণের মা জিজ্ঞেস করে—কিরণের কিছু খবর জানো বাবা?

দীপঙ্কর বলে—কিরণকে খুঁজতেই তো এসেছি আমি মাসীমা—কিরণ নেই?

কিরণের মার অভিযোগও নেই, আবার অভাবও নেই যেন। পৈতে কাটা

ছেড়ে দিয়েছে তখন কিরণের মা। কাঁথা সেলাই করে পরের বাড়ির কাজ করে সংসার চলছে তাদের। কিরণের মা বলে—তোমার সঙ্গে দেখা হলে তাকে একবার বাড়িতে আসতে বোল তো বাবা—।

আর সেই প্রাণমথবাবু। প্রত্যেক মাসে গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকায় দীপঙ্কর। প্রাণমথবাবু পান খান ঠিক তেমনি করে। বলেন—তোমার নামটা ভুলে গেছি বাবা—

—আমি দীপঙ্কর!

—ও, কেমন আছ বাবা? তোমার মা কেমন আছে? পঞ্চানন সিংহী মশাইকে আমার কথা বোল, বুঝলে?

সেই সদাহাস্য মুখ, সেই সহানুভূতি মেশানো দৃষ্টি, সেই দেশসেবা। নিজের হাতে টাকা ক'টা দিতেই দীপঙ্কর আবার প্রণাম করতো পায়ে হাত দিয়ে। আর তারপরেই প্রাণমথবাবু তাঁর নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন। কলকাতার বড় বড় কংগ্রেসের নেতারা এসে তাঁর চারদিকে ঘিরে থাকতেন। মাঝে মাঝে মাসীমাও থাকতেন। এই সমস্ত ভাল-মন্দ নিরপেক্ষ সমস্ত চরিত্রের মধ্যে দীপঙ্কর যেন মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতো। মনে হতো কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌ পথটা আসল। লক্ষ্মীদি না দাতারবাবু, না কিরণ, না অঘোরদাদু, না প্রাণমথ-বাবু! কে? কে সবচেয়ে সত্যি? কে সবচেয়ে আসল?

কালিঘাটের বাজারের কাছ থেকে পালা-কীর্তনের খোলের শব্দ আসছে। দক্ষিণ দিক থেকে শ্মশানের চিৎকারও মাঝে মাঝে ভেসে আসে। কাল লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে হবে। সতী টাকা পাঠাবে বলেছে। গিয়েই পাঠিয়ে দেবে। কিরণের ঠিকানায় মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে। আর কিছুদিন সবুর করতে হবে। মাত্র আর ক'টা দিন। তারপর থেকে দাতার-বাবুকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না, তখন পাওনাদারদের ভয়ে লক্ষ্মীদিকে আর দরজার খিল বন্ধ করে থাকতে হবে না—। আর তারপর সন্ধেবেলা কিরণ আসবে। কিরণের ভজুদা এসেছে নেপাল থেকে। সেই ভজুদা। সেই ভজুদার কাছে কিরণ নিয়ে যাবে দীপঙ্করকে।

হঠাৎ মনে হলো দরজায় কে যেন টোকা দিলে।

—কে?

সাড়া নেই। দীপঙ্কর বললে—কে?

সদর দরজায় তো খিল দেওয়া। এত রাত্রে কে দরজা ঠেলবে!

—কে?

—আমি!

দীপঙ্কর বললে—আমি! আমি কে?

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। দীপঙ্কর বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিলে।

খিলটা খুলতেই দীপঙ্কর বললে—সতী!

সতী সেই অন্ধকারের মধ্যেই যেন সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বেশ কুণ্ঠিত ভাব। যেন বাধ্য হয়েই সে অত রাত্রে এসে দীপঙ্করের দরজা ঠেলেছে। দরজা ঠেলে যেন সে অপরাধ করে ফেলেছে।

—সতী, তুমি? মা তো নেই বাড়িতে—মা যে যাত্রা শুনতে গেছে—

সতী চাইল দীপঙ্করের দিকে মুখ তুলে। বেশ মনে আছে সে রাত্রে সতী যেন বড় সোজাসুজি তার দিকে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ। সেই ছায়াচ্ছন্ন রাত—হাজিকাশিমের বাগানের নারকোল গাছটার আড়ালে একটা খণ্ড চাঁদ তখন সবে আত্মগোপন করছে। দীপঙ্করের যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। সতীর সামনে দীপঙ্কর কতবার এ-রকম মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এমন ভয় কখনও হয়নি আগে।

দীপঙ্কর আবার বললে—মা'র সঙ্গে বুঝি তোমার কোনও কথা ছিল?

সতী মাথা নাড়লো। বললে—না, তোমার সঙ্গে—

—আমার সঙ্গে?

সতী বললে—তোমার খুব লেগেছে, না? দেখি?

দীপঙ্করের যেন কান্না পেতে লাগলো হঠাৎ। বললে—হ্যাঁ, এই দেখ না, ফুলেছে কেমন, খুব ব্যথা করছে—

—তুমি কিছু মনে কোর না যেন দীপু, আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন—

বলে সতী থামলো। তারপর বললে—আমার তখন থেকে মোটে ঘুম আসছিল না—এই কথাটা বলতেই এসেছিলাম, আমি যাই—

বলে সতী সত্যি সত্যিই বারান্দা দিয়ে নিচে উঠোনে গিয়ে নামলো। অন্ধকারে ছায়া-ছায়া মূর্তিটা উঠোন পার হয়ে আমড়া গাছের তলা দিয়ে কাকাবাবুদের খিড়কির দিকে এগোচ্ছিল। দীপঙ্কর প্রাণপণে ডাকতে গেল—সতী—সতী—

হঠাৎ নিজের চিৎকারে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেছে দীপঙ্করের। আগস্ট মাসের গুমোট। সমস্ত বিছানাটা ঘামে ভিজে গেছে। দীপঙ্কর বিছানার ওপর শুয়ে শুয়েই চারদিকে চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য তো! অথচ একটু আগেই তার স্পষ্ট মনে হয়েছিল যেন সতী এসেছিল তার ঘরে। এখনও যেন ঘরের ভেতরে সতীর গায়ের পাউডারের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য তো! এমন আশ্চর্য স্বপ্নও মানুষে দেখে!!

ঘুম ভেঙে গেছে তখন। বাইরে বেশ যেন রোদ উঠেছে। তবু চোখ খুলতে দীপঙ্করের বড় কষ্ট হচ্ছিল। বেশ চোখ বুজে প্রথম রাতের স্বপ্নটা আবার দেখতে যেন ইচ্ছে করছিল। যেন সত্যিই সতী এসেছে। যেন সতী এসে

দরজায় টোকা দিলে। যেন দীপঙ্কর আবার তেমনি জিজ্ঞেস করলে—কে? আবার যেন একটা উত্তর এল—আমি।

—আমি, আমি কে?

আবার যেন দীপঙ্কর দরজা খুলে দিলে। আর সামনেই যেন মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সতীর সঙ্গে। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত যেন আবার স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগলো। আবার চোখ বুজলো দীপঙ্কর। মনে হলো কেন এত সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে যায়। কেন রাত এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। দীপঙ্কর চোখ বুজে বুজেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। যদি এখনও সেই পাউডারের গন্ধটা বাতাসে ভেসে বেড়ায়!

—দীপু, ও দীপু—দীপু—কত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস—ওঠ—ওঠ—

দরজা খুলে বাইরে এসে সেদিন যেন একেবারে বাস্তব জগতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। রাত্রের জগতের সঙ্গে কী বিরাট তফাত! রোদ উঠে খাঁ-খাঁ করছে সারা উঠোন। সামনেই সতীদের বাড়িটা। জানলাগুলো বন্ধ। রোদের জন্যে বোধহয় বন্ধ করে দিয়েছে। ও-বাড়িটার দিকে চাইতেই আবার রাত্রের স্বপ্নের কথাটা মনে পড়লো। মনে পড়লো আগের সন্ধেবেলার ঘটনাটাও। লক্ষ্মীদির কথাটাও মনে পড়লো। ছ হাজার টাকা চাওয়ার কথাটাও মনে পড়লো। এক ঘুমে যেন দীপঙ্কর এক যুগ অতিক্রম করে এসে গেছে। যেন অনেক বড় হয়েছে দীপঙ্কর। এক রাত্রের মধ্যেই যেন অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে সে।

মা বললে—শিগগির শিগগির তৈরি হয়ে নাও, আজ তোমাকে যেতে হবে—আমি ন'টার মধ্যে ভাত করে দিচ্ছি—

দীপঙ্কর তখনও জানতো না যে, সেইদিনই তার চাকরি হবে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু টাকা! পঁচিশটা টাকা তুমি দিয়েছ নাকি নৃপেনবাবুকে মা?

মা বললে—টাকার কথা তোমায় তো ভাবতে হবে না, সে-ভাবনা আমার—

তারপর আপন মনেই মা গজ্ গজ্ করতে লাগলো—রেলের চাকরি, রেলে উঠতে পয়সা লাগবে না, সেই চাকরিও ছেলের পছন্দ নয়—কত লোক পঞ্চাশ-ষাট টাকা দিতে তৈরি, নেহাত গরীব বিধবার ছেলে বলে চাকরি করে দিচ্ছেন—তাতেও ছেলের গরজ নেই—যেন যত গরজ আমার—

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে নিতেই মা বললে—চলো, এখন আমার সঙ্গে চলো—

মা-ও একটা ফরসা কাপড় পরে নিয়েছে। একেবারে সোজা অঘোরদাদুর ঘরে। মা গিয়ে বললে—বাবা, আজ আপনার দীপু চাকরি করতে যাচ্ছে—

অঘোরদাদু কুশাসনের ওপর বসে মালা জপ করছিলেন। বললেন—কই? মুখপোড়া কই? কোথায় গেল সে—?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি গিয়ে একেবারে পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—এই যে অঘোরদাদু—

—চাকরি হলো মুখপোড়ার? মুখপোড়ার গতি হলো তাহলে?—বলে অঘোরদাদু হাতটা বাড়িয়ে যেন দেখতে চাইলেন তার মুখটা।

মা বললে—আশীর্বাদ করুন বাবা, দীপু যেন আমার চাকরিতে টি'কে থাকে, সায়েবদের মন পায়—

অঘোরদাদুর কী হলো কে জানে! হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—ওরে, আমি দেখতে পাচ্ছি না চোখে, মুখপোড়ার মুখ দেখতে পাচ্ছি না যে—

—তা হোক, আপনি হাতখানা দীপঙ্করের মাথায় ঠেকিয়ে দিলেই হবে—

অঘোরদাদু বলে উঠলেন—তাই কখনও হয় মেয়ে, দেখতে না পেলে কি আশীর্বাদ ফলে? মুখপোড়া মেয়ে কী যে বলে!

তারপর দীপঙ্করের মাথাটা টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন—কেন বড় হলি মুখপোড়া। কেন বড় হলি? বেশ তো ছিলিস, ছোট ছিলিস, কেন বড় হতে গেলি, এবার চাকরিতে ঢুকছিস, বুঝবি বড় হওয়ার ঠেলাটা—যা মুখপোড়া যা—

মা বললে—আপনি আশীর্বাদ করলেন না—?

অঘোরদাদু বললেন—মুখপোড়া মেয়ের কথা দেখ, আমার আশীর্বাদ কি ফলে? চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখছিস না, জ্বল জ্বল করছে আশীর্বাদ দুটো—এর পরেও মুখপোড়াকে আশীর্বাদ করতে বলিস তুই? আশীর্বাদ করে মুখপোড়ার সর্বনাশ করবো বলতে চাস?

খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে দীপঙ্কর কথাগুলো শুনলো। আজকাল অঘোরদাদুর কথাগুলো যেন কেমন ভিজে ভিজে লাগে। কথাগুলো মুখ খিঁচিয়ে বলেন অঘোরদাদু, কিন্তু মনে হয় যেন নিজেকেই মুখ খিঁচোচ্ছেন। সংসারের এতদিনকার যত জমানো রাগ সমস্ত যেন অঘোরদাদু আজকাল নিজের দিকেই ছুঁড়ে মারছেন।

নৃপেনবাবুর সঙ্গেই আপিসে যেতে হলো। তিনি নিজে নিয়ে গেলেন। বাস থেকে নেমে আপিসটার চেহারা দেখেই কেমন যেন সমস্ত শরীর সির সির করে উঠলো। এত বড় বাড়ি, লাল রং। বাড়িটার কোঠরে কোঠরে অসংখ্য মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। লম্বা লম্বা বারান্দা জানলার ওপারে আরো অনেক মানুষ আছে নিশ্চয়ই। বাড়িটা দেখেই মানুষের সংখ্যা কল্পনা করা যায়। পাগড়ি-পরা চাপরাসী বেয়ারারা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ যেন দীপঙ্করের বড় ভয় করতে লাগলো। সারা জীবন, প্রতিদিন, প্রতিটি দুপুর এইখানেই কাটাতে হবে। এর ভেতরে। তার চাকরি হচ্ছে, মা'র অনেক দিনের সাধ-আশা পূর্ণ হতে চলেছে, যে-সে আপিস নয়, সরকারী আপিস, গবর্নমেণ্ট আপিস—একবার যেখানে ঢুকতে পারলে সারা জীবনের জন্যে আর

চাকরির খাবার ভাবনা থাকে না—তার তো আনন্দ হওয়াই উচিত ছিল সেদিন! মনে আছে নৃপেনবাবু তার দিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—কী হলো তোমার? পায়ে ফোস্কা হয়েছে নাকি?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে শরীর খারাপ?

—কই, না তো!

—তাহলে, অমন মন-মরা দেখাচ্ছে কেন? একটা কথা তোমায় বলে রাখছি, এই বাবুরা, কিম্বা চাপরাসি, কি কম্পাউন্ডার যদি কিছু চায় তো দেবে না—

দীপঙ্কর বললে—কী চাইবে?

—এই ধরো টাকাটা সিকেটা যদি চায় পান খেতে কি চা খেতে তো আমার নাম করে বেবে, বুঝলে?

সমস্ত জিনিসটাই যেন একটা যান্ত্রিক নিয়মে হয়ে গেল। এস্ট্যাব্লিশমেন্ট সেকশন থেকে শুরু করে হাসপাতাল. মেডিক্যাল একজামিনেশন পর্যন্ত অনেক-বার নিজের নাম-ধাম-কুলুজির পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেল। সবাই এক-একবার করে জিজ্ঞেস করলে—কার লোক আপনি?

দীপঙ্কর বললে—নৃপেনবাবুর। ট্রাফিক আপিসের সুপারভাইজার—

আর কিছু বলতে হলো না। নৃপেনবাবু দুদিন বাদেই রিটায়ার করবেন। অনেক দিনের লোক। যখন ঢেঁড়া পিটিয়ে কেরানী আনতে হতো, সেই আমলের। তখন রেলের আপিসে ভদ্রলোক ঢুকতো না। ওখানে বিদ্যার তেমন দরকার নেই, বুদ্ধি না থাকলেও কাজ চলে। ওখানকার ইংরিজী আলাদা, ওখানকার চাল-চলন আলাদা। কারোর সঙ্গে মেলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কবে ক'টা কোম্পানী মাটি আর পাথর কেটে কেটে দেশের বুক চিরে লোহার লাইন বসিয়ে মোটা মুনাফার পাকা বন্দোবস্ত করতে এসেছিল—সাদা চামড়ার সেই সব কর্মচারীরা এদেশের লোকদের হাতে খড়ি দিলে, অ-আ-ক-খ শেখালে, কবে সব ঘটনা ঘটলো, তার কোনও হদিশ-হিসেব কোনও মিউজিয়ামে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পাওয়া যাবে রেল-আপিসে রেকর্ড সেকশনে। একদিন কোন্ সায়েব ড্রাফট লিখেছিল খাগের কলমে—কোন্ সাহেব মোটা পেন্সিল দিয়ে দুর্বোধ্য নোট দিয়েছিল কোন্ ফাইলে, রেলের আপিসে তা চিরস্থায়ী বেদ-বাক্য হয়ে আছে, রেলের বিধানে তা গীতা, গীতার মতই অবশ্যপাঠ্য, গীতার মতই তা অবশ্যপালনীয়। ইংরিজী গ্রামারের আইন-কানুন রেলের জন্যে তারি উদার। নেসফিল্ড সাহেব যদি রেলের আপিসে চাকরি পেতেন তো হয়ত ঘেন্নায় আত্ম-হত্যাই করতেন—কারণ রেলের বৈয়াকরণেরা খাস বিলেতের জাত রেলওয়েম্যান—আর নেসফিল্ড সাহেব নেহাতই ইংরিজী-নবিস!

প্রথম প্রথম দীপঙ্কর একটু ঘাবড়ে যেত। কে-জি-দাশবাবু ডি গ্রেডের সুপারভাইজার তখন। বলতেন—ওহে, এ তোমার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নয়, এ হলো রেল কোম্পানী—

দীপঙ্কর বলতো—তা রেল কোম্পানী বলে কি ইংরিজীটাও আলাদা?

কে-জি-দাশবাবু ভয়ানক চটে যেতেন তর্ক করলে। বলতেন—আবার তর্ক করছো তুমি? দেখছো অসবরন্ সাহেবের নিজের হাতের লেখা ড্রাফট্—এই দ্যাখ—বলে কে-জি-দাশবাবু ফাইলের তলায় তিরিশ বছর আগের ফোলিও বার করে অসবরন্ সাহেবের দেব-হস্তের লেখা দেখিয়ে দিতেন। আর সগর্বে সগৌরবে লেখাটার দিকে চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। হস্তলিপি দেখছেন না তিনি, যেন দুর্লভ দেব-দর্শন করছেন। তারপর বলতেন—তোমরা তো কিছু পড়াশোনা করবে না। কেন, ছুটির পর এগুলো পড়তে পারো না—ছুটির পর বাড়ি না গিয়ে একটু লেট্ আওয়ার্স থেকে যদি এই ফাইলগুলো পড়ো তো তাতেও কত উপকার হয়, কত জিনিস শিখতে পার—কিন্তু তা তো করবে না তোমরা—

নৃপেনবাবুর কাছে যেতেই তিনি বললেন—কী হলো? খাতার নাম উঠে গেছে?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—জার্নাল সেকশনে বসিয়ে দিয়েছে—

—চেয়ার টেবিল পেয়েছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু বড্ড ছারপোকা চেয়ারগুলোতে—

নৃপেনবাবু রেগে গেলেন। বললেন—ওই তোমাদের বড় দোষ, একটু ছারপোকাও থাকবে না? আর ছারপোকা থাকলেই-বা, এখানে তো শুতে আসছো না! তোমার চাকরি করে দিতে হবে আবার ছারপোকাও মেরে দিতে হবে নাকি আমাকে?

নৃপেনবাবু রাগ করে মুখটা গম্ভীর করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—যাও, রেকর্ড সেকশন থেকে একটা পিচবোর্ড নিয়ে পেতে বোসোগে যাও—

প্রথম দিন কে-জি-দাশবাবুর কী দয়া হলো কে জানে! বললেন—আজকের দিনটা সকাল-সকাল বাড়ি যান—কাল সাড়ে দশটায় ঠিক আপিসে আসবেন—

প্রথমে মনে হলো কথাটা যেন শুনতে ভুল হয়েছে। কিন্তু পাশের গাঙ্গুলীবাবু বললেন—যান না সেনবাবু, বড়বাবু যখন বলছেন বাড়ি যান না—

সকাল থেকে আপিসে ঢোকা থেকে শুরু করেই দীপঙ্করের মনটা কেমন বিষিয়ে ছিল। এই এত লোক, এই এত খাড়ি, এই এত ফাইল, তারপর এই এত ছারপোকা—সমস্ত কিছু যেন দম বন্ধ করে দিয়েছিল তার। এই এর জন্যেই এতদিন পরিশ্রম করেছে নাকি সে? এই চাকরির জন্যেই এত কার্লাইল, এত সেকস্পীয়র, এত জর্জ দি ফোর্থ পড়েছে নাকি? এতদিন ধরে এর যোগ্যতা অর্জন করতেই তার মাকে দাসীবৃত্তি করতে হয়েছে? তেত্রিশ টাকা। তেত্রিশ

টাকার যোগ্যতার জন্যে এত পরীক্ষা, এত পাশ, এত নোট লেখা! কোথায় গেল সেই রুশো, সেই কার্ল মার্ক্স, সেই কান্ট হেগেল নিটশে সোপেনহাওয়ার! তারা সবাই যেন এখানে এসে এই ছারপোকার রাজ্যে মরে পচে পিষে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে। তাদের সব আত্মারাই যেন এখানে এসে অস্‌বরন্ সাহেব, কে-জি-দাশ-বাবু, গাঙ্গুলীবাবুতে পরিণত হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। মনে হলো অমল-বাবুর অত লেকচার, প্রাণমথবাবুর সব টাকা যেন এক নিমেষে জল হয়ে গেল। দীপঙ্কর জার্নাল সেকশনের চারটে দেয়ালের মধ্যে বসে বসে কাঁদতে লাগলো। মনে পড়লো সক্রেটিসের কথাটা— To a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being. দীপঙ্কর তো কারো কোনও ক্ষতি করেনি, কারো ওপর কখনও কোনও অন্যায় করেনি। তাহলে কেন সে এই জার্নাল সেকশনে এল, কেন সে এত জায়গা থাকতে রেল কোম্পানীর এই আড়তে এসে হাজির হলো। কোথায় রইল তার ভগবান, কোথায় রইল তার ভালত্ব।

কাজ করতে করতে গাঙ্গুলীবাবু একবার বললেন—আপনি তো বি-এ পাশ? না? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এখানে এলেন?

দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে গেল। বললে—তা আপনি কেন এলেন?

—আমার কথা আলাদা—

দীপঙ্কর বললে—আলাদা কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—সে আর একদিন বলবো—আপনি ছুটি পেয়ে গেছেন, বাড়ি চলে যান—

প্রথম দিন। চাকরির প্রথম দিনটা দীপঙ্করের মনে থাকবে। যেমন মনে থাকবে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্মীদির নাচ দেখা। যেমন আরো মনে থাকবে সতীর চারটে পয়সা ছুঁড়ে দেওয়া। সমস্ত জায়গাটা যেন গম্ গম্ করছে। পুরোন ফাইল আর জার্নালের গন্ধ। গন্ধ নয় দুর্গন্ধ। আর তার সঙ্গে ধুলো। একশো বছরের ঘুমন্ত ধুলো—। দীপঙ্কর দৌড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কয়েকটা গুর্খা দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে উর্দি পরে। এত জাঁকজমক করে পাহারা দিচ্ছে কাদের? ওই সাদা চামড়া সাহেবদের, না ওই ফাইল ধুলো আর ছারপোকাদের! না ওই কেরানীদের?

আশ্চর্য, মাত্র একটা দাসখতে দীপঙ্কর হাজার হাজার লাখ লাখ কেরানীর একজন হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

দুপুর বেলা। রাত্রের স্বপ্নটার কথা আবার মনে পড়লো। সতী নিজে এসেছিল। নিজে ক্ষমা চেয়ে গেছে। চড় মেরেছে বলে ক্ষমা চেয়ে গেছে। সেই দুপুর বেলার পিচ-গলানো রাস্তার ওপরেই যেন হঠাৎ গভীর রাত নেমে এল। ঝাঁ-ঝাঁ-করা রোদ্দুর যেন এক নিমেষে মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন দক্ষিণের হাওয়ার সঙ্গে সতীর গায়ে-মাখা

পাউডারের গন্ধ আবার ভেসে এল হঠাৎ।

মোড়ের মাথায় হঠাৎ একটা চিৎকারে যেন চমক ভাঙলো দীপঙ্করের।

—ধরমতলা, বৌবাজার, শেয়ালদা, শ্যামবাজার।

দীপঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলো—রোখ্‌কে, রোখ্‌কে—

বাসটা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল আর-একটু হলে। দৌড়ে উঠে ভেতরে গিয়ে বসলো দীপঙ্কর। এতক্ষণ মনেই ছিল না। সমস্ত দিনটা যেন বিশ্রী কেটেছে। সেই নৃপেনবাবু, নৃপেনবাবুর উপদেশ, আর কে-জি-দাশবাবুর ড্রাফ্‌ট্, আর বস্তাপচা ফাইল আর জার্নাল। ইস্কুল-কলেজও এত খারাপ লাগেনি কখনও। সেখানে ভাঙা ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুল, কালিঘাট হাইস্কুল, সাউথ সুবার্বন কলেজ—বাড়ি হিসেবে কোনওটাই ভাল নয়। সেখানেও লক্ষ্মণ সরকার ছিল, ফটিক ছিল, কলেজের মধ্যেও কত ছেলে ছিল। তারা হাজরা পার্কের ভেতরে বসে পশ্চিম দিকের বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে কত রকম মন্তব্য করতো, সিগারেট খেত বিড়ি খেত। চার বছরের কলেজ জীবনে কারো সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা করতে পারেনি দীপঙ্কর। ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল ইস্কুলের পরে আর কোনও ইস্কুলকেই ভাল-বাসতে পারেনি।

মনে আছে প্রফেসাররা লেকচার দিয়ে যেতেন আর ক্লাস শেষ হয়ে গেলেই চলে যেতেন! কারো সঙ্গেই তেমন ব্যক্তিগত আলাপ হয়নি। এক অমলবাবু ছাড়া। বড় লজ্জা করতো। বড় লজ্জা করতো ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে। ক্লাসের এক কোণ থেকে লেকচার শুনে আবার সকলের শেষে বেরিয়ে চলে আসতো। কিন্তু সেদিন অনেক দ্বিধা-সংকোচ এড়িয়ে লাইব্রেরীর মধ্যে ঢুকেছিল দীপঙ্কর। ওদিকে জগৎহরিবাবু তখন ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নিচ্ছেন।

—স্যার!

অমলবাবু ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস করে এসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন তখন। এদিকে নজর ছিল না। দীপঙ্কর ডাকতেই চোখ তুললেন।

বললেন—কী চাও?

দীপঙ্কর বললে—আমার নাম দীপঙ্কর সেন, আপনি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন লাইব্রেরীতে—

কিছুই মনে পড়লো না অমলবাবুর। বললেন—কীজন্যে বলো তো? আমার তো কিছু মনে পড়ছে না—

দীপঙ্কর সমস্ত খুলে বললে। কেন ভাল লোক, সৎ লোক কষ্ট পায় সংসারে। জানাশোনা যত লোক আছে, তাদের মধ্যে যারা ভালো লোক, সবাই কষ্ট পাচ্ছে স্যার। অত্যাচার, অন্যায়, পীড়ন সব সহ্য করতে হচ্ছে। তবে কি সক্রেটিসের কথা সব মিথ্যে?

অমলবাবু কথাটা শুনে দীপঙ্করের আপাদমস্তক আবার দেখে নিলেন।

বললেন—মনে পড়েছে, কিন্তু এতদিন কলেজে পড়াচ্ছি, কেউ আগে আমাকে এ-প্রশ্ন করেনি! তুমি এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাও, না ইকনমিক ব্যাখ্যা চাও?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

অমলবাবু বললেন—বুঝেছি—তবে শোন—

অমলবাবু লাইব্রেরীর সেই অন্ধকার ঘরে বসে সেদিন যে-ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেটা আজও মনে আছে দীপঙ্করের। আজ অমলবাবু মারা গেছেন। কোথায় গেছেন অমলবাবু, কোথায় গেছে সেই সাউথ সুবার্বন কলেজ। সে-বাড়িও নেই, সে-কলেজও নেই আর। তবু কথাগুলো মনে আছে।

সে দক্ষিণেশ্বরের কথা। পরমহংসদেব তখন বেঁচে। এগারো শ' ক্রোশ দূর থেকে এক সাধু এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরে এসে স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলুন তো ভক্তের এত দুঃখ কেন?

বিবেকানন্দ বললেন—The scheme of the universe is devilish, I could have created a better world—

সাধু বললেন—তা দুঃখ না থাকলে সুখ বুঝবেন কী করে?

তখন বিবেকানন্দ বললেন—our only refuge is in Pantheism—সবই ঈশ্বর—এই বিশ্বাসটুকু হলেই সব ল্যাটা চুকে যায়—আমিই সব করছি—

অমলবাবু বললেন—আমি ইতিহাস পড়াই, ইতিহাসেরও একটা দিক আছে, তারি ইম্পর্ট্যান্ট দিক—সেটা শোন—

—এ তার অনেক পরের কথা। উনিশশো পাঁচ সালের কথা। একদিন কয়েক হাজার লোক সবিনয়ে এক দেশের রাজার বাড়ির সামনে গিয়ে দরবার করলে। গেটের সামনে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল সেপাই-সান্ত্রী। তারা জিজ্ঞেস করলে—কী চাই?

লোকেরা বললে—হুজুরের কাছে আমরা একটা দরখাস্ত পাঠাতে চাই—

দরখাস্তখানা রাজার কাছে নিয়ে গেল তারা। অতি বিনীত দরখাস্ত। দরখাস্তে লেখা ছিল—

"We come to thee Sire, to seek truth and redress. We have been oppressed, we are not recognised as human beings, we are treated as slaves, who must suffer their bitter fate and keep silence. The limit of patience has arrived. Sire, is this in accordance with the divine law, by grace of which thou reignest? Is it not better to die, better for all the toiling people, and let the capitalist, the exploiters of the working class live? Do not refuse assistance to thy people. Destroy the wall between thyself and thy people and let them rule the country with thyself."

খানিক পরেই ওপরের বারান্দা থেকে, বলা নেই কওয়া নেই তাদের

ওপর গুলি চলতে লাগলো। গুলির ওপর গুলি। সেই হাজার হাজার নিরীহ লোকের ওপর লক্ষ লক্ষ গুলির ঝাঁক এসে পড়তে লাগলো। হাজারে হাজারে মরে পড়লো লোক, কাতরাতে লাগলো, ছটফট করতে লাগলো যন্ত্রণায়—

আর মজা এই, ঠিক তার বারো বছর পরে ঠিক সেই বারান্দা থেকেই ১৯১৭ সালে একদিন আর একজন লোক হাজার হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—Comrades—Feeding people is a simple task. We will take from the rich and give to the poor. Take milk from the rich and give to the children of the workers. He who does not work shall not eat. Workers receive cards. Cards bring food.

আগের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যিনি গুলি ছুঁড়েছিলেন, তিনি হলেন রাশিয়ার জার আর শেষে যিনি বললেন, তিনি লেনিন।

আরো অনেক কথা কী-সব বলেছিলেন অমলবাবু, সব ভাল বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। বেশি সময়ও ছিল না। ক্লাসের ঘণ্টা পড়তেই অমলবাবু চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—পরে তোমাকে এ-সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবো—

কিন্তু তখন কি দীপঙ্কর জানতো সেই অমলবাবু এত শিগগির চলে যাবেন—

কিন্তু আর একদিন মাত্র এ-নিয়ে কথা হয়েছিল অমলবাবুর সঙ্গে। তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর নতুন বি-এ ক্লাসে ঢুকছে। চুপ করে বসেছিল দীপঙ্কর এক কোণে।

—রোল সেবেনটি-থ্রি—রোল সেবেনটি-থ্রি—দীপঙ্কর সেন—

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিলে—ইয়েস স্যার—

অমলবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তুমি তোমার সেই কোশ্চেনের উত্তর পেয়েছ?

দীপঙ্কর কী বলবে ঠিক করতে না পেরে বললে—এখনও ঠিক পাইনি স্যার

অমলবাবু বললেন—পাবে পাবে, এর উত্তর কারো কাছে জিজ্ঞেস করলে পাবে না, জীবন দিয়ে এর সন্ধান করতে হবে—তবে পাবে—

—লক্ষ্মীদি।

কাটাবাজারের ঠিকানাটার সামনে এসে দীপঙ্কর ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিলে না। ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ আছে, নইলে খিল বন্ধ কেন? আস্তে আস্তে কড়াটা নাড়তে লাগলো। বললে—লক্ষ্মীদি, দরজা খোল, আমি দীপু—

তবু সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ পরে, মনে হলো খুট্ করে যেন একটা শব্দ হলো। আর দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীদির চেহারা এ কী হয়েছে। একদিনের মধ্যেই এমন হয়ে গেল!

লক্ষ্মীদি দরজাটা খুলে দিয়েই টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লো। ময়লা বিছানা। ময়লা-চিট্ বালিশ। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। যেন বড় ক্লান্ত—বিছানায় পড়েই ওপাশে মুখ ফিরিয়ে রইল!

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। লক্ষ্মীদি কিছু বললে না তো!

ডাকলে আস্তে আস্তে—লক্ষ্মীদি—

—উঁ—

—তোমার কী হলো? শরীর খারাপ? জ্বর হয়েছে?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির ফরসা কপালের ওপর হাত দিয়েই চমকে উঠেছে। বললে—একি? তোমার যে ভীষণ জ্বর লক্ষ্মীদি? এখন কী হবে?

লক্ষ্মীদি শুয়ে শুয়েই উঃ-আঃ করতে লাগলো। কোনও উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর বললে—তুমি তো দেখছি সর্বনাশ বাধিয়ে বসলে! এই এক-গা জ্বর নিয়ে এই রকমভাবে পড়ে থাকবে এইখানে? কী হবে? কে দেখবে এখন?

—আমার কপালটা একটু টিপে দে তো দীপু—

দীপঙ্কর খাটের ওপর বসে লক্ষ্মীদির কপালটা টিতে দিতে লাগলো।

যেন খুব আরাম হতে লাগলো লক্ষ্মীদির। চোখ বুজে বললে—আঃ, খুব আরাম হচ্ছে রে—

অনেকক্ষণ ধরে দু'হাত দিয়ে দীপঙ্কর কপালটা টিপতে লাগলো। আর লক্ষ্মীদি চোখ বুজে পড়ে রইল। এক সময়ে দীপঙ্কর বললে—দাতারবাবু আর আসেনি লক্ষ্মীদি—?

লক্ষ্মীদি বললে—এসেছিল—কাল—অনেক রাত্তিরে—

—তোমার অসুখের খবর জানে?

—দেখেছে, জ্বর এল তখন!

—কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন? খুব তো আক্কেল? আজকেও আসবেন নাকি?

—কি জানি! কিন্তু সে-মানুষটাই বা কী করবে বল্—আঃ—

দীপঙ্কর বললে—বাঃ, দাতারবাবুরই তো দোষ, তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে এখানে এই জ্বর অবস্থায় ফেলে তিনি চলে গেলেন। আমি হলে কিন্তু জেলই হোক আর পুলিসে ধরুক, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারতুম না—তোমার অসুখ, এই সময়ে পুলিসের ভয়টাই বড় হলো—

লক্ষ্মীদি শুধু একটা শব্দ করলে মুখ দিয়ে। বললে—ছিঃ—

—তুমি ছিঃ বলছো, কিন্তু আমি এখন কী করি? কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, এ-সব কে করে? কে টাকা দেয়?

লক্ষ্মীদি কাঁদতে লাগলো। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়েই থেমে গেল। বললে—আমি দাতারবাবুর সম্বন্ধে আর কিছু বলবো না লক্ষ্মীদি, তুমি কেঁদো না,—কিন্তু এখন আমি কী করি, বলো?

—তোকে কিছু করতে হবে না; তুই যেখানে থাকিস্, সেখানে চলে যা, আমার যা-হয় হবে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি তো বললে বেশ, বলা তো সহজ, তোমাকে এই রকম একলা ফেলে চলে যেতে পারি?

—তুই যা, যা তুই এখান থেকে, তোকে মাথা টিপতে হবে না—

বলে লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা ধরে ঠেলে দিলে।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বললে—তোমরা দুই বোনই দেখছি সমান—আচ্ছা বেশ, মাথা টিপবো না, বেশ তো যন্ত্রণা হোক না, আমার কী! তোমারই কষ্ট হবে!

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বললে—যাকগে, কাল থেকে আমি আসবোই না আর—আমি তো না-আসতে পেলেই বেঁচে যাই—ভালো কথা বললেও যদি রাগ হয় তো আমি কী করতে পারি! এই যে কাল তোমার বোন আমাকে চড় মারলে—আমি সহ্য করলুম, কী করবো—

—বকর বকর করিস নি দীপু, একে আমার জ্বর, তার ওপর—

দীপঙ্কর উঠলো। বললে—তাহলে আমি চলে যাই?

—যা—

—এবার গেলে কিন্তু আর আমি আসবো না বলে দিচ্ছি, তোমার অসুখ যদি বাড়াবাড়িও হয়, তবু দেখতে আসবো না এই বলে রাখলুম—

বলে দীপঙ্কর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দরজার দিকে এগিয়েও গেল। আবার বললে—যাই—?

তবু লক্ষ্মীদি কিছু উত্তর দিলে না। দীপঙ্কর এবার কাছে সরে এল। বললে—তুমি দেখছি সত্যিই মুশকিলে ফেললে আমাকে! এদিকে আমি তোমার জন্যে সতীকে টাকার কথা বলে রাখলুম, তার জন্যে খুব দুকথা শুনতেও হলো—শেষকালে অনেক কষ্টে রাজী হলো ছ হাজার টাকা দিতে—

—টাকা দেবে সতী?

—হ্যাঁ।

—তুই আমার কথা বলেছিস নাকি?

—পাগল হয়েছ, তোমার কথা কখনও বলি! কিন্তু এখান থেকে তো দিতে পারবে না, বর্মায় পৌঁছে মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে, এই তো সামনের

মঙ্গলবার চলে যাচ্ছে কিনা, সেখানে গিয়ে বলেছে যেমন করে-হোক গয়না বেচেও টাকা পাঠিয়ে দেবে—

লক্ষ্মীদির মুখে যেন একটা ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো। বললে—দেবে বলেছে সত্যি?

—হ্যাঁ লক্ষ্মীদি। আমি তো অনেক বলে রাজী করিয়েছি কালকে! রাজী কি সহজে হতে চায়! বলেছি ছ হাজার টাকা কোনরকমে দিতেই হবে। তোমার বোন তো সোজা লোক নয়! সন্দেহ করেছিল তোমাকে কিন্তু ওদের ধারণা হয়েছে তুমি আর কলকাতায় নেই—এদিকে আমারও এক মুশকিল হয়েছে—দিনের বেলা আর সময় পাবো না, চাকরি হয়েছে একটা আবার—

—হয়েছে?

—হ্যাঁ, তেত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি। সেইখান থেকেই তো আসছি, সে এক বিচ্ছিরি চাকরি, তাই খুব মন খারাপ হয়ে আছে সকাল থেকে—একে চাকরির ঝঞ্ঝাট, তার ওপরে তোমার এই সময়ে জ্বর হলো, এখন কী করি বলো তো?

তারপর আরো কাছে সরে এল আবার। বললে—এখন জ্বরটা কেমন আছে দেখি?

কপালে হাত দিয়ে আবার দেখলে দীপঙ্কর। যেন একটু জ্বর কমেছে মনে হলো। বললে—একটু কম মনে হচ্ছে, কিন্তু যদি রাত্রে আবার বাড়ে?

এতক্ষণে লক্ষ্মীদির হাতের দিকে নজর পড়লো। বললে—লক্ষ্মীদি তোমার চুড়ি?

হঠাৎ বাইরে একবার কড়া নাড়বার শব্দ হতেই লক্ষ্মীদি বললে—ওই, শম্ভু এসেছে, দরজা খুলে দে—

আশ্চর্য! দীপঙ্করও অবাক হয়ে গেল। লক্ষ্মীদি কী করে বুঝতে পারলে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই দাতারবাবু ঢুকলেন। লক্ষ্মীদি বললে—তুমি? এমন সময়?

দীপঙ্কর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাতারবাবু সোজা এসে ঘরে ঢুকলেন। একবার দীপঙ্করের দিকেও চেয়ে দেখলেন। তারপর লক্ষ্মীদির দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—তুমি কেমন আছ?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন তুমি এলে? কেউ দেখতে পায়নি তো?

দাতারবাবু দীপঙ্করের দিকে চাইলেন আবার। বললেন—দীপুবাবু, তুমি কতক্ষণ?

দীপঙ্কর বললে—আপনি তো আমাকে বলেন নি লক্ষ্মীদি এখানে আছে—আপনার এ কী চেহারা হয়েছে?

দাতারবাবু হাসলেন কথাটা শুনে। দীপঙ্করের মনে পড়লো সেই আগেকার কোটপ্যান্টপরা চেহারাটা। এক মুখ দাড়ি গজিয়েছে। অনেক রোগা দেখাচ্ছে। গলার শিরগুলো যেন বেরিয়ে গেছে। সমস্ত চেহারাটায় যেন অভাব আর উদ্বেগের

স্পষ্ট ছাপ। এমন তো হওয়া উচিত নয়।

লক্ষ্মীদি বললে—কিছু ব্যবস্থা হলো? কিছু খবর পেলে?

দাতারবাবু বললেন—তুমি ভেবো না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে দু একদিনের মধ্যে। এক-এক করে আমি পার্টিদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি। বর্মায় আমার পুরোন পার্টিদের চিঠি লিখেছি—

দীপঙ্করের মনে আছে দাতারবাবুকে যেন বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল সেদিন। যে-লোক বর্মায় একদিন ব্যবসা করতে গিয়ে সাফল্যের শিখরে উঠেছিল, সেই দাতারবাবুই আবার এখানে এই কলকাতায় এসে পথে বসতে চলেছে। এত-দিনকার সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত সঞ্চয় যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। বর্মায় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমল। পাঁচ গুণ দাম দিয়ে, দশ গুণ দাম দিয়ে তখন মাল বিক্রী করেছেন দাতারবাবু, তারপর এখানে এই ১৯৩০ সালের কলকাতায় পৃথিবীজোড়া হাহাকারের অবস্থা। ১৯২৯ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল। জাহাজ আর আসে না কলকাতার জেটিঘাটে। যদিই বা আসে, মাল নেই তাতে। কেনা-বেচা হয় সামান্যই। বড় বড় মার্চেণ্ট আপিস মাথায় হাত দিয়ে বসলো। মোটা মোটা ডিউটি বসলো মালের ওপর। আপিসে আপিসে লোক-ছাঁটাই হতে লাগলো। চাকরি যেতে লাগলো বহু লোকের। চাকরি আর হয় না কারো। চাল-ডালের দাম হু-হু করে কমছে। কমবার সঙ্গে সঙ্গেই মাল বেচা বন্ধ করলে আড়তদার। ওদিকে ইংরেজদের দেশে পাউণ্ডের বাজার-দর কমিয়ে দিয়েছে। আমেরিকার শেয়ার মার্কেটে লগ্নীর কারবার হু-হু করে পড়ছে। তখন বেচবার পালা। টাকা নেই, মাল নেই, কেনাবেচা নেই—সবাই হাত উঁচু করে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বসে আছে। আকাল—আকাল এসেছিল পৃথিবীতে, সেই উনিশ শো ত্রিশ সালে। সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারের মার্চেণ্ট আপিসগুলো কারবার গুটোবার কথা ভাবছে তখন। পটাপট্ ব্যাঙ্কের দরজায় তালা পড়ছে। অথচ ঠিক সেই সময়ে দীপঙ্কর যে কীভাবে হঠাৎ চাকরি পেয়ে গিয়েছিল সেইটেই এক আশ্চর্য ঘটনা।

দাতারবাবু বললেন—শেয়ারের দর হঠাৎ না পড়লে আমার এমন হতো না। আমি বুঝতেই পারিনি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এখন লক্ষ্মীদির কী হবে তা হলে? লক্ষ্মীদির এই জ্বর, আর ওদিকে আপনি বাড়িতে আসতে পারছেন না—বাড়িভাড়া খাওয়া-খরচ কোত্থেকে আসবে সব?

লক্ষ্মীদি শুনতে শুনতেই বকে দিলে। বললে—দেখছিস ভাবনায় অস্থির হচ্ছে মানুষ, তার ওপর তুই আবার ওই কথা বলছিস

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমাকে এখানে কে দেখবে বলো?

—তোকে অত ভাবতে হবে না।

লক্ষ্মীদি খুব রেগে গেল। দাতারবাবুকে বললে—তোমার নিজের

শরীরটার দিকে নজর দিও—তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে—

দাতারবাবু আবার হাসলেন। কিছু বললেন না। বলবার যেন তাঁর আর মুখ নেই।

দীপঙ্কর বললে—আপনি হাসতে পারছেন দাতারবাবু, কিন্তু লক্ষ্মীদির অবস্থার কথাটা একবার ভাবুন, আসলে তো আপনিই দায়ী এর জন্যে!

—দীপঙ্কর!

দীপঙ্কর আরো গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—তুমি আমাকে থামতে বোল না লক্ষ্মীদি, আমি থামবো না—দাতারবাবু জানেন না, কী সর্বনাশ তোমার করলেন—এখন বাড়িতে যাওয়ার উপায়ও নেই, এখানে থাকারও উপায় নেই—এখন কী করবে তোমরা শুনি?

কথার উত্তরে দুজনেই কিছু বললে না। দীপঙ্কর দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে—বলো শুনি, কী করবে তোমরা? আমি শুনে তবে যাবো এখান থেকে।

লক্ষ্মীদি কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, দাতারবাবু থামিয়ে দিলেন—তোমাদের একদিন আমিই কত উপদেশ দিয়েছি, কত সান্ত্বনা দিয়েছি—কিন্তু আজ আমি স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে—

—কিন্তু ভুল হয়েছে বললেই সব মিটে যাবে? একটা উপায় বার করতে হবে না? জানেন তো লক্ষ্মীদি কত বড়লোকের মেয়ে, কত আদরে কত আরামে মানুষ, এখন আপনার জন্যেই তো এই সর্বনাশ হলো!

দাতারবাবু ম্লান হাসি হাসতে লাগলেন। বললেন—সর্বনাশ কি শুধু আমাদেরই? সারা পৃথিবীর সর্বনাশ হয়ে গেছে যে, তার তো খবর রাখো না—জানো আমেরিকায় পাঁচ হাজার ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে, ইংল্যাণ্ডে পাঁচ লক্ষ লোক বেকার হয়েছে। ইটালীতে ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না বলে রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

দীপঙ্কর কোনও উত্তর দিতে পারলে না কিছুক্ষণের জন্যে!

লক্ষ্মীদি যেন সান্ত্বনা দেবার সুরে বললে—তুমি ওর কথায় কান দিও না, ও ছেলেমানুষ, ওর কথায় তুমি কিছু মনে কোর না—দীপু তুই যা এখন—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমরা এখন কী করবে, তাই বলো?

লক্ষ্মীদি বললে—আমরা মরবো, না খেয়ে মরবো, তোর কী! তোর কী দরকার জেনে?

দাতারবাবু বললেন—না না, দীপু শোন, আমিও ভাবছি কী করা যায়, এ-রকম বিপদ এই প্রথম নয় জীবনে, আরো অনেক বিপদের জন্যেই তৈরি হয়ে আছি, তোমারও সামনে বড় জীবন পড়ে আছে, তোমারও অনেক ঝড়-ঝাপটা আসবে,—আমি টাকার চেষ্টায় আছি, টাকাটা যোগাড় করতে পারলেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাব, তোমার লক্ষ্মীদির জন্যে আমারও কম ভাবনা নেই—

তোমার লক্ষ্মীদিকে আমি কোনও কষ্ট দেব না—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো সেই টাকার কথা বলতেই এসেছিলাম—

—টাকা? তুমি টাকা দেবে?

দীপঙ্কর বললে—দেব! আমার নিজের কোনও টাকা নেই, কিন্তু লক্ষ্মীদির জন্যে আমি সব-রকম চেষ্টা করছি, কিন্তু একটু দেরি হবে। সতী বর্মায় যাচ্ছে, সেখান থেকে গিয়ে পাঠিয়ে দেবে বলেছে—

লক্ষ্মীদি বলে উঠলো—কবে যাচ্ছে সতী বর্মায়?

—মঙ্গলবার যাচ্ছে, আমি তোমার কথা কিছুছু বলিনি—শুধু বলেছি আমার দরকার।

দাতারবাবু বললেন—কে? সতী!

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, সতী ইচ্ছে করলে দিতে পারে, আর দীপুকে সতী একটু পছন্দও করে দেখেছি, চাঁদার যার সঙ্গেও খুব ভাব—আর সতীর নিজের গয়নাই যা আছে, তার দামই অনেক—

দীপঙ্কর বললে—আর সতী যদি না-ও দেয় তো আমাদের অঘোরদাদুরও অনেক টাকা আছে, আর সিন্দুকটাও আমাদের ঘরেই থাকে—

কথাটা শেষ হবার আগেই দরজায় আবার কড়া নড়ে উঠলো। লক্ষ্মীদি ভয় পেয়ে গেল। দাতারবাবু বললেন—ওই, এসেছে—

বলে দাতারবাবু সোজা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। একটা কোট-প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

দাতারবাবু তাকে নিজের মহারাষ্ট্রী ভাষায় কী যেন সব জিজ্ঞেস করলেন। দুজনে সেই ভাষাতেই কিছুক্ষণ গড় গড় করে কথা হতে লাগলো। ভদ্রলোক এসে বসলেন একটা চেয়ারে, একবার দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলেন। দাতারবাবুরই স্বজাতি হয়ত। দাতারবাবুরই হয়ত বন্ধু কিম্বা ভাই। বড় আড়ষ্ট হয়ে উঠলো দীপঙ্কর। এবার উঠে গেলেই ভাল হয়। সন্ধ্যেবেলা কিরণ আসবে। তার সঙ্গে যেতে হবে জমাদার কাছে। এখনই বোধহয় বিকেল পার হয়ে গেছে বাইরে। লক্ষ্মীদি যেন একটু সুস্থ হয়েছে এখন। মুখ চোখ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির আরো কাছে সরে এল। বললে—লক্ষ্মীদি, এখন তোমার জ্বরটা কেমন?

লক্ষ্মীদি একমনে ওদের দিকে চেয়েই কথা শুনছিল। ওদের ভাষাও লক্ষ্মীদি বুঝতে পারে নাকি? দীপঙ্করের হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো।

—লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি এতক্ষণে মুখ ফেরাল। বললে—কী রে?

—এখন তোমার জ্বর আছে নাকি, দেখি?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির কপালে হাত দিলে। জ্বরটা একটু কম মনে হলো।

বললে—আর দিন কতক তুমি দাতারবাবুকে মুখ বুজে থাকতে বলো না, তার মধ্যে টাকাটা ঠিক এসে যাবে, সতী কথা দিয়েছে, সতী কথার খেলাপ করবে না,—টাকাটা এলেই আমি নিজে হাতে করে এনে দিয়ে যাব তোমাকে—

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভুও চেষ্টা করছে, তা তুই যদি এনে দিতে পারিস তো খুব উপকার হয় আমাদের—

দাতারবাবু এবার মুখ ফেরালেন এদিকে। বললেন—আচ্ছা দীপুবাবু, তুমি তাহলে এখন এসো—তোমার দেরি হয়ে গেল—

দীপঙ্কর উঠলো। বললে—আমি আবার আসবো কিন্তু দাতারবাবু, আমি এসে দেখে যাব লক্ষ্মীদিকে—

নতুন ভদ্রলোকটিও দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখছিল। লোকটাকে মোটে ভাল লাগছিল না দীপঙ্করের। যে-সে যখন-তখন লক্ষ্মীদির কাছে আসবে নাকি! ওরা তো জানে না লক্ষ্মীদি কত বড়লোকের মেয়ে। কত আরামের মধ্যে মানুষ, কত আদরের মধ্যে মানুষ। আজ লক্ষ্মীদির দুর্দশার মধ্যেই যে-সে দয়া দেখাতে আসছে। আর অত যদি দয়া তো ছ' হাজার টাকা দিয়ে দিলেই হয়। দীপঙ্কর যেমন চেষ্টা করছে, তেমনি চেষ্টা করো না, দেখি। তোমাদের কত দরদ, কত মুরোদ, তোমরা তো দীপঙ্করের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, অনেক বড় চাকরি করো, তা এই বিপদের সময় সাহায্য করো না লক্ষ্মীদিকে! তা তো পারবে না, কেবল যখন-তখন ঘরের মধ্যে এসে গজর-গজর করতে পারবে। বাড়ি ভাড়াটাও দাও না দেখি মাসে মাসে।

—তাহলে আমি আসি লক্ষ্মীদি,—

—আয়—

রাস্তায় বেরিয়েও যেন কিছু ভালো লাগলো না। আরো অনেকক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছিল লক্ষ্মীদির কাছে। লক্ষ্মীদির কপাল টিপে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ওই ওরা আসবার পর আর ভালো লাগলো না। দাতারবাবুই বা আগে কেন লক্ষ্মীদির কাছে। এখানে না এসে টাকার চেষ্টা করলেই হয়। তাতে কিছু কাজ হয় অন্তত। সবাই খারাপ। সত্যিই দাতারবাবু লোকটা ভাল নয়। একটু যদি আক্কেল থাকে। দীপঙ্করের চোখের সামনে সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারটা যেন হঠাৎ অন্ধকার ঠেকলো। আগের দিন যেন অনেক ভালো লাগছিল।

সেই কিড স্ট্রীট। কিড স্ট্রীট দিয়েই টেগার্ট সাহেবের গাড়িটা আসছিল, এমন সময় বোমাটা ফেটেছে। জায়গাটায় তখনও কয়েকটা পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে খারাপ লাগছিল। সেই আপিস যাওয়ার পর থেকে। সেই কে-জি-দাশবাবু আর জার্নাল সেকশনে। মনে পড়লেই যেন মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় এত বড় খোলা পৃথিবী, এখান থেকে যেন চিরকালের জন্যে তার নির্বাসন হয়ে গেছে।

বাড়ির কাছে আসতেই দূর থেকে দুনিকাকা ডাকলে—এই দীপু, শোন—কী রে, তোর নাকি চাকরি হলো আজ?

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে বললে—হ্যাঁ দুনিকা—

—ভাল ভাল, খুব ভাল খুব ভাল—তোর যে মতি-গতি ফিরেছে এও ভাল—এবার থেকে একটা কাজ করবি জানিস,—একটা কাজ করবি—

—কী কাজ?

দুনিকাকা বললে—যদি চাকরিতে উন্নতি করতে চাস তো, এক কাজ করবি, রোজ আপিসে গিয়ে তোদের সায়েবদের আয়াদের একবার করে সেলাম করবি, জানিস—

পঞ্চাদা বললে—কেন?

—আরে, আমাদের আপিসের কী হলো, আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হখন সাহেব বিলেত চলে গেল, যাবার সময় তার আয়ার ছেলেকে সেই চাকরিতে বসিয়ে দিলে! কিন্তু আমাদের চোখে তো ধুলো দিতে পারলে না—দেখলাম এক রং, এক মুখ, এক সব—। তা সে আয়াটারও কপাল মাইরি, সেও বিলেত চলে গেল সাহেবের সঙ্গে—

—তা দীপঙ্করের বাহাদুরি আছে দুনিকা, এই ট্রেড-ডিপ্রেশনের আমলে চাকরি তো একটা যোগাড় করলে।

—দেখিস বাবা, সাহেবদের মন যুগিয়ে চলবি, বুঝলি, বাপ-মা তুলে গালাগালি দিলেও যেন মন খারাপ করিসনি। বুঝলি? বলবি—ইয়েস স্যার। মেয়েমানুষের সিঁথের সিঁদুর আর বেটাছেলের চাকরি, একবার ঘুচলে আর সহজে জোটে?

সত্যিই সে-সব কথা এখন যেন কল্পনাও করা শক্ত। সেই ১৯২৯, ১৯৩০, ৩১, ৩২ সালের জীবন। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন অন্যরকম ছিল। খবরের কাগজের মাথায় সেদিন যাদের নাম বড় বড় ছাপার অক্ষরে উঠতো—সেই চিয়াং-কাইশেক। অত বড় নীডার আর হয় না। ১৯২৮ সালে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পিকিং দখল করে বসেছে। তোলপাড় হয়ে গেল পৃথিবীতে। বীরের বাচ্চা বটে। খাঁটি মানুষ। সবাই বলতে লাগলো—ইণ্ডিয়ায় যদি চিয়াং-কাইশেকের মত একটা লীডার থাকতো তো আমাদের ভাবনা। ওদিকে চোখের সামনে রয়েছে কামাল-পাশা। সারা দেশটাকে একেবারে শায়েস্তা করে দিয়েছে ঢেলে-সেজে। আর ডেমোক্রেসী-টেসী সব বাজে কথা, আসল কথা হলো ন্যাশনালিজম্—। ন্যাশনালিজম্-এর ঢেউ লেগেছে ইটালীতে, জার্মানীতে, টার্কিতে, সর্বত্র। সবাই চায় ডিক্টেটর। যাদের দেশের অবস্থা ভাল তারা 'ডেমোক্রেসী' চালাক, কিন্তু গরীব দেশের জন্যে চাই ডিক্টেটর। সেই ডিক্টেটর হলো ফ্রাঙ্কলিন-ডি-রুজভেল্ট আমেরিকায়, হিটলার হলো জার্মানীতে মুসোলিনী হলো ইটালীতে, আর রাশিয়াতেও হলো তাই। যেখানেই অরাজক,

সেখানেই গর্জিয়ে উঠলো বীর, চিয়াং-কাইশেকের মত বীরের বাচ্চা। বাহবা পড়ে গেল পৃথিবীতে। কোথাও খাবার নেই, চাকরি নেই, টাকা নেই। ছোট ব্যবসা, বড় ব্যবসা, আড়তদার, গোলদার, মহাজন, কারখানার মালিক সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কী হবে—কী হবে! ডালহৌসী স্কোয়ারের আপিসে কেরানীরা দুর্গা নাম জপ করতে করতে আপিসে যায়। তারপর হঠাৎ গিয়ে শোনে একদিন তার নোটিশ হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে আর ভগবানের নাম করে সান্ত্বনা খোঁজে। চিকেন-পক্সে একমাস ছুটির পর আপিসে গিয়ে দেখে তার চেয়ারে আর একজন বসে আছে। কম মাইনের লোক। সাহেব দুঃখ করলেন। সরি হলেন, রিগ্রেট করলেন। আর ভবিষ্যতে খোঁজ নিতে বললেন। লোকে মার্চেন্ট আপিসের কেরানীকে জামাই করতে আর চায় না। বলে—ওতে চাকরির স্থিরতা নেই। আজ আছে কাল নেই। আর ঠিক এই সময়েই ইণ্ডিয়ায় সাইমন কমিশন এসে ফিরে গেছে। 'গো ব্যাক সাইমন'। এই সময়েই ব্যারন আরউইন ভাইসরয় হয়ে এসেছে দিল্লীতে; এই সময়েই লাহোরে সুভাষ বোসের দল ২৬শে জানুয়ারীকে 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষণা করেছে, এই সময়েই গান্ধীজী বেআইনী নুন তৈরি করতে মার্চ শুরু করেছেন। সবাই জেলে। লাঠি পড়েছে সত্যাগ্রহীদের মাথায়। খবরের কাগজে সব খবর ছাপানো বন্ধ। ঠিক এই সময়ে একদিন এক ক্লাবে সাহেব-মেমদের খুব ভিড়। ডিনার খাওয়া চলেছে। নাচ-গান পান-ভোজন চলেছে পুরোদমে। বাইরে নেটিভ পাহারাদার চিৎকার করে উঠলো—Halt! Who comes there?

—Friends!

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি এসে বিঁধলো পাহারাদারের বুকে। ক্লাবের ভেতরে তখন গুলির শব্দ শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। খবর পেয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উইলসন সাহেব এসে পড়লো। সঙ্গে পুলিস সুপার। সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল খেতে খেতে মেমসাহেবকে রেখে বাইরে আসতেই বুকে গুলি লেগে টলে পড়লো। বিবি-ফ্যারেল ছোট বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে সামনে এসে কেঁদে পড়লো—For God's sake, don't, don't—! আর তারপর দু'দিন ধরে টেলিগ্রাফ নেই, টেলিফোন নেই, ট্রেন নেই, কিছু নেই। সেদিন কয়েকটা বাঙালীর ছেলের কাছে ভারতবর্ষের একটি এলাকা দু'দিনের জন্যে একেবারে স্বাধীন হয়ে গেল। চট্টগ্রাম! ১৯৩০ সালের চট্টগ্রামের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণার তারিখটাও একাকার হয়ে গেল। ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০।

আর আশ্চর্য, ঠিক এই সময়েই দীপঙ্করও রেল আপিসের চাকর হয়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকতেই মা এগিয়ে এল। বললে—এত দেরি হলো যে বাবা?

মা'র হাতে বোধহয় পুজোর ফুল প্রসাদ ছিল। বললে—মুখ হাত ধুয়ে নে, প্রসাদ দেব—

আজ যেন একটু বেশি আদর, একটু বেশি খাতির মা'র কাছে। আজ যেন

অন্যরকম। আজ যেন দীপঙ্করের মূল্য বেড়ে গেছে মা'র কাছে। তার তেত্রিশ টাকার যোগ্যতা যেন সংসারের কাছে কাগজে-কলমে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর কী চাই—মানুষে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা চায়!

মা বললে—হ্যাঁরে, ও-বাড়ির কাকীমাকে প্রণাম করিসনি?

—এখন যাবো মা?

—যা, যা, এখুনি যা, শুনে খুশী হবে—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠলো। কাকীমাকে অবশ্য প্রণাম করতে হবে। আর কাকাবাবুকেও। কিন্তু কাকাবাবু কি এত সকাল সকাল বাড়িতে ফিরেছেন? আজকাল রোজই প্রায় কাকাবাবু দেরি করে বাড়ি ফেরেন। অনেক সময়ে বিকেলবেলা একবার বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় বদলে আবার চলে যান। কাকাবাবুর আপিসে বোধহয় খুবই কাজ পড়েছে। আর সতী! আগের রাত্রের স্বপ্নটার কথাও মনে পড়লো! আশ্চর্য! বড় আশ্চর্য স্বপ্নটা! এমন আশ্চর্য স্বপ্নও মানুষে দেখে! হয়ত দেখা হলে ক্ষমা চাইবে সতী! অত জোরে চড় মেরেছিল—রাত্রেও ব্যথাটা ছিল। টন্ টন্ করছিল গালটা! সত্যিই কেন যে চড় মারলে—অকারণে—কোনও কারণই ছিল না তার। টাকাটা চাওয়া কি তার এতই অন্যায় হয়ে গিয়েছে? দু'হাজার টাকা আর সতীর কাছে কতটুকু! কিছুই না।

দীপঙ্কর সতীদের বাড়িতেই ঢুকলো আস্তে আস্তে—

—দীপঙ্করবাবু!

দীপঙ্কর পেছন ফিরে দেখলে! বেশ অন্ধকার গলি। তবু সিঁড়ির ধাপ কটা নেমে এসে দীপঙ্কর চিনতে পারলে। সেদিনের সেই ছেলেটা। সাউথ সাবার্বান কলেজের সামনে যাকে 'কিরণ' বলে একদিন ভুল করেছিল। দীপঙ্কর বললে—আমাকে ডাকছেন!

ছেলেটা বললে—হ্যাঁ, কিরণ আপনাকে ডাকছে—

—কিরণ? কোথায় কিরণ?

—চলুন না, দাঁড়িয়ে আছে ওখানে!

ছেলেটা আগে আগে চলতে লাগলো। দীপঙ্করও চললো সঙ্গে সঙ্গে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে বেরিয়ে, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের শেষাশেষি একটা গলির মুখে অন্ধকারের আড়ালে কিরণ চুপ করে তখন দাঁড়িয়ে ছিল!

—ওই যে, ওই যে কিরণ!

সামনে এগিয়ে গিয়ে দীপঙ্কর বললে—কিরণ, তুই কী রে, তুই বাড়ি যাস্ না মোটে, তোর মা সেদিন খুঁজছিল—

—বাড়ির কথা থাক, চল্ এখন ভজুদার সঙ্গে দেখা করবি চল্, তোকে দেখতে চেয়েছেন—

ভজুদা! সেই ভজুদা তার মত লোকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে! বিগলিত হয়ে গেল দীপঙ্কর। নিজেকে হঠাৎ বড় বড় মনে হলো। কিরণের জন্যেও তার

খর্ব হলো। খবরের কাগজে যে-সব বড় বড় ঘটনা ঘটে, কিরণ সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিরণ ম্যাট্রিক ফেল, আর দীপঙ্কর বি-এ পাশ। তবু কিরণের যেন নাগাল পাওয়া আর সম্ভব নয়।

দীপঙ্কর বললে—তোর ঠিকানায় একটা মনি-অর্ডার আসবে আমার নামে. তোর বাড়ির ঠিকানায়—

—কিন্তু আমি যে বাড়িতেই থাকি না রে, আমার তো কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই—যদি নাও থাকি তো আমার মাকে তুই বলে রাখিস। পিওন এলে মা তোকে ডেকে দেবে।

যে-ছেলেটা দীপঙ্করকে ডেকে এনেছিল সে এক ফাঁকে চলে গেছে। কখন চলে গেছে টেরও পায়নি দীপঙ্কর। হঠাৎ খেয়াল হলো নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের তেলের আলোটার নিচে দীপঙ্কর একলা কিরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। অস্পষ্ট আলোয় এতক্ষণ যেন দীপঙ্কর কিরণের মুখখানা ভাল করে দেখলে। আগের দিন সেই ডালহৌসী স্কোয়ারের গণ্ডগোলের মধ্যে যেন ভাল করে দেখা হয়নি। হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গীর সঙ্গে যেন এই কয়েক মাসের মধ্যেই তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিরণ যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে। কিরণের মুখে দাড়ি-গোঁফ উঠেছে। সেই ফরসা নরম মুখখানা যেন কর্কশ হয়ে উঠেছে এই কমাসের মধ্যেই। শুধু বিচ্ছেদই নয় যেন কিরণ তাকে অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। গলির ভেতর দিয়ে চলতে চলতে কিরণ কোনও কথা বলছিল না। এদিক-ওদিক ভাল করে তাকাচ্ছিল।

দীপঙ্কর বললে—কোথায় যাচ্ছি আমরা রে?

কিরণ বললে—তোকে তো বলেছি ভজুদার কাছে—

—ভজুদা কোথায়?

—চল্ না, নিয়ে যাচ্ছি আমি!

কিরণের সঙ্গে চলতে চলতে যেন নিজেকে আবার বড় ছোট মনে হচ্ছিল দীপঙ্করের। সে তো সামান্যই ছিল, কিন্তু রেলে চাকরি নেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো যৎসামান্য হয়ে গেছে। আরো তুচ্ছ, আরো অকিঞ্চিৎকর। সব কথা শুনে কিন্তু কিরণ নিরুৎসাহ করলে না। বললে—ঠিক আছে, চাকরি তুই কর, চাকরি করতে ক্ষতি নেই, কিন্তু দাসত্ব করিসনি যেন—

—কিন্তু চাকরি মানেই তো দাসত্ব?

কিরণ বললে—দূর তা কেন—মনটাই হচ্ছে আসল, মনটাকে স্বাধীন রাখবি—

যেতে যেতে অনেক কথাই বললে কিরণ। দেহের সঙ্গে মনটাকেও গড়ে তুলতে হবে। আয়ার্ল্যাণ্ডে কী হয়েছিল? ইটালীতে কী হয়েছিল? রাশিয়াতে কী হয়েছে? সব বই তো পড়িয়েছে কিরণ দীপঙ্করকে। সেই রকম করতে হবে

আমাদের দেশেও।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ—টেগার্ট সাহেবকে তুই যে মারলি—তোর ভয় করলো না?

কিরণ বললে—বেটা বড় জ্বালাচ্ছিল ভাই, রোজ আমার বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করছিল, ও-বেটাকে না মারতে পারলে কিছুই হবে না, সেদিন বড় জোর ফসকে গেছে, একটুর জন্যে বেঁচে গেল—এবার দেখে নেব—

—আবার মারবি?

—চুপ!

মনে হলো যেন একজন লোক তাদের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি দিচ্ছে। সব রাস্তাই প্রায় আধো-অন্ধকার। কিরণ কোথা দিয়ে কোন্ গলির ভেতরে, কার বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে একেবারে হাজরা রোডের মোড়ে নিয়ে এসে ফেললে। এ সব রাস্তা দীপঙ্করের চেনা। এই সব রাস্তা দিয়েই এককালে দুজনে কত ঘুরেছে, দুজনে লাইব্রেরীর জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়িয়েছে, পৈতে বিক্রী করেছে কিরণ। তবু যেন আজ এ-রাস্তাগুলো বড় রহস্যময়, বড় রোমাঞ্চময় মনে হলো দীপঙ্করের কাছে। সকাল থেকে আপিসের জন্যে মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, এখন সেই মনটাই আবার যেন তাজা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এখনও যেন আশা আছে। চাকরি করলেই মনুষ্যত্ব একেবারে চলে যায় না। চাকরি করেও অনেক কাজ করা যায়। চাকরি করেও দেশ-সেবা করা সম্ভব।

মনে আছে তখনকার দিনে বাংলা দেশের ছেলেরা যেন অন্যরকম ছিল। এদিকে ইস্কুলের প্রাণমথবাবু বলতেন—চরিত্র গঠন করতে। পার্কে পার্কে বক্তৃতায় স্বদেশী প্রচার চলতো। সত্য কথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে। মাতৃভূমির সেবা করতে হবে। অনেক কথা তখন ছেলেদের কাছে বেদ-বাক্য হয়ে উঠেছিল। স্বদেশীর সঙ্গে সঙ্গে ছিল বিলিতি বয়কট। সিগারেট খাওয়া, চা খাওয়াও পাপ মনে হতো তখন। আরো মনে আছে আর একজনের কথা। গোপীনাথ সাহা।

কিরণ বললে ছোট বেলায় গোপীনাথ সাহার কথা মনে আছে তোর? সে-ও পারেনি, ফসকে গিয়েছিল—

সি আর দাশ মারা যাবারও আগের কথা। দুপুর তখন দুটো কি আড়াইটে। ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারীর দুপুরে। চৌরঙ্গী রোডের ওপর দিয়ে চার্লস টেগার্ট আসছে মোটরে চড়ে। গাড়িটা হল্ এন্ড এন্ডারসনের দোকানের সামনে আসতেই গোপীনাথ ফুটপাথের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। আর তারপরেই সোজা টিপ করে গুলি ছুঁড়লে সাহেবকে লক্ষ্য করে। গুলিটা গিয়ে লাগলো সোজা ফুসফুসের ওপর। সাহেব মোটরের মধ্যেই ঢলে পড়লো।

কিন্তু গোপীনাথ তখন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে সোজা দৌড়তে শুরু করেছে। হৈ-হৈ শব্দ করে লোক ছুটলো পেছন-পেছন। কে মেরেছে? কে গুলি

ছুড়েছে? ধর, ধর, পাকড়ো! পাড়ার এধার-ওধার থেকে দারোয়ান, চাপরাসী, খানসামা, বয়, বাবুর্চি সব দৌড়লো।

আর টেগার্ট সাহেব!

কিরণ বললে—আসলে গোপীনাথেরই ভুল হয়েছিল। টেগার্ট সাহেব নয়, গাড়িতে যাচ্ছিল কিলবার্ন কোম্পানীর একজন বড়সাহেব।

দীপঙ্কর বললে—তুই একটু সাবধানে থাকিস্ কিরণ, আজকাল বড় স্পাই ঘোরাঘুরি করছে চারদিকে—

কিরণ হাসলে। কিরণের হাসি দেখে দীপঙ্করের আরও ভয় হলো। কিরণ বললে—দূর, তোর মতন অত ভীতু হলে চলে না—

মনে আছে গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হলো ১লা মার্চ তারিখে। কিন্তু আশ্চর্য! সেই ক'দিনেই তার ওজন আরো পাঁচ পাউন্ড বেড়ে গেছে।

হাজরা রোড-এর চৌমাথাটা পেরিয়ে খানিকক্ষণ সোজা পূব দিকে চললো কিরণ। তারপর প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। তারপর বেলতলা, বকুলবাগান, তারপর রামময় রোড। কত রাস্তা, কত গলি পেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়লো ম্যাডক্স স্কোয়ারে। পার্কটার চারদিকে বড় বড় বাড়ি। বেশি লোকজন আসে না ভেতরে। মাঝখানে পাম গাছের একটা গ্রোভ। ভেতরে অন্ধকারে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা। কিরণ বললে—আয়, এখানে বোস—

দীপঙ্কর বললে—ভজুদা কোথায় তোর?

কিরণ বললে—আসবে এখুনি—

দীপঙ্কর আবার বললে—নেপাল থেকে কবে এল রে ভজুদা?

কিরণ বললে—নেপাল নয়, ভজুদা গিয়েছিল চাটগাঁয়—

—চাটগাঁয়? এই সময়ে চাটগাঁয়ে অত গণ্ডগোল চলছে, গুলি চলছে, এখন ওখানে কেন?

কিরণ বললে—সব ব্যবস্থা শেষ করে এল আর কি! সূর্যদা তো পালিয়েছে, ভজুদা ওখান থেকে চন্দননগরে ছিল, আজকে এসেছে কলকাতায়—

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। দু-একটা করে সবগুলো আলো জ্বলে উঠলো পার্কের ভেতরে। আশে-পাশের বাড়িতেও আলো জ্বলছে। দীপঙ্করের মনে হলো সমস্ত দেশের এই এক বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে তারও যেন কিছু একটা ভূমিকা আছে। সে-ও যেন এই কিরণ, ভজুদা, এই গোপীনাথ সাহা, দীনেশ মজুমদার, সকলের গৌরবের একজন অংশীদার। কোথায় কোন্ সাত সমুদ্র পরপারের কোন্ বিদেশী শাসক এখানে এই দীপঙ্করদের দেশের বুকে অত্যাচার চালাচ্ছে, তার প্রতিবাদ করবার শুভ সঙ্কল্প যেন দীপঙ্করেরও আছে। সে-ও যেন এদেরই একজন।

দীপঙ্কর আবার বললে—কখন আসবে রে ভজুদা?

সমস্ত পার্কটা যেন হঠাৎ বড় মুখর হয়ে উঠলো। অন্ধকার ঝাপসা গ্রোভের

তলায় দীপঙ্কর আর কিরণ নিঃশব্দে বসে আছে। অসংখ্য কলকাতার লোক অসংখ্য কাজে ব্যস্ত। তারই মধ্যে আরো কত অসংখ্য লোক এমনি করে অন্ধকারের ছায়ার আড়ালে এমনি অটুট সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছে কিরণের মত। বাড়িতে অভাব, বাবার অসুখ, মায়ের দুঃখ, কিছুই গ্রাহ্য করে না তারা।

দীপঙ্কর আবার বললে—বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে কিরণ, কালকে আবার আমাকে সকাল সাড়ে দশটায় আপিসে যেতে হবে—

—আর একটু বোস না, আপিস তো তোর পালিয়ে যাচ্ছে না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু, যদি কেউ দেখতে পায় আমাদের?

—দেখতে পেলে ধরবে!

কিরণ অবলীলাক্রমে কথাটা বলে হাসলো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু যদি ধরে জেলে পুরে ফাঁসি দিয়ে দেয়?

—তা তো দেবেই! ধরতে পারলেই তো ফাঁসি দিয়ে দেবে। অনেকগুলো খুন তো করেছি! ফাঁসিকে ভয় করলে চলে! দলে দলে আমাদের ফাঁসি হলে তবেই বেটারা ভয় পাবে—

মনে আছে কিরণের কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের ভয়ও হচ্ছিল, আনন্দও হচ্ছিল। কেমন করে এত সাহস হলো কিরণের। কোথা থেকে এই সাহস পেলে। এই কিরণই একদিন এই উৎসাহ নিয়ে পৈতে বিক্রী করেছে, এই উত্তেজনা নিয়েই মিটিং শুনতে গেছে। যেদিন ভূপেন বাঁড়ুয্যেকে গুলি মারলে তাদের মুখের সামনে সেদিনও এই কিরণ আর সে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এসেছে। তারপর ম্যাট্রিক দেওয়া হলো না, একটা পয়সা নেই পকেটে, খাওয়া নেই, নিদ্রা নেই, কেবল লাইব্রেরী নিয়ে মেতেছে—আবার সেই কিরণ আজ এই ম্যাডক্স স্কোয়ারে বসে ফাঁসির কথা হাসিমুখে বলে চলেছে।

দীপঙ্কর বললে—বড় দেরি হয়ে গেল ভাই, আমি যাচ্ছিলাম সতীদের বাড়িতে খবরটা দিতে এমন সময়ে তুই ডাকলি—

—কিসের খবর?

দীপঙ্কর বললে—চাকরির খবরটা তো কাকাবাবু কাকীমাকে দিতে হবে মা বলেছিল কাকীমাকে প্রণাম করে আসতে—

কিরণ বললে—দেখ, তুই ওদের বাড়ি আর যাসনি—

—কার কথা বলছিস?

—ওই তোর কাকাবাবু। লোকটাকে আমি প্রথমে ভাল ভেবেছিলাম—লাইব্রেরীতে মাসে মাসে দু' টাকা করে চাঁদা দিত—

সত্যিই কাকাবাবু অনেকদিন ধরে চাঁদা দিয়ে এসেছেন। কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন বটে, কিন্তু চাঁদাও দিতেন। শুধু লাইব্রেরীতেই নয়। সব জায়গায়। পাড়ার সরস্বতী পুজো হবে। কোথায় মহিম হালদার স্ট্রীটের ছেলেরা সরস্বতী পুজো করবে—তার চাঁদাও কাকাবাবুর কাছে চাইতে আসতো।

শ্মশান-কালী পুজো এখানকার বহুদিনের। শানগরের পান্ডারা বাড়ি-বাড়ি আসতো চাঁদা চাইতে। অঘোরদাদু চাঁদার নাম শুনলে হাঁকিয়ে দিত। দীপঙ্কর নিয়ে যেত তাদের কাকাবাবুর কাছে। পাঁচ টাকা করে প্রতি বছরে কাকাবাবু চাঁদা দিতেন।

কিরণও আগে বলতো—তোর কাকাবাবু লোকটা ভাল মাইরি—

শুধু কিরণই নয়। আশে-পাশের সর্বত্র কাকাবাবুর খুব সুনাম ছড়িয়ে গিয়েছিল। কাকাবাবুর কাছে গিয়ে কেউ ফিরে আসতো না। কাকাবাবু বলতেন—শেষে কম পড়লে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও তোমরা—

কাকাবাবুর আপিস যাবার কোনও বাঁধাধরা সময় ছিল না। তবু বেশির ভাগ দিনই সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যেতেন। কোট-প্যান্ট পরে পাথরপটি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজরা রোডে ট্রাম ধরতেন। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীট দিয়ে ঘুরে পাথরপটি দিয়ে তারপর মন্দিরের পাশের গলি দিয়েও কোনও-কোনও দিন বেরোতেন। তারপর যখন সদানন্দ রোডটা হলো, তখন আরো সোজা হয়ে গেল রাস্তা। পাড়ার ছেলেরাও কাকাবাবু বলে ডাকতো।

—কাকাবাবু, কাকাবাবু।

কাকাবাবু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যেতেন। ছেলেরা বলতো—আমাদের ফুটবল ক্লাবের চাঁদা দিতে হবে কাকাবাবু—

—চাঁদা? তা কোথায় বাড়ি তোমাদের? ছেলেরা বলতো—হালদার পাড়ায়—

—হালদার পাড়ায় থাকো তো এতদূরে এসেছো চাঁদা চাইতে?

ছেলেরা বলতো—আপনাকে দিতেই হবে কাকাবাবু, আপনি নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের ছেলেদের দিয়েছেন!

বাড়িতে কাকীমা বলতেন—এখন তো তিনি আপিস থেকে আসেন নি, এলে বলবো—

কালিঘাটের সবাই জানতো এ-বাড়িতে চাঁদা চাইতে এসে কেউ ফিরে যাবে না। কাকাবাবুও বলতেন—ছেলেদের কাউকে ফিরিয়ে দিও না, ওরা চাইলে দু-চার আনা যা চায় দিয়ে দিও—

তারপর শুধু চাঁদা দেওয়া নয়, শুধু চাঁদা দিয়ে সাহায্য করা নয়। মাঠেও যেতে হবে। যেখানে খেলা হবে, গিয়ে দাঁড়াতে হবে মাঝে মাঝে। অন্তত ফাইনাল খেলার দিন। তিনিও একটা মেডেল দেবেন। মোটা সোনার মেডেল কিংবা জার্মান সিলভারের কাপ। ছেলেরা খেলার শেষে সেই কাপ নিয়ে চিৎকার করতে করতে মিছিল করে যাবে!—থ্রি চিয়ারস্ ফর কালিঘাট ফুটবল ক্লাব—হিপ্ হিপ্ হুররে—। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভেতর দিয়ে চিৎকার করতে করতে যাবে। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সামনে একবার দাঁড়াবে। ছেলেদের চিৎকার শুনে কাকাবাবু বেরিয়ে আসবেন, কাকীমা বেরিয়ে আসবে।

সতী বেরিয়ে আসবে। লক্ষ্মীদি যখন ছিল, তখন লক্ষ্মীদিও বেরিয়ে আসতো। ছেলেরা মেয়েদের দেখে আরো জোরে-জোরে চিৎকার করতো। যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠতো। লক্ষ্মী, সতী দুই বোনকে দেখে তাদের বীরত্ব যেন গলার জোরে ফেটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইত। তারপর ছিল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময়, বন্যার সময় দল বেঁধে হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে কোরাস গান গাইতে গাইতে আসতো একদল। ওপর থেকে লক্ষ্মীদি আর সতী ঝুঁকে পড়ে দেখতো। কাকাবাবু রঘুর হাত দিয়ে চাঁদা পাঠিয়ে দিতেন। ছেঁড়া কাপড় কি চাল, তা-ও পাঠানো হতো। দীপঙ্কর দেখতো ভিড়টা একটু বেশিই হতো তাদের বাড়ির সামনে। কাকাবাবুরা আসবার আগে তেমন ভিড় হতো না বিশেষ। কিন্তু লক্ষ্মীদিরা আসবার পর থেকেই চাঁদা আদায়ের হিড়িকটা বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম দীপঙ্কর কিছু বুঝতে পারতো না। পরে ব্যাপারটা বুঝলে।

তারপর থেকেই প্রায়ই লোকে জিজ্ঞেস করতো—তোদের বাড়িতে এসেছে কারা রে?

পাড়ার মোড়ে বাড়ির রোয়াকে বসে কেউ কেউ গান জুড়ে দিত। 'বাঁধনা তরীখানি আমারি এ নদীকূলে'। কিম্বা 'কালা তোর তরে কদমতলায় বাজায় বাঁশী'। আঙুরবালার নতুন টাট্‌কা রেকর্ড বেরিয়েছে তখন। সেই সব গান।

কাকীমা বলতেন—ও-সব দিকে তোমরা কান দিও না যেন লক্ষ্মী—

কিন্তু লক্ষ্মীদির সামনে কিম্বা সতীর সামনে কিছু বলবার সাহস ছিল না কারো। তারা জুতো পায়ে গট্ গট্ করতে করতে গিয়ে বাসে উঠতো। ঠিক ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের পক্ষে যেন বড় বেশি নির্ভীক, বড় বেশি অ-সামাজিক।

কাকাবাবু বলতেন—ও-রকম সব পাড়াতেই আছে। নিজেরা ঠিক থাকলেই হলো।

কাকীমা বলতেন—তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে থাকো, পরের মেয়ে নিয়ে আমার যে ভয় করে

কাকাবাবু বলতেন—যে-পাড়াতেই যাবে, সেখানেই ভয় করবে—

কিন্তু তবু কাকাবাবু পাড়ার লোকদের, পাড়ার ছেলেদের কিছু বলতেন না। চাঁদা দিতেন হাসিমুখে। ফুটবল খেলার কাপ দিতেন, শীল্ড দিতেন। তাদের মাঠে খেলা দেখতেও যেতেন। সেই কাকাবাবুর সম্বন্ধেই কিরণ যখন বিরূপ মন্তব্য করলে, তখন দীপঙ্করের ভালো লাগলো না। দীপঙ্কর বললে—জানিস কিরণ, আমার সেই লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদিকে মনে আছে তো তোর? সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে রে—

কিরণ অন্যমনস্ক ছিল। কথাটা শুনে কিছুক্ষণ পরে বললে—কী বললি

—তুই?

—লক্ষ্মীদি বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে একজনকে—

কিরণ বললে—তা তো যাবেই—

—কেন?

কিরণ বললে—ওর ছোট বোনটাও পালিয়ে যাবে দেখিস, দেখবি বাপ-মা ভাই-বোন কারো সঙ্গে আর কারো সম্পর্ক থাকবে না—কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না যে, কেউ কাউকে ভালবাসছে না যে! ভাল না বাসলে ঘর-সংসার তো ভাঙবেই—এই দেখ না, আমিও বাবা-মা'কে আর ভালবাসি না, আমিও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এতদিন তো ছিল, এতদিন তো ছিল সবই ঠিক—

কিরণ বললে—ওই ইংরেজদের জন্যেই এ-সব ভেঙে যাচ্ছে। মেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে, বাপ ছেলেকে তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে, বউ স্বামীকে বিষ খাইয়ে খুন করবে। এ-সব আরো বাড়বে। এ-সব ইংরেজরা না গেলে আরো খুন-জখম হবে, পালিয়ে যাওয়া আরো বাড়বে, এই সবে শুরু হলো। যখন ইংরেজদের তাড়িয়ে দেব, দেখবি তখন সব ভালো হবো আমরা, আবার সেই সত্যযুগ ফিরে আসবে—আমরা সত্যযুগ আবার ফিরিয়ে আনবো—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তা হোক, সতী সে-রকম নয়, সতী যাবে না দেখিস—সতীকে তুই জানিস না, সতীর খুব ভগবানে বিশ্বাস আছে, সতী কখনও বাবাকে না-বলে কোথাও যাবে না—বাবাকে সতী খুব ভালবাসে—

—কিন্তু যখন বিয়ে হবে?

দীপঙ্কর বললে—বিয়ে হলে সতী স্বামীকে খুব সেবা-যত্ন করবে—

কিরণ বললে—তা তুই কি এখনও দিন-রাতই ওই ওদের কথা ভাবিস? তোর কি আর কোনও ভাবনা নেই? তোর কি একবারও ভাবনা হয় না, কী করে দেশ স্বাধীন করা যায়? কী করে ইংরেজদের তাড়ানো যায়? কেন মিছিমিছি মেয়েদের কথা ভাবিস্ বল তো? এতে কী লাভ হয়? ও-ভাবনা একবার ঢুকলে কিন্তু মাথা থেকে আর দূর করতে পারবি না!

দীপঙ্কর কেমন যেন লজ্জায় পড়লো একটু।

কিরণ আবার বলতে লাগলো—তোকে এত বই পড়তে দিলুম, এত লেখা-পড়া করবার পরও তোর এই সব বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকছে? তুই কীরে?

দীপঙ্কর বললে—না, বেশি তো ভাবি না—

—বেশি ভাবিস না কীরে, তখন থেকে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুই তো কেবল ওই মেয়েদের কথাই বলছিস!

—না, এবার আর ভাববার সময় পাবো না। এবার তো সকাল সাড়ে দশটায়

আপিস যাবো, তারপর সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আসবো, ভাববো কখন? আর তাছাড়া লক্ষ্মীদি তো চলেই গেছে, সতীও মঙ্গলবার চলে যাচ্ছে—

—কোথায় চলে যাচ্ছে?

দীপঙ্কর বললে—বর্মায়, বাবার কাছে। চলে যাওয়াই ভালো জানিস। যত শিগগির চলে যায়, ততই ভাল। আমারও ভাবতে আর ভাল লাগে না ও-সব। তাছাড়া, আমাদের তো খেটে খেতে হবে! আমরা গরীব লোক, ওদের মতন তো বড়লোক নই, ওদের কথা ভাবলে চলবে কেন?

কিরণ বললে—তোকে একটা বই দেব, সেটা পড়লেই মেয়েদের কথা দেখবি একেবারে মন থেকে পালিয়ে যাবে—

দে ভাই বইটা, কী বই।

স্বামী বিবেকানন্দর লেখা—'ব্রহ্মচর্য'। ব্রহ্মচর্য পালন না করলে কোনও কাজই করতে পারবি না জীবনে। আমরা আমাদের দলের সব ছেলেকে ওই বইটা প্রথমে পড়তে দিই। পড়লে দেখবি মনটা পবিত্র হয়ে যাবে। মন আর শরীর এই দুটোকে যদি কন্ট্রোল করতে পারিস তো কাউকে কেয়ার করবার দরকার নেই—

মনে আছে শুধু ব্রহ্মচর্যই নয়, আরো কত রকম পন্থা আবিষ্কার করতে হয়েছিল দীপঙ্করকে। কাউকে মনে রাখবে না দীপঙ্কর। ও-সতীকেও নয়, লক্ষ্মীদিকেও নয়। সামান্য রেলের চাকরি, তার মধ্যে দিয়েই জীবনে উন্নতি করতে হবে। ওদের কথা মনে রাখলে কোনও লাভ হবে না তার। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সাদা দেয়ালের গায়ে একটা গোল দাগ দেওয়া ছিল, সেই গোলের মধ্যে ছিল একটা বিন্দু। পয়েন্ট। সেই পয়েন্টটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতো। চোখের পাতা ফেলাতে পারবে না, নড়তে-চড়তে পারবে না। প্রথমে এক সেকেন্ড, তারপরে অভ্যেস করতে করতে এক মিনিট পর্যন্ত চোখের পলক পড়বে না। সতীকে ভুলতে হবে। সতীকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে। রাত্রে যদিও বা স্বপ্ন দেখে সতীকে তো সকাল বেলা তার কোনও চিহ্ন থাকবে না মনে। পৃথিবীতে শুধু সতীই নেই, আরো অসংখ্য মানুষ আছে। অনাহার আছে, দারিদ্র্য আছে, লোভ, মোহ, হিংসা সবই আছে। উন্নতি আছে, অবনতি আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাট মানুষের মিছিল আছে, সেখানে সতী কতটুকু। কতটুকু তার অস্তিত্ব। কে সতী! অমন কত মেয়ে কত পুরুষকে প্রলোভন দেখিয়ে জয় করেছে, আবার একদিন কালের অমোঘ নিয়মে নিঃশেষে হারিয়েও গিয়েছে। ইতিহাস খুঁজলে তাদের কোনও চিহ্নই পাওয়া যাবে না আজ। মিছিমিছি সেই সতীকে মনে করে রেখে কেন কষ্ট পাবে দীপঙ্কর। তার চেয়ে ওই ভাল। সাদা দেয়ালের গায়ে কালির গোল দাগটার আরো কালি বুলিয়ে স্পষ্ট করে তুলতো দীপঙ্কর। তার ভেতরের লাল পয়েন্টটার ওপর অপলক দৃষ্টি দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়তো যখন

সবাই চুপ হয়ে যেত—যখন মা-ও বিন্তীদির কাছে গিয়ে শুতো, তখন একলা ঘরে সেই বিন্দুটার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনটাকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করতো দীপঙ্কর। এক সেকেণ্ড, দু সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড—তারপর এক মিনিট। চোখ টন্ টন্ করতো ব্যথায়। মনে হতো সে বুঝি সব জয় করে ফেলেছে। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সব হেরে গেছে তার কাছে। তখন, ঠিক তখন, হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাউডারের গন্ধ ভেসে আসতো—বেশ মিষ্টি মৃদু গন্ধ! আর হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই অন্যমনস্ক হয়ে যেত দীপঙ্কর! আর চারিদিকে চেয়ে দেখতো—সতী আবার চুপি চুপি তার ঘরে এসেছে নাকি!

কিন্তু সে-সব অনেক পরের কথা। দীপঙ্করের তখন চাকরিতে উন্নতি হয়ে গেছে। মাইনে বেড়েছে, খাতির বেড়েছে। নৃপেনবাবু তখন রিটায়ার করে গেছেন। কে-জি-দাশবাবু তখন আপিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে গেছেন। গাঙ্গুলী-বাবু তখন......কিন্তু গাঙ্গুলীবাবুর কথা যথাসময়েই বলা ভাল।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আমি ভুলে যাব ভাই, ঠিক বলেছিস, তোর কথাই ঠিক—

কিরণ বললে—আর একটু ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবি মেয়েরা পৃথিবীতে শুধু কর্মনাশ করতে আসে—কর্মনাশা—

দীপঙ্কর বললে—ঠিক বলেছিস, কাল রাত থেকে কেবল ভাবছি ওদের কথা, আপিসে গিয়েও ভেবেছি, ট্রামে উঠেও ভেবেছি—এবার আর ভাববো না—

কিরণ বললে—চুপ কর—ওই ভজুদা আসছে—

দীপঙ্করের সমস্ত শরীরটা যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো। পার্কের পুব দিকের ছোট গেটটা দিয়ে সাদা জামা-কাপড়-পরা কে যেন ভেতরে ঢুকলো। ঢুকে হন্ হন্ করে তাদের দিকে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে চেহারাটা ভাল করে দেখা যায় না। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো এই সামান্য একটা মানুষ, এই মানুষটার জন্যেই সারা দেশে এত কাণ্ড হচ্ছে! এই মানুষটার জন্যেই দুর্দান্ত টেগার্ট সাহেব এত জাল পেতেছে চারিদিকে! এই সামান্য মানুষটার জন্যেই এই সেদিন চট্টগ্রামে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল! সেই ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহ ঘোষণার বিখ্যাত দিনটাকে বেছে নিয়ে এই মানুষটাই চট্টগ্রামের জালালাবাদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল! এই লোকটাই সেই?

ওদিকে সুভাষ বোস আর কিরণশঙ্কর রায়ের তখন জেল হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে ২৬শে জানুয়ারীকে 'স্বাধীনতা দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়েছে লাহোর কংগ্রেসে। সঙ্গে সঙ্গে ভগৎ সিং-এর মামলাও চলছে। দিল্লীর পার্লামেন্ট হাউসের ভেতর বোমা ফেলেছিল ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত। সে-ট্রেনে সাইমন কমিশন আসার কথা, সেই ট্রেনটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কও লুট হয়েছে। যতীন দাস

চৌষট্টি দিন ধরে জেলের মধ্যে উপোস করে মারা গেছে। আর এদিকে মহাত্মা গান্ধী নিজে গেছেন ডাণ্ডী মার্চে। ১৯৩০ সালের মার্চ। বেআইনী নুন তৈরি করতে গিয়ে ইংরেজরা তাঁদের পুরেছে জেলে। চারিদিকে উত্তেজনা। কত ইতিহাস গড়া চলেছে। আর ঠিক সেই সময় বাঙালীর ছেলেরা দল বেঁধে মিলিটারি পোশাক পরে জালালাবাদের আর্মারীতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো একদিন। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক শুনে হতবাক হয়ে গেল। ব্রিটিশ রাজত্বের একটা এলাকা বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙালীরা একেবারে পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে।

সমস্ত ঘটনাগুলো ভাবতেই তখন রোমাঞ্চ হতো। দীপঙ্কর বেঞ্চির ওপরে স্থির হয়ে বসে রইল। একেবারে নড়বার ক্ষমতাও নেই যেন, মনে হলো এইবার যেন তার এতদিনের বাসনা পূর্ণ হবে। সেই চট্টগ্রাম, সেই ডালহৌসী স্কোয়ার, সেই লাহোর, সেই মেদিনীপুর, সব জায়গার সব মানুষগুলো যেন তাকে ডাকছে। সামান্য একটা স্বপ্ন, সামান্য একটু পাউডারের গন্ধ, সামান্য একটা চাকরি, সামান্য দু হাজার টাকাই নয়। এবার আরো বেশি কিছু নিতে হবে, এবার আরো বেশি কিছু দিতেও হবে! মা'র কথা ভেবে বিমর্ষ হলে চলবে না, লক্ষ্মীদির কথা ভেবে দুঃখ পেলে চলবে না, সতীর কথা ভেবে ভেবে স্বপ্ন দেখা চলবে না। দীপঙ্করেরও একটা দায়িত্ব আছে, দীপঙ্করেরও একটা কর্তব্য আছে—

কিরণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চুপি চুপি বললে—কী হলো?

যে এসেছিল, সে একবার দীপঙ্করের দিকে দেখে নিলে। বেশ সাদাসিধে শার্টপরা চেহারা। এতক্ষণে স্পষ্ট দেখা গেল চেহারাটা। খুব তাড়াতাড়ি যেন এসেছে মনে হলো। একেবারে দৌড়তে দৌড়তে।

কিরণ বললে—ভজুদা এল না?

লোকটা কিরণকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কী যেন বললে। দীপঙ্কর কান পেতেও কিছু শুনতে পেলে না। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগলো দুজনে। তারপর লোকটা আবার হন্ হন্ করে যেদিক দিয়ে এসেছিল, সেই দিক দিয়েই চলে গেল।

কিরণ কাছে এসে বললে—চল্, দীপু চল্—

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—ভজুদা আসবে না?

কিরণ বললে—না, এখন আসতে পারবে না, সি-আই-ডি লেগেছে পেছনে। টের পেয়ে গেছে ওরা। চল্ তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

অনেকক্ষণ কিরণ কোনও কথা বললে না। এবার আর সেই এক পথ নয়। অন্য এক ঘোরাপথ দিয়ে আবার বাড়ির দিকে চলেছে। একটা জায়গা বেশ অন্ধকার মতন। কিরণ হঠাৎ চারদিকে দেখে নিলে। বললে—এবার তুই বাড়ি যা দীপু—

—তুই যাবি না?

—না, আমার অন্য কাজ আছে—

কিরণ চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ডাকলে—কিরণ, শুনে যা—

বলে দীপঙ্কর নিজেই এগিয়ে গেল কিরণের কাছে। বললে—তুই ঠিক বলেছিস কিরণ, আমি আর ও-সব ভাববো না, জানিস—

কিরণ বললে—বেশ, ভালো কথা তো—

—হ্যাঁ, তুই সেই বইটা দিস। ব্রহ্মচর্য! আর দেখ, আর-একটা দিন শুধু যাবো সতীর কাছে বুঝলি, একটা কাজের কথা শুধু বলেই চলে আসবো—একটা দিন, তারপরে তো সতী চলেই যাচ্ছে—তখন আর কে কাকে মনে রাখে, কী বল!

কিরণ সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গেল। দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে—কিরণের চেহারাটা বেলতলা রোডের অন্ধকার গাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কিরণের কাছে যেন ছোট মনে হলো নিজেকে। কিরণ কত কাজ করছে। কত কাজের মানুষ। আর সে কেবল চাকরির ঘানিতে ঘুরবে সারা-জীবন। সকাল দশটা থেকে বিকেল সন্ধ্যে পর্যন্ত। কে-জি-দাশবাবু আর গাঙ্গুলীবাবু আর নৃপেনবাবুর মত। সমস্ত জীবনটা, সমস্ত পরমায়ুটা অপচয় করবে রেলের আপিসে। জার্নাল সেকশনের চিন্তা করতে করতে সকাল বেলা তার সূর্য উঠবে আর সন্ধ্যেবেলা ডুববে। কিন্তু পৃথিবী আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত লোক এগিয়ে যাবে—দীপঙ্করকে অতিক্রম করেই সবাই এগিয়ে যাবে। দীপঙ্কর তার লক্ষ্যকে কেটে-ছেঁটে ছোট করেছে বলে সকলের পেছনে সে পড়ে থাকবে। সকলের দয়ার, সকলের অনুকম্পার পাত্র হয়ে যাবে। সেই বেলতলার অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্কর শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াল। না, মানুষের সঙ্গে মিশতেই হবে তাকে। মিশতে গিয়ে যদি তার অহঙ্কারে ঠেকে, অবিবেচনায় ঠেকে, অহমিকায় ঠেকে, কিম্বা অর্থাভাবে ঠেকে, তাতেও সে নিচু হবে না আর। অমলবাবুর কথাই ঠিক। জীবন দিয়েই তার সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে এবার থেকে সে। সস্তা সমাধানের সহজ পথ আর মাড়াবে না।

মনে আছে দীপঙ্কর ঠিক করেছিল সোজা বাড়িতেই আসবে। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে। একা-একা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে এই কথাটাই ঠিক করলো যে, এবার থেকে অন্য মানুষ হয়ে যাবে সে। একদিন এই জীবন থেকেই কত কী দেখেছে দীপঙ্কর, কত কী ভেবেছে। সমস্ত জীবন ধরে শুধু ভাবতেই শিখেছে সে। ভেবে ভেবে ভাল-মন্দর তুল্য-মূল্যও বিচার করেছে। কিন্তু শেখা হয়নি কিছুই। ছোটবেলায় ছেলেমেয়েদের ভাষা শেখার মত সেগুলো সে শুনে শুনেই আয়ত্ত করেছে, কিন্তু ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করে সেগুলোকে পাকা করে নেওয়া হয়নি। সহজ পাওয়াকে নিয়ম-শৃংখলা দিয়ে বেঁধে কাজের মধ্যে পরখ করিয়ে নিতে হয়—তাতেই স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। সেটাই হয়নি। এবার থেকে দীপঙ্করের অন্য পথ। অন্য মানুষ হয়ে

যাবে সে।

ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে ঢুকে উনিশের একের বি বাড়িটার সামনে এসেও তার প্রতিজ্ঞা অটুট ছিল। সতীদের দরজা পেরিয়ে নিজেদের সদর দরজাটা দিয়েই বাড়ির ভেতরে ঢুকতো, কিন্তু কী যে হলো। কাকীমাকে প্রণাম করার কথাটা মনে পড়লো। যত সামান্য চাকরিই হোক, আজ তার চাকরি হয়েছে। সে-চাকরির সংবাদটা দিয়ে আসা উচিত। কাকীমা কাকাবাবু তার শুভাকাঙ্ক্ষী! গিয়ে চলে এলেই হলো। সতীর সঙ্গে দেখা না-করলেই হলো। সতীর সঙ্গে কথা না-বললেই হলো। তাতে আর দোষ কী!

—কাকীমা।

কাকীমা রান্নাঘরের মধ্যেই ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে বোধহয় রান্নাঘর তদারক করছিলেন। দীপঙ্কর একেবারে সোজা জুতো জোড়া বাইরে খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

—একী দীপু! ওমা, প্রণাম করছো কেন হঠাৎ! কী হলো আবার?

দীপঙ্কর হাত বাড়িয়ে কাকীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। কাকীমা অবাক হয়ে হাসলেন। বললেন—এত ভক্তি কেন হঠাৎ?

দীপঙ্কর বললে—আমার আজ চাকরি হলো কিনা কাকীমা তাই—

কাকীমা আশীর্বাদ করলেন। বললেন—হয়েছে? আশীর্বাদ করি বাবা চাকরিতে তোমার উন্নতি হোক, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করো, তোমার মা যে কষ্ট করে মানুষ করেছে তোমাকে—তা......

তারপর বললেন—যাও, ওপরে যাও, সতী আছে—

—না কাকীমা, অনেক রাত হয়ে গেল, বাড়ি যাই—

বলে দীপঙ্কর সোজা বাইরে চলে আসছিল। বললে—কাকাবাবুর বোধহয় আসতে অনেক রাত হবে, কাল বরং সকালেই আসবো—

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে রোয়াকে উঠতে হয়। রোয়াকটা ঘুরে সোজা সদর দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। রোয়াকের কাছে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলে ওপরে একবার যাবে কিনা। এক মুহূর্তের দ্বিধাও হলো। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলে। কিন্তু না, থাক।

হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই চমকে উঠলো। সতীর একজোড়া পা। একেবারে সোজা সামনে দাঁড়িয়ে।

দীপঙ্কর চোখ তুলতে পারলে না। চোখ তুললেই মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে। একজোড়া ফরসা পায়ের ওপর রঙিন শাড়িটা ঝুলছে। পা জোড়া নড়েও না, সরেও যায় না। অথচ সতীকে এড়িয়ে যাবার রাস্তাও নেই আর। সদর দরজার দিকে যেতে গেলেই সতীকে ঠেলে যেতে হবে।

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তখনও। কিন্তু তবু সতী নড়ে না। কী

করবে দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। অথচ সরতে বললে কথা বলতে হয়। দীপঙ্কর শেষ পর্যন্ত চোখ তুললো। দেখলে সতীও তার দিকে চেয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর চোখ নামিয়ে নিলে। তেমনি করেই দাঁড়িয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ!

তারপর এক সময় দীপঙ্কর হঠাৎ আবার মুখ তুলে বললে—সরে যাও—বাবে—

সতী কিন্তু সরলো না। তেমনি করেই দাঁড়িয়ে রইল তার দিকে চেয়ে।

দীপঙ্কর আবার বললে—সরে যাও—আমি যাবো যে—

সতী তখনও নড়লো না। দাঁড়িয়ে রইল। মুশকিলে পড়লো দীপঙ্কর। সতীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েই যেতে হবে নাকি? অথচ সতী কী যে বলতে চায়, তখনও বোঝবার উপায় নেই, তার দিকে গম্ভীর হয়ে শুধু চেয়েই দেখছে। কী যে করতে চায়, তারও ঠিক নেই।

—তা সরবে তো? না সরলে আমি যাবো কী করে?

সতী পাথরের মত চুপ করে তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে।

দীপঙ্কর বললে—এবার না সরলে আমি কিন্তু তোমাকে ঠেলে সরিয়ে চলে যাবো—

তবু নিশ্চল নিথর মূর্তি সতীর।

দীপঙ্কর ঠিক করলে সতীকে গায়ের জোরে ঠেলেই চলে যাবে। আর কোনও লজ্জা-সম্ভ্রম দেখালে চলবে না।

দীপঙ্কর হাত তুলতেই যাচ্ছিল—হঠাৎ ওদিকে একটা বিকট শব্দ হলো রান্নাঘরের টিনের চালের ওপর। সবাই চমকে উঠেছে। দীপঙ্করও চমকে উঠেছে, সতীও চমকে উঠেছে। কাকীমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—ও কী পড়লো রে রঘু?

রঘুও বেরিয়ে এসেছে। একটা আধ-ভাঙা ইঁটের টুকরো টিনের চাল থেকে গড়াতে গড়াতে উঠোনে পড়লো ধপ্ করে। ইঁট কে ফেললে? সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা ইঁট। এবার পড়লো উঠোনের পুব দিকে। প্রায় আস্ত ইঁট। দুম করে শব্দ হলো। তারপর আর-একখানা। পর পর তিনখানা ইঁট পড়তেই কাকীমা বললেন—রঘু, বাইরে গিয়ে দেখ্ না, কে ইঁট ফেলছে—

রঘুকে আর বাইরে যেতে হলো না। বাইরের দিক থেকেই অসংখ্য লোকের গলা শোনা গেল। তারা চিৎকার করছে। কাকীমা সতী দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গিয়েছে যেন। রঘু সদর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই সবাই ভেতরে ঢুকে পড়েছে। একজন-দুজন নয়—ঢুকতে ঢুকতে ষাট, সত্তর, একশোজন ঢুকে পড়লো বাড়ির ভেতর। আরো অনেক লোক তখন যেন বাইরে গোলমাল করছে। সামনের কয়েকজন লোক একেবারে মুখোমুখি এগিয়ে এল।

রঘু বললে—কী চান আপনারা? বাবু নেই—

দীপঙ্কর যেন চিনতে পারলে কয়েকজনকে। কালিঘাটের পাড়াতেই থাকে সব। হাতে লাঠি আছে কারো কারো। দীপঙ্কর বললে—কাকে চাই? ইঁট ফেলছিলেন আপনারাই?

লোকগুলো যেন মারমুখো হয়ে এসেছে সবাই। বললে—সেই সি-আই-ডি লোকটা কোথায়?

সি-আই-ডি! দীপঙ্কর বললে—সি-আই-ডি কেউ নেই এখানে—আপনারা বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান, নইলে এখনি পুলিসে খবর দেব—

কোথা থেকে যেন দীপঙ্করের অসীম সাহস এল মনে। এগিয়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে। সামনের একজন পাণ্ডা মতন লোক আরো এগিয়ে এল। বললে—ভদ্দরলোকের পাড়ার মধ্যে সি-আই-ডি রাখা, আর জায়গা হলো না কোথাও—

—কে সি-আই-ডি?

দীপঙ্করও সমান গলার জোরে উত্তর দিলে।

সামনের লোকটা লাঠিটা ঠুকে এগিয়ে এসে বললে—আপনি কে? আপনি কে শুনি? আপনি এ-বাড়ির কে?

পেছন থেকে কে একজন বললে—ওরে, ও পাশের বাড়ির লোক, অঘোর ভট্টাচার্যি'র বাড়িতে থাকে—

বাকি লোকগুলো তখন হৈ-হৈ করে উঠেছে। একজন বলে উঠলো—বন্দে মাতরম্। আর তুমুল চিৎকার উঠলো সমস্বরে—বন্দে মাতরম্। আর সঙ্গে সঙ্গে সে এক পৈশাচিক কাণ্ড শুরু হলো। পেছনের যত লোক সব ঢুকে পড়লো উঠোনের মধ্যে। বাড়ির উঠোনে, সিঁড়িতে, রোয়াকে সর্বত্র গুণ্ডাদের দল ছেয়ে ফেললে। [illegible] বাবু বাড়ি নেই, সে-কথায় কেউ কান দেয় না। কেউ কেউ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ওপরে উঠে পড়লো ক'জন। কাকীমা থর থর করে কাঁপতে লাগলেন এক কোণে দাঁড়িয়ে।

—আপনারা কী চান কী? দেখছেন ভদ্রলোকের বাড়ি?

—ভদ্দরলোক না ছাই, সি-আই-ডি, সি-আই-ডি এসেছে কালিঘাটের মধ্যে। [illegible]।

দীপঙ্কর তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কে সি-আই-ডি, কার কথা বলছেন? কোথায় সি-আই-ডি?

—ওরে বন্দুক আছে বাড়িতে, বন্দুক [illegible] সাবধান।

যে লোকটা লাঠি হাতে সামনে এগিয়ে এসেছিল, সে হঠাৎ বন্দুকের নাম শুনেই লাঠিটা ঘোরাতে লাগলো। একেবারে দীপঙ্করের মুখের সামনে এগিয়ে এল। সতী দেয়ালের একটা কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। লোকটা সেই দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর সামনের দিকে যেতেই সতী তার হাতটা টেনে ধরলে

—দীপ্ন সরে এসো—

—বন্দে মাতরম্‌, বন্দে মাতরম্‌—

তুমুল শব্দে সমস্ত বাড়িটা গম্‌ গম্‌ করে উঠলো।

দীপঙ্কর বললে—আপনারা কালিঘাটের ছেলে হয়ে কালিঘাটের বদনাম করছেন? লজ্জা করে না আপনাদের?

—লজ্জা! লোকটা তাকে যেন আঘাত করবার জন্যে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরলো। দীপঙ্করের মনে হলো লাঠিটা যেন সোজা সতীর মাথার ওপরেই পড়বে! দীপঙ্কর হুংকার করে উঠলো—খবরদার—

কিন্তু ঠিক সময়েই দীপঙ্কর সামলে নিয়েছে। লাঠিটা পড়বার আগেই দীপঙ্কর এক লাফে সতীকে জড়িয়ে ধরে লাঠির আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে! আর লাঠিটা এসে পড়েছে দীপঙ্করের পিঠে। পিঠটা যেন ভেঙে গেল দীপঙ্করের। কিন্তু তবু রক্ষে, সতীর গায়ে ওটা পড়েনি। পড়লে সতী মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। কিন্তু যদি আবার লাঠি পড়ে সতীর গায়ে! আবার যদি আঘাত করে! দীপঙ্করের তখন আর কোনও দিকে জ্ঞান নেই। ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ্‌ করে দিচ্ছে। চায়ের কাপ, কাঁসার বাসন, কাচের আলমারি, দামী দামী সব জিনিস দুম-দাম পড়ছে আর ভাঙছে। কোথা থেকে পিল পিল করে অসংখ্য লোক ঢুকে আসছে বাড়ির ভেতরে। মুহুর্মুহু চিৎকার উঠছে—বন্দে মাতরম্‌, বন্দে মাতরম্‌—! যে-যেখানে পারছে ঢুকে পড়ছে। রান্নাঘরের থালা-বাসন, রান্না-জিনিস উঠোনে ছত্রাকার করে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত বাড়িটা যেন অসংখ্য গুন্ডার হাতে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। আর মনে হলো সতীর ওপরেই যেন সকলের বেশি আক্রোশ! সতী থর থর করে কাঁপছে! দীপঙ্কর প্রাণপণে সতীকে জড়িয়ে ধরে আছে। দীপঙ্কর যেন সতীর হৃৎপিন্ডের ওঠা-পড়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছে। যে-যেখানে যা-ইচ্ছে যা-খুশি করুক, সতীর গায়ে যেন কারো ছোঁয়া না লাগে! কারো অশুচি স্পর্শ না ঠেকে। সতীকে সে অশুচি হতে দেবে না, সতীর পবিত্রতা সে জীবন দিয়েও অম্লান রাখবে।

দীপঙ্কর তখনও প্রাণপণে সতীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু সতী যেন দীপঙ্করের আলিঙ্গনের মধ্যেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই ভয়ে ভয়ে দীপঙ্করের শক্ত আশ্রয়ের মধ্যে সতীও নিজেকে সমর্পণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করলে। দীপঙ্করের বুকের মধ্যে মাথাটা লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করলে—

হঠাৎ দোতলার ওপর আবার একটা চিৎকার উঠলো—বন্দে মাতরম্‌—

সমস্ত কালিঘাটটাই যেন সেদিন ভেঙে পড়েছিল ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর

বাড়িটাতে। কয়েকজন লোকের মুখ হয়ত চিনতো দীপঙ্কর, কিন্তু নাম জানতো না। কাকাবাবু বাড়িতে নেই। তার অবর্তমানেই সমস্ত লোক বাড়িটা তছনছ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে। কোথায় কে কোন্‌ দিকে কাকে সামলাচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রঘু, ঠাকুর, তারা দুজনে বোধহয় ভয়ে ভয়ে কিছুই বলতে পারছে না। আর তারা যা খুশি তাই করে চলেছে। ওপরের একখানা চেয়ার সোজা উঠোনে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কাকাবাবু আর কাকীমার একটা জোড়া ছবি দেয়ালে টাঙানো ছিল, সেটাও কে যেন ছুঁড়ে মারলে ওপর থেকে। কাচটা সিমেন্টের ওপরে পড়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে ছত্রখান হয়ে গেল।

হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে কে যেন ডাকলে—দীপু—

দীপু তখনও সতীকে আড়াল করে রয়েছে। ফিরে চেয়ে দেখলে। বললে—এই যে আমি, মা—

আশ্চর্য! সেই ভিড়ের মধ্যে মা কেমন করে এল। একটুও ভয় করলো না! মার মাথার চুলগুলো এলিয়ে পড়ছে, আলুথালু চেহারা।

এসো মা, এসো, চলো, ভয় কি—চলো আমার সঙ্গে—

কাকীমা সতী দুজনকে নিয়ে মা খিড়কির দরজা দিয়ে সোজা একেবারে তাদের নিজেদের বাড়িতে এনে তুলেছে। শোবার ঘরের মধ্যে দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে মা দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সতীর চেহারার দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। অবস্থাটা যেন তখনও ভাল করে বুঝতে পারেনি সে।

মা বললে—আপনারা এখানে বসুন দিদি, কোনও ভয় নেই—

বাইরে থেকে তখনও শব্দ আসছে গোলমালের। অঘোরদাদু চিৎকার করছে নিজের ঘর থেকে—বাড়িটা ভেঙে ফেললে মুখপোড়ারা, আমার বাড়ি ভেঙে ফেললে—

কিন্তু তুমুল হট্টগোলের মধ্যে অঘোরদাদুর গলার শব্দটা বড় ক্ষীণ শোনালো, বাতাসে যেন মিলিয়ে গেল সে শব্দ। কেউ শুনতে পেলে না।

আর খানিক পরেই অনেকগুলো মোটরগাড়ির শব্দ হলো গলির ওপর। চিৎকার উঠলো চারদিক থেকে। দুম্‌দুম্‌ করে পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। যারা এতক্ষণ লুটপাট করছিল তারা সবাই যে-যেখান দিয়ে পারলে পালিয়ে গেল। উঠোনের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালাবার শব্দ হচ্ছে। আর তাদের পেছনে যেন পুলিসের দল। সার্জেন্ট পুলিসে ছেয়ে গেল বাড়ি। দেখতে দেখতে খাঁ খাঁ করতে লাগলো সমস্ত জায়গাটা। সব যেন চুপচাপ। দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে চারটে প্রাণী চুপ করে নিঃশব্দে সমস্ত শুনতে লাগলো।

কাকীমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

মা বললে—কাঁদছেন কেন দিদি, আমরা তো রয়েছি। দীপু রয়েছে, ভয় কী—

কাকীমা বললেন—উনি যে বাড়ি নেই—

মা বললে—পুলিস এসে গেছে, আর ভয় কী—

কাকীমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। বললেন—সব জিনিসপত্তোর আমার চোখের সামনে ওরা ভেঙে দিলে দেখলাম—

মা জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের তো কারো খাওয়াও হয়নি বোধহয়?

কাকীমা বললেন—আর খাওয়া—খাবার তৈরি করছিলুম সবে—

মা বললে—আমাদেরও কারো হয়নি দিদি, দীপুর জন্যে বসে ছিলুম আমি, এমন সময়—

সে-রাতটা যে কোথা দিয়ে কেমন করে কাটলো! দীপঙ্করের মনে আছে সে-রাত্রে সে স্তম্ভিত হয়ে ছিল অনেকক্ষণ ধরে। অনেকক্ষণ তার ভাবনা-চিন্তা যেন জট পাকিয়ে গিয়েছিল। সকাল-বিকেলের সমস্ত সংকল্পের সৌধ যেন তার হঠাৎ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন যেন সে অন্ধের মতন পৃথিবী সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করে এসেছে। এতদিন পরে বোঝা গেল—কেন সেদিন কাকাবাবু কিরণের সঙ্গে মিশতে বারণ করেছিলেন। কেন কাকাবাবুর ঘরে দূরবীন থাকতো, কেন পাড়ার ছেলেদের চাঁদা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন। কেন এত জায়গা থাকতে তাদের ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এসে ঘরভাড়া নিয়েছিলেন! কেন সময়ে-অসময়ে নানা জাতীয় নানা পোশাকে দেখা যেত কাকাবাবুকে। এতদিন সত্যিই যেন দীপঙ্করের একটা চোখ অন্ধ ছিল। পৃথিবীকে এক-চোখে দেখার ফলই বোধ হয় এই। মানুষকে তবে কী দিয়ে বিচার করবে দীপঙ্কর? কেমন করে বিচার করবে সংসারকে? তবে কি মানুষকে সে এতদিন দু-চোখ দিয়ে দেখেনি? মানুষের বিচার করেছে কি শুধু স্বার্থ দিয়ে, সংস্কার দিয়ে? তাইতেই তার এই ভুল? মানুষ তো কত রকম আছে। পরিবারের মানুষ আছে, প্রয়োজনের মানুষ আছে, অজ্ঞাত-পরিচয় মানুষও আছে। মানুষের সেই পরিচয়টা কি তবে মিথ্যে? কেন তবে এতদিন কেউ জানায়নি তাকে খবরটা? কেন এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিল দীপঙ্কর! বিশ্বাস করে ভালবেসেছিল সবাইকে। ভালবেসেছিল কাকাবাবুকে, ভালবেসেছিল কাকীমাকে, লক্ষ্মীদিকে, এমন কি সতীকেও। দীপঙ্করের মনে হলো ওদের সবাইকে ভালবেসে যেন নিজের অগোচরেই এতদিন একটা মহা লোকসান বুকের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছে! যে-লোকসানের আর কোনও খেসারত নেই কোথাও। কেন ওরা এতদিন বলে নি? কেন তবে এতদিন কেউ জানায়নি খবরটা?

চারিদিকে যখন পুলিসে-পুলিসে ছেয়ে গেছে বাড়িটা, যখন কয়েকজনকে ধরে ফেলেছে পুলিসে, কয়েকজন গুলির আঘাতে মরেছে, চোট খেয়েছে, তখনও দীপঙ্কর মন থেকে ভাবনাটাকে দূর করতে পারছে না। অনেক রাত্রে কাকাবাবুও এলেন। পাড়ার কোনও লোক ভয়ে এগোয়নি এদিকে। কাকীমা আর সতী পুলিসের হেপাজতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কাকাবাবুর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। এই-ই কি সংসারের মানুষ? এই-ই কি প্রয়োজনের মানুষ, স্বার্থের মানুষের চেহারা! কিরণরা তো এদের বিরুদ্ধেই প্রাণ দিতে

সংকল্প করেছে। কিরণরা তো এদের জন্যেই বাড়ি-ঘর-সংসার ত্যাগ করে লুকিয়ে লুকিয়ে মৃত্যুর সাধনা করতে শুরু করেছে। ঘেন্নায় সমস্ত বুকখানা ছি ছি করে উঠলো দীপঙ্করের।

রাত তখন অনেক। মা নিজে খাওয়ালে কাকীমাকে। সতীকেও খাওয়ালে। সঙ্গে দীপুও খাচ্ছিল। কিন্তু গলা দিয়ে কিছু যেন তার নামছিল না। সমস্ত কালিঘাট নিষুতি। শুধু ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের উনিশের একের বি'তে তখন বাইরে পুলিসের গাড়ি পাহারা দিচ্ছে। চারদিকে টহল দিচ্ছে। কয়েকজনকে গাড়িতে করে ধরে নিয়ে গেছে থানায়। কয়েকটা কুকুর তখনও শুধু ফাঁকা চিৎকার করছে রাস্তায়।

—দিদি?

বিন্তীদি ঘরের ভেতর থেকে একবার ডাকলে।

মা বললে—তুমি কিছু ভাবনা কোর না মা, ঘুমোও তুমি—

বিন্তীদি বললে—এবার দরজা খুলবো?

—না না দরজা খুলো না। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও এবার।

বিন্তীদি আবার জিজ্ঞেস করলে—ওঁরা চলে গেছেন?

—না, ওঁদের জন্যেই বাইরে রয়েছি, ওঁদের খাওয়াচ্ছি,—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না মা!

বিন্তীদি আবার ডাকলে—দিদি একবার শোন তো আমার কাছে—

মা কাছে গেল। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী বলছো মা?

বিন্তীদি গলাটা নিচু করে বললে—ডাকাতরা চলে গেছে?

—হ্যাঁ, তুমি ঘুমোও, আর কথা বলো না, অনেক রাত হয়েছে, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—

সমস্তক্ষণ কাকীমাও একটা কথা বলেন নি, সতীও একটা কথা বলেনি। দীপঙ্করও একটা কথা বলেনি। অনেক রাত্রে যখন রঘু এসে ডেকে নিয়ে গেল, পুলিস এসে পাহারা দিয়ে দুজনকে আবার বাড়ি নিয়ে গেল, তখনও কিছু কথা বলেনি কেউ। বাড়িতে আলো জ্বলল না। দরজা জানালা ভেঙেছে, আসবাব-পত্র ভেঙেছে, বাসন-কোসন ভেঙেছে। আলমারিতে ট্রাঙ্কে যা কিছু ছিল সব তছনছ করে ফেলে দিয়েছে, লুটপাট করেছে। ওদিকে হালদারপাড়া, আর পশ্চিমে পাথরপটি, দক্ষিণে শানগর আর পূব দিকে হাজিকাশিমের বাগান—সমস্ত এলাকায় শোরগোল উঠে গেছে। সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা যে যার বাড়ির মধ্যে দরজায় খিল বন্ধ করে প্রহর গুনছে।

—মা!

রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেঙে দীপঙ্করের গলাটা কেঁপে উঠলো হঠাৎ।

—কী রে দীপু?

—কাকাবাবু পুলিসের সি-আই-ডি, তুমি জানতে? এতদিন ধরে এ-বাড়িতে আছে ওরা, এতদিন ওদের ওখানে যাচ্ছি, লক্ষ্মীদি সতী ওরা কেউ একদিনও বলেনি কাউকে! ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে সি-আই-ডি-দের কেউ জেনেশুনে বাড়ি ভাড়া দেয়? তুমিই বলো তো! শোনবার পর থেকেই আমার খুব খারাপ লাগছে, জানো মা! এত বড় আশ্চর্য ঘটনা, অথচ কেউ বললে না আমাদের, আমরা জানতেই পারলুম না—

মা বললে—চুপ কর—

—চুপ করবো কেন? আমি সকালবেলাই বলবো কাকাবাবুকে! এ তো আমাদের ঠকানো, আমরা জানি না বলে, আমাদের ভালমানুষ পেয়ে ঠকিয়েছেন আপনারা! আমরা যদি জানতুম তো ওদের সঙ্গে কি মিশতুম ভেবেছ?

—তোর অত কথায় দরকার কী শুনি! ওরা পুলিসের লোক হোক আর যা-ই হোক, সে নিয়ে তোর অত মাথা ঘামাবার দরকার কী! ওই সব নিয়ে যেন কিছু আবার বলতে যেও না তুমি! অনেক কষ্টে তোমার চাকরি হয়েছে, শেষকালে ওই নিয়ে যদি মাথা ঘামাও তো চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়বে তোমার! খুব সাবধান!

তারপর যথারীতি সকাল হলো। রোজকার মত চন্নুনী উঠে সদর দরজা খুলে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে। গোবর-ছড়া দিয়েছে। বাড়ির উঠোনে গতরাতের ইঁট-পাটকেল জমা হয়েছিল। জঞ্জাল জমেছিল বাড়ির চারদিকে। যেন ছোটখাটো যুদ্ধ হয়েছে উঠোনে। জানালার ভাঙা কাচ, আলমারির পাল্লা, চেয়ারের পায়া সর্বত্র ছড়ানো। অঘোরদাদু ভোর না হতেই গালাগালি দিতে শুরু করেছে। বিন্তীদি অনেক বেলা করে দরজা খুলেছে। সমস্ত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটারই যেন ছন্নছাড়া মূর্তি। ভোরবেলাই বাজারে যেতে হয়েছে দীপঙ্করকে। এ-দিকটার লোকজন কম। নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের মোড়ে যেতেই ছোট-ছোট জটলা জমেছে জায়গায় জায়গায়। সবাই জিজ্ঞেস করলে—কাল কী হয়েছিল ভাই তোমাদের বাড়িতে?

কেউ কেউ বললে—অঘোর ভট্চার্যি শেষকালে সি-আই-ডি ভাড়াটে বসালে?

পাথরপটিতেও তার দিকে দু'একজন আঙুল দিয়ে দেখালে। এক-একজন ডাকলে—আপনাদের বাড়িতে রাত্তিরে কী হয়েছিল মশাই?

মধুসূদনের রোয়াকে সেদিন আর কারো চিহ্ন নেই। সবাই চুপি চুপি কথা বলছে। সবাই ফিস্ ফিস্ করে আড্ডা দিচ্ছে। রাস্তায়, রোয়াকে, দোকানে, বাজারে সর্বত্র ওই একই আলোচনা। এক রাত্রের ঘটনায় রাতারাতি উনিশের একের বি বাড়িটা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। বাজারের থলি নিয়ে আসবার পথেও ওই এক আলোচনা। সবাই আজ তার দিকে নজর দিয়ে দেখছে। সে-ও যেন

বাড়িটার সঙ্গে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। সে-ও যেন সকলের আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে রাতারাতি। বাড়ির কাছে আসতেই আবার সেই নির্জনতা। শুধু কয়েকটা লাল-পাগড়ি পুলিস বাড়ির সদর দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে লাঠি হাতে। কাল রাত্তিরে সেই যে পুলিস এসে ঘাঁটি করেছে, তারপরে আর নড়েনি তারা! বাজারে গিয়ে শোনা গেল নাকি পুলিস এসে পঞ্চাশজনকে ধরে নিয়ে গেছে। হাসপাতালে পাঠিয়েছে দশজনকে। একজনের অবস্থা নাকি মরো-মরো।

আজকে আর কাকাবাবুদের বাড়ির ভেতরে ঢোকা যাবে না। ঢুকতে গেলে পুলিস বাধা দেবে। পুলিসের অনুমতি নিতে হবে, তবে ঢুকতে পারবে। দীপঙ্কর পাশের দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়লো। ভাত খেতে বসেও দীপঙ্কর একবার দোতলার দিকে চাইলে। আজ জানালা-দরজা সব বন্ধ। সব নিস্তব্ধ। কোথাও কোনও প্রাণস্পন্দনের চিহ্নটুকুও নেই যেন বাড়িতে। বার বার চোখ তুলে দেখতে লাগলো দীপঙ্কর। কোথাও কোনও জানালা যদি একবার খুলে যায়; যদি চকিতে একবার দেখে ফেলে সতীকে!

সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে গেল দীপঙ্করের।

খেয়ে-দেয়ে আপিস বেরোবার পথেও একবার দাঁড়াল রোয়াকের ওপর। শার্টের কলারটা একটু উঁচু করে নিলে। ধুতির কোঁচাটা ঠিক করলে বার বার।

—কী রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? দেরি হয়ে গেল যে! আপিসে যা—

মা'র কথাতে যেন সম্বিৎ ফিরে এল। ন'টা বেজেছে। মা সকাল-সকালই ভাত করে দিয়েছে। এখনও দেড় ঘণ্টা হাতে। এখনও অনেক সময় আছে। মা'রই যেন তাড়া বেশি তার আপিসের জন্যে। মা'রই যেন ঘুম হচ্ছে না।

দীপঙ্কর বললে—এই তো যাচ্ছি মা, এখনও সময় আছে অনেক—

মা বললে—তা-একটু সময় থাকাই ভাল, নতুন চাকরি, ঠিক সময়ে যাবে—

দীপঙ্কর আর একবার ঘরে গেল। পেন্সিল কলম নিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। আর একবার প্রণাম করলে ঠাকুরকে। তারপর আবার এসে দাঁড়াল বারান্দায়। মা তখন রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। বিন্তীদি মা'র কাছে দাঁড়িয়ে আছে দরজায় হেলান দিয়ে। আমড়া গাছটার ভেতর একটা ডালে সেই কাকটার দিকে হঠাৎ নজর পড়লো দীপঙ্করের। অনেক দিন দেখেইনি ওটাকে। এতদিন ভুলেই গিয়েছিল। সেই জোড়াটা মারা যাবার পর থেকেই ওইখানে এসে বসতো—। দীপঙ্কর একদিন লক্ষ্মীদির দেওয়া চকোলেট দিয়েছিল ওকে। গপ্ গপ্ করে কাকটা সবগুলো চকোলেট খেয়ে ফেলেছিল সেদিন। আবার এতদিন পরে সব মনে পড়লো। সে-লক্ষ্মীদি নেই, সে-লক্ষ্মীদিও আর এখন সে-লক্ষ্মীদি নেই। কত বিপদের মধ্যে দিন কাটছে লক্ষ্মীদির। খেতে পাচ্ছে না, ভয়ে ভয়ে একলা দরজা-বন্ধ ঘরে কাটিয়ে জ্বর বাধিয়ে ফেলেছে সেই লক্ষ্মীদি! আর সতী! সতীরও বড় খারাপ চলছে দিনগুলো। কাল সমস্ত শক্তি দিয়ে দীপঙ্কর সতীকে

জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়েছে। নইলে কী সর্বনাশ যে হতো কল্পনা করা যায় না!

দীপঙ্কর টিফিনের কৌটোটা খুলে তার ভেতর থেকে একটা পরোটা বার করলে। তার পর হাত বাড়িয়ে কাকটার দিকে ছুঁড়ে দিলে। বললে—আঃ আঃ —আঃ আঃ—

কাকটা টপ করে নেমে এল উঠোনের ওপর। তারপর গপ্ গপ্ করে পরোটাটা খেতে লাগলো। পুরোপুরি যেন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার এদিক-ওদিক চাইছে আর মুখে পুরছে—

দীপঙ্কর বললে—খা, খা, কেউ কিছু বলবে না—খেয়ে নে, পেট ভরে খেয়ে নে—পৃথিবীতে খাওয়া নিয়েই যত গণ্ডগোল, খাওয়া নিয়েই যত মারামারি, খাবার যোগাড় করতেই তো চাকরিতে ঢুকেছি, নইলে......

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই দীপঙ্কর ওপর দিকে মুখ তুললে। দীপঙ্কর অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সতীদের বাড়ির দোতালার একটা জানালার একটা পাখি হঠাৎ উঁচু হলো। কে দেখছে ভেতর থেকে দেখা গেল না। হয়ত সতী, কিম্বা হয়ত সতী নয়। সতীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হলে কিছু বলতে পারতো। বলতে পারতো—সকাল থেকেই তোমাদের বাড়ি যাবার জন্যে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু যাবো কী করে? চারদিকে যে পুলিস ঘিরে রয়েছে?

হঠাৎ জানালার পাখিটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে। তারপর পাখিটা বন্ধ হয়ে যেতেই উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা দিয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে গিয়ে পড়লো।

নৃপেনবাবুর সঙ্গে আপিসেই দেখা। নৃপেনবাবু চাপরাসী দিয়ে ডেকে পাঠালেন। দীপঙ্কর ঘরে যেতেই নৃপেনবাবু বললেন—কী হয়েছিল তোমাদের পাড়ায়? কাল রাত্তিরে? শুনলাম নাকি পুলিস-টুলিস এসেছিল সব?

নৃপেনবাবুর ঘরটা ভাল। ছোট পার্টিশন-ঘেরা ঘর। এক-মানুষ মাথা পর্যন্ত কাঠের পার্টিশন। পাশেই অনেকগুলো ট্রে। ফাইল ভর্তি ট্রেগুলো। বাতাসা আর মুড়ি খাচ্ছিলেন ঠোঙায় করে। সব শুনে বললেন—তাই বলো, তোমাদেরই বাড়িতে? তা সি-আই-ডিকে কখনও ঘর-ভাড়া দিতে আছে!

তারপর আর এক গাল মুড়ি মুখে পুরে বললেন—তা এখনও পুলিস আছে নাকি?

দীপঙ্কর বললে—আপিসে আসবার সময় পর্যন্ত তো দেখে এলাম আছে—

—খুব সাবধান, আজকাল স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে মোটে মেলামেশা নয়, বুঝলে, আমি তো স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে মিশিনে, আবার পুলিসের সঙ্গেও

মিশিনে, দুটোই সমান জিনিস—তা হ্যাঁ ভাল কথা—

বলে নৃপেনবাবু গলা নিচু করলেন—একটা কথা বলে দিই তোমাকে শোন—কাছে এস—

দীপঙ্কর আরো কাছে সরে এল। নৃপেনবাবু মুড়ি খাওয়া থামিয়ে বললেন—দেখ, তোমার মাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তোমার চাকরির জন্যে যে তেত্রিশটা টাকা খরচা করতে হয়েছে, সেটা যেন কাউকে না বলে তোমার মা, বুঝলে? তুমি না হয় বেটা ছেলে, সেয়ানা ছোকরা, তুমি বলবে না জানি—কিন্তু তোমার মা তো মেয়েমানুষ, হয়ত কথায় কথায়......

সমস্ত শরীরটা দীপঙ্করের যেন গরম হয়ে উঠলো। মনে হলো এখনি এক ঘুষি মেরে নৃপেনবাবুর দাঁত ক'টা একেবারে ভেঙে উপড়ে দেয়।

—মনে থাকবে তো? ভুলো না যেন বলতে!

হঠাৎ বাইরের দিকের সুইং-দরজাটা ফাঁক করে কে যেন মুণ্ডু বাড়ালে। নৃপেনবাবু চমকে উঠে বললেন—কী রে? কী এনেছিস?

মুণ্ডুটা বললে—চপ্—নেবেন নাকি?

—কিসের চপ্?

মুণ্ডুটা বললে—পাঁঠার চপ্—

—আর কী আছে?

—পাঁঠার চপ্, কাবুলি ঘুগনিদানা, পরোটা, আলুর দম আর হাঁসের ডিমের কালিয়া—

মুণ্ডুটা এতক্ষণে ভেতরে এল। আপিসেরই চাপরাসী। খাকি উর্দি পরা। মাইনে নেয় আপিস থেকে, কিন্তু আসলে এই টিফিনের ব্যবসা করে। দাম নগদ দিতে হয় না। মাইনের দিন মাসকাবারি শোধ করলেই হয়ে যায়। লোকটা ঘরে ঢুকে পোঁটলাটা মেঝের ওপর নামালো। ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। একটার ওপর আর একটা সাজানো। নৃপেনবাবু চেয়ারে বসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। কালো আবলুস কাঠের মত ডিমের ঝোল, তার নিচে আর একটা ডেকচিতে কাবুলি মটরের ঘুগনি, তার নিচে আলুর দম, তার নিচে পাঁঠার চপ্, তার নিচে থাক্ থাক্ পরোটা......

নৃপেনবাবু বললে—চপ্ গরম আছে? দেখি, হাতে-গরম?

বলে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চপগুলো ছুঁয়ে দেখলেন। দীপঙ্করের মনে হলো নৃপেনবাবুর জিভে জল আসছে এবার। আর চার দিন আছে রিটায়ার করতে এগারোটা ছেলে-মেয়ের বাপ। দীপঙ্করেরই কেমন লজ্জা করতে লাগলো।

নৃপেনবাবু বোধ হয় বুঝতে পারলেন। মুখ তুলে বললেন—তা হলে তুমি যাও ভাই, ওই ওই কথাই রইল, মাকে বলে দিও ঠিক—

তারপর যেন সাফাই গাইবার সুরে বললেন—এই তো শেষ, আর চার দিন,

তখন এ-সব তো আর কেউ খাওয়াবে না হে—

দীপঙ্কর সবটা না-শুনেই বাইরে চলে এল। দীপঙ্কর দেখলে তাদের জার্নাল সেকশনেও ঠিক তাই। সদর-গেটে গুর্খা দরোয়ান রয়েছে, তবু কোথা থেকে দলে দলে ফেরিওয়ালারা আসতে আরম্ভ করেছে। একজন ঝাঁকে করে কী সব নিয়ে ঢুকলো। চিৎকার করে হাঁকতে লাগলো—চাই রসগোল্লা, পান্তুয়া, সিঙাড়া, নিমকি—

নতুন মুখ দেখে লোকটা একেবারে দীপঙ্করের কাছে এসে হাঁকলে—গরম সিঙাড়া আছে, নেবেন নাকি বাবু?

তারপর বিরাট এক কেটলি নিয়ে ঢুকে পড়লো এক চা-ওয়ালা। গরম চা, গরম চা হাঁকতে লাগলো সারা আপিসময়। হঠাৎ জার্নাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে দীপঙ্করের যেন খেয়াল হলো। একবার চারদিকে চাইলে। কেউ নেই চেয়ারে। কে-জি-দাশবাবু একলা কাজ করছেন, আর বিড়ি খাচ্ছেন, আর সব চেয়ার ফাঁকা। কোথায় গেল সব? ছুটি নাকি? দীপঙ্করের কেমন অবাক লাগলো। তারপর আবার জার্নাল ঘাঁটতে শুরু করে দিলে। পাঁচটার মধ্যে এক বছরের জমানো জার্নাল শর্ট করতে হবে। খানিক পরে সবাই ফিরে এল আবার। গাঙ্গুলীবাবু বললেন—বড়বাবু, চা এসেছে গেলাসে দিন—

এক গ্লাস চা এনেছেন গাঙ্গুলীবাবু। তাই-ই চার ভাগ করা হলো। চার জনের গ্লাসে সমান মাপে ঢেলে দিলেন গাঙ্গুলীবাবু।

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—আপনার গেলাস?

দীপঙ্কর বললে—গেলাস তো নেই আমার—

—সে কি? এখনও গেলাস পান নি? যান, স্টোর থেকে গেলাস নিয়ে আসুন। বড়বাবুকে দিয়ে ইনডেন্ট্ স্লিপ করিয়ে নিয়ে যান, হাতে হাতে গেলাস নিয়ে আসুন—নইলে লোপাট হয়ে যাবে—

এ-সব সেই কোম্পানীর যুগের ইতিহাস। রেলওয়ের হোম বোর্ড থাকে বিলেতে। সেখানে ডিরেক্টরদের মীটিং বসে। এখানে রেলওয়ে বোর্ড আছে। নিয়ম করে রিপোর্ট যায় বোর্ডের আপিসে। রেলের লোকদের সুখ-সুবিধের জন্যে এক্ষুনে এত কোটি টাকা খরচ হলো হাল সনে। আসছে বাজেট-ইয়ারে আরো এত কোটি টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু আসলে রেলওয়েম্যানদের সুখ-সুবিধের কথাটা গৌণ। শুধু রেলওয়েম্যান কেন, ইণ্ডিয়ার একত্রিশ কোটি পাঁচ লক্ষ লোকের সুখ-সুবিধের কথাটাও গৌণ, আসল কথা হলো মুনাফা। পৃথিবীর বাজারে ইংলন্ডের পাউন্ডের তখন বড় খাতির। ফ্রান্সের কাছে খাতির, আমেরিকার কাছে খাতির, জার্মানীর কাছে খাতির, রাশিয়ার কাছেও তখন খাতির। তখন নর্থ আমেরিকা আর রাশিয়া হলো ইংরেজদের ক্ষেত, চিকাগোতে হলো খামার, ক্যানাডায় হলো অরণ্যসম্পদ, অস্ট্রেলিয়াতে মাংস, সাউথ আমেরিকায় ষাঁড়। পেরু থেকে রুপো আসে লন্ডনে, আর ক্যালিফোর্নিয়া আর

অস্ট্রেলিয়া থেকে সোনা আসে, চায়না থেকে আসে চা, মালয় জাভা থেকে আসে চিনি আর মশলা। ফ্রান্স হলো ইংলন্ডের আঙুরের ক্ষেত, মেডিটারেনিয়ন হলো ফলের বাগান, আর তুলো তো তখন সব জায়গাতেই জন্মায়। আর বাকি রইল ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া হলো কামধেনু। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যাণ্ডের দু'কোটি লোকের জন্যে কিছু খরচ করা ভাল—কারণ তারা সাদা চামড়া, স্বজাতি। কিন্তু একত্রিশ কোটি পাঁচ লক্ষ ইণ্ডিয়ানদের জন্যে কিছু করে লাভ নেই। তারা নেটিভ। নেটিভদের জন্যে একখানা করে জানালাহীন কোয়ার্টার করলেই চলবে। ট্রেনে নেটিভদের কামরায় পায়খানা না করলেও চলবে, আপিসের ক্লার্কদের জন্যে ভাঙা একটা টেবিল, আর ছারপোকাওয়ালা একটা চেয়ার হলেই যথেষ্ট। আর মাইনে? বৃটিশ অফিসার যাঁরা, অর্থাৎ ডাইরেক্ট আপয়েন্টমেন্ট, তাঁদের গ্রেড যদি হয় বারো শ'—তাহলে নেটিভ কেরানীদের মাইনে হওয়া উচিত তিরিশ, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে নব্বুই। যথেষ্ট, যথেষ্ট! সাফিসিয়েন্ট।

একদিন রবিনসন্ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চাপরাসী এসেই বললে—সেনবাবু, সা'ব বোলায়া—

কে-জি-দাশবাবু অস্ফুটেই শুনেছেন আগে থেকে। বললেন—যান, এখন সাহেবকে কী বোঝাবেন বোঝান গিয়ে—

দীপঙ্কর একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বললে—কেন, কী হয়েছে কে-জি-দাশবাবু?

—আপনি ড্রাফ্‌ট পাঠিয়েছেন সোজা সাহেবের কাছে? আমাকে একবার দেখিয়ে পাঠাতে পারলেন না? এখন ঠেলা বুঝুন—কী লিখেছেন সাপ ব্যাং কে জানে, লেখাপড়া-জানা লোক নিয়ে এই হয় মুশকিল—অসুবিধে, সাহেবের নিজের হাতের লেখা ড্রাফ্‌ট রয়েছে ফাইলের ভেতর, একবার চোখ তুলে দেখতেই আলসা?

দীপঙ্কর সোজা সাহেবের ঘরে গেল। সুইং-ডোর খুলে ঢুকতেই একটা কান-ঝোলা কুকুর জিভ্ বার করে বসে আছে। কামড়াবে নাকি? দীপঙ্কর একটু পেছিয়ে এল।

সাহেবের গলা শোনা গেল—কাম্ ইন্—ভেতরে চলে এসো—

দীপঙ্কর টিপি টিপি পায়ে ভেতরে গিয়ে বিরাট ঘরজোড়া টেবিল্‌টার সামনে ফাঁসির আসামীর মত দাঁড়াল। সাহেব চুরোট খাচ্ছিলেন। চুরোট মুখে দিয়ে বললেন—

কিন্তু কী বললেন তার এক বর্ণও বোঝা গেল না। বোবার মত দীপঙ্কর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। গা দিয়ে তখন দর দর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। হঠাৎ মনে হলো যেন পায়ের তলা থেকে তার মাটি সরে যাচ্ছে। এ কোন্ ইংরেজী! কলেজে তো ইংরিজী লেকচার বুঝতে পেরেছে, ইংরিজী বই পড়লে তো বুঝতে পারে, লিখতেও তো পারে। কলেজ ম্যাগাজিনে তো দীপঙ্কর

'এসে' লিখেছে। কিন্তু এ কী হলো! সাহেবের মোটা ঠোঁট, তার ওপর চুরোট ধরিয়েছে—একটা কথা বোঝা যাচ্ছে না। শুধু গোটাকতক হাউ হাউ শব্দ বেরোচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সাহেব আবার কথাটা বললে। আবার সেই হাউ হাউ শব্দ! সাহেব আবার বললে। আবার হাউ হাউ শব্দ।

শেষে হাত নেড়ে বললে—গো—যাও—

দীপঙ্কর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তার। সেক্শনে আসতেই সাহেবের ঘর থেকে চাপরাসী কে-জি-দাশবাবুকে ডেকে নিয়ে গেল। কে-জি-দাশবাবু খুলে রাখা কোটটা গায়ে দিয়েই দৌড়লেন। দীপঙ্কর নিজের চেয়ারে বসেই তখন ঘামছে। ছি, এত বড় লজ্জা, ইংরিজী ভাষাটা বুঝতেই পারলে না সে! লোকে কী ভাববে! ইংরিজী বুঝতে না-পারার লজ্জায় সেদিন দীপঙ্করের যেন মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল একেবারে।

মিনিট পনেরো পরে হাসতে হাসতে কে-জি-দাশবাবু ফিরে এলেন। আবার কোট খুলে রেখে দিলেন চেয়ারে।

—কী হলো, আপনি সাহেবের কথা বুঝতেই পারলেন না? সে কি মশাই?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—তা সেনবাবুকে ডেকেছিল কেন রবিন্সন্ সায়েব?

কে-জি-দাশবাবু বললেন—আপনাদের নিয়ে মশাই, আমার হয়েছে জ্বালা. কিছু পড়বেন না, শিখবেন না, সাহেবের ইংরিজী কথাও বুঝতে পারবেন না, তাহলে কাজ চলবে কী করে?

গাঙ্গুলীবাবু দীপঙ্করকে চুপি চুপি বললে—কী বললে আপনাকে সাহেব?

দীপঙ্কর বললে—সাহেবের কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না—

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—রবিনসন সাহেবের কথা একটু জড়ানো, একটু অভ্যেস হলেই বুঝতে পারবেন, প্রথম প্রথম আমারও অসুবিধে হতো—আসলে সাহেব লোক ভাল, ওই কুকুরটা দেখলেন, ওই কুকুরই হলো সাহেবের ছেলে-মেয়ে যা-বলুন সব—

দীপঙ্কর বললে—সাহেব বোধ হয় আমার ওপর খুব চটে গেছে—

—তা চটলে আপনি আর কী করবেন?

দীপঙ্কর বললে—এখানেই তো সারাজীবন কাটাতে হবে, এই রকম চটে থাকলে চাকরি করবো কী করে? কেউ আমার ওপর মুখ ভার করে থাকলে আমার যে মোটে ভাল লাগে না—

এতদিন পরে প্রথম দিনের ঘটনাটা যেন আজো স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন দীপঙ্করের মনে হয়েছিল তার মাথার ওপর কে যেন সংসারের সমস্ত অগৌরবের বোঝা, সমস্ত লজ্জা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। সামান্য ইংরিজী না-বোঝার কলঙ্ক যেন তাকে একেবারে ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। যেন মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত কে তার হরণ করে নিয়েছে। আবার মনে হয়েছিল কেন সে

এল এখানে? এখানে না এলে সে তো তার লজ্জা-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলতে পারত। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সরু গলিটার গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্মীদি সতী বিন্তীদি আর অঘোরদাদুর আওতার ভেতরে সে তার দারিদ্র্য ঢেকে রাখতে পারত! কেন ধরা পড়তে গেল এমন করে? কেন তাকে রবিন্সন্ সাহেব ডেকে পাঠালো?

পরের দিনই কিন্তু বোঝা গেল সব। কে-জি-দাশবাবু সাহেবের ঘর থেকে এসেই কোট খুলতে খুলতে বললেন—যান মশাই, এ-সেকশনে আপনাকে আর রাখবে না—

—কেন?

সেকশন সুদ্ধ লোক অবাক হয়ে চাইলে কে-জি-দাশবাবুর দিকে। কে-জি-দাশবাবুর হাতে একটা স্লিপ। স্লিপটার দিকে চেয়ে একমনে যেন কী পড়তে লাগলেন তিনি। বুকটা ভয়ে দুর দুর করতে লাগলো। আবার এ কোন্ বিপত্তি। আসতে-না-আসতেই এ-সব কী ঝঞ্ঝাট! এ-সেকশনের সবাই এই সেকশনেই ঢুকেছে, এই সেকশনেই রয়েছে।

কে-জি-দাশবাবু বললেন—যান, দোতলায় ট্রানজিট্ সেকশনে আপনাকে ট্রানস্ফার করে দিয়েছে সাহেব—

গাঙ্গুলীবাবুই জিজ্ঞেস করলেন—কেন? হঠাৎ এমন অর্ডার দিলে যে সাহেব?

—আর কেন, সেই কালকের ব্যাপার। কথা না-বুঝতে পারলে সাহেব ক্ষেপে যাবে না?

কোথায় ট্রানজিট্ সেকশন, কেমন মানুষ সেখানকার বড়বাবু, কিছুই জানা নেই। এখানে এক দিনের মধ্যেই বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল সকলের সঙ্গে। এক দিনের মধ্যেই যেন বহু দিনের চেনা-শোনার মত হয়ে গিয়েছিল। একদিন রেলের প্রত্যেকটি নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, এ তারই সূত্রপাত তখন। একটি সেকশন থেকে আর একটি সেকশন। যে-বাড়িটায় একদিন ঢোকবার প্রথম দিনে বিতৃষ্ণা হয়েছিল, তার সঙ্গেই যে আবার একদিন এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে, তাই-ই কি সে তখন ভাবতে পেরেছিল! তখন জাপানের সঙ্গে ভারি ভাব ইংরেজদের। জাপান তখন আয়রন-ওর কিনছে ইণ্ডিয়া থেকে। জাপান ভাল খদ্দের, নগদ টাকা দেয়। হাজার-হাজার ওয়াগন ভর্তি আয়রন-ওর চালান যায় জাপানে। লোহার গুঁড়ো। ইণ্ডিয়ার খনি থেকে লোহার গুঁড়ো ওয়াগনে ঢেলে, সেই ওয়াগন চালান দিতে হবে কলকাতা আর ভাইজাগাপটম্-এর পোর্টে। যেখানে যত ওয়াগন আছে সব জড়ো করেছে রেল-কোম্পানী! কাজের আর কামাই নেই রেল-আপিসে। দিন রাত জেগে কন্ট্রোলাররা ওয়াগন ডেলিভারি দিচ্ছে। আর হেড-আপিসে তার হিসেব রাখতে হয়। ট্রানজিট্ সেকশনে স্টেটমেন্ট্ তৈরি হয় কত ওয়াগন লোহা রোজ জেটিঘাটে ডেলিভারি দেওয়া হলো। আসলে জাপান তখন সভ্য হয়েছে। জাতে উঠেছে। রাশিয়াকে যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছে। কোরিয়া দখল করে নিয়েছে, মাঞ্চুরিয়াও নিয়েছে।

ইংরেজরা কিছু বলছে না। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই তখন। চীনের লীগ অব্ নেশানস্-এর কাছে দরখাস্ত করেও কিছু লাভ হয়নি। তুমি যত ইচ্ছে চীনেদের মারো, বোমা ফেলে মেরে ফেল সবাইকে, কিছু বলবো না। আমার সাংহাইতে হাত না-পড়লেই হলো। তা ছাড়া জাপানকে লোহা বেচে অনেক মুনাফা। চারদিকে যখন ডিপ্রেশন তখন কাঁচা টাকা কে দেয়? এ সুযোগ ছাড়া চলবে না। রেল আপিসগুলো রাত নেই দিন নেই, লোহাই পাঠাচ্ছে কেবল। জাপান-ট্র্যাফিক নিয়ে তখন রেল-কোম্পানীর মস্ত মাথা-ব্যথা। সকাল বেলাই ঘুম থেকে উঠে রবিন্‌সন্ সাহেব কোয়ার্টার থেকে টেলিফোন করে আপিসে—জাপান-ট্র্যাফিকের ফিগার আজ কত?

তখন ভোর বেলা আপিসে যেতে হয় দীপঙ্করকে। ঘুম থেকে উঠেই আপিস। বেলা করে বাড়ি ফেরা। ট্র্যানজিট সেকশনের কেরানী আর তখন নয় দীপঙ্কর। সোজা একেবারে রবিন্‌সন্ সাহেবের খাস কর্মচারী। সারাদিন সেকশনে সেকশনে ঘুরে ফিগার আদায় করতে হয়। সেই ফিগার আবার টোটাল করতে হয়। ডিস্ট্রিক্ট্ থেকে টেলিফোনে ফিগার নিয়ে পোস্ট করতে হয়। তারপরে সেই ফিগার জড়ো করে স্টেটমেণ্ট তৈরি হবে। স্টেটমেণ্টের এক কপি যাবে রেলওয়ে বোর্ডে, আর এক কপি যাবে বিলেতের হোম বোর্ডে। আসল মালিকের কাছে। যারা দেশকে বোঝে না, যারা বোঝে শুধু পাউণ্ড-শিলিঙ-পেনস্। কাজ করতে করতে দীপঙ্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তো। স্টেট্‌মেণ্ট্ দিতে একটু দেরি হলেই ওদিক থেকে ঘোষাল সাহেব হুমকি দিতো। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন রবিন্‌সন্ সাহেব তো জানতো না যে, সেই লোহার গুঁড়োই আবার বোমা হয়ে একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাথার ওপরেই এসে পড়বে। সিঙ্গাপুর, মালয়, বার্মা থেকে শুরু করে একেবারে কলকাতার হাতীবাগানেই নয়, খাস লণ্ডনের ওপরেই পড়ে ফেটে চৌচির হবে! আর শুধু রবিন্‌সন্ সাহেবও নয়, ঘোষাল সাহেবও নয়, রেল কোম্পানীও নয়, দিল্লির রেলওয়ে বোর্ডও নয়, এমন কি, বিলেতের হোম-বোর্ডও নয়; ইণ্ডিয়ার ভাইসরয় ব্যারন আরাউইন সাহেবও জানতো না, ইংল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেবও জানতো না।

অথচ সেদিন সেই লোহার ওয়াগন পাঠাতে দীপঙ্করকে কত খাটুনি খাটতে হয়েছে। সারা আপিসে বহু লোক হিমশিম খেয়ে গেছে একেবারে। ট্র্যানজিট্ সেকশনের ভেতরে ঢোকবার মুখে এক-একদিন দেখা হয়ে যেত গাঙ্গুলীবাবুর সঙ্গে। বলতেন—কেমন আছেন সেনবাবু?

দীপঙ্কর বলতো—আর মাথা তোলবার সময় নেই গাঙ্গুলীবাবু—

গাঙ্গুলীবাবু বলতেন—তা না-ই বা পেলেন, এত তাড়াতাড়ি গ্রেড তো পেয়ে গেলেন—

দীপঙ্কর বললে—সে তো জাপান-ট্র্যাফিকের জন্যে, নইলে স্পেশ্যাল পোস্ট

তৈরি হতো কী আর—?

—আসলে তা নয় মশাই, আপনার ড্র্যাফট্ রবিন্‌সন্ সাহেবের ভালো লেগেছিল, তাই এত লোক থাকতে আপনাকে নিয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—তাই নাকি?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—হ্যাঁ, কে-জি-দাশবাবু যে বললে। বললে—ছোকরা সাহেবের ইংরিজী বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু ছোকরার ইংরিজী ড্র্যাফট্ দেখে রবিন্‌সন্ সাহেব তারিফ করেছে হে—ছোকরা একদিনেই সাহেবের নেক-নজরে পড়ে গেছে—

যাবার সময় গাঙ্গুলীবাবু বলে গেলেন—সবই ভাগ সেনবাবু, সবই ভাগ্য, নইলে দেখুন না বারো বছর চাকরি করার পর পঁচাত্তর টাকা হাতে পাই, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের লোন নিয়েছিলাম বউ-এর অসুখের সময়, তাই আজ চার বছর ধরে কাটছে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি একদিন বলেছিলেন আপনার সব হিস্ট্রি বলবেন—

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—আজ নয়, আর একদিন বলবো, তবে বড় হয়ে গেলে আমাদের মনে রাখবেন ভাই, এই বলে রাখছি, তখন যেন আবার ঘোষাল সাহেবের মত হয়ে যাবেন না—

কথাটা শুনে দীপঙ্করের হাসি পেয়েছিল সেদিন। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের পরের গলগ্রহ, নগদ তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি হওয়া জীবন, সে হবে বড়, সে ভুলে যাবে! যেন দীপঙ্কর গরীব হওয়ার দুঃখ বোঝে না, যেন দীপঙ্কর অর্থাভাব কাকে বলে জানে না! যেন তার মা পরের বাড়ির রান্না করে, মুড়ি ভেজে কাঁথা সেলাই করে তাকে মানুষ করেনি। তার চাকরি হওয়া যে কী জিনিস তা গাঙ্গুলীবাবু কে-জি-দাশবাবু কেমন করে বুঝবে!

সন্ধ্যার অনেক পরে ড্রয়ারের ভেতর কলম পেন্সিল অ্যালুমিনিয়মের গেলাস সব কিছু পুরো চাবি দিয়ে তখন বেরিয়ে আসতে হয় ফাঁকা আকাশের তলায়। এতক্ষণ যেন পৃথিবী ভুলে গিয়েছিল দীপঙ্কর। রেলের আপিসের মধ্যে এতক্ষণ যেন তার নিজের সত্তা বলতে কিছু ছিল না। পৃথিবীটা যে এত বড়, পৃথিবীতে যে এত গোলমাল তা-ও যেন ভুলে গিয়েছিল। শুধু মনে ছিল হোম বোর্ড, শুধু মনে ছিল রেলওয়ে বোর্ড, শুধু মনে ছিল রবিন্‌সন্ সাহেব আর ঘোষাল সাহেব। আর তার চেয়েও বেশি করে মনে ছিল জাপান-ট্র্যাফিক। খবরের কাগজে সকাল বেলা দেখা যায় বড় বড় হরফে লেখা আছে—জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ। সাংহাইতে আর চাপেইতে অমানুষিক বোমাবর্ষণ। হাজার হাজার নিরীহ অধিবাসীর ওপর জাপানের নৃশংস অত্যাচার। আর আপিসে এসেই রবিন্‌সন্ সাহেবের প্রথম প্রশ্ন—হাউ ইজ্ দি জাপান-ট্র্যাফিক টো-ডে?

রাস্তায় বেরিয়ে সেই সন্ধ্যেবেলায় কিন্তু সে-খবর কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে

যায় দীপঙ্কর। তখন মনে পড়ে লক্ষ্মীদির কথা। তখন মনে পড়ে সতীর কথা। লক্ষ্মীদির কী করে চলবে? দাতারবাবুর যদি সত্যিই জেল হয়ে যায়? আর সতী? সমস্ত কালিঘাটসুদ্ধ লোক যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল তখন সত্যিই যদি সতীর গায়ে হাত তুলতো তারা? দীপঙ্কর নিজের সমস্ত শরীরটা নিজের হাত দিয়ে অনুভব করলে। তার এই শরীরের সঙ্গে সতীর শরীরটাও একাকার হয়ে গিয়েছিল তখন। সতী তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভর করেছিল। বাইরের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে যেন একমাত্র দীপঙ্করই তাকে বাঁচাতে পারে। দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল যেন আরো অত্যাচার হোক, আরো লুটপাট হোক, তবু সতীকে সে তো বুকের মধ্যে পেয়েছে। তারপর কখন পুলিস এল, কখন সবাই পালিয়ে গেল, সব যেন স্বপ্নের মত ঘটে গেছে।

দীপঙ্কর রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। কোন্ দিকে যাবে? লক্ষ্মীদির বাড়ির দিকে, না ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে। কালকের ঘটনার পর সতী যদি বর্মায় চলে যায়। তা ছাড়া লক্ষ্মীদির তো অনেক লোক আছে। তারা এসে লক্ষ্মীদির সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। সে ভাষাও বোঝে না দীপঙ্কর। ওখানে এখন না-গেলেও ক্ষতি নেই। সতীর সঙ্গেই আগে দেখা করা দরকার। সতীদের বাড়ির জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে—কাকাবাবু থাকলে কী এসব হতে পারতো!

সকালে আপিসে আসবার সময়ই কয়েকজন তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে।

আশ্চর্য, যেন সেই-ই অপরাধী! যেন সি-আই-ডি'কে বাড়ি ভাড়া দেওয়া তারই অপরাধ। অথচ তখন সবাই চাঁদা নিয়েছে মোটা-মোটা টাকার কাকাবাবুর কাছ থেকে। শ্মশান-কালী পুজো, সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, কালিঘাট বাজারের রক্ষে-কালী পুজো—কোন্ জায়গায় চাঁদা দেননি কাকাবাবু! হালদার পাড়া লেন থেকে ফুটবল ক্লাবের চাঁদা চাইতে এসেছে কাকাবাবুর কাছে। অথচ এক মুহূর্তে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই কিরণ, কিরণই আজ কাকাবাবুর সম্পর্কে বলে—ভাল লোক নয়। সমস্ত কালিঘাটের লোকের কাছেই এখন কাকাবাবুরা রাতারাতি খারাপ লোক হয়ে গেল। আশ্চর্য!

সংসারে এমনিই হয় বোধহয়। এইটেই বোধহয় নিয়ম!

দলে দলে লোক চলেছে ফুটপাথ দিয়ে। এই সেদিন কিড্ স্ট্রীটের ধার দিয়ে চলতে চলতে বোমা ফাটিয়েছিল কিরণদের দল। তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে এল দীপঙ্কর। আজকাল কাউকেই বিশ্বাস নেই, সমস্ত কলকাতা শহরটা সি-আই-ডি'তে ভরে গেছে। বাড়ির গয়লা, ধোপা—তারাও ইন্‌ফরমার হয়েছে। দুধ দেবার নাম করে বাড়িতে বাড়িতে খবর নিয়ে বেড়ায়। ট্রামের ভেতরেও মন-খুলে কথা বলা বিপদ। আশে-পাশের সমস্ত লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে

দীপঙ্কর। এদের মধ্যেই হয়ত কত লোক সি-আই-ডি। কত লোক ইন্‌ফরমার। সত্যিই ইংরেজ-রাজত্ব না-গেলে আর উপায় নেই। গান্ধী যখন ভাইসরয় হয়ে বসবে, অন্তত একটা সুবিধে হবে, মন খুলে কথা বলা যাবে। এমন ঘরে ঘরে সি-আই-ডি আর থাকবে না তখন। এত যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এর কারণ কী? কালিঘাট বাজার থেকে এই সেদিনও চাল কিনে এনেছে। ভাল বাঁকতুলসী চাল ছ' টাকা মন! আর এমনি সাধারণ চাল চার-পাঁচ টাকা! তা চালের দামও কমবে বৈ কি! তখন তো আর সব টাকা বিলেতে চলে যাবে না। দেশের টাকা দেশেই থাকবে। দুনিকাকারা বলে—কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট হলে নাকি তিন টাকা মন চাল হয়ে যাবে। তখন প্রাইম মিনিস্টরের মাইনে হবে পাঁচশো টাকা। পাঁচশোর বেশি কারো মাইনে হবে না! কিন্তু ইংরেজরা কি অত সহজে যাবে! চিয়াং-কাইশেক যেমন চায়নাকে স্বাধীন করে দিয়েছে, এই রকম একটা লোক ইণ্ডিয়ায় থাকলে কবে স্বরাজ এসে যেত দেশে। চীনেম্যানরা সত্যিই ভাগ্যবান!

কালিঘাট ট্রাম ডিপোয় নেমে অলি-গলি দিয়ে রাস্তা।

—শুনুন, ও দীপঙ্করবাবু, শুনুন—

দীপঙ্কর সামনে এগিয়ে গেল। লোকটা বললে—কালকে কী হয়েছিল মশাই? আপনাদের বাড়িতে?

সেই একই প্রশ্ন, সেই একই উত্তর। সকাল থেকে একই উত্তর দিতে হয়েছে সকলকে। দীপঙ্কর বললে—আমরা তো জানতাম না, জানলে কি আর কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় সি-আই-ডি'কে?

রাস্তায় আসতে আসতে ঘটনাটা আবার মনে পড়লো। সতী কী তেল মাখে মাথার চুলে? দীপঙ্করের বুকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল মাথাটা। অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল চুল থেকে। গন্ধটা ভারি মিষ্টি। গন্ধটা যেন মন জুড়িয়ে দেয়। সেদিনকার পাউডারের গন্ধটার চেয়েও মিষ্টি গন্ধ! সতীর কাছে তেলটার নাম জেনে নিতে হবে। খানিকটা হাতেও লেগেছিল। মাথাটা এই হাত দিয়েই দীপঙ্কর চেপে ধরেছিল। দীপঙ্কর হাতের আঙুলটা নাকের কাছে এনে ধরলে। যেন কালকের গন্ধটা এখনও একটু একটু আঙুলে লেগে আছে। কী চমৎকার গন্ধ।

বাড়ির কাছে আসতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল!

বাড়ির সামনে যেন এইমাত্র একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। ঠিক উনিশের একের বি'র সামনে। অনেক দূর থেকে বোঝা গেল ঠিক তাদেরই বাড়ির সামনে। তখনও পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। একজন সার্জেণ্ট টুলের ওপর বসে আছে—আর কয়েকজন লালপাগড়ী পরা পুলিস। কালকে ঘটনা ঘটে গেছে, আর এখন পর্যন্ত পুলিস। দীপঙ্কর দেখলে—ট্যাক্সিটা আসতেই ভেতর থেকে রঘু দৌড়ে এসেছে। ট্যাক্সি থেকে নামলো একজন ভদ্রলোক। চমৎকার চেহারা ভদ্রলোকের। সামান্য একটু ছুঁচলো দাড়ি, কোঁকড়ানো মাথার চুল। ট্যাক্সি থেকে বিছানা-বাক্স

মাল-পত্র নামলো। কাকীমা বাইরে এসেছে। সতীও এসেছে। কাকাবাবুও হেসে হেসে কথা বলতে বলতে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। ট্যাক্সিতে আরো দু'জন লোক ছিল। তারাই জিনিসপত্র নামাতে লাগলো। মাল অনেক, নামাতেও সময় লাগবার কথা। কে এল? বর্মা থেকে যদি হয় তো সতীর বাবা নাকি! অনেকটা তো সতীর মতনই চেহারা, বেশ লম্বা ফর্সা কোঁকড়ানো চুল!

দীপঙ্কর বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল। কিন্তু একটু সঙ্কোচ হলো। সমস্ত বাড়িটা পুলিসে পাহারা দিচ্ছে। কাল রাত থেকেই বসে আছে সবাই। সার্জেন্টের কোমরে পিস্তল ঝুলছে। পুলিসের হাতেও লম্বা লম্বা লাঠি। একটু সরে এসে দাঁড়াল। দূর থেকেই দেখতে লাগলো। হোল্ড্-অল নামলো, ট্রাঙ্ক, সুটকেস নামলো। হ্যাট্, ছাতা, ছড়ি, অ্যাটাচি কেস্, ব্যাগ—নানা রকম জিনিস বোঝাই হয়ে গেল।

—রঘু!

রঘু পেছন ফিরে চাইল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে এল তোমাদের বাড়িতে রঘু?

রঘু বললে—বড়বাবু, বর্মা মুলুক থেকে এসেছে—

লক্ষ্মীদির বাবা! সতীর বাবা! ভুবনেশ্বর মিত্র।

কথাটা বলেই রঘু জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে চলে গেল। দুজনে, যারা এসেছিল ভুবনেশ্বরবাবুর সঙ্গে, তারাও ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে একটা বেঞ্চিতে পুলিসরা লাঠি নিয়ে বসে আছে। সার্জেন্টটা বসে আছে পিস্তল নিয়ে। এ-রাস্তা দিয়ে আজ লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও ওদিকের নতুন সদানন্দ রোড দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে সবাই।

বাড়িতে ঢোকবার মুখেও ভাল করে দেখে নিলে দীপঙ্কর। সারা রাতই আজ ওরা পাহারা দেবে হয়ত। ভাড়াটেদের বাড়িটার জানলার কাঁচগুলো ভেঙে গেছে। একদিনেই যেন হতশ্রী হয়ে গেছে বাড়িটার চেহারা। এই বাড়িতেই ছোটবেলা থেকে তার অধিকার ছিল অবারিত। এই বাড়ির সঙ্গেই তার ছোট-বেলার জীবনটা জড়িয়ে গিয়েছিল। সেই কবে একদিন লক্ষ্মীদি এসেছিল। অঘোরদাদু তখন শক্ত-সমর্থ মানুষ। তখন চিৎকার করে করে গালাগালি দিত। তখন থেকে সুখে-দুঃখে ছোট থেকে বড় হওয়ার বিবর্তনে দীপঙ্করের জীবনে এ-বাড়িটাও যেন নির্দিষ্ট একটা স্থান দখল করে নিয়েছিল। আরও নানান রকম সংস্পর্শের সঙ্গে এরও একটা নিজস্ব দান ছিল যেন। সেই ফটিক, সেই রাখাল, সেই কিরণ, সেই নির্মল পালিত, সেই লক্ষ্মণ সরকারদের সঙ্গে এই বাড়িও ছোটবেলা থেকে তাকে এই বর্তমান অবস্থায় এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ-বাড়িটা যেন তার অস্তিত্ব থেকে পৃথক নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। এ-বাড়িটাও যেন তারই একটা নিজস্ব সৃষ্টি। ইচ্ছে দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ দিয়ে যেন একে একদিন তিলে তিলে সৃষ্টি করেছিল দীপঙ্কর। ওই লক্ষ্মীদি যেন শুধু ভুবনেশ্বরবাবুর মেয়েই নয়, দীপঙ্করেরও একটা অপরিপূর্ণ বাসনা যেন। সতী লক্ষ্মীদির বোনই শুধু নয়, সতী যেন দীপঙ্করেরও অপরিহার্য একটা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আর শুধু কি লক্ষ্মীদি? শুধু কি সতী? এই কালিঘাট, কালিঘাটের মন্দির, ওই সোনার কার্তিকের ঘাট ওই হাজি কাশিমের বাগান, বাজার, টিপু সুলতানের বাড়ি, এই নতুন রাসবিহারী এভিনিউ—এই হরিশ মুখার্জি রোড, শেতলাতলা, কাকাবাবু, কাকীমা, ওই আমড়া গাছের নিঃসঙ্গ কাকটা পর্যন্ত যেন এর ব্যতিক্রম নয়। দীপঙ্করের অদম্য ইচ্ছেই যেন তার চারিদিকে এতভাবে এতরূপে প্রকাশ হয়েছে। সবই যেন দীপঙ্করের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, সবাই যেন দীপঙ্করের অস্তিত্বের পক্ষে অনিবার্য। এখানকার সবটাই যেন তার ইচ্ছের, তার প্রয়োজনের তালুক। নিজের সৃষ্টি করা সেই তালুকদারির যেন দীপঙ্করই একমাত্র মালিক। এ-তালুক-দারিতে যেন আর কারো হস্তক্ষেপ সে সহ্য করবে না! তাই বোধহয় সবাই যখন সতীদের বাড়িতে কাল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল, তখন সতীকে সে অমন করে জড়িয়ে ধরেছিল। অমন করে সতীকে রক্ষা করেছিল সকলের অশুচি ছোঁয়াচ থেকে।

—হ্যাঁরে আপিসে কিছু খেয়েছিলি তো?

দীপঙ্কর আবার বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে। সারা বাড়ির সবগুলো জানলা-দরজা বন্ধ। কালকের ঘটনার পর থেকেই বন্ধ। যেন কালিঘাটের সমস্ত অপবিত্রতাকে দূরে রাখবার চেষ্টাতেই কাকাবাবুরা বাড়ির সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

দীপঙ্কর মুখ তুললে। বললে—মা, দেখলাম লক্ষ্মীদির বাবা এল হঠাৎ—সেই বর্মা থেকে এল—হঠাৎ কেন এল বলো তো? তোমার কী মনে হয়?

মা বললে—তা মেয়েদের জন্যে ভাবনা হবে না বাপের?

—কিন্তু এতদিন তো শরীর খারাপ ছিল শুনেছি, সতীরই তো যাবার কথা ছিল, হঠাৎ সব উল্টে গেল কেন?

মা বললে—ওঁদের আর আসতে কী? ওঁদের তো আর পয়সার অভাব নেই, এলেই হলো—তা আমি যা বলছি, সে-কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন? কী খেয়েছিলি আপিসে শুনি?

হঠাৎ রঘু এসে হাজির বাড়ির ভেতরে।

মা বললে—কী রঘু, তোমার বাবু এল বুঝি বর্মা থেকে?

—হ্যাঁ মাসীমা, বাড়ির সব জিনিসপত্র তো ভেঙে-চুরে গেছে, তেল-নুন, মশলা-চাল-ডাল, সব কিনে আনতে হলো আবার—

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে-বেরোতে দিচ্ছে?

রঘু বললে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। সকাল বেলা থেকেই গয়লা ভেতরে আসতে পারেনি। কাকাবাবু কাউকে ঢুকতে দিতে বারণ করে দিয়েছে পুলিসকে। এখন ক'দিন ধরেই পুলিস পাহারা থাকবে। কালকে শেষ রাত্রেও-নাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর আবার ইঁট পড়েছিল উঠোনে।

মা বললে—হ্যাঁ আমি শুনেছি—খুব দুম্‌দাম্‌ করে শব্দ হলো দুবার—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা পুলিসরা ছিল, কিছু করলে না?

রঘু বললে—বাবু ছাদের ওপর থেকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তেই আবার সব চুপ হয়ে গেল—

সত্যিই দীপঙ্কর তো কিছুই টের পায়নি। কখন ইঁট পড়লো, কখন পিস্তলের শব্দ হলো, কিছুই জানতে পারেনি। তখন বোধহয় অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। সারাদিন আপিসের পরিশ্রম, তারপর বৌবাজারে লক্ষ্মীদির কাছে যাওয়া, তারপর কিরণের সঙ্গে স্যাডক্স স্কোয়ারে হেঁটে-হেঁটে যাওয়া—তারপর রাত্রিবেলা ওই কাণ্ড। অন্তত পাঁচশো লোকের ভিড়। যে যা কিছু পেরেছে ভেঙে ফেলেছে। একটা বাসনও আস্ত নেই। সব থান ইঁট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আয়নাগুলোকে পর্যন্ত লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে। সতীর গয়না ছিল আলমারির মধ্যে—সে-সব একটাও নেই। শাড়ি সেমিজ ব্লাউজ—সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফর্দাফাই করেছে। শেষকালে আর কিছু না পেয়ে ভাত ডাল তরকারি, রান্নাঘরে যা কিছু রান্না তৈরি ছিল, সব উল্টে ফেলেছে। রান্নাঘরে সব থই থই করছে। একবার গেলে দেখতে পেতেন আপনারা।

রঘু বললে—কাকীমা তো ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন, তাই বেঁচে গেছেন—আর ছোটদিদিমণিকে তো মেরে ফেলতো—নেহাত—

দীপঙ্করের মনে আছে সে-সব।

হুড়মুড় করে যখন সব ঢুকে পড়েছিল, তখন সতী একটু গরম্ গরম কথা বলেছিল।

সতী বলেছিল—কে আপনারা? বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—ভদ্রলোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন যে না বলে কয়ে? কে আপনারা? কোথা থেকে আসছেন?

সতীর সে-চেহারা দেখে ভয় পাবার লোক নয় তারা। সতী বর্মার মানুষ। বর্মীদের মত নিরীহ মানুষ নয় কালিঘাটের লোকরা। সবই কালিঘাটের লোক। দীপঙ্করের একটু-একটু মুখচেনা। কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যে সকলকে তো দেখা যায়নি ভালো করে। 'কালিঘাট ব্যায়াম সমিতি'র লোকও থাকতে পারে। পুলিস তাদেরও কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করেছে। কালিঘাটময় যেন অ্যারেস্ট করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

হয়ত সতীর কথায় তারা একটু চটে গিয়েছিল। কে একজন লাঠিও উঁচিয়েছিল সতীর দিকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার বড়বাবু সব শুনে কী বললেন রঘু?

রঘু বললে—দোতলায় সবাই মিলে কথা হচ্ছে এখন, বড়বাবুর জাহাজ এসে পৌঁছেছে বিকেল বেলা—

—তা আগে থেকে খবর ছিল নাকি যে বড়বাবু আসছেন?

—কী জানি বাবু, আমি তো কিছু জানতাম না।

মা জিজ্ঞেস করলে—তা তোমার বড়বাবু ক'দিন থাকবেন কলকাতায়?

রঘু বললে—তা-ও জানিনা, মাসীমা, বড়বাবু তো চিল্লাচ্ছেন খুব ওপরে, আমি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেলাম—

হঠাৎ যেন কী মনে পড়লো রঘুর। বললে—আমাকে দুটো থালা দিতে পারেন মাসীমা, থালা কম পড়েছে বাড়িতে—

থালা! মা বললে—থালা, তা তোমাকে দিচ্ছি, তা তুমি তো জানো, আমি এ-বাড়ির কেউ-ই নই; অঘোরদাদুই এ-বাড়ির মালিক, কাজ হয়ে গেলেই আবার থালা দুটো দিয়ে যেও বাবা—

রঘু বললে—কালই নতুন থালা-বাসন কিনে আনবে বাবু, আজকে কী দিয়ে খেতে দিই, তাই চাইতে এলাম আপনার কাছে—

মা দুখানা থালা দিলে বার করে। দীপঙ্কর বললে—রঘু, তোমাদের বাড়ি আমাকে যেতে দেবে না পুলিস?

রঘু বললে—পুলিস তো হুকুম দিয়ে দিয়েছে, কাউকে ঢুকতে দেবে না—সকাল বেলা গয়লাকে পর্যন্ত ঢুকতে দেয়নি—

মা বললে—দরকার কী তোর এখন ওদের বাড়ি যাবার? এই সব হাঙ্গামার মধ্যে না-ই গেলি—

রঘু নিজের বাড়ির দিকে গেল। বললে—সদর দরজাটা বন্ধ করে দিন মাসীমা—

দীপঙ্কর উঠে বন্ধ করে দিয়ে এল। সমস্ত উঠোনটা যেন থম্‌থম্‌ করছে। আগে দোতলায় জানলা থেকে আলো এসে পড়তো উঠোনের ওপর। পেছনের আমড়া গাছের দিকে খিড়কির দরজাটাও আজ বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। কাল পুলিস আসবার পর ওই দরজাটা দিয়েও অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল। অঘোর-দাদু সেই শব্দ পেয়েই চিৎকার করে উঠেছিল। তার মনে হয়েছিল যেন ডাকাতি করতে এসেছে কারা। বলছিল—মুখপোড়ারা বাড়ি ভেঙে ফেললে আমার, মুখপোড়ারা আমার সর্বনাশ করলে—ও মেয়ে, কোথায় গেলি মেয়ে তুই, মুখপোড়া শোনেও না—

তখন সেই হট্টগোল। হট্টগোলের মধ্যেও কিন্তু মা সম্বিৎ হারায় নি। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেছে অঘোরদাদুর ঘরে। যাকে দেখেই অঘোরদাদু চিৎকার করে উঠেছে—মুখপোড়া ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, শুনতে পাসনি—

—ডাকাত না বাবা ওরা স্বদেশী—

—হারামজাদা স্বদেশী, তা আমার বাড়িতে ক্যান রে? আমি কী করেছি মুখপোড়াদের? আমি কি মুখপোড়াদের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি?

মা বললে—না বাবা, আমাদের বাড়ি নয়, ওই ভাড়াটেদের বাড়ি—

অঘোরদাদু বললে—মুখপোড়া, ভাড়াটেদের বাড়ি হলেই-বা, বাড়িটা তো আমার রে? বলি, বাড়িটাও কি মুখপোড়া ভাড়াটেদের—

মা বললে—আপনি চুপ করুন বাবা, আমি দেখে আসছি কী হয়েছে—

অঘোরদাদু বললে—মুখপোড়া মেয়ের বুদ্ধি দেখ, বলি, তুই যাবি কেন শুনি? ভাড়াটেরা মরবে তাতে তোর কীরে মুখপোড়া? সে মুখপোড়াটা কোথায় গেল? সেই মুখপোড়াটা?

—তার জন্যে আপনি ভাববেন না বাবা—

অঘোরদাদু যেন ক্ষেপে উঠলো। বললে—সে ভাববো কেন? তুই ভাববি কেবল, না? মুখপোড়াটা আপিসে গেল, এখনও এল না, তা আমি ভাববো না তো কে ভাববে রে মুখপোড়া? কে ভাববে?

মা সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আপনি বুড়ো মানুষ, চোখে দেখতে পান না, আপনি বরং ঘুমোতে চেষ্টা করুন—

অঘোরদাদু যেন অন্ধকারের মধ্যেই খিঁচিয়ে এল। বললে—আমি ঘুমোব? মুখপোড়া আমাকে ঘুমোতে বলছিস? এবার তো ঘুমিয়েই পড়বো মুখপোড়া, এবার একেবারে ক্যাওড়াতলায় গিয়ে ঘুমোব—

অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। চারদিকে তুমুল হট্টগোল। তখন 'বন্দে মাতরম্' শব্দে কান পাতা দায়। সমস্ত কালিঘাটটাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই শব্দে। সেই শব্দের তরঙ্গ ভাসতে ভাসতে অনেক-দূরে চলে গেল। কয়েকজন লাঠি দিয়ে কী সব ভাঙছে। সত্যিই, দীপঙ্কর এখনও এল না আপিস থেকে। মা বড় অস্থির হয়ে পড়েছিল তখন। কিন্তু এর চেয়েও ভীষণ অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছে মা'কে। এর চেয়েও ভীষণ ষড়যন্ত্রের জালে আটকে পড়তে হয়েছে মা'কে। সেদিন দেড় মাসের দীপুকে নিয়ে একলা নিঃসম্বল অবস্থায় সেই গ্রামের মধ্যে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ সহায় ছিল না মা'র। সেদিনই যদি মা'র ভয় না হয়ে থাকে, তো এই স্বদেশী ব্যাপারে মা ভয় পাবে?

পচা সন্দেশের গন্ধে তখন বাতাস দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো অঘোরদাদুর গলা দিয়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে। অঘোরদাদু রাগলে ওরকম শব্দ বেরোয় না, বকলে ওরকম শব্দ বেরোয় না, গালাগালি দিলেও ওরকম শব্দ বেরোয় না। তবে কি কাঁদছে?

মা বললে—আপনি কাঁদবেন না বাবা, আমি তো রয়েছি—আমিই সব দেখছি—

আর যায় কোথায়? হঠাৎ যেন বাঘের মত ফেটে পড়লো অঘোরদাদু। কোনো দুই হাত দিয়ে মাটির ওপর ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে। বললে—মুখপোড়া, আমি কাঁদবো? আমার কী হয়েছে শুনি যে, কাঁদতে যাবো মুখপোড়া? আমি কাঁদবো কোন্ দুঃখে রে মুখপোড়া?

বলে সত্যি সত্যিই এঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—কেন আমি কাঁদতে যাবো বল্ তো মুখপোড়া? আমার যজমান নেই? লকার মাঠের একাদশী বাঁড়ুজ্জে আমার যজমান নয়? চালপট্টির শশধর চাটুজ্জে আমার যজমান নয়? এখ্খুনি যজমান-বাড়ি খবর দিলে দৌড়ে আসবে না? আমার কে নেই মুখপোড়া? কে নেই? আমার সব আছে, আমার টাকা আছে, যজমান আছে। টাকাকড়ি থাকলে কাকে পরোয়া শুনি? কড়ি দিয়ে সব কেনা যায় মুখপোড়া, বুঝলি, সব কেনা যায়......

বলতে গিয়ে বোধহয় পড়েই যাচ্ছিল, হঠাৎ ধরে ফেলেছে মা। বোধহয় কোমরটায় ব্যথাও লেগেছে একটু। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো অঘোর-দাদু সঙ্গে সঙ্গে। মা ধরে আবার শুইয়ে দিলে। মাথার বালিশটা টেনে সোজা করে দিলে। কথা বললে আবার বকুনি বাড়বে। মা জানে।

তারপর সেই রাত্রে যখন কাকীমা সতী সবাইকে এনে ঘরে তুলেছে, তখন খাওয়া-দাওয়ার পর মা বললে—একবার তোর অঘোরদাদুকে দেখে আয় দীপু—

দীপঙ্কর বলেছিল—কেন, কী হয়েছে অঘোরদাদুর? অসুখ?

—না, তোর আপিস থেকে আসতে দেরি হয়েছে শুনে খুব ভাবছিলেন বাবা—

দীপঙ্কর সেই অত রাত্রেই আবার অঘোরদাদুর ঘরে গিয়েছিল। তখন কাকীমা আর সতী ঘরে গিয়ে শুয়েছে, অনেক রাত হয়েছে তখন। মা ছিটে-ফোঁটার ভাত ঢাকা দিয়ে রাখলে রোজকার মত। তখনও তারা আসেনি। বিন্তীদির ঘরেও আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজায় খিল দিতে বলেছে মা। চন্নুনী অত রাত্রে উঠেও এঁটো পেড়েছে, বাসন সরিয়েছে। গজ্ গজ্ করতে করতে সব কাজই করেছে। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে অঘোরদাদুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু ভ্যাপসা একটা গন্ধ আসে নাকে। তারপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল। মনে হলো যেন অঘোরদাদুর নাক-ডাকার শব্দ হচ্ছে।

দীপঙ্কর আবার ফিরে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে। বলেছিল—অঘোরদাদু ঘুমিয়ে পড়েছে মা, আমি ডাকিনি আর—

—ঘুমিয়েছেন, তাহলে ভালোই হয়েছে, এখন ঘুমো—

কিন্তু ঘুম কি আসে। তারপরেই কাকাবাবু এসে ডেকে নিয়ে গেলেন কাকীমাকে। সতীও গেল। তারপর সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বিছানায় এসে ভেবেছিল সে-রাত্রে বুঝি আর ঘুম আসবে না। প্রথমটা সত্যিই ঘুম আসেনি। কুকুরগুলো পুলিস দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল খুব—সে-শব্দটাও কানে গেছে। শ্মশান থেকে ঘন-ঘন হরিবোল ধ্বনি হচ্ছিল—তাও কানে গেছে। সেই

জাগরণের মধ্যেই সমস্ত ঘটনাটা যেন আবার মনে করতে ভালো লাগছিল। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। সতী হয়ত কোন কথা বলতেই চেয়েছিল তার সঙ্গে। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছিল তার। হয়ত কিছু বলতো। হয়ত সত্যিই কিছু কথা ছিল তার। হঠাৎ সেই সময়ে রান্নাঘরের টিনের চালের ওপর ইঁটটা পড়লো, আর সব ছত্রখান হয়ে গেল।

এর পরে আর কিছু মনে নেই। কখন ঘুমের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে গিয়েছিল কিছুই খেয়াল ছিল না। কখন আবার শেষ রাত্রের দিকে উঠোনে ইঁট পড়েছে, তা-ও টের পায়নি দীপঙ্কর। তারপর সকাল বেলা উঠেছে। উঠে বাজারে গেছে। আপিসে গেছে, আপিস থেকে এসেছে। উত্তেজনায় উত্তেজনায় দীপঙ্কর যখন ক্লান্ত হয়ে আপিস থেকে ফিরেছে, তখন ও-বাড়িতে বর্মা থেকে ভুবনেশ্বরবাবু এসেছেন।

পরের দিনও আবার রাত হলো। আবার মা ছিটে-ফোঁটার ভাত ঢেকে রেখে দিলে। আবার যথারীতি বিস্তীদি আলো নিভিয়ে দিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে। দীপঙ্কর আবার বিছানায় গিয়ে শুলো। আবার কালকের মত কুকুরগুলো রাস্তায় চিৎকার শুরু করে দিলে। আবার শ্মশানের দিক থেকে হরিধ্বনির আওয়াজ এলো। এই সব রাতগুলোই যেন দীপঙ্করের বিনিদ্র কাটাতে ভালো লাগে। তার মনে হয় তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার জগৎটার মধ্যে কোথাও যেন অশান্তি না থাকে। দীপঙ্কর কেবল অনুভব করতে চায় যেখানে তার অধিকার, সেখানে যেন কোনও কিছু ক্ষুণ্ণ না হয়। তার এই আকাঙ্ক্ষার জগৎ যেন তার নিজস্ব। যেন তার নিজস্ব তালুক। সেখানে সে যেন লিখে দিয়েছে—'যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ'। যতদিন তার ইচ্ছে, ততদিন সে তার এই আকাঙ্ক্ষার জগতের অধিকার ভোগ করবে। কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। তার অধিকারের আওতার মধ্যে যদি লক্ষ্মীদি কষ্ট পায় তো সেটা দীপঙ্করের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব দিয়ে দীপঙ্কর লক্ষ্মীদিকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। তার অধিকারের আওতার মধ্যে সতীও একজন। সতীকেও রক্ষা করার দায়িত্ব যেন দীপঙ্করেরই। সেখানে লাঠি-ধরা পুলিসের দরকার নেই, বর্মা থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে ভুবনেশ্বরবাবুরও আসবার প্রয়োজন নেই, দীপঙ্কর নিজেই যথেষ্ট। তাই তার তালুকদারিতে যখন বেনিয়ম ঘটে, তখন দীপঙ্করের ভালো লাগে না। কাকাবাবুর সি-আই-ডি হওয়া দীপঙ্করের ভালো লাগেনি। আপিসে নৃপেনবাবুর পাঁঠার চপ্ খাওয়া ভালো লাগেনি। চেয়ারে ছারপোকা থাকাতে ভালো লাগেনি। এক গেলাস চা চারজনে ভাগ করে খাওয়াও ভাল লাগেনি তার। এই অধিকার-বোধ নিয়েই দীপঙ্কর এক-একবার অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তখন আর কাউকেই মানতে চায় না মন। তখন যে তার অধিকার হরণ করতে

আসে, তাকেই দুহাতে নির্মমভাবে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়।

—মা!

খুব সজাগ ঘুম মা'র। তবু ক'দিন ধরে মা'রও খুব পরিশ্রম চলছে। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। আজকাল খানিকটা যেন আশার আশ্বাস দিতে পেরেছে মা'র মনে। মা যেন আবার আলো দেখতে পেয়েছে এই চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে। মা স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে এবার—তার দীপঙ্কর একদিন সাহেবের মন পাবে। একদিন এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের কদর্য আব-হাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে। হয় ভবানীপুর, নয় নতুন শহর বালিগঞ্জে। এমন জায়গায় আশ্রয় নেবে মা, যেখানে মানুষের লজ্জা বাঁচুক-না-বাঁচুক, নিন্দে বাঁচুক-না-বাঁচুক, সম্ভ্রম বাঁচুক-না-বাঁচুক, ধর্ম যেন বাঁচে। ধর্ম মানে মা'র কাছে মনুষ্যত্ব। শুধু ধর্ম নয়। দীপঙ্করের মনুষ্যত্বও যেন বাঁচে, দীপঙ্করের সত্যও যেন বাঁচে। অবশ্য তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে দীপঙ্করের চাকরি হয়েছে, কিন্তু সেই সত্য বাঁচাতে, সেই ধর্ম বাঁচাতে তেত্রিশ টাকার কলঙ্ক আর কতটুকু। তেত্রিশ টাকার গ্লানি একদিন মুছে যাবে হয়ত, কিন্তু দীপঙ্কর তো মনুষ্যত্বের গর্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দশজনের মধ্যে দাঁড়াবে! তখন সবাই বলবে—ও কে? না, দীপঙ্কর! তখন তেত্রিশ টাকার দাগ কি আর তার গায়ে লেগে থাকবে!

হায়রে! এখন ভাবলে হাসি পায় দীপঙ্করের। মা তো সেদিন জানতো না, কলঙ্ক, তা সে যতটুকুই হোক, অসত্য, তা সে যত নগণ্যই হোক, একদিন সেই এক কণা অসত্য, এক কণা কলঙ্কই সারা দেশকে মনুষ্যত্ববর্জিত করতে পারে, ধর্মবর্জিত করতে পারে। একজনের সামান্য পাপ লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ দিয়েও, কোটি কোটি লোকের ধ্বংস দিয়েও মোছা যায় না। মা তো জানতো না যে, একজন চেঙ্গিস খাঁর পাপের ঋণ একদিন কোটি লোকের মৃত্যু দিয়ে শোধ করতে হয়! এই যে কোথায় কার হিসেবের ভুলে ঘটলো ট্রেড-ডিপ্রেশন, আর এখানে গৌবাজারের একপ্রান্তে দাতারবাবুকে তার খেসারত দিতে হলো। শুধু দাতারবাবু কেন, লক্ষ্মীদিকেও তার খেসারত দিতে হচ্ছে! মা'র দোষ নেই, হয়ত কেউই বোঝে না। নইলে যেদিন টোকিও থেকে ক্যান্টনে এসে নামলো জাপানীরা, সেদিন আমেরিকাই তাদের দিয়েছিল এরোপ্লেন, গ্রেট ব্রিটেন দিয়েছিল রাইফেল, রাশিয়া দিয়েছিল ট্যাঙ্ক, জার্মানী দিয়েছিল মেশিনগান। ব্যবসা হলো ব্যবসা। তাতে বাছ-বিচার করতে নেই। কিন্তু তখন কি-ওরা জানতো, একদিন সেই জাপানই আবার সমস্ত আফ্রিকা আর এশিয়ার চেহারা এমনভাবে আমূল বদলে দেবে। এশিয়ায় তাদের সব কলোনিগুলো এমন করে হাতছাড়া হয়ে যাবে।

মা মনে মনে হিসেব করে ফেলেছিল। তেত্রিশ টাকা! তেত্রিশ টাকার হিসেব বড় সোজা হিসেব। ভবানীপুরে ছোট্ট একটি বাড়ি, ভদ্রপাড়ার আওতায়

একটুকরো আরাম, এক ছটাক বিশ্রাম আর এক কাঁচা শান্তি। মা'র আকাঙ্ক্ষা বড় পরিমিত।

মা জিজ্ঞেস করতো—বছরে ক' টাকা করে মাইনে বাড়বে?

দীপঙ্কর বলতো—তিন টাকা—

মনে মনে হিসেব করতো মা রাঁধতে রাঁধতে। বছরে তিন টাকা যদি হয়, তাহলে পাঁচ বছরে পনের টাকা। অর্থাৎ দীপঙ্করের যখন বয়েস হবে পঁচিশ তখন মাইনে হবে আটচল্লিশ টাকা। তখন দীপুর একটি বউ হবে। সুন্দরী একটি প্রীতিময়ী মেয়ে। এমন মেয়ে যে দীপঙ্করকেও সেবা-যত্ন করবে, শাশুড়ীকেও ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে। আটচল্লিশ টাকায় সংসার চালাতে পারা চাই। দুহাতে খরচ করে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে মাসের শেষে আবার পরের কাছে তেল-নুন-হলুদ ধার করতে হবে—তেমন বউ হলে চলবে না। তা আটচল্লিশ টাকাও কম নয়। গুছিয়ে চলতে পারলে ওই টাকাতেই বেশ চালানো যায়।

খেতে বসেও মা জিজ্ঞেস করে—তিন টাকা করে বেড়ে বেড়ে কত টাকায় শেষ হবে?

—নব্বুই টাকা!

নব্বুই টাকা কত বছরে হয়, তারই তখন হিসেবের পালা। হিসেব করতে করতে ছেলের সংসারের জমা-খরচের একটা আলগা খতিয়ানও তৈরি করে। শুধু তো বউ নয়, ছেলে-পুলেও হবে। ছেলের লেখাপড়া আছে, মেয়ের বিয়ে আছে, মেয়ের তত্ত্ব-তাবাশ আছে, নাতি-নাতনীর ভাত, নাতজামাই-এর......

হিসেব করতে করতে মা অনেকদূর এগিয়ে যায়। তখন আর হিসেবে কুলোয় না। তখন নব্বুই টাকার অঙ্কটার ভগ্নাংশগুলো সব গোলমাল হয়ে যায়। তাহলে একটা বাড়ি হবে কী করে? বেশি নয়, ছোট এক কাঠা দু কাঠা জমি হলেই চলবে। দুখানা ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা ভাঁড়ার ঘর। কিন্তু যাই বলো বাপু ঠাকুরঘর একটা চাই। সে-সব পাট তো উঠেই গেছে দীপঙ্করের মা'র। নিজের বাড়ি হলে একটা ঠাকুরঘর আগে করতে হবে। একটি পশমের আসন থাকবে সেখানে, গঙ্গাজল, ধূপদানি, কোষাকুশি, প্রদীপ এই রকম টুকি-টাকি। তারপর আর ক'টা দিন! দীপুর সংসার দীপুই দেখবে। বিয়ে দিয়ে মা'র কাজ শেষ। মা'র কর্তব্য শেষ। আজকাল ভালো করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় মা। বাজারের পয়সা একটু বেড়েছে। অত আপিসের খাটুনি খাটতে পারবে কেন? কোথা থেকে গাওয়া-ঘি এনেছে মা। ঘিটা দইটা, পাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

বিন্তীদি মুখটা শুকনো করে এসে দাঁড়ায়। বলে—দিদি, দীপুর চাকরি হয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ মা, অ্যাদ্দিনে মা মুখ তুলে চেয়েছেন।

তারপর খানিক পরে আবার বলে—এবার তুমি চলে যাবে নাকি দিদি?

—যাবো আর কোথায় মা? কোন্ চুলোয় আর যাবো, যাবার কি ঠাঁই আছে মা আমার?

বিন্তীদি বলে—তবে যে বলেছিলে দীপুর চাকরি হলেই এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাবে?

—ওমা, তুমি বুঝি সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েছ, আ আমার কপাল ওর তো ভারি মাইনে, সেই মাইনেতে কি আলাদা সংসার করা যায় মা? নিজের পেটে খেতেই বলে কুলোবে না—দীপুর আবার সংসার হবে, দীপুর আবার সুখ হবে—কী যে বলো মা তুমি!

কিন্তু বিন্তীদি ছাড়ে না। মা রাঁধতে রাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন। হঠাৎ বিন্তীদি আবার ডাকে—দিদি—

—কী মা?

—আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যেও দিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো. আমি এখানে একলা থাকতে পারবো না।

মা বলে—তুমি কেন আমাদের সঙ্গে যাবে মা, তুমি কত বড়লোকের নাতনী, তোমার দাদুর কত টাকা, তোমার কত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হবে, তোমার দুঃখু কিসের মা? তুমি কেন আমাদের সঙ্গে কষ্ট করতে যাবে!

অনেক সান্ত্বনা দেয় মা বিন্তীদিকে। আঁচল দিয়ে বিন্তীদির চোখের জল মুছিয়ে দেয়। কত সুখ-সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখায়। হয়ত বিন্তীদিও বিশ্বাস করে, কিন্তু আবার যখন পাত্রপক্ষ এসে দেখে চলে গিয়ে কোনও খবর দেয় না, তখন আবার কাঁদে। চুপ করে ঘরের খিল বন্ধ করে কাঁদে। সে-কান্না কেউ টের পায় না। সংসারে এত লোকের এত সমস্যা, এত লোকের এত দুঃখ, এত লোকের এত কাজ, তবু বিন্তীদির হয়ত মনে হয় তার সমস্যা তার দুঃখের বুঝি তুলনা নেই।

দীপঙ্কর বিছানায় শুয়ে শুয়েই আর একবার পাশ ফিরলো।

—মা!

মা'র সাড়া-শব্দ নেই। কুকুরগুলো তখনও চেঁচাচ্ছে। শ্মশানের দিক থেকে তখন হরিধ্বনি আসছে। এত লোক কোত্থেকে মরে! প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু যেন তার দাবি মেটাবেই। এক মুহূর্তের জন্যেও ফাঁক যায় না হরিধ্বনির। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হলো। দীপঙ্কর মাথাটা তুললো। সতী এল নাকি! সেই সেদিনকার স্বপ্নের মতন আবার তাদের ঘরে এল নাকি সতী! কিন্তু আসবে কী করে? আর কী জন্যেই বা আসবে! বাড়ির সামনে তো পুলিসরা এখনও পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখের সামনে দিয়ে আসবে? না কি পেছনের খিড়কির দরজা দিয়ে আমড়া গাছের তলা দিয়ে উঠোন পেরিয়ে আসবে।

দীপঙ্কর চারদিকে চেয়ে দেখলে।

স্বপ্ন দেখছে না তো সেদিনকার মত! না, স্বপ্ন তো নয়। এই তো হাত

দিয়ে পা ছুঁয়ে দেখছে। এই তো ওপরের কড়িকাঠগুলো কালো কালো দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যেও। এই তো চোখ বুজলেই সব ঝাপসা, আর চোখ খুললেই সব অন্ধকার! দীপঙ্কর নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলো। কিন্তু কোনও শব্দই তো আর হচ্ছে না। না, সতী কেন আজ আবার আসবে? তার কিসের দরকার? এখন তো বাবা এসেছে। এত বাবাকে ভালবাসে সতী। বাবার চিঠি একটু দেরিতে পেলেই যে-মেয়ে ভেবে অস্থির হয়, তার বাবা এতদিন পরে এসেছে। এখন তো সতী আর আসতে পারে না। অবশ্য কোনও কিছুই ঠিক করে বলা যায় না। আসলেও আসতে পারে সতী! হয়ত কালকের কথা বলতে এসেছে। কালকে অত কাণ্ড হয়ে গেল, তারপর হয়ত কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে। হয়ত এসে বলবে—তুমি কালকে ছিলে দীপু, তাই রক্ষে, নইলে ওরা আমাকে আর আস্ত রাখতো না—হয়ত এইটুকু জানাতেই এসেছে চুপি চুপি।

দীপঙ্করের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠলো। কোথাও কোনও শব্দ নেই এখন। কুকুরগুলোও যেন এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্মশান থেকেও যেন আর হরিধ্বনির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কত রাত এখন কে জানে!

খুট!

এতক্ষণে মনে হলো শব্দটা তাদের ঘরে নয়। যেন একটু দূরে। মনে হলো কাকাবাবুদের বাড়িতে সতীর ঘরের জানালাটা হঠাৎ খুট্ করে কে খুললে!

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। আস্তে আস্তে খিলটা খুললে। বাইরে তখন গাঢ় অন্ধকার। চাঁদের কোনও চিহ্ন নেই আকাশে। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে সতীর ঘরের জানালাটার দিকে। সন্ধ্যেবেলা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই রয়েছে। কেউ খোলেনি। কেউ খোলেনি, কেউ বন্ধও করেনি। পাখিগুলোও বন্ধ রয়েছে। তবে কিসের শব্দ হলো? কোন্ শব্দ শুনলে সে! কোন্ শব্দ শুনে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল!

হঠাৎ চমকে উঠলো দীপঙ্কর। একটা বেড়াল ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়েছে সদরের পাঁচিল থেকে। লাফিয়ে পড়েই আস্তে আস্তে সামনে এল। চেনা বেড়াল। সামনে এসে দীপঙ্করের দিকে মুখ তুলে আদর দেখাল—ম্যাঁও—

—তুই? তুই শব্দ করেছিলি?

বেড়ালটা আস্তে আস্তে পশ্চিম দিক থেকে এসে পুব দিকে চলে গেল। গিয়ে আমড়া গাছের তলা দিয়ে সতীদের বাড়ির পাঁচিলে উঠলো এক লাফ দিয়ে। রাত্রের এঁটো-কাঁটা খাবার জন্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীপঙ্কর আবার নিজের ঘরের দিকে চলে এল।

হঠাৎ যেন বাইরে আবার একটা শব্দ হলো।

—কোন্ হ্যায়?

পাঁচিল টপ্‌কে কে যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকছিল। তার মুণ্ডটা দেখা যাচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যেও। দীপঙ্কর চিনতে পারলে—ফোঁটা। ফোঁটা রোজকার মত

বাড়ি ফিরছে এখন। পেছন থেকে পুলিসের হাঁক-ডাক শুনে ফোঁটা বললে—আমি, পাহারাওলা সাহেব, আমি—

পুলিস-পাহারা তাহলে সজাগ হয়ে উঠেছে। ক'জন পুলিসের ভারী-বুটের শব্দ শোনা গেল। তারা কাছে এল। কাছে এসে আবার জিজ্ঞেস করলে—কৌন্ হ্যায় তুম্?

—আমি ফোঁটা, এ-বাড়ির ছেলে, এই বাড়িতে থাকি আমি—

পুলিস সে-যুক্তি শুনবে না। বাড়ির ছেলে তো পাঁচিল টপ্‌কে বাড়িতে ঢুকবে কেন? আর তাছাড়া এই এত রাত্রে? এত রাত্রে তো বাড়ির বাইরে বাড়ির ছেলেদের থাকবার কথা নয়।

—উত্‌রো, জল্‌দি উত্‌রো, বদমাশ্ চোট্টা কাঁহাকা!

ফোঁটাও কালিঘাটের ছেলে। অনেক পাহারাওয়ালা দেখেছে জীবনে। অনেক পাহারাওয়ালার সঙ্গে ভাব আছে। একসঙ্গে বিড়ি খেয়েছে। বিড়ি খেতেও দিয়েছে তাদের। ভেবেছিল পুলিসের দলের লোক সে। তাকে কিছু বলবে না। দীপঙ্কর উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

ফোঁটা দীপঙ্করকে দেখে বললে—দেখছিস মাইরি, দেখছিস্, তুই একটু বল্ তো এদের, তুই বল্ তো এদের—আমি এ-বাড়ির ছেলে। অঘোর ভট্‌চাযিার নাতি—বল্ তো তুই এদের—

তারপর পুলিসের দিকে চেয়ে বললে—আরে বাবা, এ বাড়িও আমার, অঘোর ভট্‌চাযি্য মরে গেলে আমিই এ-বাড়ির মালিক হবো—

পুলিস কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে—উত্‌রো তুম্, উত্‌রো জল্‌দি—

ফোঁটা বললে—এই দ্যাখ, আবার ইয়ার্কি করছে। ওরে আমি অঘোর ভট্‌চাযি্যর নাতি ফটিক ভট্‌চাযি্য, ফোঁটা বললে কালিঘাটের সবাই আমাকে চিনবে, কেন বাবা আমার সঙ্গে দিল্লাগি করছো?

এবার আর সহ্য করলে না পুলিস। পা ধরে টেনে নামিয়ে দিলে ফোঁটাকে। দীপঙ্কর শুনতে লাগলো ফোঁটা কত করে অনুনয় বিনয় করছে। সব কথা বোঝা গেল না। মনে হলো যেন ফোঁটাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেল পুলিস। তারপর আবার সব শান্ত। আর কারো গলা শোনা গেল না। দীপঙ্কর ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ছিটে এখনও ফেরেনি। ছিটেও ঠিক ওইরকম করে পাঁচিল টপ্‌কে ফিরবে। তাকেও ধরবে পুলিস। তাকেও হাজতে আটকে রাখবে। এক কাকাবাবুদের জন্যে দোষী নির্দোষী সব ধরা পড়বে আজ। অথচ কাল যত লোক কাকাবাবুদের বাড়ি ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে ফোঁটাও ছিল না। ছিটেও ছিল না। ওরা এ-সবের মধ্যে নেই। ওদের গতিবিধি কালিঘাটের বাজারের আশেপাশের টিনের বস্তিগুলোতে। সেখানে ওরা তবলা বাজায়, বিড়ি খায়—নেশা করে। রাত বারোটা পর্যন্ত ওখানে দিন হয়ে থাকে। ওখানেই ওদের রাজত্ব। ও-পাড়ায় খুন-রাহাজানি হলে ওরা এগিয়ে

দায় ফয়সালা করতে। খুব বড় জোর কখনও গাঁজায় দম দিতে ইচ্ছে হলে শ্মশানে চলে যায়। ক্যাওড়াতলার শ্মশানে। সাধু-সন্নিসীদের তালিম দিয়ে দু'এক ছিলিম্ দম দিয়ে আসে। এই পর্যন্ত। ওরা সি আর দাশকে চেনে না। কংগ্রেস চেনে না, টেগার্ট সাহেবকেও চেনে না। ইংরেজ, আমেরিকা, চিয়াং-কাইশেক চেনে না। ওদের চাকরি করতে হয় না, নৃপেনবাবুদের ঘুষ দিতেও হয় না। ওদের উন্নতির দরকার নেই, অবনতির দরকার নেই। ওরাই হলো সত্যিকারের সিটিজেন অব্ দি ওয়ার্ল্ড্। ওরা ইংরেজ-রাজত্বে আছে। আবার যদি কখনও কংগ্রেস-রাজত্ব হয় তখনও থাকবে! ওদের নিয়ে কোনও দিন কোনও গভর্নমেন্ট মাথা ঘামায় না। ওরা অজর-অমর। ইতিহাসও বদলায়, কিন্তু ওরা অক্ষয় অব্যয়! ওরাই ইতিহাসের ডাস্টবিন্।

দীপঙ্কর ঘুমোতে ঘুমোতে একবার পাশ ফিরলো।

শেষ রাত্রের ঘুম একটু গাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। প্রথমটা একটু ঠেলাঠেলি করতে হয়েছিল। প্রথমটায় এমন ঘটনা বিশ্বাস না-হবারই কথা। এতদিনের সমস্ত রুটিন ওলট-পালট হয়ে গেলে বিশ্বাস হবেই বা কেমন করে? হঠাৎ পায়ের তলার সমস্ত মাটি যেন এক মুহূর্তে সরে গেল, আর দীপঙ্কর যেন সেই ধ্বংসস্তূপের তলায় বিলীয়মান হয়ে গেল নিঃশেষে।

প্রথমে দীপঙ্কর তো টের পায় নি। দীপঙ্করের মা-ও টের পায়নি।

শেষ রাত্রেই উনিশের একের বি বাড়িটার চারদিক ওরা ঘিরে ফেলেছিল। চন্নুনী ভোর বেলাই ওঠে চিরকাল। বুড়োমানুষ। ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙে যায় আর ঘুম আসে না তখন। তখনই উঠে পড়ে। উঠে পড়ে ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট দেয় আর গালাগালি দেয়। কাকে গালাগালি দেয় ভগবান জানে। চন্নুনীর মেয়ে বহুদিন আগে কবে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, তাকে উদ্দেশ করেই এক-একদিন গালাগালি করে হয়ত।

বলে—মর তুই, মরলে আমার হাড় জুড়োয়, আমার পেটের মেয়ে, তোকে আমি পেটে ধরেছি বলে আমাকে এত হেনস্থা? ঝাঁটা মারবো না তোর মুখে! ভগবান সাক্ষী আছে আমার, ভগবানকে সাক্ষী করে এই শাপান্ত করছি—তুই মর, তুই মর, মর। আবার আমার গয়নার লোভ! তোকে গয়না দেব না ছাই দিয়ে দেব—আমার গয়না আমি কালিঘাটের ভিখিরিদের বিলিয়ে দেব, তবু তোকে দেব না—তুই আমার শত্তুর, তোর মুখে ঝাঁটা মারি—

এসব রোজকার গালাগালি। এ-শুনেও কেউ কিছু বলে না। কবে একদিন চন্নুনীর মেয়ে মাকে ছেড়ে বাজারে গিয়ে ঘর-ভাড়া করেছিল, বহুদিন পরে সেই মেয়েকে লক্ষ্য করেই এক-একদিন বিষ ছড়ায়।

হঠাৎ সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়লে।

—কে গা? ভোরবেলা বাসি উঠোনে এখনো গোবর-ছড়া দেয়া হয়নি, এখন কে দরজা ঠেলে গা?

ভারি একটা গলার আওয়াজ। তার সঙ্গে জোরে জোরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে চন্নুনী এবার আরো জোরে গালাগালি শুরু করলে। বললে—হাতের জোর দেখ না মিনসের, তোর হাতে কুষ্ঠ হোক্ মিন্‌সে, কুষ্ঠের জ্বালায় যে-হাত দিয়ে কড়া নাড়ছিস সেই হাত খসে পড়ুক—

গালাগালি দিয়ে দরজা খুলতেই কিন্তু গলা বন্ধ হয়ে গেছে চন্নুনীর। দুজন পুলিস আর একজন দারোগা সামনে দাঁড়িয়ে।

বললে—দীপঙ্কর সেন আছে?

—ওমা, কী হলো গো! কার সব্বনাশ হলো গো! আমি কোথায় যাবো গো!

চন্নুনীর গলায় যে আবার এত জোরও থাকতে পারে তাও যেন আগে জানা ছিল না কারো।

চন্নুনী দীপঙ্করের ঘরের দরজায় ঘা দিতে দিতে বললে—ও দিদি, পাহারোলা এসেছে গো—ও দিদি—দীপু কার সব্বনাশ করেছে গো—

সে এক তুমুল হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল সেদিন চন্নুনী। সে চিৎকারে দীপঙ্করের মা'ও উঠেছে, বিন্তীদিও উঠেছে। অঘোরদাদুও হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে এ-এস-আই আর কনস্টেবল দুটোও ঢুকে পড়েছে উঠোনের মধ্যে। তাদের এক্তিয়ার সর্বত্র।

মা ঠেলা-ঠেলি শুরু করে দিয়েছে—ও দীপু—ওঠ্—উঠে পড়—পুলিস এসেছে—পুলিস—

অনেক ঠেলাঠেলিতে উঠলো দীপঙ্কর। ঘুম চোখে সামনে আসতেই এ-এস-আই বললে—আপনার নাম দীপঙ্কর সেন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে, আপনাকে অ্যারেস্ট করছি আমরা।

মনে আছে দীপঙ্কর সেদিন প্রথমটা যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল! দীপঙ্করকে অ্যারেস্ট করবে! কী করেছে সে! কী তার অপরাধ? তা ছাড়া তার যে আপিস। রেলের আপিসে চাকরি করে সে। সাড়ে দশটায় যে তাকে আপিসে যেতে হবে। এখুনি বাজার করে আনলে মা রান্না করে দেবে, সেই খেয়ে আপিস যেতে হবে যে তাকে। যদি অ্যারেস্টই করে তাহলে সাড়ে দশটার আগে তো ছেড়ে দিতে হবে! তা না হলে তার নতুন চাকরি, চাকরি থাকবে না যে! রবিন্‌সন্ সাহেব যে খোঁজাখুঁজি করবে! ট্রান্সিট সেকশনের কাজ যে অচল হয়ে যাবে। জাপান-ট্রাফিক যে চলবে না।

সাদা গলা-বন্ধ ইউনিফর্ম পরা এ-এস-আই। শেষ রাত্রে তাকেও ঘুম ভেঙে ডিউটি করতে আসতে হয়েছে। বিরক্ত হবারই কথা।

বললে—অত কথা বলবার সময় নেই, থানায় গিয়ে সব জবাব পাবেন—

—তাহলে?

কড়ি দিয়ে কিনলাম

—তাহলে থানায় চলুন এখন আমার সঙ্গে—

—কখন ছেড়ে দেবেন?

—সে থানার ও-সি বলতে পারেন।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

দীপঙ্কর বললে—চলুন—

মা এতক্ষণ শুনছিল সব কথা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। বললে—

—কী করেছিস তুই? বল, তুই কী করেছিস? কার সর্বনাশ করেছিস? আমি এতদিন এত কষ্ট করে পরের বাড়িতে রান্না করে দাসীবৃত্তি করে তোকে মানুষ করেছি এই জন্যে? ভগবান শেষপর্যন্ত এই আমার কপালে লিখেছিল? তোকে পেটে ধরে শেষে এই আমার ফল হলো? তুই ছেলে হয়ে শেষকালে আমাকে এই শাস্তি দিলি রে? তোকে যে দুমাস বয়েস থেকে বুকে-কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি দীপু, নিজে না-খেয়ে তোকে খাইয়েছি, নিজের সুখ আহ্লাদ বলে কিছু করিনি সারাজীবন, সেই তুই বড় হয়ে আমাকে এই শাস্তি দিলি আজ? আমার সব আশায় ছাই দিলি তুই এমন করে? এখন আমি কার কাছে দাঁড়াবো? কার কাছে হাত পাতবো বিধবা মানুষ হয়ে? আর চাইবোই বা কিসের জন্যে? কার জন্যে হাত পাতবো? কে রইল আমার?

মা'র চিৎকারে সমস্ত পাড়া যেন সেই ভোরবেলা সচকিত হয়ে উঠলো। মা'র কান্নার রোলে সমস্ত কালিঘাটের বাতাস যেন স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। মা সেই ঘরের বারান্দাতেই মূর্ছিত হয়ে পড়লো। বিন্তীদি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। চন্নুনীও ঝাঁটা হাতে উঠোনে দাঁড়িয়ে সব দেখে শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সামনের কাকাবাবুদের বাড়ির জানালাগুলো যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধই রইল। সেখানে কারোর কাছ থেকে কোনও সাহায্যের ইঙ্গিত এল না। কাকাবাবু আছেন, কাকীমাও আছেন, সতী আছে! ভুবনেশ্বরবাবুও নতুন এসেছেন এখানে —তিনিও আছেন। আর খানিক দূরেই প্রাণমথবাবু আছেন, কিরণের মা বাবা আছে। তারও ও-পাশে নৃপেনবাবু আছেন। কারো কাছ থেকে কোনও সাহায্যের ক্ষীণতম প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল না। দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ মা'র দিকে চেয়ে দেখল। তারপর মুখ তুলে চাইতেই দেখলে আমড়া গাছের ডালে সেই কাকটা। ভোর না হতেই উঠে এসে বসেছে ওখানে। ও-ও একলা।

—চলুন।

মনে আছে রাস্তায় বেরিয়েও দীপঙ্করের আর কোনও দিকে মন ছিল না। তখনও মা'র আর্তনাদটাই কানে আসছিল যেন সারা রাস্তাটা। কেন মা'র কপাল এমন করে পুড়লো! প্রতিদিন কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে সব ঠাকুরের কাছে ফুল দিয়ে এসে তার ছেলের কপালে কেন এমন ঘটলো! প্রাণমথবাবুকে ধরে তার পড়ার খরচ চালিয়েছে মা, নৃপেনবাবুকে ধরে চাকরিও যোগাড় করেছে, চাকরি হবার পরেও মা মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ এনে খাইয়েছে। এত সাধ্য-সাধনা কেন তবে ব্যর্থ হলো। মা'র সমস্ত আশা কেন এমন করে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, কে বলে দেবে? মা রোয়াকের ওপর শুয়ে পড়ে চিৎকার করে নিজের ভাগ্যবিধাতাকেও লক্ষ্য করে যেন এই প্রশ্নগুলোই করছিল!

আগের দিনই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের চার পাশের সমস্ত বাড়ির লোকজনকে ধরে নিয়ে গেছে। 'ব্যায়াম-সমিতি'র সব ছেলেরা তখন পুলিসের হেফাজতে। টেগার্ট সাহেব নিজে এসে সব জায়গায় ঘুরে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। ব্রিটিশ-রাজত্বের একেবারে কেন্দ্রে এতখানি অরাজকতা যেন টেগার্ট সাহেবকে উন্মাদ করে দিয়েছে, ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, অসহ্য করে তুলেছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে যখন টেগার্ট সাহেব খাস-বাংলায় কথা বলেছে, গালাগালি দিয়েছে, তখন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। এ-লোকটাকে তারা কতদিন এই পাড়ার মধ্যেই আদ্দির পাঞ্জাবী পরে বেড়াতে দেখেছে, কিন্তু সেদিন জানতো না এই-ই হলো সেই টেগার্ট সাহেব—কলকাতার পুলিস কমিশনার, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিভূ চার্লস্ টেগার্ট!

পাড়ার সমস্ত জোয়ান ছেলে ধরা পড়ে ছিল। বাকি ছিল শুধু দীপঙ্কর। তাকেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হলো। অপরাধ? অপরাধের কথা পরে হবে, আগে তো থানায় চলো, আগে তো জিজ্ঞাসাবাদ হোক্, তখন চার্জ তৈরি হবে, তখন শাস্তি হবে!

বাজারের পাশ দিয়ে রাস্তা। সমস্ত লোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। দীপঙ্কর মাথা নিচু করে চলেছে তখনও। তার কানে তখনও যেন ভেসে আসছে মা'র আর্তনাদের সুর।

ভবানীপুর থানায় এসে ও-সি'র কাছে প্রথম ধাপ।

একটা ভাঙা চেয়ারে বসলো দীপঙ্কর।

—নাম কী?

শুধু নামই নয়। নাম, ধাম, পিতৃ-পরিচয় সবই লেখা হলো। চারদিকে পুলিস পাহারা। চারদিকে শাসনের যন্ত্র। চারদিকে ক্রূর কঠিন কর্তব্য। লৌহ-কঠিন নির্মম শাসন। এতটুকু শৈথিল্য নেই কোথাও। সাত সমুদ্রের ওপার থেকে তৈরি আইন-কানুনের নিগড় দিয়ে বাঁধা যন্ত্র, সেই যন্ত্র গড়িয়ে চলেছে। সেই যন্ত্রই গড়াতে গড়াতে এল একেবারে গেটের সামনে। কালো একখানা গাড়ি। সেপাইএর দল লেফ্‌ট্‌-রাইট্ করে রাস্তা তৈরি করে দিলে। আসামী যেন না পালায়। খুব সাবধান। বেয়নেট খাড়া রেখো। একটু শিথিল হলেই হাত-ছাড়া হয়ে যাবে ইন্ডিয়া। দীপঙ্কর সেই গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে ডুব দিতেই ভারত-শাসন আইনের যন্ত্রটা আবার গড়িয়ে চললো। এবার উত্তর দিকে। তারপর সোজা চৌরঙ্গী রোড ধরে থামলো গিয়ে একেবারে ইলিশিয়াম রো'র উঠোনের মধ্যে!

ছোট ছোট খুপরি-খুপরি সব ঘর। ঘরের পর ঘর। এস-বি আর আই-বি অফিস। সেখানেও সেই এক নিয়ম। বাঁধা প্রশ্নের সাইক্লোন্ উঠলো সামনে যেতেই।

—এসব কী শুনছি?

বজ্র-গম্ভীর আওয়াজে দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইল। বিরাট লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার মানুষ। ভদ্রলোকের মত সাধাসিধে পোশাক। এই প্রথম রায়-বাহাদুরকে দেখলে। রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। কালো কুচকুচে গায়ের রং। একবার দেখলেই মানুষটার সব যেন দেখা হয়ে যায়। আসল মানুষটার মনের ভেতরের ছবিটার ছাপ যেন মুখের ওপরেও পড়েছে।

—কী শুনছি এ সব?

দীপঙ্কর স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলে—কী শুনছেন?

—যা শুনছি সব সত্যি কিনা বলুন, বাজে কথা শুনতে চাই না!

অদ্ভুত প্রশ্ন এখানকার। দীপঙ্কর তবু বললে—কী শুনছেন আপনারা বলুন না?

—আপনি কিছু জানেন না, না? কিরণ চাটুজ্জের সঙ্গে আপনি মেশেন না?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ মিশি। সে আমার ছোটবেলার বন্ধু—

—জানেন সে কী?

দীপঙ্কর বললে—জানি।

—কী জানেন?

দীপঙ্কর বললে—সে খুব গরীবের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি—

রায় বাহাদুর এবার হুঙ্কার দিলেন—শান্তি—

শান্তি এ-এস্-আই। কাছেই ছিল,—এই যে স্যার—বলে দৌড়ে এল।

—একে ব্যাটারি ঘরে নিয়ে যাও, ছোকরা বড় বেয়াদব—

সত্যি দীপঙ্করকে নিয়ে শান্তি চলে যাচ্ছিল কোন্ ব্যাটারি-ঘরে। কিন্তু রায় বাহাদুর আবার হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন। বললেন—শুনুন—

তারপর অসংখ্য প্রশ্ন। সত্যিই তখন প্রশ্নের সাইক্লোন বয়ে গেল যেন মাথার ওপর দিয়ে। ম্যাডক্স স্কোয়ারে কিরণের সঙ্গে যাওয়া, সেখানে ভজুদার জন্যে অপেক্ষা করা, ভজুদার না-আসা—সমস্ত জেনেছে আই-বি-আপিস। কবে কবে কিরণের বাড়িতে বেড়াতে গেছে দীপঙ্কর, কবে তারা লাইব্রেরী করেছে, লাইব্রেরীতে কী-কী প্রোসক্রাইব্ড্ বই ছিল, সব ইতিহাস এদের জানা। শুধু জানা নেই কিরণের ঠিকানা, শুধু জানা নেই ভজুদার ঠিকানা!

—বলুন? বলুন শিগ্গির?

দীপঙ্কর বললে—কী বলবো? কিরণের ঠিকানা, ভজুদার ঠিকানা কিছুই আমি জানি না—

রায় বাহাদুর পারলে যেন তখনি দীপঙ্করের মাথাটা নিজের হাতেই কেটে

নিতেন। কিন্তু তখন বোধহয় তাঁর অনেক কাজ। আরো অনেক স্বদেশী অপেক্ষা করে আছে পাশের ঘরে। শান্তিকে বললেন—একে থানার লক্-আপে রেখে দাও গিয়ে—পরে দেখছি—

তারপর আবার যন্ত্রটা গড়িয়ে চললো। চৌরঙ্গী রোড ধরে আবার এসে দাঁড়াল ভবানীপুর থানার সামনে। আবার লেফ্ট্-রাইট্। বেয়নেট খাড়া করে রাখো। পালায় না যেন। সাবধান। এবার আর থানার আপিস-ঘরে নয়। এবার একেবারে লক্-আপের মধ্যে। শক্ত শক্ত লোহার রেলিং-এর দরজাটা হাঁ করে খুলে গেল। একটা দুর্গন্ধ আবহাওয়ার মধ্যে দীপঙ্করের দম্ বন্ধ হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমটায় কিছু নজরে পড়েনি। অন্ধকারের মধ্যে চোখে ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল। তারপরে মনে হলো যেন ভেতরে অনেক লোক কিল্‌বিল্ করছে।

—কী রে, দীপু? মাইরি তুই এখেনে? তোকেও ধরেছে?

ফোঁটার গলা! ভাল করে দীপঙ্কর লক্ষ্য করে দেখলে। ছিটেও রয়েছে। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে পা-মুড়ে মেজের ওপর বসে রয়েছে।

ফোঁটা কাছে সরে এল। আশ্বাস দিলে দীপঙ্করকে। বললে—অত মন-মরা কেন রে? এই প্রথম বুঝি তোর?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিতে পারলে না চট করে।

ছিটেও এবার কাছে এল। বললে—প্রথমবার একটু মন-মরা তো লাগবেই, প্রথমবার আমরাও মন-মরা হয়ে গিয়েছিলুম—না রে ফোঁটা?

ফোঁটা বললে—তোর কিছুছু ভয় নেই দীপু, এখানে কোনও অসুবিধে হবে না তোর, দরকার হলে তোকে এখানেই বিড়ি আনিয়ে দেব—

দরজার ভারি পাল্লাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তখন।

শুধু একদিন নয়, পর পর ক'দিনই তাকে নিয়ে গেল আর এনে রেখে দিলে আবার। মনে আছে কত রকম অত্যাচার, কত রকম অনুনয়-বিনয়। কিন্তু দীপঙ্কর জানতোই বা কী যে বলবে?

দীপঙ্কর বলেছিল—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না—

রায় বাহাদুর শেষে অন্য পথ ধরলেন। বললেন—ছি-ছি, আপনাকে এরা মেরেছে নাকি কপালে? দাগ দেখছি যে—?

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একথার উত্তর দিতেও তার ঘেন্না হলো।

রায় বাহাদুর বললেন—থাক্, তা, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে? বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আরে, আপনিও বাঙ্গালী, আমিও বাঙ্গালী—

আগের দিনের রায় বাহাদুরের কথাগুলো তখনও দীপঙ্করের মনে ছিল। তবু চুপ করে রইল। ক'দিন ধরে কিছু খাওয়াও হয়নি। এ-এস-আই ভদ্রলোক দুখানা কচুরি আর একটু আলুর তরকারি দিয়েছিল দয়া করে। পুলিসের

লোকেরও তাহলে দয়া আছে। ভারি ভালো লেগেছিল তাঁর ব্যবহার দেখে। জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আপনার নামটা কী?

এ-এস-আই ভদ্রলোক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কেন? নাম জিজ্ঞেস করছেন কেন?

দীপংকর বলেছিল—আগের ক'দিন খেতে পাইনি, অথচ আজকে আপনি এত খেতে দিলেন—

—কী আর খেতে দিলাম, আপনিও তো ভদ্রলোকের ছেলে, আপনারও তো মা আছে—

মা'র কথা বলতেই দীপংকরের চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়েছিল। বাড়ি থেকে আসবার সময় মা'র সেই আর্তনাদের সুরটা যেন হঠাৎ আবার কানে ভেসে এল।

—আপনার নামটা বলুন, আমি আপনাকে চিরকাল মনে রাখবো!

ভদ্রলোক বললেন—নাম শুনে আর কী করবেন, চাকরি করতে হয় আমাদের পেটের জন্যে—নইলে.....

ইলিশিয়াম রোডে এসে রায় বাহাদুরের খাতিরের বহর দেখে শুনে সেই কথাগুলোই মনে পড়ছিল!

রায় বাহাদুর একটা আরদালীর ওপর হঠাৎ চিৎকার করে ধমকে উঠলেন—এই শুয়োর-কা-বাচ্চা চেয়ার দে, দেখছিস না দীপঙ্করবাবু দাঁড়িয়ে আছেন, বেটা এখনও সহবৎ শিখলো না—মশাই পুলিসের চাকরিতে এসে এই সব দেখে শুনে আমার ঘেন্না ধরে গেল, সাধে কি আর বদনাম হয় পুলিসের—

দীপংকর বললে—থাকগে, কী কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—বলুন—

—হ্যাঁ বলি, পুলিসের চাকরি করি বলে কি ছোটলোক হতে হবে? এইটেই এ-লাইনে কেউ বোঝে না। আমি তো সকলকে এই কথাই বলি—যাক্‌গে—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আপনি এক কাজ করুন, আপনি পুরোন লোক, অনেক জানেন—। সকলের নামই আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, কিন্তু তার দরকার নেই, কারো নামই আপনার বলতে হবে না, আপনি কেবল অমৃত সরকারের ঠিকানাটা বলুন! আপনি তো তার বাসায় অনেকদিন গিয়েছেন। এখান থেকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে দরজা-জানালা-খড়খড়ি বন্ধ করে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যদি বাসার নম্বর না মনে থাকে তো দূর থেকে শুধু খড়খড়ি দেখিয়ে দেবেন—ব্যস্, আর কিছু না—

দীপংকর বললে—কে অমৃত সরকার?

রায় বাহাদুর সেকথার ধার দিয়েও গেলেন না। হঠাৎ চুরুটের গলগলে ধোঁয়া মুখ থেকে বার করে পকেট থেকে একগাদা নোট বার করলেন। দশ টাকার নোট। কেবল বারই করতে লাগলেন। থাক-থাক নোট। বার বার পকেটে হাত দিয়ে বললেন—রাখুন এগুলো আপনার কাছে—দশ হাজার টাকা, আমি গুনেছি,

তবু আপনার সামনে আবার গুনছি—

বলে একটা থাক্ গুনতে লাগলেন—এক, দুই, তিন—

দশ হাজার টাকা! এই টাকার জন্যেই সতীর কাছে সেদিন ধর্না দিতে গিয়েছিল দীপঙ্কর। দশ হাজারেরও দরকার নেই। ছ' হাজার হলেই চলে যায়। সব দেনা তাহলে শোধ হয়ে যায় দাতারবাবুর। দীপঙ্কর টাকাগুলোর দিকে অপলক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো।

—নিন এগুলো, আপনার কাছেই রাখুন, দেখি আপনার পকেট দেখি, আমিই পকেটে পুরে দিচ্ছি, তারপর না-হয় ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেব—নিন, আসুন—একটিমাত্র নাম তো ভারি বলবেন, অথচ কেউ যে জানতে পারবে, সে-ভয়ও নেই—মাঝখান থেকে আপনি এই দশটি হাজার টাকা বেকসুর পেয়ে গেলেন। কত লোকই তো রোজ অ্যারেস্ট হচ্ছে, অমৃত সরকারও তো অ্যারেস্ট হবে, আপনি কিছু না-বললেও অ্যারেস্ট হবে—বলতে গেলে আপনি ফাঁকতালে এতগুলো টাকা পেয়ে যাবেন। অথচ দেখুন আপনার পোজিশন নষ্ট হলো না—আপনি ভেবে দেখুন—

সেদিন এই পর্যন্ত।

অনেকখানি সময় দিয়েছিলেন রায় বাহাদুর ভাবতে। লক-আপের মধ্যেও অনেক ভেবেছিল দীপঙ্কর। দশ হাজার টাকা। তার মায়ের অভাব, তার তেত্রিশ টাকার চাকরি, তার ভবিষ্যৎ! জীবনে কোনও দিন সে কি দশ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে পারবে? কেউ জানবে না, কেউ সন্দেহও করবে না! কিন্তু অমৃত সরকার। কে অমৃত সরকার? এক কিরণ ছাড়া কাকেই বা সে জানে! আর কিরণের ঠিকানাও তো সে জানে না। কিরণের বাবার অসুখ, মায়ের দারিদ্র্য—নেপাল ভট্টাচার্যি-লেনের বস্তির বাড়িতে কিরণ তো আর থাকে না! কোথায় থাকে কিরণ, তারও তো ঠিক নেই। অথচ কিরণের নামটা বলে দিলেও দশ হাজার টাকা চলে আসে। কোথায় কেমন করে কিরণের সঙ্গে ম্যাডক্স স্কোয়ারে গিয়েছিল, কী-কী কথা হয়েছিল—সেইটুকু বললেও দশ হাজার টাকার মালিক হওয়া যাবে!

পরের দিন আবার সেই ঘরে। রায় বাহাদুর বসেছিলেন। পাশে আরো দুজন পুলিসের ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে।

দীপঙ্কর এগিয়ে যেতেই রায় বাহাদুর বললেন—এই যে আসুন আসুন, বসুন—

তারপর ইন্সপেক্টরদের দিকে চেয়ে বললেন—দীপংকরবাবুকে আপনারা মেরেছেন?

দুজনে চুপ করে রইলেন।

ধমকানি দিলেন রায় বাহাদুর। বললেন—ছি-ছি, আপনারা কি জানোয়ার?

একজন ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত দিতে আপনাদের বাধলো না—যান্ বেরিয়ে যান্ এখান থেকে—

তারা দুজন বেরিয়ে গেলেন। রায় বাহাদুরের আবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন—কী ঠিক করলেন?

—কী সম্বন্ধে বলছেন?

—ওই দশ হাজার টাকা। আরে মশাই, আপনাদের মতন বোকা তো আমি পৃথিবীতে দেখিনি, আমার এই এত বয়েস হলো। আপনি রেল কোম্পানীতে কত মাইনে পান? তেত্রিশ টাকা তো? আপনি একজন স্কলার বি-এ পাশ করে তেত্রিশ টাকার চাকরিতে ঢুকেছেন—শেষ-জীবনে আপনার কত মাইনে হবে? নব্বুই টাকা? তার বেশি তো নয়? দশ হাজার টাকা জীবনে একসঙ্গে কখনও পাবেন ভেবেছেন?

দীপঙ্কর কোনও উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

—আচ্ছা, এক কাজ করুন, অমৃত সরকার বা আর কারো নাম বলতে হবে না! আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিরণকে শুধু আপনি দেখিয়ে দেবেন, রাস্তায়, আপনার সঙ্গে আমাদের লোক দেব—ব্যস্, তারপর যদি আপনি চান তো আপনাকে আমরা বিলেত পাঠিয়ে দেব। আপনি পি-এইচ-ডি ডিগ্রী নিয়ে আসুন—নিজের উন্নতি করুন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন, আপনার বিধবা মা'র কথাও ভাবুন। একদিন এসব স্বদেশী দল ভেঙে যাবেই, তখন এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে-না—ডিগ্রী নিয়ে মোটা মাইনের চাকরি করুন, আমরাই আপনার চাকরি জুটিয়ে দেব। রেল কোম্পানীতে আর আপনাকে ঘানি ঘষতে হবে না—! আর তাছাড়া এই সামান্য কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় আপনার পক্ষে—কিরণ চাটুজ্জে আপনাকে খুব ভালোবাসে তা আমরা জানি, সে আপনাকে সন্দেহও করতে পারবে না—

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে ছিল।

রায় বাহাদুর বললেন—উত্তর দিচ্ছেন না কেন, বলুন?

দীপঙ্কর বললে—উত্তর দেবার আমার কিছুই নেই—

রায় বাহাদুর এবার কড়া হলেন একটু। বললেন—তাহলে কিন্তু আপনাকে রেগুলেশন থ্রি-তে আটকে রাখবো। জীবনে কখনও আর শিরদাঁড়া সোজা করতে পারবেন না—বলে রাখছি—টি-বি হবে, কালাজ্বর হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যাবেন—

দীপঙ্করের মনে হলো এক ঘুষি মেরে রায় বাহাদুরের মুখখানা বেঁকিয়ে বিকৃত করে দেয়। কিরণ! তার প্রাণের বন্ধু কিরণকে সে ধরিয়ে দেবে! এরা ভেবেছে কী? রেগুলেশন থ্রির ভয় দেখাচ্ছে। টাকার লোভ দেখাচ্ছে! বিলেতে পাঠাবার লোভ দেখাচ্ছে! এরা কি মানুষকে জানোয়ার ধরে নিয়েছে! চোখের সামনে রায় বাহাদুরের চুরোট-ধরা মুখখানা বড় বীভৎস দেখাতে লাগলো হঠাৎ!

হঠাৎ মনে হলো আবার যেন শয়তান সশরীরে নেমে এসেছে সংসারে। আবার যেন কালাপাহাড় এসেছে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে।

—কী হলো, জবাব দিন?

দীপঙ্কর বললে—আমি জবাব দেব না, আপনাদের যত কিছু অস্ত্র আছে সব আপনারা ব্যবহার করতে পারেন—

—তার পরিণাম কী ভেবে দেখেছেন?

দীপঙ্কর বললে—টি-বি, মুখে রক্ত উঠে মারা যাবো—

রায় বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—না মশাই, এতক্ষণ আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম—আপনি দেখছি সত্যিকারের বন্ধু-বৎসল লোক—

তারপর শান্তিকে ডাকলেন—শান্তি, ভদ্রলোককে আর একদিন ভাবতে সময় দাও—কাল একবার নিয়ে এসো—বলে রায় বাহাদুর চলে গেলেন।

এ-এস-আই শান্তিবাবু ঘরের বাইরে আসতে আসতে বললেন—কী মশাই, আপনি এমন চান্সটা ছেড়ে দিচ্ছেন?

—কিসের চান্স্?

শান্তিবাবু বললেন—রায় বাহাদুরকে তো আপনি চেনেন না, রায় বাহাদুর এমন চান্স কাউকে দেন না। আপনার ওপর কীরকম একটা ফ্যান্সি এসে গেছে ওঁর, এক-কথায় দশ হাজার টাকা বার করে দিলেন! আর আপনাকেও বলিহারি মশাই, সামান্য রেলের চাকরি করেন, আপনার বিধবা মা রয়েছে—তাঁর মুখের দিকে একবার দেখলেন না—

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

শান্তিবাবু বলতে লাগলেন—আমি পুলিসের লাইনের লোক মশাই, এ-সব কথা আপনাকে বলা উচিত নয়, কিন্তু আপনার কথা ভেবে না-বলেও পারছি না—আমারও মশাই বিধবা মা আছে বাড়িতে, তিনটে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আমাকে যদি এই চান্স কেউ দিত তো আমি ছাড়তুম না—আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন!

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন—যাক গে, আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন, আমার কী বলার দরকার—যান, আজকে রাত্তিরটা গিয়ে ভাবুন—কালকে বোধ হয় আটটার-মধ্যেই ঠেলবে রায় বাহাদুর—

দীপঙ্কর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল।

শান্তিবাবু হন্ হন্ করে এগিয়ে এল। বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি মশাই, কাউকে যেন বলবেন না, নইলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে—

—কী কথা?

—আপনি কায়স্থ, আমিও কায়স্থ, স্বজাতি! স্বজাতি বলেই বলছি—আসলে কী হয়েছে জানেন? আসলে আপনার বন্ধু কিরণ চাটুজ্জে ধরা

পড়েছে—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে আকাশ থেকে পড়লো! কিরণ ধরা পড়েছে? তাহলে কী হবে?

শান্তিবাবুর মুখখানাও কালো হয়ে উঠলো। গলা নিচু করে বললে—খুবই দুঃখের কথা অবশ্য! দেশ স্বাধীন হোক আমরাও চাই। চাকরি করি বলে আর একেবারে অমানুষ তো হয়ে যাইনি, আপনি খবরটা শুনে যেমন কষ্ট পেলেন, আমিও সেইরকম কষ্টই পেয়েছি—সত্যিই বড় দুঃসংবাদ!

দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারলে না। কিরণের ধরা পড়া মানে যে ফাঁস হওয়া। দীপঙ্করেরই সমান বয়েস। এই বয়েসেই তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হয়ে গেল!

শান্তিবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললে—আর ভেবে কী করবেন—যান্—

দীপঙ্কর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। শান্তিবাবু কাছে সরে এল এবার। বললে—কাউকে যেন বলবেন না যে খবরটা আপনাকে আমি বলেছি—

দীপঙ্কর বললে—না বলবো না—

—না, বলবেন না, কথা থেকে অনেক কথার জন্ম হয়। এই দেখুন না কিরণ আপনার নাম ধাম বলতেই তো আপনি ধরা পড়ে গেলেন! নইলে আপনার নাম তো আমাদের জানবার কথা নয়!

—কিরণ আমার নাম বলেছে?

শান্তিবাবু বললে—তবে আর বলছি কি মশাই, আজকালকার বন্ধুত্ব এমনিই জিনিস, আপনি তো দশ হাজার টাকার লোভ হেলায় এড়াতে পারলেন—কিন্তু যার জন্যে আপনি এত করলেন, সে তো করলে না? সে তো আপনার নাম ঠিকানা বলে দিলে টপ্ করে—

তারপর একটু থেমে শান্তিবাবু বললে—তাই তো আপনাকে বলছিলুম, দুনিয়া এইরকমই মশাই, আপনি এ-চান্স নষ্ট করবেন না—

সমস্ত মাথাটা যেন তোলপাড় করতে লাগলো দীপঙ্করের। অন্ধকার দরজা-বন্ধ ভ্যানের মধ্যে বসে দীপঙ্করের মনে হলো, সে যেন মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়বে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে। সেই কিরণ! সে এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলে! নিজের সর্বনাশ করেছে সে, দীপঙ্করেরও সর্বনাশ করলে! দীপঙ্করের ওপর তার এত হিংসে! সেই কিরণ! কত ভালো ভালো কথা শুনিয়েছে সে! কত ভালো-ভালো বই পড়িয়েছে! ভেতরে ভেতরে তার এই মতলব! সমস্ত রাস্তাটা দীপঙ্করের ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলো! কাউকেই তো সংসারে বিশ্বাস করা চলে না! শেষকালে অত্যাচারের কাছে মাথা নিচু করলে সে! কই, গোপীনাথ সাহা তো কারো নাম বলেনি। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস, শিবরাম, রাজগুরু—লাহোর মামলার কেউ তো কারো নাম বলেনি! তবে কেন কিরণ এমন করতে গেল। কেন

কিরণ ছোট করলে নিজেকে! দীপঙ্করের চোখে কেন এমন করে কিরণ নিজেকে ছোট করলে!

প্রত্যেক দিনই সেই ইলিশিয়াম রো আর ভবানীপুর থানা। সমস্ত পৃথিবী যেন পরিক্রমা করে আসা। সেদিন ইলিশিয়াম রো থেকে এসে দেখলে লক্-আপ্ ফাঁকা। কেউ নেই। কেউ নেই। ছিটে নেই, ফোঁটা নেই। এ ক'দিনে বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল ওদের সঙ্গে। ওদের বাড়িতে বাস করেও এত ঘনিষ্ঠ হয়নি দীপঙ্কর। যখন দেয়ালে মাথা দিয়ে দীপঙ্কর চুপ করে একলা বসে থাকতো, তখন ছিটে এক-একদিন কাছে আসতো। বলতো—কাঁদছিস নাকি রে? দেখি, মুখ তোল্, মুখ তোল্—

দীপঙ্করের মুখখানা নিজেই হাত দিয়ে তুলে ধরতো। বলতো—তাই বল্ আমি ভাবলাম কাঁদছিস্ বুঝি—

তারপর অভয় দিত। বলতো—অত ভাবছিস্ কেন? এই আমাদের কথা ভাব দিকিনি—! আমরা কতবার এখানে এসেছি, আবার একদিন ছেড়ে দিয়েছে—গায়ে কি সে-সব লেখা আছে আমাদের? সুভাষ বোসের কথা ভাব না, গান্ধীর কথা ভাব না।—কতবার এই ঘরে আমরা এক সঙ্গে পাশাপাশি কাটিয়েছি, আবার একদিন ছেড়েও দিয়েছে! তবে যাই বলিস ভাই, এত লোকের সঙ্গে তো কাটালাম এখেনে, তার মধ্যে সুভাষ বোস লোকটা দেখলাম সত্যিই ভালো মাইরি—লোকে যে-যাই বলুক, একদিন একটা বিড়িও খায় নি—ও খাঁটি লোক মাইরি—

ছিটেও আসতো। বলতো—আমারও এক-একবার এ-সব লাইন ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, জানিস্ দীপু, ঘেন্না ধরে গেছে এ-লাইনের ওপর। আগে এ-লাইনটা ভালো ছিল, ভদ্দরলোকেরা আসতো এ-লাইনে, মাল খেতো, ফুর্তি করতো, আর্টিস্টের খাতির করতো—আর আজকাল যত ছোটলোকের ভিড় হয়েছে, একটুখানি মাল খেলেই বেচাল হয়ে যায়, বাপ-মা তুলে কথা বলে—

একটা মনের মত শ্রোতা পেয়ে ফোঁটা যেন বেঁচে গিয়েছিল। দীপঙ্করের কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে বসতো।

বলতো—তবে শোন্, রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে একবার বাজাতে গেছি, লখনৌ থেকে আখতারী বাইজী এসেছে, আমি বাজাবো বলে যন্তর নিয়ে আস্তিন গুটোচ্ছি, রাজার ম্যানেজার কাছে এসে হাত জোড় করে বললে—ফটিকবাবু, একটু অনুগ্রহ করতে হবে—বলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, বিশ্বাস করবি না দীপু, খাঁটি বিলিতি হুইস্কির একটা বোতল খুলে দিলে। বললে—আগে নিবেদন করে নিন ফটিকবাবু, তা না হলে তবলা জমবে না আপনার—

তারপর যেন হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠতো ফোঁটা। থানার সেই অন্ধকার বীভৎস হাজতখানার ভেতরে দার্শনিক হওয়া ছাড়া কোনও গতিই ছিল না

যেন। বলতো—তাই জন্যেই তো তোকে বলছিলাম দীপু, ভদ্দরলোকের ছেলেদের এ-লাইনে থাকা চলে না, আজকাল আর মান-সম্মান থাকছে না আমাদের—বুঝলি, যারা এখনও ধা-গে-ধি-না শেখেনি, তারাই আজকাল তেহাই মেরে আসর পয়মাল্ করতে আসে—দুঃখের কথা আর কাকে কী বলবো ভাই।

সত্যি, ছিটে-ফোঁটারও যে দুঃখ আছে এ-কথা সেদিন ভবানীপুর থানার লক্-আপের মধ্যে না বাস করলে কি দীপঙ্কর কোনওদিন জানতেই পারতো? তখন বড় অশান্তিতে দিন কাটছিল দীপঙ্করের। সে-ক'দিন। সেই কিরণ! সেই কিরণ এমন করে ছোট করলে নিজেকে! এমন করে ছোট করলে সমস্ত দেশকে! এমন করে সমস্ত লোকের মুখে চুন-কালি লেপে দিলে। দীপঙ্কর না-হয় তেতিশ টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারী চাকরি নিয়েছে! কিন্তু কিরণ? কিরণ তো দীপঙ্কর নয়! দীপঙ্করের কাছে কেন কিরণ এত ছোট হয়ে গেল! এ অনুশোচনা যেন দীপঙ্কর ভুলতে পারলো না সে-ক'দিন। দশ হাজার টাকার লোভের প্রশ্ন তার মনে জাগতো না, বিলেত যাবার প্রলোভনও তাকে বিচলিত করতো না, রেগুলেশন-থ্রির ভয়ও তাকে সন্ত্রস্ত করতো না। কিরণের জন্যে সত্যিই তার দুঃখ হতো। এমন অধঃপতন কেন হল তার! ব্যাটারি-ঘরের এই অত্যাচারই সে সহ্য করতে পারলো না। তা হলে কেন এসেছিল স্বদেশীদের দলে? এইটুকু অত্যাচারেই সে সব বলে দিলে?

—কী ভাবছিস্ রে দীপু?

দীপঙ্কর বলতো—কিছু ভাবছি না তো—

—তবে অত মন-মরা হয়ে গেছিস্ কেন? কথা বলছিস্ না যে?

দীপঙ্কর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতো। বলতো—আমি আর কী বলবো? আমি তো তব্‌লার কিছু জানি না, তবলা আমি বাজাতেই পারি না—

ফোঁটা বলতো—তুই তব্‌লা শিখবি? শিখবি তো বল্, আমি শিখিয়ে দিতে পারি—

দীপঙ্কর বলতো—আমার দ্বারা ও-সব হবে না ভাই—

ফোঁটা বলতো—হবে না বলে কোনও কথা নেই। এই আমি শিখলুম কী করে?

ছিটে বলতো—চেষ্টা করলে আমিও শিখতে পারতুম, আমাকে যে আবার অন্য নেশায় ধরলে, নইলে—

ফোঁটা বলতো—তাহলে এক কাজ কর দীপু, তুই আমার কাছে রেগুলার আয়, রাত্তির এগারোটার সময় লোটনের ঘরে আয়—আমি তোকে তালিম দেব, তিন দিনে তোকে ধা-গে-ধি-না তুলে দেব—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—লোটন কে?

—সে কি রে? লোটনকে চিনিস না? কালিঘাট বাজারের নামজাদা মেয়েমানুষ যে রে ঠিক হিন্দু-হোটেলের পেছনেই পাকা টিনের ঘর, আমাদের

চন্নুনীর মেয়ে—

চন্নুনীর মেয়ে! সেই অন্ধকার লক্-আপের মধ্যেই দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইলে ফোঁটার দিকে।

ছিটে বললে—সে কিরে, তুই লোটনের নামই শুনিস্ নি, অ্যাদ্দিন কালিঘাটে আছিস? তা লক্কার নাম শুনেছিস?

লক্কা! দীপঙ্করের চাউনি দেখেই ছিটে-ফোঁটা বুঝতে পারলে যে, দীপঙ্কর দুজনের নামই শোনেনি। সত্যিই অবাক হবার মতই খবর বটে! এতদিন কালিঘাটে আছে, এতদিন এই পাড়ার মধ্যে লেখাপড়া করেছে, এই পাড়া থেকেই বি-এ পাশ করেছে, এই লক্কা আর লোটনের খবরটাই রাখে না।

—তুই দেখছি বি-এ পাশই করেছিস্ বিদ্যের নামে অষ্টরম্ভা!

ফোঁটা বললে—তা নাম শুনিস আর না-শুনিস কিছু আসে যায় না। তুই হিন্দু-হোটেলের পেছনে ঢুকে পাকা টিনের চালের বাড়ির দরজায় গিয়ে—'লোটন্' 'লোটন্' বলে ডাকবি, রাত এগারোটার সময়, ডাক শুনেই আমি বেরিয়ে আসবো—

তারপর অভয় দিয়ে বললে—তোর কিছু ঘাবড়াবার দরকার নেই, লোটন আমার নিজের মেয়েমানুষ, কেউ যদি কিছু বলে তো আমার নাম বলে দিবি, ব্যস্, ও-পাড়ার গুন্ডারা সব আমার হাত-ধরা! তুই অ্যাদ্দিন আছিস্ আর এইটেই জানতিস্ না! আমিই তো লোটন্‌কে রেখেছি বে—আর দাদা রেখেছে লক্কাকে—চন্নুনীর বড় মেয়েকে—

ছিটেও সায় দিলে। বললে—হ্যাঁরে, তুই জানতিস্ না? লক্কা তো আমারই মেয়েমানুষ, চন্নুনীর বড় মেয়ে—

ছিটে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তা চন্নুনী অঘোরদাদুর কে জানিস তো? জানিস তু ... জানিস্ না?

থানার লক্-আপের মধ্যে মানুষ বোধ হয় সত্যিই অমানুষ হয়ে যায়। সুস্থ স্বাস্থ্যবান মানুষই অসুস্থ হয়ে ওঠে, তাতে ছিটে-ফোঁটার তো কথাই নেই। সে-ক'দিন ছিটে-ফোঁটার কথা শুনে শুনে দীপঙ্করের সত্যিই কোনও ঘৃণা হতো না ওদের ওপর, শুধু বড় মায়া হতো। মায়া হতো এই ভেবে যে, এই একই দেশের মধ্যে এরাও তো থাকে! এরাও বাঁচে আর এদেরও তো বংশ-বৃদ্ধি হয়! দেশে স্বরাজ এলে এদেরও কি একদিন ভোট দেবার ক্ষমতা হবে? এরাও কি আবার ভোট দেবে! এদেরও ভোটের ওপরেই কি একদিন দেশের ভাল-মন্দ নির্ভর করবে! কোথায় যেন কোন্ বইতে পড়েছিল দীপঙ্কর—এরাই ইতিহাসের ডাস্টবিন! ছিটে-ফোঁটা বোধ হয় তাই!

—আরে সেই জন্যেই তো বিন্তীর বিয়ে হচ্ছে না। তা জানিস না!

ছিটে-ফোঁটার হাসির আওয়াজ শুনে লক্-আপের বাইরের কনস্টেবলটা পর্যন্ত একবার পেছন ফিরে চাইলে।

—হল্লা মাত্ করো, হল্লা মাত্ করো—

যত কুৎসিতই হোক, যত অশ্রাব্যই হোক, তবু দীপঙ্করের কাছে মনে হয়েছিল এ-ও তার এক আবিষ্কার যেন। এখানে এসেই যেন জীবনকে আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কার করলে দীপঙ্কর! এতদিন ছোটবেলা থেকে কেবল লাইব্রেরী করে বেড়িয়েছে, স্বদেশীর খবর রেখেছে, সি আর দাশ, সুভাষ বোস আর কংগ্রেসের নাম শুনেছে, সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধু আর প্রাণমথবাবুর উপদেশ—এই সবই জেনে এসেছে। কিন্তু এরাও তো সংসারের মানুষ! এরাও তো পৃথিবীতে রয়েছে! এ দিকটা এতদিন দেখেনি তো সে! দীপঙ্কর সত্যিই অবাক হয়ে গেল।

—তুই এইতেই অবাক হয়ে গেলি, আর আরো সব সদি বলি তো তুই সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা যাবি রে—

ছিটে বললে—আরে চন্নুনী যে আগে জোয়ান বয়েসে খাসা দেখতে ছিল—

তা হবে! তাই হয়ত লোকে বিন্তীদিকে দেখতে আসে, রসগোল্লা-সিঙাড়া খায়, পছন্দও করে। কিন্তু তার পরে বংশ-পরিচয় খোঁজ-খবর নেবার পর আর কোনও খবর দেয় না। আর কোনও উৎসাহ দেখায় না। সেই জন্যেই হয়ত ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে মা অত পীড়াপীড়ি করে। সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে তার দীপুকে উদ্ধার করে ভদ্র পরিবেশে নিয়ে যেতে চায়। সব আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে দীপঙ্কর। চন্নুনীর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করলে। যৌবনে কি সুন্দরী ছিল চন্নুনী? বিপত্নীক অঘোরদাদুকে হয়ত সেদিন চন্নুনীই সান্ত্বনা দিয়েছে। চন্নুনী না-থাকলে সেদিন একটি নাতনী আর দুজন নাতির সেই সংসার কে চালাতো! কে তাদের বড় করেছে, কোলে করে মানুষ করেছে। হয়ত অঘোরদাদুর তখনও রক্তের তেজ কমেনি, হয়ত চোখে তখনও ছানি পড়েনি। বিপত্নীক অঘোরদাদুর চোখে হঠাৎ ভালো লেগে গিয়েছিল চন্নুনীকে। গ্রাম থেকে চোদ্দ বছরের একটি বামুনের ছেলে একদিন একটি বস্ত্র সম্বল করে কালিঘাটের এলাকায় এসে ভাগ্য-অন্বেষণ করতে করতে কখন যৌবন কাটিয়ে দিয়েছিল অবহেলায়। সেদিন অর্থ ছিল না, আশ্রয় ছিল না, বলতে গেলে কিছুই ছিল না। যখন হলো সব, তখন আর-একটা দিক একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। স্ত্রী গেছে, কন্যা গেছে, তিনটি নাতি-নাতনী গলগ্রহ হয়ে গলায় ঝুলছে। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ নজরে পড়লো চন্নুনীকে! আর অঘোর ভট্টাচার্যি যেন নতুন করে আবার তার যৌবন ফিরে পেলে। আবার তার জীবন ফিরে পেলে। বিপত্নীক অঘোর ভট্টাচার্যির সংসার আবার পূর্ণ হয়ে উঠলো। স্ত্রী, কন্যা হারিয়ে যে-সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল আবার তা জোড়া লাগলো। তখন একদিন এসে হাজির হলো মা, আর এসে হাজির হলো দীপঙ্কর।

সেসব অনেক দিনের কথা। তারপর চন্নুনী বুড়ো হয়েছে, অস্থিসার চেহারা

হয়েছে তার। বিন্তী বড় হয়েছে, ছিটে-ফোঁটাও বড় হয়েছে। কিন্তু ঘোল দিয়েই বুঝি দুধের স্বাদ মিটিয়েছে অঘোরদাদু। তাই ভাঙা সংসার আবার ভেঙেছে। যৌবন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য আবার তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে।

এতদিন পরে দীপঙ্করের চোখের সামনে সব যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

যাবার আগের দিনও বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। আগের দিনও ফোঁটা বলেছিল—তা হলে ঠিক আসিস কিন্তু, বাজারের পেছনের পাকা টিনের বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকবি! লোটনের নাম মনে থাকবে তো?

পরের দিন আবার সেই ইলিশিয়াম রো। আবার সেই রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারের জেরা।

—কী ঠিক করলেন, দীপঙ্করবাবু?

শান্তিবাবু সঙ্গে ছিল। বললে—আমিও অনেক বুঝিয়েছি স্যার, কিন্তু কিছু বার করতে পারছি না—

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। রায় বাহাদুর যেন কী ভাবতে লাগলেন চুরোট মুখে দিয়ে। বললেন—তা হলে রেগুলেশন থ্রি-তেই ঠেলে দাও—

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনারা সত্যি বলছেন,—কিরণ ধরা পড়েছে?

—তা সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলছি? মিথ্যে বলে আমাদের লাভ?

—কিরণ আমার নাম করেছে আপনাদের কাছে?

—তা কিরণ না-বললে আমরা আপনার নাড়ী-নক্ষত্র জানলুম কী করে বলুন? এই রকম ভাবেই তো নাম-ধাম আদায় হয়। আর তাছাড়া শুধু কিরণ কেন, আপনাদের দলের সব লোককেই একে-একে ধরে ফেলবো। কেউ-ই বাকি থাকবে না। আর কটা মাস আমাদের সময় দিন! তাই তো বলছিলুম, আপনি শুধু বোকামি করছেন—নেহাত আপনি বিধবার একমাত্র ছেলে বলে আপনাকে এই স্পেশ্যাল অফার দিচ্ছি—

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল আবার। এমন কেন বললে সে! এমন করে কেন সকলের সর্বনাশ করতে গেল সে! কিরণই তো বুঝিয়েছিল তাকে একদিন যে বড় বড় রাজ্য-সাম্রাজ্য একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, বড় বড় ঐশ্বর্যভাণ্ডারও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ, সে যে চিরকালের! সেই মনুষ্যত্বের অপমান শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ তা পূর্ণতার অন্তর্ধান। সেই মনুষ্যত্বই ছিল কিরণের একমাত্র সম্পদ। কিরণের অর্থ ছিল না, ঐশ্বর্য ছিল না। বংশগৌরব, পদমর্যাদা, বিত্ত-বৈভব, কিছুই ছিল না তার। তবু তো দীপঙ্কর তাকে ভালবাসতো। সেই ভালবাসার এমন করে প্রতিদান দিতে হয়?

সেদিন ফিরে এসে ছিটে-ফোঁটাকে আর দেখা গেল না। পাশের অন্য দু-

চারজন লোক যারা ছিল, তারা বললে, তারা সকালেই ছাড় পেয়ে গেছে। ভালোই হলো। দীপংকর একলাই এক কোণে বসে কাটিয়ে দিয়েছিল সেদিনটা। ভালোই হয়েছিল সেদিন। দিন-রাত বড় বিরক্ত করতো দুজনে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওরা করায়ত্ত করে ফেলেছে এমনি ওদের ভঙ্গি। অথচ দীপংকরের মায়া হতো। মনে হতো ওরা কত দরিদ্র তা ওরা নিজেরাই জানে না। কালিঘাট বাজারের পৃথিবীটাকেই ওরা গোটা দুনিয়া ভেবে নিয়ে মহা আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। লোটন আর লক্কা আর চমনী আর বিন্তীদি আর অঘোরদাদুকে কেন্দ্র করেই ওদের পরিক্রমা, তার বাইরের হাজার হাজার ঐশ্বর্যের সন্ধানই রাখে না ওরা। ওরা বড় অল্পেতে তুষ্ট, দুটো বিড়ি দুটো হাত-খরচের পয়সা, একটু নেশার জিনিস দিয়েই যে-কেউ ওদের কিনে নিতে পারে। তাই যখন গল্প করতে করতে দীপংকর ওদের দিকে চেয়ে দেখতো,—তখন দুঃখও হতো ওদের জন্যে, মায়াও হতো ওদের জন্যে! বেশি হৈ-চৈ, গোলমাল করার জন্যে ওরা চাবুক খেত, বেত খেত, শাস্তি পেত। তবু একটু পরেই আবার হাসতো।

বলতো—এর সব শোধ নেব একদিন কড়ায়-গণ্ডায়—দেখে নিস দীপু, কড়ায়-গণ্ডায় শোধ তুলে নেব একদিন—

তারপর গলাটা নিচু করে মুখটা কাছে সরিয়ে এনে বলতো—মাসে মাসে যে পাড়া থেকে তিরিশ টাকা চাঁদা তুলে দিই, তা কি অমনি-অমনি?—মাগীদের রক্ত-ওঠা পয়সা, তার দাম নেই?

প্রতি মাসে পুলিস-কনস্টেবলদের কত করে ঘুষ খাওয়াতে হয় বাজারের মেয়েমানুষদের, তার হিসেব ছিটে-ফোঁটার মুখস্থ। আবগারী ডিপার্টমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে কারবারের যা কিছু মুনাফা হয়, তাতে বখরাও নেবে, আবার চোখও রাঙাবে। সেই লক্-আপের মধ্যে বসেই ছিটে-ফোঁটা মিথ্যে আস্ফালন করতো গলা নিচু করে আর বলতো—এখান থেকে বেরিয়ে সব কড়ায়-গণ্ডায় শোধ নেব এই তোকে বলে রাখছি দীপু, দেখে নিস—

সেই ছিটে-ফোঁটাই আর নেই। সমস্ত লক্-আপটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল তাই।

হঠাৎ চোখের সামনে লোহার রেলিং দেওয়া ভারী গেটটা হড়্-হড়্ করে খুলে গেল একদিন।

হয়ত আবার বাইরের নতুন কেউ ঢুকছে। কিম্বা ভেতরের কাউকে আবার তলব হয়েছে বাইরে।

—দীপঙ্কর সেন!

এ-এস-আই-এর গলা। দীপংকর চোখ তুলে চাইলে।

—আপনার অর্ডার হয়ে গেছে, আসুন, বাইরে আসুন—

অর্ডার। কিসের অর্ডার! দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। যেন বিশ্বাস হলো না। এ ক'দিন দীপংকর ভুলেই গিয়েছিল যে, সে এই পৃথিবীরই মানুষ একজন।

ভুলেই গিয়েছিল এই পৃথিবীর বাতাসে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অধিকার আছে তার।

—কিসের অর্ডার বললেন?

—রিলিজ্ অর্ডার!

মনে আছে দীপংকর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। বাইরে এসে তখন রাস্তায়-রাস্তায় বাতি জ্বলো দেখেও তবু বিশ্বাস হয়নি। তাই সেই চেনা ভবানীপুরের চেনা রাস্তায় দীপঙ্কর প্রাণ ভরে চারদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল শুধু খানিকক্ষণ। যে-পৃথিবী সুখ দেয়, দুঃখও দেয়, যন্ত্রণা দেয়, সান্ত্বনাও দেয়, যে-পৃথিবী প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠতায় সহজেই পুরোন হয়ে ওঠে, যে-পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের জন্মের সম্পর্ক, মৃত্যুর সম্পর্ক, যাকে প্রতি মুহূর্তে পদদলিত করি, আবার যার আশ্রয়ে আবহমানকাল বাঁচি, সেই পুরোন পৃথিবীকেও যেন বড় ভালো লাগলো দীপঙ্করের। সেইদিনই বিশেষ করে মনে হয়েছিল—এই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যেন আর শেষ নেই। সে-সম্পর্ক যেন জীবনকালেরই নয়, জীবনাতীত কালেরও। একদিন অন্য সব সম্পর্কের মত পৃথিবীর সম্পর্কেরও হয়ত সাময়িকভাবে শেষ হয়, কিন্তু মানুষের ইতিহাসের বিচারে সেইটুকুই যেন তার কাছে কল্পকাল বলে মনে হয়েছিল সেদিন। সেদিন সেই ভবানীপুরের জনবহুল রাস্তাটাকেই দেখে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল তার জীবনের সব সম্পর্কের সূত্র যেন এইখানে এসেই মিলেছে। এতদিন যে-পথের বিভ্রমে দীপঙ্কর ঘুরে মরেছে, কখনও প্রেম, কখনও অবিশ্বাস, কখনও তাচ্ছিল্য, কখনও বাধা-বিপত্তি, কখনও আনন্দ—আজ যেন সকলের ঐক্য-সাধন হয়েছে এই জেলখানার দরজার সামনেই—এই হাজত-ঘরের বাইরেই। এতদিন যেন ভাগ্যচক্র তাকে ঠিক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ভালবাসা যে দীপংকর পায়নি তা সত্যি নয়, আবার ভালবাসা যে পেয়েছে তা-ও সত্যি নয়। এই পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বের আন্দোলনে যখন আছাড় খেয়ে পড়েছে দীপঙ্কর, তখনই যেন ঠিক পথের সন্ধিস্থলে এসে তার গম্যস্থানের নির্দেশটুকু পেয়েছে। হয়ত বিচ্ছিন্ন না হলে দৃষ্টির বিভ্রম দূর হয় না। পৃথিবী থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বলেই যেন আবার এই পৃথিবীর এই ভবানীপুরকে এত ভালো লাগলো। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে এ অনেক দূর নয়, তবু এইটুকু রাস্তা চিনে আসতে যেন তার বহুকাল সময় লাগলো। কিরণকে হয়ত সে ভোগই করতে চেয়েছিল প্রাণ ভরে। কিরণকে হয়ত ভালবেসেছিল দীপঙ্কর স্বার্থপরের মতই। তাই বোধহয় তার অনুরাগ আর বিচ্ছেদের মধ্যে এমন বিরোধ ঘটলো আজ! তাই বোধহয় কিরণের এই অপঘাত-মৃত্যু তাদের দুজনের সমস্ত সম্পর্কের সূত্র এমন করে বিলোপ ঘটিয়ে দিলে!

—দীপংকর!

কোন দিন, কোনও রাত্রে যদি কোন অশরীরী আত্মা তাকে ডাকে, সে-ও যেন

এমনি করেই ডাকবে। হরিশ মুখার্জি রোডের ভেতর দিয়ে আত্মগোপন করেই চলেছিল দীপঙ্কর। মনে হলো তার অতীত যেন তাকে আবার পেছন ফিরতে বলছে। বলছে—সব ভুল, আমিই সত্যি। অতীতের আনন্দও সত্যি, অতীতের দুঃখটাও সত্যি! ভবিষ্যৎ তোমার যতটুকু সত্যি, অতীত তার চেয়ে কম সত্যি নয়। তবু দীপঙ্কর দু চোখ বুজে চলতে লাগলো। কী হয়েছে তার। কিছুই হয়নি! এমন কত বিপর্যয় ঘটে, কত অধঃপতন ঘটে! আবার উত্থানও আছে, সংসারে অভ্যুত্থানও আছে। হয়ত এই ক'দিনের অনুপস্থিতিতে তার চাকরি আর নেই, হয়ত তার জন্যে কেঁদে-কেঁদে মা-ও রোগশয্যায়। তবু উত্থান আছে, অভ্যুত্থানও আছে সংসারে। হয়ত ভুবনেশ্বরবাবু এসে সতীকে বর্মায় নিয়ে চলে গেছেন। হয়ত বাবার আসার খবর পেয়ে লক্ষ্মীদিও এসে বাবার পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়েছে, আশীর্বাদ পেয়েছে। হয়ত ভুবনেশ্বরবাবু আশীর্বাদ করেছেন। তা হোক, তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক......

—দীপংকর!

দীপঙ্কর দুই হাতে নিজের কান বন্ধ করে দিলে—না, তার আত্মার পেছু-ডাক সে শুনবে না। পেছনটা মিথ্যে! অতীতটা অসত্য!

—কীরে, অমন করে কোথায় চলেছিস?

একটা হাত এসে কাঁধে পড়লো। দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইতেই হতবাক হয়ে গেছে।

নির্মল পালিত! কোট, প্যান্ট, টাই—একেবারে নিখুঁত পরিপাটি নির্মল পালিত!

দীপঙ্কর কী করবে ভেবে পেলে না খানিকক্ষণ! সেই ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে। তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। এই বাড়ি থেকেই একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের, আবার এই বাড়ির সামনেই একদিন সতীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দীপঙ্করের। সে কত বছর আগের ঘটনা সব। বুকের বোতামের ফুটোতে গোলাপ ফুলের কুঁড়ি, ঘন ঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

—কী করছিস তুই আজকাল?

—চাকরি!

নির্মল জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

—রেলওয়েতে!

—কত পাস?

—তেত্রিশ টাকা স্টার্টিং!

নির্মলের মুখখানা ম্রিয়মাণ হয়ে উঠলো। বললে—বড্ড পুওর পে তোদের—তা হলেও তোর পক্ষে নট্ ব্যাড্ আইদার—

দীপঙ্কর কিছু বলবার আগেই নির্মল বলতে লাগলো—আমি সেদিন সেই কথাই কাকে যেন বলছিলাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রবিনসনকে—রবিনসনকে

চিনিস তো?

—হ্যাঁ. তোর সঙ্গে কী করে আলাপ হলো?

নির্মল বললে—ও তো আমার ওল্ড ফ্রেণ্ড রে, ভেরি ওল্ড ফ্রেণ্ড—

—তোর বাবার বন্ধু?

—না-না, আমার! রোটারীর মেম্বার আমরা! লোকটা ভালো, বেশ হাই-ডিয়ার লোক. আমি বলছিলাম বুড়োকে যে, এই যে কান্ট্রি-ওয়াইড ডিস-স্যাটিস-ফ্যাকশ্যান, এর জন্যে দায়ী তোমাদের পুওর পে—এটা রিভাইজ না করলে এসব দিন-দিন বেড়েই চলবে—হ্যাঁ, ভালো কথা—

নির্মল পালিতের যেন কী-একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

বললে—বাই-দি-বাই. আমাদের সেই কিরণ, তোরও বন্ধু ছিল, আমি একবার তার লাইব্রেরীর চাঁদাও দিয়েছিলাম মনে পড়ছে—সে নাকি একেবারে বখে গেছে? শুনেছিস কিছু তুই?

দীপংকর স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নির্মল বলতে লাগলো—শুনলাম. টেররিজম্ করে বেড়াচ্ছে—শুনে আমি বড় শক্ পেলাম. আই গট হার্ট—হাজার হোক এককালে তো চিনতাম তাকে—সেই শেষকালে.... অবশ্য পভার্টি, পভার্টিই এর একমাত্র কজ্—আমি সেই কথাই সেদিন রবিনসনকে......

হঠাৎ বাঁ-হাতের কব্জিটা উল্টে দেখেই লাফিয়ে উঠলো।

—মাই গড্—

পাশের গ্যারেজ থেকে একটা বিরাট গাড়ি বেরিয়ে আসছিল। সেই দিকে চেয়েই যেন কথাটা মনে পড়ে গেল নির্মলের।

বললে—পাস্ট সেভেন—

—কোথাও যাবি বুঝি? দেরি করিয়ে দিলাম—

নির্মল বললে—বেশি দূরে যাবো না, সতী মিত্তিরের বিয়ে—জয়ন্তীর বন্ধু—

সতী!

নির্মল বললে—আগে তোদের পাড়াতেই ভাড়া থাকতো. ভদ্রলোকের অপরাধ তিনি সি-আই-ডি—দেশটা যে লিডিং টুওয়ার্ডস হোয়াট—আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় পভার্টি—আর কিছু নয়. আমি সেদিন সেই কথাই রবিনসনকে.

—সতীর বিয়ে হচ্ছে? সতীর? ঠিক বলছিস?

নির্মল বললে—বিয়ে ঠিক নয়, মানে যাকে বলে বৌভাত আর কি, এই তো কাছেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে. জয়ন্তীকে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দেব—আমিও একটু দেখা করে যাবো আর কি! সতীর বাবা যাহোক এ ক'দিনের মধ্যে একটা ভাল পার্টি পেয়ে গেছেন। মালটি-মিলিওনেয়ার লোক, জানিস্ তো—বরটাও ভালো পেয়েছে. বেশ হ্যান্ড্সাম্ চেহারা. সনাতন ঘোষ আমাদের পুরোন ক্লায়েন্ট

আবার—

আরো যেন কী সব বলে গেল নির্মল পালিত। আধা-ইংরিজী আধা-বাঙলা মিলিয়ে যত কথা বললে তার কিছুই কানে যায়নি দীপঙ্করের। হঠাৎ গাড়িটার স্টার্ট নেওয়াতেই চমকে সরে এল ফুটপাতের ওপর। এক পলকে শুধু দেখতে পেলে গাড়ির ভেতরে নির্মল পালিত বসে আছে, আর তার পাশেই তার বোন জয়ন্তী। এক পলকই মাত্র। বলতে গেলে এক পলকও নয় ঠিক। এক পলকের হয়ত একটা ভগ্নাংশ। কিন্তু গাড়িটা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীপঙ্কর সেখানে।

রাত আরও বাড়ছে।

তারপর হরিশ মুখার্জি রোড পেরিয়ে, হাজরা রোড পার হয়ে সেই কালিঘাট বাজারের রাস্তাটা। ওখানে আরো ভিড়, আরো আলো, আরো গোলমাল। অনেক পথচারীকে পাশ কাটিয়ে আসতে আসতে দীপঙ্কর নিজেকেও যেন অতিক্রম করে গেল। যেন তার উত্তরণ হলো! যেন তার প্রমোশন।

ভিড়ের মধ্যে থেকেই একজন তার হাত ধরেছে।

—তোকে ছেড়ে দিলে ব্যাটারা?_ এই এখন আসছিস বুঝি?

দীপঙ্কর একেবারে ফোঁটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লো।

ফোঁটা বললে—ভালোই হয়েছে, আয়, চল তোকে আজ থেকেই আরম্ভ করে দিই—

ফোঁটা বাজারের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল হাত ধরে।

দীপঙ্কর বললে—কোথায়?

—সেই তবলা? ধা-গে-ধি-না'টা তুলে দেব চল্—লোটনের ঘরে!

দীপঙ্কর এক ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা টেনে নিলে। হঠাৎ যেন কোথা থেকে অমানুষিক শক্তি ফিরে এল দীপঙ্করের শরীরে। ফোঁটাও অবাক হয়ে গেছে। সে ঝাঁকুনি খেয়ে প্রায় টলে পড়েছিল আর একটু হলে। আর ততক্ষণে দীপঙ্কর হন হন্ করে সোজা পাথরপটির দিকে এগিয়ে গেছে। পেছনে ফোঁটা কী যেন বললে—কিন্তু তাতে কান দেবার সময় তখন আর নেই। যেন দেরি করলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে তার। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল। তার সামনে দিয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের গলিটার মধ্যেও ঢুকতে হয়। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো দীপঙ্করের। অকারণ ভয় যে কেন, কেন যে এই অকারণ রোমাঞ্চ কে জানে। বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো। বাড়ির সামনে সতীদের বাড়ির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। সদর দরজায় একটা মস্ত ভারি তালা ঝুলছে। আর দেয়ালের গায়ে সেই সাইনবোর্ডটা আবার ঝুলছে—'বাটি ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও যেন ঢুকতে পা সরলো না দীপঙ্করের!

মা হয়ত বিছানায় শুয়ে আছে। হয়ত দীপুর জন্যে কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে! যাবার দিন মার আর্তনাদ যেন তাকে থানা পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল। সে আর্তনাদ যেন তখনও থামেনি। হঠাৎ তাকে দেখে মা হয়ত লাফিয়ে উঠবে। মা জানেও না দীপঙ্কর ছাড়া পেয়ে গেছে। মার কাছে কেউ এসে সে খবরটা দেবারও নেই।

—মা!

একবার ভাবলে বাইরে থেকেই ডাকবে মাকে। ডেকে বলবে যে একবার এখুনি সে ফিরে আসবে। কিন্তু ডাকতে গিয়েও গলা দিয়ে তার স্বর বেরোল না। আজ কতদিন সে খায়নি। শুধু কয়েকটা কচুরি আর আলুর তরকারি দিয়েছে তাকে দু-বেলা। পা-ও যেন টলছে দীপঙ্করের। যেন বাড়িতে গিয়ে বিছানার ওপর গড়াতে পারলেই ভালো হয়। কিন্তু ডাকতে গিয়েও গলাটা বন্ধ হয়ে এল তার। যদি কেউ তাকে এ অবস্থায় দেখে ফেলে। যদি চন্নুনীও এই সময়ে বাইরে আসে হঠাৎ? দরজা খুলে বাইরে আসতেই হঠাৎ তার ওপর নজর পড়ে যায়? দীপঙ্কর আবার ফিরলো।

ঠিক যে-পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়ে। তারপর মায়ের মন্দিরটার উত্তর দিকের নতুন রাস্তাটা ধরে আবার চলতে লাগলো। তারপর রসা রোড ধরে সোজা হাজরা রোড। তারপর পুব দিকে বেঁকে বাঁ দিকে প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। কত নম্বর বাড়ি তা-ও জানা নেই। শুধু রাস্তার নামটা বলেছে নির্মল পালিত।

গলিটার মধ্যে ঢোকবার আগেই দূর থেকে নহবৎ-এর সুর কানে এল।

দীপঙ্কর গলির মুখ থেকে ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজানো। বাড়ির ছাদের মাথায় ম্যারাপ বাঁধা। গলির মুখ থেকে গাড়ির ভিড় শুরু হয়েছে, সেই সার-দেওয়া গাড়ি শেষ হয়েছে অনেক দূরে গিয়ে। নহবতে কী সুর বাজাচ্ছে কে জানে! যেন নেশা ধরতে লাগলো দীপঙ্করের মাথার ভেতরে। কদিন থেকে যে দীপঙ্কর না-খেয়ে আছে তাও যেন সে ভুলে গেল। কাল থেকে তার চাকরি থাকবে না তাও যেন তার মনে রইল না। তার যে মার অসুখ, তার মা যে শয্যাশায়ী তাও মনে রইল না। চারিদিকে অনেক ভিড়, অনেক উৎসব, অনেক আদর আপ্যায়নের অকুণ্ঠ আয়োজন। সেখানে বোধহয় দীপঙ্করই একমাত্র অনাহূত, দীপঙ্করই বোধহয় একমাত্র অপাঙক্তেয়। তবু তার মনে হলো এই ভালো হলো। এই-ই তো ভালো। একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা অপাঙক্তেয় হয়ে যাওয়াই তো ভালো। এই বিচ্ছেদকে অতিক্রম করেই দীপঙ্কর পূর্ণ হবে। এতদিন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি বলেই যেন যত বিক্ষোভ তাকে বিব্রত করেছে। এখন আর কোনও দায় রইল না তার, দায়িত্বও রইল না। এখন আর কাউকে তার প্রয়োজন নেই, এখন আর কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই তার। একে একে তার তালুকদারির

সমস্ত স্বত্ব উপস্বত্ব যেন সে ত্যাগ করে দিলে স্বেচ্ছাচিত্তে বহাল-তবিয়তে। একদিন অন্যোন্য আলো-গন্ধ নিয়ে যদিই বা তার কোনও অস্থিরতা সে প্রকাশ করে থাকে আজ আর তো রইল না। আজ সর্বরিক্ত হয়ে দীপঙ্কর তার সর্বস্ব নিবেদনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেলে।

তখনও আলো আর আনন্দ আর আপ্যায়নের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই।

লাল শালু ঢাকা ক্যানাতের পাশ দিয়ে অসংখ্য নিমন্ত্রিতের আনাগোনা চলেছে তখনও। দীপঙ্কর দোতলার খোলা জানালাগুলোর দিকে অনির্দিষ্ট চাউনি তুলে নিজের মনে কী দেখতে লাগলো কে জানে! আজকের এই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দীপঙ্কর কেউই নয়, আজকের উৎসবের অনুষ্ঠানে দীপঙ্করের উপস্থিতি অপরিহার্যও নয়—। তবু কান্নায় বুকটা ভারি হয়ে এল তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের মনে হলো—তার অন্তরের গোপন অন্তস্তল থেকে কে যেন অত্যন্ত নিঃশব্দে এক অস্ফুট বাণী উচ্চারণ করে চলেছে। দীপঙ্কর কান পেতে শুনতে লাগলো—তোমার আমার মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান, এ তো আমারই সৃষ্টি। ব্যবধান না থাকলে তুমি যে থেমে যাবে মাঝ-পথে, বিচ্ছিন্ন না হলে তুমি যে ভুলে যাবে আমাকে। এখানেই তোমার যে শেষ নয়, এখানে যে তোমার পূর্ণচ্ছেদও নয়। এখনও যে তোমার অনেক পথ বাকি। এগিয়ে চলো দীপঙ্কর, এগিয়ে চলো—

দীপঙ্কর অস্থির হয়ে চারপাশে দেখতে লাগলো ভয়ে ভয়ে। কে বলছে কথাগুলো! কে কাকে বলছে! চারদিকের ওই ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলো সে। সবাই যেন তাকে সন্দেহ করছে। সে এখানে কী করতে এল! ছি, ছি।

হঠাৎ একটা গাড়ি আসতেই চারদিকে পুলিস পাহারায় কড়া ব্যবস্থা হয়ে গেল। সসম্ভ্রমে সরে গেল সবাই। এতক্ষণে সবাই সাদর অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল দেখে। সেই রায় বাহাদুর। আই-বি ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার। রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। কালো কুচকুচে দশাসই চেহারা। বিরাট লম্বা দেহখানা গাড়ি থেকে নামতেই সবাই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন—আসুন আসুন রায় বাহাদুর—

দীপঙ্কর লজ্জায় ঘৃণায় আর এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না সেখানে।

গলিটা পেরিয়ে হাজরা রোডের বিস্তৃত পরিধির অবকাশে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচলো। এইই তো ভালো হলো। এখানেই তার শেষ নয়, এখানেই তার পূর্ণচ্ছেদ নয়। এখনও যে অনেক দূর—এখনও যে অনেক দূরে যেতে হবে তাকে!

বাড়িতে ঢুকেই কিন্তু মাকে ডাকতে সাহস হলো না। মার যদি অসুখ হয়ে থাকে। মা যদি সেই দিন থেকে কেঁদে কেঁদে শরীর খারাপ করে ফেলে থাকে!

প্রথমেই চন্নুনীকে দেখতে পেলে।

চন্নুনী দীপঙ্করকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে—ও দিদি, তোমার দীপু এয়েচে গো, এই দ্যাকো—

মনে আছে তখন দীপঙ্কর আর ছেলেমানুষ নয়। দিনে দিনে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়, প্রতিমুহূর্তের অনুভাবনায় দীপঙ্কর তখন অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু চন্নুনীর হয়ত সে-খেয়াল নেই। চন্নুনীর কাছে সে হয়ত সেই ছোট দীপুই রয়েছে। সেই দুমাসের শিশু দীপু। যে-দীপু নিরাশ্রয় হয়ে মা'র কোলে উঠে একদিন এই বাড়িতে এসেছিল। এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের উনিশের একের বি-র বাড়িতে। চন্নুনীর কাছে সেই কোলে চড়া দীপুর সঙ্গে এই বড়-দীপুর যেন কোনও পার্থক্যই নেই। তাই হয়ত দীপুর সামনে সেই আগেকার মতই গালাগালি দিত—অশ্রাব্য অসভ্য গালাগালি।

কিন্তু দীপঙ্কর সেদিন এক অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চন্নুনীর দিকে! কবে একদিন বয়েস কম ছিল চন্নুনীর। কবে একদিন এই সংসারে উপ-গৃহিণী ছিল, সে-চিহ্ন খুঁজলে তার চেহারায় কি কোথাও পাওয়া যাবে না? বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত অতীত কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? সব কলঙ্ক অবলুপ্ত হয়ে যায়?

সবাই দৌড়ে এসেছে। বিন্তীদি নিজের ঘর থেকে এসে বাইরে দাঁড়াল। তার মুখে আর কথা নেই। অবাক বিস্ময়ে সে যেন হতবাক হয়ে গেছে। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় চন্নুনী? মা ভালো আছে তো?

বিন্তীদি বললে—তোমার মা খুব কাঁদছিল দীপু—

এতক্ষণে মা নিজের ঘর থেকে বেরোল। কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়ছিল। সেটা আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে নিলে। তারপর দরজার দুটো চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল।

দীপঙ্করের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঠায়। যেন আর নড়বার সামর্থ্য নেই মা'র। মা'র মুখ দিয়ে কোনও কথাও বেরোচ্ছে না। যেন বোবা হয়ে গেছে মা।

দীপঙ্কর কাছে এগিয়ে গেল।

—মা, আমি এসেছি মা, আমি এসেছি—

মা যেন কী কথা বলতে গেল। কিন্তু বড় গম্ভীর দেখাল মা'র মুখখানা। আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি! সে-দৃষ্টি তিরস্কারেরও নয়, স্নেহেরও নয়। দুই মিলিয়ে সে এক বিভ্রান্তি! মা'র চোখের দিকে চেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল দীপঙ্কর। এ কদিনেই কী হয়ে গেছে মা! কী অদ্ভুত বদলে গেছে। নিজের মাকেও যেন চিনতে কষ্ট হয়। মা'র সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল।

দীপঙ্কর মাকে গিয়ে ধরে ফেললে।

—আমি এসেছি মা, তুমি কথা বলো, কথা বলো তুমি!

আর সঙ্গে সঙ্গে মা'র সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে গেল হঠাৎ!

মুখ দিয়ে শুধু আওয়াজ বেরোল—দীপু—

অস্পষ্ট অপ্রত্যক্ষ একটা অভিযোগের সুর শুধু গলা দিয়ে বেরিয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। দীপঙ্কর খপ্ করে মা'কে ধরে ফেলেছে। তারপর আস্তে আস্তে মা'কে ধরে শুইয়ে দিলে বিছানায়। একদিন এমনি করে দীপঙ্করকে মা' শুইয়ে বসিয়ে দাঁড় করিয়ে এত বড় করে তুলেছে। আর আজ দীপঙ্করেরই সেই মা'কে সেবা করবার পালা। মা বিছানায় শুয়ে হাঁফাতে লাগলো। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগলো মা'র।

চন্নুনীর গলা শোনা গেল বাইরে।

—কী আক্কেল গা ছেলের, মা রইল পড়ে আর ছেলে স্বদেশী করতে গেল! পোড়াকপাল অমন ছেলের, ঝাঁটা মারি অমন ছেলের মুখে!

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিন্তীদির শুকনো মুখটা দেখা যাচ্ছিল। কোনও-দিন তার মুখে কথা থাকে না। আজও নেই। দীপঙ্কর বুঝতে পারলে, দীপঙ্করের চেয়ে যেন বিন্তীদির সহায়হীনতার তুলনা নেই। এই সংসারের ভিতটুকু তার চোখের সামনেই ধ্বসে যেতে বসেছে।

একটা পাখা এনে দীপঙ্করের হাতে দিল বিন্তীদি।

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে চাইলে বিন্তীদির মুখের দিকে। বিন্তীদির এ-বুদ্ধিটাও তো আছে! দীপঙ্কর পাখাটা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো মা'কে। মা'র মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে মনে হলো যেন মা একটু নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। মা যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে—

বাইরে এসে চন্নুনীকে ডাকলে—কবে থেকে এমন হলো চন্নুনী!

চন্নুনী গলা-ঝাম্টা দিয়ে উঠলো—বলিহারি তোমার আক্কেল বাছা, বুড়ী মা রইল বাড়িতে, আর তুমি কোন আক্কেলে স্বদেশী করতে গেলে শুনি? আমার নিজের পেটের ছেলে হলে আমি ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতুম না—! ছেলে-মেয়ে নয় তো শত্তুর! তাইতো দিদিকে বলছিলুম—'ছেলে দিয়েছে সগ্যে বাতি, বাকি রয়েছে নাতি'—পোড়া-কপাল আমার।

—কই, মুখপোড়া এসেছে? এসেছে মুখপোড়া?

হঠাৎ কেমন করে যেন গলার আওয়াজ পেয়েছিল অঘোরদাদু। সেই অন্ধকারের মধ্যেই চিৎকার করতে করতে নেমে এল। বিন্তীদি হঠাৎ অঘোর-দাদুর গলা পেয়েই নিজের ঘরে পালিয়ে গিয়েছে!

—হারামজাদা কই? কোনদিকে গেল সে? সে কী রুদ্র মূর্তি! বড় বীভৎস চেহারা অঘোরদাদুর!

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। যেন

ঝড়ের মতন ফেটে পড়বে একেবারে দীপঙ্করের ওপর। চন্নুনীও কাঠ হয়ে গেছে অঘোরদাদুকে দেখে! এখুনি যেন সর্বনাশ হয়ে যাবে! এখুনি যেন প্রলয় শুরু হবে! এমন মূর্তি যেন কেউ কখনও দেখেনি অঘোরদাদুর!

—কই? কোথায় গেল সে?

বলতে বলতে আর তাল সামলাতে পারলে না। একেবারে সোজা এসে পড়লো থামের ওপর। থামের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়েই যেত হয়ত অঘোরদাদু। হয়ত একটা রক্তারক্তি কান্ড হয়ে যেত। কিন্তু দীপঙ্কর ধরে ফেলেছে।

অঘোরদাদু তখনও চিৎকার করছে—এই? কোথায় গেল মুখপোড়া? কোথায় সে? ছাড় আমাকে, আমি দেখে নেব মুখপোড়াকে—

—এই যে আমি।

হঠাৎ এতক্ষণে যেন জ্ঞান হলো। দু'দণ্ডের জন্যে একটু সামলে নিলে নিজেকে। তারপর হঠাৎ দীপঙ্করের মাথার চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগলো। বললে—মুখপোড়া, আমার মেয়েকে কষ্ট দেওয়া? আমি চোখে দেখতে পেলে তোমাকে খুন করে ফেলতাম না। তোমাকে ক্যাওড়াতলায় নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত চিতেয় তুলে পুড়োতাম না! আমার মেয়ে ভালমানুষ বলে এত হেনস্থা?

অঘোরদাদুর গায়ে যে তখনও অত জোর, তা কে জানতো। দীপঙ্করের মাথার চুলের মুঠি ধরে প্রাণপণে টানা-হ্যাঁচড়া করতে লাগলো অঘোরদাদু আর চিৎকার করতে লাগলো গলা ছেড়ে!

—বল মুখপোড়া, স্বদেশী করতে শেখালে তোকে কে? কে তোকে মুখ-পোড়া স্বদেশীর দলে নিয়ে গেল।

আবার চুল টানা, আবার চিৎকার।

দীপঙ্করের সমস্ত মাথাটা টন টন করতে লাগলো যন্ত্রণায়। কিন্তু তবু এতটুকু মাথা টেনে নেবার চেষ্টাও সে করলে না। ভালই হয়েছে। এই অত্যাচার যেন তার কাছে অত্যাচার বলে মনে হলো না। মনে হলো এ শাস্তি যেন তার প্রাপ্য। দীপঙ্কর মাথা পেতে দিলে অঘোরদাদুর সামনে। মনে হলো—অঘোর-দাদু যেন তাকে শাস্তি দিচ্ছে না, আশীর্বাদ করছে। অঘোরদাদুর স্নেহের আশীর্বাদ তার মাথায় আরো ঝরুক। আরো শাস্তি দিক তাকে। আরো অত্যাচার করুক।

শুধু একবার মুখ ফুটে বললে দীপঙ্কর—একটু আস্তে অঘোরদাদু, মা এখুনি একটু ঘুমিয়েছে—

—তবে রে মুখপোড়া! আবার দরদ হচ্ছে! গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হচ্ছে। থামবো না আমি, আমি চেঁচাব! আমি চেঁচিয়ে তোর মা'র ঘুম ভাঙাবো—তুই কী করতে পারিস কর দিকি দেখি—

সেদিন চন্নুনী শেষ পর্যন্ত না ছাড়িয়ে দিলে হয়ত ছাড়তোই না অঘোরদাদু। সেদিন মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল অঘোরদাদুর।

চন্নুনী বুড়ী মানুষ। সেই বুড়ীই শেষকালে অঘোরদাদুর হাত চেপে ধরেছিল।

বলেছিল—করছো কী? ওকে মেরে ফেলবে নাকি?

অঘোরদাদু তখন হাঁফাচ্ছে। বললে—মেরেই ফেলবো, আজ আমি মুখপোড়াকে মেরেই ফেলবো।

—ও ও কি আর সেই তোমার আগেকার ছোট ছেলেমানুষ আছে? ও যে এখন বড় হয়েছে, ছাড় ওকে—ছাড়, ছেড়ে দাও—

কী হলো কে জানে! সেই অন্ধ বুড়ো অঘোরদাদু হঠাৎ থেমে গেল। হয়ত এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে, দীপু আর সেই ছেলেমানুষ নেই, তার দীপু এখন বড় হয়েছে, তার দীপু বি-এ পাশ করেছে, তার দীপু চাকরি করছে।

কাঁপতে কাঁপতে অঘোরদাদু নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

চন্নুনী কাছে এল। বললে—ছি বাবা, কানতে নেই, বুড়োমানুষ কী বলছে কী বলেছে, ওর কি মাথার ঠিক আছে—

দীপঙ্কর হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে চোখের জল লুকোবার চেষ্টা করলে!

পান্না ডাক্তার কালিঘাটের হালদার পাড়ায় নাম করা ডাক্তার। নগদ এক টাকা নেয় বাড়ি এসে রোগী দেখতে। সকাল বেলাই এল।

সব দেখে শুনে বললে—এই ওষুধ লিখে দিলাম, আমার ডিসপেনসারী থেকে নিয়ে এসো—চার আনা দাম লাগবে—

সেদিন চন্নুনী ছিল, তাই রক্ষে। চন্নুনী সমস্ত রাত মার পাশে জেগেছে। তারপর সকালে উঠোন ঝাঁট দিয়েছে, বাজারে গেছে। তারপর রান্না করে আপিসের ভাত দিয়েছে।

চন্নুনী বলেছে—কী আক্কেল গা তোমার? নতুন চাকরি, কামাই করলে তোমার চলবে?

—কিন্তু মাকে একলা ফেলে কেমন করে যাই চন্নুনী?

—ওমা, তা আমি কি মরে গেছি? আমি তো ক্যাওড়াতলায় গিয়ে চিতেয় উঠিনি গো!

আপিস যাবার আগে দীপঙ্কর বার বার চন্নুনীকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিল। বিন্তীদিকেও বুঝিয়ে দিয়েছিল! পাশে সব সময় যেন কেউ-না-কেউ থাকে! সাবু, বার্লি, লেবু, সব রইল। দীপঙ্কর যাবে আর ছুটি হলেই সোজা চলে আসবে! অনেকদিন আপিসে যাওয়া হয়নি। সে চাকরি আছে কি নেই তারও ঠিক নেই। এ কদিন লক-আপের মধ্যে ঘুম ছিল না, খাওয়া ছিল না, শান্তি ছিল না। বাড়িতে এসেও মার অসুখ। সারা রাত ঘুম হয়নি। মা ছাড়া সংসারে আর কে তার রইল। কিরণ গেছে, লক্ষ্মীদি গেছে, সতীও গেছে!

আছে শুধু মা! দীপঙ্কর এত বড় হয়েছে, এত যুদ্ধতে শিখেছে, এত লেখাপড়া করেছে! তবু যেন কোথায় তার মধ্যে একটা চিরস্থায়ী শিশু রয়েছে। সে শিশুটা যেন এতদিনেও বড় হলো না। যেন এতদিনেও তার সাবালকত্ব এলো না। এখনও মা'র অসুখে তার কান্না এসে পড়ে। এখনও মায়ের মৃত্যু সে যেন কল্পনাও করতে পারে না!

সেই কদিনেই হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল আপিসে। সামান্য কদিনের চাকরি। কিন্তু জাপান-ট্রাফিক যেন এর মধ্যেই অচল হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের যেন ভিত ধ্বসে যাচ্ছিল। কদিন ধরে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোকও মাঝে মাঝে গরম হয়ে উঠত! বার বার কেবল জিজ্ঞেস করেছে—বাট্‌, হোয়ার ইজ্‌ সেন্‌?

ট্রানজিট্‌ সেকশনের বড়বাবু রামলিঙ্গমবাবু। রামলিঙ্গমবাবু অস্থির হয়ে পড়েছে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের হুকুমের ঠেলায়। একবার সেকশন একবার সাহেবের কামরা—এই করেছে কেবল। কাগজ-পত্র, ফাইল্‌, স্টেট্‌মেণ্ট্‌ কোথায় রেখে গেছে দীপঙ্কর, তাও জানা ছিল না। সেকশনে তোলপাড় পড়ে গেছে কদিন ধরে।

—ও হরিপদ, জাপান-ট্রাফিকের স্টেটমেণ্ট্‌ কোথায় আছে, বলতে পারো?

শুধু হরিপদ নয়, সেকশনের যত ক্লার্ক, সবাই গরু-খোঁজা করে খুঁজেও পায়নি স্টেট্‌মেণ্ট্‌। ওদিকে রেলওয়ে বোর্ড থেকে কড়া নোট্‌ এসেছে। রেলওয়ে বোর্ড 'আর্জেণ্ট' শ্লিপ্‌ লাগিয়ে চিঠির জবাব চেয়ে পাঠিয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে রামলিঙ্গমবাবু।

—ও হরিপদ, রেকর্ড সেকশনে গিয়ে একবার খোঁজ নাও তো! শিগ্‌গির বলো গিয়ে অ্যাসেম্‌ব্লিতে কোশ্চেন উঠেছে—এখ্‌খুনি দরকার—

আশ্চর্য কিন্তু! সেই স্টেট্‌মেণ্ট ফাইল্‌ প্রতিদিন ঘাঁটা হয়, প্রতিদিন নাড়া-চাড়া হয়, প্রতিদিন সামনেই থাকে। রেলওয়ে বোর্ড থেকে চিঠি এলেই রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালেই স্টেনোগ্রাফারকে নোট্‌ দিয়ে সাহেব উত্তর দিয়ে দেয়। কিন্তু সেই সামান্য জিনিসের জন্যেই বজ্রপাত হয়ে গেল আপিসে।

রবিন্‌সন্‌ সাহেবের চাপরাশী দ্বিজপদও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—রামলিঙ্গমবাবু, জলদি—

—আবার?

রামলিঙ্গমবাবু সেইমাত্র ঘরে এসে বসেছিলেন। আবার ডাক এল, আবার ছুটলেন।

হরিপদ জিজ্ঞেস করলে—ও দ্বিজপদ, কী হলো সাহেবের? এত গরম কেন সকাল থেকে?

দ্বিজপদ বললে—সাহেবের কুকুরের অসুখ করেছে, মেমসাহেব কেবল টেলিফোন করছে বাড়ি থেকে—

সর্বনাশ করেছে! রামলিঙ্গমবাবু সেই যে সাহেবের ঘরে ঢুকেছে, আর আসবার নাম নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিন পা একেবারে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর। রেলের চাকা বোধহয় আর চলবে না। এমনি অবস্থা তখন। পাঁচটা পর্যন্ত কোনও রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই ক্লার্কদের ছুটি, তারপর তাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই। যত ঝঞ্ঝাট বড়বাবুর। আর যত ঝঞ্ঝাট সাহেবের। শেষে ডিস্ট্রিক্টে টেলিফোন করা হলো। ট্রাঙ্ক কল্। শেষকালে সেই ফিগার এনে কোনও রকমে চাকরি বজায় রইল সেদিনকার মত। পরের দিন যা-হয় হবে।

আর পরের দিনই দীপঙ্কর আপিসে গিয়ে হাজির!

—কী মশাই? কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন? কী হয়েছিল? একটা খবর দিতে পারেন নি? এদিকে সাহেব যে ক্ষেপে লাল?

দীপঙ্কর এ-অবস্থার জন্য তৈরী হয়েই ছিল। আপিসে আসার পথে বুকটা বার বার কেঁপে উঠেছে। যখন কিছুই রইল না, তখন চাকরিটাও হয়ত চলে যাবে! চাকরি তখনও পাকা হয়নি। আর নৃপেনবাবুর লোক বলে কেউ কিছু বলতেও পারেনি এতদিন। কিন্তু সুযোগ তো খুঁজেছিল সবাই। কে কার ভাল দেখে সংসারে। চাকরি দীপঙ্করের প্রয়োজন। চাকরিটা বলতে গেলে তার কাছে অপরিহার্য। তবু আপিসে ঢোকবার মুখে যেন বিতৃষ্ণায় সারা মনটা ভরে উঠলো! পৃথিবীতে যে এত ঘটনা ঘটে চলেছে, এখানে যেন তার কোনও তরঙ্গের স্পর্শ লাগে না। এখানে কেবল প্রমোশন, গ্রেড্, ট্র্যান্স্ফার আর ইনক্রিমেন্ট্। তবু বিতৃষ্ণা থাকলে চলবে না। চাকরি করতেই হবে তাকে। মা'র অসুখের সময় চিকিৎসাও করতে হবে। মা'কে নিয়ে অন্য বাড়িতে উঠতে হবে। সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে মা'কে। তার জন্যে এমনি করেই বোধহয় এক দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তার উত্তরণ হবে একদিন। মানুষের সবরকম পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই বোধহয় দুঃখ! হয়ত এই অবহেলা, দুঃখ, কষ্টস্বীকার—সমস্তই একদিন তাকে সর্বযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করবে। কিরণ বলতো—কষ্ট সহ্য করা ভালো। তাই সে হাসিমুখে তেতো ওষুধ খেতো। দীপঙ্করও যে এই কষ্ট সহ্য করছে, সে তো একদিন কষ্টাতীত হবে বলেই। অন্তত নিজে না হোক, মা'কে সে তো শান্তি দিতে পারবে, সুখ দিতে পারবে।

হাঁড়িকাঠে যেমন পাঁঠারা কালিঘাটে গলাটা বাড়িয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

রবিন্সন্ সাহেব টেবিলের ওপর ঘুষি মারলে একটা।

পাশেই রামলিঙ্গমবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দায়িত্ব যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। তিনি আসামীকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, এখন আসামীর হাজত-বাস হোক, জেল হোক, দ্বীপান্তর হোক, ফাঁসি হোক, তাঁর আর কিছু যেন করণীয় নেই।

দীপঙ্কর লক্ষ্য করলে ঘরের মধ্যে সাহেবের কুকুরটা কোথাও নেই। কোথায় গেল কুকুরটা! হঠাৎ কি কুকুরটারও সময় বুঝে শরীর খারাপ হয়েছে নাকি!

রবিন্সন্ সাহেব বললে—কোথায় ফাইলটা ছিল?

উত্তর দিলেন রামলিঙ্গমবাবু। বললেন—সেকশনের র‍্যাকে—

—তাহলে তোমার লোকগুলো কী করছিল এতদিন? দোজ্ ক্লার্ক্স্—

তারপর বললে—নো, নো, আমি সমস্ত সিস্টেম্ বদলে দিতে চাই—জাপান-ট্র্যাফিকের সমস্ত কাগজ-পত্র, ফাইল, স্টেট্মেন্ট্ কিছু রেকর্ড-সেকশনে থাকবে না, সব আমি আমার চোখের ওপর দেখতে চাই। সব আনো আমার ঘরে—আই ওয়ান্ট্ ইট্ নাউ ওন্লি—

দীপঙ্কর আর রামলিঙ্গমবাবু চলে আসছিল।

সাহেবের কী মনে পড়লো হঠাৎ। বললে—আনাদার থিং—আর একটা কথা—সেন শুড্ সীট্ হিয়ার, সেন এখানে বসবে, এই পাশের ঘরে—

সেকশনে আসতেই হরিপদ দৌড়ে এল। কী খবর বড়বাবু? রামলিঙ্গমবাবু বললেন—দরকার নেই বাবা, জাপান-ট্র্যাফিকের ঝঞ্ঝাটসে বাঁচ গিয়া—

—কেন? কেন?

—সাহেবের অর্ডার হয়ে গেছে, জাপান-ট্র্যাফিক-ক্লার্ক ওর স্টেনোগ্রাফারের ঘরে বসবে এবার থেকে, স্টোরে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। নতুন ড্রয়ার টেব্ল্ চেয়ারের হুকুম দে দিয়া—

ভালোই হয়েছে। রামলিঙ্গমবাবুও বেঁচে গেলেন, সেকশন সুদ্ধ লোকও বেঁচে গেল। ও-ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেয়ে গেল সবাই। সকাল থেকেই ওই জাপান-ট্র্যাফিক নিয়ে যে-ঝড় ওঠে তার ঠেলা সামলানো দায় হয়ে পড়ে। ওতে মাইনে তো এক পয়সা বাড়বে না, শুধু খেটে মরো। তাছাড়া, সাহেবের চোখে চোখে থাকা, সে-ও এক বিপজ্জনক চাকরি। পান খেতে পারা যাবে না, গল্প করতে পারা যাবে না, খবরের কাগজ নিয়েও মুখরোচক আড্ডা দেওয়া যাবে না। আপিসে এসেই ফাইল নিয়ে বসতে হবে, আর যতক্ষণ সাহেব আপিসে থাকবে ততক্ষণ বন্দী হয়ে থাকো। দরকার নেই মশাই অমন চাকরিতে। ও আপনাদেরই পোষায় আপনারা বিয়ে-থা করেন নি, ব্যাচিলর মানুষ, সমস্ত দিন সায়েবকে তেল দিতে পারবেন।

এস্টাব্লিশ্মেন্ট্-ক্লার্ক দরখাস্তখানা দেখেই বললে—এ কি, নতুন চাকরিতে ঢুকেই কামাই?

দীপঙ্কর বললে—কী করবো বলুন, আমি তো ইচ্ছে করে কামাই করিনি—

—তাহলে সার্ভিস ব্রেক হচ্ছে, এই ক'দিনের মাইনে কাটা যাবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু রবিন্সন্ সাহেব নিজে ছুটি গ্র্যান্ট্ করে দিয়েছে, এই দেখুন সাহেবের সই—

—সে কি? টেম্পোরারী সার্ভিসে ছুটি কী করে দেয় সাহেব?

দীপঙ্কর বললে—তা জানি না, আপনি রবিন্সন্ সাহেবকে বরং জিজ্ঞেস

খুব যেন প্রসন্ন হলো না এস্টাবলিশ্‌মেণ্ট্‌ ক্লার্ক। সত্যিই কেউই যেন প্রসন্ন নয় তার চাকরির ব্যাপারে। কেউই খুশী নয়। সবাই যেন খুশী হতো তার চাকরি গেলে। নতুন সার্ভিস, পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে আটকে রেখে দিলে এতদিন, তবু সাহেব দরখাস্তের ওপর বড় বড় অক্ষরে 'গ্র্যাণ্টেড' লিখে দিয়েছে। নিজেরা আলোচনা করতে লাগলো রুল নিয়ে। এস্টাবলিশ্‌মেণ্ট্‌ ম্যানুয়েলে কী আইন আছে, আর সে-আইন ভঙ্গ হয় কী করলে, তা তাদের মুখস্থ। অথচ ডি-টি-এস সাহেব তাদের সঙ্গে কনসাল্ট না-করেই অর্ডার ইস্যু করে দিলে! তা ছাড়া ওদিকে স্টোর সেকশনেও তখন আলোচনা চলছে।

—কে হে? কবে ঢুকেছে? কী নাম বললে? দীপঙ্কর সেন?

—ওই যে হে, নৃপেনবাবুর লোক, ট্র্যাফিক আপিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—

—তা বলে, পুরোন চেয়ার টেবিল আলমারি দিলে চলবে না? কে এমন কেষ্ট-বিষ্টু এল একেবারে?

স্টোরের বড়বাবু তাড়াতাড়ি রবিন্‌সন্‌ সাহেবের ঘরে গিয়ে বললে—স্যার—

—ইয়েস?

—পুরোন চেয়ার টেবিল দিলে চলবে না স্যার? এখন তো স্টকে নতুন কিছু নেই আমাদের।

রবিন্‌সন্‌ সাহেব বিরক্ত ছিল সকাল থেকেই। বেশি তর্ক করবার সময়ও ছিল না। বিশেষ করে কুকুরের অসুখ চলছে কদিন ধরে। মেমসাহেব ঘন-ঘন টেলিফোন করছে তাই নিয়ে। সি-এম-ওকে টেলিফোন করেছিল সাহেব একবার দেখে আসার জন্যে। তখনও খবরটা আসেনি। হঠাৎ স্টোর-ক্লার্কের কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

বললে—লিসন্‌, শোন, আই ওয়াণ্ট্‌ টু সী দ্যাট্‌ মাই অর্ডার ইজ্‌ ক্যারেড্‌ আউট্‌—

স্টোরস্‌-ক্লার্ক আর বেশি কথা বললে না। সোজা এসে বললে—ওহে, নতুন ফার্নিচারই দিতে হবে, সাহেবের মেজাজ গরম—

সেদিন স্টকে না-থাকা সত্ত্বেও কোথা থেকে যে নতুন ফার্নিচার বেরোল শেষ পর্যন্ত সেটাই আশ্চর্য! স্পেশ্যাল টাইপের চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইম্পর্ট্যাণ্ট্‌ কাগজ-পত্র থাকবে সেখানে। যেটা যখন হঠাৎ দরকার হবে, সেটা খুঁজে পাওয়া চাই। সেকশনের মধ্যে থাকলে অন্য ফাইলের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। এখানে প্রত্যেকটা আইটেম-বাই-আইটেম্‌ সাজানো থাকবে। একদিন যদি দীপঙ্কর হঠাৎ ছুটি নেয়, তাতেও কোনও অসুবিধে হবে না। যে-কেউ এসে খুঁজে দেবে। দরকার হলে সাহেব নিজেও এসে নিয়ে যেতে পারে। কিম্বা মিস্‌ মাইকেল আছে। রবিন্‌সন্‌ সাহেবের স্টেনোগ্রাফার! মিস মাইকেলের বেশি বয়েস হয়নি। বড় সুন্দর দেখতে!

করিডরেই গাঙ্গুলীবাবুর সঙ্গে দেখা। দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসছিলেন।

বললেন—এই এখ্‌খুনি খবর পেলাম, আপনি এসেছেন—তাই দৌড়ে আসছি, এসে গেছেন ভালোই হয়েছে, আজকেই নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েল—

—আজকে? সে কি? আমি তো জানতাম না!

—হ্যাঁ, আপনার নামে একটাকা চাঁদা ধরেছি—

দীপঙ্কর বিব্রত হয়ে পড়লো। বললে—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই, শুধু ট্রাম-ভাড়াটা আছে—

—সে দেবেন অখন, মাইনে পেলে দেবেন; এখন আপনার নামে চাঁদা ফেলে দিলাম, তারপর দেখা যাবে মাসকাবারে! কী দিচ্ছি জানেন তো?

—কী?

—আমরা দিতে চেয়েছিলাম একখানা মহাভারত আর একখানা রামায়ণ, কিন্তু উনি বললেন, মহাভারত-রামায়ণ ওঁর আছে, উনি নিজে থেকেই তখন এক সেট সোনার বোতাম চাইলেন!

—সোনার বোতাম?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—চল্লিশ টাকার কমে তো আর বোতাম হবে না, তাই আট-আনা করে ধরেছিলাম প্রথমে, এখন মাথা পিছু একটাকা করে ধরতে হলো—

দীপঙ্করের তবু যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—উনি নিজে মুখ ফুটে চাইলেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—হ্যাঁ, তা যাক্‌ গে, আজকে বিকেল পাঁচটার সময় টিফিন-রুমে ফেয়ারওয়েল হবে, আপনি থাকবেন কিন্তু, ফটো তোলা হবে,—আমি যাই—

গাঙ্গুলীবাবু চলে গেলেন। দীপঙ্করের বিতৃষ্ণাটা যেন আবার মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো! নৃপেনবাবু চলে যাবেন, আর আসবেন না। ভাবতে একটু দুঃখও হলো। এতদিনের চাকরি। ছাড়তে কষ্ট হবারই কথা! আজকের দিনে কোনও ঘৃণা, কোনও বিরাগ রাখতে নেই মনে। রাখা অন্যায়। যে চলে যাচ্ছে, তাকে যেন সবাই প্রসন্ন মনেই বিদায় দেয়। একদিন তো দীপঙ্করও চলে যাবে! সেদিন? সেদিন কি এমনি কুণ্ঠিত চিত্তে তাকে বিদায় দেবে তার সহকর্মীরা! কিন্তু কেন ভালো হতে পারে না মানুষ! কেন এত লোভ মানুষের? দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল! এই ছোট লোভটুকু ত্যাগ করলে নৃপেনবাবু কি দরিদ্র হয়ে যেতেন! গাঁটের কড়ি দিয়ে যে-জিনিস কিনি আমরা, তার চেয়ে উপরি-পাওনায় কি বেশি তৃপ্তি? অথচ সুখের উপকরণ কিনতে জীবনে যে-জিনিসের যা দাম দিই, অনেক সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশিই তো আসলে পাই! কিন্তু তখন কি ভেবে দেখি আমি তার অযোগ্য?

নৃপেনবাবুর ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল।

আজকে ফেয়ারওয়েলের দিন। শেষ-দেখা করে যাওয়া ভাল। কিন্তু দীপঙ্কর ভেবেছিল নৃপেনবাবুর মুখটা ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবে! বিদায়ের দিনে একটু হয়ত

গম্ভীর, একটু মর্মাহত। এতদিনের অবলম্বন ত্যাগ করার সময় সেইটেই হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু নৃপেনবাবুর ভারি হাসি-হাসি মুখ।

সব শুনে বললেন—তা যাক্‌গে, মিট্‌-মাট্‌ গেছে এখন, ভালোই হয়েছে। আমি তখুনি বলেছিলুম স্বদেশী-ফদেশীর মধ্যে থেকো না, ওতে সাহেবদের নজর খারাপ হয়ে যায়—

তারপর হাসতে হাসতে বললেন—শুনেছ তো, আজকে আমার ফেয়ার-ওয়েল্—?

দীপঙ্কর বললে—এখুনি শুনলুম—

নৃপেনবাবু টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। গলা নিচু করে বললেন—তুমি কত চাঁদা দিলে?

দীপঙ্কর বললে—একটাকা চাঁদা ধরেছে—

নৃপেনবাবু বললেন—কী কাণ্ড দেখ, মতলব ছিল একখানা মহাভারত আর রামায়ণ দিয়ে ব্রাহ্মণ-বিদায় সারবে, শোন ব্যাপারখানা! তা আমি বললাম—না, যদি দিতেই হয় তো একসেট সোনার বোতাম দাও, যেটা সত্যিই থাকবে! আমরা অসবর্‌ন্‌ সাহেবের ফেয়ারওয়েলের সময় তিনটাকা করে চাঁদা দিয়েছিলাম। চাঁদা দিয়ে সোনার একটা পাইপ্‌ কিনে দিয়েছিলাম, আর আমার বেলাতেই কিনা রামায়ণ-মহাভারত—এ কি পুরুত-বিদায়? তুমিই বলো না, সোনার বোতাম চেয়ে ভাল করিনি—? পনের টাকার মধ্যে সারছিল, আর গোটা পঁচিশেক টাকা বেশি পড়লো—এই যা! এমন কিছু বেশি চাইনি আমি—কী বলো?

তারপর একটু থেমে বললেন—তুমিই বলো না, আমি সোনার বোতাম চেয়ে কিছু অন্যায় করেছি? ওই কে-জি-দাশ, ওই রামলিঙ্গম, ওরা আমি না থাকলে সিনিয়র-গ্রেড্‌ পেতো? এই তোমারই কথা ধরো না, তুমি চাকরি পেতে রেলে?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বললে—আচ্ছা আমি আসি তাহলে—

—দাঁড়াও, দাঁড়াও না হে, অত ব্যস্ত কিসের, আসল কথাই তো বলা হয়নি তোমাকে! তুমি মীটিংএ যাচ্ছো তো?

—যাবোখন!

—যাবোখন নয়, যেতেই হবে, বুঝলে না, মীটিং-এ লোক-জন না হলে বড় খারাপ দেখায়, বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে, তাই বলছি তুমি যাবে, আর কিছু বলতেও হবে তোমাকে! লেকচার দিতে হবে—

দীপঙ্কর লজ্জায় পড়লো। বললে—লেকচার? আমি তো লেকচার দিতে পারি না—

—সে কি? তুমি যা জানো আমার সম্বন্ধে, তাই-ই দু'চার কথা বলবে! তোমরা যদি কিছু না লেকচার দাও তো মীটিং মানাবে কেন? তুমি কী বলবে বলো দিকিনি? একটু ভাবো না—

—কী বলবো বলুন?

নৃপেনবাবু বললেন—ইংরিজীতে বলতে হবে কিন্তু!—ইংরিজীতে না বললে সাহেবরা আবার বুঝতে পারবে না। আর সাহেবরা না বুঝলে বলেই বা কী লাভ?

—কিন্তু আমি যে কখনও লেকচার দিইনি কোথাও?

—আরে তুমি যা জানো তাই বলবে, তাকে লেকচার বলো আর যা-বলো, আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো না?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, জানি বৈ কি।

—তা সেইটেই বলবে তুমি। তুমি তো জানো আমি কী-রকম ভালো লোক! আমি কী-রকম পরিশ্রমী লোক, কী-রকম পরোপকারী লোক, আপিসের কাজে কী-রকম খাটি—তুমি তো জানো সব! তুমি জানো না যে আমি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলিনি? কখনও কারোর কাছে ঘুষ নিইনি? কারোর কোনও ক্ষতি করিনি? কারোর অনিষ্ট-চিন্তাও করিনি? এই কথাগুলো তুমি জানো না?

দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারলে না।

—জানো আর না-জানো, বলতে তোমার দোষটা কী? এই কথাগুলোই গুছিয়ে বলতে পারবে না?

মীটিং-এ দাঁড়িয়ে সেদিন কী বলেছিল দীপঙ্কর তা আর নিজের কানে যায়নি। কিন্তু নৃপেনবাবু যে-কথাগুলো বলেছিলেন, তা আজো মনে আছে। আপিসের ছুটির পর টিফিন-রুমে ভিড় হয়েছিল মন্দ নয়। ফুলের মালা এসেছিল নিউ-মার্কেট থেকে। রবিন্‌সন্‌ সাহেব আর ম্যাক্‌ফারসন সাহেব দলের মধ্যখানে বসেছিল। আর ট্র্যাফিক আপিসের তেষট্টিজন লোক তাদের ডাইনে আর বাঁয়ে।

গাঙ্গুলীবাবু দেখতে পেয়েই দৌড়ে এলেন।

বললেন—আপনি এসেছেন? কিছু বলতে হবে আপনাকে কিন্তু—

দীপঙ্কর বললে—না না, আমি সত্যিই বলতে পারি না।

—তবু বলতে হবে, নৃপেনবাবু আমাকে নিজে ডেকে আপনাকে বলতে বলেছেন—ইংরিজীতে, মনে থাকে যেন। ইংরিজীতে না বললে সাহেবরা বুঝবে না! এখনও তো কুড়ি মিনিট সময় আছে, ততক্ষণে ভেবে নিন্—

একটা উদ্বোধন-সঙ্গীত হলো।

প্রথমে বলতে উঠলেন কে-জি-দাশবাবু। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন। দীপঙ্কর মন দিয়ে শুনতে লাগলো। নৃপেনবাবু শুধু যে রেলের ট্র্যাফিক আপিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌ তাই-ই নয়, তিনি রেল-সেবক। রেল-সেবা মানেই দেশ-সেবা। সুতরাং নৃপেনবাবু একজন আদর্শ দেশ-সেবক। যেদিন সমস্ত রেল-কর্মচারী নৃপেনবাবুর মত দেশ-সেবক হতে পারবে সেইদিনই রেলওয়ে-কোম্পানী সার্থক হবে। সেইদিনই সমস্ত দেশ সার্থক

বোমা-গুলি-গোলা যারা ছোঁড়ে তারা দেশের শত্রু! প্রকৃত দেশ-সেবা যদি কেউ চায় তো সে নৃপেনবাবুর পথ অনুসরণ করুক। আজ বেয়াল্লিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নৃপেনবাবু রিটায়ার করছেন, আমরা শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তাঁর বিশ্রাম-গ্রহণ শান্তিপূর্ণ হয়—! আর আজকের সভার সভাপতি মিস্টার রবিন্সন্ আর মিস্টার ম্যাক্ফারসন—তাঁরা যে তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাদের উৎসাহ দিতে এসেছেন, তার জন্যেও ধন্যবাদ। তাঁরা নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে শুধু ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে এখানে এই দেশে এসেছেন, তাঁদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা মিস্টার রবিন্সন্ আর মিস্টার ম্যাক্ফারসনের সুদীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

খুব হাততালি পড়লো।

দীপঙ্করকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন নৃপেনবাবু। মুখ নিচু করে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—দেখলে তো কে-জি-দাশবাবুর কাণ্ড, আমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেমন সাহেবদের খোশামোদ করলে? মানে এত অকৃতজ্ঞ লোক, ছিঃ—অথচ আমি না হলে সিনিয়র গ্রেডই পেত না, জানো—যাক্ গে, তুমি ততক্ষণ মুখস্থ করো......

নৃপেনবাবু আজ ফুলের মালা পরেছেন। বেশ হাসি-হাসি মুখ।

একে একে রামলিঙ্গমবাবু, গাঙ্গুলীবাবু সবাই বললে। ওই এক কথা সকলের। সাহেবরা নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষের কল্যাণ করতে এসেছেন, কষ্ট করে রেলের চাকরি করছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই কাগজে লিখে এনেছে বক্তৃতা।

এবার দীপঙ্কর!

পাশ থেকে গাঙ্গুলীবাবু ঠেলে দিলেন। বললেন—উঠুন, উঠুন—ভয় কী—

কী যে বলেছিল দীপঙ্কর কী গুণকীর্তন করেছিল নৃপেনবাবুর, তা নিজের কানে কিছুই গেল না। মনে হলো আগাগোড়া সমস্তটাই যেন ভণ্ডামি! জব চার্নক থেকে শুরু করে লর্ড ক্লাইভ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে কুইন ভিক্টোরিয়া সবাই নিজের জন্মভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্যেই এসেছিলেন বটে। তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই একদিন এসেছিল রেলওয়ে কোম্পানি। রেল প্রতিষ্ঠার মূলে যে-উদ্দেশ্যই থাক, তা বিচার করার ভার ঐতিহাসিকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। তাতে ভারতবর্ষের কল্যাণ হয়েছে কি হয়নি, তার বিচারের ভারও ভবিষ্যতের গর্ভে থাকুক। আজকে নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েলের দিন। সুতরাং নৃপেনবাবুর প্রশংসা করারই দিন আজকে। আজকে অপ্রিয় কিছু থাকলেও তা বলা নিষেধ। বলতে নেই। তিনিই আমাকে চাকরি করে দিয়েছেন। আমি যদি তার সম্বন্ধে কিছু বলি তো সে আত্মপ্রশংসা হবে—আত্মপ্রশংসা মহা পাপ। সুতরাং......

সভার শেষে নৃপেনবাবু একেবারে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—

তুমি তো এম-এ পাশ হে?

—না, বি-এ।

নৃপেনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—বি-এ পাশ? অথচ কিছু না-পড়েই তো গড় গড় করে বলে গেলে! অথচ তুমি বললে লেকচার দেওয়া তোমার অভ্যেস নেই!...তা যাক্‌গে, আমার লেকচারটা কেমন হয়েছিল?

দীপঙ্কর বললে—ভাল—

তাতে যেন সন্তুষ্ট হলেন না নৃপেনবাবু। বললেন—কী রকম ভালো?

—খুব ভালো!

—রবিন্সন্ সাহেব, ম্যাক্ফারসন সাহেবের চেয়েও ভালো?

এবার মুশকিলে পড়লো দীপঙ্কর। একটু হাসলো।

নৃপেনবাবু বললেন—দেখ, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তোমার ভাল লেগেছে, অথচ ওরা কী বলছে জানো? বলছে আমি নাকি বাড়ি থেকে মুখস্থ করে এসেছি—

গাঙ্গুলীবাবু দৌড়ে এলেন। বললেন—চলে যাবেন না যেন, জলখাবার আছে। হৃদয়-চাপরাসীকে দিয়ে ভাল মাংসর চপ্ করিয়েছি—

খাওয়ার জন্যে ওদিকে তখন সবাই ব্যস্ত। নৃপেনবাবু সাহেবদের কাছেই ঘোরাঘুরি করছেন। সোনার বোতামটা একটা কেসের মধ্যে সিল্কের ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, একটা ছাপানো ফ্রেমেবাঁধা মান-পত্রও আছে। সেটা এক বগলে রয়েছে। আর এক হাতে ফুলের মালাটা।

দীপঙ্কর বললে—আমি বাড়ি যাই গাঙ্গুলীবাবু, বাড়িতে আমার মা'র বড় অসুখ—

—তাহলে একটা সিঙাড়া অন্তত খেয়ে যান—

রাস্তায় আসতে আসতে দীপঙ্কর সেই কথাগুলোই ভাবছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা মিথ্যে। বক্তৃতাও মিথ্যে, সিঙাড়া রসগোল্লাও মিথ্যে, ওই মানপত্রটাও মিথ্যেতে ভর্তি। লোকগুলোও মিথ্যে!

জলখাবারের জায়গাটায় ভীষণ ভিড় হয়েছিল। ফেয়ারওয়েলে জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে জানা ছিল, তাই কেউ আর টিফিন করেনি সেদিন! টিফিনের পয়সাটা বাঁচিয়েছে। দীপঙ্কর চলেই আসছিল। কিন্তু গাঙ্গুলীবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন—চমৎকার ফ্লুয়েন্ট লেকচার হয়েছে আপনার। কে-জি-দাশবাবু খুব প্রশংসা করছিলেন, আপনি কখন মুখস্থ করলেন?

পাশের একটা কোণের দিকে তখন কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু আরো কয়েকজন খুব ফিস্‌ফিস্ করে আলোচনা করছে।

কে-জি-দাশবাবু বললেন—শালা, শুয়োরের বাচ্চা, আবার রবিন্সন্ সাহেবের কাছে এক্সটেনশনের দরখাস্ত করেছে!—শুনেছেন?

—সে কি?

রামলিঙ্গমবাব্ খবরটা জানতেন না। বললেন—সে কি? তাহলে ভেকেন্সিটা হলো না?

ওই ভেকেন্সিটার জন্যেই সবাই হাঁ করে বসেছিল এতদিন। ন্পেনবাব্ রিটায়ার করলেই একটা ভেকেন্সি হবে! হয় কে-জি-দাশবাব্, নয় রামলিঙ্গম-বাব্, নয়তো আর কেউ চান্সটা পেত! কিন্তু খবরটা শোনার পর সবাই মিইয়ে গেল। তাহলে লেকচারে এত প্রশংসা না করলেই হতো! সব আনন্দটা যেন মাটি হয়ে গেল দ্'জনের।

—আস্তে, মশাই আস্তে কথা বল্ন!

—কেন?

—ওই যে সেনবাব্ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ও আবার ন্পেনবাব্র লোক, সব শ্নতে পাবে!

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি আসার পথে কেমন মনে এলো—এই তো কাছেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। আর দ্'পা। দ্'পা গেলেই বাড়িটা দেখা যায়। কিন্তু থাক্। আর কোনও অবলম্বনের দরকার নেই তার।

হঠাৎ একটা নতুন গাড়ি পাশ দিয়ে একেবারে গা ঘেঁষে চলে গেল। আর একটু হলেই চাপা দিত। গাড়িটার ভেতরে কে একজন মেয়ে বসে আছে। অনেকটা সতীর মত দেখতে। ফরসা, লাল শাড়ী পরা, কোঁকড়ানো চুল। গাড়িটা সামনে গিয়েই থেমে গেল। সতী নাকি? বিয়ের পরই গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছে! হয়ত চিনতে পেরেছে!

দীপঙ্কর সামনে যেতেই ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলে—নিউ রোডটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?

—নিউ রোড!

—হ্যাঁ, নিউ রোড। আলিপ্রে—

দীপঙ্কর বললে—এ তো কালিঘাট, আপনি সোজা এই রাস্তা ধরে ওদিকে যান, প্লের ওপারে আলিপ্র—

কী মিষ্টি গলা! গাড়িটা চলে যাবার পর দীপঙ্কর আবার চলতে লাগলো। আশ্চর্য ভুল তো! সতীর বিয়ে হয়ে গেছে, এখনও সতীর কথা কী বলে ভাবছে সে!

তারপর হঠাৎ কথাটা আবার মনে মনে আওড়াতে লাগলো। নিউ রোড! নিউ রোড! নতুন পথ! সত্যিই তো দীপঙ্করেরও তো নতুন পথে যাত্রা শ্রে্ হয়েছে। এ-পথে কেউ তার সঙ্গী নেই! এই নতুন পথ ধরে এবার থেকে তাকে একলাই চলতে হবে! কী আশ্চর্য! নিউ রোড, নিউ রোড! মেয়েটা তার কাছে নতুন পথের নিশানা চাইতে এসেছিল। অথচ দীপঙ্করেরই তো নতুন পথের নিশানা দরকার!

নিউ রোড! নিউ রোড! নতুন পথ!

সত্যিই এবার থেকে এক নতুন পথে চলতে হবে তাকে। যখন সবাই একে একে ছেড়ে গেল দীপঙ্করকে, তখন তার নিশ্চয়ই একটা নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। লক্ষ্মীদিরও তাকে আর প্রয়োজন নেই। সতীর প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছে। কিরণ তাকে ত্যাগ করেছে! সকলের সব চাওয়ার সব পাওয়ার ভেতরকার চাওয়া-পাওয়ার পরিচয় সে পেয়েছে। সবাই বলছে—এই বিচ্ছেদ থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করো। অথচ তাদেরই মতন দীপঙ্করও তো একদিন মিশতে চেয়েছিল সকলের সঙ্গে। সেই ছোটবেলাকার লক্ষ্মণ সরকার থেকে শ্র্ করে সকলের সঙ্গেই সে মিশতে চেয়েছে। কিন্তু এমন মেলা-মেশা তো সে চায়নি। যেখানে যার সঙ্গেই সে মিশতে চেয়েছে, সেখান থেকেই এসেছে বিচ্ছেদ। এমন মিল কি তার হয় না, যা পেতে হলে বিচ্ছেদের ম্ল্য লাগে না!

মোটরটা চলে গেল!

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সেই দিকে। মহিলাটির লিপস্টিক মাখা ঠোঁট। কাঁধ কাটা ব্লাউজ। একা-একা সে ড্রাইভারের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছে। ছোটবেলায় কিন্তু এরকম দেখা যেত না। আগে ঘোড়ার গাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে বেরোত মেয়েরা। প্জোর সময় কালিঘাটে যারা বাজি-পোড়ানো দেখতে যেত তারা পাশের হালদারদের বাড়ির দিকের আড়াল থেকে দেখতো। এ-রকম হলো কবে থেকে। বালিগঞ্জের দিকে অনেকগ্লো নতুন পাড়া হয়েছে, হয়ত সেখানকার মেয়ে। আশ্চর্য, একেই কিনা সতী বলে ভুল করেছিল দীপঙ্কর! বাঁ পাশেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। কালকে এইখানেই এসেছিল দীপঙ্কর। বিরাট ম্যারাপ বাঁধা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কালকেই অদ্ভুত সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল মনে মনে। ভালো, ভালো, বিচ্ছেদ হওয়াই ভালো; পাওয়া মানেই তো থেমে যাওয়া। দীপঙ্করকে তো এখানে থামলে চলবে না। দীপঙ্করকে যে আরো অনেক দ্রে যেতে হবে, সতীর কাছ থেকে দ্রে গেলেই তো তার ম্ক্তি!

অনেকদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়নি। সেই বৌবাজারের সর্ গলিটার মধ্যে লক্ষ্মীদির দিনগ্লো কেমন করে কাটছে কে জানে। সেই দাতারবাব্। দাতারবাব্রই বা কী অবস্থা। হয়ত এতদিন বাড়িভাড়া দিতে পারেন নি বলে তাড়িয়েই দিয়েছে বাড়িওয়ালা। হয়ত দাতারবাব্ ধরা পড়েছে। হয়ত লক্ষ্মীদি আবার নিরাশ্রয়। আবার কোথাও ভেসে গেছে—ভেসে তলিয়ে গেছে। সমস্ত কলকাতা শহরে এতটুকু আঁকড়ে ধরবার মত আশ্রয়ই তার আর নেই। লক্ষ্মীদি যা মেয়ে, সে কি আর ভুবনেশ্বরবাব্র কাছে এসেছে? আর ভুবনেশ্বরবাব্! ভুবনেশ্বর মিত্র। তাঁরই বা কী খবর! সতীর বিয়ের পর তিনি হয়ত সতীকে নিয়ে ফিরে যাবেন বর্মায়! এখন এই ম্হ্র্তে হয়ত ভুবনেশ্বরবাব্ কলকাতাতেই

আছেন। আর কাকাবাবু? কাকীমা?

সমস্ত বাড়িটা বড় ফাঁকা লেগেছিল দীপঙ্করের। মা'র অসুখ, মা'কে পাথার বাতাস করতে করতে কতবার চেয়ে দেখেছিল বাড়িটার দিকে। যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে বাড়িটা। এখন এতদিনের পুরোন বাড়িটার দিকে যেন চেয়ে দেখতেই ইচ্ছে করে না আর।

ইলিশিয়াম রো'র এ-এস্-আই শান্তিবাবুকে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, শচীশবাবুকে চেনেন?

—কে শচীশবাবু?

—আমাদের বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন, সি-আই-ডি, আমরা কাকাবাবু বলে ডাকতুম—

শান্তিবাবু বললেন—তিনি তো ছুটিতে—তিনি এস-বি ব্রাঞ্চের লোক—আর আমরা আই-বি ব্রাঞ্চ—

—তা তিনি ছুটিতে কেন? তিনি আমাকে খুব ভালো করে জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই আমার সম্বন্ধে সব খবর পাবেন—

শান্তিবাবু বললেন—তিনি বোধহয় আর কলকাতায় থাকবেন না,—

—কেন থাকবেন না? তিনি তো বার্মা থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছিলেন।

—তা এসেছিলেন, এখন আবার শুনছি ট্রান্সফারের জন্যে দরখাস্ত করেছেন—

তা হবে! স্বামী স্ত্রী—ছেলেমেয়ে কিছু নেই। আর লক্ষ্মীদি ছিল, লক্ষ্মীদি চলে গেল। আর ছিল সতী, তারও বিয়ে হয়ে গেল। তাই আর হয়ত কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে নেই।

একটা ট্রাম আসছিল। দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো বৌবাজারে গিয়ে একবার দেখে আসে লক্ষ্মীদিকে। হঠাৎ মনটা বড় ছট্‌ফট্ করে উঠলো লক্ষ্মীদির জন্যে। সতীর তবু নতুন বিয়ে হয়েছে, তার শ্বশুর শাশুড়ী আছে, স্বামী আছে, বিরাট বাড়ি-গাড়ি-টাকা সব আছে। তার কিসের ভাবনা! দুদিন বাদে সমস্ত কিছু ভুলে যাবে। ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক! ওই মেয়েটার মত ঘাড়ের চুল ছোট করে ছাঁটবে, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখবে, একলা-একলা ড্রাইভারের সঙ্গেই হয়ত নিউ রোডের ঠিকানায় গাড়ি চালিয়ে যাবে। রাস্তার ছেলেদের দাঁড় করিয়ে ঠিকানার নির্দেশ জানতে চাইবে। হয়ত দীপঙ্করদের গায়ে গাড়ির কাদা ছিটিয়ে যাবে! হয়ত কেন, সত্যিই তাই। সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার আগেই হয়ত বিছানার মাথার কাছে চা এসে যাবে। বয় বাবুর্চি খানসামারা হয়ত তটস্থ হয়ে থাকবে মিসেস ঘোষের হুকুমের ভয়ে। সতী এখন আর সতী মিত্র নয়, সতী ঘোষ! গ্রীষ্মকালে দার্জিলিং যাবে, সী-সাইডে যাবে। আর শীতের দিনে? শীতের দিনে যদি ইচ্ছে হয় তো থাকতে পারে কলকাতায়। আর কলকাতায় যদি থাকতে ইচ্ছে না-করে তো যাবে নিশ্চয়ই কোথাও। কত জায়গা আছে যাবার। ভালো না-লাগলে এক-একদিন দুজনে চলে যাবে

হোটেলে। চৌরঙ্গীর হোটেলের টেরাসের ওপর বসে বসে চা খাবে। কফি খাবে। বিকেলের ছুটির আলস্য তখন সামনের ময়দানের ওপর পাখা বিস্তার করেছে। সেই টেরাসের ওপর বসে বসে দুজনে দেখবে বাইরের চলন্ত পৃথিবীকে। ট্রাম আর বাস, গতি আর বিশ্রাম, কল্পনা আর সম্ভাবনার পৃথিবী। তারপর যখন ফোর্ট উইলিয়ামের মাথার লম্বা পোস্টটার ওপর লাল আলোটা জ্বলে উঠবে, তখন নামবে দুজনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলের লাউঞ্জ পেরিয়ে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ঘুরবে গাড়ির চাকা। তারপর প্রিন্সেপস্ ঘাট, আউটরাম ঘাট, কিম্বা যশোর রোডের নিরিবিলি, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের হাতছানি।

আর ওদিকে তখন রেলের আপিসে জাপান-ট্র্যাফিকের ফাইল পাতলা থেকে মোটা হচ্ছে ক্রমাগত। চেয়ারের ছারপোকাগুলোর পেট ভরে গিয়ে টইটুম্বুর। দীপঙ্কর সেন তিনটে স্পেশালের হিসেব মেলাতে গিয়ে গলদঘর্ম। জার্নাল সেকশনে গাঙ্গুলীবাবু একগ্লাস চা চার ভাগ করে কে-জি-দাশবাবুকে তুষ্ট রাখছেন। রামলিঙ্গমবাবুর টেবিলে ফাইলের পাহাড়। স্টোরস্ সেকশানে নতুন ইন্ডেন্ট নিয়ে তুমুল ঝগড়া চলেছে। হৃদয় চাপরাসী অ্যালুমিনিয়ামের ডেক্‌চিতে পাঁটার চপ বিক্রি করতে চলেছে। ধুলো, গোলমাল, ঝগড়া, ছারপোকা, কাজ সব মিলিয়ে তখন ছত্রখান করে দেবে সেই দুজনের বিকেল বেলার আলস্য। সেখান থেকে সেই জাপান-ট্র্যাফিকের ফাইলের কাজ করতে করতেই দীপঙ্কর কানে শুনতে পাবে দুজনের আলগা কথার টুকরো—

—আজকে কোন্ দিকে যাবে সতী?

—চলো না যশোর রোড ধরে যাই, যতদূর চোখ যায়!

—যদি বৃষ্টি নামে?

—তা কি নামবে? তাহলে তো আরো কাছাকাছি হবো, আরো হারিয়ে যাবো আমরা!

—তোমার বুঝি হারিয়ে যেতে ভালো লাগে?

—খুব!

—কিন্তু তুমি হারিয়ে গেলে আমার যে কষ্ট হবে? আমি তখন কী করবো?

—তুমি আমায় খুঁজে বের করবে! তুমি খুঁজে পাবে বলেই তো আমি হারাবো। নইলে হারিয়ে গিয়ে লাভ কী?

তারপর হাসবে দুজনে। সেই সন্ধ্যে বেলা, যখন দীপঙ্কর জাপান-ট্র্যাফিকের শেষ ফিগারটা মিলিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে ক্লান্ত পায়ে আপিসের গেটের সামনে একেবারে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে, গুর্খা সেপাইটা ভারী বুট পরে লোহার গেটটা শেষবারের মত বন্ধ করে দেবে, তখন যশোর রোডের গাড়িটা সত্যিই হারিয়ে গেছে চাঁদনী রাতের আলোয়। একটা ঝাঁকড়া-মাথা বিরাট আম গাছের তলায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছু দেখা যায় না। শুধু দুজনের

ভাঙা-ভাঙা হাসির শব্দ হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট হয়ে।

ট্রামটা সামনে এসে দাঁড়াল, আবার চলেও গেল।

না থাক, আজকে লক্ষ্মীদির কাছে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বরং কালই যাবে দীপঙ্কর। অবশ্য মা'র শরীরটা যদি ভাল থাকে।

মা'র কথা মনে পড়তেই দীপঙ্কর পা চালিয়ে চলতে লাগলো। কালিঘাটের বাজারের রাস্তাটা দিয়ে আর নয়। হয়ত ছিটে কি ফোঁটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। হয়ত কালকের মত আবার টানাটানি করবে! আশ্চর্য, চন্নুনীকে এতদিন ধরে দেখে দেখেও তো এমন করে চিনতে পারেনি আগে! অনেকদিন গালাগালি দিয়েছে চন্নুনী, অকারণে গালাগালি দিয়েছে। আকাশের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, সংসারের স্থাবর-জঙ্গম, জড়-জীব সকলের সঙ্গে ঝগড়া করেছে সে। কিন্তু এতদিন পরে প্রথম তার ঝগড়ার কারণটা ধরতে পারলে দীপঙ্কর। দুটি মেয়ে—লোটন লক্কা। হয়ত দেখে ফেলেছিল অঘোর-দাদু! তাই তারপরেই দূর করে দিয়েছে ছিটে-ফোঁটাকে। একেবারে সংসারের বার করে দিয়েছে!

সেই চন্নুনীর সঙ্গেই সদর দরজার সামনে দেখা হয়ে গেল।

চন্নুনী তখন বোধহয় সদর দরজা বন্ধ করতেই এসেছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো চন্নুনী, মা এখন কেমন আছে?

চন্নুনীকে আর উত্তর দিতে হলো না। দীপঙ্কর দেখলে সোজা সামনের দাওয়ার ওপরে মা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। কোনওদিকে যেন মা'র দৃষ্টি নেই। যেন নিজস্ব দুর্ভাবনায় মা থই পাচ্ছে না।

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো মা?

মা বেশি কথা বললে না। শুধু বললে—ভালো—

দীপঙ্কর মা'র পাশে গিয়ে বসে পড়লো। বললে—এখানে তুমি বসে আছ কেন? যদি আবার শরীর খারাপ হয়? ঘরে গিয়ে শুলে ভালো হতো না? ওষুধ খেয়েছিলে তো?

মা যেন দীপঙ্করের কথাগুলো শুনতে পেলে না। স্থির শান্ত দৃষ্টিতে সামনের ভাঙা পাঁচিলটার দিকে চেয়ে রইল একভাবে।

দীপঙ্কর বললে—খুব ভয় পেয়েছিলাম, জানো মা, আপিস যাবার আগে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি ক'দিন যাইনি, এদিকে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গিয়েছে তাই নিয়ে। কেউ ফাইল খুঁজে পায় না—শেষকালে রবিনসন্ সাহেব অর্ডার দিয়ে দিলে এবার থেকে তার পাশের কামরায় বসতে হবে—

চন্নুনী একটা বাটিতে মুড়ি এনে দিলে সামনে।

মা আস্তে আস্তে বললে—কী খেয়েছিলি আজ?

দীপঙ্কর বললে—এখুনি আসছি মা, জামা-কাপড়টা ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে আসি—

খানিক পরে ফিরে এসে মুড়ি খেতে খেতে দীপঙ্কর বললে—আমার লেকচার শুনে রবিনসন্ সাহেব তো খুব খুশী। জানো মা। নৃপেনবাবুও খুব খুশী! ওঁরা সবাই মুখস্ত করে এসেছিল, মুখস্ত করে গেলে অবশ্য ভালোই হতো কিন্তু আমি তো আগে জানতাম না যে আজই নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েল হবে—

তখনও মা'র মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে আবার—পান্না ডাক্তারকে আর একবার ডাকবো মা! খবর দিয়ে আসবো যে এখন তুমি ভালো আছো?

মা তেমনি গম্ভীর ভাবেই বললে—না!

—কিন্তু যদি তোমার অসুখটা আবার বাড়ে! তখন কী হবে বলো তো? কাল সারাদিন খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আর এখন কি উঠে হেঁটে বেড়ানো ভালো! চন্নুনী তো রান্না-বান্না করছেই, তুমি আবার মিছিমিছি উঠলে কেন বিছানা থেকে, বলো তো?

এতক্ষণে যেন মা মুখ ফেরালে দীপঙ্করের দিকে।

বললে—দীপু!

দীপঙ্কর মা'র গলার গাম্ভীর্য দেখে ভয় পেয়ে গেল।

বললে—কী মা?

মা কিছু উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর বললে—কী মা, কী হলো? ঘরে যাবে? তোমাকে ধরবো?

মা বললে—না, ঘরে যাবো না, তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর.....

দীপঙ্কর মা'র মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মা'র এমন মূর্তি তো দেখেনি সে কখনও।

—তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর স্বদেশী করবি না—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল মার কথাগুলো শুনে। হঠাৎ যেন তার বিশ্বাস হলো না। মনে হলো ভুল শুনেছে সে!

—কর তুই প্রতিজ্ঞা! আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর্—।

—কিন্তু মা......

—আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর জীবনে কখনও স্বদেশী করবি না।

দীপঙ্কর মা'র দিকে সোজা চেয়ে রইল কিছুক্ষণ!

তারপর বললে,—কিন্তু, কখন আমি স্বদেশী করলুম? কখন তুমি স্বদেশী করতে দেখলে আমায়?

মা বললে—কিন্তু স্বদেশী না-করলে পুলিসে তোকে ধরলে কেন?

দীপঙ্কর এর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না।

মা আবার বললে—বল্ কেন তোকে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল, বল্?

তুই যদি স্বদেশী ব্যাপারে না থাকবি তোকে কেন ধরবে তারা? তাহলে বল্, তুই কী করেছিলি?

—বিশ্বাস করো মা, আমি কিছু করিনি! আমি ছোটবেলায় কিরণের সঙ্গে শুধু লাইব্রেরী করেছিলুম, কিন্তু যেদিন থেকে কাকাবাবু বারণ করে দিয়েছিলেন সেইদিন থেকেই লাইব্রেরীতে আর যাইনি আমি—

—তাহলে কি ওরা তোকে মিছিমিছি ধরে নিয়ে গেল বলতে চাস্?

মা'র যেন কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মা হাঁফাচ্ছিল কথাগুলো বলতে বলতে।

দীপঙ্কর বললে—তা তুমি এখন একটু চুপ করে থাকো না মা, তোমার শরীর খারাপ, এই সময়ে, তুমি কেন ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?

মা যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—মাথা ঘামাবো না? তোমার জন্যে ভেবে ভেবে আমার রাত্তিরে ঘুম আসে না, দিনে খেতে পারি না! আমি তোমার মা হয়ে কী অপরাধ করেছি বলো তো? কী এমন শত্রুতা ছিল তোমার সঙ্গে আমার যে তুমি আমাকে এমন করে জ্বেলে মারবে? বলতে পারো, আমি তোমার কী সর্বনাশটা করেছি?

অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলতে লাগলো মা। ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে কান্না ঝরতে লাগলো! দীপঙ্কর চুপ করে কান পেতে শুনলে সব। যেন তার আর কিছু বলবার নেই, তার আর কিছু করবারও নেই—

অনেকক্ষণ পরে দীপঙ্কর বললে—মা, সব শুনলুম এবার ঘরে চলো,—

—না আমি ঘরে যাবো না, আমি মরলে কার কী এসে যায়! আমি মরে গেলেই তো তোমার নিশ্চিন্তি!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু নিজের অসুখ হলে তুমি নিজেও তো কষ্ট পাবে!

—তুই বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যা! আমার কষ্টের কথা তোকে ভাবতে হবে না—

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—সে তুমি যাই বলো না, তোমার কষ্ট হলে আমি ভাববোই, তুমি বারণ করলেও ভাববো!

মা আঁচল দিয়ে নিজের চোখটা মুছে নিলে। দীপঙ্কর বললে—তুমি আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছো মা, সত্যি বলছি আমি স্বদেশী করিনি—

—স্বদেশী করিস আর না-করিস, তুই আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনও স্বদেশী করবি নে। এই পা-ছুঁয়ে বল্ আমার—ছোঁ পা—

দীপঙ্কর মা'র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। হঠাৎ মনে হলো মা যেন তাকে দিয়ে এক ভীষণ দাসখত সই করিয়ে নিতে চায়! চিরজন্মের মত যেন আত্ম-অবমাননার মূল্যে তার নিজের জীবনটাকে ফিরে পেতে হবে!

—তুই যতক্ষণ না পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছিস, ততক্ষণ আমি উঠবো না, খাবোও না, ঘুমোবও না! আমি মাথা খুঁড়ে মরবো এখানে!

মা'র মুখের দিকে চেয়ে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল দীপঙ্কর! মা'র জেদ বড় ভীষণ। দীপঙ্কর মা'কে চেনে।

চন্নুনী এতক্ষণ শুনছিল সব কথা। বললে—তুমি পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাও না বাছা, মায়ের পায়ে হাত দিতেও লজ্জা—বলিহারী লজ্জার বালাই বাছা তোমার, ছিঃ—

চন্নুনীর কথায় কেউই কান দিলে না। মা যেন অচল-অটল হয়ে রইল নিজের জিদের কাছে। দীপঙ্করও সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে অটল হয়ে রইল।

কিন্তু হঠাৎ মা এক তুমুল কান্ড করে বসলো। বলা নেই কওয়া নেই মা হঠাৎ সরে গিয়ে সামনের ইঁটের থামে মাথাটা ঠাঁই ঠাঁই করে ঠুকতে লাগলো—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে।

—মা, মা, এ কী করলে তুমি? এ কী করলে মা?

চন্নুনীও দৌড়ে এসেছে। বিন্তীদিও শব্দ শুনে দৌড়ে এসেছে কাছে।

মা'র কপালটা ততক্ষণে ফুলে উঠেছে। দীপঙ্কর বললে—বিন্তীদি এক ঘটি জল দাও না—

মা'র মাথায় জলটা থাবড়াতে থাবড়াতে দীপঙ্করের কান্না পেতে লাগলো। একে এ ক'দিন শরীর খারাপ ছিল। এ ক'দিন দীপঙ্করের জন্যে ভেবে ভেবে ঘুম হয়নি, তার ওপর এই অত্যাচার!

মা তখনও বলছে—তুই ছাড় আমাকে দীপু, ছাড় তুই—তোর সামনেই আমি মাথা খুঁড়ে মরবো—

দীপঙ্কর বললে—এই তোমার পা ছুঁচ্ছি—

—তা হলে কর্ প্রতিজ্ঞা, জীবনে কখনও স্বদেশী করবি না, কর্ প্রতিজ্ঞা।

—এই প্রতিজ্ঞা করছি মা, আমি জীবনে কখনও স্বদেশী করবো না, এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলুম, এবার ওঠো, এবার ঘরে চলো তুমি—

মা তখন একটু শান্ত হয়েছে। নিজের মনেই বলতে শুরু করেছে—ওই কিরণ ছোঁড়াই আমার দীপুকে এমন খারাপ করেছে, ওই কিরণটাই যত নষ্টের গোড়া—

চন্নুনী বললে—হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছ, তোমার দীপুকে ওই কিরণ ছোঁড়াই গোল্লায় দিয়েছে—আমি দেখেছি যে ছোট্টবেলা থেকে, দেখি সারা দুপুর, সারা বিকেল দু'জনে ফিস্-ফিস্ গুজ্-গুজ্ করছে, বলি দুই বেটাছেলে মিলে এত কিসের গুজ্-গুজ্ বাছা—বেটাছেলের সঙ্গে এত পীরিত কেন গা?

—থাম তুমি চন্নুনী!

দীপঙ্কর হঠাৎ ধমকে উঠলো। বললে—যত কিছু বলি না বলে তোমার বড্ড বাড় হয়েছে, না?

হঠাৎ দীপঙ্করের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে চন্নুনীও থমকে গেল। সেও যেন দীপঙ্করের কাছ থেকে এমন কথা আশা করে নি! কিন্তু দীপঙ্করের

মা হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—কেন? চন্নুনী অন্যায়টা কি বলেছে শুনি? আমিও তো দেখেছি তোকে কিরণের সঙ্গে মিশতে! মিশিস না তুই?

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—চল্, চল্ তুই আমার সঙ্গে—আমি কিরণের মা'কে গিয়ে বলছি—তোমার ছেলের জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ, তোমার ছেলেই তো দীপুকে এমন খারাপ করে দিয়েছে—চল্ তুই চল্ আমার সঙ্গে—এখুনি চল্—

বলে সত্যি সত্যিই মা পা বাড়াল কিরণদের বাড়ি যাবার জন্যে।

—কিন্তু মা, কী পাগলামি করছো তুমি!

—পাগলামি নয়, আমি যাবোই, আমি এখুনি গিয়ে বলে আসবো কিরণের মাকে, যত সব ছোটলোক জুটেছে পাড়ায়, তাদের সঙ্গে মিশেই এই ফল হয়েছে আমার, তাদের জন্যে আমার কপাল ভেঙেছে—

সত্যি সত্যিই মা সেই অবস্থাতেই উঠোনে নামলো। মা তখনও টলছে। দীপঙ্কর গিয়ে মাকে ধরলে। বললে—মা কেন মিছিমিছি কিরণের মা'কে কষ্ট দেবে, কিরণ নেই বাড়িতে, সে বাড়িতে থাকে না—

—না থাক্, আমি তার মা'কে বলে আসবো!

—কিন্তু তা'র মা'র যে বড় কষ্ট, তার বাবার অসুখ, সংসার চলছে না, তুমি গিয়ে মিছিমিছি তাদের কষ্ট আরো বাড়াবে!

—তাদের কষ্ট, আর আমার কষ্টটা বুঝি তুই দেখছিস না? আমার কষ্টটা কষ্ট নয়?

বিন্তীদিও এসে মা'কে অনেক বোঝালে। বললে—দিদি, তুমি যেও না এই শরীর নিয়ে, পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে—

কিন্তু মা'র যখন যা জিদ চাপবে, তখন কারো ক্ষমতা নেই তা ভাঙার। দীপঙ্কর মাকে ধরে চলতে লাগলো। তখন বেশ ভালো করে সন্ধ্যে হয়েছে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়ে নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের রাস্তাটা খারাপ। মা যেন ধুঁকছে। এতদিনের উদ্বেগ, অনাহার—সব যেন মা'কে সহ্যের শেষ সীমায় এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কোন কথা নেই মা'র মুখে। সরু রাস্তাটা দিয়ে যেন এক অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে মা চলেছে। দীপঙ্করকে ভাল করতেই হবে। দীপঙ্করকে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতেই হবে। দীপঙ্কর বড় হবে, মানুষ হবে! দীপঙ্কর অন্যায় অনিয়ম থেকে মুক্তি পাবে। সৎ মানুষ হবে, সংসারী হবে—তবেই যেন মা'র আশা পূর্ণ হবে! আশে-পাশের বাড়ি থেকে উনুনের কয়লার ধোঁয়া উঠে বাতাসে ভাসছে। মা আস্তে আস্তে সন্তর্পণে নর্দমাগুলো পেরিয়ে গেল। তারপর একেবারে কাঁচা রাস্তা। এবড়ো-খেবড়ো-অসমান। প্রতি পদে হোঁচট খাবার ভয়। একবার পড়ে গেলে আর বাঁচানো যাবে না মা'কে!

দীপঙ্করের তখন সব ভাবনা যেন লোপ পেয়েছে।

সেই বালিশ বুকে বুড়ো মানুষটা। তিনি কানে শুনতে পাবেন সব, কিন্তু

বলতে পারবেন না কিছু। শুধু ঘড়-ঘড় করে শব্দ হবে একরকম। তখন হয়ত একটু গরম জল দিলে ঠান্ডা হবে। কিরণের মা হয়ত কিছু বলবে না, হয়ত মা'র কথা শুনে কাঁদবে!

কিন্তু গলিটার সামনে গিয়ে হঠাৎ একটা আর্তনাদ কানে যেতেই দীপঙ্কর চমকে উঠলো।

মা'ও চমকে উঠেছে!

—ও কে কাঁদছে রে?

দীপঙ্করের যেন কী সন্দেহ হলো। বললে—কিরণের মা'র গলা মনে হচ্ছে মা!

কিরণের মা! ততক্ষণে কিরণদের বাড়ির একেবারে দরজার সামনে এসে গেছে। দরজাটা খোলা ছিল। দীপঙ্কর উঁকি মেরে দেখলে। মা-ও দেখলে। কিরণের বাবা সেই বালিশের ওপরেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মাথাটা দাওয়ার নিচে ঝুলছে। আর কিরণের মা একলা কিরণের বাবার সেই প্রাণহীন বিরাট শরীরটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে অসহায়ের মত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। সেই আর্তনাদে সমস্ত কালিঘাট যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো এক নিমেষে। মৃত্যুর কাছাকাছি এলে সব জীবন্ত মানুষই বোধহয় ঝিমিয়ে আসে। মা'ও যেন কেমন হয়ে গেল। সেই নোংরা বিছানা-বালিশ থুথু-দুর্গন্ধের মধ্যে মৃত্যু কেন যে আসতে সঙ্কোচ বোধ করলে না, তা-ই একটা বিস্ময়! কত দিন কত বার মনে মনে মৃত্যু কামনা করেছে কিরণের বাবা, বাইরে ভাষাতেই শুধু তা প্রকাশ করতে পারেনি। আজ সেই মৃত্যুই এল। কিন্তু যেন বড় মর্মান্তিক ভাবে এল। আজ কিরণ নেই, কেউ নেই। সহায়-সম্বলহীন পরিবার। ধৈর্যের সীমান্তে যেখানে জীবন-মৃত্যু একাকার হয়ে যায়, যেখানে আনন্দ-বেদনার তারতম্য-বোধ আর থাকে না, সেইখানে বুঝি পৌঁছে গিয়েছিল সেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের অসহায় পরিবারটি! কিন্তু মৃত্যুর কাছে বোধহয় উচ্চ-নীচ নেই, সুখী-দুঃখী নেই, অসহায়, আতুর, অনাথ কোনও বিচারই নেই। মৃত্যু বোধহয় বিচার-অবিচারের ঊর্ধ্বে। চারিদিকের সেই জঘন্য দুর্গন্ধের মধ্যে দীপঙ্করেরও যেন কেমন ঘেন্না করছিল। মা'কে তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েই আবার চলে এসেছে!

কিরণের মা হঠাৎ সেই অবস্থায় দীপঙ্করকে দেখে যেন একটু অবাক হলো।

—আপনি সরুন মাসীমা!

—তুমি মা'কে বলে এসেছ তো বাবা?

একদিন মা'র অনুমতি ছাড়া এ-বাড়িতে আসবার অধিকার ছিল না দীপঙ্করের—সেকথা যেন কিরণের মা এখনও ভুলে যায়নি। ছোটবেলায় কিরণের বাবার কাছে অঙ্ক বুঝে নিয়ে গেছে দুজনে। কতদিনের অসুখ কিরণের বাবার। কতদিন ধরে বোধহয় মৃত্যুকামনা করেছে কিরণের বাবা, কিন্তু তখন

মৃত্যু আসেনি। তখন মৃত্যু হলেই হয়ত ভালো হতো। তা হলে কিরণের বাবার এই অপমৃত্যুর সংবাদ তাকে কান দিয়ে শুনতে হতো না! তা হলে হয়ত এমন করে কিরণের মা'কে অনাথ করবার পুরোপুরি দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেত। কিন্তু আজ যখন নিঃসহায় নিঃসম্বল নিঃশেষ হয়ে এসে দারিদ্র্যের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তার পরিবার, তখনই সব শেষ হয়ে গেল। নিজের ভাষাহীন চোখ দিয়ে দেখে যেতে হলো কিরণ গৃহত্যাগী, স্ত্রী অনাথা! একটা কপর্দকের জন্যে প্রতিবেশীর কাছেই হাত পাততে হতো ইদানীং! সেই চরম দুঃসহ দৃশ্যের মূক সাক্ষী হয়ে প্রতি পলের বেঁচে থাকার চেয়ে এই মৃত্যু ঢের ভালো। শান্তি পেয়েছে কিরণের বাবা! কিরণের মা'ও বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো।

সেদিন সেই সন্ধ্যাবেলাই লোক-জনের চেষ্টা করতে হয়েছিল দীপঙ্করকে! কাছেই শ্মশান। তবু কুষ্ঠ রোগী তো। বড় ছোঁয়াচে রোগ। 'কালিঘাট ব্যায়াম সমিতি'র দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল একবার দীপঙ্কর। দরজায় তালা লাগানো। টেগার্ট সাহেব সেদিন নিজে এসে তালা বন্ধ করে দিয়েছে। আশে-পাশের পাড়ার লোক-জন ছেলে-ছোকরা ক'জন এসে দাঁড়াল। একটু আহা-উহু করলো। সমবেদনা দেখাল সবাই। কিরণের জন্যে দুঃখও প্রকাশ করলে। ছেলেটা অকালে বখে গেল বলে হা-হুতাশ করলে। লেখাপড়া করলো না, বাপ-মাকেও দেখলে না। এমন ছেলে থাকলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী! স্বদেশী আমরাও করি, খদ্দর পরি, বিলিতি কুমড়োটাও খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি গান্ধীর কথা মত—কিন্তু এটা কী? বাপ-মা-ই হলো আসল, বিপদের সময় তাদেরই যদি না-দেখলুম তো সে আবার করবে দেশসেবা, সে আবার ইংরেজ তাড়াতে চায় দেশ থেকে। এইটেই কি তোর দেশসেবা করার সময় রে বাপু?

দীপঙ্কর ঘুরে এল আবার।

মাসীমা তখনও মৃতদেহের পাশে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। ময়লা-বিছানার আণ্ডিল। সেই নোংরা ময়লার ওপরেই মূর্তিমান মৃত্যু তার সস্তা শিকার পেয়েছে। কিন্তু মাসীমার যেন কিছুতেই আর বিকার নেই। আশে-পাশের বাড়ির দু'একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে তখন উঠোনে। মুখে-নাকে আঁচল দিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে। তাদেরও বোধহয় আজকের দিনে পাশে এসে দাঁড়ানো একটা কর্তব্যের সামিল।

পাথরপটির গলির ভেতর ফটিকদের বাড়ি। ফটিকের নাম ধরে ডাকতেই তার মা বেরিয়ে এল। বুড়ী মা। তাদের অবস্থা কিরণের মত! ফটিকের মা বললে—কিন্তু ফটিক তো নেই বাবা?

—কখন আসবে?

—তার কি আসবার ঠিক আছে বাবা? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পয়সার ধাক্কাতেই ঘুরছে কেবল—

একবার চণ্ডীবাবুদের বাড়িতে গেলেও হয়। রাখাল তাদেরই দলের।

বাড়ি থেকে চুরি করে করে তাদের লাইব্রেরীতে বই দিয়েছিল একদিন। কিন্তু তার আগে পথে পড়ে মধুসূদনের বাড়িটা। মধুসূদনদের বাড়ির রোয়াকের আড্ডাটা ভেঙে গিয়েছে। দুনিকাকাও আসে না, পঞ্চাদাও আসে না। গরম গরম তর্কের ঝড় বয়ে যায় না আর খবরের কাগজ নিয়ে।

মধুসূদনকে ডাকতেই খানিক পরে বেরিয়ে এল। বললে—কী রে দীপু? কী খবর তোর? কবে ছাড়া পেলি?

দীপঙ্কর বললে—কিরণের বাবা মারা গেছে জানিস?

—সে কী রে! কখন?

—এই এক ঘণ্টা আগে, একটু শ্মশানে যেতে পারবি? কেউ নেই ওদের, জানিস্ তো— তুই, আমি আরও দু'জন দরকার, ডেকে নেব 'খন আমি—

মধুসূদনের মুখ দেখে মনে হলো যেন বড় বিপদে পড়েছে। খানিক কী যেন ভেবে বললে—দ্যাখ্, যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আসলে কী জানিস ভাই, বড়দা ভয়ানক আপত্তি করবে, দেখেছিস তো আমাদের রোয়াকের আড্ডা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে—যা কাণ্ড সব হচ্ছে পাড়ায়, কারোর সঙ্গে ভয়ে মিশতেই ভাই বারণ করে দিয়েছে বড়দা—

তারপর একটু থেমে বললে—তা যাক্‌গে, তোকে ধরেছিল কেন রে? কী করেছিলিস্ তুই?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়িতে সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলতে লাগলো। বললে—সে-সব কথা বলবার সময় নেই এখন—আমি অন্য জায়গায় দেখি—

অন্য জায়গায় মানে যে কোথায় তা তখনও ঠিক ছিল না। রাখাল! রাখাল কি যাবে? বড়লোকের ছেলে, সে কী করতে শ্মশানে যাবে! তার কিসের দায় পড়েছে। তবু রাখালের বাড়ির সামনে গিয়েও একবার দাঁড়াল দীপঙ্কর। রামধনি দরোয়ান তখনও আছে। গেটের পাশেই ছোট ঘরখানায় বসে আটা মাখছিল। দীপঙ্কর খানিক দাঁড়াল। এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। অনেক বড় বাড়ি। বিরাট বাড়ি, কে কোথায় থাকে, কখন থাকে, তার হদিস রাখা শক্ত। দীপঙ্কর ফিরে এল আবার। এত বড় পৃথিবী, এত বিরাট কালিঘাট—অথচ সেদিন দীপঙ্করের মনে হয়েছিল যেন কোথাও কেউ নেই! এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারে সে।

হতাশ হয়ে আবার নেপাল ভট্টাচার্য লেনের দিকে ফিরেই আসছিল দীপঙ্কর, হঠাৎ মনে পড়লো ছিটে-ফোঁটার কথা!

কালিঘাট বাজারের উত্তর গায়ে হিন্দু হোটেল। তারই পেছনে টিনের পাকা বাড়ি। আর কোনও উপায় না দেখে দীপঙ্কর সেই দিকেই গেল। বেশ রাত হয়ে আসছে তখন। কিন্তু ও-পাড়া তখনও জমেনি ভালো করে। জমবে আরো অনেক রাত্রে। রাত আর একটু গভীর হলে। অনেক অবাঞ্ছিত লোক ঘোরা-ফেরা করছে এদিকে ওদিকে। সরু একটা পাঁচ ফুট চওড়া গলি। খোয়া

বাঁধানো। গলির দু'পাশে একটা নয়, অনেকগুলো টিনের পাকা বাড়ি। ভেতরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে এক-জায়গায় গান হচ্ছিল। ফেরিওয়ালারা গলির মধ্যেও কারবার করতে ঢুকেছে।

—চাই পাঁঠার ঘুগ্‌নি। গরম আলুর চপ্‌, পেঁয়াজি—

আরো অনেক রকম ফেরিওয়ালা। মালাই বরফ, বেলফুল। পায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে সখী সেজে চানাচুর বিক্রি করছে একজন। দু'পাশে অনেক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাজগোজ করে। হাসি-মস্করা করছে। পানের পিচ্‌ ফেলছে শব্দ করে। দীপঙ্কর মাথা নিচু করে হিন্দু হোটেলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

—ওদিকে নয় গো, ওদিকে নয়, ওটা বাঁধা ঘর।

দীপঙ্কর পেছন ফিরে কথাটা কে-বলছে দেখতেই একপাল মেয়ে কিল্‌বিল্‌ করে উঠলো। হেসে গড়িয়ে পড়লো সবাই।

যেন মরীয়া হয়েই দীপঙ্কর ডাকলে—লোটন্‌—

'লোটন' বলেই ডাকতে বলেছিল ফোঁটা। লোটনকে দেখতে কেমন, মানুষ কেমন তাও জানতো না দীপঙ্কর। ডাকতে একটু সঙ্কোচও হলো। কিন্তু না-ডাকলেও উপায় নেই। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

দীপঙ্কর আবার বাড়িটার সদর-দরজা লক্ষ্য করে ডাকলে—লোটন—

—কে গা?

একজন মেয়ে বেরিয়ে এসেছে হাসতে হাসতে। এক মুখ পান। কিন্তু দীপঙ্করকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেছে। দীপঙ্করও চিনতে পারলে যেন। যেন চেনা-চেনা মুখ। অঘোরদাদুর বাড়িতেই দেখেছে—চন্নুনীর কাছেই দেখেছে।

—এসে গেছিস্‌? আয়, আয়, ভেতরে আয়—

খালি-গায়ে লুঙ্গী-পরা ফোঁটা বেরিয়ে এসেই টানতে আরম্ভ করেছে হাত ধরে। বললে—আরে, এ যে-সে লোক নয়, বি-এ পাশ, গ্র্যাজুয়েট, রেলের অফিসার মানুষ—

দীপঙ্কর বললে—আমি ভীষণ বিপদে পড়ে এসেছি তোমার কাছে—কিরণের বাবা মারা গেছে, শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, কেউ নেই সাহায্য করবার, যার কাছে গেলাম সে-ই ফিরিয়ে দিলে, অথচ কিরণও নেই, শেষে কোনও উপায় না পেয়ে এখানে এলাম তোমার কাছে, তোমাকে সাহায্য করতেই হবে—

ফোঁটা যে ফোঁটা সে-ও মন দিয়ে শুনলে কথাগুলো। তারপর কী যেন ভাবতে লাগলো।

দীপঙ্কর আবার বললে—খরচপত্রও কিছু দিতে হবে তোমার, ওদের কিছু নেই—অন্তত দশটা টাকা লাগবেই—

ফোঁটা খানিক ভেবে চিন্তে বললে—দশ টাকায় হবে না,—

দীপঙ্কর বললে—দশ টাকাও লাগবে না হয়ত, তবে সঙ্গে থাকা ভালো—

ফোঁটা বললে—না, আমি অনেকবার গেছি, মাল-টাল খেতে হয়, কুড়ি টাকা

নেওয়াই ভালো—

তারপর লোটনের দিকে ফিরে বললে—কুড়িটা টাকা দাও তো গো, আর গামছাটা—

তারপর দীপঙ্করকে জিজ্ঞেস করলে—আর কে যাচ্ছে? আর কাউকে যোগাড় করতে পেরেছিস?

—আর কেউ নেই, শুধু আমি আর তুমি। যদি আর কাউকে যোগাড় করতে পারো তো বড় ভালো হয়—

—যোগাড় করতে পারবো না মানে? আমি বললে এ-পাড়ার কারোর বাবার ক্ষমতা আছে 'না' বলে?—বলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ফোঁটা।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত সেদিন ফোঁটা ছিল বলে কোনও অসুবিধাই হয়নি। কোথা থেকে আরো তিন-চারজন লোক যোগাড় করেছিল। সবাই যেন দেবতার মতন ভক্তি করতে লাগলো ফোঁটাকে। সবাই 'দেবতা' বলে ডাকতে লাগলো ফোঁটাকে। দীপঙ্করকে কিছুই করতে হয়নি। ছিটেও ছিল সঙ্গে।

একজন বললে—দেব্‌তা, কিছু মাল-টালের ব্যবস্থা নেই?

ক্যাওড়াতলার শ্মশানের মধ্যেও ফোঁটার রাজত্ব। ডোমরাও সসম্ভ্রমে প্রণাম করতে লাগলো ছিটে-ফোঁটাকে। দীপঙ্কর দেখে অবাক হয়ে গেল ছিটে-ফোঁটার প্রতিপত্তি। ব্রাহ্মণ-পুরুত, কাঠওয়ালা থেকে শুরু করে সাধু-সন্নিসী সকলের ওপরেই সমান প্রতিপত্তি। তার এক ডাকে মুহূর্তে কার্য সমাধা হয়ে যায়। এক হাঁকে শ্মশানসুদ্ধ লোক তটস্থ হয়ে থাকে। যাকে যা হুকুম করে সে-ই এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

পুরুত বললে—মুখাগ্নি করবে কে?

সত্যিই তো, মুখাগ্নি করবে কে?

ফোঁটা বললে—দীপু করবে, আবার কে করবে—আমি তো পাষণ্ড একটা—বলে বিড়িটায় লম্বা টান দিলে একটা।

দীপঙ্কর তখন গঙ্গার ঘাটের ওপর অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। সমস্ত মনটা তার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সমস্ত দিন। আর শুধু সমস্ত দিনই বা কেন? ক'দিন ধরেই একটার পর একটা ভাবনার ঝড়ে যেন একেবারে ভেঙে দিয়েছে তাকে। সেই আপিস, আপিসের চাকরি। কাকাবাবুর বাড়িতে হৈ চৈ, লক্‌-আপ, ছিটে-ফোঁটা, চন্নুনী, কিরণ, মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা আর তারপর এই কিরণের বাবার মৃত্যু!

গঙ্গার ঘাটের একেবারে শেষ ধাপে জলের ধার ঘেঁষে একটা লোক চুপ করে বসে আছে অনেকক্ষণ। চারদিক অন্ধকার। ছিটে-ফোঁটারা কাঠ কিনে চিতের যোগাড় করছে। মাঝে-মাঝে হরি-ধ্বনি কানে আসছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে শ্মশানের ভেতরটা। চোখ জ্বালা করে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে। কিন্তু এখানটা নির্জন। ওপারে আলো জ্বলছে চেতলার রাস্তায়। কে একজন ওপারে

গঙ্গার ধারে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে একমনে।

হঠাৎ পাশে কে একজন এসে ডাকলে। বললে—দেব্‌তা আপনাকে একবার ডাকছেন, দীপুবাবু—

—কেন?

—আজ্ঞে আপনিই তো মুখাগ্নি করবেন!

মুখাগ্নি করতে হবে দীপঙ্করকেই। সত্যিই তো, কেউ নেই তো ওদের। ছেলে থেকেও নেই! আশ্চর্য! এতদিন পরে বুঝি কিরণের দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হলো! সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে হলো। গরমে যেন মাথাটা পুড়ে যাবে এত হল্কা লাগছে চোখে-মুখে।

ফোঁটা কাছে এল। বললে—যা দীপু, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, আমরা সব করছি, তুই ঘাটে গিয়ে ঠাণ্ডায় বস্‌গে যা—

ঘাটে আসতেই মাথাটা আবার ঠাণ্ডা হলো। রাত হচ্ছে! আটটার সময় চড়ানো হয়েছে, রাত এগারোটার আগে আর শেষ হবে না। অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে হবে। ওরা ততক্ষণ খাবার খাবে, আরো যা খুশি ওদের সব খাবে! টাকা-কড়ি সব কিছুর খরচা ওদের। দীপঙ্করকে কিছু ভাববার দরকার নেই।

হঠাৎ যেন টিপি টিপি পায়ে কে কাছে এসে দাঁড়াল। সেই ছেলেটা! অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। সেই বহুদিন আগে কিরণের খবর এনে দিয়েছিল। ম্যাডক্‌স্‌ স্কোয়ারে ভজুদার খবরও এনে দিয়েছিল! দীপঙ্কর ভূত দেখবার মত করে চম্‌কে উঠেছে। বললে—আপনি, এখানে?

ছেলেটি বললে—আমি আপনার কাছেই এসেছি, কিরণ পাঠিয়েছে—

—কিরণ? কিরণ কোথায়? কিরণের বাবা যে আজ মারা গেলেন?

ছেলেটি আস্তে আস্তে বললে—জানি—

দীপঙ্কর যেন হঠাৎ রেগে গেল। বললে—কিন্তু আপনাদের কিরণ এত ছোট করলে কেন নিজেকে? আমার নাম-ধাম ঠিকানা, সব বলে দিলে এমন করে? জানেন, তার জন্যে আমাকেও ক'দিন লক্‌-আপে আটকে রেখেছিল? কালই তো ছাড়া পেলাম! নিজে ধরা পড়লো, আবার আমাকেও জড়ালে? আমি সেদিন কিরণের সঙ্গে ম্যাডক্স-স্কোয়ারে গিয়েছিলাম, তাও বলে দিয়েছে ওদের। যদি কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে তো, কেন স্বদেশী করতে যাওয়া?

ছেলেটি কিছু বললে না। চুপ করে রইল। চারদিক দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে এগিয়ে দিলে। বললে—কিরণদা আপনাকে লিখেছে—

—কিরণ, কিরণ কোথায়? ছাড়া পেয়ে গেছে?

ছেলেটি বললে—চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে পড়তে লাগলো।

"আমি এইমাত্র খবর পেলাম। কিন্তু ভাই আমার কিছুই করবার নেই। চারদিক থেকে জাল ফেলা হচ্ছে আমাদের ধরবার জন্যে। যদি কোনওদিন সুযোগ পাই তো তোকে সব বলবো। শয়তানদের শেষ না-করা পর্যন্ত আমাদের আহার-নিদ্রা নেই—বাড়ি-ঘর নেই, বাবা-মা নেই। তোকে এই সঙ্গে যে-কাগজটা দিলুম সেটা পড়ে সই করে দিস্‌—তারপরে যা করবার আমরা করবো।"

চিঠির ওপরে বা নিচে কারোর নাম লেখা নেই। তবু কিরণের হাতের লেখা দীপঙ্করের চেনা।

দীপঙ্কর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—এটা কী?

ছেলেটি বললে—পড়েই দেখুন না—

আলোর তলায় গিয়ে দীপঙ্কর কাগজটা পড়তে লাগলো—। তাতে লেখা রয়েছে—

ওঁ বন্দে মাতরম

"আমাদের কর্তব্য কী? আমাদের কর্তব্য খুব পরিষ্কার। রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের কোনও মাথা-ব্যথা নাই। রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্স সফল হউক বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হউক তাহা জানিবার আগ্রহও আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের প্রথম ও শেষ কথা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অন্যায় গভর্নমেণ্ট অচল করিয়া তুলিতে হইবে, মৃত্যুদূতের মতন আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে হইবে এবং আমলাতন্ত্রের মাথায় মৃত্যু বর্ষণ করিতে হইবে। মনে রাখিও, আমাদের ভ্রাতারা জেলে এবং গ্রামে অন্তরীণে পচিতেছে; যাহারা মরিয়াছে বা উন্মাদ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ভুলিও না। ঈশ্বর ও দেশের নামে ভাইরা আবার তোমাদের বলিতেছি বালক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দাও, রক্ত দাও, ধন দাও। আমরা যে-স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতেছি তা ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা কয়েকজন মুষ্টিমেয় অর্থপিশাচ বিদেশী বণিকদের গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা আসিলে সেদিন আমরা সবাই তাহা একযোগে ভোগ করিব। সেই দিনের সুখ-সমৃদ্ধির আদর্শ সামনে রাখিয়া আমরা আজ কুকুর-বিড়ালের মত প্রাণ দিতেছি, এবং প্রয়োজন হইলে আরো দিব। তোমাদেরও প্রাণ দিতে আহ্বান করিতেছি। ওই শোন জননীর আহ্বান ও পথ-নির্দেশ—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সঙ্গে আরও একটা কাগজ। তাতেও লেখা রয়েছে অনেক কিছু।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এটা কী?

ওটাই প্রতিজ্ঞা-পত্র, ওইটেতেই আপনাকে সই করতে হবে—

দীপঙ্কর পড়তে লাগলো—"ঈশ্বর, জননী, পিতা, গুরু, নেতা ও সর্বশক্তিমানকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ করিতেছি—(১) উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চক্র ত্যাগ করিব না। স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব না। নেতার আদেশে চক্রের কাজ

বিনা প্রতিবাদে করিয়া যাইব। (২) যদি এই শপথ পালনে অক্ষম হই তবে পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণ ও সর্বদেশের দেশপ্রেমিকদের অভিশাপ যেন আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।”......ইত্যাদি ইত্যাদি—

অনেক বড় লেখা। এক দুই করে অনেকগুলো শর্ত। অল্প আলোয় সবগুলো পড়াও যায় না।

ছেলেটি বললে—এই কাগজটাতেই সই করতে হবে—কিরণদা বলে দিয়েছে।

দীপঙ্কর কাগজটা হাতে নিয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—কিন্তু আমি তো এখন সই করতে পারবো না—

—তাহলে কখন করবেন?

—সে আমি কিরণকে বলবো'খন।

—কিন্তু কিরণদার সঙ্গে তো খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে না, আজকেই কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি যে আর সই করতে পারি না, আমি যে আজকেই মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, এসব আর জীবনে করবো না—

কথাগুলো বলতে গিয়ে দীপঙ্করের মাথা যেন লজ্জায় নুয়ে এল হঠাৎ। আর যেন মাথা তুলে তাকাবারও সাহস নেই তার। সে যেন বড় হীন প্রতিপন্ন হয়ে গেল পৃথিবীর সকলের সামনে। মনে হলো সকলে যেন তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে ছি-ছি করে উঠলো সেই নির্জন শ্মশানভূমির নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে।

—তাহলে ওগুলো দিন—

দীপঙ্কর কাগজগুলো দিয়ে দিলে ছেলেটির হাতে।

ছেলেটি বললে—আর কিরণদার চিঠিটা, ওটাও দিন—

কিরণের চিঠিটা নিয়ে ছেলেটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ছাইগাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপরে আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তখনও শ্মশানের মধ্যে বিকট হরিধ্বনির শব্দ উঠছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ভেতরটা। বিরাট শিরীষ গাছটার মাথায় কয়েকটা শকুনি অদ্ভুত একটা কিচ্-কিচ্ শব্দ করছে মাঝে-মাঝে। রাত প্রায় দশটা বেজে গেছে। ওপারে চেতলার রাস্তায় ধান-গোলার সামনে লোক-চলাচল পাতলা হয়ে এল। যে-লোকটা এতক্ষণ বাঁশি বাজাচ্ছিল, সে-ও থেমে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

দীপঙ্কর আবার এসে বসলো ঘাটের ওপর।

ঘাটের একেবারে শেষ-ধাপে যে-লোকটা বসেছিল, হঠাৎ যেন সে একটু নড়তে-চড়তে লাগলো। অন্ধকারে হাব-ভাব, চেহারা, পোশাক কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট করে। লোকটা দাঁড়িয়ে উঠে জলে পা দিলে, তারপর এগিয়ে যেতে লাগলো। তারপর আরো একটু......

দীপঙ্করের কেমন যেন সন্দেহ হলো। লোকটা কে? এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। কী মতলব ওর?

এবার আর চুপ করে বসে থাকা গেল না। লোকটা আরো এগোচ্ছে......

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে টপ্ টপ্ করে নামতে লাগলো।

বললে—কে ওখানে? কে আপনি?

লোকটা এবার পিছন ফিরলো। দীপঙ্করকে দেখেই লোকটা ওপরে উঠে আসতে লাগলো। তারপর আরো একটু কাছে আসতেই দীপঙ্কর চিনতে পেরেছে। দাতারবাবু!

—দাতারবাবু না? আপনি এখানে?

কোনও সন্দেহ নেই। আরো রোগা হয়ে গেছে চেহারা। ফিকে কঙ্কালসার চেহারা দাতারবাবুর। দীপঙ্করের কথার কোনও উত্তর নেই দাতারবাবুর মুখে। যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গেছেন!

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি কেমন আছে?

দাতারবাবু বললেন—ভালো—

বলেই আর কোনও কথা না বলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যেতে লাগলেন। খুব জোরে জোরে চলতে লাগলেন। যেন দীপঙ্করকে এড়িয়ে যাবার মতলব। পাশের মাইশোর ঘাটের নির্জন অন্ধকারের মধ্যেই আত্মগোপন করতে চাইলেন।

দীপঙ্করও পেছন-পেছন ছুটলো।

—দাতারবাবু, দাতারবাবু—

দাতারবাবু ততক্ষণে অনেকদূরে চলে গেছেন। আরো জোরে জোরে পা চালাচ্ছেন। দীপঙ্করও সরু গলিটা দিয়ে দক্ষিণের মাইশোর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে ফোঁটার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—কীরে দীপু, কোথায় যাচ্ছিস ওদিকে!

দীপঙ্কর কাছে এল। দেখলে ফোঁটা কাঁধে গামছা নিয়ে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বললে—কীরে, অন্ধকারের মধ্যে ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলিস? আমাদের কাজ সব ফতে! এখন নাই-কুণ্ডলীটা তোকেই গঙ্গায় ফেলতে হবে—চল্—

ফোঁটার মুখ দিয়ে তখন ভর্-ভর্ করে দেশী মদের বোট্‌কা গন্ধ বেরোচ্ছে।

দীপঙ্কর আবার শ্মশানের মধ্যে এসে ঢুকলো। তখন কলসী করে জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে চিতার ওপর। সব শেষ!

কিন্তু পরের দিন আপিস থেকে ফেরবার পথেও যেন দীপঙ্কর মন থেকে

দূর করতে পারলে না ভাবনাটা! দাতারবাবু এত জায়গা থাকতে ওখানেই বা খুঁজতে করতে গিয়েছিল। ওই ক্যাওড়াতলার শ্মশানের কাছে। অথচ একটা কথারও ভালো করে জবাব দিলে না। চোখগুলো কেমন জ্বলছে। যেন খানিকটা লাল। অন্ধকারে ভাল করে দেখা যায়নি অবশ্য। কিন্তু মনে হলো যেন কোথায় কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

বউবাজারের সেই রাস্তাটা দিয়েই যেতে হবে।

দীপঙ্কর আপিস থেকে সকাল-সকাল বেরিয়েছিল। মিস্ মাইকেলের ঘরের ভেতরে তার বসবার জায়গা হয়েছে। নতুন চেয়ার নতুন টেবিল। নতুন একটা আলমারি। ফাইলগুলো সব একে একে হিসেব করে সেকশন থেকে আনাতে হয়েছিল। রামলিঙ্গমবাবু অনেক দিনের লোক। বহুদিন নিজের দেশ ছেড়েছেন। একেবারে নিখুঁত বাংলা বলেন। বললেন—সাহেবের পাশের ঘরে কাজ করতে একটু অসুবিধে হবে আপনার—

দীপঙ্কর বলেছিল—তা চাকরি যখন করতে এসেছি, তখন আর উপায় কী?

সত্যিই উপায় ছিল না দীপঙ্করের। চাকরি করতে এলে যখন যেখানে বসতে বলবে, যখন যে-কাজ করতে বলবে, তাই-ই করতে হবে। কিন্তু সেদিনও দীপঙ্কর জানতো না যে, সেই ঘরে বসবার সুযোগ না পেলে হয়ত ঘোষাল সাহেবের নজরেও পড়বার সুযোগ আসতো না। আর অমন করে রবিন্‌সন্ সাহেবেরও প্রিয়পাত্র হওয়া যেত না। রবিন্‌সন্ সাহেবের মেম-সাহেবদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হতো না।

রবিন্‌সন্ সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—সেন, আর ইউ এ বেঙ্গলী?

রবিন্‌সন্ সাহেবের এ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে তার একটু দ্বিধা হয়েছিল। দীপঙ্কর সেন বাঙালী না তো কী?

বলেছিল—ইয়েস স্যার—হোয়াই?

রবিন্‌সন্ সাহেব বলেছিল—না, মিসেস রবিন্‌সন্ বলছিল তুমি বাঙালী হতেই পারো না, তুমি নিশ্চয়ই সাউথ-ইণ্ডিয়ান—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—এ-কথা কেন মনে হলো তাঁর স্যার?

রবিন্‌সন্ সাহেব হেসেছিল খুব। বলেছিল—না, তার মত, বেঙ্গলীরা কখনও ভালো হতে পারে না, অল বেঙ্গলীজ আর টেররিস্টস্—বাঙালীরা কী-রকম করে ইংরেজদের গুলি করে মারছে—দেখছো তো?

এ নিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করাও বিপজ্জনক। এ নিয়ে কথা উঠলে অনেক কথা বলতে হয়। সাহেব বলতো—দেখ সেন, তুমি নিশ্চয়ই রিয়েলাইজ করবে ইংরেজরা তোমাদের ভালো করেছে, তোমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে চাকরি দিয়েছে, রেলওয়ে করেছে, স্টীমশিপ করছে, ফেমিন্ বন্ধ করেছে—হোয়াট নট—

—কিন্তু স্যার পভার্টি তবু ঘোচেনি কারো!

রবিন্‌সন সাহেব একটু অবাক হতো শুনে। বলতো—কেন, কোনও পভার্টি তো নেই ইণ্ডিয়ায়, আমি তো কোনও পুওর পীপল্ দেখতে পাই না এখানে, আমি যখন চৌরঙ্গীতে যাই, ক্লাবে যাই, সব ওয়েল-ড্রেসড্ পীপল্, আমার কথা বিশ্বাস না-হয় তো মিসেস রবিন্‌সন্‌কে জিজ্ঞেস কর, শি ইজ অব্ দি সেম্ ওপিনিয়ন—

সাহেব ছিল সত্যিই পাগলা মানুষ। সাহেব গরীব লোক দেখতে পেত না চৌরঙ্গীতে।

সাহেব বলতো—জানো, আমার চাপরাশী দ্বিজপদ, সে এইটিন্ রুপিজ পে পায়, জানো সে একজন মনি-লেনডার—একথা তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না সেন, পভার্টি নেই ইণ্ডিয়ায়—কিন্তু তবু বেঙ্গলীজরা টেররিজম্ করছে! জানো মিস্টার বার্জকে গুলি করে মেরেছে, মিস্টার পেডিকে গুলি করে মেরেছে ওরা, কী হরিব্‌ল্! ইনোসেন্ট পীপলদের খুন করে কী লাভ! তারা তো কোনও অন্যায় করেনি!

সাহেবের এ-সব কথা প্রতিবাদ করবার যোগ্য নয়। তবু সাহেব লোক ভালো। সাহেব একদিন পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে। জাপান-ট্রাফিকের ব্যাপারে রবিন্‌সন্ সাহেব নিয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। মিস্টার ঘোষালের নিন্দে দীপঙ্কর শুনে আসছে গোড়া থেকে। সবাই বলতো ঘোষাল সাহেব এক নম্বরের চশমখোর লোক। শুয়োরের বাচ্চা বলে সবাই গালাগালি দিত। তখনও দেখেনি তাকে দীপঙ্কর।

গাঙ্গুলীবাবু বলতো—দেখবেন সেনবাবু, বড় হয়ে গেলে আপনিও যেন ঘোষাল সাহেবের মত হয়ে যাবেন না!

কিন্তু আশ্চর্য! ঘোষাল সাহেব হেসে কথা বললেন দীপঙ্করের সঙ্গে। মিছি-মিছি লোকে নিন্দে করতো। বোধহয় বড় হলেই লোকে নিন্দে করে।

সাহেব বললে—কাম-অন্—

তারপর একেবারে সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে। মিস্টার ঘোষাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার। হোম-বোর্ড থেকে ডাইরেক্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—গুড্ক হিয়ার ঘোষাল—

কথা বলতে বলতে রবিন্‌সন্ সাহেব গিয়ে ঢুকলো ভেতরে। দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করছিল। সাহেব বললে—কাম-ইন, কাম-ইন্ সেন—

সাহেবের কুকুর জিমিও চলেছে পেছন-পেছন। সে-ও ঘোষাল সাহেবের ঘরে ঢুকলো।

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—লুক হিয়ার ঘোষাল, দিস ইজ সেন, আমার জাপান ট্রাফিক ক্লার্ক, আমি একে আমার ঘরের ভেতরে এনেছি, তোমার সেকশনের মধ্যে সমস্ত মেস-আপ্ হয়ে আছে—একটা পেপার চাইলে খুঁজে পাওয়া যায় না। রেকর্ড সেকশন থেকে একটা চিঠি সেকশনে এসে পৌঁছতে

লংগে ফোর্টিন ডেজ—ক্যান ইউ ইমাজিন!

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে সাহেব বললে—টেক ইওর সীট সেন, টেক ইওর সীট—

সাহেব না হয় পাগলা তা বলে দীপঙ্কর তো আর পাগল নয়। দীপঙ্কর তব্ চেয়ারে বসলো না। মিস্টার ঘোষাল যেন কটমট্ করে চাইতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে।

রবিন্‌সন্ সাহেবের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। বলতে লাগলো—ইউ নো ঘোষাল, হোয়াই আই হ্যাভ্ সিলেকটেড্ সেন? কেন জানো?

ঘোষাল সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—আমি ভেবেছিলাম হি মাস্ট বি এ সাউথ ইণ্ডিয়ান, এখন সেন বলছে, হি ইজ এ বেঙ্গলী—তুমি জানো ঘোষাল বেঙ্গলীজ আর ডেঞ্জারাস পীপল্, দে আর অল টেররিস্টস্—

ঘোষাল সাহেব বললেন—জানি—

—অ্যানাদার থিং, আর দেয়ার এনি পভার্টি ইন ইণ্ডিয়া? এখানে পভার্টি আছে? তোমার কী ওপিনিয়ন, ঘোষাল? ইউ মে নো বেটার দ্যান মী! তুমি ইণ্ডিয়ান তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালো করে বলতে পারবে! আমার এই জিমিকে যে দেখা-শোনা করে, তুমি জানো আমি তাকে কত দিই মান্থলি? টেন টিপস্—আমি তাকে মাসে দশ টাকা দি—। না ঘোষাল, আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ায় পভার্টি নেই কোথাও—! হয়ত ছিল ব্রিটিশদের আসবার আগে, এখন রেলওয়ে হয়েছে, টেলিগ্রাফস—টেলিফোন হয়েছে, কত লোক প্রোভাইডেড হচ্ছে—এখন পভার্টি কোথায়? আমরা রোটারি ক্লাবে এই নিয়ে ডিসকাস করেছি—

ঘোষাল সাহেব এত কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই এতক্ষণ বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ যে কেন উঠলো, তা-ও তিনি বুঝতে পারলেন না। রবিন্‌সন্ সাহেবের দিকে যখন চাইছিলেন, তখন হাসি-হাসি মুখ কিন্তু দীপঙ্করের দিকে নজর পড়তেই কেমন গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। কোথায় কে-একজন সামান্য ক্লার্ক—তাকে ঘরের মধ্যে এনে এ কী অবান্তর আলোচনা!

তারপর হঠাৎ রবিন্‌সন্ সাহেবের কী খেয়াল হলো। বললে—আচ্ছা ঘোষাল, ওয়ান্ থিং, তুমি বেঙ্গলী না সাউথ ইণ্ডিয়ান?

ঘোষাল সাহেব যেন প্রশ্নটা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপরে বললেন—আই কাম ফ্রম সাউথ ইণ্ডিয়া—

—নাউ, সী!

রবিন্‌সন্ সাহেব দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললে—এখন দেখ, ঘোষাল ইজ এ সাউথ ইণ্ডিয়ান! আমি জানি, সাউথ ইণ্ডিয়ানরা ভালো লোক।

তারপর হঠাৎ সামলে নিয়ে আবার বললে—কিন্তু, সেনও ভালো, জানো ঘোষাল, সেন যদিও বেঙ্গলী, তবু লোক ভালো, হি রাইটস্ গুড ড্রাফটস্—

তুমি ওর কাজ দেখে স্যাটিসফায়েড্ হবে—

তারপর দাঁড়িয়ে উঠলো সাহেব। বললে—যাক্‌গে, যে-কথা বলতে এসেছিলাম, আমাদের রোটারি ক্লাবে এ নিয়ে ডিসকাশ্‌ন হয়ে গেছে—হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক—ইজ্ দেয়ার পভার্টি ইন ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়ায় পভার্টি আছে?

ঘোষাল সাহেব বললে—কোনও পভার্টি নেই, সবাই হ্যাপি, দে আর অল ভেরি হ্যাপি উইথ দি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট—কারো কোনও দুঃখ-কষ্ট নেই—

—নাউ সী!

রবিন্‌সন্ সাহেব আবার নিজের ঘরে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও এল। দীপঙ্করও চলে এল। হঠাৎ কী নিয়ে কথা উঠতে উঠতে কী-কথা উঠে গেল, আর সাক্ষী মানতে গেল সাহেব ঘোষাল সাহেবকে। আর আশ্চর্য মিস্টার ঘোষাল! মুখের সামনে মিথ্যে কথাটা বললে। বললে—ঘোষাল সাহেব সাউথ ইণ্ডিয়ান। বললে—দেশে পভার্টি নেই। দারিদ্র্য নেই। সবাই সুখী, সবাই শান্তিতে আছে। আশ্চর্য, এর নামই কী চাকরি। এর নামই কি চাকরির উন্নতি!

গাঙ্গুলীবাবুর কাছেই শোনা ছিল মিস্টার ঘোষালের ইতিবৃত্ত।

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিলেন—ঘোষাল সাহেবের ইতিহাস জানেন? কী করে চাকরি পেলে?

সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু সবাই জানে না হেড্ আপিসে। কোথা থেকে হাজার কয়েক টাকা যোগাড় করে একদিন মিস্টার এন-কে-ঘোষাল লণ্ডন শহরে গিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য কিছু একটা হওয়া। মাস কয়েক গেল সিগারেট খাওয়া আর মদ খাওয়া শিখতে। আর ঈস্ট-এণ্ডে রাত কাটিয়ে ফুর্তি করতে! পাড়া-গাঁয়ের ছেলে হঠাৎ বিলেত গেলে যা হয়। সুট পরা, ইংরিজী বলা আর রাস্তায় বাইরে কাটানোটা শিখতেই হাতের টাকা-পয়সা সব শেষ হয়ে গেল। তখন কোথায় যায়? কোথায় খায়? কী উপায়? ফেরবার জাহাজভাড়াই বা কোত্থেকে জোটে? ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই তখন। কিম্বা উপোস করে মরা। কয়েকজন ইণ্ডিয়ান ছিল তখন লণ্ডনে। তাদের কাছে হাত পাতলে ঘোষাল। কেউ দিলে না। শেষে প্রায় মরো যাবার অবস্থা। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্য ফিরে গেল ঘোষালের। তখন লণ্ডনে রেলওয়ে স্ট্রাইক চলছে। তখন ১৯২৬ সাল। সমস্ত স্টাফ স্ট্রাইক করেছে। কেউ কাজ করতে চায় না। সেই সময়ে ঘোষাল গিয়ে হাজির হলো রেল-কোম্পানীর আপিসে।

তারা জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে?

ঘোষাল বললে—আমি মিস্টার এন-কে-ঘোষাল, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—আমি এখানে ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছিলাম, হঠাৎ ইণ্ডিয়ায় আমার বাবা মারা যাওয়ার আমার টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেছে—আমি এখন হেলপ-লেস্, আমি আপনাদের রেলওয়েতে স্ট্রাইক-পিরিয়ডে কাজ করতে চাই—

বেশ। তাই হলো। স্ট্রাইক চললো অনেকদিন ধরে। ঘোষাল কাজ করলে প্রাণ দিয়ে জান দিয়ে। তারপর স্ট্রাইক যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আবার চাকরি খতম। ঘোষাল আবার গিয়ে দাঁড়াল রেল-কোম্পানীর আপিসে।

তারা বললে—কী চাও—

ঘোষাল বললে—ইণ্ডিয়ায় একটা রেলের চাকরি যদি দেন—আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিলেন—তারা তখন একবার খুঁজেও দেখলো না, লোকটা সত্যিই গ্র্যাজুয়েট কিনা, স্ট্রাইক-পিরিয়ডে কাজ করেছে, তাইতেই খুশি হয়ে একেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার করে পাঠিয়ে দিলে এখানে—আমাদের হাড়-মাস জ্বালাবার জন্যে—

যাহোক, ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে চলে আসার পরই চাপরাসী এসে ডাকলে দীপঙ্করকে।

বললে—ঘোষাল সাব সেলাম দিয়া হুজুর—

—আমাকে?

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গেল। এই তো এখনি ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে এল। এরই মধ্যে আবার কী দরকার পড়লো!

ঘোষাল সাহেবের ঘরে যেতেই চেহারা দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল! এ যেন একেবারে অন্য মানুষ! একেবারে বদলে গেছে মুখের চেহারা।

—আপনি ক'দিন চাকরি করছেন?

দীপঙ্কর বললে।

—রবিনসন্ সাহেবের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হলো কী করে?

সবই ইংরেজীতে প্রশ্ন। একেবারে নিখুঁত বিলিতী ইংরিজী! খাস লণ্ডন থেকে শেখা নিশ্চয়ই। যেমন উচ্চারণ তেমনি ইনটোনেশন। দীপঙ্কর সোজা হয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখের ওপর চোখ রেখে কথাগুলোর উত্তর দিয়েছিল সেদিন। বাইরে পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি নিপাট তেড়ি, সব কিছু কিন্তু যেন ফিটফাট বলেই মনে হচ্ছিল। কারণ ভেতরের পশুটা যেন বাইরের ছদ্মবেশের আড়ালে পুরোপুরি ঢাকা পড়তে পারেনি। যেন তার দাঁত আর নখ দেখা গিয়েছিল। যে-লোকটা সাহেবকে তুষ্ট করবার জন্যে অনায়াসে নিজেকে সাউথ ইণ্ডিয়ান বলে প্রচার করতে পারে, সে-লোকটা ওপরওয়ালাকে খুশি করবার জন্যে মুখ ফুটে বলতে পারে দেশে দারিদ্র্য নেই—তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার ঘৃণা হচ্ছিল সেদিন।

হঠাৎ ঘোষালের চিৎকারে গম্‌গম্‌ করে উঠলো কামরা—

—গেট আউট্, গেট আউট্, ক্লার্ক ক্লার্কের মতন থাকতে চেষ্টা করবেন, যান—

মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে সেই-ই প্রথম সাক্ষাৎ। পরে জীবনে এই মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে তাকে বহুবার সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। অদ্ভুত আশ্চর্য

চরিত্র এ-মানুষটা। পরে আরেকবার মনে হয়েছিল—এত যে বদনাম তাদের, এত যে নিন্দে এ-সমস্তই বোধহয় এই রকম কয়েকজন লোকের জন্যে। ওই কে-জি-দাশবাবু, নৃপেনবাবু, মিস্টার ঘোষাল, রামলিঙ্গমবাবু—অন্তত এদের হাত থেকেও যে মুক্তি পেয়েছে দীপঙ্কর, এর জন্যেও রবিনসন্ সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। পরে দীপঙ্কর অনেক বড় হয়েছিল, কিন্তু সেদিন মিস্টার রবিনসন্‌কে না পেলে হয়ত তাকে চাকরি ছেড়ে দেবার কথাও বিবেচনা করতে হতো।

সন্ধ্যেবেলা জাপান-ট্র্যাফিকের ফাইলগুলো আস্তে আস্তে গুছিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠলো দীপঙ্কর। বাইরে আপিসের ভেতরে তখনও কয়েকজন কাজ করছে।

মিস মাইকেলও অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে। মিস্টার রবিনসন্‌ও চলে গেছে। আর কোনও কাজ নেই তখন। আবার এক মিনিট বসলো দীপঙ্কর চুপ করে। সারাদিন ধরে কোনও কিছু ভাববার অবসরই ছিল না। এখন যেন সব ভাবনার পাহাড়গুলো মাথায় চেপে বসলো একসঙ্গে! এখন হয়ত একটা গাড়ি ছুটছে কলকাতার রাস্তা দিয়ে। গাড়িটা সোজা উত্তর দিক দিয়ে গিয়ে পড়লো একেবারে যশোর রোড-এ। তারপর সেই রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অনেক রাত হবে। অনেক সময় গড়িয়ে যাবে। তারপর আবার একটা গাছের ছায়ার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে গাড়িটা। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি মানুষ একাত্ম হবে সেখানে। দুটি আনন্দ মূর্তি গ্রহণ করবে একটি বিশ্বাসের স্পর্শে। একজন বলবে তার বিগত জীবনের কথা। আর একজন শুনে হাসবে। বলবে—কোথায় ছিলে তুমি, আর কোথায়ই বা ছিলাম আমি—অথচ দুজনে আজ এক হয়ে গেলাম—

একজন বলবে—কালিঘাটে যখন ছিলাম, তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখেছি—

—কী?

—বাড়ির উঠোনে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেখানে একটা কাক দিনরাত একলা বসে থাকতো—জানো! পাশের বাড়ির একটা ছেলে ছিল তার বন্ধু! ভাত খেয়ে উঠে রোজ ভাত দিত কাকটাকে—

—কেন?

—কত মানুষের কত রকমের নেশা থাকে তো! এ-ও এক রকম নেশা।

—ছেলেটা কে?

—সে এমন কেউ না—

—তার কথা তোমার হঠাৎ মনে পড়লো যে?

—এমনি।

হঠাৎ চাপরাসীটা ঘরে ঢুকলো। বললে—সায়েব চলে গেছে হুজুর—

চাপরাসীটা ভেবেছে, এতক্ষণ বুঝি ঘোষাল সাহেবের জন্যেই বসে ছিল দীপঙ্কর। ঘোষাল সাহেবের জন্যে সে বসে থাকবে কেন! আবার দাঁড়িয়ে উঠলো দীপঙ্কর। সবাই যখন আপিস থেকে চলে যায়, তখনই যেন আপিসটা ভাল লাগে। মনে হয়, আপিসটা যেন আর আপিস নয়। যেন তখনই নিজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারা যায়। যেন সে তখন নিঃশব্দে মুখর হয়ে ওঠে নিজের মধ্যে! কিন্তু আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরোতেই চাপরাসীটা দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে দিলে। তারপর গেটের সামনে যেতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো মুখে। আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে!

তারপর আবার সেই রাস্তা।

এই তো কাছেই বউবাজার! একবার ঘুরে গেলে কী এমন ক্ষতি!

কিন্তু বউবাজারের সেই গলিটার ভেতরে যেতেই দেখলে লক্ষ্মীদির ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা জানলা দিয়ে আলো ঠিকরে এসে পড়েছে বাইরের গলিতে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই থমকে যেতে হলো। একদল চীনে পরিবার—কিচির-মিচির করছে। ঘরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। অন্তত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে জন কুড়ি একটা ঘরে।

কাকে কী প্রশ্ন করবে, কে উত্তর দেবে বোঝা গেল না। দাতারবাবুরা তাহলে এখান থেকে উঠে গেছে। এই ক'দিনের মধ্যেই এত পরিবর্তন হয়ে গেল। এই ক'দিন আসতে পারেনি দীপঙ্কর। সেই টাকার কথা বলতে এখানে এসেছিল। তারপর দীপঙ্কর চলে গেল থানায়।

—ইয়েস বাবু, কী চান আপনি?

—দাতারবাবুর ওয়াইফ এখানে থাকতো, তারা কোথায় গেল?

তারা কিছুই বলতে পারলে না। একজন পুরুষ উঠে এল বাইরে। ভাঙা ইংরিজীতে যা বললে তার মানে দাঁড়ায় এই যে, তারা এক মাস হলো এখানে এসেছে। আগে কারা এখানে ছিল, তা জানে না।

—আর কেউ জানে? আর কেউ বলতে পারে?

কে বলতে পারে, তার হদিস তারা বলতে পারলে না। বললে—আশে-পাশে জিজ্ঞেস করে দেখ, যদি কেউ খবর রাখে!

আশে-পাশে কাকেই বা চেনে দীপঙ্কর। এ-পাড়ায় আগে তো কারোর সঙ্গেই কথা বলেনি। কারোর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় নেই। বেশির ভাগই এখানকার চীন থেকে আমদানি! প্রায় চীনে-পাড়াই বলা যায়। একটা ছেলে ছিল, যে লক্ষ্মীদির খাবার এনে দিত দোকান থেকে। ফাই-ফরমাশ খাটতো লক্ষ্মীদির। তাকেও যদি কোনও রকমে পাওয়া যেত।

—নো বাবু, আমরা জানি না।

হতাশ হয়েই বেরিয়ে আসছিল দীপঙ্কর। মনে পড়লো সেই আপিসটার কথা। যে-আপিস থেকে প্রথম দিন লক্ষ্মীদির বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিল।

গলির মুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ওপরে। দাতারবাবুর আপিসটা আবার খুলেছে। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলে। দাতারবাবুর চেয়ারটা দেখা গেল না। দাতারবাবুর সেই বন্ধুর চেহারাটাও দেখা গেল না।

—আচ্ছা, দাতারবাবুর আপিস এটা? মিস্টার এস-এস-দাতার?

দুজন লোক ভেতরে ছিল। একজন জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি আমার বিশেষ চেনা লোক। তিনি কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক বললে—ভেতরে গলির মধ্যে একটা হলদে রং-এর একতলা বাড়ি, সেইখানেই তাঁর ফ্যামিলি থাকে—

—সেখানে নেই, আমি এখুনি দেখে এলাম!

—কী দরকার আপনার!

দীপঙ্কর বললে—কোনও দরকার নেই, অনেক দিন দেখা হয়নি, তাই দেখা করতে এলাম, আমি এই কাছেই আপিসে চাকরি করি—

—মাফ করবেন, আমরা আর কোনও খবর বলতে পারবো না।

বলে ভদ্রলোক আবার নিজের কাজে মন দিলে। দীপঙ্কর আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিভ্রান্ত হয়ে। কোথায় গেল লক্ষ্মীদি, কোথায় গেল দাতারবাবু! আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর। সবাই যখন তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, তখন এই একটা আশ্রয়স্থলই যে ছিল তার। এই এখানে এলেই বা কিছু একটু আনন্দের খোরাক তার জন্যে মজুত ছিল। এটাও গেল। এটা সত্যিই চলে গেলো সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে যে সে! আর কী আছে! আর যেন দীপঙ্করের কিছুই নেই। শুধু বাড়ি আর আপিস, আপিস আর বাড়ি!

আবার হাঁটতে আরম্ভ করলে। হাঁটার মধ্যে একটা আনন্দ আছে যেন। তখন আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। মনে হয় সে তো চলেছে। গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে তার যাত্রা বুঝি শেষ হয়নি। আর পৃথিবীতে এত রাস্তা আছে, এত পথ আছে যে, এক-জীবনে হেঁটেও তা শেষ করা যায় না। গন্তব্যস্থান থাক আর না-ই থাক, পথ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ গন্তব্যস্থানও একটা আছে। আর পথের যখন শেষ নেই, তখন গন্তব্যস্থানেরও শেষ নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে-হেঁটেই একটা জীবন অনায়াসে ফুরিয়ে দেওয়া যায়।

হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কতদূর এসে পড়েছিল তারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ভিড়ের আভাস পেতেই যেন সম্বিৎ ফিরে এল। অনেক লোকের ভিড়। অনেক চিৎকার। একেবারে হুড়মুড় করে ছুটে চলেছে সবাই। ভিড়ের স্রোত বয়ে চলেছে দীপঙ্করের দুপাশ দিয়ে।

একজনকে জিজ্ঞেস করতে খানিকটা বোঝা গেল। রবিঠাকুর লেকচার দিতে এসেছে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! বহুদিন আগে কালিঘাটের মন্দিরে এসেছিলেন তিনি। মা দেখিয়ে দিয়েছিল। দীপঙ্কর তখন ছোট। কিরণের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় পৈতে বিক্রি করে বেড়ায়, আর দু-এক পয়সা হাতে পেলে বেগুনী, আলুর চপ্ কিনে খায়।

খানিক পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল। টাউন হল-এ মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু লোকের ভিড়ে জায়গা না-হওয়ায় সবাই মনুমেন্টের তলায় গিয়ে হাজির হচ্ছে। কী ভীষণ ভিড়! জীবনে এত ভিড় কখনও দেখেনি দীপঙ্কর। বহুদিন আগে সি আর দাশ মারা যাবার পরও এত লোক হয়নি। সমস্ত ধর্মতলাটা যেন ভর্তি হয়ে গেছে মানুষের মাথায়। দীপঙ্করও গিয়ে দাঁড়াল এক কোণে।

ক'দিন আগেই হিজলী জেলখানায় দুজন খুন হয়ে গিয়েছিল পুলিসের গুলিতে। সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেন। হিজলী জেলের ভেতরে তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। সেদিন আলীপুরের সেসন জজ মিস্টার গার্লিক আই-সি-এসকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল, সেদিন হিজলী জেলের ভেতর তারা আলো দিয়ে সাজিয়েছিল। তারপর আর কোনও কথা নেই—গুলির ওপর গুলি চললো জেলের ভেতর। কলকাতায় এল তাদের দুজনের মৃতদেহ—মিছিল করে নিয়ে গিয়েছিল কেওড়াতলার শ্মশানে।

দীপঙ্কর দেখতে লাগলো ভিড়ের চেহারা। মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে সে। তবু সব কানে এল। বিচ্ছিন্ন বিপর্যস্ত দীপঙ্কর দূর থেকে দেখতেই লাগলো শুধু। কিন্তু এ কোন্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটবেলাকার সেই চেহারার সঙ্গে তো এ মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের দু'পাশে দুজন দাঁড়িয়ে। একদিকে সুভাষ বোস, আর একদিকে জে এম সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের নাকের কাছে অক্সিজেন ধরে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন—প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনও অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার, সে কেবল অপমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এত বড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলাম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে......

প্রচুর হাততালি উঠলো। খানিকক্ষণ আর কোনও কথাই শোনা গেল না।

আবার অনেক পরে শোনা গেল—যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে

পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের উপরে, সেই সব শাসনকর্তার এবং তাঁদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

আবার হাততালি পড়তে লাগল। কবি যেন এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন—প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ শুনতে লাগল। মনে হল, এ-কথা শোনবার অধিকারও যেন তার মা হরণ করে নিয়েছে। সবটা শোনাও হল না। তাড়াতাড়ি ভিড় থেকে সরে বেরিয়ে এল দীপঙ্কর। আজ এই লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যেও দীপঙ্কর যেন অপাঙক্তেয় হয়ে রইল। সে যেন অস্পৃশ্য এদের চোখে।

আবার হাঁটা। আবার তাকে হাঁটতে হবে। হাঁটাপথের শেষে যেন দীপঙ্কর তার গন্তব্যস্থানের নির্দেশটুকু পেয়ে যেতে পারে। পেছনে যেন এক মহাসমুদ্রের গর্জন—সেদিকে চেয়ে দেখবারও অধিকার তার আর নেই। সমস্ত পৃথিবী থেকে যেন তার নির্বাসন হয়ে গেছে কাল থেকে। সে যেন শুধু আপার-ট্র্যাফিক-এর কাজ করবার জন্যেই জন্মেছে পৃথিবীতে। সে যেন রবিনসন্ সাহেব আর ঘোষাল সাহেবের খবরদারি করবার জন্যেই বেঁচে আছে। আপিসের কথাটা মনে পড়তেই যেন সমস্ত মনটা আবার বিবিয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে পৌঁছতেই মা এল। আজকে মাকে যেন অনেক ভাল দেখাচ্ছে। মা যেন সুস্থ হয়েছে আরো। তবু মা'র দিকে দীপঙ্কর সেই আগেকার দৃষ্টি দিয়ে আর যেন চাইতে পারলে না। মা যেন সেই আগেকার মা আর নেই। দীপঙ্করের কাছেও যেন মা তার ছোট হয়ে গেছে। কেন তাকে দিয়ে অমন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে; কেন তাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে দিলে পৃথিবী থেকে। মা'র ওপর যেমন তার কর্তব্য আছে, সকলের ওপরেই তো আছে। এই চারপাশের পৃথিবীও তো তার আপনার জন!

মা বললে—কী রে, অমন দেখাচ্ছে কেন রে তোকে? খুব খাটুনি গেছে আপিসে?

দীপঙ্কর শুধু বললে—না!

মা বললে—সাহেব বকেছে বুঝি তবে?

দীপঙ্করের কেমন রাগ হয়ে গেল। বললে—তুমি চুপ করো তো মা, সাহেব বকতে যাবে কেন মিছিমিছি?

মা আর কোনও কথা বললে না। দীপঙ্কর বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ-সংসারের কোনও কাজেই লাগবে না যখন সে, তখন তার তো আর কিছুই করবার নেই। সত্যিই তার যেন কিছু করবারই নেই। এবার থেকে সে শুধু সকাল থেকে আপিসে যাবে আর বিকেলবেলা বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে থাকবে! এই উনিশের একের বি'র অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সে নিশ্বাস গ্রহণ করবে আর নিশ্বাস ত্যাগ করবে!

মা আবার ঘরে ঢুকলো। একটা চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও, তোমার একটা চিঠি এসেছে—

চিঠি! দীপঙ্কর তড়াক করে উঠে বসলো বিছানার ওপর। চিঠি তো তার আসে না বড় একটা! চিঠি তো তাকে কেউ লেখবার নেই!

দু'হাতে খামটার মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে দীপঙ্কর রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে লাগলো!

লক্ষ্মীদির চিঠি। লক্ষ্মীদি লিখেছে—

দীপু,

অনেকদিন তুমি আসোনি। আমি এখনও কলকাতায় আছি। তুমি বোধহয় বৌবাজারের ঠিকানায় গিয়ে আমাকে না-পেয়ে ফিরে গেছ। আমি এখন ওপরের ঠিকানায় আছি। তুমি চাকরি করছো বলেছিলে। সেই জন্যেই আমি আর তোমায় বিরক্ত করিনি। অনেকদিন কারোরই কোনও খবর পাই না। যদি সময় করতে পারো তো আমার ওপরের ঠিকানায় একবার এসো। তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুশী হবো!

তোমার—লক্ষ্মীদি

মা বললে—কার চিঠি রে দীপু? আপিসের?

দীপঙ্কর তখনও এক মনে পড়ছে। একবার পড়া হয়ে গেছে, তখন আবার পড়ছে!

চন্নুনী ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠলো—ও দিদি, এদিকে তোমার ডাল পুড়ে যাচ্ছে যে?

তাড়াতাড়ি মা চলে গেল। এতদিন পরে যেন মা আবার আশা পেয়েছে মনে মনে। এবার আর কোনও ভয় নেই। কোনও আশঙ্কা নেই। দীপুকে এবার সব ছোঁয়াচ্ থেকে মুক্ত করতে পেরেছে মা! দীপু মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনওদিন স্বদেশী করবে না। এবার শুধু একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যাবে মা এখান থেকে। তার আগে বিন্তীর একটা বিয়ে দিতে পারলেই সব দায়-দায়িত্ব মিটে যায়।

পাশের বাড়িটা অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে। অনেকদিন ভাড়াটে আসে না বলে অঘোর ভট্টাচার্যও কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বাড়ি-ভাড়ার সাইন-বোর্ডটা ঝুলছে। তবু লোক আসে না। কুড়ি টাকা মাত্র। এই বাড়ির জন্যে কুড়িটা টাকা! কুড়িটা টাকা মাসে মাসে কে গুনতে পারে! কার এত ক্ষমতা।

কজন লোক আছে কলকাতায় কুড়ি টাকা ভাড়া দেবে মাসে!

যারা আসে তারা কেউ কেউ বলে—পনেরো টাকা হলে নিতে পারি, কুড়ি টাকা বড্ড বেশি মশাই।

অঘোর ভট্টাচার্য বলে—তবে পড়ে থাক্, ও মাছ নয় যে পচে গন্ধ বেরোবে হে—

দীপঙ্করের মা বলে—তা দিন্ না বাবা পনেরো টাকাতেই ভাড়া দিন্ না—

অঘোর ভট্টাচার্য রেগে যায়। বলে—কেন দেব? আমার কি টাকার সতো? আমার কি টাকার গাছ আছে বাড়িতে, নাড়া দেব আর ঝরে পড়বে মেঝেয়,—

এ-কথার উত্তর দেওয়া চলে না। তবু মনে হয়, বাড়িটার লোক এলে যেন ভাল হয়। তারা বেশ ছিল। মেয়েটা আসতো, মাসীমা বলে ডাকতো। বিন্তীকে দেখতে এলে নিজের গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিত। কোথায় যে চলে গেল সে-মেয়ে। বাপ বর্মা থেকে এসে হয়ত নিয়ে গেছে।

—মা!

দীপঙ্কর এসে একেবারে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। বললে—ভাত হয়েছে নাকি?

—কেন রে? এত সকাল-সকাল ভাত কেন রে? কোথাও যাবি?

—হ্যাঁ!

মা বললে—তা আপিস থেকে খেটে খুটে এই এলি, আবার এখুনি কোথায় যাবি? কেউ ডাকতে এসেছে বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—না, কেউ ডাকতে আসেনি—

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। যে-সব বন্ধু জুটেছে, সময় নেই অসময় নেই ডাকলেই হলো!

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে এর কোনও জবাব বেরোল না। বললে—দুটি ভাত দেবে তো দাও, নইলে না-খেয়েই যাবো, এসে খাবো'খন্!

—কেন রে, কী এমন জরুরী রাজকার্য এসে গেল এখন, যে এখুনি না গেলে নয়! এত রাতে আবার কোথায় বেরোবি!

—তা সব কথা তোমায় বলতে হবে নাকি?

মা যেন ছেলের কথায় একটু অবাক হয়ে গেল। এমন করে তো দীপু কখনও কথা বলে না। এমন সুরে তো আগে কখনও কথা বলেনি মা'র সঙ্গে! মা চেয়ে দেখলে ছেলের মুখের দিকে! কী একটা কথা বলতে গিয়েও যেন মা'র মুখ দিয়ে কথাটা বেরোল না। দীপুর মুখের দিকে চেয়ে মা'র হঠাৎ মনে হলো দীপু যেন এখন বড় হয়ে গেছে! এখন যেন দীপুকে আর আগেকার মত শাসন দিয়ে বেঁধে রাখা যাবে না। দীপুরও একটা নিজস্ব মত-মতন জিনিস তৈরি হয়েছে। দীপু এখন সত্যিই সাবালক।

দীপু একেবারে জামা-টামা পরে তৈরি। সত্যিই যেন সে বেরোবে। বলে

তৈরি হয়েই এসেছে। বললে—তাহলে একেবারে ফিরে এসেই খাবো। যদি আমার ফিরতে দেরি হয় তো আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখো!

মা বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে কোথায় যাবি তুই যে ফিরতে দেরি হবে?

—সে অনেক দূরে!

—তা এত রাত্তিরে অনেক দূরে না-গেলেই নয়! আবার বুঝি সেই স্বদেশী দলে মিশছিস?

দীপঙ্কর এবার সত্যিই একটু রেগে গেল। বললে—মা, কাল তোমার না পা ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি স্বদেশী আর করবো না, তবু তোমার বিশ্বাস হলো না?

মা বললে—আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলি, নইলে আমার কী? আমি আর ক'দিন! একদিন তোমারও ছেলেপুলে হবে, সেদিন বুঝবে বাবা সন্তান কী জিনিস—

কথাটার দিকে কোনও কান দিলে না দীপঙ্কর। সেই লেখার কথাটা মনে পড়লো। উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত চক্র ত্যাগ করিব না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, গৃহ, পরিবার কাহারও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিব না। নেতার আদেশে চক্রের কাজ বিনা-প্রতিবাদে করিয়া যাইব। যদি এই শপথ পালনে অক্ষম হই, তবে পিতা, মাতা, ব্রাহ্মণ ও সর্বদেশের দেশ-প্রেমিকদের অভিশাপ যেন আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।

—দেখিস, যেন বেশি রাত করিস নি! তুই বাড়ি না-এলে আমার ঘুমই আসবে না!

এতদিন সংসারের কাছ থেকে কেবল বাধাই পেয়ে এসেছে দীপঙ্কর। প্রতি পদে পদে বাধা। কোনও কাজই স্বাধীনভাবে করতে দেয়নি মা। ছোটবেলা থেকে শুরু করে চিরকাল কেবল নিষেধ আর বারণ। নিষেধের আর বারণের বেড়াজালে ঘিরে রেখে দিয়েছে তাকে। তাই বোধহয় দীপঙ্কর শান্তি চেয়েও শান্তি পায়নি কোথাও। সংসারের কোথাও একটু আশ্রয় জোটেনি তার। আপিসে রবিন্‌সন্ সাহেবের আশ্রয়ের মধ্যে এসেও মিস্টার ঘোষালের দৌরাত্ম্য তাই বোধহয় তাকে বিচলিত করেছে। তাই-ই হয়ত বাইরে কিরণের সঙ্গে মিশে, কিরণের সাহচর্য পেয়েও কিরণকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই বোধহয় সতী তাকে সন্দেহ করে এসেছে। তাই বোধহয় লক্ষ্মীদি এতদিন তাকে দূরে ঠেলে রেখেছে!

সত্যিই অনেক দূর। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে আবার ঠিকানাটা দেখে নিলে দীপঙ্কর। একেবারে বালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে। গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত ট্রাম। তারপর পায়ে হাঁটা। একেবারে সোজা দক্ষিণ দিকে হেঁটে হেঁটে চললো দীপঙ্কর। দু'একটা ছাড়া ছাড়া বাড়ি। একেবারে অন্য চেহারা হয়ে গেছে এ-দিকটা। একটা লেক্ হচ্ছে এদিকে। গাছে গাছে ভর্তি। লম্বা-লম্বা

তাল-গাছের জঙ্গল। কয়েকটা বাড়ি উঠছে। এখনও জঙ্গল সাফ হয়নি ভাল করে। রাস্তা দিয়ে মোষের-গাড়ি চলেছে। সার সার। ক্রমে রাস্তার আলো কমে এল। কয়েকটা মুদিখানার দোকান। তারপর বাঁ দিকে জলা-জমি। জলের ওপর কচুরিপানার ভিড়।

চলতে চলতে একেবারে গড়িয়াহাটা-রেলের লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর গিয়ে পড়লো। এখানে রেলের লাইনটা উত্তর দিক থেকে বেঁকে এসে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গেট্‌টা বন্ধ। বন্ধ লেভেল-ক্রসিংটার সামনে সার-সার মোষের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা লাল-আলো জ্বলছে গেটের গায়ে। পাশেই লম্বা নর্দমা। ব্যাং ডাকার শব্দ আসছে কানে। পাশেই হয়েছে একটা বুদ্ধমন্দির। মন্দিরের ভেতর থেকে পুজোর ঘণ্টার শব্দ আসছে ঢং—ঢং—

দীপঙ্কর চিনতে পারলে। ভূষণ দাঁড়িয়ে আছে। ভূষণ মালীর হাতে সবুজ হ্যাণ্ড্-সিগন্যাল ল্যাম্প্। রেলের গুমটিওয়ালা। গেটম্যান।

মাঝে-মাঝে দু'একবার ভূষণ গেছে হেড্-আপিসে! অনেকদিনের গেট-ম্যান। কোনও অ্যাক্‌সিডেন্ট্ হলে সাক্ষী দিতে যায় ভূষণ। ঘোষাল সাহেবের কাছে গিয়ে দরবার করে। এদিকে বালিগঞ্জ ওয়েস্ট্ কেবিনের কেবিনম্যান করালীবাবুও চেনা লোক। আর স্টেশনমাস্টার মজুমদারবাবু আছে বালিগঞ্জ স্টেশনে।

হঠাৎ একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন হুশ্ হুশ্ করে চলে গেল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো থর থর করে। তারপর গেট্‌টা খুলে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেই মোষের গাড়িগুলো সার সার চলতে লাগলো। গলার ঠুন-ঠুন ঘণ্টা বাজছে সব।

দীপঙ্করও চলতে লাগলো। এখন ভূষণের সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। ভূষণ দেখলেই সেলাম করবে। রবিন্‌সন্ সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করবে, ঘোষাল সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করবে। অনেক বাজে কথা বক্ বক্ করে বলবে!

দীপঙ্কর গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে একেবারে লাইনের ওপারে গিয়ে পড়লো। তারপর পকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করলে। একটা আলোর তলায় ঠিকানাটা পড়ে নিয়ে আবার চিঠিটা পকেটে রেখে দিলে।

রাস্তার এক ভদ্রলোক বললে—কত নম্বর বললেন?

দীপঙ্কর বললে—তিপ্পান্ন—

—ওই দিকে দেখুন, ওই বাড়িটা হলো পঞ্চাশ নম্বর—

এর পর আর খুঁজতে অসুবিধে হয়নি। অন্ধকারের মধ্যে একটা লম্বা তালগাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারই তলায় বাড়িটা। পাশেই একটা মাঠ।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই লক্ষ্মীদি নিজে দরজা খুলে দিয়েছিল। অন্ধকারে প্রথমে একটু চিনতে কষ্ট হয়েছিল লক্ষ্মীদির। এই ক'দিনের মধ্যেই যেন বড় হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। তা ছাড়া প্যান্ট পরা দীপঙ্করকে লক্ষ্মীদি,

চিনবেই বা কেমন করে?

—তোমার চিঠি এই এখুনি পেলাম লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বললে—আয় ভেতরে আয়—

লক্ষ্মীদি আগে আগে যাচ্ছিল, দীপঙ্কর তার পেছনে। গলিটা অন্ধকার, রাতও অনেক হয়েছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানে কবে এলে লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি যেতে যেতে বললে—প্রায় এক মাস হলো—

তারপর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো দুজনে। লক্ষ্মীদি যেন কী ভাবলে এক মুহূর্ত। একবার চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক যেন লক্ষ্মীদির মুখের চেহারায় ভেসে উঠলো। যেন কী বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। দীপঙ্কর বড় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে লক্ষ্মীদির গা ঘেঁষে। লক্ষ্মীদি থমকে দাঁড়িয়েছে হয়ত কিছু বলবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই বুঝি বলতে পারছে না।

দীপঙ্কর একবার কী বলতে গেল—লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—চুপ, আস্তে—

দীপঙ্করের মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন এক মহা সমস্যায় পড়েছে। চারিদিকে অন্ধকার। কাছাকাছি কোনও আলো নেই কোথাও। পাশেই উঠোনের ওপর একটা তালগাছ সোজা মাথা উঁচু করে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। মাটির উঠোন। চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলের ওপরে জলা-জায়গা থেকে বোধ হয় ব্যাং ডাকছে।

লক্ষ্মীদি গলা নিচু করে বললে—তুই এমন সময় এলি—?

দীপঙ্করও আস্তে আস্তে বললে—তোমার চিঠিটা যে আপিস থেকে এসে তবে পেলুম। তারপর মা বললে খেয়ে বেরোতে, তাই একেবারে খেয়ে বেরোলাম—

তারপর একটু থেমে বললে—তাহলে আমি না-হয় এখন যাই, পরে বেলাবেলি আসবো আবার একদিন—

—না দাঁড়া, তোকে তো আমিই আসতে বলেছিলুম।

—তা হোক, তার জন্যে তুমি ভেবো না, আমি আর একদিন আসবো।

তারপর হঠাৎ মনে পড়লো। বললে—কালকে হঠাৎ দাতারবাবুকে দেখলুম লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু কি এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে? আমি ডাকলুম, উত্তর দিলেন না। কী, হয়েছে কী?

লক্ষ্মীদি সে-কথার উত্তর দিলে না। দীপঙ্করকে বললে—এদিকে আয়—

বলে অন্য একটা গলি দিয়ে অন্যদিকে নিয়ে গেল। এদিকটাও অন্ধকার। লক্ষ্মীদি আগে আগে চলেছে। কেমন যেন সমস্ত জিনিসটা রহস্য মনে হলো দীপঙ্করের কাছে। কোথায় সেই বৌবাজারের চীনে পাড়া। আবার কোথায় এই

গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং। এদিকটা ঢাকুরিয়া। এত জায়গা থাকতে এখানে এল কেন? সেই লক্ষ্মীদি, কত বড়লোকের মেয়ে। কত তার টাকা-পয়সা ছিল। ভুবনেশ্বরবাবুর কত টাকা! কত বড় জায়গায় বিয়ে হতো তার। সতীর মতই কত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হতো! সতীর বিয়ের দিনেও যেমন গাড়ির সার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, লক্ষ্মীদির বিয়েতেও তাই হতো। বড় বড় লোক দামী-দামী গাড়ি চড়ে আসতো। রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার আসতো!

লক্ষ্মীদি একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। জানালাটা খোলা। ভেতরদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে। বললে—ওই দ্যাখ্—

দীপঙ্কর দেখলে। কলকে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায়নি। ঘরে টিম্ টিম্ করে একটা হারিকেন জ্বলছে। একটা তক্তপোশের ওপর শুয়ে রয়েছে দাতারবাবু। বড় অসহায় মুখটা। যেন অনেক যুদ্ধ করে অনেক আঘাত পাবার পর ক্লান্তিতে একটু ঘুমিয়েছে এখন। আবার যেন এখুনি জেগে উঠবে। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো। সেই শৌখিন মানুষটা। কোট প্যাণ্ট্ টাই পরে ট্যাক্সি চড়ে ভোরবেলা কালিঘাটের মন্দিরে আসতো—শুধু লক্ষ্মীদির একটা চিঠির জন্যে। সিগারেট খেত। কোথায় ভারতবর্ষের কোন্ পশ্চিম প্রান্তের কোন্ জনপদের অধিবাসী। অন্য আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাগ্যান্বেষণে সমুদ্র পেরিয়ে কোন্ সুদূর দেশে গিয়ে পৌঁছেছিল।

সেখানে দাতারবাবু প্রতিপত্তি করেছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কোন্ ষড়যন্ত্রের ফলে বুঝি লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল কোন্ এক অশুভ মুহূর্তে। তখন অর্থ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব কিছু নিরর্থক মনে হলো তার কাছে। একদিন লক্ষ্মীদির সঙ্গে সঙ্গে দাতারবাবুও চলে এল কলকাতায়। আর তারপর জীবনে নতুন করে যখন আবার প্রতিষ্ঠার স্বর্ণসূত্র আবিষ্কার করেছে, ঠিক সেই সময়ে কিনা এল পরিহাস। পৃথিবীর প্রথম ট্রেড-ডিপ্রেশন। আবার অর্থ গেল, প্রতিষ্ঠা গেল, প্রতিপত্তি গেল। আবার লুকিয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হলো রাস্তায় রাস্তায়। দেনার দুর্দশায় মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল দাতারবাবুর।

লক্ষ্মীদি সরে এল। বললে—আজকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি, মোটে ঘুম নেই চোখে—চেহারা কী হয়েছে দেখেছিস?

দীপঙ্কর বললে—আমি ভেবেছিলুম তোমার সেই ছ' হাজার টাকা যোগাড় করতে পারবো, সতী রাজীও হয়েছিল, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল—

তারপর দীপঙ্কর নিজের কথা বললে। কেমন করে কেটেছে এ ক'দিন। কেমন করে পুলিসের লক্-আপের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। সতীর বিয়ে হবার দিন কেমন করে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে।

লক্ষ্মীদি সব মন দিয়ে শুনলে

দীপঙ্কর বললে—তা ছাড়া, আরো অনেক সব এমন ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্যে তোমার খবরই নিতে পারিনি। আর আপিসের কাজও রয়েছে—

লক্ষ্মীদি বললে—তোরও চেহারা অনেক বদলে গেছে—আর সেই আগেকার ছেলেমানুষটি নেই—

দীপঙ্কর হাসলো কথাটা শুনে। ছোটবেলাকার কথা লক্ষ্মীদির তাহলে এখনও মনে আছে। সেই চকোলেট ঘুষ দেওয়া, সেই চড় মারা, সেই চা খেতে শেখা প্রথম লক্ষ্মীদির কাছে। লক্ষ্মীদি প্রথম দীপঙ্করকে চা খাইয়েছিল একদিন। সত্যি সেইসব দিনের কথা ভাবলে দীপঙ্কর এখনও হাসে। এখনও হাসি পায় তার। এ-ঘটনার অনেকদিন পরে যখন লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়তো তখন দীপঙ্করের আরো হাসি পেত। ছোটবেলায় গরীব ছিল বলেই দীপঙ্করের মনে হতো, যখন চাকরি হবে তার, প্রতিষ্ঠা হবে তার, তখন হয়ত কোনও দুঃখ থাকবে না আর। মনে হতো পৃথিবীর যত অর্থবান লোকই বুঝি সুখী। শুধু তারই অর্থ নেই, পরের দানের ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই তার এত কষ্ট। কিন্তু লক্ষ্মীদি কেন তার বাবার অত ঐশ্বর্য ছেড়ে এমন করে দাতারবাবুর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। যার আছে সে কেন ত্যাগ করে? কিসের সন্ধানে ত্যাগ করে? যখন চাকরিতে আরো উন্নতি হয়েছে দীপঙ্করের, যখন সমস্ত আপিসসুদ্ধ লোক দীপঙ্করকে সম্মান দিয়ে খাতির দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে, সেন সাহেবের এক কণা কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্যে লালায়িত হয়েছে, তখনও দীপঙ্করের অন্তরের দারিদ্র্যের সন্ধান তারা রাখেনি। তারা দেখেছে সেন সাহেবের পদমর্যাদা, সেন সাহেবের মাইনে, সেন সাহেবের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! কিন্তু তারা, আপিসের সেই কে-জি-দাশবাবু, সেই রামলিঙ্গমবাবু, গাঙ্গুলীবাবু, তারা কি জানতো, এক মুহূর্তের শান্তির জন্যে তাদের সেন-সাহেব তার পদ-মর্যাদা, সম্মান, অর্থ, বিত্ত, সমস্ত পদদলিত করতে পারে!

কিন্তু সে-কথা পরে হবে!

লক্ষ্মীদির জীবনেই বা কিসের অভাব ছিল। অর্থ? সে তো লক্ষ্মীদিকে কখনও আকর্ষণ করেনি! লক্ষ্মীদির রূপ ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, গুণ ছিল, লেখা-পড়া জানা ছিল, সবই ছিল। বাপের স্নেহ, বোনের ভালবাসাও ছিল। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও ছিল। আর ভুবনেশ্বরবাবু কী-ই না করতে পারতেন মেয়ের জন্যে! একদিন ভুবনেশ্বরবাবুর মৃত্যুর পর লক্ষ্মীদিই তো তার অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতো। ভুবনেশ্বরবাবু তো মেয়েদের মুখের দিকে চেয়েই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। ভেবেছিলেন, বড় হয়ে মেয়েরা বাবার অবিমৃশ্য-কারিতায় একদিন মনে মনে অপরাধ নেবে। তখন তিনি কী বলে নিজের কাজের জবাবদিহি করবেন?

বহুদিন পরে দীপঙ্কর একদিন লক্ষ্মীদিকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ লোভ তুমি কেমন করে ছাড়লে লক্ষ্মীদি?

তখন লক্ষ্মীদি তার দুর্দশার শেষ সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। রোজ খাবার সংস্থানও জোটে না। শহরের প্রান্তের একেবারে বাইরে ভাঙা-বাড়ির তলায় ময়লা শতচ্ছিন্ন কাপড়ে লজ্জা ঢাকতে হয় লক্ষ্মীদিকে। তবুও কখনও কাঁদতে দেখেনি, মুখ ভার করতে দেখেনি। ছেঁড়া-কাপড়টা সেলাই করে পরতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সে এক চরম দুর্দশার দিন গেছে লক্ষ্মীদির!

—সত্যি বলো না, কেমন করে এত ঐশ্বর্যের লোভ ছাড়তে পারলে তুমি? তোমার অনুতাপ হয় না!

লক্ষ্মীদি বলেছিল—শম্ভুকে যদি তুই ভালো করে চিনতিস তাহলে আর এ-কথা জিজ্ঞেস করতিস্ না!

—কিন্তু দাতারবাবু তোমাকে কী দিয়েছে! শুধু অভাব আর অনটন ছাড়া আর কিছু তোমাকে দিয়েছে কোনওদিন?

লক্ষ্মীদি কথাটা শুনে হেসেছিল সেদিন। বলেছিল—তুই বাইরের লোক, তুই তো সে-কথা বলবিই। আমার বাবা দেখলেও ওই কথাই বলতো!

—কিন্তু দাতারবাবু কি সত্যিই তোমায় ভালবাসে?

—ভালো না বাসলে, অত সন্দেহ করে কেন দেখতে পাস না, তোর সঙ্গে মিশি বলেও ওর সন্দেহ—জানিস্—

সে-এক অসহ্য অবস্থা দাতারবাবুর তখন। লক্ষ্মীদির সে-সব দিনকার কথা ভাবলেও আতঙ্ক হয় দীপঙ্করের। লক্ষ্মীদিকে দেখেই দীপঙ্কর নিজেকে যেন নতুন করে চিনতে পেরেছিল। সমস্ত দুঃখের মধ্যে অবিচল থাকার শিক্ষা লক্ষ্মীদির কাছেই তো পেয়েছিল দীপঙ্কর। আর সতী? সমস্ত সুখের মধ্যেও অশান্তির সর্বগ্রাসী দাহনে জ্বলার যে সুখ—সে তো সতীর কাছেই জেনেছিল দীপঙ্কর।

কিন্তু সে-সব কথাও পরে হবে।

মনে আছে গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর ধারের সেই লক্ষ্মীদির বাড়িতে সেদিন লক্ষ্মীদির সব ব্যাপার শুনে দীপঙ্কর কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তখনও কিছু জানতে পারেনি। কেমন করে বৌবাজারের চীনে-পাড়ার বাড়িটা থেকে আবার এখানে আসতে হলো, এই জলা-জমির ভাঙা বাড়িতে। হারিকেনের টিম্-টিমে আলোয় দাতারবাবুর ঘুমন্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত চেহারাটা দেখেই দীপঙ্কর খানিকক্ষণ নির্বাক হয়ে গিয়েছিল শুধু! আগের দিন শ্মশানের বাইরে গঙ্গার ঘাটের ধারে দাতারবাবুর পরিবর্তনটা অন্ধকারে ভালো বোঝা যায়নি। কিন্তু এখন যেন বড় মর্মান্তিক লাগলো দাতারবাবুকে দেখে। কেন এমন হলো?

লক্ষ্মীদি বললে—এদিকে আয়, সব বলছি, অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি এই একটু আগে—

দীপঙ্কর বললে—কেন? দাতারবাবু ঘুমোয় না নাকি?

—না, ডাক্তার বলেছে, ঘুমোলেই ভাল হয়ে যাবে, যত ঘুমোবে তত ভাল। মোটে ঘুম পাড়াতে পারি না! সমস্ত দিন-রাত কেবল কী যে ভাবে। ভেবে ভেবে ওইরকম মাথা গরম হয়ে গেছে—পাগলের মতন অবস্থা। আর একটু বাড়লে একেবারে পাগল হয়ে যাবে—

—কী ভাবেন এত?

লক্ষ্মীদি বললে—ভাবে আমি আর ওকে ভালবাসি না। সেই যে ওর এক পার্টনার ছিল, যার সঙ্গে ব্যবসা করেছিল তাকে কেবল সন্দেহ করে!

—সে কী?

—হ্যাঁ, সে কেনেডী অকল্যান্ড কম্পানীতে ছ' হাজার টাকা ধার করে ওর সব দেনা মিটিয়ে দিয়েছে। বৌবাজারের যত বাড়িভাড়া বাকি ছিল সব শোধ করে দিয়েছে, এখন আর বলতে গেলে কোনও দেনাই নেই আমাদের, কিন্তু এই আর এক উপসর্গ এসে জুটেছে!

দীপঙ্কর বললে—কালকে রাত্তিরে তাই আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো দাতারবাবুকে দেখে, সেই অত রাত্তিরে শ্মশানে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে আছেন, মনে হলো যেন জলের ভেতরে নামছেন। আমি ডাকতেই পালিয়ে গেলেন—

লক্ষ্মীদি বললে—সেইজন্যেই তো চোখে-চোখে রাখি কেবল, আত্মহত্যা করতে চায় কেবল—

—কিন্তু তুমিই বা একলা সামলাবে কী করে?

—হঠাৎ একটু চোখের আড়াল হলেই বেরিয়ে যায়। কাল যখন বাড়ি এল, তখন অনেক রাত, রাত দুটো হবে একটা। আমারও ভয় হচ্ছিল খুব, কিছুতেই ঘুম আসে না! আমার ওই রেলের লেভেল-ক্রসিংটা, ওইটের জন্যেই বেশি ভয় করে—

—কেন?

—অনেক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে যে ওখানে। লাইন পার হতে গিয়ে অনেকে ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে। মাথার তো ঠিক নেই, হয়ত কখন অন্যমনস্ক হয়ে রেল-লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটবে, আর ওদিক দিয়ে যে ট্রেন আসছে তার হয়ত খেয়ালই থাকবে না—

দীপঙ্কর বললে—তা এত জায়গা থাকতে এখানেই বা ঘর-ভাড়া নিতে গেলে কেন লক্ষ্মীদি! আর কোথাও ঘর পেলে না?

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু এত সস্তায় তো আর কোথাও বাড়ি পাওয়া যাবে না—

মাত্র একখানা ঘর। আরও একখানা ঘর আছে বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক একখানা ঘর বলা চলে না। শুধু দেয়াল আছে চারদিকে। এই পর্যন্ত। সেই ঘরেই লক্ষ্মীদি বসালে দীপঙ্করকে। পাশের ঘরে দাতারবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

লক্ষ্মীদি একে-একে সব বলতে লাগলো ঘটনাগুলো।

লক্ষ্মীদি বললে—এইজন্যেই তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—

দীপঙ্কর বললে—আমার দ্বারা কী সাহায্য হবে তুমি বলো, তুমি যা বলবে আমি তাই-ই করতে পারি—আমি তো এখন আপিসে চাকরি করছি, আমার মাইনেও বেড়ে গেছে এই ক'দিনে।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—এটা কী রে? তোর মণিব্যাগ?

মণিব্যাগটা কখন প্যান্টের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল টের পায়নি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর বললে—ওতে মাত্র বারো আনা পয়সা আছে—

তারপর একটু থেমে বললে—তোমার টাকার দরকার থাকে তো বলো লক্ষ্মীদি—আমি দিতে পারি টাকা—

লক্ষ্মীদি বললে—না, টাকার আমার দরকার নেই, সব দেয় অনন্ত—

—অনন্ত কে?

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভুর বন্ধু!—ওই যাকে এত সন্দেহ করে ও—

—কেন, সন্দেহ করে কেন?

লক্ষ্মীদি হেসে বললে—কে জানে? অনন্ত না থাকলে আজ কোথায় থাকতুম বল্ তো? অনন্ত না থাকলে আজকে তো ওকে জেলে যেতে হতো। অনন্তকে দোষ দেওয়া সহজ, কিন্তু অনন্ত ছিল বলেই তো আজকে টিঁকে আছি! সে-বেচারীর সংসারে কেউ নেই, কার জন্যে সে করতে যাবে এত! তার কিসের দায়! আমি তার কেউ-ই না, তবু এত করে কেন?

অনন্তর কথা বলতে বলতে লক্ষ্মীদি যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

—প্রায় তো বৌবাজার থেকে আমাদের পথে বসবার অবস্থা হয়েছিল! জানিস, কী অবস্থা তখন আমাদের! তখন আমার হাতে একটা পয়সা নেই যে কিছু কিনে খাই। গয়নাগুলো তখন একে একে সব বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা এসে বাড়ি-ভাড়ার তাগাদা করে, আর শুধু হাতে ফিরে যায়! ক'দিন আর শুধু হাতে ফিরে যাবে সে! তারপর, আমি একলা! সবাই কেমন সন্দেহ করতো! মারহাটি ভদ্রলোকের বাঙালী বউ, এটাই বা কী রকম! তবু ভাগ্যিস চীনেপাড়ায় ছিলুম তাই রক্ষে! আমি তো ভালো করেই জানতুম কাকাবাবু খুঁজবে আমাকে। আর একবার খবর পেলেই ধরে নিয়ে যাবে! তাই অনেক কষ্ট করেও সব মুখ বুজে সহ্য করতুম—

লক্ষ্মীদি তারপর হঠাৎ বললে—তোর খাওয়া হয়ে গেছে?

দীপঙ্কর বললে—আমি খেয়ে তবে এসেছি—এখুনি বললুম তো—

—আমার এখনও খাওয়া হয়নি। অনন্ত এলে তবে এক সঙ্গে খাবো!

—অনন্তবাবুও কি তোমার এখানে খায় নাকি?

—আমার এখানে খাবে না তো কোথায় খাবে? আমার এখানেই খায়,

এখানেই শোয়া! আর এখানে ছাড়া তার তো খাবার-থাকবার জায়গা নেই আর। তারও তো কেউ নেই কলকাতায়! তাছাড়া, এই বাড়ি-ভাড়া, এই এখানকার সংসার খরচ, এ-সব সে-ই তো চালাচ্ছে—! সেই জন্যেই তো শম্ভুর অত রাগ তার ওপরে—

দীপঙ্কর কথাগুলো শুনছিল। কিছু মন্তব্য করলো না। একদিন শুধু দেখেছিল ভদ্রলোককে সেই বৌবাজারের ঘরে।

—কিন্তু লক্ষ্মীদি—

—কী বল্?

দীপঙ্কর বলবে না মনে করেও একবার জিজ্ঞেস করলে—অনন্তবাবু কী করেন?

লক্ষ্মীদি বললে—কোত্থেকে অনেক ধার-টার যোগাড় করে একলা আমাদের এই দেনা-টেনা সব শোধ করে দিয়েছে—এখন সারাদিন ওই খুচরো টুকি-টাকি উপায় করে, অর্ডার সাপ্লাই করে। শম্ভুর ছোটবেলার বন্ধু ও—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানেই এসে খাবে আজ?

—হ্যাঁ, রোজই খায়। এইটেই তো তার বাড়ি!

—তা এক্ষুনি আসবে নাকি?

—এখনও আসতে পারে, এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা পরেও আসতে পারে। সে এলে এক সঙ্গে দু'জনে খাবো। নানান্ জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয় কিনা? আজ-কাল ক্যাপিটেল্ না থাকলে ব্যবসা করা কী যে শক্ত তা জানবি কী করে তুই? অনন্ত বলে, বাজার নাকি ভীষণ খারাপ! ধারে জিনিস দেবার জন্যে লোক খোশামোদ করছে, কিন্তু কিনবে কে? কেনবার লোকই নেই!

—তাহলে আমি উঠি লক্ষ্মীদি, আমাকে তো আবার অনেক দূরে যেতে হবে!

—উঠবি কেন? এত তোর তাড়া কিসের? অনন্ত আসুক আগে, অনন্ত এলে তারপর না হয় যাস্—আর কী খবর বল্, তোদের পাড়ায়? মাসীমা কেমন আছে, আর সেই মেয়েটা? বিন্তী না কী নাম? তার বিয়ে হয়েছে?

অনেক কথা গড়-গড় করে জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীদি। অনেক খবর নিলে। সতীর কী রকম বিয়ে হলো, নেমন্তন্ন করেছিল কিনা, শ্বশুরবাড়ি কোথায়! অনেক কথা সব!

হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা লক্ষ্মীদি—

—কী?

—ওকে তুমি এ-বাড়িতে শুতে দাও কেন?

—কাকে?

—ওই অনন্তবাবুকে! হাজার বন্ধু হলেও, এক-বাড়িতে শোয়া কি ভালো! দাতারবাবুর অসুখ, আর অসুখটা তো ওই জন্যেই। ওই অনন্তবাবুর জন্যেই! অনন্তবাবুকে তুমি অন্য বাড়িতে শুতে বলতে পারো না? এখানে থেকে লোক

নেই কিন্তু শোওয়ার দরকারটা কী?

তারপর একটু থেমে বললে—কোথায় শোয় অনন্তবাবু? কোন্ ঘরে?

—এই তক্তপোশের ওপর। এটা তো অনন্তরই ঘর!

—আর তুমি? তুমি কোথায় শোও?

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। লক্ষ্মীদি উঠলো। বললে—ওই অনন্ত এসেছে—

লক্ষ্মীদি দরজা খুলতে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর বললে—তাহলে আমিও আসি এখন, অনেক রাত হয়ে গেল—

—না বোস্, অনন্তর সঙ্গে দেখা করে যা। অনন্তর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো তোকে ডেকে পাঠিয়েছি।

বলে লক্ষ্মীদি গলি দিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতে গেল! রাত অনেক হয়েছে। আর বেশিক্ষণ দেরি করা চলে না। সেদিন দীপঙ্করের মনে হয়েছিল লক্ষ্মীদি যেন বড় অন্যায় করছে। শুধু অন্যায় নয়, অপব্যয় করছে নিজেকে। অথচ লক্ষ্মীদির যা বুদ্ধি, তাতে যেন এমনভাবে এই অবজ্ঞাত জীবন যাপন করা তার পক্ষে অন্যায়। এমন করে এই অন্ধকার শহরের প্রান্তে একলা বিচ্ছিন্ন জীবন যেন লক্ষ্মীদির মানায় না। লক্ষ্মীদি এর চেয়েও কোনও বড়, কোনও মহৎ জীবনের জন্যেই যেন তৈরী হয়েছিল। যা হতে পারতো সে আলাদা কথা, কিন্তু এত দারিদ্র্যের মধ্যেও লক্ষ্মীদি যে মুখের হাসি কী করে অম্লান রাখতে পেরেছে, তাইতেই দীপঙ্কর সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আর সেই অনন্তবাবু? অনন্তরাও ভাবে আর শিবশম্ভু দাতার—দু'জনেই বহুদিনকার বন্ধু। পরে দীপঙ্কর শুনেছিল—দু'জনেই এক হোটেলে থাকতো। এক সঙ্গে ব্যবসা করতো। কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব সমস্ত ছিল দাতারবাবুর। কিন্তু শেয়ার দু'জনের সমান-সমান। অনন্তরাওয়ের ব্যবসা খুচরো ব্যবসা। খুচরো কারবারের মালিক। অর্ডার সাপ্লাই করে অল্প মূলধন নিয়ে। হঠাৎ পাঁচশো মন সরষের তেল সাপ্লাই করতে হবে তাতেও আছে, আবার এক টন ছোলা সাপ্লাই করতে হবে ফোর্ট উইলিয়মে তাতেও আছে। হাতে যা কাজ আসবে তাতেই রাজী। আর দাতারবাবুর ছিল ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের কারবার। বহুদিন আগে একদিন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছিল। একদিন রাজপুতানা থেকে এসেছিল মারোয়াড়িরা, পাঞ্জাব থেকে এসেছিল শিখ, ইংলন্ড থেকে এসেছিল ইংরেজরা, চায়না থেকে এসেছিল চীনে-ম্যান, আর হিন্দুস্থানী, বেহারী, পার্শি, ভোরা মুসলমান। সকলের জন্যে কলকাতার রাজধানীতে নিরঙ্কুশ নিমন্ত্রণের স্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। বাঙালীরা সরকারী চাকরি করেছে, সওদাগরী আপিসে গোলামি করেছে, হাতের লেখা ভাল করেছে, টাইপ-রাইটিং শিখেছে, স্কুল-মাস্টারি করেছে, কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলটা রেখে দিয়েছিল ওদের জন্যে খোলা রাস্তা। সেখানেই একদিন প্রথম এসেছিল

অনন্তরাও ভাবে। আর তারপর এসেছিল বর্মা ফেরত দাতারবাবু।

উনিশ শো তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশের সেই বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশে তখন আগুন নিয়ে খেলা চলেছে। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন, মদের দোকানে পিকেটিং, বিলিতি কাপড় বয়কট, সাইমন-কমিশন-রিপোর্ট, লর্ড আরউইনের ডোমিনিয়নের স্টেটাসের প্রস্তাব আর ওদিকে পৃথিবীজোড়া ট্রেড্-ডিপ্রেশন। তিন-রঙা কংগ্রেসের ফ্লাগ তখন সর্বত্র উড়ছে। রাস্তায় রাস্তায় ভলান্টিয়ারদের মিছিল, মিছিলের সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা সেই প্রথম যোগ দিলে। বড়বাজারে মারোয়াড়িরা মোটা চাঁদা দেয় কংগ্রেসকে। সেই বড়বাজারেও তখন মালের কেনা-বেচা কমে গেছে। অনেকে ফিরে গেছে যোধপুর, জয়পুর, বিকানীরে। যারা যেতে পারেনি, যাদের যাবার জায়গা নেই, তারা তখনও কেউ কেউ টিঁকে আছে। এই দাতারবাবু আর অনন্তরাও ভাবের মত কয়েকজন।

অনন্তবাবু ঘরে ঢুকলো। আর তার আগে আগে লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি ভেতরে এসে বললে—এই সেই দীপঙ্কর, একে তো দেখেছ তুমি বৌবাজারে?

অনন্তবাবুও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। অন্তত চেহারা দেখে তাই-ই মনে হলো দীপঙ্করের। দাতারবাবুর সঙ্গে একদিন দেখেছিল বৌবাজারের সেই চীনেপাড়ার বাড়িতে।

—আপনি রেলওয়েতে চাকরি করেন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—ছোট চাকরি না বড় চাকরি?

দীপঙ্কর এ-কথার উত্তর দিলে না। কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অবজ্ঞার হুল লুকিয়ে ছিল। লোকটাকে সেই প্রথম দিনেই ভাল লাগেনি দীপঙ্করের। দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি এবার যাই লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—সে কি রে? যে-কাজটার জন্যে ডাকা সেইটেই তো হলো না।

দীপঙ্কর শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াল। বললে—অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, তা ছাড়া আমি আসতাম না তোমার কাছে, নেহাত তুমি চিঠি দিয়েছিলে বলেই এসেছিলাম আজ—

—কিন্তু আমার একটা উপকার করবি না?

—উপকার? দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। এখন তো অনন্তবাবুই সব উপকার করছে লক্ষ্মীদির। ছ'হাজার টাকার দেনা শোধ করে দিয়েছে, বাড়ি-ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছে! এখন আর কী দরকার দীপঙ্করকে!

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। ছোট ঘর, অনন্তবাবু নিজের জামা-টামা ছাড়বে! অত ছোট ঘরে এত লোককে ধরে না একসঙ্গে। আর তা ছাড়া লক্ষ্মীদি এই লোকটার সঙ্গে এত মেলা-মেশাই বা করে কেন? দাতার-

বাবুর এই অসুখ, তার কথা তো কই ভাবছে না এরা!

দীপঙ্কর বাইরে আসতে লক্ষ্মীদিও এল সঙ্গে সঙ্গে।

দীপঙ্কর পেছন ফিরে বললে—এখন, আমাকে কী জন্যে ডেকেছিলে বলো!

লক্ষ্মীদি বললে—তুই রাগ করছিস কেন? অনন্তর কথার উত্তর দিলি না যে? কী হয়েছে তোর?

সত্যিই দীপঙ্করের আত্মসম্মানে যেন সেদিন ঘা লেগেছিল। বললে—তুমি কিছু মনে করো না লক্ষ্মীদি, আমি যেখানে যার সঙ্গেই মিশতে গেছি, যাকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে গেছি, যারই উপকার করতে গেছি, সেখানেই একটা-না-একটা বাধা এসেছে—একটা গণ্ডগোল হয়েছে। এ আমার ভাগ্যেরই দোষ! নইলে আজ তো আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলেই, তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাবো বলেই একেবারে মা'কে বলে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছিলাম—

—তা বোস্ না, গল্প কর না তুই! কে তোকে চলে যেতে বলেছে?

অন্ধকার গলির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন দু'জনে। বড় কাছাকাছি, বড় মুখো-মুখি, বড় সামনা-সামনি। লক্ষ্মীদি একেবারে তার সামনে বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—বুঝেছি, তুই কেন চলে যাচ্ছিস! অনন্ত তোকে যদি কিছু বলেই থাকে, আমি তো আছি, আমি তোর কী করেছি? আমার ওপর তুই রাগ করছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—আগে বলো, ও লোকটা কে? ও-লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক?

—হঠাৎ তুই একথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

—না, তোমাকে বলতেই হবে, ওই অনন্তবাবুর কিসের স্বার্থ যে তোমাদের এত সাহায্য করে? এত টাকা খরচ করে কেন তোমাদের জন্যে? আর তুমিই বা ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকো কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—না রে, তুই যা ভাবছিস তা নয়! এতদিনেও তুই আমাকে চিনলি না?

দীপঙ্কর বললে—এখন বুঝতে পারছি দাতারবাবু কেন পাগল হয়েছে! তোমরাই দু'জনে মিলে দাতারবাবুকে পাগল করে তুলেছ, তুমি আর ওই তোমার অনন্তবাবু—

লক্ষ্মীদি আরো কাছে সরে এল। বললে—একটু আস্তে কথা বল, লক্ষ্মীটি—অনেক কষ্টে ওকে ঘুম পাড়িয়েছি, আবার জেগে উঠবে! তুই কিছু মনে করিসনি, অনন্তই তোকে ডাকতে বলেছিল—

—আমাকে? অনন্তবাবু আমাকে ডাকতে বলেছিল?

—হ্যাঁ, তুই যদি অনন্তকে একটা কাজ করে দিতে পারিস তোদের রেলে তো আমারও উপকার হয়, শম্ভুরও উপকার হয়।

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দেবার আগেই অনন্তবাবু এসে দাঁড়াল।

অনন্তবাবু বললে—কী কথা হচ্ছে তোমাদের?

লক্ষ্মীদি বললে—এই যে দীপুকে নিয়ে আছি, চলো—

বলে দীপঙ্করের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বললে—তুই বোস না, একটুখানি বসে অনন্তর কথাগুলো শুনে যা না, যদি তুই কিছু করতে পারিস আমাদের জন্যে, দেখ্ না—

দীপঙ্কর অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মীদির ঘরের ভেতরে গেল। লক্ষ্মীদি বসলো, অনন্তবাবু বসলো, দীপঙ্করও বসলো। অনন্তবাবু খুচরো অর্ডার সাপ্লাই করে মাঝে মাঝে রেলওয়েতে। সম্প্রতি একটা তিন হাজার টাকার কাজ ধরবার চেষ্টায় আছে। সেইটের জন্যে অনন্তবাবু চেষ্টা করছে। অনেকদিন ঘোরাঘুরি করেছে অনন্তবাবু। কাজটা পেলে পাঁচশো টাকার মতন নেট প্রফিট্ থাকে—খরচ-খরচা বাদ দিয়ে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কিসের কাজ? কোন্ ডিপার্টমেন্ট?

অনন্তবাবু বললে—আপনাদের আপিসে মিস্টার এন-কে-ঘোষালের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল মিস্টার ঘোষালের নাম শুনে। বললে—কেন? তাঁর সঙ্গে আপনার কী দরকার?

অনন্তবাবু বললে—তিনিই তো যত গণ্ডগোল করছেন—

—কিসের গণ্ডগোল?

অনন্তবাবু বললে—অনেক টাকা চাইছে! অন্তত তিন শো টাকা চাই-ই তার, অথচ তিন শো টাকা দিলে আমার কী-ই বা থাকবে! আমি দু'শো পর্যন্ত দিতে রাজী! আপনার সঙ্গে বেশ জানাশোনা আছে?

দীপঙ্কর বললে—অর্ডারটা স্যাংশন করবে কে!

অনন্তবাবু বললে—রবিন্‌সন্ সাহেব।

সেদিন সেই অন্ধকার ঢাকুরিয়ার সেই ঘরটাতে বসে দীপঙ্কর যেন বজ্রাহত হয়েছিল অনন্তবাবুর কথা শুনে। বাইরে থেকে যে-আপিসে প্রতিদিন সে যাচ্ছে, প্রতিদিন যে-আপিসে অ্যাটেনডেন্স-রেজিস্টারে সই করে দৈনন্দিন কাজ করে চলেছে, সেখানকার ভেতরের ব্যাপার কোনোদিন তো কানে আসেনি তার। সোজাসুজি কাজ করে যায় কলমের খোঁচায়। নোট লেখে, ড্রাফ্‌ট পাঠায়, স্টেটমেন্ট তৈরি করে, কিন্তু তার পেছনে যে এত রহস্য তা তো কখনও জানতো না দীপঙ্কর! কোথাকার কোন্ বোর্ড থেকে টেলিগ্রাম আসে, আসে পাবলিকের কাছ থেকে। হেড্-আপিস থেকে অর্ডার গেলে তবে ডিভিশন্ থেকে সে হুকুমের তামিল হয়। বাইরে থেকে গেটে গুর্খা দারোয়ান, আর যত কিছু এস্টেব্লিশ্-মেন্টের আইনের কড়াকড়ি! কিন্তু এতদিন কাজ করছে দীপঙ্কর, এ-সব তো জানা ছিল না। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। এত ফুটো সেখানে? এত ফাঁক?

এত ফাঁক?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণ সব শুনছিল। বললে—হ্যাঁ রে দীপু, কী বলিস্ তুই? পারবি কিছু করতে? চিনিস তুই মিস্টার ঘোষালকে?

অনন্তবাবু বললে—আমি দু'শো টাকা পর্যন্ত দিতে পারি—কিন্তু তিনশো টাকা দিলে আমার কী থাকবে—সেইটে বলুন!

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—তা রবিন্‌সন্ সাহেব যখন স্যাংশন করবার মালিক, তখন মিস্টার ঘোষালের কাছে যাবার দরকার কী আপনার?

অনন্তবাবু বললে—মিস্টার ঘোষালই যে রবিন্‌সন্ সাহেবের ডান হাত—মিস্টার ঘোষালকে যে রবিন্‌সন্ সাহেব খুব বিশ্বাস করে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি রবিন্‌সন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কখনও?

অনন্তবাবু বললে—না, আমি একজন এন্‌লিস্টেড সাপ্লায়ার ওদের। কন্ট্রোলার অব্ স্টোরসের আপিসে আমি নাম রেজিস্ট্রি করে নিয়েছি, তাতেও কিছু টাকা খরচ হয়েছে। নাম কি সহজে খাতায় ওঠে? নাম ওঠানোই এক হ্যাঙ্গাম, তারপর একে খাওয়াও, ওকে খুশী করো, তাকে তোয়াজ করো! এখন বলছে মাল আমি সাপ্লাই করবো বটে কিন্তু ডি-টি-এস্ যদি রিজেক্ট করে তো পেমেণ্ট হবে না! আসলে এর সঙ্গে ওর সঙ্গে সব জড়ানো ব্যাপার—অর্থাৎ সবাইকে খাওয়াতে হবে। তা আমি দেখা করেছিলাম আপনাদের আপিসে—

—কার সঙ্গে?

অনন্তবাবু বললে—সে-নামটা আমি বলতে পারবো না। বলতে বারণ করে দিয়েছে ভদ্রলোক। তার হাত দিয়েই যায় মিস্টার ঘোষাল। তার নাম বললে আমার কাজটাই আটকে যেতে পারে।

দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, নাম আপনাকে বলতে হবে না। আমি আপনার কাজটা করে দেব। আপনাকে আর মিস্টার ঘোষালের কাছে যেতে হবে না। আর খাওয়াতেও হবে না কাউকে। একটা পয়সাও লাগবে না আপনার। এবার থেকে যত কাজ পাবেন আপনি, সব আমার কাছে নিয়ে যাবেন, আমি নিজে আপনাকে রবিন্‌সন্ সাহেবকে দিয়ে সব করিয়ে দেব—

লক্ষ্মীদি খুশী হলো খুব। বললে—করবি তুই দীপু? করবি ভাই?

দীপঙ্কর বললে—আপনি কাল আমার আপিসে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, আমি থাকবো।

—কোথায় বসেন আপনি?

দীপঙ্কর বললে—ঠিক রবিন্‌সন্ সাহেবের পাশের ঘরে—যেখানে সাহেবের স্টেনোগ্রাফার বসে, সেই এক ঘরেই—আমি রোজ বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থাকি—

লক্ষ্মীদি অনন্তবাবুকে বললে—সেই তো ভালো হলো, তুমি মিস্টার ঘোষালের কাছে না গিয়ে দীপুর কাছে যেও, দীপুই তোমাকে রবিন্‌সন্

সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—আগে ব্যবসা যে-রকম ছিল তেমন থাকলে কোনও অসুবিধে হতো না আমাদের। বুঝলি। আগে শম্ভু দু'হাতে লাভ করেছে। আমি তো দেখেছি, টাকা খরচ করতো দু'হাতে। আর এখন যে কী হলো, সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল হঠাৎ—

মনে আছে সেদিন লক্ষ্মীদির কথাগুলো শুনে ভারি হাসি এসেছিল দীপঙ্করের। লক্ষ্মীদি এই ক'মাসের মধ্যেই এমন গৃহিণী হয়ে উঠেছে, এমন সংসারী হয়ে উঠেছে যে, দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যেন। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। যেন আরো ভারী হয়ে গেছে লক্ষ্মীদি এই ক'দিনের মধ্যেই। আগে যেন আরো পাতলা ছিল, আরো হাল্কা। একটা আটপৌরে ব্লাউজের ওপর আরো আটপৌরে একটা শাড়ি জড়িয়েছে গায়ে। দু'হাতে শাঁখা ছাড়া আর কোনও গয়না নেই। গোল-গোল ফরসা হাত দুটো আর আধ-খোলা গলাটা নিরাভরণ। শুধু বাইরের দিকেই নয়, ভেতরে-ভেতরেও যেন সেই লক্ষ্মীদি একেবারে আগাগোড়া বদলে গিয়েছে। আগে ঘুম থেকে ওঠার আগে বিছানার পাশে চা না দিলে ঘুমই ভাঙতো না লক্ষ্মীদির। আগে কাকীমা কলেজ থেকে আসার পর খাওয়া নিয়ে সাধাসাধি। সেই মেয়ে কোথায় পড়ে রইল, কোথায় কোন্ প্রান্তে এসে কার সংসার করছে, আশ্চর্য! সত্যিই লক্ষ্মীদি বলেছে ঠিক, কী যে হলো যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল হঠাৎ!

বাইরে গলির কাছে এসেও যেন দীপঙ্করের চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। বললে—আমি তাহলে আসি—

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়া। তুই অন্ধকারে যেতে পারবি না, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি—

বাইরে দরজার কাছে এসে দীপঙ্কর পা বাড়িয়েও একটু থামলো। বললে—তা হলে আমি আসি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—আয়—

দীপঙ্কর বললে—এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, আর কিছু কথা জিজ্ঞেস করবে না? আর কারো কথা?

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে গেল একটু। বললে—আর কা'র কথা জিজ্ঞেস করবো, বল্?

—কারো কথাই তোমার জিজ্ঞেস করবার নেই? এতদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে ছিলে, কাকাবাবু, কাকীমা, সতী,—সকলকে ভুলে গেলে একেবারে!

লক্ষ্মীদি বললে—কই, ভুলিনি তো?

—কিন্তু তাদের কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না! এমন করে তুমি সকলকে ভুলে যেতে পারলে? কিন্তু তার বদলে তুমি পেলে কী, সত্যি বলো তো? এই তোমার অবস্থা তো আজ নিজের চোখের ওপরেই দেখে গেলুম,

এতে তুমি সুখী হয়েছ মনে করো! এই যে যার জন্যে তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে এলে, তাকেও কি সুখী করতে পেরেছ তুমি? আর কোথাকার কে একজন, যার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই, সেই তারই দয়ার ওপর নির্ভর করে তোমার ভরণ-পোষণ চালাতে হচ্ছে—এটাও কি খুব গৌরবের মনে করো!

লক্ষ্মীদি কোনও কথার উত্তর দিতে পারলো না।

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলো তো, আবার জিজ্ঞেস করছি, ও-লোকটা তোমার কে? ওর সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক এখন! ও তোমাদের জন্যে এত করে কেন? কিসের স্বার্থে?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—রাত হয়ে গেল, তোর ফিরতে দেরি হবে—তুই বাড়ি যা—

দীপঙ্কর বললে—যাবো তো আমি নিশ্চয়ই, তোমার এখানে থাকতে আসিনি, কিন্তু আমার কথার জবাব দাও—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই জানিস না, অনন্ত না থাকলে আমাদের এই বিপদের সময়ে কী হ'তো ভাবাই যায় না। ও অনেক করেছে, এখনও করছে। সেই জন্যেই তো বলছি ওর কাজটা তুই যদি পারিস তো করে দে—ওতে আমারই উপকার—

—তোমারই উপকার হবে বলেই তো করছি, নইলে ওর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক।

—হ্যাঁ আমার নিজের উপকার হবে বলেই তোকে আজ চিঠি পাঠিয়েছিলুম। অসুখটা সেরে গেলে আমি শম্ভুকে তাহলে এখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো, তখন কেউ আর থাকবে না আমাদের সঙ্গে,—তখন আর কারো দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে না আমাকে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করল—কিন্তু দাতারবাবুর চিকিৎসা কি করাচ্ছো?

—আমি মেয়েমানুষ, কী আর করবো বল্, ওই অনন্তই ডাক্তার দেখাচ্ছে—

—ডাক্তার কী বলছে?

—ডাক্তার আর কী বলবে, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি, কেবল সন্দেহ করে, সন্দেহবাতিক এসেছে ভীষণ! আমাকে সন্দেহ করে, অনন্তকে সন্দেহ করে। কেবল ওর মাথায় ঢুকেছে যে আমি বুঝি আর ওকে তেমন করে ভালবাসি না, ওর কেবল সন্দেহ আমি ওকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো—

হঠাৎ ভেতরে যেন দাতারবাবুর গলা শোনা গেল। দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব চিৎকার করে বলছে পাশের ঘর থেকে।

লক্ষ্মীদি চমকে উঠেছে। বললে—ওই দ্যাখ্ শম্ভুর ঘুম ভেঙে গেছে, আমি যাই—

অনন্তবাবু এসে গেল। বললে—এই দেখ শম্ভু উঠেছে,—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—তোমার তো রাত হয়ে গেল, অনেক

দূরে তো যেতে হবে তোমাকে—

লক্ষ্মীদি বলল—তাহলে আবার আসিস্ তুই দীপু—

—আসবো—

তারপর অনন্তবাবুকে বললে—আপনি কিন্তু যাবেন ঠিক, আমি সাহেবকে বলে সব বন্দোবস্ত করে দেব—আপনার একটা টাকাও খরচ হবে না—

বলে অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াল দীপঙ্কর। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিকে। নিচু জমি। দু'পাশে নর্দমায় কাদা জমে আছে। তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর পা চালিয়ে চললো। এখান থেকে অনেকখানি হেঁটে যেতে হবে। তারপর সেই মোড় থেকে ট্রাম। ট্রাম এত রাত্রে হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। আশে-পাশে কোথাও ঘড়ি নেই। রাত বোঝা যাবার উপায় নেই। দীপঙ্কর লেভেল-ক্রসিং-এর গেটটা পেরিয়ে ওপারে চলে গেল। যদি ট্রাম না থাকে তো সমস্ত রাস্তাটা হেঁটেই যেতে হবে। তারপর কাল সকালেই আবার আপিস আছে। আবার সেই জাপান-ট্র্যাফিক, আবার সেই মিস্টার ঘোষাল! কালকেই যেতে বলে দিয়েছে অনন্তবাবুকে। কী আশ্চর্য! নৃপেনবাবু তবু ভাল। তেত্রিশ টাকায় তার লোভ মিটে যায়—আর এ চায় তিনশো টাকা!

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে চমকে উঠেছে! মনিব্যাগটা কোথায় গেল। তার পার্স!

তার ভেতরে যে পয়সা আছে। ট্রাম ভাড়া দেবে কী করে? অবশ্য বেশি পয়সা নেই। বোধহয় আনা বারো হবে সব সুদ্ধ। সেই লক্ষ্মীদির ওখানেই পড়ে আছে ঠিক।

তাড়াতাড়ি আবার ফিরলো দীপঙ্কর। এইটুকু রাস্তা যাতায়াতে আরো হয়ত মিনিট পনেরো লাগবে। তা হোক, কিন্তু মনিব্যাগটা না হলে কী করে চলবে। কাল তো আবার আপিসে যেতে হবে সকালবেলাই।

আবার সেই গেট্টা পেরোতে হলো। গেট্টা তখনও বন্ধ রয়েছে। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। গুড্স্ ট্রেন আসছে বোধ হয়। দোতলা গুমটি ঘরের ওপরে আলো জ্বলছে। ভূষণ মালী তখন ভেতরে। গেট বন্ধ করে ভেতরে সাউথ্ কেবিনের সঙ্গে কথা বলছে টেলিফোনে। রাস্তা থেকেও তার গলা শোনা যায়।

—হ্যালো, থ্রি-সেভেন্টিন আপ? গেট্ বন্ধ করেছি হুজুর—

—না না সনাতন নই, আমি ভূষণ। ভূষণ মালী! সেকেন্ড নাইট্ ডিউটি হুজুর—

সেই ভূষণ! ভূষণের গলা শুনলেই চেনা যায়। পরে রবিন্সন্ সাহেবের সঙ্গে যখন দীপঙ্কর লাইন দেখতে এসেছিল, তখন এই ভূষণই ছিল ডিউটিতে। বিনয়ের অবতার একেবারে ভূষণ! সেলাম করতে ভূষণের ক্লান্তি নেই। রবিন্সন্ সাহেব খুব ভালবাসতো ভূষণকে।

রবিন্সন্ সাহেব দীপঙ্করকে জিজ্ঞেস করেছিল—ইজ্ হি এ সাউথ ইন্ডিয়ান মেন?

রবিন্সন্ সাহেবের কী একটা ধারণা হয়েছিল ভালো লোক হলেই সে সাউথ্ ইন্ডিয়ান হবে। তা না হয়ে পারে না। মিসেস রবিন্সনের সঙ্গেও তখন দীপঙ্করের খুব পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। সাহেবের সঙ্গে মেম-সাহেবও লাইনে আসতো মাঝে মাঝে। যখন এই লেভেল-ক্রসিং গেট্ আরো চওড়া হলো তখন প্রায়ই আসতে হতো এখানে। কখনও সাহেবের গাড়িতে, কখনও ট্রলিতে। সাহেবের কুকুর জিমিও আসতো। সবাই নামতো গাড়ি থেকে। নেমে মাপা হতো, ইনস্পেকশন্ হতো—। সেই সময়েই ভূষণ মালী এসে সাহেবের কাছে দাঁড়াতো। আর সিগারেট-মুখে মিসেস রবিন্সনের মুখের দিকেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো!

রবিন্সন্ সাহেব একদিন জিজ্ঞেস করেছিল ভূষণকে—হোয়াট্ ইজ্ ইয়োর পে গেটম্যান?

দীপঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছিল ভূষণকে। বলেছিল—সাহেব জিজ্ঞেস করছে তুমি কত মাইনে পাও?

ভূষণ বলেছিল—হুজুর আঠারো রুপেয়া।

রবিন্সন্ সাহেব তাতেও খুশী হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল—আর ইউ স্যাটিস্ফায়েড?

দীপঙ্কর তর্জমা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল—সাহেব জিজ্ঞেস করছে, তুমি ওই মাইনেতে খুশী?

ভূষণ বলেছিল—জী হুজুর, খুশী—

সাহেবও তখন উত্তর শুনে খুশী হয়েছিল। বলেছিল—সী, হি ইজ্ হ্যাপি—

কাউকে অসুখী দেখতে চাইত না রবিন্সন্ সাহেব। সাহেব চাইতো সবাই যেন সন্তুষ্ট মনে, সুস্থ চিত্তে কাজ করে। তবে ভাল করে কাজ চলবে রেলওয়ের।

চলতে চলতে দীপঙ্কর গেট্টা পেরিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াল সেই তিপ্পান্ন নম্বর বাড়িটার সামনে। হয়ত লক্ষ্মীদিরা এতক্ষণে সবাই শুয়ে পড়েছে। রাত তো কম হয়নি। আবার তাদের ডেকে ঘুম ভাঙাতে হবে। নর্দমাটা ডিঙিয়ে দীপঙ্কর সদর-দরজাটার কড়া নাড়তেই যাচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, দরজাটা শুধু ভেজানো ছিল। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। বন্ধ করতে হয়ত ভুলে গিয়েছে।

ভেতরে তেমনি অন্ধকার। সরু গলিটার মধ্যে ঢুকতেই দীপঙ্করের কানে গেল দাতারবাবুর সেই চিৎকার। সেই আগেকার মতন চিৎকার করছে। তাহলে এখনও ঘুমোয়নি নিশ্চয়ই। হয়ত দাতারবাবুকে জোর করে খাওয়াচ্ছে, জোর

করে খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আহা! দীপঙ্করের মন থেকে আহা শব্দটা নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে এল। আশ্চর্য লক্ষ্মীদির কপাল! কত সুখ ছেড়ে এই এখানে কী কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে!

হঠাৎ গলির শেষে পৌঁছোতেই দীপঙ্কর চমকে উঠলো।

ভেতর থেকে একটা উদ্দাম হাসির শব্দ কানে এল। এমন করে হাসছে কে? এত রাত্রে। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। দীপঙ্কর জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ ফেলতেই অবাক হয়ে গেল।

ঘরের মেঝের ওপর লক্ষ্মীদি আর অনন্তবাবু মুখোমুখি খেতে বসেছে। আর খেতে খেতে দুজনে কী একটা কথায় প্রাণ খুলে হাসছে। হাসির দমকে দুজনেই ফুলে ফুলে উঠছে। ভারি একটা মজার কথায় যেন হাসি আর চাপতেই পারছে না।

দীপঙ্কর জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে নিলে। ও-পাশ থেকে দাতারবাবুর চিৎকার তখনও চলেছে সমান তালে! সেদিকে কারো খেয়াল নেই। এরা হেসেই চলেছে! দাতারবাবুর এই চিৎকারের মধ্যেও হাসি আসছে এদের!

না, দরকার নেই। হেঁটেই বাড়ি যাবে দীপঙ্কর। যত রাতই হোক, যত দূরই হোক। মনিব্যাগ তার দরকার নেই। বারো আনার পয়সার জন্যে ওদের হাসিতে বাধা দেবার দরকার নেই, বারো আনার ক্ষতি দীপঙ্কর সহ্য করবে। আর কালকেই তো মাইনের তারিখ। মাসের পয়লা!

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তখনও যেন লক্ষ্মীদির হাসিটা কানে আসতে লাগলো। সেই উদ্দাম, উজ্জ্বল হাসি। আর দাতারবাবুর সেই বীভৎস চিৎকার। সেই চিৎকার আর পাশের ঘরেই এদের হাসি। একেবারে পাশাপাশি।

লক্ষ্মীদির জীবনটা কেমন যেন জটিল মনে হয়েছিল সেদিন। মনে হয়েছিল—বোধহয় সব মানুষেরই এমনি হয়। দীপঙ্করও তো কতবার সহজ করতে চেয়েছে জীবনকে। সোজা, সরল, সহজ জীবনই তো দীপঙ্কর চেয়েছিল। একটা ঋজু রেখার মত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। হয়ত সবাই তাই-ই চায়। জীবনকে সহজ করার জন্যেই আয়োজন করে অনেক কিছুর, শেষে আয়োজনটাই ভারি হয়ে ওঠে, আয়োজনটাই জঞ্জাল হয়ে শেষে পীড়া দেয় জীবনকে। যেদিন লক-আপ্ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই দিনই তো দীপঙ্কর সঙ্কল্প করেছিল—এই শেষ! সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বিয়ে-বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর তো সেই প্রতিজ্ঞাই করেছিল। বলেছিল—ভালোই হয়েছে, সব বন্ধন ছিন্ন করে সে মুক্তি পেল। সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে সে পরিত্রাণ পেল। মা'র পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেও তো সেই সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করেছিল। তারপর আর কোনও সংসর্গ তো সে চায়নি। চাকরি করবে আর উনিশের একের

বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে এসে সে অজ্ঞাতবাস করবে, এই-ই তো সে ভেবেছিল। কোনও আয়োজনই তো তার ছিল না। কোনও আকর্ষণই তো তার ছিল না আর। ভেবেছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল তার জীবন থেকে। কিরণের বাবার নশ্বর দেহটা যেমন করে শ্মশানে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি করেই দীপঙ্করের জীবন থেকেও সব আকর্ষণ তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলে আবার কেন এত আয়োজন স্তূপীকৃত হলো তার জীবনে, কেন এত জঞ্জাল তার জীবনে জড়ো হলো, কেন এমন করে আবার লক্ষ্মীদিও জড়িয়ে পড়লো তার জীবনে। কেন সতীও আবার তাকে এমন করে মূল ধরে আকর্ষণ করলে।

মনে আছে মিস মাইকেল বলতো—মিস্টার সেন, ইউ আর ভেরি শাই—তুমি এত লাজুক কেন?

মিস মাইকেলের সঙ্গে বেশি দিনের পরিচয় নয়। কিন্তু কিছুদিন পাশাপাশি বসতে বসতেই যেন পুরোপুরি চিনে ফেলেছিল দীপঙ্করকে। মিস মাইকেল বাড়ি থেকে টিফিন আনতো। একটা চ্যাপ্টা কৌটোর মধ্যে কয়েকটা মোটা-মোটা জেলি-মাখানো স্যাণ্ডউইচ। তারপর ইলেকট্রিক কেটলিতে একটু চা করে নিত।

প্রথম দিন দীপঙ্করকেও চা খেতে বলেছিল মিস মাইকেল।

দীপঙ্কর বলেছিল—না আমি চা খাই না মিস মাইকেল—

মেমসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়েছিল দীপঙ্করের কথাটা শুনে। বলেছিল, সে-কি, তুমি চা খাও না? কখনও চা খাওনি?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, আমি কখনও চা খাইনি—

কিন্তু কথাটা বলেই মনে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। চা তো একবার সে খেয়েছিল। সেই ছোটবেলায়। সেই লক্ষ্মীদির কাছে—তাদের লাইব্রেরীর চাঁদা চাইতে গিয়ে একবার চা খেয়েছিল। খুব কিন্তু ভালো লেগেছিল চা খেতে।

মিস মাইকেলের সঙ্গে শেষের দিকে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সব রকম গল্প হতো।

মিস মাইকেল বলতো—দ্যাট্স ভেরি গুড্ সেন, চা না-খাওয়া খুব ভালো—

—কেন? ও-কথা বলছো কেন?

মিস মাইকেল হেসে বলেছিল—ইউ উইল গেট প্লেজার ইন কিসিং—চুমু খেয়ে সুখ পাবে খুব—

কথাটা শুনে দীপঙ্করের কান দুটো খানিকক্ষণের জন্যে গরম হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিন যে কী লজ্জা হয়েছিল দীপঙ্করের। আগে কখনও দীপঙ্কর কোনও মহিলার সঙ্গে এক ঘরে এতক্ষণ [illegible] হয়েছিল—শুধু অনেকক্ষণ মিস মাইকেলের দিকে তাকাতেই পারেনি দীপঙ্কর।

সেই দিনই মেমসাহেব বলেছিল—তুমি খুব লাজুক দেখছি তো—

দীপঙ্কর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বিয়ে করোনি কেন মিস মাইকেল?

বিয়ে! ভারি কঠিন প্রশ্ন করেছে, ভেবেছিল দীপঙ্কর। মেমসাহেব টাইপিং থামিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি তো সুন্দরী, তাহলে বিয়ে করলে না কেন?

মেমসাহেব হেসেছিল খুব। বলেছিল—খুব, খুব সুন্দরী ছিলাম আমি, ইন মাই ইয়ং ডেজ্—তখন যদি তুমি আমায় দেখতে—

—তা হলে? তা হলে বিয়ে করোনি কেন?

মেমসাহেব বলেছিল—সুন্দরী ছিলুম বলেই তো বিয়ে করিনি—

—সে কি! সুন্দরী হলে বিয়ে করবার দরকার নেই—?

মেমসাহেব বললে—সে তুমি বুঝবে না সেন, তুমি ছেলেমানুষ!

—জানো—

তারপর মেমসাহেব টাইপ-রাইটার থামিয়ে বলেছিল—তুমি ভিভিয়ান লে'র নাম শুনেছ? দি গ্রেট হলিউড ফিল্ম স্টার? এখন আমেরিকাতে খুব ফেমাস স্টার, সে আর আমি একসঙ্গে এইখানে কাজ করেছি—তুমি হয়ত বললে বিশ্বাস করবে না—তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—

দীপঙ্কর চুপ করে ছিল দেখে মিস মাইকেল বললে—তোমাকে আমি তার চিঠি এনে দেখাবো, তা হলে তো বিশ্বাস হবে?

মিস মাইকেল ভেবেছিল দীপঙ্কর বুঝি তার কথা বিশ্বাস করছে না।

মেমসাহেব বলেছিল—তুমি এখানে যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে-ই বলতে পারবে সেন। আমরা দুজনে একসঙ্গে এক-বাড়িতে থাকতুম, এক ঘরে শুতুম, একসঙ্গে আপিসে আসতুম—

—তা তুমি তার সঙ্গে হলিউডে চলে গেলে না কেন?

মিস মাইকেল আপিসে আসতো কাঁটায়-কাঁটায় নিয়ম করে। নিখুঁত পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ। কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না। আপিসে এসেই মেশিনটা খুলে নোট-খাতাটা বার করে বসতো। তারপর পেন্সিলটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে শিষটা ছুঁচলো করে নিত। তারপর যতক্ষণ না রবিনসন্ সাহেব ডাকতো, ততক্ষণ গল্প করতো সেন-এর সঙ্গে। তিনবার চা করতো, বার বার ব্যাগ থেকে আয়না বার করে মুখ দেখতো, ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে নিতো, ভ্রূটা এঁকে নিত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখতো বার বার। যতদিন আপিসে ছিল, ততদিন সময় পেলেই নিজের গল্প বলেছে। জীবনের কোনও গল্পই বলতে বাকী রাখেনি। দীপঙ্করের ওপর কেমন যেন একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল মেমসাহেবের।

মিস মাইকেল একদিন বলেছিল—আমার খুব হেট্রেড ছিল বাঙালীদের

ওপর, জানো সেন—আমি বেঙ্গলীদের খুব হেট্ করতাম—কিন্তু—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—কেন?

—আই ডোণ্ট নো, এই আপিসে আমি কারো সঙ্গে কথা বলি না, তুমি দেখেছ তো—আমি বাবুদের সঙ্গে একটাও কথা বলি না—আই হেট দেম্ ফ্রম মাই হার্ট—আমি মন থেকে তাদের হেট করি, কিন্তু—

—কিন্তু, কী?

—কিন্তু, তোমাকে দেখবার পর থেকে আমি মাইণ্ড চেঞ্জ করেছি, আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইণ্ড—

দীপঙ্কর হেসে ফেললে। বললে—কেন?

—বিকজ ইউ আর রিয়্যালি গুড—তুমি সত্যিই ভালো। তোমার ভালো হোক্ এই আমি চাই—তোমার জীবনে উন্নতি হলে আমার চেয়ে কেউ খুশী হবে না—মনে রেখো—

আশ্চর্য! সংসারে হয়ত এমনি করেই এক একজনকে অকারণে ভালো লাগে। আবার অকারণে খারাপও লাগে! সংসারে ভাল-লাগা আর খারাপ-লাগার মধ্যে ফাঁকটা বোধহয় খুবই সামান্য। সেইজন্যেই বোধহয় একজনের ভাল-লাগার সঙ্গে আর একজনের খারাপ-লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাকে মিস মাইকেলের ভালো লাগার পেছনেও তাই সেদিন কোনও কারণ খুঁজে পায়নি দীপঙ্কর, দীপঙ্কর বলেছিল—তুমি নিজে ভালো, তাই আমাকেও তোমার ভালো লাগে মিস মাইকেল—

—নো নো সেন, নেভার! তুমি জানো না সেন আমি কী জঘন্য মেয়ে!

হঠাৎ মিস মাইকেলের প্রতিবাদ করবার ভঙ্গী দেখে দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল।

—আমি তোমাকে আজ বলছি সেন, জীবনে এমন ক্রাইম নেই যা আমি করিনি! আমি যে সারা-জীবন কত ক্রাইম্ করেছি, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না সেন! লর্ড জেসাসের কাছে যে আমি কত অপরাধী!

বলে হঠাৎ মাথাটা নিচু করে ফেলতো। দীপঙ্কর বুঝতে পারতো মিস মাইকেল কাঁদছে। ব্যাগ থেকে সিল্কের রুমালটা বার করে চোখটা আলতো করে মুছে নিত। তারপর অনেকক্ষণ আর কথা পর্যন্ত বলতে পারতো না। অবাক কাণ্ড!

দীপঙ্করও আশ্চর্য হয়ে যেত মেমসাহেবের কাণ্ডকারখানা দেখে! কত মানুষ, কত বিচিত্র মানুষ যে আছে পৃথিবীতে, তাই দেখেই অবাক হয়ে যেত দীপঙ্কর। কোথাকার কে এক মেমসাহেব, এও তো এই কলকাতা-শহরের মানুষ। এও তো এই কলকাতার হাওয়াতেই দীপঙ্করের মত বড় হয়েছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেছে, একই কলকাতার বুকের ওপর মিস মাইকেলও তো দীপঙ্করের মত বেড়ে উঠেছে। এরও তো একদিন বাবা ছিল, মা ছিল,

বন্ধুবান্ধব ছিল, এও তো দীপঙ্করের মত স্কুলে পড়েছে! কিন্তু এই পাউডার আর লিপস্টিক আর ববড-চুলের আড়ালে আসল মানুষটাকে কে দেখতে পেয়েছে এমন করে? বাইরে থেকে দেখলে কে ভাববে এই মেমসাহেবও আবার কাঁদে! বাইরের এই চেহারা দেখে কে ভাবতে পারবে যে এরও দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, অশান্তি আছে!

প্রথম দিকে গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—খুব সাবধান সেনবাবু, মেমসাহেবের সঙ্গে এক-ঘরে বসছেন, একটু বুঝে-শুনে চলবেন—বলা তো যায় না!

—কেন? দীপঙ্কর সত্যিই বড় ভাবনায় পড়েছিল কথাটা শুনে।

সারাটা জীবন লোকের কাছে অনাদর আর অবহেলা পেতে অভ্যস্ত দীপঙ্কর। সারা জীবন যার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে মানুষ নয়, সে অপদার্থ। শুনে এসেছে তার জন্যেই মা'র এত কষ্ট। সে মানুষ হলে মা একটু আরাম পেত! ছোটবেলা লক্ষ্মণ সরকার তাকে মেরেছে, লক্ষ্মীদিও তাকে মেরেছে। সতী তাকে তাচ্ছিল্য করে এসেছে! গাঙ্গুলীবাবুর কথায় দীপঙ্কর তাই ভয় পায়নি তেমন। কষ্ট করতেই জন্মেছে দীপঙ্কর। না-হয় কষ্টই ভোগ করবে আরো। কী আর করতে পারে সে। চাকরি তো সে ছাড়তে পারবে না—

গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—বড় দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। ইণ্ডিয়ানদের বড় ঘেন্না করে—আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না মশাই। আমাদের যেন গরু-ভেড়া মনে করে ও, এমন করে হাঁটে—

কিন্তু আশ্চর্য! মিস মাইকেলের ভেতরেও যে একটা সহজ মানুষ লুকিয়ে আছে, সে-কথা বোধহয় আপিসের মধ্যে একা দীপঙ্করই জানতে পেরেছিল। কিন্তু মিস মাইকেল বলেছিল—তুমি একদিন আমার ফ্ল্যাটে চলো সেন—

—আমি?

—কবে যাবে বলো?

দীপঙ্কর যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। এতখানি আগ্রহ মিস মাইকেলের, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছেও হয় না।

—আজ যাবে?

দীপঙ্কর বলেছিল—না-না, আজ আমার জামা-কাপড় বড় ময়লা—

—তাতে কী! আমার ফ্ল্যাটে কেউ নেই। আমি শুধু একলা থাকি। আর কেউ নেই আমার সংসারে। সংসারে আমি একেবারে এলোন্ সেন, একেবারে এলোন্—!

তারপর একটু থেমে বলেছিল—ভিভিয়ান্ যে-খাটে শুতো, সেটা তোমায় দেখাবো, চলো, যে-টেব্‌লে বসে ড্রেস করতো, সেই টেবলটাও দেখাবো, সমস্ত আমি রেখে দিয়েছি, একটাও নষ্ট করিনি। আমার অ্যালবামটাও তোমায় দেখাবো, দেখবে ভিভিয়ানের চেয়েও আমি কত সুন্দরী ছিলাম, কত বিউটিফুল ছিলাম—আমার নিজের লাভ-লেটার্স আছে ফাইভ হাণ্ড্রেড থার্টি থ্রি, পাঁচশো তেত্রিশটা

লাভ-লেটার্স আছে আমার জানো,—আর ভিভিয়ানের ছিল ওন্লি থ্রি হান্ড্রেড্—মাত্র তিনশো—উড্ ইউ বিলিভ্—?

দীপঙ্করের দিকে খানিকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মিস মাইকেল।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—অথচ দেখ, সেই ভিভিয়ান এখন আমেরিকার দি গ্রেট ফেমাস ফিল্ম স্টার, আর আমি? আমি এই রেলওয়েতে রট্ করছি—আর এখন তো......

বলতে বলতে মিস মাইকেলের বুকটা যেন ফাঁকা হয়ে যেত। মিস মাইকেলের দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা করতো দীপঙ্কর, কষ্টটা অনুভব করতে চাইতো। কিন্তু তবু যেন পুরোপুরি বুঝতে পারতো না। পাঁচশো তেত্রিশ আর তিনশো লাভ-লেটার্সের তফাৎটাও বুঝতে পারতো না। দীপঙ্করকে তো কেউ-ই লাভ-লেটার্স লেখেনি, তাতে এত দুঃখ কেন মিস মাইকেলের?

বাইরে কে যেন ডাকলে। চাপরাসী এসে ডাকলে দীপঙ্করকে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে?

একঠো বাবু।

বোধহয় অনন্ত এসেছে। সেই অনন্ত রাও ভাবে। দাতারবাবুর বন্ধু। লোকটাকে ভালো লাগেনি কাল। সত্যিই কাঁসের আর টান! লক্ষ্মীদির জন্যে অতো টান ভালো নয় অনন্তবাবুর! তবু যা হোক, উপকার তো হবে লক্ষ্মীদির! লক্ষ্মীদির এই অভাবের সময় অনন্তবাবুকে উপকার করলে লক্ষ্মীদিরও তো উপকার হবে। রবিন্‌সন্ সাহেবকে গিয়ে যদি বলে দীপঙ্কর, সাহেব কথাটা এড়াতে পারবে না।

বাইরে গিয়ে দেখলে—না। অনন্তবাবু নয়, অন্য একজন ভদ্রলোক।

—কী চাই আপনার? কে আপনি?

ভদ্রলোক বললে—মিস্টার সেনকে চাই—

—আমিই তো মিস্টার সেন। আসল নামটা কী? পুরো নাম?

—হরিপদ সেন!

দূর। কোথাকার কে হরিপদ সেন। তাকে খুঁজতে এসেছে এখানে।

দীপঙ্কর বললে—সে রেটস্ আপিসে, সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় চলে যান—

ভদ্রলোক চলে গেল। কী আপদ সব। যে-সে এসে ডাকে। চাপরাসীকে বললে—ও তো আমাকে নয়, রেটস্ আপিসের হরিপদ সেনকে খুঁজছিল—

তারপর বললে—দেখ, একজন আমাকে খুঁজতে আসবে আজকে, ভদ্রলোক বাঙালী নয়, মারাঠী—নাম অনন্ত রাও ভাবে—সে ভদ্রলোক এলে আমায় ডেকে দিবি, বুঝলি, খুব জরুরী কাজ, তার জন্যে আমি অপেক্ষা করছি—

রবিন্‌সন্ সাহেব লাঞ্চ খেতে যায় ঠিক একটার সময়। আসে দুটোর পরে।

অনন্তবাবু যদি আগে আসে তো ভাল, আর তা নয় তো দুটোর পরে। একটা থেকে দুটোর মধ্যে এলে মিছিমিছি বসিয়ে রেখে দিতে হবে। অকারণে অনেক গল্প করতে হবে। অনন্তবাবুর সঙ্গে গল্প করে লাভটা কী! আপিসে যতক্ষণ হৈ-চৈ-হল্লা চলে, তখন ভালো লাগে না দীপঙ্করের। তবু মিস মাইকেলের ঘরের ভেতরটা বেশ নিরিবিলি। কোনও শব্দ আসে না কানে। কাজ করতে করতে অনেক কিছু ভাবা যায়। অনেক কথা ভাবার আছে দীপঙ্করের। ভাবনার কি শেষ আছে! দীপঙ্কর ভাবতো জীবন তো আরম্ভ হলো। তারপর? তারপর কী? তারপর কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে? এই আপিসে এই রবিনসন্ সাহেব, এই মিস্টার ঘোষাল, এই মিস মাইকেল! আজ না-হয় এখানে এসে পৌঁছিয়েছে। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল থেকে একদিন যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর কিরণ, লক্ষ্মণ সরকার, প্রাণমথবাবু, রোহিণীবাবু, কাকাবাবু, কাকীমা, লক্ষ্মীদি, সতী, সবাইকে অতিক্রম করে এতদিন পরে না-হয় এখানে এল। কিন্তু তারপর? তারপর কী? এই এখানে এসেই আটকে যাবে নাকি সে? এখানে এসেই থেমে যাবে?

হঠাৎ গাঙ্গুলীবাবু এল ঘরের মধ্যে। দীপঙ্করের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লো।

বললে—এক মিনিটের জন্যে একটু বিরক্ত করতে এলাম সেনবাবু—

—না, না, বিরক্ত কী, বলুন—

হাতে শালপাতা মোড়া একটা জিনিস এগিয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—এইটে দিতে এলুম—প্রসাদ, মায়ের প্রসাদ—খান—

দীপঙ্কর ঠোঙাটা খুলে দেখলে। একটা শালপাতার ওপর একটু সিঁদুর লাগানো। দু-চারটে গাঁদা ফুলের পাপড়ি আর একটা চিনির ডেলার সন্দেশ।

—এ কিসের প্রসাদ?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—মা-কালীর প্রসাদ, সকাল বেলা পুজো দিয়ে এসেছিলাম কিনা, ভাবলাম আপনাকে একটু প্রসাদ দেব, তাই আপিসে এনেছিলাম—

—তা হঠাৎ পুজো দিলেন কেন?

—আমার স্ত্রীর আজ পাঁচ বছর ধরে অসুখ চলছিল, সেটা ভালো হয়ে গেছে, তাই।

—পাঁচ বছর ধরে অসুখ? কী অসুখ? আপনি বলেন নি তো?

গাঙ্গুলীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—আপনাকে তো কোনও কথাই বলিনি! আপনি আর আমার কতটুকু জানেন! আমার স্ত্রী আজ পাঁচ বছর ধরে পাগল হয়ে গিয়েছিল!

পাগল! দীপঙ্কর চমকে উঠলো! দাতারবাবুরও তো মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে! গাঙ্গুলীবাবু এতদিন কথাটা বলেনি, নইলে জেনে নিলেই হতো!

লক্ষ্মীদিকেও বলা যেত তাহলে! লক্ষ্মীদি এতদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছে। দাতারবাবু ভালো হয়ে গেলে আর অনন্তবাবুর কাছে সাহায্য নিতে হয় না। লক্ষ্মীদি বেঁচে যেত তাহলে!

—কেন পাগল হয়েছিলেন আপনার স্ত্রী?

—সে অনেক কথা। আপনাকে তো বলেছিলাম, একদিন বলবো সব! সময় হলেই বলবো একদিন, এখন উঠি!

বলে গাঙ্গুলীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবার উপক্রম করলে।

দীপঙ্কর হাতটা ধরে টানলে। বললে—না-না, আপনি এখনি বলুন, আমার এখন হাতে কাজ নেই—আপনি বসুন—বলুন ব্যাপারটা—

গাঙ্গুলীবাবু বাইরে চলে এল। দীপঙ্করও সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

দীপঙ্কর বললে—বলুন, কী হয়েছিল কী?

গাঙ্গুলীবাবুর মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে এল। বললে—এখানে ঠিক বলা যাবে না—বরং আর একদিন বলবো

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমাকে যে আজ শুনতেই হবে—আমারও এক আত্মীয় সম্প্রতি পাগল হবার মত হয়েছে কিনা—

—কে?

—আমার একজন দিদির স্বামী!

গাঙ্গুলীবাবু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—আজ পাঁচ বছর যে কী কষ্টেই ছিলাম সেনবাবু, কী বলবো—পাঁচটা বছর আমার রাতে ঘুম ছিল না, দিনে শান্তি ছিল না। আমি ভগবান মানতাম না, তবু ভগবানকে দিনরাত ডেকেছি। বলেছি—আমার কষ্ট দূর করো ঠাকুর, আমি আর সহ্য করতে পারি না এ-কষ্ট! আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি, আপিসের কাজ করেছি, বাইরে হেসেছি, কথা বলেছি, কিন্তু মনের মধ্যে কেবল অশান্তির আগুন জ্বলেছে—

দীপঙ্কর বললে—চলুন, কোথাও গিয়ে বসি, বসে বসে শুনি—

—কোথায় আর যাবেন! এ অনেক বড় গল্প, অনেক সময় লাগবে—

—তবু চলুন—

দীপঙ্কর চাপরাসীকে বলে গেল যদি কেউ খোঁজ করতে আসে যেন বসিয়ে রাখে তাকে। গাঙ্গুলীবাবুও কে-জি-দাশবাবুকে বলে এসেছিল।

কী বিচিত্র মানুষ আর কী বিচিত্র মানুষের জীবন। কোথায় মিস মাইকেল, তারও একটা সমস্যা আছে। সে-সমস্যার কথা বলতে বলতে মেমসাহেব কেঁদে ফেলে। আবার এই গাঙ্গুলীবাবু। এরও কত বিচিত্র এক সমস্যা। এরও মুখ-চোখ কান্নায় ভারী হয়ে আসে কথা বলতে বলতে।

সত্যিই, এদের তুলনায় তো দীপঙ্করই সুখী। দীপঙ্করের তো কোনও সমস্যাই নেই বলতে গেলে। শুধু লক্ষ্মীদির সমস্যাটাই এখন একটা পাথরের মত বুকের ওপর ভারী হয়ে চেপে বসেছে। লক্ষ্মীদি সুখী হলেই দীপঙ্করের

কোনও সমস্যা থাকে না। দাতারবাবুর অসুখ ভাল হয়ে গেলেই সব সমস্যা মিটে যায় লক্ষ্মীদির। দীপঙ্করও নিশ্চিন্ত হয়।

মনে আছে গাঙ্গুলীবাবুকে নিয়ে দীপঙ্কর সামনের পার্কটাতে গিয়ে বসেছিল। চারিদিকে আপিস। আপিস আর আপিসের কেরানী। সমস্ত মণ্ডলটা যেন গম্ গম্ করছে আপিসের গন্ধে। সেই আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে দীপঙ্কর একেবারে খোলা আকাশের তলায় গিয়ে বসলো।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনি ঠিক বুঝবেন না আমার কথাগুলো সেনবাবু, যে ভুক্তভোগী, সে-ই শুধু বুঝতে পারে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি বলুন আমি ঠিক বুঝবো—

দীপঙ্কর জানতো সংসারে যে ভুক্তভোগী, সে-ই কেবল দুঃখের কথা বুঝতে পারে। দীপঙ্কর কি ভুক্তভোগী নয়? দীপঙ্কর কি মানুষ দেখেনি? দীপঙ্করও কি জানতো না যে মানুষের বাইরের চেহারা দিয়ে তাকে বিচার করার মত ভুল আর নেই। দীপঙ্কর কি দেখেনি ছিটে-ফোঁটাকে, দেখেনি বিন্তীদিকে, দেখেনি প্রাণমথবাবুকে, দেখেনি কিরণ, ফটিক, রাখাল, নির্মল পালিত, লক্ষ্মণ সরকারকে।

দীপঙ্কর বললে—আমিও অনেক লোক অনেক রকম মানুষ দেখেছি গাঙ্গুলীবাবু, আসলে আমি জিজ্ঞেস করছি অন্য কারণে—জিজ্ঞেস করছি আমার এক দিদির জন্যে—

—দিদি? কী-রকম দিদি? আপন?

—না, আপন দিদি নয়। এমন কি, দূর-সম্পর্কেরও দিদি নয়। বলতে গেলে কেউ-ই নয়। তবু খুব আপন। তার কথা আমি খুব ভাবি—প্রায়ই ভাবি। পৃথিবীতে দুজনের কথা কেবল ভাবি আমি, তাদের মধ্যে এই দিদিই একজন—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমারও আপনার মত কেউ ছিল না সেনবাবু, বেশ ছিলাম, বাবা-মা ছিল, তাঁরা মারা যাবার পর লেখা-পড়া করতাম, আর শেষকালে এই রেলের আপিসে চাকরি পেয়ে গেলাম—একটা বোন ছিল বিয়ে দিতে, তা তারও বিয়ে দিয়েছিলাম টাটানগরে—

—তারপর?

—তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল হঠাৎ। হঠাৎ মানে আমি তার জন্যে ঠিক তৈরি ছিলাম না মশাই। মস্ত বড়ঘরের মেয়ে। আপনি বর্ধমানের ভট্টাচার্যিদের নাম শুনেছেন? তাঁরা ওখানকার বনেদী ঘর। বহু পুরুষের বাস ওদের ওখানে। মানে ইচ্ছে করলে ওরা কলকাতাতেই একশোখানা বাড়ি তৈরি করতে পারতো—এত পয়সা। অনেক মেয়ে বাড়িতে—মানে আমার অনেক শালী। একেবারে পর পর সব মেয়ে জন্মেছে ভাইদের। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে হয়েছে সব বড় বড় জায়গায়। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ উকিল, ব্যারিস্টার, কেউ আবার ব্যবসাদার। একমাত্র আমিই হলুম জামাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আমারই

একমাত্র খারাপ অবস্থা। আমিই একমাত্র কেরানী!

মশাই, সেই গোড়া থেকেই আমার স্ত্রীর কেমন লজ্জা করতো আমার জন্যে। কেবল আমাকে বলতো—তোমার বড় চাকরি হয় না? আরো বড় চাকরি? তোমার সেজ-জামাইবাবুর মত?

তা আমি আর কী উত্তর দেব এর, বলুন? আমি ভাবতাম বুঝি হাসি-ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই আমার বউ বাড়ি থেকে চলে গেল। একলা চলে গেল মশাই। আমি আপিস থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, বউ বাড়ি নেই—। কী হলো? হলো কী, এমন তো হয় না। খোঁজাখুঁজি করলুম অনেক। অনেক জায়গায় গেলুম। আমার তো আর কেউ নেই কলকাতায় যে সেখানে যাবে? পাশের বাড়িতে খোঁজ নিলুম—সেখানেও নেই। শেষে কী সন্দেহ হলো, গেলুম বর্ধমানে, আমার শ্বশুরবাড়িতে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই! গিয়ে দেখি বউ গেছে বাপেরবাড়িতে—

আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, তাঁরা সেকেলে লোক। বললেন—একলা-একলা থাকে, তাই ওই রকম হয়েছে, আর কিছুদিন সবুর করো বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে—

আমার তখন বাড়িতে কেউ নেই, বুঝলেন না। স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে পারবো কেন?

শ্বশুরমশাইকে বললাম—যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন তো আমার বড় ভাল হয়, বড় কষ্ট হচ্ছে আমার খাওয়া-দাওয়ার—

শাশুড়ী বললেন—তাহলে পটলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাকে যদি বোঝাতে পারো তো দেখ—

আমার স্ত্রীর ডাক নাম পটল। তা যাকগে, বউ ঘরে এল।

বললাম—তুমি হঠাৎ যে না-বলে কয়ে চলে এলে, আমায় কী ভাবনায় ফেলেছিলে বলো তো—

বউ বললে—আমি আর যাবো না কলকাতায়, আমার লজ্জা করে।

আমি বললাম—লজ্জা কিসের? আমার কাছে থাকবে তাতে লজ্জা কী?

তখন থেকেই মাথাটা একটু-একটু খারাপ হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারিনি আর কি। বউ সে-কথার উত্তরে বললে—তুমি যে মাইনে কম পাও, তাই আমার লজ্জা করে—

বললাম—মাইনে কম-বেশি পাওয়া কি আমার হাত?

—তা বললে কি জানেন? বললে—সেজ-জামাইবাবু, ন'-জামাইবাবু, ওরা তো বেশি মাইনে পায়—তুমি ওদের মত মাইনে পাও না কেন?

—তা আমি এর কী জবাব দেব বলুন!

দীপঙ্কর মন দিয়ে শুনছিল গল্প। বললে—তারপর?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনি তো বিয়ে করেন নি। কিন্তু বিয়ে যদি কখনও করেন তো বড়লোকের মেয়েকে কখখনো বিয়ে করবেন না মশাই, এই আপনাকে আমি বলে রাখলুম! আমার নিজের কখনও একটা অসুখ করেনি মশাই, কখনও আমার নিজের জন্যে ডাক্তার ডাকতে হয়নি একটা। আমার ওই চা-খাওয়া ছাড়া আর কোনও নেশাই নেই জীবনে, কিন্তু এখন ভাবি, বিয়ে না করলে আমি কত সুখেই থাকতে পারতুম! আরাম করে চাকরি করতুম, আর সিনেমা-থিয়েটার দেখে বেড়াতুম—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা আপনার প্রমোশন হয়ই বা না কেন গাঙ্গুলীবাবু? এত বছর চাকরি করছেন আপনি?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনিও ওই কথা বলছেন? প্রমোশন হবে কী করে সেনবাবু? আপনার কথা আলাদা, আপনি ঢুকলেন জার্নাল সেকশনে, তারপর কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল, রবিন্‌সন্‌ সাহেব আপনাকে বসিয়ে দিলে নিজের ঘরে, আর আমাদের তো তা নয়, চিরকাল ওই এক চেয়ারে, এক খাতায় মাথা পচতে হবে—

দীপঙ্কর বললে—তা তারপর?

—তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সেবার তো নিয়ে এলাম বউকে বাড়িতে। শাশুড়ী অনেক বুঝিয়ে-টুঝিয়ে মেয়েকে পাঠালে। আমি বউ-এর মন ভোলাবার জন্যে আপিসের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে দেড় হাজার টাকা লোন নিলুম। বউ-এর দামী শাড়ি কিনে দিলাম, ভালো-ভালো গয়না গড়িয়ে দিলাম। সিনেমায় নিয়ে গেলাম, থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। মহা খুশী বউ। ভাবলাম বুঝি সেরে গেল। সেইবারেই প্রথম বড় মেয়ে হলো আমার। তারপর একটা ছেলে।

কিন্তু পরের মাস থেকে হাতে মাইনে পেতে লাগলাম কম। আর কুলোতে পারি না, আর চলে না সংসার। বউকেও বলতে পারি না তখন। শেষে একদিন আর চাপা রইল না। একেবারে খোলাখুলি গালাগালি দিতে লাগলো আমাকে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—গালাগালি?

—হ্যাঁ সেনবাবু, আপিসে কাউকেই এ-সব কথা বলিনি, কেউ জানে না। আজ আপনাকেই প্রথম বললাম। তখন আর কি একেবারে উন্মাদ অবস্থা। সে শাড়ি-শায়ারও ঠিক থাকে না। চিৎকার করে গালাগালি—

—কাকে গালাগালি দিতেন?

—আমাকে সেনবাবু, আবার কাকে। আমি মাইনে কম পাই, আমি বউকে শাড়ি-গয়না কিনে দিতে পারি না, আমি ইতর, আমি ছোটলোক—শেষকালে কানে আঙুল দিতে হতো। পাড়ার লোক পর্যন্ত সে-চিৎকারে তিষ্ঠোতে পারতো না—এমন চিৎকার। ছেলেমেয়েরা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠতো মায়ের কাণ্ড দেখে—

গাঙ্গুলীবাবুর গল্প শুনতে শুনতে দীপঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

কী সাংঘাতিক অবস্থা গাঙ্গুলীবাবুর। অথচ বাইরে থেকে তো কিছুই বোঝা যায় না, কিছু বোঝবারই উপায় নেই। দিনের পর দিন জার্নাল সেকশনে এসেছে নিয়ম করে। নিয়ম করে কে-জি-দাশবাবুকে চা দিয়েছে, হেসেছে, রসিকতা করেছে। নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েলের সময় সবই তো করেছে গাঙ্গুলীবাবু, কিছু তো বোঝা যায়নি বাইরে থেকে।

পার্কের ভেতরে আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। এতক্ষণে বোধহয় রবিন্‌সন্‌ সাহেবের লাঞ্চ খেয়ে ফেরবার সময় হলো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—তারপর ডাক্তার দেখাতে লাগলুম। শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁরাও এলেন। আমার তো টাকা ছিল না। তাঁদেরই জ্বালা, আমার মত জামাই করে তাঁদেরই পস্তাতে হচ্ছে। ভেবেছিলেন জামাই-এর রেলের চাকরি, উন্নতি হলে প্রচুর উন্নতি হবে, একেবারে মাথায় উঠে যাবে জামাই, আবার যদি তা না-ও হয়, তো মেয়ের খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না জীবনে—কিন্তু তাঁরা তো জানতেন না যে, আমি জার্নাল সেকশনের এ-বি গ্রেডের ক্লার্ক, জার্নাল সেকশনে একবার নাম লেখালে সেখান থেকে আর মুক্তি নেই।

—যাক, তারপর? কিসে ভালো হলো?

গাঙ্গুলীবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাধা পড়লো। দ্বিজপদ দৌড়ুতে দৌড়ুতে একেবারে পার্কের মধ্যে এসে পড়েছে।

—হুজুর, রবিন্‌সন্‌ সাহেব।

—ডেকেছে? এরই মধ্যে এসে গেল সাহেব?

দীপঙ্কর উঠে পড়লো। সাহেব আজকে সকাল-সকাল এসে পড়েছে দেখছি। তাড়াতাড়ি জুতোটা পায়ে গলিয়ে দৌড়লো। গাঙ্গুলীবাবু সঙ্গে সঙ্গে চললো। দীপঙ্কর বললে—শেষটা শোনা হলো না, গাঙ্গুলীবাবু, ছুটির পরে শুনবো কিন্তু—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—এখন মশাই আর কোনও গণ্ডগোল নেই, ধন্বন্তরি ওষুধ একেবারে, তাই তো সকালবেলা উঠেই কালিবাড়িতে গিয়ে পুজো দিয়ে এলুম—

—তা কী ওষুধে সারলো?

—আরো কত রকম কী করেছি, তার কি ঠিক আছে। পাগ্‌লা কালির বালাও পরিয়েছিলাম, তাতেও কিছু হয়নি। শেষে শ্বশুরমশাই অনেক টাকা খরচ করে কলকাতার বড় বড় ডাক্তার দেখালেন, তাতেও কোনও ফল হয়নি—শেষে—

—শেষে?

তখন একেবারে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের ঘরের সামনে এসে গেছে দুজনে।

—শেষে হরকালী কবিরাজের মধ্যমনারায়ণ-তৈল আছে এক রকম, তাই মাখিয়ে মাখিয়ে ভালো হলো। এখন আবার নরম্যাল, সব স্বাভাবিক—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তেলটা কোথায় পাওয়া যায়? কত দাম? আমাকে এক বোতল কিনে দিতে পারেন?

—আপিসের পরে দেখা হবে তো, তখন বলবো'খন আপনাকে, আমাকে ডাকবেন!

সাহেবের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখলে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের মুখে হাসি। দীপঙ্কর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও যেন সাহেবের চৈতন্য হলো না। তেমনি দীপঙ্করের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। একরকম দুর্বোধ্য অব্যক্ত হাসি।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলো সাহেব। নড়ে বসলো।

বললে—আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, না?

দীপঙ্কর বললে—ইয়েস স্যার—

—কী জন্যে বলো তো? হোয়াই?

রবিন্‌সন্‌ সাহেবের এই রকমই অদ্ভুত কাণ্ড! কী বলতে ডেকেছিলেন ভুলে গেছেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—জাপান-ট্র্যাফিকের পিরিঅডিক্যাল স্টেট্‌মেণ্ট স্যার?

—নো, নো, নট্‌ দ্যাট্‌—

বলে সাহেব ভাবতে লাগলো মাথায় টোকা দিতে দিতে। দীপঙ্কর দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ জিমির দিকে নজর পড়তেই সাহেব বললে—জানো সেন, জিমি ইজ্‌ অ্যান ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌ ডগ্‌, জিমির খুব বুদ্ধি! আজকে কী করেছে জানো—?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো।

সাহেব বললে—আজকে মিসেস্‌ ঘুম থেকে উঠতে দেরি করেছে, আর্লি মর্নিং ছ'টার সময় ওঠে রোজ মিসেস্‌—এদিকে জিমির ঠিক খেয়াল আছে, উড্‌ ইউ বিলিভ্‌, জিমি মিসেসের ঘরের দরজায় গিয়ে নক্‌ করছে—ধাক্কা দিচ্ছে—

জিমির বুদ্ধি দেখে যে দীপঙ্করও অবাক হয়ে গেছে তা বোঝাবার জন্য দীপঙ্কর জিমির দিকে চেয়ে একটু হাসলো। জিমি বোধহয় বুঝতে পারলে যে, তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। মুখটা দীপঙ্করের দিকে তুলে ল্যাজ্‌টা একটু নেড়ে দিলে।

সাহেব বললে—ভেরি ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌, বুঝলে সেন, ইভ্‌ন্‌ মোর ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌ দ্যান্‌ দীজ্‌ অফিস-ক্লার্কস—

সাহেব গড়-গড় করে জিমির আরো গুণপনার কথা সবিস্তারে বলতে লাগলো। কবে একদিন ছোট্ট একটুকু বাচ্চা বয়েসে এসেছিল বাড়িতে, তারপর ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছে সাহেবের। সাহেব আর মেমসাহেব সারাদিন

৫০৫

জিমি-জিমি করেই অস্থির। একদিন শরীর খারাপ হলে, একদিন জিমির অরুচি হলে, সি-এম-ও থেকে হসপিটালের কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে। জিমির জন্যে কোথায় মাংস, কোথায় সোপ্‌, কোথায় বিস্‌কিট্‌ সব দিকে নজর দিতে হয় মেমসাহেবকে। জিমি হট্‌ ওয়াটার খাবে না জানো, জিমির রেফ্রিজারেটেড্‌ ওয়াটার চাই। স্টু খাবে, বেকন্‌ খাবে, হ্যাম, পরিজ সব খাবে। কিন্তু রাইস্‌ মুখে দেবে না—এমন ডগ্‌ দেখেছ তুমি সেন?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনছিল সব। এই জন্যেই সাহেব তাকে ডেকেছিল নাকি! এই জিমির কথা শোনাতেই ডেকে পাঠিয়েছিল সাহেব চাপরাসী দিয়ে। আশ্চর্য খেয়ালী সাহেব! পরে অনেকবার রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কথা মনে পড়ায় দীপঙ্করের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে। হোক ইউরোপীয়ন, হোক ফরেনার, হোক ব্রিটিশ, কিন্তু অমন লোক যে হয় না! ভালো লোক কি নেই ব্রিটিশারদের মধ্যে? আছে বৈ কি! রবিন্‌সন্‌ সাহেবই তো তার প্রমাণ! অতখানি বিশ্বাস, অতখানি ভালবাসা আর ক'জনের কাছেই বা পেয়েছে দীপঙ্কর! প্রাণমথবাবু—তা প্রাণমথবাবু তো তার উপকার করেছেন। চ্যারিটি করেছেন। গরীবদের ওপর তাঁর কর্তব্যবোধ থেকে তিনি সাহায্য করেছেন দীপঙ্করকে! কিন্তু রবিন্‌সন্‌ সাহেব তো তা নয়। রবিন্‌সন্‌ সাহেব তো ইণ্ডিয়ার পভার্টি দেখতে পারেননি। সাহেব পভার্টি টলারেট করবেন না। জিমির ক্লীনারকে টেন চিপ্‌স্‌ দিতো সাহেব। পৃথিবীতে গরীব কেন থাকবে! সে যত ছোট কাজই করুক, হি মাস্ট্‌ বি ফেড্‌। তাকে খেতে দেওয়া চাই। কুকুরের সেবা করছে বলে সে কি কম খাবে নাকি? তারও কি বাঁচবার অধিকার নেই! দৈত্যকুলে হঠাৎ যেন এক প্রহ্লাদ এসে জুটে গিয়েছিল। যেন গোভ, বার্জ, টেগার্ট, সিমসনদের দলের ভেতরে হঠাৎ একজন ডেভিড হেয়ার ভুল করে ঢুকে পড়েছিল। আর আসবি তো আয় একেবারে এই জায়গায়—এই রেলের আপিসে!

তারপর হঠাৎ যেন সাহেবের আসল কথাটা মনে পড়ে গেছে।

বললে—হ্যাঁ, যে-কথা বলতে তোমাকে ডেকেছিলুম—তুমি অফিসে কী কাজ করো?

প্রশ্নটা শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। বললে—আমি ক্লার্ক স্যার, জাপান-ট্র্যাফিকের কাজ করি—

—আই সী, তা আর ইউ এ গ্র্যাজুয়েট?

—ইয়েস স্যার।

সাহেব খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—তা তুমি সেফ-ওয়ার্কিং এগজামিনেশনটা দাও না কেন? সেফ-ওয়ার্কিং আর ইয়ার্ড!

দীপঙ্কর বললে—আপনি যদি পারমিশন দেন তো দিয়ে দিতে পারি—

—ইয়েস, ডু ইট্‌, আমি ডি-টি-আই নিচ্ছি, ইউ মে বি এ ক্যাণ্ডিডেট—

কথাটা বলেই জিমির দিকে চাইলে সাহেব আবার। বললে—জানো, হোয়াট

ম্যান ইন্‌টেলিজেণ্ট ডগ্‌, আমি ওকেই ডি-টি-আই করে দিতুম—বাট্‌ আনফর-চুনেটলি জিমি ইজ্‌ এ ডগ—দো হি ইজ্‌ মোর ইনটেলিজেণ্ট দ্যান্‌ দোজ্‌ অফিস-ক্লার্কস—

কী কথা বলতে বলতে কী কথা বলে ফেললে সাহেব।

দীপঙ্কর বললে—আমি পরীক্ষা দেব স্যার—

—হ্যাঁ, দাও—আই উইল্‌ হেল্‌প্‌ ইউ—

বলে সাহেব নিজের কাজে মন দিতে যাচ্ছিল। দীপঙ্করও চলে আসছিল ঘর থেকে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়লো। বললে—স্যার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে—

—বলো?

দীপঙ্কর বললে—আমার এক আত্মীয়ের ভীষণ বিপদ হয়েছে স্যার, তার হাজ্‌ব্যান্ড হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে, তার জন্যে আমি একটা ফেবার চাই আপনার কাছে। তিনি রেলওয়ের এনলিস্টেড্‌ কন্‌ট্র্যাক্‌টার, তার একটা কাজ যদি আপনি করে দেন, মাত্র তিন-হাজার টাকার কাজ—

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ?

দীপঙ্কর যতটুকু জানে সমস্তই বললে। বড় বড় কন্‌ট্র্যাক্‌টার অবশ্য অনেক আছে লিস্টে, কিন্তু ইনি তাদের মত নন্‌। ছোট-ছোট অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করেন। অত্যন্ত দুরবস্থা এঁদের। বেঙ্গলী নয়। মহারাষ্ট্রীয়ান্‌। ট্রেড্‌-ডিপ্রেশনের জন্যে অফিস উঠে গেছে এঁদের। একটা সামান্য ছোট বাড়ি ভাড়া করে কলকাতার বাইরে—ঢাকুরিয়ায় থাকেন। গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে। আমার নিজের দিদি নেই—কিন্তু এ আমার নিজের দিদির চেয়েও নিজের। ছোটবেলা থেকে এক বাড়িতে—এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেছি। এর কষ্ট আমার নিজের কষ্ট। এর দুঃখ আমার নিজেরই দুঃখ। আমি নিজে গিয়ে এদের দুঃখ-কষ্ট দেখে এসেছি। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তো এদের আমি টাকা দিয়ে সাহায্য করতাম। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলে গেল দীপঙ্কর। সাহেবের দয়া উদ্রেক করবার জন্যে যা কিছু বলা দরকার সব বললে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—এরা টেন্ডার পাঠিয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব আমি জানি না—ভদ্রলোক আজকেই আসবেন,—

সাহেব বললে—অল্‌ রাইট্‌, আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো, আই শ্যাল্‌ সী টু ইট্‌।

দীপঙ্কর আরো একটু করুণ করে বলতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা—

সাহেব বললে—আর বলতে হবে না সেন, আই উইল্‌ ডু ইট্‌ ফর ইউ—

দীপঙ্কর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে বাইরে চলে এল। বাইরে এসেই একবার দেখলে চারিদিকে। অনন্তবাবু হয়ত এসে অপেক্ষা করছে। ওদিকের করিডোর থেকে এদিকের করিডোরটা একবার ঘুরে দেখে নিলে। কোথাও অনন্তবাবুকে

দেখা গেল না। এত দেরি করছে কেন আসতে। তারই তো কাজ। দীপঙ্করের কী। গরজটা তো তারই। কাজটা পেলে অনন্তবাবুরই উপকার। লক্ষ্মীদিরই উপকার। তারই পাঁচশো টাকা অন্তত প্রফিট থাকবে। কাউকে ঘুষ দিতে হবে না। রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেই শুধু ফর্মের ওপর সই করে দেবে। তাহলেই হয়ে যাবে। আর কারোর কিছু বলবার থাকবে না।

আবার নিজের ঘরের কাছে এসে চাপরাসীকে একবার জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ রে, কেউ খুঁজতে আসেনি আমাকে?

—না, হুজুর।

দীপঙ্কর বললে—যদি কেউ এসে আমাকে খোঁজ করে, আমাকে ডেকে দিবি বুঝলি? মনে থাকবে তো?

—থাকবে হুজুর।

—হ্যাঁ, ভুলিসনি যেন, খুব জরুরী।

আশ্চর্য বটে! এত করে আসতে বলে এল দীপঙ্কর, আর কি না এল না। সত্যি, কী আক্কেল লোকটার। দীপঙ্কর তো তাদের জন্যেই অত করে বলে এসেছিল। নইলে তার কিসের স্বার্থ! লক্ষ্মীদির জন্যেই দীপঙ্কর নিজে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কাছে অনুরোধটা করেছে। আর এত করে বলেও অনন্ত-বাবু ঠিক সময়ে আসতে পর্যন্ত পারলো না।

আবার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দীপঙ্কর, মিস মাইকেলকে লম্বা নোট দিয়েছে সাহেব। সেইটেই একমনে টাইপ করছে। দীপঙ্কর নিজের ফাইলগুলো আবার নামালো। আবার স্টেট্‌মেণ্ট করতে হবে। স্টেট্‌মেণ্ট পাঠাবার তারিখ এসে গেল আবার। কাজ করতে করতে দীপঙ্কর আবার বাইরে এল। না, এখনও অনন্তবাবুর দেখা নেই।

চাপরাসীকে আবার জিজ্ঞেস করলে—কী রে, কেউ আসেনি?

—না হুজুর।

আশ্চর্য! লক্ষ্মীদিরই বা কী রকম দায়িত্ব-জ্ঞান। লক্ষ্মীদির ব্যাপারটাই যেন দুর্বোধ্য। অনন্তবাবুর সঙ্গে অত মাখামাখিই বা কেন! হ্যাঁ, উপকার করছে ভদ্রলোক, সেইজন্যেই যা একটু কৃতজ্ঞতা। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতাটুকুর জন্যে অত ঘনিষ্ঠতার দরকার কী! অত হাসাহাসি, অত গায়ে গড়িয়ে পড়ার দরকার কী! অথচ পাশের ঘরে দাতারবাবু তখন চিৎকার করছে—উন্মাদের চিৎকার।

হঠাৎ নজরে পড়লো এতক্ষণে অনন্তবাবু আসছে। বাইরের গেট দিয়ে সোজা ভেতরে আসছে তার দিকে। পোশাকটা বদলিয়েছে। একটু ফিট্‌ফাট। ফরসা জামা-কাপড়। দীপঙ্কর হেসে এগিয়ে গেল অনন্তবাবুর দিকে। শেষ পর্যন্ত যে অনন্তবাবু এসেছে এই-ই যথেষ্ট। তা না হলে এত তোড়-জোড় এত চেষ্টা-চরিত্র এত রবিন্‌সন্‌ সাহেবকে ধরা সব মাটি হতো!

—অনন্তবাবু! আপনি এত দেরি করে এলেন, আমি অনেকক্ষণ ধরে এখানে

অপেক্ষা করে আছি—

অনন্তবাবু হন হন করে আসছিল সোজা। তারপর দীপঙ্করের পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেল। যেন দীপঙ্করকে দেখতেই পেলে না!

দীপঙ্কর ডাকলে—অনন্তবাবু,—এই যে আমি—

অনন্তবাবু পেছন ফিরে চাইলে একবার দীপঙ্করের দিকে। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারলে। বললে—ও, আপনি, আমি আসছি—

বলে আর দাঁড়ালো না, একেবারে হন হন করে মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে পড়লো। আর চাপরাসীটাও তেমনি। অনন্তবাবুকে দেখেই একটা সেলাম করলে, তারপর দরজাটা খুলে ফাঁক করে দিলে।

এক নিমেষে যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল দীপঙ্করের চোখের সামনে। সেই অনন্তবাবুই তো, না সে ভুল করেছে? না সে অন্য লোককে অনন্তবাবু বলে ভুল করেছে। আশ্চর্য তো! চিনতেই পারলে না দীপঙ্করকে! অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো দীপঙ্কর। এ কী রকম হলো। যার জন্যে সে এত চেষ্টা করলে, সে-ই তাকে চিনতে পারলে না! মিস্টার ঘোষালকে এত ভাল করে চিনেও সেখানে তার কাছেই গেল!

সেদিন দীপঙ্কর তার চাকরি-জীবনের প্রথম দিকে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। নিঃস্বার্থ উপকার যে করতে চায়, তার কাছে লোকে না এসে কেন যায় স্বার্থপর অশুভবুদ্ধি লোকের কাছে! যেখানে সহজে কার্যসিদ্ধি হয়, সেখানে যাবার প্রবৃত্তি কেন মানুষের হয় না! দীপঙ্করের কোনও স্বার্থ ছিল না বলেই কি অনন্তবাবু মিস্টার ঘোষালের ঘরে গিয়ে ঢুকলো—যেখানে ঘুষ দিতে হবে, যেখানে অন্যায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে, সেখানে?

সেইখানেই আরো অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল দীপঙ্কর। কাল সেই রাত্রের পর এমন কী ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্যে আজ অনন্তবাবুর এই বিপরীত আচরণ। দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরটা বেদনায় টন টন করে উঠলো। বেদনাটা অনন্তবাবুর এই বিপরীত ব্যবহারের জন্যে ততটা নয়, যতটা আত্মগ্লানিতে। ছোটবেলা থেকে অনেক মানুষের অনেক ব্যবহারের সঙ্গে তার মুখোমুখি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, অনেক দুর্বোধ্য আচরণের ব্যাখ্যাও মিলেছে, কিন্তু এ কী হলো! এমন তো হবার কথা নয়। মনে হলো দীপঙ্করের সততা, দীপঙ্করের নিষ্ঠা, দীপঙ্করের ভালবাসার যেন চরমতম অপমান করলে অনন্তবাবু!

দ্বিজপদ এসে ডাকলে—হুজুর, সাব সেলাম দিয়া—

দীপঙ্কর চাপরাসীকে বললে—একটু দেখিস তো, ওই বাবু ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কিনা—

রবিনসন সাহেবের ঘরে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। একটা দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে এসেছে। এসেই চাপরাসীকে জিজ্ঞেস করলে—বাবু বেরিয়েছে?

—না হুজুর।

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। অনন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই হবে আজ। অন্তত লক্ষ্মীদির জন্যেও দেখা করতে হবে। তাহলে কেন তাকে চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল লক্ষ্মীদি! কেন তাকে অপমান করা এমন করে? রবিনসন সাহেব যখন জিজ্ঞেস করবে—কই, তোমার রিলেটিভ এল না? তখন কী উত্তর দেবে দীপঙ্কর?

হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের দরজাটা খুলে যেতেই দীপঙ্কর তৈরি হয়ে নিলে।

কিন্তু অনন্তবাবুর সঙ্গে মিস্টার ঘোষালও বেরোল বাইরে। দুজনের যেন খুব ভাব। গল্প করতে করতে দুজনে বেরিয়ে সামনের গেটের দিকে গেল। মিস্টার ঘোষালের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। দুজনেই গিয়ে উঠলো তাতে। দীপঙ্কর ডাকতে যাচ্ছিল অনন্তবাবুকে। কিন্তু তার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপরে আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো।

মিস মাইকেলের তখন হাত খালি। এক কাপ চা করে খাচ্ছে।

বললে—কী হলো সেন? তোমাকে এত ওরিড্ দেখাচ্ছে কেন? হোয়াট হ্যাপেন্ড্?

দীপঙ্কর মুখটা আড়াল করে বললে—না কিছু হয়নি—

মেমসাহেব বললে—আজ যাবে সেন?

—কোথায়?

দীপঙ্করের কোনও কথা মনে ছিল না। তার মাথাটার ভেতর সব যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

মেমসাহেব বললে—আমার ফ্ল্যাটে। আমার অ্যালবামটা দেখাবো তোমায় চলো। অনেক কালেকশন আছে আমার—ভিভিয়ানের ছবিও দেখাবো, সে যে খাটে শুয়ে থাকতো, সেটা দেখাবো, সে যে ড্রেসিং টেবলে বসে ড্রেস করতো সেটা দেখাবো—চলো—

তারপর হঠাৎ দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে মেমসাহেব বললে—কি ভাবছো? এনিথিং রং উইথ ইউ?

দীপঙ্কর তখনও ভাবছিল—এ কেমন করে হলো। এ কেমন করে সম্ভব হলো! এমন ব্যবহার কেন করলে অনন্তবাবু! লক্ষ্মীদি আর অনন্তবাবু যে খেতে বসে এত হেসে গড়িয়ে পড়েছে, তার জন্যে তো কিছু বলেনি দীপঙ্কর। দীপঙ্কর সে-সব দেখতে পেয়েছে, তাও তো কেউ জানে না। সে তো চুপি চুপি দেখে আবার চুপি চুপি বেরিয়ে এসেছে। লক্ষ্মীদিও জানতে পারেনি, অনন্তবাবুও জানতে পারেনি। তার মনিব্যাগটা সেখানেই পড়ে ছিল—তবু পাছে তারা জানতে পারে, পাছে তাদের আনন্দের ব্যাঘাত হয়, তাই সেটা না-নিয়েই সে তো

ফিরে এসেছে। সেই অত রাত্রে অত দূর থেকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত হেঁটেই চলে এসেছে।

হঠাৎ গাঙ্গুলীবাবু ঘরে ঢুকলো। বললে—সেনবাবু, যাবেন নাকি?

—কোথায়?

—সে কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সেই কবিরাজী তেল কিনবেন না? মধ্যমনারায়ণ তেল? সেই পাগলের ওষুধটা!

দীপঙ্করের ঘেন্না হলো কথাটা ভাবতে। বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, ও তেল আমার দরকার নেই—

—সে কি, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? সত্যি বলছি তেলটা ভাল, আমি তো কল্পছি, যত দিনের পাগলই হোক, একটু মাথালেই সেরে যেত। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ, দামটাও বেশি নয়—

দীপঙ্কর বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, আমার দরকার নেই, আমি আর কারোর ভালোর জন্যে মাথা ঘামাবো না—যাদের আমি নিজের লোক মনে করে উপকার করবার চেষ্টা করি, তারাই আমাকে পর ভাবে, আপনি যান আজকে, আমার দেরি হবে যেতে—

গাঙ্গুলীবাবু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। সত্যিই তো, কেন সে ভাবতে যাবে! লক্ষ্মীদির তো কোনও দুঃখ নেই। তার তো হাসতে বাধে না। দাতারবাবু পাগলই হোক আর যাই হোক, তাতে লক্ষ্মীদির তো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। লক্ষ্মীদি তো অনন্তবাবুর সঙ্গে সুখেই আছে!

খানিক পরে মিস মাইকেল বললে—চলো সেন—

দীপঙ্কর সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—জানো মিস মাইকেল, আমি যেখানেই মিশতে গিয়েছি, যার সঙ্গেই ভাব করতে গেছি, সেখানেই আমাকে বহু বাধা পেতে হয়েছে। আমি স্বার্থ চাইনি, অর্থ চাইনি, শুধু চেয়েছিলাম মিশতে, শুধু চেয়েছিলাম ভালবাসতে—কিন্তু সব জায়গা থেকেই আঘাত পেয়েছি কেবল—কেন এমন হয় বলতে পারো? কেন সংসারের মানুষরা ভালো হয় না? কেন সৎ হয় না, কেন ভালবাসতে জানে না কেউ, বলতে পারো?

মেমসাহেব খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল দীপঙ্করের দিকে। হঠাৎ দীপঙ্করের ভাবান্তর দেখে কেমন আশ্চর্য হয়ে গেল। এতদিন একসঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু এর আগে এমন করে তো কথা বলেনি সেন!

বললে—চলো। কেন মানুষ ভাল হয় না আমি তোমায় বলবো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব—

মিস মাইকেল তাড়াতাড়ি কাগজপত্র সব গুছিয়ে রাখলে। মেশিনটা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলে চাপরাসী। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম সব গুছিয়ে রেখে আলমারিতে চাবি লাগিয়ে দিলে। রবিনসন্ সাহেব চলে গেছে।

সব ঠিক করে বেরোতে যাবার বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় হঠাৎ কাছাকাছি

কোথাও দুম দুম করে কয়েকবার বিকট আওয়াজ হলো। বন্দুক কিম্বা রিভলবারের শব্দ। অনেক লোকের চিৎকারের শব্দ কানে এল। কাছাকাছি যেন কোথাও গণ্ডগোল শুরু হলো। মিস মাইকেল আর্তনাদ করে উঠেছে।

—সেন, স্টপ্, স্টপ্—ফায়ারিং—ফায়ারিং হচ্ছে, স্টপ্—

তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর আবার ঘরের ভেতর ঢুকলো। মেমসাহেব বললে—ক্লোজ দি ডোর—ক্লোজ ইট্—কুইক—

অনেকক্ষণ ধরে যেন অনেক গোলমাল চলতে লাগলো কাছাকাছি। দরজা বন্ধ ঘরের ভেতর মিস মাইকেল আর দীপঙ্কর ঘন হয়ে বসলো। মিস মাইকেল দীপঙ্করের হাত দুটো ধরে রাখলে জোর করে। বললে—বাইরে যেও না, এখানে থাকো—ফায়ারিং হচ্ছে—

হঠাৎ গাঙ্গুলীবাবু আবার দৌড়ে ফিরে এসেছে। তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—সর্বনাশ হয়েছে সেনবাবু, রাইটার্স বিল্ডিং-এ গুলি চলছে—

—কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—সমস্ত লোকজন যে-যেদিকে পারছে পালাচ্ছে—পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে একেবারে, আমি দৌড়তে দৌড়তে আবার চলে এসেছি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে, কিছু শুনলেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কর্নেল সিম্সনকে স্বদেশীরা খুন করেছে—জেলখানার আই-জি। সাহেব আপিসের ভেতরে বসে ছিল, হঠাৎ স্বদেশীরা ঢুকে একেবারে বুকের ওপর গুলি করেছে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কারা মেরেছে জানেন? শুনলেন কিছু?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—অত শোনবার সময় হলো না, গুলির আওয়াজ পেয়েই আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি মশাই—

অবশ্য পরের দিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। দীপঙ্কর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও কিরণের নামটা দেখতে পেলে না। কিরণ ধরা পড়বার ছেলে অবশ্য নয়। তবু দীপঙ্কর যেন আশ্বস্ত হলো। সেদিন সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারটাই যেন একটা আগুনের কুণ্ড হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য পুলিস, আর পুলিস সার্জেণ্ট, চারিদিকে ঘেরাও করে ফেলেছিল সবাইকে। বহু নির্দোষ লোককেও লালবাজারের থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মিস মাইকেলের মুখটা ভয়ে একেবারে লাল হয়ে উঠেছিল। বয়স কম নয় মেমসাহেবের। লিপস্টিক রুজ আর পাউডারের আড়ালে বয়সটা ঢেকে রাখতো। বললে—আমি কী করে বাড়ি যাবো সেন?

দীপঙ্কর বললে—একটু থামুক, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো—

সমস্ত ডালহৌসী স্কোয়ারটায় তখন সে কী উত্তেজনা। কখন স্বদেশীরা ঢুকেছিল ভেতরে কেউ জানে না। পাকা নিখুঁত সাহেবী পোশাক-পরা তিনজন

ছেলে ঢুকেছে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ভেতরে। সবাই ভেবেছে, হয় খাঁটি সাহেব নয় তো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। সিমসন সাহেব তখন ভারি ব্যস্ত—সামনে সেকশনের বড়বাবু ফাইল দেখাতে নিয়ে এসেছে। হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই সাহেব বলে উঠেছে—হুজ্ দ্যাট্? কে?

সিমসন সাহেবের ঘরে অনুমতি না নিয়ে ঢোকা অপরাধ।

—হু আর ইউ?

কিন্তু কথাটা পুরো বলতেও পারলে না সাহেব। তার আগেই একটা গুলি এসে মুখে লাগলো। আর লেখা হলো না সাহেবের। হাত থেকে কলমটা খসে পড়লো।

বাইরে হোম সেক্রেটারী আলবিয়ন সাহেবের ঘর। আলবিয়ন মারে।

সেখানে গিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলে—মারে সাব্ টেব্‌ল্ পর হ্যায়?

উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করেনি কেউ। ঘরের কাচে গুলি ছুঁড়তেই ঘরের দরজা ভেঙে গেল। আওয়াজ পেয়েই পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল ক্রেগ্ সাহেব দৌড়ে এসে গুলি ছুঁড়ছে। অ্যাসিস্টেন্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল জোনস্ সাহেবও ততক্ষণে বেরিয়ে এসে গুলি ছুঁড়েছে। কিন্তু কারোর গুলিই ঠিক লোকের গায়ে লাগলো না। তারা ততক্ষণে পাসপোর্ট আপিসের দিকে গেছে। সেখানে রিভলবারে গুলি ভর্তি করে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিস্টার নেলসনের ঘরটা পাশেই। নেলসন সাহেব ঘর থেকে উঁকি মারতেই তার গায়ে একটা গুলি এসে লাগলো। একটা বিকট আর্তনাদ উঠলো মিস্টার নেলসনের মুখ দিয়ে।

পাশেই ছিল প্রেণ্টিস্ সাহেবের ঘর। দৌড়তে দৌড়তে নেলসন সাহেব সেই ঘরে এসে ঢুকলো।

বাইরে রাইটার্স বিল্ডিং-এর কোরিডারে তখন গুলি ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলেছে। জোন্‌স্ নেলসন সাহেবের বডিগার্ড গুলি ছুঁড়ছে স্বদেশীদের লক্ষ্য করে—ওরাও ছুঁড়ছে।

তেতলায় এডুকেশন সেক্রেটারী স্টেপল্‌টন্ সাহেবের ঘর। স্টেপল্‌টন্ সাহেব খবর পেয়েই লালবাজারে টেগার্ট সাহেবকে টেলিফোন করে দিলে।

লালবাজার থেকে এসে হাজির হলো শুধু টেগার্ট নয়। গর্ডন সাহেব, বার্ট সাহেব, সবাই। লালবাজারের সমস্ত পুলিস এসে তখন রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে ফেলেছে। আপিসপাড়ার যত লোক মজা দেখতে এসেছিল, সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে পুলিস।

বার্ট সাহেব তখন সিমসন সাহেবের ঘরে ঢুকলো।

দেখলে—চেয়ারে বসে আছে একজন লোক হেলান দিয়ে।

আর দুজন টেবিলের নিচে বসে আছে।

খবর পেয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো টেগার্ট সাহেব। যে ছেলেটা

চেয়ারে বসে ছিল, তাকে তখন ধরা অবান্তর। সে বোধহয় খানিক আগেই বিষ খেয়েছে। মাথাটা ঝুলছে তখনও কাত হয়ে।

টেগার্ট সাহেব টেবিলের নিচে রিভলবার বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো—হ্যান্ডস্ আপ্—

হাত তোলবার ক্ষমতাই তখন আর তাদের নেই। দুজনেই রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু তখন তাদের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছে। দুজনেই তখন ধুঁকছে।

টেগার্ট সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী নাম তোমার?

—দীনেশ গুপ্ত।

—আর তোমার?

—বিনয় বসু।

এই বিনয় বসুকে ধরিয়ে দেবার জন্যেই পুলিস এতদিন দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। একেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিল পুলিস।

ততক্ষণে রাইটার্স বিল্ডিং-এর বাইরে পুলিস লাঠি নিয়ে তাড়া করছে সবাইকে—ভাগো, ভাগো, শালা লোগ্—

কুকুর-বেড়ালের মত তাড়া করে এল পুলিস। তারপর হাসপাতালে বিনয় বসু মারা গেল। আর তারপর কিছুদিন পরে দীনেশ গুপ্তেরও ফাঁসি হয়ে গেল একদিন।

কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি শোক-সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন—

"We have read instances in history, where the perpetrators of acts like these in one generation having been punished for them, have been acclaimed as martyrs by the next generation. Therefore let us pay our respect to the courage and devotion shown by this young man in the pursuit of his ideal".

তা মেমসাহেব সেদিন খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। থর থর করে কাঁপছিল। দীপঙ্কর যখন আপিস থেকে বেরোল, তখন সমস্ত জায়গাটাই বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। পুলিসে ছেয়ে গেছে জায়গাটা। আপিসেও যারা দেরি করে কাজ করে, তারা মাইনের দিন বলে সকাল-সকাল চলে গিয়েছে। দীপঙ্করের নিজের একবার মনে হলো হয়ত কিরণও এর পিছনে আছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাকেও ধরবে পুলিস। এবার ধরলে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না কিরণকে। এবার নিশ্চয়ই ফাঁসি হয়ে যাবে তার! সেই আপিসের ঘরের মধ্যে বসেও দীপঙ্করের নিজেকে আবার বড় ছোট মনে হয়েছিল। কিরণের তুলনায় অনেক ছোট!

কিরণের মা, কিরণের বিধবা মা'র কাছে খবরটা যাবে। এই সেদিন কিরণের বাবা গেছে, এবার কিরণ গেলে মাসীমা আর হয়ত বাঁচবে না। আবার হয়ত দীপঙ্করকেই শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে মাসীমাকে!

মেমসাহেব বললে—আমার বড় ভয় করছে সেন—

গাঙ্গুলীবাবু আগেই চলে গিয়েছিল। গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী পাঁচ বছর পরে সেরে উঠেছে। বেশি দেরি করে গাঙ্গুলীবাবু বাড়ি যেতে চায় না। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী নিয়ে এতদিন পরে সুখের সংসার করতে চায় গাঙ্গুলীবাবু। মাইনে কম পায়, তাতে কী ক্ষতি! সত্যিই তো, সুখটাই বড়। শান্তিটাই বড়।

দীপঙ্কর বললে—চলো, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব মিস মাইকেল—

কোথায়, কোন্ দিকে মিস মাইকেলের বাড়ি, তা জানতো না দীপঙ্কর। মিস মাইকেলই অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে উঠলো। দীপঙ্কর সামনের সীটে বসতে যাচ্ছিল। মেমসাহেব বললে—ওকি, ভেতরে বোস, আমার পাশে—

ট্যাক্সি চলার পর মিস মাইকেল আবার বললে—আমার এখনও ভয় করছে সেন—

—কেন, ভয় করবার কী আছে? আমি তো আছি।

মিস মাইকেল বললে—সব ইউরোপীয়ানদের এই রকম করে খুন করলে, কী হবে শেষকালে?

দীপঙ্কর বললে—তা তুমি তো ইউরোপীয়ান নও, তুমি তো ইণ্ডিয়ান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—তোমার ভয় কী?

কিন্তু সে-কথা কি আর তখন কেউ শুনবে। সেদিন যখন আসবে, তখন ইণ্ডিয়ানরা সবাইকে খুন করবে। স্বরাজ এলে ইউরোপীয়ান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কেউ-ই তখন রেহাই পাবে না। কিরণও একদিন সেই কথাই বলেছিল।

মিস মাইকেল বললে—ভিভিয়ান বেশ আরামে আছে সেন—সে ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এখন হয়ে গেল য়ুরোপীয়ান—

ট্যাক্সির ভেতরে বসে দীপঙ্কর বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিল। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেছে এদিকটা। এই আপিসপাড়াটা। চৌরঙ্গীতে তখনও লোক-জন রয়েছে। জায়গায়-জায়গায় জটলা হচ্ছে। পুলিস দেখলেই দল ভেঙে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্মীদির কথাও মনে পড়লো। এত করে দেখা করতে বলে আসার পরও অনন্তবাবু দেখা করলে না। ভালোই হয়েছে! তার কিসের গরজ! লক্ষ্মীদির সুবিধে হোক, অসুবিধে হোক, আর কিছু দেখবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্মীদি নয়, কারোরই সুবিধে-অসুবিধে দেখবার গরজ আর তার নেই।

মিস মাইকেল হঠাৎ বললে—কী ভাবছো সেন?

দীপঙ্কর বললে—কই, কিছু ভাবছি না তো।

—খুব আনমাইণ্ডফুল দেখছি যে তোমাকে?

দীপঙ্কর বললে—অন্য কথা ভাবছিলাম মিস মাইকেল—

—তুমি এত ভাবো কেন? সব সময়েই দেখেছি তুমি ভাবো?

দীপঙ্কর বললে—না, দেখ, আজ মিস্টার রবিনসন্‌কে বলে একটা কাজের কথা বলেছিলাম। সাহেবও রাজী ছিল। আমার এক রিলেটিভের জন্যে। তাকে বলেছিলুম আমার কাছে আসতে—কোনও ঘুষ দিতে হবে না, আমি তার কাজ করে দেব—

হঠাৎ ট্যাক্সিটা এসে একটা গলির মধ্যে থামলো।

মিস মাইকেল নেমে পড়লো। বললে—এখানেই আমার বাড়ি—

দীপঙ্কর বললে—তা হলে এবার আমি আসি মিস মাইকেল—

মিস মাইকেল হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে—না-না, সে কি, আমার ফ্ল্যাটে এসো, একটুখানির জন্য আসতেই হবে—বেশিক্ষণ তোমায় আটকাবো না, আমার ঘরে কেউ নেই, আমি এলোন—

শেষ পর্যন্ত জোর করেই টেনে নিয়ে গেল মেমসাহেব। কেন যে তাকে তার ঘরে নিয়ে যাবার এত আকর্ষণ, কে জানে! এ-ও কলকাতার আর-একটা অঙ্গ। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে ছোটবেলায় অনেক জায়গায় বেড়াতে বেরিয়েছে দীপঙ্কর, কিন্তু এমন জায়গায় কখনও আসেনি। ছোট ছোট দোকান চারদিকে। মাংসের দোকান, চায়ের দোকান, দরজির দোকান। চারদিকেই ভিড়। এত ভিড় যেন কালীঘাটেও নেই। শহরের একেবারে কেন্দ্রেও যে এমন পাড়া আছে, তা আগে জানতো না দীপঙ্কর। ছোট ছোট অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মেয়ে খড়ম পায়ে দিয়ে মগে করে দোকান থেকে চা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। দোকানগুলো সবই মুসলমানদের। লুঙ্গি পরে বেচা-কেনা করছে। মেমসাহেবদের সঙ্গে খুব ভাব। মেমসাহেবরা একলাই দোকানে গিয়ে সওদা করছে। গম্ গম্ করছে সমস্ত পাড়াটা। এই যে একটু আগেই রাইটার্স বিল্ডিংএ এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, এখানে যেন তার কোনও আভাসই নেই। সহজ স্বাভাবিক জীবন এখানে। শিস্ দিতে দিতে কেল্লা থেকে টমিরা ঘুরছে। হাতে ছোট ছোট ছড়ি। লাল-লাল মুখ। খাকী পোশাক। বিরাট বিরাট আস্ত গরুর মাংস টাঙানো রয়েছে দোকানের সামনে। রাত্রি বেলাও মাছি এসে বসছে মাংসের গায়ে। টমিগুলো কিছু কিনছে না, কিন্তু খুব চেনা-লোকের মত রাস্তার চারদিকে দেখতে দেখতে চলেছে।

দীপঙ্কর বললে—আমি আর ভেতরে যাবো না আজ, অন্য দিন বরং যাবো—

—কেন? কী হলো তোমার বলো তো?

দীপঙ্কর বললে—মনটা সারাদিন খুব খারাপ হয়ে আছে আজ—

—কেন? খারাপ কেন? এস, পাঁচ মিনিটের জন্যে এসো ভেতরে—

কাঠের সিঁড়ি। পুরনো বাড়ি। দেয়ালে খড়ি দিয়ে নানারকম ছবি আঁকা। এ-বাড়ির বাসিন্দারাই এঁকে রেখেছে। মস্ত বড় একটা মুখ সিগারেট খাচ্ছে। দুটো মুখ পরস্পরকে চুমু খাচ্ছে। এমনি নানারকমের ছবি সব।

মেমসাহেব সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে—কেন, মন খারাপ কেন তোমার সেন? বস্ কিছু বলেছে?

—না-না, আপিসের কোনও কিছু ব্যাপারই নয়!

—তা হলে?

মেমসাহেব একটু কটাক্ষ করলো দীপঙ্করের দিকে। বললে—এনি লাভ-অ্যাফেয়ার? কোনও ভালোবাসার ব্যাপার?

—না-না, ভালোবাসা-টাসা আমার নেই মেমসাহেব! আমিও তোমার মত একোন্—

মেমসাহেব চাবি দিয়ে দরজার তালাটা খুললে। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ ছিল। একটা যেন কেমন ভিজে গন্ধ ঘরের ভেতর। জানলা খুলে দিতেই বাইরের হাওয়া একটু ঢুকলো ভেতরে। দীপঙ্কর ঘরের ভেতরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলো।

মেমসাহেব বললে—আমি আগে আপিসের কোনও লোককে ঘরে আনিনি জানো, তুমিই প্রথম এলে—

তারপর একটু থেমে বললে—দাঁড়াও তোমার জন্যে চা করি, বেশি দেরি হবে না—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো চা খাই না তুমি জানো—

—তা হলে কী খাবে তুমি?

—কিছু খাবো না আমি, শুধু তোমার অ্যালবামটা দেখেই চলে যাবো, আমার মা ভাববে বেশি দেরি হলে!

—তা হলে একটু পুডিং খাও—

বলে মেমসাহেব পর্দার আড়ালে গিয়ে কী করতে লাগলো। খুট-খাট শব্দ! মাঝে-মাঝে টুং-টাং শব্দ হচ্ছে। তারপর স্টোভ জ্বালার শব্দ হলো। ছোট্ট একটুখানি ঘর। কিন্তু পর্দা, আলো, পুরনো ফার্নিচারের বাহুল্যে ঘরটা ভরে আছে। দেয়ালে অনেকগুলো ছবি। দেয়াল ভর্তি ছবি। অনেক পুরুষ অনেক মেয়ের ছবি। কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে। কোথাও দুটি মেয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে রঙিন কাগজের ফানুস।

হঠাৎ পর্দার ভেতর থেকে মেমসাহেব বেরিয়ে এল। হাতে এক কাপ চা আর দুটো ডিশে পুডিং—

মেমসাহেব দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—আবার ভাবছো নাকি সেন?

দীপঙ্কর ধরা পড়ে গিয়ে হাসলো। বললে—না ভাবছি না, আর ভাববো না—

তারপর হঠাৎ মিস মাইকেলকে যেন বড় ভালো লোক বলে মনে হলো। কেন তাকে মেমসাহেব ডেকে আনলে, এত লোক থাকতে? কই, কেউ তো দীপঙ্করকে এত আগ্রহ করে ডাকে না! শুধু কি নিজের কথা বলবার জন্যে!

মেমসাহেব বললে—তাহলে মাইকেল কুল-কিনারা পাবে না সেন, তার চেয়ে খাও—

দীপঙ্কর বললে—তুমি নিজেই রান্না করো নাকি?

—নিজে রান্না করবো না তো কে করবে? কুক্? আমার একলার লাইফ, কুক রেখে কী হবে। আর আমি মাইনে কী পাই, তা তো তুমি জানো। আগে যখন ভিভিয়ান ছিল, তখন একদিন ভিভিয়ান রাঁধতো, একদিন আমি রাঁধতুম—

হঠাৎ বাইরে দোতলার ওপর কোথায় যেন খুব নাচ-গান আরম্ভ হলো। মাথার ওপর দুম দুম করে নাচছে কারা?

দীপঙ্কর বললে—কে নাচছে?

—ও কেউ না, ভাড়াটেদের বাড়ির মেয়েরা?

খাবার পর মেমসাহেব অনেকগুলো অ্যালবাম বার করলে। বেশ চামড়ায় বাঁধানো আলবাম। দীপঙ্কর ছবিগুলো দেখতে লাগলো। মিস্ মাইকেলের কত রকম ভঙ্গির ছবি সব। জোড়ায় জোড়ায় ছবি। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গি। কোথাও মিস মাইকেল গাউন পরেছে। কোথাও প্রায় সমস্ত শরীরটাই দেখা যায় শুধু, হয়ত কোমরে একটুখানি কাপড়ের টুকরো লেগে আছে। দীপঙ্কর দেখতে দেখতে একবার চোখ নামিয়ে নিলে। কান মুখ কপাল সব যেন তার ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। এসব ছবি কেন তাকে দেখাচ্ছে মেমসাহেব? ওপরে নাচের সঙ্গে গানও চলছে মনে হলো। দীপঙ্করের মনে হলো এখনি উঠে যায় সে! এ-সব ছবি তাকে দেখানো কী দরকার!

—কেমন সেন? হাউ ডু ইউ লাইক ইট? তোমার পছন্দ হয়?

কী আশ্চর্য! এরা কী! এদের একটু লজ্জাও নেই! একটু দ্বিধা-সঙ্কোচ কিছুই নেই!

—আচ্ছা সেন, আমার ফিগার ভাল না ভিভিয়ানের? সত্যি বলো তো?

দীপঙ্কর এতক্ষণে মুখ তুললে।

বললে—এসব আমাকে দেখাচ্ছ কেন মেমসাহেব? আমি তোমাদের ফিগারের কী বুঝি?

মেমসাহেব হেসে উঠলো। বললে, তুমি কখনও মেয়েদের সঙ্গে মেশোনি? তোমার কোনও লেডী-লাভ নেই?

মনে আছে, সেদিন মিস মাইকেলের ঘরে বসে দীপঙ্কর যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিল। যে-মিস মাইকেল আপিসে স্টেনোগ্রাফার, সে যেন এই মেয়ে নয়। মিস মাইকেল মানুষের এই পৃথিবীতে এসে যেন হেরে গিয়েছিল! অথচ যাত্রা শুরু করেছিল একদিন আর সকলের সঙ্গে। যৌবন ছিল সেদিন। তার জন্যে দলে দলে ইয়ং ম্যানরা এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতো। মোটরবাইক নিয়ে আসতো। সন্ধ্যেবেলা হলেই ভিড় করতো তারা নিচেয়। শিস দিত নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মেমসাহেব বললে—আমার তখন তোমার মত বয়েস, জানো সেন—

—সেই জন্যেই কি তুমি আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছ?

মেমসাহেব হাসলো। বললে—না, ডেকেছি, কারণ তুমি তবু বুঝতে পারবে—তারপর যখন তুমি বড় হয়ে যাবে, তোমার বয়েস বেড়ে যাবে, তখন তো আর বুঝতে পারবে না—

মেমসাহেবের ওপর আর ঘৃণা হলো না দীপঙ্করের। মেমসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যিই দেখলে মায়া হয়। এখন আর কেউ আসে না। এখন আর সেই আগেকার মত নিচে মোটরবাইক নিয়ে এসে কেউ শিস দিয়ে ডাকে না তাকে। এখন যারা আসে, তাদের লক্ষ্য অন্য জায়গায়।

মেমসাহেবের গলাটা করুণ হয়ে উঠলো বড়। বললে—এখন আর কেউ আসে না সেন—অবশ্য আসে এক-একজন মাঝে-মাঝে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কারা?

মেমসাহেব সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—আগে যারা আসতো, তারা আমার জন্যেই আসতো আর ভিভিয়ানের ফিগার তো দেখছো, ভিভিয়ানের সেই জন্যে হিংসে ছিল আমার ওপর—। আমি নিজে ভিভিয়ানকে কত ফ্রেন্ড জুটিয়ে দিয়েছি। ভিভিয়ানের জন্যে আমি কতদিন খারাপ করে সেজেছি—

তারপর হঠাৎ মেমসাহেব আলমারি খুলে একটা প্যাকেট বার করলে।

বললে—এই দেখ—

বেশ যত্ন করে সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা প্যাকেট। দামী জিনিসের মত তুলে রেখে দিয়েছে মেমসাহেব। প্যাকেটটা বার করতেই ভর্ ভর্ করে সেন্টের গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। আস্তে আস্তে মিস মাইকেল প্যাকেটটা খুললে। নানা রং-এর চিঠি। কত রকম বিচিত্র কাগজ। কত বিচিত্র ছবি আঁকা। কেউ লিখেছে 'মাই লাভ', কেউ লিখেছে 'ডিয়ারেস্ট', কেউ লিখেছে 'মাই সুইট'—কত যে বিচিত্র সম্বোধন।

মেমসাহেব বললে—এই চিঠিগুলো সব মাঝে-মাঝে খুলে পড়ি, জানো সেন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ি—পড়তে পড়তে আমার পুরনো কথাগুলো সব মনে পড়ে যায়—তখন যেন আবার পুরোন দিনে ফিরে যাই আমি—

মেমসাহেবের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। এ-ও একরকম মানুষ তো! কলকাতা শহরে কত লোকের কত রকম সমস্যা—কিন্তু এ-সমস্যার কথা সত্যিই দীপঙ্কর জানতো না। পাঁচশো তেত্রিশটা চিঠি। চিঠি যারা লিখেছিল, তারা কোথায় চলে গেছে, কেউ জানে না হয়ত! এরাই একদিন এই ফ্ল্যাট-বাড়ির তলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিস দিয়েছে। কেউ কেউ হয়ত আবার মিস মাইকেলকে মোটর-বাইকের পেছনে নিয়ে ঘুরিয়েছে। হোটেলে খাইয়েছে। নেচেছে। তারপর হয়ত অনেক রাত্রে আবার এইখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তখন হয়ত মিস মাইকেল নেশায় টলছে।

—এরা সব কোথায় গেল মিস মাইকেল?

মিস মাইকেল বললে—কখন যে সবাই কোন্ দিকে ছিটকে ছড়িয়ে গেল, তার হিসেব রাখবারও সময় পাইনি সেন, মাঝে-মাঝে এক-একজনের সঙ্গে দেখা হয়। সেদিন আর্থারের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ হগ মার্কেটে, সঙ্গে তার মিসেস রয়েছে, বেবীরা রয়েছে, আমি চিনেত পারলুম, কিন্তু আর্থার আমাকে চিনতেও পারলে না—অথচ—

—অথচ?

মিস মাইকেল বলতে লাগলো—অথচ ওই আর্থারের কত চিঠি আছে এর মধ্যে, ওই আর্থার আর আমি একবার ওর ফ্ল্যাটে সেভেনটি-টু আওয়ার্স একসঙ্গে কাটিয়েছি, একসঙ্গে খেয়েছি, একসঙ্গে জেগেছি, একসঙ্গে ঘুমিয়েছি, একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছি—

—তুমিও ড্রিঙ্ক করো নাকি মিস মাইকেল?

—ড্রিঙ্ক?

মিস মাইকেল খিল খিল করে হেসে উঠলো।—ড্রিঙ্ক করবো না? ড্রিঙ্ক না করলে কবে সুইসাইড্ করতুম সেন, আমি রোজ ড্রিঙ্ক করি, এই দেখ—

হঠাৎ উঠে গিয়ে মিস মাইকেল তার কাবার্ডটা খুলে একটা বোতল বার করলে। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—তুমি খাবে?

—না-না—দীপঙ্কর জোরে জোরে হাত নাড়লে।

আর-একটু হলেই মুশকিলে পড়েছিল দীপঙ্কর। হয়ত পীড়াপীড়ি করতো খুব।

তবু মেমসাহেব বললে—খাও না, একটুখানি খাও—দেখবে এ-খেলে তুমি তোমার সব ওরিজ্ ভুলে যাবে, সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারবে—খাও না—

অদ্ভুত লাগলো দীপঙ্করের। হেসে বললে—না, না—আমার কোনও ওরিজ নেই মেমসাহেব—আমার কোনও সমস্যাই নেই। যাদের নিয়ে আমার ভাবনা ছিল, তারা সবাই কোথায় চলে গেছে, সবাই ভুলে গেছে আমাকে—আমি আবার একলা হয়ে গেছি—

মেমসাহেব বললে—আমারই কি আগে কোনও ভাবনা ছিল? কোনও ভাবনা ছিল না! আমি আর ভিভিয়ান দিনরাত ফুর্তি করেছি, দিনরাত ড্রিঙ্ক করেছি তখন—তখন কি ভিভিয়ান জানতো যে, সে হবে ফিল্ম-স্টার, আর আমি রেলওয়ে আপিসে চিরকাল রট্ করবো—!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ভিভিয়ান তোমাকে এখনও চিঠি লেখে?

মেমসাহেব বললে—না সেন, এখন সে আমার কথা ভুলেই গেছে, এখন সে রেলওয়ের কথা ভুলেই গেছে—অথচ আমার জন্যেই সে আজ এত ফেমাস্ হতে পারলো, আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম বলেই সে আজ ফিল্ম-স্টার—

দীপঙ্কর মাথা নিচু করে দু-একখানা চিঠি আবার পড়তে লাগলো। কত ভালবাসার কথা রয়েছে চিঠিগুলোতে সব। কী আগ্রহ সকলের মিস মাইকেলের জন্যে! কত চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে, কত প্রেম-নিবেদন। পড়তে পড়তে দীপঙ্করের সত্যিই হাসি পেতে লাগলো। ভালবাসা বুঝি একেই বলে। কাছাকাছি থাকা, তবু দুবেলা চিঠি লেখা। চিঠি না পেলে মন খারাপ হয়ে যাওয়া। আর সেই চিঠিগুলো সিল্কের ফিতে জড়িয়ে যত্ন করে তুলে রাখা।

দোতলার ওপরে নাচ-গান তখনও চলছে।

দীপঙ্কর বললে—এবার উঠি মিস মাইকেল, তোমার অনেক দেরি করে দিলাম—

—না, আর একটু বোস।

বলে মিস মাইকেল চিঠিগুলো একে-একে আবার বেঁধে ফেললে ভাল করে। তারপর সেগুলো আলমারির ভেতরে তুলে রাখলে। আশ্চর্য, চিঠিগুলো অত যত্ন করে রেখে দিয়ে কী লাভ হবে মিস মাইকেলের! ওগুলো এখন আর কী কাজে আসবে!

—মেমসা'ব?

বাইরের দরজায় একটু আস্তে টোকা পড়লো। শুনেই মিস মাইকেল উঠলো। বললে—কে? কোন্ হ্যায়?

দরজাটা খুলতেই একটা লুঙ্গি-পরা ছেলে এগিয়ে এল। বললে—মেমসাব—একঠো সাব আয়া—

মিস মাইকেলের মুখখানা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললে—তুম যাও রহিম—যাও তুম—

রহিম তবু যায় না। দাঁড়িয়ে রইল মেমসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে। বললে—সাহেব এসেছে মেমসাহেব, খুব বড় আদমি, খুব বড় গাড়ি নিয়ে এসেছে—বিলিতি সাহেব।

মেমসাহেব বললে—তুই অন্য কোথাও নিয়ে যা সাহেবকে, আমার সময় নেই এখন—

তবু রহিম ছাড়ে না। বলে—সব মিসিবাবার ঘরে আদমী আছে মেমসাব, আজ কেউ খালি নেই—

—বেরো এখান থেকে, গেট আউট—

মিস মাইকেল হঠাৎ যেন রেগে আগুন হয়ে গেল। বললে—বলছি আমার সময় নেই, তবু কথা বলছে, বেরিয়ে যা—

এবার রহিমের মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে মিস মাইকেল। তারপর আস্তে আস্তে এসে আবার চেয়ারটায় বসলো। দীপঙ্কর দেখলে মেমসাহেবের মুখটা কেমন হয়ে গেছে যেন! হঠাৎ যেন কেউ অপমান করেছে মিস মাইকেলকে। খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলো না

মেমসাহেব।

দীপঙ্কর বললে—আমি তা হলে উঠি মিস মাইকেল—

মিস মাইকেল চোখ তুলে চাইতে পারলে না দীপঙ্করের দিকে। দুই হাত দিয়ে হঠাৎ নিজের মুখখানা ঢেকে ফেললে। তারপর খানিকক্ষণের জন্যে আর মুখই তুলতে পারলো না উঁচু করে।

বড় মুশকিলে পড়লো দীপঙ্কর। লজ্জাটা যেন মিস মাইকেলের নয়, দীপঙ্করের। হঠাৎ মেমসাহেবকে না-বলেও যাওয়া যায় না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দীপঙ্কর। মিস মাইকেলের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

—মিস মাইকেল—

মেমসাহেব এতক্ষণে মুখ তুললো। এরই মধ্যে চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে। ফুলে উঠেছে। অনেক ভিজে-ভিজে রয়েছে চোখের পাতাগুলো।

—মিস মাইকেল, এবার আমি উঠি?

মিস মাইকেলও দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তুমি যা দেখলে, তা ভুলে যেও সেন, ফরগেট ইট, প্লিজ—

বলতে বলতে মেমসাহেব আবার মুখ নিচু করে ফেললে। মুখ নিচু করেই বললে—আমাকে ভুল বুঝো না সেন, প্লিজ ভুল বুঝো না—চিরকাল আমি এমন ছিলুম না, এর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী নয়—দায়ী শুধু ভিভিয়ান, ভিভিয়ান আমাকে পাগল করে দিয়েছে সেন, শি হ্যাজ রুইন্ড মাই লাইফ—

বলতে বলতে আর সামলাতে পারলে না মিস মাইকেল। একেবারে দীপঙ্করের সামনেই চোখে রুমাল চাপা দিলে।

তারপর বোধহয় হঠাৎ আবার সম্বিৎ ফিরে এল। চোখ মুখ মুছে বললে—অলরাইট, তুমি আজ আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ—কালকে আবার আপিসে দেখা হবে।

দীপঙ্করের কিছু বলবার ছিল না। বলতে পারলেও না। সমস্ত ঘটনাটা যেন একটা স্বপ্নের মত ঘটে গেল। হয়ত এ-পাড়ার জীবনে এ-ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক। এখানে এমন ঘটনা রোজকার। তবু সব দেখে যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। যে-মেমসাহেবকে রোজ আপিসে দেখে, এ যেন সে-মেমসাহেব নয়। কবেকার কোন্ বন্ধুর ভাগ্যের উন্নতিতে মেমসাহেব যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। একজন যশের শিখরে উঠে গেছে অদৃশ্য এক ভাগ্যের দোলাতে, আর অন্য একজন এখানেই পড়ে আছে তার ভাঙা অদৃষ্টের সমস্ত হাহাকার নিয়ে। এও কি কম ট্রেজেডি! তবু দীপঙ্কর এখানে আজ এসেছিল বলেই তো এমন করে

জীবনের আর-একটা দিক দেখতে পেলে! সেই কালিঘাট বাজারের পেছনে ছিটে-ফোঁটার যে-জীবন, এখানে এই কলকাতা শহরের একেবারে কেন্দ্রেও যেন সেই জীবনেরই পুনরাবৃত্তি দেখে গেল দীপঙ্কর। অথচ সেই কালিঘাটের বাজারের জগতে যারা নিঃশব্দে বিচরণ করে তারা মানুষের চোখে ঘৃণ্য বলে ঘোষিত হয়। আর এখানে, এই সভ্য জগতে যারা আসে তারা সম্ভ্রান্ত, তারা চিহ্নিত। তফাৎ শুধু এইটুকুই যে সেখানে যৌবনের বাজি খেলা চলে গোপনে, আর এখানে সশব্দে সগৌরবে, উচ্চ ঘোষণা করে! নির্লজ্জ, সদম্ভ এখানকার কারবার।

কিন্তু তখনও হয়ত দীপঙ্করের দেখবার সামান্য কিছু বাকি ছিল।

বাইরে দরজার কড়াটা আবার নড়ে উঠলো। বেশ সচকিত শব্দ এবার। বেশ উচ্চারিত!

আবার বোধ হয় রহিম এসেছে। অনুনয়ে, বিনয়ে আবার হয়ত মিস মাইকেলকে রাজী করাতে এসেছে।

—কে? কৌন হ্যায়?

চীনে পাড়াতে লক্ষ্মীদিকেও একদিন এমনি করে আগন্তুক সামলাতে হয়েছে। মিস মাইকেলের ঘরে দাঁড়িয়ে সেই দিনকার কথাগুলো মনে পড়লো দীপঙ্করের।

মিস মাইকেল বললে—একটু দাঁড়াও সেন। দেখি কে ডাকছে—

দরজাটা খুলতেই দীপঙ্কর যেন সামনে ভূত দেখলে।

মিস্টার ঘোষাল!

পেছনেও যেন আর একজন কে রয়েছে। অন্ধকারে ভাল করে দেখা গেল না তার মুখটা।

দীপঙ্করকে দেখেই মিস্টার ঘোষাল এগিয়ে এল। বললে—হ্যাল্লো, আমি তোমাকে চিনি মনে হচ্ছে—

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমি দীপঙ্কর সেন, ক্লাপান-ট্র্যাফিক ক্লার্ক—

—হোয়াট্ ব্রট ইউ হিয়ার? তুমি এখানে কী করতে?

দীপঙ্করকে এর উত্তর দিতে হলো না। মিস মাইকেলই বুঝিয়ে দিলে। রাইটার্স বিল্ডিংএ গুলিচালানোর জন্য মেমসাহেব নিজেই সেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সেন আসতে রাজী হয়নি। বলতে গেলে মেমসাহেবের পীড়াপীড়িতেই সেন এখানে এসেছে স্যার।

—আই সী!

বোধহয় বেশি সময় ছিল না মিস্টার ঘোষালের হাতে। ভারি ব্যস্ত-ত্রস্ত ভাব। যেন একটু আগেই কোথা থেকে ঘুরে এসেছে। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। মিস মাইকেলকে হঠাৎ বাইরে ডেকে নিয়ে গেল মিস্টার ঘোষাল। দীপঙ্কর একলা বসে রইল ঘরে। বাইরে নিচু গলায় কী যেন সব কথা হতে লাগলো ওদের।

দীপঙ্কর চুপ করে বসে বসে ঘামতে লাগলো!

এখানে কেন এল মিস্টার ঘোষাল। এত জায়গা থাকতে এই মিস মাইকেলের বাড়িতে! যে-লোক আপিসে এত গম্ভীর হয়ে কথা বলে, সে-ই এখন হেসে কথা বললে দীপঙ্করের সঙ্গে! কী অদ্ভুত লোক! কী আশ্চর্য চরিত্র!

হঠাৎ মিস মাইকেল আবার ঘরে ঢুকেছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার ঘোষাল চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—এখানে কেন এসেছিল, তোমার কাছে?

মেমসাহেব হাসলো। বললে—ও এসেছিল গার্লস্ খুঁজতে—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—সে কি? গার্লস্?

—এখানে, ওপরে নিচে সব ঘরে গার্লস্ পাওয়া যায় কিনা! আজকে কোথাও কিছু পাচ্ছিল না, তাই আমি যোগাড় করে দিয়ে এলাম! মিস্টার ঘোষাল যে ব্যাচিলর—বিয়ে করেনি, এই কাছেই 'প্যালেস্ কোর্টে' থাকে!

কিছুক্ষণ দীপঙ্করের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

তারপর উঠলো। বললে—আমি আসি তাহলে মিস মাইকেল—

—অলরাইট, কালকে আবার দেখা হবে!

তিন-চার তলা উঁচু বাড়ি। মিস মাইকেলের ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি। কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। ওঠবার সময় নজরে পড়েনি দীপঙ্করের। মিস মাইকেলের সঙ্গেই চলে এসেছিল। বাইরে বেরিয়েই কেমন ভয় করতে লাগলো। বিরাট চওড়া কাঠের সিঁড়ি। ওপরে নিচে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সর্বত্র যেন অনেক লোকের ভিড়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সব ঘরের ভেতর থেকে গান বাজনা নাচের শব্দ হচ্ছে। ছোট ছোট সুরের টুকরো. অচেনা গন্ধে সমস্ত জায়গাটা জম-জমাট! একতলার সিঁড়ির পাশের ঘরের পর্দাটা একটু ফাঁক করা ছিল। ভেতরে নজর যেতেই দেখলে একদল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ঝলমল্ করছে, কিলবিল্ করছে। সিল্ক আর সেন্টের ছড়াছড়ি। এ কোথায় তাকে নিয়ে এসেছে মিস মাইকেল।

হঠাৎ পেছনে দুম্ দুম্ করে অনেকগুলো পায়ের শব্দ হলো। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যেন কয়েকজন নামছে। দীপঙ্কর সরে গিয়ে দাঁড়াল একটা কোণে।

আর তারপরেই একদল লোক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। দুজন মেয়ে আর দুজন......

কিন্তু দীপঙ্কর আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। মিস্টার ঘোষাল আর অনন্তবাবু! অনন্তরাও ভাবে! দুজনেই দুটো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলেছে।

রাস্তার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। দীপঙ্কর চিনতে পারলে। মিস্টার ঘোষালের গাড়ি। চারজনেই গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসলো। তারপর একটা যান্ত্রিক আর্তনাদ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের চোখে মুখে এসে ছিটকে পড়লো পেট্রলের ধোঁয়া আর চারজনের অশ্লীল হাসি!

এ কোন্ জগতে এসে পড়েছে দীপঙ্কর! এরা কোথাকার জীব! সেই কিরণের সঙ্গে দেখা কলকাতার সঙ্গে এ তো মিলছে না! এ তো অন্য জগৎ। এখানকার স্বরাজ তো তারা চায়নি। ওই যারা বোমা রিভলবার নিয়ে টেগার্ট সাহেবকে খুন করবার চেষ্টা করছে, যারা রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে কর্নেল সিম্‌সনকে গুলি করলে, যাদের সদ্‌গতির জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত মনুমেন্টের তলায় এসে লেকচার দিলেন, তাদের সঙ্গে এদের যোগসূত্র কী? এদের মুক্তির জন্যেই কি ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো! এদের জন্যে ভেবে-ভেবেই কি সি আর দাশ জীবন দিলেন নাকি! এদেরই জন্যে গোপীনাথ সাহা, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, যতীন দাস আত্মত্যাগ করলে? হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দীপঙ্করের মনে হলো এখনই কিরণের সঙ্গে দেখা হলে যেন ভাল হতো! কিরণকে বুঝিয়ে দিত—তুই যাদের জন্যে এত কষ্ট করছিস্ কিরণ, তারা অনন্তরাও ভাবে—। স্বরাজ হলে ওদেরই সুবিধে হবে। ওরাই মাথায় চড়ে বসবে তখন, দেখিস্!

মাইনের টাকাটা জামার বুক পকেটে রয়েছে।

সেই জন-বহুল রাস্তাটার ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। কালিঘাটের বাজারের যে-সমাজ, সেখানকার অধঃপতনকে তবু যেন ক্ষমা করা যায়। সেখানে অজ্ঞতাকে মূলধন করে তারা জীবনের ফাটকা বাজারে জুয়া খেলতে নেমেছে। হোক তারা পাপী। সে তবু অজ্ঞানতার পাপ। যেদিন কিরণের চাওয়া স্বরাজ আসবে, সেদিন তারা কাড়াকাড়ি করে সামনের সারিতে দাঁড়াবার প্রতিযোগিতায় নামবে না। কিন্তু এই সমাজ? এরাই তো সেদিন ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরাকাষ্ঠার প্রশংসা করে লেকচার দেবে! এরাই তো সেদিন দেশ-সেবকের প্রাপ্য ফুলের মালাটা আগে-ভাগে এসে গলায় পরবে!

একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। দীপঙ্কর ট্যাক্সিটাকে ডেকে উঠে পড়লো।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করলে—কাঁহা সাব?

ট্যাক্সিওয়ালা ভেবেছিল হয়ত পার্ক স্ট্রীট, কিংবা ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কিংবা ওই রকম কোনও রাস্তার নাম করবে বাঙালী সাহেব। কিন্তু দীপঙ্কর বললে—কালিঘাট—

হু হু করে চলতে লাগলো ট্যাক্সিটা। ছোট বেলায় এক-একদিন কিরণ আর

দীপঙ্কর দূর থেকে এ-পাড়াটার দিকে চেয়ে দেখেছিল। সেদিন ভারি আপসোস হয়েছিল মনে মনে। ভেবেছিল এদের মধ্যেই বুঝি মানুষের সব সমস্যার সমাধান-গুলো লুকিয়ে আছে। মানুষ সুস্থ মনে স্বাভাবিক হলে যা হয়, তা বুঝি এই। বড় বড় বাড়ি, ভাল ভাল পর্দা, ভাল ভাল খাবার, বিলাস, ঐশ্বর্য—এ-ই বুঝি মানুষের কামনার শেষ ধাপ! এখানে পৌঁছতে পারলেই বুঝি আর কিছু চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে দীপঙ্কর আবার বাড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে। মিস মাইকেলের ঘরের পর্দার মত পর্দা ঝুলছে এখানকার জানলায়। মিস মাইকেলের ঘরের মত বাতি ঝুলছে এখানকার সিলিং-এ। হয়ত এ-বাড়িগুলোর ভেতরে এ-বাড়ির মেয়েরা মিস মাইকেলের মত সিল্কের ফিতে দিয়ে লাভ-লেটার্সগুলো বেঁধে যত্ন করে তুলে রাখে। এরাও বোধহয় মিস মাইকেলের মত মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। বাইরে থেকেই শুধু চেনা যায় না!

চলতে চলতে ট্যাক্সিটা হাজরা রোড দিয়ে মন্দিরের দিকে ঢুকছিল—

দীপঙ্কর লাফিয়ে উঠলো। বললে—কালিঘাট নয় সর্দারজী, গড়িয়াহাট চলো, গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং—

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা একটু অবাক হলো। হয়ত ভাবলে বাঙালী সাহেব অপ্রকৃতিস্থ। তা ভাবুক। এখনি লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে একবার দেখা করা ভাল। লক্ষ্মীদিকে তার অনন্তবাবুর কাণ্ডটা বুঝিয়ে বলা দরকার। অন্তত লক্ষ্মীদি বুঝতে পারুক কার ওপর নির্ভর করে আছে লক্ষ্মীদি। কী রকম চরিত্রের লোক সেই অনন্তবাবু! কী জঘন্য চরিত্রের লোক!

লেভেল-ক্রসিং-এর গেটটা খোলাই ছিল। এখন আর কোনও ট্রেন নেই বোধহয়। ট্যাক্সিটা লাইনের ওপর উঠতেই দীপঙ্কর অন্ধকারে চিনতে পেরেছে। দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠলো—রোখো রোখো—

ক্রসিং পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ট্যাক্সিটা ব্রেক কষে থেমে গেল।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়েই দৌড়ে কাছে এল। বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি এখানে?

লক্ষ্মীদি লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল একা। মুখটা শুকনো। চুল বাঁধেনি আজ। টিপ্ পরেনি।

—তুমি একলা এখানে কী করছো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদিও দীপঙ্করের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। বললে—তুই যে হঠাৎ? তোর মনিব্যাগটা নিতে?

—না, সেজন্যে নয়, অন্য একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। তা তুমি এখানে কেন এখন? এই রাত্তির বেলা

লক্ষ্মীদি বললে—শম্ভু হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেছে—জানিস, বড় ভাবনায় পড়েছি—কখন যে বেরিয়ে গেল টেরই পাইনি, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এই এখন তাকে কোথায় খুঁজে পাবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তা জানি না, কিন্তু মানুষটা কোথায় গেল তাই ভাবছি। শেষে কিছু ঠিক করতে না পেরে বেরিয়ে পড়লাম—

দীপঙ্কর বললে—চলো চলো, কী আশ্চর্য এই সময়ে একলা-একলা এই রকম করে বেরোতে আছে! আমি যদি এখন না আসতুম—

লক্ষ্মীদির দৃষ্টিটা যেন চঞ্চল। সেই অন্ধকার লেভেল-ক্রসিং-এর গেটের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীদিকে যেন বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। সত্যিই তো, দীপঙ্কর যদি এই সময়ে না-আসতো লক্ষ্মীদি হয়ত একলাই বেরিয়ে যেত এমনি করে!

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—কোথায় যাবে তুমি?

লক্ষ্মীদি বললে—চল না, ওই দিকটা দেখে আসি একটু, কত দূরে আর যেতে পারে, এই হয়ত ওইদিকে একটুখানি দূরে গেছে—আয় না তুইও আয় না আমার সঙ্গে, তুই সঙ্গে থাকলে তবু একটু করে খুঁজতে পারবো—

—কিন্তু কতক্ষণ বেরিয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—এই তো আমি রান্না করছিলুম, অতটা খেয়াল ছিল না আমার, হঠাৎ নজরে পড়লো দেখি দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছি—তারপর যা ভেবেছি তাই, দেখি ঘর ফাঁকা—

লক্ষ্মীদির সঙ্গে দীপঙ্করকেও চলতে হলো। খানিকটা এগিয়েই বুদ্ধ-মন্দির। সরু সরু গলি রাস্তা। দুপাশে পোড়ো জমি আর আগাছা। তারপরেই লেক। মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্যাসের আলো জ্বলছে। তাও অনেক দূরে-দূরে। এ অন্ধকারে তেমন স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। কোথায় অনেক দূরে একটা লোক অস্পষ্ট ছায়ার মত নড়ছে, দূর থেকে তাকে চেনাই মুশকিল। সেদিন তো কালিঘাটের শ্মশানেই গিয়ে হাজির হয়েছিল। আজও যদি সেখানে যায়? অত দূরে চলে গেলে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে! পাগল মানুষ, তার তো কোনও খেয়ালের ঠিক-ঠিকানা নেই। যেখানে খুশি যাবে। হয়ত পুলিসেও ধরতে পারে।

দীপঙ্কর বললে—তোমারই তো অন্যায়, তুমি একটু দেখতে পারো না?

লক্ষ্মীদি কিছু বললে না। শুধু আগে আগে চলতে লাগলো। একটা অনির্দিষ্ট ছায়ার অনুসরণ করে। দীপঙ্করও পেছন-পেছন চলছিল। সারাদিন আপিসের কাজ নিয়ে কেটেছে, তারপর মিস মাইকেলের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা বাড়িতে যাওয়ারই তো তার কথা। তা হলে কেন হঠাৎ এখানে চলে এল দীপঙ্কর! কী দরকার ছিল তার এখানে আসার।

—ওই যে, ওই বোধহয় শম্ভু!

লক্ষ্মীদি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল একলাই। সমস্ত লেকটা জনহীন। দীপঙ্করের ভয় করতে লাগলো। এত রাত্রে লক্ষ্মীদির মত মেয়েকে নিয়ে এখানে ঘোরাফেরা কি উচিত। এখানে কত কী কাণ্ড হয়, শুনেছে দীপঙ্কর। রাত গভীর হলেই নানারকম বদ লোক এসে জোটে এখানে।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীদির পাশে এগিয়ে গেল। দূরে একটা গ্যাসের নিচে দিয়ে যেন দাতারবাবু আস্তে আস্তে এলোমেলোভাবে চলেছে। লক্ষ্মীদির মুখে কথা নেই। হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু সামনে গিয়েই ভুলটা ধরা পড়লো। একজন হিন্দুস্থানী খাওয়া-দাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়েছেন।

দীপঙ্কর বললে—দেখলে তো? এ রকম করে কি তাঁকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

লক্ষ্মীদিও সত্যিই হতাশ হয়ে গিয়েছিল। কোন কথা বললে না।

দীপঙ্কর বললে—চলো, ফেরো, এমনভাবে খুঁজলে পাবে না, বরং থানায় একটা খবর দেওয়া ভালো—

শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দীপঙ্কর লক্ষ্মীদিকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। চারিদিকে বেশ অন্ধকার। আশে-পাশের নর্দমায় তখন ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকছে। লক্ষ্মীদি তখনও অন্যমনস্ক ছিল। লেক পেরিয়ে সোজা বুদ্ধ মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা।

লক্ষ্মীদি বললে—জানিস দীপু, আজ বুঝতে পারি, আমার জন্যেই শম্ভুর এই অবস্থা—আমি না থাকলে হয়ত ওর এ-অসুখটা হতো না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু ও-লোকটাকে তুমি কেন তোমার কাছে থাকতে দাও লক্ষ্মীদি—? ও-লোকটা কেন তোমাদের কাছে থাকে? জানো, ও লোকটা ভাল নয়?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণে মুখ তুললো। বললে—কেন?

দীপঙ্কর বললে—তুমি কিছু মনে কোরি না, কালকে তুমি চিঠি লিখেছিলে বলেই এসেছিলুম, তুমি বলেছিলে বলেই আমি অনন্তবাবুকে আজকে আপিসে যেতে বলেছিলুম—

—তা যায়নি তোর কাছে?

দীপঙ্কর বললে—গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কাজটা পেয়েছে তো?

দীপঙ্কর বললে—তা জানি না। হয়ত পেয়েছে, হয়ত পায়নি। কিন্তু মাঝ-খান থেকে আমি রবিনসন্ সাহেবের কাছে লজ্জায় পড়লুম। তোমার কথা ভেবেই আমি সাহেবকে বলে রেখেছিলুম। সাহেবও রাজী ছিল, কিন্তু দেখি অনন্তবাবু আপিসে গিয়ে সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে গেল—

—সে কি রে?

দীপঙ্কর বললে—বললে তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না। না-দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আশ্চর্য, আমি ডাকলুম অনন্তবাবুকে। আমি নিজের কাজ ফেলে সমস্ত দিন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনন্তবাবুর জন্যে, অথচ যেন

চিনতেই পারলে না, অথচ আমার নিজেরই যেন গরজ, যেন আমার নিজেরই কাজ—

লক্ষ্মীদি বললে—তা অনন্ত তোকে দেখে কী বললে?

—আমি ডাকলুম, আমাকে দেখলে অনন্তবাবু, তবু যেন চিনতেই পারলে না। সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে ঢুকে গেল। অথচ সাহেবকে আমি বলে রেখেছিলুম। রবিনসন্ সাহেব আমাকে কথা দিয়েছিল, একটা পয়সা লাগতো না আমার কাছে গেলে—

লক্ষ্মীদি বললে—যাক গে, তুই কিছু মনে করিসনি, নিশ্চয় মিস্টার ঘোষাল কম টাকা নিতে রাজী হয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু হলোই-বা কম টাকা, কেন ঘুষ দিতে যাবে? জানো, আমার নিজের চাকরি হয়েছে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে। সে-কথা আমি এখনও ভুলতে পারি না—

লক্ষ্মীদি বললে—সংসারে তোর মত লোক তো সবাই নয়, এ দুনিয়াটাই মন্দ; এই মন্দর রাজ্যে মন্দ না-হলে লোকে বাঁচবে কী করে? কী করে টিঁকে থাকবে মানুষ?

তারপর দীপঙ্করের পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো লক্ষ্মীদি।

বললে—সবাইকে নিজের মতন ভাবিসনি তুই, এ-সংসারে ভালোও আছে, মন্দও আছে—মন্দই বেশি, সবাইকে নিয়েই যখন ঘর করতে হবে, তখন মন-খারাপ করলে চলে?

চলতে চলতে লেভেল-ক্রসিংটার কাছে এসে পড়েছিল।

দীপঙ্কর বললে—মন খারাপের কথা বলছো, তোমার ব্যাপার দেখেও তো আমার মন খারাপ হয়।

—আমার ব্যাপার? আমি আবার কি করলুম?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ভাবো তো, কতখানি অন্যায় করছো তুমি দাতারবাবুর ওপর?

লক্ষ্মীদি বুঝতে পারলে না কথাটা। হাঁ করে চেয়ে রইল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—দোষ কি তোমার একটা? তোমার হাজার দোষ! তুমি সতীকে কষ্ট দিয়েছ, তুমি তোমার বাবাকে কষ্ট দিয়েছ, তুমি দাতারবাবুকেও কষ্ট দিচ্ছ—

লক্ষ্মীদি হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—হেসো না, হাসতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যখন ছোট ছিলাম তখন বুঝতে পারতুম না। তখন ভাবতুম সবাই বুঝি তোমাকেই কষ্ট দেয়, সবাই বুঝি তোমার ওপরেই অত্যাচার করছে, পীড়ন করছে—। সেদিন তোমার কষ্টের জন্যেই আমার কষ্ট হয়েছে। সকলের কাছে তোমার কষ্টের কথা বলেছি, এখন দেখছি আমারই ভুল—

—কেন, ভুল কেন?

—ভুল নয়? ও-লোকটা তোমার কে? ওর জন্যেই তো দাতারবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে তোমার এত কিসের সম্পর্ক? কেন ওর টাকা নিয়ে তুমি সংসার চালাও?

লক্ষ্মীদি আবার হাসলো। বললে—এই জন্যে তোর এত রাগ?

—আমার কেন রাগ হতে যাবে লক্ষ্মীদি! রাগ আমার হয় না, আমার দুঃখ হয় তোমার জন্যে। তুমি তোমার বাবার টাকা, সুখ আরাম সব ত্যাগ করে এলে কি এই জন্যে? এই অনন্তবাবুর সঙ্গে এক ঘরে থাকবার জন্যে? জানো, অনন্তবাবু কী জঘন্য চরিত্রের লোক?

লক্ষ্মীদি বললে—তুই সত্যিই রেগে গেছিস দেখছি, চুপ কর তুই—

দীপঙ্কর বললে—চুপ করবো না, তোমাকে আমি সব কথা বলে তবে যাবো, আর এই কথা বলতেই এসেছি এত রাত্রে—নইলে আমি তো বাড়িতেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কথাগুলো তোমাকে বলতে এলাম—ভাবলাম, তুমি হয়ত জানো না, তোমাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার—

লক্ষ্মীদি বললে—বল, তুই কী বলবি?

দীপঙ্কর বললে—জানো, অনন্তবাবু মদ খায়?

লক্ষ্মীদি হেসে উঠলো শব্দ করে। বললে—খায় তো খায়, তাতে কী?

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে। দীপঙ্কর ভেবেছিল কথাটা বলে লক্ষ্মীদিকে চমকে দেবে! অথচ লক্ষ্মীদি এত সহজ ভাবে নিল কথাটা!

লক্ষ্মীদি বললে—মদ তো খাবার জিনিস, খাবে না?

—তুমি বলছো কি?

লক্ষ্মীদি বললে—তোর বয়েস বাড়লে কী হবে দীপু, তুই দেখছি এখনও সেই ছেলেমানুষ আছিস। তুই হাসালি আমাকে, অনন্ত মদ খায় তুই জানতিস না? মদ তো শম্ভুও খায়। আর তাছাড়া মদ খেলেই লোক খারাপ হয়ে গেল একেবারে?

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ হাঁ করে। লক্ষ্মীদি বলছে কী! সেই লক্ষ্মীদি এখন কোথায় এসে নেমেছে! এত অধঃপতন হয়েছে লক্ষ্মীদির!

লক্ষ্মীদি বললে—অনন্ত মদ খায়, এই কথাটা বলতেই তুই এত রাত্তির কষ্ট করে আমার কাছে এলি? কেন, তুই বুঝি নিজে মদ খাস না?

দীপঙ্কর বললে—আমি মদ খাবো?

—কেন, খেলে কী হয়েছে? তোর এখনও এই সব গোঁড়ামি রয়েছে? তুই কি এখনও মানুষ হলি না দীপু? আর কবে হবি?

বলে লক্ষ্মীদি সেই রাস্তার ওপরেই বেদম হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। কোনও কথা বলবার মত প্রবৃত্তিও হলো না তার।

লেভেল-ক্রসিংটার ওপর এসে লক্ষ্মীদি বললে—অনেক রাত হলো, তুই এবার বাড়ি যা, তোর মা হয়ত ভাবছে—

দীপঙ্কর বললে—মা তো ভাবছেই, কিন্তু দাতারবাবু যদি আজ রাতে আর না ফেরে?

লক্ষ্মীদি বললে—আগেও কয়েকদিন শম্ভু বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে—ফিরে আসবেখন, তুই যা—

দীপংকর বললে—চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি নিজেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবো—তোর ভয় নেই—

দীপঙ্কর বললে—ভয় তোমার জন্যে নয় লক্ষ্মীদি, ভয় আমার নিজের জন্যেই।

—কেন?

দীপংকর বললে—আজ অনন্তবাবুকে এমন জায়গায় দেখলুম, আর এমন-ভাবে দেখলুম, সে-কথা বললে তুমিও অনন্তবাবুকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে, জানো, এর পরে আর কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় অনন্তবাবুকে—

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—সে এক জঘন্য জায়গায়! অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাড়ায়—মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে—সঙ্গে দেখলাম, দুটো মেয়ে রয়েছে আবার, আমি ওদের দেখে লুকিয়ে পড়লাম—

—অনন্ত কী করতে গিয়েছিল সেখানে?

—তা কী করে জানবো। তবে সেখানে যে-জন্যে সবাই যায়, সেই জন্যেই গিয়েছিল। ছি, ব্যাপারটা দেখবার পর থেকে আমার ঘেন্না হয়ে গেল অনন্ত-বাবুর ওপর। আর তাই বলতেই তোমার কাছে এলাম!

লক্ষ্মীদি চুপ করে রইল।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—সেই জন্যেই তোমাকে বলতে এলাম, তোমার টাকার দরকার থাকে তুমি আমাকে বলো, আমি তোমাকে মাসে মাসে সংসার খরচের সব টাকা দেব, কিন্তু অনন্তবাবুকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও, ও-সব লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াও উচিত নয়—

লক্ষ্মীদি এবারও কোনও জবাব দিলে না।

দীপঙ্কর আবার বলতে লাগলো—তুমি হয়ত ভাবছো আমি অনন্তবাবুর বিরুদ্ধে এত বলছিই বা কেন? তাতে আমার কী স্বার্থ? কিন্তু আমার স্বার্থ তোমার আর দাতারবাবুর জন্যে—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু আমাকে তো সংসার চালাতে হবে—

দীপঙ্কর বললে—তোমার সংসার আমি চালাবো।

লক্ষ্মীদি বললে—দূর, শুধু তো সংসার চালানো নয়, শম্ভুর চিকিৎসাও আছে, শম্ভুকে ডাক্তার দেখানোর খরচও তো আছে—

দীপঙ্কর বললে—কত টাকা তোমার দরকার বলো? তুমি বলো তোমার কত টাকা দরকার মাসে মাসে?

লক্ষ্মীদি বললে—তা ছাড়া আমি তোর টাকাই বা নেব কেন? তোর মা-ই বা কী ভাববে?

দীপঙ্কর বললে—আপিসের মাইনেটা আমি মাকে দেব, তার বাইরে সকালে সন্ধ্যেয় না হয় আমি টিউশনি করবো তোমার জন্যে!

লক্ষ্মীদি বললে—না সে হয় না—

—কেন হয় না? টাকার জন্যেই যদি তোমার অনন্তবাবুকে এত দরকার, তাহলে আমিই তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তোমার সব খরচ আমি দেব, এমন কি দাতারবাবুর চিকিৎসার খরচও আমি দেব! আর তা ছাড়া এমন একটা ওষুধ আছে যেটা মাখালে এখনি দাতারবাবু ভাল হয়ে যায়—জানো—

—কী ওষুধ?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি ওষুধ দিলে সে ওষুধ তো মাখাবে না তোমরা! অনন্তবাবু যে-রকম লোক সে তো চাইবেই যে দাতারবাবুর অসুখটা না-সারুক—

—কী ওষুধ-তাই-ই বল্ না?

দীপঙ্কর বললে—আমাদের আপিসের এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর পাঁচ বছর ধরে মাথা-খারাপ ছিল, শেষে এই ওষুধটা মাখিয়ে ভাল হয়ে গিয়েছে—। শুধু ওষুধ কেন, তোমাদের খাওয়া-পরা, তোমাদের বাড়ি ভাড়া, তোমাদের যাবতীয় খরচ সব আমি দিতে পারি, তার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না! আর তাছাড়া আমি শীঘ্র একটা বড় প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছি—রবিনসন সাহেব আমাকে ডি-টি-আই করে দিচ্ছে—

চলতে চলতে আরো অনেক দূর চলে এসেছিল দুজনে।

দীপঙ্কর বললে—আর বাড়ির কথা বলছো, আমাদের অঘোরদাদুর বাড়িটা তো এখনও খালি পড়ে রয়েছে, সেই যেদিন থেকে কাকাবাবু কাকীমা চলে গেছে, তারপর থেকে আর কোনও ভাড়াটে আসেনি—সেই বাড়িতে গিয়েই তো তুমি উঠতে পারো—

—সে তো অনেক ভাড়া?

—ভাড়ার কথা তুমি ভাবছো কেন? ভাড়া তো দেব আমি! আর আমি বললে ও-বাড়ির ভাড়া অঘোরদাদু পনেরো টাকাও করে দিতে পারে—অঘোর-দাদু আমাকে খুব ভালবাসে—! আর অঘোরদাদু যদি নাও থাকে তো ছিটে-ফোঁটাও আমি ভাড়া নিলে কিছু বলবে না। যত খারাপ ভাবো ওদের আসলে

তত খারাপ নয় ওরা—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তুই-ই বা কেন অত করতে যাবি আমাদের জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব কথা তোমার ভাববার দরকার কী? তোমার টাকা পেলেই তো হলো?

লক্ষ্মীদিও যেন রাজী হলো দীপঙ্করের কথায়। কেমন যেন ভাবতে লাগলো কথাটা। সত্যিই তো ওখানে থাকলে দীপঙ্করের কাছে হবে, দীপঙ্কর সময়ে সময়ে দেখতে পারবে। দাতারবাবুর চিকিৎসা করতে সুবিধে হবে।

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের কিছু করতেই হবে না, আমি আছি, আমার মা রয়েছে, বিন্তীদি আছে, আর ওটা তোমাদের পুরোন পাড়া, ওই পাড়াতে তুমি এতদিন কাটিয়েছ, তোমার কোনও অসুবিধেই হবে না, তুমি চলো লক্ষ্মীদি। এখানে একলা তুমি থাকতে পারবে না! আমি তো তোমাকে সেদিনই সেই বৌবাজারেই বলেছিলুম চলে আসতে—

—আর অনন্ত?

লক্ষ্মীদি যেন অনন্তবাবুর নামটা উচ্চারণ করতেও ভয় পাচ্ছিল। বললে—ওকে কী বলবো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ওকে এত ভয় করো?

লক্ষ্মীদি বললে—ভয় নয়, কিন্তু এতদিন আমাদের দেখাশোনা করলে, আমাদের এত টাকা দিয়ে উপকার করলে। এখন তাকে কী বলবো?

দীপঙ্কর বললে—বলবে, এতদিন তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ, এর জন্যে তোমার ওপর আমরা কৃতজ্ঞ—। আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না!

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তুই তো জানিস না, ওর উপকার জীবনে ভোলবার মত নয়। ও না-থাকলে আমরা উপোস করে মরে যেতাম—। আমাদের বিপদের সময়ে ও যা করেছে, কোনও মানুষ তা করে না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু উপকার যা কিছু করেছে, সে তো ওর নিজেরই স্বার্থে!

—কেন? স্বার্থ কিসের?

লক্ষ্মীদি মুখ তুলে চাইলে দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না, কিসের স্বার্থ?

—না জানি না!

দীপঙ্কর বললে—নিজের মনকে এমন করে তুমি চাপা দিতে চেষ্টা কোর না। ওকেই বলে মনকে চোখ ঠারা। কিন্তু যাদের চোখ আছে তাদের তুমি কী বলে বোঝাবে? কী বলে জবাবদিহি করবে?

লক্ষ্মীদি বললে—কিসের জবাবদিহি?

লক্ষ্মীদি তখনও যেন বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

দীপঙ্কর বললে—তুমি জান না, কেন তোমাদের জন্যে অনন্তবাবু এত করে?

কিসের লোভে? কিসের লোভে অনন্তবাবুর দরদ তোমার ওপর? তোমার কাছে কি কিছুই পায় না অনন্তবাবু? দাতারবাবুর পাগল হওয়ার পেছনে কি অনন্তবাবুর কোনও হাত নেই? দাতারবাবু যে ব্যবসা করতে গিয়ে এমন করে লোকসান খেয়ে গেল, এর পেছনেও কি অনন্তবাবুর কোনও কারসাজি নেই বলতে চাও?

লক্ষ্মীদি চুপ করে চলতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে দেখতে সুন্দর, তোমার রূপ আছে, আয়নাতে কি সেটাও তুমি দেখতে পাও না? অনন্তবাবু আর কতটুকু দিয়েছে তোমাকে? কতটুকু উপকার করেছে? তোমার রূপের জন্যে এর চেয়েও বেশি উপকার করবার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে, এটা তুমি বিশ্বাস করো?

লক্ষ্মীদি হঠাৎ মুখ টিপে হেসে ফেললে। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

বললে—হ্যাঁরে, তোরও বুঝি সেই জন্যে আমার উপকার করার এত আগ্রহ?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা আলাদা—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, আলাদা কেন? তুইও তো পুরুষ মানুষ।

খানিকক্ষণ দীপঙ্করের মুখে আর কোনও কথা বেরোল না। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির পাশ থেকে একটু সরে এল।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে।

বললে—লজ্জা করছিস কেন? বল্ না—

দীপঙ্কর হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু লক্ষ্মীদি খুব শক্ত করে হাতটা ধরে ফেলেছে।

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—আমার কাছ থেকে তুই হাজার চেষ্টা করলেও পালাতে পারবি না,—আয়, বাড়ির ভেতরে আয়—

বাড়ির কাছে গিয়ে লক্ষ্মীদি দরজার তালাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো। দীপঙ্করও ঢুকলো।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জেবলে লক্ষ্মীদি বললে—বোস, বোস এখানে—

দীপঙ্কর বসলো। বসে বললে—অনেক দেরি হয়ে গেল, বাড়ি যাই আমি—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ একেবারে গা ঘেঁষে পাশে বসলো। বললে—কেন, তোর যাবার এত তাড়া কেন? এখন তো কেউ নেই এখানে? শম্ভুও নেই, অনন্তও নেই—

দীপঙ্কর একটু সরে বসতে চেষ্টা করলে। কিন্তু লক্ষ্মীদি তার হাতটা জোরে ধরে রেখেছে।

দীপঙ্কর বললে—ছি—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তুমি মানুষ না কী, লক্ষ্মীদি—ছি—

লক্ষ্মীদি হাসতে হাসতে বললে—মানুষ হলে আজ আমার এই দশা হয়, তুই বুঝতে পারিস না? মানুষ হলে আজ অনন্তর পয়সায় পেট চালাই? মানুষ হলে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে শম্ভুর সঙ্গে পালিয়ে আসি? মানুষ হলে এই অন্ধকারে একলা-একলা রাস্তায় বেরোই? তুই তো আমার চেয়ে ছোট, মানুষ হলে তোকে ঘরে টেনে নিয়ে এসে তোর গা ঘেঁষে গল্প করি? তুই কি আমাকে এখনও মানুষ মনে করিস?

কথাগুলো বলে লক্ষ্মীদি হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর একদৃষ্টে লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। সেই লক্ষ্মীদি আজ কোথায় নেমেছে। এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি দেখছি জ্ঞানপাপী লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি আজ জ্ঞানও বুঝি না, পাপও বুঝি না, বেঁচে থাকবার জন্যে কী করা উচিত সেইটেই শুধু বুঝি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এ-রকম করলে আর কতদিন বাঁচবে? তুমিও যে পাগল হয়ে যাবে দাতারবাবুর মত!

লক্ষ্মীদি বললে—পাগল হয়ে গেলে তো বেঁচে যাই! সুখ-দুঃখ কোনও জ্ঞানই থাকে না—শম্ভু তো তাই বেঁচে গেছে! আমার অন্য ভয় করে—

—কী ভয়?

লক্ষ্মীদি বললে—এক এক সময় ওই রেল-লাইনটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, যখন ট্রেনগুলো আসে, যখন পায়ের তলার মাটি থর থর করে কাঁপতে থাকে, মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি সামনে, মনে হয় সব আপদ চুকে যাক—

দীপঙ্কর বললে—দেখছি তোমারও মাথা-খারাপ হতে বাকি নেই আর—

লক্ষ্মীদি বললে—লেভেল-ক্রসিং-এর যে গেটম্যানটা আছে, সে মাঝে মাঝে আমাকে ওখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায়—

—কে? ভূষণ?

—নাম জানি না। সে লোকটা অনেক দিন আমাকে দেখেছে। কী ভাবে কে জানে! তোর মত সেও হয়ত ভাবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে!

দীপঙ্কর বললে—তাহলে এক কাজ করো লক্ষ্মীদি। তোমার বাবার ঠিকানাটা আমায় দাও—আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেব তাঁকে! নিজের বাবার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা নেই—

লক্ষ্মীদি গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—না!

দীপঙ্কর বললে—তুমি ঠিকানা দাও আর না-দাও, আমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দেবই—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি সব ছাড়তে পারি দীপু, কিন্তু আমার অহঙ্কার আমি ছাড়তে পারি না, অহঙ্কার ছাড়লে আমি বাঁচবো কী দিয়ে বল্? অহঙ্কার সম্বল করেই যে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি আমি, যেদিন সেটাও থাকবে না, সেদিন

কিছুই যে আর নিজের বলে থাকবে না রে আমার—

—কিন্তু কিসের এত অহঙ্কার তোমার শুনি? রূপের?

লক্ষ্মীদি বললে—অহঙ্কারের কি নাম আছে রে? অহঙ্কারের কি উপলক্ষ আছে? অহঙ্কার যার আছে, তার কাছে আর সব যে তুচ্ছ—

—কিন্তু জীবনের চেয়ে কি অহঙ্কারটাই তোমার কাছে বড় হলো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—যারা বেঁচে আছে, তারাই তো জীবনকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু আমি তো বেঁচে নেই—আমি তো আর বাঁচতে চাই না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু যেদিন দাতারবাবুকে আমার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাতে, যেদিন দাতারবাবুর অসুখের খবর শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, সেদিন তো বাঁচতেই চেয়েছিলে?

লক্ষ্মীদি বললে—মানুষ তো অনেক কিছুই চায়! কিন্তু কে চাওয়ার মত করে চাইতে পারে?

—কিন্তু চাওয়ার মত করে চাইতে কে তোমায় বারণ করেছিল? কে তোমায় বাধা দিয়েছিল?

লক্ষ্মীদি বললে—ওই যে বললুম, আমার অহঙ্কার।

দীপঙ্কর বললে—তাহলে এতই যদি বোঝ তুমি তো কেন আজ অনন্তবাবুকে এমন করে সহ্য করো? দূর করে দিতে পারো না ও-লোকটাকে? তার সঙ্গে হাসাহাসি করো, হেসে গড়িয়ে পড়ো তার সামনে, এটাও কি ভাল?

—কখন আমি হাসাহাসি করেছি? কখন হেসে গড়িয়ে পড়েছি বল?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ভাবছো আমি দেখিনি? আমি নিজের চোখে দেখে তবে বলছি, কাল রাত্রে মনিব্যাগটা ফেরত নিতে এসে দেখি ও-ঘরে দাতারবাবু পাগল অবস্থায় চিৎকার করছে, আর এ ঘরে তুমি আর অনন্তবাবু দুজনে খেতে খেতে হেসে গড়িয়ে পড়ছো। দাতারবাবুর দিকে তোমাদের ভ্রূক্ষেপই নেই। একেও যদি তুমি অহঙ্কার বলো তো অহঙ্কারের মানেই আমি জানি না বলতে হবে—

লক্ষ্মীদি এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—আমি তোমার কাছে কিসের জন্যে আসি জানি না, হয়তো তোমাকে ভালবাসি বলেই আসি, কিন্তু তুমি আপত্তি করো আর যাই করো, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না—। আমি যদি অনন্তবাবুর এখানে আসা বন্ধ না করতে পারি তো তোমার বাবাকেই আমি চিঠি লিখে সব জানিয়ে দেব।

লক্ষ্মীদি তখন যেন একটু নরম হয়ে এল।

বললে—বেশ তুই যা বলবি, আমি তাই-ই করবো—বল্ কী করতে হবে?

দীপঙ্কর বললে—তুমি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে আমাদের বাড়িতে উঠে চলো, বাড়িটা এখনও খালি পড়ে আছে—

—ভাড়া ?

দীপঙ্কর বললে—ভাড়ার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, সে আমি বুঝবো! তা ছাড়া তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। দাতারবাবুর চিকিৎসা আমিই করবো, তার সমস্ত খরচা আমি দেব—

—এত টাকা খরচ করবি তুই আমাদের জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—করবো! টাকা না থাকলে আমি ধার করবো আপিসের ব্যাঙ্ক থেকে!

লক্ষ্মীদি বললে—কত দিন খরচ করবি? শেষে তো তোরও সংসার হবে, বউ হবে, ছেলে-মেয়ে হবে—তখন?

—ততদিনে দাতারবাবু ভাল হয়ে উঠবে!

—যদি না হয়?

হঠাৎ বাইরে কড়া নড়ে উঠলো।

দীপঙ্কর বললে—ওই বোধ হয় দাতারবাবু এসেছে—

লক্ষ্মীদি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অনন্তবাবু এল ভেতরে। লক্ষ্মীদিও আগে আগে এল।

অনন্তবাবুকে দেখে দীপঙ্কর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে বললে—আমি উঠি তাহলে লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—যাবি?

—হ্যাঁ যাই।

বলে চোখ ফেরাতেই দেখলে অনন্তবাবু তার দিকেই চেয়ে আছে। অনন্তবাবুর চোখে-মুখে যেন একটা কর্কশ ঔদ্ধত্য। যেন কেমন রূঢ় দৃষ্টি দিয়ে দেখছে তার দিকে। দীপঙ্কর সে-দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ লক্ষ্মীদি কথা বলে মুশকিল করে দিলে—

লক্ষ্মীদি অনন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—কাজটার কী হলো অনন্ত?

অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে বললে—হয়েছে—

—তুমি নাকি দীপুর কাছে যাওনি? ও তোমার জন্যে সমস্তক্ষণ বসে ছিল, রবিনসন্ সাহেবকেও বলে রেখেছিল। তা কত টাকা নেবে মিস্টার ঘোষাল?

অনন্তবাবু বললে—সে সব তোমার শুনে দরকার কি? সে নিক না-নিক, তোমার শুনে লাভ কি?

দীপঙ্করের কানে কথাটার খোঁচা এসে লাগলো বড় তীক্ষ্ণ হয়ে। যেন কথাটার লক্ষ্য লক্ষ্মীদি নয়, দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কিন্তু আপনিই বলেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি তাই রবিনসন্ সাহেবকে বলেও রেখেছিলাম।

অনন্তবাবু এ-কথার উত্তর না-দিয়ে লক্ষ্মীদিকে বললে—এ কতক্ষণ এসেছে?

লক্ষ্মীদি বললে—অনেকক্ষণ, শম্ভু বেরিয়ে গেছে হঠাৎ, তাকে খুঁজতে

বেরিয়েছিলাম, দীপু তখন আসছিল এখানে, পথে দেখা হয়ে গেল।

অনন্তবাবু বললে—এতক্ষণ কি সেই সব কথাই হচ্ছিল?

লক্ষ্মীদি হাসতে হাসতে বললে—দীপুর সঙ্গে আমার যে-কথা বরাবর হয়, সেই সব কথাই হচ্ছিল, কেন, তুমি অত রাগ করছো কেন?

অনন্তবাবু যেন ধমকে উঠলো লক্ষ্মীদিকে। বললে—ওর সঙ্গে তোমার এত কিসের কথা?

এতক্ষণে দীপঙ্কর সামনে এগিয়ে এল। অনন্তবাবুর সামনে আসতেই একটা মদের গন্ধ এল নাকে। মনে হলো অনন্তবাবু যেন এখন প্রকৃতিস্থ নয়। কিন্তু তবু অনন্তবাবুর ঔদ্ধত্যটুকু যেন আর বরদাস্ত করা যায় না। বিশেষ করে লক্ষ্মীদির সঙ্গে এমন করে কথা বলবার সাহস কোথায় পেলে অনন্তবাবু!

অনন্তবাবু বললে—ওকে বারণ করতে পারো না এখানে আসতে?

লক্ষ্মীদি যে লক্ষ্মীদি, সে-ও যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি কাকে কী বলছো?

অনন্তবাবু বললে—হ্যাঁ ঠিকই বলছি, ও একটা রেলওয়ে ক্লার্ক, ও কেন আসে এখানে? কিসের লোভে? ও কী চায়?

লক্ষ্মীদি বললে—তুমি ভুল করছো, ও আমার ভাই-এর মত যে, ছোট থেকে ওকে দেখে আসছি আমি—

—সেই জন্যে একলা একলা নিরিবিলিতে বসে তার সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত গল্প করতে হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন, গল্প করলে দোষ কী?

দীপঙ্কর এতক্ষণে কথা বললে। বললে—চুপ করো লক্ষ্মীদি, অনন্তবাবু মদ খেয়েছে, এখন মাথার ঠিক নেই ওঁর।

—কী?

অনন্তবাবু চোখ বড় বড় করে চাইলে দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—এখন আপনার মাথার ঠিক নেই, আপনি বেশি মাত্রায় মদ খেয়েছেন, নইলে আপনাকে বুঝিয়ে বলতাম—আপনিও বুঝতে পারতেন—আপনি শুয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি, নইলে পড়ে যাবেন।

অনন্তবাবু রুখে এল দীপঙ্করের দিকে। বললে—কাকে কী বলতে হয় জানেন না আপনি?

দীপঙ্কর বললে—মাতালের কাছে আমি ভদ্রতা শিখতে রাজী নই।

অনন্তবাবু বললে—করেন তো একটা ক্লার্কের চাকরি, মিস্টার ঘোষাল আমাকে সব বলেছে, তার এত আবার তেজ কেন?

দীপঙ্কর বললে—ক্লার্ক নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনার মত অভদ্র নই—

লক্ষ্মীদি বললে—কেন তুমি ওকে অমন করে বলছো?

অনন্তবাবু লক্ষ্মীদির হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার ভাইকে আজকে

এমন জায়গায় দেখেছি, তারপরেও ওর লজ্জা নেই!

লক্ষ্মীদি বললে—কী বলছো তুমি অনন্ত? কাকে দেখেছো? কোথায়? আর ওর কাছেই বা তুমি গেলে না কেন আজ?

অনন্তবাবু বললে—কেন যাবো? ঘুষ দিয়ে যখন কাজ আদায় করবো জুতো মেরে কাজ নেব। অত খোশামোদের ধার ধারবো কেন?

দীপঙ্কর বললে—আমি তো আপনাকে খোশামোদ করতে বলিনি—

—বিনা ঘুষে কাজ নেওয়া মানেই তো খোশামোদ? কেন খোশামোদ করবো? মিস্টার ঘোষালকে ঘুষ দেব, সে আমার পা চাটবে, পোষা কুকুরের মত আমার পা চাটবে—

বলে নিজের একটা পা উঁচু করে বাড়িয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে।

—তাতে পেটও ভরবে, মানও বাঁচবে!

দীপঙ্কর বললে—সেটা আপনি আগে বুঝলে সাহেবের কাছে আমার মুখটা নষ্ট হতো না!

অনন্তবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললে—আপনার কি সোনা-বাঁধানো মুখ, যে নষ্ট হলে লোকসান হবে? করেন তো ক্লার্কের চাকরি—

দীপঙ্করের সমস্ত শরীর যেন রি-রি করে উঠলো। তবু অনেক কষ্টে সামলে নিলে।

বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি ওঁকে একটু থামতে বলো, নইলে সহের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছেন—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের সামনে এসে তার হাত দুটো ধরলে। বললে—তুই যা এখন দীপু—ওর কথায় কান দিসনি—

অনন্তবাবু বললে—হ্যাঁ, বেশি কথা বললে অপমান করে বসবো তখন—চলে যেতে বলো—

লক্ষ্মীদি ঠেলতে ঠেলতে দীপঙ্করকে একেবারে গলির ভেতরে নিয়ে এল। ওদের দরজার সামনে এসে দরজাটা খুলে দিলে লক্ষ্মীদি। বললে—তুইও রেগে গেছিস্ আজ—যা তুই—

দীপঙ্কর বললে—আমার রাগটাই দেখলে তুমি?

লক্ষ্মীদি বললে—ও তো ওই রকমই—ওর কথা ছেড়ে দে—

দীপঙ্কর বললে—আমার জন্যে তো নয়, কিন্তু এই লোকের সঙ্গেই তো তুমি ঘর করছো, এই লোকের সঙ্গেই তো তোমার খাওয়া-পরার সম্পর্ক, এই লোককে সন্তুষ্ট করেই তো তোমাকে চলতে হচ্ছে—! তাই তোমার কথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথা ছেড়ে দে, আমি তো আর বেঁচে নেই, সেই জন্যে আমার ও সব গায়ে লাগে না—

—কিন্তু আমাদের ওখানে তোমার যাওয়ার কী হবে?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তো বলেছি, যাবো—

—তাহলে আমি বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিই? শেষকালে তুমি আপত্তি করবে না তো?

লক্ষ্মীদি বললে—না!

হঠাৎ অনন্তবাবুর গলা শোনা গেল পেছনে। বললে—ফিস্ ফিস্ কী প্রেমালাপ হচ্ছে দুজনে?

বলতে বলতে একেবারে কাছে এসে গেল অনন্তবাবু।

লক্ষ্মীদি বললে—তা তুমি আবার এলে কেন?

অনন্তবাবু হঠাৎ লক্ষ্মীদিকে জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—ওর সঙ্গে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তুমি প্রেমালাপ করবে আর আমি বুঝি......

কথাটা আর শেষ হলো না। লোকটার স্পর্ধা দেখে দীপঙ্করের মাথায় যেন খুন চেপে গেল।

বললে—স্কাউণ্ড্রেল—

বলে অনন্তবাবুর মুখটা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল। ঘুষিটা অনন্তবাবুর মুখের ওপর গিয়ে যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টলে পড়ে গেল মাটিতে। আর ছট্‌ফট্ করতে লাগলো যন্ত্রণায়!

মুহূর্তের মধ্যে কী যে ঘটে গেল, দীপঙ্করেরও খেয়াল ছিল না।

লক্ষ্মীদিও প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। তারপর অনন্তবাবুর ওই অবস্থা দেখে মাটিতে বসে পড়ে অনন্তবাবুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে ডাকতে লাগলো—অনন্ত—অনন্ত—

অনন্তবাবু তখন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। তার তখন সাড়া দেবার ক্ষমতাটুকুও বোধ হয় আর নেই।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

বললে—তুই অনন্তকে মারলি?

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকে উঠলো।

বললে—তুমি বলছো কি লক্ষ্মীদি, ও একটা স্কাউণ্ড্রেল,—ওকে মেরে ফেলিনি এই-ই ওর ভাগ্য! যে তোমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করতে পারে, তাকে তুমি স্কাউণ্ড্রেল ছাড়া আর কী বলবে—?

...থাম তুই।

লক্ষ্মীদি একেবারে গর্জন করে উঠেছে। লক্ষ্মীদির চেহারা দেখে দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল।

তোর এত বড় আস্পর্ধা? তুই ওকে মারলি কী বলে? আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করে থাক্ সে আমি বুঝবো, তুই কে?

বলেই তখনি আবার মাটিতে বসে পড়ে অনন্তবাবুর মাথাটা ধরে আদর করতে লাগলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলো—

অনন্ত—অনন্ত—

অনন্তবাবু বোধ হয় তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না মুখটা। লক্ষ্মীদি বার বার ডাকতে লাগলো—অনন্ত—অনন্ত—

তারপর সাড়া না পেয়ে আবার উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মীদি।

বললে—বল্ কেন তুই মারলি ওকে? তুই ওকে মারবার কে? আমাকে যদি অপমান করে থাকে সে আমি বুঝবো, তুই কেন মারিস?

একটু থেমে আবার বললে—তোর বড় বাড় হয়েছে না? হেসে কথা বলি বলে তুই একেবারে মাথায় উঠে বসবি? বেরো বেরিয়ে যা এখান থেকে—তোকে আর আসতে হবে না আমার এখানে, বেরিয়ে যা—বেরো—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করকে ঠেলে একেবারে দরজার বাইরে বার করে দিলে। তারপর দড়াম্ করে সদর দরজাটার খিল্ লাগিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্কর সেই দরজার বাইরের অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। দীপঙ্করের মনে হলো এতদিনের সব বিশ্বাস এতদিনের সব আকর্ষণের মূল ধরে যেন লক্ষ্মীদি টান দিলে। যেন সব সম্পর্কের সূত্র নিশ্চিহ্ন করে দীপঙ্করকে একেবারে নিরাশ্রয় করে রাস্তায় ছেড়ে দিলে।

রাত্রের শেষ নির্জন ট্রামটা ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মোড়টা পেরিয়ে গেল, তখনও দীপঙ্কর সেই কথাটাই ভাবছে। তারপর হাজরা রোডের মোড়ে আসতেই চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। এই তো কাছেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। সতীর শ্বশুর বাড়ি। সতীর কাছে তার বাবার ঠিকানাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে ঢুকে একেবারে সতীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দীপঙ্কর। বিরাট তেতলা বাড়ি। সামনের গেটে দারোয়ান বসে পাহারা দিচ্ছে।

দীপঙ্কর বাড়িটার গেটের দিকে এগিয়ে গেল। এর মধ্যেই সতী নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি। এত সকাল-সকাল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয় জেগে আছে এখন। নিশ্চয়ই জেগে আছে।

সতী যদি তাকে না-চিনতে পারে। অনেকদিন পরে এসেছে দীপঙ্কর। অনেক বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। বাড়ির সামনে লোহার রেলিং দেওয়া গেট। ইঁট-বাঁধানো রাস্তা ভেতরে। বাড়ির সামনে দাঁড়ালে সোজা ভেতরের গ্যারেজটা নজরে পড়ে। গেটের দু' মাথার ওপর ইলেক্‌ট্রিকের ডুম-বাতি জ্বলছে—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ সেইখানে এধার-ওধার পায়চারি করতে লাগলো।

ঠিক এই সময়ে বাড়ি ঢোকবার মুখে যদি সতী তাকে দেখতে পায় তো ভাল হয়। তাহলে আর ডাকতে হয় না। একটা চিঠি বা একটা স্লিপে দীপঙ্করের

নাম লিখে ভেতরে পাঠালেও চলে। কিন্তু স্লিপ্ পেয়ে যদি সতী দেখা না করে। যদি উত্তর না দেয়। যদি বলে—এখন সময় নেই। দারোয়ান হয়ত ফিরে এসে বলবে—এখন মোলাকাত্ হবে না!

দীপঙ্করের মনে হলো সে বড় মর্মান্তিক! কেউ চিনতে না পারলে মনে বড় কষ্ট হয়।

কিন্তু লক্ষ্মীদির বাবার ঠিকানাটাও যে তার দরকার! লক্ষ্মীদির ব্যাপারটা তাঁকে আর না জানালে যে চলবে না। তাঁকে জানালেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। লক্ষ্মীদি কোথা থেকে কোথায় নেমেছে, অনন্তবাবুর পাল্লায় পড়ে কত নিচে নেমে এসেছে! শেষকালে কোথায় কত গভীরে যে নামবে তা-ও বলা যায় না। লক্ষ্মীদির সেই আগেকার রূপ, সেই আগেকার চাল-চলন, কথা বলা, সমস্ত যেন বদলে গেছে। লক্ষ্মীদির কথা ভাবতে বড় দুঃখ হয়েছে দীপঙ্করের। ট্রামে বসে সমস্তক্ষণ কেবল লক্ষ্মীদির কথাই ভেবেছে। লক্ষ্মীদিকে উদ্ধার করার আর কী উপায় খোলা আছে! ফাঁকা ট্রামের মধ্যে কেবল দীপঙ্করই একলা। একলা-একলাই কথাগুলো ভেবেছে শুধু। দীপঙ্করকে লক্ষ্মীদি তাড়িয়ে দিয়েছে বলে নয়, লক্ষ্মীদির অধঃপতনের জন্যেই দীপঙ্করের মনে আঘাত লেগেছে। এমন করে চোখের সামনে লক্ষ্মীদি নষ্ট হয়ে যাবে! হয়ত তারপর যখন একদিন সমস্ত জলুস চলে যাবে লক্ষ্মীদির, তখন ওই অনন্তবাবুকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে! তখন আর কেউ সাহায্য করবার থাকবে না। তখন হয়ত ওই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর ওপরই ট্রেনের চাকার তলায় আত্মহত্যা করতে হবে লক্ষ্মীদিকে!

—এখানে কাকে চাই আপনার?

দীপঙ্কর হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখলে। এক ভদ্রলোক সামনের রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তারই দিকে চেয়ে।

—কাকে খুঁজছেন?

দীপঙ্কর বললে—খুঁজতে এসেছিলাম এই পাশের বাড়িতে—

—ঘোষেদের বাড়ি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, সনাতন ঘোষ।

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু এত রাত্তিরে কি ওঁরা জেগে আছেন?

ভদ্রলোক বললেন—জেগে আছেন নিশ্চয়ই। আলো তো জ্বলছে ভেতরে—ডাকুন না, ওই সামনে দারোয়ান বসে আছে, ওকে বলুন, ও ডেকে দেবে—

দীপঙ্কর বললে—এতক্ষণ তো সেই কথাই ভাবছি—এখন কি ডাকা ঠিক হবে? বরং কাল দেখা করাই ভালো—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে গলি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এল! না, আজ থাক। এত রাতে বাড়ির বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াই তো অন্যায়। দারোয়ানের কাছেও নিজের পরিচয় দিতে হবে। দারোয়ান হয়ত তাকে সনাতনবাবুর কাছেই

নিয়ে যাবে! সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয়ও দিতে হবে। সনাতনবাবু কী-রকম লোক কে জানে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এত রাত্রে কিসের দরকারে দেখা করতে এসেছে তা-ও বলতে হবে। তারপর নানান্ জেরার পরও যে সতীর সঙ্গে দেখা করতে অনুমতি পাওয়া যাবে, তারও কোনও ঠিক নেই! যদি তিনি জিজ্ঞেস করেন—দীপঙ্কর কে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কোন্ সূত্রে পরিচয়? তখন? তখন কী জবাব দেবে সে? পাশা-পাশি বাড়িতে থাকার সম্পর্কটাই একমাত্র সূত্র! আর কোন সূত্রই তো নেই সতীর সঙ্গে।

দরকার নেই।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আবার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দিকে হাঁটতে লাগলো। মস্ত বড় বাড়ি। সতীর শ্বশুরবাড়িটা! ভেতরে অনেকখানি জায়গা। অনেক চাকর-বাকর। অনেক গাড়ি, অনেক অর্থের চিহ্ন বাড়িটার সর্বাঙ্গে! সমস্ত পাড়াটার মধ্যে সব বাড়িগুলোর চেয়ে বড়। সকলকে ছাড়িয়ে সকলের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আপন আভিজাত্য নিয়ে।

হঠাৎ মনে হলো সতী হয়তো কলকাতায় নেই। হয়ত বর্মায় চলে গেছে বাবার কাছে। বিয়ের পর একবার তো বাবার কাছে যায় মেয়েরা। হয়ত সেখানেই গেছে। সেখানেই আছে। সতী যে-রকম বাবাকে ভালবাসে, বাবাকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারবে কেন? কলকাতায় থাকলে একদিন কি আর আসতো না ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দিকে। সেই পুলিসে ধরে নিয়ে যাবার পর আর তো দেখা হয়নি দীপঙ্করের সঙ্গে! মেয়েরা কি এত শিগ্গির সব ভুলে যায়! এত শিগ্গির সব ভুলে যেতে পারে! কিরণ তো ঠিকই বলেছিল সেদিন—ওদের জন্যে তুই এত ভাবিস দীপু, ওদের বিয়ে হয়ে যাবার পর দেখবি সবাই ভুলে যাবে তোকে! সত্যি, সেই লক্ষ্মীদিই আজ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। যে লক্ষ্মীদিকে এত ভালবাসতো দীপঙ্কর, সেই লক্ষ্মীদি! আর সতী! এখন সেই সতীর শ্বশুরবাড়ির সামনেই দীপঙ্করকে প্রার্থীর মতন ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়!

হঠাৎ দীপঙ্করের আবার মনে হলো—সে বড় একলা! তার কেউ নেই। তার লক্ষ্মীদি নেই, লক্ষ্মীদির সঙ্গে তার যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তাও তো লক্ষ্মীদি শেষ করে দিলে। সতীও নেই। কিরণও নেই। সকলের সবাই আছে, তারই শুধু কেউ নেই। এই শহরে, এই কালিঘাটের সমস্ত লোকের সব কিছু আছে, দীপঙ্করই শুধু নিঃসঙ্গ, দীপঙ্করই শুধু একলা। দীপঙ্করেরই যেন কোনও কাজ নেই সংসারে। আজ এর কাছে, কাল ওর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ছিটেরও একটা নিজস্ব পৃথিবী আছে। ফোঁটারও আছে তার নিজস্ব জগৎ। সেখানকার জগতে ছিটে-ফোঁটা সম্রাট হয়ে আছে, দেব্‌তা হয়ে আছে। তারাও সুখী! গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীও ভাল হয়ে গেছে। সে-ও সুখী। মেমসাহেবও তার ছবির অ্যালবাম আর প্রেমপত্র নিয়ে নিজস্ব জগতে বাস করছে। কিরণ?

কিরণের কি কাজের অভাব আছে? কোথায় পৃথিবীর কোন্ কোণে নিজের কাজ করে চলেছে সে। শুধু দীপঙ্করই আজ পথে পথে নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরছে।

কালিঘাটের বাজারের দিকটা দিয়ে না গিয়ে দীপঙ্কর সোজা পথ ধরলো। গলি দিয়ে ঢুকে সোজা ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে পড়া যাবে। অন্ধকার গলিগুলো সব সরু। দু'পাশের ঘেঁষা-ঘেঁষি বাড়িগুলোর ভেতরে গাদাগাদি হয়ে বাস করছে কত পরিবার। কোনও কোনও জানালায় তখনও আলো জ্বলছে। কোনও কোনও বাড়ি তখন অন্ধকার। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেতরের মানুষরা। সকলের কাজ আছে, সকলের ঘুম আছে—শুধু দীপঙ্কর যেন এই সংসারে প্রহর গুনতে এসেছে! মা হয়ত এতক্ষণ ভাবছে খুব। হয়ত না-খেয়ে বসে আছে দীপঙ্করের জন্যে! তার দীপু আজকে মাইনে পেয়েছে। মাইনে পেয়ে এত দেরি করা উচিত হয়নি। মাইনের দিনটায় দীপঙ্কর বরাবর সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে মা'র হাতে টাকাটা তুলে দেয়। মা টাকাগুলো গুনে নিয়ে মাথায় ঠেকায়। তারপর তার কাঠের বাক্সটায় তুলে রাখে।

দীপঙ্কর পা চালিয়ে চললো। মা'র কথাটা মনে পড়তেই পায়ের গতি যেন বেড়ে গেল।

নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের কাছেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেন। কিরণদের বাড়িটার দিকে চাইতেই মনে হলো যেন বড় অন্ধকার। হয়ত কিরণের মা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিরণের বাবা মারা যাবার পর আর যাওয়া হয়নি—

কী যে হলো। হঠাৎ নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের ভেতরে ঢুকলো দীপঙ্কর! কিরণদের বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

—মাসিমা!

আর একবার কড়া নাড়তে হলো। বেশি জোরে কড়া নাড়তে যেন সাহস হলো না দীপঙ্করের। অন্ধকারের মধ্যেই চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। কিরণদের বাড়ির আশে-পাশে সি-আই-ডি'রা এখনও ঘোরা-ফেরা করে। কোথায় থাকে কিরণ, কেউ জানে না। সারা বাঙলা দেশে, সারা কলকাতায় যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দীপঙ্কর চারদিকে আর একবার চেয়ে দেখলে। কেউ কোথাও নেই। কিরণের বাবা মারা যাবার পর থেকে সি-আই-ডি'রা আরো বেশি করে চর লাগিয়েছে এখানে।

দীপঙ্কর চলে আসবে ভাবছিল। দরকার নেই। এই অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তাকেও হয়ত অকারণ হয়রানি করবে তারা।

কিন্তু হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

অন্ধকারের মধ্যেই কিরণের মা'র চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দীপঙ্কর বললে—আমি দীপু মাসীমা—

—এসো বাবা, এসো।

দীপঙ্কর বললে—কেমন আছেন মাসীমা?

—তুমি ভেতরে এসো, বলছি।

অন্ধকার উঠোন। উঠোনের এক কোণে একটা কুমড়োশাকের মাচা। দাওয়ার ওপর যেখানটায় কিরণের বাবা বুকে বালিশ নিয়ে বসে থাকতো, সেখানটায় গিয়েই যেন দীপঙ্করের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। মনে হলো কিরণের বাবা নেই বটে, কিন্তু সমস্ত বাড়িটার মধ্যে যেন তার অশরীরী ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন মুক্তি পেয়েছে এ-কথাটা বলতে এসেছে, কিন্তু বলতে পারছে না মুখ ফুটে।

—আমি আসতে পারিনি মাসীমা আপিসের নানান্‌ কাজে—আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মাসীমা বললে—অসুবিধে হলেই বা কী করছি বলো বাবা! আমার মরণ হলেই বাঁচি—

মাসীমা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে।

দীপঙ্কর বললে—অমন কথা বলছেন কেন মাসীমা,—

—কেন বলবো না বাবা, আমার কে আছে বলো, কার মুখ চেয়ে বাঁচবো?

—কেন? কিরণ তো রয়েছে! কিরণের মত ছেলে থাকতে আপনি এ-কথা বলছেন কেন মাসীমা। কিরণ তো আর চিরকাল এমনি করে বাড়ি ছেড়ে থাকবে না—

মাসীমা কিছু উত্তর দিলে না।

দীপঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলে। বললে—আপনি এই টাকাটা রাখুন মাসীমা, আজকে আমি মাইনে পেরেছি, মাসে মাসে আমি পাঁচ টাকা করে দেব আপনাকে—

কিরণের মা টাকাটা নিলে হাতে করে। বললে—তোমার মাকে জিজ্ঞেস করেছ তো বাবা?

দীপঙ্কর বললে—এ আমার নিজের টাকা মাসীমা, আমি নিজে উপায় করেছি—

—তা হোক, তবু তোমার মাথার ওপরে মা তো আছে।

দীপঙ্কর বললে—এখন আমি বড় হয়েছি, এখনও কি সব কাজ মাকে জিজ্ঞেস করে করতে বলেন মাসীমা?

কিরণের মা সে-কথার উত্তর দিলে না। বলতে লাগলো—না বাবা ও-কথা বলো না। ছেলে যে কত কষ্ট করে মানুষ করতে হয় তা যারা মা হয়েছে তারাই জানে। সেই ছেলে বড় হয়ে মাকে না দেখলে মা'র মনে যে কী কষ্ট হয়, তা অন্য লোকে কী করে বুঝবে! আর কাকেই বা বোঝাবো?

বলে মাসীমা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—কিরণের মত ছেলে কি সব মা পায় মাসীমা? আপনি তো

সৌভাগ্যবতী মাসীমা!

মাসীমা বললে—আমার মরণ হওয়াই ভাল বাবা, উপযুক্ত ছেলে থাকতে যাকে পরের কাছে হাত পাততে হয় তার মরণ হওয়াই ভাল—

—ছি মাসীমা, অমন কথা বলবেন না, ওতে কিরণের অমঙ্গল হবে!

মাসীমা আঁচলে চোখ মুছতে লাগলো আবার। দীপঙ্কর বললে—আজ আপনি কাঁদছেন মাসীমা, কিন্তু যখন স্বরাজ হবে তখন দেখবেন এই ছেলের জন্যেই আপনার গর্বে বুক ফুলে উঠবে আবার। স্বরাজ হলে তখন কিরণদেরই কত খাতির হবে দেখবেন। আজকের এই সুভাষ বোস, এই জে এম সেনগুপ্ত, বিধান রায় এঁরাই তখন তো দেশের লাটসাহেব হবে—

মাসীমা বললে—তা হয়ত হবে, কে জানে বাবা, কিন্তু গরীব-দুঃখীদের কষ্ট চিরকালই থাকবে—দেখো—

দীপঙ্কর বললে—না মাসীমা, আপনি জানেন না, এখন যারা স্বদেশী করছে, এখন যারা জেল খাটছে, দেখবেন তখন তাদের কত খাতির হবে। এই জে এম সেনগুপ্ত কি বিধান রায় যদি লাটসাহেব হয় তো দেখবেন আপনাদের কোনও দুঃখ থাকবে না তখন, কিরণদেরই খাতির তখন সকলের আগে—

মাসীমা সে-কালের মানুষ। কী বুঝলো মাসীমা কে জানে! হয়ত বিশ্বাস করলে, কিম্বা হয়ত বিশ্বাস করলে না। বিশ্বাস না-হবারই কথা। কে-ই বা তখন বিশ্বাস করতো! বিপিন পাল, যিনি 'স্বরাজ' কথাটা প্রথম প্রচলন করলেন—তিনিই কি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন পুরোপুরি! আর কুমিল্লা জেলার বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার শরৎকুমার বসু? তাঁর স্কুলের দুটি ছেলে একদিন লিফ্‌লেট বিলি করছিল। হেড্‌মাস্টার তাদের নাম ধাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দিলেন। তারপর একদিন তিনি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, এমন সময় কে তাঁকে পিস্তলের গুলিতে মেরে ফেললে! আর সেই ময়মনসিং-এর ডি-এস্‌-পি যতীন্দ্রমোহন ঘোষ? বাইরের ঘরে বসে নিজের ছোট ছেলেকে আদর করছেন, এমন সময় কোথা থেকে পাঁচটা ছেলে ঘরে ঢুকে পড়লো। ঢুকে পড়েই তাঁর বুকের ওপর গুলি। গুলির পর গুলি! তারপর রংপুরে পুলিসের ডি-আই-জি রায়সাহেব নন্দকুমার বসু। স্বদেশী ছেলেদের ধরতে তাঁর ভারি উৎসাহ। হঠাৎ একদিন চারটে ছেলে তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাঁকে গুলি ছুঁড়ে মারলো। শুধু কি তাই? একটার পর একটা। সাব-ইনস্পেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে চলেছে। রাস্তায় অনেক ভিড়। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। মধুসূদন ভট্টাচার্য রাস্তার ওপরেই ঢলে পড়লো। আর এর সূত্রপাত কি আজকে? সেই একদিন বড়লাটের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সার হারবার্ট রিজলী বক্তৃতা দিলেন— !

'বর্তমানে আমাদের এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হতে হয়েছে। দেশের গভর্নমেণ্ট উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ-শাসন অচল করবার জন্য দেশব্যাপী যুদ্ধ

চালানোই এদের উদ্দেশ্য। এদের সঙ্ঘশক্তি যেমন কার্যকরী, তেমনি ব্যাপক। সংখ্যায়ও এরা অনেক। নেতারা গোপনে কাজ করে, আর শিষ্যরা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করে। রাজনৈতিক মার্ডার এদের আন্দোলনের উপায়। মার্টিসিনির পথই এদের পথ। এরা দুবার স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। একবার সকলের সামনে তাঁকে গুলি করবার চেষ্টাও করেছে। মিস্টার কিংসফোর্ডকে খুন করবার চেষ্টা করেছে দুবার। তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া বোমার ঘায়ে দুজন ইংরেজ মহিলা প্রাণ হারিয়েছে। ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি, আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাস, স্যার উইলিয়ম কার্জন-উইলি, মিস্টার জ্যাকসন, আর এই সেদিন ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট শামসুল আলম্‌ এই ক'জনকে বেপরোয়াভাবে খুন করা হয়েছে। তিনজন ইনফরমারের মধ্যে দুজনকে গুলি করে মেরেছে। আর একজনকে ধরতে না-পেরে তার ভাইকে তার মা আর বোনের চোখের সামনে খুন করেছে এরা। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেনকেও এরা রেহাই দেয়নি। ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে দুটো পিক্‌রিক্‌ এসিড্‌ বোমা ছোঁড়া হয়েছিল—কিন্তু বোমা ফাটেনি বলে তিনি কোনও-রকমে বেঁচে গেছেন। এই সব ঘটনা কয়েকটা খবরের কাগজের প্রচারের ফল। বিদ্রোহের জমি তারাই তৈরি করে দিয়েছে।'

কত দিনকার আগেকার সব ঘটনা। যখন কিরণের সঙ্গে দিনরাত মিশতো, তখনকার দিনের কথা সব। কিরণ বলতো সব গল্পগুলো। আজ সেই কিরণদের বাড়িতে কিরণের বিধবা মাকে দেখে সেই কথাগুলোই মনে পড়তে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—আপনি কেবল নিজের কথাই ভাবছেন মাসীমা, কিন্তু ভাবুন তো সুভাষ বোসের কথা—

মাসীমা বললেন—তাঁদের কথা ছেড়ে দাও বাবা, স্বরাজ হলে যদি কিছু হয় তো তাঁদেরই হবে, তাঁরাই বড় বড় চাকরি পাবেন, তখন আমার গরীব ছেলের কথা কে আর ভাববে বলো?

—ভাববে মাসীমা ভাববে। আমি বলছি ভাববে। তখন এই দিশী-লোকরাই তো রাজ্য চালাবে, দিশী লোকেরা তো আর সাহেবদের মত এমন নেমকহারামি করবে না—

—কে জানে বাবা! আমার যা কপাল, তাতে কিছুই বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না যে!

খানিক পরেই দীপঙ্কর উঠলো। মাসীমা বললে—তোমার মা হয়ত ভাবছে, তুমি মিছি-মিছি এখানে দেরি করলে এতক্ষণ!

দীপঙ্কর বললে—আমি আসবো মাসীমা মাঝে মাঝে—আপনি দরকার হলেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন—

মাসীমা বললে—দরকার তো হয়ই মাঝে মাঝে,—

—কিন্তু আমাকে ডাকেন না কেন? টাকার দরকার হলে আমাকে বলবেন,

লজ্জা করবেন না যেন!

—টাকার কথা নয় বাবা! কত রকম যে লোক আসে, কত সব কথা জিজ্ঞেস করে! কিরণ বাড়িতে আসে কি না, কিরণ কোনও চিঠি দেয় কি না—এই সব। আমার বড় ভয় করে বাবা—

তারপর হঠাৎ থেমে বললে—আজকে আবার আর এক কাণ্ড হয়েছে—এই দেখাচ্ছি তোমাকে—

বলে কিরণের মা ঘরের ভেতর থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে এল। দীপঙ্করের হাতে দিয়ে বললে—এই দেখ, একজন লোক এসে আজ আবার এইটে রেখে গেছে, বলেছে কিরণ এলে তাকে দিতে—

প্যাকেটের দড়িটা খুলে দীপঙ্কর দেখলে। কয়েকটা বই। মোটা-মোটা ইংরিজী বই সব। বোমা বারুদ গুলী তৈরি করবার বই। একখানা বই—অরবিন্দর 'ভবানী মন্দির'। আর একখানা—বারীন ঘোষের 'মুক্তি কোন্‌ পথে'। সঙ্গে একগাদা ছাপানো কাগজ—হ্যাণ্ড্‌বিল। নিচে লেখা রয়েছে 'স্বাধীন ভারত সিরিজ'।

দীপঙ্কর হ্যারিকেনের আলোর কাছে এসে হ্যাণ্ডবিল্‌টা পড়তে লাগলো।

"জার আমাদের বলে থাকেন—ঈশ্বরই আমাকে রাশিয়ার সম্রাট করে পাঠিয়েছেন। তোমরা আমার সিংহাসনকে ঈশ্বরের সিংহাসন মনে করে প্রণাম করবে। আমাকে বিরক্ত করতে তোমরা আমার কাছে এসো না। আমি সব সময়েই তোমাদের কথা ভাবি। আমার কোনও পরামর্শের দরকার নেই—কারণ ঈশ্বর আমাকে পূর্ণ জ্ঞান দিয়েছেন। আমি তোমাদের মধ্যে রয়েছি, এতেই তোমাদের গর্ববোধ করা উচিত—এবং আমার ইচ্ছাকেই আইন বলে মেনে নেওয়া উচিত।'

"আমরা জারের এই কথা বিশ্বাস করেছি। তিনি যা বলেছেন তাই-ই মেনে নিয়েছি। কিন্তু তার ফল কী হয়েছে? আপিসের ফাইলের পাহাড় গরীবদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরা সামনে মন্ত্রীদের আর সেক্রেটারিদের পায়ের ধুলো নেয়, আর পেছনে নির্বিকারভাবে চুরি করে। চুরির প্রাধান্য এত বেড়েছে যে, যে যতবড় চোর সে তত বড় সম্মানিত লোক। আপিসে চাকরি-প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচারের কোনও বালাই নেই। আস্তাবলের সহিস হয়েছে প্রেস-সেন্সর। সম্রাটের চাটুকার এক অপদার্থ হয়েছে অ্যাড্‌মিরাল। আর আমরা রাশিয়ানরা কী করছি? আমরা পরম-নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছি। বুক-ফাটা কান্নায় চাষী তার জমাবন্দির আদায়ের টাকা দাখিল করছে। যার সম্পত্তি আছে, সে তা বন্ধক দিচ্ছে। লোকে সরকারী কর্মচারীদের ঘুষের দাবি মেটাচ্ছে বাধ্য হয়ে। সম্রাটের প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে লাখ লাখ টাকা নষ্ট হতে দেখছি কিন্তু তার পরেই নিশ্চিন্তে তাস খেলছি, সিনেমার স্টার কিম্বা গানের আসরের গায়িকাদের সুরের সমালোচনা করছি, শয়তানদের সামনে মাথা নিচু করছি আর যে-সব কাজের নিন্দেয় পঞ্চমুখ হচ্ছি সেই কাজই নিজেরা করবার জন্যে কাড়া-

কাড়ি শ্ন্য করে নিয়েছি। এরই মধ্যে যখন কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়. দেশের জন্যে সংগ্রাম করতে আরম্ভ করে, আমরা বলি—লোকটা কী আহাম্মক!

"এত সবের মধ্যেও আমাদের একটা সান্ত্বনা ছিল যে বিশ্বের দরবারে রাশিয়া শক্তিশালী দেশ বলে, পরিগণিত। ইংরেজরা যখন ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রকারী সম্রাট এবং বিশ্বাসঘাতক অস্ট্রিয়ার সাহায্যে পশ্চিম ইওরোপকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল তখনও আমরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি—জার আমাদের দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন—আমাদের পরোয়া কিসের? নির্ভীক চিত্তে আমরা যুদ্ধে গিয়েছি। কিন্তু রাশিয়ার দর্প চূর্ণ করে আমাদের সে-যুদ্ধে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। হাজারে হাজারে আমরা প্রাণ দিয়েছি।

"হে জার, রাশিয়ার লোক তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিল, পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে তোমাকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু, তুমি কী করেছ? সত্যকে তুমি খুন করেছ। রাশিয়া জাগো, মঙ্গল খাঁর উত্তরাধিকারীদের দাসত্ব বহুদিন করেছ। আজ অত্যাচারী শাসকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। জাতির এই দুর্দশার জন্যে তার কাছে কৈফিয়ত দাবি কর। দৃঢ়কণ্ঠে শুনিয়ে দাও সম্রাটের সিংহাসন ঈশ্বরের সিংহাসন নয়। আমরা চিরকাল দাসের জীবন যাপন করবো, তা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়—ইতি—

নিহিলিস্ট পার্টি—রাশিয়া।"

পড়তে পড়তে দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো। খানিক পরে বললে—এ-সব আপনাকে কে দিয়ে গেল? তাকে আপনি চেনেন?

মাসীমা বললে—না বাবা, আমি চিনি না, কখনও দেখিনি তাকে। তারা বললে কিরণ এলে তাকে দিতে!

দীপঙ্কর বললে—আমাকে দেখিয়েছেন, ভালো করেছেন মাসীমা—এ 'সি আই-ডি'দের কাজ—একটা দেশলাই আছে?

মাসীমা ঘর থেকে একটা দেশলাই এনে দিলে। বললে—কী করবে বাবা দেশলাই দিয়ে?

—পুড়িয়ে ফেলবো। কিরণকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এই কাণ্ড করেছে ওরা—

বলে ফস্ করে আগুন জ্বালিয়ে দিলে সমস্ত কাগজগুলোতে। কিরণদের সেই উঠোনের মধ্যে সমস্ত বই কাগজ-পত্র দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। মা'র কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে দীপঙ্কর—স্বদেশী করবে না জীবনে। তবু যেন কিরণকে বাঁচাতে গিয়ে এটুকু করলে কোনও অপরাধ নেই। অন্ধকার উঠোনের মধ্যে আগুনের শিখাগুলো লক্ লক্ করে উঠছে। দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তারপর এক সময়ে আগুনটা নিভে এল। কাগজগুলো গন্-গনে লাল হতে হতে ক্রমে কুচকুচে কালো হয়ে গেল। তারপর শুধু ধোঁয়া।

দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ হলো।

—কে?

চমকে উঠেছে দীপঙ্কর। কে ওখানে?

তাড়াতাড়ি উঠোনের দরজাটা খুলে বাইরে এসে কাউকে দেখা গেল না কোথাও। এধার-ওধার সব দিকে দেখলে দীপঙ্কর। তারপর বললে—মাসীমা, আপনি দরজা বন্ধ করে দিন, সাবধানে থাকবেন, আমি যাচ্ছি।

মাসীমা বললে—কে বাবা! কাকে দেখলে!

দীপঙ্কর বললে—না, ও কেউ না। আমি যাচ্ছি—

মাসীমা দরজা বন্ধ করে দিলে। আশ্চর্য, কিরণ বাড়ি আসে না, তবু তারও পেছনে ঘোরাঘুরি করছে পুলিসের লোক। তাকে জড়িয়ে ফেলবার জন্যে নিষিদ্ধ কাগজ-পত্র রেখে গেছে। রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারের লোক এখনও তার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের কাছে আসতেই একটা শোরগোল কানে এল দীপঙ্করের। ঠিক যেন তাদের বাড়ির ভেতর থেকেই আসছে। এখন এত রাত্রে কী হলো আবার! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাড়ির সামনে আসতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছিটে।

ছিটের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

ছিটে ভেতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। সামনে দীপঙ্করকে দেখেই থমকে গেল।

বললে—এই যে দীপু, শালা শুয়োর-কা-বাচ্চার কাণ্ডটা দেখেছিস্?

ছিটের মূর্তির দিকে চেয়ে দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দর দর করে ঘাম ঝরছে সারা শরীরে। হাতে একটা লাঠি। চুলগুলো এলো-মেলো। যেন মারমুখো হয়ে কোথাও যাচ্ছে। কার সঙ্গে মারামারি লাগিয়েছে এখন?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে?

ছিটে বললে—আমি ভালোমানুষ আছি তো আছি, আমি চাকর হয়ে তোমার পা চাটবো, কিন্তু রাগলে আমি কারোর নই! শালা শুয়োর-কি-বাচ্চা, হারামজাদ্-কি-ভেড়ুয়া, আমার মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা? আমার গায়ে হাত তুললে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের গায়ে হাত? এত বড় আস্পর্দা শালার। শালা জানে না আমি কে?

দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারছিল না তখনও। বললে—কী হয়েছে বলো না? হয়েছে কী?

ভেতর থেকে হঠাৎ আর্তনাদ উঠলো। মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ। যেন ভীষণ ঝগড়া চলছে ভেতরে। যেন কে কাকে মেরেছে। অনেক মেয়ে-মানুষের গলার আওয়াজ একসঙ্গে কানে এল। বাড়িতে এত মেয়েমানুষ কোথা

থেকে ঢুকে পড়লো।

ছিটে আর দাঁড়াল না। লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পাগলের মতন আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

—তোর বাবার খাই আমি শালা? তোর বাবার পরি? শালা আমার মেয়েমানুষের ইজ্জত নষ্ট করবি তুই? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শালা, দেখি তোর ক'টা মুণ্ডু!

দীপঙ্করও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো। চন্নুনীর ঘরের সামনে আরো দু'জন মেয়েমানুষ! তারাও চিৎকার করছে গলা ছেড়ে। এরা কারা! এরাই কি লক্ষ্মী আর লোটন! বেশ সাজা-গোজা চেহারা। একজনকে তো সেদিন দেখেছিল কালিঘাট বাজারের বস্তিতে! লোটন!

ছিটেকে দেখে ফোঁটা বেরিয়ে এল। তারও হাতে একটা চ্যালা কাঠ! বলছে—আয় চলে আয়, বাপের ব্যাটা হোস্ তো সামনা-সামনি লড়ে যাবি—চলে আয়—

ছিটে—বলা নেই কওয়া নেই—হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো ফোঁটার ওপর। আর একটু হলেই একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধতো। কিন্তু দীপঙ্কর দৌড়ে সামনে গিয়ে দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বললে—করছো কী তোমরা, মারামারি করবে নাকি?

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ফোঁটার চ্যালা-কাঠটা সোজা একেবারে দীপঙ্করের মাথার ওপর এসে পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় দীপঙ্করের মাথাটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মনে হলো যেন অনেকগুলো মানুষের আর্ত চিৎকার কানে এল। আর তারপর সে-আওয়াজও যেন আর শোনা গেল গেল না। যেন মা দৌড়ে কাছে এল। যেন অঘোরদাদুর গলাও শোনা গেল একটু। মুখপোড়া বলে যেন কাকে গালাগালি দিচ্ছে। তারপর......

কোথা দিয়ে সব কী যে হয়ে গেল। মাথাটায় বেশি লাগেনি তাই রক্ষে। সারাদিন পরিশ্রমের পর একটু লাগতেই দীপঙ্কর পড়ে গিয়েছিল।

* * *

মনে আছে অঘোরদাদু সেই রাত্রেই নেমে এসেছিল ওপর থেকে। না নামলেই হয়ত ভালো হত। বুড়ো মানুষ। চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না। সারাজীবন যজমানদের কাছ থেকে সম্মান শ্রদ্ধা ঐশ্বর্য পেয়ে এসেছে—নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি অর্জন করেছে। হঠাৎ শেষ বয়সে পৌঁছে কি না দেখলে, যে-ভিতের ওপর তার সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠা, সেই ভিতটাই ফাঁকি দিয়ে তৈরি। তার সংসার একদিন নিজের মনের দুর্বলতার সুযোগে আপনিই গড়ে উঠেছিল। অঘোরদাদু এতদিন সেই সংসারের গোড়ায় জল দিয়ে সার দিয়ে জিইয়ে তুলেছিল তাকে। হয়ত কোনও দুর্বল মুহূর্তে আশা করেছিল তাতে ফুল ফুটবে, ফল ফলবে। সেই সংসারের ফল ভোগ করবে

অঘোরদাদু বুড়ো বয়েসে। কিন্তু হঠাৎ একদিন অঘোরদাদু টের পেলে, যে-ফল তাতে ফলেছে তা বিষ-ফল। যে-ফুল তাতে ফুটেছে তা কাঁটা-ফুল। তখন থেকেই নৈতিবাদী হয়ে গেল অঘোরদাদু। তখন থেকেই বলতে লাগলো—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়—সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—।

তখন থেকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করলে সমস্ত পৃথিবীটাকে। তখন থেকেই অঘোরদাদুর কাছে সমস্ত মানুষ মুখপোড়া হয়ে গেল। নিজের নাতিও মুখপোড়া হয়ে গেল, নিজের নাতনীও মুখপোড়া হয়ে গেল। হয়ত নিজেও মুখপোড়া হয়ে গেল নিজের কাছে।

তখন থেকেই সব স্নেহ, সব মায়া, সব মমতা গিয়ে পড়লো টাকার ওপর। টাকা থাকলে কাকে পরোয়া? টাকা থাকলে কিসের ভয়? তাই টাকাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে চেয়েছিল অঘোরদাদু। ভেবেছিল টাকাই তাকে শেষ জীবনে শান্তি দেবে, সান্ত্বনা দেবে। টাকার কাছে আত্মসমর্পণ করেই অঘোরদাদু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিল।

তবু টাকা তো কথা বলে না, টাকা তো সজীব পদার্থ নয়, টাকা তো ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে না—তাই দীপঙ্করকে দিয়ে সে-সাধ কিছুটা মেটাতো। তাই একজামিন পাশের খবর শুনে অঘোরদাদু নতুন কাপড় কিনে দিত দীপঙ্করকে। চাকরি হবার খবর শুনে আনন্দ হতো। মাঝে মাঝে ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ পচা বাতাসা কি সন্দেশ উপহার দিত!

কিন্তু এতদিনে বুঝি সেই ভালোবাসা স্নেহমমতাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল দীপঙ্করের জীবন থেকে।

কিরণদের বাড়ির সামনে থেকে ফেরবার সময়ও দীপঙ্কর এ-কথা কল্পনা করতে পারেনি। জ্বর হয়েছিল বুঝি দুপুর বেলা থেকেই। দীপঙ্কর তখন আপিসে। চন্নুনীর ক'দিন থেকেই শরীর খারাপ ছিল। উঠোনের কোণে তার নিজের ঘরটার ভেতর শুয়ে থাকছিল ক'দিন ধরে। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল। দুপুরবেলা মা গিয়ে ঘরে ঢুকে চন্নুনীর কপালে হাত দিয়ে দেখেছিল—কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে—

মা জিজ্ঞেস করেছিল—কিছু খাবে বাছা? কিছু খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?

চন্নুনী বলেছিল—তোমার দীপু কোথায় দিদি?

মা বলেছিল—কেন, দীপু কী করবে? দীপু তো আপিসে—

চন্নুনী বলেছিল—আমি আর বাঁচবো না দিদি—

—বালাই ষাট, মরবে কেন তুমি? জ্বরজ্বারি কি হয় না কারো?

তারপর একটু থেমে মা আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার মেয়েদের খবর দেব? মেয়েদের ডাকবো?

চন্নুনী ঘাড় নেড়েছিল। যে-মেয়েরা বাজারে গিয়ে উঠেছে তাদের ওপর

চন্নুনীর কোনও টান ছিল না কোনওদিন। নিজের কলঙ্কিত জীবনের ছোঁয়াচ থেকে মেয়েদের বাঁচাতে পারেনি বলে চন্নুনীর যে ক্ষোভ ছিল তা বুঝি এতদিন পরে স্পষ্ট করে ধরা গিয়েছিল। সেই জন্যেই বুঝি একদিন আকাশ-বাতাসকে লক্ষ্য করে তার অশ্রাব্য গালাগালির ঠেলায় কানে আঙুল দিয়ে থেকেছে। তাই বুঝি রোগশয্যায় শুয়েও চন্নুনী মেয়েদের নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

বললে—সে মুখপুড়ীদের নাম কোর না দিদি—

মা বলেছিল—তবু তো মেয়ে তোমার বাছা,—নিজের পেটের মেয়ে—

নিজের পেটের মেয়ে বলেই চন্নুনী তাদের গালাগালি দিতে পারতো আগেকার মতন। স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আবার আগেকার মত চেঁচিয়ে পাড়া মাত্ করে দিত। কিন্তু সে-সব কিছুই করলে না চন্নুনী। বিছানার তলায় হাত দিয়ে একটা হার বার করলে। সোনার বিছে হার। হয়ত যৌবনকালে অঘোরদাদুরই দেওয়া।

বললে—এই হারটা তোমার দীপুকে দিও দিদি—

—এ কি, বলছো কী তুমি চন্নুনী?

মা একেবারে যেন সাত হাত পেছিয়ে এসেছে। বললে—তুমি দীপুকে হার দিতে যাবে কেন বাছা! না না, তুমি ভাল হয়ে যাবে দেখো, ঠিক ভাল হয়ে যাবে দেখো, ঠিক ভাল হয়ে যাবে, ও হার তুমি রেখে দাও—

তারপর দুপুর বেলা চন্নুনীকে সাবু বার্লি করে দিয়েছে মা। একদিন চন্নুনীর দাপট ছিল, বয়েস ছিল। একদিন চন্নুনী এই সংসারের গৃহিণী ছিল। দীপঙ্করের মা যখন প্রথম বিধবা হয়ে ছেলে কোলে করে এ-বাড়িতে এসেছিল, সে-দিনের কথাও মনে পড়লো। এই-ই মানুষের পরিণতি। সেদিন চন্নুনীর দাপটে ভাড়াটেরা টিকতে পারতো না। চন্নুনীকে সেদিন খোশামোদ করে চলতে হয়েছে সকলকে। অঘোরদাদু সেদিন চন্নুনীর কথায় উঠেছে বসেছে। তারপর আস্তে আস্তে চন্নুনীর দিন গেল, দাপট গেল, বয়েস গেল। চোখে ছানি পড়লো। লক্কা আর লোটন তার আগেই হয়েছিল। তাদেরও বয়েস হলো একদিন। তারপর একদিন তারাও চলে গেল বাজারে!

দীপঙ্করের মা কাজ সারতে করতে আর একবার গিয়ে দেখে এল ঘরের ভেতরে।

—বলি, এখন কেমন আছো গো চন্নুনী?

তখন আর গলার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো মা'র। কপালে হাতটা ঠেকালে। মাথাটা নিচু করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

—ও চন্নুনী, চন্নুনী?

এ-সব খবর বোধহয় কাকের মুখে-মুখে ছড়ায়। বিকেল বেলা কলে জল এসেছে। দীপু আপিস থেকে আসবে সেই ছ'টার সময়। দীপঙ্করের মা'র

হাত-পা দুটো যেন অবশ হয়ে আসতে লাগলো। মানুষটার জন্যে কেমন যেন দুঃখ হতে লাগলো। যতই ঝগড়া করুক, যতই খিটখিটে লোক হোক, তবু তো জলজ্যান্ত একটা মানুষ!

বিন্তী বললে—কী হবে দিদি?

মা বললে—তুমি কিছু ভেবো না মা, ভগবানকে ডাকো—

—দাদুকে তুমি খবর দিয়েছ?

মা বললে—দিয়েছি—

অঘোরদাদুর বলে নিজেরই জ্বালা। তাকে নিজেকেই কে দেখে তার ঠিক নেই। তারও যাবার অবস্থা। তাকেও তো দেখা দরকার। একে অঘোর-দাদু নিজের জ্বালা নিয়েই অস্থির, তার ওপর চন্নুনীর কথা আর শুনতে ভাল লাগে না।

অঘোরদাদু বললে—ও বুড়ী মরুক গে, ও মুখপোড়া মরলে আমার হাড় জুড়োয়—

তবু দীপঙ্করের মা নিজেই একবার গিয়ে ফণি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। হাতের কাছে ফণি ডাক্তার থাকতে বিনা-চিকিৎসায় মারা যাবে মানুষটা! ডাক্তার এসে চন্নুনীকে দেখলে, ওষুধ দিলে। একটা টাকাও দিতে হলো তাকে। তারপর সন্ধ্যে হলো। বড় টিপি-টিপি পায়ে যেন সন্ধ্যে এলো সেদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িটাতে! সমস্ত কাজের মধ্যেও কোথায় যেন একটা আতঙ্ক লুকিয়ে ওত পেতে ছিল। দরজায় একটু শব্দ হলেই মা যেন চমকে উঠছিল—ওই আসছে দীপু! যেন দীপু এলেই সব আতঙ্কের অবসান হবে। যেন দীপু এলেই এই অবধারিত মৃত্যু এড়ানো যাবে।

—কে রে? দীপু?

সদর দরজায় খিল দেওয়া ছিল। শব্দ হতেই মা তাড়াতাড়ি হারিকেনটা হাতে নিয়ে দরজাটা খুলতে গেছে।

—তুই এত দেরি করে এলি বাবা? দেখ্ তো, এদিকে চন্নুনী যায়-যায়!—

কিন্তু দরজা খুলতেই দীপুর মা অবাক হয়ে গেছে। চন্নুনীর বড় মেয়ে লক্কা। দরজাটা খুলে মা খানিকটা নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কখনও চন্নুনীর মেয়েদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। মাজা-ঘষা চেহারা। কানে সোনার মাকড়ি, হাতে কাচের চুড়ি। মাথার চুলগুলো আঁট করে খোঁপা বাঁধা। গা ধুয়ে এসেছে বোধহয় এখনি। গা দিয়ে সাবানের গন্ধ বেরোচ্ছে ভুর ভুর করে।

বললে—মা কেমন আছে মাসি? মা'র নাকি অসুখ?

তারপর আর দাঁড়াল না। একেবারে শোক যেন উথলে উঠলো মেয়ের। চোখ ছল্ ছল্ করতে করতে দৌড়ে গেল চন্নুনীর ঘরের দিকে।

বিন্তী রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

মা বললে—তুমি ঘরে যাও মা, ওদের দিকে দেখো না—

চন্দনীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো বড় মেয়ে। তারপর এলো ছোট মেয়ে। লোটন্। তারও শোক উথ্‌লে উঠেছে। মাকে একটা পয়সা দিয়ে কখনও সাহায্য করেনি মেয়েরা। কখনও একটা ভাল-মন্দ জিনিস হাতে করে এনে মাকে গিয়ে বলেনি—মা তুমি এটা খাও—! সেই মেয়েদেরই কান্ড দেখে হাসি এল। এই তো পৃথিবী গো! বাপ বলো, মা বলো, মেয়ে বলো, পুত্ বলো, কেউ কারো নয়। এখন এসেছে মাকে দেখতে।

হঠাৎ এলো ফোঁটা। সে-ও খবর পেয়েছে। সঙ্গে ফণি ডাক্তার।

দীপুর মা বললে—আমি তো ডাক্তারবাবুকে ডেকেছিলুম, তুমি আবার কেন ডেকে আনতে গেলে—

ফোঁটার বড় আঁটা। বললে—তা হোক দিদি, আমার কর্তব্য আমি করছি, বাঁচা মরা তো ভগবানের হাত—

সকাল বেলাই ফণি ডাক্তার এসেছিল। আর একবার এল ফোঁটার সঙ্গে। আবার একটা টাকা পেলে। কী দেখলে ডাক্তার কে জানে! নাড়ি ঠিকই আছে। ওষুধ সকালেই দিয়েছিল। আবার ওষুধ দিলে। চন্দনীর তক্তপোশের পাশে বসলো খানিকক্ষণ। লক্কা আর লোটন্ দু'জনে তক্তপোশের দু'ধারে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ ছিটে ঢুকলো আর একজন ডাক্তার নিয়ে। নটে ডাক্তার।

সবাই অবাক হয়ে গেছে।

ফোঁটা বললে—আবার কেন ডাক্তার আনলি দাদা?

ছিটে বললে—বেশ করেছি এনেছি, তুই ভেবেছিস তুই আগে ডাক্তার এনে জিতে যাবি?

—তার মানে?

ফোঁটাও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। এমন রোগী দেখতে তারা কখনও কোনও বাড়ি যায়নি!

ছিটে বললে—হারামজাদা, মায়ের গয়নার লোভে তুই ডাক্তার এনেছিস, তা আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছিস?

—গয়নার লোভে?

—হ্যাঁ গয়নার লোভে। দশ ভরি বিছে হারের জন্যে ডাক্তার ডেকে ভারি একেবারে ডিউটি করছিস, তা আমি বুঝি না কিছু?

লোটন গালে হাত দিলে। বললে—ওমা, সে কী কথা গো! কী বলে দেখ! আমরা ডাক্তার ডেকেছি দশ ভরি গয়নার লোভে?

লক্কা বললে—তা না তো কী! আর ছেনালী করিসনি, তোর ছেনালী দেখলে গা জ্বলে যায় মাইরি—

ফোঁটা চেঁচিয়ে উঠলো—খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবি—

ছিটেও এগিয়ে গেল—কী, আমার মেয়েমানুষকে শাসাচ্ছিস—?

—তোর মেয়েমানুষকে চুপ করতে বল্ ছিটে, সাবধান করে দিচ্ছি এখনও—

লক্কা হাউ-মাউ করে উঠলো। বললে—ওমা, কোথায় যাবো গো, আমাকে খুন করে ফেলতে আসছে যে গো—

সে এক তুমুল চিৎকার শুরু হলো চন্দনীর ঘরের ভেতর। ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার হাত গুটিয়ে কান্ড দেখছে। চন্দনীর তখন কথা বলবারই অবস্থা নয়। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। আর ওদিকে দুই সহোদর ভাই আর সহোদর বোনে কুৎসিত ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল।

—বেরো শালা এখান থেকে বেরিয়ে যা!

—কেন রে শালা বেরিয়ে যাবো, আমার বাড়ি, আমি আলবৎ বসে থাকবো এখানে, তোর শালার কী রে?

—আবার গালাগালি দিচ্ছিস? খবরদার বলছি, মেরে খুন করে ফেলবো!

—তবে রে, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

লোটন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—ওগো, মেরে ফেলে গো, ওগো মেরে ফেল্লে—

লক্কাও কম যায় না। সেও চেঁচাতে জানে। বললে—ওগো কী সব্বনাশ হলো গো আমাদের।

ফোঁটা হাতের কাছ থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিয়ে তেড়ে এসেছিল ছিটের দিকে।

বললে—দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে, তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব একেবারে—

ফণি ডাক্তার আর নটে ডাক্তার তখন প্রাণের ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লক্কা লোটনের চুলের মুঠি ধরে টেনে ধরলে। বললে—হারামজাদী, ছেনালী, তোর মতলব আমি বুঝিনি! বুঝেছি, তোর পেটে পেটে এমন বুদ্ধি—

ছিটে তখন আর কিছু না পেয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এল। চিৎকার করতে লাগলো—আমি কালিঘাটের গুন্ডা, আমাকে চেনোনি শালা, আমি তোকে খুন করে গঙ্গায় কুচি কুচি করে কুটে ফেলে দেব—তবে আমার নাম ছিটে ভট্‌চাযি—

বলে একেবারে বাইরের সদর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেন শাগ্‌রেদদের ডাকতে যাচ্ছিল। আর সেখানেই দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা।

দুই ভাইএর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কথা বলতে গিয়েই যত গন্ডগোল বেধেছিল সেদিন। ফোঁটার চ্যালা-কাঠটা এসে ঠিক মাথার ওপর পড়লো। আর দীপঙ্করের মা বোধহয় দূর থেকে দেখছিল সব। এতক্ষণে তার মুখ দিয়েও একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

—মা গো!

সেইটুকুই কানে গিয়েছিল নিজের, তারপরে একটু জল মাথায় দিতেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল দীপঙ্করের। ডাক্তার দু'জন ছিল সেখানেই। সেখান থেকে উঠিয়ে সবাই ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এসেছিল সেদিন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। খানিকপরেই ওপর থেকে বুড়ো মানুষটা চিৎকার শুনে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

—মুখপোড়া, মুখপোড়ারা আবার এসেছে জ্বালাতে। মুখপোড়াদের ঝ্যাঁটা মারি মুখে—কোথায় গেল মুখপোড়ারা? কোন্ চুলোয় গেল তারা!

অন্ধ মানুষ। সেই অন্ধকার রাত্রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গালাগালি দিচ্ছে।

—হারামজাদা, আবার এ-বাড়িতে এসেছে, মুখপোড়াদের বের করে দেব বাড়ি থেকে! হারামজাদা মুখপোড়া কোথাকার—কোথায় গেল মুখপোড়ারা—

নামতে নামতে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। বিরাট ভারি লম্বা-চওড়া দশাসই শরীরটা। আর বুঝি ভার সইতে পারলে না। বোধহয় হোঁচট্ খেলে অঘোরদাদু। তারপর একেবারে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো উঠোনে। তখনও মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে—মুখপোড়া, মুখপোড়াদের......

জীবনের পথ তো অত সহজ, অত সরলগতি নয়। জীবন উপন্যাসও নয়। সে নিজের পথেই চলে। তার একটা বাঁধা নিজস্ব পথও আছে। তার নিয়ম-কানুনও আছে। জীবনের পথচলার আইন জীবনেরই নিজস্ব আইন। সেই পথ ধরেই দীপঙ্করের রথ এতদিন চলে এসেছে। সেদিন সেই কথাই বার বার মনে হয়েছিল দীপঙ্করের। পরের দিন সকাল পর্যন্ত অঘোরদাদুর জ্ঞান ফেরেনি মনে আছে। বুড়ো সকালবেলা একবার চোখ খুলেছিল। তা-ও খানিকক্ষণের জন্যে।

দীপঙ্করের মা মুখে একটু জল দিয়েছিল।

মাথাটা নিচু করে জিজ্ঞেস করেছিল—আর একটু জল দেব বাবা?

বুড়ো মানুষটা যতদিন শক্ত সামর্থ্য ছিল, ততদিন কারো টুঁ-শব্দ করবার সাহসটুকু পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু সেইদিন ছিটে-ফোঁটা যেন বাড়িতে এসে গেড়ে বসলো। নিচের উঠোনের সামনে ঘরের দাওয়ার ওপর এসে বসে রইল ছিটে-ফোঁটা। সকাল থেকে রান্না-বান্না কিছু হয়নি। চন্নুনীরও শেষ অবস্থা। অঘোরদাদুরও তাই। একা মাকেই সব দিক সামলাতে হচ্ছে।

বিন্তী সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বাইরে বেরোতে সাহস হচ্ছে না তার।

মা নিচের আসতেই ছিটে ধরলে—দিদি, চাবিটা কার কাছে?

—কিসের চাবি বাবা?

ছিটে যেন ধমকে উঠলো। বললে—কিসের চাবি জানো না? সিন্দুকের—আবার কিসের?

দীপঙ্করের কানেও কথাটা গেল। অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। এখনও যে অঘোরদাদু মরেনি, এখনও যে বেঁচে আছে বুড়ো মানুষটা। [illegible] চাবি চায় সিন্দুকের?

মা বললে—দেখছো তো বাবা, বুড়ো মানুষটার এখন শ্বাস [illegible] নিজের দাদু হয়ে এই কথা বলতে পারছো?

—তা বুড়ো মরতে এত দেরি করছে কেন?

সমস্ত রাত মা'র যে সে কী কষ্ট গেছে। রাত্রে খাওয়া হয়[illegible] হয়নি। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ! কোথায় পথ্য! একটা মানুষ ক[illegible] সামলাবে। বাড়িটা যেন হাট হয়ে উঠেছে। চন্নুনীর মেয়ে দুটো বাড়ি ছেড়ে [illegible] না।

দীপঙ্কর বলেছিল—মা, ও, হার আমার দরকার নেই. [illegible] দাও—

মা বললে—কিন্তু চন্নুনী যে হারটা তোর নাম [illegible]

সামান্য একটা হার। হোক, দশ-ভরি সোনার হার [illegible] চেয়ে সোনার দামটাই তো আর বেশি নয়! তা [illegible] দিয়ে কেটে দু'ভাগ করা হলো। সেই হারই অর্ধেক [illegible] নিলে লোটন। তারপর সারা রাত বসে ছিল দু'জন। [illegible] দেখে আর জিজ্ঞেস করে—দিদি, বুড়ো মরেছে?

যত বেলা বাড়তে লাগলো, ততই যেন অধৈর্য হয়ে উঠলো ছিটে-ফোঁটা।

বললে—আটটা বাজতে চললো, এখনও মরলো না বুড়ো

তারপর কোথা থেকে একে-একে ছিটে-ফোঁটার শাগরেদরা এসে জুটতে লাগলো। তারাও বাড়ির ভেতর এসে বসলো সব উঠোনে। [illegible] দল হয়ে গেল পাড়াতে। বসে বসে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো। দীপঙ্করের ঘরের ভেতরের সিন্দুকটার দিকে উঁকি দিয়ে দেখে গেল বার-কয়েক। দীপঙ্কর [illegible] গিয়ে অঘোরদাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

আবার ডাক্তার এল। মা জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন ডা[illegible]

দীপঙ্করের মনে হলো অঘোরদাদুর সঙ্গে যেন একটা য[illegible] মেতে বসেছে। যখন সবাই চলে গেছে, তখন একমাত্র অঘোরদাদুই [illegible]ঙ্করের শেষ বন্ধু। সেটাও শেষবার চলে গেল। অঘোরদাদুর পাশে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো জল্ জল্ করে এল তার! আর কেউ রইল না। কেউই রইল না আর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের যেন বড় কষ্ট হতে লাগলো। অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। এই তো শেষ। এই-ই তো শেষ পরিণতি। অঘোরদাদুর সেই তেজ কোথায় গেল! সেই দাপট কোথায় গেল। কার জন্যে এতদিন এত ঐশ্বর্য জমিয়ে এসেছে! কার জন্যে এতদিন টাকাকড়ি গয়না-বাসন সন্দেশ জমিয়ে জমিয়ে পচিয়েছে! কে খাবে এসব? কার ভোগে লাগবে? টাকা দিয়ে কি সব হয়? সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে? কোথায় গেল সেই যজমান[illegible] এতদিন ছিল অঘোরদাদু? কোথায় তারা? দীপঙ্কর খুঁটিয়ে [illegible]

লাগলো মুখখানার দিকে। কয়েকদিন কামানো হয়নি। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরিয়েছে সারা মুখে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে—ভেতরে দাঁত নেই। ফোগলা মুখ। মনে হলো অঘোরদাদু যেন হাসছে। আবার মনে হলো যেন হাসছে না—কাঁদছে। হাসি-কান্না কিছুই বোঝা যায় না। বড় অদ্ভুত করুণ হয়েছে মুখখানা। যেন চোখের পাতা দুটো একটু নড়ালো। যেন ঠোঁটটা একটু চমকে উঠলো কোণের দিকে। কিন্তু না, আর নড়ছে না। দীপঙ্করের মনে হলো একবার জিজ্ঞেস করে এখন কেমন লাগছে অঘোরদাদুর! মরবার আগে মানুষের কী মনে হয়, কেমন অনুভূতি হয় তা যেন অঘোরদাদুর কাছ থেকে জেনে নিলে ভাল হতো! খুব কি যন্ত্রণা হয়? খুব কি কষ্ট হয়? মরবার আগে মানুষ কি বুঝতে পারে যে তার জীবনের পালা শেষ হলো? বুঝতে পারে যে এতদিনের পৃথিবীটাকে ফেলে যেতে হচ্ছে?

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল এবার।

মা মুখের দিকে চাইলে। একটা আশার কথাও বোধ হয় শুনতে চাইলে।

বললে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

দীপঙ্করও উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল ডাক্তারবাবুর দিকে।

হঠাৎ ছিটে-ফোঁটার দল একেবারে হুড়-মুড় করে উঠে এসেছে। তারা বোধ হয় আর অপেক্ষা করতে পারেনি।

ফোঁটা বললে—কী হলো? মরলো?

এ-কথার কে উত্তর দেবে! ছিটে বললে—সারা রাত খাওয়া নেই দাওয়া নেই, শালা বুড়ো তো জ্বালালে খুব—

ফোঁটা আর দাঁড়াল না। অঘোরদাদুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দলের লোকরাও সঙ্গে গেছে। ছিটের দলের লোকরাও পেছপা নয়। ঘরটা খোলা ছিল না। অন্য দিন হলে অঘোরদাদু লাঠি উঁচিয়ে আসতো—মুখপোড়া বলে গালা-গালি দিত। আজ আর কেউ বাধা দিলে না। ছিটে-ফোঁটার দল তচ-নচ করে ফেললে সমস্ত জিনিসপত্র। কোথায় ছিল পচা সন্দেশ, কোথায় ছিল ময়লা কম্বল বালিশ—সব উল্টে পাল্টে সে এক তাণ্ডব কাণ্ড শুরু করে দিলে।

দীপঙ্কর রেগে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। মানুষটা এখনও মরেনি—এরই মধ্যে লোকটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায় নাকি! কিন্তু মা ইশারায় বারণ করলে। বললে—তুই কিছু বলিস নি, ওদের জিনিস ওরা যা খুশি করুক—

আর তারপর হয়ত চাবির গোছাটা পেয়ে গেল। সেই চাবিটার গোছা নিয়ে হুড়-মুড় করে আবার নিচেয় নেমে গেল সবাই। তারপর গিয়ে ঢুকলো দীপঙ্করের ঘরে। যে-ঘরে সিন্দুকটা ছিল।

দীপঙ্কর ওপর থেকে কাণ্ড দেখে বললে—মা, ওরা যে সব আমাদের ঘরে ঢুকলো—

মা বললে—ঢুকুক—

আর তারপর সিন্দুক ভাঙার পালা। দুম্ দাম্ শব্দ হতে লাগলো হাতুড়ির। তালা খুলতে পারেনি তাই হাতুড়ি শাবল ছেনি যা পেয়েছে তাই দিয়ে ঘা দিচ্ছে। কোথা থেকে যে এত লোক এল, কোথা থেকে যে কী সব হলো, কিছুই যেন কল্পনা করা গেল না। হৈ হৈ শব্দ করে চিৎকার করছে। কী আছে সিন্দুকের মধ্যে কেউ জানে না। অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করেছে তারা। অনেক অপমান-গঞ্জনা পেয়ে এসেছে অঘোরদাদুর কাছে। আজ যেন এতদিন পরে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

দীপঙ্করের সারা বুকটা যেন সির সির করে উঠলো। এ-সংসারে মায়া-দয়া-ভালবাসার কি কোনও মূল্য নেই? অঘোরদাদু কি জানতো এমন হবে একদিন? অঘোরদাদু কি কল্পনা করতে পেরেছিল এইসব ঘটনা? অঘোরদাদুর মুখের দিকে আবার চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। অঘোরদাদুর মুখে কোনও বিকার নেই যেন। যেন সমস্ত পার্থিব সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। মা পাশে বসে অঘোরদাদুর মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। স্থির হয়ে অন্তিম মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

নিচের উঠোনে লক্কা আর লোটন আবার এসে হাজির হয়েছে। এবার সেজে গুজে এসেছে দুজনে। হারের ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এখন আর তেমন ঝগড়া নেই। পান খেয়ে মুখ লাল করেছে।

দীপঙ্কর আবার ডাকলে—মা—

মা চাইল ছেলের মুখের দিকে মুখ তুলে।

—ওরা যে আমাদের ঘরের সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে—আমি যাবো?

মা গম্ভীর গলায় বললে—না—

তারপর হঠাৎ যেন নিচে থেকে একটা শোরগোল উঠলো খুব জোরে। সবাই চিৎকার করে উঠলো পাড়া কাঁপিয়ে। আশে-পাশের বাড়ির কিছু লোক তখন ঢুকে পড়েছে বাড়ির উঠোনে। আজ এ-বাড়িতে রান্না নেই, খাওয়া নেই। একদিকে উন্মত্ত মানুষের কোলাহল, লুকোন সম্পদের জন্যে হুড়োহুড়ি—যে-সম্পদ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাউকে উপার্জন করতে হয়নি, যে-সম্পদ ঠাকুরের নাম করে দিনের পর দিন সঞ্চয় করেছে, যে-সম্পদ ঈশ্বরকে ঠকিয়ে একজন কৃপণ আহরণ করেছে ভোগের উপকরণ হিসেবে—। আর একদিকে মৃত্যু। ধীর স্থির গম্ভীর অবধারিত মৃত্যু! দীপঙ্করের মনে হলো যেন সমস্ত পৃথিবীটা একেবারে উলঙ্গ হয়ে উঠলো তার চোখের সামনে। শুধু ছিটে-ফোঁটা নয়। ওই যারা নিচের উঠোনে ভিড় করে আছে, ওরা সব কে-জি-দাশবাবু, ঘোষাল সাহেব, অনন্তরাও ভাবে। এই লক্কা-লোটন—ওদের সঙ্গে মিস মাইকেলেরও যেন কোন পার্থক্য নেই। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন যেন নয় এটা—এটাই যেন পৃথিবী! দীপঙ্করের দেখা-অদেখা গোটা পৃথিবীটা যেন মূর্তি গ্রহণ করেছে এখানে! মৃত্যুর ওপর কোনও শ্রদ্ধাও নেই যেন ওদের। ওরা হাসছে, কথা বলছে, পান

খাচ্ছে।

ছিটে বিড়ি খাচ্ছিল, আর তদারক করছিল। বললে—তালাটাকেই তোরা ভাঙতে পারলি না, সর্ তোরা, আমি দেখি—

বলেই একটা শাবল নিয়ে তালার ভেতর ঢুকিয়ে দিলে।

অঘোরদাদুর তালা। সহজে ভাঙবার মত নয়। তবু চাড় দিতে লাগলো ছিটে।

ফোঁটাও বিড়ি ফুঁকছিল গামছা কাঁধে নিয়ে। বললে—মাল নেই পেটে, গায়ে জোর আসবে কোত্থেকে—

কাছেই একজন শাগ্রেদ হুকুমের অপেক্ষা করছিল। বললে—মাল আনবো দেব্‌তা?

—আন্—

বলে ফোঁটা পকেট থেকে টাকা বার করে দিলে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সবাই। অথচ জায়গাটা ছেড়েও চলে যেতে পারছে না কেউ। অনেক দিনের সিন্দুক। অনেক দিনের লোভ এই সিন্দুকটার ওপর। সে কি আজকের কথা! অঘোর-দাদুর এতটুকু স্নেহ মমতা পায়নি এরা। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিষনজরে পড়ে গেছে তার। তারপর থেকে রাস্তায় ঘুরে তবলা বাজিয়ে আর নিতান্ত বুদ্ধির জোরে নিজেদের জায়গা করে নিতে হয়েছে সংসারে। জেলে গেছে, হাজতে গেছে একেবারে সমাজের ডাস্ট্‌বিনে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে তাদের। তবু তাদের নিজের জগতে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন কালিঘাটের বস্তিতে কাটিয়েছে, এবার এখানে এসে উঠবে। উঠে অনেক টাকার মালিক হবে। লক্কা-লোটনকে নিয়ে সমাজের মধ্যে বাস করবে। তাই বোতলটা আনতেই ফোঁটা প্রাণ ভরে মুখের মধ্যে উপুড় করে দিলে।

শাগ্রেদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটু পেসাদ দ্যান্ দেব্‌তা—

—দেব, দেব, আগে সিন্দুকটা খোল্!

ছিটে দেখতে পেয়েই কাছে সরে এল। বললে—কী রে, একলাই খাবি নাকি?

ফোঁটা বললে—বেশ করবো খাবো, নিজের মেহনতের টাকায় খাচ্ছি—তোর বাপের টাকায় খাচ্ছি না তো—

ছিটেও রেগে গেল। বললে—তুই বাপ তুলে কথা বলছিস্?

—বেশ করবো, বাপ তুলবো।

—তবে রে হারামজাদা—

বলে ছিটে বোধহয় একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে দিত। কিন্তু হঠাৎ দীপঙ্কর ঘরে ঢুকলো। দীপঙ্করকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ালো। ছিটেও চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে। ফোঁটাও চেয়ে দেখলে।

দীপঙ্কর একটু চুপ করে থেকে বললে—অঘোরদাদু মারা গেছে—

—মারা গেছে?

সে কী উল্লাস! মারা গেছে! মারা গেছে! সমস্ত লোকগুলো যেন আত্মহারা হয়ে যাবার যোগাড়। ফোঁটা প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করেনি। তারপর একটু সম্বিৎ পেয়েই মুখের মধ্যে গড়-গড় করে ঢেলে দিলে সবটা। উপুড় করে নিঃশেষ করে ফেললে সমস্ত বোতলটা। তারপর আরো বোতল এল। আরো হুল্লোড় বাড়লো তাদের। আরো তামাশা চলতে লাগলো মৃত্যুর সঙ্গে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল এক নিমেষে। এই এদের এত গোলমাল, এত হল্লা, তার মধ্যেও দীপঙ্করের মনে হলো যেন সব নিস্তব্ধ, সব নিঝুম, সব শূন্য! পাড়ার কয়েকজন মেয়ে, কয়েকজন ছেলে মজা দেখতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দু'একজন মা'র কাছে গিয়ে বসেছে। বিন্তীও মা'র আঁচল ধরে বসে আছে। মা'র চোখ দিয়ে শুধু নিঃশব্দে টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর অঘোরদাদুর শুষ্ক দেহটা কাঠ হয়ে পড়ে আছে সামনে। একটু নড়া নেই চড়া নেই, একটু প্রতিবাদও নেই মুখে। মৃত্যুর আগে একটা কথাও বলে যেতে পারেনি অঘোরদাদু। কাউকে প্রাণ ভরে গালাগালিও দিয়ে যেতে পারেনি। পনেরো ষোল ঘণ্টা অসাড় হয়ে পড়েছিল শুধু চোখ বুজে।

মা শুধু এক ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়েছিল মুখে শেষ সময়টায়।

অঘোরদাদু শেষ হয়ে গেল। তবু শেষ হয়ে গেলেই তো সব শেষ হয় না। দীপঙ্কর উঠোনটার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাই ভাবছিল। যা ইচ্ছে নিক ওরা। সিন্দুক ভেঙে সব কিছু ওরা নিয়ে যাক্। দীপঙ্কর কিছু বলবে না। তার কিছু বলবারও নেই। আবার মা'কে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে।

সেই ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ কে যেন ডাকলে।

—দীপঙ্করবাবু হ্যায়?

দীপঙ্কর ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে। একেবারে অচেনা মুখ।

—দীপঙ্করবাবু কৌন্?

বেশ খাকি পোশাক পরা হিন্দুস্থানী একজন। বাড়ির সদর-দরজা দিয়ে একেবারে খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

দীপঙ্কর এগিয়ে গেল সামনে। বললে—কাকে খুঁজছো?

—দীপঙ্করবাবুকে!

—আমিই দীপঙ্করবাবু!

লোকটা বললে—আপনাকে বৌদিদিমণি ডাকছেন বাইরে—

—কে বৌদিদিমণি?

লোকটা বললে—বাইরে গাড়িতে বসে আছেন—

—বাইরে কোথায়? দীপঙ্কর লোকটার সঙ্গে বাইরে এল। এ-রাস্তায় গাড়ি ঢোকে না। দু'পা হেঁটে গেলেই নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটের চওড়া রাস্তা। রাস্তাটার ওপর একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাদামী রং। দীপঙ্করের কী যেন সন্দেহ হলো। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। যেন চেনা মুখ একটা গাড়ির ভেতরে। তাড়াতাড়ি কাছে যেতেই অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্কর!

—সতী, তুমি?

বেশ সিঁথির ওপর টকটক্ করছে সিঁদুর। আরো যেন ফরসা দেখাচ্ছে সতীকে। আরো যেন মোটা হয়েছে। আরো যেন সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু সতীও দীপঙ্করকে দেখে কম অবাক হয়নি। বললে—ও কি, তোমার মাথায় কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—ও কিছু না, কালকে মাথায় চোট লেগেছিল—কিন্তু তুমি হঠাৎ, কী মনে করে?

সতী হাসলো। বললে—তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এলাম!

—আমার সঙ্গে?

—কেন, আসতে নেই?

বলে সতী আবার হাসলো একটু।

দীপঙ্কর বললে—কাল তো তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি, তোমার শ্বশুরবাড়িতে, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। কিন্তু অনেক রাত তখন, তুমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে—তাই ডাকতে ভয় হলো—

তারপর একটু থেমে বললে—তুমি নামবে না?

সতী বললে—আর নামবো না এখন, কেন এসেছি তোমাকে বলে যাই শোন—আসছে সোমবার দিন একবার আমাদের বাড়ি যেতে পারবে? সোমবার সন্ধ্যেবেলা—

দীপঙ্কর বললে—আসছে সোমবার সন্ধ্যেবেলা?

সতী বললে—হ্যাঁ—

দীপঙ্কর বললে—কেন যেতে পারবো না? কিন্তু হঠাৎ কী ব্যাপার?

সতী বললে—তুমি আমার ওখানেই খাবে—

দীপঙ্কর মাথাটা নিচু করে কথা বলছিল। বললে—খাবো?

—হ্যাঁ, যাকে নেমন্তন্ন বলে আর কি, তাই!

দীপঙ্কর বললে—খুব আশ্চর্য তো—

সতী বললে—কেন, আশ্চর্য হবার কী আছে? খাওয়াতে নেই? মানুষ তো মানুষকে নেমন্তন্ন করেই—

দীপঙ্কর বললে—না, সে-জন্যে বলছি না! কাল রাত্তির বেলা আমি তোমার শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, অথচ আজ তুমিই এসে গেলে—

—তা ডাকলে না কেন? আমি তো ছিলুম বাড়িতে!

দীপঙ্কর বললে—খুব ভয় করতে লাগলো আমার—ভাবলাম বড়লোকের বাড়ি ঢুকবো, শেষে যদি কেউ কিছু বলে!

সতী খুবই হাসলো। কিন্তু প্রতিবাদ করলে না। শুধু বললে—বাবা তো বড়লোক দেখেই আমার বিয়ে দিয়েছেন!

তারপর হঠাৎ সে-প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বললে—থাক্ গে, তুমি তা হলে যেও ঠিক, বুঝেছ?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে বুঝি এখন অনেক লোককে নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে?

সতী বললে—অনেক লোককে? কেন? অনেক লোককে নেমন্তন্ন করতে যাবো কেন? শুধু তোমাকেই নেমন্তন্ন করলাম—আর কাউকে বলছি না—

—শুধু আমাকে!

দীপঙ্কর যেন একটু অবাকই হয়ে গেল। আর কাউকে নেমন্তন্ন করেনি, শুধু একলা তাকে? দীপঙ্কর সোজা সতীর মুখের দিকে মুখোমুখি চেয়ে দেখলে। সতীর গায়ে অনেক গয়না, সতীর চেহারায় অনেক রূপ, সতীর চোখেও যেন অনেক আত্মীয়তা। এতক্ষণ যেন এসব কিছুই নজরে পড়েনি তার। দীপঙ্কর চোখ ভরে দেখতে লাগলো।

বললে—এত লোক থাকতে বেছে বেছে শুধু একলা আমাকেই যে নেমন্তন্ন করলে?

সতী বললে—করলুমই না! করতে নেই?

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললে—যাবে তো?

বড় করুণ শোনালো সতীর গলার স্বরটা। দীপঙ্কর বললে—তুমি এমন-ভাবে কথাটা বলছো যেন তোমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আমি তোমাদেরই উপকার করবো, অথচ তুমি নিজে না এসে তোমাদের চাকরকে দিয়ে ডেকে পাঠালেও আমি যেতাম—জানো—

—তাহলে আমি যাই? মনে থাকবে তো? ঠিকানা চিনতে পারবে তো?

কী যে বলে সতী! সতী তো জানে না আপিসে কাজ করতে করতে, রাস্তায় ট্রামে চলতে চলতেও কতবার সতীর কথা ভেবেছে! বাড়ি আসবার পথে কতবার ওই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডটার দিকে চেয়ে দেখেছে।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল—সতী বললে—মাসীমার সঙ্গে আর দেখা করে গেলাম না, কিছু মনে করেন না যেন, তুমি একটু বুঝিয়ে বোল, বুঝলে?

দীপঙ্কর বললে—দেখা না-করেছ ভালোই করেছ, মা'র এখন কথা বলবারই সময় নেই—

—কেন? খুব কাজে ব্যস্ত বুঝি?

—না, আমার অঘোরদাদু এখ্‌খুনি মারা গেল!

—সেকি!

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, এই তুমি ডাকবার একটু আগেই মারা গেল! বাড়িতে এখন যে-কাণ্ড চলেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে! আমাকে নিজের নাতির মত ভালবাসতো অঘোর-দাদু। নিজের নাতির চেয়েও বেশি ভালবাসতো—তুমি তো সবই জানো! সংসারে আমার মা ছাড়া নিজের বলতে আর তো কেউ রইল না—

—কী হয়েছিল?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা, সব কথা বলবারও আমার সময় নেই, তোমারও শোনবার সময় হবে না এখন। তোমরা চলে যাবার পর অনেক কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে, সব কথা বললেও তুমি বুঝতে পারবে না—

—তা হলে তো [illegible] সময় নষ্ট করবো না। আগে বললে তোমার এতক্ষণ সময় নষ্ট করতাম না। আমি চলি তাহলে—

—হ্যাঁ, সে-সব শুনে তোমার কাজ নেই।

—তাহলে সোমবার, মনে থাকে যেন, আমি অপেক্ষা করবো—

সতীর গাড়িটা চলে গেল একটা মৃদু শব্দ করে। কী আশ্চর্য! দীপঙ্করের মনে হলো, এমন আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে সংসারে! এই ক'টা বছর কতবার যার কথা মনে পড়েছে, সেই সতীই এমন করে আসবে আবার তারই খোঁজে, এমনও সংসারে ঘটে তাহলে! অনেক কথাই তো জিজ্ঞেস করার ছিল, অনেক প্রশ্নই তো জমে ছিল দীপঙ্করের মনে! কিন্তু কিছু তো জিজ্ঞেস করা হলো না! তাকে নেমন্তন্ন করে গেল সতী!

—দীপুবাবু, দেখুন আপনাকে ডাকছে!

দীপঙ্কর হঠাৎ পেছন ফিরলো। দেখলে ফোঁটারই এক [illegible] পরে রাস্তাটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখলে—সতীর গাড়ির চিহ্ন নেই কোথাও। তার পর আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। [illegible] হয়ে গেছে সেখানে। [illegible] ঘরের ভেতরে তখনও অনেক [illegible]। [illegible]-ফোঁটা সবাই আছে। সিন্দুকটার তালা ভাঙা। ভেতরের জিনিসপত্র সব [illegible] করেছে! রুপোর বাসন, সোনার মোহর, টাকা, পয়সা, আনি, [illegible] স্তূপ। দু'ভাগে চুলচেরা ভাগ হচ্ছে।

ফোঁটা দেখতে পেয়েই বললে—কী রে দীপুদা? কোথায় [illegible] আমি ভাবলাম পালালি বুঝি। ওদিকের খবর কী?

ফোঁটার এক হাতে গ্লাস। ছিটেরও তাই। [illegible] দীপঙ্করের রাগ হয়ে গেল। এই [illegible] এইখানেই [illegible] মা [illegible] কাঠের ক্যাশবাক্সটা [illegible]। এই সিন্দুকের [illegible] করে। মা'র কাছে এই সিন্দুক [illegible] লক্ষ্মী! [illegible]

দিয়েছে। সমস্ত অশুচি অপবিত্র করে দিয়েছে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে মা'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সমস্ত রাত মা অঘোরদাদুর পাশে বসে আছে ঠায়। এক মিনিটের জন্যে উঠে যায়নি কোথাও। অঘোরদাদু চিত হয়ে শুয়ে আছে। ধীর স্থির মূর্তি। বিন্তীও পাশে বসে আছে মা'র কাছ ঘেঁষে।

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মা মুখ তুলে চাইলে। বললে—আজকে আর আপিসে যেও না তুমি, তোমাকেই তো সব করতে হবে—

দীপঙ্কর বললে—আমি তাহলে সাহেবকে একটা টেলিফোন করে দিয়ে আসি মা—

—তাই দাও!

কাছেই শ্মশান। ক্যাওড়াতলা শ্মশান থেকে দীপঙ্কর আপিসে টেলিফোন করে দিলে। রবিনসন সাহেব জিজ্ঞেস করলে—হোয়াটস রং উইথ ইউ? কী হয়েছে তোমার?

দীপঙ্কর বললে—আমার গ্র্যান্ড-ফাদার মারা গেছে!

সাহেব বললে—কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তোমার মাদার ছাড়া আর কেউ নেই!

—এ আমার নিজের গ্র্যান্ড-ফাদার নয় স্যার, কিন্তু নিজের গ্র্যান্ড-ফাদারের চেয়েও আপন—আমার আপন-জনের চেয়েও আপন!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কবে আপিসে আসতে পারবে?

দীপঙ্কর বললে—সোমবার!

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—ডেফিনিটলি সোমবার?

—হ্যাঁ স্যার!

সতীদের বাড়িতে সোমবার সন্ধেবেলা যেতে হবে। সেইদিনই আপিসে যাবে। আপিস থেকে ফেরার সময়!

আবার সেই শ্মশান। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে বাড়ি। ছোটবেলা থেকে শ্মশান দেখা অভ্যেস আছে দীপঙ্করের। প্রতিদিন রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন শ্মশানের চিৎকার কানে আসে। কিরণের সঙ্গে শানগর রোড দিয়ে যেতে যেতে ওই শ্মশানের পাশেই কতদিন আলুর চপ বেগুনী কিনে খেয়েছে। শ্মশান সম্বন্ধে কোনও ভয়, কোনও আতঙ্ক দীপঙ্করের মনে নেই। এ যেন তাদের বাড়ির উঠোন। এই উঠোনেই যেন ছোটবেলা থেকে দীপঙ্কর বড় হয়েছে। এই শ্মশান থেকেই দীপঙ্কর জীবনের বীজ আহরণ করেছে। সেই চেনা শ্মশানটাই যেন সেদিন আবার নতুন করে চিনতে হলো। বার বার চিনে-চিনেও যেন শ্মশানটা পুরোন হয় না দীপঙ্করের। এই সেদিন কিরণের বাবাকে এই

শ্মশানেই এনেছিল। এখানেই জীবন-মৃত্যুর মহাসন্ধিস্থলে যেন দীপঙ্করের আবার নতুন করে নবজন্ম হলো সেদিন।

ফোঁটা কাছে এল হঠাৎ। বললে—হ্যাঁ রে দীপু, তোরা নাকি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছিস?

দীপঙ্কর বললে—কে বললে? কার কাছে শুনলে?

ফোঁটা বললে—দিদি বলছিল! আমরা না-হয় লেখা-পড়া শিখিনি, তোরা তো লেখা-পড়া শিখেছিস, তোদের এ কী রকম বুদ্ধি শুনি?

দীপঙ্কর বললে—এতদিন অঘোরদাদু ছিল, এতদিন একটা জোরও ছিল, এখন আর কে আছে বলো? কার জোরে থাকবো?

ফোঁটা বললে—কেন? কোন্ শালা তোদের তাড়াবে? আমি থাকতে কোন্ শালা তোদের বাড়ি থেকে বার করে দেয় দেখি?

দীপঙ্কর বললে—না, সে কথা নয়, এখন তো আমি বড় হয়েছি ভাই, এখন আলাদা বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাওয়াই ভাল, চিরকাল তোমাদের বাড়িতে থাকবো, সেটাই কি ভাল দেখায়?

ফোঁটার তখন ঠিক সজ্ঞান অবস্থা নয়। সকাল থেকেই অনেক টেনেছে। সারা দিনই টানছে। শুধু ফোঁটা নয়, ছিটেও সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছে। অনেক মোহর, অনেক গয়না এসেছে হাতে। এতদিন পরে বাড়িটাও হাতে এসেছে।

ফোঁটা বললে—যতদিন ইচ্ছে তুই থাকবি, কোন শালা কিছু বলবে না।

দীপঙ্কর বললে—তুমি এখন ওদিকে যাও ফোঁটা। এখন তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না—

ফোঁটা বললে—কী বললি তুই, আমি মাতাল হয়েছি?

দীপঙ্কর বললে—না, তা বলিনি, আমি বলছি, এখন আমার মনটা খারাপ, ও-সব আলোচনা না-করাই ভাল—

সত্যিই অঘোরদাদুর মৃত্যুটা যেন দীপঙ্করের জীবনের ভিত্‌টা পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিল। এতদিনকার সম্পর্ক, এতদিনকার আকর্ষণ সব এমনি করেই বুঝি একদিন ছিঁড়ে যায় মানুষের। এই ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে কত লোকের সঙ্গে কত সম্পর্ক গড়ে উঠলো, আবার একদিন কত সম্পর্ক ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তার হিসেব নিকেশ করতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এমনি করেই বুঝি একদিকে যেমন ভাঙে, আর একদিকে তেমনি গড়ে ওঠে। অঘোরদাদুকে খাটে তোলবার সময় কেউ কাঁদবার ছিল না বাড়িতে। কেউই কাঁদেনি সেদিন। একটা সস্তা তিন টাকা দামের খাটিয়া। আর দশ পয়সার নারকোল দড়ি। কিছু ফুল কেনবার ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের, কিন্তু ফোঁটা বলেছিল—দূর ফুলটুল দরকার নেই, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট!

হয়ত সত্যিই পয়সা নষ্ট! কিন্তু তবু দীপঙ্করের মনে হয়েছিল যে-মানুষটা এত বড় সংসারের কর্তা ছিল একদিন, তার মৃত্যুতে এই পয়সা নষ্ট করাটাও যেন

দরকার। সামান্য দু-আনার ফুল কিনে খাটের ওপর ছড়িয়ে দিলেই চলতো। কিন্তু তাতেও উত্তরাধিকারীদের আপত্তি। অঘোরদাদু বেঁচে থাকলে নিজেও হয়ত আপত্তি করতো না। দশ পয়সার দড়ি আর তিন টাকার একটা পলকা খাটিয়া। আর সংকারের খরচ তিন টাকা চার আনা। মোট ছ' টাকা সাড়ে ছ' আনা খরচ। লাখপতির শেষ খরচ। সেই সামান্য খরচটুকু করতেও যেন উত্তরাধিকারীদের আপত্তি।

একাদশী বাড়ুজ্জেমশাই খবর পেয়ে এসেছিলেন। বিরাট গাড়ি তাঁর। গাড়ি থেকে নেমে খালি পায়ে এসে অঘোরদাদুর শেষ নশ্বর দেহটা দেখে গিয়েছিলেন। চাউলপটি রোডের বড়লোক যজমানরাও এসেছিলেন। যাঁরা যাঁরা খবর পেয়েছিলেন তাঁরাই এসেছিলেন। পাড়ার লোকরাও এসেছিল। হালদারবাড়ির কয়েকজন সেকেলে লোকও এসেছিল। যৌবনে এককালে যাঁদের সঙ্গে অঘোরদাদু মেলা-মেশা করতো, যাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতো—তারাও শেষবারের মত এসে কর্তব্যটা করে গেল।

কেউ কেউ বললেন—আহা বড় ভাল-লোক ছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই—

কেউ বললেন—পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন তিনি, স্বর্গে চলে গেলেন—

একজন বললো—কালিঘাট কানা হয়ে গেল এতদিনে গো—

অঘোর ভট্টাচার্যির সঙ্গে দীপঙ্কর কোনও দিন কাউকে মিশতে দেখেনি। অঘোরদাদুকে চিরকাল একলা মানুষই জেনে এসেছে দীপঙ্কর। অঘোরদাদু শুধু চিৎকার করেছে আর দেবতার নৈবেদ্য নিয়ে এসে নিজের ঘরে জমিয়েছে। আর সারাদিন সমস্তক্ষণ পৃথিবীর সব মানুষের মুখ পুড়িয়ে বেড়িয়েছে। সেই মানুষকেই এক মুহূর্তে পুণ্যাত্মা হতে দেখে দীপঙ্কর কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

শ্মশান থেকে যখন ফিরলো সবাই তখন বাড়িটা নিস্তব্ধ।

ফোঁটা একবার চিৎকার করে উঠে [illegible] হরি, হরি বোল্—

সকলের সম্মিলিত চিৎকারে [illegible] লেনটা যেন হঠাৎ গমগম করে উঠলো। একটা মানুষ শেষ হয়ে গেল, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। একটা পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেল।

মা তৈরিই ছিল। নাপিত অপেক্ষা করছিল সকলের জন্যে। সকলের হাত-পায়ের নখ কেটে দিলে। প্রত্যেকের জন্যে একটু নিমপাতা আর একটা করে বাতাসা। নিমপাতাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে বাতাসাটা খেতে হয়। এতে তৃপ্তি হয় পরলোকগত পিতৃপুরুষদের। ওতে 'না' বলতে নেই, ওকে অস্বীকার করতে নেই। যুগ যুগ ধরে এই অনুষ্ঠান আর সংস্কারের শৃঙ্খলা দিয়ে বাঁধা তাদের জীবন। ভালো হোক মন্দ হোক—যদি অঘোরদাদুর আত্মার কল্যাণ হয় তাতে দোষ কী!

দীপঙ্কর উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকটা চেয়ে দেখছিল। সমস্ত বাড়িটাই যেন ফাঁকা মনে হলো আজ। একদিন কাকাবাবুরা পাশের বাড়িটা

ছেড়ে চলে গিয়েছিল—সেদিনও ফাঁকা মনে হয়েছিল। কিন্তু সে অন্যরকম। আজ যেন বাড়িটার আত্মাও মরে গেছে। আর কেউ স্নেহ দিয়ে ভর্ৎসনা দিয়ে গালাগালি দিয়ে দীপঙ্করকে রক্ষা করবার নেই। আজ দীপঙ্কর আর তার বিধবা মা আবার যেন নিরাশ্রয় হয়ে গেল।

বিন্তীদি মা'র কাছ-ছাড়া হচ্ছে না সকাল থেকে। সকাল থেকে মা'র পাশে পাশে ঘোরা-ফেরা করছে। মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘরের সিন্দুকটা সকালেই ছিটে-ফোঁটা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানটা ফাঁকা হয়ে আছে। দীপঙ্কর ঘরে ঢুকে দেখলে একটা মাদুর পেতে মা সেখানেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর পাশে বিন্তীদি মায়ের কোল ঘেঁষে বসে আছে।

দীপঙ্কর বললে—মা, আমি একটু বেরোব—

মা বললে—এখন এত রাত্রে আবার কোথায় বেরোবি তুই?

দীপঙ্কর বললে—এ-বাড়ি তো এবার ছাড়তে হবে আমাদের—

মা বললে—তা তো হবেই—কিন্তু তা বলে আজই? শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাক্—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এখন থেকেই তো খোঁজ-খবর করতে হবে। একটু ভদ্দরলোকের পাড়ার মধ্যে না হলে তো আর থাকা যাবে না—!

মা বললে—তা তুই যা ভালো বুঝিস কর—আমি আর কী বলবো—

—বা রে, তোমার জন্যেই তো বাড়ি ছাড়া! তুমিই তো বরাবর বলতে অন্য পাড়ায় যেতে! এতদিন অঘোরদাদুর জন্যেই তো যাওয়া হয়নি, এখন তো আর সে ভয় নেই। এখন তো তোমাকে গালাগালি দেবারও আর কেউ নেই!

মা কিছু বললে না। চুপ করে রইল শুধু। দীপঙ্করের মনে হলো অঘোর-দাদুর মৃত্যুতে মা'র শোকটাই যেন সবচেয়ে গভীর। সেই অঘোরদাদুর পড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে এই সংকারের শেষ অনুষ্ঠানটুকু পর্যন্ত একলা মুখ বুজে মা'ই সব করে এসেছে। এতটুকু কাঁদেনি। এতটুকু চোখের জল ফেলেনি। বাড়িতে চোখের সামনে এত বড় অনাচার, অবিচার, অত্যাচার হয়েছে তাতেও যেন মা এতটুকু বিচলিত হয়নি। মা'র নিঃশব্দ ব্যবহারই যেন সব শোকের পূর্ণতা প্রকাশ করে ফেলেছে। মা'র মুখে সকাল থেকে কথা বেরোয় নি একটা। যা কিছু করণীয় সব কিছু করে গেছে নিঃশব্দে। মানুষটাকে যখন সবাই শ্মশানে নিয়ে গেছে, মা বিন্তীদিকে কোলের মধ্যে পুরে সান্ত্বনা দিয়েছে। তারও যে কেউ নেই। মা'কে কাঁদতে দেখলে তার যে কান্না রাখবার জায়গা থাকবে না। সে কার কাছে সান্ত্বনা খুঁজবে, কার কাছে আশ্রয় চাইবে। কতদিন মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছে, কতদিন কত লোক এসে দেখে গিয়েছে তাকে। জলযোগ করেছে, মিষ্টি খেয়েছে, মেয়ে দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর আর কোনও খবর দেয়নি তারা। কোথাকার কার মেয়ে, বাপ-মা মরা মেয়ে বিন্তী! তাকে নিয়েই মা বাঁধা পড়ে গেল এখানে।

মুখখানা হাত দিয়ে তুলে ধরে মা বলে—হ্যাঁ রে, তোর কি ঘুমও পায় না? তুই সারাদিন আমার আঁচল ধরেই থাকবি?

কথা বললেও তবু বোঝা যেত, কিন্তু এ-মেয়ে কথাও বলে না, কাঁদেও না, রাগও করে না। শুধু বোবার মতন মা'র পিছু-পিছু ঘোরে।

—হ্যাঁ রে, তোর জন্যে কি আমি নরকেও যেতে পারবো না মা?

অঘোরদাদুর মৃত্যুর কয়েকদিন পর পর্যন্ত যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল এ-বাড়ির আধখানা জীবন। এই দীপঙ্কর, এই দীপঙ্করের মা, আর বিন্তীদি। আর আধখানা যেন নতুন জীবন পেয়ে গেছে! ছিটে-ফোঁটা আসর জাঁকিয়ে বসেছে এখানে। লক্কা-লোটনও এসে উঠেছে এ-বাড়িতে। নতুন গয়না গড়িয়েছে দুজনে। গাল ভর্তি করে পান খেয়েছে। পুরুত এসেছে, শ্রাদ্ধের ফর্দ তৈরি হয়েছে। ষোড়শ হবে, বৃষোৎসর্গ হবে। শুধু তাই নয়। একশো একজন ব্রাহ্মণভোজনের ফরমাশ দিয়েছে ফোঁটা। বলেছে—ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে হবে অঘোর ভট্টাচার্যির। নইলে বদনাম হবে। যজমানরা অসন্তুষ্ট হবে।—

এ-সমস্তই লক্ষ্য করেছে দীপঙ্কর। কিন্তু কোনও কথাতেই কথা বলেনি। দীপঙ্করও বলেনি, মা-ও বলেনি, বিন্তীদিও বলেনি। এরা যেন এ-তরফের, ওরা ও-তরফের। বাড়ির সমস্ত আবহাওয়াই বদলে গিয়েছে। এ-বাড়িতে এতদিন হাসি ছিল না, শব্দ ছিল না, গোলমাল ছিল না। এখন সব এসেছে। ছিটে-ফোঁটা এখন এ-বাড়িতে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। লক্কা-লোটন এখন চেঁচিয়ে কথা বলে।

পুরুত মশাই আসেন। বলেন—বৃষোৎসর্গ হবে তো বাবাজী?

ছিটে বলে—আলবৎ হবে, বৃষোৎসর্গ না-হলে শ্রাদ্ধ কিসের?

—আর দান কেমন হবে?

যা যা প্রয়োজন, সবই করা হবে! অন্য লোকের শ্রাদ্ধে যা হয়, তার চতুর্গুণ হবে! দীপঙ্কর সবই শুনতে পায়। মা-ও সব শুনতে পায়। বিন্তীদিও শুনতে পায় সব। বড় বড় হাঁড়ি কড়া এসেছে, মণ মণ কাঠ এসেছে। ছিটে-ফোঁটার শাগরেদেরা এসে বাড়ি গুলজার করে তুলেছে।

দীপঙ্করের মা একবার গিয়ে দাঁড়ায় চন্নুনীর ঘরে। চন্নুনী কথা বলতে পারে না ভাল করে। ময়লা বিছানাটার ওপর বেঁকে কুঁকড়ে শুয়ে থাকে। আর দীপঙ্করের মা'কে দেখলে চোখের জল ফেলে।

দীপুর মা বলে—কেমন আছো বাছা আজ?

চন্নুনী হাত নাড়ে। বলে—নেই—দিদি আমি আর নেই—

মা বলে—আমরা চলে যাচ্ছি, জানো চন্নুনী, আমরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি—

চন্নুনী বুঝতে পারে কথাটা। চোখ দিয়ে আরো বেশি করে জল পড়ে। হাত দিয়ে দীপুর মা'র হাতটা ধরে। কী যেন বলতে চায় বুড়ী। হয়ত বলতে চায় তার দশ ভরির সোনার হারটা দীপুকে দিয়েছে কি না। হয়ত আরো অনেক কিছু। মা বুড়ীকে খানিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে আবার নিজের ঘরে এসে

ঢেকে। আজকাল মা'র আর কোনও কাজ নেই। দু'টি মানুষের রান্না। আর খাওয়া।

দীপঙ্কর সকালবেলা যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে। আবার কোথায় বেরিয়ে যায় মাঝে মাঝে। কোথাও একটা মনের মত বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না।

গাঙ্গুলীবাবু একদিন বলেছিল—আমাদের পাড়ায় ভাল বাড়ি আছে একটা, নেবেন সেনবাবু?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু বউবাজারে যাবো না, এই ভবানীপুরের দিকে খুঁজছি! গঙ্গার কাছে হলে ভাল হয়—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আচ্ছা, যদি খোঁজ পাই তো বলবো আপনাকে—

দীপঙ্কর বললে—আমার কিন্তু খুব শিগগির দরকার—ও-বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না গাঙ্গুলীবাবু—আজ পেলে আজই উঠে যাই—

দু'খানা ঘর হলেই চলবে! একখানাতে মা থাকবে আর একখানাতে দীপঙ্কর। যদি তিনখানা ঘর হয় তো আরো ভালো। সেখানা বসবার ঘর হবে! বাইরের লোকজন এলে বসবে!

শেষকালে পাওয়া গেল একটা বাড়ি। বেশ খোলা চারদিকে। বাইরের 'টু-লেট' টাঙানো দেখে ঢুকেছিল। সম্পূর্ণ আলাদা বাড়ি। দোতলাবাড়ি। নিচেয় দু'খানা বড় ঘর ওপরেও দু'খানা। কলের জল আছে। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে। স্টেশন রোড। ওপরের বারান্দা থেকে রেলওয়ে লাইন দেখতে পাওয়া যায়। দিন-রাতই ট্রেন আসা-যাওয়া করে। একটু শব্দ হবে। তা হোক। অভ্যেস হয়ে গেলে ওতে কোনও অসুবিধে হবে না। গঙ্গাটা একটু দূরে হয়ে গেল। মা'র গঙ্গাস্নান করতে অসুবিধে হবে। কিন্তু ভাড়ার দিকটাও দেখতে হবে। কুড়ি টাকা ভাড়া। এমন কিছু বেশি নয়।

পাশেই মালিকের বাড়ি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী কাজ করেন?

দীপঙ্কর বললে—রেলওয়েতে—

ভদ্রলোকও নিশ্চিন্ত হলেন। বছর দু'-তিন কোনও ভাড়াটেই পাচ্ছিলেন না ভদ্রলোক। খালি পড়ে ছিল বাড়িটা। আসলে কে আর শহর ছেড়ে এই বন-জঙ্গলের দিকে আসতে চায় বলুন। এখন তবু এদিকে লেক-টেক হয়েছে, একটু লোকজনের মুখ দেখতে পাচ্ছি। এই সেদিনও শেয়াল ডাকতো বাড়ির পেছনে। এই গড়িয়াহাটের মোড়ে তখনও বাজার হয়নি। ট্রামই ছিল না মশাই। লোকে আসবে কী করতে। একমাত্র এই রেল যা ভরসা। দীপঙ্কর পাঁচ টাকা আগাম দিয়ে দিলে।

ভদ্রলোক বললেন—কবে থেকে আসবেন?

দীপঙ্কর বললে—আজ থেকেই আসবো—আজ আর আপিসে যাবো না,—

—সকালে না সন্ধ্যেবেলা?

দীপঙ্কর বললে—আজ দুপুরের মধ্যেই আসবো—

বাড়িতে ফিরতেই মা বললে—কী রে, এত দেরি? আপিস যাবি না?

দীপঙ্কর বললে—চলো মা, বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি, আজকেই চলে যাবো।

মা বললে—সে কী রে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ওমনি গেলেই হলো?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আর যে আমার এখানে এক মিনিট থাকতে ইচ্ছে করছে না—

—তা এতদিন কাটালি, আর এই একটা দিন থাকতে পারবি না! কাল না-হয় যাবো—

দীপঙ্কর বললে—একটা দিনও আর আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না মা, আমি এখুনি চলে যাবো—এখানে কি ভদ্দরলোকে থাকতে পারে এর মধ্যে?

মা বললে—কিন্তু আজকে যে তোর জন্মদিন বাবা, জন্মদিনে এতদিনের বাসা ছাড়বি?

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে এসেছি মা তাদের কাছে, আজকে দুপুরের মধ্যেই আসবো!

—তা আমাকে জিজ্ঞেস না-করে কেন কথা দিতে গেলি অমন? জানিস না আজ তোর জন্মদিন?

জন্মদিন বলে বাড়ি ছাড়া যাবে না, এমন কথা জানা ছিল না দীপঙ্করের। তা ছাড়া আজকেই যে তার জন্মদিন, তাই-ই কি তার মনে ছিল।

দীপঙ্কর বললে—আমি পাঁচ টাকা বায়না দিয়ে এলুম যে!

—তা টাকা তো মারা যাচ্ছে না। জন্মদিনে কেউ বাড়ি ছাড়ে? তুই না-হয় এসব মানিস না, কিন্তু আমি মা হয়ে কেমন করে না-মেনে থাকতে পারি বল্?

—তা হলে কবে যাবে?

মা বললে—কাল। কাল চল্—

তা শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হলো। কালই যাওয়া হবে। এতদিনকার বাস উঠিয়ে কাল এখান থেকে চলে যাবে। এখানকার ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুর সংস্রব ত্যাগ করে চলে যাবে। এখানকার কথা আর ভাববে না দীপঙ্কর। এই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল, এই কালিঘাট, এই পাথর-পটি, এই সোনার কার্তিকের ঘাট, এই মায়ের মন্দির, এই হাজিকাশিমের বাগান—এই সব কিছু ভুলে যাবে। বড় মধুর, বড় তিক্ত এই এখানকার স্মৃতি। এই সব স্মৃতি মুছে ফেলেই চলে যাবে। আর কাউকে মনে রাখবে না।

দীপঙ্কর বললে—তা হলে সঙ্গে কী-কী জিনিস যাবে বলো, আমি গুছিয়ে নিই।

মা বললে—তা এত তাড়াতাড়ি কিসের, বিকেল রয়েছে, সন্ধ্যে রয়েছে—পরে করলেই তো হবে, আপিস থেকে এসেই না-হয় করিস—

দীপঙ্কর বললে—না, সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ি আসতে দেরি হবে আজকে—

—কেন? সন্ধেবেলা আবার কোথায় যাবি?

দীপঙ্কর বললে—রাত্রে আমি বাড়িতে খাবো না, আজকে—

—কেন? কোথায় যাবি? কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—তা এতদিন থাকতে আজকেই নেমন্তন্ন? আজকে যে আমি তোর জন্যে ভাল-মন্দ রান্না করবো ভাবছিলাম—!

দীপঙ্কর বললে—তা কী করা যাবে!

—তা কোথায় নেমন্তন্ন শুনি? কে নেমন্তন্ন করলে তোকে?

দীপঙ্কর বললে—সতী!

সতী! মা-ও যেন চমকে উঠেছে।

বললে—কোন্ সতী? আমাদের সতী? সে আবার তোকে নেমন্তন্ন করতে গেল কেন? তার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হলো?

দীপঙ্কর বললে—এই এখানে। আমাদের বাড়িতে এসেছিল পরশুদিন—

—সে কী রে? আমি তো জানি না কিছু?

দীপঙ্কর বললে—সেই যেদিন অঘোরদাদু মারা গেল, সেই তখন। সব শুনে আর তোমার সঙ্গে দেখা করলে না। আমাকে বলেই চলে গেল। আর তখন বাড়ির মধ্যে যা কান্ড, কী করেই বা আসতে বলি—

মা বললে—তা তার তো বিয়ে হয়ে গেছে! কী রকম বিয়ে হলো কিছুই তো জানতে পারলুম না! তুই তার শ্বশুরবাড়ি চিনিস? তোকে ঠিকানা দিলে বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—কিসের নেমন্তন্ন হঠাৎ?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কী করে জানবো বলো। তখন কি জিজ্ঞেস করবার সময়? হঠাৎ এসে বলে চলে গেল, তখন আর অত-শত জিজ্ঞেস করবার সময় ছিল না।

—তা আরো সব লোকজন বোধহয় আসবে!

দীপঙ্কর বললে—না, আর কেউ নয়, শুধু আমাকে একলাই যেতে বলেছে।

মা তবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। এত দিন বাদে এত লোক থাকতে দীপঙ্করকেই বা একলা যেতে বলবে কেন? তারা তো বড়মানুষ। অনেক টাকা-কড়ি তাদের। দীপঙ্করের সঙ্গে তাদের কিসের সম্পর্ক! একদিন ভাড়াটে হয়ে এসেছিল। এমন কত ভাড়াটেই তো এসেছে গেছে। কেউ তো আর কখনও ফিরেও একবার দেখা করতে আসেনি।

মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, ছেলেপুলে কিছু হয়েছে নাকি সতীর? দেখলি কিছু?

দীপঙ্কর হেসে ফেললে। বললে—সে-কথা বাপু আমি জিজ্ঞেস করতে

পারিনি—ও-সব কি মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে পারা যায়?

মা বললে—জিজ্ঞেস করবি কেন, ও তো দেখেই বোঝা যায়। হলে তো সঙ্গেই থাকতো—

—না মা, ছেলে-মেয়ে কিছু সঙ্গে ছিল না। গাড়িতে আর কেউ ছিল না, একলাই এসেছিল।

দীপঙ্কর খেয়ে-দেয়ে আপিসে চলে গেল। গাঙ্গুলীবাবু টিফিনের সময় এসেছিল। দেখে অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কি সেনবাবু, আজ যে ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছেন?

দীপঙ্কর বললে—আজ একটা নেমন্তন্ন আছে, সোজা আপিস থেকেই যাবো সেখানে—

—কোথায়? আত্মীয়ের বাড়িতে?

—না, আত্মীয় স্বজন নয়, আমাদের পুরোন ভাড়াটে ছিল এককালে। খুব বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, হঠাৎ নেমন্তন্ন করে গেল।

—উপলক্ষটা কী?

—তা জানিনে মশাই, এসে খেতে বলে গেল, আর আমিও রাজী হয়ে গেলুম।

—কিছু দিতে-টিতে হবে, না শুধু খাওয়া?

দীপঙ্কর বললে—সে সব তো কিছু বলে যায়নি, শুধু বলেছে খেতে।

—তা হলে বোধহয় ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী, বিবাহ-বার্ষিকী! আজকাল ওই সব স্টাইল হয়েছে এক-রকম। অনেক জিনিসপত্র উপহার পাওয়া যায় ওতে—

দীপঙ্কর ভাবলে—তা হয়ত হতে পারে! হয়ত বিয়ের বার্ষিক উৎসব পালন করছে। কিন্তু সে-সব তো কিছুই বললে না সতী!

গাঙ্গুলীবাবু বললে—ওই, আমি যা বলেছি তাই, নিশ্চয়ই বিয়ের বার্ষিক উৎসব, আপনি বরং একটা কিছু উপহার কিনে নিয়ে যান—

—কী কিনবো বলুন তো?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—যা-ই কিনুন, এক টাকা দু'টাকার কমে কিছুতেই হবে না।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো বেশি টাকা সঙ্গে আনিনি—আগে কথাটা মনেই আসেনি! শুধু ট্রামভাড়া আছে পকেটে, সকাল বেলাই আবার পাঁচটাকা বায়না দিয়ে এলুম বাড়িওয়ালাকে কিনা—

—কোথায় বাড়ি পেলেন?

—বালিগঞ্জ, স্টেশন রোডে!

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কিন্তু সেখানে কি থাকতে পারবেন, শুনেছি বালিগঞ্জে তো ভীষণ মশা, আর কেবল বন-জঙ্গল চারদিকে—

দীপঙ্কর বললে—না গাঙ্গুলীবাবু, সে বালিগঞ্জ আর বন-জঙ্গল নেই, আপনি

অনেকদিন যাননি ওদিকে—গিয়ে দেখবেন, গাড়িয়াহাটার মোড়ে একটা মস্ত বাজার হয়েছে, অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে ওদিকে—একেবারে চিনতেই পারবেন না গেলে—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—যাক্ গে, আপনি বরং দু'আনা দিয়ে একটা রজনী-গন্ধার ঝাড় কিনে নিয়ে যান। সস্তাও হবে, স্টাইলও হবে—

হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ঘরে ঢুকেই বললে—হোয়ার ইজ্ মিস্ মাইকেল? মিস্ মাইকেল কোথায়?

গাঙ্গুলীবাবু আর দীপঙ্কর দু'জনেই দাঁড়িয়ে উঠলো। দীপঙ্কর বললে—মিস্ মাইকেল আজকে আপিসে আসে নি স্যার—অ্যাব্সেন্ট!

—আই সী।

তারপর মিস্টার ঘোষাল কী ভাবলে কে জানে! হঠাৎ চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—সেন্, সী মি ইন্ মাই রুম, আমার ঘরে একবার দেখা করবে এসো—

বলেই গট্ গট্ করে মিস্টার ঘোষাল তার নিজের ঘরে চলে গেল।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—হঠাৎ আপনাকে ডাকলে যে ঘোষাল সাহেব, সেনবাবু?

—কী জানি! দেখি—

বলে দীপঙ্কর সোজা মিস্টার ঘোষালের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ বললে—টেক্ ইয়োর সীট সেন, বোস চেয়ারটায়—

দীপঙ্কর বসলো। কিন্তু কেমন অবাক হয়ে গেল। এমন ব্যবহার তো করে না ঘোষাল সাহেব। কদর্য মুখটা যেন হাসি-হাসি। বললে—ডু ইউ নো, আমি তোমায় প্রোমোট্ করেছি— ?

দীপঙ্কর তবু বুঝতে পারলে না। এই সেদিন রাত্রে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মিস মাইকেলের ঘরে দেখা হয়েছিল। তখনই ঘৃণায় রি রি করে উঠেছিল মনটা। আজ হাসিমুখ দেখেও দীপঙ্করের কোনও ব্যতিক্রম হলো না।

মিস্টার ঘোষাল সিগ্রেট ঠোঁটে লাগিয়েই বললে—ইয়েস, আই হ্যাভ প্রোমোটেড্ ইউ টু ডি-টি-আই—তোমার পেপার আমি দেখেছি—ইউ হ্যাভ্ ফেয়ার্ড ওয়েল—

কথাটা বলে যেন মিস্টার ঘোষাল একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলো।

তারপর বললে—তোমার প্রস্পেক্ট আছে, তুমি উন্নতি করবে জীবনে, মন দিয়ে কাজ করবে, আরো উন্নতি করে দেব তোমার—যাও—

ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটলো যে দীপঙ্কর ধন্যবাদ দিতেও যেন ভুলে গেল। কী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। এমন সোজা সরল মিথ্যে কথাটা বলতেও বাধলো না!

বাইরে আসতেই গাঙ্গুলীবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সেনবাবু? কী বললে ঘোষাল সাহেব?

দীপঙ্করের কাছে ব্যাপারটা শুনে গাঙ্গুলীবাবু বললে—শালা একেবারে

আসল শুয়োরের বাচ্ছা! করলে রবিন্সন্ সাহেব আর ক্রেডিট্ নিলে নিজে? এ তো মানুষ খুন করতে পারে মশাই—! আপনি কিছু বললেন না?

দীপঙ্কর বললে—বলতে দিন, মানুষ চিনতে পেরেছি, এইটেই তো আসল লাভ, আর কী চাই—

গাঙ্গুলীবাবু চলে গেল। রবিন্সন্ সাহেবও সকাল সকাল চলে গেল। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে দেখছিল দীপঙ্কর। জানলা দিয়ে বাইরেও একবার চেয়ে দেখলে। সন্ধ্যের সময় যেতে বলেছে সতী। ছ'টার সময়েও সন্ধ্যে! ঠিক কখন গেলে যে মানানসই হয় তা ঠিক করতে পারলে না দীপঙ্কর।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্রামে করে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে নামতে হলো। অনেক বেছে বেছে রজনীগন্ধার একটা ঝাড় কিনলে। গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল দু'আনা নেবে। কিন্তু ছ'পয়সাতেই দিয়ে দিলে। একটা পাতলা সাদা কাগজে বেশ ভাল করে মুড়ে দিলে। তারপর আবার ট্রামে উঠে হাজরা রোডের মোড়ে এসে নামলো।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে ঢুকে সতীদের বাড়িটা।

দারোয়ানটা বসে ছিল। সামনে গিয়েও কেমন একটু বুকটা কাঁপতে লাগলো দীপঙ্করের।

কিন্তু সামনে যেতেই দারোয়ানটা উঠে দাঁড়াল।

বললে—আপনার নাম দীপন্‌করবাবু?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

দারোয়ান বললে—আইয়ে, ভিতর আইয়ে—

দারোয়ানটা আগে আগে চলতে লাগলো। দীপঙ্কর পেছনে। ইঁট বাঁধানো লম্বা রাস্তা গিয়ে মিশেছে সোজা আস্তাবল-বাড়ির দিকে। উত্তর দিকে লন্। লন্-এর চারপাশে বাগান। বড় রাস্তাটা থেকে আর একটা ইঁট বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে বাঁদিকে। সেদিকে একতলায় অনেকগুলো ঘর পাশা-পাশি। কাচের জানলার ভেতরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। তার সামনেই দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপর কার্পেট পাতা। দীপঙ্কর চারদিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেল। এত ঐশ্বর্য! এই ঐশ্বর্য দেখাতেই সতী তাকে ডেকেছে নাকি?

দারোয়ানটা হঠাৎ বললে—আইয়ে বাবুজী—উপর আইয়ে—

দারোয়ানের পেছন পেছন দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

কত ঐশ্বর্য, কত বিলাস চারদিকে ছড়ানো। সিঁড়ির দু'পাশে ছোট ছোট টবে পাতা-বাহার গাছ। বাঁকের মাথায় মোরাদাবাদী ভাসের ওপর ক্যাক্টাস্। কোথায়ও এতটুকু ধুলো নেই, এতটুকু অসংযম নেই। সিঁড়ির মাথায় একটা পাপোশের ওপর কালো অক্ষরে একটা মনোগ্রাম লেখা। দেয়ালগুলো সাদাও নয়, সবুজও নয়, দুয়ের মাঝা-মাঝি কেমন একটা তেল-চক্চকে জলুস! এ কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে দারোয়ানটা। এত পরিচ্ছন্নতার মধ্যে জুতো পরে

চলতেও যেন মায়া হচ্ছে।

একতলা থেকে দোতলা। দোতলার পর তিনতলা।

সত্যিই ভুবনেশ্বরবাবু অন্তত একটা মেয়ের বিয়ে দিয়ে শান্তি পেয়েছেন। দীপঙ্কর অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। এ কী বাহার, এ কী বিলাস। কলকাতা শহরের মধ্যে যাদের টাকা আছে তারা কি এমনি সুখেই জীবন কাটায়! এমন ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করতে হলে সত্যিই অনেক সৌভাগ্য থাকা চাই। সতী ছোট থেকেই সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। তার যে এমন ঐশ্বর্য হবে, তখনই বোঝা গিয়েছিল। মা'র সঙ্গে মন্দিরে যেত, গঙ্গায় স্নান করতে যেত। বিন্তীদিকে দেখতে আসার সময় নিজের গয়নাগুলো পরিয়ে সাজিয়ে দিত। দীপঙ্করের বড় ভালো লাগলো। বড় ভালো লাগলো সতীর সৌভাগ্য দেখে। এতদিন মনে মনে যে-ক্ষোভটা ছিল তা এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সত্যিই তো, দীপঙ্করের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কিসের। পাশাপাশি বাড়িতে ছোটবেলা থেকে থাকা ছাড়া আর কিসের সম্পর্ক!

—এই যে এসে গেছ, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ভুলে গেলে!

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল সতী! দীপঙ্কর চোখ তুলে দেখলে। এই চারিদিকের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে সতীকে যেন অন্যরকম দেখালো। একেবারে অন্যরকম। হাসি হাসি মুখ। অল্প একটু ঘোমটা দিয়েছে। একটা নীল শাড়ি পরেছে। চুমকি বসানো ব্লাউজ একটা গায়ে। মাথার পেছন দিকটা খুব ভারি। মনে হলো যেন মস্ত বড় একটা খোঁপা ঝুলছে কাঁধের ওপর।

—দরোয়ান, তুমি নিচে চলে যাও—

দরোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে চলে গেল। দীপঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল সতীর দিকে। বিয়ে হবার পর আজকেই বলতে গেলে সত্যিকারের প্রথম দেখা। সেদিন নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীটে গাড়ির ভেতরে বসা সতী যেন এ নয়। এ যেন আলাদা।

সতীও একটু এগিয়ে এল। বললে—তোমার এত দেরি হলো যে?

দীপঙ্কর অবাক হলো। দেরি করে এসেছে নাকি সে! তার নিজের কেন, মনে হচ্ছিল একটু সকাল-সকালই এসে পড়েছে। বললে—দেরি কোথায়, আমি তো ভাবছিলাম আরও পরে এলে ভালো হতো—

—ও, তুমি ভেবেছিলে খেয়ে-দেয়েই পালিয়ে যাবে!

দীপঙ্কর বললে—খাবার নেমন্তন্ন করলে আগে কী করে আসি?

সতী হঠাৎ বললে—হাতে কী তোমার?

দীপঙ্কর একটু লজ্জায় পড়লো। বললে—ফুল।

—ফুল? ফুল কী হবে? ফুল কার জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে?

সতীও অবাক হয়ে চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে। একটু আগেই বোধহয় সাবান দিয়ে গা ধুয়ে এসেছে সতী। মুখে স্নো পাউডার মেখেছে। গলা পর্যন্ত সমস্ত মুখখানা ধপ্‌ধপ্‌ করছে। বাগান থেকে তোলা টাট্‌কা ফুলের মত। আর মাথার সিঁথির আগায় লাল টক্‌টক্‌ করছে সিঁদুর। সিঁদুরের পাতলা রেখাটা যেন হোমের আগুনের মত জ্বলছে।

—তা আমার জন্যে আবার ফুল আনতে গেলে কেন?

দীপঙ্কর বললে—একটা কিছু উপহার তো দিতে হবে!

—কিসের উপহার?

—বারে, তোমাদের বিয়ের বার্ষিকী উৎসব করছো, আর আমি খালি হাতে আসি কী করে?

সতী হো হো করে হেসে উঠলো। হাতটা ধরে বললে—এসো এসো, ঘরে এসো—বসবে চলো—

চক্‌চকে মেঝে। দীপঙ্করের জুতো পরে চলতে লজ্জা হচ্ছিল। বললে—জুতোটা এখানে খুলি—

সতী বললে—কেন?

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের বাড়ি যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জুতোটা খুলে এলেই ভালো হতো! বলে জুতো-জোড়া খুলে রাখলে দরজার পাশে। বললে—এখানে রাখবো?

সতী বললে—থাক্‌—

দরজায় পাতলা জালি-পর্দা ঝুলছিল। দুপাশে কর্ড দিয়ে বাঁধা। ঘরের ভেতরে পরিষ্কার তক্‌ তক্‌ করছে মেঝে। মধ্যেখানে একটা মিনে করা বিরাট থালার মত টিপয়, তার ওপর জাপানী ফুলদানী। অনেক ফুল রয়েছে তাতে। টিপয়টার চারপাশে আপহোলস্টার্ড সোফা কোচ্‌ সাজানো। কিউবিজম্‌ ধরনের ডিজাইন সোফার গায়ে। দীপঙ্কর গিয়ে বসলো একটাতে। ঘরটা যে এত বড় তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এদিকটাতে সোফা কোচ্‌, আর আর-এক প্রান্তে একটা ডবল ডিভান। আগাগোড়া লেদার ফিটিং। আর মাঝখানে অনেকখানি খালি মেঝে। দেয়ালের দিকেও চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। একজন বৃদ্ধ লোকের ছবি টাঙানো। পোর্ট্রেট। ঠিক তার উল্টোদিকের দেয়ালে একটা জোড়া-ছবি। চেয়ারে বসে আছে সতী আর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন অচেনা ভদ্রলোক।

ফুলের ঝাড়টা সতী একটা ভাসের মধ্যে রেখে দিয়ে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—ওঁকে চিনতে পারছো তো? ওই আমার বাবা—

ভুবনেশ্বর মিত্র। এতক্ষণে চিনতে পারলে দীপঙ্কর। যেদিন প্রথম বর্মা থেকে আসেন ভদ্রলোক সেদিনই দেখেছিল। সেই প্রথম আর শেষবার। ছোট একটু দাড়ি চিবুকের ওপর। সতী যেন বাবার কাছ থেকে সেই তেজটা পেয়েছে।

যৌবনের আর রূপের তেজ। স্নিগ্ধ শান্ত অথচ প্রখর তেজ একটা। যে-তেজের জন্যে দীপঙ্কর বরাবর আকর্ষণ বোধ করলেও কেমন যেন দূরে দূরে থেকেছে।

সতী হাসতে লাগলো। বললে—আমার দিকে বার বার অমন করে কী দেখছো?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবার চেহারার সঙ্গে তোমাকে মিলিয়ে নিচ্ছি—

সতী বললে—আমি বাবার চেহারার কিছুই পাইনি—। যাক্ গে, আর এদিকে এঁকে চিনতে পারছো? ইনিই হলেন আমার কর্তা—

সতীর 'কর্তা' কথাটা বলার ধরন দেখে দীপঙ্কর বেশ মজা পেলে। বললে—ইনিই বুঝি সনাতনবাবু? বাঃ, বেশ চমৎকার চেহারা তো!

সতী নিজের স্বামীর চেহারার প্রশংসা শুনে যেন খুশী হলো মনে মনে। বললে—বাবা আমার অনেক দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন, খারাপ চেহারা দেখে বিয়ে দেবেন কেন?

দীপঙ্কর কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে—না, আমি তা বলছি না, সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি এত বড়লোকের বাড়ি তোমার বিয়ে হবে! আরো একদিন তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে তোমাদের বাড়ির সামনে ঘুরে গেছি, কিন্তু তোমাদের দরোয়ানের চেহারা দেখে ভয়ে ঢুকতে পারিনি—!

সতী বললে—লোকটা কিন্তু ভালো, ওই গোঁফজোড়াটা দেখলেই খালি ভয় করে—

দীপঙ্কর বললে—তোমার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন খেতে পাইনি বলে একটা দুঃখ ছিল মনে, তুমি সে-দুঃখটা আজ সুদে-আসলে মিটিয়ে দিলে—

বলে হাসবার চেষ্টা করলে দীপঙ্কর। তারপর সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু, একটা কথা বুঝতে পারছি না, তোমাদের বিয়ের বার্ষিক উৎসবে আমাকে একলা শুধু নেমন্তন্ন করলে কেন?

সতী মুখ টিপে হাসতে লাগলো। বললে—আমাদের বিয়ের বার্ষিকী, এ তোমার কে বললে?

দীপঙ্কর বললে—আমি বুঝতে পারি। প্রথমটায় আমার খেয়াল ছিল না। ভেবে ভাবলাম বিনা উপলক্ষ্যে আমাকে কেন নেমন্তন্ন করতে যাবে সতী! অনেক ভেবে ভেবে তখন বার করলাম—তখন এই রজনীগন্ধার ঝাড়টা কিনে আনলুম—

সতী বললে—কেন, বিনা উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন করতে নেই কাউকে?

দীপঙ্কর বললে—সত্যি বলো না, আর কাউকে নেমন্তন্ন করোনি কেন?

—আরে একে নিয়ে তো এক মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি! তোমাকে একলা নেমন্তন্ন করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

দীপঙ্কর চুপ করে গেল। সত্যিই তো যার যাকে খুশি নেমন্তন্ন করবে, তাতে কা'র কী বলবার থাকতে পারে! কথাটা ভাবতে দীপঙ্করের একটু গর্বও

হলো।

বললে—আমাকে একলা নেমন্তন্ন করে তুমি আমাকে খাতির করলে, না সম্মান দিলে তা বলতে পারি না, আমার কিন্তু মনে মনে খুব গর্ব হচ্ছে সতী!

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু তিনি কোথায়?

—কে?

—তোমার স্বামী! সনাতনবাবু! তোমাদের বাড়িতে এসে একলা-একলা তোমার সঙ্গে এক-ঘরে বসে গল্প করছি, এটা যেন কী-রকম দেখাচ্ছে! তিনি আসবেন না? তাঁকে ডেকে দাও?

সতী হাসলো। বললে—ওমা, তাঁকে ডাকবো কী করে? তিনি তো নেই বাড়িতে।

দীপঙ্কর বললে—কোথাও বেরিয়েছেন বুঝি?

সতী অবাক হলো। বললে—ও, তোমাকে বলিনি বুঝি? তিনি তো পুরী গেছেন! তিনিও গেছেন, আমার শাশুড়ীও গেছেন আজ তিনদিন হলো—

দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়লো। সেই জন্যেই কোনও শব্দ শোনা যায়নি। সমস্ত বাড়িটাতে ঐশ্বর্যের চিহ্ন থাকলেও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। সেই জন্যে বাড়িটাতে ঢুকে মনে হচ্ছিল যেন কেমন জন-মানবহীন! দরোয়ান চাকর-বাকর আছে বটে, কিন্তু যেন তবু কেউ নেই।

—তা তোমার ছেলে-মেয়েও বুঝি সঙ্গে গেছে?

সতী হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—তোমার আক্কেল তো বলিহারি! মা'কে ছেড়ে ছেলে-মেয়ে থাকতে পারে?

—আমিও তো তাই ভাবছি! তুমি রইলে এখানে, আর তোমার ছেলে-মেয়েরা চলে গেল বাবার সঙ্গে! তা তারা কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না?

সতী বললে—পারি না বাপু তোমার সঙ্গে কথা বলতে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি কী করবো বলো, মা'কে যখন বললাম যে তুমি নেমন্তন্ন করে গেছো, তখন মা-ই আমাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার ছেলে-পুলে হয়েছে কি না—

সতী বললে—তা হলে তো এতক্ষণ দেখতেই পেতে, কিন্তু না হলে কী করবো?

দীপঙ্কর বললে—হয়ই নি?

দীপঙ্কর মনে মনে হিসেব করতে লাগলো—কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে সতীর!

—দাঁড়াও, আমি দেখে আসি মাংসটা কী হলো!

দীপঙ্কর বললে—তুমিই রান্না করছো নাকি?

সতী বললে—না, ঠাকুর আছে, কিন্তু তোমাকে একদিনের জন্যে নেমন্তন্ন করেছি, তাকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। শেষকালে যদি নুনে পুড়িয়ে দেয়, তখন কি

আমার মুখ থাকবে? পুরোন ঠাকুরকে যে আমার শাশুড়ী পুরীতে নিয়ে গেছেন, এ তেমন সুবিধের ঠাকুর নয়—

—তাহলে তো তোমার খুব কষ্ট হলো?

সতী হাসলো। বললে—রাঁধতে কি কষ্ট হয় নাকি মেয়েদের?

দীপঙ্কর বললে—না, তা বলছি না, ওঁরা পুরী থেকে ফিরে এলেই নেমন্তন্ন করলে পারতে। তাহলে সনাতনবাবুর সঙ্গেও আলাপ হতো, আর তোমারও এই দুর্ভোগ হতো না—

সতী বললে—বাঃ, জন্মদিন বুঝি কারো বদলানো যায়?

জন্মদিন? জন্মদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ! তার জন্মদিন. সে-কথা সতীর কী করে মনে থাকলো?

বললে—আজকে যে আমার জন্মদিন, তা তোমার কী করে মনে রইল?

সতী বললে—বোস, আমি মাংসটা দেখে এক্ষুনি আসছি,—

বলে সতী ঘর থেকে চলে গেল। সতী চলে যেতেই দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে গেল। তার জন্মদিনের কথা তো এক মা ছাড়া আর কারো জানবার কথা নয়। আর জানলেও মনে রাখবার কথাও তো নয়। আশ্চর্য তো! আর সতীই বা কেমন মেয়ে! স্বামী নেই, শাশুড়ী নেই বাড়িতে, হঠাৎ তাকে কি না নেমন্তন্ন করে বসলো! এদের সমাজে কি এটা চলে! আর সনাতনবাবুই বা কেমন, আর সতীর শাশুড়ীরই বা কী-রকম আক্কেল! তাঁরা পুরী গেলেন তাঁদের বউকে একলা ছেড়ে! আর সতী তাকে ঠিক এই সময়েই নেমন্তন্ন করে বসলো, যখন বাড়ির লোকজন কেউই নেই! এটা কি সতীর পক্ষে ভাল কাজ হয়েছে!

খানিক পরেই সতী ঘরে ঢুকলো হাওয়ায় ভেসে। বললে—তোমাকে বসিয়ে রেখে গেছি অনেকক্ষণ,—কিছু মনে করলে না তো আবার—

দীপঙ্কর বললে—বা রে বা, তোমার কাছে আমি আজ নতুন মানুষ হলুম নাকি?

সতী বললে—নতুন না হোক, আমার শ্বশুরবাড়ি তো নতুন—

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা সতী, সনাতনবাবুর এ-ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না, মাকে নিয়ে তিনি পুরী গেলেন তোমাকে এখানে একলা ফেলে. এটা কী রকম?

সতী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো! বললে—বিয়ের পর এতদিন কেটে গেল, এখনও ভয় থাকবে না কি? কী যে বলো তুমি? আমি কি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবো?

—না পালিয়ে যাবার কথা হচ্ছে না, কিন্তু......

—কিন্তু কী? বিরহ?

দীপঙ্কর বললে—তিনি তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছেন?

সতী বললে—না গো না, তুমি যা সন্দেহ করছো, তা নয়. আমাদের দুজনের খুব টান আছে!

তারপর একটু থেমে বললে—আসলে আমার শাশুড়ীর একটা মানত ছিল কি না, তাই গেছেন। তা বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে যাব সেটা তো ভাল দেখায় না,. তাই আমি বললুম আমি থাকবো—

দীপঙ্কর বললে—কবে আসবেন সবাই?

সতী বললে—গেছেন তো মাত্র তিনদিন আগে, আসতে সেই পরের সপ্তাহ হয়ে যাবে—

দীপঙ্কর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো সতীকে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাড়াটে বাড়ির সতী, কলেজে যেত বাসে করে, আর এখানে এসে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। কেমন যেন বউ-বউ চেহারা। গালে মুখে গলায় বুকে যেন একটু মন্থরতা এসেছে। একটু মোলায়েম হয়েছে। তা বিয়ের পর এই রকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। শুধু লক্ষ্মীদির চেহারাটাই আরো খারাপ হয়ে গেছে। যেন আরো কঠোর, আরো প্রখর।

—তা সারাদিন কী করো তুমি? এত চাকর-ঝি, তোমাকে বোধহয় কিছুই কাজ করতে হয় না। কী করে সময় কাটাও তোমার? দুজনে বুঝি খুব ঘুরে বেড়াও গাড়ি নিয়ে?

সতী বললে—এক এক দিন যাই—

—কোথায় যাও?

—এই একদিন হয়ত বোটানিক্সে, আর একদিন হয়ত যশোর রোড ধরে সোজা যতদূর খুশি চলে যাই। তারপর যখন ও ফিরতে বলে তখন ফিরি। এক-একদিন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি আসে, আমরা গাড়ির ভেতরে বসে বসে বৃষ্টি-পড়া দেখি—

দীপঙ্কর বললে—সত্যি তোমরা খুব সুখে আছো সতী!

—তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—না, আমার নিজের কথা ভাবছি, সকাল বেলা তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে আপিসে যেতে হয় তো, তারপর কত রকম লোকের সঙ্গে কত রকম কথা বলতে হয়, সে এক জঘন্য জগৎ সতী! অথচ এখন ভাবি এই চাকরির জন্যেই একদিন কত খোশামোদ, কত ধরাধরি। এখানে বেশি দিন চাকরি করলে মনুষ্যত্ব চলে যাবে আমার মনে হচ্ছে—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে তুমি বুঝবে না, আর বুঝতেও যেন কখনও না হয়। সে না-বোঝাই ভাল! চাকরির জন্যে মানুষ এমন হীন কাজ নেই যা করতে পারে না! মিথ্যে কথা বলতে গেলে মুখ একটু কোঁচকায় না পর্যন্ত......তা আপিসের কথা থাক্ গে—

—না, থাকবে কেন! আমি তোমাদের আপিসে যাবো একদিন!

—তুমি?

—হ্যাঁ, গেলে দোষ কী?

দীপঙ্কর বললে—দোষ আর কী? কিন্তু তোমরা এত সুখে আছো, আপিসে যাবেই বা কেন! আর গেলে লোকেই বা বলবে কী?

—তোমার প্রমোশন-টমোশন কিছু হলো?

দীপঙ্কর বললে সব। কেমন করে সামান্য চাকরি থেকে তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়েছে তার। যা কখনও কারো হয়নি। অথচ ঘুষও দিতে হয়নি, খোশামোদও করতে হয়নি। কে জানে কেন যে রবিনসন্ সাহেবের সুনজরে পড়ে গেছে সে, তার ফলেই চাকরিটা চলছে ভালমতন। নইলে প্রাণ বেরিয়ে যেত আপিসে। আরো অনেক কথা বলে গেল দীপঙ্কর। নতুন বাড়ি ভাড়া করেছে স্টেশন রোডে, অঘোরদাদুর মৃত্যু, ছিটে-ফোঁটার ব্যবহার, লক্ষ্মী-লোটন কারোর কথাই বাদ গেল না। আর বিন্তী?

সতী বললে—এখনও বিয়ে হয়নি?

দীপঙ্কর বললে—তুমি একটু চেষ্টা করো না সতী। তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়। মেয়েটার জন্যেই মা ভেবে-ভেবে অস্থির। কী করে যে বাড়ি ছেড়ে যাবো আমরা তাই ভাবছি—। কিন্তু যাক্ গে—

বলে অন্য প্রসঙ্গ ওঠালে দীপঙ্কর। বললে—ও-সব বাজে কথা থাক্, তোমার কথা বলো—

সতী বললে—আমার কথা কী বলবো? আমাকে তো সামনেই দেখতে পাচ্ছো? খাই-দাই ঘুমোই, আর কী খবর থাকতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—বিয়ের পরে তো এই প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হলো। শ্বশুরবাড়ি কেমন, নতুন বর তোমার কেমন হলো, দু'জনে কেমন কাটাচ্ছ, সেই সব কথা বলো?

সতী হেসে ফেললে। বললে—যেমন সবাই কাটায় তেমনি কাটাচ্ছি—। বিয়ের পর একবার ওর সঙ্গে বাবার কাছে গিয়েছিলাম, এক মাস থেকে চলে এসেছিলাম—

দীপঙ্কর বললে—এখানে এ-বাড়িতে ঢুকে পর্যন্ত আমার খুব ভালো লাগছে, জানো সতী! মনে হচ্ছে, অন্তত এমন একজনকেও জানি যে জীবনে সুখী হয়েছে। সংসারের চারদিকে নানান্ ব্যাপার দেখে দেখে মনটা বড় ভারী হয়ে গেছে। নিজে সুখী না-ই বা হতে পারলাম, তুমি তো সুখী হয়েছ, এতেই আনন্দ হয়েছে আমার—

সতী বললে—যাক্ গে, তোমাকে আর বুড়োমানুষী করতে হবে না! তোমার কী এমন কষ্টটা শুনি?

দীপঙ্কর বললে—বলছো কী? কষ্ট নয়?

—শুনিই না, কিসের কষ্ট তোমার? চাকরিতে প্রমোশন হয়েছে, আলাদা

বাড়ি ভাড়া করেছ—

—তা চাকরি আর বাড়ি হলেই বুঝি সব কষ্ট ঘুচে যায় মানুষের?

সতী হেসে বললে—এখন বাকি আছে শুধু বিয়েটা! আমিই মাসীমাকে গিয়ে কথাটা বলে আসবো! না, সত্যিই এবার তোমার বিয়েটা দেওয়া দরকার। একলা-একলা আর ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি!

দীপঙ্কর বললে—তোমার মত সুখের বিয়ে হলে বিয়ে করতেও রাজী আছি আমি—

সতী বললে—বিয়ে করে আবার কারো কষ্ট হয় নাকি?

দীপঙ্কর বললে—হয় না? আমাদের আপিসেই কত লোক আছে, বিয়ে করে পস্তাচ্ছে—তুমি নিজে সুখে আছো বলে তাই ওই রকম ভাবছো—তোমাদের এই সংসার, টাকার অভাব নেই, ঐশ্বর্যের অভাব নেই, এক গ্লাস জল পর্যন্ত তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না, বিয়ে করা তো তোমাদেরই পোষায় সতী—

সতী বললে—তা আমরা সুখে আছি বলে তুমি যেন বাপু নজর দিও না —হ্যাঁ—

—না না, দারিদ্র্য, তো তুমি দেখনি সতী। আমি দেখেছি, এই আমার কথাই ধরো না, ছোটবেলায় কী কষ্টে যে মানুষ হয়েছি, বলতে গেলে ভিক্ষে করে পরের বাড়ি রান্না করে মা চালিয়েছে। সে তো তুমি দেখেছ। আমার বড় সাধ ছিল স্বদেশী করবার, দেশের শতকরা নব্বুই জনই তো আমাদের মতন অবস্থা, রাস্তার কাটা ডাব কুড়িয়ে এক-একজন ভদ্রলোকের ছেলে পেট ভরায়, জানো, তাই যখন স্বদেশীদের বোমার ঘায়ে বড় বড় জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট, লাটসাহেবরা খুন হয়, তখন বড় কষ্ট হয় মনে। মনে হয়, আমি কিছু করতে পারছি না। আমি চাকরি করছি বাধ্য হয়ে, মনে হয়, আমি দেশের কোনও কাজে লাগলাম না—! তোমাদের মতন টাকা যদি থাকতো তো আমাকে আর চাকরি করে সময় নষ্ট করতে হত না—

সতী চুপ করে শুনতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের এত টাকা। এত সুখ দেখে বড় ভালো লাগলো! তাই বলছি, দেশের প্রত্যেকটা লোকের এইরকম সুখ, এইরকম ঐশ্বর্য যেদিন হবে, সেইদিনই আমার সুখ হবে—

সতী বললে—তুমি দেখছি এখনও সেইরকমই আছ—

—কী রকম?

—যে-রকম ছিলে আগে! ভেবেছিলাম এতদিন পরে একটু সেয়ানা হয়েছ বুঝি।

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না সতী, আমরা সব প্রাণমথবাবুর হাতে-গড়া মানুষ। আমরা ভালোর সুগার-কোটিং দিয়ে খারাপ জিনিসের বেসাতি করি না। এককালে তুমি তো কিরণকে ঘেন্না করতে, কিন্তু জানো, সেই কিরণই......

সতী বললে—থামো বাপ্‌, তুমি কি বক্তৃতা করতে এখানে এসেছো নাকি? তোমাকে নেমন্তন্ন করলুম কি তোমার বক্তৃতা শোনবার জন্যে?

দীপঙ্কর যেন এতক্ষণে একটু সম্বিৎ ফিরে পেলে। বললে—সত্যিই, যত বাজে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম! তা সত্যি তোমার কী করে মনে রইল যে, আজকে আমার জন্মদিন? আমি নিজেই তো ভুলে গিয়েছিলাম—

সতী হেসে বললে—মেয়েদের মনে থাকে সব!

—থাকে? সত্যিই থাকে?

—হ্যাঁ, সব মনে থাকে।

দীপঙ্কর বললে—আমারও থাকে। প্রথমদিন আমাকে সেই কুলী মনে করে চারটে পয়সা দিয়েছিলে, তাও আমার মনে আছে।

সতী বললে—তোমার তো বড় সাংঘাতিক মন? অত মনে থাকাও কিন্তু ভাল নয় আবার—জীবনে কখনও সুখ পাবে না তুমি!

হঠাৎ একটা চাকর ঘরে ঢুকলো। সতী বললে—কী রে শম্ভু, কিছু বলবি?

শম্ভু নামটা শুনে দীপঙ্করের মনটা চমকে উঠলো। শম্ভু! লক্ষ্মীদির মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো মুহূর্তের জন্যে!

শম্ভু বললে—ঠাকুর বলছিল এখন লুচি বেলবে?

সতী দীপুর দিকে চেয়ে বললে—তুমি খাবে এখন দীপু? খিদে পেয়েছে? আমার সব তৈরি—

দীপঙ্কর বললে—আমার জন্যে ভেবো না, তোমাদের যখন সুবিধে হবে, আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন?

সতী বললে—তাহলে ভাজতে বল্, আর খাবার জায়গা করে দে টেবিলে—

শম্ভু চলে গেল। সতী বললে—সকাল-সকাল খেয়ে যেন পালিয়ে যেও না,—

—তুমিও আমার সঙ্গে খাবে তো?

সতী বললে—না না, তাই কখনও হয়? তুমি নতুন এলে, তোমার খাওয়ার তদারক করতে হবে তো—তুমি খেয়ে নিলে তারপর আমি খেয়ে নেব—! খাবার পর চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি, গাড়ি তো রয়েছেই—

—কোথায়?

—এই ময়দানের দিকে!

—তোমরাও বুঝি খাওয়া-দাওয়ার পর বেড়াও!

সতী বললে—মাঝে মাঝে বেড়াই বই কি! আমারও কিছু কাজ নেই, ওরও কিছু কাজ নেই—কী করি বলো!

—তাহলে তোমাদের এত বড় সংসার চলে কিসে?

সতী বললে—পৈতৃক টাকা! টাকা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। শেয়ার কেনা আছে গাদা-গাদা। একেবারে যার মার নেই, সেই সব শেয়ার, ডিভিডেণ্ড্ আসে।—কিছু করবার দরকারই হয় না ওর! তাছাড়া, আমি ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথাই ঘামাই না—

—আর তোমার শাশুড়ী?

—শাশুড়ীও বউ বলতে একেবারে অজ্ঞান! আমার শাশুড়ীও খুব ভাল—

দীপঙ্কর বললে—তা তো ভাল হবেই, এত টাকা-কড়ি, শাশুড়ী তো ভালবাসবেই, আর তুমি হলে বাড়ির একমাত্র বউ, বাড়িতে লোক-জনও কম—বেশ সুখে আছো সতী সত্যি—মাকে গিয়ে সব বলবো।—আর সেই কাকাবাবু কাকীমা তাঁরা কোথায় গেলেন?

সতী বললে—সেই কালিঘাটের সেদিনকার কাণ্ডর পর তিনি বদ্‌লি হয়ে চলে গেছেন বর্মায়—

—আবার বর্মায়?

সতী বললে—হ্যাঁ, কাকীমার তো ছেলে-মেয়ে কিছু নেই, কী করতেই বা কলকাতায় থাকবেন, অনেক চেষ্টা করে আবার চাকরিতে বদ্‌লি করে নিলেন—

দীপঙ্কর বললে—জানো সতী, তোমার বিয়ের দিন আমি হাজত থেকে ছাড়া পেলাম, পেয়েই শুনলাম তোমার বিয়ে হচ্ছে, শুনে তখনি চলে এসেছিলাম—এই বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, অনেক লোকজন গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছিল, প্রথমটা একটু কষ্ট হয়েছিল—

—কেন, কষ্ট হয়েছিল কেন?

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—কষ্ট হচ্ছিল নেমন্তন্ন হয়নি বলে, শেষকালে মনে হলো, তোমার বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, এ তো সুখের কথা—অথচ লক্ষ্মীদি—

সতী জিজ্ঞেস করলে—লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা হয় নাকি?

হঠাৎ শম্ভু ডাকলে—বৌদিমণি!

শম্ভু এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—এবার খাবার দেওয়া হবে? টেবিল তৈরি—

সতী উঠলো। বললে—চলো চলো—তুমি আপিস থেকে আসছো, খেয়েই নেবে চলো।

এতক্ষণ যে-ঘরে বসেছিল—তার পাশেই আর একটা ঘর। পাশ দিয়ে বারান্দা গেছে। ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের টেবিল। দেয়ালের গায়ে স্টীল-লাইফ্ স্টাডি অনেকগুলো ঝুলছে। আস্ত মাছ, কাটা তরমুজ। পাশের দেয়ালে নিচু মিট্-সেফ্।

সতী বললে—বোস—

দীপঙ্কর বললে—এত!

সতী করেছে কী? অসংখ্য বাটি সাজিয়েছে থালার চারিদিকে। কত রকমের যে মাছ। কত রকমের যে তরকারী। জীবনে এমন যত্ন করে এত পর্যাপ্ত খাবার আয়োজন কেউ করেনি দীপঙ্করের জন্যে। সতী বললে—নাও, ওইখানে হাতটা ধুয়ে নাও ভাল করে, সাবান তোয়ালে সব আছে—

হাত মুখ ধুয়ে এসে দীপঙ্কর বসলো।

সতী নিজে লুচিগুলো একটা একটা করে থালায় দিচ্ছে। বললে—তুমি একটা-একটা করে খাও, আমি একখানা করে দেব, তাড়াতাড়ি কোর না, আস্তে আস্তে খাও—

দীপঙ্কর বললে—এত আয়োজন করেছ আমার জন্যে?

সতী বললে—থাক্‌, ভণিতা থাক্‌, খাও, খেতে আরম্ভ করো—

দীপঙ্কর থালায় হাত দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শম্ভু এল দৌড়তে দৌড়তে।

—বৌদিমণি?

—কী রে?

—মামণি এসেছে!

মামণি! দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর মুখখানা যেন কেমন যন্ত্রণায় হঠাৎ নীল হয়ে উঠলো এক নিমেষে। সতী যেন খানিকক্ষণের জন্যে দীপঙ্করের উপস্থিতিও ভুলে গেল। কী বলবে ভেবে পেলে না।

শম্ভু বললে—দাদাবাবুও এসেছেন—

—তুই যা, ওদের জিনিসপত্র সব নামিয়ে দিগে যা—

বলে সতী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন দীপঙ্করের কথা মনে পড়তেই হেসে ফিরে তাকাল এদিকে। দীপঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো নিজের মধ্যেই।

এক-সময়ে জিজ্ঞেস করলে—কে এসেছে সতী? কারা? সনাতনবাবু পুরী থেকে ফিরে এলেন নাকি?

সতী বললে—হ্যাঁ—

আর কিছু বললে না। দীপঙ্কর খেতে গিয়েও হাত গুটিয়ে বসে রইল। যেন খেতে পারলে না আর।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আজকেই কি আসবার কথা ছিল ওঁদের?

সতী কিছু কথা হয়ত বলতো কিন্তু তার আগেই অনেক লোকের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমে কয়েকজন চাকর-বাকর মালপত্র নিয়ে চলে গেল পাশের বারান্দা দিয়ে। তারপর এক ভদ্রলোক। বেশ ফরসা চেহারা। হাসি হাসি মুখ। একবার এ-ঘরের দিকে তাকালেন। তারপর যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে সোজা সামনের দিকে চলে গেলেন। তাঁর পেছনেই এলেন একজন বিধবা মহিলা। সাদা থান পরা। তিনি যেন চাকরদের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে বলতে আসছিলেন। হঠাৎ এ-ঘরের সামনে আসতেই দীপঙ্করকে দেখে যেন থমকে দাঁড়ালেন একবার। অবাক হয়ে তাকালেন দীপঙ্করের মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে গেলেন।

দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর চেহারাটা যেন বিষের মত নীল হয়ে উঠেছে। দীপঙ্করের ইচ্ছে হলো সে এ-ঘর থেকে উঠে পালিয়ে যায়।

এ-বাড়ি থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

—বউমা!

হঠাৎ যেন বাইরে বজ্রপাত হলো। সতী উঠলো। বললে—তুমি খেতে আরম্ভ করো দীপু, আমি শুনে আসি কী বলছেন।

সতী বাইরে চলে যেতেই সতীর শাশুড়ীর বজ্র-গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—ঘরে কে ও?

সতী যেন একটু দ্বিধা করছিল।

আবার আওয়াজ—কে ও, বলো?

সতী বললে—ও দীপঙ্কর, আমাদের কালিঘাটের বাড়ির পাশে থাকতো—

—পাশে থাকতো? ও! তা ওকে ঘরে এনে খাওয়াবার আর সময় পেলে না? না কি আমরা বাড়িতে ছিলাম না বলেই ডেকেছিলে?

—না, আজকে ওর জন্মদিন!

—যার-তার জন্মদিন করবার জন্যেই কি ঘোষ-বাড়ির বউ করে এনেছি তোমাকে?

সতী বললে—আপনি জানেন না, ওর মাকে আমি মাসীমা বলে ডাকি, ও আমার ভাই-এর মতন—

—কিন্তু তোমার ভাইকে এতদিন তো একবারও ডাকোনি, যতদিন আমরা বাড়িতে ছিলাম! জন্মদিন কি এই প্রথমবার হলো তোমার ভাই-এর?

সতী বোধহয় চুপ করে ছিল। শাশুড়ীর গলা আবার শোনা গেল। বললেন —যাও, যা বলবার তোমার ভাইকে বলে এসো, আমি আছি আমার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে—যাও—

খানিক পরেই সতী ঘরে এল। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু মুখটায় একটা হাসি আনবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগলো।

সতী ঘরে আসতেই দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি তাহলে আসি সতী—

সতী হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো সমস্ত চেহারাটায়। বললে—দীপু, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এর পরেও তুমি আমাকে খেতে বলো?

—না, তুমি যেতে পাবে না! না-খেয়ে তুমি আজ যেতে পাবে না এ-বাড়ি থেকে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সতী, আমার যে কিছুই মুখে উঠবে না, এর পরেও আমি খাবো কী করে?

সতী যেন কঠিন হয়ে গেল একমুহূর্তে। বললে—আমিও এ-বাড়ির বউ, আমারও অধিকার আছে তোমাকে খাওয়াবার, সেই অধিকারটুকু তুমি আজ

হাত মুখ ধুয়ে এসে দীপঙ্কর বসলো।

সতী নিজে লুচিগুলো একটা একটা করে থালায় দিচ্ছে। বললে—তুমি একটা-একটা করে খাও, আমি একখানা করে দেব, তাড়াতাড়ি কোর না, আস্তে আস্তে খাও—

দীপঙ্কর বললে—এত আয়োজন করেছ আমার জন্যে?

সতী বললে—থাক্ ভণিতা থাক্, খাও, খেতে আরম্ভ করো—

দীপঙ্কর থালায় হাত দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শম্ভু এল দৌড়তে দৌড়তে।

—বৌদিমণি?

—কী রে?

—মামণি এসেছে!

মামণি! দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর মুখখানা যেন কেমন যন্ত্রণায় হঠাৎ নীল হয়ে উঠলো এক নিমেষে। সতী যেন খানিকক্ষণের জন্যে দীপঙ্করের উপস্থিতিও ভুলে গেল। কী বলবে ভেবে পেলে না।

শম্ভু বললে—দাদাবাবুও এসেছেন—

—তুই যা, ওদের জিনিসপত্র সব নামিয়ে দিগে যা—

বলে সতী কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন দীপঙ্করের কথা মনে পড়তেই হেসে ফিরে তাকাল এদিকে। দীপঙ্কর অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো নিজের মধ্যেই।

এক-সময়ে জিজ্ঞেস করলে—কে এসেছে সতী? কারা? সনাতনবাবু পুরী থেকে ফিরে এলেন নাকি?

সতী বললে—হ্যাঁ—

আর কিছু বললে না। দীপঙ্কর খেতে গিয়েও হাত গুটিয়ে বসে রইল। যেন খেতে পারলে না আর।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আজকেই কি আসবার কথা ছিল ওঁদের?

সতী কিছু কথা হয়ত বলতো কিন্তু তার আগেই অনেক লোকের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। প্রথমে কয়েকজন চাকর-বাকর মালপত্র নিয়ে চলে গেল পাশের বারান্দা দিয়ে। তারপর এক ভদ্রলোক। বেশ ফরসা চেহারা। হাসি হাসি মুখ। একবার এ-ঘরের দিকে তাকালেন। তারপর যেন কিছুই ঘটেনি এমনিভাবে সোজা সামনের দিকে চলে গেলেন। তাঁর পেছনেই এলেন একজন বিধবা মহিলা। সাদা থান পরা। তিনি যেন চাকরদের সঙ্গে কী-সব কথা বলতে বলতে আসছিলেন। হঠাৎ এ-ঘরের সামনে আসতেই দীপঙ্করকে দেখে যেন থমকে দাঁড়ালেন একবার। অবাক হয়ে তাকালেন দীপঙ্করের মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে চলে গেলেন।

দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে দেখলে। সতীর চেহারাটা যেন বিষের মত নীল হয়ে উঠেছে। দীপঙ্করের ইচ্ছে হলো সে এ-ঘর থেকে উঠে পালিয়ে যায়।

এ-বাড়ি থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

—বউমা!

হঠাৎ যেন বাইরে বজ্রপাত হলো। সতী উঠলো। বললে—তুমি খেতে আরম্ভ করো দীপু, আমি শুনে আসি কী বলছেন।

সতী বাইরে চলে যেতেই সতীর শাশুড়ীর বজ্র-গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল—ঘরে কে ও?

সতী যেন একটু দ্বিধা করছিল।

আবার আওয়াজ—কে ও, বলো?

সতী বললে—ও দীপঙ্কর, আমাদের কালিঘাটের বাড়ির পাশে থাকতো—

—পাশে থাকতো? ও! তা ওকে ঘরে এনে খাওয়াবার আর সময় পেলে না? না কি আমরা বাড়িতে ছিলাম না বলেই ডেকেছিলে?

—না, আজকে ওর জন্মদিন!

—যার-তার জন্মদিন করবার জন্যেই কি ঘোষ-বাড়ির বউ করে এনেছি তোমাকে?

সতী বললে—আপনি জানেন না, ওর মাকে আমি মাসীমা বলে ডাকি, ও আমার ভাই-এর মতন—

—কিন্তু তোমার ভাইকে এতদিন তো একবারও ডাকোনি, যতদিন আমরা বাড়িতে ছিলাম! জন্মদিন কি এই প্রথমবার হলো তোমার ভাই-এর?

সতী বোধহয় চুপ করে ছিল। শাশুড়ীর গলা আবার শোনা গেল। বললেন —যাও, যা বলবার তোমার ভাইকে বলে এসো, আমি আছি আমার ঘরে, তোমার সঙ্গে কথা আছে—যাও—

খানিক পরেই সতী ঘরে এল। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু মুখটায় একটা হাসি আনবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগলো।

সতী ঘরে আসতেই দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি তাহলে আসি সতী

সতী হঠাৎ করুণ হয়ে উঠলো সমস্ত চেহারাটায়। বললে—দীপু, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এর পরেও তুমি আমাকে খেতে বলো?

না, তুমি যেতে পাবে না! না-খেয়ে তুমি আজ যেতে পাবে না এ-বাড়ি থেকে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সতী, আমার যে কিছুই মুখে উঠবে না, এর পরেও আমি খাবো কী করে?

সতী যেন কঠিন হয়ে গেল একমুহূর্তে। বললে—আমিও এ-বাড়ির বউ, আমারও অধিকার আছে তোমাকে খাওয়াবার, সেই অধিকারটুকু তুমি আজ

প্রমাণ করে-দিয়ে যাও—! তুমি না খেলে যে আমার অপমান হবে। এটা বুঝছো না কেন?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার স্বামী? সনাতনবাবু?

—সে আমি বুঝবো! আমি তোমার জন্মদিনে তোমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছি, তোমাকে খেতেই হবে, তোমার মুখে না রুচলেও খেতে হবে, তুমি না খেয়ে চলে গেলে তোমার চোখের সামনে আমি আত্মহত্যা করবো—

দেখতে দেখতে সতীর চেহারাটা দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন বাঘিনীর মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

সেদিন কী অদ্ভুত অবস্থার মধ্যেই যে পড়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর! সতীর শাশুড়ীর গলার আওয়াজই কানে এসেছিল দীপঙ্করের। কিন্তু সতীর স্বামীর গলার আওয়াজ একবারও কানে আসেনি। কেন সতী এমন কাজ করলো! কেন সকলকে না-জানিয়ে তাকে নেমন্তন্ন করতে গেল। আর যদি নেমন্তন্নই করেছিল তবে কেনই বা সতীর শাশুড়ী হঠাৎ খবর না দিয়ে এসে পড়লো!

দীপঙ্করের হাতও নড়ছিল না। মুখও নড়ছিল না।

সতী হঠাৎ আবার সামনে এসে বললে—ওকি, হাত গুটিয়ে রইলে কেন, খাও? আর লুচি নেবে?

দীপঙ্করের মনে হলো সে যেন বিষ খাচ্ছে। লুচিগুলো গলা দিয়ে ঢুকে গিয়ে যেন বিষক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সে যেন ফাঁসির কয়েদী! সামনে যেন সতী চাবুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

দীপঙ্কর বললে—আর খেতে পারবো না আমি—

—না আমি কোনও কথা শুনবো না, তোমাকে খেতেই হবে। যা যা দিয়েছি সব খেতে হবে। কিছু ফেলে রাখতে পারবে না। আমি সারাদিন ধরে নিজে তদারক করে সব করিয়েছি, এ তোমায় ফেলে রাখতে দেব না!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কেন তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করতে গেলে? এতদিন এতবার তো আমার জন্মদিন এসেছে, তুমি ডেকে খাওয়াওনি বলে তো আমার কোনও দুঃখ ছিল না! আমি তো তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম—

সতী জোর গলায় ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু এল। সতী বললে—পান সেজেছে কৃতির মা?

—না বৌদিমণি।

সতী রেগে উঠলো। বললে—কেন? পান সাজেনি কেন?

দীপঙ্কর বললে—না-ই বা সাজলো সতী, থাক্ না আমি তো পান খাই না—

সতী যেন রেগে গেছে খুব। বললে—তুমি চুপ করো, যা তুই পান সেজে নিয়ে আয় এখনে, জানিস না বাড়িতে লোককে নেমন্তন্ন করলে পান দিতে হয়!

দীপঙ্কর উঠলো। উঠে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিলে।

সতী ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। পান আনতেই সতী বললে—নাও, পান খাও—

—পান? একটু বুঝি দ্বিধা করতে গেল দীপঙ্কর। কিন্তু সতীর মুখের দিকে চেয়ে আর আপত্তি করতে ভরসা হলো না।

সতী আবার শম্ভুকে ডাকলে। বললে—রতনকে বল্ গাড়ি বার করতে, দীপঙ্করবাবুকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে—

শম্ভু বললে—মা-মণি গাড়ি বন্ধ করতে বলে দিয়েছে যে—

দীপঙ্কর বললে—গাড়ি কী হবে, আমি তো এটুকু বেশ হেঁটেই যেতে পারবো—

সতী ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি চুপ করো তো! তুই রতনকে বলে আয় গাড়ি যে-ই বন্ধ করতে হুকুম দিক, আমি হুকুম দিচ্ছি গাড়ি বেরোবে—যা বলে আয়—

শম্ভু চলে গেল। দীপঙ্করও পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

সতী বললে—শোন দীপু—

দীপু পেছন ফিরলো। সতী বললে—কালও তুমি ঠিক এই সময়ে এখানে আসবে—

—কাল? কালও খেতে হবে?

সতী বললে—হ্যাঁ, কাল তুমি এসো, তারপর যা করবার আমি করবো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কাজটা কি ভাল করছো?

সতী বললে—ভাল-মন্দ সে আমি বুঝবো, আমি অনেক সহ্য করেছি,—ঠিক এসো—ভুলো না, আমি বসে থাকবো তোমার জন্যে—

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলে সতীর শাশুড়ীর গলার আওয়াজ—বৌমা, এদিকে একবার এসো তো—

পরিষ্কার তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দীপঙ্করের পা দুটো কাঁপতে লাগলো। তারপর বাইরে বাগানের সামনে আসতেই দেখলে ড্রাইভার গাড়ি বার করে দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর কাছে যেতেই দরজাটা খুলে দিলে। দীপঙ্কর ভেতরে উঠে বসলো।

তারপর ইঁট বাঁধানো রাস্তাটা দিয়ে বাড়ির গেট পেরিয়ে গাড়িটা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গিয়ে পড়লো।

উনিশ শো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর একদিন পৃথিবীর একটা অংশে যুদ্ধ বেধেছিল। ছোট যুদ্ধ সেটা ছিল প্রথমে। প্রথমে কি কেউ কল্পনা করেছিল তার জের এতদিন ধরে চলবে! কিন্তু যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত চলেছিল ছ' বছর একুশ ঘণ্টা তেইশ মিনিট ধরে। তারিখ-সময় সবই মনে আছে দীপঙ্করের। ঠিক ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়—শুক্রবারে। আর

দীপঙ্করের জীবনের এই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল সোমবার ঠিক রাত আটটার সময়। প্রথমে সনাতনবাবুও বুঝতে পারেন নি। প্রথমে সতীর শাশুড়ীও বুঝতে পারেনি—দীপঙ্করও বুঝতে পারেনি। এমন কি সতী যে সতী—সে-ও বুঝতে পারেনি! অর্থাৎ কেউই বুঝতে পারেনি। শুরু যার এত সামান্য, শেষ তার এমন ভয়াবহ হবে কে কল্পনা করতে পারবে!

অনেকদিন পরে সতীর মুখ থেকেই শুনেছিল দীপঙ্কর।

দীপঙ্করের একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল শম্ভুকে। শম্ভুকে জিজ্ঞেস করলেই সে হয়ত সব বলে দিত। বাড়ির চাকরদের কিছু জানতে বাকি থাকে না। গিন্নীরা বাবুরা কখন কী করে, কার সঙ্গে কখন কার ঝগড়া হয়, সব তারা জানে।

তবু দীপঙ্কর সাহস করে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা শম্ভু, তোমার মা্মণির কি আজকেই আসবার কথা ছিল?

—আজ্ঞে, না বাবু, কথা ছিল না তো! রেলের লাইন্-টাইন্ সব জলে ডুবে গেছে বলে রেল চলেনি, আট্‌কে ছিল রাস্তায়। বাবুরা তিনদিন কটকের ইস্টিশানে পড়ে। তাই এখন আবার রান্না-বান্না চাপিয়েছে ঠাকুর!

তারপর দীপঙ্কর গাড়িতে উঠতেই দুই হাত জোড় করে বলেছিল—আচ্ছা পেন্নাম হই বাবু—

সিঁড়িতে নামবার সময়ই শাশুড়ীর গম্ভীর গলার ডাক শোনা গিয়েছিল—বৌমা, এদিকে শুনে যাও তো একবার—

সতী গিয়ে কাছে দাঁড়াল। বহুদিনের বিধবা গিন্নী এ-বাড়ির। একদিন যখন এ-বাড়ির আরো জলুস ছিল, আরো জাঁকজমক ছিল, সেইদিন তিনি দুধে-আলতায় পা দিয়ে এই ঘোষ-বাড়িতে ঢুকেছিলেন। সেদিন পাড়ার লোক নতুন বউ দেখতে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল সামনে। অঘোরদাদুর ওই সব যজমানদের বাড়ির লোকেদের সমপর্যায়ের লোক এরা। ব্যারিস্টার পালিতের সমগোত্রীয়। খিদিরপুরের ডকে স্টিভেডোরের কারবার ছিল শিরীষ ঘোষের। সেকালের নাম করা স্টিভেডোর শিরীষ ঘোষ। বার্ড কোম্পানী, কিলবার্ন কোম্পানী, শ ওয়ালেস কোম্পানীর একচেটিয়া কাজ করতো এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের শিরীষ ঘোষের ফার্ম। সাহেবরাও শিরীষ ঘোষকে মানতো, খাতির করতো। শিরীষ ঘোষও সাহেবদের মর্যাদা রেখে কথা বলতো। শিরীষ ঘোষের ছেলে গিরীশ ঘোষ-এর বিয়েতে কলকাতার বড় বড় কোম্পানীর সাহেবরা এসে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছিল। সেদিন ঘোমটার আড়ালে এই শাশুড়ীর মুখ দেখেই তারা দামী দামী উপহার দিয়েছিল। তারপর শিরীষ ঘোষ বুড়ো বয়েসে একদিন মারা গেলেন। মারা যাবার আগে ছেলে-বউ-এর হাতে এই কারবার, এই স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস, ওটা দরকার, কিন্তু ওটাই সার করিসনে তোরা, অনেক টাকা

জমিয়েছি জীবনে, তোদের কিছু ভাবনা রেখে যাবো না—একটু দেখে চলবি—

আরো সব কী কী কথা বলেছিলেন শিরীষ ঘোষ। শেষ জীবনের সব আধা-বৈরাগ্যের কথা। সে-সময়ে সকলেরই বৈরাগ্যের কথা আসে। আসাটাই স্বাভাবিক। ব্যাঙ্কে তখন তাঁর লাখ বিশেক টাকা। সুন্দরবনে ছ' হাজার বিঘে আবাদ, সিন্দুকে সোনা-দানা-হীরা-জহরৎ—কোম্পানীর কাগজের মোটা সুদের টাকা, আর চালু কারবার। মরবার আগে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। সে-যুগেই ফ্যানের হাওয়া খেয়ে গিয়েছেন, তেতলা বাড়ি করেছেন, গাড়ি চড়েছেন। আবার কী করবেন?

সতীর শাশুড়ী নতুন বউ হয়ে তখন বেশিদিন আসেন নি। শ্বশুর মারা যাওয়ার পর সবই তাঁর ঘাড়ে পড়লো। স্বামী গিরীশ ঘোষ ছিলেন ভাল মানুষ গোছের লোক। দরকার হলে মিথ্যে কথাও বলতে পারতেন না, সত্যি কথাও জোর করে বলতে পারতেন না কখনও। প্রথম প্রথম নতুন বউ বলতেন—সব তাতেই যদি তুমি মাথা নাড়ো তো তোমার আসল মতটা কী?

স্বামী বলতেন—আসল মতটা না-বলাই ভালো, ওতে শুধু অশান্তি বাড়ে—

স্ত্রী বলতেন—কিন্তু এ-রকম কদ্দিন এড়িয়ে চলবে?

পুরনো কোম্পানীর সাহেবরা তখনও ঘোষ-কোম্পানীর কাছে কাজ দেয়। ঘোষ-কোম্পানীকে বিশ্বাস করে। সাহেবদের তখন ওই গুণটা ছিল। একবার এক ফার্মকে ধরলে সহজে অন্য কোথাও যাবার নাম করতো না।

গিন্নী বলতেন—কী হলো, আজ আবার মুখটা শুক্‌নো কেন? কেউ মেরেছে নাকি?

গিরীশ হেসে উঠতেন। বলতেন—কী যে বলো, মারবে আবার কে?

—না, তুমি যে-রকম মুখটা করে রয়েছ, যেন কেউ চড় মেরেছে তোমার গালে।

স্বামী বলতেন—না, হয়েছে কি, একজনকে ঠকিয়ে ফেলেছি, প্রায় হাজার দুয়েক টাকা ঠকিয়েছি—

—তাতে হয়েছে কি?

—বলো কি? ঠকানো তো পাপ। পাপের সামিল। পাপই করে ফেললাম তো! এখন কোথায় যে তাকে পাই আবার—

—তাহলে আর কি! বসে বসে কাঁদো, কাঁদতে বসো!

কিন্তু বেশিদিন গিরীশ ঘোষকে এ-জ্বালা সহ্য করতে হয়নি। একদিন আপিস থেকে এসে সেই যে শুলেন, সে ঘুম আর ভাঙলো না। খবর গেল ডাক্তারের কাছে। কিন্তু কিছু ফল হলো না। শ্বশুর বলে গিয়েছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস—সেই নচ্ছার জিনিসই শেষ পর্যন্ত পড়ে রইল আর তিনিই চলে গেলেন। তখন সোনার বয়স দু' বছর। সনাতন ঘোষ তখনকার কথা কিছুই মনে করতে পারেন না।

তা সেই সনাতন যে বড় হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছে এর পেছনে শাশুড়ীর অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল। স্টিভেন্সনের কারবার সেদিন তুলে দিতে হয়েছিল সেই বিধবা শাশুড়ীকে। মোটা টাকায় কোম্পানীর স্বত্ব উপস্বত্ব সমস্ত বিক্রি করে আঁচলে চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি তার হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। চারদিকে ঘটকী লাগিয়েছিলেন। শেষে একজন এসে খবর দিয়ে গেল এই মেয়ের কথা। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে বাপের বন্ধুর কাছে থেকে লেখা-পড়া করে। আর বাপ থাকে বর্মায়। তাঁর কাঠের ব্যবসা। ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে। বাপের টাকার কথাটা উহ্য থাক্‌। তিনি টাকার দিকটা দেখেন নি। সত্যিই টাকাটা নগণ্য জিনিস। দেখেছেন শুধু কুল বংশ মর্যাদা রূপ গুণ। ভুবনেশ্বর মিত্র টেলিগ্রাম পেয়েই দৌড়ে এসেছিলেন কলকাতায়। রাতারাতি মেয়ে দেখা পাত্র দেখা সব কিছু হলো। সুন্দরবনের ছ' হাজার বিঘে আবাদ, মোটা টাকার কোম্পানীর কাগজ, ভাল-ভাল বাছা-বাছা সব বিলিতি কোম্পানীর শেয়ার। সেটাও বড় কথা নয়। আসল হলো বংশ। আসল হলো বনেদিয়ানা। কাকাবাবুকে বললেন—কেমন দেখলে তুমি হে শচীশ?

কাকাবাবু বললেন—আমি তো সব রকম খোঁজ খবর নিয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি, রায়বাহাদুরও চেনেন ওঁদের—

—কে রায়বাহাদুর?

—রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার। এক পাড়ারই লোক তো সব। ওই খুরুন লখার মাঠের একাদশী বাঁড়ুজ্জে, চাউলপট্টির শশধর চাটুজ্জে—সকলের চেনা। শিরীষ ঘোষের নাম করলে এখনও সবাই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে—বলে তিনি ছিলেন দেবতার মত—

সেই শিরীষ ঘোষেরই নাতি।

ভুবনেশ্বরবাবু বলেছিলেন—কিন্তু বাড়িতে তো ওই মা ছাড়া দুটি প্রাণী নেই শচীশ, সতী যে-রকম ছটফটে মেয়ে, ও কি টিকতে পারবে?

কাকাবাবু বলেছিলেন—তা নেই, ভালোই তো! ও ননদ ভাজ দেওর ও-সব না-থাকাই ভালো। থাকলেই ঝঞ্ঝাট যত! আপনার মেয়ে যেমনভাবে মানুষ হয়েছে তাতে ও-সব না-থাকাই ভালো! এখানেই দিয়ে দিন বিয়ে—

তারপর আর কিছু ভাববার সময়ও ছিল না। একটা মেয়ে সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে নিজেরই গাফিলতিতে। এ মেয়েটার বেলায় আর সে-ভুল করলেন না ভুবনেশ্বর মিত্র! তিনদিনের মধ্যেই আয়োজন অনুষ্ঠান সব পাকা হয়ে গেল। ভুবনেশ্বর মিত্র ভবানীপুরেই একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া করে বিয়ের আয়োজন করে ফেললেন। লোকজন নেমন্তন্ন, কেনা-কাটা সবই করলেন কাকাবাবু। একদিন উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বেনারসী জড়িয়ে সতী এসে ঢুকলো এ-বাড়িতে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। অনেক বছরও কেটে গেল।

কোথায় বর্মায় কোন্ এক মগের মুল্লুকে জন্ম হয়েছিল। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের এঁদো গলিতে এসে উঠেছিল। আবার একদিন হঠাৎ এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসতে হলো সতীকে।

শাশুড়ী বললেন—দেখি, খোঁপাটা খোল তো মা, চুলটা দেখি—

প্রথম প্রথম সতী কিছু বলতো না। যা বলতো শাশুড়ী মুখ বুজে শুনতো। বুঝতো নতুন-বউয়ের এ-সব সহ্য করতে হয়। দু'দিন বাদেই এ-সব বন্ধ হয়ে যাবে!

—চুল খুলতে বলছি, তা খুলছো না কেন, খোল?

সতী বললে—চুল তো আপনি বিয়ের সময়ই দেখেছেন, আবার কেন?

শাশুড়ী বললেন—তা হোক বাপু, কী রকম যেন পরচুলো-পরচুলো মনে হচ্ছে, আবার একবার দেখাও—

সতী খোঁপা খুলে পিঠের ওপর চুল এলিয়ে দিলে। শাশুড়ী মেপে দেখলেন।

সতী বললে—কী হলো? দেখলেন? সন্দেহ ঘুচলো?

এ-সব প্রথম দিকের কথা। বড় তেজী মানুষ শাশুড়ী। তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক ভুগেছেন, অনেক বুঝেছেন। শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল বলতে গেলে তাঁরই কোলের ওপর। স্বামীরও মৃত্যু হয়েছিল তাঁর কোলে। শ্বশুর স্বামী হারিয়ে অজস্র অর্থের মালিক হয়ে তিনি দেখেছেন সংসারে কড়া মানুষ না হলে কপালে অনেক দুঃখ। তাই এক-একদিন ছাদে উঠে হঠাৎ জেরা করতেন। বলতেন—ওদিকে কী দেখছিলে বৌমা?

সতীও সোজা মেয়ে নয়। বলতো—কোন্ দিকে?

—ওই যে পাশের বাড়ির জানালার দিকে? ওখানে কে আছে?

সতী বলতো—আপনি নিজে দেখুন না এসে কাকে দেখছিলুম—আসুন, দেখে যান্—

ওই পর্যন্তই। বেশি দূর গড়াতো না এ-সব ঘটনা। শাশুড়ীও চুপ করে যেতেন, সতীও চুপ করে যেত।

রাত্রে সনাতন ঘোষ একটু দেরি করে ঘুমোতেন। দিনের বেলাও তাঁর খুব কাজ ছিল না। তবু এখানে ওখানে যেতে হতো। সনাতনকে মা'ও একটু সমীহ করে চলতেন। ছেলে পড়ছে, আস্তে আস্তে কাছে যেতেন। তারপর জিজ্ঞেস করতেন—সোনা, আজকে দুধ খেয়েছো?

শুধু আজকেই নয়, সনাতন ঘোষ বরাবরই এমনি। একটু ভেবে নিয়ে বলতেন—হ্যাঁ মা খেয়েছি তো!

মা বলতেন—কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলেছিল বাবা, রাত জেগে জেগে কী পড়ো? অত পড়ে কী হবে? যারা রাত জেগে জেগে বই লিখেছে, তাদের টাকার দরকার ছিল তাই লিখেছে, তোমার সে-সব অত কষ্ট করে পড়বার দরকার কী বাবা?

মাঝে মাঝে মা ধমক দিতেন চাকরদের।

বলতেন—তোদের আক্কেলটা কী শুধু, দেখছিস দাদাবাবু ঘরে রয়েছে, আর তুই এখানে গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছিস্? বেরো এখান থেকে, দূর হয়ে যা—

—বৌমা!

শাশুড়ী ভোর বেলা উঠেই ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে ডাকতেন।

বলতেন—এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা আমি পছন্দ করি না, সারা-রাত কী করো শুনি? সোনা না-হয় বেশি রাত অবধি জেগে পড়া শোনা করে, সে না-হয় দেরি করে উঠবে, কিন্তু তোমার কিসের ঘুম—তুমিও কি জাগো নাকি ওর সঙ্গে?

সতীর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না। শুধু বোবার মত কিছুক্ষণ শাশুড়ীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে। এক-একটা ঘটনা ঘটে আর অবাক হয়ে ভাবে—এ কোন্ সংসারে, এ কাদের সংসারে এসে পড়লো সে! এ কোথায় কাদের কাছে তাকে তুলে দিয়ে গেল তার বাবা! সমস্ত পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। এ-সব দিনকার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা সতী পরে দীপঙ্করকে বলেছে। ভোর হতে-না-হতেই সতীকে উঠতে হবে, উঠে কলঘরে যেতে হবে। তারপর স্বামীর শাশুড়ীর চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকজন আছে। তাদের কাজ নেই কিছু। তাদের ঝগড়া, বিবাদ, দলাদলি—তার মধ্যে সতী সব দেখাশোনা করবে। এমনি করেই সমস্ত শিখতে হবে সংসারের কাজ। একদিন শাশুড়ীও নাকি এমনি করে হাতে ধরে কাজ শিখেছেন, নকুনি খেয়েছেন, তবে এত বড় সংসারের হাল ধরে একে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে। যখন শাশুড়ী থাকবেন না, তখন তো তোমাকেই সব চালাতে হবে। নইলে ঝি চাকরের হাতে সব ছেড়ে দিলে কিছু কি আর আস্ত থাকবে!

বাতাসীর মা আদ্দিকালের লোক এ-বাড়ির। বলতো—বৌদিমণি, তুমি কেন আবার রান্নাবাড়িতে এলে বাছা, দেখ তো, ধোঁয়া-কালির মধ্যে তোমার শরীর কী টিঁকবে? ঠাকুর একলাই তো সব পারে—

তা বাতাসীর মা বলতে পারে বটে এমন কথা। ঘোষবাড়ির আদি থেকে আছে। হয়ত অন্ত পর্যন্তই থাকবে। সে কারো পরোয়া করে কথা বলে না। একতলাটায় তারই রাজত্ব। সেখানে তার মুখের ওপর কারো কথা বলার এক্তিয়ার নেই।

বলে—আমি কার পরোয়া করতে যাবো শুনি? আমি মাঙনা খাই না পরি? গতর দিয়ে খাটি না? ওই দাদাবাবুকে মানুষ করিনি এই হাতে? বলুক তো দের মামণি কেমন না বলতে পারে?

হঠাৎ কথার মধ্যেই সতীকে আসতে দেখে বলে—আবার বুঝি খবরদারি করতে পাঠালে তোমাকে বুড়ী?

বাতাসীর মা নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছিল—আমার নাম বাতাসীর মা বৌদিমণি—বাতাসীর মা বললেই সবাই চিনবে,—এ-বাড়ির পান থেকে চুন খসলে এই বাতাসীর মা'কেই জবাবদিহি করতে হয়, ওই তোমার কর্তাকে আমিই বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি, ও তোমার শাশুড়ী তো নড়ে বসতে মূর্ছো যেত তখন. —এখন ভারি কাজ দেখাচ্ছে—

ভূতির মা বলতো—তুমি থাম তো বাতাসীর মা, নতুন বউ-এর সঙ্গে ওমনি পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে বসো না—

—তা ঘাঁটবো না, বাতাসীর মা কাউকে কি পরোয়া করে? গতর আছে বলে এত খাতির আমার, নইলে কে পুঁছতো না?

তারপর বাতাসীর মা সতীর ওপর হঠাৎ সদয় হয়ে উঠতো। বলতো—দেখ তো, ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছ বৌদিমণি—বাড়িতে আসতে-না-আসতে একেবারে কাজের কাজী করে তুললে গা, এমন বৌ-কাঁটকি শাশুড়ী তো মায়ের জন্মে দেখিনি বাছা—আহা, মুখটা একেবারে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে—

এমনি করে রান্নাবাড়ি, ভাঁড়ার ঘর, পুজোর দালান, বারবাড়ি ভেতরবাড়ি একে একে সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শাশুড়ী। কিন্তু সমস্ত দিনের শেষে যখন নিজের ঘরে শুতে যেত, তখনও সনাতনবাবু লাইব্রেরীঘর থেকে আসেন নি। কিছুক্ষণ বসে থাকতো সতী চেয়ারটায়। এটা ওটা ঘাঁটতো। এটা গুছিয়ে রাখতো, ওটা ঠিক করে দিত।

সনাতনবাবু এসে ঢুকতেন এক সময়ে।

—ক'টা বাজলো বল তো?

সতী ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলতো—বারোটা বাজে—

—উঃ, বড় রাত করে দিলাম তো তোমার? তা তুমি শুয়ে পড়লেই তো পারতে—

তারপর হঠাৎ ছোট টেবিলটায় বসে পড়ে বলতেন—তুমি শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো—আমার একটু দেরি হবে—বলে আধ-পড়া বইটা আবার পড়তে বসতেন।

খানিক পরে বোধহয় খেয়াল হতো। বলতেন—আলোটা তোমার চোখে লাগছে না তো?

সতী বলতো—না,—

তারপর অনেকক্ষণ তেমনি করেই কাটতো। সনাতনবাবু মুখ নিচু করে পড়তেন এক মনে। কী যে পড়তেন, বিছানায় শুয়ে তা দেখা যেত না। সতী প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে থাকতো। তারপর পাশ ফিরতো। ঘড়ির কাঁটাটা আস্তে আস্তে নড়তে নড়তে উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছোত। তখনও সনাতনবাবুর হুঁশ নেই। সতী ওপাশ ফিরে চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতো। তখন পৃথিবীর কোথাও কোনও কোণে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। শুধু ঘরের ঘড়িটার ধুক্ ধুক্ আওয়াজ কানে বিঁধছে কাঁটার মত। মুহূর্তগুলো তখন

এসে সঙ্গীন ঘাড়ে করে সতীর চোখের সামনে স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেইসব সময়ে সতীর মনে হতো পৃথিবীটা বুঝি এবার থেমে যাবে। একটা বিধ্বংসী প্রলয়ের মধ্যে পৃথিবীটা গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একেবারে। এমনি করে কত রাত কেটেছে ঘোষ-বাড়ির নতুন স্বামী-স্ত্রীর জীবনে।

—কী বলছো! আমায় ডাকছিলে?

হঠাৎ সনাতনবাবুর যেন হুঁশ হতো। যেন আবার অদৃশ্য জগৎ থেকে ফিরে আসতেন নিজের শোবার ঘরে। লজ্জায় পড়ে যেতেন একটু। তারপর তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়তেন।

বলতেন—ইস্, বড় দেরি করে ফেললাম—

তারপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতীর আর ঘুম আসতো না। সনাতনবাবু কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ একতালে বয়ে চলেছে। একবার শুলে তাঁর আর ঘুম আসতে দেরি হয় না। যে কাত্ হয়ে শোবেন সেই কাত্ হয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। মাঝখানে একবার এপাশ-ওপাশও করতেন না। মাঝ-খানে যখন একভাবে শুয়ে শুয়ে সমস্ত শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে, তখন সতী উঠবে: উঠে পাশের বাথরুমে গিয়ে মুখে কপালে ঘাড়ে জল দিয়ে আসবে, একবার ঘড়িটা দেখবে। তারপর আবার নিজের বিছানায় এসে চিত হয়ে শুয়ে পড়বে। শুয়ে শুয়ে ঘড়ির ঘণ্টা শুনবে। একটা, দুটো। দুটোর পর তিনটে, তারপর চারটে ….তারপর ভোর হয়ে যাবে। শাশুড়ীর ভোর বেলা ঘুম ভাঙে। তিনি দরজার বাইরে থেকে ডাকবেন—বৌমা, ও বৌমা—

এক-একদিন বিকেল বেলা শাশুড়ী সোজা লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে হাজির হন।

—সোনা?

সনাতনবাবু পড়তে পড়তে মুখ তোলেন।

—মা, তুমি?

—একবার আমার সঙ্গে তোমার যেতে হবে যে বাবা, নদিদির নাত্নী হয়েছে, দেখতে যেতে বলেছিল, সময় তো আর হচ্ছে না, আজকেই চলো!

সনাতনবাবু ঘরে এসে বলেন—চলো, তৈরি হয়ে নাও—

সতীও অবাক হয়ে তাকায়। বলে—কোথায়?

সনাতনবাবু বলেন—মা যেতে বলেছে, মা'র নদিদির নাত্নী হয়েছে, অনেক দিন ধরে যেতে বলেছে, সময় পাওয়া যাচ্ছিল না মোটে, চলো—

সনাতনবাবু তখন জামা-কাপড় পরে তৈরী। সতীও আলমারি খুলে গয়না বার করলে, শাড়ি বার করলে, ব্লাউজ বার করলে। অনেক শাড়ি, অনেক ব্লাউজ, অনেক গয়না দিয়েছে বাবা। একটাও পরা হয় না। নতুন কুটুম্বাড়ি যাচ্ছে, যা তা পরে যাওয়া যায় না। বিছানার ওপর সব শাড়িগুলো একে একে নামিয়ে ফেললে।

সনাতনবাবু বললেন—আমি বেরোচ্ছি, তুমি এসো—

—শোন শোন, একটু দাঁড়াও—

সতী ডাকলে পেছন থেকে। বললে—একটু দাঁড়াও, এদিকে এসো না—

সনাতনবাবু কাছে এলেন। বললেন—কী হলো?

সতী বললে—কোন্ শাড়িটা পরি বলো তো?

সনাতনবাবু বললেন—যেটা ইচ্ছে পরো না—সবগুলোই তো ভালো—

—না না ও-রকম করে বললে চলবে না, ভালো করে ভেবে বলো,—

তারপর সতী একটা বেছে নিয়ে বললে—এটা মানাবে আমাকে, না গো—এটা বেশ বট্ল্ গ্রীন রং—

—তা পরো—

যেন সতীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই সনাতনবাবু উত্তরটা দিলেন। বললেন—মা হয়ত রাগ করছে, তুমি এসো শিগ্গির, আমি গেলাম—

নতুন শায়া, নতুন ব্লাউজ, নতুন শাড়ি। বিয়ের পর এ-শাড়িটা আর পরাই হয়নি মোটে। একেবারে আনকোরা। কাপড়ের ভাঁজ খুলতে গিয়ে কেমন একরকম চমৎকার খস্ খস্ শব্দ হতে লাগলো। শাড়ির এই শব্দগুলো সতীর বড় ভালো লাগে। যেন আদর করে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার মতন। অন্তরঙ্গতার সুর মেশানো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গয়না পরলে। মুখে পাউডার দিলে, স্নো দিলে। তারপর টিপ্ দিলে দুটো ভুরুর মধ্যে। তারপর আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখলে এপাশ-ওপাশ করে। বেশ দেখাচ্ছে এবার। চুলগুলো ছোটবেলা থেকেই কোঁকড়ানো। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সেই ছেলেটা এই চুলের দিকে চেয়ে থাকতো অনেকক্ষণ ধরে। দেখা যেন আর শেষ হয় না মুখখানা! তারপর ঘরের বাইরে বেরিয়ে একতলায় আসার মুখেই বাতাসীর মা'র সঙ্গে দেখা।

—বাতাসীর মা, ভূতির-মা কোথায় গো?

—ডাকবো বৌদিমণি?

সারা শরীরে সেণ্টের গন্ধ ভুর ভুর করে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সতীর নিজের নাকেও লাগলো নিজের শরীরের গন্ধটা। বললে—আমি চললুম বাতাসীর মা, তাড়াতাড়িতে ঘরটা বন্ধ করা হলো না, ঘরময় কাপড়-চোপড় ছড়ানো রইল, ভূতির মাকে একটু বলে দিও তো—ঘরে ধুনো দিয়ে যেন দরজাটা চাবি-বন্ধ করে দেয়—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর শম্ভু কোথায় গেল?

শম্ভু ওদিক থেকে দৌড়ে আসছিল। সতী বললে—শম্ভু, ঘরে সব ছড়ানো পড়ে রইল, ভূতির মা ধুনো দিয়ে দিলে, ঘরে চাবি দিয়ে দিস্, বুঝলি—

হঠাৎ যেন বাজ পড়লো মাথায়।

—বৌমা তুমি কোথায় যাচ্ছো আবার এখন?

সতী পেছনে চেয়ে দেখলে শাশুড়ী নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। সাদা গরদের থান পরেছেন। সতী থমকে দাঁড়াল।

—তুমি আবার সাত তাড়াতাড়ি কোথায় চললে?

সতী অবাক হয়ে চাইলে শাশুড়ীর দিকে মুখোমুখি।

—তুমি যে সেজে-গুজে বেরোচ্ছ বড়? আমি তোমাকে যেতে বলেছি?

বাতাসীর মা দাঁড়িয়ে ছিল, শম্ভুও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনেই শুনলো। আর সতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত তখন থর থর করে কাঁপছে—

শাশুড়ী বললেন—আমি সোনাকে নিয়ে বলে একটা কাজে যাচ্ছি—আনন্দ করতেও যাচ্ছি না, নেমন্তন্ন খেতেও যাচ্ছি না, তা তুমি কী বলে এত সাজ-গোজ করে ঝামেলা করতে যাচ্ছো শুনি? কে যেতে বলেছে তোমাকে?

কথাটা বলে শাশুড়ী সামনে এগিয়ে গেলেন। বাগানে গাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ারও শব্দ হলো। তারপর গাড়িটা চলে যাবার শব্দও শুনতে পেলে সতী! তখনও কিন্তু সতী পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তার শাড়ি, তার গয়না, তার স্নো পাউডার সেন্ট—সমস্ত কিছু যেন তার শরীরে দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনে যেন তার সমস্ত শরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তবু এতটুকু ভেঙে পড়লো না সতী। বাতাসীর মা, শম্ভু দু'জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সতীর এই চূড়ান্ত অপমান চোখ দিয়ে দেখছিল। তাদের চোখের সামনে দিয়েই সতী আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগলো। উঠে নিজের ঘরে গেল। তারপর একে একে নতুন শাড়ি, গয়না, ব্লাউজ, শায়া সব খুলে ফেললে। আবার পুরোন শায়া ব্লাউজ শাড়ি গায়ে জড়ালো। আশ্চর্য, চোখ দিয়ে এতটুকু জল পড়লো না। বিছানায় ঢলে পড়লো না। মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতেও বসলো না।

এ-সমস্তই দীপংকরের জানা। এ সমস্ত ঘটনাই সতী দীপঙ্করকে পরে বলেছে!

বর্মা থেকে ভুবনেশ্বর মিত্র চিঠি লিখেছেন—

"মা সতী, অনেক কাজের মধ্যে তোমাকে সব সময় সময়-মত চিঠি দিতে পারি না। তুমি কিছু মনে কোর না। তোমাকে সৎ পাত্রে অর্পণ করতে পেরেছি এই আমার এক পরম সান্ত্বনা। স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, স্বামী ছাড়া ত্রিভুবনে স্ত্রীলোকের আর কোন দ্বিতীয় দেবতা নেই। সর্বদা স্বামীর ধ্যানই স্ত্রীলোকের পরম কর্তব্য জানবে। আর তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, তাঁকেও মায়ের মত সেবা করবে। শৈশবে তুমি মাকে হারিয়েছিলে, এখন বিয়ের পর শাশুড়ী ঠাকুরাণীই তোমার মায়ের স্থান গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রাণ দিয়ে তাঁর তুষ্টি বিধান করবে। তোমার মা জীবিত নেই। থাকলে তিনিই তোমাকে এ-সব কথা লিখতেন। তাঁর অবর্তমানে তাই আমাকেই এত কথা লিখতে হচ্ছে। আমার শরীরে আর পূর্বের ন্যায় পরিশ্রম সহ্য হয় না। ভাবি বিশ্রাম নেব। কিন্তু

আবার ভাবি, বিশ্রাম নিলে বাঁচবো কী নিয়ে? তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। তোমরা দু'জনে আমার আশীর্বাদ নিও। আর শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাবে। ইতি—আশীর্বাদক তোমার বাবা।"

সনাতনবাবুর নজর সাধারণত কোন ব্যাপারেই পড়ে না।

সতী বললে—বাবা চিঠি লিখেছেন—

সনাতনবাবু মুখ তুলে বললেন—ও—

সতী আবার বললে—জানো, বাবার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, বাবার শরীর খারাপের কথা শুনলে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।

সনাতনবাবু বলেন—সত্যিই তো, বড় ভাবনার কথা—

বলেই অন্যমনস্ক হয়ে যান আবার।

সতী বলে—চিঠিটা পড়বে?

—না, তুমি তো পড়েছ, আমি আর কী করতে পড়বো!

তারপর অনেকক্ষণ ধরে বাবার কথা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, যদি কারো সঙ্গে বসে বসে বাবার গল্প করা যেত! যদি কেউ কথাগুলো মন দিয়ে শুনতো একটু! দুপুরবেলা সতী বাবাকে চিঠি লিখতে বসে। একটা চিঠি লেখে। দু' পাতা চিঠি। নিজের মনের কথার কিছু আর বাকি থাকে না লিখতে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে লেখে—

"পরম পূজনীয় বাবা, তোমার শরীর খারাপের কথা শুনে বড় চিন্তিত হলাম। তুমি এবার বিশ্রাম নাও একটু। নয়ত কিছুদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে যাও। কাজ করলে তোমার শরীর আর টিঁকবে না। আর আমাকে তুমি সৎ পাত্রে অর্পণ করেছ লিখেছ। সৎপাত্রে যে অর্পণ করেছ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এক এক সময় আমার সন্দেহ হয় বাবা, তুমি আমাকে কেন এত লেখা-পড়া শেখালে? কেন এত আত্মসম্মানের জ্ঞান দিলে? কেন আমি বোবা-কালা-কানা হয়ে জন্মালাম না বাবা? তাহলে এ-সব কিছুই দেখতে শুনতে হতো না আমাকে। তাহলে আমি মুখ বুজে এ-সংসারে নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার চারিদিকে এত সুখ তুমি কেন দিলে? আমি যে সুখের উপকরণের জ্বালায় বেঁচে মরে আছি। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, সে কেবল তোমার মুখ চেয়ে বাবা। আর কোন কারণে নয়। ফেরত ডাকে তোমার চিঠি যেন ঠিক পাই—ইতি তোমার সতী।"

চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে খামের মুখটা এঁটে বাবার ঠিকানাটা লিখলে ওপরে।

তারপর ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু ঘরে এলে সতী বললে—এই চিঠিটা নিজের হাতে পোস্টবক্সে গিয়ে ফেলে দিবি বুঝলি? ভুল করে যেখানে-সেখানে ফেলিস্ নি যেন—

শম্ভু বরাবরই চিঠি ফেলে। এ আজ প্রথম নয়। তবু প্রত্যেকবারই সতী বার বার সাবধান করে দেয়। সতর্ক করে দেয়। ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করে—ঠিক বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিস তো? বাইরে পড়ে যায়নি?

শম্ভু বলে—হ্যাঁ বৌদিমণি, আমি বরাবর চিঠি ফেলছি আর আজ আমি চিঠি ফেলতে জানবো না—

আজও শম্ভু চিঠি নিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেছে। হঠাৎ কী যে হলো। সতী উঠে পড়লো। উঠেই ডাকলে—শম্ভু, ও শম্ভু—

তাড়াতাড়ি সতী সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল তর্-তর্ করে। সেখানেও শম্ভু নেই। একেবারে বারবাড়ি পেরিয়ে হয়ত সদর রাস্তায় গিয়ে পৌঁছেছে। তাড়াতাড়ি বারবাড়ির উঠোনে গিয়ে বাগানের সামনে দরোয়ানকে ডাকলে—দরোয়ান, শোন তো, শম্ভু চিঠি ফেলতে গেল এখ্খুনি—শম্ভুকে একবার ডাক তো, শিগ্গির—

অনেকক্ষণ পরে দরোয়ান শম্ভুকে ডেকে নিয়ে এল।

—কী রে চিঠি ফেলিস্ নি তো?

না, তখনও হাতে রয়েছে তার চিঠিটা। চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে সতী সেখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। চিঠির টুকরোগুলো কুচো কুচো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলো।

সতী তাড়াতাড়ি আবার ঘরে এল। ঘরে এসে আবার একটা পত্র লিখলে—

"বাবা, তোমার শরীরের কথা ভেবে খুব ভাবনায় পড়লাম। দিনকতক তুমি বিশ্রাম নাও। আমাদের এখানে এসে থাকতেও তো পারো। আমার শাশুড়ী বললেন—তোমার বাবাকে লিখে দাও এখানে আসতে। আমার এখানে কোনও কষ্ট নেই। শাশুড়ী আমাকে মেয়ের মতন যত্ন করেন। ছোটবেলায় আমি মাকে হারিয়েছিলাম বলে আমার যে দুঃখ ছিল, বিয়ের পর আমার শাশুড়ী সে-দুঃখ মিটিয়েছেন। তুমি কেমন আছো, ফেরত ডাকে জানাবে। ইতি তোমার সতী।"

এ-সমস্ত দীপঙ্করের জানা ঘটনা। এ-সমস্ত ঘটনাই সতী দীপঙ্করকে পরে জানিয়েছে।

কিন্তু এর পরেই ঘটলো পুরী যাওয়ার ঘটনা। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষেদের বাড়ির বাইরে থেকে যারা দেখতো, তাদের চোখে পড়তো অন্য জিনিস। খাকি ইউনিফর্ম পরা দরোয়ান কাঠের টুলের ওপর বসে থাকতো গেটের পাশে। সরু ইঁট বাঁধানো লম্বা রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার গ্যারাজে পর পর দুখানা গাড়ি। তার পাশে বাগানের ফুল গাছের কেয়ারি। পাশের লাল রং-এর বাড়িটার রং করা দরজা-জানালা, শার্সি খড়খড়ি, আলো, জাঁক-জমক—

কোনও কিছুরই কম্‌তি নেই। যারা আরো একটু ভেতরে ঢুকতো, তারা আরো অবাক হয়ে যেত এ-বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে। মার্বেল পাথরের মেঝে, মোরাদাবাদী ভাস্-এ ক্যাক্‌টাসের চারা, বাগানের শেষ প্রান্তের এক-কোণে রাজহাঁসের দল বেঁধে চরা। কলকাতা শহরের ভবানীপুর অঞ্চলের বুকের মধ্যেও যেন এ এক অন্য জগৎ। সমস্ত বাড়িটা সব সময়েই যেন বড় নিরিবিলি। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ হয়ত গেট্ দিয়ে একটা গাড়ি হুস্ করে বেরিয়ে এল। দরোয়ান তার আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। দেখা যেত গাড়ির ভেতর বসে আছে একজন গরদের থান পরা বিধবা মেয়েমানুষ। পাকা চুলের ওপর বেশ যত্ন করে ঘোমটা তোলা। আর তার পাশেই একজন ভদ্রলোক। ধব্ ধব্ করছে দুজনের গায়ের রং। প্রশান্ত গম্ভীর ধীর স্থির চেহারা। গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই গেটটা আবার বন্ধ হয়ে যেত।

যারা দেখতো তারা বলাবলি করতো—খুব বড়লোকের বাড়ি মনে হচ্ছে হে—

কিন্তু সেদিন যখন গাড়িটা বেরলো তার ভেতরে তখন অন্য একজন। সেই বিধবা মেয়েমানুষটিও নেই, সেই প্রশান্ত চেহারার ভদ্রলোকটিও নেই। আছে অন্য একজন। বেশ সুন্দর ফরসা একটি বৌ। মাথায় কোঁকড়ানো চুলের খোঁপা। শরীরে আল্গা রূপের ঢেউ।

যারা দেখলে তারা বলাবলি করলে—খুব আরামে আছে মশাই এরা, এদেরই তো রাজত্ব হে—

হয়ত দীর্ঘনিশ্বাসও পড়লো কথাটার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বলা সেই সতীর কানে এ সব পৌঁছুল না।

ড্রাইভার শুধু একবার জিজ্ঞেস করলে—কোন্ দিকে যাবো বৌদিমণি?

সতী বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—কালিঘাট—

সমস্ত দিন ধরে সতী কেবল ভেবেছিল। এখনও কিছুই বলেননি শাশুড়ী। বাতাসীর মা সব খবর রাখে ভেতর-বাড়ির। সে-ও জানতে পারেনি। ভূতির মা, শম্ভু, দরোয়ান, বাড়ির অন্য চাকর ঝি তারাও কেউ জানতো না। সরকারবাবু নিজের ঘরে বসে হিসেব নিকেশ করে—তারও জানা ছিল না হয়ত। সনাতনবাবু লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন। বাইরে থেকে মা ডাকলেন—খোকা—

সনাতনবাবু বললেন—আমাকে ডাকছো মা?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রের ট্রেনে পুরী যাবো, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে। অনেক দিনের মানত ছিল, এখন না গেলে হয়ত আর যাওয়া হবে না।

সরকারবাবুর ডাক পেয়েই চশমাটা পরে দৌড়ে এল। শাশুড়ী বললেন—ক্যাশে টাকা আছে সরকারবাবু?

—আজ্ঞে কত?

—হাজার দুয়েক?

—আজ্ঞে মা, হাজার দুয়েক তো হবে না, আমি দেখছি কত আছে।

শাশুড়ী বললেন—দেখতে হবে না, আপনি ব্যাঙ্ক থেকেই তুলে আনুন, সোনা সই করে দিচ্ছে—

এসব ঘটনা ঘটেছে নিচেয়। কখন সরকারমশায় ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গেছে, কখন ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছে, কিছুই জানতে পারেনি সতী। সকালে উঠে যথারীতি কলঘরে গেছে। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, তারপর রান্নাবাড়িতে নেমেছে। তারপর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়েছে। দুপুর বেলা নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বইএর পাতাও উল্টিয়েছে। বিকেল বেলা সনাতনবাবু একবার ঘরে এসেছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নি।

খবরটা দিলে শম্ভু।

শম্ভু এসে বললে—বৌদিমণি, দাদাবাবুর জামা-কাপড় বার করে দিন—

—জামা-কাপড়? জামা-কাপড় বার করে দেব কেন? ধোপা এসেছে?

—আজ্ঞে না, দাদাবাবু যে পুরী যাচ্ছেন মার্মণির সঙ্গে!

পুরী! আকাশ থেকে পড়লো সতী। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, পুরী যাচ্ছেন!

শম্ভু বললে—হ্যাঁ বৌদিমণি, ভাঁড়ারে হুকুম হয়ে গেছে, ঘি-ময়দা বেরিয়েছে, বাতাসীর মা লুচি ভাজতে বলেছে ঠাকুরকে, বিছানা বাঁধছে কৈলাস, এবার সুটকেস গোছানো হবে—

ধড়মড় করে উঠে বসলো সতী! পুরী যাচ্ছেন দুজনে—আর সে! সতী কি এখানে থাকবে? জামা-কাপড় বার করে দিলে আলমারি থেকে। একগাদা জামা-কাপড়। সমস্ত মাথাটা যেন গরম হয়ে গেল এক মুহূর্তে! শম্ভু জামা-কাপড়গুলো নিয়ে যাবার পর সতী একবার দাঁড়ালো চুপ করে ঘরের মধ্যেই। মনে হলো তখনি ছুটে যায় লাইব্রেরী-ঘরে। কিন্তু তারপরেই আবার গিয়ে দাঁড়ালো জানালার সামনে। জিনিস-পত্র বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে, খাবার তৈরি হচ্ছে—আর সতী কিছুই জানে না! সতীকে কিনা খবরটা শুনতে হলো চাকরের মুখ থেকে। সবসময় ছটফট করে বেড়াতে লাগলো সতী! ঘড়িতে চারটে বাজলো। পাশে চাকর-বাকরদের যাওয়া-আসার শব্দ হচ্ছে। তোড়-জোড় চলছে যাওয়ার। নিচের রান্নাবাড়িতে লুচি ভাজা হচ্ছে। হঠাৎ শম্ভুকে দেখেই সতী ডাকলে—শম্ভু শোন্—

শম্ভু আসতেই সতী জিজ্ঞেস করলে—সঙ্গে কে-কে যাচ্ছিস্ তোরা? তুই যাচ্ছিস্?

শম্ভু বললে—না বৌদিমণি, আমি যাচ্ছি না, কৈলাস, ঠাকুর আর বাতাসীর মা যাবে—

—তাহলে ঠাকুর গেলে এখানে রান্না করবে কে?

—নতুন বামুন ঠাকুর!

তারপর হঠাৎ কী মনে হলো। একটু থেমে বললে—দাদাবাবু তোর কোথায় রে? লাইব্রেরী ঘরে?

—না, মার্মণির ঘরে।

সতী বললে—আচ্ছা তুই যা—

কী যে করবে বুঝতে পারলে না। মনে হলো এখনি বাবাকে টেলিগ্রাম করে দেয়। আর এক মুহূর্ত এ-বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। দরকার নেই এই সংসারে। দরকার নেই। দরকার নেই। নিজের ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো সতী! মনে হলো একটা খাঁচার মধ্যে যেন কেউ তাকে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। আর বেরোবার উপায় নেই তার। হঠাৎ জামা-কাপড় পরা সাজা-গোজা সনাতনবাবু ঘরে এসে হাজির হলেন।

সতী সামনে গিয়ে কী বলবে বুঝতে পারলে না। হাঁফাতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর বললে—তোমরা পুরী যাবে?

সনাতনবাবু যেন অন্য কিছু ভাবছিলেন। বললেন—হ্যাঁ, কেন?

—তা আমাকে তো জানাওনি কিছু তোমরা?

—তুমি জানতে না?

সনাতনবাবু যেন এতক্ষণ জানতেন না সে-কথা। বললেন—তা নাই বা জানলে, আমিও তো জানতুম না, এখন মা আমাকে বললে—

—কিন্তু আমাকে জানানোও কি তোমাদের উচিত ছিল না?

সতী কথাগুলো বলতে বলতে হাঁফাচ্ছিল।

—আমি কি তোমাদের বাড়ির কেউ নই?

সনাতনবাবু বললেন—সত্যিই তো, তোমাকে জানানোই উচিত ছিল—

বলে তিনি নির্বিকারভাবেই ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলেন। সতী তাঁর সামনে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল, বললে—তুমি কী বল তো? তোমরা সবাই চলে গেলে আমি একলা এ-বাড়িতে থাকবো কী করে? আমাকে একলা ফেলে যেতে তোমাদের কষ্ট হয় না—

সনাতনবাবু কেমন যেন বিব্রত বোধ করলেন। বললেন—না না, তুমিই বা একলা থাকবে কী করে? সত্যিই তো! দাঁড়াও মাকে বলছি গিয়ে, আমি বলছি গিয়ে মাকে—

সতী সনাতনবাবুর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে—বলতে হবে না। বলতে হবে না তোমার মাকে—আমি যেতে চাই না, আমি একলাই থাকবো—একলা থাকতে কোনও কষ্ট হবে না—

সনাতনবাবু সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—তা হলে বলবো না মাকে?

—না, বলতে হবে না। তোমরা যেখানে খুশি যাও, যতদিন ইচ্ছে থাকো, আমার দরকার নেই তোমাদের, আমি এখানে খুব আরামে থাকবো!

সনাতনবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন মনে হলো। বললেন—হ্যাঁ, মা-ও সেই

কথাই বলছিলুম, শম্ভুকে রেখে যাচ্ছি, আর নতুন বামুন ঠাকুর রইল। আর আমরা তো বেশি দিন থাকবো না। পাঁচ ছ'দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো—

সতী হাতটা ছেড়ে দিলে। সনাতনবাবু আবার হঠাৎ ভেবে বললেন—তা তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে তো চলো না, তোমার কথাটা ঠিক আমার মনে ছিল না—

সতী বললে—না, থাক্, আমি যাবো না—

—তা হলে আসি, কেমন!

বাইরে থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল—খোকা—

—যাই মা—

সনাতনবাবু বেরিয়ে গেলেন। শাশুড়ী একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন। সেই গরদের থান। মাথার পাকা চুলের ওপর চিরুনি বোলানো। ব্যস্ত খুব। শাশুড়ীকে আসতে দেখেই সতী সামনে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। শাশুড়ী বললেন—সাবধানে থাকবে বৌমা, আমি সরকারবাবুকে সব বুঝিয়ে বলে গেলাম—তোমার অসুবিধে হবে না কিছু, শম্ভুকে রেখে গেলাম, নতুন ঠাকুরটাও রইল, দরোয়ানকে বলে দিচ্ছি একটু হুঁশিয়ার হয়ে যেন থাকে—আর, আর কিছু বলতে হবে?

সতী বললে—না!

—দেখ আমার মানত ছিল বলেই যাওয়া, নইলে কে যায় এই সময় সংসার ফেলে? তোমার কিছু অসুবিধে হলে শম্ভুকে বলবে, সরকারবাবুকে সব বলা আছে আমার—

তারপর হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল। বললেন—যাই, ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে আবার—

বলে শাশুড়ী চলে গেলেন। সনাতনবাবু আগেই চলে গিয়েছিলেন। সতী ঘরটার মধ্যে একলা খানিকক্ষণ সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সদর রাস্তায় গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। গাড়ি বেরলো। গাড়ির শব্দটাও এক সময় মিলিয়ে গেল। তারপর সব ফাঁকা। সতীর মনে হলো সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দে একটা অট্টহাসি হাসতে লাগলো তার দিকে চেয়ে। মনে হলো এই ঐশ্বর্য, এই গাড়ি, এই সুখ, আরাম, বৈভব সব যেন মিথ্যে। সব যেন ফাঁপা! এর চেয়ে যদি তার অসুখ করতো, যদি সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতো সে-ও যেন অনেক ভাল ছিল তার পক্ষে। এর চেয়ে যদি একটা ছোট সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতো তার চিন্তা-ভাবনা-কর্ম, সে-ও যেন এর চেয়ে অনেক ভাল হতো। এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বিরাট বাড়িটার চেয়ে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের পুরোন ভাঙা বাড়িটাও যেন অনেক ভাল ছিল।

শম্ভু এল ঘরে হঠাৎ। বললে—বৌদিমণি—

—হ্যাঁরে, ওঁরা চলে গেছেন?

রাত্রে খাবে না-ই ভেবেছিল সতী। কিন্তু কেন খাবে না। কেন সে নিজেকে কষ্ট দেবে? কার ওপর অভিমান করে? কে তার অভিমানের মূল্য দেবে? আবার ডাকলে—শম্ভু—

শম্ভু ঘরে এল আবার। সতী বললে—আমি খাবো রে—

—তখন যে বললে খাবো না! উনুন নিবিয়ে দিয়েছে নতুন ঠাকুর—

—তা হোক, আবার উনুনে আগুন দিতে বল্, আমার জন্যে লুচি ভাজবে!

সেই অত রাত্রে আবার উনুনে আগুন দিতে হলো। বাতাসীর মা চলে গিয়েছে। ভূতির মা'র ঘাড়ে পড়েছে সংসার। নতুন ঠাকুর আবার লুচি ভাজলে। আবার বৌদিমণির জন্যে লুচি ভাজা হলো। আবার তরকারী রান্না হলো। সতী চেয়ে চেয়ে খেলে। কী হয়েছে তার? কিছুই হয়নি। সে কেন শরীরকে কষ্ট দিতে যাবে। আরাম করে খেয়ে রাত ভোর ঘুমোবে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠবে সকাল বেলা। শাশুড়ী নেই যে তাকে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে হবে।

তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর সতী বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ভূতির মা বললে—বৌদিমণি একলা শুতে তোমার ভয় করবে না তো?

—কেন, ভয় করবে কেন?

—না, যদি বলো তাহলে আমি তোমার দরজার বাইরে না-হয় শুচ্ছি—

—না, না, আমার কী হয়েছে? তুমি তোমার নিজের ঘরে শোও-গে যাও ভূতির মা, আমার জন্যে তোমার কষ্ট করার দরকার নেই—

—তা হলে দরজায় খিল লাগিয়ে দিও বৌদিমণি!

ঘুম অবশ্য আসেনি সেদিন সতীর। ঘুম এলে অন্যায় হতো। সমস্ত রাত কত রাস্তার শব্দ শুনেছে শুয়ে শুয়ে। তারপর শেষ রাত্রের দিকে একটু তন্দ্রাও এসেছিল বোধহয়। তা সেও খানিকক্ষণের জন্যে! তারপরেই ঘড়ির শব্দ কানে এসেছে আবার। আবার দূরে ট্রাম-বাস চলার আওয়াজ এসেছে কানে। সতী তখন বিছানা থেকে উঠে পড়েছে। উঠে বাইরে বারান্দায় এসে দেখেছে ভূতির মা দরজার সামনেই মেঝের ওপর শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—

—ভূতির মা, ও ভূতির মা।

ভূতির মা ধড়মড় করে উঠে বললে—বৌদিমণি?

—সকাল হয়ে গেছে, উঠবে না?

তারপরে শম্ভুকে ডাকলে সতী। বললে—ড্রাইভারকে বলবি আমি বেরোব আজ গাড়িতে—

—কোথায় যাবে বৌদিমণি তুমি?

—তা তোর শোনবার দরকার কী? আমার যেখানে খুশি বেরোব, যা বলছি তাই কর গিয়ে—

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে সতী একটা শাড়ি বেছে নিয়ে পরলে। ভাল শাড়ি। মুখটায় স্নো পাউডার ঘষে নিলে। প্রথমে কোথাও ঠিক ছিল না কোথায়

যাবে। শম্ভু বলেছিল—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বৌদিমণি?

—না, তুই থাক্, দরোয়ান আমার সঙ্গে যাবে।

ড্রাইভার একবার জিজ্ঞেস করেছিল—কোন্ দিকে যাবো বৌদিমণি?

সতী বললে—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন—কালিঘাট—

কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো। গাড়িটা তখন হাজরা রোড দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে ঘুরছিল। হঠাৎ সতী বললে—না সোজা চলো—

তখন সকাল। এত সকালে গেলে হয়ত সবাই বিব্রত হয়ে উঠবে সেখানে। গলির ভেতরে তো গাড়িটা ঢুকবে না। অনেক দিন পরে যাওয়া। হয়ত সতীকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। হয়ত তাদের সেই বাড়িটাতে নতুন ভাড়াটে এসেছে। হয়ত দীপুরাও আর নেই সে-বাড়িতে। হয়ত দীপুরা উঠে গেছে অন্য কোনও জায়গায়। তার মাকে পরের বাড়ি রান্না করতে হয় না। হয়ত দীপু বিয়ে করেছে। হয়ত তার ছেলে-মেয়ে হয়েছে।

গাড়িটা সোজা একেবারে জজেস্ কোর্ট রোড দিয়ে চলছিল। আবার ঘুরে এল এদিকে। এবার আবার হাজরা রোড দিয়ে ফিরে এল গাড়িটা। হরিশ মুখার্জি রোড। হরিশ মুখার্জি রোডের ওপরেই জয়ন্তীদের বাড়িটা। লক্ষ্মীদির বন্ধু জয়ন্তী পালিত। ব্যারিস্টার পালিতের মেয়ে। আর সেই ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত। বহুদিন আগে একবার লক্ষ্মীদির সঙ্গে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে।

সতী হঠাৎ বললে—না থাক্, সোজা চলো—একেবারে সোজা—

একেবারে সোজা। এইসব রাস্তা কত চেনা। কতদিন কলেজ যাবার পথে এই রাস্তা দিয়ে কলেজের বাসে করে গেছে। সে-সব দিন যেন চোখের ওপর ভাসছে। সতী হেলান দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলো। সমস্ত কলকাতা যেন চষে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনের ইচ্ছেটা যেন গাড়ির চাকা হয়ে বন্ বন্ করে ঘুরছে। এ-রাস্তা যেখানে শেষ হবে, সেইখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে যেন ভাল হয়। রাস্তা দিয়ে আপিস-যাত্রীর দল চলেছে। একটু পরেই আপিসের দরজাগুলো খুলবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে বইখাতা নিয়ে। একদিন সতীও এই রকম করে স্কুলে গিয়েছে। কলেজে গিয়েছে, তারপর বড় হয়েছে। তারপর একদিন বিয়েও হয়ে গেছে তার। বিয়ের পর থেকেই যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে।

সতী হঠাৎ বললে—গাড়ি ঘোরাও, গাড়ি ঘোরাও—

গাড়ির চারটে চাকা কলকাতার রাস্তা তখন অনেক মসৃণ করে দিয়েছে। মনের অনেক উত্তাপ নিভে গেছে।

—কোন্ দিকে যাবো বৌদিমণি?

—ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালিঘাট—

কথাটা বললে বটে সতী। কিন্তু তারা যদি সেখানে না থাকে আর। তারা

যদি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়ে থাকে। নতুন ঠিকানাটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে ও-বাড়ি থেকে। গিয়ে বলবে সতী—এমনি এলাম! কেন, আসতে নেই নাকি! এতদিন আসেনি বলেই কি চিরকালের মত আসতে পারবে না! চিরকালের সম্পর্ক কি একেবারেই ঘুচিয়ে দিতে হবে নাকি! বলে একটু হাসবে! আর তা ছাড়া সম্পর্কটাও বড় কথা নয়। সংসারের কাজে কে কার খবর নিতে পারে। সবাই-ই তো নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বড়লোকের বাড়িতে সতীর বিয়ে হয়েছে বলে কি তার কোনও সমস্যাই থাকবে না?

কিন্তু নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটের সেই রাস্তাটার ওপর গিয়ে গাড়ি থামতেই সতী কী যেন ভাবলে।

বললে—দরোয়ান, উনিশের একের বি নম্বরে গিয়ে দেখে এসো তো, দীপঙ্করবাবু বলে কোনও লোক আছে কিনা, থাকলে ডেকে নিয়ে আসবে আমার কাছে—

দরোয়ান বুঝতে পারেনি। সতী আরো বুঝিয়ে দিয়ে বললে—ওই যে ইঁট বার করা বাড়িটা—ওইখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করো গে—

আর তারপরেই দীপঙ্কর এসেছিল। কী চেহারা হয়েছে দীপুর! মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

আশ্চর্য তখনও জানতো না সতী কেন সে এতদিন পরে আবার পুরোন পাড়াতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো। দীপঙ্কর যদি জিজ্ঞেস করে সতী কেন এসেছে এতদিন পরে, তা হলে কী জবাব দেবে সে! হঠাৎ সতীর মনে পড়লো। দীপঙ্করের মা বরাবর প্রত্যেক বছর এই তারিখে ছেলের জন্যে পায়েস রান্না করতো। দীপুর মা এই দিনটাতেই ছেলের জন্যে ঝিকে দিয়ে বাজার করিয়ে আনাতো। দীপু যা-যা খেতে ভালবাসে সেই সব রান্নার আয়োজন করতো। কতবার দীপুর মা সতীকে বলেছিল—দু মাস বয়েস থেকে ওকে বুকে করে এখানে এসেছি মা, ও যে আবার বড় হবে মানুষ হবে তা তো তখন ভাবিনি—

এমন করে কোনও মাকে তার ছেলেকে এত ভালবাসতে দেখেনি কোনওদিন সতী!

মাসীমা বলেছিল—ভরা অমাবস্যার দিন জন্মেছিল দীপু, একেবারে মৌনী অমাবস্যা, ও যখন হলো, লোকে বললে এ ছেলে তোমার চোর হবে—তা কী জানি কী হবে, ছেলে বেঁচে থাকলেই আমি খুশী মা, ছেলে-মেয়ে যে কী জিনিস তা যখন আবার তোমার ছেলে-মেয়ে হবে, তখন বুঝবে মা—

দীপঙ্কর যখন জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ, কী মনে করে তুমি?

সতী টপ্ করে বলে দিয়েছিল—সোমবারে তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে, ওখানেই খাবে—

কথাটা হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দীপুকে নেমন্তন্ন করবার

কোনও কল্পনাই ছিল না সতীর যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। যখন নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট থেকে ফিরে এসেছিল তখনও সতীর সংশয় কাটেনি। কাজটা ভাল করেছে না মন্দ! ন্যায় না অন্যায় করলে সে! কিন্তু তখন আর উপায় নেই! তখন আর বারণ করবারও পথ বন্ধ। সব ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেছে। দীপঙ্কর সোমবার আসবে। ফাঁকা বাড়িটার মধ্যে ক'টা দিন কী অস্বস্তিতেই সে কাটলো! কেন সে নেমন্তন্ন করতে গেল দীপুকে! কেন সে এমন কাজ করে বসলো! কার সঙ্গেই বা সে পরামর্শ করবে! কেমন করে তাকে বারণ করবে!

দেখতে দেখতে সোমবার এসে গেল।

ভূতির মাকে ডেকে পাঠালে সতী। বললে—ভূতির মা, আজকে একজনকে নেমন্তন্ন করেছি বাড়িতে, তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে?

ভূতির মা বললে—কেন পারবো না বৌদিমণি, বাতাসীর মা নেই বলে কি গেরস্থবাড়ির কাজ-কম্ম বন্ধ হয়ে যাবে?

—তুমি তাহলে শম্ভুকে বলে দাও ভূতির মা, কী কী আনতে হবে। যেন গুছিয়ে গাছিয়ে সব নিয়ে আসে, অনেক রকম মাছ, মাংস, ডিম—আর পায়েসও করতে হবে গন্ধ-চালের—

ভূতির মা সত্যিই বাঁচিয়ে দিলে। বললে—তুমি কিছু ভেবোনি বৌদিমণি, হারামজাদী বাতাসীর মা নেই বলে ভেবোনি ভূতির-মা মরে গেছে। আমি থাকতে কিছু ভাবনা কোরনি তুমি, আমি সব যোগাড়-যন্তর করে দিচ্ছি—

—আর রান্না? নতুন বামুন-ঠাকুর কি পারবে?

ভূতির মা'র যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। বললে—রান্না না করতে পারে তো আমি আছি কী করতে? আমি কি মরেছি?

সমস্ত দিন সত্যিই খুব খাটুনি গেল সতীর। একটা-একটা করে রান্না। কেন যে হঠাৎ নেমন্তন্ন করতে গেল দীপুকে কে জানে! অথচ যখন নেমন্তন্ন করা হয়েছে তখন তো আর পেছানো যায় না। সমস্ত দিন রান্না-বান্নার পরিশ্রমের পর গা ধুয়ে যখন তৈরি হয়েছে, তখন দীপঙ্কর এসে গেল।

সকাল থেকেই দরোয়ানকে বলে রেখেছিল সতী! বাবু এলেই যেন ওপরে নিয়ে আসে। কিন্তু তার আগেই শম্ভু এসে খবর দিয়ে গেছে। বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল এক মুহূর্তের জন্যে! কোনও অন্যায় কাজ করছে নাকি সে! কিন্তু তখনি মনটাকে দৃঢ় করে নিয়েছিল। অধিকার আছে বৈ কি তার। অধিকার আছে বৈ কি নিজের আত্মীয়-স্বজনদের নেমন্তন্ন করবার। সে-ও এ-বাড়ির বউ। এ-বাড়িতে অন্য সকলের মত তারও অধিকার আছে।

আর তারপর শেষ মুহূর্তে সেই দারুণ দুর্যোগ।

সেই ঘটনার পরও দীপঙ্কর খেলে। খেতে বাধ্য করলে সতী। সমস্ত বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল ... সতী বলেছিল—

আমারও অধিকার আছে এ-বাড়িতে—তুমি খেয়ে তার পর যাও আজ—

যতক্ষণ খেয়েছে দীপঙ্কর ততক্ষণ এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপেছে শুধু সে। তারপর যখন দীপঙ্কর চলে গেছে তখন সতী শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছে—কালও তুমি আসবে—আবার কাল আসবে—বুঝলে—

দীপঙ্কর চলে যাবার পর শাশুড়ী আবার ডাকলেন—বৌমা, একবার শুনে যাও এদিকে—

সতী নিজেকে শক্ত করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল শাশুড়ীর সামনে।

শাশুড়ী তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই একই জায়গায়। তখনও ট্রেনের সাজ-পোশাক ছাড়েন নি তিনি।

বললেন—আমি এখনও মরিনি বৌমা, আমার মরার আগেই আমার শ্বশুরের ভিটেতে দাঁড়িয়ে তুমি আমারই সামনে আমাকে অপমান করলে—

সতী চুপ করে রইল মাথা নিচু করে।

শাশুড়ী আবার বললেন—আর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি যা পরে বললে তা-ও আমি শুনেছি, কিন্তু মনে রেখো এখনো আমি বেঁচে আছি—

তারপর একটু থেমে বললেন—যাও—

সতী আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে এল। দেয়ালের ঘড়িটার বুকের মধ্যে তখন বোধহয় তুমুল শব্দে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সতী খাটের বাজুটা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, যেন ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে সে। যেন পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

—বৌদিমণি!

শম্ভু ঘরে এসেছে। বললে—তোমার খাবার দেব বৌদিমণি?

সতী হঠাৎ পেছন ফিরলো। বললে—না, তুই যা, বাতাসীর মা'কে বলগে যা, আমি খাবো না আজ—

শম্ভু চলে গেল। খানিক পরে ভূতির মা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকেছে। বললে—হ্যাঁ বৌদিমণি, তুমি খাবে না কেন? চোপর রাত না-খেয়ে থাকলে পিত্তি পড়বে যে, চলো খাবে চলো—

সতী বলল—না ভূতির মা, আমার খিদে নেই, সত্যি বলছি—তুমি যাও এখন এখান থেকে—

ভূতির মা তবু নড়ে না। বলে—তুমি না খেলে আমরা খাই কী করে বলো দিকি—?

—না, খাওগে যাও ভূতির মা, তাতে কোনও দোষ হবে না, যাও তুমি, খেয়ে নাও গে—

সতীর সেই সব দিনের কথা দীপঙ্করের এখনও মনে আছে। প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত সতী দীপঙ্করকে বলেছিল। এ-এক

অদ্ভুত আরামের জীবন সতীর। এ আরামের জ্বালা যত, মাদকতাও তত। সতীর দিনগুলো যেন আরামের আতিশয্যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেত। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন যন্ত্রণার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। অথচ কোথায় যেন একটা আকর্ষণও ছিল সনাতনবাবুর জন্যে!

রাত যখন অনেক, তখন সনাতনবাবু ঘরে এলেন। তাঁর হাসি হাসি মুখ। বললেন—দেখ, ভগবানের ইচ্ছে না থাকলে কোনও আশা কি মেটে মানুষের?

সতী ভেবেছিল সনাতনবাবুও বোধ হয় প্রথমে এসেই সেই প্রশ্ন করবেন। কে এসেছিল? কাকে নেমন্তন্ন করেছিল সতী। কিন্তু সে-সবের ধার দিয়েও গেলেন না তিনি। বলতে লাগলেন—আর ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যেই পুরী পৌঁছে যাবো, হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে ট্রেনটা এমন আটকে গেল, আর যায় না—লাইন-টাইন সব জলে ডুবে একাকার—

সতী কিছু কথা বললে না।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—তারপর ট্রেনটা পেছু হেঁটে কটক স্টেশনে এল আবার, ভাবলাম যাওয়া যখন হলো না, তখন কলকাতাতেই ফিরে আসতে হবে, কিন্তু সেদিকেও রাস্তা বন্ধ তখন, সেদিকেও নদীর জল উঠে লাইন আটকে আছে! দু'দিন সেই গাড়িতেই বসা—শেষকালে মাকে বললুম—

কী সব অনেক কথা বলে গেলেন সনাতনবাবু। কিছুই কানে গেল না। অন্যদিনকার মত সনাতনবাবু আর বই নিয়ে টেবিলে পড়তে বসলেন না। তিন-দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি তাঁর শরীরে। আস্তে আস্তে জামা খুলতে লাগলেন। সতীর মনে হলো এইবার বোধ হয় বলবেন। এইবার বোধ হয় জিজ্ঞেস করবেন।

কিন্তু সে-সব কথাই উত্থাপন করলেন না সনাতনবাবু। জামা খুলে সনাতন-বাবু বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললেন—এ কি, তুমি শোবে না?

—হ্যাঁ, শুই!

সতী আস্তে আস্তে এসে পাশে শুলো। এক বিছানা। একেবারে পাশা-পাশি। আলো নিভিয়ে দিয়েছে সতী। সমস্ত ঘরখানা অন্ধকার। একবার উস্‌খুস্‌ করে উঠলেন সনাতনবাবু। ওপাশ ফিরলেন। সতী চমকে উঠলো এক মুহূর্তের জন্যে। এইবার বোধ হয় জিজ্ঞেস করবেন। এইবার বোধ হয় প্রশ্ন করবেন—কে ও? কে এসেছিল বাড়িতে! কাকে বসে খাওয়াচ্ছিলে!

কিন্তু সনাতনবাবু কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। ঘড়ির বুকের ধুকধুকুনি বাড়তে লাগলো। টিক্ টিক্ শব্দটা যেন সতীর বুকের মধ্যে ঘা দিতে লাগলো। যেন আঘাত লাগাতে লাগলো জোরে জোরে। যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার।

—দেখ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সতী উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল। এইবার নিশ্চয় কথাটা বলবেন। বললে—কী কথা?

সনাতনবাবু বললেন—উনিশ শো বত্রিশ সালেও এই বর্ষার সময়ে একবার রেল-লাইন এই রকম ডুবে গিয়েছিল জানো—তাই ভাবছিলাম বর্ষাকালে পুরী যাওয়াটাই আমাদের ভুল হয়েছে।

বলে সনাতনবাবু চুপ করে গেলেন। তারপর মনে হলো তিনি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছেন।

সতী আর থাকতে পারলে না। বললে—আর কিছু বলবে না তুমি?

সনাতনবাবু ঘুমের মধ্যেই যেন উত্তর দিলেন—হুঁ—

—তুমি ঘুমিয়ে পড়লে?

সনাতনবাবু বললেন—না, কিছু বলছিলে তুমি?

সতী বললে—থাক্, তোমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি ঘুমোও—

—না না, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা এখন জেগে উঠেছি, বলো না কী কিছু বলছিলে তুমি?

সতী একটু থেমে বললে—তুমি তো কিছু বললে না আমায়?

সনাতনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—কিসের জন্যে?

—ওই যে যাকে তুমি দেখলে আমার ঘরে, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না, ও কে?

সনাতনবাবুর যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। বললেন—ও, তাই তো বটে! ও কে?

—কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন?

সনাতনবাবু বললেন—আমার ঠিক মনে ছিল না—

—সে কি, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে একজন অচেনা লোক বাড়ির ভেতরে ঢুকে কথা বলছিল, আর তুমি একবার জিজ্ঞেসও করলে না, ও কে? এ-কথা মানুষ ভুলে যায়? ভুলতে পারে?

সনাতনবাবু যেন নিজের ভুল স্বীকার করলেন। বললেন—তা যাক্‌গে তুমিই বলো না ও কে?

—না, তা আমি বলবো না, কিন্তু তুমি আগে বলো তুমি কেন জিজ্ঞেস করলে না?

সনাতনবাবু বোধ হয় কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

সতী বললে—তোমারই তো আগে জিজ্ঞেস করা উচিত, ও কে?

সনাতনবাবু স্বীকার করলেন। বললেন—হ্যাঁ, আমারই আগে জিজ্ঞেস করা উচিত—

—তা জিজ্ঞেস করলে না কেন?

হেসে ফেললেন সনাতনবাবু এবার। বললেন—এই দেখ, কী মুশকিলে

ফেললে তুমি আমাকে—

—না বলো· তোমাকে জবাব দিতেই হবে।

সনাতনবাবু বললেন—এবার থেকে জিজ্ঞেস করবো, এবার মনে রাখবো ঠিক!

সতী বললে—আমি কালকেও ওকে আসতে বলেছি—

—ভালোই করেছ!

—কালকে এলে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, তুমি কথা বলবে ওর সঙ্গে, তুমি আমার সম্মান বাঁচাবে, তুমি আমার কথার মর্যাদা রাখবে—

—নিশ্চয়ই রাখবো। কালকে আমি নিশ্চয়ই কথা বলবো—

সনাতনবাবু বোধ হয় সত্যিই ক্লান্ত ছিলেন খুব। তিনি ওপাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খানিক পরে ঘুমিয়েও পড়লেন। একটানা নিশ্বাস পড়তে লাগলো। সতীও ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রথমে চোখ দুটো বুজে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। শুধু ঘুম, কোথাও কিছু অশান্তি নেই। পৃথিবীর সব জায়গায় অখণ্ড শান্তি আছে। আমিও সুখী। আমারও কোনও দুঃখ নেই। এমনি করে একমনে ঘুমের সাধনা করে অনেকবার ঘুম এসেছে তার। প্রথম আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা একটু চেষ্টা করতে হয়, তারপরে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কেমন শিথিল হয়ে আসে। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ঘুম, নিস্তরঙ্গ বিশ্রাম!

সতী আবার চিৎ হয়ে শুলো। মনে হলো কোথায় যেন শব্দ হলো একটা। খুট্-খুট্ শব্দ! কোথায় শব্দ হবে? কে শব্দ করবে? ওপরে ছাদে তো কেউ চাকর-বাকর শোয় না। সবাই একতলায় সরকারবাবুর পাশের ঘরে শুয়েছে। কেউ তো কোথাও নেই! তিন-চারখানা ঘর পেরিয়ে শাশুড়ী শুয়ে আছেন তাঁর নিজের ঘরে। সনাতনবাবুর পাশেই শুয়ে আছেন। তাঁর তো একটানা নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শব্দ হয় না কোনও দিন।

সতী বিছানা ছেড়ে উঠলো। তবে হয়ত ঘড়িটার শব্দ। বিরাট ঘড়ি। মাঝে মাঝে ভেতর থেকে কেমন একটা কল-কব্জার খুট্-খাট্ শব্দ হয়। সতী উঠে দাঁড়াল গিয়ে ঘড়িটার তলায়। আশ্চর্য! ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটাও তো হচ্ছে না আর! অন্ধকারের মধ্যেই সতী ঘড়িটার দিকে চাইলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। কখন রাত একটা বাজার পর আর চলে নি। কাঁটা দুটো এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত দম দেওয়া হয় নি। হয়ত দম ফুরিয়ে গিয়েছে।

সতী আবার নিজের বিছানায় এসে শুলো। তখন কত রাত কে জানে!

অনেক দিন পরে এই ঘটনা শুনতে শুনতে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু শব্দটা হয়েছিল কিসের?

সতী বলেছিল—তখন বুঝি নি শব্দটা কিসের, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম—

ও বাইরের শব্দ নয়, ও ভেতরের—আমার অন্তরাত্মার শব্দ, আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—তার মানে?

সতী বলেছিল—তার মানে তুমি বুঝবে না, ও সবাই বোঝে না—সবাই শুনতেও পায় না। কপাল যখন কারো ভাঙতে শুরু করে, ও শব্দ শুধু সে-ই শুনতে পায়—

সতীরও সেদিন তাই মনে হয়েছিল বিছানায় শুয়ে শুয়ে। একটু ভয় পেয়েছিল প্রথমে। তারপরে আবার ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল। কেবলি মনে পড়ছিল—দীপঙ্কর এলে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। সনাতনবাবু তার সঙ্গে কথা বলবে, সতীর সম্মান বাঁচাবে, সতীর কথার মর্যাদা রাখবে......

সব রাতই এক সময়ে ভোর হয়, সব দিনই এক সময়ে আবার সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে ঠেকে। তবু সেদিন রাতটা যেন কাটতে চায় নি দীপঙ্করের। দীপঙ্করের মনে আছে সতীদের গাড়িটা যখন তাকে নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তখনও দীপঙ্কর যেন সম্বিৎ ফিরে পায়নি। তখনও যেন সতীর কথাটা তার-কানে বাজছে—আমারও যে এ-বাড়িতে একটা অধিকার আছে, সেটা তুমি অন্ন খেয়ে প্রমাণ দিয়ে যাও—

তখনও যেন সতীর নীল চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। সতীর সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছিল যেন তখনও।

তাড়াতাড়ি যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দীপঙ্কর নিজের বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। অন্যদিন এ-সময়ে অন্ধকার থাকে। চন্নুনী সকাল-সকাল তার নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বিন্তীদিও নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে খিল দিয়ে দেয়। তখন আর কোনও কাজ থাকে না মা'র। তখন মা-ও ছিটে-ফোঁটার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে শুয়ে পড়তো। কিন্তু এখনকার চেহারা আলাদা। এখন অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে ঘরে-ঘরে। লক্ষ্মী-লেটনের হাসি-ঠাট্টার আওয়াজ শোনা যায়। এখন বাইরে হল্লা চলে বটে, ছিটে-ফোঁটার শাগরেদরা এসে অনেক রাত পর্যন্ত আসর জমায়— কিন্তু মা নিজের রান্নাটা সেরে বিন্তীকে বাইরেই ঘরে খিল দিয়ে দেয়। আধখানা বাড়ি তখন অন্ধকার।

মা দেখতে পেয়েই বললে—খেয়ে এলি?

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে যেন কেমন ভাবনাও হলো আবার। বললে—কী রে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে পেট ভরেনি যেন তোর?

—না মা ভরেছে।

তারপর হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—কাল ভোরবেলা কিন্তু যাওয়া আমাদের, মনে আছে তো? যা নেবার গুছিয়ে নিয়েছ তো?

নেবার আর কীই বা আছে দীপঙ্করদের। যা কিছু সম্পত্তি সব তো অঘোর-

দাদুর। যে-তক্তপোশটায় শোয় দীপঙ্কর, তা-ও অঘোরদাদুর। যে থালাটায় খায়, তা-ও অঘোরদাদুর। এই যা কিছু সবই অঘোরদাদুর দেওয়া। যখন মা'র কোলে চড়ে এখানে এসেছিল, সেদিন যা সঙ্গে ছিল আজও তাই সঙ্গে যাবে। শুধু পাথরপটি থেকে একটা কাঠের বাক্স মা কিনেছিল। তাও অনেকদিন হয়ে গেছে। সে-বাক্সটার কব্জা ভেঙে গেছে, রঙ চটে গেছে। সেইটেই একমাত্র সঙ্গে যাবে। আর যাবে জামা-কাপড়, মা'র দু'একখানা সাদা থান। এই।

দীপঙ্কর আবার বললে—কাল ভোরবেলাই আমি গাড়ি নিয়ে আসবো, দেরি করো না যেন, আমাকে আবার ঠিক সময়ে আপিসে যেতে হবে—

মা বললে—যাওয়া আমার হবে না কাল—

—কেন?

—এই যে, এই শত্তুরকে ফেলে কেমন করে যাই বল্? একে কোথায় রাখি?

বিন্তীদি মা'র কোল ঘেঁষে এতক্ষণ বসে ছিল। বাড়িতে যে এত হৈ-চৈ উৎসবের আয়োজন হচ্ছে, এ-মেয়ে যেন সে-সবের মধ্যে নেই। এ যেন একেবারে দলছাড়া।

দীপঙ্কর বললে—তা বিন্তীদিকেও নিয়ে চলো না আমাদের সঙ্গে—বিন্তীদিও যাক্—

—দূর, তা কী করে হয়। এদের মেয়ে, এর মায়ের পেটের ভাইরা থাকতে আমি নিয়ে যাবো, লোকে বলবে কী! আর ভাইরাই বা ছাড়বে কেন? আমরা তো পর!

তা-ও বটে। তা রাতটা কাটলো সেই রকম করেই। কিন্তু ভোর বেলাই একেবারে অন্যরকম। মা রাত থাকতেই উঠেছে। উঠে চন্নুনীর ঘরে গিয়েছে। ভেতরে ঢুকে বললে—আমরা আজ চল্লুম বাছা—তুমি যেন কিছু ভেবো না আবার—

চন্নুনী কথা বলতে পারলে না। হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলে। বললে—কেঁদে কী করবে বাছা, চিরকাল কি কেউ থাকে সংসারে? একদিন-না-একদিন তো যেতেই হবে সকলকে—

পেছন থেকে দীপঙ্কর এসে ডাকলে। বললে—মা চলো—ট্যাক্সি এসেছে—

মা বললে—ওরে, বুড়ী কাঁদতে লেগেছে, তুই একবার আয় বাবা, কাছে আয়, তোকে ছোটবেলায় কত কোলে-পিঠে করে বেড়িয়েছে, আহা তোকে দেখলেও একটু শান্তি পাবে বেচারী মরবার সময়—

দীপঙ্কর ঘরে ঢুকলো। মা নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে—এই আমার দীপু এসেছে বাছা। দীপুকে দেখ—

দীপঙ্কর ঝুঁকে দাঁড়াল। চন্নুনী দীপুর মাথায় হাত ছোঁয়ালো। হয়ত আশীর্বাদ করলে বুড়ী।

মা বললে—আশীর্বাদ করো বাছা, দীপু যেন আমার বড়মানুষ হয়—

সত্যিই, সেই মানুষই কেমন করে আবার বয়েস হলে এমন অথর্ব হয়ে পড়ে এটাই আশ্চর্য! সবাই একদিন এই রকম বুড়ো হবে। এই রকম অথর্ব হবে। এই রকম কথা বন্ধ হয়ে যাবে। অঘোরদাদুও শেষের কয়েক ঘণ্টা আর কথা বলতে পারে নি। জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। চন্নুনী মেয়েমানুষ, তাই হয়ত এত জোর। এখনও টিঁকে রয়েছে।

দীপঙ্কর বললে—চলো মা, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে—

—চল্ চল্ বাবা—

তারপর বললে—বিন্তীকে একবার ডাকবো না, যা অভিমানী মেয়ে, না বলে গেলে সে মেয়ে কি আমার রক্ষে রাখবে—

তা বটে। বিন্তীদি হয়ত তখনও দরজায় খিল দিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। মা সেই দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ ফোঁটা টের পেয়েছে। সাধারণত ছিটে-ফোঁটা সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। ওদিকে অনেক রাত করে শোয়। তারপর বেলা আটটা-নটায় ঘুম ভাঙে তাদের। এখন তো আর অঘোরদাদু নেই। আগে যখন অঘোরদাদু বেঁচে ছিল, তখন ভোরবেলা উঠেই বাজারের বস্তীতে চলে যেত। ছোটবেলাকার দেখা সেই ছিটে-ফোঁটাদের তখন কী ভয়ই করতো দীপঙ্কর। তারাই এখন বড় হয়েছে, এ-বাড়ির মালিক হয়েছে, অনেক টাকারও মালিক হয়েছে।

ফোঁটা দেখতে পেয়েই এসেছে। বললে—কোথায় যাচ্ছ তোমরা দিদি? বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছো?

যেন ধমকাতে ধমকাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

মা বললে—হ্যাঁ বাবা, এখন তোমরা নিজেদের সংসার নিজেরা করো, আমার দীপু এখন বড় হয়েছে—সে কেন তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবে. এখন ছেলে চাকরি করছে, ছেলের বিয়ে-থা দেব আমি, আমারও তো সাধ-আহ্লাদ হয়—

ফোঁটা যেন কী ভাবলে। তারপর চিৎকার করে ডাকলে—ছিটে, ছিটে—

ছিটেও ঘর থেকে বেরিয়ে এল চোখ মুছতে মুছতে। ফোঁটা বললে—এই দ্যাখ, দীপুটার কাণ্ড দ্যাখ্, এখন লায়েক হয়েছে কিনা, মাকে নিয়ে কাউকে না-বলে-কয়ে ভেগে যাচ্ছে। দ্যাখ্ তুই—

ছিটে সব জিনিসটা বুঝে নিয়ে বললে—তার মানে? তার মানেটা কী?

মা বললে—তোমার রাগ করো না বাবা, দীপু তো কোনও মন্দ কাজ করছে না, এখন তো স্বাধীন হয়েছে, এখন তো আমাদের চলে যাওয়াই ভালো—আর কার জন্যেই বা থাকা? অঘোরদাদুও তো চলে গেলেন—

ছিটে বললে—অঘোর ভট্টাচার্যি চলে গেল তা কী হলো? তার নাতিরা রয়েছে কী করতে?

ফোঁটা দীপঙ্করের দিকে এগিয়ে এল। বললে—কী মতলব তোর শুনি; বলি কী মতলব তোর?

দীপঙ্কর হাসতে লাগলো। বললে—আমি একটা বাড়ি ভাড়া করেছি, স্টেশন রোডে, বালিগঞ্জে পনেরো টাকা ভাড়ায়, পাঁচ টাকা বায়না দিয়ে এসেছি—অনেক দিন তো তোমাদের জ্বালালুম, এবার—

ফোঁটা বললে—ভালো চাও তো এখানে থাকো, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—

ছিটে বললে—বাড়ি ভাড়া করতে হয় তো এই বাড়ি ভাড়া নাও—এই পাশের বাড়িটা তো খালি পড়ে রয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু পাঁচ টাকা যে বায়না দিয়ে এসেছি সেখানে—

—কুছ পরোয়া নেই, পাঁচ টাকার জন্যে ফটিক ভট্চায্ গরীব লোক হয়ে যাবে না, আমি পাঁচ টাকা তোর দিয়ে দেব। তুই আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাক্, কিন্তু চলে যেতে পাবে না। তোমার ট্যাক্সিওয়ালাকে চলে যেতে বলো—

তারপর কী ভেবে নিজেই বাইরে চলে গেল। বোধ হয় ট্যাক্সি ফেরত পাঠিয়ে দিতে গেল।

দীপঙ্কর মার দিকে চাইলে। মা-ও চাইলে ছেলের দিকে।

ছিটে বললে—আর ভাবাভাবি নেই, এখানেই থেকে যাও—

মা বললে—কিন্তু বাবা, বিন্তীর জন্যেই আমার ভাবনা, মেয়েটার বিয়ে-থা হলো না, তোমরাও কেউ দেখলে না ওকে, ও আমাদের কাছে থাকবে—

ছিটে বললে—তা থাক, কিন্তু ওর বিয়ে আমরা দেব বলে রাখছি, আমাদের বোনের বিয়ে আমরা দেব—কাউকে দিতে হবে না—

তা শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। এত আয়োজন এত কল্পনা, এত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সব পণ্ডশ্রম। সতী, লক্ষ্মী, কাকাবাবু, কাকীমারা এতদিন যে-বাড়িতে কাটিয়েছে, সেই বাড়িতেই দীপঙ্করেরা থাকবে ঠিক হলো। ভাড়া দেবে মাসে দশ টাকা করে। ভালোই হলো, মার মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল। গঙ্গা থেকে অনেক দূর, মায়ের মন্দির থেকেও অনেক দূর। শেষ পর্যন্ত ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে! আবার এতদিন পরে সেই বাড়িতে ঢুকবে, আবার সতী যে-ঘরে ঘুমোত, থাকতো, সেই ঘরেই থাকতে পারবে। আরও একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে বৈ কি!

মা-ও ভাবছিল বিন্তীটারই আনন্দ হবে সবচেয়ে বেশি। সেই ক'দিন ধরে ভাল করে কথা বলছিল না। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। সে জানতো ভোরবেলায় দিদি চলে যাবে—সন্ধ্যে থেকেই দিদির কাছ-ছাড়া হয়নি।

মা বিন্তীর ঘরের কাছে যেতেই কেমন অবাক হয়ে গেল। বিন্তী কোথায়? দরজা হাট করে খোলা। এমন তো হয় না! নিজের-ঘর ছেড়ে সে তো বড় কোথাও একটা যায় না। গেল কোথায়?

—ওরে দীপু, বিন্তী কোথায় গেল? এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না তো সে? গেল কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—কলঘরে দেখেছ?

—হ্যাঁ, সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম তো!

ছিটে-ফোঁটাও অবাক হয়ে গেল। এমন তো হয় না। কোথায় গেল। সমস্ত বাড়িটা তছনছ করে খুঁজে দেখা হল। চন্নুনীর ঘর, উঠোনের কোণ, হাজী-কাশিমের বাগানের পাঁচিলটার ওপাশে। কোথাও নেই। হ্যাঁ গা, মেয়েটাকে কি ভূতে নিয়ে গেল! দীপুর মা'র মাথায় যেন আকাশের বাজ ভেঙে পড়লো। সে মেয়ে নিশ্চয় কোনও সর্বনাশ বাধিয়েছে। দাওয়ার ওপরেই দীপুর মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

দীপঙ্কর বললে—মা, তুমি ওঠো, আমি খুঁজছি, দেখছি কোথায় আছে, যাবে কোথায়, আছে বোধহয় কোথাও এখানেই—

মা চুপ করে রইল। ছিটেও বললে—তুমি ভাবছো কেন দিদি—যাবে কোথায় সে—আমি দেখছি—

সকাল থেকে সেই যে শুরু হলো, সে যেন আর থামতে চায় না। সত্যি সত্যি ছিটেও বেরোল আশে পাশে খুঁজে দেখতে। ফোঁটাও একটু ভাবতে লাগলো। এতদিন ধরে এত জিনিস নিয়ে ভেবেছে তারা, এত জিনিস নিয়ে ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে, মুখ-খারাপ করেছে; নিজেদের অধিকার-বোধ নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারদিকে। তারা এতদিন ধরে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কিন্তু বোনটার কথা তো তারা ভাবেনি। একটা বোনও যে আছে তাদের, সে কথা তো তারা ভুলেই গিয়েছিল। কবে একদিন ছোট ফুটফুটে একটা মেয়ে তাদের সঙ্গেই এ-বাড়িতে বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে। কিন্তু তাদের মতন সে ঝগড়া করতে শেখেনি, প্রতিবাদ করতে শেখেনি। সংসারের প্রতিযোগিতার ভিড়ে অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে এদের মত ঠেলাঠেলি করে নিজের জায়গাটুকু দখল করবার কায়দাটুকুও শিখে নিতে জানেনি। তাই বুঝি তার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিল। এখন যেন তার কথা আবার নতুন করে মনে পড়লো সবার। শুধু মাই যেন ভুলতে পারেনি তাকে। সব সময় তাকে সামলে সামলে চলেছে। এ-সংসারে বিন্তীদিই বুঝি একমাত্র অচল মানুষ। সে কিছু কেড়ে নিতে জানে না, শুধু বোবার মত চুপ করে বড়-বড় চোখ তুলে চেয়ে থাকতে জানে আর কাঁদতে জানে।

আগের রাত্রে তার কান্নাটাও শুকিয়ে গিয়েছিল বুঝি। যখন বাড়ি-বদলাবার কথা আলোচনা করেছে দীপু আর দীপুর মা, যখন গুছিয়ে-গাছিয়ে পরদিন ভোরবেলা চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে, তখনও সে বেশি কিছু বলেনি। আগে বলতো। তারপর যত দিন গেছে, ততই যেন সে নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে। একেবারে মনের অতলে গিয়ে ডুব দিয়েছে। এক মা ছাড়া আর কেউ

যেন তার সন্ধানই পায়নি। তাই দীপুর মাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো দাওয়ার ওপর।

মা'র অনেক দিন থেকেই যন্ত্রণার চাপ চলেছে। একটার পর একটা যেন লেগেই আছে। একমাত্র ভরসা ছিল অঘোরদাদু। সেই অঘোরদাদু যেতে-না-যেতেই আবার এই।

ও-বাড়ি মানে পাশের বাড়ি। একদিন ও-বাড়িতে কত সন্তর্পণে ঢুকেছে দীপঙ্কর। কত বিগত স্মৃতির বেদনায় জড়ানো ও-বাড়ির প্রত্যেকটা ইঁট। সেই বাড়িতেই এবার থেকে থাকবে দীপঙ্কর। ভালোই হলো। এ-বাড়ির এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সঙ্গে দীপঙ্করের জীবন জড়িয়ে গেছে। এ ছেড়ে চলে না যাওয়াই ভালো। এ ছাড়তেও হয়ত পারা যাবে না আর। জীবনের সঙ্গে যা জড়িয়ে যায়, তাকে ছাড়তে পারা কি অত সহজ। এই বাড়িতেই একদিন লক্ষ্মীদি তাকে প্রাণপণে মেরেছিল, আবার এ-বাড়িতেই লক্ষ্মীদি তাকে ভালোও বেসেছিল, চকোলেট দিয়েছিল। এ-বাড়ি থেকেই কতদিন ভোরবেলা লক্ষ্মীদির চিঠি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দাতারবাবুকে দিয়ে এসেছে। আবার এই বাড়িতেই সতী তাকে তাচ্ছিল্য দিয়েছে, অবজ্ঞা দিয়েছে, হয়ত বা একটু কৃপা-কণাও দিয়েছে। আর এই পাড়া। এই পাড়ার এই বাড়ির সঙ্গে যে তার সারা জীবনের যোগাযোগ। এইখানেই কিরণের সঙ্গে চাঁদা তুলে দীপঙ্কর লাইব্রেরী করেছে, এইখানকার স্কুলেই প্রাণমথবাবু তাদের হাতে গড়ে মানুষ করেছেন। এই কালিঘাটের মাটিতেই বলতে গেলে গজিয়ে উঠেছে সে। এখানকে কি এত সহজে ছাড়া যায়।

ছিটেও ফিরে এল এদিক-ওদিক ঘুরে। বললে—নাঃ, বিন্তীটা পালিয়েছে নিশ্চয়—

দীপঙ্কর বললে—পালিয়েছে? পালাতে যাবে কেন?

ছিটে বললে—না পালালে যাবে কোথায়? কোনও জায়গা তো আর খুঁজতে বাকি রাখিনি—পাথুরেপটি, হালদার-পাড়া, পান্ডা-বাড়ি, ধর্মশালাগুলো সব চষে এলাম, কোথাও নেই—। কালিঘাটে থাকলে আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোনও শালা লুকিয়ে থাকতে পারবে না—সে নেই, হাওয়া হয়েছে—

ফোঁটাও ফিরে এল। বললে—দিদি, পাওয়া গেল না—ভেগেছে সে নির্ঘাৎ—

দীপঙ্কর বললে—পুলিসে খবর দিয়েছ? থানায় খবর দিলে না কেন?

ফোঁটা বললে—থানার কথা ফটিক ভট্‌চার্যিকে বলতে হবে না—থানা-পুলিস ও-শর্মাদের ঘর-বাড়ি—

সত্যিই শেষ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া গেল না বিন্তীদিকে। সকাল সাতটা আটটা ন'টা বাজলো। তখন আর দেরি করা যায় না। আপিস আছে।

মা বললে—জানিস দীপু, সেই জন্যেই মেয়েটা কাল অন্যদিনের মত মোটে কান্নাকাটি করলে না—

দীপঙ্কর বললে—তুমি অত ভাবছো কেন মা পুলিসে তো খবর দেওয়া হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবে—

মা বললে—এতদিন বুকের কাছে রেখে রেখে সে যে আমার পেটের মেয়ের মত হয়ে গিয়েছিল রে, আমি না ভাবলে আর কে ভাববে—তার আছে কে?

সত্যিই তো, তার আছে কে! কার জন্যে সে এ বাড়িতে থাকবে! অঘোর-দাদুর মৃত্যুর পর থেকেই মা কেমন হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিন্তীদির ব্যাপারে যেন আর ঠিক থাকতে পারলে না। কোথাকার কাদের মেয়ে, খুঁজলে তার সঙ্গে সম্পর্ক বার করা যাবে না, তবু কেন যে তার জন্যে দীপঙ্করেরও মনটা কেমন করতে লাগলো, কে জানে! মনে হলো এ তার কী হলো। পৃথিবীতে এত জিনিস আছে ভাববার, এত সমস্যা! বিরাট পৃথিবীর কত অসংখ্য মানুষ কত অসংখ্য সমস্যার ভারে একেবারে জর্জরিত হয়ে আছে, দীপঙ্কর একলা ভেবে তার কতটুকু প্রতিকার করতে পারবে।

আপিসে বেরোবার সময় দীপঙ্কর ফোঁটাকে দেখতে পেয়ে বললে—আমি আপিসে চললুম, তোমরা একটু খোঁজ নিও, জানো—

ফোঁটা বললে—তোর কিছু ভাবনা নেই দীপু, আমরা দু'ভাই খুঁজে বার করবোই—তুই নিশ্চিন্তে আপিসে যা—

দীপঙ্কর বললে—মাকে তো বলে বলেও মুখে একটু জল দেওয়াতে পারলুম না, মা সকাল থেকে কিছু খেলে না পর্যন্ত—এখন বিন্তীদিকে যদি না-পাওয়া যায় তো কী যে হবে বুঝতে পারছি না—

ফোঁটা বললে—সে কি, দিদি কিছু খায়নি? কেন? না খেলে কি সে ফিরবে? তা তুই কিছু ভাবিস নে, তুই আপিসে যা, আমি দিদিকে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলছি—

দীপঙ্কর তারপর আপিসে চলে এসেছিল। আপিসেও অনেক দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছিল। প্রমোশন হলেই হয় না। হাতে কলমে কাজ করতে হোক আর না-হোক, দায়িত্বটা বেড়েছে। যারা একদিন দীপঙ্করের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করেছে, তারাও আজ সসম্ভ্রমে সমীহ করে কথা বলে। যে জাপান-ট্র্যাফিক এতদিন এত জরুরী ব্যাপার ছিল তা নিয়ে আর কেউ-ই মাথা ঘামায় না। রবিন্‌সন্‌ সাহেব এখন অন্য জিনিসে মাথা ঘামাচ্ছে। কখনও খেয়াল হলো তো একবার ফাইলটা এনে দেখে। দিল্লী থেকে জরুরী চিঠি না এলে আর তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না।

দীপঙ্করের নতুন চাপরাশি লোকটা ভালো। দীপঙ্কর আপিসে যাবার আগেই ঘরের চেয়ার টেবিল পরিষ্কার করে রাখে। মেদিনীপুরে দেশ মধুর।

দীপঙ্কর ডাকে—মধু—

মধু তড়াক করে ভেতরে ঢুকে বলে—আমাকে ডাকছিলেন হুজুর—

—রবিন্‌সন্‌ সাহেব আমাকে ডাকেনি?

—না হুজুর!

সবে ধন ওই এক কর্তা! কবে কখন এসে পড়ে সাহেব তার বাঁধা ধরা নিয়ম-কানুন নেই। খেয়াল হলো তো ভোরবেলাই কুকুর নিয়ে এসে হাজির। আবার এক-একদিন দশটা বেজে গেলেও সাহেবের দেখা নেই। দোতলা থেকে এজেন্টের খাস-চাপরাশি বার-বার এসে রবিন্‌সন্ সাহেবের খোঁজ করে গেছে। দ্বিজপদ সকাল থেকেই দরজা আগলে বসে আছে। কিন্তু সাহেবের দেখা নেই। দ্বিজপদ জানে কেন সাহেবের দেরি হচ্ছে। কুকুরের অসুখ। কুকুরের একটা কিছু অসুখ হলেই সাহেবের সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে ফোন্ করে। মাঝে মাঝে বাজারে কুকুরের বিস্কুট না-পাওয়া গেলেই সাহেব ক্ষেপে যায়।

বলে—ডু ইউ নো সেন, বাজারে বিস্কিট পাওয়া যাচ্ছে না—

দীপঙ্কর তো অবাক হয়ে যায়। বলে—পাওয়া যাচ্ছে স্যার—প্লেণ্টি পাওয়া যাচ্ছে—

সাহেব বলে—অল্ রাইট্, তুমি এখনি বলো কোন্ দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, আমি চাপরাশি পাঠাচ্ছি—

শেষকালে দ্বিজপদ বলে—না হুজুর, আমি চারদিন ধরে কলকাতার সব দোকানে খুঁজেছি, সে-বিস্কুট নয়—কুকুরের খাওয়ার বিস্কুট—

শেষে যখন কোথাও পাওয়া যায় না, তখন ডাক পড়ে মিস্ মাইকেলের। শর্ট-হ্যান্ড্ নোট নিতে হবে। লেখো চিঠি লণ্ডনে। বিস্কিট-ম্যানুফ্যাক্চারার্স—লণ্ডন। ফেমাস কোম্পানি সমস্ত। সেইখানে চিঠি লিখতে হয় রেলওয়ের কাগজে, রেলওয়ের কালিতে আর রেলওয়ের খরচে। সাতদিন ধরে সারা পৃথিবীর বিস্কুট-কোম্পানিদের চিঠি লিখতে লিখতে মিস্ মাইকেলের হাত ব্যথা হয়ে যায়। হাত টন্ টন্ করে। তখন রেলওয়ের কাজের কথা আর মাথায় ঢোকে না সাহেবের। কেউ মোটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকলে সাহেব বিরক্ত হয়। বলে—নো নো নট্ টো-ডে, মাই ডগ্ ইজ সিক্ নাউ—

তা সিক্ হলে কী হবে, সেই কুকুরই আবার আপিসে আসে। এসে টেবিলের ওপরে উঠে বসে থাকে। আর সাহেব তার সঙ্গে কানে কানে কী সব বিড় বিড় করে কথা বলে। সে-কথা আর কেউ বুঝতে পারে না। দ্বিজপদ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে আর অবাক হয়ে যায়। হেসে ফেলে।

জার্নাল সেকশানের কে-জি-দাশবাবু দেখা হলে ঘাড় নিচু করে সসম্ভ্রমে হাত তুলে নমস্কার করে। কিন্তু সেকশানে গিয়ে বলে—কাজ করবো কী গাঙ্গুলীবাবু, কাজ করতে আর মন চায় না—

গাঙ্গুলীবাবু বলে—কেন বড়বাবু?

কে-জি-দাশবাবু বলে—আরে, সেদিনের ছোকরা, যাকে হাতে ধরে কাজ শেখালুম, তাকেই আবার গুড্-মর্নিং করতে হয়, মান-আপমান কিছু আর রইল না—

কথাটা গাঙ্গুলীবাবুই আবার দীপঙ্করের কানে তোলে। বলে—দেখুন সেনবাবু, আপনার প্রমোশন হয়েছে বলে বড়বাবুর হিংসেটা দেখুন—

দীপঙ্কর বলে—তা হোক গাঙ্গুলীবাবু, ওটা আমি হলে আমারও হতো, আমারও হিংসে হতো—

তারপর একটু থেমে দীপঙ্কর বলে—আমি জানি কে কী বলে আমার সম্বন্ধে।

গাঙ্গুলীবাবু বলে—সব কি আর আপনার কানে যায় সেনবাবু? সব কানে যায় না। আপনি যে এই সাদাসিধে কোটপ্যাণ্ট পরে আসেন তাতেও আপনার নিন্দে হয়—

—কেন, নিন্দে হয় কেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—বলে ও-ও আপনার একটা চাল! অহঙ্কারটা ঢাকবার ও-ও একটা ছল্ আর কি! লোকে বলে আপনি রবিন্‌সন্ সাহেবের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দেন টিন্-টিন্—তাইতেই আপনার প্রমোশন হয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনি তো জানেন গাঙ্গুলীবাবু, আমি কত গরীব। আপনাকে আমি সব তো বলেছি। আমার মা পরের বাড়িতে রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে। আমার অজান্তে আমার মা নৃপেনবাবুকে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে আমার চাকরি করিয়ে দিয়েছিল—তা-ও তো আপনাকে বলেছি। তা আমি কিসের অহঙ্কার করতে যাবো বলুন? আর অভাবের কথা যদি বলেন তো অভাব আমি যা দেখেছি তা আপনারাও দেখেন নি! আমি কিনতে যাবো সাহেবের বিস্কুট! আর রবিন্‌সন্ সাহেব তাই নেবে?

সত্যিই, দীপঙ্করের মনে হতো এই চাকরি, এই প্রমোশন, এই ফরসা জামা-কাপড়ও যেন তাকে আজ লজ্জা দেয়। এই চাপরাশির সেলাম—এ-ও যেন তার পাওনার অতিরিক্ত। গেটে ঢোকবার মুখে দরোয়ান আজকাল তাকে সেলাম করে। কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু, সবাই কেমন অন্যরকম চোখে চেয়ে দেখে। কোথায় যেন একটা সম্পর্কের বাধা-নিষেধ এসে দীপঙ্করকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মাইনে বেড়েছে তার নিঃসন্দেহে। এখন আর মাইনে নেবার জন্যে পে-ক্লার্কের সামনে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াতে হয় না। এখন পে-ক্লার্ক নিজেই এসে তার হাতে মাইনে দিয়ে সই করিয়ে নেয়। এ-ও যেন ভালো লাগে না। পদ-মর্যাদা হয়েছে বলে সে কি দূর হয়ে যাবে? সে কি পর হয়ে যাবে? এক-একদিন নিজেই সেকশানে যায়। যেতেই সবাই যেন চকিত হয়ে ওঠে। কেউ-কেউ মুড়ি খেতে খেতে মুড়ির ঠোঙাটা লুকিয়ে ফেলে। যারা আপিসের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ে, তারা হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে কাগজটা লুকিয়ে মুখটা নিচু করে বসে থাকে। তবু কিছু বলে না দীপঙ্কর। কেন বলবে? মানুষ তো মেশিন নয়। সকাল দশটা থেকে মুখ বুজে কাজ করলেই কি ভাল কাজ হয়? কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্প করা ভালো বৈ-কি। একদিন

দীপঙ্কর এদের মধ্যেই এইখানে বসেই কাজ করেছে। সুতরাং সেকশানে কাজ হয় কি না-হয় কিছুই জানতে বাকি নেই। তবু দীপঙ্করের বলতে যেন কেমন বাধে! কে-জি-দাশবাবু এসে কম্‌প্লেন করেন। বলেন—কেউ কাজ করে না সেকশানে, এরকম করলে আমি কী করে কাজ চালাবো বলুন—আপনি কিছু বলেন না ওদের—ওরা তাই সাহস পেয়ে গেছে—

দীপঙ্কর বলে—ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে কে-জি-দাশবাবু, গল্প করার মধ্যেই কাজ তুলে নিতে হবে—

কে-জি-দাশবাবুর সঙ্গে এইসব কথা নিয়ে আলোচনা করতেও যেন দীপঙ্করের কেমন লজ্জা হয়। এই চেয়ার, এই চেয়ারটারই এত মূল্য? এই চেয়ারটাকেই তো তারা সম্মান দেয়। তারপর আপিস থেকে বেরোলে অগণিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে দীপঙ্কর আবার তখন যেন নিজেকে খুঁজে পায়। আবার যেন বেঁচে ওঠে সে। আবার যেন অস্বস্তি কেটে যায়। কিন্তু এমন একদিন তো আসবে, যখন এই চেয়ার থেকে তাকে সরে যেতে হবে—একদিন বাইরের পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে এক সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তখন কোথায় থাকবে এই ভয়, এই মর্যাদা, এই সেলাম, আর এই চেয়ার! আপিসে ঢোকবার পর-মুহূর্ত থেকেই যেন সারাক্ষণ তাই আড়ষ্ট হয়ে কাটে। যেন সহজ-স্বাভাবিক হওয়া যায় না। যেন এখানে সে দীপু নয়, যেন এখানে সে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে নয়। এখানে যেন সে রাজা। নকল-রাজা। যাত্রা-থিয়েটারের মত জরি আর ভেলভেটের জামা পরা নকল রাজা। এই নকল সাজ ছেড়ে সকাল বেলাই আবার তাকে ছেঁড়া শার্ট ময়লা ধুতি পরে আত্মপ্রকাশের বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। যখন দিল্লির বোর্ড থেকে চিঠি আসে, যখন সেকশানের বড়বাবুরা সেন সাহেবের মতামতের জন্যে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা করে থাকে, তখন হাসি পায় দীপঙ্করের। মনে হয়, এত সহজেই এরা এত গুরুত্ব দেয় একে। এদের কাছে ধর্ম গেলেও যেন ক্ষতি নেই, মনুষ্যত্ব গেলেও যেন লোকসান নেই, চাকরিটা যেন বাঁচে, সেলাম যেন বাঁচে, চেয়ার যেন টিঁকে থাকে।

মিস মাইকেল এক্-একদিন ঢুকে পড়ে। ঢুকে দীপঙ্করকে দেখে অবাক হয়ে যায়।

বলে—এ কি সেন, কী ভাবছো? বাড়ি যাবে না?

মিস মাইকেলের সেই এক-রকম চেহারা। সেই কাঁধ-কাটা গাউন্, সেই বব্ করা চুল, সেই রং মাখা ঠোঁট! এক-একদিন এক-এক রকম ভ্যানিটি ব্যাগ। আজকাল আর বেশি দেখা হয় না আগেকার মতন। যেদিন প্রথম ঘরটা ছেড়ে চলে এসেছিল দীপঙ্কর, সেদিন ভারি দুঃখ করেছিল মেম-সাহেব। কিন্তু হাসি-মুখেই বলেছিল—কিন্তু আমি রিয়্যালি গ্ল্যাড্ সেন, আই উইশ্ ইউ মোর সাক্‌সেস্—

তারপর বলেছিল—আর তুমি দেখে নিও সেন, আমিও আর বেশিদিন ইণ্ডিয়ায় থাকবো না—

—কেন? কোথায় যাবে?

মিস মাইকেল বলেছিল—আমি ভিভিয়ানকে চিঠি লিখেছি—

—ভিভিয়ানকে? কেন?

—আমি ম্যারিকায় চলে যাবো। আই শ্যাল্ টেক্ এ চান্স্—

মিস্ মাইকেলের ধারণা, যত কষ্ট বুঝি শুধু তারই কপালে। মিস্ মাইকেল ছাড়া আর সবাই যেন সুখে আছে। বলে—কী আছে আমার জীবনে? প্রত্যেক মাসে আমাকে লোন্ করতে হয়—এভাবে আর কতদিন চালাবো বলো—

—কিন্তু আমি এত কম টাকায় কী করে চালাচ্ছি?

মিস্ মাইকেল বলে—তুমি যে ড্রিংক কর না। ড্রিংক না করলে বেঁচে থেকে লাভ কী! তুমি সিগ্রেট খাও না, ড্রিঙ্ক কর না, তোমার ভাবনা কী?

—কিন্তু তুমিও তো না করে থাকতে পারো। তাতে অনেক পয়সা বাঁচে। লোন্ করতে হয় না। হেলথ্ ভালো থাকে, কত সুবিধে!

মিস্ মাইকেল হাসে। বলে—লাইফের তুমি আর কতটুকু জানো সেন, লাইফের তুমি কিছুই তো দেখলে না! মানি ইজ্ এভরিথিং, টাকাই জীবনের সব। যদি আমার ভিভিয়ানের মত টাকা থাকতো!

আশ্চর্য! অঘোরদাদুও ঠিক এই কথাই বলতো! টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। সব কেনা যায় টাকা দিয়ে! কিন্তু সবই যদি টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব, তাহলে লক্ষ্মীদি কেন দাতারবাবুর মত লোককে গরীব জেনেও বিয়ে করলে। আর টাকাই যদি সব, তবে সতীই বা অত ঐশ্বর্যের মধ্যে কেন বিষের মত নীল হয়ে শুকিয়ে যায়! একদিন দীপঙ্কর চাকরির জন্যে কত ঘোরাঘুরি করেছে। সেদিন তেত্রিশ টাকার চাকরিটা পেয়ে মনে হয়েছিল হাতে বুঝি স্বর্গ পেলে সে। কিন্তু সেই তেত্রিশ টাকাই ধাপে ধাপে বেড়ে আজ এত উঁচুতে উঠেছে। কিন্তু সেদিনের চেয়ে সুখ কি বেশি বেড়েছে তার? শান্তি কি বেশি পেয়েছে সে! বিচার করলে বোধহয় প্রমাণ হয়ে যাবে, সেদিনই দীপঙ্কর বেশি সুখী ছিল! সেই এক পয়সার তেলে-ভাজা খেতে খেতে কিরণের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোই যেন বেশি আনন্দে কেটেছে তার। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন দিয়েই দীপঙ্কর এখন ফরসা ধোপ-দুরস্ত কাপড় জামা পরে আপিসে আসে, দশজনে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। হয়ত সমীহ করে, হয়ত-বা শ্রদ্ধাও করে। হয়ত ভয়ও করে। তার কাছ থেকে কৃপা পাবার জন্যে হয়ত উন্মুখ হয়ে থাকে। তবু ভয়ে সসম্ভ্রমে হয়ত কাছে আসতে পারে না। ছোট ছোট ছেলেরা সেই আগেকার মত চাঁদা তুলতে আসে। সরস্বতী পুজোর চাঁদা। দুর্গা পুজোর চাঁদা। দীপঙ্করের সামনে এসে ভয়ে ভয়ে চাঁদার খাতাটা এগিয়ে দেয়। ঠিক যেমন দীপঙ্কর একদিন দিত। তাদের দিকে চেয়ে দীপঙ্কর কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তবুও মনে পড়ে যায়,

নিজের ছেলেবেলাকার কথা। কিন্তু ওরা তো জানে না, বাইরেই শুধু বয়েস বেড়েছে দীপঙ্করের—মনে মনে তো সেই ছোটই আছে সে। এখনও কিরণের সঙ্গে দেখা হলে যেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তেলেভাজা কিনে খেতে পারে!

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—তোমরা সব কোন্ পাড়ায় থাকো খোকা?

তারা বলে—হালদার পাড়ায়—

—তা এতদূরে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চাঁদা চাইতে এসেছো যে?

তারা বলে—আপনার নাম শুনে এসেছি—

—আমার নাম শুনে? দীপঙ্কর অবাক হয়ে যায়! দীপঙ্কর কি এ-পাড়ায় নামজাদা লোক হয়ে গেছে নাকি?

তারা বলে—হ্যাঁ, আপনি যে রেলের মস্ত বড় অফিসার! আমরা জানি যে! আপনি অনেক টাকা মাইনে পান।

হয়ত তারা কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কথাটা বলেনি। হয়ত দীপঙ্করকে তারা সম্মান দিতেই চেয়েছিল কথাটা বলে। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো তাকে যেন ছেলেরা চড় মারলে! দীপঙ্কর বেশি টাকা মাইনে পায়, এইটেই যেন তার পরিচয়! আর কিছু নয়। আর কিছু পরিচয় নেই তার! আর কোনও গুণ নেই। তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়েই দীপঙ্কর সোজা আপিসে চলে গেল। হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে আত্মগোপন করতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু কোথায় যাবে! কোথায় গিয়ে বাঁচবে! কোথায় গিয়ে আত্মবিলোপ করবে! আপিসে যাবার আগেই, বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায় রোজ! আবার সেই ঘরটাতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসতে হবে। সেই ফাইল, সেই মধু দরজাটা খুলে দিয়ে সবিনয়ে সেলাম করবে। আবার সেই দিল্লির বোর্ডের চিঠি, সেই রবিন্‌সন্ সাহেবের কুকুরের প্রসঙ্গ, সেই মিস্টার ঘোষাল। সমস্ত দিনটা পুরোন ফাইলের চিঠির তলায় তলিয়ে যেতে হবে। তারপর যখন মুখ তুলে চাইবে, যখন জ্ঞান ফিরবে, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দিনের পর দিন। সম্মান কেবল মাইনে দিয়ে বিচার হবে সেখানে, মানুষের মূল্য যাচাই হবে টাকা আনা পাই দিয়ে।

তবু কাজ করতে হয়। যেতেও হয় রোজ। এক-একদিন রবিন্‌সন্ সাহেব ডেকে পাঠায়। দ্বিজপদ এসে ডেকে নিয়ে যায়। ঘরে গিয়ে দেখে সাহেবের ঘরে হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে। মিস্টার ঘোষাল আছে। আরো কত লোক দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। সাহেবের কুকুর জিমিও আছে।

—লুক হিয়ার সেন,—

দীপঙ্কর ঘরে ঢুকতেই রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—লুক হিয়ার, এই দেখ, এই চিঠিখানা বোর্ড থেকে এসেছে সাত তারিখে, অন্ সেভেন্‌থ্ অব দিস্ মন্‌থ্—রেকর্ড সেকশানে এসে তিনদিন পড়ে ছিল—সী—

দীপঙ্কর দেখলে। সত্যিই তারিখ স্ট্যাম্প সব লাগানো হয়েছে তিনদিন

পরে। সেখান থেকে ট্রান্সফিক্ট্ সেকশানে এসেছে পনেরো দিন পরে। সেখানে দু'দিন আটকে ছিল। সেখান থেকে রবিন্‌সন্ সাহেবের কাছে আসতে লেগেছে আরো তিনদিন!

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—কী ভাবে তোমাদের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন চলছে—দেখ, দেখবার জন্যেই তোমাদের ডেকেছি—ঘোষাল, হ্যাভ্ ইউ সীন? তুমি দেখেছ?

মিস্টার ঘোষাল বললে—দেখেছি—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে সাহেব বললে—তুমি দেখেছ সেন?

দীপঙ্কর মাথা নাড়লে।

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—এখন বলো হোয়াট্ টু ডু? আমি কী করবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—স্যার, আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন কেস্‌টা, আমি ডীল করবো—

—কী করে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—আই শ্যাল পানিশ দি কালপ্রিটস্—

—নো—

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—তুমি সাউথ্ ইণ্ডিয়ান, তুমি গুড্‌নেচার্ড লোক, তোমার দ্বারা হবে না—আমি সকলকে শাস্তি দিতে চাই, এমন শাস্তি দিতে চাই যাতে কেউ ভুলে না যায় লাইফে—

সকলের সামনে ঘোষালকে সাউথ-ইণ্ডিয়ান বলাতে সকলে অবাক হয়ে চাইলে এ-ওর মুখের দিকে। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল গম্ভীর হয়ে রইল।

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—সেন, আমি তোমাকে দিচ্ছি, ইউ মাস্ট্ পানিশ দেম্—আই লিভ্ ইট্ টু ইউ—

এমনি করেই আপিসের কাজ চলে। একটা চিঠি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে চোদ্দ দিন লাগে। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে সারা আপিসে হৈ-চৈ পড়ে যায়। কে দোষী, কে গিল্টী তাই খুঁজতেই সব কাজ ফেলে রাখতে হয়। আসল কাজের কাজ কিছু হয় না। বোর্ড থেকে একটা চিঠি এলে তাই নিয়ে সবাই হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। কিন্তু সমাধান কেউ করে না। এমনি করেই চিরদিন আপিসের কাজ চলে আসছে, এমনি করেই হয়ত চিরদিন চলবে। দীপঙ্কর অনেক চেষ্টা করেও কাজের কোনও উন্নতি করতে পারেনি। দীপঙ্কর বুঝেছিল দোষ আসলে ক্লার্কদের নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে ওপর-তলায়। ওপর-তলার কর্তাদের সাত খুন মাপ। ওপর-তলার কর্তাদের জবাবদিহি করতে হয় না। তারা দরকার হলে ময়দানে খেলা দেখতে যায়, আপিসের চাপরাশি নিয়ে বাড়িতে বাটনা বাটায়, রান্না করায়। সেখানে কারোর কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। কিন্তু জানে সবাই। দেখে সবাই। দেখে জেনেও কিছু বলবার উপায় নেই, বলবার অধিকারও নেই। পুওর ক্লার্ক যে ওরা!

সবাইকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে এল দীপঙ্কর। রেকর্ড সেকশান, ডেসপ্যাচ্ সেকশান, ট্রাফিক আপিসের সবাইকে ডেকে নিজের ঘরে আনলে দীপঙ্কর। সবাই দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে আসামীর মত তার দিকে মুখ করে।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—এমন কাজ কেন করেন আপনারা যাতে অন্য লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়? নিজের কাজটুকুর মধ্যে কেন ফাঁকি দেন আপনারা? কেন ধরা পড়বেন? ভুল সকলেরই হয়, ভুল করাই মানুষের নিয়ম, কিন্তু ফাঁকি কেন দেবেন সেটা আমি বুঝতে পারি না।

কথাগুলো বলে দীপঙ্কর সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

তারপর আবার বলতে লাগলো—আপনারা সরকারী আপিসে কাজ করছেন, তাই চাকরির মূল্যটুকু বুঝতে পারছেন না—আজ মার্চেন্ট আপিসের ভেতরে গিয়ে দেখে আসুন তো, দেখবেন সেখানে নিখুঁতভাবে কাজ হয়ে চলেছে। ভুল সব জায়গাতেই আছে, সেখানেও আছে, কিন্তু সেখানেও মানুষে কাজ করে, মেশিন নয় তারা—কিন্তু এখানকার মত এত ফাঁকি সেখানে চলে না—কারণ সেখানে শাস্তির ভয় আছে, সেখানে ফাইন হয়—

কথাগুলো বলতে বলতে দীপঙ্করের যেন কেমন অকারণ ভয় হতে লাগলো। হয়ত এখনি প্রতিবাদ করবে। হয়ত প্রতিবাদে কেউ বলবে—ফাঁকি শুধু আমরাই দিই না স্যার, ফাঁকি অফিসাররাও দেন, কই তাদের তো এমন করে জবাবদিহি করতে হয় না?

হয়ত কেউ বলবে—স্যার, আমরা পাঁচ মিনিট দেরি করে এলে আমাদের নামে ক্রস্ পড়ে যায়, আর সেদিন যে ক্রফোর্ড সাহেব দেরি করে আপিসে এলেন? তার বেলায়? অফিসাররাও তো দেরি করে আসেন। তাঁদের নিজের গাড়ি থাকতেও কেন তাঁদের দেরি হয়? তাঁরা যে খেলার মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখেন নিশ্চিন্তে, আর এসে বলেন গার্ডেন রীচে ডিস্‌কাশান্ করতে গিয়েছিলেন ফাইল নিয়ে, তার বেলায়? তাঁরা যে স্টেশন-ওয়াগনে করে ডিউটির নাম করে চৌরঙ্গীতে গিয়ে চুল ছেঁটে আসেন—তার বেলায়? ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করে লগ্-বুকে কী লিখবো, তখন যে তাঁরা লিখিয়ে দেন,—অন টেস্ট্! তার বেলায়?

সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তবু দীপঙ্কর কথাগুলো বলতে বলতেই নিজের মধ্যে যেন ভয়ে শিঁটিয়ে উঠলো। কেন এরা এত নিরীহ কেন এরা এত সহ্য করে, কেন এরা এত বোবা! দীপঙ্কর প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। এখনি যদি কেউ সাহস করে বলে দেয়—স্যার আপনি যে এত কথা বলছেন আমাদের, আপনি নিজে নৃপেনবাবুকে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে রেলে ঢোকেন নি? রবিন্‌সন্ সাহেবের কুকুরের যখন কোথাও বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন আপনি খুঁজে খুঁজে নিজের পয়সায় বিস্কুট এনে দেননি? আপনিই কি আমাদের চেয়ে বেশি অনেস্ট?

হঠাৎ ভয়ে একটা আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে দীপঙ্কর নিজের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে। কেউ জানতে পারলে না দীপঙ্করের মনের ভেতরকার কথাগুলো। কেমন নিরীহ অপরাধীর মত সব দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে মুখ করে। এদের প্রত্যেকের সংসারে অভাব আছে, দুঃখ আছে। এদের বোনের বিয়ের পাত্র খুঁজতে খুঁজতে এরা হয়রান হয়ে যায়। এরা বৌ-এর অসুখের সময় পাড়ার শেতলাতলার চরণামৃত খাইয়ে ডাক্তার-ওষুধের খরচ বাঁচায়। একটা কাপড় আর একটা শার্ট পরে সারা সপ্তাহ চালিয়ে এরা সমাজে ভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে। দীপঙ্কর সেন তো এদেরই সমগোত্রীয়। এদেরই দলে তো দীপঙ্কর। আজ এরা আসামী আর দীপঙ্কর এদেরই বিচারক হয়ে গদি-আঁটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বসে মাতব্বরি করছে। আজ ঘটনাচক্রে এদের বিচারের ভার তো দীপঙ্করের হাতে পড়েছে, কিন্তু দীপঙ্করের বিচার কে করবে? কবে করবে?

—আপনারা আপিসে এসে কতক্ষণ খবরের কাগজ পড়েন আর কতক্ষণ আপিসের কাজ করেন তা আমি জানি, তারপর কতক্ষণ টিফিন-রুমে গিয়ে কাটান তা-ও জানি। অথচ পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যাবার বেলায় আপনারা এক সেকেন্ডও দেরি করেন না! কিন্তু এ ফাঁকি আপনারা কাকে দিচ্ছেন, ভেবে দেখেছেন কি? এখন যদি প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা করে ফাইন করি?

দীপঙ্করের মনে হলো তার নিজের পিঠেই যেন সপাং করে কেউ চাবুক মারলো! এ কী বলছে সে? এ কাকে বলছে সমস্ত কথা? দীপঙ্কর কি নিজেকেও ভুলে গেছে এই গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে? দীপঙ্করও তো ওদেরই মতন একজন রাস্তার লোক। ফরসা জামা-কাপড় পরে এই চেয়ারে বসেছে বলেই কি তার সাত খুন মাপ হয়ে গেছে? কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য হয়ে গেল দীপঙ্কর লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে। কারো দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি, কারো চশমার একটা ডান্ডি ভাঙা, কারো জামার নীচে ছেঁড়া গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। এদের কাছে চাকরি যে তাগা-তাবিজ। চাকরি যে এদের ক্লীভ্ বানিয়ে ছেড়েছে। এরা কি স্পষ্ট কথা বলতে পারে, এরা কি সত্য কথা বলতে পারে? এরা কি আর মানুষ আছে আজ? এরা যে ক্লার্ক! দীপঙ্করের একটু সাহস হলো তখন। এরা জানেও না যে, এরা ইচ্ছে করলেই দীপঙ্করকে এখান থেকে এক নিমেষে সরিয়ে দিতে পারে। শুধু দীপঙ্করকে নয়, এই রবিন্‌সন্ সাহেব, এই এজেন্ট, এই দিল্লির রেলওয়ে বোর্ডকেও এরা উৎখাত করতে পারে! অথচ এরা খবর রাখে না। খবর রাখবার সময়ই পায় না। সকাল থেকে এরা বাজার-হাট-সংসার-সন্তান-চাকরি-স্বাস্থ্য-উকীল-ডাক্তার নিয়েই ব্যস্ত। কখন খবর রাখবে! জানে না তাদের মতই ছেঁড়া শার্ট পরা একজন লোক উনিশ শো আঠারো সালে একদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের মুক্তি দিয়েছে—। সেও যুদ্ধের শেষের দিকে। সে বলেছিল—

"Comrades, labouring people, you are now the state's supreme power. The revolution has put meaning into life for us just as it will

for millions around the world, who now see no meaning in their eight-hour labour in someone else's factory, at monotonous toil at someone else's machines. We would free man from his enslavement by man."

দীপঙ্কর যেন বুক ফুলিয়ে চাইলে তাদের দিকে। এরা সে-খবর জানে না তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণে দীপঙ্করকে এরা পাল্টা প্রশ্ন করতো! প্রশ্ন করতো—কেন রবিনসন সাহেবের এত মাইনে আর কেনই বা তাদের মাইনে এত কম। প্রশ্ন করতো—কেন তাদের ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খেতে পায় না, অথচ রবিনসন সাহেবের কুকুরের কেন বিস্কুট খেয়ে খেয়ে জিভে অরুচি ধরে গেছে। প্রশ্ন করতো—কেন সেন সাহেবের চেয়ারে গদি আঁটা আর তাদের চেয়ারে কেনই বা ছারপোকার বাসা। প্রশ্ন করতো—কেন তাদের গাফিলতির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়, আর ক্রফোর্ড সাহেবের দেরি করে আসার ঘটনা কেনই বা চোখ বুজে সহ্য করা হয়!

দীপঙ্কর বাঁচলো যেন। ভালোই হয়েছে। ভালোই হয়েছে এরা সে প্রশ্ন করে না। এরা তো কিরণের মত সর্বস্ব জলাঞ্জলি দেবার দীক্ষা পায়নি। দীপঙ্কর নিজেকে আবার কঠোর করে তুললে। এরা জানে না, দীপঙ্করও একদিন ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লাইব্রেরীর জন্যে চাঁদা চেয়ে চেয়ে বেড়িয়েছে। জানে না তাই বেঁচে গেল আজ। আর জানলেই বা কী হতো। দীপঙ্কর তো একলা নয়। দীপঙ্করের পেছনে মিস্টার ঘোষাল আছে, এজেন্ট আছে, বোর্ড আছে, লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে। দীপঙ্করের পেছনে সমস্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই তো আছে।

—এখন যদি আপনাদের সকলকে পাঁচ টাকা করে ফাইন করি, কী করবেন আপনারা?

আশ্চর্য, লোকগুলো গরু-ভেড়ার মত চোখ পিট্ পিট্ করে চাইতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে। যেন হাত-জোড় করে তারা তার কাছে ক্ষমা চাইছে! আশ্চর্য, বিদ্রোহ না করে, তারা ক্ষমা চাইছে! এরা আবার মানুষ!

দীপঙ্কর আর সহ্য করতে পারলে না। তার নিজের কড়া কথাগুলো নিজের কানেই যেন ভণ্ডামির মত শোনালো। এত নীচ, এত হীন, এত জঘন্য কাজ করবার ভার দিয়েছে তাকে রবিনসন সাহেব! এ সে কাদের শাস্তি দিচ্ছে, কাদের পানিশমেন্ট দিচ্ছে। দীপঙ্করকে শাস্তি দেবার কি কেউ নেই! এত বড়-বড় অন্যায়ের পরও তো সে ফরসা-জামা-কাপড় পরে আপিসে এসে বসছে। তাকে সবাই সম্মান করছে, খাতির করছে! তাকে তো কেউ জেলে দিচ্ছে না! এত বড় ভণ্ড হয়েও তো সে সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে! দীপঙ্করকে তো কেউ সন্দেহ করছে না। সে তো সকলের চোখে সাধু, সৎ, সভ্য মানুষ!

—যান, এমন করে আর ফাঁকি দেবেন না! যান—

সবাই চলে গেল আস্তে আস্তে! কৃতজ্ঞতায় তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যাবার সময়। তারা বাইরে এসে নিশ্চিন্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।

একজন বললে—সত্যি, সেন সাহেব কী চমৎকার লোক—দেবতার মতন—

খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পারলে দীপঙ্কর। অস্বস্তিতে উসখুস করতে লাগলো মনটা। এত বড় মিথ্যে যেন সংসারে নেই আর। এত বড় ঠক্ যেন পৃথিবীতে আর নেই। ঘৃণায় লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফাইলের কাগজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে নিজেকে। ওরা তো জানে না, দীপঙ্কর সারা জীবন ভণ্ডামি করেছে! কিরণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লক্ষ্মীদির কাছে ভালোমানুষির অভিনয় করেছে, সতীর সঙ্গেও ছলনা করেছে। আসলে দীপঙ্কর বুঝি ভদ্রলোক হতেই চেয়েছে কেবল, অথচ তারা কেউই তার ভেতরটা তো দেখতে পায়নি! দেখতে না পেয়ে ভালোই হয়েছে। তার চাকরিতে প্রমোশন হয়েছে। সবাই তার প্রশংসা করেছে। সকলের চোখে সে নিজেকে মহৎ প্রমাণ করেছে। অথচ তারা তো জানে না আসলে সে-ও তাদেরই মতন। লক্ষ্মীদির সঙ্গ তার ভাল লাগে, সতীর সান্নিধ্য সে কামনা করে। কিরণের মা'কে যে সে পাঁচ টাকা করে মাসে মাসে দেয়, সে তো তার মহানুভবতা নয়, সে তো তার অহঙ্কার; আর সত্যি কথা বলা? সেও তো আর এক ছল। মিথ্যে কথা বলবার ক্ষমতা তার আছে নাকি? মিথ্যে কথা বলতে পারা, ছিটে-ফোঁটার মত সংসার-সমাজকে অস্বীকার করা—ও-সব কি অত সহজ?

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ ঘরে এল। মুখে চুরোট। জুতোর আওয়াজেই বুঝেছিল দীপঙ্কর যে ঘোষাল সাহেব আসছে। ঘরের ভেতরে এসেই একটা পা চেয়ারে তুলে দিয়ে কায়দা করে বেঁকে দাঁড়াল। বললে—কী করলে সেন? হাউ ডিড্ ইউ ডীল উইথ্ দেম্?

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়লো। পাঁচটা বেজে গেছে! ইস্, সারাদিনটা এই সব বাজে কাজে কাটলো। আপিসের আসল কাজ কিছুই হয়নি। একগাদা ফাইল জমে গেছে। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। তারপর? তারপর সতীর ওখানে যাবার কথা আছে! সতী কেন যে আবার তাকে যেতে বললে কে জানে! কী অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই যে ফেলেছিল কাল সতী! পান দিলে, গাড়ি দিলে! এত খাতির কেন তাকে কে জানে!

মিস্টার ঘোষাল বললে—ফাইন করে দিয়েছ তো সবাইকে?

দীপঙ্কর বললে—না—

—হোয়াই? তুমি ফাইন করোনি?

ঘোষাল সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়লো! তোমাকে দিয়ে দেখছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ কিছুই চলবে না। মিঃ ঘোষাল চুরোটটা মুখ থেকে বার করে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো!

বললে—হোয়াট্ ডু ইউ মীন?

দীপঙ্কর বললে—বড় গরীব লোক ওরা মিস্টার ঘোষাল, আমি ওদের জানি, আমি ওদেরই মতন একজন ছিলাম, আমিও ওদের মতন একদিন গরীব ছিলাম। আমার মা পরের বাড়িতে এই সেদিন পর্যন্তও রান্না করে আমাকে মানুষ করেছে —আই নো দেম্ পারফেক্টলি ওয়েল্, দে আর হেলপ্‌লেস্ ক্রিচার্স—

—কিন্তু এখন তো তুমি আর পুয়োর নও, এখন তো তুমি ওদের বস্—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু ওদের দেখে আমার নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল।

—তার মানে?

—তার মানে, আমিও তো অন্যায় করি, আমিও তো ফাইল ক্লিয়ার করতে ডিলে করি, আমিও তো মাঝে-মাঝে দেরি করে আপিসে আসি, আমিও তো তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছি—

ঘোষাল সাহেব যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপঙ্করের কথা শুনে। খানিকক্ষণ যেন চুরোট টানতেই ভুলে গেল।

বললে—কিন্তু ইউ আর অ্যান্ অফিসার, তুমি এখন ওদের বস্, তুমি এখন ওদের লর্ড—

—কিন্তু আমি নিজেও তো কালপ্রিট্ মিস্টার ঘোষাল!

—সে কি?

দীপঙ্কর বললে—ওদের মতন আমিও কত ভুল করেছি, কত মিস্‌বিহেভ করেছি, আমার ভুলের জন্যেও তো রেলওয়ের কত হাজার-হাজার টাকার লোকসান হয়েছে—

—বাট কিং ক্যান ডু নো রং!

দীপঙ্কর হাসলো। বললে—এখনকার দিনে এ-কথার কোনও মূল্য নেই মিস্টার ঘোষাল। দু'দিন পরে পৃথিবীতে কিং বলেই হয়ত কোনও জিনিস থাকবে না—

—কিন্তু কিং না থাকুক, তার বদলে ডিক্‌টেটর আসবে, যেমন জার্মানিতে, রাশিয়ায়, ইটালীতে......

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সে তো ট্রেড্-ডিপ্রেশনের জন্যে! ওয়ারের পর বলেই এই হচ্ছে, এ ওয়ারের এফেক্ট, কিন্তু একদিন সাধারণ মানুষ তো মাথা তুলে দাঁড়াবে, আমাদের কাছে আমাদের অত্যাচারের তো কৈফিয়ৎ চাইবে একদিন—সেদিন যে......

হঠাৎ ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

—হুজ্ দ্যাট্?

অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢোকা অপরাধ। দরজাটা খুলতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেছে। সতী! সতী এখানে! সতী আপিসে এসে হাজির হয়েছে! ঘোষাল সাহেবও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেছে। এ বেঙ্গলী লেডী!

দীপঙ্কর অবাক হয়ে বললে—তুমি?

সতী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। আজকে একটা অন্য শাড়ি পরেছে। নীল নয়, বটল্ গ্রীনও নয়। কেমন যেন কমলা-লেবুর মত রং। কেমন না মজু কে-জানে। সতীকে দেখে মিস্টার ঘোষালও যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মিস্টার ঘোষাল সহজে আড়ষ্ট হবার লোক নয়। কিন্তু সতীর চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে! মানুষকে যেন আকর্ষণ করে। আবার দূরেও ঠেলে। সতী সোজা এসে বললে—তোমার কাজের ক্ষতি করলাম বোধহয় দীপু—

সতী ততক্ষণে নিজেই একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। যেন বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। সতীকে দেখে দীপঙ্কর আরো বিব্রত হয়ে পড়লো। তা বলে একেবারে আপিসে এসে হাজির হলো শেষকালে! বিশেষ করে মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ঠিক যেন ভাল মনে হলো না। তাছাড়া, অনেক কাজও পড়ে আছে হাতে। সারাদিন কোনও কাজই হয়নি।

—হঠাৎ আমার আপিসে এলে যে?

—কেন, আসতে নেই?

—না, তা নয়। কিন্তু চিনতে কষ্ট হয়নি তো?

সতী বললে—না, কষ্ট হবে কেন? ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিয়েছিলুম, সে-ই নিয়ে এল সোজা। ভাবলাম আমাদের বাড়ি যাবার কথাটা হয়ত তোমার মনে থাকবে না, তাই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এলুম!

—আবার আজকে? কালই তো গিয়েছিলাম, আজকে আর না-ই বা গেলাম!

হঠাৎ দীপঙ্করের মনে পড়লো মিস্টার ঘোষালের কথা। এতক্ষণে তার উপস্থিতি যেন ভুলেই গিয়েছিল দীপঙ্কর সতীকে দেখে। মিস্টার ঘোষালের দিকে ফিরে বললে—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই মিস্টার ঘোষাল, ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী সতী ঘোষ, আমার বাল্যবন্ধু—আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার ঘোষাল আমার ওপরওয়ালা—

সাধারণত মিস্টার ঘোষাল এত সব ফর্মালিটির বালাই মানতে চায় না। বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে আলাপের ব্যাপারে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে হাতটা সতীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—অত্যন্ত খুশি হলাম মিসেস ঘোষ, আমি সামান্য একজন রেলওয়ের সেবক মাত্র,—মিস্টার সেনের ওপরওয়ালা হওয়াটা আমার একমাত্র গৌরব বলতে পারেন—

সতীও নিয়ম-মাফিক নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল মিস্টার ঘোষালের দিকে। দীপঙ্কর লক্ষ্য করলে মিস্টার ঘোষাল যেন সতীর হাতটা একটু বেশি জোরেই ঝাঁকুনি দিলে। তারপর বললে—বসুন, বসুন, আপনি—

সতী বসেছিল বটে কিন্তু কথাগুলো বলেছিল দীপঙ্করের দিকে চেয়ে।

বলেছিল—তুমিই তো আমাকে আপিসে আসতে বারণ করেছিলে, বলেছিলে এখানে চাকরি করলে ভদ্রতা রক্ষে হয় না, মানুষ এখানে অমানুষ হয়ে যায়—

মিস্টার ঘোষাল বললে—সেন যদি ও-কথা বলে থাকে তো কোনও অন্যায় বলেনি মিসেস ঘোষ, এতক্ষণ আমাদের এই কথাই হচ্ছিল। আপনি তো আর আমাদের ক্লার্কদের দেখেন নি, আসলে তারা মানুষ নয়—

—মানুষ নয়? মানুষ নয় তো কী ?

—তারা সব বীস্ট্, এক-কথায় বীস্টই বলতে পারেন তাদের! তাদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি। তাদের জামা-কাপড়, তাদের দাড়ি, তাদের চাল-চলন কিছুই মানুষের মত নয় এত নোংরা ডার্টি থাকে সে আপনি না-দেখলে বুঝতে পারবেন না।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। কাদের গালাগালি দিচ্ছে মিস্টার ঘোষাল! মনে আছে সতী ঘরে আসার পর থেকেই সেদিন গড় গড় করে কথা বলে যাচ্ছিল ঘোষাল সাহেব। যেন অনেক দিনের পরিচয় দুজনের। অনেক দিনের আলাপ। বিলেতের গল্প, নিজের ঐশ্বর্যের গল্প। ঘোষাল সাহেব যে এত কথা বলতে পারে, সতী না থাকলে তা জানতেই পারতো না দীপঙ্কর।

হঠাৎ দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলো। বললে—হুজুর, সাব সেলাম দিয়া—

—কাকে? আমাকে?

মিস্টার ঘোষাল উঠলো। বললে—যাবেন না মিসেস ঘোষ, আমি আসছি—

মিস্টার ঘোষাল চলে যেতেই সতী বললে—তুমি কী রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে দীপু, এ যে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়, একেবারে ছাড়তে চায় না। এমন জোরে হ্যান্ডসেক করেছে যে, হাতটা এখনও টন্ টন্ করছে—

দীপঙ্কর সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে—হঠাৎ তুমি কী করতে এলে আবার আজই?

সতী বললে—ওই যে বললাম, তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে—

—কিন্তু তোমাদের ব্যাপারের মধ্যে আমি নাই-ই বা গেলাম—মিছিমিছি তোমার শাশুড়ী কী ভাবলেন আমার সম্বন্ধে, কে জানে!

সতী বললে—কী আবার ভাবলে? বাড়ি তো তার একার নয়—

—আর তোমার স্বামী সনাতনবাবুই বা কী ভাবলেন বলো তো! আমি চলে আসার পর তিনি কী বললেন?

সতী বললে—তিনিই তো আজকে নিয়ে যেতে বললেন তোমাকে। বললেন, আজকে পরিচয় হলো না, কালকে ওঁকে আবার নিয়ে এসো—চলো চলো—

—কিন্তু এত সকাল-সকাল?

—তাতে কী হয়েছে! এখন গিয়ে গল্প করবে, চা খাবে তারপর রাত্রে

একেবারে খেয়ে-দেয়ে চলে আসবে—

—কিন্তু………

দীপঙ্কর কেমন যেন দ্বিধা করতে লাগলো। বললে—জানো সতী, আজকে বাড়িতেও একটা কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড?

—সেই বিন্তীদিকে ভোরবেলা থেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মা'র এত ভাবনা হয়েছে যে, কী বলবো। এদিকে নতুন বাড়ি ভাড়া করে পাঁচ টাকা বায়না দিয়েছিলুম, সেখানেও যাওয়া হলো না! সেই তোমরা যে-বাড়িটাতে ভাড়া ছিলে, সেই বাড়িতেই মাকে নিয়ে উঠেছি। আজ সকালে বাড়িটাতে ঢুকে সমস্তক্ষণ কেবল তোমাদের সেই পুরোন কথাগুলো মনে পড়ছিল—

—কিন্তু বিন্তী গেল কোথায়? পেয়েছ তাকে শেষ পর্যন্ত?

দীপঙ্কর বললে—না, আপিসে আসার সময় পর্যন্ত কোনও খবর জানি না—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে—

—কোথায় যেতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—নিজের ঘর ছাড়া সে কোথাও যেত না, সেইজন্যেই মা সকাল থেকে খায়নি আজ—

সতী বললে—তাহলে আর দেরি কোর না, চলো চলো শিগ্গির চলো, আমি তোমাকে সকাল-সকাল ছেড়ে দেব, শেষকালে তোমাদের ঘোষাল যা লোক, হয়ত এখুনি এসে পড়বে আবার—

দীপঙ্করেরও ভয় হলো। সত্যিই যদি এখুনি এসে পড়ে তো আর ছাড়তে চাইবে না হয়ত। শেষকালে তাকে এড়াবার জন্যে মুশকিলে পড়তে হবে তাদের। অথচ অসংখ্য কাজ পড়ে রয়েছে টেবিলে। অনেক ফাইল দেখা হয়নি সকাল থেকে। বাড়িতেও বিন্তীদি ফিরে এসেছে কিনা কে জানে। সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। আবার এখন সতীদের বাড়ি যেতে হবে! নিজের সংসার, নিজের স্বামী নিয়ে সতী সুখে থাকুক, তাতে দীপঙ্করও সুখী হবে। কিন্তু তার জীবনের সঙ্গে দীপঙ্করকে কেন মিছিমিছি জড়ানো!

সতী বললে—কী ভাবছো এতো? চলো—

—কিন্তু এখনও যে বিকেল!

—তা না হয় একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে তারপর বাড়ি যাবো, এখন আপিস থেকে বেরোও তো!

দীপঙ্কর উঠলো। তারপর বললে—আমি কিন্তু কালকের মত দেরি করতে পারবো না, আমাকে একটু সকাল-সকাল ছেড়ে দিও, কেমন?

সতী বললে—তাই ছাড়বো, এখন চলো—

সেদিনও জানতো না দীপঙ্কর সতী তাকে এ কোথায় নিয়ে চলেছে।

মানুষের জীবনে যখন অভিশাপ আসে তখন সে প্রথমে এমনি আশীর্বাদের ছদ্মবেশেই আসে। তখন তার বাইরের চেহারা দেখে তার আসল রূপটা দেখা যায় না। তাকেই সত্য বলে মনে করি, আনন্দ বলে ভুল করি, বন্ধু বলে অভ্যর্থনা করি। অথচ বেশ তো ছিল দীপঙ্কর। সকলকে ছেড়ে নিজেকে নিয়েই তো সে বেশ ছিল। নিজে আর তার মা। ছোটবেলা থেকে যা সে হতে চেয়েছিল তা সে হতে পারেনি, কিন্তু যা সে হয়েছিল তাই-বা কি কম! সেই কমটুকু নিয়েই জীবনে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। নিজের জীবনের অসাফল্যকে অনাবশ্যক অভাববোধ দিয়ে পীড়িত করতেও চায়নি দীপঙ্কর। লক্ষ্মীদি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেও প্রত্যাখ্যানের পর দীপঙ্কর নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিল—এমন সময় কেন সতী এল!

পরে একদিন শম্ভু বলেছিল—আপনি তো জানেন না নতুনবাবু, বৌদিমণির জন্যে আমার বড্ড কষ্ট হয়—

দীপঙ্কর একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল—কেন শম্ভু, তোমার বাবুদের এত টাকা, তবে কষ্ট কেন?

—ওই যে মামণি; মামণি কি সোজা মানুষ ভেবেছেন?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তোমার দাদাবাবু? দাদাবাবু তো লোক ভাল—

শম্ভু বলেছিল—আজ্ঞে দাদাবাবু তো দেবতুল্য লোক, তার তুলনা হয় না—

—তাহলে তোমার বৌদিমণির কষ্ট কিসের?

শম্ভু এ-কথার উত্তর দিয়েছিল, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। সেদিন আপিস থেকে গাড়িতে যেতে যেতেও দীপঙ্কর সেই কথাই আরম্ভ করেছিল। সতীর গাড়ি। এই গাড়িটা চড়েই সেদিন সতী তাকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল।

সতী বললে—তোমার আপিসের কাজের ক্ষতি করলাম নাকি?

দীপঙ্কর বললে—না, ক্ষতি আর কি, আমিই আজকে সকলকে কাজ করে না বলে ধমকেছি, আর আমিই আজকে কাজ ফাঁকি দিয়ে তোমার সঙ্গে চলেছি—

—তা একটু না হয় আমার জন্যে কাজে ফাঁকিই দিলে—

দীপঙ্কর বললে—সে জন্যে নয়, কিন্তু কালই তো গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে! কাল না-হয় আমার জন্মদিন ছিল, কিন্তু আজকে আবার কিসের উপলক্ষ্য?

সতী বললে—তুমি আবার জিজ্ঞেস করছো, কেন? আমার অপমানটা তো তুমি নিজের কানেই শুনলে?

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—আমি তোমাদের বাড়িতে নতুন মানুষ, সবটা বুঝতে পারিনি, আর তা ছাড়া, আমার কৌতূহলও নেই ও-ব্যাপারে—

—কৌতূহল না থাক, উপকার তো করতে পারো আমার।

—উপকার?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। বললে—আমাকে তুমি উপকার করতে বলো না সতী! ছোটবেলায় একজনের উপকার করেছিলাম, রোজ ভোরবেলা মন্দিরে-মন্দিরে ফুল দিয়ে আসতাম, সেই সময়ে একজনের খুব উপকার করতাম, অন্তত মনে করতাম তার উপকার করছি বুঝি; কিন্তু সেই উপকারের ফলটা দেখে পর্যন্ত উপকারের ওপর অরুচি ধরে গেছে—

—কার? কার উপকার করেছিলে?

—সে তুমি না-ই বা শুনলে। আর তাছাড়া, তোমার কাছ থেকে উপকারের অনুরোধ শুনলেও হাসি পায় যে—!

সতীও হাসলো। বললে—এখন আর সে-কথা বলতে পারবে না। এখন তুমি অনেক বড়। এখন তুমি অন্য মানুষ, এখন তুমি আর সে-তুমি নেই—

দীপঙ্কর গম্ভীর হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—কেন?

—এখন তুমি কত বড় চাকরি করো। এখন তুমি কত মাইনে পাও।

দীপঙ্কর আর থাকতে পারলে না। বললে—শেষকালে তুমিও আমাকে অপমান করবে সতী! মাইনে দিয়েই তুমি আমাকে বিচার করবে? তোমার কাছে অন্তত এটা আশা করিনি! তাহলে আমার চেয়ে মিস্টার ঘোষাল বেশি মাইনে পায় বলে তুমি দেখছি কোনদিন তাকেও আমার চেয়ে বেশি খাতির করবে!

সতী বললে—সত্যিই, তোমাদের মিস্টার ঘোষাল কি জঘন্য লোক—

দীপঙ্কর বললে—সব মানুষ তো সমান হয় না—আমার দুর্ভাগ্য যে ওই সব লোকের সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়! অথচ দেখ সতী, একদিন এই চাকরির জন্যে কত মাথা খুঁড়েছে আমার মা, কত ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করেছে—এখন দেখছি এরা চাকরি দিয়ে টাকা দিয়ে আমার মনুষ্যত্বটুকুও কিনে নিয়েছে—

সতী ঠিক বুঝতে পারলে না কথাগুলো। বললে—কেন, ও-কথা বলছো কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে ঠিক তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। আজকেই অনেকগুলো লোককে খুব বকেছি, খুব ধমক দিয়েছি, কিন্তু বকতে বকতে কেমন মনে হচ্ছিল, আমি যেন নিজেকেই শাস্তি দিচ্ছি আমার বকুনিগুলো যেন আমার মুখেই ফিরে আসছে! আমি যেন তখন থেকে নিজেই অপরাধী হয়ে আছি তাদের শাস্তি দিয়ে!

—কেন, এ-রকম কেন মনে হয় তোমার?

দীপঙ্কর বললে—জানো সতী, ছোটবেলায় আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে ছিল, তার নাম লক্ষ্মণ সরকার, আমাকে দেখলেই সে চাঁটি মারতো। আমি যে তার কী শত্রুতা করেছিলাম জানি না কিন্তু আমাকে দেখলে সে না-মেরে থাকতে পারতো না! কতদিন তার মার খেয়ে আমি কেঁদেছি, ভেবেছি কেন ও মারে।

ছোটবেলায় কারণটা বুঝতে পারিনি আজ বড় হয়ে বড় চাকরি করে বুঝতে পেরেছি—

—কী বুঝেছ?

দীপঙ্কর বললে—বড় হয়ে আজ আমি নিজেও একজন লক্ষ্মণ সরকার হয়ে গেছি। আর শুধু আমিই নয়, আমরা যারা বেশি মাইনের চাকরি করি, যারা একটু অবস্থা ফিরিয়েছি তারা সবাই লক্ষ্মণ সরকার হয়ে গেছি। আমরা তাই সুবিধে পেলেই দীপঙ্করদের চাঁটি মেরে মজা পাই—

তারপর একটু হেসে বললে—একলা তোমার শাশুড়ীকে দোষ দিয়ে লাভ কী!

সতী বললে—তুমি সব জানো না তাই হাসতে পারছো—

দীপঙ্কর বললে—দেখবে, একদিন যখন তুমি নিজেও শাশুড়ী হবে, তখন তুমিও লক্ষ্মণ সরকার হয়ে উঠবে—

সতী বললে—শাশুড়ী আমি আর হবো না—

—কেন, যখন তোমার ছেলে মেয়ে হবে, তাদের বিয়ে হবে, তখন শাশুড়ী হবে বৈ কি!

সতী বললে—তুমি সব জানো না, তাই এইরকম কথা বলছো—

দীপঙ্কর বললে—যেটুকু দেখলাম কাল, তাতেই সব বুঝে নিয়েছি—

—তা যদি বুঝতেই পারলে তো বললে না কেন কিছু?

দীপঙ্কর বললে—আমি আর কী বলবো বলো, আমি আর কী করতে পারি? আমি খেলুম শুধু, পেটে ঢুকছিল না, তবু খেলুম—তোমার মান রাখবার জন্যেই খেলুম—

তারপর একটু থেমে বললে—তারপর তুমি তো গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়েই কি ঘুম আসে—? কিছুতেই ঘুমোতে পারি না—। শেষে ভাবলাম, দূর ছাই, সতীর কথা ভেবে ভেবে আমার ঘুম আসবে না এটা কী রকম!—সতী আমার কে? কেউ না—

সতী বললে—আমারও ঘুম আসেনি দীপু, পরশু রাতের পর এখন পর্যন্ত একটুও ঘুমোই নি—

দীপঙ্কর বললে—আর একটু সহ্য করো, তোমার শাশুড়ী তো বুড়ো মানুষ, ক'দিনই বা বাঁচবে বুড়ী—তারপর তুমি আর সনাতনবাবু—

সতী বললে—আজ সেই জন্যেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি—

—কিন্তু আমি গিয়ে তোমার কতটুকু সাহায্য করতে পারবো বুঝতে পারছি না—! আমি আজ না-ই বা গেলাম, তাছাড়া, বাড়িতে অনেক কাজ, বিন্তীদিকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সতী বললে—না না তুমি চলো, ওঁকে বলে রেখেছি যে তুমি আসবে, ওঁর সঙ্গে যে তোমার আলাপ করিয়ে দেব! আজকে তোমার যাওয়া চাই-ই। আর কিছু

নয়, কালকের ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করা চাই-ই—তারপরে তোমাকে আর জীবনে কখনও যেতে বলবো না—জীবনে আর কখনও না গেলেও আমি কিছু মনে করবো না—

এখন মনে হয়, আশ্চর্য, সতী যদি জানতো মানুষের জীবনে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তিই এত সহজে হয় না! যদি জানতো যে-সমস্যা নিয়ে সে এমন করে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার সমাধান এত সহজে হবার নয়। যদি জানতো এমনি করে মানুষের জীবনে সমস্যাটা প্রথমে ছোট হয়েই উদয় হয় বটে, কিন্তু তারপর তাকে বাড়তে দিলে তা আর ছোট থাকে না। সেই ছোটই আবার একদিন বৃহৎ হয়ে বৃহত্তরকেও উপহাস করতে পারে। যদি জানতো তাহলে আর সেদিন অত আগ্রহ করে গাড়ি নিয়ে একেবারে দীপঙ্করের আপিসে এসে হাজির হতো না।

গাড়িতে পাশে বসে রয়েছে সতী। আর দীপঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে নানান্ কথা ভাবতে লাগলো। এমন করে নিজেকে সতীর হাতে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কি ভাল! সতী বড়লোকের বাড়ির বউ, তার অনেক আছে, অল্প নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। অনেক আছে বলেই অল্পকে হারাতে তার ভয় নেই, কিন্তু দীপঙ্কর কেন যাচ্ছে! কিসের স্বার্থ তার! শুধু একটু সান্নিধ্য! শুধু একটু কথা বলার সুখ!

সতী হঠাৎ বললে—বাঁ দিক ধরে চলো—

গাড়িটা এবার বাঁদিকের রাস্তা ধরলো।

দীপঙ্কর বললে—আমার যেন কী-রকম ভয় করছে সতী—

—কেন, কী হয়েছে? কিসের ভয়?

দীপঙ্কর বললে—না, ভয় নয়, তোমাদের সংসারের মধ্যে আমি গিয়ে কেন আবার গণ্ডগোল বাধাই বলো তো—

সতী বললে—না, কোনও গণ্ডগোল হবে না, আজকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব যে তোমাকে—কালকে আমারই ভুল হয়েছিল, কালকে ওঁকে ডেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেই ভালো হতো—

দীপঙ্কর বললে—তুমি বলছো, যাচ্ছি। কিন্তু তোমাদের শাশুড়ী স্বামী তোমাদের পরিবারের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কী সুরাহা হবে বুঝতে পারছি না—

গাড়িটা আবার সোজা রাস্তায় পড়লো। আর বেশি দূর নয়। বেশ সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায়-রাস্তায় আলো জেলে দিয়েছে। বাড়িতে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে। বিন্তীদিকে পাওয়া গেছে কিনা তার ঠিক নেই। বাড়িতে মা'কেও বলে আসা হয়নি। মা-ও হয়ত ভাববে। এখন মা'র আর কোনও কাজ নেই আগের মত। আগে বাড়ি সুদ্দু লোকের ভাত রাঁধতে হতো। আজ সকাল থেকে বলে বলেও মা'কে খাওয়ানো যায়নি। মা কেবল কেঁদেছে। আশে-পাশের সব জায়গায় দেখা হয়েছে। কোথাও নেই! সেই পুরোন বাড়ি। যে-বাড়ির ভেতরে

একদিন ঢুকতে কত রোমাঞ্চ হতো, এখন সেই বাড়িরই বাসিন্দা হয়ে গেছে দীপঙ্কর। সতী লক্ষ্মীদি যে-ঘরে শুতো সেই ঘরটাতেই আজ শোবে দীপঙ্কর। সেই ঘরেরই চারটে দেয়ালের মধ্যে দীপঙ্করের রাতটা কাটবে!

—নেমে এসো দীপু!

হঠাৎ যেন জ্ঞান ফিরে এল দীপঙ্করের। কালকে এই বাড়িতেই এসেছিল দীপঙ্কর। এই বাড়ির গেট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে ঢুকেছিল। আজ আবার সেই বাড়ির গেট দিয়ে সতীর গাড়িতে করেই ভেতরে ঢুকছে।

—এসো,—

আপিস থেকেই সোজা আসা। সেই সকাল বেলা বাড়ি থেকে আপিসে গিয়েছে। আপিসে গিয়ে পর্যন্ত এক মিনিটের বিশ্রাম পাওয়া যায়নি। রবিনসন সাহেবের ঘরেই কেটে গেছে দু' ঘণ্টা। সকলের সময় নষ্ট হয়েছে। তারপর স্টাফের সঙ্গে বকাবকি। কিছুই কাজ হয়নি সারাদিনে। টেবিলে ফাইলের পাহাড় জমে গেছে। কালকে সকালে গিয়েই সব পরিষ্কার করতে হবে। তারপর যেটুকু সময় কাজ করার ইচ্ছে ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেল সতী আসার পর।

সতী আগে আগে চলছিল। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে আসার সময়ও খেয়াল হয়নি। হঠাৎ মনে হলো সতী কী যেন একটা সেন্ট মেখেছে! দীপঙ্করের মনের সমস্ত গ্লানিটা যেন এক মুহূর্তে কেটে গেল। কী সেন্ট! এত চমৎকার গন্ধ! না কি, বাগানের ফুলের গন্ধ। ভারি চমৎকার, ভারি চমৎকার সতীদের বাগানটা! নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে! আজও সেই মার্বেল-ফ্লোর, আজও সেই ক্যাকটাস, আজও সেই মনোগ্রাম-আঁকা পাপোশ! আজও সেই ঝক্-ঝকে তক্-তকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ!

আজ কিন্তু আর দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটার দিকে নয়। আজ একতলাতেই। সতী সামনে সামনে যাচ্ছিল। সিঁড়িটার কাছে যেতেই পেছন ফিরে বললে—এদিক দিয়ে এসো দীপু—

বলে সতী আবার চলতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায় এদিকে?

কত বড় বাড়ি সতীদের। বাইরের রাস্তা থেকে এতখানি বোঝাই যায় না বোঝা যায় না—ভেতরে এত ঘর আর এত কম লোক! বোঝা যায় না—এত বিরাট বাড়ির মধ্যে এত বারান্দা আর এত করিডোর আর এত কিছু অতিক্রম করে তবে সনাতনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়।

—আর কতদূর, সতী?

সতী বললে—তোমার ভয় নেই, এসো না—

সে কবেকার কথা। কত কাল আগে স্টিভেডোর শিরিষ ঘোষ সবে কলকাতায়

সাহেব কোম্পানীর আমলে বেশ পশার জমাতে শুরু করেছেন। সস্তা-গণ্ডার সময় তখন। দু'তিন টাকা চালের মণ। চার আনা করে দুধের সের। কিন্তু সেই সস্তা-গণ্ডার আমলেও মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষ হতো, ফরিদপুর বন্যায় ভেসে যেতো। সনাতনবাবুর কাছেই সে-সব কাহিনী শুনেছিল দীপঙ্কর। নিজেদের বাড়ির নিজেদের বংশের সব পুরোন কাহিনী। দেয়ালে দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো। পূর্বপুরুষ বলতে নাম-করা কেউই নেই। কবে বর্ধমান না হুগলী কোন জেলা থেকে এসেছিলেন শিরিষ ঘোষ। খিদিরপুর ডক্ তখন তৈরি হয়েছে। মাল ওঠানো নামানো আর কুলি-মজুর খাটানো এক সমস্যার ব্যাপার। জাহাজ এসে পৌঁছোলে সবাই ভিড় করে দাঁড়াতো গিয়ে। রাতারাতি সাহেবদের ঠকিয়ে, সাহেবদের ভুল বুঝিয়ে অনেক মাল পাচার হয়ে যেত বাইরে। সাহেব কোম্পানী টেরও পেত না সে-সব। কাপড় আসতো ম্যাঞ্চেস্টার থেকে যন্ত্রপাতি আসতো লিভারপুল থেকে। কাগজ, কালি, পুতুল, খেলনা, চটের থলি সবই আসতো জাহাজে। তখন ভালো করে গুদামও তৈরি হয়নি। বৃষ্টিতে মাল ভিজতো, রোদে পুড়তো। সাহেবরা আমদানি-রপ্তানির কাজে হাজার-হাজার টাকা লগ্নী করেছে, ছোটখাটো ব্যাপারে নজর না-দেওয়ায় লোকসান হতো মাঝে-মাঝে। শিরিষ ঘোষ তখন ছোট ছেলেটি। ভাগ্য অন্বেষণে হাজির হয়েছিল খিদিরপুরে ডকের ধারে। ঘুরে বেড়াত কাজের সন্ধানে। ভাবতো যদি জাহাজে চড়ে বিলেত যাওয়া যায় একবার তো ভাগ্য ফিরিয়ে নেবে চিরকালের মত। কিন্তু সে-আশা সফল হয়নি তার। ভাগ্য ফিরলো অন্য রকম ভাবে।

একদিন জাহাজ থেকে নামাবার সময় একটা ক্রেন জেটির ওপর পড়ে গেল। বিরাট একটা ক্রেন। মাল জাহাজে ওঠানো-নামানোর জন্যে তখন সবে কলকাতায় ক্রেন আমদানি করছে সাহেব কোম্পানী। সেই বার্মিংহামে তৈরি ক্রেন জেটিতে নামাতে গিয়ে পড়ে গেছে। জখম হয়েছে অনেকে। কেউ আর কাজ করতে চায় না। শিরিষ ঘোষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সাহেব কোম্পানীর বড়কর্তা পামারস্টোন সাহেব এসে হাঁক-ডাক করছিলেন খুব। কিন্তু নেটিভ-নিগাররা কেউ কাজ করতে চায় না। তখন শিরিষ ঘোষ এগিয়ে গেলেন। ভাঙা ইংরিজীতে বললেন—আমি ক্রেনটা তুলে দিতে পারি হুজুর—আমার কুলি-মজুর আছে—

—কে তুমি? হু আর ইউ?

শিরিষ ঘোষ বললেন—আমি পুওর ম্যান স্যার—পুওর ম্যানস্ সন্—

তা আনো। আনো লোক, আনো কুলি-মজুর। তখুনি শিরিষ ঘোষ চলে গেলেন মুন্সীগঞ্জে। সেই ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মুন্সীগঞ্জের একটা খোলার চালের খুপরিতে তখন থাকতেন তিনি। মা'র একজোড়া সোনার অনন্ত ছিল তাঁর তখন শেষ সম্বল। সেইটি নিয়েই তখুনি বেরিয়ে পড়লেন বাজারে। স্যাকরার দোকানে গিয়ে বেচে দিলেন সে-দুটো। খাঁটি গিনি সোনার অনন্ত। যখন আর কিছু জুটবে না তখনকার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন লুকিয়ে। তখন

আর বেশি ভাববারও সময় নেই। পাঁচ ভরির অনন্ত। বারো টাকা করে ভরি তখন সোনার। ষাট টাকায় দিলেন সে-দুটো বেচে। টাকাগুলো পকেটে নিয়ে মুন্সীগঞ্জের কুলিপাড়ার গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তখন বহু কুলির আড্ডা। সকলকে আগাম চার আনা করে বিলোতে লাগলেন। তাদের সবাইকে নিয়ে হাজির হলেন জেটিতে। দেড়শো কুলি। এখন এই চার আনা করেই নাও সবাই, বাকিটা পরে পাবে। জোটতে যেতেই সাহেব কুলি-মজুর দেখে খুব খুশী। মাথার ওপর কাঠ-ফাটা রোদ, তখনও লাঞ্চ খাওয়া হয়নি।

পামারস্টোন্ সাহেব দেখেই বললেন—কী পুওর ম্যান, কুলি এনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, দরকার হলে আরো আনতে পারবো।

তা সেই ক্রেন উঠলো শেষ পর্যন্ত। নির্বিঘ্নেই উঠলো। হৈ হৈ শব্দ করে ক্রেন উঠলো। পামারস্টোন্ সাহেব খুব খুশী। আর সেই থেকেই শিরিষ ঘোষের ভাগ্য ফিরলো। ক্রেন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিরিষ ঘোষেরও ভাগ্য উঠলো।

আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে আর এক নতুন মহাজনের ইতিহাস। কলকাতার এই দক্ষিণে তখন সব সুরকির রাস্তা। কিছু কিছু মেঠোপথ। কিছু বাঁশঝাড় আর কিছু ধানজমি। হাজরা রোডের দক্ষিণ দিকে তখন সবটাই জঙ্গল। সেই সময়েই এই মাঠের কোণে এসে বসতবাড়ি করলেন, নতুন মহাজন শিরিষ ঘোষ। যখন টাকা ছিল না, তখন মুন্সীগঞ্জের খোলার বস্তিতে তাঁর দিব্যি চলে যেত। কিন্তু টাকা হাতে আসার পর আর তা চললো না। টাকার কী অদ্ভুত দাক্ষিণ্য। মানুষ যন্ত্র আবিষ্কার করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, আকাশে পাখা মেলিয়ে দূরত্বকে জয় করেছে। রেলগাড়ি স্টীম ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি চড়ে রূপ-কথার দৈত্য-দানব রাজকুমাররা এক পদক্ষেপে সাত-সাত ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়েছে। সবই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নতুন যন্ত্রযুগের সব আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে টাকা। নতুন সমাজের বনেদ হলো বংশ-গৌরব নয়—টাকা! যা কিছু হচ্ছে পৃথিবীতে, যা কিছু ঘটছে, যত প্রেরণা যত গবেষণা, যত উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা উত্থান সবই এই মুদ্রার মোহে। শিরিষ ঘোষ যখন কোম্পানী খুললেন খিদিরপুরে, যখন বাড়ি করলেন ভবানীপুরে, তখন সবে মাত্র টাকার পাখা গজাচ্ছে। আগেকার দিনে শ্যামবাজারের বনেদী পাড়ার টাকা থাকতো আরাম করে লোহার সিন্দুকের মধ্যে ঘুমিয়ে। বাইজী-নাচের আসরে আর শুঁড়িখানায় তার খাতির ছিল অনেক। কিন্তু এবার আর বাইজী নয়, টাকা নিজেই ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো। কারবারের টাকা ব্যাঙ্কের সিন্দুকে এসে আর ঘুমিয়ে রইল না, বাইরের জগতে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। সে হলো সচল সজীব গতিশীল টাকা! এ যুগে টাকা শুধু গতিশীল নয়, এ-যুগে টাকা হলো ক্রিয়েটিভ্। টাকা বংশবৃদ্ধি করতে লাগলো। টাকা যত বেশি চলতে লাগলো, তত বাড়তে লাগলো। এ-যুগের মহাজনদের আর বাইজীদের নাচের আসরে টাকা খরচ করতে হলো না—। টাকা নিজেই নেচে মর্যাদা বাড়াতে লাগলো। সবই

এ-যুগে বেচা-কেনার পণ্য হয়ে উঠলো। টাকা নিজে রূপান্তরিত হয়ে সকলকেই রূপান্তরিত করে দিলে। স্নেহ দয়া মায়া ভালবাসা সবই হলো টাকার শিকার। মানুষ নিজেই একদিন টাকার পণ্য হয়ে উঠলো। তাই টাকা যাকেই ছুঁলো, যা কিছু স্পর্শ করলো সব সোনা হয়ে উঠলো। আগেকার যুগে মুনি-ঋষিদের হাড়েও এমন ভেল্কি খেলতো না। আগে ছিল 'ডেথ্ দি লেভেলার', এখন হয়েছে 'টাকা দি লেভেলার'। মৃত্যুর চেয়েও কঠিন, মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী টাকা। টাকা সমস্ত শ্রেণীভেদ ভেঙে দিয়ে নিজের নতুন কৌলীন্য জাহির করলো। টাকা স্বর্গ তো বটেই—টাকাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাছাড়া, টাকাই বংশ, টাকাই গোত্র, টাকাই শ্রেণী! নতুন করে যে-শ্রেণীতে শিরিষ ঘোষ ঠাঁই পেলেন, সে-সমাজও টাকায় তৈরি। সবার চেয়ে বড় কুলীন টাকা, সবার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ টাকা। আসলে রক্তই হলো টাকা, রক্তের মতন টাকাই সমাজের শিরা-উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত হতে লাগলো তখন থেকে।

এই এত যে টাকার ক্ষমতা, এ শিরিষ ঘোষ বুঝেছিলেন বৈকি। বুঝেই টাকার পেছনে এত ছুটেছিলেন। কিন্তু আর একটা দিকও নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন বোধহয়। কারণ তখন দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস প্রচার করছেন—মাটি টাকা, টাকা মাটি। কিন্তু তখন খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। ততদিনে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছেন তিনি। বাড়ি গাড়ি করে, বাগান, জমিদারী, আবাদ কিনে টাকার ক্ষমতাটাও বুঝেছেন, টাকার জ্বালাটাও বুঝে নিয়েছেন। তিনি দেখেছিলেন, যারা একদিন প্রথমে জীবনে তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, টাকা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশ্রয়ে এসে তাঁকে তোষামোদ করেছে। টাকার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব জুটেছে। যত ভক্ত-সংখ্যা বেড়েছে, যত গলগ্রহদের সংখ্যা বেড়েছে, তত টাকার জ্বালা বুঝেছেন। শেষ জীবনে নিজের সহধর্মিণীর মৃত্যুতে সেটা আরো বেশি করেই বুঝেছিলেন। তারপর একদিন গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। তখন সেখানে অনেক ভক্তের ভিড়। কিছু কথা বলবার সাহসও হয়নি, সুযোগও হয়নি। নিজের অগাধ টাকার অপরাধে তখন নিজেই তিনি অপরাধী, তাই আর মুখ খুলতে পারেন নি। তারপর শেষকালে একদিন তো মারাই গেলেন।

শিরিষ ঘোষ আর বেশিদিন বাঁচলে কী হতো বলা যায় না, হয়ত সব সম্পত্তি-টম্পত্তি বিলিয়ে যেতেন দু'হাতে। কিন্তু তখন ছেলের হাতে এসে পড়লো সেই অগাধ টাকা। ছেলে শুধু নয়, পুত্রবধূর হাতে। আজ তিন পুরুষ ধরে সেই টাকা বেড়ে বেড়ে এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে যে, খরচ করে উড়িয়েও তা আর ফুরোন যাবে না।

গাড়িতে আসতে আসতেই সতী বলেছিল—এ-বাড়ির যদি এত টাকা না থাকতো তো বোধ হয় ভালো হতো দীপু—

—কেন, টাকার জন্যেই তো আমরা সব এত চাকরি-বাকরি করছি, টাকার জন্যেই তো এই দাসত্বের জ্বালায় জ্বলছি—টাকা থাকলে কি আর এত সইতে

হতো!

—না, তুমি জানো না দীপু, সকলের সব জিনিস তো সয় না, এদেরও তেমনি টাকা সয় না।

—সে কি! টাকা কি এরা ওড়ায়?

সতী বলেছিল—সে তো তবু বরং ভালো ছিল, তাতেও বুঝতাম এরা বেঁচে আছে, কিন্তু সে-ক্ষমতাও যে এদের নেই, টাকা ওড়ানোতেও ক্ষমতার দরকার হয়, সাহসের দরকার হয়, মেজাজের দরকার হয়—

সেই যে কবে একদিন তিন পুরুষ আগে শিরিষ ঘোষ বলে গিয়েছিলেন—টাকা বড় নচ্ছার জিনিস। এরা বুঝি তার কদর্থ করেছে। এরা তাতেই বুঝি বড় ভয় পেয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের ডিপোজিটে, আইরনের শেয়ারে সেই যে টাকাগুলো আটকে রেখেছে, তার থকে আর নড়চড় হবার যেন উপায় নেই। শুধু টাকাই আটকে রাখেনি, টাকার সঙ্গে শিরিষ ঘোষের অধস্তন পুরুষ তাদের আত্মাও আটকে রেখেছে, তাদের সম্ভ্রম বনেদিআনা, পৌরুষ সব কিছু গচ্ছিত রেখে দিয়ে এসেছে ব্যাঙ্কে। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। সম্ভ্রমের এক তিল নষ্ট হলেই তাদের যেন লোকসান হয়ে যাবে, বনেদিয়ানার এক চুল নষ্ট হলেই যেন তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি পরমার্থকেও তারা বন্দী করে রেখেছে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপোজিট্ ভল্টে। পৃথিবী যদি একদিন রসাতলেও যায়, যদি প্রলয়-পয়োধি জলে সবকিছু একাকার হয়ে যায় একদিন, তবু তাতেও তাদের বনেদিয়ানা ধ্বংস হবে না! প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের গেট-এ দরোয়ান বসিয়ে, ব্যাঙ্কের পাশ-বই সিন্দুকে আটকে রেখে তাই তাঁরা তাঁদের আভিজাত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন। যেন কিছুতেই না খোয়া যায়, যেন কিছুতেই না গায়ে আঁচড় লাগে সেখানে! কিন্তু কে জানতো বর্মায় মানুষ হওয়া একটা আশ্চর্য মেয়ে সে-বাড়ির বউ হয়ে ঢুকে তিন-পুরুষের সমস্ত ধ্যান-ধারণা এমন করে তছনছ করে দেবে!

দীপঙ্করও বুঝতে পারেনি তার সেই জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার জের এমন করে এতদিন ধরে চলবে। এমন মর্মান্তিক তার পরিণতি হবে!

সতী সামনে সামনেই চলছিল। বললে—এসো, ভেতরে এসো, এইখানেই উনি আছেন—

দীপঙ্কর বললে—এ কোথায় নিয়ে এলে?

সতী বললে—এইটেই ওঁর লাইব্রেরী-ঘর, এখানেই ওঁর বেশির ভাগ সময় কাটে—

পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই দীপঙ্কর দেখলে—বিরাট একটা ঘর। চারদিকে খালি বই। বই-এর মধ্যে টেবিলে বসে আছেন কালকের সেই ভদ্রলোক, সেই সনাতনবাবু। তখন পেছন ফিরে বসেছিলেন।

সতী ভেতরে গিয়ে ডাকলে। বললে—শুনছো, এই দীপুকে এনেছি—

ভদ্রলোকের গায়ে একটা হাত-কাটা পাঞ্জাবী। উস্কো-খুস্কো চুল। সতীর কথাটা কানে যেতেই পেছন ফিরলেন। দীপঙ্করের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু চিনতে পারলেন না। সতীর দিকে ফিরে বললেন—কাকে এনেছো বললে?

সতী বললে—সেই যে যার কথা বলেছিলুম—?

—ও, তাই বলো—

বলে উঠে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন—কী আশ্চর্য, আগে বলতে হয়! আপনি বসুন বসুন—

দীপঙ্কর একটা চেয়ারে বসলো। বললে—আপনি ব্যস্ত হবেন না—

সনাতনবাবু যেন সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়লেন তবু। বললেন—দেখুন, কালকে আমি পুরী থেকে ফিরে এলাম তখন, মানে পুরী থেকে ঠিক নয়, আসলে কটক থেকে ফিরে এলুম। বর্ষাকালে রথের সময় পুরী যাওয়াটাই ভুল—আমি ভেবে দেখছিলাম পুরী যেতে হলে হয় সেপ্টেম্বর নয় মার্চ মাসে যাওয়াই ভালো—

তারপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—আমি আজ তিনখানা বই কিনেছি এই সম্বন্ধে, কাল রাত্রে আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমার ভালো ঘুমই হয়নি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—ঘুম কী করে হবে বলুন, আমি ভাবতে লাগলাম, উড়িষ্যাতেই বা এত বন্যা হয় কেন? আমাদের পূর্ববঙ্গেও বন্যা হয় অবশ্য, গত একশ বছরে নব্বুই-বার বন্যা হয়েছে। কিন্তু উড়িষ্যা সম্বন্ধে আমার সঠিক স্ট্যাটিসটিক্স জানা নেই, তাই পড়ছিলুম—ভাবলাম উড়িষ্যার বন্যা সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা ভালো—এই দেখুন এই তিনখানা বই আজ কিনে এনেছি—

দীপঙ্কর দেখলে তিনখানা মোটা-মোটা নতুন বই টেবিলে রয়েছে। উড়িষ্যার বন্যা, উড়িষ্যার ভূতত্ত্ব, নদীতত্ত্ব আর যেন সব কী বিষয় নিয়ে লেখা।

দীপঙ্কর বললে—আপনি পড়ছিলেন, আপনার পড়ার ক্ষতি করলাম মাঝখান থেকে—

—না না, ক্ষতি করবেন কেন? এ কি একদিনে শেষ হবে ভেবেছেন? এ তিনখানা বইতে তো হবে না, আরো অনেকগুলো বই কিনতে হবে, আজ বুক-সেলার্সদের চিঠি লিখে দিয়েছি, উড়িষ্যা সম্বন্ধে যত বই আছে, সব পাঠাতে—আমি তো ঠিক করেছি অন্তত ছ'মাস লাগবে, এ ব্যাপারটা জানতে—

দীপঙ্কর সনাতনবাবুর কথা, সনাতনবাবুর ব্যবহার লক্ষ্য করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে—কোন্ ব্যাপারটা?

সনাতনবাবু বললেন—এই বন্যার ব্যাপারটা—ব্যাপারটা তো ঠিক সহজ নয়, প্রায়ই হয় যে এটা, উনিশ শো বত্রিশ সালে যে ভীষণ বন্যা হয়েছিল আমার মনে

আছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু বন্যা যদি হয়ই, তার আপনি কী করবেন শুনি? আপনি তো প্রতিকার করতে পারবেন না?

সনাতনবাবু চাইলেন সতীর দিকে, চেয়ে হাসলেন। বললেন—দেখছ সতী, তুমি যা বলো, ইনিও তাই বললেন—প্রতিকার যদি না-ই করতে পারলুম, জানতেও তো ইচ্ছে করে, জানতেও তো আনন্দ—

আশ্চর্য এই মানুষটা। সতীও বলেছিল দীপঙ্করকে। শুধু বন্যাই নয়, সব জিনিস সম্বন্ধেই সনাতনবাবুর কৌতূহল। বহুদিন আগে একদিন ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে খুব ভালো লেগেছিল সনাতনবাবুর। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী মাছ ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—আজ্ঞে ইলিশ মাছ—

ইলিশ মাছ! ইলিশ মাছ ভাজা তো আগেও খেয়েছেন। কিন্তু এত ভালো তো লাগেনি কখনও!

জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ বাজার থেকে মাছ আনা হয়েছে জানো তুমি ঠাকুর?

—আজ্ঞে, জানি, কৈলাস তো যায় বাজারে, রোজ যে-বাজার থেকে আনে, সেই বাজার থেকেই এনেছে।

সনাতনবাবু বললেন—কৈলাসকে ডাকো তো ঠাকুর!

কৈলাস আসতেই সনাতনবাবু বললেন—ঠাকুর কৈলাসকে জিজ্ঞেস কর তো কোন্ বাজার থেকে মাছ এনেছে—

কৈলাসের কথায় তেমন সন্তুষ্ট হলেন না সনাতনবাবু। শেষে ডাক পড়লো সরকারবাবুর। সরকারবাবু এলেন ভেতরে। সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আজকে ইলিশ মাছটা কোথা থেকে কিনে আনা হয়েছে সরকারবাবু?

সরকারবাবু একটু ভয় পেয়ে গেল। বললে—আজ্ঞে হুজুর, আমি তো টাটকা মাছ দেখেই নিয়েছিলাম—রোজ তার কাছ থেকেই মাছ কিনি—

সনাতনবাবু তখন খাওয়া থামিয়ে দিয়েছেন। বললেন—সেই জন্যেই তো আমি জিজ্ঞেস করছি, কোন্ বাজারের মাছ?

—আজ্ঞে, জগুবাবুর বাজার!

সনাতনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ নদীর মাছ বলতে পারেন?

—আজ্ঞে তা তো বলতে পারি না! আমি মেছুনীকে জিজ্ঞেস করবো কাল—

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—তবেই হয়েছে, সে কি আর নদী চেনে, সে কেবল মাছই চেনে—তাকে জিজ্ঞেস করলে কিছু ফল হবে না, সে তো আর লেখাপড়া জানে না সরকারবাবু—

সরকারবাবু বললে—তা হলে কী করবো বলুন আজ্ঞে?

সনাতনবাবু আবার খেতে লাগলেন। বললেন—না, আপনাকে কিছু করতে

হবে না, যা করবার আমিই করবো'খন—

খেয়ে উঠেই সনাতনবাবু লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে ডায়েরী খুললেন। খুলে লিখে রাখলেন—'বেলা বারোটার সময়ে ইলিশ মাছ ভাজা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু লাগলো। সকাল বেলা জগুবাবুর বাজারের মেছুনীর কাছ থেকে কেনা। কোন্ নদীর মাছ জানা যায় নাই।' ডায়েরীতে লেখা শেষ করে বইগুলো খুঁজতে লাগলেন। মাছ সম্বন্ধে কোনও বই নেই তাঁর কাছে। একবার টেলিফোন করলেন কলেজ স্ট্রীটে। জিজ্ঞেস করলেন—ইলিশ মাছ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কোনও বই আছে?

কয়েকটা দোকানেই টেলিফোন করলেন। কোথাও নেই। তারা বললে—আমাদের এখানে পাবেন না, আপনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির জুলজি ডিপার্টমেণ্টে একবার টেলিফোন করতে পারেন—

শেষকালে তাই হলো। টেলিফোন করলেন সেখানে। নো রিপ্লাই। একজন অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিলে—হঠাৎ ইউনিভার্সিটি ছুটি হয়ে গেছে লাইব্রেরীয়ানের মৃত্যুতে। কালকে টেলিফোন করবেন আপনি, বেলা বারোটার পর।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। জরুরী ব্যাপার। ফেলে রাখলে চলে না। হঠাৎ খেয়াল হলো। চিড়িয়াখানায় টেলিফোন করলেন। সে ক'দিন যে কী উত্তেজনায় কাটলো সনাতনবাবুর! একবার এখানে টেলিফোন করেন, একবার সেখানে। সনাতনবাবুর মা বললেন—কী হলো বাবা, কিছু বলতে পারলো ওরা?

সনাতনবাবু বললেন—না মা, কী করা যায় বলো তো এখন?

মা বললেন—কী আর করবে বাবা, ও ছেড়ে দাও—তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো—

কিন্তু সে-ক'দিন কিছুতেই আর ঘুম আসে না। সকাল বেলা জগুবাবুর বাজারের মেছুনীর কাছ থেকে ইলিশ মাছ এনে বেলা বারোটার সময় ভাজা খেতে কেন এত সুস্বাদু লাগলো, তা জানা উচিত।

রাত্রিবেলা সতী বললে—তোমার হয়ত খিদে পেয়েছিল খুব, তাই ভাল লেগেছে—ও নিয়ে অত ভাবছ কেন?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু জানতো তো ইচ্ছে করে, জানলে তো আনন্দ হয়—

সতী বললে—তা পৃথিবীর তো জানার অনেক জিনিস আছে, সব কি তুমি জানতে পারবে, না জানা সম্ভব?

সনাতনবাবু বললেন—তা বলেছ তুমি ঠিক, সত্যিই তো, ইলিশ মাছ ছাড়াও তো অনেক জিনিস আছে, সব কি আমি জানতে পারবো? সব কি জানা যায়?

—তার চেয়ে এখন এসো, শুয়ে পড়ো—

জোর করে সতী সনাতনবাবুকে শুইয়ে দিলে। গায়ে চাদরটা ঢাকা দিয়ে

দিলে। বললে—শুয়ে পড়ো এবার,—তোমার ঘুম পায় না?

সনাতনবাবু বললেন—কী রকম আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, তোমরা সবাই তো মাছ খেলে, আমিও খেলুম, কিন্তু আমারই ভালো লাগলো, আর আমারই যত মাথাব্যথা—

কথা বলতে বলতেই খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লেন সনাতনবাবু। সতী টের পেলে সনাতনবাবুর তালে তালে নিশ্বাস পড়তে লাগলো। তারপরেও অনেকক্ষণ জেগে রইল সতী। অনেকক্ষণ। আবার সেই ঘড়ির ধুক-ধুকুনি সতীর বুকে বাজলো। আবার তন্দ্রা এল সতীর। আবার ভোর বেলা ঘরের বাইরে শাশুড়ী ডাকলেন—বৌমা—

কিন্তু পরের দিনই তিনশো টাকার বই কিনে আনলেন সনাতনবাবু চৌরঙ্গীর বিলিতি দোকান থেকে। একেবারে মাছের যাবতীয় ইতিহাস, মাছের চাষ, কত রকমের মাছ আছে পৃথিবীতে—সমস্ত লেখা আছে। সমুদ্রের মাছ, নদীর মাছ, পুকুরের মাছ। বিদেশের মাছ, স্বদেশের মাছ। সেই বই পড়তে লাগলেন আবার দাগ দিয়ে দিয়ে। সকাল থেকে অনেক গভীর রাত পর্যন্ত। আর কোনও চিন্তা নেই তাঁর। ছ'মাস পরে মাছ সম্বন্ধে সব কিছু যখন জানা হয়ে গেল, তখন বাঁচলেন সনাতনবাবুও বাঁচলেন, সনাতনবাবুর মা'ও বাঁচলেন।

কিন্তু জানবার বিষয় তো আর একটা নেই সংসারে। সব জিনিসেই সনাতনবাবুর অদম্য কৌতূহল। একদিন সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলেই দেখলেন 'স্টেটস্‌ম্যানের' এডিটারের ওপর কে যেন পিস্তলের গুলি ছুঁড়েছে, বড় বড় অক্ষরে খবরটা ছাপা হয়েছে। সে উনিশ শো বত্রিশ সালের কথা। কলকাতার বহু লোক সে-খবরে চমকে উঠেছিল। কিন্তু সনাতনবাবু চমকালেন না।

বিকেল ছটার সময় এডিটার ওয়াটসন্ সাহেব অক্টারলোনী মনুমেন্ট, ইডেন গার্ডেন স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে নেপিয়ার রোডের দিকে মোটরে চড়ে আসছেন। গাড়িটা একটু ধীরে ধীরে চলেছে, এমন সময় একটা লোক গাড়ির জানালা দিয়ে সাহেবের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। ওয়াট্‌সনের স্টেনোগ্রাফার মিস্ গ্রস্ পাশে বসে ছিল—। তিনটে গুলির মধ্যে একটা তার গায়েও এসে লাগলো। তারপর অনেক কাণ্ড। ওয়াটসন সাহেবকে পি-জি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। আর সন্ধ্যে সাতটার সময় মাঝেরহাটে বুড়োশিবতলায় দুজনকে পাওয়া গেল। দুজনেই তখন মরে গেছে। একজনের নাম ননী লাহিড়ী। আর একজন হালদার পাড়া রোডের গোপাল চৌধুরী।

তখন এ-সব নিয়ে ক'দিন খুব হৈ চৈ হলো শহরে। পুলিস, খানাতল্লাসী চললো। দীপঙ্করের সে-সব দিনকার কথা মনে আছে। কিরণের সঙ্গে মেশাই তখন বন্ধ। পেছনে পেছনে সি-আই-ডি ঘুরছে। আই-বি আপিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করকে। সতীরও তখন নতুন বিয়ে হয়েছে।

সনাতনবাবু মাকে ডাকলেন। বললেন—কী ভীষণ কাণ্ড হয়েছে জানো

মা?

মা বললেন—কী!

সনাতনবাবু বললেন—একেবারে সাহেবদের মেরে খুন করে ফেলছে সবাই—

মা বললেন—ও-সব স্বদেশীদের কাণ্ড, ও তো রোজই হচ্ছে সোনা—ও আর নতুন কী?

সনাতনবাবু বললেন—তা তো আমিও জানি, কিন্তু এত পিস্তল কোত্থেকে আসছে জানতে হবে তো!

মা বললেন—ও জেনে তোমার কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—না, জানা তো দরকার। এত পুলিস, পাহারা, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রয়েছে, তবু এত পিস্তল কোত্থেকে আসছে!

—যেখান থেকে খুশী আসুক, আমাদের কী?

—বারে! জানতে হবে না। পিস্তল অমনি এলেই হলো? তাহলে পুলিস মিলিটারি রাখবার দরকার কী? আমাদেরই তো দেশের সব মানুষ, আমরা তো এই দেশেই বাস করছি। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমোনো তো পশুরাও করে। আমাদের সঙ্গে তাহলে আর তাদের তফাৎটা কী?

রাত্রে একমনে বই পড়া দেখে সতী জিজ্ঞেস করলে—সত্যি এ-সব জেনে কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

সতী বললে—না!

সনাতনবাবু বললেন—আশ্চর্য তো! সত্যিই তোমার জানতে ইচ্ছে করে না, কে প্রথম পিস্তল আবিষ্কার করলো, প্রথম কাকে পিস্তল মারা হলো। প্রথম পিস্তল দেখতে কী রকম ছিল, তারপর সেই পিস্তল থেকে আজকের মডার্ন পিস্তলের কী তফাৎ—সে-সব জানতে ইচ্ছে করে না!

সতী বললে—সে আমার জেনে কী লাভ?

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—তাহলে খেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

সেই গুলিমারার ঘটনার পর থেকেই গাদা গাদা বই আনাতে লাগলেন সনাতনবাবু। সেই বই সব আবার দিন রাত পড়তে লাগলেন। ছ'মাস পরে সব জানা হয়ে গেল। তখন বাঁচলেন। সনাতনবাবুও বাঁচলেন, সনাতনবাবুর মা'ও বাঁচলেন।

কথাগুলো শুনতে শুনতে দীপঙ্করের খুব ভালো লাগছিল। এও একরকম মানুষ। কত জানবার জিনিস পৃথিবীতে। একটা জীবনে সব জিনিস জেনে শেষ করা যায় না। পৃথিবীতে এত বই, এক জীবনে সব পড়ে শেষ করা যায় না। তবু চারদিকে থাক্-থাক্ সাজানো বইগুলো দেখে কেমন শ্রদ্ধা হতে লাগলো

সনাতনবাবুর ওপর। দরকার কি এত জানার। অন্য দশজন বড়লোকরা যা করে, তাই করলেই তো পারেন সনাতনবাবু! কেন মিছিমিছি এত পরিশ্রম। এত পয়সা খরচ। বিচিত্র মানুষ বটে সনাতনবাবু। এই সব নিয়েই মেতে আছেন তো বেশ! এই সব নিয়েই তো উন্মত্ত হয়ে আছেন!

দীপঙ্কর বললে—এ গুলো সব কী বই?

সনাতনবাবু বললেন—এইগুলোই তো এতদিন পড়ছিলুম, ওয়ার নিয়ে কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলুম অনেকদিন ধরে, হঠাৎ এই মাছের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকতেই আবার মাছ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে হলো—

—ওয়ার? যুদ্ধ সম্বন্ধে হঠাৎ পড়লেন কেন?

—ওয়ার বাধবে শুনছি।

—যুদ্ধ বাধবে?

বহুদিন আগে একটা যুদ্ধ গিয়েছে, সে-যুদ্ধ দেখেনি দীপঙ্কর। সে-যুদ্ধের গল্পই শুধু শুনেছে। মধুসূদনের রোয়াকে দুনিকাকারা বসে সব গল্প করতো যুদ্ধের। মেসোপোটেমিয়া আর প্যারিসের লড়াই-এর গল্প হতো রোয়াকের ওপর বসে বসে। আবার সেই যুদ্ধ বাধবে? বলছেন কী সনাতনবাবু!

সনাতনবাবু বললেন—সে কি, আপনি শোনেন নি? আপনাদের আপিসের সাহেবেরা কিছু বলছে না?

দীপঙ্কর বললে—না, কই, কিছু তো শুনিনি!

—শুনুন আর না-শুনুন, আমার নিজেরই যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে যুদ্ধ বাধবে আবার মশাই। জার্মানীতে নাজি-পার্টি ওঠার পর থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছে। ওই যে হিটলার লোকটা দেখছেন, ও লোকটা তত খারাপ নয়, লোকটা দেশকে ভালবাসে, দেশের ভালোই চায়, কিন্তু ওর পেছনে অনেক মাড়োয়ারী রয়েছে, তারাই আসলে ওকে নাচাচ্ছে—

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তারা অনেক বন্দুক-রাইফেল গোলা-গুলি তৈরি করে ফেলেছে, সেগুলো বিক্রী হচ্ছে না, একেবারে কারখানায় জমে পাহাড় হয়ে উপচে পড়ছে, সেগুলো চালানো চাই তো—

সনাতনবাবু অনেক সব কথা বলতে লাগলেন। যুদ্ধের একেবারে গোড়াকার কথা সব। তখন কেউই জানতো না যুদ্ধ হবে। দীপঙ্করও জানতো না। খবরের কাগজেও সে-সব কথা বেরোতো না। কিন্তু সনাতনবাবুই, মনে আছে, সেদিন প্রথম দীপঙ্করকে যুদ্ধের কথাটা বলেছিলেন। কে জানে, হয়ত সনাতনবাবু নিজেই জানতেন না তাঁর কথা শেষকালে এমন করে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে। আর সে-যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী জড়িয়ে পড়বে। জড়িয়ে পড়বে ইংরেজ, জড়িয়ে পড়বে ফরাসী, রাশিয়া সবাই। জড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক, প্রত্যেকটা অধিবাসী! আর সে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সতীও জড়িয়ে পড়বে!

—আপনি তো জানেন, কী করে হিটলার ক্ষমতা পেলে? ভোটের আগে কমিউনিস্ট পার্টিকে বদনাম দেবার জন্যে নিজেরাই নিজেদের পার্লামেন্ট হাউসটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে মশাই! কী শয়তান দেখুন! বদনাম হলো অন্য সব পার্টির। আর তারপরেই ভোট। ভোটে একেবারে গো-হারান্ হারিয়ে দিলে সকলকে। আমি তখন থেকেই ওয়াচ্ করছি কি না, বই পড়ছি আর দেখছি—কী হয়!

কথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ হয় না। কথা বলতে আরম্ভ করলে সনাতনবাবুর আর জ্ঞান থাকে না কোনও দিকে। সাধারণত কথা বলবার হয়ত লোকই পান না মনের মত। আজকে দীপঙ্করকে পেয়ে সনাতনবাবু যেন মন খুলে কথা বলতে পেরে বেঁচেছেন! একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু, আর দীপঙ্কর আর সতী, দুজনেই শুনছিল।

বললেন—আমি কি এ-সব জানতুম! স্টেট্‌সম্যানের এডিটরকে যেদিন স্বদেশীরা গুলি করলে, সেই দিনই প্রথম খেয়াল হলো যে পিস্তল কোথা থেকে প্রথম এল। মানে বন্দুক কবে প্রথম আবিষ্কার হলো। সেই সব বই আনালুম, এনে পড়তে পড়তে দেখি আরে জার্মানী তো কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—এ তো যুদ্ধ লাগলো বলে! তখন আরো বই আনাই, দেখি যা ভেবেছি তাই—আসলে দেখলাম হিটলারের পেছনে রয়েছে থাইসেন—

—থাইসেন?

—থাইসেনের নাম শোনেন নি? আসলে লোকটা ব্যবসাদার। লোহা-লক্কড়, কয়লা, নানারকমের ব্যবসা তার, সে দেখলে হিটলার লোকটা তো বক্তৃতা করতে পারে ভালো! তো দাও একে চ্যান্সেলার করে। তাহলে একটা মজার গল্প বলি শুনুন—

বেশ মশগুল হয়ে গল্প ফাঁদছিলেন সনাতনবাবু। সতী বললে—আর গল্প থাক্, দীপু এসেছে আপিস থেকে, তা জানো তো! আমি আপিস থেকে ওকে টেনে এনেছি। এখনও ওর খাওয়া-দাওয়া হয়নি—

সনাতনবাবু বললেন—ছি ছি ছি, এ কথা তো আগে বলোনি আমায়! আপনার খাওয়া হয়নি তা তো আমায় বলতে হয়! না, না, আপনাকে আর আটকাবো না, আপনি বাড়ি চলে যান, আপনাকে আর কষ্ট দেব না—

—ওমা, সে কি? বাড়ি চলে যাবে কেন? তুমি চলে যেতে বলছো কেন ওকে?

সতীও হাসতে লাগলো। দীপঙ্করও একটু লজ্জায় পড়লো।

সতী বললে—দেখলে তো ওঁর কাণ্ড, জানো, ওকে আমি নেমন্তন্ন করেছি আজ, তোমাকে কাল অত করে বললাম।

—তাই নাকি?

আকাশ থেকে পড়লেন সনাতনবাবু। বললেন—না না, আমার মনে পড়েছে—

তাহলে তো ভালোই হলো, আরো অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে—

বলে উঠলেন। বললেন—দাঁড়ান, তাহলে আর একটা বই এনে দেখাচ্ছি আপনাকে, এই পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসছি—

বলে পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। দীপঙ্কর সতীর দিকে চাইলে, বললে—সনাতনবাবু তো বেশ মানুষ সতী!

সতী সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—তুমি কিন্তু আজ খেয়ে যাবে দীপু, চলে যেও না যেন—

দীপঙ্কর বললে—আজ সনাতনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে সত্যিই খুব খুশী হলাম, এত খবর রাখেন—

ততক্ষণে এসে পড়েছেন সনাতনবাবু। হাতে একখানা বই। বললেন—এখানা নতুন আনিয়েছি, এই দেখুন, একটা জায়গায় আপনাকে পড়িয়ে শোনাই—

সতী বললে—তাহলে, আমি রান্নার কতদূর কী হলো দেখি গে—তুমি বোস দীপু—

বলে সতী চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ এই সনাতনবাবু! কোথায় কত দূরে সব দেশ, সে-সব দেশের সমস্যা, সে-সব দেশের মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে মুখস্থ করে বসে আছেন একেবারে। উনিশ শো একত্রিশ সালে ব্রেজিলে কত লক্ষ ব্যাগ কফি সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাও মুখস্থ। একদিকে সাধারণ মানুষে তার ধর্ম, তার জীবিকা, আর একদিকে বড়দের রাজনীতি। জার্মানীতে ইহুদীদের ওপর যেমন অত্যাচার, তেমনি রাশিয়াতে মহাজনদের ওপর অত্যাচার। দুটোই এক। কোথাও বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই, সহযোগিতা নেই। যুদ্ধ বাধলে কেউ জিতবে না, দেখবেন। আজ দু'দিক থেকেই দু'দল দু'রকম মত চালাবার চেষ্টা করছে। একদল বলছে সহযোগিতা শান্তি আর যুক্তির পথেই সভ্যতা এগিয়ে চলবে—আর একদল চাইছে ধ্বংস। মৃত্যুর মধ্যে, অপঘাতের মধ্যে, আত্মহত্যার মধ্যেই আত্মবিনাশ! কাকে আপনি চান বলুন? দু'জনেরই সমান ভোট, দু দলই দলে ভারি—দু'দলের হাতেই সব রকম হাতিয়ার আছে—বোমা, বারুদ, রাইফেল, বন্দুক, গ্যাস সব কিছু! কারা জিতবে এখন বলুন ?

—সোনা!

হঠাৎ সনাতনবাবুর কথার মধ্যে বাধা পড়লো। সনাতনবাবু কথা থামিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললেন—এই যে মা—

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে। সনাতনবাবুর মা ঘরের ভেতরে ঢুকছেন। সতীর শাশুড়ী। কালকে এই চেহারাটাই দেখেছিল দীপঙ্কর। এ'কে দেখেই সতী ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল।

—এ কে সোনা?

সনাতনবাবু উত্তর দেবার আগেই দীপঙ্কর সোজা তাঁর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে বললে—সতী আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে—সনাতনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে দিতে-

—বৌমা ডেকে এনেছে? তুমিই কালকে এসেছিলে, না?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—তা বৌমা না-হয় পাগল, তুমি কী বলে পাগলের কথায় এলে এখানে?

পাগল! সতী পাগল! দীপঙ্কর কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লো। সনাতনবাবুর মা এ কী বলছেন! সতী পাগল! একবার সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। সনাতনবাবু তখন সেই বইটা নিয়ে আবার চোখ বোলাতে শুরু করেছেন—

—তুমি কী রকম ভাই, বৌমার?

দীপঙ্কর বললে—ওরা কালিঘাটে আমাদেরই বাড়ির পাশে থাকতো—ছোটবেলা থেকেই পরিচয়। একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি কিনা, আমার মাকে সতী মাসীমা বলে ডাকতো—আর কিছু নয়—

—তা এতদিন দেখছো, ও পাগল কিনা জানো না?

—আজ্ঞে, আপনি কী বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

—তা যদি না বুঝতে পেরে থাকো তো আর বুঝেও কাজ নেই। আমি এই বউকে নিয়ে এতদিন ঘর করছি, আমি বুঝতে পেরেছি, ও পাগল ছাড়া আর কিছু নয়—! আমরা না-হয় ভালো করে খোঁজ-খবর না-নিয়ে বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমরা কেন ওর কথায় ভোল? তোমরা কেন ওর কথায় এ-বাড়িতে আসো?

অপমানটা দীপঙ্করের বুকে গিয়ে শেলের মতন বিঁধলো। কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারলে না।

সতীর শাশুড়ী আবার বলতে লাগলেন—কালকে তোমাকে আমি দেখেছি, কিন্তু মুখের ওপর কিছু বলিনি, কিন্তু আজও কী বলে তুমি এলে?

দীপঙ্করের মনে হলো আর যেন একমুহূর্ত এখানে দাঁড়ানো তার উচিত নয়।

বললে—আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি এখুনি—

—হ্যাঁ, যাও, ও ডাকলেও কখনও এসো না, ও একটা পাগল, একটা বদ্ধ পাগলকে আমার বউ করে এনেছি—

ততক্ষণে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিল দীপঙ্কর। সনাতনবাবুর যেন এতক্ষণে খেয়াল হলো, বললেন—কোথায় যাচ্ছেন দীপঙ্করবাবু—? এই চ্যাপ্টারটা শুনুন, এই চ্যাপ্টারটা পড়িয়ে শোনাই আপনাকে—

সনাতনবাবুর মা বললেন—তুমি আর ওকে ডেকো না সোনা, ওকে যেতে দাও—

বলে পেছন-পেছন বেরিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে এসে দীপঙ্কর কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারলে না। লম্বা বারান্দা। তার একপাশে ঘর, আর একপাশে চৌকো-চৌকো থাম। দুটো থামের ফাঁকে ফাঁকে বাগানের কিছু-কিছু নজরে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে।

সতীর শাশুড়ী বোধহয় দীপঙ্করের অসুবিধেটা বুঝতে পারলেন। বললেন—তুমি যেন কিছু মনে কোরো না আবার—

দীপঙ্কর পেছন ফিরে যেন কথাটার মানে বুঝতে চাইলে।

সতীর শাশুড়ী বললেন—তোমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললাম বলে কিছু যেন আবার ভুল বুঝো না বাবা—আমাদের এই ঘোষ-বাড়ির বংশে এ নিয়ম নেই—

দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করতে লাগল। তারপর বললে—কিন্তু আপনি ওকে পাগল কেন বলছেন বুঝতে পারছি না—

সতীর শাশুড়ী এবার গলা ছাড়লেন। বললেন—তা পাগল নয়? পাগল না হলে নিজের পেটের ছেলেকে মা হয়ে কেউ খুন করতে পারে?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। কথাটা শুনে এক-পা পেছিয়ে এসেছে। বললে—কী বলছেন?

সতীর শাশুড়ী বললেন—যা বলছি ঠিকই বলছি বাবা, নিজের পেটের ছেলেটাকে জলজ্যান্ত মেরে ফেললে?

তারপর দীপঙ্করের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আবার বললেন—অনেক দুঃখেই আমার মুখ দিয়ে এ-সব কথা বেরোচ্ছে আজ, নইলে তোমরা পাড়ার লোক, পাড়ার লোকের কাছে ঘরের কথা সাত-কাহন করে বলার মানুষ আমি নই, আমার সে-স্বভাবও নয়—তোমাকে বৌমা নিজে ডেকে এনেছে বলেই এত কথা বলতে হলো, আমার নিজের জ্বালায় জ্বলছি ওকে নিয়ে, এর মধ্যে তোমরা এসে আর আমার জ্বালা বাড়িও না বাবা, তুমি যাও এখন—

দীপঙ্করের আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ-চোখের দিকে চেয়ে আর কথা বলতে সাহস হলো না। এ কোন্ সংসার, এ কোন্ রহস্যের মধ্যে এসে পড়লো দীপঙ্কর! সতীকে দেখে বাইরে থেকে পাগলের কোনও লক্ষণই বোঝা যায়নি। সতীকে তো সহজ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কেন সে খুন করলে নিজের ছেলেকে। আর তার যে কোনদিন ছেলে হয়েছিল, তা-ও তো বলেনি সতী!

দীপঙ্করের মনে হলো, সত্যিই তো সতীর শাশুড়ীর কোনও অন্যায় নেই। যাকে সংসার করতে হয়, সে-ই সংসারের জ্বালা বোঝে। সতীর কী! সতী তো এ-সংসারের সামান্য বউ মাত্র। কিন্তু এই শাশুড়ীকেই তো বিধবা হবার প্রথম দিন থেকে এই সংসারের হাল চালাতে হচ্ছে। থাকুক না অজস্র টাকা, কিন্তু টাকাটাই তো সব নয়। একদিন সামান্য জাহাজটাকে একলাই চালিয়ে নিয়ে

এসেছেন এতদিন। এখন এই সংসার কার হাতে তুলে দিয়ে তিনি যাবেন। কার ওপর তিনি ভরসা করবেন! ছেলে তো লেখাপড়া, বই-বিদ্যে নিয়ে মেতে আছে। হয়ত ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়ের পর ছেলের বউকেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু হয়ত সতীকে তাঁর পছন্দ হয়নি। হয়ত সতী তাঁর মনোমত নয়। এ কী অদ্ভুত জগৎ, এ কী অদ্ভুত সংসার। এদের এ-সংসারে স্বামী হয়ত স্ত্রীর মনোমত নয়, স্ত্রীও হয়ত স্বামীর মনোমত নয়। আবার ছেলেও হয়ত মায়ের মনোমত নয়, মা-ও হয়ত ছেলের মনোমত নয়। আর পুত্রবধূ! সতী যেমন শাশুড়ীর মনোমত নয়, শাশুড়ীও তাই হয়ত সতীর মনোমত নয়। অথচ দিনের পর দিন এক সংসারে এক ছাদের তলায় একই সঙ্গে এদের বসবাস করতে হবে। ভালো না লাগলেও বাস করতে হবে। এ কী যন্ত্রণা! গেটটা পেরিয়ে যাবার সময় দীপঙ্করের মনে হলো, একদিন সাহেবপাড়ায় মিস্ মাইকেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও ঠিক এই কথাই তার মনে হয়েছিল। লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়েও এই একই কথা মনে হয়েছিল তার। বাইরে থেকে তো লক্ষ্মীদিকে দেখেও কেউ বুঝতে পারে না, মিস্ মাইকেলকে দেখেও কারো বুঝতে পারার কথা নয়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সতীদের বাড়িটা দেখেও তো বোঝবার কোনও উপায় নেই। তবে কি সবাই এক! গরীব বড়লোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভদ্র-অভদ্র সবাই! প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, গড়িয়াহাটা, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন-এর মধ্যে কোনও তফাৎ নেই? কোনও তফাৎ নেই কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ইংলন্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী, রাশিয়ার মধ্যে। মানুষের পৃথিবীতে এমনি করেই কি সর্বত্র অন্তরে হাহাকার আর বাইরে ছদ্মবেশের প্রলেপ!

দীপঙ্করের নিজের মতই যেন সবাই। ভেতরে ফুটো আর বাইরে জামা-কাপড়ের ফরসা চাকচিক্য! একদিকে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভাঙা বাড়িটার মধ্যে জীবনযাত্রার নির্লজ্জ পরিহাস আর অন্যদিকে আপিসে গদি-আঁটা চেয়ার-টেবিলের বিলাস-বৈভব! এইটেই কি সত্যি, এইটেই কি নিয়ম। আশ্চর্য! তেত্রিশ টাকার ঘুষের কনক্রীটের ওপরেই কি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবনের বুনিয়াদ!

—দীপু—দীপু—উ-উ-উ-উ—

হঠাৎ কানটা খাড়া করে একবার দাঁড়াল দীপঙ্কর। মনে হলো সতীর গলা ভেসে আসছে। যেন বাড়ির ভেতরের বারান্দা থেকে সতীর গলাটা ক্রমে আরো কাছে আসছে। সতী যেন দূরে থেকে তাকে ডাকছে। সে ডাক ক্রমে কাছে আসছে। আরো কাছে। আরো, আরো কাছে। অন্দর মহল থেকে বার-বাড়ি, বার-বাড়ি থেকে, বার-বাড়ির বারান্দা, বারান্দা থেকে বাগান, বাগান থেকে সদর গেট—এইবার হয়ত একেবারে দৌড়তে দৌড়তে রাস্তায় এসে তাকে ধরবে।

—দীপু—উ-উ-উ-উ—

দীপঙ্কর হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। আরো তাড়াতাড়ি। হাজরা রোডের মোড়ের ট্রাম রাস্তার লোকজনের ভিড়ের মধ্যে একবার মিশে যেতে পারলে আর তাকে খুঁজে পাবে না সতী। আর খুঁজে পাবে না দীপঙ্করকে। সতীর জীবন থেকে এবার চিরকালের মত হারিয়ে যাবে দীপঙ্কর। দীপঙ্করের মনে হলো, এ সংসারের যেন কোন অর্থ নেই, যেন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যি, সকাল বেলার জীবনটা যেন আপিসে যাবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। আপিসটা তৈরি হয়েছে যেন পা দুটোকে খানিক বিশ্রাম দেবার জন্যে! আর সন্ধ্যেবেলাটা! সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি যেন আপিস থেকে বাড়ি ফেরবার পর একটু অবসর যাপনের জন্যে। আর কিছু নয়। আর তারপর ঘুম। ঘুম না হলে পরের দিন আপিস যাবে কী করে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সেই একই চক্র। পৃথিবীর বুড়ো সূর্যটার মতই যেন অকারণে কেবল চক্রাকারে ঘোরা।

সতীর গলাটা তখন আর কানে আসছে না। রাস্তার ভিড় তখন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। হাজরা পার্কের দক্ষিণের এই ফুটপাথের ওপর বহুকাল আগে একবার প্রফেসর অমল রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন দীপঙ্কর যে-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল তাঁকে, সে-প্রশ্নটাই আবার কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো। সক্রেটিসের সেই কথাটা। কেন সংসারে ভালো লোকেরা কষ্ট পায়! কেন ভালো লোকেরা স্যাফার করে! কে তার কথার উত্তর দেবে। এই অগণিত জনতা, এই ট্রাম-বাস, দোকান-পাট, এই রাস্তা-ঘাট-পার্ক, ওই আকাশ-নক্ষত্র-চাঁদ, কার কাছে সে উত্তর পাবে! সক্রেটিস যদি বেঁচে থাকতেন আজ!

—স্যার আপনি এখানে?

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে দীপঙ্কর। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সসম্ভ্রমে। সার্ট-পরা, মালকোঁচা-মারা ধুতি, হাতে একটা গোল অ্যালুমিনিয়ামের খাবারের কৌটো। বোঝা গেল আপিসের ক্লার্ক কেউ হবে।

দীপঙ্কর বললে—তুমি এদিকে কোথায়?

ছেলেটি বললে—বায়োস্কোপ দেখতে এসেছিলাম স্যার এম্প্রেস থিয়েটারে—

কথাটা বলে চলে যাওয়াই উচিত ছিল ছেলেটার। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল। বললে—স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমি দু মাস ধরে লিভ-ভেকেন্সিতে কাজ করছি, এখনও পার্মানেন্ট ভেকেন্সিতে আমাকে দেওয়া হলো না—

আরো বোধহয় অনেক কথা গড়গড় করে বলে গেল। নিজের দুঃখের কথা, নিজের বি-এ পাশ করার কথা, নিজের সংসারের কথা। নিজের চাকরির কথা। নিজের সামান্য আয়ের কথা।

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তুমি ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছ? তেত্রিশ টাকা ঘুষ?

কিন্তু বলতে গিয়েও দীপঙ্করের মুখে কথাটা বেধে গেল। মুখের চেহারাটা ভালো করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। কোন্ সেকশন, কোথায় বাড়ি, কিছুই জিজ্ঞেস করলে না দীপঙ্কর। কিছুই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো না। দীপঙ্করের মনে হলো, এরা দীপঙ্করের চেয়েও যেন সুখী, দীপঙ্করের চেয়েও ভাগ্যবান। নইলে এত অভাবের মধ্যেও তো সিনেমা দেখতে এসেছে। এরা তো কই তার মত সংসারের কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় না। এরা কি সক্রেটিসের নাম শুনেছে, বাবাক্-এর নাম শুনেছে, থাইসন-এর নাম শুনেছে। এরা কি তার মত এই ট্রাম-বাস-পার্ক, এই দোকান-পাট-মানুষ, এই আকাশ-চাঁদ-নক্ষত্র নিয়ে মাথা ঘামায়। এরা কি প্রশ্ন করে কেন ভালো মানুষেরা কষ্ট পায় সংসারে! এরা কি জীবনের অর্থ খুঁজতে একলা-একলা ঘুরে বেড়ায় তার মত গড়িয়াহাটা, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে! খুঁজে বেড়ায় ইতিহাসের কেতাবে!

দীপঙ্কর ছেলেটিকে সরিয়ে দিলে। বললে—এ-সব কথা রাস্তায় হয় না—আপিসে দেখা করো—

আশ্চর্য, এখানেও আপিস! এখানেও আপিসের হাত থেকে মুক্তি নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলতে লাগলো দীপঙ্কর। হয়ত ওদের মতন হতে পারলেই ভালো হত। সংসারের বুকের ওপর বসে দেনা-পাওনার কড়ি নিয়ে মাথা ঘামাতো না। সব জিনিস কড়ি দিয়ে কিনতো আর দাম পেলেই বেচতো। কিন্তু যে-মানুষ সামাজিক, যে-মানুষ স্বাদেশিক, যে-মানুষ মানবিক—যে-মানুষ একাধারে সব, তার শান্তি কেমন করে হবে! তাকে শান্তি দেবে কে?

বাড়ির কাছে আসতেই দীপঙ্কর যেন চমকে উঠলো। বাড়ির সামনে যেন অনেক লোকের ভিড়। অন্ধকারে কাউকে বিশেষ করে চেনা যায় না। কিন্তু যেন কিছু একটা ঘটেছে। একটা কিছু বিপর্যয়।

কাছে আসতেই পুলিসের ভিড় দেখে আরো অবাক হয়ে গেল।

তবে কি ছিটে-ফোঁটার কাণ্ড! ছিটে-ফোঁটার ব্যাপারে পুলিস আসাটা কিছু বিচিত্র নয়। অনেক কাণ্ডর মধ্যে তারা জড়িয়ে থাকে। পুলিস-দারোগার সঙ্গে জীবনে তাদের অনেকবার মোলাকাত করতে হয়েছে। পুলিস-দারোগাকে ভয় করে চলবার মানুষ নয় ছিটে-ফোঁটারা।

তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবারই ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের। কিন্তু হঠাৎ ফোঁটা ডাকলে দূর থেকে।

বললে—এই যে দীপু এসে গেছে রে—এই দীপু—

দীপঙ্কর ভিড় ঠেলে কাছে গেল।

—কী হয়েছে এখানে!

ফোঁটা বিড়ি টানছিল। বললে—বিন্তীটার কাণ্ড শুনেছিস?

বিন্তীদি! বিন্তীদির আবার কী কাণ্ড হলো? বিন্তীদিকে পাওয়া গেছে

তাহলে?

ফোঁটা বললে—আয়, ভেতরে দেখবি আয়—

বলে ফোঁটা দীপঙ্করের হাত ধরে বাড়ির উঠোনে নিয়ে গেল।

ভেতরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা বুকফাটা কান্না যেন হঠাৎ সেই অন্ধকার রাত্রির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে দীপঙ্করকে গ্রাস করতে এল। পাশেই মা বসে ছিল বিন্তীদির মাথাটা ধরে। মাথার চুলগুলো একদিনেই জট ধরে গেছে। ধুলোয় লুটোচ্ছে। গলা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটার ওপর একটা চাদর বিছানো। স্থির নিশ্চল নিথর শরীর। বিন্তীদি যেন চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

দীপঙ্করকে দেখেই মা নতুন করে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ফোঁটা বললে—বোকার বেহদ্দ—

এতক্ষণে যেন জ্ঞান ফিরে এল দীপঙ্করের। পাশ ফিরে বললে—কে?

—আরে, বলা নেই কওয়া নেই, চুপি চুপি একলা গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে! কেউ টের পাইনি আমরা—

বড় অস্বাভাবিক লেগেছিল ছিটের কাছে, ফোঁটার কাছে। তাদের কাছে বড় বিচিত্র লেগেছিল বিন্তীদির এই আত্মবিলোপ! যেন তারা আশা করেনি এমন হবে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই অন্ধকার উঠোনের মধ্যে বিন্তীদির নশ্বর দেহটার সামনে দাঁড়িয়ে বিন্তীদির অপমৃত্যুটাকে দীপঙ্করের বড় সহজ বড় স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সেদিন। ছোটবেলা থেকে দেখা বিন্তীদিকেই যেন আবার নতুন করে দেখছিল সে। যেন আবার নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করছিল তাকে। সারা জীবন ধরে যে কথা বলেনি, সেই মেয়ে যেন হঠাৎ আজ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। যে-মেয়ে সব-সময়ে সকলকে ভয় করে এসেছে, আজ যেন সে হঠাৎ নির্লজ্জ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নির্ভীক হয়ে উঠেছে। এইটেই যেন বিন্তীদির পক্ষে স্বাভাবিক। একলা চুপি চুপি বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে তাই বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। অন্ধকার পাথর-পটির গলির মধ্যে গিয়ে তাই হয়ত তার পথ চিনতে কষ্ট হয়নি। তাই হয়ত বর্ষার গঙ্গার দিকে চেয়ে একবার দ্বিধাও করেনি। অমাবস্যার অন্ধকার যেমন অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে প্রকাশ করে দেয়, তেমনি নিবিড়তম দুঃখের মধ্যেও হয়ত তার আত্মা আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখতে পেয়েছিল। হয়ত তাই দেখেই বিন্তীদির মন বলে উঠেছিল—বুঝেছি, সব দুঃখের রহস্য আমি বুঝে ফেলেছি, আর কোনও সংশয় নেই, আর কোনও দ্বিধা নেই। সব সুখ-দুঃখের শেষপ্রান্ত যেখানে গিয়ে মিলেছে, সেখানে গিয়েই আমার হৃদয় অনন্ত দেবতার সন্ধান পাবে। অমৃত যাঁর ছায়া, মৃত্যুও যাঁর ছায়া, তাঁকে ছাড়া আর কার কথা ভাববো? তাঁকে ছাড়া আর কার কাছে আশ্রয় চাইবো—

তারপরেই হয়ত একটা শব্দ হয়েছিল গঙ্গার বুকে।

● আর ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে বিন্তীদি হয়ত তার অনন্ত দেবতার কাছেই পৌঁছিয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

কয়েকজন পুলিস-কনস্টেবল এসে ঢুকলো থানা থেকে। তারা এবার বিন্তীদিকে নিয়ে যাবে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তাকে নিয়ে।

মা কেঁদে উঠলো—ওগো, তোমরা ওকে কাটা-ছেঁড়া কোর না—

ছিটে বলল—না দিদি, কাটা-ছেঁড়া করবে না, শুধু এগজামিন করে নিয়েই আবার আমাদের মড়া আমাদেরই দিয়ে দেবে—

সত্যিই তো, মাকে কে বোঝাবে যে পুলিসেরও একটা দায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্য আছে। কেউ বিষ খাইয়ে মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতেও তো পারে! দীপঙ্কর আস্তে গিয়ে মাকে ধরে তুললো। বললে—ঘরে চলো মা, ও আর ভেবে কী হবে! যা হবার হয়ে গেছে—

মা হয়ত বুঝলো। মা তো দীপঙ্করের চেয়েও আরো বেশি দেখেছে। কত মৃত্যু অতিক্রম করে কত দুঃখের সমুদ্র পার হতে হয়—তবেই তো জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। বহুকাল আগে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সেই যে এক মহোৎসব শুরু হয়েছে, সেইখানেই তো আমরা এসে নিমন্ত্রিতের মতন দাঁড়িয়েছি। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সমস্তই যে সেই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে। জীবনের মহোৎসবের নিমন্ত্রণে এসে আমরা কত বিচিত্র স্বাদে কত বিচিত্র রূপে কত অভাবনীয় কত অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে কতবার আত্মহারা হয়ে উঠবো, তার কি শেষ আছে!

সেদিন সমস্ত রাত মা ঘুমোতে পারেনি। সকাল থেকে খায়নি কিছু। তারপর বিকেল থেকেই এই বিপর্যয়। সমস্ত বাড়িটাও এক-সময়ে নিঃঝুম হয়ে উঠলো।

মা-র ঘর থেকে নিজের ঘরে এসে দীপঙ্কর নিজেও ঘুমোতে পারলো না। মনে হলো শুধু বিন্তীদির অপমৃত্যুই নয়, শুধু লক্ষ্মীদির অধঃপতনই নয়, সতীর অপমানও নয়, কিছু নয়, এরা যেন সবই উপলক্ষ্য! দীপঙ্করের জীবন-যাত্রার পথের দু'ধারের সব জঞ্জাল। পথের ধারেই যেন এদের রেখে যেতে হয়—পথের ধারেই এদের সমাধি, পথের ধুলোতেই এদের পরিসমাপ্তি!

কিন্তু পরদিন আর কোনও কথা শুনলো না দীপঙ্কর।

একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল নিজেই। মাকেও নিয়ে এসে তুললো গাড়িতে। বললে—এখানে থাকলে আর তুমি বাঁচবে না মা, এখানে থাকলে তোমাকে আর আমি বাঁচাতে পারবো না—

মা-ও যেন আপত্তি করতে পারলে না আর।

ছিটে এল, ফোঁটা এল। তারাও যেন বিন্তীদির ঘটনার পর কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে।

বললে—যাবি? সত্যি সত্যিই যাবি?

দীপঙ্কর বললে—এবার আর বাধা দিও না তোমরা, এর পর এখানে থাকলে মা বাঁচবে না আর—

এই বাড়ি থেকে যাওয়া কি এতই সোজা! কথাগুলো বলতে বলতে দীপঙ্করের গলাটাও কেমন বুজে এল। আজ আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। যারা বাধা দিয়েছিল, সেই ছিটে-ফোঁটাও যেন আজ অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদেরও আর জোর খাটছে না যেন। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো ছিটে-ফোঁটা বাধা দিলেই যেন ভালো হতো। যেন একটু বাধা দিলেই দীপঙ্কর থেকে যায় এখানে। এই ছোটবেলা থেকে এত বড় হওয়ার স্মৃতি জড়ানো বাড়িটাতে।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—এখানে থাকবো বলেই তো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এর পর থাকি কী করে তোমরাই বলো?

কই, কিছু তো বলছে না ছিটে-ফোঁটা। কই, আগের বারের মতন তো টেনে নামিয়ে নিচ্ছে না গাড়ি থেকে! কেন ওরা প্রতিবাদ করছে না। কেন বলছে না—কী হবে গিয়ে? থাক্ না এখানে। থাকতে থাকতে সব সয়ে যাবে। আবার নতুন পাড়ায় গিয়ে, নতুন জায়গায় ভালো লাগানো শক্ত! গঙ্গা দূর হয়ে যাবে। লাভ কী গিয়ে!

দীপঙ্কর বললে—পুলিস থেকে যা বলে, আমি খবর নেব 'খন, আর অঘোর-দাদুর শ্রাদ্ধতেও আমি আসবো, তোমরা কিছু ভেবো না—

মা এতক্ষণে কথা বললে। বললে—চন্নুনীর সঙ্গে আর দেখা করলুম না বাছা, তোমরা বলে দিও আমি চলে গেছি—

তখনও কেউ কিছু বলছে না। ছিটে-ফোঁটা যে অত দুর্দান্ত লোক, তারাও যেন মনে মনে চাইছে দীপঙ্কর চলেই যাক্। দীপঙ্কর এখান থেকে দূর হয়ে যাক। আশ্চর্য! এই রকমই বোধহয় হয় সংসারে। এইটেই বোধহয় স্বাভাবিক! দীপঙ্করের মনে হলো তারা যেন তাকে তাড়িয়েই দিচ্ছে বাড়ি থেকে। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিচ্ছে। একবার বলুক না ওরা, শুধু আর একটি বার থাকতে বলুক না। তাহলে তো আর দীপঙ্কর যায় না। এতদিনের পাতা সংসার ছেড়ে আবার নতুন করে তাহলে সংসার পাততে হয় না। বলুক না সেই কথাটা। বলুক না যে চলে গেলে তারা কষ্ট পাবে!

—কী বললে?

মনে হলো যেন কী বললে তারা!

ছিটে বললে—না কিছু বলিনি—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে আসি?

তারপর পাঞ্জাবি ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলে। পাড়ার দু'একজন ভদ্রলোক অত ভোরে উঠে এসে দেখছিল। তারাও কিছু বলতে পারলে না। তাদের সকলের চোখের সামনে স্নেহ-প্রীতির সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে দীপঙ্কর চলতে লাগলো।

মনে আছে পরে গাঙ্গুলীবাবু শুনে বলেছিলেন—কেন? আপনার কষ্ট হলো কেন?

দীপঙ্কর বলেছিল—কী জানি, আমার মনে হলো ওরা যেন আমায় তাড়িয়ে দিলে মশাই! আমাকে আর একবার বললেই আমি গাড়ি থেকে নেমে ওই বাড়িতেই থাকতুম, আর যেতুম না কখনও—

আশ্চর্য! এই রকম মানুষই দীপঙ্কর! যেখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেখানে সম্পর্কটা চিরস্থায়ী করতে না পারলে যেন বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, বেদনা হয়। অথচ মুখে বললে সে-কষ্টটার কথা কেউ বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে এও এক ছলনা বুঝি দীপঙ্করের। এও এক-রকম মিথ্যাচার।

দীপঙ্কর বললে—অথচ দেখুন, এতদিন কেটে গেল, আর একদিনের জন্যেও যাইনি ও-বাড়িতে। সেই বিন্তীদির শেষ পর্যন্ত কী হলো, অঘোরদাদুর শ্রাদ্ধই বা কী রকম হলো, তা-ও দেখতে যাইনি!

ছিটে নিজে এসে নতুন ঠিকানায় নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। বলেছিল—যাস্ কিন্তু ঠিক্, খুব ঘটা করছি—সাত শো লোক খাবে—দিদিকে নিয়ে যাস্—

ছিটে-ফোঁটা দুজনেই একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছে।

বললে—মোল্লার চকের দই অর্ডার দিয়েছি। আর দত্তপুকুর থেকে ছানা আসছে—আর সোমবার দিন জ্ঞাত-ভোজন, বারাসত থেকে তিন-মণ পোনা মাছ আসছে, পোনা মাছের কালিয়া আর খাসীর মাংস করবো—কেমন হবে বল্ তো?

দীপঙ্কর ফিরিস্তি শুনে যাচ্ছিল। বললে—ভালোই তো—

ছিটে বললে—শ্রাদ্ধের দিন ছানার ডালনা আর ধোঁকার তরকারি করছি, আর দই সন্দেশ, রাবড়ি আর শেষকালে একটা করে ল্যাংড়া আম—কেমন হবে?

দীপঙ্কর এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

ছিটে বললে—কী রে, কথা বলছিস্ না কেন, বল্ কেমন আইটেম্ করছি—

দীপঙ্কর বললে—আমি আর কী বলবো, ভালোই তো!

ছিটে বললে—সবাই বলছে এত খরচ করবার দরকার কী?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলছি তোমাদের—

ছিটে বললে—না রে, তুই জানিস না, শালারা বলবার সময় ওই কথা বলবে, কিন্তু খারাপ খেতে দিলে আবার আড়ালে ঠুকবে। বলবে—নাতি দুটো ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধে একটা পয়সা খরচ করলে না। এ শালারা ভদ্দরলোকদের আমি খুব চিনে নিয়েছি, জানিস্, এর চেয়ে ছোটলোক শালারা ভালো, তারা নুন খাবে গুণও গাইবে!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আর বিন্তীদির শেষ পর্যন্ত কী হলো?

—কী আর হবে, তুই তো গেলিনে, আমাকেই সব করতে হলো! টাকা ছাড়লুম, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কিসের টাকা? টাকা কেন?

ছিটে বললে—টাকা লাগবে না? তুই বলছিস কী? টাকা না দিলে লাস্ দেবে কেন আমাদের?

দীপঙ্কর কেমন অবাক হয়ে গেল। এতেও টাকা? বেঁচে থাকলেও টাকা, মৃত্যুতেও টাকা! লাস্ তো পাওয়া গিয়েছিল লক্-গেট-এর ভেতর। বিন্তীদি ভাসতে ভাসতে একেবারে চেতলার মাটি-কাটা খালের লক্-গেটে গিয়ে আটকে ছিল। সেইখান থেকে পুলিস প্রথম আবিষ্কার করে বিন্তীদিকে। শাড়িটা ভেসে উঠেছিল জলের ওপরে। যারা ভোরবেলা বেড়াতে বেরোয়, তাদের নজরেই প্রথমে জিনিসটা পড়ে। কী যেন একটা ভাসছে। মেয়েমানুষের শাড়ি এখানে ভাসছে কেন? তারপর ভিড় জমে যায় ব্যাপারটা দেখতে। তারাই খবরটা দেয় আলিপুর থানায়। তারা ডোম নিয়ে এসে লাস্ তোলে। তারপর খোঁজখবর করতে করতে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ঠিকানাটা বেরিয়ে পড়ে। সেখান থেকেও একটা মেয়ের নিরুদ্দেশ হবার খবর ভবানীপুর থানায় ডায়েরী করে গিয়েছিল। সোজা কেস্, ঘোরপ্যাঁচ নেই এর মধ্যে! তবু টাকা লাগছে কেন?

ছিটে বললে—তা বললে শুনবে কেন? শেষকালে দিলুম নাকের ওপর পাঁচটা টাকা ফেলে—তারপর একেবারে জল্! সেই লাস নিয়ে ক্যাওড়াতলায় গিয়ে পুড়িয়ে এলুম—

কী সহজ সরলভাবে কথাগুলো বলে গেল ছিটে! বললে—ও নিয়ে আর ভাবি না বুঝলি, কপালে গচ্চা লেখা ছিল, গাঁট-গচ্চা—কে খণ্ডাবে বল?

তারপর একটু থেমে বললে—আর গচ্চা কি আজ প্রথম দিলুম রে, সারা জীবনটা তো গচ্চা দিতে দিতে গেল কেবল—সেইজন্যেই তো কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে গেছি—

—সে কি? কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছ তুমি?

ছিটে হাসলো দাঁত বার করে। বললে—শুধু আমি নই, ফোঁটাও হয়েছে—তোদের মাস্টার প্রাণমথবাবুর কাছে গিয়ে চার আনা চাঁদা দিয়ে জয়-মা-কালী বলে মেম্বার হয়ে গেছি—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তো জেল খাটতে হবে?

—তা খাটবো, জেলই খাটবো, জেল খাটতে তো পেছ্‌পাও নয় ছিটে-ফোঁটা, জেল তো এমনিতেই খাটছি, না-হয় ওমুনিতেও খাটবো!

—কিন্তু, কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে সুবিধেটা কী হবে তোমার?

ছিটে বললে—আরে দ্যাখ্ না, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘরে বসে মাল খাবো, তাতেও ঘুষ দিতে হবে—এ কী রাজত্বে বাস করছি বল্ দিকিনি আমরা! এ শালার স্বরাজ হলে ঘুষ থেকে তো অন্ততঃ বাঁচবো! আমরা তো সুভাষ বোসের সঙ্গে এক-হাজতে কাটিয়েছি। ও জে এম সেনগুপ্তর দলের লোকেরা যা-ই বলুক, লোকটা মাইরি সাচ্চা লোক, স্বরাজ হলে আর যাই হোক, ঘুষ তো আর দিতে হবে না—

কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললে—যাই, অনেক জায়গায় আবার ঘুরতে হবে—তা তুই যাস্ কিন্তু, দিদিকে নিয়ে যাস্—

বলে উঠলো ছিটে। বাড়িটার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে এদিক-ওদিক। বললে—কত ভাড়া দিস্ বাড়ির? কুড়ি টাকা?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

ছিটে বললে—কুড়ি টাকা? ভাড়াটা একটু বেশি, তা যাই হোক, স্বরাজ হলে এই বাড়ির ভাড়া দশটাকা করে দেব আমরা,—শালা ইংরেজরা না গেলে আর ভদ্দরলোকদের বেঁচে থেকে সুখ নেই—যাই—

বলে গাড়িতে উঠে চলে গেল ছিটে-ফোঁটা!

শেষ পর্যন্ত হয়ত শ্রাদ্ধবাড়িতে যেত দীপঙ্কর। একবার ইচ্ছেও হয়েছিল। অনেক দিনের সম্পর্ক। অনেক কিছু দিয়েছিল অঘোরদাদু! বলতে গেলে অঘোরদাদু না থাকলে হয়ত বড় হওয়াই হতো না শেষ পর্যন্ত। হয়ত সেই দু'মাস বয়সেই জীবন-লীলা ফুরিয়ে যেত দীপঙ্করের। মানুষটার মনের কোণে যতটুকু স্নেহ-প্রীতিই থাক্, সবটুকু পেয়েছিল শুধু দীপঙ্কর একলা। আর কেউ নয়। সেই তার আত্মার সদ্‌গতির জন্যে অন্ততঃ দীপঙ্করের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সকাল বেলাই একটা কাণ্ড হলো।

প্রতিদিন সকালে উঠে বাজার করে নিয়ে এসে দীপঙ্কর আপিসে চলে যেত ভাত খেয়ে। ছোটখাটো সংসার। বলতে গেলে দুজনের সংসার। মা যে সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে চলে এসেছে, তারপর থেকে যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যেন কথা কমে গিয়েছিল মুখে। এত সাধ ছিল মা'র, এত কল্পনা। কতদিন থেকে আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলে নিজে একটি বাড়ি ভাড়া করবে—আর মা হবে সেই সংসারের গৃহিণী। পরের বাড়ির রান্নার হাত থেকে মা বাঁচবে। মা ভেবেছিল তাতেই বুঝি স্বর্গ-সুখ। তাতেই বুঝি সমস্ত কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবে মা। কিন্তু দীপঙ্করও লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল—মা যেন চুপ করে কী ভাবে একলা-একলা। মা যেন নিজের জীবনের ভারে দিন দিন নুইয়ে পড়ছিল।

সেই ছোটবেলাকার মতন দীপঙ্কর মা'র কাছে আপিস থেকে এসে বলতো—মা, কী হয়েছে তোমার?

মা বলতো—কই কিছু হয়নি তো!

—তবে? এ-পাড়াটা কি খারাপ লাগছে তোমার?

—না খারাপ লাগবে কেন?

পুব দিকের রেল-লাইনের ওপারে কচুরিপানা ভর্তি সার-সার পুকুর। আর আশে-পাশে কয়েকটা চালাঘর। পাশেই রেলওয়ের গুডস্ শেড্। ওয়াগন থেকে মাল নামে ইয়ার্ডে। সেখান থেকে শেড্-এর ভেতরে ওঠে। পুবদিকের

বারান্দায় দাঁড়ালে স্পষ্ট রেলের কাজকর্ম দেখা যায়। এতদিন রেলের চাকরি করছে দীপঙ্কর, অথচ নিজের চোখে রেলগাড়ি দেখবার সুযোগ কবারই বা হয়েছে? মা'র কত সাধ ছিল ছেলে রেলের চাকরি করলে ছেলের পাশে তীর্থ দর্শন করবে। কাশী গয়া বৃন্দাবন যাবে। কিন্তু এতদিন অঘোরদাদুর জন্যে কোথাও যাওয়া হয়নি। কার ওপর অঘোরদাদুর ভার দিয়ে যাবে! বিন্তিদিই বা কার কাছে থাকবে! কিন্তু এখন? এখন তো আর কোনও বন্ধন নেই, এখন তো আর বাধা দেবার কেউ নেই।

—একবার কোথাও যাবে মা? তুমি যে কত বলতে তীর্থ করবার কথা।

মা বলতো—না বাবা, কোনও তীর্থের দরকার নেই আমার, তুই-ই আমার তীর্থ, তুই-ই আমার কাশী গয়া—

আশ্চর্য! অঘোরদাদুর বাড়িতে রান্না করতে করতে কতদিন অনুযোগ করেছে অভিযোগ করেছে মা। চিরকাল রান্না করতে পারবে না বলে কত বক্ বক্ করেছে মা চন্নুনীর কাছে। অথচ আজও নিজের হাতে রান্না করতে মার এতটুকু ক্লান্তি নেই।

দীপঙ্কর বলেছিল—একজন লোক বরং রাখি, সে-ই রাঁধবে, তুমি বরং জপ্ তপ্ আহ্নিক নিয়ে থাকো—

মা বলেছে—না বাবা, রাঁধতে আমার কষ্ট নেই—

—কিন্তু এমন করে সারাজীবনই কি তুমি ভাত রেঁধে যাবে কেবল?

মা বলেছে—আমি মরলে তুই বরং ঠাকুর রাখিস্ একটা—

অঘোরদাদু আর বিন্তিদির মৃত্যুর পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে মা। অর্থাৎ এ-বাড়িতে আসবার পর থেকেই যেন মা অন্যরকম হয়ে গেছে। সকাল বেলাই কলে জল আসে। সেই অত ভোরেই মা চান করে নেয়। তারপর উনুনে আগুন দিয়ে ঠিক আগেকার মত ভাত চড়িয়ে দেয়। দীপঙ্কর তখন চাকরটাকে নিয়ে বাজারে চলে গেছে। নতুন চাকর। ছোট্ট ছেলে। মেদিনীপুর না কাঁথি—কোথায় যেন বাড়ি।

দীপঙ্কর ডাকে—কাশী—

কাশী এসে দাঁড়ায় বাজারের ঝাড়ন নিয়ে।

দীপঙ্কর বলে—তোর আসল নামটা কী রে? কাশীনাথ না কাশীশ্বর না কাশীপতি?

কাশী হাসে। বলে—শুধু কাশী—

—শুধু কাশী কি রে। শুধু কাশী কারো নাম হয়!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু কাশী!

ছেলেটার বাপও নেই, মাও নেই। দীপঙ্করের চেয়েও দুঃস্থ। দীপঙ্করের চেয়েও অনাথ। কাশীকে দেখে দীপঙ্করের নিজের কথাই মনে পড়ে। কাশীর মতই দীপঙ্কর একদিন নিঃস্ব ছিল, সহায়সম্বলহীন ছিল, অনাথ ছিল। তফাৎ

শুধু দীপঙ্করের মা ছিল, কাশীর মা নেই।

সংসারের কাজে ঝঞ্ঝাট ঝামেলা থাকেই। ঝঞ্ঝাট ছাড়া সংসার হয় না। মাঝে মাঝে মা-ও কাশীকে বকে। মা-ও মেজাজ খারাপ করে। বলে—বসে তো আছিস্, বলি ততক্ষণে ঘরগুলো ঝাঁট দিতে পারিস না—

তারপর আবার হয়ত মা রান্নাঘর থেকে ডাকে—কাশী, ও কাশী—

কাশীর কোথাও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। হঠাৎ কখন কোথায় যে থাকে, তারও ঠিক থাকে না। ছোট ছেলে, হয়ত বাইরে দোকান থেকে কিছু আনতে গেছে। তারপর রাস্তায় কিছু মজা দেখে সেখানেই জমে গেছে। যখন বাড়িতে এল, তখন মা'র উনুন কামাই যাচ্ছে। কাশী আসতেই মা ঝাঁজিয়ে উঠলো—কোথায় গিছলি রে তুই, গেছলি কোথায় বল্?

কাশী বলে—আমি তো দোকান থেকে সরষের তেল আনতে গিয়েছিলাম—

সরষের তেল আনবার কথা মা ভুলে গিয়েছিল। তবু দমলো না মা। বললে—সরষের তেল আনতে গিয়েছিলি—তা এতক্ষণ? এই এক ঘণ্টা? মাইনে দেওয়া হচ্ছে না তোমাকে? ছ' টাকা যে মাইনে দেওয়া হচ্ছে তোমায়, সে কি মুখ দেখে?

এক-এক সময় মা'র বকুনি দেখে দীপঙ্করও অবাক হয়ে যেত। এমন তো ছিল না মা। এমন মেজাজ তো মা'র ছিল না আগে! একদিন মা-ই ছিল অঘোরদাদুর বাড়িতে আশ্রিতা, আজ মা-ই হয়েছে মালিক। একদিন মা'র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল অঘোরদাদু, আজ মা-ই হয়েছে আবার কাশীর দণ্ডমুণ্ডের মালিক। মালিক হলেই কি এমনি হতে হয়! ঘরের ভেতরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দীপঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাশীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। মুখটা কেমন ম্লান হয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে চেহারাটা বকুনি খেয়ে। আহা! কেউ ওকে লেখাপড়া শেখায়নি। ওকে লেখাপড়া শেখাবার কেউ নেই। অঘোরদাদু দীপঙ্করকে লেখাপড়ার খরচ দিয়েছিল, তাই দীপঙ্করের লেখাপড়া হয়েছে। চাকরি হয়েছে। কাশীকে দেখে দীপঙ্করের নিজের কথাই বার বার মনে পড়ে যায়। অঘোরদাদু না থাকলে তাকেও তো এই রকম কাশীর মতন পরের বাড়িতে চাকরের কাজ করে পেট চালাতে হতো। তাতে আর কাশীতে তফাত কী! দীপঙ্কর না-হয় মোটা মাইনে পায়, কিন্তু তাতে কী!

মা ধমক দিয়ে বলে—কোন্ কম্মে আছো তুমি শুনি? বাবুর জুতোটায় একটু রং দিতে পারো না? কেবল খাবার কুমীর?

তাড়াতাড়ি রং আর বুরুশটা নিয়ে কাশী পায়ের সামনে বসে জুতো রং করতে লেগে যায়।

মাঝে মাঝে দীপঙ্করের মনে হয় মাকে একটু বুঝিয়ে বলে। বুঝিয়ে বলে যে—মা, ও-ও তো মানুষ, ওরও তো একটু বিশ্রাম দরকার, ওরও তো একটু খেলা করতে ভালো লাগে, ও-ও তো আমার মত অনাথ—

কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে যায়। দরকার নেই। এতদিন পরে মা একটু কর্তৃত্ব

করতে পেরেছে, এতদিন পরে অন্তত একজনের ওপরেও নিজের মালিকানা আরোপ করতে পেরেছে। বললে হয়ত মা সব কথা বুঝবে না। সারা জীবন মা পরের কর্তৃত্ব মেনেই চলেছে, পরের খেয়াল-খুশির তাঁবেদারি করে চলেছে, এই এতদিন পরে মুক্তি হয়েছে মা'র, মা যদি কাশীকে একটু বকেই, তাতেই বা কী! দীপঙ্কর চোখ-কান বুজে থাকলেই পারে। কিন্তু পৃথিবীর সব দিকে চোখ-কান খোলা রাখা যার স্বভাব, সে কেমন করে সব দেখেও চুপ করে থাকতে পারবে!

আড়ালে কাশীকে ডেকে বলে—হ্যাঁরে, কাশী, তোর কষ্ট হচ্ছে?

—না বাবু, কিসের কষ্ট!

কাশী বুঝতে পারে না। দীপঙ্করের মত নরম মন নয় বলেই হয়ত কষ্ট-বোধটা তার এত তীব্র নয়। কিন্তু কষ্ট যা, তা কষ্টই। বোধ থাকুক আর না-থাকুক। শীতে কাশী হি-হি করে কাঁপলে দীপঙ্করেরই যেন শীত করে, বর্ষায় বেশী ভিজলে দীপঙ্করেরই যেন গা শপ্-শপ্ করে। কাশীর কষ্ট দেখলে দীপঙ্করের নিজেরই কষ্ট হয় যেন। দীপঙ্করের কেমন মায়া হয় কাশীটার জন্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে গেঞ্জি কিনে এনে দেয় কাশীকে। বলে—নে পর এটা—

তারপর চুপি চুপি বলে—মাকে যেন বলিস নি আমি দিয়েছি এটা—

তারপর ঘরে নিয়ে গিয়ে বলে—দ্যাখ, একটা কথা শোন্—

কাশী বুঝতে পারে না দাদাবাবু কী বলবে। কাছে এসে দাঁড়ায়। একটু ভয়ও হয় বুঝি তার।

দীপঙ্কর বলে—দ্যাখ, মা যদি তোকে বকে, তুই যেন কিছু মনে করিস নি, মা'র তো বয়েস হয়েছে, বুড়ো মানুষ তো, একটু বকলে তোর ক্ষতি কী, বুঝলি?

কাশী মাথা নাড়ে।

—আর দ্যাখ, মা যদি তোকে পেট ভরে খেতে না দেয় তো আমাকে বলবি, বুঝলি। আমি তোকে পয়সা দেব, দোকান থেকে খেয়ে আসিস—বুঝলি? বুঝলি তো?

কাশী আশ্বাস পেয়ে চলে যায়। কিন্তু দীপঙ্করের মনে হয় এ-ও যেন স্বার্থপরতা! এ-ও আর-এক রকমের স্বার্থপরতা! কাশীর ভাল করাটা যেন উপলক্ষ্য। আসলে দীপঙ্কর নিজের স্বার্থেই কাশীকে সন্তুষ্ট করতে চায়? কাশী চলে গেলে তো তারই ক্ষতি! তার মায়েরই ক্ষতি! কাশী চলে গেলে তো দীপঙ্করকে নিজেকেই দোকানে ছুটতে হবে, বাজারে ছুটতে হবে। কিন্তু আসলে সে কাশীর ভালো চায়, না নিজের ভাল চায়? নিজের আরাম চায় বলেই তো কাশীকে এত ভালবাসে দীপঙ্কর। ভালবাসার ভান করে। আসলে দীপঙ্কর তো ভাল নয়—স্বার্থপর, ভণ্ড শয়তান। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কাশীর কাছেও ভালোমানুষ সাজে সে। ভাবতে ভাবতে আবার কেমন ঝিমিয়ে পড়ে দীপঙ্কর।

আবার আপিস গিয়ে খানিকক্ষণ নিস্তেজ হয়ে বসে থাকে! সে ক'দিন কিছুই ভালো লাগে না। সমস্তক্ষণ কেবল মনে হয়, সে ফরসা জামা-কাপড় পরে ভদ্রলোক সেজে বেড়াচ্ছে—আসলে সে নীচ, সে হীন, সে পশু!

সেদিন সকাল বেলাই কাণ্ডটা ঘটলো। একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে—

কাশী সদর দরজা খুলে দিলে। বললে—হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকেন—

আর কথাবার্তা নেই। দীপংকর তখন জামা-কাপড় পরে আপিস যাবার জন্যে তৈরি। নতুন এজেন্ট এসেছে আপিসে। আজকাল ঘন-ঘন ডাক আসে ক্রফোর্ড সাহেবের কাছে। মিস্টার ঘোষালের মত লোকও ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে। দিল্লী থেকে এক-একটা জরুরী চিঠি আসে, আর আপিসসুদ্ধ তোলপাড় পড়ে যায়। নতুন সাইডিং হবে কোথায়, কোথায় নাইনটি পাউন্ড রেল-লাইন তুলে একশো কুড়ি পাউন্ড করা হবে, তারই জোর তলব। একটু দেরি হলে চলবে না। মিস মাইকেলেরও কাজ বেড়ে গেছে। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সবাই মিলে মিটিং হয়। তারপর দু-তিন দিন একসঙ্গে কনফারেন্স করে চিঠি ড্রাফট্ করতে হয়। কিন্তু একটা ঝঞ্ঝাট মিটতে-না-মিটতে আর-একটা ঝঞ্ঝাট এসে হাজির হয়। তখন আবার মিটিং আবার কনফারেন্স!

মিটিং-এ কিছু কথা উঠলেই রবিনসন্ সাহেব বলে—অল্ রাইট, সেন ক্যান ডু ইট্—সেন সব পারে—!

তারপর সেনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় কাজ। কত ওয়াগন ডক্-এ হ্যান্ড-ওভার করা হয় রোজ, তার স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে। সেন তৈরি করবে। লাস্ট ইয়ারে কত ওয়াগন ডেলিভারি হয়েছে, আর এ-বছরে এই ছ' মাসে কত হয়েছে, তার নিখুঁত হিসেব চাই। এক দিনের মধ্যে।

চীফ ইঞ্জিনীয়র বলে—ট্রিট্ দিস্ য়্যাজ মোস্ট আর্জেন্ট—

দীপংকর রামলিঙ্গমবাবুকে ডেকে পাঠায়। রামলিঙ্গমবাবু বলে—এ-কাজ আজকের মধ্যে কী করে হবে স্যার? এখন তো তিনটে বেজেছে—

দীপংকর বলে—কী করবো বলুন, বোর্ডের রিপ্লাই কাল পাঠাতেই হবে—

রামলিঙ্গমবাবু কিছু না-বলে নিজের সেকশানে গিয়ে বলে—আজ কেউ পাঁচটার সময় বাড়ি যেতে পারবে না—বীরেশবাবু, পঞ্চাননবাবু, কালীপদবাবু, সব এখানে আসুন—

—কেন?

—সেন-সাহেবের অর্ডার। এই স্টেটমেন্ট তৈরি করে তবে যাবে সবাই।

সবাই ফোঁস করে উঠলো। তার মানে? পাঁচটা তেইশের পাশকুড়া লোক্যাল ছাড়লে কোন্ ট্রেনে বাড়ি যাবো শুনি? ছটা ছাপ্পান্ন? ছটা ছাপ্পান্নয় গেলে

বাড়ি পৌঁছাতে তো সেই যার নাম রাত ন'টা। তারপর খরচ-পাতি নেই—বাড়ির লোক ভাববে না? তাছাড়া আপিসে চাকরি করতে এসেছি বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি সাহেবরা? এই বেলা তিনটের সময় দেড় বছরের পুরোন স্টেটমেণ্ট তৈরি করতে হবে! সাহেবদের কী! তাদের তো সংসার দেখতে হয় না, তাদের তো বাজার করতে হয় না। তারা বুঝবে কী করে আমাদের জ্বালাটা!

—তাহলে আপনারা সেন-সাহেবকে বলুন গিয়ে, আমি কী করবো!

—হ্যাঁ, যাবো তো, এখ্খুনি গিয়ে বলবো।

কিন্তু আশ্চর্য কেউ সেন-সাহেবের কাছে যায় না। কারোরই সাহেবের সামনে গিয়ে বলবার সাহস নেই। মাথা গুঁজে স্টেটমেণ্ট তৈরি করে। বকেয়া কাজ ফেলে রেখে সেকশানসুদ্ধ লোক স্টেটমেণ্ট নিয়ে বসে। পুরোন এক-বছর দেড়-বছর আগেকার সব ফাইল। ধুলো ময়লা জমেছে। ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাবুদের জামা-কাপড়, ধুতি-সার্ট ধুলোয়-ধুলো হয়ে যায়।

ওদিক থেকে ক্রফোর্ড সাহেব তাগাদা দেয়—ইজ ইট রেডি সেন? এত দেরি হচ্ছে কেন?

সাহেবদের ঘরে টি আসে, কফি আসে, স্যান্ড্ আসে আর মিটিং বসে। তারপর এক-সময়ে আর ধৈর্য থাকে না কারো। সাহেবরা চলে যায়। পরের দিন আর্লি আওয়ার্সে এসে যেন সব রেডি থাকে। তখন পেলেই চলবে। কিন্তু সেকশানে পুরোদমে তখন কাজ চলছে। সন্ধ্যে ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো। রাত আটটা বাজলো।

হঠাৎ রামলিঙ্গমবাবু ঘরে ঢুকলেন আবার। হাতে একটা দশ টাকার নোট। বললেন—সেন-সাহেব মিষ্টি খেতে দিয়েছে আপনাদের, এই নিন—

এত যে রাগ, এত যে গজ্-গজানি, সব জল হয়ে গেল দশ টাকার ঘুষ পেয়ে। বাবুদের মুখে হাসি ফুটলো। চাপরাশি দশ টাকার সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি, রসগোল্লা, চা নিয়ে এল সেই রাতে আটটার সময়। বাবুরা গপ্ গপ্ করে গিলতে লাগলো সেই ঘুষ। দশ টাকার ঘুষ দিয়ে দীপঙ্কর সেকশানের বাবুদের কিনে নিলে। রাতারাতি ভালো হয়ে গেল মানুষটা! রাতারাতি দেবতা হয়ে গেল দীপঙ্কর সেন। রাত ন'টার সময় সেই স্টেটমেণ্ট তৈরি করে বাবুরা লাফাতে লাফাতে বাড়ি চলে গেল! কিন্তু যে-স্টেটমেণ্টের জন্যে এত চা, কফি, সিঙাড়া, কচুরি খরচ হলো, সেই স্টেটমেণ্টই আর দরকার হলো না। পরদিনই বোর্ড থেকে টেলিগ্রাম এল প্রোজেক্ট ক্যানসেলড্। লেটার ফলোজ!

এমনি করেই রোজ একটা-না-একটা হুলস্থুল কান্ড বাধে। তখন মনে হয় দিন বুঝি আর কাটবে না—চাকরি বুঝি আর টিকবে না। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। আবার ঢিমেতালে চলে আপিস। আবার হৃদয় চাপরাশি পাঁঠার চপ্ আর হুদানি নিয়ে ঘরে-ঘরে ফিরি করে বেড়ায়। আবার রবিনসন্ সাহেবের কুকুরের অসুখ করে। আবার রেকর্ড সেকশান থেকে একটা চিঠি ট্রানজিট

সেকশানে আসতে চৌদ্দ দিন লাগে। আবার সকলের তলব পড়ে সাহেবের ঘরে। আবার বোর্ড থেকে জরুরী চিঠি আসে। আবার মিটিং, আবার কনফারেন্স। আবার চা, সিঙাড়া, কচুরি, রসগোল্লা ঘুষ দিতে হয়। আবার বাবুরা খুশী হয়।

এমনি করেই চলছিল। এমনি করেই হয়ত বরাবর চলবে আপিসের কাজ। তবু নতুন এজেণ্ট আসার পর আবার আপিসে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। আবার হাঁক-ডাক শুরু হয়েছে!

সেদিন তাড়াতাড়িই আপিস যাচ্ছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ কাশী বললে—ঘোড়ার গাড়িতে একজন বাবু এসেছে—

বাবু! কে বাবু?

কাশী বললে—সঙ্গে একজন মেয়েমানুষও আছে—

ততক্ষণে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছে ভদ্রলোক। তিন টাকা ভাড়া হয়েছিল হাওড়া স্টেশন থেকে কালিঘাট। কালিঘাট ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন পর্যন্ত। কিন্তু সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে আবার এই জায়গা পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল গাড়োয়ানের। বললে—সাড়ে তিন টাকা দিচ্ছি তবু হবে না? আমাকে কি পাড়াগেঁয়ে লোক পেয়েছ? নেবার হয় নাও, নয়তো চলে যাও, আমি আর একটি পয়সা দেব না—

গাড়োয়ান বললে—পুরোপুরি চার টাকা না দিলে আমি যাবো না বাবু, চার টাকাই দিতে হবে, অনেক ঘুরেছি—

—এ তো দেখছি মহা জ্বালা হলো!

তারপর পাশের দিকে চেয়ে বললে—ওরে ক্ষিরি, তুই যা। তুই বাড়ির ভেতরে যা দিকি—তোর জ্যাঠাইমাকে গিয়ে বল্ তো গাড়োয়ান ঝামেলা করছে বড়—

দীপঙ্করের মা এসে অবাক। এ কে? এরা কারা?

ভদ্রলোক কিন্তু এক নিমেষেই চিনতে পেরেছে। বললে—আমায় চিনতে পারছো না বৌদি, আমি সন্তোষ—

সন্তোষ! তবু চিনতে পারলে না মা। ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিলে মুখের ওপর। ভদ্রলোকের গায়ে ছিটের সার্ট। পায়ে ডার্বি জুতো। উঁচু কাপড়। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। আর পাশে একটি ফুটফুটে মেয়ে। মাথায় বেড়া-বিনুনী খোঁপা। একটা কাঁচপোকার টিপ্ কপালে। একটা ডুরে শাড়ি পরেছে। পায়ে আলতা।

সন্তোষ বললে—ওরে ক্ষিরি, তোর জ্যাঠাইমাকে পেন্নাম কর্—পেন্নাম করতেও শিখিয়ে দিতে হবে?

—থাক্, থাক্, বাছা—

চিবুকে হাত দিয়ে মা একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে।

সন্তোষ বললে—যাই বলো বৌদি, তোমাদের কলকাতার গাড়োয়ানরা কিন্তু

বড় বদমাইস, তিন টাকায় রফা হলো, আমি আট গণ্ডা পয়সা বখশিস দিচ্ছি, তাতেও খুশী নয়—

বলে চামড়ার ব্যাগ বার করে পুরোপুরি চারটে টাকাই দিয়ে দিলে। তারপর বললে—তোমার চাকরটাকে বলো না বৌদি, মালগুলো নামিয়ে নিক—

মাল মানে টিনের তোরঙ্গ একটা আর একটা পাকা কুমড়ো আর কয়েকটা ঝুনো নারকোল। কাশী কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে নামিয়ে নিলে ট্রাঙ্কটা আর পুঁটলিটা।

সন্তোষ বাড়ির মধ্যে ঢুকে বললে—আমাকে তুমি চিনতে পারোনি বৌদি ঠিক—

সত্যিই মা তখনও চিনতে পারেনি।

সন্তোষ বললে—কে বল তো?

মা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সন্তোষ বললে—সে কি আজকের কথা বৌদি, সম্পর্ক তো রাখলে না আর দেশের সঙ্গে। ভাবলাম বৌদি যদি সম্পর্ক না-ই রাখে তো আমরা রাখবো না কেন? তাই ক্ষিরিকে নিয়ে চলে এলাম রেলে চড়ে—

মা বললে—রসুলপুরের সন্তোষ তুমি!

—দেখ দিকিনি! এতক্ষণ লাগলো চিনতে! তবু যা হোক চিনতে পারলে এই-ই যথেষ্ট—

মা বললে—তা এই তোমার মেয়ে নাকি?

সন্তোষ বললে—মেয়ে নয় বৌদি, গলার কাঁটা—

—তা আমার জা কোথায়? জাকে নিয়ে এলে না যে?

সন্তোষ বললে—জা কি আর আছে বৌদি! এই গলার কাঁটাকে রেখে পালিয়েছে আমাকে জ্বালাতে—

—সে কি! এই এতটুকু দেখেছি তোমাকে সন্তোষ, কবেই বা বিয়ে করলে, আর কবেই বা মেয়ে হলো, কিছুই জানি না।

সন্তোষ বললে—দিন যে হু-হু করে যাচ্ছে বৌদি, দিন কি কারো জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তা বেশ বাড়ি তোমার বৌদি, ভাবলাম কলকাতায় গিয়ে তবু একটা ওঠবার জায়গা হলো, কী দিনকাল যে পড়েছে! তা পা ধোবার জল কোথায় বল দিকিনি—কাল রাত্তির বেলা কাদা মাড়িয়ে রেলে উঠিছি, আর পা ধোবার জল পাইনি—

কাশী জল দিলে। পা ধুতে লাগলো সন্তোষ। জুতো জোড়াও ধুতে লাগলো। বললে—ও ক্ষিরি পা ধুবি তো ধুয়ে নে মা—

দীপঙ্কর আপিসের জামা-কাপড় পরছিল। মা কাছে আসতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ওরা কারা মা?

মা বললে—তুই ওদের চিনবি না, রসুলপুরের লোক—সম্পর্কে ঠাকুরপো—

নিচে থেকে সন্তোষ তখন ডাকছিল—ও বৌদি, কোথায় গেলে?

মা বললে—এই দীপু আপিস যাচ্ছে ঠাকুরপো, তুমি একটু বোস, আমি যাচ্ছি—

দীপঙ্কর বললে—মা তুমি যাও, আমার কিছু দরকার নেই, ওদের আবার খাবার যোগাড় করতে হবে বোধহয়—

মা নিচেয় আসতেই সন্তোষ বললে—এই কুমড়োটা আমার ভিটের কুমড়ো, ভাবলাম দেশের কুমড়ো খেতে বৌদির হয়ত ভালো লাগবে—খেয়ে দেখো মিষ্টি একেবারে গুড়—ও ক্ষিরি, কুমড়োটা বার কর তো মা পোঁটলা খুলে—

তারপর খানিক পরে সন্তোষ আবার বললে—দুটো কুমড়ো আনবার ইচ্ছে ছিল, বুঝলে বৌদি, কিন্তু আনা কি অত সহজ কথা—রেল ইস্টিশান কি এখানে—দু' মাইল হেঁটে তবে ইস্টিশানে আসতে হয়—আর যা কাদা—

মা বললে—তা মেয়ের বিয়ের ঠিক করেছ কিছু?

সন্তোষ বললে—সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলুম বৌদি—তুমি যদি একটা হিল্লে করে দিতে পারো—

—তা গাঁয়ে পাত্র পেলে না সন্তোষ। গাঁয়ে দত্তরা তো মস্ত বড় বংশ। ওদের বলে কয়ে কারো সঙ্গে দু' হাত এক করে দিলে না কেন?

সন্তোষ বললে—গাঁয়ের কথা আর বলো না বৌদি, গাঁয়ের নাম কোর না, সে গাঁ আর নেই; নেহাৎ উপায় নেই বলে গাঁয়ে পড়ে আছি, নইলে ঝাঁটা মারি অমন গাঁয়ের মুখে, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না, কেউ কারো নাম সইতে পারে না, মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে আমিও বেরিয়ে পড়বো গাঁ থেকে—দেখে নিও—

মা বললে—বেরিয়ে পড়ে কোথায় যাবে?

—এই যেদিকে দু' চোখ যায় বেরিয়ে পড়বো। আমি তো সেই কথাই বলি সকলকে। বলি, তোমরা সতীলক্ষ্মীকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিলে, এ গাঁয়ের কি আর ভালো হবে ভেবেছ, সব উচ্ছন্নে যাবে, তা উচ্ছন্নে যাচ্ছেও সবাই—

মা বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও সন্তোষ, আমি জীবনে কারো মন্দ করিনি, জীবনে কখনও কাউকে মন্দ কথা বলিনি, মাথার ওপর ভগবান আছেন, তাঁর দিকে চেয়েই চলেছি—

তারপর একটু থেমে বললে—তা তুমি আজকে থাকছো তো?

সন্তোষ বললে—কী যে তুমি বলো বৌদি, থাকবো না তো যাবো কোথায়? থাকতেই তো এইচি—

মা বললে—তা হলে চান-টান করে নাও—আমি তোমাদের চাল নিই—

সন্তোষ বললে—নাও নাও চাল নাও—আমার জন্যে একটু বেশি করে চাল নাও বৌদি, আমি একটু বেশি ভাত খাই, তা জানো তো—আর মুড়ি আছে?

—মুড়ি?

—হ্যাঁ, সেই কাল রাত্তিরে বেরিয়েছি, তারপর থেকে আর পেটে তো কিছু

পড়েনি, আমাকেও দাও, আর ক্ষিরিকেও দুটি দাও—

ক্ষিরি এতক্ষণ দরজার চৌকাট ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, বাবার কথা শুনছিল। এতক্ষণে কথা বললে—আমাকে দিতে হবে না জ্যাঠাইমা, বাবাকেই দাও—

সন্তোষ বললে—কেন? খা না, খেতে দোষ কী? রসুলপুরের মুড়ি খেয়েছিস্, এখন কলকাতার মুড়ি খেয়ে দেখ্ না, দেখবি কলকাতার মুড়ি কত মিষ্টি—

দীপঙ্কর দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা পার হয়ে সদর দরজার দিকে যেতে হবে। সন্তোষ চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—এই তোমার ছেলে বুঝি বৌদি?

দীপুর মা বললে—হ্যাঁ—দীপু, ইনি তোমার সম্পর্কে কাকাবাবু হন্, প্রণাম করো এঁকে—

সন্তোষ বসে ছিল পা মুড়ে। কথাটা শুনেই পা দু'টো দীপুর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

দীপু সেই কাকাবাবুর কাদা ধুলো মাখা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই, সন্তোষ বললে—বাঃ, বেশ দিব্যি ছেলে তোমার বৌদি, সেই দু' মাস বয়েসে দেখেছিলুম, আর আজ দেখলুম—

মা বললে—হ্যাঁ, তাই আশীর্বাদ করো ঠাকুরপো, যেন ওকে সুস্থ রেখে যেতে পারি, আমি—

—বেশ ছেলে তোমার! কী নাম তোমার বাবা?

মা বললে—মনে আছে সেই জমিদার-বাড়ির নাতি হলো, তার নাম রেখেছিল দীপঙ্কর, তাই আমার ছেলেরও নাম রেখেছি দীপঙ্কর—রেলে চাকরি করছে এখন—

—বাঃ বাঃ, তা কত মাইনে পাচ্ছে এখন?

সন্তোষ এতক্ষণে পা দু'টো গুটিয়ে নিলে। এতক্ষণে দীপঙ্করের আপাদ-মস্তক ভালো করে দেখে নিলে আর একবার। সেই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বৌদির এমন সোনারচাঁদ ছেলে হবে, তা যেন কল্পনাও করতে পারেনি সন্তোষ-কাকা। শুনেছিল ছেলের চাকরি হয়েছে, কোন্ এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে ছেলেকে মানুষ করেছে বৌদি। সেই ছেলের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেই এসেছিল। কিন্তু সে-ছেলে যে এমন কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছে তা রসুলপুরের সন্তোষ-বিহারী মজুমদারের জানার কথা নয়।

—তা ভালোই হলো বৌদি, দ্যাখো দিকিনি কাণ্ড, আমি ক্ষিরির পাত্তোরের জন্যে হিল্লী-দিল্লী খুঁজে বেড়াচ্ছি আর এদিকে তোমার ছেলেই যে রয়েছে, তা মাথায় ঢোকেনি।—যাও বাবা, আপিসে যাও, দেরি কোর না, চাকরি হলো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে নেই, গাঁয়ের লোক ক্ষিরির কপাল দেখে একেবারে

চম্‌কে উঠবে—এমন জামাই গাঁয়ে কারো হয়নি বৌদি—

দীপঙ্কর ততক্ষণে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

সন্তোষ বললে—বুঝলে বৌদি, কোথায় গেলে তুমি? ও বৌদি— দ্যাখ্ তো ক্ষিরি, তোর জ্যাঠাইমা কোথায় গেল?

মা তখন রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে হাঁড়িতে নতুন করে ভাত চড়াচ্ছে—

ক্ষিরির ওপর নির্ভর না করে সন্তোষ নিজেই রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বললে —বৌদি কোথায় গো, রান্নাঘরে নাকি?

—এই যে ঠাকুরপো—

সন্তোষ বললে—আমি ঠিকই করে ফেললাম বৌদি—ও তোমার ছেলেকেই জামাই করবো আমি! এমন পাত্তোর থাকতে আমি কিনা ক্ষিরির বিয়ের জন্যে কাঁহা-কাঁহা ঘুরে বেড়াচ্ছি—

মা রান্নাঘর থেকে বললে—তুমি চান করে নাও ঠাকুরপো, চৌবাচ্চায় জল আছে—

—সে হবে খন, আগে মুড়ি খাই, মুড়ি খেতে খেতে তেল মাখবোখন—ও ক্ষিরি, ক্ষিরি কোথায় গেলি রে, ইদিকে আয় না, মুড়ি খাবি তো আয় না ইদিকে, নে আঁচলটা ফাঁক কর—

শুধু মুড়ি নয়, মুড়ির সঙ্গে নারকোলকোরা, কাঁচা লঙ্কা সবই এল। তারপর স্নান, তারপর আর এক প্রস্থ খাওয়া, আর এক প্রস্থ গল্প।

সন্তোষ বললে—উঃ, এতদিনে ভাবনাটা চুকলো, জানলে বৌদি, আজ একটু পেট ভরে ঘুমোতে পারবো—

তারপর একটু থেমে বললে—তোমারও ভাবনা চুকলো বৌদি, তোমাকেও আর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হবে না, দীপুর আপিসের ভাত দিতে হবে না! কীরে ক্ষিরি, পারবি না? আপিসের ভাত করে দিতে পারবি না?

ক্ষিরি আর পারলে না। বললে—বাবা, তুমি থামো তো!

সন্তোষ অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন রে, কী বলছিস্ তুই? থামবো কেন? এমন বর পাবি নাকি তুই রসুলপুরে? দেখবি কলকাতার জল গায়ে পড়লেই তোর কেমন ফরসা রং বেরোয় গায়ে। বৌদির মতন এমন শাশুড়ী অনেক তপস্যা করলে তবে পায় মানুষে!

মা বললে—সে-সব কথা পরে হবে খন সন্তোষ, আজ তো তুমি আছো—

সন্তোষ বললে—আমি আর যাবো কোথায় বৌদি, আমার কোন্ চুলোয়ই বা যাবার জায়গা আছে? মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি জামাই-এর এখানেই পড়ে থাকবো—আমাকে দুটো খেতে দেবে না তোমার ছেলে?

দুপুরবেলা এই নতুন পাড়ায় একটু শব্দ হয় বেশি। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের চেয়েও একটু বেশি শব্দ। হুস্ হুস্ করতে করতে ট্রেন আসে, মালগাড়ি আসে,

ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় আকাশ। উঠোনের তারে কাপড় শুকোতে দিলে কয়লার গুঁড়োয় ভর্তি হয়ে যায়। তখন ঠিকে ঝি বাসন মাজতে আসে। কাশী তখন আবার ঘর-দোর ঝাঁট দিতে বসে। ছেলে আসবে কখন তার ঠিক থাকে না। চাকরিতে মাইনে বাড়ার পর থেকেই ছেলের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। কোনও দিন ন'টা কোনওদিন রাত দশটা। মা ততক্ষণ ভাত আগলে বসে থাকে। আস্তে আস্তে পাড়া নিরিবিলি হয়ে আসে, তখন মশা ভন্ ভন্ করে চারিদিকে। হঠাৎ হয়ত একটা রেলগাড়ি শিস দিতে দিতে ছুটে আসে ইস্টিশানের দিকে, আর সমস্ত বাড়িটা তখন থর থর করে কাঁপতে থাকে।

দুপুরবেলা সন্তোষ খালি মেঝের ওপরেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো। অদ্ভুত নাক-ডাকা। কাশী যে কাশী, ছোট এতটুকুন ছেলে, সে-ও নাক-ডাকার বহর দেখে হেসে ফেললে।

মা খুব বকুনি দিলে একচোট। বললে—হাসছিস কেন রে? হাসছিস কেন? তোর নাক ডাকে না? না তুই একেবারে মহাপুরুষ হয়ে জন্মেছিস—

ক্ষিরি কুণ্ঠিত গলায় বললে—বাবাকে ডেকে দেব জ্যাঠাইমা?

—কেন? ডাকবে কেন মা? কাল সারারাত ঘুম হয়নি, একটু ঘুমোন্ না!

ক্ষিরি বললে—না, বড্ড নাক ডাকছে কিনা তাই......

—তা নাক ডাকলেই বা, বুড়ো মানুষ হলে অমন নাক একটু ডাকেই! তাতে কী হয়েছে? তুমিও একটু গড়িয়ে নাও না। তুমিও তো বাছা রাত জেগে এসেছ, ঘুমোও না একটু—

—আপনি শোবেন না জ্যাঠাইমা?

—তা আমি শুলে যদি তুমি শোও তো আমি শুচ্ছি, আর শুলে কি আমার চলে বাছা, এখুনি কলে জল আসবে, একটু যদি না দেখি তো রান্নার জল ধরা হবে না, ঠিকে-ঝি এসে ফিরে যাবে, সংসার করা কি কম জ্বালা—

বলতে বলতে মা মেঝের ওপরই গড়িয়ে পড়লো।

বললে—তুমি ওই মাদুরটা টেনে নিয়ে শোও মা, কাপড় ময়লা হয়ে যাবে—

কিন্তু তার আগেই ক্ষিরি মা'র পাশে শুয়ে পড়েছে। মা'র মনে হলো এ যেন সন্তোষের মেয়ে নয়, যেন বিন্তীই। বিন্তীর মতই ন্যাওটা। ঠিক তার মতই পাশ-ঘেঁষে শুয়ে পড়লো।

মা বললে—তোমার ভাল নাম কী মা?

ক্ষিরি বললে—ক্ষীরোদা—

—বেশ নাম, মা বুঝি নাম রেখেছিল?

ক্ষিরি বললে—মা'কে তো আমি দেখিনি জ্যাঠাইমা, জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত বাবাকেই দেখে আসছি—

হঠাৎ মা'র যেন বিন্তীর কথাগুলোই মনে পড়তে লাগলো শুয়ে শুয়ে।

আহা গো! সে-মেয়েটাও এমনি করে গায়ের পাশটিতে পড়ে থাকতো দিন রাত। কোল থেকে নড়তো না। এমন মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অমন করে আত্মঘাতী না হলে কি আর বাড়ি ছাড়তে পারতো। আশ্চর্য মেয়ের সাহস বটে। সেই মেয়ে, যার কথা বেরোত না মুখ দিয়ে, সেই মেয়েই কী করে যে অমন সাহসের কাজ করতে পারলো কে জানে! ভাবতে ভাবতে কখন যেন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল মা'র। সকাল থেকে রান্না করতে হয়েছে দুবার করে। খুব বুঝি পরিশ্রম হয়েছিল।

—জ্যাঠাইমা, ও জ্যাঠাইমা?

ও-পাশের বারান্দায় সন্তোষকাকার তখনও নাক ডাকছে জোরে জোরে। বাড়িটা বেশ সরগরম হয়ে রয়েছে।

—জ্যাঠাইমা, ও জ্যাঠাইমা!

মা ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—কী মা, কী হলো মা?

ক্ষিরি বললে—কে যেন সদর-দরজায় কড়া নাড়ছে, দরজা খুলে দেব?

হয়ত ঝি এসেছে। মা বললে—দাঁড়াও, আমি দেখছি—

কেমন হঠাৎ যেন ঘুমটা দু চোখ জুড়ে এসেছিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, টের পায়নি। এত রেলগাড়ির আনাগোনা বালিগঞ্জ ইস্টিশানে, অন্যদিন ঘুমই আসে না। আর আজ একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বেলা পাঁচটা পর্যন্ত একেবারে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল।

কিন্তু দরজা খুলতেই মা পিছিয়ে এল। কাদের বাড়ির চাকর।

—দীপঙ্করবাবু আছেন?

—তুমি কোত্থেকে আসছো?

লোকটা বললে—আমি পিরোনাথ মল্লিক রোড-এর ঘোষেদের বাড়িতে কাজ করি, দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম—

—তা বাবু তো নেই। বাবু আপিসে। কী দরকার আছে বলো, এলে বলবো।

লোকটা আবার জিজ্ঞেস করলে—বাবু আপিস থেকে কখন আসেন?

আরে, তার কি ঠিক আছে? কাজ পড়লে রাত ন'টা রাত দশটাও হয় ফিরতে। যেমন কাজ পড়বে, তেমনি দেরি হবে। কতদিন রাত দশটার পরও এসেছে আপিস থেকে দীপঙ্কর। মা জানালাটা ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতো। এ-রাস্তাটা জনহীন। সন্ধ্যের পর এ-রাস্তা দিয়ে লোকই হাঁটে না কেউ। এ কালিঘাট নয়। রাত বারোটার সময়ও সন্ধ্যে মনে হবে। ওই ইঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ আর মালগাড়ির শান্টিং-এর আওয়াজ এ-পাড়াকে চব্বিশ ঘণ্টা সরগরম করে রাখে।

কাশী এল। ছোট ছেলে। কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছিল পাড়ায়।

মা বললে—কোথায় গিয়েছিলি রে? সমস্ত দুপুর হুট্-হুট্ করে ঘুরে

বেড়াবি? এদিকে কেউ দরজা ঠেললে আমি খুলে দেব নাকি? তাহলে তোকে মাইনে দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে কেন শুনি?

তখনও লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। বললে—আমি যাচ্ছি মা, বাবু এলে বলে দেবেন আমি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষেদের বাড়ি থেকে এসেছিলাম—

বলে চলে গেল লোকটা। তারপর কাশীকে নিয়ে পড়লো মা। এমন চাকর হয়েছে মা, যে কোনও কম্মে নেই, কেবল খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো—

কিন্তু খানিক পরেই আবার ফরমাশ। বাজার করতে যেতে হবে কাশীকে। আলু বেগুন পটল দু'-একটা টুকি-টাকি কিনে আনতে। বাড়িতে লোক এসেছে, তাদের খাওয়ার জন্যে দরকার। ঝাড়নটা নিয়ে বাইরে বেরোতেই লোকটার সঙ্গে দেখা। ইস্টিশানের গেট্‌টা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে। কসবায়। লোকটা ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীই আগ্ বাড়িয়ে গেল। বললে—কালকে সকাল-সকাল এসো; বুঝলে, এই আপিস যাবার আগে—

—বাবু কখন আপিসে যায়?

কাশী বললে—সকাল ন'টার আগে। ন'টার আগে এলে দেখা হবে,—

—আর বিকেল বেলা?

কাশী বললে—বিকেল বেলার কোনও ঠিক নেই, সেই রাত ন'টার সময়ও হতে পারে রাত দশটাও হতে পারে—

বলে চলে যাচ্ছিল কাশী। বালিগঞ্জ ইস্টিশানের লাইনে তখন গাড়ি নেই। লোহার গেটটা খোলা। ওপারে বাজার। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠলো—কাশী—

কাশী নিজের নামটা শুনে এদিক ওদিক চাইলে। তারপর হঠাৎ দাদাবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। দীপঙ্করেরও মনে আছে সেদিন অমন করে বালিগঞ্জ স্টেশনে না এলে কাশীর সঙ্গেও দেখা হতো না। আর কাশীর সঙ্গে দেখা না হলে শম্ভুর সঙ্গেও দেখা হবার সুযোগ হতো না।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিস তুই? ওরা আছে এখনও? সেই রসুলপুর থেকে যারা এসেছিল?

কাশী বললে—দাদাবাবু, আপনাকে একজন খুঁজতে এসেছিল—

—কে রে?

কাশী বললে—প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষেদের বাড়ি থেকে!

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষেদের বাড়ি থেকে? কে? কী বলতে এসেছিল? কখন এসেছিল? কে সে? কী নাম তার? কী রকম চেহারা?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের ভিড় ঠেলে আসতে দীপঙ্কর যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো একেবারে।

কাশী বললে—দাঁড়ান, আমি ডেকে দিচ্ছি—

লোকটা বোধহয় তখনও ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিল। পাঁই পাঁই করে

দৌড়ুল কাশী। দীপঙ্করের মনের মধ্যে যেন প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল। সতী পাঠিয়েছে! সতী তার বাড়ির ঠিকানা জানলো কী করে? হয়ত ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ছিটে-ফোঁটার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। কিন্তু সতী নিজে এল না কেন? আর এমন কী দরকার পড়লো হঠাৎ যে, লোক পাঠিয়েছে তার কাছে! সেদিনের সেই ঘটনার পর আর কেমন করেই বা দেখা করে সে! সেদিনই তো চরম শিক্ষা হয়ে গেছে। সমস্ত আশা, সমস্ত কামনার সমাধি হয়ে গেছে। সতীর শাশুড়ীই তো দীপঙ্করকে যেতে বারণ করে দিয়েছে। তারপর আর কেমন করে যায় সে? কোন্ সাহসে তার সঙ্গে দেখা করে! সতী তো পাগল। সতীর শাশুড়ীই তো বলেছে পাগল সে। তারপর কতদিন আপিসে গিয়ে ভেবেছে, সতী হয়ত সেদিনের মত হঠাৎ আবার একদিন আপিসে এসে হাজির হবে। কতবার মনে হয়েছে একবার সতীকে টেলিফোন করে। টেলিফোন করে জানিয়ে দেয় সেদিনকার সমস্ত ঘটনাগুলোর কথা। সতীর শাশুড়ী কেমন করে তাকে বাড়ি থেকে মিষ্টি কথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল—তা সবিস্তারে সতীর কানে তোলে। কিন্তু অনেক ভেবেও সাহস হয়নি। এতদিন পরে সতী তাহলে আবার খবর পাঠিয়েছে কেন? বালিগঞ্জ স্টেশনের সেই চালু প্লাটফরমটার ওপর দাঁড়িয়ে দূরে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো দীপঙ্কর। সাইডিং-এর ওপর রবিন্‌সন্ সাহেবের সেলুনটা রয়েছে। ভেতরে সাহেব আছে, মিসেস রবিন্‌সন্ আছে। আর আছে জিমি। ওয়াগনগুলো অকারণে আটকে থাকে এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নিজের চোখে দেখতে এসেছে মিস্টার রবিন্‌সন্। তারপর এখান থেকে মটর-ট্রলির ব্যবস্থা হয়েছে। মটর-ট্রলিতে করে সাহেব লাইন দেখতে দেখতে যাবে গড়িয়াহাটা লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত। লেভেল-ক্রসিং-এ অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে গেছে একটা। মোষের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে থার্টি সেভেন্ আপ-এর সঙ্গে। সাহেব নিজে গিয়ে স্পট্ দেখে আসবে।

—এই যে দাদাবাবু, এসেছে!

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে—শম্ভু। শম্ভু তার বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছে!

শম্ভুও অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্করকে দেখে।

শম্ভু বললে—আপনাকে খুঁজতেই গিয়েছিলুম আপনার বাড়িতে—

—কেন রে? কী হয়েছে?

তারপর কাশীর দিকে চেয়ে বললে—তুই যা কাশী এখন, মাকে গিয়ে বলবি সাহেবের সঙ্গে আমি আপিসের কাজে এসেছি এদিকে, আমার দেরি হবে বাড়ি ফিরতে—

কাশী চলে গেল। শম্ভু যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। বললে—মহা মুশকিল হয়েছে দাদাবাবু, বৌদিমণি আপনার কাছে পাঠালে আমাকে—

দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গেল। বললে—কী হলো?

শম্ভু বললে—সেই যে আপনি চলে এলেন সেদিন তার পরই কাণ্ডটা ঘটলো—

—কী কাণ্ড?

—বৌদিমণিকে মা-মণি আর বেরোতে দেয় না বাড়ি থেকে। বৌদিমণিকে চোখে-চোখে রেখে দিয়েছে সারাক্ষণ, বাতাসীর মা, ভূতির মা, দরোয়ান, কৈলাস, সবাইকে বলে দিয়েছে মা-মণি,—

সেই বিকেল বেলার পড়ন্ত সূর্যের আলোর তলায় বালিগঞ্জ স্টেশনের ঢালু প্লাটফরমটার ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন তখনও তাদের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটার ভেতর থেকে বারান্দার সামনে দৌড়ে আসতে আসতে চিৎকার করে ডাকছে—দীপু-উ-উ-উ-উ—

হঠাৎ পাশেই একটা ইঞ্জিনের হুইশল্-এর শব্দে দীপঙ্করের ভাবনার থেইগুলো যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। বললে—তা হলে তোমার বৌদিমণি তোমাকে কী বলতে বলেছে আমাকে?

শম্ভু বললে—কী আর বলবে দাদাবাবু, শুধু বলেছে আপনাকে খবরটা দিতে—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—কিন্তু আমি কী করবো খবরটা শুনে বলো?

শম্ভু বললে—তাও তো বটে, আপনিই বা কী করবেন! মা-মণি লোকটা তো ভাল নয়, ওই মাগীটাই যত নষ্টের গোড়া দাদাবাবু, অমন ভালোমানুষ বউ পেয়েছে কিনা তাই অমন কষ্ট দিতে পারছে—!

বলে খানিক থেমে আবার বললে—জানেন দাদাবাবু, এক-একদিন আমাদের চাকর-ঝিদের সামনেই বৌদিমণিকে ক্যাট-ক্যাট্ করে কথা শোনায়! আপনি চলে আসার পরেই বৌদিমণিকে বললে—আমাদের ঘোষবাড়ির নাম ডোবালে তুমি বৌমা, বাইরের লোকদের বাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে তুমি সোহাগ করো, তোমার গলায় দড়ি জোটে না?

আশে-পাশে অনেক ভিড়। দীপঙ্কর বললে—এখানে দাঁড়িয়ে গল্প হবে না, তুমি এসো শম্ভু আমার সঙ্গে—

দীপঙ্কর শম্ভুকে নিয়ে লাইন পেরিয়ে নিজের সেলুনে গিয়ে বসালো। বললে—বোস শম্ভু ওখানে—

শম্ভু গাড়ির মধ্যে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলে চারদিকে। গদি আঁটা চেয়ার দুটো। গদি আঁটা বিছানা। ভেতরে ঠিক যেন শোবার ঘরের মতন সাজানো। পাশেই রান্নার জায়গা।

দীপঙ্কর বিছানার ওপর বসলো। বললে—তোমাদের সামনেই এই সব কথা শোনায়?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, আমাদের সামনেই শোনায়। আর বৌদিমণির সেই সব কথা শুনে চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসে। শুনে আমাদেরই লজ্জা হয় দাদাবাবু। আমরা সেখান থেকে সরে আসি—।

—আর সেদিন কী হলো? সেই আমাকে যেদিন তোমার মা-মণি তাড়িয়ে দিলে?

শম্ভু বললে—মা-মণির কি চোখের পর্দা আছে দাদাবাবু, চোখের পর্দা নেই মাগীর! চোখের পর্দা থাকলে কেউ অমন কথা বলতে পারে? আর আমিও তাই বৌদিমণিকে বলি। বলি—তোমার ভাবনা কিসের বৌদিমণি? তুমি তোমার বাপের কাছে চলে যাও না, তোমার বাপের অত টাকা, আরাম করে থাকবে সেখানে, শ্বশুরের ঘর তোমার কপালে নেই তো কী করবে তুমি?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা শুনে কী বলে তোমার বৌদিমণি?

—বলে, আমি চলেই যাবো রে শম্ভু, আমি শেষ পর্যন্ত বাবার কাছেই চলে যাবো। বৌদিমণি কথাগুলো বলে আর মুখটা কেমন শুকিয়ে যায় তার। মা তো নেই বৌদিমণির, তাই বাপের কাছে যেতেও কষ্ট হয় আর কি। বাপও যে মেয়ে-অন্ত প্রাণ—

—তুমি কেমন করে এত সব জানলে শম্ভু?

শম্ভু বললে—আমি জানবো না তো কে জানবে দাদাবাবু, আমি ও-বাড়িতে এই এতটুকু বেলা থেকে আছি। আমার মা ছিল ওই বাড়ির ঝি, সেই ছোটবেলা থেকেই ওখানে আমি মা'র সঙ্গে আছি যে! মা কবে মারা গেছে, কিন্তু আমি কি আর এখন ও-বাড়ি ছাড়তে পারি? ওই বৌদিমণির বিয়ের তত্ত্ব তো আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি বৌদিমণির বাবাকে—

—আচ্ছা শম্ভু—বলে যেন একবার দ্বিধা করতে লাগলো একটু। বলবে কি বলবে না বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর। আর সব কথা একজন চাকরের কাছে জিজ্ঞেস করা যায় কিনা তা-ও ঠিক করতে পারলে না।

—কী বলবেন বলুন না দাদাবাবু!

দীপঙ্কর বললে—তোমার বৌদিমণির কি ছেলে হয়েছিল?

শম্ভু বললে—তা আপনি জানেন না বুঝি? ওই শাশুড়ী-মাগীর জন্যেই তো মরে গেল ছেলেটা! আহা কি ফুটফুটে ফরসা দেখতে হয়েছিল কী বলবো! ঠিক বৌদিমণির মতন! তা শাশুড়ীর তা আর সহ্য হলো না। দিনরাত কেবল পিট্-পিটুনি আরম্ভ হলো—কেবল বলে—বৌমা এটা ছুঁয়ো না, বৌমা ওটা ছুঁয়ো না—আঁতুড়ের কাঁথা একদিন কাকে নিয়ে ফেলেছিল রান্নাবাড়ির রোয়াকে সেই নিয়ে বাতাসীর মা'কে যত বকুনি, বৌদিমণিকেও তত বকুনি! তা বাতাসীর মা তো মেদিনীপুরের লোক, সে ছাড়বে কেন? সে-ও হাজার-গণ্ডা কথা শুনিয়ে দিলে। তখন রোখ্ পড়লো বৌদিমণির ওপর।

—বৌদিমণি কী বললে?

—বৌদিমণি আর কী বলবে! চোখ দুটো রাগে ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল, তবু মুখ দিয়ে কিছু বললে না। আর জানেন তো বৌদিমণি বড়ঘরের মেয়ে, তার মুখ দিয়ে কি গালাগালি বেরোয়?

—তা তোমার মা-মণি কি গালাগালি দেয় নাকি বৌদিমণিকে?

শম্ভু বললে—দিনরাত তো গালাগালিই দেয় দাদাবাবু! আমাদের সকলকে গালাগালি দেয়, তার তবু একটু মানে আছে। আমরা চাকর-ঝি, আমাদের না-হয় উপায় নেই। কী করবো, পরের বাড়িতে গতর খাটাই, মাইনে পাই, খেতে পাই, তাতেই পুষিয়ে যায়—কিন্তু বৌদিমণি কেন সইবে? বৌদিমণি তো মাগীর পেট্-ভাতার ঝি-চাকর নয়—

—তা তারপর কী হলো?

—তারপর শেষকালে ছেলেকেও ছুঁতে দেয় না মা-মণি! কেবল বলে—বাসি-কাপড়ে ছেলেকে ছুঁয়োনি, ছেলেকে ছুঁয়ে ঘরের আলনায় হাত দিয়োনি। এটা করোনি, সেটা করোনি! ছেলের একটা দিন-রাত্তিরের ঝি ছিল, তাকে পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা উঠতে বসতে খ্যাচ্-খ্যাচানি! অমন করলে কে কাজ করবে দাদাবাবু!

—তা তোমার মা-মণির কি ছুঁচিবাই আছে নাকি?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে না, ছুঁচিবাই থাকতে যাবে কেন? বেশ খাচ্ছে দাচ্ছে, মোটা হচ্ছে মাগী। আর বলিহারী চোখ বটে মা-মণির আজ্ঞে, সেই তিনতলার ঠাকুর-ঘরে বসে বাড়ির কোথায় কী হচ্ছে সবদিকে নজর রেখেছে। কে কখন শুক্‌নো গামছা পরে কল থেকে ভেতর-বাড়িতে এল, ঠাকুর ক' পলা ঘি দিলে চাকরদের ডালে, বাতাসীর মা ভাঁড়ার থেকে ক'টা বাসন বার করে দিলে, সব জানতে পারে বুড়ী! এমন স্যায়নার ধাড়ি, জানেন?

—কিন্তু ছেলেটা মরে গেল কেন?

শম্ভু বললে—তা মরবে না? অত ছোঁয়াছুঁয়ি, অত পিট্‌পিটুনি করলে ছোট ছেলে বাঁচে? তিন মাস যেতে না যেতেই শরীরে নোনা লেগে গেল! দাদাবাবু ডাক্তার ডেকে আনলে, বড় বড় ডাক্তার। কিন্তু তখন আর ডাক্তার ডাকলেই বা কী হবে বলুন!

—তারপর?

—তারপর শাশুড়ী মাগীর পিট্-পিটুনি আরো বেড়ে গেল। বলে—বৌমা তুমি নিজের পেটের ছেলেকে খুন করলে গা, তুমি ডান্ না পিশাচ! কথায় কথায় বৌদিমণির হেনস্থা হতে লাগলো। তারপরে পুরীতে শ্রীক্ষেত্রে বাবা জগন্নাথের কাছে মানত্ ছিল, সেইখানে গেল মাগী! নিজের নাতিকে খুন করে আবার ঠাকুর-দেব্‌তার কাছে মানত্ রক্ষে হচ্ছে। অমন মানতের মুখে ঝাঁটা মারি। যাবার সময় বৌদিমণি কত করে বললে—আমায় নিয়ে যাও শ্রীক্ষেত্রে, আমিও বাবা জগন্নাথের শ্রীচরণে মানত্ রক্ষে করবো, তা শুনলে কি মাগী? নিয়ে গেল?

দীপঙ্কর এতক্ষণ মন দিয়ে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে সব শুনছিল। বললে—তা তোমার দাদাবাবু কিছু বলেন না? তাঁরই তো মা? মা'কে তিনি বলতে পারেন না কিছু?

শম্ভু বললে—তা হলেই হয়েছে, মায়ের মুখের ওপর কথা বলবে? সাতজন্মে অমন মা যেন কারো না হয় দাদাবাবু। মা নয় তো ডাইনী, অনেক পাপ করলে তবে অমন মায়ের গভ্ভে মানুষের জন্ম হয়—ছি ছি ছি—

শম্ভু বেশ ভারিক্কি চালে, বুড়ো মানুষের মত কথাগুলো বলে গম্ভীর হয়ে রইল।

তারপর বললে—আপনি সেদিন চলে আসার পরই আমি বৌদিমণিকে গিয়ে খবরটা দিলুম—বৌদিমণি শুনেই ছুটতে ছুটতে এল। ততক্ষণ আপনি চলে গেছেন। বৌদিমণি আপনার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে দৌড়চ্ছিল সদর-গেটের দিকে, হঠাৎ মা-মণি ধরে ফেললে। বললে—কোথায় যাচ্ছো বৌমা?

বৌদিমণি বললে—আপনি দীপুকে তাড়িয়ে দিলেন?

মা-মণি বললে—বেশ করেছি, তাড়িয়ে দিয়েছি, আমার বাড়ি থেকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—

বৌদিমণি কথাটা শুনে খানিক থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। কী বলবে যেন বুঝতে পারলে না। কথা যেন মুখে আটকে গেল আজ্ঞে।

মা-মণি বললে—তুমি যা করছিলে করোগে, ভেতরে যাও—.

বৌদিমণি আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে যাচ্ছিল। তারপর কী ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে না উঠে, লাইব্রেরী-ঘরের দিকে চলতে লাগলো।

মা-মণি ডাকলে—ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?

বৌদিমণি পেছন ফিরে দেখলে একবার। তারপর আবার যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো—

মা-মণিও বৌদিমণির পেছন পেছন চলতে লাগলো তাড়াতাড়ি। বললে—বৌমা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছো আবার?

কিন্তু বৌদিমণি ততক্ষণে সোজা একেবারে দাদাবাবুর লাইব্রেরী-ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে। দাদাবাবু তখন বই পড়ছে। দাদাবাবুর বই পড়বার সময় একেবারে কোনও দিকে জ্ঞান থাকে না। বৌদিমণি সোজা একেবারে টেবিলের সামনে গিয়ে দাদাবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াল। ঝড়ের মতো একবারে বইখানা উল্টে দিয়ে বললে—তুমি কী বলো তো?

দাদাবাবু চম্‌কে উঠেছে। বললে—কেন, কী হলো?

—তোমার চোখের সামনে দীপুকে তাড়িয়ে দিলেন মা, আর তুমি কিছু বললে না? তুমি মুখ বুজে রইলে? তুমি কী? তুমি আটকাতে পারলে না তাকে, আমি রান্নাঘরে খাবার যোগাড় করতে গেছি, আর এরই মধ্যে সর্বনাশ হয়ে গেল? তুমি কিছু বলতে পারলে না? তোমার মুখ নেই?

—বৌমা!

হঠাৎ ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল সতীর শাশুড়ী। মা-মণির গলা পেয়ে সনাতনবাবু পেছন ফিরলেন। মা'র মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। একবার মার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, আর একবার সতীর মুখের দিকে।

শাশুড়ী বললে—তোমার কি আজকাল কানে কথা যায় না বৌমা? আমি তোমাকে বললাম না রান্নাবাড়িতে যেতে, তুমি যে আবার এখানে এলে? যাও, ভেতরে যাও—

সতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলছিল। বললে—আমি যাবো না!

—তার মানে?

—আপনি আগে জবাব দিন, কেন দীপুকে আপনি তাড়িয়ে দিলেন? কী করেছে সে? কী ক্ষতি করেছে সে আপনার?

সনাতনবাবু এতক্ষণে যেন জিনিসটা বুঝতে পারলেন সমস্ত। বললেন—না, ক্ষতি তো কিছু করেননি তিনি মা, খুব ভালো লোক তো দীপঙ্করবাবু। তা তিনি তো নিজেই চলে গেলেন,—

—তুমি থামো সোনা! আমি কথা বলছি বৌমার সঙ্গে, তুমি কেন কথা বলো মাঝখান থেকে? তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে? বৌমা, তুমি এ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসো—খোকার পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে—

সতী সনাতনবাবুর মুখের দিকে তাকালে একবার। সনাতনবাবু বললেন—না মা আমার পড়া হয়ে গেছে, ও কালকে পড়লেও চলবে, যা বলবার তুমি বলো না আমার সামনে! আমিও শুনি—

মা-মণি বললেন—না, তোমার শোনার দরকার নেই, সব কথায় তোমার থাকা উচিত নয় সোনা—

সতী বললে—হ্যাঁ উনি শুনবেন, ওঁরও শোনা উচিত, আমি কত সুখে এ-বাড়িতে বাস করছি, তা ওঁরও জানা উচিত। উনি দেখুন কত সুখে আমাকে রেখেছেন আপনি! উনি নিজের চোখেই আজ দেখুন—

সনাতনবাবু বললেন—ছি, অমন করে কথা বোল না ওঁর সঙ্গে সতী, উনি মা, ওঁর সঙ্গে কি অমন করে কথা বলতে আছে?

মা-মণি বললেন—তুমি আর এর মধ্যে থেকো না সোনা, যা বলবার আমিই বলছি,—

তারপর সতীর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—বৌমা এদিকে এসো—

সনাতনবাবু বললেন—যাও না, মা ডাকছেন, কথা শুনছো না কেন? যাও—মা'র কথা শুনতে হয়—

সতী শাশুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—কী বলবেন, বলুন?

—তুমি এ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসো আগে—

সতী বললে—এ-ঘর কি আমার নয়? এ-ঘরে কি আমার ঢোকবার অধিকার নেই? এ-বাড়িতেও কি আমি শান্তিতে থাকতে পাবো না? আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই বলতে চান?

বলতে বলতে সতী যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো বড়। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তার সমস্ত শরীরটা। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সেই প্রাসাদের

মধ্যে সেদিন যেন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বস্তির অন্ধকার নেমে এল। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মতই কদর্য কুশ্রী আবহাওয়া। সতী তখনও বলে চলেছে—আপনারা ভেবেছেন এমনি করে আমাকে জব্দ করে আমার গলা টিপে মেরে ফেলবেন? আমার কেউ নেই বলে কি আপনারা এমনি করে আমাকে কষ্ট দেবেন? আমার কি মন বলে কোনও জিনিস থাকতে নেই? আমিও তো মানুষ! আপনাদের মতই আমারও তো কষ্ট থাকতে পারে, ব্যথা থাকতে পারে, ঘুম পেতে পারে! আমি আপনার কী করেছি যে আমাকে এত কষ্ট দেন আপনি?

যতক্ষণ সতী কথা বলছিল, শাশুড়ী কিছু বলেন নি। সতী থামতেই শাশুড়ী বললেন—তোমার কথা শেষ হয়েছে?

সতী বললে—কথা আমার শেষ হবে না, আপনারা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমার কথা শেষ হবে না, আপনারা মরলে আমার কথা শেষ হবে, তখন আমি চুপ করবো—

—কী বললে?

শাশুড়ী যেন এবার রুখে দাঁড়ালেন। বললেন—কী বললে তুমি বৌমা?

—যা বললাম শুনলেন তো!

সনাতনবাবু আবার কথা বললেন। বললেন—ছি, এই কথা বলতে আছে! এটা তুমি কী বললে বল তো, রাগলে তোমার আর জ্ঞান থাকে না দেখছি—

—তুমি থামো সোনা, যা বলবার আমি বলবো ওকে! তোমার কিছু বলতে হবে না।

তারপর সতীর দিকে চেয়ে বললেন—বৌমা, আমি অনেক সহ্য করেছি, মুখ বুজে আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন, তবু কিছ্ছু বলিনি তোমায় কখনও! আমার এক ছেলে, ভেবেছিলাম সেই ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো, কিন্তু সে আমার কপালে নেই। আমি ভালো করে বুঝে নিয়েছি আমার কপালে সুখ নেই। কিন্তু আমি আর সহ্য করবো না! তোমার বাবা সামনে থাকলে তাঁকেও বলতাম। বলতাম—এমন করে আমার সর্বনাশ করলেন কেন? তোমার বোন যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তা-ও আমাকে তখন বলেন নি তিনি! হয়ত ভেবেছিলেন আমি মেয়েমানুষ, মাথার ওপর কেউ নেই, কিছুই টের পাবো না—কিন্তু যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, এখন তুমি যে ঘোষবাড়ির নাম ডোবাবে, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না—তুমি এখন এসো—

তারপর সনাতনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—সোনা, বৌমাকে এত কথা শোনাচ্ছি বলে তুমি যেন আবার কিছু মনে কোর না বাবা, বৌমার ভালোর জন্যেই বলা, তোমারও ভালোর জন্যেই বলা—

সনাতনবাবু বললেন—না মা, আমি কিছু মনে করছি না তার জন্যে—

সতী হঠাৎ বললে—তা হলে আমাকে চলে যেতে দিন এখান থেকে—

শাশুড়ী কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন—কোথায় যেতে দেব? তোমার

বাপের কাছে?

সতী বললে—আমার যেখানে খুশি আমি যাবো, তা আপনার জানবার দরকার নেই!

—তার মানে? তুমি যেখানে-সেখানে যাবে, আর আমার জানবার দরকার থাকবে না?

সনাতনবাবু কথা বললেন এতক্ষণে। তিনিও সতীর কথায় অবাক হয়ে গেছেন যেন। বললেন—কোথায় যাবে তুমি এত রাত্তিরে?

—আমি যেখানেই যাই তোমার কী? তোমরা কি আমার জন্যে ভাবো? আমার সুখ-দুঃখের কথায় কান দাও?

শাশুড়ী বললেন—কোথায় যাবে, যাও দেখি—যাও—

সতী বললে—আমি যেতে পারি না ভাবছেন?

—যাও না দেখি—যাও—

সতী খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। কিন্তু তখুনি শক্ত করে নিলে নিজেকে। বললে—এই আমি চললাম—

বলে সত্যিই চলতে লাগলো সতী। সত্যিই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শাশুড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। সতীর পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সনাতনবাবুও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে বাইরে এলেন। শাশুড়ী দেখলো সতী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো না। বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকেও গেল না। সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলো। একেবারে সোজা।

শাশুড়ী পেছনে দূর থেকে ডাকলেন—বৌমা—

সতী কোনও উত্তর দিলে না। যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো সোজা।

শাশুড়ী আবার ডাকলেন—বৌমা, দাঁড়াও—

সতী তখন বারান্দা থেকে বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে বাগানের রাস্তায় নামছে—

সনাতনবাবু মা'র পাশে পাশে চলছিলেন। বললেন—আরে, চলে যাচ্ছে দেখছি যে—

সেই অন্ধকারের মধ্যেই সতী সিঁড়ি দিয়ে বাগানে নামলো। বাগানের গায়ে সরু ইট বাঁধানো রাস্তা। বহু বছর আগে এই বাড়ির এক পূর্বপুরুষ যে-রাস্তা দিয়ে একদিন তাঁর গৃহলক্ষ্মীকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করেছিলেন, সেদিন সেই সন্ধ্যে বেলায় সেই বাড়িরই এক গৃহলক্ষ্মী সেই রাস্তা দিয়েই আবার চলে যেতে লাগলো বাইরের দিকে। একদিন খিদিরপুর ডকে পামারস্টোন্ সাহেব লক্ষ্মী-বরণের পন্থাটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষ-পরিবারকে, কিন্তু কেমন করে আবার সেই লক্ষ্মীকে ঘরে অচলা করে রাখতে হয়, তা শিখিয়ে দেন নি তাঁর উত্তর-পুরুষকে। বলে দেননি যে লক্ষ্মী বরণ করা সোজা, কিন্তু তাঁকে বেঁধে রাখা

সোজা নয়। শিখিয়ে দেননি যে ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপোজিট্ ভল্টে চাবি বন্ধ করলে কাগজে ছাপা নোটকে হয়ত আটকানো যায়, মিন্টের ছাপা সোনার কয়েনকেও হয়ত নিরাপদে রাখা চলে, কিন্তু লক্ষ্মী তো নোট নয়, কয়েনও নয়। তার আত্মা আছে, তার প্রাণ আছে, তার হৃদয় আছে। স্টীলের চাবিতে তাকে বন্দী করা যায় না, লোহার শেকলে তাকে শৃঙ্খলিত করা যায় না। তাকে মুক্তি দিয়েই তবে তাকে পেতে হয়, তাকে বন্ধনহীন করেই তবে তাকে বাঁধতে হয়।

শাশুড়ী শেষ বারের মত আর একবার ডাকলেন—বৌমা—শোন—

সনাতনবাবুও ডাকলেন—সতী—ফিরে এসো—

কিন্তু পৃথিবী তখন এক কক্ষপথ থেকে আর এক কক্ষপথে ছুটে চলেছে। সতেরো শো উননব্বই সালে কবে একদিন ফ্রান্সে এক বিপ্লব হয়েছিল। তার স্মৃতি লোকে ভুলে গেছে। টাট্‌কা মনে আছে উনিশ শো চোদ্দ সালের বিশ্ব-যুদ্ধটার কথা। কিন্তু তখনও ফ্রান্সের লুই-দ্য-ফোর্টিনথ্ আর ম্যাডাম-দ্য-ব্যারিরা পৃথিবী থেকে মুছে যায়নি। তাদের কেউ বসেছে ইংলন্ডের সিংহাসনে, কেউ জার্মানীতে, কেউ আমেরিকায়, কেউ বা ফ্রান্স-এ। কবে একদিন আমেরিকার এক ঋষি বলেছিল—"That Government is best which governs not at all". কবে একদিন একজন কোন্ জার্মান ঋষি বলেছিল—'Workers of the World, unite. You have nothing to lose but your chains, and have a world to win.' সে-সব কোনও কথাই এতদিন ফলেনি। মানুষের কুরুক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে একদিন শেষও হয়ে গেছে। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অপমৃত্যু দিয়েও মানুষ তাদের চাওয়া গভর্নমেণ্ট পায়নি। শ্রমিকেরাও তাদের বন্ধন ভাঙতে পারেনি তখনও। মানুষের সংসারের লক্ষ্মী বুঝি এমনি করে সতীর মতই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ঘর থেকে। ইণ্ডিয়ার টাকা, ইংলন্ডের পাউন্ড, আমেরিকার ডলার, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর মার্ক, রাশিয়ার রুবল, ইটালীর লীরা—সকলকে ট্যারিফ্ বোর্ডের চাবি দিয়ে সেফ্ ডিপোজিট্ ভল্টে আটকে রাখবার চেষ্টা হয়েছে কতবার। কিন্তু তবু কোথাও স্ট্রাইক্ বন্ধ হয়নি, কোথাও হরতাল থামেনি, কোথাও অসন্তোষ কমেনি একতিল। দিন দিন সায়েন্স আর ইন্‌ডাস্ট্রি কেবল এগিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে আর সমাজ স্থাণুর মত এক জায়গায় হতভম্ব হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। সনাতনবাবু আর তাঁর মা তাই সতীর কাণ্ড থেকে অবাকই হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

শাশুড়ী আবার ডাকলেন—বৌমা—শোন এদিকে—

সতী তখন ছুটতে আরম্ভ করেছে গেটের দিকে। একবার গেট্-এর দিকে যেতে পারলে ঘোষ-বাড়ির সুনামকে আর ধরে রাখা যাবে না। শিরীষ ঘোষের গৃহলক্ষ্মী প্রিয়নাথ মল্লিক রোড ধরে হাজরা রোডে গিয়ে পড়লে শহরের মধ্যবিত্ত নোংরায় সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শাশুড়ী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন—দরোয়ান গেট বন্ধ করো—

দরোয়ান—

সনাতনবাবুও বললেন—দরোয়ান গেট বন্ধ করো—

চিৎকার শুনে ঘোষ-বাড়ির যে-যেখানে ছিল সবাই দৌড়ে এল। বাতাসীর মা, ভূতির মা, ঠাকুর, কৈলাস, ড্রাইভার সবাই। ঘোষ-বাড়ির গেটে দরোয়ান সজাগই থাকে সব সময়। সতী গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ঝন্ ঝন্ করে একটা যান্ত্রিক শব্দ হলো। আর সতী গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো বন্ধ গেটটার ওপর।

বালিগঞ্জ স্টেশনের সাইডিং-এর ওপর দরজা-বন্ধ সেলুনের ভেতর বসে গল্প শুনতে শুনতে দীপঙ্করের যেন দম আটকে এল। দীপঙ্কর ভুলে গেল পাশের সেলুনেই রবিনসন্ সাহেব, আর মিসেস রবিনসন্ রয়েছে। রয়েছে তাদের কুকুর জিমি। ভুলে গেল সে এসেছে ডিউটিতে।

শম্ভু থামতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

শম্ভু বললে—তারপর আর কী, দাদাবাবু, তারপর থেকেই হুকুম হয়ে গেল বৌদিমণিকে আর বাইরে বেরোতে দেওয়া হবে না।

শম্ভু আরো অনেক কথা বলে গেল। কেমন করে সতীর শাশুড়ী সতীকে দিন-রাত নজরবন্দী করে রেখেছে। কোথাও বেরোতে দেয় না। এখন প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সদর গেট-এ তালাচাবি বন্ধ থাকে দিনরাত। যখন কেউ বেরোয়, দারোয়ানকে বলে চাবি খুলে তবে বেরোয়। পেছনের খিড়কির একটা দরজা ছিল, সেটাতেও চাবি পড়ে গেছে। খিড়কির দরজার চাবি থাকে মা-মণির কাছে। সে চাবি চাইবার দরকার হয় না কখনও। বাইরের মেথর সে-দরজা দিয়েই ভেতরে আসতো নর্দমার ময়লা পরিষ্কার করতে। আজকাল সদর দিয়ে ঢোকে। সরকার-বাবু কৈলাসকে নিয়ে বাজার করতে যাবার সময় দরজা খুলে দেয় দারোয়ান, তারপর আবার চাবি বন্ধ করে দেয়। বাতাসীর মা ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে বসে বসে আপন মনেই গজ গজ করে—কী সব্বনেশে শাশুড়ী মা, এ কি তোমার গাঁটের কড়ি, যে চাবি দিয়ে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবে গা—

যখন কেউ থাকে না কাছে তখন বাতাসীর মা এক-একবার সতীর কাছে যায়। বলে—তোমার কিসের দায় বৌদিমণি? কিসের দায় তোমার শুনি? তোমার বাপকে চিঠি লিখে দাও না বাছা, বাপ এসে তোমাকে নিয়ে যাক, দেখি কী করে মাগী আটকায়! বউ করে ঘরে এনেছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি মাগী?

সতী বলে—তুমি এখন যাও বাতাসীর মা, এ-সব শুনতে আমার ভালো লাগে না—

ভূতির মা লুকিয়ে লুকিয়ে কাছে আসে। চারদিকে দেখে নিয়ে বৌদিমণির ঘরে আসে। বলে—একবার এলাম বৌদিমণি—

সতী বলে—কেন এলে ভূতির মা, তোমাদের চাকরিটা যাবে শেষকালে—

ভূতির মা বলে—মা-মণি নেই এখন বৌদিমণি, বাইরে গেছে, তাইতো ভরসা করে এলুম—

সতী বলে—শাশুড়ী থাকুক আর না-থাকুক, তোমরা আমার কাছে এসো না ভূতির মা—জানতে পারলে তোমাদের ওপরেই আবার চাপ দেবে, ভাববে আমিই বুঝি ডাকি তোমাদের—

ভূতির মা বলে—সে যা হবার হবে বৌদিমণি, তোমার যদি কিছু কাজ থাকে তো বলো আমি করে দিই—চিঠিপত্তর কিছু যদি পাঠাতে চাও কারো কাছে তো আমাকে বলো—

শাশুড়ী যদি বাইরে কোথাও যান তো বেশিক্ষণ থাকেন না বাড়ি ছেড়ে। কলকাতার মধ্যেই আশেপাশে আত্মীয়স্বজন আছে। দেখা করে আসেন। যাবার সময় দারোয়ানকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে যান। বলেন—দারোয়ান, গেটে চাবি লাগিয়ে দেবে আমি যাবার পর, সবদিকে যেন নজর থাকে, খুব হুঁশিয়ার, বুঝলে—

দারোয়ান বলে—বুঝেছি মাইজী—

যাবার সময় সনাতনবাবুকেও বলে যান। সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে বলেন—সোনা, আমি একবার বেরোচ্ছি, নদিদির বাড়িতে যাচ্ছি! তুমি বাড়িতে আছো তো?

সমস্ত দিনটা যে কেমন করে কাটে, কেমন করে চলে যায়, তা শুধু সতীই জানে। শাশুড়ী পাশের ঘরে থাকে। শোবার ঘরের পাশে পুজোর ঘর। পুজোর ঘরে বসে জপ তপ করেন। কিন্তু নজর সবদিকে! পুজো করতে করতেই হঠাৎ কি খেয়াল হয়। ডাকেন—বৌমা, অ বৌমা—

সতী গিয়ে কাছে দাঁড়ায়।

শাশুড়ী বলে—কোথায় ছিলে? আমি তোমায় কখন থেকে ডাকছি—

সতী সে-কথার জবাব দেয় না, বলে—কী বলবেন, বলুন—

শাশুড়ী রেগে যান। বলেন—তুমি অমন করে কথা বলছো কেন, তোমার কী হয়েছে? কী হয়েছে বলো তো তোমার?

সতী বলে—আপনি কী জন্যে ডেকেছিলেন, তাই বলুন—

শাশুড়ী তখন আরো রেগে যান। বলেন—তোমার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই বৌমা? কার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় তুমি জানো না?

কী কথা থেকে কী কথা এসে যায়। সামান্য ব্যাপার থেকে একেবারে তুমুল কাণ্ড বেধে ওঠে। শাশুড়ী বলেন—বৌমা, তোমার বাবার কাছে যা করতে করতে, এখেনে ঘোষবাড়িতে ওসব চলবে না, এই আমি তোমায় বলে রাখলুম—

সতী কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে—কী চলবে না?

শাশুড়ী বলেন—দেখ বৌমা, তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে বলে ভেবো না

আমি মুখ্যু মানুষ—

সতী বলে—এসব কথা কেন বলছেন আপনি আমাকে? আমি কী করেছি? কেনই বা আমাকে ডাকেন আপনি! আমি কি চোর না ডাকাত?

শাশুড়ী বলেন—দ্যাখো বৌমা, আমি এখন পুজোয় বসেছি। আমাকে বিরক্ত কোর না, যাও—

—কিন্তু আপনিই তো আমায় ডাকলেন!

—আবার কথা বলছো?

এর পর আর সতী দাঁড়ায় না। শাশুড়ী আবার ডাকেন। বলেন—যেও না বৌমা, শোন—

সতী ফিরে দাঁড়াল।

শাশুড়ী বললেন—ভেবো না বুড়ো মানুষ বলে আমি চোখ-কানের মাথা খেয়ে বসে আছি, আমি সব দেখতে পাই, সব শুনতে পাই।

তারপর একটু থেমে বললেন—ঝি-চাকর-বাকরের সঙ্গে অত শলা-পরামর্শ ভাল নয়। ওরা হলো ছোটলোক, ওদের সঙ্গে অত কথা বললে ওরাই তোমার মাথায় চড়ে বসবে একদিন—সেটা কি তোমার পক্ষে ভালো হবে?

সতী খানিকক্ষণ শাশুড়ীর মুখের দিকে সোজা চেয়ে রইল। তারপর বললে—আর কিছু বলবেন?

শাশুড়ী বললেন—বলবার আমার অনেক কথা আছে বৌমা, কিন্তু এখন পুজোয় বসেছি, তাই বেশি বলা হলো না, তুমি যাও, তোমার জন্যে আমার ধর্ম-কর্ম সব মাথায় উঠবে দেখছি—

বলে তিনি আবার পুজোয় মন দেবার চেষ্টা করেন। সতী তখন একেবারে নিচে নেমে গেছে। সনাতনবাবু নিজের লাইব্রেরী ঘরে পড়ছিলেন। একেবারে ঝড়ের মতন গিয়ে ঢুকলো সতী সেই ঘরে।

সনাতনবাবু চমকে উঠলেন। বললেন—এসেছো? এই তোমার কথাই ভাবছিলাম—

—আমার কথা? আমার কথা তুমি ভাবো?

সনাতনবাবু বললেন—সেদিন তুমি বলছিলে না কোথাও বেরোতে পাও না, কোথাও যেতে পাও না, তাই ভাবছিলাম তুমিও আমার মত বই পড়ো না, এই দ্যাখ, কী চমৎকার একটা বই......

সতী বললে—আচ্ছা, তোমরা কি চাও আমি আত্মঘাতী হই?

সনাতনবাবুর মুখটা শুকিয়ে গেল, বললেন—আমরা?

—হ্যাঁ, তোমরা! আমি কি বাঘ না ভাল্লুক, না চোর না ডাকাত! আমাকে এভাবে আটকে রেখেছ কেন?

—তোমাকে আটকে রেখেছি? আমরা?

—আটকে রাখোনি? জানো না তুমি? চাকর-ঝিদের সঙ্গে কথা বলা পর্যন্ত

বারণ। আমার জন্যে সদর গেটে পর্যন্ত তালা-চাবি দেওয়া থাকে। কোথাও চিঠি লিখতে পারবো না। টেলিফোন লাইনটা পর্যন্ত সরিয়ে দরজা-বন্ধ ঘরের ভেতর রাখা হয়েছে! কেন? আমি পালিয়ে যাবো বলে? আর আমি যদি পালাই-ই তো তোমরা আমাকে ধরে রাখতে পারবে? সে-ক্ষমতা তোমাদের আছে?

—এসব তুমি বলছো কি? তুমি পালাবে মানে?

সতী বললে—আমি যদি মরেই যাই তো তাতেই বা তোমাদের কী এসে যায়? আমার জন্যে তো তোমাদের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না। তোমরা তো বাঁচবে তা হলে। তোমাদের টাকা, তোমাদের নাম, তোমাদের বংশ......

—ছি, কী যে বলো! তুমি রেগে গেছ খুব দেখছি, বোস, বোস, এখানে বোস, মাথা ঠান্ডা করো—

সতী বললে—না, তোমার ঘরে আমি বসতে আসিনি—

সনাতনবাবু বললেন—বসতে না-ই বা এলে তবু যখন এসেছ তখন বোস না একটু—তোমার তো কোনও কাজ নেই এখন—

—কাজ? কাজ কি তোমরা দিয়েছ আমাকে? এ-বাড়ির কোনও কাজে কি আমার হাত দেবার অধিকার আছে?

—আচ্ছা, কাজ না-হয় না-ই করলে, আমিও তো কোন কাজ করি না, একটু না-হয় বসেই রইলে আমার কাছে!

সতী যেন কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সনাতনবাবুর মুখের দিকে। বললে—তুমি আজ এই কথা বললে?

—কেন, আমি তো কতবার তোমাকে বলেছি।

—কী বলেছ?

সনাতনবাবু বললেন—বলেছি তো যে আমার সঙ্গে তুমিও লেখাপড়া করো, কত জিনিস জানতে পারবে, কত আনন্দ পাবে। এসো না একসঙ্গে পড়ি এই বইখানা—ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট—কী সব ভালো-ভালো কথা লিখেছে, জানো—একবার পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়তে পারবে না—এ-বইখানা প্রথম ছাপা হলো উনিশ শো আঠারো সালে—

সতী বললে—তোমার কাছে এলে কি কেবল এই সব কথাই শুনতে হবে? আর কিছু কথা নেই তোমার?

—কেন, এ-সব কথা তোমার ভালো লাগে না?

সতী বললে—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে কি এইসব কথা বলবার জন্যে?

সনাতনবাবু হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সতীর দিকে। যেন কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি।

সতী বলতে লাগলো—তুমি জেগে-জেগেও বই পড়বে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও বই-এর স্বপ্ন দেখবে, তাহলে কেন তুমি বিয়ে করেছিলে! আর যার মা এমন

তার বিয়ে করাই বা কেন?

—মা'র কথা বলছো! তা মা'তো অন্যায় কিছু করে না। মা'তো তোমার ভালোর জন্যেই বলে, মা'তো তোমার ভালোই চায়—

হঠাৎ পেছনে নিঃশব্দে কখন মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টের পায়নি দুজনেই।

মা বললেন—বৌমা, তুমি কি নালিশ করবার জন্যেই এসেছো সোনার কাছে?

সনাতনবাবু বললেন—না মা, নালিশ করছে না তো, ঠিক নালিশ নয়—

—থামো তুমি—আমি বৌমাকে বলছি, বৌমা আমার কথায় জবাব দেবে—।

সতী চুপ করে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এবার সোজা মুখ তুলে চাইল শাশুড়ীর দিকে। হয়ত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই শাশুড়ী বললেন—আমার দিকে চেয়ে অমন করে চোখ রাঙাচ্ছ যে বড়? কাকে তুমি চোখ রাঙাচ্ছ শুনি? তোমার চোখ রাঙানিতে আমি ভয় পাবো না বৌমা, আমাকে তুমি তেমন মেয়েমানুষ পাওনি! এসো, চলে এসো এ-ঘর থেকে। আমি তোমাকে বলেছি না, যখন-তখন সোনার কাছে আসবে না, যখন-তখন বরের সঙ্গে দেখা করা আমি পছন্দ করি না—

সতী মাথা নিচু করলো। তারপর আস্তে আস্তে কোনও কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা বললেন—দেখলে তো সোনা, বৌমার তেজটা দেখলে তো একবার! কী-রকম মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে গেল—তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে!

সনাতনবাবু কথাটা বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে গেল মানে?

মা বললেন—ওকেই তো মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাওয়া বলে—তুমি তো সংসারের কিছুই জানলে না, কিছুই দেখলে না, তা এখন সব দেখ—

—সব দেখবার এখনও অনেক বাকি আছে মা।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। শাশুড়ীও দেখলেন, সনাতনবাবুও দেখলেন—সতী দরজার বাইরে গিয়েও যেন তাদের কথা শুনছিল এতক্ষণ। তাঁরা টের পাননি। সতী দরজার সামনে এসেই বললে—সব দেখার এখনও অনেক বাকি আছে—

—কী বললে?

—বলছি, এখন দেখার হয়েছে কী, দেখার এখনও অনেক বাকি আছে।

—তার মানে?

সতী বললে—বলছি, যে সব দেখবে, সে একদিন জগৎ দেখবে!

—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় বৌমা! তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলো?

কিন্তু যাকে বলা সে ততক্ষণে দুম দুম করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে।

শাশুড়ীও পেছনে-পেছনে গেলেন। সিঁড়ির পর বারান্দা। সেই বারান্দার শেষে বাঁ দিকে সতীর ঘর। সতী নিজের ঘরে গিয়েই দরজায় দড়াম করে খিল বন্ধ করে দিয়েছে। শাশুড়ীও বউ-এর পেছনে-পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে খানিক দাঁড়ালেন। তারপর হতাশায় রাগে যেন নিজেকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবেন মনে হলো। অসহায়ের মত সেইখানে দাঁড়িয়েই ফুলতে লাগলেন। তাঁর মুখ যেন বোবা হয়ে গিয়েছে! চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন—শম্ভু, শম্ভু, ও শম্ভু—

—তারপর?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, আমরা তখন সব দেখছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, আমি, সরকারবাবু সকলের কানেই কথাগুলো গিয়েছিল। মা-মণির গলা তো খাটো নয়। বাজখাঁই গলা মাগীর।

বাতাসীর মা বললে—ছি ছি, আমি হলে অমন শাশুড়ীর মুখে নুড়ো ঘষে দিতুম না—

ভূতির মা বললে—বৌদিমণি ঠিক করেছে, মা-মণির মুখের মত জবাব দিয়েছে—ঠ্যাকার ভাঙবে এবার—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তাহলে তোমার বৌদিমণির ওপর খুব অত্যাচার হচ্ছে তো!

—আজ্ঞে, অত্যাচারের আর কতটুকু বললাম আপনাকে। দূর থেকে আপনি কতটুকুই বা জানতে পারবেন। আমরা বাড়ির ভেতরে থাকি, তাই কিছু দেখতে পাই, শুনতে পাই! আহা, বাড়ির মধ্যে বৌদিমণির হয়ে কথা বলবার একটা মানুষ পর্যন্ত নেই।

গল্প শুনতে শুনতে দীপঙ্কর যেন একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। যেন স্বচক্ষে সব দেখছে। সতীর কপালে এত দুঃখ ছিল, এত কষ্ট ছিল, কে তা কল্পনা করতে পেরেছিল?

শম্ভু বলতে লাগলো—তারপর মা-মণি আমাকে ডাকতেই আমি কাছে গেলাম। বললাম—কী বলছেন, মা-মণি?

মা-মণি বললেন—বাতাসীর মা কোথায়? তাকে ডাক—আর ভূতির মা, কৈলাস, তাদেরও ডেকে নিয়ে আয় আমার সামনে—সকলকে ডেকে আন আমার ঘরে—এক্ষুনি—

শম্ভু সকলকে ডেকে নিয়ে এল মা-মণির ঘরে। মা-মণির নিজের ঘরে। মা-মণি তখনও যেন অপমানে অবজ্ঞায় থর থর করে কাঁপছেন। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। বেশ ধীর স্থির গম্ভীর চেহারা। নিজের ঘরের ভেতর কার্পেটের আসনের ওপর বসে ছিলেন। সকলকে দেখেই বললেন—সবাই এসেছিস?

বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, শম্ভু, সবাই বললে—এসেছি মা-মণি।

মা-মণি বললেন—দারোয়ান কোথায়, দারোয়ানকে ডাক—

শম্ভু গিয়ে আবার দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে এল। মা-মণি বললেন—দারোয়ান, গেটে ঠিক রোজ চাবি দেওয়া হচ্ছে তো?

দারোয়ান বললে—জী হাঁ—

মা-মণি বললেন—চাবি খোলা পেয়ে যদি বাড়ির বউ বেরিয়ে যায় তো তোমার চাকরি আমি খতম করে দেব দারোয়ান, এটা যেন মনে থাকে—

দারোয়ান বললে—কভি নেই মা-মণি—

—আর শম্ভু, তুই আর বৌদিমণির ফরমাজ খাটতে পারবিনি, যদি দেখি ফরমাজ খাটছিস তো তোরও চাকরি খতম হয়ে যাবে এই বাড়ি থেকে—এই বলে রাখলুম—আর বাতাসীর মা—

বাতাসীর মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে।

মা-মণি তার দিকে লক্ষ্য করে বললেন—আর বাতাসীর মা, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি বাছা, যদি তোমার ভালো চাও তো বৌমার কানে আর বিষ-মন্তর দিও না, এই বলে রাখছি—

বাতাসীর মা হাউ-হাউ করে উঠলো। বললে—ওমা, কোথায় যাবো গো, আমি আবার কখন বৌদিমণির কানে বিষমন্তর দিলাম, আমি বলে আমার বাতের ব্যথায় মরছি, আমি দেব বিষমন্তর!

মা-মণি বললেন—কে কী মন্তর দেয় বৌমার কানে সব আমার জানা আছে। সব আমার কানে যায়, আমার সবদিকে নজর আছে, আমার দশটা চোখ—তা নইলে এই ঘোষবাড়িকে এতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম না। কবে দেউলে হয়ে যেত, তা জানো?

বাতাসীর মা বলতে লাগলো—ওমা, কী সব্বনেশে কথা মা, আমি বলে বুড়োমানুষ, তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমি বিষমন্তর দেব তোমার বৌমার কানে—আমার কি পরকালের ভয় নেই গা?

মা-মণি বললেন—মড়া কান্না নিচেয় গিয়ে কাঁদো গে বাতাসীর মা, এখানে আর জ্বালিও না আমাকে, যাও—

বাতাসীর মা চলে গেল গজ গজ করতে করতে।

—আর শম্ভু, শোন,—ফের যদি কোনও দিন শুনি যে, তুই বৌমার চিঠি ফেলতে গেছিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন! অত যদি দরদ তোর বৌমার জন্যে তো এ-বাড়িতে থাকা চলবে না—

অনেকক্ষণ ধরে অনেক বকুনির পর মা-মণি সকলকে ছেড়ে দিলেন। তারপর রান্না-বাড়ির দাওয়ায় জটলা বসলো। প্রথমে ফিস ফিস। তারপরে গুজ গুজ। বাতাসীর মা বললে—আমি কারো পরোয়া করিনে, কিসের পরোয়া শুনি? কাকে ভয়? আমি মেদিনীপুরের মেয়ে, আমাকে শাসানো? আমি দেখিয়ে দেব না—

ভূতির মা বললে—তা তখন তো মা-মণির মুখের ওপর কথা বেরোল না, এখন যে ফোঁসফোঁসানি বড়—

—থাম তুই, ছোট মুখে বড় কথা! বলি তোর কীর্ত্তি জানিনে আমি? কার সঙ্গে বাতি দিয়ে বাঁজা মাগী সেজেছিল, বলবো? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো?

দীপঙ্কর বাধা দিয়ে বললে—ও-সব কথা থাক শম্ভু, তারপর কী হলো বলো? তোমার বৌদিমণি ঘরে খিল দিয়েই পড়ে রইল সারাদিন?

শম্ভু বললে—সেই কথাই তো বলছি দাদাবাবু, সেই কথা বলতেই আসা। রাত্তির বেলা ঠাকুর জিজ্ঞেস করলে—বৌদিমণি খাবে না? দাদাবাবু খেলেন, মা-মণিও পরোটা খেলেন। কিন্তু বৌদিমণির খাবার কথা কেউ বলে না। আমি মা-মণিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—বৌদিমণিকে খেতে ডাকবো মা-মণি?

মা-মণি বললে—আর আদিখ্যেতা করে খেতে ডাকতে হবে না, যার খিদে পাবে সে নিজে এসে খেয়ে যাবে—তোর অত টান কেন শুনি?

তা আমারও সাহস হলো না আজ্ঞে যে বৌদিমণিকে গিয়ে ডাকি! শেষে বাতাসীর মা গেল। বৌদিমণির ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—বৌদিমণি, খাবে না আজ?

ভেতর থেকে কেউ উত্তর দেয় না। কোনও সাড়া শব্দ নেই। আমার বড় ভয় করতে লাগলো আজ্ঞে। কতরকম কাণ্ড তো হতে পারে। মেয়েমানুষের মন তো, কিছুই বলা যায় না। ছেলে মারা যাবার পর বৌদিমণি এইরকম তিন দিন খায়নি। তিন রাত্তির ঘরের দরজা খোলেনি। সে সব তো জানি। সে-সব কী দিন গেছে বাড়িতে। ছেলেটাকে যখন শ্মশানে নিয়ে গেল, তখন কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বৌদিমণি—কিছুতেই আর জ্ঞান আসে না। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে তবে চৈতন্য ফিরে আসে। তখন ওই শাশুড়ী মাগীই কী হেনস্থা করেছিল—সে তো সকলের মনে আছে! আমার তাই কেমন ভয় করতে লাগলো। আমিও দরজার সামনে গিয়ে ডাকলুম—বৌদিমণি, খেয়ে নাও, খাবে না? দরজা খোল—

ক্রমে আরও রাত হলো।

মা-মণি ডাকলেন আমাকে। বললেন—যা, দাদাবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় লাইব্রেরী ঘর থেকে—

দাদাবাবুকে ডেকে নিয়ে এলুম। দাদাবাবু আসতেই মা-মণি বললেন—সোনা, আজকে আর বেশি পড়াশোনা করতে হবে না, আজকে শুয়ে পড়ো—

দাদাবাবু চলে যাচ্ছিল নিজের ঘরের দিকে। মা-মণি বললে—ওদিকে যাচ্ছো কোথায়, আজকে ওঘরে নয়, এই আমার ঘরে শোও—

সনাতনবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কোন্ ঘরে?

মা-মণি বললেন—এই আমার ঘরে, আজ থেকে তুমি আমার ঘরেই শোবে

বাবা—

—কেন মা?

মা-মণি বললেন—তর্ক করো না তুমি, যা বলছি শোন, আমার ঘরেই তোমার বিছানা করিয়েছি।

—তা হলে তুমি কোথায় শোবে?

মা-মণি বললেন—দুজনেরই জায়গা হবে আমার ঘরে। আমার কোনও অসুবিধে হবে না—

—তাহলে তোমার বৌমা কোথায় শোবে মা?

—বৌমার কথা আর বোল না তুমি। আমার খুব শিক্ষা হয়ে গেছে! আমাকে বলে কিনা জগৎ দেখাবে! কত বড় আস্পর্ধা মেয়েমানুষের! যার এত তেজ, তার এ বাড়িতে থাকা কী করতে?

সনাতনবাবু মার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। দুপাশে দুটো খাট। এতদিন একটা খাটই ছিল ঘরে। দেয়ালের গায়ে ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙানো, মা পুজো জপ-তপ নিয়েই থাকেন সারাদিন। হঠাৎ যেন নিজের শোবার ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেছেন। বললেন—তা বৌমাকে বলেছ তো?

—কী আবার বলবো?

সনাতনবাবু বললেন—যে এবার থেকে আমি এখানে তোমার কাছে শোব?

—তা সে-কথাও কি বৌমার কাছে অনুমতি নিয়ে করতে হবে? আমি কেউ না? আমার কথাটা কি এতই ফ্যালনা? বৌমা আজ নতুন এসেছে এ-বাড়িতে? তার অনুমতি নিয়ে তবে আমাকে কাজ করতে হবে নাকি?

সনাতনবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন—না না তা ঠিক বলছি না আমি—

—তবে? আমি হুকুম দিলাম আজ থেকে তুমি আমার কাছে শোবে। তাতে কার মনে কী হবে তা-ও কি আমি ভাবতে যাবো? এতটুকু বেলায় যখন তোমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, তখন বৌমা কোথায় ছিল শুনি? সেই বৌমাই আজ আপন হয়ে গেল, আর মা-বেটি হয়ে গেলাম পর?

সনাতনবাবু তাড়াতাড়ি বিছানায় বসে পড়লেন। বললেন—আমি কি তাই বলেছি?

—বলবে কেন? মুখ দেখেও তো মনের ভাব বোঝা যায়! তোমার মুখের সামনেই তো আমাকে বললে জগৎ দেখাবে! তা কে-কাকে জগৎ দেখায় দেখা যাক। আমিও মরছি না এত শিগ্‌গির। আমিও দেখবো জগৎ দেখাতে জানি কি না! আমিও ঘোষবাড়ির বউ! নদিদি ঠিকই বলেছে—তোর বউকে অত আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা খেইছিস তুই নয়ন—

তা সেই ঘরেই সনাতনবাবুর রাত ভোর হলো সেদিন। সেই এক ঘরে। তিনি পড়লেন আর ঘুমোলেন। কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল বুঝতে পারলেন না। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা শাশুড়ী গিয়ে বৌমার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু সেদিন আর ডাকলেন না। সতীর ঘরের দরজাও খুললো না।

শম্ভু গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারলো দরজায়।

—বৌদিমণি, বৌদিমণি, আমি শম্ভু।

তবু কেউ দরজা খোলে না। কেউ সাড়া দেয় না।

শম্ভু বললে—আমার বুকটা কেমন দুর-দুর করে কাঁপতে লাগলো হুজুর: কেমন যেন মনে হলো যদি কিছু বিপদ ঘটে থাকে। যদি.........আর ভাবতে পারলুম না। বড় ভয় করতে লাগলো। শরীরের মধ্যে হাত-পা গুলো সেঁধিয়ে যেতে লাগলো ভয়ে।

বললাম—বৌদিমণি দরজা খুলুন, মা-মণি কলঘরে নাইতে গেছে—

কিছুতেই দরজা খুললো না আজ্ঞে। কাল সন্ধ্যেবেলা দরজায় খিল দিয়েছে, আর আজ এত বেলা হলো, খেলে না দেলে না, কিছু করলে না। আমার বড় ভয় করছে হুজুর, তাই খুঁজে খুঁজে দুপুরবেলা আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম—

দীপঙ্কর বললে—তা তুমি যে বললে বৌদিমণি আমার কাছে পাঠিয়েছে তোমায়?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলুম তখন, আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমার বড় ভয় করছে কাল থেকে। আমি কার কাছে যাব, কাকে খবর দেব, কিছুই বুঝতে পারছি নে! একটা মানুষ ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে রইল, আমি কেমন করে চুপ করে থাকতে পারি বলুন—তাই আপনার কাছে দৌড়ে এসেছি। কালিঘাট থেকে এই ঠিকানা নিয়ে এসেছিলাম—

—তা বাড়ির লোক কেউ কিছু বলছে না? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না?

—কে কী বলবে আজ্ঞে? বৌদিমণির জন্যে কার এত মাথাব্যথা হবে বলুন?

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো আপন মনে। বললে—তা এ-ব্যাপারে আমি কী করতে পারি বলো তো শম্ভু? ওদের বাড়ির অন্দর মহলের ব্যাপারে আমার কথা ওরা শুনবে কেন?

শম্ভু বললে—কিন্তু আপনি না বললে আর কে বলবে? আর কে আছে বৌদিমণির? আপনি বললে তবু বৌদিমণি দরজা খুলতে পারে! যদি বেঁচে থাকে তো আর কারো কথা শুনবে না, শুধু আপনার কথাই শুনবে—

দীপঙ্কর বললে—তোমাকে কে বললে যে আমার কথা শুনবে!

শম্ভু বললে—হ্যাঁ দাদাবাবু, আমি সব জানি, বৌদিমণি যদি কারো কথা শোনে তো সে দাদাবাবু নয়, মা-মণি নয়, একমাত্তর আপনি। বাতাসীর মা, ভূতির মা, সবাই আমাকে তাই বললে—শম্ভু তুই সেই সেদিনকার দাদাবাবুকে

ডেকে নিয়ে আয়, সেই বাবু এলে তবে হয়ত বৌদিমণির রাগ পড়বে—

—কিন্তু তোমার বৌদিমণির রাগ ভাঙাতে গিয়ে শেষে কি তোমার মা-মণির গালাগালি খাবো আবার?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, বৌদিমণির জীবনের চেয়ে মা-মণির গালাগালিটার কথাই আপনি বেশি ভাবলেন! আর বৌদিমণি যদি একটা সর্বনাশ বাধিয়ে বসে তো তখন?

দীপঙ্কর নিজের মনেই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলো। হয়ত দীপঙ্কর গেলে সতীর ওপর অত্যাচার আরো বাড়বে। তা-ছাড়া সতীর স্বামী আছে। তাদের চেয়ে কি দীপঙ্করই সতীর ভালো-মন্দ বেশি বুঝবে? দীপঙ্কর কে? সতীর কে? কেউ নয়। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউই নয়। কোনও অধিকারই বলতে গেলে নেই দীপঙ্করের। কোন্ অধিকারে তাহলে সে যাবে সেখানে? গিয়ে কী বলবে সতীর শাশুড়ীকে? সতীর স্বামী সনাতনবাবুকে? আর দীপঙ্করের কথাই যে সতী শুনবে, তারই বা নিশ্চয়তা কী? সতীর যদি অভিমানই থাকে তো সে তো দীপঙ্করের ওপর নয়। তবে দীপঙ্করের কথায় কেন তার রাগ ভাঙবে?

শম্ভু বললে—এখন একবার যাবেন দাদাবাবু? এখন না গেলে দেরি হয়ে যাবে বড়। পরে আর হয়ত দেখা হবে না—

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিতে পারলে না হঠাৎ। শম্ভু তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টে। আর দীপঙ্কর বাইরের প্লাটফর্মের অগণিত জনস্রোতের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

—কাল সারা রাত ঘুম হয়নি আমার আজ্ঞে, কী করবো কিছু ঠিক করতে পারিনি আমরা। তাই সকালবেলাই বাতাসীর মাকে বললুম। বাতাসীর মা সেকালের লোক তো। মা-মণির ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। তা ভূতির মা-ও ছিল কাছে। সবাই বললে—সেই সেদিনকার দাদাবাবুর কাছে গিয়ে খবর দিয়ে আয়, অন্ততঃ বাপকে যেন খবরটা দিয়ে দেয়। তা আপনার ঠিকানা তো জানতাম না, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে সে বলে দিল। সেখান থেকে সোজা এখানে আসছি—

দীপঙ্কর বললে—দেখ শম্ভু, এখন তো আমি যেতে পারবো না, আমি এখন আমাদের অফিসের সাহেবের সঙ্গে কাজে বেরিয়েছি—

—তা কাজ শেষ করেই না-হয় যাবেন!

দীপঙ্কর বললে—কাজ শেষ হতেও দেরি হবে আজ, এখনি সাহেবের সঙ্গে গড়িয়াহাটের লাইন দেখতে যেতে হবে, সেখান থেকে কখন ফিরতে পারবো, তা-ও ঠিক নেই—

—হুজুর সাহেব ডেকেছে!

হঠাৎ দ্বিজপদ সেলুনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দীপঙ্কর উঠলো। বললে—বলো যাচ্ছি—

শম্ভু যেন অনিচ্ছের সঙ্গেই উঠলো। বললে—তবে আমি আসি দাদাবাবু—

দীপঙ্কর কি বলবে বুঝতে পারলে না। খানিক পরে বললে—আমাকে তুমি কেন যে খবরটা দিলে বুঝতে পারছি না শম্ভু। আমি কোনও উপকারই করতে পারবো না তোমার বৌদিমণির, শুধু শুধু কষ্ট করে আমাকে বলতে এলে এতদূর—

শম্ভু নিচে নামতে নামতে বললে—আপনি যা ভালো হয় করবেন, আমি আর কিছু বলবো না—

শম্ভু সত্যিই চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর সেলুনের দরজায় দাঁড়িয়ে আর একবার ডাকলে। বললে—কী হয় শেষ পর্যন্ত আমাকে একবার জানাবে?

শম্ভু যেন খুশী হয়নি। বললে—দেখি কী করি—

শম্ভু আস্তে আস্তে লাইন পেরিয়ে চলে গেল। দীপঙ্কর সেখানেই, সেই সেলুনের দরজার হ্যাণ্ডেলটা ধরেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে স্টেশনের প্লাটফর্মের ভিড়। এখুনি লক্ষ্মীকান্তপুর লোক্যাল আসবে। অনেক লোক জমায়েত হয়েছে। ওদিকে চায়ের স্টল। অথচ সব যেন কেমন ফাঁকা মনে হলো। মনে হলো হঠাৎ বড় নির্জন হয়ে গেল জায়গাটা। যেন আবার ঝড় উঠবে। আবার কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সমস্ত কিছু উড়ে যাবে। ঠিক যেমন করে ছোট-বেলায় ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে ঝড় উঠতো সেইরকম। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাজি-কাশিমের বাগানের নারকোল গাছগুলো এপাশ থেকে ওপাশে দুলতো। কী ভয় যে করতো তখন দীপঙ্করের। সত্যিই অনেক দিন ঝড় হয়নি কলকাতায়। সারা পৃথিবীতেই যেন অনেক দিন কেউ ঝড় উঠতে দেখেনি। যেন এতদিন এত বছর ধরে কেবল ঝড়ের প্রস্তুতি চলেছে। যেন পশ্চিমের আকাশটায় একটু একটু করে মেঘ জমেছে কেবল। মেঘ জমেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে, মেঘ জমেছে গড়িয়াহাটার লক্ষ্মীদির বাড়িতে আর জমেছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। অনন্ত-রাও ভাবে যেন সেই ঝড়েরই অগ্রদূত, ভিভিয়ান লে-ও যেন সেই ঝড়ের বার্তাবহ আর সনাতনবাবুও যেন সেই ঝড়ের পুরোধা! দীপঙ্করই কি সেদিন কল্পনা করতে পেরেছিল সেই ঝড়ে সবাই একদিন জড়িয়ে পড়বে। বুঝতে পেরেছিল যে, সে-ঝড় থেকে দীপঙ্করও রক্ষা পাবে না?

দীপঙ্করের সমস্ত জীবনটা যেন তিনটে জায়গার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। কোথায় জন্ম, তারপর কোথায় বড় হওয়া, আর তারপর দিনে দিনে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার রৌদ্র-ছায়ায় সে বেড়ে উঠলো। অথচ কাউকেই ত্যাগ করতে পারলো না। সেই ছোটবেলার ছোট পরিধির সঙ্গে যেন আজকের এই বড় মানুষটার কোনও তফাৎ রইল না আর। শুধু বয়েসই বাড়লো, অভিজ্ঞতাই বাড়লো, কিন্তু জীবন বড় হলো না। দৃষ্টি পরিষ্কার হলো না! নইলে কেন সে সব জেনেও নিজের ছোট মনের ছোট পরিধিতে আশ্রয় দিয়েছিল সতীকে। যে সতী পরের স্ত্রী। যে সতী প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষবাড়ির

কুলবধূ। কেন তা জেনেও তার ভাল-মন্দর ভার তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

রবিন্‌সন্ সাহেব তৈরিই ছিল নিজের সেলুনে। মিসেস-রবিন্‌সন্‌ও তৈরি ছিল। তৈরি ছিল জিমি।

রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—আর ইউ রেডি সেন?

—ইয়েস স্যার!

—আমরাও রেডি!

রবিন্‌সন্ সাহেব উঠলো। মিসেস রবিন্‌সন্‌ও উঠলো সাহেবের পেছনে। রবিন্‌সন্ সাহেব বললে—জিমি ইজ ভেরি জলি টু-ডে—জিমি আজ খুব খুশী, জানো সেন—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হোয়াই?

সাহেব বললে—বিকজ মিসেস আমাদের সঙ্গে আছে—

মেমসাহেব সিগারেট ধরিয়েছিল। বললে—তুমি জানো সেন, হি লাইকস মী মোস্ট—

তারপর কোলে করে জিমিকে মটর ট্রলিতে তুলে নিলে। সত্যি, কী আদরের কুকুরই যে ছিল জিমি। মটর ট্রলি চালাতে লাগলো সাহেব। একটা বিচিত্র শব্দ করতে করতে মটর ট্রলি ছেড়ে দিলে। লাইন ক্লিয়ার দেবার ব্যবস্থা করেছিল মজুমদারবাবু। সাউথ কেবিনে কপালীবাবু উঁকি মেরে দেখলেন জানালা দিয়ে। বড় সাহেব ইন্সপেকশনে যাচ্ছে। লেবেল ক্রসিং-এ প্রায়ই অ্যাকসিডেণ্ট হয়। মদ খেয়ে কতকগুলো লোক রাস্তা পার হচ্ছিল, গুড্‌স ট্রেন এসে সব কটাকে চাপা দিয়ে দিয়েছে। অনেক দিন থেকে সাহেবের ইচ্ছে ছিল সেফটি মেজারস্ আরো ভালো করতে। ওখানে লেক হয়েছে। পচা এঁদো জায়গাগুলো ভরাট করে আরো বড় লেবেল ক্রসিং করতে হবে। গেটম্যান বাড়িয়ে দিতে হবে। মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়। অনেক দিন ধরে করেসপণ্ডেন্স চালিয়েছে বোর্ডের সঙ্গে। তাই নিজের চোখে স্পট্‌টা দেখা দরকার।

দুদিকে পানা পুকুর, খাল, মেঠো পথ। বিকেলের সূর্যটা পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ছে।

সাহেব মটরের লিভারটা টিপে বসে আছে আর ফট ফট শব্দ হচ্ছে।

রবিন্‌সন্ সাহেব দুপাশে নজর দিয়ে বললে—সী, হাউ ডার্টি, ওতেই তো মশা হয়, সি-এম-ওকে একটা নোট দিতে হবে সেন, টেক ইট ডাউন—

দীপঙ্কর হাতের ফাইলটা খুলে নোট করে নিলে। সি-এম-ওকে চিঠি দিলেই স্টেপ নেবে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। ম্যালেরিওলজিস্টকে খবর দিলেই তেল ছড়িয়ে দিয়ে যাবে এখানে। এই পানা পুকুরে। এই মশাই স্টাফকে কামড়াবে। কেবিনের লোকরা মশার জন্যে ভালো করে কাজ করতে পারে না। গেটম্যানরাও মানুষ—তারাও বাঁচবে! রবিন্‌সন্ সাহেব ম্যাপ খুলতে বললে।

ম্যাপ দেখতে দেখতে সাহেব ট্রলি চালাতে লাগলো। দিস এরিয়া। আগে কত বনজঙ্গল ছিল। সেসব দিনের কথা সাহেবের মনে আছে। দীপঙ্করের তখন চাকরি হয়নি। কী রকম বদলে গেছে সব। সমস্ত জায়গাটা একদিন আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট এদিকটাও শহর বানিয়ে তুলবে।

সেই গড়িয়াহাট লেবেল ক্রসিং।

ভূষণ মালি ডিউটিতে ছিল। সাহেব আর মেমসাহেব ট্রলি থেকে নামতেই ভূষণ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সেলাম করলে। তারপর মেমসাহেবকেও সেলাম করলে। মেমসাহেব তখন কুকুরটার গলা থেকে চেন খুলে দিয়েছে। খুলে দিয়ে সিগ্রেট ধরালে একটা।

রবিন্‌সন্ সাহেব দীপঙ্করকে কাছে ডাকলে—কাম হিয়ার সেন, ডায়াগ্রামটা খোল তো—

ম্যাপটা খুলতেই সাহেব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলো। ব্লু-প্রিণ্ট। ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে তৈরি হয়েছে ট্র্যাফিক আপিসের চাহিদা মত। এই দেখ, এদিক থেকে লেকটা শুরু হয়েছে, এ রেল লাইনের প্যারালেল চলে যাবে ওই পশ্চিমের রসা রোড পর্যন্ত। ওদিকে ওভারব্রীজ পর্যন্ত একেবারে। তারপর একদিন দু' পাশেই শহর বেড়ে উঠবে। আরো ট্র্যাফিক, আরো ব্যস্ত হয়ে উঠবে এই লেবেল-ক্রসিং। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সঙ্গে চিঠিপত্রের ফাইলটাও সঙ্গে এনেছিল দীপঙ্কর। এই গুমটি ঘরও বড় করতে হবে। অনেক বড়। গুমটি ঘরে বসে লিভার টানলেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে। ওদিকে ইস্ট কেবিন আর ওয়েস্ট কেবিন—এর মধ্যে এক ফারলং জমি দিয়ে আরো বড় করে তৈরি করতে হবে রাস্তা। একসঙ্গে দুখানা কার্ট যাতে যেতে পারে—আপ অ্যান্ড ডাউন! কত সাধ ছিল রবিন্‌সন্ সাহেবের। কত সাধের রেলওয়ে তার। দিন-রাত এই রেলওয়ের ভালোর জন্যে কী চিন্তাই করতো। রেলওয়ে আর রেলওয়ে স্টাফ—তাদের দুঃ কষ্ট সাহেব সইতে পারতো না। আর মেমসাহেব! ভূষণ তো মা বলতে অজ্ঞান। মেমসাহেব যেন তার মা। ওই সিগারেট খাওয়াটুকুই শুধু যা পছন্দ হতো না তার। সাহেবের ইচ্ছে ছিল এই রেলওয়েকে একদিন মনের মত করে গড়ে তুলবে। ভালো ভালো স্টাফ কোয়ার্টার হবে। ভালো ভালো ইউনিফর্ম পাবে। বিনা পয়সায় স্টাফের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে পাবে। হয়ত সাহেব শেষ পর্যন্ত থাকলে তাই-ই হতো, কিংবা হতো না। কিন্তু সাহেব তো জানতো না একদিন বিনা নোটিশেই তার যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসবে। বিনা নোটিশেই একদিন যুদ্ধ বাধবে পৃথিবীতে। বিনা নোটিশেই একদিন তাকে রেলওয়ে ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর সে কি ছোটখাট যুদ্ধ। সাহেবও জানতো না যে, সেই যুদ্ধই আবার ছ' বছর একুশ ঘণ্টা তেইশ মিনিট ধরে চলবে। আর বিনা নোটিশেই.........

দীপঙ্করের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কাছেই লক্ষ্মীদি। এত কাছাকাছি।

একবার যাওয়া যায় না লক্ষ্মীদির কাছে! এই তো এই রাস্তাটা ধরে একটু এগিয়ে গিয়েই ডান দিকে পড়বে বাড়িটা! দাতারবাবু কি এখনও ভালো হয়নি! অনন্তবাবু কি এখনও লক্ষ্মীদির সঙ্গে পাশের ঘরে বসে হাসাহাসি করে! অনন্তবাবু কি এখনও সেই রকম মদ খেয়ে আসে আর লক্ষ্মীদি অসঙ্কোচে তার সঙ্গে কথা বলে! একদিন লক্ষ্মীদিই তার বাবার ঠিকানা জানায়নি। ভুবনেশ্বর মিত্রের ঠিকানাটা জানতে সেদিন দীপঙ্করই গিয়েছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সতীদের বাড়িতে। তারপর দেখা না করেই ঠিকানা না নিয়েই ফিরে এসেছিল। আর আজ আবার লক্ষ্মীদির কাছেই যেতে হবে ভুবনেশ্বরবাবুর ঠিকানা জানবার জন্যে! লক্ষ্মীদি যদি ঠিকানা না দেয়! যদি জিজ্ঞেস করে ঠিকানা নিয়ে কী হবে? কার জন্যে দরকার ঠিকানা? সতীর কথা সব বললেও কি ঠিকানা দেবে না? বড় লোভ হতে লাগল দীপঙ্করের। অনেক দিন এদিকে আসেনি। এত কাছে স্টেশন রোডে বাড়ি ভাড়া করেছে, তবু আসা হয়নি। আসতে ইচ্ছে করলেও আসেনি। ইচ্ছে করেই আসেনি। কী দরকার। কিন্তু এত কাছে এসে দীপঙ্করের মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হাতের খোলা ম্যাপটা দেখতে দেখতে তখন কত কথা বলে চলেছে সাহেব। ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, ওয়েস্ট কেবিন, গ্যাঙ্ ম্যান, ডবল্ লাইন, ব্লু-প্রিন্ট—কত সব টেকনিক্যাল কথা। কিছুই যেন কানে যাচ্ছিল না দীপঙ্করের। কিছুই যেন শুনতে ইচ্ছে করছিল না। এত কাছে এসে পড়েছে আর একবার দেখা করবে না!

হঠাৎ মেমসাহেবের চিৎকারে যেন সম্বিত ফিরে এল।

—জিম্মি, মাই জিম্মি—

রবিন্সন্ সাহেব চমকে উঠলো। দীপঙ্করও ফিরে চাইলে।

গেটটা পেরিয়ে ও-পাশের জলাজমির ধারে বুঝি ছাড়া পেয়ে জিমি একটু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা আর্তনাদে চমকে উঠেছে মেমসাহেব। মেমসাহেবের অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে গেছে। মেমসাহেব দৌড়ে গেছে জিমির কাছে। সাহেবও দৌড়ে গেছে। কয়েকটা নল-খাগড়ার গাছ, একটু ঢালু জলা-জমি, পানাভর্তি জল।

মেমসাহেব কাছে গিয়ে কুকুরটাকে ধরতেই দীপঙ্কর প্রথমে দেখতে পেয়েছে। অল্প-অল্প অন্ধকারে জায়গাটা একটু ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। তবু স্পষ্ট দেখলে দীপঙ্কর।

—স্নেক্ স্যার, স্নেক্—

সাহেব মেমসাহেব দুজনেই তিন হাত পেছিয়ে এসেছে। একটা কাল-কেউটে। ততক্ষণে সাপটা কিল্‌বিল্ করতে করতে নিঃশব্দে আবার জলা-জমির নল-খাগড়ায় ঢাকা জায়গাটায় লুকিয়ে পড়লো। তারপর সেই ধুলো-কাদার ওপরেই মেমসাহেব সিল্কের গাউন নিয়ে বসে পড়লো। আর কুকুরটাকে কোলে

নিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

—জিম্মি, মাই জিম্মি—

রবিন্সন্ সাহেব, দীপঙ্কর, ভূষণ সবাই সেই দৃশ্য দেখে যেন হতবাক হয়ে গেছে। তাদের কারো মুখে আর কোনও কথা নেই। যেন কিছুক্ষণের জন্যে তিনজনেই কথা বলতে ভুলে গেছে! মেমসাহেব তখনও কুকুরের মুখখানা ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছে। পেটের ছেলের শোকেও বুঝি কেউ অমন করে কাঁদে না।

সব মানুষেরই একটা-না-একটা অবলম্বন থাকে। অবলম্বনও বটে, আবার বোঝাও বটে। সেই বোঝার ভার বয়ে বয়ে যতক্ষণ সে বেড়ায় ততক্ষণ তার অপার শান্তি। কত আনন্দের বোঝা, কত বেদনার বোঝা। কম হোক বেশি হোক, সেই বোঝাটাই বুঝি তার জীবনের সম্পদ। সেই সম্পদটুকু আঁকড়ে ধরে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে আর আরো বাঁচতে চায়। রাত্রের অন্ধকারের অবসরে সেই স্মৃতির সম্পদ-গুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করে। গুছিয়ে রাখে, ধুলো ঝাড়ে, যত্ন করে স্মৃতির আলমারিতে সাজায়। কবে একদিন দু' দণ্ডের জন্যে কাকে ভাল লেগেছিল, কবে হাসিমুখে কে কথা বলেছিল, কবে দুঃখ দিয়েছিল কে, তারই সব খুঁটিনাটি। যত বয়েস বাড়ে খুঁটিনাটিগুলো জমে জমে স্তূপাকার হয়ে ওঠে। যত স্তূপীকৃত হয়, তত কৃপণের মত সেগুলো সঞ্চয় করে মানুষ। নিজের মনের এক কোণে লুকিয়ে রাখে। কেউ যেন জানতে না পারে, কেউ যেন দেখতে না পায়। সে সম্পদ তার একার, তার একান্ত নিজের। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই।

সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ছোটবেলা থেকে ছোট-ছোট স্মৃতি জমে জমে স্তূপাকার হয়ে গিয়েছিল একদিন। যখন দীপঙ্কর আরো বড় হয়েছিল, আরো বয়েস বেড়েছিল তার, তখন সেই স্মৃতির বোঝা নিয়ে এক-একদিন ভাবতো। সাজাতে বসতো, গুছোতে বসতো। মনে হতো—কেন এমন হলো। কেন এমন ঘটলো। কার দোষে এমন হতে পারলো। কে দায়ী? কারা দায়ী? ভেবে ভেবেও কোনও কূল-কিনারা পেত না।

মনে আছে পরের দিন অফিসে গিয়েই প্রথমে মনে পড়েছিল রবিন্সন্ সাহেবের কথা। সাহেব আপিসে আসেনি। সাহেব মেমসাহেব সারারাত কেউ-ই ঘুমোয়নি। সে কি কান্না মেমসাহেবের। মেমসাহেবরাও কাঁদে কেমন করে, তা দীপঙ্কর জানতো না আগে। মিস মাইকেলকেই প্রথম কাঁদতে দেখেছিল। তারপর এই মিসেস রবিন্সন্।

—মাই জিম্মি, মাই জিম্মি—

সেই মরা কুকুরকেই জড়িয়ে ধরে মেমসাহেব চিৎকার করে কেঁদেছিল। ভূষণের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠেছিল তাই দেখে। রবিন্সন্ সাহেব কাঁদেনি

বটে, কিন্তু তার সেই চেহারা কান্নার চেয়েও যেন বেশি কর্ণ।

ক্রফোর্ড সাহেব বাড়িতে টেলিফোন করে সাহেবকে কন্‌ডোলেন্স জানিয়েছিল। সমস্ত আপিসটাই যেন হাহাকার করে উঠেছিল সাহেবের কুকুরের শোকে। তারপর সাহেব একদিন চাকরিও ছেড়ে দিলে। সেই কুকুর মারা যাওয়ার পর থেকে আর আপিসে আসেনি সাহেব। আপিসে নিজের ঘরে ঢোকেনি।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আবার সেই মটর ট্রলিতে করে বালিগঞ্জ স্টেশনে ফিরে যাওয়া। তারপর সেই সেলুনে চড়ে আবার শেয়ালদার হাসপাতালে যাওয়া। সেই কুকুরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তখনি সি-এম-ও'কে পাঠানো। ডি-এম-ও, অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জেন, কম্পাউণ্ডার, নার্স—কেউ আর বাদ রইল না। সবাই এসে জড়ো হলো। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। তখন সব আশার সমাধি। রবিন্‌সন্‌ সাহেব উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে ছিল সি-এম-ও'র মুখের দিকে। দীপঙ্করও চেয়ে দেখলে।

ডাক্তার বললে—হি ইজ্‌ ডেড্‌—অ্যাণ্ড গান্‌—

তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার পালা। দীপঙ্কর মানুষের মৃত্যু অনেক দেখেছে। কিরণের বাবার মৃত্যু, অঘোরদাদুর মৃত্যু, বিন্তীদির অপঘাত মৃত্যুও দেখেছে। তার কাছে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের জিমির মৃত্যু তেমন কিছু নতুন নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু হোক কুকুর, কিন্তু তার মৃত্যুতেও যে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের এত শোক হতে পারে, সেইটেই নতুন লেগেছিল দীপঙ্করের। সেইদিনই বুঝেছিল দীপঙ্কর, জিমি বোধহয় অঘোরদাদুর চেয়েও ভাগ্যবান। অঘোরদাদুর মৃত্যুর দিনের স্মৃতিটাও তার মনে পড়লো। সেদিন কেউ ছিল না কাঁদবার, একটা গাঁদা ফুলের মালা কিনতেও ছিটে-ফোঁটা আপত্তি করেছিল সেদিন। কিন্তু জিমির জন্যে সাহেব আর মেমসাহেবের শোক দেখে কে বলবে যে, জিমি মানুষ ছিল না, ছিল সামান্য একটা কুকুর মাত্র। সেই কুকুরেরই কফিন্‌ এল, সেই কুকুরের জন্যেই ফুল এল। সেই কুকুরের জন্যেই আবার মিছিল হয়েছিল সেদিন। সাহেব, মেমসাহেব, ঘোষাল সাহেব, দীপঙ্কর, রেলের প্রায় সমস্ত অফিসার কালো সুট পরে কবরখানা পর্যন্ত গিয়েছিল কফিনের সঙ্গে সঙ্গে।

গাঙ্গুলীবাবুই প্রথম খবরটা এনেছিল। বলেছিল—জানেন সেনবাবু, রবিন্‌সন্‌ সাহেব নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিলেত চলে যাচ্ছেন?

—কে বললে আপনাকে?

গাঙ্গুলীবাবু বললেন—কে-জি-দাশবাবুর কাছে শুনলাম, শুনলাম নাকি ঘোষাল সাহেব রোজ যাচ্ছে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কাছে—যাতে ওই পোস্ট্‌টা পায়—

দীপঙ্কর বললে—তা হতে পারে, আমি কিছু জানি না, আমি খবরও রাখি না—

—আপনি যান্‌ না?

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি প্রথম ক'দিন গিয়েছিলুম, পরে যাওয়া বন্ধ করলুম, সবাই ভাবছিল, আমি বুঝি প্রমোশনের কথা বলতেই যাচ্ছি। একে তো আমার বদনাম আমি সাহেবের কুকুরের বিস্কুট কিনে দিয়ে প্রমোশন পেয়েছি—

সত্যিই, দীপঙ্করের মনে হয়েছিল কী-ই বা হবে প্রমোশন হয়ে, কী-ই বা হবে আরো টাকা হয়ে। আরো প্রমোশন হলে কি আরো সুখী হবে, আরো টাকা হলে কি আরো শান্তি পাবে। কই, মা'র তো সুখ বাড়েনি, মা'র তো শান্তি বেশি হয়নি। মনে হয়, মা যেন নতুন বাসায় এসে আরো খিট্‌খিটে হয়ে গেছে। কথায় কথায় কাশীকে আরো বকাবকি করে, আরো মেজাজ খারাপ করে। এখন মা'র নিজের সংসার, এখন তো মা-ই গিন্নী, এখন তো মা-ই সব। মা'র কথার ওপরে কথা বলবার কারো এক্তিয়ার নেই। সংসারের ব্যাপারে মা-ই একচ্ছত্র। কোনও কথা মা'কে জিজ্ঞেস না করে দীপঙ্কর করে না। মা'র অনুমতি ছাড়া দীপঙ্কর কিছু করা ভাবতেই পারে না। পাছে মা'র মনে আঘাত লাগে, পাছে মা'র মনে কষ্ট হয়। কিন্তু তবু মা'র যেন অভিযোগের শেষ নেই। যেন হাজার-হাজার অভিযোগ অশান্তি সারাক্ষণ মা'কে ঘিরে রয়েছে।

সন্তোষকাকা রয়েছে সংসারে, তার মেয়েও রয়েছে। রসুলপুর থেকে এসে একদিন উঠেছিল হয়ত বিনা উদ্দেশ্যেই। কিংবা হয়ত কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আর যায়নি। সন্তোষকাকা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে গল্প করে। ক্ষীরোদা বাট্‌না বাটে, মা'কে সাহায্য করে। মা'র একটা সাহায্য করবার লোক হয়েছে আজকাল। রান্না করতে করতে মা বলে—ভাঁড়ার থেকে একটু সরষের তেল নিয়ে এসো তো মা—

সন্তোষকাকা দাওয়ার ওপর বসে বলে—অনেকদিন মাংস খাওয়া হয়নি বৌদি, একদিন মাংস করতে পার না, দেখতাম কলকাতার মাংস কেমন খেতে—বেশ ঝাল্‌ দিয়ে গরম মশলা দিয়ে—

তারপর ক্ষিরির দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁরে ক্ষিরি, একবার রসুলপুরে সেই পাঁঠা কেটেছিলুম মনে আছে তোর? তুই তখন ছোট, ওঃ, কী ঝাল দিয়েছিল তোর মা! একেবারে নালে-ঝোলে একাকার হয়ে গিয়েছিলি তুই—তোমার জা খুব ভাল রাঁধতে পারতো জানলে বৌদি, এমন রাঁধতো না, যে নোলায় পড়ে আমিই সব ভাত খেয়ে ফেলতুম, শেষে আর ভাত থাকতো না কারোর জন্যে, আবার রাঁধতে হতো—

বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতো।

সন্তোষকাকার সঙ্গে কেউ কথা বলুক আর না-বলুক, তাতে কিছু এসে যায় না সন্তোষকাকার।

দীপঙ্করকে দেখতে পেলেই বলতো—এই যে বাবা, এখন আপিস থেকে

এলে?......তা খুব মন দিয়ে চাকরি করবে বাবা, চাকরি হলো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলবে না বাবা—এই তোমায় বলে রাখলুম—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো এখেনে?

—আরে, অসুবিধে হলে আমি চুপ করে থাকবো ভেবেছ, আমি সে লোকই নয় বাবা, এই দেখ না, বৌদিকে সেদিন বললাম—কলকাতার লোক চা খায় শুনলাম, তা কই তোমাদের বাড়িতে চায়ের পাট তো নেই। তারপরেই চা খেতে শুরু করলাম, এখন রোজ চা খাচ্ছি,—ঘুম থেকে উঠেই বৌদি চা করে দেয়, আবার কালকে মাংস খেয়েছি,—কোনও অসুবিধে নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—তা তোমার তো দেখাই পাওয়া যায় না বাবা, তুমি যে কখন আপিস থেকে আসো, কখন আপিসে যাও, কিছুই টের পাই না—

দীপঙ্কর বললে—আপিসের খুব কাজ পড়েছে, তাই একটু দেরি হয় আমার আজকাল—

—তা বাবা, তুমি তো রেলে কাজ করো, বলি পাশ-টাশ দিতে পারো না আমাদের, বুড়ো বয়েসে একটু তীর্থ-ধর্ম করতাম, বৌদিও তো কোথাও যায়-টায় নি শুনলুম—

এ-কথার উত্তরে দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারলে না।

সন্তোষকাকা আবার বললে—তুমি বাবা রেলে চাকরি করবে আর আমি তোমার কাকা হয়ে কিনা পয়সা খরচ করে টিকিট কেটে রেলে চড়বো, সে যে বড় লজ্জার কথা, লোকে বলবে কী—আর তাছাড়া, আমার অত পয়সাই বা কোথায়—

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয় না। এদের বোঝানোও মুশকিল যে, গ্রাম-সুবাদে কাকা হলে তার পাশ পাওয়া শক্ত। শুধু গ্রাম সুবাদে কেন, কাকা জ্যাঠা বাবা কারোর পাশই দেয় না। সন্তোষকাকার সঙ্গে এত কথা বলা অর্থহীন। আপিস থেকে এসে রোজই বাড়িতে দেখে খুব খাওয়ার পাট চলেছে। হয় মুড়ি, নয় পরোটা, নয় একটা কিছু মুখে পুরছে সন্তোষকাকা। মা-ও কাছে কাছে আসে। বলে—চাকরি আছে তো তোর?

দীপঙ্কর হাসে। বলে—চাকরি আমার যাবে না মা, তোমার ভয় নেই—

মা বলে—তবু ভয় করে বাবা, সেই নৃপেনবাবু চাকরিটা করে দিয়েছিলেন, তাই তবু চলছে, নইলে কে চাকরি দেয় অমন করে বল্ তো?

কবেকার সব কথা। সব কথা মা'র মনে আছে। মা মনে মনে অতীতের কথাও ভাবে, বর্তমানের কথাও ভাবে, ভবিষ্যতের কথাও ভাবে হয়ত। দীপঙ্করের এক-একবার মনে হয়, মা না থাকলে তার কথা এমন করে কে ভাবতো। মা ছাড়া তো তার আর কেউ নেই।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে—তুমি কোথাও যাবে মা? কাশী কি বৃন্দাবন কি গয়া? সন্তোষকাকা বলছিল—

মা বললে—যেতে তো পারি, কিন্তু তোকে এখানে কে দেখবে?

—কেন, কাশী! কাশী আমার ভাত ফুটিয়ে দেবে—

মা বলে—তবেই হয়েছে, কাশী তোকে আপিসের ভাত দেবে,—

দীপঙ্কর বলে—দুটো দিন যে-কোনও রকমে চালিয়ে নেবে ও, তা বলে তুমি কেন আমার জন্যে এখানে চিরকাল ভাত রাঁধতে যাবে—

মা বলে—তা হলে তুইও চল্ না, আমাদের সঙ্গে যাবি—

দীপঙ্করের কি এখন যাওয়া চলে! আপিস ছেড়ে কি একদিনও যাওয়া চলে কোথাও। কত কাজ জমে গেছে তার। দিনে দিনে কত কাজ বেড়েছে। দীপঙ্কর বলে—এখন আপিস থেকে যাওয়া চলবে না আমার মা,—অনেক কাজ—সাহেব অফিসে আসছে না—

সত্যিই কাজ অনেক। রবিনসন্ সাহেব আর আপিসে আসছে না। মিস্টার ঘোষাল রোজ রবিনসন্ সাহেবের বাড়ি গিয়ে কী সব বলে আসছে। কী সব শোনাচ্ছে সাহেবকে কে জানে। নানারকম কথা উঠেছে আপিসে। ক্রফোর্ড সাহেবও কিছু বলছে না।, সব যেন থমথমে ভাব চারদিকে। সেদিন আপিসে গিয়েই ডেকে পাঠালে পাশ-সেক্শ্যানের বড়বাবুকে। হরিশবাবু বৃদ্ধ লোক। পাকা ঘুঘু। এই পাশের ব্যবসা করেই বেশ দু' পয়সা কামিয়ে থাকেন। কার্ড পাশ ভাড়া খাটান। পাশ বেচেনও আবার। সেন সাহেবের ডাক পেয়েই দৌড়ে এলেন। বললেন—আমায় ডাকছিলেন স্যার?

এককালে এই হরিশবাবুই ছিল পাশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ক্লার্কদের কাছে এরই আবার অন্যরকম মূর্তি। তাদের কাছে অন্যরকম মেজাজ। বললেন—আপনার পাশ চাই নাকি স্যার?

দীপঙ্কর বললে—আমার নয়, আমার মা'র জন্যে—মা কাশী যাবে—

হরিশবাবু বললে—তা ফর্মটা আমি এনে দিচ্ছি, আপনাকে জিজ্ঞেস করে আমি নিজেই ফিলআপ করে দিচ্ছি—

তারপরেই দৌড়ে একটা ফর্ম নিয়ে এসে নিজেই ভর্তি করতে লাগলেন। বললেন—শুধু আপনার মা, আর কেউ নয়? ভাই, বোন, কি কাকা, জ্যাঠা, কেউ নয়?

দীপঙ্কর হাসলো একটু। দীপঙ্কর হাসতেই হরিশবাবু যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কাকা জ্যাঠার পাশও পাওয়া যাচ্ছে নাকি আজকাল হরিশবাবু?

হরিশবাবু বললে—আপনি যদি চান তো কায়দা করে আমি তাও করে দিতে পারি—সবই তো আমার হাতে, এই তো সেদিন ঘোষাল সাহেব ওয়াইফের পাশ নিলেন—

ঘোষাল সাহেবের ওয়াইফ! মিস্টার ঘোষাল তো বিয়েই করেননি।

হরিশবাবু বললেন—উনি তো প্রায়ই নেন, একলা তো কখনও বাইরে যান না,

ওয়াইফও থাকে, সঙ্গে আবার দু'তিনজন সিস্টার-ইন-ল থাকে অনেক সময়— আমি তো স্যার আপনাদের সেবা করবার জন্যেই আছি, তবু আপিসে সবাই আমার বদনাম দেয়, সবাই বলে আমি নাকি এই পাশ নিয়ে ভাড়া খাটাই—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—সিস্টার-ইন-ল-রাও আজকাল পাশ পায়?

হরিশবাবু বললে—পায় না স্যার, রুল নেই, কিন্তু আমি যখন আছি তখন আর কে দেখছে? আমি আনম্যারেড সিস্টার বলে লিখে দিই—কে ধরবে, বলুন? আপনাদের সেবার জন্যে আমি সব করতে পারি! আপনিও নিন না, মাদার-এর সঙ্গে আনম্যারেড সিস্টার, আঙ্কেল-টাঙ্কেল সব নিয়ে নিন, আমি এমন কায়দা করে দেব, দেখবেন কেউ ধরতে পারবে না—

—থামুন!

দীপঙ্করের গলার গম্ভীর স্বরে হরিশবাবুর কলমটা হাত থেকে হঠাৎ খসে পড়ে গেল। সোজাসুজি চেয়ে দেখলে সেন সাহেবের দিকে। সেন সাহেবের যেন এ অন্য মূর্তি। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে হরিশবাবু! দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল হরিশবাবুর স্পর্ধা দেখে। ভেবেছে কি এরা! সবাই ঘোষাল সাহেব নাকি! যখন ক্লার্ক ছিল দীপঙ্কর, তখন এই হরিশবাবুই তার সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করতো। মানুষই মনে করতো না তাকে। আজ যদি অাঁটা চেয়ারে বসেছে বলে একেবারে আমূল বদলে যেতে হয়! একেবারে খোশামোদে বিগলিত হয়ে যেতে হয়! শুধু পদোন্নতি হয়েছে বলেই তার খাতির, মাইনে বেড়েছে বলেই তার বেশি সম্মান?

—আপনি কি সকলকেই নিজের মত মনে করেন হরিশবাবু?

—স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় করেছি স্যার!

তারপর দীপঙ্কর সই করে দিতেই ফর্মটা নিয়ে হরিশবাবু কেন্নোর মত নিঃশব্দে সরে গেল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে পাশ এনে হাজির করলে। পাশটা নিয়ে দেখে দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, যান আপনি—

স্কাউণ্ড্রেল! কথাটা ভাবতেই দীপঙ্কর শিউরে উঠলো। কে স্কাউণ্ড্রেল নয়? সবাই তো স্কাউণ্ড্রেল! ভাবতে নিজেরই লজ্জা হলো। দীপঙ্কর নিজেই তো স্কাউণ্ড্রেল! কেন মিছিমিছি এত রেগে গিয়েছিল সে! কই, নৃপেনবাবুকে তো এমনভাবে অপমান করতে পারেনি সে! সেদিনকার নৃপেনবাবুর সেই অন্যায় তো দীপঙ্কর নিঃশব্দেই হজম করেছিল! তাড়াতাড়ি মধুকে আবার ডাকলে। বললে—মধু, পাশবাবুকে একবার ডেকে আন্ তো—

পাশবাবু আবার তেমনি ঘাড় নিচু করে ঘরে ঢুকলো। বললে—আমাকে ডেকেছিলেন স্যার?

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে অকারণে বকেছি হরিশবাবু, কিছু মনে করবেন না—

হরিশবাবু হাসলো। কিছুই যেন হয়নি তার। বললে—না, না, আপনি আর আমাকে লজ্জা দেবেন না স্যার, আপনি তো আমাকে ন্যায্য কথাই বলেছেন—এই দেখুন না, কত লোক এসে ধরে আমাকে, পরের জন্যে কত বে-আইনী কাজ করতে হয় আমাকে! এই ঘোষাল সাহেব, ক্রফোর্ড সাহেব। এঁরা তো হামেশাই বে-আইনী পাশ নিচ্ছেন, আসলে তো সবাই-ই নেয় স্যার। রেলের চাকরিতে কে না নিচ্ছে? পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে রেলে চড়তে যাবে কেন বলুন তো? আপনিই শুধু দেখছি......

—থাক্—

দীপঙ্কর নিজের ফাইলের দিকে চোখ নামাতেই হরিশবাবু সেলাম করে চলে গেল।

বাড়িতে যেতেই মা এল। দীপঙ্কর বললে—মা, তোমার পাশ এনেছি—তুমি যে বিশ্বনাথ দর্শন করবে বলেছিলে—

—সে কি রে?

মাও অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি আবার কবে বলেছিলুম তোকে বিশ্বনাথ দর্শন করবার কথা!

দীপঙ্কর বললে—তুমি বলেছিলে মা, তোমার মনে নেই! নৃপেনবাবুকে যেদিন চাকরির দরখাস্ত দিয়েছিলুম, সেইদিনই তুমি বলেছিলে—

—তা আমি কার সঙ্গে যাবো! চিনি না, শুনি না—কোথায় যাবো, কোথায় থাকবো, তোকে এখানে কে-ই বা দেখবে?

—কেন সন্তোষকাকা যাবে, সন্তোষকাকার মেয়ে যাবে—তোমরা তিনজনে যাবে, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব, ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসবো! আমার জন্যে ভেবো না—

—ওদেরও পাশ নিয়েছিস নাকি?

দীপঙ্কর বললে—ওদের তো পাশ হবে না মা, ওদের টিকিট কেটে দেব আমি—

—সে কি? টাকা খরচ করে টিকিট কাটতে হবে ওদের! রেলের চাকরি করে তাহলে আর কী সুবিধে হলো?

মা-ও সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের কাণ্ড দেখে! রেলের চাকরি করে কেউ রেলের টিকিট কাটে! গাঙ্গুলীবাবু, হরিশবাবু সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—সবাই তো নিচ্ছে মশাই, আপনার নিতে দোষ কী? কে দেখছে?

দীপঙ্কর বলেছিল—তা নিক, ওতে আমার মন সায় দেবে না, তা ছাড়া রাত্তিরে ঘুমই হবে না আমার—

—সে কি? সেদিন ঘোষাল সাহেব রেলের বড় ঘড়িটা বাড়িতে নিয়ে গেছে,

জানেন?

—বড় ঘড়িটা? যেটা ওঁর ঘরে টাঙানো ছিল?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—ওঁরই বা দোষ কী, আমরা তো সবাই-ই নিই সেনবাবু। আপিসসুদ্ধ লোক কেউ কাগজ কালি কলম কেনে ভেবেছেন? কেউ কেনে না। সকলের ছেলে-মেয়েরা এই কাগজেই ইস্কুলের লেখা চালাচ্ছে, চিরকাল তো এই-ই হয়ে আসছে! তাতে দোষই বা কী বলুন, সাহেবদের জিনিস, যত নেওয়া যায় ততই ভালো, ওরা তো আমাদের দেশ থেকে সব নিয়ে যাচ্ছে লুটে-পুটে—

বলে কী গাঙ্গুলীবাবু! গাঙ্গুলীবাবুর কথা শুনে দীপংকরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সির সির করে উঠলো। চিরকাল ধরে কাগজ কলম কালি সব নিচ্ছে।

—শুধু কাগজ-কলম-কালি নয়। পেন্সিল, ব্লটিং পেপার, আলপিন সমস্ত—আপনি জানতেন না এতদিন? আশ্চর্য!

তা হোক। তবু টিকিটই কিনে নিলে দীপংকর। সন্তোষকাকা আর তার মেয়ের টিকিট। অনেক টাকা লাগলো। চিঠি লিখে দিয়েছিল কাশীতে। কোনও অসুবিধে হবে না মা'র। গাঙ্গুলীবাবুদের পান্ডা স্টেশনে এসে নিয়ে যাবে। মা'র হাতেও টাকা দিয়ে দিলে। বললে—সঙ্গে টাকা থাকা ভাল মা, কখন কী দরকার হয়, তুমি নিজের কাছে রেখে দিও টাকাগুলো।

জীবনে কখনও এমন গাড়িতে মা ওঠেনি। ওমা, এ যে সাহেবদের গাড়ি দীপু! সন্তোষকাকা আর তার মেয়েও গাড়িতে ঢুকে চারদিকে চাইতে লাগলো। এই পাশেই কলঘর। সব সময় দরজা বন্ধ রেখে দেবেন। বাজে লোককে ঢুকতে দেবেন না। এ কামরাটাই রিজার্ভ করা। এখানে কেউ ঢুকতে পাবে না। আপনারা তিনজনেই এ-গাড়িতে যাবেন।

মা বললে—খুব সাবধানে থাকবে বাবা, কাশী যেন সদর দরজা বন্ধ করে রাখে, একটু বলবে তুমি—

দীপংকর বললে—গিয়েই চিঠি দেবেন কাকা, নইলে আমি ভাববো—

সন্তোষকাকা বললে—তুমি ভেবো না বাবা, ক্ষিরি আছে আমার, ও চিঠি লিখতে জানে—ওকে আমি ওই জন্যেই তো লেখাপড়া শিখিয়েছি—কী রে, ও ক্ষিরি, তুই চিঠি লিখতে পারবি না?

মনে আছে ট্রেনটা ছেড়ে দেবার পরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দীপঙ্কর সেখানেই। মা চলে গেল, এ কথাটা যেন ভাবতেই পারা যায় না। ছোটবেলা থেকে এতদিন একসঙ্গে কেটেছে, এতদিন এক বাড়িতে কাটিয়েছে। মা ছাড়া দীপঙ্কর নিজেকে যেন কল্পনাই করতে পারে না। বাড়িতে গিয়ে আজই প্রথম দেখবে মা নেই। আজই প্রথম মা'র বিছানাটা রাত্রে খালি পড়ে থাকবে। আজই প্রথম দীপঙ্করের সমস্ত জীবনটা এমন করে ফাঁকা হয়ে গেল। প্রত্যেকদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রথমে মা'কে দেখে তবে অন্য কাজ করেছে দীপংকর। যেখানেই গেছে, বাড়ি ফেরবার কথা মনে হলেই প্রথমে মনে পড়েছে মা'কে। আজ রাত্রে

হয়ত ঘুমই আসবে না। হয়ত মা'ও ঘুমোতে পারবে না সেখানে গিয়ে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে যেমন, এই স্টেশন রোডের বাড়িতেও তেমনি। খুব ভোরেই মা ঘুম থেকে উঠিয়ে দিত। ছোটবেলায় কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে আসতো দীপঙ্কর, এখানেও দীপঙ্করকে উঠিয়ে দিয়ে তবে সংসারের কাজে হাত দেয় মা। প্লাটফরম থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাইরে আসবার সময় মনে হলো ট্রেনটা ঠিক পৌঁছোবে তো! যদি কোনও লোক গাড়ির দরজা ঠেলে, আর মা যদি ভুলে দরজা খুলে দেয়! যদি টাকাগুলো কেড়ে নেয়। ভালো করে বলে দেওয়া হলো না তো! তা ছাড়া আরো বেশি টাকা মা'র হাতে দিলে হতো! মা হয়ত ইচ্ছে মত খরচ করতে পারবে না। তা মা'র আর কীই বা দরকার, কীই বা কিনবে! হয়ত কিনবে হাতা-বেড়ি, চাকী বেলুন, এমনি সংসারের খুঁটিনাটি কিছু। নিজের জন্যে তো মা'র কেনবার কিছু নেই। কিনবেও না। হয়ত এক পয়সার একটা তেলের পলা, কি পেটা লোহার কড়া একটা। বড় জোর একটা কাঁসি। এই রকম টুকিটাকি কিছু।

প্লাটফরমের বাইরে অনেক ভিড়। দীপঙ্কর দাঁড়িয়েছিল চুপ করে।

—গাড়ি হবে হুজুর, ফিটন গাড়ি?

—রিক্সা চাই হুজুর?

—ট্যাক্সি হবে স্যার?

দু'তিন জন দালাল হেঁকে ধরলে তাকে। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে তাদের দিকে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। তখনও যেন দীপঙ্করের কানে বেনারস এক্সপ্রেসের হুইসলের শব্দটা আসছে। ট্রেনটা চলেছে, আর চাকার একটানা শব্দ হচ্ছে—ঘটাঘট। মা হয়ত শুয়ে পড়েছে বার্থের ওপর। আজই প্রথম বিশ্রাম মা'র জীবনে। আজই দীপু নেই, রান্না নেই। কিছু কাজ নেই মা'র। সন্তোষকাকা আর তার মেয়ের জন্যে লুচি পরোটা আলু চচ্চড়ি করে পোঁটলা বেঁধে সঙ্গে নিয়েছে।

—আর তোমার খাবার? তুমি রাত্তিরে কি খাবে মা?

—আমি আর কী খাবো, রেলে চড়ে আমি কিছু খাবো না বাবা, আমার খেতে প্রবৃত্তি হয় না—

তা হোক, ডাব খেতে তো আর আপত্তি নেই। গাড়ি তো গিয়ে পৌঁছবে সেই কাল ভোর বেলা! রাত্তিরে কিছু মুখে না দিলে কি চলে! দীপংকর চারটে ডাব, চারটে কমলা লেবু কিনে দিয়েছিল সঙ্গে। ডাবের মুখটা কাটিয়ে এনেছিল। সন্তোষকাকা গাঁয়ের লোক, ডাবের মুখটা খুলে দেবে'খন। গাড়িতে আবার বাসি কাপড়, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার যেন কোর না। কত করে বুঝিয়ে বলে দিয়েছিল দীপঙ্কর। গাঙ্গুলীবাবু বলেছিল—আমাদের চেনা শোনা পাণ্ডা, আমার শ্বশুর মশাই বরাবর ওদের কাছে গিয়ে ওঠেন, আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, আপনার কোনও ভাবনা নেই—

—আর আসবার সময় রিজার্ভেশনের কথাও লিখে দিয়েছেন তো?

—তা আর দিইনি, বলেন কী আপনি! বলে দিয়েছি আমাদের সেন সাহেবের মা যাচ্ছেন, কোনও অসুবিধে যেন না হয়—

তারপর একটু থেমে গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমিও একবার বেড়াতে যাবো সেনবাবু, অনেকদিন ধরে আমার স্ত্রী বড্ড পীড়াপীড়ি করছে।

—কোথায় যাবেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—এই কাশী হোক, পুরী হোক, মধুপুর গিরিডি হোক —যেতেই হবে, আর ছাড়ছে না! পাগল মানুষ তো, আবার কবে মাথা বিগড়ে যায়, বলা তো যায় না—

তা গাঙ্গুলীবাবুই সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তারই পাণ্ডা, তাকেই আগে থাকতে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা হয়েছিল। মা'র এতদিনের সাধ! মুখে বলতো বটে যে—দীপুই তার কাশী-গয়া, দীপুই তার তীর্থ-ধর্ম। কিন্তু মনে মনে তো তীর্থ করতে ইচ্ছে হতো মা'র। তাই ইদানীং মেজাজ যেন আরো খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছিল। কাশীকে দিনরাত বকতো মা। ভালোই হয়েছে। একটু ঘুরে এলে মা হয়ত আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। কত দিন আর দীপঙ্করের জন্যে সংসারে আটকে থাকবে স্বার্থপরের মত! কাল ভোরবেলা, রাত থাকতে থাকতে মোগলসরাইতে গাড়ি পৌঁছোবে! এতক্ষণ বোধহয় বর্ধমান পেরিয়ে গেছে! মা হয়ত ঘুমোচ্ছে এখন। গরমে হয়ত একটু তন্দ্রা এসেছে। ইলেকট্রিক পাখাটা মা'র দিকে টেনে দিয়ে এসেছিল দীপঙ্কর। মা'র দিকের জানালাটার কাচটা বন্ধ করে দিয়েছিল। ধুলো আসবে ভেতরে। যদি রোদ আসে তো খড়খড়িটাও যেন বন্ধ করে দেয়। সন্তোষকাকাকে সমস্ত বলে দিয়ে এসেছিল। কেমন করে জানালা খুলতে হয় বন্ধ করতে হয় সব দেখিয়ে দিয়ে এসেছিল।

সন্তোষকাকা বলেছিল—ও ক্ষিরি, ভালো করে দেখে নে মা, কেমন করে জানালা খুলতে হয় বন্ধ করতে হয়, শিখে নে—

দীপঙ্কর বলেছিল—আর ভেতর দিকের এই ছিটকিনিটা বন্ধ করে রাখবেন, তাহলে কেউ আর ঢুকতে পারবে না—

—ওই ক্ষিরিকে দেখিয়ে দাও বাবা, ক্ষিরি সব বুঝতে পারে, ক্ষিরির খুব বুদ্ধি, একবার বললেই সব বুঝতে পারে, কী রে ক্ষিরি, বুঝতে পারবি না?

ক্ষিরি কিছু কথা বলেনি। লজ্জায় জড়সড় হয়ে সব লক্ষ্য করছিল।

সন্তোষকাকা তাকে আরো লজ্জায় ফেললে। বললে—তুমি যা ভাবছো বাবা, ও তা নয়, খুব চালাক-চতুর মেয়ে আমার এই দেখ না, তোমার কাকীমা মারা যাবার পর থেকে ওই মেয়েই তো আমার সংসার চালিয়ে আসছে—

তারপর মা'র দিকে ফিরে বললে—কী বলো বৌদি—তুমি তো দেখলে এ ক'দিন ক্ষিরিকে—ঠিক বলিনি?

মা কিছু বললে না।

সন্তোষকাকা তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—তুমি তো সেদিন মাংস খেলে, কী রকম রান্না হয়েছিল বলো তো? ভাল না? কার রান্না ধরতে পেরেছিলে?

হাসতে লাগলো সন্তোষকাকা হো হো করে। ক্ষিরিকে বললে—দেখলি তো ক্ষিরি, দীপু আমার ধরতেই পারেনি—

ওদিকে তখন হুইসল্ দিয়েছে।

মা বললে—গাড়ি ছাড়বে বাবা, তুমি নেমে যাও—

দীপঙ্কর তারপর নেমে এসেছিল। গাড়িটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে। প্রথমে আস্তে, তারপর বেগ বাড়লো। দীপঙ্কর এগিয়ে চলতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে। মা নেই, মা চলে গেল। মা'কে যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল দীপঙ্করের কাছ থেকে। দীপঙ্করের মনে হতে লাগলো—কেউ যেন জোর করে তার মা'কে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে।

দীপঙ্কর হাত তুলে নাড়াতে লাগলো। তারপর ট্রেনটা প্লাটফরম ছাড়িয়ে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল এক নিমেষে!

—কাশী!

নিজের বাড়ির সামনে গিয়ে দীপঙ্কর কাশীকে ডাকতে গিয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো হঠাৎ। অন্যদিন বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রথমে মা'কে দেখতে পেত। আজ আর তা হবে না। আজ সমস্ত বাড়িটাই ফাঁকা। সারা কলকাতা শহরটা ঘুরে বেড়িয়েও যেন নিঃসঙ্গতা কমেনি। সমস্ত থেকেও যেন কিছু নেই। দীপঙ্করের মনে হলো—সে যেন নিঃসম্বল হয়ে গেছে। সমস্ত জীবনটাই যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে তার। কেউ নেই, কিছু নেই।

—কাশী!

কাশী বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। কাজ নেই। বাড়ি পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কাশীর দিকে চেয়ে দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো সে আর কাশী যেন আজ একাকার হয়ে গেছে। তারও মা নেই, দীপঙ্করেরও মা নেই। কাশীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে খানিকক্ষণ। কাশী কিছু বুঝতে পারলে না। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী রে, তোর ভয় করছিল কাশী?

—না।

সত্যিই তো, ভয় করবে কেন তার। কাশী বললে—না তো—

—বেশ বেশ, তোর তো খুব সাহস আছে দেখছি, একলা তোর ভয় করলো না মোটে! খুব বীর তো তুই!

কথাটা বলে দীপঙ্কর যেন নিজেকেই হাল্কা করতে চাইলে। সত্যিই তো, ভয় করতে যাবে কেন তার। হয়ত দীপঙ্করেরই ভয় করছিল। সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা। গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো। কেন এমন হয়! মা তো কারো চিরকাল

থাকে না। মা যখন থাকবে না তখন তো দীপঙ্করকে একলাই থাকতে হবে। এই সমস্ত বাড়িটাতে একলা। কাশী কিন্তু কাজের লোক হয়েছে বেশ। বেশ আপন মনে কাজ করে চলেছে। দীপঙ্কর দোতলায় উঠে দেখতে লাগলো। উঠোনের ওপর কাপড়গুলো শুকোতে দিয়েছিল সেগুলো তুললে কাশী। কল থেকে বালতি করে জল তুলে রান্নাঘরে রাখলে। দীপঙ্কর নিজের ঘরে গিয়ে একবার দাঁড়াল। তারপর মা'র ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। দোতলায় দুটো ঘর পাশাপাশি। মা'র ঘরটা আজ খালি। কয়েকটা ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙিয়েছে মা দেয়ালে। মা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছবিগুলোকে প্রণাম করে তবে নিচে নামে। পাশে দীপঙ্করের ঘরে ঢুকে জাগিয়ে দিয়ে যায় বরাবর। বিছানার কাছে এসে ডাকে—ও দীপু, দীপু, ওঠো বাবা—

পাশের বালিগঞ্জ স্টেশনের ইঞ্জিনের শান্টিংএর শব্দ, উত্তরে ট্রাম চলার আওয়াজ, সব তখন কানে আসে। দীপঙ্কর সেই ভোরে উঠেই পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন আবার সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যাগুলো ভিড় করে আসে মাথায়। তখন খবরের কাগজ দিয়ে যায়। তখন মা জল-খাবার করে দিয়ে যায় দীপঙ্করকে। তারপর শুরু হয়ে যায় দিনগত যুদ্ধ। জীবন-ধারণ আর জীবিকা উপার্জনের যুদ্ধ। এমনি প্রতিদিন চলে আসছে। সূর্য প্রতিদিন পুব দিক থেকেই ওঠে, যেমন উঠতো ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে। কিন্তু দীপঙ্করের কত কিছু বদলে গেছে। সেই দীপু দীপঙ্কর হয়েছে। সেই কাশীও এখন বড় হয়েছে। তারও দায়িত্ব বেড়েছে। এমনি করেই দীপঙ্করের পর আরও হাজার হাজার দীপু এই পৃথিবীতে জন্মাবে, বড় হবে, কিন্তু সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, কিছুই বদলাবে না। সূর্য ঠিক ওই জায়গা থেকেই উঠবে। ঠিক সময়েই সকাল হবে, আবার নিয়ম করে সন্ধ্যা হবে কলকাতায়, নিয়ম করে শীত পড়বে, গরম পড়বে, বৃষ্টি হবে, ফুল ফুটবে গাছে, ফুল ঝরে যাবে। কিন্তু তবু মনে হলো কাল সকালে বোধহয় কিছুই হবে না। মা সকাল বেলা আর ডাকবে না, আর জল-খাবার নিয়ে কাছে আসবে না। এতক্ষণ মা-ও হয়ত দীপুর কথাই ভাবছে। এখন ট্রেনটা কতদূর, কোথায় চলেছে। চাকার আর ইঞ্জিনের সেই ঝক্ ঝক্ শব্দ হচ্ছে একটানা। মা হয়ত বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে একভাবে।

কাশী হঠাৎ ঘরে এল। বললে—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি দাদাবাবু—

—কী কথা রে?

কাশী বললে—সেই লোকটা আবার এসেছিল আপনাকে খুঁজতে, সেই সেদিন গিরোনাথ মল্লিক রোড থেকে এসেছিল!

—কখন? কখন এসেছিল সে?

—আপনি আসবার আগে, দুপুরে বেলা।

দীপঙ্কর লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। আশ্চর্য শম্ভু এসেছিল আর তার

দেখা না পেয়েই চলে গেছে!

বললে—কী বললে সে? কিছু বলে গেছে তোকে?

কাশী বললে—আমি বললুম দাদাবাবু রাত্তিরে আসবে, তা শুনে কিছু বললে না, চলে গেল—

—তা একটু বসতে বললি না কেন? আমি তো আজ আপিসে যাইনি রে। তুই তো জানিস সব, তুই একটু বসতে বলতে পারলি না? তোর কোনও বুদ্ধি নেই?

রাগ হয়ে গেল কাশীর ওপর। শম্ভু এল অথচ তাকে বসতেও বললে না কাশী! এখন কী হবে! সে কি আর রাস্তায় এখন আছে! হয়ত সতীর খবর দিতেই এসেছিল। দীপঙ্কর উঠলো। এখন কোথায় যাবে সে! কোথায় গেলে আবার খবর পাওয়া যাবে শম্ভুর! এতক্ষণে কি আর আছে সে। হয়ত খবর দিতে এসেছিল। দীপঙ্করকে কোনও নতুন খবর দিতে এসেছিল।

—আবার কোথায় যাচ্ছেন, দাদাবাবু?

দীপঙ্কর বললে—দাঁড়া, আমি একটু ঘুরে আসি—

জামা-কাপড় বদলেই দীপঙ্কর বেরোচ্ছিল। কাশী বললে—খাবার তৈরি হয়ে গেছে দাদাবাবু, খেয়ে গেলে হতো—

দীপঙ্কর বললে—থাক, আমার যদি দেরি হয় একটু, তুই খেয়ে নিস—

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু মনে হলো কোথায়ই বা যাবে সে। কোথাও তো তার যাবার নেই। সমস্ত রাস্তায় ট্রাম বাস চলেছে উদ্দাম বেগে। এর মধ্যে সে কি খুঁজে পাবে শম্ভুকে? হয়ত সতীই তাকে পাঠিয়েছিল তার কাছে। হয়ত তার ঘরের দরজা সে খুলেছে এতদিনে। হয়ত এতদিনে শাশুড়ীর দয়া হয়েছে। হয়ত এতদিনে সনাতনবাবুর কথায় শাশুড়ী কান দিয়েছে। বলেছে—যা হয়েছে হয়েছে, ওকে যেতে দাও, ওর যেখানে খুশি যাক—

হয়ত সনাতনবাবু বলেছে—কোথায় যাবে তুমি? কোথায় যেতে চাও—?

সতী হয়ত বলেছে—যেখানে হোক আমি চলে যাবো, এখানে আর থাকবো না—আমার ভালো-মন্দের কথা তোমাদের ভাবতে হবে না।

—আমরা তোমার ভাল-মন্দ দেখবো না তো কে দেখবে? বা রে—

সতী হয়ত বলেছে—আমার ভাল-মন্দ দেখবার অনেক লোক আছে! আমি আমার বাবার কাছে চলে যাবো!

—তা বাবার কাছে কি একলা যেতে পারবে? তাঁকে আগে চিঠি লিখি, তিনি আসুন, তিনিই না-হয় তোমাকে নিয়ে যাবেন!

অনেক কথা কল্পনা করে দীপঙ্কর নিজের মধ্যেই অশান্তি ভোগ করতে লাগলো। এমনও হতে পারে হয়ত শরীর খারাপ হয়েছে খুব। অত্যাচারে, অনিয়মে রাগে রোষে একেবারে অচল হয়ে গিয়েছে শরীর। হয়ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে। ডাক্তার হয়ত বলে গিয়েছে—আর বাঁচবে না। হয়ত সেই খবরটাই

দৌড়ে দিতে এসেছিল শম্ভু।

দীপঙ্কর ট্রামে উঠে পড়েছিল। হাজরা রোডের মোড়ে পৌঁছতেই ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। ঝাপসা হয়ে এসেছে জায়গাটা। দু'একটা আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছে দোকানে দোকানে। এ-পাশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর অনেক-বার ভাবতে লাগলো। আবার সেই সতীর বাড়িতে যাবে! যদি আবার তাড়িয়ে দেয় সতীর শাশুড়ী। দারোয়ান যদি ঢুকতে না দেয়। কেমন যেন দ্বিধা হতে লাগলো বার-বার। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। দীপঙ্কর ছাড়া সতীর যেন আর কেউ নেই। হোক অপমান, হোক অত্যাচার, নিজের বাড়ির বউই হোক, আর ছেলেই হোক কাউকে অত্যাচার করবার কোনো অধিকার নেই কারো। এ তো সহ্য করাও অন্যায়!

সামনেই কে একজন আসছিল। দীপঙ্করের মনে হলো যেন চেনা মুখ। কাছে আসতেই দীপঙ্কর সামনে এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—কে বাবা, আমি তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না!

গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে সেই শু জুতো, গোড়ালির দিকটা দুমড়ে চটি জুতোর মতন হয়ে গেছে। এক মুখ পান। আরো বুড়ো হয়ে গেছেন।

দীপঙ্কর বললে—স্যার, আমি দীপঙ্কর।

—ওঃ তুমি দীপঙ্কর! তা কেমন আছো বাবা? কী করছো এখন?

সঙ্গে আরো দু'চারজন লোক ছিল। তাদেরও পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি। তারাও বোধহয় কংগ্রেসের লোক সব। সব শুনে প্রাণমথবাবু বললেন—খুব খুশী হলাম, তোমার মা তোমাকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন—তাঁর কষ্টও সার্থক হয়েছে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি সাহায্য না করলে কিছুই হতো না—

প্রাণমথবাবু সে-কথার ধার দিয়ে গেলেন না। বললেন—হ্যাঁ ভাল কথা, সেই তোমাদের অঘোর ভট্টাচার্যির বাড়ির দুটি ছেলে এসে সেদিন কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে গেল, তোমার নাম করছিল তারা—

মনে আছে প্রাণমথবাবুকে এতদিন পরে দেখে দীপঙ্করের সেই পুরোন কথাগুলো কেবল মনে পড়ছিল। সেই কিরণ, সেই কিরণের কথাও এতদিন পরে মনে পড়েছিল। সেই প্রাণমথবাবুর জেলে যাওয়া, সেই 'বন্দে মাতরম' বলা, সেই ফুলের মালা দেওয়া। সমস্ত। সুভাষ বোসকে কংগ্রেস থেকে তিন বছরের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন। তাই নিয়েই খবরের কাগজে লেখা-লেখি চলেছে।

দীপঙ্কর প্রাণমথবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলতে লাগলো।

প্রাণমথবাবু বলতে লাগলেন—তোমরা সব আমার ছাত্র, তোমরা বড় হয়েছ, মানুষ হয়েছ দেখলে আমারই বেশি আনন্দ হয়—

দীপঙ্কর বললে—কী আর হয়েছি স্যার, আপনার স্নেহ পেয়েছিলাম, তবু

জীবনে কিছুই হতে পারলাম না, রেলের চাকরি নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হলো—

—তাতে কি হয়েছে বাবা? সবাইকেই আমি কি কংগ্রেসের কাজ করতে বলি? কংগ্রেসের মেম্বার না-হয়েও দেশের কাজ করা যায়। সৎপথে থাকবে, সৎ আচরণ করবে, তাতেও দেশ-সেবা হয়। রেলের কাজই মন দিয়ে করো না, সে-ও তো একরকম দেশ-সেবা!

দীপঙ্কর কথাগুলো শুনে যেন অন্তরের মধ্যে উৎসাহ পেলে। বললে—কিন্তু বড় নীচতা বড় হীনতার মধ্যে চাকরি করতে হয় স্যার—

প্রাণমথবাবু বললেন—কোথায় নীচতা নেই বলো? ও সব জায়গাতেই আছে। রাজনীতিতে কি নীচতা-হীনতা নেই? এই দেখ না সুভাষবাবুকে কীভাবে সরানো হলো কংগ্রেস থেকে, এখন আবার গ্রেভ্ ইন্‌ডিসিপ্লিন-এর চার্জে তিন বছরের জন্যে তাড়িয়ে দেওয়ায়ও হলো—এও তো একরকম নীচতা—কিন্তু এসব ভাবলে চলবে না, এর মধ্যে থেকেই কাজ করে যেতে হবে আমাদের—

তারপর হঠাৎ থেমে বললেন—আর হ্যাঁ, সেই কিরণ, কিরণ এখন কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—তার তো কোনও সন্ধান নেই স্যার, সেই টেররিস্ট পার্টির মধ্যে ছিল, একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল আর কোনও খবর পাইনি—

—ওই দেখ, ওই একটা ছেলে, নিজের বিশ্বাসের পথ ধরেই চলেছে, ওকেও আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের মনের কাছে খাঁটি থাকলে কোনও কাজই দোষের নয় বাবা, নিজের মনের কাছে খাঁটি থেকো, তাহলেই স্বদেশের সেবা করা হবে—

আরো অনেক কথা হয়েছিল সেদিন। সেই প্রাণমথবাবু! আজীবন কংগ্রেসের কাজ করে গেলেন, শেষকালে সেই তাঁর কপালেই যে অমন মর্মান্তিক পরিণতি আছে তা-ও কি তিনি জানতেন? কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

প্রাণমথবাবু সদলবলে চলে গেলেন। দীপঙ্কর তাঁর কথা ভাবতে ভাবতেই আবার হাজরার মোড়ের দিকে ফিরে এল। নিজের মনের কাছে খাঁটি থাকলে কাকে সে ভয় করবে? মনে আছে আস্তে আস্তে মোড়টা পেরিয়ে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের দিকে এগোতে লাগলো। নিজের বিশ্বাসের পথ ধরে চলেছে সে। নিজের মনের কাছে সে খাঁটি। সুতরাং কোনও অন্যায় নেই তার। হয়ত বাড়িতে ডাক্তার এসেছে, বাড়ির সামনে গেলেই বোঝা যাবে ডাক্তারের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে সামনে। ভেতরে যাবার অনুমতি যদি না-ও পায়, শম্ভুর সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। শম্ভু তাকে দেখে নিশ্চয় কাছে আসবে।

কিন্তু বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখলে একেবারে ফাঁকা রাস্তা। দু'একজন লোক যাতায়াত করছে। সমস্ত বাড়িটা নিঝুম। ভেতরের জানলায় জানলায় আলো জেলে দিয়েছে। কিন্তু দরজায় তালা-চাবি ঝুলছে। দূর থেকে দীপঙ্কর দেখতে

পেলে—তালা-চাবি বন্ধ গেটের ভেতরে সেই দারোয়ানটা চুপচাপ বসে পাহারা দিচ্ছে।

দীপঙ্কর সামনে যেতেই দারোয়ান চিনতে পারলে। উঠে দাঁড়াল। দীপঙ্করকে সেলাম করলো। কিন্তু গেটের চাবি খুললে না।

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবু আছেন?

—জী হাঁ, আছেন।

দীপঙ্কর বললে—একবার খবর দাও তো—বলো গিয়ে দীপঙ্করবাবু এসেছেন—

দারোয়ান ভেতরে খবর দিতে চলে গেল।

খানিক পরেই আবার দারোয়ানটা ফিরে এল। বললে—নেই হুজুর, দেখা হবে না এখন—

—কেন? সনাতনবাবু বাড়িতে আছেন?

—আছেন, লেকিন হবে না—

দীপঙ্কর তবু জিজ্ঞেস করলে—সনাতনবাবুকে তুমি আমার নাম বলেছ?

—দাদাবাবুকে বলিনি, মা-মণিকে বলেছি, মা-মণির বে-হুকুমে তো আমি গেট খুলতে পারি না হুজুর।

দীপঙ্কর কী যেন ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ। অনেকখানি আগ্রহ, অনেকখানি উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল। আসবার সময় অনেক দৃঢ় সংকল্পের জাল বুনেছিল মনে মনে। দীপঙ্কর ভেবেছিল সেই দিনকার ঘটনার পর হয়ত সব মিট-মাট হয়ে গেছে। হয়ত সতী সংসারে তার ন্যায্য দাবির প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। হয়ত শাশুড়ী তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। হয়ত মানিয়ে-গুনিয়ে নিয়েছেন সমস্ত। কিন্তু তাহলে কেন শম্ভু আবার এসেছিল! কেন তাহলে এখনও পর্যন্ত গেটে তালা-চাবি দেওয়া! এখনও কি তাহলে সতীর ওপর সেই রকম অত্যাচারই চলছে?

দীপঙ্কর নিজের মনেই ভাবতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সব জেনেও কি তার ফিরে যাওয়া উচিত? অন্তত সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে অবস্থাটা পরিষ্কার করা উচিত। দীপঙ্কর অন্তত বলে যাবে তাঁকে যে দীপঙ্করের জন্যেই সতীর ওপর যদি কোনও অন্যায় কোনও অত্যাচার হয় তো তার সমস্ত দায়িত্ব দীপঙ্করের নিজেরই। দীপঙ্কর অন্তত সতীর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে বলে যাবে যে আপনি সতীকে এত কষ্ট দেবেন না। বলবে—আমি সতীর কেউ নই, সতীও আমার কেউ নয়। আপনি বিচক্ষণ মানুষ, আপনি তো সমস্ত বুঝতে পারেন, আমি সতীর শুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া আর কিছু নই। আমি চাই সতী সুখী হোক, সতী শান্তি পাক। ওর কোনও দোষ নেই। ওর মা নেই, আপনিই ওর মায়ের মতন। আপনিই ওর ভাল-মন্দের সব ভার নিন। ওর অন্যায় হলে ওকে বোঝান, আপনার পায়ে পড়ি ওকে আর এমন করে কষ্ট দেবেন না—

শাশুড়ী হয়ত বলবে—আমার বৌ-এর ব্যাপার, আমি বুঝবো, তুমি কে? তুমি কেন আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলাতে আসো বাবা?

তখন কী বলবে দীপঙ্কর? তখন কী জবাব দেবে? সত্যিই কি সতীর ভালো-মন্দের ব্যাপারে দীপঙ্করের কোনও দায়িত্ব নেই! সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়েই আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো দীপঙ্কর। এত ভীরু সে! এত দুর্বল! সামান্য বাধাটুকু ঠেলে ভেতরে ঢোকবার সাহসও নেই তার! কিসের ভয়? এখনি তো চিৎকার করে বাইরে থেকে ডাকা যায় সনাতনবাবুর নাম ধরে। এই বাড়ির ভেতরেই একজন মেয়েমানুষের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, এ-কথা এখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় তো ঘোষণা করা যায়। প্রাণমথবাবুর কথাও তো ঠিক। নিজের মনের কাছে খাঁটি থাকলেই তো হলো। এই ত্রিপুরী কংগ্রেস থেকেই তো বোঝা গেছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই, সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত নেহরু—পনেরো জনের মধ্যে প্রায় তেরো জন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারই নিজেদের নাম তুলে নিয়েছে। সুভাষ বোস কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকলে আমরা কেউ কমিটিতে থাকবো না। তোমার কাজ আমরা অচল করে তুলবো।

প্রাণমথবাবুর মত লোকও বলেছিলেন—ঠিক এই সময়েই কিনা মহাত্মা গান্ধী গেলেন রাজকোটে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে—ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে গেলেই তো চলতো! কিন্তু......

সঙ্গের একজন লোক বলেছিলেন—কিন্তু মাস্টারমশাই, সুভাষবাবু তো দুশো পাঁচ ভোটে পট্টভি সীতারামিয়াবাবুকে হারিয়ে দিলেন, তবু মহাত্মাজী বললেন—After all, Subhas Babu is not an enemy of his country.

আজকের এ-ঘটনা হয়ত কাল লোকে ভুলে যাবে। কালকের নতুন সমস্যার ভিড়ে আজকের এই অভিমন্যু-বধের পালার কথা হয়ত কারো মনে থাকবে না। কিন্তু আজ থেকে দশ বছর পরে, কুড়ি বছর পরে, কি পঞ্চাশ বছর পরে হয়ত কোনও সাহিত্যিক এই ঘটনা নিয়েই উপন্যাস লিখবে। উনিশ শো পঞ্চাশ, কি উনিশ শো ষাট সত্তর সালে হয়ত আবার এই ঘটনাটাই নতুন করে লিখতে বসবে কোনও ঐতিহাসিক। সেদিন ইতিহাস-বিধাতা কি মুখ বুজে চুপ করে বসে থাকবে! সব তো চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা থাকছে। সেদিন হয়ত দীপঙ্কর থাকবে না, এই প্রাণমথবাবু থাকবেন না, ওই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ভুলাভাই দেশাই, ওই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, কেউই থাকবেন না—সেদিন কে মুখ বন্ধ করবে তাঁদের? ইতিহাস তো কারো হাত-ধরা পুতুল নয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকে শুরু করে, সমুদ্রগুপ্ত, অশোকের যুগ পেরিয়ে মহম্মদ ঘোরীর আমলও পার হয়ে পৌঁছিয়েছে ব্রিটিশ-যুগে। কেউ চেপে রাখতে পেরেছে ভারত-বিধাতাকে! কেউ ঘুষ দিতে পেরেছে ভারত-ভাগ্য-বিধাতাকে! কেউ কাউকে কড়ি দিয়ে কিনতে পেরেছে চিরকালের জন্যে? লর্ড

লিন্‌লিথগো, লর্ড আরউইন—কেউ পেরেছে? কেউ পারবে?

দারোয়ানটা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে।

দীপঙ্কর তখনও প্রাণমথবাবুর কথাই ভাবছিল। প্রাণমথবাবুর মত লোক, তিনিও কিনা বলে গেলেন—নিজের মনের কাছে খাঁটি থাকাটাই আসল কথা! সত্যিই তো, কিরণ তো ভুল করেনি। কিরণ তো নিজের বিশ্বাসের পথই বেছে নিয়েছে। মনের কাছে সে তো খাঁটি থেকেছে! আজ যদি কেউ তাকে দেখতে পায় এখানে, হয়ত ভাববে দীপঙ্কর এখানে কেন? এ-রকম সময়ে এ-বাড়ির সামনে কেন? এই তালা-বন্ধ দরজার সামনে সে কী করছে একলা-একলা! আজ এখন দীপঙ্করের নিজের বাড়িটা ফাঁকা। কাশী হয়ত এতক্ষণে রোয়াকের উপর শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত খাওয়াও হয়নি তার। কোনও কাজ তো নেই, কোনও দায়িত্বই নেই। মা হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে ট্রেনের মধ্যে। হয়ত কমলা-লেবু খায়নি, ডাবও খায়নি হয়ত। সন্তোষকাকা কি আর পীড়াপীড়ি করবে খাবার জন্যে! দায় পড়েছে সন্তোষকাকার!

হঠাৎ দীপঙ্কর কান খাড়া করে উঠলো। কে যেন কাঁদছে না! যেন অনেক দূরে আকাশের উঁচু থেকে কার নিঃশব্দ কান্না ভেসে আসছে! অঘোরদাদু, তুমি ভুল বলেছিলে, আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে তুমি ভুল বলেছিলে, আমায় ছেলে-মানুষ পেয়ে তুমি ভুল শিখিয়েছিলে। কিছু কেনা যায় না কড়ি দিয়ে। আমি তোমার কথা মানবো না। আমি তোমার কথা শুনবো না। তেত্রিশ টাকার ঘুষ দিয়ে রেলের চাকরিই শুধু কেনা যায়, সম্মান প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাই শুধু কেনা যায়। কিন্তু তার বেশি কিছু কেনা যায় না। স্বাধীনতা কেনা যায় না, শান্তি কেনা যায় না কড়ি দিয়ে। পরের কষ্ট দূর করা যায় না কড়ি দিয়ে, পরকে সুখী করা যায় না কড়ি দিয়ে!

—হুঁশিয়ার বাবুজী, হুঁশিয়ার—

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো দীপঙ্করের। এতক্ষণ কত কী আবোল-তাবোল ভাবছিল ঠিক ছিল না। হঠাৎ পেছনে বিরাট লম্বা একটা মোটর একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান গেট-এর তালা খুলে দিলে। গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। অনুমতি নিতে হলো না, দরবার করতে হলো না। গাড়িটা গেটের সামনে আসতেই দারোয়ান শশব্যস্ত হয়ে তালা খুলে দিয়ে সেলাম করলে। রাস্তার গ্যাসের আলোটা গাড়ির ভেতরে পড়তেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে—নির্মল পালিত। নির্মল পালিত গাড়ির ভেতর বসে বসে সিগারেট টানছে!

নির্মল পালিত এত রাত্রে এ-বাড়িতে কেন? নির্মল পালিত হয়ত দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে সে-ও অবাক হয়ে যেত এখানে দীপঙ্করকে দেখে! হয়ত কোনও মামলা মোকর্দমা আছে হাইকোর্টে। হয়ত জমি-জমা নিয়ে

ঘোষ-বাড়ির মামলা চলছে। ঘোষ-বাড়ির পক্ষের ব্যারিস্টার হয়ত নির্মল পালিত।

দীপঙ্কর আবার ফিরে চলে আসছিল। এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। গলিটার বাইরে কোলাহলের জগৎ এখন আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অফিস ফেরত লোকের ভিড় বেড়েছে রাস্তায়। দীপঙ্কর চলেই আসছিল। হঠাৎ একেবারে মুখোমুখি শম্ভুর সঙ্গে দেখা।

দীপঙ্করই প্রথমে চিনতে পেরেছে। বললে—শম্ভু না?

শম্ভুর হাতে একটা কিসের ঠোঙা। হয়ত দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসছিল। বললে—আমি তো আপনার কাছেই গিছলাম দাদাবাবু—

দীপঙ্কর বললে—আমিও তো সেইজন্যেই এলুম—কী খবর বলো শম্ভু? তোমার বৌদিমণি কেমন আছে?

শম্ভু বললে—খবর ভাল নয় আজ্ঞে, বৌদিমণি কিছু খায় না দায় না, একেবারে শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে খুব, সেইজন্যেই তো আপনার কাছে গিয়েছিলুম আমি।

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কী করতে পারি বলো তো? আমি তো তোমার দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলুম, কিন্তু দাদাবাবুর কাছে তো খবরই পৌঁছল না, তোমার মা-মণি তো দরজা খুলতেই বারণ করলেন দারোয়ানকে। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবো, শেষে চলে আসছিলুম, এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—

শম্ভু বললে—আপনি দেখা করতে চান বৌদিমণির সঙ্গে?

—দেখা করবো? আমি? তুমি বলছো কী শম্ভু?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল শম্ভুর কথা শুনে।

শম্ভু বললে—আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বিপদও আছে—যদি মা-মণি টের পায় তো আপনারও সব্বনাশ, আমারও সব্বনাশ, বৌদিমণিরও সব্বনাশ—

দীপঙ্কর বললে—থাক, তার দরকার নেই, তার চেয়ে যদি মা-মণির সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারো তো সেই ভালো—

শম্ভু বললে—মা-মণি আপনার সঙ্গে দেখা করবে না হুজুর,—

—তাহলে, দাদাবাবু! দাদাবাবুর সঙ্গে অন্তত দেখা করিয়ে দিতে পারো আমার?

শম্ভু বললে—মা-মণি না বললে দাদাবাবু দেখা করবে না আজ্ঞে, মা-মণির কথা ছাড়া দাদাবাবু এক পা নড়েন না—

—তাহলে আমি আর কী করতে পারি বলো? আমার দ্বারা আর কী হতে পারে?

শম্ভুও কী বলবে বুঝতে পারলে না।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুমি আমার কাছে কী করতে গিয়েছিলে আজ?

শম্ভু বললে—এই সব কথা বলতেই গিয়েছিলাম। বাতাসীর মা, ভূতির মা, সবাই বড় ভাবছে আজ্ঞে, তারাই তো আপনার কাছে আমায় যেতে বললে। সবাই ভয় পেয়ে গেছে কি না!

—কেন? ভয় কিসের?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে ভয় হবে না। বৌদিমণি কি কিছু খাচ্ছে? খায় না, দায় না, শুধু চুপ করে থাকে, না-খেলে শরীর টিঁকবে কী করে?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—বৌদিমণি দরজা খুলেছে?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ খুলেছে। একদিন পরে মা-মণি গিয়ে বলার পর দরজা খুলেছে—

—আর তোমার দাদাবাবু কোথায় শোয়? কার ঘরে শোয়?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে মা-মণি কি দাদাবাবুকে বৌদিমণির কাছে যেতে দেয়? আমাদের কাউকেই যে যেতে দেয় না। শুধু ভূতির মা গিয়ে বৌদিমণিকে খাবার দিয়ে আসে—তা খায় না কিছুই বৌদিমণি, নামমাত্তোর শুধু ভাত ছুঁয়ে হাত গুটিয়ে নেয়—!

—তা মা-মণি কিছু বলে না তোমার বৌদিমণিকে?

শম্ভু বললে—সেই নিয়েই তো ঝগড়া বাধলো আবার নতুন করে। মা-মণি সেদিন গেল বৌদিমণির ঘরে। বৌদিমণির ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। বললে—বৌমা, দরজা খোল, খোল দরজা—

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি দূর থেকে।

সতীর শাশুড়ী তখনও দরজা ঠেলছে। দু'দিন জলগ্রহণ করেনি সতী।

—দরজা খোল বলছি বৌমা, আমার বাড়িতে বসে তুমি আত্মঘাতী হবে, তা আমি হতে দেব না, দরজা খোল।

সতী দরজা খুললো। দু'দিন খায়নি। দু'দিনেই যেন রোগা হয়ে গেছে প্যাকাটির মত। দরজাটা খুলেই শাশুড়ীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো।

শাশুড়ী বললেন—বলি, তুমি কী ভেবেছ বলো দিকি বৌমা, তুমি ভেবেছ কী? দু'দিন না-খেয়ে তুমি কার মাথা কিনলে? তুমি ভাবছো আমি তোমার মতলব বুঝতে পারিনি? তুমি কি আমার হাতে পুলিসের হাত-কড়া লাগাবে ঠিক করেছ?

সতী তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু উত্তর দিলে না।

—রাগ দেখিয়ে তুমি যে খুব দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দাঁতকপাটি মেরে পড়ে রইলে? আমি তোমার কী এমন ক্ষতি করেছি শুনি? আমি তোমায় এমন কী বলেছি? আমি তোমার মায়ের তুল্য মানুষ, গুরুজন, আমি যদি তোমার ভালোর জন্যে দুটো কড়া কথা বলেই থাকি তো কী এমন অন্যায়টা করেছি বলো তো?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—তোমার কী বৌমা, তুমি তো শুধু খাচ্ছ দাচ্ছ ঘুমোচ্ছ—তাতেই তোমার ল্যাঠা শেষ, কিন্তু আমাকে যে হাজারোটা জ্বালা সইতে হচ্ছে দিনরাত, তার খবর তো তোমরা কই রাখতে আসো না! তার বেলায় তো তোমরা কেউ বলো না—মা আপনি বসুন, আপনি পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকুন, আমরা আপনার হয়ে সংসারের ঘানি টানছি। এই যে হাইকোর্টের মামলা-মকদ্দমা উকীল-মুহুরি-ব্যারিস্টার সব আমি সামলাচ্ছি, কই, তার বেলায় তো তুমি একটু মুখের কথা বলেও শাশুড়ী-মাগীকে একটু সাহায্য করতে আসো না। আমি লেখা-পড়া-জানা বউ করেছিলুম, ভেবেছিলুম বিধবা মানুষ, আমার একটু সুরাহা হবে বৌ ঘরে এনে! তা যথেষ্ট হয়েছে মা, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। আমরা লেখা-পড়া শিখিনি, ভগবান আমাদের বাঁচিয়েছেন, তা যেমন হয়েছে আমার ছেলে, তেমনি হয়েছে আমার বউ—আমার কপালে খুব সুখ হয়েছে, আমার আর সুখের দরকার নেই মা, সুখের কপালে পেন্নাম করি আমি,—

সতী তখনও দরজার দুটো পাল্লা ধরে দাঁড়িয়েছিল। শাশুড়ীর কথা কানে গেল কি কানে গেল না বোঝা গেল না।

শাশুড়ী বললেন—তা বলি এখন খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে, না কী? আমার অনেক কাজ। সকাল থেকে ভালো করে জপ-তপ্ পর্যন্ত করতে পারলাম না—ওদিকে সরকারবাবু হিসেবের খাতাপত্তোর নিয়ে হাঁ করে বসে আছে—আমি কোন্ দিক্ সামলাই!

তারপর ভূতির মাকে ডেকে বললেন—দে, বৌমাকে চা এনে দে তো ভূতির মা, আহা মুখটা বাছার শুকিয়ে গেছে উপোস করে—

তারপর যাবার আগে বললেন—তোমার মা নেই তো, মা থাকলে বুঝতে—আর আমারে দেখ দিকিনি, মা-বাপ দু'জনের দু'দিক সামলাতে হচ্ছে। তা তোমাকে এ-সব বলা বৃথা বৌমা, তুমি এত কথা বললেও বুঝবে না। বাপ বরাবর টাকা পাঠিয়েছে, আর তুমি পরের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছ, বৈষয়িক ব্যাপারের হ্যাপা তুমি বুঝবে কী করে বৌমা? তোমার বাবা হলে বুঝতেন, তিনি জানতেন টাকা উপায় করা যত শক্ত, টাকা রাখা তার চেয়ে আরো শক্ত! আর এসব যে আমি করছি, সব কার জন্যে? আমার জন্যে? আমি তো দু'দিন পরে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবো, তখন তোমাদেরই তো ভুগতে হবে! তোমাদেরই সংসার নয়-ছয় হয়ে যাবে। আমি আর ক'দিন? পিঠে খেতে তো সকলেরই আরাম, পিঠের ফোঁড় গুনতে তো সেই আমি—

কথাগুলো বলে শাশুড়ী চলে যাচ্ছিলেন।

সতী হঠাৎ বললে—আমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন, আমাকে এসে তিনি নিয়ে যাবেন—

শাশুড়ী ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—কী বললে?

—বললাম আমার বাবাকে আপনি চিঠি লিখে দিন, তিনি যেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলে যান। এখানে থাকলে আমারও জ্বালা, আপনাদেরও জ্বালা—

শাশুড়ী কী যেন ভাবলেন একটু। তারপর বললেন—তাতে বাপের জ্বালা বাড়বে বই কমবে না তো! তুমি কি ভাবছো বাপের কাছে গেলে তোমার জ্বালা কমবে? নিজেও জ্বলবে, বাপকেও জ্বালাবে—

—জ্বলি যদি তো সে জ্বালায় আমিই জ্বলবো, আমার নিজের বাবাকে জ্বালাবো! আপনাদের জ্বালাতে আসবো না।

শাশুড়ী বললেন—খুব মেয়েকে জন্ম দিয়েছিল বটে তোমার বাবা! এক মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে জ্বালিয়েছে, আবার তুমিও শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে জ্বালাও—। আমি হলে এমন মেয়েকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করতুম না,—

সতী কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—আমার বাবাকে খবর দেবেন কি না বলুন?

—তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ নাকি?

শাশুড়ীও এতক্ষণে কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন সতীর দিকে।

সতী দমলো না। বললে—ভয় দেখানো যদি মনে করেন তো ভয়ই দেখাচ্ছি, আর নইলে আপনার দুটি পায়ে পড়ছি আমায় আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিন, নইলে আমি আর পারছি না—

শাশুড়ী বললেন—বৌমা, তোমার এই ছিঁচকাঁদুনে কান্না শুনলে আমার গা জ্বালা করে, তোমার আমি কী হেনস্থা করেছি যে তুমি আর পারছো না? তোমার কোন্ অভাবটা আমি রেখেছি শুনি? তোমায় পেট ভরে খেতে দিই নি? তোমায় শাড়ি গয়না পরতে দিই নি? তুমি বুড়ো মানুষের মুখের সামনে মিছে কথাটা বলতে পারলে?

সতী কিছু উত্তর দিলে না।

শাশুড়ী আবার বলতে লাগলেন—সোনাকে তো তোমার ঘরে শুতে বারণ করিনি। তুমিই ঢং করে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে মটকা মেরে পড়ে রইলে। তা বাছা আমার কোথায় শোয় বল দিকিনি। সে তো আর আমার ছেলে বলে বানের জলে ভেসে আসেনি! তা তাই আমি তাকে বললাম—বৌমা দরজায় হুড়কো দিয়েছে তা কী হয়েছে, তুই আমার ঘরে শো! আমি তো এখনও মরিনি—! আমি যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন তোর কোনও ভাবনা নেই, আমি মলে তখন ওই বউই তোর গলায় ঠ্যাং দিয়ে তোকে থেঁতলে মারবে, দেখে নিস্—

রাত্রে মা-মণি বললেন—সোনা, আজকে তুমি তোমার ঘরেই শোওগে যাও বাবা,—

সনাতনবাবু বললেন—কেন মা? আমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না—

—তা না হোক, বৌমা দরজা খুলেছে, তুমি তোমার ঘরেই যাও—

সনাতনবাবু সতীর ঘরে গিয়ে দরজা ঠেলতে লাগলেন। সতী অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে দিলে। বললে—এ কি? তুমি এলে যে?

সনাতনবাবু বললেন—আজ এ-ঘরেই শোব আমি—

বলে ঘরের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। সতী রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

সনাতনবাবু বললেন—কী হলো, পথ ছাড়ো—

সতী বললে—না, এ-ঘরে তোমায় শুতে হবে না, তুমি যে-ঘরে শুচ্ছিলে সেখানেই যাও—

—তার মানে?

সনাতনবাবু বিচলিত হলেন না। যেন রুখে দাঁড়ালেন সতীর সামনে।

সতী বললে—তার মানে তোমাদের দয়ার দান নিয়ে আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না। ভেবেছ আমার কাছে শুয়ে আমাকে তুমি কৃতার্থ করে দেবে? ভেবেছ তুমি আমার পাশে শুলে আমি ধন্য হয়ে যাবো? আমার নারী-জন্ম সার্থক হবে?

বলতে বলতে হঠাৎ সনাতনবাবুর বুকের ওপর মাথা রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো সতী। সে-কান্না আর থামতে চায় না যেন। সনাতনবাবুর বুকের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে মাথা ঘষতে লাগলো।

সনাতনবাবু বিব্রত হয়ে পড়লেন—বললেন—আরে, ছি ছি, এ কি, কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন? কী করেছি আমি?

সতী মুখ তুললো। বললে—আজ তুমিই বলছো তুমি কী করেছ? তুমি যদি অন্যরকম হতে তাহলে আমার ভাবনা? তুমি যদি আমার দিকে হতে তো আমি এমন করে দগ্ধে দগ্ধে মরি? তুমি আমার সহায় হলে আমি যে সব কষ্ট সব দুঃখ হাসি মুখে সহ্য করতে পারতুম—

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি তো তোমারই দিকে, আমি তো তোমারই—কী যে ছেলেমানুষি করো!

সতী বললে—তুমি যদি আমার হবে তো আমার অপমান হলে তোমার তো কই গায়ে লাগে না! তুমি যদি আমারই হবে তো আমার জন্যে তো তুমি এতটুকু ভাবো না—

—কে বললে তোমার জন্যে আমি ভাবি না—

—ভাবো? আমার জন্যে ভাবো তুমি? আমার কথা সারাদিনে একবারও তোমার মনে পড়ে? তা হলে আমার ঘরে অচেনা লোককে নিয়ে এলে তুমি তো জিজ্ঞেস করো না, কে সে। আমি যখন বাড়ি থেকে বেড়াতে চলে যাই, তুমি তো জিজ্ঞেস করো না কোথায় গিয়েছিলুম। এই যে আমাকে বাড়িতে আটকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, কাউকে চিঠি লিখতে দেওয়া হয় না, কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না, তার জন্যে তুমি তো কিছু বলো না। তুমি

তো আমাকে বকো না, তুমি তো আমাকে শাসন করো না—

সনাতনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—শাসন করবো? তোমাকে? কেন তুমি কী করেছ?

সতী বললে—তা শাসন যদি না-ই করলে তো আদরও তো করো না—

—বা রে, তা বলা নেই কওয়া নেই, আদরই বা হঠাৎ করতে যাবো কেন?

—তা আদর যদি না করবে তো কেন বিয়ে করতে গিয়েছিলে? কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বিয়ে করতে বলেছিল? কেউ তো তোমার হাত-পা বেঁধে জোর জবরদস্তি করে আমার গলায় ঝুলিয়ে দেয়নি?

সনাতনবাবুর বুকে তখন সতী মাথাটা হেলিয়ে রেখেছে। সনাতনবাবু বললেন—এ-সব কী আবোল-তাবোল বলছো বলো দিকিনি তুমি? আমি কিছুছু বুঝতে পারছি না তোমার কথার মাথামুণ্ডু—

সতী হঠাৎ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। সনাতনবাবুকে দূরে ঠেলে দিয়ে বললে—এইটুকু যদি বুঝতে না পারো তো যাও, বুঝেও দরকারও নেই তোমার। তোমাকে বুঝতেও হবে না—কেন তুমি তাহলে আমার ঘরে শুতে এসেছিলে? যেখানে শুচ্ছিলে সেখানেই শুতে যাও না—কে তোমায় ডেকেছে? কে বলেছে তোমায় আসতে? যাও তুমি, তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি—

বলে ঘরের দরজাটা সনাতনবাবুর মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলে সতী। তারপর ভেতরে খিল দেওয়ারও শব্দ হলো।

সনাতনবাবু সেইখানেই খানিকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সদর গেটে তালা খোলার শব্দ হলো হঠাৎ। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে নির্মল পালিতের যে-গাড়িটা কিছুক্ষণ আগে ভেতরে ঢুকেছিল, সেটা আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তায় পড়ে সোজা হাজরা রোডের দিকে চলে গেল।

শম্ভু বললে—ওই ব্যারিস্টারবাবুর গাড়ি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ব্যারিস্টারবাবু কি রোজ আসে তোমাদের বাড়িতে?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, রোজই তো আসে, মামলা লেগেছে কি না। মা-মণির সঙ্গে ব্যারিস্টারবাবুর পরামর্শ হয়। দাদাবাবু তো মামলা-মোকদ্দমার কিছু বোঝে না, মা-মণিই সব করে—

—তা এত মামলা-মোকদ্দমাই বা কিসের? কী নিয়ে মামলা?

—তা জানিনে, মামলা তো লেগেই আছে চিরকাল দেখে আসছি বাড়িতে। তা সম্পত্তি থাকলেই হয়ত মামলা হয়—

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তা যাক্ গে, তারপর কী হলো?

—আজ্ঞে তারপর আর কী হবে, দাদাবাবু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বারান্দা

দিয়ে সিঁড়ির দিকে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে একতলায় নিজের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে আবার বইপত্তর নিয়ে পড়তে বসলো। পড়তে বসলে তো আর দাদাবাবুর জ্ঞান থাকে না কোনও দিকে—

—তা ঘুমোলেন কখন?

শম্ভু বললে—এই চেয়ারে বসে পড়তে পড়তেই কখন মাথাটা টেবিলের ওপর কাত্ করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়াল ছিল না। আমি যখন ভোর বেলা ঘর ঝাঁট দিতে গেছি দেখি তখনও ঘরে বাতি জ্বলছে, আর দাদাবাবুর মাথাটা টেবিলের ওপর হেলে পড়েছে।

আমি গিয়ে ঠেলে তুললুম। বললাম—দাদাবাবু, পড়ে যাবেন যে, উঠুন, ও দাদাবাবু—

দাদাবাবু ধড়মড় করে উঠলো। চারদিকে চেয়ে যেন খেয়াল হলো সব। বললে—ক'টা বাজলো রে শম্ভু? এখন কত রাত্তির?

আমি বললুম—রাত কোথায় দাদাবাবু, এখন যে সকাল হয়ে গেছে, আমি ঘর ঝাঁট দিতে এসেছি, উঠুন, আপনি যে পড়ে যাচ্ছিলেন—

আমার কথা শুনে দাদাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগলো। দাদাবাবুর কাণ্ড দেখে আমারও মায়া হলো। ভাবলুম দাদাবাবুর কপালের দুর্ভোগ। নইলে দাদাবাবুই বা কী দোষ করেছে! আর কাকেই বা দোষ দেব বলুন! কারোর তো দোষ নেই—

বাড়ি ফিরে আসবার পথে দীপঙ্কর সেই কথাই ভাবছিল। কার দোষ! কে দোষী! সতী? না সনাতনবাবু? নাকি সতীর শাশুড়ী! কাকেই বা দোষ দেওয়া যায়! মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে সতীর শাশুড়ী তো ব্যতিব্যস্ত। সেই কতকাল আগে একদিন সমস্ত ভার মাথায় পড়েছিল তাঁর। এমনি শক্ত হাতে সব না সামলালে কি এতদিনে এই সংসার টিঁকতো! সেদিনকার সেই পূর্ব-পুরুষের আমলের সমস্ত নিয়ম-কানুন সমস্ত ক্রিয়া-অনুষ্ঠান সবই তো চালিয়ে যাচ্ছেন। মামলা-মোকদ্দমা তো করছেন নিজে। কোথায় সংসারের কোন্ কোণে কী ঘটছে, সব কিছুর ওপরেই তো তাঁকে নজর রাখতে হচ্ছে। তিনি ছাড়া আর কে আছে? তিনি যদি হাল ছেড়ে দেন, তাহলে সমস্ত যে রসাতলে যাবে! তিনি যদি ছেলের বউকে শাসন না করেন, যদি নিজের ইচ্ছেমত তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে না নেন, তো তাঁর অবর্তমানে সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে! সংসার তো করলেই হলো না, সংসারের আরামের দিকটাও যতখানি, সংসারের কর্তব্যের দিকটাও যে ততখানি। মা আছে বলেই দীপঙ্কর এতদিন সংসারের সেই দিকটা বুঝতে পারেনি। আর দীপঙ্করের আর কতটুকুই বা সংসার। ভাড়াটে বাড়ি—দুটো মাত্র লোক। তবু তাই নিয়েই তো মা হিমশিম খেয়ে যায় দিনরাত। কিন্তু সতীদের বাড়ি চাকর-বাকর, ঝি, মালী, ড্রাইভার, দারোয়ান, মেথর, ঠাকুর গাড়ি, বাগান, মামলা, ট্যাক্স, পুজো, আহ্নিক—সমস্ত কিছুর পেছনে যে একটিমাত্র মানুষ।

সেই একটি মানুষই যে আজীবন, এ-বাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর থেকেই একলা সব চালিয়ে আসছে। সে-মানুষ যদি কড়া না হয় তো চলবে কী করে।

শম্ভু বলেছিল—আপনি যদি বৌদিমণির সঙ্গে দেখা করতে চান তো বলুন, আমি দেখা করিয়ে দিতে পারি—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল—কী করে দেখা করাবে?

শম্ভু বলেছিল—সে আমি সব পারি, পেছনের খিড়কির দরজার আমি ডবল-চাবি করে নিতে পারি, যখন সবাই ঘুমোবে, তখন সেই দরজা দিয়ে আমি আপনাকে বৌদিমণির ঘরে নিয়ে যেতে পারি—

দীপঙ্কর বললে—না থাক, তার দরকার নেই—তার চেয়ে একটা কাজ করতে পারো?

—কী কাজ?

—তোমার বৌদিমণির বাবার ঠিকানাটা যোগাড় করে দিতে পারো? আমি তাহলে তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি সমস্ত কিছু জানিয়ে। এরকম করে থাকলে তোমার বৌদিমণি আর কতদিন বাঁচবে? বাবা এলে তিনি হয়ত একটা কিছু ব্যবস্থা করতেও পারেন—কিম্বা টেলিগ্রামও করে দিতে পারি তাঁকে, যাতে শিগগির শিগগির চলে আসেন—

শম্ভু কী যেন ভাবলে। বললে—আমি বলে দেখবো।

দীপঙ্কর বললে—তুমি ঠিকানাটা পেলেই আমার বাড়িতে আমাকে দিয়ে যেও—

শম্ভু বললে—তা হলে আসি দাদাবাবু, ভূতির মা'র মুড়ি আনতে গিয়েছিলুম, এতক্ষণে মুড়ি বোধহয় মিইয়ে গেল—আমি কালকেই বৌদিমণির কাছ থেকে ঠিকানাটা নিয়ে আপনাকে গিয়ে দিয়ে আসবো—

শম্ভু চলে গেল। গড়িয়াহাট পর্যন্ত এসেও দীপঙ্কর সেই কথাই ভাবছিল। এই যে আশে-পাশে কত মানুষ ট্রামে-বাসে চলেছে, সকলেই কি নিজের নিজের সমস্যায় জর্জর। সকলেই কি দীপঙ্করের মত নানা কথা ভাবছে। নানা ভাবনায় জড়িয়ে পড়েছে। সকলেরই তো ফরসা জামা-কাপড়, সকলেরই তো দাড়ি-কামানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা। দীপঙ্করের মতই কি সবাই সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অক্লান্ত চিন্তায় অস্থির? কই, কারোর মুখ দেখে তো তা বোঝা যাচ্ছে না। কেউ নিরুদ্বিগ্ন মনে বই পড়ছে, কেউ জানলার বাইরে চেয়ে আছে কেউ পাশের লোকের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-গল্প করছে। হয়ত সবাই তার মত। কিম্বা হয়ত কেউ-ই তার মত নয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করছে, সহজভাবেই গ্রহণ করেছে জীবনকে। যা না চাইতেই আসে, তা-ও প্রত্যাখ্যান করে না, আর যা না চাইলেও পায় না, তার জন্যেও হা-হুতাশ করে

মরে না। সেই রকমই তো ভাল ছিল। তবে কেন দীপঙ্কর এমন হলো! কেন বিধাতাপুরুষ তাকে এমন করে গড়লে? কেন সহজভাবে সব কিছু গ্রহণ করতে পারে না সে। কেন ভুলতে পারে না সে কিছুই? কী করলে সব কিছু ভোলা যায়। ভুলের দেবতা তুমি ভোলানাথ! কী করলে তোমাকে তুষ্ট করা যায়। কী করলে ভোলানাথ হতে পারে সে!

গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছে আসতেই হঠাৎ খেয়াল হলো।

এই তো! একটু হেঁটে গেলেই তো লক্ষ্মীদির বাড়ি। এখনি গিয়ে তো লক্ষ্মীদির কাছ থেকে ভুবনেশ্বরবাবুর ঠিকানাটা যোগাড় করা যায়। কিন্তু লক্ষ্মীদি কি ঠিকানা দেবে?

সামনেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। দীপঙ্কর ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসলো। বললে—ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিং—

পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার। সার সার অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। একজনের বরাত খুলে গেল। ট্যাক্সিটা চলতে আরম্ভ করতে মনে হলো একটু তাড়াতাড়ি করাই ভালো। কাশীটা অনেকক্ষণ হয়ত বসে আছে জেগে। কিম্বা হয়ত না-খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাশীকে আর-একটা গেঞ্জি কিনে দিতে হবে। দুটো মাত্র গেঞ্জি। দুটো গেঞ্জিতে ঠিক চলে না ওর। ওই বয়েসে দীপঙ্করও অনেক কষ্ট করেছে। কিন্তু পরের বাড়িতে তার মত চাকরের কাজ করতে হয়নি।

—এই রোখকে!

কখন লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে এসেছিল খেয়াল ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে রাস্তাটির বেঁকবার মুখে। দীপঙ্কর বললে—আরেকটু পিছে হটো, আর একটু পিছে—

দরকার নেই। এটুকু হেঁটে গেলেই চলবে। কিন্তু তার পরেই মনে হলো ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েই বা কী হবে। আগে দেখা যাক, লক্ষ্মীদিরা এখানে আছে কিনা। হয়ত লক্ষ্মীদি এখানে আর নেই এখন। কিন্তু বাড়িটা তেমনিই আছে। সেই সামনে একটা নর্দমা। নর্দমাটা পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে হয় একটা গলি দিয়ে। গলির মুখে একটা দরজা। দরজাটা তখনও খোলা। ঢুকতে গিয়েও কেমন একটু দ্বিধা হতে লাগলো। অনেকদিন পরে ঢুকছে, সেই দিনকার সেই ঘটনার কথাটাও মনে পড়লো। এখনও কি সেই অনন্তবাবু আছে এখানে? লোকটা সত্যিকারের স্কাউণ্ড্রেল! আর দাতারবাবু!

গলিটা দিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই যেন অনেক লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। গলির শেষেই ঘরটা। সেখান থেকেই আওয়াজটা আসছে।

যেন কেউ চিৎকার করছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে হাসির আওয়াজ। আবার অনেক লোকের কথা। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলছে সবাই। এত লোক এ-বাড়িতে কোথা থেকে এল। এরা সব কারা! এখানে কী করতে এসেছে! তবে কি

লক্ষ্মীদিরা চলে যাবার পর অন্য লোকেরা এসেছে এ-বাড়িতে। অন্য লোকেরা বাস করছে!

একটু এগিয়ে গিয়েই একটা জানালা। জানালাটা খোলা ছিল। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে সব দেখা গেল এক নিমেষে!

আশ্চর্য! অনেকদিন পরে যখন এই ঘটনার কথা মনে পড়েছে দীপঙ্করের তখন অবাক হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাকে কাটাতে হয়েছে, সেই লক্ষ্মীদিই বা জীবনের মোড় এমন করে কী করে ফেরালে! কোন মন্ত্র জানতো লক্ষ্মীদি। কোন জাদু জানতো। দীপঙ্করের কতবার মনে হয়েছে লক্ষ্মীদি এ কী করছে। এ যে সর্বনাশের চূড়োয় উঠেছে লক্ষ্মীদি। এখান থেকে পা ফসকালে যে একেবারে রসাতলে তলিয়ে যাবে। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে তখন ভালো করে তাকানোও যেত না। চেয়ে দেখলে ঘেন্না হতো। লক্ষ্মীদির চোখ দুটোর চারপাশে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। সেই গালের লাল আভাটুকু কোথায় ডুবে গিয়েছিল। ভাবাও যেত না, একদিন এই লক্ষ্মীদিই পায়ে ঘুঙুর পরে নাচতো। গায়ের শাড়িটা আঁট করে কোমরে জড়িয়ে নাচতো। সেদিন সেই লক্ষ্মীদির হাতের মার খাবার জন্যেই কত লোভ হতো দীপঙ্করের। সেই লক্ষ্মীদিকে দেখবার জন্যে পাড়ার ছেলেরা তার কলেজে যাবার সময় জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতো। যারা গান গেয়ে গেয়ে বন্যার চাঁদা চাইতে আসতো তারা দোতলায় লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে গান গাইতে ভুলে যেত! সেসব দিনের কথা কি দীপঙ্কর জীবনে ভুলতে পারবে!

আজ এতদিন পরে আবার সেই লক্ষ্মীদির কাছেই আসতে হয়েছে। যদিও দীপঙ্কর আর সে-দীপঙ্কর নেই। সেদিনকার সেই গরীব দীপঙ্কর এখন চাকরি করছে। ভাল চাকরি করছে। দশজনের মাথায় উঠেছে। সবাই খাতির করে, সবাই নমস্কার করে তাকে। এখন সমীহ করে কথা বলে। চাকরির জন্যে, প্রমোশনের জন্যে, কনফার্মেশনের জন্যে খোশামোদ করে অনেকে। কিন্তু কেউ জানে না ভেতরে সে বদলায়নি। অন্তরের অন্তস্তলে এখনও সেই শিশুটি তার লুকিয়ে আছে। সে এখনও বেগুনী-ফুলুরি তেলেভাজা খেতে চায়, এখনও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, বেদনায় বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসে!

জানালা দিয়ে দেখতে দেখতেও লজ্জায়-ঘেন্নায় দীপঙ্করের বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগলো।

বোধহয় পাঁচ ছ'জন লোক মেঝেয় মাদুরের ওপর বসে আছে। বসে বসে তাস খেলছে। শুধু তাস খেলছে নয়, সকলের সামনে গ্লাস রয়েছে। গ্লাসের মধ্যে যা রয়েছে তা দীপঙ্কর চিনতে পারলে। আর সকলের মাঝখানে টাকা নোট পয়সা জমা রয়েছে অনেক। এক হাতে টাকা ছুঁড়ছে আর একহাতে তাস। আর গা ঘেঁষে বসে রয়েছে লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদি খেলা দেখছে আর হাসছে খিল্‌খিল্‌ করে।

যারা খেলছে তাদের চিনতে পারলে না দীপঙ্কর। এরা কারা? অনন্তবাবু তো নেই এদের মধ্যে! সে কোথায় গেল?

একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—কুইন্‌ অব স্পেড্‌স্‌—

আরও যেন কী সব বললে। দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। তাস খেলতেই জানে না দীপঙ্কর তো তাসের কথা বুঝতে পারবে কী করে। আর বোঝবার উপায়ও ছিল না। সেই ভদ্রলোকের চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা হট্টগোল উঠলো। সে হট্টগোল আর থামে না।

একজন বললে—আমি সাঁন্‌ খেলেছি, আমার কী দোষ—

কিন্তু হট্টগোল আর থামে না। চিৎকার হৈ চৈ হট্টগোল। লক্ষ্মীদি হঠাৎ একজনের পাশে গিয়ে গা ঘেঁষে বসে তার হাত দুটো চেপে ধরলে। বললে—তুমি চুপ করো সুধাংশু—

সুধাংশু বললে—বারে, তুমি আমাকে চুপ করতে বলছো। আমি ব্লাইন্ড খেলেছি—আমি কেন চুপ করবো!

—আমি বলছি তুমি চুপ করো সুধাংশু—

লক্ষ্মীদি এমন ভাবে চাইলে সুধাংশুর দিকে যে দীপঙ্করও সে-চাউনি দেখে চমকে উঠলো। এ-রকম তো ছিল না লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদির চোখের চাউনিতেই ভদ্রলোক চুপ করে গেল। বললে—ঠিক আছে, মিসেস দাতার যখন বলছে তখন আমি ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু চৌধুরী, এবার থেকে কেয়ারফুল হয়ে খেলবে—

—এবার কার ডীল?

লক্ষ্মীদি বললে—এবার চৌধুরীর ডীল—

নতুন করে আবার তাস দিতে লাগলো একজন। আবার নতুন করে তাস তুলে নিলে সবাই। লক্ষ্মীদি সকলের কাছ ঘেঁষে তাস দেখতে লাগলো। আবার ডাক চলতে লাগলো। টাকা পয়সা নোট আবার পড়তে লাগলো মাদুরের ওপর। একটা চাকর এসে আবার গ্লাস ভর্তি করে দিয়ে যেতে লাগলো। আবার হাসি, আবার তর্ক, আবার ঝগড়া। যে জিতছে সে স্তূপাকার টাকা-নোট-পয়সা সব নিয়ে নিচ্ছে। তার থেকে ভাগ দিচ্ছে লক্ষ্মীদিকে। লক্ষ্মীদি আবার সেই টাকা নিয়ে একটা ব্যাগে রেখে দিচ্ছে। এই রকম চললো অনেকক্ষণ ধরে। সবাই অবস্থাপন্ন, সবাই বেশ শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হলো। কী আনন্দেই আছে এরা। কী উৎসাহ খেলায়! পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, কোথায় কী চলছে, কোনও দিকেই এদের খেয়াল নেই। সবাই যেন এক ছন্দে বাঁধা। এরা সবাই কি এখানে এই বাড়িতেই থাকে নাকি? কোথায় শোয়? কোথায় খায়? কোথায় চাকরি করে? এরা কারা?

—ট্রাম্প!

চিৎকার করে উঠলো একজন। হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি টাকা-পয়সাগুলো নিজের কোলের দিকে টেনে নিলে। লক্ষ্মীদিও তার থেকে ভাগ নিলে। নিজের ব্যাগে রাখলে।

লক্ষ্মীদি বলে উঠলো—চৌধুরীর আজকে লাক্ ফিরে গেছে সুধাংশু—ওর সঙ্গে পারবে না—

সুধাংশু বললে—আমার তো বরাবরই লাক্ খারাপ মিসেস দাতার—

—দাঁড়াও, আমি তোমার লাক্ ভাল করে দিচ্ছি—

বলে লক্ষ্মীদি সরে গিয়ে সুধাংশুর ঠিক পেছনে একেবারে তার পিঠ্ ঘেঁষে বসলো। তারপর আবার খেলা চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা-পয়সাগুলো জমতে লাগলো সুধাংশুর পকেটে।

চৌধুরী বললে—ওকে বড় জিতিয়ে দিচ্ছেন মিসেস দাতার—একটু আমাদের দিকেও কৃপা-বর্ষণ করুন-

লক্ষ্মীদি বললে—তোমার লাক্ ফিরিয়ে দিলে আগে তুমি কী দেবে বলো?

চৌধুরী খেলতে খেলতে বললে—আমি আপনাকে সব দিতে পারি মিসেস দাতার—

লক্ষ্মীদি তেমনি হাসতে হাসতেই বললে—সব দিলে তোমার বউ-এর জন্যে কী বাকি থাকবে চৌধুরী?

—বউ-এর জন্যে রইল আমার দেনা!

বলে হো হো করে হেসে উঠলো চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে উঠলো। আবার চাকরটা এসে গ্লাস ভর্তি করে দিয়ে গেল। লক্ষ্মীদি এক মনে খেলা দেখতে লাগলো সুধাংশুর পিঠ ঘেঁষে।

সুধাংশু লক্ষ্মীদির দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললে—সিগ্রেট খাবেন নাকি মিসেস দাতার?

লক্ষ্মীদি বললে—দিচ্ছ খাবো—

বলে সত্যি সত্যিই সিগারেট মুখে দিলে লক্ষ্মীদি আর সুধাংশু দেশলাই ধরিয়ে দিলে। আর সত্যি সত্যিই লক্ষ্মীদি সিগারেট টানতে লাগলো। ধোঁয়াও বেরোতে লাগলো মুখ দিয়ে। মুখ থেকে ধোঁয়া ছাড়বার কায়দা দেখে দীপঙ্করের মনে হলো লক্ষ্মীদি যেন সিগ্যারেট খেতে জানে। সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস আছে বেশ। খেয়ে যেন বেশ আরাম পেতে লাগলো!

দীপঙ্কর আর দাঁড়াতে পারলে না। সমস্ত শরীরটা যেন রি-রি করে উঠলো! এখানে যেন না-এলেই ভাল হতো! না-এলে তো আর এ জিনিস দেখতে হতো না। কেন সে এল! কেন দীপঙ্কর এখন এখানে আসতে গেল। কে তাকে আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল!

ট্যাক্সিটার ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। এখনও দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়।

দীপঙ্কর গলিটা দিয়ে আবার ফিরে চলতে লাগলো। এ সব কী হয়ে গেল!

সমস্ত যেন আমূল বদলে গেল মানুষের সমাজের। বেশ তো ছিল লক্ষ্মীদি! বেশ তো ছিল সতী! বেশ তো ছিল মিস মাইকেল! বেশ তো ছিল ছিটে-ফোঁটাও। বেশ তো ছিল বিন্তীদি! কিন্তু কোথায় যেন একটা সুতোয় টান পড়লো আর বদলে গেল সবাই! দীপঙ্করের চোখের সামনেই যেন সব বদলে গেল। সমস্ত কলকাতা শহরটাই বদলে গেল। শুধু ভূগোলই বদলায়নি, শুধু ইতিহাসই বদলায় নি। ভূগোল ইতিহাসের ধারণাটাই বদলে গেল যেন! শুধু কালিঘাট বদলায় নি, বালিগঞ্জ বদলায় নি। কালিঘাট বালিগঞ্জের মানুষগুলোই বদলে গেল। আর শুধু মানুষই বা কেন, মানুষের মনগুলোও যেন বদলে গেল। কোন অদৃশ্য লোকের ইঙ্গিতে যেন কালিঘাট বালিগঞ্জ কলকাতা পৃথিবী সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। শুধু তো পৃথিবী নয়। বিগত বর্তমান অনাগত সমস্ত কিছুই অন্যরকম হয়ে গেল। এ কী আশ্চর্য! দীপঙ্করই কি এক-রকম আছে! দীপঙ্করের সেই বয়েসটা না-থাক, দীপঙ্করের চোখটাও কি সেই এক-রকম আছে! দীপঙ্কর কি এখনও সেই আগেকার মত রাস্তায় ছেঁড়া জামা ছেঁড়া চটি পরে ঘুরতে পারে! সেই আগেকার মত তেলে-ভাজা, আগেকার মত চিনে-বাদাম চিবোতে চিবোতে ঘুরে বেড়াতে পারে! এখন তো তার ফরসা জামা-কাপড় ফরসা কোট-প্যান্ট ফরসা ধুতি-সার্ট দরকার হয়! ফরসা জামা-কাপড়ের সঙ্গে তার মনটাও কি বেশি ফরসা হয়েছে! তার খাতির হয়ত বেড়েছে, তার মাইনে হয়ত বেড়েছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব কি এক তিল বেশি বেড়েছে তার! মনুষ্যত্ব বাড়লে দীপঙ্কর তো আজ সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসতো! কথা বলে সতীর অপমানের প্রতিকার চাইতো। মনুষ্যত্ব বাড়লে তো আজ দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আসতো। কথা বলে লক্ষ্মীদির অধঃপতনের প্রতিকার করতো!

দীপঙ্কর বাইরে এসে আবার ট্যাক্সিতে উঠলো—শিখ ড্রাইভার তখনও হাঁ করে বসে ছিল। তার ভাড়া উঠছে মিটারে।

দীপঙ্কর বললো—চলো—

কিন্তু অসহায়ের মত যদি শুধু সমস্ত কিছু দেখা ছাড়া আর কিছুই সে করতে পারলে না, তা হলে কেন সে এসেছিল এখানে? দীপঙ্কর কি ভয় পেয়ে গেল নাকি? লক্ষ্মীদিকে তার এখনও ভয়? লক্ষ্মীদিকে ভয় করবার এখন আর কী আছে! এখনও কি লক্ষ্মীদি তার চেয়ে বড় আছে? এখনও কি লক্ষ্মীদি তাকে সেই ছোটবেলাকার মত চাঁটি মারতে পারে! আশ্চর্য! লক্ষ্মীদির চেহারাটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো। লক্ষ্মীদি যেন তখনও তার চোখের সামনে খিল্‌খিল্ করে হাসছে আর সিগারেট খাচ্ছে। যেন কায়দা করে তখনও লক্ষ্মীদি তার চোখের সামনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। দীপঙ্কর নিজের দুর্বলতায় নিজেই লজ্জায় পড়লো। তারও তো অধিকার আছে। অধিকার আছে প্রতিকার করবার। অধিকার আছে প্রতিবাদ করবার।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো দীপঙ্কর—ঘুরিয়ে নিয়ে চলো—ট্যাক্সি ঘুরাও—ড্রাইভার অবাক হয়ে গেছে। পেছন ফিরে চাইলে দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—যেখান থেকে উঠেছিলাম, ওখানেই নিয়ে চলো আবার—ট্যাক্সি আবার ঘুরলো। আবার গিয়ে দাঁড়াল লক্ষ্মীদির বাড়ির সামনে।

সত্যিই তো, তারও তো অধিকার আছে প্রতিকার করবার। অধিকার আছে প্রতিবাদ করবার।

আবার সেই গলি-রাস্তা। তখনও দরজাটা তেমনি খোলা। দীপঙ্কর একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সেই খোলা-জানালার সামনে তখনও সুধাংশুর পিঠ ঘেঁষে বসে আছে লক্ষ্মীদি! তখনও হাসছে খিল্‌খিল্ করে। তখনও লাভের ভাগ নিচ্ছে। তখনও চাকর এসে সকলের গ্লাস ভর্তি করে দিচ্ছে। যেমন চলছিল, ঠিক তেমনই চলছে। এদের আসর এমনি কতক্ষণ চলবে কে জানে?

দীপঙ্কর হঠাৎ ডাকলে—লক্ষ্মীদি!

ডাকটা শুনেই লক্ষ্মীদি চম্‌কে পেছন ফিরে দেখলে।

তারপর বললে—কে?

বলে উঠে বাইরে চলে এল।

অন্ধকারে প্রথমে চিনতেই পারেনি লক্ষ্মীদি! কিম্বা হয়ত এতদিন পরে দেখছে বলে না-চেনাটাই স্বাভাবিক। দীপঙ্করও তো এতদিন পরে দেখছে লক্ষ্মীদিকে। খানিকক্ষণ যেন হাঁ করে চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের মুখের দিকে।

বললে—কে আপনি? কাকে চান?

—আমি লক্ষ্মীদি, আমি! দীপু!

—ও তুই? কী রে? এতদিন পরে তুই কোত্থেকে?

লক্ষ্মীদি যেন বিব্রত হয়ে পড়লো মনে হলো। দীপঙ্করকে কোথায় বসাবে, এই নিয়ে যেন চিন্তান্বিত হলো। কিন্তু সে একমুহূর্তের জন্যে। হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আমি অনেকক্ষণ এসেছি লক্ষ্মীদি—সব দেখেছি।

লক্ষ্মীদি চাইলে দীপঙ্করের মুখের দিকে ভালো করে! যেন সন্দেহ হতে লাগলো। দীপঙ্কর বললে—আমি এসেছিলাম একটা কাজে—

লক্ষ্মীদি সে-কথার ধার দিয়েও গেল না। বললে—কী দেখেছিস?

দীপঙ্কর বললে—আমার মুখে সে না-ই বা শুনলে।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি সিগ্রেট খাই, আমি মদ খাই, এই তো?

শুধু তাই নয়, আরো অনেক কিছু দেখেছি।

লক্ষ্মীদি বললে—লুকিয়ে লুকিয়ে পরের বাড়ির ভেতর চেয়ে দেখতে তোর লজ্জা করে না?

লক্ষ্মীদির গলাটা যেন একটু তীক্ষ্ণ শোনালো। দীপঙ্কর বললে—পর মনে করলে তো আমি চেয়ে দেখতাম না। আর তোমাকে পর মনে করলে তোমার

সঙ্গে কথা না-বলেই চলে যেতাম। চলে যেতে গিয়েও চলে যেতে পারলাম না, ফিরে এসে তোমাকে ডাকলুম!

লক্ষ্মীদি কথাটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—এখন কী কাজে এসেছিলি বল?

দীপঙ্কর বললে—তুমি খুব ব্যস্ত, আমি জানি! আমার সঙ্গে কথা বললে তোমার সময় নষ্ট হবে তাও জানি। সুতরাং নিজের কাজটা সেরেই আমি চলে যাবো—তোমাকে বিরক্ত করতে আর কখনো আসবো না তোমার বাড়িতে—

—কিন্তু আমার সঙ্গে তোর কাজটা কী?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবার ঠিকানাটা দাও—ঠিকানাটা আমার দরকার—

হঠাৎ ভেতর থেকে কে যেন ডাকলে—মিসেস দাতার—

লক্ষ্মীদি সে-ডাকের উত্তর না দিয়ে বললে—কেন? ঠিকানা নিয়ে কী করবি তুই?

—মিসেস দাতার? কোথায় গেলেন আপনি?

বলতে বলতে সেই ভদ্রলোক বাইরে এসে হাজির। এরই নাম সুধাংশু। তার পেছনে চৌধুরীও এল। তার পেছনে আরও দুজন ভদ্রলোক এল। দীপঙ্করকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে।

লক্ষ্মীদি তাদের দিকে না-চেয়েই বলতে লাগলো—ঠিকানা নিয়ে তুই আমার বাবাকে জানাবি ভেবেছিস? কেন? বাবাকে জানিয়ে তোর কিসের লাভ? কী হবে বাবাকে জানিয়ে? আমাকে অপমান করবার জন্যে? আমাকে ভালো করবার জন্যে? কী মতলব করে এসেছিস, বল্ না আমাকে—

দীপঙ্করের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। এতগুলো লোক, তারাও কিছু বুঝতে পারছে না। কে দীপঙ্কর, লক্ষ্মীদির সঙ্গে দীপঙ্করের কী সম্পর্ক তারা তা-ও জানে না।

লক্ষ্মীদি আবার প্রশ্ন করলে—কথা বলছিস না কেন, কথা বল্?

ভদ্রলোকেরা দীপঙ্করের মুখের দিকে তখনও হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সিগারেট খাচ্ছে সবাই। দীপঙ্করের চেহারা, দীপঙ্করের হাব-ভাব দেখে মিসেস দাতারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে।

সুধাংশু জিজ্ঞেস করলে—ইনি কে, মিসেস দাতার?

লক্ষ্মীদি সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে—কীরে, বোবা হয়ে গেলি নাকি?

দীপঙ্কর একটু থেমে বললে—না, বোবা হইনি, বোবা হলেই অবশ্য ভালো হতো। তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে বোবা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু থাক, এখন আমি যাই—

—কার সঙ্গে কথা বলছেন মিসেস দাতার, কে এ ভদ্রলোক?

লক্ষ্মীদি বললে—তোমরা থামো...তা যে-কাজের জন্যে এসেছিলি, তা না বলে চলে যাচ্ছিস কেন?

সুধাংশু বললে—আপনি রাগ করছেন কেন স্যার, খেলবার যদি ইচ্ছে থাকে তো আপনিও খেলুন না, আমাদের কোনও আপত্তি নেই, আপনার লাক্ ভাল থাকলে আপনি জিতবেন, আমরা রাগ করবো না। যে-যার ভাগ্য নিয়ে এসেছি আমরা—জীবনটাই তো জুয়া—

দীপঙ্কর বললে—না, আপনারাই খেলুন, আমি তাস খেলতেই জানি না, আপনাদের সময় নষ্ট করার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন—আমি এখনি চলে যাচ্ছি—

তারপর একটু থেমে বললে—আর তাছাড়া আপনাদের মত আমি জীবনটাকে জুয়া বলে মনে করি না। জীবনের আরো অনেক মানে আছে। জুয়া খেলে নষ্ট হবার জন্যে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। সে-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আপনাদেরও নেই, আর আমারও সময়ের দাম আছে—নইলে এ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়—

চৌধুরী সিগারেটে টান দিয়ে বললে—ঠিক বলেছেন দাদা, টাইম ইজ মনি—

অন্য সবাই চৌধুরীর কথা বলার ঢং দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো। লক্ষ্মীদিও হেসে উঠলো সকলের সঙ্গে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন সবাই ঠাট্টা করছে তাকে। সবাই হাসির পাত্র পেয়েছে তাকে। কিন্তু এর চেয়েও অনেক অপ্রিয় ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে দীপঙ্কর। এতে বিচলিত হলে চলে না। দীপঙ্করের মনে হলো, এদের সে চেনে। এরাই হলো কোট-প্যাণ্ট-পরা ছিটে-ফোঁটা। আসলে ছিটে-ফোঁটার সঙ্গে, এদের ভেতরের কোনও তফাত নেই। ছিটে-ফোঁটারা কালিঘাটের বাজারে যেত, আর এরা এসেছে লক্ষ্মীদির বাড়িতে। উদ্দেশ্য এদের একই। এরাই অনন্ত রাও ভাবে, এরাই ঘোষাল সাহেব, এরাই মিস মাইকেলের টম-ডিক-হ্যারি। এদের কোনও জাত নেই। এরা সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে। পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করছে।

সুধাংশু হঠাৎ বললে—মিসেস দাতারকে আপনি একলা পেতে চান বুঝি?

লক্ষ্মীদি সে-কথার প্রতিবাদ করলে। বললে—তুমি থামো সুধাংশু, কার সঙ্গে কী কথা বলতে হয় জানো না—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—তুই এখন যা দীপু, এখন চলে যা—রাত্তিরে আর কখনও আসিসনি আমাদের বাড়িতে—

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে লক্ষ্মীদির মুখের দিকে। লক্ষ্মীদির মুখের কথা যেন বড় করুণ হয়ে বাজলো দীপঙ্করের কানে। লক্ষ্মীদি পিঠে হাত দিয়ে দীপঙ্করকে দরজার দিকে নিয়ে চললো। অন্ধকার চারিদিক এখানটায়।

দরজার কাছে এসে দীপঙ্কর থামলো। বললে—এর পরেও আসতে বলো তুমি আমাকে?

লক্ষ্মীদি বললে—আর কখনও আসিসনি তুই—

দীপঙ্কর বললে—আসবার সময় অনেক কিছু ভেবে এসেছিলাম, অনেক কথাও ছিল তোমার সঙ্গে! কিন্তু কিছুই বলা হলো না—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু প্রাণ গেলেও বাবার ঠিকানা তোকে আমি দিতে পারবো না—

দীপঙ্কর বললে—বিশ্বাস করো, তোমার কথা আমি বাবাকে জানাবো না! আমি সতীর জন্যে ঠিকানাটা নিতাম—

—সতী? সতী কোথায়?

লক্ষ্মীদি সতীর নাম শুনেই চমকে উঠলো!

বললে—সতীর জন্যে বাবাকে চিঠি লিখবি? কেন, সতীর কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—সতী তোমার চেয়েও কষ্টে আছে, তোমার তবু যা খুশি করবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তার তাও নেই। তার কষ্টের প্রতিকার কেবল তোমার বাবাই করতে পারেন।

—কিন্তু সতীর তো বিয়ে হয়েছে বড়লোকের বাড়িতে। বাবা তো নিজেই অনেক দেখে শুনে তার ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়ে গেছেন! তার তো অনেক টাকা!

—তা শুধু টাকা হলেই কি সুখ হয় সংসারে!

লক্ষ্মীদি বললে—আমার টাকা থাকলে কি আজ এই রকম করে সংসার চালাতে হতো? টাকা নেই বলেই তো আমার এত কষ্ট!

দীপঙ্কর বললে—সে-সব কথা থাক, তুমি ঠিকানাটা দাও—আমি আজই চিঠি লিখে দেব। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কথা লিখবো না চিঠিতে!

লক্ষ্মীদি কী যেন ভাবলে। বললে—আমার সঙ্গে যে তোর দেখা হয়েছে, তাও জানাবি না তো?

দীপঙ্কর বললে—না—

—আমার বিয়ের আগে তুই যে শম্ভুকে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসতিস, তাও জানাবি না তো?

—না, তাও জানাবো না!

লক্ষ্মীদি আবার বললে—ভেবেছিলাম বাবার কাছ থেকে চলে এসে নিজের এক নতুন সংসার গড়ে তুলবো, আমার অহঙ্কার, আমার অভিমান, সব কিছু বজায় রাখতে পারবো, আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে রাখবো, কিন্তু সব সাধ ধুলোয় লুটিয়ে গেল। আমি একেবারে ফুরিয়ে গেলাম রে—

বলে লক্ষ্মীদি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

দীপঙ্কর বললে—তোমার মায়া-কান্না শোনবার সময় আমার নেই, তুমি ঠিকানাটা দেবে তো দাও—আমার নিজেরও অনেক সমস্যা আছে, আমার

নিজেরও অনেক কাজ আছে—

লক্ষ্মীদি মুখ তুলে চাইল দীপঙ্করের দিকে। দীপঙ্কর বললে—তোমাকে দেখছি আর ভাবছি, তুমি এখনও সেই রকমই আছো, সেই একই রকম, কিন্তু পৃথিবী কত বদলে যাচ্ছে দিন-দিন, সেদিকে তোমার কোনও খেয়ালই নেই—মান-অভিমান সব মানুষেরই থাকে, কিন্তু একটা বয়েসের পরে তা আর মানায় না—

লক্ষ্মীদি কথা বোধহয় বুঝতে পারলে না।

দীপঙ্কর বললে—লোকের বয়েস বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বাড়ে—কিন্তু তোমার এ কীরকম বলো তো, যত বয়েস বাড়ছে, তত তুমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো—

—তার মানে ?

—তার মানে আমি তোমাকে বার-বার বোঝাতে পারবো না, তুমি বুঝবেও না—তোমার মুখে এখন মদের গন্ধ পাচ্ছি, যদি তুমি সুস্থ থাকতে তো তোমায় বোঝাতুম—

লক্ষ্মীদি হঠাৎ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তুই যখন ওই কথা বললি, তাহলে আয়, আমার সঙ্গে আয়, দেখে যা—

বলে লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে।

দীপঙ্কর বললে—ছাড়ো, হাত ছাড়ো—

—না তোকে দেখতেই হবে, তুই নিজের চোখেই আজ দেখে যা—

দীপঙ্কর বললে—আমি দেখেছি, যা-দেখবার আমি সব দেখেছি—

—না, তুই কিছুই দেখিসনি, তোর দেখবার অনেক বাকি—

বলে লক্ষ্মীদি হিড়-হিড় করে দীপঙ্করকে টেনে ভেতরে নিয়ে চললো আবার।

দীপঙ্কর বললে—তোমার ঘরে ওরা সব রয়েছে, ওরা কী ভাববে বলো তো! ছাড়ো—

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করকে নিয়ে একেবারে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। মনে আছে, দীপঙ্করকে সেই অবস্থায় দেখে ঘরের মধ্যে যারা ছিল, সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তারা ভেবেছিল যেন হয়ত দীপঙ্করও তাদের মতো একজন এসে হাজির হলো। ভেবেছিল দীপঙ্করও তাদের মত রোজ সেখানে গিয়ে তাস খেলবে, তাদের মত দান ফেলবে, আর সময়ের আর টাকার সদ্ব্যবহার করবে।

কিন্তু লক্ষ্মীদির কথায় সবাই চমকে উঠলো। লক্ষ্মীদি বললে—তোমরা এখন ওঠো সুধাংশু—চৌধুরী তুমিও ওঠো—তোমরাও ওঠো আজ সকলে—

চৌধুরী বললে—সে কি মিসেস দাতার, এখনও যে নাইট ইজ ইয়াং—

—হোক, আজ দীপু এসেছে, দীপুর সঙ্গে আজ আমার একটু কাজ আছে—

আজ ওঠো তোমরা—

লক্ষ্মীদির চোখের চাওয়ায় বোধহয় রুক্ষতা ছিল একটা। কেউ আর বেশি আপত্তি করলে না। আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো সবাই। যেন অনিচ্ছে রয়েছে উঠতে। স্যুট-পরা ভদ্রলোক সব। হয়ত ভাল চাকরি করে সবাই। আপিসের কোনও বড়সাহেব হয়ত। গভর্নমেণ্ট আপিসের বিগ-বস্ হয়ত। এদেরই ভয়ে হয়ত আপিসের ক্লার্করা কাঁপে। দামী সিগ্রেট খাচ্ছে, দামী আংটি পরেছে, দামী সময়-জ্ঞান। সময় নষ্ট না করে এখানে টাকা উপায় করতে এসেছে। কিন্তু লক্ষ্মীদির সামনে সবাই মাথা নিচু করে ফেললে।

সুধাংশু বললে—গুড লাক্ টু ইউ বয়—

লক্ষ্মীদি বললে—চুপ করো সুধাংশু, দীপু আমার ভাই-এর মতন—

চৌধুরী হঠাৎ বলে উঠলো—ভাই-ভাতারি বুঝি ?

লক্ষ্মীদি আর থাকতে পারলে না। ঠাস করে চৌধুরীর গালে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ চড় খেয়ে চৌধুরী যেন টলে পড়ছিল। কিন্তু সামলে নিলে। লক্ষ্মীদি বললে—কার সঙ্গে কী কথা বলতে হয় জানো না তো চুপ করে থাকতে পারো না—

চৌধুরী আর কোনও কথা বললে না। আস্তে আস্তে আহত কুকুরের মত নিজের জুতো জোড়া পায়ে পরতে লাগলো। সুধাংশুও সিগারেটের টিনটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সবাই বাইরে চলে যাবার পর লক্ষ্মীদি বললে—কেশব, বাইরে দরজায় খিল দিয়ে দিগে যা—

কেশব চলে যেতেই দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চাইলে। একেবারে অন্য চেহারা হয়ে গেছে তখন। আবার একেবারে অন্য মানুষ। লক্ষ্মীদির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও যেন ভয় পাচ্ছিল। কেশব আসতেই লক্ষ্মীদি বললে—এসব সরিয়ে নিয়ে যা, সব পরিষ্কার করে ফেল্—

খানিকক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সিগারেটের ছাইদানি, মদের গ্লাস, চায়ের কাপ যা কিছু সব। লক্ষ্মীদি বাক্সের ভেতরে কী যেন খুঁজছিল। টাকা-পয়সার আওয়াজ হলো। একটা টাকা নিয়ে কেশবের হাতে দিলে। বললে—যা তো কেশব দুটো মিষ্টি নিয়ে আয় তো দোকান থেকে, রসগোল্লা হোক পান্তুয়া হোক—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—মিষ্টি কী হবে? আমার জন্যে?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ তুই খাবি,—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু, আমি তো এখুনি বাড়ি যাবো, আমার তো কাছেই বাড়ি—

—কাছেই ? কোথায় ?

দীপঙ্কর বললে—এই তো স্টেশন রোডেই বাড়ি ভাড়া করেছি, মা আছে, একটা চাকরও আছে, আমি তো আর ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে নেই— ১

লক্ষ্মীদি বললে—তা হোক, এখন তো-আপিস থেকেই আসছিস্, একটু না-হয় খেলেই দিদির বাড়ি—

তারপর হঠাৎ বললে—তবে জুয়ার টাকায় যদি তোর খেতে আপত্তি থাকে তা হলে জোর করবো না!

দীপংকর বললে—তুমিও তো জুয়ার টাকাতেই খাও—

—আমার কথা আলাদা! আমি আর তুই কি এক? তোর হয়ত এখানে বসতেই ঘেন্না হচ্ছে!

—কিন্তু এতই যদি ঘেন্না তোমার তাহলে কেন ওদের আসতে দাও?

লক্ষ্মীদি বললে—কেন আসতে দিই তাই দেখাতেই তো তোকে ডাকলুম ভেতরে! অনন্তও একদিন এসেছিল আমার উপকার করতে আমাকে সাহায্য করতে! আমার সব খরচ দিচ্ছিল, আমার বাড়ি ভাড়া, আমার খাওয়া-খরচ, আমার ছেলের.........

—তোমার ছেলে—?

দীপংকর চমকে উঠলো। লক্ষ্মীদির আবার ছেলে আছে নাকি?

এমন সময় কেশব এসে ঢুকল খাবার নিয়ে। একটা রেকাবি করে মিষ্টি দুটো সামনে এগিয়ে দিলে। এক গ্লাস জলও দিলে। দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—বাবুর ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে আয় তো কেশব—

দীপংকর বললে—তোমার ছেলে মানে? তোমার ছেলে আছে নাকি লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—মিষ্টি দুটো খেয়ে ফেল্। আমার নিজের ছেলেও ওই টাকাতেই খায়, ওই টাকাতেই পড়ে, তাকে আমি যখন দিতে পারি, তখন তোকে দিতে আপত্তি নেই—

—কিন্তু তোমার সে-ছেলে কোথায়?

লক্ষ্মীদি বললে—সে অনেক দূরে, দেরাদুনে, আমার কাছ থেকে তাকে অনেক দূরে রেখেছি, সে যেন আমার ছোঁয়াচ না পায়, তাই!

—কিন্তু এতদিন তো জানতুম না।

লক্ষ্মীদি হাসতে লাগলো। বললে—মানুষের সবটা কি জানা যায়?

তারপর দীপংকরের মুখ-চোখের ভাব দেখে বললে—কিন্তু কার ছেলে সে তা জিজ্ঞেস করলি না তো?

দীপংকর মিষ্টিটা মুখে দিয়েও গিলতে পারলে না। লক্ষ্মীদির মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইল।

—কার ছেলে মানে?

লক্ষ্মীদি বললে—মানে শত্তুর না অনন্তর?

দীপংকরের অবাক হওয়ার আগেই আর একজন ঘরে ঢুকলো আস্তে আস্তে। লক্ষ্মীদি সেই দিকে চেয়ে বললে—এসো এসো, বোসো—

বরং লক্ষ্মীদি গিয়ে তাকে ধরলে।

ভূতের মতন একটা ছায়া-শরীর সামনের দিকে এগিয়ে এল। যেন হাওয়ায় ভাসছে। একটা মোটা আধ-ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে, মোটা ধুতি। মাথার চুলগুলো পাতলা। গাল তোবড়ানো, চোখ দুটো ঢোকা। বৃদ্ধ, অথর্ব পঙ্গু একটা মানুষ। দীপংকরের ভয় করতে লাগলো।

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—একে চিনতে পারছো তুমি?

লোকটা চাইলো দীপংকরের দিকে। কিন্তু ঝাপ্‌সা দৃষ্টি। সে-চোখে কোনও দৃষ্টি নেই যেন।

দীপংকরের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীদি বললে—তুই চিনতে পারিস?

দীপংকর বললে—কে ইনি?

লক্ষ্মীদি বললে—এই হলো দীপু, আমাদের দীপংকর, সেই তোমাকে যে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে চিঠি দিয়ে আসতো। মনে নেই?

সে যেন কত যুগ আগের কথা! সেই মানুষ এমন হতে হয়। সেই মানুষেরই এই চেহারা হতে হয়। কোথায় রইল সেই ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া, সেই স্যুট, টাই! বিংশ শতাব্দীর ট্রেড ডিপ্রেশনের ভূতই যেন সেদিন দীপংকরের সামনে উদয় হয়েছিল সশরীরে। সারা পৃথিবীর পীড়িত মানবাত্মা যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে উঠেছিল সেদিন সেই দাতারবাবুর মধ্যে দিয়ে। দাতারবাবু লক্ষ্মীদির কথায় একটু চোখ তুললো। ঠোঁট দুটোও যেন একটু ফাঁক হলো। কিন্তু চিনতে পারলে কি চিনতে পারলে না বোঝা গেল না।

দীপংকরের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীদি বললে—আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো হয়েছে, আগে সারাদিন চিৎকার করতো, এখন চুপচাপ থাকে—

তারপর দাতারবাবুর দিকে চেয়ে বললে—খিদে পেয়েছে?

দাতারবাবু ঘাড় নাড়লে।

লক্ষ্মীদি বললে—ভাত খাবে?

সব কথাতেই ঘাড় নাড়তে লাগলো দাতারবাবু।

লক্ষ্মীদি বললে—দেখ্‌ছিস তো, এখন তবু চেনা যায়, এখন তবু বেঁচে আছে বলে বোঝা যায়, আগে তো একেবারে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলুম—ডাক্তার বলেছে, আরো বছর খানেক লাগবে পুরোপুরি সারতে—

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—কী করে সারিয়ে তুললে তুমি?

লক্ষ্মীদি বললে—টাকার জোরে!

টাকার জোরে! কথাটা খট্ করে কানে বাজলো দীপংকরের! টাকার জোরে মানুষকে বাঁচানো যায়! পৃথিবীতে টাকাই সব তাহলে! অঘোরদাদু কি তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল! অঘোরদাদু তাহলে তাকে ভুল শেখায় নি? অঘোরদাদুর কথা যদি সত্যিই হবে তো কেন অমন মর্মান্তিক পরিণতি হলো তার শেষকালে!

—কিন্তু এত টাকা তুমি কোথা থেকে পেলে?

লক্ষ্মীদি বললে—অনন্ত টাকা দিত, অনন্ত তো অনেক টাকা উপায় করতো—তোদের ঘোষাল সাহেবকে ঘুষ দিয়ে অনেক কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল, সব আমাকে দিত, সেই টাকাতেই তো বাড়ি ভাড়া মিটিয়েছি, ছেলেকে মাসে-মাসে পাঠিয়েছি, শম্ভুর চিকিৎসা চালিয়েছি—

—কিন্তু সেই অনন্তবাবু কোথায় এখন? তাকে তো দেখছি না এখানে।

দাতারবাবু হঠাৎ যেন কী বললে। ভালো করে বোঝা গেল না কথাগুলো। দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। লক্ষ্মীদিও বুঝতে পারলে না। লক্ষ্মীদি দাতারবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী বলছো তুমি? কিছু বলছো?

দাতারবাবু আবার কিছু বললে।

দীপঙ্কর তবু বুঝতে পারলে না।

লক্ষ্মীদি বললে—বলছে ঘুম পাচ্ছে—

তারপর লক্ষ্মীদি দাতারবাবুকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। যাবার আগে বললে—একটু বোস তুই দীপু, আমি শম্ভুকে ঘুম পাড়িয়ে আসি—

দীপঙ্কর বসে রইল একলা। খানিক পরে লক্ষ্মীদি আবার ফিরে এল। দীপঙ্করের পাশে বসে বললে—এখন অনেকটা ভালো, দেখলি তো—ও-ঘরে গিয়ে তোর নাম বলছিল, তোকে চিনতে পেরেছে জানিস্—

দীপঙ্কর বললে—এবার ভাল হয়ে উঠলে তুমি দাতারবাবুকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাও লক্ষ্মীদি—কলকাতা তোমার জন্যে নয়—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু কলকাতা ছেড়ে গেলে এত টাকা কোত্থেকে আসবে? কলকাতার মতন এত জুয়াড়ী কোথায় পাবো?

দীপঙ্কর বললে—আমি দেব—

—তুই কেন দিবি? কিসের দায় তোর?

দীপঙ্কর বললে—কোন দায় নেই, ভেবে নাও এমনিই—

—কিন্তু এমনি আমি কিছু নেব না, জীবনে কখনও কারো কাছে ভিক্ষে করিনি। খালি হাতে কখনও টাকা নিইনি কারো কাছে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু অনন্তবাবু? অনন্তবাবুও কি তোমার কাছ থেকে কিছু চেয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—চেয়েছে বৈ কি। চেয়েছে আর পেয়েছেও—

—বলছো কি তুমি?

লক্ষ্মীদি স্পষ্ট করেই বললে—সত্যি কথাই বলছি, কিন্তু অনন্তরই ভুল, অনন্ত ভেবেছিল টাকাটাই বুঝি আমার কাছে সবচেয়ে বড়! অনন্ত জানতো না টাকা আমার দরকার বটে, কিন্তু আগে শম্ভু, আগে আমার ছেলে, তারপর টাকা—সে আমার ছেলেকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল—আমি যে মা সে কথাও সে ভোলাতে চেয়েছিল আমাকে, সে ভেবেছিল আমি বুঝি বাজারের একজন

মেয়েমানুষ—

—তারপর?

—তারপর তাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিলুম একদিন। আমাকে তো সে চেনে না! আমি মেয়েমানুষ হতে পারি কিন্তু আমি তো মা, আমি তো স্ত্রীও বটে—সেই কথাটাই তাকে জুতো মেরে বুঝিয়ে দিলুম একদিন।

—তার মানে?

লক্ষ্মীদি বললে—অনন্ত ভেবেছিল সে চলে গেলে আমি উপোস করে মরবো, শম্ভুর চিকিৎসা হবে না, আমার ছেলের স্কুলে দেরাদুনে টাকা পাঠানো হবে না—কিন্তু কলকাতা শহরকে তো আমি ভালো করেই চিনে গিয়েছি তখন—কলকাতা শহরের সভ্য শিক্ষিত মানুষদের তখন আমি বুঝে নিয়েছি। আমি জুতো মেরে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম—আমার সঙ্গে মদ খেতে দিয়েছি বলে কি আমি তোমার কেনা মেয়েমানুষ হয়ে গেছি—

লক্ষ্মীদির কথা শুনতে শুনতে দীপঙ্কর যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছিল সেদিন।

উনিশ শো সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ সালের সেই কলকাতা। একদিকে কংগ্রেসের মিটিং, একদিকে স্বদেশী সভা-সমিতির হিড়িক, আর একদিকে উচ্ছৃঙ্খল মানুষের নৈশ-বিহার। একদিকে প্রাণমথবাবুদের অক্লান্ত নিষ্ঠা, কিরণদের আত্মোৎসর্গ, আর একদিকে ছিটে-ফোঁটাদের উৎপাত। চৌরঙ্গীর শুরু থেকে একেবারে মিউজিয়াম পর্যন্ত সোজা লম্বা ফুটপাথটার ওপর ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের জটলা। কোনও লোক পাশ দিয়ে গেলেই গাড়োয়ানরা পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানের কাছে কী যেন ফিসফিস করে বলে যায়। যারা নতুন তারা একটু চমকে যায়। সমস্ত শরীরটা সির-সির করে ওঠে। গলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফিটনগাড়িগুলো নিঃশব্দে ঝিমোয়। তারপর দৈবাৎ একটা-একটা শিকার জুটে গেলে সোয়ারীকে নিয়ে গিয়ে তোলে একেবারে পার্ক স্ট্রীটে আর ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িগুলোতে মিস মাইকেলদের পাড়ায়। সেখানে টাকা-পয়সার লেন-দেন চলে, মাংস কেনা-বেচা চলে, আর কখনও কখনও ব্ল্যাক-মেলিংও চলে।

লক্ষ্মীদি একদিন সেজেগুজে এসে সেইখানেই দাঁড়াল। ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে, চোখে সুর্মা এঁকে দাঁড়াল এসে একেবারে রাজপথে। আপিস ফেরত জনতার মুখোমুখি। একেবারে ট্রাম-বাস রাস্তার মোড়ে। তারপর একজন দুজন আশেপাশে ঘুরতে লাগলো। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো। লক্ষ্মীদি একজনের দিকে চেয়ে একটু কটাক্ষ করলে আর চলতে লাগলো দক্ষিণমুখো। আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলতে লাগলো পেছন-পেছন।

—তারপর?

লক্ষ্মীদি তখন পরের দিন কী খাবে তার ব্যবস্থা নেই। ছেলেকে দেরাদুনে

টাকা পাঠাতে হবে—পঞ্চাশ টাকা। তারও যোগাড় নেই। সাতারবাবু তখনও তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে বসে চিৎকার করছে। রাত্রে তাকে কী খেতে দেবে তারও যোগাড় নেই।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তখন আর কিছু ভাববার সময় পাইনি, যা করে হোক, যেমন করে হোক আমাকে বাঁচাতেই হবে, আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আমি শাড়িটাকে আরো আঁট করে গায়ে লাগিয়ে নিলাম, তারপর একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, লোকটা তখনও আমার পেছনে-পেছনে আসছে। আমি আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম, লোকটা তখন একেবারে কাছে এসে গেল—একেবারে আমার কাছাকাছি। তারপর একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে আমি উঠলুম, লোকটাও সাহস পেয়ে উঠে বসলো ট্যাক্সিতে—

—তারপর?

লক্ষ্মীদি গল্প বলতে বলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তুই বাবার ঠিকানা চেয়েছিলি না?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর কী হলো বললে না?

লক্ষ্মীদি বললে—তারপর সেই প্রথম সুধাংশু এল আমার বাড়িতে। তারপর নিয়ে এল চৌধুরীকে, তারপর একে একে অনেকেই এসে হাজির হলো, তাদের আড্ডা জমলো, বড় বড় অফিসার সব ওরা, আমার ছেলের স্কুলে টাকা পাঠানোও চলতে লাগলো, শম্ভুর চিকিৎসাও চলতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে—

—কিন্তু তোমার যে ছেলে আছে তা আমি জানতাম না।

—কেউই জানে না। শম্ভুও জানে না। হয়ত ছেলে না থাকলে এতদিনে কোথাও ভেসে চলে যেতাম, কেউ আমাকে খুঁজে পেত না, হয়ত শম্ভুও বাঁচতো না—

মনে আছে, সেদিন লক্ষ্মীদির সেই ঘরে বসে লক্ষ্মীদিকে যেন বড় রহস্যময়ী মনে হয়েছিল। কোথায় গেল সেই কলেজে পড়া মেয়ে ছোট লক্ষ্মীদি। ভাগ্যের কত ঘাট পেরিয়ে কোথা দিয়ে কেমন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাইরে থেকে দীপঙ্কর এতদিন তা জানতে পারেনি। এতদিন যেন ঘৃণা করে এসেছে দীপঙ্কর লক্ষ্মীদিকে—আর সেদিন যেন কৌতূহল হলো লক্ষ্মীদির জন্যে! এ তো হলো, কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় যাবে? কোথায় গিয়ে পৌঁছোবে লক্ষ্মীদি! কোন্ আঘাটায় গিয়ে লক্ষ্মীদির নৌকো ঠেকবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তারপর একদিন মানস মানুষ হবে,—

—মানস কে?

—আমার ছেলের নাম রেখেছি মানস। এই দ্যাখ তার ছবি—

বলে লক্ষ্মীদি একটা ফোটো বার করে দিলে বাক্স থেকে। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য সুন্দর মোটা-সোটা থলথলে চেহারার একটা শিশু। বড় বড় চোখ।

লক্ষ্মীদি কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। বললে—কার মতন দেখতে হয়েছে বল তো? আমার মতন না শম্ভুর মতন?

লক্ষ্মীদির মুখের চেহারাটা যেন একেবারে অন্যরকম দেখালো। লক্ষ্মীদিকে যেন মায়ের মত মনোরম মনে হলো হঠাৎ। আশ্চর্য, একটু আগেই যে-লক্ষ্মীদিকে মদ খেতে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দীপঙ্কর, সেই লক্ষ্মীদির মুখেই যেন কেমন কমনীয় লাবণ্য ফুটে উঠলো। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মাতৃমূর্তি।

—মা!

কেশব এসে দাঁড়াল বাইরে। লক্ষ্মীদি বললে—কী রে?

কেশব বললে—বাবু ডাকছে—

—আমাকে?

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়া দীপু, আমি আসছি। শুনে আসি কী বলছে শম্ভু, বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে আবার—

দীপঙ্কর বললে—আমি এখন উঠি লক্ষ্মীদি, অনেক রাত হয়ে গেল, আর একদিন বরং আসবো, তুমি তোমার বাবার ঠিকানাটা দাও—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার কথা লিখবি না তো?

দীপঙ্কর বললে—না, আমি তো তোমায় কথা দিয়েছি—

—আমার ঠিকানাও জানাবি না তো?

—বলছি তো না! আমি শুধু সতীর কথা লিখবো। শুধু লিখবো তিনি যেন এসে সতীকে নিয়ে যান নিজের কাছে, সতী শ্বশুরবাড়িতে বড় কষ্ট পাচ্ছে—

লক্ষ্মীদি একটা কাগজে খচ খচ করে ঠিকানাটা লিখে দিলে। তারপর দীপঙ্করের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেখিস আমার কথা যেন লিখিস নি—

দীপঙ্কর কাগজটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লক্ষ্মীদি বললে—কেশব, যা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়—

বলে লক্ষ্মীদি পাশের ঘরে চলে গেল।

স্টেশন রোডে সমস্ত বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগলো। এতক্ষণ ট্রেনটা বোধ হয় ধানবাদ ছেড়ে গেছে। মা হয়ত না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত দীপঙ্করের কথাই ভাবছে মা। দীপঙ্করকে ছেড়ে এই-ই মা'র প্রথম বাইরে থাকা! মা না থাকলে দীপঙ্করেরও যেন কেমন ফাঁকা লাগে সমস্ত। পাশেই মার ঘর। অন্যদিন দীপু না-আসা পর্যন্ত মা জেগে থাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই উসখুস করে। বার বার কাশীকে বলে—ওরে দ্যাখ তো, এই দীপু এল বোধ হয়—দীপু আমার কড়া নাড়ছে—

কিম্বা অনেক দিন মা মেঝেতে পা ছড়িয়ে সলতে পাকাতে বসে। সন্ধোবেলা ঠাকুরঘরে পিদিম জ্বালাবার সলতে। তারপর দীপু এলে খাবার এগিয়ে দেয়। পাশে বসিয়ে খাওয়ায়। মা নিরামিষ খায়, কিন্তু দীপঙ্করের জন্যে মাছ করে, মাংস করে।

দীপঙ্কর বলে—আমার জন্যে কেন এসব করো মা তুমি?

—কেনরে? রান্না ভালো হয়নি বুঝি?

—না, রান্নার জন্যে নয়, হাত পুড়িয়ে এসব করার দরকারটা কী!

মা বলে—আমি তো রাঁধিনি, রেঁধেছে ক্ষিরোদা, সন্তোষের মেয়ে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে—তা ওরা বুঝি থাকবে এখেনে?

মা বলে—থাকবে বলেই তো এসেছে—এখন ধরেছে তোর সঙ্গে বিয়ে দেবে মেয়ের—তা মেয়েটাও ভাল খুব, মা নেই তো, রান্নাবান্না শিখেছে কেবল—

দীপঙ্কর এসব কথায় কান দেয় না তেমন।

মা বলে—হ্যাঁ রে, লেখাপড়া জানা মেয়ে না-হলে কি তোর পছন্দ হবে না? এরা তো দিতে থুতে পারবে না কিছু, সন্তোষের পয়সা-কড়ি কিছু নেই। নিলে খাঙা সুতো বেঁধে মেয়েকেই শুধু নিতে হয়—

এতেও দীপঙ্কর কিছু কথা বলে না।

খানিক পরে মা আবার জিজ্ঞেস করে—সন্তোষকে এখন কী বলি বল তো? ও তো খুব চেপে ধরেছে। বলে ক্ষিরির মতন এমন বৌ তুমি পাবে না বৌদি। ও এক হাতে তোমার সংসারের সবদিক সামলাবে।

দীপঙ্কর চুপ করে খাচ্ছিল তখনও। মা আবার জিজ্ঞেস করলে—তুই কী বলিস দীপু? কী বলি আমি সন্তোষকে?

দীপঙ্কর বললে—আমি ও সম্বন্ধে কী বলব মা? ওকথা তো ভাবিনি আমি—

—তা না ভেবেছিস তো এখন না-হয় ভাবলি—

দীপঙ্কর বললে—এখন কি ভাববার সময় আছে মা, রবিন্‌সন্ সাহেব চাকরি ছেড়ে চলে যাবে, সেই সব নিয়েই সবাই ব্যস্ত—

—তা সন্তোষকে তো একটা জবাব দিতে হবে, ও তো না-ছোড়-বান্দা একেবারে, বলে তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেই—আহা গরীব লোক তো! মেয়েটাও বড় লক্ষ্মী। এই ক'দিনই বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছে আমার, ঠিক বিন্তীটার মতন—

বলে মা আঁচলে চোখদুটো মুছে নিলে।

দীপঙ্কর বলেছিল—তা তোমার যা-খুশী বলে দাও না মা, আমি তোমার কথায় কোনও দিন আপত্তি করেছি?

অন্ধকার রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই সব কথাই মনে আসছিল। হয়ত কাশী থেকে ফিরেই মা আবার কথাটা পাড়বে। সন্তোষকাকা যখন আছে তখন

কোনও ভাবনা নেই। আর পাণ্ডাও চেনা-শোনা। গাঙ্গুলীবাবুদের পুরোন পাণ্ডা। বুড়ো মানুষকে যেন হাতে ধরে রাস্তা পার করে দেয়। আর কাশীর সেই সরু সরু গলি। শুনেছে গলিগুলোতে নাকি ভীষণ ভিড়। বড় বড় ষাঁড় রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর, রাত এগারোটা বেজে গেছে। কাশী রান্নাঘর ধুয়ে মুছে বাইরের বারান্দাটায় শুয়ে পড়েছে। আহা বেচারী!

দীপঙ্কর বাইরে উঠে গিয়ে একবার দেখে নিলে। সদর দরজায় খিল দিয়েছে কি না। শেষকালে চোর ঢুকলে ছেলেমানুষকে দোষ দেওয়া চলবে না। বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে অনেক দূর থেকে একটা আপ ট্রেন আসবার শব্দ শোনা গেল। কোল ট্রাফিক। কয়লার ওপন ওয়াগন চলেছে। ডকে গিয়ে আনলোডিং হবে।

দীপঙ্কর পকেট থেকে ঠিকানাটা বার করলে। লক্ষ্মীদির বাবার ঠিকানা।

একটা চিঠির প্যাডের খাতায় চিঠি লিখতে বসলো। কাল সকালেই অফিসে যাবার পথে পোস্টবক্সে ফেলে দিলেই চলবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠিখানা ভুবনেশ্বরবাবুর হাতে গিয়ে পৌঁছোবে।

দীপঙ্কর লিখতে লাগলো:

শ্রীচরণেষু,

আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোর ভট্টাচার্যের বাড়িতে আগে থাকিতাম। আপনার কন্যা শ্রীমতী সতী ঘোষের সঙ্গে সেইখানেই আমার পরিচয়। শচীশবাবুকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে আমি কাকাবাবু ও কাকিমা বলিয়া ডাকিতাম। আমি তাঁহাদের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলাম। সম্প্রতি একটি বিশেষ জরুরী কারণে আপনাকে এই চিঠি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনার কন্যা শ্রীমতী সতীর জীবন তাহার শ্বশুরবাড়িতে নানা কারণে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়াছে। আপনাকে সে চিঠি লিখিতেও পায় না। ঘটনাটা আমার কানে আসাতে অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আপনাকে এই পত্র দ্বারা সমস্ত অবগত করাইলাম। আপনি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন। আমি সতীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই আপনাকে এই পত্র লেখা অনিবার্য বিবেচনা করিয়াছি। পত্র পাঠ যথাকর্তব্য করিবেন।

ইতি, ভবদীয়
দীপঙ্কর সেন।

চিঠিটা বার বার করে পড়ে দেখলে দীপঙ্কর। চিঠিটা পেলেই হয়ত ভুবনেশ্বরবাবু টেলিগ্রাম করে বসবেন মেয়েকে। কিম্বা যদি জাহাজ পাওয়া যায়, তখনি চলে আসবেন। খুব চিন্তিত হয়ে পড়বেন ভদ্রলোক। অনেক কাজের মানুষ তো তিনি। তারপর আচমকা একেবারে সতীর শ্বশুরবাড়িতে এসে

উঠবেন। সতীর শাশুড়ী চমকে উঠবেন। সনাতনবাবুও অবাক হয়ে যাবেন। সতীও কম অবাক হবে না! কে চিঠি লিখলো তাঁকে? কে তাঁকে খবর দিলে? ভুবনেশ্বরবাবু বলবেন—কে একজন দীপঙ্কর সেন, আমি তাকে চিনতে পারলাম না—

দীপঙ্কর আবার চিঠিটা পড়তে লাগলো। চিঠিটা যেন পছন্দ হলো না। বাঙলায় চিঠি লেখা অভ্যেস নেই দীপঙ্করের। বাঙলায় চিঠি লিখতে গেলে কেমন যেন বক্তব্যটা স্পষ্ট হয় না ঠিক। আবার পড়ে দেখলে গোড়া থেকে। বার বার পড়ে দেখলে। না, ঠিক লেখা হয়নি। ফস ফস করে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। তারপর ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিলে। কুণ্ডলীটা রাস্তায় পড়ে গড়াতে গড়াতে গ্যাসের তলায় নর্দমায় গিয়ে পড়লো।

সমস্ত প্লাটফরমটা আলোয় আলো হয়ে আছে তখনও। দোতলা থেকে প্লাটফরমটা স্পষ্ট দেখা যায়। শেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা তখন চলে গিয়েছে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। কয়েকটা রাস্তার কুকুর লাইনের ওপর খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে ঘেউ ঘেউ করে। প্যাসেঞ্জারদের ফেলে যাওয়া খাবারের খালি ঠোঙা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে ওদের।

দীপঙ্কর আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মা এতক্ষণ কত দূরে? হয়ত বর্ধমান পেরিয়ে গেছে। ধানবাদও পেরিয়ে গেছে হয়ত। হয়ত ভাতটা খায়নি, কমলালেবুও খায়নি। চাদর মুড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছে মা সন্ধ্যেবেলাই। কেন যে মাকে পাঠালো দীপঙ্কর। আর যদি পাঠালোই তো দীপঙ্কর নিজে সঙ্গে গেলে পারতো! রবিন্‌সন্ সাহেব চলে যাবার পর অফিসের ঝামেলা মিটে গেলেই পাঠালে হতো মা'কে। মাও তো দীপঙ্করের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল।

এবার অন্যরকম করে চিঠি লিখতে হবে। সহজ সাদা-সিধে চিঠি। মনে মনে চিঠিটা মক্‌শো করতে লাগলো দীপঙ্কর।

শ্রীচরণেষু,

আপনি অবিলম্বে একবার কলকাতায় এলে ভাল হয়। আপনার মেয়ে শ্রীমতী সতী ঘোষ-এর অনুরোধ মত আমি এই চিঠি আপনাকে লিখছি। আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। এখানে এলে সব জানতে পারবেন—

ইতি, শ্রীদীপঙ্কর সেন

বাস্! আর কিছু লেখার দরকার নেই। এইটুকু লিখলেই যথেষ্ট! এর চেয়ে বেশি কিছু লিখতে গেলেই ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠবে।

হঠাৎ একটা শব্দে দীপঙ্কর চমকে উঠেছে।

—দীপু, ও দীপু!

বিছানা ছেড়ে উঠতেই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেছে।

—মা, তুমি? ফিরে এলে যে?

মা বললে—না বাবা, আমার কাশী-গয়া দরকার নেই বাবা, আমি চলে এলুম, আমার মন-কেমন করতে লাগলো তোর জন্যে—

—সে কি মা, অত করে সব ব্যবস্থা করে দিলাম, আর তুমি কিনা ফিরে এলে?

মা বললে—বর্ধমান ইস্টিশানেই নেমে পড়লাম বাবা, সন্তোষকে বললাম, আমায় কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো সন্তোষ, আমি বাবা বিশ্বনাথকে ফেলে কোথাও যাবো না আর, দীপুই আমার বাবা বিশ্বনাথ। দীপুই আমার ঠাকুর-দেবতা সব—

বলে মা বিছানার উপর বসে পড়লো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু ফিরে আসতে কষ্ট হলো তো খুব তোমার। ট্রেনে জায়গা পেয়েছিলে?

—তা পেয়েছিলাম বাবা, আর না-পেলেও আমি ফিরে আসতাম। তোকে ছেড়ে বাবা বিশ্বনাথের কাছে গিয়েও আমার মন টিঁকতো না—তোকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাবো না—

বলে মা সেইখানে বসেই দীপুর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। দীপঙ্করের মনে হলো মা ফিরে এল ভালোই হলো। মাকে ছেড়ে তারও মন টিঁকছিল না বাড়িতে—। মাকে ছেড়ে দীপঙ্করও যেন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছিল সারাদিন। মাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে পর্যন্ত তারও মনে শান্তি ছিল না। একবার সতীদের বাড়ির কাছে গিয়েছে, একবার লক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়েছে। এতক্ষণে যেন শান্ত হলো দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর ডাকলে—মা, ও মা—

—মা কোথায়, আমি, আমি এসেছি—

ভোর তখনও ভাল করে হয়নি। ঘরের ভেতরটায় তখনও অন্ধকার। দীপঙ্কর আস্তে আস্তে চোখ খুললো।

—আমি এসেছি, এই যে, আমি—

দীপঙ্কর সামনে সতীকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে—তুমি? এখানে? এত ভোরে?

সতী বললে—আমি চলে এলুম—

এতক্ষণে তবে স্বপ্ন দেখছিল নাকি দীপঙ্কর!

সতী বললে—তোমার চাকরটা আমায় দরজা খুলে দিয়েছে। শম্ভুর কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা নিয়ে চলে এসেছি—

কিন্তু কী করে এলে? তোমাকে আসতে দিলে?

সতী সমস্ত গায়ে ভালো করে চাদর জড়ানো। ঘোমটার ফাঁকে শুধু ফরসা মুখটা বেরিয়ে আছে।

বললে—দারোয়ানটা ঘুমিয়ে পড়েছিল—একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এসেছি, তা মাসিমা কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—মা তো কাশীতে গেছে তীর্থ করতে—বাড়িতে চাকর ছাড়া আর কেউ নেই এখন—

—তা না-ই বা থাকলো। মাসিমা কবে ফিরে আসবেন?

—মা তো সবে কাল দুপুরবেলা গেছে। ফিরতে পাঁচ সাত দিন দেরি!

সতী চেয়ারটার বসলো। বললে—একটা দিন তোমার এখানে থাকতে দেবে না? একটা দিন থেকে তারপর যা-হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে নেব—

—কিন্তু কেউ যে নেই বাড়িতে!

সতী বললে—না-ই বা থাকলো, আমি তোমার কোনও অসুবিধে করবো না—ট্যাক্সিটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর ভাড়াটা তুমি মিটিয়ে দাও—

কথাগুলো বলতে বলতে সতী থর থর করে যেন কাঁপছিল। দীপঙ্কর কী করবে কী বলবে বুঝতে পারলে না। আস্তে আস্তে পকেট থেকে মনিব্যাগটা নিয়ে নিচে চলে গেল।

ছোটবেলায় স্কুলে বইতে পড়েছিল দীপঙ্কর যে মানুষের জীবনটা নাকি ঠিক নদীর মত। দু'পাশের উঁচু তীর দিয়ে ঘাট-ঘাট বাঁধা। শুধু সামনে দৌড়তে হয় দুর্নিবার বেগে। প্রয়োজন হলে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হয়! দিন নেই রাত্রি নেই, জীবন একটানা বয়েই চলেছে। মাঝে মাঝে সে-জীবনে বন্যা আসে, মাঠ-ঘাট সব ভাসিয়ে দেয় সে-বন্যাতে, কিন্তু আবার এক সময়ে সেই স্রোত স্তিমিত হয়ে আসে। আবার একটানা বয়ে চলে দূর-সমুদ্রকে লক্ষ্য করে।

ছোটবেলায় কথাটা দীপঙ্কর বিশ্বাসও করেছিল। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে উৎপত্তি হয়েছিল তার। তারপর দিনে রাত্রে দুর্নিবার গতিতে কেবল এগিয়েই চলেছে সে। প্রথমে কালিঘাট, তারপর ভবানীপুর, তারপর টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ, তারপর সমস্ত কলকাতা সমস্ত পৃথিবীতে যেন সে পরিব্যাপ্ত হতে চলেছে।

কিন্তু বড় হবার পর দীপঙ্করের মনে হয়েছিল নদী নয়—যেন আকাশ। মানুষের জীবনটা যেন আকাশ। যে-আকাশ ফ্রেমে আঁটা জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায়, সে-আকাশ নয়। যে-আকাশ সংকীর্ণ সংসারের ফুটো দিয়ে দেখা যায়—সে আকাশও নয়! সেই আকাশ—যেখানে দিকচক্রবালের শেষ সীমারেখাটা পর্যন্ত ভাস্বর, যেখানে দিনের বেলায় সূর্য উঠলে উজ্জ্বল হয়, সুস্পষ্ট হয়, আবার রাত্রি হলে যেখানে রহস্যের হাতছানি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মানুষের সেই আকাশে সুখ-দুঃখ স্মৃতি-বিস্মৃতির গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর দল কত খেলা খেলে

চলেছে, শীতে শরতে বর্ষায় কত তার রূপ কত আলো-আঁধারি! কখন ঘন হয়ে আসে দুর্যোগের মেঘ, কখন উচ্ছল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের সূর্য-কিরণ, কখন আবার সজল হয়ে আসে বর্ষার লাবণ্য। কখনও আবার রুক্ষ-কঠিন হয়ে আসে দৈন্যের গ্রীষ্ম! কাউকে কি ভুলতে পারে আকাশ? কাউকে কি ত্যাগ করতে পারে? সবাইকে নিয়েই তো মানুষ। সবাইকে নিয়েই তো দীপঙ্কর। দীপঙ্করের আকাশেও তো এমনি করে কত বর্ষা, কত শরৎ, কত ধূমকেতুর উদয় হয়েছে—কাউকে তো ভুলতে পারেনি সে? আজ এতদিন পরে সেই আকাশটার দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় যেন সবাই সেখানে রয়েছে। কেউ হারিয়ে যায়নি! কিছুই বুঝি হারায় না মানুষের জীবনে! নইলে এত কথা মনে থাকলো কী করে!

সেদিন বোধহয় ধূমকেতুর মতই সতী এসে উঠেছিল তাদের বাড়িতে। দীপঙ্করের অন্তত তাই মনে হয়েছিল। এক-তলায় গিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সেই রোয়াকের ওপর। সতী এল! সতী সত্যিই এল! এখন? এখন কী করবে সে?

যেদিন বর্মা থেকে প্রথম সতী ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এসেছিল সেদিনকার আলোর সঙ্গে এই আলোর কত তফাৎ!

দীপঙ্কর বললে—তুমি যে এমনি করে চলে এলে, তারপর?

সতী বললে—তারপর কী?

দীপঙ্কর বললে—বা, তারপরের কথা ভাবতে হবে না? সনাতনবাবু, তোমার শাশুড়ী, তোমার শ্বশুরবাড়ির বংশমর্যাদা, সে-সব কথা কিছু ভাবতে হবে না?

কাশী যেন কেমন তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল সতীর দিকে। সে নতুন লোক, সে সতীকে আগে দেখেনি। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি তাকে গিয়ে চা-জলখাবার করতে বলে এসেছিল।

ভোর তখনও ভাল করে হয়নি। দীপঙ্করের বিছানা তখনও অগোছালো। দীপঙ্করও তখন ঠিক সতীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত নয়। দীপঙ্করের আকাশ তখন ঝাপসা। সে-আকাশে তখনও যেন সূর্যোদয় হবার লগ্ন হয়নি। তার আগেই যেন মেঘ করে এ

সতী দীপঙ্করের বিছানাতেই দীপঙ্করের বালিশের ওপর মাথা দিয়ে তখন শুয়ে পড়েছে।

সতী বললে—আমি একটু ঘুমোই তোমার বিছানায়, কতদিন যে প্রাণভরে ঘুমোতে পারিনি—

—কিন্তু ওরা যদি খবর পায়, ওরা যদি জানতে পারে তুমি এখানে এসেছো, তাহলে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সতী বললে—তোমার চাকরকে কিছু খাবার করতে বলেছ? আমি ক'দিন কিছুছু খাইনি, জানো—

দীপঙ্কর বললে—মা থাকলে এখন খুব ভালো হতো, কিন্তু আমি তো চা খাই না, তবু কিছু জলখাবার করতে বলে এসেছি—

সতী বললে—আর ভাতও খাবো সকাল-সকাল—পেট ভরে ভাত খাবো অনেকদিন পরে—

দীপঙ্কর বললে—তার ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি বরং মা'র বিছানাটায় শোও—

—কেন, এ বিছানায় কী দোষ হলো?

দীপঙ্কর বললে—চাদর-বালিশ সব ময়লা, আমি ফরসা চাদর পেতে দিচ্ছি মা'র বিছানায়, ওখানে শোওয়াই তোমার পক্ষে ভালো—এসো—

সতী বললে—আমার এখন আর উঠতে ইচ্ছে করছে না—

বলে চাদরটা টেনে নিয়ে আরাম করে চোখ বুজলো।

তারপর শুয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বললে—অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম তোমার এখানে চলে আসবো, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিলাম না, এত কড়া পাহারা চারদিকে। আজ দারোয়ানটা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই ফাঁকে চলে এসেছি, তা-ও হাজরা রোডের কাছে ট্যাক্সির জন্যে একটু দেরি হলো, নইলে বেরিয়েছি সেই রাত সাড়ে তিনটের সময়—

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবু কিছুই জানতে পারেন নি?

সতী বললে—সে-মানুষের তখন মাঝ-রাত, নাক ডাকিয়ে আবেস করে ঘুমোচ্ছেন তখন—

—কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যখন দেখবেন তুমি পাশে নেই, তখন?

সতী বললে—তখন আবার পাশ ফিরে শোবেন—

—সে কি! তোমার জন্যে ভাবনা হবে না তাঁর! তাঁর স্ত্রী কোথায় গেল, তিনি একবার খোঁজ করবেন না?

সতী হাসলো। বললে—আমি কি এক ঘরে শুতাম যে তিনি টের পাবেন! আর তিনিই যদি আমার খোঁজ করবেন তো আমার ভাবনা কিসের! খোঁজ করলে তো আমি বেঁচে যেতাম, তবু বুঝতাম আমার জন্যে তাঁর একটু ভাবনা হয়।

—কী বলছো তুমি সতী! নিজের স্ত্রী কোথায় গেল তা খবর নেবেন না তিনি! তাই কখনও হয়?

সতী চোখ বুজেই বললে—হয়, হয়! তুমি আর ক'টা স্বামী দেখেছ, আর ক'টা স্ত্রীই-বা দেখেছ তুমি জীবনে!

—কিন্তু এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! তুমি হঠাৎ বলা-নেই-কওয়া-নেই একেবারে আমার এখানে এসে উঠলে! তারপর আমার মা-ও নেই আবার বাড়িতে, এ তো বড় মুশকিল হলো দেখছি—

সতী বললে—মাসীমা তো দু'দিন পরেই আসবে, তার জন্যে আর তাড়াতাড়ি

কিসের! আমার খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবছো? তুমি যা খাবে, আমিও তাই খাবো—

দীপঙ্কর কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে না। বললে—না, সে-কথা ভাবছি না—

সতী বললে—তাহলে খরচের জন্যে ভাবছো! যা খরচ হয় আমি না-হয় পরে শোধ করে দেব—

দীপঙ্কর হাসলো না। সতীর রসিকতায় হাসবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন।

সতী নিজেই আবার বলতে লাগলো—এক কাপড়ে চলে এসেছি। দু' একটা শাড়ি আমায় কিনতে হবে, তা সে টাকাও আমি বাবার কাছ থেকে নিয়ে পরে তোমায় শোধ করে দেব—

কাশী নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে জল-খাবার করে এনে দিলে। সতী খাবারের গন্ধ পেয়ে নিজেই উঠে বসলো। বললে—এগুলো সবই আমার?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ সবই তোমার, যদি এতে না পেট ভরে তো আরো দিতে বলবো—

সতী বললে—যখন ঘাড়ে এসে পড়েছি তখন তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে বৈ কি!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আর ফিরে যাওয়া যায় না?

সতী খেতে খেতে বললে—কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, তোমার শ্বশুরবাড়িতে?

সতী বললে—ওখান থেকে যখন একবার চলে এসেছি তখন আর যাবো না—

—তাহলে কোথায় থাকবে?

—কেন, এখানে?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। বললে—আমার এখানে?

সতী বললে—ভয় পেও না, খরচ যা লাগে সব দেব আমি—

দীপঙ্কর বললে—খরচের কথা বোল না, কিন্তু আমার এখানে তোমার একদিনও থাকা চলবে না—

—কেন? আমার কিন্তু অসুবিধে হবে না! আর তোমারই বা কিসের অসুবিধে?

দীপঙ্কর বললে—আমার অসুবিধে আছে।

—কিসের অসুবিধে? তোমার এখানে তো অনেক ঘর রয়েছে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু রাত্রে কোথায় থাকবে?

সতী বললে—কেন এই ঘরে—আর যদি এ-ঘরে থাকলে তোমার অসুবিধে হয় তো পাশে মাসীমার বিছানা রয়েছে—

—উঁহু, হবে না।

—কেন? মাসীমার বিছানাটা তো খালিই পড়ে রয়েছে, ওতে শুলে দোষ কী?

দীপঙ্কর বললে—দোষ আছে! বাড়িতে মা থাকলে কিছু বলতুম না, কিন্তু যতদিন মা না আসছে, ততদিন এক বাড়িতে তোমার আমার থাকা চলে না—হয় তুমি এখানে থাকো, তাহলে আমাকে অন্য জায়গায় অন্য কোথাও গিয়ে রাত কাটাতে হয়—আর নয় তো......

সতী বললে—রাতটাকেই বুঝি ভয়?

দীপঙ্কর বললে—ভয় থাকুক আর না-থাকুক তুমি এ-বাড়িতে থাকলে আমার থাকা চলবে না! আর তা ছাড়া, তুমি এ-রকম হুট্ করে চলে এলেই বা কেন? শাশুড়ী সকলেরই ও-রকম হয়, কিন্তু সনাতনবাবু তো কোনও অন্যায় করেন নি, তিনি তো দেবতুল্য লোক, তাঁর সঙ্গেও তুমি বনিবনা করে চলতে পারলে না! তাহলে সংসারে কার সঙ্গে তুমি ঘর করবে! এইটুকু সহ্য করতে না-পারলে কেন মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিলে!

সতী হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেল। দীপঙ্করের মুখের দিকে একবার চাইলে। বললে—ঠিক বলেছ তুমি দীপু, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছিল—

বলে সতী উঠে দাঁড়াল। বিছানার চাদরটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে—আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম, কলকাতা শহরে একটা জায়গায় অন্তত আমার আশ্রয় মিলবে—

দীপঙ্কর বললে—কী হলো? উঠলে যে?

সতী বললে—দয়া করে শুধু একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও—আর যদি সম্ভব হয় কিছু টাকা দাও আমাকে—পরে আমি সব শোধ করে দেব—সঙ্গে কিছু টাকা-কড়ি আনতে পারিনি আমি—

—কিন্তু কোথায় চললে তুমি?

সতী তখন গায়ের শাড়িটা ঠিক করে নিয়েছে। বললে—এ তো বড় মুশকিল হলো দেখছি, তুমি থাকতেও দেবে না আবার কৈফিয়ৎও চাইবে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো তোমাকে এখনই চলে যেতে বলিনি, বলেছি রাতটা এখানে তোমার কাটানো উচিত নয়।

সতী বললে—তুমি এখনও সেই ছেলেমানুষটি রয়ে গেলে দীপু। এত বয়েস হলো, এখনও এত ভীরু? এখনও এত ভয়? আমার সঙ্গে এক বাড়িতে রাত কাটালে তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে? এই তোমার পৌরুষ? এত ঠুনকো তোমার চরিত্র? নিজের ওপর তোমার এতটুকু বিশ্বাস নেই?

বলে সত্যি-সত্যিই সতী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আবার বললে—সত্যিই আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম, আর যেখানে যা কিছু হোক, এখানে অন্তত আমার দরজা খোলা আছে—

দীপঙ্কর বললে—সতী, শোন—সতী—

সতী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। বললে—আজকের মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, তুমিই যখন তাড়িয়ে দিলে তখন আর একটা জায়গার সন্ধান আজকেই করতে হবে আমাকে—

দীপঙ্কর পেছনে নামতে নামতে বললে—তুমি ভুল বুঝলে আমাকে সতী, আমি তো তোমাকে চলে যেতে বলিনি—

সতী ততক্ষণে নেমে গিয়েছে একতলায়। সদর দরজাটা লক্ষ্য করেই সোজা যাচ্ছিল। দীপঙ্কর পেছনে পেছনে গিয়ে বললে—কিন্তু কোথায় যাচ্ছো তুমি?

সতী এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। ভোরবেলা যেমনভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই আবার চলে যাচ্ছিল। তখনও বেলা হয়নি বেশি। সতীর কি সত্যিই মাথা-খারাপ হয়েছে? সতী কি সত্যিই একলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে নাকি? সতী গিয়ে সদর-দরজার খিলটা খুলতে যেতেই দীপঙ্কর তার হাতটা চেপে ধরেছে।

বললে—কোথায় যাবে তুমি? যাবে কোথায়?

সতী মুখ ফিরিয়ে দীপঙ্করের দিকে চাইলে।

দীপঙ্কর আবার বললে—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যেতে হয় পরে যেও, এখুনি কি তোমাকে যেতে বলেছি আমি? রাত্রে তোমাকে থাকতে বারণ করেছি বলে এখনি চলে যেতে হয়?

সতী বললে—তোমার ছেলেমানুষির বয়েস থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমায় যেতে দাও—

—কিন্তু কোথায় যাবে তুমি?

সতী বললে—যেখানেই আমি যাই না, তোমার জেনে কী লাভ?

দীপঙ্কর বললে—পাগলামিরও একটা সীমা আছে। শেষকালে কি একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসবে নাকি? কলকাতা শহরে একলা কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? কে আছে তোমার এখানে?

সতী বললে—তুমি হাত ছাড়ো আমার, আমি নিজেই ট্যাক্সি ডাকতে পারবো—

দীপঙ্কর এবার কঠিন হয়ে উঠলো। সতীর হাতটা আরো জোরে চেপে ধরলো। বললে—আমি যেতে দেব না—

সতী দীপঙ্করের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

দীপঙ্কর বললে—চলো, ওপরে চলো, রাত্রের এখনও অনেক সময় আছে, অনেক ভাববার সময় পাওয়া যাবে, এখন যখন একবার বেরিয়ে এসেছো বাড়ি থেকে, তখন মাথা ঠাণ্ডা করে সব ভাবতে হবে—চলো, চলো, ওপরে চলো—

সতী বললে—কিন্তু ওখানে আমি আর ফিরে যাবো না—

—কেন ? কী এমন দোষ করেছে ওরা ? সংসারে বাস করতে গেলে এ-রকম একটু সহ্য করতেই হয় !

সতী বললে—সে তুমি বুঝবে না—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি এখানে থাকো, আমি বরং সনাতনবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি, দুজনে বোঝাপড়া করে তারপর যা ঠিক হয় তাই করবে না-হয়—

সতী বললে—বোঝা-পড়ার দিন চলে গেছে আমাদের—

দীপঙ্কর বললে—স্বামী-স্ত্রীতে এ-রকম রাগ তো হয়েই থাকে, কত ঝগড়া হয়, কত মনোমালিন্য হয়, তা বলে এমন করে বাড়ি ছেড়ে কি বেরিয়ে আসতে আছে ?

সতী বললে—তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসিনি দীপু, আমি যখন এসেছি তখন সব ভাল-মন্দ বিচার করেই এসেছি, সুতরাং আমাকে তুমি আর বোঝাতে এসো না। হয় এখানে আমাকে থাকতে দাও আর না-হয় আমার যে-দিকে দু' চোখ যায় যেতে দাও—এতবড় কলকাতা শহরে একটা মানুষের জায়গা হবেই—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো তোমাকে তাড়িয়ে দিই নি, আমি তো শুধু বলছি তুমি ওপরে চলো—

সতী বললে—তুমি আগে কথা দাও আমাকে এখানে থাকতে দেবে, আমার যত দিন ইচ্ছে ততদিন আমাকে থাকতে দেবে ?

দীপঙ্কর বললে—তা থাকো না তুমি, আমি কি আপত্তি করছি ? মা নেই এখানে তাই তোমাকে বলেছিলাম। মা থাকলে তোমাকে [illegible] দিতে কেন আপত্তি করবো ? তুমি যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকো, খাও, আমার কী ; আমার কিসের অসুবিধে ?

তারপর সতীর হাতটা ধরে টানতে লাগলো। বললে—চলো, ওপরে চলো—

সতী ওপরে উঠলো আবার। দীপঙ্কর বললে—এখনো তোমার সেই ছোট-বেলাকার তেজ রয়েছে দেখছি, ঠিক সেই আগেকার মতন—

সতী ওপরে উঠে এবার একটা চেয়ারে বসল।

দীপঙ্কর বললে—খুব ক্লান্ত লাগে তো শুয়ে পড়ো না, সারারাত তো ঘুমোওনি বলছো, তারপর খাবার সময় ডেকে দেবো—

সতী আবার বিছানায় গিয়ে হেলান দিলে বালিশে। সত্যিই যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সতীকে। আবার চোখ বুজলো।

বললে—তুমি আজ আপিসে যাবে না ?

দীপঙ্কর বললে—তা তো যেতেই হবে—

সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—মাসীমা কবে আসবে ?

দীপঙ্কর বললে—মা আজ এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছে কাশীতে, আজকে যদি চিঠি ফেলে তো কাল পাবো—আর তিন-চারদিনের মধ্যেই এসে যেতে পারে—আর তা ছাড়া, আমাকে ছেড়ে মা'র তো এই প্রথম বাইরে যাওয়া, মা একদিনও সেখানে টিঁকতে পারবে না !

তারপর একটু হেসে বললে—জানো, তুমি আসার ঠিক আগে আমি মা'কেই স্বপ্ন দেখছিলুম, স্বপ্ন দেখছিলুম যেন মা মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে—এমন সময়ে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি তুমি—

সতী কিছু কথা বললে না।

দীপঙ্কর বললে—মা'র ঘরে তোমার বিছানা করে দেব ?

সতী বললে—কেন, এখানে তো আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না—

দীপঙ্কর বললে—না, একটু নিরিবিলিতে ঘুমোতে পারতে !

সতী বললে—আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না—

দীপঙ্কর বলে—তাহলে তুমি ঘুমোও—আমি দেখিগে কাশী কতদূর কী করছে—

যেতে গিয়েও আবার ফিরে দাঁড়াল দীপঙ্কর। বললে—আর একটা কথা, তুমি কী খাবে আজ ? মাছ না মাংস না কী বলো তো ! মা তো বাড়িতে নেই, আমাকেই সব ভাবতে হবে—

—যা খুশি তোমার ! তুমি যা খাবে আমিও তাই খাবো—

বলে সতী ও-পাশ ফিরে শুলো। দীপঙ্করের পাশ-বালিশটা নিয়ে বালিশে মাথা গুঁজে দিলে।

কাশীর বুদ্ধি আছে বেশ। চালও নিয়েছে বেশি করে। ডাল চড়াচ্ছে। কিছুই বলতে হয়নি তাকে। বুঝে নিয়েছে যে, সতীর এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার আছে। তার দাদাবাবুর আপনার জন। কাশী তো জানে না সতী শুধু দীপঙ্করের আপনার জন নয়, পরম আপনার জন। সেই ছোটবেলা থেকে যে-দিন প্রথম এসেছিল সতী কলকাতায় সেই দিন থেকেই। বলতে গেলে সতী কলকাতায় আসবার আগে থেকেই দীপঙ্করের আপনার জন হয়ে গিয়েছিল। কিরণের মতই আপন। কিরণকে যতখানি ভালবেসেছিল দীপঙ্কর, ঠিক ততখানি ভালবেসেছিল সতীকে। ভালবেসেও সতী ছিল দীপঙ্করের দূরের মানুষ। সতী ছিল স্বপ্নের মানুষ ! সেই সতী শেষকালে কিনা এত কাছে এসে গেল। একেবারে এত কাছাকাছি। একেবারে তার নাগালের মধ্যে।

কাশী বললে—মাছ আনতে হবে দাদাবাবু—

দীপঙ্কর বললে—মাছ তো আনতেই হবে, আর মাংস রাঁধতে পারবি তুই ?

কাশী বললে—মাংস তো রাঁধিনি কখনও—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে থাক্, ওরা বড়লোক, তোর রান্না কি খেতে পারবে ? কী মাছ আনবি ?

—যে-মাছ আনতে বলবেন!

দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। যেন বিব্রত হয়ে পড়লো খুব। সতী এসেছে অথচ এমন করে কেন আসতে গেল! এমন করে ধূমকেতুর মতন কেন এল! কোথায় থাকবে সতী, কোথায় শোবে! পাশাপাশি ঘরে রাত কাটাবে! সে কী করে হয়। সতীর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলেও দীপঙ্করের ঘুম আসবে না। সতী পাশের ঘরে শুলে কি ঘুম আসে।

—আপনি আজ আপিসে যাবেন না দাদাবাবু?

—আপিসে যাবে না? বলে কি কাশীটা! সতী এসেছে বলে আপিসে যাওয়া বন্ধ হবে নাকি? কাশীও কি জানতে পেরেছে নাকি দীপঙ্করের দুর্বলতাটুকু! কাশীও কি ধরতে পেরেছে! ভালো করে চেয়ে দেখলে কাশীর দিকে। কাশী বেশ রান্নাঘর জুড়ে রান্না করতে বসেছে। রান্নাঘরে দীপঙ্কর কখনও আসে না! বিশেষ করে সন্তোষকাকা তার মেয়েকে নিয়ে আসবার পর থেকে দীপঙ্কর আর এদিকে ঘেঁষে না। কাশী শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে ফেলেছে, বালতিতে কলের জল ধরেছে। তারপর ঝাঁটা নিয়ে ঘর-দোর উঠোন সব ঝাঁট দিয়ে ফেললে। কলঘরের ভেতর থেকেও দীপঙ্কর কাশীর ঝাঁট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলে। আজ সকালেই বর্মায় ভুবনেশ্বরবাবুকে চিঠি দিতে হবে একটা। সেখানে সে-চিঠি পৌঁছোতে তিন-চার দিন সময় লাগবে। তারপর সব কাজ-কর্ম গুছিয়ে আসতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বৈ কি! বর্মা তো এখানে নয়! চিঠি পেয়েই দৌড়ে আসা যায় না। জাহাজেই লাগবে চার-পাঁচ দিন! ততদিন কোথায় থাকবে সতী! ততদিনে যদি মা না এসে পড়ে, তাহলে? এই সময়ে আজই মা এসে পড়লে ভালো হতো!

—কাশী ওপর থেকে আমার জামা-কাপড়টা নিয়ে আয় তো!

স্নান করে উঠে কাচা-কাপড় পরে একেবারে সোজা বাজারে গেলে হয়! দীপঙ্করের জন্যে যা-ইচ্ছে রান্না করুক কাশী, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সতী কী করে যা-তা দিয়ে খাবে। সতী তো বাবার আদরের মেয়ে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতেও দীপঙ্কর দেখেছে কাকীমা সতীর জন্যে কত যত্ন করে রান্না করতো। সতী লক্ষ্মীদি দুজনের জন্যে। দুজনেই যা-তা দিয়ে খেতে পারে না।

জামা-কাপড় দিতেই দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে কাশী, দিদিমণি কী করছে দেখলি, ঘুমোচ্ছে?

কাশী বললে—হ্যাঁ—

—তুই শব্দ করিস নি তো?

কাশী বললে—আমার পা লেগে চেয়ারটা কাত্ হয়ে গিয়েছিল তবু ঘুম ভাঙেনি—

ঘুমোক, আহা! কতদিন ঘুমোয়নি হয়ত! তা না হলে নতুন জায়গায় এসে

এই সকালবেলা কেউ ঘুমোতে পারে?

দীপঙ্কর বললে—আজ খুব ভালো করে রান্না করবি বুঝলি কাশী, যেন সেদিনকার মত ডালে নুন দিতে ভুলে যাসনি আবার। আর আমি আপিসে চলে যাবার পর যত্ন করে খেতে দিবি—খুব বড়লোক ওরা, বুঝলি, জিজ্ঞেস করে করে খাওয়াবি—

ধুতি আর গেঞ্জিটা পরে খবরের কাগজের পাতাগুলো উল্টোতে লাগলো দীপঙ্কর। এখনও সেই কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়া চলছে। ফরওয়ার্ড ব্লক বলে নতুন একটা দল খুলেছে সুভাষ বোস। বাঙালীদের সঙ্গে কোনও দিন কারো বনবে না দেখছি। ওয়ার্ধাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। জওহরলাল নেহরু স্পেশ্যাল ইন্‌ভিটেশন পেয়ে হাজির ছিলেন। বাঙলা থেকে মেম্বার ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। মহাত্মাজীও হাজির ছিলেন রোজ। বম্বেতে মদ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওদিকে মস্কোতে জার্মান-রাশিয়ান প্যাক্ট্ সই হয়ে গেছে। কী যে সব হচ্ছে। হিটলার পোল্যান্ড চেয়ে বসেছে। ও ঠিক নেবে পোল্যান্ড। কেউ ঠেকাতে পারবে না। যতই ইংল্যান্ডের সঙ্গে পোল্যান্ডের মিউচুয়্যাল অ্যাসিস্‌টেন্সের প্যাক্ট থাক্। খবরের কাগজের মোটা-মোটা হেডিং-এর ওপর চোখ বুলোতে লাগলো দীপঙ্কর। তারপর হঠাৎ কাগজটা পাশে সরিয়ে রাখলে।

কোনও দিকে ভালো করে মন যাচ্ছে না সকাল থেকে। ভুবনেশ্বরবাবুকে নিজে চিঠি না লিখে সতীকে দিয়ে লেখালে হয়। সতীই লিখুক। সতীর কথাতেই বেশি গুরুত্ব দেবেন তিনি। তাছাড়া, দীপঙ্করকে তিনি চোখে দেখেন নি, দীপঙ্করকে তিনি চেনেন না, নামও শোনেন নি দীপঙ্করের—তার চিঠি পেয়ে তিনি অবাকই হয়ে যাবেন বরং। তার চেয়ে সতী লিখলেই তো ভালো হবে!

কাশী এল। দীপঙ্কর বললে—আমার জামার পকেট থেকে টাকা নিয়েছিস্?

কাশী দেখালে। বললে—এই যে নিয়েছি—

—ভালো দেখে মাছ নিবি, আলু নিবি, পটল নিবি—দামের জন্যে ভাবিসনি বুঝলি? আর আসবার সময় দই মিষ্টি কিনে নিয়ে আসবি! আমি তোর সঙ্গেই যেতাম, কিন্তু খালি বাড়ি ছেড়ে যাই কী করে—

কাশী চলে গেল। সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দীপঙ্কর বাইরের দিকে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। মা হয়ত এতক্ষণে পৌঁছে গেছে কাশীতে। এ-সময়ে কাশীর ক্লাইমেট্‌টা ভালো। গাঙ্গুলীবাবুদের পুরোন পাণ্ডা এসে হয়ত নিয়ে গিয়ে তুলেছে ধর্মশালায়। আর মা'র হাতেও তো টাকা দিয়েছে দীপঙ্কর। যা খুশি কিনবে। নিজের পছন্দ মত সংসারের টুকিটাকি সব।

আর তারপর ধুলো পায়েই বিশ্বনাথ দর্শন করতে হয়!

একটা পোস্ট অফিসের পিওন এক তাড়া চিঠির ব্যাগ নিয়ে রাস্তা দিয়ে ওধারে চলে গেল। আজ যদি মা চিঠি ফেলে তো কাল এই সময়ে হয়ত চিঠি এসে পৌঁছোবে। মা ছাড়া দীপঙ্করকে কে আর চিঠি লিখবে! যদি কিরণ কখনও চিঠি লেখে! আর কে লিখবে তাকে চিঠি! আর কারো সঙ্গেই তো দীপঙ্করের চিঠি লেখার সম্পর্ক নেই! ছোট থেকে বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে, চাকরি করছে। চাকরিকেই সার করেছে জীবনে। খবরের কাগজ পড়লে বুঝতে পারা যায় পৃথিবীতে কত দেশ, পৃথিবীতে কত মানুষ। দীপঙ্করের মতই সব মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ওই পোল্যান্ড, ওই জার্মানী, ওই ওয়ার্শা, ওই ইংল্যান্ড ওখানেও দীপঙ্করের মতই সব মানুষরা আপিসে যায়, খবরের কাগজ পড়ে। ওখানেও হয়ত সতীদের মত মেয়েরা শাশুড়ীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে, ওখানেও হয়ত লক্ষ্মীদির মত মেয়েরা বাড়িতে জুয়ার আড্ডা বসিয়ে সংসার চালায়। ওখানেও হয়ত বিন্তীদির মত মেয়েরা হতাশায় আত্মহত্যা করে। ওখানেও নিশ্চয়ই ছিটে-ফোঁটারা আছে। জওহরলাল নেহরুর ভাষায় ওখানেও হয়ত আছে ওইরকম ইতিহাসের ডাস্টবিন সব। ওখানেও প্রাণমথবাবু, কিরণ, রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার আর নির্মল পালিত আর লক্ষ্মণ সরকাররা আছে। ওখানেও কে-জি-দাশবাবু, মিস মাইকেল, রবিনসন সাহেব, রামলিঙ্গমবাবু আছে। হয়ত নামই আলাদা, মানুষগুলো একরকম। একই মানুষের বিভিন্ন রকমফের শুধু। সেখানেও সবাই যুদ্ধ নিয়ে, দেশ নিয়ে, টাকা নিয়ে, পার্টি নিয়ে, চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। সেখানেও দীপঙ্করেরা তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকে হয়ত এখন সেন সাহেব হয়ে বসেছে। কেউ কাউকে আমরা চিনি না। অথচ এই একই সূর্য সেখানেও আলো দেয় সকালবেলা, একই চাঁদ সেখানেও সন্ধ্যেবেলা আকাশে ওঠে!

হঠাৎ যেন দোতলায় একটা শব্দ হলো।

সতী বোধহয় ঘুম থেকে উঠলো এখন।

দীপঙ্কর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। দোতলার। দরজাটা তেমনি খোলা রয়েছে।

কিন্তু বিছানাটার ওপর সতী তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এবার এ-পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। বড় নিশ্চিন্ত, বড় প্রশান্ত সতীর মুখের চেহারাটা। দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন দীপঙ্করের বিছানার ওপর তার পরম নির্ভরতার স্বস্তি পেয়েছে। অন্তত মুখের ভঙ্গি দেখলে তাই মনে হয়। মাথার কোঁকড়ানো চুলের ভারি খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে বালিশের ওপর। সিঁথিতে পাতলা সিঁদুরের রেখাটা তখনও স্পষ্ট। দুটো ভুরুর মধ্যেও একটা সিঁদুরের টিপ। সরু জ্যামিতিক রেখার মত নাকটা নিঃশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটু ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের পাতা দুটো বোজা আর পাতলা ঠোঁট দুটো জোড়া।

দীপঙ্কর একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। এমন করে সতীকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখবার সুযোগ আগে কখনও পায়নি দীপঙ্কর। সতী এত সুন্দর। এত সুন্দর দেখতে সতীকে! অথচ সাজেনি, গোজেনি কিছু না। কাল রাত্রে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনিভাবেই চলে এসেছে। সতীর আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখতে লাগলো দীপঙ্কর। রঙিন একটা শাড়ি পরেছে। ঘুমোবার সময়ে গা থেকে খসে গেছে আঁচলটা। মোটা লাল চওড়া পাড় শাড়িটার। পায়ের গোছটা বেরিয়ে গেছে। কী সুন্দর পা। শুকনো পা-জোড়া। কবে বুঝি একদিন আলতা পরেছিল—তার চিহ্ন লেগে রয়েছে অস্পষ্ট। আঙুলের নখগুলো পাতলা সাদা ধপ্ ধপ্ করছে। গায়ের রং-এর সঙ্গে যেন মিলে একাকার হয়ে গেছে। ঘুমের ঘোরে নিঃশ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ওঠা নামা করছে তালে তালে। আশ্চর্য, এমন বউকে নিয়ে সুখী হলো না সতীর শাশুড়ী। এমন স্ত্রীকে সনাতনবাবু বাড়িতে রাখতে পারলেন না। এমন মেয়ের কপালে এত কষ্ট! দীপঙ্কর নিঃশ্বাস বন্ধ করে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো।

অথচ কিসের অভাব ছিল এই মেয়ের। ভুবনেশ্বরবাবুর তো টাকার শেষ নেই। তাঁর সমস্ত টাকা তো এই মেয়েই পাবে। তাঁর তো ছেলে নেই, লক্ষ্মীদি তো তাঁর জীবন থেকে মুছে গিয়েছে। সনাতনবাবুদেরও তো অনেক টাকা, অনেক ঐশ্বর্য! কলকাতার বাড়ি, গাড়ি, ঝি-চাকর-ঠাকুর, বাগান, মালী, দারোয়ান, জমিদারী, কিছুরই তো অভাব নেই। অঘোরদাদু চেষ্টা করে যা জমিয়েছে, সতী বিনা চেষ্টায় জন্মেই তা পেয়েছে। তার ওপর পেয়েছে তার এই রূপ। এই দুধে-আলতায় মাখা গায়ের রং, এই স্বাস্থ্য, এই চুল, এই ঠোঁট, এই চোখ, এই সব! ঈশ্বর যেন সব কিছু দিয়েছিল সতীকে উজাড় করে।

একটা মাছি কোথা থেকে হঠাৎ সতীর গালের ওপর বসলো।

কোথা থেকে জানালা দিয়ে হয়ত সকালের রোদ পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে সতীর গালের ওপর বসে পাখা নাড়াচ্ছে। ছোট-ছোট পা-দুটো দিয়ে পাখা পরিষ্কার করছে।

আহা! এমন আরামে ঘুমোচ্ছে সতী, আর ঘুমটা ভেঙে দেবে!

দীপঙ্কর পাখাটা আরো বাড়িয়ে দিলে। পাখাটা আরো জোরে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো সতীর মাথার ওপর। কোঁকড়ানো চুলগুলো একটু দুলে উঠলো। মাছিটা তবু নড়ে না।

দীপঙ্কর আরো কাছে সরে এল। একেবারে সতীর মুখের কাছাকাছি। মুখের কাছে হাতটা নিয়ে এসে মাছিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করলে। মাছিটা নড়লো বটে, কিন্তু আবার নাকের ওপর বসলো। নাকের ওপর থেকেও যদি বা নড়লো, কপালের ওপর গিয়ে বসলো আবার।

ছোট্ট ছাই রং-এর মাছি একটা।

দীপঙ্কর এবার আরো নিচু হয়ে মাছিটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু সতী যদি জেগে ওঠে, যদি আচমকা সতীর গালে হাত লেগে যায়! যদি সতী সন্দেহ করে!

অন্য একটা উপায় আছে। ঘর অন্ধকার করে দিলে মাছিটা হয়ত চলে যেতে পারে। দীপঙ্কর পূব দিকের জানালা দুটো নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলে। অন্ধকার হয়ে এল ঘরটা। দিনের বেলাই যেন রাত্রি নেমে এল। সেই রাত্রির অন্ধকারে সেই নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের মনে হলো যেন সতী বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যেন বড় কাছাকাছি। বড় একান্ত। মাছিটা তখন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্কর সতীর মুখের কাছাকাছি নিজের মুখটা নামিয়ে দেখতে লাগলো—কোথায় গেল মাছিটা। তখনও ঘুমোচ্ছে সতী। তখনও পরিপূর্ণ নির্ভরতার চিহ্ন সতীর সর্বাঙ্গে। একটানা নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ কানে আসে। দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়ে চোরের মত সতীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সেই শব্দ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে লাগলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের এতদিনের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সততা সব যেন ভেসে যাবার উপক্রম করলো। দীপঙ্করের মনে হলো অনেক না-পাওয়ার বঞ্চনায় যেন হাহাকার করে উঠলো আদিম একটা মানুষের আত্মা। দীর্ঘদিনের নৈরাশ্যের পর আজ যেন সে আশার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে তাকে! যুগের পর যুগ কেটে গেছে শুধু প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে। সেই কবে একদিন মানুষের জন্ম হয়েছিল বুভুক্ষার অতৃপ্তি নিয়ে। কবে একদিন বন্য সমাজের একটি প্রান্তে একটি মানব-শিশু জন্ম-লগ্নেই ক্ষুধা, আলো আর আশার জন্যে আকাশে হাত বাড়িয়েছিল। এতদিন কেউ সে-আশা তার মেটায় নি, কেউ পরিতৃপ্তির বাণী, পরিত্রাণের বাণী শোনায় নি তাকে। আজ যেন হাতের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে সেই অমৃত অযাচিতভাবে! এতদিন শুধু বয়েসই বেড়েছে, এতদিন শুধু বাঁধাবুলির গৎ মুখস্থ করে বঞ্চনাই বাড়িয়েছে! এতদিন জীবন, ধর্ম, দেশ, প্রকৃতি সব কিছু নিয়ে কেবল বিড়ম্বিতই করেছে নিজেকে। অথচ......

হঠাৎ সতী যেন নড়ে উঠলো।

নড়তেই দীপঙ্কর তিন-পা পেছিয়ে এসেছে। আশঙ্কায় আতঙ্কে একেবারে থর থর করে কেঁপে উঠেছে সমস্ত শরীরটা।

সতী চোখ খুললো আস্তে আস্তে। তারপর আড়মোড়া খেয়ে যেন কোথায় আছে ভাবতে চেষ্টা করলে। তারপর দীপঙ্করকে দেখতে পেয়ে বললে—কী হলো?... কে?

দীপঙ্কর সহজ হবার চেষ্টা করে বললে—কিছু না, তুমি ঘুমোও—আমি—

সতী বললে—কত রাত্তির হলো? তুমি আপিসে যাওনি?

দীপঙ্কর বললে—না, এখন তো সকাল—

—তাহলে এত অন্ধকার কেন?

দীপঙ্কর বললে—আমি জানলা বন্ধ করে দিয়েছি, মাছি আসছিল কিনা—

সতী একটু থেমে বললে—ওরা কেউ আসেনি?

—কারা?

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। আবার বললে—কারা?

সতী বললে—ওই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড থেকে—?

—না কেউ তো আসেনি। কারো আসবার কথা ছিল নাকি?

সতী বললে—না, তাই জিজ্ঞেস করছি, জানালাটা খুলে দাও, বড্ড অন্ধকার লাগছে, দেখতে পাচ্ছি না কিছু—

দীপঙ্কর বললে—না-ই বা খুললাম, তুমি ঘুমোও না—আমি চলে যাচ্ছি—

সতী হঠাৎ বললে—অন্ধকারে কী করছিলে তুমি একলা-একলা?

দীপঙ্কর ভাবনায় পড়লো। হঠাৎ কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না। বললে—কিছু করছিলুম না—এমনি—

—তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে কেন অমন করে? আমার মনে হলো যেন অনেক রাত হয়ে গেছে, আর ঘরের মধ্যে যেন কে ঢুকেছে, ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম খুব। দাও, জানলাটা খুলে দাও, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না—

বলতে বলতে সতী উঠে বসলো। বললে—ও-বাড়িতে এতক্ষণে যে কী হচ্ছে কে জানে—!

দীপঙ্কর জানালা দুটো খুলে দিতে যাচ্ছিল। সতী আবার বললে—সত্যি, যদি কেউ খুঁজতে আসে আমাকে, কী হবে? কী বলবে তুমি?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিলে না।

সতী বললে—বলে দিও আমি এখানে নেই—

দীপঙ্কর বললে—তা আমি বলতে পারবো না—তার চেয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি চলো সনাতনবাবুর কাছে, আমি সমস্ত মিটমাট করে দেবো। আর তাতেও যদি রাজী না থাকো তো আমি সনাতনবাবুকে গিয়ে ডেকে আনছি—

সতী বললে—তাই যদি যাবে তো আমি এখানে এলুম কেন—তোমার এখানে এলাম কি সেই জন্যে?

দীপঙ্কর ততক্ষণ জানালা দুটো খুলে দিয়েছে। সকাল বেলার পূব দিকের রোদ এসে আবার ঘরে পড়েছে। দীপঙ্কর একটা চেয়ারে বসলো। বললে—কিন্তু তাহলে কী করবে?

হঠাৎ নিচেয় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। ওই বোধহয় কাশী এসেছে!

তাড়াতাড়ি নিচেয় গিয়ে দীপঙ্কর সদর দরজা খুলে দিয়ে এল। মা চলে যাবার পর থেকে এই হয়েছে। সদর দরজা বন্ধ করা, খোলা—এও একটা কাজ! যখন কিছু ছিল না দীপঙ্করের তখন কোনও কাজও ছিল না। কিন্তু এখন বাড়ি ভাড়া করেছে, এখন বাড়িতে বাসন-কোসন আছে, আলমারি, ট্রাঙ্ক আছে। জামা-কাপড় আছে। সংসার করতে গেলে যা কিছু দরকার সব আছে। দিনে দিনে খুঁটি-নাটি বেড়ে বেড়ে জঞ্জাল জমে গেছে। কলকাতা শহরের আরো দশ

অন্য মানুষের মত দীপঙ্করেরও ঐশ্বর্য হয়েছে, সমৃদ্ধি হয়েছে, বিত্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও বেড়েছে। একা দীপঙ্কর কত দিকে দেখবে! আশ্চর্য, অথচ যারা আরো বিত্তবান, যারা আরো সমৃদ্ধিশালী, যারা অনেক ঐশ্বর্যের মালিক, তারা কেমন করে বাঁচে, তারা কেমন করে শান্তি পায়!

বাজারের থলিটা খুলে দেখলে দীপঙ্কর। কাশী অনেক কিছু বেছে বেছে এনেছে। আলু, মাছ, বেগুন, কত কী!

দীপঙ্কর বললে—ভালো করে রাঁধবি, জানিস! নুন তেল দিবি ভাল করে, নইলে খেতেই পারবে না—ওরা খুব বড়লোক বুঝলি—

তারপর একটু থেমে বললে—আমি একটু বেরোচ্ছি বুঝলি কাশী—

কাশী বললে—আপনি আপিসে যাবেন না?

দীপঙ্কর বললে—আপিসে যাবো না কী রে? এখুনি ফিরে আসছি, ফিরে এসেই ভাত খেয়ে আপিসে যাবো—

রাস্তায় বেরিয়েই দীপঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। কিছু কিছু লোক আপিসে বেরোচ্ছে অত সকালেই। রাস্তাতে তখনি ভিড় বেড়ে গেছে! কিন্তু কোথায় যাবে দীপঙ্কর? কার কাছে? সনাতনবাবুর কাছে? সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে কী বলবে?

বাড়িতে সতীকে তেমনি বিছানায় বসিয়ে রেখে এসেছে। ঘুমের ঘোরে সতীকে সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। দীপঙ্করের নিজের মনেই বড় লজ্জা হলো। এমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা উচিত হয়নি। সতীর দিকে অমন করে লুকিয়ে দেখা অন্যায়।

প্রথমেই সনাতনবাবুর কাছে যাওয়া ভালো। ভদ্রলোক অমায়িক মানুষ। কোনও সাতে-পাঁচে থাকেন না কারো। নিজের বই আর নিজের চিন্তার জগতে তিনি সব-সময় ব্যস্ত। সমস্ত বাইরের পৃথিবী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন।

সমস্ত কলকাতার মানুষকে সেই সকালবেলা যেন বড় বিভ্রান্ত মনে হলো। এত সকালে কখনও রাস্তায় বেরোয় না দীপঙ্কর। অন্তত এত সকালে এদিকে আসতে হয় না তাকে। আরো ঘণ্টা দু'এক পরে তবে দীপঙ্করের জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু তবু বাড়ি থেকে বেরিয়েই যত মানুষ নজরে পড়লো, সবাই যেন বিভ্রান্ত। সমস্ত মানুষই কি দীপঙ্করের মত এমনি বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? সকলের বাড়িতেই কি মা নেই। আজ মা থাকলে দীপঙ্করকে এত ভাবতে হতো না! ঠিক এই সময়েই কেন মাকে কাশী পাঠিয়ে দিলে।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে ঢোকবার মুখেই একটা মন্দির। কী একটা ঠাকুর। খুব ঘটা করে পুজো হচ্ছে। গৃহ-বিগ্রহের পুজো। অনেকদিন থেকে দেখে আসছে দীপঙ্কর মন্দিরটা। ভেতরে ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে। আগে কোনও-দিন ভালো করে নজর করে দেখেনি। একমাত্র ছোটবেলাতেই মা-কালীর মন্দিরে গিয়ে প্রত্যেক দিন ফুল দিয়ে এসেছে, নমস্কার করেছে। তারপর কতদিন,

কত বছর কেটে গিয়েছে—কালিঘাটের মন্দিরে আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি। কোনও ঠাকুরকেই আর নমস্কার করা হয়নি। আর কার জন্যেই বা নমস্কার করবে?

দীপঙ্কর মন্দিরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামনে চাইলে।

ভেতরটা অন্ধকার। পকেট থেকে একটা পয়সা বার করতে যাচ্ছিল। দেবতার প্রণামী।

—বাবু একটা পয়সা!

দীপঙ্কর হঠাৎ গলা শুনে পাশে চেয়ে দেখলে।

—বেরো, পয়সা হবে না, যা এখান থেকে!

একটা ছোট ভিখিরীর মেয়ে। ডান হাতটা নেই। সমস্ত মুখে বসন্তর দাগ। বাঁ হাতে একটা মগ বাড়িয়ে দিয়ে ভিক্ষে করছে। দীপঙ্করের ধমক শুনেও সরতে চায় না।

দীপঙ্কর আবার ধমক দিলে—বেরো এখান থেকে, যা—

ভিখিরি-মেয়েটা হতাশ হয়ে চুপ করলো। বোধহয় নিরুৎসাহ হয়ে গেল এবার।

দীপঙ্কর আবার ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখলে। পকেট থেকে পয়সাটা বার করে দিতে গিয়েও কেমন একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর ঠিক সেই ছোট-বেলার মতন পয়সাটা ছুঁড়ে ভেতরে ফেলে দিলে। অভ্যাস মত হাত দুটোও জোড়া করলে। ঢং ঢং করে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ঠাকুর-দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কামনা করতে হয়। কিছু চাইতে হয়। কিন্তু কী চাইবে? চাওয়ার তো অনেক কিছু আছে সংসারে। দীপঙ্করেরও তো অনেক কিছু চাইবার আছে। কিন্তু কী চাইবে? কা'র মঙ্গল চাইবে? মা'র? মাও এতক্ষণ এই সময়ে হয়ত বিশ্বনাথের মন্দিরে দাঁড়িয়ে দীপঙ্করেরই মঙ্গল কামনা করছে। মাও হয়ত ঠিক এমনি করে ঠাকুরের বেদীতে এক পয়সা দক্ষিণা দিয়ে ছেলের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি সম্বন্ধে ঠাকুরের কাছে গ্যারান্টি চাইছে! আশ্চর্য, কত পয়সা এমনি করে কত লোক প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দক্ষিণা দিচ্ছে ঠাকুরকে। আর ঠাকুর?

ঠাকুরের মন্দিরের ভেতরে প্রদীপের আলো জ্বলছে টিম্ টিম্ করে। আবার মাথার ওপর ইলেকট্রিকের বাল্বও ঝুলছে। একজন পুরুত দাঁড়িয়ে উঠে ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ, আর বাঁ হাতে ঘণ্টা নাড়াচ্ছে। ঘণ্টার শব্দে আরো অনেক রাস্তার লোক জড়ো হয়ে গেল! ভেতর থেকে ধুপ-ধুনোর গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

আর কা'র মঙ্গল কামনা করবে দীপঙ্কর? মা'র কথা তো বলা হয়ে গেছে ঠাকুরকে। এবার সতীর কথা?

হঠাৎ নিজেরই মনে হলো দিন দিন যেন সে অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। সেই ছোটবেলাকার বিশ্বাস যেন তার ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। তেমন করে ঠাকুর-দেবতার

ওপর যেন আর ভক্তি নেই। ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে গেলে যেন আগেকার মত ভক্তিতে মাথা নুইয়ে আসে না তার। কেন এমন হলো? 'এ কি অধঃপতনের লক্ষণ? ঠাকুর তো সেই একই রকম আছে। সেই পলকহীন পাথরের চোখ, সেই শুদ্ধ দৃষ্টি। তবে সেই কি নাস্তিক হয়ে পড়েছে! কেন নাস্তিক হবে সে? কোন্ দেবতাকে সে পুজো করছে আজকাল? কে তার মঙ্গল করবে! তার নিজের মঙ্গলের জন্যে কা'র মন্দিরে সে গিয়ে দাঁড়াবে?

আর বেশি সময় নেই। অফিস যাবার সময় হয়ে এল। হঠাৎ রাস্তায় একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠলো। তারপরেই একটা মোটর গাড়ির ব্রেক-কষার শব্দ! দীপঙ্কর উঠে মুখ ফেরাল।

আর সঙ্গে সঙ্গে যারা কাছে ছিল তারাও একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—ইস্-স্—

দীপঙ্কর ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় গেল দৌড়ে। কিন্তু তার আগেই অনেক ভিড় জমে গেছে। অনেক মানুষ দৌড়তে দৌড়তে ঘটনাস্থলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারপাশে একটা বিরাট জনতা জমে গেল সেই সকালবেলাই।

দীপঙ্কর গাড়িটার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না।

—কী হয়েছে স্যার এখানে?

দীপঙ্কর বললে—কী জানি, বোধহয় গাড়ি চাপা পড়েছে কেউ—

বলে আরো ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। ভেতরে উঁকি দেবার চেষ্টা করলে। কার যেন কান্নার শব্দ উঠলো হঠাৎ। মেয়ে-মানুষের গলা।

একজন চিৎকার করে উঠলো—মার শালাকে, শালা গাড়ি চালাচ্ছে, একেবারে নবাব হয়ে গেছে নাকি—

দু'একটা পুলিস এসে গেল। তারা ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

দীপঙ্কর তখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাজরা রোডের মোড়ে সকালবেলা কখনও ভিড় জমাবার লোকের অভাব হয় না।

পাশ থেকে একজন বললে—অন্ধ নাকি মশাই? চোখে দেখতে পায় না?

আর একজন বললে—ওরা তো গাড়ি চাপা পড়বার জন্যেই জন্মেছে মশাই, ও মরেছে বেশ হয়েছে—

ততক্ষণে পুলিস দু'জন সামনে যেতেই এদিকটা ভিড় একটু পাতলা হলো। সেই ফাঁকের মধ্যে হঠাৎ দীপঙ্করের নজরে পড়লো ঠিক গাড়ির দুটো চাকার মধ্যেখানে একটা ছোট মেয়ে পড়ে আছে। আর এক হাতে তখনও সেই ফাঁকা মগটা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে পিচের রাস্তার ওপর।

—গাড়ি যদি চালাতে না জানে তো, গাড়ির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হোক—

আর একজন বললে—এদের জেলে পুরে ফাঁসি দেওয়া উচিত মশাই—

দীপঙ্কর তখনও এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল সেই ফাঁকা মগটার দিকে। একটা পয়সা চেয়েছিল এই মেয়েটাই। দীপঙ্করই দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। হাতটা তখনও যেন তার দিকে বাড়িয়ে রয়েছে। তখনও যেন মগটা বাড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বলছে—বাবু, একটা পয়সা—

আশ্চর্য! দীপঙ্করের পিঠের ওপর যেন চাবুক পড়লো। দীপঙ্করই যেন মেয়েটাকে খুন করে ফেললে। একটা পয়সা দিলে কী এমন ক্ষতি হতো তার! ঠাকুরকে পয়সা না দিয়ে মেয়েটাকে দিলেই হতো। ঠাকুরকে দিয়ে কী লাভ হলো! কার মঙ্গল হলো! কার স্বর্গলাভ হলো! সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো দীপঙ্করের। পাশেই বুঝি তার মা আর্তনাদ করে উঠলো—কী সব্বনাশ হলো মা, তুই কোথায় গেলি মা—

হাজরা রোডের আকাশ-বাতাস সেই কান্নায় যেন বড় মন্থর হয়ে উঠলো। যত মন্থর হলো, মানুষের উত্তেজনা তত বাড়তে লাগলো! মেয়েটা তখনও পড়ে আছে। যার গাড়ি, সে ভদ্রলোক তখনও গাড়ির ভেতরে। সবাই মিলে তাকে ধরেছে। পেছন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। গাড়ির ড্রাইভারকেও সবাই চেপে ধরেছে। সবাই তাদের নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু মেয়েটার কথা কেউ ভাবছে না। দীপঙ্করের মনে হলো এখন এই মুহূর্তে যদি মেয়েটা বেঁচে উঠে তার কাছে পয়সা চায় তো তার পকেটে যা-কিছু আছে সব যেন তাকে দিয়ে দিতে পারে। মেয়েটা যেন দীপঙ্করকে পরীক্ষা করতেই এসেছিল। যেন জীবন দিয়ে মেয়েটা দীপঙ্করকে শিক্ষা দিয়ে গেল। কী হলো ঠাকুরকে পয়সা দিয়ে? সত্যিই তো, কী লাভ হলো?

মাথার মধ্যে তার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। কেন এমন করলে সে! যেন মেয়েটার মৃত-আত্মা তার দিকে চেয়ে খিল-খিল করে হাসছে। বলছে—বেশ হয়েছে, কেমন জব্দ! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! কী করতে এসেছিল সে এখানে? কী তার কাজ? সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে? তাহলে সনাতন-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে এখানে এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কেন সে ভক্তির ভান করছিল? কেন সে মাটির মানুষকে অবহেলা করে পাথরের ঠাকুরকে নিয়ে মেতে উঠেছিল! দীপঙ্করের মনে হলো—এত বড় ভুল যেন জীবনে সে আর কখনও করেনি! মনে হলো তার ভণ্ডামি যেন হঠাৎ সকলের সামনে ধরা পড়ে গেছে। সেই ভণ্ডামিটুকু প্রকাশ করে দেবার জন্যেই যেন মেয়েটা ভিখিরি সেজে তার সামনে এসে ভিক্ষে চেয়েছিল। ঠাকুরই যেন পরিচয়পত্র দিয়ে তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিল দীপঙ্করের কাছে! কই, আমি তো ঈশ্বর মানি না, আমি তো ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। ছোটবেলা থেকে ঠাকুরকে যে ফুল দিয়ে এসেছি সে তো অভ্যেসের ফলে। দীপঙ্করের আবার মনে হলো এতদিন যে ঈশ্বরকে ফুল দিয়ে এসেছে, সেই ঈশ্বরই যেন পিচের রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে। ঈশ্বরের ঠোঁটের ফাঁক দিয়েই যেন রক্ত গড়াচ্ছে। ময়লা ছেঁড়া

জামা পরা ঈশ্বর মাটিতে লুটোচ্ছে। ঈশ্বরকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে আমেরিকা-মেড মোটর গাড়ি।

দীপঙ্কর আরো এগিয়ে গেল। মেয়েটার মা মাটিতে রাস্তায় বসে তখনও বুক চাপড়ে কাঁদছে চিৎকার করে। পকেট থেকে দীপঙ্কর সব টাকাগুলো বার করলে। দশ বারো টাকা ছিল পকেটে। পাঁচ টাকার দু'খানা নোট আর খুচরো দু'টো টাকা। সবগুলো নিয়ে মায়ের হাতে দিলে।

বললে—এই রুপেয়া লেও মাতাজী—

কাঁদতে কাঁদতেও মেয়েটার মা যেন একবার থমকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। এক মুহূর্তের বিরতি। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। টাকাগুলোর দিকে একবার চাইলে।

দীপঙ্কর বললে—লেও রুপেয়া, টাকা নাও—

আশে-পাশের লোকগুলো যারা এতক্ষণ দেখছিল, তারাও দীপঙ্করের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। মেয়ে মরে গেছে যার তাকে কি টাকা দিয়ে খুশী করা যায়? টাকাতে কি মেয়ের অভাব পূরণ হয়?

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, তুমি গরীব লোক, টাকা কটা নাও—আমি দিচ্ছি—

আশ্চর্য, টাকা-ক'টা নিলে মেয়েটার মা। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর ভিড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে আসছিল। চোখের সামনে যেন অঘোরদাদুর মুখটা ভেসে উঠলো। দুই হাতে মুখটা ঢেকে দীপঙ্কর ভিড়ের বাইরেই চলে আসছিল।

হঠাৎ কানে গেল কে যেন বললে—দেবতা, তুমি?

রাস্তার কতগুলো ছেলে। এতক্ষণ তারাই তম্বি করছিল। এতক্ষণে চিনতে পেরেছে। দীপঙ্কর চলে যেতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে অবাক হয়ে গেছে। ফোঁটা! গাড়ির মালিক ফোঁটা! আশ্চর্য চেনা যায় না একেবারে। ক'দিনেই যেন আরো মোটা হয়েছে। গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

ফোঁটা বলছে—ভাই, আমিও তোমাদের মত রাস্তার লোক, গাড়ি কিনেছি বলে তো আর বড়লোক হয়ে যাইনি। আমি বিলিতি কাপড় পরি না, এই দেখ খদ্দর পরেছি—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—

বলে ফোঁটা তার গায়ের খদ্দরের চাদরটা দেখালে।

দীপঙ্করও দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ফোঁটার চেহারা যেন বদলে গেছে রাতারাতি। কোঁচানো ধুতি, ফরসা ধবধবে পাঞ্জাবি—সমস্ত খদ্দরের। একটা ফরসা খদ্দরের চাদরে সারা শরীর ঢাকা। চুলগুলো বড় বড় করে মাথার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

ফোঁটা বলতে লাগলো—তোমরা ভাবছো আমার কষ্ট হয়নি? মানুষ চাপা

দিলে কার না কষ্ট হয়? কে এমন পাষণ্ড আছে? আর তাছাড়া আমি তো কংগ্রেসের লোক, আমি ভাই এখানকার কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট—

—দেব্‌তা তুমি?

এতক্ষণে ফোঁটার পুরোন সাগরেদদের কেউ একজন বোধহয় চিনতে পারলে। বললে—আরে, ইনি আমাদের দেব্‌তা যে!

—দেব্‌তা মানে?

—দেব্‌তা মানে, ফটিকবাবু! ফটিকবাবুকে চেনেন না?

ফোঁটা বললে—থাক থাক, এসব বলবার দরকার নেই,—আমি ভাই দেশের সামান্য একজন কংগ্রেস-সেবক—

লোকেরা কিন্তু তখন ক্ষেপে গেছে। এতক্ষণ একজন কংগ্রেসের লোককে তারা মিছিমিছি হয়রানি করছিল।

একজন বললে—আরে ছোটলোকেরা কি রাস্তায় চলতে জানে মশাই? আপনি চলে যান স্যার, কেউ আপনার গায়ে হাত দেবে না—

ফোঁটা বললে—না ভাই, আইন মানতে আমি বাধ্য, ফাইন দিতে হলে ফাইনও দেব, মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে না, তা সে গরীব লোকই হোক আর বড়লোকই হোক—আমার কাছে সকলেরই প্রাণের দাম সমান—

ফোঁটার কথা শুনে দীপঙ্কর আরো অবাক হয়ে গেল।

ততক্ষণে মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা হয়েছে। মেয়েটার মাও গাড়িতে উঠলো। পুলিস দু'টো উঠলো গাড়ির পা'দানিতে।

ফোঁটা বললে—পুলিসের হাজতে যেতে ভয় নেই ভাই আমার, সারা জীবনই তো দেশের জন্যে জেল খাটছি, কংগ্রেসের লোক আমরা, আমাদের জেলের ভয় করলে তো চলে না—চলো—

ফোঁটার সাগরেদ চিৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

সবাই সেই সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করলে—বন্দে মাতরম্—

ফোঁটা সকলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—শান্ত হও ভাই তোমরা, উত্তেজিত হয়ো না—আমরা অহিংসার সাধক, পুলিসের ওপর কেউ যেন ভাই ঢিল ছুঁড়ো না—আমি যদি অন্যায় করে থাকি তো শাস্তি নিতে বাধ্য—

তারপর ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দীপঙ্করকে দেখে চমকে উঠেছে।

—আরে, দীপুবাবু যে? তুমি এখেনে?

দীপঙ্কর বললে—আমি এদিকে এসেছিলাম—তোমার খবর কী?

ফোঁটা বললে—খবর তো এই দেখছো, দেশ-সেবার পুরস্কার! যাচ্ছিলুম কংগ্রেস অফিসে, আমাদের মীটিং ছিল, এখন রাস্তার মধ্যে এই কাণ্ড—যাহোক, পরে দেখা হবে—

বলে মুখে একরকম প্রশান্ত করুণ একটা হাসি ফুটিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে ফোঁটা। অঘোরদাদুর সেই ফোঁটা। ফোঁটা আবার গাড়ি কিনলে কবে! রীতিমত

সত্য ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে! হয়ত পয়সা হবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হওয়া যায়। ভাল ভাল কথাও বেরোয় মুখ দিয়ে। কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়ে গেছে। কী চমৎকারভাবে ভিড় শান্ত করলে। তখনও বন্দে মাতরম্-এর সুরটা বাতাসে ভাসছে। আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হতে লাগলো। সবাই যে-যার কাজে যেতে লাগলো।

একজন বললে—মশাই, কংগ্রেসের লোক তো, তাই অত ভদ্রলোক—অন্য কেউ হলে দেখতেন চাপা দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেত—

আর একজন বললে—আরে মশাই, দোষ তো আমাদেরই, আমরাই কেমন করে রাস্তায় হাঁটতে হয় জানি না—ও ভদ্রলোকের দোষ কী?

পাশ থেকে একজন বললে—ওই তো বাঙালীদের দোষ মশাই। পরের ভালো দেখতে পারি না যে আমরা—আমাদের নিজেদের মধ্যেই ইউনিটি নেই, শিক্ষা নেই, এ জাত আবার স্বরাজ চায়—ছোঃ—

নানা রকম মন্তব্য করতে করতে সবাই চলে গেল। দীপঙ্করের হঠাৎ খেয়াল হলো, কেউ নেই তার চার পাশে। সে একলা দাঁড়িয়ে আছে। যে জায়গাটায় মেয়েটা চাপা পড়েছিল সেখানে তখনও রক্তের দাগ ঘন হয়ে আছে। আশ্চর্য! আসলে কেউই জানলো না, ফোঁটাও জানলো না, ওই মৃত্যুটার জন্যে কে দায়ী!

আস্তে আস্তে ফুটপাথটা ধরে দীপঙ্কর আবার রসা রোডে এসে পড়লো।

সেদিন সেই ঘটনার পর আর সনাতনবাবুর বাড়ি যাবার ইচ্ছে হয়নি! সেখান থেকেই সোজা চলে এসেছিল দীপঙ্কর। অফিসেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সতীর শাশুড়ী হয়ত দীপঙ্করের কথাগুলো ঠিক বুঝতেন না। তিনি যে-যুগের যে পরিবারের মানুষ সেখানে এত বড় অপরাধের হয়ত ক্ষমা নেই।

সেখান থেকেই সোজা একেবারে চলে এসেছিল লক্ষ্মীদির বাড়ি!

এর আগে সকালবেলা এখানে কখনও আসেনি দীপঙ্কর!

এ সেই উনিশ শো উনচল্লিশ সাল। পৃথিবীর মানুষের জীবনের এক-চরম সন্ধিক্ষণ! জীবনের সবটুকু নোংরা সবটুকু গ্লানি লোক-চক্ষের আড়ালে রেখে দেবার সেই প্রাণান্তকর চেষ্টার যুগ। যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। যেন ধামা চাপা থাকে। সমস্ত কলঙ্ক যেন ঢাকা থাকে আড়ালে, কেউ যেন জানতে না পারে। মুখোশ খুলো না। সবাই তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি যাচাই করে ফেলবে। ভদ্র-সমাজের যেটুকু ঐতিহ্য তাই দিয়েই বাইরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখো। দরকার নেই ঘাঁটিয়ে। বাড়ি থেকে যদি সতীরা বেরিয়ে যায় তো যাক, কেউ জানতে না পারলেই হলো। তোমার যদি ভাত না জোটে তো মুখে প্রকাশ কোর না, রাস্তার দোকান থেকে এক পয়সার পান কিনে ঠোঁট রাঙিয়ে নিও। ফর্সা জামা-কাপড়ে সাজাও নিজেকে, তাহলে লোকে তোমাকে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলবে। কান্না

পেলে চোখের জল ফেলো না, তাতে কেউ সহানুভূতি দেখাবে না। সে বড় করুণ যুগ, সেই উনিশ শো উনচল্লিশ সাল। কোথাও যুদ্ধ নেই, কিন্তু হাজার-হাজার লোক মরে যায় কলেরায়, বসন্তে আর ম্যালেরিয়ায়। কোথাও দুর্ভিক্ষ নেই, কিন্তু তবু মানুষের সংসারে সংসারে অরন্ধন। কিরণই কি একলা রাস্তায় ভাব কুড়িয়ে খেয়েছে? আরও কত ছেলে কত রকম করে দাঁতে দাঁত চেপে হাসি ফুটিয়েছে মুখে। কত গাঙ্গুলীবাবুরা কো-অপারেটিভ থেকে লোন নিয়ে বউকে গয়না কিনে দিয়ে নিজেদের মান বাঁচিয়েছে। কত কিরণের মা'রা বাড়িতে একখানা গামছা পরে দিন কাটিয়েছে। আর পৈতে কেটেছে। কত লক্ষ্মীদিরা চৌরঙ্গী থেকে গভর্নমেণ্ট অফিসারদের ধরে নিয়ে এসেছে বাড়িতে। কত বিন্তীদিরা আত্মবিসর্জন দিয়েছে আদিগঙ্গার কালীদহে। আবার কত ছিটে-ফোঁটা খদ্দর পরে মহামানব সেজেছে। চরকার ব্যবসা করেছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের ব্যবসা করেছে। স্বদেশীর নাম করে কটন মিল খুলেছে। বন্দে মাতরম্ বলেছে। জেলে গিয়েছে। শহীদ হয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছে! আবার ওদিকে সাহেব-পাড়ায় কত মিস মাইকেল ভিভিয়ান লে'র স্বপ্ন দেখেছে। কত ঘোষাল সাহেবরা সাউথ ইণ্ডিয়ান সেজে প্যালেস-কোর্টে ক্রাউনের পার্ট করেছে। সেই জন্ম থেকে শুরু করে উনিশ শো উনচল্লিশ সাল পর্যন্ত কত জীবন, কত মানুষ, কত চরিত্র, কত সংসার দেখেছে দীপঙ্কর সব, সব তার মনে আছে। হে ভোলানাথ, কেন তুমি তোমার মত ভুলতে শেখালে না দীপঙ্করকে। সমস্ত ভুলে দীপঙ্করও তোমার মত ভোলানাথ হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। যেমন আর দশজন অফিসার চাকরি, ওয়াগন্, ঘুষ, গ্রেড, প্রমোশন, সাহেব নিয়ে মেতে থাকে, সে-ও তেমনি মেতে থাকতে পারতো। প্রমোশন আর গ্রেডের জন্যে সাহেবের মনস্তুষ্টির পথ আবিষ্কারের চিন্তা নিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতো। এর সঙ্গে ওর ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির শিখরে গিয়ে উঠতো! কেন সে ভুলতে পারে না! কেন সে সব মনে রাখে! কেন তার সমস্ত মনে থাকে!

কিন্তু একদিন সব প্রকাশ হয়ে পড়লো।

একদিন সব লজ্জা বে-আব্রু হয়ে গেল। একদিন সব ঘা উলঙ্গ হয়ে গেল। চেম্বারলেন থেকে শুরু করে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ছিটে-ফোঁটা সবাই। সবাই। সেই উনিশ শো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মনে আছে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই কেশব দরজা খুলে দিয়েছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—লক্ষ্মীদি আছে?

সরু রাস্তাটা পার হয়েই উঠোন। দিনের বেলায় জায়গাটাকে যেন বড় অচেনা লাগলো দীপঙ্করের। রাত্রে এই রাস্তাটিকেই কতদিন দীপঙ্করের মনে হয়েছে যেন একটা সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়েই যেন সভ্যতার সমস্ত পাপ সমস্ত কলঙ্ক এখানে এসে ঢোকে। এখান দিয়েই যেন লক্ষ্মীদির আত্মা রাত্রির

অন্ধকারে ব্যভিচার করতে বেরোয়। আজ মনে হলো এটা যেন আরো দশটা গৃহস্থ বাড়ির মত। রাস্তাটার লম্বা-লম্বি তে-কোণা জায়গায় একটা ফুল গাছের টব। মাটির টবের ওপর একটা তুলসী গাছ। আশ্চর্য! লক্ষ্মীদি কি তুলসী গাছও পুঁতেছে এত যত্ন করে! তুলসী গাছের ওপরেও কি লক্ষ্মীদির শ্রদ্ধা আছে নাকি আবার! অবাক কাণ্ডই বটে!

দীপঙ্কর উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে আরো অবাক হয়ে গেল।

লক্ষ্মীদি পেছন ফিরে ছিল। জিজ্ঞেস করলে—কে রে কেশব? কে এসেছে?

সিমেন্ট বাঁধানো উঠোনের ওপর সেই দাতারবাবু চুপ করে বাবু হয়ে বসে আছে। আর লক্ষ্মীদি ঘটি করে জল নিয়ে দাতারবাবুকে স্নান করাচ্ছে। গাছ-কোমর বেঁধে নিয়েছে শাড়িটা। ভিজে চুলগুলো মাথায় জড়িয়ে এলো খোঁপা করে নিয়েছে। এক গোছা চাবি ঝুলছে পিঠে। নিচু হয়ে ঝুঁকে দাতারবাবুকে জল ঢেলে স্নান করিয়ে নিচ্ছে। সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ পেছন ফিরে দীপঙ্করকে দেখেই লক্ষ্মীদি বললে—ওমা, তুই? এত সকালবেলা যে?

দীপঙ্কর প্রথমে কিছু কথাই বলতে পারলে না। কে বলবে কালকের রাত্রের সেই লক্ষ্মীদি এই!

লক্ষ্মীদি বললে—বোস বোস, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোস—রাত্তিরে আসতে বারণ করেছিলাম বলে সকালে এলি বুঝি?

দীপঙ্কর তবু বসলে না। দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। বললে—একটা জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি—

চান করাতে করাতে পেছন ফিরেই লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ? তোর অফিস নেই আজ?

তারপর আর এক ঘটি জল দাতারবাবুর মাথায় ঢেলে পিঠে সাবান ঘষতে লাগলো।

বললে—জানিস, আগে মোটে চান করতে চাইত না শম্ভু, জল দেখলে চিৎকার করতো, এখন দেখছিস তো কেমন চুপ করে চান করছে—

তারপর দীপঙ্করকে আবার জিজ্ঞেস করলে—তুই বাবাকে চিঠি লিখেছিস?

দীপঙ্কর বললে—অনেক কাণ্ড হয়েছে এর মধ্যে! আজ ভোর রাত্রে হঠাৎ সতী এসে হাজির হয়েছে আমার বাড়িতে—

—সতী?

লক্ষ্মীদির হাতের ঘটিটা হঠাৎ থেমে গেল।

দীপঙ্কর বললে—তোমার এখান থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলুম, তোমার বাবাকে চিঠি লিখবো বলে। গিয়েই একটা চিঠি লিখলুম। কিন্তু পছন্দ হলো না বলে

সে-চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তারপরে ভেবেছিলাম সকালে লিখবো, কিন্তু ভোর হবার আগেই সতী এসে হাজির। তাকে রেখেই তোমার কাছে এলাম—

—কেন? সতী চলে এলো কেন?

দীপঙ্কর বললে—শ্বশুরবাড়িতে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। তার স্বামীকে পর্যন্ত সতীর ঘরে শুতে দিত না—

—কেন? কী করেছিল সতী?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা। সব কথা বলবার সময়ও নেই এখন—

—তা সেই জন্যে সতী একেবারে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসবে?

দীপঙ্কর বললে—আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। আমি নিজে তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসবো বলেছিলাম, তাতেও রাজী নয়। ভেবেছিলাম তার স্বামীকে গিয়ে খবর দেব, তা তাও হলো না, এখন আমার বাড়িতেও আবার মা নেই, মা কাশীতে গেছে। আমি একলা রয়েছি—এখন কী করি বলো তো? তাই তোমার কাছে এলাম—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু সতী তো ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, সেখান থেকে চলে এল? তারপর? তারপর কী হবে একবার ভাবলে না? আর শ্বশুরবাড়ি যদি না থাকে তো যাবে কোথায়? কার কাছে থাকবে! সে-সব কথা ভাবছে না?

দাতারবাবু এতক্ষণ কোনও দিকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ বলে ফেললে—দী-পু-বা-বু—

লক্ষ্মীদি বললে—ওই দেখ, দেখলি? তোকে চিনতে পেরেছে রে—

তারপর দাতারবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে—চিনতে পেরেছ ওকে? সেই দীপু আমাদের—খুব ছোটবেলায় দেখেছিলে ওকে। ও এখন মস্ত বড় হয়েছে। অনেক টাকা উপায় করছে, অফিসার হয়েছে—

দাতারবাবু তখনও দীপঙ্করের দিকে চেয়ে ফাঁকা হাসি হাসছিল। দাঁতগুলো বেরিয়ে গেছে। যেন খুব আনন্দ হয়েছে দীপঙ্করকে দেখে।

দাতারবাবুর স্নান করা হয়ে গিয়েছিল। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে দিতে লক্ষ্মীদি বললে—কী যে ভাবনা হয়েছিল এ-মানুষকে নিয়ে কী বলবো তোকে—এখন তো তবু কথা বুঝতে পারে, তোকেও চিনতে পারলে—

দাতারবাবুর গা মুছিয়ে দিয়ে লক্ষ্মীদি ঘরে নিয়ে গেল ধরে ধরে। বললে—একটু দাঁড়া আমি আসছি—

দীপঙ্কর সেই উঠোনে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলো চারিদিকটা। সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন। কোণের দিকে তুলসী গাছের টব। একটা লাউগাছ [illegible] চালে উঠেছে। বেশ গৃহস্থালী চেহারাটা। রাত্রে এ-বাড়িটার অন্য রূপ। কিন্তু এখন যেন বড় ভাল লাগলো দীপঙ্করের। রান্নাঘরের ভেতরে একটা উনুনে আগুন জ্বলছে। ভাত ফুটছে। বঁটি পড়ে রয়েছে। পাশে কিছু তরকারীও

কোটা রয়েছে। কেবল রান্নাঘর গুছোচ্ছে।

লক্ষ্মীদি আবার এল। বললে—জানিস, আজকে মানসের চিঠি এসেছে—

মানস! হঠাৎ মনে পড়লো। লক্ষ্মীদির ছেলে!

লক্ষ্মীদি বললে—এই সকাল বেলাই চিঠি পেলুম, এবার ভালো করে পাশ করেছে এগ্‌জামিনেশনে—। আমার খুব ভাবনা ছিল কদিন ধরে। এত কষ্ট করে টাকা পাঠাচ্ছি, আর যদি পাশ না করতে পারে তো কী হবে বল্ তো—

ছেলে স্বামী—কত কথা বলতে লাগলো লক্ষ্মীদি। কত স্বপ্ন লক্ষ্মীদির। কত আশা লক্ষ্মীদির। কেমন ছোট সংসারটি গড়ে তুলেছে। এখন এই মুহূর্তে যেন ক্ষমা করতে ইচ্ছে হলো লক্ষ্মীদিকে। লক্ষ্মীদির যেন কোনও দোষ নেই। কী চমৎকার সংসার। কী চমৎকার গৃহস্থালী! ছেলের চিঠি এসেছে, ছেলে পাশ করেছে, শম্ভুর শরীর ভাল হয়েছে, শম্ভু আবার ব্যবসা আরম্ভ করবে, আবার দাঁড়িয়ে উঠবে! কত আনন্দ মায়ের, কত আশা স্ত্রীর।

শেষকালে লক্ষ্মীদি বললে—তা হলে আমি কী করবো বল্?

দীপঙ্কর বললে—আমি তো বলে-বলেও শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে পারলুম না, আমি বলেছিলুম বলে আমার ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল, তাই তো তোমার কাছে এলুম—

—কিন্তু শ্বশুরবাড়ি যদি না-যায় তো কোথায় যাবে সে?

দীপঙ্কর বললে—বলছে দু'চার দিন আমার বাড়িতে থাকবে, তারপর একটা ব্যবস্থা করে নেব—আর বাবাকে চিঠি লিখে উত্তর আনতেও তো অনেকদিন। সে-কদিন কোথায় থাকবে?

—কেন, শ্বশুরবাড়িতে যাবে না কেন? বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়িতে পড়ে থাকবে চিরকাল?

দীপঙ্কর বললে—বলছে সেখানে প্রাণ গেলেও যাবে না আর—

লক্ষ্মীদি বললে—তাই নাকি? মেয়েমানুষের আবার কষ্ট কী শুনি? এইটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারছে না সতী? শাশুড়ী তো চিরকাল থাকবে না কারো?

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবুর কাছেও থাকবে না—

লক্ষ্মীদি বললে—শেষকালে এত লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হলো সতীর? ঘরে-ঘরে কার না কষ্ট আছে? সকলেরই কষ্ট থাকে, দুঃখ থাকে—তা বলে কে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসে! আমি কষ্ট করি নি? আমি কষ্ট করছি না?

দীপঙ্কর বললে—সে আমি জানি না! কিন্তু আমার বাড়িতে এখন মা নেই, এই সময় যদি আমার কাছে থাকে তো অনেক রকম কথা উঠবে! তার চেয়ে আমি বলি কি তোমার এখানে বরং ক'দিন নিয়ে এসে রাখো—

—আমার এখানে? বলছিস কী তুই?

দীপঙ্কর বললে—যতদিন তোমার বাবা না এসে পৌঁছান, ততদিন অন্তত রাখতে পারো তো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার এখানে সতী থাকবে? এখানে কি কোনও ভদ্রলোকের মেয়ে থাকতে পারে? রাত্রে কি থাকবার মত জায়গা এটা? তুই সব জেনেও এই কথা বলছিস্?

তারপর একটু থেমে বললে—তা ছাড়া, আমার যা হয় হোক, কিন্তু সতী! সে যে গেরস্থ ঘরের বউ, তার একটা সম্মান নেই, মর্যাদা নেই?

—কিন্তু তা হলে কী করবো?

দীপঙ্কর আবার বললে—সে আর কোনও থাকবার জায়গা নেই বলেই আমার কাছে এসেছে। তোমার কথা এখনও বলিনি তাকে—!

লক্ষ্মীদি যেন চিন্তিত হয়ে পড়লো সত্যি সত্যিই!

দীপঙ্কর বললে—আমার বাড়িতেই তাহলে থাকবে সে?

লক্ষ্মীদি বললে—সে কি রে, তোর বাড়িতে থাকবে কী রে! তোর মা নেই এখন বাড়িতে। আর তা ছাড়া তোর বিয়ে হয়নি। সে আর তুই কখনও এক বাড়িতে থাকা উচিত? বিশেষ করে রাত্তির বেলা?

দীপঙ্কর বললে—আমিও তো তাই বলছি—

লক্ষ্মীদি বললে—তাতে যে তার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকা চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে—

—তা হলে?

লক্ষ্মীদি অনেক ভেবে বললে—যতদিন বাবা এসে না-পৌঁছোয় ততদিন শ্বশুরবাড়িতেই থাকুক—শ্বশুরবাড়ি ছাড়া মেয়েমানুষের অন্য কোথাও থাকা উচিত নয়।

দীপঙ্কর বললে—আমি তো সে-কথা বলেছি—

লক্ষ্মীদি বললে—আবার সেই কথাই তুই গিয়ে বল্‌গে যা—

—কিন্তু সতী কিছুতেই যাবে না। তুমি যদি গিয়ে বলো তো হতে পারে—

—আমি?

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে দীপঙ্করের মুখের দিকে চাইলে। বললে—আমি? আমি গিয়ে বলবো তাকে? আমার কথা সে শুনবে কেন? আমার কথা সে জীবনে কখনও শোনে নি, আর আজ শুনবে? সে বরং তোর কথা শুনলেও শুনতে পারে!

—আমার কথা?

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, আমি জানি, তোকে সে বরাবর পছন্দ করতো—তোকে তার বরাবর ভালো লাগতো।

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদির কথা শুনে! লক্ষ্মীদি বলছে কী!

লক্ষ্মীদি বললে—হ্যাঁ, সে আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি—তোকে সে সত্যিই ভালবাসতো বরাবর—

কথাটা শুনে দীপঙ্করের মাথাটা হঠাৎ নিচু হয়ে গেল।

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু তা বলে তো এখন আর তোর বাড়িতে থাকা যায় না। এখন তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে—তুই একটু দাঁড়া, আমিই যাচ্ছি তোর সঙ্গে, আমিই গিয়ে বুঝিয়ে বলছি তাকে—

তারপর লক্ষ্মীদি তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে এল। মাথায় ঘোমটা দিলে। চাকরকে বললে—কেশব, তুই দেখিস্ বাবুকে, আমি আসছি এখুনি—আমার বেশি দেরি হবে না, ভাতটা হলে নামিয়ে রাখিস—

তারপর নিজের ঘরটায় তালা লাগিয়ে দিলে।

গায়ের ওপর চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে বললে—চল্—তাড়াতাড়ি চল্—

তখনও দীপঙ্কর মনে-প্রাণে পরিণত হয়নি। অনেক দেখার পরেও অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল তার। মানুষকে সহজ করে পেতে গিয়ে নিজেই জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সুখ-দুঃখকে শুধু সুখ-দুঃখ বলেই জেনেছিল। সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়েই সুখ-দুঃখাতীতকে পাবার কথা তার মনে হয়নি। আর সে-যুগটাও তখন ভারি জটিল হয়ে উঠেছিল আপাত-আনন্দের জঞ্জালে।

মধুসূদনের রোয়াকে তখন হয়ত আবার আড্ডা বসতো। আবার হয়ত দুনীকাকা খবরের কাগজ নিয়ে আড্ডা জমাতো আগেকার মত। কিন্তু সে-সব দেখবার সময় হয়নি তখন দীপঙ্করের। কিন্তু দেখা যেত অন্যত্র। যে-লোকটা খবরের কাগজ দিয়ে যেত, সে একদিন কাগজ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বললে—বাবুজী—

অন্য দিন কাগজটা ভেতরে ফেলে দিয়েই চলে যায়। সেদিন তাকে দাঁড়াতে দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। বললে—কেয়া?

লোকটা বললে—লড়াই শুরু হোগা কেয়া, বাবুজী?

দীপঙ্কর বললে—কেন, কে বললে তোমাকে?

লোকটা বললে—সবাই তো বাত-চিত্ করে বাবুজী—কহতা হ্যায় কি লড়াই জবর হোগা—

আশ্চর্য! লোকটা নিজেই খবরের কাগজ ফিরি করে। অথচ সে-ই খবর রাখে না কিছুর। লড়াই হলে যে কী হবে, সে-ধারণা নেই। কিন্তু শুনেছে লড়াই হবে। কাশীও একদিন জিজ্ঞেস করেছিল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—তোকে কে বললে?

কাশী বলেছিল—বাজারের আলুওয়ালাটা বলছিল—বলছিল আলুর দর চড়বে, লড়াই হলে—

বাড়িতে সেদিন এসে সদর দরজার কড়া নাড়তেই কাশী দরজা খুলে দিলে। কিন্তু কিছু বলবার আগেই পাশে লক্ষ্মীদিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না। কাশী এতদিন এ-বাড়িতে আছে, এমন ঘন-ঘন অচেনা মেয়েমানুষের আসা দেখেনি।

দীপঙ্কর বললে—দিদিমণি ওপরে কী করছে রে?

কাশী বললে—আপনি চলে যাবার পরেই দিদিমণি রান্নাঘরে এসেছিল। এসে জিজ্ঞেস করছিল—কী রাঁধছি—

দীপঙ্কর চলে যাবার পরই সতী ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেছিল। সতী নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেছিল। রান্নাঘরে এসেছিল। রান্না দেখেছিল। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার নাম কী?

কাশী বলেছিল—কাশী—

—কতদিন চাকরি করছো তুমি?

কাশী বলেছিল—সে কি আজকের কথা দিদিমণি, অনেকদিন ধরে, সেই ছোটবেলা থেকে—

তারপর একটু থেমে সতী নাকি জিজ্ঞেস করেছিল—আলনায় শাড়ি ঝুলছে, ওটা কার?

—শাড়ি? মা'র ঘরে? ও তো দিদিমণির?

—দিদিমণি কে?

কাশী বলেছিল—সন্তোষকাকাবাবুর মেয়ে, তোমরা সবাই কাশী গেছেন—

—[illegible]?

কাশী বলেছিল—আজ্ঞে, তা জানিনে। দিদিমণির সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ে হবে কিনা! বিয়ের পরও কাকাবাবু এখানে থাকবে—

—বিয়ে হবে?

কথাটা শুনে সেদিন খুব রাগ হয়েছিল দীপঙ্করের। সব ব্যাপারে কেন কথা বলে কাশীটা! হয়ত লক্ষ্মীদির সামনেই সেদিন ধমকে দিত দীপঙ্কর। বাড়ির ভেতরকার এত কথা সতীকে বলবার দরকার কী ছিল! সে তো বাইরের লোক। বললেই হোত—জানি না—

দীপঙ্কর বললে—এত কথা তুই বলতে গেলি কেন? কে তোকে এত সর্দারি করতে বলেছে?

কাশী কিন্তু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল!

—তোকে কতবার না বলেছি, তুই চাকর, চাকরের মত থাকবি! সব কথায় কেন এত কথা বলিস তুই? কাজ করবি মাইনে নিবি আর চুপ করে থাকবি বুঝলি?

বহুদিন পরে এ-ঘটনার কথা মনে হলেই দীপঙ্করের নিজের অনুশোচনা হয়েছে। কাশীর সেই অপরাধীর মত চেয়ে থাকা, কাশীর সেই অপরাধের গুরুত্ব না-বোঝা, তা যেন বহুদিন তার চোখে ভেসেছে। তারপর সেই কাশীই একদিন সব বুঝলো, একদিন চিনতে পারলো সতীকে, চিনতে পারলো লক্ষ্মীদিকে, চিনতে পারলো দীপঙ্করকেও। কাশীও দিন-দিন চালাক-চতুর হয়ে উঠলো। দীপঙ্কর যখন চুপ করে একলা জানলার ধারে বসে বসে ভাবতো, কিম্বা ছাদের

কড়িকাঠের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকতো, তখন কাশীও কাছে আসতো না। সেই সব দিনগুলো—যখন লোভ-মোহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে দীপঙ্করের জীবন জটিল হয়ে উঠেছে, যখন প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে উঠেছে দীপঙ্করের আত্মা—যখন সতীই একদিন তাকে প্রতারিত করেছে, তখন কাশীই একলা সব লক্ষ্য করেছে। কাশীই কেবল সে-সব দিনের মূক সাক্ষী হয়ে আছে। যখন মা-ও নেই সংসারে, যখন কেউই নেই দীপঙ্করের, তখনও কাশী ছিল। আর কাশী ছিল বলেই তো দীপঙ্কর সেদিন সতীর সেই অপমান সহ্য করতে পেরেছিল।

সতী বলেছিল—দীপু, তুমি পশু, তুমি জানোয়ার—তুমি ইতর, তুমি ছোটলোক—

আরো কত কী জঘন্য অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছিল সতী। তখন দীপঙ্কর যে কেমন করে মুখ নিচু করে সে-সব সহ্য করেছে, কাশী তা সমস্ত জানতো। কাশীই বুঝতো সব, একমাত্র কাশীই জানতো সব। আর কেউ নয়।

কিন্তু সে তো মা মারা যাবার পর। সে-সব কথা এখন থাক।

সতী বোধ হয় তখন ঘরের মধ্যে ছটফট করছে। দীপু কোথায় গেল ভাবছে। দীপু হয়ত প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গেছে। হয়ত সেখানে গিয়ে খবর দেবে। হয়ত সেখানে গিয়ে বলে দেবে সমস্ত ঘটনা। ভোর তখনও ভালো করে হয়নি। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের শিরীষ ঘোষের বংশের কুললক্ষ্মী বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এসে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলে বাইরের দিকে। কালো অন্ধকার চারদিকে। ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুললে। বারান্দায় একটা বাতি সারারাত টিম্ টিম্ করে জ্বলে। সতী সেদিন সে বাতিটা আস্তে আস্তে নিভিয়ে দিয়েছিল।

—কে?

সতীর নিজেরই আত্মা যেন হঠাৎ চমকে উঠে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল—কে?

পামারস্টোন সাহেবের দেওয়া সোনা-জহরৎ-টাকা-পয়সা-জমিদারী সমস্ত কিছু সেই প্রশ্নে হঠাৎ একসঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—আমি!

—আমি কে?

সতী আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন। নিচের বাগানে তখন ঝিম্-ঝিম্ অন্ধকার। কোথাও কেউ নেই। এ-বাড়ির সমস্ত প্রহরী তখন ঘুমে অচেতন। পামারস্টোন সাহেব কবে কলকাতা ছেড়ে কোথায় কোন্ বার্মিংহামে কিম্বা ডার্বি-শায়ারে চলে গেছেন। শিরীষ ঘোষও চলে গেছেন। যাঁরা জেগে থাকলে কাজ হতো তাঁরা কেউ নেই। শুধু আছে সিন্দুক, বাড়ি, বাগান, টাকা, বংশ। যা সঙ্গে নিয়ে যাবার নয়। সতী আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামলো। সতীর শাশুড়ী একবার ঘুমের ঘোরে কী যেন একটা শব্দ

শুনে অন্য দিকে পাশ ফিরলেন। পাশের খাটেই সনাতনবাবু ঘুমোচ্ছিলেন। অনেক রাত্রে ফিরেছেন তিনি। ডাকলেন—সোনা—

সনাতনবাবুর সজাগ ঘুম। বললেন—কী মা—?

মা বললেন—বারান্দার আলোটা বুঝি জ্বালতে ভুলে গেছে কৈলাস?

সনাতনবাবু বললেন—কৈলাসকে ডাকবো?

—না থাক। একদিন আলো না থাকলে এমন কিছু ক্ষতি নেই। বললেন—কিছু ভয় নেই, তুমি ঘুমোও বাবা—

নিচেয় চাকরদের ঘরে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ছিল শম্ভু। আর তারপরেই কৈলাস। তারপর ঠাকুররা। ভাঁড়ার ঘরের পাশে বাতাসীর মা আঁচল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল আর মশা তাড়াচ্ছিল।

পাশেই ভূতির মা শুয়ে। বললে—রাত পুইয়ে এল নাকি গা বাতাসীর মা?

বাতাসীর মা বললে—তুই থাম তো বাছা, তোর বকুনির ঠেলায় ঘুমোবার যো আছে—

সতী তখন একেবারে বাগানের সিঁড়িতে। দারোয়ানের ঘরের বাইরে খাটিয়ায় শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে দারোয়ান। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বেরিয়েছে সতী। শুধু মুখটা খোলা। খাটিয়ার ওপর গেটের চাবিটা পড়ে আছে শেকল-বাঁধা। চাবিটা নিঃশব্দে নিতে গিয়েই একটা বাধা পড়লো।

—কে?

সতীর মনে হলো তার নিজেরই আত্মা যেন হঠাৎ চমকে উঠে নিজেকেই প্রশ্ন করলে—কে?

পামারস্টোন সাহেবের দেওয়া সোনা-জহরৎ-টাকা-পয়সা-জমিদারী সমস্ত কিছু সেই প্রশ্নে হঠাৎ এক সঙ্গে উত্তর দিলে—আমি—

সতী তাড়াতাড়ি লোহার গেটটা নিঃশব্দে খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

—আমি কে?

সতী সে প্রশ্নের জবাব দিলে না। সে প্রশ্নের জবাব খুঁজেও পেলো না। বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই শিরীষ ঘোষের প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্মী জোড়-বাড়ি থেকে রাস্তার ধুলোয় এসে দাঁড়াল।

লক্ষ্মীদি জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

সতী এতদিন পরে লক্ষ্মীদিকে পেয়ে প্রথমে অনেকই যেন ফিরে এলো—বললে—তারপর এখানে চলে এলাম, আর কী—

লক্ষ্মীদি বললে—তা তুই কি ভুল করেছিস, এখানে থাকলে তোর মান-মর্যাদা বাড়তো?

সতী বললে—দূরে থেকে ওসব কথা সবাই বলতে পারে, সংসার করলে

তোমরা বুঝতে পারবে। আমি ছেলেমানুষ নই, আমিও বুঝি, আমাকে তুমি মান-মর্যাদার কথা শুনিও না—

লক্ষ্মীদি বললে—এতই যদি বুঝিস তো মুখ পোড়ালি কেন এমন করে?

সতী বললে—কার মুখ পুড়িয়েছি আমি শুনি?

—তোর নিজের, আবার কার?

প্রথমে বেশ সহজ করেই কথা বলতে চেয়েছিল সতী। কিন্তু ব্যাপারটা যেন অন্যরকম রূপ নিলে। এতদিন পরে দুই বোনে দেখা। দীপঙ্কর ভেবেছিল সতী এখনো দিদির কথা শুনবে। দুই বোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর চুপ করে দুজনের কথা শুনতে লাগলো।

সতী তখন সত্যিই রেগে গিয়েছে। বললে—লজ্জা করে না তোমার? তুমি আজ এসেছ মান-মর্যাদার কথা শেখাতে?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি না তোর বড়? তোর বড় বোন?

সতী বললে—বড় বোনের মর্যাদা তুমি খুব রেখেছ বটে! তোমার জন্যেই তো আমার এই দুর্দশা—। তুমি যদি আমাদের বংশের মুখ না পোড়াতে তো আমার কপালে এমন হতো? তুমিই তো সব সর্বনাশের মূল!

লক্ষ্মীদির দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। যেন মায়া হতে লাগলো লক্ষ্মীদিকে দেখে।

দীপঙ্কর সামনে এগিয়ে গেল। বললে—ওসব কথা থাক সতী, এখন আর ও নিয়ে চেঁচিয়ে লাভ কী?

সতী বললে—তুমি থামো দীপু, কেন বলবো না? আমার শাশুড়ী তো সেই নিয়েই দিনরাত খোঁটা দেয়! তা অন্যায় তো বলে না। আমি কারোর কাছে মুখ দেখাতে পারি না ওই জন্যে! শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম কারোর কাছে আমার মুখ দেখাবার পর্যন্ত উপায় নেই। আর আজ ও এসেছে আমাকে মর্যাদা শেখাতে।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তো জানি আমার বলবার মুখ নেই—সেই জন্যেই তো আমি আসছিলুম না, দীপু বললে বলেই তো এলুম—

দীপঙ্কর লক্ষ্মীদিকে বললে—তুমি কিছু মনে কোর না লক্ষ্মীদি, ছেলেমানুষের কথায় কান দিও না তুমি—

সতী বললে—হ্যাঁ ছেলেমানুষই বটে, ছেলেমানুষ বলেই নিজের শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, ছেলেমানুষ বলেই অমন স্বামীর কাছ থেকে চলে এসেছি—

দীপঙ্কর বললে—তা ছেলেমানুষ হও আর না-হও, তুমি ছেলেমানুষের মত কাজ করেছ, এ সবাই বলবে—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি নিজে মন্দ কাজ করেছি বলে কি ভাল কথা বলবার ক্ষমতাও আমার নেই রে?

দীপঙ্কর বললে—ওসব কথা থাক না এখন লক্ষ্মীদি—

সতী বললে—কেন, থাকবে কেন? কিসের জন্যে থাকবে? আজ যখন সর্বনাশ করা হয়ে গেছে, তখন এসেছে দিদির মত উপদেশ দিতে। তখন এসেছে মায়া-কান্না কাঁদতে! গোড়া কেটে এখন আগায় জল দিতে এসেছে—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তো স্বীকার করছি আমি ভুল করেছি, আমি দোষ করেছি, আমি পাপ করেছি, তা তার জন্যে কী শাস্তি আমাকে দিবি দে না! আমি তো মাথা নিচু করেই আছি রে—আমি বাবার মুখে চুন-কালি লেপে দিয়েছি, তোর কপাল ভেঙেছি, নিজের স্বামীকে পর্যন্ত সুখী করতে পারিনি, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারিনি—আর নিজের সুখের কথা তো ভাবিই না—। তা কী শাস্তি তুই দিবি আমাকে দে না, আমি সব শাস্তি মাথা পেতে নেব—

সতী বললে—তুমি আর ন্যাকামি কোর না লক্ষ্মীদি, তোমার ন্যাকামি শুনলে আমার গা জ্বালা করে—

দীপঙ্কর সতীকে বললে—কেন তুমি অমন করে বলছো সতী? তোমার মায়া-দয়া নেই একটু?

সতী বললে—মায়া-দয়া? আমি যখন দিনের পর দিন কেঁদে রাত কাটিয়েছি, দিনের পর দিন শাশুড়ীর মুখ-ঝামটা খেয়েছি, আমি যখন আমার মরা-ছেলেকে বুকে করে হাহাকার করেছি তখন তো কেউ মায়া-দয়া করেনি আমাকে!

দীপঙ্কর হঠাৎ দেখলে লক্ষ্মীদি শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছছে।

মুখটা তুলে হঠাৎ লক্ষ্মীদি দীপঙ্করকে বললে—আমি যাই দীপু, আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারছি না—

দীপঙ্করও কী বলবে বুঝতে পারলে না।

সতী বললে—হ্যাঁ তুমি যাও, আর কখনও ও-মুখ দেখাতে এসো না—

লক্ষ্মীদি হয়ত চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু দীপঙ্কর সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে—না তুমি যেও না লক্ষ্মীদি, সতীর এখন মাথার ঠিক নেই, ও কী বলছে বুঝতে পারছে না, নিজের ভালো-মন্দ বোঝবার ক্ষমতাও নেই ওর—তুমি ওর কথায় রাগ কোর না—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই তো বলছিস দীপু, কিন্তু এখন তো আর ও ছোট নেই, এখন তো ওর বয়েস হয়েছে, আর আমারও বয়েস হয়েছে, তোরও বয়েস হয়েছে—এখন অবুঝের মত কথা বলা আমাদের সাজে, না অবুঝের মত কথা বলবার সময়ই আছে!

দীপঙ্কর বললে—না, তবু ওর ওপর রাগ করতে পারবে না—ওকে তুমি বুঝিয়ে বলো একটু—

লক্ষ্মীদি বুঝতে পারলে না। বললে—কী বুঝিয়ে বলবো?

দীপঙ্কর বললে—বুঝিয়ে বলে ওকে ওর শ্বশুরবাড়িতে পাঠাও, সেখানে ছাড়া আর কোথাও থাকা সতীর পক্ষে মঙ্গল নয়, এইটে তুমি বুঝিয়ে দাও—স্বামীর সংসারে অত্যাচার হলেও তবু সে স্বামীরই সংসার, শাশুড়ী বকাবকি করলে তবু তো তিনি ওরই শাশুড়ী! আর তা ছাড়া সতী থাকবেই বা কোথায়? সেইটেও তো ভাবতে হবে—

সতী বললে—কেন, আমি এখানে থাকবো—

—এখানে? এখানে কী করে থাকবে তুমি?

দীপঙ্কর সতীর দিকে চেয়ে বললে—এখানে কি আমার মা আছে? মা থাকলে তো আমি কিছু বলতুম না তোমাকে—

লক্ষ্মীদি জ্বলে উঠলো—পোড়ারমুখী, দীপুর সঙ্গে কি এক-বাড়িতে তোর থাকা উচিত না থাকা মানায়!

সতী বললে—কেন, কী হয়েছে তাতে?

—তুই আবার জিজ্ঞেস করছিস কী হয়েছে! দীপু তোর মায়ের পেটের ভাই না আত্মীয়, কে? আর তোর শ্বশুরবাড়িতে যদি পরে কথা ওঠে তো তখন তুই কী জবাবদিহি দিবি? জানতে পারলে তোকে তারা আর ঘরে নেবে?

সতী বললে—কিন্তু তারা নিতে চাইলেও কি আমি সেখানে আর যাবো ভেবেছ?

লক্ষ্মীদি বললে—না গিয়ে কী করবি শুনি? আমার মত সকলের মুখ পোড়াবি?

বলতে বলতে লক্ষ্মীদি যেন ভয়ানক হাঁফাতে লাগলো। বলতে লাগলো—আমাকে দেখছিস না তুই? চোখের সামনে আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না তুই? আমাকে দেখেও তোর শিক্ষা হয় না? তুই কী বল্ তো সতী? তুই কী?

সতী এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার কথা বললে। বললে—তোমার সঙ্গে আমার তুলনা কোর না লক্ষ্মীদি—! আমি তোমার মত নই, আমার আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে—। আমি বুঝি কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়—

লক্ষ্মীদি বললে—স্বীকার করছি না-হয় তোর আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, তোর ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে, কিন্তু বড়বোনের কথাটা না-হয় শুনলিই একবার! আমি অনেক ঠকেছি রে, অনেক ভুগেই, তাই তোকে বলা! ভগবান না-করুন তোকে যেন আমার মতন কখনও ভুগতে না হয় জীবনে, সংসারে কেউ শত্রুও যেন আমার মত এমন করে না ভোগে—। তুই ছোট, তুই এখনও সংসারের কিছু বুঝিস না, স্বামী শাশুড়ীর আওতায় আছিস, ঝড়-ঝাপটা কিছুই তোকে মাথা পেতে নিতে হচ্ছে না! কিন্তু আমি জানি রে, কাকে বলে পৃথিবী, কাকে বলে সংসার! এমন কতদিন গেছে আমার যেদিন একটা পয়সা নেই হাতে, একটা চাল পর্যন্ত নেই যে ফুটিয়ে খাবো, এমন এক-একদিন গেছে যখন রাত্তিরে একলা কেঁদে-কেঁদে ভাসিয়েছি। সে-কান্না শোনবার মত কেউ ছিল না কাছে—সে-সব

দিনের কথা ভাবলে এখনও বুকটা শিউরে ওঠে রে! আমার পরম শত্রুও যেন তেমন করে কষ্ট না-পায়—

তারপর বলতে বলতে সতীর হাত দুটো হঠাৎ ধরে ফেললে। বললে—আমার কথাটা রাখ ভাই, আমি যে-ভুল করেছি, তুই যেন সেই ভুল করিসনি আর! শাশুড়ীরা অমন বলেই থাকে, শাশুড়ী কারো চিরদিন থাকে না। তারপর একদিন তোদের আবার ছেলে-মেয়ে হবে, সংসার ভরে যাবে, তখন বলবি দিদি একদিন ঠিক কথাই বলেছিল! তোকে সুখী দেখলে তবু আমি বাঁচবো রে! আমি জীবনে সুখ পেলুম না, কিন্তু তুই তো সুখী হবি তাতেও যে আনন্দ আমার—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সতী যেন কেমন হয়ে গেল। লক্ষ্মীদির বুকের ওপর মুখ লুকোল।

সেদিন দুই বোনের সেই ছবি আজো দীপঙ্করের মনে যেন আঁকা রয়েছে। এখনও চোখ বুজলে যেন সেই দুজনের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে চোখে ভাসে।

খানিক পরে কাশী খেতে ডাকতে এসেছিল। আপিস যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল তখন। তাড়াতাড়ি একতলা থেকে নিয়ে ওপরে এসে দেখেছিল দুই বোনে তখনও জড়াজড়ি করে আছে। তখনও লক্ষ্মীদির বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে কাঁদছে সতী।

আপিস যাবার জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে দীপঙ্কর ঘরে ঢুকে বলেছিল—আমি তাহলে আসি লক্ষ্মীদি, আমার আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু আমিও তো আর বেশিক্ষণ দেরি করতে পারবো না দীপু—ওদিকে যে সে-মানুষকে না-খাইয়ে রেখে এসেছি। আমার সংসারেও তো আমি একলা—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমি ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিও—একটা ট্যাক্সি করে একেবারে দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে এসো—

তারপর পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে বললে—আর এই টাকাটাও রেখে দাও, পরে সব কথা বলবো—সতী যেন ভাত খেয়ে যায় এখান থেকে, না খাইয়ে পাঠিও না—

খাবার সময় নিচে গিয়ে কাশীকে ডাকলে, কাশী কাছে এল। দীপঙ্কর বললে—ভালো করে খেতে দিস্ বুঝলি—পেট ভরে খেতে দিস, 'না' বললেও শুনিস নি

তারপর ঘড়িটার দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠলো। এত দেরি হয়ে গিয়েছে! রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো। কাল তো মা'র চিঠি আসবার কথা। আজ হয়ত স্টেশনে নেমেই মা চিঠি ছাড়বে। পৌঁছনোর খবরটা দিয়েই চিঠি লিখবে। নিরাপদে পৌঁছনোর খবরটাই পাওয়া দরকার।

কাশী দরজা বন্ধ করে দিতে এসেছিল।

হঠাৎ দীপঙ্কর পেছন ফিরলো। বললে—কাশী, দাঁড়া একটা জিনিস ভুলে গেছি—

বলে আবার দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। লক্ষ্মীদির কোলে তখনও মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে সতী! লক্ষ্মীদি বললে—কী হলো, আবার ফিরে এলি যে?

দীপঙ্কর বললে—তোমার বাবাকে তো চিঠি লেখা হলো না! একটা চিঠি লিখে দিলে আমি আপিস যাবার পথে ফেলে দিতে পারতাম—

লক্ষ্মীদি বললে—দাও, কাগজ আর খাম দাও একটা তোমার—

দীপঙ্কর চিঠি লেখবার প্যাড, কলম আর খাম এগিয়ে দিলে। লক্ষ্মীদি সতীকে কোল থেকে সরিয়ে বললে—দে ভাই, বাবাকে একটা চিঠি লিখে দে—আমার কথা কিছু লিখিস নি যেন, তোর কষ্টের কথাই লেখ। লিখে দে তিনি যেন চিঠি পেয়েই চলে আসেন। বেশি আর কিছু লিখতে হবে না। বেশি কথা লিখলে আবার তিনি ভাববেন মিছিমিছি—

সতী প্যাডটা নিয়ে লিখতে লাগলো। তারপর চিঠিটা খামের মধ্যে পুরে এঁটে দিলে।

লক্ষ্মীদি বললে—লিখেছিস তো যে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে, এখুনি এসে তোকে নিয়ে যেতে?

সতী বললে—হ্যাঁ—

লক্ষ্মীদি বললে—সেই ভালো, এ ক'দিন একটু কষ্ট করে থাকো। তারপর বাবা এলে তো আর ভাবনা নেই তখন! এইটুকুতেই এত মুষড়ে পড়লে চলে ভাই! তাহলে আমার মত অবস্থায় পড়লে তুই কী করতিস্ বল্ দিকিনি!

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললে—তুই যা দীপু, তোর আপিসের আবার দেরি হয়ে গেল হয়ত—আমি ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবো—

আর দাঁড়ায়নি সেখানে দীপঙ্কর। চিঠিটা নিয়েই সেদিন আপিসে চলে গিয়েছিল সোজা!

সেইদিনই আপিসে রবিন্‌সন্ সাহেবের ফেয়ারওয়েল। দীপঙ্কর নিজেও দিয়েছিল চাঁদা। মিস্টার ঘোষালই উদ্যোক্তা! মিস্টার ঘোষাল ট্র্যাফিক অফিসের প্রত্যেক সেকশানের সুপারভাইজারদের ডেকে ডেকে চাঁদা আদায় করেছে। কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু সেকশন্ থেকে ক'দিন ধরে চাঁদা চেয়ে চেয়ে সব মিস্টার ঘোষালের হাতে এনে তুলে দিয়েছে। ইউরোপীয়ান ইনস্টিটিউটে মীটিং হবে। খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এজেন্ট নিজে থাকবে। ক্রফোর্ড সাহেব থাকবে। মিস্টার ঘোষাল থাকবে। ডিপার্টমেন্টের বড় বড় অফিসাররা সবাই থাকবে। সাহেবদের জন্যে এক-রকম খাবার—ক্লার্কদের জন্যে এক-রকম।

আপিসের কাজের সমস্ত চাপ এসে পড়েছে দীপঙ্করের ঘাড়ে। রবিন্‌সন্ সাহেব আসছে না ক'দিন ধরে। সেই কাজ এসে জমেছে মিস্টার ঘোষালের টেবিলে। মিস্টার ঘোষালও ফেয়ারওয়েল নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং তার কাজও এসে জমেছে দীপঙ্করের টেবিলে।

ঘরে ঢুকতেই মধু সেলাম করলে। বললে—হুজুর, ঘোষাল সাহেব খোঁজ করে গেছেন দু'বার—

—কেন? কিছু বলেছে?

মধু বললে—না—

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছে আপিসে আসতে। একেবারে বাড়ির কাছ থেকে সোজা ট্যাক্সিতে আসতে হয়েছে। গাঙ্গুলীবাবু অনেকদিন ধরে বলছে—এইবার একটা গাড়ি কিনুন সেনবাবু—আর মানায় না আপনাকে—

দীপঙ্কর বলেছে—কী হবে গাড়ি কিনে গাঙ্গুলীবাবু, গরীবের ছেলে আমি, অত বিলাসিতা সহ্য হবে না—

—কিন্তু আপনার তো টাকা লাগছে না। আপিস থেকেই তো আপনাকে ছ'হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেবে! এতেও যদি না কেনেন তো লোকে আপনাকে কৃপণ বলবে। এমনিতেই লোকে বলে আপনি টাকা জমাচ্ছেন! আর তাছাড়া এবার আপনার প্রমোশন হচ্ছে, এখন গাড়ি না কিনলে খারাপ দেখাবে সত্যি!

দীপঙ্কর গাঙ্গুলীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে! বড় মায়া হলো গাঙ্গুলীবাবুকে দেখে। দীপঙ্করের চাকরিটা গাঙ্গুলীবাবুর হলে গাঙ্গুলীবাবু হয়ত সত্যিই সুখী হতো।

—আচ্ছা গাঙ্গুলীবাবু, আপনার স্ত্রী এখন আর আপনার মাইনে বাড়ার কথা বলেন না?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—মুখে বলে না, কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারি, খুব কষ্ট হয়! অনেকদিন ধরে বলছে কাশ্মীর বেড়াতে যাবে, আমার শালীরা গিয়েছিল কি না—!

দীপঙ্কর বললে—তা যান না একবার, রেলের চাকরি করছেন, একবার ঘুরে আসুন—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কী যে বলেন আপনি, প্রতি মাসে কত সুদ দিতে হয় জানেন, সুদ দিতে দিতেই সব টাকা ফুরিয়ে যায়, তখন আবার টাকা ধার করি—এখন অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে।

দীপঙ্কর বললে—একটু টেনে টেনে চললেই হয়—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—তা চলবে না, কবিরাজ বলেছে তাহলে আবার পাগল হয়ে যাবে মশাই, আসলে তো আপিস থেকে মাইনে পাই পঁচাশি টাকা, বাড়িতে স্ত্রীকে বলেছি একশো দশ আমার মাইনে—!

বলে কী রকম ম্লান একরকম হাসি হাসতে লাগলো গাঙ্গুলীবাবু। নিরুপায়

নিঃসম্বলের হাসি।

দীপঙ্কর একদিন বলেছিল—দরকার হলে আমার কাছে আপনি টাকা নেবেন গাঙ্গুলীবাবু, আমি একদিন একসঙ্গে আপনার সঙ্গে চাকরি করেছি, সেই অধিকারেই নেবেন—

গাঙ্গুলীবাবু কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জিত হতো। বলতো—না, না সে প্রাণ গেলেও নেব না, তাহলে আপনার কাছে এই যখন তখন আসতে পারবো না—

—তাহলে কাশ্মীর যাবেন কী করে?

গাঙ্গুলীবাবু কথাটা শুনে হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে পড়তো। বলতো—তাও তো ভাবছি, অনেকদিন ঠেকিয়ে রেখেছি কিন্তু এবার আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না, কবিরাজ বলেছে যেমন করে পারেন ধর-খোর করে অন্তত নিয়ে যান বউকে, নইলে আবার মাথা-খারাপ হয়ে যাবে—

একদিন কে-জি-দাশবাবুকে ঘরে ডেকে এনেছিল দীপঙ্কর। জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, কে-জি-দাশবাবু, গাঙ্গুলীবাবু গ্রেড্ পাচ্ছেন না কেন?

কে-জি-দাশবাবু একবার একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। বলেছিল—স্যার, গাঙ্গুলীবাবুর চেয়েও সীনিয়র লোক রয়েছে, তাঁরাও কেউ গ্রেড্ পায়নি—

—কেন পায়নি!

—আমার সেকশানে গ্রেড্ যে নেই। সব গ্রেড্গুলো এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশান নিয়ে নিয়েছে।

—কী করে নিলে?

কে-জি-দাশবাবু বললে—আজ্ঞে, সেটা আমি আর কী বলবো, সবই তো এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশানের হাতে। তারা ইচ্ছে করলে হোয়াইটকে ব্ল্যাক করতে পারে। ওরা বুঝিয়েছে জার্নাল সেকশানটা সবচেয়ে আন্ইম্পরট্যাণ্ট সেকশান, সেইজন্যে আগে যে-দুটো গ্রেড্ ছিল তাও কেড়ে নিয়েছে—

দীপঙ্কর অনেক ভেবে জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, একটা কথা, গাঙ্গুলীবাবুকে ট্র্যাফিকে ট্রান্সফার করা যায় না?

কে-জি-দাশবাবু বলেছিল—ভেকেন্সি তো নেই ওখানে, যদি ভেকেন্সি থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করলে করতে পারেন—

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা আপনি যান,—গাঙ্গুলীবাবু সম্বন্ধে একটা ভালো নোট দিন আমাকে, তাতে লিখবেন যে গাঙ্গুলীবাবু খুব এফিশিয়েণ্ট লোক, তারপরে আমি দেখি কী করতে পারি—

বহুদিন পরে অনেক চেষ্টা করে দীপঙ্কর সেই গাঙ্গুলীবাবুকে গ্রেড পাইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু গাঙ্গুলীবাবু তখন সমস্ত গ্রেডের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। আজ দীপঙ্কর অনেক দূরে থেকে সেই দিনকার সব কথা ভাবতে গিয়ে সমস্ত ভাবনায় ভিড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আর শুধু কি গাঙ্গুলীবাবু? কে নয়? সমস্ত

আপিসটা ছিল যেন একটা চক্র। সেই চক্রের সঙ্গে এক সূত্রে যেন সবাই বাঁধা ছিল। সকলের সব ভবিষ্যৎ, সব বর্তমান সব অতীত যেন দীপঙ্করের চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। কারো উপকার করতে পারেনি সে। কারো ভালো করতে পারেনি। আইনের শেকল দিয়ে তার হাত-পা যেন বেঁধে দিয়েছিল তারা। অথচ ভেকেন্সি না-থাকলেও ট্রান্সফার হয়েছে, স্যাংশান না-থাকলেও গ্রেড্-প্রমোশান হয়েছে। কোন্ গোপন সূত্রের নিবিড় সম্পর্কে কার ভাগ্যের উত্থান হয়েছে, আর কার ভাগ্যের পতন হয়েছে তা এতবছর চাকরি করেও দীপঙ্কর জানতে পারেনি। আরো বহু বছর চাকরি করলেও জানতে পারতো না।

গাঙ্গুলীবাবু দুঃখ করেছে। বলেছে—আপনি আর কী করবেন সেনবাবু, আপনি তো আমার জন্যে সব রকম চেষ্টা করছেন—আমার কপালে নেই—

দীপঙ্কর তবু চেষ্টা করেছে। রবিন্সন্ সাহেবকে দিয়ে নোট দিইয়েছে। কিন্তু এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশান থেকে ফিরে এসেছে যেমন-কে-তেমন। নো-ভেকেন্সি। কিম্বা নো-গ্রেড্ য়্যাট্ প্রেজেণ্ট। কিছুই হয়নি শেষ পর্যন্ত।

সারা জীবনে অনেক কিছু করবার ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের। অনেক কিছু উন্নতি। শুধু স্টাফের নয়। ট্রেন কেন নিয়ম করে আসবে না? ট্রেন কেন নিয়ম করে পৌঁছোবে না! সকাল আটটার পরে হাওড়ায় এসে পৌঁছলেই তবে টি-এ পাওয়া যায়। ট্রেন এসে পৌঁছোচ্ছে সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে। অফিসারের টি-এ হবে না। সাড়ে আট টাকা লোকসান। তিনি হঠাৎ এলার্ম চেন টেনে দিলেন। কে তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে? কার এত সাহস আছে?

দীপঙ্কর ঘরে ঢুকেই মধুকে ডাকলে। বললে—দেখে আয় তো মিস্টার ঘোষাল ঘরে আছে কি না—

মিস মাইকেল এক-একদিন ঘরে ঢুকলে আর যেতে চায় না। রবিন্সন্ সাহের অফিসে না এলে মেমসাহেবের কোনও কাজও থাকে না হাতে।

বলে—মে আই কাম ইন সেন?

বয়েস হয়েছে মিস মাইকেলের। তবু সেই মিষ্টি হাসি। তবু সেই মিষ্টি লিপস্টিক। সেই মিষ্টি ফিগার। হাসতে হাসতেই ঘরে ঢোকে।

—আজকে তোমার এত দেরি মিস্টার সেন?

তারপর অনেক আজে-বাজে কথার পর বলে—তুমি শুনে গ্ল্যাড হবে সেন, আমি আমেরিকা যাচ্ছি—

—সে কি? কবে?

—ভিভিয়ান আমাকে চিঠি দিয়েছে মিস্টার সেন। এভরিথিং রেডি। আচ্ছা দেখ তো, আমাকে আরো বিউটিফুল দেখাচ্ছে না?

দীপঙ্কর ভাল করে নজর দিয়ে বলে—খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আজ! কেন বলো তো?

এই ধরনের কথা বললে মিস মাইকেল বড় খুশী হয়। সুন্দর দেখাচ্ছে

বললে মিস মাইকেলের যেন আর আনন্দ ধরে না। সুন্দর বললে মিস মাইকেল যেন তার সব কিছু উজাড় করে দিতে পারে।

মিস মাইকেল বললে—আমি অফিস থেকে লোন নিয়েছিলাম মিস্টার সেন, তিন হাজার টাকা, আমার চুল কার্ল করিয়েছি, এই দেখ আমার কসমেটিকস আনিয়েছি ফ্রান্স থেকে, আমি একজন গার্ল ম্যাসাজিস্ট রেখেছি, তাকে মাসে মাসে হাণ্ড্রেড চিপস দিই—আর কত করবো! আচ্ছা আমাকে কী-রকম সুন্দর দেখাচ্ছে?

দীপঙ্কর বললে—তোমার মত সুন্দরী আমি কখনও চোখে দেখিনি, কেবল ছবিতে দেখেছি—

মিস মাইকেল তাতেও যেন খুশী হয় না। জিজ্ঞেস করে—ক্লারা বো'র চাইতেও সুন্দরী?

দীপঙ্কর বললে—ক্লারা বো'কে তো আমি দেখিনি—

—আচ্ছা, তবে লিলিয়ান গিশ?

কারোরই নাম জানে না দীপঙ্কর। সিনেমাই দেখে না তা জানবে কী। আরো কত কী বলে গেল। আরো কত নাম করে গেল একে একে। তখন কলকাতা শহর সিনেমা-সিনেমায় ভর্তি হয়ে গেছে। গ্রেটা গার্বো, জেনেট গেইনর, আরো সব কত নাম। কাউকেই চেনে না দীপঙ্কর।

মিস মাইকেল বললে—ভিভিয়ানের চিঠিটা দেখবে তুমি? আমি এনেছি মিস্টার সেন—

বলে হাতের ব্যাগটা থেকে বার করলে। যেন কত দামী চিঠি। কত অমূল্য রত্ন। কত যত্ন করে রেখে দিয়েছে। কত দিনের স্বপ্ন মিস মাইকেলের। কত জীবনের সাধনা। ভিভিয়ান লে, তার রুম-মেট—সে তাকে ডেকেছে। ইণ্ডিয়ার রেলের আপিসে তাকে চাকরি করতে হবে না। সেখানেই তার স্বর্গ, সেখানেই তার সুখ। দীপঙ্কর মিস মাইকেলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বড় আনন্দ হ'ল। গাঙ্গুলীবাবু জীবনে সুখ পেলে না কিন্তু মিস মাইকেল তো পেয়েছে। সুখী লোকের মুখ দেখেও সুখ।

দীপঙ্কর বললে—সেখানে গিয়ে যেন আমাকে ভুলে যেও না তুমি মিস মাইকেল—

—না না বলছো কী? বড়লোক হয়ে কি সব ভুলে যাবো? জানো, ইউ আর দি ওনলি ইণ্ডিয়ান যাকে আমি ভালবাসি! তুমি আমার ঘরে গিয়েছিলে শুধু ও-পাড়ায় একদিনও যাওনি। অথচ মিস্টার ঘোষাল—

—মিস্টার ঘোষাল কি এখনও যায় তোমাদের পাড়ায়?

মিস মাইকেল বললে—রোজ রোজ, ডেলি যায়—আর আমাকেই এনটারটেন করতে হয়, আই ক্যানট রিফিউজ, হি ইজ এ বিস্ট—

অনেক কাজ সত্ত্বেও মিস মাইকেলের সঙ্গে কথা বলতে হয়। কথা না বললে

মিস মাইকেলের কষ্ট হবে। কারো কষ্ট দেখতে পারে না দীপঙ্কর। এমনি করে মিস মাইকেল সময় পেলেই আসে। আর গল্প করে যায়। দীপঙ্করকে বলতে হয় মিস মাইকেল সুন্দরী কি না। সুন্দরী হলে কার চেয়ে সুন্দরী। ক্লারা বো না লিলিয়ান গিশ না জেনেট গেইনর, না গ্রেটা গার্বো ঠিক কার চেয়ে সুন্দরী। কার মত তার চোখের ভ্রূ। কার মত তার ফিগার, কার মত তার লিপস, কার মত আরো অনেক কিছু। যেন শিশুর মত সরল। যেন মোমের মত নরম। মিস মাইকেলকে দেখতে দেখতে দীপঙ্করের বিন্তীদির কথা মনে পড়তো। এমন সরল শিশুর মত ছিল বিন্তীদিও। এমনি করেই জিজ্ঞেস করতো সে সুন্দরী কি না।

সেদিন মধু ফিরে আসবার আগেই মিস্টার ঘোষাল এসে ঘরে ঢুকলো। বাইরে থেকে জুতোর আওয়াজ পেয়েই বুঝেছিল মিস্টার ঘোষাল আসছে। পঞ্চাশ গজ দূরে থেকেও মিস্টার ঘোষালের জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়।

—ইউ আর লেট টো-ডে সেন?

চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে মিস্টার ঘোষাল চুরুট টানতে লাগলো। যেন কৈফিয়ৎ চাইবার মত গলার সুর।

দীপঙ্কর বললে—ইয়েস, আমি লেট্—

—না না সে-কথা বলছি না। রবিনসন্ সাহেব তোমাকে খুঁজছিল। হি ব্যাড্লি নীডেড্ ইউ।

দীপঙ্কর শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—কোথায়? কোথায় তিনি? অফিসে এসেছেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না না, এখানে আসেন নি, আমি গিয়েছিলুম বাংলোতে। রবিনসনের দোষ কী জানো, বড় গুড্‌নেচার্ড লোক ভেরি মাই-ডিয়ার—কবে আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, তাই এখনও বিশ্বাস করে বসে আছে আই য়্যাম্ এ সাউথ্ ইণ্ডিয়ান্—আমিও ভুল ভাঙাই না—

বলে চুরুটে টান্ দিলে। ধোঁয়া ছাড়লে।

তারপর বললে—আমাকে জিজ্ঞেস করছিল রবিনসন্, হোয়্যার ইজ্ সেন? এতদিন আমি বাড়িতে রয়েছি তুমি তো রোজ আসো ঘোষাল, সব্বাই আসে, সেন তো একবারও আসে না—। তোমার ওপর খুব রেগে আছে ওল্ড্ ম্যান্—

দীপঙ্কর বললে—আমাকে না-ডাকলে আমি কী করে যাই বলুন? লোকে ভাববে আমি বুঝি প্রমোশনের জন্যে খোশামোদ করতে যাচ্ছি—

—এক্‌জ্যাক্টলি সো। তুমি ঠিক করেছ, যাওনি। ওল্ড ম্যান তোমাকে কিছুতেই প্রমোশন দেবে না, আমিও ছাড়বো না। আমি বললুম—সেন ইজ্ কোয়াইট অল রাইট। শেষকালে অনেক কষ্টে তবে রাজী করিয়েছি বুড়োকে, বুড়ো ক্রফোর্ডকে লিখে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত—

—আমার প্রমোশনের জন্যে? দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল।

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে নোট্ গেছে ক্রফোর্ড সাহেবের কাছে। তুমি আমার জায়গায় প্রমোটেড হবে। আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তোমার গ্রেটফুল থাকা উচিত আমার ওপর।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো প্রমোশন চাই না!

—সে কি?

মিস্টার ঘোষাল যেন আকাশ থেকে পড়লো। চুরোটের ছাইটা টপ্ করে করে পড়লো টেবিলের ওপর। বললে—বলছো কি তুমি? প্রমোশন চাও না? ইউ ডোণ্ট ওয়াণ্ট প্রমোশন?

দীপঙ্কর বললে—না।

তবু মিস্টার ঘোষালের যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—য়্যাম্ আই টু বিলিভ ইউ? তুমি প্রমোশন চাও না?

দীপঙ্কর আবার বললে—না। কী হবে প্রমোশন নিয়ে! আমি কার কী উপকার করতে পারবো প্রমোশন পেয়ে? আমার চেয়েও ভালো ভালো কত ক্লার্ক রয়েছে আপিসে, তাদের তো কই প্রমোশন হয় না। তারা নিঃশব্দে কাজ করে যায় মন দিয়ে, অফিসারদের ঘরে গিয়ে তোশামোদ করে না বলে কারো নজরে পড়ে না। প্রমোশান হয় পাশ্-ক্লার্ক হরিশবাবুর, প্রমোশন হয় কে-জি-দাশ-বাবুর, প্রমোশন হয় রামলিঙ্গমবাবুর, প্রমোশন হয় নিবারণবাবুর। কারণ তারা ব্যাক্‌বাইট করতে পারে, কারণ তারা এক্সপ্লয়েট করতে পারে। আর আমরা? আমরা আমাদের দরকারের সময় ক্লার্কদের রসগোল্লা-কচুরি ঘুষ দিয়ে তাদের কাছে কাজ আদায় করি। এখানে কি জাস্টিস আছে? এখানে কি আইন আছে? এখানে কি অনেস্টি আছে?

বলতে বলতে দীপঙ্কর যেন হঠাৎ নিজেকে ভুলে গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ঘোষাল সাহেব অবাক হয়ে দীপঙ্করের কথাগুলো শুনছিল। দীপঙ্কর থামতেই বললে—কিন্তু তুমি প্রমোশন চাও না? ঠিক বলছো? তুমি টাকা চাও না?

দীপঙ্কর বললে—না, টাকা চাই না। টাকায় কী হয়। টাকায় কিছু হয় না মিস্টার ঘোষাল। আমার এক সিস্টার, তার মস্ত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, তার বাবাও খুব বড়লোক, তাদের গাড়ি, বাড়ি, দারোয়ান, জমিদারি সব আছে। তাদের প্রচুর টাকা, টাকার শেষ নেই তাদের। তবু সে সুখী নয়, জানেন—লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও তাকে সুখী করা যাবে না—সে আজ সকালে আমার বাড়িতে এসে উঠেছে, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে!

—কে সে?

দীপঙ্কর বলবে না বলেও বলে ফেলালে—মিসেস ঘোষ, আপনি তাকে চেনেন—

মিস্টার ঘোষাল চুরোটটাকে আরো বাগিয়ে ধরলে। হঠাৎ চেয়ারে বসে পড়ে

বললে—হোয়াট্ ডু ইউ মিন্?

মিস্টার ঘোষালের আগ্রহ দেখে সেদিন দীপঙ্করের ঘৃণা আরো শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল মনে আছে।

মিস্টার ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে—কেন পালিয়ে এসেছে কেন? কী হয়েছিল?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা, সব কথা আপনি বুঝতে পারবেন না। অত টাকা, অত বড় বংশ কিন্তু সুখ নেই এক তিল। তাই তো আপনাকে বলছিলাম প্রমোশন আমি চাই না, প্রমোশন নিলেও তো কারোর উপকার করতে পারবো না—ওই তো জার্নাল সেকশানে পি-কে-গাঙ্গুলী রয়েছে, দিলে ওকেও তো প্রমোশন দিতে হয়, মোস্ট এফিশিয়েণ্ট ক্লার্ক—তাকে কি প্রমোশন দিতে পেরেছে কেউ?

দীপঙ্কর গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল। ওই যে হরিশবাবু! যেহেতু লোকটা সকলের মনোরঞ্জন করে বেড়ায়, সকলের তোষামোদ করে, ওরও প্রমোশন হয়। কিন্তু আরো হাজার লোক রয়েছে। হাজার-হাজার লোক। আর শুধু রেলই বা কেন? সমস্ত কালিঘাট, সমস্ত বালিগঞ্জ, সমস্ত কলকাতার লোক রয়েছে। কে তাদের প্রমোশন দেবে? তাদের প্রমোশনের জন্যে কার কাছে দরখাস্ত করবে দীপঙ্কর? কে তাদের ভাগ্য-বিধাতা? দীপঙ্করের যেন লজ্জা করে। মনে হয় ফরসা জামা-কাপড় পরে যেন সমস্ত মানুষের মুখে চুন-কালি লেপে দিচ্ছে সে। তার নিজের প্রমোশন যেন তার নিজের কাছে লজ্জার শামিল। মিস্টার ঘোষাল শুধু সতীর শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসার ঘটনা জানতেই ব্যাকুল। কিন্তু কেন সে পালিয়ে আসে, কেন পালিয়ে এসে তার বাড়িতে এসে ওঠে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে চায় না। সমস্তর মূলেই তো সেই টাকা! সতীর টাকার কাছে সতীর রূপ, গুণ সব যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সনাতনবাবুর টাকার কাছেও সতীর সতীত্ব যেন নস্যাৎ হয়ে গেছে। এত টাকা তাদের। এত নিশ্চিন্ত জীবন তাদের, সতীর ভালো-মন্দ নিয়ে ভাববার কথা তাদের তাই মনেও আসে না। টাকা কি এমনি অমানুষ করে মানুষকে? দীপঙ্করের মনে হলো, হয়ত এত টাকা থাকা ভাল নয়। জীবন এত নিরুপদ্রব হওয়া উচিত নয়, জীবন এত উদ্বেগহীন হওয়া ঠিক নয়। সনাতনবাবুদের জীবনে একটু উপদ্রব, একটু উদ্বেগ থাকলে বোধহয় সতী এমন করে চলে আসতে পারতো না।

মিস্টার ঘোষাল চলে যাবার পর দীপঙ্কর মধুকে ডাকলে।

মধু এল। দীপঙ্কর বললে—এই চিঠিটা ফেলে দিয়ে আয় তো মধু, খুব জরুরী, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম—

মধু চিঠি নিয়ে চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ দীপঙ্করের কী খেয়াল হলো।

বললে—মধু, শোন্, চিঠিটা একবার দেখি—

সতী নিজের হাতে চিঠি লিখেছে। নিজের হাতে খামটা এ'টেছে। ভেতরে সতী কী লিখেছে দেখবার ইচ্ছে হলো। বাবাকে হয়ত আসতে লিখছে কলকাতায়। হয়ত লিখেছে খুব জরুরী। যাতে ভুবনেশ্বরবাবু চিঠি পেয়েই চলে আসেন। বলতে গেলে একমাত্র মেয়ে তাঁর। একমাত্র সন্তান। তার চিঠি পেয়েই চলে আসবেন নিশ্চয়। একদিনও দেরি করবেন না।

মধুর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ওপরের খামটা আস্তে আস্তে খুলে ভেতরের চিঠিটার ভাঁজ খুললে।

কিন্তু চিঠিটা পড়েই দীপংকর একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। সতী লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, অনেকদিন তোমাকে কোনও চিঠি দিতে পারিনি। তুমি আমার জন্যে ভেবো না। আমার এখানে কোনও কষ্টই নেই। সম্প্রতি আমরা কয়েক মাসের জন্যে দেশ-ভ্রমণে বেরোচ্ছি। সময়মত তোমাকে হয়ত চিঠি দিতে পারবো না। তার জন্যে তুমি যেন চিন্তিত হয়ো না। আশা করি, ভালো আছো—আমার প্রণাম নিও।

ইতি তোমার,
সতী

দীপঙ্করের কী যে হলো। হঠাৎ চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যে! মধু তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেন-সাহেবের কাণ্ড। মধুর দিকে নজর পড়তেই দীপঙ্কর বললে—এ চিঠি ফেলবার দরকার নেই, তুই এখন যা—

হঠাৎ দ্বিজপদ ঘরে ঢুকলো। বললে—হুজুর, রবিন্‌সন্‌ সাহেব আপকো সেলাম দিয়া—

দীপঙ্কর চমকে উঠেছে। বললে—কোথায়? আপিসে না বাঙলোয়?

—বাঙলোয়।

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল।

সেই সাহেবের ফেয়ারওয়েলের দিনের কথাটাও স্পষ্ট মনে আছে দীপঙ্করের। নিবারণবাবুর ফেয়ারওয়েলের উৎসবের মতই। তবে তার চেয়ে আরো বড়। আরো জাঁক-জমকের। সমস্ত সাহেবরা এসেছে। সমস্ত ক্লার্ক। সবাই চাঁদা দিয়েছে। এরই মধ্যে রটে গিয়েছে দীপঙ্করের প্রমোশনের কথা। এরই মধ্যে অফিস-সুদ্ধ ক্লার্করা তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। জুনিয়ার অফিসাররা কনগ্র্যাচুলেট করতে লাগলো।

সমস্ত সময়টা দীপঙ্কর চেয়ারের ওপর স্ট্যাচুর মত চুপ করে বসে রইল। কে কী বক্তৃতা দিলে, কে কী বললে, তা-ও যেন কানে গেল না! কেন এমন হয়! কেন দীপঙ্করের এমন হয়। কেন আর দশজনের মত দীপঙ্কর সব জিনিস সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

রবিন্‌সন্‌ সাহেবের কথাগুলো যেন তার কানে তখনও বাজছিল।

রবিন্‌সন্‌ সাহেবের বাঙলোতে বসে সাহেব বলেছিল—আমি সকলের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রমোশন দিচ্ছি সেন, ইউ মাস্ট য়্যাকসেপ্ট ইট—ইউ মাস্ট—

দীপঙ্কর শিউরে উঠতে লাগলো সাহেবের কথাগুলো শুনে।

সাহেব আবার বললে—আজ ঘোষাল অনেক বললে তোমার বিরুদ্ধে। বাট ঘোষাল ইজ্‌ এ সাউথ ইণ্ডিয়ান, আমি তাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তবু তার কথা রাখিনি—। তুমি জানো, ঘোষাল ইজ্‌ ফ্রেণ্ডলি টু ব্রিটেন, উনিশ শো ছাব্বিশ সালের স্ট্রাইকের সময়ে ইংলণ্ডে সার্ভিস দিয়েছিল—কিন্তু স্টীল, তার কথা আমি রাখতে পারিনি, আমি ক্রফোর্ডকে তোমার সম্বন্ধে নোট্‌ দিয়েছি, আই উইশ্‌ ইউ সাক্‌সেস্‌ এণ্ড হ্যাপিনেস্‌—

দীপঙ্কর হঠাৎ মুখ খুললে—কিন্তু স্যার, হোয়াই?

—বিকজ্‌ ইউ ডিজার্ভ ইট। ইউ আর ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌ এণ্ড এফিশিয়েণ্ট—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনি জানেন না স্যার আমার মত হাজার হাজার ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌ আর এফিশিয়েণ্ট্‌ লোক আমাদের রেলে রয়েছে তাদের প্রমোশন হয় না—তাদের কেউ দেখে না—। কেউ কেউ আমার চেয়েও ইন্‌টেলিজেণ্ট্‌, কেউ কেউ আমার চেয়েও এডুকেটেড্‌—

রবিন্‌সন্‌ সাহেব যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—ইম্‌পসিবল্‌, হতেই পারে না—আমার অফিসে আমি সকলকে জানি, সকলের বিদ্যে-বুদ্ধি আমার জানা আছে, আমার জিমি তাদের চেয়ে ইন্‌টেলিজেণ্ট ছিল—পুওর সোল—

বলতে বলতে সাহেব নিজের হাত দু'খানা বুকের ওপর ক্রুশের ভঙ্গিতে রাখলে। তারপর কী যেন হলো সাহেবের। বললে—দি ক্লার্ক্‌স আর ওয়ার্স দ্যান্‌ বীস্টস্‌, আমাকে মিস্টার ঘোষাল সব বলেছে, ঘোষাল কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না, হি ইজ্‌ এ সাউথ্‌ ইণ্ডিয়ান—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু স্যার আমি প্রমোশন চাই না—প্রমোশন আমার দরকার নেই, আমি যে-মাইনে পাচ্ছি তারও যোগ্য নই আমি—

—সে কী?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার, আমি আপনার ভালবাসার যোগ্য নই—

সাহেব অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন?

দীপঙ্কর একটু দ্বিধা করতে লাগলো প্রথমে। তারপর মাথা উঁচু করে বললে—আজ আপনাকে আমি বলি, আমি ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নৃপেন বাবুকে তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে এখানে চাকরি পেয়েছি, সে-লজ্জা সে-কলঙ্ক

আমি জীবনে ভুলতে পারবো না—!

সাহেব নৃপেনবাবুর নাম শুনে হতবাক হয়ে গেল। দি নটোরিয়াস স্কাউন্ড্রেল! অনেক কিছু বলে সাহেব অসংখ্য গালাগালি দিয়ে গেল অদৃশ্য নৃপেনবাবুকে।

সাহেব বললে—কিন্তু নৃপেন তো ভালো লোক ছিল বলে জানতুম! ভেতরে ভেতরে সে এত শয়তান—?

দীপঙ্কর বললে—ঘুষ হয়ত আমি একলাই দিইনি, এই অফিসের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লোকই হয়ত ঘুষ দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে স্যার, কিন্তু আমার জীবনে সেই তেত্রিশ টাকার ঘুষ জগদ্দল পাথরের মত ভারি হয়ে চেপে বসেছে। কথাটা ভাবলেই মনে হয় আমি জোচ্চোর, ঠগ, আমিও একটা স্কাউন্ড্রেল, মাইনে নেবার সময় আমার হাত কাঁপে, মনে হয় আমি রেলওয়েকে ঠকাচ্ছি—

সাহেব অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলো শুনলে। তারপর বললে—ফরগিভ্ এন্ড্ ফরগেট্, সেন—ঈশ্বর নৃপেনকে শাস্তি দেবে—

দীপঙ্কর বললে—না স্যার, দেখেছি সেই নৃপেনবাবু ঘুষের টাকায় রিটায়ার করার পর বিরাট দোতলা বাড়ি করেছেন, রোজ কালিঘাটের মন্দিরে যান, রোজ গঙ্গায় গিয়ে স্নান করেন, তাঁর ছেলেরা বড় হয়েছে, বড় বড় চাকরি করছে—খুব হ্যাপি লাইফ্ লীড্ করছে, ভগবান তো কোনও শাস্তি দেয়নি তাঁকে—

সাহেব বললে—ইউ ওয়েট এন্ড সী, কিন্তু প্রমোশন নিতে চাও না কেন? তুমি কি সুখী হতে চাও না? তুমি কি লাক্সারি কম্ফোর্ট কিছু চাও না?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। সাহেবকে বোঝানো বৃথা যে রাজার ছেলে সিদ্ধার্থের কিসের অভাব ছিল যে সমস্ত সুখ, সমস্ত ঐশ্বর্য ছেড়ে বনে পর্বতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল? আলেকজান্ডারের কিসের অভাব ছিল যে হঠাৎ দুর্গম গিরি-নদী-পর্বত পার হয়ে দিগ্বিজয় যাত্রা করবার ইচ্ছে হয়েছিল? রাজ্য সিংহাসনের আরাম ফেলে রেখে এমন করে ঘর ছাড়ায় কে? সে কি টাকা? সে কি খ্যাতি? সে কি শান্তি? সে কি সুখ? দীপঙ্কর নিজেই ভাল করে বুঝতে পারে না তো সাহেবকে কী বলে বোঝাবে?

সাহেব বললে—যা হোক, আমি নোট দিয়ে ফেলেছি, আমি চাই তুমি আমার নোটের মর্যাদা রাখবে, মিস্টার ক্রফোর্ডের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, আমরা দুজনেই একমত—

সাহেবের ফেয়ারওয়েলের সভায় বসে বসে সেই কথাগুলোই ভাবছিল দীপঙ্কর। সত্যিই, কেন এমন হয়? যে-চাকরির জন্যে একদিন তার মা দিনরাত ঠাকুরকে ডেকেছে, যে-চাকরির জন্যে কালিঘাটের সমস্ত লোককে মা খোশামোদ করে বেড়িয়েছে, সেই চাকরির প্রায় মাথায় উঠে কেন এমন বিতৃষ্ণা আসে? এ কি তার পাগলামি? এর মূলেও কী সতী? এর মূলেও কি লক্ষ্মীদি? এর মূলে কি অঘোরদাদু? এরই মূলে কি ছিটে-ফোঁটা? সেই

ছিটে-ফোঁটা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট্ হয়েছে? যে-চেয়ারে এতদিন প্রাণমথবাবু বসেছে সেই চেয়ারেই কি বসছে ছিটে-ফোঁটা? দীপঙ্করের বিতৃষ্ণা কি সেই কারণেই?

সবাই কী-কারণে যেন হাততালি দিয়ে উঠলো।

দীপঙ্কর সচেতন হয়ে বসলো আবার। এতক্ষণ তলিয়ে গিয়েছিল ভাবনার অতলে! এবার চারদিকে চোখ চেয়ে দেখলে। সবাই তাকে দেখছে। হয়ত রবিন্সন্ সাহেব এতক্ষণ তার কথাই বলছিল। কথাগুলো কানে যায়নি। ভালোই হয়েছে। আশ্চর্য, সবাই তাকে ঈর্ষা করছে, সবাই তাকে লক্ষ্য করছে। আজকের ফেয়ারওয়েলের উৎসবে মিস্টার ঘোষাল আর মিস্টার সেনই যেন সকলের লক্ষ্যস্থল। মিস্টার ঘোষাল না-হয় বর্ন অফিসার। অফিসার হয়েই ঢুকেছে। কিন্তু দীপঙ্করের উন্নতিটা যেন সকলের চোখে কট্-কট্ করে বিঁধছে। দীপঙ্করের যন্ত্রণা হতে লাগলো। সারা শরীরে আঘাত পেলে যেন সে। শুধু শরীরে নয়, মনেও। সমস্ত মন তার অসাড় হয়ে এল। একদিন বইতে পড়েছিল দীপঙ্কর, বিসমার্ক নাকি জার্মানীকে উঁচু করে সমস্ত জার্মান-জাতকে ছোট করে দিয়েছিল। আজ রবিন্সন্ সাহেবও যেন দীপঙ্করকে প্রমোশন দিয়ে সমস্ত মানুষ-জাতকে ছোট করে দিলে!

বাড়ি আসার পথেও কথাটা মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগলো।

হঠাৎ অনেকক্ষণ পরে সতীর কথা মনে পড়লো। সতী হয়ত আবার গিয়ে উঠেছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। হয়ত দারোয়ান সতীকে দেখেই দরজা খুলে দিয়েছে। সতীকে পৌঁছে দিয়েই লক্ষ্মীদি হয়ত চলে এসেছে। তারপর গেট পেরিয়ে বাগান। বাগান পার হয়ে বাঁ দিকে সার-সার ঘর। তারপর চাকর-দারোয়ানদের থাকবার জায়গা। তারপর অনেক দূর গিয়ে একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে সনাতনবাবুর লাইব্রেরী।

সতী সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল একবার সিঁড়ির গোড়ায়।

কোথায় যাবে সে? ওপরে নিজের ঘরে? শাশুড়ীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে? এত তেজ করে বেরিয়েছিল বলে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাবে?

কিন্তু সতী তো তেমন মেয়ে নয়!

দীপঙ্কর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই কথাগুলোই মনে মনে ভাবতে লাগলো। সত্যিই তো, সতী তো তেমন মেয়ে নয়। তাকে জোর করে দীপঙ্কর তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে হয়ত ভুলই করলে। হয়ত দীপঙ্করের নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেই ভালো হতো। সতী শান্তি পেতো!

মনে হলো সতী যেন আস্তে আস্তে লাইব্রেরীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আবার।

সনাতনবাবু ভেতরে পড়ছিলেন রোজকার মত। মোটা বই। বই-এর পাতার দিকে চোখ দুটো নিবদ্ধ ছিল। টের পেলেন না তিনি।

সতী আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলো। তারপর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সনাতনবাবুর পায়ের ওপর হাত ঠেকালে। আর সঙ্গে সঙ্গে সনাতনবাবু চমকে উঠলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ে কী ঠেকলো?

বললেন—কে? কে? কে?

সতী কথা বললে না।

সনাতনবাবু ভালো করে নজর দিতেই দেখলেন সতীকে। বললেন—আরে তুমি? দেখ দিকিনি, তোমাকে নিয়ে খুব খোঁজা-খোঁজি পড়ে গেছে এদিকে। মা বলছিল—তুমি নাকি বেরিয়ে চলে গিয়েছ! আমি বললাম—সে কী? তাই কখনও যেতে পারে বেরিয়ে! নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। ভালো করে চার ধারে খুঁজে দেখ তোমরা!

সতী তখনও কথা বলছে না।

সনাতনবাবু বললেন—আমি তখুনি জানি তুমি যেতে পারো না কোথাও। কোথায় যাবে তুমি? কী বলো? আমি মাকে বললুম কৈলাসটা চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে নিশ্চয়ই! তা কোথায় ছিলে সত্যি বলো তো?

সতী বললে—সত্যি, সত্যি তুমি আমায় খুঁজেছিলে?

—আরে কী যে বলো তুমি! একটা কুকুর-বেড়াল বাড়ি থেকে চলে গেলেও লোকে ভেবে অস্থির হয়, আর তুমি একটা জল-জ্যান্ত মানুষ, কেউ খুঁজবে না?

সতী যেন আদরে বিগলিত হয়ে গেল। বললে—সত্যি, বলো না, আমাকে খুঁজেছিলে তুমি?

সনাতনবাবু বললেন—আরে আমি কেন খুঁজতে যাবো, কৈলাস খুঁজছিল—আমি তো একটু ব্যস্ত ছিলুম কিনা!

সতী বললে—তুমি খোঁজনি?

সনাতনবাবু বললেন—দাঁড়াও, কৈলাসকে ডাকি আগে, ও জানে! ওকে বললাম নিশ্চয়ই আছে কোথাও, খুঁজে দ্যাখ্ ভালো করে। তা এসে মাকে বললে, কোথাও নেই বৌদিমণি। দাঁড়াও কৈলাসকে ডাকি আমি—

বলে সনাতনবাবু দাঁড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।

সতী বললে—থাক্—

—থাকবে কেন, আমি এক্ষুনি ডাকছি কৈলাসকে, ওকে তুমি নিজেই জিজ্ঞেস করো না, খুঁজতে বলেছি কিনা—

সতী আবার বললে—না, থাক, জিজ্ঞেস করতে হবে না—

সনাতন আবার চেয়ারে বসলেন বটে। কিন্তু বললেন—মাকে বলতে হবে—

—কী বলতে হবে?

সনাতনবাবু বললেন—মাকে বলতে হবে কৈলাস কোনও কাজ করে না!

সতী বললে—না, তার বলার দরকার নেই। আমি সত্যিই চলে গিয়েছিলাম, যখন তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলে, তখন সেই রাত তিনটের সময় আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম—তোমরা কেউ টের পাওনি।

সনাতনবাবু শুধু বললেন—ও—

সতী আবার বলতে লাগলো—যে ছেলেটাকে আমি নেমন্তন্ন করেছিলুম বাড়িতে, তাদের বাড়িতেই চলে গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম আর কখনও আসবো না, ভেবেছিলুম আর কখনও তোমাদের মুখ দেখবো না!

সনাতনবাবু বললেন—ও, সেই জন্যে কৈলাস তোমাকে খুঁজে পায়নি—

সতী তেমনি করেই বলতে লাগলো—ভেবেছিলাম তোমাদের কাছে তোমাদের বাড়িতে বউ হয়ে থাকার চেয়ে রাস্তায় থাকা হাজার গুণ ভালো। ভেবেছিলাম আমি নিজের মুখে কালি মেখে তোমাদের মুখও কালো করে দেব, ভেবেছিলাম আমাকে তোমরা যে-শাস্তি দিয়েছ, সেই শাস্তির শোধ তুলবো তোমাদের বংশের নাম ডুবিয়ে, ভেবেছিলাম আমি নিজে মরে তোমাদেরও মেরে যাবো—

তারপর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—কী, চুপ করে আছো কেন? কথা বলছো না যে?

সনাতনবাবু যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। বললেন—কী বলছিলে, আর একবার বলো, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম—

সতীর হঠাৎ যেন বড় ঘৃণা হলো সনাতনবাবুকে দেখে। হঠাৎ যেন বড় রাগ হলো সনাতনবাবুর ওপর। এ মানুষটা কী? এ মানুষটা কি পাথর? এ মানুষটা কি জানোয়ার?

—আচ্ছা, এই যে আমি চলে গিয়েছিলুম, তার জন্যে তোমরা একটুও ভাবোনি?

সনাতনবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে উঠছিলেন।

সতী হঠাৎ তাঁর হাতখানা ধরে ফেললে। বললে—কোথায় যাচ্ছো?

সনাতনবাবু বললেন—মাকে বলি গে যাই—

—কী বলবে?

সনাতনবাবু বললেন—সকালবেলা মা কৈলাসকে খুব বকেছে কিনা, তাই মাকে বলিগে যাই যে, কৈলাসের দোষ নেই, সতী বাড়ি থেকে চলেই গিয়েছিল।

সতী বললে—থাক্, বলতে হবে না—তুমি বোস, তোমার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি—

সনাতনবাবু বললেন—তা বসছি, কিন্তু তুমি মা'র সঙ্গে দেখা করেছ?

সতী বললে—না, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, তুমিই আমার স্বামী, তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই আগে দরকার—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু আমার মাথার ওপরে তো মা রয়েছে, মা'ই তো আমার গুরুজন—

সতী আর থাকতে পারলো না। বললে—তা আমার চেয়ে তোমার মা-ই বড় হলো? আমি কেউ না?

সনাতনবাবু বললেন—না, তা কেন হতে যাবে?

—তবে? তবে কেন তুমি মা'র কথা বলছো বার বার? আমার বাবা কি তোমাকে দেখে বিয়ে দিয়েছে, না তোমার মা'কে দেখে? বলো তুমি, তোমাকে বলতেই হবে!

সনাতনবাবু বললেন—তা তো আমি জানি না, দাঁড়াও আমি মা'কে জিজ্ঞেস করে আসি—

সতী আর থাকতে পারলে না। বললে—এ-ও তোমার মা'কে জিজ্ঞেস করতে হবে?

সনাতনবাবু বললেন—মা'কে জিজ্ঞেস না করলে কা'কে জিজ্ঞেস করতে যাবো? কে আর জানে?

—তা তুমি নিজে বলতে পারো না?

সনাতনবাবু বললেন—আমার কি এত সব ভাববার সময় আছে? এই দেখ না, ক'দিন থেকে এই বইটা কিনেছি, এখনও শেষ করতে পারিনি। আর কবে যে শেষ হবে তাও বলতে পারছি না! সকাল থেকে পড়তে গিয়ে কেবল একটার পর একটা বাধা আসছে—

সতী কী বলবে ভেবে পেলে না। একটু থেমে বললে—আমিই তোমার পড়ার ব্যাঘাত করলুম,—আমি যাই তাহলে—

সনাতনবাবু বললেন—কোথায়?

—যেখানে চলে গিয়েছিলুম, সেখানেই ফিরে যাই।

সনাতনবাবু বললেন—ফিরে আর কেন যাবে, তার চেয়ে বরং চা-টা খেয়ে ঘরে একটু বিশ্রাম করো গে, মা'র সঙ্গে একটু দেখা করো গে, কৈলাসটা তোমার জন্যে খুব বকুনি খেয়েছে!

সতী বললে—এবার আর কাউকেই বকুনি খেতে হবে না আমার জন্যে, আমি একেবারে চলে যাচ্ছি। আর ফিরবো না তোমাদের বাড়িতে। সেবারে না-বলে গিয়েছিলুম, এবার বলেই চলে যাচ্ছি—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু আমাকে বলে গেলে তো হবে না, মা'কেও বলে যাও—

সতী চলতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। বললে—কী বললে?

—বললাম, আমার মা'কে বলে যাও। আর ক'টার সময় ফিরে আসবে সেটাও বলে যেও, নইলে মা আবার ভাববে কিনা!

কথাটা শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল সতী। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে। তারপর হঠাৎ দৌড়ে সনাতনবাবুর হাত থেকে মোটা বইটা কেড়ে নিয়ে টেনে পাতাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। সতীর মনে হলো সে যেন সনাতনবাবুকেই হাতের নখ দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

সনাতনবাবু কিছু বললেন না। তেমনি চুপ করে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সতীর কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

খানিক পরে সতী যেন নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই হতবাক হয়ে গেছে। সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। সে-মুখে কোথাও বিস্ময় নেই, অভিযোগ নেই, রাগ নেই, অনুরাগও নেই। সতী নিজের অসহায়তায় নিজেই হঠাৎ মুষড়ে পড়লো। তারপর এক সময়ে হঠাৎ সনাতনবাবুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতে লাগলো—ওগো আমার ঘাট হয়েছে, আমার দোষ হয়েছে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তোমার পায়ে পড়ছি আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি ঝোঁকের মাথায় তোমার বইটা ছিঁড়েছি, আমার দোষ হয়েছে। ক্ষমা করতে না পারো তো আমাকে তুমি বকো, আমাকে একবার বকো শুধু তুমি। ক্ষমা করতে হবে না আমাকে, আদর করতেও হবে না, আমাকে শুধু একবার বকো। তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে বকো, তোমার বই ছিঁড়ে ফেলার জন্যে বকো, তোমাকে ঘরে শুতে না দেবার জন্যে বকো! যা হোক কিছু করো!

বলতে বলতে সতী সনাতনবাবুকে জড়িয়ে ধরে আকুলি-বিকুলি হয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো।

আর সেই সময় হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ হলো:

—সোনা!

—সেনবাবু!

দীপঙ্করের মনে হলো সে যেন ভুল শুনেছে। 'সোনা' শুনতে যেন 'সেনবাবু' শুনেছে। চমকে উঠে চারিদিকে চাইতেই খেয়াল হলো। এ কোথায় চলেছে সে? এ তো বউবাজার।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—এদিকে কোথায় চলেছেন?

দীপঙ্কর এতক্ষণে একমনে বাড়ি যেতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে ভুল করে কোন্ দিকে চলে এসেছে। বললে—এই এমনি একটু বেড়াচ্ছি—আপনি কোন্ দিকে?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—বারে, আমার তো বাড়িই এইদিকে, আমি এখানে কাছেই নামবো—

তারপর আবার বললে—আজকে রবিন্‌সন্ সাহেব যে-সব কথাগুলো বললে মীটিং-এ, শুনে আমার খুব ভালো লাগলো—

—কী বললে রবিন্‌সন্ সাহেব?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কেন, আপনি শোনেন নি? আপনিও তো ছিলেন।

মীটিং-এ!

দীপঙ্কর বললে—আমার আজকে মনটা ভাল নেই খুব,—আমার ইচ্ছে ছিল না মীটিং-এ যাবার, তাছাড়া, আজকে আপিসেই আসতুম না, নেহাৎ বুড়োমানুষ চলে যাচ্ছে তাই আসা—

—কেন, শরীর খারাপ নাকি?

দীপঙ্কর বললে—শরীর খারাপ নয়। মা তো নেই, ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। জীবনে এই প্রথম ফাঁকা বাড়িতে মা'কে ছেড়ে একলা থাকা; তাই কেমন ভাল লাগছে না—। বাড়িতে গিয়েও তো সেই ফাঁকা বাড়ি দেখবো, ভাবলেই যেন কেমন লাগছে—

—আপনার বাড়িতে আর কেউ নেই?

দীপঙ্কর বললে—আর কে থাকবে? একজন ছিল, সে-ও আজকে দুপুর-বেলা চলে গেছে।

—কে? কোথায় গেছে?

—সে আপনি চিনবেন না। আমাদেরই পাশের বাড়িতে থাকতো ছোটবেলায়। অনেকদিন তার বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎ আজ সকালে এসেছিল, তারপর আবার চলে গেছে তার শ্বশুর-বাড়িতে! আমার মা'কে মাসীমা বলে ডাকতো তারা, এখন মা নেই বাড়িতে, সুতরাং আমাদের বাড়িতে থাকা হলো না—

গাঙ্গুলীবাবু জিজ্ঞেস করলে—কাল বোধ হয় বেনারস থেকে চিঠি পাবেন—

দীপঙ্কর বললে—মনে তো হচ্ছে, আজকে সকালে যদি চিঠি ফেলে থাকে তো কাল চিঠি আসবেই—

গাঙ্গুলীবাবু হঠাৎ বললেন—আপনার যদি বিশেষ দরকার না থাকে তো একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না, একদিনও তো আসেন নি—একটু চা খেয়ে যাবেন!

দীপঙ্করও ভেবে দেখলে। চা খাবার জন্যে নয়। চা সেই জীবনে একবারই খেয়েছিল দীপঙ্কর। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে লক্ষ্মীদির কাছে। কিরণ বলত—চা মানে কুলীদের রক্ত। কিন্তু বাড়িতে এখন গিয়েই বা কী করবে! সেই ফাঁকা বাড়ি। সতীকে একরকম জোর করেই তাড়িয়ে দেওয়া হলো। হয়তো সতিই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আবার কান্নাকাটি করছে। আবার হয়ত সেই দরজা-বন্ধ করে উপোস করা আরম্ভ করবে। আবার হয়ত রাগ করে কথাই বলছে না সনাতনবাবুর সঙ্গে। আবার হয়ত শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করছে গলা উঁচু করে। কী ছেলেমানুষ সতীটা! সংসারের কিছুই বুঝলো না। সংসারে কি অত একগুঁয়ে হলে চলে! লক্ষ্মীদি তবু অনেকটা বুঝেছে। তবু সামলে নিয়েছে। মা থাকলে হয়ত সতীকে বোঝাতে পারতো। মা'র কথা হয়ত শুনতো সতী!

গাঙ্গুলীবাবু বললে—এইখানে নামতে হবে, আসুন—

ছোট গলি। অন্ধকার। কিন্তু দু'পাশের ছোট-ছোট দোকানের আলোয় রাস্তায় যা-হোক আলো পড়েছে একটু।

গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িটা একতলায়। এতদিন চাকরি করছে দীপঙ্কর। কতদিন লালদীঘিতে ঘাসের ওপর বসে গল্প করেছে দুজনে। গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীর কথা কত শুনেছে। কেমন করে পাগল হয়ে গেল স্ত্রী কেমন করে মধ্যমনারায়ণ তেল মেখে ভাল হয়েছে, সব বলেছে। যেদিন স্ত্রী ভাল হয়ে গিয়েছিল, সেদিন কালিঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল। প্রসাদ দিয়েছিল দীপঙ্করকে।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমার স্ত্রী যদি আপনাকে আমার মাইনের কথা জিজ্ঞেস করে তো আপনি যেন আবার আসল মাইনেটা বলে দেবেন না সেনবাবু—

—মিথ্যে কথা বলবো?

—হ্যাঁ, কবিরাজ বলেছে যে। আমি তো বলেছি একশো দশ টাকা। আপনি যেন আবার টপ্ করে বলে দেবেন না প'চাশি টাকা পাই—দেখবেন—

ছোট একখানা বাইরের ঘর। কিন্তু কী চমৎকার সাজিয়েছে। কোথাও কোনও নোংরা নেই। সব গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীর সাজানো। দেওয়ালে কার্পেটের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিটা নানারকম রঙিন উল দিয়ে তৈরি নাড়ুগোপাল। মাথায় লেখা 'গড ইজ্ গুড্'। চারদিকে দেয়ালের ড্যাম্পলাগা অন্ধকার। টিম্-টিমে একটা বালব্ ঝুলছে মাথার ওপর। দুটো তিনটে চেয়ার। একটা টেবিল। টেবিলের ওপর এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি। হলদে পদ্মের চারপাশে লাল পাতা। তা হোক, তবু মনে হলো যেন গৃহিণীর পরিপাটি হাতের ছাপ সর্বত্র। গাঙ্গুলীবাবু দীপঙ্করকে বসিয়েই ভেতরে স্ত্রীকে খবর দিতে চলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এল। বললে—ময়লা শাড়িটা বদ্‌লে আসছে—

তারপর চুপি চুপি বললে—কী জিজ্ঞেস করছিল জানেন?

—কী?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আপনি যে আমাদের অফিসার তা বলিনি। শুধু বলেছি আমাদের আপিসের ক্লার্ক। জিজ্ঞেস করছিল—কত মাইনে পান আপনি। আমি বলেছি—প'চাশি—আপনি যেন আবার কিছু মনে করবেন না—। যদি শুনতো আপনি চারশো টাকা মাইনে পান তো দেখা করতেই আসতো না—

সত্যি সত্যিই এক সময়ে গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলো। দীপঙ্করের দেখেই মনে হলো যেন এখুনি গয়না শাড়ি পরে সেজে গুজে এসে ঢুকলো। শাড়িটা যেন পাটভাঙা। গয়নাগুলোও যেন আলমারি থেকে বার করে পরেছে। এত গয়না কিনে দিয়েছে গাঙ্গুলীবাবু! আশ্চর্য, এত গয়নাও আছে গাঙ্গুলী-বাবুর স্ত্রীর। কী ভারি-ভারি গয়না সব।

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। বললে—আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম বৌদি—

গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী বললে—ভালোই করেছেন, আর দুদিন পরে এলে

আমাদের দেখাই পেতেন না, ফিতে যেতে হতো—

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—কেন? কোথাও যাবার কথা আছে নাকি?

গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী বললে—আমরা তো কাশ্মীর যাচ্ছি—আপনি শোনেননি?

কাশ্মীর! দীপংকর গাঙ্গুলীবাবুর দিকে চাইলে। গাঙ্গুলীবাবু হাসতে লাগলো। কিছু কথা বলতে পারলে না।

বৌদি বললে—কাশ্মীর খুব ভালো জায়গা জানেন? বড় বড় লোকেরা সবাই কাশ্মীর যায়। আমার দিদি আমার জামাইবাবু গিয়েছিল। আমার জামাইবাবু ন'শো টাকা মাইনে পায়—! ন'শো টাকা কি কম, বলুন তো?

বলে একটু থামলো। থেমে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—ন'শো টাকা মাইনে ছাড়া আবার গাড়িও-আছে নিজের, মোটরগাড়ি, আপিস থেকে দিয়েছে—। খুব আরাম আমার দিদিদের। জানেন, আমার দিদি পুজোর সময় সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে একটা বেনারসী শাড়ি কিনেছে। আসল কড়িয়াল বেনারসী—। আমি হাত দিয়ে দেখেছি, আজকালকার টিস্যু বেনারসী নয়, একেবারে খাঁটি সোনার ফুল আঁটা—আমার এই যে শাড়িটা দেখছেন—

দীপংকর শাড়িটার দিকে দেখলে ভালো করে।

বৌদি বলতে লাগলো—এটা কী শাড়ি বলুন তো?

দীপংকর জীবনে কখনও শাড়ি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শাড়ির নাম-ধামও জানে না।

বৌদি বললে—বলতে পারলেন না তো? কেউ বলতে পারে না। যারা কাশ্মীর যায়, তারাই কেবল বলতে পারে। দিদি বললে—এটা দেড়শো টাকা দিয়ে কিনেছে। আমাদের সব বোনকে একটা করে এই শাড়ি কিনে দিয়েছে দিদি। তা ন'শো টাকা মাইনে পায় জামাইবাবু, কিনে দেবে না? কী বলেন, হ্যাঁ।

একটা কিছু কথা বলতে হয়। তাই দীপংকর বললে—তা তো বটেই।

বৌদি বললে—আপনি এই শাড়িটা দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন, আর আমার বাবা আমাকে বিয়ের সময় যে-বেনারসীটা দিয়েছিল সেটা দেখলে আপনি আরো অবাক হয়ে যাবেন—। আনবো সেটা? আপনি দেখবেন?

বলে সত্যিই গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী উঠে ভেতরের দিকে যাচ্ছিল।

দীপঙ্কর বললে—না, না আপনি আর কষ্ট করবেন না মিছিমিছি, অন্য একদিন বরং দেখবো—

বৌদি নিরস্ত হলো। বসে পড়লো আবার। বললে—তা আপনি এবার পুজোয় কী শাড়ি কিনলেন স্ত্রীর জন্যে?

গাঙ্গুলীবাবু বললে, শাড়ি কিনবেন কি, উনি এখনও বিয়েই করেন নি—

—বিয়ে করেন নি?

গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—মাইনে কম বলে বুঝি বিয়ে করেননি! আচ্ছা আপনাদের আপিসে মাইনে এত কম কেন সকলের? আমার জামাইবাবুর আপিসে তো সবাই বেশি মাইনে পায়!

তারপর হঠাৎ থেমে একটু হাসলো। গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীকে সত্যিই ভাল দেখতে। কী চমৎকার স্বাস্থ্য! এত হাসি-খুশী। দীপঙ্করের মনে হলো যেন এদের সঙ্গে বহুদিনের পুরোন পরিচয় তার। কোনও সঙ্কোচ নেই জড়তা নেই। প্রাণখোলা কথা বলছে একজন অচেনা লোকের সঙ্গে!

বৌদি হঠাৎ বললে—জানেন, আমার বাবার ইচ্ছে ছিল না এঁ'র সঙ্গে আমার বিয়ে দেন—কিন্তু......

গাঙ্গুলীবাবু বাধা দিলে। বললে—থাক না এখন ও-সব কথা, সেনবাবু আজ প্রথম এলেন, আর আজকেই তুমি ওই সব কথা পাড়লে?

বৌদি বললে—কেন, তোমার গুণের কথা বলছি বলে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? বেশ করবো বলবো, হাজারবার বলবো—দেখি তুমি কী করতে পারো আমার। আপনি শুনুন তো ঠাকুরপো ওঁর গুণের কথা সব বলছি আপনাকে—

তারপর দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—আপনি বর্ধমানের সরকারদের নাম শুনেছেন তো?

বর্ধমানের সরকারদের নাম দীপঙ্কর শোনেনি। কী বলবে উত্তরে বুঝতে পারলে না।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আমি তো বলেছি সেনবাবু আপনাকে সরকারদের কথা—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ শুনেছি—

বৌদি বললে—কলকাতার বড়লোকেরা সব্বাই বর্ধমানের সরকারদের নাম জানে। বাবার কাছে শুনেছি সেকালে আমাদের তিনটে হাতী ছিল বাড়িতে—তা এমন কপাল দেখুন, আমি যখন ঠিক বড় হলুম তখনই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। তা বাবা বললে—রেলের চাকরি, বাড়ি-ঘর-দোর নেই, এ-ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব না—। তা মা বললে রেলের চাকরি খারাপ কী? বাবা বললে—রেলেতে ভদ্দরলোক চাকরি করে না—। ইনি তখন মাইনে পাচ্ছেন তেত্রিশ টাকা। মা বললে—তা মাইনে কি আর চিরকালই তেত্রিশ টাকা থাকবে? তা বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত হলো,—বিয়ে হবার পর প্রথম যখন শ্বশুরবাড়িতে এলুম, দেখি—

এ-সব কথা শুনতে দীপঙ্করের ভালো লাগছিল না। একেবারে গাঙ্গুলীবাবুর ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যাপার সব।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—তুমি কি সমস্তক্ষণ কেবল ওই সব কথাই বলবে নাকি সেনবাবুকে?

বৌদি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে—কেন বলবো না শুনি? কেন বলবো না? তোমার সঙ্গে বাবা আমার বিয়েই দিতে চায়নি। আমার জামাইবাবুরা

দিদিদের কত গয়না কত শাড়ি কিনে দেয়, তুমি দিতে পারো? আমার জামাইবাবুরা দিদিদের প্রত্যেক ছুটিতে কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়, তুমি নিয়ে যেতে পারো? তোমার পয়সা আছে? তুমি তো একশো দশ টাকা মাত্র মাইনে পাও, তোমার লজ্জা করে না?

তারপর হঠাৎ দীপঙ্করকে দেখিয়ে বললে—এই তো দেখ না ঠাকুরপোকে, কম মাইনে পায় বলে এখনও বিয়েই করেনি। যার মাইনে কম তার বিয়ে করার এত শখ কেন শুনি?

গাঙ্গুলীবাবুর আশ্চর্য ধৈর্য! এত কথার পরও গাঙ্গুলীবাবু একটা কথাও বললে না। চুপ করে হাসিমুখে সব সহ্য করতে লাগলো। বোবার শত্রু নেই।

বৌদি বললে—দেখছেন ঠাকুরপো, কেমন বোকার মত হাসছে আবার, লজ্জাও করে না! বউকে যে খেতে-পরতে দিতে পারে না, বৌকে যে শাড়ি-গয়না দিতে পারে না, বৌকে যে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে না, তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি—

গাঙ্গুলীবাবুর মুখের চেহারাটা দেখে হঠাৎ দীপঙ্করের ভয় লেগে গেল। সেই হাসিমুখ আর নেই, সেই অমায়িক চেহারা আর নেই। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে রাগে। ফরসা কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

দীপঙ্কর বললে—এবার আমি উঠি বৌদি, আমার রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূরে যেতে হবে আবার—

গাঙ্গুলীবাবুও আর থাকবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলে না।

গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে—আবার কবে আসবেন!

দীপঙ্কর বললে—আর একদিন সময় পেলে আসবোখন—

বৌদি বললে—ভাল কথা, আপনি পাঁচুলালের নাম শুনেছেন?

পাঁচুলাল! নামটা শুনে দীপঙ্করও দাঁড়িয়ে গেল। গাঙ্গুলীবাবুও দাঁড়িয়ে গেল।

—পাঁচুলালের নামই শোনেন নি? কলকাতার সব বড়লোক পাঁচুলালের নাম জানে। বেনারসে গেলে পাঁচুলালের হাতের শাড়ি দেখে আসে সব্বাই, আমার দিদিদের সব শাড়ি পাঁচুলালের তৈরি! সবাই তো পাঁচুলালের শাড়ি কিনতে পারে না! সকলের অত টাকা কোথায় বলুন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—চলুন সেনবাবু, আপনার রাত হয়ে গেল—

গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী বললে—তা হলে এবার যেদিন আসবেন সেদিন আপনাকে সেইটে দেখাবো—মনে থাকে যেন—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—কোনটা?

বৌদি বললে—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?

দীপঙ্কর লজ্জায় পড়লো। বললে—কোনটা বলুন তো, ঠিক মনে পড়ছে না—

—এই দেখুন, এরই মধ্যে ভুলে বসে আছেন আপনি। সেই বেনারসীটা। যেটা বাবা আমার বিয়ের সময় দিয়েছিল—পাঁচুলালের নিজের হাতে তৈরি। বাবা নিজে পাঁচুলালকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছিল কিনা। আপনি তো আমার এই শাড়িটা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন, সেটা দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবেন না—

রাস্তায় তখন আরো অন্ধকার হয়ে এসেছে। দোকানে-দোকানে আরো ভিড় বেড়েছে। দীপঙ্করের কানে তখনও গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রীর কথাগুলো বাজছিল।

পাশে গাঙ্গুলীবাবু আসছিল। বললে—দেখলেন তো সেনবাবু, আপনি নিজের কানেই তো শুনলেন, এখন তো অনেকটা সুস্থ, আগে মুখে যা-ই চ্ছে-তাই বলে গালাগালি দিত—

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না।

গাঙ্গুলীবাবু বলতে লাগলো—তবে এখন একটু রেগে গেলেই কেবল বলে—যে বৌকে খেতে-পরতে দিতে পারে না, যে বৌকে শাড়ি-গয়না দিতে পারে না, যে বৌকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে না তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি—ওই রকম করে পা ঠুকে ঠুকে তিন বার করে বলে—

দীপঙ্কর সান্ত্বনা দিলে। বললে—ও-সব কথায় আপনি কান দেবেন না—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কত আর সহ্য করা যায় বলুন, তাই এক-এক সময় মনে হয় দিই গলায় দড়ি, গলায় দড়ি দিলে ওর কী-দশাটা হয় একবার বুঝিয়ে দিই—

দীপঙ্কর বললে—খবরদার খবরদার, অমন কাজ করবেন না। আপনি বরং কাশ্মীরে নিয়ে যান স্ত্রীকে, দেখুন হয়ত ভাল হয়েও যেতে পারে—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—কিন্তু কী করে যাই বলুন, টাকা কোথায় পাবো? একে তো মাইনে পাই পঁচাশি টাকা, ওর কাছে বলেছি একশো দশ, প্রত্যেক মাসে তো ওকে দেখাবার জন্যে এই পঁচিশ টাকা ধার করতে হয় আমাকে—

—তা শোধ করেন কী করে?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—শোধ তো করি না! এখন চারদিকে তাই ধার হয়ে গেছে। এখন কাবলীওয়ালারাও আসে সুদ চাইতে। আসল দূরের কথা, সুদও দিতে পারি না কাউকে। দেব কোত্থেকে? ওই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, আর দু' চার টাকা করে মিটিয়ে দিই—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ভাবলে। বললে—তা হোক, তবু আপনি কাশ্মীরে নিয়ে যান স্ত্রীকে।

গাঙ্গুলীবাবু বললে—বলছেন কি আপনি? কাশ্মীরে যাবো আমি? ওর ভগ্নিপতিরা বড়লোক, তারা ন'শো হাজার মাইনে পায় তারা যাক কিন্তু আমি যাবো কী করতে?

দীপঙ্কর বললে—তাহলে যে আপনার স্ত্রী বললেন কাশ্মীরে যাচ্ছেন আপনারা?

—সে ওই স্তোক দিয়েছি, আর কি! স্তোক না দিলে যে আবার পাগল হয়ে যাবে সেনবাবু!

—কিন্তু স্তোক দিয়ে দিয়ে আর কতদিন এমনি করে ঠেকিয়ে রাখবেন?

গাঙ্গুলীবাবু বললে—যদ্দিন পারি। আর তারপর যা-হয় হবে। আমি আর ভাবতে পারি না সেনবাবু। নইলে আমি তো লেখাপড়া শিখেছিলুম, এম-এ পাশও করেছিলুম কিন্তু কে জানতো জার্নাল সেকশানে একবার ঢুকলে আর সেখান থেকে বেরোন যাবে না—

দীপঙ্কর বললে—সে আমি যা-হয় করবো, কিন্তু স্ত্রীকে আপনি কাশ্মীরে নিয়ে যান—

—কিন্তু খরচ কে দেবে? দু' এক টাকার ব্যাপার তো নয়, অন্তত আট ন'শো টাকা কম করেও।

দীপঙ্কর বললে—তার জন্যে আপনি ভাববেন না, সে আমি দেব—

—কিন্তু অত টাকা আমি শোধ করবো কি করে?

—সে আপনি যখন হোক শোধ করবেন। আর শোধ না-করতে পারেন, করবেন না।

তারপর গাঙ্গুলীবাবুর দিকে ফিরে আবার বললে—ঘটনাচক্রে আমি আপনার চেয়ে বেশি মাইনে পাই, ঘটনাচক্রে আমি আপনার মাথায় গিয়ে বসেছি। কিন্তু আর কেউ না-জানুক, আমি তো জানি যে, তাতে আমার নিজের কোনও বাহাদুরি নেই। গবর্নমেন্টের আপিস, ওখানে আমার মধুকে বসিয়ে দিলেও কাজ চলে যায়, কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না, আমার কিছু টাকা আছে এখন হাতে, আপনি যান কাশ্মীরে। ধরে নিন স্ত্রীর এটা রোগ, রোগ হলেও তো ডাক্তার-ওষুধের পেছনে খরচ করতে হতো—! দেখুন না, হয়ত এতেও রোগ সেরে যেতে পারে।

—যে বউকে শাড়ি-গয়না দিতে পারে না, যে বৌকে খেতে-পরতে দিতে পারে না, যে বউকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে না, তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি, তার গলায় দড়ি—

অনেকক্ষণ পরেও কথাটা কানের মধ্যে বাজছিল। সত্যিই তো, এও একটা রোগ! দীপঙ্কর ট্রামে বসে বসে অনেক কথা ভাবছিল। কাল আবার নতুন ঘরে, নতুন চেয়ারে গিয়ে বসতে হবে। মিস্টার ঘোষাল গিয়ে বসতে আরম্ভ করবে রবিন্সন্ সাহেবের ঘরে। আবার সেই নতুন করে দায়িত্ব নিতে হবে। আবার নতুন করে চলবে রেলের চাকা! এতদিন রবিন্সন্ সাহেবের রাজত্ব ছিল। নামে ক্রফোর্ড সাহেব মাথার ওপর ছিল। কিন্তু আসলে রবিন্সন্ সাহেবই তো ছিল সব।

ফেয়ারওয়েল মিটিংএ সাহেব অনেক কথাই বলেছিল। কিছুই বিশেষ কানে যায়নি। সাহেব ইণ্ডিয়াকে ভালবেসে ফেলেছিল। বড় অপাত্রে পড়েছিল সাহেবের ভালবাসা। কোন্ দূর সাত সমুদ্র তের নদীর পারের মানুষ কিসের টানে এখানে এসেছিল কে জানে। হয়ত টাকার টানে। টাকাই হয়ত সাহেবকে টেনে এনেছিল ইণ্ডিয়ায়। তারপর এখানে থাকতে থাকতে যেটুকু ইণ্ডিয়া দেখেছিল, সবটাই ভাল লেগে গিয়েছিল। সাহেব কাউকে উপোস করতে দেবে না। কোনও মানুষের দুঃখ সইতেও পারতো না সাহেব। হাতের কাছে যে-মানুষ ক'টা এসেছিল, তাদের ওপরেই সবটুকু ভালবাসা ঢেলে দিয়ে সাহেব চলে গেল। তার বাইরে আর কিছুই দেখলে না। কিন্তু সাহেব জানতে পারলে না যে, যে-রেলের চাকরি করতে সাহেব ইণ্ডিয়ায় এসেছিল, সেই রেলও গরীব মানুষদের বড়লোক করবার জন্যে আবিষ্কার হয়নি। সাহেব জানতে পারলে না যে, শুধু রেলই নয়। সব কল-কব্জাই একদিন তৈরি হয়েছিল গরীব মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নেবার জন্যে। ওই টেলিগ্রাফ, ওই স্টীম-ইঞ্জিন, ওই কাপড়ের কল—ওসব শুধু বড়মানুষদের আরো বড়লোক করবার জন্যে, আর গরীবদের আরো গরীব। যখন সেই এইটিন্থ সেঞ্চুরীতে কলকব্জার জোয়ার এল য়ুরোপে, তারও আগের কথা! কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন—কত সব প্রাতঃস্মরণীয় নাম। কে ভেবেছিল তাঁদের সেই সব আবিষ্কার অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে এমন করে গরীবদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে আফ্রিকা আর এশিয়ার ভূখণ্ডে। তারা কি জানতো, সেই রেলের আপিসেরই জার্নাল সেকশানের বি-গ্রেড পি-কে-গাঙ্গুলী মাসে মাসে দেনা করে আপাদমস্তক ডুবে যাবে তাদের আবিষ্কারের আশীর্বাদেই। তারা কি জানতো, এই উনিশ শো উনচল্লিশ সালে দীপঙ্কর সেই রেলের চাকরির প্রমোশনের গোলক-ধাঁধাঁয় সারা সন্ধ্যেটা এমনি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। অথচ অবস্থা কি ফেরেনি লোকের? ফিরেছে বৈকি! জুলিয়াস সীজার, ক্যাথেরিন দি-গ্রেট, লুই ফোর্টিন্থ কিংবা আকবর বাদশা পর্যন্ত যে-বিলাসিতার কল্পনা করতে পারেনি, তাই-ই ভোগ করছে বিংশ শতাব্দীর একজন বড়লোক। ওই রবিন্সন্ সাহেবেরই ব্রেকফাস্টের টেবিলে থাকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার আপেল, তানজিয়ারের কমলালেবু, ব্রেজিলের কফি দার্জিলিং-এর চা, অস্ট্রেলিয়ার বীফ আর ডেনমার্কের বেকন। যে খবরের কাগজ রবিন্সন সাহেব পড়ে, তাতে চব্বিশ ঘণ্টা আগের তিব্বতের ভূমিকম্পের কথা যেমন থাকে, তেমনি চিকাগোর শেয়ার মার্কেটের খবরও থাকে। আবার হলিউডের টাটকা আনকোরা নতুন ফিল্ম-স্টার ভিভিয়ান-লে'র কথাও থাকে। কিন্তু রবিন্সন্ সাহেব কি কখনও খবর রেখেছে, কোথা থেকে কত কষ্ট করে কাদের মুখের গ্রাস কেড়ে ওই ব্রেকফাস্টের আয়োজন করেছে তার খানসামা। কোন রেল গাড়িতে চাপিয়ে সেই খাবারগুলো এসে পৌঁছেছে তার টেবিলে। কে সেই ট্রেনের

ড্রাইভার, কে খালাসি? তারা ব্রেকফাস্ট খেয়েছে কি না? কিম্বা রবিন্‌সন্‌ সাহেব কখনও কি ভেবেছে, খবরের কাগজের এই খবরের বাইরেও আরো অনেক খবর আছে, যা ছাপা হয় না, যা ছাপা হতে নেই। যা ছাপা হলে ওই ব্রেকফাস্টের প্লেটেই একদিন ছাই পড়বে! রবিন্‌সন্‌ সাহেবের ব্রেকফাস্ট খাওয়া চিরকালের মত ঘুচে যাবে!

আশ্চর্য! মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে দীপঙ্কর স্বদেশী করবে না সে! কিন্তু রবিন্‌সন্‌ সাহেব যেন সেই স্বদেশীদের বিরুদ্ধাচরণ করতেই তাকে যাবার আগে প্রমোশন দিয়ে গেল। যাতে দীপঙ্করও ব্রেকফাস্ট খেতে পায়। যাতে দীপঙ্করের ব্রেকফাস্টের টেবিলেও ওই সব এসে পৌঁছোয়! কিন্তু দীপঙ্কর তো প্রমোশন না নিলেই পারে! কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে। কে তাকে বলেছে নিতেই হবে প্রমোশন!

দীপঙ্করকে যেন রবিন্‌সন্‌ সাহেব তার সব পাপের উত্তরাধিকারী করে গেল যাবার সময়। কিরণের মা'কে সে যে দশ টাকা করে মাসোহারা দিয়ে আসছে, তাতেই কি তার পাপ স্খালন হবে? সব কলঙ্ক মুছে যাবে? নাকি প্রাঙ্গুলীবাবুকে কাশ্মীরে যাবার খরচ দিলেই তার সব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত হবে?

—দাদাবাবু!

শম্ভুকে দেখে দীপঙ্করও অবাক হয়ে গেছে। শম্ভু ছিল সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে। আর দীপঙ্কর ফার্স্ট ক্লাসে। রাস্তায় নেমেই দেখে ফেলেছে।

শম্ভু বললে—আমি তো আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম—

দীপঙ্কর বললে—ভালোই করেছ এসে, আমারও খুব আগ্রহ ছিল জানতে। বৌদিমণি বাড়িতে পৌঁছোতে খুব হৈ-চৈ হলো তো?

শম্ভু বললে—হৈ-চৈ? বলছেন কি আপনি?

শম্ভু কিছু বুঝতে পারলে না। আবার বললে—কিসের হৈ-চৈ?

দীপঙ্কর বললে—সকাল থেকে কোথায় ছিল তোমার বৌদিমণি, কেউ খোঁজ নেয়নি? বাড়ি ফেরার পর তোমার মা-মণি কিছু বললে না তোমার বৌদিমণিকে?

শম্ভু যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। বললে—কার কথা বলছেন? কে বাড়ি ফিরে গেছে?

—কেন, তোমার বৌদিমণি?

শম্ভু বললে—সেই বৌদিমণির কথা জিজ্ঞেস করতেই তো এসেছি আপনার কাছে। ভোর রাত্তির থেকে তো পাওয়া যাচ্ছিল না, আমার কাছ থেকে আপনার ঠিকানা নিয়েছিল কালকে, তা ভাবলাম এখানেই বোধ হয় এসেছে। সারাদিনের মধ্যে আর সময় করতে পারিনি, তাই এখন আসছিলাম খবরটা নিতে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তোমার বৌদিমণি তো ফিরে গেছে আবার। তুমি

জানো না?

—আজ্ঞে না। কখন?

—তুমি কখন বেরিয়েছ?

শম্ভু বললে—আমি তো খেয়ে-দেয়েই সরকার মশাইএর সঙ্গে মুদিখানায় গিয়েছিলাম। মাসকাবারি চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা সব খরিদ করে বাড়ি ফিরেছি বিকেলে, তখন তো দেখিনি বৌদিমণিকে। শুনিওনি তো কিছু!

দীপঙ্কর বললে—ওই দুপুরবেলাই গিয়ে পৌঁছেছে তোমাদের বাড়িতে। তুমি তখন বাজারে গিয়েছিলে তাই টের পাওনি।

—তারপর বিকেলবেলা অতক্ষণ ছিলুম, তা-ও তো কিছু কানে গেল না!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তুমি ওপরে গিয়েছিলে?

শম্ভু বললে—না, ওপরে যাবার আর সময় পেলাম কোথায়? ভাঁড়ারঘরের জিনিসপত্র বার করা হয়েছিল সেইগুলো আমি আর কৈলাস মিলে তুললুম, তারপর সন্ধ্যেবেলা বাতাসীর মা'র মুড়ি আনতে গিয়েছিলুম—

দীপঙ্কর বললে—সেই জেনাই টের পাওনি,—এখন যাও, গিয়ে বৌদিমণির ঘরে গিয়ে দেখবে সব ঠিক আছে—

—তাই যাই!

বলে শম্ভু চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর বললে—তা সকালবেলা খুব হৈ-চৈ করেছিল তো তোমার মা-মণি?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে না, মা-মণির কানে যখন খবরটা দিলে কৈলাস, বুড়ী কিচ্ছু বললে না—না রাম না গঙ্গা না কিচ্ছু—

—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়িসুদ্ধু আমরা সব্বাই অবাক হয়ে গেছি তখন আজ্ঞে। বাতাসীর মা বললে—বুড়ী খুব সেয়ানা মাগী—

ভূতির মা বললে—হ্যাঁ গা, তা খবরটা একবার দেবে না কেউ, বউটা কোথায় গেল?

রান্নাবাড়িতে যে-কজন ঝি ঝিউড়ি কাজ করে, তাদেরই মধ্যে গুজ গুজ ফিস ফিস হতে লাগলো। কৈলাস গিয়েছিল সতীর ঘরে চা দিয়ে আসতে। গিয়ে দেখলে ঘর ফাঁকা। তাড়াতাড়ি গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর দেখেছে। তারপর মা-মণির কাছে গিয়ে বলেছে।

মা-মণি কথাটা শুনে শুধু বললে—দারোয়ানকে ডাক, ডেকে দে—

দারোয়ান এল। বললে—আমি বাইরে খাটিয়ায় শুয়েছিলুম হুজুর, যখন নিদ ভাঙলো, দেখি গেট খোলা—

—তা চাবি কোথায় রেখেছিলে তুমি?

দারোয়ান বললে—হুজুর আমার কাছে—

—তোমার কাছে যদি চাবি ছিল তো গেটের তালা খুললো কী করে?

দারোয়ান আর কিছু জবাব দিতে পারে না।

মা-মণি বললেন—যাও তুমি—

ধমক খেয়ে চলে গেল দারোয়ান। তারপর কৈলাসকে বললেন—সোনা কোথায়? সোনাকে ডেকে দে—

সনাতনবাবুর তখন চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এসে বললেন—কী হলো মা?

মা-মণি বললেন—শোন, এখানে বোসো—

সনাতনবাবু বসলেন। মা-মণি বললেন—বৌমা চলে গিয়েছে, শুনেছ?

সনাতনবাবু বললেন—ও—

—হ্যাঁ, তা সে গেছে আপদ গেছে। আমি চাই না তাই নিয়ে কেউ হৈ-চৈ করুক। গয়না-টয়না যা কিছু ছিল বউমার সে-সব তো আমার কাছেই আছে। দু' একখানা চুড়ি হাতে ছিল, তার জন্যে আমি ভাবি না। এখন তোমায় যে-জন্যে ডেকেছি তা হলো এই যে, তুমি যেন ওই নিয়ে মাথা ঘামিও না আবার, বুঝলে?

সনাতনবাবু বললেন—বুঝেছি—

সনাতনবাবু চলেই যাচ্ছিলেন। মা-মণি আবার ডেকে বললেন—কোথায় গেছে, কী করতে গেছে, কেন গেছে, তা নিয়েও যেন কেউ মাথা না ঘামায়—। দেখি কোথায় যায়! কোথায় গিয়ে এই সুখ পায়। অনেক অহঙ্কার দেখেছি, এবার বৌমার অহঙ্কারটাও না-হয় দেখা যাক—

সনাতনবাবু বললেন—আচ্ছা—

—আর যদি কখনও ফিরে আসে, ফিরে এলেও যেন কিছু বোল না তুমি বাবা। যা বলবার আমিই বলবো। আমিই পছন্দ করে ঘরে এনেছিলুম, এখন আমারই জ্বালা! বড় মেয়ে একদিন পালিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে, ছোট মেয়েও সেই পথ ধরলে আর কি! বংশের ধারা যাবে কোথায়! আর একটা কথা—

সনাতনবাবু দাঁড়ালেন।

মা-মণি বললেন—তুমি যেন বেয়াইমশাইকে কোনও খবরাখবর দিও না আবার এবিষয়ে। যা করবে আমাকে জিজ্ঞেস করে করবে—কেমন?

শুধু দারোয়ান নয়। শুধু সনাতনবাবুও নয়। একে একে সকলেরই ডাক পড়লো। কে কোথায় বৌদিমণিকে দেখেছে সেই ফিরিস্তি দিলে। কারোর কথাতেই কিছু সুরাহা হলো না। আসলে কেউ-ই দেখেনি। সবাই যখন ঘুমোচ্ছিল, সেই সময়েই বৌমা চলে গেছে বাড়ি থেকে।

শম্ভুকেও ধমকালেন মা-মণি। বললেন—তুই-ই যত নষ্টের গোড়া, তোর সঙ্গেই যত শলা-পরামর্শ হতো তার, খবরদার বলে দিচ্ছি শম্ভু, এ-বাড়িতে যদি আর রাখতে চাস তো, মুখ বুজে থাকবি, আমার হুকুম মেনে চলবি, নইলে জুতো পেটা করে দূর করে দেব এখান থেকে। আমারই খাবি সবাই আবার আমারই

গালে কালি দিবি, এ আমি সহ্য করবো না—যা সব এখান থেকে, আপদ বিদেয় হ—

শম্ভু বললে—তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে বাজারে গেলুম সরকার মশাইএর সঙ্গে। তারপর এখন একটু হাল্কা পেতেই দৌড়ে এসেছিলাম—

দীপঙ্কর বললে—তুমি কিছু ভেবো না শম্ভু, আমি তোমার বৌদিমণিকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি, আর বাড়িতে কী ঘটছে এখন, সেটাও কাল সকালে আমাকে একবার জানিয়ে যেও—

শম্ভু চলে যেতে গিয়ে বললে—তা জানাবো, ফুরসুত পেলেই আপনাকে জানাবো—

দীপঙ্কর বললে—আর দেখ, তোমার বৌদিমণিকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে বোল, হুট করে যেন আবার একদিন এখানে চলে না-আসে—আর বোল, আমি বৌদিমণির বাবার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি—ভাবতেও বারণ কোর।

শম্ভু চলে যাচ্ছিল।

দীপঙ্কর আবার মনে করিয়ে দিলে। বললে—তাহলে কালকে খবর দিয়ে যেও বৌদিমণি কেমন আছে, বুঝলে?

শম্ভু চলে গেল। ট্রাম রাস্তা থেকে সোজা আসতে বাড়ির একেবারে কাছে এসে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগলো আবার। মা নেই। মা এতক্ষণ কাশীতে ধর্মশালায় শুয়ে-পড়েছে হয়ত। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছে। পা বোধহয় ব্যথা হয়ে আছে। কাল সকালে বোধ হয় চিঠি আসবে। এই সাড়ে আটটা নটা নাগাদ পিওন এ-রাস্তায় আসে। তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে।

এদিকে সতী ছিল, সে-ও নেই। সতী থাকলেও বেশ হতো। অন্তত এত ফাঁকা লাগতো না আর তাহলে। আশ্চর্য মেয়ে বটে। বাবাকে চিঠি লিখেছে, তবু নিজের বিপদের কথাটা লেখেনি। কী জেদী মেয়ে সতী! এত জেদ কিসের? কে শেখালে এত জেদ?

সদর দরজার কড়া নাড়তেই কাশী দরজা খুলে দিয়েছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, সকাল বেলা দিদিমণিকে ভালো করে খেতে দিয়েছিলি তো?

কাশী বললে—না দাদাবাবু, খায়নি—

—সে কীরে, না খেয়েই চলে গেল?

কাশী বললে—না, আমি অনেক সাধাসাধি করলুম, কিছুতেই খেলে না। আর কী চেঁচামেচি দুজনে। সে চেঁচানিতে কান পাতা যায় না কিছুতে—একজন যত চেঁচায়, আর একজন তত চেঁচায়—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। অফিস যাবার সময় দীপঙ্কর দেখে গিয়েছিল লক্ষ্মীদির কোলে মাথা রেখে সতী কাঁদছে। ভেবেছিল বুঝি দু' বোনে খুব

ওখন হয়ে গেল।

—তার তারপর?

কাশী বললে—তারপর একজন তো রেগে-মেগে বাড়ি থেকে চলে গেল, আর একজন দিদিমণি রইল—

—কে রইল?

কাশী বললে—প্রথমে সকালবেলা যে-দিদিমণি এসেছিল—সেই দিদিমণি—

অবাক কাণ্ড। সতী যায়নি তাহলে? তাড়াতাড়ি সেই অবস্থায়ই ওপরে উঠে গিয়ে ঘরের সামনে যেতেই দেখলে সতী তার বিছানাতেই চোখ বুজে সেই রকম শুয়ে আছে। দীপঙ্করের জুতোর আওয়াজ পেতে চোখ খুললে।

দীপঙ্কর বললে—কী হলো? তুমি যাওনি?

সতী বললে—আমি যাবো না, দেখি লক্ষ্মীদি কী করতে পারে।

—কেন লক্ষ্মীদি কী করলে? অফিস যাবার সময় দেখে গেলাম সব মিট-মাট হয়ে গেছে, হঠাৎ আবার কী হলো! আর তাছাড়া তুমি খেলে না-ই বা কেন? সারাদিন ঝগড়া করে উপোস করে রইলে? তোমার সত্যিই কী হলো বলো তো? আমি অফিস থেকে বেরিয়ে ভাবছি এতক্ষণে তুমি বোধ হয় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সব মিট-মাট করে ফেলেছো—

সতী বললে—না আমি আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকবো—

বলে আবার চোখ বুজলো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু খেলে না কেন? উপোস করলে কার ওপর রাগ করে?

সতী বললে—তোমার ওপর—

দীপঙ্কর হেসে বললে—তুমি রাগ করে না খেলে কি আমি জব্দ হবো মনে করেছ? আর এদিকে আমি যে পেট ভরে খেয়ে আবার টিফিন খেলুম—চলো ওঠো ওঠো—খেয়ে নাও—

কাশীও পেছন-পেছন এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। দীপঙ্কর বললে—খাবার দে আমাদের, দুজনে এক সঙ্গে খাবো—

কাশী চলে যেতে দীপঙ্কর বললে—আশ্চর্য দেখ, আমি ধরে বসে আছি যে তুমি চলে গিয়েছ, এই একটু আগে শম্ভু এসেছিল তোমার খোঁজে—

—শম্ভু?

সতী এতক্ষণে চমকে উঠে মুখ তুললো। বললে—শম্ভু এসেছিল? আমার খোঁজে? কী বললে সে? বাড়িতে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে তো ওখানে?

দীপঙ্কর বললে—তা তো হবেই, তোমার শাশুড়ী সব্বাইকে ডেকে বলে দিয়েছেন, যেন এই নিয়ে ঘোঁট পাকানো না হয়, সনাতনবাবুকেও বলে দিয়েছেন!

সতী জিজ্ঞেস করলে—শম্ভু আর কী বললে?

দীপঙ্কর বললে—আর কিছু বললে না।

সতী বললে—তা শম্ভুকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন এখানে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি কি জানি যে তুমি এখনও এখানে আছো, আমি জানি লক্ষ্মীদির সঙ্গে তুমি চলে গিয়েছ, লক্ষ্মীদি তোমাকে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে পৌঁছে দিয়েছে। অফিস যাবার আগে তো সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল?

সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—শম্ভু ওঁর কথা কী বললে? উনি কি খুব মুষড়ে পড়েছেন?

—কার কথা বলছো? সনাতনবাবু? তাঁর কথা তো শম্ভু কিছু বললে না।

সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—কিচ্ছু বললে না? কোন্ ঘরে শুচ্ছেন এখন?

—তা তো আমি জিজ্ঞেস করিনি!

সতী বললে—তাহলে তুমি কী আর জিজ্ঞেস করলে? তুমি তো জিজ্ঞেস করবে আমি চলে আসার পর কী হচ্ছে বাড়িতে? দারোয়ানের চাকরি গেছে কিনা, বাতাসীর মা কী বলে, ভূতির মা কী বলছে—সেই সব কথাই তো আসল! সেইগুলোই জিজ্ঞেস করলে না?

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা, কাল তো শম্ভুকে আসতে বলেছি, সে এলে সব কথা তাকেই জিজ্ঞেস কোর—

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু তা তো হলো, এখন তুমি গেলে না কেন?

সতী প্রথমে কিছু উত্তর দিলে না। তারপর একটু থেমে বললে—আমি চলে গেলেই কি তুমি খুশী হতে?

হঠাৎ সতীর এ-প্রশ্নের জন্যে দীপঙ্কর যেন প্রস্তুত ছিল না। বললে—তুমি শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে-গুনিয়ে সুখে ঘরকন্না করবে এইটেই তো স্বাভাবিক, এইটেই তো লোকে দেখতে চায়।

—লোকের কথা ছেড়ে দাও, তুমিও কি তাই চাও? তুমিও কি চাও আমি ওই বাড়িতে ওই জেলখানার মধ্যে পচে মরি? যেখানে আমার নিজের কথার কোনও দাম নেই, আমার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু জিনিস নেই, যেখানে আমি নামে মাত্র বউ, যেখানে আমার কোনও অধিকারই নেই, সেখানেই থাকি, এইটেই তুমি চাও? তুমি তো জানো তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করেছিলুম বলে আমার অপমানের শেষ ছিল না, আর সে-অপমান তোমার সামনেই আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল? এর পরেও তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলছো?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সেখানে না-গিয়ে কী করবে?

সতী বললে—এতদিন সেই কথা ভাববার সময়ই তো পাইনি, এখন একটু ভাববার সময় দাও—

দীপঙ্কর বললে—সকালবেলা তোমার বাবাকে চিঠি লিখতে বললুম, কিন্তু বাবাকেও তো তুমি নিজের অবস্থার কথা কিছু লেখোনি?

সতী মুখ তুলে চাইল সোজা দীপঙ্করের দিকে। বললে—তুমি কী করে

জানলে? তুমি কি চিঠি খুলেছ আমার?

—হ্যাঁ খুলেছি, কিন্তু বলো কেন তুমি নিজের অবস্থার কথা জানালে না?

সতী বললে—তুমি আমার বাবাকে জানো না তাই অমন কথা বলছো! লক্ষ্মীদির ব্যাপারে বাবা যা কষ্ট পেয়েছেন, এর পর আমার অবস্থা শুনলে আরো কষ্ট পাবেন—

দীপঙ্কর বললে—তিনি কষ্ট পাবেন বলে তুমি নিজের কথা গোপন করে রাখবে? এ কি গোপন রাখবার জিনিস? আর এ কি গোপন থাকবে ভেবেছ?

সতী বললে—তা জানি না, তবে এমনি করে যতদিন লুকিয়ে রাখা যায়, ততদিনই ভালো!

—কিন্তু তারপর?

সতী বললে—তারপরের কথা আমি আর ভাবতে পারি না।

বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দীপঙ্কর বললে—তুমি ভাবতে না-পারো কিন্তু আমাকে তো ভাবতেই হবে—

সতী এবারও কথা বললে না। দীপঙ্কর বললে—একটা কিছু তো জবাব দেবে আমার কথার। তোমার নিজের দায়িত্ব যে এখন আমার দায়িত্ব, তোমার ভালো-মন্দ যে এখন আমারও ভালো-মন্দ—। তোমার ভবিষ্যৎ-ভাগ্যের সঙ্গে যে আমারও ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছ!

সতী এবার মুখ তুলে চাইল। বললে—তার মানে?

দীপঙ্কর বললে—তুমি যদি সেদিন আমাকে তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে না-খাওয়াতে তো আমার কিছু বলবার ছিল না। তোমার সঙ্গে আমার যদি আবার দেখা না-হতো তো আমিও তোমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু এখন তো আর তার উপায় নেই। এখন যে তুমি আমার বাড়িতে এসে উঠেছ, এখন যে এক-বাড়িতে এক-ঘরে বসে আছ আমার সঙ্গে—এ-কথা যে আর কারো জানতে বাকি থাকবে না দু'দিন পরে—

সতী হাসলো ঠোঁটের আড়ালে। বললে—কেউ জানতে পারবে বলেই বুঝি তোমার এত ভয়?

দীপঙ্কর বললে—ভয় আমার নয়, আমি পুরুষ মানুষ—কিন্তু তুমি যে মেয়েমানুষ। ভয় তো তোমারই।

সতী বললে—আমার ভয়ের জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

দীপঙ্কর বললে—তোমার জন্যে আমি ভাববো না তো কে ভাববে? কে আছে তোমার এখানে?

সতী বললে—আমার জন্যে যদি তোমার এতই ভাবনা তো আমাকে না-হয় তোমাদের বাড়িতে থাকতে দাও দুটো দিনের জন্যে, আমি একটু ভালো করে ভেবে দেখি নিজের অবস্থাটার কথা!

কাশী হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। বললে—খাবার দেব দাদাবাবু?

দীপঙ্কর সতীকে জিজ্ঞেস করলে—এখন খাবে তো, না এ-বেলাও আমার ওপর রাগ করে উপোস করে থাকবে?

সতী হেসে বললে—সত্যিই আমি সকালবেলা তোমার ওপর রাগ করেছি নাকি—আচ্ছা সকালবেলা কেন তুমি লক্ষ্মীদিকে ডেকে এনেছিলে বলো তো? তুমি কি ভেবেছিলে তোমার কথা না-শুনে আমি লক্ষ্মীদির কথা শুনবো? তোমার চেয়ে লক্ষ্মীদিই বড়ো হলো আমার কাছে?

দীপঙ্কর কাশীকে বললে—খাবার দে আমাদের—

তারপর সতীর দিকে চেয়ে বললে—লক্ষ্মীদি না তোমার নিজের মায়ের পেটের বোন? তার কাছে আমি কে তোমার?

সতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তুমি সকাল থেকে আমাকে অনেক অপমান করেছ দীপু, আমি মুখ বুজে সব সহ্য করেছি, আর আমার সহ্য হচ্ছে না—তুমি চুপ করো—

দীপঙ্কর আর কিছু না বলে পাশের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে নিলে। তারপর বেরিয়ে এ-ঘরে এসে সন্তোষকাকার মেয়ের শাড়িটা দিয়ে বললে—এইটে তুমি পরে নাও—

সতী শাড়িটা নিলে। তারপর বললে—যার শাড়ি সে যদি জানতে পারে তো রাগ করবে না?

দীপঙ্কর বললে—সে-ভাবনা তোমার নয়, রাগ করলে তোমার ওপরে তো আর রাগ করবে না—

সতী বললে—তোমার ওপরে রাগ করলেও তো আমাকেই ভাবতে হবে!

—কেন? আমার ওপর রাগ করলে তোমার তাতে কী!

সতী হেসে ফেললে। বললে—বা রে বা, মিছিমিছি আমি কেন দু'জনের মধ্যে কাঁটা হয়ে থাকবো বলো তো?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তুমি যা ভেবেছ তা নয়, কাশী তোমাকে সব ভুল বুঝিয়েছে—

সতী বললে—ভুল হোক ঠিক হোক, আমি কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যাই মাঝখান থেকে—

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, তোমার শ্বশুরবাড়িতেও তো আমি নিমিত্তের ভাগী হয়ে আছি, এর পরে তুমি নিমিত্তের ভাগী হলে না-হয়, শোধ-বোধ হয়ে যাবে—যাও, ও-ঘরে গিয়ে কাপড়টা বদলে এসো—দেরি করো না—

ওা কাশী নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে রান্না-বান্না করেছিল মন্দ না। দীপঙ্কর বার বার চেয়ে চেয়ে দেখলে সতী খাচ্ছে কি না। আগের দিন সতীদের বাড়িতে সতী সামনে বসিয়ে দীপঙ্করকে খাইয়েছিল। সেদিন অনেক আয়োজন, অনেক অনুষ্ঠান করেছিল সতী দীপঙ্করকে একরকম না-জানিয়েই বলতে গেলে।

সেদিন ছিল দীপঙ্করের জন্মদিন। আর আজ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থায় সতী এসে পড়েছে। নিতান্ত অযাচিত, রবাহূত নেমন্তন্ন।

দীপঙ্কর বললে—পেট ভরে খাও সতী, আজকে তো আর বাড়িতে মা নেই যে তোমাকে আদর করে সেধে-সেধে খাওয়াবে! আর তা ছাড়া আমি ঠিক মনের কথা মুখে বলতেও পারি না।

সতী বললে—বহুদিন থেকে আমার একটা সাধ ছিল যে তোমার জন্মদিনে ভালো করে তোমাকে খাওয়াবো—উল্টে তুমিই আজ আমাকে খাইয়ে দিলে দীপু—

দীপঙ্কর বললে—এখনো কিন্তু সেইদিনকার কথাটা ভুলতে পারি না, মনে হয় কেন তুমি আমাকে অমন করে খাবার নেমন্তন্ন করেছিলে সেদিন!

সতী বললে—কিন্তু সেদিন খাবার নেমন্তন্ন করেছিলুম বলেই তো আজকে এখানে এমন করে দুজনে এক সঙ্গে খেতে বসবার সুযোগটা হলো!

দীপঙ্কর বললে—কথাটা তুমি এমন করে বললে যেন মনে হচ্ছে খেতে তোমার খুব ভাল লাগছে—! অথচ মা থাকলে কি তোমাকে এই খাওয়া খেতে দিতে পারতো? সেদিন তুমি আমার জন্যে কত-কী খাবার আয়োজন করেছিলে বলো তো। কত রকম রান্না করেছিলে সারা দিন ধরে? কী কষ্টটাই না করেছিলে আমার জন্যে?

সতী বললে—কিন্তু কী লাভটাই বা হলো তাতে তোমার?

দীপঙ্কর বললে—বাঃ, বলছো কী? লাভ হলো না, কত ভাল-ভাল জিনিস খেতে পেলাম!

সতী বললে—জানো, তুমি চলে আসার পর আমি সেদিন কিছু খাইনি, খেতে পারিনি—সারারাত কেবল নিজের মনেই হায়-হায় করেছি, আর কেঁদেছি—। উনি বললেন—দীপঙ্করবাবুকে আর একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিও—

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবু কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসেন সতী—

সতী বললে—সত্যিই মানুষটা তো খারাপ নয় দীপু—আমার রাগ হয় বটে ওঁর ওপর, কিন্তু সত্যিই মানুষটা খারাপ নয়—। এত ভাল মানুষ যে মাঝে-মাঝে যখন বকি ওঁকে, কষ্টও হয় নিজের—

দীপঙ্কর বললে—তুমি হাসালে সতী—

সতী বললে—তুমি ঠিক বুঝবে না দীপু! আর তোমারই বা দোষ কী, কেউই বোঝে না। যে শুনবে ভাববে বুঝি আমারই দোষ! বুঝি আমিই ঝগড়া করি দিনরাত, আমিই বুঝি সাধ করে অশান্তি সৃষ্টি করি, আমিই বুঝি ও-বাড়িতে সব অশান্তির মূল।

কথা বলতে বলতে সতীকে যেন নেশায় পেয়ে গিয়েছিল সেদিন। কথা বলতে বলতে সতী সেদিন ক্রমেই যেন বড় সহজ হয়ে গিয়েছিল। সকালবেলার সেই রুক্ষ মেজাজের মানুষ যেন আর নয় সে তখন। কাশী পরিবেশন করছে

দুজনকে। বালিগঞ্জের স্টেশন রোডে সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উতরে গেছে। সেই গোল গোল চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে ভাত খেতে খেতে সতী যেন ভুলে গেল কোথায় কাদের বাড়িতে বসে সে গল্প করছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলের খোঁপাটা আলগা হয়ে কাঁধে ঝুলছে। কথা বলতে বলতে সে যেন ক্রমে সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোরদাদুর দোতলা ভাড়াটে বাড়ির ভেতরে রান্না-ঘরে চলে গিয়েছে একেবারে। বিয়ের আগের সেই ছোট্ট চঞ্চল ছটফটে মেয়েটি। দীপঙ্করের তখন খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সতীর তখনও শেষ হয়নি। একটু একটু করে মুখে দিচ্ছে আর গল্প করছে।

সতী হঠাৎ বললে—ওমা, ওই দ্যাখ, গল্প করতে করতে কত ভাত খেয়ে ফেলেছি দেখেছ—

দীপঙ্কর বললে—তাতে কী হয়েছে, এখানে খেতে আর দোষ কী! এ তো আর শ্বশুরবাড়ি নয়—

সতী উঠলো। বললে—এবার ওঠো, ওঁর কথা বলতে বলতে খেয়ালই ছিল না একেবারে—

হাত ধুয়ে ঘরে বসেও সতী যেন তখনও আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সনাতনবাবুর কথায়।

বললে—জানো দীপু, ও-মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া আমার কপালে হয়নি, অথচ কতদিন আমার সাধ হয়েছে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসি, দুজনে গল্প করি, দুজনে একসঙ্গে মুখোমুখি হয়ে থাকি—।

দীপঙ্কর বললে—তা করো না কেন? সময় হয় না বুঝি?

সতী বললে—ওমা, সময় হবে না কেন? সময় তো অঢেল, ওঁরও সময় যথেষ্ট, আমারও কোনও কাজ নেই—

—তাহলে অসুবিধেটা কোথায়?

সতী বললে—ওদের ওখানে নিয়ম নেই যে, স্বামী আগে খাবে, শাশুড়ী খাবে, তারপর বাড়ির বউ, তারপর ঝি-চাকর সবাই—

দীপঙ্কর বললে—এসব নিয়ম তো সেকালে ছিল, একালে কে আর ও-নিয়ম মানে?

সতী বললে—কেউ না মানুক, ওরা মানে!

দীপঙ্কর বললে—তা ও-নিয়ম না মানলেই পারো তোমরা? তুমি সনাতনবাবুকে নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেই পারো—তোমাদের গাড়ি রয়েছে, চাকর-বাকর রয়েছে, ঠাকুর রয়েছে, ভাবনা কী?

সতী বললে—সে হলে তো বেঁচে যেতাম দীপু, উনি যদি আমাকে একটু বকতেন, কিম্বা বারণ করতেন, তাতেও ভালো লাগতো, তবু বুঝতুম যে আমি বলে একটা মানুষ আছি সংসারে। কিন্তু উনি এক-এক সময়ে ভুলে যান যে আমি বেঁচে আছি, ভুলে যান যে আমারও একটা নাম আছে! তা নয় আমি

যেন বাড়ির একটা টেবিল কি চেয়ার কি আলনা কি ওমনি একটা কিছু—আমি যেন ও-বাড়ির একটা ফার্নিচার ছাড়া আর কিছু নই—

তারপর একটু হেসে ফেললে।

দীপঙ্কর বললে—কী হলো? হাসছো যে হঠাৎ?

সতী বললে—হঠাৎ হাসি পেল—জানো দীপু, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা বলো তো আমার নাম কী? আমি রসিকতা করেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলুম, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ভাই, আমার নামটাই ভুলে গেছেন—

দীপঙ্কর বললে—সে কি? তাই কখনও হতে পারে?

সতী বললে—সত্যি ভাই দীপু, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

সতী সত্যিই নিজের একটা আঙুল দিয়ে দীপঙ্করের হাতটা ছুঁলে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী রকম?

—আর কী রকম! হঠাৎ কথাটা জিজ্ঞেস করতেই যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন। বললেন—নাম? কী যেন তোমার নামটা, কী যেন—

বলে ভাবতে লাগলেন।

আমি বললাম—যাক্, তোমার আর কষ্ট করে মনে করতে হবে না, খুব হয়েছে—

উনি তখন বললেন—মনে পড়েছে—সতী, সতী—

আমি বললাম—যথেষ্ট হয়েছে, তোমার স্মরণ-শক্তি খুব ভালো, এই স্মরণ-শক্তি নিয়ে তুমি এম-এ পাশ করতে পারলে আর আমার নামটা তুমি ভুলে গিয়েছিলে?

উনি বললেন—আমি একটু অন্য কথা ভাবছিলাম কি না, তাই—

বললাম—তুমি অন্য কথাই ভাবো তাহলে, আমি আর তোমায় বিরক্ত করবো না—

—তা ওমা, আমি যেই ওই কথা বলেছি আর তিনি ওপাশ ফিরেই নাক ডাকিয়ে ঘুম। ভাবতে পারো দীপু, এমন মানুষকে নিয়ে কেউ ঘর করতে পারে। না করতে ভাল লাগে। অথচ মানুষটা যে খারাপ তাও বলতে পারবো না। এমনিতে তো কোনও দোষ নেই। লোকের কত রকমের দোষ থাকে, চরিত্রের দোষ যাকে বলে। বড়লোকের ছেলে, চরিত্রের দোষ থাকলেই বা আর আমি কী করতে পারতুম? মদের নেশাও থাকতে পারতো। তা সে-সব কিচ্ছু নেই। একেবারে সাধু-পুরুষ যাকে বলে আর কি! এমন কি পানটা পর্যন্ত খান না। বাড়িতে বাস করেন, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন, নইলে গেরুয়া পরিয়ে দিলে ওঁকে সন্ন্যাসী বলতুম আমি। পুরোপুরি সন্ন্যাসী হলেও তবু বাঁচতুম। ভাবতুম যে হ্যাঁ আমার সঙ্গে না-হয় একজন সন্ন্যাসীরই বিয়ে হয়েছে—। কিন্তু এ এদিকেও না, ওদিকেও না, এক-এক সময়ে মনে হয় উনি মাতাল লম্পট চরিত্রহীন হলেও বুঝি ভালো হতো এর চেয়ে। তবু বুঝতে পারতুম যে উনি

মানুষ। কিন্তু এ যে পুরোপুরি দেবতাও নয় আবার পুরোপুরি মানুষও নয়। এ যেন দুইএর মাঝামাঝি।

তারপর হঠাৎ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা, তুমিই বলো তো দীপু, পুরুষ-মানুষ পুরুষ-মানুষের মত না হলে কারো ভালো লাগে?

দীপঙ্কর এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। সতীর গলার সুরে কোথায় যেন একটা কান্নার সুর মেশানো ছিল। অভিযোগ নয়, অনুযোগ নয়, কান্না। দীপঙ্করের সত্যিই মায়া হলো সতীর ওপর।

—তা এসব কথা তোমাকে বলছি বলে যেন কিছু মনে করো না দীপু।

—না, না, তুমি বলো না।

সতী বললে—আর তাছাড়া তোমাকে না-বললে আর কাকে বলবো বলো? এসব কে শুনবে আর কে-ই বা বুঝবে? আর কারই বা এত মাথা-ব্যথা হবে আমার জন্যে! বাবাকে তো এসব কথা বলা যায় না। আর লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি গোল্লায় না-গেলে হয়ত বুঝতো! কিন্তু লক্ষ্মীদি তো আমার সে-রকম দিদি নয়। একেবারে গোল্লায় গেছে। আশ্চর্য, লক্ষ্মীদি কিনা মদ খায়। আমি কি সাধ করে ঝগড়া করলুম আজ!

দীপঙ্কর বললে—কে বললে তোমাকে মদ খায়?

সতী বললে—আমি জেনেছি—

—লক্ষ্মীদি তোমাকে বলেছে?

সতী বললে—না, আমি যে মুখে গন্ধ পেলুম। তুমি আপিস যাবার পর আমাকে উপদেশ শোনাতে এসেছিল। ভাবলাম হয়ত এখন নানান্ কষ্টে ভুগে ভুগে অনুতাপ হয়েছে লক্ষ্মীদির। কিন্তু মুখে মদের গন্ধ পেতেই আমি ধরলাম। বললাম তুমি মদ খাও লক্ষ্মীদি? তোমার মুখে মদের গন্ধ পাচ্ছি যে—

লক্ষ্মীদি বললে—না, ও হোমিওপ্যাথিক্ ওষুধের গন্ধ—

প্রথমে লুকোতে চেষ্টা করেছিল, জানো দীপু। প্রথমটায় ভেবেছিল আমি বুঝতে পারবো না। কিন্তু রেঙ্গুনে বার্মিজদের দেখেছি তো, রাস্তা দিয়ে মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে যেত। ও আমার চেনা গন্ধ। আমি এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দিলুম লক্ষ্মীদিকে। বললাম—বেরিয়ে যাও এ-ঘর থেকে। তুমি মদ খেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ?

ধাক্কা দিতেই লক্ষ্মীদি একেবারে ওইখানে ওই দেয়ালে লেগে ছিটকে পড়ে গেল মেঝের ওপর।

দীপঙ্কর বললে—সর্বনাশ! তাই নাকি? লাগেনি তো?

সতী বললে—লেগেছে বৈ কী? খুব লেগেছে, বোধ হয় মাথাটা কেটে গেছে, আমি তখন রেগে গেছি, আমার কোনও জ্ঞান নেই তখন, আমাদের চেঁচামেচিতে তোমার চাকরটাও দৌড়ে এসেছে। সেই অবস্থাতেই আমি লাথি মেরেছি লক্ষ্মীদিকে, যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়েছি, যা মুখে আসে তাই

মনে চেঁচিয়েছি—

দীপঙ্করের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। বললে—ছি ছি, লক্ষ্মীদিকে তুমি মারলে? লাথি মারলে লক্ষ্মীদিকে?

সতী বললে—কী করবো? তখন কি আমার জ্ঞান আছে? আমি তখন নিজের জ্বালায় জ্বলছি, ক'দিন ঘুমোতে পারিনি, ক'দিন খাইনি, চান করিনি তার ওপর লক্ষ্মীদির কাণ্ড দেখে আমার মাথায় রাগ চড়ে উঠেছে—

—তারপর কী হলো?

সতী বললে—তারপর আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম—বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও—। লক্ষ্মীদির মাথায় তখন বোধহয় খুব জোরে লেগেছে। দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল—বোধহয় মাথাটায় খুব লেগেছে—

দীপঙ্কর বললে—ছিঃ, তুমি লক্ষ্মীদিকে এই রকম ভাবে মারলে? আগে জানলে আমি নিয়ে দেখে আসতাম—আমি নিজে গিয়ে যে তাকে ডেকে এনেছিলাম, লক্ষ্মীদি আসতে চায়নি। দেখো তো কী সর্বনাশ করলে তুমি! তার কত কষ্ট তুমি তা জানো? জানো যে লক্ষ্মীদি ছাড়া অন্য কোন মেয়ে হলে এতদিন কোথায় ভেসে তলিয়ে যেত।

—তলিয়ে যেতে আর বাকিটা কী আছে?

দীপঙ্কর বললে—ও-রকম করে বলতে নেই সতী—ছি। দিদি হোক আর না-হোক, মানুষ তো! লক্ষ্মীদিও তো মানুষ। ভুল তো মানুষেই করে, পাপ তো মানুষেই করে, তোমার নিজের কথাটাই আজ ভাবো না!

সতী বললে—তা বলে মদ খাবে লক্ষ্মীদি? মদ কখনও ভদ্র-মেয়েমানুষরা খায়?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কেন খায় সেটা তো তুমি জিজ্ঞেস করোনি লক্ষ্মীদিকে! তাহলে আর তোমার অমন রাগ হতো না—

সতী বললে—কিন্তু তার জন্যে তো লক্ষ্মীদি নিজেই দায়ী, নিজে সাধ করে যদি কেউ দুর্ভাগ্য ডেকে আনে তো কাকে দোষ দেবে? সেটা বলো?

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা ধরে নিলাম লক্ষ্মীদি না-হয় নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেই দায়ী, লক্ষ্মীদি না-হয় বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অসামাজিক কাজ করে ফেলে তাই এত কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তুমি? তোমাকে তো তোমার বাবা অনেক দেখে শুনে অনেক টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছেন, অনেক বড়লোক তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকরা, অনেক বংশ-মর্যাদা, কোথাও কোনও খুঁত নেই—তবু তুমি কেন কষ্ট পাচ্ছো? তোমাকে কেন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে? জবাব দাও এর?

সতী যেন সত্যিই কোনও উত্তর খুঁজে পেলে না এ কথার।

তারপর হঠাৎ এক-সময়ে বললে—সত্যি বলো তো আমি কী করি?

দীপঙ্কর বললে—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি—

—কী? কী বলেছ?

দীপঙ্কর বললে—তোমার শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে যাওয়া উচিত—

সতী বললে—কিন্তু সেখানে যে আমার সুখ নেই, শান্তি নেই, সেখানে থাকলে যে আমি পাগল হয়ে যাবো, সেখানে থাকলে যে আমি আত্মঘাতী হবো—

দীপঙ্কর বললে—অত ভেবো না ও-নিয়ে। যত ভাববে তত অশান্তি বাড়বে—

—কিন্তু না-ভেবে যে থাকতে পারি না আমি দীপু! স্বামীর কথাও ভাববো না, নিজের সুখ-দুঃখের কথাও ভাববো না তো বাঁচবো কী নিয়ে? আমার কি ছেলে আছে, আমার কি মেয়ে আছে যে তাদের বুকে করে সব ভুলে থাকবো?

দীপঙ্কর দেখলে সতী যেন ক্রমেই মুষড়ে পড়ছে কথা বলতে বলতে। যেন আর কিছুক্ষণ কথা বললেই একেবারে ভেঙে পড়বে। বললে—যাও ওঠো, এবার শুয়ে পড়োগে যাও, ক'দিন ঘুমোওনি, না ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তোমার শরীরটাও ভেঙে পড়বে শেষকালে!

সতী বললে—কিন্তু তুমি আমাকে বলো দীপু, কী করবো? আমার কী গতি হবে? আমি কোথায় থাকবো, কার কাছে যাবো, কে আমায় বাঁচাবে?

দীপঙ্কর বললে—এ-সব কথা যত আলোচনা করবে, যত ভাববে তত মন-খারাপ হয়ে যাবে, তত শরীরটাও ভেঙে পড়বে—চলো ওঠো—ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে—

নিচেয় কাশী বোধহয় তখন রান্নাঘর ধুচ্ছিল। ঝাঁটার আওয়াজ আসছে ওপরে। বাইরে বড় রাস্তার ট্রামের আওয়াজও এতক্ষণে কানে আসছে। দীপঙ্করের ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। সেই ভোর থেকে এত রাত পর্যন্ত কত জায়গায় ঘুরেছে। কত দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করেছে। কত আনন্দের কত বেদনার আর কত উত্তেজনার সংঘাতে জর্জরিত হয়েছে, এখন এতক্ষণ পরে তারও যেন ক্লান্তি নেমে এল শরীরে।

সতী বললে—আমার জন্যে তোমাকেও কত কষ্ট দিচ্ছি দীপু, তোমারও ঘুম পাচ্ছে হয়ত—তুমি তো সারাদিনই ঘুরছো, সারাদিন অফিসে খেটে কাজ করে এসেছ—

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা যাক, একটা দিন বেশি খাটলে আমার এমন কিছু ক্ষতি হবে না—

সতী বললে—কিন্তু আমি যে কী করি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না—। দেখ দীপু, এ নিয়ে যে একা-একা কত ভেবেছি কী বলবো তোমাকে। আজ তো তবু তুমি আছো, তোমার সঙ্গে কথা বলে তবু খানিকটা হাল্কা হচ্ছি। কিন্তু এমনি রোজ ভাবি ভাই। বিছানায় শুই গিয়ে আর ভাবনাগুলোও পাখা মেলতে শুরু করে। ভেবে-ভেবে শেষকালে আর কূল-কিনারা পাই না। ঘড়িতে ঢং ঢং

করে দশটা বাজে, এগারোটা বাজে, বারোটা বাজে, একটা বাজে—কখন সব কটা বেজে যায় একে একে, কখন রাত কাবার হয়ে যায়, সব শুয়ে শুয়ে টের পাই—কিন্তু কিছুতেই কিছু উপায় বার করতে পারি না—

দীপঙ্কর বললে—কাল সকালে উঠে যা ভাববার ভেবো, এখন ঘুমোও গিয়ে—

সতী বললে—ঘুমোবার জন্যে চোখ ঢুলে আসছে আমারও, কিন্তু শুলেই ঘুমগুলো সব কোথায় উড়ে পালাবে—তখন চিৎ হয়ে শুয়ে এলোপাতাড়ি যত রাজ্যের ভাবনা ভাবতে বসবো—

—কিন্তু ভেবে তো কিছু করতেও পারবে না!

সতী বললে—না তা-ও পারবো না, কিন্তু শুধু ভাববো—এই-ই আমার রোগ—

দীপঙ্কর বললে—কাল সকালে শম্ভুকে আসতে বলেছি, সে যা বলে তা শুনে ব্যবস্থা করো—

সতী বললে—সে-মানুষকে তো তুমি চেনো না দীপু, তাই এমন কথা বললে—

দীপঙ্কর বললে—আমি ভাল রকমই চিনেছি, সনাতনবাবুর মত স্বামী কারো হয় না—

সতী বললে—অমন স্বামী যেন কারো না হয় দীপু, যেন কারো না হয়! ওর চেয়ে যদি বাবা আমাকে একটা গরীব কেরানীর সঙ্গেও বিয়ে দিতেন তাতেও যেন আমি সুখী হতে পারতাম ভাই। ছোট বাড়ি, ছোট সংসার, কম টাকা মাইনে, তবু সেই কম টাকাতেই আমরা সুখে না-হোক শান্তিতে কাটাতাম, সে সারাদিন আপিসে পরিশ্রম করে আমার কাছে এসে বিশ্রাম চাইতো, আমিও উন্মুখ হয়ে থাকতাম তাকে সুখী করবার জন্যে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের মধ্যে সে-রকম ছোট সংসার অনেক দেখেছি দোতলার জানলা দিয়ে। আজ মনে হয় আবার ফিরে যাই সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে। কিন্তু কেন যে এত বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হলো, কেন যে ওদের এত টাকা হলো, কেন যে ওদের কিছু করতে হয় না—! জানো দীপু, ও-বাড়িতে জল তেষ্টা পেলেও কেউ নিজের হাতে গড়িয়ে জল খায় না—। আমি না-থাকলেও ও-মানুষটার কোনও কষ্ট হবে না, পা টেপবার দরকার হলে চাকর আছে, অসুখ হলে ডাক্তার-নার্স আছে, এক গেলাস জল খেতে ইচ্ছে করলেও জল দেবার চাকর আছে ও-বাড়িতে, দেখেছি আমি ও-মানুষের কাছে একেবারে ফাউ—

দীপঙ্কর বললে—থাক, ওসব কথা ভাবলেই তো কষ্ট, কেন ভাবছো আর?

সতী বললে—কিন্তু না-ভেবেই বা কী করবো বলো?

—ভেবে কি তুমি কিছু সুরাহা করতে পারবে?

সতী আবার বলতে লাগলো—জানো দীপু এক-এক সময় মনে হয় সত্যিই কোথাও চলে যাই—এই যেমন আজ তোমার কাছে চলে এসেছি, এরকম লুকিয়ে

চলে আসা নয়, অন্য রকম। একেবারে ওদের জানিয়ে ওদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাই কোথাও—দেখি না ওরা কী করে!

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না কিছু। বললে—তার মানে? কোথায় চলে যাবে?

সতী বললে—এই ধরো ওদের বাড়ির সামনেই, একেবারে ঠিক উল্টো দিকের বাড়ির একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করি, করে লক্ষ্মীদি যেমন করে কাটাচ্ছে সেই রকমভাবে জীবন কাটাই। মনে হয় ওদের চোখের সামনেই বাড়িতে বাইরের লোক এনে ঘরে বসাই, তাস খেলি, গান গাই আমার যা-খুশী করি, আর লক্ষ্মীদির মত পান খেয়ে জর্দা খেয়ে হেসে হেসে গল্প করি ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে, আর ওরা দেখুক জানালা দিয়ে—দেখে কী করে তাই শুধু আমার জানতে ইচ্ছে করে—

দীপঙ্কর বললে—যত সব উদ্ভট্ কল্পনা তোমার—তুমি এতও ভাবতে পারো?

সতী বললে—না দীপু, উদ্ভট্ কল্পনা নয়, আমার সত্যিই ইচ্ছে হয়, ওদের বাড়ির সামনের বাড়িটা ভাড়া নিই, নিয়ে সেখানে আমি ওদের চোখের সামনেই হৈ-হল্লা করে কাটাই—। ওরা দেখুক যে আমিও প্রতিশোধ নিতে পারি, আমিও জানি কেমন করে ওদের ব্যবহারের জবাব দিতে হয়!

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—যাও যাও ওঠো, শোওগে যাও—যত সব বাজে কথা তোমার।

সতী উঠলো। বললে—বাজে কথা বলছো বটে দীপু, কিন্তু দেখবে একদিন হয়তো আমাকে সেই পথই বেছে নিতে হবে—

—ছি সতী, তোমার বাবার কথাটা মনে রেখো!

সতী বললে—বাবার কাছে তো আমি এখুনি চলে যেতে পারি, বাবাকে চিঠি লিখলেই বাবা এসে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাতে তো আমিই হেরে যাবো দীপু, তাতে তো ওরাই জিতে যাবে—

বলে সতী অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলো। রাত অনেক হয়েছে। বাইরের পৃথিবীতে নিস্তব্ধতা নেমে আসছে আস্তে আস্তে। পাশে মা'র ঘরে কাশী এসে বিছানা করে দিয়ে গেছে সতীর শোবার জন্যে।

দীপঙ্কর বললে—এবার ওঠো সতী—ওঠো—

সতী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলো। বললে—জানো দীপু, তুমি বিশ্বাস করো, এর চেয়ে একজন অল্প মাইনের কেরানীর সঙ্গে বিয়ে হলেও আমি বোধহয় সুখী হতে পারতাম! ছোট্ট একটা এক-কামরার ভাড়াটে বাড়ি, বছরে দু'খানা শাড়ি, একটা কাঠের তক্তপোশ, আর দিনরাত পাওনাদারদের তাগাদা, এর চেয়ে সেও ভাল ছিল—

বলতে বলতে সতী গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো। ঘরটায় ঢুকে চারদিকে

দেখতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—ওই দেখ, দক্ষিণ দিকেও একটা দরজা আছে, রাত্রে যদি দরকার হয়, ওই দরজা দিয়ে বাইরে বেরোতে পারবে—

সতী দেখলে ভাল করে। দীপঙ্কর বললে—আর আমার এই ঘরের দিকের দরজার ছিট্‌কিনিটা দিয়ে দাও—

সতী বললে—কেন ছিটকিনি বন্ধ করার কী দরকার?

দীপঙ্কর বললে—আমার তো কোনও দরকার নেই এ-ঘরে, তুমি ছিট্‌কিনি বন্ধ করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে—

সতী যেন কী করবে বুঝতে পারল না।

দীপঙ্কর বললে—ছিট্‌কিনি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো—

সতী বললে—বন্ধ করবো? তোমার কোনও দরকার হবে না তো এ-ঘরে? ঠিক বলছো?

—হ্যাঁ বন্ধ করে দাও—খুব জোরে বন্ধ করে দাও—আমার কিছু দরকার নেই—

দীপঙ্কর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিক থেকে বললে—দাও, এবারে ছিট্‌কিনি বন্ধ করো—

কোনও আওয়াজ হলো না ও-পাশ থেকে।

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলে। তারপর বললে—কই, বন্ধ করলে না তুমি?

সতী তখনও বন্ধ করছে না। দীপঙ্কর দরজাটা খুলে দেখলে সতী বিছানায় গিয়ে বসেছে। বোধহয় শোওয়ার কথা ভাবছে। দীপঙ্কর বললে—কই, বন্ধ করো?

সতী বললে—বাবা রে বাবা, তুমি দেখছি আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না—

দীপঙ্কর বললে—বিশ্বাসের কথা নয়, তোমারই ভালোর জন্যে বলছি, আমার আর কী?

সতী শেষ পর্যন্ত উঠে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে। ভেতরে ছিট্‌কিনি বন্ধ করার শব্দ হলো। তখন যেন নিশ্চিন্ত হলো দীপঙ্কর।

দীপঙ্করও শোবার আয়োজন করছিল। অনেক পরিশ্রম হয়েছে। অনেক পরিক্রমাও হয়েছে। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। হঠাৎ কাশী এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—দাদাবাবু, সেই অন্য দিদিমণিটা এসেছে—

—সে কী রে? কে?

ততক্ষণে লক্ষ্মীদি ঘরে এসে ঢুকেছে। লক্ষ্মীদির চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্কর। বললে—লক্ষ্মীদি, তুমি এত রাত্তিরে যে?

লক্ষ্মীদির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজটা ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

বললে—সতী কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—ভেবেছিলাম আমি আসবো না। কিন্তু না এসেও পারলাম না। সতী না-হয় আমাকে দেখতে পারে না, কিন্তু বাড়িতে গিয়েও মনটা কেমন করতে লাগলো জানিস। ভাবলাম আচ্ছা, আমার জন্যেই তো ওর এই শাস্তি। তাই আবার দেখতে এলাম, আর এই টাকাটাও নে তুই, এ আর কাজে লাগলো না আমার—

বলে দশ টাকার নোটটা এগিয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে—এই জন্যেই তুমি এত রাত্রে এলে নাকি? এ তো পরে দিলেও চলতো—

লক্ষ্মীদি বললে—না, আসলে এসেছি সতীর জন্যে, ভাবলাম, সত্যিই মেয়েটার কপালে এত কষ্টও ছিল, বাড়িতে গিয়েও সারাদিন ওর কথাই ভেবেছি, সারাদিন মুখে ভাত ওঠেনি আমার ওই কথা ভেবে—

দীপঙ্কর বললে—এত রাত্রে কার সঙ্গে এলে?

লক্ষ্মীদি বললে—সুধাংশু আজকে ওর গাড়িটা এনেছিল, সে-ই আমাকে পৌঁছে দিয়েছে, আমাকে আবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তবে সে বাড়ি যাবে, এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ থেকেই আসবো-আসবো করছি। সন্ধ্যেবেলা ওরা সব এসে গেল, তারপর খেলা ওদের আর ভাঙতেই চায় না। শেষে জোর করে ওদের তুলে দিলুম আমি। তা সতী কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ—

লক্ষ্মীদি বললে—ঘরে খিল দিয়ে শুতে বলেছিস তো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ ছিট্‌কিনি বন্ধ করে শুয়েছে—

লক্ষ্মীদি কী যেন ভাবলে মনে মনে। তারপর বললে—আমি তাহলে যাই এখন দীপু, ওরা আবার গাড়িতে বসে আছে আমার জন্যে। আর আমি তো ওকে পাঠাতে পারলুম না শ্বশুরবাড়িতে, তুই যদি পাঠাতে পারিস দেখিস—

দীপঙ্কর বললে—আমি কী করে পাঠাবো বলো? আমার কথা কি শুনবে ও?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি ভাই হাল ছেড়ে দিয়েছি, আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, শেষে আমাকে গালাগালি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিলে মেঝের ওপর, তা আমি আর কী বলবো? আমিও মুখ বুজে সব সহ্য করে গেলুম। এখন বাবার কাছে চিঠি গেছে, বাবা এসে যা ভাল বুঝবে করবে—

দীপঙ্কর বললে, না, সে চিঠি কিন্তু তোমার বাবার কাছে আমি পাঠাইনি—

—কেন?

দীপঙ্কর বললে—ফেলতে গিয়েও আমার কী-রকম সন্দেহ হলো, ভাবলাম পড়ে দেখি সতী বাবাকে কী লিখেছে। দেখি ভেতরে সমস্ত মিথ্যে কথা লেখা!

আমি সে-চিঠি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি—

—সে কী? বলছিস কী তুই? তাহলে কী হবে?

দীপঙ্কর বললে—আমি ভাবছি সতী যখন নিজের আসল অবস্থাটা জানাবে না, তখন আমিই সমস্ত কথা খুলে লিখে দিই একটা চিঠি—ভাবছি টেলিগ্রাম করে দেব কাল, যাতে শিগগির শিগগির তার হাতে খবরটা পৌঁছোয়—

লক্ষ্মীদি বললে—যা ভালো বুঝিস তাই কর—আমি আর কিছু ঠিক করতে পারছি না—

বলে লক্ষ্মীদি বাইরে গিয়ে নিচে চলে যাচ্ছিল।

দীপঙ্কর বললে—তুমি আজকে এখানে থাকলে কিন্তু ভাল হতো লক্ষ্মীদি—আমি অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারতুম—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি কী করে থাকি বল্, আমার দিকটা তো কেউ তোরা বুঝবি না? সকালবেলা যে-কাণ্ড করেছে সতী, তারপরে অন্য কেউ হলে আর এ-বাড়ি মুখো হতো না—মাথার দু' ইঞ্চি চামড়া আমার কেটে গেছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে সোজা এখান থেকে ডাক্তারখানায় গিয়ে তবে আমি বাঁচি!

বাইরে রাস্তায় মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। অর্থাৎ তাগাদা দিচ্ছে ওরা।

লক্ষ্মীদি বললে—এই দ্যাখ, ওরা তাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ ভাল কথা, সতী তো শাড়ি-টাড়ি কিছু সঙ্গে আনেনি, ভাবলাম আমার কাপড় নিয়ে আসবো কিনা, কিন্তু আবার ভাবলাম, আমাকেই যখন দেখতে পারে না ও, তখন আমার শাড়ি কি আর ও ছোঁবে, হয়ত রেগে-মেগে ছুঁড়েই ফেলে দেবে—

দীপঙ্কর বললে—সে-সবের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, দরকার হলে আমি কিনে দেবখন—

লক্ষ্মীদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—তা মাসীমা কবে ফিরবেন?

দীপঙ্কর বললে—আজ তো কাশী পৌঁছিয়েছে, কাল সকালবেলা চিঠি আশা করছি—

লক্ষ্মীদি বললে—দেখি আমি যদি পারি তো কাল একবার সকাল বেলা খবর নিয়ে যাবো—

দীপঙ্কর আবার বললে—কিন্তু তুমি আজ রাত্তিরটা থেকে গেলে খুব ভালো হতো লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে তোর দাতারবাবুকে কে দেখবে বল? সে মানুষটাকে বাড়িতে একলা রেখে কী করে থাকবো এখানে?

বলে লক্ষ্মীদি নিচে নেমে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্কর দেখলে বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকজন আবছা মানুষের ছায়ামূর্তি। সকলের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। হাসি চলেছে সশব্দে। লক্ষ্মীদি গিয়ে গাড়িতে উঠতেই গাড়িটা আর্তনাদ করে উঠলো একবার। তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে পাড়ার নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়িটা

চলে যাবার পরে দীপঙ্কর সেই অত রাত্রে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

যদি কখনও দীপঙ্করকে কোনওদিন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় যে মানুষের আত্মার আহ্বানকে কেন সে এমন করে সেদিন অস্বীকার করেছিল, তাহলে হয়ত কোনও জবাবদিহি করবারও কিছু থাকবে না তার। হয়ত নিজেকে ক্ষমা করবার অবসরও আর কোনও দিন মিলবে না। এতদিন ছোট ছিল সে। ছোট হয়ে বড়র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল! ছোট থেকে বড় হতে হবে। শুধু মানসিকতায় নয়, মনুষ্যত্বের দুর্লভ আয়ত্তেও নয়, প্রেমে জ্ঞানে সহযোগিতা আর সহানুভূতির মুক্ত-প্রাঙ্গণে পদার্পণ করে!

কিন্তু মা'র চোখে তো দীপঙ্কর বড়ই হয়েছিল। মা যা চেয়েছিল, দীপঙ্কর তো তা-ই হয়েছিল। অর্থে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে অত ছোট থেকে আর কী-ই বা সে হতে পারতো? আর কেই-বা হতে পেরেছে দীপঙ্করের মত। আপিসে ঢুকলেই গেটের গুর্খা দারোয়ান স্যালিউট করতো। মধু শশব্যস্ত হয়ে সুইং-ডোরটা ফাঁক করে দাঁড়াতো। ক্লার্করা সসম্মানে সভক্তিতে সভয়ে তার সঙ্গে কথা বলতো। অল্প বয়েস তার। ক্রমে আরো পদোন্নতি হবে, তখন আরো সম্মান করবে, আরো ভয় করবে ক্লার্করা, তখন আরো সভক্তি স্যালিউট করবে গেটের গুর্খা দারোয়ান। পাড়ার ভদ্র-প্রতিবেশীরা সাগ্রহে চেয়ে দেখে দীপঙ্করের দিকে আপিস যাবার সময়। কত বড় চাকরি করে, কত বিরাট মাইনে পায়। এ-পাড়ার ছেলেরাও চাঁদা চাইতে এসে সমীহ করে কথা বলে। সম্মান করে চলে। হয়ত তার মাইনের খবরটা, তারা পেয়েছে। তার পদমর্যাদার খবরটা তারা পেয়েছে। কিন্তু একেই কী বলে বড় হওয়া?

এক-একদিন মা'কে জিজ্ঞেস করতো দীপঙ্কর। বলতো—তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ তো মা?

মা কিছু বুঝতে পারতো না। বলতো—আমি তোর কথার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি নে, কী বলছিস তুই?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—আমি যদি ছোট-কেরানী হতাম, মাসে-মাসে দেনা করে সংসার চালাতে হতো আমাকে, জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে অফিসে যেতাম, কিন্তু সৎপথে থেকে সৎভাবে জীবন কাটাতাম, তাহলে কি তুমি আমাকে কম ভালবাসতে মা?

মা হাসতো। বলতো—তাই কখনও কোনও মা করতে পারে রে?

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু মা তুমি তো আমার টাকা হওয়াই চেয়েছিলে? তুমি চেয়েছিলে আমি মস্ত বড় চাকরি করি, সাহেবের মন পাই, তা তো হয়েছে। আমি নিজে আলাদা সংসার করেছি, তোমাকে আর পরের বাড়ি ঝি-বৃত্তি করতে

হয় না, এই-ই তো তুমি চেয়েছিলে?

মা বলতো—কেন, আজ হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন তুই?

দীপঙ্কর বলতো—না, তুমি আমার কথার জবাব দাও না, তুমি তো একদিন তোমার পা ছুঁইয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলে যে আমি যেন কখনও স্বদেশী না করি, কখনও জেলে না যাই। তোমার সে-কথা তো আমি রেখেছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি এতে কি তুমি সুখী হয়েছো?

মা অবাক হয়ে যেত—ওমা, ছেলের কথা দেখ, তা আমি কি খারাপ কিছু করেছি তোর? তোর ভাল হয়নি এতে? তুই বলছিস কী?

দীপঙ্কর বলতো—আমার কথা ছেড়ে দাও মা তুমি। আমি যদি সুভাষচন্দ্র বোসের মত হতুম তাহলে কি তুমি রাগ করতে?

—তা রাগ করবো না? ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে জেল খাটবি তুই? ভদ্দরলোকের ছেলেরা জেল খাটে কেউ? ওই দেখ্ না, নৃপেনবাবু, সেই তোকে যিনি চাকরি করে দিয়েছিলেন, সেদিন দেখলুম কেমন চমৎকার বাড়ি করেছেন, আহা চোখ জুড়িয়ে গেল বাড়ি দেখে—তাই বলে এলাম, আপনি দাদা গরীবের উপকার করে এসেছেন বরাবর, আপনার সুখ হবে না তো কার হবে?

দীপঙ্কর হাসতো—। বলতো—আর যদি কিরণের মত হতুম মা—?

—দূর, দূর, বখাটে ছেলে যত, ওর সঙ্গে মিশলে চিরকাল ওই রকমই হয়ে থাকতে হতো, আর ওর মা'র মত আমাকেও ভুগতে হতো, অনেক পাপ করলে তবে ওই রকম ছেলে পেটে ধরে মানুষে—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু মা, ছিটে-ফোঁটার মত ছেলে?

মা রেগে যেত। বলতো—তুই আর বলিসনে বাপু ওদের কথা, ও-বাড়ি থেকে চলে এসেছি আপদ চুকেছে—

—কিন্তু তুমি তো জানো না মা, ওদেরও বাড়ি হয়েছে।

—বাড়ি হয়েছে কী রে? কোথায় বাড়ি হলো?

মা আকাশ থেকে পড়লো যেন।

দীপঙ্কর বললে—সেই অঘোরদাদুর বাড়িটাই ভেঙে ফেলে সেখানে এখন বিরাট কনক্রীটের বাড়ি করেছে ওরা। গাড়ি করেছে, কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছে. আলো দিয়ে ফুলগাছ দিয়ে সাজিয়েছে, সে-বাড়ি আর চিনতেই পারবে না তুমি গেলে—

মা বললে—কই? আমি তো শুনিনি কিছু?

দীপঙ্কর বললে—ছিটে-ফোঁটার চেহারা ভাল হয়ে গেছে এখন, বউরা মোটর-গাড়ি চড়ে বেড়ায়, বাড়ির মাথায় বাড়ির নাম লিখে রেখেছে—'অঘোর সৌধ'—। বাড়িতে ঢুকতেই ভয় করবে তোমার এত বড় বাড়ি!

মা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল খবরটা শুনে। বলেছিল—তুই গিয়েছিলি নাকি ওদিকে? কবে গিয়েছিলি?

দীপঙ্কর সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—আমি যদি ওদের মতও হতুম, তাহলেই কি তুমি খুশী হতে?

মা বললে—পারিনে বাপু তোর সঙ্গে তর্ক করতে—যত সব অনাছিষ্টি কথা—

বলে মা কাজের অছিলায় রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। হয়ত যুক্তিতে মা হেরে গিয়েছিল, কিন্তু প্রশ্নটার সমাধান হয়নি। কিরণ কিছু হতে পারেনি জীবনে। তাই কি কিরণ ছোট? আর ছিটে-ফোঁটা? বিরাট বাড়ি, বিরাট প্রতিষ্ঠা—সেও কি তাদের বড় হওয়ারই পাসপোর্ট?

একদিন ও-পাড়ায় গিয়েছিল দীপঙ্কর। প্রত্যেক মাসেই অবশ্য একবার করে ও-পাড়ায় যেতে হতো। কিরণের মা'র হাতে গিয়ে টাকা দশটা দিয়ে আসতে হতো। প্রতি মাসেই অফিসের ফেরত ডাকতো গিয়ে দরজায়—মাসীমা—

শেষের দিকে কিরণের মার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে এসে উঠোনের দরজাটা খুলে দিতো কোনওরকমে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করতো—এ কি, আপনি কি শুয়ে পড়েছিলেন নাকি?

কিরণের মা'র সেই আগেকার স্বাস্থ্য, আগেকার শক্তি ছিল না আর। পৈতেও কাটতে পারতো না। আর কাটলেও বেচবার লোক ছিল না। হয়ত সেই সময় থেকেই পৈতে পরা উঠে যাচ্ছিল। হয়ত সেই সময় থেকেই দারিদ্র্য আর দরিদ্রকে ঘৃণা করবার যুগ আরম্ভ হচ্ছিল কলকাতায়। সেই উনিশ শো উনচল্লিশ সাল থেকে। যাদের টাকা নেই, তাদের দয়া করবার প্রতিষ্ঠান পত্তন হচ্ছিল পাড়ায় পাড়ায়—কিন্তু যত দাতব্যশালার প্রতিষ্ঠানের আড়ালে দারিদ্র্যের ওপর সভ্য মানুষের ঘৃণা আর অবজ্ঞা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল সেই সময় থেকেই! সেই সময় থেকেই গান-বাজনা-জলসা অনুষ্ঠানের নামে দাতব্যের উৎপত্তি। কিরণের মা'রা সেই সব দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোরই লক্ষ্যস্থল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে এসে পৌঁছতো না সে-সব অনুগ্রহ, সে-সব ঘৃণা!

দীপঙ্কর বলতো—কিরণের আর কিছু খবর পেয়েছেন মাসীমা?

কিরণের নামও যেন শেষকালের দিকে ভুলে গিয়েছিল কিরণের মা। কিরণ বলে যে একজন মানুষ ছিল এ-পৃথিবীতে, সে-কথা নিজের মা'রও যেন আর মনে ছিল না শেষাশেষি। কিরণের নামটা শুনে যেন আস্তে আস্তে আবার সব মনে পড়তে চাইত। কিন্তু দীপঙ্কর তখনও কিরণের কথা ভুলতে পারেনি। কিরণকে ভুললে যেন দীপঙ্করের নিজেকেই ভুলতে হয়।

—তুমি কিছু খবর পেয়েছ না কি তার বাবা?

পৃথিবীতে যেন তখনও একটি লোকই কিরণকে স্মরণ করে রেখেছে। আর স্মরণ করে রেখেছে রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদারের আই-বি অফিসের পুরোন রেকর্ডের খাতা।

দীপঙ্কর বলতো—শুনেছি নাকি কিরণ ইণ্ডিয়া ছেড়ে পালিয়েছে—

—তা হলে তো সে বেঁচে আছে বাবা!

যেন বেঁচে থাকলেই হলো। যেন কিরণ বেঁচে থাকলেই মা'র শান্তি। তার বেশি আর কিছু আশা করবারও নেই।

—এবার যে দু'খানা নোট দিলে বাবা? আমি তো চোখে দেখতে পাইনে, কত দিলে এবার?

দীপঙ্কর বললে—আমার মাইনে বেড়েছে মাসীমা, অফিসে অনেক টাকা মাইনে বেড়েছে, এবার থেকে কুড়ি টাকা করেই দেব আপনাকে—

কৃতজ্ঞতায় হয়ত বুড়ীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইত। কিম্বা হয়ত নিজের ছেলের অপদার্থতার কথা মনে করে তুলনামূলক বিচারে ভারি কষ্ট হতো। বলতো—আর বেশি দিন তোমাকে দিতে হবে না বাবা, আমি তোমাকে আর বেশি দিন জ্বালাবো না—বেশি দিন জ্বালাতে পারবোও না—

বলে মাসীমা চোখে আঁচল দিয়ে জল মুছতো।

কিন্তু কিরণের মা তো জানতো না যে এ টাকা-দেওয়া তার কৃতজ্ঞতার দান নয়, এ দীপঙ্করের দয়ার বহিঃপ্রকাশও নয়। কিম্বা এ-দয়া তার অহঙ্কারের আত্মপ্রচারও নয়। শুধু কিরণের মা-ই বা কেন, কেউই বুঝতো না। কাউকে বললেও কেউ বুঝতে পারতো না। কেউ জানতো না কেন প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে দীপঙ্কর কালিঘাটের মোড়ে এসে নেমে পড়ে। কেন সেই জনবহুল রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে সকলের অগোচরে এসে দাঁড়ায় নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের বস্তিটার মধ্যে। কেউ জানতো না কেন সে এসে ওই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে! কিন্তু কেউ না জানুক, দীপঙ্কর নিজে তো জানতো! দীপঙ্কর নিজের কাছে তো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারতো না। দীপঙ্কর তো জানতো সারাটা মাস আপিসে মানুষের হীনতার আর নীচতার পরিবেষ্টনীতে কাজ করে যত পাপ যত কলঙ্ক তার জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতো, তার সমস্তটুকু ক্ষালন হতো প্রতি মাসের এই পয়লা তারিখটিতে। এ যেন ঠিক সেই সারাদিনের পর সন্ধ্যেবেলায় দেবতার মন্দিরে এসে আত্মনিবেদন করার মতো। দীপঙ্কর মাসীমার হাতে টাকাটা দিয়ে নিঃশব্দে বলতো—কিরণ, আমি পারিনি ভাই, আমি হেরে গেছি, তুই আমাকে ক্ষমা কর্—

তারপর তাড়াতাড়ি নিজেরই অযোগ্যতার লজ্জায় যেন নিজেই বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়। নিজের ওপরেই তার লজ্জা হতো। নিজের পৌরুষের ওপরই লজ্জা। দীপঙ্করের মনে হতো সব জিনিসের যেন সীমা আছে। অর্থের, গৌরবের, স্বাস্থ্যের, অহঙ্কারের—সব কিছুরই সীমা আছে। মহাভারতের অক্ষৌহিণী সৈন্যেরও সীমা-সংখ্যা আছে একটা। কিন্তু তার সেই লজ্জার যেন আর শেষ নেই। তার তেত্রিশ টাকার ঘুষের লজ্জা। তার তেত্রিশ টাকার আত্ম-বিক্রয়ের লজ্জা।

এমনি করেই একদিন কিরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিল দীপঙ্কর। সেদিনও মাসের পয়লা। সত্যিই পথ হারাবার মতই

অবস্থা তার। ছোট বেলা থেকে যে-পাড়ায় মানুষ সেই পাড়ার সেই রাস্তায় এসেই যেন পথ ভুল হয়ে গেল! এ কোথায় এল সে! সেই উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন। সেই পরিচিত দরজা, সেই সতীদের বাড়ির সিঁড়ি, সেই ইঁট বার করা দেয়াল, সেই ভেতরে আমড়া গাছটা। যে-গাছটার ডালে একটা কাক সারাদিন বসে থাকতো চুপ করে! কোথায় গেল সে-সব? কোথায় গেল সে-বাড়িটা!

দীপঙ্কর ওপর দিকে চেয়ে দেখলে। বাড়ির বাইরে লোহার গেট হয়েছে। পাশে গ্যারেজ হয়েছে। হলদে রংএর নতুন একটা বাড়ি উঠেছে। আগা-গোড়া কনক্রীটের। দোতলা থেকে রেডিওর আওয়াজ আসছে কানে। ঝকঝকে তকতকে ফিটফাট বাড়িটা।

কোথায় গেল সেই পুরোন অঘোরদাদুর বাড়িটা? কোথায় গেল সেই ঘরটা যেখানে দীপঙ্কর ছোট থেকে বড় হওয়ার যন্ত্রণা অনুভব করেছে সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত! সব কি মুছে গেল তার জীবন থেকে! কে মুছে দিলে? কে এমন করে দীপঙ্করকে বিলীন করে দিলে বিস্মৃতির সমুদ্রে। দীপঙ্করের সমস্ত অস্তিত্বকে এমন করে নিঃশেষ করে দিলে পৃথিবী থেকে? দীপঙ্কর ওপর দিকে চাইলে। চাইতেই নজরে পড়লো বাড়িটার মাথায় বড় বড় করে পাথরে খোদাই করা অক্ষরগুলো—'অঘোর সৌধ'।

আর দীপঙ্করের হঠাৎ মনে হলো অঘোরদাদু যেন উৎকট একটা অট্টহাসি করে উঠলেন ওপর থেকে।

বললে—মুখপোড়া দেখলি তো, কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—দ্যাখ্ মুখপোড়া, চেয়ে দ্যাখ্—

দীপঙ্করও প্রতিবাদ করে উঠলো।—না, না, না-না—

ঘুম নয়। জেগেই ছিল দীপঙ্কর। কিন্তু জেগে জেগেই চিৎকার করে উঠেছে।

এতক্ষণে যেন দীপঙ্করের খেয়াল হলো। খেয়াল হলো সমস্ত। খেয়াল হলো সে দীপঙ্কর সেন। অফিসের সেন সাহেব। কাল থেকে সে অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার। এ-টি-এস। কাল থেকে আরো বড় আর মাথা-নিচু করা স্যালিউট্ পাবে সে। খেয়াল হলো লক্ষ্মীদি এ-বাড়িতে এসেছিল। খেয়াল হলো তার মা কাশীতে গেছে। খেয়াল হলো সতীও রয়েছে এ-বাড়িতে। এই পাশের ঘরেই। পাশের ঘরে দরজার ছিট্‌কিনি বন্ধ করে শুয়ে আছে।

সকাল হয়ে গেল নাকি? সেই লক্ষ্মীদি চলে যাবার পর থেকে এতক্ষণ জেগে-জেগেই কেটে গেল। সমস্তটা রাত! সমস্ত রাত এলোপাতাড়ি কত সব চিন্তা করেছে সে!

দীপঙ্কর উঠলো। উঠে ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসটা মুখে তুলে নিয়ে সব

জলটা খেয়ে ফেললে! তারপর ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখতেই অবাক হয়ে গেল। মাত্র রাত দুটো!

দীপংকর আবার এসে বিছানায় বসলো। তারপর শুতে গিয়েও শুতে পারলে না। কোনও রকমেই যেন আর ঘুম আসবে না তার। তবু সমস্ত রাত বসে কাটালে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। সকালে অনেক কাজ। সকালে শম্ভু আসবে। সকালেই সতীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর হয়ত লক্ষ্মীদিও আসবে। তারপর অফিস আছে। কাল থেকেই মিস্টার ঘোষালের চেয়ারে গিয়ে বসতে হবে। নতুন দায়িত্ব, নতুন ভূমিকা জীবনের।

হঠাৎ খট্ করে পাশের ঘরে যেন একটা শব্দ হলো!

দীপংকর উঠে বসলো আবার! সতী কি এখনও জেগে আছে! সতীরও কি ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল দীপংকর। না, কোনও শব্দ নেই। হয়ত ভুল শুনেছে দীপংকর। সতী কেন জেগে থাকতে যাবে তার মতন। সতী হয়ত অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দীপংকর উঠে আবার একবার জল গড়িয়ে খেলে। তারপর আবার এসে বসলো নিজের বিছানায়! তারপর আলোটা নিভিয়ে দিলে।

কিন্তু আবার উঠে বসলো বিছানায়।

আর কী যে হলো। দীপংকরের মনে হলো যেন বড় একলা সে। সারা জীবনই বড় একলা। এই এখন খানিকক্ষণ গল্প করতে পারলেও যেন তার একাকীত্ব ঘুচতো। অন্তত মা পাশের ঘরে থাকলেও মাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসতো। এক-একদিন মা-ও হঠাৎ দরজা খুলে এ-ঘরে এসেছে। বলেছে—কী রে, ঘুমের ঘোরে কী সব বকছিলি?

দীপংকর বলতো—না মা, ঘুমের ঘোরে নয়, জেগে জেগে—

আজ মাও নেই। কেউই নেই। দীপংকর আবার একবার জল খেলে। অনেক তৃষ্ণা যেন জমে জমে শুকনো মরুভূমি হয়ে গেছে ভেতরটা। তারপর বিছানায় ফিরে এসে বসতে গিয়েও বসতে পারলে না। একবার দাঁড়িয়ে ভাবলে খানিকক্ষণ! সতীকে যদি এখন ডাকে, ডেকে গল্প করে তো ক্ষতি কী! কিসের ক্ষতি!

কিন্তু না, সতীকে সে নিজে ছিট্‌কিনি বন্ধ করে শুয়ে ঘুমোতে বলেছে। তাকে এখন ডাকা উচিত নয়।

দীপংকর ফিরে আবার বিছানাতেই বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু কি মনে হলো, পায়ে পায়ে আবার দরজাটার দিকে গেল। হয়ত সতী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অনেক বিনিদ্র রাতের পর বিশ্রামের প্রশান্তিতে এলিয়ে দিয়েছে নিজেকে। নিজের সুবিধের জন্যে কেন তাকে বিরক্ত করতে যাবে!

কিন্তু তবু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যদি জেগে থাকে তো সামান্য একটা টোকা দিলেই সতী সাড়া দেবে! একবার টোকা দিলেই বোঝা যাবে

সতীও তার মত জেগে আছে কি না।

দীপংকর দরজার গায়ে হাত দিতে গিয়েও দ্বিধা করতে লাগলো। এই রাত্তির দুটোর সময় এমন করে সতীকে ডাকা কি ভাল হবে! যদি দীপঙ্করকে সন্দেহ করে, যদি মনে করে দীপঙ্কর অসৎ, দীপঙ্কর লোভী, দীপঙ্কর নীচ, হীন, জানোয়ার একটা! ছি ছি! দীপঙ্কর সেই বন্ধ দরজার সামনেই চোরের মত দাঁড়িয়ে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো।

—খট্!

আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ভেতর থেকে খুলে গেছে হঠাৎ।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্কর দেখলে ছিট্‌কিনিটা খুলে দরজা ফাঁক করে সতী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লজ্জায় ধিক্কারে দীপঙ্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

সতী বললে—একি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? কী করছিলে?

দীপংকর অপরাধীর মত নিজেকে লুকোতে চাইলে অন্ধকারের আবরণে। কিন্তু সতীর কাছে সে বোধহয় ধরা পড়ে গেছে।

সতী আবার বললে—হঠাৎ মনে হলো তুমি যেন চিৎকার করে উঠলে—না-না-না-না বলে? কী হয়েছিল তোমার? স্বপ্ন দেখেছিলে নাকি? তোমার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল—! ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

দীপঙ্কর কী বলবে হঠাৎ বুঝতে পারলে না। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই। সতীর মুখের দিকে চাইতেও যেন তার সঙ্কোচ হলো। মনে হলো সতী যেন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখছে। যেন সতী তাকে সন্দেহ করছে। দীপঙ্করের বিশ্বাসঘাতকতা সতী যেন ধরে ফেলেছে।

সতী হঠাৎ তার দুটো হাত ধরে ফেলে ঝাঁকুনি দিলে। ঝাঁকুনি খেয়ে দীপংকরের যেন চৈতন্য ফিরে এল।

সতী বললে—কী হলো? কী হলো তোমার? তুমি এমন করছো কেন দীপু?

দীপংকরের মুখ দিয়ে তবু যেন কোনও কথা বেরোতে চাইল না।

সতী দীপংকরকে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে এসে তার বিছানায় বসালে। বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসলো। বললে—অমন করছো কেন দীপু? কী হয়েছে তোমার, বলো না?

দীপংকরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো যেন নেশা লেগে অসাড় হয়ে গেছে। বললে—ঘুম হয়নি আমার—

সতী বললে—ঘুম হয়নি? তা আমারও তো ঘুম হয়নি! তা বলে অমন করছো কেন?

দীপংকর বললে—অনেকবার জল খেলুম, অনেকবার ঘুমোতে চেষ্টা করলুম, তবু ঘুম এল না।

সতী বললে—তা আমাকে ডাকলে না কেন?

সতী আবার বললে—আমারও ঘুম আসেনি, জেগে জেগেই যেন স্বপ্ন দেখছিলুম। দেখছিলুম ও-বাড়িতে আমাকে না-দেখতে পেয়ে খুব যেন হৈ-চৈ হচ্ছে, ওরা পুলিসে খবর দিয়েছে, পুলিস আমাকে খুঁজতে এখানেও এসেছে। এখানে এসে তোমার ঘরে ঢুকেছে। পুলিস জিজ্ঞেস করলে—আমি আছি কি না। উত্তরে তুমি খুব রেগে গেলে। রেগে চিৎকার করে উঠলে—না-না, না-না—আর সেই চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল—

দীপঙ্কর কিছু বললে না। একটু পরে শুধু বললে—তুমি তোমার ঘরে শুয়ে পড়ো গে যাও—এখন মাত্র রাত দুটো—

—কেন, তুমি ঘুমোবে?

দীপঙ্কর বললে—না, না-ঘুমোলে তোমার শরীর খারাপ হবে! আর না-ঘুমোলে সর্বনাশ হয়ে যাবে—

সতী জিজ্ঞেস করলে—কার? কার সর্বনাশ হবে? তোমার?

দীপঙ্কর বললে—আমার নয়, তোমার—

সতী হেসে উঠলো খুব। বললে—আমার জন্যে তোমাকে আর ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করতে হবে না। আমার যা সর্বনাশ হবার, তা হয়েই গেছে—

দীপঙ্কর বললে—না, তোমাকে কাল ফিরে যেতেই হবে। এখানে থাকা আর তোমার উচিত নয়। কাল আমি নিজে গিয়ে তোমাকে রেখে আসবো! রাত্রে তোমার এখানে থাকাই উচিত হয়নি। আর কোনওদিন এখানে এসো না। যদি শ্বশুরবাড়িতে না-থাকতে পারো তো অন্য কোথাও চলে যেও—আমার এখানে আর এসো না—

সতী দীপঙ্করের কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন অবাক হয়ে গেল। দীপঙ্করের গলায় যেন আজ অন্য সুর বাজছে।

দীপঙ্কর নিজের মনেই বলতে লাগলো—ইচ্ছে হয় শ্বশুরবাড়িতে থেকো, অত্যাচার সয়েও থেকো, তাইতেই তোমার মঙ্গল হবে, আর তা যদি না-থাকতে পারো তো বাবার কাছে চলে যেও, কিম্বা অন্য কোথাও, যেখানে তোমার খুশী! কিন্তু দয়া করে আমার এখানে আর এসো না—! এমন কি মা ফিরে আসার পরও এসো না!

বলতে বলতে দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরের এধার থেকে ওধার পায়চারি করতে লাগলো। বললে—আমি তোমাকে কালকেই বলেছিলাম, এখানে থাকলে তোমার ভাল হবে না। আমার মা নেই, লক্ষ্মীদিও তো তোমায় বুঝিয়ে বলেছিল কত, তবু তুমি শুনলে না! কেন তুমি এলে? কেন তুমি এলে আমার বাড়িতে? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলুম?

সতী স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—আমি তোমাকে বার-বার বারণ করিনি এখানে থাকতে? বার-বার বলিনি যে, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, শ্বশুরবাড়ির বাইরে অন্য কোনও লোকের বাড়িতে থাকা উচিত নয়? তুমি জানো আমার মা নেই এখানে, এ-বাড়িতে আমি একলা, অন্য কোনও মেয়েমানুষ নেই এখানে, তবু কেন তুমি থাকলে? কেন তুমি এখানে রাত কাটাতে এলে?

সতী তখনও দীপঙ্করের মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে।

—যদি তুমি আমার কথা না-শোন, তাই লক্ষ্মীদিকে ডেকে এনেছিলুম এইখানে। ভেবেছিলুম, আমার কথা না-শোন নিজের বড় বোনের কথা অন্তত শুনবে। কেন তুমি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে? তুমি না লেখাপড়া শিখেছ? তোমাকে না তোমার বাবা কত টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন? সে-সব কি এই জন্যে? নিজের স্বামীকে ভালবাসতে পারলে না তুমি, নিজের শাশুড়ীকেও শ্রদ্ধা করতে শিখলে না, এর জন্যে দায়ী কে? তুমিই তো দায়ী! ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে ভেবেছ কোনওদিন তুমি শান্তি পাবে জীবনে?

মনে আছে সেই রাত দুটোর সময় অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রে দীপঙ্কর চিৎকার করে সতীকে যা-নয়-তাই বলে শাসন করতে লাগলো। সতী চুপ করে সব কথা শুনছিল। হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই, সতী বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা গিয়ে আবার মা'র ঘরের ভেতর ঢুকলো। ঢুকে ভেতর থেকে সজোরে দরজার ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিলে। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

সতীর এই ব্যবহারে দীপঙ্করও এতক্ষণে অবাক হয়ে গেল যেন। ঝোঁকের মাথায় খুব অন্যায় কিছু বলে ফেলেছে কি সতীকে? এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো দীপঙ্করের। এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে দীপঙ্কর। এমন করে সতীকে সে এত কড়া কথাগুলো বলতে গেল কেন? সতী তার সত্যি সত্যিই কী ক্ষতি করেছে?

হঠাৎ আবার বড় মায়া হলো সতীর জন্যে। সতী তো তার কোনও ক্ষতি করেনি। কোনও অন্যায় করেনি তো সতী তার! দীপঙ্করকে আপনার জন মনে করেই সতী তার কাছে এসেছিল। হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়েই বা উঠলো কেন সে? এখানে কে আছে সতীর? দীপঙ্করের কাছে না এসে কার কাছে সে যেতে পারত?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলো—সতী—সতী—দরজা খোল, দরজা খোল—

ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

দীপঙ্কর আবার ধাক্কা দিতে লাগলো।—সতী, দরজা খোল, দরজা খোল—

তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। দীপঙ্কর কান পেতে শুনতে লাগলো। সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের আত্মা নিথর-নিশ্চল হয়ে যেন দীপঙ্করকে নিঃশব্দে ব্যঙ্গ করতে

লাগলো। আর দীপঙ্কর লজ্জায় অপমানে আত্মগ্লানিতে পাথর হয়ে চুপ করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন মনে আছে, শম্ভুর ডাকে প্রথম সম্বিৎ ফিরে এসেছিল দীপঙ্করের। শম্ভুর সামনেও যেন মুখ দেখাতে সংকোচ হচ্ছিল। সকাল হয়ে গিয়েছে স্টেশন রোডের পৃথিবীতে। বাইরের রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝের ওপর। দীপঙ্কর নিজের তুচ্ছতায় নিজেকে লুকোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

শম্ভু বললে—আমি শম্ভু—

যেন শম্ভু এসে দীপঙ্করকে আরও অসাড় করে দিলে। আরো অসহায়। দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইতেও যেন ভয় পাচ্ছিল। শম্ভু বললে—বৌদিমণি তো ও-বাড়িতে যায়নি দাদাবাবু!

দীপঙ্কর বললে—বাড়ির খবর কী?

শম্ভু বললে—আমি বাড়িতে গিয়ে বাতাসীর মাকে জিজ্ঞেস করলুম—বৌদিমণি এসেছে? দেখলুম সবাই যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। কেউ কিছু খুলে বলে না! মা-মণি সকাল বেলায় পুজোয় বসেছিল, আমি সোজা চলে এলুম এখানে—

—আর তোমার দাদাবাবু?

—আজ্ঞে, দাদাবাবু নিচেয় নামলো তখন। আমি যখন বেরিয়ে আসছি, তখন ব্যারিস্টারবাবুর গাড়ি এসে ঢুকলো ভেতরে—! ব্যারিস্টারবাবুকে চেনেন তো?

ব্যারিস্টারবাবু! নির্মল পালিত? নির্মল পালিত নতুন ব্যারিস্টার। ঘোষ-পরিবারের শেষ ভাগ্যের সঙ্গে সে-ও জড়িয়ে নিয়েছিল নিজেকে। ঘোষ-বংশানুক্রমিক ঐশ্বর্যের রক্ষক শুধু নয়, ধারকও হয়েছিল সে শেষ পর্যন্ত। কোথায় কোন্ জমির কত দর উঠেছে, কোন্ জমি কাকে বেচলে তিন পার্সেণ্ট বেশি প্রফিট হবে, সে-বুদ্ধি ঘোষ-গৃহিণীকে নির্মল পালিতই দিত। বিধবা-ঘোষ-গিন্নীর একমাত্র সহায় ছিল সনাতনবাবু নয়, নির্মল পালিত। নির্মল পালিতের জন্যে এ-বাড়ির ছিল অবারিত দ্বার। যখন সতীর জন্যে সদর-গেটে তালা-চাবির বন্দোবস্ত হয়েছে, কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবার নিয়ম নেই, তখনও নির্মল পালিতের গাড়ি এসে হাজির হলেই দারোয়ান লম্বা সেলাম করে সদর-গেট খুলে দিত। ব্যারিস্টারবাবুর আসার খবর পেলেই মা-মণি ওপর থেকে নেমে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে চা আসতো, শরবৎ আসতো, স্ন্যাক্স্ আসতো। চাকর-বাকর মহলেও সাড়া পড়ে যেত। হাঁক-ডাক শুরু হয়ে যেত। ব্যারিস্টারবাবু জাঁদরেল লোক। এক মিনিট চুপ করে থাকতে পারে না। হয় কথা বলবে, নয় চুরোট চিবোবে। আর কিছু কাজ না-থাকলে শিষ দেবে। শিষ দেবে পা দুলিয়ে দুলিয়ে। তারপর মা-মণি ঘরে এলেই দাঁড়িয়ে উঠবে। বলবে—এই যে

মা-মণি, আসুন, বসুন—

বলে চেয়ারটা এগিয়ে দেবে। মা-মণি গরদের থান পরে এসে বসতেন তাঁর নিজের চেয়ারটিতে। সরকার মশাই খাতাপত্র নিয়ে এসে হাজির হবে তখন। সুন্দরবনের আবাদ নিয়ে একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে। তারপর আছে শ্যামবাজারে কয়েকটা বাড়ি। ভাড়াটে বাড়ি। কোনওটা বেচে বেশি প্রফিট পেলে আবার একটা নতুন বাড়ি কিনতে হয় সেই টাকা দিয়ে। জমি কেনার পর হয়ত দেখা গেল দু ভাইয়ের সম্পত্তি। এক ভাই মোকদ্দমা করে বসলো শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসীর নামে। একটা মামলা শেষ হতে-না-হতে আর-একটা মামলা শুরু করতে হয় বউবাজারের প্রপার্টি নিয়ে। ঈশ্বর গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিধবা পত্নী শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাস্যার প্রপার্টি নিয়ে হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে মামলা চালায় ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে ব্যারিস্টার নির্মল পালিত।

নির্মল পালিত বলে—যে-প্রপার্টি যত এন্‌কামবার্ড, সে-প্রপার্টিতে তত লাভ—

মা-মণি বলেন—কিন্তু আমার বেলায় তো সব লাভ লোকসানে দাঁড়াচ্ছে বাবা—আমি আর পেরে উঠছি না!

নির্মল পালিত বলে—না-পারলে তো চলবে না মা-মণি, পারতেই হবে—তাহলে আমি আছি কী করতে? আমার হাতে সব ছেড়ে দিন, আমি আপনার সব প্রপার্টি গোল্ডে কনভার্ট করে দেব—তখন আপনি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করবেন বসে বসে—

মা-মণি বলেন—আয়েস আমার কপালে নেই বাবা—আমার আরাম হবে মলে—

—সে কী মা-মণি? প্রপার্টি করে তো লোকে আরামের জন্যেই, আর যাতে সেই প্রপার্টি নিয়ে বদারেশন না হয়, সেই জন্যেই তো ব্যারিস্টার-অ্যাটর্নীর সৃষ্টি—এটা আপনি কী বলছেন? আর যদি এই সামান্য ঝঞ্ঝাটটুকু না চান তো বনে চলে যান, সেখানে গিয়ে ফলমূল খেয়ে থাকুন, কোনও বদারেশন নেই সেখানে, সেখানে অরিজিন্যাল, ডিফেন্স, অ্যাপিলেট—কেউই নেই, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী, জুরী, জজ, কোর্ট পুলিস কিছু নেই; সেই রকম চান আপনি?

মা-মণি বলেন—একথা তো তোমার বাবাও বলতেন—

নির্মল পালিত বলে—একথা শুধু বাবা কেন, প্রত্যেক সেন-ম্যানই বলবে। জানেন ইংরেজীতে একটা কথা আছে—খুব দামী কথা, সকলে ঠিক বোঝে না— Put not your trust in money, but put your money in trust. আপনার শ্বশুরমশাই নাকি বলে গিয়েছিলেন শুনেছি, টাকা নচ্ছার জিনিস! কিন্তু টাকা নচ্ছার কার কাছে? আপনার আমার কাছে নয় মা-মণি, নচ্ছার ওই যারা মামলাবাজ, যারা ফোর-টুয়েণ্টি, যারা ডিবচ্, যারা পুওর, তাদের কাছে! টাকা হাতে এলে তারা আরো মদ খাবে, আরো রেস খেলবে! টাকার মহিমা বুঝবো আমরা। আমাদের কাছে টাকা রুট্ অব অল ইভল নয়। টাকা হলো

পাওয়ার, আপনার ছেলে বলুন পুত্রবধূ বলুন—তারা যে এখনও আপনাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, সে কিসের জন্যে? সিম্পি টাকা!

মা-মণি বলেন—আমিও তো তাই ভেবেছিলাম যে আমি মেয়েমানুষ, স্টিভেডোরের ব্যবসা চালাবো কেমন করে? তাই সব বেচে দিয়ে নগদ টাকা করে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছিলাম। তা তোমার বাবাই তো পরামর্শ দিলেন প্রপার্টি কিনতে—তখন কি জানতাম, সেই প্রপার্টি মানে এত মামলা-মোকদ্দমা?

নির্মল পালিত হেসে উঠলো। বললে—তা সংসারে বাস করবেন আর ট্যাক্স দেবেন না?

মা-মণি বললেন—কিন্তু ট্যাক্স দিতে দিতে যে ফতুর হয়ে গেলাম বাবা, আমার যে ধর্ম-কর্ম, পুজো-আচ্ছা কিছু হয় না এই ঝামেলার জন্যে। আর ঝামেলাও কি একটা? আমার যে আবার ঝামেলা নেবার কেউ নেই সংসারে! তোমার বাবা আমার এই সর্বনাশটা করে গেলেন আমার বুড়ো বয়েসে—

নির্মল পালিত বললে—বাবার কী অন্যায় বলুন মা-মণি, বাবা হয়ত ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন পেয়েছেন বড় জোর, কিন্তু কাজটা তো ভালোই করেছেন। টাকা তো আইড্‌ল্ রাখতে নেই। হিন্দুদের বাড়িতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজো না-করা যেরকম পাপ, টাকা উপায় করে আইড্‌ল্ রাখাও সেই রকম পাপ! এই ভেবে দেখুন না, আপনি ছেলের বিয়েতে ডাউরি কত নিয়েছিলেন ক্যাশ?

মা-মণি বললেন—সে আর বোল না বাবা, তোমার বাবার কথা শুনে সে যা ঠকেছি, সে আর কী বলবো?

—কী রকম?

—কোত্থেকে এক সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। শুনলাম বড়লোক, একমাত্র মেয়ে তাঁর! তা তখন কি জানি অত বড়লোক, আমি বোকার মত চেয়ে বসলাম দশ হাজার টাকা নগদ—

নির্মল পালিত জিভ্ কাটলে। বললে—ইস্-স্, একেবারে ড্যাম লস্—

—আমি আর কী বলবো, তোমার বাবাই সম্বন্ধটা এনেছিলেন, তাঁরই ওপর আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছিলুম। তিনি যদি একবার আভাস দিতেন, পাত্রীর বাপের অত টাকা তো আমি তিরিশ হাজার চেয়ে বসতাম। আমার ছেলেও তো খারাপ নয়। তুমি তো দেখেছ, কোনও নেশা করা নেই। এম-এ পাশ, সচ্চরিত্র, কারো সাতে পাঁচে থাকে না, নিজের বই আর লাইব্রেরী নিয়েই কেবল আছে—সাত চড়েও কথা বলবে না! অমন হীরের টুকরো ছেলে মাটির দরে বিলিয়ে দিলাম, আমার লোকসানের কপাল! তোমার বাবার জন্যেই এটা হলো—

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু মেয়ের তো ভাই-টাই কেউ নেই, একমাত্র সন্তান, বাপ মারা গেলে তো সমস্ত প্রপার্টি আপনিই পাবেন—

মা-মণি বললেন—না, তুমি যা ভাবছো তা নয়—

—কী রকম?

মা-মণি বললেন—ওই মেয়েই পাবে, আমি কিছুই পাবো না, আমার ছেলেও পাবে না—

—তা মেয়ে পেলেও তো আপনার ছেলের পাওয়া হলো। আপনার ছেলে পেলেই তো আপনারও পাওয়া হলো!

মা-মণি বললেন—না—

নির্মল পালিত অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে তো তাই-ই আছে—না যদি পান তো আমি আছি, আমি লিটিগেশন করবো, এ কী কথা!

মা-মণি বললেন—না, তা নয়—

—তা নয় মানে?

বলতে গিয়েও মা-মণি যেন কেমন একটু দ্বিধা করলেন। বললেন—তোমার বাবার সঙ্গে তো সব বিষয়েই পরামর্শ করতাম, এখন তোমার পরামর্শও নিই। আমার বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু কথাটা তুললে বলেই বলছি, বৌমা নেই বাড়িতে—

—নেই মানে?

—মানে, চলে গেছে।

—বাপের কাছে গেছে? বর্মায়?

মা-মণি বললেন—না—

হঠাৎ মা-মণির নজর পড়লো বাইরের বারান্দার দিকে। বললেন—কে রে? শম্ভু? তুই এখানে কী করছিস? কী শুনছিস ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? যা, এখান থেকে চলে যা—

শম্ভু পাশ থেকে সরে গেল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

শম্ভু বললে—তারপর ব্যারিস্টারবাবু আর মা-মণি দুজনে মিলে কথা বলতে লাগলো, আর আমি চলে এলুম। এখন তো সরকার মশাই আর বাজারে যেতে পারবে না। ব্যারিস্টারবাবু যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ সরকার মশাইকেও থাকতে হবে খাতাপত্র নিয়ে। সরকার মশাই-ই আদালত-কাছারি সব করে কি না।

নিচে কড়া নাড়ার শব্দ হতেই দীপঙ্কর কান খাড়া করে রইল। হয়ত লক্ষ্মীদি এসেছে। কাশী দরজা খুলে দিতেই কার যেন পায়ের আওয়াজ হলো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। দীপঙ্কর ঘরের বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই লক্ষ্মীদি ঘরে এসে ঢুকলো। বললে—কী দীপু, সতী কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—সতী ঘুমোচ্ছে—

লক্ষ্মীদি বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে দেখলে।

দীপঙ্কর বললে—এই দেখ, সতীর শ্বশুরবাড়ির লোকও এসেছে, এর কাছেই

সব বাড়ির ভেতরের ব্যাপার শুনছিলাম। শুনলাম, ওদের ব্যারিস্টারের সঙ্গে এই সব পরামর্শই হচ্ছিল।

লক্ষ্মীদি বললে—সতী কী বলছে? যাবে?

দীপঙ্কর বললে—তা তো বলতে পারছি না। এখনও ডাকিনি। ও তো কাল বলছিল যাবে না কিছুতেই—

লক্ষ্মীদি বললে—তুই ডাক না একবার!

দীপঙ্কর বললে—তুমিই ডাকো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি ডাকবো না, আমার কথা শুনবে না ও। শুনলে তোর কথাই শুনবে! তুই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পৌঁছে দিয়ে আয়। ওর শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে ক্ষমাও চেয়ে আয়। বলিস—বয়েস কম, না-বুঝে ভুল করে ফেলেছে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি কে বলো না? আমার কথা শুনবে কেন? তুমি বরং চলো, আমি সঙ্গে থাকবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি গেলে জিজ্ঞেস করবে কে আমি? অনেক কথা উঠবে, তাতে উল্টো বিপত্তি হবে। তার চেয়ে তুই ওকে দিয়ে আয়—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু যেতে চাইলে তবে তো!

শম্ভু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। বললে—আমি ডাকবো বৌদি-মণিকে?

—ডাকো না।

শম্ভু দরজার সামনে গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলো। বললে—বৌদিমণি, বৌদিমণি—

দীপঙ্করের আজও মনে আছে, সেদিন সে অনেক কিছু ভয় করেছিল। সমস্ত রাত্রের ঘটনাটা তার তখনও চোখের সামনে ভাসছে। সেই ঘটনার পরেও কি সতী তার সঙ্গে কথা বলবে! তার দিকে চেয়ে দেখবে! দ্বিধা আর সঙ্কোচের পাহাড় যেন তার মাথার ওপর কে চাপিয়ে দিয়েছিল সেদিন। দীপঙ্কর ভালো করে নিজের মুখোমুখি হতেও যেন ভয় পেয়েছিল। যেন সে নিজেকে অমন করে হারিয়ে ফেলেছিল সেই রাত্রের অন্ধকারে। এতদিনের সব শিক্ষা কি তবে তার মিথ্যে? এতদিনের এত চিন্তা কি তবে তার ব্যর্থ! তবে কি বার বার তাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দেন ঈশ্বর! এমনি করেই যেন সেই হাত-কাটা ভিখিরির মেয়েটা তাকে পরীক্ষা করতে এসেছিল কাল। এমনি করেই যেন সতী তাকে পরীক্ষা করতেই রাত দুটোর সময় তার ঘরে ঢুকেছিল!

শম্ভু আবার ডাকলে—বৌদিমণি, বৌদিমণি, আমি শম্ভু—

আজ এতদিনের পরেও সেদিনকার সেই ঘটনার ছোটখাট খুটিনাটিগুলো পর্যন্ত মনে আছে দীপঙ্করের। সতীর শাশুড়ীর সেই প্রপার্টি-প্রীতি, নির্মল

পালিতের সেই বৈষয়িক-বুদ্ধি—সমস্ত যে কোথায় ভেসে গেল। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন নতুন দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখছে আজ সতীর শ্বশুরবাড়ির দিকে। মানুষের বনেদিয়ানার চিহ্ন পর্যন্ত টলে গেল এই ক'টা বছরে। আবার নতুন একটা বড়-লোকের জাত তৈরি হলো, আবার কলকাতায় নতুন বনেদ পত্তন হলো। সেই ভবানীপুর, সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেই স্টেশন রোড, সেই ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, সেই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং—নতুন করে সকলের মূল্যায়ন হলো সেই উনিশ শো উনচল্লিশ সাল থেকে।

ট্যাক্সিটা গিয়ে সেদিন সকাল বেলা পৌঁছুলো সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে।

লক্ষ্মীদি প্রথমে আসতে চায়নি, প্রথমে সঙ্কোচ হয়েছিল। সঙ্কোচ হবারই কথা। বলেছিল—আমি আর কেন যাবো দীপু, আমি গেলে হয়ত রাগ করবে ওর শাশুড়ী—

তবু দীপঙ্করের মনে হয়েছিল, সবাই মিলে সতীর শাশুড়ীকে ধরলে হয়ত তাঁর রাগ কমতেও পারে। সতীর বাবা-মা থাকলে আর কারো সঙ্গে যাবার দরকার হতো না। আর কারো সাহায্যও লাগতো না। দীপঙ্করের নিজের মা থাকলেও অনেকটা সাহায্য হতো। মা একলাই সতীকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে পারতো তার শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু কেউ যখন নেই, তখন তাদেরই যেতে হবে।

লক্ষ্মীদি বলেছিল—আমার যে আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে রে বাড়িতে—

দীপঙ্কর বলেছিল—তা আমারও তো কাজ রয়েছে লক্ষ্মীদি, আমাকেও তো আপিসে যেতে হবে, আজ থেকে আবার আমার নতুন কাজ আরম্ভ হচ্ছে—

অথচ যে-সতীকে নিয়ে এত সমস্যা ছিল, সেই সতী কিন্তু আর আপত্তি করেনি। সেই রাত্রি দুটোর পর থেকে সতী যেন আমূলে বদলে গিয়েছিল। যেন বড় নীরব হয়ে গিয়েছিল। শম্ভু ডাকবার পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সামনে এতগুলো লোককে দেখেও কিছু বলেনি। যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনার পর থেকেই। দেখে মনে হয়েছিল সতীর যেন সারারাতই ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে। একবার সকলের দিকে চেয়ে দেখে নিলে। তারপর শম্ভুকে দেখেই এগিয়ে এল। বললে—কী খবর রে শম্ভু? ও-বাড়ির খবর কী?

শম্ভু সতীকে দেখে যেন কেঁদে ফেলবার মত করলে। বললে—তোমাকে খুঁজতেই এসেছিলুম বৌদিমণি—

—ওরা কি খুঁজছে সবাই আমাকে?

শম্ভু বললে—কেউ খুঁজছে না তোমাকে বৌদিমণি, মা-মণি সবাইকে খুঁজতে বারণ করে দিয়েছে, মা-মণি তোমার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করতে বলে দিয়েছে সবাইকে—

সতী যেন একটু ভাবলে। বললে—কেউ খুঁজেছে না? থানায় খবরও দেয়নি? আর দারোয়ানকেও বলেনি কিছু গেটের চাবি খোলার জন্যে?

শম্ভু বললে—কিচ্ছু বলেনি কাউকে। শুধু মা-মণি সকলকে ডেকে সাবধান করে দিয়েছে। আমাকেও চাকরি ছাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে—

—আর তোর দাদাবাবু?

শম্ভু বললে—দাদাবাবুও তেমনি আছেন, তিনিও কিছু বলছেন না—

—কোথায় শুয়েছিলেন কাল রাত্রে? কোন্ ঘরে?

—মা-মণির ঘরে, যে-ঘরে রোজ শোন। দাদাবাবুকেও মা-মণি বলে দিয়েছেন কিছু না-বলতে, বলেছেন যা-করবার তিনি নিজেই করবেন। আজ সকালবেলা ব্যারিস্টারবাবুকে ডেকে আনিয়েছেন। তার সঙ্গে আপনার কথাই হচ্ছিল—

—কী কথা হচ্ছিল?

—তা শুনতে পাইনি, আমাকে দেখতে পেয়েই তাড়িয়ে দিলেন।

কথাগুলো শুনে সতী আবার কী-সব ভাবতে লাগলো। বললে—ঠিক আছে, আমি ফিরেই যাবো—

শম্ভু বললে—হ্যাঁ বৌদিমণি, ফিরেই চলুন, আমাদের আর ও-বাড়িতে ভাল লাগছে না থাকতে, বাতাসীর মা ভূতির মা সব্বাই আপনার কথা বলাবলি করছে। সকলের বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে কেমন—

শম্ভুর বাকি কথাগুলো যেন সতীর কানেও গেল না। সতী যেন নিজের মনেই ঠিক করে ফেলেছে যে, সে ফিরে যাবে।

সতী হঠাৎ বললে—একটা ট্যাক্সি ডাক্—

শম্ভু ট্যাক্সি ডাকতে গেল। দীপঙ্কর বললে—যদি বলো তো আমরাও তোমার সঙ্গে যেতে পারি—

সতী বললে—না তোমাদের কাউকে সঙ্গে যেতে হবে না—

লক্ষ্মীদি বললে—দীপুর যাওয়াই ভালো, শাশুড়ী যদি কিছু বলে তো দীপু কিছু বলতে পারবে, নইলে ভাববে কোথায় ছিলি, কোথায় রাত কাটিয়েছিস্, নানা কথা উঠবে—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো লক্ষ্মীদি, সবাই মিলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি, একজন মেয়েমানুষ থাকলে তবু ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসবে—

সেদিন শেষ পর্যন্ত তিনজনেই গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। অপরাধ যখন ঘটেছে, তখন সর্বরকমে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। গাড়িতে যেতে যেতে লক্ষ্মীদি বলেছিল—আমি গিয়ে যদি কোন উল্টো ফল হয়?

দীপঙ্কর বলেছিল—তোমার কিছু ভয় নেই লক্ষ্মীদি, সতীর হয়ে আমরা ক্ষমা চেয়ে নেব ওর শাশুড়ীর কাছে—

লক্ষ্মীদি বলেছিল—ক্ষমা চাইতে তো আমার আপত্তি নেই ভাই, আমি না-হয় পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাবো। আমাদের যখন মেয়ে, তখন আমরাই তো অপরাধী! বরপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা কী? কিন্তু তিনি আমাকে দেখে যদি আরো রেগে যান?

দীপঙ্কর বললে—সেই জন্যেই তো তোমায় নিয়ে যাচ্ছি লক্ষ্মীদি, বলবো, যার জন্যে আপনি এত গঞ্জনা দেন সতীকে, এই সেই লক্ষ্মীদি আমার, এখন দেখুন সেই লক্ষ্মীদি নিজে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে। তোমাকে একবার দেখলে নিশ্চয়ই তাঁর ভুল-ধারণা ভেঙে যাবে—তোমার চেহারা একবার দেখলে কারো রাগ থাকতে পারে না—

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তাঁর পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইতে পারি, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই—। তিনি আমাকে গালাগালি-মন্দ যা-ইচ্ছে করুন, আমি সব মাথা পেতে নেব। শুধু বলবো, সতীকে আপনি ক্ষমা করুন। আমাদের মা নেই, আপনিই সতীর মা—। তাতে আমার অপমানও নেই, লজ্জাও নেই—

তারপর একটু থেমে বললে—সতী তো জানে না, ও যখন ছোট, তখন থেকে ওর জন্যে আমি কীই-না করেছি, আজকে ও হয়ত ভুলে গেছে। আমায় একটা কিছু জিনিস কিনে দিলে ওকেও আমি বাবাকে বলে কিনিয়ে দিয়েছি—আমি ছিলাম বড় মেয়ে, বাবা আমাকেই বেশি ভালবাসতো, কিন্তু বলুক দিকি ও যে কখনও আমি ওকে না-দিয়ে কিছু নিয়েছি কি না! আমার সঙ্গে ও-ই বরাবর ঝগড়া করেছে, কিন্তু ওকে আমি কোনওদিন কিছু বলেছি তার জন্যে?

সত্যিই গাড়ির মধ্যে সেদিন লক্ষ্মীদির কথাগুলো শুনে সতীও কিছু বলেনি। হয়ত তার বলবার কিছু ছিলও না। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হওয়ার দীর্ঘ দিনগুলো হয়ত তার মনে উদয় হচ্ছিল। হয়ত সেই সকালবেলা গাড়িতে দুই বোনে পাশাপাশি বসে চলতে চলতে বিগত দিনের স্মৃতিগুলোর জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। এমনি করেই হয়ত মানুষ একদিন বড় হয়ে ছোটবেলাকার জন্যে দুঃখ বোধ করে। ছোটবেলায় ফিরে যেতে চায় মানুষ আবার। দীপঙ্কর দু'জনের মুখের দিকেই চেয়ে দেখছিল। দুই বোন। এত তাদের ঝগড়া, অথচ এত তাদের প্রীতি! সতী লক্ষ্মীদিকে গালাগালি দিয়েছে, আঘাত করেছে, কত কী বলেছে, তবু তো লক্ষ্মীদি আজ না এসে পারেনি এখানে!

লক্ষ্মীদি বললে—আর তা ছাড়া এই-ই তো বলতে গেলে আসল জীবন আরম্ভ হলো সতীর। বিয়ের পর থেকেই তো মেয়েমানুষের সত্যিকারের জীবন আরম্ভ হয়! জীবনের কতটুকু জানতে পারা যায় বিয়ের আগে, কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়। আসল পরীক্ষা তো এই সময়েই। বাপের বাড়িতে সব মেয়েই ভাল। হাজার-দোষ করলেও সেখানে ক্ষমা করবার, মিষ্টি কথা বলবার লোকের অভাব নেই—কিন্তু শ্বশুরবাড়ি? শ্বশুরবাড়িতেই তো ভাল-মন্দ যাচাই হবে! যে শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ীকে খুশী করতে পেরেছে স্বামীকে বশ করতে

পেরেছে, তারই তো জয়। তুমি কত গুণের মেয়ে তা বোঝা যাবে শ্বশুরবাড়িতে গেলে—! আমার কাকীমা বলতো—'তেলের পরীক্ষা বেগুনে আর সোনার পরীক্ষা আগুনে'—তা মেয়েমানুষের পরীক্ষাও ওই শ্বশুরবাড়িতে—

দীপঙ্কর সতীর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। সতী তখনও কথা বলছে না। চুপ করে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। কোথায় যেন সে হারিয়ে গেছে। যেন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে জীবনের গোলক-ধাঁধায়। নিজের বুদ্ধি দিয়ে যা সে হারিয়েছিল, হৃদয় দিয়ে তা যেন সে ফিরে পেয়েছে। যেন সে এতদিনে বুঝতে পেরেছে বিশৃঙ্খলতায় উদ্দীপনা আছে কিন্তু কল্যাণ নেই, আনন্দও নেই। যেন সেই জন্যেই চুপ করে বসেছিল আপন মনে।

লক্ষ্মীদি হঠাৎ বললে—মাকে তো তুই দেখিসনি, আমি দেখেছি, আমার একটু-একটু মনে আছে—

সতী কোনও কথা বললে না।

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—আমার মুখে আজ মায়ের কথা শোভা পায় না ঠিক, কিন্তু তবু বলছি, মা আজ বেঁচে থাকলে আমাদের সংসারটা এমন করে ছারখার হয়ে যেত না। মা থাকলে তুই-ই কি আর এমনি করে চলে আসতে পারতিস শ্বশুরবাড়ি থেকে? মা'র কথা মনে করেও তোর একটু কষ্ট হতো—। আর শুধু তোর কথাই বা বলি কেন? আমিও কি যা হয়েছি, তা হতুম? ছোট-বেলায় মনে আছে মা আমাকে কত ছড়া শেখাতো—। মা একদিন বলেছিল—হাতে হলুদ না লাগলে রাঁধুনী হয় না। তা মেয়েমানুষেরও তাই রে। বিয়ে না হলে মেয়েরা মেয়েমানুষই হয় না। যতদিন বিয়ে হয়নি ততদিন অন্যরকম। অন্যায় করলেও কেউ বকবার নেই। কিন্তু একদিন তো সকলকেই স্বামীর সংসার করতে হবে। একদিন তোমারই আবার ছেলে হবে, তোমারই আবার ছেলের বউ ঘরে আসবে। তখন সেই ছেলের বউকেও আবার নিজের মনে করে তার সঙ্গে ঘর করতে হবে। তখনও তো আর এক পরীক্ষা—

দীপঙ্কর বললে—শুধু মেয়েদের কেন লক্ষ্মীদি, মানুষের জীবন মানেই তো পরীক্ষা—। স্কুলে কলেজে পরীক্ষা দিয়েছি একদিন। এখন মনে হচ্ছে এই পরীক্ষার কাছে সে-পরীক্ষা কত সহজ!

লক্ষ্মীদি বললে—কলেজের বইতে পড়েছি অসকার ওয়াইল্ডের একটা কথা—The Book of Life begins in a garden, and ends in Revelations এই তো সবে আমাদের জীবন আরম্ভ হলো। সবে শুরু! এখনই থেমে গেলে চলে?

দুজনের কথার লক্ষ্যস্থলই সতী। যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা সে কিন্তু একটাও কথা বলেনি। সে তখনও একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নির্বিকার নির্বিকল্প। গড় গড় করে গড়িয়ে চলছে গাড়ি। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছে শম্ভু আর তারা তিনজনে বসে কেবল কথা বলে

চলেছে।

লক্ষ্মীদি আবার বলতে লাগলো—আজকে হয়ত আমার কথাগুলো তোর ভাল লাগছে না সতী, কিন্তু দেখবি, একদিন যখন আবার গিন্নি-বান্নি হয়ে উঠবি, একদিন যখন তুই-ই আবার ছেলে-মেয়ের মা হবি, তখন তুই-ই বলবি—লক্ষ্মীদি ঠিকই বলেছিল! আমার জীবন তো ফুরিয়েই এসেছে। আমি হয়ত তখন আর দেখতেও আসবো না, বলতেও আসবো না তোকে—। কিন্তু যেখানেই থাকি, তোকে সুখী দেখলে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো রে—

দীপঙ্কর বললে—ও কথা কেন বলছো লক্ষ্মীদি, তোমারই বা বয়েস কী এমন হলো?

লক্ষ্মীদি বললে—বাইরের বয়েসটাই বুঝি সব? মনের বয়েসটা তো দেখছিস না। কত ঝড়-ঝাপটা যে জীবনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, অন্য কেউ হলে বোধহয় পাগল হয়ে যেত এতদিনে। আমি যে বেঁচে আছি, সেইটেই তো ঢের! ওই একটা আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি—ভাবছি জীবনের শেষটা দেখবো। তা সে যত দুঃখেরই হোক আর যত কষ্টেরই হোক। দেখি ভাগ্য আমাকে কোন্ ঘাটে নিয়ে তোলে—! সতীর এখন এই সবে জীবন আরম্ভ হয়েছে, এখনই এত মুষড়ে পড়লে চলে? তোর যে এখনও অনেক বাকি রে! তোকে যে এখনও অনেক দূর যেতে হবে রে! আর জীবনটা শুধু সুখের যাত্রা মনে করে তাদের কথা আলাদা! আবার যারা শুধু দুঃখের মনে করে তাদের কথাও আলাদা! কিন্তু ভাই, আমি দেখেছি জীবনটা যত দুঃখের তত মধুর! দুঃখের মধ্যে দিয়েই সুখকে খুঁজে বার করে নিতে হবে—। তা না করলে যে উপায় নেই—

লক্ষ্মীদির মুখ থেকে এত কথা কোনওদিন শোনেনি দীপঙ্কর আগে। এত কথা যে লক্ষ্মীদি ভাবে তা-ও দীপঙ্কর কল্পনা করতে পারেনি কখনও।

দীপঙ্কর বললে—তুমি এত কথা কী করে জানলে লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি জানবো না তো কে জানবে রে? আমার মত করে কোন্ মেয়ে জীবনকে এমন করে দেখেছে? কলকাতার সব চেয়ে উঁচুমহলের সঙ্গে যেমন মিশেছি তেমনি একেবারে রাস্তার নর্দমার জীবনও দেখেছি আমি—আমার দেখতে কি কিছু বাকি আছে? তবু মনে হয়, কিছুই যেন দেখা হলো না। জীবনের যেন অনেকটুকুই দেখতে বাকি রয়েছে এখনো—! এত দেখেছি বলেই তো সতীকে বলছি এত কথা! আজ সতী এইটুকু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারছে না, কিন্তু ও তো জানে না সহ্য করতে পারার কত লাভ! মানুষ সহ্য করতে পারে বলেই তো মানুষ। মানুষই সামনে দেখতে পায়, মানুষই আশা করে, মানুষই ভালবাসে, মানুষই বড় হয়। যে সহ্য করতে পারে না সেই তো ঠকে! সে-ই আত্মহত্যা করে! কিন্তু যে সহ্য করতে পারে, তার কি কম লাভ! সে সব পায়। সে দুঃখও পায়, কষ্টও পায়, বেদনাও পায়, আনন্দও পায়। আর যে আত্মহত্যা করে সে শুধু পায় কষ্ট। সে জীবনের একটা দিকই দেখলে,

সব দিকটা তার চোখে পড়লো না—। সে একচক্ষু হরিণ—

সব কথাগুলোই সতীকে লক্ষ্য করে বলা। তবু দীপঙ্করেরও শুনতে ভাল লাগছিল। এত কথাও শিখেছে লক্ষ্মীদি! এত দেখেছে, এত ভেবেছে!

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—কিন্তু আশ্চর্য, একদিন সতীই যখন আবার নিজে শাশুড়ী হবে, নিজে সংসারের গিন্নী হবে, তখন এই সতীই আবার ছেলের বউকে ঠিক এমনি করেই কষ্ট দেবে, এমনি করেই সতী আবার তার ছেলের বউকে অত্যাচার করবে—তখন নিজের জীবনের অতীতের কথাটা একেবারে ভুলে যাবে। এইটেই হলো নিয়ম, এইটেই হলো রীতি—এইটেই হলো মেয়ে-মানুষের জীবনে চরম অভিশাপ! কিন্তু দ্যাখ.....

হঠাৎ প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে গাড়িটা ঢুকতেই দীপঙ্কর বললে—এইবার এসে পড়েছি লক্ষ্মীদি, ওইটেই সতীর শ্বশুরবাড়ি—

—কোন্‌টা রে?

—ওই যে ডান দিকের তেতলা বাড়িটা, ওইটে!

যথারীতি দারোয়ান বসে ছিল গেটের ভেতরে। গাড়ির আওয়াজ পেতেই দৌড়ে এসে গেট খুলে দিলে। তারপর সতীকে গাড়ির ভেতরে বসে থাকতে দেখে হাত তুলে সেলাম করলে একবার। সতী কিন্তু তখনও নির্বিকার। লক্ষ্মীদি বাড়িটার বিরাটত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভেতরে বাগানের দিকটা নজরে পড়তেই বললে—খুব বড়লোক তো এরা!

গাড়িটা থামতেই শম্ভু আগে নেমে গিয়ে কোন্ দিকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। দীপঙ্কর নামলো, লক্ষ্মীদিও নামলো। নেমে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সতীও নেমে পড়েছে। দীপঙ্কর গাড়ির ভাড়াটা মিটিয়ে দিতেই সেটা বেরিয়ে গেল বাইরে।

বাগানের মালীটা দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। গ্যারাজের পাশে ড্রাইভারটাও বসে ছিল। সবাই এল কাছে। এসে সতীকে প্রণাম করলে। কারো মুখ দিয়ে যেন কিছু কথা বেরোচ্ছে না। সবাই যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সতীকে দেখে। সমস্ত বাড়িটা যেন থম্ থম্ করছে। সমস্ত বাড়িটা যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দীপঙ্করের ভয় করতে লাগলো। কোথায় এর প্রাণ, কোথায় এর আত্মা? কার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে! কার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে তারা?

মনে আছে সেদিন, সেই সকাল বেলা দীপঙ্করের প্রথমটায় একটু ভয় করেছিল। কিসের ভয়, কেন ভয়, তার স্পষ্ট ধারণা কিছু ছিল না। আর অপরাধটা যে কী, সে-সম্বন্ধেও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরেও কোনও দিন স্পষ্ট হয়নি! অপরাধ তো মানুষই করে। দেবতাদের তো অপরাধ করতে হয় না। ক্ষমাও মানুষই করে। তবু অপরাধী মানুষকে নিয়ে অপরাধী মানুষেরই যে মর্মান্তিক প্রায়শ্চিত্তের বিড়ম্বনা তার পরিচয় তো সারাজীবনই দীপঙ্কর

পেয়ে এসেছে। যে অপরাধ করে তারই মুখে অপরাধের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ প্রচার সংসারকে চিরদিন বিড়ম্বিত করে এসেছে। তবু দীপঙ্কর সেই মামুলি প্রায়শ্চিত্ত আর সেই মামুলি ক্ষমার বুলি সম্বল করে সেদিন ঘোষ-বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সতী আগে আগে যাচ্ছিল। লক্ষ্মীদিও তাকে অনুসরণ করে ভেতরের বারান্দার দিকে যাচ্ছিল। দীপঙ্করও চলেছিল তাদের পেছন-পেছন। কোথায় যে গিয়ে শেষ হবে, তা বোধহয় তিনজনের কেউই জানতো না। হয়ত সনাতনবাবুর ঘরটা লক্ষ্য করেই সতী চলেছিল। সনাতনবাবুর কাছে গেলেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে না তা জানতো সতী। কিন্তু সনাতনবাবুর ওপরেও যে আর একজন শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসী আছে তা যেন ইচ্ছে করেই ভুলতে চেয়েছিল।

হঠাৎ বাধা পড়লো একটা শব্দে।

—কে যায় ওখানে?

সতী দাঁড়িয়ে পড়লো প্রথমে। পেছনে লক্ষ্মীদিও দাঁড়িয়ে পড়লো। তার পেছনে দীপঙ্কর।

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সতীর শাশুড়ী।

—কে তোমরা? কোথায় যাচ্ছো?

দীপঙ্করেরই উত্তর দেবার কথা। কিন্তু কোনও উত্তর না-দিয়ে সোজা সামনে গিয়ে সতীর শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে।

—থাক্, থাক্, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ে ফেলো না, আমি পুজো করে উঠছি এই মাত্র!

দীপঙ্কর বললে—আমাকে চিনতে পারবেন না বোধহয়, আমি দীপঙ্কর, অনেকদিন আগে আমি দুবার এসেছিলাম এ-বাড়িতে—

সতীর শাশুড়ী চিনতে পারলেন কি চিনতে পারলেন না তা বোঝা গেল না। বললেন—আর এ কে?

লক্ষ্যটা লক্ষ্মীদির দিকে।

দীপঙ্কর বললে—এই-ই সতীর বড় বোন লক্ষ্মীদি—

কিন্তু পরিচয় দেবার আগেই লক্ষ্মীদি আঁচলটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে সতীর শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছে।

—ছি ছি, ছুঁয়ে ফেললে তুমি? তুমিই তো ওর বোন। বৌমার বড় বোন?

লক্ষ্মীদি সবিনয়ে বললে—হ্যাঁ মা, আমারই বোন সতী!

—তা তুমিই তো বেরিয়ে গিয়েছিলে বাড়ি থেকে? বিয়ে দেবার সময় বেয়াই মশাই তোমার কথা কিছু বলেননি! আমাকে বিধবা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে ছোট মেয়েকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন! তা তুমি এখন কোত্থেকে? কে তোমাকে ঢুকতে দিয়েছে এ-বাড়িতে? তোমার কাছেই কি বৌমা

রাত কাটিয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—আজ্ঞে না, আমাদের বাড়িতে ছিল, আমিই লক্ষ্মীদিকে খবর দিয়ে আনিয়েছি—

—তা তোমাদের বাড়িতেই যদি একটা রাত কাটাতে পারলো বৌমা তো এখানে আবার ফিরিয়ে আনলে কেন তোমরা? একটা রাতেই মনের সাধ মিটে গেল?

এ-সব কথার জন্যে তৈরিই ছিল দীপঙ্কর। এ-সব কথার উত্তরও কেউ আশা করে না। তাই চুপ করে রইল দীপঙ্কর। চুপ করে রইল লক্ষ্মীদি।

—তা বৌমার না-হয় সাধ মিটে গেল, তোমরা কী করতে এসেছ? তোমরা কোন্ অধিকারে এ-বাড়িতে ঢুকেছো? কে এ-বাড়িতে ঢুকতে বলেছে তোমাদের? ভদ্দরলোকের বাড়িতে ঢুকতে তোমাদের লজ্জা করলো না? এত বড় আস্পর্ধা তোমাদের?

তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন—এই দারোয়ান, দারোয়ানটা কোথায় গেল? দারোয়ান—

এ-ঘটনার জন্যেও প্রস্তুত ছিল লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদি সামনে গিয়ে আবার সতীর শাশুড়ীর পায়ের কাছে মেঝেতে মাথা ঠেকাল। বললে—আপনার পায়ে পড়ছি মা, আমাদের মা নেই, আপনিই ওর মা, আপনিই ওর সব—ওকে ক্ষমা করুন মা আপনি। ওর সব দোষ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি—আমায় আপনি শাস্তি দিন—

সতী এ-ঘটনার পর বারান্দা পেরিয়ে সোজা সামনের দিকে যাচ্ছিল। সেদিকে শাশুড়ীর নজর পড়তেই বললেন—তুমি আবার কোথায় যাচ্ছো বৌমা? কোথায় যাচ্ছো? দাঁড়াও এখানে চুপ করে!

সতী আর নড়লো না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো—

লক্ষ্মীদি বলতে লাগলো—আপনি যা শাস্তি দেবেন, সব আমি মাথা পেতে নেব মা, সব অপরাধ আমাদের। আপনি সব অপরাধ ক্ষমা করে সতীকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিন। ওর বয়েস কম, ও না-বুঝে ভুল করে ফেলেছে, কিন্তু আপনি তো বিচক্ষণ, আপনি ওকে তাড়িয়ে দেবেন না, আপনি আশ্রয় না-দিলে ও কোথায় দাঁড়াবে? কার কাছে যাবে। কে আছে ওর?

দীপঙ্কর এতক্ষণ দেখতে পায়নি। নির্মল পালিত ঘরের ভেতরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সে এতক্ষণ পরে হঠাৎ বাইরে এল। এসেই বললে—আমি তাহলে আসি মা-মণি,—

শাশুড়ী নির্মল পালিতের দিকে ফিরলেন। বললেন—সে কি? তোমার সঙ্গে যে আমার কাজ আছে, একটু অপেক্ষা করো—অনেক কাজ আছে তোমার সঙ্গে যে—

নির্মল পালিত আবার ঘরের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ দীপঙ্করকে দেখেই অবাক হয়ে গেল।

—আরে দীপু, তুই?

দীপঙ্কর বললে—এই এসেছি একটা কাজে! তুমি এখানে?

—আরে এরা যে আমার ক্লায়েণ্ট! তা এখানে কী কাজ তোর? এদের বাড়ির সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক?

দীপঙ্কর বললে—আছে কাজ, সনাতনবাবুর স্ত্রী আমার চেনা, সেই ব্যাপারেই এসেছি—

সতীর শাশুড়ীর কানে গিয়েছিল কথাগুলো। বললেন—তুমি ওই ছোকরাকে চেনো নাকি বাবা?

—চিনি না? খুব চিনি। ছোটবেলায় এক ক্লাসে পড়েছি আমরা, ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলে—পরে ক্যাথিড্রাল মিশনারিতে চলে এসেছিলাম—। তা সেই কিরণ কোথায় গেল রে? শুনেছিলাম নাকি টেররিস্ট পার্টিতে ঢুকে একেবারে উচ্ছন্নে গেছে! বড় পুয়োর ছিল ওরা—

দীপঙ্কর শুধু বললে—হ্যাঁ—

—তারপর রায়বাহাদুর একদিন বলছিলেন যে, সে নাকি অ্যাব্‌স্‌কণ্ড্ করে জার্মানীতে গিয়ে পালিয়ে আছে? উঃ, মানুষের কত রকম অধঃপতনই হয়, বেঁচে থাকলে অনেক কিছু দেখা যায় রিয়্যালি—

দীপঙ্করের এ-সব কথা ভাল লাগছিল না। বলতে গেলে এই বাড়িতে এই অবস্থায় নির্মল পালিতের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও তার ভাল লাগেনি।

নির্মল পালিত কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। বললে—তোদের বুড়ো রবিন্‌সন্ তো রিটায়ার করলে। শুনেছিস বোধহয়? আমরা রোটারিতে একটা পার্টি দিলাম ওল্ড ম্যানকে। তা তোর কিছু প্রমোশন হলো? না সেই থার্টি থ্রি-তেই আছিস্? আমি বলছিলাম বুড়োকে রেলওয়েতে এরকম পুওর-পে দিলে সবাই তো অটোমেটিকেলি টেররিস্ট পার্টিতে ঢুকবেই—ইউ কান্ট্ চেক্ ইট্, ইটস্ নেক্‌সট্ টু ইমপসিবল্—

—ওঠো, ওঠো বলছি—

লক্ষ্মীদি তখনও পায়ের কাছে পড়ে ছিল।

শাশুড়ী আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—ওঠো, ওঠো বলছি, ঢের মড়া-কান্না শুনেছি আমি, আর মড়া-কান্নায় আমি ভুলছি না—ওঠো, ওঠো—যেমন বেয়াড়া আমার বউ, তেমনি বেয়াড়া তার বড় বোন! ওঠো—

লক্ষ্মীদি বললে—আপনি আগে বলুন সতীকে ক্ষমা করলেন আপনি—

—তুমি আগে ওঠো তো বাপু! আমি কী-এমন পাপ করেছি যে, তোমাদের কাছে আমায় কথা দিতে হবে—ওঠো বলছি, নইলে দারোয়ান ডাকবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আপনার দু'টি পায়ে ধরছি মা, আপনি সতীকে একটু আশ্রয় দিন—

সতীর শাশুড়ী বললেন—পা আমার অমন সস্তা নয় বাছা, সরো তুমি—

বলে নিজেই একটু সরে গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মীদিও এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

শাশুড়ী বললেন—বলি আবদার তো মন্দ নয়! বাইরে রাত কাটিয়ে এল ঘোষবাড়ির বউ, আর আমি দেব আশ্রয়! কেন, আমি কী অপরাধ করেছি যে তাকে আশ্রয় দিতে যাবো?

লক্ষ্মীদি বললে—ক্ষমাও তো মানুষে করে! অপরাধ যেমন মানুষে করে, ক্ষমাও তো করে মানুষেই! আর যদি ক্ষমা না-করতে পারেন তো শাস্তি দিন। হয় আমাকে দিন, নয় তো ওকেই শাস্তি দিন! শাস্তি নিতেই তো এসেছি আমরা আপনার কাছে—আপনার যেমন খুশী শাস্তি দিন—

কথাটায় যেন কাজ হলো একটু মনে হলো।

শাশুড়ী নিজের মনেই কী যেন ভাবলেন, এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর সামনে শম্ভুকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন—শম্ভু এদিকে শুনে যা—

শম্ভু কাছে এল। শাশুড়ী বললেন—ভেতর-বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয় তো সকলকে, ভূতির মা, বাতাসীর মা, কৈলাস-ঠাকুর—যে যে আছে সবাইকে ডেকে আন্ তো—

—কোথায় ডাকবো মা-মণি?

—এই উঠোনে ডেকে আনবি; আবার কোথায়? আর দারোয়ানকেও ডাক—

শম্ভু চলে গেল ডাকতে। শাশুড়ী লক্ষ্মীদিকে বললেন—তুমি শাস্তি দেবার কথা বললে, তাই শাস্তিই আমি দিচ্ছি—

তারপর নির্মল পালিতের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি যেন চলে যেও না বাবা, একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে—

তারপর উঠোনের দিকে চেয়ে দেখলেন। বললেন—কই; সবাই এসেছে?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ মা-মণি, সবাই এসেছে—

শাশুড়ী সকলকে দেখলেন। বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, দু'জন ঠাকুর। আরো কয়েকজন চাকর-বাকর। সবাইকে দীপঙ্কর চেনে না।

শাশুড়ী বললেন—ড্রাইভার কোথায় গেল? ড্রাইভারকেও ডাক্—

ড্রাইভারও দৌড়তে দৌড়তে এল। মা-মণি বললেন—এখানে আসতে হবে না, ওইখানে সার দিয়ে দাঁড়াও—

তারপর দারোয়ানের খোঁজ পড়লো। দারোয়ান? দারোয়ান কোথায় গেল? দারোয়ানকেও ডাক?

শেষে সবাই এল। সবাই উঠোনে সার দিয়ে দাঁড়াল। দীপঙ্কর কিছুই বুঝতে পারছিল না—কী মতলব সতীর শাশুড়ীর!

মা-মণি হঠাৎ ডাকলেন—সোনা—!

সনাতনবাবু এতক্ষণ নিজের লাইব্রেরী-ঘরে নিজের মনেই পড়ছিলেন। শম্ভুর ডাকে চমকে উঠলেন। বললেন—কী রে?

শম্ভু বললে—মা-মণি আপনাকে ডাকছেন বাইরে—

—কেন রে?

—তা জানিনে, আসুন—

সনাতনবাবু এসে এত লোককে দেখে অবাক হয়ে গেছেন। সতী এসেছে! সতীর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

মা-মণি ডাকলেন—ওদিকে নয়, আমার কাছে এসো সোনা—

সনাতনবাবু এসে বললেন—কী মা?

মা-মণি বললেন—তোমার চটি-জোড়াটা পা থেকে খুলে দাও তো—

—চটি-জোড়া?

—হ্যাঁ, যা বলছি শোন—

সনাতনবাবু পা থেকে চটি-জোড়া খুলে নিয়ে মা'কে দিচ্ছিলেন। মা-মণি বললেন—আমাকে নয়, বৌমাকে দাও—

সনাতনবাবু কী করবেন বুঝতে না পেরে সতীর হাতে দিলেন।

মা-মণি সতীকে বললেন—নাও, ওই জুতো দু' হাতে দিয়ে মাথায় তুলে নাও—

সতী একবার দ্বিধা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু মা-মণি আবার চিৎকার করে বললেন—নাও, মাথায় তোল—

সতী জুতো-জোড়া নিয়ে মাথায় তুললো। চটি-জোড়া দু' হাত দিয়ে ধরে মাথার ওপরেই রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

মা-মণি বললেন—হ্যাঁ এই রকম করে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি যতক্ষণ না নামাতে বলি, ততক্ষণ তুলে রাখবে, নামিও না—

সমস্ত লোকের মুখ যেন বোবা হয়ে গেছে। নির্মল পালিত, লক্ষ্মীদি, ঝি-চাকর দারোয়ান ড্রাইভার সবাই সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে। যেন চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছে সবাই।

সনাতনবাবু আর থাকতে পারলেন না। বললেন—জুতো যেন মাথায় রাখলে সতী—?

মা-মণি ধমকে উঠলেন। বললেন—তুমি থামো—

আর সতী! পাথরের মূর্তিও বোধহয় অত অচল, অত অনড় নয়। পাথরের চোখও বুঝি অত শুকনো, অত কঠিন, অত তীক্ষ্ণ হতে পারে না। সর্বংসহা পৃথিবীও বুঝি অত সহনশীল হতে জানে না। মানুষের সমস্ত লজ্জা, সমস্ত পাপ, সমস্ত ঘৃণা আত্মসাৎ করে সতী যেন সেই সকাল বেলার প্রখর সূর্যের আলোর তলায় সকলের সঙ্কুচিত দৃষ্টির সামনে ধৈর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রেষ্ঠ অপরাধীর মত। আর অসংখ্য সাক্ষীর রুদ্ধ দৃষ্টি যেন সেই লজ্জাশালিনীর লজ্জার আবরণ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দূরে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আর সতী সকলের সামনে যেন উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। ঘোষ-বাড়ির

কুললক্ষ্মী যেন সেই প্রথম অপবিত্র হলো সকলের চোখের সামনে!

লক্ষ্মীদি হাতটা ধরে টান দিতেই দীপঙ্করের যেন সম্বিৎ ফিরে এল। বললে—চলো লক্ষ্মীদি, চলো—আর দেখতে পারছি না—

নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দু'জনে। বাইরে এসে লক্ষ্মীদি বললে—ছি, কাঁদতে নেই—কাঁদে না—

—কিন্তু এ কী হলো লক্ষ্মীদি? এ তো চাইনি আমি!

লক্ষ্মীদি বললে—ভালই হয়েছে দীপু, তুই কিছু ভাবিসনি—ওতে সতীর ভালোই হবে—

কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো এ-ও যেন একরকমের আউট্‌রেজ! দীপঙ্করের চোখের সামনে সতীকে সবাই মিলে আউট্‌রেজ করলে। সবাই মিলে সতীকে রেপ্ করলে। আর দীপঙ্কর কিছুই করতে পারলে না। অসহায়ের মত চুপ করে শুধু দু' চোখ মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। দীপঙ্করের মনে হলো হাজরা রোডের মোড়ের ভিড়ের মধ্যে তার অন্তরের রুদ্ধ প্রতিবাদ যেন আর্তনাদ হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

লক্ষ্মীদি বললে—চল্, ট্রাম এসে গেছে—

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় খণ্ড

আবার সেই আপিস। আবার সেই জীবন। নতুন চেয়ারে বসেও পুরোনো আপিসের গন্ধটা যেন বিষিয়ে দেয় মনটাকে। মিস্টার ঘোষালের ঘরে বসেও দীপঙ্কর যেন পুরোন দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না। সকাল বেলার আবহাওয়াটা সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। কখন ফাইলগুলো এসে জমা হয়েছে টেবিলের ওপর আবার কখন সেগুলো চলে গিয়েছে টেবিল থেকে যন্ত্রের মত। যন্ত্রের মত কাজ করে যায় দীপঙ্কর। যন্ত্রের মত আপিসের রেলগাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে যেন শুধু চলতেই জানে। থামতে জানে না। ট্রেনের তবু ড্রাইভার বদল হয়, ইঞ্জিন বদল হয়, গার্ড বদল হয়। ট্রেনের তবু বৈচিত্র্য আছে যাত্রায়। এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে আর এক ডিস্ট্রিক্টে। এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে। রোড-সাইড থেকে জংশনে, জংশন থেকে ব্র্যাঞ্চে। কিন্তু আপিসের যেন আর ঋতু বদল নেই। চেয়ার বদলালেও যেন আবহাওয়া বদলায় না।

ফাইলের মধ্যে চোখ নিবিষ্ট রেখেও যেন মন উড়ে যায় অন্য জায়গায়। যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে দৃশ্যটা। সতী যেন আপিসের ফাইলের ভিড়ের মধ্যেও উঁকি মারে। সতীর সেই মূর্তিটা ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সতীর চোখে জল নেই। সতীর শরীরে প্রাণ নেই। সতী যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানেও। সতী যেন আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সতী যেন বলছে—আমি সব সহ্য করবো, আমি সকলকে ভুলে যাবো—আমার নিজের শিক্ষা, নিজের অস্তিত্ব কোনও কিছুরই দরকার নেই, সব আমি জলাঞ্জলি দেবো—আমি আত্মঘাতী হবো—

জার্নাল সেকশ্যানের কে-জি-দাশবাবু চায়ের গেলাস থেকে মুখ তুলে নিয়ে বললে—ছোটবেলায় বইতে পড়েছি অতি বাড় ভাল নয় ঝড়ে পড়ে যাবে—কথাটা মিথ্যে নয় হে—

রমেশবাবু জিজ্ঞেস করলে—কেন বড়বাবু, কী হলো?

—আরে, এই সেন-সাহেবের কথা ভাবছি। ওই যে, যে-চেয়ারটায় আপনি বসেছেন, ওই চেয়ারে একদিন বসেছে সেন-সাহেব। এই এনামেলের গেলাসে চা খেয়েছে, আর এখন সে-ই আমাদের সেন-সাহেব! একেই বলে বরাত—

রমেশবাবু জিজ্ঞেস করলে—খুব অহঙ্কার দেখলেন বুঝি?

—অহঙ্কার বলে অহঙ্কার। আগে তবু দেখা হলে হেসে কথা বলতো আজকে একেবারে চিনতেই পারলে না হে! রবিনসন্ সাহেবের কুকুরকে বিস্কুট খাইয়ে হাতে একেবারে স্বর্গ পেয়ে গেছে। ফাইলটা নিয়ে ঘরে গেলুম, বললে—এখন নয় পরে—! এরই নাম টাকা! টাকার মহিমাই এমনি—

যোগেনবাবু বললে—কিন্তু লাক্‌টা খুব ভাল বড়বাবু! স্রেফ্ লাক্—

—লাক্ নয় যোগেনবাবু, লাক্ নয়, আমিও যদি অমন করে সাহেবের পায়ে

তেল দিতে পারতুম তো আমারও লাক্ ফিরে যেত! তা যে কুষ্ঠিতে নেই আমার—

গাঙ্গুলীবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই সব আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। গাঙ্গুলী-বাবুর সঙ্গে সেন-সাহেবের ঘনিষ্ঠতার কথাটা কারোর অজানা নয়! কিন্তু শুধু জার্নাল-সেক্‌শ্যানেই নয়। ট্র্যাফিক আপিসেও একই আলোচনা চলছে। রামলিঙ্গম্‌বাবু সেন-সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এল মুখ কাঁচুমাচু করে।

রঞ্জিতবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো বড়বাবু, সিগ্‌নেচার দিলে সাহেব?

রামলিঙ্গম্‌বাবু বললে—নেহি, বোলা আভি নেহি, পিছে—

রঞ্জিতবাবু বললে—যে-যায় লঙ্কায় সে-ই হয়ে যায় রাবণ! অথচ সেদিন পর্যন্ত অত ভাল লোক ছিল, আজকেই এমন হয়ে গেল! ও সেন-সাহেবের দোষ নয় বড়বাবু, ও চেয়ারেরই দোষ—

শুধু ট্র্যাফিক আপিসেই নয়। এস্‌টাব্লিশমেন্ট্‌ সেক্‌শ্যানেও ওই আলোচনা চলছে। যারা পুরোন লোক তারা সেন-সাহেবকে একদিন ক্লার্ক হয়ে ঢুকতে দেখেছে এই আপিসে। ওই হৃদয় চাপরাসীকে নাকি জিজ্ঞেস করলেই টের পাওয়া যাবে। হৃদয় চাপরাসী কত পরটা পাঁঠার ঘুগ্‌নি আর মাংসের চপ্‌ খাইয়েছে। ট্র্যাফিক আপিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্‌ নৃপেনবাবুর লোক। যারা নতুন, তারা সব হাঁ করে গল্প শুনছে। ভাগ্য মশাই, সবই ভাগ্য!-অথচ দেখুন না, আপিসে এক-একটা ক্লার্ক জন্ম কাটিয়ে দিলে এ-বি গ্রেডে। কেউ তাদের কথা ভাবেই না। কোথায় রইল আপনাদের এস্‌টাব্লিশমেন্ট ম্যানুয়েল্‌ আর কোথায় রইল কোড্‌-রুল। কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানোর কথাটা বোগাস্‌! আসল হলো কুষ্ঠি। একাদশে বৃহস্পতি থাকলে অমন হয় সকলেরই!

—আরে জানেন মশাই, আমি নিজের মুখে শুনেছি সেন-সাহেব ঝি-এর ছেলে। কালিঘাটের এক বামুনের বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করতো ওর মা!

—কী বলছেন যা-তা, তাই কখনও হয়?

—হয় হয়, এ-দুনিয়ায় সবই হয় মশাই! জানেন, মুসোলিনী মুচির ছেলে! বাপ জুতো সেলাই করতো রাস্তার ধারে বসে। আর জার্মানীর হিটলারই বা কী ছিল বলুন! ভিক্ষে করেছে এককালে! আরে, এ-খবর বিশ্বাস না হয় নৃপেনবাবু তো এখনও বেঁচে আছে—যান্‌ না, ছ' পয়সা ট্রামের টিকিট কিনে দেখা করে জিজ্ঞেস করে আসুন না—

একে একে অনেকেই কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ করে গেছে সকাল থেকে। ইঞ্জিনীয়ারিং আপিস থেকে শুরু করে অডিট্‌ আপিস, সি-এম-ও আপিস, কণ্ট্রোলার অব্‌ স্টোরস্‌। দূর থেকে শুধু চেনা-জানা। তবু দীপঙ্কর তাদের জাতে উঠেছে। দীপঙ্করের এখন থেকে অন্য মর্যাদা। এখন থেকে দীপঙ্কর আপিসের জগতে ব্রাহ্মণ। হ্যাভ্‌-নট্‌দের দল থেকে প্রমোশন পেয়ে হ্যাভ্‌দের দলে উঠেছে। সমস্ত ক্লার্কদের স্বপ্নের মানুষ। এখন থেকে অন্য ক্লার্কদের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে

বিরাজ করবে। সবাই আঙুল দিয়ে দেখাবে তার দিকে। বলবে—দেখ কী ব্রিলিয়ান্ট্‌ বয়! তোমরাও ভাল করে মন দিয়ে কাজ করলে একদিন সেন-সাহেব হতে পারবে! তোমরাও লেট্‌-আওয়ার্স পর্যন্ত আপিসে কাজ করলে এই রকম প্রমোশন পাবে একদিন! কিন্তু দীপঙ্করের মনে হলো আসলে এত বড় ধাপ্পা হয়ত নেই। সমস্ত স্টাফ্‌কে খাটিয়ে নেবার পক্ষে এত বড় ধাপ্পাবাজি হয়ত আর নেই। আপিসের অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন তাকে প্রমোশন দিয়ে একেবারে সোনার হরিণ বানিয়ে তুললে। সেই সোনার হরিণের প্রলোভনে কত রঘুবংশ ধ্বংস হবে কে জানে! নিজের ঘরের মধ্যে সোনার হরিণ সেজে দীপঙ্কর আত্মধিক্কারে আঁতকে উঠতে লাগলো বারবার! বাইরে বেরোতেও লজ্জা করতে লাগলো তার। আপিসের দেয়ালগুলোও যেন ওত পেতে আছে তাকে দেখবার জন্যে! গেটের দরোয়ান থেকে শুরু করে মেথর ঝাড়ুদার চাপরাসী পিওন—সকলের মুখে মুখে তার নাম। গেটের পাশে বিশিষ্টদের তালিকায় তার নামও আজ যোগ হয়েছে। রবিনসন্‌ সাহেবের নাম মুছে সেখানে লেখা হয়েছে মিস্টার ঘোষালের নাম। মিস্টার ঘোষালের জায়গায় তার। অথচ ভাবলেও অবাক হতে হয় কেমন করে কোন্‌ যোগ্যতার বাহন হয়ে সে এখানে এসে চেয়ার জুড়ে বসলো। কোথায় তার কৃতিত্ব! সে কি বেশি কাজের? সে কি বেশি পরিশ্রমী! সে কি বেশি-লেখা-পড়া জানে! সে কি যোগ্যতম ব্যক্তি বলেই এই পোস্ট পেয়েছে, না উঁচু পোস্ট পেয়ে সে যোগ্য হয়েছে! তাহলে কি সংসারের সব পদ-মর্যাদার মূলেই এই? এই ধাপ্পাবাজি? আপিসের স্টাফ্‌ আজ কন্‌গ্র্যাচুলেট্‌ করছে কাকে? তাকে না তার চেয়ারকে? কিন্তু এমন তো একদিন আসবে যেদিন এই চেয়ার থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হবে। সেদিন?

সেই নৃপেনবাবু! সেই ট্র্যাফিক আপিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নৃপেনবাবু! পাড়ায় ধুতি কামিজ পরেন। গামছা নিয়ে ময়লা ধুতি পরে গঙ্গায় স্নান করতে যান। কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে মা-মা বলে চিৎকার করে মন্দির মাত করে দেন। কিন্তু কচিৎ কদাচিৎ আপিসে এলে সেই আগেকার কোট-প্যাণ্ট্‌ আবার বেরোয়। সেই আগেকার মতন চুরোট চিবোতে চিবোতে গট্‌-গট্‌ করে এসে আপিসে ঢোকেন। ভাবেন আগেকার মতই বুঝি সবাই সেলাম করবে, খাতির করবে, ভয় করবে। কিন্তু তাঁর নিজেরই চাপরাসী হরনাথ এখন আর আগেকার মত দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করে না। তাঁকে আসতে দেখেও হরনাথ টুলের ওপর বসে থাকে। তাঁর সামনেই টুলে বসে বিড়ি খায়। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

বলে—কেমন আছেন নেপেনবাবু?

সেকশ্যানে সেকশ্যানে গিয়ে বসেন। সবাই কাজে ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে গল্প ফাঁদবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের আর খাতির করবার দরকার নেই তাঁকে।

বলেন—কী খবর গো রামলিঙ্গম্‌বাবু?

কিন্তু রামলিঙ্গম্‌বাবুর তখন গল্প করে নষ্ট করবার মত সময় নেই। অনেক

ক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে আবার এক সময়ে বাড়ি চলে যান। কেউ ফিরেও চায় না তাঁর দিকে। কারোর হাত খালি দেখলেই কাছে বসেন। যেচে যেচে কথা বলেন। জিজ্ঞেস করেন—তোমাদের নতুন সাহেব কেমন কাজ করছে গো?

—কে? কোন্ সাহেবের কথা বলছেন!

—ওই যে নতুন ছোকরা! তোমাদের সেন-সাহেব গো! আমিই তো চাকরি করে দিয়েছিলুম একদিন। ওর মা এসে কেঁদে পড়লো। হাতে পায়ে ধরলো—ভাবলুম গরীবের ছেলে। দিলুম ঢুকিয়ে। থাক্, তা হাতে ধরে ইংরিজী ড্রাফ্‌ট শিখিয়েছি কত, কত ইংরিজী কেটেছি, ছোক্‌রা শুনতো মন দিয়ে বুঝলে, বরাবর কাজ শেখবার ঝোঁক ছিল, উন্নতি করবার ইচ্ছেটা ছিল। তা ছোকরা আমাকে এখনও খাতির করে ভায়া, অকৃতজ্ঞ নয়। সংসারে আজকাল কে-কার বলো না! তবু যা হোক্, উপকারটা মনে রেখেছে বটে!

কথা বলতে বলতে দেখেন সবাই যে-যার কাজে মন দিয়েছে। উঠে দাঁড়ান। বলেন—যাই, উঠি—তোমাদের দেখছি আজকাল কাজের খুব আঠা—ভাল, ভাল—

তারপর দীপঙ্করের ঘরের দরজার সামনে এসে মধুকে বলেন—কী রে, কেমন আছিস বাবা মধু? চিনতে পারিস—?

বলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছিলেন। মধু বললে—ঢুকবেন না বাবু, সাহেব রাগ করবে—

—রাগ করবে মানে! জানিস সাহেবকে কে চাকরিতে ঢুকিয়েছে?

—তা হোক বাবু, না-বলে ঢুকলে আমার চাকরি চলে যাবে। এখন সাহেব ব্যস্ত!

নৃপেনবাবু রেগে যান। বলেন—জানিস আমি কে?

—আপনি যে-ই হোন বাবু, আমি সাহেবের চাকর, আমি ঢুকতে দেব না। আগে আপনি স্লিপ্ দিন!

—স্লিপ্ দিন্ মানে!

বলতে বলতে মুখে কথা আটকে যায় নৃপেনবাবুর। তারপর এদিক ওদিক ঘুরে দেখেন। হাতের কাছে যাকে দেখেন তাকেই ডাকেন। বলেন—ও গোবিন্দ, এই দ্যাখ, তোমাদের আপিসের চাপরাসীর কাণ্ড দ্যাখ। ঢুকছিলাম সেন-সাহেবের ঘরে, জানো তো সেন-সাহেবকে আমিই ঢুকিয়ে দিয়েছি—তা বলে কি না স্লিপ দিতে হবে। এতবড় আস্পর্ধা তোমাদের চাপরাসীদের আজকাল। আমার সময়ে এই কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে দিতাম।—আমি জীবনে কখনও কারো বেয়াদপি সহ্য করিনি হে, আমার সঙ্গে চালাকি—

গোবিন্দবাবু কিছুই বলেন না।

নৃপেনবাবু বলেন—তোমাদের এস্‌টাব্লিশমেন্টের কর্তা আজকাল কে হে?

গোবিন্দবাবু বলেন—সুধীরবাবু!

—কে? সুধীর? সে আবার বড়বাবু হয়ে গেছে? তা যাচ্ছি আমি, সুধীরকে

গেয়ে বলছি—

বলে হন্ হন্ করে বারান্দা পার হয়ে এস্‌টাব্লিশমেন্ট সেকশ্যানের দিকে চলে যান্। গিয়ে দেখেন নতুন নতুন ক্লার্ক। কাউকেই চিনতে পারেন না। সুধীরবাবুও চেয়ারে নেই, হয়ত সাহেবের ঘরে গেছেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানে। তবু সুধীরের দেখা পান্ না। কেউ যেন তাঁকে চেনেই না। কি-রকম যেন বোকা-বোকা দৃষ্টি দিয়ে দেখেন সকলের দিকে। তারপর আবার চুরোট টানতে টানতে চলে যান বাইরে। বাইরে গিয়ে রাস্তার ট্রামে গিয়ে উঠে পড়েন।

সকাল বেলা আপিসে ঢুকেই দীপঙ্কর চাপরাসীকে বলে দিয়েছিল—কেউ যেন আমার ঘরে না ঢোকে আজ—

কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গম্‌বাবু, সুধীরবাবু যারাই দেখা করতে এসেছে, তারাই ফিরে গিয়েছে। সেন সাহেব ব্যস্ত। সময় নেই সেন-সাহেবের।

পাশ-ক্লার্ক হরিশবাবু একবার দেখা করে প্রণাম করতে এসেছিল। হরিশ-বাবুর এটাই কাজ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাহেবদের ঘরে ঢুকে ঢুকে 'গুড-মর্ণিং' করাই হরিশবাবুর নিয়ম। চিরকাল এই কাজই ক'রে আসছে। এই করে করেই ছোট নৌকোখানাকে জীবন-বৈতরণীর ঘাটে ভেড়াতে পেরেছে। আজ সেন-সাহেবের পদোন্নতিতে হরিশবাবুরও একটা কর্তব্য ছিল। আখেরের কাজ। কিন্তু মধু আটকালো দরজার মুখেই। বললে—না বাবু, এখন ঢুকবেন না—

—ঢুকবো না কী রে? কী বলছিস তুই?

মধু বললে—হ্যাঁ বাবু সেন-সাহেব বারণ করে দিয়েছে—

হরিশবাবু তাতেও নিরস্ত হবার লোক নয়। বললে—আমাকে চিনতে পারছিস না তুই? আমি যে পাসবাবু রে! পাস নিতে গেলে তো আমার সেকশ্যানেই যেতে হবে রে তোকে!

মধুও চালাক খুব! বললে—তাহলে স্লিপ্ দিন্—

—এই দ্যাখ, আমার কাছে আবার স্লিপ্ চায়! আমাকে নতুন লোক পেলি নাকি?

বলতে বলতে আত্মসম্মান নিয়ে হরিশবাবু এক সময়ে চলে গেল। মধু সেদিন উঁকি মেরে দেখেছে ভেতরে। সেন-সাহেব যেন অন্য দিনের মত নয়। অন্য দিনের মত হাসিমুখ নয় সাহেবের। গম্ভীর হয়ে ঘরে ঢুকেছে। দু' একবার ঘণ্টা বাজিয়েছে সাহেব। মধু ভেতরে গিয়ে ফাইল নিয়ে এসেছে। কিন্তু সাহেব বেশি কথা বলেনি। কেমন যেন মুখ ভার-ভার। ফাইল নিয়ে আবার চলে এসেছে। কিন্তু খানিক পরে কাচের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে সেন-সাহেব যেন অন্যমনস্ক। ফাইলের দিকেও চোখ নেই। টেবিলের দিকেও চোখ নেই। কোনও

দিকেই যেন চোখ নেই সাহেবের। যেন কী ভাবছে একমনে। নতুন প্রমোশন হয়েছে বলেই কি এমনি! নতুন প্রমোশন হয়েছে বলেই রাতারাতি বদলে গেল সেন-সাহেব!

বিকেল পাঁচটার সময়ই কাঁটায় কাঁটায় সেন-সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মধুও অবাক হয়ে গেছে। এমন সচরাচর হয় না। মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে তখন অনেক ভিড়। দীপঙ্কর সেইদিকে একবার চেয়ে দেখলে। অনেক মাড়োয়ারী, অনেক গুজরাটী, অনেক বাঙালী। নানান কাজের তাগিদ তাদের। কেউ ওয়াগন চায়, কেউ চাকরি চায়। সকলেই কোন-না-কোনও ফেবার চায় ঘোষাল সাহেবের কাছে। ঘোষাল সাহেবের পদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাতির বেড়েছে পাবলিকের কাছে। আগে যে-কাজ রবিনসন্ সাহেব করতো না, সে কাজটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। সকাল থেকে ব্যস্ততা, খালি কাজ, খালি ইন্‌টারভিয়ু। মিস্টার ঘোষালের পদোন্নতিতে যেন উমেদারদের সুবিধেই হয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়েও দীপঙ্করের যেন সমস্ত কিছু ব্যতিক্রম মনে হলো। এই একদিনেই যেন পৃথিবীর চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেই কবে, কবে একদিন এইখানে এই অফিসে সামান্য চাকরি-প্রার্থী হয়ে ঢুকেছিল সে। তারপর দিনে-রাত্রে নিদ্রায়-জাগরণে চাকরিটা তার কাছে যেন অভিশাপ হয়ে উঠেছে। চাকরি তো তার প্রয়োজন ছিল। চাকরি পেয়ে সে তো বেঁচে গেছে। চাকরি পেয়েছে বলেই আজ সে স্বাধীন হয়েছে। আজ সে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সংসারে। তবু চাকরির ওপর এ-বিরাগ তার কেন? দীপঙ্কর এক-এক সময় বুঝতে পারে না কেন তার এমন হয়! যদি চাকরিরই তার প্রয়োজন ছিল তবে এত আত্মবিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা কেন হয়েছিল! কেন সে নিজেকে এমন করে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে চায়? সে-ও তো আরো দশজনের মত অধিকার পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেই পারে! পৃথিবীতে কত কী আছে ভোগ করবার! কত কী আছে দেখবার, অনুভব করবার। কিছু না থাকে তো সিনেমায় গিয়েও বসতে পারে। বসে বসে সময় কাটিয়ে দিতে পারে। আজ কেন সে সারাদিন কারো সঙ্গে দেখা করলে না? মিস্ মাইকেল এসেছিল দেখা করতে, গাঙ্গুলীবাবু এসেছিল দেখা করতে। মধুকে বারণ করে দিয়েছিল দীপঙ্কর। কারোর সঙ্গেই সে আজ দেখা করবে না।

অভয়ঙ্কর টেলিফোনে কনগ্র্যাচুলেট্ করেছে দীপঙ্করকে।

রামমূর্তিও টেলিফোন করে দীপঙ্করকে কনগ্র্যাচুলেট্ করেছে।

আরো কত অফিসার সব। সকলের আত্মীয় হয়ে গেছে দীপঙ্কর তার প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে। ওদের চোখে সত্যিই দীপঙ্কর উঁচুতে উঠেছে। সারা ক্লার্ক-মহলে তাকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে আজ। সে-সব কানে না শুনলেও আন্দাজ করতে পারে দীপঙ্কর। তার অতীতকালের শুরু থেকে বড় হওয়ার

সমস্ত কাহিনী আলোচিত হয়েছে সেকশ্যানে-সেকশ্যানে। অন্য লোকের এ-ঘটনা ঘটলে হয়ত তাদের আনন্দের কারণই ঘটতো। কিন্তু দীপঙ্কর যেন কেমন লজ্জায় ঘৃণায় মুষড়ে পড়লো। তার মাইনে বেড়েছে তাতে পৃথিবীর কার কী ক্ষতি-বৃদ্ধি হলো। তাতে তার ছাড়া আর কার ভালো হলো? তাতে কি তার মনুষ্যত্বকে সম্মান দেওয়া হলো?

মিস্টার ঘোষাল প্রথম দিনই লিস্ট্ করে দিয়েছিল। বলেছিল—এ-সব ফাইল্ এবার থেকে আমিই ডীল করবো সেন্—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—আপনি কেন করবেন? আমিই করতে পারি ও-সব—

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—না, মিস্টার ক্রফোর্ডকে আমি বলেছি, ও-সব আমার কেস্ আমার হাতেই রাখবো—

মিস্টার ঘোষালের কেস মানে পাবলিকের সঙ্গে যত করেসপন্‌ডেন্স্। স্টাফের প্রমোশন। ওয়াগন। যে-সব ব্যাপারে বাইরের লোকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া যাবে, পাবলিকের কাছে খাতির বাড়বে, দশজন এসে তার সঙ্গেই দেখা করতে চাইবে। একটা ওয়াগন বিড়িপাতা বুক করতে পারলে যেখানে সাতশো টাকা প্রফিট্ হবে সেখানে তিনি দাবি করতে পারবেন তিনশো টাকা ব্রাইব্। স্টাফের প্রমোশনের বেলাতেও তাই। বিনা ব্রাইবে মিস্টার ঘোষালের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। পাবলিকও ব্রাইব্ দিতে রাজী। যে ব্রাইব্ নেবে না, সে অচল। রেলের চাকরিতে সে আনফিট্! তবু দীপঙ্করের প্রমোশন হয়েছে। তবু দীপঙ্কর ঘাড় নিচু করে প্রমোশন নিয়ে সেই চেয়ারে বসে সারাদিন কাজ করে এলো! এত বড় অপমান সে সারাদিন কেমন করে সহ্য করলো!

কালিঘাটের মোড়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়লো দীপঙ্কর। কাছেই প্রাণমথবাবুর বাড়ি। প্রাণমথবাবু ছাড়া আর কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় এ-বিষয়ে! আর কে সৎপরামর্শ দিতে পারে তাকে। সেই পুরোন চেনা রাস্তা সেদিনও মানুষের ভিড়ে ভর্তি। দু' পাশে দোকানের সারি। আলো জ্বলে রাস্তাটা উজ্জ্বল করে দিয়েছে। টিনের আর ধোঁয়ার রাজত্ব। হাঁটতে হাঁটতে প্রাণমথবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে একবার দ্বিধা করতে লাগলো।

প্রাণমথবাবু হয়ত কথাটা শুনে অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন—তা বলে চাকরি ছেড়ে দেবে তুমি?

দীপঙ্কর বলবে—হ্যাঁ, আমি তাই ঠিক করেছি, যেখানে মানুষের মর্যাদা নেই সেখানে মাইনে নেওয়া পাপ স্যর—

প্রাণমথবাবু হয়ত বলবেন—কিন্তু সংসারে মর্যাদা কি কেউ কাউকে দেয় দীপঙ্কর? মর্যাদা যে আদায় করে নিতে হয়—জোর করে আদায় করতে হয়—

দীপঙ্কর বলবে—কিন্তু তা বলে ঝগড়া তো আমি করতে পারি না স্যর—

প্রাণমথবাবু হয়ত বলবেন—ব্যাপারটা কী হয়েছে খুলে বলো তো?

দীপঙ্কর সমস্ত খুলে বলবে। তার পোস্টের সঙ্গে যে-দায়িত্ব জড়িত, দীপঙ্করকে আপিস সেই দায়িত্ব বাদ দিয়ে শুধু পোস্টটাই দিয়েছে। শুধু পোস্টের মাইনেটাই দিয়েছে। আসল ক্ষমতাটুকু সব কেড়ে নিয়েছে। এর পরেও কি তার থাকা উচিত সেখানে? সে কি তবে সে-দায়িত্ব পালন করতে অপারগ? তবে কেন তাকে প্রমোশন দেওয়া হলো? এ-ও তো এক-রকমের অপমান! এ-ও তো তার মনুষ্যত্বের ওপর আঘাত! দায়িত্বই যদি না দিলে তো মাইনে নিয়ে সে কী করবে? দায়িত্বহীন মর্যাদা তো তার সম্মানের ওপর কটাক্ষপাত! আর যদি দায়িত্ব না-দিতে চাও তো প্রমোশন দিও না। কে চেয়েছিল তোমাদের কাছে প্রমোশন! তোমরাই প্রমোশন দিয়েছ আমাকে, এখন তোমরাই বলছো তোমার দায়িত্বের ভার আমরা কমিয়ে দিলাম। ঠুঁটো জগন্নাথের মত তুমি পোর্টফোলিও-হীন মিনিস্টার হয়ে থাকো।

প্রাণমথবাবু হয়ত বলবেন—কিন্তু ছেড়ে দিলে তো সমস্যা মিটবে না তোমার! অন্য অনেক লোক আছে যারা সেই অপমান গায়ে মাখতে স্বেচ্ছায় রাজী হবে—সংসারে সুবিধেবাদীর তো অভাব নেই!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করবে—তাহলে আমি কি করবো বলে দিন স্যার, সমস্ত দিন ধরে আমি কেবল ভাবছি, কেবল মনে হচ্ছে চাকরি ছেড়ে দিই—আমার কেউ নেই যে তার সঙ্গে পরামর্শ করবো। আমার মা নেই এখানে, কিন্তু থাকলেও মা এ-সব কথা বুঝতো না—তাই তো আপনার কাছে এসেছি—

বড় রাস্তার পর সরু গলি। গলির ভেতরে প্রাণমথবাবুর বাড়িটা। অনেক ভাবতে ভাবতে বাড়িটার কাছে যেতেই দীপঙ্কর দেখলে—ঘরের ভেতরে লোক ভর্তি। ঘর-বোঝাই। সবাই খদ্দর পরা। সবাই আলোচনা করছে যেন কী নিয়ে। মধ্যেখানের চেয়ারে প্রাণমথবাবু। একটা প্রচণ্ড তর্ক বেধেছে দুজনে। কথার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, বল্লভভাই প্যাটেল, পন্থজী কত কথা উঠছে।

—মশাই, গোবিন্দবল্লভ পন্থের মতন অত শক্ত নার্ভ কার আছে বলুন তো! নইলে যে-রেজিলিউশন পড়তে সবাই ভয় পেয়ে গেল, পন্থজী উঠে গড় গড় করে তাই পড়ে গেলেন! সুভাষ বোসের এগেনস্টে কার দাঁড়াবার সাহস ছিল সেদিন! মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সেদিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন!

—আজকে স্টেটস্‌ম্যান কী লিখেছে দেখেছেন প্রাণমথবাবু?

হঠাৎ কে যেন তাকে দেখতে পেয়েছে। ডাকলে—আরে, দীপু যে—

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। ছিটে আর ফোঁটা দুভাই-ই বসে আছে আসরে। ফোঁটাই প্রথমে দেখতে পেয়েছে। বললে—মাস্টারমশাই আমাদের দীপু এসেছে। দীপুকে চেনেন তো?

প্রাণমথবাবু দীপঙ্করের দিকে চাইলেন। বললেন—কী বাবা? কী খবর?

দীপঙ্কর বললে—আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলাম স্যার—

—কী কাজ?

ফোঁটা এগিয়ে এল চেয়ার ছেড়ে। বললে—কী রে, কংগ্রেসের মেম্বার হবি নাকি?

প্রাণমথবাবু বললেন—না না, তুমি গভর্নমেণ্টের চাকরি করো, তোমার মেম্বার হয়ে দরকার নেই, চাকরির ক্ষতি হতে পারে!

দীপঙ্কর বললে—চাকরি সম্বন্ধেই কথা বলতে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে, তা এখন থাক, আমি পরে একদিন আসবো—

বলে চলেই আসছিল দীপঙ্কর। ফোঁটা বললে—তোর সঙ্গে আমার একটা কাজ আছে দীপু—তোর বাড়িতে একবার যাবো আমি—কবে তোর সময় হবে?

বলতে বলতে ফোঁটা দীপঙ্করের সঙ্গে বাইরে এল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী কাজ, এখনই বলো না?

ফোঁটা ততক্ষণে সরু গলিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার জায়গাটা। সেই সাউথ-ক্যালকাটা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ফটিক ভট্টাচার্য। আজ যেন কোনও বিশেষ কারণে দীপঙ্করকে তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী এমন কাজ বলো না?

ফোঁটা বললে—তোকে কংগ্রেসের মেম্বার হতে হবে।

—আমি তো গভর্নমেণ্ট অফিসার! আমার তো মেম্বারশিপ হবে না!

ফোঁটা বললে—খুব হবে! আমি বলছি হবে? আমি কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, আমি তোকে মেম্বার করে নেব, কেউ জানতে পারবে না। তুই শুধু ব্যালট্-বক্সে ভোট দিবি—

—কিসের ভোট?

ফোঁটা বললে—প্রেসিডেণ্টের ইলেকশ্যান! তুই শুধু চুপি-চুপি নামটা সই করে দিবি, তারপর ভোটের পর তোর নামটা কেটে দেব, কেউ জানতে পারবে না—তোর অফিসের কেউ জানতে পারবে না—

—কিন্তু তাতে তোমার লাভ কী?

ফোঁটা বললে—কংগ্রেসের লাভ! কংগ্রেসের লাভ মানেই দেশের লাভ! কংগ্রেসের কাজ করলে আখেরে তোরও লাভ—যখন স্বরাজ হবে, তখন চাকরিতে তোর আরও প্রমোশন হবে, সাহেবরা সব চলে যাবে, তোরাই তখন একচ্ছত্র! এখন মাইনে পাচ্ছিস চারশো টাকা, তখন হবে হাজার টাকা। যে-সব পোস্টে সাহেবরা আছে এখন, সে-সব পোস্ট তখন তোদের বাঁধা—!

দীপঙ্কর বললে—আমাকে ভাই ক্ষমা করো তুমি, আমি ওর মধ্যে যাবো না—

ফোঁটা বললে—আরে, স্বদেশী করতে কে তোকে বলছে, তুই শুধু ভোট দিয়ে খালাস। আর কিছু করতে হবে না তোকে।

—কিন্তু তাতে তোমার স্বার্থটা কী?

—আমার স্বার্থ আছে বলেই তো বলছি, আমি এখানকার প্রেসিডেণ্ট হতে

পারবো!

দীপংকর বললে—কেন প্রাণমথবাবু তো প্রেসিডেণ্ট রয়েছেই, প্রাণমথবাবু প্রেসিডেণ্ট থাকলেই তো ভাল—

ফোঁটা বললে—না রে, প্রাণমথবাবু থাকলে হবে না, প্রাণমথবাবু বড্ড ভাল লোক। অত ভাল লোক দিয়ে দেশের কাজ চলে না। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হতে হবে তো! মাস্টারমশাই ও সব করতে পারে না, শুধু বলে 'অহিংসা'—আরে বাবা, অহিংসা মুখে বলা ভাল। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মুখের সামনে 'অহিংসা' প্রচার করবো, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কার্যসিদ্ধি করতে গেলে যা-করা দরকার সব করতে হবে।—সেখানে ফেয়ার ফাউল্ বলে কোনও কথা নেই! এই যেমন ভোট! ফল্‌স্ ভোট না দিলে তো প্রাণমথবাবুকে তাড়ানো যাবে না—! আর প্রাণমথবাবু যদ্দিন আছে তদ্দিন তো আমাদের কংগ্রেসেরও কোনও উন্নতি নেই—

দীপঙ্করের হতবাক মুখের ওপর হাতটা তুলে ফোঁটা আবার বললে—তা যাবো তোর কাছে, বুঝলি? ফর্ম নিয়ে যাবো—কবে যাবো?

দীপঙ্করের ঘৃণা হলো। কিছু উত্তর না দিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো এক নিঃশ্বাসে!

ফোঁটা আবার পেছন থেকে ডাকলে। বললে—শোন্ দীপু—

বলে নিজেই কাছে এল। গলা নিচু করে বললে—দ্যাখ্, তুই নিজের ভোট্‌টা তো দিবিই, আর তোদের পাড়ার যদি কেউ থাকে তো তাদেরও মেম্বার হতে বলবি—

দীপঙ্কর বললে—পাড়ায় আমার সঙ্গে কারো পরিচয় নেই—

ফোঁটা বললে—পরিচয় না-ই বা থাকলো, আমরা দুজনে গিয়ে পরিচয় করবো, তুই আমার সম্বন্ধে বলবি, আমি জীবনে কতবার জেল খেটেছি তা তো তুই জানিস। প্রাণমথবাবুর চেয়ে আমি কম জেল খাটিনি—কী বল?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিলে না।

—আর তুই যদি টাকা চাস তা-ও দিতে পারি।

—টাকা?

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল। টাকা দিতে চায় দীপঙ্করকে!

ফোঁটা কিন্তু সে-দিকে চেয়েও দেখলে না। বললে—সব টাকা দিতে রাজী আছি আমি, আমি নিজের গাঁট থেকে টাকা খরচ করবো। যত মেম্বার করে দিবি, পার-হেড্ এক টাকা করে পাবি। আর যে-মেম্বার আমাকে ভোট দেবে তাকেও দেব এক টাকা করে। রাজী আছিস?

ফোঁটা দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। দীপঙ্করও তখন ফোঁটার মুখের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন অঘোরদাদু। অঘোরদাদুর যেন অনেক বয়েস কমে গেছে। অঘোরদাদু যেন আবার নতুন

করে জন্ম নিয়েছে কালিঘাট কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ফটিক ভট্টাচার্যির মধ্যে। অঘোরদাদু যেন তাকে পচা সন্দেশ দেখিয়ে লোভ দেখাচ্ছে। অঘোরদাদু যেন এবার আরো চালাক হয়েছে, আরো চতুর, আরো ধূর্ত! কবে ১৮৮৫ সালে এই কংগ্রেসের জন্ম! কত রক্তাক্ত অধ্যায় অতিক্রম করে, কত সুরেন ব্যানার্জি, কত মদনমোহন মালব্য, কত দেশবন্ধুর ত্যাগ আর বীরত্বের মর্যাদায় পুষ্ট হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে, কত লোক কত জীবন যৌবন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়েছে এই কংগ্রেসের নামে! সেই ছোটবেলায় দুনিকাকার আড্ডায় কত দিন কত খবরের-কাগজের তুমুল বাদ-বিতন্ডার মধ্যে কত কী শুনেছে, আজও সব মনে আছে দীপঙ্করের। সেই দেশবন্ধু সি আর দাশ সম্বন্ধেই ১৯২৫ সালে স্টেটস্‌ম্যান লিখেছিল—India's evil genius, servant of chaos His spiritual house is Moscow, the general headquarters of the forces of hate. তখন এ-কথার স্পষ্ট মানে বোঝেনি দীপঙ্কর কিম্বা কিরণ! কিন্তু রাগ হয়েছিল খুব ওই খবরের কাগজটার ওপর। কতদিন কত বছর ও-কাগজখানা তারা ছোঁয়নি পর্যন্ত। তারপর সি আর দাশের মৃত্যুর দিনের সেই মনের অবস্থা, সেই সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধুর কথা, সেদিন সমস্ত কাহিনীগুলো, সমস্ত স্মৃতিগুলো চোখের সামনে আবার ভেসে উঠলো। অন্ধকার গলিটার মধ্যে ফোঁটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো এখনি এক ঘুষিতে ফোঁটার চোয়ালটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেয়। যেমন-ভাবে লক্ষ্মীদির বাড়িতে অনন্তবাবুকে ঘুষি মেরেছিল তেমনি করে মেরে মাটিতে রাস্তায় শুইয়ে ফেলে! সেই সি আর দাশের চেয়ারে বসবে ফোঁটা! যে-চেয়ারে সুভাষ বোস বসেছে, যে-চেয়ারে প্রাণমথবাবু বসেছে; সেই চেয়ারে ফল্‌স্ ভোট দিয়ে বসবে ফটিক ভট্টাচার্য—ফোঁটা ভট্টাচার্য! তার চেয়ে কংগ্রেস উঠে যাক সে-ও তো ভাল। ইন্ডিয়া স্বরাজ না-পাক, তাও তো ভাল। ফোঁটা যদি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয় তো চিরকাল ইন্ডিয়া পরাধীন থাকুক—সে-ও তবু সহ্য করবে! তাতেও দীপঙ্করের কোনও দুঃখ নেই।

—আচ্ছা এক টাকাতে যদি রাজী না হোস তো দু'টাকা সই। কিন্তু গ্যারাণ্টি দিতে হবে ভোটটা আমাকেই দেবে সবাই—

তারপরে হঠাৎ ফোঁটা অধীর হয়ে উঠলো। বললে—কী রে, চললি কেন—শোন্—শোন্—

—আরে চললি কোথায়, শোন্ শোন্—

লক্ষ্মীদির গলা। কেশব দরজাটা ভেতর থেকে খুলে কোথায় যাচ্ছিল, পেছনে লক্ষ্মীদির গলা পাওয়া গেল। কেশব আর লক্ষ্মীদি দুজনেই দরজার সামনে দীপঙ্করকে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—তুই? কী খবর? কিছু খবর আছে সতীর?

তারপর কেশবের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীদি বললে—তুই যা কেশব, আটটা সোডার বোতল নিয়ে আসবি, আর দু'সের বরফ—যা, আর পান আনবি এক টাকার—সঙ্গে কুচো সুপুরি, চুন আর দোক্তা আনবি—যা দেরি করিসনি, খুব শিগগির—

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললে—কী-রে, সতীর খবর কী? আর গিয়েছিলি সেখানে?

গলিটাতে ঢুকেই দীপঙ্করের যেন কেমন অন্যরকম লাগছিল। অনেক জোড়া জুতো পড়ে ছিল গলিটার শেষ প্রান্তে। দূর থেকে উঠোনটা আলোয় ঝলমল করছে। নানারকম মশলা দেওয়া রান্নার গন্ধ আসছে বাতাসে। যেন কোনও উৎসব এ-বাড়িতে। কীসের উৎসব? লক্ষ্মীদির ছেলের জন্মদিন? লক্ষ্মীদির ছেলে এসেছে বাড়িতে? না-কি লক্ষ্মীদির বিয়ের বার্ষিকী!

লক্ষ্মীদি বললে—আয়, ভেতরে—

দীপঙ্কর বললে—তোমাদের বাড়িতে আজ যেন একটা কিছু আছে মনে হচ্ছে—

লক্ষ্মীদি বললে—আজ একটা কান্ড হয়েছে—

—কী কান্ড?

—চল, তোকে বলছি সব। তুই ওদের সঙ্গে বসবি গিয়ে? সুধাংশু, সুধাংশুর বন্ধুরা, তারপর চৌধুরীও তার দলবল নিয়ে এসে হাজির। ক'বোতল হুইস্কি এনেছে। আর নিউ মার্কেট থেকে ফাউল কিনে এনেছে। আমার বাড়িতে পরোটা আর মাংস খাবে সবাই—

দীপঙ্কর বললে—ওদের কাছে আর না-ই বা গেলাম—

—তাহলে চল, তোর দাতারবাবুর ঘরে বসবি। বসে বসে দাতারবাবুর সঙ্গে একটু গল্প কর না, ও তো একলাই বসে আছে ও-ঘরে। তোর কথা আমিও ভাবছিলুম!

দীপঙ্কর চলতে চলতে হঠাৎ বললে—তা হঠাৎ এমন পরোটা মাংসর ব্যবস্থা হলোই বা কেন লক্ষ্মীদি? অকেশানটা কী?

—অকেশান এমন কিছুই না। সুধাংশু আমাকে কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছে—এই শ' পাঁচেকের মতন। ওদের অফিসে তো ওরা নানারকম মাল কেনে! এবার কিছু সুপুরি কেনার টেন্ডার ছিল, সেই টেন্ডার আমি দিলুম। তিন হাজার টাকার সুপুরি বিক্রী করে পাঁচশো টাকা আমি পেলাম! তা সেই উপলক্ষেই খাওয়াটা—

—কিন্তু এত সুপুরি তুমি কোত্থেকে কিনলে?

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—আমি কিনবো কোত্থেকে। সবই সুধাংশু করলে। সুধাংশু নিজেই সুপুরির টেন্ডার দিলে, নিজেই বিল পাশ করলে। আসলে সুধাংশুই তো সব। আমার কিছুই করতে হয়নি—

বাল্বের পাওয়ার বাড়ানো হয়েছে। রান্নাঘর থেকে ভুর ভুর করে মাংস রান্নার গন্ধ বেরোচ্ছে। উঠোনে জুতোর পাহাড় জমে গেছে। সবই সুধাংশুর খরচ। আসলে সুধাংশুই এ-বাড়ির মালিক। অনন্তবাবু চলে যাবার পর সুধাংশু এসেই তার সিংহাসন জুড়ে বসেছে। ছোট ঘরখানার মধ্যেই সবাই গুঁতোগুঁতি করে মাটিতে বসেছে। মেঝেতে মাদুর পাতা। গোল হয়ে বসে তাসের মধ্যে সবাই মশগুল। পাশে হুইস্কির গেলাস। পানের প্লেট, সিগারেটের কৌটো।

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীদি বললে—তুই দাতারবাবুর সঙ্গে গল্প কর, আমি আসছি—

এ-ঘরটা ছোট। এ-ঘরে উৎসবের কোনও ছোঁয়াচ লাগেনি। একটা তক্তপোশ, দুটো চেয়ার, একটা জামা-কাপড়ের আলনা। তারই মধ্যে দাতারবাবু ফরসা কোট-প্যান্ট পরে ভূতের মতন চুপ করে বসে আছে একটা চেয়ারে। অর্থাৎ লক্ষ্মীদি বসিয়ে রেখেছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আপনি ভাল আছেন দাতারবাবু?

দাতারবাবু মাথা নাড়লে। বললে—হ্যাঁ—

—আমাকে চিনতে পারছেন?

—দীপুবাবু!

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তিই বটে। হয়ত সবই বুঝতে পারছে দাতারবাবু। হয়ত দেখতে পাচ্ছেও সব। হয়ত অনুভবও করতে পারছে। কিন্তু হয়ত উপায় নেই। উপায় না-থাকার লজ্জায় অধোবদন হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। একই বাড়ির পাশের ঘরে হুইস্কি আর জুয়ার জোয়ার চলেছে। আর এখানে এই ঘরে চরম অক্ষমতার সজীব প্রতিমূর্তি! ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ করবার উপায় নেই। বিদ্রোহ করবার ক্ষমতা নেই। ভগ্ন দেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সজীব সাক্ষী হয়ে দিন গুনছে।

—আপনি কিছু ভাববেন না, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন আবার। আবার আপনি ব্যবসা আরম্ভ করতে পারবেন, দেখবেন!

দাতারবাবু বললে—পারবো?

—হ্যাঁ পারবেন, আপনি তো ভালো হয়েই গেছেন। আগে যা দেখেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ভালো। লক্ষ্মীদির জন্যেই এমন শিগগির শিগগির ভালো হলেন। এর পর আরো ভালো হয়ে উঠবেন। আর বেশিদিন ভুগতে হবে না আপনাকে।

দাতারবাবু অনেকক্ষণ চেষ্টা করে বললে—অনেক দিন...

—কীসের অনেক দিন?

—অনেক দিন যে অসুখ—

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না দাতারবাবু কী বলতে চায়। বোঝা গেল অনেক কথা, অনেক দুঃখ, অনেক অভিযোগ জমে আছে বুকের ভেতর। তার

কথা বলবার তার কথা বোঝবার সময় নেই কারো। পাশের ঘর থেকে হাসি গল্পের শব্দ আসছে। বাড়িতে মাংস রান্নার গন্ধ ভাসছে।

দাতারবাবু হঠাৎ বললে—মাটন্—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ মাটন্ রান্না হচ্ছে বাড়িতে, আপনিও মাটন্ খাবেন।

দাতারবাবু হয়ত বুঝতে পারলে। বললে—আমি খাবো না—

—কেন খাবেন না? মাটন্ খেলে দোষ কী? আপনি তো মাটন্ খেতেন আগে?

দাতারবাবু যেন হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নিজের মনেই কী ভাবতে লাগলো। তারপর বললে—সিগারেট!

—আপনি সিগারেট খাবেন! আমি তো সিগারেট খাই না, ও-ঘর থেকে এনে দিতে বলছি।

লক্ষ্মীদি এলে তাকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে নেবার কথাটা ভাবলে দীপঙ্কর। দাতারবাবু আগে কী সিগারেটটাই না খেত। একটার পর একটা! সেই মানুষই এইরকম হয়ে গেছে। সেই সুদূর বর্মা থেকে শুধু লক্ষ্মীদির জন্যে কলকাতায় এসেছে। নিজের কাজ-কর্ম-ব্যবসা সব ছেড়ে শুধু লক্ষ্মীদির জন্যেই এসেছিল এই মানুষটা। কিন্তু এখন? কোথায় গেল লক্ষ্মীদি! কোথায় গেল তার ব্যবসা। কোথায় গেল সেই নিজে! সেই মানুষটা যে নিজেকেও হারালে শেষ পর্যন্ত।

—ওরা কে?

হঠাৎ পাগল দাতারবাবুর মুখে প্রশ্নটা শুনে দীপঙ্কর চমকে উঠলো। পাগলের মনেও প্রশ্ন জেগেছে। পাগলের চোখেও যেন ধরা পড়েছে সব। যেন অনেক দ্বিধার পর কথাটা দাতারবাবু বলে ফেলেছে দীপঙ্করকে।

—এই যে, এবার বল্ তোর কথা।

বলে লক্ষ্মীদি এসে ঘরে ঢুকে তক্তপোশের ওপর বসলো। বললে—এতক্ষণে কেশব এলো, মাংসটা সেদ্ধ হতে এখনও একটু দেরি আছে। এবার বল্, সতীর কাছে আর গিয়েছিলি?

দীপঙ্কর বললে—আমি আর যাইনি—তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম, তুমি কিছু জানো?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি তো তারপরে এদিক নিয়ে ব্যস্ত, আর সময় কোথায় আমার বল্। রাত্তির বেলা তো আমার সময় হয় না—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কাল সকালবেলা আর একবার যেতে পারবে?

লক্ষ্মীদি বললে—আমি আর যেতে পারবো না ভাই—

—তাহলে খবরটা কী করে পাওয়া যাবে?

লক্ষ্মীদি বললে—তুই-ই একবার যা না—

তারপর একটু থেমে বললে—আর গিয়ে দরকার নেই কিছু। তুই বাবাকে

খবর দিয়েছিস তো!

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। আপিসে গিয়েই করে দিয়েছি—

লক্ষ্মীদি বললে—ভালোই হয়েছে। তাহলে আর কোনও ভাবনা নেই। দেখিব বাবা এসে সতীকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যাবেন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই কিছু ভাবিসনি। আর তা ছাড়া শ্বশুরবাড়িতে আবার কোন্ শাশুড়ী কোন্‌কালে বউকে আদর দিয়ে মাথায় তুলে রাখে! শ্বশুরবাড়ি মানেই তো কষ্ট! ও-রকম কষ্ট একটু-আধটু সব মেয়েকেই সহ্য করতে হয়—

দীপঙ্করের তবু যেন কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো। সারাদিন আপিসের ঝঞ্ঝাট গেছে। সারাদিন আত্মগ্লানিতে কেটেছে। তবু সতীর কথাটা ভুলতে পারছে না। সেই বারান্দায় সকলের সামনে অমন করে চূড়ান্ত শাস্তি দেখে এসেছে সতীর। তারপর থেকে কোনও কাজেই শান্তি পায়নি। বাড়িতে গিয়ে চিঠিও পায়নি মার। সমস্ত বুকটা যেন ফাঁপা হয়ে আছে। তাই বুঝি আপিসে কারো সঙ্গে কথা বলতে, কারো সঙ্গে দেখা করতেও ইচ্ছে হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হয়েছে প্রাণমথবাবুর বাড়িতে। আবার হাঁটতে হাঁটতে এখানে লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এখানেই বা কেন সে এল? দীপঙ্কর কি আশা করেছিল লক্ষ্মীদির কাছে খবরটা পাওয়া যাবে! অথচ বাড়িতেও তো সেই নিঃসঙ্গ শূন্যতা! বাড়িতে গিয়েও তো সেই হতাশ চিন্তার জাল বোনা! ভরসা তো কেবল সেই কাশী!

লক্ষ্মীদি আবার ভরসা দিলে—তুই মিছিমিছি অত ভাবছিস কেন?

দীপঙ্কর বললে—ভাবছি, আমরাই তো ওর এই অপমানের জন্যে দায়ী—

—তা কেন দায়ী হতে যাবো? আমরা তো ওর ভালোর জন্যেই করেছি। ও যাতে শ্বশুরবাড়িতে সুখে থাকে, সেই জন্যেই তো ওকে নিয়ে গিয়েছি। আর তা ছাড়া ওর নিজেরও তো শেষকালে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল—

দীপঙ্কর তবু যেন সন্তুষ্ট হলো না। বললে—টেলিগ্রাম পেলেই তো তোমার বাবা চলে আসবেন, কী বলো?

লক্ষ্মীদি বললে—তা আসবেন বৈ কি! সতীকে বাবা খুব ভালবাসেন যে—

দীপঙ্কর বললে—তা হলে বাবা এলেই সব মিটে যাবে, কী বলো!

—হ্যাঁ হ্যাঁ সব মিটে যাবে। তুই মিছিমিছি ভাবছিস এত! আরে মেয়েদের মন পুরুষ মানুষদের মতন অত পলকা নয়। অত অল্পেতে মেয়েমানুষেরা ভেঙে পড়ে না। এই আমাকে দেখছিস না! আমি যদি অত নরম হতুম তো আমার এই সংসার এমন করে সামলাতে পারতুম!

দাতারবাবু দুজনের সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনছিল। দীপঙ্কর সেদিকে চেয়ে দেখলে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠলো।

তারপর সরু গলিটা দিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লো। লক্ষ্মীদি দরজা

পর্যন্ত এসেছিল। হয়ত কিছু সান্ত্বনার কথাও শুনিয়েছিল। কিন্তু কিছুই কানে যায়নি তার। অন্ধকার জনহীন রাস্তার সমুদ্রে দীপঙ্কর গা ভাসিয়ে দিলে।

—লড়াই শুরু হো গিয়া—লড়াই শুরু হো গিয়া—টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ—

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা লোক ছুটছে। সমস্ত বালিগঞ্জ যেন সেই শব্দে হঠাৎ চমকে উঠলো। প্রথমটা দীপঙ্করের কোনওদিকেই কান ছিল না। নিজের ভাবনাতেই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। হঠাৎ মনে হলো পৃথিবীর মাথার ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটে গেল একটা!

আজো মনে আছে সেদিন রাত্রিবেলার অন্ধকারে সেই অখ্যাতনামা একটা হকার কেমন করে মহামারী ডেকে এনেছিল সারা-পৃথিবীতে। প্রথমে বালিগঞ্জের মোড়ে। বাতাসভেদী একটা কর্কশ গলার আর্তনাদ। টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাফ—

আরা কি দ্বারভাঙ্গা কিম্বা মুঙ্গেরের জেলার কোন্ অখ্যাত গ্রামের এক বাসিন্দা হয়ত। ছাতু আর ভেলিগুড় খেয়ে ভোরবেলা সাইকেলে চড়ে খবরের কাগজ বেচে বেড়িয়েছে প্রত্যেক দিন। ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটিয়েছে, আর দিনের বেলা কোন্ আপিসে পিওনের কাজ করেছে। সুদূর বেহার থেকে কলকাতা শহরের টাকার আকর্ষণে ছুটে এসেছিল বেচারী। যেমন করে হোক অর্থ উপায় করতে হবে। হঠাৎ সুযোগ এসে গেল সন্ধ্যেবেলা। পৃথিবীর কোথাকার কোন্ গোলার্ধের কোণে একজন মানুষ লড়াই বাধিয়ে দিলে নিজের কোন্ খেয়ালের বশে, আর এখানে কলকাতার একটা সাইকেল-পিওন হঠাৎ দুটো কাঁচা পয়সার লোভে কাঠফাটা আর্তনাদ করতে লাগলো—টেলিগ্রাফ টেলিগ্রাফ বলে।

আর মুড়ি-মুড়কির মত হাতে হাতে ছড়িয়ে গেল কাগজগুলো। স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, অমৃতবাজার আরও সব কত নাম। বড়বড় মোটা-মোটা অক্ষর। অস্পষ্ট ইলেকট্রিক আলোর তলায় অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো হাজার হাজার চোখের সামনে। জার্মানীর কারখানা থেকে বেরিয়ে লক্ষ লক্ষ বোমা বারুদ গোলা গুলী নিয়ে মোটরগাড়িগুলো ছুটতে আরম্ভ করেছে পোল্যান্ডের গ্রাম-প্রান্তর ভেদ করে। উনিশ শো উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। তারপর সকাল গেছে, বিকেল গেছে, সন্ধ্যেও উত্তরে গেছে কলকাতার শহরে। প্রাণমথবাবু কংগ্রেসের ইলেকশন নিয়ে মিটিং করেছেন। দীপঙ্কর আপিসের বন্ধ ঘরে আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হয়েছে। লক্ষ্মীদির বাড়িতে বোতল-বোতল হুইস্কি শেষ হয়েছে। মিস্ মাইকেল হয়ত তখন হলিউডে যাবার তোড়জোড় শুরু করেছে নিজের ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িতে। আর গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী বোধহয় তখন বেনারসী শাড়ি পাট করে কাশ্মীরে যাবার বন্দোবস্থা করছে। এমন সময় বেহারী সাইকেল পিওনের আর্তনাদে এক সঙ্গে সকলের সব ভাবনায় ছেদ পড়লো।

—কাশী, কাশী!

কাশী দরজা খুলে দিতেই দীপঙ্কর বললে—ওপরে আলো জ্বলছে কেন রে? তুই আলো জেলে রেখেছিস?

কাশী বললে—না, মা এসেছে—

মা? মা কাশী থেকে এসে গেল এর মধ্যে! আর সবাই? সন্তোষকাকা, সন্তোষকাকার মেয়ে! দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল।

কাশী বললে—মা'র খুব অসুখ দাদাবাবু—

দীপঙ্করের মাথার ওপরেই যেন বজ্রাঘাত হলো। দীপঙ্করের মনে হলো তার নিজের জীবনেই যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

মা যে এমন করে হঠাৎ চলে আসবে তা কল্পনাও করতে পারেনি দীপঙ্কর। দীপঙ্করের কাছে মা শুধু মা-ই নয়, মা ছিল দীপঙ্করের অস্তিত্ব। মা'কে বাদ দিলে যেন দীপঙ্করের আর কিছুই থাকে না। মা নেই এ-কথা যেন ভাবতেও পারতো না দীপঙ্কর। সেই মা বাড়িতে এসেছে আর দীপঙ্কর জানতেই পারেনি।

নতুন পাড়ার ডাক্তারবাবুও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন—একটু অসুখ-বিসুখ হবে না তা বলে? আপনি অত ভাবছেন কেন?

দীপঙ্কর বলেছিল—আপনি বলছেন কী ডাক্তারবাবু, মা'র অসুখ, আর আমি ভাববো না?

ডাক্তারবাবু তো জানতো না, যে মা দীপঙ্করের কতখানি। ডাক্তারবাবু তো জানতো না মা'কে বাদ দিয়ে দীপঙ্কর নিজের অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষের জীবনে বাপ-মায়ের আয়ু চিরস্থায়ী নয় কারো। বাপ-মা চিরদিন বেঁচে থাকা সুস্থও নয়, স্বাস্থ্যকরও নয়। তবু সেই ক'দিন দীপঙ্করের সে-যুক্তি মনে আসেনি। ডাক্তারখানার ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দীপঙ্কর কেমন যেন শিশুর মত অসহায় হয়ে উঠতো।

বলতো—মা'র যে জ্বর এখনও ছাড়ছে না ডাক্তারবাবু, কী হবে?

ডাক্তার বলতেন—অত ভাবছেন কেন? ভাল হয়ে যাবেন ঠিক—

অন্যান্য যারা থাকতো, তারা চেয়ে দেখতো দীপঙ্করের দিকে। এতখানি ব্যাকুলতা, এতখানি অধৈর্য তারা আগে দেখেনি কারো। কিন্তু সেদিকে দীপঙ্করের লক্ষ্য ছিল না। উন্মাদের মত হয়ে উঠেছিল দীপঙ্কর সে-ক'দিন। কোথা দিয়ে যে সকাল হতো, কোথা দিয়ে যে সন্ধ্যে নামতো টের পেত না। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বটুকুও ভুলে গিয়েছিল।

মা বলতো—তুই অত ভাবিসনি দীপু—

দীপঙ্কর বলতো—তুমি একটু ভালো হয়ে ওঠো মা শিগ্‌গির শিগ্‌গির—

মা বলতো—এইবারে আমি ভাল হয়ে যাবো বাবা—দেখিস্—

প্রথম দিন মা'র অবস্থা দেখে দীপঙ্কর ভয় পেয়ে গিয়েছিল সত্যি-সত্যিই। বলেছিল—এ কি মা, তুমি চলে এলে যে হঠাৎ?

মা বলেছিল—না বাবা, আমি তোকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বাবা সেখানে—

—কিন্তু তুমিই তো যেতে চেয়েছিলে অত করে?

মা বলেছিল—বাড়ির বিশ্বনাথ ছেড়ে আমি কাশীর বিশ্বনাথ নিয়ে কী করবো বাবা—

সন্তোষকাকা এসেই একেবারে রান্নাঘর নিয়ে পড়েছে। বলেছে—বাবাজী, তুমি এদিকে মন দিও না—আমি আছি ক্ষিরি আছে, খাওয়া-দাওয়ার দিকে ভাবতে হবে না তোমাকে। আর বাজারের ব্যাপারটাও আমার হাতে ছেড়ে দাও—আমি বুঝে-সুঝে এমন বাজার করবো, দেখবে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার—

সেই যে একদিন সন্তোষকাকা এসেছিল রসুলপুর থেকে, তারপর একেবারে এ-বাড়ির লোক হয়ে গেছে। শুধু এ-বাড়ির নয়, এ-পাড়ার লোকদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় করে ফেলেছে। সকালবেলাই এক-একদিন গয়লার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে। বলে—দাম পাবে না বাপু তোমার দুধের, এই বলে রাখছি—যা ইচ্ছে করোগে যাও তুমি, দাম তুমি পাবে না—

পাড়ার লোকেরা এ-লোকটাকে চিনে গেছে। বলে—কী দত্তমশাই, কী বাজার করলেন?

সন্তোষকাকা বলে—যাই বলুন, এ দেশ আপনাদের সুবিধের নয়—আড়াইপো আলু বলে কিনা সাত পয়সা! কলকাতা আমার মাথায় থাকুক মশাই—রসুলপুরই আমার ভাল—

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে—তা রসুলপুরে কবে নাগাদ ফিরছেন?

সন্তোষকাকা বলে—এই ক্ষিরির বিয়েটা দিয়েই যাবো—সামনের অঘ্রাণেই কাজটা করবো ঠিক করেছি—

—তা শুভ কাজ এত দেরি করছেন কেন আর?

—আজ্ঞে, আমার বৌদির আবার ব্যামো হলো কি না? নইলে তো কাজটা আগেই চুকিয়ে ফেলতাম! মা'র অসুখ, ছেলেই বা বিয়ে করে কেমন করে বলুন! দেখছেন তো, জামাইএরও মাথার ওপর কর্তা বলতে কেউ নেই—আমাকে দুপক্ষের দিকটা দেখতে হবে!

রাস্তায় চলতে চলতে কথা না বলে থাকতে পারে না সন্তোষকাকা। কেউ ফেরিওয়ালা রাস্তা দিয়ে গেলেই ডাকে। বলে—ওহে, ও ফেরিওয়ালা, কী ওতে? কী বেচছো তুমি?

ফেরিওয়ালা কাছে আসে। মাথার ঝাঁকাটা নামায়। বলে—ছেলে-মেয়েদের খেলনা—

—দেখি, কীরকম জিনিস?

নানা ধরনের পুতুল। রবারের ছোট-ছোট বেলুন, ইঁদুর, খরগোশ। পেট টিপলে চাঁ-চাঁ শব্দ করে। একটা-একটা করে নাড়া-চাড়া করে সন্তোষকাকা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। পেট টেপে। হরেক রকমের জিনিস। বাহারি মাল।

সন্তোষকাকা বলে—কী রকম দাম গো সব?

দাম শুনে চমকে ওঠে। বলে—অ্যাঁ, তোমরা যে ডাকাত দেখছি গো, এই-টুকুন্-টুকুন খেলনা, এই পল্‌কা জিনিস—চার-আ-না? তুমি যে দিনে ডাকাতি করতে জানো দেখছি। এ তো একবার খেললেই গোল্লায় গেল—

ফেরিওয়ালা বলে—কোন্‌টা আপনি নেবেন বলুন না—

সন্তোষকাকা বলে—আমি নিতে যাবো কেন, আমি কি ছেলেমানুষ হে? আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমি তোমার এই খেল্‌না নিয়ে খেল্‌বো ভেবেছ?

লোকটা তো অবাক। বলে—আপনি নেবেন না তো আমাকে ডাকলেন কেন মিছিমিছি?

—মিছিমিছি মানে? মিছিমিছি মানে কী?

সন্তোষকাকা একেবারে আগুন হয়ে যায় রাগে। বলে—মিছিমিছি কথার মানেটা কী? তুমি জিনিস বেচবে আর আমি জিনিসের দর জিজ্ঞেস করতে পারবো না? দর জিজ্ঞেস করাতেই অপরাধ হয়ে গেল?

ফেরিওয়ালা তখন গজ্ গজ্ করতে আরম্ভ করেছে—যদি মাল না কিনবেন তো আমার মালে হাত দিলেন কেন আপনি?

—এই দ্যাখ, মজা তো মন্দ নয়,—

ফেরিওয়ালা বলে—তা তো বলবেনই মজা, আপনারা ভদ্দরলোক, আপনাদের টাকা আছে, আপনারা যা ইচ্ছে করবেন আর আমাদের বলতে গেলেই যত দোষ—

সন্তোষকাকা তখন সত্যি-সত্যিই রেগে যায়। চিৎকার করে বলে—চেঁচিও না, চেঁচিও না, এই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। খবরদার বলছি ভদ্দরলোকের পাড়ায় চেঁচাবে না, এ কলকাতা শহর, এ পাড়া গাঁ নয় যে যা-ইচ্ছে করবে—

—যা-ইচ্ছে আমি করলুম না আপনি করছেন? আপনিই তো আমার হয়রানি করলেন ঝুট্‌মুট্—

—আবার চেঁচায়? জানো, ওপরে বাড়িতে অসুখ, এখানে চেল্লাচেল্লি করো না। এর পর যদি একটু চেঁচাও তো থানা-পুলিসে খবর দেব বলে রাখছি—

থানা-পুলিসের নাম শুনে লোকটা ক্ষেপে ওঠে। সন্তোষকাকাও মেজাজ গরম করে। আর থাকতে পারে না। শেষকালে দু'জনের চিৎকারে পাড়া গরম হয়ে ওঠে। আশে-পাশের বাড়ি থেকে দু'চারজন গৃহস্থ লোক বেরিয়ে আসে।

তখন দু'জনে বাগ্-বিতণ্ডা চলেছে।

—তোম্ চোপরাও—

—তোম্ চোপরাও—

এর পরেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যেত হয়ত। কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেরা এসে ঠেকায়। বলে—থামুন, করছেন কী?

সন্তোষকাকা বলে—দেখুন না মশাই, লোকটার আস্পর্ধাখানা একবার দেখুন। লোকটা দুপুরবেলা পাড়ার মধ্যে বেমক্কা চেঁচাচ্ছে। আমার দোষের মধ্যে দোষ হয়েছে, আমি ওকে বলেছি, বেশ ভদ্রভাবেই বলেছি যে আমাদের বাড়িতে অসুখ, একটু আস্তে চেঁচা বাবা, তা কথা-নেই-বার্তা-নেই একেবারে গালাগালি—। ভদ্দরলোকের বাড়ি বয়ে গালাগালি দিয়ে যাবে আর আমাদের তাই সহ্য করতে হবে?

সবাই বলে কয়ে ফেরিওয়ালাকে সরিয়ে দিলে। বললে—থাম বাবা, তুমি যেখানে যাচ্ছিলে চলে যাও, এখানে কেউ তোমার খেলনা কিনবে না—

লোকটা চলে গেল। তখন সন্তোষকাকার তেজ দেখে কে! বলে—এই তো, এই করে-করেই আপনারা ওদের মাথায় তুলছেন মশাই, আমাদের রসুলপুরে হলে এতক্ষণ রক্তগঙ্গা বয়ে যেত না!

দীপঙ্কর ওপরে মা'র পাশে বসে ছিল। গোলমাল শুনে সে-ও নিচে নেমে এসেছিল। সদর দরজার বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো?

সন্তোষকাকা হাসলো। বললে—হবে আবার কী বাবাজী! এই তোমাদের কলকাতার ফেরিওয়ালাদের আক্কেলখানা দেখছিলাম—

শেষ পর্যন্ত সব গোলমাল মিটে যায়। সন্তোষকাকা ভেতরে চলে আসে। দীপঙ্কর বলে—আপনি কেন ও-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান কাকাবাবু, ওদের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করে পারবেন না!

সন্তোষকাকা বলে—এই দেখ, বাবাজী, তুমিও ভুল করলে! আমি কেন ঝগড়া করতে যাবো ওদের সঙ্গে! আমার ঝগড়া করার দরকার কী! আমি কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, আমি চুপ চাপ ঘুরে বেড়াই আর কাঁসি বাজাই! আমার দরকার কী কারো সঙ্গে কথা বলবার! আমার কথা বলতে বয়ে গেছে!

দীপঙ্কর নিজের ঘরে চলে যাবার পরই ক্ষীরোদা কাছে এল। বললে—তুমি কেন সব ব্যাপারে থাকো বাবা—

সন্তোষকাকা ক্ষেপে যায়। বলে—কী? কী বললি তুই? আমি সব ব্যাপারে থাকি? কখন আমাকে তুই সব ব্যাপারে থাকতে দেখলি? কখন থাকতে দেখলি, বল্? বল্ তুই?

মা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিরক্ত হয়। বলে—দীপু, নিচেয় গোলমাল হচ্ছে কিসের রে?

দীপঙ্কর বলে—ও কিছু না মা, ও কিছু না—

এমনি রোজই একটা-না-একটা গোলমাল বাধে বাড়িতে। সামান্য উপলক্ষকে কেন্দ্র করে গোলমাল বাধাতে সন্তোষকাকার জুড়ি নেই। খেতে বসে সন্তোষকাকা মেয়েকে বকাবকি করে—এ কী রেঁধেছিস রে ক্ষিরি? কী ছাই রেঁধেছিস্ শুনি?

দীপু এ-ছাইএর রান্না খেতে পারবে? তেল না দিলে চচ্চড়ি হয়? খাবো না, আমি—এই আমি উঠলুম—

বলে সত্যি-সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে সন্তোষকাকা।

ক্ষীরোদা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে। গলা নামিয়ে বলে—বাবা, তুমি কী বল তো, তোমার কি একটুও জ্ঞান নেই। দেখছো জ্যাঠাইমার অসুখ, আর তুমি চেঁচাচ্ছ এমন করে?

সন্তোষকাকা আরো জোরে বলে—চেঁচাবো না? চেঁচাবো না তো কী করবো। এই ছাই পাঁশ খাওয়া যায়? আমি যে হাঁড়ি হাঁড়ি তেল নিয়ে আসি বাজার থেকে, সে এই ছাই পাঁশ রান্নার জন্যে? এই দিয়ে দীপু কী করে খাবে বল্ দিকিনি? এ কেউ খেতে পারে?

আপিসে যাবার আগে সন্তোষকাকা সামনে আসে। বলে—কী রকম রান্না বাবাজী? খেতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে না তো?

দীপঙ্কর বলে—না—

সন্তোষকাকা বলে—ক্ষিরি রাঁধে ভাল বাবাজী। বুঝলে, রান্নাটা করে ভাল। আমি তো তাই বলি—ক্ষিরি তোর রান্নাটা ঠিক তোর মা'র মত হয়েছে—দেখবে, বিয়ের পর তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। ও ভাত ক'টা আর ফেলে রেখো না, খেয়ে ফেল—

সন্তোষকাকা আসার পর থেকে বাজার করা, তদারক করা সমস্তই সন্তোষকাকা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছে। কোনও দিকেই দীপঙ্করকে দেখতে হয় না আর। প্রথম প্রথম মার অসুখের জন্যে আপিসে যাবার ইচ্ছে ছিল না দীপঙ্করের। মা বলেছিল—না বাবা, আমার জন্যে আপিসে যাওয়া বন্ধ কোর না—। আমি দু'দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবো—

আপিসে যাবার আগে দীপঙ্কর সন্তোষকাকাকে বলে গিয়েছিল—আপনি একটু মাকে দেখবেন কাকা, পাশে থাকবেন সারাদিন—তারপর আমি আপিস থেকে এসে আবার দেখবো—

আপিসে গিয়েই সেদিন গাঙ্গুলীবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিল। গাঙ্গুলীবাবু প্রথমে টাকা নিতে চায়নি। বলেছিল—কিন্তু আপনি কেন টাকা দিচ্ছেন সেনবাবু? আমার এ-অভাব তো ঘুচবে না জীবনে—

দীপঙ্কর বলেছিল—তা হোক, ধার হিসেবেই নিন, ইচ্ছে হয় শোধ করবেন, আর না-পারলে শোধ করবেন না—

আটশো টাকা গাঙ্গুলীবাবু গুনে গুনে নিয়েছিল। গাঙ্গুলীবাবু যাবে, গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী যাবে, গাঙ্গুলীবাবুর ছোট পাঁচ বছরের মেয়েও যাবে সঙ্গে।

টাকা ক'টা পকেটে পুরে গাঙ্গুলীবাবু বললে—কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে আর ছোট করবো না সেনবাবু, কিছুই আমার বলবার নেই আপনাকে—

দীপঙ্কর বললে—গিয়ে যদি সময় পান তো চিঠি দেবেন। জানাবেন কেমন থাকেন আপনার স্ত্রী—

তারপর ছুটি নিয়ে পাস নিয়ে একদিন চলে গেল গাঙ্গুলীবাবু। কোথায় কত দূরে কাশ্মীর! দীপঙ্কর নিজে কখনও কাশ্মীর যায়নি। হয়ত যাবেও না কোনদিন। কিন্তু দীপঙ্করের বড় তৃপ্তি হলো। মনে হলো দীপঙ্কর নিজেও যেন মুক্তি পেলে। সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্তি। আপিসে সেদিন বড় আনন্দে কাটলো বহুদিন পরে। মনে হলো যেন দীপঙ্কর বহুদিন পরে পবিত্র হলো। গাঙ্গুলীবাবু জানতেও পারলে না তাকে টাকা দিয়ে দীপঙ্কর কোন্ স্বর্গরাজ্য হাতে পেলে। মনে হলো সবাইকে যেন আজ ক্ষমা করতে পারে দীপঙ্কর। সমস্ত দিনটাই কেমন ভাল লাগতে লাগলো। আপিসে যে কাছে এল, সে-ই সেন-সাহেবের মেজাজ দেখে খুশী হলো। সুধীরবাবুকে ডেকে গাঙ্গুলীবাবুর ফাইলটা আনিয়ে নিলে। এতদিন পরে ক্ষমতা এসেছে দীপঙ্করের হাতে। এতদিনের অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে।

সুধীরবাবু বললে—কিন্তু স্যার, আপনি যে নোট দিচ্ছেন, এ নোটে তো কাজ হবে না—

—কাজ হবে না মানে?

সুধীরবাবু বললে—জার্নাল সেকশ্যানে তো গ্রেড্ তৈরি করতে হবে—গ্রেড্ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে—

—যা করতে হবে করে ফেলুন।

—কিন্তু তাহলে তো ক্রফোর্ড সাহেবের স্যাংশান্ চাই—

—তা স্যাংশান্ নিন্ আপনি! এতদিন স্যাংশান্ নেন্‌নি কেন? আপিসে কোথায় ইন্‌জাস্‌টিস্ হচ্ছে, কোথায় অবিচার হচ্ছে, সে-সব দেখা তো আপনাদেরই কাজ! এমন অনেক স্টাফ্ আছে যাদের প্রমোশন হওয়া দরকার, তাদের প্রমোশন দিতে হবে!

সুধীরবাবু বললে—তা দিতে তো আমাদের আপত্তি নেই স্যার! এখন ঘোষাল সাহেব এই সব ফাইল দেখছেন। তিনি যদি ক্রফোর্ড সাহেবকে দিয়ে স্যাংশান্ করান তো আমার আপত্তি নেই।

দীপঙ্কর বললে—আপনি মিস্টার ঘোষালের কাছে আমার নোট পাঠিয়ে দিন, তারপর আমার যা বলবার আমি বলবো—

ফাইলটা নিয়ে সুধীরবাবু চলে গেল। সমস্ত আপিসময় তোলপাড় পড়ে গেল সেদিন। গাঙ্গুলীবাবু গ্রেড্ পেয়ে যাচ্ছে। সেন-সাহেব নোট দিয়েছে। শুধু তাই নয়। সকলের জন্যে গ্রেডের ব্যবস্থা করতে বলেছে। কাজের জন্যে উৎসাহ না পেলে মানুষ কাজ করবে কেন? রবিনসন্ সাহেব নিজে যা করতে পারেনি, দীপঙ্কর একবার শেষবারের মত করবার চেষ্টা করবে! প্রাণমথবাবু বলেছেন—অবিচার দেখলে দূরে সরে দাঁড়ালে চলবে না। অবিচারের প্রতিকার

করতে হবে। পালিয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। ক্ষমতা তার কেড়ে নেওয়া হয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু ক্ষমতা আদায় করে নিতে হবে। সত্যিই তো, মর্যাদা কেউ কাউকে দেয় না, মর্যাদা জোর করে আদায় করে নিতে হয়। মর্যাদা কেড়ে নিতে হয়! আদায় করতে গেলে যদি ক্ষতি হয় দীপঙ্করের তো হোক!

যাবার দিন গাঙ্গুলীবাবু এসেছিল আপিসে। শেষবারের মত দেখা করে গেল। বললে—তাহলে কাল যাচ্ছি সেনবাবু, অনেক ধন্যবাদ—

দীপঙ্কর বললে—আসুন—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—চিরকাল আপনার কথা মনে থাকবে সেনবাবু, আপনি পরের দুঃখ বুঝতে পারেন, পরের ব্যথা অনুভব করতে পারেন, সবাই যদি আপনার মত হতো—

দীপঙ্কর বললে—সেখানে গিয়ে যদি আরো টাকার দরকার হয় তো আমায় টেলিগ্রাম করবেন, লজ্জা করবেন না—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—আর টাকার দরকার হবে না সেনবাবু, শীতের জামা-কাপড় যা দরকার সবই কেনা হয়ে গেছে—এখন শুধু ওখানে থাকবার খরচটা—তা এতেই কুলিয়ে যাবে—

পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের কেউই জানলো না, জার্নাল সেকশ্যানের এ-বি গ্রেড্ ক্লার্ক পি কে গাঙ্গুলী সেদিন মুক্তি পেলে তার ষোল বছরের বন্ধন থেকে। কোটি কোটি লোকের কেউই জানলে না যে তাদেরই মত একজন নগণ্য মানুষ সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে রাত্রি আটটার এক্‌স্‌প্রেস্ ট্রেনে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে দীর্ঘযাত্রার পাড়ি দিলে। স্টেশনের লোহার ঘণ্টা ঢং ঢং করে নির্দেশ দিলে বিদায়ের। ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠলো। হুইস্‌ল্ বাজালো গার্ড সাহেব।

দীপঙ্করও মুক্তির নিশ্বাস ফেললে। একটা মানুষকেও তো কয়েকদিনের মুক্তি দিতে পেরেছে সে।

আজ এতদিন পরে সব ঘটনা ভাবতে গিয়ে সমস্ত খুঁটিনাটিগুলোও মনে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে! দীপঙ্করের বোধহয় অহঙ্কারই হয়েছিল সেদিন। পি কে গাঙ্গুলী যেন দীপঙ্করেরই আর এক সত্তা। দীপঙ্করই যেন জার্নাল সেকশ্যানের পি কে গাঙ্গুলীর মধ্যে এতদিন বন্দী হয়ে কারাবাস করছিল। প্রমোশন হয়েও যেন দীপঙ্করের বন্দী আত্মার মুক্তি হয়নি। আপিস থেকে বেরোবার পর কেমন যেন হাল্‌কা-হাল্‌কা মনে হলো সমস্ত কিছু। দীপঙ্করের যে-সত্তা সতীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, যে-সত্তা লক্ষ্মীদির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিরাজ করছে গড়িয়াহাটের গলিতে, যে-সত্তা মিস্ মাইকেলের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ছট্‌ফট্ করছে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে, যে-সত্তা তার মা'র মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে আছে স্টেশন রোডের বাড়িতে, সব যেন ছুটি পেয়ে

গেল এই একটা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে। দীপঙ্করের সবগুলো সত্তা যেন বন্দীত্ব ঘুচিয়ে বন্ধন ঘুচিয়ে উধাও হয়ে গেল উন্মুক্ত আকাশের অবাধ স্বাধীনতায়। মনে হলো তার যে-সত্তা কিরণের মধ্যেও সম্ভাবনা হয়ে লুকিয়ে ছিল, তাও যেন সফলতার শিখরে গিয়ে পৌঁছুলো আজ। মনে হলো যেন পি কে গাঙ্গুলী নয়, দীপঙ্করই গার্ডের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেয়ে গেল হাওড়া-স্টেশনের খাঁচা থেকে।

সেদিনও আপিসের মধ্যে নিজের কাজের মধ্যে ডুবে ছিল দীপঙ্কর। মধু এসে বললে—মাইকেল মেমসাব—

মিস্ মাইকেল হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। বললে—হাউ ডু ইউ ডু মিস্টার সেন?

বলে গাউনটা গুটিয়ে একটা চেয়ারে বসলো। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে মিস্ মাইকেলের দিকে। বললে—তোমাকে আর চেনা যাচ্ছে না মিস্ মাইকেল, তুমি একেবারে বদলে গিয়েছ—

সত্যিই বদলে গিয়েছিল মেম-সাহেব। চুলগুলো কুঁকড়িয়ে ফেলেছে। কোঁকড়ানো চুলগুলো ফুলে ফুলে মাথার চারদিকে কেমন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। ম্যাসাজ করে করে ফিগারটাকেও অন্য রকম করে ফেলেছে। যেন আরো মিষ্টি হয়েছে, আরো নরম হয়েছে, আরো বয়স কমিয়ে ফেলেছে। আরো সুন্দরী হয়েছে। গাল দুটো নতুন কস্মেটিক্স মেখে আপেলের মত রঙিন করে ফেলেছে। মৌসুমী ফুলের মত বাহার নিয়ে ঘরে ঢুকেছে মিস্ মাইকেল।

—মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্টার সেন। আমি চেক্ ক্যাশ্ করে ফেলেছি।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—না, কোনও অসুবিধে হয়নি। প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডে আমার জমেছিল টোট্যাল পনেরো হাজার টাকা। আর আমার কাছে ক্যাশ আছে তিন শো—এই আমার ক্যাপিট্যাল।

দীপঙ্কর বললে—তোমার জাহাজ ভাড়াও তো লাগবে অনেক—

মিস্ মাইকেল বললে—তা যা লাগবে তা তো লাগবেই, তারপর ভিভিয়ান্ আছে, দরকার হলে সে-ই দেবে। তার তো অনেক টাকা। তার টাকার শেষ নেই এখন—

দীপঙ্কর বললে—তোমার যদি কিছু টাকার দরকার থাকে তো আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি—

মিস্ মাইকেল ধন্যবাদ দিয়ে বললে—নো থ্যাঙ্কস্ মিস্টার সেন, আই শ্যাল্ রিমেমবার ইউ, তোমাকে চিরকাল আমি মনে রাখবো, আমি জীবনে যদি কাউকে মনে রাখি তো সে তোমাকে মিস্টার সেন—যখন হলিউডে গিয়ে ফিল্‌মে-ডমু-এর

মধ্যে সব স্মৃতি মুছে যাবে, তখনও তোমাকে ভুলবো না আমি—

দীপঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করে এসেছ?

মিস্ মাইকেল বললে—হ্যাঁ, আমার জায়গায় এখনও কাউকে অ্যাপয়েন্ট্ করেনি।

দীপঙ্কর বললে—তোমার জায়গায় আবার কে আসবে জানি না, হয়ত এমন মেয়ে আসবে যার সঙ্গে ঠিক তোমার মত বনিবনা হবে না। সেই প্রথম যখন চাকরিতে ঢুকি, তখনই তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে-সব দিনের কথা আমারও চিরকাল মনে থাকবে—! তুমি তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিলে আমাকে, সে-সব কথা কখনও ভুলবো না—

—তাহলে আসি মিস্টার সেন?

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। গাঙ্গুলীবাবু কাশ্মীর চলে গেল। মিস্ মাইকেলও চলে যাচ্ছে। গাঙ্গুলীবাবু তবু ফিরবে। কিন্তু মিস্ মাইকেল আর ফিরবে না। সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান অতিক্রম করে একেবারে সুদূর হয়ে যাবে। একেবারে সুদূর। আর ইণ্ডিয়ার কথা ভাববে না। ইণ্ডিয়ার নামও ভুলে যাবে হয়ত। যতই মুখে বলুক, সেখানে একবার গেলে কেউ কি ইণ্ডিয়ার কথা মনে রাখে? তখন আর টাইপিস্ট-গিরি করতে হবে না, তখন আর চাকরির জন্যে সকাল ন'টার মধ্যে আপিসে আসার জন্যে দৌড়তে হবে না! আহা, ভালো হোক। শুধু মিস্ মাইকেলের নয়, সকলেরই ভালো হোক। সুখী হোক মিস্ মাইকেল। সকলের ভালো হলেই যেন দীপঙ্করের ভালো হবে!

—হাউ ইজ্ ইওর মাদার? তোমার মা কেমন আছে?

দীপঙ্কর বললে—সেই রকমই, মা'কে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি—কী যে করি—

মিস্ মাইকেল সান্ত্বনা দিলে। বললে—কিছু ভেবো না মিস্টার সেন, গড্ উইল্ লুক্ আফ্টার হার—

তারপর আস্তে আস্তে মিস্ মাইকেল ঘরের বাইরে চলে গেল। যাবার সময় বললে—তোমাকে চিঠি দেব, জাহাজ থেকেই চিঠি দেব—অলরাইট্—ও কে—

মিস্ মাইকেলের চলে যাবার পর কিছুক্ষণ দীপঙ্কর কিছুই কাজ করতে পারেনি। তার মনে হলো একটা-একটা করে সমস্ত দরজাগুলো যেন তার খুলে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত কোনও দিকে কোনও হিসেব রইল না তার। ফাইলের পর ফাইল যেন হাওয়ায় উড়ে চললো। কাজগুলোর যেন পাখা আছে। ঘরের বাইরে মিস্ত্রী খাটছে সমস্ত দিন-রাত। তাদের খট্-খট্ শব্দ হচ্ছে। ব্যাফ্‌ল্-ওয়াল্ তৈরি হচ্ছে চারদিকে। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের তোড়-জোড় চলছে।

মিস্ মাইকেলের ঘরে তখন সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। বহুদূরে যাত্রা। আর বেশি দেরি করা চলবে না। এখন তো সবে যুদ্ধ আরম্ভ। শেষকালে আটলাণ্টিক

ওস্যান্ বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। শেষকালে যদি ইটালি যুদ্ধে নামে তখন আরো ভয়ানক কাণ্ড হয়ে যাবে। হিটলার তার বইতে লিখেছে—

He who wants to live should fight and he who does not want to battle in this world of eternal struggle does not deserve to be alive. In eternal warfare mankind have become great—in eternal peace mankind would be ruined.

রাস্তায় ট্রামে বাসে লোকে আলোচনা করে—এবার মশাই ইংরেজরা জব্দ হবে—বড় বাড় বেড়েছিল শালাদের—

ওপাশের কোণ থেকে একজন গলা বাড়িয়ে বলে—কলকাতার একটা ইঁট পর্যন্ত আস্ত থাকবে না, দেখে নেবেন, গুঁড়ো হয়ে যাবে সমস্ত শহর, এই বলে রাখলুম—

—যদি পারেন তো কিছু চাল কিনে ঘরে স্টক্ করে রাখুন মশায়, শেষকালে খেতে পাবেন না এমন দিন আসছে—

দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ে গেছে—গুজবে কান দিবেন না।

দুনিকাকার আড্ডায় পণ্ডারা আবার জটলা পাকায়। একখানা খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কাগজখানা খুলেই চিৎকার করে ওঠে।

—ওরে বাব্বা, এবার হিটলার লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে রে বাবা!

বলে এক মনে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই কারো। কংগ্রেস মিনিস্ট্রি ছেড়ে দিয়েছে আটটার মধ্যে সাতটা প্রভিন্সে। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে মহাত্মা গান্ধীর দিকে। সুভাষ বোসের দিকে। কারো আর টুঁ শব্দটি করবার ক্ষমতা থাকবে না। চারদিকে স্পাই ঘুরে বেড়াচ্ছে মশাই। আস্তে আস্তে কথা বলুন। দুনিকাকা বলে—না, তোদের জ্বালায় দেখছি আমার চাকরিটা যাবে—

বলে আড্ডা ছেড়ে বাড়ি পালিয়ে যায়।

দিল্লিতে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ সাহেব এসে গেছে। ওদিকে লড়াই চলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। আপিস থেকে লোকেরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায় সব। সকলেই ভয় পেয়ে গেছে। এবার জোর করে সব লড়াইতে নিয়ে গিয়ে গরুর মাংস খেতে দেবে, শুয়োরের মাংস খেতে দেবে। তখন?

প্রথমে স্টেশনারি দোকান থেকে কিছু প্রভিশন্ কিনে নিয়েছিল মিস্ মাইকেল। টফি লজেন্স, ওয়াইন। আরো অনেক টুকি-টাকি। নিউ মার্কেটের ফ্রুটস্। বোম্বে মেলের কামরায় বসে খেতে খেতে যাবে। প্রায় আড়াই দিন ট্রেনে কাটবে। তারপর বোম্বের ভি-টিতে পৌঁছে সেখান থেকে জাহাজ। হিল্ ডোজায় কিড-স্ট। সবাই তার চেনা। জীবন কেটে গেল এই পাড়ায়। শেষবারের মত দেখে নিলে চারদিকে চেয়ে। ওইটে গ্রোসারি। ওই দোকান থেকে কতদিন কত জিনিস কিনেছে মিস্ মাইকেল।

—মেমসাব!

দোকানের ভেতর থেকে গণি মিয়া ডাকলে। মিস্ মাইকেল হাসতে হাসতে কাছে গেল।

গণি মিয়া বললে—কিছু গন্ধ করবেন না মেমসাব?

মিস্ মাইকেল হাসলো। বললে—আই অ্যাম গোইং গণি—গোইং হোম্—

গণি মিয়া বুঝতে পারলে না। বললে—হোম্ মানে?

—হলিউড্! আমেরিকা। আমার ফ্রেণ্ড, ভিভিয়ান লে সেখানে থাকে, ফেমাস ফিল্ম্ স্টার, সে চিঠি লিখেছে—

—আবার কবে আসবেন মেমসাব?

মিস্ মাইকেল বলে—আর আসবো না গণি, আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, এবার ফিল্ম্ স্টার হবো—তোমার সব লোন্ তো ক্লিয়ার্ড—

সকলের সব দেনা ক্লিয়ার করে দিয়েছে মিস্ মাইকেল। নিউ মার্কেট থেকে কিছু কেক্ পেস্ট্রি কিনে নিলে। আজ যেন সকলকে ভাল লাগতে লাগলো। হাউ সুইট্, হাউ নাইস্ দিজ্ পিপল্।

—চললুম মুলজী—

মুলজী মুখ তুলতেই মেমসাহেবকে দেখে ডাকলে—আইয়ে মেমসাব, আইয়ে—

হাতে একগাদা প্যাকেট। ভ্যানিটি ব্যাগ্। সামনে এগিয়ে গিয়ে মিস্ মাইকেল বললে—চললুম মুলজী, হাম যাতা হ্যায়—

—কোথায় যাচ্ছেন মেমসাব!

—তুমি জানো না? আমেরিকায় যাচ্ছি যে, হলিউডে, দি গ্রেট্ হলিউড্। আমার ফ্রেণ্ড্ ভিভিয়ান লে, ফিল্ম স্টার, সে-ই আমাকে চিঠি দিয়েছে—এই ধ্যাখ, চিঠি দেখ—

বলে পকেট থেকে ভিভিয়ানের চিঠিটা বার করলে। যেন চিঠি না-দেখালে বিশ্বাস হবে না কারো। ইংরিজী চিঠি, মুলজীর বুঝতে পারার কথা নয়। দূর থেকে দেখে হাসলো শুধু। আনন্দের হাসি, অভিনন্দনের হাসি। মিস্ মাইকেল চলে যেতে যেতে বললে—আমি তোমাদের ভুলবো না মুলজী, আই উইল্ রিমেম্বার ইউ অল্—তোমরা সবাই এত ভাল—

মেমসাহেব চলে গেল। মুলজী পাশের লোককে বললে—মাগীটা খুব মদ খেতে পারতো ভাই, খুব দিল-দরিয়া ছিল, দিনরাত ছোকরাদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে এককালে—

পাশের লোকটা বললে—আরে ভাই ও-বেটীদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা হলো রাজার জাত, ওরা আমেরিকায় যাবে না তো যাবে কারা?

শুধু গণি মিয়া নয়। শুধু মুলজী নয়। মাটন্ওয়ালা, ভেজিটেব্লওয়ালা, বাটারওয়ালা সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে দেখা করে এল মিস্ মাইকেল। কাল

থেকে আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না। কাল ইন্ডিয়া ছেড়ে যাওয়া। এতদিনের সব পরিচয়। এতদিন অহংকারে কারোর সঙ্গে ভালো করে কথা বলেনি। আজ যেন সবাইকে জানিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো। তার আনন্দের খবরটা কাউকে না জানালে যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। তার নিজের আনন্দটা সকলের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে ইচ্ছে করছে।

—আর দেখা হবে না তোমার সঙ্গে হরুমালী!

—কেন মেমসাব।

—ও, তুমি জানো না বুঝি? আমি তো আমেরিকায় যাচ্ছি, হলিউড্। হলিউডের নাম শুনেছ? যেখানে ফিল্ম্ বানায়?

—খুব শুনেছি মেমসাব।

—আমি সেইখানে যাচ্ছি। ভিভিয়ান লে'র নাম শুনেছ তো? সেই ভিভিয়ান আমায় চিঠি দিয়েছে, এই দেখ চিঠি! সে আমার খুব ইন্টিমেট্ ফ্রেন্ড্—

হরুমালী এ-পাড়ার নাম করা টেলার। মাস্টার টেলার। মেমসাহেবদের হরেক ডিজাইনের গাউন তৈরিতে পাকা হাত।

বললে—তাহলে আর আসছেন না মেমসাহেব?

—আর কী করতে আসবো বলো? আর তো আসবার দরকার নেই আমার। তবে আসবো বৈ কি। একেবারে পালিয়ে যাবো না। মাঝে মাঝে আসবো—

হরুমালী বললে—মাঝে মাঝে এলে দেখা করবেন মেমসাহেব, আমি গাউন তৈরি করে দেব—

মিস মাইকেল খিল্ খিল্ করে হেসে ফেললে। বললে—তুমি রসিকতা বুঝলে না হরুমালী, মাঝে-মাঝে আসবো বলে কি আর সত্যিই আসবো? আসবো এই গ্লোব-সিনেমায়, আসবো এল্ফিন্স্টোনে, আসবো প্লাজায়! তোমরা টিকিট কাটলে আমাকে দেখতে পাবে! আমার সঙ্গে লিলিয়ান গিশকে দেখতে পাবে, জেনেট গেইনরকে দেখতে পাবে, ক্লারা বো'কে দেখতে পাবে—সবাই যে আমরা একসঙ্গে কাজ করবো—।

তারপরে একটু থেমে বললে—এই দেখ না, আপিস থেকে আজ প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে নিয়ে এলুম—সারা জীবন চাকরি করে যা জমেছে সব—

সকলের সঙ্গেই শেষবারের মত দেখা করা হয়ে গিয়েছে। বাড়ি আসার পথে হঠাৎ খেয়াল হলো একটা ভিখিরি রাস্তায় বসে বসে ভিক্ষে করছে। রোজই ওখানে বসে থাকে বেগারটা। ময়লা একটা ন্যাকড়া পেতে বসে থাকে। যার খুশি পয়সা ফেলে দিয়ে যায় ন্যাকড়ার ওপর। ভিখিরিটা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে মুখ তুলে।

—টুম্ লেও, টুম রুপেয়া লেও—

ভিখিরিটার তখন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত অবস্থা। বললে—আপ্ রানী হোগা মেমসাব—

মিস্ মাইকেলের হাসি এল। বললে—রানী নেহি, ফিল্ম্ স্টার। ফিল্ম্ স্টার জান্তা? ভিভিয়ান লেকা নাম শুনা হ্যায়?

রাস্তার নিঃসম্বল ভিখিরি কোনও খবরই রাখে না, এক পেটের খবর ছাড়া। মিস্ মাইকেল চলে যেতে যেতে বললে—তোমার আচ্ছা হোগা, গড্ ব্লেস্ ইউ পুওর সোল্—

ভিখিরিটা জানতেও পারলে না, কোন্ ঘটনার সূত্রে আজ তার ছেঁড়া ন্যাকড়ার ওপর এমন ভাগ্যোদয় হলো। এমন ঘটনা তার জীবনে কখনও ঘটেনি! আর কার জীবনেই বা ঘটেছে! কজনই বা রেলের চাকরি ছেড়ে ভিভিয়ান লে হতে পারে? ভিভিয়ান্ই ইতিহাসে প্রথম। তার পরেই মিস্ মাইকেল। কিড্-সুটক্টক্ শব্দ করতে করতে গিয়ে উঠলো নিজের ফ্ল্যাটের কাঠের সিঁড়িতে।

—ট্রা-লা-লা-লা-লা—

কিড্-সু শিস দিতে দিতে গান গাইতে গাইতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। ওপর থেকে অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা নামছে। বেয়ারা, খানসামা, আয়া, দালাল—সকলেই ব্যস্ত। প্রত্যেক দিনের মত আরম্ভ হয়েছে সন্ধ্যেবেলার ব্যবসা। পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসছে অন্য কার ফ্ল্যাট থেকে।

—হ্যাল্লো জোন!

মিস্ মাইকেল দেখেই হেসে উঠলো। তিনতলার মেয়ে ডরোথি।

—গেটিং রেডি?

মিস্ মাইকেল বললে—এভ্রিথিং কম্প্লিট্। কেনা-কাটা শেষ। এখন খালি রেস্ট্। এখন ব্যাগ্স্ আর ব্যাগেজ গুছোতে হবে।

ডরোথি বললে—কাল ক'টার সময় প্লেন?

—এইট্ থার্টি।

ডরোথি কী যেন ভাবলে। বললে—আমারও এ-লাইফ আর ভালো লাগে না জোন। আই অ্যাম্ ডগ্টায়ার্ড। আমাকেও তুমি নিয়ে চলো জোন। আই অ্যাম টায়ার্ড অব্ ক্যালকাটা।

মিস্ মাইকেল বললে—বাট্ লেট্ মি গো ফার্স্ট। আমি আগে যাই—আমি সেখানে গিয়ে আগে সেট্‌ল করি, তারপরে তোমাকে চিঠি লিখবো—

—ভুলে যাবে না তো?

মিস্ মাইকেল বললে—ভুলে যাবো কেন? আই উইল রাইট টু ইউ—আমি কথা দিচ্ছি চিঠি লিখবো—।

হঠাৎ নিচের খুব জোরে কে যেন শিস দিয়ে উঠলো। ডরোথি শুনেই বললে—সো লং জোন, সো লং—

বলে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে নিচের নামলো। ডরোথির বয়-ফ্রেন্ডরা তখন মোটর বাইক নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। মিস্ মাইকেল নিজের দরজার চাবি খুললে। আয়াকে ছাড়িয়ে দিয়েছে আগেই। দরজাটা খুলতেই একটা ড্যাম্প্

হাওয়া নাকে এসে লাগলো। তবু শীতের মধ্যে থেকে ঘরে এসে আরাম হলো একটু। হলিউড আরো কোল্ড। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললে। জেনেলে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর আন্ড্রেস করতে লাগলো। একটা গুন্ গুন্ করা সুর বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। তারপর মুখে চোখে সাবান দিয়ে আয়নার সামনে এসে চুলটা ঠিক করতে লাগলো। কাল এতক্ষণে ট্রেনে। সেকেন্ড্ ক্লাস কম্পার্টমেন্টে নিরিবিলি বার্থ। লেডিজ্ কামরা। এতক্ষণ ট্রেন ছেড়েছে। গুড্ নাইট্, গুড্ নাইট্ ইন্ডিয়া!

ব্যাগ থেকে টাকাগুলো আবার বার করলে। কাল এক্সচেঞ্জ করে নিতে হবে ব্যাঙ্কে গিয়ে। পনেরো হাজার টাকা! হাণ্ড্রেড্ রুপীজ নোট আর হাজার টাকার নোট! আর স্মল্ কয়েনস্ কিছু। ট্রেনে লাগবে, জাহাজে লাগবে টিপ্স্ দিতে। টাকাগুলো একে একে গুনতে লাগলো। আসলে কত টাকা সঙ্গে রইল জেনে রাখা ভাল।

—খুট্!

—হুজ্ দ্যাট্? কে?

দরজায় কে যেন নক্ করলে। আবার জিজ্ঞেস করলে— কে?

মনে হলো আয়াটা আবার এসেছে। বহুদিনের আয়া। যাবার আগে আর একবার দেখা করতে চায়।

মিস্ মাইকেল টাকাগুলো আড়াল করে দরজাটা একটু খুললে। না কেউ নয়। মনের ভুল। মিস্ মাইকেল আবার সুর ধরলো—ট্রা-লা-লা-লা—! সেই চিঠিগুলো বার করলে। ফাইভ হাণ্ড্রেড্ থার্টিন লাভ লেটার্স। সিল্কের রুমালে জড়ানো। দামী সেন্টের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। বেঁচে থেকে সুখ আছে পৃথিবীতে। ট্রা-লা-লা-লা। তারপর? তারপর গুড্ নাইট্, গুড্ নাইট্ ইন্ডিয়া—গুড্ নাইট্—

সেন-সাহেবের ঘরে হঠাৎ রিং বেজে উঠলো।

—ইজ্ দ্যাট্ সেন?

দীপঙ্কর বললে—স্পীকিং—

—আই অ্যাম ঘোষাল—

অনেকগুলো কাজ জমে গিয়েছিল। সেদিন ক্লিয়ার করতেই হবে! ওয়ার-ট্রাফিক যাবে সাউথে। ইন্ডিয়ার কোস্ট্যাল ডিফেন্সের জন্যে ওয়ার-ট্রাফিক মুভ করবে। তার প্রোগ্রাম করে দিতে হবে ডিভিসনকে। মধুও ছিল অনেকক্ষণ! সে-ও অস্থির হয়ে উঠেছিল দীপঙ্করের কাছে। কে-জি-দাশবাবু শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। ট্রাফিক-সেকশ্যানের রামলিঙ্গম্‌বাবুও চলে গেছে। সকলকেই যেতে বলেছে দীপঙ্কর। সমস্ত আপিস ফাঁকা হয়ে গেছে। মিস্টার ঘোষালও চলে গেছে। আপিস থেকে সবাই চলে গেলেই যেন কতকটা শান্তি পায় দীপঙ্কর।

হঠাৎ মধু ঘরে ঢুকলো। বললে—হুজুর?

—তোর দেরি হচ্ছে না তো মধু? তোর যদি কাজ থাকে তো তুই চলে যা! আমি দারোয়ানকে ডেকে ঘর বন্ধ করতে বলবো।

—না হুজুর আমি আছি।

দীপঙ্কর আবার কাজ করতে লাগলো। গাঙ্গুলীবাবু চলে গেছে। কোথায় কতদূরে এখন গাঙ্গুলীবাবু কে জানে। ইন্টার ক্লাসের পাস গাঙ্গুলীবাবুর। হয়ত দিল্লী গিয়ে পৌঁছিয়েছে এখন। কিংবা লখ্নৌ কিম্বা গাজিয়াবাদ। কোথায় দিল্লী, কোথায় লখ্নৌ, কোথায় গাজিয়াবাদ কিছুই জানে না দীপঙ্কর। কখনও যায়নি ওখানে। শুধু ডায়গ্রাম দেখেছে। রেলওয়ে জাংশান সব। বলে নিজের জীবনের জাংশানেরই কোনও হিসেব পাওয়া গেল না, তার ওপর আবার রেলওয়ে জাংশান। মানুষের জীবনকে কি শান্তিতে থাকতে দেবে না কেউ! সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে ইন্ডিয়া। কার টেবিলে মাখন কম পড়লো—কার গাড়িতে পেট্রল কম পড়লো, কার রুমালে আতর কম লাগলো—কলোনীকে এক্সপ্লয়েট করো। লেবাররা গোলমাল করছে, আরো বেশি মজুরি চায়—কলোনীর ওপর চাপ দাও। কলোনী না থাকে, খুঁজে বার করো কোথায় কলোনী পাওয়া যায়। ব্রিটেনের কলোনী আছে, ইউ-এস্-এর কলোনী আছে, ফ্রান্সের কলোনী আছে। কিন্তু জার্মানীর? ইটালীর? জাপানের?

একদিন ছিল, যখন মালের বদলে মাল মিলতো। তুমি দেবে চাল, আমি দেব হাঁড়ি। পরস্পরের তৈরি মাল-বদলের যুগ। তারপর এল টাকা। এল রুবল, এল কড়ি, এল ফ্রাঙ্ক, এল ডলার, এল টাকা। সেই টাকা প্রয়োজনের বেশি জমতে লাগলো সে-যুগের অঘোরদাদুদের হাতে। টাকা উপায় করতে হলে চাই যজমান। আরো যজমান হলে আরো টাকা। যজমান আরো বাড়াও, কলোনী আরো বাড়াও। তখন অঘোরদাদুদের সঙ্গে অন্য অঘোরদাদুদের ঝগড়া শুরু হলো। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে প্রয়োজনের বেশি টাকা জমে আর সিন্দুকে ভর্তি হয়। মানুষের লোভের সীমা একদিন অভ্রভেদী হয়ে উঠলো। পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ছিঁচকে-চোরের দল। বুড়ো চিৎকার করে বললে—কে রে বেটা মুখপোড়া, কে ওখানে?

কেউ উত্তর দিলে না।

অন্ধ চোখ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়লো, বৃটেন, ফ্রান্স, ইউ-এস-এ। কিন্তু জার্মানীর আর্মি তখন পোল্যান্ডের পাঁচিল টপকে একেবারে বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়েছে। বসত-বাড়ির উঠোনে। আর এখানে এই ইন্ডিয়ার এক কোণে সেন-সাহেব এত রাত পর্যন্ত ওয়ার-ট্রাফিকের প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। আপিসের কামরার মধ্যে।

—এত রাত পর্যন্ত কী করছো আপিসে!

দীপঙ্কর বললে—ওয়ার-ট্র্যাফিকের প্রোগ্রাম—

—এখনও কমপ্লিট হয়নি!

দীপঙ্কর বললে—না, আর একটু দেরি আছে!

মিস্টার ঘোষাল বললে—এদিকে এক ভীষণ বিপদ হয়েছে,—তুমি এখনি চলে এস—

—কোথায়?

—ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে। আমি ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের থানা থেকে কথা বলছি।

বলে টেলিফোনটা ছেড়ে দিলে মিস্টার ঘোষাল! দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের থানা! ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে তো মিস্ মাইকেলের বাড়ি! সেখানে কী হলো হঠাৎ?

তাড়াতাড়ি দরোয়ানকে ডেকে দীপঙ্কর আপিসের দরজা বন্ধ করতে বললে। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের দিকে চললো। শীতার্ত রাত। রাস্তার আলোগুলোর মুখে বোরখা ঢাকা। স্পষ্ট দেখা যায় না কিছু। মিস্টার ঘোষাল যেন ধূমকেতুর মত টেলিফোনে উদয় হয়ে ঝড় বাধিয়ে দিলে দীপঙ্করের জীবনে!

থানার কাছে আসতেই সামনে দাঁড়িয়ে ছিল মিস্টার ঘোষাল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী খবর? হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন আমাকে?

থানার ইনস্পেক্টর তৈরিই ছিল। জিজ্ঞেস করলে—আপনি মিস্ মাইকেলকে চিনতেন?

—হ্যাঁ চিনতাম। আজ দুপুরবেলাও দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। কেন, কী হয়েছে তার?

—দুপুর বেলা আপনার সঙ্গে মিস্ মাইকেলের কী কথা হয়েছিল?

দীপঙ্কর বললে—বিশেষ কিছু নয়, হলিউডে যাবার আগে শেষবারের মত আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

—টাকার কথা কিছু বলেছিল আপনাকে? কত টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তুলেছিল, বলেছিল কি?

দীপঙ্কর বললে—বলেছিল, পনেরো হাজার টাকা, আর তার কাছে ছিল তিনশো টাকা—এই নিয়েই আমেরিকায় চলে যাচ্ছিল। ভিভিয়ান-লে তার বন্ধু, সেই বন্ধুর চিঠি পেয়েই আমেরিকায় যাচ্ছিল ফিল্‌ম্-স্টার হতে—

—আপনার সঙ্গে তার কত দিনের সম্পর্ক?

দীপঙ্কর বললে—যেদিন থেকে চাকরিতে ঢুকেছি, প্রায় সেইদিন থেকেই—

—আপনি কখনও মিস্ মাইকেলের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলুম সে অনেক দিন আগের কথা, সেই একদিনই মাত্র গিয়েছিলুম।

তারপর ইনস্পেক্টর কী যেন ভাবলে। বললে—আপনি ম্যারেড না আনম্যারেড?

দীপঙ্কর একটু বিরক্ত হলো। বললে—এত কথা কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আন্‌নেসাসারিলি?

—দরকার আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমি আশা করি আপনি আমাদের ইনভেস্টিগেশনে হেল্‌প্ করবেন—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে করুন, আর কী কোশ্চেন করবার আছে করুন—

ইনস্পেক্টর বললে—আর একটা মাত্র কোশ্চেন করবো। আপনি কখনও টেররিস্ট পার্টিতে ছিলেন?

দীপঙ্কর মিস্টার ঘোষালের দিকে চাইলে। মিস্টার ঘোষাল পাশে চুপ করে বসে আছে নির্বিকারভাবে।

দীপঙ্কর বললে—না—

—কখনও কি আই-বি ব্রাঞ্চ থেকে আপনাকে ডেকেছিল?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—সেই সময়ে কি আপনি লক্-আপে আটক ছিলেন কিছু দিন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—আমার সব কোশ্চেন শেষ হয়েছে, এখন চলুন, আমরা স্পটে যাই—

বলে ইনস্পেক্টর উঠলো চেয়ার ছেড়ে। দীপঙ্করও দাঁড়িয়ে উঠলো। মিস্টার ঘোষাল উঠলো। বেশি দূর নয়। কাছেই মিস্ মাইকেলের ফ্ল্যাট-বাড়ি। ঠুলি-আঁটা ঝাপসা আলোতেও দেখা গেল ফ্ল্যাট-বাড়িটার সামনে অনেক পুলিসের ভিড়। অসংখ্য লোক জমেছে। ইনস্পেক্টর যেতেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই কাঠের সিঁড়ি। কিন্তু সেদিন আর সেখানে পিয়ানোর আওয়াজ নেই। মেমসাহেব, দালাল, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছোকরাদের ভিড় নেই। সিঁড়িতেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ইনস্পেক্টর যেতেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। মিস্ মাইকেলের ফ্ল্যাটের দরজার সামনেও পুলিস পাহারা দিচ্ছে। ইনস্পেক্টর ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর নিঃশব্দে একটা আর্তনাদ করে উঠলো।

ঘরের মেঝেতে রক্ত ভেসে বেড়াচ্ছে। আর তারই মাঝখানে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে মিস্ মাইকেল! নিথর নিস্পন্দ।

দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়েই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। যে-গাউন পরে মিস্ মাইকেল আপিসে যেত মাঝে মাঝে সেই গাউন পরা। ঠোঁটে তখনও লিপস্টিক লাগানো। হাতের কাছে ভ্যানিটি ব্যাগটা—খোলা। হাঁ করে আছে।

—কী করে এমন হলো?

সন্ধ্যে বেলা যথারীতি শপিং করে ফিরেছে মিস্ মাইকেল। মার্কেটে গণি মিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে। মুলজীর সঙ্গে কথা বলেছে। টেলার হুকুমালীর সঙ্গে কথা বলেছে। আরো যত চেনা-শোনা শপ্-কীপার, সকলের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সকলকে বলে এসেছে—হলিউডে চলে যাচ্ছি কাল। সকলের কাছে

বিদায় নিয়ে এসেছে। তারপর নিজের ঘরে এসে ঢুকেছে। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আগের দিন আয়াটাকে মাইনে চুকিয়ে দিয়েছিল। সে বাড়ি চলে গিয়েছিল তার। সুতরাং আর কেউ ছিল না তার সঙ্গে। একেবারে একলা ছিল নিজের ঘরে।

ইনস্পেক্টর বললে—আমি খবর পেলাম ইভনিং সাড়ে সাতটার সময়—তারপর দরজা ভেঙে ঢুকে দেখি এই কাণ্ড। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন মিস্টার ঘোষাল, কে এ-কাজ করতে পারে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি কী করে বলবো, আমি তো আপিস থেকে সকাল-সকাল বেরিয়ে আমার প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাটে চলে এসেছি, সেখান থেকে বেরোইনি! তারপরেই আপনার রিং পেলাম—

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরলো ইনস্পেক্টর। বললে—আপনি বলতে পারেন মিস্টার সেন?

দীপঙ্কর বললে—কীসের কথা বলছেন?

—কেমন করে মিস্ মাইকেল খুন হলেন? কে করলে? কাকে আপনার সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ হয়! দীপঙ্কর ইনস্পেক্টরের মুখের দিকে চাইলে। এমন সহজ কথাটাও কেউ এরা বুঝতে পারে না। বহুদিন আগে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে যা হয়েছিল এ-ও তাই। পোল্যাণ্ডে যা হয়েছে, এ-ও তাই। ফ্রান্সে যা হচ্ছে এ-ও তাই। ইটালী, যুগোস্লোভিয়া, ডেনমার্ক, রুমানিয়া, রাশিয়া, আফ্রিকা, ইণ্ডিয়া—সব জায়গায় যা হচ্ছে, এ-ও তাই!

—কাকে সন্দেহ হয় আপনার?

দীপঙ্কর ইনস্পেক্টরের দিকে মুখ তুলে চাইল আবার। বললে—টাকা।

আজো এক-একদিন মনে হয় যে-জীবন যুগ থেকে যুগে, কল্পকাল থেকে কল্পকালে পরিব্যাপ্ত, যে-জীবন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে শুরু করে স্টেশন রোড, গড়িয়াহাটা, ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, কলকাতা, ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবীতে প্রসারিত, তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা মিস্ মাইকেল কতটুকু? একটা মিস্ মাইকেল কি একটা বিন্তীদির আত্মত্যাগ কত সামান্য? তাইত একটা নেপোলিয়ন, কি একটা আলেকজাণ্ডার কি একটা চেঙ্গিস খাঁর আত্মদান সংসারী লোকের চোখে অনেকখানি। ঐতিহাসিকদের চোখেও তার অনেক দাম। কিন্তু ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের সেই সেদিনকার একটি মৃত্যু কারো মনেই হয়ত দাগ কাটেনি। হয়ত সেদিন অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েদের নৈশ-অভিযানে একটু বাধার সৃষ্টিও করেনি। হয়ত সেদিন বোকার মত মোটর-বাইক চালিয়ে কেউ এসে শিসও দেয়নি নিচেয় দাঁড়িয়ে। নিউ মার্কেটের গণি মিয়া, মুলজী শেঠ, হরকুমারী দোকানে বসে একটু আপসোস

করেছে বড় জোর। কিন্তু বাইরের রাস্তায় মোটরগাড়ি আর ফুটপাথে খদ্দেরদের ভিড়ে তাদের সে-সব আপসোসও হয়ত তখনি মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। আবার হয়ত একদিন পরেই কেউ এসে ভাড়া নিয়েছে সে-ফ্ল্যাট। আবার পিয়ানোর টুং-টাং শব্দে পাড়া থেকে সে-বিভীষিকা মুছে গেছে। মুছে গেছে সকলের মন থেকে। হলিউডের ফিল্ম-স্টার ভিভিয়ান লেও হয়ত টের পেলে না কলকাতার ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের একটা অখ্যাত ফ্ল্যাট-জীবনের শেষ পরিণতির ইতিহাসটুকু। ইতিহাস থেকেও মুছে গেল একেবারে মিস্ মাইকেল। মুছে গেল মিস্ মাইকেল আর সেই তার পাঁচশো তেরখানা লাভ-লেটারের দীর্ঘনিশ্বাস।

গণি মিয়া বললে—ও-সব মাগীদের কথা ছেড়ে দাও ভাইয়া, ওদের চিৎ-পাতের কড়ি এমনি উৎপাতেই যায়—

মিস্টার ঘোষাল যেন কেমন বেপরোয়া। বললে—এ আর কী হবে সেন, চলো, লেট্ আস গো—এসব এখানকার ডেইলি ইন্সিডেণ্ট—

থানার ইন্সপেক্টরও যেন কেমন নিরাসক্ত। রক্তমাখা গাউনখানা হাত দিয়ে ছুঁয়েও একটু শিউরে উঠল না! ডাক্তার এসেছিল। যথারীতি পরীক্ষা যা করার করলে। ইনভেস্টিগেশন যা হবার তা হলো। প্রথম দিন খবরের কাগজে ঘটনাটা এক কোণে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামাবে? মিস্ মাইকেলের মৃত্যুর চেয়েও বড় বড় মৃত্যুতে তখন ছেয়ে গেছে পৃথিবীর মন। মানুষ তখন আর মৃত্যুতে কাতর হয় না। মরতেও কাতর হয় না, মারতেও কাতর হয় না।

সেদিন হঠাৎ বলা-নেই, কওয়া-নেই সন্তোষ-কাকা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—বাবাজী, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

দীপঙ্কর বললে—কী কথা বলুন?

—তুমি তো কথাই দিয়েছিলে। কিন্তু বৌদির অসুখের জন্যেই আটকে ছিল এ্যাদ্দিন।

—কী আটকে ছিল? দীপঙ্কর তবু বুঝতে পারলে না।

—এই ক্ষিরির বিয়ে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—কত টাকা লাগবে আপনার মেয়ের বিয়েতে বলুন?

সন্তোষ-কাকা বললে—সে তোমার বিয়ে, তুমি বুঝবে, বৌদি বুঝবে আর ক্ষিরি বুঝবে। আমি কে বাবাজী? আমি কেউ না। দেখছো তো, ওই মেয়েটির বিয়ে দিয়ে আমি ঝাড়া-হাত-পা হয়ে যাবো। তারপর আমাকে দুটি খেতে দাও ভালো, না-খেতে দাও উপোস করবো। আমার জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। বুঝলে বাবাজী, আমি হলুম বিবাগী মানুষ। দুধ-ভিখ করা আমার অভ্যেস আছে। আমার কথা ছেড়ে দাও—

দীপঙ্কর তখন আপিসে যাচ্ছিল—

পেছনে যেন ফিস ফিস করে কার গলার আওয়াজ হলো। কে যেন আলগোছে ডাকলে—বাবা—

দীপঙ্কর আর দাঁড়াল না।

সন্তোষ-কাকা বললে—এখন আর তোমাকে বিরক্ত করবো না বাবাজী, তুমি এখন আপিসে যাও ওবেলা কথা হবেখন—

তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বললে—কী রে, কী বলছিলি? দেখছিস তোর বিয়ের কথাটা পাড়ছি বাবাজীর কাছে, আর ওমনি দিলি তো সব ভণ্ডুল করে—। আর কথা বলবার সময় পেলিনে?

তারপর মেয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—বাজারে যেতে হবে? কী আনতে? তেল না ঘি?

ক্ষিরি বললে—তুমি একটু চুপ করো না বাবা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি একটু চুপ করো না—

—কেন রে? কী করলুম আমি? চুরি করেছি আমি? না ডাকাতি করেছি যে চুপ করতে যাবো?

ক্ষিরি বললে—তোমার জন্যে আমার লজ্জায়- আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে বাবা, আমি যে কী করি!

সন্তোষ-কাকা ক্ষিরিকে ঠেলে দিয়ে বললে—তোকে কিছু করতে হবে না, তুই রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করগে দিকিনি। আজকে কী রান্না করছিস, বল?

তারপর ক্ষিরির পেছন-পেছন রান্নাঘরে গিয়ে বলে—কী যে রান্না করিস তুই! তোর মা কাঁপ দিয়ে কই মাছ দিয়ে একরকম রান্না করতো, আহা, এখনও জিভে লেগে রয়েছে—সেই রকম একদিন রাঁধতে পারিস না?

ক্ষিরি কিছু কথা বললে না।

সন্তোষ-কাকা বলতে লাগলো—আর-এক কাজ কর দিকিনি, সরষের তেলে ভাল করে জিরে-মরিচটা ভেজে নে, ভেজে নিয়ে দুটো কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে দে, তারপর ডুমো-ডুমো কাঁপ তাতে ছেড়ে দে, দেখবি........

ক্ষিরি আর থাকতে পারলে না। বললে—বাবা তুমি যাও তো, তুমি রান্না-ঘর ছেড়ে তোমার নিজের কাজ করোগে যাও তো—

সন্তোষ-কাকা অবাক হয়ে যায়। বলে—কেন রে, আমি আবার কী করলুম তোর?

ক্ষিরি বলে—সমস্ত দিন খাওয়ার চিন্তা ভাল লাগে না, তুমি তোমার নিজের কাজ করোগে যাও না—

—নিজের কাজ? আমার আবার নিজের কাজ কীরে? আমার খাওয়া ছাড়া কাজটা কী শুনি? খাবো দাবো বাজার করবো, এই তো আমার কাজ। যদি দোকানে যাবার থাকে তো বল্ আমাকে, নিয়ে আসি—

—তোমায় কিছু নিয়ে আসতে হবে না।

সন্তোষ-কাকা বলে—তা দোকানেও যেতে হবে না, গপ্পোও করতে পারবো না—তাহলে আমি কী করবো বল? আর তা না হলে একবাটি মুড়ি দে, বসে বসে চিবোই—

ক্ষিরি বলে—তুমি ওপরে গিয়ে জ্যাঠাইমার কাছে একটু বোস না। সেখানে বসলেও তো একটু কাজ হয়—

সন্তোষ-কাকার যেন কিছুই ভাল লাগে না। ওদিকে পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা বললেও বেশিক্ষণ জমে না। পাড়ার সব লোকই বাস্তবাগীশ। বাড়িতে ক্ষিরিও কাজে-কর্মে ব্যস্ত। কাশীটাকে অকারণে ধমক দেয়। সন্তোষ-কাকা কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে বলে—ঘুমোচ্ছিস যে বড়? ঘুমোচ্ছিস কেন?

কাশী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। বলে—কিছু কাজ আছে?

সন্তোষ-কাকা বলে—কাজ থাকুক-না-থাকুক, তুই ঘুমোবি কেন? ঘুমোবি কেন তুই? গুনে গুনে মাইনে নিস নে?

কাশী হকচকিয়ে যায়। বলে—তা কী কাজ আছে বলুন না—

সন্তোষ-কাকা বলে—কাজ না থাকে, ঘর ঝাঁট দে—

কাশী বলে—ঝাঁট তো দিয়েছি সকালে—

—তা সকালে ঝাঁট দিয়েছিস বলে কি আর দুপুরবেলা ঝাঁট দিতে নেই! দে, ঘর ঝাঁট দে আবার, আমি দেখি বসে বসে—

গোলমাল শুনে ক্ষিরি কাছে আসে। বাবার কাণ্ড দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সন্তোষ-কাকা মেয়েকে দেখেই বলে—এই দ্যাখ্ ক্ষিরি, দ্যাখ কাশীর কাণ্ড, একবার ঘর ঝাঁট দিলে নাকি আর-একবার ঘর ঝাঁট দিতে নেই—আমার সঙ্গে আবার তক্কো করছে—

কাশী তখন ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে।

বাবা বাইরে আসতেই ক্ষিরি বলে—কেন বাবা তুমি অমন করে বকো বলো তো কাশীকে যখন-তখন?

সন্তোষ-কাকা চিৎকার করে ওঠে। বলে—আমি বকি! আমি কখন আবার বকলুম শুনি? তুই তো কেবল আমাকে বকতেই দেখিস—তা চাকর মানুষ, বকবো না।· যদি বকেই থাকি তো কী অন্যায়টা করেছি শুনি? বকবো না? হাজার বার বকবো, লক্ষ বার বকবো! মাইনে নেয় না ও? আমি অপচো-নষ্ট দেখতে পারিনে! বেশ করেছি, বকেছি—আরো বকবো বেটাকে—

ক্ষিরি বলে—তা যাদের চাকর তারা বকুক, তুমি কেন বকতে যাও—? আমরা কে? আমরা দুদিনের জন্যে এসেছি, আমাদের ও-সব কথায় থাকবার দরকার কী?

—কেন? দুদিনের জন্যে এসেছি মানে। দুদিনের জন্যে এসেছি মানেটা কী? তুই-ই তো এ-বাড়ির গিন্নী, ও তো তোরই চাকর! তুই তো আমার মেয়ে? তা আমি কেউই নই এ-বাড়ির? আমার কাউকে বকবার ক্ষেমতা নেই? আমি

তো দীপুর শ্বশুর হলাম, জামাই-এর চাকর তো আমারও চাকর বটে—

ক্ষিরি লজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কথাটা কেউ শুনতে পেয়েছে কিনা দেখে নেয়। তারপর বলে—আচ্ছা বাবা, তুমি কী বলো তো? তুমি কী?

—কেন? আমি কী?

সন্তোষ-কাকা মেয়ের কথা কিছুই বুঝতে পারে না। বলে—আমাকে তুই এত হতচ্ছেন্দা করিস কেন বল তো? আমাকে তুই হতচ্ছেন্দা করিস কেন এত?

—না, তোমার সঙ্গে আর আমি কথা বলতে পারি না। তুমি যাও তো, তুমি বাড়ি থেকে একটু বেরোও, এদিক ওদিক ঘুরে এসো—যাও—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি একটু বেরোও—

—কী? তুই আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললি?

ক্ষিরি বললে—বেরিয়ে যেতে বলিনি। বলছি একটু বাইরে বেড়িয়ে এসো, সারাদিন বাড়ির মধ্যে থেকে থেকে তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে—

সন্তোষ-কাকারও আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে—মেয়ের কথা শুনে প্রথমটা কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর বললে—তাই যাচ্ছি আমি। তাতেই যদি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয় তো তাই যাচ্ছি। আমি আর আসবো না এ-বাড়িতে। আমি যদি এক বাপের ব্যাটা হই তো আর আসবো না এ-বাড়িতে—আমি চললুম—

বলে সত্যি-সত্যিই সন্তোষ-কাকা দপ্ দপ্ করে পা ফেলতে ফেলতে সদর দরজাটা দড়াম করে শব্দ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্ষীরোদা বাবার কাণ্ড দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

দুপুর বেলা। খাওয়া হয়নি, দাওয়া হয়নি। মাথার ওপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করে। রাস্তার ধারে পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়ে সন্তোষ-কাকা। ও-পাশের একটা কারখানার ঘড়িতে একটা বেজেছে কাঁটায় কাঁটায়। পার্কের মধ্যে দু' একটা কুকুর পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। রাস্তায় ট্রাম বাস শব্দ করতে করতে চলেছে। সন্তোষ-কাকা চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। কাশী হয়ত তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কী বিরাট-বিরাট মিলিটারি মোটরগাড়ি গুম্ গুম্ আওয়াজ করতে করতে চলেছে। রাস্তা কাঁপছে, পার্ক কাঁপছে, বাতাসগুলো পর্যন্ত যেন কাঁপছে সেই শব্দে। সন্তোষ-কাকার খুব কিদে পেতে লাগলো। বাইরে একটা জলের কল রয়েছে। সন্তোষ-কাকা জলের কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কল্‌টা টিপলে। দুপুর একটার সময় কোথায় জল? খানিকক্ষণ নাড়া-চাড়া করেও কিছু জল হলো না। হতাশ হয়ে আবার বেঞ্চিটায় এসে বসলো। কিন্তু সন্তোষ-কাকার মনে হলো যেন পেটের ভেতরটা মোচড় দিতে শুরু করেছে।

—ও ভায়া, একটু জল দিতে পারো!

সামনের ফুটপাথে একটা খাবারের দোকান। সামনের কাচের বাক্সের মধ্যে খাবার সাজানো রয়েছে থরে থরে। গজা আছে, রসগোল্লা আছে, পান্তুয়াও আছে।

সন্দেশ আছে। বোঁদে মিহিদানা, দরবেশ। সবই আছে।

—ওগুলো কী হে ভায়া? কালো-ক্যালো ও-গুলো কী?

দোকানী বললে—কালো জাম। নেবেন নাকি?

সন্তোষ-কাকা গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে বললে—কালোজাম? ভাল-ভাল! কত করে দাম ফেলেছ?

—দু' আনা।

—দু' আ—না!

সন্তোষ-কাকা চম্‌কে উঠলো। বললে—বড্ড গলা-কাটা দাম করেছ তো ভায়া! আমাদের রসুলপুরে যদি যাও তো এর ডবল্ পান্তুয়া তোমায় দু' আনায় খাইয়ে দেব! কলকাতা শহরের তো সবই গলা-কাটা দর হে—! মাথায় থাকুক আমার কলকাতা শহর—

দোকানী লক্ষ্য করছিল সন্তোষ-কাকাকে। বললে—কী নেবেন আপনি?

সন্তোষ-কাকা বললে—নিতে তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু তোমাদের যা দর! শুনলে হাত-পা বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে আসে—

—তা কিছু যদি না-নেন্ তো যান এখান থেকে, দোকানের সামনে ভিড় বাড়াবেন না!

সন্তোষ-কাকা রেগে যায়। বলে—আমি ভিড় বাড়াচ্ছি?

—তা জিনিস নেবেন্ না তো দর করছেন কেন মিছিমিছি? দর জেনে কী হবে?

সন্তোষ-কাকা বলে—বেশ তো মজা, দর জিজ্ঞেস করাও অন্যায় হয়ে গেল? তুমি তো বেশ দোকানী হে—

দোকানী তখন সহ্যের শেষ-সীমায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে। বললে—আপনি নেবেন কী বলুন তো?

সন্তোষ-কাকা বললে—কিছুই নেব না, শুধু একটু জল চাইছি, এই খাবার জল আর কী!

—খাবার জল-টল হবে না, আপনি যান্ এখান থেকে।

সন্তোষ-কাকা অবাক হয়ে যায়। বলে—এ তো তাজ্জব লোক দেখছি। একটু খাবার জল চাইছি, তা-ও দেবে না। বলি তেষ্টার জল খেলেও কি পয়সা দিতে হবে নাকি?

—আমার জল আমি যদি না-দিই তো কী করতে পারো শুনি?

—তা বেশ, খাবো না জল। না-দিলে না-দিলে—তার জন্যে অত কথা শোনাচ্ছো কেন আবার? তুমি 'না' বললেই চলে যাবো। আমি অত সাত-কথার লোক নই। তুমি আমায় চেন না তাই বলছো হে! জানো আমার জামাই রেলে চাকরি করে?

শেষ পর্যন্ত দোকানীর আর সহ্য হয় না। একেবারে দোকান ছেড়ে সামনে

এগিয়ে আসে। বলে—বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

ভয়ে ভয়ে সন্তোষ-কাকা পেছু হটে আসে। বলে—ঠিক আছে, না-হয় জল দেবে না খেতে, তা বলে অত চোট-পাট্ কেন? মারবে নাকি আমাকে?

—হ্যাঁ মারবো! করবে কী তুমি? কী করবে আমার?

সন্তোষ-কাকা তখন রণে ভঙ্গ দেয়। হেঁটে হেঁটে আবার রাস্তা পার হয়। পেছন ফিরে বলে—জলও খেতে দেবে না আবার মুখে চোট্‌পাট্‌ও করবে, বেশ লোক যাহোক সব—

পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা হৈ-চৈ কানে গেল। রাস্তার সমস্ত লোক চিৎকার করে উঠেছে এক সঙ্গে—গেল, গেল, গেল—

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মিলিটারি লরী একেবারে ঠিক ঘাড়ের কাছে এসে ব্রেক কষে থেমে পড়লো। আর একটুর জন্যে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল মানুষটা। গাড়ির ভেতরে মিলিটারি ড্রাইভার, ইংরিজীতে কী-সব গালাগালি দিয়ে উঠলো চিৎকার করে। এক গাদা লোক জমে গেল। সবাই ধমক্ দিলে।

বললে—কী রকম মানুষ আপনি মশাই, এখুনি যে যাচ্ছিলেন—

ততক্ষণে সন্তোষ-কাকা দূরে সরে পড়েছে। বললে—তা আমার কী দোষ মশাই, যে গাড়ি চালাবে তার চোখ নেই? কানা নাকি?

বলতে বলতে আবার পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো। রাস্তার লোকজন তখনও দেখছিল সন্তোষ-কাকার দিকে চেয়ে। গাড়িটা চলে যেতেই ভিড় পাত্‌লা হয়ে এল। সন্তোষ-কাকা দূর থেকে দেখলে চেয়ে চেয়ে। কলকাতার সব লোক পাগল। পাগলের রাজ্যি কলকাতা শহর। কী এমন অন্যায় করেছে সন্তোষ-কাকা? দোকানে গিয়ে একটু তেষ্টার জল চেয়েছে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে? রসুলপুরে কত লোক অজানা-অচেনা বাড়িতে গিয়ে পাতা পেড়ে ভাত খায়। তার বেলায় তো দোষ হয় না। আর গাড়ির গাড়োয়ানেরই বা কী আক্কেল! দেখে শুনে চলতে পারো না বাপু! রাস্তা তো মানুষের হাঁটার জন্যেই তৈরি হয়েছে। গাড়ি চালাবার জন্যে তো হয়নি! গাড়ি চালাতে দিচ্ছি, সে-ই তো তোমাদের ভাগ্যি! যত সব পাগল। পাগলের ডিম সব!

আবার ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। আবার ক্ষিদে পেতে লাগলো সন্তোষ-কাকার। পেটের ভেতর কে যেন বাট্‌না বাটছে! মোচড় দিচ্ছে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো। ঘড়িতে চারটে বাজলো। রাস্তায় জল দিচ্ছে নল দিয়ে। আবার উঠে দাঁড়াল সন্তোষ-কাকা! এখনও তো কেউ খুঁজতে আসছে না। কাশীটা কোনও কম্মের নয়। বেটা কেবল মাইনে নেবার যম। কোনও কাজ নেই, কেবল ঘুমোবে পড়ে পড়ে। একটা মানুষ যে না-খেয়ে পার্কে বসে বসে ঝিমোচ্ছে সেদিকে তোর খেয়াল নেই। ক্ষীরি তো বাপকে খুঁজতে রাস্তায় বেরোতে পারে না। তাহলে তুই আছিস কী করতে? তুই তো দেখবি কাকাবাবু কোথায় গেল? তুই তো বাড়ির বাইরে এসে রাস্তার ধারে চোখ বুলোবি! এই যে মানুষটা না-খেয়ে পার্কে বসে

হা-পিত্যেশ করে চেয়ে রয়েছে পথের দিকে, এই যে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল মানুষটা, তার জন্যে তোর একটু ভাবনা নেই রে? কাকাবাবু খেলে কি না-খেলে তাতে তোর কী? তুই চাকর মাইনে পেলেই হলো? তুই একটু খোঁজ্ আমাকে! একবার ভাবতেও তো পারিস যে, কাকাবাবু পার্কেও যেতে পারে। পার্কটা না-হয় একবার খুঁজে আসি!

নাঃ, এ বেটাকে ছাড়াতেই হবে! বেটার চাকরি খেয়ে তবে আমি জলগ্রহণ করবো! বেটা কোনও কাজের নয়। বেটা আমাকে খুঁজে বার করতেও পারে না! এই তো, আমি লুকিয়েও নেই, মরেও যাই নি! পার্কের বেঞ্চির ওপর রাস্তার দিকে চেয়ে তোর জন্যে বসে আছি! বেটা এ দিকটাই একবার মাড়াচ্ছে না!

সন্তোষ-কাকা উঠলো।

তারপর আস্তে আস্তে আবার বাড়ির রাস্তাটা ধরলে! দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাছে গিয়েও কেমন থম্‌কে দাঁড়াল। কার জন্যে বাড়ি যাওয়া। কিসের টান! মেয়ের? মেয়েই কি বাপের কষ্টটা বুঝতে পারছে! মেয়ে যদি বাপের কষ্টটা বুঝতো তো ভাবনা! আরে, কার জন্যে এত করি? আমার কে আছে তুই ছাড়া? আমি যে সুখের গাঁ ছেড়ে এখানে এই পাগলের রাজ্যিতে রয়েছি, সে কার জন্যে? কার সুখের জন্যে? আমার না তোর? তোর বিয়ের জন্যেই তো আমি এই কলকাতা শহরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে-ও তো তোরই ভালোর জন্যে! আমার কী? আমার আর ক'টা দিন! তোর বিয়েটা হয়ে গেলেই তো আমার কর্তব্য খালাস!

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলে সন্তোষ-কাকা।

কোথাও কারো টিকির দেখা নেই। পাড়াটা যেন খাঁ খাঁ করছে। কাদের বাড়ির একজন ঝি কাপড় চাপা দিয়ে এক কাঁসি ভাত নিয়ে যাচ্ছে। একটা কাক মাথার ওপর উড়ছে। ঝি'টা ডান হাতে একটা লাঠি মাথার ওপর নাড়াতে নাড়াতে চলেছে।

সন্তোষ-কাকা আরো সাবধান করে দিলে। বললে—খুব সাবধানে ভাত নিয়ে যাবে বাছা, কাগ্ আছে মাথায়—

ঝিটা গায়ে মাখলে না কথা। কাপড়ের আড়ালে ভাতগুলো একটু দেখা যাচ্ছে। মোটা চালের ভাত। পুরো এক কাঁসি। যতক্ষণ ভাত নিয়ে গেল, ততক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সন্তোষ-কাকা। সবাই বেশ পেট পুরে ভাত খাবে। সবাই বেশ ভাত খেয়ে আরাম করে ঢেকুর তুলবে, আর তার কপালেই ভাত নেই!

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই সন্তোষ-কাকা ফিরে দেখলে অবাক কাণ্ড! সেই এক কাঁসি ভাত রাস্তায় পড়ে ছত্রখান। ঝি'টার হাত থেকে থালাটা পড়ে গেছে, আর একপাল কাক গোল হয়ে ঘিরেছে ঝি'টাকে। সন্তোষকাকা দৌড়ে কাছে গেল। বললে—হুস্—হুস্—হুস্‌স্‌স্—

কাক কি আর সহজে নড়ে! একটু পেছিয়ে যায় লাফাতে লাফাতে; আবার

এগিয়ে আসে। একটাকে তাড়াতে গেলে আর একটা ছোঁ মারতে আসে পেছন থেকে।

সন্তোষ-কাকা বললে—আমাকে লাঠিটা দাও তো বাছা, কাগের গুষ্টির আমি নির্বংশ করছি—। তোমাকে বললাম তখন একটু সাবধানে যেতে—এখন হলো তো!

বেচারী এমনিতেই তখন লজ্জায় পড়েছে। ভাতগুলোর দিকে চেয়ে চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে এল।

সন্তোষ-কাকা বললে—দেখ দিকিনি, কী কাণ্ড হবে এখন? এমন ভাতগুলো নষ্ট হলো তো? এখন কী খাবে তুমি?

ঝি'টার মুখে তখন আর কিছু কথা বেরোচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কাঁসিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে-জায়গা থেকে সরে গেল। সন্তোষ-কাকা দেখলে যে-বাড়িটা থেকে ঝি'টা বেরিয়েছিল, সেই বাড়িতেই গিয়ে ঢুকলো আবার। সন্তোষ-কাকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকগুলোর ভাত খাওয়া দেখতে লাগলো। প্রথমে সন্তোষ-কাকাকে দেখে একটু ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু একটু সরে যেতেই কাকগুলো এগিয়ে এসে গপ্ গপ্ করে ভাতগুলো গিলতে লাগলো। ভাত খাওয়া দেখতে দেখতে সন্তোষ-কাকার নিজের জিভ্ দিয়েই জল পড়তে লাগলো। আহা, এই ভাত! কারোর ভোগেই লাগলো না শেষ পর্যন্ত। ঝি'টাও খেতে পেলে না, কেউই খেতে পেলে না। সন্তোষ-কাকাকে দিলেও খেয়ে সাবাড় করে দিত। শুধু ভাত নয়। পুঁইশাকের চচ্চড়িও রয়েছে। বেশ মোটা-মোটা ডাঁটা। চিংড়ি মাছের ঝোলও ছিল বোধ হয়। বড়ি আলু আর চিংড়ি মাছ দিয়ে রাঁধা। আহা বেশ খেতে হয়। ক্ষিরির মা রাঁধতো এমন করে! ভাতগুলো ততক্ষণে সব ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে ফেলেছে কাকেরা। একটা কণাও আর পড়ে নেই তখন। খোয়ার রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে পর্যন্ত ঠুক্‌রে তুলে খেয়ে নিয়েছে। একটা ছিটে-ফোঁটাও আর পড়ে নেই। কাকগুলো তখন বাড়ির পাঁচিলে উঠে ঠোঁট মুছছে পা দিয়ে। সন্তোষ-কাকা তাদের দিকে চেয়ে বললে—বেশ করেছিস্ তোরা খেয়েছিস্—ভাত হলো লক্ষ্মী, ভাত ফেলতে নেই—বেশ করেছিস্—

তারপর কাকগুলো একে একে আবার সব কোথায় উড়ে গেল।

সন্তোষ-কাকা আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই। সবাই বাড়ির ভেতরে খেয়ে দেয়ে জিরোচ্ছে। ভারি আরাম সকলের। সে যে এখন না-খেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। এই-ই সংসার। একেই বলে ধোঁকার টাটি!

—এই, ও খোকা, ও ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছো হে?

একটা কাদের বাড়ির চাকর বুঝি। রাস্তায় বেরিয়েছে কাজ-কর্ম সেরে। বললে—এই বাড়িতে আমি কাজ করি—কেন?

সন্তোষ-কাকা বললে—একটা কাজ করতে পারবে? বেশি হাঙ্গামের কাজ নয়,

ওই যে বাড়িটা দেখছো, উইটে আমার জামাই-এর বাড়ি, বুঝলে?

চাকরটা বললে—বুঝলাম, কিন্তু কী করতে হবে?

—সামান্য কাজ হে, তোমায় খাটাবো না বেশি, তুমি শুধু ওই বাড়িতে যাবে, গিয়ে আমার মেয়েকে বলবে যে, তার বাপ ওই পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে—বাস্, এই টুকুন কথা বলবে। আর তোমায় কিছুছু করতে হবে না—

—আর কিছু বলতে হবে না?

সন্তোষ-কাকা বললে—না—

চাকরটা চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। পেছন থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছিল। তার ভেতর থেকে কে যেন ডাকলে। বললে—এখানে কী করছেন কাকাবাবু?

সন্তোষ-কাকা পেছন ফিরেই অবাক! বললে—এই যে বাবাজী, তুমি?

দীপঙ্কর এমন সময় কোনোদিন বাড়ি ফেরে না। আপিসের কাজে বালিগঞ্জ স্টেশনে আসতে হয়েছিল একবার আপিসেরই গাড়ি নিয়ে। স্টেশন-মাস্টার মজুমদারবাবুর সঙ্গে আসছিল। রাস্তার মধ্যে সন্তোষ-কাকাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে দিলে।

সন্তোষ-কাকার তখন চোখে জল বেরিয়ে আসবার যোগাড়। বললে—এই যে বাবাজী, এই বিকেল গড়িয়ে গেল, এখনও আমার ভাত খাওয়া হয়নি—

দীপঙ্কর বললে—কেন? এই এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে আছেন কেন?

সন্তোষ-কাকা বললে—তা ভাত দিলে তবে তো খাবো বাবাজী! আমার মেয়েই যে আমাকে ভাত খেতে দিলে না। শেষ পর্যন্ত, এই-ই আমার কপালে ছিল বাবাজী, জানো, এই বিকেল গড়িয়ে গেল, এখনও আমার ভাত খাওয়া হয়নি—

বলতে বলতে সন্তোষ-কাকা প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন, খেতে দেয়নি কেন? কী করেছিলেন আপনি?

—কী আবার করবো? তুমি তো আমাকে চেন বাবাজী এতদিন ধরে তুমি আমাকে দেখছো, আমাকে কখনও কারো সাতে-পাঁচে থাকতে দেখেছ? আমি কোনো দিকেই থাকি না। খাই-দাই আর নিজের মনেই কাঁসি বাজাই। তা আমাকে বলে কি না বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে! কেন, বাবাজী, আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো? আমি আমার জামাই-এর বাড়িতে থাকবো তাতে যদি কিছু বলতে হয় তো তুমি বলবে! ও কে? ও বলবার কে শুনি?

দীপঙ্কর কিছু বললে না। ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললে। সন্তোষ-কাকা তখন গাড়িতে উঠে বসেছে। বললে—আমার অপরাধের মধ্যে অপরাধ হয়েছে, ক্ষিরির বিয়ের কথা তোমাকে বলেছি। তা বলবো না? কী বলো বাবাজী!

ক্ষিরিকে তুমি বিয়ে করবে কথা দাওনি? বলো তো তুমি?

ব্যাড়ির সামনে গাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল। দীপঙ্কর কথার কিছু উত্তর না দিয়ে নেমে পড়লো। সন্তোষ-কাকাও নামতে নামতে বললে—তুমি তো আমাকে পাকা-কথাই দিয়ে দিয়েছ, এই বৌদি একটু ভাল হয়ে উঠলেই দু-হাত এক করে দেব! তা সেই কথাটা বলেছি বলেই ক্ষিরির যত রাগ আমার ওপর। বুঝলে বাবাজী, আমাকে যা-নয়-তাই বলে বাড়ি থেকে বার করে দিলে একেবারে—বললে ভাত দেব না খেতে—তা না দিক গে, ভাবলাম খাবো না আমি ভাত, দেখি কী করতে পারিস তুই—

গাড়ি থেকে নেমেই দীপঙ্কর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সন্তোষ-কাকাও ভেতরে ঢুকলো।

খাটের ওপর দীপঙ্করের মা শুয়ে ছিল চাদর চাপা দিয়ে। অনেকক্ষণ পরে যেন হুঁশ হলো। ক'দিন থেকে কিছুই পেটে যাচ্ছে না। কিছু মুখে দিলেই বমি-বমি ভাব। কিছু রোচে না মুখে। মনে মনে কেবল জপ করে—আমার দীপু রইল মা, দীপুকে দেখো তুমি! দীপুর আর কেউ রইল না মা সংসারে। আমার কত সাধ ছিল মা, কিছুই মিটলো না। কোনও দিকেই কিছু সুরাহা হলো না। বড় সরল ছেলে আমার, কারো কোনোও কথায় থাকে না, মা বলতে সে অজ্ঞান—তোমার কাছেই রেখে গেলাম আমার দীপুকে। তুমি দেখো মা, তার ভালো-মন্দ সব কিছু দেখো—

হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বললে—কে মা, ক্ষীরোদা? তোমার খাওয়া হয়েছে?

ক্ষীরোদা বললে—এই ডাবের জলটা খেয়ে নিন জ্যাঠাইমা—

—তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

ক্ষীরোদা তবু দ্বিধা করতে লাগলো।

—কথা বলছো না কেন মা? তোমার খাওয়া হয়েছে তো? সন্তোষ খেয়েছে? আমার কী যে হলো মা, তোমরা দু'দিনের জন্যে এলে, কী খাচ্ছো, কেমন থাকছো, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—

বলে মা চোখের জল মোছবার চেষ্টা করলে।

মা বললে—এই এতটুকু বেলা থেকে ওই দীপুকে মানুষ করেছি জানো মা, কী কষ্টে যে মানুষ করেছি, তা কেউ জানে না। দিনের পর দিন পরের বাড়িতে ঝাঁটা খেয়ে, গাল-মন্দ খেয়ে, ওকে বুকে করে চোখের জল মুছেছি, কেউ টের পায়নি! তা ভগবান যখন মুখ তুলে চাইলেন, তখন আবার আমি অসুখে পড়লুম—

—আপনি কাঁদবেন না জ্যাঠাইমা, আপনি ভালো হয়ে যাবেন!

মা বললে— সন্তোষ কোথায় গেল মা?

ক্ষীরোদা বললে—বাবা বাড়ি থেকে চলে গেছে, ভাত-টাত কিছু খায়নি—

আমার ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছে—

—ওমা, কী সব্বনাশ, কোথায় গেছে, আমাকে বলোনি তো?

—আপনাকে বলে আর কষ্ট দিতে চাইনি মিছিমিছি—

—তা ভাত খেলে না কেন? তুমি বুঝি কিছু বলেছিলে বাবাকে? দেখ দিকিনি, আমি এখন কী করি। তুমিও বুঝি তাই এত বেলা পর্যন্ত না-খেয়ে উপোস করে আছো? ছি-ছি, কাশীকে ডাকো তাহলে, কাশীকে ডেকে ওঁকে খুঁজে আনতে বলো—হয়ত রাগ করে কোথায় গিয়ে বসে আছে—ছি-ছি—

হঠাৎ দীপঙ্কর ঘরে ঢুকেছে। বললে—কেমন আছো মা তুমি এখন?

মাও অবাক হয়ে গেছে। বললে—ওমা, তুই আবার আপিস কামাই করলি নাকি? হঠাৎ এলি যে?

দীপঙ্কর বললে—আপিসের কাজে এদিকে এসেছিলাম, তাই তোমাকে একবার দেখতে এলাম—

সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ-কাকাও ঘরে ঢুকেছে। ঘরে ঢুকেই বলতে আরম্ভ করলে—ওই দেখ বাবা, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে কি না—ওই তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—

মা হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—হ্যাঁগা সন্তোষ, তুমি কী বলো তো? তুমি খেলে না দেলে না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, আর এদিকে তোমার এইটুকুন মেয়েটা এই এত বেলা পর্যন্ত উপোস করে রইল? তোমার আক্কেলখানা কী-রকম শুনি? না-খেয়ে পিত্তি পড়িয়ে নিজেও ভুগবে আর দুধের মেয়েটাকেও যে ভোগাবে! আমি অসুখে পড়েই যত জ্বালা হয়েছে—

সন্তোষ-কাকা বললে—তা তুমি তো ক্ষিরির দিকে টেনে কথা বলবেই বৌদি, আর আমার জ্বালাটা তো বুঝলে না। আমি কী সাধ করে উপোস করে আছি? আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না? আমার বুঝি ক্ষিদের চোটে চোখ-কান ঝাঁ-ঝাঁ করে না? আমি যে পার্কের বেঞ্চিতে বসে ভ্যারান্ডা ভাজছি, সেদিকে তো তোমার দুধের মেয়ের হিসেব নেই?

—তা ক্ষিদে পেলে বাড়িতে চলে আসলেই পারতে?

সন্তোষ-কাকা বললে—বা বা বা, তুমি তো বেশ বলছো বৌদি! ক্ষিদে পেলেই আমি বাড়িতে চলে আসবো? কেন, আমার কি মান-সম্ভ্রম কিছুছু থাকতে নেই? গরীব লোক বলে আমি কি কান্ডজ্ঞানটাও হারিয়ে বসে আছি? ও-মেয়ে আমাকে কি না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। ওর বাড়ি, যে ও বেরিয়ে যেতে বলবে?

মা ক্ষীরোদার দিকে চেয়ে বললে—ছি মা, বাবাকে কি অমন কথা বলতে আছে?

—শুধু কি তাই? আরো কত কথা বলেছে জিজ্ঞেস করো না ওকে, ওই তো সামনেই মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি তো মিছে-কথা বলছি না—জিজ্ঞেস করো না—

মা বললে—যাও মা, বাবাকে ভাত বেড়ে দিয়ে, নিজেও খেয়ে নাও—বাবা হলো গুরুজন, বাবাকে কি ওসব কথা বলতে আছে?

সন্তোষ-কাকা তবু নাছোড়বান্দা। বললে—না, আমি ভাত খাবো না, কিছুতেই খাবো না তো, ও আগে বলুক, ও দোষ করেছে—

মা বললে—বলো না মা বলো। বাবার কাছে মাপ চাও—তাতে কোনো লজ্জা নেই—

একে দীপঙ্করের সামনে ক্ষীরোদা মুখ তুলে কথা বলতে পারে না, তার ওপর মাপ চাওয়ার কথা উঠতে আরো নীচু হয়ে গেল তার মাথাটা। ঘরের এককোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—দেখছো তো বৌদি! তোমার দুধের মেয়ের আক্কেলখানা দেখছো তো! অথচ আমি কিছুছু বলিনি ওকে জানো বৌদি! ওরই ভালোর জন্যে আমি ভেবে ভেবে মরি। ওকে শুধু বলার মধ্যে বলেছি যে, জ্যাঠাইমাকে বল্ একটু তাড়াতাড়ি করতে—

মা বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কীসের তাড়াতাড়ি—

সন্তোষ-কাকা বললে—ওর বিয়ের। তুমিও তো কথা দিয়েছ আর বাবাজীও রাজী হয়ে গেছে। শুধু-মুধু দেরি করে তো লাভ নেই! মুখের কথাই হলো আসল—তা তোমার মাঝখান থেকে অসুখ হয়েই তো বিয়েটা আটকে গেল। তা তোমাকেও বলি বৌদি, তোমার অসুখ যদি এক বছর ধরে চলে তো ছেলের বিয়ে কি বলে তুমি আটকে রাখো? তোমারও তো একটু ছেলের দিকটা ভাবা উচিত—

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল। এবার একটু নড়ে দাঁড়াল।

মা বললে—আমি আর সারবো না সন্তোষ—

সন্তোষ-কাকা বললে—তা তো বটেই, আর, বয়েসও তো হচ্ছে! এই আমাকেই দেখ না। আগে কত উপোস করেছি, এখন একটু না-খেলেই একেবারে মরো-মরো অবস্থা হয়। মনে হয় যে, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাই। আর আগে?

তারপর হঠাৎ থেমে বললে—তা যাকগে এসব বাজে কথা! এখন দীপুও সামনে রয়েছে, তুমিও রয়েছ, আর ক্ষিরিও রয়েছে, আমিও রয়েছি—এই মওকায় একটা পাকা-কথা দিয়ে দাও দিকিনি—বিয়েটা কবে দেবে? মানে আর কতদিন আমাকে এমনি ঝুলিয়ে রাখবে?

সন্তোষ-কাকার সোজা কথা। তবু ঘরের অন্য তিনজন প্রাণীই যেন সন্তোষ-কাকার কথায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

মা বললে—আর ক'টা দিন সবুর করো সন্তোষ, আমি একটু দাঁড়িয়ে উঠি—

সন্তোষ-কাকা বললে—তা তো সবুর করতে পারি, কিন্তু সবুর করতে করতে যে আমার মেয়ে বুড়ী হয়ে গেল, তোমরা তো আমার মেয়ের দিকে একবার চোখ তুলে চাইছো না—শেষকালে যে পাড়ার লোক বউ দেখে তোমাকেই ছি-ছি

করবে—

তারপর দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললে—কী বলো বাবাজী, আমি কিছু অন্যায় বলেছি?

কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে বলা, সেই দীপঙ্কর তখন আর নেই সেখানে। দীপঙ্কর যে এই কথার মধ্যে কখন নিঃশব্দে চলে গেছে, সেটাই কেউ জানতে পারেনি। মাও জানতে পারেনি, ক্ষীরোদাও জানতে পারেনি। এমন কি, সন্তোষ-কাকাও জানতে পারেনি!

মা বললে—ওমা, দীপু কোথায় চলে গেল?

সন্তোষ-কাকা বললে—দেখলে তো? তুমি নিজের চোখেই দেখলে তো? বিয়ের পাকা-কথা যেই বলেছি ওমনি তোমার ছেলে পালিয়েছে—না বৌদি, এ ভালো কথা নয়! আমাকে ভালোমানুষ পেয়ে তোমরা যে এই রকম কথার খেলাপ করবে, এটা তো ভালো নয়! আজকে একটা কথা তোমাকে দিতেই হবে—নইলে আমি মামলা করবো বলে রাখছি—

প্রথমে কাশী টের পেয়েছিল। বলেছিল—দাদাবাবু, আপনি আবার চলে যাচ্ছেন যে?

দীপঙ্কর বলেছিল—তুই মা'কে বলে দিস, আমাকে আবার আপিসে যেতে হবে, আপিসে কাজ ফেলে এসেছি—

তাড়াতাড়ি সব কাজ করতে হয়। কাজের যেন আর শেষ নেই। বালিগঞ্জ স্টেশনে মজুমদারবাবু বহুদিনের পুরনো স্টেশন-মাস্টার। সেই গোড়া থেকে আছে এ-স্টেশনে। যখন এই বালিগঞ্জ জঙ্গল ছিল, তখন থেকে। আস্তে আস্তে ট্রাম লাইন হলো, বাড়িঘর হলো।

মজুমদারবাবু বলেছিল—আমাকে এখান থেকে বদলি করবেন না স্যার, আমার ছেলেমেয়েরা এখানকার স্কুলে পড়ছে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি বরং একবার মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করুন এ-বিষয়ে—

মজুমদারবাবু বললে—আপনার সামনে যেমনভাবে কথা বলতে পারি, তাঁর সামনে তো বলতে পারি না তেমন করে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এস্টাবলিশমেণ্টের ব্যাপারটা তো আমি দেখি-না মজুমদারবাবু, ও-সব মিস্টার ঘোষালই দেখেন—

সত্যিই মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে কেউই দেখা করতে চায় না। যেন মিস্টার ঘোষালকে এড়িয়ে চলতেই চায় সকলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর বললে—দেখি আমি আপনার কী করতে পারি—

রেলের সমস্ত স্টাফ সেন-সাহেবের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করে। সেন-সাহেবের

সঙ্গেই সবাই সাহস করে কথা বলতে পারে। অথচ কেউই জানে না যে সংসারে দীপঙ্করের মত নিঃসহায় কেউ নেই। কারোর কোনও উপকার করবার ক্ষমতা-টুকুও নেই তার। কারোর কোনও দুঃখ দূর করবার ক্ষমতাও নেই। সব ক্ষমতা তার কেড়ে নিয়েছে মিস্টার ঘোষাল। এর চেয়ে অপমান, এর চেয়ে অসম্মান যেন আর নেই। তার বাইরের পোশাকটা, বাইরের চেহারাটা দেখে যেন সবাই তাকে বিচার করে। মাইনের মানদণ্ড দিয়ে তাকে সম্মান করে, সমীহ করে,—হয়ত কেউ কেউ ঈর্ষাও করে।

গাড়িটা হাজরা রোডের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী খেয়াল হলো দীপঙ্করের। ভুবনেশ্বরবাবু কি এসেছেন? ভুবনেশ্বরবাবুর কি এই ক'দিনের মধ্যে কলকাতায় আসা সম্ভব?

হয়ত এসেছেন। হয়ত এসে সতীর শাশুড়ীকে সব বোঝাচ্ছেন। হয়ত মেয়ের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন শাশুড়ীর কাছে। হয়ত সতীও ক্ষমা চেয়েছে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে।

শাশুড়ী হয়ত বলেছেন—এই তোমার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে, আমার কথা মেনে চলবে—

সতী হয়ত সব শর্তেই রাজী হয়েছে। সতী হয়ত সুখী হয়েছে তারপর থেকে। হয়ত সুখেই ঘর করছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে। আহা, সুখী হলেই তো ভাল। শুধু সতী কেন, শুধু লক্ষ্মীদিই-বা কেন, সবাই সুখী হোক। এ পৃথিবীতে সবাই সুখে জীবন কাটাক।

হঠাৎ হরিশ মুখার্জি রোডের সামনে আসতেই গাড়িটা থামাতে বললে।

সেই ব্যারিস্টার পালিতের বাড়ি। নির্মল পালিত কি এখন এত সকাল-সকাল কোর্ট থেকে এসেছে? এত সকালে কোর্ট থেকে আসার তো কোনও সম্ভাবনা নেই। একমাত্র নির্মল পালিতই সে-দিনের সেই ঘটনার সাক্ষী ছিল। দীপঙ্কর আর লক্ষ্মীদি চলে আসার পর নির্মল পালিতই শুধু সেই মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী ছিল সেদিন। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারা যাবে সব ঘটনা। আর শুধু সেদিন কেন? নির্মল পালিত তো প্রায়ই যায় প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। রোজ গিয়ে মা-মণিকে বৈষয়িক পরামর্শ দেয়। প্রপার্টি আর প্রফিট সম্পর্কে আলোচনা করে মা-মণির সঙ্গে। ব্যারিস্টার পালিতের মারা যাবার পর থেকে নির্মলই হয়েছে এখন তাঁর শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।

সেই পুরোন বাড়ি। একদিন এই বাড়ি থেকেই ছোটবেলায় তাড়িয়ে দিয়েছিল ব্যারিস্টার পালিত। তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে আর কিরণকে। বাড়িটা ঠিক সেই রকমই আছে। সেই লাল ইঁট বার-করা দেয়াল। সেই লতানো অর্কিড। সেই টবের ওপর পাম গাছ বসানো।

সামনের দরোয়ান সেলাম করলে আজ। হয়ত দীপঙ্করকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই এত খাতির। মানুষের মর্যাদা দেয় তারা পয়সা দেখে।

দরোয়ান বললে—সাহেব তো নেই হুজুর—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কখন থাকেন বাড়িতে?

—সাত বাজে!

সন্ধ্যে সাতটা। তাই ভাল। সন্ধ্যেবেলা আপিসের ফেরত এখানে একবার আসবে দীপঙ্কর। নির্মল পালিতের কাছেই সব খবর পাওয়া যাবে। সে প্রতিদিনের খবর রাখে। প্রত্যেক দিন ও-বাড়িতে যায়!

দীপঙ্কর ফিরছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে গাড়ির ভেতর নির্মল পালিত বসে আছে। গাড়ি থেকে নেমে সামনে দীপঙ্করকে দেখেই হাতটা বাড়িয়ে দিলে—হ্যাল্লো, দীপু, তুই?

নির্মল পালিত বাবার কাছেই বৈষয়িক শিক্ষা পেয়েছে। একদিন কলকাতার ধর্মাধিকরণে যে নতুন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর আমদানি হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষে, নির্মল পালিত তাদেরই বংশধর। নির্মল পালিতরা জানে প্রপার্টি যার আছে, তাকে খাতির করতে হয়। প্রপার্টিহীন মানুষ আর প্রাণহীন মানুষে কোনও তফাৎ নেই তাদের কাছে। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষ-বংশ এমনি একটা পরিবার। বিশেষ করে এ-পরিবারের মালিক মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের প্রপার্টি থাকলে নির্মল পালিতরা তাদের কাছে গিয়ে জোটে। তাদের পরামর্শ দেয়, উপদেশ দেয়। তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে।

নির্মল পালিতই মা-মণিকে বলেছিল—এটা আপনার ভুল হলো মা-মণি—একেই বলে ব্লান্ডার—

মা-মণি বুঝতে পারলেন না। বলেছিলেন—কেন বাবা? কী ভুল করলাম—

নির্মল পালিত বলেছিল—আপনার পুত্রবধূও তো একটা প্রপার্টি—

—তার মানে?

—মানে, বাবা তো সব দিক কনসিডার করেই এমন সম্বন্ধ করেছিলেন। বাবা তো আপনার ভালর জন্যেই এমন পুত্রবধূ এনে দিয়েছিলেন। দেখুন না, এ-প্রপার্টির জন্যে আপনাকে ক্যাপিটাল ঢালতে হলো না, ইনভেস্টমেণ্ট করতে হলো না, অথচ সমস্ত বেনিফিট্ পেয়ে গেলেন—মানে সমস্ত প্রফিট প্লাস ক্যাপিটাল পেয়ে গেলেন। বলতে গেলে সেণ্ট্-পারসেণ্ট্ লাভ—

মা-মণি বললেন—কিন্তু আমার সোনা? তার পেছনেও তো আমার খরচ হয়েছে। তার খাওয়া-দাওয়া, তার লেখা-পড়ার জন্যে তো আমার খরচ হয়েছে প্রচুর—

নির্মল পালিত উত্তরে বলেছিল—কিন্তু তার ডবল তো আপনি উশুল করে নিয়েছেন ছেলের বিয়ে দিয়ে—

মা-মণি বলেছিলেন—কী যে বলো বাবা, তোমার বাবার জন্যে আমি যা ঠকেছি, কী আর বলবো। ভেবে এখনও আঙ্‌ল কামড়াই—

এমনি করেই প্রতিদিন বৈষয়িক-স্‌ত্রে কথা হয়েছে সনাতনবাব্‌র স্ত্রীকে নিয়ে। প্‌ত্রবধ্‌কে নিয়ে যে মা-মণির কী রকম জ্বালা তা নির্মল পালিত আগে থেকেই জানতো। কিন্তু সেদিন ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখলে সে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে। নির্মল পালিত ব্‌ঝলে এই ঘোষ-বংশের রন্ধ্রের মধ্যে যদি শনি হয়ে সে ঢুকতে চায় তো এই তার ছিদ্র। এই ছিদ্র দিয়েই তাকে নাক গলাতে হবে এ-সংসারে!

সেদিন যখন দীপঙ্কর চলে এল, যখন লক্ষ্মীদিও চলে এল, নির্মল পালিত তখনও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। চাকর-বাকর-ঝি-ঠাকুর-দরোয়ান, সবাই যখন দেখছে তারই বা দেখতে দোষ কী! কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছিল নির্মল। কিন্তু হঠাৎ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে তার মনে হলো সনাতন-বাব্‌র স্ত্রী যেন থরথর করে কাঁপছে। ফরসা টক্‌টকে রং। রোদের আভা লেগে আর লজ্জা আর অপমানের হতাশায় সমস্ত শরীরটা যেন আগ্‌ন হয়ে উঠেছে।

নির্মল আর দাঁড়াতে পারলো না সেখানে! আস্তে আস্তে নিজের ঘরে এসে আবার নিজের চেয়ারটায় বসলো।

বাইরে মা-মণির গলা শোনা গেল—দরোয়ান—

দরোয়ানের গলার আওয়াজ এল—হ্‌জ্‌র—

—তুমি এইখানে পাহারা দাও, যদি বৌদি একটু নড়ে তো আমায় খবর দেবে, আমি ব্যারিস্টারবাব্‌র সঙ্গে কথা বলছি—

বলে মা-মণি আবার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকে নিজের চেয়ারে বসলেন। তাঁর চেহারায় যেন কোনও বিকার নেই, কোনও বৈলক্ষণ্য নেই। তিনি নির্বিকার শান্ত। বললেন—দেখলে তো, তুমি নিজের চোখেই তো সব দেখলে বাবা—

নির্মল পালিতের ম্‌খ দিয়ে কিছ্‌ কথা বেরোল না।

মা-মণি বলতে লাগলেন—তোমার বাবাই হলেন এর ম্‌ল। তিনি ভালো করে না-দেখে-শ্‌নে কেন এমন সম্বন্ধ করলেন বলো তো! কেন আমার এই সর্বনাশটা করলেন? আমি কি ক্ষতি করেছিল্‌ম তাঁর?

নির্মল পালিত তব্‌ কোনও উত্তর দিলে না।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার নিজের মেয়ে হয়নি, আমি ভেবেছিলাম ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি মেয়ে পাবো। আমার বড় সাধ ছিল জানো? আমি এক-ছেলের পর বিধবা হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওই এক ছেলেই আমার ঘর ভরিয়ে তুলবে। আমার ভাবনা কী? আমার টাকার অভাব নেই, আমার কিছ্‌রই অভাব নেই সংসারে। স্বামী যদি না-ই থাকে, ছেলে তো আছে! ছেলেই আমার সব দ্‌ঃখ ঘোচাবে! পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা ছেলে—সেই একটা ছেলেই আমায় যে এমন করে জ্বালাবে কে জানতো?

নির্মল এবারও কোনও কথা বললে না।

মা-মণি আবার বলতে লাগলেন—কে জানতো সেই এক ছেলের বিয়ে দিয়েই আমি আষ্টে-প্‌ষ্ঠে জ্বলে প্‌ড়ে মরবো! রাত্রে আমার ঘ্‌ম হয় না জানো বাবা! তোমাকে সব কথাই আমি খ্‌লে বলছি। এই বউ আসার পর থেকে আমার মনে একতিল শান্তি নেই! তুমি বলো কী? আমার নিজের পেটের ছেলে, যে-ছেলেকে আমি এই এতটুকু বেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মান্‌ষ করেছি, তার গায়ে কোনওদিন একটু আঁচ লাগতে দিইনি, সেই ছেলেকেও কি না দেখতে পারে না আমার বউ? সে কী দোষ করলে বলো তো! সে এমন কী দোষ করলে যে তার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় পর্যন্ত শোবে না—

নির্মল বলে—সে কী? বউ স্বামীর কাছে শোয় না?

—তবে আর বলছি কী বাবা! আমার এ-দ্‌ঃখের কথা কার কাছেই বা বলি, আর কে-ই বা বিশ্বাস করবে? মা হয়ে দিনের পর দিন আমাকে এই সহ্য করতে হয়েছে।

বলতে বলতে মা-মণির বোধ হয় গলাটা ব্‌জে আসবার যোগাড় হয়। বলেন—তুমি তো আমাকে এতদিন দেখছো বাবা, আমাকে এমন করে কখনও কথা বলতে শ্‌নেছো? কাউকে কষ্ট দিলে আমার মনে যে কী কষ্ট হয় বাবা, সে কী বলবো!

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু আপনি আর কী করবেন! আপনাকে সবই সহ্য করতে হবে!

মা-মণি বললেন—কেন বাবা? আমি কী এমন দোষ করেছি যে আমাকে সব ম্‌খ ব্‌জে সহ্য করতে হবে?

—তা সহ্য না করলে তো আপনারই লস্‌—

—কেন?

—লস্‌ নয়? এত টাকা আপনার বউএর, সে-টাকার জন্যে অন্তত আপনাকে সব সহ্য করতে হবে!

—তুমি কি ভাবছো আমি টাকার পরোয়া করি বাবা? তুমি কি ভাবছো আমি বৌমার টাকা নিয়ে বড়লোক হবো! তেমন বংশে আমার জন্ম নয় বাবা, তেমন টাকার আমার দরকার নেই! আমি উপোস করবো তাও ভালো, তব্‌ সে-টাকায় আমার দরকার নেই—

হঠাৎ কথায় ছেদ পড়লো।

—মা!

সনাতনবাব্‌ শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকেছেন। ছেলের ম্‌খের চেহারা দেখে মা অবাক হয়ে গেলেন। এমন উত্তেজিত তো হয় না কখনও খোকা। বললেন—কী বাবা?

—মা, তোমার বৌমা পড়ে যাবে!

—পড়ে যাবে?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ পড়ে যাবে, থর থর করে কাঁপছে! ঘরে গিয়ে শুতে বলবো?

মা-মণি বললেন—না!

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু যদি একটা অসুখ-বিসুখ হয়ে যায় তখন? গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম জ্বর এসেছে।

মা-মণি বললেন—তোমাকে ও-সব কথা ভাবতে হবে না, যা-ভাববার আমি ভাববো—তুমি কেন গায়ে হাত দিতে গেলে আমাকে না বলে?

—কিন্তু জ্বর হলে যে কষ্ট হবে খুব?

মা-মণি বললেন—তুমি থামো দিকিনি! সব-কথায় তোমার থাকবার দরকার কী?

কিন্তু সনাতনবাবু সেদিন থামলো না। অনেক থেমে এসেছেন তিনি। অনেক সহ্য করে এসেছেন। বললেন—কিন্তু এ-রকম অত্যাচার করা কি তোমার ভাল? কাউকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত? তাতে কি ভাল হয় কখনও?

মা-মণি বিরক্ত হলেন এবার। বললেন—তুমি আবার কথা বলছো?

সনাতনবাবুকে মা'র সঙ্গে এমন করে কথা বলতে নির্মল পালিত দেখেনি। বাড়ির কেউই দেখেনি। দরোয়ান চাকর ঝি ড্রাইভার কেউই এই ধীর-স্থির মানুষটাকে এমন উত্তেজিত হতে দেখেনি কখনও। সনাতনবাবু যেন উত্তেজিত হয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। খানিক থেমে বললেন—তুমি ওকে ঘরে গিয়ে শুতে বলো!

—কী বললে?

সনাতনবাবু আবার স্পষ্ট করে বললেন—তুমি ওকে কেন মাথায় জুতো নিতে বললে? কী করেছে ও?

মা মণি বললেন—তুমি জানো না কী করেছে?

সনাতনবাবু বললেন—না আমি জানি না—

—না জানো তো তুমি তোমার নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পড়ো গে। তোমার জানবার দরকার নেই। সংসারের ব্যাপারে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না আমি বার বার বলেছি না তোমায়? মেয়েদের ব্যাপারে তুমি কখনও থাকবে না!

সনাতনবাবু বললেন—তা তুমিই তো ডাকলে আমাকে, আমি তো ঘরে বসে পড়ছিলুম—

মা-মণি বললেন—তোমায় আমিই তখন ডেকেছিলুম, এখন আমিই আবার যেতে বলছি—তুমি যাও এখান থেকে—

—কিন্তু তোমার বৌমার কী হবে? ও কি সারাদিন এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

মা-মণি বললেন—হ্যাঁ থাকবে—!

সনাতনবাবু বললেন—না, থাকবে না—

নির্মল পালিত এবার উঠে দাঁড়াল। এর পর তার আর নিষ্ক্রিয় থাকা চলে না। বললে—মিস্টার ঘোষ, আপনি থামুন, মাদারের ওপর কথা বলতে নেই।

মা-মণি বললেন—দেখলে তো বাবা, দেখলে তো তুমি, নিজের পেটের ছেলে আমার সঙ্গে কী রকম করে কথা বললে!

নির্মল পালিত বললে—আপনি দুঃখ করবেন না মা-মণি, মিস্টার ঘোষ একটু উত্তেজিত হয়ে গেছেন, হাজার হোক, নিজের ওয়াইফ্ তো!

সনাতনবাবু বললেন—আপনি আমাদের মধ্যে কথা বলতে আসছেন কেন? আপনি কেন ইন্টারফিয়ার করছেন আমাদের ব্যাপারে? আপনি কে? শুধু ওয়াইফ্ বলে নয়, কারোর ওপরেই টরচার করা উচিত নয় সংসারে। এও তো টরচার এক-রকম! মা তো বকতে পারতো, দরজা বন্ধ করে বন্দী করে রাখতে পারতো, আমি কিছু বলতুম না, কিন্তু এ তো আউটরেজ—আমি এর প্রতিবাদ করছি—

নির্মল পালিত বললে—আপনি এক্সাইটেড হয়ে উঠেছেন মিস্টার ঘোষ, আপনি মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করুন—

সনাতনবাবু তখন থর থর করে কাঁপছেন। তাঁর ফরসা চেহারা লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে। তিনি কখনও যা করেন নি হঠাৎ তাই করলেন—বললেন—শাট্ আপ্—

—খোকা!

মা-মণির গলার আওয়াজও সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ফেটে পড়লো। বললেন—তুমি কার সঙ্গে কী-কথা বলতে হয় জানো না—

সনাতনবাবু বললেন—আমি যার সঙ্গে কথা বলছি ভেবে-চিন্তেই বলছি—

তারপর হঠাৎ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন—দরোয়ান—

বাড়িসুদ্ধ লোক হতভম্ব হয়ে গেল এই মানুষটির ব্যবহারে। মা-মণিও সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নিজের ছেলেকেও যেন চিনতে পারলেন না। যেন এক নিমেষে তাঁর সমস্ত হিসেব, সমস্ত অঙ্ক গোলমাল হয়ে গেল। এতদিন নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে যে-সংসার নিখুঁতভাবে চালিয়ে এসেছিলেন আজ এত-দিন পরে এখানে এসে সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। শিরীষ ঘোষের কুললক্ষ্মী তিনি। তাঁর একটা দায়িত্ব আছে। এ-সংসারের সুনাম-দুর্নামে তাঁরও একটা বিরাট অংশ আছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ অংকে এসে তাঁর এতদিনকার নিয়মনিষ্ঠা সব যেন জলে চলে গেল। তিনি কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না।

সমস্ত বাড়িতে তখন সাড়া পড়ে গেছে। যারা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও এই কাণ্ড দেখে আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। বাতাসীর মা, শম্ভু, দরোয়ান,

ড্রাইভার, কৈলাস তারাও যেন ভয়ে আঁতকে উঠেছে।

সনাতনবাবু আবার ডাকলেন—দরোয়ান—

মা-মণি একবারে কাছে এলেন। বললেন—দরোয়ানকে ডাকছো কেন?

দরোয়ানও সেই সময়ে কাছে এসে দাঁড়াল।—হুজুর!

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থমথম করছে তখন।

মা-মণি বললেন—দরোয়ান, তোমাকে আমি যা করতে বলেছি তাই করো—কারো হুকুম শুনতে হবে না—

সনাতনবাবু কী করতেন বলা যায় না, তৎক্ষণে ওদিকে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল।

—ইস—স্-স্-স্—

সকলের মুখ দিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে নিঃশব্দে হাওয়ায় ভেসে গেল। সতী সেই মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো হঠাৎ।

—তারপর?

নির্মল পালিত একটা সিগারেট ধরালো। নির্মল পালিতের বাবার অফিস-ঘরেই নির্মল পালিতের অফিস। নির্মল পালিতের কুকুরটা বাইরের বারান্দায় এতক্ষণ স্থির হয়ে চোখ বুজে পড়েছিল। হঠাৎ সতীর দেহ লুটিয়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও যেন একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো।

দীপঙ্কর উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—তারপর?

নির্মল বললে—কিন্তু তোর এত আগ্রহ কেন ওবাড়ির ব্যাপারে? তুই কেন ইণ্টারেস্টেড্?

দীপঙ্কর বললে—সে-কথা পরে বলবো, তারপরে কী হলো, বলো?

নির্মল পালিত বললে—তারপর আর কী হবে, আমি চলে এলুম—

দীপঙ্করের মনে হলো এখনি যেন সে ছুটে চলে যায় প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে! এখনি যেন সে গিয়ে সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করে।

—বাবা এসেছে কিনা জানো?

—কার বাবা?

—সতীর বাবা। মিসেস ঘোষের বাবা। তাঁকে আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, সেইদিনই।

নির্মল বললে—তুই কেন টেলিগ্রাম করতে গেলি? মিসেস্ ঘোষ তোর কে?

দীপঙ্করের তখন আর দেরি সইছে না। বললে—ভুবনেশ্বরবাবু এসেছেন কি না তাই আগে তুমি বলো?

নির্মল বললে—মিস্টার মিত্রকে তুই চিনিস? খুব রীচ্, না? কীসের ব্যবসা রে! শুনেছি নাকি টিম্বার মার্চেণ্ট? আচ্ছা, এত প্রপার্টি তাঁর কে

খাবে বল্ তো? মেয়ে তো ওই একটা? না দুটো? নো সন্! তাহলে? তাহলে তো প্রপার্টি পাবে ওই বুড়ী! নয়নরঞ্জিনী দাসী!

দীপঙ্কর তখন অন্য কথা ভাবছে। কী আশ্চর্য! সেই দিন এত কাণ্ড ঘটে গেছে ও-বাড়িতে। এতদিন মাথায় আসেনি বলেই নির্মলের কাছে আসা হয়নি! নির্মল পালিতের কাছে আর কিছুদিন আগে এলেই সব জানা যেত। অন্তত জানলে কিছু প্রতিকার করবার চেষ্টাও করতো।

নির্মল পালিত বলতে লাগলো—আমি বার বার বললাম বুড়ীকে যে দিস্ ইজ্ রং। এভাবে নিজের ছেলের বউকে অত্যাচার করা অন্যায়। বিশেষ করে যখন মেয়ের বাপ অত রীচ্। বড়লোকের মেয়ে। গরিব হলে আমি কিছু বলতাম না। তাকে তুমি মেরে ফেল কেটে ফেল আমি কিছু বলতে যেতাম না। কিন্তু এর পর যদি ছেলের শ্বশুর লিগ্যাল স্টেপ্ নেয়, তখন?

দীপঙ্কর বললে—কিছু লিগ্যাল স্টেপ্ নেওয়া যায়?

—আলবাৎ নেওয়া যায়! হিন্দু ম্যারেজ য়্যাক্টে তার প্রভিসনস্ আছে।

—কে মামলা করবে?

নির্মল পালিত বললে—কেন, মেয়ের বাবা করবে। আমি ব্রীফ্ নিতে রাজী আছি। আমি তো বুড়ীকে তাই বুঝিয়ে এলাম। শেষকালে আপনি দুকূল হারাবেন। আপনার বউকেও হারাবেন, আর বউএর প্রপার্টিও হারাবেন! মেয়েমানুষের বুদ্ধি তো! ভাবছে এই করেই বুঝি ছেলের শ্বশুরের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে পারবে! তা যদি পারতো তো আমরা আছি কী করতে? ঘাস কাটতে? একটা চাইনিজ্ প্রোভার্ব আছে—Going to law is losing a cow for the sake of a cat—কিন্তু এ-কথাটা কে বুঝবে বল্?

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা আমি এখন উঠি—

—কোথায় যাবি? অফিসে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে দীপঙ্কর বললে—আমি আবার একদিন আসবো তোমার কাছে। যদি কোনও খবর থাকে তো আমাকে শুনিও।

—কীসের খবর?

দীপঙ্কর বললে—ওই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির খবর। ও-বাড়িতে তুমি রোজই যাও?

নির্মল পালিত বললে—রোজ নয়, তবে প্রায়ই যাই। যাই আমার নিজের ইণ্টারেস্টে! অনেকগুলো টাকা আইড্‌ল্ পড়ে আছে বুড়ীর হাতে। কিছু ক্যালকাটা-প্রপার্টি কিনিয়েছি। কিন্তু বুড়ী ভাড়াটেদের নিয়ে ঝঞ্ঝাটে পড়েছে বড়। বলছে বাড়িগুলো বেচে লিকুইড্ ক্যাশ করে ফেলবে। তা আমি ভেবেছি কিছু শেয়ার কেনাবো বুড়ীকে দিয়ে। বলেছি, এতে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, বসে বসে ডিভিডেণ্ড্ খাবেন—তা নিমরাজি করিয়েছি কোনও রকমে—

দীপঙ্কর আবার বললে—তারপর আর যাওনি ওদের বাড়িতে! শোননি

কিছু ও-সম্বন্ধে?

নির্মল পালিত বললে—শুনেছি বৈ কি! এই তো আজকেই গিয়েছিলাম। শুনলাম, সনাতনবাবুর খুব অসুখ—

—সনাতনবাবুর অসুখ?

দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—কেন, হঠাৎ অসুখ হলো কেন?

নির্মল পালিত বললে—কেন আবার? ওই ব্যাপারের পর মনে তো শান্তি নেই ফ্যামিলিতে। বুড়ীটাও যেন কেমন হয়ে গেছে। অনেকগুলো শেয়ারের প্রপোজাল্ নিয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু কিছু কথা হলো না। বুড়ীর মন ভাল নেই। নাকি ছেলের খুব জ্বর! শুধু গল্প করে তো আর সময় কাটানো যায় না। তাড়াতাড়ি চেম্বার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বুড়ীর কিছু খসাবো, তা হলো না। শেষকালে চলে এলাম।

—আর সতী? সনাতনবাবুর স্ত্রী! সে কোথায়?

হঠাৎ টেবিলের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠলো। নির্মল পালিত রিসিভারটা তুলে নিলে।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে গাড়িতে উঠলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপিসে ফিরে যেতে হবে। মিস্টার ঘোষাল অপেক্ষা করবে তার জন্যে। গাড়িতে উঠেই বললে—প্রিয়নাথ মল্লিক রোড—

গাড়িটা আবার ঘুরলো। বিকেল হয়ে এসেছে হাজরা রোডের মোড়ে। সকাল-সকাল আজকাল সবাই বাড়ি ফেরে। ব্ল্যাক-আউট্-এর রাত কলকাতার। সন্ধ্যের কলকাতার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। সে ভিড় নেই। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায় রাত বাড়বার আগেই। গাড়িটা হাজরা রোড দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলো। সনাতনবাবুর অসুখ। একবার গিয়ে দেখে আসবে। নির্মল বলেছে—বড় অশান্তিতে কাটছে ওদের। মনে শান্তি নেই। অথচ শান্তির জন্যে যা-যা দরকার পৃথিবীতে সবই তো আছে। অর্থ আছে, স্বাস্থ্য আছে, গাড়ি, বাড়ি, বংশমর্যাদা, সবই তো আছে ওদের। সতীর শাশুড়ীও যেন কেমন হয়ে গেছে। সনাতনবাবুর অসুখ। হয়ত সতী সেবা করছে প্রাণপণে! এই সময় যদি ভুবনেশ্বরবাবু এসে পড়েন!

গাড়িটা যাবার আগেই দীপঙ্কর প্রশ্নগুলো মনে মনে ভেবে নিলে। হয়ত মুখোমুখি সতীর শাশুড়ীর সঙ্গেই প্রথমেই দেখা করতে হবে। প্রথমে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ধুলো নিতে হবে। জিজ্ঞেস করতে হবে—কেমন আছেন? সনাতনবাবুর অসুখ শুনলাম, তিনিই বা কেমন আছেন? তারপর সতীর কথা। সতী তো প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সতী তো সব শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। যেমন শাস্তি দিয়েছে, সেই শাস্তিই মুখ বুজে স্বীকার করেছে। এবার তো আর কোনও অভিযোগ নেই! এবার তো আর কোনও অপরাধ নেই।

—দাদাবাবু!

শম্ভু পেছন থেকে ডাকলে হঠাৎ। চেনা গলা। দীপঙ্কর পেছন ফিরে দেখলে। গাড়িটা থামাতে বললে ড্রাইভারকে।

—আমি তো আপনার বাড়ি থেকেই আসছি। একজন বুড়োমতন লোক বললে আপনি একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন। এদিকে সব্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু, বৌদিমণি নেই।

—সে কী? কবে? কখন?

শম্ভু হাঁফাচ্ছিল। বললে—ভাবলাম আপনার বাড়িতে গেছে। কিন্তু শুনলাম সেখানেও নেই। এদিকে খবরটা জানার পর থেকেই বাড়িতে বড় অশান্তি হয়েছে। দাদাবাবুর সঙ্গে মা-মণির খুব কথাকাটি চলেছে ক'দিন ধরে। জানেন, মা-মণি কেঁদেছিল?

—কেঁদেছিল?

যেন মা-মণির চোখে কান্নাটা এক অভাবনীয় ব্যাপার। ঘোষ-বাড়ির বিধবা গৃহিণী বরাবর বকতেই জানে, এইটেই সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু তিনি কি আবার কাঁদতেও জানেন!

ভূতির মা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলে বাতাসীর মাকে। সব শুনে বাতাসীর মা মাথা নেড়ে উঠলো।

—মরণ আর কি! মাগীর ঢং দেখে আর বাঁচিনে! এমন অনেক মড়াকান্না শুনেছি লা অমন অনেক মড়াকান্না শুনেছি! মেয়ে তো হয়নি মাগীর, মেয়ের বউএর মর্ম কী বুঝবে শুনি?

ভূতির মা বললে—হ্যাঁ গা, সত্যি বলছি, মা-মণি কাঁদছে, চোকে আঁচল দিয়ে চোক মুচছে—দেখে এলাম—

বাতাসীর মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে—তুই আর হাসাস্ নে লা, হাসাস্ নে, সেই যে কথায় আছে না—

বেটা বিয়লাম বউকে দিলাম,
ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী
পা ছড়িয়ে কাঁদি—

অমন অনেক দেখেছি—

কৈলাস কাছে ছিল। বললে—কেন গা ভূতির মা, কাঁদছে কেন মা-মণি?

বাতাসীর মা'র তখনও ঝাঁজ কমেনি। বললে—ওলো এমন কান্না আমরাও জানতে পারি। বলে—নাচতে কি আর জানিনে, মাজার ব্যথায় পারিনে—

ঘোষ-বাড়িতে সেদিন বিপ্লবই ঘটে গেল সতীকে কেন্দ্র করে। ডাক্তারবাবু এল। মা-মণির ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু সনাতনবাবুই দরোয়ানকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনালেন। বরফ এল মাথায় দেবার জন্যে। সতী সেই যারেজি

পাথরের মেঝের ওপর অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করলেন। করে প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিলেন। সনাতনবাবু মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বারকয়েক দেখলেন।

পাড়ার ডাক্তারবাবু। বললেন—এখন একটু বিশ্রাম দরকার, নার্ভ স্যাটার্ড হয়ে গেছে—

তারপর একটু থেমে আর একবার পরীক্ষা করে বললেন—কোন ছেলেমেয়ে আছে এঁর?

সনাতনবাবু বললেন—না—

—কখনও হয়েছিল?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো বাঁচেনি—

ডাক্তারবাবু বললেন—মনটাকে সব সময়ে খুশী রাখতে হবে, সারাদিন হাসি-খুশির মধ্যে কাটানো চাই—একটু সকলকে বলে দেবেন এঁর মনকে আঘাত দিয়ে কেউ যেন কথা না বলে—তাহলেই দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীকে তখন ঘরে নিয়ে শোওয়ানো হয়েছে। সনাতনবাবুও পাশে আছেন।

কৈলাস এসে ডাকলো—দাদাবাবু, মা-মণি ডাকছেন—

সনাতনবাবু বললেন—বল্, এখন যেতে পারবো না—

এ-রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। মা-মণি নিজে এলেন শেষ পর্যন্ত। বললেন—খোকা, আমি তোমায় ডাকছি না? কথা শোন না কেন?

সনাতনবাবু বললেন—একটু পরে যাবো মা,—

—না, আমি ডাকছি তোমাকে, এখনি এসো একবার এ-ঘরে!

সনাতনবাবু আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে কাছে এলেন। গলা নামিয়ে বললেন—মা, চেঁচিয়ে কথা বোল না, নার্ভ একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে তোমার বৌমার—মনের ওপর আঘাত যেন না-লাগে, খুব বিশ্রাম দরকার—ডাক্তারবাবু খুব সাবধান করে দিয়ে গেলেন—

—আমার বিশ্রামের কথা কে ভাবে তার ঠিক নেই, বৌমার বিশ্রামের কথাই তুমি ভাবছো? কেন, তোমার পড়াশোনা কী হলো? এখানে বৌমার মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে? সংসারে আর কিছু কাজ নেই তোমার?

সনাতনবাবু এ-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—তুমি ও-ঘরে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি—

মা-মণি বললেন—খোকা, তুমি আমায় এই কথা বললে? তোমার মুখ থেকে আমায় এই কথা শুনতে হলো আজ?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার যদি কিছু বলবার থাকে তো বলো না আমাকে—আমি তো শুনছি—

মা-মণির গলাটা অপমানে বুজে এল যেন। বললেন—তোমার মুখে আজ

এই ভাষা?

সনাতনবাবু যেন একটু বিরক্ত হলেন। বললেন—তুমি একটু আস্তে কথা বলো মা, তখন থেকে বলছি চেঁচিও না।

মা-মণি বললেন—তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলছো? এত সাহস তোমার?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার মুখের ওপর কখন কথা বললুম?

—বলছি তোমাকে, তুমি উঠে এসো। অসুখ হলে মানুষ মরে না, ও-রকম অসুখ আমাদেরও হয়, তাহলে আমরা কবে মরে যেতুম। ওঠো, উঠে এসো—

সনাতনবাবু বললেন—কেন উঠে আসতে বলছো আমাকে?

—তোমার কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? তুমি উঠবে কি না বলো?

সনাতনবাবু এতক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন মা-মণির সামনে। মা-মণি বললেন—বলি, তুমি কি নিজের মাথাটা খেয়ে বসে আছো? কার হুকুমে আমার কথা অগ্রাহ্যি করলে? আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে ডাক্তার ডাকবার আগে? আমি তোমাকে কি অনুমতি দিয়েছি?

—মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি একটু আস্তে কথা বলো।

—কেন আস্তে কথা বলবো? কী অপরাধ করেছি আমি? আমি তো কারোর কাছে ধার করে খাইনি যে ভয় করবো, ভয় পেয়ে গলা নিচু করবো! আমি ন্যায্য কথা বলবো তাতে ভয় কীসের শুনি? আমি কি চুরি করেছি? না ডাকাতি করেছি? আজ যে বাড়িসুদ্ধ চাকর-বাকর সকলের সামনে আমায় তুমি বে-ইজ্জৎ করলে, কই, তার জন্যে তোমার তো লজ্জা হচ্ছে না খোকা! তার জন্যে তো আমার কাছে একবারও ক্ষমা চাইলে না! এখন বৌমার কথাটাই তোমার কাছে এত বড় হলো! আমি কেউ না?

সনাতনবাবু যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বললেন—আমি তো ঠিক বুঝতে পারিনি—

—তা বুঝবে কেন? আর বৌমার অসুখের বেলায় তো ঠিক বুঝেছ, তার জন্যে ডাক্তার ডাকবার কথা তো ঠিক মনে পড়েছে? তার সেবা করতে তো ভুলে যাওনি?

বলে নিজের কপাল চাপড়ালেন ডান হাত দিয়ে। বললেন—তোমাকে এত লেখাপড়া শেখানোর এই ফল হলো—

কথাটা বলে থান কাপড়ের আঁচল দিয়ে নিজের চোখ মুছলেন। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। সনাতনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে মা-মণির ঘরে এলেন। বললেন—মা, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না—

মা-মণি তখন নিজের বিছানায় বসে পড়ে চোখ ঢেকে আছেন।

সনাতনবাবু আবার বললেন—মা, আমার কথাটা শোন—

মা-মণি বললেন—খুব শুনেছি খোকা, আমার খুব শিক্ষা হয়েছে, এতদিন

ধরে শরীরের রক্ত জল করে তোমার জন্যে ভেবে-ভেবে মরেছি, তার উপযুক্ত শিক্ষাই আমাকে তুমি দিয়েছ—তুমি যাও বাবা, বৌমার কাছে গিয়ে বোস—বৌমার কষ্ট হচ্ছে, তার সেবা করো গে—

সনাতনবাবু আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন মা'র কাছে। বললেন—তুমি এসব কথা বলছো কেন মা মিছিমিছি?

—হ্যাঁ, মিছিমিছিই আমি তোমাকে এত কথা শোনাচ্ছি। আমি ঘাট মানছি তোমার কাছে বাবা, আমারই হাজার দোষ, বৌমার কোনও দোষ নেই—বৌমা ভাল, আমিই মন্দ—

বলতে বলতে মা-মণি সেখানেই যেন ভেঙে পড়লেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

শম্ভু বললে—তারপর ক'দিন ধরে এমনিই চললো। বাড়ির মধ্যে এমন অশান্তি আগে কখনও হয়নি। রোজ রোজ মা-ছেলেতে ঝগড়া।

—আর বৌদিমণি?

শম্ভু বললে—বৌদিমণি কারোর সঙ্গেই কথা বলতো না। নিজের ঘরে শুয়ে থাকতো। আমরা ভাবলুম একটা মিট্-মাট্ হয়ে যাবে বুঝি। কিন্তু শাশুড়ী মাগী কি কম দজ্জাল দাদাবাবু। ডাক্তার এসেছিল প্রথম দিন। তারপর আর এল না।

মা-মণি বললেন—কই, তুমি আমার কাছে বসে আছো কেন, যাও, বৌমার কাছে যাও?

রাত হচ্ছে তখন। সনাতনবাবু কিছু উত্তর দিলেন না।

মা-মণি বললেন—আমি আর জেগে থাকতে পারছি নে, কোথায় শোবে তুমি? আমার ঘরে না বৌমার ঘরে? কোথায় শোবে ঠিক করে বলো!

তারপর থেকেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষ-বাড়ির অভ্যন্তরে চরম বিপর্যয় নেমে আসতে লাগলো আস্তে আস্তে। একদিন সতী সমস্ত সহ্য করে, সব অপমান মাথা পেতে নিতে তৈরিই হয়েছিল, কিন্তু বিপর্যয় এল আর এক ছিদ্র দিয়ে। প্রতিদিনের বিড়ম্বনা, প্রতি মুহূর্তের অত্যাচার, তাকে আর এক মহা অমঙ্গলের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। কলকাতার নগর-জীবনের ব্ল্যাক-আউটের মত তার জীবনেও ব্ল্যাক্-আউট নেমে এল। অন্ধকার রাত্রিগুলোতে দেয়ালের ঘড়িটা টিক্-টিক্ শব্দ করতো আর সতীর মনে হতো ও যেন তার হৃদ্‌স্পন্দনের আর্তনাদ। সমস্ত দিন-রাত যেন মুখর হয়ে থাকতো সে-আর্তনাদে। অনেক রাত্রে কোথায় কত দূরে একটা কামান গর্জে উঠলো, একটা এরোপ্লেন বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে উড়ে গেল, সতীর মনে হতো ও যেন তার নিজেরই অন্তরাত্মার মুখরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সতী বলতো—সে ক'দিন যে আমার কেমন করে কেটেছে, তুমি বুঝতে পারবে না দীপু—

বুঝতে অবশ্য পারতো দীপঙ্কর। শেষের দিকে সমস্তই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন আর কিছু বলবার ছিল না দীপঙ্করের। তখন চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে সতীর জীবনে। একে একে সেই সর্বনাশের দিকেই পা বাড়িয়ে চলেছে তখন সতী!

এক-একদিন দীপঙ্কর আর সতী তখন মুখোমুখি বসে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা! অন্ধকার বাড়িটাতে কেউ নেই। সমস্ত পৃথিবীও তখন থেমে গেছে। রাত্রের শেষ ট্রেনটাও তখন মাটি কাঁপাতে কাঁপাতে চলে গেছে গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে। বাইরে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকটা আরো তীক্ষ্ণ, আরো প্রকট হয়ে উঠেছে।

দীপঙ্কর এক সময় উঠতো। উঠে দাঁড়াতো খানিক। তারপর বলতো—অনেক রাত হয়ে গেছে আমি যাই—

সতী বলতো—অনেক রাত করিয়ে দিলাম তোমাকে—

দীপঙ্কর বলতো—তা হোক্—

সতী দরজার কাছে এসে দাঁড়াতো। দরজা বন্ধ করবার আগে জিজ্ঞেস করতো—কালকে আসছো তো?

দীপঙ্কর বলতো—না এসে কোথায় যাবো?

সতী বলতো—হ্যাঁ এসো কিন্তু ঠিক, তুমি না এলে বড় খারাপ লাগে আমার—

তারপর অন্ধকারের মধ্যে যতক্ষণ দীপঙ্করকে দেখা যেত, ততক্ষণ দরজাটা সেইভাবে খুলে দাঁড়িয়ে থাকতো সতী।

একে একে দিন আসতো, রাত আসতো, জীবন আসতো, মৃত্যু আসতো। দীপঙ্করের সমস্ত জীবনের তখন শেষ অধ্যায়। চাকরি জীবনেরও হয়ত শেষ অধ্যায়। তখন মাথার ওপরে মা নেই, চোখের ওপর চাকরির ভ্রূকুটিও নেই। সেইসব দিনগুলোর যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে কে জানতো।

কিন্তু সে অনেক বছর পরের কথা সব। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে, শম্ভুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে-সব কথার কল্পনা করাও তখন অন্যায় যেন। দীপঙ্করের জীবনে তখন শেষ অঙ্কের শেষ পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে।

শম্ভু বলেছিল—হঠাৎ আজকে সকাল বেলা আবার শোরগোল পড়ে গেল বাড়িতে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

শম্ভু বলেছিল—সেই জন্যেই তো আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম এখন—

—কী জন্যে?

বৌদিমণিকে তখন থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না! সবাই বলছে আপনাদের বাড়িতে গেছে, সেই সেবারও গিয়েছিল কিনা—। বাতাসীর মা বললে আমাকে দেখে আসতে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো এই এখুনি আসছি বাড়ি থেকে, আমার বাড়িতে তো বৌদিমণি যায়নি। গেলে আমি জানতে পারতুম।

শম্ভু বললে—তাহলে কোথায় গেল বুঝতে পারছি না তো—

—কখন বেরিয়েছে?

—এই খাওয়া-দাওয়ার পর, সবাই যখন বাড়ির ভেতর জিরোচ্ছে। মা-মণি নিজের ঘরে, দাদাবাবুও লাইব্রেরী-ঘরে। দরোয়ানেও টের পায়নি। আগেকার মতন গেটে তো আর তালা লাগানো থাকতো না।

দীপঙ্কর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। কোথায় গেল আবার? কোথায় যেতে পারে? কে আছে সতীর কলকাতায়? লক্ষ্মীদির বাড়ি? লক্ষ্মীদির বাড়ি চিনবে কী করে? আর চিনলেই বা যাবে কেন সেখানে?

—কিন্তু এখুনি আমি তোমাদের ব্যারিস্টারবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম, তিনি তো কিছু বললেন না।

শম্ভু বললে—তিনি তো বেলায় এসেছিলেন, মা-মণি আজকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বসেন নি মোটে। মা-মণি যেন এ ক'দিনে অন্যরকম হয়ে গেছেন। ছেলের সঙ্গে মন-কষাকষি হবার পর থেকেই তিনি আর তেমন কথা বলেন না। গলার ঝাঁজও কমে গেছে তাঁর—

—আর বৌদিমণির বাবা এ ক'দিনের মধ্যে কি এসেছিলেন, কিছু জানো?

শম্ভু বললে—তিনি তো বিদেশে হুজুর, সাত সমুদ্দুর তের নদী পারে, তিনি কি আর এত-শত খবর রাখেন! তিনি কী করে টের পাবেন?

—কিন্তু আমি যে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

শম্ভু বললে—তা জানিনে হুজুর, সব কথা তো আমরা জানতে পারিনে। বৌদিমণি চলে যাবার পর থেকেই দাদাবাবুও আবার বড় মুষড়ে পড়েছেন—মাথার যন্তরণা নিয়ে ঘরে ছট্‌ফট্ করছেন, ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিলুম আমি, তিনি এসে ওষুধ দিয়ে গেলেন, তারপর আমি বেরোলুম—

—কিন্তু তোমার দাদাবাবুর তো অসুখ করে না বড় একটা।

শম্ভু বললে—তা করে না, কিন্তু ধকল্‌টা কেমন গেল বলুন? মানুষটা কথা বলেন না তো বেশি, মনে মনে তো সব বোঝেন, লেখাপড়া জানা লোক, সমস্ত বুঝতে পারেন। এতদিন মা'র মুখের ওপর কথা বলেন নি, কিন্তু কতদিন আর সহ্য করবেন? আজকে বৌদিমণি চলে যাবার পর দাদাবাবু আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। খুব বলেছেন যা-তা—

—কাকে?

—মা-মণিকে। মা-মণি ছেলের কথা শুনে খুব কেঁদেছেন। আর দাদাবাবুও মাথার যন্তরণায় ছট্‌ফট্ করছেন তারপর থেকে—সেই যে দুপুর থেকে মাথার যন্তরণায় ছট্‌ফট্ করছেন, সে আর থামেনি। মা-মণি ঘরে এসেছিলেন দেখতে—

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছো সোনা—

সনাতনবাবু চিৎকার করে উঠেছেন—তোমার এ-ঘরে আসতে হবে না, তুমি এখান থেকে যাও—তুমি চলে যাও এখান থেকে—চলে যাও—

সনাতনবাবুর সেই চিৎকার একতলায় রান্নাঘর থেকেও সবাই স্পষ্ট শুনতে পেলে। শিরীষ ঘোষের বংশ-গৌরব, বংশ-মর্যাদায় প্রথম আঘাত লাগলো এইবারই। এইবারই প্রথম ফাটল ধরলো ঘোষ-বংশের প্রেস্টিজের কংক্রিটে। সতী চলে যাওয়াতে যা হয়নি, তাই-ই হলো সনাতনবাবুর অপমানে। সনাতনবাবুর সেই চিৎকার বাড়িটার প্রত্যেকটা ইঁটে এসে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। প্রত্যেকটা ইঁট যেন চিৎকার করে বলতে লাগলো—তুমি চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও তুমি—চলে যাও—যাও—

আর হরিশ মুখার্জি রোডের ব্যারিস্টার পালিতের ছেলে নির্মল পালিত তো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ওঁত পেতে বসে ছিল এতদিন!

মিস্টার ঘোষালের চেম্বার থেকে দম্‌কা আওয়াজ বেরিয়ে এল—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্—

হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের মেজাজ আবার বিগড়ে গেছে। কয়েকজন বাইরের মার্চেন্ট্ ওয়াগন্ সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছিল। এমন প্রতিদিন সবাই এসেও থাকে। লেনদেনের কারবার আছে তাদের সকলের সঙ্গে। দ্বিজপদ জানে। রবিনসন্ সাহেবের পুরোনো চাপরাসী দ্বিজপদ। এতদিন রবিনসন্ সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছে। হাসিমুখেই কাজ করেছে। এখন এসেছে ঘোষাল-সাহেব।

বলে—শুয়োরের বাচ্ছা—

কে-জি-দাশবাবু বলে—অমন কথা বোল না দ্বিজপদ, কোন্‌দিন তোমার চাকরি চলে যাবে—

দ্বিজপদ বলে—চাকরি যাক্ গে বড়বাবু, এর চেয়ে ভিক্ষে মেগে খাওয়া ভাল—এ শুয়োরের বাচ্ছার কাছে কাজ করার চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাওয়াও ভাল—

দ্বিজপদর চোখের সামনেই ঘটনাগুলো ঘটে। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায় গেটের বাইরে। মারোয়াড়ী, গুজরাটী, বাঙালী, ভাটিয়া, সিন্ধী কেউই বাদ নেই। যুদ্ধও যত পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে, তাদের ভিড়ও তত বাড়ে। এক-একদিন গাড়ির ভিড়ে জম্‌-জমাট্ হয়ে যায় সামনেটা। প্রথমে পোল্যান্ড, তারপর বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে আর ডেনমার্ক। জার্মান ব্লিৎসক্রীগ্-এর পাল্লায় ফ্রান্সের সেডানে ভাঙন ধরলো। ইংরেজরা পেছিয়ে এল ডানকার্কে। ফ্রান্স্ পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলন্ডের বিপদ ঘনিয়ে এল একেবারে বুকের ওপর। লন্ডনের মাথার ওপর ব্লিৎসক্রীগের চাপে উনিশ হাজার লোক মরে গেছে তখন, আর সাতাশ হাজার লোক হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে।

কলকাতার মাঠে মাঠে, পাড়ায় পাড়ায় এ-আর-পি শেল্‌টার তৈরি হয়েছে।

স্লিট্ ট্রেঞ্চ তৈরি হয়েছে। লম্বা জিগ্ জ্যাগ্ গর্ত। যদি বোমা পড়ে তখন তার ভেতরে গিয়ে লুকোবে সবাই। সিভিক গার্ড, এ-আর-পি'র দলে ভর্তি হচ্ছে পাড়ার বখাটে ছেলের দল। এতদিন বিড়ি খেয়ে রাস্তায় ঘাটে আড্ডা দিয়ে বেড়াতো। এবার হিল্লে হয়ে গেল সবার। কলকাতা সরগরম।

দ্বিজপদ সঙ্গে সঙ্গে পেছন-পেছন যায়। বলে—হুজুর, সেলাম—

ঘোষাল সাহেবের ঘর থেকে বেরোলেই তাদের মুখের হাব-ভাব দেখে দ্বিজপদ বুঝতে পারে। একেবারে সত্তরখানা ওয়াগন পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হওয়া চেহারা। বড় বড় পার্টি সব রেলওয়ের। বাইরের রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ি-গুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, কী-দরের মাল সব। দ্বিজপদ সকলকে চেনে। ঘোষাল-সাহেব রবিনসন্ সাহেবের চেয়ারে বসবার পর থেকেই তার অবস্থা ফিরে গেছে। বড় বড় ভাটিয়া পার্টি মাথায় পাগড়ি পরে বাইরে গট্-গট্ করে হেঁটে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে ওঠে। দ্বিজপদও পেছন-পেছন যায়। বলে—হুজুর, সলাম—

গাড়িতে ওঠবার মুখে হঠাৎ নজরে পড়ে তাদের। এতক্ষণে তাদের খেয়াল হয়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয় দ্বিজপদর দিকে।

দ্বিজপদ সেটা খপ্ করে পকেটে পুরেই চারদিকে একবার দেখে নেয়। তারপর সামনে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলে—সেলাম হুজুর, সেলাম—

কিন্তু দ্বিজপদর সেলাম নেবার দিকে তখন তাদের আগ্রহ নেই আর। নাকে ধোঁয়া উড়িয়ে তখন গাড়িটা উধাও হয়ে গেছে।

আবার নিজের টুলে গিয়ে বসে দ্বিজপদ। আবার হা-পিত্যেশ করে চেয়ে থাকে সদর গেটের দিকে। আবার কোনও পার্টি আসছে কিনা। আবার কোনও মওকা আসছে কিনা ওঁত পেতে দেখে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ওঁত পাততে হয় না। বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় আবার। বিরাট ঝক্-ঝকে তক্-তকে গাড়ি। ভারি ভারি চেহারার তিন-চারজন মারোয়াড়ী নামে গাড়ি থেকে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারে দ্বিজপদ।

—সেলাম হুজুর সেলাম।

সবাই ভেতরে ঢুকে যায় গট্ গট্ করে। দ্বিজপদ পকেটে হাত দিয়ে দেখে। টাকাগুলো অনুভব করে। এক-একদিন কুড়ি টাকা, পঁচিশ টাকা, তিরিশ চল্লিশ পর্যন্ত ওঠে। ঘোষাল সাহেবের চাপরাসীর দাম পাঁচ টাকার নিচে কখনও নামেনি। পাঁচ টাকার নিচে নামলে আর মান-মর্যাদা থাকে না দ্বিজপদর।

দ্বিজপদ বলে—বাঙালীবাবুদেরই বড় হাতটানু, কিছুতে টাকা গলে না হাত দিয়ে—

সেদিন সুইং-ডোরটা খুলে বেরোতেই দ্বিজপদ আপাদ-মস্তক দেখে নিলে কে লোকটা। কোট্-প্যাণ্ট পরা লোক। গলায় নেক্‌টাই। হাতে সিগারেটের টিন্ আর দেশলাই। চক্‌চকে জুতো।

লোকটা গট্ গট্ করতে করতে গিয়ে বাইরের গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দ্বিজপদ একেবারে গাড়ির জানালার কাছে গিয়ে মুখ নামিয়ে আবার বললে—সেলাম, হুজুর সেলাম—

ভদ্রলোক যেন দেখেও দেখলে না। টিন্ থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে।

দ্বিজপদ আবার বললে—সেলাম হুজুর, সেলাম—

এতক্ষণে যেন লোকটা দেখতে পেলে। পকেটে হাত দিয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেতে একটা টাকা বার করে দ্বিজপদর দিকে বাড়িয়ে ধরলে। দ্বিজপদ নিলে টাকাটা, কিন্তু ঘেন্নায় যেন হাতটা শিঁটিয়ে এল। একটা টাকা! নিতেও ঘেন্না হলো তার। এক টাকার ফোতো বাবু আবার টিনের সিগারেট খায়। ছোঃ—

গাড়িটা তখন চলতে আরম্ভ করেছে। দ্বিজপদ টাকাটা হাতের মুঠোয় পাকিয়ে গুলি করে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ঘোষাল সাহেবের চাপরাসী এক-টাকার অপমান যেন আর সহ্য করতে পারলে না।

তারপর থেকেই দ্বিজপদ বলতো—দূর, বাঙালীরা আবার বাবু, ওদের আর সেলাম করবো না, দূর দূর—শুধু হাত নষ্ট।

ঘোষাল সাহেবের ঘরের মধ্যে বিরাট একটা টেবিল। খাঁটি বার্মা টিক্-উডের তৈরি। সাইজ্ আঠারো বাই বারো। গ্লাস-টপ। চারপাশে টিক-উডের কেন্-চেয়ার। রবিনসন্ সাহেবের চলে যাবার পর নতুন ফার্নিচার তৈরি হয়ে এসেছে। দেয়ালে ডায়াগ্রাম। ওয়ার ট্র্যাফিকের ডায়াগ্রাম। ঘোষাল-সাহেবের চোখের সামনে সব থাকা চাই। সব হ্যাণ্ডি। সব রেডি মেড্। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে রেলওয়ের, ট্র্যাফিক বন্ধ হয়ে যাবে গভর্নমেণ্টের। ক্লার্কদের টেবিল ছোট হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অফিসারদের বড় টেবিল চাই, বড় চেম্বার। বেশি মাথার কাজ করতে হয়, বেশি দায়িত্বের কাজ, বেশি রেসপন্‌সিবিলিটির।

দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে বলে—হুজুর মেমসাব—

—মেম্‌সাব? কোন মেম্‌সাব?

তারপর সুইং-ডোর ঠেলে একেবারে সসম্মানে দাঁড়িয়ে উঠেছে ঘোষাল-সাহেব।

—আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, আপনাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে, ইউ লুক্ সো নাইস্, সো বিউটিফুল—আসুন, আসুন—

বলে সামনে হাত বাড়িয়ে দিলে মিস্টার ঘোষাল।

দ্বিজপদ দরজাটা বন্ধ করে আবার এসে টুলের ওপর বসলো। আজকে সকাল থেকে পঁচিশ টাকা হয়েছে মাত্র। এখন তিনটে। বেলা তিনটে। হাতে আরো তিন-চার ঘণ্টা সময় রয়েছে। তেমন তেমন পার্টি এলে চাই-কি আরো পঁচিশ টাকা মবলক্ হাতে এসে যেতে পারে। আর যদি ভাগ্যে থাকে তো দুটো মারোয়াড়ী পার্টি এলেই পুষিয়ে যাবে মেহনত্। জয় বাবা জগন্নাথ। জয়

বাবা বলরাম! আর কোন গাড়ি আসছে কিনা দেখবার জন্য রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল দ্বিজপদ।

দীপঙ্কর যখন ফিরলো, তখন বেশ বেলা পড়ে গেছে। সারা দিনটা বড় খাটুনি গেছে। মধু ঘরের সামনেই হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেন-সাহেবকে দেখেই সুইং-ডোরটা ফাঁক করে খুলে ধরলে। ভেতরে ঢুকে পাখাটা চালিয়ে দিলে, টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলে। সেন-সাহেবের কাছে কাজ করলে কলাটা মুলোটা কিছুই পাওয়া যায় না। সকাল থেকে একটা পয়সার মুখ পর্যন্ত দেখেনি মধু। আর চোখের সামনেই দ্বিজপদ সেলাম বাজিয়ে বাজিয়ে মাইনের হাজার ডবল কামিয়েছে।

ফাইলগুলো একে একে পাড়লো দীপঙ্কর। সব এসে জমেছে সকাল থেকে। একটার পর একটা জমেছে এসে তার কাছে। কেউ দেখবার নেই, কেউ ক্লিয়ার করবার নেই। কারো সঙ্গে একটু কথা বলবার মত লোকও নেই আপিসে। গাঙ্গুলীবাবু নেই, মিস্ মাইকেলও নেই। মিস্ মাইকেলের কথাটা মনে পড়তেই বুক থেকে একটা নিঃশব্দ আহা বেরিয়ে এল! কোথায় গেল সতী! সতীই বা কলকাতা শহরে কোথায় যেতে পারে। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে, একটু পরেই কলকাতা শহর ঠুলি চোখে দিয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন কোথায় আশ্রয় নেবে সতী? কে আশ্রয় দেবে?

—কী রে?

মধু ভেতরে ঢুকে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কিছু বলবি তুই?

মধু বললে—হুজুর, একজন মেয়েমানুষ আপনাকে খুঁজতে এসেছিল, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম—

দীপঙ্কর লাফিয়ে উঠেছে। মেয়েমানুষ! কখন এসেছিল? কী রকম চেহারা? বয়েস কত? একলা না আর কেউ ছিল সঙ্গে?

অনেকগুলো প্রশ্নের ঝড়ে মধু একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বললে—একলা, সঙ্গে কেউ ছিল না—

—কোথায় গেল? ফিরে গেছে? বসতে বললি না কেন?

—হুজুর আমি বসতে বলেছিলুম, তিনি বসলেন না, ঘোষাল-সাহেবের ঘরটা দেখিয়ে দিতে বললেন, আমি ঘোষাল-সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিলুম।

দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠলো। বললে—ঘোষাল-সাহেবের ঘরে?

যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা তখনও। দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে গেল। তারপর এক লাফে মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে যেতেই দ্বিজপদ সেলাম ঠুকলে। বললে—সাব নেই হুজুর—

—কেন? কোথায় গেছেন সাহেব?

দ্বিজপদ বললে—সাহেব চলে গেছেন হুজুর, কিছু বলে যান্‌নি!

দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। একবার দাঁড়াল খানিক। তারপর দাঁতে দাঁত চাপলে। তারপর আবার গট্ গট্ করতে করতে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো। ডাকলে—মধু—

—হুজুর?

—কী রকম দেখতে তাকে?

—হুজুর খুব ফরসা চেহারা, কোঁকড়ানো মাথার চুল, মাথায় সিঁদুর আছে—

দীপঙ্কর বললে—তুই বাইরে যা—যা, বাইরে যা—

মধু বাইরে যেতেই আবার তখুনি ভেতর থেকে ডাক এল—মধু—

—হুজুর।

—দ্যাখ্ তো ক্রফোর্ড সাহেব ঘরে আছে কি না।

মধু বাইরে যাচ্ছিল। দ্বিজপদ বললে—কী রে তোর ছোট-সাহেব অত ক্ষেপে গেছে কেন? কী হলো?

মধু তাড়াতাড়ি ক্রফোর্ড সাহেবের ঘরটা দেখে ফিরে আসছে। দ্বিজপদ বললে—দেখলি তো, আজকে দিনটা কেমন নষ্ট হলো?

—কেন?

দ্বিজপদ বললে—সাহেব আর দিন পেলে না বাড়ি যাবার, এদিকে সব পার্টি এসে ফিরে যাচ্ছে, বড় বড় সব পার্টি, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, সিন্ধী, গুজরাটী—

মধু ভেতরে ঢুকে খবর দিতেই দীপঙ্কর উঠলো। বললে—আছে ক্রফোর্ড সাহেব?

সোজা ক্রফোর্ড সাহেবের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোন্‌টা বেজে উঠলো। দীপঙ্কর রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে—ইয়েস স্পীকিং—

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে বললে—প্রায় আধ ঘণ্টা আগে আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোন এসেছিল আপনাকে খবর দিতে—

—আমার বাড়ি থেকে? আমার বাড়িতে তো টেলিফোন নেই!

—আপনার পাশের বাড়ি থেকে একটা মেসেজ্ দিতে বলেছেন আপনাকে, আপনার মাদারের খুব সীরিয়াস অসুখ—আপনাকে এখুনি বাড়িতে যেতে বলেছেন একবার!

—মা'র অসুখ!

—আমি তো দু ঘণ্টা আগেও বাড়িতে ছিলাম। কতক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিল?

—এই প্রায় আধ ঘণ্টা আগে!

দীপঙ্কর রিসিভারটা রেখে দিলে। তার হাতটা যেন অবশ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এই উপন্যাস যাঁরা পড়ে আসছেন, তাঁরা জানেন প্রত্যেক মানুষের মানসলোকে যে চিরন্তনী সব সময় আনন্দে বেদনায়, আশায়, আশঙ্কায় ধ্রুব হয়ে বিরাজ করে, যে-চিরন্তনী তাকে নিদ্রায়-জাগরণে সর্বক্ষণ সচেতন রাখে, কখনও বা সজ্ঞানে, আবার কখনও বা অজ্ঞানে তাকে অনুসরণ করে, আনন্দের দিনে না হলেও দুঃখের দিনে সেই তার কাছে গিয়েই আশ্রয় চায় দীপঙ্কর। তখন মনে হয় তার চেয়ে অন্তরতম বুঝি আর কেউ নেই। সেই চিরন্তনীকে বড় সহজ করে নিয়েছিল দীপঙ্কর। তাই বাইরের লোকের চোখে কখনও সে শিশু, কখনও সে ভীরু, কখনও সে সাহসী, কখনও কঠোর, আবার কখনও বা স্বার্থপর। দীপঙ্করের কাছে সবটাই ছিল সহজ। আনন্দের সময়ও সে সহজ হতে পারতো, দুঃখের সময়ও সহজ হতে পারতো। সহজকে তাই সে অত সহজে হারিয়ে ফেলতো। হারিয়ে ফেলতো কেবল তাকে খুঁজে বার করবে বলেই। হঠাৎ যখন হারিয়ে ফেলতো, তখন একেবারে দিশেহারা হয়ে যেত। বলতো—কই কই তুমি? আবার তখনই নিজেই বলে উঠতো—এই তো তুমি, এই তো রয়েছ। এই আমার মনের মনে, এই আমার বুকের বুকে। দিক্-বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এসে একেবারে নিজের ভেতরেই পাওয়া যেত তাকে। সহজ আবার সহজ হয়ে আসতো। দীপঙ্কর আবার সেই পুরোন দীপঙ্কর হয়ে উঠতো।

এই যেমন মায়ের মৃত্যু!

আর একদিনের কথাও মনে পড়ে। খবরের কাগজে যে-বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল সেদিন, তা পড়েও সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। সবাই বলেছিল—ঠিক কথা বলেছে হিট্‌লার—খুব ঠিক কথা—

—পড়েছেন মশাই হিটলারের লেকচার?

—এবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সবাইকে, ইংরেজ বাছাধনদের আর মাথা তুলতে হবে না।

পাড়ায়-পাড়ায় সিভিক-গার্ড আর এ-আর-পি দের কাজ নেই কিছু। খাকি ইউনিফর্ম পরে, বিড়ি খায় সিগারেট খায়, ইংরেজদের টাকাও খায়, আবার ইংরেজদের গালাগালিও দেয়।

সেদিন খবরের কাগজ খুলে সবাই তিন-কাপ করে গরম চা খেয়ে ফেললে। এত গরম বক্তৃতা এর আগে আর বেরোয়নি কখনও খবরের কাগজে। গরম দিয়ে গরম ভাঙল।

হিটলার বলেছে—In fact, it is a struggle between two worlds. 46 million English rule a territory of 40,000,000 square Kilometers in this world. 85 million Germans have a living

space of hardly 600,000 square Kilometers. This earth, however, was not distributed by Almighty God. All my life I have been a have-not. Now again I enter the fight as the representative of the have-nots. These people have the possibility of pocketing up to 160 per cent dividend from the ammunition industry. They say that if these German methods prove victorious all this will stop. They are right. I believe 6 per cent sufficient. Two worlds are in conflict, two philosophies of life. They say we should help to keep up the gold standard—of course, for they have the gold and we have not.

আবার আর একদিনের কথা। দীপঙ্করদের আপিসের সামনেই প্রতিদিন ঘটনাটা ঘটতো। সে বোধ হয় উনিশ শো চল্লিশ সালের কথা। ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে রাস্তার ওপর অন্ধকূপ-হত্যার স্তম্ভটাকে দিনের পর দিন সবাই দেখে আসছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মিথ্যে কলঙ্ক চিরস্থায়ী করবার জন্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট নিজেদের কলঙ্ককে পাথর চাপা দিয়ে মনুমেণ্ট গড়েছে। এ-পাড়ার রাইটার্স বিল্ডিং-এ, রেলওয়ে আপিসে, মার্চেণ্ট ফার্মে যারা প্রতিদিন ট্রামে-বাসে চড়ে আপিসে এসেছে গেছে, তারাও কেউ মাথা ঘামায়নি ওটা নিয়ে। লোকে বলতো হল্‌ওয়েল মনুমেণ্ট। ওইখানেই নাকি অন্ধকূপ হত্যা হয়েছিল। সত্য-মিথ্যে ভগবান জানে। কিন্তু টনক্ নড়লো প্রথম সুভাষ বোসের। সুভাষ বোস বললে—এখানে এটা রাখা চলবে না—

আপিসের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতো সবাই। দলে দলে ভলাণ্টিয়ার আসছে হাতুড়ি নিয়ে আর স্তম্ভটার গায়ে ঘা দেবার চেষ্টা করছে। পুলিসের দল লাঠি নিয়ে তাড়া করতো। তারপর পুলিসের ভ্যানে তুলে নিয়ে পুরতো জেলে।

এমনি রোজ।

সে এক কাণ্ড চললো কদিন ধরে। কোত্থেকে যে পিল্ পিল্ করে এত ভলাণ্টিয়ার আসে, কে যে তারা, কেউ জানতো না। সারা শহরে সিভিক গার্ড হয়েছে, এ-আর-পি হয়েছে, তারাও লুকিয়ে লুকিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে দলে জুটতো। বলতো—শালা, ইংরেজদের টাকা নিয়ে ইংরেজদেরই সর্বনাশ করবো—

সমস্ত আপিস পাড়ায় তখন ওই এক আলোচনা। ওই এক কথা। দীপঙ্করেরও কানে গিয়েছিল। কিন্তু কোনও দিন বাইরে রাস্তায় এসে দেখেনি দৃশ্যটা। যেদিন সুভাষ বোসকে জেলে ধরে নিয়ে গেল, সেদিনও হৈ চৈ করেনি কলকাতার অন্য লোকদের মত। আবার যেদিন জেলখানার মধ্যে হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবার জন্যে ছেড়ে দিলে সেদিনও, আনন্দে লাফিয়ে ওঠেনি। দীপঙ্করের মনে হয়েছিল—এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে সমস্ত কোলাহলের মধ্যে কোথায় যেন একটা সত্যের আশ্রয় পেয়েছে সে। একটি প্রশ্নের আশ্রয়। একটি প্রশ্নের সন্ধানেই যেন তাকে জীবন দিতে হবে। কী সে প্রশ্ন? কীই বা সে উত্তর, তা-ও সে জানতো না, তবু

সন্ধান যেন তার জীবনে শেষ হবে না।

মনে আছে আশুতোষ কলেজের প্রফেসার অমলবাবুও তাকে সেই কথাই বলেছিলেন। ভাল লোকেরা কেন কষ্ট পায়? ভক্তের কেন এত দুঃখ? তবে কি সক্রেটিস্ মিথ্যা কথা বলেছেন—To a good man whether alive or dead, no evil can happen.

আর সতী?

সতীও সে-সব দিনের কথা মনে করিয়ে দিত। লক্ষ্মীদিও মনে করিয়ে দিত। কিন্তু দীপঙ্করকে কিছুই মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল না। দীপঙ্করের সব মনে ছিল। সব মনে থাকে। সব মনে আছে।

মনে আছে মা'র মৃত্যুর দিনের কথাগুলো।

ক্ষীরোদা বোধ হয় ডাবের জল খাওয়াতে গিয়েছিল। তার আগে সন্তোষ-কাকা যা-নয় তাই বলেছে। আহা, গ্রামের লোক সন্তোষ-কাকা। সহজ সরল বিশ্বাসের মানুষ। শহরের মুখোশ পরা ভদ্রতার ধার ধারে না। যা মনে আসে মুখে বলে যায়। সাদাকে সাদা বলে, কালোকে কালো বলে।

ক্ষিরি বলতো—তুমি একটু চুপ করো না বাবা—

সন্তোষ-কাকা বলতো—চুপ করবো কেন শুনি? চুপ করতে যাবো কেন? ক্ষিদে পেলে খেতে দিতে বলবো না? খেতে চাইলেও দোষ?

ক্ষিরি বলতো—তা আমি কি চুপ করে বসে আছি?

সন্তোষ-কাকা বলতো—তা তোর ভাত রাঁধতে এত দেরি? জানিস যে মাথায় জল পড়লেই আমার ক্ষিদে পায়—

ক্ষিরি বলতো—কিন্তু আমার তো একটা হাত—আমি ক'দিক দেখবো। সকাল থেকে জ্যাঠাইমাকে ওষুধ দিয়েছি, পথ্যি দিয়েছি, তারপর আপিসের ভাত দিয়েছি এর ওপর তুমি যদি আবার বিরক্ত করো, তাহলে কখন কী করি?

সন্তোষ-কাকা বলে—তা সেটা আগে বললেই পারতিস্, আমি আর সাত-তাড়াতাড়ি চান্ করতুম না—

ক্ষিরি বলে—তা একটু বোস, আমি ভাতটা চড়াচ্ছি, আলো-চালের ভাত এখ্খুনি হয়ে যাবে—

—কেন? আলো চাল কেন? আলো চাল আমি খাই?

সন্তোষ-কাকার সামান্য ব্যাপারেই এমনি তিরিক্ষি মেজাজ। এমনি মেজাজ নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে। এমনি মেজাজ নিয়েই সকলের ওপর তম্বি করে এসেছে চিরকাল। আপন-পর জ্ঞান করেনি কোনওদিন। পৃথিবীর সবাই যেন তার আপন, সবাই যেন তার পর, আপন-পরের ভেদাভেদ তুলে সন্তোষ-কাকা সকলের হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সন্তোষ-কাকা আর মাথা ঠিক রাখতে পারেনি বুঝি। দীপঙ্কর

চলে যাবার পর যা-ইচ্ছে তাই বলেছিল দীপঙ্করের মা'কে। বলেছিল—আমাকে তুমি চেনোনি বৌদি, আমি রসুলপুরের দত্ত, আমাকে যত ক্যাপাটে ভাবো, আমি তত ক্যাপাটে নই, আমি বোকা হলে কী হবে, আমি সব বুঝতে পারি—

একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—তুমি ভেবেছ, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা পাবে, তাই আর উচ্চবাচ্য করছো না, কিন্তু জানো, আমি মামলা করে খ্যাসারত আদায় করতে পারি? আমার মেয়ের খোর-পোষ আদায় করতে পারি—

বলতে বলতে সন্তোষ-কাকা সপ্তমে গলা চড়িয়ে দিলে। বললে—কথা বলছো না কেন শুনি? কথা বলছো না কেন? জবাব দাও?

তবু বৌদি জবাব দেয় না। যেমন চুপ করে শুয়ে ছিল, তেমনি চুপ করে শুয়ে রইল।

—বলি, কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? জবাব দাও? জবাব না-দিয়ে পার পাবে ভেবেছ? দাও জবাব?

তারপর হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো। ভালো করে মুখ নিচু করে দেখলে।

ক্ষিরি এসেছিল বাবাকে ভাত খেতে ডাকতে।

সন্তোষ-কাকা বললে—ওরে ক্ষিরি, বৌদি যে কথা বলছে না রে, কী হলো? মরে গেল নাকি?

তারপর মুখটা আরো নিচু করলে, আরো নিচু। তারপর গায়ে হাত দিতেই একেবারে শিউরে উঠলো।

ততক্ষণে ক্ষিরিও হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে। সন্তোষ-কাকার কান্না যেন ক্ষিরির কান্নাকেও ছাপিয়ে গেল। পুরুষ মানুষ যে অমন কান্না কাঁদতে পারে এর আগে তাও কেউ জানতো না। সন্তোষ-কাকার কান্না এপাড়া থেকে ওপাড়া পর্যন্ত সমস্ত সচকিত করে দিলে। তখন বিকেল বেলা। অফিসের পুরুষ-মানুষরা তখনও কেউ বাড়ি আসেনি। বাড়ির মেয়েরা কেউ তখন ঘুমিয়ে উঠেছে, কেউ কাঁথা সেলাই করছে, কেউ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। বলতে গেলে কলকাতার শহরতলীতে তখন অলস-অপরাহ্ণ। সেই সময় একজন পুরুষ মানুষের কাঠফাটা কান্নার শব্দে সমস্ত অঞ্চলটা একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। কাশী বারান্দায় শুয়ে শুয়ে গড়াচ্ছিল। কান্নাটা তার কানে যেতেই সে ওপরে গিয়ে কান্ড দেখে অবাক।

সন্তোষ-কাকা কাশীকে দেখে আরো হাউ-মাউ করে উঠলো, বললে—ওরে, আমিই বৌদিকে মেরে ফেললাম রে, ওরে-কাশী আমারই মতিচ্ছন্ন হয়েছিল রে—

কাশী আর দাঁড়াল না। পাশের বাড়িতে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে বললে—আমার বাবুর আপিসে একবার টেলিফোন করে দিন না—মা, আমার মা আর নেই—

বলেই আবার দৌড়ে নিজের বাড়িতে চলে এসেছিল—

এই-ই হলো সেদিনকার ইতিহাস। কিন্তু আশ্চর্য, মায়ের মৃত্যুটা যতখানি অসহ্য হবে মনে হয়েছিল দীপঙ্করের, ততখানি তো হলো না। বলতে গেলে সন্তোষ-কাকার তুলনায় কিছুই হলো না। একটা মানুষ এই পৃথিবীতে তাকে এনেছিল, তাকে লালন-পালন করেছিল, তার ভাল-মন্দের ভাবনা ভেবেছিল, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে নিয়েছিল। আর শুধু তাই নয়, তার জন্মের পর থেকে যে তার অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় হয়ে বিরাজ করছিল, সে আর রইল না। সে আগুনে ধোঁয়ায় ধুলোয় একাকার হয়ে মিলিয়ে গেল, অথচ কোনও বিপর্যয় ঘটলো না দীপঙ্করের জীবনে। এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা দীপঙ্করের জীবনে যেন আর কখনও ঘটেনি!

জীবন দিয়ে যাকে জানি, মৃত্যু দিয়েও যে তাকে জানা উচিত এই সত্যটাই যেন সেদিন দীপঙ্করের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। অঘোরদাদুর মৃত্যুও সে দেখেছে, কিরণের বাবার মৃত্যুও দেখেছে। বিন্তীদির মৃত্যু, মিস্ মাইকেলের মৃত্যু, কোনও মৃত্যুই দীপঙ্করকে উপলব্ধির এত গভীরে পৌঁছে দেয়নি। এই উপলব্ধির গিরিচূড়ায় উঠে বিস্ময়ে, বিহ্বলতায়, বিমূঢ়তায় দীপঙ্কর তার নিজের শোকও ভুলে গেল। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই দীপঙ্কর যেন সেদিন নিজের স্বরূপকে স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিল। দীপঙ্কর যে এই জগতের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত কিছু থেকে বিভিন্ন, তার নিজেরও যে একটা স্বকীয় অস্তিত্ব আছে, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেন মা তাকে এই শিক্ষাটাই দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

বেশি চিৎকার করেছিল সন্তোষ-কাকা। স্টেশন রোড থেকে শ্মশান পর্যন্ত সন্তোষ-কাকার গলাই সেদিন সকলকে ছাপিয়ে উঁচুতে উঠেছিল। এক-একবার চিৎকার করে—বলহরি—

আর সকলে সমবেত স্বরে বলেছিল—হরিবোল—

খবর পেয়ে ছিটে-ফোঁটাও এসেছিল। একদিন কিরণের বাবার মৃত্যুর সময় যখন কেউ এসে সাহায্য করবার ছিল না, সেদিনও ওরাই এগিয়ে এসেছিল। আজও এলো ছিটে-ফোঁটা। কাছেই বাড়ি। তবু খবরটা পেয়েই গাড়ি চড়ে-চলে এসেছে। নতুন গাড়ি। বেশ ভাবিযুক্তভাবে গম্ভীর মুখে দীপঙ্করের কাছে এল। কেমন করে মারা গেলেন দিদি, কী হয়েছিল, কোন্ ডাক্তার দেখছিল। যা যা প্রশ্ন করা উচিত, সেই সব প্রশ্নই করলে। তারপর খানিকটা সান্ত্বনাও দিলে। যেমন সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। সেদিন আর অন্য প্রসঙ্গ তুললে না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তদারক করলে গম্ভীর হয়ে এদিক-ওদিক দেখলে, তারপর এক সময়ে চলেও গেল। তারা যেন অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। তারা যেন সমাজের একজন হয়েছে। কিন্তু তারা জানতে পারেনি যে দীপঙ্করের সেদিন কোন সহানুভূতি, কোন সাহায্য, কোনও চোখের জলেরই প্রয়োজন ছিল না। আশ্চর্য মায়ের মৃত্যু যে সে এমন করে সহ্য করতে পারবে, তা কি সে নিজেও আগে জানতো?

নির্জন ঘরের দরজা-আঁটা নিরিবিলিতে দীপঙ্কর সেই কদিন যেন আপন সত্তার বড় মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল এতদিনের জীবনে কী তার হয়েছে, আর কী তার হয়নি। কী পেয়েছে আর কী-ই বা সে পায়নি! আর পাওয়ার কথার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল চেয়েছিলই বা সে কী? কোন্ চাওয়াকেই চরম চাওয়া বলে ভেবেছিল সে?

—বাবু!

যখন একেবারে নিঃসঙ্গ একেবারে নিরাসক্ত হয়ে দীপঙ্কর নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই কাশীর কথা মনে পড়ে। কাশীই যেন মার মৃত্যুতে বেশি শোক পেয়েছে। দীপঙ্করের চেয়েও বেশি। কত বকতো মা, কত শাসন করতো কাশীকে। তবু কাশী বুঝতো এ-সংসারে এই একটি লোকের কাছেই তার মান-অভিমান-অত্যাচার-আবদার সব কিছু খাটে। একটা বেড়াল-কুকুর পর্যন্ত তা বুঝতে পারে আর কাশী বুঝবে না! কাশীও তো দীপঙ্করের মতই। কাশীও হয়ত দীপঙ্করের মত সমস্ত কিছু অনুভব করে, শুধু দীপঙ্করের মতই বলতে পারে না মুখ ফুটে। এ-সংসারে চেয়ে নিতে না জানলে যে কিছু পাওয়া যায় না, কাশী বোধহয় তা বোঝে না।

—খাওয়া হয়েছে তোর কাশী?

কাশী বলে—হ্যাঁ—

—পেট ভরেছে তো? কী খেলি?

কাশীর পেট ভরেছে। কী কী খেয়েছে তারও তালিকা দেয়। দীপঙ্কর বলে—পেট না-ভরলে দিদিমণিকে বলবি, বুঝলি? এখন তো আর মা নেই! আর পেট না-ভরলে আমাকেও বলতে পারিস!

কাশী বললে—চার আনা পয়সা দেবেন বাবু—

—পয়সা কী করবি?

আর কথা বলে না। আর কোনও উত্তর নেই মুখে। একেবারে মুখ বন্ধ।

—পয়সা কী করবি বল্ না? কিছু খাবি? খিদে পেয়েছে?

কাশী বললে—না—

—তবে?

কাশী বললে—সন্তোষ-কাকা চেয়েছে—

এতক্ষণ সন্তোষ-কাকা কোথায় ছিল কে জানে। হয়ত লুকিয়ে-লুকিয়ে সব শুনছিল। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে কাশীকে এই মারে তো সেই মারে—। বলে—আমি চেয়েছি পয়সা? পয়সা আমি চেয়েছি? মিছে কথা বলবার আর জায়গা পাওনি তুমি?

বলে কাশীকে প্রায় মারবার যোগাড়। দীপঙ্কর থামিয়ে দিলে। বললে—আপনার পয়সার দরকার থাকলে, আমার কাছেই চাইলে পারতেন। আর চাইবার দরকারই বা কী! আমার পয়সা-কড়ি কোথায় থাকে তা তো জানেন, যা-দরকার

নিয়ে নিলেই পারেন—

সন্তোষ-কাকা তখনও হৈ-চৈ করছে। বললে—কথা তো তা নয়, তোমার পয়সা আর আমার পয়সা কি আলাদা? কিন্তু বেটা মিথ্যে-কথা বলবে কেন? ও কে?

—থাক্ থাক্ ওকে আর বকবেন না আপনি। আপনার যা দরকার হয়, আপনি আমার কাছে বলবেন, আমি দিয়ে দেব।

সন্তোষ-কাকা বললে—না বাবাজী, হয়েছে কী তবে শোন—

দীপঙ্কর বললে—থাক্, কাকাবাবু আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি—

সন্তোষ-কাকা বললে—তুমি ছাই বুঝেছ, বুঝলে আমার এই নরক-যন্ত্রণা! আমি মেয়ের বিয়ে নিয়ে পাগল হয়ে আছি, আমার মাথার ঠিক নেই, বুঝলে বাবাজী, মাথার ঠিক নেই আমার! পাড়ার সব লোকে জিজ্ঞেস করে, কই, এবার তো আপনার বৌদি মারা গেল দত্তমশাই, এবার কবে বিয়ে হচ্ছে আপনার মেয়ের! তা আমি আর কী বলবো বলো? আমার কি বলবার মুখ আছে? বৌদি থাকলে তবু জোর করতে পারতুম, এখন তুমি কি আর আমার কথা শুনবে? তুমি বড় মাইনের চাকরি করো, তুমি আমার ক্ষিরিকে বিয়ে করবে কেন? এখন আমাদের যাবার বন্দোবস্ত করে দাও—আমরা রসুলপুরে চলে যাই—

আজকাল সন্তোষ-কাকা এই বুলি ধরেছে। বলে—তুমি ক্ষিরিকে বিয়েও করবে না, আবার রসুলপুরে যেতেও দেবে না, এ তো মহা জ্বালা হলো দেখছি আমার—

রাস্তায় চেনা লোকের সঙ্গে কথা হলেই বলে—চললুম, বুঝলেন বাঁড়ুজ্জে মশাই। এবার চললুম কলকাতা ছেড়ে, আপনাদের কলকাতা শহর খুব দেখা হলো—যথেষ্ট শিক্ষা হলো আমার, হয়রানি যা হলো তা আর কহতব্য নয়—

তারা বলে—সে কি, মেয়ের বিয়ে দেবেন না? মেয়ের বিয়ে দিতেই তো এসেছিলেন এখানে—

সন্তোষ-কাকা বলে—না মশাই, কলকাতার লোকদের আমার খুব চেনা হয়ে গেছে, কলকাতা শহরে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না—গরীবের মেয়ে বলে কি ফ্যালনা নাকি?

—কেন? কী হলো? মেয়ে পছন্দ হলো না?

সন্তোষ-কাকা রেগে যায়। বলে—মেয়ে পছন্দ হলো না মানে? আমারই জামাই পছন্দ হলো না মশাই। এদিকে আমিও বিয়ে দেব না, ওদিকে ছেলেও গরে বসেছে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে! আমি বলেছি—না, ছেলের শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, এখানে বিয়ে দেব না আমার মেয়ের। এখন এই দো-টানার মধ্যে পড়ে মুশ্কিল হয়েছে যত আমার—

শেষকালে অবস্থা আরো চরমে উঠলো। সন্তোষ-কাকাকে দেখলেই রাস্তার ছেলেরা ক্ষেপায়।

বলে—এই বুড়ো, পান্তুয়া খাবি?

প্রথম-প্রথম গা করতো না সন্তোষ-কাকা। বলতো—সে না পান্তুয়া, সে না কটা পান্তুয়া দিবি দে, খাচ্ছি—

ছেলেরা দূরে থেকে সে-কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বলতো—এই বুড়ো পান্তুয়া খাবি?

শেষের দিকে তেড়ে তেড়ে যেত সন্তোষ-কাকা। ছেলেগুলো সন্তোষ-কাকার তাড়া খেয়ে পাঁই পাঁই শব্দে দৌড়ে পালাতো।

সন্তোষ-কাকা দূর থেকে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বলতো—আমাকে পাগল পেয়েছিস নাকি? আমি পাগল? আমার সঙ্গে ইয়ারকি? বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিতে পারিস না? যত সব পাগলের ডিম্ কোথাকার—

মিস্টার ঘোষালের কাছে এসে এস্‌টাবলিশমেন্ট্ ক্লার্ক ফাইল নিয়ে দাঁড়ায়। বলে—স্যার, মিস্ মাইকেলের ভেকেন্সিটা খালি পড়ে রয়েছে অনেক দিন—ওটার কী করলেন?

মিস্টার ঘোষালের কাজের অন্ত নেই। বললেন—এখন না, পরে হবে—

ক্লার্কটা বললে—কবে আসবো স্যার—

মিস্টার ঘোষাল রেগে গেলেন। বললেন—নট্ নাউ—আমি পরে দেখবো—

তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—হোয়েন ইজ্ মিস্টার সেন ডিউ? মিস্টার সেন কবে জয়েন করছে?

ক্লার্ক বললে—টুয়েনটি সেভেন্‌থ্—

—অল্-রাইট্, আই শ্যাল্ সী টু ইট্—

আজকাল বিকেল হতে-না-হতেই মিস্টার ঘোষাল বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আগে ছটা সাতটা পর্যন্ত কাজ করেও কুলিয়ে উঠতে পারতো না। পার্টির ভিড় লেগেই থাকতো সারাদিন। একদলের পর আর একদল ঢুকছে। দল-দল লোক। বড়-বড় গাড়ি এসে দরজার সামনে দাঁড়াতো। আর সব গিয়ে ঢুকতো ঘোষাল সাহেবের ঘরে।

দ্বিজপদ সেলাম করতে করতে মাথা বেঁকিয়ে ফেলতো। বলতো—সেলাম হুজুর—

কিন্তু ইদানীং মিস্টার ঘোষাল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়ে। লোক এসে ফিরে যায়। হায়-হায় করে দ্বিজপদ। এত লোকজন। এত লোকসান সহ্য হয় না দ্বিজপদর। বলে—শুয়োরের বাচ্চা—

বলে—শুয়োরের বাচ্চা নিজেরও লোকসান করছে, আমারও লোকসান করছে—শালা আমার লোকসানেরই বরাত কেবল—

কিন্তু সেদিন দ্বিজপদও থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। ভেতরে সাহেব টেলিফোনে যেন কার সঙ্গে খুব জোরে-জোরে কথা বলছে। টেলিফোনটা নিয়ে যেন যুদ্ধ করছে ঘোষাল সাহেব। দ্বিজপদ উঁকি মেরে দেখতে লাগলো ভেতরে।

ইংরিজী কথা, কিছছু বোঝা যায় না এক বর্ণ। ইংরিজীতে যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে। এক মিনিট দুমিনিট নয়, অনেকক্ষণ ধরে।

একজন পার্টি এসেছিল। দ্বিজপদ বললে—সেলাম হুজুর—

অনেকবার বকশিশ দিয়েছে দ্বিজপদকে। এর অনেক নুন খেয়েছে দ্বিজপদ আগে। বললে—একটু দাঁড়ান হুজুর, সাহেব টেলিফোনে বাত করছে—

দেখতে-দেখতে আর একটা পার্টি এসে হাজির হলো। আর একজন পার্টি। দ্বিজপদ সকলকেই সেলাম করলে। বললে—একটু সবুর করুন হুজুর, সাহেব টেলিফোনে জরুরী বাত করছে—

কিন্তু ঘোষাল সাহেবের জরুরী বাত আর শেষ হতে চায় না। ঘোষাল সাহেবের হাউ-হাউ চিৎকার বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। হৈ-চৈ পড়ে গেল আপিসে। সবাই বুঝলে ঘোষাল সাহেব রেগে গেছে কার ওপর। রেগে রেগে কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছে।

তারপরই দড়াম করে রিসিভারটা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। রাগে তখন ঘোষাল সাহেব দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গায়ে পরে নিলে কোটটা। চুরোটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ডাকলে—চাপরাসী—

দ্বিজপদ দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো।—হুজুর—

—আবি যাতা হ্যায়—

—ঠিক আছে হুজুর।

তার মানে আজ আর কোনও কাজ হবে না। আজকে লোকসানের বরাত। শালা, শুয়োরের বাচ্চা। নিজেরও লোকসান করছে, চাপরাসীরও লোকসান করছে—শালা লোকসানেরই বরাত কেবল! ঘোষাল সাহেব সুইং-ডোরটা ঠেলে গট্‌ গট্‌ করে বেরিয়ে গেল সদর রাস্তার দিকে।

পার্টিরা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা প্রাণের দায়ে এগিয়ে গেল।

—গুড্‌ মর্নিং স্যার—

ঘোষাল সাহেব দেখেও দেখলে না। সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে চুরোটের ধোঁয়া ছাড়লে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে শুধু বললে—নট্‌ নাউ—

তারপর গাড়ির ভেতরে উঠতেই দ্বিজপদ দৌড়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—সেলাম হুজুর—

ঘোষাল সাহেব ড্রাইভারকে বললে—ঘর চলো, জলদি—

ঘর-ঘর আওয়াজ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলে। দ্বিজপদ খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়েই সাহেবের মুন্ডপাত করতে লাগলো। সারাদিনে মাত্র কুড়িটা টাকা রোজগার, আর ঘণ্টা দুই সাহেব থাকলেই আরো কুড়ি টাকা রোজগার হয়ে যেত। শালা শুয়োরের বাচ্চা, শালা হারামির বাচ্চা......

টেলিফোনটা রেখে দিলে দীপঙ্কর। মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে এতক্ষণ অনেক চিৎকার করেছে।

দীপঙ্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে শির-শির করে উঠলো। আশ্চর্য! তার চোখের আড়ালে এত কাণ্ড ঘটে গেছে পৃথিবীতে। এত অন্যায়, এত অনাচার। প্রথমে যখন মধু বলেছিল তখনও বিশ্বাস হয়নি কথাটা। ভেবেছিল অন্য কেউ। তারপর এতদিন ছুটিতে কেটে গেছে। মা'র মৃত্যুটা একেবারে হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত তার জীবনে এসে লেগেছিল। অথচ বাড়িতে ভালো লাগতো না। মনে হতো কোথায় যেন জীবনের ছন্দপতন হয়ে গেছে হঠাৎ। আত্মপরীক্ষার অজ্ঞাতবাসে দীপঙ্কর আবার নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। সেদিন হঠাৎ খবরের কাগজটা খুলেই চমকে উঠেছিল সকালবেলা। বর্মা রোড ক্লোজ্‌ড্‌। উনিশ শো ছত্রিশ সালে যে-রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেই রাস্তা এতদিনে বন্ধ হয়ে গেল। উনিশ শো চল্লিশ সালের জুলাইতে। জাপান য়াক্সিস্‌দের দলে যোগ দেবার পরেই যুদ্ধের ভয় বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়ায় আসবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট্‌। এখন? এখন কী হবে? ভুবনেশ্বরবাবু আসবেন কী করে?

সিঁড়ির গোড়ায় কাশীর সঙ্গে দেখা। বললে—আবার কোথায় চললেন?

দীপঙ্কর বললে—একবার ঘুরে আসছি—

সকালবেলা। বেলা হয়ে গেছে বেশ। হঠাৎ একটা পোস্ট্যাল্‌ পিওন সাইকেল চড়ে এসে হাজির। বলেছিল— দীপঙ্কর সেন কার নাম স্যার?

দীপঙ্কর বললে—আমার। আমার চিঠি আছে নাকি?

সত্যিই তো, টেলিগ্রাম করতে যাবে কে আবার তাকে। তার সম্বন্ধে কে এত আগ্রহী।

—আপনি টেলিগ্রাম করেছিলেন বর্মায়? বি মিত্রের নামে?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগে—

—সে টেলিগ্রাম ফিরে এসেছে—এই নিন্‌।

—কেন?

পিওন বললে—এই খামটায় সই করে দিন একটা—

দীপঙ্কর সই করে দিলে। তারপর ভাল করে পড়ে দেখলে টেলিগ্রামটা। লেখা রয়েছে—য়্যাড্রেসী নট্‌ ট্রেসেবল্‌। ঠিকানায় লোক পাওয়া গেল না! আশ্চর্য তো! অত বড় বিরাট টিম্বার মার্চেন্ট্‌, তাঁর ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেল না! যুদ্ধ বেধেছে বলে কি সব ওলোট্‌-পালোট্‌ হয়ে যাবে!

সই নিয়ে পিওনটা চলে গেল। পিওনটা যাবার সময় বলে গেল—ভুল ঠিকানা হয়ত, ভাল করে দেখুন—

দীপঙ্কর টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ! ভুল ঠিকানা কেন হবে? লক্ষ্মীদি যেমন লিখে দিয়েছিল, সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করা

হয়েছিল। কোনও ভুল নেই। দীপঙ্কর আবার ওপরে নিজের ঘরে উঠে এল। বাক্সর মধ্যে কাগজপত্র ছিল অনেক। খুঁজে খুঁজে কাগজখানা বের করল। পেন্সিলে লেখা সতীর বাবার ঠিকানা। কোনও ভুল নেই। হয়ত ভালো করে খোঁজেনি পোস্টাপিসের লোক। কিম্বা হয়ত যুদ্ধের সময়, পোস্টাপিস বদলে গেছে, থানা বদলে গেছে। লক্ষ্মীদির দেওয়া ঠিকানা তো। লক্ষ্মীদি কতদিন আগে বর্মা ছেড়ে চলে এসেছে। এখনকার বর্মার অবস্থা তো জানে না। তাছাড়া কলকাতাতেও কত সব বদলে গেছে। ময়দানে মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে, মাঠের ওপরে সার-সার মিলিটারি লরী, বেঁটে-বেঁটে জিপ্ সাজানো থাকে। সারা কলকাতার চেহারাই বদলে গেছে। লেকের দিকে গেলে আর চেনা যায় না। ছাউনি পড়েছে ফাঁকা জায়গাগুলোতে। ছেলেদের খেলবার মাঠের ওপর স্লিট্‌ট্রেঞ্চ খুঁড়েছে। আর গ্রামের ভেতরে কোথায় কী হয়েছে, কে জানে!

লোকে বলে—একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর—এবার মুসোলিনী নামলো, লড়াইটা জমবে—

নরওয়ের রাজা দল-বল মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র-কোটাল নিয়ে এসে ইংলণ্ডে উঠেছে। হিটলারের সেপাইরা প্যারিস নিয়ে নিয়েছে। রাশিয়া লিথুয়ানিয়া নিয়ে নিয়েছে। একে একে সব যাবে। সব যাবে। কেউ রাখতে পারবে না। পৃথিবীর ভূগোলটাই বদলে গেল। নতুন করে আবার গ্লোব তৈরি করতে হবে, নতুন করে অ্যাটলাস আঁকতে হবে, নতুন রং লাগাতে হবে তাতে। কোথায় বর্মার কোন্ কোণে ভুবনেশ্বর মিত্র বিরাট কাঠের ফ্যাক্টরি করেছেন, সে কি আর ঠিক তেমনি আছে?

বিকেল বেলা দীপঙ্কর আবার বেরোল। সারাদিন ধরে কোনও কিছু ঠিক করা গেল না। বার্মা রোড বন্ধ হবার সঙ্গে ভুবনেশ্বরবাবুর কলকাতায় আসার কোনও সম্বন্ধ আছে নাকি?

নির্মল পালিত সেদিন ছিল বাড়িতে। অনেক ফাইল-টাইল নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে। একজন টাইপিস্ট এক কোণে বসে টাইপ করছিল কতকগুলো কাগজ। দীপঙ্করের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল নির্মল। বললে—কীরে, কী হয়েছে তোর?

—মা মারা গেছে।

নির্মল জিজ্ঞেস করলে—তারপর আছিস্ কেমন?

দীপঙ্কর পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা বার করলে। বললে—ভুবনেশ্বরবাবুর নাম শুনেছ তো? মিস্টার মিত্র? সেই ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম, আজ ফেরত এল, ব্যাপার কী?

নির্মল বললে—দেখি—

বলে হাতে নিলে চিঠিখানা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে। তারপর বললে—ঠিক হয়েছে, ঠিকানা বদলে গিয়েছে—

—কিন্তু ঠিকানা বদলাবে কেন?

নির্মল বললে—আমার এক বার্মার ক্লায়েন্ট আছে, সে চিঠি লিখেছে এই ক'দিন আগে, লিখেছে—ওখানে সাউথ-ইস্ট-এশিয়ার ওয়ারফ্রন্ট হচ্ছে একটা। ওটা তো জাপানের আরও কাছে, ওখানেই আগে যুদ্ধ বাধবে, বার্মা যে খুব ভাল্‌নারেবল্ স্পট্—ওখানে আরো হিউজ ওয়ার প্রিপারেশন হচ্ছে লিখেছে—

—তাহলে কী করবো? কোথায় তাঁর ঠিকানা পাবো?

নির্মল হঠাৎ বলে উঠলো—বাই-দি-বাই, খবর শুনেছিস, মিসেস ঘোষের পুত্রবধূ—সনাতনবাবুর স্ত্রী রে—সে নাকি তোদের রেলওয়ে অফিসারের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে—

—সে কি? তুমি কী করে জানলে?

দীপঙ্কর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। উত্তেজনায় আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলে না।

—তুই জানিস না? আমি যে কেস টেক-আপ করেছি। এই দ্যাখ—মকদ্দমা হবে। আমি মা-মণিকে বলেছি, আমি ব্রিফ্ নেব। বলবো বিশ হাজার টাকার গয়না নিয়ে বাড়ি থেকে অ্যাবসকন্‌ড্ করেছে! থেফট্, চীটিং—

—কোথায় আছে সতী?

নির্মল বললে—প্যালেস-কোর্টে—

কথাটা কানে যেতেই দীপঙ্কর সোজা চেয়ার থেকে উঠে এসেছিল। চোখের সামনে যেন সমস্ত কলকাতাটা চক্রাকারে ঘুরছিল তখন। নির্মল আরো যেন কত কী বলেছিল, স্পষ্ট করে সে-সব কিছুই কানে যায়নি তখন। সব কথা কানে নেবার মত মানসিক অবস্থাও তখন নয়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে যে-নাটক অভিনয় হচ্ছে, তারই কিছু আভাস দিয়েছিল নির্মল। এই-ই তো নির্মল পালিতের সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ। এই সব সুযোগ যদি নির্মল পালিত সদ্ব্যবহার করতে পারে, তাহলে সে-ও তার বাবার মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, প্রতিপত্তি করতে পারবে কলকাতা শহরে।

নির্মল পালিত ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই মা-মণি এলেন। নির্মল পালিত বললে—আমাকে ডেকেছেন মা-মণি?

—হ্যাঁ বাবা, বোস বলছি তোমাকে—আমার বৌমা তো চলে গেছে জানো। তা জানো আর না-জানো চলে গেছে। তোমার কাছে তো কোনও কথা লুকোলে কাজ চলবে না আমার। তাই সমস্ত বলবো বলেই ডেকেছি—

নির্মল পালিত কী যেন বলতে যাচ্ছিল। মা-মণি বললেন—তুমি চুপ করো, আমি আমার কথাটা আগে বলে নিই!

নির্মল পালিত বললে—আপনি অত হাঁফাচ্ছেন কেন মা-মণি, ধীরে সুস্থে বলুন না! এ তো তাড়াহুড়ো করার কাজ নয়—যা করতে হবে ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তে করতে হবে—

—না বাবা, ধীরে সুস্থে করবার আর সময় নেই বাবা। আমি বাঁচি কি

না-বাঁচি, ঠিক আছে?

—ছি মা-মণি, এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন?

—তা মুষড়ে পড়বো না? তুমি সবটা শুনলে আর এ-কথা বলতে না বাবা। আমার আর বেশি দিন বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কার জন্যে আর টাকা-কড়ি আগলাবো? কে আছে আমার? আর কদ্দিন ভূতের ব্যাগার খাটবো বলতে পারো? পেটের শত্তুর বড় শত্তুর। সেই নিজের পেটের ছেলে আজ আমার শত্তুর হলো বাবা? এও আমার কপালে ছিল। বউ না-হয় পরের ঘরের মেয়ে, তার দোষ নেই, সে তো মুখে লাথি-ঝাঁটা মারবেই। নিজের পেটের ছেলেই যদি অমন করে বলতে পারে তো বউ তো বলবেই, হাজারবার বলবে—লক্ষ বার বলবে—তাহলে আমি কার জন্যে এত করি বাবা? কার ভালোর জন্যে করি? আমার কি কম জ্বালা—

সত্যিই ঘোষ-বাড়ির বিধবা গৃহিণীর অনেক জ্বালা। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু ভেতরের খবর ক'জন রাখে! ক'জন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পায়? ঝি-চাকর পর্যন্ত আমায় দেখে মুখ-নাড়া দেয় বাবা। আমি নাকি বৌ-কাটকী, আমি নাকি বৌ-খাগী শাশুড়ী!

—ছি ছি মা-মণি! এমন কথাও লোকে বলে! আপনার মত শাশুড়ী ক'টা পাওয়া যায় মা-মণি? আর কেউ না-চিনুক, আমি তো চিনি আপনাকে। আপনার মত গিন্নী পেলে কলকাতার সব সংসার সোনা হয়ে যেত মা-মণি। সোনা হয়ে যেত! তাহলে আর হাইকোর্টে এত মামলা-মকদ্দমাও হতো না আর আমাদের প্রোফেশনেও এত আন-ডিজায়ারেবল্ লোককে আসতে হতো না!

তারপর কাজের কথায় আসে নির্মল। বলে—তা আমাকে কী করতে হবে বলুন? মামলা? আপনার জন্যে আমি সব ঝামেলা নিতে পারি মা-মণি!

—শুধু মামলা নয় বাবা। আরো কাজ আছে, উইল্ করতে হবে।

নির্মল পালিত এতদিন এই সুযোগই খুঁজছিল। বললে—উইল্ করতে বলেন করতে পারি। কিন্তু কার নামে উইল্ করবেন? আপনার ছেলের নামে করবেন?

মা-মণি মুখ বাঁকালেন। বললেন—রক্ষে করো বাবা, নিজের ছেলে শেষকালে আমায় লাথি মারবে, সে আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে আমি ভাগাড়ে মরে পড়ে থাকবো তা-ও ভাল—খুব শিক্ষা হয়েছে বাবা আমার—

—তাহলে এক কাজ করুন না?

—কী কাজ?

নির্মল পালিত বললে—একটা ট্রাস্ট্ করে যান্ না—ট্রাস্ট্ করলে আপনার প্রপার্টি কেউ নষ্ট করতে পারবে না, আপনি যেমন-ভাবে টাকা খরচ করতে বলে যাবেন, সেইভাবে খরচ করবে তারা। তা আমি নিজে তার ভার নিতে পারি। আমিও নিজে সেই ট্রাস্টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারি—আমি যতদিন বেঁচে

আছি ততদিন তো আর চুরি-জোচ্চুরি চলবে না—

—আমার ছেলে?

—আপনার ছেলেকে আপনি ত্যাজ্য করে যান্—! আমি আপনার ছেলেকে ট্রাস্টে হাত দিতে দেব না। সে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলবোখন্, আপনার কোনও চিন্তা নেই—আপনার ছেলে বা ছেলের-বউ—

—ছেলের বউ-এর কথা ছেড়ে দাও বাবা, তার নাম আর মুখে এনো না আমার সামনে।

নির্মল পালিত বললে—তাহলে আপনি মামলা করুন, ছেলের বউ-এর নামে মামলা করুন—

—মামলা হয়?

—কেন হবে না!

—কী বলে মামলা করবো?

নির্মল পালিত বললে—কেন? বলুন যে আপনার পুত্রবধূ পাঁচ হাজার টাকার গয়না নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে—

মা-মণি নিজের মনেই যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—তা বেশ তো, তাই মামলা করো, তবে পাঁচ হাজার কেন, দশ হাজার টাকার গয়নার জন্যে মামলা করে দাও। কী রকম খরচা পড়বে?

নির্মল পালিত হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—আপনি দেখছি আমাকেও বিশ্বাস করেন না—

মা-মণি বললেন—না বাবা, হয়েছে কী, এমন মনের অবস্থা হয়েছে যে কাউকেই আমায় বিশ্বাস হয় না আর—নিজের পেটের ছেলে যার এমন করতে পারে তার অবস্থাটা একবার ভাবো দিকিনি তুমি? আমি কি সাধ করে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি বাবা, প্রাণের দায়ে ডেকেছি—

সত্যিই প্রাণের দায় মা-মণির। নিজের ঘরে বসে বসে মতলব আঁটেন সারাদিন। কত সাধের সংসার তাঁর। কত দিক দেখে, কত আট-ঘাট বেঁধে এই সংসারকে এতদিন চালিয়ে এসেছেন এই জন্যে? যাক্, সব পুড়ে-ঝুড়ে যাক্, গোল্লায় যাক্।

সরকারবাবু দোর-গোড়ায় এসে ডাকে—মা-মণি—

মা-মণি ঝাঁজিয়ে ওঠেন—কী? আবার কী সরকারবাবু? তোমাদের কী সময়-অসময় জ্ঞান নেই?

—আজ্ঞে, বউবাজারের বাড়িতে ছাদ ফেটে জল পড়ছে—সারাতে বলছিল—

মা-মণি রেগে চিৎকার করে ওঠেন—সারানো হবে না, বলে দিও যা করতে পারে করুক ওরা, মামলা করুক। আমিও মামলা করতে জানি, বাড়ি আমার, পারে তো নিজেরা সারিয়ে নিক আর না-পারে তো বাড়ি ছেড়ে দিক, আমি সারাবো না—

সনাতনবাবু খেতে বসে দেখলেন। বললেন—মা-মণি খাবে না?

শম্ভু ছিল কাছে। সনাতনবাবু মা'র ঘরের কাছে গিয়ে বললেন—মা, খাবে না?

মা-মণি প্রথমবার উত্তর দেননি। আর একবার বলতেই বললেন—খোকা, তুমি বিরক্ত কোর না আমাকে, আমার খিদে নেই—

সনাতনবাবু আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। সোজা এসে খেয়ে নিয়ে উঠে আবার নিজের ঘরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন ঘরের।

মা-মণি শম্ভুকে ডাকলেন। বললেন—আবার আমার সঙ্গে দাদাবাবুকে খেতে দিয়েছিস্, খবরদার বলছি, কাল থেকে আমাকে আলাদা খাবার দিবি। বাতাসীর মাকে বলে দিস্—বার বার বলে দিয়েছি, তবু হুঁশ হয় না তোদের—

নির্মল পালিত ব্যারিস্টার-য়্যাট-ল এতদিন ঘাস কাটবার জন্যে এ-বাড়িতে আসেনি। বাড়ি থেকে যাবার আগে বললে—যতক্ষণ আমি আছি কিছু ভাববেন না আপনি মা-মণি, দেখবেন আপনার ছেলে ছেলের-বউ সব এসে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বে—তবে আমি ছাড়বো, জানেন, ইংরিজীতে একটা কথা আছে—Mammon is the largest slave-holder in the world তা দেখবেন না, আমি কেমন করে জব্দ করি ওদের—

পালেস্-কোর্টের ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে প্রথমে অসুবিধে হয়েছিল। কোথায় কোন্ ঘরে মিস্টার ঘোষাল থাকে এখানে, কত নম্বর, কোন্ তলা কিছুই জানতো না দীপঙ্কর। আলাদা ভাগ করা-করা ফ্ল্যাট্। সেলফ্-কন্টেইনেড্। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। কেউ কাউকে চেনে না। একটা ফ্ল্যাটে খুন হয়ে গেলেও পাশের ফ্ল্যাটের লোক টের পায় না। পুরোপুরি ইওরোপীয়ান-কোয়ার্টার। দিশী লোকের এখানে থাকবার অসুবিধে। কলকাতা শহরের মধ্যেই একটা আলাদা জগৎ। এখানকার লোকেরাও কলকাতার বাসিন্দা। কলকাতার সিটিজেন্। কত জায়গাই দেখলে দীপঙ্কর। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে শুরু করে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট, গড়িয়াহাট্, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, স্টেশন রোড—শেষকালে এই প্যালেস-কোর্ট! প্যালেসই বটে? মিস্টার ঘোষালের প্যালেস! আশ্চর্য, এখানে এসে উঠেছে শেষকালে। এখানে এনে তুলেছে! স্কাউন্ড্রেল্ কোথাকার।

দরজাটা খুলতেই চম্‌কে উঠেছে সতী। মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বেরোল না খানিকক্ষণ!

—তুমি?

দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকবে কি না বুঝতে পারলে না। দুজনেই দুজনের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে! তারপর মাথা নিচু করলে সতী। দীপঙ্করও কিছু কথা বলতে পারলে না। বেদনায়, ঘৃণায়, লজ্জায় যেন নীল হয়ে উঠেছে দীপঙ্কর। এত সাহস মিস্টার ঘোষালের। এত বড় স্কাউন্ড্রেল!

দীপঙ্কর বললে—তুমি শেষ পর্যন্ত এখানে এসে উঠলে?

সতী কোনও কথা বললে না। তেমনি চুপচাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

দীপঙ্কর বললে—আজকে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে সতী—তুমি এত নিচে নামতে পারো, এত ছোট হতে পারো আমি ভাবতেও পারিনি—

সতী বললে—তুমি যা বলবে বলো আমাকে, কিন্তু দয়া করে গালাগালি দিও না—

—তা তো বটেই—কথাগুলো গালাগালি বলে আজকে তো তোমার মনে হবেই—

সতী বললে—না, সে-জন্যে নয়, তোমার মুখে গালাগালি শোভা পায় না দীপু—তুমি চরিত্রবান, তোমার চরিত্রের দাম আছে—পরস্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করলে তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় বলেই বলছি—

—তা বলে আর কোনও জায়গা পেলে না, মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে এসে উঠতে হলো? এত অধঃপতন তোমার?

সতী সোজা কঠোর হয়ে উত্তর দিলে—অধঃপতন আমার, না তোমার?

—কেন?

সতী বললে—হ্যাঁ, যেদিন তোমাদের কথায় বাড়ির চাকর-ঝি-দরোয়ান সকলের চোখের সামনে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মুখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন তো তুমি এগিয়ে আসো নি আমাকে বাঁচাতে? সেদিন আমার অধঃপতন দেখে তোমাদের বুক তো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়নি? সেদিন তো আমার সেই অধঃপতন দেখে তোমরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলে! পালাও নি? চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও?

কথাগুলো বলে সতী সেইখানেই দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো।

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর আজকে এসেছ তুমি তোমার সহানুভূতি দেখাতে—? আজকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে এখানে এসেছ চোখ রাঙাতে? কোথায় আমার অধঃপতনটা দেখলে? আমার কীসের অভাব এখানে? কীসের দুঃখ? আমার কীসের জ্বালা? কোনও দুঃখই তো নেই আমার আর! ওই দেখ আমার বিছানা, ওই দেখ আমার ড্রেসিং টেবল্, ওই দেখ আমার সোফা-সেট্—ওইখানে বসে বসে আমার দিন কেটে যায় আরামে, এখানে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না আমাকে—রাত্রে আমার এখানে ঘুমের ব্যাঘাত করবারও কেউ নেই—জানো, আমি এখানে পরম নিশ্চিন্তে আছি—সুখে আছি—শান্তিতে আছি—

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—

সতী আবার বলতে লাগলো—আর, এ না করে যদি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের

শ্বশুরবাড়ির সামনে ঘর ভাড়া নিয়ে মজলিস জমাতুম সেইটেই কি ভালো হতো? তাতেই কি তোমাদের সম্মান বাঁচতো? অথচ আমার কাছেই তো সে-জন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেদিনের সেই ঘটনার পর ওই করলেই তো আমার চরম প্রতিশোধ নেওয়া হতো—! আমাকেই তো তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে, তোমাদের ভালবাসার মর্যাদা রেখেছি আমি। আর শুধু তোমার কেন, আমার শাশুড়ী, আমার স্বামী দেবতা—তাদেরও তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার ওপর—

দীপঙ্কর নিরুত্তর হয়ে চেয়ে রয়েছে তখনও।

সতী বলতে লাগলো—তুমি বলবে এ অবৈধ, এ ইম্প্রিসিট্! বলতে তো তোমাদের ট্যাক্স লাগে না। বলতে তো তোমাদের পয়সা খরচ নেই! কিন্তু আমি যে এতদিন অকারণে এত অত্যাচার সহ্য করে এলুম, অকারণে এত ট্যাক্স্ দিয়ে এলুম, কই তার জন্যে তো সমাজ আমাকে এক পয়সাও রিবেট্ দিলে না—

তারপর হঠাৎ কী হলো, সতী হাসলো। যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি। একেবারে মুখের ভাব বদলে গেছে এক নিমেষে। হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—থাক্ গে এ-সব বাজে কথা, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, আর আমি তোমাকে কড়া-কড়া কথা শোনাচ্ছি কেবল, এসো এসো বোস—

বলে সতী দীপঙ্করের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

দীপঙ্কর বসলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

সতী বললে—কী দেখছো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার ঘোষাল কোথায় থাকে?

সতী হাসলো। প্রথমে মুচকে মুচকে, তারপর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন?

সতী বললে—তবু ভাল, তোমার হিংসে হচ্ছে ঘোষালের ওপর! তা সে-ভয় তোমার নেই দীপু, মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাট আলাদা—এর পাশের ফ্ল্যাট্টা—! তোমার মতন তার চরিত্র অত দুর্বল নয়, অনেক স্ট্রং ক্যারেক্টারের লোক মিস্টার ঘোষাল—তাকে হিংসে করে লাভ নেই তোমার—

দীপঙ্কর বললে—আমি হিংসে করতে আসিনি, তাঁর সঙ্গে আমার হিংসের সম্পর্ক নয়—

সতী শুধরে দিলে। বললে—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই তো?

তারপর দীপঙ্করের মুখের চেহারা দেখে বলে উঠলো—তুমি আবার কথাটা শুনে রেগে যেও না যেন! নিজে চাকরি না-করলেও আমি জানি চাকরির ক্ষেত্রে এ-সম্পর্ক লজ্জারও নয়, অপমানেরও নয়,—অযোগ্য লোকের আন্ডারে কাজ করে অপমান-বোধ করলে আখেরে তাকে পস্তাতেই হয়—তাতে রাগ করতে নেই—চাকরিক্ষেত্রে ওটাই নিয়ম—

দীপঙ্কর বাধা দিয়ে বললে—চাকরির কথা থাক্, আমি এসেছি অন্য কথা বলতে—

সতী বললে—তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি মাসীমা মারা গেছেন—তা ভালোই হয়েছে, বেঁচে থাকলে আমার এই ব্যাপার শুনে তিনি কষ্ট পেতেন—

দীপঙ্কর বললে—তিনি না-হয় বেঁচে গেছেন কষ্ট থেকে—কিন্তু আমি যে কষ্ট পাচ্ছি সতী—

সতী বললে—না, আর কষ্ট পেও না—! যে-কষ্ট থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি, সেই কষ্টটার কথা মনে করেও তোমার আনন্দ পাওয়া উচিত।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কথা তো তা নয়—তুমি জানো না, একটা সংসার আজ ভেঙে যেতে বসেছে তোমার জন্যে। তোমার জন্যেই একটা বংশ ছারখার হতে চলেছে—শম্ভুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, সে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চারদিকে—

সতী অবাক হলো। বললে—কেন? তারা এখনও জানে না আমি কোথায় আছি?

দীপঙ্কর বললে—শম্ভু অন্তত জানে না—

সতী বললে—ঠিক আছে, আমি কালকেই জানিয়ে দেব টেলিফোন করে, কিংবা চিঠি লিখে। তাঁদের জানা উচিত যে, ঘোষ-বংশের কুললক্ষ্মীকে তাঁরা কোথায় ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। এটা না-জানালে আজ রাত্তিরে আমার ঘুমই হবে না—

দীপঙ্কর বললে—তোমার কাছে এটা হাসির ব্যাপারই বটে—কিন্তু নির্মল পালিত, তোমাদের বাড়ির ব্যারিস্টার, এর মধ্যে উস্কানি দিচ্ছে তোমার শাশুড়ীকে—তোমার নামে মামলা করবে বলছে—

—আমার নামে না মিস্টার ঘোষালের নামে? কিসের চার্জ?

দীপঙ্কর বললে—তুমি দশ হাজার টাকার গয়না চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এই চার্জে—

তারপর একটু থেমে বললে—শুধু তাই-ই নয়, তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে তোমার স্বামীর কথা বন্ধ—দুজনে দুজনের মুখদর্শন করে না, সমস্ত সংসারটা তোমার জন্যে ছারখার হয়ে যাচ্ছে জানো, আর তারই সুযোগ নিয়ে নির্মল পালিত তোমাদের সংসারে......

সতী বাধা দিয়ে বললে—আমাদের সংসার বলছো কেন? আমি ও-সংসারের আর কেউ নই—

—কিন্তু তুমি এ-সময়ে না গেলে যে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার শাশুড়ী সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাস্টের নামে—আর নির্মল পালিতই হবে সেই ট্রাস্টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান।

সতী বললে—একবার তোমাদের কথা শুনে আমি যা-ভুল করেছি, আর সে

ভুল করছি না দীপু, তুমি যদি এই কথা বলবার জন্যেই আমার কাছে এসে থাকো তো এবার তুমি যেতে পারো—আমি আর ফিরে যাবো না—

—কিন্তু সনাতনবাবুর কথাটা একবার ভাববে না? তিনি কী দোষ করলেন?

সতী রেগে উঠলো। বললে—তার নাম আর কোর না তুমি—তিনি মানুষ নয়, জানোয়ার—

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না বলেই এত কথা বলছো, জানো, তুমি চলে আসার পর তিনি কী করেছেন, অত যে শান্তশিষ্ট মানুষ, তাঁরও ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, তিনিও আজ মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে অসুখে পড়ে আছেন—

—অসুখ?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তাঁকেও ডাক্তার এসেছিল দেখতে! ভাবো তো তাঁর দশাটা একবার।

সতী হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—কে তোমাকে বললে অসুখের কথা? তুমি নিজে গিয়েছিলে?

দীপঙ্কর বললে—না, নিজেই যাচ্ছিলুম তাঁকে দেখতে, কিন্তু শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে-ই বললে—

—কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও অসুখ তো হয়নি—অসুখ তো হতে দেখিনি কখনও তাঁর।

দীপঙ্কর বললে—সেই জন্যেই আমি তোমাকে একবার যেতে বলছি, তোমার একবার যাওয়া উচিত সেখানে, অন্তত সনাতনবাবুকে দেখতেও একবার যাওয়া উচিত—

—কিন্তু এর পরেও আমাকে তুমি যেতে বলছো? এত কাণ্ডর পরেও আমার যাওয়া উচিত? তুমি কি সব ভুলে গেলে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সে-ঘটনার পর যে সব কিছু বদলে গেছে, সে বাড়ি যে আর সে-রকম নেই, সেই সনাতনবাবুও যে আর সেই মানুষ নেই, তোমার সেই শাশুড়ীও যে এখন অন্যরকম হয়ে গেছেন,—সবাই অবাক হয়ে গেছে তাঁকে দেখে—জানো, তোমার শাশুড়ী কাঁদেন আজকাল?

—কেন?

—নিজের মনে তো সব বুঝছেন, নিজের মনে অনুতাপ এসেছে হয়ত। তার ওপর নির্মল পালিত এসে দিন-রাত তাঁর কানের কাছে মতলব দিচ্ছে নানারকম—এখন যদি না-যাও তুমি তাতে তোমারও ক্ষতি আর সনাতনবাবুরও ক্ষতি—সনাতনবাবু নিরীহ ভালো-মানুষ, ওই মা মারা যাবার পর, সনাতনবাবুকে হয়ত পথে বসাবে নির্মল পালিত—। সনাতনবাবু তো সংসারে মা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না—তাঁর দশা কী হবে তখন ভাবো!

সতী কিছু কথা বললে না। কী যেন ভাবতে লাগলো।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—তারপর তোমার বাবার কথা—

সতী হঠাৎ বললে—আমি বাবাকে চিঠি দিয়েছি একটা—

—কোনও রিপ্লাই পেয়েছ?

সতী বললে—না, প্রায় এক মাস হলো আমি চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোনও উত্তর নেই, অথচ আমার চিঠি না-পেলে বাবা বড্ড ভাবনায় পড়েন—

দীপঙ্কর বললে—আমিও টেলিগ্রাম করেছিলাম, সে টেলিগ্রামও ফেরত এসেছে, লিখেছে, বি মিত্র বলে কোনও লোক সেখানে নেই—নির্মল বললে, ওয়ারের জন্যে ওঁর ফ্যাক্টরি বাড়ি সব বোধহয় মিলিটারিতে নিয়ে নিয়েছে, উনি বোধহয় ঠিকানা বদ্‌লিয়েছেন—এদিকে বর্মা রোডও বন্ধ করে দিয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট—

সতী তখনও চুপ করে ভাবছিল। বললে—বাবার চিঠি পেলে আমি তো সেখানেই চলে যেতাম—সেইজন্যেই তো চিঠি লিখেছিলাম—সে-ও হলো না—

—সেখানে গেলেই তোমার ভালো হতো সতী! সব দিক থেকেই ভালো হতো! তাহলে আজ আর এখানে এসে উঠে এই অবস্থায় তোমায় থাকতে হতো না!

সতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ওরা কি আমার খোঁজ করছে?

দীপঙ্কর বললে—ওদের ব্যারিস্টার তো খোঁজ পেয়েছে, নির্মল পালিত খোঁজ পেয়েছে, তা না-হলে আমি কী করে খোঁজ পেলুম। সেখান থেকেই তো শুনলুম তুমি এখানে আছো, মিস্টার ঘোষাল আমাকে কিছু বলেন নি তোমার সম্বন্ধে!

সতী বললে—কিন্তু আমি তো তোমার খোঁজ করতেই তোমার আঁফিসে গিয়েছিলুম—তোমাকে সেদিন পেলে তো আর মিস্টার ঘোষালের কাছে যেতুম না—

দীপঙ্কর বললে—আশ্চর্য, আমি সেই দিনই আপিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলাম কয়েক ঘণ্টার জন্যে, আর তারই মধ্যে সব ঘটে গেল, আর এতদিন মা মারা যাবার জন্যে ছুটিতে ছিলাম—আমি এ-সব কিছুই জানতে পারিনি। পারলে আমি আগেই সব মিট-মাট্ করে দিতাম—

সতী বললে—আর মিট্-মাট্ হবে না দীপু তুমি আর সে-চেষ্টা কোরও না—

—কিন্তু সনাতনবাবুর অসুখ শুনেও তুমি যাবে না? অসুখের ব্যাপারে এত রাগ থাকা কি ভাল?

—কিন্তু আবার যদি সেই রকম অপমান করে আমাকে?

দীপঙ্কর বললে—আর সে-রকম অপমান করবার অবস্থা নেই এখন ওদের, তোমাকে বলেছি তো, সব হাল-চাল বদলে গেছে ও-বাড়ির—

সতী বললে—তাহলে মিস্টার ঘোষালকে একবার জিজ্ঞেস করে যাওয়া ভাল।

—কেন? তোমার কি সে-স্বাধীনতাটুকুও নেই?

—আমার বিপদের দিনে মিস্টার ঘোষালই আশ্রয় দিয়েছে, মিস্টার ঘোষাল না-হলে সেদিন আমি যে কী করতুম বলা যায় না—

মনে আছে দীপঙ্কর তখনই উঠে গিয়ে টেলিফোন করেছিল মিস্টার ঘোষালকে। আর টেলিফোনে দীপঙ্করের গলা শুনেই মিস্টার ঘোষাল একেবারে রেগে ক্ষেপে চিৎকার করে উঠলো। কেন? কেন তুমি আমার ফ্ল্যাটে গেছ? কার পারমিশন নিয়েছ? কে তোমাকে ঢুকতে দিয়েছে? আমার ফ্ল্যাট আর মিসেস ঘোষের ফ্ল্যাট—ও তো একই কথা। তুমি ওখান থেকে এখনি চলে যাও! দিস্ ইজ্ ট্রেস্‌পাস, দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল! মিস্টার ঘোষাল টেলিফোনের রিসিভারটা মুখে দিয়ে যেন যুদ্ধ করতে লাগলো! তুমুল ঝড় বয়ে গেল টেলিফোনের তারে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন দীপঙ্করকে সামনে পেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একেবারে গ্রাস করে ফেলবে মিস্টার ঘোষাল। শেষকালে রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আমি এখুনি যাচ্ছি—ওয়েট্—

দীপঙ্করের মনে আছে সেদিন মিস্টার ঘোষালের চিৎকারে শুধু হেসেছিল সে। শুধু হাসি পেয়েছিল দীপঙ্করের। সত্যি, সে কতদিন আগেকার কথা। কতদিন আগের সেই সব ঘটনা। ঘটনার নিবিড় জালে জড়িয়ে গিয়েছিল তখন দীপঙ্কর। সেই সনাতনবাবু! সেই নয়নরঞ্জিনী দাসী! সেই নির্মল পালিত! সেই লক্ষ্মীদি!

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষ-বাড়ির ভেতরেও তখন অনেক অদল-বদল হয়েছে। মা-মণি তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন একেবারে। ড্রাইভার ছাড়িয়ে দিয়েছেন, গাড়ি বেচে দিয়েছেন। চাকর-বাকরও ছাড়িয়ে দেবার মতলব করেছেন। বউবাজারের বাড়ি, শ্যামবাজারের তিনখানা বাড়িও বেচে দেবার তোড়জোড় করছেন।

নির্মল পালিত বলে—কিন্তু টাকা বাঁচিয়ে আপনার লাভ কী মা-মণি?

মা-মণি বলেন—না বাবা, আমি ছেলের জন্যে কিছু রেখে যাবো না, আমার গাড়ি আমার বাড়ি আমি যা খুশি করবো, তাতে কারো কিছু বলবার নেই—

নির্মল পালিত বলতো—কিন্তু ক্যাশ টাকা নিয়েই বা আপনি কী করবেন?

মা-মণি বলতেন—আমি খরচ করবো—

—কীসে খরচ করবেন?

মা-মণি বলতেন—আমি কলকাতা ছেড়ে কাশীবাস করবো, শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে থাকবো, আমার কীসের দরকার কলকাতায় থাকার, আমার কে আছে? আমি কার ওপর ভরসা করবো—?

—কেন? আপনার টাকা আছে, আপনার ভাবনা কীসের? টাকা থাকলেই তো সব থাকা হলো, টাকা থাকাই তো সব থাকা। আপনি কেন এত ভাবছেন?

আর তাছাড়া, আমি তো আছি—আপনার টাকা-কড়ির ব্যাপারটা, আপনার প্রপার্টির ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি চুপ করে বসে থাকুন না—

—কিন্তু বাবা, আমি চাই না যে বুড়ো বয়েসে ছেলে আমাকে লাথি-ঝাঁটা মারবে! সারা জীবন সব কিছু নিজে চালিয়ে আমি বুড়ো বয়েসে পরের মুখ-নাড়া সইতে পারবো না—

নির্মল পালিত বলতো—সেই জন্যেই তো বলছি আপনি ট্রাস্ট্ করে যান, আমি সেই ট্রাস্টের ভার নিচ্ছি—

—সে ট্রাস্টে কী হবে?

—তাতে আপনি সারা-জীবন, যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন নিজের মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন!

মা-মণি বলতেন—কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কাউকেই যে আমার বিশ্বাস হয় না বাবা, আমার যে ভয় করে—

নির্মল পালিত বলতো—কিন্তু আমাকে? আমাকেও আপনি বিশ্বাস করেন না?

—না বাবা, তোমার কথা আলাদা! কিন্তু সবাই তো আর তোমার মত নয়!

নির্মল পালিত বলতো—তা আমিই তো চালাবো—আমি তো এত শিগ্‌গির মারা যাচ্ছি না—

—তা কী করতে হবে?

নির্মল পালিত বলতো—কিছুই করতে হবে না আপনাকে, এইখানে একটা সই করতে হবে শুধু—

মা-মণি একটু দ্বিধা করতেন। নির্মল পালিত বলতো—এখনি সই করতে হবে না, পরে ধীরে সুস্থে বিচার-বিবেচনা করে সই করলেও হবে—সই করবার আগে একবার সনাতনবাবুকে জিজ্ঞেস করে নেবেন—হাজার হোক ছেলে তো—একমাত্র সন্তান—

—ছেলে?

ছেলের নাম শুনেই মা-মণি জ্বলে উঠতেন। বলতেন—তুমি আমার ছেলের নাম মুখে এনো না বাবা, ছেলে আমার শত্রু—খবরদার বলছি, তার নাম মুখে আনতে পারবে না তুমি—

নির্মল পালিত বোঝাতো। বলতো—এখন মুখে বলছেন ওই কথা, কিন্তু নিজের ছেলে তো হাজার হোক, দু'দিন পরে সব মিটে যাবে আপনাদের—তখন আমাকেই দোষ দেবেন আপনারা—

—তুমি থামো দিকিনি, ও ছেলের মুখদর্শন আমি আর করবো না প্রতিজ্ঞা করেছি—তা জানো তুমি?

নির্মল পালিত তাতেও দমলো না। বললে—না মা-মণি, তাহলেও আমিও তো আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি, এতগুলো টাকার ব্যাপার—

একটা-দুটো নয়, লক্ষ-লক্ষ টাকার ব্যাপার—আমারও তো লোভ হতে পারে। কিছুই বলা যায় না—তাই বলছিলুম একবার সনাতনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার সই করাই ভাল—

মা-মণির আর তর্ সইল না। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আমাকে দাও তো কাগজখানা—দাও—

নির্মল আস্তে আস্তে ডীড্খানা বাড়িয়ে ধরলে। বললে—না মা-মণি, আমার তবু সন্দেহ যাচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ঠকিয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে—

মা-মণি ততক্ষণে কাগজের ওপর সই করে দিয়েছেন। মোটা-মোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছেন—শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসী।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রং লাগানো শুরু হয়ে গেল। নেপোলিয়নের পর পৃথিবীর আর কোনও ডেস্পট এমন করে মানচিত্রের মূল ধরে নাড়া দিতে পারেনি। নরওয়ে থেকে স্পেন পর্যন্ত যত পোর্ট যত সী-কোস্ট আছে সব বেহাত হয়ে গেল একে-একে। ইটালী মেডিটারেনীয়ান-এর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। লিবিয়া আর ইথিওপিয়ার ইটালীয়ানরা ঈজিপ্ট দখল করবার তোড়জোড় করছে। ঈজিপ্ট দখল করে সুয়েজ নেবে। সুয়েজের পর নেবে এডেন। তারপর নেবে টিউনিস্, তারপর ফ্রেঞ্চ মরোক্কো। সেই মুহূর্তেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে ব্রিটিশ। লন্ডন সাদাম্পটন্ লিভারপুল গ্লাস্গোর খাবার-দাবার আনার পথ বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। হল্যান্ড ফ্রান্স নর্থ আফ্রিকা থেকেই আসতো লোহা আর কাগজ, মাখন আর ডিম—সব বন্ধ হয়ে গেল। কী হবে তাহলে? তাহলে কী হবে? চার সপ্তাহে গেছে পোল্যান্ড। তিরিশ মিলিয়ান লোকের দেশ। আর সব জড়িয়ে ষাট মিলিয়ন লোকের দেশ নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস্, বেলজিয়াম আর ফ্রান্স—তা যেতে সময় লেগেছে মোটে আট সপ্তাহ। আর কতদিন টিঁকে থাকবে গ্রেট ব্রিটেন? আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্যার উইনস্টন চার্চিল এসে গ্রেট ব্রিটেনের হাল ধরে বসলেন। আর রক্ষে নেই। আর বিশ্বাস নেই কাউকে। বাঁচতেই হবে। নয়নরঞ্জিনী দাসীকে বাঁচতেই হবে। দরকার হলে নির্মল পালিতকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে হবে। তিনি মোটা-মোটা অক্ষরে নিজের হাতে নিজের নাম সই করে দিলেন। লিখে দিলেন নিজের দাসখৎ।

আর সেই মুহূর্তেই নিজের ঘরের বিছানায় সনাতনবাবু যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে উঠলেন—মা মাগো—

আর সেই মুহূর্তেই মিস্টার ঘোষাল এসে ঢুকলো সতীর ফ্ল্যাটের ভেতরে। রেগে আগুনের মত এসে ফেটে পড়লেন। বললেন—কেন এসেছো তুমি এখানে? হু দি হেল্ টোল্ড ইউ টু কাম্ হিয়ার? হু?

দীপঙ্কর বসে ছিল সোফাটার ওপর। মিস্টার ঘোষাল ঘরে এসে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—আমি নিজেই এসেছি এখানে, সতী আমাকে ডাকেনি—

—কিন্তু কেন? কেন? হোয়াই? আন্ডার হুজ অথরিটি?

দীপঙ্কর বললে—আপনি বসুন, আমি সমস্ত খুলে বলছি—

মিস্টার ঘোষাল বসলো না। বললে—আমি সমস্ত কিছু জানতে চাই না। মিসেস ঘোষের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক আমি সেইটে জানতে চাই। মিসেস ঘোষের লাইফ ইজ ইন্ ডেন্জার, মিসেস ঘোষের প্রেস্টিজ্ ইজ য়্যাট স্টেক, আমি মিসেস ঘোষের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনেছি। মিসেস ঘোষের কোনও দোষ নেই—সি ইজ্ এ চেস্ট্ লেডী। তাকে এ-রকমভাবে অপমান করবার কী রাইট্ আছে তোমাদের? জানো, আমি তোমার নামে ট্রেসপাসের চার্জ আনতে পারি? তোমাকে মিসেস ঘোষের মডেস্টি আউট্রেজের চার্জে প্রসিকিউট্ করতে পারি?

—কিন্তু সে তো মিথ্যে কথা।

মিস্টার ঘোষাল গর্জে উঠলো। বললে—কে বললে মিথ্যে কথা? জানো, টাকা খরচ করলে মিথ্যেকে সত্যি করা যায় মডার্ন ওয়ার্ল্ডে? আমার টাকা আছে, আমি টাকার জোরে তোমাকে মিথ্যেবাদী লায়ার প্রমাণ করতে পারি? সে-রকম য়্যাড্ভোকেট্ আছে কলকাতা শহরে—টাকার জোরে সাক্ষী ল'য়্যার, প্রসিকিউশন সব পাওয়া যায়—তা জানো? আই ক্যান বাই জাস্টিস—বিচার কেনা যায় তা জানো তুমি?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

মিস্টার ঘোষাল বললে—যদি ভাল চাও তো চলে যাও—অ্যান্ড ডু নেভার কাম হিয়ার। আর কখনও এসো না।

দীপঙ্কর তবু নড়লো না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

—ডু ইউ হিয়ার মী অর নট্? বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—আর এক মিনিট তুমি এখানে থাকতে পাবে না—

দীপঙ্কর তবু নড়লো না।

—তুমি জানো আই পজেস্ এ রিভলবার? আমার রিভলবার আছে তা তুমি জানো? বিফোর আই ইউজ দ্যাট, আই ওয়ান্ট ইউ টু লীভ দি রুম। আদারওয়াইজ আমি পুলিস ডাকবো! আমি তোমাকে য়্যারেস্ট করাবো! আমি তোমার চাকরি খতম করতে পারি তা জানো?

মিস্টার ঘোষাল যেন বাঘের মত ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করতে লাগলো। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো। যেন দীপঙ্করকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। আঁচড়ে কামড়ে নিঃশেষ করে ফেলবে।

তবু দীপঙ্কর ধীর স্থির হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

ঘোষাল চিৎকার করে বললে—এখনও যাবে না? তব্ যাবে না তুমি?

এতক্ষণে দীপঙ্করের ম্খে কথা ফুটলো। গম্ভীর গলায় বললে—নো, আই ওণ্ট—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বজ্রপাত হলো ঘরের ভেতর। মিস্টার ঘোষালের ম্খের ওপর এমন করে কথা বলার সাহস রেলের অফিসের ইতিহাসে কখনও হয়নি। মিস্টার ঘোষাল যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে আত্মসম্বিত ফিরে পেলে। তারপর বললে—অল্ রাইট্—

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর তারপর এক ম্হ্র্তের মধ্যেই আবার ফিরলো। হাতে তখন তার খোলা রিভলবার। দীপঙ্করের দিকে ম্খ ঠিক করে চিৎকার করে উঠলো—গেট্ আউট্—গেট্ আউট্—

দীপঙ্কর সেই দিকে শান্ত দ্ষ্টিতে চেয়ে উত্তর দিলে—নো, আই ওণ্ট্—

আর সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটতো বলা যায় না।

—দীপ্—

হঠাৎ সতী আর থাকতে পারলো না। একেবারে দীপঙ্করের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হঠাৎ। বললে—তুমি করছো কী দীপ্—তুমি করছো কী—তুমি যাও এখান থেকে—যাও—

দীপঙ্কর সতীর ম্খের দিকে চাইলে একবার। তারপর বললে—না—

সতী দীপঙ্করের হাত ধরে টানতে লাগলো। দীপঙ্করকে টেনে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে—পাগলামি কোর না দীপ্, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তুমি যাও না, চলে যাও—

দীপঙ্কর তব্ বলতে লাগলো—না, আমি যাবো না—

ততক্ষণে দীপঙ্করকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এসেছে সতী। ঘরের বাইরে। বারান্দায়।

—তুমি চলে যাও এখান থেকে। কী পাগলামি করছো, বলো তো!

দীপঙ্কর বললে—পাগলামি আমি করছি না তুমি করছো?

—বেশ, তোমার কথাই সই, আমিই পাগলামি করছি, কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি তুমি চলে যাও দীপ্, এখন আর কথা বাড়িও না, চলে যাও—

দীপঙ্কর সতীর ম্খের দিকে গম্ভীর দ্ষ্টিতে চেয়ে দেখলে। বললে—কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে চলে যাই তাই বলো?

সতী তখনও ঠেলছে দীপঙ্করকে। বললে—তুমি আর কথা বাড়িও না দীপ্, তুমি চলে যাও—

দীপঙ্কর বললে—যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মিস্টার ঘোষাল [illegible] আমি ওর রিভলবার দেখে ভয় পেয়েছি—

সতী বললে—ওসব কথা থাক্, তুমি যাও, এখন চলে যাও—দেখছো না ও একটা জানোয়ার, একটা পশ্, ও—ও সব করতে পারে—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু তুমি? ওই জানোয়ারের কাছেই তো থাকবে তুমি!

সতী বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও দীপ্। এই-ই আমার কপাল—আমার কথা তুমি ভেবো না। আমার যা-হয় হোক, কিন্তু তুমি চলে যাও—চলে যাও তুমি—আর কখনও এসো না—

বলে দীপঙ্করকে ঠেলে একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ দীপঙ্করকে রেখে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বারান্দার দিকে চেয়ে হতব্দ্ধি হয়ে গেল।

কোথাও যেন কোনও শান্তি নেই। কোথাও যেন কোনও সান্ত্বনাও নেই। শ্ধ্ অক্ষম অকর্মণ্য দেহটাকে কোনও রকমে বয়ে বেড়ানো। এমন করে এত আগ্রহ করে কার ভালো সে চেয়েছিল? কার মঙ্গল সে কামনা করেছিল? কার ভালোর জন্যে সে দিনরাত নিজের বিশ্রাম, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে? সে কি সতী? সে কি সেই ঈশ্বর গাঙ্গ্লী লেনের সেই প্রথম দেখা মেয়েটি?

রাস্তায় ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার। কোথায় কত দ্রে য্দ্ধ বেধেছে টাকার, য্দ্ধ বেধেছে প্রতিষ্ঠার, য্দ্ধ বেধেছে অস্তিত্বের, য্দ্ধ বেধেছে প্রতিযোগিতার, দম্ভের আর ক্ষমতার। এখানে এই ভারতবর্ষের কলকাতা শহরেও তার ছোঁয়াচ এসে লেগেছে। ট্রামে-বাসে তারই নির্লজ্জ প্রমাণ। কলকাতা থেকে পালাতে হবে। এখানে জাপানীরা বোমা ফেলবে। শহর ভাঙবে, গ্ঁড়ো হয়ে যাবে। অস্বাস্থ্যকর গ্জবে ভরে গেছে কলকাতার বাতাস। কোথাও শান্তি নেই। কোথাও সান্ত্বনাও নেই। সমস্ত প্থিবীটাই যেন দীপঙ্করের অন্তরাত্মার মত বিক্ষ্ব্ধ হয়ে উঠেছে। বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়লো।

সমস্ত প্থিবীর মধ্যে লক্ষ্মীদিই যেন কেবল এ-অবস্থায় তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। সত্যিই তো, লক্ষ্মীদি ছাড়া আর কে আছে তার? গাঙ্গ্লীবাব্ নেই, মিস্ মাইকেল নেই, মা ছিল, তাও নেই। সতীর চিন্তা ছিল—তাও ম্ছে গেল। এখন আছে শ্ধ্ লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি হয়ত এখন এই ম্হ্র্তে খ্ব ব্যস্ত। এখন সেই তারা সব এসে হয়ত জড়ো হয়েছে লক্ষ্মীদির ঘরে। সেই গভর্নমেণ্ট অফিসার স্ধাংশ্, সেই চৌধ্রী। সকলের নাম জানে না দীপঙ্কর। হয়ত সেদিনকার মত ফাউল-রান্না হচ্ছে, মাংসের গন্ধে ভরে গেছে বাড়ি। আর সেই দাতারবাব্ হয়ত পাশের ঘরে কোট-প্যাণ্ট পরে সেজে-গ্জে প্তুলের মত বসে আছে।

তা হোক, তব্ আজকের সতীর এই ঘটনাটা লক্ষ্মীদিকে বলা ভাল।

লক্ষ্মীদিকে খবরটা দেওয়া উচিত।

সেই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং। সেই ভূষণ গেটম্যান। লাল সিগন্যালটা জ্বালিয়ে গেটটা বন্ধ করে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত সেভেনটিন আপ আসবে। এই তো সেভেনটিন আপ আসবার টাইম হয়ে গেছে।

কিন্তু লক্ষ্মীদির বাড়ির সামনে যাবার আগেই দূর থেকে জায়গাটা দেখে দীপঙ্কর থমকে দাঁড়াল। এত লোক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী হলো ওখানে? কী হলো? কোনও বিপদ হলো নাকি? কোনও দুর্ঘটনা? যাবে কি যাবে না দ্বিধা হতে লাগলো। যদি দাতারবাবুর কোনও দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। যদি লক্ষ্মীদির কোনও বিপদ হয়ে থাকে। যদি......

—দীপু।

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল লক্ষ্মীদি! দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদিকে দেখে! যেন আর চেনা যায় না। আবার যেন সেই আগেকার মত চেহারা হয়ে গেছে। সেই কলেজে পড়বার সময়কার মত। শাড়িতে গয়নায় ঝলমল করছে লক্ষ্মীদি। পান খেয়েছে জর্দা দিয়ে। হাতের কব্জিতে ঘড়ি। খোঁপায় ফুল, ঠোঁটে রঙ।

—আর একটু পরে এলেই দেখা হতো না!

তারপর পাশের একজনকে ডেকে বললে—এই দেখ, কে এসেছে দেখ—

—আরে দীপুবাবু!

একেবারে হাত জড়িয়ে ধরেছে দাতারবাবু। দীপঙ্করও দাতারবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই সেই দাতারবাবু। এমন চেহারা হয়ে গেছে। কোট, প্যান্ট, টাই—সিগারেট খাচ্ছে দাতারবাবু সেই আগেকার মত।

দাতারবাবু বললেন—কী হয়েছে তোমার দীপুবাবু?

লক্ষ্মীদিও একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দীপঙ্করের দুটো কাঁধে হাত রেখে বললে—কীরে, কী হয়েছে তোর?

অন্য যারা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে তারাও একদৃষ্টে দেখতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে। দীপঙ্করের যেন কেমন অস্বস্তি লাগলো।

সুধাংশু এগিয়ে এল দীপঙ্করের দিকে। হাতের সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—নিন মিস্টার সেন—

লক্ষ্মীদি বললে—আরে, তুমি কাকে কী দিচ্ছ, দীপঙ্কর স্মোক করে না—

সবাই অবাকই হয়ে গেছে। সিগারেট খায় না! এমন ভদ্রলোকও আছে নাকি এ-যুগে।

সুধাংশু বললে—আমিও আগে খেতুম না মিসেস দাতার—কিন্তু যেদিন থেকে ড্রিঙ্ক করছি, সেইদিন থেকেই স্মোক করতে আরম্ভ করলুম—

দাতারবাবু বললেন—দীপুবাবু বরাবর গুড় বয়—

লক্ষ্মীদি বললে—তুমি তো জানো না, দীপু এখন রেলওয়ের মস্ত অফিসার—

সুধাংশু বললে—আপনি মিস্টার ঘোষালকে চেনেন মিস্টার সেন? আমার ফ্রেন্ড—আমরা কন্টিনেন্টে একসঙ্গে ছিলুম—শেষে—

দীপঙ্কর বললে—আমি এখন আসি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদির শাড়িতে দামী সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। বললে—তুই যাবি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, আর একদিন আসবো—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু একটু সকাল-সকাল আসিস, আজকাল সন্ধ্যেবেলা রোজ বাড়িতে থাকি না। এই দেখ, এই গাড়িটা কিনলুম—

গাড়ি! দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়লো।

লক্ষ্মীদি বললে—পনেরো হাজার টাকা পড়লো। কিনলে ভালো জিনিসই কেনা উচিত, কী বল? দেখ্ না নাইনটিন ফর্টি মডেল, সুধাংশুর এই মডেলটাই পছন্দ হলো—

সুধাংশু বললে—কী বলেন মিস্টার সেন, মিসেস দাতার বলছিলেন মেরুন কালারটাই ভাল, আমি বললাম বটল-গ্রীন—গ্রীনটাই মিসেস দাতারকে মানায় না? আপনি কী বলেন?

দীপঙ্কর একটু হাসলো। তারপর বললে—আমি তাহলে আসি লক্ষ্মীদি—

—তুই যাবি?

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের সঙ্গে একটু এগিয়ে এল। দল ছাড়িয়ে একটু দূরে। বললে—কিছু কন্ট্রাক্ট পেয়েছি, মিলিটারি কন্ট্রাক্ট জানিস—সুধাংশু এখন সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর হয়েছে। যত কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে, সব আমাকে দিচ্ছে, টাকা আসছে তাই গাড়িটা কিনলুম, আর দেখলি তো দাতারবাবুও কেমন ভালো হয়ে গেছে—

—আমি তাহলে আসি লক্ষ্মীদি—

—কিন্তু আসিস তুই আবার। আজকে তোর সঙ্গে আর কথাই হলো না। নাইট-শোতে সিনেমায় যাচ্ছি এখন সবাই মিলে, টিকিট কাটা হয়ে গেছে তা না-হলে তোকেও নিয়ে যেতুম।

দীপঙ্কর বললে—তাতে কী হয়েছে, আমি যাই—

—মাসীমা কেমন আছেন?

দীপঙ্কর বললে—মা নেই—

—সে কীরে? কবে? কী হয়েছিল?

অনেক কথা! অনেক কথা জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীদি। অনেক সহানুভূতি অনেক সান্ত্বনা, অনেক বাঁধা বুলি। দীপঙ্কর সব কথার জবাব দিলে সংক্ষেপে। বললে—আমি যাই তাহলে লক্ষ্মীদি—

—হ্যাঁ, ভালো কথা, সতীর খবর কী?

দীপঙ্কর তখন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। পেছন থেকেও সুধাংশুর দল তখন তাগাদা দিচ্ছে। দীপঙ্কর যেন সে-কথার উত্তর না দিতে পেরে বেঁচে গেল।

সিনেমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে ওদের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিলে।

খানিক পরেই লক্ষ্মীদির নতুন-কেনা নাইনটিন ফর্টি মডেলের গাড়িখানা দীপঙ্করের পাশ কাটিয়ে সোঁ-সোঁ করে চলে গেল। ভালোই হলো। সতীর কথা শোনবার মত সময় লক্ষ্মীদির তো এখন নেই। আর শুনলেও তো কোনও প্রতিকার করতে পারবে না।

অনেক রাত্রে বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে।

সাধারণত কাশী এসেই দরজা খুলে দেয়। বেশি রাত হলেও কাশীই খোলে। ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে উঠে দরজা খুলে দেয়।

আজ কিন্তু দীপঙ্কর লজ্জায় পড়ে গেল।

সন্তোষ-কাকার মেয়ে নিজে দরজা খুলে দিয়ে পাশে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না। আস্তে আস্তে ওপরে গেল। ওপরে গিয়ে নিজের জামা-কাপড় বদলালে। তারপর নীচের কলতলায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। সবাই ঘুমোচ্ছে। অন্ধকার সারা বাড়িটা। কাশীটা একতলার বারান্দায় পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সন্তোষ-কাকারও নাক-ডাকার শব্দ আসছে একতলার ঘর থেকে। দীপঙ্কর কি নীচের যাবে? নীচেয় গিয়ে খাবার দিতে বলবে? সমস্ত বাড়িটাতে কেউ জেগে নেই। হয়ত কাশীকেই ডাকবে সন্তোষ-কাকার মেয়ে। কাশীকেই ডেকে তুলবে। সাধারণত কাশীই খেতে ডাকতে আসে। দীপঙ্কর খাবার জন্যে তৈরি হয়ে চুপ করে টেবিলের সামনে বসে রইল।

—আপনার খাবার কি এখানে এনে দেব?

বড় মিষ্টি গলা। দীপঙ্কর পেছন ফিরে দেখলে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তোষ-কাকার মেয়ে তাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলছে।

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—না, না, আমি নীচেই খাবো—ওপরে আনবার দরকার নেই—

তারপর তাড়াতাড়ি নীচেয় এসে দেখলে তখনও খাবার দেওয়া হয়নি। দীপঙ্কর সেখানে দাঁড়িয়েই কী করবে ভাবতে লাগলো। সন্তোষ-কাকার মেয়ে ততক্ষণে তাড়াতাড়ি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়েছে। একটা আসন পেতে দিয়েছে। তারপর একগ্লাস জলও দিলে। দীপঙ্কর লক্ষ্য করলে সন্তোষ-কাকার মেয়ে যেন থর থর করে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যেন আর সামলাতে পারছে না নিজেকে।

তারপর ভাতের থালাটা এনে রাখতে গিয়েই কী যে হলো। হাত থেকে থালাটা পড়ে গিয়ে ঝন্ ঝন্ করে একটা শব্দ হলো। আর থালার অর্ধেক ভাত

ছড়িয়ে ছিটকে ছত্রখান হয়ে গেল চারিদিকে।

এক মুহূর্তে যেন বিপর্যয় ঘটে গেল হঠাৎ।

আর সন্তোষ-কাকার মেয়ে সেই দৃশ্য দেখে একেবারে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে।

দীপঙ্কর দেখলে—সন্তোষ-কাকার মেয়ের চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আর সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে কাশীর। ঘুম ভেঙে গেছে সন্তোষ-কাকার। সন্তোষ-কাকা ঘর থেকে চিৎকার করে উঠেছে—কে রে? কে রে? কী পড়লো ওখানে?

কাশীও উঠে এসেছে। সন্তোষ-কাকাও কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে একেবারে সামনে এসে হাজির। এসে একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে, আর একবার ক্ষিরির মুখের দিকে চাইলে।

—কী হলো? ভাত পড়লো কী করে?

তারপর দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন সন্দেহ করলে। বললে—কী করেছ, বলো? তুমি মেরেছ ক্ষিরিকে? তুমি মারলে আমার মেয়েকে?

ক্ষিরি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবার হাতটা ধরলে। বললে—না বাবা, না, আমার হাত থেকে পড়ে গেছে থালাটা—

—কিন্তু পড়লো কেন?

—এমনি পড়ে গেছে বাবা, আমি বুঝতে পারিনি।

সন্তোষ-কাকা দীপঙ্করের মুখের দিকে চাইলে আবার। তারপর বললে—এখন কী খাবে?

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওপরের সিঁড়ির দিকে উঠে গেল। বললে—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার খিদে নেই—

—ব্যস্ত হচ্ছি কেন? বেশ তো কথা, আমার মেয়ে রান্না-বান্না করলে, খাটুসে খুটলে, আর তুমি খেতে পেলে না, আমি ব্যস্ত হবো না? আমি ভাববো না তো কে ভাববে, শুনি? আমার মেয়ে যে দিনরাত ঝি-এর মত খাটছে, রাঁধুনির মত উনুনের ধোঁয়ায় দেহ কালি করে ফেলছে—তার বেলায়? তার বেলায় তো তুমি ভাবছো না? এই যে রান্না-বান্না করে এত রাত ওবধি ভাত আগলে বসে থাকে—তার বেলায় তো আমি ছাড়া ভাববার আর কেউ নেই?

—আঃ—

ক্ষীরোদা বাবাকে জোর করে থামিয়ে দেয়। সন্তোষ-কাকা তখন গজ্ গজ্ করতে করতে গিয়ে আবার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুতে শুতেই আবার নাক ডাকতে শুরু করে সন্তোষ-কাকার। কাশীটাও ঢুলছিল। সে-ও খানিক পরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। ক্ষীরোদা তখনও কী করবে বুঝতে পারলে না। একটা বেড়াল পাঁচিল টপ্‌কে এসে দাঁড়াল

উঠোনের মধ্যে। তারপর ক্ষীরোদাকে দেখে যেন একটু সঙ্কোচ করতে লাগলো। তারপর আরো একটু এগিয়ে এলো। তারপর আরো। ক্ষীরোদা চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। হঠাৎ নজর পড়লো বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটা আরো এগিয়ে এল। একেবারে ভাতের কাছাকাছি। আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগলো। ক্ষীরোদা তখনও একদৃষ্টে দেখছে। বেড়ালটা ভাতগুলো খাচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে ক্ষীরোদার মতই ভীতু বেড়ালটা।

নিজের ঘরে গিয়েও দীপঙ্করের মনে হলো সন্তোষ-কাকার মেয়েও বোধহয় তখন না-খেয়ে আছে। হয়ত সে-ও খাবে না আজ। দীপঙ্করের খাওয়া হলো না বলে, সে-ও হয়ত সারারাত না খেয়ে কাটাবে। কী করবে বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর। শুতে গিয়েও শোওয়া হলো না। আবার উঠলো। আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সন্তোষ-কাকার মেয়ে হয়ত শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। কিন্তু নিচের বারান্দায় তখনও আলো জ্বলছে। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দীপঙ্কর দেখলে—আশ্চর্য কাণ্ড। সন্তোষ-কাকার মেয়ে তখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—আর একটা বেড়াল আরাম করে তার সেই পড়ে থাকা ভাতগুলো খাচ্ছে এক মনে নির্ভয়ে। কেউ বাধা দিচ্ছে না, কেউ আপত্তি করছে না। নিস্পন্দ নিথর পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্তোষ-কাকার মেয়ে।

দীপঙ্করের পায়ের শব্দ পেতেই সন্তোষ-কাকার মেয়ে চমকে উঠে পেছন ফিরেছে।

হয়ত দেখতে পেয়েছে দীপঙ্করকে। কিংবা হয়ত দেখতে পায়নি। কিন্তু দীপঙ্কর তার আগেই গিয়ে নিজের ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

পৃথিবীর অন্য জায়গায় যে-নিয়ম, প্যালেস-কোর্টের সে-নিয়ম নয়। প্যালেস-কোর্ট পৃথিবী থেকে আলাদা। দিনের বেলাও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, রাত্রেও তাই। এখানে বাস করলে কোথা দিয়ে সকাল হয়, কোথা দিয়ে রাত হয় টের পাবার দরকার নেই। যারা থাকে এখানে তারা এ-পৃথিবীরই মানুষ নয়। তাদের পৃথিবী খবরের কাগজের পৃথিবী, টেলিফোনের পৃথিবী। এ পৃথিবীটা যে মাটির, এ-পৃথিবীতেও যে যুদ্ধ হয়, মহামারী হয়, এ-খবর তারা জোর করেই ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। এ পুরোপুরি বয় বাবুর্চি খানসামা আর চাপরাসীর পৃথিবী। কোথায় কে কত ভোরে উঠে হগ্ মার্কেট থেকে ফাউল কিনে এনেছে, ভেজিটেবেল কিনে এনেছে, কখন গ্যাসের উনুন ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছে তার খবর রাখবার প্রয়োজন এখানে কম। এখানে হুকুম আর হুকুম-তামিলের রাজ্য। কলিং-বেল্ টিপ্‌লেই বয় আসে, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস ঘরে এসে হাজির হয়। মুখের কথা খসানোটাই এখানে একমাত্র শারীরিক মেহনত্।

ভোরবেলা থেকে প্যালেস-কোর্টের সামনে সার সার গাড়ি ধোয়া হয়, মোছা

হয়। ধুলো ঝাড়া হয়। কার গাড়ি, ভেতরে কারা থাকে তা কেউ জানতে পারে না। যে-যার ঘরের ভেতরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, যে-যার ঘরের ভেতরে পৃথিবীর সম্রাট। চালের দর যখন বাজারে চড়ে, কাপড়ের দর যখন দোকানে ওঠে, যখন বাজারে চিনি পাওয়া যায় না, নুন পাওয়া যায় না, সিগারেট, চা, বিস্কুটের জন্যে যখন কলকাতা শহরে হাহাকার পড়ে যায়, তখন প্যালেস-কোর্টের ভেতরে সে খবর পৌঁছোয় না। প্যালেস-কোর্টের পৃথিবী তখন কলকাতা শহরের মধ্যে অনড় অচল স্থিতধী হয়ে মহাকালের অক্ষয় মহিমা ঘোষণা করে। প্যালেস-কোর্ট ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনও নয় যে কেউ কাউকে চিনবে। প্যালেস-কোর্ট ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট নয় যে কেউ কাউকে ঈর্ষা করবে। প্যালেস-কোর্ট গড়িয়াহাটাও নয় যে কেউ কাউকে আকর্ষণ করবে, আবার প্যালেস-কোর্ট স্টেশন রোডও নয় যে কেউ কাউকে ভালবাসবে, প্যালেস-কোর্ট প্যালেস-কোর্টই। কলকাতা শহরে প্যালেস-কোর্টই প্যালেস-কোর্টের তুলনা।

প্যালেস-কোর্টের হদিস বলা শক্ত। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে কোন্ রাস্তায় ঢুকে কোন্ রাস্তার মোড়ে প্যালেস-কোর্ট তা প্যালেস-কোর্টের বাসিন্দারাই জানে। আর জানে তারা যারা প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রমোশন পাবার জন্যে উন্মুখ।

ছোট বেঁটে মত একটা লোক কিন্তু তর তর করে চেনা-লোকের মত ঢুকে পড়লো প্যালেস-কোর্টের ভেতরে। তারপর যথাস্থানে গিয়ে বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এল।

—কাকে চাই?

—মিস্টার ঘোষালকে।

ড্রেসিং গাউন-পরা মিস্টার ঘোষাল বেরিয়ে এল। মুখে চুরোট।

—হুজুর, আমি আসছি মিস্টার পালিতের কাছ থেকে, মিস্টার এন পালিত বার-য়্যাট-ল। আপনার কি একটু সময় হবে? বড় জরুরী দরকার ছিল তাঁর।

—হবে, কিন্তু সকাল ন'টার আগে, নট আফটার দ্যাট—

তা, তা-ই সই। পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টার সময় নির্মল পালিতের গাড়ি এসে ঢুকলো প্যালেস-কোর্টের উঠোনে। এক লাফে নামলো গাড়ি থেকে নির্মল পালিত। তারপর তর তর করে ভেতরে ঢুকে গেল সিগারেট ধরিয়ে। মিস্টার ঘোষাল খবর পেয়ে বেরিয়ে এল ড্রেসিং গাউন পরে। বললে—আমি কি মিস্টার পালিত বার-য়্যাট-ল'র সঙ্গে কথা বলছি?

—ইয়েস মিস্টার ঘোষাল!

—বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশী হলুম! বলুন, হোয়াট ক্যান্ আই ডু ফর ইউ?

নির্মল পালিত তখন বসে পড়েছে। একবার চারদিকে চাইলে ভাল করে।

হৃদয়ের ব্যাপারটা রাখলে একধারে।

তারপর বললে—প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার ঘোষাল, আমি এসেছি প্রফেশনাল কল্-এ। আমি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মিসেস ঘোষের অ্যাপয়েন্টেড লইয়ার—আমি তাঁরই ব্রীফ নিয়েছি—

—আমি আপনাকে কী হেলপ্ করতে পারি বলুন? আই অ্যাম রেডি—

—বলছি মিস্টার ঘোষাল। আপনার সাহায্যের জন্যেই তো এসেছি, অবশ্য আপনি ভেরি বিজি ম্যান আমি জানি, আপনি রেলওয়ের এক রেস্‌পনসিবল গেজেটেড অফিসার। আপনাকে বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না আমি জানি। তবু বলছি, আপনার সাহায্য পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাবো—

—বলুন, কী সাহায্য দরকার?

নির্মল পালিত আর ভূমিকা করলে না। বললে—মিসেস ঘোষ এখানে আপনার কেয়ারে আছেন? মিসেস সতী ঘোষ, ওয়াইফ অব মিস্টার সনাতন ঘোষ, ওন্‌লি সন অব মিসেস নয়নরঞ্জিনী দাসী?

মিস্টার ঘোষাল এবার চুরোটে লম্বা একটা টান দিলে। তারপর বললে—কিন্তু একটা ভুল করছেন মিস্টার পালিত—

—কী ভুল বলুন?

—মিসেস সতী ঘোষ এখানে আছেন বটে, কিন্তু আমার কেয়ারে নয়, তিনি আছেন পাশের ফ্ল্যাটে, তিনি নিজেই ফ্ল্যাটের টেনেন্ট, আমার সঙ্গে তাঁর কোনও কনসার্ন নেই—

নির্মল পালিত বললে—ওয়েল ওয়েল ভেরি গুড, আমার খুব উপকার হলো মিস্টার ঘোষাল, আমার ধারণা ছিল তিনি আপনার কেয়ারে আছেন—আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙলো—

বলে নির্মল পালিত আবার চুরোটে টান দিলে।

—আর একটা কথা মিস্টার ঘোষাল, মিসেস ঘোষ যে এখানে আছেন, তার জন্যে আপনি তাহলে মোটেই দায়ী নন?

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—না না, আমি দায়ী থাকবো কেন?

—না তাই জিজ্ঞেস করছি। আর একটা কথা। আপনি তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসেননি?

—না না, আমি কেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে যাবো? তিনি আমার কে?

—তাঁর সঙ্গে আগে আপনার কোনও পরিচয়ও ছিল না?

—না না, তা কী করে থাকবে?

নির্মল পালিত বললে—দেখেছেন, আমি সব ভুল ইনফর্মেশন পেয়েছিলুম। ভাগ্যিস আপনি সব সত্যি কথা বললেন—আদারওয়াইজ মিসেস ঘোষ তো বড় মুশকিলে পড়তেন, আর অকারণে আপনাকেও লিটিগেশনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হতো।

—কেন? আমি জড়িয়ে পড়তুম কেন?

নির্মল পালিত বললে—তা বুঝি জানেন না, আমাকে যে কেস্ করতে হবে আপনার নামে, আমার পয়েন্ট অব আর্গুমেন্ট হচ্ছে আপনিই মিসেস ঘোষকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছেন—আর তাঁর সঙ্গে আছে দশ হাজার টাকার অর্নামেন্ট! আপনি না বললে তো খুব মুশকিলে পড়েছিলাম।

বলে উঠলো নির্মল পালিত। বললে—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার ঘোষাল, আপনার ভ্যালুয়েবল সময় নষ্ট করলাম বলে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তাহলে মামলা আর করছেন না?

নির্মল পালিত বললে—করবো, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে নয়, মামলা হবে মিসেস ঘোষের বিরুদ্ধে—

—কেন? কোন্ চার্জে?

নির্মল পালিত বললে—শাশুড়ীর দশ হাজার টাকার গয়না নিয়ে পালিয়ে আসার চার্জে! মিসেস ঘোষ স্বামীর অমতে শাশুড়ীর অমতে তো এখানে এসে উঠেছেন—

—কিন্তু সে আপনি প্রমাণ করবেন কী করে? হাউ?

—প্রমাণ আছে আমার হাতে মিস্টার ঘোষাল। প্রমাণ না থাকলে কি আর বলি! মিসেস ঘোষের হাসব্যাণ্ডই সাক্ষী দেবেন মিসেস ঘোষের বিরুদ্ধে—আর...

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু শাশুড়ীর অত্যাচারে কোনও ম্যারেড লেডীর শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার রাইট নেই বলতে চান?

—আছে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু গয়না চুরি করে নিয়ে আসার রাইট তো নেই তা বলে। কিছুই চুরি করবার রাইট নেই!

—কিন্তু মিসেস ঘোষ যে গয়না চুরি করেছেন, একথা আপনাকে কে বললে?

নির্মল পালিত বললে—বলেছে আমার ক্লায়েণ্ট! আর তাছাড়া আমি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি তিনি এখানে আড়াই শো টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছেন—এ টাকা নইলে কোত্থেকে পাচ্ছেন তিনি? আপনি তো আর দিচ্ছেন না! আপনার কেয়ারে তো তিনি নেই! তাঁর তো অন্য কোনও সোর্স-অব-ইনকাম নেই!

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, থাকলেও আমি জানি না—

—তিনি তো চাকরি করেন না কোথাও?

মিস্টার ঘোষাল বললে—বোধহয় না—

—চাকরি করলে অবশ্য আমার প্রীড করা শক্ত হতো! চাকরি করলে অবশ্য বলতে পারতেন যে তিনি অফিসের মাইনে থেকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছেন। আর তা না হলে ধরে নিতে হয় যে হয় তিনি গয়না বেচে বেচে চালাচ্ছেন, আর নয়তো

আপনি তাঁর হয়ে টাকাটা দিচ্ছেন মাসে মাসে—অর্থাৎ আপনার কেয়ারে তিনি আছেন—অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধেও এডাল্টারির চার্জ আসতে পারে!

নির্মল পালিত একটু থেমে বললে—আচ্ছা, আমি তাহলে আসি মিস্টার ঘোষাল, বিরক্ত করলুম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি—

বলে নির্মল পালিত চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল বাধা দিলে। বললে—আচ্ছা মিস্টার পালিত—এসব কেসে কী হতে পারে? পানিশমেন্ট কী হতে পারে?

নির্মল পালিত বললে—তা আমি কী করে বলবো মিস্টার ঘোষাল, সে ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটই বলতে পারে—

বলে নির্মল পালিত চলে যাবার উদ্যোগ করতেই মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—একটা কথা মিস্টার পালিত—

—বলুন।

—এ সম্বন্ধে আমরা একটা টার্মস অব সেটেলমেন্টএ আসতে পারি না?

নির্মল পালিত একটু থমকে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—টার্মস অব সেটেলমেন্ট! মানে আপনি টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিতে চান? কিন্তু মিসেস ঘোষের শাশুড়ী তাতে রাজী না হতে পারেন, মিসেস ঘোষের হাসব্যান্ডও রাজী না হতে পারেন। তবে আপনি যখন বলছেন, তখন আমি তাঁদের বলে দেখতে পারি! কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না মিস্টার ঘোষাল, তাঁদের তো টাকার অভাব নেই—তাঁরা মিলিওনেয়ার লোক—

—কিন্তু আপনি?

—আমি?

নির্মল পালিত যেন চমকে উঠলো। বললে—আমাকে আপনি মিথ্যে ওবলিগেশনে ফেলছেন মিস্টার ঘোষাল। আমি এই কেসের জন্যে অলরেডি পেপার্স তৈরি করে ফেলেছি—এতে অনেক টাকা ইনভলবড্ হয়ে গেছে—

—কত টাকা?

নির্মল পালিত বললে—তা অন্তত ফাইভ থাউস্যান্ড—পাঁচ হাজার টাকার মতন জড়িয়ে পড়েছে অলরেডি!

—ধরুন যদি টাকাটা আমিই দিয়ে দিই আপনাকে?

নির্মল পালিত যেন চিন্তিত হবার ভান করলে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মিস্টার পালিত! আপনি একটু বসুন না! আসলে তো ওদের পেছনে বিধবা মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ নেই—আপনি যদি কেসটা একটু ম্যানিপুলেট করেন, তাহলেই তো সব চুকে যায়। আর ফাইভ থাউজ্যান্ড্ যদি কম মনে করেন তো সিক্স থাউজ্যান্ড্ দিচ্ছি—আমি চাই না মিসেস ঘোষকে নিয়ে একটা কিছু পাবলিক স্ক্যান্ডাল হয়—

—সেটা কি আমিই চাই?

—না, সেই জন্যেই তো বলছি, মিসেস ঘোষ একজন রেসপেক্টেবল লেডী, তাঁকে নিয়ে স্ক্যান্ডাল হলে পাবলিকই হাসবে। আর সেই জন্যেই তো আমি তাঁকে এখানে শেল্টার দিয়েছি। তাঁর অবস্থা যদি আপনি দ্যাখেন তো আপনার দয়া হবে, পিটি হবে তাঁর ওপর—! তাঁকে ডাকবো এখানে?

নির্মল পালিত বললে—না ডাকবার আর কী দরকার! বিশেষ করে একজন রেসপেক্টেবল লেডীকে আমি কোর্টে টানা-হ্যাঁচড়া করতে চাই না। আর সেই জন্যেই তো কোর্টে কেস ফাইল করবার আগে আপনার কাছে এলাম—

মিস্টার ঘোষাল তারপর তাড়াতাড়ি ভেতরে উঠে গেল। তারপর একটু পরেই আবার বেরিয়ে এসে মিস্টার পালিতের হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিলে। বললে—আমি ক্যাশ্‌ই দিয়ে দিলাম—

ঘটনাটা ঘটলো অত্যন্ত গোপনে। প্যালেস-কোর্টের বাইরের পৃথিবীর লোক কেউ কিছু জানতে পারলে না। মিস্টার ঘোষালের মত লোকও মুখে হাসি এনে ঘটনাকে সহজ করবার চেষ্টা করলে। মিস্টার পালিতও টাকাগুলো গুনে গুনে ব্যাগে পুরে ফেললে। তারপর যাবার আগে বললে—কিন্তু একটা উপকার আমার করতে হবে মিস্টার ঘোষাল!

—বলুন, কী উপকার করতে পারি?

—আপনি মিসেস ঘোষকে কোনও চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন। এনি কাইন্ড অব জব! মানে যাতে নিজের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অব ইনকাম থাকে। অন্তত আমি বলতে পারি যে মিসেস ঘোষ নিজের রোজগারে নিজের লাইভলিহুড চালাচ্ছে—নইলে সমস্ত দোষটা আপনার ঘাড়ে পড়বে! তাতে আমারও উপকার, আপনারও উপকার—

—একটু চা খেয়ে যাবেন না?

কিন্তু কাজের পর নির্মল পালিত আর বসবার লোক নয়। উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল বললে—দাঁড়ান, মিসেস ঘোষকে একবার ডাকি, বড় মুষড়ে পড়েছেন, আপনি একটু হোপ দিয়ে যান—

টাকাটা তখন ভেতরে পুরে ব্যাগের মুখ শক্ত করে আঁটা হয়ে গেছে। বললে —তা ডাকুন—

নির্মল পালিত চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ! একবার এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। পয়সাওয়ালা লোক মিস্টার ঘোষাল। সিক্স থাউজ্যান্ড ক্যাশ বার করে দিয়েছে এক কথায়! টেন থাউজ্যান্ড বললেই হতো। একটু মিস-ক্যাল-কুলেশন হয়ে গেছে!

হঠাৎ যেন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলো সতী!

—আপনি কেস করবেন আমার নামে?

নির্মল পালিত পেছন ফিরে দেখতেই চমকে উঠলো। এই মিসেস ঘোষেরই আর এক রূপ দেখেছে নির্মল পালিত। কিন্তু আজ যেন অন্যরকম দেখালো

একেবারে। কোঁকড়ানো চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা লাল নতুন শাড়ি পরেছে। ঘরের ভেতর যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি ভাবেই বেরিয়ে এসেছে। মিস্টার ঘোষালও পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকেছে তার।

—আপনি কেস করবেন বলে ভয় দেখাতে এসেছেন এখানে?

নির্মল দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আসুন মিসেস ঘোষ, বসুন—

সতী বললে—না, আমি বসতে আসিনি—আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতেই এসেছেন এখানে?

নির্মল পালিত বললে—এটা আপনি কী বলছেন মিসেস ঘোষ, আমি তো আপনার ভালোর জন্যেই খবরটা দিতে এসেছিলাম—তাছাড়া আমার তো প্রফেশনই এই, কিন্তু কারো ক্ষতি হয়, কারো সর্বনাশ হয় এটা তো আমি চাই না। আমাকে মামলা করতে বললেন আপনার শাশুড়ী আপনার নামে, আমি ব্রীফও তৈরী করেছি সেই রকমভাবে, কিন্তু ভাবলাম এও তো একটা স্ক্যান্ডাল। এত বড় একটা ফ্যামিলির নামে স্ক্যান্ডাল রটবে—সেটা কি ভাল!

সতী বললে—না আমি চাই, আমার নামে মামলা হোক।

—আপনি মামলা চান?

সতী বললে—হ্যাঁ চাই—

মিস্টার ঘোষাল এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কিন্তু মামলা হলে যে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়বো মিসেস ঘোষ! নিউজ পেপারে যে সব ছাপা হবে—

সতী বললে—হোক ছাপা! ছাপা হলেই তো ভাল! লোকে জানুক বড়-বড় লোকের সংসারে কী কী ঘটে, কী ধরনের অত্যাচার হয়—বড়-বড় লোকেরা বাড়ির ভেতরে কী অশান্তিতে কাটায়। লোকে জানে তারা বড় আরামে থাকে, গাড়ি চড়ে বেড়ায় আর সুখে দিন কাটায়—কিন্তু তাদের জীবনেও যে কত অসহ্য অশান্তি থাকে—তা বাইরের লোকদের জানানো উচিত!

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ মিসেস ঘোষ?

—আমার লাভ আছে বলেই বলছি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—একজ্যাক্টলি সো, সেসব বাইরের লোকদের জানাবার দরকার কী? বাইরের লোকরা বড়লোকদের স্ক্যান্ডাল শুনে মিছিমিছি হাসাহাসি করবে!

—আমি তো চাই তারা হাসাহাসি করুক! জানুক সব লোকে! আর কতদিন চাপা থাকবে? একদিন না একদিন সব তো জানাজানি হয়ে যাবেই!

—কিন্তু সে তো স্ক্যান্ডাল! স্ক্যান্ডাল কি প্রকাশ হওয়া ভাল?

সতী বললে—হ্যাঁ ভাল! আর এই স্ক্যান্ডাল হবে বলেই আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি প্যালেস-কোর্টে! স্ক্যান্ডাল না হলে ওদের কীসের শাস্তি হলো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু তাতে তো আপনিও জড়িয়ে পড়বেন মিসেস

ঘোষ? শুধু আপনি নয় আমিও!

সতী বললে—আমার কথা ভাববেন না আপনি, মিস্টার ঘোষাল! আমি সমস্ত স্ক্যান্ডালের ওপরে উঠে গেছি, আমার আশা ভরসা সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি নিজের জন্যে আর ভাবি না। কিন্তু আমি চাই আমাকে যে কষ্ট ওরা দিলে, সে কষ্ট ওরাও পাক—আমাকে কষ্ট দিয়ে ওরা যেন পার না পায়—

নির্মল পালিত বললে—ঠিক কথা মিসেস ঘোষ, আমিও বলেছিলাম আপনার মাদার-ইন-ল'কে যে দিস ইজ রং—অ্যাবসালিউটলি রং—আপনার পুত্রবধূও একটা প্রপার্টি—আমি তো তাই একটা মিটমাট করবার চেষ্টাতেই আছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—না মিস্টার পালিত, মিটমাট আর হবে না—

সতী বললে—আমি আর মিটমাট করতে চাইও না—

নির্মল পালিত বললে—আপনার শাশুড়ীও মিটমাট করতে চান না মিসেস ঘোষ—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু তা বলে যেন কোর্টে আপনি যাবেন না মিস্টার পালিত—

নির্মল পালিত বললে—তা কোর্টে কি আমিই যেতে চাই মিস্টার ঘোষাল, আপনি কোর্টকে যত ভয় করেন, আমি ভয় করি তার হাজার গুণ! কিন্তু আমার যে প্রফেশনই এই—

সতী বললে—না, আপনি কোর্টেই যান, আমি কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমার কথা বলতে চাই—

নির্মল পালিত বললে—সবই তো বুঝলুম মিসেস ঘোষ—আপনার রাগের কারণও আমি জানি, কিন্তু আপনার হাসব্যান্ডের অসুখের কথাটাও একবার ভাবুন—জানেন তো তাঁর খুব অসুখ, মাদারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও বন্ধ! এই অবস্থায় আপনি যদি তাঁকে আঘাত দেন, তাহলে তিনি কি আর বাঁচবেন?

সতী যেন হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না।

মিস্টার ঘোষাল বললে—একজ্যাক্টলি সো, মিস্টার ঘোষের কথাটাও আপনার ভাবা উচিত মিসেস ঘোষ!

সতী বললে—না, তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার ঘুচে গেছে, মিস্টার ঘোষ আমার কেউ নয়, তাঁর ভালমন্দে আমার কিছু এসে যায় না—

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন মিসেস ঘোষ, তিনিই আপনার লিগ্যাল হাসব্যান্ড—

—নো—

হঠাৎ সতী চিৎকার করে উঠলো। বললে—নো, হি ইজ নো-বডি টু মি! আমার কোন কনসার্ন নেই তাঁর সঙ্গে—তাঁর অসুখই হোক, আর তিনি মারাই যান, ইট ম্যাটার্স ভেরি লিটল্ টু মি—

নির্মল পালিত আর দাঁড়াল না। বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সতী বললে —আপনি ওঁদের বার-য়্যাট-ল, আপনি ওঁদের গিয়ে বলে দেবেন, আমি ওঁদের মামলার ভয় করি না, আমি ওঁদের সামনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেব, ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আই ন্যাল্ লিভ্ মাই ওন লাইফ—দেখি রিভেঞ্জ নেওয়া কাকে বলে—

নির্মল পালিতের কিছু বলবার ছিল না। আস্তে আস্তে বাইরে চলে এল। মিস্টার ঘোষাল এসে কাছে দাঁড়াল।

নির্মল পালিত বললে—ডোণ্ট বদার মিস্টার ঘোষাল, আমি আছি, আপনার ভাবনার কিছু নেই, মিসেস ঘোষ বড় একসাইটেড হয়ে উঠেছেন তো, তাই—তা আমি ওসব কথায় কিছু মনে করিনি—আফ্‌টার অল উইমেন আর উইমেন—আসলে তো মেয়েমানুষ!

বলে নির্মল পালিত নেমে গেল রাস্তায়। তারপর হঠাৎ আবার উঠে এল ওপরে। কী যেন একটা কথা বলতে ভুলে গেছে। বললে—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মিস্টার ঘোষাল—

—বলুন!

—আপনি যেন মিসেস ঘোষকে আবার বলবেন না এই টাকার কথাটা। জানেন তো—Men are women's playthings; woman is devil's.

বলে নির্মল পালিত একটা শয়তানি হাসি হেসে উঠলো হো হো করে!

* * *

কিন্তু প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে গিয়ে নির্মল পালিত আবার আর এক মানুষ। আর এক চেহারা তার। মস্ত বাড়িটা যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। সেই আগেকার মতন আর শৃঙ্খলা নেই যেন কোথাও। দরোয়ানটা গেটের পাশেই একটা খাটিয়া নিয়ে শুয়ে থাকে। আগে তার এমন সাহস হতো না। মা-মণি কোথায় তেতলার ঘরে চুপ করে বসে থাকে কেউ টের পায় না। আগেকার সেই ধমকানিও আর নেই। ঝি-চাকররা আগে উঠতে বসতে বকুনি খেত, গালাগালি খেত, এখন যার যা খুশি তাই করে। পাখীটা ছোলা খেতে পায় কি না, ঘর ঠিকমত ঝাঁট দেওয়া হলো কি না, বাগানে মালিটা কাজ করে কি না—কেউ দেখবার নেই।

সরকারবাবুরই জ্বালা। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে বলে—মা-মণি—

—আবার কী সরকারবাবু?

—আজ্ঞে এসেছিলাম, ভাড়াটেদের কথা বলতে—

—ভাড়াটেদের কথা আবার বলতে এসেছো আমাকে? বলেছি না, ছাদ আমি সারাতে পারবো না, মামলা করুক আমার নামে—

—আজ্ঞে ছাদ নয়, ভাড়া দেয়নি দুমাসের—

—দুমাসের ভাড়া দেয়নি, তা তুমি কি অ্যাদ্দিন ঘুমোচ্ছিলে? তবে তোমাকে

রাখা কেন? ভাড়া না পেলে তোমার মাইনে থেকে আমি কেটে নেব তা বলে রাখছি—যাও, এখন বিরক্ত কোর না আমাকে।

সরকারবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু থেমে বললে—আর একটা কথা—

—আবার কী কথা? আর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! আগে ভাড়া আদায় করে নিয়ে এসো, তবে কথা শুনবো, যাও এখন সামনে থেকে—এখন আমার কথা শোনবার সময় নেই—

সরকারবাবুর আর দাঁড়াবার সাহস হয় না। কোনও কাজকর্ম যদি হবার যো আছে। কী যে হয়েছে ঘোষ-বাড়িতে। আগে মা-মণি সব দেখতো, সব শুনতো, বকুনি দিত, গালাগালি দিত, সেও যেন ভাল ছিল এর চেয়ে। কাজ করে সুখ ছিল তখন!

ভাঁড়ার ঘরে ভূতির মা যা খুশি তাই করে। কেউ কিছু বলবার নেই। ঠাকুর যত ইচ্ছে তেল-ঘি খরচ করে, বাতাসীর মা ঘুমোয় বেলা পর্যন্ত। শম্ভু সেই যে আড্ডা দিতে বেরোয়, তার আর ফেরবার নাম নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে এই ক'দিনের মধ্যেই।

সনাতনবাবু বিছানায় শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করে। বলে—মা, মাগো—

মা-মণির কানে মাঝে-মাঝে যায় কথাগুলো। তারপর শম্ভুকে দেখলেই বলেন—দরজাটা বন্ধ করে দে আমার—বন্ধ করে দে—

শম্ভু দরজা বন্ধ করে দেয়। খোকাবাবুর গলার শব্দটাও যেন বিষ লাগে মা-মণির কানে।

সনাতনবাবুর ঘরে গিয়ে শম্ভু বলে—ডাক্তারবাবুকে ডাকবো একবার দাদাবাবু?

শম্ভুর গলায় শব্দ পেয়ে সনাতনবাবু চুপ করে যান। বলে—এক গ্লাস জল দিতে পারো শম্ভু—

শম্ভু জল এনে দেয় তাড়াতাড়ি। বলে—জল তেষ্টা পেয়েছে, তা বলেননি কেন আমাকে দাদাবাবু, আমি তো এখানেই আছি।

তারপর শম্ভু আবার জিজ্ঞেস করে—ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেব?

সনাতনবাবু বুঝতে পারে না তবু। বলে—খবর দিবি?

—আপনি যদি বলেন তো খবর দিচ্ছি—

—না থাক—

সনাতনবাবুর কাছে তাঁর অসুখ হওয়াটাই যেন একটা অপরাধের সামিল মনে হয়। শম্ভু দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে—একটু মাথাটা টিপে দেব আপনার?

সনাতনবাবু বলেন—মাথা টিপলে কি সারবে?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, দেখবেন আরাম হবে খুব—

মা-মণির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে কৈলাস এসে ডাকে—মা-মণি—

—আবার কী? আবার বিরক্ত করতে এলি?

মা-মণির সব কথাতেই বিরক্তি। সব ব্যাপারেই রাগ। অথচ মা-মণি ছাড়া এ সংসারের কোন্ কাজটা কোনদিন হয়েছে তাও কেউ জানে না। তবু যতক্ষণ মা-মণি আছে, ততক্ষণ তাকে জিজ্ঞেসও করতে হবে, হুকুমও তামিল করতে হবে।

—উকীলবাবু এসেছেন নিচের, আপনাকে ডাকছেন।

মা-মণি বলেন—তা সেই কথাটা বলবি তো আমাকে!

বলে তাড়াতাড়ি নিচের আসেন। নির্মল পালিত বসে ছিল বৈঠকখানায়। মা-মণি ঢুকেই বললেন—কী হলো বাবা? সব তৈরি?

নির্মল পালিত বললে—হ্যাঁ মা-মণি, সব তৈরি করে এনেছি—এখন আপনি সই করলেই হয়—

তারপর ব্যাগটা খুলে কাগজটা বার করতে করতে বললে—বুঝলেন মা-মণি, আপনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক,—

—কীসের ঠিক?

—আপনার ডটার-ইন-ল'র কথা বলছি, আপনি যা করেছেন, ভালোই করেছেন, আমি ভেবেছিলুম আপনারই দোষ কিন্তু দেখলুম আপনার ডটার-ইন-লরই দোষ আসলে। আমায় টাকা দিতে এলো, বুঝলেন! আমাকে বলে কি দু'হাজার টাকা দেব, আপনি মামলা করবেন না—!

মা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি হতভাগীর কাছে গেছলে নাকি?

নির্মল পালিত বললে—গিয়েছিলুম বলেই তো বলছি। ভাবলুম যাই, তাতেই বা কী দোষ, যদি মিটিয়ে ফেলতে পারি ব্যাপারটা! কিন্তু দেখলুম এ মেটবার নয় মা-মণি! বললে কী জানেন?

—তুমি আর তার কথা আমায় বোল না বাবা, তার নাম শুনলেও আমার ঘেন্না হয়!

—আমারও ঘেন্না হলো মা-মণি তার কথা শুনে। দেখলুম—তোফা আরামে রয়েছেন তিনি, কোনও দুঃখ নেই। বললাম হাসব্যান্ডের অসুখ, তা ভ্রূক্ষেপই নেই। বড় হোপলেস হয়ে গেলাম সব দেখে শুনে। শেষে বললাম—মামলার কথা। শুনে কী করলে জানেন? আমার হাতে টাকা গুঁজে দিলে—দু' হাজার টাকা। বললে—মামলা করাবেন না, তাতে তাঁর বদনাম হবে, স্ক্যান্ডাল হবে—

—তুমি টাকা নিলে?

—আজ্ঞে, কী যে বলেন আপনি! আমি কি সেই রকম লোক? আমি আপনারও ফীজ্ নেবো, তারও ফীজ্ নেবো? আসামী ফরিয়াদী দু'পক্ষের

টাকা খাবো? আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন—Make money your God, it will plague you like the devil. জানেন—

মা-মণি বললেন—ছাড়ো ওসব কথা বাবা। ও-কথা শুনলেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে—

নির্মল পালিত বললে—তা তো করবেই—আমি বার-অ্যাট-ল, আমারই তাই গা ঘিন্-ঘিন্ করে তো আপনি—

মা-মণি বাধা দিয়ে বললেন—আমার আসল কাজের কী করলে বলো?

নির্মল কাগজগুলো সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—এই উইল তৈরি করেছি—আর এই হলো মামলার নথি—

—ও তো হচ্ছে, কিন্তু বাড়ি বিক্রির কী করলে?

—সেও পার্টি ঠিক করে ফেলেছি। এই দেখুন ডীড—

মা-মণি বললে—ও ডীড-ফিড আমি কীই বা বুঝব—ইংরিজীর আমি কী বুঝি? মুখে বলো না কী করলে? কত দর পেলে?

নির্মল পালিত বললে—বেশ প্রফিটেবল দর পেয়েছি মা-মণি, দুটো বাড়ি কুড়ি হাজার—

—কুড়ি হাজার? কিন্তু আমার কেনা দর যে ষাট হাজারে বাবা? ষাট হাজার দিয়ে তোমার বাবাই আমাকে যে কিনিয়েছিলেন—তিনতলা বাড়ি, দু'খানা মিলিয়ে খান্ তিরিশেক ঘর—

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু সময়টা কী-রকম সেটা ভাবুন, আপনি যখন কিনেছিলেন তখন বাড়ির দর ছিল, এখন কি কেউ কেনে? কেনবার টাইম কি এটা? এখন সব মাড়োয়ারীরা পর্যন্ত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে, আপনি এখন তো তবু কুড়ি হাজার পাচ্ছেন, এর পর যে খদ্দেরই পাবেন না কেনবার! আর যুদ্ধের মধ্যে যদি একদিন কলকাতার জাপানীদের বোমা পড়ে তো তখন আপনার বাড়ি কি থাকবে ভাবছেন? তখন তো আমাকেই দোষ দেবেন!

তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নিন্, এই কাগজে তিনটে সই করে দিন্—আমি আপনার সব কাজ হাঁসিল করে দিচ্ছি—দেখুন না—

মা-মণি কলমটা নিয়ে সই করলেন—নয়নরঞ্জিনী দাসী। একটা, দুটো, তিনটে সই—

আর হঠাৎ পাশের বারান্দার দিকে নজর পড়তেই ডাকলেন—কে? কে ওখানে?

মা-মণির যেন মনে হলো বারান্দা দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে ভেতরের দিকে চলে গেল।

—কে? কে ওদিকে গেল রে? কে? !

নির্মল পালিত বললে—কই, কেউ তো যায়নি ওদিকে মা-মণি—

মা-মণি বললেন—মনে হলো কে যেন গেল ওদিকে—

তারপর ডাকলেন—শম্ভু, শম্ভু কোথায় গেলি ? কৈলাস ? কৈলাস কোথায় ?

কৈলাস আসতেই মা-মণি বললেন—এখ্খুনি কে গেল রে ওদিকে ?

কৈলাস বললে—বৌদিমণি !

বৌদিমণি। মা-মণি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—কোথায় গেল বৌদিমণি ? কোন্ দিকে ? ওপরে ?

কৈলাস বললে—দাদাবাবুর ঘরে—

দাদাবাবুর ঘরে! আমাকে না বলে ভেতরে চলে গেল ? তোরা সব মরে গিছলি না কী ? চল্, দেখি কোথায় গেল! বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে হন্ হন্ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল ?

কিন্তু ততক্ষণে সতী একেবারে সনাতনবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শম্ভু পাশে বসে সনাতনবাবুর মাথা টিপে দিচ্ছিল। সতী গিয়ে দাঁড়াতেই শম্ভু অবাক হয়ে চেয়ে রইল সতীর মুখের দিকে।

—কেমন আছো তুমি ?

সনাতনবাবু এ-পাশ ফিরে চেয়ে দেখলেন। বললেন—ও, তুমি এসেছ ?

সতী এগিয়ে গিয়ে মাথার কাছে বসলো। বললে—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার ? হঠাৎ অসুখ হলো যে !

সনাতনবাবু বললেন—মাথাটায় বড্ড ব্যথা লাগছে—তুমি বোস, ভালো করে এখানে সরে বোস—

—তুমি এখান থেকে চলো, এখানে থাকলে তোমার অসুখ সারবে না—

—কোথায় যাবো ?

সতী বললে—কেন, আমার কাছে, আমার কাছে যেতে তোমার আপত্তি আছে ?

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ হলো। শাশুড়ী এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—এ-বাড়িতে আবার ঢুকলে কেন শুনি ? কাকে বলে ভেতরে ঢুকেছ ? কে তোমায় ঢুকতে দিয়েছে ?

সতী পেছন ফিরে তাকালোও না, এ-কথার জবাবও দিলে না। তেমন ভাবেই সনাতনবাবুর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। বললে—তুমি যদি যাও আমার সঙ্গে তো আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি—যাবে ?

—বলি, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে ?

সতী এতক্ষণে মুখ ফেরালো। বললে—আমি আপনার কথার উত্তর দেব না, আপনি যা ইচ্ছে করুন গিয়ে—

শাশুড়ী এবার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বললেন—বলি, এ কি তোমার নিজের বাপের বাড়ি পেয়েছ ? ভেবেছ কী তুমি ?

সতী বললে—যা বলবার আপনি বাইরে গিয়ে বলুন, রুগীর ঘরে চেঁচাবেন

শাশুড়ী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—রুগীর ওপর যে তোমার বড় টান্ দেখছি—এতদিন এ-টান কোথায় ছিল শুনি ? তখন তো ঘরে হুড়কো এঁটে ডাক্তারকে বের করে দিতে! তখন তো এত আটা দেখিনি ? এখন যে দেখছি আদরে একেবারে টইটুম্বুর—

সনাতনবাবুর মুখ দিয়ে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরোল—আঃ—মা গো—

সতী বললে—আপনি এখন যান্ এখান থেকে, আমাকে যা বলবেন, পরে বাইরে গিয়ে বলবেন—

শাশুড়ী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো জানো ? জানো এখনি দরোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বের করে দিতে পারি ?

—যদি তা করতে পারেন তো তাই করুন, বাজে বক্ বক্ করবেন না—

সনাতনবাবু হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—তুমি কেন গোলমাল করছো সতী, তুমি কেন এলে ? তুমি চলে যাও না এখান থেকে—

সতী হঠাৎ সনাতনবাবুর মুখ থেকে এই কথা শুনে থমকে গেল। বললে—তুমি বলছো কী ?

—হ্যাঁ, তুমি চলে যাও, কেন তুমি এলে ? আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—

—তা শেষকালে তুমি আমাকে এই কথা বললে ?

শাশুড়ী বললেন—তা বলবে না, গুণধরীর গুণের কথা জানতে তো আর কারো বাকি নেই! নিজের মুখ পুড়িয়ে আবার এখন সোয়ামীর মুখ পোড়াতে এসেছে—লজ্জাও করে না—

—তুমি চলে যাও সতী, আমি বলছি, তুমি আর এসো না, যাও এখান থেকে—

সতী যেন এতক্ষণে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলে। বললে—আচ্ছা, আমি চলেই যাচ্ছি—

বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—থাকতে আমি এখানে আসিনি, থাকতে চাইও না আমি তোমাদের বাড়িতে—তোমাদের এখানে থেকে আমার স্বর্গলাভও হবে না জানি। কিন্তু আজ একটা কথা বলে রাখছি, এতে কারোরই ভাল হবে না, তোমাদেরও না, আমারও না—তোমাদের আমি ভালোই চেয়েছিলাম, তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি আমার ভালো চেয়েছিলুম—কিন্তু তোমাদের ভালো করা শিবেরও অসাধ্য—

শাশুড়ী বাধা দিয়ে বললেন—যাও যাও, ঢের হয়েছে—

সতী ততক্ষণে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। তারপর তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নিচেয়। খবর পেয়ে বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস ঠাকুর, ড্রাইভার, সবাই সিঁড়ির নিচে খিড়কীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই দেখলে বৌদিমণি কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা সদর-গেটের দিকে বেরিয়ে গেল।

নির্মল পালিত বৈঠকখানা ঘরে একলা চুপচাপ মা-মণির জন্যে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করবার কিছু অবশ্য ছিল না। দলিলগুলোতে সই-সাবুদ যা করবার তা করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু যাবার আগে কথা বলে যেতে হবে। বউবাজারের দুটো বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। শ্যামবাজারেরটাও ব্যবস্থা করতে হবে এবার। তারপর কিছু শেয়ার। শেয়ারেই বেশ কিছু মোটা রকমের আশা আছে।

হঠাৎ মনে হলো মিসেস ঘোষ তর্ তর্ করে বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলে—মিসেস ঘোষ—

সতী একবার নিজের নাম শুনে পেছন ফিরলে। তারপর আবার সোজা সদর গেটের দিকে যেমন যাচ্ছিল তেমনি এগিয়ে গেল।

বাইরে সদর গেটের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সতী দরজা খুলে তার ভেতরে গিয়ে উঠলো। উঠতেই শম্ভু দৌড়তে দৌড়তে এল কাছে। বললে—বৌদিমণি তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সতী কিছু উত্তর দিলে না।

শম্ভু বললে—সেই দাদাবাবু এসেছিল একদিন তোমাকে খুঁজতে বৌদিমণি—

—কে? দীপু?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, আমায় জিজ্ঞেস করলে বৌদিমণি কোথায়? আমি বললুম—তা জানি না!

সতী হঠাৎ একটা টাকা বার করে শম্ভুর হাতে দিলে। বললে—এইটে নে, আর তোর দাদাবাবুকে একটু দেখিস্, বুঝলি, দেখিস্ একটু—

তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই শম্ভু মাথাটা নিচু করে, একেবারে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে প্রণাম করলে। কিন্তু যখন মাথা তুললো তখন বৌদিমণি অনেক দূর চলে গেছে—

নির্মল পালিত নিজের বাড়ির চেম্বারে কাগজ-পত্র গুছিয়ে উঠলো। বললে—ঠিক আছে, ওই কথাই রইল—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এ-রকম করে কতদিন চলবে?

নির্মল বললে—তা আমি কী বলবো বল্, আমি তো মিট্-মাট্ করতেই গিয়েছিলুম, আমাকে সিক্স্ থাউজ্যান্ড রুপীজ্ ঘুষও দিতে এল, কিন্তু আমি গাছেরও পাড়বো তলারও কুড়োব, তেমন লোক নই ভাই, তেমন করতে পারলে আমি আজ কলকাতা শহরে অনেক প্রপার্টি করে ফেলতে পারতাম—তাহলে আমার প্রপার্টি আজ খায় কে?

দীপঙ্করও উঠলো।

নির্মল পালিত বললে—কিছু ভাবিসনি, যা হবার তা হবেই, একবার যখন

বিষ ঢুকেছে তখন আর কেউ রোধ করতে পারবে না—মিসেস ঘোষ বলেছে ঠিক, ও শিবেরও অসাধ্য—দেখা যাক্ আমি কতদূর কী করতে পারি—

রাস্তায় এসেও দীপঙ্কর হাজরা রোডের মোড়ে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো পৃথিবীটা যেন থেমে গেছে। এখন কোথায় যাবে সে? কার কাছে গেলে মনটা শান্ত হবে! এতখানি বোঝা দীপঙ্করের মাথার ওপর, কে তার বোঝা নামিয়ে নেবে!

প্রাণমথবাবুর কথা মনে পড়লো। এমন করে সর্বস্ব দিয়ে কে দেশকে ভালবাসতে পেরেছে, কে মানুষকে ভালবাসতে পেরেছে প্রাণমথবাবুর মত। যেমন প্রাণমথবাবু, তেমনি প্রাণমথবাবুর স্ত্রী। যখন বৈঠকখানা ঘরে সবাই এসে জোটে, প্রাণমথবাবুর পাশে মাসীমাও চুপ করে বসে থাকেন। প্রাণমথবাবুর মত তিনিও জেলে গেছেন সারাজীবন। কিরণের মাকে মাসকাবারি টাকা দেবার পর, আর একদিন প্রাণমথবাবুর বাড়ি গিয়েছিল দীপঙ্কর। সেদিন বৈঠকখানায় কেউই ছিল না। একলা বসেছিলেন। দীপঙ্কর গিয়ে প্রণাম করেছিল, তবু অন্য দিনের মত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন নি প্রাণমথবাবু। কেমন আছে দীপঙ্কর, মা'র কী হয়েছিল শেষকালে, কত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এক সময়ে বলেছিলেন—জানো বাবা, এ হলো বাঙলা দেশ, এ বেহার নয়, গুজরাট নয়, মাদ্রাজও নয়—এদেশে যে জন্মেছে তাকে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে—লোকে বলছে সুভাষ নাকি সাধু হয়ে গেছে—! কিন্তু তাকে তো আমি জানি, সে কি পালাবার ছেলে? সাধু হলে সে অনেক আগেই সাধু হয়ে যেত—

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—দেখ বাবা দীপু, গাছপালা যত সহজে গাছপালা, মানুষ তত সহজে মানুষ নয়। এই মাদ্রাজ কি বেহারের কথাই ধরো না, রাজাগোপালাচারীরা মাদ্রাজে যত সহজে রাজাগোপালাচারী হয়েছে, রাজেন্দ্র প্রসাদ বেহারে যত সহজে রাজেন্দ্র প্রসাদ হয়েছে, সুভাষ কি বাঙলা দেশে তত সহজে সুভাষ হতে পেরেছে? না দেশবন্ধু হতে পেরেছে?

যেন অনেক দুঃখ পেয়ে কথাগুলো বলেছিলেন প্রাণমথবাবু! প্রাণমথবাবুর শরীর আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।

চলে আসবার সময় বলেছিলেন—তুমি মাঝে মাঝে চলে এসো বাবা, আমি বড় ব্যস্ত আছি ক'দিন—

—খুব কাজ পড়েছে বুঝি স্কুলে?

—ইস্কুল নয় ইলেক্শন, আমাদের কংগ্রেসের ইলেক্শন নিয়ে খুব খাটছি ক'দিন ধরে। দেশবন্ধুর নিজের হাতে গড়া কংগ্রেস, আমরা গোড়া থেকেই আছি, তাই যার তার ওপর ভার ছেড়ে দিতে ভয় করে বাবা—

দীপঙ্কর সামনে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে উঠলো।

প্রাণমথবাবুকে এখন বিরক্ত করা উচিত নয়।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যেতে হবে হুজুর?

—ডালহৌসী স্কেয়ার।

ডালহৌসী স্কোয়ারে বার্মা ইভাকুয়ীজ অফিস হয়েছে। সেখানে গেলে ভুবনেশ্বরবাবুর খবরটা হয়ত পাওয়া যেতে পারে। বিকেল হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই হয়ত অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। অফিসের সাইনবোর্ড ছিল, চাপরাসী ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। অফিসের সামনেও খুব ভিড়। প্রচুর লোক বর্মার আত্মীয় স্বজনের খবর নেবার জন্যে ভিড় করেছে সামনে। দীপঙ্করও আর সকলের মত একটা ফর্ম চেয়ে নিলে। তারপর নাম-ঠিকানা ভর্তি করে এগিয়ে দিলে।

ভেতরের ক্লার্কটা ফর্ম নিয়ে একবার পড়ে দেখলে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কতদিন পরে খবর পাওয়া যাবে?

ক্লার্কটা বললে—আপনি এক সপ্তাহ পরে একবার আসবেন—

—অত দেরি হবে?

ক্লার্কটা বললে—এ কি আর একটা-দুটো লোকের ব্যাপার স্যার, লক্ষ-লক্ষ লোক—সকলের ট্রেস করা কি অত সহজ—?

পেছনে অনেক লোক তখন দাঁড়িয়ে আছে। সকলকে কাটিয়ে দীপঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এল। সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো যেন দীপঙ্কর। এত সকাল-সকাল বাড়ি গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলবে? কে আছে? সেই সন্তোষ-কাকা আর সন্তোষ-কাকার মেয়ে!

সন্তোষ-কাকার মেয়ে সেদিনকার সেই ঘটনার পর যেন আরো জড়োসড়ো হয়ে গেছে।

সন্তোষ-কাকা মেয়েকে বলে—দরকার নেই তোর ক্ষিরি, তোর কিসের দায়, তোকে বিয়েও করবে না কিছু না, তুই কেন খাটতে যাবি গতর দিয়ে! গতর কি সস্তা?

তারপর রোয়াকের ওপর বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে—আহা, কী যে দুর্মতি হয়েছিল আমার। কেন যে রসুলপুর থেকে এসেছিলাম সুখের দেশ ছেড়ে, ভীমরতি হয়েছিল রে ক্ষিরি, ভীমরতি হয়েছিল আমার—

তারপর আবার মুড়ি চিবোয় আপন মনে।

বলে—আর একটু গুড় আছে রে ক্ষিরি—আর একটু গুড় দিবি মা?

ক্ষিরি এক ডেলা গুড় ফেলে দিয়ে যায় বাটিতে।

সন্তোষ-কাকা হাঁ হাঁ করে ওঠে। বললে—এ কী করলি? গুড় চাইলুম বলে এতখানি গুড় দিলি ভাবলে? তাহলে দে, আর দু'টি মুড়ি দে, দেখিস আবার যেন বেশি দিয়ে ফেলিস নে, তাহলে আবার গুড় দিতে হবে—

দীপঙ্কর যখন বাড়ি ফিরলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পা দু'টোকে টেনে নিয়ে বাড়ির দরজার কাছে আসতেই পেছনে একটা ট্যাক্সির

শব্দ হলো। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থেকে নেমে দীপঙ্করকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, দীপঙ্করবাবুর বাড়ি কোন্‌টা।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। ট্যাক্সি করে এত রাত্রে কে আসবে তার বাড়িতে! বললে—আমারই নাম দীপঙ্করবাবু—

গাড়ি থেকে ততক্ষণে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নেমে এসেছে। কোট, প্যান্ট, টাই—লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। দীপঙ্কর ভদ্রলোককে দেখেই এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—হুম্ ডু ইউ ওয়াণ্ট্ প্লিজ্?

—আই ওয়াণ্ট্ মিস্টার ডীপঙ্কর সেন—

—ইয়েস্, হিয়ার আই য়্যাম্!

—আর ইউ?

দীপঙ্কর তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে। এত লোক থাকতে দীপঙ্করকে খুঁজতে কলকাতার এই প্রান্তে এসেছে কেন! কীসের দরকার? কী চায় তার কাছে? ভদ্রলোকের মুখে চুরোট, হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ। ফরসা ধপ্ ধপ্ করছে মুখের রং।

সাহেবটা একেবারে দীপঙ্করের মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললে—আই য়্যাম্ কিরণ।

—কিরণ!!

একেবারে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল দীপঙ্কর।

কিন্তু কিরণ তার আগেই মুখে আঙুল চাপা দিয়ে দিয়েছে।

—চুপ!

মনে আছে সে উনিশ শো একচল্লিশ সালের বাইশে জুনের কথা। হঠাৎ সকালবেলা পৃথিবীর সব মানুষ একসঙ্গে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলো জার্মানীর আর্মি বলা-নেই কওয়া-নেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে একেবারে সোভিয়েট রাশিয়ার বুকের ভেতরে। বাল্টিক্ থেকে ব্ল্যাক-সী পর্যন্ত সমস্ত এরিয়া জুড়ে জার্মান-আর্মি তছ্-নছ্ করে দিয়েছে রাশিয়ার ডিফেন্স লাইন। ফিন্‌ল্যান্ড, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া—সবাই আছে হিটলারের সঙ্গে।

ক্রফোর্ড সাহেব ডেকেছিল দীপঙ্করকে। দীপঙ্কর গিয়ে বসল সামনে। বড় গম্ভীর মানুষ ক্রফোর্ড সাহেব। রেলের অফিসের কোনও কাজ নিয়ে কখনও তাড়াহুড়ো করবার মানুষ নয়। ধীর স্থির মানুষটা। কোয়ার্টার থেকে এসে চুপ করে সারাদিন কাজ করে যায়, আবার ঠিক অফিস থেকে চলেও যায় নিজের সময়মত।

ক্রফোর্ড সাহেব একটু হাসলো। সাধারণত গোঁফের আড়ালে হাসতে সাহেবকে কখনও দেখেনি কেউ।

জিজ্ঞেস করলেন—সেন, আর ইউ অ্যাফ্রেড্?

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নটা শুনে। বললে—কেন স্যার? এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

হাতে ফাইলটা ছিল সাহেবের। হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বললে—এই ফাইলটা দেখেছ? শুনছি, হোল্ ক্যালকাটার লোক নাকি অ্যাফ্রেড হয়ে উঠেছে—

সত্যিই কলকাতার তখন শহর ছেড়ে বাইরে চলে যাবার হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ মধুপুর, কেউ গিরিডি, কেউ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার আগেই নন্-অ্যাগ্রেশন্ প্যাক্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার হাতের কাছে তখন এগিয়ে এসেছে ওয়ার। পার্ল হারবারের লড়াই-এর পর জাপান আর একদিনও দেরি করেনি, এক দমে নিয়ে নিয়েছে ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। কলকাতার পাশে বর্মা তখন টস্-মস্ করছে—

দীপঙ্কর বললে—আমি তা জানি স্যার—

—তুমি তোমার ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি বাইরে?

ক্রফোর্ড সাহেব জানতো না যে দীপঙ্করের ফ্যামিলি বলতে কেউই নেই। অথচ ফ্যামিলি না থাকলেও যে দীপঙ্করের কত আত্মীয় আছে তা কী করে বোঝাবে সাহেবকে। সাহেব হয়ত বুঝতেও পারবে না সে সব কথা!

—তোমার কী মনে হয় সেন, উই উইল্ লুজ্ দি ওয়ার? আমরা যুদ্ধে হেরে যাবো?

দীপঙ্কর ক্রফোর্ড সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। যে-মুখে কখনও কিছুর রেখাই পড়ে না, সেই মুখেই যেন ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে। উদ্বিগ্ন চার্চিল যেন চুরুট টানতেও ভুলে গেছে। হাওড়া স্টেশনে, শেয়ালদা স্টেশনে রোজ স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। শুধু ক্রফোর্ড সাহেব কেন, সমস্ত অফিস-সুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কলকাতাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যাদের ভাড়াবাড়ির ওপর আয়, তাদের আয় কমে যাচ্ছে। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অনেক বাড়ি। দর সস্তা হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তির। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির মালিক নয়নরঞ্জিনী দাসী তাই একে একে সব বাড়ি বিক্রি করে লিকুইড্ ক্যাশ করে রাখছে ব্যাঙ্কে। ফিক্সড্ ডিপোজিট্। দীপঙ্করের নিজের জীবনের মতই যেন সমস্ত পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। হঠাৎ সেই সময়ে দেখা কিরণের সঙ্গে।

কিরণ একধারে টেনে নিয়ে এল দীপঙ্করকে। বললে—কেউ জানে না আমি এখানে—আমার নামে ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে ওয়ারেন্ট ঘুরছে—

—কিন্তু তুই এই সময়ে এলি কী করে?

কিরণ বললে—সাবমেরিনে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কোথায় আছিস্?

—হোটেলে। সবাই জানে আমি ইউরোপীয়ান, কিন্তু আর হোটেলে থাকা চলবে না, অল্‌রেডি সাস্‌পেক্ট করতে আরম্ভ করেছে সবাই, এই জিনিসটা তোর কাছে রাখতে এলুম—এটা রেখে দিবি? খুব সাবধানে রাখতে হবে কিন্তু—

একটা কাগজে মোড়া ছোট বান্ডিল। দীপঙ্কর হাতে নিয়ে বললে—কী এটা?

—তা জানতে চাসনি তুই, যা বলছি করবি কিনা বল্, আবার দু' তিন দিন পরে আমিই নিয়ে যাবো।

হঠাৎ দীপঙ্করের মা'র কথাটা মনে পড়লো। বললে—অব্‌জেক্‌শ্যানেব্‌ল্ কিছু আছে?

—তাহলে দে, রাখবার দরকার নেই—বলে বান্ডিলটা আবার টেনে নিয়ে কিরণ চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বললে—দে না, আমি কি বলেছি রাখবো না?

—আমি তাহলে চলি?

কিন্তু......

কিরণ বললে—আর দেরি করবার সময় নেই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা সন্দেহ করছে—

—তোর মা, তোর মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কিরণ ততক্ষণে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। উঠতেই ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিলে।

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—তোর মা'র সঙ্গে দেখা করেছিস?

ততক্ষণে ট্যাক্সিটা হু হু করে চলে গেছে অনেক দূর। দীপঙ্কর হাঁ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তার মনে হলো যেন আবার বয়েস কমে গেল তার। আবার সেই তারা দুজনে লাইব্রেরী করবে, আবার তারা সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের জীবন ফিরে পাবে, আবার যেন কিরণের বাবা বেঁচে উঠবে, দীপঙ্করের মা-ও ফিরে আসবে—আবার সেই অঘোরদাদু, বিন্তিদি, আবার সেই পুরোনো ছোটবেলায় যেন ফিরে যেতে ইচ্ছে করতে লাগলো দীপঙ্করের।

সেই অন্ধকার রোয়াকের ওপর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দীপঙ্কর।

কিরণের ট্যাক্সি চলে গেছে। স্টেশন রোডের রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো অন্ধকারে মুখ ঢেকে ঠায় দাঁড়িয়ে। বড় নিরিবিলি রাত। বড় নিঃসঙ্গ অন্ধকার। বহু যুগ পরে যেন দীপঙ্কর এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করে এল। এ কী করলে কিরণ! এক মুহূর্তে এ কী রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল তার? সেইখানে সেই রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়েই তার মনে হলো বড় দেরি হয়ে গেল। কিরণকে ধরে রাখলেই ভালো হতো! কিরণকে তার মার কাছে পৌঁছিয়ে দিলেই ভালো করতো। কেন যেতে দিলে কিরণকে? আর যদি কিরণ না আসে? আর যদি না দেখা হয়! আর যদি ধরা পড়ে? ধরা পড়ে যদি জেল হয়? ফাঁসি হয়?

—দাদাবাবু!

টপ্ করে হাতের বান্ডিলটা দীপঙ্কর নিজের অজ্ঞাতেই লুকিয়ে ফেলেছে। কাশী দীপঙ্করকে এই অবস্থায় দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল। অনেকদিন থেকেই কাশী সব লক্ষ্য করছিল। কোথায় যেন কি বিপর্যয় ঘটেছে। মা'র মারা যাবার পর থেকেই দাদাবাবু যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এক-একদিন সকলের আগে ঘুম থেকে উঠে ছাদে গিয়ে বেড়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ি আসে। অনেক রাত্রে ঘুমোতে যায়। কখন যে ঘুমোয় টের পায় না কেউ। কাশী একা-একা লক্ষ্য করে। একা-একা দেখে।

এক-একদিন সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে দীপঙ্কর ইজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পাশ দিয়ে কাশী গেলেই ডাকে। বলে—কাশী—

কাশী কাছে আসে। বলে—কিছু বলছিলেন আমাকে?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে—কাজ করছিলি?

কাশী বলে—না, আপনাকে খেতে দেব?

দীপঙ্কর বলে—না—

তারপরে কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না দীপঙ্কর। বলতে যেন দ্বিধা হয়, যেন বেধে যায় গলায়। কেমন করে বলতে হবে সেইটেই যেন ভেবে নেয় মনে মনে। অনেকদিন ধরেই কথাটা ভাবছে দীপঙ্কর! অনেক দেখলে দীপঙ্কর, অনেক দেখেছে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে শুরু করে অনেক পথ পরিক্রমা করে এসেছে। অনেক মৃত্যু অতিক্রম করেছে, অনেক জীবন অতিবাহিত করেছে। কোথাও কোনও সান্ত্বনা পায়নি, কোথাও কোনও সমাধানও পায়নি। এখন মনে হয় একমাত্র কাশীর মধ্যেই দীপঙ্কর নিজেকে দেখতে পাবে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, তুই লেখাপড়া করবি?

লেখা-পড়া! লেখাপড়ার কথা কখনও কল্পনা করেনি কাশী।

—লেখাপড়া করলে মানুষ হতে পারবি। লেখাপড়া করলেই তবে মানুষ মানুষ হতে পারে। লেখাপড়া করলে অন্তত বুঝতে পারবি পৃথিবীর কে কী-রকম মানুষ। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ।

কাশী বললে—কখন লেখাপড়া করবো?

—কেন, আমি আপিস থেকে ফিরে এসে তোকে পড়াবো। একটু খাটি মন দিস্, তাহলেই খুব শিগ্গির বুঝতে পারবি, তারপর যদি চাস্ তো তোকে আমাদের আপিসে চাকরি করে দেব। চিরকাল কি এমনি করে পরের বাড়িতে চাকরের কাজ করবি তুই—চিরকালই কি বাসন মাজবি, ঘর ঝাঁট দিবি?

—তাহলে কে বাসন মাজবে? কে আর ঘর ঝাঁট দেবে তখন?

দীপঙ্কর বললে—দুটো কাজই করবি, লেখাপড়া করলে কি আর সংসারের

কাজ করা যায় না?

তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক-কথা বলে যায় দীপঙ্কর। কাশী কিছু বুঝতে পারে না। দীপঙ্কর যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। নিজের কাছেই নিজের জবাবদিহি করছে। যেন আত্মবিশ্লেষণ করছে আপন মনে। একদিন সমস্ত পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার উঠে যাবে। একদিন মানুষ সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হবে। কাশী এ-সব কথা বুঝতে পারে না।

দীপঙ্কর বললে—কাল তোর জন্যে একটা প্রথমভাগ কিনে আনবো, তুই পড়বি, বুঝলি?

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে গিয়ে কী মনে হলো। বিছানা থেকে আবার উঠলো দীপঙ্কর। সমস্ত নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক দূরে থেকে থেকে কোথায় যেন কামানের শব্দ হচ্ছে—তারই প্রতিধ্বনি এখানে এই কলকাতা শহরে এসে যেন পৌঁছুল এখন। কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, কত লোক নিঃসন্তান হচ্ছে, কত লোক নিরাশ্রয় হচ্ছে, এখানে এই কলকাতা শহরে বসে তা যেন কল্পনা করা যায়। মস্কো আর লেনিনগ্র্যাডের দিকে এগিয়ে চলেছে জার্মানী। আর এদিকে জাপান এগিয়ে আসছে বর্মার পথ ধরে। বর্মার পরই কলকাতা। ক্রফোর্ড সাহেব ভয় পেয়েছে। রেলের আপিসের সমস্ত লোক ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ার ইউনিটে নাম লিখিয়েছে। যে ক্লার্ক পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাচ্ছে—এই ইউনিটে নাম লেখালে পাবে আরো পঞ্চাশ টাকা। দিল্লী বোর্ড থেকে চিঠি এসেছে। যার খুশী সে-ই নাম লেখাতে পারবে। খাকী বুশ কোট, খাকী প্যান্ট, খাকী ক্যাপ। সমস্ত আপিসসুদ্ধ লোক মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে।

ক্রফোর্ড সাহেব সেদিন ডেকেছিল। বললে—তুমি নাম লেখাওনি সেন?

দীপঙ্কর বললে—না স্যার, সবাই আছে, আমি না-ই বা থাকলাম—

—কিন্তু তুমি নাম লেখালে কিংস্ কমিশন পাবে—লেফ্‌টেন্যান্ট হবে, মেজর হবে—

দীপঙ্কর বললে—আমি জানি স্যার—

—তাহলে তুমি কি ভয় পেয়েছো? তুমি কি আফ্রেড্?

দীপঙ্কর বললে—ভয় নয়, ঠিক উল্টো, আমি ভয় পাইনি বলেই সই করিনি—

—কিন্তু টাকা? ডি অব্ আইতে সই করলে আরো দেড় শো টাকা এক্সট্রা পাবে—টাকার বেনিফিট্ তুমি চাও না?

সত্যিই, জিনিস-পত্রের দাম বাড়বার জন্যে পুওর-ক্লার্করা সবাই মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে। শুধু দীপঙ্করই নাম লেখায়নি। বুড়ো বুড়ো ক্লার্ক, যারা জীবনে সংসার আর চাকরি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারাও সবাই দুপুরবেলা প্যারেড করে। মাঠে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট-রাইট্ করে। রোদে ঘেমে নেয়ে হাঁপায়। শুধু দুটো টাকার মুখ দেখতে পাবে বলে। কোথায় রইল কংগ্রেস, কোথায় রইল স্বরাজ, কোথায় রইল মহাত্মা গান্ধী—সবাই টাকার

জন্যে দাসখৎ দিয়ে দিলে কাগজে। রেলের আপিসকে আর রেলের আপিস বলে চেনা যায় না। অন্য চেহারা হয়ে গেছে রাতারাতি। সবাই মিলিটারি—সবাই সেপাই। তালপাতার সেপাই সব। টাকার দাস। সুধীরবাবু, মধু, রঞ্জিতবাবু, পালবাবু—কাউকেই আর চেনা যায় না। মাদ্রাজ আর কলকাতা—রেঙ্গুনে বোমা পড়বার পরই চেহারা বদলে গেল। দলে দলে দুটো শহরের লোক পালাচ্ছে। শহরের লোক সব হাওড়া আর শেয়ালদ' স্টেশনের দিকে ছুটছে। ছেলেরা চুপ-চাপ বসে থাকে। স্কুল কলেজ বন্ধ, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। সমস্ত পৃথিবীতে যেন মানুষ নিরাশ্রয়ের মত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটছে।

—তাহলে তুমি কি ভিক্টরি চাও না?

ভিক্টরি! কাদের ভিক্টরি, কীসের ভিক্টরি! কেন ভিক্টরি চাইবে দীপঙ্কর। যদি মানুষের জয় হয় তো নিশ্চয়ই দীপঙ্কর সে-দলে থাকবে। কিন্তু কই, পাঁচ বছর ধরে চায়নার ওপর বোমা ফেলেছে জাপান, তবু চাইনিজরা তো পালায়নি! গ্রেট ব্রিটেনের ওপর জার্মানী তো কত বোমা ফেলেছে, কই, এমন করে তো ইংরেজরা পালায়নি সেখান থেকে! কেন তবে কলকাতার লোক পালায়! কেন তারা অসহায় বোধ করে! কেন তারা অভিভাবকহীন হয়ে গ্রামে মফঃস্বলে গিয়ে প্রাণের ভয়ে লুকোয়।

সন্তোষ-কাকা সেদিন এল। একেবারে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে ঢুকলো। দীপঙ্কর তখন আপিসে যাচ্ছে।

সন্তোষ-কাকা বললে—তুমি তো আমাদের যেতে দিলে না রসুলপুরে, এখন এদিকে কী কান্ড হলো দেখছো তো?

দীপঙ্কর বললে—কী কান্ড?

—কেন, তুমি জানো না কী কান্ড? তুমি জানো না? আমার সঙ্গে আবার চালাকি হচ্ছে?

দীপঙ্কর একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—কী বলতে চান, আপনি সোজা করে বলুন আমাকে?

—সোজা করে বলুন মানে? আমি কি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করছি বলতে চাও? মানুষের প্রাণ নিয়ে ইয়ারকি করার সময় এইটে? আমরা গরীব লোক বলে আমাদের প্রাণের কি দাম নেই ভেবেছ?

—তার মানে?

সন্তোষ-কাকা বললে—তোমার না-হয় আপিস আছে, যদি বোমা পড়ে তো আমরা কোথায় থাকবো শুনি? আমরা কোথায় থাকবো? আমরা বাপ-বেটিতে বেঘোরে মারা যাবো, এই কি তোমার মনোবাঞ্ছা?

দীপঙ্কর এতক্ষণে বুঝতে পারলে। বললে—কিন্তু বোমা পড়লে দেশে পালিয়ে গিয়েই কি বাঁচতে পারবেন কাকাবাবু?

—তোমায় আর অত দরদ দেখাতে হবে না বাবাজী, খুব দরদ দেখিয়েছ। তোমার নিজের রান্না-খাওয়া চলে যাচ্ছে কিনা, তাই আর উচ্চবাচ্য করছো না, এদিকে যে পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল, পাড়ায় যে আর কেউ নেই—আমরা কি মরতে এসেছি এখানে?

দীপঙ্করের উত্তর দেবার আগেই সন্তোষ-কাকা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু আর আমায় রাখতে পারবে না তুমি এই বলে রাখছি, আর আমায় ধরে রাখতে পারবে না—আমার মেয়ে আর তোমার আপিসের পিণ্ডি রাঁধতে পারবে না—এই বলে দিলুম—

দীপঙ্কর বললে—তা ভাত রান্নাটা তো বড় কথা নয় কাকাবাবু, আমার কাশীই ভাত রাঁধতে পারবে—আপনারা আরাম করে থাকুন না এখানে—বিপদ হলে তো আর একলা আপনার হবে না, সকলেরই হবে! দেশে গিয়ে কী করবেন?

সন্তোষ-কাকা বললে—তার মানে? দেশে গিয়ে কী করবো? তুমি তো বেশ বললে, এদিকে আমার মেয়ের বয়েস হচ্ছে না? লড়াই যদি এখন দশ-বছর চলে তো আমার মেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকবে! তার বিয়ে দিতে হবে না?

দীপঙ্কর বললে—বিয়ের জন্যে অত ভাবছেন কেন? আমি তো আছি—

সন্তোষ-কাকা এবার রেগে উঠলো। বললে—দেখ, খবরদার বলছি আমার সঙ্গে ইয়ারকি কোরো না, তোমার সঙ্গে আমার ইয়ারকির সম্পর্ক নয়—জানো, আমি রসুলপুরের দত্ত?

বলে ঘর থেকে তেড়ে-মেরে বেরিয়ে গেল সন্তোষ-কাকা। যাবার সময় বলে গেল—আমি দেখাচ্ছি তোমার ইয়ারকি দেওয়া, আমার সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া আমি দেখাচ্ছি—

বলে চিৎকার করে শাসাতে শাসাতে সন্তোষ-কাকা একতলায় নেমে এল। তারপর সোজা উঠোন পেরিয়ে একেবারে রান্নাঘরে।

—এই ক্ষিরি, ক্ষিরি, আয় ইদিকে—হাতা-বেড়ি রাখ্ তো—রাখ্—

ক্ষীরোদা রান্না করছিল। হঠাৎ সন্তোষ-কাকা হাতা ধরে টান দিলে। বললে—রাঁধতে হবে না আর—

ক্ষীরোদা প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বললে—বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

সন্তোষ-কাকা বললে—না, পাগল হইনি, তবে পাগল হতে আর দেরি নেই, তুইও পাগল হয়ে যাবি, আমিও পাগল হয়ে যাবো! ভেবেছে কী সব? আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে? আমার ক্ষমতা নেই? আমি সবাইকে দেখিয়ে দেব রসুলপুরের সন্তোষ দত্ত কী করতে পারে? আমি লঙ্কাকান্ড বাধিয়ে দিতে পারি—তা জানিস্, আমি কিছু বলিনে বলে তাই—

ক্ষিরি খানিকক্ষণ বাবার কথা শুনতে লাগলো। তারপর বললে—এমন করে চেঁচিও না তুমি—দুটো মুড়ি দিচ্ছি, খাও বসে বসে—

—কী? মুড়ি দিয়ে তুই আমার মুখ বন্ধ করতে চাস? খাবো না আমি মুড়ি—আমি চুপ করবো না, আমি আজ এর একটা হেস্তনেস্ত করবোই—রাখ তুই হাতা-বেড়ি, চল্ আমার সঙ্গে,—চল্—

ক্ষিরিকে সন্তোষ-কাকা যত টানে, ক্ষিরিও তত ভয়ে পেছু হাটে।

ক্ষিরি বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? কোথায় যাবো?

সন্তোষ-কাকা তখনও হাত ছাড়েনি। বলে—চল্, রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করবো তবু এখানে থাকবো না, ও ভেবেছে আমার থাকবার জায়গা নেই, এ-বাড়ি ছাড়া আমার গতি নেই—

—কিন্তু তা বলে এই অবস্থায় যাবো?

—হ্যাঁ, যা বলছি শোন্—

—এখনও যে খাওয়া-দাওয়া হয়নি তোমার? তুমি ভাত খাবে না?

সন্তোষ-কাকা বললে—আমি পিণ্ডি খাবো না, উপোস করবো, তবু এখানে থাকবো না—একদিন না-খেলে কী হয় শুনি? একদিন না-খেলে কী হয়? মরে যায় লোক? মরে যায় না। তুই চলে আয়—

ক্ষিরিকে টানতে টানতে সন্তোষ-কাকা প্রায় উঠোনের মধ্যেখানে এসে হাজির হয়েছে। তখনও ছাড়ে না।

হঠাৎ দীপঙ্কর ওপর থেকে শব্দ পেয়েই একেবারে সিঁড়ি দিয়ে নিচের নেমে এসেছে। একেবারে সন্তোষ-কাকার হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—করছেন কী? করছেন কী কাকাবাবু? হাত-টানাটানি করছেন কেন? ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—

সন্তোষ-কাকার হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে দিতেই, সন্তোষ-কাকা দীপঙ্করের দিকে কেমন কট্‌মট্ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—তুমি আমার গায়ে হাত দিলে শেষকালে? শেষকালে তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে হেনস্থা করলে? আচ্ছা দেখাচ্ছি—দাঁড়াও—

বলে আর কথাবার্তা নেই, একেবারে চিৎকার করতে করতে লাফাতে লাফাতে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রাস্তার বাইরেও সন্তোষ-কাকার চিৎকার শোনা গেল—আচ্ছা দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, মজা টের পাওয়াচ্ছি আমি—

তারপর আর সন্তোষ-কাকার গলা শোনা গেল না।

সেই উঠোনের ওপরেই দীপঙ্কর আর ক্ষীরোদা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যেন দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সন্তোষ-কাকার কাণ্ড থেকে।

দীপঙ্কর ক্ষীরোদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—তুমি কিছু ভেবো না, কাকাবাবু খিদে পেলেই বাড়ি ফিরে আসবেন—তুমি ভেবো না কিছু—

খিদে পেলে যে সন্তোষ-কাকা বাড়ি ফিরে আসবে, তা ক্ষীরোদা জানতো। কিন্তু এও জানতো যে তার খেয়ালী বাবা খেয়ালের ঝোঁকে সারাদিন উপোস করেও কাটিয়ে দিতে পারে। ক্ষীরোদা তার বাবাকে ভাল করেই চিনে নিয়েছিল তার এতটুকু জীবন-পরিধির মধ্যে। বাবা যেমন খেতে পটু, তেমনি না-খেয়েও যে পটু, সে-খবর বাইরের কেউ না-জানুক, ক্ষীরোদা জানতো। জানতো বাবা যখন রাগ করে, সে বড় কঠিন রাগ। তখন সে-রাগে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। আবার যখন ভালবাসে, তখন সে ভালবাসা বুঝি কখনও অমন করে পরকে আপন করেও নিতে জানে না। আরো জানতো বাবা গ্রামের লোক বটে, কিন্তু গ্রামেও বুঝি অমন লোক দু'টি পাওয়া যাবে না। তাই গ্রামেও বাবা টিকতে পারেনি, শহরেও টিকতে পারলো না।

তারপর এক সময় আরো বেলা হলো। বাবা এল না। দীপঙ্কর আপিসে চলে গেল খেয়ে-দেয়ে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে কাশীও খেয়ে নিলে। কাশী জিজ্ঞেস করলে—তুমি খাবে না দিদিমণি?

ক্ষীরোদা বললে—না—

কাশী বললে—কাকাবাবুকে একবার খুঁজতে বেরোব?

ক্ষীরোদা বললে—একবার তুমি যেতে পারো তো ভালো হয়—বুড়ো মানুষ তো—

কাশী বললে—কোথায় দেখবো? কোন্ দিকে যেতে পারেন?

ক্ষীরোদা বললে—আমি কি কোনওদিন বাইরে বেরিয়েছি এখানে যে বলবো! কোথায় আর যাবে বাবা, কাছেই হয়ত আছে কোথাও—দেখ না বাইরে গিয়ে—

কাশী বেরোল। ক্ষীরোদা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দিকে চেয়ে। রাস্তাটা নিঝুম হয়ে আছে। দুপুরের কলকাতা শহর। কয়েকমাস হলো রাস্তাটা আরো নিঝুম হয়ে গেছে। গলিটার ওধারে একটা নর্দমা। তার ওপাশে বেশি দূর আর নজর চলে না। একটা বাড়ির আড়ালে রাস্তাটা কোথায় গিয়ে ট্রাম-রাস্তায় ঠেকেছে—কিছুই জানে না ক্ষীরোদা। শুধু কর্কশ ঘড়-ঘড় আওয়াজ কানে আসে। দু'একটা বাড়ির ঝি-চাকর এধার থেকে ওধারে যায়। পাশের বাড়ির একটা বুড়ী-ঝি যাচ্ছিল। ক্ষীরোদা আস্তে আস্তে ডাকলে। বললে—ও মেয়ে শুনছো?

—কী মা? কাছে এল বুড়ী-ঝিটা।

ক্ষীরোদা বললে—তুমি কোন্ দিকে গিয়েছিলে গা? আমার বাবাকে দেখেছ?

বুড়ী-ঝিটা অবাক হয়ে তাকালো। বললে—তোমার বাবা? কই দেখিনি তো মা? কোথায় গেছে?

বুড়ী-ঝিটা আরো দু'একটা কথা বলে নিজের কাজে চলে গেল। ক্ষীরোদা গরাদে মাথা ঠেকিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখতে লাগলো। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। কাঠ ফেটে যাচ্ছে রোদের ঝাঁজে! আর একজন কে আসছিল। ক্ষীরোদার [illegible] না। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। বললে—হ্যাঁ গো, একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছ তুমি?

—বুড়ো মানুষ? কী-রকম বুড়ো মানুষ?

সত্যিই তো, বুড়ো মানুষ তো সংসারে কতই আছে, রাস্তাতেও কত ঘোরা-ফেরা করছে। কে আর তার সন্ধান করছে। কে তার বাবার নাম-ধাম চেহারা মুখস্থ করে রেখে দিয়েছে! ক্ষীরোদা আরো অনেকক্ষণ ধরে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মাথার ওপরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লো। চারটে বাজলো ঘড়িতে। পাঁচটা বাজলো, ছ'টা বাজলো। সন্তোষ-কাকা আর ফিরে এল না।

লক্ষ্মীদি সকালবেলাই ঘুম থেকে উঠেছে। সকাল থেকেই তার বড় তাড়া। দাতারবাবুও তৈরি হয়ে নিয়েছে। সকাল থেকেই লক্ষ্মীদির দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। সকালবেলাই চা চড়ায় কেশব। চা মুখে পড়লেই লক্ষ্মীদির আর জড়তা থাকে না। আগের রাত্রে দেরি করে ঘুমোলেও চায়ের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

বিছানায় শুয়ে-শুয়েই লক্ষ্মীদি এপাশ-ওপাশ করে।

দাতারবাবু সেজে-গুজে ঘরে এসে বলে—কী হলো, এখনও ওঠোনি?

লক্ষ্মীদি বললে—ক'টা বাজলো?

দাতারবাবু বললে—পাঁচটা—

—এখনও যে চা দিলে না কেশব?

দাতারবাবু চিৎকার করে ডাকে—কেশব, কেশব—শিগগির চা দাও—

খানিক পরে সুধাংশু এসে হাজির। সুধাংশুও সকাল-সকাল উঠেছে আজ। উঠেই চলে এসেছে।

বললে—মিসেস দাতার, এত দেরি যে আপনার?

লক্ষ্মীদি বললে—কালকে তুমি বড্ড বেশি খাইয়ে দিয়েছিলে সুধাংশু—

কেশব ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিতেই সমস্ত জড়তা কেটে গেল শরীরের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। বলে—তুমি বোস সুধাংশু একটু, আমি তৈরি হয়ে আসছি—

দাতারবাবু তৈরি হয়েই বসেছিল। সুধাংশু বললে—সাতটায় প্লেন আসবে, এখনও তো টাইম আছে—

দাতারবাবু বললে—আমার সেই ভোর চারটেতেই ঘুম ভেঙে গেছে সুধাংশুবাবু,—আমি অনেকক্ষণ আগে থেকে তৈরি—

—আজকাল কেমন আছেন আপনি মিস্টার দাতার?

দাতারবাবু বললে—এখন আর কোনও কষ্ট হয় না—আগে মাথাটা কেমন করতো, আজকাল তাও সেরে গেছে—

সুধাংশু বললে—তবু ওষুধটা এখনও খেয়ে যান—ওষুধ ছাড়বেন না—

কোথা থেকে যে সুধাংশু ওষুধ এনে দেয়! যে ওষুধ বাজারে কোথাও পাওয়া যায় না, সুধাংশু একটা টেলিফোন করলেই হাতের কাছে এসে যায় সেই

ওষুধ। শুধু ওষুধ নয়, সব কিছুই সুধাংশুর হাতের নাগালের ভেতরে। যে হুইস্কি বাজারে ব্ল্যাকে আশি টাকা নব্বই টাকা, সেই হুইস্কি পঁয়তাল্লিশ টাকা ফেললেই চলে আসে সুধাংশুর কাছে। সুধাংশু বলে—আমাকে শুধু আপনি বলুন না আপনার কী চাই, আমি এনে দিচ্ছি। হরলিকস্ নেবেন? বাঘের দুধ নেবেন? খাঁটি ঘি নেবেন?

এই গড়িয়াহাটের এই বাড়িটা কি এমনি ছিল আগে? দীপঙ্কর একদিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসে প্রথমে চিনতেই পারেনি। এ কী বাড়ি? এ কার বাড়ি? বিকেল বেলা তখন। দীপঙ্কর বলেছিল—এ হঠাৎ কী হলো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—বাড়িটা আমি কিনলুম যে!

—তুমি এই বাড়ি কিনলে?

দীপঙ্করের যেন বিশ্বাস হবার কথা নয়। যে-বাড়িতে একদিন ভাড়াটে হয়ে এসেছিল, সেই বাড়ির মালিক হয়ে বসেছে লক্ষ্মীদি। বাইরে থেকে একেবারে সমস্ত বাড়িটার ভোল বদলে গেছে। নতুন কনক্রীটের হাল ফ্যাশানের বাড়ি। সামনে গ্রীলের গেট। লম্বা টাওয়ার। গ্লাস-ফিটিং আঁটা উইনডো।

দীপঙ্কর বলেছিল—এত সিমেন্ট কোথায় পেলে এখন?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—কেন, সুধাংশু আছে আমার, ভাবনা কী?

—তা কত দিয়ে বাড়িটা কিনলে?

সত্যিই, লক্ষ্মীদির অনেক সাধ ছিল জীবনে। স্বামী হবে, সংসার হবে, টাকা হবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, ছেলে হবে। সব হয়েছে। সব হয়েছে লক্ষ্মীদির। লক্ষ্মীদি যা কিছু চেয়েছিল, সমস্ত পেয়েছে। আর কিছু হতে বাকি নেই।

—এখন তোমার ছেলের কোন্ ক্লাশ হলো?

হঠাৎ যেন মনে পড়লো। বললে—মানস? মানস তো আসছে রে কলকাতায় —তোকে বলতে ভুলে গেছি—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—জানিস দীপু, সেই ছোটবেলা থেকে মানসকে দূরে সরিয়ে রেখেছি—একদিনের জন্যে কাছে আনতে পারিনি। বরাবর কষ্ট করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে—কিন্তু কাছে এনে রাখতে কখনও সাহস পাইনি—

—কেন?

লক্ষ্মীদি গলা নিচু করে বলেছিল—ছি, তুই বলিস কী—আমি মা হয়ে কি ছেলেকে এখানে আসতে বলতে পারি কখনও? এই জুয়া হুইস্কি আর এইসব পাপের মধ্যে?

দীপঙ্করের চোখের সামনে লক্ষ্মীদির যেন আর এক রূপ ফুটে উঠেছিল।

লক্ষ্মীদি আরো বলেছিল—আমি তো জানি আমি কী! আমি তো জানি

আমি কী ভাবে টাকা রোজগার করেছি, কীভাবে শম্ভুকে সারিয়ে তুলিয়েছি, কীভাবে ছেলে মানুষ করেছি—তুইও তা কিছু কিছু জানিস তো! তাই তো ছেলেকে বরাবর বাইরেই রেখেছিলাম—

—তোমার ছেলেকে আমি কখনও দেখিনি, লক্ষ্মীদি!

—দেখবি কী করে? আমিই কি দেখেছি? শুধু মাঝে মাঝে কয়েকবার গিয়েছিলাম ছেলেকে দেখতে। তার ভেকেশনের সময় পর্যন্ত তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছি। তবু এখানে আসতে দিইনি। লিখেছি—তোমার বাবার অসুখ, এখানে এলে তোমার অসুবিধে হবে। কিন্তু এমন করে আর কতদিন আটকে রাখতে পারবো? একদিন তো মানস বড় হবে, একদিন তো মানস সব বুঝতে শিখবে, সব জানতে পারবে, তখন?

দীপঙ্কর এ-কথার কিছু উত্তর দিতে পারেনি।

তারপর লক্ষ্মীদি আবার বলেছিল—এবার মানস লিখেছে—এবার এখানে আসবেই—

দীপঙ্কর বলেছিল—এখন তো তোমার সব হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, এখন দাতারবাবুকে দিয়ে আবার বিজনেস্ করাও না—আবার একটা ব্যবসা ফাঁদো না—সেই আগেকার মত অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসা—

লক্ষ্মীদি বলেছিল—এখনও তো শম্ভুই ব্যবসা করছে। এখন তো শম্ভুর নামেই কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে সুধাংশু—। আসলে এ-সবই তো সুধাংশুর দেওয়া, কিন্তু নামটা তো শম্ভুর—

তারপর হঠাৎ দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখিয়ে বলেছিল—ওই দ্যাখ্, ওই মানসের ছবি—

দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে আঁটা ফোটোগ্রাফ ঝুলছিল। দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়ে দেখলে! কী আশ্চর্য! এমন চমৎকার ছেলে লক্ষ্মীদির। কী চমৎকার বড় বড় চোখ। চোখও যে কথা বলতে পারে, ছবিখানা না দেখলে যেন বোঝা যায় না।

—সুধাংশু বলছিল মানসকে ওখান থেকেই লন্ডনে পাঠিয়ে দিতে। অক্সফোর্ড কিম্বা কেমব্রিজে কোথাও পড়ুক গিয়ে।

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু তুমি কি থাকতে পারবে ছেলেকে অতদূরে পাঠিয়ে?

—না পারলেও তো পারতে হবে। এতদিনই বা পারছি কী করে?

—তাহলে?

—কিন্তু মানস শুনবে না। আমাকে চিঠি লিখেছে কলকাতায় এবার আসবেই। এখানে বাড়িতে আমার কাছে থাকবে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কবে আসবে?

—এই মার্চের শেষে!

এই সেই মার্চের শেষ। সকাল সাতটার প্লেনে আসছে মানস। লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু, সুধাংশু সবাই তৈরি, সবাই আজ আনতে যাবে।

লক্ষ্মীদি তৈরি হয়ে এল। ডার্ক গ্রীন রং-এর ব্লাউজের ওপর লাইট ইয়েলো কলারের শিফন শাড়ি।

সুধাংশু বললে—রেডি?

—রেডি!

হঠাৎ লক্ষ্মীদির কী যেন একটা কথা মনে পড়লো। এতদিন পরে খোকা আসছে। মা'র কাছে আসছে।

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়াও সুধাংশু, আমি আসছি—এক মিনিট—

বলে লক্ষ্মীদি আবার পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ঘরে এসে ঢুকেছে। বললে—চলো চলো,আর টাইম নেই—

বলে নিজের রিস্ট-ওয়াচটা একবার দেখে নিলে।

সুধাংশু তখন যেন সামনে ভূত দেখছে। দাতারবাবুও অবাক হয়ে গেছে। সুধাংশু বললে—এ কি, শাড়িটা বদলে এলেন যে মিসেস দাতার?

মিসেস দাতারের সত্যিই তখন অন্য চেহারা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শাড়ি ব্লাউজ সব বদলে এসেছে। সেই ডার্ক গ্রীন ব্লাউজ আর লাইট ইয়েলো শাড়ির বদলে পরে এসেছে একটা সাদা পপলিনের ব্লাউজ আর শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি।

সুধাংশু বললে—এ কী করলেন মিসেস দাতার? সে শাড়িটা বদলে এলেন কেন? রঙিন শাড়িতেই তো আপনাকে বেশি মানায়—

লক্ষ্মীদি বললে—ছি, আমার লজ্জা করছিল বড্ড—

সুধাংশু তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—না না সুধাংশু, ছেলেকে আনতে অত সাজ-গোজ করতে কেন কেমন লজ্জা করছিল—

—কেন তাতে কী হয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—না সুধাংশু, আমি যে তার মা—

তারপরে গাড়িতে উঠেই লক্ষ্মীদি বললে—চলো, আগে দীপুর বাড়িতে যাই, দীপুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো, ও-ও মানসকে দেখবে বলেছিল—

সেদিনও এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশান থেকে সুধীরবাবু এসে মিস্টার ঘোষালের সামনে ফাইলটা খুলে দাঁড়ালো।

বললে—স্যার, সেই মিস্ মাইকেলের কেসটা—

মিস্টার ঘোষাল কাজ করতে করতে বললে—নট নাউ—

—স্যার অনেকদিন দেরি হয়ে গেল—

মিস্টার ঘোষাল আবার গর্জন করে উঠলো—নট নাউ—

সুধীরবাবুর আর সামনে দাঁড়াবার সাহস হলো না। একেবারে ঘরের বাইরে এসে বাঁচলো। ঘরের বাইরে আসতেই দ্বিজপদ বললে—কেমন মেজাজ দেখলেন বাবু সায়েবের?

সুধীরবাবু বললে—তোর সাহেবের মেজাজের বালাই নিয়ে এবার আমরা মরে যাবো দ্বিজপদ—এবার সমস্ত আপিসটাই মারা যাবে তোর সাহেবের জন্যে—! কবে তোর সাহেব নিজে মারা যাবে বলতে পারিস?

দ্বিজপদ বললে—শালা আমার সায়েব নয় তো শুয়োরের বাচ্চা—

বাইরে মুখে যাই বলুক, মনে মনে কিন্তু দ্বিজপদ সাহেবের দীর্ঘ-জীবনই কামনা করে, বলে—জয় বাবা জগন্নাথ, জয় বাবা বলরাম, সাহেবকে আমার বাঁচিয়ে রেখ বাবা। আর ক'টা মাস বাঁচিয়ে রাখলে দ্বিজপদকে আর চাকরি করে খেতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে দেশে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে! আর ক'টা মাস, বেশি দিন নয়। মাত্র আর ক'টা মাস!

রেলের বাবুরা মিলিটারি পোশাক পরে প্যারেড করে—আর হাঁপায়। কখনও তো অভ্যেস নেই। ক'টা টাকার জন্যে বেমালুম দাসখৎ লিখে দিয়েছে বাবুরা। জীবনে কখনও ধুতি-কামিজ ছাড়া পরেনি, তারাই আবার পরেছে প্যান্ট-কোট।

দ্বিজপদ হাসে বাবুদের দিকে চেয়ে। বলে—দেবে যখন গরু খাইয়ে তখন বুঝবেন ঠেলাটা—

—কেন গরু খাওয়াবে কেন?

বাবুরা রেগে যায় দ্বিজপদর কথা শুনে। বলে—গরু ওমনি খাওয়ালেই হলো?

দ্বিজপদ বলে—তা বাবু, লড়াইয়ে গেলে খাওয়াবে না? লড়াইতে নিয়ে গিয়ে কি কালিঘাটের পাঁঠার মাংস খাওয়াবে ভেবেছেন—

সত্যিই, বাবুদেরও ভয় লেগে গিয়েছে। দুটো টাকার জন্যে শেষ কালে হয়ত জাতটা খোয়াতে হবে। দ্বিজপদর কী? দ্বিজপদর কিসের ভাবনা! ঘোষাল-সাহেব যদ্দিন আছে, তদ্দিন মজা লুঠে নাও। তারপর বুঝবে ঠেলা। দ্বিজপদ ছাড়া আর সবাই মিলিটারিতে নাম সই করেছে। ট্র্যাফিক আপিসে এক দ্বিজপদ সই করেনি। আর সই করেনি সেন-সাহেব। সেন-সাহেব তখনও আপিসে আসেনি। একজন বাঙালীবাবু এসে মধুকে জিজ্ঞেস করলে—সেন-সাহেব আছে?

মধু বললে—না—

—কখন আসবে সাহেব?

মধু বললে—আসবে দেরিতে—আসতে দেরি হবে সায়েবের—

লোকটা তখনও ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। কোণের দিকে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। তার ওপর বসলো গিয়ে।

মধু বললে—আপনি বরং কাল আসবেন বাবু, আজকে দেখা হবে না—

—কেন? আজকে কী হলো?

—এখন অনেক কাজ সায়েবের। আপিসে এসে কারো সঙ্গে দেখা করেন না আজকাল।

লোকটা বললে—আমার সঙ্গে দেখা করবে—সেন-সাহেব আমার বন্ধু, এক সঙ্গে এক ক্লাশে এক ইস্কুলে আমরা পড়েছি এককালে—

লোকটার কথা শুনে মধু যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সেন-সাহেবের বন্ধু—এ কেমন বন্ধু আবার!

সেন-সাহেবের আপিসে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বেলা যখন বারোটা তখন আপিসে এসে হাজির দীপঙ্কর। সমস্ত সকালটা কেটেছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। বর্মা ইভাকুয়ীজ আপিসের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিনও খুব ভিড়।

দীপঙ্কর রসিদটা দিতেই ভেতরের ক্লার্কটা বললে—ভুবনেশ্বর মিত্র?

তারপর ঠিকানা দেখলে। অনেক কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি করলে। অনেক ফাইল, অনেক পুঁথি অনেক নথি।

তারপর বললে—না স্যার, এখনও ট্রেস পাওয়া যায়নি—

দীপঙ্কর বললে—এর আগে অনেকবার এসে ফিরে গিয়েছি, একটু দেখুন ভাল করে—

ক্লার্কটা বললে—খুব ভাল করে দেখেছি স্যার, যাদের ট্রেস পাওয়া গেছে তাদের লিস্টও দেখেছি, আর যাদের ট্রেস পাওয়া যায়নি তাদের লিস্টও দেখেছি, কোনও লিস্টেই তার নাম নেই—

তারপর লম্বা একখানা লিস্ট দেখিয়ে বললে—আর এই দেখুন ক্যাজুয়েল্টি লিস্ট—যারা বোমা পড়ে মারা গেছে, তাদের লিস্টেও ও নাম নেই—আপনি পরে আর একদিন আসবেন—

দীপঙ্কর সেখানে আর দাঁড়ায়নি। তারপর সেখান থেকে সোজা আপিসে আসতেই নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কে যেন পাশ থেকে ডাকলে—দীপু—

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে।

—কে?

লোকটা এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়ালে। বললে—আমায় চিনতে পারলে না?

—কে তুমি?

—আমি লক্ষ্মণ সরকার। সেই কালিঘাট স্কুলের ইনফ্যান্ট ক্লাশে এক সঙ্গে—

—এসো এসো, তুমি লক্ষ্মণ!

আশ্চর্যই বটে! আশ্চর্য ঘটনাই বটে! সেই ছোটবেলাকার লক্ষ্মণ সরকার! সেই ছোটবেলায় যখন-তখন মাথায় চাঁটি মারতো! রাস্তায়, পথে, বাজারে সব জায়গায় অপমান-অত্যাচারের একশেষ করতো যে লক্ষ্মণ, সেই আজ এসেছে দীপঙ্করের কাছে!

ততক্ষণে দীপঙ্কর নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসেছে। বললে—বোস বোস —কী মনে করে?

—তুমি আমায় চিনতে পেরেছ তো ভাই?

দীপঙ্কর বললে—খুব চিনেছি—হঠাৎ কী জন্যে?

লক্ষ্মণ বললে—ভাই, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—ছোটবেলাকার কথা সব ভুলে যাও—আমিও এখন অনেক বড় হয়েছি, সে বয়েসও নেই, তুমিও এখন অনেক বড় হয়ে গেছ—

—আসল কথাটাই বলে ফেল না।

লক্ষ্মণ বললে—আমায় একটা চাকরি করে দিতে হবে ভাই—

চাকরি! চমকে উঠলো দীপঙ্কর। সেই লক্ষ্মণ সরকার আজ এত লোক থাকতে চাকরি চাইতে এল তার কাছে! এত সাহস হলো তার! একটু লজ্জাও করছে না দীপঙ্করের কাছে চাকরি চাইতে! সেই লক্ষ্মণ সরকার আজ নিজে এসে তার কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীপঙ্করের মনে হলো এক চড় কসিয়ে দেয় লক্ষ্মণ সরকারের গালে। বলে—মনে নেই? মনে নেই সেই সব দিনের কথা! যেদিন রাস্তায় অকারণে অপমান করেছে, বই কেড়ে নিয়েছে, খাতা কেড়ে নিয়েছে, মেডেল কেড়ে নিয়েছে, খাবার কমলালেবু, কদমা কেড়ে নিয়েছে। মনে নেই!

কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে দীপঙ্কর। আত্মসম্বরণ করে নিলে হঠাৎ।

লক্ষ্মণ সরকার তখনও মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে প্রতীক্ষা করছিল।

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ পরে বললে—আচ্ছা যাও—দেখি আমি কী করতে পারি—

লক্ষ্মণ বললে—আমি ভীষণ বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছি ভাই—আমি একেবারে খেতে পাচ্ছি না—

দীপঙ্কর বললে—তুমি যাও এখন, পরে দেখা করো—

—কবে আসবো? আমি একটা দরখাস্ত এনেছিলাম, এই নাও—

দীপঙ্করের হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। বললে—চাকরি কি আমার হাতের জিনিস যে তুমি চাইলেই আমি দিয়ে দেব?

লক্ষ্মণ সরকার কী বলবে বুঝতে পারলে না। দরখাস্তখানা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ পরে দরখাস্তখানা হাতে তুলে নিলে। তারপর ছিঁড়েই ফেলতে যাচ্ছিল সেখানা। কিন্তু কী মনে হলো আবার রেখে দিলে টেবিলে। তারপর সুধীরবাবুকে ডাকলে।

সুধীরবাবু আসতেই দীপঙ্কর বললে—কোথাও ভেকেন্সি আছে ট্র্যাফিকে?

সুধীরবাবু কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—আছে স্যার—

—কোথায়?

—জার্নাল সেকশানে!

—জার্নাল সেকশানে ভেকেন্সি কোথায়?

সুধীরবাবু বললে—আজ্ঞে, গাঙ্গুলীবাবুর জায়গায় একটা টেম্পোরারী ভেকেন্সি আছে—গাঙ্গুলীবাবু তো অনেকদিন আসছেন না—তিনি সেই যে সেই কাশ্মীর চলে গিয়েছেন—

দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, এই ভদ্রলোককে ওই ভেকেন্সিতে রাখুন, যতদিন না গাঙ্গুলীবাবু আসেন—

—আর একটা কথা।

সুধীরবাবু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল।

দীপঙ্কর বললে—আর একটা কথা, মিস্ মাইকেলের ভেকেন্সিতে কোনও লোক নেওয়া হয়েছে?

সুধীরবাবু বললে—হ্যাঁ স্যর—

—কে? কাকে নেওয়া হয়েছে?

সুধীরবাবু বললে—মিস্টার ঘোষালের একজন ক্যান্ডিডেট—

—কে? নাম কী?

সুধীরবাবু বললে—মিসেস ঘোষ।

সেন-সাহেব একেবারে লাফিয়ে উঠেছে। কে মিসেস ঘোষ? কোন্ মিসেস ঘোষ? পুরো নাম কী?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল যেন। সুধীরবাবু সেন-সাহেবের মুখ দেখে ভয়ে আতঙ্কে একেবারে শিউরে উঠেছে।

—বলুন, বলুন কোন্ মিসেস ঘোষ?

—আজ্ঞে মিসেস সতী ঘোষ!

লক্ষ্মীদি ভেবেছিল অত ভোরে বোধহয় দীপু ঘুম থেকে উঠবে না। সকাল সাতটার প্লেন এসে পৌঁছোবে। এতদিন পরে, এত বছর পরে মানস আসছে। এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা অন্তত পৌঁছোতে লাগবে দমদমে। গাড়ির ভেতরে উঠেছিল দাতারবাবু আর লক্ষ্মীদি। আর গাড়ি চালাচ্ছিল সুধাংশু।

স্টেশন রোডের ঠিকানা সুধাংশু চেনে। অনেকবার মিসেস দাতারকে নিয়ে এসেছে।

ট্রাম রাস্তা থেকে মোড় ঘুরতেই দেখা গেল অনেক মানুষের ভিড় জমেছে দীপুদের বাড়ির সামনে।

সুধাংশু বললে—ওখানে অনেক ভিড় দেখছি মিসেস দাতার—

লক্ষ্মীদিও বুঝতে পারলে না। এত ভোরে ওখানে ভিড় কিসের! কিছু পুলিসও দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িটা কাছে যেতেই মেয়েলী গলার কান্না শোনা গেল যেন। কে যেন ভেতরে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। ভিড়ের মধ্যে সেই ভোরবেলাই দীপঙ্করের লম্বা চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল। স্পষ্ট দীর্ঘ চেহারা। আর তার পায়ের কাছেই যেন কার ক্ষত বিক্ষত শরীর মাটিতে শোয়ানো। দর দর করে রক্ত পড়ছে। আর পাড়ার লোকজন চাকর-বাকর-ঝি চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

লক্ষ্মীদির গাড়িটার শব্দ পেয়েই দীপঙ্কর মুখ ফিরিয়ে চাইলে।

সুধাংশু গাড়িটা থামাতেই লক্ষ্মীদি একেবারে ভিড় ঠেলে দীপঙ্করের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—এ কে দীপু?

দীপঙ্কর বললে—আমার এক কাকা—

—তোর তো কাকা ছিল না কখনও! কী হয়েছিল এঁর?

দীপঙ্কর বললে—মিলিটারি লরীতে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছেন—

—কখন হলো? কোথায়? কোন্ রাস্তায়?

দীপঙ্কর বললে—কাল সকাল বেলা বাড়ি থেকে রাগ করে না খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, কেউ খোঁজ পায়নি—এখন ভোর রাত্রে পুলিস নিয়ে এল—

লক্ষ্মীদি বলবার মত কোনও কথা খুঁজে পেলে না। সমস্ত জায়গাটা শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। বাড়ির দরজার আড়াল থেকে মেয়েটার আর্তনাদে আবহাওয়াটা কেমন মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে। সুধাংশু, দাতারবাবু, লক্ষ্মীদি সবাই বোবার মত একদৃষ্টে রক্ত মাখা নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে অপলক-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। দীপঙ্করের মুখেও যেন ভাষা ফুরিয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি আসি ভাই দীপু, আমার জরুরী কাজ আছে—আমার ছেলে আসছে আজ সাতটায়—

—কে? মানস?

—হ্যাঁ, দেরি হলে হয়ত অসুবিধে হবে তার, এত বছর পরে আসছে তো—তোকে নিয়ে যেতেই এসেছিলাম—তা—

দীপঙ্কর বললে—তাহলে এসো—

সবাই আবার গাড়িতে উঠলো। দীপঙ্কর বললে—তোমার সঙ্গেও আমার অনেক কথা ছিল লক্ষ্মীদি—

—কী কথা?

দীপঙ্কর বললে—পরে বলবো সব! সারা জীবনটার আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না লক্ষ্মীদি, এ কেন হয়? কেন হয় এমন কে জানে! কে বলে দেবে আমায়?

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—কেন রে? কী হলো?

দীপঙ্কর বললে—জানো, সতী আমাদের আপিসে চাকরি করতে ঢুকেছে—

—সে কী রে?

লক্ষ্মীদিও খানিকক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল দীপঙ্করের মুখের

দিকে। কিন্তু তখন আর বেশি কথা শোনবার সময় নেই। সুধাংশু গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে।

লক্ষ্মীদি যেতে যেতে বললে—পরে সব শুনবোখন, আসিস্ একদিন—

সেদিন সন্তোষ-কাকার সেই অপঘাত-মৃত্যুটা দেখে মনে হয়েছিল যেন শুধু সেটা অপঘাত-মৃত্যুই নয়, সে-মৃত্যু যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের প্রথম বলি। প্রথম হত্যা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ আরো বেধেছে। যুদ্ধের শেষ হয়নি পৃথিবীতে। মানুষ শিক্ষা পেয়েছে, সভ্যতা পেয়েছে, ধর্ম পেয়েছে, সমাজ পেয়েছে—সব পেয়েও মানুষ যে কিছুই পায়নি, সন্তোষ-কাকার মৃত্যু যেন তারই প্রথম প্রমাণ। সন্তোষ-কাকা কি পৃথিবীতে একজন! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তোষ-কাকারা আত্মবলিদান দিয়েছে মানুষের লড়াইতে। সন্তোষ-কাকারা জানেনি কী তাদের অপরাধ, আর কেনই বা তাদের এই শাস্তি! সন্তোষ-কাকারা বুঝতে পারেনি কে তাদের ভাগ্যবিধাতা, আর কী-ই বা তাঁর বিচার। শুধু কলকাতার এই পূর্ব-প্রান্তেই নয়, শুধু বাঙলা দেশের প্রান্তরে প্রান্তরেই নয়, শুধু ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর জলে স্থলে জনপদে-জনপদে সন্তোষ-কাকারা আত্মবলি দিয়েছে অকারণে। তারা জানতেও পারেনি কেন এই যুদ্ধ, কেন এই শত্রুতা। তারা জার্মানী দেখেনি, ইটালী দেখেনি, ইংল্যান্ড দেখেনি, আমেরিকা দেখেনি, জাপানও দেখেনি। তারা বোঝেনি কেন জার্মানী তাদের শত্রু, আবার কেন আমেরিকা তাদের বন্ধু। কিছু দেখতে পায়নি তারা শুধু দেখেছে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, শুধু দেখেছে প্রাণঘাতী মৃত্যু! মৃত্যুই সন্তোষ-কাকাদের সব প্রশ্নের নির্বাক উত্তর দিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুই সন্তোষ-কাকাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। যদি বেঁচে থাকতো সন্তোষ-কাকারা তাহলে হয়তো দীপঙ্করের মতই জানতে পারতো তাদের মৃত্যুর জন্যে মিলিটারি লরী দায়ী নয়, বোমা, বারুদ, রাইফেল, কিছুই দায়ী নয়। দায়ী আমেরিকার ডলার, দায়ী ইংলণ্ডের পাউন্ড, ইটালীর লিরা, জার্মানীর মার্ক, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জাপানের ইয়েন, আর ইণ্ডিয়ার টাকা!

সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা। ক্রমে আরো রাত হলো। আরো গভীর রাত। ফাঁকা হয়ে এল ভিড়। ফাঁকা হয়ে এল পৃথিবী। দীপঙ্করের পৃথিবীতে তখন সমস্ত নিস্তব্ধ। শুধু একতলার ঘরখানা থেকে একটানা একটা কান্নার আওয়াজ তখনও ক্ষীরোদার বুক চিরে বাইরে বাতাসের কানে এসে বিঁধছে।

অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু কাকে সান্ত্বনা দেবে? কে সান্ত্বনা চাইছে? শোকের প্রতিকার কেমন করে করবে দীপঙ্কর? পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শোকার্ত আত্মাকে সান্ত্বনার স্তোক দিয়ে দীপঙ্কর একলা কেমন করে ভোলাবে?

প্রত্যেক দিনের মত কাশী এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। প্রত্যেক দিনই

আসে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম-ভাগখানা নিয়ে পড়তে আসে। প্রথম পাতা থেকে আরম্ভ করে ক'দিনের মধ্যেই অনেকখানি শিখে ফেলেছে, মুখস্থ করে ফেলেছে। একটা স্লেটও কিনে দিয়েছে দীপঙ্কর। চমৎকার হাতের লেখা হয়েছে কাশীর। এই প্রথম-ভাগ শেষ করেই দ্বিতীয়-ভাগ ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে ধারাপাত।

কাশী বলে—ইংরিজী পড়াবেন না দাদাবাবু?

দীপঙ্কর বলে—সব পড়াবো তোকে, ইংরিজী ফার্স্ট-বুকও কিনে দেব, তুই পারবি তো ইংরিজী শিখতে?

আজ কিন্তু দীপঙ্কর নিজেই বারণ করলে। বললে—আজ থাক কাশী, আজকে আর পড়াতে ভালো লাগছে না—

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের পর বাড়ি এলেই দীপঙ্কর পড়াতে বসে কাশীকে। মনে হয় কাশীর মধ্যে দিয়েই দীপঙ্কর যেন নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলবে। দীপঙ্কর যা পায়নি, তাই পাবে কাশীর মধ্যে দিয়ে। দীপঙ্কর যা জানেনি, কাশীর মধ্যে দিয়েই তা জানবে। এই সংসার, মা'র এই নিজের হাতে গড়া সংসারকে কাশীকে দিয়ে যেন নতুন করে গড়ে তুলবে। দীপঙ্কর যে যন্ত্রণা পেয়েছে, কাশী যেন তা না পায়, কাশী যেন দীপঙ্করের না-পাওয়া সম্পদে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে! কিন্তু আজ আর ভালো লাগলো না কিছুই। সন্তোষ-কাকার মৃত্যু যেন বিকল করে দিলে সমস্ত চৈতন্যকে।

তারপর আরো রাত হলো। জীবনে কতবার শ্মশানে যেতে হয় মানুষকে। সেই শ্মশানেই আর একবার যেতে হয়েছিল আজ। শ্মশানে গেলেই যেন সেই পুরোন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের কাছাকাছি যেতে হয়। যেতে হয় একেবারে নিজের জীবনের ছোটবেলাকার কাছাকাছি। সমস্ত জীবনটাই পরিক্রমা করে আসতে হয়। ছোটবেলা থেকে এতখানি পথ যেন বড় ছোট, যেন বড় সঙ্কীর্ণ মনে হলো। যেন মাত্র এই সেদিন সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলো, এই সেদিন সে বড় হলো। বড় হলো আর দু চোখ ভরে দেখে নিলে পৃথিবীকে। কিন্তু কই, পৃথিবী কি দীপঙ্করের সঙ্গে এতটুকু এগিয়েছে? দীপঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ কি এতটুকু বড় হয়েছে?

বাড়িতে কেউ ছিল না। পাশের বাড়ির দু'একজন মহিলা এসে ক্ষীরোদার পাশে বসেছিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভোলাবারও চেষ্টা করেছিলেন। দীপঙ্করেরা শ্মশান থেকে এসেও শুনতে পেয়েছে ক্ষীরোদার অব্যক্ত কান্নার আওয়াজ। দীপঙ্করের মনে হলো—ও ক্ষীরোদা নয়, যেন ক্ষীরোদার গলার কান্নাই নয় ওটা। একটা অস্ফুট অপরিণত আর্তি, ধরিত্রীর অন্তঃস্থল ভেদ করে ওপরে উঠে আসছে অক্লান্ত ধারায়। বলছে—আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে শান্তি দাও, আমার দুঃখের ভার লাঘব করো তুমি—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগলো কান পেতে। তারপর এক সময়ে

নিচে নামলে। তারপর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষীরোদা তখনও দেখতে পায়নি।

দীপঙ্কর বললে—

বলতে গিয়েও কিন্তু থেমে গেল। এতদিন সন্তোষ-কাকার মেয়ে এ-বাড়িতে আছে, কিন্তু কখনও-মুখোমুখি একটা কথাও বলেনি কখনও। জিভ্‌টা কেমন আটকে গেল। কেমন করে কথা বলতে হবে তাই-ই যেন ভেবে পেলে না।

তারপর অনেক চেষ্টা করে বললে—কেঁদে তো কিছু লাভ নেই, যিনি গেলেন, তাঁকে তো কেঁদে ফেরাতে পারা যাবে না—

যেন মন্ত্রের মত কাজ হলো। হঠাৎ কান্না থেমে গেল ক্ষীরোদার।

দীপঙ্কর বললে—আজ রাতটা তুমি বরং ওপরে শোও, আমি নিচেয় শুচ্ছি—আমি কাল থেকে ঝি রাখবার ব্যবস্থা করছি একটা—

তারপর কাশীকে ডাকলে—কাশী—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা এক কাণ্ড করে বসলো। একেবারে হুড়মুড় করে দীপঙ্করের পায়ের ওপর মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আমায় আপনি আর যন্ত্রণা দেবেন না—

হঠাৎ ক্ষীরোদার এই ব্যবহারে দীপঙ্কর যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরোল না। আস্তে-আস্তে সেখান থেকে পা দু'টো সরিয়ে নিলে। না-জেনে ক্ষীরোদার মনের কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে কিছুই বুঝতে পারলে না। দীপঙ্করও হতবাক্, কাশীও হতবাক্। তারপর বিস্ময়ে লজ্জায় আতঙ্কে দীপঙ্কর আবার তার নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

* * *

সকাল দশটা থেকেই কানা-ঘুষো চলছিল। প্রথমে চুপি চুপি, তারপর প্রকাশ্যে। দ্বিজপদই প্রথমে দেখেছিল। লাল শাড়ি, কোঁকড়ানো চুল, সিঁথিতে সিঁদুর। ঘোষাল-সাহেবের গাড়ি থেকেই নামলো, তারপর সোজা ঘোষাল-সাহেবের সঙ্গেই ঢুকে পড়লো। তারপর এক কান থেকে আর এক কানে উঠলো কথাটা।

কে-জি-দাশবাবু নিজের চোখে দেখে এল। এসে বললে—ওহে, দেখে এলাম তোমাদের মিসেস ঘোষকে—

মিসেস ঘোষ নামটা ক'দিন থেকেই মুখে মুখে রটছিল। এতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই এই পোস্টে একচেটিয়া ছিল। এই প্রথমবার এল বাঙালী মেয়ে। একেবারে সিঁদুর-পরা বাঙালী হিন্দু মেয়ে। ট্র্যাফিক সেকশানেও কথাটা গিয়ে পৌঁছুলো। যারা ডেলি-প্যাসেঞ্জার, তারা একটু দেরি করে এসেছিল আপিসে। এসেই খবরটা শুনলে। বললে—কী রকম দেখতে?

এস্টাব্লিশমেণ্ট সেকশানে সুধীরবাবুর কাছেই বেশি ভিড়। সুধীর-

বাবু নিজে গিয়ে সই-সাবুদ করিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রথম চাকরির দিন। নাম-ধাম লেখা, অনেক রকমের ফর্ম্যালিটি আছে রেলের আপিসে। মিসেস ঘোষকে কিছুই করতে হয়নি। মিস্টার ঘোষাল নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিল সুধীরবাবুকে। সুধীরবাবুই নিজে এসে পার্সোন্যাল্ ফাইলে যা কিছু লেখবার দরকার সব লিখে নিয়েছে।

সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—এ'র কী ডেজিগ্‌নেশন লিখবো স্যার? স্টেনোগ্রাফার?

সতী বলেছিল—আমি তো শর্টহ্যান্ড জানি না—

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—লিখুন পি-এ। পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট্—

—তাহলে আপনার স্টেনোগ্রাফারের কাজ কে করবে?

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—টাইপিস্ট্ সেকশান্ থেকে একজন টাইপিস্ট দাও আমাকে—

তা সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। আসলে গভর্নমেণ্ট আপিসে সবই হয়। আইন মানতেও যতক্ষণ আইন ভাঙতেও ততক্ষণ। আইনের অত কড়াকড়ি বলেই, গভর্নমেন্ট আপিসে আইন অত ঢিলে। যেখানে আইন আছে, সেখানে আইনের ফাঁকিও আছে। সেই অস্‌বর্ন সাহেবের আমল থেকেই এইরকম চলে আসছে। মিস্টার ঘোষালেরা সমস্ত জানে। সুধীরবাবুরাও সমস্ত জানে। গাঙ্গুলীবাবুর প্রমোশনের বেলাতে আইনের কড়াকড়ি দেখানো হয়, আবার মিসেস ঘোষের চাকরির সময়ে আইনের ফাঁকটাও কাজে লাগানো হয়। আইন আছে বলেই আইন ভাঙার এত দরকার হয়। আর আইন ভাঙবার দরকার হয় বলেই আইন তৈরি করতে হয়। আসলে আইনটা কিছু নয়, স্বার্থসিদ্ধিটাই বড় কথা। আইনই যদি মানতে হবে তাহলে সুধীরবাবুকে অত মাইনে দিয়ে রাখা কেন? সুধীর-বাবুদের সৃষ্টিই হয়েছে আইন মানবার জন্যে ততটা নয়, যতটা আইন ভাঙার পথটা বাতলে দেবার জন্যে।

রঞ্জিতবাবু বললে—তাহলে এবার থেকে কি বাঙালী মেয়েও আপিসে ঢুকবে নাকি সুধীরবাবু?

সুধীরবাবু বললে—আমাকে বলছিস্ কেন তুই, আমি তো হুকুমের চাকর রে—

—তাহলে আড়াই শো টাকা গ্রেড্ কোন্ আইনে হয় সুধীরবাবু! শর্টহ্যান্ড জানে না কিছু না—

সুধীরবাবু বললে—হয় রে বাপু হয়, ঘোষাল-সাহেব বললে সবই হয়—ঘোষাল-সাহেবের ইচ্ছে হলে নতুন করে আইনও তৈরি হবে—

পাসবাবু সকালবেলাই দেখেছিল। ঘোষাল-সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই পাসবাবু মাটি পর্যন্ত মাথা নিচু করে বলেছিল—গুড মর্নিং স্যার—

মাথা তুলতেই দেখে সঙ্গে আর একজন মেয়েমানুষ। হয়ত বউ, কিংবা হয়ত

বউ নয়, বন্ধুর বউ। দরকার কী অত ঝঞ্ঝাটে। তাকেও মাথা নীচু করে নমস্কার করলে—গুড্ মর্নিং ম্যাডাম্—

রঞ্জিতবাবু জিজ্ঞেস করলে—কেমন চেহারা দেখলেন পাসবাবু?

পাসবাবু বললে—আহা যেন সাক্ষাৎ মা আমার—

—তা আপনি তাকেও গুড্ মর্নিং করতে গেলেন কেন?

পাসবাবু বললে—আরে বাবা, তোরা আজকালকার ছেলে কিছুই জানিস না, সব দেব্‌তাকেই খুশী রাখা ভালো, কখন কে বিগড়ে যাবে আর চাকরিটি চলে যাবে কিছু বলা যায়?

সমস্ত আপিসের কথা-বার্তাগুলো আপিসের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সব সেকশানেই ওই এক আলোচনা। ওই একই বিষয়বস্তু। এতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই একচেটিয়া কাজ চালিয়ে এসেছে আপিসে। তারা গাউন পরে, লিপ্‌স্টিক্ মেখে, হিল্ তোলা জুতো পরে খটাখট্ করে আপিসে এসেছে গেছে, কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারাও মেয়েমানুষ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়েও তারা বাঙালী পুরুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারেনি। এবার এসেছে খাঁটি বাঙালী মেয়ে! খাঁটি বাঙালী বাড়ির বউ!

—ও কী পাস সুধীরবাবু?

সুধীরবাবু বললে—বি এ পাস—

—কত বয়েস?

পার্সোন্যাল ফাইলে সবই লিখতে হয়! এজ্, এডুকেশন্, হাসব্যাণ্ডের নাম—সব কিছু।

—কাদের বাড়ির বউ? হাসব্যাণ্ডের নাম কী?

প্রথমে মিস্টার ঘোষাল ওসব লিখতে চায়নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যেমন ফাদারের নাম লেখবার নিয়ম নেই, তেমনি।

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—ও কলম্‌টা ব্ল্যাঙ্ক্ থাক্—

সুধীরবাবু তখনও ফাইলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সতীও চুপ করে বসেছিল। বললে—কেন, ব্ল্যাঙ্ক্ থাকবে কেন? লিখে নিন্ আপনি, আমি বলছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কেন, মিসেস ঘোষ, ও কলম্ এখনি ফিল্-আপ্ করবার দরকার নেই, পরে করলেও চলবে—

সতী বললে—না, লিখে নিন্ হাসব্যান্ড্ সনাতন ঘোষ,—ঠিকানা...

স্বামীর নাম, ঠিকানা, বংশ, কুলুজী সমস্তই লিখে নেওয়া হলো। সতী যেন নিশ্চিন্ত হলো সমস্ত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে। যেন দরকার হলে সে শাশুড়ীর নামও প্রকাশ করে দিতে কুণ্ঠিত হতো না। রেলের চাকরির খাতায় লেখা থাক্ কোন্ বংশের বউ, কার বউ, কার পুত্রবধূ, কোন্ প্রয়োজনে এখানে এই রেলের আপিসে চাকরি করতে আসতে বাধ্য হয়েছে। লোকে জানুক অগাধ টাকা থাকলেও কেন একজন মেয়ে কোন্ পরিচয়ে এসে রেলের চাকরিতে ঢোকে। এবং কোন্

প্রয়োজনে!

সতী বললে—আমি কোন্ ঘরে বসবো মিস্টার ঘোষাল?

মিস্টার ঘোষালের তখন কাজ আরম্ভ করবার কথা। আজকাল কাজের শেষ নেই মিস্টার ঘোষালের। বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মার্চেণ্ট্রা শ্লিপ দিয়েছে ভেতরে। সবাই চায় ওয়াগন্। সোনা নয়, রূপো নয়, হীরে নয়, মুক্তোও নয়। টাকা-কড়ি সম্মান প্রতিপত্তি কিছুই নয়। এমন কি ভগবানও নয়। শুধু ওয়াগন্। পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ একখানা ওয়াগনের জন্যে স্বর্গ-মর্ত্য চষে বেড়াচ্ছে। আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। শুধু ওয়াগন আর ওয়াগন। একখানা ওয়াগন পেলে ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম্ সমস্ত পাওয়া হবে।

দীপঙ্কর যখন আপিসে এসে পৌঁছুলো তখন সবাই এসে ঢুকছে আপিসে। প্রতিদিনের মত হাতে কলম তুলে নিয়েছে। ড্রয়ার থেকে কাগজ বার করে ক্লার্করা দুর্গা-নাম লিখতে শুরু করবে। তারপর ঢিমে চালে ফাইল আসবে, ফাইল যাবে, আর তারপর রেলের চাকা চলতে শুরু করবে। কোথায় কতদূরে রেল-লাইন, কোথায় লাইন-ক্লিয়ার, আর কোথায় ইঞ্জিন, কিন্তু এখানে এই হেড্-আপিসে বাবুদের কলমের কালি কতবার শুকোবে, বাবুদের চোখে কতবার ঘুম নেমে আসবে, কতবার অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে চা আসবে, কিন্তু ওয়াগন সাপ্লাই বন্ধ হবে না মিস্টার ঘোষালের। দশটা ওয়াগন যাবে মণিহারিঘাটে, বারোটা শিলিগুড়িতে, তিরিশটা ময়মনসিং-এ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মিস্টার ঘোষালের কলমের একটা খোঁচায় বেঙ্গলের একশোটা মার্চেণ্ট্ রাতারাতি কোটি-পতি হয়ে উঠবে!

কাজ তখন খুব চলছে সেন-সাহেবের ঘরেও। হঠাৎ মধু ঘরে ঢুকে একটা শ্লিপ্ দিয়ে গেল।

দীপঙ্কর কাজের মধ্যেও শ্লিপটা তুলে নিলে। বললে—কে দিয়েছে?

মধু বললে—নতুন মেমসাহেব—

নতুন মেমসাহেব! দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে পড়লে—ছোট শ্লিপ্। নিচেয় সই করেছে সতী। সতী লিখেছে—

'দীপু, আজ থেকে তোমাদের আপিসে চাকরি নিয়েছি। কখন তোমার হাত খালি থাকবে? আমি একবার দেখা করতে চাই।

ইতি—সতী—

শ্লিপটা পড়েই দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বাইরে এসেই সোজা গেল মিস্ মাইকেলের ঘরের দিকে। চাকরির প্রথম দিকে এই ঘরেই বসতো একদিন দীপঙ্কর। দরজাটা বন্ধ ছিল। সেন-সাহেবকে দেখেই দ্বিজপদ এগিয়ে এল। বললে—সেলাম হুজুর—

দীপঙ্কর বললে—এ-ঘরের দরজা বন্ধ কেন?

—ঘোষাল-সাহেব বন্ধ করে দিয়েছে হুজুর! সাহেবের ঘরের ভেতর দিয়ে রাস্তা, নতুন মেম-সাহেব এসেছে ভেতরে—

মিস্টার ঘোষালের ঘরের ভেতর দিয়েই দীপঙ্কর ঢুকছিল। তারপর ডান দিকে মিস্ মাইকেলের ঘরে যাবার রাস্তা। ঘরে তখন একজন মার্চেণ্ট্ বসে। আপিসের নানা কাজে পাবলিক এসে দরবার জমিয়েছে ঘরে।

—ওয়েল্!

মিস্টার ঘোষাল মুখ তুলে দীপঙ্করকে দেখেই রেগে আরো কালো হয়ে উঠলো। বললে—ওখানে কী চাও সেন? ওদিকে কী?

দীপঙ্কর বললে—মিসেস ঘোষ এখানে আছে?

—হ্যাঁ আছে, কিন্তু তাতে তোমার কী? তুমি ওখানে যাচ্ছো কেন? সি ইজ্ মাই পি-এ—

—আমার কাজ আছে।

বলে দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকতেই যাচ্ছিল। মিস্টার ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে—স্টপ্ দেয়ার—

দীপঙ্কর হঠাৎ বাধা পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে কর্তব্য ঠিক করে নিতে হবে। গুজরাটি ভদ্রলোকও অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। মিস্টার ঘোষাল বললে—তোমার কী কাজ মিসেস ঘোষের সঙ্গে?

দীপঙ্কর সোজাসুজি মিস্টার ঘোষালের চোখে চোখ রাখলে।

—আমার পারমিশন্ ছাড়া কেউ দেখা করতে পারবে না মিসেস ঘোষের সঙ্গে! ডু ইউ হিয়ার মী?

দীপঙ্কর যেন তখনও কী তার কর্তব্য বুঝতে পারছে না।

—দিস্ ইজ্ অফিস, দিস্ ইজ্ নট্ ইওর পার্লার!

অপমানে দীপঙ্করের সমস্ত মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো এক নিমেষে। হাতের মুঠোর মধ্যে সতীর শ্লিপ্টা টিপে পিষে জানলার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সেটা অতদূর গেল না। ঘরের কোণে গিয়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা লেগে স্থির হয়ে গেল। দীপঙ্কর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল।

—দীপু!

দীপঙ্কর মুখ ঘুরিয়ে দেখলে—সতী তার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। কপালে সিঁদুরের একটা মোটা টিপ। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো খোঁপা করে বেঁধেছে আজ।

—আমার শ্লিপ্ পেয়েছিলে তুমি?

একটি মুহূর্ত শুধু! তারপর দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—দীপু!

ডাকটা আরো কাছে সরে এল যেন। দীপঙ্করের মনে হলো দুই হাত দিয়ে নিজের কান দুটো এ'টে বন্ধ করে দেয়। সতী হয়ত দীপঙ্করের পেছন-পেছনই আসছিল। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল একেবারে সামনে এসে পথ আটকে দিয়েছে। বললে—কোথায় যাচ্ছো?

সতী মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।

মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—কোথায় যাচ্ছো তুমি? গো টু ইওর রুম মিসেস ঘোষ। তোমার ঘরে গিয়ে বোস! তোমার কাজ আছে—ইউ আর পি-এ টু ডি-টি-এস—

গুজরাটি ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ঘটনাটা। কিন্তু সেদিকে মিস্টার ঘোষালের খেয়াল নেই তখন। মিসেস ঘোষেরও খেয়াল নেই।

মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—যাও, ডু হোয়াট আই সে! যাও—

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

মিস্টার ঘোষাল সতীর চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। যে-মেয়ে কাঁদতে পারে, যে-মেয়ে তার আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হতে পারে, সে-মেয়ের গলায় এত তেজ! যেন হঠাৎ কেউটে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে মিসেস ঘোষ!

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—কিন্তু এটা আপিস, এটা ড্রয়িং-রুম নয় তোমার। এখানে আমি সিনীয়র অফিসার। আই অ্যাম ডি-টি-এস্ হিয়ার—

জাঁদরেল মিস্টার ঘোষালের আওয়াজে যেন একটা ক্ষীণ কৈফিয়তের সুর বেজে উঠলো। বললে—তুমি আগে কখনও আপিসে কাজ করোনি মিসেস ঘোষ, আপিসেরও একটা ডিসিপ্লিন আছে, আপিসেরও একটা রয়্যাল কোড্ আছে,—

গুজরাটি ভদ্রলোক এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে বসলো। ভাষা না বুঝুক, ব্যাপারটার কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। বললে—আমি তাহলে পরে আসবো স্যার—

বলে নিজেই বাইরে চলে গেল। গিয়ে একেবারে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দ্বিজপদ সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দৌড়িয়েছে। গাড়ি তখন চলতে শুরু করে-করে। কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বললে—সেলাম হুজুর—

গুজরাটি মার্চেন্ট্ পুরোন খদ্দের মিস্টার ঘোষালের। রামপুরহাটে তিনটে রাইস্-মিল্ দেশাইজীর। রামমনোহর দেশাই বহুদিন থেকে ওয়াগন চাইতে আসে। দশখানা চাইলে একখানা পায়। মিস্টার ঘোষালকে কিছুতেই খুশী করতে পারে না। দিনে কুড়িখানা হলে তবে কাজ চলে দেশাইজীর। সামনে আছে রাইস্‌মিল্। মিলের নাম করে ওয়াগন চেয়ে সেই ওয়াগনে টিম্বার, স্ট্র, ফায়ার-উড্ বা-কিছু পাঠাতে পারে। তাতে কারো কিছু বলবার থাকে না।

—সেলাম হুজুর।

দেশাইজী বললে—উও কৌন্ হ্যায় চাপরাসী?

—হুজুর, ও তো ঘোষাল সাহেবকা নয়াবিবি হুজুর!

গুজরাটি দেশাইজী একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—আচ্ছা ঠায়রো, ময় আতা হুঁ—

গাড়িটা স্টার্ট দিলে। আপিস-কোয়ার্টার পেরিয়ে একেবারে মেন্ রাস্তায় গিয়ে পড়লো। দেশাইজী বললে—জলদি ম্যান্, জলদি...

গাড়ি আরো জলদি চলতে লাগলো। লালবাজার পেরিয়ে বৌবাজার। একটা জুয়েলারির দোকানের সামনে আসতেই দেশাইজী লাফিয়ে উঠলো—রোখ্‌কে—

হীরালাল মোতিলাল কোম্পানীতে দেশাইজীর আসা-যাওয়া আছে। গাড়ি থেকে নামতেই আয়নায় দেশাইজীর ছায়া পড়লো। দেশাইজী একবার চেহারাখানা দেখে নিলে। কিন্তু দোকানের মালিক দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করেছে তখন।

—আইয়ে শেঠজী, আইয়ে!

দেশাইজী বললে—জলদি কীজিয়ে জনাব। আচ্ছা সোনেকো হার দেখলাইয়ে—

দুপুরবেলার দিকে জুয়েলারী দোকানে ভিড় কম থাকে। দোকানের পাখা জোরে খুলে দেওয়া হলো, পান-জর্দা লেমনেড্ আইসক্রীম সব এল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা সোনেকা হারও এল।

দেশাইজী বললে—এ কী চীজ্ দেখাচ্ছ জনাব, বঢ়ীয়া দেখ্‌লাও—

আরো বঢ়ীয়া চীজ রাখা হলো দেশাইজীর সামনে।

—কেত্‌না ভাউ?

—পান্‌শো রুপেয়া।

দেশাইজী হাত দিয়ে কেস্‌টা পাশে ঠেলে দিলে। বললে—ঔর বঢ়ীয়া দেখলাও—

হাজার টাকার জিনিস দেখানো হলো। তবু ঔর বঢ়ীয়া। দু'হাজার টাকার জিনিস এল। তাও ঔর বঢ়ীয়া। তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকার চীজ্ এল। তাও দেশাইজী বলে—ইস্‌সে ঔর বঢ়ীয়া—

শেষে দশ হাজার টাকার চীজ এল সামনে। জড়োয়া হার। রুবি, ডায়মণ্ড্, স্যাফায়ার সেট্ করা নেকলেস্।

দেশাইজী জিজ্ঞেস করলে—কেয়া ভাউ ইসকো!

—দশ হাজার!

তখন চেক বই বার করলে দেশাইজী। আরে, দশ হাজার টাকার জন্যে রামমনোহর দেশাই পরোয়া করে না। ঘোষাল-সাহেব কৃপা করলে দশ হাজার টাকা মুনাফা করতে এক মিনিট! এক মিনিটের তোয়াক্কা। ওয়ান মিনিট ওন্‌লি।

দেশাইজী বললে—আচ্ছা করে চীজ্ বেন্ধে দাও জনাব, নয়া বিবি, নজ্‌রানা,

চি নয়া—

—পান লিয়া নেই শেঠজী?

দেশাইজী ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। বললে—পান খাবার অনেক মওকা মিলবে জনাব—লেকিন্ ওয়াগন মিলনেকা মওকা জিন্দিগী মে কৌন্ দেনেওয়ালা!

রেলের আপিসের বড় সাহেবের ঘরে তখনও সেই একই দৃশ্য চলছে। সেই তখনও ফণা তুলে রয়েছে সতী।

—তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার চাকরির জন্যে কেয়ার করি?

মিস্টার ঘোষাল বললে—ভুলে যেওনা, এটা আপিস সতী! এ প্যালেস-কোর্ট নয়। এখানে চেঁচিয়ে কথা বললে আমার চাপরাসী শুনতে পাবে, আমার ক্লার্করা শুনতে পাবে—

—তোমার চাপরাসী আর ক্লার্কদের তুমি ভয় করবে! আমি ভয় করবো কেন? হোয়াই ডীড্ ইউ ইনসাল্ট্ দীপু? কেন তুমি ওকে অপমান করলে? জানো আমি তাকে শ্লিপ্ পাঠিয়েছি দেখা করবার জন্যে?

—কিন্তু আমার পারমিশন্ নিয়েছিলে তুমি? তুমি আমার পি-এ তা জানো না!

সতী দরজার দিকে ততক্ষণ এগিয়ে গেছে। বললে—এই তো আমি যাচ্ছি দীপুর কাছে, দেখি তুমি কী করতে পারো—

—আই ক্যান্ স্যাক্ ইউ মিসেস ঘোষ!

সতী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—হ্যাঙ্ ইওর স্যাকিং! আমি নিজের হাসব্যান্ডকে ছেড়ে চলে এসেছি, আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, আমাকে তুমি আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরির ভয় দেখাও! আমাকে তুমি স্যাকিং-এর ভয় দেখাও—

বলতে বলতে সতীর বুকটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। মাথার ওপর পাখার হাওয়া লেগে কোঁকড়ানো চুলগুলো উড়তে লাগলো ঘন-ঘন। হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনার চুড়িগুলো ঠিন্ ঠিন্ করে বেজে উঠলো।

সতী আবার বললে—আমাকে তুমি মিস্ মাইকেল পাওনি মিস্টার ঘোষাল—আই য়্যাম মেড্ অব্ ডিফারেন্ট্ মেট্যাল—

—মিস্ মাইকেলের কথা তুলছো কেন তুমি?

সতী সত্যিই রাগী মেয়ে। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না। বললে—তুলবো না? তুমি ভেবেছ আমি জানি না, কে মিস্ মাইকেলকে খুন করেছে?

—সতী!!

মিস্টার ঘোষাল দৌড়ে কাছে এসে সতীর মুখটা চেপে ধরতে গেল। কিন্তু তার আগেই সতী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঘরের বাইরে এক গাদা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। গুজরাটি ভাটিয়া সিন্ধী। সকলেরই ওয়াগন চাই।

—সেলাম হুজুর।

সতী বেরোতেই দ্বিজপদ মাথা নিচু করে সেলাম করলে। সতীও মাথা হেলিয়ে বললে—সেলাম—

তারপর সোজা চলে এল দীপঙ্করের ঘরের সামনে। পাসবাবু সেলাম দিয়ে যাচ্ছিল। সারাদিন কোনও কাজ থাকে না পাসবাবুর। এই আপিসের মধ্যে এখানে-ওখানে ঘোরাটাই কাজ। আর সাহেব-মেমসাহেবদের দেখে সলাম করাই কাজ। আসলে এইটেই আসল কাজ। বলতে গেলে আখেরের কাজ। নতুন মেমসাহেব। ঘোষাল সাহেবের সঙ্গে এক-গাড়িতে আপিসে আসতে দেখেছে। সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে—সেলাম মেম-সাহেব—

পুলিনবাবু পাসবাবুর কাণ্ড দেখে অবাক। বললে—এ কি পাসবাবু, ওকে সেলাম করতে গেলেন কেন?

পাসবাবু বললে—তুমি ও বুঝবে না ভায়া, তোমরা আজকালকার নতুন ছোকরা সব—

—তা ওকে সেলাম করলে কি আপনার প্রমোশন হবে?

পাসবাবু বিজ্ঞের মত হেসে বলে—আরো কিছুদিন রেলে থাকো, বুঝবে কিসে কী হয় কিছু বলা যায় না—

তা পাসবাবু ওই রকমই। ক্রফোর্ড সাহেবের আয়া বিকেল-বেলা কোয়ার্টারের সামনে ঘোরা-ফেরা করে, পাসবাবু তাকে দেখলেও সেলাম বাজায়। কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলে—ও তোমরা বুঝবে না ভায়া, ওই আয়ার পেটেই হয়ত একদিন ফিউচার ডি-টি-এস জন্মাবে—তখন?

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণ সতী একেবারে সোজা দীপঙ্করের ঘরে ঢুকে পড়েছে। দীপঙ্কর মুখ তুলতেই সতীকে দেখে আবার মুখ নামিয়ে নিলে।

সতী দৌড়তে দৌড়তেই এসেছে। তখনও হাঁপাচ্ছিল। বললে—দীপু, এ কী করলে তুমি?

দীপঙ্কর মাথা না তুলেই ফাইল্ নিয়ে কাজ করতে লাগলো।

সতী বসলো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। বললে—তুমি আমার শ্লিপ্ পাওনি?

দীপঙ্কর এবার মাথা তুলে বললে—আমি এখন একটু ব্যস্ত, তুমি যাও এখন—আমি পরে দেখা করবো—

—কিন্তু তুমি আমাকে ডেকে না-পাঠিয়ে নিজে গিয়েছিলে কেন? আমার জন্যে কেন তুমি এমন অপমানিত হতে গেলে? তুমি জানতে না মিস্টার ঘোষাল কী-রকম লোক? তুমি ডেকে পাঠালে না কেন আমাকে?

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। সতী দীপঙ্করের মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলো। বললে—কী হলো তোমার?

দীপঙ্কর বললে—আমি এখানে চাকরি করি—

—কিন্তু আমিও তো চাকরি করতে এসেছি দীপু!

দীপঙ্কর বললে—তোমার কথা আলাদা!

—কিন্তু আলাদা বলে কি কথা বলাও বারণ? আলাদা বলে তোমার কাছেও আমি আলাদা! আমি এখানে এলে কি তোমার কাজের ক্ষতি হয়? যদি ক্ষতি হয় তো বলো, আমি আর আসবো না।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ ক্ষতি হয়!

সতী চুপ করে রইল দীপঙ্করের দিকে মুখ করে। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। দীপঙ্করের গলার আওয়াজে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য ছিল। দীপঙ্করের এ-গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার যেন কোনও পরিচয় ছিল না এতদিন। এ যেন নতুন দীপঙ্কর।

—তাহলে আমি চলে যাবো তোমার ঘর থেকে?

দীপঙ্কর বললে—আমার অনেক কাজ রয়েছে হাতে—

—কিন্তু তুমি নিজের মুখে চলে যেতে বলো, তবে আমি যাবো।

দীপঙ্কর বললে—তোমার প্যালেস-কোর্টে তুমি যা খুশি করো, এটা প্যালেস-কোর্ট নয়।

—তা বলে আমাকে তুমি এই রকম করে অপমান করবে দীপু?

—তোমার আরো অপমান হওয়া উচিত! কিছুই হয়নি এখনও।

সতী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—বুঝেছি—

—কী বুঝেছ তুমি?

—বুঝেছি আজকে সুযোগ পেয়ে তুমি আমার সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ নিলে। আজ আমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে এত অপমান করবার সাহস পেলে।

দীপঙ্কর বললে—বাইরে হলে তোমার এ-কথার জবাব দিতুম, কিন্তু এটা আপিস।

—কিন্তু আপিস বলে কি মান-সম্মান-মর্যাদা-ভদ্রতা সব জলাঞ্জলি দিতে হবে? আপিস বলে কি এখানে মানুষ নয় কেউ?

—মানুষ আছে কি না, আর কিছুদিন চাকরি করলেই তা বুঝতে পারবে।

সতী বললে—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল দীপু। অনেক কথা ছিল। সব বলবার জন্যেই যে আমি এসেছিলুম তোমার কাছে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোস না, বোস!

দীপঙ্কর তবু দাঁড়িয়ে রইল। বললে—তুমি ঘর থেকে চলে গেলে বসবো—

এবার সতীও দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তাহলে তুমি কিছুই শুনবে না?

দীপঙ্কর বললে—সেদিন প্যালেস-কোর্টে মিস্টার ঘোষালের রিভলবারের মুখে তুমি আমাকে দাঁড়াতে দাওনি, বোধহয় আজকে নতুন করে অপমান করাবার

জন্যেই দাঁড়াতে দাওনি তুমি!

—তোমার হলো কী দীপু? তোমার কী হলো? তুমি তো এমন ছিলে না?

দীপঙ্কর সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে—তুমি যাও এখান থেকে, আর কথা বাড়িও না—

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি?

দীপঙ্কর বললে—বাঙলা ভাষায় তো সেই মানেই দাঁড়ায়!

সতী নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছিল, দীপঙ্কর ডাকলে—শোন—

সতী ফিরে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বললে—কী? 12

দীপঙ্কর বললে—তুমি কি সত্যিই তোমার ভাল চাও?

সতী হাসলো এতক্ষণে। ব্যঙ্গের হাসি। তারপর বললে—আমার ভাল-মন্দ নিয়ে তুমি এখনও ভাবো তাহলে?

—বাজে কথা থাক, তুমি নিজের ভাল চাও তো এ-চাকরি ছেড়ে দাও—

—তারপর?

—প্যালেস-কোর্টও ছেড়ে দাও। অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকো তুমি। যেখানে তোমার খুশি। কলকাতায় না থাকতে চাও, কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে পারো। এখন কলকাতা থেকে সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে, তুমিও বাইরে গিয়ে থাকো। আমি তোমার সমস্ত খরচ দেবো, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নেবো, আমি কথা দিচ্ছি, তুমি এ-পথ ছাড়ো—

—থাক আর বলতে হবে না, বুঝেছি...

বলে সতী আবার পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। সুইং-ডোরটার কাছে গিয়ে আবার মুখ ফেরালে। বললে—ভেবেছিলাম তুমি অন্তত অন্য পুরুষের মত নও, কিন্তু তুমিও একটা জানোয়ার, তুমিও একটা পশু—

বলতে বলতে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সতী! আর দীপঙ্কর সতীর মুখের চেহারা দেখে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রামমনোহর দেশাইরা সময় বোঝে, মেজাজ বোঝে, সুযোগও বোঝে। এই সব বুঝেই তিনটে রাইস মিল করেছে। পাঁচটা খাঁটি ভেজিটেবল ঘি আর তিনটে ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার চালাচ্ছে।

মিস্টার ঘোষাল সত্তরটা ওয়াগনের ইনডেন্ট অর্ডার ফর্মে সই করে কাগজটা দেশাইজীর দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এটা আবার কেন দিলে দেশাইজী—? এ হার আমার কী হবে?

দেশাইজী হেসে বললে—এ কিছু না জী, গরীব আদমী কিছু নজরানা দিলে আপনার মিসেসের জন্যে!—আপনার মিসেসের নজরানা—

—কত দাম পড়লো?

ভাল করে কেসটা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো মিস্টার ঘোষাল।

—দাম কী লাগবে হুজুর? দাম কেন লাগবে? আমার তো নিজের জুয়েলারীর দুকান আছে হুজুর! দুকান থেকে নিয়ে এলুম!

—তোমার কি আবার জুয়েলারীর কারবারও আছে নাকি দেশাইজী?

—হুজুর আপনার কৃপায় সবই আছে, সব কারবার থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়েই কিছু হয়. আপনি যদি ওয়াগন দেন তো আমি একটা সরষু-তেলের কারবার করতে পারি, সরষু তেলের কারবারে বহুত নাফা হুজুর—

মিস্টার ঘোষাল হারটা তখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বললে—আর কতদিন নাফা করবে দেশাইজী!

—কেন হুজুর? যতদিন হুজুরের কিরূপা থাকবে, ততদিন নাফা করবো!

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—আর বেশিদিন নাফা করতে পারবে না দেশাইজী—

—কেন হুজুর? হুজুর কি বদলি হয়ে যাচ্ছেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, তা নয়, ক্রিপস্ সাহেব তো বিলেত থেকে এসেছিল, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছে, জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছে—হয়ত আজাদী হয়ে যাবে ইণ্ডিয়া, তখন কী করবে? তখন তো স্বদেশী-জমানা—

দেশাইজী হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—আজাদী হয়ে গেলে তো আরো সুবিস্থা হবে হুজুর।

—কেন? তখন কি দিশী সাহেবদের ভেট দিতে পারবে? তারা কি ভেট নেবে তোমার? তারা তো সব জেল-খাটা লোক?

দেশাইজী আরো জোরে হাসলো। বললে—আমরা বেওসাদার আদমী আছি হুজুর—এখন যেমন বেওসা করছি, তখনও তেমনি বেওসা করবো—দেখে লেবেন।

—কী করে করবে?

দেশাইজী বললে—তা করবো হুজুর! আমি তো কংগ্রেস-পার্টির মেম্বার ভি আছি—

—তুমিও কংগ্রেসের মেম্বার?

দেশাইজী বললে—জী হুজুর! জমানা বদ্‌লালেও আমরা বদলাবো না হুজুর. স্বদেশী জমানায় আমরা বেওসা ভি করবো, আরো বেশী নাফা ভি করবো।. এ ইংরেজ-শালারা হারামী আছে হুজুর—ও-শালারা যাওয়াই ভালো। ওরা দেশ থেকে চলে গেলে ওদের বেওসা ভি আমরা লিয়ে লেব—

ততক্ষণে দেশাইজীর কাজ হয়ে গেছে। ইনডেন্ট-ফর্মগুলো ব্যাগের ভেতর পুরে নিয়ে উঠলো। বললে—রাম রাম হুজুর—রাম রাম—

বাইরে বেরোতেই দ্বিজপদ পেছন নিলে। বললে—সেলাম হুজুর—

রামমনোহর দেশাই তখনও সত্তরখানা ওয়াগনের আনন্দে ডগমগ করছে!

সে কথায় কানই দিলে না। গট্ গট্ করে সদরের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

দ্বিজপদ পেছন-পেছন যেতে-যেতে বললে—সেলাম হুজুর—

একেবারে গাড়ির ভেতর উঠে বসেছে দেশাইজী। গাড়ি ছাড়লো বলে।

দ্বিজপদ মাথা নিচু করে আবার বললে—সেলাম হুজুর—

এতক্ষণে বুঝি নজরে পড়লো। দেশাইজী বুক পকেট থেকে একটা দশ টাকার আস্ত নোট বার করে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। ফেলে দিতেই গাড়িখানা হুশ হুশ করে চলে গেল। আর ওদিকে হাওয়ায় তখন নোটখানা উড়তে উড়তে চলেছে—

নোটও দৌড়োয়, দ্বিজপদও দৌড়োয়—

শেষকালে নর্দমার ধারে গিয়ে ধরে ফেলেছে। তারপর নোটটাকে পকেটে পুরে নিজের মনেই বলে—শালা যেন ভিক্ষে দিচ্ছে, শালা যেন ভিখিরি পেয়েছে আমাকে—যেমন হয়েছে শুয়োরের বাচ্চা, তেমনি হয়েছে শালার খদ্দের, সত্তরখানা ওয়াগন পেলি, আর আমার বেলাতেই যত বুড়ো আঙুল—

মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে তখনও লাল আলো জ্বলছে। লাল আলো জ্বললে কারোর ভেতরে যাবার অধিকার নেই। কিন্তু ঝড়ের বেগে সতী ঘরে ঢুকলো। আপিসের আর যার জন্যে যে নিয়মই থাক, পি-এ'র জন্যে সে নিয়ম নয়!

মিসেস ঘোষের চেহারা দেখে মিস্টার ঘোষাল চমকে উঠলো।

ততক্ষণে জুয়েলারীর কেসটা সরিয়ে ফেলেছে মিস্টার ঘোষাল। হোয়াটস্ আপ? কী হলো?

সতী সোজা নিজের কামরার দিকেই চলে যাচ্ছিল। মিস্টার ঘোষালও চেয়ার ছেড়ে উঠলো। বললে—কী হলো? কোথায় গিয়েছিলে? সেন-এর সঙ্গে দেখা করে এলে?

সতী মুখ ঘুরিয়ে একেবারে সোজা মিস্টার ঘোষালের দিকে চাইলে। বললে—তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

মিস্টার ঘোষাল অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী কথা?

—তুমি রাখবে কিনা আগে বলো?

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ ড্রয়ার থেকে কেসটা বার করে বললে—এটা দেখেছ? তোমার জন্যে কিনে এনেছি—

সতীও দেখলে চেয়ে। রুবি, ডায়মণ্ড, স্যাফায়ার বসানো নেকলেস।

সতী বললে—কখন কিনলে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—তোমাকে বলিনি, কাল কিনেছি, ভেবেছিলাম আজকে রিসেস-এর সময় চা খেতে খেতে তোমায় চমকে দেব! কিন্তু তুমি যে-রকম রেগে গেলে তখন—

সতী বললে—আমি রাগিনি; তুমিই আমাকে রাগিয়ে দিলে—

—তোমার পছন্দ হয়েছে? কত প্রাইস হবে বলো তো?

—জীবনে কখনও তো নিজে কিছু কিনিনি, দাম কত কী করে বলবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—থার্টিন থাউজ্যান্ড ক্যাশ্ ডাউন—

—কিন্তু এত টাকা দিয়ে কেন মিছিমিছি কিনতে গেলে আমার জন্যে? আমার তো সব গয়নাই আছে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—সে থাক, সে তো তোমার শ্বশুর-বাড়িতে আছে—

সতী হাতে তুলে নিলে কেসটা। মিস্টার ঘোষাল বললে—আর ইউ হ্যাপি মিসেস ঘোষ?

—আই য়্যাম, কিন্তু এত দাম দিয়ে কেন কিনতে গেলে?

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—তোমার জন্যে আমি আর কী করতে পারি মিসেস ঘোষ?

সতী বললে—সত্যি তুমি আমার জন্যে কিছু করতে চাও?

—আই য়্যাম য়্যাট ইওর সার্ভিস মিসেস ঘোষ! অলওয়েজ—

—তাহলে মিস্টার সেনকে ট্রান্সফার করে দাও—

মিস্টার ঘোষালও এতটা আশা করেনি। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সতীর দিকে। বললে—আর ইউ শিওর?

সতী বললে—হ্যাঁ যা বলছি তুমি করো, আর নয়তো ওকে—। যেখানে হোক, যে কোনও ডিভিশনে—

—কিন্তু কেন? কী হলো হঠাৎ?

সতী তখনও হাঁফাচ্ছে। যেন দীপঙ্করের সমস্ত কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল। বললে—ও একটা জানোয়ার, ও একটা পশু—

মিস্টার ঘোষাল কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—তোমাকে ইনসাল্ট করেছে সেন?

—সব কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। কিন্তু ওর চোখের সামনে একই আপিসে আমি চাকরি করতে পারবো না—ওকে আমি আর টলারেট করতে পারছি না—হি ইজ এ ড্যাম নুইসেন্স হিয়ার—

মিস্টার ঘোষাল বললে—অলরাইট, আমি মিস্টার ক্রফোর্ডকে আজই নোট দিচ্ছি—

বলে চেয়ারে বসেই মিস্টার ঘোষাল কলিং-বেলের ওপর জোরে ঘা মারলে।

বাইরে থেকে আওয়াজ এল—হুজুর—

দ্বিজপদ ঘরে এসে দাঁড়াল। মিস্টার ঘোষাল বললে—টী—

রেলের আপিসের বাবুদের টেবিলে তখন অনেক কাজ। ওয়ার-ট্রাফিক মাথা

খারাপ করে দিয়েছে সকলের। এজেন্টের আপিস থেকে সকালবেলা একটা অর্ডার আসে, দিল্লীর বোর্ড থেকে আসে উল্টো অর্ডার বিকেল বেলা। তারপর আছে লোক্যাল ট্রাফিক। কলকাতার সমস্ত লোক সার বেঁধে চলেছে রেল-স্টেশনের দিকে। ডালহৌসী, স্ট্র্যান্ড রোড, হাওড়া-ব্রীজ ধরে একেবারে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলেছে মানুষের মিছিল। মানুষের কোলে ছেলে, মাথায় মোট! ঘোড়ার গাড়ির মাথায় মানুষের দল বসে বসে চলেছে। সমস্ত খাটাল উজাড় করে হিন্দুস্থানীরা চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া। গরু-মোষের পাশাপাশি মানুষও চলেছে। কলকাতার মানুষ মরতে চায় না, তাই কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচবে।

সমস্ত আপিস যখন ছুটি হয়ে গেল, মধু এল ঘরে।

দীপঙ্কর বললে—কিছু বলবি মধু?

মধু বললে—সবাই চলে গেছে হুজুর!

দীপঙ্কর বললে—তুইও যা, আমার যেতে দেরি আছে—

তারপর ক্রমে সমস্ত আপিসই ঠান্ডা হয়ে এল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ওয়ার-ট্রাফিকের কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হলো কোথায় যেন একটা কী শব্দ হচ্ছে। হয়ত পাশের বাথরুমে কলের জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে। কিম্বা হয়ত ফাইলের গাদায় ইঁদুর ঢুকেছে। কিম্বা হয়ত সে-সব কিছুই নয়। অন্য শব্দ। বহুদিন আগে কলেজে পড়বার সময় হাইনের লেখা লাইনগুলো মনে পড়লো—

In the silence one can hear a soft monotonous dripping. It is the dividends of the capitalists continuously trickling in, continuously mounting up. One can literally hear them multiply, the profits of the rich. And one can hear too, in between, the low sobs of the destitute, and now and then a harsher sound, like a knife being sharpened.

আজ এতদিন পরে দীপঙ্কর সেই পুরোন কথাগুলোর মানে যেন বুঝতে পারলে। কোথায় কিয়েভ, কোথায় ওডেসা, কোথায় খারকভ, কোথায় লেনিনগ্রাড, কোথায় সেভাস্টোপল্—সেখানে যুদ্ধ করছে কারা, আর এখানে রেলের আপিসে চলেছে আর এক যুদ্ধ, আর এক লড়াই। টাকার লড়াই, ডিভিডেন্ডের লড়াই, গ্রাইব আর ডিবচারির লড়াই।

দীপঙ্কর উঠলো। তখনও সেই শব্দটা কানে আসছে। একটানা একঘেয়ে শব্দ। ডিভিডেন্ড, শেয়ার, ইন্টারেস্ট, প্রপার্টি। একটানা, একঘেয়ে। প্রমোশন, ট্রান্সফার, ইনক্রিমেন্ট।

নির্মল পালিত সেই কথা বোঝাচ্ছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে।

—তোমরা যাবে না বাবা কলকাতা ছেড়ে?

নির্মল পালিত বললে—আমি তো যেতে পারলে বাঁচতাম মা-মণি—কিন্তু

যাই কী-করে বলুন?

—কেন?

নির্মল পালিত বললে—এই আপনার প্রপার্টির একটা ব্যবস্থা না করে যাই কী করে? আমি আপনার সব প্রপার্টি বেচে লিকুইড ক্যাশ করে দিয়ে তবে ছুটি পাবো, তার আগে নয়।

মা-মণি বললে—তোমার বাবাই তো এর জন্যে দায়ী বাবা! আমি কি এ-সব চেয়েছিলুম? আমি বিধবা মানুষ, একটু ধর্ম-টর্ম করে শেষের ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট মনে করতুম, কিন্তু তোমার বাবাই সব কাল করে গেলেন—

—কিন্তু রাতারাতি তো আর সংসার ছেড়ে যেতেও পারেন না আপনি!

—হ্যাঁ, আমার আবার সংসার। সংসারের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে বাবা! টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রেখে মাসে মাসে সুদ পেলেই আমি খুশী, সেই সুদ নিয়ে একটা জীবন আমার কাশীতেই কেটে যাবে—

—কিন্তু সনাতনবাবু? তাঁকে দেখবার কে থাকবে এখানে?

—যে-যার কপাল নিয়ে সংসারে এসেছে বাবা। আমি কী করবো। আমি তো তার ভাল করতেই চেয়েছিলুম আর তার ভালোর জন্যেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম। আজ যদি বউ ভাল হতো আমার তো ভাবনা ছিল না। এতদিনে ছেলে-পিলেতে ঘর ভরে যেত! কত বাড়িতে তো যাই, কত আনন্দ করে আছে সবাই দেখি। কিন্তু দেখ না, এ যেন ভূতের বাড়ি হয়েছে। যেন শ্মশানের মধ্যে বাস করছি বাবা। যেন শ্মশান, বাড়ি নয় তো! এবার একপাল শকুন এসে বাগানে বসে না কেন তাই ভাবি। এই দেখ না বাবা, আগে তবু মালী ছিল, গাড়িটা ছিল, ড্রাইভারও ছিল, রাগ করে সব বেচে দিলাম। সকলকে ছাড়িয়ে দিলাম—

—কিন্তু কেন বেচলেন? টাকার জন্যে?

মা-মণি আর কথা বাড়ালে না। বললে—থাকগে ও-সব কথা। ও-কথা ভাবতেও খারাপ লাগে বাবা। তুমি আসো তাই একটু যা কথা বলে সুখ পাই। তুমি তো সবই জানো, তোমাকে বলতে দোষ নেই—ছেলের সঙ্গেও আমার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ!—আমি শ্মশানে বাস করছি বাবা, ক্যাওড়াতলার শ্মশানও এর চেয়ে ভাল আমার কাছে—

হঠাৎ বাইরে কার জুতোর আওয়াজ পেতেই নির্মল পালিত মুখ ফেরালে। মা-মণিও ফিরে দেখলে।

নির্মল পালিতই মুখ খুললে প্রথম। বললে—আরে তুই?

দীপঙ্কর বললে—আমি সনাতনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

নির্মল পালিত মা-মণির মুখের দিকে একবার চাইলে। মা-মণি বললে—কী দরকার?

দীপঙ্কর বললে—আমার বিশেষ জরুরী একটা দরকার আছে—

অন্যদিনের চেয়ে দীপঙ্করের মুখটা যেন আরো গম্ভীর, আরো করুণ দেখালো।

মা-মণি বললে—কী দরকার তোমার বলো?

দীপঙ্কর যেন এতক্ষণে মা-মণিকে দেখতে পেয়েছে। সামনে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—সনাতনবাবুর সঙ্গেই আমার দরকার ছিল—

—তা তো ছিল, কিন্তু দরকারটা কীসের?

—আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো!

মা-মণি বললে—সে তো বুঝলুম, কিন্তু কীসের দরকার, সেইটে জিজ্ঞেস করছি—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো বলেছি, দরকার আমার তাঁর সঙ্গে!

—আরে, এ তো দেখছি বড় আল্‌টপকা মানুষ! আমি বলছি কীসের দরকার আর তুমি বলছো বিশেষ দরকার!

তারপরে নির্মল পালিতের দিকে ফিরে বললে—শুনলে তো বাবা, শুনলে তো?

নির্মল পালিত সবই শুনেছিল। এতক্ষণে কাছে এল। বললে—কীরে, কী দরকার বল্ না? এই প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু বলবি? প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু যদি বলতে চাস তো আমাকে বলতে পারিস্। ঘোষ-ফ্যামিলির প্রপার্টি আমিই দেখাশোনা করি। বাড়ি কিনবি?

দীপঙ্কর আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—সনাতনবাবু কি নেই বাড়িতে? আর থাকলে তাঁর সঙ্গে কি দেখা করতে দেওয়ার নিয়ম নেই?

মা-মণি নির্মল পালিতের দিকে চেয়ে বললে—তুমি বাবা একটু বুঝিয়ে বলো তো একে যে, এ-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে না-জিজ্ঞেস করে এ-বাড়ির ভেতরে কারো সঙ্গে কথা বলা যায় না—

হঠাৎ শম্ভু কাছে এসে দাঁড়াল। বললে—দাদাবাবু আপনাকে ভেতরে ডাকছেন একবার—

—কে ডাকছে রে শম্ভু?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবু! দাদাবাবু নিজের ঘর থেকে নতুন-দাদাবাবুর গলা শুনতে পেয়েছে—

—শুনলে তো বাবা, শুনলে তো! শুনলে তো ছেলের কাণ্ড? আমি আর কী বলবো বলো, এরকম করলে মানুষের কি মাথার ঠিক থাকে! আর আমি একলা মানুষ, কত দিকে মাথা দেব! আমার এই সম্পত্তিই হয়েছে কাল! তোমার বাবা এই সর্বনাশটা আমার করে গিয়েছেন বাবা—যা ইচ্ছে করুক ওরা, আমার কী!

নির্মল পালিত বললে—আপনি কোনও দিকে কান দেবেন না মা-মণি, আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই দলিলটাতে সই করে দিন—

এই তিনটে জায়গায়—

ততক্ষণে দীপঙ্কর একেবারে সোজা সনাতনবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে—কেমন আছেন সনাতনবাবু?

—ভালো আছি দীপুবাবু। আপনি কেমন আছেন? দেখলেন তো আপনাকে আমি বলেছিলাম ওয়ার বাধবে। এ আর কেউ রোধ করতে পারবে না! রোধ করতে পারবে কী করে, বলুন?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ!

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—কেবল হিটলারের দোষ দিচ্ছে চার্চিল সাহেব! কিন্তু হিটলারের কী দোষ বলুন। হিটলার না-থাকলেও লড়াই বাধতো। ছোট ছোট হিটলারে দেশ যে একেবারে ভরে গেছে মশাই, কেউ কাউকে বিশ্বাস করছি না, কেউ কারোর উন্নতি সহ্য করতে পারছি না, কেউ কারোর দুঃখ বুঝছি না। আমাদের হাড়েই ঘুণ ধরেছে যে—

দীপঙ্কর বললে—আমি একটা কাজের কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে—

—তা এটাও তো কাজের কথাই দীপুবাবু, এটা ভাবছেন কাজের কথা নয়! এত বড় কাজের কথা আর আছে কী, বলুন তো! সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মন-প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে, আর আপনি বলছেন কাজের কথা নয় এটা!

দীপঙ্কর বললে—কাজের কথা তো বটেই। কিন্তু আরো জরুরী কাজের কথা বলতে এসেছি আমি!

—দেখুন দীপুবাবু, এ-যুদ্ধ আমাদের ঘর-সংসার সব বদলে দেবে, সব ভেঙে দেবে, এই আমি বলে রাখলুম। আমাদের ভালোটাও ভাঙবে, আমাদের খারাপটাও ভাঙবে। এ-যুদ্ধটাও আমাদের তাই দরকার ছিল—আমার তো তাই মনে হয়। আপনি কী বলেন!

তারপর দীপঙ্করের গম্ভীর মুখটার দিকে নজর পড়তেই সনাতনবাবু বললেন—আপনি কি আপিস থেকে আসছেন? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে!

দীপঙ্কর বললে—আমি সতীর কথা বলতে এসেছিলাম, মিসেস ঘোষের কথা—

—সতীর কথা!—সনাতনবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কিন্তু তিনি তো নেই দীপঙ্করবাবু, তিনি তো বাড়িতে নেই। জানেন দীপঙ্করবাবু আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, তিনি একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন! এখানে আর তিনি থাকেন না!

দীপঙ্কর বললে—সে আমি জানি। জানি বলেই তো এসেছি—

সনাতনবাবু বললেন—আপনি জানেন? কিন্তু তিনি কেন চলে গেলেন বলুন তো! আমি তো অনেক করে থাকতে বললাম, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে চলে যেতে বললেন। কিন্তু আমি কী করে যাই? আপনিই বলুন!

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন, জানেন দীপঙ্করবাবু, এমন ভালো সচরাচর দেখা যায় না। আমি তো বিয়ের দিন থেকেই দেখে আসছি, বড় ভালো মানুষ ছিলেন। আমি তাঁকে বরাবর বলতাম, লেখাপড়ার মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখতে, লেখাপড়ার মত বন্ধু তো আর নেই জগতে! কিন্তু তাঁকে আমি দোষ দিই না দীপঙ্করবাবু! তাঁর কোনও দোষ নেই, তিনি বড় ভালো মানুষ ছিলেন—

তারপর আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন—দীপঙ্কর তার আগেই বললে—সব আমি জানি—

—আপনি সব জানেন?

সনাতনবাবু যেন দীপঙ্করের কথার মধ্যে সতীর কাজের সমর্থন পেয়ে অকূলে কূল পেলেন। বললেন—আপনিও জানেন তিনি কি-রকম ভালো মানুষ ছিলেন? আপনিও জানেন?

দীপঙ্কর বললে—জানি বৈকি সনাতনবাবু, সতীর মত স্ত্রী পাওয়া যে-কোনও পুরুষের পক্ষে সৌভাগ্য!

সনাতনবাবুর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল এতক্ষণে। বললেন—তাহলে তো আপনিও জানেন দেখছি! আর জানবেন নাই-বা কেন? আপনি তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন! কিন্তু আরো অনেক জিনিস জানি, যা আপনিও জানেন না দীপঙ্করবাবু!

—কী জিনিস?

সনাতনবাবু বললেন—স্ত্রীলোকের সমস্ত ভূষণ তাঁর মধ্যে আছে দীপঙ্করবাবু। শাস্ত্রে যে-সব গুণ থাকলে স্ত্রীলোককে স্ত্রী-রত্ন বলা হয়, তার সমস্তগুলি তাঁর মধ্যে বর্তমান। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে-কোনও পুরুষের পক্ষেই অমন স্ত্রী পাওয়া সৌভাগ্য!

—কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, জানেন আপনি?

সনাতনবাবু বললেন—না তো!

দীপঙ্কর বললে—আপনি হয়তো শুনে অবাক হয়ে যাবেন, তিনি এখন আমাদের আপিসে চাকরি করছেন।

—তাই নাকি? সে তো বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

দীপঙ্কর বললে—সেই কথাই আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, এমন এক জায়গায় চাকরি করছেন যেখানে চাকরি করলে মানুষের মনুষ্যত্বে কলঙ্ক লাগে, এখন আপনি আপনার যা-বিবেচনা হয় করুন!

সনাতনবাবু যেন মহা-সমস্যায় পড়লেন। বললেন—কিন্তু দীপঙ্করবাবু, আমার তো বিবেচনা হচ্ছে ভালোই করেছেন তিনি। সংসারের মধ্যেই কি কম আবিলতা মনে করেন! যত ছোট বা যত বড়ই সংসার হোক, তার মধ্যে থেকেও তো মনুষ্যত্বকে নিষ্কলঙ্ক রাখবার উপায় নেই আজ, আর চাকরি করলেই যত দোষ!

—তা হলে আপনিও তার চাকরি করা সমর্থন করেন?

সনাতনবাবু বললেন—না, তা করি না! আমি তো তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই সমর্থন করি না। আপনাদের আপিসেই তো তিনি চাকরি করেন, তা আপনি একবার দেখা হলে তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন?

—বলুন, কী জিজ্ঞেস করবো?

সনাতনবাবু বললেন—এই কেন তিনি চলে গেলেন? আমি নিজে তো কোনও দোষ করিনি!

দীপঙ্কর বললে—আপনি তো নিজেই সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেন!

সনাতনবাবু বললেন—তা পারি বৈ কি! আমি নিজেও জিজ্ঞেস করতে পারি—

—আপনার অসুখটা সেরে গেলে একদিন আপিসে যাবেন। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব! আপনার শরীরটা তার আগে একটু ভালো হোক!

সনাতনবাবু বললেন—আপনি তো ভালো প্রস্তাবই করেছেন। তা শরীর আমার এমন কিছু খারাপ নয়, আমি কালকেই যেতে পারি। ট্যাক্সি করে যেতে হবে। আমাদের গাড়িগুলো মা-মণি বিক্রি করে দিয়েছেন, আপনি জানেন তো! তিনি চলে যাবার পর এ-বাড়ির সব কিছু বদলে গিয়েছে, আপনি তাঁকে বলবেন—

—সে তো আপনি গিয়েও বলতে পারেন!

—তা আমিও গিয়ে বলতে পারি! আমার বলতে কীসের আপত্তি! আমার সঙ্গে তো তাঁর কোনও মনোমালিন্য হয়নি দীপঙ্করবাবু যে আমি বলতে পারবো না। আপনি আপিসে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি সব বলবো। আপনার সঙ্গে যা-যা কথা হলো সব বলবো! আমার বলতে আপত্তি কীসের!

দীপঙ্কর বললে—আপনি তাকে চাকরি করতে বারণ করবেন সনাতনবাবু! আমি বারণ করেছি, কিন্তু আপনি বারণ করলে সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না সতী! আপনি তাকে চাকরি করতে বারণ করবেন, বাড়িতে ফিরে আসতে বলবেন—। আমার কথা সে না শুনুক, আপনার কথা শুনবেই, আপনার কথা ফেলতে পারবে না কিছুতেই—

সনাতনবাবু বললেন—তা বলবো, কিন্তু আপনি উঠলেন কেন, বসুন না—

দীপঙ্কর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসলো। দীপঙ্করের মনে হলো একদিন অনেক দিন আগে এই বাড়িতে আসতেই তার কেমন রোমাঞ্চ হয়েছিল, আর আজ সমস্ত বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। যেন খাঁ খাঁ করছে সমস্ত বাড়িটা। ঘরের জানলা দিয়ে বাগানটার দিকে চেয়ে দেখলে। বাগানে সেই ফুলের কেয়ারি নেই। অনেক ঘাস গজিয়ে জায়গাটাকে জঙ্গলে পরিণত করেছে।

সনাতনবাবু বললেন—আপনার জলযোগের ব্যবস্থা করতে বলি শম্ভুকে

আপনি আপিস থেকে আসছেন—

দীপঙ্কর আপত্তি করলে। বললে—ব্যস্ত হবেন না, আমি এখান থেকে বাড়ি চলে যাবো—

সত্যি, বাড়িতেই বা কে আছে দীপঙ্করের। সেই মা তো আর নেই। কে-ই বা তার জন্যে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকবে মা'র মতো! দীপঙ্কর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। একদিন এই ঘরেই সতী থাকতো। এই ঘরেই সতী শুতো, এই ঘরেই বাস করতো। এই ঘরেই খিল বন্ধ করেই সনাতনবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি সতী। সতীর জীবনের কতদিনের ইতিহাস এই ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ঘরেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একলা কেটেছে সতীর। এই ঘরের ভেতরেই যেন সতীর সান্নিধ্যের উত্তাপ লেগে আছে।

অনেক দিন পরেও দীপঙ্করের এই ঘটনাটার কথা মনে পড়তো! এতদিন পরে এই দিনকার কথা ভাবতে গিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হৃৎপিণ্ড ভেদ করে। এমনি করেই বোধহয় একদিন মানুষের সব স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমনি করেই বোধহয় অলক্ষ্য কাল এসে সব কামনা-বাসনাকে গ্রাস করে। এমনি করেই একদিকে ভাঙে, আর একদিক গড়ে তোলবার জন্যে! কিন্তু প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের এত বড় স্বপ্নটাকে ভেঙে মহাকালের কী লাভ হলো! কার উপকার হলো? সনাতনবাবুর, না দীপঙ্করের, না সতীর—কার?

কিন্তু দীপঙ্কর কি জানতো ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তেই আর একটা স্বপ্ন প্যালেস-কোর্টের করিডোর অতিক্রম করে একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মোড়ে এসে বাসা বাঁধছে! দীপঙ্কর কি জানতো সেই সতীর সর্বাঙ্গ জুড়ে ঘৃণার আর প্রতিশোধের বহ্নি লেলিহান হয়ে উঠেছে! তা জানলে দীপঙ্কর এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারতো না সনাতনবাবুর রোগশয্যার সামনে।

সতী গাড়িতে হেলান দিয়ে হাহা করে হেসে উঠলো।

মিস্টার ঘোষাল পাশে বসে চুরোট টানছিল। বললে—হাসছো যে!

সতী হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের দিকে ঝুঁকে পড়লো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। বললে—তোমাদের সেন-সাহেবের কথা ভাবছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—একটা আস্ত কাউয়ার্ড—আই শ্যাল্ ট্রান্সফার হিম্—

সতী বললে—তুমি পারবে তো ট্রান্সফার করতে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—নিশ্চয় পারবো, এমন জায়গায় ট্রান্সফার করে দেব, যেখান থেকে আর কলকাতায় না আসতে পারে—

সতী বললে—যেন কখনও ওর মুখ না দেখতে হয় আমাকে—

গাড়িটা সোজা যাচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে—এইটেই

তো প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, এই বাঁদিকে!

সতী ততক্ষণে আবার গম্ভীর হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে তার মুখে যেন কথা আটকে গেল।

—তোমার শ্বশুর-বাড়ি কোন্‌টা?

সতী তখনও সেই দিকে চেয়ে ছিল একদৃষ্টে। এইখান থেকেই একদিন বিতাড়িত হয়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে। এইখানেই একদিন চূড়ান্ত অপমানের ধৈর্য-পরীক্ষা হয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। এই বাড়িতেই একদিন তার ভাগ্য-দেবতার স্থান সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার বাবা। সতীই কি একদিন জানতো আবার একদিন এইখানেই তাকে ফিরে আসতে হবে চরম প্রতিশোধের দণ্ড হাতে নিয়ে।

—কোন্‌টা তোমার শ্বশুর-বাড়ি? ডান দিকের এইটে?

সতী তখনও সেইদিকে চেয়ে আছে। গেটে আর সেই দরোয়ান নেই। অন্ধকারে ভেতরটা স্পষ্ট দেখা গেল না। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সতী চিনতে পারলে—ব্যারিস্টার পালিতের গাড়ি হবে তো!

—চারদিকে তো অন্ধকার দেখছি, লোকজন কেউ নেই বুঝি ভেতরে! সব চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে?

সতী শুধু বললে—না—

—তাহলে? মেম্বর ক'জন বাড়িতে?

সতী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে। বললে—ওদের কথা ছেড়ে দাও—এখন থেকে ওরা কেউ নয় আর আমার—এখানে থামতে বলো—

গাড়িটা থামলো। মিস্টার ঘোষাল নামলো। ঠিক উল্টোদিকের বাড়িটা। রাস্তার সামনের দিকে বারান্দা। ওপরে দু'খানা ঘর, নিচেও দু'খানা। বাড়ি-ওয়ালা পেছনের অংশে থাকে। কড়া নাড়তেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বললেন—আসুন, আসুন, আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম—

মিস্টার ঘোষাল চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেল—

—তাতে কী হয়েছে, আপনি তো অ্যাড্‌ভান্স দিয়ে গেছেন, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আর এ-সময়ে তো টেনেন্ট পাওয়াই যায় না। সবাই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এখন, আপনারা হলে তবু বাড়িটা দেখা-শোনা করবার একজন লোক পাওয়া যাবে!

সতীও ভেতরে ঢুকলো। ভদ্রলোক আগে আগে চললেন। এ-পাড়ার বহুদিনের বাসিন্দা। যেতে যেতে বললেন—সবাই চলে গেছে তো পাড়া থেকে, আমিও ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বাইরে—। এ-পাড়ায় তো লোক নেই কেউ আর। আছি শুধু আমরা আর সামনের ঘোষেরা—

—ঘোষেরা? কোন্ ঘোষেরা?

ভদ্রলোক বললেন—সনাতন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক। তিনি আছেন আর তাঁর বিধবা মা আছেন বাড়িতে, আর কেউ নেই, ছেলের বউ ছিল, তা সে-বউও শুনেছি নাকি আর নেই। বলতে গেলে পাড়া একেবারে খাঁ খাঁ করছে। এখানে থাকতেও ভয় করে স্যার—

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার রাস্তা। ভদ্রলোক হাতে চাবির গোছা নিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। বললেন—নিচেয় কিচেন, আর বাথরুম, আর ওপরে অ্যাটাচড্ বাথ্ আর দু'খানা বেড-রুম্—

মিস্টার ঘোষাল পেছনে উঠতে উঠতে বললে—ওতেই আমাদের পার্পাস্ সার্ভড্ হয়ে যাবে—

ভদ্রলোক বললেন—কেন যে আপনারা প্যালেস-কোর্টের মত ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে আসছেন কে জানে, তার তুলনায় এ অবশ্য কিছুই না—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তা হোক, এখানে আমরা একটু নর্‌মাল থাকতে পারবো, মানে ঢিলে-ঢালাভাবে! দরকার হলে মাঝে-মাঝে গানের আসর বসাবো—। মিসেসের আবার গান-বাজনার শখ আছে কি না—

—ও, তাই বলুন!

ততক্ষণে দু'টো ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন ভদ্রলোক। সতী সোজা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের দিকের ছোট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বাড়িটার সমস্তটা স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। ওই গেট, গেট পেরিয়ে ভিতরে গিয়ে বাঁদিকে সরকারবাবুর ঘর। তারপর বসবার বৈঠকখানা। বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলছে। ব্যারিস্টার পালিত বোধহয় শাশুড়ীর সঙ্গে পরামর্শ করছে ওখানে বসে বসে। কেমন করে জব্দ করা যায় সতীকে, সেই মতলবই আঁটছে বোধহয়। তারপরেই কিছুদূর গিয়ে লাইব্রেরী-ঘর। ঘরটা অন্ধকার। দোতলার সমস্ত জানলাগুলো বন্ধ। তেতলার ঘরটায় আলো জ্বলছে। নিজের ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যায় হয়ত কেউ আছে। হয়ত তিনিই আছেন।

—ঘর সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই, পুবমুখো ঘর, আলো-বাতাস পাবেন।

মিস্টার ঘোষাল কাছে এল। বললে—কী হলো? তুমি কিছু বলছো না যে?

সতী বললে—আমি আর কী বলবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—এই ঘরেই আসর পাতা যাবে, এই ঘর থেকেই তো ও-বাড়ির সব কিছু ডাইরেক্ট দেখা যাবে!

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন—ওখানে পর্দা ঝুলিয়ে রাখবেন, তাহলেই আর কিছু দেখা যাবে না—

সতী অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসলো। এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে পারলেও যেন খানিকটা হাল্কা হতো মনটা। যেন গালাগালি দিলেও

মনটা পরিতৃপ্ত হতো। অনেক কাঁটা, অনেক কলঙ্ক জমা হয়ে আছে ভেতরে। সব পরিষ্কার হয়ে যেত এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারলে।

বললে—এখান থেকে গান গাইলে ওদের বাড়িতেও শোনা যাবে তো?

ভদ্রলোক বললেন—আপনারা তো আর দিনরাত গান-বাজনা করছেন না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যদি তাই-ই করি, তাতেই বা কী! আমরা নিজেদের বাড়িতে নাচবো গান গাইবো—যা খুশি আমাদের করবো—ওদের কী!

ভদ্রলোক বললেন—তা করতে পারবেন, ইচ্ছে হলে করতে পারেন বৈ কি। আর ওদের যদি অসুবিধে হয় তো আপনারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে গাইবেন—ওরা শুনতে পাবে না!

সতী হঠাৎ মুখ ফেরালো। বললে—কেন? ওদের কি ভয় করে চলতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন—না না ভয়ের কথা হচ্ছে না, ওদের ভয় করতে যাবেন কেন আপনারা?

—তাহলে কেন বলছেন ও-কথা আপনি? আমরা ভাড়া দিয়ে থাকবো না? আমরা এখানে যা-খুশি করবো। ওদের যদি অসুবিধে হয় তো ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্!

ভদ্রলোক বললেন—না না, সে-কথা নয়, ও-বাড়িতে তো কেউ থাকে না। থাকবার মধ্যে থাকে কেবল বুড়ী-মা আর তার ছেলে। বহুকালের লোক ওরা—এককালে ওদের স্টিভেডোরের ব্যবসা ছিল—লোক ওরা খুব ভালো!

—কে আপনাকে বললে, লোক ভালো? কে বললে?

ভদ্রলোক কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

সতী আবার বলতে লাগলো—আপনি আমার চেয়ে ওদের বেশি চেনেন? আমার চেয়ে ওদের বেশি জানেন? আপনি আমাকে চেনাতে এসেছেন ওদের? ওরা লোক ভালো?

মিস্টার ঘোষাল ততক্ষণে ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে পকেটে পুরে নিয়েছে। বললে—আপনাকে কে বলেছে ওরা লোক ভালো? আপনি জানেন ওদের?

দুদিক থেকে তাড়া খেয়ে ভদ্রলোক আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় বার করতে পারলেন না। বললেন—ওঁরা তো পাড়ার কোনও ব্যাপারেই থাকেন না কিনা তাই বলছি—

সতী তখনও থামেনি। বললে—ওরা যদি ভালো লোক হবে তো ওদের বাড়ির বউ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়?

ভদ্রলোক বললেন—আমরা তো অত খবর জানতে পারি না।

—তাহলে কেন বলছেন ওরা লোক ভালো! ওদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে আপনি দেখেছেন, না শুধু বাইরে থেকে গাড়ি দেখেছেন, চাকর-বাকর দেখেছেন আর বিচার করেছেন! জানেন ওদের অন্দর-মহলে কত রকম অত্যাচার হয়?

জানেন ওদের বাড়িতে বউ হয়ে এলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যায় চিরকালের মত? তার ইহকাল-পরকাল-চিরকাল কেঁদে কাটাতে হয়?

বলতে বলতে সতী হঠাৎ যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললে। উত্তেজনায় কাঁধের শাড়িটা খসে গেল অজ্ঞাতে। যেন এক মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে উঠলো সতী! যেন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত তার একাকার হয়ে গেল এক নিমেষে।

মিস্টার ঘোষাল সামলে নিলেন। বললেন—চুপ করো, ওঁর সঙ্গে অত কথা বলবার দরকার কী?

সতী বললে—কেন চুপ করবো? চুপ করে থাকবার জন্যে কি ওঁর বাড়ি ভাড়া নিয়েছি? আমি এ-বাড়ির ছাদে উঠে চেঁচাবো, সকলকে জানিয়ে দেব আমি কে। সকলকে প্রচার করে দেব আমি ঘোষ-বাড়ির বউ—

—আঃ—

মিস্টার ঘোষাল আবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মিসেস ঘোষের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই সতী চুপ করে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল সতীর ঘরের জানলায় যেন কার মুখ দেখা গেল। সনাতনবাবু! হয়ত তিনিই টের পেয়েছেন। হয়ত তিনি সতীর গলা চিনতে পেরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন।

সতীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে মিস্টার ঘোষালও চেয়ে দেখলে সেই দিকে। বললে—কে ও? মিস্টার সেন না!

সতীও যেন এতক্ষণে চিনতে পারলে। দীপু না? দীপু ওখানে কেন এই সময়ে?

কিন্তু একটি মুহূর্ত। তারপরেই মুখটা ভেতরে সরে গেল।

একতলার বৈঠকখানা ঘরে নির্মল পালিত তখন কাগজপত্র ছড়িয়ে মা-মণিকে বলছিল—নিজের চোখে আপনি সমস্ত দেখে নিন্—নিজের প্রপার্টি নিজের চোখে দেখাই ভালো মা-মণি—

মা-মণি বললেন—আমার কি পোড়া চোখ আছে যে আমি দেখবো বাবা, ও-সব আমায় দেখাচ্ছো কেন? আমি ও-সব কী-ই বা বুঝি?

নির্মল বললে—কিছু বুঝতে যে আপনাকে হবেই মা-মণি! আপনার প্রপার্টি আপনি না বুঝে নিলে বুঝবে কে?

—না বাবা আমার ও-সব বুঝে দরকার নেই। আর আমিই যদি অত বুঝতে পারলো তো তুমি আছো কী করতে? আর আমার কি মনের ঠিক আছে বাবা। আমার মন যে পড়ে রয়েছে অন্য জায়গায়—

—অন্য জায়গায়? কোথায়?

মা-মণি বললেন—সেই যে ছোক্‌রা ওপরে ছেলের কাছে গেল, সে তো

এখনও ফিরলো না! কানে কী ফুস্-মন্তর দিচ্ছে কে জানে-

তারপর উঠলেন। বললেন—দাঁড়াও বাবা, তুমি বোস, আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি এতক্ষণ ধরে কী শলা-পরামর্শ দিচ্ছে কানে। একে আমার বাতের জ্বালা, তার ওপর হয়েছে এই এক ঝঞ্ঝাট—

বলে মা-মণি উঠে ঘরের বাইরে গেলেন।

ঘরের মধ্যে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দীপঙ্করের মনে হলো যেন কোথা থেকে সতীর গলার শব্দ আসছে। তবে কি সতীও এসেছে এ-বাড়িতে! ঠিক সতীর গলার শব্দের মতই বটে! এখন এখানে এসেছে! দীপঙ্কর জড়সড় হয়ে বসলো। এক্ষণি হয়ত এ-ঘরে ঢুকে পড়বে! কিন্তু আবার মনে হলো, ভেতরে নয়, বাইরে। বাইরে কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে। ঠিক অবিকল সতীর মত গলা। দুজনের গলার শব্দ কি একরকম হতে পারে! হঠাৎ পাশের জানলাটার গিয়ে দাঁড়াল দীপঙ্কর। একটা দোতলা বাড়ির বারান্দায় যেন দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অল্প অন্ধকারে স্পষ্ট চেনা যায় না। তবু তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দীপঙ্করের মনে হলো সতীই যেন। আর সতীর পাশে? সতীর পাশে যেন মিস্টার......

—কানে কী এত ফুস্-মন্তর দিচ্ছ শুনি?

হঠাৎ দীপঙ্কর পেছন ফিরলো। ফিরেই দেখলে সামনেই সতীর শাশুড়ী। সতীর শাশুড়ী আবার বললেন—তখন থেকে বসে বসে কী এত ফুস্-মন্তর দেওয়া হচ্ছে আমার ছেলেকে?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি কাছে সরে এসে বললে—এ আপনি কী বলছেন? শুনেছিলাম সনাতনবাবুর অসুখ, তাই দেখতে এসেছিলাম—

—তা দেখতে কি এই দশ ঘণ্টা লাগে বাবা! চোখে তো এখনও চশমা ওঠেনি, তবু এত কীসের দেখা।

দীপঙ্কর বললে—এইবার আমি যাচ্ছিলাম—

—তা যাচ্ছিলাম তো যাও। যাই-যাই করেও দশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে! এতক্ষণ কী শলা-পরামর্শ হচ্ছিল শুনি?

দীপঙ্কর সহজভাবেই উত্তর দিলে—শলা-পরামর্শ আবার কী হবে মা-মণি!

হয় হয় বাবা হয়। আমি বুড়ো মানুষ হলে কী হবে, কোথায় কার সঙ্গে কী শলা-পরামর্শ হয় সব আমার কানে আসে, আমি সব টের পাই! বুড়ো হয়েছি বলে এখনও চোখ-কানের মাথা খেয়ে বসিনি—

দীপঙ্কর বললে—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি—

বলে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল দীপঙ্কর, হঠাৎ সনাতনবাবু বললেন—আপনি তাহলে আমাকে আপনাদের ওখানে একদিন নিয়ে যাচ্ছেন দীপঙ্করবাবু—

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন—

মা-মণি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন যেন। বললেন—কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

কথাগুলো যে কাকে উদ্দেশ করে বলা হলো বোঝা গেল না। দীপঙ্কর দরজার দিকে যেতেই সতীর শাশুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় নিয়ে যাবে শুনি? কোথায়?

কিন্তু ততক্ষণে দীপংকর সোজা বেরিয়ে এসেছে। সতীর শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তর সনাতনবাবু দিলেন কি না তা আর জানা হলো না। সোজা তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারদিকে চেয়ে দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল আবার। একদিন এই বাড়ির ভেতরেই বহুকাল আগে একবার এসেছিল, সেদিন এখানে সযত্ন পারিপাট্যের ছোঁয়াচ ছিল, আজ যেন সব হতশ্রী। বারান্দার কোণে, সিঁড়ির দুপাশে ধুলো জমেছে! নিচের সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছেও একটা পাখি ছিল। খাঁচাটা খালি পড়ে আছে আজ। তারপর বারান্দা আর বাগান পেরিয়ে সোজা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এসে থামলো!

ব্যাড়ওয়ালা ভদ্রলোক বললেন—তাহলে কবে থেকে আসছেন আপনারা?

মিস্টার ঘোষাল বললে—ধরে নিন আজ থেকেই—আজ থেকেই নিয়ে নিলুম—আপনি তো ভাড়া পেয়ে গেলেন—

গাড়িতে উঠে মিস্টার ঘোষাল বললে—কী ভাবছো?

সতী বললে—কই, ভাবছি না তো কিছু—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি বলেছিলে বলেই ভাড়া নিলুম—তোমার জেদটা রইল—

তবু সতী কিছু কথা বলে না। এতদিন এত জল্পনা-কল্পনা, এতদিন ধরে এত প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা সব যেন আজ হঠাৎ শিথিল হয়ে গেছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটার সামনে এসে।

মিস্টার ঘোষাল আর একটা চুরোট ধরালে। বললে—তুমি যা চেয়েছিলে সব তো দিলাম, তবু মুখ ভার করে রইলে কেন?

সতী উত্তর দেবার আগেই গাড়িটা ব্রেক কষে একবার হর্ন বাজালে। রাস্তার মধ্যেই কে যেন ছিল। সে সরে যেতেই গাড়িটা আবার সোজা হাজরা রোডে গিয়ে পড়লো। মিস্টার ঘোষাল বললে—ঘর চলো—

এক মুহূর্ত শুধু। ব্রেক কষে থেমে আবার সোজা ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া। ব্ল্যাক্-আউটের অন্ধকার। তবু স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলে দীপঙ্কর। স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলে সতী। আর তারপরেই দীপঙ্কর খানিকক্ষণ সেই রাস্তার ধারেই নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার চলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

হাজরা পার্কের ভেতরে তখন কিছু ভিড় জমেছে। আলো নেই। ব্ল্যাক্-আউটের রাতে বাইরে আলো জ্বালানো নিষেধ। তবু কয়েকজন জড়ো হয়েছে সেখানে। জোর বক্তৃতা চলছে। বক্তাকে ঘিরে অনেক লোক চুপ করে লেকচার শুনছে।

ভদ্রলোক বলছেন—বন্ধুগণ, আমরা আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসবাস করছি। আমাদের মাথার ওপর যুদ্ধ, আর আমাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে বিভেদ। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর প্রস্তাব আমরা নাকচ করে দিয়েছি আপনারা জানেন। আজ যদি আমরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসী একমত হতে পারতুম, আজ যদি মহম্মদ আলি জিন্না আমাদের কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন, তাহলে কি আজ ক্রিপস্-সাহেব এমন করে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে খালি হাতে চলে যেতে পারতেন! তবু আমি বলছি, আমাদের ভয় করবার কিছু নেই: আমরা কংগ্রেসসেবীরা মহাত্মা গান্ধীকেই আমাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছি—মহাত্মাজী ওয়ার্ধার মিটিং-এ আমাদের বলেছেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর শূন্য স্থান শ্রীরাজাগোপালাচারীকেও দিতে চান না, সর্দার প্যাটেলকেও দিতে চান না। দিতে চান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। পণ্ডিতজী বাঙলার বড় আদরের নেতা—আজ যখন বাঙলা দেশ নেতাহীন, সুভাষবাবু নিরুদ্দেশ, শরৎ বসুও জেলে, তখন পণ্ডিতজীর মত নেতা থাকতে বাঙালীর ভয় কী......

অনেক দূর থেকেও কথাগুলো কানে আসছিল দীপঙ্করের। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েও হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো। আবার পার্কের কাছে ফিরে এল। তারপর পার্কের ভেতরে ঢুকে কাছে গিয়ে দেখলে।

—এই যে যুদ্ধ বেধেছে, এ হিংসা, এ ষড়যন্ত্র, এ অন্যায় আর অত্যাচারের ফল। মানুষ আজ সৎ হতে ভুলে গেছে, মানুষ আজ অহিংসার পথ ভুলে গেছে, মানুষ আজ সত্য কথা বলতেও ভুলে গেছে!

দীপঙ্কর অবাক হয়ে দেখলে—বক্তৃতা দিচ্ছে ফোঁটা। ফটিক ভট্টাচার্য! একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফোঁটা বক্তৃতা দিচ্ছে, আর প্রাণমথবাবু তারই পাশে চুপ করে বসে আছেন। ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ, অসহায়ের মত চেহারা। আর তাঁর পাশেই ছিটে। ফোঁটা যেন আরো ফরসা হয়েছে, আরো স্বাস্থ্যবান। ফরসা ধপ্‌ধপে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর গায়ে। কী চমৎকার সৌম্য শান্ত চেহারা, কী উদাত্ত কণ্ঠ। কথা শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করে! ছিটেকেও আর চেনা যায় না।

আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না দীপঙ্করের। সোজা বেরিয়ে হাজরা রোড পার হয়ে একেবারে নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। একে বস্তি, তার ওপর ব্ল্যাক্-আউট্। কিরণের মা কি জানে যে, কিরণ ফিরে এসেছে? বাড়িতে ক্ষীরোদা একলা রয়েছে, এ-সময়ে যদি কিরণের মা দীপঙ্করের কাছে গিয়ে থাকে তো অনেক সুবিধে হয়। তা ছাড়া, এই বস্তির মধ্যে একলা পড়ে

থেকে লাভ কী! কে দেখবার আছে? যদি একটা অসুখ বিসুখ হয়, তখন?

কিন্তু কিরণদের বাড়িটার সামনে গিয়েই দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। চার পাঁচটা পুলিস বাড়ির সদর দরজার সামনে রোয়াকের ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে।

দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকতে যেতেই তারা বাধা দিলে।

বললে—কাঁহা যানা হ্যায় বাবু?

দীপঙ্কর বললে—ভেতরে মাঈজীর সঙ্গে দেখা করবো—

পুলিসদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে—কোন্ মাঈজী?

দীপঙ্কর বললে—কিরণবাবুর মা—

তারা ভেতরে যেতে দিলে না। শেষ পর্যন্ত কিরণের মা-ই বাইরে এল। বললে—দীপু! তুমি?

দীপঙ্কর বললে—মাসীমা, আপনার সঙ্গেই একটা কথা বলতে এসেছিলুম, কিন্তু চারদিকে পুলিস-পাহারা দেখছি—

মাসীমা বললে—হ্যাঁ বাবা, দেখ না, বাড়ির বাইরেও যেতে পারিনে, বাড়ির ভেতরে থেকেও শান্তি নেই, ক'দিন থেকে যে কী হয়েছে বুঝতে পারছিনে, কেন এমন করছে তা-ও কেউ বলতে পারছে না,—আমি ক'দিন ধরে বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা—

দীপঙ্কর পুলিসদের দিকে ফিরে জানতে চাইলে কেন তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে। এর কারণ কী? তারা জানালে—তাদের ওপর যেমন হুকুম হয়েছে, তেমনি করছে।

মাসীমা বললে—তুমি বাবা দীপু এদের একটু বলে দাও না, কেন এরা এ-রকম করছে! কিরণ তো নেই এখানে, তাকে কতদিন দেখিনি—সে বেঁচে আছে কি না তাও জানি না, তবু কেন এত দুর্ভোগ বল দিকিনি বাবা? আমি কী করেছি? কার কী ক্ষতি করেছি?

দীপঙ্কর একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি মাসীমা আমার বাড়িতে চলুন—যাবেন?

মাসীমা বললে—না বাবা, আমি কোথাও যাবো না, এখানেই মরবো আমি—আমি এখানেই মরবো—এখানেই মরে পড়ে থাকবো—

দীপঙ্কর আর কথা বাড়ালো না। বললে—আপনি ভেতরে যান মাসীমা, আমি এখন আসি, আবার আসবো—

মনে আছে, সেদিন আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি সেখানে দীপঙ্কর। মাসীমার মুখের চেহারা দেখে কেমন ভয় হয়েছিল মনে। বোধ হয় মাসীমা আর বেশি-দিন বাঁচবে না। মনে হয়েছিল কিরণের মা'র মনে এতটুকু শান্তি দেবার ক্ষমতাও তার নেই। নিজেকে তাই বড় অপদার্থ মনে হয়েছিল তার। কিরণের মা'র উপকার করা যেন কিরণেরই উপকার করা। কিরণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দীপঙ্কর, কিরণের মা'র উপকার করলে তার যেন কিছুটা স্খালন হতো। যেন

কিরণেরই উপকার সে করতে এসেছিল এখানে।

কিন্তু কিছুই করা হলো না। অসহায় দুর্বলের মত, অপরাধীর মত দীপঙ্কর আস্তে আস্তে আবার নেপাল ভট্টাচার্যি লেন পার হয়ে চলে এল বড়-রাস্তায়।

সকাল থেকেই সনাতনবাবু তৈরী হয়েছিলেন। নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। নিজেই নিজের সব জামা-কাপড় বার করেছেন। কখনও নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়নি তাঁকে। কোথায় কোন্ জামা কোন্ কাপড় থাকে তাও জানেন না। আলমারির চাবিও কোনও দিন নিজের হাতে স্পর্শ করেন নি। কোন্ ফুটোতে কোন্ চাবি লাগে তাও জানেন না।

শম্ভু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললে—এ কী জামা পরেছেন দাদাবাবু, এ যে উল্টো পরেছেন!

—হোক্ উল্টো, উল্টো পরলে কে দেখতে পাচ্ছে?

শম্ভু বললে—আসুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি—

দীপঙ্কর নিচের বৈঠকখানা ঘরে বসে ছিল অপেক্ষা করে। আপিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও সনাতন-বাবু আসছেন না।

হঠাৎ মা-মণি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—কোথায় যাচ্ছো তুমি সোনাকে নিয়ে?

দীপঙ্কর মা-মণির এই হঠাৎ উপস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এই প্রশ্নের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না। কী বলবে বুঝতে পারলে না। মা-মণি আবার বললেন—তোমায় সেদিন বলেছিলুম না যে তুমি আমার ছেলের কানে ফুস্-মন্তর দিতে এসো না—

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবু যদি না যেতে চান তো আমি জোর করে তাঁকে নিয়ে যাবো না—

—তুমি তো বড় বেয়াদপ্ দেখছি।

দীপঙ্কর বললে—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন আমার ওপর।

মা-মণি বললেন—আবার তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলছো? তুমি যাও এখান থেকে, বেরিয়ে চলে যাও—

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে—আপনি আমাকে আজ যেতে বললেও যাবো না, সনাতনবাবু এলে তিনি যা বলবেন, তাই করবো!

—তা আমি কেউ না? তোমার কাছে আমার ছেলেই আমার চেয়ে বড় হলো?

দীপঙ্কর বললে—আপনি ভুল বুঝেছেন মা-মণি, আমি আপনাকে সে-কথা বলিনি। আপনাকে আমি সম্মান করেই কথা বলেছি, আপনার যথাযোগ্য মর্যাদা আমি দিয়েছি, তবু আপনি আমাকে অপমান করছেন। আমি আপনারও শুভাকাঙ্ক্ষী, সনাতনবাবুরও শুভাকাঙ্ক্ষী—

—ছেঁদো কথা রাখো, আমি যা বলছি করো, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আর কখনও এসো না। যেদিন থেকে তুমি এসে ঢুকেছ, সেইদিন থেকেই শনি ঢুকেছে আমার সংসারে। আমার কত সাধের সংসার, আমার কত যত্নের বাড়ি, সব ছারখার হয়ে গেল তোমাদের জন্যে! কেন তুমি আসো? আমার বউকে নিয়ে গেছ, তাতেও তোমাদের সাধ মেটেনি? এখন আবার আমার ছেলেকে ভাগিয়ে নিতে চাও—

বলতে বলতে মা-মণি যেন বেদনায় নরম হয়ে এলেন। অনুশোচনায় সজল হয়ে এলেন। এমন চেহারা কখনও দেখেনি দীপঙ্কর মা-মণির।

মা-মণি আবার বলতে লাগলেন—আমি তোমাদের কী করেছি বলো তো? কী করেছি আমি তোমাদের? আর কারই বা আমি কী সর্বনাশ করেছি? আমার সোনার সংসার তোমরা দশজনে মিলে কেন এমন করে নষ্ট করলে? কী পাপ করেছিলুম আমি?

হঠাৎ শম্ভু ঘরে এল। বললে—মা-মণি, দাদাবাবুর বোতাম কোথায়? খুঁজে পাচ্ছি না তো! কোথায় আছে?

একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন মা-মণি।

—দাদাবাবুর বোতাম কোথায় তা আমি কী জানি? আমি দাদাবাবুর বোতাম লুকিয়ে রেখেছি যে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস?

শম্ভু তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলো। মা-মণি যেন নিজের মনের আগুনেই নিজে পুড়তে লাগলেন। বললেন—খবরদার বলছি, আমাকে কারো কোনও কথা জিজ্ঞেস করবি না কেউ, আমি কেউ নই এ-বাড়ির, আমি কারোর ব্যাপারে থাকি না, থাকবোও না—

কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা সে ততক্ষণে ঘর থেকে বাইরে চলে গেছে। দীপঙ্করের দিকে ফিরে মা-মণি বললেন—বলি, তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে, না কী? কথা যে তোমার কানে যায় না মোটে—

সঙ্গে সঙ্গে সনাতনবাবু এসে পড়েছেন। বললেন—চলুন, চলুন, বোতাম না হলে আর কী এমন অসুবিধে—চলুন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, চলুন—

—সোনা!!

বোধ হয় বহুদিন বাদে এই প্রথম মা-মণি নিজের ছেলেকে নাম ধরে ডাকলেন।

—কী মা-মণি?

—কোথায় যাচ্ছো শুনি? আমাকে না জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছো শুনি? বৌকে আনতে?

সনাতনবাবু ধুতির কোঁচা গোছাতে গোছাতে বললেন—হ্যাঁ—

—তাকে যে আনতে যাচ্ছো, তা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ ? আমার মত নিয়েছ ? আমিও তো একটা মানুষ, না কি মনে করেছ মা-মাগী একটা মানুষই নয় !

সনাতনবাবু কথাটা শুনে যেন আরো বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন—সে কি মা, আমি তো খারাপ কাজ কিছু করছি না, বড় কষ্টে পড়েছে তোমার বৌমা, টাকার অভাবে দীপঙ্করবাবুর আপিসে চাকরি করতে হচ্ছে তাকে—তাই আনতে যাচ্ছি, বাড়ির বউ চাকরি করবে, কথাটা কি ভালো ? তুমিই বলো ?

—তা সে কি তোমার পায়ে ধরে সেধেছে এখানে আসবার জন্যে ?

—সাধবে কেন ? আমরাই তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সে কোন্ সাহসে সাধবে আবার ? তার কি লজ্জা-সম্ভ্রম-মান-অপমানের কিছু বাকি রেখেছি আমরা ?

মা-মণি বললে—খুব তো লজ্জা-সম্ভ্রমের কথা আওড়াচ্ছো দেখছি, কিন্তু এতদিন কার বাড়িতে কার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে সে খবরটা রেখেছ ? নির্মল পালিত আমাকে সব বলেছে !

সনাতনবাবু বললেন—আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে ? তোমার বৌমাকে তুমিই চেনো আর আমি চিনি না ? আর তা ছাড়া রাত যদি কাটিয়েই থাকে তো তার জন্যে কে দায়ী মা !

—তার মানে ?

দীপঙ্কর দেখলে মা-মণির সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। যেন এখনি প্রলয়-কাণ্ড শুরু হবে। আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—তার মানে আমি দায়ী ?

সনাতনবাবু বললেন—আমি কি তাই বলেছি তোমাকে মা-মণি ? বলেছি তুমিও দায়ী, আমিও দায়ী।

বলে দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললেন—চলুন দীপঙ্করবাবু, আপনার আপিসের দেরি করিয়ে দিলাম—

দীপঙ্কর বললে—না, আপনি সেজন্যে ভাববেন না, আমি আজ দেরি হবে জেনেই বেরিয়েছি—

সনাতনবাবু বললেন—বোতামটা পাওয়া গেল না, বোতামের জন্যেই এতক্ষণ দেরি হয়ে গেল—

দীপঙ্কর বললে—তাতে কী হয়েছে, আমি সেদিন আপনাকে বলে গেলাম পরের দিন আসবো, কিন্তু সময় করে আসতে পারিনি—চলুন—

বাইরের সদরের দিকেই পা বাড়াচ্ছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ মা-মণির বজ্র-গম্ভীর গলার আওয়াজে থেমে যেতে হলো।

—যেও না, শোন !

সনাতনবাবু ফিরলেন। বললেন—আমাকে বললে ?

মা-মণি বললেন—হ্যাঁ, যদি বৌকে আনতেই হয় তো একটা কথা মনে রেখে

তবে এনো, তোমার বউ আমাদের এই রাস্তায় মিত্তিরদের বাড়িটা ভাড়া করেছে ! বিশ্বাস না হয় নির্মল পালিতকে জিজ্ঞেস কোর !

—ভাড়া করেছে ? তোমার বৌমা ? কীসের জন্যে ?

সনাতনবাবু দীপঙ্করের মুখের দিকেও চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—ভাড়া করেছে নাকি দীপুবাবু ? আপনি তো বলেননি কিছু আমাকে ? কীসের জন্যে ভাড়া করেছে ?

উত্তর দিলেন মা-মণি ! তাঁর গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে বললেন—কীসের জন্যে আবার, ব্যবসা করবার জন্যে !

—মা !!

মা-মণিও কম উত্তেজিত হননি। বললেন—চোখ রাঙাচ্ছো কাকে ? চোখ রাঙাচ্ছো কাকে তুমি খোকা ! আমিই এ-বাড়ির মালিক, এ-বাড়িতে বৌকে আনতে হলে আমার অনুমতি নিতে হবে, এই আমার হুকুম। আমার হুকুমটা মনে রেখে তবে বৌকে আনতে যেও—

বলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। সনাতনবাবুও সদর দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হতেই দীপঙ্কর ফিরে দেখলে মা-মণি সিঁড়ির প্রথম ধাপটার ওপর উঠতে গিয়ে ধপাস করে পা পিছলে পড়ে গেছেন। দীপঙ্করও দেখেছে, সনাতনবাবুও দেখেছে।

দীপঙ্কর দৌড়ে ধরে তুলতে গেল। কিন্তু কী ভেবে একটু সংকোচও হলো আবার। কিন্তু সনাতনবাবু ততক্ষণে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছেন। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মা-মণির হাতটা ধরে তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মা-মণির তেজ বোধ হয় তখনও কমেনি। একেবারে আর্তনাদের মত করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ছুঁও না আমাকে, ছুঁও না—তোমার মত ছেলের ছোঁয়াচও পাপ—

সনাতনবাবু কিন্তু দমলেন না তবু। নিচু হয়ে বললেন—মা-মণি, লেগেছে খুব ?

শব্দ পেয়ে শম্ভু দৌড়ে এসেছে। ভেতর-বাড়ি থেকে কৈলাসও দৌড়ে এসেছে। বাতাসীর-মা, ভূতির-মা, তারাও দৌড়ে এসেছে। ঠাকুর রাঁধতে রাঁধতে খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। ভিড় জমে গেল বারান্দায়। মাথাটাতেই বেশি লেগেছিল। সিঁড়ির সিমেন্টের ওপর টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়তে লাগলো।

সনাতনবাবু বললেন—শম্ভু, ডাক্তারবাবুকে খবর দে একবার—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ব্লাড-প্রেশার ছিল নাকি মা-মণির ?

সনাতনবাবু বললেন—তা তো জানি না—

ডাক্তারবাবু বোধ হয় পাড়ারই। সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন। সনাতনবাবু তখন নিজেই কাঁপছেন থর থর করে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু ব্লাডপ্রেশারটা দেখছিলেন তখন। দেখা শেষ করে বললেন—

না, প্রেশার নর্ম্যাল—এমনি পা শিলপ করে পড়ে গেছেন—কিছু ভয় নেই—এবার ধরাধরি করে ভেতরে শুইয়ে দিন—

মা-মণি তখন অচৈতন্য। আর মুখে সেই ঝাঁজ নেই। সনাতনবাবু দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন—আজ আর আমার যাওয়া হবে না দীপঙ্করবাবু, দেখছেন তো ব্যাপারটা—

দীপঙ্করও বললে—না না আজকে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই—আমি আসি—

সনাতনবাবু বললেন—আপনি সতীকে সব জানাবেন দীপঙ্করবাবু,—বলবেন আমি যেতুম ঠিক, কিন্তু বাধা পড়লো—সে যেন একবার মা-মণিকে দেখতে আসে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার সঙ্গে যে সতী আর কথা বলে না—

—কেন? কথা বলে না কেন?

দীপঙ্কর বললে—আর আমিও তো এখানে কলকাতার বেশি দিন থাকছি না, আমিও যে ট্রান্সফার হয়ে চলে যাচ্ছি, তাই ভেবেছিলাম যাবার আগে একটা যাহোক ব্যবস্থা করে যাবো......

—কোথায় ট্র্যান্সফার হচ্ছেন?

দীপঙ্কর বললে—ময়মনসিংএ।

রাস্তায় বেরিয়েই নজরে পড়লো। সনাতনবাবুদের বাড়ি ঢোকবার সময় অতটা লক্ষ্য হয়নি। ঠিক সামনের বাড়িটা। এতদিন প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এসেছে, এ-বাড়িটার দিকে কখনও নজর পড়েনি আগে। কোন্ মিস্তিরদের বাড়ি। ওপরে দু'খানা ঘর, নিচেও দু'খানা। রাজমিস্ত্রী খাটছে বাইরে। বাঁশের ভারা বেঁধেছে। চুন-কাম হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা। এইখানেই এসে সতী উঠবে। এইখানেই মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকবে। একেবারে এক ছাদের তলায়। একেবারে ঘোষ-বাড়ির মুখোমুখি। একেবারে সনাতনবাবুর চোখের সামনে। একেবারে নয়নরঞ্জিনী দাসীর বুকের ওপর!

আস্তে আস্তে দীপঙ্কর হাজরা রোডে গিয়ে পড়লো। তারপর হাজরা রোড থেকে একেবারে সোজা ডালহৌসী স্কোয়ার।

ট্যাক্সিটা আপিসের দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু দীপঙ্করের কী মনে হলো, বললে—সামনে চলো—

সোজা গিয়ে ট্যাক্সিটা থামলো রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে। তখন অনেক ভিড় জমেছে সেখানে। বার্মা ইভাকুয়ীজ আপিসের সামনে অসংখ্য মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিতে এসেছে। দীপঙ্কর তাদের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকলো। সমস্ত কলকাতা যেন এসে জুটেছে এই আপিসের সামনে। জেনারেল ওয়াভেল বার্মা নিয়ে নেবার তোড়জোড় করছে

তখন। কিন্তু সবাই বলছে এবার ইণ্ডিয়ায় বোমা পড়বে। এবার কলকাতার পালা। দীপঙ্করের কানে নানারকম কথা এল। পাশের দেয়ালে পোস্টার পড়েছে—একজন জাপানী রাইফেল উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। ছবির নিচের বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'গুজবে কান দিবেন না'। আরো কত রকমের সব পোস্টার। খরচ কমান। যুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করতে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন। ঘুড়ি উড়িয়ে সুতো নষ্ট করবেন না। ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করে পরুন।

অনেকক্ষণ পরে দীপঙ্করও জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রসিদটা এগিয়ে দিলে। বললে—ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—

ভেতরে ক্লার্করা খেটে-খেটে হিম্‌-শিম্ খেয়ে যাচ্ছে। গাদা-গাদা ফর্ম, গাদা গাদা ফাইল। দীপঙ্করের হাত থেকে রসিদটা নিয়ে কাগজ-পত্র-ফাইল সব ঘাটতে লাগলো। তারপর খানিক পরে বললে—এখনও নো ট্রেস্—কোনও খবর নেই—এই নিন—

দীপঙ্কর বললে—সে কি? আজ তিনমাস ধরে ঘুরে যাচ্ছি, এখনও খবর আসেনি, আই মাস্ট সী ইওর চীফ। আমি আপনাদের চীফের সঙ্গে দেখা করবো—আর একটু ভালো করে দেখুন—

ক্লার্কদেরও দোষ নেই। তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে বিপর্যস্ত। আবার কাগজ-পত্র-ফাইল পাড়লে। আবার নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো শেষে পাওয়া গেল। বললে—এই যে স্যার, পেয়েছি—

—পেয়েছেন? বেঁচে আছেন?

ক্লার্কটা বললে—না, এই ক্যাজুয়েল্টি-লিস্টে নাম রয়েছে, ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—

—মারা গেছেন?

ক্লার্ক বললে—হ্যাঁ, ইভাকুয়েশনের সময় যে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই জাহাজটাই বোমা পড়ে ডুবে গেছে, কোনও লোক বাঁচেনি—যারা ছিল তারাও ডেড্—এই দেখুন, লিস্ট দেখুন—

বলে ভদ্রলোক ছাপানো ক্যাজুয়াল্টি-লিস্টটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু দীপঙ্করের তখন সমস্ত হাত-পা হিম্ হয়ে গেছে। মুখ দিয়েও কথা বেরুচ্ছে না যেন।

বললে—আর একবার ভালো করে দেখুন, ভুলও তো হতে পারে—

ভদ্রলোক বললে—ভুল হবে কী করে স্যার, আপনি নিজের চোখেই দেখুন না, এই তো ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে—ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—বার্মা। এ খবর কখনও ভুল হতে পারে, আপনি নিজের চোখেই দেখুন না—

—কিন্তু এক নামের দুজনও তো থাকতে পারে?

ভদ্রলোক এবার বিরক্ত হলো। তার অনেক কাজ। পেছনে অনেক লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাগজ-পত্র গুটিয়ে রেখে বললে—তা ভুল থাকলে-থাকবে—আমরা ছাপার অক্ষরে যা দেখছি তাই আপনাকে বললুম—এর পরেও যদি আপনার সন্দেহ হয় তো হোক—তাতে আমরা কী করতে পারি—

সত্যিই তো, তাদের কী দোষ। তারা কী করবে। জীবনের এই উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা যতই বিস্তীর্ণ হবো, ততই তো আমাদের আনন্দ, আবার ততই তো আমাদের আঘাত সহ্য করতে হবে। আনন্দকে যদি স্বীকার করে নিয়ে থাকি, তাহলে আঘাতকেও এড়ালে চলবে না তো—! যে-সৃষ্টি কার্যটি নিঃশব্দে সারা ভুবনময় চিরদিন ধরে চলে আসছে, ধ্বংসের অঙ্কুরটি তো তার মধ্যেই চির-নিহিত আছে। এসব জেনেও দীপঙ্কর সেদিন প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল খবরটা শুনে। তাই প্রথমে বিশ্বাস হয়নি ক্লার্কের কথাগুলো। তাই বার-বার প্রশ্ন করে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিল। তাহলে? সমস্ত আশ্রয়গুলো নির্মূল হয়ে গেলে কোথায় আশ্রয় পাবে সতী? কোথায় সান্ত্বনা পাবে সে?

—হুজুর!

আপিসের নির্জন কামরার মধ্যে এতক্ষণ দীপঙ্কর যেন আত্ম-সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় কত দূরে কোন্ এক অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের যেন অন্তর্ধান হয়েছে, তারই বিয়োগ দীপঙ্করকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুহ্যমান করে দিয়েছিল একেবারে। অথচ পাশেই রয়েছে সতী। একেবারে পাশের ঘরেই। সেই সতীও জানে না কোন্ অপঘাত তার অজ্ঞাতে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার জীবনে। শুধু সতী নয়, কেউই জানে না। লক্ষ্মীদিও জানে না হয়ত!

—হুজুর!

এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলে দীপঙ্কর। মধু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী রে?

—ক্রফোর্ড সাহেব ডেকেছেন হুজুর।

সেদিন ক্রফোর্ড সাহেব হয়ত আশা করেছিল দীপঙ্কর তার কাছে অনুনয়-বিনয় করবে। হয়ত তার ট্র্যান্স্ফার ক্যানসেল্ড করবার জন্যে দরবার করবে। সদাশিব ক্রফোর্ড সাহেব শুধু বললে—তোমার কবে যেতে সুবিধে হবে সেন?

দীপঙ্কর বললে—যেদিন আপনি বলবেন।

সাহেব বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। বললে—তোমার বোধহয় সুবিধেই হলো সেন, এ-সময়ে ক্যালকাটা ইজ এ ডেঞ্জার জোন্. ডেঞ্জার জোন্ ছেড়ে যাওয়াই হয়ত ভালো তোমার পক্ষে!

সাহেব চেয়েছিল দীপঙ্কর প্রতিবাদ করে দরখাস্ত করবে। কিন্তু কিছুই করেনি দীপঙ্কর। এ ট্র্যান্সফার সে মাথা পেতেই নিয়েছে। আপিসের হুকুম

বলে নয়। এ সতীর দেওয়া শাস্তি বলে সে মাথা পেতে নিয়েছে। সতী তাকে মমতা দেয়নি। সতী তাকে সান্নিধ্য দেয়নি; তাতে দীপঙ্করের মনে মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, সতীর ঘৃণা পেয়ে, সতীর শাস্তি পেয়ে যেন তার সমস্তটুকু ধুয়ে মুছে গেল।

—তোমার যদি ময়মনসিংএ যেতে কোনও অসুবিধে থাকে তো তুমি অ্যাপীল করতে পারো—ইউ ক্যান অ্যাপীল—আমি কন্সীডার করবো তোমার অ্যাপ্লিকেশন্ সেন!

আশ্চর্য! ক্রফোর্ড সাহেব জানতো বাঙালীরা কলকাতা শহর ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, তাই বার বার অনুরোধ করেছিল সেদিন। কিন্তু তবু দীপঙ্কর কিছুতেই রাজী হয়নি। অভয়ঙ্কর সোজা এসে ঢুকেছিল ঘরের মধ্যে। সেও বুঝতে পেরেছিল এ ট্র্যান্সফার অন্যায়, এ ট্র্যান্সফার অবৈধ, অকারণ। দীপঙ্কর ক্লার্ক থেকে বড় হয়েছে, সেইটেই হয়ত তার একমাত্র অপরাধ। কিন্তু আর কোনও অপরাধের রেকর্ড তার পার্সোন্যাল ফাইলে নেই। দিল্লীর বোর্ড থেকে শুরু করে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই জানে সেন এফিসিয়্যান্ট অফিসার। ডি-টি-আই হিসেবেও এফিসিয়্যান্ট ছিল, এখন অফিসার হিসেবেও এফিসিয়্যান্ট। স্টাফের কাছে পপুলার। স্টাফরা ভালবাসে। ক্রফোর্ড সাহেব বেশী কাজ দেখে না, মোষাল ওয়াগন আর এস্টাবলিশমেন্ট নিয়েই ব্যস্ত। ট্র্যাফিকের কাজ সেনকেই সব করতে হয়। আর কেউ নেই।

অভয়ঙ্কর বলেছিল—কিন্তু দিস্ ইজ রং. দিস্ ইজ আন্ওয়ারেন্টেড—ইউ মাস্ট প্রোটেস্ট—

দীপঙ্কর হেসেছিল। বলেছিল—আমি প্রোটেস্ট করবো না—

—কিন্তু কেন? হোয়াই? তোমার কি ভয় করছে প্রোটেস্ট করতে?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, ভয় করছে না, ভাল লাগছে, এই ইনসাল্ট আমার ভাল লাগছে—

—তার মানে?

অভয়ঙ্কর কিছু বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারবেই বা কী করে! এ দীপঙ্করের এক অদ্ভুত আস্বাদ। সতীর সমস্ত ইনসাল্ট যেন দীপঙ্করের কাছে আশীর্বাদ। আর তাই-ই তার আনন্দ। সতী তাকে আরো আঘাত করুক। আরো অপমান করুক। তার আঘাতের মধ্যে দিয়েও যেন দীপঙ্কর সতীর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। মমতা না দিক আঘাতের মধ্যে দিয়েই তাকে মর্যাদা দিক তাকে আপন আত্মীয় করুক।

সেই আনন্দের কথাটা বলতেই বোধহয় দীপঙ্কর সেদিন আবার লক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়েছিল। সেই লক্ষ্মীদির বাড়ি। সেখানে তখন আরো পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য সেখানে তখন আকাশের মত নিচু হয়ে নেমে এসেছে লক্ষ্মীদির মাথায়। লক্ষ্মীদি শুধু হুকুম করে। একদিন যে ঐশ্বর্য

সতীর করায়ত্ত হয়েছিল ভুবনেশ্বর মিত্রের অর্থের যৌতুকে, সেই ঐশ্বর্যের সবটুকু আশীর্বাদের মত লক্ষ্মীদির মাথায় এসে নেমেছে। লক্ষ্মীদি ঘুম থেকে ওঠে দেরি করে। তারপর চা খায়। তারপর ব্রেকফাস্ট। পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে, বাড়িটা কেমন ভাঙা-বাড়ি ছিল, আর কেমন রাতারাতি হঠাৎ একটা প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। ভেতরের অনেক বিলাসের প্রাচুর্য বাইরের জগতে উঁকি-ঝুঁকি মারে। সবটা দেখা যায় না, বেশির ভাগটাই আন্দাজ করে নিতে হয়। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির গেটের সামনে। বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক নামে। তারপর ভেতরে ঢুকে যায় তারা। কোট-ট্রাউজার পরা সব সম্ভ্রান্ত লোক। সম্ভ্রান্ত লোকদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়। লক্ষ্মীদি তাদের অভ্যর্থনা করে আমন্ত্রণ করে। লক্ষ্মীদির সঙ্গ পেয়ে তারা ধন্য হয়ে যায়।

কেউ বলে—আজকাল হুইস্কিতে বড় ভেজাল চলছে—

তখনি টনক নড়ে ওঠে লক্ষ্মীদির। বলে—ভেজাল! ভেজাল তো হতে পারে না। আমি তো ওল্ড কাস্টমার, আমাকে ভেজাল প্রভিসন দেবে কেন? আচ্ছা দেখছি—

বলে তখনই ফোন্ করে দেয় স্টোরে। মিসেস দাতারের বাড়িতে হুইস্কি সাপ্লাই করা হয়েছে অমুক তারিখে। সে হুইস্কি কবেকার ইনডেণ্ট, কোন্ কোম্পানীর সাপ্লাই, সব খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। হুলস্থূল পড়ে যায় দোকানে। মিসেস দাতার আমাদের পুরোন কাস্টমার। ওয়াঁরের শুরু থেকেই তার বাড়িতে মাল যাচ্ছে, এরকম কম্প্লেন হওয়া অন্যায়। এমনি করে শুধু হুইস্কি নয়। সব কিছুই মিসেস দাতারের বাড়িতে সচ্ছল। সব কিছুই উদার। টাকার জন্যে চিন্তা নেই, শুধু পিওর মাল দরকার। পিওর মাল দাও, পেমেণ্ট দেব ক্যাশ। মিসেস দাতারের কাছে পেমেণ্টের জন্যে কেউ ভাবনা করে না। বিরাট মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর। যুদ্ধ যদি চলে আরো কিছুদিন মিসেস দাতার আরো উদার হবে, আরো সচ্ছল হবে! টি একটু বেশী বয়েল হয়ে গেলে মিসেস দাতারের মেজাজ বিগড়ে যায়। বলে—কী যে করে এরা সব, এখনও চা তৈরি করতে শিখলে না—

তারপর ডাকে—কেশব—

কেশব তখনও আছে। কেশবের পদমর্যাদা বেড়েছে মাইনে বেড়েছে এ-বাড়িতে। সে দৌড়ে এসে বলে—কী মা?

লক্ষ্মীদি বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলে—এ চা কে করেছে রে? এখনও চা করতে শেখেনি? আকবর বুঝি?

সামান্য একটু চা, সেই চা খারাপ হলেই লক্ষ্মীদির মাথায় এখন বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাত হয় বাড়ির বাবুর্চি, বয়, খানসামা চাকর—সকলের মাথায়! তারপর হুইস্কি, চা, সোডা, লেমনেড, ডিনার, ব্রেকফাস্ট—সব কিছুর দিকেই মিসেস দাতারের তীক্ষ্ম নজর। মিস্টার দাতার চুপ করে থাকেন। তাঁর পোশাক-

পরিচ্ছদেও এখন আরো জৌলুস এসেছে। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে টাকা জোগাচ্ছে, সব দেখতে পান। তাঁর নামেই কারবার। যে ফ্যাক্টরি তাঁর নেই, সেই ফ্যাক্টরি থেকেই লক্ষ-লক্ষ টাকার অর্ডার সাপ্লাই হচ্ছে। তিনিই চেক সই করছেন, তিনিই চেক রিসিভ করছেন। তিনিই সব। তাঁর নামেই ব্যাঙ্ক য়্যাকাউণ্ট। লক্ষ্মীদি কেউ না, কিছু না। কিন্তু তবু যখন সুধাংশু আসে বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। সুধাংশুর হুইস্কিতে একটু সোডার প্রপোরশন কম হলে চলবে না, সুধাংশুর চায়ে একটু কম চিনি হলে চলবে না। সুধাংশুর জন্যেই এই বাড়ি, এই গাড়ি, এই ঐশ্বর্য এই সুখ, এই টাকা, এই সব কিছু। সবাই টেবিলে বসে আছে, হঠাৎ খবর এল। সুধাংশুর গাড়ির হর্ন-এর শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পারে।

—কী হলো সুধাংশু, এত দেরি যে?

সকলেরই মুখ এই একটি মানুষের মুখের দিকে। এই একটি মানুষকে ঘিরেই সকলের সব উৎসব, সব আয়োজন।

—আর বলেন কেন মিসেস দাতার, এবার গভর্নমেণ্ট আমাকে খেয়ে ফেলবে। হোল্ সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সাপ্লাই সেণ্টার হয়ে গেছে আমাদের আপিসটা, কাজ করে করে আর পারছি না।

মিসেস দাতার বলে—সত্যিই তো, তুমি আর কতদিক সামলাবে, কিন্তু এ-রকম করলে যে তোমার হেলথ ব্রেক করবে—আরো গোটা কয়েক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসার নাও—

সুধাংশু বলে—সে তো নিয়েছি, কিন্তু যেমন হয়েছে আমাদের রটন্ গভর্নমেণ্ট, তেমনি হয়েছে আমাদের রটন্ অ্যাসিস্ট্যাণ্টস্—কারোর যদি একটু বুদ্ধি থাকে—ওয়ান আউন্স অব ব্রেন থাকে—রটন্—রটন্—

মিসেস দাতার বলে—কেন, আজকেও বুঝি কনফারেন্স ছিল?

—কনফারেন্সের কথা ছেড়ে দিন মিসেস দাতার, এই মুসলিম লীগ মিনিস্ট্রি হয়েছে যেমন, তার মিনিস্টাররাও হয়েছে তেমনি—খাজা হাবিবুল্লার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আজ আমার মাথা ধরে গেছে। কিছু বোঝে না—ইংরিজী ভাষাটাও এরা ভালো করে শেখেনি, অথচ মিনিস্টার হয়েছে—।

তারপর হঠাৎ বললে—ভাবছি দিল্লীতে চলে যাবো—

দিল্লীতে! সবাই চমকে উঠলো। মিসেস দাতার বললে—দিল্লীতে?

সুধাংশু ততক্ষণে চায়ে চুমুক দিয়ে সিগ্রেট ধরিয়েছে। বললে—দিল্লীতে না গেলে কাজের বড় অসুবিধে হচ্ছে, বার বার দিল্লীতে যেতে-আসতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, কেউ তো কিছু কাজ জানে না—সমস্ত রটন্ হয়ে গেছে, এ ওয়ার যে-এরা কেমন করে জিতবে বুঝতে পারছি না—

চৌধুরীও এতক্ষণ সব শুনছিল। সে যেন আঁতকে উঠলো। বললে—ওয়ার কি শেষ হয়ে যাবে না কি?

মিসেস দাতারও চমকে উঠলো। বললে—বলছো কী, সুধাংশু, ওয়ার শেষ হয়ে যাবে?

সুধাংশু চায়ে আর একবার চুমুক দিয়ে বললে—আমি যদি ঠিকমত সাপ্লাই না দিতে পারি তো ওয়ার তো শেষ হয়ে যাবেই—ওয়ার করবে সোলজাররা কী খেয়ে?

মিসেস দাতার বললে—না, না, সে কি? ওয়ার যেন শেষ করতে দিও না, আরো কয়েকটা বছর অন্ততঃ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চাই—তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে দেখছি সুধাংশু—

চৌধুরী বললে—আমিও ভয় পেয়ে গেছি, তিনশো টাকা অ্যালাওয়েন্স হঠাৎ স্টপ হয়ে গেলে খাবো কী?

সুধাংশু বললে—সেই অবস্থাই হয়ে উঠেছে—কেউ কিছু কাজ করবে না সবাই ডিস্-অনেস্ট হয়ে উঠেছে, কীসে আরো একস্ট্রা উপায় করবে তাই ভাবছে—সে গভর্নর থেকে আরম্ভ করে ডাউন টু মিনিস্টারস্—

মিস্টার দাতার এতক্ষণ শুনছিলেন সব কথা। বললেন—ওয়ার কি সত্যিই থেমে যাবে সুধাংশুবাবু?

সাধারণত এ-সব আলোচনার সময় মিস্টার দাতার কথা বলেন না। তিনি সেজেগুজে চুপ করে বসে থাকার দলে। কিন্তু তাঁকে কথা বলতে শুনে সুধাংশু একটু অবাক হলো। বললে—আপনার কিছু ভয় নেই মিস্টার দাতার—অন্তত আমি যতদিন সাপ্লাইতে আছি—

মিস্টার দাতার বললে—না, আপনারা তো সেসব দিন দেখেননি সুধাংশুবাবু, ট্রেড-ডিপ্রেসনের ভিকটিম যে আমি—অনেক ভুগেছি—তখন এখনকার মত ক্যাশে পেমেণ্ট হতো না তো—দু বছর তিন বছর পর্যন্ত ক্রেডিট পড়ে থাকতো পার্টির কাছে—

এমনি করেই প্রতিদিন এ-বাড়িতে আড্ডা হয়। বাইরে যখন ব্ল্যাক আউট, যখন মিলিটারি লরী রাস্তা কাঁপিয়ে লোক চাপা দিয়ে ছুটে বেড়ায় বাইরে, যখন যুদ্ধ কবে শেষ হবে তাই নিয়ে আলোচনা করে গৃহস্থেরা, তখন এখানে হুইস্কিতে ভেজাল হলে হুলস্থুল পড়ে যায়, চায়ে চিনি কম হলে খানসামার চাকরি চলে যায়, তখন যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে শুনলে সবাই চমকে ওঠে।

তারপর যখন রাত আরো গভীর হয়, এ-পাড়ার রাস্তায় মিলিটারি লরীর আওয়াজ আরো বাড়ে, তখন চলে তাস। দল বেঁধে তাস খেলা শুরু হয়। হুইস্কির বোতল খোলা হয় নতুন করে। সিগারেটের টিন খোলা হয় নতুন করে।

মিসেস দাতার সুধাংশুর হাতটা চেপে ধরে। বলে—আর খেও না সুধাংশু, এর পরে আর ড্রাইভ করতে পারবে না—

সুধাংশু হাসে। বলে—কী বলছেন মিসেস দাতার, আপনি আমাকে এখনও চিনলেন না—

মিসেস দাতার বলে—আর চিনে দরকার নেই তোমাকে—

সুধাংশু তবু হাসে। বলে—আপনি ভয় পাবেন না মিসেস দাতার, বর্ন ইন এইটিন এইট্টি অ্যান্ড স্টিল গোয়িং স্ট্রং—আমি খাঁটি স্কচ—ডাইরেক্ট ফ্রম ব্রুয়ারী, হোয়াইট হর্স—রেড লেবেল—ব্ল্যাক-মার্কেটে আমার দাম পঁচাত্তর টাকা পার বটল্—

মিসেস দাতার বলে—আস্তে, একটু আস্তে সুধাংশু—

সুধাংশু বলে—কেন, আস্তে কেন মিসেস দাতার, আমি কাউকে ভয় করি না কি?

মিসেস দাতার বলে—পাশের ঘরে যে মানস আছে—

—মানস!

এতক্ষণ কারোরই খেয়াল ছিল না। সুধাংশু বললে—তা মানস কবে যাবে?

—কোথায় যাবে? ও তো আর কোথাও যেতে চাইছে না!

—পাঠিয়ে দিন! জোর করে পাঠিয়ে দিন আপনি! অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ যেখানে হোক পাঠিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি—

মিসেস দাতার বললে—কিন্তু এখন পাঠাই কী করে আমি? ওকে সেই যুদ্ধের মধ্যে পাঠিয়ে কি আমিই থাকতে পারবো?

সুধাংশু বললে—কিন্তু এখানে আপনার চোখের সামনে অত বড় ছেলে থাকলে ফুর্তি জমবে কী করে মিসেস দাতার? ছেলের সামনে কি ফুর্তি জমে? আপনিই বলুন?

ওদিকে ভেতরে মিস্টার দাতার নিজের বিছানার ওপর চিত হয়ে চুপ করে শুয়ে ছিল। অন্ধকার চারদিকে। মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে অ্যাণ্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট বন্দুকের আওয়াজ আসছে। হঠাৎ ঘরের ভেতরে কার পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে উঠলো।

—কে?

—এ কি, তুমি ঘুমোও নি এখনও? রাত তো অনেক হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়। আবার তোমার শরীর-খারাপ হবে দেখছি—

মিস্টার দাতার বললে—তুমি ঘুমোবে না?

মিসেস দাতার বললে—আমি কী করে ঘুমোই, ওরা যে এখনও রয়েছে—

—ওরা কখন যাবে?

মিসেস দাতার বললে—তা ওরা না গেলে কি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেব বলতে চাও? তুমি যে কী বল তার ঠিক নেই। আমি কি ওদের চলে যেতে বলতে পারি?

—না, আমি কি তাই বলেছি? বলছিলুম যে ওদের কি ঘুমও পায় না?

—থাক, তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক করতে পারি না।

দাতারবাবু কিছু বললে না। খানিক চুপ করে রইলো। তারপরে আবার বললে—তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ নাকি এখন?

মিসেস দাতার শাড়ি বদলাচ্ছিল। বললে—হ্যাঁ, একটু মাঠের দিকে বেড়াতে যেতে বলছে সুধাংশু—

—তা বলে এত রাত্তিরে? এখন তো অনেক রাত!

মিসেস দাতার বললে—ওরা বায়না ধরেছে এখন, না গেলে চলে?

দাতারবাবু একটু চুপ করে থেকে বললে—একটা কথা তোমাকে বলছিলুম—

—কী কথা বলো, আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে, শিগগির বলো।

দাতারবাবু বললে—আমাদের তো অনেক টাকা হয়ে গেল, সেদিন ব্যাঙ্কের পাশ-বইটা দেখছিলুম, আর এখন টাকার দরকারই বা কী!

—তুমি যে কী বলো! তোমার দেখছি মাথাটা এখনও ভাল করে সারেনি। টাকার দরকারের আবার শেষ আছে নাকি? যে-কষ্ট আমরা করেছি, তোমার মনে না-থাক, আমার তো মনে আছে। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিনি। আমি চললুম—

দাতারবাবু আর কথা বললে না। লক্ষ্মীদি নতুন শাড়িটা গায়ে জড়ালে। মুখে, গালে, গলায় পাউডার, স্নো ঘষলে। তারপর বললে—মানস যদি ওঠে, তাহলে যেন বোল না আবার কোথায় গেছি আমি,—

—কখন আসবে?

—মানস টের পাবে না। মানস ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমি ফিরে আসবো—যাই, কেমন?

খানিক পরেই বাইরের রাস্তায় সুধাংশুবাবুর গাড়ির ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠলো। হৈ হৈ শব্দ করতে করতে দল-বল বেরিয়ে গেল। দাতারবাবু শুনতে পেলে লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে গাড়িটা জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে। বোধহয় গেটটা বন্ধ। সেই মাল-গাড়িটা এই সময়ে রোজ আসে। রোজ রাত্রে দাতারবাবু জেগে-জেগে মাল-গাড়ির শব্দটা শোনে। প্রথমে ঝিক-ঝিক ক্ষীণ শব্দ। তারপর শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়, আরও তীক্ষ্ণ হয়। ক্রমে আরও স্পষ্ট, আরও তীক্ষ্ণ। তারপর একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ে বাড়িটার কাছাকাছি। তখন মাটি কাঁপে, বাড়িটাও কাঁপে। দাতারবাবুও থর থর কাঁপে বিছানার শুয়ে শুয়ে। তার মনে হয় আবার বুঝি তার মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে আগেকার মত। একদিন টাকার অভাবে মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার টাকার প্রাচুর্যে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

এমনি রোজ। রোজ রোজ এমনি করে বেরিয়ে যায় মিসেস দাতার শেষ রাত্রের দিকে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে সুধাংশুর গাড়িটার হর্ন বেজে ওঠে। অধৈর্য হয়ে ওঠে সুধাংশুর রক্ত। অধৈর্য হয়ে ওঠে রেড-লেভেল হুইস্কি। অধৈর্য হয়ে ওঠে উনিশ শো বিয়াল্লিশ সাল।

—কে?

সকাল বেলাই দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। দাতার-বাবু সকাল বেলাই উঠে পড়ে। বললে—তুমি অনেকদিন পরে যে এবার?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আপিস যাবার পথে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, লক্ষ্মীদি কোথায়?

—তিনি তো এখনও ঘুমোচ্ছেন!

—সে কি? এখন তো সাড়ে ন'টা বাজছে—

দাতারবাবু বললে—কাল ফিরতে অনেক রাত হয়েছে কি না, একটু বোস না, এই দশটার সময়ই উঠে পড়বেন—

পাশেই ছোট ছেলে একটি দাঁড়িয়ে ছিল। কী চমৎকার চেহারা। বছর চোদ্দ-পনেরো বয়েস হবে। এই চেহারাটাকেই যেন বহু দিন আগে ফ্রেমে আঁটা দেয়ালের ছবিতে ঝুলতে দেখেছিল। বললে—এই বুঝি আপনার ছেলে দাতারবাবু?

—হ্যাঁ, মানস!

এর চোখই সেদিন কথা বলেছিল মনে আছে। এই ছেলের জন্যেই লক্ষ্মীদি অপারগ হয়ে একদিন চৌরঙ্গীর রাস্তার দাঁড়িয়ে মানুষ ডেকে এনেছে নিজের বাড়িতে। এই ছেলের জন্যেই একদিন অনন্ত রাও ভাবের মাতলামি সহ্য করেছে। এই ছেলের জন্যেই আজ লক্ষ্মীদির বাড়িতে সুধাংশুর এত প্রতিপত্তি। এই ছেলের জন্যেই সুধাংশু আজ এ-বাড়িতে তার আনাগোনার অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে-পেরেছে। এই ছেলের জন্যেই আজ লক্ষ্মীদির এমন অবস্থা যে এখন সুধাংশুকে তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। সে ছেলে এই! দীপঙ্কর একদৃষ্টে দেখতে লাগলো মানসের দিকে চেয়ে। মনে হলো সেই লক্ষ্মীদির প্রথম যৌবনের সমস্ত সৌরভটুকু নিংড়ে নিয়ে যেন মানস-কমল হয়ে ফুটে উঠেছে মানস।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে? কী পরীক্ষা দিলে তুমি?

মানস মাথা নাড়লে। বললে—সিনীয়র কেম্ব্রিজ—

লজ্জা নেই, জড়তা নেই, সহজ সরলভাবে মুখের দিকে মুখ রেখে উত্তর দিলে মানস। লক্ষ্মীদির কলঙ্কের ওপর সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত একটা স্বপন। লক্ষ্মীদির স্বপন, দাতারবাবুর স্বপন। দীপঙ্কর বললে—চমৎকার ছেলে আপনার দাতারবাবু, লক্ষ্মীদির মুখে নাম শুনেছিলাম, এখন দেখলাম—

তারপর একটু থেমে বললে—আপনি কেমন আছেন আজকাল?

দাতারবাবু বললে—তুমি কেমন দেখছ আমাকে?

—খুব ভালো।

দাতারবাবু বললে—তা হবে, হয়ত এত ভালো থাকাও ভালো নয় দীপুবাবু!

—কেন, একথা বলছেন কেন দাতারবাবু?

দাতারবাবু বললে—তুমি তো জান একদিন অনেক অভাব ছিল আমার, টাকার অভাবের জন্যে জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছি। আজ আবার অনেক টাকার মুখ দেখেছি দীপুবাবু, এখন অনেক টাকা আমাদের। এই বাড়ি ঘর গাড়ি, সবইতো দেখতে পাচ্ছ! কিন্তু মনে হচ্ছে এত ভালো থাকাও হয়ত ভাল নয়—

কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা বেরিয়ে গেল দাতারবাবুর মুখ দিয়ে, তা নিজেও হয়ত বুঝতে পারেনি। কিন্তু দীপঙ্করই সামলে নিয়েছিল সেদিন। সেদিন আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রবৃত্তি হয়নি সেখানে। সেই ঐশ্বর্য যেন দীপঙ্করকে পীড়া দিচ্ছিল। সেই সাজানো-গোছানো বাড়ি, সেই শৌখিন ফার্নিচার, সেই বাবুর্চি, খানসামা, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জিনিস যেন দীপঙ্করের চোখে আঙুল দিয়ে বলছিল—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—

দাতারবাবু বলেছিল—সে কি, উঠছ কেন তুমি? তোমার লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা করবে না?

দীপঙ্কর বলেছিল—না দাতারবাবু, আমি আর থাকতে পারব না, আমাকে এখনি আপিসে যেতে হবে—। আমি আবার শীঘ্রি বদলি হয়ে যাচ্ছি কলকাতা থেকে—

—কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—ময়মনসিংএ।

—কেন? হঠাৎ বদলি হবার কথা উঠলো কেন?

দীপঙ্কর বললে—ওই যে আপনি যা বললেন, আমারও তাই—এত বেশি ভালো হয়ত ভালো লাগছে না—

—তাহলে, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে?

দীপঙ্কর বললে—কলকাতা শহরকে ভালোবাসি বলেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাব। কলকাতার সবটাই যেন বেশি-বেশি। এখানকার ভালোটাও বেশি, এখানকার খারাপটাও বেশি। এখানে পুণ্যও বেশি পাপও বেশি, এখানে টাকাটাও বেশি, টাকার অভাবটাও বেশি—এত বেশি-বেশিটা হয়ত ভালো লাগছে না—চেষ্টা করলে হয়ত ট্রান্সফারটা ঠেকিয়ে রাখা যেত। কিন্তু ভেবেছি সে-চেষ্টাও করবো না আমি!

দাতারবাবু বললে—বোধহয় আমরাও কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো দীপুবাবু। তোমার লক্ষ্মীদি বলছিল—

—আপনারাও যাবেন? কেন? হঠাৎ?

দাতারবাবু বললে—সুধাংশুবাবু ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাচ্ছেন দিল্লিতে, তাই আমরাও যাচ্ছি, দিল্লিতে আরও বেশি কন্ট্র্যাক্ট আরও বেশি পারমিট পাওয়া যায়—আর সুধাংশুবাবুই যে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সিনীয়র সেক্রেটারী, ওঁর হাতেই তো সব। ওঁকে বাদ দিয়ে ওয়ার-মিনিস্ট্রিই অচল হয়ে পড়বে যে! ওঁর কাছাকাছি থাকাই তো ব্যবসার পক্ষে ভাল!

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা তাহলে এখন চলি, আর দেরি করলে আপিসের দেরি হয়ে যাবে আবার—একটা কথা শুধু বলে দেবেন লক্ষ্মীদিকে—লক্ষ্মীদির বাবা মারা গেছেন—

—সে কি? ভুবনেশ্বরবাবু? কবে? কে বললে তোমাকে?

দীপঙ্কর বললে—কেউ বলেনি, আমি বার্মা ইভাকুয়ীজ্ আপিস থেকে খবর পেয়েছি। হয়ত লক্ষ্মীদির এ-খবর শুনে কিছু মনে হবে না, কিন্তু তবু খবরটা দেওয়া কর্তব্য মনে করে দিয়ে গেলাম। খবরটা শুনে যার সবচেয়ে কষ্ট হবে সেই সতীই খবরটা এখনও জানে না—তাকেও খবরটা দিতে হবে! আমি চললুম, আপনি বলবেন, আমি এসেছিলুম—

আর কিছুক্ষণ থাকলেই হয়ত সেদিন লক্ষ্মীদিকে খবরটা মুখোমুখি দেওয়া যেত, কিন্তু দীপঙ্করের যেন মনে হয়েছিল সত্যিই এ-সব ভাল নয়। লক্ষ্মীদি সুখী হয়েছে হোক, কিন্তু কোন্ মূল্যে? সততার মূল্য, আন্তরিকতার মূল্য, সত্যের মূল্য দিয়ে যা পাওয়া নয়, তাকে দীপঙ্করের বড় ভয়। সে-পাওয়া তো ক্ষণিক পাওয়া। সে-পাওয়া তো পাওয়ার প্রবঞ্চনা। তার চেয়ে সতীই ভালো। সতী পায়নি, কিন্তু না-পাওয়ার পরিতৃপ্তি দিয়ে নিজেকে তো প্রবঞ্চনা করেনি লক্ষ্মীদির মত!

সেদিন আপিসে যাবার আগেই মনে মনে অনেক পরিকল্পনা করে গিয়েছিল দীপঙ্কর। অনেকগুলো কাজ ছিল মাথায়। প্রত্যেক দিন ফাইলের স্তূপের মধ্যে সে-কাজগুলো হারিয়ে যেত। লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনে মনে সংকল্প স্থির করে নিলে। প্রথমেই লক্ষ্মণ সরকারের খবর নিতে হবে। গাঙ্গুলীবাবুর লিভ্-ভেকেন্সিতে লক্ষ্মণ সরকার ঢুকেছে আপিসে সেই গাঙ্গুলীবাবুরই বা কী খবর। এতদিন কাশ্মীরে গেছে। একটা খবরও দেয়নি। টাকার দরকার হলেও লিখে জানাবার কথা ছিল। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে দীপঙ্কর ভাল করে বলে দিয়েছিল—টাকার দরকার হলেই আমাকে জানাবেন চিঠি দিয়ে, লজ্জা করবেন না যেন—

দীপঙ্কর আরো বলেছিল—আপনার স্ত্রী যা খুশি কিনতে চাইলে টাকার জন্যে যেন বারণ করবেন না—

গাঙ্গুলীবাবুর সেই মুখখানার কথাও বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। কার কথাই বা ভেসে উঠতো না দীপঙ্করের মনে! শুধু কি লক্ষ্মণ সরকার? শুধু কি গাঙ্গুলীবাবু? আরো কত লোক আছে দীপঙ্করের চারপাশে! ক্ষীরোদা। ক্ষীরোদার শান্ত নির্বাক মূর্তিটা বাড়িতে থাকলেই চোখে পড়তো।

আগে যাও বা একটু কথা বলতো, সন্তোষ-কাকার মৃত্যুর পর তাও বলতো না। মৃন্ময়ী যেন একেবারে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কাশী এসে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল—দাদাবাবু ?

দীপঙ্কর মুখ তুলে বললে—কিছু বলবি ?

—আমরা কলকাতা ছেড়ে বদলি হয়ে যাচ্ছি নাকি ? কবে যাবো ?

—তোকে কে বললে ?

—আপনিই তো বলছিলেন সেদিন। আমি দিদিমণিকে তাই বলছিলাম। শুনে দিদিমণি খুব ভয় পেয়ে গেল।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন, ভয় পেয়ে গেল কেন দিদিমণি ?

কাশী বললে—তা জানি না—

তারপর একটু থেমে কাশী আবার বললে—দিদিমণির বিয়ে হবে না দাদাবাবু ?

বিয়ে! দীপঙ্কর চমকে উঠলো। বললে—দিদিমণির বিয়ের কথা তোকে কে জিজ্ঞেস করলে ? দিদিমণি নিজে ?

কাশী তখন ভয় পেয়ে গেছে। বললে—না, দিদিমণি কিছু বলেনি, আমি নিজের থেকেই বলছি—

কাশী আর এ সম্বন্ধে কথা বাড়ালে না। আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল। দীপঙ্কর আর কিছু বলেনি সেদিন। এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি কোনওদিন। কিন্তু কাশীর কথাতেই যেন খোঁচাটা আবার নতুন করে বুকে গিয়ে ঠেকলো। একটা হাহাকার বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস হয়ে। যেন একটা মহা অপরাধ দীপঙ্করের কাঁধের ওপর চাপিয়ে গেছে সন্তোষ-কাকা। সন্তোষ-কাকা তার কেউই নয়—কিন্তু কেউ না হয়েও সন্তোষ-কাকা যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে দিনরাত। দয়া যেন দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে আজ!

আরো মনে আছে সেদিন রাত্রেই সদর দরজার কড়া নাড়ানাড়িতে দীপঙ্কর সচকিত হয়ে উঠেছিল। কে ? এত রাত্রে কে কড়া নাড়ে ?

কাশী দৌড়তে দৌড়তে ওপরে উঠে এসেছিল। হাঁফাচ্ছিল তখনও। বললে—দাদাবাবু, গোরা পুলিস এসেছে—

—গোরা পুলিস ?

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি নিচেয় গিয়ে দেখেছিল দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। এ রকম পুলিসের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আছে দীপঙ্করের। রায় বাহাদুর মজুমদারের বীভৎস মূর্তিটাও মনে আছে। কিন্তু তখন যুদ্ধের সময় নয়। তখন ডিফেন্স-অব-ইন্ডিয়া অ্যাক্ট হয়নি। আজ নতুন করে দীপঙ্করের সমস্ত মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠলো। ভয় নিজের জন্যে নয়, যতটা আর একজনের জন্যে।

দীপঙ্কর বললে—আমিই দীপঙ্কর সেন—

—কিরণ চ্যাটার্জিকে আপনি চেনেন ?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—আমি চিনি, তার মা'কেও আমি চিনি। আমরা ক্লাসফ্রেন্ড—। ছোটবেলার বন্ধু আমার কিরণ।

—তার বাড়ি আপনি চেনেন ?

—চিনি। প্রত্যেক মাসে আমি তার মার সঙ্গে দু'একবার দেখা করে আসি—

—হোয়াই ?

দীপঙ্কর বললে—তার মাদার খুব গরীব। তার মা'কে আমি মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে চ্যারিটি করি।

—কিরণ লাস্ট ওয়ান-ইয়ারের মধ্যে আপনার এ-বাড়িতে কখনও এসেছিল ?

দীপঙ্কর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পুলিস দুজনের দিকে চেয়ে রইল। যেন তারা তার মুখের দিকে চেয়ে তার সততার পরীক্ষা করছে। যেন দীপঙ্করের সততার ওপর কিরণের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। দীপঙ্করের একটা উত্তরের ওপর কিরণের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। হঠাৎ দীপঙ্করের চোখের সামনে কিরণের নির্ভীক চেহারাটা ভেসে উঠলো। কিরণ যেন বললে—সত্যি কথা বল্, সত্যি কথা বল্ তুই দীপু, প্রাণমথবাবুকে মনে করে দেখ, কখনও মিথ্যে কথা বলবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস। তাতে আমার যা হয় হোক—

পুলিস আবার প্রশ্ন করলে—বলুন, বলুন, কখনও এসেছিল কিনা কিরণ চ্যাটার্জি ?

দীপঙ্কর জীবনে বহুবার নিজের আত্মার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমন করে এমন অকরুণভাবে কখনও মুখোমুখি হতে হয়নি। তখন যুদ্ধের এক কঠোর পরিচ্ছেদ চলেছে পৃথিবীতে। এক দিকে মানুষের দম্ভ আর এক দিকে নিরীহ অস্তিত্বের প্রশ্ন। দম্ভে দম্ভে সমস্ত পৃথিবীর স্থল জল অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত। সাধারণ নিরীহ অস্তিত্ব-সন্ধানী মানুষ সে-দম্ভের তলায় একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে আর্তনাদ করছে। আকাশে শূন্যচারী হিংসা, বাতাসে বারুদের গন্ধ। মানুষ কেবল মানুষকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে পেরু থেকে ফিলিপাইনস পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে। পৃথিবী দুভাগ হয়ে গেছে দুদলের ক্ষোভের আর অত্যাচারের ভয়ে। দীপঙ্কর একলা তার কতটুকু হিসেব করতে পারে ? এত ক্ষমতা সে কোথায় পাবে ? দু'টি মানুষকে আজ পর্যন্ত মিলিয়ে দিতে পারলো না সে একটি সুষ্ঠু গ্রন্থি দিয়ে, একটি মানুষকেও সান্ত্বনার শান্তি দিয়ে সজীব করে তুলতে পারলো না। তাহলে সে কতটুকু ক্ষমতার অধিকারী! অন্যের যন্ত্রণায় কাতর হওয়াটাই কি বড় কথা! আর অন্যের ক্ষতি ? ক্ষতিই বা সে কেমন করে করবে ? কিরণ তো দূরের কথা, কারোর ক্ষতিও তো জ্ঞানত করতে পারবে না সে। ক্ষতি করতেও তো ক্ষমতার দরকার হয়!

কিন্তু সত্য যে আরো বড়। জীবনের চেয়েও বড়, মৃত্যুর চেয়েও বড়। পাপ, পুণ্য, ধর্ম, ইহলোক, পরলোক সব কিছুর চেয়েও যে সত্য বড়। সেই সত্যকেই সে পরিত্যাগ করবে!

দীপঙ্কর সোজাসুজি চাইলে দুজনের মুখের দিকে। সত্যিই যেন দুটো বুলডগ্। রক্তপান করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যে কোনও প্রকারে রক্ত চাই। হয় কিরণের, না-হয় দীপঙ্করের, না-হয় আর কারো। কোনও ইন্ডিয়ানকে আর বিশ্বাস নেই। সব ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের লোক। আর কংগ্রেসের লোক মানেই প্রো-হিটলার। ইন্ডিয়ানরা সবাই চায় ব্রিটিশ এ-যুদ্ধে হেরে যাক, ইন্ডিয়ানরা সবাই চায় হিটলার এ-যুদ্ধে জিতুক। বুলডগরা চিনে নিয়েছে ইন্ডিয়ানদের। এরা সবাই এক-একটা আস্ত সুভাষ বোস।

হঠাৎ কিরণের মুখটা আবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কিরণ আবার বলতে লাগলো—বল্ দীপু, তুই সত্যি কথাই বল—তুই সত্যবাদী, তুই ভালো ছেলে, তুই সংসারী মানুষ, আমি মরবো তাতে কারু কোনও ক্ষতি হবে না, তুই সত্যি কথা বল্। তোকে বাঁচতে হবে, তোকে আরো টাকা উপায় করতে হবে, তোকে বিয়ে করে ছেলে-মেয়ের বাবা হতে হবে, তুই এত সহ্য করতে পারবি না—বল্—

সেদিন মনে আছে সেই সার্জেন্ট দুটোর সামনে এক মুহূর্ত দ্বিধা করতে গিয়ে দীপঙ্কর সত্যি-সত্যিই কিরণকে বিপদে ফেলেছিল।

তারা আবার জিজ্ঞেস করলে—ইয়েস অর নো?

দীপঙ্কর সামনের দিকে মুখ তুললে। বললে—ইয়েস!

—কবে এসেছিল?

দীপঙ্কর তারিখটাও বললে। যেমন অবস্থায়, যে-সময়ে এসেছিল, তাও বললে।

বুলডগ্ দুজন নিমেষের মধ্যে কী যেন পরামর্শ করলে। কী যেন দুর্বোধ্য ইঙ্গিতে আলোচনাও করলে। তারপর বললে—অলরাইট—

তাদের ভঙ্গিতে মনে হলো, তারা যেন রক্তের গন্ধে আরো উন্মত্ত হয়ে উঠলো। হিটলারকে সামনে না পাক, কিরণকে পেলেও তাদের কাজ চলবে। মোটর-বাইক হাঁকিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে সেদিন তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়েছিল দীপঙ্কর। লেভেল-ক্রসিংয়ের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। গুডস্-ট্রেন আসবে। ভূষণকেও দেখা গিয়েছিল। সেই কালো বেঁটে চেহারা। আরো বুড়ো হয়েছে এখন। অনেক দিনকার লোক। চিনতে পারলে আবার সামনে আসতো। সামনে এসে সেলাম করতো। অনেক কথা বলতো। রবিনসন্ সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করতো।

সেই সব পুরোন দিন। যখন দীপঙ্কর ডি-টি-আই ছিল। যখন পৃথিবী আরো সহজ ছিল, যখন মানুষ আরো সরল ছিল। গাড়িটা গড়গড় করে গড়িয়ে

চলেছে। আর দুদিন। দুদিন পরেই দীপঙ্কর কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। আর দুদিন পরে এই পৃথিবী এই রকমই থাকবে, শুধু দীপঙ্করই আর থাকবে না এখানে। নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হবে নতুন এক মফঃস্বলে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সঙ্গেও আর কোনও সম্বন্ধ থাকবে না তার। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সঙ্গেও আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। লক্ষ্মীদির সঙ্গেও দেখা করা হলো না। না হোক। দেখা করার আর কোনও প্রয়োজনও নেই। দাতারবাবু ভাল হয়ে উঠেছে, মানস লেখাপড়া শিখেছে, লক্ষ্মীদি যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে। এখন আর দীপঙ্করকে কিসের প্রয়োজন? এক সতী? সনাতন-বাবুর সঙ্গে সতীর একটা বোঝাপড়া করে দিতে পারলেই দীপঙ্করের বাকি কাজটা শেষ হয়ে যাবে। আর ক্ষীরোদা।

ক্ষীরোদার সঙ্গে তারপর থেকে আর কোনও কথা বলবারই সুযোগ হয়নি দীপঙ্করের। নিঃসহায় নিঃসম্বল মেয়েটিকে মা হয়ত পুত্রবধূই করতে চেয়েছিল। তাতে হয়ত মা'র প্রয়োজন মিটতো। কিন্তু তা-ই বা দীপঙ্কর কেমন করে সার্থক করে?

সংসারে তখনও ক্ষীরোদা সেই একভাবে নিঃশব্দে সব কাজ করে যায়। সেই আগেকার মত রান্না করে। সেই আগেকার মত ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে যায় সামনে। তারপর নিঃশব্দে সরে যায় সামনে থেকে। কোথায় কেমন করে দিন কাটে ক্ষীরোদার, তার খবর কেউ রাখা প্রয়োজন মনে করে না। ক্ষীরোদা যেন নিজেকে আড়াল করে রাখতেই ভালবাসে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে থেকে নিজের কাছ থেকেও যেন নিজের অস্তিত্বটুকু মুছে ফেলতে চায়। দীপঙ্কর হাজার চেষ্টা করেও ক্ষীরোদার এতটুকু দুঃখ ঘোচাবার পথ খুঁজে পায় না। তবু আগে সন্তোষ-কাকা ছিল। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেও দিনটা কাটতো তার। সন্তোষ-কাকা নিজে বাক্যবাগীশ লোক। নিজে বাক্যবাগীশ, বাক্যবাগীশ লোককেই তাই ভালো লাগতো তার। কিন্তু ক্ষীরোদা হয়েছে ঠিক উল্টো। ক্ষীরোদা জানে না যে এ-সংসারে জোর করে আদায় না-করে নিলে কিছুই পাওয়া যায় না। তারপর যখন দীপঙ্কর আপিসে চলে যায়, তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করে। কতদিন দীপঙ্কর খুঁজেছে ক্ষীরোদাকে। দুটো কথা বলতে চেয়েছে। অন্ততঃ দুটো সান্ত্বনার বাঁধা বুলি। কিংবা ভবিষ্যতের কিছু পরামর্শ। কিন্তু সারা বাড়ির চারিদিকে চেয়েও কোথাও কোনও চিহ্ন পায়নি ক্ষীরোদার।

এখন বদলির খবরটার পরই বেশি করে মনে পড়েছে ক্ষীরোদার কথাটা। ক্ষীরোদা কোথায় যাবে?

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়ে একলা আপিস করতেন। তিনি খবর শুনে একদিন এলেন। বললেন—কী হলো, আপনার বদলির?

দীপঙ্কর বললে—আমি তো চলে যাচ্ছি, এ-বাড়ি আপনার, আমি ছেড়ে দেব।

বাড়িওয়ালা দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন—কী আর বলবো আপনাকে, আমারই কপাল—

তারপর একটু থেমে বললেন—আপনি কি সবসুদ্ধ চলে যাচ্ছেন?

দীপঙ্কর বললে—তা এখানে আর কীজন্যেই বা থাকবো বলুন, সেখানে তো বড় কোয়ার্টার পাবো—

সবসুদ্ধ কথাটার অর্থ যে কী, তা দীপঙ্কর বুঝতে পেরেছিল। ক্ষীরোদাও যাবে। যদি সেখানে যেতে আপত্তি না থাকে তো যাবে নিশ্চয়ই। কোথাও তো আর যাবার জায়গা নেই তার। কেউ যে নেই তার পৃথিবীতে। একবার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল দীপঙ্করের, সত্যিই কি কেউ নেই ক্ষীরোদার? নিকট না হোক, দূর-সম্পর্কের কেউ! এতদিন এখানে আছে, কই, কেউ তো খোঁজ নিতেও আসেনি কখনও। এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তা-ও তো কোনও চিঠি এল না সমবেদনা জানিয়ে।

কাশীকেও একদিন খবর নিতে বলেছিল দীপঙ্কর। কাশী এসে বলেছিল —না দাদাবাবু দিদিমণির কেউ নেই—

—কোনও দূরসম্পর্কের আত্মীয়?

কাশী বলেছিল—তা-ও জিজ্ঞেস করেছি। দিদিমণি বললে—কেউ নেই—

—কিন্তু বিয়ে হলে তো নিজের লোকজনদের খবরাখবর দিতে হবে, নেমন্তন্ন তো করতে হবে—

কাশী বলেছিল—এ-কথা তো জিজ্ঞেস করিনি, জিজ্ঞেস করে আসবো?

—না, থাক্!

তারপর যখন বদ্‌লি হবার কথা উঠেছিল, তখনও কাশীকে বলতে বলেছিল ময়মনসিং-এ যেতে ক্ষীরোদার কোনও আপত্তি আছে কি না!

কাশী এসে বলেছিল—না, দাদাবাবু, কিছু বললে না দিদিমণি—

—কলকাতা ছেড়ে চিরকালের জন্য বিদেশে চলে যেতে রাজী আছে কি না জিগ্যেস করেছিলি?

কাশী বলেছিল—জিগ্যেস করেছিলুম, কিছু বললে না—

—তা তোর আপত্তি নেই তো?

কাশীর কিছুতেই আপত্তি নেই। সারাজীবন সে দীপঙ্করের কাজ করবে বলে দিয়েছে। যে প্রতিবাদ করে, যে প্রতিরোধ করে, তাকে তবু সরানো যায়, কিন্তু যে নির্বাক হয়ে শুধু নির্ভর করে তাকে নিয়েই তো মুশকিল। তবু দীপঙ্কর সকলকে নিয়েই চলে যাবে ঠিক করে ফেলেছিল। কলকাতায় তার কিছু দায়-দায়িত্ব ফেলে রেখে যাবে না। সবাই তার আপন। যে দীপঙ্করকে ত্যাগ করবে, তার কথা আর ওঠে না। সতী থাক এখানে। মিস্টার ঘোষাল থাকুক। লক্ষ্মীদি থাকুক, তারা কেউ-ই তাকে চায়নি। কিরণও হয়ত তাকে

চায়নি। একে একে সবাই দূরে চলে গেল। কিম্বা হয়ত দীপঙ্করকেই দূরে ঠেলে দিলে।

তবু শেষবারের মত একবার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটা দেখে যেতে ইচ্ছে হলো। ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে নিতে বললে। রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে সদানন্দ রোড। তারপর বাঁদিকে। আস্তে আস্তে চলতে লাগল ট্যাক্সি। কী ছিল জায়গাটা, আর কী হয়েছে। কত বদলে গিয়েছে। এই মোড়েই ছিল আশু কলুর তেলের ঘানিকলটা। এখানেই ছিল টিকেপাড়া। এর মাটির সঙ্গে একদিন দীপঙ্করের এই মাটির শরীরটার যোগ বড় নিবিড় হয়ে উঠেছিল। সে বড় নিবিড় যোগ। তখন ভাবতেও পারেনি, একদিন ঐ পাড়াতেই আবার ট্যাক্সি করে দেখতে আসতে হবে। বাড়ির ভেতর গাড়ি ঢোকে না এই মোড়ে। এই মোড়ে এসে দাঁড়াতো সতীদের কলেজের বাসটা। উঁচু হিল-তোলা জুতো পরে এইখানে এসেই বাসে উঠতো সতী! এইখানেই একদিন পাড়ার ছেলেরা ভিড় করে সতীদের বাড়ি চড়াও হয়েছিল। বন্দে মাতরম বলে চিৎকার করেছিল। সেদিন এই দীপঙ্কর সতীর মর্যাদা নিজের শরীরের আচ্ছাদনের মধ্যে ঢেকে রক্ষা করেছিল। এই পাড়ায় রাস্তাতেই পুলিস এসে দীপঙ্করকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বয়সই শুধু বাড়ে, মানুষ সেই শিশুই থাকে ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না। কেউ তা দেখতে পায় না।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে রইল। দীপঙ্কর দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে। সেই পুরোন বাড়িটার ভগ্নাবশেষ আর কোথাও নেই। চারদিকের এলোপাতাড়ি বাড়ির মধ্যে তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অঘোরদাদুর বাড়িটা। 'অঘোর-স্মৃতি-সৌধ'। হয়ত সেই ঘরগুলোও আর নেই সেখানে। সেই উঠোনটাও নেই। সেই আমড়া গাছটাও নেই—আর সেই কাকটাও হয়ত নেই। সে-ও হয়ত অঘোর-দাদুর মত একদিন পৃথিবীর বুকের ওপর আছাড় খেয়ে মরেছে।

—এই যে দীপুদা, আপনি?

দীপঙ্করের যেন জ্ঞান ফিরে এল। একটা অচেনা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। দীপঙ্কর চিনতে পারলে না চেহারাটা।

—এদিকে কী করতে? কোথায় এসেছিলেন?

ছেলেটার হাতে বাজারের থলি। দীপঙ্কর বললে—তোমায় তো ঠিক চিনতে পারলুম না ভাই—

—আমি গোবিন্দ, ব্যায়াম সমিতিতে সেই প্যারালেল-বার প্র্যাকটিস করতুম—চিনতে পারলেন না আমাকে?

তবু মনে পড়লো না। শুধু মুখে বললে—ও—

—ফোঁটাদা বলছিল আপনার কথা—আমি আপনার বাড়িতে একদিন যেতুম—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—একটা যদি চাকরি করে দিতেন আমায় আপনার আপিসে, আমি বড় অভাবে পড়ে গেছি। বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আপনি লক্ষ্মণদাকেও চাকরি করে দিয়েছেন।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখন কী করছো?

—এখন তো অনেক কষ্টে এ-আর-পিতে ঢুকেছি। তাতে ঠিক চলে না। আর তা ছাড়া, এ তো পাকা চাকরি নয়, ওয়ার থেমে গেলে তো ছাড়িয়ে দেবে ওরা!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি যে পরশু চলে যাচ্ছি এখান থেকে বদলি হয়ে—

—ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তা তোমার ফোঁটাদার কী খবর?

ছিটে-ফোঁটার খবরও বললে ছেলেটা। বললে—ওঁরাই তো পাড়ার ইজ্জত রেখেছে দীপুদা, এই দেখুন না, এ-পাড়ায় তো কত ছেলেই ছিল, ওঁদের মতন ক'জন দেশের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আমরা যখন সবাই এ-আর-পি, সিভিক গার্ডে ঢুকে গেলুম, ওঁরা এখনও সেই খদ্দর পরে দেশ নিয়ে পড়ে আছেন। এবার প্রাণমথবাবুর সঙ্গে ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে ফোঁটাদা, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবে শুনছি—

ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটাকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর ট্যাক্সি চালাতে বললে। যাবার সময় বললে—আচ্ছা চলি—

সেই পাড়ার কী দশা হয়েছে নিজের চোখে তা আর দেখতে ভাল লাগলো না। হয়ত পাড়ার উন্নতিই হয়েছে সত্যি-সত্যি। কিন্তু তবু দীপঙ্করের মনে হলো সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন যেন আর ঠিক তেমন নেই। যেন কিছুটা শ্রীহীন। তখন আপিস যাবার টাইম। দলে দলে ট্রাম-রাস্তার দিকে ছুটেছে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে। শেষবারের মত প্রাণ ভরে দেখে নিতে ইচ্ছে হলো দীপঙ্করের। একবার শেষ বারের মত। এখানেই একদিন মা তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে। এখানে এলেই যেন মা'র কথা মনে পড়ে।

মাসীমাও সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অসময়ে দীপঙ্করকে দেখে ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। বললে—কী বাবা দীপু, এমন সময়ে যে?

—মাসীমা, আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ময়মনসিং-এ বদলি হয়েছি—তাই যাবার আগে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম—

পুলিসের দল তখনও বাড়ির সামনে বসে পাহারা দিচ্ছে। দীপঙ্কর তাদের দিকে চেয়ে বললে—এরা এখনও আছে?

—হ্যাঁ বাবা, দিনরাত পাহারা দেয়, আমার ভাল লাগে না মোটে।

দীপঙ্কর বললে—আমি আপনাকে সেখান থেকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেবখন, আপনি কিছু ভাববেন না। এই বলতেই এসেছিলুম—

—না বাবা, টাকা তুমি আর পাঠিও না।

—কেন? কী হলো?

—আমি মরে গেলেই তো ভালো। না-খেতে পেয়ে যদি মরে যাই, সেই ভালো। তুমি এদের বলো না বাবা আমাকে মেরে ফেলতে, এদের হাতে বন্দুক আছে, লাঠি আছে, একটু চেষ্টা করলেই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। তা-ও মারবে না, আবার পাহারাও দেবে দিনরাত—

একবার দীপঙ্কর ভাবলে কিরণের কথা বলবে মাসীমাকে। কিরণ এসেছিল কিনা, জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পুলিসরা তখনও তাদের কথাবার্তা শুনছে মন দিয়ে। তাড়াতাড়ি বললে—যাই মাসীমা, আপিসের দেরি হয়ে গেল—

মাসীমা বললে—এসো বাবা, তোমাকে দেখলেও শান্তি পাই, তোমার মা অনেক পুণ্য করেছিল, তাই তোমার মত ছেলে গর্ভে ধরেছে—

কিন্তু দীপঙ্কর কি জানতো তারই অজ্ঞাতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে তখন আর-এক নাটক অভিনয় হচ্ছে। আর-এক নাটকের প্রথম অঙ্ক। আর প্রথম অঙ্কও ঠিক নয়। প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগেই। অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। সে কবেকার কথা। কোন্ এক বিচক্ষণ লোক কবে টাকা আবিষ্কার করেছিলেন কে জানে। ইতিহাসের সে মধ্যযুগের কাহিনী। ধান, চাল, বাসন, তৈজস, ঘরবাড়ি, গরু-মোষ সমস্তই ছিল, টাকা ছিল না। কিন্তু একদিন সেই অদ্ভুত জিনিসটার আবির্ভাব হলো সংসারে আর সব ওলোটপালোট হয়ে গেল রাতারাতি। দরকারের বেশি টাকা এসে জমলো যাদের হাতে, তারাই হলো শেষে মহাজন। মহাজনদের তখন ভারি খাতির। যুদ্ধ বাধবে, টাকা চাই। দাও ধার। রাজা প্রাসাদ বানাবে, টাকা চাই। দাও ধার। রাজা-রাজড়াদের স্বার্থেই মহাজনরা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো দেশে দেশে। টাকা এল—আর সঙ্গে সঙ্গে এল টাকার সুদ। শেষে একদিন সেই মহাজনরাই রাজার ঘাড়ে চেপে বসলো। বললে—আমার কারবারের সুবিধে হচ্ছে না, আইন বানাও। এমন আইন করো, যাতে আমার টাকা-খাটানোর সুবিধে হয়। তা সেই আইনই হলো। সেই টাকা এদেশ থেকে ওদেশে গেল। স্বদেশ থেকে বিদেশে। কোথায় কাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে খেতে পায় না, মোটা সুদে সেখানে ধার দাও। অবস্থা ভাল হলে শোধ দিও। শেষে রাজা-রাজড়ারা আর কেউ কিছু নয়—আসলে মহাজনরাই সর্বেসর্বা। এডওয়ার্ড থার্ড কি একশো বছর ধরে যুদ্ধ চালাতে পারতো—মহাজনেরা সাহায্য না করলে? সেই মহাজনেরাই শেষে ব্যাঙ্ক খুললে, টাকা খাটাবার নানান ফন্দি বার করলে। ব্যবসাদারদের টাকা দাদন দিতে লাগলো। মোটা সুদ, মোটা লাভ। নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে উঠলো টাকা পেয়ে পেয়ে। সেই টাকায় জাহাজ বানিয়ে ভাস্কো-ডি-গামা আরো টাকা উপায় করতে বেরোল—

আরো নতুন মার্কেট। আরো নতুন মহাদেশ। নতুন টাকার বাজার খুললো আমেরিকায়, ইন্ডিয়ায়। তারপর এল মেশিন। মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গোটা চেহারাটাই বদলে গেল। গোটা সমাজটার ভোল পাল্টে গেল। এক নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন সমাজ, পুঁজিপতি, মজুর, কেরানী, উকিল, ব্যারিস্টার—যাদের নাম কখনও কেউ শোনেনি আগে। আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, নিউ ইয়র্ক, বোম্বাই, কলকাতা। নেপোলিয়ান যুদ্ধ করবে—টাকা জোগায় মহাজনেরা। আকবর যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় মহাজনেরা, আলীবর্দীও যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় জগৎশেঠরা। হিটলার যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় থাইসেনরা। এমনি করে গড়ে উঠলো একাদশী বাঁড়ুজ্জে আর শশধর চাটুজ্জেরা। এমনি করে গড়ে উঠলো অঘোরদাদুরা। এমনি করে গড়ে উঠলো শিরীষ ঘোষ, নয়নরঞ্জিনী দাসী, প্রাণমথবাবু। এমনি করেই তৈরি হলো ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল। এমনি করেই গজিয়ে উঠলো রেল কোম্পানি, রবিনসন্ সাহেব, রোটারী ক্লাব। এমনি করেই সৃষ্টি হলো মিস্টার ঘোষাল, ছিটে-ফোঁটা কিরণ, দীপঙ্কর। এমনি করেই সম্ভব হলো লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু আর সুধাংশু। এমনি করেই একদিন এসে হাজির হলো নির্মল পালিতরা।

নির্মল পালিতরাই একদিন শিরীষ ঘোষকে হটিয়ে দিয়ে গ্রাস করলো প্রপার্টি। কাইজার গেল, জার গেল, পোপ গেল, পুরোহিত গেল, সিরাজ-উদ্দৌলা গেল, নির্মল পালিতরাই একদিন দখল করে বসলো গদি। তারপর যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন তাদেরই জয়-জয়কার। এবার কেবল টাকা, টাকা, টাকা! টাকা তখন উড়তে শুরু করেছে।

সেই নির্মল পালিতেরই সেদিন খোঁজ পড়লো প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের নয়নরঞ্জিনী দাসীর বাড়িতে।

সরকারবাবু ছুটতে ছুটতে এসেছে। ডাকলে—মা-মণি—

মা-মণি তখনও বিছানায় পড়ে। পা'টা মচকে গেছে। জখম-পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বললেন—আবার কী? তুমি কি আমাকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, সরকারবাবু!

—আজ্ঞে, চেক ফিরে এসেছে।

—সে কি? বলছো কী তুমি?

মা-মণিও চমকে উঠলেন। মাসকাবারি সংসার খরচের চেক কেটেছিলেন তিনি। যেমন কাটেন বরাবর। এমন প্রত্যেক মাসে কাটা হয়ে থাকে। নেই-নেই করেও তো এখনও অনেক খরচ আছে। ঝি-চাকরের মাইনে, খাই-খরচ, জামা-কাপড়। সরকারবাবু আছে, তার মাইনে আছে। তারও সংসার চালাতে হয় এই মাইনের ওপর নির্ভর করে। নিজের হাতে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই খরচের বহরটা টের পাচ্ছেন তিনি। সনাতনবাবু যখন চেক কাটতেন, তখনকার কথা আলাদা। নির্মল পালিতই সেসব আলাদা করে দিয়েছে। নির্মল পালিতকেই

আমমোক্তার-নামা দিয়ে দিয়েছেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। নির্মল পালিতই তাঁর একমাত্র বিশ্বাসী লোক। তার সঙ্গে এক-পুরুষের নয়, দু-পুরুষের সম্পর্ক।

মা-মণি বললেন—চেক ফেরত দিলে কেন? কী বললে তারা?

—আজ্ঞে, বললে, টাকা নেই—

—সে কি? হাজার টাকা নেই? এই যে গেল মাসে বউবাজারের বাড়ি বিক্রি করে কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলে তুমি? সে টাকা কি রাতারাতি উড়ে গেল? যাও, তুমি আবার যাও, আবার গিয়ে বলো তাদের। তোমাদের নিয়ে যত ঝামেলা হয়েছে আমার, একটা কাজ যদি তোমাদের দিয়ে হয়। যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও—

সরকারবাবু বললে—আজ্ঞে, মা মণি, আমি তা বলেছি—দিলে না কিছুতেই—

—তার মানে?

খোঁড়া পায়েই উঠে বসতে চাইলেন মা-মণি। টাকা গেল কোথায়? টাকার কি পাখা আছে নাকি যে উড়ে পালাবে! চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন। সেই চিৎকারে রান্নাঘরের মধ্যে কৈলাস, বাতাসীর-মা, ভূতির-মা সবাই চমকে উঠলো। আবার মাগী ধমকায় কাকে! মাগীর পা খোঁড়া হয়ে গেছে, তবু গলার তেজ কমলো না এতটুকু গা। বউটাকে তো বাড়িতে তিষ্ঠোতে দিলে না এখন কাকে আবার ধমকাচ্ছে?

শম্ভু বললে—ও সরকারবাবুকে—সরকারবাবুরও যেমন কপাল।

বাতাসীর-মা বললে—তা সরকারবাবু ছেড়ে দিলেই পারে চাকরি। কে খোশামোদ করতে বলেছে তোর সরকারবাবুকে শুনি? মাইনে নেবে কাজ করবে, তুমি কি আমার পর! এ-মাসে তো মাইনে দিলে না এখনও—এখনও কাজ করছে কেন?

কৈলাস বললে—গেল মাসেও তো মাইনে পাইনি আমার বাতাসীর-মা—

বাতাসীর-মা বললে—আর পেয়েছিস তুই ছোঁড়া, এখন ভালোয়-ভালোয় বিদেয় হ' দিকিনি—সেই যে কথায় আছে না—বিশ্বকর্মাও ঋষি, পদীর মা-ও পিসী—। ওই আবার চেঁচাচ্ছে মাগী—

সত্যিই তখন ওপরে আবার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে জোর। চেক্ ভাঙানো যায়নি। নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। সনাতনবাবুরও ডাক পড়লো। নিজের লাইব্রেরীঘরে তিনি পড়ছিলেন। সরকারবাবু গিয়ে বললেন—দাদাবাবু, ব্যাঙ্ক থেকে চেক্ ভাঙায়নি, আপনি একটু দেখবেন?

সনাতনবাবু বললেন—কীসের চেক্? কার চেক সরকারবাবু?

কোনওদিন চেক্-বই নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি। আগে শুধু সই করতেন। ইদানীং তাও করতে হয় না। তিনি বেঁচেই গিয়েছিলেন। সরকারবাবু বললেন—আজ্ঞে, মহা মুশকিলে পড়েছি, মা-মণি আমায় বকাবকি করছেন—আপনি

একবার চলুন—

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি কী করবো গিয়ে, নির্মল পালিত বাবুকে খবর দাও না—

সরকারবাবু বললে—আজ্ঞে তাঁকে তো মা-মণি টেলিফোন করেছিলেন, তিনি তো বাড়িতে নেই—

—তা তাড়াতাড়ি কীসের সরকারবাবু, তিনি বাড়ি ফিরে এলে আসবেন—

—আজ্ঞে না, তিনি কলকাতাতেই নেই।

—কলকাতাতেই নেই তো কোথায় গেলেন? তিনি তো পালিয়ে যেতে পারেন না।

মা-মণি কিন্তু অতটা অপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর যেন কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তিনি প্রথমে পাঠালেন শম্ভুকে। তারপরে পাঠালেন কৈলাসকে। শেষে সরকারবাবু নিজেই গেল। আগে একবার টেলিফোন করলেই হতো। টেলিফোন পেলেই নির্মল পালিত কাজ-কর্ম ফেলে দৌড়ে আসতো। কিন্তু সেই নির্মল পালিত আজ বাড়িতেই নেই। দরোয়ান কিছু বলতে পারলে না। মুহুরি ম্যানেজার কেউই কিছু বলতে পারলে না। শুধু বললে—সাহেব কাল সন্ধ্যেবেলা মেমসাহেবকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে।

সরকারবাবু জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে সাহেব?

মুহুরি বললে—সাহেব তা বলে যায়নি—

আর তারপরই মা-মণির উদ্বেগটা আরো বেড়ে গেল। একবার টেলিফোন করেন ব্যাঙ্কে। তাতে সুবিধে না পেয়ে, সরকারবাবুকে যেতে হয়। সরকারবাবু ফিরে আসেন শুকনো মুখে। মা-মণির কাছে আরো বকুনি খেতে হয়। তখন আবার ছুটতে হয় নির্মল পালিতের বাড়িতে। সেখানে গিয়েও কোনও সুরাহা হয় না। সমস্ত সকালটা এ-বাড়িতে একটা তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। সরকারবাবু আবার সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হয় ভয়ে-ভয়ে। বলে—দাদাবাবু সর্বনাশ হয়েছে—

—কীসের সর্বনাশ সরকারবাবু?

—আজ্ঞে আপনি একবার মা-মণির কাছে চলুন—সর্বনাশ হয়ে গেছে—

মা-মণি সনাতনবাবুকে দেখেও ধমক্ দেন। পায়ের যন্ত্রণায় ক'দিন থেকেই তিনি ছট্‌ফট্ করছিলেন। সামনে সনাতনবাবুকে দেখে আরো জ্বলে উঠলেন। বললেন—তোমাকে কে আবার আসতে বললে আমার কাছে? তুমি আমার কাছে এসেছ কিসের জন্যে শুনি? যাও, বেরিয়ে যাও সামনে থেকে, যেমন আহাম্মক বাড়ির সরকার, তেমনি হয়েছে পেটের ছেলে—সবাই সমান!

সনাতনবাবু নির্বাক হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মা-মণি আবার তেড়ে উঠলেন—বলি, সামনে দাঁড়িয়ে দেখছো কী, হাবার মত? যা দু' চক্ষে দেখতে পারিনে, তাই হয়েছে আমার—

সনাতনবাবু বললেন—কী হয়েছে মা-মণি?

মা-মণি তখন পারলে যেন নিজের মাথাটাই নিজে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন। বললেন—তোমাকে আর সোহাগ করতে হবে না, তোমাকেই যদি বলে বোঝাতে পারবো, তো আমার এই দশা হয়! আমি মরছি পায়ের ব্যথায়, আর তুমি এলে এখন সোহাগ জানাতে। এখনও গেলে না সামনে থেকে? এখনও দাঁড়িয়ে আছো হাঁ করে?

—তা কী হয়েছে বলবে তো?

মা-মণি বললেন—না, আমার কিছু হয়নি, আমি মহা আরামে আছি, তোমাদের সোহাগে আমি একেবারে স্বর্গে বাস করছি, আমার সুখের আর সীমে-পরিসীমে নেই, টাকার গাদায় শুইয়ে তোমরা আমায় কিতাথ করে দিয়েছ একেবারে—

—শুনেছিলুম চেক্ নাকি ফিরে এসেছে ব্যাঙ্ক থেকে। সরকারবাবু বলছিল ব্যাঙ্কের টাকা নাকি সব তোলা হয়ে গেছে।

মা-মণি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—সরকারবাবু বলছিল? কোথায় গেল সরকারবাবু? ডাক তাকে আমার কাছে। ডেকে দাও—

সরকারবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে আসতেই মা-মণি গর্জন করে উঠলেন—বলি, তুমি ডেকেছ দাদাবাবুকে? কেন তুমি ডাকলে শুনি আমার হুকুম ছাড়া? আমার হুকুম ছাড়া তুমি ডাকবার কে? তোমার এত নবাবী করতে কে বললে বলো তো? কেন তুমি ডাকলে জবাব দাও। দাও, জবাব দাও। চুপ করে রইলে কেন, কৈফিয়ৎ দাও—

—আজ্ঞে, আমার ভুল হয়ে গেছে।

—ভুল হয়ে গেছে? এমন ভুল কেন হলো তাই বলো আগে। কেন তুমি ডাকলে? তুমি জানো আমার কেউ নেই। আমার ছেলে বউ কেউ নেই। তুমি জানো আমার পেটের ছেলে আমার শত্রু! অমন ছেলের মুখদর্শন পর্যন্ত আমি করি না। তবু কেন তুমি ডাকলে শুনি? কী করতে ডাকলে?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু চেক্‌টা কেন ক্যাশ হলো না, সেইটেই তো আগে ভাবতে হবে—

—রাখো তোমার ভাবনা, তুমি বৌকে আনতে যাচ্ছিলে আগে তাই যাও, পরে চেকের কথা ভেবো। এ-বাড়ি ভেঙে যাক্, চুরে যাক্, চুলোয় যাক্, আমার টাকা সাত ভূতে লুটে-পুটে নিক্, তা তো তোমার দেখবার দরকার নেই—।

—কিন্তু নির্মলবাবুর তো খোঁজ-খবর নিতে হবে। তিনি এই সময়ে হঠাৎ না-বলে-কয়ে কোথায় গেলেন, তাও তো দেখতে হবে!

মা-মণি বললেন—খুব হয়েছে, যা দেখবার যা করবার, তা আমি করবো। আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই করবো। আমার পা ভেঙে গেছে বলে আমি তো মরে যাইনি। আর আমি নির্মলকে আমমোক্তার-নামা দিয়েছি, সে আমার

খুশি। আমার টাকা যদি খোয়া যায় তো তোমার কী? তুমি কেন বলতে আসো আমাকে? তোমার টাকা খুইয়েছি আমি? তোমার টাকায় আমি হাত দিয়েছি? তুমি বলবার কে?

সনাতনবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মা-মণি থামিয়ে দিলেন। বললেন—যাও, আর কথা বাড়িও না—যাও আমার সামনে থেকে—

নিচে একতলায় দীপঙ্কর এসে ঢুকতেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। সরকারবাবুর ঘরটা খোলা। ওপর থেকে মা-মণির গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কাকে ডাকবে, কেমন করে সনাতনবাবুকে খবর দেবে ভাবছিল। হঠাৎ দেখলে শম্ভু সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

দীপঙ্কর ডাকলে। বললে—তোমার দাদাবাবু কোথায় শম্ভু?

শম্ভু কাছে এসে বললে—আপনি এসেছেন? কিন্তু ওপরে মা-মণির সঙ্গে দাদাবাবুর খুব ঝগড়া হচ্ছে—

—কেন? হঠাৎ ঝগড়া হচ্ছে কেন?

—আজ্ঞে, ঝগড়া তো রোজই হয়, আজকেও হচ্ছে। ব্যারিস্টারবাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মা-মণির ব্যাঙ্কের টাকা চুরি হয়ে গেছে—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—সে কি? কোন্ ব্যারিস্টারবাবু? নির্মল পালিত বাবু?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, তাঁকে খুঁজতেই তো আমরা সবাই তাঁর বাড়ি গিয়েছিলুম—আপনি বসুন, আমি দাদাবাবুকে ডেকে দিচ্ছি—

সনাতনবাবু খানিক পরেই এলেন। বললেন—এই যে দীপঙ্করবাবু, কী হয়েছে জানেন, আমাদের একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, নির্মল পালিত বাবু, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না—

দীপঙ্কর বললে—হয়ত বাইরে কোথাও গেছেন।

সনাতনবাবু বললেন—তা তো বটেই, পাওয়া যাচ্ছে না মানে, তিনি বাইরে গেছেন—আবার ফিরে এলেই পাওয়া যাবে। তিনি লোক খুব ভালো, ভেরি অনেস্ট ম্যান্, তাঁকেই তো পাওয়ার-অব্-য়্যাটর্নী দেওয়া ছিল। এখন একটা হাজার টাকার চেক্ ডিস্অনার্ড হয়ে ফিরে এসেছে—

—এখন কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—সেই কথাই তো আমি মা-মণিকে বলছিলাম। টাকা বড় তুচ্ছ জিনিস দীপঙ্করবাবু, কিন্তু সেই তুচ্ছ জিনিসটাও তো এক-এক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই হয়েছে আর কি—আর কিছু নয়! ওর জন্যে আপনি ভাববেন না, নির্মল পালিত বাবু এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

দীপঙ্কর বললে—তা হলে আমি উঠি, আমি ভেবেছিলাম, আজকে আপনাকে নিয়ে আমাদের আপিসে যাবো—

এতক্ষণে যেন সনাতনবাবুর মনে পড়লো। বললেন—ও, তাই তো! আমার একেবারে মনে ছিল না। আপনি সতীকে সব বলেছিলেন তো সেদিন? বলেছিলেন তো যে সেদিন বাধা পড়ে গিয়েছিল? বলেছিলেন তো?

—আজ্ঞে না বলিনি। বলবার সুযোগ পাইনি। আর আপনাকে তো বলেইছিলাম, সতী আমার সঙ্গে কথা বলে না।

—কেন? কথা বলে না কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব অনেক কথা, পরে সব আপনাকে বলবো। তা এখন বোধহয় আপনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে?

সনাতনবাবু বললেন—কেন? যেতে পারবো না কেন?

দীপঙ্কর বললে—এই অবস্থায় আপনার বোধহয় যেতে অসুবিধা হবে। তার চেয়ে আপনি যদি একটা চিঠি দেন—তাহলেও হতে পারে। আমি পরশু দিন তো ময়মনসিং-এ বদলি হয়ে যাচ্ছি—আজকেই আমি তার হাতে চিঠিটা দিয়ে দিতে পারতাম। যাবার আগে আমি দেখে গেলে মনে তৃপ্তি পেতাম যে, সতী আপনার কাছে এসেছে।

—তা দিতে পারি। চিঠিও দিতে পারি। চিঠি দিলে যদি কাজ হয়, আমি তা-ও দিতে পারি। আমি এখনি দিয়ে দিচ্ছি। আর বলে দেবেন, আমি ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা মিটে গেলেই যাবো তাঁর কাছে। আর তিনি তো আমার ওপর রাগ করেননি? আপনি কী বলেন? তিনি রাগ করেছেন আমার ওপর? তাঁকে তো আমি চিনি দীপঙ্করবাবু, রাগ তিনি আমার ওপর করতেই পারেন না—

তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে চিঠি লিখে সেটা দিলেন দীপঙ্করের হাতে। বললেন—এবার আপনি পড়ে দেখুন তো, ঠিক হয়েছে কি না!

দীপঙ্কর বললে—এ-চিঠি আমি আর পড়বো না, আমার পড়া উচিত নয়।

—না-না, তাতে কী! আপনি পড়ুন। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই, আপনি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আবার গোপনীয় কী থাকতে পারে বলুন—

শম্ভু হঠাৎ এসে বললে—দাদাবাবু, মা-মণি আপনাকে ডাকছেন আবার।

—আমাকে? আচ্ছা যাচ্ছি, তাহলে ওই কথাই রইল দীপঙ্করবাবু।

সনাতনবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দীপঙ্কর আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। এতদিন যে-ভয় করছিল, সেই ভয়ই যেন ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। চিঠিটা পকেটে পুরে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো আবার। তারপর আপিসে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামতেই যথারীতি গুর্খা দরোয়ান সেলাম করলে। কিন্তু কোরিডোরের ভেতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেল। মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে অনেক লোকের ভিড়। ম্যাকফারসেন সাহেব নিজের ঘর থেকে বেরোলেন। অভয়ঙ্কর, সোম, সবাই এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত

করছে। আপিসের চাপরাশীরা, বাবুরা, সবাই ভিড় করেছে। অন্যদিন মার্চেণ্টদের ভিড় থাকে, তারা কেউ নেই। এ যেন অন্য রকম। যেন কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে আপিসে। কী হলো? কীসের এত ভিড়? দীপঙ্কর সোজা নিজের কামরার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ প্যানবাবু সামনে এসেই মাথা নিচু করে সেলাম করলে—গুড মর্নিং স্যার।

দীপঙ্কর চলতে চলতে বললে—এত ভিড় কীসের এখানে?

প্যানবাবু বললে—স্যার, মিস্টার ঘোষালকে পুলিসে ধরেছে স্যার—অ্যান্টি-করাপশনের পুলিস ধরেছে—

—কেন? দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়লো। ওদিক থেকে ক্রফোর্ড সাহেব নিজের ঘরে যাবার পথে দীপঙ্করকে দেখেই ডাকলে। বললে—মিস্টার সেন, কাম টু মাই রুম, আমার ঘরে এসো—

ঘরে গিয়ে বসতেই ক্রফোর্ড সাহেব বললে—তুমি শুনেছ বোধহয় মিস্টার ঘোষাল হ্যাজ বীন অ্যারেস্টেড্ বাই স্পেশাল পুলিস। বেইল-এ রিলিজ করবার ব্যবস্থা করেছি আমি—আমি চাই, তুমি চার্জ টেক-ওভার করে নেবে—

—কিন্তু আমি যে ময়মনসিং-এ ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি স্যার, ডে আফটার টু-মরো।

ক্রফোর্ড সাহেব বললে—দ্যাট অর্ডার ইজ ক্যানসেলড্—

সমস্ত পরিস্থিতিটা যেন এক মুহূর্তে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দীপঙ্কর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—স্যার, আমি মিসেস ঘোষের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, শী মাস্ট বি ফীলিং আনইজি—

মিস্টার ক্রফোর্ড বললে—মিসেস ঘোষ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—সী ইজ সীক, আমি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না কী করবো—আই ডোণ্ট নো হোয়াট টু ডু—

এমন এক-একটা ঘটনা জীবনে ঘটে, যখন মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তি-বিচার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায় হঠাৎ। সমস্ত আইন, সমস্ত বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে যায় এক নিমেষে। যদি তা না হতো তাহলে মানুষ এমন অনিশ্চিতের দিকেও দৌড়তো না, বাধা পেলে সেই বাধাকেই শাশ্বত বলে স্বীকার করে নিয়ে নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকতো। হয়ত এই বাধা আছে বলেই বাধা থেকে মুক্তি পাবার এত আনন্দ। হতাশা আছে বলেই হয়ত মানুষ আশা করতে এত ভালবাসে। বেদনাই হয়ত আনন্দের পরমায়ু।

সেই বেদনাই দীপঙ্করকে এত পথ চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে গড়িয়াহাট লেভেল্ ক্রসিং পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পথের যাত্রায় শুধু আনন্দের পাথেয় পেলে কি তার এতদূর আসার ধৈর্য থাকতো!

প্রতি পদে পদে বাধার বেদনাই তো তার আনন্দের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই কালিঘাটের অন্ধকার অস্বাস্থ্যই তো তাকে কেবল আলোর দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। আরো আনন্দ চাই, আরো আলো, আরো মুক্তি। ছোটবেলায় মা যে-আনন্দের আশ্রয় দীপঙ্করের ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিল, সেই আনন্দ না-পাক্, দীপঙ্কর, কিন্তু আর এক আনন্দ তো পেয়েছে। আর এক মুক্তি, আর এক স্বাতন্ত্র্য।

দীপঙ্করের মনে হতো—এই যে আমি, এতবড় জগতের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও এই যে স্বতন্ত্র আমি, এ আমি কার? আমি সতীর, না আমি লক্ষ্মীদির? আমি কিরণের, না মা'র? আমি প্রাণমথবাবুর না ছিটে-ফোঁটার? আমি পৃথিবীর না পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনও অদৃশ্য শক্তির? দীপঙ্করের মনে হতো—কেন আমি এত ব্যথা পাই, কেন আমি আবার এত আনন্দও পাই? কেন আমি জন্মেছি, কেন আমি সংগ্রাম করছি? এই আমার অস্তিত্বের সংগ্রাম দিয়ে কার কোন্ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হচ্ছে? সংসারের কার কোন্ উপকারটা সাধিত হচ্ছে?

সেদিন আপিসের করিডোরে যখন নানা মানুষের ভিড় উন্দাম হয়ে উঠেছিল, যখন সেক্শানে-সেক্শানে কুৎসিত আলোচনার অন্ত ছিল না, ক্লার্কদের মুখে-মুখে যখন হীন-নীচ প্রসঙ্গের খোলাখুলি আলাপ চলছিল, তখন দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল, এই সমস্তর পেছনেও যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির কোনও অজ্ঞাত এক সঙ্কেত লুকিয়ে আছে।

ক্রফোর্ড সাহেব নিজেও এসেছিল সঙ্গে। দীপঙ্কর নিজে মিস্টার ঘোষালের চেয়ারে বসলো। কাগজ-পত্র, ফাইল, চিঠি, ইন্ডেণ্ট্, এস্টাব্লিশমেণ্ট, সব কিছুই দীপঙ্করের জানা কাজ। মিস্টার ঘোষালের মুখটা কিছু গম্ভীর। কী সব অনেকগুলো কাগজ-পত্র নিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলো দীপঙ্করকে। কারো কোনও কথাই কানে গেল না। কোনও দিকেই যেন খেয়াল নেই দীপঙ্করের। এই আপিসেই একদিন তেত্রিশ টাকার সামান্য ক্লার্কের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিল দীপঙ্কর, আবার এই আপিসেরই সর্বোচ্চ চেয়ারটাতে এসে বসলো। সেদিন এখানে মনে ক্ষোভ আর বুকে ঘৃণা নিয়েই ঢুকেছিল সে, আর আজ এই চেয়ারটাতে বসেও তার সে-ঘৃণা আর ক্ষোভের যেন এতটুকু লাঘব হলো না। এই চেয়ারটাতেও যেন সংসারের সব পাপ আর কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে লেগে আছে। দীপঙ্করের মনে হলো সে-ও যেন হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের সব অপরাধের অংশ-ভাগী হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। একটা চুরুট নতুন করে ধরালো আবার মিস্টার ঘোষাল।

মিস্টার ঘোষাল অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে—ইজ্ দ্যাট্ অলরাইট সেন? সমস্ত ঠিক আছে?

আজ দীপঙ্করের অনুমতি নিয়ে মিস্টার ঘোষালকে যেতে হচ্ছে। একটু আগেই জামিনে খালাস পাওয়া মানুষটা যেন পেলে সমস্ত বিশ্ব-সংসারটাকে কামড়ে চিবিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে দেবে। যেন হাঁফাচ্ছে মিস্টার ঘোষাল। জীবনে এই-ই বোধহয় প্রথম আঘাত, প্রথম পরাজয়। সেই লণ্ডন আপিসের ধর্মঘট থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অগাধ উন্নতির শিখরে উঠতে উঠতে এই প্রথম পিছলে যাওয়া।

—আমি দেখে নেব সেন, তুমি দেখে নিও, আই শ্যাল্ ফাইট্ ইট্ আউট্, আই শ্যাল্—

দীপঙ্কর কিছু কথা বললো না। ক্রফোর্ড সাহেব তখন নিজের ঘরে চলে গিয়েছে। মিস্টার ঘোষাল আবার গর্জন করে উঠলো—আমি প্রমাণ করবো আমাকে ম্যালিসাস্‌লি ধরা হয়েছে, আমি সকলকে ওয়াগন দিতে পারিনি। ডিসগ্রাণ্টল্‌ড পার্টির এটা কাজ—আই শ্যাল্ প্রুভ্ ইট্—আই শ্যাল্

এক-তরফা কথা বেশিক্ষণ হয় না। তবু দীপঙ্করের কাছে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে মিস্টার ঘোষালের যেন আগ্রহের অন্ত ছিল না সেদিন। বললে—ডু ইউ নো সেন, আমি সকলকে চিনি—আমি পুলিস কমিশনারকে চিনি, আমি গভর্নর স্যার জন হার্বাটকে চিনি, উই আর ফ্রেণ্ড্‌স, দরকার হলে আমি ফজলুল হক্‌কে বলবো, আই উইল মুভ্ হেভেন্ য়্যাণ্ড আর্থ সেন—একজন ইনোসেণ্ট গভর্নমেণ্ট অফিসারকে এই হ্যারাস্‌মেণ্ট্ করা—

মিস্টার ঘোষাল ঘরের মধ্যে চুরুট টানতে টানতে খাঁচার বাঘের মত এধার-ওধার করতে লাগলো। যেন পারলে দীপঙ্করকেই কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। তারপর আরো কত কী বলেছিল মিস্টার ঘোষাল—সমস্ত মনে আছে দীপঙ্করের। যথারীতি টেণ্টেড্ মানি দিয়ে ধরেছিল স্পেশ্যাল পুলিস। কোনও ফাঁক রাখেনি তারা। পুলিসের এস-পি ছিল, ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ছিল—আর ছিল ইন্‌ডেণ্ট্ ফর্ম নিয়ে পার্টি। মাড়োয়ারী নয়, গুজরাটী নয়, সিন্ধী নয়, বাঙালী। খাস্ বাঙলা দেশের খাঁটি বাঙালী। ওয়াগনের জন্যে অনেকদিন ধরে আসা-যাওয়া করেছে, অনেক সাধ্য-সাধনা করেছে, অনেক খোশামোদ করেছে। দ্বিজ-পদকে বখশিশ দিয়েছে। কিন্তু মিস্টার ঘোষালকে খুশী করতে পারেনি। মিস্টার ঘোষাল দশখানা ওয়াগনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। পাঁচটি হাজার টাকা ব্রাইব্। পাঁচ হাজার টাকা দিলেও আরো পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট থাকতো পার্টির। কিন্তু তখন স্পেশ্যাল পুলিস তৈরি হয়েছে। চারদিকে আপিসের দেয়ালের গায়ে পোস্টার পড়ে গেছে—'ঘুষ দিবেন না। ঘুষ দেওয়া এবং ঘুষ নেওয়া, উভয়ই অপরাধ।' শেষে বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক হাজির হয়েছিল গিয়ে পুলিসের আপিসে।

মিস্টার ঘোষাল অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—ডু ইউ বিলিভ্ ইট সেন? এ তুমি বিশ্বাস করো? আমি ব্রাইব্ নিতে পারি?

২০৫

দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারেনি তখন।

মিস্টার ঘোষাল আবার জিজ্ঞেস করেছিল—এ তুমি বিশ্বাস করতে পারো? আমার দ্বারা ব্রাইব্ নেওয়া সম্ভব? তুমি আমাকে এতদিন দেখে আসছো! মিস্টার রবিনসন্ আমাকে চিনতো! আমি এ-কাজ করতে পারি? দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল্—ডু ইউ বিলিভ্ ইট্ রিয়্যালি?

দীপঙ্কর বিশ্বাস করুক আর না-করুক, তাতে কারো কিছু এসে যায় না। পৃথিবীও থেমে থাকে না তার জন্যে। টাকার চাকা তখন গড়িয়ে চলেছে এদেশ থেকে ওদেশে। সেই টাকা। টাকা তখন অনেক জমে গেছে সিন্দুকে। অঘোর-দাদুর সিন্দুকের মত আমেরিকার সিন্দুকে অনেক টাকা জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের সিন্দুকেও টাকার পাহাড়। নিজের খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেছে। কিন্তু ঘরে টাকা রেখেও শান্তি নেই অঘোরদাদুদের। কারবারী যারা, যারা ব্যাঙ্কার, তাদের কাছে টাকা থাকাটাই সব নয়। টাকা খাটানোটাই বড় কথা। তখন কাদের দেশে সোনা আছে, কোন্ জঙ্গলে তামা লোহা টিন আছে খোঁজো। কাদের চা-বাগানে মূলধন দরকার, কাদের রবার ক্ষেতে ক্যাপিট্যাল চাই সন্ধান নাও। কোন্ দেশে রেল-লাইন তৈরি হচ্ছে না টাকার অভাবে, পৃথিবীর কোন্ কোণে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যাণ্ট্ বানাবার পয়সা নেই, খুঁজে বার করো। তারপর সেখানে টাকা ধার দিয়ে সুদ নাও, সেই সুদ আবার খাটাও ক্যাপিটাল হিসেবে। তারপর সেই মূলধন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আরো বড়লোক হও। আরো বড় মহাজন। তখন টাকা পাহারা দেবার জন্যে আর্মি রাখো, নেভি করো, পরের দেশে লগ্নী মূলধনের খাতিরে বেশ কড়া করে আইন বানাও। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাটের ভেতরে সতীদের নিয়ে এসে দিন কাটাও। কোথাও কোনও অশান্তি নেই, কোথাও কোনও অভাব নেই, কোথাও কোনও অস্বস্তি নেই, খাও দাও ফুর্তি করো—গড্ ইজ্ ইন্ দি চার্চ!

কিন্তু, তা তো হবার নয়। প্রেমের মত টাকারও বড় বিচিত্র গতি। আমেরিকাও মহাজন, ব্রিটেনও মহাজন।। জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স—তারাও বড় বড় সব মহাজন। সবাই টাকা খাটাচ্ছে পৃথিবীর মার্কেটে। একদিন সেই মার্কেট বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আর মাল কিনতে আসে না বাজারে। সবারই দেনা হয়ে গেছে। আফ্রিকার দেনা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার দেনা হয়েছে, ইজিপ্ট, পার্শিয়া, টার্কি—সকলে দেনাগ্রস্ত। মাল দরকার বটে কিন্তু দেনা আর বাড়াতে চাই না। মহাজনরা বললে—তা হোক। দেনার জন্যে তোমাদের ভাবনা নেই, ধার নাও। ধার দিচ্ছি। ইচ্ছে হয় শোধ করো কিংবা শোধ করো না। কিন্তু টাকা তোমরা নাও বাপু। টাকা না খাটালে আমাদের ঘুম আসবে না। টাকা না খাটাতে পারলে আমাদের ভাত হজম হবে না। তা তাই হলো। কেউ ধার নিলে, কেউ নিলে না। যারা ধার নিলে, তারা দেনদার স্টেট। দেনদার হয়েই

রইল চিরকাল। সে-ধার আর শোধ হবার নয় ইহকালে। তখন দেনদারদের ওপর পাওনাদারদের পীড়ন চলতে আরম্ভ করলো। তাতেও কিছু সুরাহা হলো না। এল গ্রেট-ডিপ্রেশন। কিন্তু তত্দিনে সমস্ত পৃথিবীটাই মহাজনদের কবলে চলে গেছে। একদলের আছে, আর একদলের নেই। সেই নেই আর আছের মধ্যে বিরোধ বাধলো। জার্মানী বললে—তোমার যখন আছে, আমারই বা থাকবে না কেন? আমারও চাই স্বাস্থ্য, আমারও চাই আলো, আমারও চাই বাতাস। তোমাদের মত আমারও আরাম করবার অধিকার আছে—। আর তারপরই এল উনিশশো উনচল্লিশ সাল। আর তারপরেই এল ডিবচারি, ব্রাইব্ অ্যাডালট্রি। তারপরেই এল স্পেশ্যাল পুলিস। আর তারপরেই অ্যারেস্ট হলো মিস্টার এন্-কে-ঘোষাল!

কিন্তু এর পরে এল আর এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সমস্ত বাড়িটার ভেতরে তখন যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সনাতনবাবুরও তখন খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ব্যাঙ্কে কয়েকবার ফোন্ করেছিলেন সনাতনবাবু। মা-মণি নিজেও আর স্থির থাকতে পারেন নি। আসলে কিন্তু তিনি স্থির থাকবারই লোক। সহজে বিচলিত হলে তাঁর চলে না। বিচলিত হলে এতদিন চালাতেও পারতেন না। শেষকালের দিকে যখন সনাতনবাবুর সঙ্গে মিটমাট হয়নি, তখনই এসেছিল নির্মল পালিত। ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলের ফার্স্ট বয় নির্মল পালিত। ব্যারিস্টার পালিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই তাকে কালীঘাট স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলে মানুষ হবে। মানুষই হয়েছিল সে। কোনও রকম নেশা করেনি, কোনও রকম বদ্খেয়াল ছিল না তার। শুধু চিনেছিল টাকা। সহজে টাকা উপায় করতে শিখেছিল। কোর্টে টাকা উপায় করা শক্ত হলে কি হবে? ইচ্ছে থাকলে টাকা উপায় করার অনেক পথ আছে। কতরকম ভাবে টাকা উপায় করা যায়। টাকা উপায়ের ব্যাপারে সং-অসং ভাবতে নেই। টাকা হলো লক্ষ্মী। লক্ষ্মী রাস্তার নর্দমায় পড়ে থাকলেও অপবিত্র হয় না। সেখান থেকে লক্ষ্মীকে কুড়িয়ে এনে সিন্দুকে পুরতে হয়। ব্যারিস্টার পালিত সত্যি-সত্যিই ছেলেকে সং-স্কুলে পড়িয়ে প্রকৃত সং শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছিলেন।

সকাল বেলাই ব্যাঙ্ক থেকে লোক এসে গিয়েছিল। থানার পুলিসও এসে গিয়েছিল।

সনাতনবাবু বললেন—দেখুন, টাকা-কড়ির ব্যাপার আমি তো কিছুই দেখতাম না—আমার মা-মণিই সব করতেন—

—কিন্তু চেক তো আপনিই কাটতেন?

সনাতনবাবু বললেন—আমি আগে কাটতাম পরে মা-মণি পাওয়ার-অব্ অ্যাটর্নি দিয়েছিলেন নির্মল পালিত বাবুকে—তিনিই আমাদের প্রপার্টির ব্যাপারটা দেখতেন—

—কিন্তু তিনি তো আউট-সাইডার, তাঁকে প্রপার্টির ব্যাপারে কেন এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল?

এ-কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। অনেক অতীত ইতিহাস। বলতে হয় সনাতনবাবুর বিয়ের কাহিনী। বলতে হয় সতীর কাহিনী। বলতে হয় সতীর বোন লক্ষ্মীর কথা। আরো বলতে হয় গ্রেট-ডিপ্রেশনের কথা। মা-মণির বিধবা হওয়ার কথা। বলতে হয় টাকার বিচিত্র গতির কথা। বলতে হয় সমস্তই। এই শিরীষ ঘোষের হঠাৎ পাওয়া টাকার উৎপত্তির সেই বিচিত্র কাহিনীটাও বলতে হয়। সেই টাকার গন্ধে কেমন করে নির্মল পালিত আকৃষ্ট হলো, তাও বলতে হয়। সনাতনবাবুর সঙ্গে মা-মণির সম্পর্কের বিচিত্র দিকটার কথাও বলতে হয়। অত বলতে পারবে কে? সনাতনবাবু ও-সব নিয়ে মাথাও ঘামাননি কখনও। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিজের কাজ-কর্ম সেরে এক সময়ে চলে গেলেন। তখন রইল পুলিসের ইনস্পেক্টর। ভবানীপুর থানার দারোগা।

ইনস্পেক্টর বললেন—নির্মল পালিত সম্বন্ধেও আমি ইনকোয়ারী করেছি। কেউ জানে না তিনি কোথায় গেছেন—আমরা বম্বে, ম্যাড্রাস, দিল্লি সব জায়গায় ওয়্যার করে দিয়েছি—

মা-মণি বললেন—পাঁচ লক্ষ টাকার আমি কোনও হদিস পাচ্ছি না, কলকাতার স্থাবর প্রপার্টির একটা টাকাও আমার ব্যাঙ্কে জমা হয়নি দেখছি—

—কিন্তু আপনার ছেলে থাকতে,—আর এতবড় উপযুক্ত ছেলে থাকতে, তাকে পাওয়ার-অব অ্যাটর্নী দিলেন না কেন?

মা-মণি বললেন—সে অনেক দুঃখের কথা, আমার নিজের পেটের ছেলে হলে কী হবে—ছেলে যে আমার বাধ্য নয়—

—আপনি নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করেন না?

সনাতনবাবু পাশেই বসেছিলেন। বললেন—এ-সব জানলে কি আপনার এন্কোয়ারীতে সুবিধে হবে?

মা-মণি ধমকে দিলেন। বললেন—তুমি থামো খোকা, আমাকে বলতে দাও—

ইনস্পেক্টর বললেন—না না, আপনিই বলুন মিস্টার ঘোষ, আমি আপনার কাছেই শুনতে চাই—বড় অদ্ভুত তো আপনাদের রিলেশন্স্—এক বাড়িতে ছেলে-মা'র এ-রকম রিলেশন্স্ বড় কুইয়ার!

মা-মণি বললেন—আসলে, বাবা, আমার ছেলেও এর জন্যে দায়ী নয়, দায়ী আমার কপাল। এই ছেলেকে আমি কী করে মানুষ করেছি তা আমিই জানি। টাকা থাকলেও ছেলে মানুষ করা যায় না। আমি কারোর সঙ্গে ছেলেকে মিশতে দিইনি। ছোটবেলা থেকে কোনও বদ্-সঙ্গীদের ছোঁয়াচ লাগতে দিইনি ছেলের

গায়ে, বাড়িতে এসে মাস্টার পড়িয়ে গেছে, ইস্কুলে পর্যন্ত পড়তে দিইনি, পাছে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। বাড়িতেই সারাদিন কাটিয়েছে, দিনরাত আমার নিজের কাছেই রেখেছি ওকে। রাত্রে আমার পাশেই শুয়েছে। সেই ছেলেকে আজকে পর করে দিলে আমার বউ—

—কোথায়? আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

সনাতনবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি থামো না মা-মণি—ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই কথাটাই বলো আগে—

মা-মণিও গলা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—কেন? কেন ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা হলো? কেন তুমি থাকতে আমার এমন সর্বনাশ হলো সেটাই আমাকে আগে বলতে দাও—! টাকা আমি কার জন্যে রেখেছিলুম? টাকা আমার সঙ্গে যাবে? টাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাবো? টাকা আমায় পরকালে মুক্তি দেবে? টাকা লোকে কীসের জন্যে চায়? ছেলে-মেয়ে-বউ-জামাই, এদের জন্যেই তো টাকা! আর কীসের জন্যে? তুমি আমার পেটের ছেলে হয়ে আমাকে সেই সুখ দিয়েছ? বুকে হাত দিয়ে বলো তো তুমি? দিয়েছ?

সনাতনবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টরের সামনে এ-সব কথা হওয়া পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর।

মা-মণি বলতে লাগলেন—যা আমি জীবনে কখনও কল্পনা করিনি, আমার কপালে শেষে তাই ঘটলো! আমার আর কী? আমি আর ক'দিন? আমি তো গঙ্গামুখো পা করেই আছি। আমার তো আজ-কালের ব্যাপার। কিন্তু তোমার জন্যেই তো টাকা রাখতে চেয়েছিলাম। তোমার যাতে কোনও কষ্ট না হয়, সেই জন্যেই তো এই বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি সব করা। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে তিন কুলে?

সনাতনবাবুর আর বেশিক্ষণ সহ্য হলো না। তিনি ইন্‌স্‌পেক্টরের দিকে ফিরে বললেন—ও-সব কথা থাক, মিস্টার পালিতকে অ্যারেস্ট করার জন্যে আপনারা আর কী স্টেপ নিয়েছেন?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—এখন ইন্‌ভেস্টিগেশন চলছে, আশা করছি বেশি দিন লাগবে না—খবর পেয়েছি তিনি মিসেস পালিতকে নিয়ে গেছেন—

—মিসেস পালিত?

—হ্যাঁ, মিসেস পালিতকে তিনি বিয়ে করেছিলেন প্রচুর টাকা নিয়ে। তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ জানে না তাঁদের মুভমেন্ট্।

—তাঁদের ছেলে-মেয়ে?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি তাঁদের এখনও—

—কিন্তু কোথায় যেতে পারেন তাঁরা? কোথায়ই বা যাওয়া সম্ভব? সেটা জানলে কি আর নির্মল পালিতকে পুলিস ধরতে পারতো না এখনও?

নির্মল পালিত ক্লেভার লোক। তার ওপর ক্লেভার ব্যারিস্টার। কোর্টে কিছু না-হলেও টাকার যুগের প্রতিভূ। টাকা উপায় করতে জানে সে, টাকা সরাতেও জানে। সারা জীবনে সে যে-টাকা উপায় করতে পারতো, সেই সমস্ত টাকাটাই সে এই ঘোষ-বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কত যে নিয়ে গেছে আর কত যে নেয়নি—তারও হিসেব নেই হয়ত নয়নরঞ্জিনী দাসীর। নয়নরঞ্জিনী দাসী নিজে তন্ন তন্ন করে ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, স্থাবর সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ সব বার করেছেন। কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। কোন্ দলিলটা কখন নির্মল পালিত চেয়েছিল, আবার কখন ফিরিয়ে দিয়েছিল, তারও তো তিনি হিসেব রাখতেন না। কখন কোন্‌টাতে সই করতে বলেছিল, তারও খেয়াল নেই তাঁর।

—তা সবসুদ্ধ কত টাকার মত হবে মনে হচ্ছে আপনার?

মা-মণি বললেন—তা বিশ-তিরিশ লাখ টাকার মত হবে বলে মনে হচ্ছে, ক্যাশ টাকা কিছুই তো আর নেই আমার—বাকি যা আছে তা জুয়েলারী আর এই বাড়ি, তা এই বাড়িটার দলিলও খুঁজে পাচ্ছি না—এ বাড়িটার যে কী হয়েছে তাও জানি না।

—আর জমি-জমা?

—জমি-জমা সুন্দরবন অঞ্চলে যা ছিল, সব তো আগেই বিক্রী করে ক্যাশ করে নিয়েছিলাম। জমি-জমা তো আর কিছু ছিল না। আমার নিজের সিন্দুকে আমার কয়েকশো ভরি গয়না আর ছেলের বউ-এর গয়নাই এখন আমার ভরসা—

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ইনভেস্টিগেশন শেষ হতে কত দিন লাগবে আন্দাজ?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—তা কি বলা যায়! মিস্টার পালিত তো বোকা লোক নন, চারদিক আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন তিনি—আমরা তাঁর হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনেও ওয়াচ্ রেখেছি—

—বাড়িতে তাঁর কে আছে আর?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—বাড়িতে কেউ-ই নেই, এক বোন ছিল, ব্যারিস্টার পালিত তার বিয়ে আগেই দিয়ে গিয়েছিল, এখন বাড়িতে থাকবার মধ্যে কেবল হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ—তা তারা দুজনেই মিসিং—। এখানে যে ব্যাঙ্কে তাঁর একাউন্ট্ ছিল, তাও ক্লোজ করে দিয়ে গেছেন—

সমস্ত লেখা-পড়া শেষ করে ইন্‌স্‌পেক্টর উঠলেন। মা-মণি বললেন—তা আমার টাকা আমি ফেরত পাবো তো?

—নিশ্চয় পাবেন! এত টাকা তো এত তাড়াতাড়ি আর তছ্‌-নছ্ করতে পারবে না। কালপ্রিট্ ধরা পড়লে কন্‌ভিকশন হলেই সব উসুল করা হবে। আর টাকা যদি নষ্টও করে ফেলে তো পালিতের বাড়ি তো রয়েছে। বাড়ির প্রপার্টিও তো বিক্রী করে টাকা উসুল করা যেতে পারে। আপনি কিছু ভাববেন না। এখনও তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজত্ব—

মা-মণি বললেন—তা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই কি আর বেশি দিন থাকবে বাবা? আমার তো বড় ভয় করে!

—থাকবে না মানে! আপনি বলছেন কী? ওই গান্ধী আর নেহরুর কথা ছেড়ে দিন, জাপান জার্মানীর বড় বড় মহারথীরাই কাবু করতে পারছে না। পেছনে আমেরিকার রুজভেল্ট রয়েছে কী করতে?

হঠাৎ সরকারবাবু দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—টেলিফোন এসেছে মা-মণি!

মা-মণি বললেন—টেলিফোন? কার টেলিফোন? ব্যাঙ্ক থেকে?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—ও আমার টেলিফোন, থানা থেকে আসছে হয়ত—

নিজে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন ইন্‌স্‌পেক্টর। তারপর ফিরে বললেন—না, আমার নয়, সনাতনবাবুর—

মা-মণি একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন—খোকাকে আবার কে টেলিফোন করছে—?

সনাতনবাবু নিজেও বুঝতে পারলেন না। তাঁকে আবার কে টেলিফোন করবে। তাঁর তো পৃথিবীর কারো সঙ্গেই কোনও সম্পর্ক নেই। তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভারটা ধরলেন। বললেন—কে?

ওধার থেকে উত্তর এল—আমি দীপঙ্কর, আপনাকে বিপদে পড়েই টেলিফোন করছি, আপনি একবার শিগ্গির এখানে চলে আসতে পারেন? সতী হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—এখন হস্‌পিটালে রয়েছে, আপনি এলে একবার ভাল হয়—

মা-মণি বাধা দিয়ে বললেন—কার সঙ্গে কথা বলছো খোকা! কে টেলিফোন করছে?

সনাতনবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—কেন? হঠাৎ পড়ে গেল কেন? কোনও সিরীয়াস অসুখ হলো নাকি? ব্লাড-প্রেশার? এখন কেমন আছে? আপনি বলুন আমি এখখুনি যাচ্ছি—কোথায় আপনার আপিসটা?

অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু। মা-মণি আবার বাধা দিয়ে বললেন—কে? কার সঙ্গে কথা বলছো? কে অজ্ঞান হয়ে গেছে শুনি? কার আপিস!

সনাতনবাবু টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—আমি এখুনি যাচ্ছি, ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী হয়েছে আগে তাই বলো না? অজ্ঞান হয়েছে? বৌমা? বৌমাকে আনতে যাচ্ছো তুমি?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ—

—কেন আনছো তাকে? পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে বলে তাকে বাড়িতে আনতে হবে? আবদার তো মন্দ নয়! কীসের দায় আমাদের তাকে আনবার

জন্যে? কে টেলিফোন করছিল এখন?

সনাতনবাবু বললেন—দীপঙ্করবাবু, তিনি বড় ভয় পেয়ে গেছেন কি না—

—তা দীপঙ্করবাবুর যদি অত জ্বালা তো তিনি নিজেই তো সামলাতে পারতেন। তোমাকে আবার সোহাগ করে টেলিফোন করা কেন? আমরা কি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে ভালো করে তুলবো ভেবেছে? এত কানে-কানে ফুস-মন্তর দিয়েও আশা মিটলো না, এখন টেলিফোনে ফুস-মন্তর দেওয়া হচ্ছে আবার! না, আনতে হবে না—

সনাতনবাবু বললেন—মা, তার যে শরীর খারাপ, অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে, দেখবার কেউ নেই।

—আছে আছে, দেখবার লোক যথেষ্ট আছে। ও-সব মেয়েদের সেবা করবার লোকের অভাব হয় না। খবরদার বলছি এখানে ও-মেয়েকে আনতে পারবে না।

সনাতনবাবু কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। বললেন—কিন্তু মা, আমি আনতে যাবোই।

—এনে কোথায় তুলবে?

—আমাদের এই বাড়িতে!

মা-মণি বললেন—তবে যাও, কিন্তু আমিও বলে রাখছি তাহলে আমার এ-মুখ আর দেখতে পাবে না—

সনাতনবাবু বললেন—তবু আমি আনবো—

বলে সনাতনবাবু আর দাঁড়ালেন না। শম্ভু তাড়াতাড়ি পেছন নিলে। কোথায় রাস্তা, কোথায় ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কোন্‌দিকে হাসপাতাল, কোন্‌দিকে দীপঙ্করবাবুর আপিস,, কিছুই তার জানা নেই। দীপঙ্কর সব বলে দিয়েছিল টেলিফোনে। তবু মানুষটাকে একা ছাড়া উচিত নয়।

তখন সমস্ত আপিসের মধ্যে সকালবেলার জের চলেছে। কোথাও কারো কাজ করার নাম নেই। সেই মিস্টার এন কে ঘোষাল। বহু লোকের অপমান আর অত্যাচার জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল ঘোষাল সাহেবের জন্যে। সেই ঘোষাল সাহেবের চূড়ান্ত শাস্তিতে উল্লাস হবে বৈ কি। উল্লাসের চোটে টিফিন রুমেই ডজন-ডজন সিঙাড়া-চপ্‌-কাটলেট উড়তে লাগলো। কেউ আর কারো সীটে-এ বসে নেই। দুজনে দেখা হলেই ওই এক কথা। শালা শুয়োরের বাচ্চার ব্যাপার শুনেছো তো?

—আর সেই মেয়েটা কোথায়? তার কী হলো মশাই?

শুধু হেড-আপিসেই নয়। সর্বত্র। শেয়ালদ'র কণ্ট্রোল-রুমে, বালিগঞ্জ স্টেশন-মাস্টারের ঘরে। সাউথ-কেবিন, নর্থ-কেবিনে। এমন কি গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিংএর গেটম্যানরা পর্যন্ত। এতদিন পরে একটা মুখরোচক খবর পেয়ে

সকলের জিভ্ দিয়ে টস্ টস্ করে লালা পড়ছে। এমন খবর শুনেও আনন্দ, শুনিয়েও আনন্দ। সমস্ত লাইনময় খবর চলাচল হতে লাগলো। শুয়োরের বাচ্চা এখন কী করছে? বাবা, মাথার উপর দর্পহারী মধুসূদন আছে একজন। তাঁর নজর এড়াতে পারবে না কেউ!

—মনে আছে তো কালীবাবু সেই অপমানের কথা? গেট-আউট্ বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের?

—মনে নেই আবার। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে মশাই। বাতাসে নড়ে। হাত দিয়ে নাড়াতে হয় না।

ঘরের মধ্যে বসে দীপঙ্করের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হচ্ছিল। পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা যেন গ্রাস করে ফেলছিল তাকে। সতীর লজ্জা যেন তারই লজ্জা। সতীর আঘাত যেন তারই আঘাত! বার বার অনেকবার তাকে টেলিফোন্ ধরতে হয়েছে আজ সকাল থেকে। কেউ কনগ্র্যাচুলেট করেছে। কেউ আসল ঘটনাটা জানতে চাইছে। কে ট্রাফিকের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসার হবে, কে তার খালি চেয়ারটায় বসবে, এই নিয়ে উঁচু মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে মিস্টার ক্রফোর্ডের ওপর।

হঠাৎ হুড়মুড় করে সনাতনবাবু ঘরে ঢুকলেন। মধুর বাধাও তিনি শোনেন নি।

—এসেছেন? চলুন।

সনাতনবাবু বললেন—এখন কেমন আছেন তিনি দীপঙ্করবাবু?

দীপঙ্কর সনাতনবাবুর চেহারার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন নি এখনও?

সনাতনবাবু বললেন—সে পরে বলছি, এখন কেমন আছেন তিনি বলুন আগে!

দীপঙ্কর বললে—ঘণ্টা খানেক আগে আমি টেলিফোন করেছিলাম আমাদের হসপিটালে, তখনও আনকন্শাস ছিল, এখন একটু আগে আবার করেছিলাম, শুনলাম জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু খুব উইক্—

—আপনি নিজে একবার যাননি দেখতে?

দীপঙ্কর বললে—আমি দেখা করতে চাই না সনাতনবাবু, আমাকে দেখলে হয়ত অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই আপনাকে ডেকেছি। আপনাকে হস্পিট্যালে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

সনাতনবাবু বললেন—চলুন—

দীপঙ্কর কাগজ-পত্র গুছোতে গুছোতে বললে—দেখুন না, আমার কী ব্যাপার, আমি এদিকে ময়মনসিং-এ ট্র্যানস্ফার হবার জন্যে তৈরি হচ্ছি হঠাৎ আমাকে মিস্টার ঘোষালের কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিতে হলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই এস্টাব্লিশমেণ্ট সেক্শানের

সুধীরবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকলো।—কী সুধীরবাবু? কিছু চাই?

সুধীরবাবুর হাতে ফাইল ছিল একটা। বললে—সেই ভেকেন্সিটার কথাই বলতে এসেছিলাম—জার্নাল সেক্শানের ভেকেন্সি—

—ভেকেন্সি? জার্নাল সেকশানে আবার ভেকেন্সি কোত্থেকে হলো?

—আজ্ঞে, স্যার, বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার তো গাঙ্গুলীবাবুর লিভ্ ভেকেন্সিতে কাজ করছিল, সেই গাঙ্গুলীবাবু আর আসবেন না—

—আসবেন না মানে? এতদিন হলো কাশ্মীরে গেছেন, এখনও কোনও খবর দিচ্ছেন না, তাঁর পাসের অ্যাভেলেবিলিটি পিরিয়ড্ও তো শেষ হয়ে গেছে। একটা চিঠি লিখুন আপনারা? এখনও কেন ডিউটি রিজিউম্ করছেন না—তার খবর নিন—

—খবর নিয়েছিলুম স্যার। তাঁর উইডো চিঠি লিখেছেন—

—উইডো? উইডো মানে?

—আজ্ঞে তিনি সুইসাইড্ করেছেন!

দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বলছেন কী আপনি? কবে সুইসাইড্ করেছেন? কোথায় সুইসাইড্ করেছেন?

সুধীরবাবু বললে—মোগল-সরাই স্টেশনে। মোগল-সরাই স্টেশনের ওয়েটিং রুমের পাশে—

সেই গাঙ্গুলীবাবু! একটা অস্পৃশ্য ইলেক্ট্রিক্ শক্ যেন সমস্ত শরীরটাকে আচম্কা নাড়া দিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সেই গাঙ্গুলীবাবু! আপিসে আসার প্রথম দিনটি থেকে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ ছিল, সেই গাঙ্গুলীবাবু!

—কী হয়েছিল তাঁর? হঠাৎ সুইসাইড্ করতে গেলেন কেন?

দীপঙ্করের মনে হলো আকাশ যেন আর তার মাথার ওপর নেই, মাটি যেন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে, বাতাস থেমে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। সব সুখ, সব দুঃখ, সব বেদনা, সব আনন্দ, সব অনুভূতি যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এক অভূতপূর্ব নিশ্চেতনা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে ফেলবে! চোখের ওপর ভেসে গেল সেই চেহারাটা। সেই সংসার, বৌবাজারের গলির মধ্যেকার সেই অসুখী স্ত্রীটি। কত পরিপাটী যত্নে টেবিলের ওপরে সাজানো এম্ব্রয়ডারি করা ঢাকনি। দেয়ালে কত সযত্নে টাঙানো ফ্রেমে আঁটা নাড়ু-গোপালের কার্পেট। আর সেই স্ত্রী। স্ত্রী বলতো—যে নিজের স্ত্রীকে শাড়ি গয়না দিতে পারে না, তার গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি—

—কী হয়েছিল তাঁর? সুইসাইড্ করলেন কী ভাবে?

তিন বার গলায় দড়ি কথাটা উচ্চারণ করতো গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী! দীপঙ্করের সামনেই তো সেদিন বলেছিল। কী করুণ কী ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল গাঙ্গুলী-বাবুর মুখটা। গাঙ্গুলীবাবু কি সেদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল এই

মর্মান্তিক পরিণতির কথা! না কি গাঙ্গুলীবাবু সেই তখনি সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছিল। পলে পলে তিলে তিলে মৃত্যুর অপবাদ সইতে সইতে হয়ত অবধারিত মৃত্যুর সামনে এসে আর দ্বিধা করতে পারেনি। মৃত্যু বুঝি এমনি করেই আসে। আর মৃত্যুও তো নয় ঠিক এটা। এ যে অপমৃত্যু! অপমৃত্যুর হয়ত এই-ই নিয়ম!

—না স্যার, কেন যে সুইসাইড্ করলেন তিনি, তা কেউ জানে না। তিনি নিজে একটা চিঠি নাকি লিখে রেখে গিয়েছেন—লিখে গেছেন—তাঁর মৃত্যুর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়—

—মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!

দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করা স্বভাব নয় বড় একটা দীপঙ্করের। কিন্তু হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো। মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! সবাই দায়ী, সবাই দায়ী এই মৃত্যুর জন্যে! আপনি দায়ী, আমি দায়ী, মিস্টার ঘোষাল দায়ী, মিস্টার ক্রফোর্ড দায়ী। জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে বোর্ড দায়ী। আর শুধু আমরা কেন, শুধু এই যুদ্ধই বা কেন, আমরা যারা পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছি, সবাই-ই গাঙ্গুলীবাবুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী! আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি, আমরা স্বার্থপর হয়ে উঠেছি, আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবি করেছি, আমরা অমানুষ হয়ে গিয়েছি বলে গাঙ্গুলীবাবুরা অপঘাত-মৃত্যু বরণ করে।

—তিনি নিজের হাতে লিখে গেছেন স্যার, তাঁর উইডো লিখেছেন।

—তা হোক! আপনি আমার চেয়ে বেশি চেনেন গাঙ্গুলীবাবুকে?

সুধীরবাবু হকচকিয়ে গেলেন। বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলেন সেন-সাহেবের দিকে!

দীপঙ্কর বললে—আনুন, গাঙ্গুলীবাবুর পার্সোন্যাল্ ফাইলটা আনুন—মিস্টার ক্রফোর্ড নিজে স্যাংশন করে দিয়েছে তাঁর গ্রেড্, আনুন ফাইলটা—শিগ্গির আনুন আমার কাছে—

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটা নিয়ে এলেন। দীপঙ্কর ফাইলটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললে—এই দেখুন, এই জায়গাটা দেখুন—একটা লোক চোদ্দ বছর একটা জার্নাল সেকশানে বসে পচছে তা আপনাদের খেয়াল নেই—! একে প্রমোশন্ দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন না?

সুধীরবাবু সেন-সাহেবকে আগে এতটা রাগতে দেখে নি কখনও। বললে—তিনি ফিরে এলেই তো খবরটা পেতেন—

—তা এ ক'মাস মাইনে নিচ্ছেন না দেখেও আপনাদের সন্দেহ হয়নি? আশ্চর্য!

আশ্চর্যই বটে! দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন দৃশ্যটা ভেসে উঠলো। মোগল-সরাই স্টেশন! রাত্রে এসে ট্রেনটা থেমেছে। ট্রেন থেকে যথারীতি নেমেছে

গাঙ্গুলীবাবু। স্ত্রী-কন্যা-পরিবার নিয়েই নেমেছে। স্ত্রীর গায়ে দামী শাড়ি, দামী গয়না, পায়ে দামী জুতো!

—দিদিকে জামাইবাবু ফেরবার পথে কাশীটা দেখিয়েছিল, আমাকে কাশী দেখাবে না?

গাঙ্গুলীবাবু হয়ত বলেছিল—তাই জন্যেই তো নামছি এখানে!

স্ত্রী বললে—তাহলে এ-শাড়িটা বদলে নিই, কী বলো? একটা খারাপ শাড়ি পরলে লোকে কী বলবে?

—তা পরো।

কোনও কিছুতেই আপত্তি করেনি গাঙ্গুলীবাবু। কোনও কিছুতেই আর বিরাগ নেই গাঙ্গুলীবাবুর। বিরাগও নেই, অনুরাগও নেই। গাঙ্গুলীবাবু স্ত্রীর সব আবদার সব অনুরোধ পালন করে এসেছে সারা রাস্তা। স্ত্রী যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। কাশ্মীরে গিয়ে শাল কিনেছে দিদিদের মতন, শাড়ি কিনেছে, ভেলভেটের জুতো কিনেছে। আইভরির চুড়ি কিনেছে। স্ত্রীর কোনও সাধই অপূর্ণ রাখেনি গাঙ্গুলীবাবু। নিঃশব্দে সমস্ত কর্তব্য পালন করে এসেছে। জামাইবাবুরা যা যা কিনেছে, যা যা খরচ করেছে, সব তেমনি করেই করেছে। টাকা আছে কি নেই, সে প্রশ্ন তোলেনি গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী! গাঙ্গুলীবাবু দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছে নিজের আত্মাকে। তার পর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে এসেছে মোগলসরাই স্টেশনে। যেন অনেক বছর জার্নাল সেকশানে একই চেয়ারে একই গ্রেডে চাকরি করে আসার পর, প্রথম প্রমোশনের আশায় উজ্জীবিত হবার লগ্ন এসেছে।

—আর কিছু কিনবে তুমি?

—আর কী কিনবো বলো?

—আর কোনও শাল, আর কোনও শাড়ি, আর কোনও শৌখিন জিনিস?

—কিনবো? তোমার আরো টাকা আছে?

গাঙ্গুলীবাবু উত্তর দিয়েছে—টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, সেনবাবু আমাকে অনেক টাকা দিয়েছে খরচ করবার জন্যে, অনেক অনেক টাকা,—আরো টাকা দরকার হলে আরো টাকা পাঠাবে আমাকে—

স্ত্রীর মুখটা আনন্দে উপচে পড়তে লাগলো। বললে—সত্যি বলছো?

—সত্যি! আমার জন্যে প্রমোশনের ব্যবস্থাও করে দেবে সেনবাবু। কোনও ভাবনা নেই আর তোমার। তুমি আর কী কিনবে বলো না—

স্ত্রী বললে—তাহলে একটা বেনারসী কিনবো আমি, একটা খাঁটি কড়িয়াল বেনারসী—আমার বড়দির মতন, সাড়ে তিনশো টাকা তার দাম কলকাতাতে—

—তা তাই কিনো তুমি। আর কিছু কিনবে?

—আরো দেবে?

গাঙ্গুলীবাবু বলেছে—হ্যাঁ, তুমি যা ইচ্ছে কিনবে, আমার টাকার কথা ভেবো

না—

—তাহলে, দেখ, আর একটা সস্তার বেনারসী কিনবো, এই দেড়শো টাকার মতন দামে, বেটা এই বিয়ে-বাড়িতে পরে-টরে যাওয়া যায়, আর সাড়ে তিনশো টাকারটা পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যাবার সময় পরবো, কী বলো?

গাঙ্গুলীবাবু বলেছে—সস্তা কেনবার দরকার কী? দুটোই দামী কেনো না।

—দুটোই দামী কিনবো? তাহলে বড়দিও চমকে উঠবে, দুজনেরই খুব হিংসে হবে জনো—আমার শাড়ি দেখে—

—তা তিনখানাই কেনো না। তিনখানা ইচ্ছে হলে তিনখানাও কিনতে পারো।

স্ত্রী বললে—না, তুমি ঠাট্টা করছো—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—না ঠাট্টা নয়, তোমার কোনও সাধই আর অপূর্ণ রাখবো না—

সেই ওয়েটিংরুমের অন্ধকারে স্ত্রী গাঙ্গুলীবাবুর বুকের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিলে। চোখ দুটো বুজিয়ে বললে—ওগো, সত্যিই তুমি এত ভালো! তুমি আমার বড় জামাইবাবুর চেয়েও ভালো—! কেন তুমি আগে অমন ছিলে বলো তো! এখন কেমন তোমায় ভালো লাগছে আমার—

তারপর একটু থেমে বললে—ওগো, তাহলে এক কাজ করবো, পুজোর সময় কড়িয়ালটা পরবো, আর বড়দিদির মেয়ের বিয়ের সময় অন্য কড়িয়ালটা পরবো। খুব ভালো হবে, না গো? কথা বলছো না কেন, কথা বলো তুমি? সকলে কেমন চমকে যাবে, না গো?

তারপর অনেকক্ষণ তেমনি করে বুকে মাথা হেলিয়ে রেখে বলতে লাগলো—কিন্তু দেখ, কলকাতায় এবার ফিরে গিয়ে একটা মানতাসা গড়িয়ে দিও আমাকে—

—তা দেব!

—আর গয়না গড়িয়ে রাখলে তো তোমার কিছু লোকসান নেই, খুকুর বিয়ের সময় আর তোমাকে সোনা কিনতে হবে না তখন।

তরপর আরো রাত হলো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অনুরাগের ডিভেডেণ্ডের অঙ্ক বাড়তে লাগলো। জার্মান আর্মি তখন আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সেবার শীতে পেছিয়ে এসেছিল জার্মান-আর্মি। এবার এপ্রিল মাসেই গ্রাস করে নেবে সমস্ত রাশিয়া। ককেশাস্ চাই হিটলারের। ককেশাসের তেল বড় দরকারী। তেল না হলে ট্যাঙ্ক চলবে না, এরোপ্লেন চলবে না। মহাজনদের টাকা আটকে থাকবে। আরো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চাই যুদ্ধটা। যুদ্ধ চললে সুধাংশু আরো প্রমোশন পাবে, চৌধুরীর আরো অ্যালাওয়েন্স বাড়বে, লক্ষ্মীদির আরো টাকা জমবে ব্যাঙ্কে। মানস সাধারণের মত রেলের কেরানী হবে না। সে গাড়ি চড়বে, সে বড় হবে, মানুষ হবে, মহামানব হবে। আর নির্মল পালিত আরো

বড়, আরো টাকার মালিক হবে। আরো ধনী, আরো ক্ষমতার অধিকারী। আরো নয়নরঞ্জিনী দাসীর প্রপার্টি গ্রাস করতে হবে। আমেরিকা টাকা খাটিয়েছে পার্শিয়ার অয়েল-মাইনে, ব্রিটেন টাকা ইনভেস্ট করেছে ইজিপ্টে, ইন্ডিয়ায়, আফ্রিকায়। ফ্রান্স টাকা খাটিয়েছে ইস্ট এশিয়ায়, জার্মানী ইটালীকেও টাকা ইনভেস্ট করতে দিতে হবে। তাদের স্ত্রীদেরও কাশ্মীরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, তাদের স্ত্রীদেরও কড়িয়াল শাড়ি কিনে দিতে হবে। তাদের স্ত্রীদেরও মানতাসা কিনে দিতে হবে। লোভের সিংহাসনে সবাই সম্রাট হয়ে বসবে। আর কোনও উদ্দেশ্য নেই, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই কারো—

গাঙ্গুলীবাবুরও আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। গাঙ্গুলীবাবুরও আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। গাঙ্গুলীবাবু উঠলো ইজিচেয়ারটা ছেড়ে। মোগল-সরাই স্টেশন তখন শান্ত হয়ে এসেছে। বিয়াট ইয়ার্ডের কোন্ কোণে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তখন শান্টিং-ইঞ্জিন গাড়ি কাটছে আর গাড়ি জুড়ছে। প্ল্যাটফরমের ওপর ফালতু কয়েকটা লোক ঘুমিয়ে আছে অকাতরে। কোন্ ঘাটের লোক তারা, কোথায় এসে কোন্ ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েছে জীবনের।

গাঙ্গুলীবাবু একটু নড়তেই স্ত্রী বললে—কোথায় যাচ্ছো?

—এই দেখে আসি, কখন ট্রেন আসবে।

ওধারে পাহাড় জমে আছে গুঁড়ো কয়লার। ওয়াটারিং স্টেশন। মাথার ওপর কলের জলের ওভার-হেড্ পাইপ্। কয়েকটা পোকা লাইট-পোস্ট ঘিরে বাতিটার তলায় খেলা করছে। চাদরটা গলায় ছিল, সেটা গলা থেকে নামিয়ে নিলে গাঙ্গুলীবাবু। কড়িয়াল শাড়ি, সোনার মানতাসা, বড় জামাইবাবু, খুকু, খুকুর বিয়ে, কাবুলিওয়ালা, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, সব ঝাপসা হয়ে এল! পাশেই একটা গাছ। কী গাছ ভগবান জানে। ঠিক হাতের একটু ওপরেই একটা মোটা ডাল। গাঙ্গুলীবাবু ডালটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। এম-এ পাস করেছে গাঙ্গুলীবাবু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। আমায় ক্ষমা করবেন সেনবাবু। আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। আমায় আপনি দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি হেরে গেলুম! রেলের জার্নাল সেকশানের এ-বি গ্রেডের ক্লার্ক। ডিভিডেণ্ডের রেসে আমি লাস্ট্ হর্স। আমায় আপনি ঘৃণা করবেন না। পারেন তো আমায় ক্ষমা করবেন। আর চেষ্টা করবেন আমায় ভুলে যেতে। যেমন আমি ভুলে গিয়েছি এখন। আমার স্ত্রী-কন্যা সকলের কথা ভুলে গিয়েছি। মনে করবেন সমাজে গাঙ্গুলীবাবু নামে একটা ডাস্টবিন্ ছিল, এই সভ্যতার সুইপার এসে তাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।

—তারপর?

মোগল-সরাই স্টেশনে সেদিন একজন স্ত্রীলোক আর একটা শিশুর কান্নায় ট্রেন-চলাচল কিছুক্ষণের জন্যে ব্যাহত হয়েছিল কিনা তার বিবরণ কোথাও লেখা নেই। এক্স্-ক্লার্ক গাঙ্গুলীবাবুর পার্সোনাল ফাইলেও তা লেখা থাকার কথা

নয়। তবু দীপঙ্কর কল্পনা করে নিতে পারে। যথারীতি বেনারসের ট্রেনটা এল। ওয়েটিং-রুমের একটি বিধবা-পরিবার সেদিন সেই সেখানেই কড়িয়াল শাড়ি আর সোনার মানতাসার শোকে অধীর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু লোকে বললে—বড় প্যাথেটিক সীন্ মশাই—! সত্যিই. কী নিষ্ঠুর হাসব্যাণ্ডটা! স্ত্রী আর মেয়েকে ওয়েটিং-রুমের মধ্যে রেখে নিজে কি না সুইসাইড্ করলো গলায় দড়ি দিয়ে! স্ত্রীর দিকটা একটু ভেবেও দেখলো না মশাই—এমন পাষণ্ড স্বামী!

দীপঙ্কর বললে—যাক্, আপনার হাতে এস্টাবলিশমেন্টের ভার দেওয়া হয়েছে, শুধু আইন মেনটেন্ করবার জন্যে নয় সুধীরবাবু, সুবিচার করবার জন্যে। আপনারাই দেখবেন কোথায় ইনজাস্টিস্ হচ্ছে—

সুধীরবাবু বললে—স্যার, আমি তো এর জন্যে দায়ী নই—

—আপনাকে বলছি না আমি সুধীরবাবু, আমি নিজেকেও বলছি। আপনি আমি সবাই দায়ী এ-জন্যে। গাঙ্গুলীবাবু কি একটা আছে সুধীরবাবু আমাদের আপিসে? আমি জানি না আমি চিনি না এমন অনেক গাঙ্গুলীবাবু আছে সেকশানে-সেকশানে! আজ তারা হয়ত উপায় না পেয়ে মোগল-সরাই স্টেশনে গিয়ে আত্মহত্যা করে নিজেদের দুঃখের জ্বালা জুড়োয়, কিন্তু দলে যেদিন তারা ভারি হবে, সেদিন আর তা করবে না, সেদিন এই আপিসের ভিত্ পর্যন্ত টলিয়ে দেবে—যান্ আপনি—

সুধীরবাবু ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। দরজার বাইরে চলে গেল।

পেছন থেকে দীপঙ্কর আবার ডাকলে—সুধীরবাবু শুনুন—

সুধীরবাবু আবার ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর বললে—গাঙ্গুলীবাবুর ভেকেন্সিতে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার এখনও কাজ করছে তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে ওখানে লক্ষ্মণবাবুকে অ্যাব্‌সর্ব্ করে নেবেন—যান—

সনাতনবাবু এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন—আপনাদের তো অনেক কাজ এখানে দীপঙ্করবাবু?

দীপঙ্কর বললে—কাজ তত নয় সনাতনবাবু, যতটা কাজের আড়ম্বর। কাজ যদি সবাই করে, তাহলে কাজের চাপও কমে যায়। কিন্তু সে থাক, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, চলুন—আপনার এখনও খাওয়া হয়নি—

তারপরে টেলিফোনটা তুলতে গিয়েও রেখে দিলে। বললে—আর টেলিফোন্ করবো না, আপনাকে হঠাৎ দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে সতী। আপনি আসবেন ভাবতেই পারবে না—বড় খুশী হবে—

—কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞানই বা হলেন কেন দীপঙ্করবাবু? শরীর খারাপ নাকি? আর তা ছাড়া অভ্যেস তো নেই. আপিসের এত খাটুনি সহ্য হবে কেন?

তারপর যেন নিজের মনেই কী ভেবে নিয়ে বললেন—অথচ দেখুন, এ-

চাকরি করার কোনও দরকার ছিল না. সামান্য অর্থের জন্যে এ কী পরিশ্রম বলুন তো। স্ত্রীলোকদের কি এসব হ্যাঙ্গাম সহ্য হয়?

দীপঙ্কর বললে—আপনি যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান তো ওর ভাল হয়—আপনি জানেন না সনাতনবাবু, আপনাদের কাছে থাকতে ওর কত লোভ। মনে প্রাণে সতী তো স্ত্রীই হতে চায়, গৃহিণীই হতে চায়, ওর নিজের জায়গায় ওর আসল আসনটা পাততে চায়, কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেটাই সতী পেলে না—

—হ্যাঁ ভাল কথা। আমার চিঠিটা পেয়ে কী বললেন তিনি?

দীপঙ্কর সব কথাই খুলে বুঝিয়ে বললে। কেমন করে তার ময়মনসিং-এ বদলির অর্ডার অপ্রত্যাশিত ভাবে রদ্ হয়ে গেছে। সকাল বেলা আপিসে এসে চিঠিটা সতীকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও কেন দেওয়া সম্ভব হয়নি. সবই বললে। বললে—মিস্টার ঘোষাল ধরা পড়ে ভালো হলো কি মন্দ হলো জানি না—তবে মনে হলো এই সুযোগে হয়ত সতী আপনাদের কাছেই যেতে চাইবে। এখন তার সমস্ত আশ্রয়ই ভেঙে গেছে। এখন এক আপনি ছাড়া তার কেউই নেই বলতে গেলে—

সনাতনবাবু সব শুনলেন। বললেন—রাগ করে অনেক মানুষ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে দীপঙ্করবাবু, কিন্তু আমরা কুড়ুল মারাটাই তার দেখি, রাগটা আর দেখি না—।

দীপঙ্কর বললে—আজ কি আপনি তার রাগটাই বড় করে দেখবেন সনাতনবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—আমি কোনটাই দেখি না দীপঙ্করবাবু, আমি মানুষটাকেই দেখি। আমি তাঁকে চিনেছি বলেই আপনার টেলিফোন্ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। আপনি তাঁকে হয়ত বেশি চেনেন, কিন্তু আমিও তো তাঁকে কম চিনি না—

—আপনার মা'কে এবার একটু বুঝিয়ে বলবেন সনাতনবাবু। অনেক দিন আগে একবার সতীকে অনেক বুঝিয়ে আপনার মা'র কাছে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম. সেদিন যে-শাস্তি সে পেয়েছিল, তারপর তাকে আর কোনও অনুরোধ করার সাহসই আমার নেই—। এবার কোনও উপায় না পেয়ে শেষবারের মত তাই আপনাকেই ডেকেছি—

সনাতনবাবু বললেন—আমার মা'কে আপনি ঠিক চেনেন নি দীপঙ্করবাবু!

—কিন্তু এত অত্যাচার তিনি সতীর ওপর কেন করেন? সতীও তো মানুষ! সতীও তো একদিন আবার মা হবে, একদিন আবার শাশুড়ী হবে সেদিন এমনি করেই যদি সে তার পুত্রবধূর ওপর পীড়ন করে?

সনাতনবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন—আমার মা তো মা বলেই পীড়ন করে, আর সতী সতী বলেই বিদ্রোহ করে! আমি বাধা দিতে গেলেও তারা যে

তাই-ই করবে—

—কিন্তু অন্যায়ের বিপক্ষে আপনি বাধা দেবেন না?

—কিন্তু কাকে আপনি অন্যায় বলছেন দীপঙ্করবাবু?

—সতীকে অত্যাচার করাটাও অন্যায় নয় বলতে চান আপনি? কী অন্যায় করেছে সে? আপনাদের কতটুকু ক্ষতি করেছে সে যার জন্যে আজ আপনাদের বাড়ির বউ হয়ে এত বড় অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য হয়েছে? জানেন, আর একটু হলে সে আপনাদের বাড়ির সামনের বাড়িটা ভাড়া করে আপনাদের চোখের সামনে অসামাজিক জীবন-যাপন করতো? তাতেও সে পেছ্‌পাও হয়নি! তার এই অধঃপতনের জন্যে কে দায়ী? সে, না আপনারা?

সনাতনবাবু বললেন—আপনি তো খুব উত্তেজিত হতে পারেন দীপঙ্করবাবু?

—উত্তেজিত হবো না? সতীকে আপনারা কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছেন জানেন? আপনি তো আপনার মা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি কোনওদিন! চোখের সামনে অন্যায় দেখেও কোনও প্রতিকার করেন নি তার?

সনাতনবাবু প্রশান্ত দৃষ্টিতে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনি দীপঙ্করবাবু সত্যিই উত্তেজিত হয়ে পড়েন সহজে—

—কিন্তু এমন করে এড়িয়ে যেতে পারবেন না সনাতনবাবু! আপনাকে আজ জবাব দিতেই হবে! বলতেই হবে কেন আপনি এত সহজ? কেন এত নির্বিরোধী? কার ভয়ে কীসের স্বার্থে আপনি একটা কথাও জোর গলায় বলতে পারেন না?

সনাতনবাবু হাসতে লাগলেন আবার। বললেন—প্রতিবাদ করলেই কি প্রতিকার হয় দীপঙ্করবাবু?

—কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও তো আর এক রকমের পাপ!

সনাতনবাবু বললেন—প্রতিবাদ করলেই কি পূবের সূর্য পশ্চিমে ওঠে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু পূব দিকে সূর্য ওঠা তো অন্যায় নয় সনাতনবাবু। তার প্রতিবাদ করতে তো কেউ আপনাকে বলছে না?

সনাতনবাবু বললেন—আপনি হয়ত বলছেন না, কিন্তু কেউ কেউ তো বলে! আমার মা তো বলে। আমার মা বলে পূব দিকে সূর্য ওঠাটা নাকি ঠিক নয়—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনি তো জানেন সেটা ভুল। সুতরাং সেটার প্রতিবাদ করা আপনার উচিত ছিল—! তখন বোঝা উচিত ছিল সতী যেটা বলে সেইটেই ঠিক।

সনাতনবাবু আরো হাসতে লাগলেন। বললেন—না, তাই-ই বা কী করে বলি দীপঙ্করবাবু? ওদিকে সতী যে বলে পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবাটাও বেঠিক—! এখন আমি কার প্রতিবাদ করি, বলুন? মা যখন নির্মল পালিত বাবুকে বিশ্বাস করেছিল, তখনও তাই আমি প্রতিবাদ করিনি, সতী যখন বাড়ি

ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখনও তাই প্রতিবাদ করিনি। তাতে লাভ-লোকসান কার কী হলো জানি না, কারণ লাভ ক্ষতি দিয়ে তো আমি জীবনকে বিচার করি না—সে বিচার করবে মারোয়াড়ীরা, সে বিচার তো হিসেব-নিকেশের বিচার—

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ সনাতনবাবুর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ-মানুষটাকে যেন আজ নতুন করে চিনতে পারলে দীপঙ্কর। একটা লাজুক মুখচোরা ভীরু মেরুদণ্ডহীন লোক বলেই এতদিন ধারণা হয়েছিল সনাতনবাবুকে। কিন্তু আজ যেন দীপঙ্কর নিজের সামনে নতুন এক সনাতনবাবুকে দেখতে পেলে।

হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—তা হলে সতীর জন্যে আপনি কোনও অভাব অনুভব করেন না, বলুন?

—কে বললে, করি না? সতীর সঙ্গে কি আমার লাভ-লোকসানের সম্পর্ক যে তার অভাব বোধ করবো না আমি? আকাশে মেঘ করলে সূর্যের অভাব বোধ করবো না, আমাকে কি আপনি এতই নিষ্প্রাণ মনে করেন? যেদিন পড়ে গিয়ে মা'র পা মুচকে গেল, সেদিন রাতে আমার ঘুম আসেনি, সে কি মা'র সঙ্গে আমার লাভ-লোকসানের সম্পর্ক থাকলে সম্ভব হতো?

এ এক বিচিত্র মানুষ সনাতনবাবু! এ এক বিচিত্র ছেলে, এ এক বিচিত্র স্বামী! দীপঙ্কর তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে সনাতনবাবুর দিকে! সনাতনবাবু হঠাৎ বললেন—চলুন দীপঙ্করবাবু, আর দেরি নয়, আপনার একটু কাজের ক্ষতি করেও চলুন—

মনে আছে সেদিন দীপঙ্কর আপিস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার সমস্ত রাস্তাটাতে বার বার অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল সনাতনবাবুর দিকে। এতদিন তবে কোন্ সনাতনবাবুকে চিনে এসেছে? এতদিনের সব চেনা কি তার ভুল চেনা? এতদিনের সব দেখা কি তবে ভুল দেখা?

দীপঙ্কর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা সনাতনবাবু, এতদিন সতী যে মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে ছিল, তাতে আপনার কোনও কষ্ট হয়নি?

সনাতনবাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন—মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে মানে?

দীপঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে ঠিক নয় অবশ্য, কিন্তু পাশাপাশি ফ্ল্যাটে তো ছিল! তা শুনেও আপনার কষ্ট হয় নি?

সনাতনবাবু বললেন—কে বললে কষ্ট হয়নি? কষ্ট হয়েছে বলেই তো আজ তাঁর বিপদের কথা শুনে এখুনি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি—

—আর তখন কি সুখে ছিল বলেই দেখতে যাননি?

সনাতনবাবু বললেন—সুখে তিনি কোনওদিন ছিলেন না দীপঙ্করবাবু, তিনি সুখে থাকতে পারেন না। সুখ তাঁর জন্যে নয়—

—কেন? তারও কি সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই? তারও কি অন্য আর পাঁচজন মেয়ের মত স্ত্রী হয়ে স্বামীর সংসার করতে ইচ্ছে হয় না, মনে করেন?

মিলটা আছে শুনি? স্বরাজ হলে সামলাতে পারবি এত ঝঞ্ঝাট?

রাগে ঘেন্নায় কথাটা বলে দুনিকাকা যেন নিঃশব্দে একটা ছি ছি করে ওঠে।

সামনে প্রাণমথবাবুকে দেখে তবু দীপঙ্করের যেন একটু আশা হলো। কোথাও কোন বিরোধ নেই মানুষটার মধ্যে! সেই নাইন্টি মিলিয়ন হিন্দুর প্রতিনিধি সেজেও তো আজ বেরিয়েছেন রাস্তায়। এই একই প্রশ্ন যদি করা যায় প্রাণমথবাবুকে তো প্রাণমথবাবু কী জবাব দেবেন? প্রাণমথবাবু তো বিরোধে বিশ্বাস করেন না, অবিশ্বাসে বিশ্বাস করেন না, তাহলে প্রাণমথবাবু এ-কথার কী জবাব দেবেন?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে বলেছেন—Anarchy is always preferable to slavery, as there is hope of independence arising out of anarchy The movement will not collapse if the leaders are rounded up.

প্রসেসন্‌টা আস্তে আস্তে সরে যেতেই গাড়িটা আবার ছেড়ে দিলে। দীপঙ্কর পাশের দিকে চেয়ে দেখলে। সনাতনবাবু তখনও সেই মিছিলের দিকে চেয়ে আছেন।

রেলের হস্‌পিট্যাল। দীপঙ্কর আগে নিজে নেমে বললে—আসুন—

সনাতনবাবু নেমে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছি দীপঙ্করবাবু—

—কেন? চঞ্চল হচ্ছেন কেন? এমন কিছু তো হয়নি সতীর, এমনি আনকন্‌সাস্‌ হয়ে পড়েছে।

সনাতনবাবু বললেন—না সেবার ডাক্তার বলেছিলেন কিনা, নার্ভটা তার খুব শ্যাটার্ড হয়ে গেছে। কখনও শান্তি তো পাননি—

দীপঙ্কর বললে—সুখ দেওয়া যখন আপনার ক্ষমতার বাইরে, তখন শান্তি তো আপনি একটু দিতে পারেন সতীকে—

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি শান্তি তো দিতেই পারি, আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয়, সেইটুকু শান্তি তো আমি দিতেই পারি—সেটাও তো আমার কর্তব্য!

তারপর খুঁজে খুঁজে কেবিন্ নম্বর বার করে দীপঙ্কর বললে—এই কেবিনেই আছে সতী—

সনাতনবাবু বললেন—চলুন, আপনিও চলুন ভেতরে—

দুজনে একসঙ্গেই কেবিনে ঢুকলো। দীপঙ্কর দেখলে। সনাতনবাবুও দেখলেন। মিস্টার ঘোষাল সতীর মাথার কাছে বসে তার মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর সতী চেয়ে আছে তার মুখের

দিকে।

মনে আছে সেদিন সমস্ত দিনটা দীপঙ্করের কেটেছিল একটা অভূতপূর্ব মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে। জীবনের কি এইটেই চরম অর্থ? এই ভেতর থেকে বাইরে আসা? না কি বাইরে থেকে ভেতরে আসাটাই আসল! জীবন থেকে যত বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, ততই যেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল সে।

পরে সনাতনবাবু বলেছিলেন—যত পুষ্টি হবে ফলের, ততই সে আলগা হবে বোঁটার—

কিন্তু তাই-ই যদি হবে, তাহলে কেন মানুষ সমাজে আধিপত্য করতে চায়? কেন লক্ষ্মীকে সিন্দুকে পুরে মানুষ সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করতে চায়? কেন শত্রু জয় করে অমিতবীর্য হতে চায় মানুষ? কেন মানুষ পদ আর পদবী পেতে চায় সব আত্ম-সম্মান বিসর্জন দিয়ে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যারা তা চায়, তারা নগদ-বিদায়টাকেই যে বড় করে দেখে দীপঙ্করবাবু, কিন্তু যা হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল তাতে তো তাদের সুখ নেই—তখন বলে আরো চাই—

—তাহলে কীসে সুখ?

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় সনাতনবাবু বলেছিলেন—আগে বলুন কোন্ সুখটা চান? দেহের, না মনের, না আত্মার?

কোথা থেকে কোথায় কথা গড়িয়ে গেল, দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। এতদিন এত মানুষের মুখোমুখি হয়েছে দীপঙ্কর, কিন্তু এমন অদ্ভুত মানুষের সংশ্রবে কখনও আসেনি। সেই আশুতোষ কলেজের অমলবাবু, সেই প্রাণমথবাবু, কেউই এমন করে এই দিক থেকে জীবনকে দেখেননি। সনাতনবাবু দীপঙ্করের কাছে শুধু যেন ব্যক্তিই নয়, যেন একটা তত্ত্ব।

সেই সেদিনকার হাসপাতালের ঘটনাতেই সনাতনবাবু যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠলেন। এমন হবে তা তো ভাবতে পারেনি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকতেই মিস্টার ঘোষাল একটু ফণা তুলে উঠেছিল। হয়ত কিছু কটু কথা শোনাতো দীপঙ্করকে। কিন্তু সনাতনবাবুকে দেখে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল। হয়ত সন্দেহও করেছিল।

পরিচয়টা দীপঙ্করই করিয়ে দিলে। বললে—ইনিই মিস্টার ঘোষ, মিসেস ঘোষের হাজব্যান্ড—মিসেস ঘোষের অসুখের খবর শুনে দেখতে এসেছেন—

তাড়াতাড়ি মিস্টার ঘোষাল সনাতনবাবুর একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন। বললেন—ভারি খুশী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মিস্টার ঘোষ, এই দেখুন না, মিসেস ঘোষের অসুখে আমিও আপিস থেকে আজ বাড়ি যেতে পারিনি—আপনি এলেন, আমি একটু নিশ্চিন্ত হলুম—এখন আপনি দেখুন আমি যাই—

সতী এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। বললে—না—তুমি যেও না—

মিস্টার ঘোষাল, দীপঙ্কর, এমন কি সনাতনবাবু পর্যন্ত সতীর এই এতটুকু কথাতে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই সনাতনবাবু সতীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—কেমন আছো সতী, তুমি? তোমার কী হয়েছে? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেই বা কেন? তুমি তো জানো তোমার শরীর দুর্বল, আপিসের পরিশ্রম তোমার সহ্য হবে না—

সতী চুপ করে চেয়ে রইল সনাতনবাবুর দিকে। কিছু কথা বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

সতীর মাথার চুলের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন সনাতনবাবু। তারপর নিচু হয়ে বসলেন মাথার কাছে। বললেন—নিজের ওপর আর কত অত্যাচার করবে তুমি বলো তো?

সনাতনবাবু যেন ভুলে গেছেন, ঘরে আরো অনেক লোক আছে। সারাদিন মানুষটার খাওয়া হয়নি, বিশ্রাম হয়নি। যে মানুষ সব সহ্য করেন মুখ বুজে, সেই মানুষটা বুঝি আজ আরো অনেক সহ্য করবার জন্যেই এখানে এসেছেন। মনে হলো যেন আরো অনেক ব্যথার আঘাত সইবার পণ নিয়েই তিনি আজ তৈরি করেছেন নিজেকে।

—অনেক তুমি সহ্য করেছ সতী, অনেক তুমি আঘাতও করেছ। যত আঘাত তুমি নিজে পেয়েছ, তার অনেক বেশী আঘাত তুমি দিতে চেয়েছ। কিন্তু এখন তুমি তো বুঝলে আঘাত করতে চাইলেই আঘাত করা যায় না—

সতী তবু কিছু কথা বললে না। একদৃষ্টে সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—তুমি আমার স্ত্রী, আবার আমাদের বাড়ির বউও বটে, তোমার লজ্জা যে আমারও লজ্জা, আমাদের বাড়িরও লজ্জা। তোমার অপমান যে আমারও অপমান, আমাদের বাড়িরও অপমান সতী? তোমাকে বাদ দিয়ে তো আমার নিজের আলাদা অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই!

এতক্ষণে সতী কথা বললে—আর তোমার মা?

সনাতনবাবু বললেন—মা-মণির কথা বলছো? তুমি যেমন আমার স্ত্রী, মা-মণি তেমনি যে আমার মা। মা যদি তোমার মত বাড়ি ত্যাগ করে চলে যেতো তো, মা'কেও আমি এমনি করেই বলতাম! সংসারে বাস করতে গেলে কাউকেই যে ছাড়া যায় না! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সতী!

সতী বললে—তুমি কি এই কথা বলতেই এখানে এসেছ?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার অসুখের কথা শুনেই এসেছি, কোনও বিশেষ কথা বলতে তো আসিনি! আর তোমার বিপদের দিনে যদি না আসি তো আর কখন আসবো, বলো?

সতী বললে—আমাকে দেখতেই যদি এসে থাকো তো আমাকে দেখা তো হলো, এবার যাও—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তোমাকে শুধু তো দেখতে আসিনি, তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই যে এসেছিলাম—

—কোথায় নিয়ে যাবে?

মিস্টার ঘোষাল এতক্ষণে কথা কইলে। বললে—এর পরও আপনি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলতে পারছেন মিস্টার ঘোষ? এত ঘটনার পরেও মিসেস ঘোষ আপনাদের বাড়িতে যেতে কি রাজী হবেন?

দীপঙ্কর হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—মিস্টার ঘোষাল, চলুন, আমরা দুজনে বাইরে যাই—মনে হয় এখন এখানে আমাদের আর থাকা উচিত নয়—

—হোয়াই? এখানে আমাদের থাকতে দোষ কী?

সনাতনবাবু কিন্তু সে-সব কথায় কান না দিয়ে তেমনি করেই বলতে লাগলেন—তোমার চোখে হয়ত আমি অন্যায় করেছি সতী, তোমার চোখে আমি হয়ত দোষীই, কিন্তু সুস্থ মন নিয়ে কখনও যদি ভেবে দেখো তো দেখবে আমার কোনও অন্যায়ই হয়নি, আমি কোনও দোষই করিনি—আমি নিরুপায়—

একটু থেমে সতীর মুখের কাছে মুখ এনে আবার বলতে লাগলেন—মানুষকে জীবনে একধারে অনেকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়! কখনও সে ছেলে, কখনও সে স্বামী, আবার কখনও সে গৃহকর্তা, আবার কখনও সামাজিক মানুষ। এক সঙ্গে এতগুলো কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তার ভুলও হয় আবার কখনও ভ্রান্তিও হয়, কিন্তু তার জন্যে কি এতখানি শাস্তি দিতে হয় তাকে?

—শাস্তি?

সতী যেন নিজের মনেই নীরবে নিজের প্রতিবাদ করে উঠলো। বললে—শাস্তি আবার আমি তোমাদের কখন দিলাম? সব শাস্তি তো তোমরাই আমার মাথায় তুলে দিলে!

সনাতনবাবু বললেন—আর সেই জন্যেই কি এতখানি শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিতে হয়?

সতী বললে—আমি যদি এ-শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিয়েই থাকি, তাতে তোমাদের রাতের ঘুমের তো কিছু ব্যাঘাত হয়নি, তাতে তোমাদের বাড়ির দেয়াল থেকে আধখানা ইঁটও তো কই খসে পড়েনি—তা যদি পড়তো তো আজ আমার এই দুর্দশা হয়! তোমরা যদি আমার কষ্টের কথা এতটুকু ভাবতে তো আমিই কি আজ তোমাকে ছেড়ে এই রসাতলে এসে নামি? তুমি যদি আমার কথা একটু বুঝতে তো আমি এমন করে এই নরকে এসে ডুবি?

সনাতনবাবু সতীর মাথায় আরো জোরে জোরে হাত বুলোতে লাগলেন। দীপঙ্করের মনে হলো সনাতনবাবু যেন পারলে সতীর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিতেন। একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন সতীর মুখের দিকে। আশ্চর্য, এমন স্বামীকেও সতী ভুল বুঝতে পারলো! এমন স্বামীকে ছেড়েও কোনও

স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে আসতে পারে? মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকেও চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। মিস্টার ঘোষালও একদৃষ্টে চেয়ে আছে সতীর দিকে। স্বামীর সঙ্গে সতী কথা বলছে, আর মিস্টার ঘোষাল কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শুনছে, প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী গিলছে।

দীপঙ্কর মিস্টার ঘোষালের দিকে ইঙ্গিত করে চুপি চুপি বললে—চলুন, মিস্টার ঘোষাল, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই—

—কেন?

—ওদের প্রাইভেট কথা আমরা নাই বা শুনলাম, ও শোনা কি ভালো?

সতী আবার বলতে লাগল,—অথচ তোমরা জানো না, ছোটবেলা থেকে আমি কতদিন শিবপুজো করেছি, কতদিন কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে মনের মত স্বামী-সৌভাগ্য কামনা করেছি। তোমরা জানো না, কিন্তু ওই দীপু দাঁড়িয়ে আছে, ও জানে। সোনার কার্তিকের ঘাটে গিয়ে পুরো বোশেখ মাসটা গঙ্গায় স্নান করেছি। কেন জানো? তোমার মত স্বামী পাবার জন্যে। বিশ্বাস করো, শুধু তোমার মত স্বামী পাবার জন্যেই! সেদিন আমি তোমার মত স্বামীই চেয়েছিলাম ঠাকুরের কাছে—তা তুমি জানো?

বলতে বলতে সতীর দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মিস্টার ঘোষাল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে সতীর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

—কিন্তু তার বদলে আমি কী পেলুম? কী পেলুম আমি বলো তো? তোমরা আমায় তার বদলে কী দিলে? কী দিলে তার বদলে? আমি চেয়েছিলুম স্বামী, তোমরা দিলে অপমান, সকলের সামনে আমাকে তোমরা রেপ করলে—। তোমাদের বাড়ির বউ-এর আউটরেজ তোমাদের বাড়ির ঝি-চাকর সবাই মিলে চোখ মেলে দেখলে, এর চেয়ে আর বড় কিছু অপমান আমার আগে আর কোনও হিন্দু ঘরের বৌ ভাবতে পেরেছে? কল্পনাও করতে পেরেছে?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—এত অপমানও আমি মুখ বুজে সইতে পারতুম, যদি তুমি একটু মুখ তুলে চাইতে, যদি তুমি একটু আদর করতে, যদি তুমি আমার কথা একটু বুঝতে—!

সনাতনবাবু বললেন—তোমার যা বলবার আছে, আজ বলো তুমি, আমি শুনি—

—তোমরা বললে আমার বাবার এত টাকা আছে জানলে, আরো টাকা চাইতে। অর্থাৎ বাবা আরো টাকা দিতে পারতেন মেয়ের বিয়েতে! তারপর তোমরা বললে আমার দিদি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা আগে জানলে আমাকে বাড়ির বউ করতে না। তারপর........

বলতে বলতে সতী আরো যেন মুষড়ে পড়লো। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো—নিজে মা হয়েও মা হতে পারলাম না, এর

চেয়ে বড় দুঃখ মেয়েমানুষের জীবনে আর কী আছে বলো তো? তবু সেই-জন্যেও আবার তোমরা আমাকেই খোঁটা দিলে—যেন মা হয়ে আমিই আমার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছি—!

এবার সতী নিজেই নিজের মুখটা আঁচল দিয়ে ঢাকলে। তারপর হঠাৎ আবার মুখ তুলে বললে—কিন্তু আমি কী দোষ করেছিলুম বলো তো তোমাদের, যে তোমরা এমন করে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে? আমি তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছিলুম যে তোমরা সবাই মিলে আমায় এমন শাস্তি দিলে? তোমরা আমার কাছে কী চেয়েছিলে, সত্যি বলো তো? আজ তো তুমি আমার সামনে একলা বসে আছো, আজ তো তোমার বলতে আর কোনও বাধা নেই। বলো তুমি, আমি তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছিলুম সত্যি সত্যি?

সনাতনবাবু তবু কিছু বললেন না।

সতী বললে—জানি এসব কথার উত্তর তুমি কখনও দাওনি, আজো দেবে না। উত্তরই যদি তুমি দিতে পারবে তো আমার এ অধঃপতন হবে কেন? কেন তোমাদের বাড়ির বউ হয়ে আমাকে আজ রাস্তার ফুটপাথে নামতে হবে? কিম্বা ফুটপাতও হয়ত এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল। এবার হয়ত সেখানেই নামবো। একদিন হয়ত সেই ফুটপাথেই আমাকে শেষ পর্যন্ত নামতে হবে! এও হয়ত আমার কপালে আছে—

মিস্টার ঘোষাল অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বললে—মিস্টার ঘোষ, কাইন্ডলি আপনি একটু চুপ করুন, মিসেস ঘোষ এখন অসুস্থ, আপনার সঙ্গে কথা বললে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন—

সনাতনবাবু মাথা তুললেন। এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো ঘরে অন্য লোকও আছে। বললেন—কী বললেন? আমি বাইরে যাবো!

—হ্যাঁ, দেখছেন না কত ইমোশন্যাল হয়ে উঠছেন মিসেস ঘোষ?

সতী হঠাৎ বললে—না, তোমাকে বাইরে যেতে হবে না—

তারপর বললে—কতদিন পরে তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি, সব তোমাকে শোনাবো আজকে, আর যদি কখনও এ-সুযোগ না পাই?

দীপঙ্কর মিস্টার ঘোষালের দিকে ফিরে বললে—মিস্টার ঘোষাল, আসুন আমরাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, ওঁদের হাজব্যান্ড-ওয়াইফের একটু বোঝাপড়া হতে দিন—আসুন—

—কেন? কেন বাইরে যাবো? আমরা কি ওঁদের কোনও বাধা দিচ্ছি?

দীপঙ্কর বললে—বাধা দেবার কথা হচ্ছে না, ওঁদের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে গেলেই তো ভালো!

মিস্টার ঘোষাল যেন বিরক্ত হলো। বললে—দরকার থাকে তুমি যাও সেন, আমি কেন যাবো?

—কিন্তু আপনার সামনে কি ওঁরা ফ্রী-লি কথা বলতে পারবেন?

সতী বলতে লাগলো—ওগো, প্রথম-প্রথম নিজেকে আমি বড় অপরাধী মনে করতাম, জানো! এক-একবার মনে হতো, আমারই দোষে হয়ত এমন হলো! হয়ত আমিই একলা এর জন্যে দায়ী! এত মেয়েই তো শ্বশুর-বাড়ির সংসার করছে, শাশুড়ী স্বামীর লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে, কিন্তু আর কোনও বউ তো এমন করে আমার মত বাইরে বেরিয়ে আসে না, বাইরে বেরিয়ে এসে ঘর ভাড়া করে পরের আশ্রয়ে থাকে না! আর কোনও বউ তো আমার মত নিজের বাবার অগাধ টাকা থাকা সত্ত্বেও এমন করে পুরুষদের আপিসে চাকরি করে না! কিন্তু তখনি আবার মনে হতো আর কোনও বউই তো স্বামীর কাছে এমন ব্যবহারও পায় না। এক-একবার ভাবতাম তুমি যদি অমানুষ হতে মাতাল হতে তাও বুঝি এর চেয়ে ঢের ভালো হতো। তুমি যদি গরীব-কেরানী হতে, আর টাকার অভাবে কাবলীওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে, তাও বুঝি এর চেয়ে শতগুণ ভাল ছিল। কিন্তু তুমি কেন অন্য রকম হলে? কেন তুমি শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক হলে? কেন তুমি ছোটলোকদের মত আমাকে মারো না, তাতেও বুঝি আমি তৃপ্তি পেতাম—। কিন্তু এও হয়ত আমার কপাল—এও আমার কপালের ফের ছাড়া আর কী বলবো, বলো?

সনাতনবাবু চুপ করেই সব শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন—এখন তুমি যেতে পারবে?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে?

—তোমাদের বাড়িতে

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই এসেছিলাম। সকাল থেকে আজ আমার খাওয়া-দাওয়াই হয়নি।

—কেন? খাওনি কেন? আমার জন্যে?

সনাতনবাবু বললেন—সকাল থেকে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বাড়িতে। পুলিস এসেছিল, ব্যাঙ্ক থেকে লোক এসেছিল—সেই তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেরি হয়ে গেল, তারপর দীপঙ্করবাবু টেলিফোনে তোমার অসুখের খবর জানালেন। তুমি চলো সতী, তুমি নিজে যে শাস্তি পাচ্ছ, তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি পাচ্ছি আমরা—

সতী যেন আরো করুণ হয়ে উঠলো। বললে—ওগো, তুমি সত্যি বলছো? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না—

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু মিস্টার ঘোষ, আপনি যে মিসেস ঘোষকে বাড়িতে যেতে বলছেন, তারপর যদি আবার সেই অত্যাচার হয়, আবার যদি রিপীট হয় সমস্ত?

দীপঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষাল, আপনি চুপ করুন, আপনি কেন ওঁদের কথার মধ্যে কথা বলছেন?

মিস্টার ঘোষাল রেগে গেল, বললে—হোয়াই? আমার এভরি রাইট আছে বলবার, আমি মিসেস ঘোষের ওয়েল-উইশার! মিসেস ঘোষ, আপনি শ্বশুর-বাড়িতে যাবার আগে ভাল করে ভেবে নেবেন, এবারে যেন আর সেই সেম মিস্টেক করবেন না!

তারপর সনাতনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—আপনি আপনার মা'র প্যারমিশন নিয়েছেন?

সনাতনবাবু বললেন—মা'কে বলে এসেছি সতীকে নিয়ে যাবো!

—তিনি মত দিয়েছেন?

—না!

মিস্টার ঘোষাল বললেন—তাহলে? আপনি কি চান মিসেস ঘোষ আবার ইন্‌সাল্টেড হোন? আপনি কি মিসেস ঘোষের লাইফ আবার মিজারেবল করে তুলতে চান? তাহলে কেন আপনি নিয়ে যেতে চাচ্ছেন সেখানে এসব জেনেও?

সনাতনবাবু বললেন—সতী আমার স্ত্রী, আমি তার ভালোমন্দ বুঝতে পারি বলেই নিয়ে যাচ্ছি!

—কিন্তু আপনিই কি হাজব্যাণ্ডের ডিউটি এতদিন প্রপারলি করতে পেরেছেন?

এবার দীপঙ্কর এগিয়ে গেল। বললে—মিস্টার ঘোষাল, আপনি চুপ করুন, আপনি আর কথা বলবেন না দয়া করে—

—হোয়াট?

মিস্টার ঘোষালের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। বললে—কী বললে? আর একবার বলো?

দীপঙ্কর ধীর-স্থিরভাবে বললে—যা কিছু বলবার থাকে, আপনি বাইরে গিয়ে বলুন। এখানে চেঁচাবেন না আপনি!

মিস্টার ঘোষাল রাগে ফুলতে লাগলো। অভ্যাস মত একবার পকেটে হাত দিলে। কিন্তু যা খুঁজছিল তা না পেয়ে ক্ষেপে উঠলো যেন। বললে—আটার ইট সেকেণ্ড টাইম? আর একবার বলো কথাটা, আই শ্যাল সী—

দীপঙ্কর আবার স্পষ্ট ভাষায় বললে—এখানে গোলমাল করবেন না, আপনি বাইরে যান—

—আই—উইল—নট্!

—ইউ মাস্ট!

হঠাৎ যেন দীপঙ্করেরও কেমন রোখ চেপে গেল। বললে—আপনাকে বাইরে যেতেই হবে

—তুমি ভেবেছ কী সেন? তুমি ভেবেছ আমি য়্যারেস্টেড হয়েছি বলে ভয় পাবো তোমার কথায়? তুমি ভুলে গেছ কে তোমায় ক্লার্ক থেকে প্রমোশন দিয়ে অফিসার করেছে? তুমি জানো গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট আমার ফ্রেণ্ড?

ফজলুল হককে আমি এখনি রিং করে তোমায় শিক্ষা দিতে পারি? ইউ নো, হোয়াট আই য়্যাম?

দীপঙ্কর বললে—আপনি আর একটা কথাও বলবেন না, ইউ তু গেট আউট প্লিজ—

হঠাৎ ঘোষালের মূর্তি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠলো যেন। নিজের ফ্ল্যাটে হলে এতক্ষণ হয়ত অন্য কাণ্ড করে বসতো। রাগে ফুলতে ফুলতে বললে—তুমি জানো তুমি ক্লাস-ওয়ান গভর্নমেণ্ট অফিসারের সঙ্গে কথা বলছো!

দীপঙ্কর বললে—জানি আমি কথা বলছি একজন মিথ্যেবাদীর সঙ্গে—

—আর তুমি কী, আমি জানি না ভেবেছ? আমি জানি না ভেবেছ মিস্ মাইকেলের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক ছিল? কেন আফ্‌টার অফিস-আওয়ার্স তুমি সেখানে যেতে?

দীপঙ্কর হুংকার দিয়ে উঠলো—স্টপ দ্যাট—

—কেন থামবো? ডু ইউ নো, আমি সব জানি। আমি জানি তোমার সঙ্গে মিসেস ঘোষের কীসের সম্পর্ক! মিসেস ঘোষের সামনেই বলছি, মিসেস ঘোষের জন্যে তোমার এত ইনটারেস্ট কেন, বলবো?

হঠাৎ দীপঙ্কর আর সামলাতে পারলে না। সেইখানে, সেই হাসপাতালের কেবিনের ভেতরে সতী আর সনাতনবাবুর সামনেই প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে মিস্টার ঘোষালের-চোয়ালের ওপর। স্কাউণ্ড্রেল, বীস্ট, এই সব জঘন্য লোকের সামনে মায়া দয়া অহিংসার কোনও দাম নেই। এরা মানুষ পদবাচ্যও নয়, জন্তু পদবাচ্যও নয়। এই এদের জন্যেই রেলওয়ের এত বদনাম। এই এদের জন্যেই ইণ্ডিয়ানদের এত কলঙ্ক। এই এদের জন্যেই বাঙালীর এত নিন্দে। এরা থাকলেই বা কী, আর মরলেই বা কী। দরকার বুঝে এরা একবার বাঙালী সাজে আবার কখনও সাউথ-ইণ্ডিয়ানও সাজে। এরা পেস্টস্ অব দি সোসাইটি।

মিস্টার ঘোষাল কিন্তু তখন হঠাৎ আচমকা একটা আঘাত পেয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। দীপঙ্করের ঘুষির আঘাত খেয়ে চোখে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। পাশেই ছিল একটা চেয়ার। সেই চেয়ারের কোণটা মাথায় লেগে দিগ্‌ভ্রম হয়ে গেছে একেবারে। দীপঙ্কর তখনও চিৎকার করছে—স্কাউণ্ড্রেল, বীস্ট......

এক মুহূর্তের মধ্যে কী কাণ্ড একটা ঘটে গেল। সনাতনবাবু সমস্ত দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। আর, সতী! সতীও প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর মিস্টার ঘোষালকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট্ করতে দেখেই চিৎকার করে উঠেছে—এ কী করলে তুমি? এ কী করলে তুমি দীপু—

দীপঙ্কর বললে—শয়তানের একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিল সতী—ও বুঝুক, ভদ্রলোকের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হয়—

—তা বলে তুমি ওকে মারবে? তা বলে ওকে মেরে ফেলবে তুমি?

দীপঙ্কর বললে—না, তোমার ভয় নেই সতী, অত সহজে ওরা মরে না—কিন্তু ওকে মেরে ফেললেই হয়ত ভালো হতো—

সতী নিজেই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে ধরতে যাচ্ছিল, সনাতনবাবু ধরে শুইয়ে দিলেন। সতী বললে—ছাড়ো, ছাড়ো তুমি আমাকে, আমার চোখের সামনে তোমরা ওকে মারবে! তোমরা এত নীচ, এত হীন!......

মিস্টার ঘোষাল কিন্তু ততক্ষণে প্রথম চোটটা সামলে নিয়েছে। মাটি আঁকড়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে। তারপর দীপঙ্করের দিকে চাইতেই দীপঙ্কর আবার শাসলে—আর এগিয়ে এলে আবার মারবো তোমায়, এবার খুন করে ফেলবো—

সতী চিৎকার করে উঠলো—দীপু, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—

ভেতরের এই গোলমালের শব্দে তখন বাইরে থেকে ডাক্তার, নার্স সবাই ঢুকে পড়েছে। দীপঙ্কর তাদের দেখে বললে—এখান থেকে মিস্টার ঘোষালকে বাইরে নিয়ে যান তো আপনারা—দরকার হলে ফার্স্ট এইড্ দিনগে—

—কী হয়েছে স্যার?

দীপঙ্কর বললে—দিস্ ইজ মিস্টার ঘোষাল, জামিনে ছাড়া পাওয়া আসামী, এক্স-ডি-টি-এস—ইউ নো এভরিথিং য়্যাবাউট্ হিম—

মিস্টার ঘোষাল আর কথা বললে না। একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে নিজেই টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। আর ফিরলো না।

সনাতনবাবু তখনও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দীপঙ্কর সতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে—সতী, কিছু মনে কোর না—

কিন্তু সতী বোমার মত হঠাৎ ফেটে উঠলো। বললে—তোমরা ভেবেছ কী? তোমরা ভেবেছ আমার সামনে অপমান করবে ওকে? বেরিয়ে যাও, তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও। কে আসতে বলেছিল তোমাদের এখানে? কেন এসেছিলে তোমরা? আমাকে এত অপমান করেও তোমাদের আশ মেটেনি? আরো অপমান করতে চাও? আরও অত্যাচার করতে চাও? কী ভেবেছ তোমরা?

দীপঙ্কর আরো সামনে এগিয়ে গেল। বললে—সতী, শোন, শোন—

সতী তবু শুনবে না। বললে—না, না আমি কিছু শুনতে চাই না, আমি তোমাদের কোনও কথা শুনতে চাই না, তোমরা আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি—

সতীর মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন সনাতনবাবু। বললেন—চলুন, দীপঙ্করবাবু আমরা চলে যাই—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সতীর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু তখন সতী চাদর দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলেছে। কোনও অনুনয়-বিনয়েই আর কাজ হবে না বোঝা গেল। দীপঙ্কর শেষবারের মত ডাকলে—সতী, একটা কথা

শোন আমার—

না না, তোমরা দূরে হয়ে যাও ঘর থেকে—চলে যাও, তোমাদের মুখ দেখতে চাই না আমি—যাও—

দীপঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এল। সনাতনবাবুও বেরিয়ে এলেন। শম্ভু হাসপাতালের দরজার সামনে দাদাবাবুর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল। কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল, যেন কিছুই কিনারা করা গেল না।

দীপঙ্কর বললে—শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম সনাতনবাবু—

—কষ্ট? আমার কষ্ট কীসের?

—আপনি মা'কে বলে এসেছিলেন আজকে বাড়ি নিয়ে যাবেন সতীকে। সতী হয়ত যেত, কিন্তু আমার জন্যেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—আমি কিন্তু হতাশ হইনি দীপঙ্করবাবু, আমি এত সহজে হতাশ হই না।

দীপঙ্কর বললে—অথচ কেন যে আমি অমন করে ধৈর্য হারালুম, কে জানে! মানুষের অন্যায়, মানুষের নীচতা আমাকে বড় সহজে পীড়া দেয়, তাই হয়ত আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অত সহজে। আমি বুঝতে পারি না কেন মানুষ সহজ ভদ্রতাটুকু ভুলে যায়, কেন মানুষে এমন নীচ এমন হীন হতে পারে—

—কিন্তু আমি ওতে বিচলিত হই না দীপঙ্করবাবু, বিচলিত হলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না।

সত্যিই সেদিন সমস্ত দিনটা একটা অভূতপূর্ব মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল দীপঙ্করের। জীবনের কি এইটেই চরম অর্থ? এই ভেতর থেকে বাইরে আসা? না কি বাইরে থেকে ভেতরে আসাটাই আসল? জীবন থেকে যত বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, ততই যেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল সে!

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যত পুষ্টি হবে ফলের, ততই সে আলগা হবে বোঁটায়—

কিন্তু তাই-ই যদি হবে, তবে কেন সমস্ত মানুষ সমাজে আধিপত্য চায়? কেন লক্ষ্মীকে সিন্দুকে পুরে সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করতে চায়? কেন শত্রু জয় করে অমিতবীর্য হতে চায় মানুষ? কেন মানুষে পদ আর পদবী পেতে চায় সব আত্মসম্মানের বিনিময়ে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যারা তা চায়, তারা যে নগদ-বিদায়টাকেই বড় করে দেখে দীপঙ্করবাবু। কিন্তু তারা জানে না যে যা হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল তাতে তাদের সুখ নেই—তখন বলে আরো চাই—

—তাহলে কীসে সুখ?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—আগে বলুন কোন্ সুখটা চান? দেহের, না মনের, না আত্মার?

কিন্তু অত দূর তখনও পৌঁছোতে পারেনি দীপঙ্কর। সারাদিন সনাতন-

বাবুর খাওয়া-দাওয়া হয়নি। দীপঙ্করেরও তখন অত আলোচনা করবার সময় নেই। আপিসেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। দীপঙ্কর বললে—আপনি কিছু ভাববেন না সনাতনবাবু, আমি কালকে আবার আসবো সতীর কাছে। আপনাকে খবর দেব সতী কেমন থাকে—

আপিসের ভেতরে সেদিন তখনও সেই আলোচনা চলছে। সেই মিস্টার ঘোষালের কীর্তি-কাহিনী। এতদিন ভয়ে কারো মুখ ফোটেনি। সবাই ভেবেছিল মিস্টার ঘোষাল শুধু দেবতা নয়, শয়তানেরও নাগালের বাইরে। এতদিন সবাই মিস্টার ঘোষালকে সামনে সেলাম করেছে, সামনে খোশামোদ করেছে, সামনে স্বার্থ-সিদ্ধির একটা মহা-অস্ত্র হিসেবে দেখেছে। আর আজ এক মুহূর্তে সেই দেবতাই বাঁদরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে সব শাসনের বাঁধ ভেঙে গেছে। সবাই বলছে—বাবা, কলিযুগ হলে কি হবে, এতগুলো লোকের শাপ ওমনি যায় কখনও?

পুলিনবাবু টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বললে—আমি বলে দিচ্ছি ও কিস্যু হবে না—

—কিচ্ছু হবে না মানে?

—কিচ্ছু হবে না মানে, দেখবেন, ও ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে!

—কখখনো ছাড়া পাবে না, ছাড়া যদি পায় তো ব্রিটিশ-রাজত্ব উল্টে যাবে মশাই, দেখে নেবেন!

ওপাশ থেকে কাঞ্চনবাবু বললে—উল্টোতে আর বাকিটা কী আছে মশাই? ব্রিটিশ-রাজত্ব এমনিতেও উল্টোবে, ওমনিতেও উল্টোবে! আজকের কাগজ দেখেছেন?

এমনি প্রত্যেক সেকশানে। প্রতিটি কোণে কোণে প্রকাশ্যে আলোচনা চলেছে। টিফিনরুমেই সবচেয়ে বেশি। সিঁড়িতে, কোরিডোরে সর্বত্র। কেবিনে কেবিনে, কন্ট্রোল-রুমে-রুমে। খবরটা রেলের ডিভিসনে-ডিভিসনে ছড়িয়ে গেছে। টরে-টক্কায় সেদিন যে কত অক্ষর এক ডিভিসন থেকে আর এক ডিভিসনে পাঠানো হলো, তার কোনও হিসেবই রইল না রেলের খরচের খাতায়।

মিস্টার ক্রফোর্ড বললে—এবার থেকে ওয়াগন্ অ্যালটমেন্টের কাজ আর তোমায় করতে হবে না সেন—জেনারেল ম্যানেজার দিল্লিতে কথা বলেছে, নতুন প্রায়রিটি-অফিস খোলা হবে—যদ্দিন না খোলা হয়, ততদিন আমি দেখবো—

দীপঙ্কর চুপ করে সামনে বসে ছিল। বললে—ভালোই হয়েছে, আমি তাতে দুঃখিত নই—

ক্রফোর্ড সাহেব আবার বললে—মিস্টার রবিনসন্ আমাকে মিস্টার ঘোষাল সম্বন্ধে খুব হাইলি বলেছিল। তোমার কী মনে হয় সেন, মিস্টার ঘোষালের এ-কাজ

করতে পারে ?

সাহেবের প্রিয়পাত্র হবার জন্যে যে-লোক বাঙালী হয়েও নিজেকে সাউথ-ইন্ডিয়ান বলে প্রচার করতে পারে তার দ্বারা কী যে অসম্ভব, তা দীপঙ্কর কল্পনাও করতে পারে না। মিস্টার ক্রফোর্ডকে এ সব কথা বলেও বোঝানো যাবে না। নৃপেনবাবুর ফেয়ারওয়েলের সময়ও কি সত্যি-কথা কেউ মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিল? আসলে আমরা কেউ-ই অপ্রিয় হতে চাই না। মানুষের কাছে অপ্রিয় হবার ভয়ে অনেক ঘা-ই তো আমরা ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবি দিয়ে ঢেকে রাখি। আমরা আমাদের দারিদ্র্য ঢেকে রাখি, লজ্জা ঢেকে রাখি, দীনতা-নীচতা সমস্ত কিছু ঢেকে রাখি। কিন্তু আমরা জানতেও পারি না, সেই ঘা-ই একদিন সাইনাস্ হয়ে আমাদের মেরুদণ্ড আক্রমণ করবে, মস্তিষ্ক আক্রমণ করবে। সেই ঘা-ই একদিন সমস্ত জাতির মেরুদণ্ডে গিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটাবে। মিস্টার ঘোষাল কি শুধু একলা নিজের ক্ষতি করলে? আর কারো নয়? শুধু কি সতীরই সর্বনাশ ডেকে আনলে? আর কোনও মেয়ের নয়? চেঙ্গিস খাঁ কি শুধু নিজেরই সর্বনাশ করেছিল নিজের হাতে? আর কারো সর্বনাশ করেনি? একজন চৈতন্যদেবের কি একজন রামমোহন রায়ের পুণ্যের ফল যদি কোটি-কোটি মানুষের কাজে আসে, তাহলে একজন কালাপাহাড়ের পাপও সমস্ত মানুষ-জাতকে স্পর্শ করতে বাধ্য। পুণ্যের ফলের মত পাপের ফলও যে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে হয়।

—আমায় ডেকেছিলেন?

দীপঙ্কর তাকিয়ে দেখলে লক্ষ্মণ সরকার। বললে—তোমার সঙ্গে কথা ছিল একটু, বোস—

তবু লক্ষ্মণ সরকার বসতে একটু দ্বিধা করতে লাগলো। কবে একদিন একসঙ্গে পড়েছিল একই স্কুলে। সেদিন অপমানের চূড়ান্ত করেছে। আজ তারই দয়ায় চাকরি পেয়েছে। তারই দয়ায় একটা ভদ্র পরিচয় পেয়েছে।

লক্ষ্মণ সসঙ্কোচে বসলো সামনের একটা চেয়ারে। দীপঙ্কর বললে—কেমন চাকরি চলছে তোমার?

লক্ষ্মণ বললে—কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, তোমার দয়ায় আমি বেঁচে গেছি ভাই—দুবেলা খেতে পাচ্ছি—

—সংসারে কে-কে আছে তোমার?

লক্ষ্মণ বললে—ছিল সবাই, কিন্তু কেউই নেই এখন।

—তাহলে কোথায় থাকো?

লক্ষ্মণ বললে—একটা মেসে—

—চিরকাল কি মেসেই থাকবে?

লক্ষ্মণ বললে—আমাদের জীবনে তাছাড়া আর কী আছে?

সেন-সাহেবের সামনে কথাগুলো বলতে পেরেই যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিল

লক্ষ্মণ সরকার। অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলে দীপঙ্কর। হাতে কত মাইনে পায় লক্ষ্মণ। মেসে কত টাকা খরচ হয়। অনেক কথা। এতক্ষণ সামনে বসিয়ে সেন-সাহেব কথা বলবে, এটা লক্ষ্মণ সরকার কল্পনা করতেই পারেনি। তারপর দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আচ্ছা তুমি যাও, কে-জি-দাশবাবুকে পাঠিয়ে দাও তো একবার—

কে-জি-দাশবাবু এল। বললে—আমায় ডেকেছিলেন স্যার?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা কে-জি-দাশবাবু আপনার সেকশানে ওই যে নতুন ক্লার্ক দিয়েছি, লক্ষ্মণ সরকার, ও কেমন কাজ করছে—?

কে-জি-দাশবাবু বললে—কিছুছু জানে না স্যার, ড্রাফ্‌ট্ পর্যন্ত লিখতে শেখেনি এখনও, ইংরিজীর বানান্ ভুল করে বড্ড, আমাকে সব দেখে-শুনে তবে আপনার কাছে পাঠাতে হয়—

—নতুন তো এখন, কিছুদিন থাকতে-থাকতেই সব শিখে নিতে পারবে বোধহয়—

কে-জি-দাশবাবু বললে—স্যার, আপনারা ছিলেন অন্যরকম, আপনাদের শেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এরা তেমন নয়, লেখাপড়াটাও জানে না তেমন, আর সকলেরই যদি বুদ্ধি থাকবে তাহলে তো আর কথাই ছিল না—

দীপঙ্কর বললে—আপনি একটু দেখে দেবেন, তাহলেই শিখে যাবে—ছেলেটা অত্যন্ত গরীব, খেতে পায় না এমন অবস্থা—

—আপনি যখন বলছেন, তখন দেখবো বৈকি নিশ্চয়ই দেখবো—বলে কে-জি-দাশবাবু চলে গেল। সেক্‌শানে যেতেই সবাই উন্মুখ হয়ে ছিল। সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো কে-জি-দাশবাবু, সেন-সাহেব ডেকেছিল কেন?

কে-জি-দাশবাবু গায়ের কোট্ খুলতে খুলতে বললে—লক্ষ্মণবাবুর ওপর সাহেব খুব চটে গেছে,—

—কেন? কেন?

—আর কেন? ইংরিজীর ভুল। ছি ছি ড্রাফ্‌ট্ পাঠালেন সাহেবের কাছে, আর আমাকে একবার দেখালেন না পর্যন্ত। ফাইলের নিচে অসুবর্ণ সাহেবের নোট ছিল, সেটা দেখে টুকে দিতেও আলিস্যি হলো?

—তারপর কী হলো?

কে-জি-দাশবাবু চেয়ারের ওপর বসে পড়েছে তখন। বললে—উঃ, সেন-সাহেব যা রেগে গেছে লক্ষ্মণবাবুর ওপর, বললে, ওঁকে আমি ডিস্‌চার্জ করে দেব। তা আমি খুব বুঝিয়ে বললুম, গরীব লোক, কেন চাকরিটা খাবেন, চাকরি দেওয়া শক্ত, চাকরি কেন খাবেন তার?

—তারপর?

কে-জি-দাশবাবু বললে—তোমরা তো বিশ্বাস করবে না, তোমরা ভাবো সাহেবদের কাছে আমি তোমাদের এগেনস্টেই বলি কেবল—

লক্ষ্মণ সরকার নিজের সীটের ওপর বসে ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না। আজ অভাবে পড়ে সমস্তই মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয় তাকে। একদিন অকারণে সবাইকে অপমান করে বেড়িয়েছে সে। অকারণে বন্ধুদের মাথায় চাঁটি মেরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেদিন আর নেই। দীপু যদি আজ তার চাকরি খতম্ করেও দেয়, তাতেই বা তার বলবার মুখ কোথায়? পৃথিবীটাকে একদিন সে-ই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিল। আর আজ তাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে পৃথিবীটা। মেসের চার্জ দিন দিন বাড়ছে। চালের দাম চার টাকা থেকে পাঁচ টাকায় উঠেছে, একদিন হয়ত এই চালের দামই ছ' টাকা মণ দাঁড়াবে। তখন? তখন চাকরি না-থাকলে খাবে কী? দীপঙ্কর যখন আপিসে আসে, গুর্খা দরোয়ান থেকে শুরু করে যে সামনে পড়ে, সেই-ই সেলাম করে। দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ সব লক্ষ্য করে। সেই ধর্ম-দাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের নিরীহ লাজুক মুখচোরা ছেলেটা কেমন করে এই ক্লাসে উঠলো সেইটেই লক্ষ্মণের কাছে এক বিচিত্র ব্যাপার বলে মনে হয়। কত সুখে আছে দীপু। ঝি-এর ছেলে—ওর মা পরের বাড়িতে রাঁধুনি-বামুনের কাজ করতো। একেই বলে কপাল মশাই। আর যত ফাটাকপাল আমাদের বেলায়!

—আপনি সেন-সাহেবকে চিনতেন নাকি আগে?

—চিনতাম মানে? ছোটবেলার এক স্কুলে একসঙ্গে একই ক্লাশে পড়েছি। কী গো-বেচারা মানুষ ছিল তখন, ভাত চড়ে রা বেরোত না মুখে—তখন ওর মাথায় কত চাঁটি মেরেছি, জানেন—

এমনি অবাকই লাগে বটে। পৃথিবীর হাল-চাল নিয়ম-কানুন দেখে এমনি অবাকই হয়ে যায় লক্ষ্মণ সরকারের দল। এমনি কপালের ওপর দোষারোপ করে সান্ত্বনার সস্তা-সহজ আশ্রয়টিতেই সবাই মুখ লুকোয়। কিন্তু ওরা যদি জানতো দীপঙ্করের মনের গোপন কক্ষটিতে দিনরাত কত দ্বন্দ্বের আন্দোলন চলেছে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সরু গলি থেকে শুরু করে আজ এই ডি-টি-এস'এর চেয়ারে এসেও কেন যে সেই যন্ত্রণার জানোয়ারটা তাকে দিনরাত কামড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ছারখার করে দিচ্ছে—তা যদি জানতো! শুধু নিজের একান্ত আপন ইচ্ছেটা নিয়ে থাকলে সে তো বেঁচে যেত। কিন্তু তা তো হয় না। মনে হয়, এই কল-কাতাই শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীর সব সমস্যাগুলো যেন তার মাথার ভার হয়ে বোঝা হয়ে চেপে বসে থাকে। নিজের উন্নতির বিড়ম্বনা তাকে যে দিনের পর দিন অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারে।

—জানেন, আপনি এখন যে-চেয়ারে বসছেন, এই চেয়ারেই গাঙ্গুলীবাবু বলে এক ভদ্রলোক বসতো। তার কাছেই শুনেছি আমরা, ওই সেন-সাহেব একদিন তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে এই রেলের চাকরিতে ঢোকে!

—সে কি? কে বললে আপনাকে?

—জানি মশাই, সব জানি। নৃপেনবাবু বলে আগে যে সুপারভাইজার ছিল, তাকেই ঘুষ দিয়েছিল। ঘুষ দিতে আর ঘুষ নিতে না পারলে আজকের পৃথিবীতে কেউ বড় হতে পারবে না। এ আর সত্যযুগ নয়। দেখলেন না আজ মিস্টার ঘোষালের কী হলো? ভালোমানুষ হয়ে মুখ বুজে থাকুন, জীবনে আপনার চাকরিতে প্রমোশন হবে না! ওই সেন-সাহেব ঘোষাল-সাহেব-দের মত তোখোড় ধরিবাজ হতে হবে—এটা ধড়িবাজদেরই যুগ যে মশাই—

—কিন্তু ঘোষাল-সাহেবকে তো অ্যারেস্ট করেছে পুলিস, এবার তো জেল হয়ে যাবে।

—রাখুন মশাই, বড়লোকরা অত সহজে জেলে যায় না। জজ্ ম্যাজিস্ট্রেটরাও ঘুষ খায় না ভেবেছেন? আপনি আছেন কোথায়? পৃথিবী যে চোরের রাজ্য—যে চুরি-ডাকাতি করতে পারবে এখানে, তারই পোয়া বারো! আর সৎপথে থাকুন, তাহলে ওই গাঙ্গুলীবাবুর মত গলায় দড়ি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োতে হবে! কোন্‌টা করবেন বলুন এখন!

সত্যি, দীপঙ্করও অনেকদিন নিজের মনে ভেবেছে সে কাদের দলে? তার আগেকার চেয়ারটাতে এসে বসেছে অভয়ঙ্কর। সেই চেয়ারে বসার পর থেকেই যেন অন্যরকম হয়ে গেল রাতারাতি। তারও মত বদলে গেল এক মুহূর্তে। সে-ও বললে—ক্লার্কদের বেশি প্রশ্রয় দিলে তারা মাথায় ওঠে সেন—তাহলে আর ওরা তোমায় রেসপেক্ট করবে না—

দীপঙ্কর বলেছিল—রেসপেক্ট্ বড়ো না কাজটা বড়ো?

—কিন্তু রেসপেক্ট্ না করলে যে কাজও করবে না ওরা!

দীপঙ্কর বলেছিল—ভুল তোমার ধারণা অভয়ঙ্কর, আমিও একদিন ক্লার্ক ছিলাম, আমিও ক্লার্কদের ব্যথাটা বুঝি, ওদের একবার ভালবেসে দেখো তুমি, ওরা ডবল্ কাজ করবে—

অভয়ঙ্কর তাই বলতো—তুমি বড় ভীতু সেন, অত ভয় করে কেন চলো ওদের? অত ভীতু বলেই ওরা অত কাজে ফাঁকি দেয় তোমার কাছে—।

কথাটা শুনে দীপঙ্কর হেসেছিল। সত্যিই কি দীপঙ্কর ভীতু! ভয় পায় বলেই কি এত সহানুভূতি ওদের ওপর! কিন্তু যখন ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়, এক মুখ দাড়ি দেখে ওদের, তখন কেমন করে কোন্ প্রাণে শাস্তি দেয়? ওদের মধ্যেই যে দীপঙ্কর নিজের ছায়াকে দেখতে পায়। ওরাই যেন হাজার-হাজার দীপঙ্কর হয়ে সেকশানে সেকশানে ধুঁকছে। ওদের সামনে ফরসা কোট-প্যান্ট পরতেও লজ্জা হয় দীপঙ্করের। ওদের জন্যে কিরণ নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর দীপঙ্কর ওদেরই একজন হয়ে আজ এই ওদের মাথার বসে হুকুম চালাচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ঘরে ঢুকতেই মধু সেলাম করে সুইং-ডোরটা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই একটা চেনা-মুখের সঙ্গে আট্‌কে গেল দৃষ্টিটা।

—আরে কী খবর? তুমি এখানে?

ছিটেও অবাক হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে বহুভাবে দেখে দেখে ছিটে-ফোঁটাদের সম্বন্ধে আর অবাক হবার কিছু ছিল না। এখন আর চেনা যায় না দু'জনকেই। সেই যেদিন থেকে নতুন অ্যাক্ট চালু হয়েছে দেশে, সেইদিন থেকেই ছিটে-ফোঁটার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাল-চলনেও কেমন একটা গাম্ভীর্য আসে। অতীতের দারিদ্র্য, অতীতের হীনতা, নীচতা, ভণ্ডামি, গুণ্ডামি সব কিছুই বুঝি ঢাকা পড়ে যায়। সেই কালিঘাটের বস্তির দু'টো গুণ্ডাকে আজ এই খদ্দর-পরা চেহারার মধ্যে কে খুঁজে বার করতে পারবে!

ছিটে এসে চেয়ারে বসে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। বললে—তুই এখানে? ঘোষাল-সাহেব কোথায়?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—ঘোষাল-সাহেবকে তুমি চিনতে নাকি?

—সেকি রে, ঘোষাল-সাহেবকে চিনবো না? কত দহরম-মহরম করেছি একসঙ্গে। প্যালেস-কোর্টে কতদিন রাত কাটিয়েছি। আর শুধু রাত কেন, দিনও কাটিয়েছি একসঙ্গে। ছুটিতে বুঝি ঘোষাল-সাহেব?

—না!—দীপঙ্কর সমস্ত ঘটনাটাই খুলে বললে।

—তাহলে ওয়াগন অ্যালটমেন্ট কে করবে? তুই?

দীপঙ্কর বললে—না, নতুন প্রায়রিটি আপিস হচ্ছে—সব অ্যালটমেন্ট সেখান থেকেই হবে। কিন্তু তুমিও কি ব্যবসা করছো নাকি? তোমরা তো ব্যবসা করতে না আগে? তোমরা তো কংগ্রেসে ঢুকেছিলে!

ছিটে হেসে উঠলো। বললে—ব্যবসার সুবিধে হবে বলেই তো কংগ্রেসে ঢুকেছি—

দীপঙ্করের মনে পড়লো সেই হাজরা পার্কের মিটিং-এর দৃশ্যটা। সেই বক্তৃতার কথাগুলোও ভেসে উঠলো কানে। বললে—কিন্তু কংগ্রেস করলে ব্যবসা করবে কখন? এই তো শুনছি কংগ্রেসকেই ব্যান্ করে দেবে, তখন তো সব কংগ্রেস-লীডারদের ধরবে—তখন ব্যবসা করবে কী করে?

ছিটে বললে—আরে, আমি তো কংগ্রেসের কেউ নই, কংগ্রেস করছে ফোঁটা। ফোঁটা পারমিট্ বার করে দেয় আমার নামে, আর আমি ব্যবসাটা দেখি। দু'জনে জেলে গেলে কখনও চলে? ফোঁটা যদি জেলেও যায়, আমি তো আছি—অঘোরদাদু তো বেশি টাকা রেখে যায়নি—সিন্দুক ভেঙে মাত্র দশ লাখ টাকা পেয়েছিলুম—আর কিছু গয়না, কিন্তু তাতে তো পোষায় না—

—কেন পোষায় না?

—পোষাবে কী করে? এখন তো তুই আর যাস্ নি বাড়িতে। সে-বাড়ি তো ঢেলে-সেজে নতুন করে ফেলেছি, বাড়িটা সারতেই তো হাজার ষাটেক টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর গাড়ি কিনলাম দু'জনে দুটো। প্রথমে গাড়ি তো কিনতে

চাইনি। কিন্তু দেখলাম কংগ্রেসই করি আর যাই করি, গাড়ি না থাকলে কেউ মানতে চায় না—তার ওপর আবার ড্রাইভার পুষতে হচ্ছে—আর সংসার তো বেড়েই চলেছে দিন-দিন, জিনিসপত্তরের দাম যে কী হচ্ছে, তা দেখছিস তো—

উনিশ শো বিয়াল্লিশের সেই বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ শুধু নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ভূমিকম্পের আঘাতে টল্‌মল্ করছে। একদিন ইণ্ডিয়া থেকে আয়রন-ওর নিয়ে গিয়েছিল জাপানে। তখন নগদ দাম পেয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মাল বেচেছে তাকে। কিন্তু তখন কি জানতো সেই আয়রন-ওরই আবার বোমা হয়ে ফিরে আসবে ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেকেণ্ড সিটি এই কলকাতার বুকে! আর ঠিক সময় বুঝেই মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করে দিয়েছেন তাঁর আন্দোলন। এই কলকাতা! এই কলকাতাই হলো ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় ইনডাস্ট্রিয়াল স্ট্রংহোল্ড্। এই এখানকার ইণ্ডিয়ান ব্যবসাদাররাও চাঁদা দিয়েছে কংগ্রেসকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ লিখেছে—Birla brothers of Bombay finance the All India Congress. Mr. Birla is out openly to oust the British and he subsides the Congress heavily. Mr. Birla, Sir Badridas Goenka, Mr. J. C. Mahindra and others are not afraid that Jawaharlal Nehru's socialistic ideal will gain the ascendency. Even if he runs the show, the Indians believe that he will be 'sensible'.

ছিটে বললে—আমিই তো কংগ্রেস ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছি বিশ হাজার টাকা—একলা—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমিও দিয়েছ?

—শুধু কি আমি? সবাই দিয়েছে। বিড়লা দিয়েছে, টাটা দিয়েছে, গোয়েঙ্কা দিয়েছে। আমি কি ওম্‌নি-ওম্‌নি দিচ্ছি ভেবেছিস? এর চার ডবল তুলে নেব না পরে! তখন তো ফোঁটাই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়ে যাচ্ছে—

মনে আছে সেদিন ছিটের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। প্রাণমথবাবু থাকতে ফোঁটা হবে প্রেসিডেণ্ট! শুধু দীপঙ্কর কেন, কেউ-ই বিশ্বাস করেনি। কেউ-ই বিশ্বাস করেনি, মিস্টার চার্চিলও বিশ্বাস করেনি, এত কষ্টে গড়া ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার এত শীঘ্র চার্চিলের হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। ধর্ম দিয়ে যখন ইণ্ডিয়া জয় করেনি ব্রিটিশ, তখন ধর্ম আশ্রয় করে তাকে ধরে রাখতেও পারা যাবে না। ইণ্ডিয়াকে কে রুখবে? একদিকে মহাত্মা গান্ধী আর একদিকে মিস্টার বিড়লা। একদিকে বাইবেল আর একদিকে গীতা। বাইবেলের সঙ্গে রুজভেল্ট্ আছে। গীতার সঙ্গেও আছে বিড়লা। দেখা যাক্ কার শক্তি বেশি!

—এ ক'দিন কাজ চালাবে কে?

দীপঙ্কর বললে—ক্রফোর্ড সাহেব নিজে!

—সাহেব কত ঘুষ নেবে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি জানি না। নেবে কিনা তাও জানি না।

ছিটে হেসে উঠলো। বললে—দূর, ঘুষ নেয় না এমন মানুষ আছে নাকি দুনিয়ায়? কত বড়-বড় মহারথীকে দেখলুম, তোদের সাহেব তো কোন্ ছার। তোদের জেনারেল-ম্যানেজারকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে পারি। বাজি রাখ্। সব শালা ঘুষ নেয়। ঘুষ না নিলে বড়লোক হওয়া যায়? আমি নিজেই ঘুষ দিই পারমিট্ বার করবার জন্যে—ঘুষটা নিস্ বুঝলি? যদি দু'পয়সা করতে চাস্ তো বড় ভাই-এর মত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি তোকে—ঘুষটা নিস। তোর এই চাকরিতে কিছুছু হবে না। হাজার মন দিয়ে কাজ করলেও কিছু হবে না—

আশ্চর্য, ছিটে সেই ছিটেই আছে। বাইরেই শুধু খদ্দর পরেছে, সভা হয়েছে, কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছে।

আজ প্রথম ডি-টি-এস্'এর চাকরি। ছিটের মত বহু লোক এসে এসে ফিরে গেল। বহু গুজরাটি, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, বাঙালী সবাই। সকলেরই ওয়াগন চাই। সকলেরই প্রফিট্ চাই, সকলেরই ডিভিডেন্ড চাই। ঘোষাল-সাহেব ধরা পড়াতে কেউ খুশী নয়। আস্তে আস্তে আপিস পাত্‌লা হয়ে এল। নিঃশব্দ হয়ে এল। দীপঙ্করের মনে হলো ছিটে-ফোঁটাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? একলা ছিটে-ফোঁটাদেরই বা কী দোষ? সারা পৃথিবীটাই যেন ছিটে-ফোঁটাতে ভরে গেছে। ওই চার্চিল, রুজভেল্ট্, হিটলার, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ছিটে-ফোঁটা সব একাকার হয়ে গেছে এই যুদ্ধে! কেউ আফ্রিকা চায়, কেউ ড্যানজিগ্ চায়, কেউ সিঙ্গাপুর চায়, কেউ ওয়াগন চায়, কেউ আবার ইণ্ডিয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ চায়। সবারই সেই এক লক্ষ্য—ইণ্টারেস্ট্, প্রফিট্, ডিভিডেন্ড!

—কে?

টেলিফোনটা বাজতেই দীপঙ্কর রিসিভারটা তুলে নিলে। মেয়েলী গলা। মিহি মিষ্টি সুর। লক্ষ্মীদির অবস্থা ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলাটাও যেন আরো মিষ্টি হয়ে গেছে।

—অনেকদিন আসিস্ নি। কী খবর?

দীপঙ্কর বললে—খুব ব্যস্ত ছিলাম লক্ষ্মীদি, একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। তোমার বাবার খবরটা দিতে গিয়েছিলুম। তুমি শুনেছ বোধহয় সব! বর্মা থেকে চলে আসবার সময় বোমা পড়ে জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি একটু দুঃখ পাবে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব কিছুই বললে না। শুধু বললে—শুনেছি, কিন্তু বাবার প্রপার্টি টাকা-কড়ি, সে-সব কোথায় গেল, তুই জানিস্ কিছু? কলকাতার ব্যাঙ্কে বাবার টাকা কিছু ছিল নাকি?

আশ্চর্য, এ-কথাটা তো দীপঙ্করের মনে আসেনি। লক্ষ্মীদি বললে—এখানকার ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখবো?

দীপঙ্কর বললে—তা দেখতে পারো।

—আর সেখানকার প্রপার্টি যা-কিছু ছিল, তা কি আর পাওয়ার কিছু আশা আছে বলতে পারিস? সে-সব তো জাপানীরাই নিয়ে নেবে বোধহয় শেষকালে—না কি? আর এখানকার ব্যাঙ্কের টাকা নিতে গেলেও সাক্‌সেসান্ সার্টিফিকেট চাই! আমি আর সতী—এই দুজনেই তো পাবো! সতী কি বলছে?

দীপঙ্কর বললে—সতী এখনও খবরটা জানে না—সতীকে খবরটা বলবার এখনও সময় পাইনি—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে তো খুব মুশ্‌কিল হলো, আমি যে আবার কাল দিল্লি চলে যাচ্ছি—সুধাংশু প্রমোশন পেয়ে ট্রান্‌সফার হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমরাও যাচ্ছি। সেই খবরটা বলতেই তো তোকে টেলিফোনটা করা—

দীপঙ্কর বললে—তোমার এ বাড়িতে কে থাকবে তাহলে?

লক্ষ্মীদি বললে—কে আর থাকবে? কেউ না। যদি কখনও আসি তো এখানেই এসে উঠবো।

—তাহলে একটা কাজ করবে লক্ষ্মীদি! বাড়িটা তো তোমাদের পড়েই থাকছে—একজনকে থাকতে দেবে?

—কে?

দীপঙ্কর বললে—সতী!

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? সতী থাকবে কেন? এতদিন সতী কোথায় ছিল? সে তো তোদের আপিসে চাকরিতে ঢুকেছিল বলেছিলি—হঠাৎ তার থাকবার জায়গার অভাব হলো কেন? তার কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা। সব কথা পরে শুনো। তুমি শুধু বলো তাকে থাকতে দেবে কিনা।

—আরে, থাকতে দেব না কেন? সে থাকলে তো ভালোই। বাড়িটা তো এমনি পড়েই থাকবে, তবু সে থাকলে একটু দেখা-শোনা করতে পারবে। বাড়িটাও ভালো থাকবে। আমি তো ঠিক করেছিলাম বাড়িটায় তালা-চাবি বন্ধ করে চলে যাবো। কিন্তু আমরা তো কাল সকালের প্লেনেই যাবো, আমার প্লেন্ ছাড়বে সকাল সাড়ে ছ'টায়—

দীপঙ্কর বললে—আমি যদি আজ এখনি সতীকে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাই?

—নিয়ে আয় না, তুই নিয়ে আয় তাকে, যাবার আগে দেখা হলে তো ভালোই হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই কথাটাও হয়ে যাবে!

—কোন্ কথাটা?

—ওই ব্যাঙ্কে বাবার টাকার কথাটা। বাবার টাকাটা তো আধাআধি দুভাগ হবে!

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দীপঙ্কর বললে—তাহলে আমি সতীকে

নিয়ে এখনি যাচ্ছি তোমার বাড়িতে—

—সে কোথায় আছে এখন?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা। তোমার বাড়িতে গিয়ে বলবো সব। এ ক'দিনে অনেক কান্ড ঘটে গেছে—

তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রেখেই উঠলো দীপঙ্কর। মধু ঘরে এল। মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজপদও নেই। দ্বিজপদকেও সাস্‌পেন্ড করে দিয়েছে মিস্টার ক্রফোর্ড। মধু বললে—আপনি উঠছেন হুজুর?

দীপঙ্করের কথা বলবার সময় ছিল না তখন আর। সময় থাকার সময় ফুরিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে পৃথিবীতে। আগে সময় ছিল মানুষের। ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে ঘুরতো পৃথিবীটা। আস্তে আস্তে সূর্য উঠতো, আস্তে আস্তে সূর্য ডুবতো। এখন একটা ওয়াগন পেতে যদি একদিন দেরি হয়ে যায় তো এক হাজার টাকার লোকসান। এক হাজার টাকার লোকসান হলে—তার ইন্‌টারেস্ট কত হিসেব করো। লাভ-লোকসান কষে ব্যালেন্স শীট তৈরি করো—দেখবে সেই এক হাজার টাকা দশ বছরে দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে! তখন ইন্‌টারেস্ট কম্পাউন্ড-ইন্‌টারেস্ট কষে দেখলে জীবনটাই ফাঁকা মনে হবে। মনে হবে বহু লোকসান হয়ে গেছে জীবনে। সে বুঝি ১৫৪৩ সালের কথা। পোলাণ্ডের এক গ্রামে কোপার্নিকাস বলে একটি ছেলে জন্মেছিল। সেই ছেলেটিই বড় হলো একদিন। বড় হয়ে বললে—পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তারপর সেই কথাটাই নতুন করে বললে আবার জোহানেস কেপলার। তারপর একশ বছর পরে ১৬৪২ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সূর্য উঠতে শুরু করলো তাড়াতাড়ি, সূর্য ডুবতেও লাগলো তাড়াতাড়ি। সেই বেগ বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পীড বাড়লো লোকোমোটিভের। ফর্টি পাউন্ড থেকে নাইনটি পাউন্ড হলো রেল-লাইন। শেষকালে নাইনটি থেকে হান্ড্রেড য়্যান্ড টুয়েন্টি পাউন্ড। দিল্লি মেল সিক্সটি মাইলস্‌ পার আওয়ার কবে চলবে সেই ভাবনা ভাবছে রেলওয়ে বোর্ড—আর এদিকে মিস্টার ঘোষালরা সেই ওয়াগন নিয়েই জুয়া খেলতে শুরু করেছে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের কলকাতায় বসে।

—সেন-সাহেব চলে গেছে, মধু?

মধু তখন ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করছিল। পেছন ফিরে দেখলে লক্ষ্মণবাবু। লক্ষ্মণ সরকার সকাল থেকেই সেন-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছিল। সুবিধে পায়নি। ভেবেছিল সকলের ছুটি হয়ে গেলে দেখা করবে। হঠাৎ তার চাকরিটা যদি চলে যায় তাহলে কত অসুবিধে হবে তার, সেই কথাগুলোই বুঝিয়ে বলবার দরকার ছিল। কিন্তু হলো না।

মধু বললে—সাহেবের মুখটা খুব ভার-ভার দেখলুম। একটা টেলিফোন আসার পরেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

—কোথায় গেলেন? বাড়িতে?

মধু বললে—তা বলতে পারবো না—

ভিজিটিং আওয়ার্স তখন শেষ হয়ে গেছে। তবু গাড়ি থেকে নেমেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো দীপঙ্কর। যারা ভেতরে এসেছিল, তারা চলে গেছে সবাই। দু'একজন নার্স তখন এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। হাতে থার্মোমিটার। সাদা অ্যাপ্রন পরা মেট্রন। সোজা সতীর কেবিনের দিকে যেতেই কে একজন নার্স বেরিয়ে এল বাইরে।

—মিসেস্‌ ঘোষ কেমন আছেন, নার্স?

নার্স বললে—এখন ভাল আছেন, কাল সকালে রিলিজ করে দেবে ডি-এম-ও—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে দরজাটা খুললে। ছোট ফাঁক দিয়ে প্রথমে কিছু দেখা গেল না। তারপর আর একটু ফাঁক করলে। সতীর ফরসা পা-দুটো দেখা গেল বিছানার ওপর। দীপঙ্কর ঘরের ভেতরে ঢুকলো। সতী বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। আস্তে আস্তে মাথার কাছে গিয়ে বসলো দীপঙ্কর। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে সতীর। এত কাছে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কখনও দীপঙ্কর এমন করে আগে সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্করের মনে হলো সতী বোধহয় জেগেই আছে। চোখ বুজিয়ে যেন কী ভাবছে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে সতীর কপালে হাতটা রাখলে।

সঙ্গে সঙ্গে সতী জেগে উঠেছে। চোখ মেলে সামনে দীপঙ্করকে দেখেই বললে—একি, দীপু?

—অ্যাঁ, আমি সতী! আমি!

সতী বললে—কেন এলে তুমি আবার? আমি তো তোমাদের তাড়িয়েই দিয়েছিলাম—তাহলে কেন আবার এলে?

তারপর একটু থেমে বললে—উনি কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবুর কথা বলছো? তিনি তো চলে গেছেন।

সতী আর কোনও কথা বললে না। হঠাৎ সতী নিজের মুখটা আড়াল করতে চেষ্টা করলে। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু কান্নাটাও আর গোপন করতে পারলে না। বললে—তুমি যাও দীপু, তুমি চলে যাও—

দীপঙ্কর বললে—আমি না-হয় চলেই যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে কিছু ভেবেছ? সেই প্যালেস-কোর্টেই ফিরে যাবে?

সতী বললে—আমি যেখানেই যাই, আমার কথা তোমরা না-ই বা ভাবলে। আমাকে কি তোমরা শান্তিতে মরতেও দেবে না? আমি তোমাদের কী করেছি

বলো তো? কেন তোমরা আমাকে একটু একলা থাকতে দিচ্ছ না? আমি মরে যাবো এইটেই কি তোমরা চাও? আমি তো তোমাদের সকলকে মুক্তি দিয়েছিলুম, তোমাদের সকলের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলুম—কিন্তু কেন আমি মরলুম না বলতে পারো? কোথায় গেলে কী করলে মুক্তি পাবো বলতে পারো তুমি?

—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি সতী।

সতী চোখ বড়-বড় করে চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। যেন কথাটা ভাল করে বুঝতে পারেনি। তারপর দরজার দিকেও চেয়ে দেখলে। বললে—তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ বুঝি? ওঁকে ঘরের ভেতরে ডাকো না, এবার আমি কিছু বলবো না। সত্যি বলছি বিশ্বাস করো দীপু, আমার যে মাঝে মাঝে কী হয়, আমার খুব রাগ হয়ে যায় তোমাদের ওপর, তখন আর কিছু জ্ঞান থাকে না—তুমি ডাকো ওঁকে দীপু, ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো—আমি কিছু বলবো না—উনি আমার ওপর খুব রাগ করেছেন, না?

—না রাগ করবেন কেন? রাগ করেন নি!

—রাগ করেন নি?

সতী যেন আঘাত পেল কথাটা শুনে। হঠাৎ যেন সতীর হাতটা শিথিল হয়ে এল। রাগ করেন নি? তার ওপর সামান্য একটু রাগও করতে পারলেন না?

—তাহলে তুমি কেন এলে? কেন এলে মিছিমিছি? আমি কোথাও যাবো না। আমি এখানেই থাকবো, আমি এখানেই মরে পড়ে থাকবো—

দীপঙ্কর বললে—তোমায় একটা খবর বলা হয়নি সতী, তুমি বোধহয় শোননি, তোমার বাবা মারা গেছেন—

সতী হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। একটা অদ্ভুত আতঙ্কে তার মুখের চেহারাটা আমূল বদলে গেল।

—আমি বার্মা ইভ্যাকুয়ীজ আপিস থেকে নিজে জেনে এসেছি। সেই কথাটা বলবো বলেই এসেছি এখন। এর পরেও কি তুমি প্যালেস-কোর্টে গিয়ে উঠতে পারবে?

হঠাৎ কী যে হলো, সতী যেন হঠাৎ এক আর্তনাদ করে দীপঙ্করের বুকে নিজের মুখটা লুকোবার চেষ্টা করলে। তারপর দুই হাতে দীপঙ্করকে সজোরে জাঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। আর দীপঙ্কর সেই অবস্থাতেই আস্তে আস্তে নিজের হাতটা সতীর মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলো। যতটুকু সান্ত্বনা পায় সতী, সেইটুকুই ভালো। হয়ত কান্নারই প্রয়োজন ছিল সতীর এই সময়ে। হয়ত কাঁদলেই সতী শান্ত হবে। কাঁদলেই সতী সান্ত্বনা পাবে। দীপঙ্কর চুপ করে রইল—এতটুকু একটি সামান্য কথাও বলতে চেষ্টা করলে না। সতী তখনও দীপঙ্করের বুকের আশ্রয়ের তলায় ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে বারবার। আর দীপঙ্কর নিঃশব্দে তার কোঁকড়ানো চুলের ওপর হাত

বুলিয়ে দিচ্ছে।

বাইরের রাস্তায় হঠাৎ চিৎকার উঠলো—টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ—

খবরের কাগজের হকাররা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে খবর ফিরি করতে বেরিয়েছে কলকাতার পথে। হয়ত যুদ্ধের কোনও খবর। হয়ত জাপান ঢুকে পড়েছে ইণ্ডিয়ায়। নয়ত মস্কো দখল করে নিয়েছে জার্মানী। কিন্তু না, তা নয়।

গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার, গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার—

শুধু মহাত্মা গান্ধীই নয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব মেম্বারদের ধরে বোম্বাই থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে পুণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাটনাতে ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে মা-মণি নিজের বিছানায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলেন না। একবার উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের বারান্দায় এলেন। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। দুপুর গড়িয়ে গেল। নিচের রান্নাবাড়ির উঠোনে তখন বাসন-মাজার ঘষ্‌-ঘষ্‌ শব্দ হচ্ছে। এখনও ফিরে এল না। এখনও শব্দ হলো না গাড়ির। তারপর আবার বিছানায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু শুতে গিয়েও শুতে পারলেন না।

রান্নাবাড়িতে বাতাসীর মা বললে—মাগীর এখন হয়েছে কী, সবে তো কলির সন্ধ্যে, যখন বউ এসে শাশুড়ীর মুখে ঝামা ঘষবে, তখন শিক্ষা হবে! ওলো সেই কথায় আছে না—ভালো দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে—

কৈলাস বললে—দাদাবাবু বৌদিমণিকে আনতেই তো গেচে বাতাসীর মা! তা বুঝি জানো না—

বাতাসীর মা বললে—জানি রে জানি, জানতে কিছু বাকি থাকে না বাতাসীর মা'র—মাগীর হেনস্থা দেখবো বলেই তো বসে আছি এখনও এ-বাড়িতে, নইলে কবে চলে যেতুম—

ওপর থেকে চিৎকার এল—হ্যাঁরে, রান্নাঘরে অমন চেঁচায় কে রে? তোরা একটু জিরোতে দিবিনে আমাকে।

কথাটা কানে যেতেই সবাই চুপ করে গেল। বাতাসীর মা দাঁতে দাঁত চেপে বললে—তোর বুড়ীর হয়েছে কী এখন? হামানদিস্তে দিয়ে ওই বউ এসে তোর দাঁতের গোড়া ভাঙবে, তবে জিরোতে দেব। একেবারে কাওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে তবে জিরোবি তুই—

সমস্ত বাড়িতেই এই রকম চলছিল কয়েকদিন ধরে। দিনের পর দিন এমনি আলোচনাই চলে রান্নাবাড়িতে। একদিন এই বাড়িরই জলুস ছিল কত। সব তারা দেখেছে। একদিন এই বাড়ির জাঁক-জমক দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের অন্য দশটা বাড়ির ঝি-চাকরদের সঙ্গে কথা হয়েছে এই

নিয়ে।

তারা বলেছে—তোদের কী বাছা, তোরা মনিব পেয়েছিস্ ভালো, তোদের চাকরি করেও সুখ—

আর পাঁচটা বাড়ির চেয়ে ঘোষ-বাড়িতে মাইনে বেশি। ইজ্জত বেশি। বছরে দু'খানা কাপড়, একখানা গামছা। তারপর তেল দোক্তা পান তামাক, সবই আছে। সকালবেলা জলখাবারে রুটি-আখের গুড়। সন্ধোয় মুড়ি। আর দু' গেলাস চা দুবেলা।

পাড়ার লোকে বলতো—ঘোষ-বাড়ির ঝি-চাকর আমাদের বাড়ি চলবে না বাছা, ওরা হলো গিয়ে জমিদার, আর আমরা গেরস্ত-পোষা মানুষ, তুমি অন্য বাড়িতে চেন্টা দেখ বাছা—

সেই বাড়িরই আজ এই হেনস্থা। ভুতির-মা কাজের চেন্টায় এদিক-ওদিক ঘোরে। একবার কাজের ফাঁকে কালিঘাটটা ঘুরে আসে। চড়কডাঙার বাবুদের বাড়িটাতেও খোঁজ নিয়ে আসে।

তারা বলে—তা ওরা ছাড়িয়ে দিচ্ছে কেন গা?

ভুতির-মা বলে—ওদের লোকের আর দরকার নেই মা—

—তা হঠাৎ দরকার নেই-ই বা কেন শুনি?

—কী জানি মা, মনিবদের ভেতরের কথায় তো আমরা থাকিনে। তবে শুনছি নাকি, ব্যাঙ্কের টাকা চুরি হয়ে গেছে বাবুদের।

ব্যাঙ্কের টাকা-চুরির কথাটা কেউ বিশ্বাস করে না। তাই নাকি আবার হয়! তারপর আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ে। বলে—হ্যাঁগা বাছা, তোমাদের বউ ফিরেছে?

ভুতির মা বলে—না মা, ফেরেনি—

—তা কোন্ পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছে তোমাদের বউ, সোনাগাছি না রামবাগান? শুনেছ কিছু?

তারপর হতাশ হয়ে বলে—আর ফিরেছে! অমন শাশুড়ীর কাছেও যখন ঘর করতে পারলে না, তখন আর ফিরেছে সে বউ।

শুধু চড়কডাঙা নয়। ওই চাউলপটি, লখার মাঠ, সব পাড়ার লোকই জানে ঘোষ-বাড়ির বউ-এর কীর্তি। এসব পাড়ার বনেদী বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়া না থাকলেও পরস্পরের হাঁড়ির খবর পরস্পরে রাখে। আর সেসব খবর এই ভুতির মা বাতাসীর-মারাই বয়ে নিয়ে যায়। এই বৌদিমণির বিয়ের সময়ই সমস্ত ভবানীপুর ঝেঁটিয়ে লোক এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। এ-বাড়ির ঐশ্বর্য তারা দেখেছে নিজের চোখে। দেখে হিংসে হয়েছে, বুকে জ্বালা হয়েছে। আজ এ-বাড়ির পতনের খবর পেয়েও তাই তারা উল্লসিত হয়, আনন্দ পায়।

বাতাসীর-মা রেগে ওঠে। বললে—তা তুই কেন বললিনে, আমরা খাই ভাতারের ভাত, তোদের কেন গালে হাত?

কৈলাস বলে—পড়শীরা অমন বলবেই বাতাসীর-মা, পড়শীর কথায় কান

দিলে চলে?

ভুতির মা বলে—আমারও যেমন হয়েছে পেটের জ্বালা, কবে সরকারবাবু ছাড়িয়ে দেবে, তখন হা-ভাত হা-ভাত করে ঘুরে বেড়াবো—

তা হা-ভাত হা-ভাত করে ঘুরে বেড়ানোর দশাই বটে। বছর খানেকও কাটেনি, কলকাতার লোক পিল্ পিল্ করে সব পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে, আবার সবাই ফিরে এসেছে। আবার রাস্তা ঘাটে মানুষের ভিড়। আবার দোকান-পাটে খদ্দের আনা-গোনা করছে।

সবে তখন খাওয়া-দাওয়া চুকেছে। বাতাসীর-মা কলতলায় দাঁড়িয়ে কুলকুচো করছে, এমন সময় বাইরের গেটে গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

—কে এল রে কৈলাস?

কৈলাস ছিল নিচেয়। ডাক শুনেই দৌড়ে গেল। বললে—আমায় ডাকছেন মা-মণি।

—তোর মুখ দেখতে ডেকেছি নাকি হতচ্ছাড়া? বাইরে কার গাড়ি এল দেখবি তো? তোকে বলে রেখেছিলুম না—

—এই যাচ্ছি মা-মণি—

কৈলাস চলেই যাচ্ছিল নিচেয়। মা-মণি আবার ডাকলেন। অস্থির হয়ে এতক্ষণ পায়চারি করছিলেন তিনি। একবার ঘর, আর একবার বার। কখন যে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। হাসপাতাল থেকে সোজা হয়ত এখানেই নিয়ে আসবে খোকা। দরকার নেই, কাউকে দরকার নেই। সমস্ত পুড়ে-ঝুড়ে খাক। শ্বশুরের এই সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে যাক। কার জন্যে আর সংসার করা। আমি মরি-বাঁচি করে না-খেয়ে না-পরে এতদিন ধরে কার জন্যে এই সংসার আগলে আছি? রাতে আমার ঘুম নেই, দিনে আমার সোয়াস্তি নেই, সব সেই পোড়ারমুখীর জন্যে!

—আয়, শুনে যা, যদি কেউ ঢোকে এ-বাড়িতে তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

কৈলাস কেমন থতমত খেয়ে গেল। বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবু যে আজকে খায়নি এখনও—

—দাদাবাবু হোক, আর যেই হোক, কাউকে ঢুকতে দিবিনে, এ আমার বাড়ি। আমি যদি কাউকে ঢুকতে না দিই তো কার কী? যা—

—আজ্ঞে, শম্ভুও গেছে দাদাবাবুর সঙ্গে, দাদাবাবু বৌদিমণিকে নিয়ে আসবে বলেছে—

—চোপরাও হারামজাদা! আমার কথার ওপর আবার কথা!

এবার আর দাঁড়াবার ভরসা হলো না কৈলাসের। তরতর করে নেমে এল নিচেয়। তারপর একেবারে সদর গেটের কাছে যাবার আগেই গাড়িটা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। ইঁট বাঁধানো রাস্তাটার ওপর গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে কে একজন সাহেব-পানা লোক। অনেকটা ব্যারিস্টারবাবুর মত দেখতে।

কৈলাস কাছে যেতেই সাহেব বললে—বাড়িতে কে আছে?

কৈলাস বললে—হুজুর, আপনি ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়েছেন কেন? গাড়ি বাইরে নিয়ে যান, বাইরে নিয়ে যান—

মিস্টার ঘোষাল এত সহজে পেছপাও হবার লোক নয়। আবার জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে কে আছে তোমাদের?

কৈলাসও কম নয়। বললে—আজ্ঞে যেই থাকুক, দেখা হবে না—গাড়ি আপনার বাইরে নিয়ে যান—

মিস্টার ঘোষাল বলে—মিসেস্ ঘোষ ভেতরে আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবো—

কৈলাস বললে—দেখা করবার হুকুম নেই সাহেব, বাড়ির ভেতরে গাড়ি ঢোকবার হুকুম নেই মা-মণির—

—তোমার মা-মণির সঙ্গে একবার দেখা হবে না? তোমার মা-মণিকে গিয়ে বলো না মিস্টার ঘোষাল এসেছেন, একবার দেখা করতে চান—

—আপনি তো ভারি বে-আক্কেলে লোক দেখছি, আমি তো হুকুমের চাকর, আমার ওপর তম্বি করেন কেন? বলছি হুকুম নেই! এ-বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই—

মিস্টার ঘোষাল এবার কী করবে বুঝতে পারলে না। বললে—বাড়িতে আর কেউ নেই?

—আর কে থাকবে? দাদাবাবু ছিল, তা সেই দাদাবাবুও তো বেরিয়েছেন। বৌদিমণিকে হাসপাতাল থেকে আনতে গেছেন—

—আর কেউ? কোনও পুরুষ মানুষ! যে কেউ হলেই চলবে। আমার জরুরী কাজ ছিল একটা।

—আপনি অন্য সময় আসবেন। এখন বাইরে যান দিকি, আমি গেট বন্ধ করে দিই—

মিস্টার ঘোষাল কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—ঠিক আছে, পরে আমি আসবো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ভালো, পরে আসবেন।

গাড়িটা ঘুরলো এবার। ঘুরে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। সামনেই সেই বাড়িটা। ভাড়া নিয়েছিল ঘোষাল। বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো জোরে জোরে।

—মিস্টার মিত্র আছেন?

একটা চাকর বেরিয়ে এল। বললে—বাবু তো মধুপুরে গিয়েছেন, এখনও আসেননি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কবে আসবেন?

—আজ্ঞে তা আমি জানি না।

মিস্টার ঘোষাল বললে—এ-বাড়ি আমার নামে ভাড়া নেওয়া আছে, দু' মাসের অ্যাডভান্স দিয়ে গেছি আমি তোমার বাবুকে।

—আজ্ঞে, সে বাবু সব জানেন। আমি জানি না। মা-বাবু-দাদাবাবু-দিদিমণি সবাই মধুপুরে, আমি কিছুই জানি না।

—তা বাড়ি যেন আর কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়, তুমি তোমার বাবুকে জানিয়ে দেবে।

—আপনি কবে থেকে আসবেন বাবু?

মিস্টার ঘোষাল বললে—সে আমার সুবিধে হলেই আসবো। আর আমি আসি আর না-আসি তাতে তোমার বাবুর কী? আমি ভাড়া দিলেই তো হলো?

চাকরটা মিস্টার ঘোষালের কাছে ধমক খেয়ে থেমে গেল। আর কিছু বললে না। মিস্টার ঘোষালও আবার গাড়িতে এসে উঠলো। মিস্টার ঘোষালের কাছে সারা পৃথিবীটাই যেন রেলের আপিস। এ যেন তারই জমিদারী। তার নিজের ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্ট। ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টের সবাই তার আন্ডারে। এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সমস্ত বাসিন্দারাই যেন তার ক্লার্ক। মিস্টার ঘোষালের একটা কলমের খোঁচায় ক্লার্কদের যেন এক মুহূর্তে প্রমোশন হয়ে যেতে পারে। পুওর ক্লার্কস। দে আর বর্ন টু বি ক্লার্কস! পুওর সোলস্!

সকাল থেকেই মিস্টার ঘোষালকে যেন কেউ তার জমিদারী থেকে উৎখাত করেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে। ক্লাস ওয়ান গভর্নমেন্ট অফিসার মিস্টার ঘোষাল! হাজরা রোডের মোড়ে গাড়িটা দাঁড়াতেই একটা ভিখিরি জানালায় হাত বাড়াল।

—সায়েব, একটা পয়সা সাহেব, একটা পয়সা—

মিস্টার ঘোষালের ডি-টি-এস মনটা চিৎকার করে উঠলো—গেট আউট—গেট আউট—

তবু ভিখিরিটা নড়ে না। একটা পয়সা সাহেব, গরীব আদমী, একটা পয়সা—

—ইউ সিলি বীচ, গেট আউট ফ্রম হিয়ার, গেট আউট—

পুলিসের হাত নামতেই গাড়িটা ছেড়ে দিলে। তারপর ট্রাম-লাইন ধরে সোজা রাস্তা। তারই ডান দিকে হরিশ মুখার্জি রোড। নাম্বারটা মনে আছে মিস্টার পালিতের। দ্যাট শ্রুড ল-ইয়ার। মিসেস্ ঘোষের বার-য়্যাট-ল।

তখন নতুন এক সমাজ গড়ে উঠছে পৃথিবীতে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে নতুন দল উঠেছিল, এরা তারা নয়। এরা আর এক নতুন দল। আর এক নতুন সমাজ। এরা একদিন রাস্তার লোক ছিল। এরা কেউ স্কুল-মাস্টার, কেউ দোকানদার, কেউ সেলসম্যান। কেউ গেজেটেড অফিসার। এরা ধুলো-মুঠো ধরছে আর সোনা-মুঠো করছে। এরা কুইনাইন কিনছে তিন টাকায়, বেচছে তিন শো টাকায়। ধান, চাল, ওষুধ,—যা কিছু ইচ্ছে ধরতে পারো, হোর্ড করতে পারো, তারপর একমাস পরে বেচলেও লাভ। রাতারাতি নতুন সমাজ গড়ে উঠলো তাদের নিয়েই এই কলকাতা শহরের বুকে। তাদের দলে নতুন নাম লিখিয়েছে

মিস্টার ঘোষাল। উনিশশো বিয়াল্লিশের নতুন প্রোডাক্ট। বংশগৌরব থাকার আর দরকার নেই এখন। কানেকশন থাকারও দরকার নেই। টাকা থাকলেই প্রেস্টিজ। তোমার টাকা আছে তাহলেই তুমি আমাদের দলে। তোমাকে তাহলেই আমরা দলে টেনে নেব। সেই ফিউড্যালিজম-এর নবাবিআনার দিন চলে গেছে। এখন নিও-অ্যারিস্টোক্রাসির ঢেউ এসেছে। আমরা নিও-অ্যারিস্টোক্রাট। লেটেস্ট মডেলের গাড়ি আছে তোমার? ফরেন-এডুকেশন আছে? তা-থাক আর না-থাক, তোমার টাকা আছে জানলেই আমরা আমাদের সমাজে তোমাকে ঠাঁই দেব। চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক, কিম্বা ঘুষ নিয়েই হোক আর ব্ল্যাক-মার্কেট করেই হোক—অনেক টাকা তোমার থাকা চাই-ই।

অঘোরদাদুরও টাকা ছিল। কিন্তু সে টাকা দিয়ে চলবে না। সে টাকা সিন্দুক বন্দী করা টাকা। তার ইউটিলিটি নেই। সে স্থাণুর মত সমাজে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তাকে আমরা দলে নেব না। নয়নরঞ্জিনী দাসীরও টাকা ছিল। কিন্তু সে তো বংশানুক্রমিক টাকা। উত্তরাধিকারীসূত্রে পাওয়া। সঞ্চয়ী-বৃত্তি থেকে তার উৎপত্তি। সে টাকা পরের ঘাড় ভেঙে উপায় করা। সে টাকাও বাতিল। কিন্তু আমাদের টাকা অন্যরকম। আমরা মিস্টার ঘোষাল, আমরা সুধাংশু, আমরা লক্ষ্মীদির দল। এতদিন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না। চোর ছিল, ডাকাত ছিল, খুনী ছিল দেশে। কিন্তু বড়লোক-চোর বড়লোক-ডাকাত বড়লোক-খুনী ছিল না। এরা কথায়-কথায় মিনিস্টার, গভর্নর দেখাতে লাগলো। এরা আপিসের পর লক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়ে ফ্ল্যাশ খেলার জুয়ায় রিক্রিয়েশন খোঁজে। এরা প্যালেস-কোর্ট থেকে বেরিয়ে মিস্ মাইকেলের ফ্ল্যাটে যায়। এরা নেশা করে, কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে করে। এরা ফ্ল্যাশ খেলে, কিন্তু সজ্ঞানে খেলে। কলকাতার বুকে তখন এই এদেরই রাজত্ব। এদেরই প্রতিপত্তি। এদেরই প্রবল প্রতাপ। মিস্টার ঘোষালের ভিড়ে তখন কলকাতা ভরে গেছে। সুধাংশুদের প্রভাবে তখন কলকাতা ডুবে গেছে। যুদ্ধের শুরু থেকেই তারা প্রভাবে, প্রতিষ্ঠায়, প্রতিপত্তিতে, সংখ্যায় কেবল বেড়ে চলেছে।

—ইজ মিস্টার পালিত ইন্?

কয়েকটা পুলিস তখন পাহারা দিচ্ছে নির্মল পালিতের বাড়ির সামনের পৈঠের ওপর বসে। টবের ওপর গাছগুলো শুকিয়ে গেছে। খাঁচাটা ঝুলছে শুধু, পাখী নেই। কিন্তু কুকুরটা তখনও জিভ বার করে নিঃশ্বাস টানছে।

—ইজ মিস্টার পালিত ইন্?

কে আর উত্তর দেবে এ কথার? মিস্টার ঘোষাল নাম্বারটা মিলিয়ে দেখেছিল। কোনও ভুল নেই। গেটের বাইরে এন-কে-পালিত, বার-য়্যাট-ল লেখা ট্যাবলেটটা তখনও আঁটা।

—কোঠিমে কোই নেই হুজুর।

মিস্টার ঘোষাল অবাক হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার আরো অবাক হয়ে

গেল। কেন? বাড়িতে নেই কেন? সামথিং রং ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক?

পুলিস দুটো মিস্টার ঘোষালের চেহারা দেখে একটু সমীহ করে কথা বললে। মিস্টার ঘোষাল সবটা শুনে কেমন হয়ে গেল যেন! হলো কী তাহলে? ভদ্রলোকের পক্ষে ক্যালকাটা সিটিতে কি আর থাকা চলবে না! ও হেল! পুলিস কমিশনার তাহলে আছে কী করতে? সার জন হারবার্টকে আজকেই বলতে হবে। ফজলুল হককেও রিং করতে হবে! কোনও জেন্টেলম্যানের পক্ষে দেখছি আর এখানে থাকা সম্ভব নয়—এই ক্যালকাটা সিটিতে!

—ও হেল্!

আর একবার 'ও হেল্' বলে মিস্টার ঘোষাল গাড়িতে উঠলো। সমস্ত দিনটাই আজ তার বাজে নষ্ট হলো। গাড়িতে ওঠবার মুখেই হঠাৎ একটা চিৎকার কানে গেল। হকাররা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ—

হকারটা কাছে আসতেই মিস্টার ঘোষাল একটা কাগজ কিনলে। দু'পয়সা দামের একস্ট্রা-অর্ডিন্যারি ইস্যু।

—গান্ধীজী গ্রেপ্তার—গান্ধীজী গ্রেপ্তার—

গাড়ির ভেতরে বসেই মিস্টার ঘোষাল পড়তে লাগলো—মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু সবাই অ্যারেস্টেড। বোম্বাই থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে তাদের পুণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাইট্‌লি সার্ভড্। রাইট্‌লি সার্ভড্।

মিস্টার জিন্না স্টেটমেণ্ট দিয়েছে—I deeply regret that the Congress has finally declared war and has launched a most dangerous mass movement in spite of numerous warnings and advice from various individuals, parties and organisations in this country

পড়তে পড়তে মিস্টার ঘোষাল যেন এতক্ষণে একটু শান্ত হলো। সারাদিনের ব্যর্থতা আর অপমানের যেন প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এতক্ষণে।

রাইট্‌লি সার্ভড্। রাইট্‌লি সার্ভড্—

অনেক রাত্রে ডি-এম-ও এলেন। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। দীপঙ্করই ডাকিয়ে আনালে। বললে—আপনি যদি মিসেস্ ঘোষকে রিলিজ করে দেন তো আমি আজকেই এঁকে নিয়ে যেতে পারি—

রেলের হাসপাতাল। হাসপাতাল বটে, এ হাসপাতালের নিয়ম-কানুনও অন্য হাসপাতালেরই মত। তবু একটু যেন ঢিলে-ঢালা গতি। ডি-এম-ও তা জানেন। বললেন—আপনি নিয়ে যেতে পারেন মিস্টার সেন, আমার কোনও আপত্তি

নেই—আমি রিলিজ করে দিচ্ছি—

সতী বললে—একলা সে বাড়িতে আমি কেমন করে থাকবো দীপু—

দীপঙ্কর বললে—না থাকতে পারো প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে শ্বশুর-বাড়িতে চলে এসো—সে পথ তো খোলাই রইল—

—সেখানে আর আমার যাওয়া চলে না দীপু!

—এখনও তোমার রাগ গেল না সতী! জানো সে বাড়ির কী অবস্থা! আজ সে বাড়িতে গেলে তুমিই চিনতে পারবে না আর। সেই বাগান নেই, সেই মালি নেই, সেই দরোয়ান নেই—সমস্ত বাড়িটার চেহারাই এখন বদলে গেছে। তুমি চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রীও চলে গেছে।—আজ তোমার শাশুড়ী বুঝতে পেরেছে তুমিই ছিলে বাড়ির লক্ষ্মী—

সতী চুপ করে রইল। দীপঙ্কর বলতে লাগলো—আমি আজো ঠিক বুঝতে পারি নি কেন এমন হলো!

সত্যিই দীপঙ্কর সারাজীবন ধরে ভেবেছে কেন এমন হয়। কোন্ পথ ধরে চলেছে এই জীবন! কোন্ দিকে এর গতি! সেই ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোন্ নিয়মে এর কাজ চলছে! সত্যিই যদি কোনও নিয়ম থাকবে তবে সে-নিয়মের নিয়ন্তা কে? আর নিয়মই যদি থাকবে একটা, তাহলে এত ব্যতিক্রমই বা হবে কেন। ইতিহাসে এক-একটা যুগ এসেছে, আর সব নিয়ম ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে একেবারে। একজন চৈতন্যদেব যা গড়ে, আর একজন শঙ্করাচার্য তা ভাঙে কেন? একজন বিসমার্ক যা তৈরি করে, আর একজন হিটলার তা ধ্বংস করে কেন! তাতে কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়?

সেদিন কিরণ এসে সেই কথাই বলেছিল।

হঠাৎ কিরণ আবার একদিন এসেছিল। সেই একদিন অনেক রাত্রে কিরণ এসে কী একটা প্যাকেট দিয়ে গিয়েছিল, সে প্যাকেটটা ট্রাঙ্কের মধ্যেই পড়ে ছিল। তা খুলেও দেখেনি দীপঙ্কর। খুলে দেখবার আগ্রহ হলেও খুলে দেখেনি। তারপর তারই খোঁজে পুলিস এসেছিল বাড়িতে। ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে ধরতে এসেছিল কিরণকে। তারপর চলে গিয়েছিল, আর আসেনি।

সেদিন আবার চুপি চুপি এসে হাজির হয়েছিল কিরণ।

প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাশী বলেছিল—একজন সাহেব এসেছে দাদাবাবু।

—সাহেব? সাহেব আবার কে রে?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, আপনার নাম করে ডাকছেন। ইংরিজি কথা আমি বুঝিনে।

তারপর নিজে নিচেয় নেমে-যেতেই দেখে আর কেউ নয়, কিরণ! তাড়াতাড়ি কিরণকে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে এনে বসিয়েছিল সেদিন দীপঙ্কর।

—তুই কেমন আছিস?

মুখ দেখেই বুঝেছিল দীপঙ্কর ভালো নেই সে। বড় উদ্বিগ্ন, উস্কোখুস্কো

চেহারা। সেই ফরসা লাল টক্‌টকে রং আবার তামাটে হয়ে গেছে। আবার মুখে-চোখে অনিদ্রা আর অনাহারের ছাপ। দরজা বন্ধ করে দোতলার ঘরের ভেতর বসিয়েছিল কিরণকে। এ কিরণকে যেন চেনাই যাচ্ছিল না। এ যেন সেই কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরীর সেক্রেটারী আর নয়। এ যেন সেই ম্যাট্রিকে ফেল করা কিরণও আর নয়। সেই সেদিনকার রাস্তার ডাব কুড়িয়ে খাওয়া কিরণকে যেন এ-কিরণ আর চিনতেই পারবে না।

কিরণ বললে—অনেকের কাছেই গেলুম এ ক'দিন, কিন্তু কিছুই হলো না—

দীপঙ্কর একবার জিজ্ঞেস করলে—তোর সেই ভজুদা কোথায় রে? সেই বারোটা ল্যাঙ্গোয়েজ জানতো?

কিরণ বললে—কী জানি। কে যে সব কোথায় ছড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারছি না। এ দেশে এসে আমাদের দলটাকে আবার গড়বার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু সবাই বদলে গেছে ভাই, এখানে এসে সব দেখে শুনে তাজ্জব হয়ে গেছি—

—কেন? কী দেখলি?

—আমাদের দলে যারা ছিল আগে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেছে? কাকে?

—কাকে আবার? নিজেকে, কাপিটকে। সবাই নিজের নিজের লাভ-লোকসান নিয়ে মেতে আছে। এদিকে কংগ্রেসের মধ্যেও মতের মিল নেই, রাজাগোপালাচারী তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মিনিস্টার হবার তালে আছে, আর কেউ-কেউ আবার এই সুযোগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। কংগ্রেসের কী কাণ্ড জানিস?

দীপঙ্কর বললে—আমি কী করে জানবো?

—আরে তোরা যদি না জানিস তো জানবে কে? এই যে আজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করছে গান্ধীজী, একমাস আগেই তো এটা করবার কথা ছিল, একমাস পেছিয়ে দিলে কেন, জানিস?

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না।

কিরণ বলতে লাগলো—বিড়লার সুবিধের জন্যে। শেয়ার মার্কেটে সব শেয়ারের দাম পড়ে গেল। কিন্তু যে তারিখে হবার কথা ছিল, তা হলো না, এক-মাস পিছিয়ে গেল। শেয়ারের দাম আবার হু-হু করে চড়ে গেল রাতারাতি। বিড়লা গোয়েঙ্কা আর মাহীন্দ্র কোম্পানী এই সুযোগে শেয়ারগুলো বেচে দিলে, তারপর শেয়ারের দাম কমে যেতেই তারা আবার কিনে নিলে। কংগ্রেস তো মারোয়াড়ীদেরই সুবিধে করে দিলে এই করে। প্রায় তিনশো কোটি টাকা প্রফিট হয়ে গেল একমাসের মধ্যে! তা কাকে আর কী বলবো?

কিরণ নিজের মনেই অনেক কথা বলে গেল। জার্মানীতে যখন ছিলুম, ভেবেছিলুম ইণ্ডিয়ায় এখন খুব কাজ হচ্ছে। আর এই তো অপারচুনিটি। এ অপারচুনিটি কেউ নিলে না দেখে এত কষ্ট হচ্ছে মনে—

তারপর হঠাৎ বললে—দে, আমার জিনিসটা দে, আমি চলে যাই—

—কোথায় যাবি এত রাত্রে?

কিরণ বলেছিল—রাত্রেই তো আমার সুবিধে। বড় পেছনে লেগেছে পুলিস। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে দিচ্ছে না আমাকে। কোনও কাজ হচ্ছে না, শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে ভাই বসে বসে, তাই মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। এতদিন এখানে এসেছি অথচ কিছুই কাজ করতে পারলুম না। জানিস তো সুভাষ বোস জার্মানীতে?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি কথা? অনেকে বলছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিনি—

—একটা খাঁটি মানুষ দেখলাম। পাগল একেবারে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একঘণ্টার জন্যে। সুভাষ বোসই তো আমার এখানে আসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হিটলারও খুব সাহায্য করবে বলছে। শেষে যদি হিটলারও কিছু না করে তো অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে। জাপানে যাবারও কথা আছে। দেখা যাক। তাই তো বলছিলুম এ অপারচুনিটি কেউ নিলে না দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই—

কিরণের কথাগুলো শুনে দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল—কিরণের মনের ভেতরটা যেন কিছু করবার জন্যে ছটফট করছে। যা হোক একটা কিছু করতেই হবে। এ সময়ে জেলে গিয়ে কিছু লাভ হবে না। জেলে গিয়ে নাম-কেনা ছাড়া আর কিছু হবে না। আরে, ওয়ার তো পৃথিবীতে রোজ-রোজ হয় না!

দীপঙ্করের আজও মনে আছে সেই রাতটার কথা। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে কিরণ যখন কথা বলছিল মনে হচ্ছিল যেন দীপঙ্কর হেরে গেছে তার কাছে। বড় দুঃখ হয়েছিল মনে। বড় অনুতাপ হয়েছিল। কোথায় সেই বার্লিন, আর কোথায় এই কলকাতা। কোথায় সেই জাপান, আর কোথায় এই স্টেশন রোড। সেই ক'দিন ইণ্ডিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে কিরণ। কতদিন খাওয়া হয়নি, কতদিন ধরা পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে। কাছে টাকা নেই, পেটে ভাত নেই। আপনারা কিছু করুন, কিছু করুন আপনারা। হিটলার আমাদের সাইডে আছে, মুসোলিনী আমাদের সাইডে আছে, টোজোও আমাদের সাইডে। এ ওয়ারে হিটলার জিতবেই, এই আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। আপনারা কমিউনিস্টই হোন, আর মুসলিম লীগই হোন, কিম্বা হিন্দু মহাসভার লোক হোন—কিছু করুন। পার্টির কথা না ভেবে, সুভাষ বোসের মত দয়া করে দেশের কথা ভাবুন! চার্চিল থাকতে স্বাধীনতা আপনারা পাবেন না। আমেরী থাকতেও পাবেন না। কেউ স্বাধীনতা কাউকে দেয় না—স্বাধীনতা জোর করে কেড়ে নিতে হয়। দেখুন, আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি। আমি ম্যাট্রিক ফেল, আমি পয়সার জন্যে লেখাপড়া চালাতে পারিনি। আমার বাবা কুষ্ঠ রোগে মারা গেছে। বাবার সেবা করিনি। মা এখনও কেঁদে পায় কিনা, বেঁচে আছে কিনা, তার খবরও রাখি না। আমি বার্লিন থেকে এসেছি আপনাদের পায়ে ধরতে। আপনারা কিছু করুন।

বলতে বলতে গলা বুজে এসেছিল কিরণের। শেষকালে প্যাকেটটা নিলে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এটা কী রে?

কিরণ বললে—ওয়্যারলেস্ সেট—জার্মান গভর্নমেণ্ট দিয়েছে আমাদের—এবার যাই, আবার কবে দেখা হবে জানি না ভাই—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো তোর কিছুই করতে পারলুম না—

কিরণ বললে—তোর দ্বারা কিছুই হবে না আমি জানতুম, তুই ওই চাকরি করবি আর সংসার করবি কেবল—মানুষের জীবনে টাকা উপায় করা আর সংসার করাটা বড় জিনিস নয়—এটা তুই জেনে রাখিস—

—তবু তুই কিছু টাকা নে!

—টাকা? টাকারই তো ভীষণ দরকার রে আমার। টাকা দিবি, দে না। যত দিবি তত নেব—

দীপঙ্কর উঠলো। কিরণ বলতে লাগলো—আমি এখানে এসে সব দেখে অবাক হয়ে গেলুম, সবাই দু'হাতে টাকা লুটতে শুরু করেছে ভাই। দেশের কাজেও টাকা, ঠাকুরের মন্দির করে দিয়েও টাকা। টাকা উপায়ের জন্যেই যেন সবাই বেঁচে আছে। এ রকম তো ছিল না ভাই আগে। এই ক'বছরই যা এখানে ছিলাম না, কিন্তু আগে তো ছিলাম। তখন তো এমন ছিল না। তখন তো আমাদের লোকে চাঁদা দিয়েছে কোনও উদ্দেশ্য না নিয়েই। আমাকে গরীব দেখে কত লোক চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু প্রফিটের কথা তো তারা ভাবেনি। এখন দেখছি জেল খাটতে গিয়েও লোকে আগে মনিটারি বেনিফিটের কথাটা ভাবে। টাকা দিয়েই প্যাট্রিঅটিজম্-এর বিচার হয়। আশ্চর্য, যে সি-আর-দাশ কংগ্রেস গড়লে, আর একজন তাকে ভাঙতেই কত কষ্ট করছে—

তাড়াতাড়ি বাক্সর মধ্যে হাত পুরে দিয়ে দীপঙ্কর যে ক'টা টাকা পেলে, সব তুলে দিলে কিরণের হাতে। একবার গুণেও দেখলে না। কিরণও টাকাগুলো নিয়ে পকেটে পুরে ফেললে। কত টাকা, কীসের টাকা তাও জিজ্ঞেস করলে না।

দীপঙ্কর বললে—তোর মা'র জন্যে ভাবিসনি তুই, আমি আছি—

—আমি যাই—।

কিরণ চলে যাচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর-দরজা পর্যন্ত এসে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর বাইরে দু'দিকে একবার দেখে নিয়ে ঘাড়ের দিকে কোটের কলারটা উঁচু করে দিলে। দীপঙ্কর বললে—তোর জন্যে খুব ভয় করে ভাই, একটু সাবধানে থাকিস্—

তারপর অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে সেদিন মিলিয়ে গিয়েছিল কিরণ। আর আসেনি।

ট্যাক্সির মধ্যে সতী চুপ করে বসেছিল। সার্কুলার রোড, ল্যান্সডাউন রোড

পেরিয়ে হাজরা রোড। সতী যেন হাজরা রোডটা চিনতে পেরেছে। এই হাজরা রোডের পশ্চিম প্রান্তেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। বড় ঘন হয়ে বসেছে সতী। বাইরে অন্ধকার, জোলো হাওয়া। মাঝে মাঝে আকাশে এরোপ্লেনের পরিক্রমা আর ট্যাক্সির ভেতরে নীরব সান্নিধ্য। সতী হঠাৎ কথা বললে—এটা কোন্‌ রাস্তা দীপু? হাজরা রোড, না?

দীপঙ্কর শুধু বললে—হ্যাঁ—

হাসপাতাল থেকেই ট্যাক্সি করে নিয়েছিল। সতীর দুর্বল স্বাস্থ্য যেন এই একদিনেই আরো দুর্বল হয়ে গেছে। দীপঙ্কর নিজে হাত ধরে তুলে নিয়েছিল। বড় দুর্বল, বড় পাতলা হাত দুটো সতীর। এই ক'দিন চাকরি করেই এত দুর্বল হয়ে গেছে ভাবতে পারা যায় না। প্রথমটায় অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলেনি সতী। বাবার মৃত্যুর খবরটা দিতেই সতী যেন শিশুর মত কাতর হয়ে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—ওঁকে তুমি নিজে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে নাকি দীপু?

—কাকে?

প্রশ্নটা করেই দীপঙ্কর বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল—সনাতনবাবুর কথা বলছো? তিনি হতাশ হননি। তিনি হতাশ হন না কখনও—

—আচ্ছা সত্যি বলো তো দীপু, উনি অমন কেন?

—কী রকম?

—আচ্ছা, তুমিই বলো তো, একটু সাধারণ হতে পারেন না উনি? অত অসাধারণ স্বামী হলে মেয়েমানুষের ভাল লাগে, তুমিই বলো? একটু হাসি-ঠাট্টা-গল্প এসব কি করতে পারেন না কখনও? একটু কি আমার সঙ্গে বসে সাধারণ রসিকতা করতে পারেন না? আমি কি-ওঁর তুলনায় এতই ছোট?

দীপঙ্কর বললে—তা বলে সনাতনবাবুকে তুমি ভুল বুঝো না সতী।

—কিন্তু এত লোক তো পৃথিবীতে আছে, আর কেউই তো ওঁর মত নয়। মুখটা সব সময় গম্ভীর-গম্ভীর, যেন অনেক উঁচু জগতে বাস করেন উনি, অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, আমার কথা ভাববারই যেন সময় নেই ওঁর—

দীপঙ্কর সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল—ও তোমার নিজের মনের ভুল। ওঁকে বাইরে থেকে দেখে বিচার করতে যেও না তুমি—

—কিন্তু বাইরেটাই কি মিথ্যে হলো দীপু? বাইরেটাই কি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে মানুষ?

তারপর সেই কথার জের টেনেই সতী বলে যেতে লাগলো—আমি নিজে তো একজন সাধারণ মেয়েমানুষ, তাই আমি একজন সাধারণ স্বামীই চেয়েছিলুম দীপু, আমি তো শো-কেসে সাজিয়ে রাখবার জন্যে বিয়ে করিনি—আমি চেয়েছিলুম আমার স্বামীকে আমি ভালবাসবো, স্বামী নিয়ে নাড়বো-চাড়বো, তাঁকে নিয়ে হাসবো-কাঁদবো, স্বামী হবে আমার রোজকার ব্যবহারের সামগ্রী—

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না সতী, তোমার স্বামী সেই সাধারণ মানুষই,

অসাধারণ নয়। তোমার জন্যে তাঁরও দুঃখ হয়, তোমার জন্যে তাঁরও ভাবনা হয়, তোমার জন্যে তাঁরও মনে অশান্তি হয়—

—কিন্তু কই, আমি বকলে তিনি তো রাগ করেন না?

—রাগ করা তো সহজ সতী, রাগ তো সবাই করতে পারে।

—সেই সবাই যা পারে তা উনি পারেন না কেন? কেন উনি অন্য সকলের মত হতে পারেন না? যেমন আর পাঁচজন। কেন উনি আলাদা?

দীপঙ্কর এ কথার জবাব দিতে পারলে না। সতী আবার বললে—তুমিও তো একজন পুরুষ-মানুষ দীপু, কেন উনি তোমার মতও হতে পারলেন না?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও সতী, আমি কেউ না—

এরপরই হঠাৎ হাজরা রোডটা আসতে সতী জিজ্ঞেস করলে—এটা হাজরা রোড, না?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—এইদিকেই সনাতনবাবুর বাড়ি, যাবে তুমি?

সতী বললে—না, প্রার্থনা করো দীপু, যেন এ জীবনে আর কখনও ও-বাড়িতে না যেতে হয়—যেন ওঁদের মুখ দেখতে না হয় কখনও—

গাড়িটা ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে পড়লো। সতী একবার দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—কথা বলছো না যে দীপু? কী ভাবছো?

দীপঙ্কর বললে—ভাবছি আমার এক বন্ধুর কথা—তুমি তাকে চেনো—

—কে?

—কিরণ। সনাতনবাবুর মত তাকেও কেউ চিনলে না। তাকেও বাইরে থেকে দেখে সবাই বিচার করেছে। তার বাবা চিনতে পারেনি, তার মা চিনতে পারেনি। পাড়ার লোকেরাও কেউ চিনতে পারেনি। তোমরাও তাকে ঘেন্না করেছ। কাকাবাবুও তাকে দেখতে পারতেন না। অথচ আমি তো জানি সে কী! সে গরীব, সে লেখাপড়া জানে না ভালো, ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। অথচ দেখো, আমাদের বাড়িতে সেই ছিটে-ফোঁটা থাকতো—তারাই আজ দেশের মস্ত গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে—! মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করার মত ভুল আর নেই, এইটেই আমি সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি—

সতী কিছু কথা বললে না। অন্ধকার ব্ল্যাক-আউট ভেদ করে গাড়িটা গড়িয়ে চলেছে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে আসতেই সতী বললে—তার চেয়ে তোমার বাড়িতেই নিয়ে চলো আমাকে দীপু—আমি তোমার কাছেই আরামে থাকবো—

দীপঙ্কর কিছু প্রতিবাদ করলে না। শুধু মুখে বললে—ছি—

তারপর হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সতী অবাক হয়ে গেল। কোন্‌ বাড়িটা? এইটে নাকি?

বাড়িটার বাইরে আলো নেই। ব্ল্যাক-আউটের গরজে বাইরে থেকে অন্ধকার।

তবু বোঝা যায় নতুন ডিজাইনের ফ্যাশানেবল বাড়ি। জানালা, দরজা, গ্রিল, পেণ্টিং, এলিভেশন সবই চমৎকার। সতী অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এত বড় বাড়ি? এত বড় বাড়ি লক্ষ্মীদির? এ কেমন করে হলো? কার টাকায় হলো? লক্ষ্মীদির এত টাকা? এত টাকা কী করে উপায় করলে লক্ষ্মীদি? কীসের ব্যবসা?

দীপঙ্কর বললে—নেমে এসো সতী—

সতী তখনও চেয়ে চেয়ে দেখছে অবাক হয়ে। বললে—এত টাকা লক্ষ্মীদির কী করে হলো দীপু?

দীপঙ্কর বললে—পরে বলবো, তুমি এসো—

মা-মণি তখনও অপেক্ষা করছিলেন নিজের ঘরে। যদি খোকা বৌমাকে নিয়ে এখানেই এসে ওঠে তো তাঁরই একদিন কি ছেলেরই একদিন। নিজের মা কেউ হলো না, যত আপনার জন হলো কিনা বউ। লাথি মেরে অমন বউ-এর দেমাক ভেঙে দেবেন না তিনি। নঁদিদি ঠিকই বলেছিল—আদর দিয়েই তিনি মাথা খারাপ করে দিয়েছেন বউ-এর। আমরাও তো একদিন বউ ছিলাম। আমরাও তো একদিন নতুন-বউ সেজে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিলুম। কই, বলুক দিকি কেউ, শাশুড়ীর সামনে কখনও মুখ তুলে কথা বলেছি। একদিনের তরে কখনও দিনের বেলা বরের মুখে মুখ দিয়ে দরজায় হুড়কো দিয়ে শুয়েছি? কর্তা একদিন বলেছিলেন—একটা পান নিয়ে যেও তো বউ খাবার পরে। সে-পান তিনি চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবু দিনের বেলা মুখ দেখাননি কর্তাকে। এই তো এত বাড়ি রয়েছে ভবানীপুরে। এই চাউলপট্টির চাটুজ্জেরা রয়েছে, চড়কডাঙার মিত্তিররা রয়েছে। তাঁদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে মা-মণি দেখেছেন—আহা, কেমন লক্ষ্মী বউ সব। ভেতর-বাড়িতে গেলে শাশুড়ী একে একে ডাকেন সব বউদের। সবাই এসে সামনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায়। শাশুড়ী বলে—মাসীমাকে প্রণাম করো বউমা—

শাশুড়ীর মুখ থেকে কথা থামতে-না-থামতে বউরা সব পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে।

তারা বলে—দিদি, তোমার বউ পোয়াতি হলো নাকি আবার?

কী সব সুখের সংসার। দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। নাতি-পুতি হয়ে ঘর ভরে গেছে। যেমন পোড়াকপাল তাঁর! বউ আসবার পর থেকেই যেন অলক্ষ্মী এসে ঢুকেছে তাঁর সংসারে। গেল বছর বোমার ভয়ে সবাই চলে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে। চাউলপট্টির ওরা গিয়েছিল মধুপুরে। চড়কডাঙার মিত্তিররা গিয়েছিল গিরিডিতে। নঁদিদিও গিয়েছিল ঘাটশিলায়। যাবার আগে পই-পই করে বলেছিল—চল নয়ন, চল তুই আমাদের সঙ্গে—কার জন্যে সংসার আগলে

রয়েছিস তুই?

—কার জন্যে আবার নঁদিদি, সোনার জন্যে!

—তা সোনার বিয়ে দিয়েছিস্, বউ এয়েচে, এখনও তুই তাদের দেখবি? চিরকালটা কি সংসার নিয়েই কেবল থাকবি তুই?

মা-মণি বলেছিল—ছেলে যে আমার কাঁটা নঁদিদি! লোকের মেয়ে-কাঁটা হয়, আমার ছেলে-কাঁটা।

নঁদিদি বলেছিল—সে ছেলের কথা তোর বউ বুঝবে! তুই কেন জড়িয়ে আছিস শুনি? তোর কীসের টান? ধাড়ি ছেলে হলো, এখনও নিজের জিনিস নিজে বুঝে নিতে শিখলে না?

তারপর একটু থেমে নঁদিদি বলেছিল—তা তোর ছেলে-বউই না আবার এখানে থাকবে কোন্ সুখে? বাড়ি-ঘর-দোর সব চাবি দিয়ে চল্—

মা-মণি বলেছিল—এই এতগুলো বাড়ি, এতগুলো ভাড়াটে, আমি চলে গেলে কি চলে নঁদিদি?

—তা তোর সরকারবাবু আছে কী করতে? আমারও তো বাড়ি রয়েছে, ভাড়াটে রয়েছে—বাড়ি গেলে বাড়ি আসবে বাছা, কিন্তু প্রাণ গেলে কি আর আসবে?

তারপর সতীর ঘরে গিয়ে সতীকে ডেকে নঁদিদি বলেছিল—হ্যাঁগা বৌমা, তোমার এই বুড়ী শাশুড়ী, তার দিকে তোমরা একটু দেখ না বাছা? তুমিও তো একদিন শাশুড়ী হবে, তখন আবার তোমার বেটার-বউ এলে এই হেনস্তা করবে তো? সে-সব কথা একবার মনে পড়ে না তোমাদের বাছা, কী আর বলবো!

সতী কিছুই উত্তর দেয়নি তখন।

নঁদিদি বলেছিল—অনেক তপস্যা করলে লোকে এমন শাশুড়ী পায় বাছা, এইটে জেনে রেখো। এখন বুঝছো না তো, দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য কেউ বোঝে না। বাসি হলে তখন আমার কথাটা বুঝবে।

সেই নঁদিদিরাই এতদিন কলকাতায় ছিল না। এতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে। চাউলপট্টির চাটুজ্জে-গিন্নীরা, চড়কডাঙার মিত্তির-গিন্নীরাও আবার ফিরে এসেছে। এ-সব কথা চাপা থাকে না কখনও। কোথা থেকে কোন্ কান দিয়ে যে কোন্ কানে উঠলো, তাও কেউ বলতে পারে না। মা-মণি কারোর বাড়ি যেতেন না। সকলের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু লোকে তবু শুনবে কেন? চাটুজ্জে-গিন্নী একদিন এসে খুব মায়া-কান্না কেঁদে গেল। বললে—আহা, শুনলুম সব দিদি, শুনে পর্যন্ত মুখে আমার আর ভাত রোচে না, তাই বলছিলুম আমার বেয়ানকে, বলছিলুম, দিদির মত শাশুড়ী পেয়ে যে-বউ ঘর করতে পারলে না, তার কপালে অনেক দুঃখ আছে ভাই—

তারপরেই ঠিক আসল কথাটা বেরোল। মুখ নিচু করে বললে—তা বউ গেল কোথায়, খোঁজ-খবর কিছু পেয়েছ দিদি?

ঘোষ-গিন্নী কিছুই বললেন না।

চাটুজ্জে-গিন্নী নিজেই বললে—তা তুমিই বা জানবে কেমন করে দিদি? তাতারকে যাদের মনে ধরে না, তারা কি আর বলে কয়ে যায়?

তারপর নিজেই আবার চাটুজ্জে-গিন্নী বললে—শুনলাম নাকি ফিরিঙ্গীদের আপিসে চাকরি নিয়েছে? আমার তো বিশ্বাস হলো না দিদি। চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে তুমিই বলো না! সেই কথায় আছে না, বাড়ির বউ ঘর-ভাঙানি—এ তাই, নির্ঘাত তাই—তোমার ছেলেকে একটু চোখে-চোখে রেখো দিদি—। আজকালকার ছেলে, কিছু বলা যায় না। আমার মা বলতো—জা-জাউলী আপনাউলী ননদ-মাগী পর, শাশুড়ী-মাগী গেলে পরে হবো স্বতন্তর—এও হয়তো তাই দিদি—

চড়কডাঙার মিত্তির-গিন্নীও একদিন এসেছিল। সাধারণত এত আসা-যাওয়া নেই এ-বাড়িতে। ঘোষ-গিন্নী নিজেই কারো বাড়িতে যান না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। মিত্তির-গিন্নী এ-কথা সে-কথার পর আসল কথাটাই পাড়লে। বললে—বউকে দেখছিনে যে দিদি—বাপের বাড়ি গেছে বুঝি!

ঘোষ-গিন্নী বললেন—হ্যাঁ—

—তা এই সময়ে যে বাপের বাড়ি পাঠালে? পোয়াতি বুঝি?

এমন অনেক আজে-বাজে কথা সব। শেষকালে কোনও ভাবেই কথা আদায় করতে না পেরে মিত্তির-গিন্নী চলে গেল। কিন্তু ন'দিদি ঘাটশিলা থেকে এসেই একেবারে দৌড়ে এসেছে। বললে—হ্যাঁরে নয়ন, যা শুনছি, সত্যি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ সত্যি! কে বললে তোমাকে?

—এসব কি চাপা থাকে রে? ঢি-ঢি পড়ে গেছে যে কলকাতায়।

—কিন্তু কে ছড়ালে বলো তো?

ন'দিদি বললে—তার লোকের কি অভাব আছে সংসারে? এসব খবর চাপা রাখবিই বা তুই কেমন করে? কিন্তু কেন এমন হলো! তোর একটা বউকে তুই ঢিট্ করতে পারলি না? আমার পাঁচ-পাঁচটা বউ ঘরে, কেউ একটু টুঁ শব্দ করুক তো! মুখে ঝামা ঘষে দেব না? তা গেছে কোথায়? বাবার কাছে?

নয়ন বললে—আমারই ভুল হয়েছিল ন'দিদি! আমিই আদর দিয়ে বউকে মাথায় তুলেছিলুম—

—সে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন বেয়াই মশাইকে চিঠি লিখেছিস?

নয়ন বললে—ও চামারদের নাম আর মুখেও আনতে চাই না ন'দিদি! ও-বউ আমার চুলোয় যাক, জাহান্নামে যাক, আমি দেখতেও যাচ্ছিনে তা, শুনতেও যাচ্ছিনে—

—তোর ছেলে কী বলে?

—সোনার কথা ছেড়ে দাও ন'দিদি। সোনাকে আমার চেনো না তুমি!

ন'দিদি বললে—তোর সোনাকে একবার আমার কাছে ডাক দিকি, আমি কথা বলি তার সঙ্গে। এ কী কথা। বাড়ির বউ বেরিয়ে যাবে!

নয়ন বললে—তোমার কাছেই তাহলে বলি ন'দিদি, বউ বাপের কাছেও যায়নি, অন্য কারোর কাছেই যায়নি, গেছে চাকরি করতে—

ন'দিদি কথাটা শুনে গালে হাত দিলে। বললে—তুই যে অবাক করলি নয়ন, ঘোষ-বাড়ির বউ চাকরি করছে?

—তবে আর বলি কি ন'দিদি। আমি লজ্জায় কোথাও বেরোতে পারিনে। ভবানীপুরে আমার মুখ দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে সেই থেকে।

—তা চাকরি না-হয় করছে, কিন্তু রাত কাটায় কোথায়?

নয়ন বললে—সেও আবার তোমায় খুলে বলতে হবে ন'দিদি? সাধ করে কি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি! আমি শুনেছি তুমি ফিরে এসেছো! কিন্তু কোন্ মুখে যাই তোমার কাছে বলো তো? আমার যে নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে করছে নিজের—

—না, না, এমন বেবুঝ হলে তো চলবে না। তোর ছেলেকে ডাক্!

—ছেলেকে আর ডেকে কী করবো ন'দিদি! ছেলে বলে সেই বউকে আবার বাড়িতে এনে তুলবে!

ন'দিদি বললে—খবরদার, খবরদার, অমন কাজ করিসনি নয়ন, অমন কাজও করিসনি! বার-মুখো বউকে ঘরে ঠাঁই দিসনি—তার চেয়ে ছেলের তোর আবার বিয়ে দে, আমি তোকে ভাল মেয়ে এনে দেব—

নয়ন বললে—সেবার ব্যারিস্টারের কথায় এক বিয়ে দিয়ে ঠকেছি, আবার ঠকবো নাকি ন'দিদি—

—ঠকবি কেন? বেয়াই বাজিয়ে নিবি, বাপের এক সন্তান হওয়া চাই, দেবে থোবে ভাল, তবে না বিয়ে দেব ছেলের—আমার পাঁচ ছেলের বিয়ে তো আমি দিয়েছি, একটাও ঠকেছি বলতে পারে কেউ?

তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ন'দিদি বললে—ডাক তোর ছেলেকে, কোথায় সে? পড়ছে? কী ছাই-ভস্ম পড়ে তোর ছেলে দিনরাত শুনি? ওই বই পড়াই কাল হয়েছে তোর ছেলের। বেটাছেলে অত পড়াশুনো কেন রে? এবার এমন বউ করে দেব তোর ছেলের, দেখবি বউ-এর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে দিনরাত—

—তা সেটাই কি ভাল ন'দিদি?

—ভালো নয়? তুই বলছিস কী? আমার ছেলেদের দেখিসনি? মা-অন্ত প্রাণ সব, দিনরাত মা তুমি কী খাবে, মা তুমি কী পরবে—কেউ বলতে পারে আমার ছেলেরা মাগ-মুখো? তোর ছেলে কোথায়?

নয়ন বললে—ছেলে তো সেখানেই গেছে—

—কোথায়?

নয়ন বললে—আবার কোথায়? বউ-এর কাছে। আমাকে বলে গেছে, আজ বউকে বাড়িতে এনে তুলবে। তা আমিও বলেছি, বউ যদি তুই আনিস তো

তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

—কখন আসবে?

নয়ন বললে—সেই তো বেলা এগারোটায় গেছে, এখনও পর্যন্ত দেখা নেই—চাকরটা হয়েছে আবার তার সোহাগের—সেও সঙ্গে গেছে—

—খাওয়া হয়নি এখনও?

নয়ন বললে—কে জানে! ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলতেও মন সরে না। অমন ছেলের মুখ দেখলেও পাপ ন'দিদি—আমার ছেলে যদি আমার বশ হতো তো আমার ভাবনা। ছেলে বশে নেই বলেই তো বউ অত জো পেয়েছে। তোমায় আমি কী বলবো ন'দিদি, আমার কত টাকা যে কতদিকে নয়-ছয় হয়ে গেল, সেসব ওই ছেলের জন্যে—

—কেন, ছেলে টাকা ওড়ায় নাকি?

—ছেলের যদি ওড়াবার প্রবৃত্তি হতো তো তা-ও বুঝতুম! এ নয়-ছয় হয়ে গেল ন'দিদি! দশ জনে লুটে পুটে খেলে!

—কী রকম?

আশ্চর্য! হয়ত কথাগুলো বলবার জন্যেই একজন শ্রোতা খুঁজছিলেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। যে-হোক কেউ! কাউকে না-বলতে পেরে যেন অসহায় বোধ করছিলেন তিনি। আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় গিরীশ ঘোষের বিধবা স্ত্রী সেদিন বড় অপারগ হয়েই সব বলে ফেললেন। যেন এতদিনের সব কথা বলতে পেরে খানিকটা হাল্কা হতে পারলেন। খানিকটা স্বস্তি।

—তা মামলা কর! পুলিসে খবর দে!

নয়ন বললে—সব হচ্ছে ন'দিদি! আমি একলা মেয়েমানুষ, আমি নিজে যা করতে পারি, করছি। আমার যে কেউ নেই, একলাই যে আমাকে সব করতে হচ্ছে। একলা ছাড়া দোকলা পাবোই বা কোত্থেকে। কে আমার আছে? আমার ছেলে নেই, আমার বউ নেই, আমার টাকা ছিল, সম্পত্তি ছিল, তাও আজ নেই—কর্তা আমায় এ কী অবস্থায় ফেলে গেছেন, সংসার আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, একলা চলে গেছেন—

ন'দিদি অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিলেন। দুজনে ছোটবেলা থেকে এক পরিবারে মানুষ। দুজনেই পরস্পরের দুঃখে সুখে চিরকাল দুজনকে দেখে এসেছে। ন'দিদি বললে—আচ্ছা, দেখি, তোর ছেলে আসুক, তোর ছেলের সঙ্গে কথা বলে তবে আমি আজ যাবো—

হঠাৎ মা-মণি বললেন—ওই গাড়ির আওয়াজ হলো—ওই এসেছে—

তারপর ডাকলেন—কৈলাস, কৈলাস—

কৈলাস আসতেই বললেন—যদি কেউ আসে তো ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে—

ন'দিদি বললে—কেন রে? সোনা এলে ঢুকতে দেবে না? তুই বলছিস কী? তাহলে বউ নিয়ে যাবে ও কোথায়?

নয়ন বললে—না, ও-বউকে নিয়ে এলে এখানে ঠাঁই হবে না, তা সে ছেলেই হোক আর যেই হোক—

কিন্তু কৈলাস খানিক পরেই ফিরে এল। বললে—আজ্ঞে না মা-মণি, ও দাদাবাবু নয়, সাহেবপানা অন্য একজন লোক—

—কে সাহেবপানা লোক? উকীলবাবু?

কৈলাস বললে—না, উকীলবাবুকে তো আমি চিনি, এ অন্য লোক, ঘোষালবাবু না কী যেন নাম বললে, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—বলেছি এখন কেউ নেই, দেখা হবে না—

মা-মণি বললেন—বেশ করেছিস—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনাতনবাবু যখন এলেন, তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। ন'দিদির গাড়ি তখনও বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কৈলাস গাড়ির আওয়াজ পেয়েই সদর-গেটের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ট্যাক্সিটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শম্ভু সামনে বসে ছিল। আর ভেতরের সীটে সনাতনবাবু হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন।

ওপর থেকে মা-মণি তখন ডাকছেন—কৈলাস, কৈলাস—

কৈলাস তিন লাফে দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়েছে মা-মণির কাছে।

—কে এল রে? বৌদিমণিকে নিয়ে এসেছে দাদাবাবু?

ন'দিদিও সব শুনছিল। বললে—তুই একটু মাথা ঠাণ্ডা কর নয়ন, হুট্ করে একটা কিছু করে ফেলিস নে—ছেলে বলে কথা, পেটের ছেলেকে অত অচ্ছেদ্দা করতে নেই—

মা-মণি বললেন—না, খবরদার বলছি না! ও বউ-এর আমি মুখ দেখবো না—ও হতভাগী যেখানে ছিল, সেখানেই গিয়ে উঠুক, আমি ছেলের নতুন করে আবার বিয়ে দেব—

ন'দিদি বললে—তা বিয়ে দিস না, কে তোকে বারণ করেছে? কিন্তু তোর পেটের ছেলেকে তো বাড়িতে ঢুকতে দিবি—নইলে শেষকালে যে ছেলে-বউ দুকূল যাবে তোর—

ন'দিদি ঠাণ্ডা মাথার লোক। কথাটা শুনে শান্ত হলেন মা-মণি।

কৈলাস বললে—বৌদিমণি আসেনি মা-মণি—দাদাবাবু একলা এসেছে—দাদাবাবুর গা দিয়ে রক্ত পড়ছে—

—রক্ত?

ন'দিদি, মা-মণি দুজনেই চমকে উঠলেন। কৈলাস বললে—শম্ভু আছে সঙ্গে, সে বললে মিলিটারি গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল রাস্তায়—

সেদিন যখন সনাতনবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামানো হলো, তখনও তিনি বেশ সচেতন। এমন কিছু লাগেনি। সনাতনবাবু বললেন—মিলিটারি লরীর কিছু

দোষ ছিল না মা-মণি, আমাদের ট্যাক্সিটারই দোষ ছিল—

ন'দিদি বললে—তুমি চুপ করো বাবা, তুমি এখন কথা বলো না। ডাক্তারকে খবর দিতে বল্ নয়ন—

ন'দিদি ছিল সেদিন, তাই বেশ সামলে নিলে অবস্থাটা। শম্ভুরও লেগেছিল বেশ। তবে সনাতনবাবুর মত নয়। শম্ভু বললে—ধাক্কাটা পেছন দিকে লেগেছিল কিনা, তাই দাদাবাবুরই বেশিটা লেগেছে—

ন'দিদি বললে—কী সব্বনাশ হতো বলো দিকিনি, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, পোড়ারমুখো গাড়িগুলোর যে কী হয়েছে, দিনরাত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মরে কেবল—

শম্ভু ছিল বলে তাই রক্ষে। শম্ভুই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তারা ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আর-একটা ট্যাক্সি করে এখানে এসেছে। একে সারাদিন খাওয়া নেই, তারপর এই অপঘাত—সনাতনবাবুকে বড় কাতর দেখাচ্ছিল। ধরে ধরে সবাই তুললে ওপরে। বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। সনাতনবাবু চারিদিকে চেয়ে দেখছিলেন—বললেন—আমার কিছু হয়নি মা-মণি, তোমরা কিছু ভেবো না—

ন'দিদি বললে—তা বললে কি হয় বাছা, মায়ের প্রাণ কি তাই বললে মানতে চায়?

সনাতনবাবু বললেন—মাসীমা, আপনি বাড়ি যান, আমি বলছি, আমার কিছু হয়নি, আমার এই হাতটায় শুধু একটু ব্যথা করছে, এ সেরে যাবে, আপনি বাড়ি যান্—

ন'দিদি নয়নকে আড়ালে ডাকলে। ফিস ফিস করে বললে—ছেলেকে যেন এখন কিছু বলিসনে নয়ন—তোকে যা বললুম, তাই করিস—

—কিন্তু ও-বউকে আমি এ-বাড়িতে প্রাণ থাকতে ঢুকতে দেব না, তা আমি বলে রাখছি ন'দিদি—

—সে যখন বউ আসবে, তখন দেখা যাবে! তা সে-বউ এখন কোথায়?

নয়ন বললে—কে জানে ন'দিদি, সে-খোঁজ রাখতে আমার তো ভারি বয়ে গেছে—

ন'দিদি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না। তারও বেটা আছে, বেটার বউ আছে। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল ন'দিদি।

সমস্ত দিনই খাটুনি গেছে লক্ষ্মীদির। কাজও তো আর কম নয়। সমস্ত সংসারটা উঠিয়ে দিল্লি নিয়ে যাওয়া। দাতারবাবুকে দিয়ে কিছুই হবার নয়। সব লক্ষ্মীদিকে একলাই করতে হয়েছে। সুধাংশুরও সময় নেই। সুধাংশু আপিস থেকে টেলিফোন করে অর্ধেক কাজ সেরেছে। ভারি ভারি মালগুলো

সব গুডস্-ট্রেনে যাবে। খাট, আলমারি, টেবল, চেয়ার, ফার্নিচারই কি কম তৈরি করিয়েছিল লক্ষ্মীদি এই ক' বছরে। আর শুধু ওই ফার্নিচারই বা কেন? যে-লক্ষ্মীদির কিছুই ছিল না, একটা ভাঙা তক্তপোশ নিয়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল অনন্তর সঙ্গে, সেই লক্ষ্মীদিরই ফার্নিচারের স্টক আজ গুনে শেষ করা যায় না। দিনে দিনে শুধু অর্থই জমেনি, পরমার্থও জমেছে লক্ষ্মীদির। সমাজে লক্ষ্মীদির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজকের কলকাতার উঠতি-সমাজে লক্ষ্মীদির নাম বললে সবাই চিনতে পারে। আজকে লক্ষ্মীদির ব্যাঙ্কার লক্ষ্মীদিকে ওভারড্রাফট্ দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এই কিছু-দিন আগেও একখানা শাড়ি সাবান দিয়ে কেচে শুকিয়ে নিয়ে বাইরে বেরোতে হয়েছে। ওই একখানা শাড়িই যেদিন সম্বল, সেদিন একা একা চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের ফিগারটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে হয়েছে। সেদিনের কথা কেউ জানে না। সেটা না জানাই ভালো। সেদিনকার সব অপবাদ আজ টাকার জলুসে ঢাকা পড়ে গেছে।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে লক্ষ্মীদির সব কথা মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠলো। লক্ষ্মীদি বললে—মিসেস দাতার স্পীকিং —ও, কী খবর মিস্টার হন্সরাজ?

—ওপাশ থেকে উত্তর এল—শুনলাম আপনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন? গোয়িং টু দেহ্লি—?

—হ্যাঁ, সুধাংশু ছাড়ছে না। ঘুরে আসি দিনকতক! আপনার খবর কী? আজ বিকেলে আসবেন নাকি? আসুন না। অনেকদিন এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সব তো প্যাক্ করা হয়ে গেছে—তবু আজকের জন্যে কিছু স্টক্ বাইরে রেখেছি—আসুন, প্লীজ্ ডু কাম্—

তারপর একটু থেমে বললে—আপনার সেই সিগ্রেটের কী হলো মিস্টার হন্সরাজ? আপনি থাকতে কী উপোস করে মরবো বলতে চান?

—সিগ্রেট চাই তা আগে বলেন নি কেন? কোন্ ব্র্যান্ড?

—বিলিতি সিগ্রেট, যে-কোনও ব্র্যান্ড্। দিশি সিগ্রেট টেনে টেনে যে থ্রোট্-ক্যানসার হবার যোগাড়।

সত্যিই, কোনও বিলিতি জিনিসই আর পাওয়া যাচ্ছে না তখন। লক্ষ্মীদি-দের বড় কষ্ট হচ্ছে তখন। একে-ওকে ধরে খোশামোদ করে আদায় করতে হয়। মিস্টার হন্সরাজ কথা দিলে। তারপর একটা টেলিফোনের পর আর একটা টেলিফোন্। মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, মিস্টার সিং।

হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো লক্ষ্মীদি। বললে—কী যে বলেন মিস্টার সিং, আমি গরীব লোক, আমি কি আপনাকে এন্টারটেন করতে পারবো? আমার কি এত সৌভাগ্য হবে?

সব জায়গাতেই খবর চলে গেছে যে, মিসেস দাতার কলকাতা ছেড়ে দিল্লি

চলে যাচ্ছে। সব জায়গাতেই সাড়া পড়ে গেছে। মিসেস দাতার কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া মানে কলকাতা কানা হয়ে যাওয়া। তারপরেই হঠাৎ দীপঙ্করের কথা মনে পড়লো। দীপঙ্করকে টেলিফোন করার মাঝখানেই মিস্টার দাতার এসে কাছে দাঁড়ালো। বললে—শুনছো লক্ষ্মী?

লক্ষ্মীদি তখন টেলিফোনে কথা বলতেই ব্যস্ত। বললে—আঃ, একটু চুপ করো না তুমি—

দাতারবাবু একটু থেমে বললে—দেখো, মানস দুধ খাচ্ছে না—

—তা মানস দুধ খাচ্ছে না, তাও কি আমাকে দেখতে হবে? তুমি কী করছো? কেশব কোথায়? কেশবকে বলতে পারছো না? দেখছো আমি একটা কাজ করছি—

তারপর টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে এসে ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে পড়লো। বললে—নিজে তো একটা কাজ করতে পারবে না, অন্য লোককেও কাজ করতে দেবে না তুমি। কই? মানস কোথায়? দাও, আমি দুধ খাইয়ে দিচ্ছি—। কাজের সময় একটু সাহায্য করবে কোথায়, তা না, কানের কাছে কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান করতে আরম্ভ করেছো—।

দাতারবাবু বললে—মানস চলে গেছে—রঘুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে লেকে—

—দুধ না খেয়েই গেল? কেন যেতে দিলে?

দাতারবাবু বললে—না, দুধ খেয়ে গেছে—আমি নিজেই খাইয়ে দিয়েছি—

—তা হলে তো তুমি ইচ্ছে করলেই পারো সব, শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করা। দেখছো কত দিকে তাল সামলাতে হচ্ছে আমাকে একলা। সন্ধ্যেবেলা মিস্টার হন্‌স্‌রাজ আসছে, মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, সবাই আসছে, এই সময়ে তুমি আমাকে বিরক্ত করছো। ওদিকে দীপঙ্কর এখুনি টেলিফোন করছিল—বাবা নাকি নেই—

দাতারবাবু বললে—সে তো দীপুবাবু সেদিন এসে বলে গেল—

—তা কই, তুমি তো আমাকে বলো নি?

দাতারবাবু বললে—ভুলে গিয়েছিলাম বলতে। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। তারপর তোমারও তো এ ক'দিন শোনবার সময় ছিল না, কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি, আর আমিও ভুলে গিয়েছিলাম—

—তা তো ভুলে যাবেই। কোন্ কাজটা তোমাকে দিয়ে হবে? বাবার টাকা-গুলোর কথা ভাবতে হবে না? বাবার কি কম টাকা আছে ব্যাঙ্কে? দীপুকে তো তাই বলছিলুম। বর্মার টাকা, সে না-হয় জাপানীরা যা করে করবে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্কে যদি কিছু থাকে তো তার তো ওয়ারিশন্ আমরা, আমি আর সতী—দুজনে—। সে-সব কথা ভাবতে হবে না?

সত্যিই, কত লাখ টাকা বাবার আছে কে জানে। একদিন ভুবনেশ্বর মিত্র ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে জামাইদের সব দিয়ে যাবেন। মনের মত জামাই

করবেন। তারাই তাঁর কারবার দেখবে। কিন্তু কোনও আশাই পূর্ণ হলো না তাঁর। যখন রেঙ্গুনে বোমা পড়লো তখনই তিনি দেশে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনকার সেই বর্মার সে-দৃশ্য বোধ হয় কেউ কোনওদিনই ভুলবে না। সেদিন শিয়রে মৃত্যুর ভয়ও তাদের সাদা-কালোর তফাত মুছে ফেলতে পারেনি। সেদিন ইংরেজদের জন্যে ছিল এক রাস্তা, আর নেটিভদের জন্যে অন্য রাস্তা। কালো-চামড়াদের সেদিন যে-অত্যাচার সইতে হয়েছে, ইতিহাসে তার রেকর্ড হয়ত একদিন মুছে যাবে, কিন্তু হাতে হাতে নগদ ফল পেয়ে গিয়েছিল সেদিনকার ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। নর্থ বার্মা থেকে মেজর-জেনারেল স্টীলওয়েল নিজে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেখানকার বার্মীজদের রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থাই করেনি মিস্টার চার্চিল। হাজার-হাজার লোক পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে পথ। সে-পথেও বাধা পেতে হয়েছে বার বার। লোক মরে পড়েছে। এক ফোঁটা জলও পায়নি। পথে কত মরেছে, আর কত মরেছে ইরাবতী নদীতে, কে তার হিসেব রেখেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে লক্ষপতি ভুবনেশ্বর মিত্রও ছিলেন কিনা কে জানে! হয়ত ছিলেন, হয়ত ছিলেন না। যদি সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে তো তাঁকেও আর সকলের মত এক ফোঁটা জলের জন্যে ছট্‌ফট্ করতে হয়েছে। সেদিন লক্ষপতি বলে কেউ আর তাঁকে আলাদা খাতির তো করেনি। অঘোরদাদু কড়ি দিয়ে নিজের জীবন কিনতে পারেনি। ভুবনেশ্বর মিত্রের অত টাকা। শেষকালে এক ফোঁটা জলের তেষ্টাও সেই টাকা মেটাতে পারলে না। আশ্চর্য!

সন্ধ্যেবেলা গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর ধারের বাড়িটা অন্য দিনের মতই আবার উচ্ছল হয়ে উঠলো। বাইরে আবার সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ভেতরে দাতারবাবু কোট-প্যাণ্ট্-নেকটাই পরে রোজকার মত টেবিলের ধারে গিয়ে বসেছে। মিস্টার হন্‌স্‌রাজ এসেছে। মিস্টার মাধো এসেছে। মিস্টার লালচাঁদ এসেছে। মিস্টার সিংও এসেছে। কলকাতার বড় বড় কন্‌ট্র্যাক্টার সব। আর তাদের ইহকালের দেবতা সুধাংশুও। সেই সুধাংশু টেবিলের সামনে সকলের দিকে মুখ করে বসে আছে। সুধাংশুর কলমের একটা আঁচড়ে কন্‌ট্রাক্টরদের ভাগ্য ফিরে যায়। সুধাংশুর একটা হাসির দামই বিশ হাজার টাকা। সুধাংশুকে ধন্য করার জন্যেই সবাই জমা হয়েছে লক্ষ্মীদির বাড়িতে। সেই সুধাংশুই দিল্লি চলে যাচ্ছে। আরো বড় বড় কন্‌ট্র্যাক্টার তাকে খাতির করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে। কলকাতার চেয়েও বড় দিল্লি। দিল্লি হলো রাজধানী। ইন্দ্রের নগর দিল্লি। তাই হয়ত তার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।

তা সুধাংশু যদি দিল্লি যায় তো সবাই দিল্লি যেতে প্রস্তুত। মিস্টার হন্‌স্‌রাজ, মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, মিস্টার সিং। সবাই। সুধাংশু দিল্লি চলে গেলে এখানে থেকে তাদের ফয়দা কী?

মিস্টার হন্‌স্‌রাজ বললে—আমিও দিল্লি যাবো সুধাংশু সাব? আমাকে

নিয়ে চলুন—

সুধাংশু বললে—চলুন না, এক সঙ্গে থাকা যাবে—মন্দ কী।

লক্ষ্মীদি বললে—চলুন মিস্টার হনস্‌রাজ, আপনিও চলুন, সবাই মিলে দিল্লি গুলজার করে তোলা যাবে'খন—মিস্টার মাধো আপনিও চলুন—

তারপর বাইরের ব্ল্যাক-আউট যত ঘন হয়ে উঠতে লাগলো, ভেতরের আলো তত ফেনিল হতে লাগলো। তত উদ্দাম। বিলিতি হুইস্কির নেশা তত মর্মরি হয়ে উঠলো এ-বাড়ির মেজাজে। কাউকে পরোয়া নেই। কাউকে ভয় নেই। আরো যুদ্ধ চলুক। হিটলার আরো কিছুদিন স্ট্যালিনগ্রাড-এর চার পাশে ঘিরে থাকুক। সুধাংশু আছে, মিস্টার হনস্‌রাজ আছে, মিস্টার মাধো আছে, মিস্টার লালচাঁদ আছে, মিস্টার সিং আছে। কীসের ভাবনা লক্ষ্মীদির?

লক্ষ্মীদির কাঁধ থেকে শাড়িটা টপ্ করে খসে গেল। সেটা সামলে নিয়ে বললে—আর এক পেগ্ দেব তোমায় সুধাংশু?

হঠাৎ বাইরে আওয়াজ হতেই লক্ষ্মীদি সচেতন হয়ে উঠেছে। কেশব এসে খবর দিলে—দীপুবাবু এসেছে—

লক্ষ্মীদি সোজা হল্-ঘর ছেড়ে বাইরে এল। সতী অবাক হয়ে তখনও দেখছে চারদিকে। এই বাড়ি লক্ষ্মীদির? এত সুন্দর বাড়ি? এসব কেমন করে হলো? লক্ষ্মীদির নিজের বাড়ি? নিজের উপায় করা টাকায় কেনা?

বাইরের সিঁড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। দীপঙ্কর সতীকে নিয়ে সদর-দরজার ভেতরে ঢুকতেই একেবারে লক্ষ্মীদির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীদিকে দেখেও যেন আর চিনতে পারা যায় না। মুখে রুজ। কাঁধ কাটা ব্রোকেডের ব্লাউজ। আলুথালু সিফন্। বব্ করা চুল। ব্লাউজের তলার দিকে পেটের আধখানা দেখা যাচ্ছে। এই সেই লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদির মুখেও তখন আর কোনও কথা নেই। একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে সতীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

—তুই এসেছিস ভাই? আমি যে কত খুশী হয়েছি, কী বলবো। উঃ, কতদিন যে দেখিনি তোকে!

তারপর চিবুকটা ধরে সামনে উঁচু করে দেখলে। বললে—আহা, কী হয়েছিল তোর সতী? এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

লক্ষ্মীদির মুখের গন্ধটা নাকে লাগতেই কেমন যেন একটু সচকিত হয়ে উঠেছিল সতী। ভালো করে দেখলে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু আজ আর তার মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদের কথাই বেরোল না।

দীপঙ্কর এতক্ষণ কোনও কথাই বলে নি। এতক্ষণে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললে—সতী রইল লক্ষ্মীদি, আমি তাহলে যাই, অনেক রাত হলো—

—কেন, তুই যাবি কেন? বোস্—

—কিন্তু তোমার বাড়িতে তো এখন অনেক গেস্ট্ এসেছে দেখছি—

লক্ষ্মীদি বললে—ও কিছু না, আমি কাল চলে যাচ্ছি, তাই এসেছে সবাই—সতীকে আমি অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, ওর থাকবার ব্যবস্থা করছি অন্য ঘরে, সেখানে কেউ যাবে না—

—কিন্তু এখন তো তুমি ব্যস্ত!

লক্ষ্মীদি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সতীকে ধরে ভেতরে ঢুকলো। হল-ঘর থেকে কথার টুকরো কানে আসছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ার গন্ধও ভেসে আসছে টুকরো হাসির সঙ্গে। অনেক হাসি আর অনেক কথার আসর জমেছে ওখানে বোঝা গেল। লক্ষ্মীদি বারান্দা পেরিয়ে দক্ষিণের একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললো সতীকে। ঘরে খাট আছে, বিছানা আছে। মশারি বালিশ, সব আছে। চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং-ব্যুরো আছে। লক্ষ্মীদি বললে—এই ঘরে তুই থাকবি ভাই, যতদিন ইচ্ছে, ততদিন থাকবি—তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো এখানে!

দীপঙ্কর বললে—নাঃ, অসুবিধে হবে কেন? চমৎকার ঘরটা।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি কাল ভোরবেলা চলে যাচ্ছি, তোর জন্যে সব ব্যবস্থা করে গেছি। আমার রঘুকে এখানে রেখে যাবো, সে-ই তোর কাজকর্ম করবে! তা তোর শাশুড়ী কী বলছে এখন? শুনলুম তুই দীপুদের আপিসে চাকরি করছিলি—তা হঠাৎ কী হলো তোর? এতদিন কোথায় থাকতিস?

দীপঙ্কর বললে—এখন ওসব কথা থাক লক্ষ্মীদি, সতীর শরীর ভাল নেই—

লক্ষ্মীদি বললে—আর সেই বাবার টাকা? শুনেছিস তো বাবা মারা গেছেন? তাঁর টাকাগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কোথায় কত টাকা আছে, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে, তারও তো খোঁজ নিতে হয়—আমি তো চলে যাচ্ছি—

দীপঙ্কর বললে—সে-সব তুমি কিছু ভেবো না, আমি তো রইলুম—তুমি সতীকে কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা করো শিগগির, আমি কাল ভোর চারটে-পাঁচটার মধ্যেই আসবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার যে সাড়ে ছটায় প্লেন রে—

দীপঙ্কর বললে—আমি তার আগেই আসবো, সতী এখন একটু ঘুমোক, খুব ক্লান্ত ও—আমি চলি—

তারপর আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। সেখান থেকেই সোজা সদর-দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সেইটেতেই উঠে বসলো।

কিন্তু স্টেশন রোডের বাড়ির সামনে আসতেই অনেক লোকের ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্কর। এত লোক। এত লোক কেন? রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। এ-সময় পাড়া নিস্তব্ধই হয়ে যায় অন্য দিন। অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যেও যেন বহু লোকের অস্পষ্ট ছায়া ঘোরাফেরা করছে তারই বাড়ির সামনে।

সামনে যেতেই দীপঙ্কর দেখলে সমস্ত বাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে

ফেলেছে পর্নলিসে। মিলিটারি পর্নলিসে জায়গাটা ছেয়ে গেছে। পাড়ার কয়েকজন লোক আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে ভয়ে।

দীপঙ্কর সামনে যেতেই একজন সার্জেণ্ট এগিয়ে এল। বললে—আর ইউ ডি সেন? তুমিই ডি সেন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—আমরা কিরণ চ্যাটার্জিকে তোমার বাড়ির ভেতর থেকে অ্যারেস্ট করেছি। ডু ইউ নো হিম?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। কিরণ! কিরণ আজ হঠাৎ কোথা থেকে এল। কখন এল? সে কি তার আশাতেই অপেক্ষা করছিল? কিন্তু তার তো এ-সময় আসার কথা নয়। সে তো ওয়্যারলেস সেটটা সেদিন নিয়ে চলে গিয়েছিল! কেন সে এমন বোকামি করলে?

আর সঙ্গে সঙ্গে দর্জন সার্জেণ্ট হাতকড়া পরানো কিরণকে এনে সামনে দাঁড় করালো। ফরসা টক্‌টক্ করছে গায়ের রং। নিবাত-নিষ্কম্প দীর্ঘ দেহ। হাসি-হাসি মর্খ। দীপঙ্কর কিরণের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল। একবার কথা বলতে গেল, কিন্তু সার্জেণ্ট দর্জন থামিয়ে দিলে। বললে—আপনাকেও আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে যেতে হবে মিস্টার সেন। কাম্ অন্—আপনার বাড়িটা আগে সার্চ করবো আমরা—

মনে আছে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দীপঙ্করের বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি খর্টিনাটি, প্রত্যেকটি জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে দেখেছিল তারা। কোনও বাক্স, কোনও আলমারি, কোনও বিছানা খর্জতে বাকি রাখেনি আর। আর কিরণ? কিরণের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। শোবার ঘর, বারান্দা, উঠোন, রান্নাঘর সমস্ত তাদের দেখা চাই। সেই অন্ধকার মাঝ-রাত্রেই যেন ওয়ার-ফিল্ড্ হয়ে উঠেছিল সে-বাড়িটা।

কিরণ ধীর স্থির দর্ষ্টিতে সমস্ত দেখছিল।

যেন কিছর্ই ঘটে নি তার। যেন কোনও বিপর্যয়, কোনও বিপৎপাত তার জীবনে ঘটেনি। সে যেন একদিন এই পর্থিবীতে জন্মেছিল আকস্মিকভাবে, আবার আকস্মিকভাবেই তার বিদায় নেবার পালা এসেছে আজ। জন্মগ্রহণের জন্যে যদি আনন্দ করবার কারণ না ঘটে থাকে, তো মর্ত্যুর জন্যেও দর্঱খ করবার যেন প্রয়োজন নেই। জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি যারা করে, তাদেরই যেন মরণ নিয়ে ভয় করবার কথা। লক্ষ লক্ষ বছর আগে একদিন জীব-জগতের সর্ত্রপাত হয়েছিল পর্থিবীতে। তাই জীবের বিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পর্থিবী তো তেমনই আছে। পর্থিবী যেমন ছিল তেমনই থাকবে, আসা-যাওয়ার পালা শর্ধর্ জীবের বেলায়। তাকে আসতেও হবে আবার যেতেও হবে। কিরণের আগে তো আরো অনেক লোকই চলে গেছে, আরো অনেক মানর্ষই তো পর্নলিসের গর্লীতে মরেছে। তাতে কি তারা দর্঱খ পেয়েছিল? ফাঁসির আগে গোপীনাথ সাহার শরীরের

ওজন কত পাউণ্ড বেড়ে গিয়েছিল পর্নলিসের খাতায় কি তার রেকর্ড নেই?

কিন্তু কেন এমন বে-হিসেবী হলো কিরণ? কেন এমন অসতর্ক হলো? আর একটু সাবধান হলে পারতো না?

মা'র এত সাধের রান্নাঘর, এত সাধের পর্জোর ঘর, সমস্ত তছ্‌নছ্ হয়ে গেল দীপঙ্করের চোখের সামনে। মা'র পর্জোর কোষাকুশি গঙ্গাজলের তামার ঘড়া, মা-কালির একখানা পট্—পর্নলিসের আইনে তার যেন কোনও দাম নেই। দম্ দাম করে সমস্ত ভেঙে ফেললে তারা। ভারি-ভারি বর্ট্ দিয়ে সর্ট মারতে লাগলো। ছড়িয়ে ছিট্‌কে গেল সেগর্লো ঘরের ভেতরে।

হ্যাণ্ড-কাফ্ বাঁধা কিরণ আর স্থির থাকতে পারলে না। চিৎকার করে উঠলো—স্টপ্ দ্যাট্—

হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ হলো ঘরের ভেতরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে কিরণের মাথায় রিভলবারের বাঁট্ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলে তারা। অশ্লীল একটা গালাগালি বেরোল তাদের মর্খ দিয়ে—ব্লাডি বাস্টার্ড—সান্-অব্-এ-বিচ্—

সেই এক আঘাতেই কিরণ তখন মাটিতে পড়ে গেছে। ছট্‌ফট্ করছে, কথা বলবার চেষ্টা করছে—যেন প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করছে। মাথার খর্লিটা ফেটে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত মর্খখানা।

দীপঙ্কর সামনে ঝর্কে পড়তে যেতেই একজন সামনে রিভলবার উঁচিয়ে তার দিকে তাক্ করে বলে উঠলো—হ্যাণ্ডস্ আপ—

আর তারপর সব পড়ে রইল সেখানেই। সেই তেমনি ছড়ানো ছিটোনো। মা'র এত সাধের সংসার। সমস্ত লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে তারা তুললো কিরণকে। দীপঙ্করকেও তাদের মধ্যে গিয়ে উঠতে হলো গাড়িতে। নতুন আমেরিকান জিপ্ বিপ্লবের সর্ড়ঙ্গ পথ ধরে মহা-জীবনের রাজধানীর দিকে চললো।

বিপ্লবই বটে। একে একে আমেদাবাদ আর বোম্বাই-এর কটন্-মিলগর্লো সব বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আর কাজ করতে আসে না। টাটা আয়রন এণ্ড্ স্টীল কোম্পানীর কারখানা অচল। ব্লাস্ট্ ফারনেসের আগর্ন নিভে গেল আস্তে আস্তে। বাজার বন্ধ। দোকানপাট চলে না।

দর্নিকাকার মেজাজ তখন আগর্ন। বলে—লর্ড লিনলিথগো এবার ঠাণ্ডা করে দেবে বাছাধনদের—

দর্নিকাকার আড্ডা সকালবেলা যা একটুখানি বসে। কিন্তু বিকেলবেলা সব নিঝ্‌ঝুম। বিকেল থেকেই কালিঘাটের রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে যায়। রাস্তার আলো-গর্লো কারা নিভিয়ে দেয়। সমস্ত পাড়া তখন থম্ থম্ করে। হঠাৎ কোথাও কিছর্

নেই, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে একটা মিলিটারির গাড়ি ঢুকে পড়ে গলির মধ্যে। বেয়নেট উঁচিয়ে সোলজাররা বাইরের দিকে তাগ করে থাকে। অন্ধকার হলেই কালিঘাটের বস্তি থেকে কয়েকটা ছেলে রাসবিহারী এভিনিউএর মোড়ে গিয়ে ডাস্টবিনগুলো রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়ে আসে আর মিলিটারি লরীগুলো দৌড়তে দৌড়তে এসে হোঁচট খায়। তখন চারদিক থেকে ঢিল পড়ে তাদের গায়ে। তখন আর জ্ঞান থাকে না কারো। যেদিকে দু'চোখ যায়, যাকে সামনে পায়, তার দিকেই গুলী ছোঁড়ে এলো-পাথাড়ি। ঠেলাগাড়ি, ডাস্টবিন, সব কিছু এসে জড়ো হয় রাস্তায়। বিকেল থেকেই ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়। যে-যেদিকে থাকে, বাড়িতে এসে ঢোকে বিকেলের পরেই।

মা-মণি ডাকলেন শম্ভুকে। বললেন—কোথায় গিয়েছিলি তুই?

শম্ভু মুখ কাচুমাচু করে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবুর কাছে—

—দাদাবাবুর কী হয়েছে?

শম্ভু বললে—কাল থেকে দাদাবাবুর ঘুম হচ্ছে না, আমি মাথাটা টিপে দিচ্ছিলুম—

ঘুম হচ্ছে না! আর বেশী কিছু বললেন না। শম্ভু চলে গেল। মা-মণি আস্তে আস্তে উঠলেন বিছানা থেকে। আজকাল বিছানাতেই বেশিক্ষণ বসে থাকেন মা-মণি। দিনরাত নিজের মধ্যেই তোলপাড় করেন। বুঝতে পারেন আর কিছু নেই। আর কেউ নেই। বুঝতে পারেন তিনি সব হারিয়েছেন। সম্পত্তি হারিয়েছেন, সন্তানও হারিয়েছেন। তবু সে-সব ভুলে থাকতেই চেষ্টা করেন। যখন সন্ধেবেলা সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসে, রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত নিভে যায়, মাঝে-মাঝে দুম্-দুম্ আওয়াজ হয় বোমা ফাটার, তখন খানিকক্ষণের জন্যে একটু ভুলে থাকেন। মনে হয় শুধু তাঁর সংসারেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই বুঝি আকাল এসেছে। আকাল এসেছে, ভালোই হয়েছে। একলা তাঁর বাড়িতেই বা কেন, সমস্ত কলকাতায়, সকলের সংসারেই বিষ ছড়িয়ে যাক না। সকলের সংসারই ছারখার হয়ে যাক। এখনও নন্দিদির গাড়ি আছে, ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে। এখনও চড়কডাঙার মিত্তির-গিন্নীর দেমাক আছে, চালপটির চাটুজ্জেদের কারবার আছে। সরকারবাবু যখন এসে বলে—জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে, বাজারে মাল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মা-মণির মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। রেগে গিয়ে বলেন—কেন? পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

যেন শিরিষ ঘোষের পুত্রবধূর মেজাজের তোয়াক্কা করেই পৃথিবীর চলা উচিত!

কিন্তু না, তিনি সন্তুষ্ট হন মনে মনে। তিনি যেন খুশী হন। বাজার বন্ধ হয়ে যাক, সংসার ছারখার হয়ে যাক, কিছুই তাঁর এসে যায় না তাতে। আস্তে

আস্তে অনেক দ্বিধা করেও তিনি হাঁটতে হাঁটতে বারান্দা পেরিয়ে সোনার ঘরের সামনে আসেন। তারপর বাইরে থেকে ডাকেন—খোকা—

কোনও উত্তর আসে না ভেতর থেকে।

আবার ডাকেন—সোনা—

এবারও কোনও উত্তর নেই। মা-মণি আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে চেয়ে দেখেন। খোকার বিছানা যেমন-তেমনভাবে অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। ঘরটা ঝাঁটও দেওয়া হয় না হয়ত। কতদিন এ-ঘরে আসেন না তিনি। খোকার সেই বিয়ের পর থেকেই আসেন না। কিন্তু গেল কোথায় সোনা? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, এর মধ্যেই কি সেরে গেল। তারপর কৈলাসকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গেল রে তোর দাদাবাবু?

কৈলাস বললে—দাদাবাবু তো নিচেয় গেছেন—লাইব্রেরী ঘরে।

আবার লাইব্রেরী ঘরে! মা-মণি বলেন—ওপরে ডেকে নিয়ে আয় তো—বলগে আমি ডাকছি—

কিন্তু বলেই আবার কী মনে হলো। বললেন—না, থাক, আমিই নিচেয় যাচ্ছি—

হঠাৎ সিঁড়ির মুখেই দেখা। সনাতনবাবুর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। জামা-কাপড় বদলে নিয়েছে। জুতো পরেছে।

—আবার কোথায় যাচ্ছো?

সনাতনবাবু মুখ তুললেন। বললেন—কালকে বড় অসুস্থ দেখে এসেছিলাম তোমার বৌমাকে, তাই আর একবার যাচ্ছি—

মা-মণির চোখ দুটো বড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো আবার। জিজ্ঞেস করলেন—তাকে দেখতে যাচ্ছো, না আনতে যাচ্ছো?

সনাতনবাবু বললেন—আনতে—

মা-মণির মুখ দিয়ে হঠাৎ কোনও কথা বেরোল না। যেন কোনও রূঢ় কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিলেন তিনি। তারপর বললেন—এনে কি এ-বাড়িতেই তুলবে?

সনাতনবাবু বললেন—এ-বাড়ি ছাড়া আর কোনও জায়গা যে নেই তোমার বৌমার!

—কেন? এত জায়গা থাকতে আবার জায়গা কেন নেই তার? এতদিন কোথায় ছিল?

সনাতনবাবু বললেন—এতদিন যেখানে ছিল সেখানে আর থাকা উচিত নয়—থাকলে তার পক্ষেও খারাপ, আমাদের পক্ষেও খারাপ।

—আমাদের কথাটাও কি তুমি ভাবো?

সনাতনবাবু বললেন—আমাদের কথা ভাবি বলেই তো আনতে যাচ্ছি। তোমার বৌমা আসতে রাজী হয়েছে এবার।

—তার রাজী হওয়াটাই বুঝি বড় কথা হলো—আর আমার রাজী হওয়া-না-হওয়াটা বুঝি কিছুই নয়?

—বাড়ির বউ বাড়িতে আনার ব্যাপারে তোমার রাজী হওয়াই তো উচিত!

মা-মণি বললেন—উচিত-অনুচিতের কথা তো হচ্ছে না, কোনটা উচিত, আর কোনটা অনুচিত, তা আমি ভালো করেই জানি, তোমাকে আর তা শেখাতে হবে না।

সনাতনবাবু বললেন—আমি তো তোমাকে শেখাচ্ছি না, আমি বলছি কর্তব্যের কথা। আমি করছি আমার কর্তব্য। তুমি তোমার কর্তব্য কোর—

মা-মণি আর থাকতে পারলেন না। বললেন—দেখ খোকা, আমি তোমাকে বার-বার করে আগেও বলেছি, এখনও আবার বলছি, এ আমার বাড়ি—

সনাতনবাবু বললেন—আমি তা জানি মা-মণি—

—ছাই জানো! তুমি কতটুকু জানো শুনি? তুমি জানলেই বা কখন, আর শিখলেই বা কী? কেবল তো বই মুখে দিয়ে থাকো! সংসার তুমি কবে করলে যে শিখবে? তুমি তোমার নিজের কর্তব্য করেছো? কর্তব্যের কথা তো বলছো খুব! বউএর ওপর তোমার কর্তব্যের জ্ঞান দেখ দেখছি খুব টনটনে! আমার ওপর তোমার কর্তব্য নেই কোন? আমি কেউ না?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার ওপর জ্ঞানত কোনও অবহেলা আমি করেছি কোনও দিন?

মা-মণি বললেন—কবে অবহেলা করোনি তাই বলো তো আগে! আমার কোনও কথা তুমি কোনদিন শুনেছো? আমার কোন কথাটা তুমি রেখেছো? দিনের পর দিন বউ আমার অপমান করেছে তোমার সামনে, একটা কথা তুমি তখন শুনিয়েছ বউকে? ঝি-চাকরদের বেহদ্দ করেছে আমাকে, কই, তখন তুমি আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখেছ? আমি ভাল করতে চেষ্টা করিনি তোমার বউকে? আমি তার ভাল চাইনি? না কি তুমি ভাবো আমি গাল-মন্দই করেছি কেবল দিনরাত্ত! এই এত লোক তো সাক্ষী আছে, কই, কেউ বলুক দিকি আমি বউকে কখনও একটা কড়া কথা শুনিয়েছিলুম! ন'দিদি কত বলেছে, নয়ন, অত আবদার দিসনি বউকে, অত আদিখ্যেতা ভাল নয়, কিন্তু তবু ভেবেছি, আহা, দশটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটা বউ আমার, সাধ-আহ্লাদ তো আমারও আছে, আমারও তো ছেলের বউ নিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে ঘর-কান্না করতে সাধ যায়! কিন্তু তোমার বউ আমার সে-সাধে বাদ সাধেনি? বুকে হাত দিয়ে বলো তুমি সোনা, বাদ সাধেনি?

একটু হাঁফ ছেড়ে আবার বলতে লাগলেন—আর, কার জন্যে আমার সংসার করা শুনি? ছেলে-বউএর জন্যেই তো! যার ছেলে পর হয়ে গেল, যার বউ মুখের ওপর কথায় কথায় ঝাঁটা মারে, তার সংসার কি সংসার? তাকে তুমি সংসার বলো সোনা? যার নিজের মায়ের পেটের বোনের স্বভাব-চরিত্রের ঠিক নেই, যার

নিজের কোথায় রাত কাটে তার ঠিক নেই, তাকে আবার তুমি ঘরে আনতে চাও? তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কি এমন করেই লোপ পেতে হয়? এমন করেও পুরুষ-মানুষ বউ-এর বশ হয়? ছি ছি ছি—

সনাতনবাবু বললেন—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি—

—তবু তুমি যাবে? এত কথার পরও আমার কথা রাখবে না?

সনাতনবাবু বললেন—আমি আমার জন্যে যাচ্ছি না, তোমার ভালোর জন্যেই যাচ্ছি—

—তার মানে?

সনাতনবাবু বললেন—তার মানে বিরোধ থেকেই যত অশান্তির উৎপত্তি মা-মণি, আর কাউকে ভালো না-বাসতে পারলেই যত বিরোধের সৃষ্টি! ভালবাসলেই দেখবে সকলের সঙ্গে সব বিরোধ শেষ হয়ে গেছে! তখন দেখবে সকলকে ক্ষমা করতে পারবে, অন্য লোকের দোষগুলো আর দোষ বলে মনে হবে না তখন।

—এসব বুঝি তোমার বইতে লেখা আছে? ওই বইগুলোই হয়েছে যত নষ্টের গোড়া, ওই বইগুলোই আমি একদিন উনুনে পুড়িয়ে ফেলবো তবে আমার নাম! তা বইতে বুঝি মাকে ভালবাসার কথা লেখা নেই? কেবল বউকে ভালবাসার কথা লেখা থাকে?

সনাতনবাবু বললেন—আর দেরি করবো না মা-মণি, দেরি হলে আর ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না! খুব গোলমাল চলছে চারদিকে—

শম্ভু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সনাতনবাবু বললেন—চল্—

মা-মণি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সোনাকে চলে যেতে দেখে শেষবারের মত বললেন—যাচ্ছো যাও, কিন্তু জেনে রেখো, সেবারে যে অপমান করেছি, তার দশ-গুণ অপমানের জন্যে যেন তৈরি হয়ে আসে সে—

এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সনাতনবাবু চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাইরের গেটে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। হর্ন শুনেই শম্ভু দৌড়ে গিয়েছিল। এসে বললে—আপনাকে ডাকছেন দাদাবাবু—

—কে?

ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে এসেছে মিস্টার ঘোষাল। বললে—কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—আপনি? মিস্টার ঘোষাল না?

—কালকেও একবার আপনার বাড়িতে এসেছিলাম। আপনি ছিলেন না তখন বাড়িতে।

সনাতনবাবু বললেন—এখন হসপিট্যালে যাচ্ছি, আমার স্ত্রীকে দেখতে। আজকে আমার স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসবো ঠিক করেছি। চারদিকে যে রকম গোলমাল চলেছে, তাই একটু আগে-আগেই যাচ্ছি—

সামনে সতীর শাশুড়ীকে দেখেই চিনতে পেরেছে মিস্টার ঘোষাল। বললে—

আপনি বোধহয় মিস্টার ঘোষের মা? আপনি আমারও মা মিসেস ঘোষ—বলে মিস্টার ঘোষাল হাত-জোড় করে প্রণাম করলে।

—এ কে সোনা?

মিস্টার ঘোষাল নিজেই নিজের পরিচয় দিলে। বললে—কী পরিচয় দিলে আপনি আমাকে চিনবেন বুঝতে পারছি না মা। তবে আপনার পুত্রবধূ আমাকে চেনে। মানে সতী।

সনাতনবাবু বললেন—আমার একটু তাড়া আছে মিস্টার ঘোষাল, চলুন না, আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে হসপিট্যালে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি মিস্টার ঘোষ—

মা-মণি বললেন—তুমি আমার বউমাকে কী করে চিনলে?

—আজ্ঞে, আমি চিনবো না আপনার পুত্রবধূকে? তিনি তো আমার বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটটাই ভাড়া নিয়েছেন। শুনেছি নাকি শাশুড়ীর অত্যাচারেই তিনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন—

—কে বললে তোমাকে এ-কথা? বউমা?

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ তিনি নিজেই বলেছিলেন আমাকে। তারপর যে-সব কাণ্ড তাঁর দেখলাম, তাতে আমার বড় ঘেন্না হলো মা। আমি কতবার তাঁকে বললাম এ-কাজ ভাল নয়। এ-সব কাজ কারা করবে? যারা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—তারা। আপনি কেন এভাবে লাইফ লীড করবেন? এটা কী ভালো? কত বুঝিয়ে বললাম তাঁকে।

মা-মণি হঠাৎ বাধা দিলেন। বললেন—সে কীভাবে জীবন কাটাতো সেখানে?

—সে মা, আপনাকে আমি বলতে পারবো না। সে আপনার সামনে আমার মুখে বলতেও লজ্জা করছে। আপনি আর আমার কাছে সে-সব শুনতেও চাইবেন না। কোনও গৃহস্থ বাড়ির বউ সেভাবে জীবন কাটায়নি!

—তারপর?

মিস্টার ঘোষাল বলতে লাগলো—তারপর কত চেষ্টা করলাম তাঁকে ফেরাবার জন্যে। তিনি বললেন, আপনাদের এই বাড়ির সামনেই তিনি একটা বাড়ি ভাড়া নেবেন, নিয়ে আপনাদের চোখের সামনেই তিনি কেলেঙ্কারি চালিয়ে যাবেন! তাতেও আমি বাধা দিলাম—

—তারপর?

—তিনি কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। তিনি এই সামনেই মিস্টার মিত্র বলে একজন ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের পোরশ্যান ভাড়া নিলেন।

—তারপর?

—তারপর যখন দেখলুম কিছুতেই আর তাঁকে বন্ধ করা যাবে না, তখন একটা চাকরি করে দিলাম আমাদের রেলওয়ের আপিসে। ভাবলাম হয়ত

শোধরাবেন। হয়ত আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন! কিন্তু শেষকালে দেখলাম একবার স্বভাব যার বিগড়ে যায়, তাকে শোধরানো বড় শক্ত! শেষকালে শরীর আরো খারাপ হলো, হতে হতে একেবারে উইক হয়ে পড়লেন, তখনও একবার শেষ চেষ্টা করলাম। যদি ফেরেন! কিন্তু আর পারলাম না। তখন একদিন আপিসের ভেতরেই ফেন্ট হয়ে পড়লেন—

সনাতনবাবু এতক্ষণে কথা বললেন—আপনি যদি না যান, তাহলে আমি একলাই যাই মিস্টার ঘোষাল, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

মা-মণি বললেন—নিজের কানে এত কথা শোনার পরও তোমার সেখানে যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?

সনাতনবাবু বললেন—এত কথা শোনার পরেই তো বেশি করে যেতে ইচ্ছে করছে—

—তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত সোনা। এ জন্মেও তোমার আর আক্কেল হবে না দেখছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু যাচ্ছেনটা আপনি কোথায়?

—হস্‌পিট্যালে। আজকে আমি তাঁকে যেমন করে পারি বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে আসবোই। এর পরে আর চুপ করে থাকা যায় না।

মিস্টার ঘোষাল হেসে উঠলো। বললে—কিন্তু তিনি তো আর হস্‌পিট্যালে নেই।

—নেই?

—না, নেই।

সনাতনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—কেন, নেই তো, তাহলে কোথায় গেলেন তিনি?

মিস্টার ঘোষাল এবার খুব জোরে তার চুরোটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে। বললে—মিস্টার সেন তাঁকে নিয়ে গেছে—

মা-মণি বললে—কে? কার কথা বললে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—দীপঙ্কর সেন, আমারই অ্যাসিস্টেন্ট—

—দীপু?

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ, সেই তাকে হস্‌পিট্যাল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় নিয়ে গেছে?

—সে কি আর কাউকে জানিয়ে নিয়ে গেছে ভেবেছেন?

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে দীপুবাবুর বাড়িতেই আছে সতী। তাঁর বাড়িতেই যাবো—সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে—

—না! মিস্টার সেন তেমন কাঁচা লোক নয়। বাড়িতেও সে নেই।

সনাতনবাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন—বাড়িতে নেই তো

কোথায় আছেন?

—সেই কথা বলতেই তো এসেছি আজকে আপনার কাছে। তাকে পুলিসে ধরেছে। আজকে আপিসেও আসেনি সে। আপিসে আর আসবেও না সে। কনভিক্‌শন্‌ হলে চাকরিও আর থাকবে না তার। তাকে আপিস থেকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে—

সনাতনবাবুর তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। শম্ভুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ!

মা-মণি বললেন—তাহলে, কী ভাবছো, যাও, আনতে যাও বউকে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমাকে আপনি চেনেন না মা, হয়ত ভাবছেন, এত কথা কেন আমি বলতে এলাম আপনাদের কাছে? ভাবছেন আমার কীসের স্বার্থ এতে! কিন্তু পৃথিবীতে স্বার্থটাই কি সব? একটা সংসার ভেঙে-চুরে যাক, সেটা কে চায়? কেউ চায় না, আমিও চাই না। আপনারা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুখে ঘর-করনা করুন, সেইটেই আমি চাই—

মা-মণি বললেন—আমার আর সুখ চাই না বাবা, সুখের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে—

সনাতনবাবু বললেন—এ আমি বিশ্বাস করি না মিস্টার ঘোষাল, দীপুবাবুকে আমি চিনি, আর সতীকেও আমি চিনি—

—সে তো সুখের কথা মিস্টার ঘোষ। আপনি মিসেস ঘোষকে এ বাড়িতে নিয়ে আসুন, সেইটেই তো আমি চাই!

মা-মণি বললেন—না, অমন বউকে জেনে শুনে আমি আর ঘরে ঠাঁই দেব না—আমি বেঁচে থাকতে তো দেব না।

সনাতনবাবু এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না। শম্ভু দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললেন—চল্—

মা-মণি দেখছিলেন। বললেন—কোথায় যাচ্ছো আবার—

সনাতনবাবু বললেন—দীপঙ্করবাবুর বাড়িতে—কিম্বা তাঁর আপিসে—

মিস্টার ঘোষাল বললেন—কিন্তু তিনি তো সাসপেণ্ডেড হয়ে আছেন—

—তাহলে বাড়িতেই যাবো—

—কিন্তু বাড়িতেও তাকে পাবেন না।

—কেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে কাল রাত্রে,—

মা-মণি পর্যন্ত চমকে উঠলেন। বললেন—পুলিসে ধরেছে? কেন? চুরি করেছিল নাকি?

সনাতনবাবুও এতখানির জন্যে যেন ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন—সে কি? কেন?

মিস্টার ঘোষাল আবার চুরোটের ধোঁয়া ছাড়লে। বললে—আমার আবার

একটা কাজ আছে এদিকে, অনেক কাজ ফেলে এদিকে এসেছিলাম শুধু আপনাদের খবরটা দিতে। জানি না, আপনাদের ভালো করলাম কি মন্দ করলাম। যদি অন্যায় কিছু করে থাকি তো আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। কারণ এখন মনে হচ্ছে খবরটা না-বললেই হয়ত ভালো করতাম—

মা-মণি বললেন—না বাবা, তুমি আমাদের ভালই করলে, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর কাজই করলে। তুমি বাবা এখন চলে যেও না, একটু বোস, কথাগুলো আমার ছেলেকে আর একটু শোনাও, ওর একটু চৈতন্য হোক—

মিস্টার ঘোষাল বললে—এখন আমাকে মাপ করবেন মা, আপনি আমার মায়ের তুল্য, আপনার কথা অগ্রাহ্য করি এমন ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু মাথার ওপর আমার অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ঝামেলা ঝুলছে। এখন তো আর জেণ্টেলম্যানদের কলকাতায় বাস করা সম্ভব নয়, একটু ভালোমানুষি করেছেন কি সবাই আপনার মাথায় চাঁটি মেরে যাবে, সবাই আপনাকে বিপদে ফেলে দেবে—

মা-মণি বললেন—সে আর বোল না বাবা, আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—এখন আর কতটুকুই বা বুঝছেন, দিন কতক যাক, তখন আরো বুঝবেন, এই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আছে বলে তবু এখনও আমরা ন্যায়-বিচার পাচ্ছি, এর পরে যদি শ্যামাপ্রসাদের রাজত্ব হয় কি গান্ধীর রাজত্ব হয় তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে—। আমরা গভর্নমেণ্ট আপিসে চাকরি করি, আমরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, আপনি আর কতটুকুই বা তার টের পাবেন?

—খুব পাচ্ছি বাবা, খুব পাচ্ছি। দেখ না, এখনই ভাড়াটেরা নিয়ম করে ভাড়া দেয় না, এর পরে কি আর বাড়িওয়ালাকে তারা মানবে? অত কথা কী, বিশ্বাস করে যার হাতে কাগজ-পত্র সব দিয়েছিলাম, সেই আমার ব্যারিস্টারই সব লুটে পুটে নিলে বাবা, দু'দিন বাদে আর খেতে পাবো না, এমনি অবস্থা করে দিয়েছে—

মিস্টার ঘোষাল যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সে কি?

—হ্যাঁ বাবা, ওই আমার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো না, আমি কি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলছি!

—আপনার ব্যারিস্টার আপনাকে ঠকিয়েছে? এ-রকম তো বড় হয় না।

—হয় বাবা, কলিযুগে সবই হয়। কলিযুগ না হলে হিন্দু বাড়ির বউই কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে কলকাতা শহরের বুকে? কলিযুগ না হলে কি বাড়ির-বউ হয়ে রেলের আপিসে বসে মদ্দদের সঙ্গে চাকরি করে? এমন কথা আগে কেউ কখনও শুনেছ? এ যে ঘোর কলিযুগ বাবা—

সনাতনবাবু নিজের মনে তখনও কী যেন ভাবছিলেন। বললেন—এ আমি বিশ্বাস করি না—

—কী বিশ্বাস করো না? মা-মণি সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না—আমার কর্তব্য আমি করে গেলুম, এখন আপনাদের ভাল-মন্দ আপনারা বুঝবেন—

—কিন্তু দীপঙ্করবাবুকে কেন পুলিসে ধরেছে?

মা-মণি বললেন—তা চুরি-বাটপাড়ি করেছিল বোধহয়—আমি তখনই জানি স্বভাব-চরিত্র ওর ভাল নয়—

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, চুরি-বাটপাড়ি করেনি মিস্টার সেন—

—তাহলে কীসের জন্যে ধরেছে?

মিস্টার ঘোষাল শেষবারের মত চুরোটটা টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—কীসের জন্যে তা এখনও বুঝতে পারছেন না? পরস্ত্রীকে নিয়ে ইলোপ করবার জন্যে—

কথাটা বলেই মিস্টার ঘোষাল হাত-জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। বললে—আমি আসি মা, পরে আবার একদিন আসবো—

মা-মণি আর সনাতনবাবুর মুখের ওপরেই মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো মিস্টার ঘোষাল।

বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িতে আস্তে আস্তে ভোর হলো। আস্তে আস্তে সকালও হলো। ঘর-দোর তছ-নছ করে করে ফেলে গেছে পুলিসরা। এক একটা দৈত্যের মতন চেহারা তাদের। কাশী কিছুই জানতো না। সন্ধ্যেবেলা সবে ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে পাড়ায়। সেই তখনই দাদাবাবুর বন্ধু এসে দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। চেনা চেহারা। আর একদিন রাত্রে এসেছিল। কাশী তাই তেমন কিছু সন্দেহ করেনি। দাদাবাবু নেই শুনে বসতে চেয়েছে ভেতরে। টক টক করছে গায়ের রং। সাহেবী-পোশাক পরা। কিছুই সন্দেহ হয়নি। ওপরের ঘরেই নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল বাবুকে। আর ঠিক তারপরেই যে এত কাণ্ড হবে কে জানতো? সমস্ত পাড়ায় একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

পুলিসরা চলে যেতেই একে একে পাড়ার লোকজন এসে হাজির হলো। কেউ বললে—হ্যাঁ রে, ও কে?

কাশী বললে—আজ্ঞে, তা আমি কী করে জানবো, দাদাবাবুর বন্ধু বলে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলুম—

—তা তোর বাবুকেও ধরে নিয়ে গেল কেন? তোর বাবুও কি ওদের দলে?

ঘরের মেঝেতে তখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। দাদাবাবুর বন্ধুর মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। বাক্স, বিছানা, আয়না, আলমারি, কিছু আর আস্ত রাখেনি তারা। সমস্ত ওলট-পালট করে ভেঙে-চুরে একশা করেছে। কাশীর কান্না পেতে লাগলো। মা থাকলে এমন করে হয়ত নষ্ট করতে পারতো না। মা'র পুজোর বাসন-কোসনও বাদ দেয়নি। কালিঘাটের পটখানার

দিকে চেয়ে মা চান করে উঠে রোজ নমস্কার করতো। ধূপ-ধুনো দিত। সেই পটখানাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে পাষণ্ডগুলো। একটা ঝাঁটা নিয়ে সেই সমস্ত পরিষ্কার করতে হলো। পরিষ্কার করা কি চারটিখানি কথা? আর শুধু তো শোবার ঘরই নয়। সমস্ত কিছু ঘেঁটেছে। কয়লার ঝুড়িটা পর্যন্ত। কয়লাগুলো পর্যন্ত উপুড় করে ছড়িয়ে রেখে গেছে উঠোনের মাঝখানে। রান্না-ঘরের ভেতরেও বুট পরে ঢুকেছিল। হাঁড়ি-কুড়ি সব ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছে। আবার নতুন করে হাঁড়ি কিনতে হবে বাজার থেকে। আবার থালা-বাসন কিনতে হবে। আবার সবই কিনতে হবে বলতে গেলে।

—কাশী!

এতক্ষণে যেন কাশীর মনে পড়লো। এ মানুষটা যেন পৃথিবী থেকেই মুছে গিয়েছিল। তার কথা কারোরই মনে ছিল না। সেই সন্তোষ-কাকা মারা যাবার পর থেকেই যেন ক্ষীরোদার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল সংসার থেকে। অথচ প্রতিদিন সংসারের অনেকখানি কাজ তো ক্ষীরোদাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাশী ঝাঁটাটা হাতে নিয়েই দৌড়ে এল।

ক্ষীরোদা বললে—ওরা চলে গিয়েছে সবাই?

কাশী বললে—অনেকক্ষণ চলে গেছে দিদিমণি, দাদাবাবুর বন্ধুকে মেরে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছিল পুলিস—

আর একজনের কথাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারলে না মুখ ফুটে। যার ওপর নির্ভর করে এ-বাড়িতে থাকা, সেই মানুষটার কথাও বার বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো তার। রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে সমস্ত অবস্থাটা দেখে ক্ষীরোদার চোখেও জল এল। বললে—কী হবে তাহলে কাশী?

তা কাশীই কি জানে, কী হবে। তবু মুখে অভয় দিলে। বললে—কী আর হবে! তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি—

—যদি আর না আসেন?

কাশী বললে—খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছো? আমার কাছে টাকা আছে—

ক্ষীরোদা যেন টাকার কথা ভেবেই অস্থির হচ্ছে। আশ্চর্য!

কাশী বললে—না, চাল ডাল কেনবার কথা ভাবছো তো? সে আমি এখনি কিনে আনছি বাজার থেকে, আমার মাইনের টাকা নেই ভেবেছ?

সত্যিই, কাশী ভেবেছে রান্না-খাওয়ার জন্যেই ক্ষীরোদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাশী বললে—কলে জল এয়েছে, এই বেলা তুমি চান-টান যা করবার করে নাও, আমি বাজার থেকে সমস্ত কিনে আনছি—

ক্ষীরোদার রাগ হলো। রেগে বললে—তোমার যদি খেতে সাধ হয় এত তো তুমি খাও, আমার খিদে নেই।

কাশী সে-কথায় কান দিলে না। তাড়াতাড়ি ঘর-পরিষ্কার করে ঝুড়ি নিয়ে

একেবারে তৈরি। বললে—আমি বাজারে চললুম, দরজার হুড়কো লাগিয়ে দাও—

ক্ষীরোদা তখনও চুপ করে বসে রইল।

কাশী আবার কাছে এল। বললে—উঠে দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমি বাজারে যাচ্ছি—

ক্ষীরোদার চোখ দুটো বড় করুণ হয়ে উঠলো এবার। বললে—কিন্তু কেন যাচ্ছো কাশী, কে খাবে?

—আমি খাবো, আমি। আমি তোমার মত উপোস করে থাকতে পারবো না। আমি নিজে খাবো। তুমি সদর-দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও তো—

ক্ষীরোদার ইচ্ছে ছিল না। তবু অনেক পীড়াপীড়িতে ক্ষীরোদা উঠলো। কাশী বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বললে—বেশ ভাল করে এ'টে দরজা বন্ধ করে দাও, কেউ ঠেললেও দরজা খুলবে না, আমি এসে উনুনে আগুন দেব—আমার বেশি দেরি হবে না—

তারপর বাইরে থেকেই দরজাটা ভাল করে ঠেলে দেখলে কাশী। ঠিক-ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা। ক্ষীরোদা আবার এসে বসলো বারান্দায়। আবার হারিয়ে গেল নিজের মনের তলায়। সারা রাত ঘুম হয়নি কারো। কাশীও ঘুমোয় নি। বাড়িতে অমন কান্ড হলে কেউ ঘুমোতে পারে নাকি? কোথাকার কোন্ রসুলপুর থেকে একদিন এ-সংসারে এসে পড়েছিল ক্ষীরোদা, সেদিন কলকাতা দেখবার কলকাতায় থাকবার একটু আগ্রহ ছিল হয়ত। তারপর সেই একদিন মাসীমার সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিল রেলে চড়ে, আর কোথাও যায় নি। আর কিছু দেখবার শোনবার ইচ্ছেও হয়নি ক্ষীরোদার। এ-সংসারে সে কেউ না, কিন্তু এই সংসারই তাকে কেমন করে জড়িয়ে ধরলে, আর তার পালাবারও উপায় রইল না। এখন এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে আর যেতে পারবে না। আর কোথাও যাবার জায়গাও নেই তার।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো!

এর মধ্যেই কাশী ফিরে এল নাকি! ক্ষীরোদা দাঁড়িয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সদর দরজার সামনে গিয়ে বললে—কে? কাশী?

কেউ সাড়া দিলে না বাইরে থেকে।

ক্ষীরোদা বললে—কাশী, ফিরে এলে?

তবু সাড়া নেই।

ক্ষীরোদার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। কে এল হঠাৎ এমন সময়?

—কাশী? কাশী দরজা ঠেলছো? নাম বলো তোমার। কে?

তবু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। আরো জোরে-জোরে কড়া নড়তে লাগলো।

এবার যেন আরো ভয় পেয়ে গেল ক্ষীরোদা। দরজা খুলে যদি দেখে অচেনা লোক। যদি আবার পুলিসের লোক আসে? বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই একটা যে কথা বলতে পারবে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারলে না ক্ষীরোদা।

তখনও কড়া নাড়ছে।

ক্ষীরোদা আবার বললে—কে? কাশী তুমি?

মনে হলো যেন কাশীই বললে—হ্যাঁ দিদিমণি, দরজা খোল—

দরজাটা খুলতেই কিন্তু ক্ষীরোদা অবাক হয়ে দু'পা পেছিয়ে এসেছে। এ কে? একে তো দেখেনি কখনও। এতদিন এ-বাড়িতে এসেছে এ-চেহারা তো কখনও নজরে পড়েনি!

ভয়ে গলাটা শুকিয়ে এসেছে তখন। তবু একটু সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

—তুমি কে?

ক্ষীরোদা প্রশ্ন শুনে আরো অবাক হয়ে গেল। দুজনেই দুজনের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

যে জীবন নিয়ে দীপঙ্কর একদিন নিঃসঙ্গ যাত্রা করেছিল, সেদিন অত বছর অতিক্রম করেও সেই জীবনের বুঝি তীর্থসঙ্গমে গিয়ে পোঁছোবার সময় তখনও হয়নি। আশুতোষ কলেজের সেই প্রফেসার অমলবাবু বলেছিলেন—জীবন দিয়েই তোমার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে দীপঙ্কর। এ প্রশ্নের সমাধান তুমি তোমার ছাপানো বইতে পাবে না, প্রফেসারের লেকচারের মধ্যেও পাবে না। জীবন দিয়ে সমাধান না খুঁজলে, সে সমাধান সত্যও হবে না, স্থায়ীও হবে না। হয়ত তখনও জীবন দিয়ে দেখার অনেক বাকি ছিল তার। হয়ত এমনি করেই বাধা অতিক্রম করে মহাজীবনের দিকে এগিয়ে চলে মানুষ। এগিয়ে চলতে গিয়ে কেউ ফতুর হয়ে যায়, কেউ উত্তরণ করে। এ জীবনে যত জীবন দেখেছে, তত মৃত্যুও দেখেছে সে। যত আলো দেখেছে, তত অন্ধকারও দেখেছে। সেই সোক্রেটিস্, কনফুসিয়াস, সেই বাইবেলের আগের যুগ থেকে শুরু করে যত মানুষ যত মহামানুষ জন্মেছে সকলের সব জীবন যেন বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এসে এই দীপঙ্করের মধ্যেই জীবন পেয়েছে। তার অনুভূতির মধ্যে বাসা বেঁধেছে ইতিহাসের মানুষের সমস্ত অনুসন্ধান বৃত্তি। মাঝে মাঝে এই ভাবনাটা আসতো তার মনে, আবার মাঝে মাঝে মিলিয়েও যেত। হঠাৎ দু'দিন তিন দিন যেন বিভোর করে রাখতো তাকে, আবার সে সাধারণ হয়ে যেত। অতি সাধারণ। আবার সে রেলের স্টাফ হয়ে যেত। আবার পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়া তাকে ঘূর্ণির মত সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে নামিয়ে আনতো হঠাৎ। প্রাণমথবাবুর কাছে গেলে, প্রাণমথবাবুর কথা ভাবলে, কিরণ কাছে এলে, কিরণের কথা ভাবলেও যেন আবার এই সব তুচ্ছতার ওপরে উঠে যেত কয়েকদিনের জন্যে।

আজো মনে আছে সেদিন পুলিসের গাড়িতে কিরণের সেই ব্যবহার। মাথা দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে। দু'জন সার্জেণ্ট দু'দিক থেকে তাকে রিভল-

বারের নলের সামনে নিজ্জীব করে ধরে আছে। কিন্তু নির্জীব থাকবারই কি ছেলে কিরণ! কই, দীপঙ্কর তো সেদিন কিরণের মত বেপরোয়া হতে পারেনি। চোখের সামনে নিজের মার পুজোর জিনিসের অপমান তো নীরবে সহ্য করেছে মুখ বুজে। আর কিরণ? কিরণের নিজের মা'র অপমানের কথা তো কিরণ ভাবেনি। তার নিজের মা কেমন করে সংসার চালায়, তার নিজের মা বেঁচে আছে কিনা, সে-কথা তো সে একবারও জিজ্ঞেস করেনি। তবে কেন সে সেদিন অমন হুঙ্কার করে উঠেছিল নিজের জীবনকে বিপন্ন করে?

কিরণ বলতো—কষ্ট সহ্য করার অভ্যেস করা ভাল ভাই, শেষকালে যখন পুলিসেরা কষ্ট দেবে, তখন আর কোনও কষ্ট হবে না—

ছোটবেলায় কিরণ ইচ্ছে করে গায়ে বিছুটি লাগাতো, ইচ্ছে করে তেতো ওষুধ খেতো, না-খেয়ে দিনের পর দিন থাকতো, সে তো কেবল এই জন্যেই। এই এরই জন্যে এতদিন ধরে নিজেকে তৈরি করিয়ে রেখেছিল সে। এবার বুঝি তার সেই কষ্ট সহ্য করারই পরীক্ষার পালা। এতদিন পরে যেন তাকে পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে—

আর আশ্চর্য, কিরণের দিকে চেয়ে দেখছিল দীপঙ্কর আর নিজেরও যেন আনন্দ হচ্ছিল। এক অদ্ভুত আনন্দ। যেন কিরণ নয়, যেন দীপঙ্করের নিজের মাথা দিয়েই ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে। যেন মিলিটারি-পুলিস দীপঙ্করের ওপরেই অত্যাচার করছে। যেন দীপঙ্করই নিজে জার্মানী থেকে পালিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছে। মারো, আরো মারো তোমরা আমাকে, তাতেও যদি সকলের সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ছিটে-ফোঁটা, অঘোরদাদু, নয়নরঞ্জিনী দাসী, নির্মল পালিত, মিস্টার ঘোষাল, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মহীন্দ্র সকলের সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে কিরণ। সকলের সমস্ত পাপ সব নিজে আত্মসাৎ করে তোমাদের পবিত্র করবে সে। তোমাদের যত আঘাত সমস্তটুকু কিরণের ওপর পড়ুক, তাতে দীপঙ্করও পরিত্রাণ পাবে। দীপঙ্করও পরিশুদ্ধ হবে।

গাড়িটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে উঠলো আবার সেই লোহার গেটের ভেতর। বহুদিন আগে একদিন এখানেই এসেছিল দীপঙ্কর একলা। সেদিন রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারের সামনে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হলো আবার। একদল কিরণকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। আর দীপঙ্কর রইল দাঁড়িয়ে। অন্ধকার কলকাতা, বাইরে নিশ্ছিদ্র ব্ল্যাক-আউট। কিন্তু এখানে এই কর্মব্যস্ত ঘরের ভেতরে যেন তখন সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে, চঞ্চল হয়ে, উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নেই, শুধু খোঁজ কোথায় কে লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষের মঙ্গল-চিন্তা করছে। খোঁজ নাও কোথায় কোন্ সংলোক মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। সন্ধান করো কে কোথায় আছে এমন মানুষ, যে নিজের সংসার দেখেনি, নিজের স্বার্থের কথা ভাবেনি, যে অনাহার করেছে দিনের পর দিন, আর তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, কিম্বা যে জীবনে একদিনের জন্যে মিথ্যে কথা বলেনি, মিথ্যে আচরণ করেনি, মিথ্যে আড়ম্বরে নিজেকে ভূষিত করেনি। খুঁজে বেড়াও সেই সব সোক্রেটিসদের, সেই সব যিশু খৃস্টদের, আর সেই সব দীপঙ্করদের, সেই সব কিরণদের। তাদের হাতে বিষ তুলে দাও, তাদের ক্রসে বিঁধে মারো। তাদের ধরে আনো লালবাজার পুলিস হেড কোয়ার্টার্সে।

লোহার একটা দরজা সশব্দে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিস-ইউনিফর্ম পরা চেহারা। বাঙালী।

—এ কি স্যার, আপনি?

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে। চেনা গেল না। লোকটা আবার বললে—চিনতে পারছেন না?

—কে আপনি?

লোকটা বললে—সেই মিস্ মাইকেলের মার্ডার-কেসে আপনি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে!

দীপঙ্কর বললে—তা হবে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—কিন্তু আপনি আবার ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়ার অ্যাক্টে জড়িয়ে পড়লেন কেন? কিরণ চ্যাটার্জি আপনার কে?

দীপঙ্কর বললে—আমার বন্ধু।

—কিন্তু আপনি তো গভর্নমেন্টের গেজেটেড অফিসার! আপনি এইসব অ্যান্টি-ব্রিটিশ কাজের মধ্যে কেন যেতে গেলেন? কিরণ চ্যাটার্জির এগেনস্টে তো সিভিয়ার চার্জ, তার তো ফাঁসি হবে মশাই, আপনি আবার এ সবের মধ্যে কেন যেতে গেলেন? মহামুশকিলে ফেললেন দেখছি—আপনি এর মধ্যে আছেন, তা তো জানতাম না—

—কিরণের কি ফাঁসিই হবে?

লোকটা বললে—এই ডিপার্টমেন্টে একলা আমি শুধু বাঙালী মশাই, আর সব ইংরেজ—তাই আপনাকেই আমি বলছি, এরা কিরণ চ্যাটার্জির ফাঁসি না দিয়ে ছাড়বে না, অনেক দিনের পুরোন দাগী, রায় বাহাদুরের আমলের পুরোন ফাইল পাওয়া গেছে।

—কোর্টে মামলা হবে?

লোকটা বললে—কোর্টে মামলা হবে না, এ সব কেস কোর্টে যায় না, এ তো মিলিটারির ব্যাপার—। ইনভেস্টিগেশনও কমপ্লিট হয়ে আছে, এ ফাঁসি না হয়ে যায় না। কিন্তু আমি আপনার কথাটাই ভাবছি......

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা থাক, কিরণ চ্যাটার্জির কি ফাঁসি হবেই?

ভদ্রলোক বললে—নির্ঘাৎ, অনেকদিন ধরে খোঁজ চলছিল, লণ্ডন থেকে স্পেশ্যাল কেবল্ এসেছে, চার্চিল থাকতে কোনও আশা নেই—

তারপর একটু থেমে চারদিকে চেয়ে নিয়ে গলা নিচু করে বললে—আপনাকে

দেখেই আমি এলুম ঘরে, ভাবলাম আপনি এ সবের মধ্যে কখনও থাকতে পারেন না, তা কিরণ চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনার কিসের রিলেশন ? ও তো এককালে টেররিস্ট ছিল—

দীপঙ্কর বললে—আপনি নিজে বাঙালী, কিরণের জন্যে যদি কিছু পারেন তো করুন না—ফাঁসিটা যে কোনও রকমে বন্ধ করুন না—

—সে কি বলছেন স্যার, তাহলে যে আমার চাকরিটাই চলে যাবে। আগে তো দেখেছেন থানার ইন-চার্জ ছিলুম, এখন প্রমোশন নিয়ে এই ব্র্যাঞ্চে এসেছি, দেড়শো টাকা বেশী পাচ্ছি, এ ব্যাপারে কারো হাত নেই, গভর্নরেরও হাতের বাইরে।

—উকিল ব্যারিস্টার যদি কিছু লাগে আমি তাও লাগাতে পারি। আপনি জানেন না বোধহয় কিরণের কেউ নেই, এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে। আর তা ছাড়া ও তো সকলের ভালোর জন্যেই এ কাজ করেছিল।

ভদ্রলোক এবার বললে—এ সব কথা থাক স্যার, এ লালবাজার, এখানে দেয়ালেরও কান আছে, আমি চলি—

ভদ্রলোক চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু আবার ফিরলো। বললে—একটা কথা, সেই মিস্ মাইকেলের মার্ডার কেসটার কথা মনে আছে তো আপনার? শেষ পর্যন্ত একটা ক্লু পাওয়া গিয়েছিল, তা জানেন তো? ওটা আমারই কেস কি না!

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলো—সেদিন মিছিমিছি আপনাকে ডাউট করেছিলাম, সেও মিস্টার ঘোষালের কথায়—

—মিস্টার ঘোষালের কথায় ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন পরে তার একটু ক্লু পাওয়া গেছে, সেই মিস্ মাইকেলের মার্ডারের পেছনেও মিস্টার ঘোষালের হাত রয়েছে। আমি ইনভেস্টি-গেটিং অফিসারের কাছে শুনেছি—

কথাটা বলে ভদ্রলোক চলেই যাচ্ছিল। ভেবেছিল হয়ত দীপঙ্কর কিছু বলবে। কিন্তু দীপঙ্কর তখনও নির্বাক হয়ে আছে। ভদ্রলোক যাবার সময় বললে—এখন অ্যাণ্টিকরাপশনের কেসের সঙ্গে সে চার্জটাও এসে পড়বে—

বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়াল না।

দীপঙ্কর ডাকলে—আর একট কথা শুনুন—

—কী বলছেন? আপনার কিছু ভাবনা নেই মশাই, আপনার জন্যে আমি চেষ্টা করবো, ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট না-হওয়া পর্যন্ত এখানে আপনাকে ডিটেন করে রাখা হবে—

—আমার কথা নয়, কিরণ চ্যাটার্জির কথা জিজ্ঞেস করছি। আমাকে রেখে দিয়ে ওর জন্যে বরং আপনি একটু চেষ্টা করুন।

—অসম্ভব। বড় সিরীয়াস চার্জ ওর বিরুদ্ধে। ওর ফাঁসি কেউ আটকাতে পারবে না।

বলেই ভদ্রলোক আবার দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। বাইরে লোহার দরজায় চাবির ঝন ঝন শব্দ হলো। বোঝা গেল এ-ঘর থেকে বাইরে যাবার পথ তার বন্ধ।

বাজারের জিনিসপত্রের দাম চড়া। কাশীকে নতুন করে হাঁড়ি-কলসী-বাসন কিনতে হলো আবার। সকাল বেলাটাই যা বাজার বসে। বিকেলের বাজার উঠে গেছে। বিকেল থেকেই দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন মিলিটারি লরী ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়। হাতে ব্রেন-গান উঁচিয়ে ধরে থাকে রাস্তার দিকে। যে কেউ সামনে আসবে তাকে গুলী করে মারবে বেপরোয়া। ছেলে-বুড়ো বাদ নেই। নতুন গাড়ি উঠেছে একরকম। সামনে লম্বা ছিপের মতন একটা লোহার শিক দাঁড় করানো। কোথাও গোলমালের খবর পাওয়া মাত্র ওয়ারলেসে খবর পাঠাবে হেড-কোয়াটার্সে। এতটুকু অসতর্ক হলেই ইণ্ডিয়া বেদখল হয়ে যাবে। জাপানীরা যদি এখানে আসেই তো যেন উপোস করে মরে। চাষীদের কাছে ধান চাল যা উদ্বৃত্ত আছে সব কেড়ে নাও। মিলিটারি আর সরকারী অফিসারদের খাবার জোগাবার জন্যে এজেন্ট রাখা হয়েছে। সেই এজেন্টরাই আবার সরকারের তরফে মাল কিনবে। কিনে গুদাম বোঝাই করবে। দরকার হলে সেই মাল চালান যাবে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইনে। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াতেও দরকার হলে চাল গম পাঠাতে হতে পারে। ইণ্ডিয়া সকলকে খাওয়াবে। সকলকে খাইয়ে ইণ্ডিয়ায় যদি কিছু পড়ে থাকে তো তখন খাবে ইণ্ডিয়ানরা। শ'ওয়ালেস, ইস্পাহানী এণ্ড কোং, মির্জা আলী আকবর, এইচ এল দত্ত এণ্ড সন্স, স্টীল ব্রাদার্স—এমনি সব কত এজেণ্ট। তারা বাজার থেকে ছ' টাকা চার আনা দরে চাল কিনে মিলিটারিকে বেচে এগার টাকা দরে। ফজলুল হক সাহেব তখন পুরো দমে রাজত্ব করে চলেছে। ব্ল্যাক-আউটের তলায় তখন আর এক ব্ল্যাক-আউট চলেছে। বাজারে গিয়ে লোকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

কেউ বলে—এ কি মশাই, পনেরো দিন আগে চাল নিয়ে গেছি ছ'টাকা দরে আর আজ হলো আট টাকা—?

দোকানদার হাসে। বলে—আজ আট টাকায় পাচ্ছেন, কাল হয়ত টাকা দিলেও পাবেন না—

—সে কি মশাই, চাল না পেলে খাবো কী?

—আপনার খাবার জন্যে তো গভর্নমেণ্টের ভারি মাথা-ব্যথা মশাই—। আমরা থাকলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী!

—কেন মশাই, আমরা ট্যাক্স দিই না? গভর্নমেণ্ট কি ওমনি খাওয়াচ্ছে?

দোকানদারের আর কথা জোগায় না। খদ্দেররা বলে—এ শালা গভর্নমেণ্টের

বারোটা বেজে এসেছে—

কিন্তু লোকে যাই বলুক, যার টাকা আছে তার কোনও ভাবনাই নেই। চালের দর বারো টাকাই হোক আর চার-বারোং আটচল্লিশ টাকাই হোক, তাদের কী! যত গন্ডগোল আপনার আর আমার। এই আমরা, যারা গরীব লোক। যারা হিসেব করে মাস চালাই। ইস্পাহানী সাহেবের কীসের ভাবনা? ফজলুল হক সাহেবেরই বা ভাবনা কী! এইচ এন দত্ত কোম্পানীরই বা ভাবনা কী? তারা গাড়ি চালাচ্ছে, সিনেমা দেখছে, রেস খেলছে। চাল কিনতে না-পাওয়া যায়, কেক খাবে তারা!

কাশী কথাগুলো শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মনে পড়লো বাড়ির কথা। মনে পড়তেই বললে—আমাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, আমার কাজ আছে—

—দাঁড়া না বাবা, তোরই কেবল কাজ আছে, আর আমাদের নেই?

কাশী একটু নরম হলো। বললে—আমাদের বাড়িতে কেউ নেই, দিদিমণিকে একলা রেখে এসেছি, এই এখন চাল-ডাল নিয়ে যাবো তবে রান্না চড়বে—

—কোন্ বাড়ি তোমাদের? কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে এ স্টেশন রোডে।

এতক্ষণে সবাই চাইলে কাশীর দিকে।

—আরে তোমাদের বাড়িতেই বুঝি কালকে মিলিটারি পুলিস এসেছিল? শুনলুম দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে? বোমা-টোমা সব পেয়েছে?

কাশী বললে—আমার বাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে—বাড়িতে কেউ নেই সকাল থেকে। একলা মেয়েমানুষকে রেখে চলে এসেছি বাজার করতে—সব জিনিসপত্র ভেঙে তচ-নচ করে দিয়েছে তারা—

আরো অনেক কিছু খবর শুনতে চেয়েছিল তারা। না-পেয়ে একটু যেন হতাশ হলো। অথচ বাজারে অনেক রকম গুজব রটে গেছে। জাপানীরা আসছে কলকাতায়। এসে পড়লো বলে। তা আসুক মশাই। জাপানী আসুক আর জার্মানীই আসুক আমাদের যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। আমরা যে আঁধারে সেই আঁধারে।

—শুনেছেন, বিহারের কংগ্রেস মিনিস্টার জুগলাল চৌধুরী কি করেছে? সারন জেলায় একটা পুলিসের থানা পুড়িয়ে দিয়ে থানার দারোগাকে থলের ভেতরে পুরে গন্ডাকের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে?

—আর মশাই, যেসব কান্ড হচ্ছে তা শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। চম্পারণ ডিস্ট্রিক্টে কী হয়েছে জানেন? সবাই ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেছে।

দোকানদার হাতে কাজ করছে আর মুখে কথা বলছে।

—কিন্তু এত টাকা আসছে কোত্থেকে মশাই? কে দিচ্ছে বলুন তো?

একজন বললে—বিড়লারা দিচ্ছে—

—কেন, বিড়লার স্বার্থ কী মশাই? হঠাৎ মাড়োয়ারীরা এত সাধু হয়ে গেল

কেন বলুন তো?

—আছে মশাই আছে, মতলব আছে।

কিন্তু তখন কাশীর দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে দুহাতে ঝুলিয়ে নিলে। বেশী দূরে নয়। লাইনটা পেরিয়ে একটু হাঁটলেই বাড়িটা। ভদ্রলোকরা তখনও আলোচনা করতে লাগলো। আজকাল এই রকম সারাক্ষণই আলোচনা হয় পথে ঘাটে। দু'তিনজন লোক জড়ো হলেই আলোচনা চলে। জিনিসপত্রের দাম নিয়েই প্রথমে শুরু হয়। তারপর ওঠে যুদ্ধের কথা। তারপর ওঠে কংগ্রেসের কথা। তারপর ওঠে সুভাষ বোসের কথা। সুভাষ বোস নাকি রেডিওতে লেকচার দিয়েছে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু বিশ্বাস করতেই সকলের ভালো লাগে। এ মিনিস্ট্রি আর সহ্য হয় না মশাই। এরা দুহাতে টাকা লুঠছে, আর আমাদের বেলায় দেখাচ্ছে মিলিটারি। কেউ বলে—কিন্তু এত চাল কোথায় গেল মশাই?

—সব মিলিটারির পেটে যাচ্ছে—

—আপনি ছাই জানেন। খবরের কাগজ পড়ে আপনি ওই কথা বলছেন। দেখে আসুন গিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বিরাট বিরাট সব গো-ডাউন করে চাল জমাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ মণ চাল—

—কেন?

—আর কেন, জাপানীদের ভয়ে। জাপানীরা এসে পাছে ধান-চাল পেয়ে যায়, তাই সব জড়ো করে গুদামে রাখছে। যেই তারা এসে পড়বে আর অমনি সব চাল গঙ্গায় ফেলে দেবে হুড় হুড় করে—

বাড়ির কাছে আসতেই কাশী অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কী? বাড়ির সদর দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে। হন হন করে ঘরে ঢুকেই কাশী চেয়ে দেখলে অচেনা এক ভদ্রলোক চুপ করে বসে আছে বাইরের ঘরে।

—কে আপনি? কাকে চাই?

—দীপঙ্করবাবু আছেন?

কাশীর রাগ হয়ে গেল। বললে—আপনি বাড়িতে ঢুকলেন কেন না বলে করে? কে আপনাকে দরজা খুলে দিলে?

—আমি এসেছিলুম দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

—দেখা করতে এসেছেন তো, বাড়িতে কেন? আপিসে যেতে পারেন না? বাড়িতে তো দেখা করেন না আমার বাবু।

কাশী হাতের জিনিসপত্রগুলো মেঝের ওপর রাখলে। বড় ভারি লাগছিল। বললে—আপনি এখন যান, বাবু বাড়িতে নেই—

—কিন্তু বাড়িতে তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি একটা কথা বলবার ছিল।

কাশী বলল—আচ্ছা মুশকিল তো, বলছি বাবু বাড়িতে নেই—

—বাড়িতে নেই তো কোথায় গেছেন? আমি তো আপিস থেকেই আসছি।

আজকে তো আপিসে যাননি তিনি।

কাশী জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি বাবুর আপিসে চাকরি করেন?

—হ্যাঁ, আমার নাম লক্ষ্মণ সরকার। আমার নাম বললেই তোমার বাবু চিনবেন, তুমি গিয়ে বলো আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি—

কাশী বললে—আমি বলছি তো বাবু বাড়িতে নেই—

—কোথায় গেছেন?

কাশী একবার ভাবলে। সব কথা বাইরের লোককে বলা নিরাপদ কি না তাও ভেবে দেখলে। তারপর বললে—তা সব কথাই কি আপনাকে বলতে হবে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—তাহলে তিনি বাড়ি এলে বোল, আমি এসেছিলুম, আমার নাম লক্ষ্মণ সরকার। আমার চাকরি তোমার বাবুই করে দিয়েছিলেন। এখন মুশকিল হয়েছে বড়বাবুরা আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। কে-জি-দাশবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার বড়বাবু, তিনিই পেছনে লেগেছেন, সেই সব কথাই বলতে এসেছিলাম আর কি!

এতক্ষণে কাশীর বিশ্বাস হলো। বললে—তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, বাবুকে পুলিসরা ধরে নিয়ে গেছে—

—সে কী? কেন? বাবু কী করেছিলেন?

কাশী বললে—তা জানি না, শেষ-রাত্তিরের দিকে বাবু চলে গেছেন, একটা টাকা-পয়সা নেই হাতে, হাঁড়ি-কুঁড়ি সব ভেঙে দিয়েছে, তাই এখন এই সব কিনে আনছি, আমি বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম কেউ ঠেললেও যেন দরজা না-খোলে—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি তো এসব জানতুম না, আমি ঠিকানা নিয়ে বাড়ি খুঁজে এসে দরজার কড়া নেড়েছি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর তবে দরজা খুলেছে। বাবুকে পুলিসে ধরলে কেন?

কাশী বললে—তা কী করে জানবো?

—তোমার বাবু তো খুব ভালো লোক। তাকে কেন ধরতে গেল পুলিসে?

কাশী বললে—একজন স্বদেশী লোক আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, তাকে ধরেছে, তাই বাবুকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে—বাড়িতে এখন আমি আর দিদি-মণি ছাড়া কেউ নেই—

—দিদিমণি?

লক্ষ্মণ সরকার অবাক হয়ে গেল। বললে—দীপঙ্করের তো ভাই-বোন কেউ ছিল না। ও তো মায়ের এক ছেলে ছিল। এ কোন্ দিদিমণি তোমার?

কাশী বললে—আপনি চিনবেন না, বাবুর নিজের কেউ নয়, দেশের একজন আত্মীয়—আমাদের এখানেই থাকেন—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি তো বুঝতে পারিনি, ওঁকে কিছু মনে করতে বারণ কোর, আমি এসে দরজা ঠেলতে উনিই খুলে দিলেন, উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি কে, তাই আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম—উনি কে! তারপর হঠাৎ

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর আমি সেই থেকে চুপ করে বসে আছি। কাকে ডাকবো বুঝতে পারছিলাম না, এমন সময় তুমি এলে—

কাশী বললে—আপনি এখন উঠুন বাবু, আমি এই বাজার করে আনলুম, এখন রান্না-বান্না হবে তবে খাওয়া-দাওয়া করবো আমরা—কাল রাত থেকে আমরা না খেয়ে আছি—

অপরাধীর মত লক্ষ্মণ সরকার উঠলো। বললে—তাহলে আমি উঠি এখন—

—হ্যাঁ, আপনি যান—

আরো যেন অনেক কথা বলবার ছিল লক্ষ্মণ সরকারের। কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। বাইরে আসতেই কাশী সশব্দে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। লক্ষ্মণ সরকার ট্রামে উঠেও ভাবতে লাগলো দীপঙ্করকে ধরলে কেন পুলিসে! কী কারণ থাকতে পারে? ঘোষাল-সাহেবের মত দীপঙ্করও কি ঘুষ নিয়েছিল।

আপিসে ঢুকেই যাকে সামনে পেলে তাকেই বললে—শুনেছেন পুলিনবাবু, আমাদের সেন-সাহেবকে পুলিস ধরেছে?

পুলিনবাবু টিফিন-রুমের দিকে যাচ্ছিল। বললে—বলেন কী? কে বললে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—এই তো, এখনি শুনে এলাম—

কথাটা রটতে রটতে সারা আপিসে ছড়িয়ে গেল। পুলিনবাবুর কাছ থেকে হরিশবাবু। হরিশবাবুর কাছ থেকে গোবিন্দবাবু। গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে সুধীরবাবু। এক সেকশান থেকে আর এক সেকশানে। এক আফিস থেকে আর এক আপিসে। ট্র্যাফিক আপিস থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ। ইঞ্জিনীয়ারিং আপিস থেকে অডিট আপিসে। কোনও আপিস আর বাদ গেল না। কণ্ট্রোলার-অব-স্টোরস, টেলিগ্রাফ, সর্বত্র এক আলোচনা। মিস্টার ঘোষাল অ্যারেস্ট হবার পর যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি। কেউ বললে—তিন হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে—

গোবিন্দবাবু বললে—তিন হাজার টাকা কে বললে? আমি শুনলাম সাত হাজার—

সাত হাজার শেষে দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছুলো।

লক্ষ্মণ সরকার নিজের সেকশানে চুপ করে বসে ছিল। কবে সে একদিন কালিঘাটের পাড়ার বখাটে ছেলের দলে মিশে নিজেও বখাটে হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই পুরোন ক্লাশফ্রেন্ড দীপঙ্করের দয়াতেই তার চাকরি হয়েছে। কে-জি-দাশবাবু বার বার তাকে আপিসের সকলের সামনে অপদার্থ প্রমাণ করতে চাইছে। এই সময় দীপঙ্করও যদি তার পুরোন অপমানের কথা মনে রেখে তার চাকরি খতম করে দেয়, তখন আর তার কোনও গতিই থাকবে না। সেই কথা বলতেই লক্ষ্মণ সরকার গিয়েছিল দীপঙ্করের বাড়িতে।

কে-জি-দাশবাবু হঠাৎ ডাকলে। বললে—লক্ষ্মণবাবু, এদিকে একবার

আসুন তো—

লক্ষ্মণ সরকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—আমাকে ডাকছিলেন ?

কে-জি-দাশবাবু বললে—আপনি তো সেন-সাহেবের লোক ?

লক্ষ্মণ বললে—হ্যাঁ—

—আপনি শুনেছেন বোধহয় যে সেন-সাহেবকে অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্ট-মেন্ট থেকে ধরে নিয়ে গেছে। মিস্টার ঘোষালের যে গতি হয়েছে, সেন-সাহেবেরও সেই গতি হবে! যদি বিশ্বাস না-হয় তো ট্রানজিট সেকশানের পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন—

লক্ষ্মণ সরকার কিছু কথা বললে না।

কে-জি-দাশবাবু আবার বলতে লাগলো—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা বিশ্বাস হবে কেন? আপিস-সুদ্ধ সবাই সেন-সাহেবের নাম করতে অজ্ঞান—নাকি অমন অনেস্ট সাহেব হয় না। এখন কোথায় রইল অনেস্টি ?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—তা আমাকে এসব কথা বলছেন কেন ?

—তা আপনাদের বলবো না তো কাকে বলবো ? আপনারাই তো সব সেন-সাহেবকে নিয়ে মাথায় তুলেছিলেন, বলতেন, বড় ট্রুথফুল লোক, রেলের আপিসে অমন সৎ লোক কখনও আসেনি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। এখন হলো তো? বিশ্বাস না হয় পুলিনবাবুকে জিজ্ঞেস করে আসুন—তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন, পুলিস ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। মার্চেন্টদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নগদ ঘুষ নিচ্ছিল—

কালিদাসবাবু বললে—সত্যি? দশ হাজার টাকা ?

—আরে এতদিন রেলে কাজ করেছি আর রেলের অফিসারদের চিনবো না ? এই আপনি যেখানে বসছেন, ওইখানেই তো বসতো সেন-সাহেব। নিজে আমি হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, ড্রাফট লিখতে শিখিয়েছি, এক বর্ণ ইংরিজি জানতো না, তাও লিখতে শিখিয়েছি—আমি চিনবো না সেন-সাহেবকে? যান না, পুলিন-বাবু আপিসে আসবার সময় নিজের চোখে দেখে এসেছে—তার মুখেই শুনে আসুন গিয়ে, সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি আমি—

লক্ষ্মণ সরকার হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটবেলায় সেও বদমায়েশি করেছে, অতিষ্ঠ করে তুলেছে পাড়ার লোকদের, কিন্তু রেলের আপিসের এ জিনিসের নমুনার সাক্ষাৎ এই-ই তার প্রথম। লক্ষ্মণ সরকার যে লক্ষ্মণ সরকার—সেও নির্বাক হয়ে রইল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

আর বিংশ শতাব্দীর মাঝপথে এসে হঠাৎ যুগটাও যেন বড় জটিল হয়ে উঠলো। এ বিশ্বাসের যুগও বটে, আবার অবিশ্বাসের যুগও বটে। গড়ারও যুগ, আবার ভাঙারও যুগ। ঘর-সংসার-পরিবার-রাষ্ট্র সব ভেঙে চুরে একাকার হবার জোগাড়। আবার ঘর-সংসার-পরিবার-রাষ্ট্র যেন নতুন আকার নেবার জন্যেও

অস্থির। নতুন করে যেন সব নবরূপ নেবে, তাই ভাঙার জন্যে এত উন্মুখ। পরি-বারের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, মানুষের সম্পর্কে গ্রন্থি বেঁধেছে, অর্থ-নীতির মানদণ্ডে মনুষ্যত্বের বিচার হচ্ছে। যে স্ত্রী, সে আর স্ত্রী নয়, যে স্বামী সে আর স্বামী নয়, যে মনিব তার মনিবত্ব ঘুচে গেছে, যে মানুষ, সে পশুত্ব বরণ করেছে। বড় জটিল যুগের আবর্তে এরা জড়িয়ে গেল—এই দীপঙ্কর, এই লক্ষ্মীদি, এই মিস্টার ঘোষাল, এই সনাতনবাবু, এই নয়নরঞ্জিনী দাসী, এই ছিটে-ফোঁটা, এই সুধাংশু, এই দাতারবাবু, আর সকলের শেষে এই সতী!

রাত্রে সতীর ঘুম হয়নি। সমস্ত রাত। সেই হাসপাতাল থেকে আসার পরই এ বাড়িতে এসে সমস্ত কিছু দেখে কেমন হতচকিত হয়ে গেছে। সব তার মনে পড়েছে। সেই পুরোন অতীত থেকে আজকের বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত। বাইরে থেকে হাসির টুকরো আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এসেছে আর একে একে সমস্ত অতীতটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কী চমৎকার ঘর। দামী জানালা-দরজা। দামী ফার্নিচার, দামী পর্দা। সমস্ত কিছু দামী।

লক্ষ্মীদি বলেছিল—তুই একটু ঘুমো এখন, ভোর বেলা দীপু এলে তখন ডাকবো তোকে—

তারপর লক্ষ্মীদি চলে যাবার পর ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল সতী, কিন্তু কোথা থেকে যেন কী এসে সব ঘুম পণ্ড করে দিয়েছিল।

রাত বোধহয় তখন তিনটে, তখনই অনেক গাড়ির শব্দ হলো বাইরে। মিস্টার হনসরাজ এল, মিস্টার মাধো এল, মিস্টার লালচাঁদ এল। মিস্টার সিংও এল। লক্ষ্মীদিও বোধহয় কোথাও বেরিয়েছিল তাদের সঙ্গে—সেও ফিরে এল। কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাড়িটা একটু শান্ত হয়েছিল। একটু নিস্তব্ধ। আবার হাসি-কথা-গল্পের আওয়াজ কানে এল। আবার মালপত্র সরানোর শব্দ। শব্দের তরঙ্গের আঘাতে সতীর মনের শান্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

রাত চারটের সময় সতীর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।—সতী! সতী!!

সতী তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়েছে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিও যেন সারা রাতই ঘুমোয়নি সতীর মত। লক্ষ্মীদির চোখের কাজল তখন যেন আরো কালো হয়েছে। লক্ষ্মীদির ঠোঁটের রং যেন আরো গাঢ় হয়েছে।

—রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো তোর ?

সতী বললে—না।

—বুঝতে পেরেছি, নতুন জায়গায় তো ঘুম হবেই না। এখন চারটে বেজেছে আমরা তৈরি হয়েছি—

সতী বললে—দীপু এসেছে ?

লক্ষ্মীদি বললে—না, এখনও আসেনি, এইবার বোধহয় এসে পড়বে। তা

তুই কিছু ভাবিসনি, আমার তো সব রইল এখানে—এই দ্যাখ,—তুই দেখে যা—

সেই রাত্রেই লক্ষ্মীদি সতীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সব দেখালে। কোথায় রান্নাঘর, কোথায় বাথরুম, কোথায় স্টোর।

—চাল, ডাল, সব কিছু রয়েছে, এখন কয়েকদিন তোকে কিছুই কিনতে হবে না। আর তোর কাছে টাকা আছে তো?

সতী বললে—না—

—তাহলে এই টাকা ক'টা রাখ তোর কাছে, এই নে—

বলে পার্স খুলে কয়েকটা নোট দিলে সতীর হাতে। বললে—বাবার টাকা তো কলকাতার ব্যাঙ্কে রয়েছে, পরে হিসেব করে নেবখন—আর আমি তো আসছিই মাসখানেক পরে—

—তুমি আবার আসবে?

—আসবো না? তুই বলছিস কী? কলকাতা ছাড়লে আমার চলে? কলকাতাতেও তো আমার বিজনেস রয়েছে রে। তা ছাড়া বাবার সাকসেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে না কোর্ট থেকে! সব টাকা তো আমাদের দু' বোনের। দাঁড়া আমি আসছি—

লক্ষ্মীদি বড় ব্যস্ত। বাড়িতে অনেক গেস্ট জড়ো হয়েছে।

তারপর পাঁচটা বাজল ঘড়িতে। বাইরের আকাশ পাতলা হয়ে এল। লক্ষ্মীদির গাড়ি তৈরি। সকলের গাড়িই তৈরি। যাবার আগে লক্ষ্মীদি আবার এল। সতী বললে—দীপু তো এল না—

লক্ষ্মীদি বললে—আসবে আসবে! তার জন্যে তুই অত ভাবছিস কেন? আর রঘু তো রইলই, আমার বহুদিনের পুরোন চাকর। দীপু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার তো আর ওয়েট করা চলবে না ভাই—দীপু এলে বলিস আমি চলে গেছি, একটা সাকসেশন সার্টিফিকেট যেন জোগাড় করবার ব্যবস্থা করে, আমাকে চিঠি লিখলেই আমি কাগজপত্র সই করে পাঠিয়ে দেব—

তারপর একটু থেমে বললে—যা, তোকে আর বাইরে আসতে হবে না—রঘু দরজা বন্ধ করে দেবে খন—

সকলের সদলবলে চলে যাবার শব্দটাও কানে এল তারপর। অনেকগুলো গাড়ি এক সঙ্গে স্টার্ট দিলে। ঘরের ভেতর থেকে সতীর কানে এল সমস্ত। এইবার হয়ত দৌড়তে দৌড়তে দীপু আসবে! হয়ত দীপু ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে তো জাগিয়ে দেবার কেউ নেই। হয়ত এসেই দেরি করার জন্যে ক্ষমা চাইবে!

জানালার বাইরে আরো সকাল হলো। ছটা বাজলো। সাড়ে ছটা।

বাইরে যেন কোথায় সদরে দরজা খোলার শব্দ হলো একটা। তারপর জুতোর আওয়াজ। তারপর......

তারপর সতীর ঘরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

ওই দীপু! ওই দীপু এসেছে।

সতী ভেতর থেকে বললে—কে?

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে।

দীপু নয় রঘু। রঘু বললে—চা করে দেব দিদিমণি?

সবে ভোর হয়েছে। সতীর মনে হলো যেন তার জীবনেরও নতুন করে ভোর হলো। এমন করে লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসে তাকে আবার এ-ভাবে জীবন শুরু করতে হবে তা সে কোনওদিন কল্পনা করতে পারে নি।

সতী বললে—দীপঙ্করবাবুকে তুমি চেন?

রঘু বললে—হ্যাঁ, তিনি দুএকবার এসেছেন এ-বাড়িতে—

—তাঁর বাড়ি চেনো?

রঘু বললে—না—

সতী বললে—সেই বাবুর আসবার কথা আছে এখানে। যদি আসেন তো আমার ঘরে নিয়ে এসো তাঁকে—

আজো দীপঙ্করের মনে আছে সতীর সেই কথাগুলো। আর শুধু সতীর কথাই বা কেন? দীপঙ্করের জীবনের সঙ্গে যতগুলো জীবন জড়িয়ে গিয়েছিল, সকলের সব কথাই মনে আছে। এই সনাতনবাবু, এই মিস্টার ঘোষাল, ওই ছিটে-ফোঁটা, ওই ক্ষীরোদা, নির্মল পালিত, ওই প্রাণমথবাবু, সকলের জীবনের জটিল জালে দীপঙ্কর যে জড়িয়ে গিয়েছিল। ওরা যেন এক-একজন ব্যক্তি নয়, ওরাই যেন সমস্ত কলকাতা। ওরাই যেন কলকাতার চলমান যুগ। ওদের বাদ দিলে যেন কলকাতার ভূগোলও বাদ দিতে হয়, কলকাতার ইতিহাসকেও বাদ দিতে হয়। ওদের মধ্যেই যেন কলকাতার প্রাণধর্মের মানচিত্র স্পষ্ট রূপ পেয়েছিল।

নিঃসঙ্গ নিরিবিলি বাড়িটা। একদিন এই বাড়িটাকেই পাড়ার লোকে বাইরে থেকে কত উজ্জ্বল দেখেছে। আবার এই বাড়িটাই হঠাৎ নিঝুম হয়ে গেল রাতা-রাতি। আগে কোথা থেকে কত গাড়ি আসতো, বাড়ির সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ভেতরের নরম আলোর নিচেয় যৌবনের উন্মাদ ফোয়ারা ছুটতো, টাকার অকৃপণ ঔদার্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত। সব যেন আবার হঠাৎ স্তিমিত হয়ে এল।

প্রথম দিকে একটু অসুবিধে হয়েছিল সতীর। প্রথম প্রথম ট্রেনের শব্দ, ইঞ্জিনের হুইসল্, থান্ থান্ করে ভেঙে চুরমার করে দিত সতীকে। তারপর আস্তে আস্তে সব সহ্য হয়ে এল। শব্দও সহ্য হয়ে এল, নিঃসঙ্গতাও সহ্য হয়ে এল। একদিন শুরু হয়েছিল কোথায় কোন্ সমুদ্রপারের কোন্ একটা নির্জন নিরিবিলি শহরে। তারপর অনেক শব্দ-তরঙ্গ পরিক্রমা করে যেন আবার সেই শৈশবের নিঃসঙ্গতায় ফিরে এসেছিল।

সতী বলেছিল—প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হতো দীপু, মনে হতো আমার যেন দ্বীপান্তর হয়েছে—অনেক অপরাধের শাস্তি হিসেবে এখানে আমি এক-একা দ্বীপান্তর-বাস করছি, আজীবন যেন দ্বীপান্তর-বাসই করতে হবে এমনি করে—কিন্তু তারপর সমস্ত সহ্য হয়ে এল, মনে হলো এই নিঃসঙ্গতাই বুঝি আমার

দরকার ছিল।

দীপঙ্কর বলেছিল—এবার আমি বাড়ি যাই সতী, অনেক রাত হলো—

সতী বলতো—আমার জন্যে না-হয় একটু রাতই করলে—

দীপঙ্কর বলতো—আমি তো রোজই আসি, আবার কালই তো আসবো—

সতী বলতো—জানি, তবু মনে হয় আমার যেন কিছুই বলা হলো না—

—কিন্তু আর কী করবার আছে বলো?

সতী আপন মনে একটু ভাবতো। কেমন যেন দ্বিধা করতো একটু। তারপর বলতো—উনি কেমন আছেন?

কথাটা বলেই সতী যেন কেমন লাল হয়ে উঠতো। সমস্ত শরীরে কেমন এক লজ্জা জমে উঠতো হঠাৎ। আর দীপঙ্কর সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠতো। বলতো—আমি এখনি যাচ্ছি, তাঁকে নিয়ে আসছি তোমার কাছে, এখখুনি—এ-কথা আগে বলো নি কেন?

আর প্রতিবাদের সুরে তীক্ষ্ম হয়ে উঠতো সতী। বলতো—না দীপু, না না—তোমার পায়ে পড়ছি, এখানে তাঁকে এনো না—কখনও এনো না—

কোথায় কেমন করে সব বিলীন হয়ে যায়। কেমন করে জীবনের নদী মৃত্যুর সমুদ্রে গিয়ে মেশে কে বলতে পারে! একদিন যে-জীবন আনন্দে, আকাঙ্ক্ষায়, যন্ত্রণায় উচ্ছল হয়ে ওঠে, সেই জীবনই আবার এক-এক সময় কেমন স্থির, শান্ত, নিরুদ্বেগ হয়ে আসে। উচ্ছলতার যেমন কোনও কারণ থাকে না, প্রশান্তিরও তেমনি কোনও ব্যাখ্যা মেলা ভার হয়ে ওঠে। সব হারিয়ে সব পাওয়ার কথাটা তো দর্শনের কথা। ওটা বইতে পড়তে ভালো। কিন্তু জীবনে যে সমস্ত হারায় তার কাছে সান্ত্বনা কোথায়? কার কাছে সে হাত পাতবে? কিন্তু তবু কোথা থেকে যে শান্তি এসেছিল মনে কে বলবে? কারোর কাছে সে কিছু চায়ও নি, কিছু পায়ও নি। তাই কোথাও, মনের কোনও কোণেও যেন তার কোনও অভাব নেই। অভাব নেই বলে অভিযোগও ছিল না সে কদিন।

প্রথম দিনটা এমনি করেই কাটলো। ট্রেনগুলো লাইনের ওপর দিয়ে যায় আর আসে। আসে আর যায়। বাড়ির কাছাকাছি এলে শব্দটা একটু প্রখর হয়। মাটি কাঁপে। তারপর আবার সব স্থির হয়ে আসে। দুপুরবেলা রাস্তা দিয়ে মিলিটারি লরীগুলো যায়। ধুলো ওড়ে। আবার সব শান্ত। তখন দু-একটা লোক পায়ে হেঁটে যায় এধার থেকে ওধারে। আর জানালার ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দেখা যায় দু'জোড়া রেল-লাইন খোয়া বিছোন সমতল মাটির ঢিবির ওপর এঁকে বেঁকে শুয়ে আছে। আর তার ওধারে শুধু মাঠ, শুধু গাছ আর চিক্ চিক্ করা জল। জল আর জল।

বিকেল বেলাটা সেই জায়গাটাই আবার ঝাপ্সা হয় আস্তে আস্তে। সূর্যটা ডুবে যায় একেবারে আকাশ লাল করে। তখন আর কিছু দেখা যায় না। আশে-পাশের ঝোপ্-ঝাড় থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করে। শেষবারের মত

জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে আর একবার দেখে নিলে। কে যেন ব্ল্যাক-আউটের ভেতরে হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে না! দীপু নাকি! দীপুই হয়ত। হয়ত সকালবেলা সময় পায়নি। কিম্বা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সতী ডাকলে—রঘু—

রঘু রান্নার জোগাড় করছিল। কাছে আসতেই সতী বললে—রঘু, দীপঙ্কর-বাবু আসছে, সদর দরজাটা খুলে দাও তো তাড়াতাড়ি—

দীপঙ্কর ততক্ষণ অনেক এগিয়ে এসেছে। লেভেল-ক্রসিংটা পেরিয়ে একেবারে হাতের কাছে। একেবারে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো সতী। কিন্তু কাছে আসতেই মনে হলো—কই এ তো দীপঙ্কর নয়! এ তো অন্য লোক। বাড়ির সামনে দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

—ছোটদিদিমণি, কই দীপঙ্করবাবু তো আসেনি।

সন্ধ্যেবেলায় খাবার সময় সতী জিজ্ঞেস করলে—তুমি ভবানীপুর চেনো রঘু?

—ভবানীপুর? নাম শুনেছি ভবানীপুরের, ওদিকে যাইনি তো কখনও?

—প্রিয়নাথ মল্লিক রোড?

—না দিদিমণি।

সতী বললে—আচ্ছা, তোমায় যদি আমি জায়গা বলে দিই তুমি যেতে পারবে? কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে যেতে হবে বলে দিলে তুমি যেতে পারবে না?

রঘু বললে—আমি হারিয়ে যাবো ছোটদিদিমণি। রাস্তা হারিয়ে যাবো।

সতী জিজ্ঞেস করলে—তুমি এতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছো আর এখনও কলকাতা চেনো নি?

রঘু বললে—আমি তো কেশবের লোক, কেশব আমাকে দেশ থেকে আনিয়েছে। আমার বাড়ি বালেশ্বর—

রাত্রিবেলা শুতে যাবার আগে হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠলো। ওই!

—রঘু, ওই দীপঙ্করবাবু এসেছেন—

তাড়াতাড়ি সতী বিছানা ছেড়ে উঠলো। দেয়ালের আয়নাতে একবার মুখটা দেখে নিলে। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছেও নিলে। চুলটা খোঁপাটা ঠিক করে নিলে। তারপর শাড়িটা গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোল। এই এত রাত করে আসতে হয়! যদি সতী ঘুমিয়ে পড়তো। হয়তো আপিসের কাজে বড় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু একদিন আপিস না-গেলে কী হতো!

রঘু ফিরে এসে বললে—আপনাকে একজন ডাকছেন ছোটদিদিমণি—

—আমাকে? কে? দীপুবাবু?

রঘু বললে—না, দীপুবাবু নয়, এ অন্য লোক—

—তা আমার সঙ্গে তার কীসের দরকার? আমাকে চেনে?

রঘু বললে—তা জানি না, বললে তোমার দিদিমণিকে ডেকে দাও—

সতী একটু অবাক হয়ে গেল। সতী যে এখানে আছে তা কে আর জানে!

একমাত্র দীপু ছাড়া আর কার জানবার সুযোগ হয়েছে! তবে হয়ত দীপু নিজে না আসতে পেরে লোক পাঠিয়েছে খবর দিয়ে।

সতী সদর দরজার সামনে গিয়ে বললে—কাকে চাই?

ময়লা সার্টের ওপর পাতলা একটা আলোয়ান গায়ে। রোগা, চোয়াড়ে মুখ। দেখলেই কেমন যেন ঘেন্না হয়। তার ওপর দয়া আকর্ষণ করবার জন্যে দাঁতের পাটি বার করে হাসবার চেষ্টা করছে। সতীর মুখের দিকে সোজা চেয়ে আছে হাবার মত।

সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—কাকে চাই তোমার?

লোকটা বেশ নিচু হয়ে নমস্কার করলে হাত-জোড় করে। তারপর বললে—আর একজন দিদিমণি ছিলেন, তিনি কোথায়?

সতী বললে—তিনি নেই, তিনি দিল্লি চলে গেছেন, কী চাই তোমার?

—আজ্ঞে, আমি গরীব লোক, বড় অভাব, তিনি আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন, তিনি আমাকে আসতে বলেছিলেন—

—কীসের জন্যে আসতে বলেছিলেন?

লোকটা বললে—মাঝে মাঝে দু'-পাঁচ টাকা দিয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতেন—

—তা তিনি তো নেই এখানে, তিনি দিল্লি চলে গেছেন।

—কবে আসবেন?

সতী বললে—তার কোনও ঠিক নেই। একমাস পরেও আসতে পারেন, আবার কখনও নাও আসতে পারেন,—

লোকটা কী যেন ভাবলে মনে মনে। তারপর একটু দ্বিধা করে বললে—তাহলে আপনি কিছু সাহায্য করুন না, আমি খুব গরীব লোক, আমার মা'র অসুখ, আমার নাবালক দুই ভাই আছে, এক বোনের বিয়ে দিতে হবে......সেই দিদিমণি সব জানতেন আমার কথা।

সতী বললে—আমি কিছু দিতে পারবো না—

—যদি দিতেন বড় উপকার হতো৷

সতীর তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। বললে—বেশি বিরক্ত কোর না তুমি, এখন যাও, এখন শুতে যাবো আমরা—

লোকটা তখনও অনুনয় করতে লাগলো। বললে—দেখুন, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে এখানে আসছি, তাই এত দেরি হয়ে গেছে, এখন আবার সেই টালিগঞ্জে ফিরে যেতে হবে—

সতী আরো রেগে গেল। বললে—বার বার বলছি, তবু শুনছো না কেন!, বলছি এখানে হবে না, অন্য জায়গায় দেখো—

তারপর আর কথা না-বাড়িয়ে রঘুকে দরজা বন্ধ করতে বলে নিজের ঘরে চলে এল সতী। রঘু আসতেই সতী জিজ্ঞেস করলে—তুমি দরজা বন্ধ করে

দিয়েছ তো ভালো করে?

আশ্চর্য! এই ব্ল্যাক-আউটের রাতে যাকে তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই কি ঠিক! আবার অন্ধকারে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সতী বিছানায় শুয়ে পড়লো। সমস্ত দিনের প্রতীক্ষার ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে! সেই উনিশ-শো বিয়াল্লিশের একটা তারিখের অর্ধ প্রহর রাতে একটি মানুষ নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় হয়ে উঠেছিল পরের বাড়িতে। সংসারের কোনও মানুষের ওপরই তার কোনও অধিকারের মোহ তখন ছিল না আর। যে-টুকু অধিকার-বোধ তখনও অবশিষ্ট ছিল, তা-ও যেন তখন নিঃশেষ হয়ে গেল। একদিন কত স্বপ্ন, কত কল্পনা ছিল তার। কত অনুরাগ ছিল, কত রোমাঞ্চ। কখনও অভিমান করেছে, কখনও অনুযোগ। তার মধ্যেকার আসল মানুষটাকে কেউ দেখতে চাইল না, কেউ জানতেও চাইল না, কেউ জেনেও বুঝতে চাইল না।

মানুষকে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাবার প্রয়োজন হয়। কে জানতো একদিন এই নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ আশ্রয়ের মধ্যেই তাকে আজ আত্মগোপন করতে হবে! কোথায় গেল সেই সমুদ্র-পারের খোলা আকাশ আর কোথায় সেই কালিঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অন্ধ সঙ্কীর্ণতা। ঠিক তারপরেই সেই প্রিয়-নাথ মল্লিক রোডের অদৃষ্ট বিধাতাপুরুষ একদিন নিজের হাতেই বুঝি খাঁচার দরজাটা দয়া করে খুলে দিলেন। আর সে উড়তে উড়তে একেবারে ব্যাধের বন্দুকের নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকেই বা কে তাকে উদ্ধার করলে? সে-ও কি তার বিধাতা-পুরুষ?

বাবা বলতো—আমি তো একদিন বুড়ো হবো মা, একদিন আমিও আর থাকবো না সংসারে, সেদিন তোমাদেরই তো সব দেখতে হবে এসব—তোমাদের দুই বোনকেই তো সব দেখতে হবে—

আজ যদি বাবা দেখতে পেতেন! আজ যদি অন্য সকলের মত বাবা কলকাতায় এসে পৌঁছোতেন! বিয়ের দিনও বাবা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তখন বেনারসী শাড়ি পরে শ্বশুর-বাড়ি যাবার লগ্ন। স্বামী পাশে রয়েছেন। গাঁটছড়া বাঁধা। কাকাবাবুকে প্রণাম করেছিল, কাকীমাকে প্রণাম করেছিল, শেষে কাঁদতে কাঁদতে বাবাকেও প্রণাম করেছিল সতী৷

বাবা বলেছিলেন—চিরসুখী হও মা—

বাবারও তখন হয়ত গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট! ওইটুকু কথা বলতেও যেন বাবার সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠেছিল সেদিন! বাবা, তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি আমাকে সৎপাত্রের হাতেই তুলে দিয়েছিলে। সদ্বংশেই তুমি আমার বিয়ে দিয়েছিলে। তুমি আমার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করোনি। এমন সংসারে কম মেয়েরই বিয়ে হয়। আপন মায়ের চেয়েও মমতাময়ী শাশুড়ী পেয়েছিলাম। তুমি কোনও অন্যায় করোনি। আমারই কপালের দোষ বাবা। আমার কপালেই অত সৌভাগ্য সইল না। আমার কপালে

কষ্ট থাকলে তুমি কী করবে বাবা। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

—দিদিমণি। দিদিমণি।

হঠাৎ রঘুর ডাকে চমকে উঠলো সতী। খট্ করে বারান্দাটায় আলো জ্বালতেই সতী চেয়ে দেখলে। দরজাটা খোলা। দরজাটা খুলেই শুয়ে পড়েছিল নাকি? তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করেনি সে। আলোর রেখাটা বারান্দা থেকে সোজা ঘরের মেঝের ওপর এসে পড়েছে। রঘু দাঁড়িয়ে ছিল কাছে। তার ছায়াটাও ঘরের মেঝেতে পড়েছে। কিন্তু তার পাশেই আর একটা ছায়া।

—কে?

রঘু বললে—দীপুবাবু এসেছে—

দীপঙ্কর সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো

—ওমা, এ কি? তুমি? এত রাত্তিরে?—সতী তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়েছে।

দীপঙ্কর সোজাসুজি ঘরের মধ্যেখানে এসে অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে—বড্ডো রাত হয়ে গেল সতী, এদিকে এমন আট্কে পড়েছিলাম যে কিছুতেই আর তোমার কাছে আসতে পারছিলাম না—

সতীও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দীপঙ্কর বললে—পাছে তুমি খুব ভাবো, তাই শুধু একবার দেখা করে গেলাম, কাল সকালে আবার আসবো—তুমি শুয়ে পড়ো—

সতী বললে—কিন্তু দীপু, তুমি কী বলো তো? আমাকে যদি এমনি করে একলাই ফেলে রাখবে তো কেন এখানে আনলে? আমি তো সেই প্যালেস-কোর্টেই ছিলাম ভালো। কেন আনলে এখানে?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিতে পারলে না। জবাব দেবার যেন তার কিছু নেইও। সতী বলতে লাগলো—আজ সারা দিনটা কী করে কেটেছে জানো? এমন করে একলা-একলা মানুষ থাকতে পারে? আমার যে সারাদিন দম আটকে আসছিল। আমি যে এতক্ষণ গলায় দড়ি দিইনি কেন, এইটেই আশ্চর্য—

দীপঙ্কর বললে—এমন করে বলো না তুমি সতী, তাতে আমার আরো কষ্ট হবে—

—কিন্তু কেন তুমি এখানে আনলে আমাকে, তাই আগে বলো? আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না।

দীপঙ্কর বললে—প্রথম দিন একটু কষ্ট হবে বৈ কি, কিন্তু আমি তো তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে এখানে এনেছি। তোমার ভালো ছাড়া আমার আর কী স্বার্থ থাকতে পারে বলো?

সতী বললে—আমার ভালোর কথা দয়া করে তোমাকে আর ভাবতে হবে না দীপু। তুমি আমার যথেষ্ট ভালো করেছ—

দীপঙ্কর বললে—এমন অভিমানী হলে কি চলে সতী? সংসার কি এত

অভিমানের দাম দেয়—?

—না দেয় না দেবে, তাতে আমার কী? আমি কারো দয়ার দান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না!

দীপঙ্কর বললে—একে তুমি দয়া বলছো কেন সতী?

সতী বললে—সারাদিন তোমার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবো, আর তুমি এই মাঝ-রাত্তিরে এক মিনিটের জন্যে একটু দেখা করে যাবে, একে দয়া বলবো না তো কী বলবো?

দীপঙ্কর বললে—তুমি খুব রাগ করেছ বুঝতে পারছি—

—মিথ্যে কথা!

সতী এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। বললে—মিথ্যে কথা, তোমার ওপর রাগ করবো এমন আহাম্মক আমি নই, আমাকে তুমি এখনও চিনতে পারোনি তাহলে—

দীপঙ্কর এবার হাসলো। হেসে সামনে এগিয়ে এল আরো। বললে—এখনও তুমি সেই এক-রকমই রয়ে গেলে সতী! কিন্তু নিজেকে তুমি আর কতদিন এমনি করে কষ্ট দেবে?

সতী গম্ভীর হয়ে পেছিয়ে গেল আরো। বললে—দেখ, আমাকে তোমরা ঘেন্না করো, আমাকে তোমরা ধরে দু' ঘা চাবুক মারো তা-ও আমার সহ্য হবে, কিন্তু দয়া করে আমাকে আর সহানুভূতি দেখিও না—

দীপঙ্কর বললে—আজ বুঝতে পারছি কেন এত সুখে থাকতেও শ্বশুর-বাড়ি তোমার ভালো লাগলো না—

—দেখ দীপু, আর যাই বলো তুমি, ও-বাড়ির নাম তুমি আর মুখে এনো না—

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—কিন্তু চিরকাল কি তুমি এখানে এমনি করেই থাকবে? এই বাড়িতে একলা কাটিয়ে দেবে?

—যদি কাটাই-ই, তাতে কার কি ক্ষতি শুনি?

দীপঙ্কর বললে—ক্ষতি আবার কার, তোমারই ক্ষতি!

সতী বললে—যাক, আমার ক্ষতির কথা তোমাকে আর ভাবতে হবে না—

—কিন্তু, বা রে, আমি ভাববো না তো কে ভাববে?

সতী তখন পেছিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়েছে। বললে—কাউকেই ভাবতে হবে না, ভাবতে হলে আমি নিজেই ভাববো, আমার জন্যে কারো কিছু ভাববার দরকার নেই—

দীপঙ্করও এসে বিছানার পাশে বসলো। বললে—রাগ দেখছি তোমার ষোল আনাই আছে—এতটুকু কমেনি এখনও—

সতী এবার সত্যিই রেগে গেল। বললে—তুমি যাও দীপু, অনেক রাত হয়েছে, যাও—

দীপঙ্কর তবু গেল না, পাশে বসে রইল তার দিকে চেয়ে।

সতী বললে—কী দেখছো, কী? যাও—

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না। চুপ করে বসে রইল তখনও—

সতী চিৎকার করে উঠলো। বললে—যাও—

দীপঙ্কর আর বসলো না। আস্তে আস্তে উঠে বাইরের দিকে গেল। কিন্তু সতীর নিজের চিৎকারে হঠাৎ নিজেরই ঘুম ভেঙে গেছে তখন। অন্ধকার ঘর। অল্প-অল্প আবছা আলো আসছে দক্ষিণের জানালা দিয়ে। একবার এদিকে একবার ওদিকে চাইলে। কোথাও কেউ নেই। খিল-বন্ধ দরজা। একলা। বিছানার ওপর চুপ করে শুয়ে আছে সে। আর ঠাণ্ডা মাঝ-রাত্রে সমস্ত শরীরটাই ঘামে ভিজে গেছে। আস্তে আস্তে উঠলো সতী। ঘরের আলোটা জ্বাললে। সত্যিই কেউ কোথাও নেই। কেউ কোথাও থাকবেই বা কী করে! ঘরে ঢুকবে কী করে! দরজা তো খিল-বন্ধই রয়েছে!

এবার দরজার খিলটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। নির্জন অন্ধকার বারান্দা। আশে-পাশের দরজা-জানালা সব ভালো করে বন্ধ করেছে রঘু। নতুন জায়গায় শোওয়া। এমন জায়গায় তো কখনও আগে রাত কাটায় নি। কেমন যেন একটা খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে কোথাও। বারান্দার লাইট্‌টা জ্বালিয়ে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত দেখে নিলে। কেউ কোথাও নেই। যে-লোকটা শোবার আগে এসেছিল তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে রঘু খিল দিয়েছিল। একটা ইঁদুর পায়ের কাছ দিয়ে সুড় সুড় করে চলে গেল। গিয়ে রান্নাঘরের ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

সতী জোরে ডাকলে—রঘু—রঘু—

রঘু সারাদিনের পরিশ্রমের পর অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। দু'-একবার ডাকতেই ধড়-ফড় করে উঠে এল সামনে।

সতী বললে—লোকটা চলে যাবার পর তুমি ভালো করে দরজা বন্ধ করেছিলে তো?

রঘু বুঝতে পারলে না। বললে—কোন্ লোকটা?

সতী বললে—সেই যে, যে-লোকটা রাত্তিরে এসেছিল সাহায্য চাইতে?

রঘু বললে—হ্যাঁ ছোটদিদিমণি, আমি তো তাকে দরজার বাইরে বার করে দিয়ে তবে খিল বন্ধ করে দিয়েছি—

সতী বললে—আচ্ছা, তুমি শোও গে যাও—

রঘু আবার শুতে যাচ্ছিল। সতী আবার ডাকলে—আর একটা কথা, আর কেউ দরজা ঠেলেছিল? আমি ঘুমিয়ে পড়বার পর?

রঘু বললে—না তো ছোটদিদিমণি, আর কেউ তো দরজা ঠেলেনি!

আর কেউ আসেনি! কিন্তু এমন তো হতে পারে সারাদিন আপিসে কাজে ব্যস্ত থাকবার পর হয়ত দীপু এসেছিল, রঘু টের পায়নি। হয়ত দরজাও ঠেলেছিল। দরজা ঠেলে ঠেলে কারোরই সাড়া পায়নি। রঘু অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর এদিকে সতীও হয়ত তখন খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর

কারোর সাড়া না-পেয়ে হয়ত ফিরে গেছে আবার। কিংবা হয়ত আসেই নি মোটে। তারই মনের ভুল! যেমন মিথ্যে স্বপ্ন দেখেছিল, তেমনিই মিথ্যে সব কিছু!

রঘু তখন আবার ঘুমোতে চলে গেছে। তার নিঃশ্বাস নেবার শব্দ আসছে দূর থেকে। আলোটা নিবিয়ে দিলে সতী। নিবিয়ে দিতেই ইঁদুরটা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে তার পায়ের কাছ ঘেঁষে বাইরে চলে গেল আবার। সতী ঘরে ঢুকে আবার নিজের দরজায় খিল এঁটে দিলে।

সেই বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট মাসের শেষ তারিখে আবার ভোর হলো কলকাতায়। বড় নিঃসঙ্গ, বড় নির্জন, বড় নতুন ধরণের সে ভোর। সেদিন অন্য দিনের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে ভোর হলো কলকাতা শহরে। আগে বেঙ্গল-টাইম ছিল, ক্যালকাটা টাইম ছিল। তারপর স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হয়েছিল। এবার হলো নিউ-স্ট্যাণ্ডার্ড-টাইম। চারটের সময়েই পাঁচটা বাজবে। অর্থাৎ যাতে বিকেল চারটের সময় সবাই আপিসের কাজ থেকে ছুটি পায়। সকাল-সকাল ছুটি হলে সকাল-সকাল বাড়িতে পৌঁছোতে পারবে ক্লার্করা। রাত্রিটাতেই তো ভয়। রাত্রিতেই তো জাপানীরা আসবে। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারের সঙ্গে টেলিফোনের তার কেটে দেবে, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের লাইন কেটে দেবে। ঢিল ছুঁড়বে, বোমা ছুঁড়বে মিলিটারি লরীর ওপর। তখনই বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে সবাই। কিন্তু এ তো কলকাতার কথা। কলকাতার বাইরে মেদিনীপুরেও তখন আর এক নতুন গভর্নমেন্টের রাজত্ব শুরু হয়েছে। ২১শে আগস্ট থেকে কলকাতার সব খবরের কাগজ বন্ধ। কেউ আর কোনও খবর জানতে পারে না। আনন্দবাজার, বসুমতী, যুগান্তর, অমৃতবাজার—কলকাতার পনেরখানার মধ্যে এগারখানা খবরের কাগজ।

নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটে মধুসূদনদের রোয়াকে আড্ডা বসে ভোর বেলা। কিন্তু খবরের কাগজ না-থাকলে আড্ডা যেন আর জমে না। দুনিকাকা বলে—শালারা এবার সবংশে নিধন হবে ভাই, শালারা নিজেরাও মরবি, আমাদেরও মারবি।

পঞ্চা বলে—মেদিনীপুরে কী হয়েছে শুনেছ তো? কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়াররা নিজেরা থানা চালাচ্ছে, জেলখানা চালাচ্ছে, পোস্টাফিস চালাচ্ছে—

দুনিকাকা বলে—আর গুল মারিস নি তুই পঞ্চা, তোর পায়ে ধরছি ভাই। ও-সব আমার কাছে বলতে আসিস নি, জানিস—ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কচি খোকা নয় রে, কচি খোকা নয়। এক রাম-টিপুনি দিলে তোদের গান্ধী বাপ্ বাপ্ বলে ককিয়ে উঠবে—

মধুসূদনের বড়দা বললে—না দুনিকাকা, আমিও আমাদের আপিসে শুনেছি—বেহারে নাকি বড় বড় সব দোকান সোল্‌জার আর পুলিসরা মিলে

লুঠপাট করেছে—

দুনিকাকা আর বেশিক্ষণ থাকতে পারতো না আড্ডায়। বলতো—সব গুল্ তোদের, সব গুল্—

সমস্ত রাত কলকাতার রাস্তাতেও হট্টগোল চলে। কিন্তু সকাল বেলা সব থম্‌থমে ভাব। তখন কিছুক্ষণের জন্যে সবাই শেষ রাত্রের মত ঘুমোয়। নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চালু হবার পর আরো ভোরে সকাল হয়। আরো সকালে আড্ডাটা বসে রোয়াকের ওপর। খবরের কাগজ নেই—শুধু গুজবের ওপর নির্ভর করে আড্ডা চালিয়ে যেতে হয়! শরৎ বোসকে ত্রিচিনাপল্লির জেলে পুরে লাঠি পেটা করেছে, সুভাষ বোস রেডিওতে কী কী লেকচার দিয়েছে, এই সব। শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবে। গুজবের শেষ নেই যেন লোকের মুখে। আর জাপান? জাপানীরা তো এল বলে!

এক ঘণ্টা আগে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডেও ভোর হয়। সনাতনবাবু সকালে উঠেই খবরের কাগজ পড়তে যান। কিন্তু কাগজ নেই। খবরের কাগজ নেই।

সনাতনবাবু শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁরে, কাগজ আসেনি আজ?

—আজ্ঞে না তো!

ন'দিদি টেলিফোন করে—নয়ন, কেমন আছিস?

নয়নরঞ্জিনী দাসী বলেন—তুমি এত সকালে যে?

—সেজবৌমার যে ছেলে হলো রে, তাই আর যেতে পারিনি তোর কাছে! এখন তোর ছেলের মতি-গতি কেমন?

নয়ন জিজ্ঞেস করে—সেই পাত্রীর কী হলো ন'দিদি? মেয়ে কবে দেখাবে?

ন'দিদি বলে—আর দু'দিন সবুর কর বাছা, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি, বাগবাজারের মিত্তির-বাড়ির বড় মেয়ে, দেবে থোবে ভাল, মেয়ে লেখা-পড়া তেমন জানে না, কিন্তু একেবারে ডানা-কাটা-পরী। আমি বৌমার আঁতুড়টা তুলেই তোকে নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবো বুঝলি, কিছু ভাবিস্ নি যেন তুই—

স্টেশন রোডেও এক ঘণ্টা আগে ভোর হয়। কাশী সকাল-সকাল উঠেই বাজারে চলে যায়। যাবার সময় বার-বার সাবধান করে দিয়ে যায়। বলে—আমি না-ফিরলে যেন দরজা খুলো না, জানো—

ক্ষীরোদা মাথা নাড়ে।

কাশী বলে—মাথা তো নাড়ছো, সেদিন অত করে বলে গেলুম, আর তুমি কোথাকার কোন্ উট্‌কো লোককে দরজা খুলে দিয়ে বসলে! যদি চোর-ডাকাত হতো?

তারপর বাইরের রোয়াকে গিয়ে বেরিয়ে বলে—দাও, খিল বন্ধ করে দাও, আমি শুনি—

ভেতর থেকে ক্ষীরোদা খিল বন্ধ করে দিলে।

কাশী বার কয়েক ঠেললে। সেই বাইরে থেকেই আবার বললে—আমি না

এলে যেন দরজা খুলো না দিদিমণি, আমি এসে আমার নাম বলবো তবে দরজা খুলে দেবে, বুঝলে, খুব সাবধান—

শুধু কলকাতাই নয়। ইণ্ডিয়ার সব শহরেই ভোর হলো এক ঘণ্টা আগে। পাঞ্জাবের লায়ালপুর শহরে স্যার কে নাজিমুদ্দিন মুসলিম-লীগ-কনফারেন্সে বক্তৃতা দিলেন—The Pakistan scheme is not only in the interest of India as a whole, but actually the non-Muslims in the Muslim Majority provinces will be far better off than under one Central Government for the whole of India.

আর সকলের শেষে প্যালেস-কোর্টেও ভোর হলো এক ঘণ্টা আগে।

প্যালেস-কোর্ট-এর পৃথিবী খবরের কাগজের পৃথিবী। টেলিফোনের পৃথিবীও বটে। সেই অত ভোরেও কিন্তু মিস্টার ঘোষাল টেলিফোন পেয়েই ঘুম থেকে উঠেছে।

—হুজুর, টেলিফোন আয়া।

মিস্টার ঘোষালের সভ্য-ভব্য আর্দালী অতি সন্তর্পণে বিছানার কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে ডাকলে। মিস্টার ঘোষাল স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম মানে না। অনেক রাত্রে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট থেকে এসেছে। চোখটা খুলে বললে—কে?

—হুজুর, টেলিফোন—

মনে পড়ে গেল হঠাৎ। মিস্টার ঘোষাল ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিলে। তারপর রিসিভারে মুখ রেখে বললে—কী খবর? কিছু খবর পেলে নাকি যতীন?

ওপাশ থেকে উত্তর এল—না স্যার, কোথাও পেলাম না—

—বরানগরটা দেখেছ?

—আজ্ঞে বরানগর দেখেছি, টালা দেখেছি, দমদম দেখেছি—কোথাও নেই। ও-রকম চেহারার কোনও মেয়েমানুষ কোথাও নেই।

মিস্টার ঘোষাল বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আরো খোঁজ, এবার বাগবাজার এরিয়াটা একবার দেখ দিকিনি খুঁজে—দেখবে গায়ের রং খুব ফরসা, আর মাথার চুলগুলো খুব কোঁকড়ানো—কালকেই আবার আমাকে এই সময়ে টেলিফোন কোরো—কেমন?

আর্দালী তখন ছোট-হাজরি নিয়ে এসেছে। গরম পটের নল্ দিয়ে চায়ের কুণ্ডলী ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঠুন ঠুন আওয়াজ করে চা তৈরি করে সাহেবের হাতের কাছে এগিয়ে দিলে।

আবার টেলিফোন।

মিস্টার ঘোষাল রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে—ইয়েস্, ঘোষাল স্পীকিং—

তারপর সেই একই সাবজেক্ট। খুব ফরসা গায়ের রং, মাথার চুল কোঁকড়ানো। শিয়ালদহেও নেই? আচ্ছা ঠিক আছে, আরো খোঁজ। ভাল করে তন্ন তন্ন করে

খুঁজে দেখ। বরানগর, দমদম, চাকুরিয়া, কসবা, সব জায়গায় খোঁজ হচ্ছে। এই কলকাতাতেই কোথাও-না-কোথাও আছে। যাবে কোথায়? কাজেকেই আবার আমাকে এই সময়ে টেলিফোন কোর—রাইট্।

বলে রিসিভারটা রেখে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললে—পীয়ারি—

—হুজুর।

—পেপার।

আর্দালী বললে—আজ পেপার নেহি দিয়া হুজুর—

নেহি দিয়া! মিস্টার ঘোষালের নীল রক্ত টগ্‌বগ্ করে উঠলো। নেহি দিয়া! চিৎকার করে উঠলো—হোয়াট?

—পেপার নেহি দিয়া হুজুর!

এমন অভাবনীয় কাণ্ড প্যালেস-কোর্টের পৃথিবীতে কখনও ঘটেনি। দু'-একটা সাহেবী-কাগজ বেরিয়েছে বটে, কিন্তু দেশী হকাররা তা সাহস করে নিয়ে আসে নি। স্যার জন হারবার্ট কী করছে? লিনলিথগোটাই বা কী করছে? জেন্টলম্যানদের কি কলকাতা শহরে আর বাস করতে দেবে না? অল্ রট্। অল্ র‍্যাবিশ। আজ খবরের কাগজ পাওয়া যাবে না, কাল সিগ্রেট পাওয়া যাবে না, পরশু হুইস্কি পাওয়া যাবে না—এসব কী হলো ক্যালক্যাটায়। গান্ধীটাকে অ্যারেস্ট করেছে, তার চেলা জওহরলালটাকেও অ্যারেস্ট করেছে—তবু এত আন্‌রেস্ট কেন? হোয়াই? কিছু না হয় প্রেসকে গ্যাগ্ করো, পুলিসকে আন্‌লিমিটেড পাওয়ার দাও। দরকার হলে আর্মি ডাকো। অল্ রট্, অল্ র‍্যাবিশ—

—হুজুর!

—কে?

আর্দালী বললে—হুজুর জগন্নাথ আয়া—

—এই যে জগন্নাথ এসে গেছিস?

জগন্নাথ সামনে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে। ময়লা সার্টের ওপর পাতলা আলোয়ান গায়ে। রোগা চোয়াড়ে মুখ। দেখলেই কেমন যেন ঘেন্না হয়। তার ওপর করুণা আকর্ষণ করবার জন্যে দাঁতের পাটি বার করে হাসবার চেষ্টা করছে।

—কীরে, তুইও পেলি না?

জগন্নাথ বললে—হুজুর, দেখা পেয়েছি—

—পেয়েছিস? কোথায়? উত্তেজনায় একেবারে দাঁড়িয়ে উঠলো মিস্টার ঘোষাল।

—হুজুর, গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর কাছে একটা বাড়িতে। আপনি যেমন বলেছিলেন হুজুর, তেমনি চেহারা। ফরসা টকটকে গায়ের রং, কোঁকড়ানো

মাথার চুল—সব ঠিক আছে—তার দিদির বাড়িতে রয়েছে—

—আর তার দিদি? দিদি কোথায়?

—হুজুর, কলকাতায় নেই, দিল্লি চলে গিয়েছে, আর আসবে না।

মিস্টার ঘোষাল চুরুটটা ধরিয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়লে একবার। বললে—তোকে ধরতে পারেনি তো?

—না হুজুর, ধরতে পারবে কী করে? আমি তো পাড়ার লোকের কাছে বিকেল বেলা সব খবর-টবর নিয়ে রাত্তির বেলা গিয়েছিলুম চাঁদা চাইতে—

—কীসের চাঁদা?

জগন্নাথ সব খুলে বললে। কেমন করে আগে থেকে সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়ে রাত্রে সে বাড়িতে হাজির হয়েছিল। কী কী কথা হয়েছিল সব বললে। চেহারার বর্ণনার সঙ্গেও মিলে গেল। বাড়ির নম্বর, ঠিকানা সবই বললে জগন্নাথ।

মিস্টার ঘোষাল সব শুনে বললে—তোর খুব বুদ্ধি আছে তো জগন্নাথ—

—আজ্ঞে, সে তো হুজুরের দয়া।

মিস্টার ঘোষাল কথাটার মানে বুঝলে। বললে—হবে, হবে, সে-জন্যে ভাবিসনি, এখন চল আমার সঙ্গে—

আর্দালীটা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে গাড়ি আনতে বললে মিস্টার ঘোষাল। জগন্নাথও বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। মিস্টার ঘোষাল ড্রেস করবে এবার। ওয়ারড্রোব্ থেকে সুট বেরোল, সার্ট বেরোল। বাথরুম থেকে মিস্টার ঘোষালের শিষ্-এর শব্দ আসতে লাগলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলো জগন্নাথ। শালা, শুয়োরের বাচ্চা। দ্বিজপদ বলেছিল ঠিক। শালার হাত দিয়ে একটা পয়সা গলে না। শালার নাল পড়তে আরম্ভ করেছে জিভ দিয়ে—মেয়ে-মানুষের নাম শুনলেই শালার জিভ দিয়ে নাল পড়ে।

খানিক পরেই ফিটফাট হয়ে মিস্টার ঘোষাল বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললে—দূর থেকে আমাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই তুই গা-ঢাকা দিবি—বুঝলি—

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—তোর বখশিশের জন্যে ভাবিস নি—কাজ খতম হলে একসঙ্গে সব মিটিয়ে দেব—

মিস্টার ঘোষাল শুধু একলাই নয়। মিস্টার ঘোষালের জন্মের বহু আগে এমনি ঘটনা অনেক বার ঘটেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মিস্টার ঘোষাল পৃথিবীতে এসেছে আর গেছে। সভ্যতার আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সে-নিয়মের আর ব্যতিক্রম হয়নি। একদিন পৃথিবীর মধ্যযুগে দেশের বাইরে কী আছে, নিজেদের দেশের ওপিঠের ভূগোলে কী ঘটছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি কারো। রোমানরা গ্রীকরা যা জানতো তার বেশি এক তিল কারো জানা ছিল না। জানবার কৌতূহল থাক্ বা না থাক্, সে কৌতূহল মেটাবার

উপায়ও ছিল না। চায়নাকে তারা বলতো ক্যাথে, জাপানকে বলতো সিপানগো। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ছিল তাদের কাছে রূপকথার দেশ। কিন্তু সেই রূপকথার দেশেও একদিন মহাজনদের যাবার দরকার হলো। দরকার হলো, কারণ তখন হাতে টাকা জমে গেছে অনেক। সেই টাকা নিজের দেশে খাটিয়েও আর কুলোচ্ছে না। স্বদেশে খাটছে, বিদেশেও খাটাতে হবে। পশ্চিম দিকে ছিল আমেরিকা। নিওলিথিক যুগের মানুষ তখন তারা। মেক্সিকো, পেরু, তাদের বশে আনা বেশি শক্ত নয়। কিন্তু মুশকিল হলো এশিয়া নিয়ে। এশিয়া মানে চায়না আর ইণ্ডিয়া। এশিয়া তখন সভ্য দেশ। দু হাজার বছরেও সেখানে কিছুই বদলায় নি। কিন্তু নতুন জাহাজে উঠে সেই এশিয়াতেই এসে হাজির হলো মিস্টার ঘোষালরা। এখানে মশলা আছে, জমি আছে, সোনা, রুপো, তামা আছে। সমস্ত চাই তাদের। সব টাকা এখানেই খাটাবে মিস্টার ঘোষালরা।

চায়নাতে তখন সম্রাট সর্বেসর্বা। সবাই যো-হুজুর বলে মানে তাকে। যারা বাইরের লোক তাদের ওপর কড়া নজর সেখানে। জাপানও তাই। সেখানে মিস্টার ঘোষালরা ঢুকতে পারলে না। কিন্তু ইণ্ডিয়ার মাটি বড় নরম। এখানে ঘরে-ঘরে ঝগড়া। এখানে জাত নিয়ে বাছ-বিচার। এ এক অদ্ভুত পেনিনসুলা। এখানে দিল্লির অত্যাচার একদিকে আর একদিকে কারোর সঙ্গে কারো মিল নেই। এখানে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মিল নেই। স্ত্রীর সঙ্গে মিল নেই শাশুড়ীর। শাশুড়ীর সঙ্গে মিল নেই আবার স্বামীর। মা ছেলে বউ—কেউ কারো নয়। কেউ কারো শাসন মানে না, কেউ কারো কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। তাই বড় সুবিধে হলো মিস্টার ঘোষালদের আর নির্মল পালিতদের। বড় সুবিধে হলো পর্তুগীজ, স্প্যানীজ, ডাচ, ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চদের—

এ হলো ষোড়শ শতাব্দীর গল্প।

কলম্বাস, ডা'গামা আর ম্যাগেলানরা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বাজার খুঁজতে। নতুন নতুন টাকা খাটাবার বাজার। যেখানে পাবে সেখানেই গেড়ে বসবে। একদিন মিস্টার ঘোষালও এসে ঢুকে পড়েছিল রেলের আপিসে এই বিশ শতকের মাঝামাঝি। অনেক টাকা তখন জমে গেছে হাতে। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট তখন শেষ করে এনেছে। সারা কলকাতার বাজার তখন ফতুর। কত মিস্ মাইকেলের লাইফ তখন মিস্টার ঘোষালের পায়ে আত্মবলি দিয়েছে। এমন সময় সন্ধান পেলে ইণ্ডিয়ার। এ ইণ্ডিয়াতে তখন অরাজক অবস্থা। নির্মল পালিত ব্যাঙ্কের সব টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ। সনাতনবাবু সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে মনুষ্যত্বের মহৎ গবেষণায় ব্যস্ত। আর শাশুড়ী নয়নরঞ্জিনী দাসী তখন একেবারে অসহায়। আভিজাত্যের মর্যাদাটুকু ছাড়া আর কিছু অবলম্বনই নেই তার তখন। এমন সুযোগ ক'জন ভাস্কো-ডাগামা পায়?

ন'দিদি আবার সেদিন এল গাড়ি করে। মোটা-সোটা মানুষ। কিন্তু বেশ খট্‌খটে।

বললে—কই রে নয়ন, কোথায় তুই—

মোটা শরীর নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠলো তেতলায়। বললে—আর পারিনে বাপু সিঁড়ি ভাঙতে—

মা-মণি খবর পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন—এসো ন'দিদি, পাখার তলায় বোস একটু—

ন'দিদি বিছানায় বসে পড়লো। বললে—তোর জন্যে আবার হাঁফাতে হাঁফাতে এলুম, ওদিকে আমার সেজবৌমার আবার আঁতুড় ফেলে এসেছি—

মা-মণি বললেন—তুমি আছো ন'দিদি তাই তবু একটু কথা বলতে পেরে বাঁচি, আজ সারাদিন মুখ বুজে আছি, জানো—

কথা বলবার জন্যে আসেনি ন'দিদি। বললে—বসবো না আর, বসবার আমার সময় নেই রে। সেই বাগবাজারে মিত্তির-বাড়ি তোকে নিয়ে যাবো বলে এইচি—

নয়ন বললে—তুমি কি তাদের কথা দিয়ে দিয়েচ নাকি ন'দিদি?

—ও মা, কথা দেব না, বলছিস্ কী তুই নয়ন? তোর ছেলের বিয়ে না হলে, আমার স্বস্তি আছে? চল্ চল্—দেরি করবো না আর, বেলাবেলি যেতে হবে। মেয়ে দেখার ব্যাপার, বেলাবেলি করাই ভালো—

নয়ন বললে—কিন্তু কথাবার্তা কিছু হলো না, আগেই মেয়ে দেখতে যাবো ন'দিদি?

ন'দিদি বললে—পাকা কথা তো পরে, আগে মেয়ে তোর পছন্দ হোক!

—কিন্তু শেষে যদি মেয়ে পছন্দ না হয়?

ন'দিদি বললে—পছন্দ হবে না মানে? ডানা বসিয়ে দিলেই উড়ে যাবে, মেয়ের এমন রূপ! রূপের কথা আর বলতে হবে না, রূপ তুই তোর বউ-এর সঙ্গে মিলিয়ে নিবি, যদি এক-ছটাক নিরেস হয় তো তখন আমাকে দুষিস্—

—কিন্তু তুমি সব খুলে বলেছ তো ন'দিদি? আমার ছেলের প্রথম বিয়ের কথা সব খোলসা করে বলেছ তো?

ন'দিদি বললে—আরে, তারা যে সব জানে রে। আমার আপন জা'এর মাসতুতো ভাইয়ের মেয়ে—

—কিন্তু বউ বেরিয়ে গেছে তা শুনেও এখানে দিতে রাজী হচ্ছে?

—তা রাজী হবে না? ভবানীপুরের শিরিষ ঘোষের নাতির সঙ্গে বিয়ে দিতে কলকাতা শহরের কে পেছ্-পা হবে শুনি? তুই কাপড় বদলে নে—

তা সেই ব্যবস্থাই হলো। নয়ন কাপড় বদলে নিলে। একটা মলমলের ফরসা ধোপার-বাড়ির থান। মুখখানা মেজে ঘষেও নিলে। বাতাসীর মাকে ডেকে পাঠালেন মা-মণি। বললেন—সব রইল, বুঝলে বাতাসীর-মা, আমি ন'দিদির সঙ্গে বেরুচ্ছি সন্ধ্যেবেলা ফিরবো—

—তোমার খাওয়ার কী ব্যবস্থা করবো?

মা-মণি বললেন—কী আবার করবে, যা রোজ হয় তাই করবে! চারখানা

ফুলকো লুচি আর আলুভাজা ছাড়া আমি আর কী সোনাদানা খাই এমন শুনি?

বাতাসীর মা বললে—কিন্তু ঘি যে নেই আর—

মা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—এই খাবার সময় আমায় বলতে এলে ঘি নেই? কাল মনে পড়েনি?

—কালই তো বলেছি সরকারবাবুকে।

মা-মণি এবার একটা হেস্তনেস্ত না-করে যেন ছাড়বেন না। বললেন—কোথায় সরকারবাবু, ডাকো তাকে, আমি একটা এর হেস্ত-নেস্ত করে তবে বেরোব—

বাতাসীর মা বললে—সরকারবাবু যে নেই এখন, সকাল বেলা দেশে গেছেন—

—দেখেছ ন'দিদি, আমায় সবাই মিলে এমন করে পাগল করলে আমি বাঁচি কী করে? এরা আমায় একটু সুস্থির হয়ে বাঁচতেও দেবে না? আমি আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম বলো তো?

তারপর হঠাৎ বাতাসীর মা'র দিকে নজর পড়তেই মনে পড়ে গেল। বললে—তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বাতাসীর মা? যাও, আমি কিচ্ছু খাবো না, আমি ছাই খাবো, আমাকে দুটো উনুনের ছাই তুলে দিও পাতে—যাও এখন এখান থেকে—

বাতাসীর মা চলে গেল। মা-মণি বললেন—দেখলে তো ন'দিদি, কেমন আমার সংসার! এই পোড়া সংসার করতে কারো সাধ হয়?

ন'দিদি বললে—থাম্, আর কাঁদিসনে, বউ এলে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন চল্—

নয়ন উঠলো। ন'দিদিও উঠলো। ঘরের দরজায় চাবি লাগালো নয়ন। লাগিয়ে চাবিটা কোমরের ঘুনসিতে আট্‌কে দিলে। মা-মণি আজ আবার ঘোষ-বাড়ির গৃহিণী সেজেছেন। সাদা ফিতে পাড় থান্। মাথায় সাদা চুলের খোঁপা। সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি যেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ন'দিদি বললে—হ্যাঁ রে, তোর ছেলে কোথায়?

—আবার কোথায়? বই মুখে দিয়ে রয়েছে—

—ছেলে রাজী আছে তো? ছেলের মত আছে?

—খবরদার ন'দিদি! ছেলেকে আমি বলছি নে। আমি নিজের পেটের ছেলের বিয়ে দেব, তাতে ছেলের মতামতের ধার ধারবো? আমি কি ছেলের খাই, না ছেলের পরি?

—কিন্তু ছেলে যদি শেষে বেঁকে বসে?

নয়ন বললে—তেমন ছেলে আমি গভ্যে ধরিনি ন'দিদি! আর শুনেছ বোধহয় একটা কথা, বউ আবার পালিয়েছে?

ন'দিদি বললে—সে তো জানিই।

—না না, সে-পালানো নয়, পাশের বাড়ির কোন্ এক ছোঁড়ার সঙ্গে পীরিত জমিয়ে পালাচ্ছিল, পুলিসে ধরেছে ছোঁড়াটাকে! সোনাও জানে সে-কথা!

ন'দিদি বললে—সে কী রে? ছি ছি ছি—কে বললে তোকে?

—সেই ছোঁড়াটারই আপিসের বড়-সাহেব! সে নিজে এসে জানিয়ে গেল। আহা, ভারি ভাল ছেলে ন'দিদি। মা বলতে একেবারে অজ্ঞান! কে এমন করে বাড়ি বয়ে এসে বলে বলো তো!

—তা ছেলে শুনে কী বললে?

নয়ন বললে—সেই শুনে এস্তোক্ তো একটু সেয়ানা হয়েছে। নইলে আমি অ্যাদ্দিন যখন বউ-এর নামে বলতুম তখন তো কানে যেত না। তখন ভাবতো মা মাগী পর, এখন বুঝেছে ঠেলাটা! এখন আর মুখে কথা নেই, এখন আরো বই মুখে দিয়ে পড়ে থাকে দিন রাত—

তারপর একটু থেমে বললে—তা এখন আমিও কিছু আর বলি নে।

—ভালোই করিস। এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কাজ নেই। হাজার হোক, পেটের ছেলে বলে কথা! কত নাড়ি ছিঁড়ে যে ছেলের জন্ম দেয় মা, ছেলে তা বুঝবে কেমন করে, বল্? ছেলেই যদি মায়ের দুঃখ বুঝতো তো পৃথিবী উল্টে যেত নয়ন, উল্টে যেত—

ন'দিদির গাড়ি তখন হু হু করে কলকাতার রাস্তা ধরে চলেছে। ন'দিদির নিজের গাড়ি। নয়নরঞ্জিনী দাসী তখন নিজের দুঃখের কথাই বলে যাচ্ছিল। একদিন তারও গাড়ি ছিল। একদিন তার গাড়িতেও কত লোককে তিনি চড়িয়েছেন। একখানা নয়, দুখানা। ন'দিদির গাড়িতে চড়ে সেই কথাই তার হঠাৎ মনে পড়লো।

নয়ন বললে—আচ্ছা, দেনা-পাওনার কথাটা বলেছ তো ওদের?

ন'দিদি বললে—বলেছি বৈ কি! ওই তো একই মেয়ে। ক'ভরি গয়না চাস্ তুই বল্—আর নগদ কত নিবি তাও বল্?

—গয়না তারা যা দেবে তাই-ই দিক, কিন্তু ঘর থেকে তো খরচ করে আমি ছেলের বিয়ে দেব না—

—তা কত নগদ নিবি বল্ না!

নয়ন বললে—আমি বড় ঠকিচি প্রথম বিয়ে দিয়ে ন'দিদি। আমি কি তখন জানতুম বেয়াই মস্ত বড় লোক! সে যা-ঠকান্ ঠকিচি সে আর বলার কথা নয়, শুনলে লোকে হাসবে! এবার আমি শুধু নগদ একটু বেশি নেব—

ন'দিদি বললে—তবু কত নিবি?

—কত নিলে ভালো হয়, তুমিই বলো না ন'দিদি? তুমিই যখন বরের ঘরের মাসী আর কনের ঘরের পিসি—

ন'দিদি বললে—আমি কী বলবো বল্। তোর কত হলে চলবে, সেইটে আগে বল্?

নয়ন বললে—তাহলে তোমাকে সব খুলেই বলি ন'দিদি। তুমি তো আমার অবস্থার কথা সব জানো। গাড়ি পর্যন্ত বেচে দিতে হলো আমাকে। তিরিশ লাখ

টাকার সম্পত্তি—নগদে সম্পত্তিতে ছিল আমার, সব উকীল খেয়েছে। এখনও পুলিসের হুলিয়া ঘুরছে সেই উকীলের পেছনে—সে টাকার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি ন'দিদি। তার আশা আর আমি করিনে, এখন ঝি-চাকরের মাইনে বাকি পড়েছে ক'মাস ধরে, তাও আমি দিতে পারছিনে—

—তা কত নিবি, খুলে বল্ না?

নয়ন বললে—বেশি বলবো না ন'দিদি, তোমার কুটুম তিরিশ হলেই আমার আপাততঃ চলবে—

ন'দিদি বললে—তা ঠিক আছে—মেয়ের তো ভাইও নেই, আর একটা বোনও নেই, বাপ মারা গেলে সব সম্পত্তি তো এই মেয়েই পাবে। তা সব মিলিয়ে মেয়ের বাপের সম্পত্তিও তো কম নেই রে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে লাখ দশেক টাকার সম্পত্তি বেকসুর পাবে তোর ছেলে—

তা বাগবাজারে পৌঁছে মিত্তিরদের বাড়ি দেখে নয়নরঞ্জিনী দাসী চম্‌কে উঠলো। এককালে যখন বাড়ির মালিকের অবস্থা আরো ভালো ছিল, তখন এ-বাড়িরই চেহারা ছিল অন্যরকম। বড় বড় থাম। থামের মাথায় চুন-বালির পরী বসানো। পরীদের এখন ডানা, হাত-পা ভাঙা অবস্থা। বাগানে ঘাসও নেই এখন। কিন্তু এককালে ছিল। মোষের খাটাল হয়েছে বাগানের কোণের দিকটায়। দেয়ালের ইঁট বেরিয়ে আসছে জায়গায়-জায়গায়। কিন্তু তা হোক, মা-মণি দেখে বুঝলেন—এরা বনেদী পরিবার বটে!

খুব খাতির করলে মিত্তির-গিন্নী। বললে—আমার তো আর কোনও সাধ নেই দিদি, এই মেয়েটির বিয়ে দিয়েই আমি মনের সব সাধ মিটিয়ে নেব—

কথাগুলো কেমন যেন লাগলো! ন'দিদি বলেছে তো সব এদের? এত টাকা নগদ দেবে, এত রূপসী মেয়ে, তবু দোজ্‌বরে বিয়ে দিচ্ছে। এতে অবাক হবারই তো কথা।

ন'দিদি বললে—নয়নেরও তো কোনও সাধ মেটেনি, ধরে নাও সেই প্রথম বিয়েটা বিয়েই নয়—নামেই শুধু বিয়ে—

নয়ন বললে—ন'দিদি আমার সমস্তই জানে—

মিত্তির-গিন্নী বললে—ইনি আপনারও ন'দিদি, আমারও ন'দিদি! ন'দিদি আমাদেরও সমস্ত কিছু জানে! কর্তা তো তাই বললেন—উনি যখন মাঝখানে রয়েছেন, তখন আর আমাদের ভাবনার কী আছে! আর আপনাদের নাম কলকাতায় কে না চিনবে?

মা-মণি বললেন—সে-সব দিনকাল আর নেই ভাই, এখন দুবেলা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি, এই-ই যথেষ্ট—

ন'দিদি বললে—তা কর্তাকে তোমরা বলো ছেলের সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে, আমার কথার বিশ্বাস কোর না বাপু—

মা-মণিও বললেন—হ্যাঁ তোমরা খোঁজ-খবর নাও, তারপরে অন্য কথা—

মিত্তির-গিন্নী বললে—আপনার ছেলের আবার খবর কী নেব দিদি, আপনি দয়া করে আমার মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবেন, তাহলেই ওর ভাগ্যি—

মেয়েটিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সামনে এনে দাঁড় করালে মিত্তির-গিন্নী। গা-ময় গয়না। মেঝের ওপর একটা কার্পেটের আসন পাতা ছিল, তার ওপরেই বসানো হলো। বেনারসী দিয়ে মোড়া। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়োয়াতে ভর্তি। মিত্তির-গিন্নী বললে—এই গয়না-গাঁটি গড়িয়ে রেখেছি দিদি। এখন আপনারা দিন স্থির করে দু'হাত এক করলেই হয়—

ন'দিদি মা-মণি দুজনেই অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ন'দিদি জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম তোমার মা?

মিত্তির-গিন্নী অভয় দিয়ে মেয়েকে বললে—বলো, নাম বলো?

—লীলারাণী দাসী।

ন'দিদি বললে—বাঃ, বেশ নাম, তুই ভালো করে জিজ্ঞেস-পাতি করে নে নয়ন, শেষে যেন দুষিস্ নে আবার আমাকে।—লেখা-পড়া শেখেনি, সে তো তোকে আগেই বলে রেখেছি—

মা-মণি তখনও এক মনে চেয়ে দেখছিলেন পাত্রীর দিকে। ঠিক এমনটিই তিনি চেয়েছিলেন সেবার। ঠিক এমনি নরম-নরম স্বভাব। এমনি মোমের পুতুলের মত। বেশ নম্র স্বভাব। কেমন মাথা নিচু করে মা-মণির পায়ে হাত ঠেকিয়ে মাথায় ছোঁয়াল। বেশ ছোট মানান্‌সই কপাল। কান দুটো পাতা। ঠোঁট জোড়া পাতলা। বয়েসও এমন কিছু বেশি নয়। সতেরোর মধ্যেই। পায়ের আঙুলগুলো গোল গোল টোপা-কুলের মত। গায়ের রংটাও দুধে-আল্‌তা। ন'দিদি নিজেই মেয়ের হাত-পিট-কোমর টিপে টিপে দেখলে। হাতের পাতার উল্টো পিঠ্‌টা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে দেখতে লাগলো। তারপর সব কিছু দেখে বললে—কী রে নয়ন, এখন মেয়ে পছন্দ হলো কি না বল্—তোর বউ, তুই দেখে শুনে বাজিয়ে নিয়ে যাবি, আমার কী? আমি কে? আমি তো মাসী রে! মাসীর সংসার তো আর করবে না। যার সংসার করবে সে দেখাই ভালো—

মিত্তির-গিন্নীও তাই বললে—তা তো বটেই ন'দিদি, আমার মেয়েকে আপনি বউ করবেন, দেখে শুনে নেবেন বৈ কি! আমার নিজের পেটের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না, ওই মেয়েই আমার লক্ষ্মী। যার ঘরে যাবে তারও ঘর লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে—

ন'দিদি বললে—তা তোর কেমন লাগলো খুলে বল্ নয়ন। এ আপনা-আপনির মধ্যে লুকোচুরির তো কিছু নেই—পছন্দ হয়েছে তোর?

মা-মণি বললেন—পছন্দের কথা যদি বলো ন'দিদি তো আমার এখুনি বাড়িতে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে—

মিত্তির-গিন্নী বললে—তা নিয়ে যান্ না দিদি, ও তো এখন থেকে আপনারই মেয়ে হয়ে গেল—

নদিদি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, লীলা, যাবি মা তুই? দেখে আসবি কেমন শ্বশুর-বাড়ি—

লীলারাণীর মুখটা আরো নিচু হয়ে গেল লজ্জায়। মিত্তির-গিন্নী বললে—ওকে আবার জিজ্ঞেস করছো কেন নদিদি, আমি যখন বলছি তখন ও আর কী বলবে, আমার মেয়ে তেমন নয়—

নদিদি বললে—তবে চল্, তোকে নিয়েই যাই—

মা-মণি বললেন—সত্যি-সত্যিই যে তুমি নিয়ে যাচ্ছ নদিদি?

নদিদি বললে--তা নিয়ে গেলে দোষটা কী, মেয়েও চলুক, ওর মা-ও চলুক—

মিত্তির-গিন্নী বললে—না না, আমাকে আবার কেন? মেয়েকেই তোমরা নিয়ে যাও নদিদি, আমি তো পরে যাবোই—

কিন্তু নদিদির যে কী ঝোঁক! গাড়ি রয়েছে সঙ্গে। কোনই অসুবিধে হবে না। নদিদির যখন কুটুম, তখন নয়নেরও কুটুম। আর কুটুম এখন না-হলেও দুদিন পরে তো কুটুম হবে! তখন তো হামেশাই দেখা-সাক্ষাৎ হবে।

নদিদি বললে—নাও, তোমার মেয়ের গয়না-টয়না খুলে মোটামুটি সাজ করিয়ে দাও, তুমিও সঙ্গে চলো, বাড়ির মধ্যেই তো সারাদিন থাকো, একেবারে না হয় কালিঘাটের মন্দিরে মাকে দর্শন করেও আসবে—

অনেক দিন পরে মা-মণির বুকের ভারটা যেন একটু হাল্কা হলো। মেয়ে-মা তখন ভেতরে গেছে। নদিদি বললে—দেখ নয়ন, এই বউ যা করে দিলুম তোকে, যখন সংসার করবি, তখন আমাকে বলিস্—

নয়ন বললে—দেনা-পাওনার কথাটা তো তুললে না তুমি নদিদি—

—আঃ তুই থাম্ তো! মাঝখানে যখন আমি আছি তখন তোর ভয়টা কি! মেয়ের গায়ের গয়নাগুলো তো তুই স্বচক্ষে দেখলি, কম করে ওর দামই তো বিশহাজার টাকা হবে—

—কিন্তু নগদ?

—নগদের জন্যে অত ভাবছিস কেন তুই? তোকে তিরিশ হাজার টাকা পাইয়ে দিলেই তো হলো?

এর পরে আর কোনও কথা চলে না। মা-মণি যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, এমন মেয়ে থাকতে তিনি কী ঘোড়া মুখো বউই করেছিলেন মরতে। ব্যারিস্টার পালিতের কথায় কী লোকসানটাই না কপালে ছিল! আর শুধু কি লোকসান! দুর্ভোগটারই বা দাম দেয় কে? নদিদি বললে—আর এই বাড়ি দেখছিস তো, বাপ-মার অবর্তমানে এই মেয়েই তো সব পাবে রে—এ-বাড়ির দামও তো কম করে লাখখানেক টাকা হবে—

মা-মণির সব দেখে শুনে কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। বললেন—শেষকালে পিছিয়ে যাবে না তো নদিদি?

নদিদি বললে—পেছবে কেন? আমি তো আছি মাঝখানে। আমার জায়ের মাসতুতো ভাই-এর মেয়ে—তোর টাকা-কড়ি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা যেন আবার খুলে বলিস নে—দ্যাখ্ কেনা কী হয়—। আর সেইজন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোর বাড়ি দেখাতে—

—তা আমার প্রথম বউ-এর ব্যাপারটা খুলে বলেছ তো তুমি ওদের?

—তোকে তো বললুম সব খুলে বলিচি। এমন ছেলে তো কোথাও পাবে না। এরা তো বনেদী-ঘরই চায়!

মা-মণি তখনও চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। একমাত্র মেয়ে। এই মেয়েই একদিন সব কিছু পাবে! আর ক'টা বছর মাত্র। তিরিশ হাজার টাকা। আর তার সঙ্গে বিশ হাজার টাকার গয়না। মনে মনে মা-মণি তাঁর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করতে লাগলেন।

এক ঘণ্টা আগে গড়িয়াহাটেও ভোর হলো। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে চা নিয়ে এল রঘু। সতী বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে নিলে চা। বললে—কেউ এসেছিল রে রঘু?

রঘু বললে--কই, কেউ তো আসে নি—

—রাত্তিরে, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তখন?

—না ছোটদিদিমণি, কেউ আসে নি তো—

আশ্চর্য। কেউ আসেনি! চায়ে চুমুক দিয়ে সতী উঠে বসলো। রঘু চলে গেল বাইরে। রঘুর অনেক কাজ। একলা সে সারাদিন ধরে রান্না করবে। বাজার করবে। ঘর ঝাঁট দেবে। লক্ষ্মীদি যাবার আগে টেলিফোন লাইনটাও কেটে দিয়ে গেছে।

সতী আবার ডাকলে—রঘু—

রঘু আসতেই সতী বললে—খবরের কাগজ আসে না এ-বাড়িতে?

রঘু বললে—ক'দিন থেকে তো কাগজ দিচ্ছে না কাগজওয়ালা। আমি দেখতেই পাইনি ক'দিন তাকে—

সত্যিই কোনও খবরের কাগজ নেই কলকাতা শহরে। সারা ইণ্ডিয়াতে কোথায় কী হচ্ছে, তা গভর্নমেন্টকে আগে জানিয়ে তবে ছাপাতে হবে নিয়ম হয়েছে। তারই প্রতিবাদে কোনও খবরের কাগজ বেরোচ্ছে না। বেরোচ্ছে শুধু বুলেটিন। সেই বুলেটিন লুকিয়ে লুকিয়ে বিলোন হচ্ছে।

রঘু এসে একখানা কাগজ দিয়ে গেল। বললে—এই চিঠিখানা পড়েছিল দিদিমণি জানালার নিচে—

—চিঠি নাকি?

সতী কাগজখানা হাতে নিয়ে দেখলে। সাইক্লোস্টাইল্ করা একটা কাগজ।

ওপরে বড় বড় করে লেখা আছে—

Mahatma Gandhis last Message

Everyman is free to go to the fullest length under *Ahimsa* by *complete deadlock, strike and all other non-violent means.* Satyagrahis should go out to die and not to live. It is only when individuals go out to seek and face death that the Nation will survive, *Karenge ya Marenge*.

—এটা কে দিলে তোমাকে?

রঘু বললে—খবরের কাগজ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম এইটে পড়ে আছে—

রঘু চলে যেতেই সতী কাগজটাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে বাইরে। রেল-লাইনের ওপর দিয়ে বোধহয় একটা ট্রেন আসছিল। গুম্ গুম্ আওয়াজ হচ্ছে। সতী একমনে শুনতে লাগলো শব্দটা। এত কাছে মনে হয়। মনে হয়, যেন গাড়িটা বাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-একবার বিকট শব্দ করে হুইশল্ দেয়। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরেও ওই শব্দটা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। কালকের স্বপ্নটার কথাও মনে পড়লো। আশ্চর্য! স্পষ্ট যেন দীপঙ্করকেই এই ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল সে। একেবারে এই ঘরের বিছানার ওপর। আশ্চর্য! স্বপ্নগুলোকেও এমন সত্যি বলে মনে হয় মাঝে-মাঝে!

রঘু কাছাকাছি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। সতী আবার ডাকলে—রঘু—

রঘু এল। সতী বললে—তুমি আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবে রঘু?

—কোথায়?

সতী বললে—তোমার রান্না-বান্না হয়ে যাবার পর। কাজ-কর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমার সঙ্গে একবার যেতে পারবে না? এই ধরো, ভবানীপুর পর্যন্ত?

রঘু জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু বাড়িতে কে থাকবে? আমাকে দিদিমণি বাড়ি ছেড়ে যেতে বারণ করেছে—

—তা হোক, তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে। তালা-চাবি দিয়ে যাবো, আবার একটু পরেই ফিরে আসবো?

রঘু বললে—কিন্তু কোথায় যাবেন আপনি দিদিমণি?

—বেশি দূর নয়, ধরো ভবানীপুরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোড পর্যন্ত?

—সেখানে কী করতে যাবেন আপনি?

সতী বললে—কিছু না, এমনি, তুমি শুধু একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করে আসবে একজন ভদ্রলোক কেমন আছেন, আর আমি বাইরে ট্যাক্সিতে বসে থাকবো।

—আমি ভেতরে গিয়ে কার নাম করবো? কী বলে ডাকবো?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

রঘুর একটু কৌতূহল হলো বোধ হয়। চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে—সেটা কাদের বাড়ি?

সতী বললে—তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমার খুব চেনা বাড়ি সেটা—কেউ তোমায় কিছু বলবে না।

—আর যে-ভদ্রলোকের খবর নিতে যাবো, তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কোত্থেকে আসছি তখন কী বলবো?

সতী বললে—তোমাকে কিছু উত্তর দিতে হবে না, তুমি বলবে তোমাকে একজন খবর আনতে পাঠিয়েছে—আর কিছু বোল না যেন। ভুলেও যেন আমার কথা বলে ফেলো না—

—তা বলবো না। কিন্তু তারা আমাকে ছাড়বে কেন? আমার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে পারে।

—জিজ্ঞেস করলেও তুমি বোল না। তুমি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এসো। আমি গলির বাইরে একটা ট্যাক্সিতে বসে থাকবো—

—কিন্তু তিনি কে দিদিমণি?

সতী একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কিন্তু এক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—সে তাঁকে তুমি চিনবে না রঘু, আমার খুবই আপন জন—

তারপর একটু থেমে বললে—যা হোক, তোমাকে এ-সব ভাবতে হবে না, বেশিক্ষণও তোমাকে বাইরে থাকতে হবে না, আমরা ট্যাক্সি করে যাবো আর চলে আসবো—

তারপর সত্যিই রঘু খুব তাড়াতাড়ি করতে লাগলো। তাড়াতাড়ি উনুনে কয়লা দিয়ে আগুন ধরালে। ভাত চড়ালে। তারপর বাজার। দৌড়তে দৌড়তে বাজারে গিয়ে মাছ তরকারি কিনে আনলে। সতীও তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলে। তারপর...তারপর হঠাৎ তার মনে পড়লো শাড়িগুলো তো সবই পড়ে আছে প্যালেস-কোর্টে। একটা শাড়িও তো সঙ্গে করে আনা হয়নি। সোজা হাসপাতাল থেকেই দীপু তাকে এখানে এনে তুলেছে।

ডাকলে—রঘু—

রঘু আসতেই সতী বললে—রঘু, তোমার দিদিমণির শাড়ি-ব্লাউজ কিছু নেই? আমি তো আসবার সময় কিছুই নিয়ে আসিনি—

রঘু বললে—তা তো আমি জানি না দিদিমণি, এই পাশের ঘরের চাবি তো দিদিমণি আপনার হাতেই দিয়ে গেছেন, আপনি এই ঘরটা খুলে দেখুন না—

সত্যিই অনেক জিনিসপত্র শেষ পর্যন্ত রেখে গিয়েছিল লক্ষ্মীদি। একটা খাট, একটা মীট্-সেফ্, কিছু ছোটখাটো ফার্নিচার, দু' একটা ট্রাঙ্ক। একটা পুরোন ট্রাঙ্কের ভেতরেই দু' একটা শাড়ি পাওয়া গেল। বোধহয় লক্ষ্মীদি পুরোন বলে ফেলে রেখে গিয়েছে। সব জিনিসপত্র দিল্লি নিয়ে যাওয়া সম্ভব

হয়নি। শাড়ি-ব্লাউজগুলো বার করে দরজায় আবার তালা লাগিয়ে দিলে সতী। তারপর নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়িটা পরে দেখলে। দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা দেখতে লাগলো একমনে। ভেতরে রঘু রান্না করছে। কোথাও কেউ নেই। অনেকক্ষণ সতী নিজের চেহারাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো আয়নাতে। এই চেহারা, এই মুখ, এই চোখ, এই চুল—এর দিকে কোনওদিন চেয়ে দেখেন নি তিনি। কোন্ শাড়ি পরলে তাকে ভালো মানায় তাও মুখ ফুটে কখনও বলেন নি। কী অদ্ভুত মানুষটা। এক-একবার মনে হয়, মানুষটা যেন নিষ্প্রাণ, নির্জীব পাথর। আবার সত্যিই যা ভাবে সতী, আসলে হয়ত মানুষটা তা নয়। হয়ত দেবতা। সত্যিই দেবতার মত রূপ, দেবতার মত মন, দেবতার মত ব্যবহার। কেন এমন হয় কে জানে! আস্তে আস্তে, ঠিক কপালের মধ্যে দুটো ভ্রূর মাঝখানে ছোট করে কুঙ্কুমের একটা টিপ্ লাগিয়ে দিলে। সমস্ত মুখখানা কী চমৎকার দেখাতে লাগলো। সতী নিজের মুখখানার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এমন সুন্দর আমি! আমি এত সুন্দর!

তারপর শাড়িটা সমস্ত শরীরে জড়িয়ে বাঁদিকের কাঁধে ফেলে দিলে।

একটা হাল্কা লাল রঙের শাড়ি। ব্লাউজটা সাদা। কাঁধে গলায় গালে কপালে সব জায়গায় ফেস্-পাউডার বুলোতে লাগলো আপন মনে। সতীর মনে হলো যেন নিজের শরীরটা নিয়ে নিজেই খেলা করে। নিজেই নিজের গাল দুটো টিপে ধরলে। আরো জোরে টিপ্‌লে। আরো জোরে। কেমন যেন একটা লাল্‌চে দাগ হয়ে গেল দুটো গালের দুদিকে। কই, লাগেনি তো মোটে। গাল টিপ্‌লে তো কই লাগে না মোটে। শুধু লাল হয়। নিজের ঠোঁটটা নিয়েও আঙুল দিয়ে মোচড়াতে লাগলো। ঠোঁটটা তার খুব নরম তো! এত নরম, অথচ লাগলো না মোটে। নিজের শরীরটার সব জায়গায় টিপতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো যেন টিপ্‌লে খুব ভালো লাগে। হাত-পা-গাল-ঠোঁট-কোমর সমস্ত—

তারপর হঠাৎ কী যে হলো, সতী আয়নাটার সামনে আরো ঝুঁকে পড়লো। একেবারে নিজের ছায়ার মুখোমুখি। তার ছবিটার সঙ্গে যেন ছোঁয়া লেগে যাবে। বড় কাছাকাছি। বড় ঘেঁষাঘেঁষি। নিঃশ্বাসের বাতাস লাগছে নিজের ছবির ওপর। তারপর হঠাৎ নিজের ঠোঁট দুটো ঠেকিয়ে দিলে আয়নার গায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো নিজের ছবিটাও যেন ঠোঁট দুটো দিয়ে তাকে চুমু খাচ্ছে। সতী আর সামলাতে পারলে না। তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সতী ঠোঁট দুটো চেপে ধরে রইল ঠাণ্ডা আয়নার ওপর। তার সমস্ত শরীর যেন আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসতে লাগলো—

খড়িয়াহাটি লেভেল ক্রসিং-এর সামনে অনেকক্ষণ আটকে ছিল মিস্টার ঘোষালের

গাড়ি—

ভূষণ মালী গেটটা খুলে দিতেই হুড় হুড় করে গাড়ির দল ছাড়া পেয়ে গেল। এতক্ষণ যেন দম আটকে আসছিল মিস্টার ঘোষালের। অল্ রট্। এই রেলওয়ে, এই গভর্নমেন্ট, এই কংগ্রেস, এই মুসলিম্ লীগ, এই হিন্দু মহাসভা, এই গান্ধী, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ, জিন্না, সমস্ত। এভরিথিং রট্‌ন। রট্‌ন টু দি কোর্।

জগন্নাথ বললে—আর একটুখানি স্যার—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কোন্ বাড়িটা?

—ওই যে গোলাপী রং-এর দোতলা বাড়িটা—

লাইন পেরিয়ে গাড়িটা ওপারে যেতেই জগন্নাথ বললে—আমি এখানে নেমে যাই স্যার, আমায় আবার চিনে ফেলবে—

গাড়িটা থামলো। দরজা খুলে জগন্নাথ রাস্তায় নেমে বললে—বাইরে কলিং-বেল আছে, আপনি টিপ্‌লেই চাকরে দরজা খুলে দেবে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি ঠিক জানো তো বাড়িতে কেউ নেই?

—আজ্ঞে না স্যার, আমি কি আপনাকে জেনে-শুনে বিপদে ফেলবো বলতে চান্? আমার নিজের একটা ভয় নেই?

জগন্নাথ চলে গেল। বললে—আমি ওই লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো স্যার—

—ঠিক আছে, আমি একটু পরেই ফিরবো।

গোলাপী রং-এর দোতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে মিস্টার ঘোষাল একবার আপাদ-মস্তক চেয়ে দেখে নিলে। তারপর পকেট থেকে কেস্ বার করে চুরোট ধরালে একটা টাট্‌কা। তারপর গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেল্‌টা টিপে ধরলে।

—কে?

অল্ রট্। এই গভর্নমেন্ট, এই রেলওয়ে, এই কংগ্রেস, এই মুসলিম্ লীগ, এই হিন্দু মহাসভা, এই গান্ধী, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ, জিন্না—এভরিথিং। এভ্‌রিথিং রটন্। রটন্ টু দি কোর্।

চাকরটা দরজা খুলেই একজন নতুন চেহারার কোট-প্যান্ট্ পরা সাহেব দেখে অবাক হয়ে গেছে।

—মিসেস ঘোষ আছে?

—দিদিমণি তো নেই হুজুর, দিল্লি চলে গেছে।

—অন্য দিদিমণি? দি আদার......

বলেই মিস্টার ঘোষালের খেয়াল হলো ইংরিজী বুঝবে না চাকরটা। বললে—আর কে আছে?

চাকরটা বললে—হুজুর, ছোটদিদিমণি আছে—

—আচ্ছা তাঁকে ডেকে দাও—

রঘু তাড়াতাড়ি দৌড়ল। সতী তখনও আয়নার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে। সমস্ত আয়নাটা ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে সতীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে। হঠাৎ বাইরে রঘুর গলা শুনতে পেয়েই বললে—কি রে রঘু?

—আপনাকে একজন ডাকছেন।

—কে রে? দীপঙ্করবাবু?

রঘু বললে—আজ্ঞে না ইনি অন্য একজন—

—তা আমাকে কেন? বল্‌ না লক্ষ্মীদি দিল্লি চলে গেছে—

রঘু বললে—বলেছি, তিনি বলছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান্‌—

—এ তো ভারি মুশকিল হলো দেখছি।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরের ঘরে আসতেই মিস্টার ঘোষালকে দেখে হতবাক হয়ে গেল সতী! মিস্টার ঘোষাল! এখানে! এই সময়ে!

কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে হাসিমুখে বললে—এ কি? আপনি?

মিস্টার ঘোষালকে বসতে বলতে হলো না। নিজেই ততক্ষণে বসে পড়েছে একটা চেয়ারের ওপর। চুরোটটা একটু আগেই ধরিয়েছিল, কিন্তু তখন সেটা নিভে গেছে। নিজের মনেই পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে দেখলে মিস্টার ঘোষাল। একটাও কাঠি নেই। সামনে সতীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে—একটা দেশলাই দিতে পারবে সতী?

সতী চুপ করে দেখছিল। হঠাৎ আবার মিস্টার ঘোষাল এসে পৌঁছল কেন? এ ঠিকানাই বা পেলে কেমন করে? সতী তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই এনে দিলে। দেশলাই দিয়ে চুরুটটা অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে ধরিয়ে কাঠিটা জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেললে। বেশ গন্‌গনে আগুন ধরে উঠলো চুরোটটার মুখময়। মিস্টার ঘোষালের মুখখানা ধোঁয়ার আড়ালে এক মুহূর্তের জন্যে ঝাপ্‌সা কদর্য হয়ে উঠলো।

—দাঁড়িয়ে আছো কেন, বোস?

মিস্টার ঘোষাল বললে—ইউ লুক ভেরি বিউটিফুল—খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—আগের চেয়েও সুন্দর। কিন্তু তুমি তো অবাক হলে না, কেমন করে আমি তোমার অ্যাড্রেস পেলুম?

আবার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখটা। ঝাপ্‌সা, কদর্য!

—দেখ, লাইফ নিয়ে আমি জুয়া খেলতে ভালবাসি নিশ্চয়ই। কিন্তু এক-একজন আছে যারা ডেথ্‌ নিয়েও জুয়া খেলে, সত্যি কি না বলো?

সতী উত্তর দিলে না।

মিস্টার ঘোষাল বলতে লাগলো—দেখ, যখন লন্ডনে ছিলাম তখন কয়েকটা কথা শিখেছিলুম। সেই সময়ে কোন্‌ একটা বইতে পড়েছিলুম, If Socrates died like a philosopher, Jesus Christ died like a God. তা আমি তো ফিলজফারও নই, গড্‌ তো নই-ই। আমি একজন ম্যান

অব দি ওয়ার্লড্‌, ম্যাটার অব্‌ ফ্যাক্ট্‌ ম্যান্‌। আমার সবই চাই, পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে আমার অনেক টাকা চাই, একটা-দুটো নয়, অনেক। টাকার জন্যে আমি মিথ্যে কথা বলাকেও পাপ বলে মনে করি না। আর শুধু আমি কেন, এ-যুগের কেউ-ই তা মনে করে না।

তারপর একটু থেমে বললে—এই দেখো না, টাকার জন্যেই এত বড় যুদ্ধটা হচ্ছে, আর যুদ্ধ হচ্ছে বলেই লোকের হাতে গাদা-গাদা টাকা আসছে। আর টাকা এলেই টাকা বাড়ে। আর টাকা না হলে পৃথিবীর কিছু উন্নতিও হয় না। টাকা মানে ওয়েলথ্‌। সেই ওয়েলথ্‌ বাড়াবার জন্যেই টাকার দরকার। টাকা দিয়ে পৃথিবীর সব ওয়েলথ্‌ কেনা যায়—

হঠাৎ কথা বলতে বলতে মিস্টার ঘোষালের খেয়াল হলো যেন। বললে—এ কি, তুমি বোসছো না! বোস—

সতী তবু বসলো না।

সেদিকে মিস্টার ঘোষাল নজর দিলে না। বলতে লাগলো—এত টাকার কথা বলছি শুনে তুমি হয়ত অবাক হয়ে যাচ্ছো সতী, কিন্তু তার কারণ আছে। তুমি তো একদিন আমাকে দেখেছো, এক-বাড়িতে আমার সঙ্গে থেকেছ। কোথায় ছিলে তুমি আর কোথায় ছিলুম আমি, অথচ একদিন তোমাতে আমাতে দেখা হয়ে গেল। কী কারণে দেখা হয়ে গেল বলো তো?

প্রশ্নটা করলো সতীকে। কিন্তু উত্তর মিস্টার ঘোষালই দিলে। বললে—সেও টাকা। টাকার জন্যে তোমার শাশুড়ী তোমার ওপর অত্যাচার আরম্ভ করলে, তখন তুমি আমার কাছে আশ্রয় চাইলে—

এতক্ষণে সতী প্রতিবাদ করে উঠলো। এই প্রথম। বললে—না, আপনার ভুল কথা—

—ভুল?

সতী বললে—হ্যাঁ ভুল। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইতে যাইনি, আপনিই আমাকে ভুল বুঝিয়ে আপনার প্যালেস-কোর্টে নিয়ে তুলেছিলেন—কিন্তু তার জন্যে আমি আপনার কাছে গ্রেটফুল—

মিস্টার ঘোষাল বললে—গ্রেটফুলনেসের কথাটা থাক্‌, এখনও যদি তুমি এখানে না উঠে আমার কাছে গিয়ে ওঠো তো আমিও গ্রেট্‌ফুল হবো। আমি সেই কথাই তো বলতে এসেছি। প্যালেস্‌-কোর্ট থাকতে তুমি এখানে উঠলে কেন? এই ডার্টি ডাস্ট্‌বিনের মধ্যে? আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি এখানে আছো। এখানে কি তোমার মত মেয়ে থাকতে পারে?

সতীর মুখের দিকে চেয়ে আবার মিস্টার ঘোষাল বলতে লাগলো—তুমি ভাবছো আমি তোমার ঠিকানা পেলাম কি করে? আসলে সেনই আমাকে তোমার খবরটা দিলে—

—দীপু? দীপঙ্কর দিয়েছে?

—হ্যাঁ, তোমার সামনেই তো সেদিন সেই হস্‌পিট্যালে আমাকে চরম ইনসাল্ট্ করলে সেন! ভাবলাম সেখানে আর ও নিয়ে কথা-কাটাকাটি করবো না। পরের দিন ডাইরেক্ট্ আপিসে গেলাম। গিয়ে বললাম—মিসেস ঘোষ কোথায়? আমার কথাতে ভয় পেয়ে গেল ছোক্‌রা। জানে আমার চারিদিকে কত ইন্‌ফ্লুয়েন্স্, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঠিকানাটা বলে দিলে—আসলে তো কাউয়ার্ড্—

—দীপু বলে দিলে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ—

—দীপু কোথায়?

মিস্টার ঘোষাল বললে—তার পর এখানে আর তার আসবার সাহসই নেই—হয়ত আর আসবেও না।

সতী অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি বলছেন আপনি?

—সত্যি না হয় তো আপিসে টেলিফোন করে দেখো। আমি মিথ্যে কথা বলি বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার সে সম্পর্ক নয় সতী!

সতী বললে—এ-বাড়িতে টেলিফোন নেই, লক্ষ্মীদি যাবার আগে লাইন ডিস্‌কানেক্ট করে দিয়ে গেছে—পাশাপাশি পাড়াতেও কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—

—যদি আমার কথায় বিশ্বাস হয় তোমার, তাহলে বলি তোমাকে যে, সে আর আসবে না। হি ইজ্ অ্যাফ্রেড্ অব মি! আমার পা ধরে সে ক্ষমা চেয়েছে। কাউয়ার্ড্ তো! বলেছে আর কখনও সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে না। আমি জানি তোমার আমার দুজনের মধ্যে সে ছিল একটা হিচ্—

—কিন্তু......

—কিন্তু কিছুই নয়। সে মনে করেছিল আমি অ্যারেস্টেড হয়ে গেছি, এবার আমার কন্‌ভিক্‌শন্ হয়ে যাবে। তখন সে তোমাকে নিয়ে এখানে থাকবে। এই ছিল তার প্ল্যান্। বাট্ ম্যান্ প্রোপোজেস্ এণ্ড ঘোষাল ডিস্‌পোজেস—! আমার ফ্রেন্ডশিপ আছে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে, স্যার জন্ হারবার্টের সঙ্গে চীফ মিনিস্টার ফজ্‌লুল হকের সঙ্গে—। আমার কন্‌ভিক্‌শন্ অত সহজ নয়—! আমাকে কেউ কনভিক্ট্ করতে পারবে না। সেই কথাটাই সেনকে আমি বুঝিয়ে দিলাম—

—কিন্তু তাহলে দীপু আর আসবে না?

—তুমিই বলো না, এখানে সে এ ক'দিন এসেছে?

সতী বললে—আমি তো দীপুর জন্যই বসে আছি। অনেক কাজ আছে তার সঙ্গে আমার—

—কী কাজ?

সতী বললে—আমার এখানে থাকা-খাওয়ার একটা খরচ তো লাগবে। আমার

বাবার সাক্‌সেসন্ সার্টিফিকেট্ নিতে হবে। বাবার ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাও তুলতে হবে। আমার বাবা তো মারা গেছেন—

মিস্টার ঘোষাল মুখে একটু সহানুভূতি জানালে। তারপর বললে—কিন্তু তোমার টাকার দরকার, তা আমাকে বলোনি কেন?

বলেই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে এগিয়ে দিলে। বললে—এই-গুলো রাখো তুমি তোমার কাছে, কীপ্ ইট্—

সতী হাত বাড়ালে না। বললে—থাক্—

—না না, থাকবে কেন? কীপ্ ইট্ উইথ্ ইউ,—আমার কাছে তোমার লজ্জা করবার দরকার নেই। যখনি তোমার টাকার দরকার হবে আমার কাছে বলতে লজ্জা কোর না। আর তা ছাড়া, তোমার ফ্ল্যাট্‌টা তো এখনও রেখেছি আমি। তুমি সেখানেই চলো না। চাকরি করতে না-চাও কোর না, দ্যাট্‌স্ ওয়েল এণ্ড গুড্, তোমার চাকরি করার দরকারও হবে না। অন্তত যদ্দিন আমি আছি—

সতী বললে—চাকরি আমি আর কোরবোও না—

—ভালোই তো, চাকরি করার দরকার কী তোমার। আমি তো আছি। আসলে আমার তো চাকরি রইলই। যারা ভাবছে আমার জেল হয়ে যাবে, আমাকে যারা ভিলিফাই করে বেড়াচ্ছে, তারা যা-ই ভাবুক, আমি তো জানি আমার গ্রাউন্ড খুব সিকিওর। চলো, তুমি আমার কাছে চলো—

—কিন্তু আপনি জানেন ঠিক যে দীপঙ্কর আর আসবে না?

—ডেড্ সিওর। এর পরে আর তোমার কাছে আসতে তার সাহস হবে না।

—কিন্তু দীপু না এলে যে আমার খুব ক্ষতি হবে!

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু আমি থাকলে তোমার কীসের ক্ষতি। তোমার সাক্‌সেসন্ সার্টিফিকেট্ আমি জোগাড় করে দেব—আর টাকার জন্যে আমি তো আছিই! আমার কেসটা মিটে গিলেই আমি আবার ওই ডি-টি-এসের চেয়ারে গিয়ে বসবো। তখন আমি সেনকে দেখে নেব। আই শ্যাল্ ট্রান্‌স্‌ফার হিম্। মৈমনসিং-এ ট্রান্‌স্‌ফার করে দেব—তুমি দেখে নিও—

সতী তখনও নিজের মনে ভাবছিল। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। দীপঙ্কর তার ঠিকানা জানিয়েছে! এই জন্যেই সে এল না। অথচ তার ভরসাতেই তো এখানে এসেছে সে। এই ক'দিনের প্রতীক্ষার পর এই কথা শুনতে হলো শেষ পর্যন্ত! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন ক্লান্তি এসেছিল তার। এবারে বসে পড়লো একটা চেয়ারে!

মিস্টার ঘোষাল চেয়ারটা এবার আরো সামনের দিকে টেনে নিলে। বললে—তুমি ভাবছো আমি মিথ্যে কথা বলছি?

সতী বললে—না না, তা নয়—

—তা হলে?

সতী বললে—এমন হবে আমি জানতুম না—

মিস্টার ঘোষাল বললে—দি ওয়ার্লড্ ইজ্ এ কুইয়ার প্লেস্ সতী। আগে থেকে কিছুই ভাবা যায় না। এই দেখ না, আমাকেও লোকে ভাবছে আমি ঘুষ খাই, আমি মিস্ মাইকেলকে.....

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল মিস্টার ঘোষাল।

তারপর হঠাৎ সতীর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—সতী—

সতী হাতটা টেনে নিচ্ছিল। মিস্টার ঘোষাল চেপে ধরলে জোরে। বললে—প্লিজ্, প্লিজ্ ডোণ্ট্—

—ছাড়ুন—

মিস্টার ঘোষাল তবু জোরে চেপে ধরে রাখলে : বললে—তুমি সেখানে না যাও, আমি আসবো তোমার এখানে, প্লিজ্, আপত্তি কোর না—

—আপনি হাত ছাড়ুন, নইলে চেঁচিয়ে উঠবো আমি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—সবটা না-শুনেই তুমি আমার ওপর রাগ করছো, আগে শোন আমি কী জন্যে এসেছি—

—বলুন, কী জন্যে ?

মিস্টার ঘোষাল এতক্ষণে হাত ছেড়ে দিলে। তারপর চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তোমার এখানে কোনও লোক নেই, চা করে দিত ? আই ফীল ফর্ টী—

সতী বললে—একটা চাকর আছে, সে-ই রান্না করে কিন্তু তার এখন চা করবার সময় নেই—

—দ্যাট্স্ অল্ রাইট্, কথাটা আমি তোমাকে বলতেই এসেছি, তুমি জানো আমার অনেক এনিমি, অনেক শত্রু আমার। আমার জীবনে এইটেই এক ট্র্যাজিডি। আমি তোমার মত প্রচুর ফ্রেণ্ড্ও পেয়েছি, আবার সেন-এর মত প্রচুর এনিমিও পেয়েছি। আমি জীবন আরম্ভ করেছি খুব পুওরভাবে। কিন্তু এখন আমি একজন রীচ ম্যান্। মোর রীচ্ দ্যান্ ইউ ক্যান্ বিলিভ্। আমি মাস্টার অব ল্যাক্স্। কিন্তু বিলিভ্ মি, আমার পভার্টিরও তুলনা নেই, নো এণ্ড অব্ ইট্—

—কেন ?

মিস্টার ঘোষাল আবার সতীর হাতটা ধরতে এল। সতী তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলে।

মিস্টার ঘোষাল কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—আমি এখন একজন পুওরেস্ট্ বেগার, বেগারেরও অধম এখন—

—সে কী ?

—তোমাকে বলেই বলছি। পৃথিবীর কেউ-ই জানে না। আমার ফ্রেণ্ড্ ফজলুল হক্-সাহেবও জানে না। তাদের কাছে একদিন বড় হয়ে মিশেছি, এখন এই ছোট অবস্থায় আর তাদের কাছে যেতেও ইচ্ছে হয় না। তুমি সেই মিস্ মাইকেলের মার্ডারের কেস্টা শুনেছিলে ? এতদিন কেউ জানতো না। কিন্তু নতুন করে আবার কেস্টা রিভাইভ্ড্ হয়েছে—

সতীরও কেমন করুণা হতে লাগলো মিস্টার ঘোষালের মুখের চেহারা দেখে। লোকটা যেন সত্যিই বড় বিপদে পড়েছে।

—তুমি বুঝতে পারছো, যদি আমার এগেন্স্টে চার্জেস্ প্রমাণ হয়, তো আমার কী হবে ?

সতী বললে—কী হবে ?

—ফাঁসি!

সতীর বুকটা ধড়াস করে উঠলো কথাটা শুনে। ফাঁসি!

—হ্যাঁ, সিওর ডেথ্ বাই হ্যাঙ্গিং—

—তাহলে কী ব্যবস্থা করেছেন আপনি ?

মিস্টার ঘোষালের চোখ দুটো ছল্ছল্ করে উঠলো। বললে—আমি তো বললাম, বাইরে থেকে লোকে যা-ই বলুক, আমি আজ পুওরেস্ট্ অব্ দি পুওর! আমার টোট্যাল ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্ ছিল সেভেন ল্যাক্স্—আজ আমার ফর্টি থাউজেণ্ড্ লোন হয়ে গেছে। কেন শুনবে ?

—কেন ?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যে ইন্ভেস্টিগেটিং পুলিস অফিসার এন্কোয়ারী করছিল তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। শুধু তাকে নয়, তার দলের সকলকে। মায় ডেপুটি সুপারকে পর্যন্ত। আমার কাছে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্ এখন নীল। ব্যাঙ্কে আমার কোনও অ্যাকাউণ্টস্-ই নেই। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড থেকে সিক্সটি সিক্স্ থাউজেণ্ড্ রুপীজ লোন্ নিয়েছি—এখন আমি পপার! তোমার অন্ততঃ শুনলে দুঃখ হবে নিশ্চয়ই, আমি এখন একজন বেগার, আই অ্যাম্ মোর রেচেড্ দ্যান এ বেগার—

সতীরও সমবেদনা হতে লাগলো মিস্টার ঘোষালের অবস্থার কথা শুনে।

—আমি জানি না, আমি তোমার কোনওদিন কোনও উপকার করেছি কি না। কিন্তু থিঙ্ক্ অব্ দোজ্-ডেজ্—তোমারও একদিন ঠিক আমার মত বিপদ ছিল, সেদিন যদি আমি তোমার কোনও উপকারে এসে থাকি তো আমার আজকের বিপদটা তুমি ফীল করতে পারবে—

সতী সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—আমি বুঝতে পারছি মিস্টার ঘোষাল, খুব বুঝতে পারছি—

মিস্টার ঘোষালের গলাটা আরো করুণ হয়ে এল। বললে—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে সতী, ক্রিমিন্যাল্ কেস্ কী ডেঞ্জারাস জিনিস। আমার ফাঁসি হওয়া মানে আমার এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া। চিরকালের মত চলে যাওয়া—, আর কোনও দিন তোমাকে দেখতে পাবো না, তোমার কাছে আসতে পারবো না! আমি মরে গেলে কোনও লোকসান নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে জীবনে দেখা হবে না, এর চেয়ে বড় লস্ আর আমার কিছু নেই—

সতী বললে—সে কথা এখন থাক। কিন্তু ওরা কী বলছে ?

—কারা ?

—ওই ইন্‌ভেস্টিগেটিং অফিসার ?

—ওরা আর কী বলবে! ওরা তো এক নম্বরের চীট্। একটা মার্ডার কেস্ পেলে ওরা তো লাল হয়ে যায়। ওই তো ওরা চায়। আমার সাত লাখ টাকা, আমার লাইফ-লং জমানো টাকাগুলো ওদের দিতে হলো ক্যাশে, ভাবতে পারো। হাউ পপার আই অ্যাম্—

সতী বললে—টাকা তো নিলে, কিন্তু যদি কাজ না হয় ?—

—কাজ না-ও হতে পারে। তাই তো আমি তোমার কাছে এসেছি। এই বিপদের দিনে তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যাবো? হু এল্‌স্ আই হ্যাভ্ গট্ ?

বলে মিস্টার ঘোষাল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। চুরোট টানতেও যেন ভুলে গেল মিস্টার ঘোষাল।

সতী হঠাৎ বললে—আমি আর আপনার কী সাহায্য করতে পারি, বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি একদিন জড়োয়ার হার একটা দিয়েছিলেন আমাকে, দশ হাজার টাকার, সেটা আমার প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাটেই রয়েছে—সেই বেচে বরং কিছু ক্যাশ্ করে নিন—

—না না না, বাই নো মীন্‌স্, সে কিছুতেই হতে পারে না—

বলে অস্বীকারের ভঙ্গীতে মিস্টার ঘোষাল হাত নাড়তে লাগলো। বললে—তুমি জানো না সতী, তুমি জানলে আর এ-কথা বলতে পারতে না। আমার কাছে তুমি টাকার চেয়েও বড়, আমার কাছে তুমি আমার নিজের লাইফের চেয়েও বড়, তুমি জানো না, আমি আমার লাইফ দিয়ে তোমাকে প্লীজ করতে যদি না পারি, আমার ডেথ্ দিয়েও প্লীজ্ করতে প্রস্তুত—

—ও-সব কথা থাক্, এখন করবেন কী, তাই বলুন ?

মিস্টার ঘোষাল আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো এবার। গলাটা আরো নিচু করলে। বললে—একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো এই কেসে—

সতীও অবাক হয়ে গেল। বললে—আমি ? আমি বাঁচাতে পারি ? কী ভাবে?

—হ্যাঁ শোন তবে, আমার এগেন্‌স্টে দুটো কেস্। একটা ঘুষ নেওয়ার জন্যে, আর একটা মার্ডার চার্জে। তোমাকে স্পেশাল-ট্রাইবুনালে সাক্ষী দিতে হবে আমার ফেবারে—

—কী বলতে হবে বলুন? আমি তো জীবনে কখনও সাক্ষী দিইনি—

—সে আমি আর আমার ল'ইয়ার সব তোমায় শিখিয়ে দেব। তুমি বলবে যে আমাকে তুমি কখনও ঘুষ নিতে দেখনি। আর মার্ডার চার্জের কেসেই তুমি আমাকে বেশি সাহায্য করতে পারো। তোমার হাতেই আমার লাইফ্ নির্ভর করছে—

—কেমন করে ?

মিস্টার ঘোষাল বললে—একটা চিঠি লিখে দিয়ে। আমার নামে একটা চিঠি লিখে দিয়ে—

—চিঠি ?

—হ্যাঁ, একটা চিঠি তুমি আমার নামে ব্যাক্ ডেট্ দিয়ে লিখে দেবে।

বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলে মিস্টার ঘোষাল। একটা ভাঁজ-করা কাগজ। কাগজের ভাঁজ খুলে সামনে এগিয়ে ধরলে। বললে—এইখানে একটু তুমি নিজের হাতে লিখে দাও—

—কী লিখবো ?

মিস্টার ঘোষাল বললে—লিখে দাও, যেন তুমি আমাকে চিঠি লিখছো, তুমি আজ আপিস থেকে সকাল-সকাল বেরিয়ে সোজা আমাদের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে চলে আসবে। আজ এখানেই চা খাবে। তারপর রাত্রের খাওয়াও এখানে সারবে। আর তারপর সারারাত এখানেই থাকবে—। আবার ভোর হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেব—এইটুকু কথা দয়া করে লিখে দাও সতী—

বলে মিস্টার ঘোষাল কাগজটা আবার সতীর সামনে বাড়িয়ে ধরলে।

বললে—প্লীজ সতী, আমার লাইফের জন্যে অন্তত এইটুকু করতে তুমি হেজিটেট্ করবে না আশা করি—

—কিন্তু ও-কথা লিখলে আপনার কী সুবিধে হবে বুঝতে পারছি না।

মিস্টার ঘোষাল বললে—সুবিধে হবে এই যে, যে-রাত্রে মিস্ মাইকেল খুন হয়, সে-রাত্রে আমি আপিসের পর তোমার সঙ্গেই কাটিয়েছিলাম, সমস্ত রাত, এইটেই প্রমাণ হবে। আমার এগেন্‌স্টে সমস্ত চার্জ নালিফায়েড হয়ে যাবে। আমি বেনিফিট-অব্-ডাউট্ পাবো—

সতী বললে—কিন্তু আসলে তো তা মিথ্যে কথা—

—তা হলেই বা মিথ্যে, আমার লাইফের চেয়ে তোমার ট্রুথ্‌টাই বড় হলো! আর আমি তো এ-চিঠি কোথাও প্রোডিউস করবো না, এক কোর্ট ছাড়া। কোর্টে গিয়ে এ-চিঠি তোমাকে দেখানো হলে তুমি বলবে, এ তোমারই হাতের লেখা—। আমার অ্যাড্‌ভোকেটও বলবে যে মার্ডারের দিন আমি তোমার সঙ্গে ছিলুম—কেস্ তখুনি ফেঁসে যাবে। আমাকে আমার অ্যাড্‌ভোকেট্ এই পরামর্শই দিয়েছে—

সতীর কেমন ভয় করতে লাগলো। একজনের জীবন। সেই জীবনের চেয়ে কী তার সত্যটাই বড় হলো! তার জীবনে আর আছে কী? কার কাছেই বা আশা করবার কী আছে? এ-জীবনের মত সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তো তার শেষ হয়ে গেছে। এইটুকু উপকার সে করতে পারবে না একটা মানুষের! প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের জীবন তার শেষ হয়ে গেছে। সে তার জীবনের এক বিগত পরিচ্ছেদ। বাবাও আর এ-পৃথিবীতে নেই। দীপঙ্করও আর আসবে না। তবে,

এ-উপকারটুকু করতে কেন সে দ্বিধা করছে? কেন তার এত সঙ্কোচ?

মিস্টার ঘোষালের চোখ দুটো বড় মিনতি-করুণ! একদিন এই লোকটার কাছে সে তো একটা উপকার পেয়েছিল। তারও তো একটা প্রতিদান আছে! যত ঘৃণাই থাক, তার জীবন আজ বিপন্ন। তার চাকরি গেছে, সম্মান গেছে, সম্ভ্রম গেছে, অর্থ গেছে। জীবনটুকুই শুধু বাকি আছে এখনও। সেইটুকুও আজ যাবার দাখিল।

সতী মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে আবার চেয়ে দেখলে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—লিখবে?

—কিন্তু আমার কোনও ক্ষতি হবে না তো এতে?

—তোমার ক্ষতি হবে কেন সতী? তোমার ক্ষতি হবে মনে করলে কি তোমাকে আমি এ-কাজ করতে বলতুম? আফ্‌টার অল্‌, আমি তোমার একজন আর্ডেণ্ট ওয়েল-উইশার। তোমার ক্ষতি আমারই ক্ষতি! তোমার রেপুটেশনে স্পট্‌ লাগলে তো আমারও রেপুটেশনে স্পট্‌ লাগবে! তুমি এতদিনেও বোঝনি? তুমি বুঝতে পারছো না কতখানি বিপদে পড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি?

সতী সোজা হয়ে বসলো এবার। বললে—দিন, কী লিখতে হবে বলুন—

মিস্টার ঘোষাল নিজের কলমটা এগিয়ে দিলে। বললে—লেখ—

সতী মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চাইলে। বললে—কী লিখতে হবে বলুন, আমি লিখে দিচ্ছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—লেখ—কাল তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছিলে, আজ আপিস থেকে সকাল-সকাল বেরিয়ে সোজা আমাদের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে চলে আসবে। এখানেই চা খাবে। তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না এখানে। তারপর রাত্রের খাওয়াও সারবে। আর তারপর সারারাত এখানেই থাকবে। প্যালেস-কোর্টে ফিরে যেতে পারবে না। আবার ভোর হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেব—

মিস্টার ঘোষাল একটু-একটু করে বলে যেতে লাগলো আর সতী লিখতে লাগলো।

সতী বললে—তারপর?

—তারপর নিচেয় তোমার নাম আর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঠিকানা বসিয়ে দাও—

—কোন্‌ তারিখ বসাবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—আচ্ছা, তারিখটা আমিই বসিয়ে দেব। যে-তারিখে মিস্‌ মাইকেল খুন হয়েছিল, সেই তারিখটা নির্ভুল করে বসিয়ে দেব—তার জন্যে কিছু ভেবো না—

সতী নিজের নাম লিখলে, ঠিকানা দিলে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের। তারপর মিস্টার ঘোষালের দিকে এগিয়ে দিলে। চিঠিখানা নিয়ে একবার পড়ে দেখে

তারপর ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলে। বললে—তোমাকে আমি কী করে যে আমার গ্রেটফুলনেস্‌ জানাবো আমি বুঝতে পারছি না সতী। আমি আজীবন তোমার কেনা হয়ে রইলুম—

বলে পকেটে হাত দিয়ে ভাল করে দেখলে ঠিক আছে কি না। তারপর বললে—আর ওই স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের কেসটার জন্যে আমি ভাবি না, টাকাটা তো আমার হাতে পায়নি। ম্যাজিস্ট্রেট ঘরে ঢোকবার আগেই আমি টাকাটা ছুঁড়ে ফ্লোরের ওপর ফেলে দিয়েছিলুম। যদি দরকার হয়, তোমাকে বড়জোর একদিন হয়ত সাক্ষী দিতে হবে—তা দিতে পারবে না?

সতী বললে—দেব—

—তাহলে আমি এখন আসি। আমাকে আবার এখুনি অ্যাডভোকেটের কাছে যেতে হবে। আজকাল এইসব নিয়েই খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। ফ্রাইটফুলি বিজি—

সতীও দাঁড়িয়ে উঠলো। মিস্টার ঘোষাল চলে যাবার উপক্রম করতেই সতী বললে—আমার কোনও ক্ষতি হবে না তো মিস্টার ঘোষাল?

—না-না, এ তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে? আমি তোমার ক্ষতি করতে পারি? তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক? বলে মিস্টার ঘোষাল আর দাঁড়াল না। বাইরে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাইতেই গিয়ে উঠলো।

* * *

মানুষের জীবনের একপ্রান্তে আছে অস্তি, আর একপ্রান্তে নাস্তি। এই 'হাঁ' আর 'না'র মধ্যে দিয়ে জীবনের গতি মহাজীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক ঘড়ির দোলকের মত। একবার সে বাইরে আসে, আবার ভেতরে। একবার বলে আমি সংসারের মধ্যে বাঁচবো, আর একবার বলে সংসারের বাইরে।

সেদিন মিস্টার ঘোষাল চলে যাবার পর অনেকক্ষণ সতী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে। পেছনে রঘু এসে ডাকতেই যেন সম্বিৎ ফিরে এসেছিল।

—রান্না হয়ে গেছে দিদিমণি।

এর মধ্যেই রান্না হয়ে গেছে। এখন কটা বাজলো! এতক্ষণ কাটিয়ে দিয়েছে মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে। কিছুই খেয়াল ছিল না তো তার। আশ্চর্য! আবার নিজের ঘরে ঢুকে আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সতী! আবার নিজের মুখখানার দিকেই দেখতে লাগলো তেমনি করে। দীপঙ্কর আসবে না। মিস্টার ঘোষালের কথায় এতক্ষণে যেন দীপুর না-আসার কারণটা বোঝা গেল। এত ভয়! এত সঙ্কোচ! এত ঘৃণা!

সমস্ত মুখখানা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠলো। মনে হলো, দরকার নেই। দীপু না আসুক, তাতে তার কিছুই ক্ষতি নেই। একলাই সে এগিয়ে যাবে

সামনে। যার কেউ নেই, তাকে কে সাহায্য করে সংসারে? কারো সাহায্যের প্রত্যাশায় তো সে জন্মায়নি এ-পৃথিবীতে। তার জন্মের পর যেমন মা'র মৃত্যু হয়েছে, তেমনি বাবারও মৃত্যু হতে পারতো। ধরে নেওয়া যাক, সংসারে সে নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক শুধু আছে। সে-সম্পর্কটা না-থাকারই মত। আজ থেকে তার কথাও ভাববে না। এখানেই তার পূর্ণচ্ছেদ হোক। এই মুহূর্তে।

রঘু খাবার এনে দিলে। কী খেলে সতী কে জানে। নিজেও বুঝতে পারলে না কী সে খাচ্ছে।

—আপনি তো কিছুই খেলেন না দিদিমণি!

সত্যি, কিছুই খাওয়া গেল না। চাকরটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে ভাল রাঁধতে। সতী বললে—রান্না তোমার খুব ভাল হয়েছে রঘু, আমি কিন্তু এত খাই না, তুমি কিছু মনে কোর না—

তারপর খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানায় বসে পড়লো। সেই সকালে ঘুম থেকে ওঠা, আর রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া। এই-ই তো জীবন। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। এমনি করে আজকের দিনটাও চলবে। সন্ধ্যেবেলা সূর্য ডুবে যাবে। আবার কাল সকালে সূর্য উঠবে আকাশে। আবার রান্না করবে রঘু। আবার খেতে হবে। তারপর সন্ধ্যেবেলা আবার সূর্য অস্ত যাবে। এমনি করেই অনাদিকাল ধরে পৃথিবী চলছে, চলবে। কিন্তু একদিন সতী আর কিছু দেখতে পাবে না। বাইরে রঘু কাজ করছে। হয়ত বাসন মাজছে। খুট্-খাট্ শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর পাড়ায় তখন খানিকক্ষণের জন্যে ক্লান্তি নেমে এল। আর ক্লান্তি নেমে এল সতীর মনের পরিধিতে। কালও রঘু এসে বাজারের টাকা নেবে। তার পরদিনও নেবে। তার পরদিনও। কিন্তু তারপর আর টাকা থাকবে না। লক্ষ্মীদির দেওয়া টাকাগুলো একদিন-না-একদিন ফুরিয়েই যাবে। তখনও দীপু আসবে না।

হঠাৎ কী যে হলো। বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। সতী উঠে বসলো বিছানায়। বেলা যেন পড়ে এসেছে। বাইরে এসে সতী ডাকলে—রঘু—

রঘু ঘুমোচ্ছিল বারান্দার ফালিটার ওপর। অঘোর ঘুম।

—রঘু, রঘু—

রঘু ধড়ফড় করে উঠে বসলো। সতী বললে—তুমি চলো রঘু আমার সঙ্গে, একবার যেতে হবে তোমাকে—

—কোথায়?

—ভবানীপুরে। তুমি একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে এসো, আমি তোমায় বাড়িটা দেখিয়ে দেব। তুমি শুধু খবরটা নিয়ে আসবে বাড়ির ভেতর থেকে—

হঠাৎ বেশ ছিল। মনটা যেন কেমন টন্‌টন্ করে উঠলো। মনে হলো, সব সুর যখন ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছত্রখান হয়ে গেছে, তখনও যেন একটা মানুষের জন্যে

কেমন আকর্ষণ অনুভব করছে। এও হয়ত সেই ঘড়ির পেণ্ডুলাম। দীপঙ্করই পেণ্ডুলামের কথাটা বলেছিল। একবার মন বলে—নেই। আর একবার বলে—আছে। এও যেন সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ। নিমেষ-উন্মেষের দ্বন্দ্ব। তা না হলে এমন কেন হয়! যাকে প্রাণপণে অস্বীকার করি আজ, কাল তার জন্যেই আবার কেন হাহাকার করে ওঠে অন্তরটা! একবার ভেতরে এসে কেন ভাবি বেশ আছি, আবার কেন বাইরের জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করে। তবে কি এরই নাম এগিয়ে যাওয়া!

কোথা থেকে একটা গাড়ি এনেছিল রঘু। সতী সেই গাড়িতেই উঠে বসলো। রঘু বসলো ড্রাইভারের পাশে।

তারপর লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে গাড়ি একেবারে কলকাতার হৃৎপিণ্ডের ওপর গিয়ে পড়লো।

—এবার কোন্ দিকে দিদিমণি?

শেষ পর্যন্ত হাজরা রোডের মোড় পেরিয়ে বাঁ দিকে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের কাছে গিয়েই সতী বললে—এখানে থামাও—

গাড়িটা রাস্তার ফুটপাথ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সতী বললে—ওই যে লাল তেতলা বাড়িটা দেখছো রঘু, ওর সামনে সদর-গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে তুমি, সোজা ভেতরে—

রঘু বললে—যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে?

সতী বললে—বলবে......

বলতে গিয়েও সতী থেমে গেল। সত্যিই তো, কেনই বা সে এল এখানে? কীসের আশায়? ভেতরে কার খবর সে নিতে এসেছে? কেন এল এতগুলো টাকা খরচ করে? মিছিমিছি শুধু কষ্ট। যদি খবর নেবার আগ্রহই থাকে তার সে তো সাহস করে নিজেই যেতে পারে!

সতী বললে—না, থাক, তোমার যাবার দরকার নেই, ফিরে চলো—গাড়িতে উঠে পড়ো তুমি—

রঘু আবার গাড়িতে উঠলো। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলে। তারপর গাড়িটা ঘুরিয়ে হাজরা রোডের দিকে মুখ করতেই সতী আবার বলে উঠলো—না না, গাড়ি আবার ঘোরাও—

—কেন দিদিমণি?

সতী বললে—এত দূর যখন এসেছি, তখন ফিরে গিয়ে লাভ কী? তুমি বাড়ির ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে বাড়ির চাকর-বাকর যাকে সামনে পাবে—

—কী জিজ্ঞেস করবো?

সতী বললে—জিজ্ঞেস করবে দাদাবাবু কেমন আছেন? শুধু এই, আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না—এ খবরটা নিয়েই চলে আসবে। আমি এইখানে গাড়িতে বসে রইলুম—

গাড়িটা আবার রাস্তার ফুটপাত ঘে'ষে দাঁড়াল। রঘু দরজা খুলে বাইরে নামলো। তারপর সতী লক্ষ্য করলে রঘু ঠিক লাল রং-এর তেতলা বাড়িটার সদর গেটটার সামনে দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আর দেখা গেল না তাকে। গাড়ির ভেতরে একলা-একলা বসেও সতী যেন ঘামতে লাগলো গরমে।

কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল সতী, সে-খেয়াল ছিল না সেদিন। দুপুর বেলা হাজরা রোডের মোড়ে তখন ভিড় নেই। হঠাৎ রঘু এল গাড়ির কাছে। পেছনে-পেছনে শম্ভু। বৌদিমণিকে দেখেই গাড়ির পা-দানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—কী শম্ভু, কেমন আছো তুমি?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, বৌদিমণি, আপনি বাড়ির বাইরে গাড়িতে বসে আছেন, একবার ভেতরে আসবেন না?

সতী বললে—আমি আর ভেতরে যাবো না এখন, এমনি তোমাদের খবর নিতে এসেছিলুম। তোমার দাদাবাবু কেমন আছেন?

শম্ভু বললে—কিন্তু আপনি ভেতরে না-এলে দাদাবাবু আমার ওপর রাগ করবেন—

সতী বললে—তুমি তাঁকে বোল না যে আমি এসেছিলাম এখানে। তোমরা সব ভাল আছো তো?

—না বৌদিমণি, ভালো নেই আমরা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আসুন একবার ভেতরে, বাড়ির অবস্থাটা একবার দেখে যান—কী যে হাল হয়েছে আমাদের, আপনি নিজের চোখে দেখে যান, দাদাবাবু যেন কেমন হয়ে গেছেন আজকাল!

—কেন? কী হলো তাঁর?

—আজকাল আর কারোর সঙ্গে কথাও বলেন না। তাঁকে দেখবারও কেউ নেই, কেউ দেখেও না, তিনি খেলেন কি খেলেন না।

সতী বলে—তা তোমরা দেখতে পারো না? তুমি তো এতদিন ধরে আছো এ-বাড়িতে, তুমি তো পুরোনো লোক—

—দাদাবাবুর যত্ন করলে মা-মণি যে রাগ করেন বৌদিমণি।

—কেন?

শম্ভু বললে—মা-মণিকে তো আপনি চেনেন বৌদিমণি, বড় যে রাগী মানুষ! কারোর ভালো দেখতে পারেন না যে।

সতী বললে—আচ্ছা, তুমি এখন যাও শম্ভু, তোমার মা-মণি আবার জানতে পারলে বকবে—

—না, মা-মণি তো বাড়িতে নেই।

—নেই? কোথায় গেছেন?

শম্ভু বললে—নয়াসীমার সঙ্গে কোথায় বেরিয়েছেন দুপুরবেলা—আপনি আসুন না, বাড়িতে দাদাবাবু ছাড়া আর কেউ নেই—

হঠাৎ সতী যেন নিজের মনেই একবার ভাবলে। কেউ নেই বাড়িতে! একলা আছেন। এতদিন পরে, এই দুর্ঘটনার পরে, আবার ঢুকবে এ-বাড়িতে? এই বাড়িরই ইঁটগুলোর মধ্যে কত বিনিদ্র রাত কেটেছে তার, কত অশান্তির প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমস্ত কলকাতাটা যেন আবার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেই দুপুরবেলা সতীর মনে হলো আবার যেন ভাল লাগছে তার। আবার যেন স্ত্রী হয়ে সংসার করতে ইচ্ছে হলো। ড্রাইভারটা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। শিখ ড্রাইভার। কথাগুলোর কিছুই হয়ত বুঝছে না। এমন কত ঘটনার সঙ্গে তাকে মুখোমুখি হতে হয় প্রতিদিন। কলকাতা শহরে এসেছে সে কতদিন। এমন কত হাসি, কত কান্নার মধ্যেই তো তাকে পেট চালাতে হয়েছে। সে জানে, এ-সব কিছুই নয়। এমন হয়েই থাকে হামেশা। এদিকে চোখ-কান দিতে নেই। মাথায় গোল ঝুঁটি নিয়ে সে সামনের দিকে চেয়ে ঝিমোচ্ছিল।

সতী বললে—কিন্তু গাড়িটা কি ছেড়ে দেব?

শম্ভু বললে—ছেড়ে দিন না, আমি আবার ট্যাক্সি ডেকে দেব আপনাকে—

ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে সতী। তারপর বাড়ির দিকে যেতে-যেতে বললে—কখন ফিরবে তোমার মা-মণি?

—তা বলে যায়নি, নয়াসীমার গাড়িতে যখন বেরিয়েছেন, তখন ফিরতে বেলা হবে—

রঘুও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। সতী বললে—তুমি নিচেয় থেক রঘু, আমি একটু পরেই ভেতর থেকে আসছি—

বাড়ির ভেতরেও সবাই বোধহয় খবরটা পেয়েছিল। বাতাসীর-মা দৌড়তে দৌড়তে এসেছে। গেটের গোড়ায় এসে হাঁ করে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। পেছনে ভূতির মা। কৈলাসও দৌড়তে দৌড়তে এসে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পরে বৌদিমণি এসেছে। সবাই যে-যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে।

সতী কাছে আসতেই বাতাসীর-মা সামনে এগিয়ে এল। বললে—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার বৌদিমণি?

সতী বললে—তোমরা সব ভালো আছো তো বাতাসীর-মা?

—আর ভালো! ভালো থাকবার আর কি যো আছে বৌদিমণি যে ভালো থাকবো!

কৈলাস হঠাৎ বলা-কওয়া নেই একেবারে সতীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। সতী এক-পা পেছিয়ে গেল। বললে—একি করছো কৈলাস! আমি কি হঠাৎ পর হয়ে গেলাম নাকি তোমাদের কাছে?

বাতাসীর-মা বললে—তুমি ছিলে না, বাড়ি একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বৌদিমণি, একেবারে অন্ধকার—!

আজ নতুন করে সতীর চোখে যেন আবার জল এসে পড়লো। এরা সবাই এত ভাল! এত ভাল সবাই। আজ যেন সবাইকে আবার বড় আপনার মনে হলো। এই গেট্! এই গেটের ওপরেই দরোয়ান বসে থাকতো আগে।

—এখানে দরোয়ান কোথায় গেল?

—আহা, তার চাকরি গেছে বৌদিমণি! এবার আমাদেরও চাকরি চলে যাবে।

ভূতির মা বললে—তা এবার তুমি এখানে থাকবে তো গা? দেখ দিকিনি, তুমি ছিলে না, সমস্ত বাড়িটা কীরকম হাঁ-হাঁ করছিল—

সতী চারদিকে চেয়ে দেখছিল। বললে—ফুলের গাছগুলো বুঝি কেউ আর দেখে না? মালি নেই বুঝি?

সেই বিয়ের প্রথম দিনে এসে এই বাগানের দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গিয়েছিল সতী। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে হঠাৎ একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে—তখন এ যেন কল্পনার বাইরে ছিল। সেই সিঁড়ির দুপাশে মোরাদাবাদী ভাসের ওপর ক্যাকটাস্। মেঝেগুলোও আর তেমন পরিষ্কার নয়।

—পরিষ্কার কে করবে বৌদিমণি, আমরা আজ মাইনে পাইনি কতদিন।

সতীও অবাক হয়ে গেল।

—মাইনে পাওনি?

—না, বৌদিমণি! সরকারবাবুও তো দেশে গেছে কাল। তার তো ছেলে-মেয়ে আছে দেশে। তার কী করে চলে!

কেন এমন হলো এ-বাড়ির? কার পাপে এমন হলো? সিঁড়ির কাছে এসেও সতী খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো যেন বাড়িটার অন্তরাত্মা সেই দুপুরবেলা বড় ক্ষীণ সুরে কাঁদছে। চমকে উঠলো সতী। সে কি! এই তো পাশেই শম্ভু রয়েছে, বাতাসীর-মা রয়েছে, ভূতির মা রয়েছে। এ তো পড়ো-বাড়ি নয়, তবে এ-কান্না কিসের। তবে কি ভুল করেছে সে! এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো সতী।

—ও কিছু না বৌদিমণি, ও পায়রা!

পায়রা! পায়রা তো ছিল না অ্যাতো! পায়রা কোথা থেকে এল। সতী কড়িকাঠের দিকে মুখ তুলে দেখলে।

বাতাসীর-মা বললে—ক'দিন হলো দেখছি, মুখপোড়া পায়রা ক'টা ওইখেনে এসে জুটেছে। দিনরাত কেবল কোঁ-কোঁ করে—

সতী লাইব্রেরী ঘরের দিকে যাচ্ছিল। শম্ভু বললে—ওদিকে নয় বৌদিমণি, দাদাবাবু ওপরে, নিজের ঘরে—

—কেন, নিজের ঘরে কেন? শরীর খারাপ নাকি!

শম্ভু বললে—না, এই তো এতক্ষণ পড়ছিলেন, এই একটু আগে দেখলাম ওপরে গেলেন—

সতী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। শম্ভুও চলতে লাগলো পেছন-

পেছন। বাতাসীর-মা, ভূতির-মা, কৈলাস তারা আর এগোল না। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। ভূতির-মা বললে—বৌদিমণি কি এ-বাড়িতে থাকতে এল নাকি বাতাসীর-মা? হঠাৎ এল কেন বলো তো?

—তুই থাম্ তো ভূতির-মা, নিজের সোয়ামীর কাছে না-এসে কোথায় যাবে শুনি?

ভূতির-মা বললে—কে জানে মা, আমরাও তো মেয়েমানুষ, এমন কাণ্ড ভূ-ভারতে দেখিনি—

তেতলার সিঁড়ির মাথায় উঠে সতী একবার দাঁড়াল। বারান্দার শেষে শাশুড়ীর ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। তারই বাঁদিকে সতীর নিজের ঘর। নিজের ঘরের দিকে যেতেও সতীর পায়ে যেন বাধতে লাগলো।

শম্ভু বললে—যান না বৌদিমণি, যান, দাদাবাবু ঘরের ভেতরে আছে—

তবু যেন সতীর বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো। এ যেন চুরি করে পরের ঘরে ঢোকা! শম্ভু আর এগোল না। সতী পায়ে-পায়ে নিজের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো ছিল। একবার কী রকম একটা সঙ্কোচ হলো মনে। তারপর দরজাটা ঠেলতেই ভেতর থেকে সনাতনবাবুর গলার আওয়াজ এলো—কে? মা-মণি?

তারপর সামনে সতীকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি?

সতী সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। সনাতনবাবুও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। সতীর হাতটা ধরলেন। বললেন—তুমি? তুমি কোথা থেকে হঠাৎ?

সতী যেন আর দাঁড়াতে পারলে না। পায়ের কাছে বসে টলে পড়লো।

বললে—তুমি আমাকে ক্ষমা করো গো, ওগো, তুমি ক্ষমা করো আমাকে—

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লো সতী। যেন চরম নির্ভরতার আশ্রয়ে এসে সতীর অন্তরাত্মার ভেতর থেকে আনন্দের একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

সনাতনবাবু বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। কী করবেন যেন বুঝতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি সতীর কাঁধ দুটো ধরে তুলতে চেষ্টা করলেন। বললেন—ছি-ছি, করো কী, করো কী! তুমি দেখছি......

সকাল বেলাও দীপঙ্কর জানতো না। একটার পর একটা প্রশ্ন শুরু হয়েছে। যুদ্ধের বড় দুর্বৎসর সেই উনিশ শো বেয়াল্লিশ সাল। অ্যালায়েড্ পাওয়ার্স-এর চোখের সামনে তখন আলোর সামান্য একটু রেখা দেখা দিয়েছে সবে। স্ট্যালিন-গ্র্যাড্ তখনও জার্মান আর্মির ট্যাঙ্কের সামনে অচল-অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নর্থ আফ্রিকাতে জেনারেল মণ্টগোমারী আরো জোরে এগিয়ে চলেছে ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের দিকে। সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলবার কথা বলছে রাশিয়া। বলছে—

তোমরা আরো একটু চাপ দাও। তোমরা চাপ দিচ্ছ না বলে রাশিয়াকে একলা একশো বাহাত্তরটা জার্মান ডিভিসনের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে—কিন্তু আর কতদিন তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ওদিকে যখন হোয়াইট-সী থেকে ব্ল্যাক-সী পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা জুড়ে তিরিশ-চল্লিশ লক্ষ জার্মান আর রাশিয়ান লড়াইতে মেতে আছে, তখন চার্চিল পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সব কিছু জোগাড় করে পাহাড় করে তুলেছে। লিবিয়া, ইথিওপিয়া, সিসিলি, সার্ডিনিয়া সব জায়গায় আঘাত করবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। চারদিকের সমস্ত গোলমালের মধ্যে ইণ্ডিয়াতেও গোলমাল বেধে গেছে। ইণ্ডিয়া বলছে—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—

মহাত্মাজী বলেছেন—You have to forsake wife, friends, forsake everything in the world. Even if all the United Nations opposed me, even if the whole of India tried to pursuade me that I am wrong, I will go ahead, not for India's sake alone, but for the sake of the world. I have pledged the Congress and the Congress will do or die.

কলকাতা শহরের সমস্ত পাড়ায় এ-আর-পি, সিভিক-গার্ড-এ ভরে গেছে। যে-সব ছেলে এতদিন চাকরি পায়নি, বেকার বসে ছিল, তারা তিরিশ টাকা করে হাতখরচ পাচ্ছে, খাকি পোশাক পাচ্ছে। তাদের মুখে বিড়ি, সিগারেট। তারা পুরো দমে সিনেমার সামনে লাইন দিচ্ছে। হিন্দী সিনেমার পোস্টারে ছেয়ে ফেলেছে শহর। আর এদিকে সন্ধ্যে হলেই ব্ল্যাক-আউট, পাড়ায়-পাড়ায় সাইরেন-পোস্ট হয়েছে। সরকারী টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। কিন্তু কোথা থেকে কারা ঠিক সন্ধ্যে হলেই বাইরে বেরিয়ে আসে। ইলেকট্রিকের তার কেটে দেয়, মিলিটারি লরীতে ঢিল ছোঁড়ে। তারপর বন্দুকের শব্দ হলেই হুড় মুড় করে ছুটে পালিয়ে হাওয়া হয়ে যায়।

দীপঙ্কর রাস্তায় বেরিয়ে এসে চারদিকে চেয়ে দেখলে। মনে হলো যেন আর এক নতুন পৃথিবী দেখছে সে। ট্রাম, বাস, লোক-জন সবই যেন নতুন লাগলো। মনে আছে, খানিকক্ষণের জন্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে। লক্-আপের মধ্যে কিছু খবর পেত না, কিছু দেখতে পেত না। শুধু মনে হতো সারা দেশে যেন আগুন লেগেছে। শুধু খাকি পোশাক চারদিকে। কোথা থেকে সব নতুন পুলিসের দল এসেছে। সবাই ব্যস্ত। যেন এক মুহূর্ত দেরি করলে জাপান এসে পড়বে ইণ্ডিয়ায়। দীপঙ্কর তাদের দেখতো আর ভাবতো, এত লোক চাকরি পেয়েছে আজ। আজ পৃথিবীর কেউ বেকার তো বসে নেই। ইণ্ডিয়ার একটা বেকার লোকও আজ আর আপিসে-আপিসে ধর্না দিয়ে বেড়ায় না। কেউ ঢুকেছে মিলিটারিতে, কেউ সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে, কেউ ফুড রেশনিং-এ, কেউ এ-আর-পি, কেউ সিভিক গার্ড-এর দলে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি সবাই চাকরি পেতে পারে, তা হলে যুদ্ধের পর কেন পাবে না? সে টাকা কোথায় যাবে?

কাদের পেটে? এই পুলিস আর মিলিটারির দল যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন আমরা বেকার হবো আবার? কেন আমরা আবার বেকার বসে বসে আড্ডা দেব? এতদিন যুদ্ধের কাজে লেগেছি, এখন পিস্‌টাইমের প্রোডাকশানের কাজে কেন লাগবো না?

সেই ইনস্‌পেক্টর ভদ্রলোক সুযোগ পেলেই চলে আসতো। এসে দীপঙ্করকে অভয় দিয়ে যেত। বলতো—আপনার ইন্‌কোয়ারী হচ্ছে, আপনার কিছু ভয় নেই—

দীপঙ্কর একদিন বলেছিল—দেখুন, আমার জন্যে ভাববেন না, কিরণের কী হবে বলুন?

ইনস্‌পেক্টর বলতো—দেখুন, ইণ্ডিয়ায় অনেকগুলো এ-কেস্ হয়েছে, ফিফ্‌থ্ কলাম্‌নিস্টদের আর কোনও মাপ্ নেই, ও ফাঁসি হবেই—

—আমার সঙ্গে কিরণের একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন না?

—অসম্ভব স্যার, অসম্ভব! ও ব্রিটিশ-ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের আসামী, ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, কারো বাবার সাধ্যি নেই...কেবল একজন পারে।

—কে?

—চার্চিল, ইংলণ্ডের প্রাইম্ মিনিস্টার!

দীপঙ্কর একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছিল—কবে ফাঁসি হবে?

—তা কেউ জানে না। এ-সব সিক্রেট্ কাউকে জানানোও হয় না। পুলিস কমিশনারও জানে না। সব দিল্লি থেকে হচ্ছে কি না?

বেশিক্ষণ দাঁড়াত না ভদ্রলোক। যখন একটু ফাঁক পেত, তখনই চলে আসতো। তারপর হঠাৎ কথা শেষ হবার আগেই চলে যেত। দীপঙ্করের ওপর ভদ্রলোকের কেমন কেমন একটা মায়া ছিল। বলতো—আপনি ইনোসেন্ট্, তা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের তো হাত নেই কিছু, সব দিল্লি থেকে হচ্ছে—

অনেক কথাই ভাবতো দীপঙ্কর একলা বসে বসে। কাশীকে একটা টাকাও দিয়ে আসা হয়নি। বাড়িতে কাশী আছে, ক্ষীরোদা আছে। তারা কী করছে কে জানে! চাল-ডাল-তরী-তরকারি কিনছে কেমন করে। দিন চালাচ্ছে কীভাবে কে বলতে পারে। আপিসেই বা কী ভাবছে মিস্টার ক্রফোর্ড! একা অভয়ঙ্করই সব চালাচ্ছে হয়ত। আর সতী! লক্ষ্মীদি নিশ্চয় দিল্লি চলে গেছে। ভোর সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ছাড়বার কথা ছিল। হয়ত দীপঙ্করের জন্যে অপেক্ষা করেছিল তারা। কথা দিয়েছিল যাবে। হয়ত ভোর পাঁচটা থেকেই সবাই অপেক্ষা করেছে। সেদিন ভোর পাঁচটা বেজেছে। লক্-আপের বাইরে কোথায় ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো, আর ঘরের ভেতরে দীপঙ্করের হৃৎপিণ্ডে এসে যেন আঘাত লাগলো পাঁচ হাজার বার! হয়ত তাকে না দেখতে পেয়ে সতীও চলে গেছে লক্ষ্মীদির সঙ্গে। চলে গিয়ে থাকলেই ভালো। এখানে থেকেই বা লাভ কী? বাইরে থেকে কন্‌স্টেবল-দের লেফ্‌ট্-রাইটের শব্দ এল। সেই অত ভোরে ট্রামের চাকার ঘড়-ঘড় শব্দ

বাইরের ঘরে খেলা করছিল। দীপঙ্কর জানালার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—খোকা, ওই ও-পাশের লাল বাড়িতে যারা থাকতো, তারা কোথায় গেছে বলতে পারো?

—ওরা তো নেই।

—কোথায় গেছে, জানো তোমরা?

—দাঁড়ান্ মাকে জিজ্ঞেস করে আসি—বলে একজন ভেতরে চলে গেল। তারপর খানিক পরেই দৌড়তে দৌড়তে এসে বললে—তারা দিল্লি চলে গেছে—

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—সবাই দিল্লি চলে গেছে?

—হ্যাঁ সবাই। মা বললে।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘরের মধ্যে সনাতনবাবু কেমন যেন একলা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। বললেন—কিন্তু আমি শুনেছিলাম তুমি কোথায় চলে গেছ?

সতী বললে— আমি কোথায় যাবো, বলো? আমার কি একটা যাবার জায়গা আছে? আর কি আমার বাবা আছে যে তাঁর কাছে গিয়ে লজ্জা বাঁচাবো?

সনাতনবাবু বললেন—লজ্জার কথা বলছো কেন?

সতী বললে— লজ্জা নয়? তোমার সঙ্গে বাবা নিজে আমার ভাগ্যকে একদিন জড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তোমার মান সম্মান লজ্জা সম্ভ্রমের সঙ্গে আমারও মান সম্মান লজ্জা সম্ভ্রম যে জড়িয়ে গিয়েছিল! এখন কি তা আর ভাঙা যায়?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু আমি তো তা ভাঙতে বলিনি—

—তুমি বলোনি; কিন্তু বাধাও তো দাওনি! আমি চলে গেলে তোমার তো কষ্টও হয়নি। তুমি তো আমার অভাবও বোধ করোনি। তুমি তো আমার মত সারা রাত জেগেও কাটাও নি! তুমি তো আমার খোঁজও করোনি একবার?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার খোঁজ? কিন্তু দীপঙ্করবাবুকে দিয়ে আমি তো তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম—পাওনি তুমি?

সতী বললে—সে তুমি খোঁজ নাও আর না নাও, এবার কিন্তু আমি তোমার কথা রেখেছি—হাসপাতাল থেকে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসতে চেয়েছিলে, তখন আসিনি, কিন্তু এখন তো এসেছি! আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হওনি?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি নিচেয় বসে কেন, ওপরে উঠে বোস না—

সতী উঠে বিছানায় বসলো। বললে—বলো তুমি খুশী হওনি, আমি এসেছি বলে?

সনাতনবাবু বললেন—খুশী তো হবোই, তুমি এতদিন পরে ফিরে এলে আর আমি খুশী হবো না?

সতী এবার সনাতনবাবুর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো, বললে—ওগো, তোমরা আর আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

—কেন, তাড়িয়ে দেবার কথা বলছো কেন?

সতী সনাতনবাবুর গায়ের ওপর আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ঝুঁকে পড়লো। বললে—না, তাড়িয়ে দিও না, তুমি তাড়িয়ে দিলে আমার যে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই—। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমার সংসারে। জানো আমি ছোটবেলা থেকে শিবপুজো করে এসেছি। আমার মা ছিল না, তবু কালিঘাটে থাকতে আমাদের পাড়ার এক মাসীমা আমায় শিবপুজো করতে শিখিয়েছিল। আমি জানতুম, আমি তোমার মত স্বামী পাবো, তুমি আমার সব আশায় ছাই দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি। আমার জীবনে কোনও আশাই মেটেনি গো।

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু কাঁদছো কেন তুমি? কেঁদো না—

সতী সনাতনবাবুকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। তারপর সনাতনবাবুর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে পাগলের মত মাথা ঘষতে লাগলো। বললে—তোমার ওপরে আমি অনেক অবিচার করেছি, অনেক অন্যায় করেছি। তোমাদের কষ্ট দিতে গিয়ে আমি নিজেও কত জ্বলে পুড়ে মরেছি, সে-খবর তো তোমরা জানো না—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—যখন আমার রাগ হয় তখন আমার যে মাথার ঠিক থাকে না গো। আমি যে তখন যা তা করি, যা তা ভাবি, আমার মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি দিই। ওগো, সেটা যে আমার মনের কথা নয়, তা তুমি বুঝতে পারো না কেন? বুঝতে না পেরে কেন আমাকে বকো না, কেন আমাকে মারো না তুমি?

সনাতনবাবু সতীর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সতী বলতে লাগলো—এমনি করে তুমি যদি সব সময় আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও তো আমি পৃথিবীর সকলকে ক্ষমা করতে পারি, সকলের সব অত্যাচার, সব গালাগালি মাথা পেতে নিতে পারি—জানো। তুমি তো আমাকে চিনলে না গো। তুমি শুধু আমার বাইরেটাই দেখলে, আমাকে বুঝতেও চেষ্টা করলে না একবার। কিন্তু তুমি যদি আমাকে না বোঝ তো আর কে আমাকে বুঝবে বলো তো? আর কে আছে আমার?

সনাতনবাবু আবার বললেন—কেঁদো না, চুপ করো—

সতী বললে—কাঁদতে যে আমার কী ভাল লাগছে তা যদি তুমি বুঝতে! তোমার বুকে মাথা রেখে কাঁদতেও পাইনি কখনও এমন করে। মানুষ বোধহয় হেসেও এত সুখ পায় নি আমার মত!—আমাকে তুমি কান্না থামাতে বোল না আজ—আমি আজ বুক ভরে কেঁদে নিই—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু এখন থেকে তো তুমি এখানেই থাকবে—

সতী বললে—থাকবো বলেই তো এসেছি। তুমি থাকতে দিলে আমি আর কোথাও যাবো না গো, আমি এবার থেকে এখানেই তোমার কাছে পড়ে থাকবো। তুমি তাড়িয়ে দিলেও আর কখনও যাবো না—

—আমি তোমায় তাড়িয়ে দেব এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে কী করে?

সতী সনাতনবাবুর মুখের কাছে মুখ এনে বললে—আমি যদি চলেও যাই তো তুমি আমায় ধরে রেখো, জানো! আমাকে তুমি হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখো, বুঝলে? রাখবে তো? আমি এই যেমন করে তোমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আছি, এইরকম করে জোরে ধরে রেখো, কিছুতেই ছেড়ো না। আমি ছেড়ে যেতে চাইলেও তুমি ছেড়ো না, কেমন?

সতী প্রাণপণে দু'হাতে সনাতনবাবুকে জড়িয়ে ধরে রইল।

বললে—তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়ে আমি যে কী-ভুলই করেছি, তা আমিই জানি। আমি ফ্ল্যাট ভাড়া করে বাইরে রাত কাটিয়েছি। ভেবেছি তুমি হয়ত আমাকে একদিন গিয়ে ধরে নিয়ে আসবে। আমি বেটাছেলেদের আপিসে গিয়ে চাকরি করেছি। তখনও কতদিন ভেবেছি তুমি আমাকে ধরে নিয়ে এখানে এনে তুলবে। তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি কত কী করেছি, হিন্দু-ঘরের বউ হয়ে যা করা উচিত নয়, তাই করেছি। তবু তোমাকে আমি এতটুকু ভাবাতে পারিনি, এতটুকু রাগাতে পারিনি। তুমি পাথরের ঠাকুরের মত নিশ্চল হয়ে থেকেছ। একবার তোমার জানতেও ইচ্ছে হয়নি আমি খেতে পাচ্ছি কি না, আমি বেঁচে আছি কি না, আমি কেমন করে আছি, কোথায় আছি, কীভাবে আছি!

তারপর হঠাৎ সনাতনবাবুর মুখটা নিজের দিকে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা সত্যি বলো তো, আমার জন্যে তুমি একটুও ভাবতে না? বল না গো?

সনাতনবাবু বললেন—ভাবতুম।

—সত্যি বলছো ভাবতে? আমার জন্যে তোমার ভাবনা হতো? ঠিক আমি যেমন তোমার কথা ভাবতুম, তেমনি করে তুমিও ভাবতে? রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে আমার কথা মনে পড়তো?

সনাতনবাবু বললেন—পড়তো।

—সত্যি মনে পড়তো?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ—

সতী সনাতনবাবুর গলাটা আরো জোরে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বললে—সত্যি বলছো মনে পড়তো আমার কথা? কখন মনে পড়তো? ঘুমোবার আগে না ঘুম থেকে উঠে? না দিনের বেলা? না কি সব সময়?

সনাতনবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

সতী বললে—বলো না গো, আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে। আমি তো সব সময় তোমার কথা ভাবতুম, সকালে বিকেলে, সন্ধ্যেয়, আপিসে কাজ করতে করতে, ঘুমোবার আগে, ঘুম ভাঙার পর—সব সময়। তোমার কখন মনে পড়তো? বলো না গো?

সনাতনবাবু যেন কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বাইরে যেন শম্ভুর গলার আওয়াজ হলো। শম্ভু বাইরে থেকে বললে—দাদাবাবু, মা-মণি এসেছেন—

মা-মণি! শব্দটা যেন ছ্যাঁৎ করে সতীর বুকে এসে বিঁধলো। সঙ্গে সঙ্গে সতীর হাত দুটো সনাতনবাবুর গলা থেকে অবশ হয়ে খসে পড়লো। এতক্ষণ সতী যেন ভুলেই গিয়েছিল কোথায় কোন্ বাড়িতে বসে কথা বলছে। এতক্ষণে যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল তার। এতক্ষণে মনে পড়লো সে লক্ষ্মীদির গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতে থাকে। মনে পড়লো রঘুকে নিয়ে সে এ-বাড়িতে এসেছে একজন অবাঞ্ছিতের মত। মনে পড়লো তার জন্যে রঘু বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আরো মনে পড়লো—এ-বাড়িতে তার ঢোকবার অধিকারও সে হারিয়েছে। এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরকালের মত ঘুচে গেছে। এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিক্রমা করে এল সতী। সমস্ত জীবনটা।

আর সঙ্গে সঙ্গে সনাতনবাবুর ভেজানো দরজাটা হাট করে খুলে গেল।

সেদিন গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং থেকে দীপঙ্কর একেবারে সোজা চলে গিয়েছিল কালিঘাটে। সতীর দিল্লি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর যেন বাইরে মুক্তি পেয়ে গেছে। যেন সতীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বটাই তার কাছে বড়, আর কিছু নয়। দীপঙ্কর যেন সেদিনও জানতো না এ-বিচ্ছেদ তার বিচ্ছেদ নয়। জানতো না এই বিচ্ছেদের অসম্পূর্ণতাই তাকে আবার সতীর কাছে টেনে আনবে! অথচ ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে আবার যেতে যেতে মনে হলো ভালোই হয়েছে। সতীর দিল্লি চলে যাওয়া তো মঙ্গল হয়েছে তার পক্ষে! সতী সুখে থাকুক, সতী শান্তি পাক, এই কামনাই তো দীপঙ্কর দিনরাত করে এসেছে! সতী যদি চলে গিয়েই থাকে, তাতে তো দীপঙ্করের আনন্দ হবারই কথা। না চলে গিয়ে সে কী করতো এখানে! বরং সেখানে গেলে শান্ত হবে মনটা। সমস্ত কলকাতাটাই যেন বিষিয়ে দিয়েছিল সতীকে। একদিন তার শুভাশুভ ভেবেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ধনী পরিবারে। যখন সেখানে সুখ পেলে না, এত চেষ্টা করেও যখন সুখী হলো না সে, তখন চলে গিয়েছে ভালোই করেছে। সতী সেখানেই থাক, সেখানে গিয়েই সুখী হোক, শান্তি পাক—

—বাঁ দিকে চলো, বাঁ দিকে।

ডান দিকে মোড় ঘুরছিল ট্যাক্সিটা। আবার বাঁ দিকে চলতে লাগলো। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ভেতরে ঢুকে গাড়িটা ছেড়ে দিলে। ভেতরে গাড়ি যাবে না। নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের ভেতরে যেতে গেলে হেঁটে যেতে হয়। বিকেল হবো-হবো। পাড়ার কলে তখনও জল আসেনি। কিন্তু কলের সামনে অনেক ঘড়া-কলসী-বালতি ঘেঁষাঘেঁষি সাজানো। ঠিক সেইরকমই আছে পাড়াটা। এতটুকু বদলায় নি। ভুগোলের এত কিছু বদলে গেল যুদ্ধের এই ক'টা বছরে

কিন্তু এই নেপাল ভট্টাচার্যি লেনটা তেমনি অক্ষয়-অটুট হয়ে আছে। কিরণদের বাড়ির সামনে সেই নর্দমাটায় পর্যন্ত সেই একই রকম দুর্গন্ধ। কেমন করে কিরণের মাকে খবরটা দেওয়া যায়, তাই ভাবতে লাগলো।

—মাসীমা!

বাড়ির সামনে এত মাস ধরে পুলিস-পাহারা ছিল, আজ আর তা নেই। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে এখন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সব ভাবনা চুকেছে। কিরণকে ধরে নিশ্চিন্ত হয়েছে স্যার জন হার্বার্ট। নিষ্কণ্টক হয়েছে ইণ্ডিয়া। এবার জাপান আসুক, আর অ্যাক্সিস পাওয়ার্সই আসুক, কোনও দুর্ভাবনা নেই আর। যে যত চাও মিলিটারি কন্ট্র্যাক্ট দিচ্ছি। চালের, নুনের, কাপড়ের এজেন্সি দিচ্ছি। সে-সব ব্ল্যাক-মার্কেট করে লাল হয়ে যাও, কিন্তু ইণ্ডিয়ার ফ্রিডম চেয়ো না। ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা ভালো করতে চেয়ো না। ইণ্ডিয়ানদের পেট-ভরা খাবার চেয়ো না। তোমরা যে-ক'জন বড়লোক আছো, সেই ক'জনকে আমরা আরো বড়লোক করে দেব, তোমাদের রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর টাইটেল দেব, এমনকি তোমাদের কাউকে-কাউকে নাইট করে দেব, কিন্তু খবরদার, তার বেশি কিছু চেও না। তা যদি চাও তো, তোমাদের কিরণ চ্যাটার্জির মত অবস্থা করবো। আমরা লর্ড সিংহ বানিয়েছি একজনকে, তার জন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা কত লোককে নাইট করে দিয়েছি, কত রায়-সাহেব কত রায়-বাহাদুর বানিয়েছি, তবু তোমরা ফ্রিডম চাও ইণ্ডিয়ার?

অনেকক্ষণ দরজা ঠেলতে হলো। মাসীমা বোধহয় প্রথমে শুনতে পায়নি। হয়ত ভেবেছে আবার পুলিস এসেছে থানা থেকে। এমনি বছরের পর বছর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে কিরণের মা'র।

—ওমা, তুমি দীপু! আমি ভাবি কে না কে! কী খবর বাবা?

মাসীমার মুখের ওপর কথাটা বলতে দীপঙ্করের কেমন সঙ্কোচ হলো।

মাসীমা বললে—আজকে মাসের পয়লা নাকি বাবা?

দীপঙ্কর বললে—না পয়লা তারিখ নয়, তবু এলাম একবার দেখতে—

কথাটা শুনে মাসীমার চোখে জল এল। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে—তুমি আমার জন্যে যা করছো বাবা, আমার নিজের পেটের ছেলেও তা কখনও করেনি। তোমাকে আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও—

দীপঙ্কর বললে—আমি আপনাকে নিতে এসেছি মাসীমা—আপনি চলুন আমার সঙ্গে—

মাসীমা বললে—আমাকে আর যেতে ব'লো না বাবা, তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট করেছো, তোমাকে আর বেশি কষ্ট দিতে চাই না—

—সেই জন্যেই তো বলছি আপনি চলুন। আমাকে আপনি কিরণের মতই মনে করবেন মাসীমা, মনে করবেন আমিই আপনার কিরণ!

মাসীমার গলাটা যেন খানিকক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে এল। বললে—তার নাম আর আমার সামনে কোর না বাবা, সে মরে যাক্, তার ফাঁসি হোক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না—যে-কিরণকে আমি পেটে ধরেছি, সে মরে গেছে! মরে গেছে বালাই চুকে গেছে!—

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, আমি আপনাকে আমার কাছে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো—আপনি আপত্তি করতে পারবেন না—আর আপনার এখানে যদি কারো কাছে কিছু ধার থাকে, তাও বলুন, আমি সব মিটিয়ে দেব—

—না বাবা, আমি যাবো না, আমি এখানেই মরে পড়ে থাকবো—

দীপঙ্কর এবার নাছোড়বান্দা। বললে—আমি আপনার কথা কিছুতেই শুনবো না মাসীমা, আমি আপনাকে নিয়েই যাবো, আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন—

তখন আর বেশি সময় ছিল না। কিরণের ফাঁসির খবর শুনলে মাসীমা হয়ত আর বাঁচবে না। সুতরাং মাসীমাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তার আগে দরকার কিরণকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা। যে-কোনও রকমে। শাস্তিই যদি দিতে হয় তো ট্র্যান্সপোর্টেশন-ফর-লাইফ হোক। কত লোকের তো তাই হয়েছে। কুড়ি বছর চব্বিশ বছর পরে আবার ফিরে আসুক। সে-ও ভালো। কিন্তু ফাঁসি! দীপঙ্করের মনে হলো যেন তার নিজেরই মৃত্যুর অর্ডার বেরিয়েছে। তার নিজেরই যেন আর বাঁচবার অধিকার নেই পৃথিবীতে। সে নিজেই যেন দাগী হয়ে গেছে মানুষের কাছে। কিরণের চেয়ে সে নিজে কি কম অপরাধী! কিরণ শুধু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চোখে অপরাধী! কিন্তু দীপঙ্কর যে মানুষের কাছেই ক্রিমিন্যাল। তার নিজের ক্রাইম কি কিছু কম! সে তো সমাজের সামনে ভদ্রলোক সেজে বেড়াচ্ছে বুক ফুলিয়ে। যে-চাকরির জন্যে তার এই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি তার পেছনেও তো সেই তেত্রিশ টাকার ঘুষ। তেত্রিশ টাকার ঘুষের কনক্রিটের ওপরেই তো তার এই সম্মান। চোখের সামনে অন্যায় দেখেও তো সে প্রতিবাদ করতে পারেনি কতবার! কতবার বিশ্বাসের অপব্যবহার করেও তো সে আপিসে সম্মানের শিখরে উঠে চলেছে! কেউ তো তার ফাঁসি দেয় না, কেউ তো তার অসম্মান করে না! যত অপরাধ করেছে কিরণ!

প্রাণমথবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

এমন সময় তো প্রাণমথবাবুর সদর দরজা বন্ধ থাকে না।

—কে?

সেই পুরোন চাকরটা দরজা খুলে দিলে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—স্যার কোথায়? বাড়িতে নেই?

চাকরটা অবাক হয়ে গেছে। সবাই জানে আর এই বাবুই জানে না! বললে—আপনি শোনেননি কিছু? বাবুকে তো পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে—

—কবে?

—তিন-চার মাস হলো। বাবুকে তো আটকে রেখেছে জেলে। বাবু কোথায় কোন জেলে আছে, তাও জানি না।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি তো খবর পাইনি। তাহলে মামীমাকে ডেকে দাও—

চাকরটা বললে—মা-ও নেই, মাকেও বাবুর সঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে—কংগ্রেস আপিসের সব লোককেই ধরেছে একসঙ্গে—ফটিকবাবুও জেলে—

—সে? ফোঁটা?

চাকরটা বললে—হ্যাঁ—

সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল সেদিন দীপঙ্করের চোখে। সতী নেই, প্রাণমথবাবু নেই, কিরণ নেই, লক্ষ্মীদি নেই—সমস্ত যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। সেই বিকেল বেলা কালিঘাটে দাঁড়িয়ে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে তার। প্রাণমথবাবুর বাড়ির দরজা থেকে সেদিন সোজা একটা কথাও না-বলে চলে এসেছিল দীপঙ্কর। এবার কার কাছে সে যাবে? কাকে নিয়ে সে পৃথিবীতে বাঁচবে? কেউ নেই, কেউ নেই। শুধু আপিসটা থাকলেও থাকতে পারে। আর আপিসটা চলে গেলেও যেন আর তার কোনও দুঃখ থাকবে না।

—কী রে, দীপু না?

একটা গাড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ আসতেই দীপঙ্কর ফিরে দেখলে—ছিটে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে তাকে দেখে।

দীপঙ্কর বললে—এই এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে—তুমি কোথায় যাচ্ছো?

ছিটে বললে—বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, তোদের আপিস থেকেই ফিরছি। শালারা ওয়াগন দিলে না, ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছি। শুনলুম তোকেও নাকি মিস্টার ঘোষালের মত পুলিসে ধরেছিল? কী হয়েছিল রে? ঘুষ নিয়েছিলি?

তারপর দরজা খুলে দিয়ে বললে—আয় ভেতরে উঠে আয়—

দীপঙ্করকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে বলতে লাগলো—বেশ করেছিস তুই ঘুষ নিয়েছিস, ঘুষ না নিলে কেউ বাঁচে আজকালকার বাজারে? ও পুলিসে কিচ্ছু করতে পারবে না। যতগুলো ঘুষের কেস্ হচ্ছে সবগুলো তো ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল বসিয়েছে—তাতেও ফসকা। আরে আজকাল যে জজ ম্যাজিস্ট্রেটরাও ঘুষ খাচ্ছে, ছাড়া পাবে না? নইলে তাদের চলবে কী করে বল্?

গাড়ি চলছিল ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের দিকে।

ছিটে বলতে লাগলো—এই দ্যাখ না, গভর্নমেন্ট পেট্রল র‍্যাশনিং করেছে। পেট্রল কমিয়ে দিয়ে কী লাভটা হলো শুনি? আমি একটা ভাঙা মটর কিনেছি, সেটা চলেই না। সেই গাড়ির নাম করে পেট্রল পাচ্ছি। দুখানা গাড়ির পেট্রলে একটা গাড়ি চালাচ্ছি—এতে কার ফয়দা হচ্ছে শুনি? ওরাও যত প্যাঁচ দেবে, আমরাও তত প্যাঁচ দিতে জানি—

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আমাকে এখানে ছেড়ে দাও ভাই, আমি নেমে যাই—

—কেন রে, চল্ না, আমাদের বাড়ি চল্! ফোঁটা জেলে গেছে শুনেছিস তো? ফোঁটার এখন খুব নাম হয়েছে। জেল খাটতে তো আমাদের কষ্ট নেই, ছোটবেলা থেকে আমরা জেল খেটে আসছি। তখন ছিল থার্ডক্লাস বন্দী, এখন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে ফার্স্ট ক্লাস বন্দোবস্ত! প্রাণমথবাবুরও তাই। এখন তো আর জেল খাটতে লজ্জা নেই, গান্ধী, নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, ফোঁটা, কেউই জেল খাটতে পেছপাও নয়—

ততক্ষণে বাড়ি এসে গিয়েছিল। 'অঘোর-সৌধ'। আগে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে গাড়ি, বাস কিছু ঢুকতো না। লক্ষ্মীদি সতী সবাই নেপাল ভট্টাচার্যি স্ট্রীটে গিয়ে কলেজের বাসে উঠতো।। এখন 'অঘোর-সৌধ' পর্যন্ত গাড়ি চলে। ছিটের গাড়ি একেবারে বাড়ির উঠোনে গ্যারেজের সামনে গিয়ে উঠলো। বহুদিন পরে আবার এই উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে ঢোকা। দীপঙ্কর দেখলে সমস্ত কিছু বদলে গেছে। বাইরে যেমন বদলেছে, ভেতরেও বদলেছে। যে-ঘরে দীপঙ্কর থাকতো সে-ঘরটার চিহ্ন নেই কোথাও। যে পাঁচিল টপকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতো ছিটে-ফোঁটা, সে পাঁচিলটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই কাঁঠাল গাছটাও নেই কোথাও। যে-ঘরে চন্নুনী থাকতো তাও যেন ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। যুগ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন স্মৃতিগুলোকেও কেউ মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। চারিদিকে চেয়ে অবাক হয়ে দেখছিল দীপঙ্কর।

ছিটে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

বাবুকে দেখে চাকর-বাকর ছোটাছুটি শুরু করে দিলে। বেশ হাঁক ডাক পড়ে গেল চারিদিকে। যে-বাড়িতে একদিন অঘোরদাদুর অগোচরে নিঃশব্দে টিপিটিপি পায়ে ঢুকতে হতো, আজ সেখানে বুক ফুলিয়ে ঢুকছে। এও কি কম বিপ্লব। এর চেয়ে বড় বিপ্লব কি ভাবা যায়! পৃথিবীর ম্যাপেও তো এতবড় রঙের বদল হয়নি। হিটলার যা পারেনি, ছিটে-ফোঁটা যেন তাই-ই করে ফেলেছে রাতারাতি।

—কী খাবি বল? শ্যাম্পেন ছাড়া আর সব কিছু দিতে পারি। শ্যাম্পেনটা ফুরিয়ে গেছে ক'দিন হলো।

দীপঙ্কর বললে—না, তার চেয়ে আমি উঠে পড়ি—

—কেন? উঠবি কেন? কীরকম বাড়ি করেছি বল? ভাই, বাড়ির নাম 'অঘোর-সৌধ' রাখলুম আমি। ফোঁটা আপত্তি করেছিল, বলেছিল একটা আধুনিক নাম রাখতে। তোদের রবি ঠাকুরের কায়দায়। শেষে আমার কথায় রাজী হলো। তা ছাড়া দাদুর ক্যাপিটাল ছিল বলেই তো হলো এ-সব! আরে, ক্যাপিট্যালটাই তো সব। ব্রেন, বুদ্ধি, স্কীম এডুকেশন যতই থাক, ক্যাপিট্যাল না হলে তো কিছুই হবে না। সেই অঘোরদাদুই তো ক্যাপিট্যাল সাপ্লাই করলে। তাই বুড়োর নামেই শেষ পর্যন্ত বাড়িটার নাম দিলুম। কী বল্, ভাল করিনি?

অদ্ভুত সব কথা শোনাতে লাগলো ছিটে। যে-সব কথা ছিটের মুখ দিয়ে

শোনার আশা করেনি দীপঙ্কর। কন্ট্রাক্ট পেতে গেলে কাকে ধরতে হয়, কাকে ঘুষ দিতে হয়, সে ছিটের জানা। দিল্লির খোদ কর্তার কাছে গিয়ে কী-রকম করে কন্ট্রাক্ট আদায় করে নিয়ে এসেছে, তাও বললে। বললে—তুই টাকা খরচ কর, আমি তোকে আকাশের চাঁদ এনে দেব—টাকা দিয়ে আমি সব বেটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিতে পারি—

তারপর বললে—এই দেখ না, এই বাড়ি দেখছিস তো, এই সবই আমি আর ফোঁটা দুজনে মিলে করেছি কিন্তু সোজা আঙুলে তো ঘি বেরোয় না—

ছিটে আরো কী-কী সব নিজের গুণপনা বলতে যাচ্ছিল। কোথায় কেমন করে কাকে ধরে এইসব সম্পত্তি করেছে। অঘোরদাদু আর কত ক্যাপিট্যাল দিয়ে গেছে? মাত্র এক লাখ। সেই এক লাখকেই আজ তারা দুজনে মিলে দশগুণ করেছে—এ স্রেফ ব্রেন, বুদ্ধি, স্কীম আর ঘুষের কল্যাণে। এডুকেশন না থাকলেও ক্ষতি নেই। ঘুষ দিতে জানলেই হলো। ঘুষ সবাই নিতে চায়। কিন্তু নিতে চাইলেই তো হয় না। ঘুষ দিতেও জানা চাই। ঘুষ নেওয়ানোর মত শক্ত কাজ আর দুনিয়ায় নেই। ঘুষ নেওয়াতে হবে, অথচ সম্মানে এতটুকু দাগ লাগবে না, এই-ই হলো এ-যুগের এডুকেশন। স্কুল-কলেজে মিছিমিছি ইংরিজী আর অঙ্ক কষিয়ে সময় নষ্ট করা হয়, সেই সময়টাতে যদি ঘুষ দেওয়া আর ঘুষ নেওয়ার ফরমুলাটা শেখানো হয় তো তাতেও খানিকটা কাজ হয় দেশের। যুগ বদলেছে আর শিক্ষা বদলাবে না?

অনেক কথা শেখাচ্ছিল ছিটে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলিয়ে বললে—তোদের মিস্টার ঘোষাল, মিস্টার ঘোষাল যে আমার কাছে এসেছিল রে—

দীপঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষাল? কেন?

—আবার কেন? কিছু টাকা চাইতে। বলছিল বিপদে পড়েছে, আমি যদি কিছু টাকা দিই—

—তুমি দিলে?

ছিটে বললে—রামঃ, আমি কেন টাকা দিতে যাবো? তুমি যখন চেয়ারে বসেছিলে, তখন তোমাকে ঘুষ দিয়েছি আমার স্বার্থে এখন তোমাকে টাকা দিতে যাবো কেন? তুমি কে হে আমার?

বলে ছিটে হো হো করে হাসতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—এবার আমি উঠি ভাই, তোমার অনেক দেরি করিয়ে দিলুম—

ছিটে বললে—তা তোকেও তো পুলিসে ধরেছে, এখন জামিনে খালাস আছিস বুঝি? আচ্ছা, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বল তো, ঘুষ নিয়েছিস বেশ করেছিস, কিন্তু ধরা পড়তে গেলি কেন?

দীপঙ্কর বললে—আমি ঘুষ নিয়ে ধরা পড়েছি, কে বললে তোমায়?

—কেন? তোদের আপিসেই শুনে এলুম। তোদের আপিসের সব লোক বললে। আমি মনে মনে বললুম দীপু বাপের বেটা তাই ঘুষ নিয়েছে, কিন্তু বোকার মত ধরা পড়তে গেলি কেন? যেই দেখলি পুলিস ঘরে ঢুকছে ওমনি নোটগুলো মুখে পুরে গিলে ফেলতে পারলি না?

দীপঙ্কর আর দাঁড়াল না। বললে—আসি আমি, অনেক দেরি হয়ে গেল—

একই গাড়িতে অনেকগুলো লোক আসছিল। তা নদিদির গাড়িটা বেশ বড়ই। নয়ন বসেছে, নদিদি বসেছে, মিত্তির-গিন্নী আর মিত্তির-গিন্নীর মেয়ে। আর ড্রাইভার তো আছেই—

নদিদিই কথা বলছিল বেশি। বললে—আগে বিয়ে হোক, কুটুম কর, তখন বুঝবি কেমন বউ করে দিলুম—

মিত্তির-গিন্নী বললে—আমার তো এই একই মেয়ে দিদি, আমার সাধ-আহ্লাদ সব এই মেয়েকে নিয়েই—

নদিদি বললে—কিন্তু তত্ত্ব-তাবাস ভালো করে করতে হবে, এই এখন থেকে বলে রাখছি; শেষকালে নয়ন যেন বলতে না পারে নদিদি এমন সম্বন্ধ করলে যে কুটুম তত্ত্ব করতে জানে না!

নয়ন বললে—তত্ত্ব তো আমার নিজের জন্যে নয় দিদি, তোমাদের দশজনের জন্যেই তত্ত্ব করা। তোমরা দশজনে দেখে শুনে ভালো বললেই ভালো—আমার আর কী!

মিত্তির-গিন্নীর মেয়ে এতক্ষণ মা'র কোল ঘেঁষে বসে ছিল। সবাই তার কানে যাচ্ছিল। সিল্কের শাড়ি পরে ঘেমে নেয়ে উঠেছে মেয়ে। মিত্তির-গিন্নী নিজের আঁচল দিয়ে মেয়ের কপাল মুছিয়ে দিলে।

নদিদি বললে—কী রে, ভয় করছে নাকি তোর? ভয় কী? এমন ঘরে তোকে বিয়ে দিচ্ছি যে তখন বলবি নমাসীমা শাশুড়ী করে দিয়েছিল বটে!

মিত্তির-গিন্নী বললে—ওর ভাগ্যি আর তোমার হাত-যশ দিদি—

নদিদি বললে—হাত-যশ ফাত-যশ কিছু নয়, যার হাঁড়িতে যার চাল মাপা আছে, তা কেউ রদ করতে পারে না, আমি তো নিমিত্ত মাত্তর—

এতক্ষণে গাড়ি এসে পৌঁছেছে হাজরা রোডের মোড়ে। হাজরা রোড থেকে বাঁয়ে ঘুরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। গাড়ি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে ঢুকলো। চেনা রাস্তা। তারপর ঘোষ-বাড়ি। ঘোষ-বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। শম্ভু গাড়ির বাজনা শুনেই দৌড়ে গেট খুলে দিয়েছে।

গাড়ি এসে বাগানে ঢুকলো। নদিদি মিত্তির-গিন্নীকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো। মিত্তির-গিন্নীর মেয়েও নামলো। নয়নরঞ্জিনী দাসীও নামলো। শম্ভুকে বললে—দাদাবাবু কোথায় রে তোর?

ভেতর-বাড়িতে ততক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। কৈলাস তাড়াতাড়ি গিয়ে বাতাসীর-মাকে খবরটা দিলে। বললে—বাতাসীর-মা সব্বনাশ হয়েছে, মা-মণি এসে গেছে—

ভূতির-মা আঁচলটা মাটিতে পেতে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল। বললে—সে কী রে কৈলাস, মা-মণি?

বাতাসীর-মা বললে—বউদিমণি কোথায়?

কৈলাস বললে—বউদিমণি তো দাদাবাবুর ঘরে—

বাতাসীর-মা বললে—বুড়ী আর সময় পেলে না, মরতে ঠিক এই সময়েই হাজির হলো গা!

—কী হবে বাতাসীর-মা? এবার তো আর রক্ষে থাকবে না!

ন'দিদি তখন মিত্তির-গিন্নীকে সমস্ত দেখাচ্ছে। এই বাড়ি, এই ভবানীপুরে এত বড় বাড়ি আর কারো নেই। কর্তাদের আমলে এ-বাড়ির চেহারা আরো ভালো ছিল। আর এখন কার জন্যেই বা বাড়ি সাজাবে বল? ছেলে আর মা—এই তো সংসার। আর যে-বউ ছিল আগে, সে তো ঘর করলে না এখানে! বর্মার মেয়ে তো, তাদের বাপ্ শিক্ষা-দীক্ষাই আলাদা। সেবার ছেলের বিয়ে দেবার সময় তো নয়ন আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করলে আমিই বারণ করতুম।

নয়ন বললে—চলো ন'দিদি, ভেতরে চলো—

ন'দিদি বললে—তোর ছেলে কোথায়?

নয়ন বললে—শুনছি তো ওপরের ঘরে গিয়েছে—

ন'দিদি বললে—তবে যে বলেছিলি ছেলে দিনরাত পড়াশোনা করে, বই মুখে দিয়ে থাকে?

মিত্তির-গিন্নী গলা নিচু করে বললে—ছেলে বুঝি বই মুখে দিয়ে থাকে দিনরাত?

ন'দিদি বললে—বউ নেই তো, তাই বই নিয়েই আছে কেবল, এবার বউ এলেই আবার সব বদলে যাবে! জোয়ান বয়েস ছেলের, বউ-এর জন্যে বিবাগী হয়ে যায়নি, তাই-ই যথেষ্ট।

নয়ন একতলার ঘরগুলো দেখালে। এই হচ্ছে সরকারের ঘর, এই ঘরে বসে সরকারবাবু স্টেটের কাজ-কর্ম করে। এটটে হচ্ছে লাইব্রেরী ঘর—ছেলে পড়াশোনা করে এখানে। এর পেছন দিকে রান্নাঘর, কল-বাথরুম। আর এই হলো সিঁড়ি। সেকালে এই মোজেইকের সিঁড়ি করতেই সাত হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তখন আমার শরীর-গতিকও ভাল ছিল, সংসারে আঁঠাও ছিল, ভাবতাম এই সব নিয়ে থাকলেই সুখ হবে। তা এবার আমি ছেলের বিয়ে দিয়েই কাশী চলে যাবো ভাই। যে-ক'টা দিন বাঁচি, বাবা বিশ্বনাথের নাম করেই বাঁচবো। ছেলে-বউ রইলো। তারা সব গুছিয়ে চালাতে পারলেই চলবে এ-সব আর নয়ত সব পুড়ে-ঝুড়ে যাবে। আমি তখন দেখতেও আসবো না এ-সব।

একে একে দোতলার ঘরগুলো দেখালে নয়ন। তারপর তেতলা।

ন'দিদি, মিত্তির-গিন্নী, মিত্তির-গিন্নীর মেয়ে সবাই পেছন-পেছন আসছিল। এমন চমৎকার বাড়ি, এমন খোলা হাওয়া। এখানে মেয়ে বউ হবে, এতো ভাগ্যের কথা।

হঠাৎ সোনার ঘরের দিকে গেল নয়ন। বললে—এই হচ্ছে আমার ছেলের শোবার ঘর—

ন'দিদি বললে—ছেলে ঘরে আছে নাকি?

নয়ন বললে—হ্যাঁ, শুনছি তো আছে—

বলে নয়নরঞ্জিনী দাসী ছেলের ঘরের দরজাটা ঠেলতেই দশ হাত পেছিয়ে এসেছে। সতী ততক্ষণে সনাতনবাবুর পাশ থেকে সরে এসে সোজা হয়ে বসেছে।

মা-মণি বললেন—তুমি হে? তুমি যে এসেছ হঠাৎ? তুমি কী করতে এসেছ এ-বাড়িতে?

এতখানি মুখোমুখি হয়ে যাবার কল্পনাও করেনি সতী! প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এতগুলো লোক একসঙ্গে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের শাশুড়ী ছাড়াও ন'মাসীমা আছেন। আরো দুজন সঙ্গে। কী করবে, কী বলবে, —এতগুলো চোখের দৃষ্টির কৌতূহল কেমন করে মেটাবে সে। সতী সনাতনবাবুর দিকে একবার চাইলে। সনাতনবাবু চেয়ে আছেন বাইরে সকলের দিকে। তাঁর দৃষ্টির অর্থ খুঁজে পাওয়া ভার। সতীর মনে হলো সে একলা। একলাই এই অভিযোগের মুখোমুখি হবে। কারো সাহায্যই আর দরকার নেই তার!

—বলো, আবার কেন ঢলানি করতে এসেছো এখানে?

সতীর জবাব দিতে বোধহয় একটু দেরি হচ্ছিল। ন'দিদি তার আগেই ফোড়ন কাটলেন—সত্যিই তো বৌমা, তুমি কোথাকার কোন্ ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিছলে, ঝঞ্চাট চুকে গেছলো। তা আবার কেন আসতে গেলে বাছা? এ-সংসারে কি আর তোমার ঢোকা উচিত? এ হলো গেরস্থ-বাড়ি—কাজটা কি ভালো করলে বাছা তুমি?

মা-মণি তালে তাল মিলিয়ে বলতে লাগলেন—বাড়ি থেকে আমি একটু বেরিয়েছি, আর সেই ফাঁকে তুমি ঢুকে পড়েছ? তোমার আক্কেল তো খুব!

ন'দিদি বললে—তক্কে তক্কে ছিলে বোধ হয় যে শাশুড়ী যেই বেরোবে, ওমনি ঢুকে পড়বো! অনেক মেয়েমানুষ দেখিছি বৌমা, আমারও নিজের মেয়ে-বউ আছে, আমিও বেটা-বেটারবৌ নিয়ে ঘর করি। কিন্তু এমন তো কখনও দেখিনি গা—

মা-মণি বললেন—তবে আর বলছি কী ন'দিদি, সাধে কি আর আমার এমন উড়োন-চণ্ডী দশা হয়েছে! এই বউ আসার পর থেকেই আকাল পড়েছে আমার সংসারে। তুমি তো জানো কী ছিল আমার আর কী ছিল না?

মিত্তির-গিন্নী ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল আর ঘোমটার ফাঁক

দিয়ে সব দেখছিল। পাশেই জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার মেয়ে। লীলারাণী দাসী।

মেয়ে আর কৌতূহল দমন করতে পারলে না। চুপি চুপি মা'র কানের কাছে মুখ রেখে জিজ্ঞেস করলে—ও কে মা? কাদের বাড়ির?

মিত্তির-গিন্নী চাপা-গলায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—তুমি চুপ করো। অমন হাঁ করে দেখতে নেই ওদিকে—

—কিন্তু ওকে বকছে কেন মা সবাই?

মিত্তির-গিন্নী মেয়ের হাতটা টিপে দিয়ে বললে—আবার কথা বলে, তুমি আমার পেছনে এসো—

তারপর মিত্তির-গিন্নী ন'দিদির কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। ইচ্ছে ছিল ন'দিদিকে জিজ্ঞেস করবে—এই কি সেই বউ নাকি? কিন্তু তার আগেই ন'দিদি সামনে এগিয়ে গেছে। বললে—সে-সব কথা এখন থাক্ বৌমা, তুমি এখন যাও, আমার বোন ভালমানুষ শাশুড়ী তাই যা পেয়েছিলে! পড়তে আমার হাতে মা তো তোমার দাঁতের গোড়া আমি ভেঙ্গে দিতুম—। যাও বৌমা, ভালোমানুষের মত বলছি, তুমি এখন বিদেয় হও, আপদের শান্তি হোক—

মা-মণি এতক্ষণ ন'দিদির জোরে জোর করছিলেন। কিন্তু ন'দিদিকেও যেন নির্ভর করতে পারলেন না আর। মনে হলো ন'দিদিও যেন হেরে যাচ্ছে। বললেন —কথা বলছো না কেন? ভেবেছ বোবার শত্রু নেই? মুখে কথা না বেরোয় তো বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে—যাও—

ন'দিদি অন্য পন্থা ধরলে এবার। সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—বাবা সোনা, তুমি বাবা এ-ঘর থেকে একটু বেরোও তো, তুমি থাকলে তোমার বউকে শায়েস্তা করা যাবে না—

এতক্ষণে সনাতনবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললেন—শায়েস্তা নাই বা করলে ন'মাসীমা, না-হয় ক্ষমাই করলে তোমাদের বউমাকে—

—কী বললে?

মা-মণি আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন—কী বললে সোনা? ওই বউকে আমি খোশামোদ করবো?

ন'দিদি বললে—তুমি বিবেচক ছেলে হয়ে এই কথা বলছো বাবা? তোমার মত লেখা-পড়া জানা ছেলের মুখ থেকেও এই কথা শুনতে হলো আজ আমাদের? ছি ছি ছি.........

মা-মণি বললেন—দেখ ন'দিদি, তুমিই দেখ। এতদিন তুমি আমারই দোষ দেখতে, এখন দেখ কী রকম ছেলে গভ্যে ধরেছি আমি—

সনাতনবাবু বললেন—ন'মাসীমা, তুমি মা'কে একটু বুঝিয়ে বলো তো, এত হৈ চৈ না করে ধীরে সুস্থে সব জিনিসটার একটা মীমাংসা করা কি ভালো নয়? তোমরা সবাই এমন উত্তেজিত হলে চলবে কী করে? যা বলবার ধীরে সুস্থে

বলো না!

মা-মণি বললেন—ধীরে সুস্থে কথা বলবার লোক বটে! বলো না ন'দিদি, বলো না, চুপ করে রইলে কেন? বাড়ি থেকে একটু বেরিয়েছি আর ওমনি সর্বনাশী ফাঁকা বাড়ি পেয়ে ঢুকে পড়েছে—

ন'দিদি বললে—তা তো বটেই, তুমি যে বাবা আজ বউ-এর হয়ে সাফাই গাইছো, গেরস্থ-বাড়ির কোনও মা কি কোনও বউএর এই কীর্তি সহ্য করতে পারে, না পারা উচিত?

সনাতনবাবু বললেন—তোমাদের প্রশ্ন তো শুধু এই? না, আরো আছে?

মা-মণি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ন'দিদি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে—হ্যাঁ ধরো, এইটেই আমাদের কথা, এর কী উত্তর দেবে তুমি দাও?

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—এর উত্তরও তোমাদের জানা—

তারপর একটু থেমে বললেন—আর তোমার যদি জানা না-ও থাকে তো মা-মণির তো জানতে বাকি নেই!

ন'দিদি বললে—কী যে বাবা বলো, তোমার হেঁয়ালি-কথা আমরা কিছুই বুঝতে পারিনে, আমাদের অত লেখাপড়া জানা নেই তোমার মত, আমরা মেয়ে-মানুষ একটু সহজ করে বলো!

সনাতনবাবু বললেন—ন'মাসীমা, তুমি আসলেই ভুল করলে! সমস্যাটা যদি সহজ হতো তো তার সমাধানটাও সহজ হতো। আসলে যে গোড়াতেই আমরা সব জটিল করে ফেলেছি, সবটা তো তুমি জানো না!

মা-মণি আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, ন'দিদি আবার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে—তোমার কথা তো বুঝলাম, কিন্তু বাবা আমি একটা কথা তোমাকে বলি, তুমি হলে বেটাছেলে, লেখাপড়া জানা বিবেচক বেটাছেলে, তুমি মেয়েদের ব্যাপারে কথা বলবে এটা কি ভালো দেখায় বাবা? ওই দেখ, বাইরের একজন কুটুম দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা সব শুনে কী ভাবছে বলো তো! তোমার বাপ-পিতেমোরাও তো আগে একদিন ঘর-সংসার করেছেন, তাঁরা তো কখনও এ-সব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে থাকতেন না! আমার বেটারাও তো রয়েছে। আমার বেটার বউদের ব্যাপারেও তারা তো কেউ কখনও মাথা ঘামায় না। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমার কোনও ছেলে আমার মুখের ওপর কিছু বলুক দিকি। মুখ একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব না—

তারপর হঠাৎ থেমে সুর বদলে সনাতনবাবুর হাতটা আস্তে আস্তে ধরে বললে—তুমি বাবা ভালো ছেলের মত এখান থেকে যাও তো! যাও! তুমি তোমার লেখা-পড়া নিয়ে থাকো গে,—শাশুড়ী-বউতে কথা হচ্ছে এর মধ্যে বেটাছেলের থাকতে নেই—যাও—লক্ষ্মীটি—

সনাতনবাবু হাসলেন আবার। সেই বরাবরের মৃদু হাসি। যে-হাসি দেখে সতীর বরাবর গা-জ্বালা করতো। সনাতনবাবু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই

দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পাও নড়লেন না। বললেন—না, ন'মাসীমা, আমি তো তেমন বেটাছেলে নই,—

ন'দিদি গালে হাত দিলে। বললে—ওমা, বলছো কী বাবা তুমি? তুমি বংশ-ছাড়া নাকি?

—হ্যাঁ ন'মাসীমা, আমি হয়ত তাই!

মা-মণি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন—ওমা, কী সব্বনেশে কথা বলে গো, আমি একটুখানি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এরই মধ্যে এত? এমন করে আমার ছেলেকে বশ করে ফেলেছে গা? এমন বউও আমি ঘরে এনেছিলাম মরতে, এমন হেনস্তাও আমার কপালে ছিল?

মিত্তির-গিন্নী আর তার মেয়ে এতক্ষণ সব ব্যাপার দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা এমন অবস্থার মধ্যে পড়বে এ যেন কল্পনাও করতে পারেনি। মিত্তির-গিন্নী এক ফাঁকে ন'দিদির কাছে এসে গায়ে টোকা দিলে। বললে—ও কে ন'দিদি? এ-সব কী কাণ্ড?

এতক্ষণে ন'দিদিরও যেন খেয়াল হলো। গায়ে টোকা লাগতেই পেছন ফিরেছে। পেছন ফিরে মিত্তির-গিন্নীকে দেখেই সব খেয়াল হয়েছে। বললে—ওমা, নয়ন, কী কাণ্ড দ্যাখ্, এরা এখানে রয়েছে। তুই এদের বসাস্ নি এখনও? —তোর সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসা এদের—

মা-মণির তখন উগ্র মূর্তি। বললেন—তা দেখুক না ওরা, আমার বউএর কাণ্ডটা দেখুক একবার। কেন আমার ছেলের বিয়ে দিচ্ছি আবার, তা নিজের চোখেই দেখে যাক, আমার তো কিছু লুকোন-ছাপানো নেই, সবই দেখে যাক্—

ন'দিদি বললে—না ভাই, এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি, চল্ তোরা বসবি চল্, তোদের বসিয়ে রেখে আসি, একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছে দুজনে—

মিত্তির-গিন্নী বললে—না না ন'দিদি, তাতে কী হয়েছে, আমাদের কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তোমরা কথা সেরে নাও—

—আরে, আমাদের কথা কি এমনি শেষ হবে, আজ এর একটা হেস্ত-নেস্ত করে তবে আমি বাড়ি যাবো—আমি আমার বাড়িতে আঁতুড় ফেলে এসেছি, কত ভাবনা আমার, তার মধ্যে আবার এই সব হাঙ্গামা জুটেছে—

তারপর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—তাহলে তুমি বাবা নিজের মায়ের কথা শুনবে না? তোমার গর্ভধারিণী মা, সে-ও পর হলো তোমার বউএর কাছে—?

সনাতনবাবু হাসলেন আবার। বললেন—ন'মাসীমা, তুমি বরং বাড়ি চলে গেলেই ভালো হয়, তোমার অনেক ভাবনা—

ন'দিদি বললে—ঠিক বলেছ বাবা, ভাবনা আমার চিরকাল থাকবে। কিন্তু আমি নয়নের ভাবনাও নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি। তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো, এটাও যে আমি চাই। আর নয়ন আর আমি কি আলাদা বাবা?

সনাতনবাবু বললেন—আলাদা যে নও, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, আলাদা হলে এত কথা আমাকে বলতেও না তুমি! আর আমাকেও এত কথা বলতে হতো না!

ন'দিদি কথাগুলোর অর্থ কী বুঝলো কে জানে। বললে—তা তো বটেই বাবা, তোমাকে তো বরাবর মুখচোরা লাজুক ছেলে বলেই জানতুম, তোমার এই ব্যাভার দেখে আমিও তো তাই অবাক হয়ে গেছি—

মা-মণি বললেন—অবাক হবার কিছু নেই ন'দিদি, আমি একটুখানি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আর সেই ফাঁকে ঢুকে পড়েছে এখানে। এত বড় হারামজাদী বউ—

—ছি!

সনাতনবাবুর গম্ভীর গলার 'ছি' শব্দটা যেন হঠাৎ মা-মণির মুখের ওপর ছিটকে পড়লো। সবাই চেয়ে দেখলে সনাতনবাবুর মুখের দিকে। সনাতনবাবুর মুখের সেই হাসিটা যেন এতক্ষণে মুখ থেকে অন্তর্ধান করেছে। ব্যঙ্গ নয়, তিরস্কার নয়, প্রতিবাদও নয়। এমন কি বিদ্রোহও নয়। আসলে কিছুই নয়। একটি সহজ-সরল ছি-ছিৎকার যেন এতদিনকার সব অভিযোগ-অনুযোগের একমাত্র প্রতিবেধক হয়ে সকলের কানে গিয়ে খট্ করে বাজলো। এতদিন যেন এ-লোকটাকে চিনতে পারা যায়নি। সেই চিরদিনের বই মুখে দেওয়া মানুষটার অন্তরে যে এতখানি ধিক্কার জমা হয়ে থাকতে পারে, তাও যেন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। যেন আজ সবাই নতুন করে আবিষ্কার করলে সনাতনবাবুকে।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—শ্রদ্ধা দিয়ে যে মানুষকে জয় করা যায়, ভালবাসা দিয়েও যে-মানুষকে আকর্ষণ করা যায়, তোমরা সেই সামান্য কথাটাও ভুলে গেছ ন'মাসীমা—

মা-মণি কিন্তু এক মুহূর্তেই সামলে নিয়েছিলেন। বললেন—তা এতই যদি তোমার বউএর ওপর দরদ তো, এ-বাড়িতে তুমিও থাকতে পারবে না, এও আমি বলে দিচ্ছি, এও আমার বাড়ি, আমার শ্বশুরের ভিটে—

ন'দিদি মা-মণির মুখে হাত চাপা দিলে। বললে—তুই থাম্ তো নয়ন, কাকে কী বলছিস্, রাগের মাথায় তার ঠিক নেই—দেখছিস্ বাইরের লোক রয়েছে—

—কেন বলবো না শুনি? আমি কি ছেলের ভাত খাই, না ছেলের পরি? আমার নিজের ছেলে যাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি, সেই ছেলে আমাকে উপদেশ দিতে আসবে, এত বড় বুকের পাটা?

ন'দিদি আবার মুখে হাত চাপা দিতে গেল। বললে—তুই থাম্ নয়ন—

মা-মণি ন'দিদির হাত সরিয়ে দিয়ে বললে—না আমি কেন থামবো? আমার বউ বেশ্যা হয়ে বেরিয়ে যাবে পাড়ার ছোঁড়ার সঙ্গে.........

সতী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল কোনও রকমে। থর থর করে কাঁপছিল। তার দিকে এতক্ষণ কারো নজর ছিল না। হঠাৎ আর সহ্য হলো না। সে টলে পড়ে

যাচ্ছিল, সনাতনবাবু তাকে ধরে ফেললেন।

—ওমনি মূর্ছো গেল। অমন মূর্ছো যেতে আমরাও জানি গো, আমরাও জানি। বেহায়াপনা করবার সময় তখন তো ঘোমটার ঠিক থাকে না, সত্যি কথা শুনে মূর্ছো যাবার ঢংটা শিখেছে খুব। ঢং দেখলে গা জ্বলে যায়—

সনাতনবাবু এর একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শম্ভু ঘরে ঢুকলো। একেবারে সকলের ভিড় কাটিয়ে মা-মণির সামনে এসে বললে—মা-মণি, দারোগাবাবু এসেছে—

—দারোগাবাবু? কে দারোগাবাবু?

—আজ্ঞে, ভবানীপুরের থানার দারোগাবাবু। আগে, অনেক দিন আগে কয়েকবার এসেছিলেন এ-বাড়িতে, সেই তিনি—

মা-মণি ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। বললেন—দারোগাবাবু আবার কে আসবে আমার কাছে? ভবানীপুরের দারোগাবাবু এ-বাড়িতে কী করতে?

তবু জিজ্ঞেস করলেন শম্ভুকে—কাকে ডাকছে? আমাকে?

—হ্যাঁ মা-মণি আপনাকে ডাকতে বললেন। সঙ্গে পুলিস কনেস্টোবল আছে দু'জন।

নয়নরঞ্জিনী দাসী একটু ভেবে নিলেন। তাঁর কাছে পুলিস কী জন্যে আসতে পারে!

বললেন—তুই যা গিয়ে তাদের সরকারবাবুর ঘরে বসতে বল্‌। আমি আসছি—

শম্ভু চলে গেল। সিঁড়ির মাথায় বাতাসীর-মা, ভূতির-মা, কৈলাস, সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিল। এতক্ষণ তারা আর কৌতূহল চাপতে পারে নি। সবাই জানতে চায় কী হয়। এতদিন পরে বৌদিমণি এসেছে, মা-মণিও এসে পড়েছে, এবার একটা কিছু ফাটাফাটি হবেই।

ভূতির মা বললে—তা ঠিক এই সময়েই কি পুলিস আসতে হয় বাছা! আর একটু দেরি সইল না গো!

বাতাসীর-মা মুখ ঝাম্‌টা দিলে। বললে—তুই চুপ কর তো ভূতির-মা, মাগী শুনতে পাবে আবার—

ভূতির-মা এমনিতেই ভীতু মানুষ। বললে—তা শুনলে আর কী করবে মাগী, তাড়িয়ে তো আর দিতে পারবে না, লাথি-ঝ্যাটা মারুক আর যাই করুক, এমন গতরে খাটা মিনি-মাইনের ঝি তো আর পাবে না—

—তবে বক্‌ বক্‌ কর তুই, আমি চললুম এখেন থেকে—

কিন্তু মা-মণি ততক্ষণে সিঁড়ির দিকে আসছে। হুড়মুড় করে নেমে গেল বাতাসীর-মা। ভূতির-মা কৈলাস—তারাও সরে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

সতী তখনও সনাতনবাবুর গায়ে হেলান দিয়ে মুখ লুকিয়ে ছিল।

মা-মণি হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে নদিদিকে বললেন—তুমি তা হলে এ-দিকটা সামলাও, দেখি ওদিকে থানার দারোগা এসেছে কেন আবার—

নদিদিও পুলিস-দারোগার নাম শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—তা পুলিস-দারোগা আবার তোর কাছে এল কেন নয়ন? কে কী করলো?

মা-মণি বললেন—আমার কি একটা জ্বালা নদিদি, আমার শতেক জ্বালা নদিদি, আমার শতেক জ্বালা। সেই উকীল-ব্যারিস্টারের মামলা নিয়ে তো আমি নাজেহাল হবার জোগাড়, বোধ হয় সেই ব্যাপারেই এসেছে, আমার সঙ্গে আবার দারোগার আর কী সম্পর্ক থাকবে? তুমি সামলে রেখো দিদি, আমি চলি—

মিত্তির-গিন্নী একেবারে নতুন মানুষ এ-বাড়িতে। এখানে এসে এমন ব্যাপারে আটকে পড়বে, তা জানলে আর আসতো না। একদিকে শাশুড়ী-বউ-এর ঝগড়া, আর একদিকে দারোগা-পুলিস—সমস্ত যেন কেমন বেনিয়মের সংসার বলে মনে হলো। নদিদির কাছে এগিয়ে এসে বললে—পুলিস-দারোগা কীসের নদিদি?

নদিদি বললে—ও কিছু না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সংসার করতে গেলে পুলিস-দারোগা উকীল-মোক্তার ছাড়া কী চলে বাছা? তোকে বরং পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে আসি! দ্যাখ্‌ দিকিনি, আনন্দ করতে এসে এ কী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গেলুম—

বলে মিত্তির-গিন্নীকে পাশের ঘরে রেখে আসতে গেল নদিদি।

সনাতনবাবু সতীর কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলেন। মনে হলো যেন তার জ্বর এসেছে। আস্তে আস্তে সতীর মুখের কাছে নিচু হয়ে বললেন—তুমি বিছানায় শুয়ে পড়ো একটু—

সরকারবাবুর কাছারি-ঘরে ভবানীপুরের থানার দারোগা বসেছিলেন। কনস্টেবল দুজন বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে ফাইলপত্র।

মা-মণি হন্তদন্ত হয়ে নেমে আসতেই দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনাকে বিরক্ত করলুম মিসেস ঘোষ, আমি সেই মিস্টার পালিতের কেস-এর জন্যে এসেছিলাম। আপনার মিস্টার পালিত ধরা পড়েছেন—

—ধরা পড়েছে? তাহলে টাকাগুলো সব পাওয়া যাবে?

দারোগা সাহেব বাঙালী ভদ্রলোক। খাকি কোট প্যান্ট ক্রস-বেল্ট আঁটা হাসলেন একটু। বললেন—এখানে তো ধরা পড়েননি, সব খবরও এখন আমার কাছে পুরো এসে পৌঁছোয়নি।

—কোথায় ধরা পড়েছে?

—ধরা পড়েছে করাচীতে। করাচীর এক হোটেলে হাজব্যান্ড-ওয়াইফ দুজনে অন্য নামে থাকতো। সব জায়গাতেই তো ওয়্যার পাঠানো হয়েছিল, এ ক'বছর সব জায়গা থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছিল—নো ট্রেস। কোনও সন্ধান

নেই। হঠাৎ ক'দিন আগে করাচী থেকে খবর এসেছে—মিস্টার পালিতকে পাওয়া গেছে। আমি নিজেই সেখানে গিয়েছিল্‌ম ইনভেস্টিগেশন করতে। আমাদের ফটোগ্রাফের সঙ্গে হ্‌বহ্‌ মিলে গেল—এখন আন্ডার অ্যারেস্ট—

মা-মণি বললেন—কিন্তু আমার অতগ্‌লো টাকা?

—টাকার কথা তো পরে। আগে আইডেন্টিফিকেশন হবে, তবে তো?

—কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন বাবা, যে নয়নরঞ্জিনী দাসীর অত গ্‌লো টাকা মেরে যে পালিয়ে এলে তার কী করলে? সে-টাকাগ্‌লো কবে ফেরত দেবে?

দারোগা সাহেব বললেন—কিন্তু আমাদের প্‌লিসেরও তো একটা আইন-কান্‌ন আছে, আর মিস্টার পালিতও তো একজন ব্যারিস্টার—

মা-মণি বললেন—ছাই, ছাই-এর ব্যারিস্টার বাবা, ওর বাবা আমাদের কাজ-কর্ম করতেন, তিনি আমার শ্বশ্‌রের আমলের লোক, তাই আমি তাঁরই ওপর সব বিশ্বাস করে তাঁর ছেলেকে ওকালত-নামা দিয়েছিল্‌ম। আজ আমার এই যে হাল হয়েছে, আমার গাড়ি ছিল ড্রাইভার ছিল, বাগানে মালী ছিল, আজ পাঁচ বছর বাড়িতে চুন-বালি পড়েনি, বাড়ি ভেঙে পড়ছে, গেটে দরোয়ান পর্যন্ত নেই একটা, চোর-ডাকাত যে-ইচ্ছে ঢ্‌কে পড়তে পারে—এ তো ওই সব্বনেশে ব্যারিস্টারের কাজ—তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন?

দারোগা সাহেব বললেন—আপনি সব কথা ঠিক ব্‌ঝতে পারবেন না, আপনার ছেলে কোথায়? মিস্টার ঘোষ?

—ছেলের কথা আর বোল না বাবা, সে আর এক পণ্ডিত। এই সব পণ্ডিত নিয়েই আমাকে এতদিন চালাতে হয়েছে বাবা, আমার জ্বালা ঠিক তোমরা কেউ ব্‌ঝতে পারবে না। যা বলবার, ছেলেকে না বলে আমাকেই বলো, আমিই শ্‌নবো—জ্‌তো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছ্‌ আমাকেই করতে হবে—

দারোগা সাহেব বললেন—তাহলে শ্‌ন্‌ন।

বলে দারোগা সাহেব সব কাহিনীটা বললেন। সে এক আজব কাহিনী। করাচীর প্রিন্সেস হোটেলে গিয়ে উঠলো এক জোড়া মান্‌ষ। একজন হাজব্যান্ড আর একজন ওয়াইফ। মিস্টার এন লাহিড়ী আর মিসেস লাহিড়ী। এসেছে দিল্লি থেকে। কিন্তু মিস্টার লাহিড়ী আর মিসেস লাহিড়ীর জন্যে প্রিন্সেস হোটেলের বয়, বাব্‌র্চি, খানসামা, স্টুয়ার্ড সবাই নাজেহাল। সবাই তটস্থ।

মিস্টার লাহিড়ী ডাকে—বোয়—

বয় দৌড়ে আসে। সামনে এসেই বকুনি খায়। জল ঠিক গরম হয়নি। কিম্বা চায়ে ঠিক ফ্লেবার হয়নি। কিম্বা ডিনারের কফি ঠাণ্ডা। একটা-না-একটা খ্‌ঁত ধরা পড়বেই মিস্টার লাহিড়ীর কাছে। আর মিস্টার লাহিড়ী যদিই বা ক্ষমা করেন তো মিসেস লাহিড়ী আরো এক-কাঠি বাড়া।

মিস্টার এন্ড মিসেস লাহিড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ইনকাম বেড়ে

গেল রাতারাতি। য্‌দ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যাণ্ডের মিলিটারি অফিসারে হোটেল ভরে গেছে। মেজর, ক্যাপ্টেন, লেফ্‌টেন্যান্ট হরদম আসছে যাচ্ছে। তাদের মিস্টার লাহিড়ী পার্টি দেন। এক-এক দিনে দ্‌ তিন হাজার টাকা ইনকাম হয় হোটেলের।

মিস্টার লাহিড়ী সকলকেই বলে—কায়রো যাচ্ছিলাম, হঠাৎ এসে দেখি র্‌ট বন্ধ হয়ে গেছে—

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—কায়রোতে আপনার কী কাজ?

মিস্টার লাহিড়ী বলে—বিজনেস ট্রিপ—

এক-একদিন ভোর থেকে ট্যাক্সি এনগেজ করে মিস্টার লাহিড়ী। সারা দিন ধরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই থাকে। কেউ আসে না, কেউ নামে না হোটেল থেকে। শেষকালে রাত দশটার সময় ফুল ওয়েটিং চার্জ দিয়ে ট্যাক্সি বিদায় দেওয়া হয়। বলা হয়—নেহি, সাহাব নেহি যায়েঙ্গে—

এমনি প্রায়ই। প্রায়ই এমনি হয়। অথচ ভেতরে তখন মিস্টার লাহিড়ী আর মিসেস লাহিড়ী ব্যালকনিতে বসে অ্যারেবিয়ান ওস্যান-এর ভিউ দেখছেন। পাশে বসে আছে মিলিটারি মেজর—টম ডিক হ্যারি—

উনিশ শো বেয়াল্লিশের আগস্ট পেরিয়ে গেছে। অ্যাক্সিস পাওয়ার্স সিঙ্গাপ্‌র, রেঙ্গ্‌ন, আকিয়াব পর্যন্ত এসে গেছে। আর ঠিক সেই সময় বাঙালী-সন্তান মিস্টার লাহিড়ী করাচীর প্রিন্সেস হোটেলের ব্যালকনিতে বসে টম-ডিক-হ্যারির মনোরঞ্জন করছে।

তারপর একদিন এক কাণ্ড ঘটলো।

হোটেলের বয় যথারীতি রাত্রে ঘরে কফি দিতে গিয়ে দেখে মিস্টার লাহিড়ী চিৎকার করছে—ব্লাডি সোয়াইন, সান-অব্‌-এ-বিচ—

এ-এক অবাক কাণ্ড! হোটেলস্‌দ্ধ লোক সন্ত্রস্ত। বয়রা ছ্‌টে এল, বাব্‌র্চি ছ্‌টে এল, খানসামা ছ্‌টে এল, স্টুয়ার্ড, বিল-ক্লার্ক, অ্যাকাউণ্টেন্ট সবাই ছ্‌টে এল। অন্য সব বোর্ডাররাও ছ্‌টে এল বাইরে। সামথিং রং ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক।

—কী হয়েছে?

—হোয়াটস্‌ আপ?

—কেয়া হ্‌য়া?

—হোয়াটস রং দেয়ার?

হোটেলস্‌দ্ধ লোকের ওই এক প্রশ্ন। চারদিকে হৈ চৈ। র্‌ম নাম্বার ওয়ানের বোর্ডার সামনে যা পাচ্ছে তাই ভাঙছে। গ্লাস ভাঙছে, বাল্ব ভাঙছে, টী-পট ভাঙছে। সব ভেঙে চুরমার করছে। মিস্টার লাহিড়ী চীৎকার করছে—ব্লাডি সোয়াইন, সান-অব্‌-এ-বিচ—

খবর গেল প্‌লিসের কাছে। প্‌লিস এল। প্‌লিসের ডাক্তার এল। ততক্ষণে

মিস্টার লাহিড়ী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অকারণ চীৎকারে গলা ভারি হয়ে গেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করলে অনেকক্ষণ। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রায় দিলে—এ কেস অব ইনস্যানিটি। পাগল হয়ে গেছেন মিস্টার লাহিড়ী। হঠাৎ শক পেলে এরকম হয়। তবে সারলে সারতেও পারে। অনেক দিন অবজারভেশনে থাকতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য! মিসেস লাহিড়ীকে আর সেদিন থেকে পাওয়া গেল না কোথাও। হাজব্যান্ডের অসুখের পরেও অনেক দিন তার কোনও ট্রেস নেই। খবর পাওয়া গেল ঘটনার আগের দিন মিসেস লাহিড়ীকে সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যান্ডের আমেরিকান মেজর ওয়াটকিনস-এর সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। মেজর ওয়াটকিনস ফ্লাই করে চলে গেছে সেইদিন। তার সঙ্গে মিসেস লাহিড়ীকে দেখা গেছে কিনা কেউ জানে না।

দারোগা সাহেব বললে—আসলে আমাদের ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ-এর লোক তখন খবর পেয়ে আমাদের ওয়্যার করে। আমরা গিয়ে দেখি—যার নাম মিস্টার লাহিড়ী তার নামই মিস্টার পালিত—! আমাদের আইডেন্টিফিকেশন ফোটোগ্রাফের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল—

—এখন তাহলে কোথায় আছে সে বদমাইশটা?

দারোগা সাহেব বললেন—সেই করাচীতে, এবার এখানে আনলে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন—তখন যা-হয় হবে! আর পাগলের এগেনস্টে কেস করেই বা কী করবেন?

—কিন্তু আমার অতগুলো টাকা? সে-টাকা পাওয়া যাবে না! সব মিলিয়ে যে তিরিশ লক্ষ টাকার মত হবে!

দারোগা সাহেব বললেন—টাকার একটা ব্যবস্থা করা যাবে যাহোক, তবে কোথায় যে অতটাকা রেখেছে তাও জানি না, এখনও ট্রেস পাওয়া যায়নি। হোটেলের রুম নাম্বার ওয়ানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সামান্য কয়েকটা টাকা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

মা-মণি বললেন—অত টাকা তো আর কাছে রাখে না কেউ, নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে রেখেছে কোথাও লুকিয়ে।

দারোগা সাহেব বললেন—ব্যাঙ্কে রাখবার ছেলেই নয় মিস্টার পালিত। বিশেষ করে ব্ল্যাক টাকা। আমার মনে হয় মিসেস পালিতই সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। মেজর ওয়াটকিনসেরই ভোগে লাগবে হয়ত—

মা-মণি বললেন—তা তাদেরই না-হয় ধরবার ব্যবস্থা করো—বিধবার অতগুলো টাকা নষ্ট হবে, আর তোমরা থাকতে কিছু করবে না বাবা?

দারোগা সাহেব বললেন—তা তো সম্ভব নয় মিসেস ঘোষ। বিশেষ করে এই ওয়ারের সময়, এখন তার আর কোনও ট্রেস পাওয়া যাবে না—

—তাহলে আমার কী হবে?

কী যে হবে তাই-ই যদি তিনি জানবেন তো তিনিই বলে দিতেন। খানিক পরে বললেন—কী হবে জানি না, তবে পানিশমেন্ট যা-হবার তা তো হয়েই গেল। আমরা পানিশমেন্ট দেবার আগেই ভগবান শাস্তি দিয়ে দিলে—

মা-মণি রেগে গেলেন। বললেন—ভগবানের নাম কোর না আর বাবা তুমি! ভগবান থাকলে আমার এই দুর্দশা হয়? ভগবান থাকলে এই অনাথা বিধবার টাকাগুলো এমন করে নয়-ছয় হয়ে যায়? তুমি এত বুদ্ধিমান হয়ে ভগবানের নাম করছো? অন্য কেউ ভগবানের নাম করলে......

বলতে বলতে মা-মণি যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্থূল-শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে। তাঁর এতদিনের ক্ষমতা যেন হঠাৎ তাঁর হাত থেকে অন্য হাতে চলে যেতে বসেছে। তাঁর গৌরব যেন ধুলোয় গড়িয়ে যেতে বসেছে! আরো যেন তিনি কী সব বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই আটকে গেল। ন'দিদি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হলো ঘরের মধ্যে। বললে—ওরে নয়ন, ওদিকে যে সর্বোনাশ হয়েছে—

—কী সর্বোনাশ ন'দিদি?

মা-মণি পেছন ফিরে ন'দিদিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন! বললে—কী হলো?

—তোর বউ যে নাটক করছে রে!

—নাটক?

—হ্যাঁ রে, নাটক। বউ যে তোর ভিরমি গেছে! বিছানায় শুয়ে চোখ উল্টে পড়েছে—

মা-মণি বললেন—ও ছেনালী ন'দিদি, ওদিকে চোখ দিও না। তোমরা চোখ দিলে আরো বাড়িয়ে তুলবে—ও ছেনালী আমি অনেক দেখেছি—

ন'দিদি বললে—কিন্তু শেষকালে যদি একটা বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে যায়, তখন কেলেঙ্কারী হবে যে। তখন পুলিসে এসে তোকেই ধরবে যে—

দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে?

ট্যাক্সিটা সোজাই যাচ্ছিল। ছিটের বাড়ি থেকে একটু এগিয়েই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে চড়ে সোজা বাড়ি যাবারই ইচ্ছে ছিল দীপঙ্করের। বাড়িতে কেউ নেই। কাশী একলা কি করছে কে জানে। সন্তোষ-কাকার মেয়েও নতুন। তারা এতদিন কী করছে, কী খাচ্ছে, কেমন করে চালাচ্ছে তাও জানা নেই। হাতে টাকাও নেই তাদের। কোথা দিয়ে সব কী হয়ে গেল। দীপঙ্করের জীবনে সব যেন বেনিয়ম হয়ে গেল রাতারাতি। এরই নাম কি অনুসন্ধান? কাকে সে অনুসন্ধান করছে? কোন সত্যকে? কোন সত্যের অন্বেষণে তাকে এই

জীবন-পরিক্রমা করতে হচ্ছে এত পরিশ্রান্ত হয়ে? সে অনুসন্ধান তার কবে শেষ হবে? জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়েই কি অভীষ্টকে পাওয়া যাবে? অথচ কী-ই বা অভীষ্ট? কোন অভীষ্টকে পেলে সব পাওয়া তার চরম পাওয়া হবে? কাউকেই সে শান্তি দিতে পারেনি, কাউকেই সে সুখ দিতে পারেনি। অন্য কেউ সুখ না-পেলে দীপঙ্কর যে নিজেও সুখী হতে পারে না! কেন এমন করে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে তাকে তার সৃষ্টিকর্তা কে জানে! সৃষ্টিকর্তার কোন অভিলাষ সে পূর্ণ করবে এই জীবন দিয়ে? এই জীবন কি তার সৃষ্টিকর্তার কাছে এতই মূল্যবান। দীপঙ্করের হাসি পেল। এত কথাও, এত অদ্ভুত কথাও সে ভাবতে পারে। তবে কি সে উন্মাদ? সে কি উন্মাদ হয়ে যাবে?

হঠাৎ রাস্তার মোড়ের কাছে আসতেই দীপঙ্করের খেয়াল হলো।

যদি এখানে এসে থাকে সতী! যদি শেষ পর্যন্ত কোনও উপায় না-পেয়ে এখানে, এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডেই এসে থাকে।

দীপঙ্কর বললে—বাঁদিকে চলো, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড—

ট্যাক্সি থেকে নামতেই পেছন থেকে কে যেন ডাকলে—বাবু—

রঘু!

রঘু সেই লক্ষ্মীদির চাকর। লক্ষ্মীদির চাকর এখানে কেন!

দীপঙ্কর বললে—তুই এখানে? তোর নাম রঘু না?

রঘু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছোটদিদিমণি যে এখানে এসেছে, আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে এই বাড়িতে ঢুকেছে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখানে কখন এসেছে ছোটদিদিমণি?

রঘু বললে—সেই দুপুরবেলা।

—দুপুরবেলা থেকে এখানে বসে আছিস?

রঘু বললে—হ্যাঁ, ছোটদিদিমণি আমাকে যে এখানে বসে থাকতে বলে গেছে, বসে বসে আমার পা ভেরে গেছে—এখনও আসছে না—

দীপঙ্কর আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকলো। সন্ধ্যে নেমে এসেছে বাগানে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেজের আলোও জ্বলেনি। ব্ল্যাক-আউটের রাতে আলো জ্বলবেও না রাত্রে। তাড়াতাড়ি প্যাসেজটা পেরিয়ে বাঁদিকে রোয়াকের সিঁড়ির কাছে যেতেই হঠাৎ একেবারে সতীর শাশুড়ীর মুখোমুখি হয়ে গেল। সতীর শাশুড়ীর উগ্রমূর্তি। পাশেই আর একজন কে মোটা-সোটা চেহারার মহিলা। দুজন কনস্টেবল একজন পুলিস ইন্সপেক্টরও বসে রয়েছে।

—এই যে!

—হঠাৎ সামনে দীপঙ্করকে দেখেই যেন নয়নরঞ্জিনী দাসীর মূর্তিটা আরো উগ্র হয়ে উঠলো। বললেন—এসে গেছ? তাই ভাবছিলুম, আমি এক মিনিট বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁক পেয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে—

এর পেছনে তো কারো মতলব আছে—মেয়ে মানুষের বুদ্ধিতে তো এতখানি হয় না। তা এসে গেছ ভালোই হয়েছে—

দীপঙ্কর উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে? সতী এখানে এসেছে শুনলুম?

—সতী এসেছে, আর তুমি জানো না? বলি ভেবেছ আমি কিছু শুনিনি? তোমাদের ঘোষাল আমাকে সব বলে গেছে—। ছি ছি ছি, লজ্জার মাথা খেয়ে আবার এখানে এসেছ মুখ দেখাতে?

দীপঙ্কর বললে—আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন?

—তা তো বুঝতেই পারবে না, পরের বাড়ির বউকে নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় জ্ঞান তো বেশ টনটনে থাকে। তখন তো বেশ বুঝতে পেরেছিলে? তা পুলিসে যদি ধরলোই তো ছেড়ে দিলে কেন হারামজাদারা? হাজতে পুরে রাখতে পারলে না?

দারোগা সাহেব কিছুই বুঝতে পারছিলেন না এ-সব কথার। দুজন কনস্টেবলও চুপচাপ দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

নদিদি এতক্ষণে কথা বললে। জিজ্ঞেস করলে—এ কে রে নয়ন!

মা-মণি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তা সে সব যা হোক, এখন এসে ভালোই করেছ বাছা। চলো, ওপরে চলো, তোমার সেই তিনি এখন মূর্ছো গেছেন, তাকে নিয়ে যাও তুমি এখান থেকে—অমন বউকে আমার দরকার নেই—চলো চলো—

দীপঙ্কর তখনও বুঝতে পারছিল না। বললে—কিন্তু কী হয়েছে সতীর?

মা-মণি বললেন—সে-সব বাছা তুমি নিজের চোখেই দেখবে চলো না, অত কথা বলতে পারিনে আমি তোমার সঙ্গে—চলো—

বলে মা-মণি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—এসো, আমার সঙ্গে ওপরে এসো, নবাব-নন্দিনীকে তোমার যেখানে খুশী নিয়ে যাও, সেখানে মূর্ছো যাক, ভিরমি যাক, আমি দেখতে যাচ্ছিনে—এসো—

তারপর নদিদির দিকে ফিরে বললেন—এসো নদিদি—

দীপঙ্করও পেছন-পেছন চলতে লাগলো।

কদিন থেকে মিস্টার ঘোষালের বড় পরিশ্রম হচ্ছে। রাত্রে প্যালেস-কোর্টে বিছানায় শুয়েও শান্তি নেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশে যেন শান্তিপ্রিয় লোকের ওপর অত্যাচার বাড়ছে। সবাই বড় হতে চায়। সেদিনকার ছেলে মিস্টার সেন। থার্টি থ্রি রুপীজ্ ব্রাইব্ দিয়ে যার চাকরি হয় ক্লার্কের, সেও ডি-টি-এস হতে চায়। সেদিনকার নেকেড্ ফকির গান্ধী, সেও ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে চায়। এভরিথিং রটন্। এই ক্যালকাটা আগে কী ছিল, কী হয়ে গেল রাতারাতি।

স্ট্রীট আর্চিনস্‌রা এখন সিভিক গার্ড, এ-আর-পি হয়েছে, তারা রাস্তায় সিগ্রেট ফুঁকে বেড়ায় সকলের সামনে। গাড়ি চালালে কেয়ার নেই, নড়ে না। যেন রাস্তাগুলো তাদের।

যতীন কি জগন্নাথ কি মকবুল যখন সামনে আসে তখন ঘুঁষি মেরে মুখ ভেঙে দিতে ইচ্ছে করে। গেট্ আউট্, গেট্ আউট্—

কোনও কাজের নয়। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো সব। একটা সিগ্রেট কিনে খাবার পয়সা ছিল না কারো। ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের আশে-পাশে পিক-পকেট করা ছিল প্রফেশন। ব্ল্যাক-মেইল করা ছিল হ্যাবিট। রাস্তার মোড়ে মোড়ে অন্ধকার গ্যাস্ পোস্টের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো। কেউ রাস্তা দিয়ে গেলেই জগন্নাথরা বলতো—কলেজ গার্ল, সুইট সিক্সটিন—

আর তেমন কোনও খদ্দের এলে জগন্নাথরা একেবারে পিছু-পিছু জমে যেত।

—কলেজ গার্ল স্যার, সুইট সিক্সটিন—ভেরি বিউটিফুল—প্লিজ সী ওয়ানস্—

তর্জমা করলে দাঁড়ায়—কলেজে-পড়া মেয়ে, মোটে ষোল বছর বয়েস, খুব সুন্দরী, দয়া করে একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন—

এই ছিল এদের কাজ। তারপর খদ্দেরদের নিয়ে একেবারে তুলতো গিয়ে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট্-বাড়িতে। সেখানে গিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে একটা মেয়েমানুষকে ঢুকিয়ে দিত। বলতো—পকেটে কত টাকা আছে দেখি, ছাড়ুন, ছাড়ুন শিগগির—

লোকটা হতভম্ব হয়ে যেত।

জগন্নাথরা বলতো—শিগ্‌গির, শিগ্‌গির করুন, নইলে এখুনি পুলিস ডাকবো, মেয়েমানুষের ইজ্জত নষ্ট করেছেন—

এককালে এদের দিয়ে অনেক কাজ হাঁসিল করেছে মিস্টার ঘোষাল। এরাই ছিল মিস্টার ঘোষালের হাতের পাঁচ। আজ বহু বছর ধরে এদের মাসোহারা দিয়ে আসছে। যখন ছোট-চাকরি ছিল তখনও দিয়েছে। পরে যখন ডি-টি-এস হয়েছে তখনও দিয়েছে। তারপর যখন মিসেস ঘোষকে খোঁজবার জন্যে চারদিকে তোলপাড় করে বেড়িয়েছে, তখন মোটা টাকা এদের খাইয়েছে। এরাই এখন দিনরাত খচ্ খচ্ করে। যখন তখন এসে টাকার জন্যে ডিস্টার্ব করে। মেজাজ তখন বিগড়ে যায়-মিস্টার ঘোষালের। তখন চিৎকার করে ওঠে। বলে—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্—

সেদিন সলিসিটরকে নিয়ে বার-এট্-ল মিস্টার দত্তর কাছে যাবার কথা। সবে বেরোচ্ছে, এমন সময় জগন্নাথ এসে হাজির।

—হুজুর, আমার বখশিশ্‌টা দেবার কথা ছিল।

মিস্টার ঘোষাল চেয়ে দেখলে জগন্নাথের দিকে। আর চেনা যায় না ছোকরাকে। বেশ ফরসা পায়জামা, ফরসা পাঞ্জাবি পরেছে ছোক্‌রা। টু পাইস উপায় হচ্ছে আজকাল। মিলিটারি এসে জুটেছে কলকাতায়, তাদের নিয়ে এখন

তোলে গিয়ে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট-বাড়িতে। এখন মোটা বখশিশ পায়।

—আবার কী তোর?

—আজ্ঞে সেই কিছু দেবেন বলেছিলেন?

—কবে বলেছিলুম?

—আজ্ঞে, সেই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিংএর ধারে মিসেস ঘোষকে খুঁজে বার করেছিলুম?

বড় ভ্যালুয়েবল ডকুমেন্ট দিয়েছে মিসেস সতী ঘোষ। মনটা একটু নরম হলো। পকেট থেকে একটা একটাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলে মিস্টার ঘোষাল।

—এক টাকা? এক টাকায় কী হবে স্যার?

—আচ্ছা দুটাকা নে, দু'টাকা সাফিসিয়্যাণ্ট, মোর দ্যান্ সাফিসিয়্যাণ্ট—

—দু'টাকায় কী হবে স্যার? আমি রোজ বাস-ট্রাম ভাড়াই তো দিয়েছি আট আনা। তারপর আমার টিফিন আছে। সমস্ত ঢাকুরিয়া টালিগঞ্জ সব খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি স্যার—আমাকে দু'টাকা দিতে আসছেন! তিরিশ টাকার কমে আমি ছাড়ছি না!

মিস্টার ঘোষালের অফিসারি মেজাজ হঠাৎ টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠলো। যুদ্ধের বাজারে এদেরই পোয়া বারো। এরাই সবচেয়ে বেশি বেনিফিট্‌টা পেলে। পিক্‌পকেট, ব্ল্যাক-মেলার, চীট্, ব্ল্যাকমার্কেটারদেরই লাভ এই যুদ্ধের ফাট্‌কা-বাজিতে। তবু পেছন পেছন আসছিল জগন্নাথ।

—হুজুর আমার কী হবে?

—কী হবে তা আমি কী জানি!

—আপনি জানেন না তো কে জানে? আমাদের চটালে কিন্তু টিকতে পারবেন না কলকাতায়, এই বলে রাখছি—

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ গর্জন করে উঠলো—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার—

সলিসিটর গাঙ্গুলীর সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। ব্যারিস্টার দত্তর বাড়িতে বড় ভিড়। ওল্ড বালিগঞ্জের সব চেয়ে বড় ব্যারিস্টার দত্তর বেশি কথা বলবার সময় থাকে না। বললেন—অ্যারেস্ট তো করবেই, এ আটকানো যাবে না,—

—কিন্তু আমি যদি আবার মার্ডার চার্জে অ্যারেস্টেড্ হই তো কেস্ চালাবার অসুবিধে হবে যে মিস্টার দত্ত?

সলিসিটর গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলেন—স্যার, বেইল্ পাবার কোনও উপায় নেই?

ব্যারিস্টার বললেন—মার্ডার চার্জে বেইল্ পাওয়া অসম্ভব। পুলিস রিপোর্ট বড় খারাপ এ-কেসে, অ্যারেস্ট তো আজ-কালের মধ্যে করবেই, আর বেইল্‌ও

পাওয়া যাবে না—পেপার্স যা কিছু তোমার কাছে থাক্—

মিস্টার ঘোষাল বললে—মিসেস্ ঘোষের নামটাও উইটনেসের লিস্ট-এর মধ্যে দিয়ে দেবেন মিস্টার গাঙ্গুলী—

—সেই চিঠিটা?

—সেটা তো আপনার কাছেই আছে। ডেট্‌টা যেন কারেক্ট হয়। শুধু লক্ষ্য রাখবেন মিসেস ঘোষ যেন ইন্-দি-মীন-টাইম মত না বদলান্—তিনি বলবেন তো ঠিক যে এটা তাঁরই হাতের লেখা?

—এ-চিঠি প্রোডিউস্ করবার পরও কি কেস্ আমার ফেবারে যাবে না?

ব্যারিস্টার দত্ত বললেন—পুলিস রিপোর্ট বড় স্ট্রং, স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল কী করে বলা যায় না ঠিক। তবে আই শ্যাল্ ট্রাই মাই বেস্ট্—

ব্যারিস্টার দত্তর আরো ক্লায়েণ্ট অপেক্ষা করছিল। আর বেশিক্ষণ সময় দিলেন না তিনি। সলিসিটর গাঙ্গুলী উঠলেন। মিস্টার ঘোষালও উঠলো। আর টাইম নেই। সলিসিটর গাঙ্গুলী বললে—ব্যারিস্টার দত্ত যাই বলুন, আমি বলছি এটা ক্লিয়ার কেস্ ফর বেনিফিট্ অব ডাউট্—

—আপনি মিসেস ঘোষের চিঠিটা ভালো করে রেখে দেবেন মিস্টার গাঙ্গুলী। মিসেস ঘোষের প্রেজেণ্ট অ্যাড্রেসও ওখানে আছে।

সলিসিটর গাঙ্গুলী হঠাৎ চাইলেন মিস্টার ঘোষালের দিকে। বললেন—মিসেস ঘোষ কি এখন হাজ্‌ব্যাণ্ডের কাছে আর থাকে না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—ক্যারেক্টার তো বরাবরই লুজ্—লুজ্ মর‍্যালস-এর মেয়েমানুষ, সে তো বুঝতেই পারছেন—আর মিসেস ঘোষের একলারই বা দোষ কী! হোল্ ওয়ার্ল্ডে চ্যাস্টিটি বলে জিনিসই উঠে গেল—

সলিসিটর গাঙ্গুলী বললেন—তা তো বটেই, চ্যাস্টিটি কথাটা শেষকালে শুধু ডিক্সনারিতেই পাওয়া যাবে—বলে হাসলেন হা হা করে।

—তাহলে আমি যাই, আমি একবার মিসেস ঘোষের সঙ্গে দেখা করে আসি। কথাটা রিমাইন্ড্ করে দিয়ে আসা ভাল।

মিস্টার ঘোষাল সলিসিটরকে ছেড়ে আবার গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর দিকে চলতে লাগলো। পৃথিবীটা যেন ডে-বাই-ডে কমপ্লেক্স হয়ে উঠছে। ছোট-বেলা থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত বেশ ছিল। সহজে বিলেত চলে গিয়েছিল মিস্টার ঘোষাল। সহজে গ্র্যাজুয়েট বলে সকলকে বিশ্বাস করিয়েছে। সহজে সাউথ-ইণ্ডিয়ান বলে চালিয়েছে যখনই দরকার হয়েছে। সহজে চাকরি জুটিয়েছে। গেজেটেড্ চাকরি জুটিয়ে নিয়ে এসেছে হোম্-বোর্ড থেকে। সহজে কলকাতা শহরের ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে প্রতিপত্তি জমিয়েছে। রামমনোহর দেশাইয়া সহজে টাকা জুগিয়ে গেছে। সবই সহজে হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ কমপ্লেক্স হয়ে উঠলো সব, ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স। কোনও উপায় নেই।

লেভেল-ক্রসিংটা পেরিয়ে লাল-বাড়িটার সামনে দাঁড়াতেই একটু চমকে

উঠলো। দরজায় তালা বন্ধ!

একবার এদিক-ওদিক চাইলে। তালাবন্ধ। কোথায় গেল? কলকাতার বাইরে? দিল্লিতে—দিদির কাছে? তাহলে? হোয়াট নেক্সট্?

গাড়ি আবার ঘুরলো। আবার সলিসিটর গাঙ্গুলীর অফিসে যেতে হবে! না দরকার নেই! টেলিফোন করে দিলেই চলবে প্যালেস্-কোর্ট থেকে। ছি ছি, সেইদিনই মিসেস ঘোষকে প্যালেস-কোর্টে এনে তুললে হতো! তাহলে আর কোনও হিচ্ থাকতো না।

অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। রাস্তায় আবার লোক-জন বেড়েছে। ক্যালকাটা যেন পোকার সিটি। চারদিকে কেবল কিল্-বিল্ করছে পোকা। একটু ফাঁক পেলেই পোকারা ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কেবল পোকা। কলকাতায় আর মানুষ নেই, শুধু পোকা!

প্যালেস-কোর্টের সামনে আসতেই কিন্তু গাড়িটা থমকে থেমে গেল হঠাৎ। এত পুলিস! এত কনস্টেবল!

মিস্টার ঘোষাল গাড়ি থেকে নামতেই ইন্‌স্পেক্টর সামনে এগিয়ে এল। বললে—আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে মিস্টার ঘোষাল—হিয়ার ইট্ ইজ্—

ওয়ারেণ্ট্! তাড়াতাড়ি চোখ বুলোতেই যেন ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠলো মিস্টার ঘোষাল। মুখ দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল অভ্যস্ত বুলি—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্—

কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে। মিস্টার ঘোষাল মুখ তুলে বললে—আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন?

—ইয়েস্।

—আর বেইল্?

—আপনি সেখানে গিয়ে বেইলের ব্যবস্থা করতে পারেন।

—তাহলে একবার আমার ফ্ল্যাটে যাই, আমার সার্ভেণ্টকে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়ে আসি!

ইনস্পেক্টর বললে—আমরাও সঙ্গে থাকবো আপনার,—চলুন—

বাইরে জগন্নাথ আর যতীন তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। দূরে এক কোণে। যতীন একটা সিগ্রেট দিলে জগন্নাথকে। বললে—শালা শুয়োরের বাচ্চা। হয়েছে কি তোমার, তোমার ফাঁসি হবে, তবে খুশী হবো আমরা! আমাদের জক্ দেওয়া—আমরা লোক চরিয়ে খাই, আমাদের চটিয়ে তুমি হাওয়া খেয়ে ফুর্তিবাজি করবে বাবা?

জগন্নাথ আনন্দের চোটে সিগ্রেটে প্রাণপণে টান দিয়ে লম্বা করে ধোঁয়া ছাড়লে।

মিত্তির-গিন্নীকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ন'দিদি। মিত্তির-গিন্নী

জিজ্ঞেস করেছিল—ও বউ এই সময় আবার কোত্থেকে এল ন'দিদি?

ন'দিদি বললে—কপালের গেরো ভাই, একেই বলে কপালের গেরো। শুনেছে তো যে ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে শাশুড়ী, তাই এসে জুটেছে আর কী!

—কিন্তু তোমার বোনপো'র তো খুব টান দেখেছিলুম ন'দিদি বউ-এর ওপর—

ন'দিদি বললে—ওর আবার টান! জামাইকে তো দেখলে, সদাশিব মানুষ, কোনও কিছুতেই নেই—এই যে বাড়ি দেখছো, এই সম্পত্তি তো ওই ছেলে একলাই পাবে! নেই-নেই করেও যা আছে, তাই ভাঙিয়ে খেলে তিন পুরুষ হেসে-খেলে কেটে যাবে—

—কিন্তু ন'দিদি, বিয়ের পর যদি ওই বউ এসে আবার গণ্ডগোল বাধায়!

ন'দিদি বললে—তা তোর মেয়ে রয়েছে কী করতে? সোয়ামীকে বশ করতে পারবে না?

—কি জানি ন'দিদি, আমার যেন কেমন ভয় করছে। কর্তা সব শুনলে কী বলবে কে জানে!

ন'দিদি বললে—তোকে সে-সব কিছু ভাবতে হবে না, আমি আছি, দেখ্ না কী করি আমি। সেই যে কথায় আছে রে—অতি চতুরের ভাত নেই, অতি-সুন্দরীর ভাতার নেই—ওরও সেই হবে।

—কিন্তু আমি তো মেয়ের মা ন'দিদি, আমার যেন কেমন ঠেকছে!

ন'দিদি বললে—তুই বোস্ একটু, আমি ফয়শালা করে আসছি। আরে, তুই যেমন মেয়ের মা, আমিও তো তেমনি মেয়ের মা রে—তাই তো বলি—মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি—! মেয়ে যখন বিইয়েছিস্ তখন জ্বালা তো থাকবেই ভাই—

বলে আর দাঁড়ায়নি ন'দিদি। সোজা একেবারে নিচের চলে গিয়েছিল। নিচেয় তখন নয়ন পুলিসের দারোগার সঙ্গে কথা বলছিল।

ঠিক সেই সময়েই দীপঙ্কর এসে গিয়েছিল। মা-মণি দীপঙ্করকে নিয়ে সোজা ওপরে উঠতে লাগলেন। বললেন—তোমার যেখানে খুশী নিয়ে যাও ও-বউকে, অমন বউ আমার চাই না—

দীপঙ্কর তখনও কিছু বুঝতে পারছিল না। তাহলে এখানেই এসেছে সতী? সেবার জোর করে এনে সে এক বিভ্রাট ঘটেছিল, আর এবার স্বেচ্ছায় এসেছে আবার!

মা-মণি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলছিলেন—ওই বউ আসার পর থেকেই আমার এই হাল হলো, যখন চলে গিয়েছিল, আপদ চুকেছিল, আবার এসেছে জ্বালাতে, বলি মরতেই যদি চাস্ তুই, তো রাস্তা খোলা পড়ে রয়েছে সেখানে গিয়ে মর না—

ন'দিদি পেছন-পেছন যাচ্ছিল।

দারোগাসাহেব এতক্ষণ নিচেয় দাঁড়িয়েছিল। এবার ওপর দিকে চেয়ে বললে—আমি যাই মিসেস ঘোষ—

মা-মণি পেছন ফিরে বললেন—হ্যাঁ বাবা, তুমি এসো, পরে কী হয় আমায় জানিও। আমি মেয়েমানুষ, দেখছো তো বাবা, আমার কেউ নেই, আমি একলা, আমি মরে গেলেও কেউ ফেলবার নেই আমাকে—

দারোগাসাহেব চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কনস্টেবল দুজনও গেল।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার একুল গেল, ওকুল গেল ন'দিদি। সবাই ঠকালে, জানো ন'দিদি? আমি ভেবেছিলুম টাকাগুলো অন্ততঃ পুলিসে আদায় করে দেবে—যেমন হয়েছে পুলিস তেমনি হয়েছে উকীল! উকীল পুলিস সবাই মিলে আমাকে একেবারে জেরবার করে ছাড়লে। শেষকালে বউ এনেছিলুম, সে-ও চেটে-পুটে একেবারে আঁটি-সার করে ছাড়লো গো—

দীপঙ্কর কিছু কথা বলছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উঠছিল।

মা-মণি আবার বলতে লাগলেন—লোকে ঘরে বউ আনে বুড়ো বয়সে সুখ হবে বলে, সেবা পাবে বলে, আর আমার সেবা হচ্ছে এই, এই বুড়ো বয়সে সিঁড়ি ভেঙে কেবল ওপর-নিচ করছি—

তারপর হঠাৎ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন—তা তোমাকে তো পুলিসে ধরেছিল শুনেছি, আবার ছাড়লে কেন?

দীপঙ্কর কিছু উত্তর দিলে না।

—তা আমার বউকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে, সেখানে ধরে রাখতে পারলে না তাকে? আসতে দিলে কেন? আমার হাড়-মাস জ্বালাতে?

যখন সনাতনবাবুর ঘরের সামনে গেছে, তখন দেখা গেল ভেতরে বিছানার ওপর সতী শুয়ে আছে, আর সনাতনবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মা-মণি চেঁচিয়ে উঠলেন—কই গো ন'দিদি তুমি যে বললে বউ আমার ভিরমি গেছে, কই, এই তো এখনও জ্যান্ত রয়েছে। কী গো, খুব যে নাটক করতে শিখেছ বলি নাটক আমরাও করতে জানি, এখন ওঠো তো বাছা, নাটক যদি করতেই হয় তো বাড়ির বাইরে গিয়ে নাটক করো, এখানে এ-সব চলবে না—

সনাতনবাবু চোখ তুলেই দীপঙ্করকে দেখতে পেয়েছেন হঠাৎ। বললেন—দীপুবাবু, আপনি?

দীপঙ্কর সামনে ঘরের ভেতরে এগিয়ে গেল। বললে—কী হয়েছিল?

সতী তখনও দুর্বল। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল, সনাতনবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—বেশি আঘাত সইতে পারেনি তাই শুয়ে পড়েছে, বড় দুর্বল দীপুবাবু—

সতীর মুখ দিয়ে হঠাৎ কথা বেরোল। বললে—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে

দীপু ?

দীপঙ্কর বললে—তুমি কথা বোল না সতী, চুপ করো—

মা-মণি হঠাৎ বললেন—ওই তো কথা বলছে গো ন'দিদি, তুমি বললে একেবারে জ্ঞান নেই, দাঁতকপাটি মেরে পড়ে আছে ?

দীপঙ্কর বললে—আপনি দয়া করে চুপ করুন মা-মণি, দেখছেন কী রকম দুর্বল হয়ে গেছে সতীর শরীর—

মা-মণি গলা আরো চড়িয়ে বললেন—চুপ করবো কেন শুনি ? তুমি আমাকে চুপ করতে বলবার কে ?

দীপঙ্কর বললে—সতীর শরীরের কথা বিবেচনা করেই আপনাকে চুপ করতে বলেছি, আপনি কিছু মনে করবেন না!

ন'দিদি এতক্ষণ কিছু কথা বলেন নি। এবার তিনি উত্তোর গাইলেন। বললেন—যাই হোক বাছা, নয়ন তোমার মায়ের বয়েসী, তার মুখের ওপর কথা বলা কি উচিত ?

দীপঙ্কর বললে—আমার দোষ হয়েছে, আমায় ক্ষমা করবেন!

মা-মণি বললেন—ক্ষমা করা-করির কী আছে, তুমি এসেছো, আমি বলছি তুমি ওকে নিয়ে যাও, মরতে হয় রাস্তায় গিয়ে ও মরুক, নাটক করতে হয় রাস্তায় গিয়ে নাটক করুক, আমার বাড়িতে এ-সব ছেনালী চলবে না—

-কিন্তু এই অবস্থায় কী করে নিয়ে যাবো ?

—এখনও জ্ঞান আছে, এই বেলাই নিয়ে যাও, নইলে হাঁফ উঠলে তখন সামলাবে কে ?

দীপঙ্কর সনাতনবাবুর মুখের দিকে চাইলে। সনাতনবাবু তখনও সতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সতী সনাতনবাবুর মুখের দিয়ে চেয়ে ক্ষীণ স্বরে বললে—আমি যাবো না, আমি এখান থেকে যাবো না—

নয়নরঞ্জিনী দীপঙ্করকে বললেন—কই, নিয়ে যাও, আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কী ?

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে আমি এখনও অনুরোধ করছি, আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন, সতী এখানেই থাকতে চায়, এ ওর স্বামীর ঘর, ওর শ্বশুরের ঘর, এখান থেকে ওকে এমন করে তাড়াবেন না আপনি—

ন'দিদি বললে—দেখ বাবা, তোমার ডবল বয়েস হয়েছে আমার বোনের, তাকে তুমি উপদেশ দিতে এসো না—যা বলছে তাই করো না, যেখানে পারো ওকে নিয়ে যাও—আমার বোনেরও শান্তি হোক, ওরও শান্তি হোক—

—কিন্তু এখানেই তো থাকতে চাইছে ও, আর কখনও কোথাও যাবে না, ওর হয়ে আমি কথা দিচ্ছি, আপনারা তো অনেক শাস্তি দিয়েছেন, অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছে ও, এখন আর একবার শেষবারের মত সুযোগ দিন না—

ন'দিদি বললে—শাস্তি যা পাবার তা আমরাই পাচ্ছি, যথেষ্ট পাচ্ছি, ওই বউ

এ-বাড়ি থেকে না-যাওয়া পর্যন্ত এ-শাস্তির আর শেষ নেই, আমরা যা বলছি তাই করো তুমি—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবো বলুন ?

—যেখানে তোমার খুশী নিয়ে যাও, যেখানে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে সেখানেই নিয়ে যাও, আমরা কিছু বলবো না !

দীপঙ্কর বললে—ওর এক বোন ছিল, সে-ও কলকাতার বাইরে চলে গেছে। ওর বাবা ছিলেন, তিনিও মারা গেছেন, এখন নিয়ে গেলে আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। আপনাদের বাড়ির বউ হয়ে আমার বাড়িতে থাকবে, সেটাই কি ভাল ?

মা-মণি বললেন—খুব ভাল! খুব ভাল! কেউ কিছু বলবে না, তুমি নির্বিঘ্নে নিয়ে যাও—আমার আপদের শান্তি হোক—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, ও তো কোন দোষ করেনি, মিছিমিছি কেন ওকে এই শাস্তি দিচ্ছেন ?

মা-মণি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বললেন—বলি, তুমি ওকে নিয়ে যাবে কি না বলো ?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। তারপর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আপনিও কি তাই বলেন ?

সনাতনবাবু বললেন—না !

দীপঙ্কর মা-মণির মুখের দিকে চাইলে।

মা-মণি সনাতনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—কী বললে তুমি ?

সনাতনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—সতী এখানেই থাকবে !

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থম্ থম্ করতে লাগলো হঠাৎ। এতক্ষণের এত ঝড়-ঝঞ্ঝা সব যেন সনাতনবাবুর একটা কথায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সবাই বুঝলো যে-লোকটা চুপ করে থাকতে জানে, সে যখন কথা বলে তখন সে-কথার বুঝি আর নড়-চড় হবার নয়। সে অমোঘ। সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ন'দিদিও স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। খানিকক্ষণ কারোর মুখ দিয়েই কোনও কথা বেরোল না। সনাতনবাবু যে 'না' বলে দিয়েছেন সেই 'না'-ই যেন চিরস্থায়ী হয়ে রইল। কারো কোনও প্রতিবাদেই তার যেন আর অদল-বদল হতে নেই।

সনাতনবাবু আবার বললেন—যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ সতী এখানেই থাকবে !

দীপঙ্কর এই মানুষটার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় বিমূঢ় হয়ে রইল। একটা সামান্য নেতিবাচক শব্দ যে এতখানি শ্রদ্ধা উদ্রেক করতে পারে তা যেন এর আগে আর জানা ছিল না তার!

তারপর সনাতনবাবু আবার মুখ খুললেন। বললেন—তোমরা সব বাইরে যাও, এখানে ভিড় করলে রোগীর অসুবিধে হবে।

নন্দিদি কথাটা শুনে বোধহয় বাইরেই চলে যাচ্ছিল। দীপঙ্করও ঘর থেকে বাইরে পা বাড়িয়েছিল কিন্তু হঠাৎ নয়নরঞ্জিনী দাসী এক কাণ্ড করে বসলেন।

হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—তবে আমিও বলছি, আমিও যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমিও যদি এ-বাড়ির সতী-লক্ষ্মী বউ হই, আমিও যদি একদিন কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা করে থাকি, তাহলে আমিও বলছি এ-বউ এখানে থাকতে আমিও জলগ্রহণ করবো না, করবো না, করবো না। আমিও এই হত্যে দিয়ে পড়ে রইলাম এখানে—দেখি সোনা কী করতে পারে—

আর তারপরেই সেইখানে সেই মেঝের ওপর বসে পড়ে দেয়ালের সিমেন্টের ওপর ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ভেসে গেল সারা মুখখানা।

—ওমা, করিস কী, করিস কী নয়ন!

নন্দিদি নিচু হয়ে ধরতে গেল নয়নকে। কিন্তু সেই বুড়ো মানুষের শরীরে যে কোত্থেকে হঠাৎ অত প্রচণ্ড শক্তি এল কে জানে। মা-মণি তখনও ঘন ঘন মাথা ঠুকে যাচ্ছেন, আর রক্তের ধারা দর দর করে ঝরে পড়ছে মুখের ওপর, গায়ের ওপর, আর মেঝের ওপর।

দীপঙ্কর ধরতে গেল মা-মণিকে। কিন্তু যে-শক্তির খাণ্ডব-দাহন করেও তৃপ্তি হয় না, তাকে নিবৃত্ত করবে কে? তিনি ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকেই চলেছেন।

সনাতনবাবু নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত ধীর-স্থির দৃষ্টিতে শুধু সেদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। একটা প্রতিবাদ, কি একটা সান্ত্বনার কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না।

অন্য যে-কেউ হলে ততক্ষণে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তো কিন্তু নয়নরঞ্জিনী দাসীর প্রকৃতি বোধহয় বড় কঠিন ধাতুতে গড়া। তাঁর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। তিনি মাথা ঠুকছেন আর বলে চলেছেন—আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমি যদি সতী-লক্ষ্মী বউ হই এ-বাড়ির, আমি যদি কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা করে থাকি তো আমার কথাও থাকবে—থাকবে—থাকবে—

সত্যি, শেষ পর্যন্ত বুঝি সতী মায়ের সতী কন্যারই জয় হলো।

সনাতনবাবু বললেন—দীপঙ্করবাবু!

দীপঙ্কর সামনেই ছিল। বললে—বলুন—

—আপনি সতীকে নিয়েই যান এখান থেকে। এখানে থাকলে সতীও অপবিত্র হয়ে যাবে—

—কিন্তু আপনি?

সনাতনবাবু বললেন—আমাকে এই অপবিত্রতার মধ্যেই বাঁচতে হবে দীপঙ্করবাবু। আমি এই অপবিত্রতার মধ্যেই অপরূপের সন্ধান করবো। যদি

কোনদিন সে-সন্ধান পাই তখনই সতীকে আবার নিয়ে আসবো এখানে, তার আগে নয়—

মনে আছে সেদিন সনাতনবাবুর সেই নিস্তব্ধ মূর্তিটার দিকে চেয়ে দীপঙ্করের মাথা নিচু হয়ে আসতে চেয়েছিল। এই মানুষটাকে যেন কেউই বুঝলে না। বুঝতে চাইলে না। সংসারে যত কথা না বলতে পারা মানুষগুলোর যেন নির্বাক প্রতিনিধি এই সনাতনবাবু। দুঃখ তো সকলেই পায়। দুঃখের কত না ব্যাখ্যাই করে গেছেন কত মহাপুরুষ। কিন্তু প্রতিবাদহীন সহনশীলতার মধ্য দিয়ে সনাতনবাবুর মত আর কে দুঃখকে এমন অপরূপ মর্যাদায় মণ্ডিত করতে পেরেছে! একটি দিনের একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই যেন দীপঙ্কর অনেক কিছু শিখে ফেললে। এ সংসারে এমন ঘটনা তো নিত্য-নৈমিত্তিক। এখানে প্রতিদিনই প্রবল দুর্বলকে আঘাত করছে। ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু এখানকার প্রতি-দিনকার ঘটনা। বিপর্যয় এখানে অদৃশ্য থেকে প্রতিপদে সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল ছায়া বিস্তার করছে। তবু সনাতনবাবুর মত কে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সেই অপরিহার্য অপবিত্রতার মধ্যে অপরূপের সন্ধান করতে পেরেছে!

অন্ধকার ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে সতীকে গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে রেখে আসার পরও বার বার সনাতনবাবুর উদ্দেশে প্রণাম করলে দীপঙ্কর।

রঘু ছিল সঙ্গে। ট্যাক্সিতে সামনের সিটে বসে ছিল।

দীপঙ্কর বললে—তোমার কাছে টাকা আছে রঘু?

—আজ্ঞে, না তো!

দীপঙ্কর পকেট খুঁজে দেখলে। কয়েকটা মাত্র টাকা তখনও পড়ে ছিল। বললে—এগুলো রাখো তুমি, কালকে আরো কিছু দিয়ে আসবো—

সতী সারা রাস্তা দীপঙ্করের কোলের ওপরেই শুয়ে পড়েছিল। তার যেন নড়বার ক্ষমতাও নেই। দুই হাতে তাকে ধরে নিয়ে যেতে হয়েছে সারা রাস্তা। তারপর দুজনে মিলে ধরে তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

রঘু বলেছিল—দাদাবাবু, আপনি এখানে থাকবেন না?

দীপঙ্কর বলেছিল—আজ রাতটা দিদিমণি এমনি করেই থাক, আমি ভোর বেলাই চলে আসবো—কিছু ভেবো না তুমি—একেবারে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসবো—

চলে আসবার আগে বললে—এই ক'দিন আর কেউ এসেছিল এখানে?

রঘু বললে—এসেছিল, দুতিনজন—

—কী করতে?

রঘু তা জানে না। দীপঙ্কর আবার বললে—কোনও চিঠি এসেছে?

তাও আসেনি। তবু লেটার-বক্সের ভেতরে একটা চিঠি পড়ে ছিল। চাবি

খুলে চিঠিটা বার করতেই বোঝা গেল লক্ষ্মীদির চিঠি। হোক সতীর নামে। তবু চিঠির খামটার মুখ ছিঁড়ে ফেললে। লক্ষ্মীদি লিখেছে—

ভাই সতী,

কেমন আছিস? এখানে এসে ভালোই আছি আমরা। দীপুকে বলিস বাবার নামে সেই টাকাগুলোর যেন একটা ব্যবস্থা করে। অতগুলো টাকা ব্যাঙ্কে উইথ্‌আউট্‌ ইন্টারেস্টে পড়ে থাকা ভাল নয়। তাড়াতাড়ি যেন একটা সাকসেশন্‌ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা সে করে। যেমন-যেমন ব্যবস্থা হয়, আমাকে লিখবি। দরকার হলে আমি নিজেও চলে যেতে পারি এক-দিনের জন্যে। ইতি—

তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে সতীর টেবিলে রেখে দিয়ে এল। তারপর আবার সেই ট্যাক্সিতে চড়েই বাড়ি ফিরে এসেছে। এতদিন বাড়ি ছাড়া। যেন এক স্বপ্ন! অন্ধকারে স্টেশন রোডের ভেতরে গাড়িটা ঢুকতেই সব কথা আবার মনে পড়ে গেল। কাশী, ক্ষীরোদা। এইখান থেকেই কিরণকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তারা। বলতে গেলে এইখানেই কিরণের মৃত্যু হয়েছে। দীপঙ্করই যেন কিরণকে হত্যা করেছে নিজের হাতে। কিরণকে যেন ফাঁসির কাঠগড়ায় তুলে দিয়ে সে নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে এল।

—কাশী, কাশী।

অনেকক্ষণ ডাকার পর ভেতর থেকে দরজা খোলার ক্ষীণ শব্দ এল। কাশী দরজা খুলতে এত দেরি করছে!

কিন্তু দরজাটা খুলেই যে নিঃশব্দে এক পাশে সরে গেল সে কাশী নয়—সন্তোষ-কাকার মেয়ে! হঠাৎ সেই অন্ধকারেই বিদ্যুৎ-চমকের মত যেন এক পলক দেখে নিয়ে দীপঙ্কর কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। ক্ষীরোদা হয়ত রোজই জেগে থাকে তাকে দরজা খুলে দেবার জন্যে! কাশী ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়ে-দেয়ে। দীপঙ্কর দরজাটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু যেন বলবার ছিল কাউকে। কিন্তু না বলেই আবার আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো। ওপরের ঘরটায়-তালা লাগানো ছিল।

ক্ষীরোদা এসে আস্তে আস্তে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল চাবি নিয়ে।

দীপঙ্কর বললে—দাও, আমাকে দাও চাবিটা, আমি খুলছি—

কিন্তু চাবিটা দিতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফসকে ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে সেটা পড়ে গেল সিমেণ্টের মেঝের ওপর।

আর দীপঙ্করের মনে হলো যেন সেই সঙ্গে ক্ষীরোদার কুমারী-জীবনের সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সম্ভ্রম, সব যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ক্ষীরোদা আর দাঁড়াল না সেখানে। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সেই অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করেই যেন বাঁচলো। তখনও তার বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে।

ক্রফোর্ড সাহেব সব শুনলেন। বললেন—আমি সব জানি সেন, পুলিস আমাকে রেফার করেছিল—

মিস্টার ক্রফোর্ডকে বেশি বলতে হয় না। বেশি কথার লোকও নয় সাহেব। শুধু একটা কথার পর আবার সেই কামরা। আবার সেই চেয়ার। আবার সেই আলোচনা। আবার সেই কানাকানি। সেক্‌শানে-সেক্‌শানে আবার সেই কথা-চালাচালি। এতদিন অভয়ঙ্কর কোনওরকমে কাজ চালিয়েছিল। সে-ও বাঁচলো।

অভয়ঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষালের কেস্‌ সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?

দীপঙ্কর বললে—না, কিছুই শুনিনি তো—

—আপিসে এসেছিল মিস্টার ক্রফোর্ডকে ইনফ্লুয়েন্স করতে। কিন্তু মিস্টার ক্রফোর্ড বলে দিয়েছে—হি নোজ্‌ নাথিং—হে'কে রিফিউজ করে দিয়েছে!

এ-সব কথায় কান দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না দীপঙ্করের। অনেক ফাইল জমে গেছে টেবিলে। এতদিন আপিসের বাইরে থেকে যেন একদিক থেকে সে বেঁচেছিল। অভয়ঙ্কর বোধহয় আরো অনেক কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু দীপঙ্করই গা করলে না তেমন। বললে—আমার মনটা ভাল নেই তেমন অভয়ঙ্কর—

—হোয়াই? তোমার আবার ওরিজ্‌ কী? তুমি তো এখনও ব্যাচিলর?

সে-সব অভয়ঙ্কর ঠিক বুঝবে না। অত কথা ওদের সঙ্গে না-বলাই ভালো। সকাল থেকেই যে কত ঝঞ্ঝাট চলেছে তা কেমন করে বোঝাবে দীপঙ্কর। সকাল বেলা ডাক্তার নিয়ে গিয়ে সতীকে দেখিয়েছে। তারপর ওষুধ কিনিয়ে এনেছে। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে ভাত খেয়েই চলে এসেছে আপিসে।

হঠাৎ যেন কী-কথা একটা মনে পড়ে গেল। মধুকে বললে—লক্ষ্মণবাবুকে একবার ডাক তো—

লক্ষ্মণ সরকার আসতেই দীপঙ্কর বললে—বোস, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—

লক্ষ্মণ সরকার বসলো একটা চেয়ারে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার কে আছে সংসারে?

হঠাৎ এই প্রশ্নে লক্ষ্মণ সরকার যেন একটু বিব্রত হলো। দীপঙ্কর বললে—এ আপিসের কাজের কথা নয়, আমি অন্য কথা জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। তোমার কে-কে আছে?

এ-কথা আগেও একবার জিজ্ঞেস করেছিল দীপঙ্কর। আজকে আবার এই কথা কেন তুলছে লক্ষ্মণ বুঝতে পারলে না। বললে—আমি তো বলেছিলাম তোমাকে, আমার কেউ নেই—

—কোন্‌ গ্রেড এখন তোমার?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—সেই সব বলতেই একদিন তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, তোমার দেখা পাইনি, একটি মেয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—আমার বাড়িতে গিয়েছিলে? কেন?

—এই সব কথাই বলতে! সেক্শানে সবাই আমাকে ডাউন্ করবার চেষ্টা করে—

—কেন?

—তুমি আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়েছ বলে!

দীপঙ্কর বললে—ওতে কিছু মনে করতে নেই লক্ষ্মণ। দোষ যখন একজন লোক খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে, তখন দোষ বেরুবেই। দোষ না থাকলেও দোষ বেরুবে। আমাকে প্রাণমথবাবু বলেছিলেন, এ-সব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও কাজ করে যেতে হবে। কাজ বন্ধ করলে শত্রুদেরই তো সুবিধে! এই আমাকে দেখ না! তুমি এখন যে-চেয়ারে বসছো, একদিন আমিই ওই চেয়ারে বসতুম। তারপর মাইনে বেড়েছে, পজিশন বেড়েছে, তা বলে শত্রুতা কি কমেছে এতটুকু? বরং দিনের পর দিন উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে নিন্দে পরশ্রীকাতরতা বেড়েই চলেছে। একে এড়িয়ে যাওয়া মানে পরাজয় স্বীকার করা, এতে ভয় পেতে নেই—এ না-হলে বুঝতুম আমার উন্নতি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—শত্রুসৃষ্টি শক্তির লক্ষণ! তোমার আমার শক্তি আছে, তাই শত্রুতা হয়। আর তাছাড়া, এটা বাঙালীদের স্বভাব। সুভাষ বোসের কত শত্রুতা করেছে কংগ্রেস—তা তো জানো! প্রাণমথবাবু বলতেন—এ শত্রুতার উর্ধ্বে উঠতে হবে একদিন।

তারপর একটু হেসে বললে—তোমারও মনে আছে নিশ্চয়ই, একদিন তুমিও আমার কত চাঁটি মেরেছ—

লক্ষ্মণ সরকার মাথা নিচু করলো। দীপঙ্কর আবার বললে—রামের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ তো? কিন্তু রাবণই আবার রামের সবচেয়ে বড় ভক্ত! রাবণ সীতাহরণ না করলে রামের বীরত্ব দেখাবার সুযোগ হতো কী করে?

তারপর হঠাৎ বললে—থাক্ গে এ-সব কথা, আমি তোমাকে অন্য কথা বলতে ডেকেছিলাম। তুমি বিয়ে করবে?

—বিয়ে!

লক্ষ্মণ সরকার যেন আকাশ থেকে পড়লো। হঠাৎ দীপঙ্কর তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসে বিয়ের কথা পাড়বে, এ-কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। বিয়ে করলে খাওয়াবে কী সে। বিয়ে করলে সংসার করবে সে কোথায়! সংসার করলেও সংসার চালাবে সে কেমন করে?

—সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি মেসে আছো, সারা জীবনটাকে একটা খেলা ধরে নিয়েছ। এতদিন পরে তোমার চৈতন্য হয়েছে তাই এসেছ এখানে চাকরি করতে। তুমি তো দেখেছ, জীবনকে যা ভেবেছিলে, জীবন তা নয়। এই সংসারে বেঁচে থেকে ভোগ করতে গেলে কিছু যোগ করতেও হয়।

শুধু খাওয়া-পরা, খাওয়া-শোয়া নিয়ে তো জানোয়ারেও থাকে, মানুষকে আরো বাড়তি একটা কর্তব্য পালন করতে হয়—একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয়—

—বিয়ে করাটাই কি সেই দায়িত্ব?

দীপঙ্কর বললে—না, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেকগুলো কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় বলে বিয়েটার এত উপকারিতা—নইলে আর কিছু নয়।

—কিন্তু তুমি? তুমি তো বিয়ে করোনি শুনেছি—

দীপঙ্কর বললে—হয়ত আমিও বিয়ে করবো একদিন, কিন্তু আমার কতকগুলো দায়িত্ব আছে, সেগুলো শেষ না করতে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না।—সে তুমি বুঝবে না। আমার কেউ না-থেকেও আমার অনেক গলগ্রহ।

—কিন্তু আমি যে সব মিলিয়ে তেতাল্লিশ টাকা হাতে পাই।

দীপঙ্কর বললে—আমিও একদিন তেত্রিশ টাকা পেয়েছি।

লক্ষ্মণ বললে—তোমার কথা আলাদা, তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তোমরা ভালো ছেলে—

দীপঙ্কর বললে—সে-সব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি তো রইলুমই। এমন অনেককেই আমায় দেখতে হয়, অনেক আমার দায়িত্ব, না-হয় তোমার দায়িত্বটাও ঘাড়ে নেব। তুমি এখন যাও, তোমাকে ঠিক সময়ে খবর দেব—

লক্ষ্মণ সরকার চলে গেল। সেক্শানে যেতেই সবাই মুখ উঁচিয়ে ছিল। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো লক্ষ্মণের ওপর।

—কী হলো দাদা? কী বললে সেন-সাহেব?

—খুব সাবধান মশাই, সেন-সাহেব বড় হুইম্জিক্যাল লোক, এমনিতে বেশ ভালো মানুষ কিন্তু ক্ষেপে গেলে আর কারুর নয়—

পুলিনবাবু বললে—কারো ভালো দেখতে পারে না মশাই, ক্লার্কদের ওপর একটা জাতক্রোধ আছে, নিজে একদিন ক্লার্ক ছিল কি না!

কে-জি-দাশবাবু বললেন—তোমরা থামো না হে, কী জন্যে আসলে আপনাকে ডেকেছিল বলুন তো?

লক্ষ্মণ সরকার কিছু বলবার আগেই কে-জি-দাশবাবু বললেন—আমি আপনাকে পই-পই করে বলেছি সেন-সাহেবকে ফাইল পাঠালে আমাকে একবার দেখিয়ে পাঠাবেন, ইংরিজীর ভুল দেখলে সেন-সাহেব ক্ষেপে যায়। কেন, আপনাকে আমি বলিনি, অসবর্ন্ সাহেবের নোট্ ফাইলের তলাতেই রয়েছে, একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন—

তারপর উপদেশের ঝড় বইতে থাকে।

—আপনারা যদি অফিসের পর বাড়ি না-গিয়ে রোজ অন্তত আধ ঘণ্টাও ফাইলগুলো পড়েন তো কত ব[illegible] হয় জানেন! আপনাদেরই উপকার হয়, আমার কী? আপনারা সব আজকালকার ছেলে, পাঁচটা বাজলেই বাড়ি। আরে, বাড়িতে গিয়ে আছেটা কী! এত সকাল-সকাল বাড়িতে গিয়ে লাভটা কী হয় শুনি?

বউ-এর চুল-বাঁধা আর গা-ধোয়া দেখা ছাড়া আর কিছু লাভ আছে? তা এত-দিনে তা-ও পুরোন হয়ে গেল না আপনাদের? ছি ছি ছি—

সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট্। কাজটা যত সোজা ভেবেছিল দীপঙ্কর তত সোজা নয়। লক্ষ্মীদির সই এল দিল্লি থেকে, সতীও সই দিলে। কলকাতার ব্যাঙ্কে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল ভুবনেশ্বর মিত্রের। সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের টাকা। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাঙ্কেই ছিল হয়ত। বাইরের ব্যাঙ্কের টাকা পাওয়া অত সোজা নয়। বর্মার ব্যাঙ্কে কত টাকা ছিল কে জানে! কলকাতার একটা ব্যাঙ্কের হিসেব পাওয়া গেল অনেক কষ্টে।

যে ভদ্রলোক আপিসের বড়বাবু, তিনি শেষকালে বলেছিলেন—আমরাও কিছু পেয়ে থাকি স্যার—

—কী পেয়ে থাকেন?

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। ভদ্রলোক আজ কুড়ি বচ্ছর এই কোর্টে চাকরি করছেন। দীপঙ্কর কতদিন এসেছে। কতদিন টেলি-ফোন করেছে। কতদিন নিজে আপিস থেকে এখানে এসে ধর্না দিয়েছে।

—কী মশাই, হলো আমার কেস্‌টা?

প্রথম-প্রথম গা-ই করতেন না: আরাম করে পান খেতেন। সিগারেট খেতেন। বলতেন—অত শিগ্‌গির কি হয় মশাই? সরকারী টাকা অত শিগ্‌গির যদি পাওয়াই যাবে তো এতগুলো লোক এখানে কি ঘাস কাটতে এসেছে?

—কিন্তু টাকা তো গভর্নমেণ্ট্ পকেট থেকে দিচ্ছে না।

ভদ্রলোক বলতো—দেখুন, এ মুদিখানা নয় যে এক-পয়সার বেনে-মশলা চাইলেন, আর ঠোঙায় পুরে বাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। এর নাম কোর্ট! এখানে চাপরাসী থেকে শুরু করে মুহুরি মোক্তার উকিল জজ ম্যাজিস্ট্রেট পার হয়ে তবে মোক্ষলাভ হয়—এখানে দপ্তরে যে-সব লোক কাজ করছে দেখছেন, এরা লোক নয়, সাক্ষী-গোপাল! এই এতগুলো সাক্ষী-গোপালকে তুষ্ট করতে পারলে তবে এখানে কার্যসিদ্ধি হয়—

শেষকালে একদিন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন—তা ভদ্রলোকের মাত্র দুই মেয়ে? আর কেউ নেই!

দীপঙ্কর বলেছিল—না—

—তা জামাই না এসে আপনি যে আসেন তাগাদা করতে? আপনি কে?

—আমি কেউ না।

ভদ্রলোক বলেছিলেন—কত লোকের কত সম্পত্তি আর কত টাকা যে এখানে এমনি পড়ে আছে, তার কোনও হিসেব নেই মশাই—

দীপঙ্কর বলেছিল—আপনারা যদি একটু সাহায্য করেন তা হলেই সকলের

উপকার হয়—

ভদ্রলোক বলেছিলেন—আমরা কেন উপকার করতে যাবো মশাই! আমরা কত মাইনে পাই তা জানেন? যদি উপ্‌রির টাকা না থাকতো, তো কোর্টে কোনও শালা চাকরি করতে আসতো? মাইনেতে আমাদের কী হয় মশাই? মাইনেতে আমাদের পান-সিগারেটের খরচও ওঠে না—

দীপঙ্কর শেষ দিনে কিছু দিয়েছিল ভদ্রলোককে। ঘুষ নয় ঠিক। ভদ্রলোক শেষকালে ভিক্ষে চেয়েই নিয়েছিল বলতে গেলে। বলেছিল—এ আমরা ভিক্ষে বলেই নিচ্ছি স্যার, মনে করুন দান-খয়রাতই করলেন না-হয়। আপনারা বড়-বড় লোক, কতদিকে কত টাকা খরচ করেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কথাটা একবার বিবেচনা করবেন। এই টাকার ওপর নির্ভর করেই আমাদের ফরসা জামা-কাপড় পরতে হয়, মেয়ের বিয়ের তত্ত্ব করতে হয়, আবার লোক-লৌকিকতাও করতে হয়। ছোটলোক মুচি-মেথর হলে যে বেঁচে যেতুম মশাই, আমরা যে ভদ্দরলোক, ভদ্দরলোকের যে অনেক জ্বালা—

যাক্, শেষ পর্যন্ত সব ঝঞ্ঝাট চুকলো। লক্ষ্মীদি ক'দিন থেকে কেবল চিঠি লিখছিল। টাকার জন্যে সেখান থেকে তাগাদা দিচ্ছিল কেবল। কোর্ট থেকে আপিসে ফিরে দু' একটা কাজ সেরেই আবার বেরিয়ে পড়লো। এমন সকাল-সকাল আপিস থেকে বেরোন হয় না কখনও।

লালবাজার থানার কাছে আসতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। পুলিস দু' হাত বাড়িয়ে রাস্তা আট্‌কিয়েছে। একটা ট্যাক্সি থানার মধ্যেই ঢুকবে। গাড়িতে পুলিস ইন্সপেক্টর বসে ছিল, কনেস্টবল্ বসে ছিল। আর পেছনে...

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল সতীর শাশুড়ীকে দেখে। পেছনের সীটে সতীর শাশুড়ী বসে আছেন।

ট্যাক্সিটা গিয়ে থানার উঠোনের মধ্যে দাঁড়াল। ইন্সপেক্টর নামলো, কনস্টেবলরাও নামলো। আর সকলের শেষে মোটা শরীর নিয়ে অতি কষ্টে নামলো সতীর শাশুড়ী! নয়নরঞ্জিনী দাসী।

দীপঙ্কর আর নড়তে পারলে না এক-পা!

নয়নরঞ্জিনী দাসী হঠাৎ থানায় এলেন কেন? দীপঙ্কর ভুল দেখছে নাকি? কিন্তু সেই তো একই রকম চেহারা। সেই থান, সেই সাদা শেমিজ, সেই সাদা মাথার চুল। সেই থপ্ থপ্ করে হাঁটার ভঙ্গি! সেই কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

দীপঙ্কর আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। সতীর শাশুড়ী এখানে কেন? এমন সময়ে?

ট্যাক্সি থেকে নেমে কনস্টেবল্ দু'জন দু'পাশে দাঁড়ালো। সতীর শাশুড়ী একবার এদিকে চাইলেন, আর একবার ওদিকে চাইলেন। কোনদিকে যেতে হবে যেন বুঝতে পারলেন না। কনেস্টবল্ দু'জন তাঁকে সামনে একটা দরজার মধ্যে ধরে নিয়ে গেল। পুলিস ইন্সপেক্টর আগে আগে ঢুকে পড়লো।

কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর।

গেটে পাহারা দিচ্ছিল একজন কনেস্টবল্। দীপঙ্কর গিয়ে জিজ্ঞেস করলে —ট্যাক্সি থেকে কে নামলো?

—কৌন্ বাবুজী? কিধার?

দীপঙ্কর বুঝিয়ে দিলে। বললে—ওই যে বিধবা মেয়েমানুষটিকে কনেস্টবল্‌রা ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, ও কে?

কনেস্টবল্ চেয়ে দেখলে—বললে—উও আসামী হুজুর, জেনানা আসামী—

—জেনানা আসামী?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি ঠিক জানো?

কনেস্টবল্‌টা বললে—বাবুজী, জমানা বহুত খারাপ হয়েছে আজকাল। আজকাল দুনিয়া বদলে গিয়েছে। জেনানা আসামী ভি আজকাল হরদম হচ্ছে —যত মর্দানা আসামী, তত জেনানা আসামী হচ্ছে। দুনিয়ামে সভী লোক রাতোরাত আসামী হয়ে গেল!

তারপর হেসে বললে—এবার দেখে নেবেন বাবুজী, পুলিস ভি জেনানা হয়ে যাবে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ভাল করে ঘুম হলো না। সকাল বেলাই চলে এল গড়িয়াহাটের বাড়িতে। সারা রাত দীপঙ্কর কেবল ভেবেছে। সত্যিই কি সতীর শাশুড়ীকে শেষ পর্যন্ত আসামী হতে হয়েছে থানায়! পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কি একেবারে দাগী হয়ে গেল। কেন এই বিরোধ তাহলে? বিরোধ না থাকলে তো এই সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন ওঠে না। বিরোধ না থাকলে তো এই বিপর্যয়ও থাকে না। কিন্তু কেন বিরোধ থাকবে পৃথিবীতে।

সারা দিন আপিসের অপমান, তারপরে কোর্টে অতক্ষণ হত্যা দেওয়া, তারপর সন্ধ্যে বেলা ক্লান্ত হয়ে খানিকক্ষণের জন্যে সতীর সঙ্গে দেখা করে আবার চলে এসেছিল বাড়িতে। এত ক্লান্তির পর ঘুম হওয়ারই তো কথা ছিল। কিন্তু তবু ঘুম এল না সারা রাত।

অভয়ঙ্কর বলতো—মিস্টার সেন, বাড়ি গিয়েও কি আপনি ফাইলের কথা ভাবেন নাকি?

—ফাইলের কথা!

দীপঙ্কর মনে মনে হেসেছিল। তা ফাইলই বৈকি! জীবনটাও তো একটা ফাইল। একদিন ফাইলের জন্ম হয় একখানা কাগজকে কেন্দ্র করে। সেই কাগজটাকেই ঘিরে গড়ে ওঠে জঞ্জাল। ভাবনা আর সমস্যা জমে জমে মোটা হয় ফাইল। এদিক-ওদিক নানাদিক থেকে তার মাথায় এসে জমা হয় করেসপণ্ডেন্স। কত সাহেব কত বড়বাবু তার ওপর নোট্ লেখে। তারপর আবার একদিন ম্যালাফিতে বাঁধা হয়ে যায় চিরকালের মত। তখন তার সমাধি হয় রেকর্ড সেকশানের মাচার ওপর। তখন কেউ ছোঁয় না কেউ দেখেও না আর তাকে। মানুষ ফাইল নয় তো কী!

কাশী ভাত দেবার সময় কাছে বসে ছিল। সারাদিনের সব খরচপত্রের হিসেব দেয় সে। বলে—চালের দাম বেড়ে গেছে দাদাবাবু—

শুধু চাল নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বাড়ার ফিরিস্তি দেয়। তবু দীপঙ্কর কিছু বলে না দেখে অবাক হয়ে যায়। অথচ দোকানে রোজ ঝগড়া করে আসতে হয় তাকে। একটা ঝগড়া করবার লোকও নেই তার বাড়িতে। দীপঙ্কর সব শোনে চুপ করে, আর ক্ষীরোদাও শুধু চুপ করে রান্না করে যায়। কাশী কার সঙ্গে যে কথা বলে ঠিক নেই। তাই সব কথাগুলো বাজারে ফুরিয়ে এসে যেন তৃপ্তি পায়। আবার বাড়িতে এসে ঘুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ওঠে। একটা বক্‌বারও লোক নেই তার। সকাল থেকে দুপুর হয়: দুপুর থেকে বিকেল। তারপর বিকেল থেকে রাত। বাড়ি ছেড়ে যে একটু বেরোবে তারও উপায় নেই। দিদিমণি কিছু বলবে না মুখে। কিন্তু দিদিমণি একলা বাড়িতে থাকবেই বা কী করে।

সেদিন একেবারে কিরণের মা'কে জোর করে ধরে নিয়ে এল দীপঙ্কর। বললে—এই আপনার সংসার মাসীমা, এ আপনার ঘাড়েই তুলে দিলুম—

বিধবা মানুষ। সারা জীবন অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা আর অপরিমেয় ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এই সংসারে এসে যেন আরও বোবা হয়ে গিয়েছিল কিরণের মা। এখানে অর্থাভাব নেই, এখানে দুশ্চিন্তা নেই, এখানে জীবিকা-অর্জনের হাড়ভাঙা সংগ্রাম নেই। তবু মানুষ বোধহয় কোনও অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হতে চায় না। এ-সংসারের মর্মমূলে ঢুকে মাসীমা আর এক অশান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলো। একদিন বললে—এ কী করলে বাবা দীপু, এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?

—কেন মাসীমা, আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

—আমি যেখানে ছিলুম, সেখানেই রেখে দিয়ে এস তুমি বাবা, এখানে আমার দম আট্‌কে আসছে—

দুজনেই নির্বিরোধী মানুষ। কিরণের মা আর ক্ষীরোদা। কিরণের মা'ও সংসারের অত্যাচারে কখনও প্রতিবাদ করেনি। ক্ষীরোদাও তাই। সংসারের সমুদ্রে দু'জনেই যেন ভাঙা জাহাজ। পাল তুলে একদিন যাত্রা করেছিল ঠিকই শুভলগ্ন দেখে। কিন্তু ঝড়ে উপরে এসে এক নির্জন নির্বান্ধব চরে এসে আটকে গেছে। যেন মেরামত করবার অবস্থাও আর নেই।

একটু আদর করতে গেলেই ক্ষীরোদা কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়ে।

কাশী বলে—দেখলেন তো মাসীমা, দেখলেন তো কাণ্ডখানা, আমি বলে তাই এ-সংসারে এতদিন আছি, অন্য কেউ হলে পরনের কাপড় ছেড়ে পালিয়ে

বাঁচতো—

তখন মাসীমা আবার ক্ষীরোদাকে টেনে এনে চুল বেঁধে দেয়। মুখটা ভিজে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেয়। কত সান্ত্বনা দেয়। বলে—বাবা তো চিরকাল থাকে না মা কারো। বাপ-মা আগে যাওয়াই তো ভালো—

ক্ষীরোদা কিছু কথা বলে না। মাসীমা বলে—যাও মা, এবার কলতলায় গিয়ে গা-ধুয়ে এসো—

রাত্রিবেলা মাসীমা ক্ষীরোদাকে কাছে নিয়ে শোয়। ক্ষীরোদাও তেমনি মেয়ে। মাসীমা না বলতেই সরষের তেলের বাটি নিয়ে এসে মাসীমার পায়ে তেল ঘষে দেয়।

মাসীমা বলে—থাক্ মা থাক্—অত সুখ আমার কপালে সইবে না—

ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠবার আগেই মাসীমা দেখে পাশে ক্ষীরোদা নেই। ততক্ষণে ক্ষীরোদা উঠে কাশীকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে। উনুনে কয়লা দিয়ে আগুন ধরিয়েছে। রান্নাঘর পরিষ্কার করে ফেলেছে। মাসীমার মনে হয় কিরণের বদলে এমনি যদি একটা মেয়ে থাকতো তার, এমনি পাশে নিয়ে শুতো। এমনি না-বলতেই সেবা করত। ওইটুকু তো মেয়ে, কিন্তু কোত্থেকে যে খবর পায় কবে একাদশী, কবে ষষ্ঠী, কবে অষ্টমী। সারাদিন নিঃশব্দে কখন সব কাজ সেরে পরের দিনের কাজও এগিয়ে রাখে। দুপুরবেলা ডাল শুকোতে দেয় রোদে। বালিশের ওয়াড়গুলো খুলে নিজেই সাবান দিয়ে কেচে রোদে মেলে দেয়।

—তোমাকে এত কাজ কে শেখালে মা?

বাপ নেই, মা নেই, অথচ সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি এমন নিখুঁত পরিপাটি করে করতে কে শেখালে কে জানে!

দীপঙ্কর বলে—আপনিই একটা উপায় করে দিন না মাসীমা, এই জন্যেই তো আপনাকে এনেছি, আমার মা থাকলে আর এত ভাবতে হোত না—

—তা তোমার মা'র যদি কথা দেওয়াই ছিল তো তুমিই বিয়ে করো না বাবা! এমন বউ তুমি হাজার খুঁজলেও পাবে না, এ-ও বলে রাখছি—

এ-কথার উত্তরে দীপঙ্কর চুপ করে থাকতো। কোনও কথা না বলে খেয়ে উঠে জামা-কাপড় পরে আপিসে চলে যেত। কিন্তু একদিন আর থাকতে পারলে না মাসীমা। বললে—আমাকে তুমি কেন আনলে বাবা এখানে? আমি কী পাপ করেছিলুম?

—কেন মাসীমা, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

মাসীমা বললে—এর চেয়ে সে-কষ্ট যে অনেক ভাল বাবা, আমি সেখানে খেতে পেতুম না, আমার সেবা করবার লোক ছিল না, হাতে পয়সা ছিল না, তবু এর চেয়ে সে অনেক ভাল! এ যন্ত্রণা তো আর আমার সহ্য হয় না!

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কেন মাসীমা, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার?

—ওর বাপ-মা থাকলে আমাকে আর এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না।

বাড়িতে এত বড় একটা মেয়ে পুষে রেখেছ আর তুমি বলছ যন্ত্রণাটা কীসের? সংসারে সকলকে খেয়ে বুড়ো বয়েসে এ কী পাপে আমাকে জড়িয়ে দিলে বাবা!

যখন কোনও কাজ থাকত না, সেই দুপুর বেলা আর দুপুর রাত্রেই দু'জনে যেন একাত্মা হয়ে যেত। ক্ষীরোদাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতো মাসীমা। একজন স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে, রোগে শোকে শীর্ণ অথর্ব হয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, আর একজন জীবনের সূচনাতেই সব হারিয়ে নিঃসম্বল হয়ে যাত্রা শুরু করে-ছিল। মাসীমা বুঝতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরতো ক্ষীরোদাকে। আর ক্ষীরোদাও যেন একজনের ওপর নির্ভর করতে পেরে প্রাণ ভরে কেঁদে তৃপ্তি পেত। তখন কোনও ভাষা জোগাত না দু'জনের মুখে। সান্ত্বনা দেবার সামর্থ্যটুকু যেন দু'জনেরই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এ কী পাপ! এ কী যন্ত্রণা! এ কী অভিশাপ নেমে এসেছিল সেই সেদিনকার দু'টি মেয়েমানুষের জীবনে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ বড় বিপর্যয় ঘটে গেল আবার। দীপঙ্কর রোজই আপিসে যায়। রোজই আপিস থেকে ফেরে। রোজই দীপঙ্কর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে নিজের ঘরে। আর রোজই দু'টি নিরীহ গলগ্রহ মেয়েমানুষ দু'জনের বুকের মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। এমনি করেই চলছিল এই ছন্নছাড়া সংসার। কিন্তু একদিন দীপঙ্কর যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন তার চেহারার দিকে চেয়ে মাসীমা আঁতকে উঠলো। বললে—কী হয়েছে বাবা তোমার?

দীপঙ্কর কিছু বললে না। কিছু খেলেও না। সোজা নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। খবর পেয়েই মাসীমা কাছে গেল। কপালে হাত দিয়ে দেখলে। বললে—কী হলো বাবা তোমার?

দীপঙ্কর শুধু বললে—মাসীমা—

আর বেশি কথা বেরোল না দীপঙ্করের মুখ দিয়ে। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো দীপঙ্কর। তার মা বেঁচে থাকলে যেমন করত, মাসীমাও ঠিক তেমনি করতে লাগল। দীপঙ্করের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলে। দু'জনের কারোরই নজরে পড়ল না যে, ক্ষীরোদাও তখন সকলের অলক্ষ্যে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। সেও যেন আকস্মিক বিপর্যয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাসটা না জানলে এ-ঘটনাটা ঠিক বোঝা যাবে না।

অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে তখন দিন কাটছিল দীপঙ্করের। এ-এক অদ্ভুত অস্বস্তি। এ অস্বস্তির কোনও কারণই কিন্তু থাকতো না অন্য কেউ হলে। অন্য কেউ হলে এত বড় চাকরির মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত। কোথায় কোন্ দীন অবস্থা থেকে সে এত বড় হয়েছে। এত টাকার মালিক হয়েছে। আপিসে তাকে সেলাম করবার লোকের অভাব নেই। আপিসে তার অনুগ্রহ পাবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে ক্লার্করা। সংসারে এই-ই তো দুর্লভ। তার মা তো দীপঙ্করের

কাছ থেকে এর বেশি কিছু চায়ওনি। কালিঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের আবহাওয়া ছেড়েছে। চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। সংসারী লোক আর কী চায়? আর কী চাওয়ার আছে?

কিন্তু তবু কোথায় অন্তরের অবচেতনায় যেন একটা বেদনার কাঁটা দিনরাত খচ্ খচ্ করে বিঁধতো! কেন এত অন্যায়, কেন এত অত্যাচার, কেন এত অবিচার। কেন সৎ মানুষের এত কষ্ট! কেন সংসারে সততার কোনও মূল্য নেই। কেন পৃথিবী জুড়ে এত কান্না, এত আর্তনাদ! একলা থাকলেই প্রাণমথবাবুর সেই ছোটবেলাকার কথাগুলো মনে পড়ে। কিরণকে মনে পড়ে। অন্ধকার বন্ধ ফাঁসি-সেলের মধ্যে কেমন করে দিনগুলো কাটছে তার। সতীর কথা মনে পড়ে, লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়ে, সনাতনবাবুর কথা মনে পড়ে। সনাতনবাবুর বেদনার কথাটাও একটু-একটু বুঝতে চেষ্টা করে। অপবিত্রতাকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, অপবিত্রতার মধ্যেই সনাতনবাবু অপরূপের সন্ধান করছেন।

একদিন সনাতনবাবুর কাছেও গিয়েছিল দীপঙ্কর। সেই প্রসন্ন হাসিটা মুখে ঝুলছে।

জিজ্ঞাসা করলেন—সতী কেমন আছে?

দীপঙ্কর বলেছিল—ভালো আছে কেমন করে বলবো বলুন?

—কোথায় আছে সে?

দীপঙ্কর বলেছিল—তার দিদির বাড়িতে—

সনাতনবাবু বলেছিলেন—সতীকে বলবেন, হতাশ যেন সে না হয়, উত্তেজিত যেন সে না হয়। হতাশ হওয়া পাপ, উত্তেজিত হওয়া পাপ—! আমি আজই সতীকে গিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারি দীপুবাবু, কিংবা আমিও থাকতে পারি তার কাছে—

—তাহলে যান না কেন? সতী একটু শান্তি পেত। তার বিবাহিত জীবনটা একটু সুখের হতো তাহলে।

সনাতনবাবু বলেছিলেন—আপনিও কি তাই চান দীপুবাবু?

দীপঙ্কর বলেছিল—আমি চাই সে সুখী হোক, আর শুধু সে একলা নয়, পৃথিবীর সবাই সুখী হোক—

সনাতনবাবু বলেছিলেন—কিন্তু দুটো কথা তো এক নয় দীপুবাবু! তাহলে আর আজকের এই যুদ্ধটাও বাধতো না। আজ পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে পাশের বাড়ির লোকের আর মিল হয় না, ভাইতে ভাইতে মিল হয় না, স্বামী-স্ত্রীতে মিল হয় না—মানুষে মানুষে মিল হওয়াটাই উঠে গেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না, কেউ কাউকে ভালোও বাসি না—। কালোরা সাদাদের ভয় করে, ধনীরা গরীবদের ভয় করে, অত কথা কী, এ-পাড়ার লোক ও-পাড়ার লোকদের ভয় করে—

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু এ-ভয় তো চিরকাল থাকবে! ততদিন সতী বাঁচবে কেমন করে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—ততদিন হয়ত আমিও বাঁচবো না দীপুবাবু। কিন্তু ভয় তো এদের দূর করতেই হবে একদিন।

—কেমন করে সে-ভয় দূর হবে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—জ্ঞানে। স্কুলে কলেজে যে-জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান নয়। যতদিন সে-জ্ঞান দেবার মত কোনও মানুষের আবির্ভাব না হয়, ততদিন আমাদের দুঃখ সহ্য করতেই হবে। আমি তো সেই কথাই বলছিলুম মা-মণিকে। আমার মাকে আপনি কতটুকু চিনেছেন জানি না। কিন্তু এমন মা'ও তো কোনও ছেলে পায় না দীপুবাবু!

সনাতনবাবুর মুখের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর খানিকক্ষণের জন্যে।

—আমাদের এই সংসার তো আপনি দেখছেন, এ চিরকাল এমন ছিল না দীপুবাবু। আপনি কিছু-কিছু দেখেছেন সে-সংসারের। এর শান্তি এর ঐশ্বর্য একদিন এই ভবানীপুরের সমস্ত পরিবারের ঈর্ষার জিনিস ছিল, তা জানেন! আমি যখন ছোট ছিলাম, অল্প বয়েসে আমার বাবা মারা যান, মা না থাকলে এ-সমস্ত যে ভেসে যেত সেদিন। আমার মা শুধু আমার মা-ই নয়, আমার মা-ই যে আমার অস্তিত্ব। মা ছাড়া যে আমি কিছু কল্পনাই করতে পারি না দীপুবাবু। মা'র জন্যেই আমি এই সব কিছু পেয়েছি। এই সব কিছু ভোগ করছি। মা কি সামান্য জিনিস দীপুবাবু। আপনিও তো জানেন দীপুবাবু, আপনার মা আপনার কতখানি ছিলেন? আমি যে আর সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু মাকে? আর আমার কাছে দেশও যা, মা-ও যে তাই। মাতৃভূমি কি আমরা ত্যাগ করি? মাতৃভূমি আমাদের যত দরিদ্রই হোক, তবু কি কেউ আমরা ত্যাগ করেছি তাকে? তাহলে সকলে আমেরিকাতে গিয়ে বাস করলেই তো পারি? বঙ্কিমচন্দ্র যে 'বন্দে মাতরম্' লিখেছিলেন, সে তো এই মাতৃভূমিকেই উদ্দেশ্য করে!

তারপর মাতৃরূপের কত ব্যাখ্যাই যে করেছিলেন সেদিন সনাতনবাবু! মাতৃমন্ত্র কী, মাতৃস্বরূপ কী জিনিস, তার অনেক ব্যাখ্যাই দীপঙ্কর সেদিন বুঝতে পারেনি।

—আবার দেখুন, এই মা'র জন্যেই আজকে আমাদের সব ঐশ্বর্য রিক্ত হয়েছে, সব গৌরব অন্তর্হিত হয়েছে, আজকে আমাদের পরিবারের সব কর্মচারী ঠিকমত মাইনেও পায় না। কিন্তু আজকে মায়ের ঐশ্বর্য নেই বলে কি মাকে আমি পরিত্যাগ করব? মায়ের মূল্য কি ঐশ্বর্য দিয়ে বিচার করে কেউ?

—কিন্তু কোনওদিন যদি আপনার মায়ের সঙ্গে সতীর মিল না হয়, তাহলে?

—মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন, তা তো জানেন?

—সতী তো কোনও অপরাধই করেনি সীতার মত?

—কিন্তু সীতাই কি কিছু অপরাধ করেছিলেন?

তারপরেই একটু থেমে বলেছিলেন—না দীপুবাবু, সতীকে ত্যাগের কথা এখানে ওঠেই না, সেই রামচন্দ্রের আমল থেকে হাল-আমল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ সীতা আর লক্ষ লক্ষ রামচন্দ্র এমনি দুঃখ এমনি ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন, এই নিয়ে কত মহাকাব্য কত উপন্যাস, কত গাথা লেখা হয়েছে—তবু পাতাল-প্রবেশ কেউ তো রোধ করতে পারেনি—

—কিন্তু এর কি কোনও সমাধান নেই?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—এর সমাধান আমি আমার বইতে খুঁজে পাচ্ছি না দীপুবাবু, কেবল সন্ধান করেই চলেছি। যেদিন সন্ধান পাবো সেদিন আমি নিজে গিয়ে আপনাকে জানাবো।

সেদিন আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। কেবল ভয় হচ্ছিল হয়ত এখনি সতীর শাশুড়ী এসে পড়বে। এসে দেখে ফেলবে তাকে। হয়ত আবার একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে যাবে। একটু পরেই উঠে পড়েছিল দীপঙ্কর। সনাতনবাবুর চেহারাটাও কেমন যেন শুকনো-শুকনো। সেই লাবণ্য নেই। সেই ঘোষ-বাড়ির ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে সনাতনবাবুও যেন শুকিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—আমি তাহলে আসি সনাতনবাবু—

আগে হলে সনাতনবাবু বসতে পীড়াপীড়ি করতেন। সেদিন কেমন যেন ঝিমিয়ে ছিলেন।

দীপঙ্কর বললে—শুনলাম নির্মল পালিত, আপনাদের ব্যারিস্টার, ধরা পড়েছে—

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ—

—তাহলে হয়ত টাকাগুলোও পাওয়া যাবে!

সনাতনবাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন—টাকা পাওয়া গেলেই কি সব সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে ভেবেছেন? টাকা তো সমস্যা নয় দীপুবাবু, টাকাটা সমস্যা সমাধানের একটা উপায় মাত্র। কিন্তু টাকা দিয়ে তো সব কেনা যায় না—। টাকা ফিরে এলে কি সতী ফিরে আসবে?

দীপঙ্কর নিজের মনেই যেন হঠাৎ চমকে উঠলো। হঠাৎ এতদিন পরে যেন অঘোরদাদুর উল্টো কথা শুনলো সনাতনবাবুর মুখ থেকে। এ-পৃথিবীতে এমন করে এত সহজ ভাবে আর কেউ তো বলেনি এমন কথা।

—টাকা সব নয়?

সনাতনবাবু আর কথা বললেন না। তিনি আবার মাথা নিচু করলেন। তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন দীপঙ্করের দিকে। বললেন—টাকা ফিরে এলে কি আমি আমার মাকেও আবার ফিরে পাবো?

দীপঙ্করের বিহ্বল দৃষ্টির ওপর মুখ রেখে সনাতনবাবু আবার বললেন—

টাকা গেছে দুঃখ নেই দীপুবাবু, কিন্তু দুঃখ এই যে টাকার জন্যে মাকেও হারিয়েছি, আর মা'র জন্যে সতীকেও হারিয়েছি—

তারপর একটু থেমে দীপঙ্করকে বললেন—আপনি সতীকে বলে দেবেন দীপঙ্করবাবু, যে হতাশ যেন সে না হয়, হতাশ আমি হইনি, হতাশ আমি হই না। জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত আমি হতাশ হবো না, হতাশ হলে আমি থাকবো কী নিয়ে?

বাইরে বেরিয়ে আসছিল দীপঙ্কর। আপন মনে চোখ নিচু করেই আসছিল। পেছন থেকে হঠাৎ শম্ভুর গলা পেতেই মুখ ফিরিয়ে দেখলে।

—তুমি? তুমি কেমন আছো শম্ভু?

শম্ভু বললে—বৌদিমণি কেমন আছে?

দীপঙ্কর বললে—ভালো কি করে থাকে বলো, কিন্তু তোমরা কেমন আছো?

শম্ভু বললে—আপনি শুনেছেন তো কাণ্ড?

—কী কাণ্ড?

শম্ভু বললে—এ বাড়ি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে!

—সে কি?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, মা-মণি তো সেইজন্যেই উকীলের বাড়ি গেছে। আগেকার ব্যারিস্টারবাবু এ-বাড়ি বাঁধা রেখে দিয়েছিল মারোয়াড়ীদের কাছে, এতদিন কেউ জানত না। দলিল-টলিল তো সব সেই ব্যারিস্টারবাবুর কাছে থাকতো! এখন ডিক্রী হয়েছে, বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে আমাদের!

—কই, সনাতনবাবু তো কিছুই বললেন না এ-সব কথা!

—উনি আর কী বলবেন! উনি কি কোনও ঝঞ্ঝাটে থাকেন? নমাসীমা কদিন থেকে আসা-যাওয়া করছে। মা-মণিরও ঘুম নেই, খাওয়া নেই, কেবল এখানে দৌড়োচ্ছে, ওখানে দৌড়োচ্ছে—হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে গেছে এ-বাড়িতে. অথচ মাইনেও পাইনি আমরা কেউ কত মাস! চাকরিই থাকবে না আর তা মাইনে নিয়ে কী করবো বলুন—

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল সব শুনে। এতক্ষণ ধরে সনাতনবাবুর সঙ্গে বসে বসে কথা বলেছে, কিছুই তো বলেননি। একবার ঘুণাক্ষরেও তো এতবড় ব্যাপারটার এক বর্ণও উচ্চারণ করেন নি!

—তুমি ঠিক বলছো শম্ভু?

—আজ্ঞে ঠিক বলবো না তো কি বেঠিক বলবো আমি! আমাদের অন্ন নিয়ে কথা, আমি বেঠিক কথা বলতে যাবো কেন খোকা? আর তো দু'এক মাসের মধ্যে এ-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! বড়বাজারের মারোয়াড়ীদের কাছে বাঁধা ছিল এতদিন, কেউ টের পায়নি। শুনছি তো এক লাখ টাকায় কিনে নিয়েছে। এ নিয়েই তো যত হুজ্জুত হচ্ছে বাড়িতে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সেদিন যে তোমার মা-মণিকে লালবাজার থানায়

যেতে দেখলুম, পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল নাকি?

—কবে?

—এ তো সেদিন, আপিস থেকে বেরিয়ে লালবাজার থানার সামনে দিয়ে আসছিলুম, হঠাৎ দেখলাম দারোগা-পুলিস ঘিরে নিয়ে গিয়ে পুরলো থানার ভেতর! সে কীসের জন্যে? সে-ও কি এই বাড়ির ব্যাপার?

এতক্ষণে যেন মনে পড়লো শম্ভুর। বললে—আজ্ঞে, সে তো সঙ্গে আমিও ছিলুম। ট্যাক্সি করে মা-মণির সঙ্গে আমিও তো গিয়েছিলুম সেখানে! ব্যারিস্টারবাবুকে যে লালবাজার থানায় পুরে রেখেছে—

—কী দেখলে?

শম্ভু সেই ঘটনাটার কথাও সবিস্তারে বললে। ট্যাক্সি থেকে নেমে পুলিস কনস্টেবলরা নয়নরঞ্জিনী দাসীকে নিয়ে গেল ভেতরে। শম্ভুও গিয়েছিল সঙ্গে। একতলা, দোতলা, কত বড় বাড়িটা। কত পুলিস কত দারোগা। সমস্ত পৃথিবী যেন শাসন করা যায় এদের দিয়ে। কত তার আইন-কানুন, কত তার নিয়ম-নিগড়। এ-ঘর দিয়ে ও-ঘরে পৌঁছে কত জায়গায় নাম ধাম লিখতে হয়। নয়নরঞ্জিনী দাসী জীবনে কখনও কল্পনাও করেন নি যে একদিন এখানে তাঁকে আসতে হবে। চারদিকে চেয়ে মোটা-সোটা মানুষ হাঁপিয়ে উঠেছিলেন।

বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা, আর কতদূর? এ কোথায় নিয়ে এলে বাবা তোমরা আমাকে?

দারোগা-সাহেব সঙ্গেই ছিলেন। বললেন—একটু কষ্ট দিলুম আপনাকে মিসেস ঘোষ!

—একে কি বাবা একটু কষ্ট বলে! খেয়ে-দেয়ে একটু জিরোতে পাইনি বাড়িতে! বাড়িও যে আমার জেলখানা হয়েছে বাবা!

—আর একটু কষ্ট করুন। সম্পত্তি থাকলেই জ্বালা সইতে হবে মিসেস ঘোষ। যার সম্পত্তি নেই, এ-যুগে তার জ্বালাও নেই!

নয়নরঞ্জিনী দাসী যেন কেঁদে ককিয়ে উঠলেন। বললেন—সম্পত্তিই হয়েছে আমার কাল বাবা, সম্পত্তি না-থাকলে আমি কাশীবাসী হতাম, এখানে আর এমন করে আমাকে দগ্ধে মরতে হতো না, কার পাপে যে সম্পত্তি এমন কাল্ হলো আমার, কে জানে!

দারোগা-সাহেব বললেন—এতে আপনারই সুবিধে! আইডেন্টিফিকেশন্ হয়ে গেলে তখন আপনাকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—সোজা বাড়ি যাবার কি আমার উপায় আছে বাবা, এখান থেকে যেতে হবে আবার উকীলের বাড়ি। হারামজাদা ব্যারিস্টার যে ওদিকেও গোলমাল বাধিয়ে বসেছে—

—কী গোলমাল?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বসত বাড়িখানা ছিল, তাও হারামজাদা বাঁধা রেখে

দিয়ে গেছে মারোয়াড়ীর কাছে। এখন সেই পাওনাদার কোর্ট থেকে ডিক্রি পেয়ে চেপে ধরেছে। আমি যে কোন্ দিক রাখতে কোন্ দিক সামলাই বুঝতে পারছি না বাবা, আমার পক্ষে যে একটা বলবার লোক পর্যন্ত কেউ নেই—

নয়নরঞ্জিনী দাসীর গলায় কান্না যেন উপচে পড়লো। দারোগা-সাহেব একটা হল-ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। দু'পাশে তারের জাল-আঁটা দরজা। শক্ত লোহার তার। একজন পুলিস-সেপাই দাঁড়িয়ে রয়েছে—কখনও এধার থেকে ওধারে পায়চারি করছে। সেই স্পষ্ট দিনের বেলাতেও তখন সেখানে অন্ধকার। কয়েকটা মিটমিটে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে মাথায়।

—ওই দেখুন, চিনতে পারেন?

নয়নরঞ্জিনী দেখলেন। শম্ভুও দেখলে। অন্ধকার ঘরটার ভেতরে একজন কোট-প্যান্ট পরা লোক তাদের দেখে সেইদিকেই এগিয়ে আসছে। বেশ জুতোর খট্‌খট্ শব্দ করে হেঁটে আসছে। কাছে আসতেই শম্ভু চিনতে পারলে—ওই তো সেই ব্যারিস্টার বাবু। আলোর কাছে আসতেই নির্মল পালিত চিনতে পেরেছে।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—ওমা, এই তো সেই—এ তো সেই চেহারা—তুমি বাছা এমন করে আমায় ঠকালে, এমন করে আমার টাকাগুলো নিয়ে গেলে? এমন হারামজাদা তুমি?

মুখে যত কথা আসছিল, সব বলতে যাচ্ছিলেন নয়নরঞ্জিনী। কিন্তু নির্মল পালিত তার আগেই পকেট থেকে একটা নোটবই বার করেছে। বললে—কী নাম বললে? হোয়াট্ ইজ্ ইয়োর নেম?

—ওমা, দেখ কাণ্ড, আমার চিনতেও পারছে না যে গো!

—কী নাম তোমার? সরোজিনী নাইডু? ঠিকানা? ঠিকানা বলো, লিখে নেব! আমি সক্কলকে জেলে পুরবো, কাউকে রেহাই দেব না—ভাইস্‌রয়কে রিপোর্ট করবো—

নয়নরঞ্জিনী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, দারোগা-সাহেব বললেন—আপনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন না, এই লোকটা তো? ঠিক চিনতে পারছেন?

নির্মল পালিত ততক্ষণে ঘস্ ঘস্ করে কী সব লিখে ফেলেছে—। বলছে—গান্ধীকে জেলে পাঠিয়েছি, জহরলাল নেহরুকে জেলে পাঠিয়েছি, এবার তোমাকে জেলে পাঠাবো সরোজিনী নাইডু—

বলে আবার লিখতে লাগলো কী-সব।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তা আমার এতগুলো টাকা তুমি কী করলে বাছা? এমন করে অনাথা-বিধবার সর্বনাশ করতে হয়? এমন করে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে হয়?

দারোগা-সাহেব থামতে বললেন। কিন্তু নির্মল লিখতে লিখতে বললে—টাকা? কীসের টাকা?

—ওমা, বলে কী গো, টাকার কথা বেমালুম ভুলে গেলে?

—ওঃ, ইউ নো, আমি বলেছিল্ম তোমাকে—beauty is potent but money is omnipotent. টাকা যে গডের চেয়েও বড়। টাকা দেখালেও আমি ছাড়বো না তোমাকে, গান্ধীকে জেলে পাঠিয়েছি, জহরলাল নেহর্কে জেলে পাঠিয়েছি, এবার তুমি সরোজিনী নাইডুই হও আর যে-ই হও, তোমাকেও আমি জেলে পাঠাবো এবার—a fool makes money and it takes a wise man to spend it—ইউ আর এ ফুল—

দারোগা-সাহেব নয়নরঞ্জিনী দাসীকে আর দাঁড়াতে দিলেন না। বললেন—চলে আস্ন মিসেস ঘোষ—চলে আস্ন—

তখনও থরথর করে কাঁপছিলেন নয়নরঞ্জিনী। পেছনে তখনও চিৎকার করছে নির্মল পালিত। ইংরিজী, বাংলা, আবোল-তাবোল—কত কী বলে চলেছে—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—হ্যাঁ বাবা, টাকাগ্লো তাহলে পাওয়া যাবে না? ওগ্লো সত্যি-সত্যিই জলে গেল?

দারোগা-সাহেব বললেন—দেখলেন তো সব, আমরা তো আপনার টাকা আদায় করবার জন্যেই চেষ্টা করছি, কিন্তু পাগলের তো আর কোনও বিচার হয় না—

—কিন্তু ও যে স্যায়ানা পাগল বাবা! দেখলে না পেটে পেটে কত ব্দ্ধি? এখন কী হবে?

দারোগাবাব্ বললেন—আপনি কিছ্ ভাববেন না, সে যা করবার আমরা করবো। আপনি এখন বাড়ি যান।

নয়নরঞ্জিনী কেঁদে আকুল হলেন। বললেন—একটু দেখো বাবা, আমি জীবনে কারো কোনও ক্ষতি করিনি, বিধবার টাকাগ্লো যেন নয়-ছয় না হয়ে যায়, আমার অনেক কষ্টের টাকা বাবা, আমার বাড়িটা পর্যন্ত বাঁধা রেখে দিয়েছে, এমন হারামজাদা—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

শম্ভু বললে—তারপর আর কী করবে মা-মণি। মা-মণি চলে এল। আমি ট্যাক্সি ডেকে দিল্ম, সেই ট্যাক্সিতে করে মা-মণিকে উকীলের বাড়ি নিয়ে গেল্ম। সেখানেই রাত্তির হয়ে গেল। আজকাল এই সবই হচ্ছে দিনরাত। মা-মণির খাওয়া নেই দাওয়া নেই, দিনরাত কেবল উকীল আর উকীল—টাকা আর টাকা—

—আর সেই বিয়ে? দাদাবাব্র সেই বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল, তার কী হলো?

শম্ভু বললে—সেও তো পাকা হয়ে উঠেছিল, মাসীমা রোজই তো আসতো, সেই মিত্তির-গিন্নী আর তার মেয়েকে নিয়ে, কিন্তু এখন এই বাড়ির হিড়িকে সব ধামা চাপা পড়ে আছে—

শীতকালের দ্প্রবেলাও রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করতো। সেই সময়টাতেই সতী নিজের

ঘরটার মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে রাখতো। সকাল বেলা ঘ্ম থেকে উঠেই দীপঙ্কর আসতো একবার। আপিসে যাবার আগে এসে রোজ দেখা করতো। তখনোও সতী ঘ্ম থেকে ওঠেনি। দীপঙ্কর চুপ করে বসে থাকতো বাইরের ঘরের চেয়ারটার ওপর। প্রথমে ছ'টা বাজতো, তারপর সাড়ে ছ'টা, তারপর সাতটা। তখন হঠাৎ সতী এসে দাঁড়াতো। পাশের চেয়ারটাতেই এসে নিঃশব্দে বসে পড়তো। শ্ধ্ বলতো—তুমি এসেছো?

দীপঙ্কর বলতো—রোজই তো আসি—

সতী বলতো—কেন আসো তুমি?

দীপঙ্কর বলতো—না এসে যে পারি না—

তারপর খানিকক্ষণ আর কোনও কথা হতো না দ্'জনের মধ্যে। ম্হ্তের্র চাকাগ্লো নিঃশব্দে গড়িয়ে যেত মহাকালের সীমানায়। যেন দীপঙ্করও অনন্তকাল বসে থাকতে পারতো। তার ক্লান্তি নেই, তার শ্রান্তি নেই। এমনি করে সমস্তটা জীবন ভরে ম্হ্তের্র পদধ্বনি শ্নতে পারতো সতীর পাশে বসে। সতী চা খেত, আর দীপঙ্কর চুপ করে বসে থাকতো। রাস্তার ওপর দিয়ে মিলিটারি লরীগ্লো সার বেঁধে ধ্লো উড়িয়ে চলে যেত একে একে। দ্জনে তাই দেখতো বসে বসে। একটা চিল আকাশে অনেকক্ষণ ঘ্রে ঘ্রে উড়তো। কাদের বাড়ির কোন্ ছেলে ঘ্ড়ি ওড়াতো আনাড়ীর মত। ঘ্ড়িটা বারে বারে আটকে যেত রেল-লাইনের টেলিগ্রাফের তারে। তারপর একসময় টানাটানিতে স্তোটা ছিঁড়ে যেত। তখন ঘ্ড়িটা ঝুলতো তারের মাথায়। বাতাসে দ্লতো আর তারপর একদিন ছিঁড়ে যেত ঘ্ড়িটা। কয়েকটা কাঠি শ্ধ্ কঙ্কালের মত আটকে থাকতো সেখানে। প্থিবীতে কি দেখবার জিনিসের অভাব আছে? কত বৈচিত্র্য, কত রোমাঞ্চ, কত আনন্দ, চোখ খ্লে দেখলে ব্ঝি তার অভাব হয় না। তারপর হঠাৎ দীপঙ্কর বলতো—আমি আসি—

বলে উঠে দাঁড়াত। আর তারপর সোজা সদর দরজাটা খ্লে বেরিয়ে যেত। এ-বাড়িতে তাকে আসতেও কেউ বলতো না, এ-বাড়ি থেকে তাকে যেতেও কেউ বলতো না। এ-বাড়ির দরজা দীপঙ্করের আসা-যাওয়ার জন্যে খোলা থাকতো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তারপর আবার যখন সন্ধ্যে হতো, আবার আসতো দীপঙ্কর। সতী তখন একলা এসে বসেছে চেয়ারটায়। দীপঙ্করও সারাদিনের আপিসের ক্লান্তির পর পাশের চেয়ারটায় এসে বসে পড়তো।

সতী বলতো—তুমি এলে?

দীপঙ্কর বলতো—হ্যাঁ—

সতী বলতো—আর কেন আসো তুমি?

দীপঙ্কর সেই একই জবাব দিত। বলতো—না এসে যে পারি না—

এইটুকুতেই কথা শেষ হয়ে যেত দ্'জনের। আর যেন কথা বলবার কিছ্ ছিলও না। কিম্বা হয়ত কথার শেষও ছিল না কারো। যেন দ্'জনের মনে

অনেক কথা জমে-জমে পাথর হয়ে উঠেছিল। কবে একদিন ভূগোলের দুটি প্রান্ত থেকে দুটি মানুষ কোন্ গ্রহ চক্রের ষড়যন্ত্রে একজায়গায় এসে জুটেছিল। তারপর কত বিপর্যয়, কত দুর্বিপাক গেল, তবু তারা বিচ্ছিন্ন হতে পারলো না। সন্ধোবেলা এ-দিকটা নির্জন হয়ে আসে তাড়াতাড়ি। রঘু রান্না শেষ করে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে কখন অজ্ঞাতে ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। কখন সাতটা বাজে, আটটা বাজে, সাড়ে আটটা বাজে, ন'টা বাজে, সাড়ে ন'টা বাজে—

তখন হঠাৎ দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি আসি—

বলে সোজা সদর দরজাটা খুলে নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এমনি করেই দিন চলতো। এমনি করেই দীপঙ্কর জীবনের প্রত্যেকটি দিনের পরিক্রমা করতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দীপঙ্করের অন্তরাত্মা যেন এখানেই পড়ে থাকে। বাইরের আবর্জনাটা নিয়ে কখনও সে আপিসের কামরায় ডি-টি-এস, কখনও সে মাসীমার কাছে একেবারে শিশু। আবার কখনও সে যেন সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অনাথ ছেলেটা! তখন আবার তার মনে পড়ে যেত কিরণের কথা! এ-যুদ্ধের ব্যাপারে কত লোকের কত সর্বনাশ হচ্ছে, কত লোক হাসপাতালে পঙ্গু হয়ে আর্তনাদ করছে, খবরের কাগজে তার কোনও হিসেব থাকতো না। হয়ত হিসেব থাকবেও না। এখান থেকে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে সোজা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন নিজের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছত দীপঙ্কর তখন সকলের শুয়ে পড়ার কথা! কিন্তু একমাত্র কাশী ছাড়া আর কেউ শুয়ে পড়ে না। ঠিক মা'র মত মাসীমাও জেগে থাকে। দীপঙ্করকে দেখে বলে—কী বাবা, আপিসে তোমার এত কী কাজ?

দীপঙ্কর বলে—আপিসে নয় মাসীমা, অন্য জায়গায়—

—কিন্তু এই ডামাডোলের সময়ে এত রাত পর্যন্ত কি বাইরে থাকা ভাল বাবা? শুনছি নাকি জাপানীরা বোমা ফেলবে কলকাতায়?

তারপর খেতে বসে দীপঙ্কর। খেতে খেতে বলে—আপনি কেন জেগে বসে থাকেন মাসীমা, আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লেই পারেন?

মাসীমা বলে—আমাকে খাবার কথা বোল না বাবা, আমার উপোস করার অভ্যেস আছে, এই মেয়েকে একটু বুঝিয়ে বলো তো তুমি, ওই মেয়ে যে তুমি না-খেলে মুখে কুটোটি দেবে না, ওকে একটু বুঝিয়ে বলে দাও না—

দীপঙ্কর বলে—আপনি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন না ওকে, আপনাদের না-খেয়ে থাকতে দেখলে আমার যে বড় কষ্ট হয়—

—তা সেই কথাটা তুমি ওই মেয়েকে একবার বোঝাও না। আমি ডেকে আনছি—

বলে মাসীমা জোর করে টানতে টানতে একেবারে দীপঙ্করের সামনে এনে হাজির করে। বলে—মুখপুড়ীকে আমি পই পই করে বলি যে তুই খেয়ে নে, তুই খেয়ে নে, কিন্তু তুমি না-খেলে ও কিছুতেই খাবে না, কিছুতেই খাওয়াতে

পারি নে ওকে—কী যে মেয়ের গোঁ—

ক্ষীরোদার তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা। লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে মাসীমার বুকের মধ্যে কুঁকড়ে রয়েছে। আঁচলে মুখ ঢেকে দাঁতে দাঁত চেপে নিজের লজ্জা ঢাকছে।

—এখন বলো একে, বলো!

দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইল। কেমন যেন দয়া হলো ক্ষীরোদার ওপর। বললে—আপনি বললেই যথেষ্ট, আপনি বললেই শুনবে—

ক্ষীরোদা যেন আর থাকতে পারলো না। মাসীমা হঠাৎ জোর করে চিবুকটা ধরে তুলতেই অবাক হয়ে গেল। বললে—ওমা, এ মেয়ে যে কেঁদে ভাসাচ্ছে রে—কী রে, কী হলো তোর? কাঁদছিস কেন? এই দেখ, এতে কান্নার কী হলো?

বলে হাতটা একটু শিথিল করতেই ক্ষীরোদা দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

এমনি করেই চলছিল দিনগুলো। ভুবনেশ্বর মিত্রের কলকাতার ব্যাঙ্কে তিন লক্ষ টাকারও একটা সদ্‌গতি করে দিয়েছিল দীপঙ্কর। লক্ষ্মীদি টাকাটা পেয়েই দিল্লি থেকে চিঠি লিখেছিল দীপুকে। টাকা পেয়ে যে কত খুশী হয়েছিল তারই কথা। বেশি লেখবার সময় নেই লক্ষ্মীদির। লক্ষ্মীদি দিল্লিতে গিয়ে আরো ব্যস্ত। আরো কাজ বেড়ে গেছে তার। আরও সময়ের দাম বেড়ে গেছে। সে-যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ ব্রিটিশলক্ষ্মীর কৃপাকণা পেয়ে আরো বিলাসিনী হয়ে উঠেছে। কলকাতায় সকাল দশটায় লক্ষ্মীদির ঘুম ভাঙতো, এখন ভাঙে বারোটায়। এখানে বিলিতি সিগারেট চলতো, সেখানে গিয়ে টার্কিশ সিগারেট না হলে চলে না লক্ষ্মীদির। এখানে ইংলিশ মদ, সেখানে স্কচ্। এখানে সিল্ক, সেখানে নাইলন্। এখানে ছিল দিশী কণ্ট্রাক্‌টার, সেখানে বিলিতি। যুদ্ধের আবির্ভাবে দিল্লি তখন আমেরিকা হয়ে উঠেছে। আমেরিকান সোলজার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানকার মত। সমস্ত ইণ্ডিয়া যেন আমেরিকার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। সেই লক্ষ্মীদি লিখেছে—টাকাটা পেয়ে বড় খুশী হলুম ভাই। আমাকে শিগ্‌গিরই একবার কোলকাতায় যেতে হবে, গেলে যাবার আগে টেলিগ্রাম করবো। সুধাংশু ভাল আছে।

এমনি সব বাজে কথাতে ভর্তি।

কিন্তু সেদিন গড়িয়াহাটের বাড়িতে একটা ব্যতিক্রম হলো। দুপুরবেলা রঘু এসে দরজায় টোকা দিলে।

—দিদিমণি, দিদিমণি।

সতী উঠে দরজা খুলে দিয়েছে। বললে—কী হলো?

—আপনাকে একজন ডাকছে।

—আমাকে? কে? মিস্টার ঘোষাল? কোত্থেকে এসেছে?

রঘু বললে—হাইকোর্ট থেকে।

—হাইকোর্ট থেকে কে আবার ডাকবে আমাকে? সতী যেন বিব্রত হয়ে পড়লো। প্রতিদিনের অলস একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ যেন একটু ব্যতিক্রম হলো। এ-বাড়িতে আসার পর মন্থর হয়ে এসেছিল সতীর জীবন। কোথাও কোনও উৎসাহ ছিল না, রুটিন-বাঁধা গতিতে গড়িয়ে চলতো দিন আর রাতগুলো। দীপঙ্কর আসতো আর যেতো, আবার পরের দিন তারই পুনরাবৃত্তি হতো একইভাবে।

সতী বললে—বল্ দেখা হবে না—

—কিন্তু আমি যে তাকে বসিয়ে রেখেছি দিদিমণি। বলছেন খুব জরুরী কাজ—

—তা কেন তুই বসতে বললি! আমি কি কারোর সঙ্গে দেখা করি আর?

তারপর তাড়াতাড়ি কাপড়টা গায়ের ওপর গুছিয়ে নিয়ে সোজা বাইরের ঘরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অচেনা লোক। আগে কখনও দেখেছে বলেও মনে পড়লো না। কিছু বলবার আগে ভদ্রলোক নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আমি এসেছি এটর্নী মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছ থেকে—

সতী তবু বুঝতে পারলে না। বললে—আপনি আমাকে চান?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি মিস্টার ঘোষালের কেসের ব্যাপারটা জানেন তো? ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্ট থেকে এখন তো সেসন্‌সে গেছে—আপনি তো সমন পেয়েছিলেন! আজকে সেই সেসন্‌সের হিয়ারিং আছে—আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সতীর যেন এতক্ষণে মনে পড়লো। অনেকদিন আগে কে যেন একজন কোর্টের লোক এসে কী একখানা কাগজ দিয়ে গিয়েছিল। সতী সই করে নিয়েও ছিল সেখানা। কিন্তু সে যে আজকে তা তার মনে ছিল না।

বললে—এখন?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি একেবারে। আপনি যদি দয়া করে একটু আসেন আমার সঙ্গে—

—কোথায় যেতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন—হাইকোর্টে।

হাইকোর্ট! সতী যেন চমকে উঠলো! অনেক অসাধ্য-সাধনের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছে সতী। প্যালেস-কোর্টের নির্জন ফ্ল্যাটের মধ্যে সমস্ত রাত জেগে কাটিয়েছে। রেলওয়ে-অফিসের পুরুষ-বেষ্টিত পরিবেশে দিনের-পর-দিন চাকরিও করেছে। কিন্তু হাইকোর্টের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা তো তার কখনও হয়নি। হাইকোর্টে জীবনে যে কখনও যায়নি সতী!

ভদ্রলোক বললেন—মিস্টার ঘোষাল স্পেশ্যালি আপনার স্টেটমেন্টের ওপর নির্ভর করে আছেন—। মিস্টার গাঙ্গুলী তাই আমাকে আপনার কাছে

পাঠিয়েছেন, আমি আগেই আসতাম, কিন্তু লেভেল ক্রসিং-এর কাছে ট্যাক্সিটা অনেকক্ষণ ডিটেনড্ হয়ে গেল—

—কিন্তু আমি কী স্টেট্‌মেণ্ট্ দেব সেখানে?

—আপনাকে মিস্টার ঘোষাল কিছু বলেন নি?

সতী বললে—বলেছিলেন, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা, আমি সে-সব ভুলে গিয়েছি—। তিনি কোথায় এখন?

ভদ্রলোক বললেন—তিনি তো য়্যারেস্টেড্, আপনি জানেন না? মিস্ মাইকেলের মার্ডার চার্জে তাঁকে হঠাৎ য়্যারেস্ট করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্ট থেকে একবার সব হিয়ারিং হয়ে গেছে, সেখান থেকে সেসন্‌স-এ পাঠিয়েছে। তিনি খালাস থাকলে নিজেই আসতেন। আপনার কিছু ভয় নেই। বার-এট্-ল মিস্টার দত্ত আছেন আমাদের ডিফেন্সে।

—কিন্তু আমি মিস্ মাইকেলের ব্যাপারে কীই বা জানি যে বলবো?

—আপনি কিছুই জানেন না?

সতী বললে—আমি রেলওয়েতে যে-পোস্টে ঢুকেছিলাম, শুনেছিলাম মিস্ মাইকেল আমার আগে ছিল সেই পোস্টে। তার বেশি তো আমি কিছুই জানি না। শুনেছিলাম আমেরিকা যাবার আগের দিন তার ফ্ল্যাটে সে খুন হয়ে যায়, তখন তার কাছে সেদিন প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের অনেক টাকা ছিল—

—সেটা কী তারিখ ছিল আপনার মনে আছে তো?

সতী বললে—তা তো মনে নেই—!

—কিন্তু সেই দিন আপনি মিস্টার ঘোষালকে একটা চিঠি লিখেছিলেন তা তো মনে আছে? রাত্রে আপনি আপনার বাড়িতে থাকবার জন্যে মিস্টার ঘোষালকে আসতে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, তা তো মনে আছে?

সতী অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু সে চিঠি তো মিস্টার ঘোষাল আমাকে দিয়ে এই সেদিন জোর করে লিখিয়ে নিয়েছিলেন—। বলেছিলেন, পরে তারিখটা বসিয়ে নেবেন। তার কন্‌ভিক্‌শন হবার ভয় ছিল, তাই আমি ও-রকম চিঠি লিখেছিলাম—

ভদ্রলোক বললেন—সত্যিই কন্‌ভিক্‌শন হয়ে যাবে মিস্টার ঘোষালের। শেষ পর্যন্ত গড-ফরবিড, ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে। আপনি শুধু গিয়ে বলবেন যে ও-চিঠিটা আপনারই হাতের লেখা। স্ট্যাণ্ডিং-কাউন্সিল আপনাকে যা-যা প্রশ্ন করবে, আপনি তারই উত্তর দেবেন—তার পরেই আমি নিজে আপনাকে গাড়ি করে বাড়ি পোঁছিয়ে দিয়ে যাবো—। অল্‌রেডি দেরি হয়ে গেছে, আপনি চলুন।

সতী নিজের মনেই কী যেন ভাবতে লাগলো। একলা সে, কারোর সঙ্গেই পরামর্শ করার সময় নেই।

বললে—আজকেই যেতে হবে?

—হ্যাঁ, আর সময় নেই, এখন সাড়ে এগারোটা বেজেছে, যেতে যেতে বারোটা বেজে যাবে—তার আগে পৌঁছলেই ভাল হয়—

সতী বললে—তাহলে আমি আমার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে যাবো—

—তা চলুন, একটু শিগ্‌গির-শিগ্‌গির করুন—

সতীর মনে আছে প্রথমটায় একটু ভয় ভয় করেছিল। কিন্তু একজনের জীবন। একজনের জীবনের চেয়েও কি বড় সতীর মর্যাদা! আর মর্যাদাই বা তার কোথায়? সব মর্যাদাই তো ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তার চিরজীবনের মত। চিরকালের মত তার জীবনের সব গৌরব ধুলোয় পড়ে চুরমার হয়ে গেছে। আর কীই বা বাকি আছে শেষ পর্যন্ত। মেয়েমানুষের জীবনে যা কিছু সে চেয়েছিল সবই তো নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। তার মত এমন করে কে অপমানিত হয়েছে? কে সর্বস্ব খুইয়ে এমন করে এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছে?

টেম্পল্ চেম্বার্সের মিস্টার গাঙ্গুলীর আপিসে আসতেই মিস্টার গাঙ্গুলী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। এই লাণ্ড-আওয়ার্সের পরেই হিয়ারিং হবার কথা আছে। আপনি বসুন, এই ঘরটার মধ্যে ততক্ষণ বসুন, যখন আপনার ডাক পড়বে তখনই আমি আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো—আপনাকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক আনিয়ে দিই—

সতী বললে—না—

—তাহলে চা?

সতী তাতেও বললে—না—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আপনার খুব কষ্ট হবে জানি। কষ্ট হবে বলেই এখানে নিরিবিলিতে বসিয়ে রাখলাম। ওই যে জানলা দিয়ে বিরাট বাড়িটা দেখছেন, ওইটেই হলো হাইকোর্ট। অন্য উইট্‌নেসরা সবাই ওখানে ওয়েট করছে, আপনি রেসপেক্টেবল্ লেডী, আপনাকে তাই এখানে বসিয়ে রাখলুম—

মিস্টার গাঙ্গুলী পাখাটা জোরে ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন—আসলে আপনার এভিডেন্সের ওপরেই মিস্টার ঘোষালের কেস্‌টা ডিপেণ্ড করছে। আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা—তাহলে আপনি বসুন, আমি ওদিকটা দেখে আসি—

বলে মিস্টার গাঙ্গুলী বেরিয়ে গেলেন। আর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের নয়নরঞ্জিনী দাসীর একমাত্র পুত্রবধূ সেই কাঠের পার্টিশান্ ঘেরা অন্ধকার ঘরের ময়লা কালি-পড়া টেবিল-চেয়ারের মধ্যে নিজের সঙ্গে মিস্টার ঘোষালের ভাগ্য জড়িয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

নয়নরঞ্জিনী দাসীর তখনও গা-ধোয়া হয়নি। তখনও কাপড়-কাচা হয়নি। সবে সন্ধ্যে দেখিয়ে গেছে ভূতির-মা। শম্ভু দৌড়ুতে দৌড়ুতে এল ঘরের সামনে। বললে—মা-মণি, কোর্ট থেকে লোক এসেছে—ডাকছে আপনাকে—

চমকে উঠলেন নয়নরঞ্জিনী। বললেন—কোর্ট থেকে লোক এসেছে কী রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোর্টের পেয়াদা, নোটিশ নিয়ে এসেছে—

—নোটিশ? কীসের নোটিশ? কী শুনতে কী শুনেছিস কে জানে? কোথায় সে?

মা-মণি আর দাঁড়াতে পারলেন না। মোটা শরীরটা নিয়ে বাইরে এলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলেন। শম্ভুও তাড়াতাড়ি সামনে-সামনে নামছিল। একেবারে সদরে এসে দেখা গেল কোর্টের পেয়াদাকে।

—হ্যাঁগা, তুমি কোত্থেকে আসছো বাছা?

—আজ্ঞে কোর্ট থেকে। এই নোটিশ আছে নয়নরঞ্জিনী দাসীর নামে। সই করে নিতে হবে।

নয়নরঞ্জিনী দাসী যেন তখনও বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। বললেন—কীসের নোটিশ শুনি? আমি ইংরিজী জানি নে—কীসে সই করতে শেষে কীসে সই করে দেব, সই করে আগে অনেক ঠকেছি বাছা, এখন আর সহজে সই করিনে—তুমি খুলে বলো কীসের নোটিশ এনেছো?

—নীলেমের নোটিশ।

—কীসের নীলেম?

পেয়াদাটা ঘুঘু লোক। জীবনে এমন অনেক নোটিশ অনেক বাড়িতে দিয়ে এসেছে। অনেক ভিটেতে অনেক ঘুঘু চরিয়েছে। বললে—আজ্ঞে, আপনাদের এই বাড়ি কোর্টে নীলেম হবে, তাই নোটিশ—

নয়নরঞ্জিনী দাসী রেগে গেলেন। বললেন—কেন নীলেম হবে শুনি? আমি কার খেয়েছি না পরেছি, কার কাছে কী দেনা করেছি যে, আমার শ্বশুরের ভিটে নীলেম করে নেবে তোমরা?

পেয়াদাটার এসব কথা শোনা অভ্যেস আছে। এ-সব ক্ষেত্রে দু'দশ টাকা পেয়েও থাকে তারা। তাই মিহি সুরে বললে—আজ্ঞে, আমাকে কেন খামোকা দুষছেন, আমি কোর্টের পেয়াদা, নোটিশ আপনি না নিতে চান তো আপনার সদর-দরজায় লটকে দিয়ে যাবো নোটিশখানা—

নয়নরঞ্জিনী দাসী এবার যেন একটু ধাতস্থ হলেন। বললেন—তুমি চটছো কেন বাছা, আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি, আমি মেয়েমানুষ, ইংরিজী জানি না, তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি—। তা কীসের নোটিশ বাবা? নীলেম হবে কেন? আমি কার কী সর্বনাশ করেছি? আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে তোমরা সবাই মিলে আমায় এমন হেনস্থা করছো?

মুহূর্তের মধ্যে নয়নরঞ্জিনী দাসীর মুখখানা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি ইংরিজী জানেন না। কাগজখানা নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলেন। কিন্তু শম্ভু দেখলে মা-মণির চোখ যেন খুঁজেই বেড়াচ্ছে শুধু, খুঁজে পাচ্ছে না কিছুই। যে-মানুষ সমস্ত বাড়ির মালিক যার অহঙ্কারের শেষ নেই, যে-মানুষ

জন্ম থেকে কর্তৃত্ব করবার অধিকার অর্জন করেছে, আজ তার সেই অহংকারে যেন হঠাৎ চরম আঘাত লেগেছে এই ঘটনায়।

মা-মণি হঠাৎ বললেন—এটা নিয়ে আমি কী করবো বাবা?

পেয়াদাটা বললে—আপনি কাগজটা রেখে দিন—

মা-মণি আবার বললেন—রেখে দিলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে?

পেয়াদাটা বললে—নিজের কাছে রেখে দেবেন কেন, আপনার উকিলবাবুকে দেখাবেন, তিনি যা বলবেন তাই করবেন—

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যেবেলাই যেন নয়নরঞ্জিনী দাসীর চোখে অনন্ত রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। ভেতর বাড়িতে ভূতির-মা রোজকার মত শাঁখ বাজাচ্ছিল। সেই শাঁখের শব্দটা যেন আর শাঁখের শব্দ রইল না তখন। যেন মা-মণির অন্তরের আর্তনাদ হয়ে আকাশে বাতাসে সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার ফিরে এল তাঁর অন্তরের মধ্যে। সেখানে তিনি বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসহায়। সেখানে তাঁর কেউ নেই, সেখানে তিনি বড়ই একলা।

পেয়াদাটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বলতে পারবে বাছা কত টাকার দায় আমার?

পেয়াদাটা বুঝতে পারলে না। বললে—আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন মা!

মা-মণি বললেন—দেখ বাবা, তোমায় বুঝিয়ে বলি তবে, এ তো আমারই বাড়ি, আমার ব্যারিস্টার ছিল একজন, সে-ই বদমায়িসি করে এ-বাড়ি বাঁধা রেখেছে, তাকে আমি মরতে ওকালত-নামা দিয়েছিলুম, তা কত টাকা দিলে আবার এ-বাড়ির ছাড় পাবো?

পেয়াদাটা বললে—তা তো আমি বলতে পারবো না মা, তবে পেস্কারবাবুর কাছে শুনিছি, লাখ টাকার নীলেম—

—লাখ টাকা?

টাকার অঙ্কটা শুনে মা-মণি যেন আঁতকে উঠলেন। খানিকক্ষণের জন্যে তাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথাও বেরোল না আর। পেয়াদাটা তখন নিঃশব্দে চলে গেছে। এমন কত লোকের বাড়িতে কত নোটিশ দিয়ে এসেছে সে, কত চোখের জলের, কত হাহাকারের, কত সর্বনাশের সে সাক্ষী হয়েছে জীবনে, তার হিসেব নেই। এখন এ-সব দেখে তার ভাবান্তরও হয় না আর। রাস্তায় বেরিয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালে পেয়াদাটা, এসব ভাবতে গেলে কোর্টের পেয়াদাগিরি তাকে কবে ছেড়ে দিতে হতো। যত চোর-ছ্যাঁচোড় আর জোচ্চোরের জায়গা হয়েছে কাছারি কোর্ট। পেয়াদাটা আবার বিড়ি ধরালে একটা। পেস্কার-বাবুদেরই কপাল ভালো। হুকুম জারি করেই খালাস। লাভের গুড় সবটাই তারা খাবে, আর যত শাপ-মন্যি কুড়োবে পেয়াদা। বিড়িতে আবার একটা সুখটান দিয়ে পেয়াদাটা ট্রাম রাস্তার দিকে এগোল।

নয়নরঞ্জিনী দাসী তখন ন'দিদির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন।

ন'দিদি ওধার থেকে বলছে—তা কবে নীলেম হবে?

মা-মণি বললেন—তা কি আমিই জানি ছাই, কাগজখানায় সব তো ইংরিজী লেখা—! আমি তো সেজন্যে তোমাকে ডাকিনি ন'দিদি, সে তো আমি এখুনি উকীলের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আমি বলছিলুম অন্য কথা, লাখ খানেক টাকা আমাকে দিতে পারো তুমি? তোমার তো অনেক রয়েছে, আমি আস্তে আস্তে শোধ করে দিতাম, আর সুদও দিতাম আস্তে আস্তে—

ন'দিদি বললে—আগে উকীলের কাছে যা না, দেখ না কী বলে তোর উকীল।

মা-মণি বললেন—উকীল যা বলবে তা তো আমার জানা আছে ন'দিদি, উকীল তো কেবল টাকা চাইবে, একবার কোর্ট-কাছারির হাতের মুঠোয় গেলে কি আর আমায় রেহাই দেবে ভেবেছ? তারা তো টাকা শুষে নেবে বলে বসেই আছে। তা তুমি আমায় দরকার হলে টাকাটা দিতে পারবে কি না বলো না ন'দিদি! আমার এই বিপদের দিনে তুমি ছাড়া আর কে আছে বলো তো? দেবে টাকাটা? দিতে পারবে?

ন'দিদি বললে—আমি কী করে দিই বল তো? তাহলে তো আমাকেও বাড়ি বেচতে হয়, কিম্বা বাঁধা রাখতে হয়—

—তা তাই রাখো না ন'দিদি, তুমি যদি না দেখ তো কে দেখবে আমাকে বলো? আমার আর কে আছে?

ন'দিদি বিরক্ত হলো। বললে—কিন্তু তুই বুঝছিস না নয়ন, টাকা তো আমার একলার নয় রে/ ছেলেরা এখন বড় হয়েছে, কর্তা বেঁচে রয়েছেন, তারা কী বলবে?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আমি কথা দিচ্ছি ন'দিদি, আমি যেমন করে পারি শোধ করে দেব তোমাকে, নেহাৎ বাসন-কোসন বেচেও শোধ করবো, আমাকে তুমি বিপদ থেকে বাঁচাও—

নয়নরঞ্জিনীর গলার শব্দটা যেন কান্নার মতন করুণ শোনালো।

—কী বলো ন'দিদি, আমি যাবো তোমার কাছে? জামাইবাবুর কাছে গিয়ে সব ব্যাপারটা বলবো?

ন'দিদি কিছুতেই রাজী হয় না।

বললে—তুই তো জানিস নয়ন আমার অবস্থা, কর্তার এই শরীর, তার ওপর বউ সবে আঁতুড় থেকে উঠেছে, আমি বলে কোন্ দিক ছেড়ে যে কোন্‌দিক সামলাই তাই-ই ঠিক করতে পারছি না—। আমার নিজের হাতে যদি টাকা থাকতো তো দিতাম না ভাবছিস তুই? তুই কি আমার পর রে?

—তাহলে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক দিতে পারবে?

—ওরে, যে পঞ্চাশ হাজার দিতে পারে, সে লাখ টাকাও দিতে পারে, দিতে

পারলে তো আমি নিজেও বাঁচতুম, তোর বিপদের দিনে আমি দিতে পারছিনে, এতে আমি কষ্ট পাচ্ছি না ভাবছিস?

—তুমি আমায় কম করেও পঞ্চাশ হাজার দাও নাদিদি, আমার মানটা বাঁচাও, বাকিটা আমি যেমন করে পারি যেখান থেকে পারি, কাবলিওলার কাছ থেকে ধার করেও জোগাড় করে নেব—

নাদিদি বললে—তা তোর বউ তো শুনছি বাপের অনেক টাকা পেয়েছে, তাকে বল না—

—না নাদিদি, তুমি বলছো কী? আমি সেই হারামজাদীর কাছে হাত পাতবো? আচ্ছা, পঞ্চাশ হাজার না-হয় পঁচিশ হাজারই দাও, তাতেও আমি কাজ চালিয়ে নেবখন—

—তা তোর বউ-এর কাছে চাইতে লজ্জা কী? নিজের ছেলের বউ, তার কাছে চেয়েই দেখ না তুই একবার। কত পেয়েছে সে? তিন লাখ না চার লাখ?

—তার কথা ছাড়ো নাদিদি, তুমি এ বিপদে আমাকে বাঁচাও, তোমার দুটি পায়ে ধরছি নাদিদি, আমার মান-ইজ্জৎ সব গেল। বাড়ি যদি নীলেম হয়ে যায় তো আমি কোথায় থাকবো বলো দিদিদি?

নাদিদি যেন বিরক্ত হলো। বললে—আঃ, তোর সঙ্গে আর কথা বলতে পারিনে বাপু, আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, তুই এখন উকীলের বাড়ি যা দিকিনি, গিয়ে দেখ না, কী বলে তোর উকীল?

বলে টেলিফোন ছেড়েই দিলেন নাদিদি। নয়নরঞ্জিনী অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। জীবনে কাউকে এমন করে অনুরোধ-উপরোধ করেননি নয়নরঞ্জিনী! কেঁদে ফেলবার অবস্থা হলো নয়নরঞ্জিনীর। শেষকালে টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে একবার ভাবলেন ছেলের কাছে যাবেন। কিন্তু সেখানেও যেন বাধলো। এই-ই হলো সংসার। এই সংসারের মায়াতেই তিনি এতদিন নাজেহাল হয়েছেন, এখনও নাজেহাল হচ্ছেন। কার জন্যে তিনি এত ভাবছেন! কে ভোগ করবে তাঁর এই বাড়ি। তিনি মারা গেলে হয়ত ওই হারামজাদী বউই এসে আবার এখানে জুড়ে বসবে। তিনি এতদিন ধরে এত কষ্ট করে ঘর-বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে যাচ্ছেন, আর শেষকালে সেই বউই এসে হয়ত ভোগ করবে সব! কীসের মায়া, কীসের সংসার! চোখ বুজলেই তো সব অন্ধকার। তারপর? তারপর সাত ভূতে এসে লুটে পুটে খাবে! এই যে নাদিদি, এত টাকার মালিক। এতগুলো বাড়ি। পারতো না দিতে লাখ খানেক টাকা।

শম্ভুকে আবার ডাকলেন। কাপড়খানা ততক্ষণে বদলে নিয়েছেন। সব যেন নয়-ছয় হয়ে গেল! কী ছিল আর কী ছিরি হলো বাড়ির। তা ভাঙা হোক চোরা হোক, এই বাড়িতে এতদিন আছেন, ওমনি এক-কথায় বাড়ি ছাড়তে হবে! দেশে আইন বলে কিছু নেই গো? দেশে একজন মানুষ নেই গা যে একটু দেখবে। এই যে ভালোমানুষের বিধবা বউএর এই হেনস্থা, এ কেউ দেখবার নেই দেশে?

চাবির গোছাটা আঁচলে বাঁধলেন। তারপর শম্ভুকে দেখে বললেন—একটা গাড়ি ডাক, আমার সঙ্গে তোকে উকীল-বাড়ি যেতে হবে—

শম্ভু বললে—এখুনি?

নয়নরঞ্জিনী খেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন—তা এখুনি নয়তো কি চব্বিশ ঘণ্টা পরে?

শম্ভু তাড়াতাড়ি গাড়ি আনতে ছুটলো। নয়নরঞ্জিনী বললেন—তোরাই সুখে আছিস বাছা, তোদের সম্পত্তি নেই, টাকাকড়ি নেই, তোরাই সবচেয়ে সুখী। পরের পয়সায় খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, আর আরাম করে ঘুমোচ্ছিস—

কিন্তু ফিরে দেখলেন যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা সে তখন নেই। সত্যিই, ওরাই সুখে আছে। কোত্থেকে খাওয়া-পরা আসছে, কে দিচ্ছে, তা দেখবার জানবার বালাই নেই। সন্ধ্যেবেলায় মিনিট-কয়েকের জন্যে নয়নরঞ্জিনী দাসীর মনে হলো সম্পত্তি না থাকাই বুঝি সুখের। এই সম্পত্তিই তো যত গোল বাধালে! এই সম্পত্তির জন্যেই তো এই সংসারের মায়ায় আটকে থাকা। নইলে তাঁর তো চিরকাল ইচ্ছে ছিল ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি কাশীবাসী হবেন।

শম্ভুর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বউবাজারে গেলেন।

উকীলবাবুর কাছে গিয়ে বললেন—আজ দশ বছর ধরে মামলা চলছে, আর আমি জানলুম না, এ কী-রকম কথা উকীলবাবু?

উকীলবাবু বললেন—তা কি আমিই জানতুম?

—তা আমার বাড়ি বিক্রি করলুম আর আমি জানতে পারলুম না?

উকীলবাবু বললেন—আপনি বসুন মা, এ আইনের ব্যাপার, অত হাঁক-পাঁক করলে তো কাজ হবে না। আমি আজ সব খোঁজ নিয়েছি। কোর্টের নথিপত্র দেখলাম—নয়নরঞ্জিনী দাসীর কেস চলছে রামমনোহর দেশাই-এর সঙ্গে আজ দশ বছর।

নয়নরঞ্জিনী দাসী চমকে উঠলেন। বললেন—বলেন কী? আমি জানতেও পারলুম না, আর আমার সঙ্গে মামলা হচ্ছে? ও রামমনোহর দেশাই বেটা কে?

উকীলবাবু বুঝিয়ে দিলেন। বললেন—ও একজন গুজরাটি ব্যবসাদার, ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার খুলেছে এখন। সে-ই এই মামলার বাদী। আপনি নিজেই তো উনিশ শো তেত্রিশ সালে চৌত্রিশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন ওর কাছে আপনার বাড়ি বন্ধক রেখে—

—সে কী? আমি কবে কার কাছ থেকে চৌত্রিশ হাজার টাকা ধার করলাম?

—ওই রামমনোহর দেশাইএর কাছ থেকে। তার দলিল রয়েছে, সাক্ষী-সাবুদ রয়েছে, আপনি নিজে কোর্টে গিয়ে হাজির হয়ে তার কথায় রাজী হয়ে এসেছিলেন, তারও নথি রয়েছে, যত বছর যাচ্ছে তত বছরের সুদ ধরে এখন এক

লাখ টাকার ডিক্রী পেয়েছে সে, সুদে আসলে হিসেব করে কম-বেশি এক লাখ টাকাই তো দাঁড়ায়—আপনি তো মা নিজের মুখে টাকাটা শোধ করে দেবেন বলে এসেছিলেন জজ সাহেবের সামনে?

—ওমা, কী সব্বনেশে কথা! আমি আবার কবে কোর্টে গেলুম?

উকীলবাবু হাসলেন। বললেন—ও-সব কথা বললে তো জজসাহেব শুনবে না, ওদের নথিপত্র সাক্ষী-সাবুদ সব যে মজুদ, আপনার নিজের হাতের সই রয়েছে যে তাতে? আপনি যে নিজের হাতে দলিলে দস্তখত করে দিয়েছেন? এখন তো আপনার কথা কেউ শুনবে না—

নয়নরঞ্জিনী দাসীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন—এই ভগবানের নাম করে আমি বলতে পারি, তামা-তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে আমি বলতে পারি উকীলবাবু, আমি জীবনে কখনও কোর্ট-কাছারির মুখ দেখিনি, জজসাহেব তো দূরের কথা—

উকীলবাবু আরো হাসলেন। বললেন—তা যে-পাল্লায় আপনি পড়েছিলেন, তার পক্ষে আর একজন ডুপ্লিকেট নয়নরঞ্জিনী দাসী কোর্টে খাড়া করে দেওয়া কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, টাকা দিলে অমন অনেক নয়নরঞ্জিনী দাসী কলকাতা শহরে পাওয়া যায়। তারা গিয়ে আপনার নাম নিয়ে বেমালুম সব কবুল করে আসবে, জজসাহেবের ধরবার কোনও ক্ষমতা নেই—কোর্টে আমাদের এ-রকম হরদম হচ্ছে—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তা বলে এই রকম দিনকে রাত করা হবে? আমার যে হৃৎকম্প হচ্ছে শুনে উকীলবাবু। তাহলে অনাথা বিধবাকে দেখবার কেউ নেই সংসারে?

উকীলবাবু বললেন—আপনি বড় মুষড়ে পড়েছেন মা, অত ভাবছেন কেন? তাহলে আমরা আছি কী করতে? আমরা তো এই জন্যেই আছি! আইন যেমন দিনকে রাত করতে পারে তেমনি রাতকেও যে দিন করতে পারে, আইন যে দু'মুখো ছোরা—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না উকীলবাবু, গরীবদের মারবার জন্যেই দেখছি আইন তৈরি হয়েছে—

উকীলবাবু এবার আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—আপনি যদি গরীব হন, তো আমরা আপনার কাছে কী বলুন তো মা? আর এই রকম ঠগ-জোচ্চোর যদি দুনিয়ায় না থাকে তো আমাদের চলে কী করে বলুন তো? আমরা পেট চালাই কী করে? আমাদের কথাটাও একবার ভাবুন—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আমার ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, আপনাদের কথা আমায় ভাবতে বলছেন? আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে উকীলবাবু? আমার যে সব গেছে। আমার শ্বশুর গেছেন, স্বামী গেছেন, ছেলে গেছে, ছেলের বউ গেছে, আমার বাড়িটা ছিল মাথা-গোঁজার তাও যেতে বসেছে এখন আমি কী করি—

—কিন্তু কেঁদে তো কিছু লাভ নেই, একটা কিছু করতেই হবে—

—কী করতে হবে বলুন, এখন এই নীলেমের নোটিশ এসেছে, এখন কীসের পিন্ডী চটকাবেন চটকান!

উকীলবাবুর এসব সহ্য করা অভ্যেস আছে। বললেন—নোটিশ না হয় আমি নিলাম, নীলেমের দিন ফেলবার জন্যেও না হয় আমি দরখাস্ত করে দেব খন, এখুনি না-হয় দু'দিন পরে টাকাটা দিলেও চলবে। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব আপনাকে—তা করে দিলেই তো হলো?

—কিন্তু টাকা আমি দেব কোত্থেকে?

উকীলবাবু বললেন—সে যেখান থেকে হোক আপনাকে দিতেই হবে। সাক্ষী-সাবুদ, নথিপত্র, সব যে আপনার বিপক্ষে, আপনি যে নিজেই গোড়া থেকে ভুল করে এসেছেন, এখন খেসারত দিতে হবে না? জানেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন—সংসারে বাস করবি আর ট্যাক্সো দিবি না? একে আপনার সেই ট্যাক্সোই ধরে নিন না—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কিন্তু ট্যাক্সো যে আমি দেব, তার জন্যে সংসার আমাকে কী দিয়েছে? আমাকে কী দিয়েছে বলুন তো? সংসার আমাকে কোন্ সুখটা দিয়েছে বলতে পারেন? আমি সংসারের কাছ থেকে কোন্ সুখটা পেয়েছি? বিয়ে হবার পরেই বিধবা হলুম, ছেলে হলো, ছেলেকে ছোটবেলা থেকে বুকে আগলে মানুষ করলুম, সেই ছেলে বড় হয়ে মায়ের দুঃখ দেখলে না। তারপর ছেলের বিয়ে দিলুম, সেই বউও পর হয়ে গেল। বিষয়-সম্পত্তি দেখবার জন্যে বিশ্বাসী ব্যারিস্টার ছিল সেও শেষকালে আমাকে পথে বসালে—এত ট্যাক্সো আমি বিধবা মানুষ হয়ে দিই কী করে? কোত্থেকে দিই?

এত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা শোনবার সময় উকীল মানুষদের থাকে না। থাকবার কথাও নয়। বউবাজারের পাকা-প্রবীণ উকীল বিভূতিভূষণ বসুর অনেক মক্কেল। সব মক্কেলদের সব সুখ-দুঃখের কথা শুনতে গেলে বাহাত্তর ঘন্টায় দিন হতে হয়। সকাল থেকে লাইন দিয়ে মক্কেলরা তাঁর বৈঠকখানায় বসে থাকে। তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত তাঁর দরজায় মক্কেলরা ভিড় করে থাকে। এরকম ব্যস্ত উকীল হয়েও যে এতখানি কথা শুনেছেন, এটাই যথেষ্ট। সব শুনে বললেন—ঠিক আছে, আমি না-হয় দরখাস্ত পেশ করছি কালকেই, আরো তিন মাস ঠেকিয়ে রাখবো নীলেমটা, সেই তিন মাসের মধ্যে টাকাটা জোগাড় করতে পারবেন না?

—টাকা কোত্থেকে পাবো আমি? আমার কি টাকার গাছ আছে?

—কিন্তু সে বললে তো কোর্ট শুনবে না। টাকা আপনাকে দিতেই হবে। নইলে ও-বাড়ি নীলেম হয়ে যাবে। আপনাকে বাড়ি ছাড়তে হবে—এই যে এত

মক্কেল আমার বসে আছে দেখছেন, সকলেরই আপনার মতন সমস্যা, কারোর দেনা, কারোর পাওনা, কারোর বাড়ি, কারো জমিদারী। আপনি আজ রাত্রে ভালো করে ঘুমোনগে যান, আমি আছি, আপনার কোনও ভাবনা নেই—শুধু টাকাটা যাতে শিগ্‌গির জোগাড় হয় তার ব্যবস্থা করুন গিয়ে—

—হ্যাঁ, একটা কথা!

নয়নরঞ্জিনী উঠছিলেন, শম্ভুও তৈরি হয়ে ছিল। একটা ট্যাক্সি ডেকে আবার চলে আসছিলেন।

উকীলবাবুর যেন শেষ মুহূর্তে কথাটা মনে পড়লো। বললে—হ্যাঁ, আর একটা কথা, শ'খানেক টাকা যে দিতে হবে—

—শ'খানেক? কেন?

উকীলবাবু বললেন—মামলা হচ্ছে লাখ টাকার, তার নীলেম ঠেকাতে গেলে ওমনি তো হবে না। পেশকার আছে, নাজির আছে, পেয়াদা আছে, হাকিম-হুকুম, সবাই যে ওৎ পেতে আছে, শ্মশানে মড়া এলে শকুনিরা যেমন ওৎ পেতে থাকে, এও যে তাই—পান খেতে দিতে হবে না?

—তা বলে শ'খানেক টাকার পান?

—আহা, পান বলছি বলে কি সত্যি-সত্যি পানই খাবে? ওদের এটা পাওনা না দিলে আপনারই ক্ষতি—না দেন না দেবেন, কেউ তো আর আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়ে চাইছে না। এটা যতবার দিন পড়বে ততবার দিয়ে যেতে হবে—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তা দেব, কপালে গেরো থাকলে দিতেই হবে। আমার এই চাকরকে দিয়ে কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব—

—বাড়িতে না পাঠালেও চলবে, কাল কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বাড়িতে টাকা নিয়ে কী করবো? আমি তো নিজে পেটে পুরবো না—

বলে হো হো করে অমায়িক হাসি হাসলেন আবার।

গাড়িতে আসতে আসতে শম্ভু সারা রাস্তাটা মা-মণির পাশে বসে মা-মণির চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। আগে এতদিন এত কাণ্ড হয়েছে বাড়িতে, এত বকা-ঝকা হয়েছে বৌদিমণিকে নিয়ে কিন্তু মুখের চেহারা কখনও এমন হয়নি। সমস্ত বাড়িটা নীলেম হয়ে যাবে, তাহলে যাবে কোথায় সবাই। আর তো বাড়ি নেই মা-মণির। মা-মণি যেন পাথর হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে।

রাস্তায় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। সমস্ত গাড়িগুলো ছুটেছে সামনের আলোর ওপর ঠুলি এঁটে, সমস্ত কলকাতাটা যেন মা-মণির মেজাজের মত থম্‌থম্‌ করছে। মা-মণিকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। জাপানীদের কাছেও যেন সমস্ত কলকাতাটা ছেড়ে দিতে হবে বাঙালীদের।

এসব দিনগুলোর কথা দীপঙ্করের মনে আছে। নয়নরঞ্জিনী দাসী যখন

বাড়িটাকে বাঁচাবার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছেন, একবার উকীল আর একবার ঘর করছেন, যখন দু'হাতে উকীলেরা পয়সা দুয়ে নিচ্ছে, কোনও দিকেই কোনও আশার রেখা খুঁজে পাচ্ছেন না, দীপঙ্করও সেই সময়ে একবার আপিসে, একবার গড়িয়াহাটায় গিয়ে সতীর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছে। বাড়িতেও শান্তি নেই, বাইরেও তাই। সেই সব দিনগুলোতে অন্ধকার বিছানার ওপর শুয়ে চোখ বুজলেই কেবল কিরণের কথাটা মনে পড়তো। কিরণ যেন বলতো—আমার কথা ভাবিসনি তুই দীপু, এখন কোনও বাজে কথা ভাববার সময় নেই, এখন দোরে আগুন লেগে গেছে, তুই নিজের কথা ভাব, এখনও কেবল চুপ করে দেখবি—? গান্ধীজীর কথাও মনে পড়তো দীপঙ্করের।

"I have not asked the British to hand over India to the Congress or to the Hindus. Let them entrust India to God or in modern parlance to anarchy. Then all the parties will fight one another like dogs, or will, when real responsibility faces them come to a reasonable agreement."

সেদিন দীপঙ্কর যথানিয়মে আপিস থেকে সোজা চলে এসেছিল সতীর কাছে। এ আসাটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করের। রঘুও জানতো ঠিক কখন আসবে দাদাবাবু। এসে চুপ করে বসে থাকবে হেলানো-চেয়ারটায়। চা খাবে না, খাবার খাবে না, সিগারেট পান কিছুই চাইবে না। শুধু বসে থাকবে। পৃথিবীর সমস্ত সমস্যা, জীবনের সমস্ত জটিলতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীপঙ্কর এখানে এই গড়িয়াহাটার বাড়িটার নির্জন ঘরটাতে এসে মুক্তি খুঁজবে। মুক্তি খুঁজবে না জটিলতা বাড়াবে তা সেদিন সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু প্রতিদিনই এসে বসতো, প্রতিদিনই সতী তৈরী থাকতো। দীপঙ্কর এলেই সতী এসে বসতো পাশের চেয়ারটায়। তারপর চুপচাপ মুখোমুখি বসে চলতো দু'জনের নির্বাক আলাপ।

একবার দুবার শুধু সতী বলতো—কেন তুমি আর আসো?

কিম্বা বলতো—আজ সকালে বৃষ্টি হয়েছিল—

এই রকম অনাবশ্যক আলাপের মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন একটা গ্রন্থি বেঁধে উঠছিল একেবারে অন্তরের অভ্যন্তরে। লোকচক্ষুর আড়ালে কোন্ এক অদ্ভুত সম্পর্কের ক্ষীণ সূত্র সৃষ্টি হচ্ছিল, তা দু'জনের কেউই জানতে পারেনি। দীপঙ্কর শুধু জানতো সতী নিয়ম মাফিক পাশের খালি চেয়ারটায় এসে বসবে। আর সতীও জানতো দীপঙ্কর আপিস থেকে সোজা এখানে একটা চেয়ারে বসে পা এলিয়ে দেবে।

কিন্তু সেদিন একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিল দীপঙ্কর। অভয়ঙ্কর এসেই খবরটা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—মিস্টার ঘোষালের কেস-এর খবর কিছু রাখো সেন?

—কে মিস্টার ঘোষাল!

কথাটা বলেই নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই অল্পদিনের মধ্যেই ভুলে গেল নাকি দীপঙ্কর। অভয়ঙ্করও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—শুনেছি বোধহয়, মিসেস ঘোষের এভিডেন্সের ওপরেই এখন মিস্টার ঘোষালের ভাগ্য নির্ভর করছে?

—সে কী? কেন?

অভয়ঙ্কর বললে—তুমি জানো না?

দীপঙ্কর বললে—কই পেপারে তো কিছু দেখিনি—? মার্ডার কেসের খবর তো পেপারে বেরোচ্ছে না কিছু?

—সেদিকে মিস্টার ঘোষাল এক্সপার্ট। টাকা দিয়ে প্রেসকে গ্যাগ করে দিয়েছে। কোনও খবরের কাগজেই তার কেস-এর রিপোর্ট বেরোবে না। কিন্তু শুনেছি এবার মিসেস ঘোষকে ডিফেন্স উইটনেস করেছে—

—কোন্ মিসেস ঘোষ?

অভয়ঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষালের এক্স পি-এ, সতী ঘোষ। কেন, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয় না আর?

দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়লো। বললে—আর ইউ সিওর? তুমি ঠিক জানো?

অভয়ঙ্কর বললে—আমি কারেক্ট! হাইকোর্টে আমার এক অ্যাডভোকেট ফ্রেন্ড আছে, সে ডে-টু-ডে অকারেন্স আমাকে বলে যায়, তার কাছেই সব শুনেছি। শুনেছি মিসেস ঘোষের আজকে স্টেটমেন্ট দেবার কথা আছে, মিসেস ঘোষকে সমন করা হয়েছে আজ—

—আজ কখন?

—আজ এই এখন, এখন হিয়ারিং হচ্ছে হয়ত—

বলে ঘড়িটা দেখলে অভয়ঙ্কর। দুটো বেজেছে। দীপঙ্কর তখন অন্য কথা ভাবছে। ঘৃণা নয়, রাগও নয়। মিস্টার ঘোষালের ওপর কোনও রাগ কোনও ঘৃণা নেই দীপঙ্করের। পৃথিবীর কোনও লোকের ওপরেই রাগ নেই তার। কিন্তু যা-কিছু কুৎসিত, যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসুন্দর, তার কাছ থেকেই বরাবর দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে সে। দীপঙ্কর মুক্তি চায়নি, সংগ্রাম র কুশ্রীকে সুশ্রী করতেও চায়নি! তার কেবল মনে হয়েছে সমস্ত কলঙ্ক থেকে । প্রাণপণে দূরে থাকবে! কলঙ্ক থেকে দূরে থাকা কি সহজ কথা নাকি? প্রতি মুহূর্তে আমরা সংগ্রাম করি মিথ্যার সঙ্গে, আত্মরক্ষা করি শত্রু থেকে। আমরা তেল-নুন-মশলার অধীন, আমরা তো তুচ্ছতাকে অস্বীকার করে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। তবু তো মানুষ পরিচ্ছন্ন হতে চায়, নিজের সংসারকে সকাল-বিকেল ঝাঁটা দিয়ে আবর্জনা-মুক্ত করতে চায়। এই এতটুকুই মাত্র করতে বলেছিল সতীকে। এর বেশী কিছু নয়। সেই সামান্য কথাটুকুও সতী রাখলো

না তার! সত্যিই কি সতী আবার মিস্টার ঘোষালের সংশ্রবে গেছে? আবার এত কাণ্ডের পরেও সেখানে গিয়ে সে আত্মবিক্রয় করছে!

—তুমি ঠিক জানো অভয়ঙ্কর? আর ইউ ভেরি সিওর?

দীপঙ্কর উঠলো। বললে—আমি আজ সকাল-সকাল উঠবো অভয়ঙ্কর, আমার একটা কাজ আছে—

—হঠাৎ মনে পড়লো বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—না, আজ ক'মাস ধরে আই য়্যাম ফীলিং ভেরি ব্যাড। আমার আর কিছু ভালো লাগছে না—

—তাহলে ছুটি নাও না, টেক লীভ্—

দীপঙ্কর বললে—ছুটি নিয়েই বা কী করবো। ভাবছি ট্র্যান্সফার নেব, কলকাতা থেকে ট্রান্সফার নিয়ে শিলিগুড়ি কিম্বা ময়মনসিং কোথাও গিয়ে চাকরি করবো, আমার এই টেনশন্ আর ভালো লাগছে না অভয়ঙ্কর, আমি রান-ডাউন হয়ে গেছি, আমি হেরে গেছি, আমি লস্ট অভয়ঙ্কর, লাইফের রেসে আমি আজ লাস্ট হর্স—

হঠাৎ দীপঙ্করের কথা শুনে অভয়ঙ্কর আবার অবাক হয়ে গেল। যত প্রমোশন হয়েছে মিস্টার সেন-এর ততই যেন কেমন মনমরা হয়ে গেছে। আগে যেন একটু নিজের শরীরের দিকে যত্ন নিত, আগে যেন জামা-কাপড়ের দিকেও একটু যত্ন নিত। হয়ত মাদার মারা যাবার পর থেকেই সেন এরকম হয়ে গেছে। আর তো কোনও কারণ নেই। আর কোনও কারণই খুঁজে পেলে না অভয়ঙ্কর।

তাড়াতাড়ি ক্রফোর্ড সাহেবকে বলে দীপঙ্কর সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল।

অভয়ঙ্কররা জানবে কী করে? অভয়ঙ্কররা বুঝবেই বা কী করে? দীপঙ্করই বা কাউকে বোঝাবে কেমন করে? সকালে ঘুম ভাঙবার পর থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় পর্যন্ত মানুষের কেবল তো দেবারই পালা চলে প্রতি মুহূর্তে। চাকরকে দিতে হয়, আত্মীয়-স্বজনকে দিতে হয়, ভাই, বোন, বন্ধু, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলকে কেবল দিয়েই যেতে হয়। এ দেওয়ায় যেন তৃপ্তি পায় না দীপঙ্কর। এমন কে আছে সংসারে, কিম্বা এমন কে আছে এই সংসারের বাইরে, যাকে দিলে সব দান দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে? দীপঙ্কর তো দিতেই চায় কেবল। কিন্তু নেবার মত সেই মহাপ্রাণ কোথায়? তাকে সব কিছু দিতে পারলেই যেন কৃতার্থ হতো সে। ধন্য হতো। এতদিন মা ছিল, এতদিন কিরণ ছিল, এতদিন প্রাণমথবাবু ছিল, তাদের কেউ নেই আর। তারা সবাই দীপঙ্করের দেওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। একজন মাত্র ছিল তখনও। সে সতী! সেই সতীও যেন দীপঙ্করের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেল আজ।

দরজার কড়া নাড়তেই রঘু দরজা খুলে দিয়েছে। আজ এত সকাল-সকাল দীপঙ্করকে আসতে দেখে রঘু একটু অবাক হয়ে গেল। দীপঙ্করের সেদিকে নজর ছিল না। সোজা গিয়ে হেলানো চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলে। রঘু

পাখাটা ঘুরিয়ে দিলে জোর করে।

—দিদিমণি তো নেই!

দীপঙ্কর যেন সব জেনেও বিশ্বাস করতে চাইনি। অভয়ঙ্কর এত কথা বলবার পরও যেন অবিশ্বাসে মন থেকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কথাটা। কিন্তু রঘুর মুখ থেকে কথাটা শুনে যেন নতুন করে আবার অবাক হবার পালা এল।

—কোথায় গেছে?

—হাইকোর্টে।

—হাইকোর্টে? কার সঙ্গে গেছে? একলা?

—একজন ভদ্রলোক এসেছিল, তিনিই ডেকে নিয়ে গেলেন। আমাকেও যেতে বলেছিলেন সঙ্গে, কিন্তু আপনি আসবেন আপিস থেকে, তাই যাবার সময় আমাকে থাকতে বলে গেলেন—

এরপর আর রঘুর কোনও কাজ নেই। রঘু নিজের কাজে চলে গেল। দীপঙ্করের মনে হলো পৃথিবীর কোথায় এক কোণে যেন একটা ক্ষীণ আশার আশ্রয় ছিল তার, তাও যেন হঠাৎ এক ঝড়ের ফুৎকারে রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তবু যেন কিছু করবার নেই তার। তবু যেন এখানেই তাকে বসে থাকতে হবে। তবু যেন এমনি করেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করে করে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে হবে—

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সতীরও মনে হচ্ছিল সেও যেন মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে এসেছে এখানে। একদিন জীবনের সব অবলম্বন নিঃশেষ করে দিয়ে যখন নিরাশ্রয়ের শিখরটার ওপরে উঠেছে সে, তখনই যেন সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে ভাগ্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার হুকুম হলো তার ওপর। এ-এক অদ্ভুত জগৎ। কোনও দিকে চাইবারই সাহস হয়নি তার। মাথা নিচু করে সে যেন তার নিজের ভাগ্যদেবতার শেষ জাজমেন্ট শুনতে এসেছে এই হাইকোর্টে।

—আপনি তো একদিন রেলের আপিসে চাকরি করতেন মিসেস ঘোষ? একথা কি সত্যি যে সে চাকরি আপনি নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দিয়েছেন?

সতী মাথা নিচু করেই ছিল। মাথার ঘোমটাটা আরো একটু নামিয়ে দিলে। তারপর বললে—হ্যাঁ—

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল বললে—অনুগ্রহ করে আপনি আর একটু জোরে উত্তর দিলে সুবিধে হয়, আমরা তাহলে একটু স্পষ্ট শুনতে পাই—

সতী স্পষ্ট গলায় আবার বললে—হ্যাঁ—

—যদি নিজের ইচ্ছেতেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে আসামী মিস্টার ঘোষাল য়্যারেস্ট হবার আগে চাকরি ছাড়লেন না কেন? আপনার স্বামী কি আপত্তি করেছিলেন বলেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন?

সতী বললে—না—

সমস্ত কোর্টময় শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। আজ এতদিন ধরে কেস চলছে, বহু লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে ফলাফল শুনবে বলে। আজকের সাক্ষীর ওপরে মিস্টার ঘোষালের ভাগ্য নির্ভর করছে। সার সার বেঞ্চের ওপর সভ্য-শিক্ষিত কৌতূহলী মানুষের ভিড়। কৌতূহল মিস্টার ঘোষালের জন্যে নয়, কৌতূহল অন্য কারণে। এত বড় নৃশংস মার্ডার যে করেছে তাকে দেখবে সবাই। প্রতিটি সাক্ষীর জবানবন্দীর সঙ্গে আসামীর মুখের হাবভাব, চোখের চাউনি সমস্ত প্রতিক্রিয়া দেখবে। মিলিয়ে নেবে। খুন চোখের সামনে দেখবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, কিন্তু কোর্টের কল্যাণে হত্যাকারীকে দেখবার সৌভাগ্য সকলের মেলে। আসলে দীপঙ্করের মনে হয়, সকলেই মার্ডার করতে চায়। সকলেই খুন করতে চায়। শিক্ষা, সংস্কার খুনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় পদে পদে, তাই খুন করে না কেউ, তাই হত্যার খবর, হত্যাকারী আর ডিটেকটিভ উপন্যাসের এত আদর মানুষের সমাজে। নইলে কেন মানুষ নিজের কাজ ফেলে স্বাস্থ্য নষ্ট করে খুনের মামলা শোনে কোর্টে গিয়ে দিনের পর দিন!

—আপনি চাকরি করতেন বলে আপনার শাশুড়ী কি কোনওদিন আপত্তি করেছিলেন?

—হ্যাঁ—

—আপনি তো স্ত্রী হিসেবে খুব সুখী, হ্যাঁ কি না বলুন?

সতী বললে—না—

মিস্টার ঘোষালের এটর্নী বিশেষ করে শিখিয়েছিল সতীকে যে স্ত্রী-হিসেবে তার বিবাহিত জীবন সুখী এইটেই প্রমাণ করতে চাইবে স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল।

—আপনার স্বামীর অগাধ টাকা, আপনার স্বামীর অপরূপ স্বাস্থ্য, কলকাতার এক নামকরা ধনী-বংশে আপনার বিয়ে হয়েছিল—একথা কি সত্যি?

সতী বললে—না—আমার শাশুড়ীর সমস্ত টাকা লোকসান হয়ে গেছে!

—কিন্তু নষ্ট তো আগে হয়নি, তখন কেন চাকরি করতে গিয়েছিলেন? মিস্টার ঘোষালই কি আপনার চাকরি করে দিয়েছিলেন?

সতী বললে—হ্যাঁ— আমার নিজের টাকা উপার্জন করবার ইচ্ছে হয়েছিল।

—কিন্তু আপনি চাকরি করার পরও তো আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছেন। আপনার স্বামী একজন দেবতুল্য মানুষ,—

সতী মাথা তুললো। সিংহের মতন যেন কেশর নাড়া দিয়ে নিলে। বললে—না—দেবতুল্য মানুষ হলে আমি প্যালেস-কোর্টে ফ্ল্যাট ভাড়া করতুম না—

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ভদ্রভাবে সবিনয়ে বললে—মিসেস ঘোষ, আমি যে প্রশ্নটুকু করবো আপনি শুধু সেই প্রশ্নেরই জবাব দেবেন, তার বেশী দেবার দরকার নেই—। এখন বলুন, আপনার এত সুখের মধ্যেও কেন আপনি এই জঘন্য চিঠি লিখতে গেলেন? মিস্টার ঘোষালকে বাঁচাবার জন্যে, সত্যি কি না বলুন তো?

সতী যেন একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর ব্যারিস্টার দত্তর মুখের দিকে চাইলে একবার। সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মিস্টার ঘোষালের দিকেও চাইলে।

—বলুন, বলুন, যা সত্যি ঘটেছিল তাই-ই বলুন? কেন এমন জঘন্য কদর্য চিঠি লিখলেন? আপনি অন্যের বিবাহিতা সতীসাধ্বী স্ত্রী হয়ে, আপনার অমন স্বাস্থ্যবান সুন্দর স্বামী থাকতে, আপনার নিজের মায়ের মত অমন শাশুড়ী থাকতে, কেন লুকিয়ে লুকিয়ে এমন চিঠি লিখলেন? আপনি কি জানতেন না যে এতে আপনার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটতে পারে? আপনার সংসারে আগুন জ্বলে উঠতে পারে? আপনি মিস্টার ঘোষালের প্ররোচনায় ব্যাক ডেট দিয়ে নিজের ক্ষতি করে এই চিঠি লিখলেন? জানেন না যে এতে নিজের হাতে নিজের ডেথ-সেনটেন্স লিখে দেওয়া হলো? আপনি এমন শিক্ষিতা মহিলা হয়েও এই সহজ কথাটা একবার বুঝতে পারলেন না?

হঠাৎ কী যেন একটা গোলমাল হলো।

ব্যারিস্টার দত্ত কী যেন বললেন জজকে। স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের সঙ্গে ব্যারিস্টার দত্তর কী যেন নিম্নে বাদ-প্রতিবাদ চলতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। সতীর চোখের সামনে তখন সমস্ত হাইকোর্টটা যেন ঘুরছে। মনে হলো সে পড়ে যাবে। চারিদিকে গুজ্-গুজ্ ফিস্-ফিস্ শব্দ। সমস্ত এজলাস যেন গম্ গম্ করছে এতগুলো মানুষের কৌতূহলে। হঠাৎ সব থেমে গেল। হঠাৎ আবার প্রশ্নের ঝড় বয়ে যেতে লাগলো।

—আপনি জানেন যে, এই চিঠি যদি আপনি নিজের হাতের লেখা বলে স্বীকার করেন, তাহলে সমস্ত কলকাতার নারী-সমাজে আপনার নামে ঢি ঢি পড়ে যাবে? আপনার নামে কলঙ্ক রটবে?

সতী বললে—আমি জানি।

—এ চিঠি কি আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার দ্বারা লেখা সম্ভব? এও জজকে বিশ্বাস করতে বলেন?

সতী বললে—হ্যাঁ, সম্ভব!

—আপনি জানেন যে যদি আসামী এই মামলায় দোষী প্রমাণিত না-হন, তাহলে বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে একদিন এই পাপ সংক্রামিত হবে? খুনীর যদি শাস্তি না হয়, তাহলে সমাজে খুনের সংখ্যা বেড়ে যাবে? সে-অধঃপতন থেকে বাঙলা দেশের কোনও বাঙালীই আর রেহাই পাবে না? আরো জানেন কি যে আপনিও তার অংশভাগী হবেন?

সতী মাথা নিচু করে ঘোমটা টেনে দিলে।

—এ-সব জেনেও আপনি স্বীকার করছেন এ আপনার নিজের হাতের লেখা চিঠি? তবে কি আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবো যে, বাঙলার নারী-সমাজ থেকে সতী নারীর সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হয়েছে? এতদিন ধরে এত মহাপুরুষ

যা উপদেশ দিয়ে গেছেন,—বেদ উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর—সকলের সব শিক্ষা, সব উপদেশ কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে? বাঙলার নারী-সমাজের ওপর তার কোনও প্রতিক্রিয়াই হয়নি? মানুষ এখনও সেই আদিম অসভ্য মানুষই রয়েছে, তার এতটুকু একতিলও উন্নতি হয়নি? তাহলে কেন নারীকে আমরা মায়ের জাত বলে এত শ্রদ্ধা করি? কেন মাতৃভূমিকে আমরা এত সম্মান দিই? কেন বঙ্কিমচন্দ্র সেই মাকেই উদ্দেশ করে গান গেয়েছিলেন—বন্দেমাতরম্—

সতীর মাথার মধ্যে সব যেন তখন তাল-গোল পাকিয়ে গেছে। স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের পোশাক পরিচ্ছদ, স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলের বক্তৃতার ভঙ্গি, হাতের কাগজটাকে পাকিয়ে গোল করে দুলিয়ে দুলিয়ে সতীর দিকে চ্যালেঞ্জ করা—এ যেন অসহ্য হয়ে উঠলো। সতীর শেষকালের দিকে আর কিছুই কানে গেল না। নিন্দে, কলঙ্ক, খ্যাতি, অখ্যাতি, সতীত্ব, অসতীত্ব সমস্ত শব্দগুলো যেন মাথার মধ্যে ঢুকে এক অশরীরী আন্দোলন শুরু করে দিলে। সতীর মনে হলো যেন এবার আর তার শাশুড়ী নয়, এবার আর প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির ভেতরের উঠোনে নয়, এবার যেন কলকাতার চৌমাথার ওপর দাঁড়িয়ে সভ্য-শিক্ষিত মানুষের সার একের পর এক তার ওপর রেপ করছে। আর সে অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে সকলের সামনে বিবস্ত্র হয়ে—!

শুধু সামান্য একটা-দুটো ক্ষীণ শব্দ যেন তার কানে ভেসে এল দূর থেকে। কেউ বলছে—বরফ, কেউ বলছে—হাওয়া, কেউ বলছে—......

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এল গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতে। বাইরে-ভেতরে ক্রমে আরো অস্বস্তি জমে উঠলো। দীপঙ্কর তখনও চুপ করে বসে ছিল হেলানো চেয়ারটায় হেলান দিয়ে।

হঠাৎ একটা ঝন্ ঝন্ শব্দে দীপঙ্কর চমকে উঠেছে। কেউ যেন একটা বিকট আর্তনাদ করে উঠলো পাশেই। দীপঙ্কর চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে—কে? কে?

রঘুর গলার আওয়াজ হলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—আমি, আমি দাদাবাবু—

—কী হলো? কিসের শব্দ হলো?

রঘু বললে—হাত থেকে কাচের প্লেটটা পড়ে গেল—! আমি আলোটা জ্বালতে এসেছিলাম, আপনি একলা অন্ধকারে বসে আছেন—

তারপর আলোটা জ্বেলে দিতেই দেখা গেল কাচের প্লেটের ভাঙা টুকরোগুলো সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। কার পায়ে ফুটবে আবার। রঘু তাড়াতাড়ি একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, ভালো করে ঝাঁট দিয়ে দাও, দিদিমণির পায়ে ফুটলে আর রক্ষে থাকবে না, ওতে একেবারে সেপ্টিক হয়ে যায়—একটা ছোট্টো

টুকরোও যেন কোথাও না পড়ে থাকে—খুব সাবধান—

রঘু খুব যত্ন করে ঘর ঝাঁট দিতে লাগলো। দীপঙ্কর চেয়ারটাকে সরিয়ে নিয়ে ঘরের অন্য কোণে সরে বসলো। বাইরে অনেক দূরে চাঁদ উঠেছে একটা। বিরাট থালার মত চাঁদটা। ঢাকুরিয়ার এই দিকটার বাড়িগুলো ছোট-ছোট। কয়েকটা তাল গাছ। ক্রমে ক্রমে তালগাছগুলো কমে যাচ্ছে। যত বাড়ি হচ্ছে তত গাছ কমে যাচ্ছে। আকাশের একেবারে পূবের দিকে বাড়ির ছাদটা ছুঁয়ে চাঁদটা উঠছে। ছাদে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই যেন চাঁদটাকে ছোঁয়া যাবে।

—আজকের খবরের কাগজটা আছে রঘু?

রঘু খবরের কাগজটা দিয়ে গেল। কতদিন ধরে খবরের কাগজটা দেখার সময়ও হয়নি। কোনও খবর নেই কোথাও পড়বার মত। প্রত্যেক দিন সেই একই খবর। সেই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, সেই মিস্টার এল এস অ্যামেরি, সেই মারকুইস অব লিনলিথগো, সার মন্মথ মুখার্জি, হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস মারা গেছেন। মুশলিম লীগ। নলিনীরঞ্জন সরকার, কমার্স মেম্বার, কোথায় কী বক্তৃতা দিয়েছেন। কোথাও কিরণের খবর নেই, কোথাও প্রাণমথবাবুর খবর নেই, কোথাও সুভাষ বোসের খবর নেই। মানুষের যুদ্ধ যেন সকলকে গ্রাস করে ফেলেছে। সব শুভ-বুদ্ধিকে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে।

কাগজটা আবার সরিয়ে রাখলে দীপঙ্কর! কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন?

হঠাৎ একটা গাড়ির আওয়াজ আসতেই দীপঙ্করও যেন একটু সচেতন হয়ে উঠলো। ওই, ওই সতী এসে পড়েছে। রঘুও বুঝি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। সেও গাড়ির শব্দটা শুনতে পেয়েছে। বললে—ওই দিদিমণি এল—

দীপঙ্কর বললে—ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করেছ তো তুমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীপঙ্করও তৈরি হয়ে সোজা উঠে বসলো। এত দেরি হলো আসতে!

রঘু দরজা খুলে দিলে।

দীপঙ্কর বললে—বাইরের আলোটা যেন জেলো না আবার, ব্ল্যাক-আউট আছে—

না, বাইরের আলো জ্বালেনি রঘু। বাইরের চাঁদের আলো এসে সমস্ত ব্ল্যাক-আউট যেন ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে দিয়েছে।

রঘু বললে—কই, দিদিমণি তো নয়!

দীপঙ্কর যেন অবাক হয়ে গেল। বললে—দিদিমণি নয় তো কে? কে এল? কারা?

রঘু সদর দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলে। বললে—ও অন্য গাড়ি, এখানে একটুখানি থেমে আবার চলে গেল, ওরা ঠিক-ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছে না—

তাহলে সতী নয়! সতী নয় তাহলে! দীপঙ্কর হেলানো চেয়ারটায় আবার হেলান দিয়ে বসলো। এত রাত পর্যন্ত হাইকোর্টে কী করছে সতী!

কোর্ট থেকে কি অন্য কোথাও গেল? প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে? কিন্তু সেখানেই বা যাবে কেন হঠাৎ? তাহলে কোথায়? এত রাত পর্যন্ত কোথায় কী করছে সতী? দীপঙ্কর ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলে—রাত বাড়ছে। রাত বাড়ছে—আর আকাশের চাঁদটাও বড় হচ্ছে। হয়ত পূর্ণিমা। পূর্ণিমার চাঁদ হয়ত এমনি করে বেড়ে ওঠে।

দীপঙ্কর আবার হেলান দিয়ে বসলো হেলানো চেয়ারটায়।

নয়নরঞ্জিনী দাসীর মাথার মধ্যে যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। এতদিন যে নিশ্চিন্ততার মধ্যে জীবন চালিয়ে এসেছিলেন তিনি, সেই নিশ্চিন্ততায় যেন হঠাৎ একটা ফাঁক আবিষ্কৃত হলো, তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘরে যাচ্ছিলেন।

নিজের ছেলের সঙ্গে তাঁর বহুদিন ধরেই কথা বন্ধ ছিল। প্রত্যেক দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার পর নিজের ঘরের মধ্যেই কাটতো। কখন ছেলে খেলে, কখন সে ঘুমোতে গেল, কখন ঘুম থেকে উঠলো, সে-সব কিছুই তাঁর জানবার প্রয়োজন ছিল না। সনাতনবাবুকে গিয়ে ডাকতো শম্ভু। সনাতনবাবু এসে খেতে বসতেন। কী খাচ্ছেন, কেন খাচ্ছেন তাও বুঝতে পারতেন না। শুধু যেন খেতে হয় বলেই খাওয়া, ঘুমোতে হয় বলেই ঘুমোন। ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলে মা-মণি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। সনাতনবাবু কথা বলবার চেষ্টা করবার আগেই মা-মণি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

প্রথম প্রথম একদিন-দুদিন সনাতনবাবু এসেছিলেন মা-মণির ঘরে।

বাইরে থেকে ডাকতেন—মা-মণি—

ভেতর থেকে নয়নরঞ্জিনী বলতেন—আমার এখন সময় হবে না খোকা, পরে এসো—

সেই কবে একদিন ছেলের বিয়ে হয়েছিল, ছেলের বউ এসেছিল এ-বাড়িতে, সেই-ই বোধ হয় এ-বাড়ির শেষ উৎসব। সেদিন নবৎ বেজেছিল দেউড়িতে, চাকর-দরোয়ান-ঝি-ঠাকুর সবাই নতুন কাপড়-জামা পেয়েছিল। তারপর থেকেই যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য অভিশাপ এ-বাড়ির ওপর ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। যারা এতদিন এ-বাড়ির ঐশ্বর্যকে ঈর্ষা করে এদের দূরে রেখেছিল, তারা আবার একে একে কাছে আসতে লাগলো। অযাচিতভাবে এসে দেখা করে যেতে লাগলো। শুভাকাঙ্ক্ষী তারা কেউই নয়। নয়নরঞ্জিনী তা জানতেন। তারা কেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বউ-এর কথা জিজ্ঞেস করতো। চাকর-ঝির সংখ্যা কেন কমছে, গেটে কেন দরোয়ান নেই, সেই সম্বন্ধেই কৌতূহল প্রকাশ করতো। যত কৌতূহল প্রকাশ করতো, ততই তিনি কঠিন পাথর করে ফেলতেন নিজেকে। শেষ পর্যন্ত

কেবল নন্দীদিই ছিল। সেই নন্দীদিকে আশ্রয় করেই আবার তিনি আগেকার গৌরব ফিরে পাবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন এবার এমন জাঁক-জমক করবেন, এমন নবত সানাই বাজাবেন যে ভবানীপুরের গিন্নীদের তাক লেগে যাবে। আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবেন। দু' হাজার লোক খাওয়াবেন। এসব তাঁর মনের গোপন বাসনা। এ-বাসনা কারোর কাছে তিনি প্রকাশ করতেন না। ভেবেছিলেন একেবারে কাজে দেখিয়ে দেবেন তিনি সকলকে। কিন্তু সব যেন ভেস্তে গেল। সব যেন নিভে গেল হঠাৎ।

আস্তে আস্তে তিনি ছেলের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সনাতনবাবু তখন একমনে পড়ছিলেন।

—খোকা!

অনেকদিন পরে অনেক দূর থেকে যেন আওয়াজটা ভেসে এল।

—মা-মণি!

সনাতনবাবু উঠে এলেন। বললেন—আমায় ডাকছিলে মা?

মা-মণির চেহারার দিকে চেয়ে সনাতনবাবু বুঝতে পারলেন না কী বলতে এসেছে মা। তবু দু'জনেই দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

সনাতনবাবু বললেন—আমায় কিছু বলবে মা-মণি?

মা-মণি বললেন—তোমায় আর বলেই বা কী হবে, তুমি তো কোনও কাজেই আমায় সাহায্য করতে পারবে না! কিন্তু একটা কথা তুমি শুনবে আমার?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার সব কথাই তো আমি শুনেছি মা, আমি তো তোমার কোনও কথা অমান্য করিনি কখনও, আর করবোও না—

মা-মণি বললেন—সে-সব পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, তুমি শুনবে কি না বলো? আমার মাথা ঘুরছে, আমি বেশি কথা বলতে আসিনি—

সনাতনবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। আবার বললেন—তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে মা?

—আমার শরীরের কথা তোমায় ভাবতে হবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটাখাটুনি করলে শরীর কখনও কারো ভালো থাকতে পারে না। আমি শরীরের কথা বলতে আসিনি তোমাকে—

সনাতনবাবু বললেন—বলো তুমি কী বলবে, আমি তো শুনছিই—

মা-মণি হঠাৎ বললেন—বৌমার কোনও খবর তুমি রাখো?

—কোন্ বৌমা?

মা-মণি আর থাকতে পারলেন না। বললেন—দেখ সোনা, তুমি ন্যাকামি কোর না আমার সঙ্গে, বৌমার কোনও খবর রাখো কি না সেইটে শুধু আমি জানতে চাই!

সনাতনবাবু এতক্ষণে যেন বুঝতে পারলেন। বললেন—না—

—কোথায় থাকে তা-ও জানো না?

সনাতনবাবু বললেন—না।

—আর সেই ছোঁড়ার খবর? যে সেই মাতব্বরি করতে আসতো বার বার?

—দীপঙ্করবাবুর কথা বলছো?

মা-মণি রেগে উঠলেন। বললেন—অত নাম-ফাম আমার মনে থাকে না বাপু, নাম জানতে চাইও নে আমি—! বৌমাকে একবার ডেকে দিতে পারে সে? তার সঙ্গেই তো সে ছিল?

সনাতনবাবু বললেন—ছি মা, ও-কথা বলতে নেই—

নয়নরঞ্জিনীর মাথা তখন আরো ঘুরছে। সমস্ত সন্ধ্যেটা উকিলের কাছে বকাবকি করে শরীর যেন কেমন করছিল। বললেন—দেখ সোনা; একদিন আমি থাকবো না, সেদিন তোমাকেই দেখাশোনা করতে হবে এসব। সবই তো গেছে তোমার, বাড়ি টাকা-কড়ি; কর্তা আমার কাছে যা কিছু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন সবই গেছে। এখনি উকিলবাবুর কাছে শুনে এলুম এ-বাড়িটাও গেছে, তা আমার আর কী? আমি আর ক'টা দিন বাঁচবো? শেষকালে তুমিই থাকবে, তোমার জন্যেই ভাবনা, আর তোমার ভবিষ্যতের জন্যেই এত কথা বলা—

বলতে বলতে নয়নরঞ্জিনীর যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হলো। দু'পায়ে ভর দিয়ে যেন আর দাঁড়াতে পারছিলেন না।

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি কী করবো বলো তুমি? উকিলবাবুর কাছে যেতে হবে?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আমি তো এই উকিলের কাছ থেকেই আসছি, সে-সব কাজ তোমায় কিছু করতে হবে না তোমায় যে-কাজ করতে বলছি, সে-কাজ কি পারবে তুমি?

—কী কাজ, বলো?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তাহলে এসো, আমার ঘরে এসো, আমার শরীর আর বইছে না—

বলে নয়নরঞ্জিনী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। সনাতনবাবুও পেছনে-পেছনে চললেন। ওপরে গিয়ে নয়নরঞ্জিনী বললেন—এসো, বোসো এখেনে, তোমার সঙ্গে কথা আছে—

বহুদিন পরে আবার ছেলে আর মা এক ঘরে বসলেন। নয়নরঞ্জিনী বিছানার ওপর বসে একটু হাঁফ ছেড়ে নিলেন। তারপর বললেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও—

সনাতনবাবু দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না না, কেউ শুনতে পাবে, তুমি দরজায় খিল দিয়ে দাও—

ভেতরবাড়িতে বাতাসীর-মার কাছে দৌড়তে দৌড়তে এল ভূতির-মা। বললে—শুনেছ বাতাসীর-মা, আবার মায়ে-পুতে ভাব হয়েছে যে গো—

বাতাসীর-মা জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছিল। বললে—কে বললে তোকে লো?

কে?

—ওই তো শম্ভু, শম্ভু নিজে দেখে এসেছে, হুড়কো বন্ধ করে কী শলা-পরামর্শ করছে বসে বসে কে জানে মা? কার কপাল ভাঙছে মাগী!

শম্ভুও এসে পড়েছিল। বললে—হ্যাঁ গো সত্যি, আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম পেছনে, আমাকে দেখে মা-মণি দরজায় হুড়কো দিতে বললে দাদাবাবুকে—

ভূতির-মা বললে—এখন টাকার খাঁকতি হয়েছে, এখন বোধ হয় বৌদিমণিকে খোশামোদ করবে মাগী—

শম্ভু বললে—শুনিচি বৌদিমণি নাকি বাপের এক কাঁড়ি টাকা পেয়েচে—

বাতাসীর-মা সুপুরি কাটতে কাটতে বললে—মুয়ে আগুন, অমন শাউড়ীর, সেই যে কথায় আছে না—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই—!

ভূতির-মা বললে—তা ভাতার যদি নিজে ডাকতে যায় তো ভাতারের কথা ফেলতে পারে মাগ?

বাতাসীর-মা আর থাকতে পারলে না। বললে—ওলো, তবে শোন বলি—শুন ভাতার শুন শ্বশুর ধরি তোমার পায়, আর রণে মাততে গেলে গামছা রয় না গায়। এও হয়েছে তাই লো—

হঠাৎ ওপর থেকে ডাক এল—শম্ভু—

দাদাবাবুর গলা নয়, মা-মণির। শম্ভু বললে—ওই, ডাক পড়েছে—

সনাতনবাবু তখন ঘর থেকে বেরিয়েছে। মা-মণিও বেরিয়েছে। মুখ দেখে বোঝা গেল যেন এতক্ষণে শান্ত হয়েছে খানিকটা মা-মণি। বাইরে তখন চাঁদ উঠেছে পুবদিকে। পূর্ণিমার চাঁদ। মা-মণি একবার সেই দিকে চাইলেন। বললেন—বেশি দেরি কোর না সোনা, রাত অনেক হয়েছে—

সনাতনবাবু বললেন—না মা-মণি, আমি যাবো আর আসবো—

মা-মণি বললেন—শম্ভু, যা একটা গাড়ি নিয়ে আয়—

সনাতনবাবু বললেন—শম্ভু, তুমি সেই দীপঙ্করবাবুর বাড়িটা চেন তো? তুমিও চলো আমার সঙ্গে—

—আমিও যাবো?

তাড়াতাড়ি হাজরার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতেই মা-মণি আবার বললেন—বেশি দেরি কোর না সোনা, যাবে আর আসবে, অনেক রাত হয়েছে

আর ঠিক তারপরই সেই বিপর্যয়টা ঘটলো। সনাতনবাবু তখনও গাড়িতে ওঠেননি। শম্ভু গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সাইরেন বেজে উঠলো বিকট শব্দ করে। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটা থর থর করে কেঁপে উঠলো, সমস্ত কলকাতা শহরটা থর থর করে কেঁপে উঠলো, সমস্ত ইণ্ডিয়া, সমস্ত সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যান্ড যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। টোকিও থেকে জেনারেল তোজো বম্বার পাঠিয়েছে ক্যালকাটাতে। ক্যালকাটা ধ্বংস করে ফেলবে, ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টার্সের ইস্টার্ন

সাপ্লাই অফিসের মাথায় বোমা ফেলবে অ্যাক্সিস পাওয়ার্স। প্রথমে মৌমাছির গুন গুন শব্দের মত একটা ক্ষীণ সুর। তার পর সব নিস্তব্ধ। সবাই প্রতীক্ষা করছে মৃত্যুর।

মা-মণি বললেন—সোনা, নেমে এস, সোনা, নেমে এসো—

আর কোথায় মাটি থেকে পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপরে, একেবারে আকাশের হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে অ্যাক্সিস সোলজাররা চোরের মত ইণ্ডিয়ার দেয়ালে সিঁদ কেটে ঢুকে পড়েছে এখানে। এখানে মানুষের সংসারে তখন কোন্ নাটকের কোন্ অঙ্ক অভিনয় হচ্ছে, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং, স্টেশন রোড, প্যালেস-কোর্ট আর হাইকোর্টের ভেতরে, কোথায় টাকার আর ভালবাসার আর ঘৃণার আর বঞ্চনার সিঁদ কাটা হচ্ছে তাও জানতে পারলে না। উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের বিশ-এ ডিসেম্বর রাত্রে পর-পর বোমা ফেলে গেল একটা... দুটো...তিনটে...

টেম্পল চেম্বার্সের কালো ময়লা-চিট চেয়ারের ওপর এসে ধপাস করে বসে পড়লেন বউবাজারের প্রবীণ উকিল বিভূতিভূষণ বসু। বললেন—কই হে, গাঙ্গুলী কোথায় গেল?

যে লোকটা এককোণে বসেছিল সে বললে—আসুন, গাঙ্গুলীবাবু হাইকোর্টে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন—

আলিপুর চব্বিশ পরগণার জজ কোর্ট থেকে শুরু করে শেয়ালদ ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ঘুরে হাইকোর্টে এসে যে সার্কেলের শেষ, তার জাল ছড়ানো আছে চারদিকে। এ-কোর্টের সঙ্গে ও-কোর্টের, এ-উকিলের সঙ্গে ও-এটর্নীর যেন নাড়ীর যোগ। একটা জাল টানলে অনেক নাড়ীতে টান পড়ে। সারা কলকাতাময় মোক্তার, মুহুরি, উকিল, ব্যারিস্টার সবাই যেন জাল ফেলে অফিস খুলে বসে আছে। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে এ-জালে সবাইকেই আটকে পড়তে হবে। নয়নরঞ্জিনী দাসী, সনাতনবাবু, মিস্টার ঘোষাল, সতী, লক্ষ্মী কেউ ছাড়া পাবে না। দোষী-নির্দোষী কারোর মুক্তি নেই ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের দুর্ভেদ্য জাল থেকে।

বিভূতিবাবু বললেন—তাহলে তো বড় মুশকিল হলো দেখছি—

—কেন?

বিভূতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কীসের কেস আবার আজকে! ব্যারিস্টার দত্তর ব্রীফ্ বুঝি?

লোকটা বললে—সেই মার্ডার কেসটার হিয়ারিং, আজকে লাস্ট ডিফেন্স উইটনেস এসেছে কিনা—মিসেস ঘোষকে আজ তাইতো আমি গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়ি থেকে নিয়ে এলুম—

—কে মিসেস ঘোষ?

—আজ্ঞে, সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের নয়নরঞ্জিনী দাসীর পুত্রবধূ, সনাতন ঘোষের স্ত্রী!

বিভূতিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তাই নাকি, আমাদের কোর্টেও যে নয়নরঞ্জিনী দাসীর একটা কেস আছে হে। বাড়ি নীলেমের নোটিস বেরিয়েছে, লাখ টাকার ডিক্রি—! এ হয়েছে বেশ একরকম। শাশুড়ী-বউ-হাজব্যান্ড সবাই আটকে পড়েছে—

—কিন্তু পুত্রবধূ তো আলাদা থাকে, জানেন না?

বিভূতিবাবু বললেন—জানি জানি, সবই জানি হে, শাশুড়ী সবই বলেছে, আজকে রাত্তিরে আসবে আমার কাছে, এখন লাখ টাকার নোটিশ পেয়েছে! একবার বলেছি, আবার আজকেও বলবো, টাকাটা যেমন করে হোক জোগাড় করতেই হবে, তোমাদের ব্যারিস্টার পালিতের কাণ্ড—

—আজ্ঞে ব্যারিস্টার বলছেন কেন, বলুন টাউট—

বিভূতিবাবু বললেন—আর যে-দিনকাল পড়েছে সবাইকেই টাউটগিরি করতে হবে—তারপর জাপানীরা এলে কী হবে ভগবান জানে—

তারপর বললেন—তাহলে উঠি আজ, পরে টেলিফোন করবো, গাঙ্গুলীকে বলে দিও—

বিভূতিবাবু ব্যস্ত মানুষ। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে একটা কাজে এসেছিলেন, তারপর মক্কেলের খরচায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এখানে এসে কাজ সারবার মতলব ছিল। তারপর যেতে হবে রেজিস্ট্রি অফিসে। সেখান থেকে আরো অনেক জায়গায়।

কিন্তু ওদিকে সেসন্সে জজের এজলাসে তখন হিয়ারিং শেষ হয়ে গেছে। জজ সাহেব কোর্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। মিস্টার ঘোষাল য়্যাকিউজড্ বক্স-এ এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল নিশ্চল পাথরের মত। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চুরোট খেতে পারেনি। অথচ মেজাজ খারাপ করবার উপায় নেই। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের চরম ধারার অক্টোপাশে আটকে পড়েছে। সতী যখন প্রথম এসে উইটনেস-বক্সে দাঁড়াল, তখনও একটু ভয় হচ্ছিল। সতীর একটা কথার ওপর নির্ভর করছে তার লাইফ। কিন্তু না, একে একে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। এক-একবার মনে হলো হয়ত এখনি ফাঁস করে দেবে সমস্ত। একবার মনে হলো সতী যেন দ্বিধা করছে, সতী যেন আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এক-একবার মিস্টার ঘোষালের মনে হলো, সতী যেন সত্যি কথাই বলে ফেলবে। কিন্তু না, মানুষের সমাজ সমস্ত মানুষ-সমাজকে এমনভাবে মিথ্যে-কথা বলতে শিখিয়েছে, এমন কৌশলে খবরের কাগজ, রেডিও, টেক্সট বুক দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছে যে, মিথ্যে কথা বলতে আর দ্বিধা হলো না সতীর। স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল-এর সমস্ত জারি-জুরি সমস্ত কলা-কৌশল, সমস্ত চ্যালেঞ্জ, সব কিছু যেন পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত স্ট্যান্ডিং কাউন্সিলও বিপর্যস্ত হলো, সতীও বিপর্যস্ত হয়ে টলে পড়লো উইটনেস-বক্সের ভেতরে।

কোর্ট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার ঘোষালকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে। বার-এট-ল মিস্টার দত্তও চলে গেলেন তাঁর নিজের চেম্বারে। এটর্নী গাঙ্গুলীর তখন ফার্স্ট-এড-এর ব্যবস্থা করবার পালা। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ সময় লাগেনি জ্ঞান ফিরতে। এর পরেই চোখ মেলে চারদিকে দেখে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল সতী। এতটুকুতেই মুষড়ে পড়বার মেয়ে নাকি সে?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—চমৎকার বিউটিফুল মিসেস ঘোষ, ওয়েল ডান, খুব ভাল বলেছেন—

সতী বললে—মিস্টার ঘোষাল ছাড়া পাবেন তো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—খুব সম্ভব, তবে জাজমেণ্ট এখনও তো বেরোয়নি—এখন আপনি কেমন বোধ করছেন? বাড়ি যেতে পারবেন?

সতী বললে—হ্যাঁ—

—তাহলে চলুন। আমরা পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে!

মিস্টার গাঙ্গুলীর দয়া-মায়াও আছে। মক্কেলের জন্যে মিস্টার গাঙ্গুলীরা অনেক করে থাকেন। পরে সমস্ত বিল হবে মক্কেলের নামে। তাড়াতাড়ি নিজের চেম্বারে বসালেন সতীকে। মাথার ওপর পাখাটাকে আরো জোরে চালিয়ে দিলেন। তারপর এক কাপ কফি এনে দিলেন সামনে। বললেন—আপনার খুব স্ট্রেন হয়েছে বুঝতে পারছি, এটা খেয়ে নিন—ততক্ষণে ট্যাক্সি আসছে—

তারপর মিস্টার গাঙ্গুলী পাশের ঘরে চলে গেলেন। কার সঙ্গে যেন কী সব কথা বলতে লাগলেন।

খানিক পরে এসে বললেন—চলুন, আপনার ট্যাক্সি এসে গেছে—

সতী উঠলো। মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—এক্ষুনি একটা খবর পেলাম ফোনে—

—কী খবর?

—একটা খুব ক্রাইসিস চলছে আপনার শ্বশুর-বাড়িতে—

সতী হঠাৎ ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। মুখ ফিরিয়ে বললে—আমার শ্বশুরবাড়িতে? কীসের ক্রাইসিস? কারোর অসুখ?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—না, আলিপুর কোর্টে আপনার শাশুড়ী নয়নরঞ্জিনী দাসীর নামে একটা কেস-এর ডিক্রী হয়ে গেছে, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটা নীলেম হবে কোর্টে, আপনার শাশুড়ী আমাদের এক বন্ধু-উকিলের কাছে যাতায়াত করছেন—

—কেন? নীলেম হবে কেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—শুনলাম, অনেক দিন আগে তিনি এক গুজরাটি

ভদ্রলোকের কাছে কিছু টাকা ধার করেছিলেন, সেই টাকা এখন সুদে-আসলে এক লাখে দাঁড়িয়েছে, টাকা দিতে পারছেন না তাই বসত বাড়ি নীলেম হচ্ছে—

সতী যেন মনে মনে কী ভাবলে। তারপর গাড়িতে উঠে বসলো। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে ডালহৌসী স্কোয়ার দিয়ে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। শীতকালের সন্ধ্যে। অল্পতেই অন্ধকার হয়ে যায় চারিদিকে। সতীর মনে হলো এ আর এক দুরূহ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেন অতিক্রম করতে হচ্ছে তাকে।

মিস্টার গাঙ্গুলী অনেক কথা বলছিলেন। বেশির ভাগই মিস্টার ঘোষালের কথা। নির্দোষ মানুষকে কেমন করে অকারণে আইনের কবলে পড়তে হয়। এইসব এটর্নী আর বার-এট-ল আছে বলেই এখনও কলকাতার লোকের গায়ে আঁচ লাগছে না।

সতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কটা বাজলো?

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—সাতটা, কেন?

সতী আর কোনও কথা বললে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললেন—আপনি মিস্টার ঘোষালের জন্যে কিছু ভাববেন না, জাজমেণ্ট বেরোলেই আমি আপনাকে খবরটা দেব! আপনি এক্সমাসের ছুটিতে কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

নানা অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতে লাগলেন মিস্টার গাঙ্গুলী। বেশ বয়েস হয়েছে। যে-বয়েসে চার-পাঁচ ছেলের বাবা হওয়া যায়, মিস্টার গাঙ্গুলীর সেই বয়েস। সতী চুপ করে শুনছিল কথাগুলো। শেষকালে আর পারলে না। বললে—দেখুন মিস্টার গাঙ্গুলী, মিস্টার ঘোষাল ছাড়া পান বা না-পান, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না—

—তার মানে?

যেন অবাক হয়ে গেলেন মিস্টার গাঙ্গুলী।

সতী বললে—হ্যাঁ. মিস্টার ঘোষালের ফাঁসি হয়ে গেলেও আমার কিছু যায়-আসে না—

মিস্টার গাঙ্গুলী যেন এবার একটু কাছ ঘেঁষে বসলেন। বললেন—আমি কিন্তু অন্যরকম শুনেছিলুম—

—কার কাছে শুনেছিলেন? যার কাছেই শুনে থাকুন, সত্যি কথাটা আমার কাছে শুনে রাখুন, আমি মিস্টার ঘোষালের কেস নিয়ে মোটেই ইণ্টারেস্টেড নই—

—অথচ তার জন্যে আপনি আজ এত কষ্ট করলেন?

সতী বললে—কেন যে কষ্ট করতে গেলুম তাও ঠিক জানি না। অথচ তার ফাঁসি হলেই আমি মনে মনে খুশী হতুম বোধ হয়—

মিস্টার গাঙ্গুলী আরো কাছ ঘেঁষে বসলেন। বললেন—আমি আপনার কথা সব শুনেছি, আপনার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয় মিসেস ঘোষ—

সতী কিছু উত্তর দিলে না।

মিস্টার গাঙ্গুলী আবার বলতে লাগলেন—আপনার ম্যারেড লাইফ বড় কষ্টকর, সত্যিই আপনার মত মেয়ের জন্যে নতুন করে আইন করা উচিত, কত হিন্দু মেয়ে যে এইভাবে সাফার করছে. আমি তাদের অবস্থা যত দেখছি— মনে মনে তত কষ্ট পাচ্ছি—

সতীর ক্রমেই ভয় করতে লাগলো। একটু সরে বসলো পাশের দিকে। মিস্টার গাঙ্গুলীর স্পর্শের সান্নিধ্য বাঁচিয়ে। একেবারে দরজার গা ঘেঁষে। কিন্তু আর সরে বসবার জায়গা নেই। এতক্ষণে যেন সত্যিই আতঙ্ক হতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বললে—আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন আপনি— এখানেই নামবো আমি—

—কোথায়? এখানে কোথায় নামবেন এই সময়ে? এ তো ভবানীপুর।

সতী বললে—হ্যাঁ, এই ভবানীপুরেই নামবো, আমি আমার শ্বশুরবাড়িতেই যাবো, প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে—

তবু যেন মিস্টার গাঙ্গুলী বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—আপনি সত্যিই আপনার শ্বশুরবাড়িতে যাবেন?

সতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে। বললে—কেন? আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও আপনি এখানে যাবেন! মিস্টার ঘোষালের কাছে যে আমি সব শুনেছি আপনার সম্বন্ধে!

সতী বললে—আপনি মিছে কথা শুনেছেন—মিস্টার ঘোষাল একজন মিথ্যেবাদী, লায়ার—আপনাকে সব মিথ্যে কথা বলেছেন—

যেন প্রকাণ্ড একটা চড় এসে পড়ল মিস্টার গাঙ্গুলীর গালে।

সতী আবার বললে—আমার স্বামীর নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে আপনার কাছে, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, ও-রকম স্বামী কোনও মেয়ে পায় না—তা জানেন?

মিস্টার গাঙ্গুলী যেন কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেলেন এক মুহূর্তে। এতদিন কেস চলছে, এতদিন ওই কেস-এর সূত্রেই মেয়েটার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা শুনে এসেছেন। মিস্টার গাঙ্গুলী ভেবেছিলেন এই সুযোগে হয়ত একটু ঘনিষ্ঠতা হবে মিসেস ঘোষের সঙ্গে। কলকাতা শহরে এরকম অনেক মিসেস ঘোষ আছে। মিস্টার গাঙ্গুলীরাই সেইসব মিসেস ঘোষদের ভরণ-পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এ যেন অন্য রকম। এ মিসেস ঘোষ যেন আলাদা জাতের। মিস্টার গাঙ্গুলী ভয়ে ট্যাক্সির মধ্যে শিঁটিয়ে উঠলেন। যে মিসেস ঘোষ কোর্টে সাক্ষী দেবার সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সেই মিসেস ঘোষ যেন নয় এ। এ যেন ফণাওয়ালা কেউটে।

—এখানে গাড়িটা দাঁড় করান! দাঁড় করান—

মিস্টার গাঙ্গুলী আর প্রতিবাদ করলেন না। ট্যাক্সি থামাতে হলো হাজরা রোডের মোড়ে। ইঁদুরের গর্ত মনে করে সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন

তিনি। এখন ছোবল খেতে হয়েছে নিজের দোষে। বললেন—আচ্ছা নমস্কার—

রাস্তার অন্ধকারে মিসেস ঘোষকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর সতীও চলে যাওয়া ট্যাক্সিটার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ! লোকটা যেন ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল! নিজের ওপরও রাগ হলো সতীর। তার ওপর কেন এতখানি সাহস পায় সবাই! তার সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে, তবু এতখানি অপমান করবার দুঃসাহস কেমন করে হয় ওদের! এর জন্যে কে দায়ী? সে না তার স্বামী!

পায়ে পায়ে অনেকখানি চলে এসেছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ভেতরে। রাস্তাটা এই শীতের অন্ধকারে জনবিরল হয়ে এসেছে। এত অপমানের পরেও কেন সে যাচ্ছে আবার? কেন যাচ্ছে এমন কাঙালের মত? হয়ত এখানে নামবার দরকারই হতো না তার। হয়ত সোজাই চলে যেত সে গড়িয়াহাটের বাড়িতে! হয়ত মিস্টার গাঙ্গুলী অমন ব্যবহার না করলে এখানে নেমে পড়বার প্রয়োজনীয়তা এমন অনিবার্য হয়ে উঠতো না। তা হোক, ভালোই হলো। মন্দের ভালো! সতী মনে মনে ধন্যবাদ দিলে মিস্টার গাঙ্গুলীকে। মন্দের মধ্যেও এমনি করে মাঝে মাঝে ভালোর উদয় হয় হয়ত।

—বৌদিমণি!

যেন ধরা পড়ে গেছে এমনি করে ছিটকে উঠলো সতী। কৈলাস! কৈলাস দৌড়ে এসেছে কাছে। এসেই গড় হয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—কী খবর তোমাদের, কৈলাস?

—তুমি কখন এলে বৌদিমণি? বাড়িতে ঢুকেছিলে?

সতী বললে—না, একটা কাজে এসেছিলাম এদিকে, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি! তোমরা সব ভালো? শম্ভু কোথায়?

কৈলাস বললে—শম্ভু তো মা-মণির সঙ্গে উকিলবাড়ি গেছে, এইবার ফিরে আসবে, আপনি চলুন না, দাদাবাবু আছেন ভেতরে—

সতী বললে—না, এখন রাত হয়েছে অনেক, আর ভেতরে যাবো না—

কৈলাস বললে—শুনেছেন তো আমাদের এ-বাড়ি নীলেম হয়ে যাচ্ছে. এক লাখ টাকার দায়ে, মা-মণি উকিলবাড়ি আর ঘর করছে কেবল!

—কিন্তু কেন নীলেম হচ্ছে, তা কিছু জানো তুমি?

কৈলাস বললে—আপনাকে কত হেনস্তা করেছে মা-মণি তা তো আমরা জানি বৌদিমণি, মাথার ওপর ভগমান বলে তো একজন আছে, বাতাসীর-মা বলছিল, ভগমানের দিষ্টিতে কিছুই এড়ায় না রে, কিছুই এড়ায় না। চিত্তগুপ্তের খাতায় সব লেখা থাকে—

সতী বললে—তুই থাম্, ভগবান বলে কেউ নেই কোথাও, ও-সব বাজে কথা—

কৈলাস আঁতকে উঠলো। বললে—তুমি বলো কি বৌদিমণি, ভগমান না-থাকলে আজকে মা-মণির এই দশা হয়? মা-মণির মুখের চেহারাটা তো তুমি

আর দেখ নি! পেয়াদা যখন নীলেমের নুটিশ নিয়ে এল, তখন আমরা সব্বাই দেখেচি—! তুমি চলো, একটিবার দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে চলো—

সতীর তবু যেন কেমন দ্বিধা হতে লাগলো। বহুদিন আগে আর একবার এমনি ভেতরে ঢুকে কী বিপর্যয় ঘটেছিল, তাও মনে ছিল। কৈলাস বললে—বাতাসীর-মা কী বলে জানো বৌদিমণি?

—কী বলে কৈলাস?

—তুমি পালাগান শুনেচ বৌদিমণি? রামায়ণের পালাগান?

—হ্যাঁ, কালিঘাটে যখন থাকতুম শুনেছি। কেন?

—বাতাসীর-মা বলে বৌদিমণি আমাদের সেই জনক-নন্দিনী সতীলক্ষ্মী সীতা।

সতী এবার হেসে ফেললে। কৈলাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—বাতাসীর-মা আমাকে ভালবাসে কি না তাই এই কথা বলেছে! কোথায় সীতা আর কোথায় আমি! দূর! ভগবান নিয়ে ও-সব কথা বললে পাপ হয়, জানিস না?

কৈলাস বললে—সত্যি বৌদিমণি, তোমার নামে যখন সব্বাই দোষ দেয়, তখন আমাদের তাই-ই মনে হয়—

—কে দোষ দেয় রে আমার নামে?

—কে আবার দেয় না, সব্বাই দেয়! সেদিন তোমার আপিসের একজন সাহেব এসে তোমার নামে যাচ্ছেতাই করে বদনাম দিয়ে গেল।

সতী বুঝতে পারলে না। বললে—কে? কী বললে সে?

—বললে, তুমি নাকি দীপুবাবুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছো, তোমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দীপুবাবুকে নাকি পুলিসে ধরেচে, এই সব কথা!

সতী আবার জিজ্ঞেস করলে—কে বললে রে এ-সব কথা? আমাদের আপিসের ঘোষাল-সাহেব?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই নামই হবে। কী সব মিথ্যে কথাই গড় গড় করে শুনিয়ে গেল মা-মণিকে। মাথার ওপর ভগমান নেই ভাবছো? নিশ্চয়ই আছে বৌদিমণি, নিশ্চয়ই আছে নইলে আদালত থেকে কেন নুটিশ আসে মা-মণির নামে? সতী-লক্ষ্মীর নামে বদনাম দিলে ভগমান কদ্দিন সইবে? ভগমানের তো সহ্যের একটা সীমে আছে বৌদিমণি!

হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সতী! কেন মিস্টার ঘোষাল এসেছিল তার নামে কলঙ্ক রটাতে এখানে! যার জন্যে আজ কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এল, যার প্রাণ বাঁচিয়ে এল, সেই মিস্টার ঘোষাল এসেছিল এখানেও? এখানে এসে তার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল?

—তুমি ঠিক জানো ঘোষাল-সাহেব এসেছিল? কী রকম চেহারা বলো তো?

কৈলাস চেহারাটার যেমন বর্ণনা দিলে, ঠিক তেমনি। মিস্টার ঘোষালের

চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

—তুমি ঠিক বলছো কৈলাস? মিস্টার ঘোষাল আমার নামে এইসব কথা বলে গেল এখানে এসে?

কিন্তু কৈলাস হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বললে—ওই মা-মণি আসছে বৌদিমণি। উকীলবাড়ি থেকে মা-মণি আসছে—সরে এসো ইদিকে। সরে এসো, বুড়ী দেখতে পাবে তোমাকে—

সেই অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের গলির ভেতর দাঁড়িয়ে, সতী আর কৈলাস একটা বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলে। আর ট্যাক্সিতে পেছনের সীটে বসে ছিল নয়নরঞ্জিনী দাসী, আর সামনের সীটে শম্ভু। গাড়িটা সোজা গেট দিয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

কৈলাস বললে—আজ মা-মণির পুর্ণিমের নিশিপালন কি না, তাই সন্দেশ কিনতে গিয়েছিলুম, বুড়ীর এদিক্ নেই ওদিক্ আছে কিন্তু—

সতীর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। এখানেও এসেছিল মিস্টার ঘোষাল? এখানে এসেও তার নামে অপবাদ দিয়ে গিয়েছে। এখুনি যার প্রাণ বাঁচিয়ে এল আজ, নিজের চরিত্রে চরম অপবাদ টেনে নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে এল, সে? সে-ই এখানে এসেছিল? সেই মিস্টার ঘোষাল?

খালি ট্যাক্সিটা প্যাসেঞ্জার নামিয়ে আবার গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো। তারপর মোড় ঘুরে হাজরা রোডের দিকে চলে গেল নিঃশব্দে। সতী আর কৈলাস আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

মানুষের জীবনে এমন দিন কখনও কখনও আসে যখন নিজেকে নিয়ে যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। জন্মের গোড়া থেকে যে যন্ত্রণার সূত্রপাত, তার একমাত্র অব্যাহতি তো মৃত্যুতে। কিন্তু যন্ত্রণারও তো তারতম্য আছে! ছোট যন্ত্রণা যেমন আছে, তেমনি বড় যন্ত্রণাও তো আছে। সেই বড় বড় যন্ত্রণার যেন আর উপশম নেই। দিনের মধ্যে যখন হঠাৎ এক এক সময়ে অকারণে সেই যন্ত্রণার আবেগ তীব্র থেকে তীব্রতর, তীব্রতর থেকে তীব্রতম হয়ে ওঠে, তখন সমস্ত জীবনের শিক্ষা, সমীক্ষা, জ্ঞান, তপস্যা সব কিছু যেন বন্যায় ভেসে যায়। তখন মনে হয় এর থেকে যেন আর মুক্তি নেই, এর থেকে যেন আর অব্যাহতি নেই!

ছোটবেলা থেকে ধাপে ধাপে মৃত্যু, জীবন, জন্ম, অন্যায়, অবিচার, আনন্দ, বেদনা, সব কিছু অতিক্রম করে এসে এসে দীপঙ্করের ধারণা হয়েছিল আঘাত সে এখন সহ্য করতে পারবে হাসিমুখে, অন্যায় সে এখন অতিক্রম করতে পারবে ক্ষমা দিয়ে। কিন্তু নিজেকে যে এমন করে সে জড়িয়ে ফেলবে সেই জালে তা সে বুঝতে পারেনি। জালই তো! যন্ত্রণার জাল। জীবনের সব কুটিল প্রশ্নের

সমাধান করতে গিয়ে একদিন সে নিজেই যে যন্ত্রণার জালে আটকে পড়বে তা সে ভাবতেও পারেনি! দীপঙ্কর চেয়েছিল নিজের আত্মা দিয়ে একদিন বিশ্বের আত্মার মধ্যে সে প্রবেশ করবে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের ছোট ছেলেটি প্রতিদিনের চেষ্টায় অঘোরদাদু থেকে শুরু করে তার মা, কিরণ, সতী, লক্ষ্মীদি, মিস্ মাইকেল, প্রাণমথবাবু, সকলের মধ্যে একাকার হতে চেয়েছিল। শুধু তারাই নয়। এ-সংসারের ভালো-মন্দ সকলের যোগে সে এক অমৃতযোগে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিল। প্রতিদিনই সে নিজের চেতনার অধিকার পরিব্যাপ্ত করতে চেয়েছিল সকলের মধ্যে। তার আমিত্ব বলে যে দুর্ভেদ্য আবরণ তাকে ছোটবেলায় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, সে আবরণ যেন দিনের পর দিন তখন সরে যাচ্ছিল। সহজ হতে চেয়েছিল সে ছোটবেলা থেকে। এতদিনের চেষ্টায় তাই সহজও হতে পেরেছিল সে। ভেবেছিল তার সহজ হওয়ার শিক্ষা যেন শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যের মধ্যে সে এবং তার মধ্যে অন্যের বাধা যেন চিরদিনের মত দূর হয়ে গেছে। তাই সে আপিসে যেত, বাড়িতে আসতো, সংসারের কাজ করতো, দৈনন্দিন পৃথিবীর খবর রাখতো, কিরণের জন্যে দুশ্চিন্তা করতো, সতীর কাছে এসে বসতো—সবই যেন তার সহজ হবার সাধনা। ভেবেছিল—সেই সহজিয়া সাধনার মধ্যে দিয়েই একদিন তার সব প্রশ্নের সমাধান সে পেয়ে যাবে। তার মত সমস্ত পৃথিবীর মানুষই একদিন সহজ হয়ে আসবে। সবাই সবাইকে ভালবাসবে, সবাই সকলের সহযোগিতা করবে, সবাই মিলে সকলের সব বিরোধের একদিন অবসান করে দেবে।

কিন্তু আবার একদিন দুর্ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিতভাবে!

হয়ত মিস্টার ঘোষালই এর মূলে।

আশ্চর্য! মিস্টার ঘোষাল কি এই বিংশ শতাব্দীর একমাত্র সৃষ্টি! তা তো নয়। যুগ যুগ ধরে এরাই কখনও চেঙ্গিস খাঁ হয়, কখনও কালাপাহাড় হয়, কখনও তৈমুর লং হয়ে উদয় হয়। কিন্তু কেন হয়? কেন এদের সৃষ্টি? পৃথিবী যদি সার্থকতার দিকেই এগিয়ে চলেছে, তবে কেন এরা মাঝে মাঝে উদয় হয়ে মহাপুরুষদের সব সাধনা সব তিতিক্ষা এমনি করে খানখান করে দেয়? রামায়ণের যুগেও একজন রাবণের উদয় হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রাবণের কেন উদয় হলো? দীপঙ্করদের সহজ হবার সব প্রচেষ্টাকে কেন এরা এমন করে বিপর্যস্ত করে দিলে?

সেসনস্ কোর্টের জাজমেণ্টে সেই কথাটাই প্রকারান্তরে বলেছিলেন সেদিনকার জজসাহেব!

যেদিন মিস্টার ঘোষালের কেস-এর জাজমেণ্ট বেরিয়েছিল, দীপঙ্কর মন দিয়ে পড়েছিল সবটা। সতীকেও পড়িয়েছিল। তাতে শেষকালে মন্তব্য লেখা ছিল—"মিস্টার ঘোষাল নামে যে-আসামীর বিচারের ভার এই কোর্টের ওপর পড়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে আমি সুবিচার করতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত।

আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আজ আসামীকে মুক্তি দিচ্ছি—কারণ আমার সামনে বিবাদীপক্ষ যে এভিডেন্স হাজির করেছেন, তা অকাট্য! মিস্ মাইকেল নামে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নারী অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে জীবন ত্যাগ করেছে, সেই নারীর হত্যার জন্যে মিস্টার ঘোষালেরই মত কোনও ভদ্রবেশী তথাকথিত শিক্ষিত অর্থশালী ব্যক্তি দায়ী, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি। আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে স্বর্গতঃ নারীর মৃত্যুতে—কিন্তু আমি নিরুপায়। মিস্টার ঘোষালরা এমনই চতুর, এমনই কুটিল ব্যক্তি যে এঁদের অভিযুক্ত করার মত সুচতুর পুলিস-বিভাগ আজো দেশে সৃষ্টি হয়নি। মিস্টার ঘোষাল মুক্তি পাবার পর হয়ত আবার তাঁর পূর্ব-কার্যকলাপ অব্যাহত রাখবেন, আবার দ্বিগুণ চাতুর্য আর দ্বিগুণ কৌশলের সঙ্গে তাঁর নৃশংস অভ্যাস চালিয়ে যাবেন। দেশের এই দুর্দিনে যখন প্রত্যেক মানুষ কায়ক্লেশে জীবনধারণ আর জীবিকা-অর্জনের চেষ্টায় বিব্রত, তখন কল্পনা করতেও ভয় হয় যে এই কলকাতা শহরেই এমন মানুষ তার বিপুল অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির সাহায্যে সশরীরে বিভীষিকা-রূপে বিরাজ করবে। আর শুধু মিস্ মাইকেলই নয়, এমন একদিন আসাও বিচিত্র নয়, যেদিন আরো অনেক নিরপরাধ নারীই এই মিস্ মাইকেলের মত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হবে। মিস্টার ঘোষালকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত এবং চরম দণ্ড দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হতে পারতাম। কিন্তু আমি যে-আসনে বসে আছি, সে আসন আইনের কূট-ধারার দ্বারা শৃঙ্খলিত। আমি সেই আইনের দ্বারা বিড়ম্বিত বলেই আজ মিস্টার ঘোষালকে নারী-হত্যার অপরাধ থেকে বাধ্য হয়ে মুক্তি দিচ্ছি।"

যে আইন মিস্টার ঘোষালকে মুক্তি দিতে সাহায্য করেছিল, সেই আইনই যে আবার একদিন মিস্টার ঘোষালকে শৃঙ্খলিত করবে, তা হয়ত সেদিনকার সেসন জজ্ বুঝতে পারেন নি। তাই বার-বার আইনের দোহাই দিয়ে নিজের বিবেকের দংশনকে সংযত করেছিলেন তিনি।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। সে-কাহিনী যথাস্থানে বলবো।

সেদিন সতী জানতো না, দীপঙ্করও জানতো না কী বিপর্যয় তাদের জন্যে আত্মগোপন করে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। দীপঙ্কর চুপ করে বসেছিল তখনও। তখনও সতী আসছে না। প্রতিদিন এমনি করেই এখানে আসে, প্রতিদিনই এমনি পাশের চেয়ারে বসে থাকে সতী! কিন্তু সেদিনই প্রথম ব্যতিক্রম।

রঘু আবার ফিরে এল। জানালা দিয়ে একবার বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—দিদিমণি তো এখনও আসছে না দাদাবাবু—

দীপঙ্কর কোনও উত্তর দিলে না। ঘরের আলোয় ঠুলি পরানো। জানালার বাইরে আলো পড়ে না। কিন্তু বাইরের আকাশের তখন আলোয় আলো। পূর্ণিমার চাঁদ যেন আরো বড় হয়েছে। যত রাত বাড়ছে, চাঁদ যেন আরো বেড়ে উঠছে। বড় স্থির বড় শান্ত রাত। ভেতরের সব অশান্তি যেন শান্তির ছদ্মবেশ

ধরে বাইরের প্রকৃতিতে বিরাজ করছে। অথচ কোথায় শান্তি? সেই বিসমার্ক যেন আবার জার্মান এম্পায়ার তৈরি করতে নতুন নামে এসে পৃথিবীতে জন্মেছে। এদিকে নর্থ আফ্রিকা আর ওদিকে অ্যাট্‌লান্টিক কোস্ট থেকে ইজিপ্‌সিয়ান বর্ডার পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে টিউটন্ জাতের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছে। ব্ল্যাক্ সী ঘিরে ফেলেছে জার্মান আর্মি। মেডিটারেনিয়ান এরিয়াও গ্রাস করে ফেলতে চলেছে। ককেশাস আর সুয়েজ ক্যানালে পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই। এমনি সময়......

—ওই দিদিমণি এসে গেছে!

কথাটা যেন স্বপ্নের মত কানে এসে লাগলো। বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। তারপর রঘু এসে দরজা খুলে দিয়েছে! সতী এসে ঘরে ঢুকলো। দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে। যেন অনেক ঝড় অনেক তুফান পেরিয়ে জেটিতে এসে পৌঁছুলো একটা পাল-তোলা নৌকো।

—কখন এলে তুমি?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর সাধারণতঃ দিতে হয় না। যে প্রশ্ন করে সেও এর উত্তর চায় না।

—আমি আসছি, একটু বোস!

তারপর তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে মুখে-হাতে জল দিয়ে এসে যথারীতি পাশের চেয়ারটায় বসলো সতী; বললে—আমি রঘুকে রেখে গিয়েছিলাম তোমার জন্যে। তুমি বুঝি অনেকক্ষণ বসে আছো?

দীপঙ্কর তবু কিছু কথা বললে না।

—রাগ করলে নাকি? কথা বলছো না যে? হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের কেসের জন্যে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের এটর্নী। তারপর—

দীপঙ্কর বললে—আমি জানি সব!

—তুমি জানো! কী করে জানলে! তোমাকে তো আমি বলিনি! আমার মনে ছিল না, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম! তুমি কী করে জানতে পারলে?

দীপঙ্কর বললে—অভয়ঙ্কর আমাকে সব বলেছে। তার কাছে সব শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই সকাল-সকাল চলে এসেছিলাম আপিস থেকে! কিন্তু অনেক রাত হলো......

বলে দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর যথারীতি প্রত্যেক দিনের মত দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সতী বললে—এ কি, তুমি চলে যাচ্ছো নাকি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

সতী বললে—আশ্চর্য, তুমি তো আমাকে বকলে না, কিম্বা কোনও উপদেশও দিলে না—

তারপর সতী গিয়ে দীপঙ্করের হাতটা ধরলে। বললে—এসো, আর একটু

বোস, রাগ করো না আমার ওপর, না-গিয়ে উপায় ছিল না বলেই গিয়েছি। কিন্তু এখন ভাবছি না-গেলেই হয়ত ভালো হতো।

—কেন?

সতী বললে—শুনলাম, যার জন্যে আমি এত করলুম সে নাকি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গিয়ে আমার শাশুড়ীর কাছে তোমার-আমার নামে প্রচুর নিন্দে করে এসেছে, শুনে ভাবলাম কার জন্যে আমি এত কষ্ট করলুম! জানো, কোর্টে জেরার উত্তর দিতে দিতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলুম—

দীপঙ্কর বললে—আমি সবই জানতাম, তুমি জানতে না এইটেই আশ্চর্য—

—কিন্তু একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে কি আমার বদনামটাই বড়? তুমিই বলো?

দীপঙ্কর বললে—তাহলে তাকে বাঁচিয়ে ভাল করেছ বলো? তাহলে আর অনুতাপ করছো কেন?

সতী হাত ধরে টানলে। বললে—তুমি রাগ কোর না দীপু। আর একটু বোস—আরো অনেক খবর আছে—

দীপঙ্কর বসলো। সতী বললে—আসবার সময় একটু নেমেছিলাম হাজরা রোডে—

—কেন?

সতী চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের মুখের দিকে। বললে—তুমি আবার জিজ্ঞেস করছো, কেন?

দীপঙ্কর বললে—তারা আবার তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তো?

—না, কিন্তু অন্য একটা সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে সেখানে। কৈলাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বললে আমার শাশুড়ীর নামে নাকি কোর্ট থেকে নীলেমের নোটিশ এসেছে, ও-বাড়ি নীলেম হয়ে যাবে। আমি দেখলুম, আমার শাশুড়ী উকীলের বাড়ি থেকে এলেন ট্যাক্সি করে—

—তারপর?

সতী বললে—আচ্ছা, যদি সত্যিই ও-বাড়ি চলে যায় ওদের তো ওরা যাবে কোথায়? ওদের তো আর কোনও যাবার জায়গাও নেই, আর কোনও শেলটারও নেই ওদের, কী হবে? শেষকালে কি ও-বাড়ি ছাড়তে হবে ওদের? বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হবে? সারা রাস্তা কেবল এই কথা ভাবতে ভাবতেই এসেছি আমি—

দীপঙ্কর বললে—আমি এর কী জবাব দেব—এ-সব কথার উত্তর উকীলই একমাত্র দিতে পারে—

সতী বললে—না, আমি মনে মনে তাই ভাবছিলুম কোথা থেকে কী হলো সব? জন্ম থেকে এতদিন ধরে যা কিছু দেখছি, যা কিছু শুনছি সব যেন কেমন

অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে, মানুষ তবু কেন এত অহঙ্কার করে, তবু কেন মানুষ এত বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে। কার জন্যে করে, কীসের জন্যে করে?

কথাগুলো বলতে বলতে সতী যেন কেমন উদাস হয়ে উঠেছিল। আজকে সতীর আশ্রয় জুটেছে, অর্থ জুটেছে, নিজের ওপর নির্ভর করবার সামর্থ্যও জুটেছে। এমনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর কত দিকে কত লোক তার শাশুড়ীর মত তার স্বামীর মতই নিরাশ্রয় হয়ে যাচ্ছে, কেউ তার হিসেব রাখছে না। এই কলকাতা শহর খুঁজলেও এমন কত উদাহরণ পাওয়া যাবে। প্রতিদিন কোর্টে গেলে হাসপাতালে গেলে কেবল নতুন করে মানুষের দৃষ্টি খুলে যায়। কিন্তু পৃথিবীর তো সময় নেই। পৃথিবী নিজের আবেগে ঘুরেই চলে দিনরাত, কে মরলো কে বাঁচলো তা দেখবার তা জানবার প্রয়োজন তার নেই।

হঠাৎ সতী বললে—কই, কথা বলছো না যে?

দীপঙ্কর বললে—কী কথা বলবো বলো?

সতী বললে—কিন্তু একলাই কি আমি কেবল কথা বলে যাবো? তুমি কিছু বলবে না? ওদের এত বড় সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আর তুমি শুধু চুপ করে থাকবে? তোমার কিছু বলবার নেই?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি কী কথা বলবো? কে আমার কথা শুনবে?

সতী বললে—কেন, আমি তোমার কথা শুনি না? আমি তোমার কথা কখনও শুনিনি?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা শুনলে আজকে সমস্তই অন্যরকম হতো সতী, আমার কথা শুনলে পৃথিবীও অন্যরকম হয়ে যেত আজ!

—তাহলে কেন তুমি আসো এখানে? না এলেই পারো! আমি তো মাথার দিব্যি দিয়ে তোমাকে আসতে বলিনি—

দীপঙ্কর বললে—না এসে পারি না যে!

—কিন্তু আমার এখানে তোমার কীসের এত আকর্ষণ শুনি? আমার কাছ থেকে তুমি কী চাও সত্যি করে বলো তো?

দীপঙ্কর চমকে উঠলো। চমকে উঠেই সতীর দিকে মুখ ফেরাল একবার। দীপঙ্করের মনে হলো—তার পিঠে যেন চাবুক মারলে সতী! মুখ দিয়ে শুধু বললে—ছিঃ—

বলেই দীপঙ্কর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সতী উঠে দাঁড়াল। বললে—যেও না, দীপু শোন, শুনে যাও—

দীপঙ্কর পেছন ফিরলো না। যেমন যাচ্ছিল তেমনিই চলতে লাগলো।

সতী তবু থামলো না। বললে—নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে বলে বুঝি পালিয়ে গিয়ে মুখ রক্ষা করছো? কিন্তু আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারো নি দীপু, তোমার সমস্ত ভণ্ডামি আমি ধরে ফেলেছি, পালিয়ে গিয়েও তুমি পার পাবে না, ঘুরে ফিরে তোমাকে আবার আমার কাছে আসতেই হবে—

দীপঙ্কর দরজাটা খুলে সোজা বাইরে রাস্তার গিয়ে পড়লো।

সতী তখন যেন নির্দয় নির্মম হয়ে উঠেছে একেবারে। বললে—জানি খুব বাহাদুরি দেখানো হলো আমার কাছে, খুব ভালো ছেলে সেজে রইলে, কিন্তু এও বলে দিচ্ছি আর কখনও যেন এ-বাড়িতে এসো না, আর কখনও ঢুকতেও পাবে না এখানে—

বলে দড়াম করে সশব্দে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলে সতী! তখনও সতীর বুকটা টিপ্ টিপ্ করছে উত্তেজনায়!

সতীর কথাগুলো তখনও তীরের মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বিঁধছিল দীপঙ্করের কানে। দীপঙ্কর দুই হাতে নিজের দুটো কান বন্ধ করে দিলে। তারপর জোরে জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগলো অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে। সমস্ত রাস্তাটা জনহীন! দীপঙ্করের মনে হলো সেই পূর্ণিমার রাত্রেও যেন তার জীবনের আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সামনের অনন্ত পথ যেন তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে অট্টহাসি হেসে উঠলো একবার! দীপঙ্কর আর সহ্য করতে পারলে না। সারা জীবন নিজে যে যন্ত্রণার জাল সৃষ্টি করেছে, তারই অষ্টোপাশে যেন সে আটকে গিয়েছিল। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করছে হাত-পা ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর সেই রাত দশটার সমুদ্রে আকণ্ঠ ঝাঁপ দিয়ে যেন পরিত্রাণ পেল!

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে বিকট শব্দ করে আকাশ-বাতাস অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে সাইরেন বেজে উঠলো! আশে-পাশে কোথাও কোনও আশ্রয় নেই। দীপঙ্কর ডাইনে-বাঁয়ে উত্তরে দক্ষিণে চারদিকে চেয়ে দেখলে। সামনেই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর গেটটা। গেটটা খোলা। কোনও ট্রেন আসবার কথা নেই এখন। ওখানেই ভূষণ মালী গুম্‌টি ঘরের মধ্যে ডিউটি দিচ্ছে। ওখানেই গিয়ে দাঁড়াবে নাকি সে? ওখানেই আশ্রয় নেবে নাকি সেন-সাহেব! সাইরেনের শব্দটা ঢেউ-এর মতন কেঁপে কেঁপে উঠছে নামছে—আর বাতাসকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে বিষাক্ত হয়ে উঠলো!

—দীপু-উ-উ-উ—

দীপঙ্কর থমকে দাঁড়াল একবার। কী যেন সন্দেহ হলো। পূর্ণিমার চাঁদের আলোর নিচে সতীর রুদ্ধশ্বাস অস্পষ্ট চেহারাটা নজরে পড়লো। যেন তার দিকেই আসছে সতী। দীপঙ্কর কী করবে বুঝতে পারলে না।

—দীপু—

সামনে এসে সতী দীপঙ্করের হাত দুটো চেপে ধরলে। তখনও হাঁফাচ্ছে সতী। বললে—চলো দীপু, ফিরে চলো—

দীপঙ্কর একবার ক্ষীণ চেষ্টা করলে। যেন প্রতিবাদ করতে চাইলে। যেন সতীর হাত দুটো ছাড়িয়ে দিতে চাইলে। কিন্তু সতী তখন জোরে আঁকড়ে

ধরেছে। একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে আকর্ষণ করে রেখেছে তাকে। বললে—ফিরে চলো দীপু, এয়ার-রেড্ হবে, শিগ্‌গির চলো—

—কিন্তু তুমি কেন বেরোলে এখন? এই সময়ে?

সতী বললে—আমি যা কিছু বলেছি সব মিথ্যে দীপু, তুমি ফিরে চলো—লক্ষ্মীটি—

—কিন্তু তুমি তো অন্যায় কিছু বলো নি!

—ন্যায়-অন্যায় আমি জানি না, তোমার পায়ে পড়ি দীপু, তুমি আর কথা বাড়িও না, এয়ার-রেডের পরে তোমায় ছেড়ে দেব আমি, এখন চলো তুমি, চলো—

সেই ঝাপসা আলো আর অবধারিত মৃত্যুর নিচে দাঁড়িয়ে দুজনে যেন দুজনকে নতুন করে চিনতে পারলে। সতী তাকে দুই হাতে আকর্ষণ করছে তখনও। মৃত্যু থেকে সে নিজে বাঁচবে। শুধু নিজে বাঁচবে তাই নয়, দীপঙ্করকেও সে বাঁচাবে। দরকার হলে নিজের মৃত্যু দিয়েও সে দীপঙ্করকে বাঁচাবে। মৃত্যুর চোরাবালি থেকে তুলে জীবনের তীর্থে প্রতিষ্ঠা করে তার দীপঙ্করকে সে পরিত্রাণ দেবে।

* * *

প্যালেস-কোর্টে তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। তবু অত ভোরেও মিস্টার ঘোষালের কফি খাবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অত সকালেও খবরের কাগজের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অত সকালেও টেলিফোন ধরার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। লাইফ ক্রমেই মিজারেব্‌ল হয়ে উঠছে ভদ্রলোকদের। পিস্‌ফুল সিটিজেনদের ক্রমেই কলকাতায় থাকা অসহ্য হয়ে উঠছে। হাজত থেকে ছাড়া পাবার পর সোজা প্যালেস-কোর্টে চলে এসেছিল মিস্টার ঘোষাল। এ ক'দিন কী ন্যাস্টি কেটেছে মিস্টার ঘোষালের। হাজতের মধ্যে স্মোক্ করবার আইন নেই, ড্রিঙ্ক করবার আইন নেই। এই টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরিতেও এ-রকম জেলখানা থাকে। এ-দিকে কেউ নজর দেয় না। কতদিকে কত রিফর্ম হচ্ছে, এদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না।

—পাঁচালি—

—হুজুর—বলে দৌড়ে এল পাঁচালি। পাঁচালি বহুদিনকার লোক। সে-ও মিস্টার ঘোষালের মামলায় একজন ডিফেন্স উইটনেস ছিল। সে-ও গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছে সাহেবের পক্ষে। তারপর সাহেব অনেক রাত্রে বাড়ি আসার পর ডিনার তৈরি করেছে, কফি তৈরি করেছে। সাহেবের সঙ্গে তখন মিস্টার গাঙ্গুলী ছিল। তারাও ড্রিঙ্ক করেছে, ডিনার খেয়েছে। এত বড় একটা মামলায় জিতিয়ে দিয়েছে মিস্টার ঘোষালকে, এর পর ক্লায়েন্টের ঘাড় ভেঙে খাওয়ায় কোনও অন্যায় নেই।

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—কিন্তু স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের কেসটায় কি

কোনও ডেজার আছে মিস্টার গাঙ্গুলী?

মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিল—ও তো হাতের পাঁচ মিস্টার ঘোষাল, আমার উইট্‌নেসরা তো সব রেডি, আপনি রাইব্‌ নিয়েছেন তার কোনও কংক্রিট্‌ প্রুফ্‌ নেই—

না, কোনও কংক্রিট প্রমাণ রাখবার মানুষ নয় মিস্টার ঘোষাল। জীবনে কখনও মিস্টার ঘোষাল নিজের হাতে ঘুষ নেয়নি। কখনও নিয়েছে দ্বিজপদ। তার আপিসের চাপরাসী। বেশির ভাগই মার্চেণ্টরা আসতো প্যালেস-কোর্টে। প্যালেস্‌-কোর্টের পার্লারে বসেই আদান-প্রদান চলতো মার্চেণ্টদের সঙ্গে। টাকা হাতে করে নিত পাঁরালি। এই নিয়ম বহুদিন ধরে চলে আসছিল। মিস্টার ঘোষালের বিশ্বাস ছিল অনেস্টি দিয়ে মডার্ন পৃথিবী চলে না। চলতে পারে না। অন্ততঃ অনেস্টি বলতে ডিক্সনারিতে যে-মানে লেখা আছে, তাই দিয়ে। অনেস্টির নতুন মানে লিখতে হবে। ডিক্সনারিও নতুন করে লিখতে হবে। শুধু অনেস্টি নয়, ট্রুথের মানেও বদলে গেছে। এখন নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে নতুন রিভ্যালুয়েশন করতে হবে সব জিনিসের। আসলে মিস্টার ঘোষালের কাছে একে ঘুষ বলে না। একে বলে সাইড-ইনকাম। মার্চেণ্টরা চায় অফিসাররা ঘুষ নিক্‌। ঘুষ না দিলে তাদের ব্যবসা চলবে না। মেশিনের পক্ষে যেমন তেল, চাকরির পক্ষে তেমনি ঘুষ। তেল দিলে যেমন মেশিন চালু থাকে তেমনি ঘুষ দিলে কাজও চালু থাকবে। ঘুষ বন্ধ হলে কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ক্লার্করা থাকবে নিখুঁত। ক্লার্করা যদি ঘুষ নেয় তো আপিস অচল হয়ে যাবে। তাই প্রায়ই মিস্টার ঘোষাল আপিসের ক্লার্কদের বলতো—আপনাদের বিরুদ্ধে যদি কখনও কোন কম্‌প্লেন্‌ আসে, আই শ্যাল্‌ ফিনিশ উইথ ইউ—

মিস্টার ঘোষাল আরো বলতো—রেলওয়ে আপনাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, রেলওয়ে আপনাদের প্রোভাইড করছে, আপনারা যে-কাজ করেন তার জন্যে আপনাদের রীতিমত মাইনে দেওয়া হচ্ছে—এখানে এসে গল্প করবার জন্যে, আড্ডা দেবার জন্যে মাইনে দেওয়া হয় না—

তারপর আরো উপদেশ দিত মিস্টার ঘোষাল। বলতো—রেলওয়ের প্রপার্টি দেশের প্রপার্টি, রেলওয়ের কাজ দেশের কাজ, রেলওয়ের প্যাসেঞ্জারদের সুখ-সুবিধে দেখা আমাদের কাজ, আমাদের দায়িত্ব। যতক্ষণ আমরা রেলওয়েতে চাকরি করছি ততক্ষণ দিনরাত আমরা নিজেদের লাভ-লোকসানের কথা ভাববো না, ভাববো রেলের লাভ-লোকসানের কথা! রেলের লাভ হলেই আমাদের লাভ, রেলের লোকসান হলেই আমাদের লোকসান—বুঝলেন? বুঝলেন কিছু আপনারা?

সামনে দাঁড়িয়ে হাবার মত ক্লার্কদের দিনের পর দিন এই সব বক্তৃতা শুনতে হতো।

—দেখুন আমি যখন বিলেতে ছিলুম তখন থেকেই ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের

বদনাম শুনেছি। শুনে আমার বড় লজ্জা করতো! এখানে এসেও আমার ফ্রেণ্ডরা যখন বলে যে তোমাদের রেলওয়ে স্টাফ্‌ বড় করাপ্ট, তখন আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। তারা বলে টিকিট-কালেক্টররা নাকি প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়, বুকিং-ক্লার্করা নাকি মার্চেণ্টদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়—হোয়াট এ শেম্‌? ছি ছি—আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত রিয়ালি, আমি এই রেলওয়ের এই বদনাম মুছে ফেলতে চাই! এই বদনামের জন্যে আপনারা যারা ক্লার্ক তারাই দায়ী, আপনাদের জন্যেই সমস্ত বাঙালী জাত আজ ছোট হয়ে গেছে ফরেনারদের চোখে—আই মাস্ট স্টপ্‌ ইট্‌। আমি চাই আমার আণ্ডারে যত স্টাফ্‌ আছে সবাই মাস্ট্‌ বি ভেরি অনেস্ট! অনেস্টি ইজ্‌ দি বেস্ট পলিসি। আমি যখন বিলেতে ছিলুম তখন থেকে একটা কথা আমি মুখস্থ করে রেখেছি—কথাটা হচ্ছে—No honest man ever repented of his honesty.

এইরকম দিনের পর দিন আপিসে বক্তৃতা দিয়েছে মিস্টার ঘোষাল আর রামমনোহর দেশাইরা রাত্রে এসে চুপি চুপি দেখা করেছে মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে। কখনও দিয়েছে ক্যাশে, কখনও কাইণ্ডে। কখনও দিয়েছে টাটকা মেমসাহেব, কখনও দিয়েছে টাটকা বোতল। এমনি অবস্থায় ঘটনাচক্রে প্যালেস-কোর্টে এসে পড়েছিল সতী। তখন থেকে আর কোনও অসুবিধে হয়নি। আপিসে মার্চেণ্টরা আসতো ওয়াগন চাইতে। মিস্টার ঘোষাল যখন ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের পাড়ায় আপিসের স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে আর্জেণ্ট-ওয়ার্কে ব্যস্ত তখন চিট্‌ নিয়ে আসতো মার্চেণ্টের দল।

সতী হয়ত নিজের ফ্ল্যাটে চুল বাঁধছে, হঠাৎ পাঁরালি আসতো হাতে চিট্‌ নিয়ে।

সতী বলতো—কী রে পাঁরালি, কী?

—হুজুর, একটা আদ্‌মী এসেছে সাহেবের কাছ থেকে।

মিস্টার ঘোষালের হাতের লেখা ছোট-চিঠি। চিঠিতে নানা সময়ে নানা রকম লেখা থাকতো। মিস্টার ঘোষাল লিখতো—সতী এই মার্চেণ্টকে পাঠাচ্ছি, এ তিন হাজার টাকা দেবে, টাকাটা নিও। আমি ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেব। টাকাটা গুণে নিতে ভুলো না।

কখনও ক্যাশ টাকা, কখনও রেডিও সেট, কখনও রেফ্রিজারেটার, কখনও রেডিওগ্রাম। সে-সময়ে ঘর ভর্তি হয়ে গিয়েছিল মিস্টার ঘোষালের। শুধু তাই নয়, কখনও শাড়ি, কখনও গয়না, কখনও ফার্নিচার। উপহারের শেষ ছিল না সে-ক'বছর।

প্রত্যেকবার মিস্টার ঘোষাল চিঠি দিয়ে পাঠাতো বাড়িতে, আর প্রত্যেকবার সতী নিত টাকাগুলো।

মিস্টার ঘোষাল বাড়ি এসে টাকাগুলো নিত। আর তারপর পরের দিন আপিসে গিয়ে আবার সেই বক্তৃতা দিত। বলতো—হোয়াট এ শেম্‌! ছি ছি

আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত রিয়্যালি। আমি চাই রেলওয়ের বদনাম ঘুচিয়ে ফেলতে। এই বদনামের জন্যে আপনারা যারা ক্লার্ক তারাই দায়ী, আপনাদের জন্যেই সমস্ত বাঙালী জাত ছোট হয়ে গেছে অন্য সকলের চোখে—

কিন্তু শেষে অন্য পন্থা ধরেছিল মিস্টার ঘোষাল। যখন ঘরে ফার্নিচার ভর্তি হয়ে গেল, রেডিও, রেফ্রিজারেটার, রেডিওগ্রাম রেখে আর জায়গা নেই, তখন ধরেছিল অন্য ছল! যারাই আপিসে আসতো টাকা দিতে, তাদের হাত থেকে টাকা নিত না মিস্টার ঘোষাল। প্রত্যেককেই যেতে হতো মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে। সেখানে ফ্ল্যাটের দরজায় ছিল লেটার বক্স। সেই লেটার বক্সে টাকা ফেলে দিয়ে আসতে হতো মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে। পাঁচশোই হোক আর পাঁচ হাজারই হোক—সমস্ত। তার পরদিন টাকা পেয়েই ওয়াগন সাপ্লাই-ফর্মে সই করে দিতো মিস্টার ঘোষাল হাসিমুখে। আর ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হতো না কাউকে।

এমনি করেই চলছিল মিস্টার ঘোষালের জীবন। একদিকে সতী, সনাতনবাবু আর নয়নরঞ্জিনী দাসীর প্রাণান্তকর জীবন, অন্যদিকে ছিটে-ফোঁটা-প্রাণমথবাবুর উদগ্র সংগ্রাম, আর একদিকে কিরণের, ক্ষীরোদার মর্মান্তিক একক যন্ত্রণা। আর কলকাতার আর এক সমাজের শীর্ষে বসে মিস্টার ঘোষালের অশোভন উৎপাত। আর সকলের শেষে দীপঙ্করের বেদনাদায়ক ভূমিকা। এই নিয়েই উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের এক মহা উপন্যাস লেখা হচ্ছিল। এমন সময় সব গোলমাল হয়ে গেল মিস্টার ঘোষালের গ্রেপ্তারে।

শুধু মিস্টার ঘোষালের গ্রেপ্তারই নয়। দীপঙ্কর বুঝতেই পারেনি এমন করে কেনই বা সমস্ত কিছু জটিল হয়ে গেল? সনাতনবাবুর সমস্ত ধ্যান কেন এমন করে ভাঙলো কোন এক নির্মল পালিতের হঠকারিতায়? নয়নরঞ্জিনী দাসীর সব গর্বই বা কেন এমন করে চুরমার হয়ে গেল এক নীলেমের নোটিশে! আর লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদির কথা পরে বলবো!

সকাল থেকেই মিস্টার ঘোষালের কাজের শেষ ছিল না। অনেক দিন পর রাত্রে এই প্রথম ভালো ঘুম হয়েছে। আগের রাত্রে মিস্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। সেসনস্ কোর্টের সব গোলমাল মিটে গেছে। বাকি আছে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল। সেখানেও সব নথিপত্র তৈরি। প্রথমে প্রসিকিউশন্ হিয়ারিং হয়ে গেলেই ডিফেন্স হিয়ারিং শুরু হবে। ছুটির আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। দ্বিজপদকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে পালিয়ে গেছে। আর এক উইটনেস মিসেস ঘোষ। মিসেস ঘোষের কাছ থেকে কোনও ভয় পাবার নেই। সেদিক থেকেও মিস্টার ঘোষাল নিশ্চিন্ত!

পীরালি যথারীতি কফি নিয়ে হাজির হলো সামনে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—দ্যাখ্ পীরালি, যদি কেউ আসে আমাকে খুঁজতে,

বলবি আমি নেই—

—হুজুর?

মিস্টার ঘোষাল রেগে গেল। কথার প্রতিবাদ জীবনে কখনও সহ্য করতে পারে না মিস্টার ঘোষাল। বললে—কী?

—জগন্নাথ এসেছিল, আর মকবুল—আর যতীন—

মিস্টার ঘোষাল আগুন হয়ে উঠলো। বললে—স্কাউণ্ড্রেলদের এখানে ঢুকতে দিবি না, কাউকেই ঢুকতে দিবি না, কেউ যেন এখানে না আসে, বলবি যে-টাকা আমি দিয়েছি তার বেশি আমি দিতে পারবো না, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে, এর পরের মাস থেকে কেউ মাইনে পাবে না, বলে দিবি তুই—

তারপর বললে—হ্যাঁরে, ড্রাইভার এসেছে?

সকাল হয়েছে। প্যালেস-কোর্টের ভেতরে টেনেণ্টরা তখনও ঘুমোচ্ছে, কিন্তু বয়, বাবুর্চি, আয়া, খানসামাদের তখন দুপুর। তারা ভোর তিনটের উঠে জল গরম শুরু করে দিয়েছে, ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা আরম্ভ করে দিয়েছে। ক্লিনাররা গাড়ি সাফ্ করতে লেগে গেছে। চিম্নি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে রাত থাকতেই। কিন্তু সব কাজ আস্তে করা চাই। শব্দ করতে পারবে না কেউ। নইলে সাহেবদের ঘুম ভেঙে যাবে। সাহেবরা অনেক কাজের লোক। অনেক মাথা-ঘামাবার কাজ করতে হয় তাদের। তোমরা গরীব, তোমরা সাহেবদের জন্যে খাটো, সাহেবদের জন্যে খেটে-খেটে মরো। তোমরা মরলে দেশের ক্ষতি নেই, কিন্তু সাহেবদের বিরক্ত কোর না। ওরা অনেক কাজের লোক। অনেক দামী ওদের লাইফ। ওদের আরাম করে ঘুমোতে দাও।

সামনেই খবরের কাগজটা পড়ে ছিল। সেদিকে নজর পড়তেই মিস্টার ঘোষাল সেটা তুলে নিলে। জাজমেণ্টটা বেরিয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারা খবরটা শেষপর্যন্ত ছেপে দিলে? মিস্টার ঘোষাল আগ্রহের সঙ্গে পড়তে লাগলো—

—ড্রাইভার এসেছে হুজুর!

'যে জঘন্য অপরাধের জন্যে আসামীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার নিন্দে করবার মত ভাষা আমার জানা নেই। আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, এই সুসভ্য কলকাতা শহরে আসামীর মত এমন ব্যক্তিও সগর্বে মাথা উঁচু করে বিরাজ করছে। এই আসামী শুধু কলকাতার নয়, সমস্ত মানব সমাজের শত্রু। আজ উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আমি আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলাম বটে, কিন্তু আমার ভয় হয়, এই মুক্তি হয়ত আসামীকে আরো দুঃসাহসী, আরো বেপরোয়া করে তুলবে। আর এমন দিন হয়ত আসছে বলে আশঙ্কা করি যখন এই জাতীয় আসামীর সংখ্যা কলকাতার সমাজে আরো বেড়ে যাবে। আর সব চেয়ে আশঙ্কা এইজন্যে যে আসামী নিজেকে সম্ভ্রান্ত সুসভ্য বলে পরিচয় দিয়েছে। অশিক্ষিত দরিদ্র শয়তানের চেয়ে শিক্ষিত ধনী শয়তান সমাজের পক্ষে আরো ভয়াবহ বলে আমি মনে করি......

—ড্রাইভার এসেছে হুজুর!

—চোপরাও হারামজাদ্, ভাগো হিঁয়াসে, গেট্ আউট্ গেট আউট্—

হঠাৎ খবরের কাগজের ঝালটা সমস্ত গিয়ে পড়লো পীরালির ওপর। পীরালির এ-সব সহ্য করা অভ্যেস আছে। চুপ করে রইল সে। মিস্টার ঘোষাল জাজমেন্টটার সমস্তটা আর পড়লে না। দুই হাতে যত শক্তি ছিল, সব শক্তি দিয়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে কাগজটাকে। ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করলেই যেন খবরের কাগজের লক্ষ-লক্ষ কপি থেকে নিজের কলঙ্ক মুছে ফেলা যাবে! তারপর জামা-সুট বদলে তৈরি হয়ে বেরোল। অনেক কাজ মিস্টার ঘোষালের। স্যার জন্ হার্বার্টের ফ্রেন্ড, চীফ মিনিস্টার ফজলুল হকের ফ্রেন্ড আজ বিপদে পড়েছে, এতে ভয় পাবার কিছু নেই। এই যে অনারেবল মিস্টার এন আর সরকার। নলিনীরঞ্জন সরকার। দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী মুদালিয়ারের জায়গায় ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কমার্স মেম্বার হলো আজ। একে নিয়েও তো কত মামলা, কত মকর্দমা হয়েছে কোর্টে। খবরের কাগজে দিনের পর দিন কত কেলেঙ্কারির খবর ছাপা হয়েছে। সব লোক ছি ছি করেছে। কিন্তু কে আজ তা মনে রেখেছে? টাকা দিয়ে সব কেনা যায়। টাকা দিয়ে পাপ যেমন কেনা যায়, পুণ্যও তেমনি কেনা যায়। টাকা দিয়ে রেসপেক্ট কেনা যায়। ফেম্ কেনা যায়। মিস্টার ঘোষালও টাকা দিয়ে সব কিনে ফেলবে আবার। যে-জজ্ জাজমেন্ট দিয়েছে, টাকা দিয়ে তাকেও একদিন কিনে ফেলবে মিস্টার ঘোষাল! আসলে money makes a man.

সাহেব বেরিয়ে যাবার পরই পীরালির বেশি কাজ। তখন গেলাস, বোতল, চুরোট, পায়জামা সমস্ত গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে হবে। সাহেব যতক্ষণ না-আসে ততক্ষণ সাহেবের লাঞ্চ, সাহেবের কফি, সাহেবের গেলাস, বোতল, চুরোট আবার ঠিকঠাক সব রেডি করে রাখতে হবে। এইটেই নিয়ম এত কালের।

মিস্টার ঘোষাল গাড়িতে উঠেই হুকুম দিলে—গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং—

প্রথমেই মিসেস ঘোষের কাছে যাওয়া ভালো। কালকে কোর্টে মিসেস ঘোষ তার জন্যে যা করেছে, সে-জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসতে হবে। তারপর? তারপরের কথা তারপরে ভাবা যাবে। স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের কোর্টের কথাও ভাবতে হবে, পরামর্শ করতে হবে। মিস্টার গাঙ্গুলী অনেক ডকুমেন্ট অনেক উইটনেস-এর লিস্ট করেছে। প্রথমে প্রসিকিউশন হিয়ারিং, তারপর হবে ডিফেন্স্। ডিফেন্স্ হিয়ারিং-এর দিনেই মিসেস ঘোষকে আবার হাজির হতে হবে কোর্টে। আবার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে উইটনেস্-বক্সে।

পীরালিও প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ঘর পরিষ্কার করতে-করতে হঠাৎ মুখোমুখি হতেই চমকে উঠেছিল।

—মেমসাহেব, আপনি?

—আমি এলুম পীরালি। তোমাদের দেখতে এলুম।

পীরালি সেলাম করতেই ভুলে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে দু'বার হাত ঠেকালে কপালে।

—কিন্তু সাহেব তো নেই মেমসাহেব?

সতী বললে—সাহেব কোথায় গেছে?

যেন সতী জানে না। যেন সতী মিস্টার ঘোষালকে বাইরে যেতে দেখেনি। মিস্টার ঘোষালের গাড়িটা সামনে পড়তেই আর একটু হলে ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়ে আত্মগোপন করতে পেরেছিল বলেই রক্ষে। আগের দিন সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ঘুম না-হবারই কথা। সেই রাত্রে সতী যেন জীবনে সেই প্রথম দীপঙ্করের ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিল। সাইরেন বাজবার পর অনেকক্ষণ সব শান্ত, সব স্তব্ধ। সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মানুষ নেই, মানুষের প্রেতাত্মাও বুঝি নেই কোথাও। সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করেছে সবাই। আলো নিভিয়ে দিয়েছে। সবাই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে অসাড় হয়ে গেছে।

সতী জিজ্ঞেস করেছিল—কী ভাবছো দীপু?

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু কেন তুমি আমাকে টেনে আনলে সতী? কী উদ্দেশ্য তোমার?

—কিন্তু এ-সময়ে কি কেউ বাইরে থাকে? নিশ্চয় কোথাও-ও বোমা পড়বে। আমি জেনে-শুনে কী করে তোমাকে ছেড়ে দিই বলো তো?

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু আমি বাঁচলে তোমার কী লাভ?

—আমার লাভ না-হলেও তোমার তো লাভ! তুমি বেঁচে থাকলে তোমার নিজেরও তো ভালো?

—আমার ভালো কি তুমি সত্যিই চাও?

সতী অন্ধকারের মধ্যেই বলেছিল—চাই না, এ-কথা তোমায় কে বললে? জানো, তোমার মা'র পরে আমার মত এমন করে তোমার ভালো কেউ চায়নি!

অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায়নি। সতীর মনে হয়েছিল একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ যেন কোথা থেকে শোনা গেল। কার দীর্ঘশ্বাস, দীপঙ্করের না তার নিজের, তাও ঠিক বোঝা গেল না। তবু শব্দটা শুনে মনে হলো যেন বড় ক্লান্তি বড় শ্রান্তির খাদ মেশানো তাতে। যেন সতীই নয়, দীপঙ্করও যেন ক্লান্ত। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের উনিশের-একের-বি বাড়িটা থেকে যে ছেলেটা একদিন যাত্রা শুরু করেছিল সংসারে, সে যেন এতদিন পরে এত বাধা অতিক্রম করে এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এ পৌঁছে বড় বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

বাইরে তখন সব নিঃঝুম। দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আমাকে আজ এমন ভাবে এখানে এনে তুমি ভুল করেছ সতী!

—কেন? কী ভুল করলাম?

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না, আমি কত দুর্বল! এমন ভাবে আমাকে এখানে এনে তুমি ভাল করো নি!

সতী বললে—তোমাকে বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিলেই কি তোমার ভাল করতাম বলতে চাও?

—হয়ত ভাল করতে! হয়ত তাই করাই তোমার উচিত ছিল। হয়ত তাই করলেই আমি সহজে আত্মরক্ষা করতে পারতাম!

সতী কিছু কথা বললে না খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললে—সত্যি, তোমার মত যদি মনের জোর পেতাম আমি—

দীপঙ্কর বললে—তুমি আমার মন চেনো না বলেই এ-কথা বললে! আমি নিজেই এতদিন ধরে এত চেষ্টা করেও আমার নিজের মনকে চিনতে পারলাম না! তুমি কত দিন কত আঘাত দিয়েছ, কত অপমান করেছ, তবু কি দূরে চলে যেতে পেরেছি? আমার মনের যদি অত জোরই থাকতো তো তোমার এত বড় অভিযোগের পরেও আমি এখানে আসি?

সতী বললে—সত্যি দীপু, ও-ও যদি তোমার মতন হতো!

—কে? কার কথা বলছো?

কিন্তু প্রশ্নটা করেই দীপঙ্কর ভুল বুঝতে পেরে থেমে গেল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে সতীর গলার আওয়াজ শোনা গেল আবার। সতী বলতে লাগলো—সত্যি বলছি দীপু, তোমার মতন যদি ও হতো!

দীপঙ্কর বললে—ছিঃ, সনাতনবাবুকে তুমি এখনও চিনলে না!

—খুব চিনেছি। আমার আর ওকে চিনতে বাকি নেই। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন এক ঘরে এক বিছানায় শুয়েও যদি না-চিনতে পেরে থাকি তো আর চিনতে পেরেও কাজ নেই। তোমাকে দেখি আর ভাবি ও-মানুষটার কথা! জানো দীপু, রূপ আছে বলে আমার খ্যাতি ছিল, গুণও কিছু ছিল বলে সবাই বলেছে, কিন্তু সে-সব কী কাজে লাগলো শেষ পর্যন্ত? আমার রূপ-গুণ দিয়ে আমি কার কোন্ উপকারটা করতে পারলুম? অথচ দেখ—

একটু পরে আবার সতীর গলার শব্দ শোনা গেল। সতী বলতে লাগলো—অথচ দেখ আজ আমার সব থেকেও কিছু নেই! ছোটবেলায় লক্ষ্মীদির জন্যেই বাবার ভাবনা ছিল, আমার জন্যে বাবা ভাবতেন না। বাবা বলতেন—সতী আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে। সতী নিজের ভালো-মন্দ বোঝে, ওর জন্যে আমার মাথা-ব্যথা নেই, কিন্তু লক্ষ্মীর কথা ভেবেই আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না। কিন্তু আজ বাবা বেঁচে থাকলে কী হতো বলো তো? লক্ষ্মীদি আজ কোথায়, আর আমি কোথায়—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু লক্ষ্মীদিই কি সুখী?

সতী বললে—তা আমিই কি সুখী বলতে চাও? এত ভাল হয়ে আমি কী সুখ পেলাম জীবনে? কী লাভটা হলো আমার? তাহলে লক্ষ্মীদির মতন জীবন কাটালেই পারতাম! ওই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে শ্বশুরবাড়ির সামনে ঘর-ভাড়া নিয়ে আমিও তো বেশ আনন্দে লক্ষ্মীদির মত দিন কাটাতে পারতাম!

—কিন্তু তাহলে তোমার বিবেকের কাছে তুমি কী জবাবদিহি করতে?

—তা লক্ষ্মীদিই কি বিবেকের কাছে কিছু জবাবদিহি করে ভেবেছো? কোন্ দুঃখটা পাচ্ছে শুনি সে? লক্ষ্মীদির তো কোনও কষ্টই নেই। টাকা, ছেলে, স্বামী সংসার সবই তো লক্ষ্মীদি পেয়েছে। কোন্‌টা পেতে বাকি রয়েছে লক্ষ্মীদির? লক্ষ্মীদির কাছে আমি কী? লক্ষ্মীদির কাছে আমি কতটুকু? আজ লক্ষ্মীদির বাড়ি ছিল বলে তবু মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছি একটা, নইলে কোথায় থাকতুম আমি? কী করতুম বলো তো?

হঠাৎ কোথায় যেন গুম্ গুম্ করে শব্দ হলো কয়েকটা। বোধহয় কোথাও বোমা পড়লো। দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর আবার সব চুপচাপ। অন্ধকারের মধ্যে দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দীপঙ্করের মনে হলো যেন বড় কাছাকাছি বসে আছে সে। দীপঙ্কর একটু দূরে সরে বসলো।

সতী বললে—ওখানে কী হচ্ছে এখন কে জানে!

—কোথায়?

—প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে!

—ওদের কথা তুমি এখনও ভাবো?

সতী বললে—ভাববো না? তুমি যেমন এখানে না-এসে পারো না, আমিও যে তেমনি ওদের কথা না-ভেবে থাকতে পারি না। এক-একবার মনে হয় আর ভাববো না। আমার কথা যে ভাবে না, আমার কথা নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, তার কথা আমিও ভাববো না। কিন্তু জানো দীপু, যখন থেকে শুনলাম যে ওদের বাড়ি নীলেম হয়ে যাবে, ওদের থাকবার জায়গা থাকবে না, তখন থেকে বড় কষ্ট হচ্ছে মনে মনে—অথচ আমি কোথায় থাকছি, কী করছি, তা নিয়ে তো ওদের কোনও মাথা-ব্যথা নেই?

—ওরা যদি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসে তো তুমি দেবে নাকি?

—সে তো পরের কথা। ওরা তো আর সত্যি-সত্যি টাকা চাইতে আসছে না!

—কিন্তু চাইতে আসতেও তো পারে! ওদের কিন্তু টাকার ভীষণ দরকার। টাকা না দিলে কোর্ট থেকে ওদের বাড়ি দখল করবে! তুমি টাকা দিলে ওরা এই বিপদ থেকে বেঁচে যায়।

সতী যেন রেগে গেল। বললে—ওরা তো বাঁচবেই। কিন্তু কেন আমি দেব বলো তো? আমার কীসের দায় পড়েছে? আমার বিপদের সময় কি ওরা দেখেছে একটু? আমি যখন বিপদে পড়েছিলুম, কোনও আশ্রয় না-পেয়ে ঘোষালের প্যালেস-কোর্টে গিয়ে উঠলুম, তখন কি একবারও খোঁজ নিয়েছিল আমার?

দীপঙ্কর বললে—বিপদের দিনে কেউ কাউকে দেখে না সতী, সেটা আশা

করাই অন্যায়

—কিন্তু তুমি তো দেখেছিলে?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও—

—কেন, ছাড়বো কেন? তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক? তবু তো তুমি বরাবর আমার দেখা-শোনা করেছ! তুমি ভুলে যেতে পারো কিন্তু আমি তো ভুলিনি সে-সব দিনের কথা! তোমাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলুম, চাকর মনে করে চারটে পয়সা তোমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলুম! তারপর আমি কত অপমান করেছি, কত অন্যায় করেছি—অন্য কেউ হলে কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো সে? অন্য কেউ হলে আজকে আমার বিপদের দিনে দেখতো আমাকে?

দীপঙ্কর হেসে উঠলো। বললে—তোমার তো স্মরণশক্তি খুব দেখছি?

সতী যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বললে—স্মরণশক্তি নয় দীপু, এ শুধু স্মরণশক্তি নয়—

—স্মরণশক্তি নয় তো কী?

সতী বললে—সে তুমি বুঝবে না, সে আমি তোমাকে বোঝাতেও পারবো না। যদি কোনওদিন আমার ক্ষমতা হয় তো তোমার এ-ঋণ আমি একদিন শোধ করবোই—

দীপঙ্কর আবার হাসতে লাগলো। বললে—শোধ করবে? কী করে?

—কী জানি কী করে শোধ করবো! কিন্তু মনে হয় এ-ঋণ শোধ করতে না-পারলে আমি হয়ত স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি বলে দিতে পারি কী করে এ-ঋণ তুমি শোধ করতে পারবে।

—কী করে?

—তোমার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। তুমি সনাতনবাবুর কাছে গেলেই আমি সবচেয়ে সুখী হবো সতী, আর কিছুতেই অত সুখী হবো না আমি।

—কিন্তু এর পরেও তুমি আমাকে যেতে বলছো সেখানে? এত ঘটনার পরেও? তুমি সব জেনেও এই কথা বলতে পারছো? এর পরে হয়ত আমার কাছে টাকা আছে শুনে তারা আসবে, হয়ত খুব খাতিরও করবে জানি, কিন্তু তাতেই কি আমি আগেকার সব অপমান ভুলে যেতে পারবো? এর পরেও কি আমি তাদের ক্ষমা করতে পারবো?

দীপঙ্কর বললে—করলেই বা! তাতে তো তুমি নিজের কাছে নিজে ছোট হবে না!

সতী কী যেন ভাবতে লাগলো। বললে—কিন্তু সত্যিই তাতে তুমি সুখী হবে? তাতেই তোমার সব চাওয়া-পাওয়া মিটে যাবে?

—যদি বলি যাবে?

সতী বললে—তোমাকে তো বলেছি দীপু, তোমার জন্যে আমি তাও করতে

পারি, দাঁতে দাঁত চেপে না-হয় আমি সেখানেই পড়ে রইলুম সারাজীবন, কিন্তু তুমি? তুমি কী করবে? তুমি কী পাবে? তোমার কী লাভ হবে তাতে?

দীপঙ্কর বললে—সংসারে লোকে লাভ-লোকসানের নানারকম ব্যাখ্যা করে, আমারও হয়ত নতুন ধরনের একরকম ব্যাখ্যা আছে। যে-ব্যাখ্যা কেউ আজ পর্যন্ত করেনি!

—কিন্তু কেন? কেন তুমি এত কষ্ট করতে যাবে দীপু? কীসের জন্যে? কোন্ দায়ে?

দীপঙ্কর বলে—ও-সব কথা নাই বা বললে তুমি, অন্য কথা বলো এখন।

সতী বললে— কিন্তু কেন বলবো না? কেন তুমি সারাজীবন এমন করে নিজেকে কষ্ট দেবে? তোমার কষ্ট দেখলে যে আমারও কষ্ট হয়! তোমার জন্যে যে আমারও রাত্রে ঘুম হয় না, তা জানো?—সত্যি বলো তুমি, তোমাকে বলতেই হবে, আমার কথার জবাব দিতেই হবে—

বলতে বলতে সতী যেন এগিয়ে এল। অন্ধকারের মধ্যেই দীপঙ্করের হাতটা আন্দাজে ধরে ফেললে জোরে। বললে—তোমাকে এ-কথার জবাব দিতেই হবে দীপু, জবাব না দিলে তোমাকে আজ আমি ছাড়বো না—

দীপঙ্কর হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। বললে—ছি, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

সতীর হাতের স্পর্শটা যেন গরম ঠেকলো দীপঙ্করের কাছে। বললে—এ কি করছো তুমি?

সতী তখনও বলছে—না, জবাব না-দিলে তোমার আমি ছাড়বো না আজ, দিতেই হবে জবাব—

সতী যেন আরো জোরে চেপে ধরলো তার হাতটা। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ, সব অন্ধকার। দীপঙ্করের মনে হলো এতদিন পরে তার জীবন যেন তাকে এক কুটিল পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এতদিন বঞ্চনা করে এসে যেন এবার সে প্রতিশোধ নেবে তার ওপর। দীপঙ্কর বললে—ছাড়ো—

কিন্তু সতীকে ছাড়তে হলো না। তার আগেই অল্ ক্লিয়ার সিগ্‌ন্যাল্ বেজে উঠেছিল বিকট শব্দ করে। অস্পষ্ট মানুষের কোলাহল শোনা গেল বাইরে। শান্ত শহর যেন এতক্ষণ নির্জীব হয়ে ঘুমোচ্ছিল, এবার জেগে উঠলো। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটা জ্বেলে দিলে। সতীও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। রঘু বাইরে ছিল সে-ও ডাকলে বাইরে থেকে—দিদিমণি—

দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরোল। পেছন ফিরে দেখলেও না একবার। তারপর সদর দরজা খুলে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

সে-রাত্রে তারপর আর ঘুম আসে নি সতীর। কেবল মনে হয়েছিল—এ কেমন করে সম্ভব হলো? রঘু খাবার কথা বলতে এসেছে। কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে সতী কিছুই খায়নি। বিছানায় শুয়ে কেবল সারারাত ছট্‌ফট্ করেছে। হয়ত কলকাতার কোথাও বোমা পড়েছে, কিম্বা

হয়ত পড়েনি। অল্ ক্লিয়ার সিগন্যাল বাজবার পর অনেক রাত পর্যন্ত এ-আর-পি সিভিক-গার্ড'রা রাস্তায় টহল দিয়ে হল্লা করেছে। মনে আছে সমস্ত রাতটা যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল। তারপর আস্তে আস্তে ভোর হলো। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধটা যেন আরো প্রকট হয়ে উঠলো নিজের কাছে। নিজের কাছেই নিজের লজ্জা করতে লাগলো। তারপর তাড়া-তাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে রঘুকে ডাকলে।

রঘু ঘুমোচ্ছিল। অনেক রাত্রে শুয়েছে সে। ধড়ফড় করে উঠে বসতেই দিদিমণিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—কী হলো দিদিমণি?

সতী বললে--আমি একবার বেরোচ্ছি এখন রঘু—

—আমি সঙ্গে যাবো?

সতী বললে—না, শুধু দরজাটা বন্ধ করে দাও—

—গাড়ি ডাকতে হবে না?

সতী বলেছিল—না, আমি হেঁটেই চলে যাবো এ-টুকু।

তারপর আরো অনেক প্রশ্ন করেছিল রঘু। কোথায় যাচ্ছে সতী, কখন ফিরবে, কিন্তু কোনও কথারই জবাব দিতে পারেনি তখন। মনের সে-স্থিরতাই ছিল না তার তখন। তারপর সোজা চলে এসেছে একেবারে এখানে। প্রথমে একটু ভয় ছিল। হয়ত সকাল বেলা দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মনে মনে একটা সন্দেহ ছিল—অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে হয়ত ঘোষাল বাড়িতে নাও থাকতে পারে। তারপরে গাড়িটা দেখেই চিনতে পেরেছিল। আর তারপরেই মিস্টার ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল।

পীরালি বললে--আপনাকে অনেক দিন দেখিনি মেমসাহেব?

সতী বললে—তোমরা সব ভালো ছিলে তো পীরালি? কাজ-কর্ম ভাল চলছে তো?

পীরালি বললে—শুনেছেন তো সাহেব খালাস পেয়ে গেছেন কাল?

সতী বললে—হ্যাঁ শুনেছি, সেই জন্যেই তো দেখা করতে এলাম—

পীরালি বললে—একটু বসুন না মেমসাহেব, এতদূর এলেন, একটু কফি বানিয়ে দিচ্ছি--ভেতরে এসে বসুন না—

সতী ভেতরে ঢুকলো। অনেকদিন পরে আবার এখানে আসা। অনেক দিন অনেক রাত কেটেছে এই বাড়িতে। সে-সব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে এখনও যেন আতঙ্ক হয় সতীর। এখানেই তার হাত দিয়ে হাজার-হাজার টাকা নিয়েছিল মিস্টার ঘোষাল। এই ঘরেই কত হাজার-হাজার মেয়ের জীবন-যৌবন লুঠ হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ টাকার কত বেসাতির বেচা-কেনা চলেছে এই বাড়ির এই কামরাতেই, তার হিসেব কোথাও লেখা নেই। এখানে এই খবরের কাগজ আর টেলিফোনের পৃথিবীতেই কত ওয়ার, কত স্মাগল, ঘটে গেছে। নিঃশব্দে কত বোমা এখানেই ফেটেছে কেউ টের পায়নি এতদিন। ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকেই এখানে টাকা, নাম, পলিটিক্স, রক্ত নিয়ে কত রাহাজানি চলেছে। কলকাতার এই সব ফ্ল্যাটের ভেতরেই তো আসলে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয় প্রথম, তারপর তো পৌঁছোয় অ্যাসেমব্লিতে, পার্লামেন্টে। এখানেই যে-সব ষড়যন্ত্র হয়, তাই-ই একদিন পার্লামেন্টে আইন হয়ে পাস হয়ে যায়। এতদিন শুধু ধরা পড়েনি এই যা তফাৎ। আজ ধরা পড়েই মিস্টার ঘোষাল মহা ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠেছে। নইলে গভর্নর, মিনিস্টার, মিনিস্টারদের আই-সি-এস-দের সঙ্গে মিস্টার ঘোষালের আর তফাৎটা কোথায়?

—আমার সেই ট্রাঙ্ক, সেই আলমারী-ওয়ারড্রোব সব কোথায় গেল পীরালি?

পীরালি কফি এনে দিয়েছিল। বললে—আপনার ফ্ল্যাট তো খালি করে দেওয়া হয়েছে মেমসাহেব, জিনিসগুলো সব আমি রেখে দিয়েছি পাশের কামরায়—

—আমার শাড়ি-ব্লাউজ সব ছিল যে সেখানে?

পীরালি বললে—সে যেমন ছিল তেমনি আছে মেমসাহেব, আমি কিছুতে হাত দিইনি। এসে দেখুন না আপনি--

—কিন্তু চাবি? আমার চাবিটা কোথায়?

পীরালি বললে--চাবিও আমি রেখে দিয়েছি মেমসাহেব, আমি চাবিতে হাতই দিইনি—

বলে ঘোষাল-সাহেবের ড্রয়ার থেকে এক তাড়া চাবি বার করে দিলে। অনেক দিন হাত পড়েনি চাবিতে। মরচে ধরে গেছে।

পীরালি বললে—আমি সব ভালো করে রেখে দিয়েছি মেমসাহেব আপনার জন্যে, আমি হুজুরকে আপনার কথা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি,—

চাবিটা নিয়ে সতী পাশের কামরায় গেল। এ-সব ফার্নিচার মার্চেন্টদেরই দেওয়া। এই স্টীলের ফার্নিচারের সেট। এই ওয়ারড্রোব, এই ড্রেসিং টেবল, এই খাট, এই সমস্ত কিছু। পয়সা দিয়ে মিস্টার ঘোষালকে কিনতে হতো না কিছু।

—একটা কথা রাখবে পীরালি?

—কী কথা মেমসাহেব?

সতী বললে—আমি যে এখানে আজকে এসেছিলুম, এ-কথা তুমি নাই বা বললে তোমার সাহেবকে।

—কেন মেমসাহেব? সাহেব যদি কিছু জিজ্ঞেস করে?

সতী বললে--তোমায় কিছু বলতে হবে না সাহেবকে, জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলবে না। আমার জন্যে তুমি এইটুকু করতে পারবে না পীরালি? আমি বড় কষ্টে আছি। আর তুমি তো জানো পীরালি তোমার সাহেব কী-রকম রাগী মেজাজের লোক?

পীরালি তা হাড়ে-হাড়ে জানে। বললে—আপনিও তো জানেন মেমসাহেব, আমি আর নিজের মুখে কী বলবো। সাহেব আসল হারামীর বাচ্চা, মোটা

টাকা মাইনে দেয় সাহেব তাই পড়ে আছি। আচ্ছা এত লোকের ফাঁসি হয়, সাহেবের কিছু হয় না মেমসাহেব?

সতী বললে—সাহেব যে বড়লোক পাঁরালি। বড়লোকদের কি কেউ ধরতে পারে?

সতী ওয়ারড্রোবটা খুলে ফেললে। শাড়ি জামা দু'একটা নিলে।

পাঁরালি বললে—আমি কাগজ দিয়ে ভালো করে প্যাকেট বানিয়ে দেব, দিন আমাকে ওগুলো—

কিন্তু আসলে শাড়ি নিতে তো আসেনি সতী! আসল জিনিসগুলো কোথায় রেখেছে মনে পড়ছে না। সতী বললে—ওই ট্রাঙ্কটা খুলে দাও তো পাঁরালি—ওর ভেতরেও অনেক জিনিস আছে আমার—

সেই ট্রাঙ্কের ভেতরেই পাওয়া গেল আসল জিনিসগুলো। একটা, দু'টো, তিনটে। অনেকগুলো। অনেকগুলো জিনিস পাওয়া গেল ভেতরে। ভাগ্যিস সবগুলো রেখে দিয়েছিল সেদিন বুদ্ধি করে। এগুলো যে এতদিন পরে কাজে লাগবে, সেদিন সতী তা ভাবতেই পারেনি। ট্রাঙ্কের সমস্ত জিনিসপত্রগুলো ঘেঁটে যা-কিছু পেলে নিয়ে নিলে নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে।

পাঁরালি বললে—আর কী নেবেন মেমসাহেব?

সতী বললে—না, আর কিছু না পাঁরালি—এতেই হয়ে যাবে—

তারপর আবার বললে—কিন্তু তোমাকে যা বললুম তোমার মনে থাকবে তো পাঁরালি? সাহেবকে আমার কথা কিছু বলবে না তো?

কিন্তু ওদিকে গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াতেই মিস্টার ঘোষাল দরজা খুলে নেমে পড়লো। তারপর সোজা সদর দরজায় কড়া নাড়তেই রঘু এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

—কাকে চাই হুজুর?

—মিসেস ঘোষ আছে? বলো মিস্টার ঘোষাল এসেছেন।

তারপর বাড়িতে মিসেস ঘোষ নেই শুনে অবাক হয়ে গেল। সে কি! এত আর্লি-আওয়ার্সে কোথায় গেল!

—এখানে থাকে না এখন? কালকে রাত্রে কোথায় ছিল মিসেস ঘোষ?

—আজ্ঞে এখানেই ছিলেন দিদিমণি। আজ ভোরবেলাই বেরিয়েছেন।

—কোথায় গেছে এত সকালে?

রঘু বললে—আজ্ঞে তা জানি না—

—কখন ফিরে আসবে? এখানেই লাঞ্চ খেতে আসবে তো?

তারপর হতাশ হয়ে বললে—ঠিক আছে, আমি আবার আসবো। এই দুপুরের আগেই আমি ফিরে আসবো আবার, বাড়ি ফিরে এলে মিসেস ঘোষকে আমার কথা বোল, ঠিক বলে দিও—

বলে মিস্টার ঘোষাল আবার গিয়ে গাড়িতে উঠলো। ড্রাইভারকে বললে—চলো ওল্ড বালিগঞ্জ ব্যারিস্টার দত্ত সাহেবের বাড়ি—

গাড়িটা ছেড়ে দিল। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের কেস-এর ব্যাপার, আর একবার কনসাল্ট করে আসা ভাল। আর কালকের ব্যাপারে থ্যাঙ্কস্ দিয়ে আসাও দরকার একবার।

অত রাত্রে কিছুই পায়নি দীপঙ্কর। না একটা ট্যাক্সী, না ট্রাম, বাস, না অন্য কিছু। অন্ধকার রাস্তায় শুধু ঝাপসা পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছে। গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর ভেতরে ভুষণ বোধ হয় ডিউটি করছিল। কয়েকজন সিভিক-গার্ড আর এ-আর-পি'র ভলান্টিয়ারে মাথায় স্টীল-হেলমেট পরে এদিক-ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এখনি যেন কোথায় সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাস্তার কয়েকজন ভিখিরি নিরুপায়ের মত খোলা আকাশের তলায় পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে ছিল। তাদের জীবনও নেই, জীবনের ভয়ও নেই। এ-আর-পি'রা এসে তাদের বকাবকি করছে। এই কলকাতা শহরেই এত মানুষ। এখানে মানুষ আছে এত, কিন্তু মানুষের আশ্রয় এত নেই। অথচ এই ইন্ডিয়ার পয়সাতেই স্যার আজিজুল হক গ্রেটব্রিটেনে ইন্ডিয়ার হাই কমিশনার। এই ইন্ডিয়ার টাকাতেই স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার কমার্স মেম্বার। শীতে থর থর করে কাঁপছে মানুষগুলো। রোজ খবরের কাগজে লিস্ট বেরোয় কারা মরলো না-খেয়ে। ক'জন মরলো। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ডিরেক্টর অব ইনফর্মেশন নাম-ধাম ছাপিয়ে দেয় তাদের। কিন্তু ইন্ডিয়ার বাইরে সে-খবর পাঠানো নিষেধ। পাঠালে আমেরিকা জানতে পারবে, ব্রিটিশ পাবলিক জানতে পারবে। অ্যালায়েড পাওয়ার্স জানতে পারবে। তার চেয়ে তারা জানুক ইন্ডিয়ার গান্ধী কেউ নয়, জহর কেউ নয়, জানুক সাধারণ হিন্দু-মুসলমানরা চায় ব্রিটিশ-রাজ। জানুক ইন্ডিয়ার কোটি কোটি মানুষ সুখে আছে, আরামে আছে। কোটি কোটি মানুষের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা ফজলুল হক। একমাত্র ত্রাণকর্তা লর্ড লিনলিথগো।

লর্ড লিনলিথগো পরের দিন কাগজে স্টেটমেন্ট ছাপিয়ে দিলে। কলকাতাই যুদ্ধের প্রথম বলি। কলকাতাতেই প্রথম বোমা পড়লো।

I am glad to learn that city's defences have proved so effective. Yours is the first capital city in India to suffer in this war a baptism of fire and her citizens have proved an admirable example of steadiness and fortitude. Well done Calcutta!

—একটা পয়সা দাও না বাবা!

রাস্তার দোকান-পাট সমস্ত বন্ধ। পয়সা নিয়ে কী করবে ভিখিরিটা কে জানে। কাল সকালেই হয়ত কিছু কিনবে। দীপঙ্কর পকেট থেকে একটা আনি বার

করে দিলে লোকটার হাতে। চেহারাটা দেখে চমকে উঠলো। এ তো ভিখিরি নয়, এরা যে মানুষ। এদের জন্যে ইস্পাহানী কোম্পানীকে এজেণ্ট বানিয়েছে লর্ড লিনলিথগো। তারা ছ'টাকা চার আনা দরে চাল কিনে আর্মির কাছে বেচছে এগার টাকা দরে। মনে আছে যেদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে গিয়েছিল, ছিটে বলেছিল—চাকরি করে কী করবি তুই দীপু, কত টাকা জমাবি? তার চেয়ে কিছু চাল কিনে স্টক কর। অনেক প্রফিট হবে। ছিটেও তাই কিনেছিল। উঠোনের মধ্যে গুদাম করে মণ-মণ চাল স্টক করেছিল। আর ফোঁটা গিয়েছিল জেলে। কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

বাড়ির কাছে আসতেই যেন আবার সব মনে পড়েছিল। বাড়িতে সন্তোষ-কাকার মেয়ে আছে, কিরণের মা আছে, কাশী আছে। এতক্ষণে যেন তাদের কথাও মনে পড়েছিল।

মাসিমা মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—কী হয়েছে তোমার বাবা? খাবে না কেন?

দীপঙ্কর কিছুই বলতে পারেনি মুখ ফুটে। শুধু বলেছিল—মাসিমা—

—দেখ তো কী কাণ্ড। এদিকে বোমা পড়ছে, আর আমি বাড়ির ভেতর একলা মেয়েমানুষ, কেমন করে সামলাই বলো তো সব?

তারপর আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তা এত রাত পর্যন্ত তোমাদের আপিস খোলা থাকে কী জন্যে বাবা? রাত্তিরেও কাজ হয় আপিসে? তোমার না-হয় কেউ নেই, কিন্তু আপিসের আর-কারোরই সংসার নেই নাকি?

দীপঙ্কর বলেছিল—আপনারা খেয়ে নিন মাসিমা, আমি কিছু খাবো না আজকে—

কিন্তু দীপঙ্কর না-খেলে আর কেউ খাবে কী করে! ক্ষীরোদা চুপ করে বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

মাসিমা বাইরে এসে বলেছিল—তুই খেয়ে নে বাছা; আমি আর খাবো না—আয় খাবি আয়—

ক'দিন থেকেই মাসিমা বলছিল ক্ষীরোদাকে—হ্যাঁরে, রোজ এত রাত করে কোত্থেকে আসে বল তো দীপু? তুই জানিস কিছু? কোথায় থাকে ও?

কাশী সবজান্তা। কাশী বলতো—দাদাবাবু যে আপিসের বড়সায়েব মাসিমা, দাদাবাবুর যে অনেক কাজ!

—তুই থাম দিকিনি! তুই সব জেনে বসে আছিস একেবারে! তোকে আমি জিজ্ঞেস করেছি?

রাত্রে পাশে শুয়ে মাসিমা জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে, তুই কীরকম মেয়ে রে? এতদিন আছিস এ-বাড়িতে আর একটা টু-শব্দ বেরোয় না তোর মুখ দিয়ে? দেশে তোদের কে আছে? কেউ একবার খবর নিতেও আসে না তোর? মামা জ্যাঠা কাকা কেউ নেই?

কথাগুলো শুনে ক্ষীরোদা যেন মাসিমার বুকের আরো কাছে সরে আসতো। আরো বুকের ভেতরে মুখ গুঁজতো। আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো। আর এই বোবা মেয়েটাকে যত দেখতো মাসিমা ততই যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসতো মাসিমার বুকখানা।

—যদি দেশে কেউ থাকে তোর তো বল আমাকে, আমি দীপুকে দিয়ে চিঠি লিখে এখানে আসতে বলবো!

মেয়ের মুখ যেন আরো বোবা হয়ে যেত। আরো পাথর। অথচ সংসারে প্রত্যেকটা কাজ যেন যন্ত্রের মত চালিয়ে নিতো একলা। চোখের পলকে ভাতটা চাপিয়ে বাটনা বেটে নিত্ নিজেই। কত তাড়াতাড়ি যে দীপুর আপিসের ভাত দিত, মাসিমাও তা দেখে অবাক হয়ে যেত।

—হ্যাঁরে, এত কখন করলি? তুই ম্যাজিক জানিস নাকি রে ক্ষীরোদা?

শুধু দীপঙ্করের রান্নাই নয়, মাসিমার দিকটাও যে নিজের পেটের মেয়ের মত এমন করে দেখবে, তা কে জানতো! মাসিমা ক্ষীরোদাকে দেখতো আর বুকটা হু হু করে উঠতো কেবল। হয়ত অবচেতন মনে এমনি একটি মেয়েই একদিন চেয়েছিল মাসিমা। কিরণ ছোট বয়েস থেকেই বাউণ্ডুলে হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে সাধ তাই মেটেনি মাসিমার।

মাসিমা বলতো—উনুনের কাছে তুই আর যাসনি মা, আমার ভয় করে—

সত্যিই ভয় করতো মাসিমার। এখনও বিয়ে হয়নি। যদি ভাতের ফ্যান গালতে গিয়ে হাতটা পুড়ে যায়। যদি ফোড়ন ছিটকে এসে মুখে লাগে।

—সর মা, সর, আমি রাঁধছি, আমার হাত তো খালি এখন, তুই বরং ততক্ষণ চালগুলো বাছগে—

চালে আজকাল এত ধান এত কাঁকর মেশানো থাকে যে না-বাছলে আর খাওয়া যায় না। কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই শুনবে না। যতক্ষণ মাসিমা, দীপু না-খাবে, ততক্ষণ না-খেয়ে উপোস করে থাকবে। হাতে কিছু কাজ না থাকে ছুঁচ নিয়ে মাসিমার কাপড়টা সেলাই করতে বসবে। রোদ্দুরে ডাল শুকোতে দেবে। একটু বসে থাকতে জানে না মেয়েটা! এমন মেয়ে কোথায় কার হাতে পড়বে কে জানে! কার হাঁড়িতে এ-মেয়ের চাল মাপা আছে কে বলবে?

সমস্ত রাত বড় অশান্তিতে কাটলো সেদিন। মাসিমা নিজেও খায়নি। বললে—তুই খেলিনে কেন বল তো মা? আমি না-হয় বিধবা-মানুষ, আমার উপোস করা অভ্যেস আছে, কিন্তু তুই কেন না-খেয়ে রইলি? রাত-উপোসী থাকা কি ভালো এই বয়েসে?

ভোর না হতেই মাসিমা আবার ওপরে দীপঙ্করের কাছে গেল। দীপঙ্করও সারা রাত ঘুমোয়নি।

মাসিমা বললে—এখন কেমন আছো বাবা?

দীপঙ্কর বললে—ভাল আছি মাসিমা, আপনি কিছু ভাববেন না আমার

জন্যে—

মাসিমা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—তোমার জন্যে বড্ড ভাবনা হয়েছিল বাবা, ও মেয়েটাও সারারাত কিছু খেলে না। ঘুমোল না—

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে এখানে এনে খুব কষ্ট দিচ্ছি মাসিমা—

মাসিমা বললে—কষ্ট আমাকে যা দিচ্ছ তা তো দিচ্ছই, কিন্তু ওই মেয়েটাকে যে কষ্ট দিচ্ছ তা আর চোখ মেলে দেখতে পারছি নে আমি। ওকে এমন করে কেন এখানে আটকে রেখেছ বল তো বাবা?

এ-কথার উত্তর একটা কিছু দিত হয়ত দীপঙ্কর। কিন্তু তার আগেই কাশী এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—দাদাবাবু আপনাকে কারা ডাকতে এসেছেন?

মাসিমা বললে—কারা এসেছে আবার? বলগে যা দাদাবাবুর অসুখ, এখন দেখা করতে পারবে না—

কাশী বললে—আমি বলেছিলুম, একজন বুড়ী মেয়েমানুষ আছে সঙ্গে, বললে একটুখানির জন্যে দেখা করে যাবো—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কারা? কোত্থেকে এসেছে?

কাশী বললে—পিরোনাথ মল্লিক রোড থেকে, তাদের সেই চাকরটাও এসেছে, অনেকদিন আগে একবার এসেছিল—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসলো। তারপর বিছানা থেকে নামতে যাচ্ছিল।

মাসিমা বললে—উঠছো কেন বাবা? তোমার শরীর এখনও দুর্বল, এ অবস্থায় কোথায় যাচ্ছো?

দীপঙ্কর বললে—না মাসিমা, সতীর স্বামী এসেছে। সতীর শাশুড়ী এসেছে যে—

মাসিমা বুঝতে পারলে না। বললে—কে? কার শাশুড়ী? কে সতী?

দীপঙ্কর বললে—ওরে কাশী, শিগ্‌গির দরজা খুলে দে, বসতে বল ওদের, —আমি যাচ্ছি—

মাসিমা বললে—তা তুমি উঠছো কেন বাবা, তারাই আসুক না, তাদেরই আসতে বলো না এখানে, তোমার শরীরের এই অবস্থায় কি নিচে নামা ভালো? যা কাশী, ওদের ওপরে ডেকে নিয়ে আয়—যা—

বহুদিন আগে একদিন নয়নরঞ্জিনী দাসী অনুতাপ করেছিলেন ছেলের বিয়েতে যথেষ্ট অর্থ আদায় করতে পারেননি বলে। তখন তাঁর অর্থ ছিল। কিন্তু অর্থের তেমন প্রয়োজনও ছিল না। সে অর্থ চেয়েছিলেন তিনি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নয়—চেয়েছিলেন নিজের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে। অর্থ শুধু প্রয়োজনই মেটায় না, গৌরব বৃদ্ধিও করে। তোমার টাকা আছে জানলেই আমি তোমায় শ্রদ্ধা করবো।

আমাকে টাকা ধার দিতে হবে না, আমাকে টাকা দান করতেও হবে না। তোমার টাকা তোমারই থাকবে, শুধু আমাকে তোমার পুজো করতে দিও। শুধু তুমি নও, সংসারে যারই টাকা আছে, তারই ক্ষমতা আছে। আমি সেই টাকার অংশ চাই না, কিন্তু আমাকে ক্ষমতার ভক্ত হতে দিও। এইটুকু শুধু আমি চাই।

নয়নরঞ্জিনী দাসী নিজের শ্বশুর, নিজের স্বামী হারিয়ে যখন নিঃস্ব, তখনও যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাননি তার একমাত্র কারণ অগাধ টাকা। অগাধ টাকার ছাদের তলায় তিনি তখন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছেন। শুধু আশ্রয়ই নয়, আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পেয়েছেন শ্রদ্ধা, ভক্তি, গৌরব। তার দাম টাকার চেয়েও বেশী। তিনি সব হারিয়ে তাই টাকাকেই তখন আঁকড়ে ধরলেন। তিনি ভাবলেন—চাঁদির জুতো মেরে সকলের কাছ থেকে ভক্তি আদায় করবেন। তিনি চাকর-ঝিদের বলতেন—খুব যে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস, কেন, মাস গেলে মাইনে নিস না?

সতীকে বলতেন—এত দেরি করে ঘুম থেকে কেন ওঠো বৌমা, সকালে উঠতে পারো না?

এসব ঘটনা কেবল প্রতিপত্তিরই নামান্তর। টাকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে অন্য সমস্ত বৃত্তিকে অন্ধ করে দেয়। তখন স্নেহ-ভালবাসা-মায়া-মমতা সব কিছু পণ্য হয়ে আগাম-শোধ দাবী করে। নয়নরঞ্জিনী দাসীও সেই আগাম-শোধই দাবী করতেন সকলের কাছ থেকে। সেই দাবী সতী শোধ করেনি বলেই তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধেছে। যে কড়ায় গণ্ডায় তা শোধ করেছে সে নির্মল পালিত। নির্মল পালিত তাঁর দাবী শোধ করে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতিপত্তিও হরণ করেছিল। যখন নয়নরঞ্জিনী দাসীর চোখ ফুটলো তখন তিনি দেখলেন এতদিন যার জন্যে তাঁর প্রভাব, এতদিন যে-জন্যে তাঁর প্রতিপত্তি, সেই টাকাই তিনি হারিয়ে বসে আছেন। আর তারপর থেকেই তিনি কেমন অন্যরকম হয়ে গেলেন।

সকাল বেলাই সেদিন উঠেছিলেন তিনি। আগের রাত্রে অনেক পরামর্শ করে ছেলেকে বউ-এর সন্ধানে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা পড়েছিল। সাইরেন বাজবার সময়ে একতলার সোনার লাইব্রেরী ঘরে দুজনে কাটিয়েছিলেন। তারপর অনেক রাত হয়ে গেল।

সনাতনবাবু বলেছিলেন—এখন যাবো মা-মণি?

মা-মণি বলেছিলেন—না, কাল সকালে গেলেই চলবে!

সারা রাত্রি ঘুম না-হওয়ারই কথা। না-ঘুম না-জাগা অবস্থাতেই কাটলো সমস্ত রাত। শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছিল তাঁরই সামনে। তখনও তিনি শিরদাঁড়া সোজা রাখতে পেরেছিলেন। স্বামীরও মৃত্যু হয়েছিল তাঁর চোখের ওপর—তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। সোনাকে বুকে নিয়ে তিনি মাথা উঁচু করে ছিলেন। কিন্তু টাকা এমনই জিনিস! স্বামী-শ্বশুরের অন্তর্ধান তাঁকে বিচলিত

করতে পারেনি বটে, কিন্তু টাকার অন্তর্ধান তাঁর মর্মমূলে গিয়ে নাড়া দিয়ে দিলে।

সকালবেলা বিছানা থেকে উঠেই তিনি সোনাকে গিয়ে ডাকলেন। বললেন—সোনা, এবার তৈরি হয়ে নাও, তোমাকে যেতে হবে এখনি—

সনাতনবাবু যাবার জন্যেই প্রস্তুত। তাঁর যেতে আপত্তি ছিল না, তখনও আপত্তি করলেন না। কিন্তু নয়নরঞ্জিনী তবু ছেলেকে একলা পাঠিয়ে বিশ্বাস করতে পারলেন না পুরোপুরি।

সনাতনবাবু তখন জামা-কাপড় পরে তৈরি, ট্যাক্সী এসে গেছে, শম্ভুও হাজির। সনাতনবাবু গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নয়নরঞ্জিনী বললেন—খোকা, দাঁড়াও—

নিজের ছেলেকেও যেন হঠাৎ আর বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। জোয়ান বয়েস। হয়ত বউ-এর মুখ দেখেই সব ভুলে যাবে। রাক্ষুসীর কথাতেই হয়ত শেষ পর্যন্ত টলে পড়বে। শুধু ছেলে নয়, কাউকেই আর বিশ্বাস করবেন না তিনি। টাকার ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

তাড়াতাড়ি কাপড়টা বদলে নিলেন। ফর্সা সেমিজ পরলেন একটা। তারপর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন। বললেন—এবার গাড়ি ছাড়ো—

সনাতনবাবু বললেন—তুমি যাবে?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আমি না গেলে কি কোনও কাজ তোমার দ্বারা হবে? তুমি যদি সমস্ত বুঝতে তাহলে আজ আমাকে এই কষ্ট করতে হয়? এখন চলো, এখন তার দেখা পাওয়া গেলে হয়—

সনাতনবাবু বললেন—তুমি যা-যা বলতে বলেছিলে আমি তো তাই-ই গিয়ে বলতাম—

—তোমার ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই, শেষকালে কী বলতে কী বলবে, বউ তো সুবিধের মানুষ নয়! সে তোমাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে!

এর পরে আর সনাতনবাবু কোনও প্রতিবাদ করেননি। গাড়ি গিয়ে সোজা একেবারে হাজির হলো স্টেশন রোডে। কাশীই দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপর তাঁদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে দীপঙ্করকে গিয়ে খবর দিয়েছিল। মনে আছে দীপঙ্কর সেদিন তাঁদের দেখে শুধু অবাকই হয়ে যায়নি, জীবনের আর এক নতুন সত্যেরও পরিচয় পেয়েছিল। সনাতনবাবু সদাশিব মানুষ। ঘরে ঢুকেই আসল কথাটা পাড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তাহলে তো এ-সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা উচিত হয়নি দীপঙ্করবাবু, আপনি শুয়ে থাকুন, আমরা বরং চলি এখন—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—ইনি কে?

দীপঙ্কর বললেন—ইনি আমার মাসিমা!

—নিচে যে সোমত্ত মেয়েটিকে দেখলাম, ও কে?

মাসিমাই উত্তর দিলে দীপঙ্করের হয়ে। বললে—ও আমার মেয়ে—

সনাতনবাবু বললেন—চলো মা, এখন দীপঙ্করবাবুর অসুখ, এখন বিরক্ত করা উচিত নয়—

বলে নয়নরঞ্জিনী হঠাৎ এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বললেন—কিন্তু আমার বৌমাকে তো দেখলাম না বাড়িতে! সে কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—আপনার বৌমা আমার এখানে তো থাকে না!

—তোমার এখানে থাকে না তো কোথায় থাকে?

দীপঙ্কর বললে—সতী তো তার দিদির বাড়িতে থাকে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কোন্ দিদি? যে-দিদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল অজাত-কুজাতকে?

দীপঙ্কর পাল্টা প্রশ্ন করলে—আপনি কি সতীকে খুঁজতেই এসেছেন আমার কাছে? তাহলে আপনি ভুল ধারণা করেছেন তার সম্বন্ধে! আপনারা সতীর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন, তা সত্যিই সে নয়! কেন যে এমন ধারণা হলো আপনাদের তাই বুঝতে পারছি না।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না হলেই তো ভালো বাবা, অমন বংশের বউ হয়ে এমন কাণ্ড করলে পাড়ার লোকের কাছে যে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। সবাই বলে আমার ছেলের বউ নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে! এটা কি আমাদেরই শুনতে ভালো লাগে বাবা? তাই তো সোনাকে সকালে উঠেই বললাম—চল্ বৌমাকে দেখে আসি গিয়ে—

সনাতনবাবু বললেন—আমাদের সে-বাড়ির ঠিকানাটা একবার দিতে পারেন দীপুবাবু?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—শুধু ঠিকানা দিলে কি আমরা যেতে পারবো? তুমি যদি সঙ্গে যেতে তো খুব ভালো হতো বাবা!

দীপঙ্কর হঠাৎ এই আগ্রহের কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। বললে—হঠাৎ তার কাছে যাবার ইচ্ছেই বা হলো কেন এতদিন পরে? এত কাণ্ডর পরে তার কাছে গেলে সতীও তো অবাক হয়ে যাবে?

সনাতনবাবু বললেন—তা তো যাবেই, যে কাণ্ড তাকে নিয়ে করেছি আমরা—

নয়নরঞ্জিনী কথার মাঝখানে ছেলেকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি থামো, আমি বলছি—

বলে বলতে লাগলেন—আসলে কী হয়েছে জানো বাবা, কাল রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখিচি, ভোর রাত্তিরে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, বৌমার যেন খুব অসুখ হয়েছে, বৌমা আমাকে ডেকে যেন বলছে—মা আমি চললুম! আমি তাড়াতাড়ি বৌমার কপালে যেন হাত দিতে গিয়েছি, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি বিছানায় উঠে বসলুম। তারপর সোনাকে গিয়ে ডাকলুম, বললুম—চলো বৌমাকে

গিয়ে দেখে আসি, বৌমাকে না দেখলে মনে শান্তি পাচ্ছি না—

মাসিমা এতক্ষণ সব শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বললে—কিন্তু দীপুর যে শরীর খারাপ কাল থেকে, কাল রাত্তিরে কিছু খায়নি বাবা আমার—

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে থাক, আমরা বরং অন্য একদিন আসবো—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তুমি তাহলে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না বাবা সেখানে? আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি তোমার কাছে। বড় আশা করেই মায়ে-পোয়ে এসেছিলাম বাবা। ভেবেছিলুম বৌমাকে এখানেই পাবো! কিন্তু আজই বৌমাকে একবার না দেখতে পারলে আমি বাড়িতে গিয়েও শান্তি পাবো না যে—

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়ালো। বললে—চলুন, আমি যাবো—

—আহা, বেঁচে থাকো বাবা তুমি! তুমি যে আমার কী উপকার করলে বাবা, কী বলবো! জানো বাবা, আমার বয়েস হয়েছে, আমি আর ক'দিন! আমি তো গঙ্গামুখো পা বাড়িয়েই আছি। এখন ছেলে-বৌএর হাতে সংসার তুলে দিয়ে যেতে পারলেই হয়। যাবার আগে ছেলে-বউকে সুখী দেখে যেতে পারলে প্রাণটা তবু ঠান্ডা হয়! তুমি তো জানো, বড় অভিমানী বৌমা আমার—শুনলুম নাকি আবার বৌমার বাবাও মারা গেছেন! আহা, বেয়াই আমার বড় ভালো মানুষ ছিলেন! তা তিনি পুণ্যাত্মা মানুষ, বেশ গট্ গট্ করে চলে গেলেন, আমারই মরণ—

দীপঙ্করকে উঠতে দেখে মাসিমা কাছে এগিয়ে গেল। বললে—এই শরীর নিয়ে তুমি যেতে পারবে দীপু?

দীপঙ্কর বললে—আপনি ভাববেন না মাসিমা, এখানে না-গেলেই নয়, আমাকে যেতেই হবে!

হঠাৎ দীপঙ্করের এই দৃঢ়তা দেখে মাসিমাও যেন কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। যে মানুষ কাল থেকে খায়নি, ঘুমোয়নি, সেই লোক এখন বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ দীপুবাবু, আপনি না-হয় কিছু খেয়ে নিন, আমরা বসছি—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তোমার যদি খিদে পেয়ে থাকে তো বাবা, তাহলে দোকানেই তোমাকে কিছু খাইয়ে দেব খন, আমাদের আবার ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে ওদিকে—। আর এ-কাজটা হয়ে গেলে তোমার খাবার অনেক সময় পাবে তখন—

পাশের ঘরে দীপঙ্কর জামা পরছিল। মাসিমা গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ওরা কারা দীপু? কী করতে এসেছেন?

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে পরে সব বলবো মাসিমা—এখন এত তাড়াতাড়ি সব বলা যাবে না—

—কিন্তু ওঁর বৌমার কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—ওঁর বৌমার যা হয়েছে, তেমন সর্বনাশ যেন কোনও মেয়েমানুষের না হয়!

তারপর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে এসে বললে—চলুন—

দীপঙ্কররা চলে যাবার পরে মাসিমা বাইরের ঘর পর্যন্ত এসেছিল। ট্যাক্সীটা চলে যেতেই সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর পেছন ফিরতেই দেখলে দূরে রোয়াকের কোণে ক্ষীরোদাও সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাসিমাকে দেখেই ক্ষীরোদা চোখ ফিরিয়ে নিলে। কাছে এসে মাসিমা বললে—হ্যাঁরে, তুই কিছু জানিস মা? ওরা কারা? ওদের বৌ-এর কী হয়েছে?

সমস্ত জিনিসটাই যেন কেমন রহস্যের মত মনে হলো মাসিমার কাছে। কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞেস করা যায়? ক্ষীরোদাও মাসিমার দিকে পাথরের চোখ দুটো তুলে রইল অপলক। জীবনের মানে যার হারিয়ে গেছে, তারই বা মুখের ভাষা থাকে কী করে? মুখের ভাষা তার বেরোবে কোন্ সুখে?

এবার টাকার কথা বলি। আগেও বলেছি, আবার বলি। টাকার কথা যেন বলে শেষ করাও যায় না। টাকা যে-ই সৃষ্টি করুক, সৃষ্টির পর থেকেই টাকা যেন তার সৃষ্টিকর্তাকেও আর মানতে চাইলো না। মধ্যযুগ পেরিয়ে টাকা যখন সাবালক হলো তখন তার পাঁচ পা গজিয়েছে। আগে টাকা ছিল ব্যক্তির, এখন হলো দশের। টাকা একদিন বললে—আমি বহু হবো। আর তাই-ই সে হলো। তখন সে মাটিতে পোঁতা সম্পত্তি রইল না আর। কখনও হলো সোনা। সোনা হয়ে অলঙ্কার হলো। কখনও কাগজ হয়ে নোট হলো, আবার কখনও চেক হয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকলো। টাকার তখন দুর্দম গতি। আগে টাকা ছিল মানুষের বাহন, এখন মানুষ হলো টাকার বাহন। আগে মানুষ বলতো—টাকা চাই। এখন টাকা বললে—মানুষ চাই। টাকার মানুষেরা শেষকালে আর কোথাও মানুষ পায় না শিকার করবার। তখন নতুন মানুষ, নতুন মহাদেশ খুঁজতে বেরোল সমুদ্র পেরিয়ে। খুঁজতে খুঁজতে পেলে আফ্রিকা, পেলে ইন্ডিয়া, পেলে চায়না, পেলে জাপান। এখানে জিনিস ছিল, টাকা ছিল না। মহাজনরা বললে—তোমাদের জিনিস দাও, তোমাদের আমরা টাকা দেব। জিনিস বেচে প্রচুর টাকা হলো। টাকার পাহাড়। তারপর একদিন দেশে মহামারী হলো, দুর্ভিক্ষ হলো, বন্যা হলো। চাল, ডাল, তরি-তরকারি কিছু নেই, সব বেচে দিয়েছি। খালি টাকা আছে। কিন্তু টাকাতে পেটের ক্ষিদে মেটে না। তখন আমরা চালাক হয়ে গেলাম। টাকাকে বাঁধতে হবে, টাকাকে বুঝতে হবে, টাকাকে ভালবাসতে হবে। টাকা আগে ছিল মানুষের ক্রীতদাস, তখন থেকে মানুষ হলো টাকার ক্রীতদাস। আগে টাকা মানুষের হুকুম তামিল করতো, এখন মানুষ টাকার হুকুম তামিল করে। টাকা নতুন করে বংশ-কৌলীন্য বেঁধে দিলে। টাকা বললে—এখন থেকে বর্ণ নিয়ে সমাজ বিভাগ হবে না।

হবে টাকা দিয়ে। মহাজনই হবে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সেই মহাজনই নিজের প্রয়োজনে কায়স্থ বৈশ্য শূদ্র শ্রেণী-ভাগ করবে। আজকে যে শূদ্র সেও একদিন কায়স্থ হতে চাইলো। আজকে যে কায়স্থ সেও একদিন ব্রাহ্মণ হতে চাইলো। তখন বাধলো বিরোধ। ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ শূদ্রদের মধ্যে বিবাদ বিরোধ জটিল হয়ে উঠলো প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই। টাকার দর নামলো, সোনার দাম চড়লো। লক্ষ লক্ষ শূদ্র ব্রাহ্মণ হলো। কোটি কোটি ব্রাহ্মণ শূদ্র হলো। আর তারই ফলে অঘোরদাদুর মৃত্যুর পর ছিটে-ফোঁটারা হলো ব্রাহ্মণ, প্রাণমথবাবু হলো শূদ্র। শুধু তারাই নয়। নির্মল পালিত, মিস্টার ঘোষাল, দাতারবাবু, নয়নরঞ্জিনী, লক্ষ্মীদি, সতী, সুধাংশু, গাঙ্গুলীবাবু, সবাইকে নিয়ে এক দীর্ঘ উপন্যাস লিখে চললো টাকা। টাকা দিয়ে যাচাই হতে লাগলো মনুষ্যত্ব, ধর্ম, পাপ, পুণ্য, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সব কিছুর। টাকাই হলো ধর্ম, টাকাই হলো মোক্ষ, টাকাই হলো কাম। টাকাই সকলকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে সওদা করতে লাগলো। বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতকে পৌঁছে মানুষ হলো পোটেন্ট, কিন্তু টাকা হয়ে গেল অমনিপোটেন্ট!

এই টাকাই মিস্টার ঘোষালকে আবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনলে সতীর কাছে। তখন রোদ উঠে গেছে। প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় পড়লো সতী। আগের দিনের ক্লান্তি তখনও ঘোচেনি। সমস্ত রাত ঘুম না হওয়ার ক্লান্তি। পাঁড়ালি গেট পর্যন্ত এসেছিল।

সতী বলে এসেছিল—আমার কথাটা মনে থাকবে তো পাঁড়ালি? তোমার সাহেবকে বলবে না তো?

—না মেমসাহেব!

তারপর সোজা একেবারে নিজের বাড়িতে। রঘু দরজা খুলে দিয়েই বললে—একজন আপনাকে খুঁজতে এসেছিল দিদিমণি।

—কে রে? কী রকম চেহারা?

চেহারার বর্ণনা শুনে বোঝা গেল মিস্টার ঘোষাল।

—তুই কী বললি?

ভালোই হয়েছে। অনেক বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সতী! তারপর তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে হাতের জিনিসগুলো ভালো করে আলমারির ভেতরে রেখে দিলে। বাইরে রঘু দাঁড়িয়েছিল। সতী বললে—আজকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমি শুয়ে পড়বো। যদি কেউ আসে তো বলবি দেখা হবে না—

—কিন্তু সে ভদ্রলোক যে বলে গেলেন আবার আসবেন তিনি!

—তা হোক, আমি ঘুমোব আজকে, সারারাত কাল ঘুম হয়নি, আজকে দীপুবাবু আপিস থেকে আসবার আগে আর কারো সঙ্গে দেখা করবো না—

—তাহলে কী বলবো তাঁকে?

সতী বললে—বলবি আমার সঙ্গে দেখা হবে না—আর কিছু বলতে হবে না।

কিন্তু যে অমোঘ অনিবার্যতা মানুষের ভাগ্যকে অবধারিতের দিকে প্রতি-মুহূর্তে ঠেলে নিয়ে যায়, তাকে ঠেকিয়ে রাখা মানুষের সাধ্যের বাইরে। প্রথমে দেখা যায় না, হয়ত আভাসও পাওয়া যায় না। যুগের পর যুগ এই অমোঘ অনিবার্যতাকে মানুষ আগে-ভাগে জানতে চেয়েছে। জানলে সে অন্ততঃ প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবে। দুঃখের তীব্রতা সে এড়াতে পারবে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তাই নিজের উত্থান-পতনের ছন্দ সে আয়ত্ত করতে চেয়েছে। জীবনের অর্থ উদ্ধার করতে চেয়েছে। কিন্তু অদৃশ্য দেবতা কোথায় কোন্ গ্রহলোকে অদৃশ্য হয়ে আছে তা কেউ জানতে পারেনি আজো। মাঝে-মাঝে মানুষের গড়া ঈশ্বর মানুষের ঘরেই জন্মগ্রহণ করে বুকে ক্রুশ এঁটে মানুষের দুঃখ-বেদনার ভার লাঘব করতে চেয়েছে। কখনো আবার মানুষই জ্বালা-করাল এক মূর্তি গড়ে তাকে 'মা' বলে ডেকে সব দুঃখের অবসান কামনা করেছে। কেউ সুখকে বলেছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। কেউ দুঃখকেও বলেছে ঈশ্বরের প্রসাদ। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা সব কিছুকেই এক অদৃশ্য শক্তির পায়ে অর্পণ করে মানুষ অমোঘ অনিবার্যতাকে ভুলতে চেয়েছে। কিন্তু তবু কোনও দিক দিয়ে তার পরিত্রাণ মেলেনি। কিছু না পেয়ে তখন একনিষ্ঠ হয়ে অর্থ নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। ভেবেছে টাকাই ঈশ্বর। ঈশ্বরই টাকা। ঈশ্বরই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে এবার টাকা হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অঘোরদাদুর মত টাকারই ভজনা করো। টাকাই তোমাকে ইষ্ট দেবে, অভীষ্ট লাভ করাবে। নইলে নয়নরঞ্জিনী দাসীই বা কেন এমন করে সব মান-অপমান জলাঞ্জলি দিয়ে এখানে ছুটে আসবেন সেদিন!

সতী তখন স্নান করে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা করে সিঁদুর পরছিল।

—বৌমা, বৌমা কোথায় গো?

চিরুনীর উল্টো পিঠ দিয়ে সিঁদুর পরতে পরতে হঠাৎ আওয়াজটা শুনেই চমকে উঠলো সতী। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে লম্বা চিরুনীটা পড়ে গিয়ে দুখানা হয়ে গেল।

—বৌমা কোথায় গো কেমন আছো?

সবই অদৃশ্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলা। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা। মা-মণি একলা নয়। সনাতনবাবু আছেন সঙ্গে। দীপঙ্করও পেছনে। সতী নিজের মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে।

—এ কী চেহারা হয়েছে বৌমা তোমার? মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে যে তোমার? আহা, থাক্, থাক্—

সতী ততক্ষণে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছে। নয়নরঞ্জিনী সতীর চিবুকে হাত দিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলেন। বললেন—

বড় খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি বৌমা কাল রাত্তিরে—

বাইরের ঘরে চেয়ারের ওপর বসলেন নয়নরঞ্জিনী। চারদিকে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বললেন—এই বাড়িই বুঝি তোমার বোনের বৌমা? বাঃ, বেশ বাড়ি করেছে তো! নতুন তৈরি করিয়েছে বুঝি? কত পড়লো?

ততক্ষণে দীপঙ্কর বসে পড়েছে। সনাতনবাবুও বসে পড়েছেন।

—ওমা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা? বোস!

সতী বসলো। নয়নরঞ্জিনী বললেন—বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি বৌমা, সকাল থেকে মনটা যে কী রকম করছিল কী বলবো! এখন তোমাকে দেখে তবু মনটা ঠান্ডা হলো! তা, বেশ ভালো আছো তো?

সতী মুখে কিছু বললে না। শুধু মাথা নাড়লে।

—দেখ বৌমা, আমি সোনাকে তাই বলছিলুম। বলছিলুম বুড়ো হয়েছি তো, আমার আর ক'দিন, আমি তো গঙ্গামুখো পা বাড়িয়েই আছি, ভালোয়-ভালোয় যেতে পারলেই হয়। তোমাদেরই সংসার, তোমরা দেখে শুনে নিলে তবু নিশ্চিন্ত হতে পারতাম—তা কপালে যখন তা নেই, তখন আর ভেবেই বা কী হবে! সবই আমার কপাল বৌমা! সবই কপাল!

সতী এ-সব কথার কোনও অর্থই বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ কেনই বা এলেন শাশুড়ী আর কেনই বা স্বামী এলেন তারও কোনও কারণ ঠিক করতে পারছিল না। শাশুড়ীর কথাগুলো কানেই যাচ্ছিল শুধু, মনের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না তার। সাদা ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল সবাইকে। তার সামনে সবাই যেন পাথরের মানুষ। তাদের সঙ্গে এক জায়গায় থেকে সে-ও যেন তাদের মত পাথর হয়ে গেছে।

—কাল রাত্তিরে যখন বোমা পড়লো বৌমা, আমি আর সোনা তো লাইব্রেরী-ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে রইলুম। তখন কেবল তোমার কথা মনে পড়ছিল বৌমা! ভাবছিলুম বৌমা এখন কোথায়, আমার বৌমা কী করছে এখন? কেবল এই কথাই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বাজছিল বার বার। আহা, বাপও নেই যে মেয়ের খোঁজ করবে! তা বাপ কি চিরকাল কারো থাকে, না থাকা উচিত! সময় হলে সকলের বাপ-মাই তো একদিন চলে যায়......না কি বলো?

তবু সতী কিছু উত্তর দিলে না। নয়নরঞ্জিনীও এ-কথার যেন জবাব চাইছিলেন না।

—আমার বাপের কথাও মনে আছে, আহা কী বাবাই ছিলেন আমার। তোমার মতন আমিও যে ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিলাম কি না। তা এমনই আমার কপাল যে বাবার মৃত্যুর সময় একবার কাছে গিয়ে শেষ দেখাও দেখে আসতে পারলাম না। এ দুঃখ আমার জীবনে যাবে না।

দীপঙ্কর এতক্ষণে কথা বললে। বললে—কেন? দেখা করতে পারলেন না কেন?

—ওই যে, এই সোনা তখন আমার সবে হয়েছে। আমার তখন আঁতুড়। এই ছেলে আজ বড় হয়েছে, বই পড়ে পড়ে লায়েক হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে—এখন তো ছেলে আমার সেদিনের কষ্টটা বুঝবে না! আমি যে কষ্ট করে ছেলে মানুষ করেছি তা ছেলে যদি বুঝতো তো আমার এই ভাবনা! আজকে আমি ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এমন সতীলক্ষ্মী বউ এনে দিয়েছি। আমি মায়ের যোগ্য যা কাজ তা যথাসাধ্য করেছি। এখন তো আমার ছুটি পাবার বয়েস বাবা! এখন তো আমার কাশী-বাস করারই কথা। তা নয় এই বুড়ো বয়েসেও তেল-নুন-মশলার সংসার নিয়ে তিতি-বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। বুড়ো বয়েসে কোথায় ভগবানের নাম করবো নিরিবিলিতে বসে তা না এই সব করছি, এ-বয়েসে এ-সব করতে কি ভাল লাগে, তুমি বলো দিকিনি বাবা?

তারপর সতীর দিকে ফিরে বললেন—আমারও তোমার মত এম্‌নি অভিমান ছিল বৌমা। তাহলে শোন, একদিন কী হয়েছিল! একদিন তোমার শ্বশুরের ওপর রাগ করে আমিও ভাত খাইনি! তা ভাত খাইনি তো খাইনি! এদের বংশের ধারাই যে এইরকম বৌমা। এই আমার সোনা যেমন, তোমার শ্বশুরও ওইরকম ছিলেন! বংশের ধারা কোথায় যাবে! তা সারা দিন উপোস করে রইলুম। কর্তা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না খেলুম কি খেলুম না! আমি উপোস করলুম তো তাঁর বয়েই গেল! শেষকালে আমাকেই আমার খোঁতামুখ ভোঁতা করে সেই ভাত খেতে হলো পরের দিন! ভাবলাম মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, কষ্ট করা তো জন্মের সাথী হয়ে গেছে—তার জন্যে আর ভেবে কী করবো? আমি নিজের মনেই কাঁদতাম, আবার নিজের মনেই চোখের জল মুছতাম—কেউ দেখবারও ছিল না, কেউ একজন আহা বলবারও ছিল না! তা এসব কথা কাকেই বা বলবো আর কে-ই বা শুনবে! আজ তোমার কথা ভেবেই কথাগুলো বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে—

সতী তখনও কিছু কথা বলছে না।

নয়নরঞ্জিনী আবার বলতে লাগলেন—কত কথাই আজ মনে পড়ছে বৌমা, কত সাধই ছিল মনে তোমাকে কী বলবো! সোনার যখন বিয়ে দিলাম, তার অনেক আগে থেকে আমি গয়না গড়িয়ে রেখেছিলুম তার বৌএর জন্যে। তোমার বাবা যখন তোমার ছবি দেখালেন আমাকে, দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। আহা! আমি ঠিক যেমন বউটি চেয়েছিলুম, তেমনি বউই আমায় দিয়েছেন ভগবান! ভেবেছিলুম এ-বউকে সংসারের কাজ করতে দিলে এ ধুলো লেগে ময়লা হয়ে যাবে। ন'দিদির হিংসে হয়েছিল দেখে। ন'দিদির নিজের তো সব কয়লো-কুচ্ছিত বউ হয়েছে। ন'দিদি বললে—ওরে নয়ন এ-বউএর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিস্‌নে তুই, এত রূপ গেরস্তঘরে সয় না। ভেবেছিলুম—হিংসের চোটে ন'দিদি বুঝি ওই কথা বলছে। তা আমারও জেদ্ চেপে গেল, আমি ভাবলুম, এই মেয়ের সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ে দেব। যে যা-ই বলুক! তা শেষ পর্যন্ত

নদিদির শাপেই তো ফলে গেল বৌমা! আমার মত গেরস্তের সংসারে তুমি তো টিঁকতে পারলে না—

দীপঙ্কর বললে—ও-কথা কেন বলছেন মা-মণি? সতী তো থাকতেই চেয়েছিল—

—তা হবে! হয়ত আমারই দোষ, কিম্বা হয়ত আমার কপালেরই দোষ! আমিই হয়ত এমন সতীলক্ষ্মী বউকে ঘরে ধরে রাখতে পারলুম না। ভগবান আমার কোনও সুখই রাখেন নি, এ-সুখটাই বা রাখতে যাবেন কেন? এমন কী পুণ্যি করেছি আমি যে এমন বউ-এর সেবা আমি পাবো?

বলে নয়নরঞ্জিনী একবার আঁচল দিয়ে নিজের চোখ দুটো মুছে নিলেন। নাক দিয়েও একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগলো তাঁর।

তারপর আবার বলতে লাগলেন—তা আমার যে ঘাট হয়েছে তা তো আমি মানছিই বাবা! আমি তো বলছি অপরাধ যদি করে থাকি তো ভগবান আছেন মাথার ওপর, তিনি তো সব দেখছেন! তিনি দর্পহারী মধুসূদন, তিনিই আমার সব দর্প চূর্ণ করবেন। আমি পক্ষাঘাতে পড়ে থাকবো বিছানায়, শেয়াল-কুকুরে আমাকে শ্মশানে টেনে নিয়ে যাবে, তবু আমি কাউকে এতটুকু দোষ দেব না—ভাবলো সে আমারই কৃতকর্মের ফল! আমি তো তা স্বীকারই করছি বাবা—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—এই যে বৌমার কাছে আজ এসেছি, একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে। এ কেন এলুম? না এলেই তো পারতুম! বৌমা তো আমাকে ডাকেনি! আমি তো নিজের গরজেই এসেছি! আর বৌমাও তো একবারও ভাবেনি যে শাশুড়ী বাড়িতে রয়েছে, মোলো কি বাঁচলো একবার গিয়ে চোখের দেখা দেখে আসি! বৌমা তো একবার এক মিনিটের জন্যেও আমাকে গিয়ে দেখে আসেনি! আমি বুড়ী মানুষ, আমিই বাতের ব্যথা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এলুম। বলি—যাই, বৌমা কেমন আছে, কোথায় আছে একবার দেখে আসি! এ ভাবনা কেন এল আমার মনে? না এলেই তো পারতুম? ওই যে বললুম—গরজ বড় বালাই, নিজের গরজেই তাই তোমার বাড়িতে খোঁজ করে এখানে এলুম। নইলে খেয়ে-ঘুমিয়ে যে শান্তি পেতাম না আমি মনে মনে—

তারপর হঠাৎ বললেন—তাহলে এবার আসি বৌমা, দেখা হলো, ভালো আছো সুখে আছো, এ দেখেও মনটার তৃপ্তি হলো—এখন আসি। তুমি তো আবার আপিসে যাবে বাবা! তোমারও দেরি করে দিলাম—

তারপর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—নাও সোনা, এবার ওঠো—

সনাতনবাবু এতক্ষণ সমস্ত চুপ করে শুনছিলেন। এতক্ষণে যেন তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। সতীকে বললেন—অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম—

সতী সনাতনবাবুর দিকে সোজা মুখ তুলে চাইলে এবার।

—কেমন আছো?

সতী বললে—ভালোই তো!

সনাতনবাবু বললে—এখন বোধহয় আর আমার কাছে যেতে আপত্তি হবে না।

সতী ম্লান একটু হাসলো শুধু। বললে—আগেও তো কখনও আপত্তি ছিল না আমার—

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে চলো না—আজকে এখনই চলো—

—না না বৌমা, অমন কাজটি কোর না,—খবরদার!

বলে নয়নরঞ্জিনী দুজনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন—না বৌমা, তুমি আমার মত ভুল কোর না! আমি নিজে এক পুরুষ মানুষের কাছে ভুগেছি বলেই বলছি। যে স্বামী নিজের বউকে ঘরে রাখতে পারে না, সে আবার পুরুষ মানুষ কীসের শুনি? আমার নিজের পেটের ছেলে বলে কি আমি তার হয়ে টেনে কথা বলবো? আমাকে তেমন শাশুড়ী পাওনি। স্পষ্ট কথার কষ্ট নেই। তোমার আজ লজ্জা করে না সোনা! বিয়ে করা বউ বলে কি কেনা-বাঁদী হয়ে এসেছে? তার একটা মান-মর্যাদা বলে জিনিস নেই! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে বলে কি তার এতই হেনস্তা? তুমি যদি অন্যায় করে থাকো মনে করো, তো ঘাট চাও, মাপ চাও বৌমার কাছে। এ কী সর্বনেশে কথা? তুমি যেমন আমার নিজের পেটের ছেলে, বৌমাও তো তেমনি আমার পেটের মেয়ের মত! চলো বললেই যাবে? এতদিনে তোমার এই বুদ্ধি হলো? ছি ছি—

সনাতনবাবু কথাগুলো যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন—অনেকবার তো তুমি নিজের থেকেই যেতে চেয়েছিলে! এবার মা'র যখন আপত্তি নেই তাহলে চলো—

সতী এতক্ষণে স্পষ্ট হলো যেন। শাশুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—আপনি কি আমাকে নিয়ে যেতেই এসেছিলেন আজ?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না বৌমা, মিথ্যে কথা বলবো না, তোমাকে নিয়ে যেতে আসিনি আমি, আমার ছেলে যে-অন্যায় করেছে তারপর তোমাকে নিয়ে যেতে আর সাহস হয়নি আমার, আমি শুধু তোমাকে একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছিলাম—

—কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে চোখের দেখাই বা দেখতে ইচ্ছে হলো কেন?

নয়নরঞ্জিনী দাসী কেমন যেন থমকে গেলেন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন। হেসে বললেন—হাজার হোক বৌমা, তুমি কি করে বুঝবে? তোমার যদি কখনও ছেলের বউ হয়, তখন বুঝতে পারবে—এর কী জ্বালা।

—কিন্তু আপনি আমাকে যতখানি জ্বালা দিয়েছেন, তার একতিল জ্বালাতেও যদি আপনি জ্বলতেন!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—সে আমি তোমাকে কী বলবো বউমা, সে শুধু আমি

জানি আর আমার ভগবান জানেন কত জ্বালায় আমি জ্বলছি! আমার বুক চিরে যদি তোমায় দেখাতে পারতুম তো তুমি বুঝতে পারতে! কিন্তু তোমার বয়েস কম, তোমাকে বলা আমার বৃথা! প্রাণের দায় বলেই আজ এই অথর্ব শরীর নিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছি—

সতী বললে—আজ তো প্রাণের দায় হবেই আপনার? নইলে যে আপনাকে ছেলের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে!

—তার মানে?

সতী বললে—তার মানে আপনি নিজেই ভালো করে জানেন!

নয়নরঞ্জিনীর যেন আসল রূপটা বেরিয়ে পড়লো হঠাৎ। বললেন—বৌমা!

সতীও ফণা তুলে দাঁড়াল। বললে—কাকে আপনি ভয় দেখাচ্ছেন মা, কোথায় দাঁড়িয়ে ভয় দেখাচ্ছেন?

নয়নরঞ্জিনী দাসী হঠাৎ সতীর চেহারা দেখে চমকে উঠলেন। দীপঙ্করও অবাক হয়ে গেল সতীর ব্যবহার দেখে। বললে—সতী, এ কী বলছো? ছিঃ—

সতী সেই একই সুরে বলতে লাগলো—কেন! ছিঃ কেন? আমি জানিনা বলতে চাও কেন উনি এসেছেন? আমি কি এতই বোকা উনি ভেবেছেন? আজ এসেছেন খোসামোদ করতে! আজ এসেছেন মিষ্টি কথা বলে বাড়িতে নিয়ে যেতে! আমি এর মানে বুঝিনে বলতে চাও?

সতী কথাগুলো বলছিল আর হাঁফাচ্ছিল। দীপঙ্কর বললে—তুমি থামো সতী! এ-রকম করে ওঁকে বলতে নেই! উনি সত্যি সত্যিই তোমাকে নিতে এসেছেন। উনি যা বলছেন শোনো! ওঁর কথা আজকে অমান্য কোর না। সনাতনবাবু নিজে তোমাকে যেতে বলছেন!

সতী বললে—কিন্তু কেন? এতদিন ওঁরা আমার খোঁজ নেননি, আর হঠাৎ আজকেই বা এত আদিখ্যেতা কেন? এতদিন আমার নামে কুৎসা রটিয়ে, আমার দিদির নামে কুৎসা রটিয়ে, আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েও সাধ মেটেনি, আর এখনই বা কেন এত আগ্রহ? কেন এতদিন বাদে মা-ছেলে দুজনে আমি ভালো আছি কিনা জানতে এসেছেন! আমি কি হঠাৎ রাতারাতি এত ভাল হয়ে গেলাম? না, রাতারাতি আমি একেবারে সতী হয়ে গেলাম যে আমার জন্যে শাশুড়ীর বুক একেবারে ফেটে গেল।

নয়নরঞ্জিনী এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এবার কথা বললেন। বললেন—ঠিক! ঠিক কথাই বলেছ বৌমা! তুমি ন্যায্য কথাই বলেছ! ঘোষ-বাড়ির বউএর উপযুক্ত কথাই বলেছ।

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন—দাও, এর জবাব দাও সোনা—তোমাকে এর জবাব দিতেই হবে।

সনাতনবাবু প্রথমে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তর্কে শুধু তর্ক বাড়ে সতী, তর্ক দিয়ে তো সমস্যার সমাধান হয় না!

সতী বললে—কিন্তু তুমি কেন এর পরেও আমাকে যেতে বলছো?

সনাতনবাবু বললেন—আমি তো তোমাকে ত্যাগ করিনি যে ফিরে যেতে বলতে আমার বাধবে! আমি তো কোনওদিন আশা ছাড়বো না। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন যে তোমার আশায় আমি থাকতে প্রস্তুত! আমি যে হতাশ হতে জানি না!

—কিন্তু যেদিন তোমার এই মা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, সেদিন তো তোমার মায়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলো নি!

সনাতনবাবু বললেন—সে তো আজো বলছি না, কোনওদিন বলবোও না! শুধু তোমায় ফিরে যেতে বলছি!

—কিন্তু কেন যেতে বলছো? আমাকে অপমান করে তোমাদের আশা কি এখনও মেটেনি? আরো অপমান করতে চাও আমাকে? বলো, এ-কথার জবাব দাও?

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—জবাব দিতে পারি, কিন্তু তা কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

সতী বললে—খুব বুঝতে পারবো, তোমাদের এত বদমায়েশি বুঝতে পেরেছি আর এইটে বুঝতে পারবো না?

—তাহলে বলি, তুমি আপনা-আপনিই প্রকাশিত! তুমি রাগে-দুঃখে-অপমানে-অনুরাগে স্বপ্রকাশ! তুমি যখন যা-খুশী করেছ, যা কিছু ভেবেছ, অন্য লোকের মত আপনাকে নিয়ে ছলনা করোনি। যখন রাগ করেছ—গালাগালি দিয়েছ, যখন কষ্ট পেয়েছ—তখন আর্তনাদ করে উঠেছ, যখন স্নেহ-ভালবাসা চেয়েছ—তখন জোর গলায় তা দাবী করেছ! সূর্যের মতই তুমি স্বয়ম্প্রকাশ! সূর্যকে আর মানুষের জানতে বাকি নেই। কিন্তু এবার আমাদেরই প্রকাশ হবার পালা! এবার আমাদের কাছেও তুমি প্রকাশ হও—আমাদেরও জানতে দাও তোমাকে! আমার এই মা তোমাকে ভালো করে জানুক তাকেও তুমি প্রকাশিত করো—

নয়নরঞ্জিনী ছেলের কথাবার্তা কিছুই বুঝছিলেন না। বললেন—ও-সব কী হেঁয়ালি বলছো ছাই ভস্ম! ভালো করে বলতে পারো না যে তোমার ঘাট হয়েছে মাপ করো?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু অপরাধের প্রশ্ন তো এ নয় মা, অপরাধ তো কেউই করেনি! তুমিও করোনি, আমিও করিনি, তোমার বউমাও করেন নি!

—ও মা, এ ছেলে কী বলে গো! শোন বউমা শোন! শোন তোমার স্বামীর কথা শোন! সারাজীবন আমি এক পুরুষমানুষের হাতে পড়ে ভুগেছি, আর এও হয়েছে সেই একরকম! বংশের ধারা পেয়েছে এ ছেলে! শোন বৌমা, এ-সব বাজে কথা থাক্, তুমি চলো আজ, সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আমি আর সে-বাড়িতে থাকতে পারছি না বাপু!

সতী বললে—কিন্তু অপরাধ যদি আপনারা কেউ না করে থাকেন তো আমি কি মিছিমিছি এই কষ্ট করে এখানে আছি?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, অপরাধ না-হয় আমিই করেছি বৌমা, আমারই ঘাট হয়েছে। সব দোষ আমার! এখন হলো তো?

সতী বললে—আপনি আজ এই কথা নিজের মুখে স্বীকার করছেন? আমার এত ক্ষতি করার পরও আপনার স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে না?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কিন্তু বৌমা, বলি, আমিও তো মানুষ, না কী? মানুষ বলে কি আমারও মান-অপমান লজ্জা-সম্ভ্রম থাকতে নেই? আমি হেন মানুষটা যে আজ তোমার কাছে এসে এই খোসামোদ করছি, তাতেও তোমার একটু জ্ঞান হয় না? এতখানি অপগেরাহিা আমাকে? নিজের ছেলেকে দিয়ে মাপ চাওয়ালুম, আমি নিজে এতখানি নিচু হলুম তোমার কাছে, তাতেও তোমার রাগ পড়লো না? এত অহঙ্কার তোমার? তুমি চাও তোমার শাশুড়ী হয়ে আমি তোমার পায়ে ধরে সাধবো? এই বুড়ো মানুষকে সেই অপমানটা না-করলে আর তোমার মনের সাধ মিটছে না?

দীপঙ্কর আর থাকতে পারলে না। হঠাৎ কথার মাঝখানে বলে উঠলো—ছি ছি মা-মণি, এ আপনি কী বলছেন? আপনি সতীর গুরুজন, এ কথা বললে যে সতীরই অকল্যাণ হবে! ছি, চুপ করুন—

নয়নরঞ্জিনী আবার আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলেন। বললেন—গুরুজন হয়ে ভাল কথা বলতে এসে খুব ঝাঁটা লাথি খেলাম বাবা, এও আমার কপালে ছিল—আমার খুব শিক্ষা হলো বটে—!

দীপঙ্কর বললে—আপনি চুপ করুন মা-মণি, সতী যাবে, সতী আপনার বাড়িতে যাবে, আপনি চোখের জল ফেলবেন না এমন করে! আপনি চোখের জল ফেললে সতীর যে অকল্যাণ হবে তা বুঝছেন না?

সতী হঠাৎ বলে উঠলো—তুমি চুপ করো দীপু! কোন্ অকল্যাণটা হতে আমার বাকি আছে শুনি যে আবার আমার নতুন অকল্যাণের ভয় দেখাচ্ছ? আর আমি যাবোই বা কোন্ দুঃখে? কেন যেতে যাবো? আমার টাকা হয়েছে বলে? আমার বাবার দেড় লাখ টাকা পেয়েছি বলে?

—টাকা!

নয়নরঞ্জিনী হঠাৎ চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে বললেন—কী বললে বউমা? টাকা?

সতী বললে—হ্যাঁ টাকাই তো! আমার টাকা হয়েছে বলেই তো আপনি এসেছেন! আমি বাবার দেড় লাখ টাকা না-পেলে কি আপনি আসতেন এ-বাড়িতে? এসে এত দরদ দেখাতেন?

—বৌমা, তুমি আজকে এই কথা বললে আমাকে? আমি তোমার টাকার পিত্যেশ করি? তোমার কাছে আমাকে আজ এই কথা শুনতে হলো?

সতী বললে—শুধু টাকার কথা কেন, আরো কিছুক্ষণ থাকলে অনেক কথাই শুনবেন, কথা কি আমার বুকে কম জমেছে মনে করেন? এই ক'বছরে তিলে তিলে প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর কথা জমে জমে হিম হয়ে গেছে, আজকে আপনি সামনে এসেছেন বলেই সব বেরিয়ে পড়লো, নইলে এত কথা আমি কাউকে বলি না!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বলো বৌমা, তোমার যত কথা আছে, সব আমি শুনবো আজ—বলো!

সতী বললে—না, তার চেয়ে আপনি চলেই যান, কথা বলতে আরম্ভ করলে অনেক অপ্রিয় কথাই হয়ত মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তখন আপনি আবার চোখের জল ফেলবেন দেখিয়ে দেখিয়ে! তার চেয়ে আপনি যান এখন, আমার কপালে না-হয় শ্বশুরবাড়ির সুখ নেই বলেই ভাববো,—

—তা আমি না-হয় চলেই যাচ্ছি বৌমা, তোমার এখানে থাকতে তো আমি আসিনি। কিন্তু আমার ঈশ্বর জানেন আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসিনি। তুমি বিশ্বাস করো আমার কথা!

সতী বললে—আপনি যদি শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়েও দিব্যি গালেন তবু আমি বিশ্বাস করবো না এ-কথা!

—তাহলে আমি মিথ্যেবাদী বলতে চাও? শেষকালে তুমিই আমাকে এই বদ্‌নাম দিলে বউমা?

সতী বললে—আমি বদনাম দেবার কে বলুন! আপনি যে-ঠাকুরের সামনে বসে রোজ আহ্নিক করার ভড়ং করেন, একদিন ধীরমনে সেই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনিই এর সঠিক জবাব দেবেন!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কিন্তু টাকা আমি তোমার কাছে কেন চাইতে যাবো বউমা? আমার টাকার কীসের অভাব?

—হ্যাঁ, টাকারই আপনার অভাব!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তুমি আমাকে অবাক করলে বউমা, আমার শ্বশুরের অত লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি থাকতে আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে যাবো?

সতী বললে—সে আপনার উকীলই সব বলেছে! আপনি লাখ টাকার জন্যে দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আপনি টাকা আমার কাছে পাবেন না এ আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি! ভাববেন না টাকা দিয়ে আমার আজ শ্বশুরবাড়ির সুখ কেনবার দুর্বুদ্ধি হবে, টাকা দিয়ে স্বামী-সুখ কেনবার দুর্বুদ্ধি হবে! ঘুষ দিয়ে সুখ কেনা যায় না মা, কেনা যায় না। ঘুষ দিয়ে জীবনের কোনও সুখই কেনা যায় না—এ আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি—

নয়নরঞ্জিনী তখনও অবাক হবার ভান করছেন। বললেন—এ-সব তুমি কী বলছো বউমা?

সতী বললে—হ্যাঁ ঠিকই বলছি! একদিন আমার বাবা দশ হাজার টাকা

দিয়ে আমার সুখ কিনতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্কণ্টক হবে। ভেবেছিলেন তাঁর মেয়ে মা পাবে, স্বামী পাবে, ছেলে পাবে, সংসার পাবে! হিন্দু মেয়েরা যা-যা চায় সবই পাবে! বাবার অনেক সৌভাগ্য যে বাবাকে আজ আমার এই দুর্ভাগ্য চোখে দেখে যেতে হয়নি! দেখলে তিনি আত্মহত্যা করে মনের জ্বালা জুড়োতেন!

নয়নরঞ্জিনী দাসীর মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না। তিনি যেন হতবাক হয়ে গেছেন!

—আমি ছোটবেলা থেকে শিবপুজো করেছি। ছোটবেলা থেকে স্বামীর ধ্যান করেছি। ছোটবেলা থেকে পুণ্যিপুকুর ব্রত করে এসেছি। ফল যা হয়েছে তা তো আপনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন! আর আমার দিদি ঠাকুর-দেবতাই মানেনি, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মারহাট্টি বিয়ে করেছে। সে মদ খেয়েছে, হিন্দু গৃহস্থঘরের মেয়েদের যা করা নিষিদ্ধ তাই-ই করেছে। সে সিগারেট খায়, আরো কী-কী করে, কী-কী খায় তা মুখ দিয়ে আমি বলতে পারবো না—কিন্তু সে আজ সুখী! সে আজ অনেক টাকার মালিক! সে স্বামী পেয়েছে, শুভাকাঙ্ক্ষী পেয়েছে, ছেলে পেয়েছে, সংসার পেয়েছে। হিন্দু মেয়েরা ছোটবেলা থেকে যা-যা কামনা করে সবই সে পেয়েছে। তার এই বাড়ি ছিল বলেই আমি এখানে আজ আশ্রয় পেয়েছি—এর পরেও আপনি আমাকে সুখের লোভ দেখাবেন?

নয়নরঞ্জিনী, সনাতনবাবু, দীপঙ্কর সবাই মন্ত্রমুগ্ধের-মত সতীর কথাগুলো শুনছিল। সকলের মুখেই যেন কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। সবাই যেন পাথর হয়ে গিয়েছে!

—আর আমি? আমি তো সব সহ্য করতেই প্রস্তুত ছিলুম! ভেবেছিলুম মুখ বুজে পড়ে থাকলেই আমার মোক্ষ লাভ হবে! মন প্রাণ দিয়ে শাশুড়ীর সেবা করলেই জীবন-কৃতার্থ হবে, মন-প্রাণ দিয়ে স্বামী-সেবা করলেই অক্ষয় স্বর্গ লাভ হবে! আমি তো কোনও প্রতিবাদই করিনি প্রথমে! কিন্তু আমিও তো আপনার মত মানুষ মা, আমিও তো স্নেহ ভালবাসার কাঙাল, আমারও তো মা হতে ইচ্ছে করে, আমারও তো সংসার করতে সাধ হয়! কই, সে-সাধ তো আপনি মেটাতে দিলেন না আমাকে! তার বদলে আপনি আমার মাথায় জুতো তুলে দিলেন বাড়ির সমস্ত চাকর-ঝি-দরোয়ানের সামনে! সেদিন কি আপনি জানতেন না যে আমিও একজন মেয়েমানুষ, আমারও মন-প্রাণ বলে একটা জিনিস আছে? অথচ, এই দেখুন......

হঠাৎ সতী এক কাজ করে বসলো। সনাতনবাবুর পায়ের জুতোজোড়া হঠাৎ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে নিজের মাথার ওপর রাখলে।

বললে—এই দেখুন আজকে আমি আবার সেই জুতোই মাথায় তুলে নিলাম মা, কেউ আমাকে এর জন্যে জোর করেনি, কেউ আমাকে এর জন্যে অনুরোধ-

উপরোধও করেনি, আমি আজ স্বেচ্ছায় আমার স্বামী দেবতার জুতো মাথায় করে নিলাম—আজকে আর এ আমার অপমান নয় এ আমার আশীর্বাদ, এ আমার কল্যাণ, এ আমার অলঙ্কার, এ আমার ভূষণ. ....

ঘটনাটা এত শিগ্গির ঘটলো যে কেউই যেন জিনিসটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না সহজে। প্রহেলিকার মত সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। সনাতনবাবু বাধা দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সতীর সেই শুচি-শুভ্র মূর্তির দিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। ভিজে এলানো চুলের মাঝখানে সরু একটু সিঁথি। সেই সিঁথির মাথায় টাট্‌কা সিঁদুর জ্বল্-জ্বল্ করছে। সকাল বেলার স্নিগ্ধ সূর্যের মত সতী যেন সকলের দৃষ্টির সামনে নতুন রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠলো এতদিন পরে। এ রূপ যেন এতদিন কেউ দেখেনি তার। সে-চেহারা দেখে দীপঙ্করের মনে হলো সতী যেন অনেক কুটিল, অনেক জটিল পথ অতিক্রম করে, অনেক স্বার্থ অনেক অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে, অনেক বিস্তারের মধ্যে দিয়ে অনেক আসক্তি আর অনেক অনুরক্তির পাথর বিদীর্ণ করে তার অন্তরের অন্তরাত্মাকে অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে মেলাতে পেরেছে! সেদিন যা ছিল অপমান, আজ যেন তা কল্যাণের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-মূর্তি দেখে অনেকক্ষণ কারো কোনও বাক্-স্ফূর্তি হলো না।

কিন্তু হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো মিস্টার ঘোষাল! কখন যে তার গাড়ি এসে বাইরে থেমেছে, কখন গাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ হয়েছে, কখন তার জুতোর শব্দ হয়েছে, কেউই তা টের পায়নি।

মিস্টার ঘোষাল ঘরে ঢুকেই সকলকে দেখে বললে—মাই গড্, সকলেই যে হাজির এখানে!

তারপর নয়নরঞ্জিনীর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়তেই একেবারে সোজা গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—কেমন আছেন আপনি মা-মণি? অনেকদিন পরে দেখা—

তারপর সতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—মিসেস ঘোষ, সকাল বেলা একবার আপনার বাড়িতে এসে ফিরে গেছি—

সতী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এতক্ষণে যে উত্তেজনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল ঘরের মধ্যে, মিস্টার ঘোষালের আবির্ভাবে তা যেন তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে।

দীপঙ্করের মনে আছে হঠাৎ সেই নাটকীয় অবস্থায় সেদিন মিস্টার ঘোষাল ঘরে এসে না ঢুকলে হয়তো সতীও চুপ করতো না, নয়নরঞ্জিনী দাসীও হয়তো শেষপর্যন্ত কী করতেন বলা যায় না। এতদিন পরে সেই-ই প্রথম মুখোমুখি কথা বলা। একেবারে মুখোশ খুলে সামনা-সামনি দাঁড়ানো। দীপঙ্কর ভেবেছিল দুজনের সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে হয়ত একটা যা-হোক কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। হয়ত সতী চলে যাবে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। আর সব মেয়ে

যেমনভাবে মুখ বুজে ভালবাসে, মুখ বুজে সংসার করে, আবার মুখ বুজে সহ্যও করে, সতীও হয়ত তেমনি করবে। চিরকাল ধরে মানুষ ভালবেসেছে, সংসার করেছে, সহ্য করেছে এই পৃথিবীকে। চিরকাল ধরে কখনও হাসি, কখনও আনন্দ, কখনও দুঃখ—সংসারের এই নিয়মকেই সবাই অমোঘ বলে মেনে এসেছে। কিন্তু সতী যে আলাদা ধাতুর মানুষ তা যেন আবার নতুন করে বুঝতে পারলে দীপঙ্কর। আগের রাত থেকে কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে কাটছিল, এবার সে-অস্বস্তি যেন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল।

সমস্ত ঘরটার মধ্যে তখন কেবল মিস্টার ঘোষালের অনর্গল কথার ফুলঝুরি ফুটছে। নয়নরঞ্জিনী দাসীর সঙ্গে যেন মিস্টার ঘোষালের বহুদিনের আলাপ। বহুকালের আত্মীয়তা।

নয়নরঞ্জিনী হঠাৎ কথার মধ্যখানে বললেন—আমি উঠি তাহলে বাবা?

মিস্টার ঘোষাল বললে—সেকি? আমি আপনাদের কথার মধ্যে বাধা দিলাম নাকি?

দীপঙ্কর বললে—না মা-মণি আপনি একটু বসুন।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না বাবা, বসলে তো আমার চলবে না, আমার আবার অন্য কাজও তো আছে—

দীপঙ্কর মিস্টার ঘোষালের দিকে চেয়ে বললে—আপনার কী কোনও জরুরী কাজ আছে মিস্টার ঘোষাল? মা-মণির সঙ্গে মিসেস ঘোষের একটা ইমপর্ট্যান্ট কথা হচ্ছিল এতক্ষণ—

—তাহলে আমি এসে বাধা পড়লো? কিন্তু আমারও যে একটা ইমপর্ট্যান্ট কথা ছিল মিসেস ঘোষের সঙ্গে—

দীপঙ্কর বললে—আপনি আপনার কথাটা তাহলে বলে নিন্—

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমার এত তাড়াতাড়ি নেই, আপনারা কথা বলে নিন, মা-মণি, আমি ওয়েট্ করতে পারবো—

সতী এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এবার বললে—না, আমার সঙ্গে কারোরই কোনও জরুরী কথা নেই, আমি কারোর সঙ্গেই কোনও কথা বলতে পারবো না—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু তা বললে চলবে না সতী! কথা তোমাকে বলতেই হবে! মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে যা বলার তা আগে শেষ করে নাও—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু মিসেস ঘোষ যখন ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না, তখন কেন আর পীড়াপীড়ি করছো সেন?

তারপর হঠাৎ সতীর দিকে দেখিয়ে বললে—আর দেখছ না, ওঁর শরীর খারাপ, কালকে অনেক হয়রানি হয়েছে ওঁর—কালকে আমার জন্যে মিসেস ঘোষের অনেক হ্যারাসমেণ্ট হয়েছে, এখন ওঁকে রেহাই দাও—

দীপঙ্কর বললে—আপনার এখনও লজ্জা হয় না মিস্টার ঘোষাল? আপনি আর কত ক্ষতি করবেন সতীর?

মনে আছে সেদিন ধৈর্যের সীমা বোধহয় হারিয়েই ফেলেছিল দীপঙ্কর। এতদিন ধরে এত প্রতীক্ষার পর যখন সনাতনবাবু, সতীর শাশুড়ী দুজনেই সতীকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল, ঠিক তখনই কি না মিস্টার ঘোষাল এসে সমস্ত কিছু বানচাল করে দেবার বন্দোবস্ত করেছে!

মিস্টার ঘোষালের চেহারাটা আরো কালো হয়ে উঠলো কথাটা শুনে। বললে—ক্ষতি! হোয়াট্ ডু ইউ মীন সেন?

দীপঙ্কর বললে—আপনি নিজেই তা জানেন! আমার মুখ দিয়ে না-ই বা শুনলেন?

মিস্টার ঘোষাল রুখে দাঁড়াল। —আই টেক অবজেক্‌শান টু ইট। তোমাকে জবাব দিতেই হবে, আমি কার কী ক্ষতি করেছি!

নয়নরঞ্জিনী বাধা দিয়ে বললেন—তুমি চুপ করো বাবা, ও-সব কথা নিয়ে তর্ক করে লাভ কী? আমি এসেছিলুম বৌমার কাছে, বৌমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে! রাগ করে বউমা এখানে থাকলে পাড়ার লোকেরা তো আমাকেই বদনাম দেবে। আমি যে বৌমার নিন্দেয় কান পাততে পারছি নে বাবা। যে-সে এসে জিজ্ঞেস করে তোমার বউমা কোথায়? হাসি-ঠাট্টা-টিটকিরি চলে বউমাকে নিয়ে, এটা কি আমাদেরই শুনতে ভালো লাগে বাবা? তারপর আমি তো বুড়ো হয়েছি, আমি কবে আছি কবে নেই, আমি চলে গেলে আমার সংসার কে দেখবে, তাও তো আমাকে ভাবতে হবে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—এক্‌জ্যাক্টলি! আপনিই তো শাশুড়ী, আপনারই তো সমস্ত দায়িত্ব—

—তাহলে তুমি একটু বুঝিয়ে দাও তো বাবা বউমাকে! তুমি বুঝিয়ে বললে বউমা শুনবে! ছেলেমানুষ বউমা, হাতে অনেক টাকা এসেছে, এ-সময়ে এই নিরিবিলি জায়গায় একলা-একলা পড়ে থাকা কি ভালো? আর কলকাতা শহরে এখন বোমা পড়ছে, কত রকমের বিপদ আপদ আছে, আমিই কি বউমাকে একলা ফেলে রেখে শান্তিতে থাকতে পারি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, ঠিক কথাই বলেছেন! আমি বুঝিয়ে দেবো সব মিসেস ঘোষকে!

—হ্যাঁ বাবা, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, আমাদের তাড়াতাড়ি আছে, একেবারে সঙ্গে করে বউমাকে বাড়ি নিয়ে যেতাম—

মিস্টার ঘোষাল বললে—ঠিক আছে, আপনারা এখন বাড়ি যান, আমিই মিসেস ঘোষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব—

সতী হঠাৎ বললে—না, আপনাদের কাউকেই থাকতে হবে না, আমি এখানেই থাকবো!

দীপঙ্কর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মিস্টার ঘোষাল বললে—তা আপনার বউমা যখন আপত্তি করছে মা, তখন থাকলোই বা এখানে—আর যদি

যেতেই হয় তো পরে গেলেও তো চলবে।

দীপঙ্কর বললে—না, এখনই যেতে হবে সতীকে!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তোমরা সবাই মিলে বলো তো বাবা সেই কথা! আমার ছেলে রইল সেখানে আর বউমা রইল এখানে—তা কী করে হয়!

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ সনাতনবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী বলেন মিস্টার ঘোষ? আপনার কী মত এ-বিষয়ে?

দীপঙ্কর বললে—তার চেয়ে আমরা এক কাজ করি মা-মণি, আমরা সবাই এখন এখান থেকে চলে যাই, আসুন মিস্টার ঘোষাল। লেট্ মিস্টার ঘোষ রিমেন্ হিয়ার, লেট্ দেম্ ডিসাইড, ওঁরা দুজনেই থাকুক এখানে, ওঁদের দুজনকে একজায়গায় থাকতে দিন—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—না বাবা দীপঙ্কর সে ভালো হবে না,—

মিস্টার ঘোষাল কথাটা লুফে নিয়ে বললে—ঠিক বলেছেন মা-মণি, আন-উইলিং ওয়াইফকে এরকমভাবে ফোর্স করা উচিত নয়, তার চেয়ে বরং আপনারা চলে যাবার পর আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলবো যাতে মিসেস ঘোষ আপনাদের বাড়িতে যান—

সতী যেন এতক্ষণ এ-সব কথায় বিরক্ত হয়ে উঠছিল। অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করে করে এতক্ষণে যেন তার সহ্যের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আপনারা কেন গোলমাল করছেন সবাই মিলে, আপনারা চলে যান্ এখান থেকে, সবাই চলে যান্—

মিস্টার ঘোষালও একটু যেন থমকে গেল কথাটা শুনে। তারপর বললে—আপনার সঙ্গে যে আমার একটা কথা ছিল মিসেস ঘোষ—

সতী বললে—সকলের সব কথা শোনবার আমার সময় নেই আজ, আপনার কোর্টে আমি সাক্ষী দিয়ে আসবো, আপনার ভাবনা নেই, আপনি এখন যান্ এখান থেকে—যান্—

—কিন্তু এই শনিবারই যে আমার ডিফেন্স হিয়ারিং—

সতী ধমকানির সুরে বললে—আপনি যাবেন কিনা বলুন?

বলেই চিৎকার করে ডাকলে—রঘু—

রঘু ঘরে আসতেই সতী বললে—এই সকলকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দে, কাউকে এখানে ঢুকতে......

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একটা অঘটন ঘটলো। বাইরে কে যেন সদর দরজায় কড়া নাড়লে। রঘু গিয়ে দরজা খুলে দিতেই এক পোস্টাফিসের পিওন ঘরে ঢুকলো।

—কী চাই?

—টেলিগ্রাম!

কার টেলিগ্রাম! দীপঙ্কর একটু উৎসুক হয়ে ছিল। রঘু টেলিগ্রামটা

দিতেই সতী সই করে দিলে। তারপর খামখানা খুলে নিজের মনেই পড়তে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। সবাই উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে সেই দিকে। কার টেলিগ্রাম! কে পাঠিয়েছে! কিছু জানা যাচ্ছে না। তারপর সেখান হাতে নিয়েই সতী সোজা ভেতরে চলে গেল। ভেতরে গিয়ে নিজের ঘরের দরজায় সশব্দে খিল বন্ধ করে দিলে।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কার টেলিগ্রাম? কে পাঠিয়েছে?

কে আর উত্তর দেবে এ-কথার! কেউই তো জানে না! মিস্টার ঘোষাল বললে—ঠিক আছে, আপনারা এখন যান মা-মণি, আমি রইলুম, আমি দেখি কী করতে পারি! যা হয়, আমি আপনাকে জানিয়ে আসবো আপনার বাড়িতে গিয়ে—

নয়নরঞ্জিনী উঠলেন। সনাতনবাবুও উঠলেন। দীপঙ্করও উঠে বাইরে এল। তারপর গিয়ে গাড়িতে উঠলো। সামনের রাস্তায় তখন কুলিরা কাজ করছে। রাস্তা মেরামত হচ্ছে। খোয়ার রাস্তায় অ্যাশফাল্ট দেওয়া হচ্ছে। মিলিটারি লরীর যাতায়াতের সুবিধের জন্যে কলকাতার সমস্ত খোয়ার রাস্তায় পিচ্ ঢালা হচ্ছে। চার্চিলের আর্মি মহাত্মা-গান্ধীকে অ্যারেস্ট করেছে। আবুল-কালাম আজাদকে অ্যারেস্ট করেছে, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরুকে অ্যারেস্ট করেছে, প্রাণমথবাবুকে অ্যারেস্ট করেছে, ফোঁটাকে অ্যারেস্ট করেছে। এমন কি কিরণকেও অ্যারেস্ট করেছে। ল্যান্ড লীজ্ চুক্তির ফলে এই বেঙ্গলেই জড়ো হয়েছে অ্যালায়েড্ পাওয়ার্সের সব মাল মশলা। জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাই-শেককে সাহায্য করতে হবে প্লেন দিয়ে, আর্মি দিয়ে, আর্টিলারি দিয়ে। আমেরিকার প্রোডাক্শনের টেন্ পার্সেন্ট দিলে চায়না হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট করে তা ফেরত দেবে। কোটি-কোটি টাকার রসদ, ওষুধ, জিপ্, সব কিছু বেঙ্গলের মাটিতে এসে জড়ো হয়েছে। এখানকার কণ্ট্রাক্টাররা দুহাতে সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছে না। চিয়াং-কাইশেককে বাঁচাতেই হবে। নইলে জাপানকে রোখা যাবে না। প্যাসিফিক্ এরিয়াতে ব্রিটিশ আর আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে জাপানের দাঁত ভাঙতেই হবে। কিন্তু হায়রে, সেদিন কি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জানতো, না চার্চিলই জানতো যে এত কোটি-কোটি টাকা চিয়াং-কাই-শেককে দিয়ে শুধু ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে। সেদিন কি তারা আরো জানতো যে চিয়াং-কাইশেকের চায়নার ভেতরে মাও-সে-তুঙ্-এর আর এক নতুন চায়না মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে?

সত্যিই তো, কখন রং বদলায়, কখন রাজা বদলায়, কখন মানুষ, মানুষের মন, সব কিছু বদলে যায়, কেউ জানতে পারে না। কেউ টের পায় না। ১৯১৮ সালে ১১ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন এবার শান্তি আসবে। এবার মানুষ সুখী হবে। এবার আর্মিস্টিস্ সই হয়ে গেছে। আর ভয় নেই

কারো! লীগ অব্ নেশনস্ তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু তখন কি প্রেসিডেন্ট উইলসনই জানতো যে সোভিয়েট রাশিয়ার গোকুলে লেনিন নামে আর একজন ভদ্রলোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? কিম্বা জার্মানীতে হিটলার নামে এক ভদ্রলোক মালকোঁচা মেরে তৈরি হবে? ফ্যাসিজম্ আর নাজিজম্-এর স্বপ্নই কি দেখতে পেয়েছিল উইলসন সাহেব? ভাবতে পেরেছিল সান্ ইয়াত্ সেনের কথা? কিম্বা গান্ধীর কথা? অথচ ঠিক সেই সময়েই ভিয়েনার একটা বন্ধ ঘরে বসে আর একজন ভদ্রলোক এই সনাতনবাবুর মতই নির্বিকার চিত্তে এই যুদ্ধ আর এই মৃত্যু, এই সভ্যতা আর এই যন্ত্রণার কথা নিয়ে ভেবে চলেছে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে? কার কথা বলছেন?

সনাতনবাবু বললেন—ফ্রয়েড্—

রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার ট্যাঙ্ক আর মিলিটারি লরী সাজানো রয়েছে সার সার। নতুন গাড়ি, নতুন মেশিন। সব ল্যান্ড-লীজের মাল। সনাতনবাবু বললেন—ওই দেখুন—কাল শোভাবাজারে বোমা পড়েছে এই জন্যেই, এ সমস্তই চায়নায় পাঠানো হবে—

সত্যিই, মুষ্টিমেয় মানুষের পাপের খেসারত দিতে হবে সারা পৃথিবীর মানুষের মৃত্যু দিয়ে। হংকং-এর মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো শোভা-বাজারের বাঙালীরা। সনাতনবাবু আবার বললেন—আসলে এই পৃথিবীটারই অসুখ করেছে দীপঙ্করবাবু—পৃথিবীটাই অসুস্থ—

নয়নরঞ্জিনী আর থাকতে পারলেন না। এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন—তুমি থামো তো সোনা, আমি আমার নিজের জ্বালায় জ্বলছি, এখন যত বক্-বক্ আরম্ভ করলে, থামো—

দীপঙ্কর বললে—আপনি কেন ভাবছেন মা-মণি, আমি তো বলছি সব ঠিক করে দেব—

—ভাবি কি সাধে বাবা! আমার মাথার ওপরে যে খাঁড়া ঝুলছে!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি বলছি আমি যেমন করে পারি, সতীর কাছ থেকে আপনার টাকা যোগাড় করে দেবই—

—কিন্তু দেরি করলে তো আমার চলবে না বাবা, আমি কোর্টে দরখাস্ত করে শুধু ক'মাস নীলেম ঠেকিয়ে রাখতে বলেছি আমার উকীলকে। তিনমাস পরে কড়কড়ে লাখখানেক টাকা তো আমাকে দিতেই হবে?

—কিন্তু এমনভাবে ঠকবেনই বা আপনি কেন? আপনিও তো মামলা করতে পারেন পাওনাদারের নামে?

—সে তো আমার উকীলও বলেছে। এই মামলা করতে করতেই দেখছি বাজিভোর হয়ে যাবে। কিন্তু টাকাটা তো আমাকে জমা রাখতে হবে কোর্টে! তাই বলছিলাম টাকাটা পেলে আমার এখন সুবিধে হতো! আসলে বাবা আমি তোমাকে খুলে বলি, তুমি খুব বিবেচক ছেলে। বউমাকে যদি কোনওরকমে

এই সময়ে বাড়িতে আনতে পারতুম তো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেমন করে হোক টাকাটা আদায় করতে পারতুম—তা তো হলো না।

—কবের মধ্যে টাকাটা দরকার আপনার?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আজ দিলে আজই ভালো হয় বাবা, এমন হয়েছে কাণ্ড! তোমায় কী বলবো বাবা, আমার নদিদি আছে একজন, সে ইচ্ছে করলেই দিতে পারে, কিন্তু টাকার বেলায় কেউ কারো নয়। এমনি জগৎ। এই নীলেমের নোটিশের খবর পাবার পর থেকে আমার বাড়ির ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না—অথচ আগে রোজ আসতো।

তারপর দীপঙ্করের হাত দুটো হঠাৎ ধরে ফেললেন। তাঁর চেহারার দিকে চেয়ে দীপঙ্করের মায়া হলো। এত অসহায় রূপ আর কখনও দেখেনি সে মা-মণির।

মা-মণি আবার বলতে লাগলেন—ভেবেছিলুম আমি নিজে এসে বউমাকে বললে বউমা হয়ত 'না' বলতে পারবে না, কিন্তু টাকা না পেলে আমি কী করবো?

সনাতনবাবু বললেন—টাকা আনতে গিয়েছিলে তো টাকাটা চাইতেই পারতে? টাকা তো তুমি চাওনি মা! তুমি তো তোমার বউমাকেই চেয়েছ—

—তুমি থামো তো, তুমি আর আমাকে জ্বালিও না! টাকা সোজাসুজি ওমনি চাওয়া যায়? সোজাসুজি টাকা চাইলে কেউ দেয়? নদিদি টাকা দিলে?

দীপঙ্কর বললে—আমি সোজাসুজিই চাইবো। অত টাকা সতীর কী হবে! আপনাদের বিপদ তো তারও বিপদ!

গাড়িটা সোজা খোলা রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলছিল। নয়নরঞ্জিনী বললেন—দেখি এখন কী হয়, তোমরা দুজনে চেষ্টা করে যদি টাকা যোগাড় করে দিতে পারো তো আমি এ-যাত্রা বাঁচি বাবা, আমার আর কেউ নেই—

আর ওদিকে ঘরের মধ্যে মিস্টার ঘোষাল তখনও চেয়ারের ওপর বসে ছিল। তখনও সতী আসছে না। রঘু কাছে আসতেই মিস্টার ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে—তোমার দিদিমণি কোথায়?

রঘু বললে—ঘরে।

—ঘরে কী করছে?

—তা জানি না। ঘরের ভেতরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিয়েছে—

—চলো তো, আমি গিয়ে ডাকি একবার!

বলে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। তারপর রঘুর সঙ্গে সতীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে লাগলো।

—সতী! মিসেস ঘোষ! সতী!

কোনও সাড়া শব্দ নেই। ভেতরে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে। মিস্টার ঘোষাল আরো জোরে শব্দ করতে লাগলো।

—ওরা চলে গেছে! সবাই চলে গেছে। আমি শুধু একলা আছি, দরজা

খোল! সতী!

তব্ কোনও শব্দ নেই। কোনও উত্তর নেই। দরজার মাথায় সিলিং-এর কোণে একটা টিকটিকি শব্দ ঘাড় বেঁকিয়ে একবার মিস্টার ঘোষালকে দেখলে। টিকটিকিটাও যেন গ্রাহ্য করলে না মিস্টার ঘোষালকে। সেও নড়লো না একটুকু। সে-ও ভয় পেলে না একটু!

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে স্ট্যালিনগ্রাডও তার দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে থেকে ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারি দিয়ে জার্মান আর্মি ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে লাগলো। চিৎকার করে উঠলো। হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই। দরজার ভেতরে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে। বাইরে থেকে ডন্ আর ভল্গা নদীর মধ্যেকার সব জায়গাটুকু দখল করে নিয়েও কোনও ফল হয়নি। এবার টাকা চাই। এবার সাক্ষী দিতে হবে কোর্টে গিয়ে। নইলে মিস্টার ঘোষালরা জেলে যাবে। নইলে নয়নরঞ্জিনী দাসীরা বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াবে। ককেশাস্ চাই, নইলে পেট্রল পাবো না: সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করতে পারবো না। লেনিনগ্রাড থেকে ককেশাস পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল লম্বা লাইন দিয়েছে সোলজাররা। বাকুর তেলের খনি চাই, গ্রোজনির তেলের খনিও চাই। পেট্রল পেলে তবে মিস্টার ঘোষালরা আবার রেলওয়েতে ডি-টি-এস হয়ে বসবে, নয়নরঞ্জিনী দাসীরা আবার শাশুড়ী হয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। ইরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড, ইথিওপিয়া—সব গেছে মুসোলিনীর হাত থেকে। নয়নরঞ্জিনী এখন অনাথ। দরোয়ান গেছে, গাড়ি গেছে, ড্রাইভারও গেছে। চাকর-ঝিরাও মাইনে পাচ্ছে না। এখন একমাত্র ভরসা রাশিয়া। তাই সতীর কাছে এসেছে হিটলার। এসেছে মুসোলিনী। টাকা দাও, সাক্ষী দাও, পেট্রল দাও! সব দিয়ে ইজ্জত বাঁচাও!

কিন্তু স্ট্যালিনগ্র্যাডের দরজা বন্ধই রইল। বাইরের বন্ধ দরজা থেকেই ফিরতে হলো মিস্টার ঘোষালকে!

বৌবাজারের প্রবীণ উকীল বিভূতিভূষণ বসু টেম্পল চেম্বার্সের এটর্নী মিস্টার গাঙ্গুলীকে টেলিফোন করলে।

—কী হে, খুব কাজকর্মে ব্যস্ত নাকি? তোমার আপিসে গিয়েও দেখা পাওয়া যায় না! ঘোষালের কেসটার কী হলো?

—আরে সে কেস্-এর তো জাজমেণ্ট বেরিয়ে গেছে, দেখনি? জজ্ বড্ড কড়া রিমার্ক দিয়েছে ভাই। এমন স্ট্রিকচার দিয়েছে, আসামী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝিয়ে বললুম—ওতে কিছু ভয় পাবার নেই। তা যদি হতো তাহলে কলকাতার সমস্ত নামজাদা লোকই আজ সুইসাইড্ করতো। তবে সেই স্পেশ্যাল-ট্রাইব্যুন্যালের কেস্‌টা তো এখনও ঝুলছে, তার জন্যেই ভাবনা—

—কেন? ভাবনা কীসের? সেকশন থ্রি-হান্ড্রেড-টু থেকে যখন খালাস করে দিলে তখন আবার ভাবনা কীসের?

—না ভাই, আমার ডিফেন্স উইট্‌নেস্ মিসেস ঘোষকে নিয়ে এখন মুশকিলে পড়েছি।

—কোন্ মিসেস ঘোষ? নয়নরঞ্জিনী দাসীর পুত্রবধূ?

—হ্যাঁ, সেই-ই তো আমার প্রিন্সিপ্যাল উইট্‌নেস্। আসামী বার বার যাচ্ছে দেখা করতে, কিছুতেই দেখা করছে না।

—কী বলছে?

—আরে, দেখাই করছে না তো বলবে কী? অথচ সমন্ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সমন্ অ্যাক্সেপ্ট করেছে সে, আমি উইট্‌নেস্-লিস্টে তার নামও সাবমিট্ করেছি, এখন স্পেশ্যাল পাব্লিক প্রোসিকিউটারের কাছে নাজেহাল্ হয়ে যাবো।

বিভূতিভূষণ বসু বললে—এদিকে আমার মুশকিল হয়েছে ভাই, মিসেস ঘোষের শাশুড়ীকে নিয়ে।

—কেন? নয়নরঞ্জিনী দাসীর কেস্‌টা? তা তুমি তো সুট্ ফাইল করেছ?

—তা তো করেছি, কিন্তু জজ্ যে টাকাটা ডিপোজিট্ দিতে বলেছে। দেব কোত্থেকে? পুত্রবধূ নাকি দেড় লাখ টাকা পেয়েছে বাবার কাছ থেকে—সেই টাকাটা চাইতে গিয়েছিল, গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে শাশুড়ীকে!

গাঙ্গুলী বললে—তা তো দেবেই! বড় ধড়িবাজ মেয়ে হে! আমি তো চিনি। সেদিন কী ওয়ান্ডারফুল সাক্ষী দিলে ভাই কী বলবো! এবার ভাবছি আমি নিজে একবার যাবো। তা আমাদের পাড়ার বোমা দেখতে তো এলোনা তুমি?

—বোমা? কোথায়? শোভাবাজারে?

—হ্যাঁ, আমার বাড়ির সাতখানা বাড়ির পরেই পড়েছে বোমাটা। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি ভাই। সমস্ত কলকাতার লোক দেখতে আসছে রোজ। খুব ভিড় হচ্ছে ক'দিন—

—কোথায় পড়েছে?

—একটা ভাঙা পুরোন পাঁচিলের ওপর। তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু তাই দেখতেই লোকে লোকারণ্য। আমার ভায়রাভাই থাকে চুঁচড়োতে, সে সেদিন সপরিবারে এসেছিল দেখতে, আমার এক মামা আছে বেনারসে, তারা সবাই দেখতে আসবে লিখেছে—

সত্যিই, কলকাতার সবাই সেদিন সেই বোমা দেখতেই ছুটেছিল শোভাবাজারে। মানুষকে নিয়ে এত বড় রাহাজানিটা সেদিন মজা বলেই প্রতিপন্ন হয়েছিল কলকাতার লোকদের কাছে। কিন্তু সেদিন কেউই জানতো না যে কলকাতার সেই ইতিহাসের পেছনে আর এক মর্মান্তিক হাহাকার লুকিয়ে আছে। শুধু বোমা নয়, দুর্ভিক্ষ, খুন জখম, সমস্তই যেন ওৎ পেতে ছিল কলকাতার সদর দরজায়। বলতে গেলে আর একটা সিভিল-ওয়ার তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

উঁকি মারছে। কেউ জানতো না, কেউ টেরও পায়নি। শুধু মিস্টার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ জানতো আর জানতো মিস্টার চার্চিল। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ পার্লামেণ্টে ফিরে গিয়ে কী রিপোর্ট দিয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা জানা যায় নি। জানা যাবেও না আর। বার্ট্রান্ড রাসেল নিউ ইয়র্কের 'টাইম' কাগজে লিখলেন—না, ইণ্ডিয়াকে কখনও স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কংগ্রেস কেউ নয়। তিনি লিখলেন :—
I deplore the present conflict in India. I do not think it would be possible, as the Congress Party demanded, to hand over the Government to a professedly representative collection of Indians hastily assembled in the middle of a war, and bitterly at odds among themselves on many important questions. The replies to Sir Stafford Cripps made clear that a British withdrawal now would leave India in chaos and anarchy, if not actually in civil war.

আসলে কার মতলবে বলা যায় না, সেই সিভিল-ওয়ারই হলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে অনেক পরে। তখন মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, প্রাণমথবাবু, ফোঁটা, সবাই তখন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সে অনেক পরে। তখন লক্ষ্মীদি এসে গেছে কলকাতায় সর্বস্বান্ত হয়ে, তখন সতী তার আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে আবার। তখন ফোঁটা কালিঘাট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে। তখন প্রাণমথবাবুও মারা গেছেন। আর কিরণ? কিরণের কথাও বলবো। সে অনেক পরে। তখন এ-উপন্যাসের শেষ পর্যায় লেখা হচ্ছে। দীপঙ্করের জীবনেরও প্রায় শেষ অধ্যায়!

সোজা আপিস যাবার আগেই দীপঙ্কর আবার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের 'অঘোর-সৌধ'তে গিয়ে নামলো। আপিস যাবার জন্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়েছিল সেদিন। মনোহরদের রোয়াকের আড্ডা তার আগেই হয়ত শেষ হয়ে গেছে। সেই পুরোন রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতেই যেন দীপঙ্কর আবার তার নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেলে। যেন সেই ছোটবেলার দীপু সে। সেই রাস্তার কোণে তেলেভাজার দোকানটা তখনও রয়েছে। সেই গলিটারও তেমনি চেহারা। শুধু পিচ্ ঢালা হয়েছে রাস্তায়। ফটিকদের পাথুরেপটির ভেতরে টিনের চালাটাও তেমনি আছে। আসলে বাইরে বোধহয় সবটাই সেইরকম আছে, শুধু ভেতরটাই বদলেছে। আজ কেউ আর চিনতে পারলে না তাকে। কিম্বা হয়ত কাউকে অত চিনে রাখবার কারো সময়ও নেই। সবাই যেন ব্যস্ত! রাস্তার লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে হেঁটে চলেছে। হাঁটছে না তারা, যেন ছুটছে। যেন আর সময় নেই কারো। ছোট ছোট ছেলেরাও আর আগের দিনের মত পাড়ার গলিতে গুলি খেলছে না, খেলা

করছে না। সময় নেই কারো। ছুটে গিয়ে সকলকে সকলে পেছনে ফেলে রাখবে। অর্থাৎ আরো যেন টাকা চাই। এক মিনিট দেরি হলে যেন অনেক টাকা ফস্কে যাবে। সকলের হাতে এক নতুন জিনিস। সকলেই হাতে নিয়ে চলেছে থলি। চটের থলি। ছোটবেলায় তো এত থলি দেখেনি দীপঙ্কর কারোর হাতে!

—ছিটেবাবু আছেন?

'অঘোর-সৌধ'র সামনের গেটে একটা দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল। একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে। ভেতরে বউরা বসে। হয়ত সেই লক্কা কিম্বা লোটন। সেদিনের সেই কালিঘাটের বস্তির মেয়েদের চেনবারও আর উপায় নেই। তারা ভদ্র-গৃহস্থবাড়ির সঙ্গে নিখুঁত খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেদের। লাল চওড়া পাড় শাড়ি। গরদের শাড়ি। হয়ত কালিঘাটের মন্দিরেই পুজো দিতে যাচ্ছে। হেঁটে যাওয়া হয়ত আর সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। সম্ভ্রম, মর্যাদা, শালীনতা—অনেক কিছুরই বাধা হয়ত তাদের পায়ে হাঁটা আজ বন্ধ করে দিয়েছে।

আজ যেন ছিটেও অনেক মর্যাদার মানুষ হয়ে উঠছে। সেই খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি আরো ফরসা হয়েছে। আরো মোটা হয়েছে যেন সে। ঘরময় লোক। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, অনেক আশ্রিত, অভ্যাগত জুটেছে তাদের। আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী—কিছুরই অভাব নেই তাদের আজ। দীপঙ্করকে দেখেই একটু অবাক হবার ভান করলে। অথচ মনে মনে যেন ধারণা শুধু দীপঙ্কর কেন, সবাইকেই এই 'অঘোর-সৌধ'তে একদিন আসতেই হবে। কলকাতার হোমরা-চোমরা মানুষরা তার কাছে যখন আসে তখন দীপঙ্কর তো কোন্ ছার! দীপঙ্কর চারদিকে চেয়ে দেখলে। এই বাড়ির উঠোনের ভেতর কোন্ ঘরে সে থাকতো, কোন্ ঘরে শুতো, কোথায় সে খেত, কোথায় সেই আমড়া গাছটা ছিল—তা যেন আর চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

অনেক লোকের মধ্যে কীভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর।

—তারপর এদিকে কী মনে করে ভাই দীপু?

দীপঙ্কর বললে—তুমি খুব ব্যস্ত আছো?

ছিটে হাসলো। বললে—আর যে দিনকাল পড়েছে, এ-যুগে ব্যস্ত না-থেকে উপায় আছে? খেটে খেতে হয় তো! কী বলেন বদ্রীদাসজী?

ওপাশ থেকে কে একজন মারোয়াড়ী হেঁ হেঁ করে হেসে উঠে তাল দিলে।

—না, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, পার্সোনাল কথা একটু—

ছিটে বললে—তা তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমার আপত্তি কিছু নেই, আমি ভাই সেই প্লেন্ অ্যান্ড্ সিম্পল্ ছিটেই আছি এখনও! সিম্পল্ থাকার অনেক গুণ, জানো? তা আফিসে যাচ্ছো বুঝি?

—হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি আছে আমারও। সাড়ে আটটা বেজে গেছে কি না?

ছিটে বললে—তাহলে এই পাশের ঘরে চলো, পাশের ঘরটা তো পার্সোনাল

কথা বলবার জন্যেই তৈরি করেছি—

পাশের ঘরটাও সাজানো-গোছানো। টেবল্-চেয়ার ফরাস তাকিয়া—সব কিছুই আছে। ছিটে-ফোঁটা নিজেদের দুই ভাইএর ছবি টাঙানো রয়েছে ঘরে। জেলে ধরে নিয়ে যাবার আগে ফোঁটাকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিল গুণ-গ্রাহীরা। সেই অবস্থার ফোটো। দেশসেবক, কর্মী, ত্যাগী ফোঁটা, ফটিক ভট্টাচার্য।

ছিটে বলে—এটাতে ফোঁটা বসতো, ফোঁটার ঘর—কী, বল এবার, কী তোমার পার্সোন্যাল টক্?

দীপঙ্কর বললে—আমি এসেছিলাম তোমার কাছে, একটা বিশেষ কাজে। খুব বিপদে পড়ে। একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো!

—বিপদ? তোমার চাকরি নিয়ে কিছু বিপদ?

দীপঙ্কর বললে—না, তা নয়, কিছু টাকা আমার দরকার—

ছিটে যেন এটা ভাবতেই পারেনি। বললে—টাকা?

—হ্যাঁ, আমি অনেক ভেবে তোমার কাছে এসেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ-বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমার আপিস থেকে লোন্ নেবার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু তাতে আমার কুলোবে না। বড় জোর আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে পনেরো কুড়ি হাজার টাকা আমি ধার নিতে পারি—কিন্তু তার অনেক বেশি আমার দরকার—

ছিটে কী ভাবলে। বললে—ব্যবসা করবার মতলব? কীসের ব্যবসা করবে?

দীপঙ্কর বললে—না, ব্যবসা নয়, অন্য কারণে—

—তাহলে আর কী হতে পারে? মিলিটারি কন্ট্রাক্ট? কত অর্ডার পেয়েছো তুমি? কত পার্সেন্ট থাকবে? ক্যাশ পেমেন্ট না ক্রেডিট? গ্রেন সাপ্লাই?

দীপঙ্কর বললে—না, ও-সব কিছুই না। টাকাটা তুমি দিতে পারবে কি না বলো না। আমি ইন্টারেস্ট্ দেব, বাজারে যে-ইন্টারেস্ট তুমি পাও আমি সেই ইন্টারেস্ট্ দেব। কিম্বা মাসে-মাসে পাঁচশো টাকা করে আমি দিতে পারি। মোটকথা একসঙ্গে আমার অনেক টাকা থোক্ দরকার, আমার নিজের হাতে কিছু নেই এখন—

ছিটে বললে—কত টাকা চাই তোমার তাই-ই বলো না!

দীপঙ্কর বললে—ধরো এক লাখ!

—এক লাখ? এক লাখ টাকার জন্যে এত ভাবনা? আজকাল ক্যাপিট্যালের তো ছড়াছড়ি। মানি-লেন্ডাররা টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে ক্যাপিট্যাল্ ইনভেস্ট করবে বলে!

—কিন্তু তাদের কাছে আমি যেতে চাই না। তোমাকে চিনি, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি যদি দাও তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমি অবশ্য শুধু হাতে টাকা নেব না। আমি রীতিমত স্ট্যাম্পড্-পেপারে এগ্রিমেন্ট করে নেব। তা ছাড়া তুমি তো জানো আমি কী চাকরি করি, কত টাকা মাইনে পাই। তোমার

টাকা অন্ততঃ মারা যাবে না, এইটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি—

ছিটে হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুমি দেখছি রীতিমত ওয়ার্লডলি লোক হয়ে পড়েছ। টাকা তো চাইছো, টাকা আমার আছেও। কিন্তু টাকা তো আর লিকুইড ফেলে রাখি না আমরা। আমাদের টাকা তো আর ব্যাঙ্কে থাকে না।

—ব্যাঙ্কে থাকে না?

দীপঙ্কর যেন সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল ছিটের কথা শুনে! এত টাকার মালিক এরা, ব্যাঙ্কে টাকা রাখে না?

—না, ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের কারবার নেই। সেকালের লোকরা টাকা ব্যাঙ্কে রাখতো, এখনও যারা মাসকাবারি মাইনে পায়, তারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। বিজ্‌নেস্‌ম্যানরা টাকা কখনও ব্যাঙ্কে রাখে না। তা ছাড়া ওয়ারের সময় এত টাকা ব্যাঙ্কে রাখাও তো রিস্ক! কুড়ি পঁচিশ মেরে কেটে পঞ্চাশ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে রাখি আর বাকিটা—

—বাকিটা?

ছিটে বললে—বাকিটা সবই ইনভেস্টমেন্ট। কিছু ল্যান্ড কিনেছি, কিছু চাল স্টক্ করেছি। চালের দর তো এবার বাড়বে, চার টাকা মণ ছিল বাজারে, এখন ছ'টাকা হয়েছে। আমি তিনটাকা দরে কিনেছিলুম, যখন চল্লিশটাকা মণ দর হবে, তখন ছেড়ে দেব। তিনশ টন মাত্র কিনেছি, টাকা থাকলে আরো কয়েকশ টন কিনে ফেলতাম।

আরো অনেক কথা বলে গেল ছিটে। অদ্ভুত সব কথা। টাকা নাকি কেউ ব্যাঙ্কে রাখে না। সবাই অঘোরদাদুর মত নাকি টাকা লুকিয়ে রাখে। সাদা টাকা হলে ব্যাঙ্কে রাখা যায়, কিন্তু এ যে কালো টাকা। ব্ল্যাক মানি। এর হিসেব তো কাউকে দিতে হবে না। ব্যাঙ্কের টাকার হিসেব দিতে হবে ইনকাম ট্যাক্স আপিসকে। কিন্তু ব্ল্যাক-টাকার হিসেব কাউকেই দিতে হবে না। তুমি পাঁচ টাকার মেডিসিন কিনে পঞ্চাশ টাকায় বেচো, কেউ কৈফিয়ৎ চাইতে আসবে না তোমার কাছে। এখানে চেকের কারবার নেই, সব ক্যাশ্। নগদে কেনা বেচা। তিনশ টন চাল কিনে স্টক্ করেছে ছিটে, টাকা থাকলে আরো তিনশ টন স্টক করতো, সমস্ত উঠোনটা গোডাউন হয়ে গেছে চালের, আর মেডিসিনের আর নানা জিনিসের। শুধু কাঁটা পেরেক বেচেই কত লোক লক্ষপতি হয়ে গেছে। কেউ তাদের ফাঁসি দেয় নি, কেউ তাদের গালাগালিটাও দেয়নি সেদিন। ফোঁটা কংগ্রেসের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। জেলে যাবার সময় পাড়ার লোকেরাই তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে। তাকে আর প্রাণমথবাবুকে পুলিসে যখন ধরে নিয়ে গেছে তখন সবাই চিৎকার করে অভিনন্দন জানিয়েছে। 'বন্দে মাতরম' বলে পাড়া মাত করেছে। প্রাণমথবাবুর সঙ্গে এক র‍্যাকেটে এক লেভেলে উঠে গেছে সে। আবার যখন সে ছাড়া পাবে জেল থেকে, তখন আবার ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দেবে তারা। সবাই আবার বন্দে মাতরম্ বলে পাড়া মাত্ করবে।

দরকার হলে আবার জেলে যাবে সে, আবার ব্রিটিশ-আইন ভাঙবে। মাথায় তার লাঠি পড়বে, মাথা ফেটে রক্ত পড়বে। কিন্তু কেউ জানে না ব্যাঙ্কে তার কত টাকা আছে, কেউ জানবে না তার ভাই তিনশ টন চাল স্টক্ করে কত প্রফিট করলে। কত ক্যাপিট্যাল ইনভেস্ট্ করে কত পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড পেলে তার দৌলতে!

ছিটের অনেক কাজ ছিল। বললে—তুমি কিছু মনে কোর না ভাই দীপু, তোমাকে নিজের লোক মনে করি বলেই এত কথা বললুম—অন্য কেউ হলে আর এত কথা বলতম না।

সেদিন ছিটের কাছ থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল দীপঙ্করকে। ফিরতে হয়েছিল অনেক জ্ঞান নিয়ে। টাকা সম্বন্ধে এক নতুন জ্ঞান দিয়েছিল ছিটে। টাকা যদি উপায় করতেই হয় তো সোজা সৎ পথে থেকে তা করা যাবে না। টাকা বড় বজ্জাত জিনিস। টাকাকে ভালোভাসো সে-ও তোমাকে ভালবাসবে। কিন্তু টাকাকে ভালবাসতে ক'জন জানে? টাকাকে যারা পর মনে করে ব্যাঙ্কে রাখে, টাকাও তাদের পর মনে করে দূরে সরিয়ে দেয়। টাকাকে আরাম দিতে নেই। আরাম দিলেই টাকা আলসে হয়ে যাবে। তার বাত্ হবে। টাকাকে ঘোড়ার মত খাটাতে হয়। খাটিয়ে খাটিয়ে টাকার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। তবেই টাকার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবেই টাকার মেজাজ ভাল থাকবে। তবেই টাকা আরো জমবে। টাকা আরো বাচ্চা পাড়বে। যারা ভাবে বাঁচার জন্যে টাকা, তারাই আসলে মরে। কিন্তু যারা মনে করে টাকার জন্যেই বাঁচা, তারাই আসলে বাঁচে।

টাকা সম্বন্ধে এত বক্তৃতা দেবার কোনও দরকার ছিল না ছিটের। এত বক্তৃতা শোনবার সময়ও ছিল না তখন দীপঙ্করের। কিন্তু উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের শেষ পর্যায়ে এসে মানুষ কোথায় পৌঁছিয়েছে, দীপঙ্কর তারই যেন একটা হদিশ পেল সেদিন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সক্রেটিস্, মিল্, বেন্থাম—পৃথিবীর বড় বড় মহাপুরুষ যা যা বলে এসেছেন এতদিন, সব যেন সেই সেদিনকার কলকাতা শহরের মানুষের কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। সব মানুষ যেন নতুন করে নতুন এক সভ্যতার সূচনা করলে।

আপিসে দু'চার জন মার্চেণ্ট আসতো। নানা কাজে তাদের রেলওয়ে আপিসে আসতে হয়ই। সেদিন দীপঙ্করের কী মনে হলো, একজন মার্চেণ্টকে এক অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেস করে বসলো। প্রথমটায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল মিস্টার হোসেনভাই। হোসেনভাই বোম্বের মার্চেণ্ট। কলকাতায় তাদের ব্রাঞ্চ্ আছে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা মিস্টার হোসেনভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে, আপনার তো অনেক টাকা, এত লাখ-লাখ টাকা নিয়ে আপনি কী করেন?

হোসেনভাই হঠাৎ এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে কিছু উত্তর দিতে পারে নি। দীপঙ্কর বলেছিল—আপনি কিছু মনে করবেন না মিস্টার হোসেনভাই, কথাটা এমনি জিজ্ঞেস করলাম! আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে, যাদের অনেক টাকা তাদের জীবন কী-রকম? তারা কি আমাদেরই মত মানুষ? তারা কি আমাদেরই মত সংসারের ভাবনা ভাবে? তাদের কি আমাদেরই মত সুখ দুঃখ আছে? আমাদের যেমন হয়, তাদেরও কি তেমনি মাথা ধরে, ঘুম পায়, খিদে পায়, হাসে, কাঁদে? সবই কি আমাদের এই গরীব লোকদের মতন?

লোকটা প্রথমে বলতে চায় নি। সেন-সাহেবের সঙ্গে এ-সম্পর্কও তার নয়। বিরাট গাড়ি চড়ে আপিসে আসে। ওয়াগনের জন্যে দরখাস্ত করে। তারপর কাজ শেষ হলে থ্যাঙ্কস্ দিয়ে চলে যায়। এমনিই বরাবর হয়ে আসছে। কিন্তু সেদিন কাজ শেষ হবার পর হঠাৎ এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় হোসেনভাই একটু বিচলিত হলো। বললে—এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন সেন-সাহেব। আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও তো বাল-বাচ্চা আছে, আমাদেরও তো হাজারো তক্‌লিফ আছে—টাকার তক্‌লিফ নেই, জীবনে কোনও দিন টাকার তক্‌লিফ থাকবেও না। কিন্তু টাকাই তো দুনিয়ায় সব কুছ্ নয় সেনসাহেব!

—কিন্তু কেন তা হলে আরো টাকা চান? টাকা উপায়ের জন্যে কেন আরো ওয়াগন চান?

লোকটা কিছু উত্তর দিতে পারলে না। খানিক পরে একটু ভেবে বললে—আসলে কারবার তো চালু রাখতে হবে?

—কিন্তু কারবার চালু রাখবার দরকার কী? যে-টাকা আছে তাতে তো ছ' পুরুষ বসে খেতে পারবেন?

হোসেনভাই বললে—কিন্তু আমার আপিসে আড়াই হাজার স্টাফ আছে, তারা কী করবে? তারা যে আন-এমপ্লয়েড হয়ে যাবে।

দীপঙ্কর বললে—তাদের জন্যেই আপনি টাকা উপায় করছেন? তা হলে তাদের কারো অসুখ হয়ে মরে গেলে তার ফ্যামিলির কথা আপনি ভাবেন? তাদের ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, সব আপনি দেখেন? তাদের সব বিপদে আপনি মাথা ঘামান? তাদের জন্যে যদি এতই আপনার মাথা-ব্যথা তা হলে তারা এক মাস অসুখে পড়ে থাকলে তাদের ছাঁটাই করেন না?

হঠাৎ এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে দীপঙ্কর নিজেই অনুতপ্ত হলো। এত কথা অকারণে কাকে শোনাচ্ছে সে? আসলে টাকাও তো একটা নেশা। এই নেশার জন্যেই হয়ত গাঙ্গুলীবাবুকে প্রাণ দিতে হলো অসময়ে, অঘোরদাদুকে অপঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হলো! তবু তো সেই টাকাকেই নেশা করেছে ছিটে-ফোঁটা, সেই টাকাকেই নেশা করেছিল নির্মল পালিত! অথচ এই লোকটা ইচ্ছে করলেই আজ এক লাখ টাকা ধার দিতে পারে। এক লাখ টাকা ধার দিয়ে নয়নরঞ্জিনী দাসীকে বাঁচাতে পারে। আবার সব গোলমাল মিটে যায়। এখন

যখন নয়নরঞ্জিনী আবার তাঁর পুত্রবধূকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তখন সতীও সুখী হতো। সতী সুখী হলেই দীপঙ্করের জীবনের অর্ধেক কাজ যেন শেষ হয়ে যায়। তখন দীপঙ্কর আবার পরম নিশ্চিন্তে তার জীবন কাটাতে পারে।

আশ্চর্য! হোসেনভাই জানেও না কেন সে এত টাকা উপায় করছে। কার জন্যে করছে! সে বোধটুকুও তার নিঃশেষ হয়েছে। ছিটে-ফোঁটা, নির্মল পালিত, অঘোরদাদু, লক্ষ্মীদি এরা কেউই জানতো না কেন তারা টাকা চায়। হয়ত বাঁচার জন্যে তারা টাকা চায় না, টাকার জন্যেই তারা বাঁচে! কে জানে!

শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে টাকা ধার চাওয়া আর হলো না।

আপিসের ছুটির পর সেদিন গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এ না গিয়ে দীপঙ্কর সোজা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে গেল। দরজা ভেজানো ছিল। সেটা ঠেলে দীপঙ্কর সামনের রাস্তা দিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। বাগান আর বলা যায় না তাকে। আরো জঙ্গল হয়েছে সেখানে। সমস্ত বাড়িটা যেন কেমন বিজন। কাছাকাছি চাকর-বাকর কেউ নেই। এমন অবস্থায় চোর-ডাকাত যে-কেউ ঢুকে পড়তে পারে ভেতরে। এই বাড়িরই একদিন কী চেহারা ছিল। একদিন সতীর বিয়ের সময় এই বাড়িতেই ঢোকবার অধিকারটুকু পর্যন্ত তার ছিল না। একদিন এখানে এই বাগানের সামনেই চাকর-ঝি-ঠাকুর-দরোয়ান-ড্রাইভার সকলের চোখের সামনে সতী মর্মান্তিক অপমান মাথায় তুলে নিয়েছিল। একদিন এই বাড়িরই তেতলার একটা ঘরে গরম লুচি মুখে দিতে গিয়ে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল সে যেন বিষ খাচ্ছে। আজ এ-বাড়ির দিকে তাকালে যেন আর সে-কথা কল্পনা করাও যায় না!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল। হঠাৎ ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে তর্-তর্ করে যেন কার নেমে আসার পায়ের শব্দ কানে এল। অন্ধকার বারান্দাটার সামনে দাঁড়িয়ে আর এগোবে কি না ভাবছে। কে নামছে এমন করে? এ-বাড়িতে এমন তর্-তর্ করে হাঁটার মানুষ তো কেউ নেই। নয়নরঞ্জিনী দাসী তো মোটাসোটা মানুষ, তিনি ধীরে-সুস্থে চলাফেরা করেন। সনাতনবাবুও তো এত চটপটে নন। তবে কে নামছে?

শব্দটা তেতলা থেকে দোতলায় নেমে এল। তারপর দোতলা থেকে একতলায়। এবার একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাবে!

দীপঙ্কর বারান্দার এক পাশে সরে দাঁড়াল।

—ও মা, কে ওখানে? কে দাঁড়িয়ে?

স্পষ্ট মেয়েলি গলা! দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বললে—আমি—

—ও মা, দীপু, তুমি?

আশ্চর্য! সতী! সতী একটা ঝল্মলে জরি-পাড় শাড়ি পরেছে অনেক দিন পরে। কাছে আসতেই আরো স্পষ্ট হলো চেহারাটা। এত হাসিখুশী যেন

কখনও আগে দেখেনি সতীকে। যেন দশ বছর বয়েস কমে গেছে সতীর।

সতী বললে—তুমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো। খুব চমকে গেছ তো?

দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়েছে তখন। বললে—কিন্তু তুমি? তুমি হঠাৎ এখানে?

—তুমি জানো না বুঝি? আমি যে কাল এখানে চলে এসেছি। উনি কাল নিজে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন। আমার আর কোনও রাগ নেই মনে, জানো। আমার আর কোনও কষ্ট নেই। সব যে মিটমাট হয়ে গেছে আমাদের দুজনের—

দীপঙ্কর যেন তবু বিশ্বাস করতে পারলে না কথাগুলো। একদিনের মধ্যে এমন করে সব মিটমাট হয়ে গেল, সব গোলমাল চুকে গেল, অথচ দীপঙ্কর কিছু জানলোই না!

—কী করে মিটমাট হলো?

সতী খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো। বললে—বা রে বা, মিটমাট না হয়, এইটেই তুমি চাও নাকি?

দীপঙ্কর বলে—না, না, তা বলছি না, কিন্তু আগে আমি অত করে বলেছি, তুমি তো শোন নি!

—বা রে, উনি যে নিজে গিয়েছিলেন কাল! ওঁর কথা কি আমি ফেলতে পারি? ও আর তুমি কি এক?

তা বটে! দীপঙ্করের তখনও যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি! তবে কি সতী শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে রাজী হয়েছে শাশুড়ীকে! ঘুষ দিয়ে শাশুড়ীর স্নেহ, শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়, স্বামীর ভালবাসা, সমস্ত কিছু কিনে নিয়েছে!

—কী ভাবছো? এসো, ভেতরে এসো?

দীপঙ্কর ভেতরে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হলো। একটা গাড়ির শব্দ। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো বাগানের সামনে। গাড়ির দরজা খুলে নামলেন সতীর শাশুড়ী। আর সামনের সীট থেকে নামলো শম্ভু। ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে ট্যাক্সিটা বেরিয়ে চলে গেল।

—কে ওখানে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

দীপঙ্কর পেছন ফিরে সতীর দিকে চাইতেই যেন আবার সব অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল সতী! এই তো এখানে দাঁড়িয়ে ছিল স্পষ্ট। এই তো এতক্ষণ তার সঙ্গে কথা কইছিল। এই তো জরি-পাড় শাড়ি পরে খিল্-খিল্ করে হাসছিল এতক্ষণ!

—এ কি? তুমি দীপঙ্কর না? কী বাবা, কী মনে করে? বৌমার কিছু খবর আছে?

কী আশ্চর্য! এমন ভুলও হয়! এই বয়েসে জেগে-জেগেও মানুষে এমন

স্বপ্নও দেখে! কিন্তু স্বপ্নটা যদি সত্যি হতো? যদি সত্যিই সব মিটমাট হয়ে যেত সতীর। টাকা দিয়ে হোক, কিম্বা টাকা না-দিয়েই হোক, সতী যদি সত্যিই এ-বাড়িতে এসে স্ত্রীর মর্যাদা পেত! শুধু সতী নয়, যদি পৃথিবীর সব মানুষই সুখী হতো। সকলের কল্যাণ হতো। সকলের মঙ্গল হতো! যদি পৃথিবী থেকে যুদ্ধ, মহামারী, রোগ, শোক সব কিছু দূর হতো! যদি সত্যিই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসতো!

শম্ভু তাড়াতাড়ি আলোর সুইচটা জ্বেলে দিয়েছিল। এবার সমস্ত স্পষ্ট দেখা গেল। নয়নরঞ্জিনী যেন বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত। সারাদিন যেন ভীষণ পরিশ্রম করেছেন। মাথায়, মুখে চুলে সর্বত্র ধুলোয় ভর্তি।

—চলো বাবা, শুনি তোমার কথা, ভেতরে চলো। সমস্ত দুপুর আজ কোর্টের ভেতরে কেটেছে। সম্পত্তি নিয়ে যে কী-ঝঞ্ঝাটেই পড়েছি, কী বলবো। সম্পত্তি যেন পরম শত্রুরেরও না থাকে কখনও—সম্পত্তি না তো বিষ! সম্পত্তি আমার বিষের মত ঠেকছে বাবা—চলো—চলো—

নয়নরঞ্জিনীর পেছন-পেছন দীপঙ্করও চলতে লাগলো। কিন্তু তখনও যেন তার মন থেকে স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি!

সেদিন প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির ভেতরে ঢুকে যে-স্বপ্নটা দেখেছিল দীপঙ্কর, তা যে শুধু স্বপ্নই, তা জানতে তা বিশ্বাস করতে যেন অনেক কাল, অনেক যুগ লেগেছিল তার। মানুষের জীবনে অনেক স্বপ্নই উঁকি মারে, অনেক বাস্তবই আঘাত দেয়। কিন্তু এক-একটা বাস্তব মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায় অকারণে। আবার এক-একটা স্বপ্নও জীবনভোর যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। দিনে রাত্রে সেই স্বপ্নটাই বার বার আনন্দ দেয়, বেদনা দেয়। আবার হয়ত মাঝে মাঝে বিড়ম্বনাও দেয়।

পরে সতী বলেছিল—বারে, তুমি অমন স্বপ্নই বা দেখতে গেলে কেন? তুমি কি কেবল ওই কথাই ভাবো নাকি?

সত্যিই তো, এ-সংসারে দীপঙ্করেরই কি কম দায়িত্ব ছিল? এ-পৃথিবীর আর সব সাধারণ মানুষের মত দীপঙ্করেরও তো অনেক দায় ছিল।—জীবনের দায়, জীবিকার দায়। দীপঙ্করের মাথার ওপর ঝুলছিল কিরণের দায়িত্বটা। কিরণের মায়ের ভরণ-পোষণের বোঝা। আর শুধু তারাই বা কেন? কোথাকার কে এক সন্তোষ-কাকা! সেই সন্তোষ-কাকার কোন্ এক অরক্ষণীয়া মেয়ে এসে তার সংসারে একদিন বোঝা হয়ে ঢুকেছিল। তারপর চাকরি। চাকরিরই কি কম দায়িত্ব! প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে চাকরির খড়্গটা মাথার ওপর যেন ভীতিকর হয়ে উঠছিল।

অভয়ঙ্কর বলতো—মিস্টার সেন, আপনার কী হয়েছে? আপনাকে এত

পেল্ দেখাচ্ছে কেন?

বাইরে জার্নাল সেকশনে, ট্রানজিট্ সেকশনে, এস্টাব্লিশমেন্ট সেকশনে সেই আলোচনাই করতো সবাই। সেন-সাহেব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। যারা পুরোন লোক তারা দীপঙ্করকে আগে দেখেছিল। যুদ্ধের পর থেকে নতুন নতুন সেকশন হয়েছে, নতুন নতুন ক্লার্ক এসেছে আপিসে। নতুন কোনও ক্লার্ক এসে আপিসে ঢুকলেই উন্নতির শিখর হিসেবে সেন-সাহেবের উদাহরণটা দেখিয়ে দিত।

তারা বলতো—সে-সব সাহেবই নেই ভাই, সে-সব সাহেব থাকলে আজকে আমাদের ভাবনা?

তারা রবিনসন্ সাহেবের গল্পগুলো বলতো সবাইকে। কবে কোন্ সাহেব আপিস থেকে বাড়িতে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছিল। পেছন-পেছন একটি ছেলে রোজ বাড়ির দরজা পর্যন্ত যেত।

একদিন সাহেব আর থাকতে পারলে না। রেগে গেল। বললে—হু আর ইউ? কে তুমি?

—আজ্ঞে হুজুর, আই য়্যাম্ এ পুওর ম্যান্!

—কী চাও? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট্?

—সার্ভিস স্যার। চাকরি!

সাহেব রেগে গেল্। বললে—তা চাকরি কি আমার পকেটে থাকে? ডু আই ক্যারি ইট্ ইন্ মাই পকেট্? সী মি ইন্ মাই অফিস। আমার আপিসে দেখা করো—যাও, গেট্ আউট্—

মনে হবে সে-সব ধুঝি সত্য যুগেরই কথা। সে-সব সাহেবরা গালাগালি দিতেও যেমন ছিল পটু, আবার পরের দুঃখ-দুর্দশা দেখে চাকরি দিতেও ছিল তেমনি উদার! তার পরদিনই ছেলেটার চাকরি হয়ে গেল। চাকরির পর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে ছেলেটা কেঁদে অস্থির। এখন সেই ছেলেটাকেই দেখতে পাবে টি-টি-আই সেকশনে গেলে। সেই গরীব ছেলেটাই এখন কোট্-প্যান্ট্ নেকটাই পরে গাড়ি চড়ে আপিসে আসে। দিনকাল বদলে গেছে, সে-ছেলেটাও বদলে গেছে। এখন দু-হাতে ঘুষ নেয়। বেনামীতে বাড়ি করেছে বালিগঞ্জে। ময়মনসিং থেকে তার ঘি আসে, দেরাদুন থেকে চাল আসে, খুলনা থেকে আসে ইলিশ মাছ আর নতুন গুড়ের পাটালি। এসব হলো ভেট।

এ-সব গল্প আপিস লাইনে অজস্র। এ-গল্প সকলের মুখে-মুখে চলে। মুখে-মুখে চলে মিস্ মাইকেলের গল্প। মুখে মুখে চলে মিস্টার ঘোষালের গল্প। মুখে-মুখে চলে রবিনসন্ সাহেব আর রবিনসন্ সাহেবের কুকুরের গল্প।

আজকের নতুন যুগের আপিসে সেন-সাহেবও এক গল্পে পরিণত হয়েছে। কেউ বলে—সেন-সাহেব চাকরি ছেড়ে দেবে। কেউ বলে—সেন-সাহেব বিয়ে করবে। কেউ বলে—সেন-সাহেবের অনেক টাকা। বাইরেই শুধু সেন-সাহেব

ওই রকম সাদাসিধে সেজে থাকে। কেউ বলে—তা নয়। সেন-সাহেবের অনেক চ্যারিটি হে—

পুলিনবাবু বলে—না হে, অনেক চ্যারিটি আছে সেন-সাহেবের—তোমরা জানো না। দেখনি, এখনও গাড়ি করেনি সেন-সাহেব—

মধুকে সবাই জিজ্ঞেস করে চুপি চুপি। বলে—তোমার সাহেব এখনও বিয়ে করছে না কেন মধু? এত বয়েস হয়ে গেল—

মধু বলে—বিয়ে এবার করবে আমার সাহেব। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে কথা।

—কবে বিয়ে হবে?

মধু কোনও সেকশনে গেলেই বাবুরা চেপে ধরে। নানান কথা জিজ্ঞেস করে সেন-সাহেব সম্বন্ধে। সেন-সাহেব সম্বন্ধে আপিসের কেরানী-মহলে কৌতূহলের সীমা নেই। সেন-সাহেবকে আর পর মনে হয় না কারো। সেন-সাহেবের সঙ্গে যেন তাদের নাড়ির যোগ। একদিন তাদেরই মতন ছারপোকা-ওয়ালা চেয়ারে বসে গেছে সেন-সাহেব। তাদের দুঃখ, তাদের ভাবনা সেন-সাহেবের মত আর কে বুঝবে? এত আপন জেনেও কোথায় যেন একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে সেন-সাহেবের সঙ্গে। হঠাৎ সেন-সাহেবের কাছে গিছে দাঁড়াতে সাহসও হয় না তাদের। যেন ভয়-ভয় করে। সেন-সাহেব বেশি কথাও বলে না। মাথা নিচু করে ফাইলগুলো সই করেই হাতে দিয়ে দেয়। আগে যদিও বা একটু কথা বলতো, এখন তা-ও কমে গেছে।

সেদিন মধু গিয়েছিল স্টেশন রোডের বাড়িতে। ফাইল নিয়ে মাঝে-মাঝে গিয়ে দিয়ে আসে। দীপঙ্কর না থাকলে ফাইলগুলো রেখে আসে। মাসীমা জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কে বাছা?

মধু চালাক-চতুর লোক। দ্বিজপদর নিরুদ্দেশ হবার পর মধুর প্রমোশন হয়েছে। মাইনে বেড়েছে তার।

মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল। বলেছিল—আমি সাহেবের চাপরাসী মা!

—ওমা, তুমি আমাদের দীপুর চাপরাসী? আমার দীপু বুঝি তোমাদের আপিসের বড়সাহেব বাবা?

—হ্যাঁ মা, সেন-সাহেব আমার বড়সাহেব। সাহেব আমার খুব ভালো লোক মা। সাহেব যখন ছোটসাহেব ছিল তখন থেকে আমি সাহেবের চাপরাসী।

মাসীমা জিজ্ঞেস করেছিল—তা তোমার সাহেব রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত আপিসে কাজ করে কেন? কী এত কাজ? তোমরা বাড়িতে আসতে বলতে পারো না? এত রাত পর্যন্ত খাটলে কি শরীর টেঁকে কারো?

মধু বললে—কই মা, সাহেব তো সন্ধ্যে ছ'টার পর আর আপিসে থাকেন না?

—আপিসে থাকে না তো কোথায় যায়?

কে জানে কোথায় যায়। তা আপিসের পর বাড়িতে আসতে বলতে পারো না? এত রাত পর্যন্ত দিনের পর দিন রোজ বাইরে থাকা তো ভালো কথা নয়। মধু চলে যাবার পর মাসীমা ক্ষীরোদাকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে শুনলি তো? যে এসেছিল ও আমার দীপুর আপিসের চাপরাসী।

ক্ষীরোদা প্রশ্নটা এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। মাসীমা তাড়াতাড়ি তার হাতটা ধরে ফেললে। বললে—কোথায় যাচ্ছিস? কথার উত্তর দিচ্ছিস্ না যে?

ক্ষীরোদা বোবার মত চাইল মাসীমার মুখের দিকে।

—হাঁ করে দেখছিস কী? বল্? বল্ দীপু কোথায় যায়? কোন্ বাড়িতে?

ক্ষীরোদার চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে এল।

—বল্ কোথায় যায়? তুই নিশ্চয়ই জানিস্। উত্তর দে?

ক্ষীরোদা কোনও কথা বলতে পারলে না। সে সেখানে দাঁড়িয়েই থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

—বল্ কোথায় যায়? ওই যে এসেছিল এখানে, ও কে? কে সতী? কার নাম সতী? সতীর সঙ্গে দীপুর কীসের সম্পর্ক? বল্?

ক্ষীরোদা হঠাৎ মাসীমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কান্নায় হা হা করে উঠলো। কিন্তু মেয়ের মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না তবু।

রাস্তায় বেরিয়ে মধু কাশীকে জিজ্ঞেস করলে—ও কে গো তোমাদের বাড়িতে? সেন-সাহেবের মা?

কাশী বললে—না, ও অন্য লোক—

মধু বললে—আর ওই যে আর একজন? ও কে? সেন-সাহেবের বোন বুঝি?

কাশী বললে—দূর, বোন হতে যাবে কেন? ওরই সঙ্গে তো আমার দাদাবাবুর বিয়ে হবে!

এমনি করেই কথাটা কখন আপিসেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। শুধু দীপঙ্করই জানতো না। শুধু দীপঙ্করই তার নিজের বাড়ির কোনও খোঁজ-খবর রাখতো না। নইলে এ নিয়ে আলোচনাও হয়ে গেছে সেকশনে-সেকশনে ক্লার্কদের মধ্যে। সবাই সেন-সাহেবকে দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখাত। পরম ভাগ্যবান অফিসার। পরম সৌভাগ্যবান মানুষ। কত ছোট থেকে কত তাড়াতাড়ি কত উঁচুতে উঠেছে। একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হে! বৃহস্পতি তুঙ্গী একেবারে। আর আমাদেরই যত ফাটা কপাল। আমাদের দেখবার কেউ নেই কোথাও। সেই থার্টি-থ্রি রুপীজ্-এ চাকরিতে ঢুকেছি, আর দু'বছরে পাঁচ টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট।

সনাতনবাবু বললেন—আসুন দীপঙ্করবাবু!

নয়নরঞ্জিনী সামনে ছিলেন। বললেন—তুমি তো কোনও ভাবনার ধার দিয়েও যাও না। আমি সারা দিন উকিল-মুহুরী করে বেড়াচ্ছি—

সনাতনবাবু বললেন—উকিলবাবু কী বললেন মা আজ?

—তুমি থামো! উকিল কী বলেছে তাই শোনবার জন্যে তোমার যেন ঘুম হচ্ছে না একেবারে? উকিল আবার বলবেটা কী? মামলা করেছি, এখন টাকাটা জমা দিতে হবে। সেই টাকার চেষ্টায় গিয়েছিলাম—

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—টাকা পেলে?

নয়নরঞ্জিনীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে উঠলো। বললেন—কেমন করে পাবো টাকা, শুনি? টাকা ওমনি চাইলেই তারা দেবে? টাকা নিয়ে সবাই বসে আছে আমার জন্যে? বলে ন'দিদি আমার আপনার লোক হয়েই টাকা দিলে না, টাকা দেবে পরেরা? আমার আপন জন কে আছে শুনি? কে টাকা নিয়ে বসে আছে আমার জন্যে, শুনি?

দীপঙ্কর বললে—কাঁচা টাকা কারোর কাছেই নেই মা-মণি। সবাই টাকা ইনভেস্ট করে ফেলেছে। কেউ চাল স্টক করেছে, কেউ মেডিসিন, কেউ অন্য কিছু—সমস্ত ব্ল্যাক-মার্কেট করবার জন্যে টাকা খাটাচ্ছে—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—এই যে আমার ন'জামাইবাবু, আমি আজ উকিলের কাছ থেকে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরলুম ন'জামাইবাবুর। বললুম অন্তত হাজার পঞ্চাশ টাকা আমাকে দিন, আমি তাইতেই এ-যাত্রা চালিয়ে নেব, আমার শাশুড়ীর আমার নিজের যা গয়না-গাঁটি আছে, তাই বাঁধা দিয়েই চালিয়ে নেব। তা দিলে? ন'জামাইবাবু তো আমার আপনার জন, সে-ই দিলে আমাকে টাকা?

এর পর আর সনাতনবাবুর বলার কিছু ছিল না হয়ত। তিনি চুপ করেই রইলেন।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তারপরে আর বৌমার কাছে গিয়েছিলে বাবা তুমি?

দীপঙ্কর বললে—আমি তো রোজই যাই, একবার করে গিয়ে দেখা করে আসি—

সত্যিই প্রত্যেকদিনই দীপঙ্কর গিয়ে বসে থাকতো লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে। সেই যেদিন সনাতনবাবু গিয়েছিলেন, সেই দিন থেকে কদিন পর-পর। কিন্তু সতী যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর তেমন করে এসে বসতো না পাশের চেয়ারটায়। ভেতর থেকে বলে পাঠাতো—শরীর খারাপ তার।

দীপঙ্কর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল একদিন তার দরজার সামনে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দীপঙ্কর দরজার বাইরে থেকে ডেকেছিল—সতী, দরজা খোল সতী!

ভেতর থেকে কোনও উত্তর আসে নি। রঘু বলেছিল, দিদিমণি সারাদিনই ঘরের ভেতরে দরজা বন্ধ করে থাকে। আগেকার মতন বাইরে আসে না আর। আগে দোতলার সিঁড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতো। ট্রেন যাওয়া-আসা

দেখতো। দীপঙ্কর আসবার আগে গা-ধুয়ে শাড়ি-ব্লাউজ বদলে তৈরি হয়ে থাকতো। দীপঙ্কর এলেই পাশে এসে বসতো। তারপর সারাক্ষণ চুপ করে বসে থাকতো দু'জনে। মুহূর্তগুলো দু'জনের ভাবনার ছাদের ওপর দিয়ে হুহু করে উড়ে যেত নিঃশব্দে। তারপর রাত হতো। আরো রাত। আরো অন্ধকার। আরো ঘনিষ্ঠতা। তখন উঠে দাঁড়াতো দীপঙ্কর। আস্তে আস্তে সদর দরজা দিয়ে সোজা রাস্তায় গিয়ে নামতো। কিন্তু সেদিন আর দেখা করলে না সতী। সেদিন আর দরজা খুললে না। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে একলা বসে থেকে থেকে এক-সময়ে সদর দরজা খুলে বাইরের অন্ধকার রাস্তায় এসে নেমেছিল।

—তারপর?

নয়নরঞ্জিনী জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

দীপঙ্কর বললে—তারপর টাকার কথাটা বলবার আর কোনও সুযোগই পাইনি মা-মণি—

—আর সেই যে তোমাদের আপিসের আর একটি ছেলে—ঘোষাল না কী যেন নাম তার। সে তো রইল সেখানে সেদিন। বলেছিল—খবর দেবে। কিন্তু সে-ও তো আর কোনও খবর দেয়নি বাবা! তুমিও খবর দিলে না, তোমার ঘোষালও খবর দিলে না—আমি কদিন থেকে খুবই ভাবছিলাম।

দীপঙ্কর বললে—আমিও কি কম ভাবছি ভাবছেন?

—তুমি আর আমার ভাবনার কতটুকু বুঝবে বাবা। আমার যা হচ্ছে সে আমিই বুঝছি আর ভগবানই বুঝছে। এই দেখ না, কেবল উকিলবাড়ি যাচ্ছি আর মুঠো-মুঠো টাকা গুণে দিয়ে আসছি। সব যাচ্ছে উকিল আর পেশকারের গর্ভে। কী যে হবে!

তারপর একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা বাবা, সেদিন বউমার নামে ওই টেলিগ্রাম কে করলে? কার টেলিগ্রাম? বৌমার তো সাত কুলে কেউ নেই এক বোন ছাড়া, তা বউমাকে টেলিগ্রাম করতে যাবে কে? সে বোন তো দিল্লিতে থাকে শুনেছি —না?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—তা তার তো খুব পয়সা শুনেছি। তার সঙ্গে তোমার জানাশুনো আছে?

দীপঙ্কর বললে—আছে। লক্ষ্মীদি ইচ্ছে করলে দু'তিন লাখ টাকা দিতে পারে।

—তা তাকেই একবার বলে দেখ না বাবা! আমি তো তার বোনের শাশুড়ী। মায়ের পেটের বোনের শাশুড়ী। এটুকু উপকার তুমি বললে আমার জন্যে করবে না?

এ-কথাটা দীপঙ্করের এ কদিন একবারও মনে হয়নি। ছিটে-ফোঁটার কথা মনে হয়েছে। আপিসে যে-দু'চারজন মার্চেন্ট আসে, তাদের কথাও মনে হয়েছে।

হোসেনভাই-এর কথা মনে হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীদির কথাটা একবারও মনে হয়নি। লক্ষ্মীদি তো টাকাটা দিয়ে দিতে পারে। দিল্লির কণ্ট্রাক্টার মহলে তো ভীষণ প্রতিপত্তি লক্ষ্মীদির। সুধাংশুকে বললেই যে-কোনও কণ্ট্রাক্টার এক মিনিটে টাকাটা দিয়ে দিতে পারে। এটুকু করবে না লক্ষ্মীদি?

—তা তাই-ই করো বাবা তুমি দীপু।

বলে নয়নরঞ্জিনী দাসী যা কখনও করেন নি, তাই-ই করে ফেললেন। হঠাৎ দীপঙ্করের হাত দুটো দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—তোমাকে বাবা আমার এই উপকারটা করতেই হবে। আমার এতদিন মনে পড়েনি বলে বলিনি তোমাকে—বউমার বোনকে বলে দিতেই হবে—

দীপঙ্কর এতদিন পরে এই প্রথম নয়নরঞ্জিনীর দিকে যেন স্পষ্ট করে চেয়ে দেখলে। কী করুণ, কী বেদনাদায়ক চেহারা হয়েছে সতীর শাশুড়ীর। নির্মম ভাগ্য তাঁকে কত নিচে নামিয়ে নিয়ে এসেছে তা যেন তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না। মুখের চামড়ার রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বললেন—তুমি তো আমার সব জানো বাবা, তুমি তো আমার সব কিছু দেখেছ! সেই বাড়ি আজ কী হয়েছে, তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। আজ চাকর-ঝিদের মাইনে দিতে পারি নি কত মাস—

দীপঙ্কর আর থাকতে পারলে না। বললে—আপনি চুপ করুন, মা-মণি, আমাকে আপনি আপনার ছেলের মত দেখবেন, আমি আমার যথাসাধ্য করবো আপনার জন্যে—

নয়নরঞ্জিনী আবার চোখের জল মুছে নিলেন নিজের আঁচল দিয়ে।

বললেন—তুমি আমার ছেলের মতই বাবা, আমি আগে যা যা বলেছি তোমায়, সব ভুলে যেও বাবা, কিছু মনে রেখো না। বুড়ো মানুষের সব সময় মাথার ঠিক থাকে না। কী বলতে কী বলে ফেলি—

দীপঙ্কর বললে—আপনি থামুন মা-মণি, সে-সব কথা মনে রাখলে আমি এমন করে এত কাণ্ডর পরে এখানে আসতাম না। আমি আজ সতীর কাছে সনাতনবাবুকে নিয়ে যাবো বলেই এসেছি—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—কিন্তু আমার ছেলেকে তো তুমি চেনো বাবা, সোনাকে নিয়ে গেলে যে সব পণ্ড হয়ে যাবে, বউমার মুখ দেখে আমার ছেলে যে সব ভুলে যাবে—

দীপঙ্কর বললে—না মা-মণি, আপনি তাহলে আপনার বউমাকেও চেনেন নি, আর আপনার ছেলেকেও চেনেন নি।

—কিন্তু সেদিন তাহলে বউ অমন করে আমার মুখের ওপর কথা বলে? আজকে আমার এই অবস্থা বলেই তো সেদিন অত কথা শোনাতে পারলে! আগে হলে আমি দশ-ঘা জুতো মেরে অমন বউকে শায়েস্তা করতুম না! বউ হয়ে শাশুড়ীর মুখের ওপর কথা বলবে—এত আস্পর্ধা বৌ-এর!

দীপঙ্কর বললে—সে-সব কথা থাক্, এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে. আমরা যাচ্ছি—চলুন সনাতনবাবু—

নয়নরঞ্জিনী বললেন—সেখানে গিয়ে এই দীপু যেমন ভাবে কথা বলতে বলবে, তেমনি ভাবে কথা বোল, বুঝলে সোনা?

দীপঙ্কর বললে—সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না মা-মণি, সনাতনবাবু নিজেই সতীর সঙ্গে কথা বলবেন, দুজনের মধ্যেখানে আমি থাকবোই না—

—না না বাবা, অমন কাজটি করো না, সে-রাক্ষুসী ভালো-মানুষ পেয়ে আমার সোনাকে বশ করে ফেলবে। তাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। শেষকালে আমার ছেলেও আর বাড়ি ফিরবে না।

সনাতনবাবু এতক্ষণ কিছু কথা বলেন নি। এবার একটু হাসলেন। বললেন—না মা-মণি, তোমার ভয় নেই, আমি তোমার বউমাকে বাড়ি ফিরিয়েই আনবো—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—তাই যদি আনবে তো সেদিন অমন করলে কেন? আর তাছাড়া বউমাকে আনো আর না-আনো, বৌমার টাকাটাই আসল, সেইটে আনতে ভুলো না—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু সে তো আনতে পারবো না মা। তোমার বৌমাকে আনবার ভার নিতে পারি, টাকা সে দেবে কি না সে আমি জানি না।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বেশ তো কথা বললে! বৌমাকে এনে আমার কিসের লাভ শুনি? টাকাই যদি না-পেলুম তো বৌমার মুখ দেখলে আমার পেট ভরবে?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব আপনাকে ভাবতে হবে না মা-মণি। আমি যখন আছি, তখন সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

গাড়ি ডাকা হয়েছিল। দীপঙ্কর তখনও কেবল ভাবছিল আজ যদি সমস্ত ভালোয় ভালোয় সমাধা হয়ে যায়, তাহলে হয়ত আবার সতী সুখী হবে। হোক ঘুষ, হোক টাকার প্রলোভন, হোক মিথ্যে কথা, তাতে কিছু দোষ নেই। সংসারের প্রতিদিনের কাজ-চালাবার মত একটা সম্পর্কও যদি সে স্থাপন করে দিতে পারে, তখন সে তার নিজের কথা ভাববে। যে-স্বপ্নটা সে এই বাড়িতে ঢোকবার সময় দেখেছিল, সে স্বপ্নটা তো শেষ পর্যন্ত সত্যি হতেও পারে! মিস্ মাইকেলের আমেরিকা যাওয়ার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। তা বলে দীপঙ্করের স্বপ্নটা সত্যি হবে না এ-কথাই বা কে বললে। প্রাণমথবাবুই তো স্কুলে একদিন ছোটবেলায় বলেছিলেন—এক-একজনের স্বপ্ন সত্যিই ফলে।

গাড়িটার ভেতরে গিয়ে উঠলেন সনাতনবাবু। দীপঙ্কর তাঁর পাশে গিয়ে বসলো। বললে—চলো, গড়িয়াহাট—

রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল বসেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে একদিন বুঝি কী খেয়াল হলো কর্তাদের—যে চুরিরও নাকি একটা মাত্রা আছে। পাপেরও নাকি একটা সীমা আছে। ব্ল্যাক্-মার্কেট ভালো জিনিস ততক্ষণ, যতক্ষণ তা কর্তাদের সরকারী তহবিল স্পর্শ না করে। চুরিও খারাপ জিনিস নয়, যতক্ষণ তা সরকারের নিজের ভাঁড়ারে সিঁদ্‌কাঠি না ঢোকায়। ওটা বন্ধ করতে হবে। কারণ একদিন মিলিটারি সাপ্লাইতেই ভেজাল ঢুকে পড়লো শেষকালে। যাদের হাতে গভর্নমেণ্ট তারাই একদিন বারুদে বালি মেশালে। তারাই একদিন ওয়ার-স্ট্র্যাটেজির স্ক্রু আলগা করে দিলে। সে শুরু হলো উনিশ শো তেতাল্লিশ সালের শুরু থেকেই। পাব্লিককে ঠকাচ্ছো ঠকাও, কিন্তু সরকারকে নয়। তাতে অ্যালায়েড্ পাওয়ার্সের ক্ষতি হবে। সাউথ্ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ড-এর পরাজয় হবে। সেই তখনই প্রবর্তন হলো স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালের। যখন কোর্টের রেকর্ড-সেকশনে আর মামলার নথি-পত্র রাখবার জায়গা নেই, যখন জজদেরও আর বিচার করবার ফুরসত নেই—ঠিক সেই তখনই সৃষ্টি হলো স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল। রাতারাতি সব ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ারদের শায়েস্তা করতে হবে। নইলে ইউনাইটেড স্টেট্স-এর কাছে লজ্জায় পড়তে হয়। তারা বলে—দু'শো বছর রাজত্ব করবার পর ইণ্ডিয়াকে কোথায় এনে ফেলেছো তোমরা? আবার যুদ্ধ যেদিন মিটে যাবে, সেদিন আবার যত ইচ্ছে চুরি করো, ব্ল্যাক-মার্কেট করো, কিছুছু বলবো না। পীস্-টাইমে চুরি পাপ নয়, ক্রাইমও ক্রাইম নয়। কিন্তু এখন জীবন-মরণ সমস্যা। দিস ইজ ওয়ার!

মিস্টার গাঙ্গুলীর গাড়িটা সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছিল টেম্পল চেম্বার্স থেকে। মেন-উইটনেস্ মিসেস ঘোষ। তাকে আনা চাই কোর্টে।

মিস্টার ঘোষাল একটু হতাশ হয়ে গিয়েছিল প্রথমে। মিস্টার গাঙ্গুলী বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার ঘোষাল, আমি মিসেস ঘোষকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবো—

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—কিন্তু আমি অনেকবার গেলাম, কিছুতেই দেখা করলে না আমার সঙ্গে। কারো সঙ্গেই দেখা করছে না মিসেস ঘোষ এই ক'দিন—

মিস্টার গাঙ্গুলী জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কেন? এরকম হঠাৎ হলো কেন? কী হয়েছে তাঁর?

—কে জানে মশাই, এতদিন অনেক রকম মেয়েমানুষ দেখেছি, এমন আর দেখিনি। সি ইজ্ এ মিস্ট্রি টু মী! টাকায় ভোলে না, মিষ্টি কথায় ভোলে না, কিছুতেই ভোলানো যায় না, অদ্ভুত চীজ একটি—

মিস্টার গাঙ্গুলীরও অভিজ্ঞতা কম নয়। সারা জীবন টেম্পল-চেম্বার্সের পৃথিবীতে মানুষ চরিয়ে আসছে। খুনী, ডাকাত, ভদ্রলোক, মেয়েমানুষ, বেশ্যা, ছাত্রী, প্রফেসার, ডাক্তার, কবিরাজ, বাঙালী, ইহুদী—হাজার রকমের বৈচিত্র্য দেখতে দেখতে আজ বুড়ো হতে চলেছে। যুদ্ধের সময় ক্রাইম্ যেমন বেড়েছে ক্রিমিন্যালও তেমনি বেড়েছে। সারা কলকাতায় যে এত ক্রিমিন্যাল ছিল তাই-ই

তো আগে জানা ছিল না কারো। নিরীহ ছাপোষা ভদ্রলোকরা হঠাৎ কখন ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার হয়ে ওঠে! গৃহস্থবাড়ির বউ হঠাৎ কখন সংসার ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায়। নিজের মায়ের পেটের ভাই হঠাৎ কখন ভাইকে খুন করে বসে! এ-সব খবর কোর্টে না-গেলে পাওয়া যায় না। সমস্ত কলকাতার চেহারাখানা যেন কোর্টে এসে উলঙ্গ হয়ে যায়। মানুষ যেন বেআব্রু হয়ে পড়ে কোর্টে এসে। এখানে কৃপণের ট্যাঁক থেকেও অনায়াসে হাজার-হাজার টাকা বেরিয়ে আসে। এখানে অহঙ্কারীর অহঙ্কার, দরিদ্রের দারিদ্র্য, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য সব কিছু বানচাল হয়ে যায়। এখানে এসে সাধু ভণ্ড বলে প্রমাণ হয়, ভণ্ড সাধু! এখানে অনুমানের কোনও স্থান নেই। স্থান আছে প্রমাণের। এখানে প্রমাণ করতে পারলে অসতী সতী হয়ে যাবে। প্রমাণ দাখিল করতে পারলে খুনী এখানে বেকসুর খালাস পাবে। এই প্রমাণের রাজ্যের সম্রাট হলো টাকা। টাকা দিয়ে এখানে প্রমাণ কেনা যায়, প্রমাণ বেচা যায়। টাকা দিলে প্রমাণ ম্যানুফ্যাকচার করা যায়।

মিস্টার ঘোষাল সাধারণত আসত দুপুর বেলা। যখন সব নিরিবিলি। ভেবেছিল নিরিবিলিতে মিসেস ঘোষকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। এই কেসটা মিটে গেলেই আবার মিস্টার ঘোষাল ডি-টি-এস্ হয়ে বসবে রেলওয়ের চেয়ারে। তারপরে হবে টি-এম-এ। তারপর হবে এজেণ্ট্। সেখানে থেকে রেলওয়ে বোর্ড।

মিস্টার ঘোষাল বলতো—ইণ্ডিয়ার রেলওয়ে-অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্-এ বড় গলদ আছে, আমি সব রেকটিফাই করবো—

সতীকে বলতো—তখন দিল্লি হবে আমার হেড কোয়ার্টার—কিন্তু আমি রুল্ করবো হোল্ অব্ ইণ্ডিয়া—

সত্যিই সমস্ত ইণ্ডিয়া রুল্ করবার স্বপ্ন দেখতো মিস্টার ঘোষাল! তখন সতী মিস্টার ঘোষালের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কে জানতো মিস্টার ঘোষালের সে-স্বপ্ন একদিন সত্যি হবে! কে জানতো স্বাধীনতার পর মিস্টার ঘোষালরাই সমস্ত ইণ্ডিয়া রুল্ করবে। সমস্ত ইণ্ডিয়াময় তাদেরই রাজত্ব এমন অপ্রতিহতভাবে চলবে!

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তখন এ-উপন্যাসের যবনিকা-পর্ব চলছে!

মিস্টার ঘোষাল দুপুরবেলা এসেই একেবারে চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে ডাকতো—রঘু!

রঘু এলেই বলতো—কই, তোমার দিদিমণি কই? ৩০২

রঘু বলতো—দিদিমণি ঘরের ভেতরে—

মিস্টার ঘোষাল দরজার সামনে গিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতো। বলতো—মিসেস ঘোষ, আমি ঘোষাল

ভেতর থেকে কোনও উত্তর আসতো না।

মিস্টার ঘোষাল আবার ডাকতো—সতী, পরশুদিন হিয়ারিং আছে—মনে

আছে তো? দরজা খোল—

তবু ভেতর থেকে কোনও উত্তর আসতো না। মিস্টার ঘোষাল পোড়া চুরোটটাকে জুতোর মাড়িয়ে আবার গট্ গট্ করে বেরিয়ে যেত! সতী রঘুকে বলে দিয়েছিল কারোর সঙ্গে দেখা করবো না আমি, কাউকে ঢুকতে দিস্ নি বাড়িতে—

এমনি ক'দিন ধরেই মিস্টার ঘোষাল এসে ফিরে যাচ্ছিল।

এবার মিস্টার গাঙ্গুলী। মিস্টার গাঙ্গুলী আসতেই রঘু বললে—দেখা হবে না দিদিমণির সঙ্গে—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে—বলো, আজকে মিস্টার ঘোষালের কেস্ আছে, দিদিমণিকে সাক্ষী দিতে হবে—

রঘু বললে—দেখা হবে না, দিদিমণি বলে দিয়েছে, কারোর সঙ্গে দেখা করবে না—

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে—তুমি বলো না গিয়ে আমার কথা—বলেই দেখ না একবার—

—কেন মিছিমিছি দিক্ করছেন বাবু, দেখা হবে না তো বললুম!

মিস্টার গাঙ্গুলী অত সহজে দমবার পাত্র নয়। বললে—চলো, কোন্ ঘরে তোমার দিদিমণি আছে, দেখি—

বলতে গেলে একরকম জোর করেই মিস্টার গাঙ্গুলী ভেতরে ঢুকলো। সতীর ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে—মিসেস ঘোষ, আমি টেম্পল চেম্বার্স থেকে গাঙ্গুলী এসেছি, আজকে মিস্টার ঘোষালের ডিফেন্স হিয়ারিং—

আর বেশি বলতে হলো না—হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। আর মিস্টার গাঙ্গুলী দেখলে সামনেই সতী দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে সেজেগুজে তৈরি। যেন এতক্ষণ ধরে তৈরিই হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে—নমস্কার, আমায় চিনতে পারছেন তো?

সতী বললে—হ্যাঁ, চলুন—

—আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ভুলে গেছেন।

সতী কিছু কথা বললে না। আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের দিকে চলতে লাগলো। মিস্টার গাঙ্গুলী আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনার শরীর ভালো আছে তো মিসেস ঘোষ?

সতী তবু কিছু উত্তর দিলে না। যেমন চলছিল তেমনি সামনে রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।

মিস্টার গাঙ্গুলী বললে—মিস্টার ঘোষাল ক'দিন এসে ঘুরে গেছেন, তিনি বড় ভাবনায় পড়ে গেছেন, তিনি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—

তবু সতী কিছু কথা বললে না। যেন সচল পাথর একখানা। সচল পাথরের মত সামনের দিকে চলতে লাগলো কঠিন হয়ে। সামনেই মিস্টার গাঙ্গুলীর গাড়ি

দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে উঠলো। এবার আর পাশে নয়। এবার মিস্টার গাঙ্গুলী সামনের সীটে গিয়ে বসলো। তারপর ড্রাইভারকে বললে—চলো, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস্—

কলকাতার সেই ছোটবেলাকার জীবন, সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের শিশুটি যেন এতদিনে এত বয়েস হবার পরেও তার পরম শিশুত্বটিকে জোর করে আঁকড়ে ধরে আছে। গাড়িতে সনাতনবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে দীপঙ্করের হঠাৎ সেই কথাই মনে হলো! এক-এক সময় এমন অদ্ভুত কথাও মনে উদয় হয়। ছোটবেলায় দীপঙ্করের মা'র পয়সা ছিল না। খেল্না কিনে দিতে পারেনি তাকে। পরের ছেলেদের খেল্নার দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে থাকতো দীপঙ্কর। চণ্ডীবাবুর নাতি খেল্না নিয়ে চাকরের সঙ্গে বিকেল বেলা পার্কে বেড়াতে যেত। হাতে থাকতো বল্। কখনও লাট্টু, কখনও বা গুল্তি, কখনও ঘুড়ি। এক পয়সার একটা একতেল্ ঘুড়ি। তাও মা কখনও কিনে দেয়নি। কিরণ আর দীপঙ্কর সেদিকে শুধু হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখেছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু তবু কি খেল্না পায়নি দীপঙ্কর?

তখন দীপঙ্করের খেল্না ছিল আকাশের মেঘ, আকাশের চাঁদ, আকাশের তারা। তারপরই খেল্না হলো কালীঘাটের রেলগাড়ি, ভবানীপুরের হলুদে রং-এর ট্রাম, সোনার কার্তিকের ঘাটের সাধু, কালীবাড়ির ঠাকুর, আর তারপর ষয়েজ ওন্ লাইব্রেরী। এমনি কত খেল্না দীপঙ্কর নিজেই খুঁজে নিয়েছে। দিনে রাতে কত খেল্নাই বুকে আঁকড়ে ধরেছে। চণ্ডীবাবুর নাতির মতন কত কল্পনা কত ভাবনার খেল্নাই না বুকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা তক্তপোশের ওপর মা'র পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। একটা পয়সাও খরচ হয়নি মা'র। চণ্ডীবাবুর নাতির মত একটা খেলনাও তার ছিঁড়ে যায় নি, ভেঙে যায়নি, হারায়নি! সব মনের আলমারির তাকে থাকে-থাকে সাজানো আছে।

আর তারপরেই এসেছে লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদিও তো তার জীবনে আর এক রকমের এক খেল্না!

আর শুধু লক্ষ্মীদিই বা কেন? সতীও তো একটা খেলনা তার। সতী লক্ষ্মীদিকে নিয়ে সে তো এখনও এক বিচিত্র খেলাই খেলে চলেছে। এই যে সনাতনবাবুকে নিয়ে চলেছে, এও তো এক খেলা! ছোটবেলায় খেল্না পায়নি বলেই কি বড় বয়স পর্যন্ত খেলনা নিয়ে মেতে আছে সে? না কি ছোটবেলার খেলনার অভাবের খেসারত এমনি করেই শোধ করছে? কে জানে!

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো—না, তা তো নয়! তাও তো নয়।

ট্যাক্সিটা তখন হু হু করে ছুটে চলেছে রাসবিহারী এভিনিউ ধরে। সনাতনবাবু চুপ করে বসে আছেন সামনের দিকে চেয়ে। দীপঙ্কর তাঁর দিকে চেয়ে

দেখলে। সে-মুখে কোথাও উদ্বেগ নেই, কোনও কৌতূহল নেই, কোনও অভাব-বোধ নেই। এমন কি কোনও অভিযোগও নেই। বড় রাগ হলো দীপঙ্করের। বড় ঘৃণা হলো সনাতনবাবুর ওপর। এ কী অদ্ভুত মানুষ। তাহলে যত উদ্বেগ, যত অভাববোধ, যত অভিযোগ কি সবই দীপঙ্করের একলার! হঠাৎ দীপঙ্করের ইচ্ছে হলো এখনি সে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে। সনাতনবাবু, সতী, লক্ষ্মীদি যেখানে ইচ্ছে যাক, যা কিছু করুক, জাহান্নমে যাক্, তাতে দীপঙ্করের কিছু এসে যায় না।

দীপঙ্কর চীৎকার করে উঠলো—থামাও, ট্যাক্সি থামাও—

কেন এত ভাবনা সে একলা ভাবতে যাবে? কীসের দায় তার? কে সে? নয়নরঞ্জিনী দাসীর বাড়ি যদি নীলেমই হয়ে যায় কোর্টে, যদি তাদের রাস্তায়ই এসে দাঁড়াতে হয়, তাতে তার কী? যদি ফোঁটা সত্যি-সত্যিই একদিন কালীঘাটের কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টই হয়ে যায় তাতে তারই বা কী ক্ষতি? যদি কিরণের ফাঁসিই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত, তাতে দীপঙ্করের কীসের লোকসান? সন্তোষ-কাকার মেয়ের বিয়ে হলো বা না-হলো তাতে তার তো কিছু এসে যায় না। আর মিস্টার ঘোষাল যদি কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে আবার আপিসে এসে ডি-টি-এস হয়েই বসে, তাতেই বা তার কী? সে এত ভাবনা ভাবতে যাবে কেন? সবাই ব্ল্যাক-মার্কেট করুক, সবাই জোচ্চোর মিথ্যেবাদী জালিয়াৎ হোক্, পৃথিবী রসাতলে যাক্, তার এত ভাবনা ভাববার কীসের দায়? ইন্ডিয়া স্বাধীন হোক না-হোক তাতে তার কি এল-গেল?

—থামাও, ট্যাক্সি থামাও—

দীপঙ্কর হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো। সে এই সারাদিন আপিসে অক্লান্ত খাটুনির পর কেন চলেছে সতীর কাছে? সনাতনবাবুর সঙ্গে সতীর বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে কোন্ উপকারটা হবে তার? কেন সে এল এমন করে?

দীপঙ্কর আবার চীৎকার করে উঠলো—সনাতনবাবু, সনাতনবাবু—

কিন্তু আশ্চর্য, সনাতনবাবু তেমনি নির্বিকার, তেমনি উদ্বেগহীন, অভিযোগ-হীন দৃষ্টি দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছেন। ট্যাক্সি-ড্রাইভারও একমনে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। কেউ তার কথায় কান দিচ্ছে না। সে যেন সকলের কাছে একজন বয়স্ক শিশু। কেউ তার কথায় আমল দিচ্ছে না। এই সংসার, এই কলকাতা শহর, এই বাঙলা দেশ, এই পৃথিবী, এই গ্রহ নক্ষত্র সব কিছু এই ট্যাক্সিটার মতই দুর্দম বেগে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। দীপঙ্করের এত বাধা-নিষেধ সাবধান-বাণীতে কেউ কান দিচ্ছে না। কেউ কান দেবেও না যেন। দীপঙ্করের ইচ্ছে সত্ত্বেও সব কিছু এমনি করেই যেন অনন্তকাল ধরে চলবে!

হঠাৎ ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—এবার কোন্ দিকে যেতে হবে স্যার?

দীপঙ্করের হঠাৎ খেয়াল হলো, না, সে তো চুপ করেই বসে আছে গাড়িতে

সে তো কই ডাকেনি কাউকে। সনাতনবাবুকেও ডাকেনি, ট্যাক্সি-ড্রাইভারকেও ট্যাক্সি থামাতে বলেনি। তবে কি এ তার মনের ভুল! মনের উত্তেজনা! কেন সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল! কেন সে এমন অদ্ভুত আচরণ করেছিল মনে মনে! সেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড থেকে বেরিয়ে সে তো এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি কারোর সঙ্গে। সনাতনবাবুও বলেন নি। সমস্ত সময়টা তো এতক্ষণ নিঃশব্দেই কেটেছে।

আর তারপরেই দীপঙ্করের হাসি পেতে লাগলো! আশ্চর্য! এতদিন কথাটা সে তো ভাবেওনি। সতী, লক্ষ্মীদি, সনাতনবাবুই শুধু তার খেলনা নয়। কিরণ, ছিটে-ফোঁটা, সন্তোষকাকা, মিস্ মাইকেল, ক্ষীরোদা, গাঙ্গুলীবাবু, প্রাণমথবাবু, নির্মল পালিতকে নিয়ে সে একলাই শুধু খেলেনি। দীপঙ্কর নিজেও যেন আর একজন দীপঙ্করের অপরিহার্য খেলনা। আর একজন অদৃশ্য দীপঙ্কর যেন এই আকাশের সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে দীপঙ্করকেও তার এক খেলনা বানিয়ে নিয়েছে। দীপঙ্করের মত সেই অদৃশ্য দীপঙ্করও যেন বড় নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল। তারও কেউ নেই, কিছু নেই। সব কিছু থেকেও সেই অদৃশ্য অসহায় দীপঙ্কর যেন খেলনা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই উঠতে বসতে দীপঙ্করকে নিয়ে এত নাড়া-চাড়া করে। কখনও বুকে তুলে নেয়, কখনও লাথি মারে, কখনও আনন্দ পায়, কখনও আবার নিজে খেলনা ভেঙে ফেলে নিজেই হাহাকার করে ওঠে!

হঠাৎ লেভেল-ক্রসিং-এর গেটটা বন্ধ হয়ে গেল।

টিং টিং করে একনাগাড়ে ঘণ্টি বেজে চললো।

গুমটি-ঘরের জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ভূষণ বাইরের দিকে চেয়ে দেখলে গেটটা ঠিক পড়েছে কি না। লাল বাতিটা ঠিক জ্বলছে কি না। সাউথ কেবিন থেকে কেবিনম্যান করালীবাবু সিগন্যালটা ঠিক ফেলেছে কি না। আপ ট্রেন আসছে। থার্টি-থ্রি আপ। হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার সবাই!

সনাতনবাবু আর দীপঙ্করকে নিয়ে ট্যাক্সিটা সোঁ সোঁ করে এসে বন্ধ গেটটার সামনে ব্রেক কষলো।

রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেসের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনাল কোর্টে সবাই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। পুলিস-পাহারার বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। শুধু যারা এ মামলার উইটনেস তারাই আসবে। আর আসবে উকীল, বার-অ্যাট-ল, অ্যাটর্নী, জজ, স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর। আর আসবে পাঁচালি, যতীন, জগন্নাথ, মকবুল। আর আসবে কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু। আর আসবে আসামী মিস্টার ঘোষাল। আর, আর-একজন আসবে। সে মিসেস ঘোষ। শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসীর পুত্রবধূ, শ্রীযুক্ত বাবু সনাতন ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী—শ্রীমতী

সতী ঘোষ।

এমনি ক'দিন ধরেই মামলা চলছে। বিরাট অভিযোগ আসামীর নামে। সম্ভ্রান্ত পোস্টের অধিকারী হয়ে আসামী ইল্লিগ্যাল গ্র্যাটিফিকেশন নিয়েছে। এ রেলওয়ের শুধু নয়, গভর্নমেন্টেরও ডিসগ্রেস। বিশেষ করে এই ওয়ারের সময়। ব্রিটিশ ওয়ার-এফর্টে এ ক্রাইম পেছন থেকে ছুরি মারার মতন। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি সোলজার যুদ্ধের ফ্রন্ট-লাইনে অমানুষিক পরিশ্রম করছে দিনরাত। লাইফ দিচ্ছে আর্মার্ড-কারের সামনে। আর্টিল্যারির মুখে বুক পেতে দিচ্ছে। ওপর থেকে প্লেন এসে বোমা ফেলছে মাথায়। ঠিক সময়ে তাদের ওষুধ গিয়ে পৌঁছুনো চাই সেখানে, ঠিক সময়ে ফুড গিয়ে পৌঁছুনো চাই সেখানে। ঠিক সময়ে গুলি, বারুদ, পেট্রল পৌঁছুনোও চাই সেখানে।

ক'দিন ধরে একে একে সবাই সাক্ষী দিয়ে গেছে। নিখুঁত নির্ভেজাল সাক্ষী। একেবারে চোস্ত ট্রেনিং মিস্টার গাঙ্গুলীর। যতীন বলেছে—ঘোষাল সাহেব বড় ভালো লোক। আমি তাঁকে ভালো করে চিনি—

—কত বছর ধরে তুমি চেন তাঁকে?

—আজ্ঞে বিশ-বাইশ বছর।

—বিশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে তোমার চেনা কী করে হলো?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি গরীব লোক, সাহেব আমাকে দয়া করে সাহায্য করেন।

—কত টাকা করে সাহায্য করেন?

—মাঝে মাঝে পঞ্চাশ টাকা। কখনও একশো টাকা। আমার দরকার হলেই আমি গিয়ে চাই—

—তোমার মত আর কত লোককে সাহায্য করেন?

—আজ্ঞে, তা আমি জানি না। শুনেছি সাহেবের কাছে গিয়ে টাকা চাইলে কেউ খালি হাতে ফিরে আসে না।

—তুমি জানো কি যে সাহেব মার্চেন্টদের কাছ থেকে ঘুষ নেয়?

—না হুজুর। এ হতেই পারে না। সাহেবের মত সাচ্চা লোক কখনও ঘুষ নিতে পারে না। সাহেব সদাশিব মানুষ। টাকা-কড়ির ব্যাপারে সাহেব বড় দিল-দরাজ। সাহেব কখনও এ-কাজ করতেই পারে না। সাহেবকে আমি বিশ-বাইশ বছর ধরে দেখে আসছি।

—তুমি কি জানো যে একজন ফিরিঙ্গি মেয়েকে খুন করার অপরাধে সাহেবের বিচার হয়েছিল ক'দিন আগে?

—আজ্ঞে হুজুর, সে একদম মিথ্যে কথা। সাহেব ভালো লোক বলে সবাই সাহেবকে বিপদে ফেলতে চায়। সাহেব আমার খাঁটি মানুষ। শিবের ক্যারেকটারে বরং দোষ থাকতে পারে, কিন্তু সাহেবের ক্যারেকটারে কোনও দোষ নেই—

—আচ্ছা তুমি যাও। এর পরে কে আছে?

এর পরে মকবুল। মকবুল ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের গুণ্ডা। সেও সেই একই কথা বলে গেল। সেও নাকি একজন গরীব লোক। বহুদিন ধরে তার অবস্থা দেখে সাহেব টাকা দিয়ে সাহায্য করে আসছে তাকে। সাহেবের নাকি এই রকম গরীবদের সাহায্য করা অভ্যেস। পরের কষ্ট দেখলে সাহেব আর স্থির থাকতে পারে না। সাহেবের পক্ষে ঘুষ নেওয়া অসম্ভব। সাহেব সবাইকে টাকা দেয়। টাকা দিতে-দিতেই সাহেব ফতুর হয়ে গেছে। সাহেব কাকে কত টাকা দিয়েছে তাও মনে থাকে না সাহেবের। কত লোককে যে সাহেব রেলের আপিসে চাকরি করে দিয়েছে তার ঠিক নেই। মকবুল যদি লেখাপড়া জানতো তো মকবুলকেও সাহেব চাকরি করে দিত।

একে একে সবাই সেই এক-কথাই বলে গিয়েছিল। যতীন, মকবুল জগন্নাথ। রেলওয়ে আপিস থেকে কে-জি-দাশবাবু এসেছিল সাক্ষী দিতে। কে-জি-দাশ-বাবু বলেছিল—আমি ঘোষাল সাহেবের আন্ডারে কুড়ি বছর কাজ করেছি, আমি জানি সাহেবের মত সৎ অনেস্ট লোক হয় না!

—ঘোষাল সাহেবের চাপরাসী সাহেবের আড়ালে সাহেবকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালাগালি দিত আপনি শোনেননি?

কে-জি-দাশবাবু বলেছিল—না!

—আপনি কখনও কোন মার্চেন্টকে আপিসে এসে সাহেবকে ঘুষ দিতে দেখেননি?

—না!

—সাহেব আপনাদের ক্লার্কদের সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করতেন?

—ভদ্রলোক ভদ্রলোকের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেন, তেমনি।

—তাহলে কি স্বীকার করবো মিস্টার ঘোষাল একজন এফিসিয়ান্ট অনেস্ট রেলওয়ে অফিসার?

—হ্যাঁ। আমরা তাঁর আন্ডারে কাজ করেছি বলে গর্ব বোধ করি। তাঁর মত অফিসার পেলে রেলওয়ে আরো বেনিফিটেড হবে।

রামলিঙ্গমবাবুও ওই কথাই বলে গেল। আপিস থেকে যারা-যারা সাক্ষী দিতে এসেছিল, তারা সবাই ওই এক কথাই বললে। সবাই ঘোষাল সাহেবকে ভালবাসে। মিস্টার গাঙ্গুলী বেছে-বেছে ডিফেন্স উইটনেস নিয়েছিল। শুধু তাই-ই নয়। মিস্টার রামমনোহর দেশাই, হোসেনভাই-কাশেমভাই-এর পার্টনার মিস্টার হোসেনভাই, সবাই সেই একই কথা বলেছিল। ঘুষ দিয়ে তারা কারবার করে না। ঘুষ হলো হারাম। হারামের কারবার তারা করে না, করবেও না কখনও। ঘুষ দিয়ে যেদিন রেলওয়ের সঙ্গে কারবার করতে হবে, সেদিন তারা কারবার তুলে দেবে।

—এর পর আর কে আছে?

—এবার মিসেস ঘোষ। যিনি মিস্টার ঘোষালের পি-এ হিসেবে কাজ করেছিলেন।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষাল এবার একটু মুখ ফেরালে। দেখলে সতী একটা লাল শাড়ি পরেছে আজ। ভিজে চুল পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছে। সিঁথির গোড়ায় সিঁদুরটাও যেন একটু বেশী জ্বল জ্বল করছে আজ। মিস্টার ঘোষাল একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। সতী কোনওদিকেই দেখছে না। মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ নিচু করে এসে দাঁড়াল সাক্ষীর ডায়াসে। তারপর সেই রকম মুখ নিচু করেই রইল সতী। 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' বাঁধাবুলি আউড়ে গেল। তারপর স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে প্রশ্ন করতে লাগলো। কী নাম তার। কোথায় জন্ম। কোথায় মানুষ হয়েছে। কত বয়েস। কোথায় বিয়ে হয়েছে। স্বামীর নাম কী। স্বামীর অবস্থা কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি। অবান্তর, অসংলগ্ন সব প্রশ্ন। কোর্টে এলে সমস্ত গোপন খবর প্রকাশ হয়ে পড়ার জন্যেই তৈরি থাকা উচিত। সতীও যেন আগের বারের মত তৈরি হয়েই এসেছে। মিস্টার ঘোষাল কান তীক্ষ্ণ করে শুনতে লাগলো।

—আপনি এই আজকের আসামী মিস্টার ঘোষালকে চেনেন?

সতী ঘাড় নাড়লে—হ্যাঁ।

—আপনি কি রেলওয়েতে মিস্টার ঘোষালের আন্ডারে লেডী পি-এ'র চাকরি করেছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এখন আর একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি তার ঠিক-ঠিক উত্তর দেবেন। আপনি কি দেখেছেন মার্চেন্টরা মিস্টার ঘোষালের আপিস-ঘরে আসতো?

—হ্যাঁ।

—কী জন্যে আসতো তারা?

—আপিসের কাজে!

—আপিসের কী কাজ?

সতী বললে—ওয়াগন চাইতে। ওয়াগন অ্যালটমেন্টই ছিল মিস্টার ঘোষালের প্রধান কাজ!

—ওয়াগন যারা চাইতে আসতো তারা কি ঘুষ দিত মিস্টার ঘোষালকে?

—না।

স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার ঘোষাল তাদের কাছে ঘুষের জন্যে কখনও পীড়াপীড়ি করেছে?

সতী এবার মাথা তুললো। তারপর হঠাৎ বললে—হ্যাঁ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোর্টসুদ্ধ লোক চমকে উঠেছে। ডিফেন্স উইটনেস এ কী কথা বলছে! এ সাক্ষী তো হোস্টাইল! একে কেন প্রডিউস করেছে কোর্টে! মিস্টার গাঙ্গুলী, বার-অ্যাট-ল দত্ত, আসামী মিস্টার ঘোষাল সবাই

স্তম্ভিত!

—মিস্টার ঘোষাল ঘুষ নিয়েছে তাদের কাছ থেকে?

—হ্যাঁ।

—আপনি ঘুষ নিতে দেখেছেন?

—হ্যাঁ আমি নিজের চোখে দেখেছি। বেশীর ভাগ সময়ে তিনি আমার হাত দিয়ে ঘুষ নিয়েছেন। আমিই মিস্টার ঘোষালের হয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকার ঘুষ নিয়েছি।

ওদিকে হৈ-হৈ কান্ড বেধে গেছে। বার-অ্যাট-ল দত্ত চিৎকার করছেন। হোস্টাইল উইটনেস, হোস্টাইল উইটনেস। কিন্তু ততক্ষণে যা-হবার তা হয়ে গেল। স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটর সেই অল্প-সময়ের মধ্যেই নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

—আপনি কার-কার কাছে ঘুষ নিতে দেখেছেন মিস্টার ঘোষালকে? কার-কার কাছে আপনি ঘুষ নিয়েছেন?

—সকলকে। সকলের কাছ থেকেই নিয়েছি!

ব্যারিস্টার দত্ত মাঝখানে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কথার মধ্যেখানে কথা বলে সতীকে অন্যমনস্ক করে দেবার চেষ্টা করলে। না, এ হতে পারে না। এ অসম্ভব। দিস ইজ অ্যাবসার্ড! ইওর অনার......

—সকলকে মানে কাকে-কাকে?

—প্রত্যেকে! প্রত্যেকটি মার্চেন্ট মিস্টার ঘোষালকে ব্রাইব দিয়ে গেছে। একজনও বাদ নেই। ব্রাইব না দিলে বিজনেস হয় না, ব্রাইব না দিলে রেলওয়ে চলে না। ব্রাইব না দিলে গভর্নমেন্ট চলে না। মিস্টার ঘোষালকে একলাই আপনারা ধরেছেন। কিন্তু প্রত্যেকে গিল্টী আমরা। আমরা প্রত্যেকে ডিস-অনেস্ট। আমরা প্রত্যেকে আসামী! আমরা রেলওয়েম্যান হয়ে রেলওয়েম্যানের ডিউটি করি না। আমরা হাজব্যান্ড হয়ে হাজব্যান্ডের ডিউটি করি না। আমরা ওয়াইফ হয়ে ওয়াইফের ডিউটি করি না। আমরা সবাই রটন টু দি কোর। আমরা বাইরে ফরসা জামা কাপড় পরে সভ্য হয়েছি বলি, আসলে আমরা আদিম, আসলে আমরা অসভ্য, আসলে আমরা বর্বর!

অনেক বাজে কথা বলে গেল সাক্ষী। সমস্ত কোর্টময় হুলুস্থুল কান্ড বেধে গেছে তখন। কিন্তু সতীকে থামাবে এমন শক্তি তখন কোথাও নেই। সে যেন সমস্ত বলে দেবে বলেই এখানে এসেছে। কারো সামনে বলবার সুযোগ এতদিন হয়নি তার। তার ছোটবেলা থেকে এই এত বয়েস পর্যন্ত যত অভিযোগ জমা হয়েছিল, যত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল সব সে উজাড় করে দেবে। সে জীবনে কিছুই পায়নি। তার লক্ষ্মীদি যা পেয়েছে, সেটুকুও সে পায়নি। বাবা পায়নি, মা পায়নি, স্বামী পায়নি, শাশুড়ী পায়নি, সংসার পায়নি, সন্তান পায়নি, কিছুই পায়নি। শুধু পেয়েছে টাকা। যে টাকা নিয়ে তার জীবনে কোনও উপকারই

হবে না, সেই তুচ্ছ টাকাই সে পেয়েছে কেবল। আর সেই টাকার জন্যেই আজ তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। এর চেয়ে অপমান, এর চেয়ে অসম্মান আর কেউ করেনি তাকে!

—কিন্তু আপনিই তো এই আসামীকে সচ্চরিত্র, সাধু বলে একদিন কোর্টে গিয়ে এজাহার দিয়েছেন?

—দিয়েছি। কিন্তু আজ আর দেব না।

—কেন? কেন দেবেন না? সেদিন যদি দয়া হয়েছিল আসামীর জন্যে, তবে আজ কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন?

—নিষ্ঠুর? নিষ্ঠুর হওয়ার ক্ষমতা আমার কোথায়? নিষ্ঠুর হতে পারলে তো আমি আজ সবাইকে ফাঁসি দিতুম, সবাইকে জেলে পাঠাতুম! আমার স্বামীকে জেলে পাঠাতুম, আমার শাশুড়ীকে জেলে পাঠাতুম, আমার নিজের বোন, নিজের ভগ্নিপতি সবাইকে জেলে পাঠাতুম। এত লোককে জেলে পাঠাতুম যে তত জায়গা আপনাদের জেলখানাতেও নেই। সবাই গিল্টি। সবাই আসামী। সবাই মিথ্যোবাদী, সবাই জোচ্চোর। আজ যে আমরা সাধু-সজ্জন সেজে ভদ্র হয়ে ফর্সা জামা-কাপড় পরে সভ্য হবার অভিনয় করছি, এ জেলখানার ভয়ে নয়, এ ফাঁসীর ভয়ে নয়। এ শুধু টাকার লোভে। আরো টাকা চাই আমাদের, আরো টাকা। নিজামের মত টাকা, রকফেলারের মত টাকা, হেনরি ফোর্ডের মত টাকা, এনড্রু কার্নেগীর মত টাকা।

—থামুন!

একজন জজ বুঝি আর থাকতে পারেননি। চিৎকার করে উঠেছেন—স্টপ। ন্যায়দণ্ড ঠুকে টেবিলে শব্দ করছেন।

বেশী বাজে কথা বলা বে-আইনী। অবান্তর কথা বলা অন্যায়। কিন্তু সতী কথা বলতে পেয়ে যেন সমস্ত দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

বার-অ্যাট-ল দত্তসাহেব কী সব বক্তৃতা দিতে লাগলেন অনর্গল। স্পেশ্যাল পাবলিক প্রসিকিউটরও কী-সব বলতে আরম্ভ করলেন। দুজনের তর্ক-বিতর্কের দিকে তখন আর সতীর কান নেই। সতী তখন অন্য কথা ভাবছে। এই মিস্টার ঘোষালই একদিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এই মিস্টার ঘোষালই একদিন তার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত্রি তখন সতীর দুর্ভাবনায় আর দুশ্চিন্তায় কেটেছে। কিন্তু সে কিসের জন্যে? সে তো তার টাকা নয়। সে তো তার শরীর। তার দেহ! কিন্তু সেও তো প্রকারান্তরে টাকা। সেদিন অগাধ টাকা ছিল মিস্টার ঘোষালের। টাকা ছিল তার বিলাসের বাহন। টাকা দিয়ে মিস্টার ঘোষাল সমস্ত প্যালেস-কোর্ট, সমস্ত কলকাতা, সমস্ত রেলওয়ে, সমস্ত ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট কিনতে চেয়েছিল। মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে সতী।

অদ্ভুত মানুষ। একটু উদ্বেগ নেই। একটু অস্থিরতা নেই। সমস্ত কলকাতাকে

পায়ের তলায় মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। যেন মানুষের গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে ভেবেছিল মিস্টার ঘোষালের কাছে সতী গিয়েছিল আশ্রয়ের লোভে। আসলে আশ্রয় নয়। আসলে সেদিন নিরাশ্রয়ই চেয়েছিল সতী। আসলে নিজের ওপর, নিজের স্বামী শাশুড়ী সকলের ওপরই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। পারলে সতী সেদিন নরকে গিয়ে আশ্রয় নিত। সেদিন নরক খুঁজে পায়নি বলেই তো গিয়েছিল নরকের চেয়ে বড় নরক, নরকের চেয়েও বড় নর্দমায়—প্যালেস-কোর্টে।

—কিন্তু আপনার প্রমাণ আছে?

—আমার মুখের কথাই আমার প্রমাণ।

—কিন্তু মিসেস ঘোষ, আপনি ডিফেন্স উইটনেস, প্রমাণ দিলেই তবে আপনার সাক্ষ্য রেকর্ড হবে। তা না-হলে আপনার এজাহারের কোনও দাম নেই। বুঝবো আপনি কোনও মোটিভ নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন—এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে যাতে আপনি ডিফেন্স উইটনেস হয়েও আসামীর বিপক্ষে এজাহার দিচ্ছেন।

—আপনি প্রমাণ চান?

—নিশ্চয়ই। প্রমাণ না দিতে পারলে বুঝবো আপনি আসামীর ওপর বিরক্ত। যে কোনও কারণেই হোক আপনি আপনার মত বদলেছেন!

—তাহলে এই নিন প্রমাণ! কত প্রমাণ চান আপনি, নিন!

বলে সতী হঠাৎ তার শাড়ির ভেতর থেকে একটা বাণ্ডিল বার করলে। একতাড়া কাগজের বাণ্ডিল। যত দিন ধরে যত শ্লিপ পাঠিয়েছে মিস্টার ঘোষাল মিসেস ঘোষের নামে, সেই সমস্ত। কত রামমনোহর দেশাই, হোসেন-ভাই এণ্ড কাশেমভাই-এর পার্টনার কত মিস্টার হোসেনভাই, কত ঝুনঝুনওয়ালা, কত বাঙালী, কত সিন্ধী, কত গুজরাটি, কত পাঞ্জাবী, কেউ বাদ নেই। কোনও প্রভিন্স বাকী নেই। রেলওয়ের ওয়াগন সকলেই নিয়েছে। সকলেই রেলের ওয়াগন নিয়ে টাকা রোজগার করেছে। পাঁচশো টাকা ব্রাইব দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট করেছে। ইণ্ডিয়ার মানুষেরা সেদিন চাল পায়নি, ওষুধ পায়নি, ফায়ার-উড পায়নি, বাড়ি তৈরী করবার লোহা-কাঠ-সিমেণ্ট পায়নি। সেই ১৯৪৩ সালের ইণ্ডিয়ার এক চরম চিত্র। সেদিন গভর্নমেণ্ট থেকে প্রচারপত্র বিলোন হয়েছে—আরো কম খাও, আরো কম পরো, আরো খরচ কমাও। আর একদিকে গ্রো মোর ফুড। সেদিন ইণ্ডিয়ার চাষারা খেত মোটা মোটা রুটি আর নুন। কোনও কোনওদিন রুটিও পেট ভরে খেতে পেত না। তারা আর কত কম খাবে? তারা সেদিন খালি গায়ে থাকতো, খালি পায়ে। তারা আর কত কম পরবে? আর কত কৃচ্ছ্রসাধন করবে? এতদিন তারা জানতো না কাদের জন্যে তাদের এতো কষ্ট। এবার তারা জানলো। এবার জানতে পারলে বোমা যত মানুষে মেরেছে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী মানুষকে মেরেছে মানুষ। এবার তারা জানতে পারলে যে মানুষের চেয়ে বড় শত্রু আর আমাদের নেই। মানুষ বোমার চেয়েও

ভীষণ, মানুষ বন্দুকের চেয়েও মারাত্মক। এর আগে কলকাতার মানুষ বোমা দেখেনি, ট্যাঙ্ক দেখেনি, রাইফেল দেখেনি। এবার দেখলে। তার চেয়েও ভীষণ মারাত্মক অস্ত্র দেখলে। দেখলে কোর্ট-প্যান্ট-নেকটাই পরা একজন ভদ্রলোক। অত্যন্ত ভদ্র-সভ্য চেহারা। ঠিক তাদেরই মত তার চোখ-কান-নাক-মুখ। ঠিক তাদেরই মত তার চাল-চলন-কথা-বার্তা। ঠিক তাদেরই মত তার হাবভাব। বাঘ নয়, ভাল্লুক নয়, সিংহ নয়, কেউটে সাপ নয়। একেবারে খাঁটি মানুষ!

পাঁরালি, যতীন, মকবুল, জগন্নাথ সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। কে-জি-দাশবাবু রামলিঙ্গমবাবু তারাও শেষ পর্যন্ত সমস্ত শুনে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

জগন্নাথ বললে—শালা শুয়োরের বাচ্চা, বেশ হয়েছে—শালার টাকা যেন হাত দিয়ে গলতে চায় না—

যতীন বললে—তাহলে তুই ওই রকম সাক্ষী দিলি কেন?

জগন্নাথ বললে—তুই কেন দিলি শালা?

যতীন বললে—আমি যে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি রে শালা, মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্যে—

জগন্নাথ পকেট থেকে দশখানা দশ টাকার নোট বার করলে—এই দ্যাখ শালা আমি কত আদায় করেছি—এই দ্যাখ, গুণে দ্যাখ—

কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু কথাগুলো শুনছিল। শুনে এ-ওর দিকে চাইলে। তারা কিছুই পায়নি। মিছিমিছি এতগুলো মিথ্যে কথা বলে এল কোর্টে। শুধু মিছিমিছিই বা কেন? এ মামলায় যদি ছাড়া পায় ঘোষাল সাহেব তো আবার ডি-টি-এস-এর চেয়ারে বসবে। তখন? তখন তো আবার ঘোষাল সাহেবের কাছে গিয়েই তার পায়ে তেল দিতে হবে। আবার তো সেই প্রমোশনের জন্যে ঘোষাল সাহেবকে গিয়েই খোসামোদ করতে হবে। তখন?

সেদিন কেউই ভাবেনি, সেদিন মিস্টার ঘোষাল নিজেও হয়ত কল্পনা করতে পারেনি যে এমন হবে। মিস্টার ঘোষাল বরাবর টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে পুলিসের, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করেছে খবরের কাগজের। টাকা দিয়ে সমস্ত রেলওয়েই একদিন কিনে নিয়েছে। কিন্তু একথা হয়ত ভাবেনি যে দৈবাৎ এক-এক সময় মানুষেরও সত্য কথা বলতে ইচ্ছে হয়। মিথ্যের সংসারেও দৈবাৎ এক-এক সময় ন্যায়বিচার হয়। তা না হলে হাজার-হাজার পাপ, হাজার-হাজার অন্যায় সত্ত্বেও এ পৃথিবী আজো চলছে কেন? আজো ইতিহাস তৈরি হচ্ছে কেন?

তাই সেদিন স্পেশ্যাল-ট্রাইবুন্যাল-কোর্টের জাজমেন্ট পড়ে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু মিস্টার ঘোষাল নয়। প্যালেস-কোর্টের যত আসামী সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। নয়নরঞ্জিনী দাসী, কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গম-বাবু, যতীন, জগন্নাথ, মকবুল সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। পাড়ায়-পাড়ায় খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি পড়ে গিয়েছিল সেদিন। ক্রফোর্ড সাহেবও স্তম্ভিত

হয়ে গিয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সমস্ত রেলওয়ে অফিসার। এমন কি দিল্লির রেলওয়ে-বোর্ড পর্যন্ত। দীপঙ্কর, অভয়ঙ্কর সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি যেদিন ছিটে-ফোঁটা-প্রাণমথবাবুর খবর বেরিয়েছিল সেদিনও এত চমকায়নি কেউ। যেদিন লক্ষ্মীদির খবরটা বেরিয়েছিল, সেদিনও এত অবাক হয়ে যায়নি কেউ। কলকাতার আদালতের বিচারে এ যেন অভূতপূর্ব অভাবনীয় কাণ্ড!

কিন্তু একমাত্র যে অবাক হয়নি, সে হলো সতী!

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমেই কঠোর হয়ে আসছিল। যেন শেকল খোলা পেলে এখুনি নখের আঁচড়ে দাঁতের কামড়ে সতীকে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে। এতদিন করুণা করেছে, কৃপা করেছে। এতদিন স্বরূপ প্রকাশ করেনি। এবার উন্দাম, উন্মাদ হয়ে উঠবে! এবার সতীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে নিঃশেষ করে দেবে!

গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর গেটের ঘণ্টা তখনও টিং-টিং করে বেজে চলেছে। ট্যাক্সির ভেতর দীপঙ্কর আবার সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যিই তখনও সে-মুখে কোনও উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। সত্যিই যেন তিনি হতাশ হতে জানেন না। যত উদ্বেগ সব যেন দীপঙ্করের। যদি সতী আবার সেদিনকার মত অশিষ্ট ব্যবহার করে।

দীপঙ্কর হঠাৎ এতক্ষণে কথা বললে—আপনাকে সতীর কাছে রেখে আমি চলে যাবো সনাতনবাবু—

সনাতনবাবু বললেন—তার কোনও প্রয়োজন নেই দীপঙ্করবাবু, আমি হতাশ হই না, আমি এখনও আশা পোষণ করি—

—কিন্তু আমি কাছে থাকলে সতী হয়ত মন খুলে কথা বলতে পারবে না। আপনারা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেবেন, আমি তার মধ্যে নাই বা থাকলাম!

সনাতনবাবু অন্ধকারের মধ্যেই হাসলেন। তারপরে বললেন—আপনি কি ভাবেন অতই সহজ? প্যাসিফিক ওস্যানের রহস্য ভেদ হয়ত মানুষ একদিন করতে পারবে। কিন্তু মানুষের পক্ষে নিজের মনের রহস্য ভেদ করা কি অত সহজ? তাহলে এত সঙ্ঘর্ষ কেন? এত জাতি-ভেদ আর প্রথা-ভেদ আর নানারকম ভেদাভেদই বা কেন?

তারপর বললেন—তা ছাড়া রহস্য থাকাটাই তো ভালো! রহস্য আছে বলেই তো সংসারে যেমন এত অমিল, তেমনি এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্যও আছে। ফুলের যে সৌন্দর্য, তা কি ব্যাখ্যা করবার জিনিস দীপঙ্করবাবু?

—কিন্তু কোন্ ফুলে বিষ আর কোন্ ফুলে মধু আছে, তা জানলে ভালো

হয় না?

সনাতনবাবু বললেন—না। ভালো হয় না। সব জিনিসের সবটুকু জানতে নেই। কিছু অজানা রাখতে হয়। যেমন ভূত, যেমন ভগবান। তার সবটুকু জানলে সংসার অনেকখানি আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু বিষ খেয়ে তো মৃত্যুও হতে পারে?

সনাতনবাবু বললেন—সব সময়ে মৃত্যুও তো অবাঞ্ছনীয় নয় দীপঙ্করবাবু!

—সে কী?

সনাতনবাবু বললেন—এমন মৃত্যুও তো আছে যা দিয়ে কোটি-কোটি মানুষ নবজন্ম পায়!

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—সে কী-রকম?

তখন থার্টি-থ্রি আপ সামনে দিয়ে গুম্ গুম্ করে চলেছে। গাড়ির জানালায় আলো নেই। ট্রেন ছাড়বার পর থেকেই আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় সব ট্রেনের। নিচের ইস্পাতের চাকাগুলো লাইনের ওপর দিয়ে গড় গড় করে গড়িয়ে চলেছে।

সনাতনবাবু হঠাৎ বললেন—ওই দেখুন, লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেনের চাকাগুলো কেমন নির্মমভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে—

দীপঙ্কর আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সেইদিকে।

—এমন অনেক লোক ছিল যারা ওই চাকার তলাতেই প্রাণ দিয়েছে। এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এই হয়ত কত লোক একদিন ওই চাকার তলায় প্রাণ দিয়েছে। দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়ত একদিন প্রাণ দেবে!

কথাটা ভাবতেই দীপঙ্কর কেমন যেন শিউরে উঠলো।

—সেই প্রাণ দেওয়ার সবটাই কি মৃত্যু? তাদের মধ্যে কারো-কারো মৃত্যু হয়ত অমৃত। একজনের মৃত্যুতে হয়ত আর একজন অমৃত পেয়েছে। নিজের মৃত্যু দিয়ে হয়ত আরো দশজনকে নবজন্ম দিয়ে গেছে, এমনও তো হতে পারে!

তবু দীপঙ্কর কথাগুলো বুঝতে পারলে না। থার্টি-থ্রি আপ তখন অনেক দূরে চলে গেছে। তার পেছনের লাল টেল-ল্যাম্পটা একটা ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। সনাতনবাবুর কথায় হঠাৎ সেই বহুদিনের চেনা জায়গাটা যেন বড় ভয়ানক হয়ে উঠলো দীপঙ্করের চোখে। দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন থার্টি-থ্রি আপের চাকাগুলো সব লাল হয়ে উঠলো। লালে লাল। আর সমস্ত স্লিপার-গুলো আর নাইনটি পাউন্ড-এর একজোড়া রেল যেন টাটকা গরম রক্তে স্নান করে উঠলো হঠাৎ।

ভূষণই ডিউটি করছিল তখন। ভূষণেরও যেন একটা নেশা লেগে গিয়েছিল এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর। এই গেট ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না সে। কত লোক কত জায়গায় বদলি হয়ে গেছে। কিন্তু ভূষণ বন্দী হয়ে আছে এই গেট-এর গুমটি ঘরে। দীপঙ্করের মত সেও যেন এই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর সঙ্গেই নিজের জীবনটাকে জড়িয়ে দিয়েছে। ভূষণ গেটটা

খুলে দিলে। আশ্চর্য! দীপঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল সনাতনবাবুর কথা শুনে। এমন অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন সনাতনবাবু কেমন করে করতে পেরেছিলেন। তিনি কেমন করে জানতে পেরেছিলেন যে এখানে একদিন এমন হবে!

—আর তা ছাড়া যিশু খ্রীস্টের কথাটাই ভাবুন না দীপঙ্করবাবু, তাঁর একলার মৃত্যু দিয়ে তিনি কত কোটি-কোটি লোকের নবজন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন?

গেটটা খুলতেই ট্যাক্সিটা গিয়ে দাঁড়াল লক্ষ্মীদির বাড়ির সামনে।

রঘু দরজা খুলে দিয়ে বললে—কিন্তু দিদিমণি তো নেই—

—নেই? কোথায় গেছে?

সনাতনবাবু আর দীপঙ্কর ভেতরে এসে বসলো। রঘু বললে—হাইকোর্ট থেকে এক ভদ্রলোক এসে দিদিমণিকে নিয়ে গেছেন—

—হাইকোর্ট থেকে? কখন?

—দুপুরবেলা।

আবার সেই মিস্টার ঘোষালের কেস নাকি। সনাতনবাবুকে বললে—আর একটু বসুন, একটু পরেই হয়ত এসে যাবেন—

আর সত্যিই সতী এল। আধঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল। বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হতেই দীপঙ্কর বললে—ওই সতী এসেছে—

শব্দটা রঘুর কানেও গেছে। সে দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিয়েছে। হয়ত সতীর খুব পরিশ্রম হয়েছে সারাদিন। মিস্টার ঘোষালের মামলার সাক্ষী হয়ে হয়ত সারাদিন উকীলের জেরার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

কিন্তু উঠে দরজার কাছে যেতেই দীপঙ্কর যেন সামনে ভূত দেখে এক পা পিছিয়ে এল!

সতী নয়, লক্ষ্মীদি!

কিন্তু লক্ষ্মীদির এ কী চেহারা হয়েছে! কোথায় গেল সেই লিপস্টিক, কোথায় গেল সেই সিফন, সেই ব্রোকেড আর কোথায় সেই সিগারেট? লক্ষ্মীদিকে প্রথমটা চিনতে কষ্ট হয়। দীপঙ্কর ভূত দেখার মত লক্ষ্মীদিকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো।

ডাকলে—লক্ষ্মীদি—

মুখ তুলে সামনে দীপঙ্করকে দেখেই লক্ষ্মীদি হঠাৎ যেন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো।

—কী হলো লক্ষ্মীদি? কী হলো তোমার?

ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তখনও ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয়নি তার। রঘু তখন ট্যাক্সি থেকে লক্ষ্মীদির সুটকেস নামিয়ে নিচ্ছে। লক্ষ্মীদির কান্নার সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের সমস্ত অন্তরাত্মাও যেন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠতে চাইলো।

—কী হলো লক্ষ্মীদি? কী হলো তোমার? হঠাৎ তুমি কোত্থেকে?

আর কথাবার্তা নেই। লক্ষ্মীদি সেই সিঁড়ির ওপর উঠেই যেন টলে পড়ে যাচ্ছিল। তারপর দুই হাত বাড়িয়ে দীপঙ্করের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কান্নায় ভেঙে পড়লো লক্ষ্মীদি। বললে—আমার টেলিগ্রাম পাসনি তোরা? আমি যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম সতীকে!

—কীসের টেলিগ্রাম? টেলিগ্রামে কী ছিল?

কিন্তু লক্ষ্মীদির তখন আর সে-সব বুঝিয়ে বলবার মত ক্ষমতা নেই। দীপঙ্করের মনে হলো—লক্ষ্মীদি যেন থর থর করে কাঁপছে। লক্ষ্মীদির তখন আর কোনওদিকে জ্ঞান নেই। সেই সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই দীপঙ্কর লক্ষ্মীদিকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

—চুপ করো লক্ষ্মীদি, চুপ করো, চুপ করো।

তারপর ধরে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে বললে—চলো লক্ষ্মীদি, ভেতরে চলো, কেঁদো না, কী হয়েছে তোমার বলো?

লক্ষ্মীদি ভেতরে যেতে যেতে বললে—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে দীপু, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী সর্বনাশ? সর্বনাশটা কী? চলো, ঘরে গিয়ে বোলে সব, এই রাস্তায় কান্নাকাটি কোর না, লোকে কী ভাববে?

ঘরের ভেতরে সনাতনবাবু চুপ করে বসেছিলেন। তিনি শুধু একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু সে মুখে কোনও কৌতূহল নেই, কোনও জিজ্ঞাসা নেই। তিনি যেমন চুপ করে বসেছিলেন, তেমনি চুপ করে বসে রইলেন। দীপঙ্কর তখনও লক্ষ্মীদিকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

—ছিঃ লক্ষ্মীদি, চুপ করো, কেঁদো না, ঘরে গিয়ে তোমার সব কথা শুনবো চলো—

সে ক'দিন দিন-রাত্রি জ্ঞান ছিল না নয়নরঞ্জিনী দাসীর। কোথায় টাকা পাওয়া যাবে, কার কাছে টাকা পাওয়া যাবে—এই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে থাকতেন সব সময়। একবার যেতেন উকীল বিভূতিভূষণ বসুর বাড়ি। গিয়ে হাজার হাজার প্রশ্ন করতেন—কোর্টে কি আমাকে জেরা করবে জজ?

উকীলবাবু বুঝিয়ে বলতো—জজ সাহেব আপনাকে জেরা করবে কেন? জেরা করবে পাবলিক প্রসিকিউটর—

সে-সব কূট-নিয়ম বুঝতে পারতেন না নয়নরঞ্জিনী দাসী। বলতেন—জেরা করলে আমি জেরার উত্তর দিতে পারবো তো?

উকীলবাবু বলতো—আপনার ভয় কী? আমি তো রয়েছি, আমি আপনাকে তখন সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেব।

—কিন্তু শুনেছি নাকি কোর্টে গেলে উকীলরা হাঁড়ির খবর নেবার জন্যে

যা-তা জেরা করে?

উকীলবাবু বলতো—আমি সব সামলাবো—আপনাকে কিছু খারাপ জেরা করবে না।

নয়নরঞ্জিনী বলতেন—তুমি জানো তো বাবা, আমার বউকে নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে কলকাতায়, কারো কাছে তাই আর মুখ দেখাতে পারি না আমি—আমার যে কী জ্বালা হয়েছে, তা আমিই জানি—

উকীলবাবু বলতো—আজকাল তো ও-সব সব বাড়িতেই হচ্ছে মা। শাশুড়ী-বউতে ঝগড়া নেই, এমন বাড়ি আমায় দেখাতে পারেন আপনি? ও আকছার হচ্ছে—

—কিন্তু আমার বউএর মত বউ ভূ-ভারতে নেই বাবা। আমার সোনার ছেলে, তাই মুখ বুজে এতদিন সব সহ্য করেছে—

উকীলবাবু সান্ত্বনা দিত। বলতো—ও নিয়ে আপনি মিছিমিছি মাথা ঘামাবেন না মা। বরং এই মামলার টাকাটা শিগ্‌গির জোগাড় করবার চেষ্টা করুন। মামলা এদিকে চলতে থাকুক, আর টাকাটাও জমা দেওয়া থাক্। তিন-মাসের জন্যে নীলেমটা ঠেকিয়ে রেখেছি, এখন দেখা যাক্—

কিন্তু দেখা যাক্ বললে নয়নরঞ্জিনী দাসী শুনবেন কেন? কত টাকা যে ট্যাক্সির পেছনে খরচ হচ্ছে, আর কত টাকা যে উকীল-মুহুরীতে নিচ্ছে তার হিসেব নেই। উকীলবাবুর কাছে গেলেই টাকা চায়। বলে—আরো পাঁচটা টাকা আছে আপনার কাছে মা?

কাছে দশটাকার নোট ছিল।

উকীলবাবু বললে—তা ভালোই হলো, পেশকারকে পাঁচ টাকা দেব আর পেশকারের দু'জন চাপরাসীদের আড়াইটাকা করে পাঁচ টাকা দেব—

নয়নরঞ্জিনী বলেন—কিন্তু সেদিন যে দিলাম পেশকারের পাওনা? সেই একশো টাকার মধ্যে পেশকারের পাওনা-গণ্ডা মেটানো হয়নি?

শুধু পেশকার নয়। পেশকার, মুহুরি, পেয়াদা, চাপরাসী, আর্দালী সবাইকে দিতে হয়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, কিন্তু মামলায় ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। আপনি তো জানেন মা, এ-সব না দিলে আপনারই লোকসান। মামলা মানেই তদ্‌বির। মামলায় আর কত খরচ? বড় জোর কোর্ট-ফী আর উকীলের ফীটা। কিন্তু আসল মোটা খরচ তো তদ্‌বিরে। আর ভালো করে তদ্‌বির না করতে পারলে আপনার মামলা গেল! আপনি ফাঁসলেন! তাই প্রত্যেকদিনই নয়নরঞ্জিনী উকীলবাবুর সঙ্গে দেখা করেন।

সেদিন বললেন—আসলে সেই হতচ্ছাড়া ব্যারিস্টারটার জন্যেই তো সব কিছু ঝঞ্ঝাট হলো—

উকীলবাবু বললে—তা তো বটেই, আপনি যদি সেই ব্যারিস্টারকে অত বিশ্বাস না-করতেন তাহলে আর এ-সব কিছুই হতো না। আপনি পায়ের ওপর

পা তুলে দিয়ে এখন আরেম করতে পারতেন—

—তা তাকে এখনও ডাক্তার ভাল করতে পারলে না? ডাক্তারবেটারাও কি ঘুষ খেয়েছে?

সত্যিই নির্মল পালিত তখনও ভালো হয়নি। নির্মল পালিত ভালো হলেও না-হয় তার বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য নেওয়া যেত। উকীলবাবুর সঙ্গে নয়নরঞ্জিনীও একদিন দেখতে গিয়েছিলেন তাকে। তখন নির্মল পালিতকে পুলিস পাগলা-গারদে রেখেছে। নয়নরঞ্জিনী দেখেছিলেন—সে-নির্মল পালিত আর নেই। প্যান্ট কোট ছেঁড়া। দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে মুখে। গরাদের ভেতর তার চেহারাটা কেমন বীভৎস ভয়ঙ্কর লেগেছিল। যেন পৃথিবীর সমস্ত লোভ, সমস্ত কামনা-বাসনা-হিংসে মানুষের আকার নিয়ে সশরীরে মানুষকেই ক্যারিকেচার করছে। মানুষকে মুখ-ভ্যাঙচাবার জন্যেই যেন নির্মল পালিতকে এমনি করেছে ভগবান। দিনের পর দিন অন্ধকার সেল্-এর মধ্যে থাকতে থাকতে নির্মল পালিতের যেন ক্ষয় ধরেছে শরীরে। কিছু যেন কামড়াতে গিয়ে মুখের ভেতরে দুটো দাঁত ভেঙে গিয়েছে। কপালে চোট্ লেগেছে, দেয়ালে হয়ত মাথা ঠুকতে গিয়ে। কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রক্তের লাল দাগ কালো হয়ে নির্মল পালিতের কপালটাই যেন কলঙ্কিত করে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে নয়নরঞ্জিনী দাসীর কপালও কলঙ্কিত হয়ে গিয়েছে।

প্রথমটায় চিনতে পারেননি নয়নরঞ্জিনী। জিজ্ঞেস করেছিলেন—কোথায়? সে-বেটা কোথায়?

—ওই যে, ওই কোণের দিকে বিড়-বিড় করছে?

আর তারপর নির্মল পালিতের কানেও বুঝি শব্দটা গিয়েছিল। সেইরকম হাতে একটা ছেঁড়া নোটবুক। সারা দিনরাত নোটবুক নিয়েই থাকতো নির্মল পালিত শেষের দিকটায়। শেষের দিকটায় যখন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল তখন আর নোটবুক কেউ দিত না। একই নোটবুকে হাজারবার লিখে লিখে পাতাগুলো সব ভর্তি হয়ে গেল। তবু সেই লেখা পাতাগুলোর ওপরই হিজিবিজি কাটতো। বলতো—কী নাম তোমার? হোয়াট ইজ্ ইওর নেম্?

তারপর শুনতে পেত কি পেত না, তা আর বোঝা যেত না। কিন্তু নির্মল পালিত লিখেই চলতো। মুখে বিড় বিড় করতো আর লিখে চলতো। আকাশ-পাতাল ছাই-ভস্ম লিখে চলতো। যারা খাবার দিতে আসতো, ঘর পরিষ্কার করতে আসতো, তাদেরও নাম জিজ্ঞেস করতো—হোয়াট ইজ্ ইওর নেম্? নাম কী তোর?

তারপর সে-লেখা যেন তার জীবনে আর শেষ হতো না। কখনও-কখনও দু'একটা কথা বোঝা যেত। টাকা, ক্রায়েণ্ট, গান্ধী, সুরেন বাঁড়ুজ্জে, সি আর দাস, কংগ্রেস, সুভাস বোস। যেন সকলের বিরুদ্ধে রায় লিখতে হবে তাকে। এই পৃথিবী, এই কলকাতা, এই ইণ্ডিয়া, এই করাচী, এই ইংল্যাণ্ড, এই

আমেরিকা। সকলের বিরুদ্ধে। আর কখনও-কখনও একটা অচেনা নাম বলতো—ইন্দ্রাণী। আর সব কথার একটা মানে ছিল তবু, কিন্তু ইন্দ্রাণী কথাটার মানে বুঝতে পারতো না কেউ। তারা জিজ্ঞেস করতো—ইন্দ্রাণী কে? কোনও গার্ল?

—হ্যাঁ, ওর স্ত্রীর নাম। ওর ওয়াইফ্, ওকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল—

তা হবে। হয়ত স্ত্রীর নামই ইন্দ্রাণী। আশ্চর্য, ইন্দ্রাণীই যেন নির্মল পালিতকে ইন্দ্রের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকেই নির্মল পালিত একেবারে রাস্তার মানুষ হয়ে গেছে। যে-জীবন যে-ঐশ্বর্যের জন্যে নির্মল পালিত নয়নরঞ্জিনী দাসীর এমন সর্বনাশ করে গেল, ইন্দ্রাণী চলে যাবার পর সেই ঐশ্বর্যও চলে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই ঐশ্বর্যও হাতছাড়া হয়ে গেল তার। সাউথ ইস্ট্ এসিয়া কম্যাণ্ডের কোন্ আমেরিকা-মেড্ মেজর ইণ্ডিয়ান মানি আর ইণ্ডিয়ান্ ওম্যান নিয়ে সাগরপাড়ি দিলে! তখন একেবারে পপার, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল নির্মল পালিত। নিরাশ্রয় হয়ে গেল নয়নরঞ্জিনী দাসী। ইণ্ডিয়া ফতুর হয়ে গেল।

নয়নরঞ্জিনী আবার জিজ্ঞেস করলেন—তা হ্যাঁ বাবা, বিধবা মানুষকে এইভাবেই সর্বনাশ করতে হয়? আমার টাকাটা দেবে না?

নির্মল নোট বুক থেকে মুখ তুললে। বললে—হোয়াট ইজ্ ইওর নেম? নাম কী তোমার? সরোজিনী নাইডু?

—ওমা, এ যে কথারও উত্তর দেয় না গো? এত রোগের চিকিৎসা হয়, আর এই পাগলের রোগের চিকিৎসা হয় না? পাগল সারাতে পারে না কেউ? তুমি পুলিসদের বলো না বাবা। চিকিৎসার খরচ যা-লাগে, না-হয় আমিই দেব—

উকীলবাবু বলেছিল—না মা, তা তো হতে পারে না। গভর্নমেণ্ট আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে কেন?

—নিতে দোষ কী উকীলবাবু, গভর্নমেণ্টের তো আর দায় নয়, দায় যে আমার। আমারই যে পিতৃ-মাতৃ দায় হয়ে উঠেছে—

ততক্ষণে নির্মল পালিত যেন হঠাৎ চিনতে পেরেছে। হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেছে। ইয়েস্, মানি! ওম্যান্ ইজ্ পোটেণ্ট বাট মানি ইজ্ ওমনিপোটেণ্ট। আমি ভাইসরয়কে লিখে দেব, তোমাকেও জেলে পুরবে সরোজিনী নাইডু। গান্ধীকে জেলে পুরেছি। নেহরুকে জেলে পুরেছি, প্যাটেলকে জেলে পুরেছি, এবার তোমাকেও জেলে পুরতে লিখে দেব সরোজিনী নাইডু—তুমিও মেয়েমানুষ।

শেষকালের দিকে নির্মল পালিত মানি আর মেয়েমানুষ—দুটো জিনিসকেই সহ্য করতে পারতো না। কেবল নাম লিখে নিত নোটবুকে। চিত্রগুপ্তের নোটবুকের মত তার নোটবুকেও সব কিছু লেখা থাকতো। আর কেউ সে লেখা বুঝতে পারতো না বটে, কিন্তু নির্মল পালিত একলাই হয়ত বুঝতে পারতো। সে-নোটবুকে লেখা থাকতো—পাপের কথা, পুণ্যের কথা, লোভের কথা, হিংসার

কথা, মৃত্যুর কথা, হত্যার কথা। পৃথিবীর তাবৎ বিষয় নিয়ে তার যেন ভাবনার আর শেষ ছিল না। ভেবে ভেবেই আরো পাগল হয়ে যাচ্ছিল নির্মল পালিত।

পরের দিন সকাল-সকালই এল দীপঙ্কর। শম্ভু ছিল সামনে। দীপঙ্করের চেহারা দেখে শম্ভুও একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বললে—কী হয়েছে দাদাবাবু আপনার?

দীপঙ্কর বললে—কেন?

শম্ভু বললে—আপনার চেহারা এমন হয়েছে কেন?

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মা-মণি আছেন বাড়িতে?

ক'দিন থেকেই দীপঙ্কর যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। আসতে পারেনি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে। লক্ষ্মীদি আসার পর থেকেই জিনিসটা হয়েছিল। সব সুর সব তাল কেটে গিয়েছিল জীবনের। এতদিন ছিল এক-রকম। আপিসে গিয়েছে। আপিসের কাজও বেড়ে গিয়েছিল। আপিস সুদ্ধ লোক মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছিল। আগে ভয় হতো তাদের কোথায় নিয়ে যাবে ওয়ার-ফ্রণ্টে। খাকি পোশাক দিয়েছে, কম্বল দিয়েছে, জলের ব্যাগ দিয়েছে। কিট্-ব্যাগ দিয়েছে। তারপর একদিন হয়ত বলবে—চলো সিঙ্গাপুর, কিম্বা চলো বার্মা। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ভয়টা কেটে গেল। মাস গেলে অনেকগুলো ফাল্‌তু টাকা আসছে হাতে। অথচ কোনও ঝক্কি নেই। আগে যারা ডিফেন্স-অব্-ইন্ডিয়ার বণ্ডে সই করেনি, তারা দেখলে তারা ঠকে গেছে। কিন্তু তখন নতুন করে নাম সই করতে চাইলেও আর উপায় নেই। আর রিক্রুট করা হবে না। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে। স্ট্যালিনগ্র্যাড্ থেকে সেই যে শীতের সময় জার্মান-আর্মি সরে এলো, তখন থেকেই মোড় ঘুরে গেছে যুদ্ধের। ইজিপ্টের ফ্রণ্টেও জার্মান জেনারেল কম্যান্ডার রোমেল হটে এসেছে। কলকাতার সাহেবদের হাসি-হাসি মুখ আবার। কলকাতার মার্কেণ্টাইল ফার্মে আবার সাহেবদের কালো মুখ লাল হয়ে উঠেছে। আবার হুইস্কি উড়ছে চৌরঙ্গীর হোটেলে-হোটেলে। আবার জ্যাজ্, আবার ফক্স-ট্রট্, আবার ওয়ালজ্ চলছে জোরদার হয়ে। আমেরিকান সোলজারদের সঙ্গে কালো-কালো নিগ্রো-হাব্‌সী সোলজারে ভর্তি হয়ে গেছে কলকাতা। চৌরঙ্গীর রাস্তায় বেরোতে ভয় করে মেয়েদের। বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলা। বাসে ধারের সীটে বসলে বাইরে থেকে গায়ে হাত দেয় তারা। মেয়েমানুষ দেখলে আর জ্ঞান থাকে না। হৈ হৈ শব্দ করে ওঠে। ভিখিরির মেয়ে, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে রাস্তায় ভিক্ষে করছে। তাই-ই সই। তাকেই জিপ্ গাড়িতে তুলে নিয়ে সোঁ সোঁ করে উধাও হয়ে যায়। তারপর লেকের মাঠের তাঁবুর সামনে নিয়ে গিয়ে তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিয়ে মজা দেখে। ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তোলে। কাঁটা তারের বাইরে

দাঁড়িয়ে বাঙালীরাও মজা দেখে। বিনা পয়সার মজা। মেয়েটাকে প্রচুর হুইস্কি খাইয়ে দিয়েছে। সে ন্যাংটো হয়ে খোলা আকাশের নিচেয় দাঁড়িয়ে হাসে, গান গায়, নাচে। আর ফোটো তুলে নেয় ইয়াঙ্কিরা সব অ্যাঙ্গেল থেকে। সে-ফোটো হয়ত নিজেদের দেশেও পাঠায়। দ্যাখো, ইন্ডিয়ান মেয়েদের কাণ্ড দ্যাখো। দিস্ ইজ্ ইন্ডিয়া। দিস্ ইজ্ ক্যালকাটা। দিস্ ইজ্ বেঙ্গলী-গার্ল।

এমনি কত মেয়ে, কত পুরুষ, কত দালাল সেদিন ঘুষ নিয়েছে ইয়াঙ্কিদের কাছ থেকে। টাকা নিয়েছে। টাকা নিয়ে ইন্ডিয়ার সুনাম, সম্ভ্রম, ইজ্জত সব বেচে দিয়েছে। তারা সশরীরে এখনও বেঁচে আছে কলকাতা শহরে। তারা এখন ইয়াঙ্কিদের টাকায় বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। সেই টাকা খরচ করে ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বক্তৃতা দিচ্ছে মাঠে মাঠে। আর তাদের চেনার উপায় নেই।

কিন্তু ভিক্টরির সঙ্গে সঙ্গে এল ভাইস্। এল খাবার নিয়ে ফাটকা-বাজি। চালের দাম চড়ে গেল পঞ্চাশ ষাট টাকায়। চাল, ডাল, কয়লা, তরি-তরকারি সব আগুন হয়ে উঠলো। আর ছোঁয়া যায় না হাত দিয়ে।

ক্রফোর্ড সাহেব বেশি কথা বলবার লোক নয়। অফিসে দিল্লির রেলওয়ে বোর্ড থেকে যখন ডি-ও লেটার আসে তখন অফিসসুদ্ধ তোলপাড় পড়ে যায়। হৈ-চৈ পড়ে যায় একটা লেটার খুঁজে না পাওয়া গেলে। কিন্তু ক্রফোর্ড সাহেব ধীর-স্থির হয়ে বসে থাকে নিজের ঘরে। তাকে দেখতেই পায় না কেউ সচরাচর। রবিনসন্ সাহেবের ফেয়ারওয়েলের দিনেও সবাই বক্তৃতা দিয়েছিল, মিস্টার ক্রফোর্ড চুপ করে সমস্ত শুনে গিয়েছিল শুধু। যেদিন কলকাতায় বোমা পড়েছিল সেদিন তো অফিসে কাজই করেনি সাহেব।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ ডেকে পাঠালে দীপঙ্করকে।

—ডু ইউ নো সেন? তুমি শুনেছ?

দীপঙ্কর বুঝতে পারেনি কীসের কথা বলছে মিস্টার ক্রফোর্ড। অন্য দিনের চেয়ে যেন বেশি হাসি-হাসি মুখ। হাসির কারণটা বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর।

—আমাদের ভিক্টরি হয়েছে, শুনেছ? রোমেল্ পালিয়ে গেছে ডেসার্ট ছেড়ে। ইজিপ্ট এখন ব্রিটিশের কণ্ট্রোলে? গ্রীস্ আমরা আবার নিয়ে নিয়েছি—

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ পেপারে দেখেছি—

—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোস না, বোস। টেক্ ইওর সীট্!

কিন্তু সাহেব কী বলছে? দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। কোথায় ভিক্টরি? সমস্ত কলকাতার লোক খেতে পাচ্ছে না। রেশন-শপ্ হয়েছে সমস্ত কলকাতায়। রেলওয়ে থেকেও স্টাফ্‌দের রেশন্ দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চাশ-ষাট টাকা মণ চাল, দশ-আনা বারো-আনা সের ডাল আলু, দেড়-টাকায় আড়াই পো, এর নাম ভিক্টরি? সেই কলকাতায় বোমা পড়বার পর থেকেই জিনিস-পত্রের দাম হু-হু করে বাড়তে লাগলো। ওদিকে মিলিটারি ক্যাম্পের সামনে পাঁউরুটি আর পচা

আলু পাহাড় হয়ে রাস্তার পড়ে থাকে। কলকাতার মানুষ সেইখানে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তারপর রাস্তার ধারে মাটির হাঁড়িতে রান্না করে খেয়ে নেয়। হোক তারা ভিখিরি। কিন্তু ভিখিরি হলেও এতদিন মানুষের ইজ্জত নিয়ে তারা বেঁচে ছিল। মানুষের মতই এতদিন তাদের চাল-চলন ছিল। এবার সেই মানুষ গরু শেয়াল সব-কিছু একাকার হয়ে গেল একেবারে।

মানুষের ডিক্টেরি যদি হয় তো কেন কলকাতার মানুষ খেতে পায় না? কেন রেশনের চালের জন্যে রাত থাকতে দোকানের সামনে লাইন দেয়? আপিসের মানুষরা আর তেমন কাজ করে না। এখন আপিসের কাজ ফেলে রেখে আপিসের দোকানে রেশন নিতে যায়। সেখানেও লাইন। আপিসের ফাইল পড়ে রইল। কাজ-কর্ম সব সিকেয় উঠলো। ছুটলো রেশনের দোকানে। রেলওয়ে আপিসও চাল-ডাল-তেল-নুনের দোকান খুলেছে। সারাদিনই সেখানে কাটে তাদের। আপিসে আসবার সময় ঝোলা-ঝুলি নিয়ে আসে। তারপর আপিসে এসেই দোকানে ছোটে। সেখানে একবার গেলে আর দু'ঘণ্টার আগে ফিরে আসবার উপায় নেই। সস্তার সব জিনিস। সেই জিনিস সঙ্গে নিয়ে আবার বাড়ি যাবার হুজ্জুতও আছে।

দীপঙ্কর সব লক্ষ্য করে। আপিসের ফাইল-এ একটা আঁচড়ও পড়ে না কারো। আপিসের কাজ পড়ে থাকে। ওদিকে দিল্লির বোর্ড থেকে জরুরী চিঠি আসে। সে-চিঠি নিয়েও আগেকার মতন কেউ আর মাথা ঘামায় না। সবাই যেন অসাড় হয়ে গেছে। চোখের সামনে টাটকা মৃত্যু দেখে দেখে মৃত্যুর ওপরও যেন লোকে মমতা হারিয়ে ফেলেছে। লোকে বলে—মরতে তো একদিন হবেই মশাই!

আগে মরা এত সহজ ছিল না। আগে মরা দেখলে লোকে ভয় পেত, সাবধান হতো, চমকে উঠতো। কিন্তু তখন মৃত্যু সারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতে মৃত্যু দেখলে লোকে মড়া ডিঙিয়ে যায়। শেষকালে মৃত্যুর বিভীষিকার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর দুর্গন্ধটাও সহ্য হয়ে গেল। মড়ার দুর্গন্ধ পেলে নাকে রুমাল দেওয়াও উঠে গেল।

ক্রফোর্ড সাহেব বলে—ওদের এখন কিছু বোল না সেন! আমাদের তো ভিক্টরি হচ্ছে—

আপিসের ক্লার্কদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে বলে—এখনও হয়নি স্যার—

—কেন হয়নি?

সঙ্গে সঙ্গে বলে—রেশনের দোকানে গিয়েছিলুম স্যার—

রেশনের দোকানে থাক্ আর না-থাক্, রেশনটা একটা ওজর হয়ে দাঁড়ালো। রেশনের নাম করে ক্যান্টিনে গিয়ে গল্প করতে লাগলো। সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে লাগলো সময়, উড়িয়ে দিতে লাগলো সংসার, উড়িয়ে দিতে লাগলো জীবন। জীবন, মৃত্যু, জন্ম সেক্স সম্বন্ধে মানুষ নির্বিকার হয়ে উঠলো। আর একদিকে লোভ, পাপ, হিংসেকে ক্যাপিটাল করে আর একদল মুষ্টিমেয় মানুষ ফেঁপে উঠতে লাগলো ফানুসের মত। এই হলো ১৯৪৩ সালের কলকাতার মানুষের কাহিনী। ঠিক এই সময়েই নয়নরঞ্জিনী দাসী নীলেমের নোটিশ পেলেন। ঠিক এই সময়েই নির্মল পালিত পাগল হয়ে গেল। ঠিক এই সময়েই দিল্লি থেকে লক্ষ্মীদি কলকাতায় এসে পৌঁছাল। আর ঠিক এই সময়েই দীপঙ্কর ছট্‌ফট্ করে বেড়াতে লাগলো টাকার জন্যে!

এতদিন টাকার কোনও প্রয়োজন হয়নি দীপঙ্করের। এতদিন মাইনে পেয়েছে। মাইনে পেয়ে সংসার চলেছে। শুধু সংসার নয়। যে এসেছে হাত পেতেছে। আপিসের পিওন মধু থেকে শুরু করে বাড়ির চাকর কাশী পর্যন্ত কারোর অভাব রাখেনি দীপঙ্কর। কত টাকা হাতে এসেছে আর কত টাকা হাত থেকে গেছে সে আয়-ব্যয়ের হিসেব কখনও রাখেনি। কিন্তু এবার হিসেব করবার প্রয়োজন হলো। প্রভিডেন্ট ফণ্ডে কিছু টাকা নিশ্চয় হয়েছে।

একদিন প্রভিডেন্ট ফণ্ড সেকশনের বড়বাবুকে দীপঙ্কর ডাকলে। জিজ্ঞেস করলে—আমার কত টাকা জমেছে একবার আমাকে জেনে বলবেন?

বড়বাবু বললে—আমি আপনাকে লেটেস্ট ফিগার জানিয়ে দেব আজই—

ক্রফোর্ড সাহেবও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—তুমি প্রভিডেন্ট ফণ্ড থেকে লোন্ নেবে? কেন? হোয়াই?

দীপঙ্কর ব্যাচিলর লোক। সংসারে তার কেউ নেই, অথচ এই পোস্টে থেকে কত লোক কত টাকা ঘুষ নিয়ে বড়লোক হয়েছে। নৃপেনবাবু সামান্য অফিস-সুপারভাইজারের কাজ করে তিনখানা বাড়ি করেছে কালিঘাটে। এখন বেশ নিশ্চিন্তে গঙ্গাস্নান করে আর ভগবানের নাম করে। অথচ দীপঙ্করের এত টাকার প্রয়োজন কেন? তবে কি ভেতরে-ভেতরে মদ খায়? ভেতরে-ভেতরে মেয়েমানুষ রেখেছে?

আপিসেও সেকশনে-সেকশনে আলোচনা হয়।

কে-জি-দাশবাবু বলে—আরে মশাই, সকলকেই চেনা হয়ে গেল—

—কী বড়বাবু? কার কথা বলছেন?

কে-জি-দাশবাবু বলে—আরে ভাই, এ-সব বলবার জিনিস নয়, এ-সব খবর চেপে যাওয়াই ভালো—যত দোষ করেছে ঘোষাল-সাহেব!

তবু ক্লার্করা বুঝতে পারে না। বলে—কেন বড়বাবু, কী হয়েছে?

—আরে এই যে আমাদের সেন-সাহেব, সেন-সাহেবের কথা ভাবছিলুম, ভেবেছে ডুবে-ডুবে জল খেলে শিবের বাবারও জানার সাধ্যি নেই। এক্ষুনি হোসেনভাই এসেছিল, বলে গেল—

—কী বললে?

—বললে আর কী? বললে—কে-জি-দাশবাবু, তোমাদের সেন-সাহেবও কি আজকাল ঘ্রাইব্ নিচ্ছে নাকি?

কে-জি-দাশবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। বললে—আমি প্রথমে কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম ভাই, জিজ্ঞেস করলুম—কেন? ও-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন হোসেনভাই সাহেব?

হোসেনভাই বললে—সেন-সাহেব হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলে—বড়লোকরা এত টাকা নিয়ে কী করে? বড়লোকরা কিছু টাকা দিয়ে দিলেই তো পারে গরীবদের। বড়লোকরা গরীবদের দুঃখ বুঝতে পারে কি না—এই সব!

—তা আপনি কী বললেন!

হোসেনভাই বললে—আমি প্রথমটায় তাজ্জব হয়ে গেলুম কে-জি-দাশবাবু, ভাবলুম এতদিন ওয়াগন চাইতে আসছি, সেন-সাহেব তো কখনও টাকার কথা তোলে নি! সেন-সাহেবও কি ব্রাইব্ চায় নাকি?

কে-জি-দাশবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—তারপর?

হোসেনভাই বললে—তারপর আর কী! ব্রাইব তো কেউ খোলাখুলি চায় না, ব্রাইব্ তো সবাই ইন্‌ডাইরেক্ট-ওয়েতে চায়, আমি আর কিছু কথা বাড়ালাম না, চলে এলুম—

—ওয়াগন পেলেন?

—হ্যাঁ, ওয়াগন পেলুম। এর পরের দিন বোধহয় চাইবে। সেদিন দিতেই হবে। ব্রাইব্ তো আমরা দিয়েই থাকি কে-জি-দাশবাবু। ব্রাইব্ না-দিলে আমাদের কারবার চলে না। পরের দিন টাকা সঙ্গে করে নিয়ে আসবো—জেণ্টেলম্যানরা তো আর সোজাসুজি ঘুষ চাইতে পারে না, এইরকম এঁকিয়ে বেঁকিয়ে চায়। তা দেব!

কে-জি-দাশবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলো। বললে—না, না হোসেনভাই সাহেব, ঘুষ দেবেন না আপনি, কিছুতেই ঘুষ দেবেন না। কেন মিছিমিছি দিতে যাবেন?

হোসেনভাই বললে—না কে-জি-দাশবাবু, আমি ব্রাইব্ দেবই। রেলের অফিসার ব্রাইব্ নিলে তো আমাদের সুবিধে। ব্রাইব্ দিলেই তো আমাদের কারবার ভালো চলে। ব্রাইব্ দিলে চাঁদির জুতো মেরে কাম্ আদায় করতে পারি—ঘুষ আমি দেবই—

—না না হোসেনভাই সাহেব, আপনি ঘুষ দেবেন না। আপনি এক কাজ করুন—

—কী কাজ?

কে-জি-দাশবাবু বললে—আপনি অ্যান্টি-করাপশন অফিসের পুলিসকে খবরটা দিয়ে দিন, তাতে রেলেরও ভাল, আপনারও ভাল—

হোসেনভাই বললে—কিন্তু আমার কারবার চলবে কী করে? আমাকে কি আর কেউ কখন বিশোআস করবে?

—করবে হোসেনভাই সাহেব, করবে! আমি সেন-সাহেবকে নিজে জানি

যে ভাল করে, আমার আণ্ডারে একদিন কাজ করেছে ক্লার্ক হয়ে। আমিই যে হাতে ধরে ইংরিজী ড্রাফট করতে শিখিয়েছি। এখন আমাকেই মানতে চায় না সেন-সাহেব।

—তা এত টাকার কীসের দরকার পড়লো? সেন-সাহেব মদ খায়?

—আরে মদ খায়, মেয়েমানুষ রেখেছে। কী না-করে। ডুবে ডুবে সবই করে। কেউ জানতে পারে না তাই। ঝি-এর ছেলে। ওর মা পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করতো, জানো সাহেব? তারপর রবিনসন্ সাহেবের কুকুরকে বিস্কুট খাইয়ে খাইয়ে এই অফিসার হয়েছে। তেত্রিশ টাকায় কেরানীর চাকরিতে ঢুকেছিল, এখন ন'শো টাকার গ্রেড—আঙুল ফুলে একেবারে কলাগাছ—বুঝেছ সাহেব? তুমি পুলিসে ধরিয়ে দাও—জব্দ হোক!

জার্নাল সেকশনে এইসব গল্প সবিস্তারে বলছিল কে-জি-দাশবাবু। লক্ষ্মণ সরকার চুপ করে শুনছিল সব।

কে-জি-দাশবাবু লক্ষ্মণ সরকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে—আপনি আবার যেন বলে দেবেন না লক্ষ্মণবাবু, আপনি তো সেন-সাহেবেরই লোক আবার—বাঙালীদের তো এই-ই স্বভাব, কেবল পরের নামে লাগানি-ভাঙানি—

লক্ষ্মণ সরকারের বলবার দরকার নেই। দীপঙ্কর সবই জানতো। জানতো তাকে নিয়ে সেকশনে সেকশনে কী আলোচনা হয়। জানতো তার সম্বন্ধে কে-কী বলে। আপিসের কাজ করতে করতে এক-একবার মনে হতো—চাকরি ছেড়ে দেয়। এই চাকরি না করলে তো তাকে নিয়ে এত মাথা ঘামায় না কেউ। এই চাকরি না-করলে তো তার সম্বন্ধে এত আলোচনা ওঠে না। মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথাও কোনও গ্রামের মধ্যে গিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। যায় আবার সেই ব্যাটরায়। যেখানে দীপঙ্কর জন্মেছিল। যেখান থেকে মা তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে-টাকা কটা আছে তাই নিয়ে এক-রকম করে শেষ-জীবনটা কাটিয়ে দেবে। চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকায় একটা খামার কিনে চাষ-বাস করবে। তাতে বোধহয় অনেক শান্তি। অনেক আরাম। কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না। কোনও সম্বন্ধ রাখবে না। সতী, লক্ষ্মীদি, সনাতনবাবু, মিস্টার ঘোষাল, ছিটে-ফোঁটা সকলের কাছ থেকে দূরে চলে যাবে। পাপ থেকে দূরে চলে যাবে। পুণ্য থেকেও দূরে চলে যাবে। আসলে হয়ত জীবন থেকেও দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করতো দীপঙ্করের।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে এসে শম্ভুকে দেখে আবার সে-ভাবনাটা খানিকক্ষণের জন্যে দূরে চলে গেল।

মা-মণি নিজের ঘরেই বসেছিলেন। সেই তখুনি নির্মল পালিতকে দেখে এসেছেন। মনটা খিঁচড়ে ছিল। দীপঙ্করকে দেখে যেন একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন—কী বাবা? কী হলো?

দীপঙ্কর সামনের চেয়ারটায় বসলো। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যেন

হাঁফাচ্ছিল। বললে—আপনি সনাতনবাবুর কাছে কিছু শোনেন নি?

মা-মণি বললেন—ওর কথা ছেড়ে দাও বাবা, ও কি একটা মানুষ? বলছিল, কী যেন বৌমার বোন এসেছে নাকি দিল্লি থেকে—

দীপঙ্কর বললে—সে এক ভীষণ কাণ্ড হয়েছে সেখানে, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে আসতে পারিনি এ ক'দিন!

—কিন্তু বৌমার বোনেরও তো টাকা আছে? সে-ও তো বাপের আদ্দেক টাকা পেয়েছে?

—তাতো পেয়েছে। কিন্তু এখন লক্ষ্মীদির যা অবস্থা, তাতে টাকার কথা বল্যই যাচ্ছে না। টাকা তো টাকা, তার জীবন নিয়েই এখন টানাটানি—

নয়নরঞ্জিনী জিজ্ঞেস করলেন—কী রকম?

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবু আপনাকে কিছু বলেন নি? লক্ষ্মীদি যেদিন এল দিল্লি থেকে সেদিন তো সনাতনবাবু বসে আছেন? সেদিন সনাতন-বাবুকে নিয়ে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছিলুম আমি। এদিকে কোনও কাজই হলো না, ওদিকে সতীও তখন বাড়ি ছিল না—

—বৌমা আবার কোথায় গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে?

দীপঙ্কর বললে—সেই আমাদের ঘোষাল-সাহেবের মামলাতে সাক্ষী দিতে।

মা-মণি কিছু জানতেন না। বললেন—আহা, ছেলেটি খুব ভালো, তার আবার কীসের মামলা!

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কাণ্ড! সতী তো তার আণ্ডারেই চাকরি করেছে এককালে, সে তো জানেন? সেই মামলায় আটকে পড়েছিল ঘোষাল-সাহেব, সেদিন ছিল শুনানীর দিন। সতীর সাক্ষীতেই শেষ পর্যন্ত জেল হয়ে গেছে ঘোষাল সাহেবের, শুনেছেন বোধহয়?

মা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—জেল?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, আট মাসের।

—আট মাস! আহা গো, আপীল করতে বলো বাবা! এই মামলা মকদ্দমা নিয়ে হয়েছে ভালমানুষদের জ্বালা। এই দেখ না, কোথাও কিছু নেই আমি কিছু জানলুম না শুনলুম না, আমার নামে ডিক্রি হয়ে গেল, আমার বাড়ি নীলেমের নোটিশ এসে গেল। এ-সব গা-জুয়ারি নয়? আপীল করতে বলো বাবা। আপীলে ও ঠিক খালাস হয়ে যাবে—আহা গো—

কিন্তু তা বোধহয় হবার নয়। নয়নরঞ্জিনী দাসী তা জানতেন না। তিনি তখন নিজের ভাবনাতেই অস্থির। তাঁর ভাবনা কে ভাবে, তারই ঠিক নেই। সে-সব দিনগুলোর কথা ভাবলে দীপঙ্করেরও কেমন সমস্ত গোলমাল হয়ে যেত। সমস্ত জীবন, সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত কলকাতা যেন জটিল হয়ে উঠেছিল সে-সময়ে। মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দীপঙ্করও যেন জড়িয়ে গিয়েছিল এক জালে। সমস্ত কলকাতা সেদিন সে মামলার রায় মনোযোগ দিয়ে পড়েছিল। সকালবেলা ঘুম

থেকে উঠে কলকাতার লোক আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সেই খবর পড়ে। খবরের কাগজে বড় বড় হেডিং দিয়ে লেখা হয়েছিল—'ঘুষ-নওয়ার অপরাধে রেলওয়ে অফিসারের আট মাস কারাদণ্ড।'

স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালের রায়-এর কিছুটা অংশ তুলে দিয়েছিল খবরের কাগজে।

তাতে লেখা ছিল—'এই মামলার আসামী একজন গবর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ গেজেটেড অফিসার। একজন গেজেটেড অফিসার হইয়া আসামী যে-অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিখুঁতভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। আসামী শুধু যে যুদ্ধের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন তাহাই নহে, তাহার নিম্নপদস্থ কর্মচারী-দের চোখে দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সেই হিসাবে আসামী শুধু দেশের শত্রু নহেন, শুধু সমাজের শত্রু নহেন, সমগ্র মানব-সমাজের শত্রু। আসামীর ন্যায় সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই এখন জাতির মাথা। তাঁহারা নিজেরা অসচ্চরিত্র হইলে নিম্নপদস্থ অধস্তন কর্মচারীদের দোষ দিয়া লাভ নাই। আসামী শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বলিয়া এজাহার দিয়াছেন। কিন্তু কার্যত তিনি অশিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তি হইলে আসামীকে লঘু দণ্ড দেওয়া যাইত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-যুক্তি সম্পূর্ণ অসমীচীন। শিক্ষিত ব্যক্তির অপরাধ অশিক্ষিত ব্যক্তির অপরাধের অপেক্ষা অনেক দোষণীয়। সম্পূর্ণ সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে আসামী যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার ক্ষমা নাই। এই সমস্ত দিক ধীরভাবে বিচার করিয়া আমরা আসামীকে দীর্ঘ আট মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।'

মনে আছে দীপঙ্কর যেদিন খবরটা প্রথম শুনেছিল সেদিন যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। খুশী হওয়ার প্রশ্ন নয়। অখুশী হওয়ারও প্রশ্ন নয়। বিশ্বাস করতে পারেনি অন্য কারণে। তবে কি সত্যিই দোষীর শাস্তি হয় সংসারে? পাপের পরাজয় কথাটা তো বই-এ লেখা থাকে। ও-কথা বইতেই শোভা পায়। ন্যায়-বিচার কথাটা কি ঘটে সত্যি সত্যি? ছোটবেলা থেকে এতদিন ধরে এত দেখে এত শিখেও যেন হঠাৎ কেমন অবাক লেগেছিল খবরটা। তাই প্রথমে নিজেকে নিয়ে সামলাতে পারেনি আর। তবে কি সতীও তার জীবনে সুখ পাবে? লক্ষ্মীদিকেও তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? তাহলে কি সক্রেটিসের সেই কথাটাই সত্যি? তাহলে সেই আশুতোষ কলেজের অমলবাবু যা বলেছিলেন—সেসব সত্যি? এমনি করে এতদিন ধরে এত অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে এসে দীপঙ্কর সত্যের সন্ধান পেলে? এরই নাম কি জীবন দিয়ে সন্ধান করা?

আরো মনে আছে দীপঙ্কর সে-ক'দিন ছটফট করে বেড়িয়েছিল কেবল! আপিসে তার দুর্নাম, সতীর সেই অবস্থা, লক্ষ্মীদির সেই সর্বনাশ—সব কিছু নিয়ে দীপঙ্কর যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কোথায় সে যাবে? কার কাছে

যাবে? কার কাছে গিয়ে সে মনের সব ভার নামাবে? কোথায় তার মা? কোথায় রইলেন প্রাণমথবাবু? কোথায় রইল সেই কিরণ?

এমনি অবস্থাতেই দীপঙ্কর আর কোনও জায়গায় আশ্রয় না-পেয়ে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এসে হাজির হয়েছিল। তাই শম্ভু তার চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

আসলে এসেছিল সনাতনবাবুর কাছে। কিন্তু শম্ভু একেবারে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল নয়নরঞ্জিনীর কাছে।

—তোমার কি কোনও অসুখ করেছে নাকি বাবা? শরীর খারাপ?

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আমি উঠি মা-মণি!

—কিন্তু আমার টাকার কোনও ব্যবস্থা করতে পারলে? উকীল তো আমায় খেয়ে ফেললে বাবা। আমার গয়নাগাঁটি যা আছে তা বেচে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা হবে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে—কিন্তু বাকীটা?

দীপঙ্কর বললে—আমার প্রভিডেন্ট ফন্ডে চোদ্দ-পনেরো হাজার টাকা জমেছে, তার থেকে আমি সবই তুলে দিতে পারি। তাতে হবে আপনার?

—সে তো পঞ্চাশ হাজার হলো। কিন্তু বাকীটা? বাকীটা কোত্থেকে পাই?

—আমার কাছে তো আর কিছু নেই। আমার হাতে কিছুই থাকে না। আপনার কোনও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিতে পারবেন না?

—আত্মীয়-স্বজনের নাম কোর না। তারা তো এই খবর শোনার পর থেকে ধেই ধেই করে নাচছে—আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালে তারা কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে মা-কালীর কাছে পুজো দেবে, জানো? এই হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে—আপনি ভাববেন না, আমি দেখি কী করতে পারি।

—করতে পারি না বাবা! তোমাকে করতেই হবে! তুমি বললেই বৌমা শুনবে! তোমার কথা বৌমা ফেলবে না—। তুমি একবার ভালো করে বউমাকে বুঝিয়ে বলো না!

দীপঙ্কর কী ভেবে বললে—তাহলে সনাতনবাবুকে আর একবার নিয়ে যাই—

—না বাবা, সোনাকে নিয়ে গিয়ে কোনও কাজ হবে না। সেদিন তো সোনাকে নিয়ে গিয়েছিলে কাজ হলো? তবে আবার কেন মিছিমিছি নিয়ে যাবে? তুমিই কায়দা করে একবার বলো গিয়ে, নিশ্চয়ই কাজ হবে—

—আচ্ছা দেখি—বলে দীপঙ্কর সেদিন উঠে পড়ছিল।

মা-মণি আবার ডাকলেন। বললেন—তা হ্যাঁ বাবা, বউমার বোনের কাছে চাইলে হয় না? তার কাছেই না-হয় একবার চেয়ে দেখ না?

দীপঙ্কর মুখ ফেরাল। বললে—কিন্তু তার অবস্থা তো বললুম আপনাকে—

—কেন, কী-রকম অবস্থা?

—লক্ষ্মীদি বোধহয় পাগল হয়ে যাবে।

—পাগল হয়ে যাবে? কেন কী হয়েছে তার আবার? সেই কাকে যেন

বিয়ে করেছিল বাপের অমতে? আবার স্ত্রী হলো তার? সে তো ব্যবসা-ট্যাবসা করে অনেক টাকা-কড়ি করেছে শুনিচি। আর আমি তো তার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি না!

দীপঙ্কর বললে—পালিয়ে যাবার কথা হচ্ছে না, তার এখন মানসিক অবস্থা খুব খারাপ, তার ছেলেকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়েছে—

—কী মুশকিলে পড়েছে ছেলেকে নিয়ে?

দীপঙ্কর বললে—তার ছেলে একজনকে খুন করেছে—

নয়নরঞ্জিনী আঁতকে উঠলেন, বললেন—ওমা কী সর্বনাশ! কাকে খুন করেছে গো?

দীপঙ্কর বললে—সে আপনি চিনবেন না—পরে সব জানতে পারবেন—

বলে দীপঙ্কর আর দাঁড়াল না সেখানে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

সেদিনের ঘটনাটাও স্পষ্ট মনে আছে। মনে আছে গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে সেদিন ছিল আরো অন্ধকার। কোথায় যেন সমস্ত গরমিল হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর সনাতনবাবুকে যেদিন এ-বাড়িতে এনেছিল সেইদিন থেকেই। সেদিন থেকেই যেন ছন্নছাড়া চেহারা হয়ে গিয়েছিল এ-সংসারের।

সনাতনবাবু বাইরের চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিল তাঁর। দীপঙ্কর সনাতনবাবুর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিল। একবার ভেতরে যাচ্ছিল, আর একবার বাইরে আসছিল। সতী তখনও আসেনি।

দীপঙ্কর বললে—সতী তো এখনও এল না সনাতনবাবু?

হঠাৎ মনে হলো ভেতরের ঘর থেকে লক্ষ্মীদির কান্নার শব্দ কানে এল আবার। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল ভেতরে। লক্ষ্মীদি বালিশে মাথা গুঁজে তখন ছটফট করছে। দীপঙ্কর মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করেছিল—কী হলো তোমার লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি শুধু বলেছিল—আমি কী করবো দীপু?

—কেন, কী হয়েছে তোমার বলো না?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—আমি কী নিয়ে বাঁচবো দীপু? আমি কার জন্যে বাঁচবো?

তবু কিছুই বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। জিজ্ঞেস করেছিল—দাতারবাবু কোথায়? দাতারবাবু এলেন না কেন?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—আমার কেউ নেই দীপু, কেউ নেই—আমাকে ওরা ধরে রেখেছিল। আমি এখানে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

—কেন? কেন পালিয়ে এসেছ তুমি?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—আমি লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলুম সতীকে, কিন্তু আসতে পারছিলুম না রে, আসতে গেলেই ওরা আমাকে ধরে রাখছিল—সারা রাস্তা আমি কাঁদতে কাঁদতে এসেছি—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কে ধরে রাখছিল? কারা? সুধাংশু? দাতারবাবু? তোমার ছেলে? মানস?

লক্ষ্মীদি ছটফট করছিল তখনও। মুখটা বালিশের ওপর তখনও গুঁজে রেখেছে। রঘু এসে একবার লক্ষ্মীদির দিকে চাইলে। দীপঙ্কর এবার নিচু হলো। মাথায় হাত দিলে। মাথাটা ধরে স্থির করে রাখবার চেষ্টা করলে।

লক্ষ্মীদি দীপঙ্করের হাতটা আঁকড়ে ধরলে জোরে।

বললে—দীপু......

আর কোনও কথা বেরোল না যেন লক্ষ্মীদির মুখ দিয়ে। লক্ষ্মীদি যেন আর কিছু বলবার শক্তিও হারিয়ে ফেললে।

দীপঙ্কর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়েছিল এবার।

বলেছিল—কোনও কষ্ট হচ্ছে তোমার, ডাক্তার ডাকবো?

লক্ষ্মীদি বললে—না রে দীপু, না—এখন ডাক্তারের হাতের বাইরে চলে গেছে একেবারে—

তারপর হঠাৎ মুখটা তুললো। একেবারে দীপঙ্করের মুখের কাছাকাছি। যেন মুখটা ঠেকে যাবে দীপঙ্করের মুখের সঙ্গে। দীপঙ্কর আরো জোরে চেপে ধরলে লক্ষ্মীদিকে। বললে—লক্ষ্মীদি, একটু শান্ত হও, একটু চুপ করো, বলো তোমার কী হয়েছে?

কিন্তু লক্ষ্মীদিকে চেপে ধরে রাখা যাবে, এমন শক্তি বোধহয় দীপঙ্করের ছিল না। দীপঙ্কর খাটের পাশে মাটিতে বসলো। বসে লক্ষ্মীদিকে ধরে রইল। বললে—এমন করলে তুমি পড়ে যাবে লক্ষ্মীদি—চুপ করো, ঠাণ্ডা হও—

লক্ষ্মীদি তেমনি ছটফট করতে-করতেই বলতে লাগলো—কিন্তু কেন আমার এমন সর্বনাশ হলো বল তো দীপু? তুই তো আমার সব জানিস। ছোটবেলা থেকে তুই তো আমাকে দেখে আসছিস, আমি কার জন্যে টাকা চেয়েছি। আমি কার জন্যে বাড়ি কিনেছি। কার জন্যে গাড়ি চেয়েছি, আমি কার সুখের জন্যে এমন করে নিজের ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছি?

দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারলে না। মাথায় হাত বুলোতে লাগলো শুধু।

লক্ষ্মীদি তখনও বলে চলেছে—আমি আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম দীপু, আমার পাপের আর শেষ নেই রে, তাই বুঝি ভগবান আমায় এমন করে শাস্তি দিলে—তাই বুঝি এমন করে আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করলে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু, কী হয়েছে বলবে তো তুমি? না-বললে আমি কী করবো?

লক্ষ্মীদি তখন অসহায়ের মত আরো কাঁদতে লাগলো। বললে—তুই আমায় মেরে ফেল দীপু, আমার গলাটা জোরে টিপে ধরে মেরে ফেল—আমার আর বেঁচে দরকার নেই, আমার মরে যাওয়াই ভালো—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—দেখ লক্ষ্মীদি, শোন, সতী বাড়ি নেই, তোমার কী দরকার বলো, আমি তার ব্যবস্থা করছি—

—তোকে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না দীপু, তুই যা, তুই চলে যা, তোরা সবাই চলে যা, আর কাউকে আমার দরকার নেই, তোদেরও থেকে দরকার নেই, আমার বেঁচে থেকেও দরকার নেই—যা, তোরা চলে যা। আমি তোদের কী করেছি? কেন তোরা সবাই মিলে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস? আমি তোদের কী করেছি। কী ক্ষতিটা করেছি?

বলতে বলতে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো লক্ষ্মীদি। আর তারপর আবার বালিশে মুখ গুঁজে মাথা কুটতে লাগলো।

দীপঙ্কর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—তুমি থামো লক্ষ্মীদি, থামো, চুপ করো, রঘু কী ভাবছে বলো দিকিনি, বাইরে সনাতনবাবু বসে আছেন, তিনিই বা কী ভাবছেন বলো তো? এমন করলে সবাই কী মনে করবে, বুঝতে পারছো না—

লক্ষ্মীদি তেমনি মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলো—তোর পায়ে পড়ি দীপু, তুই চলে যা এখান থেকে, সবাইকে চলে যেতে বল্, কারোর থাকবার দরকার নেই, কাউকে আমার পোড়া-মুখ আমি দেখাতেও চাই না, আমার মুখ পুড়ে গেছে রে, আমার পোড়ামুখ দেখিয়ে আমি কারো অকল্যাণ করতে চাই না—তুই যা, তোর পায়ে পড়ি দীপু, তুই যা—যা—যা—

বলে লক্ষ্মীদি হঠাৎ আবার অস্থির হয়ে উঠলো। দীপঙ্করকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। দীপঙ্কর এই অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারলে না। ডাকলে—রঘু—

রঘু আসতেই দীপঙ্কর বললে—লক্ষ্মীদিকে একটু ধর তো—ওই পায়ের দিকটা একটু ধরে থাক্—নইলে পড়ে যাবে—

রঘু প্রথমে একটু দ্বিধা করতে লাগলো। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

আর ওদিকে বাড়ির সামনে তখন আর একটা নাটকের অভিনয় চলছিল। একটা ট্যাক্সি থামবার শব্দ হলো। সনাতনবাবু তখনও নির্বিকার হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ কে যেন ঘরে ঢুকলো।

—তুমি?

সনাতনবাবু গলার আওয়াজে মুখ তুলে দেখলেন—সামনেই সতী দাঁড়িয়ে আছে।

—আবার এসেছ?

সনাতনবাবু যেমন চেয়েছিলেন, তেমনিই চেয়ে রইলেন, কোনও কথা বললেন না।

—সেদিন অমন করে অপমান করার পরও আবার টাকা চাইতে এসেছো? তোমাদের লজ্জা করে না? যে-বউকে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ তার কাছে টাকা চাইতে আসতে লজ্জা করে না তোমাদের? বলো, আবার এসেছ কেন আমার কাছে? বলো?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছ, সতী, টাকা চাইতে। আবার টাকা চাইতেই এসেছি—

—তবু যা-হোক তোমার মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরোল। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কোন্ মুখে এসেছো? আসতে লজ্জা করলো না তোমার?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার সে-সম্পর্ক নয়, তুমি তা জানো।

সতীর মুখের চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—এতদিন পরে আজ তুমি সম্পর্কের কথা তুললে!

সনাতনবাবু বললেন—সম্পর্কটা সত্যি বলেই সম্পর্কের কথা তুললাম।

—কিন্তু তাহলে কেন বলছো, টাকা চাইতে এসেছো? আমার সঙ্গে তোমার কোন্ সম্পর্কটা সত্যি? টাকার সম্পর্কটা না বিয়ের সম্পর্কটা?

সনাতনবাবু বললেন—দুটোই সত্যি সতী। তুমি আমার স্ত্রী, এটাও যেমন সত্যি, আমাদের টাকার দরকার সেটাও তেমনি সত্যি!

সতী প্রথমে কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—কিন্তু টাকা তুমি পাবে না, এটা আমি বলেই রাখছি—

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে টাকা থাক্, তুমিই এসো—তোমাকেই চাই—

সতী অবাক হয়ে গেল সনাতনবাবুর কথা শুনে। ভালো করে চেয়ে দেখলে সনাতনবাবুর মুখের দিকে। কী যেন সন্দেহ হলো।

সনাতনবাবু আবার বললেন—এখনি উত্তর দেবার দরকার নেই, পরে ভেবে উত্তর দিও, কালকে উত্তর দিলেও চলবে, ছ'মাস পরে দিলেও ক্ষতি নেই, আমি হতাশ হবো না—

—কিন্তু তোমার মা? তিনিও কি আমার টাকা চান না, আমাকেই চান?

সনাতনবাবু বললেন—না—

—তিনি আমার টাকা চান?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ—

সতী আবার আগেকার মত রুদ্রমূর্তি হয়ে উঠলো। বললে—তাহলে, এর

পরেও আমাকে তোমার কাছে যেতে বলছো? এর পরেও তুমি আমার কাছে এসে সম্পর্কের কথা তুলে আমাকে ভোলাতে চাইছো? আমাকে এত অপমান করেও তোমাদের তৃপ্তি হয়নি? আরো অপমান করতে চাও?

সনাতনবাবু বললেন—এ-কথার উত্তর চাও তুমি?

সতী যেন জ্বলে উঠলো। বললে—না, তোমরা যা উত্তর দেবে তা আমি জানি, তোমাদের উত্তর শুনে-শুনে আমার কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে, আমার আর কোনও উত্তর শোনবার ধৈর্য নেই, দয়া করে তুমি আর কখনও এসো না, আর কখনও আমাকে এ-বাড়িতে এসে জ্বালিও না—তোমাদের মুখও দেখতে চাই না আমি, তোমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না—। যতদিন বেঁচে থাকবো মনে করবো আমার বিয়ে হয়নি, মনে করবো তোমার সঙ্গে কখনও আমার মালাবদল হয়নি, নয় তো মনে করবো তুমি নেই—

সতী অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁফিয়ে পড়েছিল। একটু দম নেবার জন্যে বোধহয় খানিক থামলে। সনাতনবাবু কিন্তু তেমনি ধীর স্থির। কথাগুলো শুনে তাঁর কোনও বিকারের লক্ষণ দেখা গেল না।

সনাতনবাবু কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাধা পড়লো।

—দিদিমণি!

সতী পেছন ফিরে দেখলে রঘু।

রঘু বললে—বড়দিদিমণি এসেছেন,—

—বড়দিদিমণি? দিল্লি থেকে? কখন এল?

বলে আর দাঁড়াল না। ভেতর দিকে চলে গেল দৌড়তে দৌড়তে। রঘুও চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর ভেতরে এল। বললে—আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, এদিকে বাড়িতে একটা ভীষণ বিপদ হয়ে গেছে সনাতনবাবু! তাই ব্যস্ত ছিলাম। সতীর সঙ্গে আপনার কথা হলো?

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ হলো—

—কী বললে? আপনি সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলেছেন তো?

সনাতনবাবু আবার বললেন—হ্যাঁ—

—রাজী হয়েছে টাকা দিতে?

সনাতনবাবু বললেন—না।

—তা হলে? তা হলে কী হবে?

বলেই দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আর একবার বলে ঠিক করবো, আপনি মা-মণিকে ভাবতে বারণ করবেন, যেমন করে পারি আমি টাকার ব্যবস্থা করবোই, তিনি যেন কিছু না ভাবেন, আপনাকে রঘু একটা গাড়ি ডেকে দিচ্ছে, আপনার রাত হয়ে যাচ্ছে। আপনি বাড়ি যান্। এদিকে এমন বিপদ হয়েছে, আমি যেতে পারছি না আপনার সঙ্গে—

দীপঙ্কর তারপর সনাতনবাবুকে ট্যাক্সি ডেকে গাড়িতে তুলে দিলে।

লক্ষ্মীদি আসার দিন থেকেই সব বদলে গিয়েছিল এ-বাড়ির। সে রাত্রে সনাতনবাবুকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার পর দীপঙ্করও একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

আর সতীও এসে লক্ষ্মীদিকে নিয়ে পড়েছিল। সতীও ঝুঁকে পড়ে বলেছিল—কী হলো লক্ষ্মীদি! তোমার কী হলো বলো তো?

লক্ষ্মীদি তখনও তেমনি করেই কাঁদছিল শুধু। নিজের বোনকে দেখে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। সতীকে জড়িয়ে ধরেই যেন সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিল লক্ষ্মীদি। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি, শুধু বলেছিল—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই, আমার সব গেছে—

—সব গেছে মানে কী? কী গেছে তোমার? কেন একলা চলে এলে? দাতারবাবু কোথায়? তোমার ছেলে কোথায়?

লক্ষ্মীদি সে-সব কথার কোনও উত্তর দিত না। শুধু কাঁদতো। শেষকালে অনেক রাত্রে বোধহয় একটু ক্লান্তি এল লক্ষ্মীদির। লক্ষ্মীদিকে রেখে সতী বাইরে এল। দীপঙ্কর চুপ করে তখনও বসে ছিল। সতীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কী হলো? কেমন আছে লক্ষ্মীদি?

সতী বললে—বুঝতে পারছি না, এখন যেন একটু চোখ ঢুলে আসছে—

দীপঙ্কর বললে—কী সর্বনাশ হয়েছে, বলেছে কিছু?

সতী বললে—না, কিছু বলছে না, শুধু কাঁদছে—.

—সেদিন যে তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিল, তাতে কী লেখা ছিল?

সতী বললে—কিছুই না, শুধু লিখেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, স্টার্টিং—আর কিছু নয়। কবে আসছে কখন আসছে, তাও জানতাম না—ক'দিন ধরে তাই বড় মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল—

তারপর দীপঙ্করও কী করবে বুঝতে পারেনি।

সতী বললে—তুমি আর বসে কী করবে। তুমি এখন যাও—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এই অবস্থায় লক্ষ্মীদিকে নিয়ে তুমি একলা সামলাতে পারবে?

সতী বললে—আমি সামলাতে পারি আর না-পারি তুমি তো সারারাত্রি তা বলে এই রকম করে রাত জাগতে পারবে না? তুমিও তো সারাদিন আপিসে খেটেছ, তার ওপর আবার কালকেও তো তোমার আপিস—

দীপঙ্কর বললে—আমি না-হয় আপিসে কাল না-ই যাবো—

—না, না, তা বলে আপিস কামাই করতে যাবে কেন মিছিমিছি? অনেক রাত হয়ে গেল তুমি এখন যাও। কাল সকালে যদি পারো তো একবার এসো।

পরের দিন আপিসে যাবার আগেও একবার এসেছিল দীপঙ্কর। সকাল-

সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরেই এসে হাজির হয়েছিল। লক্ষ্মীদি তখন যেন একটু শান্ত হয়েছে। দীপঙ্কর কাছে গিয়ে খাটের ওপর বসলো।

বললে—এখন কেমন আছো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার দীপঙ্করের কথায় যেন আবার উথ্‌লে উঠলো। বললে—দীপু, আমি কী করবো বলতে পারিস, আমি কার কাছে যাবো, কোথায় গেলে বাঁচবো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—দাতারবাবু জানে যে তুমি এখানে চলে এসেছ?

লক্ষ্মীদি বললে—কাউকে কিছু বলিনি, সোজা এখানে চলে এসেছি—

—খবর দেব দাতারবাবুকে? টেলিগ্রাম করে দেব আজকে?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—না দীপু, তোর পায়ে পড়ি, কাউকে খবর দিস্‌নি, আমি কারোর মুখ দেখতে চাই না, আমার কেউ নেই, আমার কিছু নেই—

সতী এসে বললে—তুমি আপিসে চলে যাও, তোমার আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

তারপর বললে—আজকেই তুমি টেলিগ্রাফ করে দিও দীপু, আমার যেন কেমন ভালো মনে হচ্ছে না—

—সারা রাত কেমন ছিল লক্ষ্মীদি?

সতী বললে—কেবল ছট্‌ ফট্‌ করেছে, নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি—

আপিসে গিয়েই দীপঙ্কর সেদিন টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল। যে-ঠিকানা থেকে লক্ষ্মীদি চিঠি লিখতো, সেই ঠিকানাতেই। আর্জেন্ট।

অভয়ঙ্কর বললে—কী ব্যাপার সেন? কীসের টেলিগ্রাম? হোয়াই ডু ইউ লুক আপসেট্‌?

সমস্ত দিনই বড় রুক্ষ ছিল দীপঙ্করের মেজাজ। ফাইল নিয়েও যেন পুরোপুরি মন বসাতে পারলে না। কারোর সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতে পারলে না। সবাই সেন-সাহেবের মেজাজ দেখে হতবাক হয়ে গেল। এমন ব্যবহার তো করে না কখনও সেন-সাহেব। কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু ফাইল নিয়ে এসেছিল। পুলিনবাবু, হরিশবাবু, সুধীরবাবু সবাই এসে এসে ফিরে গেল।

হরিশবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী রে মধু, সেন-সাহেবের কী হয়েছে? এমন গোমড়া মুখ কেন?

মধু বললে—সাহেবের আজকে শরীর ভাল নয় হুজুর—

কয়েকদিন ধরেই আপিসে কানাঘুষো চলছিল। কয়েকদিন ধরেই সেকশনে-সেকশনে গুজ্‌-গুজ্‌ ফিস্‌-ফিস্‌ হচ্ছিল। ঘোষাল-সাহেবের আট মাস জেল হবার পর থেকেই সমস্ত আপিসময় যেন একটা থম্‌থমে ভাব। বাইরের লোক, কোনও বাইরের মার্চেন্ট্‌ এলেই সবাই যেন বাঁকা চোখে দেখতো চেয়ে চেয়ে।

সবাই যেন সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। আপিসের ফাইল নিয়ে কাজ করতে করতে এদিক-ওদিক চেয়ে নিত। কে কোন্ ঘরে ঢুকছে, কে কার সঙ্গে চুপি-চুপি কথা বলছে, তা লক্ষ্য রাখতো। ঘোষাল-সাহেব যেন সকলের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তবে তো পাপীর সাজা হয় মশাই। তবে যে বলে এটা কলিযুগ। কলিযুগে নাকি পাপের পরাজয় হয় না?

কে-জি-দাশবাবু বললেন—ঘোষাল-সাহেব তো তুচ্ছ মশাই, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই এখন টলোমলো, দেখছেন না?

একজন বললে—পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না জানবেন, একদিন ফুটে বেরোবেই—

হঠাৎ সকলেরই যেন কেমন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে ব্যাপার দেখে। তবে এত যে ব্লাক-মার্কেটিং চলছে, এত যে চুরি, বাটপাড়ি চলছে, সকলেরই তাহলে শাস্তি হবে একদিন? সবাই তাহলে একদিন ঘোষাল-সাহেবের মত জেল খাটবে? এতদিন যারা ধর্ম নেই বিচার নেই বলে গলাবাজি করছিল, তারাও মুখ বুজিয়ে ফেলেছে। তাদের আর কিছু বলবার মুখ নেই। কই, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তো তেমন খারাপ লোক নয় মশাই। সেই তো জেল হলো! সেই তো শাস্তি হলো আসামীর। যে মানুষের এত তম্বি ছিল, যে-মানুষটা এতদিন সকলকে গেট-আউট্ বলে গালাগালি দিয়ে এসেছে, তার তো উচিত শাস্তিই হলো! আট মাস জেল! সোজা কথা! কোথায় পাবে চুরোট, কোথায় পাবে ড্রিঙ্কস্, কোথায় পাবে মেয়েমানুষ? সবাই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল খবরের কাগজ পড়ে। সেদিন টানাটানি পড়ে গিয়েছিল খবরের কাগজখানা নিয়ে। সেদিন অ্যাংলো-আমেরিকার অতবড় ডেসার্ট-ভিক্টরিও যেন ফিকে হয়ে গিয়েছিল ঘোষাল-সাহেবের জেলে-যাওয়ার খবরের কাছে। ওয়েন্ডেল্ উইল্কি সেই সময় রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানকার অবস্থা দেখতে। সেদিন সে-খবরও বেরিয়েছিল—

"Clothing nearly gone. Children work in many of the shops the full 66-hour week worked by adults. The only food that can be bought in the markets was black bread and potatoes at exhorbitant prices."

জার্মান সিক্স্থ আর্মি স্ট্যালিনগ্রাড থেকে হটে এসেছে। স্ট্যালিন শেষ হুকুম দিয়েছে Die, but do not retreat. ফজলুল হক্ মিনিস্ট্রি চলে গিয়ে নাজিমুদ্দিনের মিনিস্ট্রি হয়েছে। কত খবর কত দিকে। খবরের কাগজ পড়ে শেষ করা যায় না। ছ'পয়সার আনন্দবাজার পত্রিকা কিনলে খবর পড়ে পেট টইটুম্বুর হয়ে ভরে যায়। কিন্তু সেদিন আপিসের লোকের কাছে অন্য সমস্ত খবর যেন জোলো হয়ে গেল। সবাই খবরের কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে আপিসে নিয়ে এসেছে। চুপি চুপি পড়ো। কেউ যেন হেসো না। কেউ যেন টিট্‌কিরি দিও না। ঠাট্টা কোর না। হোক ঘোষাল-সাহেবের জেল, তবু সে তোমাদের ডি-টি-এস। এক্স-ডি-টি-এস। তার বিরুদ্ধে কোনও রিমার্ক করা

চলবে না। বি কেয়ারফুল!

এক-একজন খবরটা পড়তে পড়তে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লো। এক-একজন তেত্রিশ টাকার ক্লার্ক একলাই এক প্যাকেট্ সিগ্রেট টেনে শেষ করে ফেললে। সেদিন ক্যান্টিনে দু'মণ রসগোল্লা এক ঘণ্টার মধ্যে কাবার হয়ে গেল। শুধু রসগোল্লা নয়, সিঙ্গাড়া, পান্তুয়া, চপ্, কাটলেট, ডিম, এমনকি দরবেশ পর্যন্ত লোপাট্। ক্যান্টিন্ একেবারে ধোয়া-মোছা। কিছু নেই, একেবারে সাফ্-সুট। দলে-দলে খদ্দের-বাবুরা এসে খালি পেটে ফিরে গেল। মিষ্টির থালা তখন নিঃশেষ। শুধু মাছি। মাছিরাই তখন রাজত্ব চালাচ্ছে ক্যান্টিনে। এমন ঘটনা রেল-আপিসের ক্যান্টিনে কখনও ঘটেনি। এমন ঘটনা রেলের আপিসের ক্যান্টিনে কেউ দেখেও নি!

যারা জানতো না, যারা খবরের কাগজ পড়তো না, তারাও জেনে গেল। সাউথ্ কেবিন জানিয়ে দিলে নর্থ কেবিনকে। কন্ট্রোল-আপিস জানিয়ে দিলে ডিস্ট্রিক্ট্‌কে। ডিস্ট্রিক্ট্ জানিয়ে দিলে গার্ড, ফায়ারম্যান, ড্রাইভারদের। তারপর সেখান থেকে জেনে গেল কুলী, গ্যাঙ্‌ম্যান, খালাসী সকলে। কারোর আর জানতে বাকি রইল না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা হাতে-পাকানো সিগ্রেট দাঁতে কামড়ে বললে—ব্লাডি বাস্টার্ড—

ক্লার্করা কলম পিষতে পিষতে চুপি চুপি বললে—বেশ জব্দ হয়েছে শালা—

কুলী-জমাদাররা বললে—ঠিক হুয়া বেইমান—

স্টেশন-মাস্টাররা টরে-টক্কা করতে করতে বললে—ভগবান বলে একজন আছেন মশাই—

ট্র্যাফিক-আপিসের কর্মচারীরা সেদিন চাঁদা তুলে সবাই মিলে ট্রাম-ভাড়া খরচ করে কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এল। মা'র সামনে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—মা, তুমি আমাদের মুখ রেখেছ মা—

কিন্তু সংসারী মানুষ যেমন অল্পতে ভয় পায়, তেমনি বোধহয় বড় অল্পতে খুশীও হয়। মানুষের ঈশ্বর তার খুশী-অখুশীর ধার ধারুক আর না-ই ধারুক, তাতে তার ভয় পাওয়াও যেমন আটকায় না, তেমনি তার খুশী হওয়াও আটকায় না। ফরাসী বিপ্লবের পর লুই-দি-সিক্স্‌টিন্‌থ্‌কেও এমনি করে গালাগালি দিয়েছিল ফরাসীরা, রাশিয়ার বিপ্লবের পর নিকোলাস দি সেকেন্ডকেও এমনি করেই গালাগালি দিয়েছিল রাশিয়ানরা। এমনি করেই চার্চে গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু ইতিহাস জানে মানুষের ঈশ্বর তাদের সে-পুজো গ্রহণ করেছে কি করেনি। ইতিহাসই কেবল সাক্ষী আছে সে বিবর্তনের। ইতিহাস বলতে পারে কখন কার পুজো ঈশ্বর গ্রহণ করবে আর কার করবে না।

মিস্টার ঘোষালকে জেলে পাঠিয়ে সেদিনকার কলকাতার মানুষে যদি খুশীই

হয়ে থাকে তো সে-সুখ বড় ক্ষণিক। বড় সাময়িক। মাত্র আটমাসের সুখ। আট তিরিশং দু'শো চল্লিশ দিনের সুখ। পাঁচ হাজার সাত শো ষাট ঘণ্টার সুখ। কিন্তু দীপঙ্করের একত্রিশ-বছর জীবনের পটভূমিকায় সে-সুখ আর কতটুকু? কিন্তু সে-ঘটনা আরো পরের।

সেদিনও দীপঙ্কর একমনে ফাইল দেখছিল। হঠাৎ মধু এসে একটা স্লিপ্ দিয়ে এল। দীপঙ্কর বললে—ভেতরে পাঠিয়ে দে—

আর একজন মার্চেণ্ট্। দীপঙ্কর ভেবেছিল যেমন আর পাঁচজন মার্চেণ্ট্ আসে তেমনি। ভালো করে নামটা পড়েও দেখিনি। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর দেখলে হোসেনভাই কাশেমভাই-এর পার্টনার—মিস্টার হোসেনভাই।

—আবার কী মিস্টার হোসেনভাই? এ-মাসের অ্যালটমেণ্ট্ তো নিয়ে গেলেন সেদিন?

—না, ওয়াগন নয় সাহাব। এসেছি অন্য কাজে।

দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। বললে—কী কাজ?

হোসেনভাই পকেট থেকে একটা চেক-বই বার করলে।—আপনি সেদিন কিছু টাকা চেয়েছিলেন?

টাকা! দীপঙ্কর ভালো করে চেয়ে দেখলে সোজাসুজি!

হোসেনভাই বললে—আপনি বলেছিলেন আপনার টাকার দরকার, আমি সেই টাকা এনেছি—

দীপঙ্করের সমস্ত শিরা-উপশিরায় যেন হঠাৎ রক্ত চলাচল বেড়ে গেল। নিজের শরীরটা যেন নিজেরই বশে রইল না আর। একেবারে একদৃষ্টে চেয়ে রইল হোসেনভাই-এর দিকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোতে গিয়েও যেন আটকে গেল।

হোসেনভাই ততক্ষণে চেক্-বই বার করে ফেলেছে। ফেলে একেবারে লিখতে শুরু করেছে। তারপর লিখতে গিয়ে বললে—কত টাকা দরকার আপনার? এক লাখ?

দীপঙ্কর যেন বোবা হয়ে গেছে। তার সমস্ত শরীরে জামার ভেতরে সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। দর-দর করে ঘাম ঝরছে। মুখ দিয়ে একটাও উত্তর বেরোল না তার। হাজার চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলে না। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সতীর মুখখানা। সতী আবার সুখী হবে। সনাতনবাবু আবার স্ত্রী পাবে। নয়নরঞ্জিনী দাসী আবার তার বাড়ি খালাস করতে পারবে।

—আমি তিনটে বেয়ারার চেক্ লিখে দিচ্ছি—তিনটে ব্যাঙ্কের।

—আর ইণ্টারেস্ট্?

হোসেনভাই হাসতে লাগলো। বললে—ইণ্টারেস্ট কিছু লাগবে না সেন-সাহেব. ইণ্টারেস্ট আপনার কাছ থেকে নেব না আমি, আপনি অনেক ওয়াগন দিয়েছেন আমাদের—

দীপঙ্কর আপত্তি করলে—সে কি? ইণ্টারেস্ট্ ছাড়া আপনার কাছ থেকে টাকা নেব কেন আমি, আমি মিছিমিছি আপনার কাছ থেকে এত টাকা.........

কিন্তু হোসেনভাই অনেক সাহেব দেখেছে জীবনে। শুধু এই রেল নয়। অনেক রেলের হেড্-আপিসে তাকে যেতে হয়। অনেক সাহেবদের চরিয়ে আসছে আজ অনেক দিন্ ধরে। অমায়িক হাসতে হাসতে সেলাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস্টার হোসেনভাই। তখনও যেন দীপঙ্কর নিজেকে নিয়ে সামলে উঠতে পারেনি। তখনও যেন সে স্থাণুর মত চুপ করে বসে আছে।

অনেকক্ষণ পরে যেন খেয়াল হলো। তাড়াতাড়ি ডাকলে—মধু!

ঘড়িতে তখন একটা বেজেছে। আর সময় নেই। মধুকে বললে—আমি আজ এখুনি বেরোচ্ছি—কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি চলে গেছি—

থাক্ রেলওয়ের কাজ। থাক সব কিছু ফাইল। পৃথিবী রসাতলে যাক। কারোর কিছু দরকার নেই। দীপঙ্কর যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। কে-জি-দাশবাবু ফাইল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। এসে সুইং-ডোরটা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে। মধু বললে—সাহেব নেই হুজুর—

—সে কী রে? সাহেব কোথায় গেল?

—বাইরে—

—কখন আসবে?

মধু বললে—তা বলে যায়নি আমাকে—

দীপঙ্কর তখন আর দাঁড়ায়নি কোথাও। সোজা ব্যাঙ্ক থেকে চেক্ ভাঙিয়ে নিয়ে একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে গিয়ে হাজির। দুপুর বেলা। এমন সময়ে কখনও আসেনি দীপঙ্কর এ-বাড়িতে। দু'একটা পায়রা কার্নিশের ধারে বক্‌বকম্ করছে। যেন ভূতের বাড়ি মনে হলো দীপঙ্করের কাছে। যেন ঝিমিয়ে পড়েছে সমস্ত বাড়িখানা। ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কোন দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে ওপরে উঠতে লাগলো। একেবারে তেতলায়। জুতোর আওয়াজেই বোধহয় নয়নরঞ্জিনী কান খাড়া করেছিলেন। বললেন—কে?

দীপঙ্কর কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। বললে—আমি, আমি আপনার সেই টাকাটা পেয়েছি—

টাকা! নয়নরঞ্জিনী সোজা হয়ে বসলেন। দীপঙ্কর তখন এ-পকেট ও-পকেট থেকে টাকাগুলো বার করছে। হাজার টাকার নোট সব। ব্যাঙ্ক থেকে পিন-আপ্ করা তাড়া তাড়া নোট। নোটের বাণ্ডিল। বাণ্ডিল-বাণ্ডিল নোটের গাদা বিছানার ওপর রাখলে দীপঙ্কর। এত নোট দীপঙ্করও একসঙ্গে কখনও দেখেনি। হয়ত নয়নরঞ্জিনী দাসী এককালে দেখেছেন। কিন্তু তখন সে-সব কথা ভুলে গেছেন। সে-সব শ্বশুরের আমলের কথা। তখন এমনি নোটের বাণ্ডিল

এসে এ-বাড়ির সিন্দুকে জমা হতো। সে-সিন্দুকের চাবি থাকতো তাঁরই কাছে।

দীপঙ্কর বললে—আপনাকে আর গুণতে হবে না, আমি ব্যাঙ্ক থেকে গুণেই এনেছি—

নয়নরঞ্জিনী দাসীর তখন মনের কী অবস্থা তা তিনিই বলতে পারেন। বললেন—তা হ্যাঁ বাবা, বৌমা শেষ পর্যন্ত রাজী হলো দিতে?

দীপংকর সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—এতেই হবে তো আপনার? এতেই আপনার বাড়ি খালাস হয়ে যাবে তো?

নয়নরঞ্জিনী নোটের তাড়াগুলোর গায়ে তখন হাত বুলোচ্ছেন। বললেন—খুব হবে বাবা, খুব হবে! উকীলবাবু তো বলেছিল এক লাখ টাকা জমা দিলেই হবে আপাততঃ, তারপরে মামলায় যা হয় হবে। এখন রাস্তায় দাঁড়ানোটা তো বন্ধ হলো।

তারপরেই হঠাৎ বললেন—ওমা, তুমি উঠছো নাকি?

দীপঙ্কর বললে—আমি উঠি এবার, আমার কাজ আছে—

ব্যাঙ্ক থেকে অনেক ভিড় ঠেলে বেরোতেই আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। তারপর এই ভবানীপুরে এসেছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। তারপরে এখান থেকে আর আপিসে গিয়ে কোন লাভ নেই। তারপর যেতে হবে লক্ষ্মীদির বাড়িতে। লক্ষ্মীদি ক'দিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। কিছু কথা বলছে না। শুধু কাঁদে, আর অনেক সময় আবার চুপ করেও থাকে। এখন গিয়ে লক্ষ্মীদিকেও দেখে আসতে হবে।

—তা একটু মিষ্টিমুখ করে গেলে না? এই দুপুর রুদ্দুরে তেতে-পুড়ে এলে?

নয়নরঞ্জিনী দাসীর মুখে এ-কথা শুনে দীপঙ্করের অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু তখন আর সে-দিকে মন দেবার সময় ছিল না দীপঙ্করের। দীপঙ্কর তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এসে রাস্তায় পড়লো।

সে উনিশ-শো তেতাল্লিশের কলকাতা। কোথায় কত দূরে যুদ্ধ হচ্ছে ঠিক নেই, কিন্তু এখানে এই ইণ্ডিয়ায় তখন তার ছোঁয়াচ লেগেছে বড় স্পষ্ট হয়ে। চাল-চিনির জন্যে সকাল থেকে লাইন দিতে হয়। কেরোসিনের জন্যে ধর্না দিতে হয় দোকানে-দোকানে। পাঁচ সের কয়লা পেতে গেলে খোসামোদ করতে হয় দোকানদারকে। কাশী কত দিন ফিরে এসেছে খালি হাতে। হাতে পয়সা নিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

এ-সব খবর দীপঙ্কর রাখতো বৈকি। সবই জানতো সে। কিন্তু কোথায় এর প্রতিকার বুঝতে পারতো না। জীবনের কত সমস্যার প্রতিকার করবে সে? নয়নরঞ্জিনী দাসী সব টাকা জমা দিয়ে এসেছেন কোর্টে গিয়ে। এবার মামলা

চলছে বাদীর সঙ্গে। দিনের পর দিন মামলা চলছে। যত দিন পড়ছে তত টাকা নিচ্ছে উকীল। কত দিনে কত বছরে যে সে মামলার ফয়শালা হবে কে জানে? তারপর আছে কিরণ। কিরণের কোনও খবরই পায় নি কতদিন। কতদিন কত জায়গায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছে। কেউ বলতে পারে না। প্রাণমথবাবুও কোথায় কোন্ জেলে আছে তাও জানার উপায় নেই। প্রত্যেকদিন গড়িয়াহাটের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসে। লক্ষ্মীদি যেন দিনের পর দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। কিছু আর খায় না তখন।

কিন্তু সেদিন বড় অবস্থা খারাপ হয়ে গেল লক্ষ্মীদির। সন্ধ্যে থেকে কারো আর ফুরসৎ নেই। লক্ষ্মীদি যেন আর স্থির থাকতে পারছে না। সতী বললে—দাতারবাবুর কোনও খবর এল?

দীপঙ্কর বললে—বোধহয় ঠিকানা বদলেছেন তাঁরা—

—কিন্তু লক্ষ্মীদি এখানে আছে কিনা সে খবরটাও তো তারা একবার নেবে? কী রকম মানুষ তারা?

দীপংকর বললে—এখানে চলে এসেছে তা-ই বা তারা কী করে জানবে?

—জানুক আর না-জানুক, তোমাকেও তো একবার একটা চিঠি লিখতে পারতো!

কে জানে! এত লোক থাকতে দীপঙ্করকে লিখবে কী করতে! দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির কে? কিন্তু সতী তো রয়েছে! এ-বাড়িতে সতী রয়েছে, এটা তো জানে দাতারবাবু! সতীর কাছেও তো একটা চিঠি লিখতে পারতো যে লক্ষ্মীদি কলকাতায় এসেছে কি না!

দীপঙ্কর আরো কয়েকটা টেলিগ্রাম করেছিল। তারও কোনও উত্তর আসেনি। প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত ও-বাড়িতে কাটিয়ে শেষকালে চলে আসতো দীপঙ্কর। পা যেন আর চলতে চাইতো না। মনে হতো ওখানে থাকলেই যেন ভালো হতো। ডাক্তার এসে লক্ষ্মীদিকে দেখে যেত। কিন্তু কিছুই ধরতে পারতো না তারা।

সেদিন ডাক্তারবাবুকে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কি করবো বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু নতুন দেখতে এসেছিলেন। বললেন—এরকম পেসেণ্ট আগে আমি কখনও দেখিনি, তবে খুব নার্ভাস শক্ পেয়েছেন মনে হচ্ছে—খুব সাবধানে থাকা দরকার, পাগল হয়ে যেতে পারে—

—কিন্তু একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে অন্তত ঘুমোতে পারে পেসেণ্ট—

ডাক্তারবাবুর ঘুমের ওষুধেই যেন শেষকালে একটু ঝিমিয়ে পড়লো লক্ষ্মীদি। দীপঙ্কর বাইরের চেয়ারে তখনও চুপ করে বসেছিল। সতী বাইরে আসতেই হঠাৎ দেখে ফেললে। বললে—একী এখনও যাওনি তুমি?

দীপঙ্কর বললে—এই অবস্থায় তোমাকে একলা ফেলে যাই কী করে?

সতী বললে—কিন্তু কাল তো আপিস আছে তোমার। রাত্রে ঘুমোবে না?

দীপঙ্কর বললে—একটা রাত না ঘুমোলে আর কী হয়?

—কিন্তু এখানেই এমনি করে বসে থাকবে তা বলে!

—বসে থাকবো না তো কী করবো?

সতী বললে—না-না, পাগলামি করো না, বাড়ি যাও—যাও, যাও, আমাদের জন্যে কি তুমিও বাড়িঘর ত্যাগ করবে নাকি?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু হঠাৎ যদি কোনও দরকার হয়, তখন?

—তুমি যদি না-থাকতে, তোমার সঙ্গে যদি পরিচয়ই না হতো তাহলেই বা কী করতুম? যাদের দীপঙ্কর নেই, তাদের কি চলছে না? তারা কি বেঁচে নেই? সব মরে গেছে?

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখলে। এতদিন সতীর জন্যে এত করেছে। এতদিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিজের সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সতীর সুখের কথা ভাবার পর সতীর মুখ থেকেই এই কথা শুনতে হচ্ছে! সতীর হয়ে যে-টাকা নয়নরঞ্জিনী দাসীকে দীপঙ্কর দিয়েছে, সে-টাকা সারা জীবন ধরেই হয়ত শোধ করতে হবে তাকে। মাইনেটা হাতে পেয়ে আগে দিয়ে আসতে হবে মিস্টার হোসেনভাইকে। তারপর তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে তিনটি প্রাণী। তাদের কথাও এতদিন দীপঙ্কর একমুহূর্তের জন্যেও ভাবেনি। আর তারই প্রতিদান হিসেবে সতী এই কথা বললে তাকে। দীপঙ্কর যেন বিশ্বাস করতে পারলে না নিজের কানকেও।

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—তুমি আমাকে চলেই যেতে বলছো সত্যি-সত্যি?

—হ্যাঁ যাও, লক্ষ্মীদির যা হবার হবে, আমারও একদিন যা হবার হবে, তা বলে তুমি তাই ভেবে-ভেবে নিজের শরীর খারাপ করবে নাকি! আমার কপালে যদি শ্বশুর-বাড়ির সুখ না-থাকে, লক্ষ্মীদির কপালে যদি কষ্ট থাকে তাহলে তুমি কী করবে? তুমি তো সব রকম চেষ্টা করে দেখলে?

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে রইল। সতী বলতে লাগলো—একদিন ছোট-বেলায় দুই বোনে এসেছিলাম কলকাতায়। তখন অনেক সাধ ছিল অনেক স্বপ্ন ছিল। তারপর কত কী ঘটলো, কত জিনিস ওলোটপালোট হয়ে গেল। আমার বিয়ে হলো, আমি আবার ছিটকে কোথায় চলে এলুম, লক্ষ্মীদি কত কাণ্ড করে কোথায় চলে গিয়েছিল, সে-ও ফিরে এল—সব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে দেখেছি—কিন্তু এখন থেকে ঠিক করেছি আর ভাবব'না, মানুষ ভেবে-চিন্তে সব কিছু ঠিক করলেও, একজন বুঝি আড়াল থেকে সব কিছু উল্টে দেয়—

দীপঙ্কর সতীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। সতী এত কথাও ভাবে তাহলে?

—ভেবেছিলাম স্বামী শাশুড়ীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে পৃথিবীতে যত কিছু অন্যায় আছে সব করে দেখবো, যা প্রাণে চায় সব করবো, কারোর কথা

মানবো না। সবই তো করলুম। তুমি কত বারণ করেছিলে, তবু আমি তা শুনিনি। কিন্তু লক্ষ্মীদিকে দেখে আজ আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই। আমার কোনও দুঃখ নেই। দুজনে দুপথে গিয়েছিলুম, দুজনেরই এক পরিণতি হয়েছে—! এর পরও তুমি আমাদের ভালো চাইছো? আমাদের ভালো করবার ক্ষমতা তোমার আছে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সনাতনবাবু কেন হতাশ হতে বারণ করেন তাহলে?

সতী বললে—ওঁর কথা ছেড়ে দাও. মানুষের জীবনটা তো পুঁথি নয়, মানুষের জীবন ওঁর পুঁথির নিয়ম-কানুন মেনে তো চলে না! তুমি এখন যাও, তুমি এখানে এলেও যা হবে, এখানে না এলেও তাই হবে। তুমি না এলেও আমাদের দুই বোনের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না—

দীপঙ্কর তবু যেন কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। বললে—সত্যিই কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না তোমাদের?

—কীসের ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে? আসলে যারা আপনার লোক তারা চলে যাবার পরও যখন কোনও ক্ষতি হলো না, তখন তুমি মনে করছো তুমি চলে গেলে আমাদের মস্ত ক্ষতি হবে? তুমি তো পর ছাড়া কিছু নও!

তারপর সতী দীপঙ্করের দুটো হাত ধরলে। বললে—বললে তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আমাদের সঙ্গে তুমি আর কোনও সম্পর্ক রেখো না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তোমার কপালেও আমাদের মতন দুর্দশা আছে। যাও—

বলতে গেলে দীপঙ্করকে একরকম জোর করেই সতী রাস্তায় বার করে দিলে। কিন্তু সম্পর্ক রাখবো না বললেই কি সম্পর্ক মুছে ফেলা যায়? সম্পর্কটা কি শুধু বাইরের জিনিস? জামা-কাপড়ের মত একেবারে তুচ্ছ সামগ্রী? ফেলে দিতে চাইলেই কি ফেলা যায়?

রাস্তায় বেরিয়েই সেদিন দীপঙ্কর ঠিক করেছিল আর সে আসবে না। অন্ততঃ এত ঘন-ঘন, এত সকাল-বিকেল আর আসবে না। কেন সে আসতে যাবে এখানে? কীসের দায়? লক্ষ্মীদির নিজের টাকা আছে, সতীরও নিজের টাকা আছে। টাকার যখন ভাবনা নেই, তখন যেমন করে হোক দুজনের চলে যাবেই। নয়নরঞ্জিনী দাসী টাকা পেয়ে গেছেন। এর পর তাঁকে আর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। মাঝখান থেকে দীপঙ্কর কেন জঞ্জাল হয়ে সকলের মাঝে বাধার সৃষ্টি করবে?

সেদিন ক্রফোর্ড সাহেব ডেকে পাঠালেন। বললেন—বোস সেন, টেক ইওর সীট—

দীপঙ্কর বসলো। সাহেব বললে—সেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে

চাই ; তুমি ভুল বুঝো না—

দীপঙ্কর বললে—বলুন—

সাহেব বললে—রেলওয়েতে আমার চাকরি হয়ে গেল আজ তিরিশ বছর, আমি অনেক রকম লোক দেখলাম, অনেক ইন্ডিয়ান দেখলাম, আই য়্যাম্ এ ম্যান্ অব্ ফিউ ওয়ার্ডস্—কিন্তু আমি তোমাকেও দেখলাম!

সাহেব কী কথা বলতে চায় বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর।

—নাউ, আমি জানি না কার এ কাজ, কোত্থেকে দিল্লির বোর্ড এ খবর পেলে, কিন্তু আমাকে তুমি সত্যিই বলো তো, তোমার কি টাকার দরকার খুব?

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। টাকার দরকার ছিল বটে একদিন। কিন্তু সে দরকার তো তার মিটে গেছে!

জিজ্ঞেস করলে—এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন স্যার?

সাহেব বললে—না, দিল্লি থেকে একটা কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল চিঠি এসেছে জেনারেল ম্যানেজারের নামে, তোমাকে ট্রানস্‌ফার করে দিতে বলেছে এখান থেকে। ডিস্ট্রিক্টে—

—ট্রানস্‌ফার?

সাহেব বললে—ইয়েস, ট্রানস্‌ফার!

—কিন্তু কেন স্যার? আমি কী দোষ করেছি?

সাহেব বললে—জানি না। সে লেটার আমি দেখিনি। কিন্তু ঘোষালের কেস্‌এর পরে আর ও-পোস্টে কোনও জুনিয়ার লোককে রাখা যায় না। বোর্ড থেকে মিস্টার ভার্মা ওখানে আসবে। ইউ আর ভেরি জুনিয়ার—

দীপঙ্কর হতবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আমার এগেন্‌স্টে কোনও কম্‌প্লেন্ আছে?

—আমি যতদূর জানি নেই। তবে সন্দেহ আছে। য়্যাস্‌পারশন্ আছে। তোমারও নাকি অনেক অভাব। তোমারও নাকি অনেক টাকার দরকার হয় মাঝে-মাঝে। তা কোথায় তুমি যেতে চাও? শিলিগুড়ি যাবে? শিলিগুড়িতে একটা ভেকেন্সি আছে—

দীপঙ্কর পাথরের মত চুপ করে রইল। সমস্ত অন্তরাত্মা তার যেন বিদ্রোহ করতে চাইলো। কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করে নিলে সে। আশ্চর্য! একদিন তো চাকরি ছেড়ে দিতেই চেয়েছিল সে। একদিন তো চাকরি থেকে ঘৃণায় দূরে চলে যেতেই চেয়েছিল সে। তাহলে কেন সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে যাচ্ছে। হঠাৎ মনের সামনে প্রাণমথবাবুর মুখটা ভেসে উঠলো তার। চোখের সামনে অমলবাবুর মুখটা ভেসে উঠলো। কিরণের মুখটাও ভেসে উঠলো। মা'র মুখটা ভেসে উঠলো। কত কষ্টে নৃপেনবাবুকে ধরে মা তেরিশ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিল তাকে। তারপর ধাপে-ধাপে কত বড় হয়েছে। কত মাইনে বেড়েছে তার। দশজনের চোখে কত সম্মান সে পায় এই চাকরিটার জন্যে।

আর তা ছাড়া কার জন্যেই বা এই চাকরি করবে সে? সতী, লক্ষ্মীদি, নয়নরঞ্জিনী, গাঙ্গুলীবাবু, সবাই চলে গেছে। কিরণও হয়ত দু'দিন পরে পৃথিবী থেকে চলে যাবে। একটি মাত্র বন্ধন—তার ধার। মিস্টার হোসেনভাই-এর কাছে ধার। কোনও সই নেই, কোনও রসিদ নেই, কোনও ভাউচার নেই। তবু ধার তো ধারই। সে ধার শোধ করতে হলে চাকরি তাকে করতে হবেই। তার চাকরি যদি করতে হয় তো এই কলকাতা থেকে দূরে চলে যাওয়াই ভালো। এমন এক জায়গায় যেখানে প্রতিদিনের এই গ্লানি প্রতি মুহূর্তের এই অপমৃত্যু তাকে নিজের চোখে দেখতে হবে না। সেখান থেকেই প্রতি মাসে সে টাকা পাঠিয়ে দেবে মিস্টার হোসেনভাইকে। প্রতি মাসের শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকবে সতীর কাছে। এই-ই তার বন্ধন। এই-ই তার মুক্তি! এমনি করে সতীর কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েই বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পাবে।

দীপঙ্কর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো। দাঁড়িয়ে উঠে বললে—অল্‌রাইট্ স্যার, থ্যাঙ্কিউ—

বলে আর দাঁড়াল না সেখানে। একেবারে সোজা নিজের ঘরে চলে এল। তারপর কিছুক্ষণ কোনও কাজ করতে পারলে না। সমস্ত মন সমস্ত মানসিকতা যেন তার বিকল হয়ে গেছে। কখন ঘণ্টার ঘণ্টায় ঘড়ি বেজে গেছে, কখন বিকেল হয়েছে কখন সন্ধ্যো হয়েছে কিছুই খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ মধু এসে ঢুকলো। একটা চিঠি এনে সামনে রাখলে। আপিসের নয়। দীপঙ্করের নামে।

কেমন অবাক হয়ে গেল। তাকে তার নামে আপিসে কে চিঠি দেবে? ওপরে দিল্লির পোস্ট্-আপিসের ছাপ। চিঠিখানা হাতে তুলে নিয়ে বার-কয়েক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে। তারপর ছিঁড়ে ফেললে খামের মুখটা।

আশ্চর্য! দাতারবাবুর চিঠি! দাতারবাবু লিখেছে দিল্লি থেকে। দাতারবাবুর নতুন ঠিকানা করলবাগ। সমস্ত চিঠিখানা ইংরিজীতে লেখা। দীপঙ্কর দম বন্ধ করে পড়তে লাগলো—

'ডিয়ার দীপুবাবু,

আমি আজ ভীষণ বিপদাপন্ন। অনন্যোপায় হয়ে অন্য ঠিকানা জানি না বলে তোমার আপিসের ঠিকানায় এই চিঠি লিখছি। জানি না এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছোবে কি না। তোমার লক্ষ্মীদি তোমাদের কলকাতায় গেছে কি না বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমাদের বাড়ি ছেড়ে কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। আজ একমাস ধরে অনেক জায়গায় চিঠি দিয়েছি, অনেক জায়গায় খোঁজও করেছি। শেষের দিকে তোমার লক্ষ্মীদির মাথাটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু আমরা সাবধানে রাখতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তুমি বোধহয় এখানকার খবর জানো না। আমি যে এখনও বেঁচে আছি এ বোধহয় আর এক পরম আশ্চর্য ঘটনা। তোমার লক্ষ্মীদি

পালিয়ে গিয়ে হয়ত বেঁচেই গেছে। আমি কিন্তু পালাতে পারিনি। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমার পালাবার উপায় নেই। আমার ছেলে আজ মানুষ খুন করার অপরাধে জেলে বন্দী হয়ে আছে। বাপ হয়ে তার মামলার তদ্বির করতে হচ্ছে আমাকেই......

দীপঙ্করের চোখের সামনে চিঠির ছোট-ছোট অক্ষরগুলো যেন ঝাপসা হয়ে গেল এক নিমেষে। আরো আলোর তলায় নিয়ে এল চিঠিখানা।

সমস্ত শরীরে তখন অবধারিত রোমাঞ্চ শুরু হয়ে গেছে দীপঙ্করের। চোখের সামনে দীপঙ্কর যেন সমস্ত ঘটনাটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। যেন দিল্লির একটা বাড়িতে তখন নাটকের শেষ অঙ্ক শুরু হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ রাত। কনট্-প্লেসের একটা বাড়িতে টিপি-টিপি পায়ে এ ঘর থেকে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল একজন বিংশ-শতাব্দীর মানুষ। সমস্ত দিল্লি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। টাকার দিল্লি, ব্যাভিচারের দিল্লি, মোগল-সম্রাটদের দিল্লি, ভাইসরয়-দের দিল্লি যেন অসাড় হয়ে পড়ে আছে চোখ বুজে। যা খুশী পাপ করো তোমরা, আমরা চোখ বুজে থাকবো। আমাদের অন্য অনেক ভাবনা আছে। আমরা কেউ কিছু দেখতে যাবো না। ঘরের দরজা বন্ধ করে তোমরা এডাল্টি করো, রেপ্ করো, যা-কিছু করো, তবু আমরা চোখ বুজে থাকবো। আমরা শুধু যুদ্ধে জিততে চাই। আমরা শুধু চাই ভিক্ট্রি। আর কিছু চাই না।

বারান্দা পেরিয়ে মানুষটা টিপি টিপি এগিয়ে এল আর একটা ঘরের সামনে। দরজাটা ভেজানো। মানুষটা ভেজানো দরজার সামনে গিয়ে কী যেন দ্বিধা করলে একবার।

তারপর ঘরের ভেতর ঢুকেই হঠাৎ আচমকা দুম্-দুম্ আওয়াজ করলে দুবার। একটা মেয়েলি গলার চিৎকার। আলো জ্বলে উঠলো। সেই চিৎকারে সমস্ত দিল্লি আত্কে উঠলো আর্তস্বরে। ভাইসরয়ের দিল্লি কেঁপে উঠলো, চম্কে উঠলো।

কিন্তু লক্ষ্মীদি তখন আর চুপ করে থাকতে পারে নি। সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে গলা ছেড়ে। সে শব্দে ওঘর থেকে ঘুম ভেঙে উঠেছে দাতারবাবু। চাকর-বাকর-ঝি-খানসামা-বাবুর্চি-আর্দালী-সবাই জেগে উঠেছে। হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার সবাই। আসামী পালিয়ে যাবে।

কিন্তু যে আসামী সে পালাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি। রিভলবারটা হাতে নিয়ে চুপ করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে তখনও। লোকজন সবাই এসে ঘরে ভিড় করেছে। দাতারবাবুও এসে হতবাক হয়ে গেছে। লক্ষ্মীদিও তখন যেন আসামীর মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে ভুলে গেছে।

শুধু একজনই উঠলো না আর। উঠতে পারলো না। লক্ষ্মীদি আর সুধাংশু একই ঘরে একই বিছানায় শুয়ে ছিল। গুলী দুটো গিয়ে সুধাংশুর বুকেই লেগেছিল টিপ্ করে। সুধাংশু বিছানাটার ওপর রক্তের সমুদ্রে যেন

ভাসছে তখন। ভাসছে আর অসাড় হয়ে পড়ে আছে। মিলিটারি সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর তখন সমস্ত সাপ্লাই-এর ঊর্ধ্বে চলে গেছে—

দাতারবাবুর মুখ দিয়ে শুধু একটা কথা বেরিয়েছিল—মানস, তুমি—

তারপরের ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত। তারপরের ইতিহাস বড় মর্মান্তিক। পুলিস, দারোগা, কোর্ট কাছারি, এনকোয়ারী সে তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু তুচ্ছ জিনিস হলেও বাপ হয়ে তার তদ্বির তাকে করতেই হচ্ছে—। চিঠির শেষে দাতারবাবু লিখেছে—'যদি তোমার লক্ষ্মীদি তোমার কাছেই গিয়ে থাকে তো তাকে একটু দেখবে। তার আঘাতটাই বড় মর্মান্তিক। এই ছেলের জন্যেই তোমার লক্ষ্মীদি তার সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়েছিল একদিন, এই ছেলের জন্যেই আমি একদিন সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম—। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধহয় তা নয়। তবু লক্ষ্মীদি যদি তোমাদের কাছে আছে জানতে পারি তো কিছুটা নিশ্চিন্ত হবো। আমাকেও একটা খবর দিও—

ইতি তোমার দাতারবাবু'

* * *

শুধু দিল্লির কনট্ প্লেসেই নয়, শুধু কলকাতার প্যালেস্-কোর্টেই নয়, সমস্ত ইণ্ডিয়াতেই তখন আর এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। একদিন বাঙলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে কটন্ মিলের পত্তন হয়েছিল, বিলিতী কাপড় পোড়ানোর আন্দোলন শুরু হয়েছিল, উত্তর-পশ্চিম ভারতের গুজরাটীরা তারই সুযোগ নিয়ে তখন কাপড়ের দুর্ভিক্ষ শুরু করে দিলে। প্রথমে ছিল চাল। তারপর হলো কাপড়, বাপ-মাকে পেটের ছেলেরা বিশ্বাস করতে, শ্রদ্ধা করতে ভুলে গিয়েছিল, স্বামীরা স্ত্রীদের ভালবাসতে কার্পণ্য করছিল, শাশুড়ীরা বউদের অত্যাচার করতে আরম্ভ করেছিল, বউরা স্বামীদের নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাইছিল। সমাজে-সংসারে যেমন ভাঙন ধরছিল তেমনি বাইরের জগতেও। বাড়ির ছেলেরা বাড়ি ছেড়ে আলাদা-আলাদা হয়ে গেল। মা-বাবা-স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সব ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেল চারদিকে। আসল কারণ টাকা। আগে যে-টাকায় সংসার চলতো সে-টাকায় আর সংসার চললো না। আগে যে-ত্যাগ করতে তৈরি ছিল সবাই, সে-ত্যাগ আর করতে চাইল না কেউ। আমি সংসারে মাসে দু' শো টাকা দিই সুতরাং আমার ছেলে লুচি খাবে। তুমি দিচ্ছ পঞ্চাশ টাকা, তোমার ছেলে খাক মুড়ি। এই চণ্ডীদাস, এই চৈতন্যদেব, এই রাম-মোহন, এই পরমহংসদেবের দেশের লোকই হঠাৎ ১৯৪৩ সালে এসে বলতে শুরু করলো—টাকাই ধর্ম, টাকাই মোক্ষ, টাকাই স্বর্গ। সেদিনকার কলকাতার মানুষ সব জিনিসের দাম বুঝতো, কিন্তু কোনও জিনিসেরই মূল্য দিতে চাইল না আর। একলা দীপঙ্কর শুধু দেখতো আর মনে মনে কষ্ট পেত। আর একজন বুঝেছিলেন। আগা খাঁর প্যালেসের জেলখানার এক কোণে তখন

আর একজন একুশ দিনের উপবাস করছেন। সমস্ত দেশের পাপের জন্যে, সমস্ত দেশের অন্যায়ের জন্যে আমি দায়ী। আমি উপবাস করে পরিশুদ্ধ হবো। সমস্ত ইণ্ডিয়া আমার পরিশুদ্ধিতে পরিত্রাণ পাবে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেই তখন দেখা যেত মানুষের জটলা। মহাত্মা গান্ধী উপবাস করছেন। উপবাস করছেন নিজের জন্যে, ইণ্ডিয়ার জন্যে, ওয়ার্ল্ডের জন্যে। মানুষ পরিশুদ্ধ হোক। মানুষ শুদ্ধাত্মা হোক। মানুষ মানুষ হোক।

দীপঙ্করও আপিস থেকে ফেরার পথে অনেকদিন দাঁড়িয়ে শুনতো। কী খবর? শেষ খবর কী? তিনি বেঁচে আছেন? এক দিন, দু' দিন, তিন দিন। ইণ্ডিয়ার মানুষ দিনের পর দিন আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছে খবরের জন্যে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার বিধান রায় গিয়েছেন গান্ধীজীর কাছে। আরো ছ'জন ডাক্তার পরীক্ষা করছেন তাঁকে। না, কোনও ভয় নেই। একুশ দিনের দিন বড় অশান্তিতে কাটলো দীপঙ্করের। মানুষ কি পরিশুদ্ধ হবে সত্যি সত্যি? মহাত্মা গান্ধীর আশা পূর্ণ হবে? দীপঙ্কর যা চায় তা-ই কি হবে শেষ পর্যন্ত?

ডাক্তার বিধান রায় ফিরে এলেন। এসে এক সভায় বক্তৃতা দিলেন। কোনও ভয় নেই। সমস্ত নির্বিঘ্ন। যেদিন উপবাস ভাঙলেন মহাত্মাজী, শেষ মুহূর্তে যখন সমস্ত বিপদ কেটে গেল, মহাত্মাজী চাইলেন তাঁর টাঁকঘড়ির দিকে। ডাক্তার রায় শুনলেন—মহাত্মাজীর প্রথম কথা—

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী প্রথম কথা?

মহাত্মাজী বললেন—আমি বুঝতে পারছি না ঈশ্বর কেন এ-যাত্রা আমাকে রক্ষা করলেন। হয়ত আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁরই কোনও ইচ্ছে পূর্ণ করতে চান—আরো কোনও কাজ করাতে চান আমাকে দিয়ে—

যারা শুনছিল ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা, তাদের চোখ এইবার সজল হয়ে উঠলো।

বিকেল থেকেই সেদিন লক্ষ্মীদি একটু যেন শান্ত হয়ে এসেছিল। সতী নিয়ম করে ওষুধ খাইয়েছে। শুধু আজ নয়, যেদিন প্রথম লক্ষ্মীদি এসেছিল, সেই-দিন থেকেই সতী লক্ষ্মীদিকে নিয়ে পড়েছিল। কখন লক্ষ্মীদি ওষুধ খাবে, কখন স্নান করবে তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হতো সতীকে। দুই বোন যেন অনেক ঘাটের ঝড়-ঝাপ্‌টা অতিক্রম করে আবার একই বন্দরে এসে জুটেছে। সতী বোঝাতো—তুমি কেন এত কাঁদছো লক্ষ্মীদি? কার জন্যে কাঁদো এত? সংসারে কে কার? আমার কথাই ভেবে দেখ না! আমার কথা ভেবেও তো তুমি একটু সান্ত্বনা পেতে পারো! স্বামী কেউ নয়, ছেলেও কেউ নয়, সবাই নিজের-নিজের স্বার্থ চায়, কেউ কারো দুঃখের দিকে চায় না, এ সংসারের এইটেই নিয়ম বলে মনে করে নাও না তুমি!

লক্ষ্মীদি বলতো—ওরে, তা আমি কেমন করে মনে করবো? তুই তো

জানিস না আমার সে-সব কী দিন গেছে! একখানা কাপড়ে সাবান দিয়ে কেচে বাইরে বেরিয়েছি, এক-হাতে বাঁ চোখের জল মুছে, ডান চোখ দিয়ে হেসেছি। সে কার জন্যে করেছি, বল্?

সতী বলতো—সে-সব করেছ, ভুল করেছ তুমি! সংসারে কেউ কারো নয়, স্বামী-পুত্র-শ্বশুর-শাশুড়ী-বাবা-মা সবাই স্বার্থপর, স্বার্থ ছাড়া আজকাল কিছুই চলে না, স্বার্থ ছাড়া জগৎ-সংসার সব কিছু অচল হয়ে যায় লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বলতো—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না ভাই! আমার ছেলে যে সে-রকম ছেলে নয়। আমার ছেলে যে মা বলতে অজ্ঞান ছিল—

—সে তোমার মনের ভুল লক্ষ্মীদি! সে-সব মনের ভুল মনে ক'রো। সেই সব ভেবে কি তুমি মরে যাবে বলতে চাও?

লক্ষ্মীদি বলতো—হ্যাঁ ভাই, আমি মরবো। মরাই আমার ভালো—আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কী? এ-জীবন নিয়ে আমার কী লাভটা হবে?

তারপর সতী অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে লক্ষ্মীদিকে শান্ত করতো। ওষুধ খাওয়াতো। ডাক্তার বলেছিল ঘুমোতে-ঘুমোতেই আস্তে আস্তে উনি সব ভুলে যাবেন। যত ঘুমোতে দেবেন ততই ভালো। এ-রোগীর ঘুমই একমাত্র ওষুধ! ওষুধ খেলেই একটু পরে ঘুমিয়ে পড়তো লক্ষ্মীদি। তখন সতীর একটু বিশ্রাম। তখন কিছুক্ষণের জন্যে সতী তার নিজের কথা ভাববার সময় পেত। তখন দীপঙ্কর আপিস থেকে আসতো। দীপঙ্কর বদ্‌লি হয়ে যাবে শিলিগুড়িতে, তার কথা বলতো। তার শাশুড়ী টাকা পেয়ে গেছেন, সেই সব কথা বলতো। আর কোনও ভাবনা নেই তাদের। টাকার জন্যেই তো সতীকে এত খোশামোদ। টাকার জন্যেই একদিন শাশুড়ীর এত আদর। সেই টাকাই যখন যোগাড় হয়ে গেছে তখন আর সতীকে তাঁদের দরকার নেই। সতী কেমন আছে তা দেখবারও প্রয়োজন নেই।

দীপঙ্কর বলতো—তোমাকে শ্বশুর-বাড়িতে তুলে দিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম, কিন্তু তা আর হলো না—

সতী বলতো—তাঁরা টাকা পেয়ে গেছেন যখন, তখন আর কেন আমাকে নেবেন? কিসের দায় পড়েছে তাঁদের?

দীপঙ্কর বলতো—দায় তাঁদের নয়, দায় আমার—

—তোমার দায়? কেন?

দীপঙ্কর অন্য দিকে চোখ রেখে বলতো—কী জানি, কেন? কিন্তু মনে হয়, তোমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে হয়ত আমিই দায়ী, আমার জন্যেই তোমার এই দুর্ভোগ হলো—

—কেন? তুমি দায়ী হতে যাবে কেন? আমারই কপালের দোষ!

দীপঙ্কর বলতো—না, সেই বহুদিন আগে, একদিন আমার জন্মদিনে যে কেন মরতে করতে গিয়েছিলে তুমি! সেদিন তুমি তোমার বাড়িতে নেমন্তন্ন না-করলে

আজ এই দুর্দশা হতো না তোমার—

—দুর্দশা! সতী হেসে উঠতো। বলতো—একে তুমি দুর্দশা বলো? আমার মত সুখী কে? আমার মত স্বাধীন কে? আমার মত ক'জন মেয়ে এত টাকার মালিক? আমি কার পরোয়া করি আজ? জানো, এখন থেকে কারোর কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি যখন ইচ্ছে ঘুমোতে যাবো, যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠবো, কেউ বলবার নেই। আমি এখন যা খুশি ভাববো, যা খুশি করবো, কারোর মুখ চেয়ে আমাকে চলতে হবে না। কারোর মন যুগিয়ে আমায় শাড়ি-গয়না পরতে হবে না। একে যদি সুখ না বলি তো সুখ বলবো কাকে?

ইদানীং সতী এই ধরনের কথাই বলতো কেবল। বলতো—তুমি শিলি-গুড়িতে গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো, আমার কোনও বিপদ হবে না এখানে। আমি এখানে খুব আরামে থাকবো। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না—

যেদিন থেকে সতী খবর পেয়েছে দীপঙ্কর বদলি হয়ে যাচ্ছে, সেইদিন থেকেই সতী এই ধরনের কথা বলছে। বলছে—ভালোই তো হলো দীপু, ভাবছো কেন অত? দূরে গেলে তবু তুমি তোমার চাকরিতে মন দিতে পারবে। দূরে গেলে তবু আমার কথা ভুলতে পারবে! আমার কথা ভুলে যাওয়াই তো তোমার পক্ষে ভালো। আমি তোমার কে বলো না? আমি তো আসলে তোমার কেউই নই। মাঝখান থেকে আমার কথা ভেবে-ভেবে তুমি কেন নিজের জীবনটা নষ্ট করবে? এ তো ভালোই হলো এক-রকম। তোমার পক্ষেও ভালো হলো, আমার পক্ষেও ভালো হলো—না কি বলো?

দীপঙ্কর এর কিছু উত্তর দিতে পারতো না।

সতী বলতো—তুমি বিয়ে করবে, সংসার করবে, তোমার সংসারকেই না-হয় আমি আমার নিজের সংসার বলে মনে করবো, তাতে দোষ কী বলো? তোমার ছেলেকেই না-হয় আদর করবো, তোমার ছেলেকেই না-হয় আদর করে আমার নিজের ছেলে ভাববো! তাতে তোমার আপত্তি কিসের? আর তোমার ছেলে আর আমার ছেলে কি আলাদা? না-হয় ভাববো আমার মরা ছেলে আবার তোমার ছেলে হয়ে জন্মেছে—। ভাবতে কিছু দোষ আছে, তুমিই বলো না? দোষ আছে?

এ-সব পাগলামির কোনও উত্তর দিত না দীপঙ্কর।

সতী বলে যেত—কিন্তু তুমি যদি বিয়ে করো দীপু তো আমি নিজে তোমার মেয়ে দেখে দেবো। সত্যি! আমাকে মেয়ে দেখিয়ে তবে বিয়ে ক'রো তুমি। শেষকালে হয়ত আমার মত এক অপয়া মেয়েকে বিয়ে করে বসবে, আর ওঁর মতন সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে তোমাকে। তুমি জানো না দীপু সে কী জ্বালা। আমার জন্যে যে উনি কত যন্ত্রণা পেয়েছেন, তা তুমি বুঝতে পারবে না—

—জেনে-শুনে তুমি সনাতনবাবুকে যন্ত্রণা দিয়েছ?

—আমি কি দিয়েছি দীপু, দিয়েছে আমার কপাল। আমার মত বউ হয়েছিল বলেই ওঁর এত কষ্ট। আমি ওদের সংসারে ঢোকবার পরদিন থেকেই ওদের

আকাল হলো। ওদের টাকা গেল, প্রতিপত্তি গেল, গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল, ওদের সংসারে শনি ঢুকলো। আমি শনি হয়েই ঢুকেছিলুম ওদের বাড়িতে—! সাধে কি আমি বলছি তোমাকে ভালো করে মেয়ে দেখে বিয়ে করতে। খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে অনেক বিচার করে তবে বিয়ে করবে ভাই। হুট্ করে যা-তা করে যাকে-তাকে বিয়ে করে ফেল না দীপু, তার চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। ওঁকে দেখেও তোমার শেখা উচিত—

দীপঙ্কর বলতো—কিন্তু সনাতনবাবু তো তোমার অযোগ্য নন, কিংবা তুমিও তো তাঁর অযোগ্য নও, তবে কেন এমন হলো?

সতী বলতো—সে তো আমিও ভাবি কেন এমন হলো। শুধু কি আমার শাশুড়ীর জন্যে? তাও তো নয়। কত বউয়ের কত খারাপ শাশুড়ী তো থাকে, কই, তারা তো আমার মত এমন করে স্বামী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় না, এমন করে পরের বাড়িতে বাস করে না! আমারই বা কেন এমন হলো! তাই বলি, এ আমার কপাল।

দীপঙ্কর বলতো—না, হয়ত আমিই এর কারণ, আমি দূরে চলে গেলেই হয়ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে—

সতী বলতো—না দীপু, না, আর ঠিক হবে না কিছু, আর জোড়া লাগবে না। আর সে জোড়া না-ই বা লাগলো, ক্ষতি কী? এই তো ভালো। বেশ স্বাধীন। তারপর তুমি একদিন বিয়ে করবে, সংসার করবে। আমি বছরে এক-একবার করে তোমাদেব দেখে আসবো, তোমার বউয়ের জন্যে শাড়ি কিনে নিয়ে যাবো, তোমার ছেলের জন্যে খেলনা কিনে নিয়ে যাবো। আবার ফিরে আসবো, এখানে। লক্ষ্মীদিও তখন ভালো হয়ে উঠবে, আবার দিল্লি চলে যাবে। তখন একেবারে স্বাধীন। সমস্ত বাড়িটাতে একলা! একলা কাটাতে আমার আর খারাপ লাগে না আজকাল জানো দীপু, একলা-একলা আমি বেশ সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। কোনও কষ্ট হবে না আমার—

শেষের দিকে দীপঙ্কর এলেই এমনি সব আজেবাজে কথা সতী এক-নাগাড়ে বলে যেত। সে-কথা যেন আর ফুরোত না। তারপর যখন অনেক রাত হয়ে যেত, তখন দীপঙ্কর উঠতো। আস্তে আস্তে অন্ধকার রাস্তায় পা বাড়াতো। আর সেই অন্ধকারে দীপঙ্করের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার হয়ে যেত। কলকাতা, ইণ্ডিয়া, এসিয়া, সক্রেটিস, গান্ধী, প্রাণমথবাবু সব মন থেকে মুছে যেত। আপিস, টাকা, ধার, ট্রানসফার সব কিছু সে-ভাবনার তলায় তলিয়ে যেত।

হোসেনভাই কাশেমভাই-এর পার্টনার মিস্টার হোসেনভাই অবাক হয়ে গেছে সেন-সাহেবকে দেখে। কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে, কেমন করে অভ্যর্থনা করবে ভেবে পেলে না। সেন-সাহেব একেবারে সশরীরে এসে গেছে তার আপিসে।

এ যে অভাবনীয় সৌভাগ্য।

দীপঙ্কর বললে—আমি বসতে আসিনি মিস্টার হোসেনভাই, আমি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি, শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ, সে তো জানি।

দীপঙ্কর বললে—আমি মাসে-মাসে আপনার ধার শোধ করবো বলেছিলুম। এই নিন্ এ-মাসের টাকা। আমি মাইনে পেয়েই আপনাকে দিতে এসেছি। আট শো দিয়ে গেলাম, গুনে নিন্—

হোসেনভাই বললে—এর জন্যে আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো কিছু বলিনি তার জন্যে?

—না বলুন, কিন্তু আমার তো দায়িত্ব আছে। এর পর আমি শিলিগুড়ি থেকে টাকা পাঠাবো।

—সে আপনার যেমন খুশি দেবেন। আমি কত ওয়াগন পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আমি তো দশ-বিশ লাখ কামিয়েছি সেই ওয়াগন নিয়ে!

দীপঙ্কর বললে—তা হোক, আমি তো ধার নিয়েছি আপনার কাছ থেকে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি শোধ দিতে চাই, আমি দেনা রাখতে চাই না।

হোসেনভাই বললে—কিন্তু, আপনি পরে দিলেও তো হ'ত, আমি তো মারা যাচ্ছি না, আমার তো ফার্ম রইল।

—আপনি না মারা যেতে পারেন, কিন্তু আমি মারা যেতে পারি, তখন কে আপনার ধার শোধ করবে?

এর পর দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। আপিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যাবার আগে সব কিছু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে। কলকাতা থেকে চলে যাওয়া মানে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল দীপঙ্কর। এত সহজে কি ছাড়া যায়? এই কলকাতা, এই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, এই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, এই স্টেশন রোড, এই গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং। এর প্রত্যেকটি ধূলি-কণার সঙ্গে সে যে মিলে-মিশে ছিল এতদিন। এখানকার খুঁটিনাটি, এই কলকাতার পাপ-পুণ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সে। একে ছেড়ে যেতে হবে। যত দিন এগিয়ে আসতে লাগলো ততই যেন টান পড়তে লাগলো তার মনে। দাতারবাবুকেও টেলিগ্রাম করে দিয়েছিল তাঁর করলবাগের নতুন ঠিকানায়। দাতারবাবু উত্তর দিয়েছিল—আমি দু দিনের জন্যে কলকাতায় যাবো। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে থাকতে পারবো না। আমার মামলার তদবির করতে হবে। তোমরা তোমাদের লক্ষ্মীদিকে দেখো।

ফেরার পথে শেষবারের মত প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ির সামনে নামলো। শেষবারের মতই বটে। আর কি কখনও এ-বাড়িতে আসা হবে! শেষবারের মতন সতীর শাশুড়ীকে একবার অনুরোধ করে আসবে। সনাতনবাবুকেও একবার বলে আসবে।

শম্ভুর সঙ্গে দেখা হলো বাইরেই। বললে—আসুন, দাদাবাবু—

শম্ভুরও যেন মুখের ভাব বদলে গিয়েছে। ওরাও যেন টের পেয়ে গিয়েছে এ-বাড়ি ছেড়ে আর রাস্তায় দাঁড়াতে হবে না তাদের। ওরাও যেন টের পেয়ে গিয়েছে টাকা জমা দেওয়ার কথা। ওরাও জানে ওদের বউদিমণি এক লাখ টাকা দিয়ে এ-যাত্রা ওদের রক্ষা করেছে।

শম্ভু জিজ্ঞেস করলে—এবার বউদিমণি আসবে, জানেন বোধ হয়?

—কেন? কে বললে?

—জানেন না? বউদিমণি যে মা-মণিকে মকদ্দমার টাকা দিয়েছে, দাদাবাবু যে আনতে গেছে বউদিমণিকে—

—সে কী? কে বললে তোমায়?

শম্ভু বললে—আমরা সব শুনেছি, বাতাসীর-মা, ভূতির-মা সবাই জানে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা-মণি বাড়িতে আছেন?

—আছেন, যান্ না, ওপরে আছেন। বলেই নিজেও সামনে সামনে চলতে লাগলো।

নয়নরঞ্জিনী সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তখন। একটু যেন ভালো হয়েছে চেহারাটা আবার। আবার যেন সেই আগেকার মত খুশী-খুশী মেজাজ।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—সতীকে আপনি আনতে পাঠিয়েছেন? শুনলাম সনাতনবাবু নাকি গেছেন সতীকে আনতে? সত্যি?

নয়নরঞ্জিনী মুখ বেঁকালেন। বললেন—আরে তুমিও যেমন ভালোমানুষ বাবা! কে বললে তোমায়?

—শম্ভু বলছিল।

নয়নরঞ্জিনী শম্ভুর উদ্দেশে এ-দিক ও-দিক চাইলেন। সামনে থাকলে হয়ত বকুনি খেয়ে মরতো। কিন্তু সে তখন কোথায় সরে গেছে চট্ করে।

দীপঙ্কর আবার জিজ্ঞেস করলে—সত্যি বলুন না, আপনি রাজী হয়েছেন?

নয়নরঞ্জিনী আবার মুখ বেঁকালেন। বললেন—কী যে বলো তুমি বাবা, আমি রাজী-অরাজী হবার কে? কে আমার কথার ধার ধেরেছে? বউমা টাকা দিয়েছে আমাকে, এখন বউমার খুশি! আমি রাজীও হইনি, অরাজীও হইনি! তুমি তো এতদিন দেখছো বাবা আমাকে! আমি কোনওদিন বউমার কোনও কথায় হাঁ-না-রাম-গঙ্গা কিছু বলেছি? আমি কি সেই কথা বলার মানুষ! আমি তো কোনওদিন ছেলে-বউয়ের কোনও কথাতেই থাকিনি বাবা! তাদের কথায় আমার থাকা কিসের দায়? এই দেখ না, এই যে মামলা চালাচ্ছি, এ কার জন্যে? এ বাড়ি যদি বাঁচে তো কে ভোগ করবে এ-সব? আমি?

এ-সব পুরোনো কথা শোনবার জন্যে দীপঙ্কর আসেনি। বললে—সে তো আমি জানি, কিন্তু আপনি বউমাকে নেবেন কি না বলুন?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আচ্ছা, তুমি যে কী বলো! আমি কি বউমাকে

তাড়িয়েছি বাড়ি থেকে যে, আমি ডেকে আনতে যাবো ? বউমার খুশি হয় আসবে, না-হয় না-আসবে! আমি কী করতে পারি বলো ? আমি এই বুড়ো বয়েসে কি বউয়ের পায়ে হাত দিয়ে সাধবো বলতে চাও ?

দীপঙ্কর বললে—আমি সে-সব কিছুই শুনতে চাই না আপনার কাছে, আমি যাবার আগে শুধু জেনে যেতে চাই যে, আপনি তাকে গ্রহণ করেছেন।

—তুমি চলে যাবে ? কোথায় যাবে তুমি ?

দীপঙ্কর বললে—আমি বদলি হয়ে বিদেশে চলে যাবো ! হয়ত আর আসা হবে না কখনও। কিন্তু আপনার বউকে আপনি ঘরে নিয়েছেন এইটে জানতে পারলেই আমি নরকে গিয়েও শান্তি পেতে পারি—আপনি বলুন, আপনি তাকে নেবেন। আপনি আপনার টাকা পেলেন, এখনও আপনার কিসের আপত্তি ? আপনি জানেন সতীর মত মেয়ে হয় না—সতী আপনার সত্যিই সতী-লক্ষ্মী বউ, আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, অনেক তপস্যা করলে তবে সতীর মত বউ পাওয়া যায়—

—তা আমি কি বলছি বাবা যে, পাওয়া যায় না ? এ তো দেখছি মহা জ্বালা হলো তোমাকে নিয়ে.....

দীপঙ্করের আর তখন এ-সব বাজে কথা শোনবার সময় ছিল না। বললে—আপনি জানেন সনাতনবাবু সতীর কাছেই গেছেন ?

—হ্যাঁ বাবা, তা গেছে। জোয়ান ছেলে যখন বায়না ধরেছে তখন আর আমি তাকে না বলতে পারিনি ! কেন ? তুমি ও-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন ?

কিন্তু দীপঙ্কর তখন আর দাঁড়ায়নি সেখানে। আর বেশী কথা শোনবার সময়ও ছিল না তার। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে দীপঙ্কর দেখে যাবে। দেখে যাবে সতী এখানে এসেছে। সতীকে সনাতনবাবু আবার সম্মান দিয়েছেন, আবার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছেন। আর তারপর শিলিগুড়ি কেন, পৃথিবীর যে কোনও কোণে গিয়ে থাকতেও তার কোনও আপত্তি নেই।

সতী তখন লক্ষ্মীদিকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও গা ধুয়ে নিয়েছে। আয়নাতে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ্ দিয়েছে। এতদিন কোথা দিয়ে তার সময় কেটে গেছে, কোথা দিয়ে তার দিন কেটেছে, রাত কেটেছে কিছুই সে টের পায়নি। সেই কবে কোন্ ১৯৩১ সালের কোন্ মাসে পৃথিবীর বুকে এক যুদ্ধ বেধে উঠেছিল, তার হিসেব সে রাখতে পারেনি। কিন্তু তার নিজের বুকের ওপর যে-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার হিসেব সে জানতো। সে যুদ্ধে কত রাত বিনিদ্র কেটেছে, কত চোখের জল, কত মনের স্বপ্ন মাটিতে ঝরে পড়েছে তারও হিসেব তার জানা ছিল। লক্ষ্মীদি আসার পর থেকেই যেন সতী অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। এতদিনে নিজেকে নিয়েই সে বিব্রত ছিল, এবার লক্ষ্মীদিকে দেখে যেন সে শান্ত হয়েছিল।

এই তো জীবন। কান্না আর হাসি, সুখ আর দুঃখের মধ্যে তফাত তো এইটুকু ! এরই জন্যে এত হাহাকার, এত মারামারি, এত কাড়াকাড়ি আর এত হা-হুতাশ !

সিঁদুরের টিপ্ লাগানোটাও যেন অভ্যেস। ওটা লাগাতে হয় তাই লাগানো, নইলে ওর যেন কোনও উপকারিতা নেই জীবনে। ওটা যেন শুধু মুখের একটু শোভা মাত্র। মনের দুঃখটা ঢাকবার একটা ছদ্মবেশ। আর কিছু নয়—

বাইরে হঠাৎ কড়া নড়ে উঠলো। ওই দীপু এসেছে। সতী ডাকলে—রঘু—

রঘু বুঝি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। প্রত্যেকদিন আপিস থেকেই তো সোজা চলে আসে দীপঙ্কর। যতদিন সতী এ-বাড়িতে এসেছে ততদিন এসেছে ঃ ঝড়-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম, কোনও দিন কোনও ব্যতিক্রম হয়নি তার। কতদিন এয়ার রেড হয়েছে। কতদিন সাইরেন বেজেছে। কতদিন কত কী বিপর্যয় ঘটে গেছে পৃথিবীতে, কিন্তু দীপঙ্কর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে এসে হাজির হয়েছে এখানে। ওই ঘরটিতে বসে দুজনে মুখোমুখি কাটিয়েছে। তারপর আবার যখন রাত ঘন হয়েছে, তখন উঠে দাঁড়িয়েছে দীপু। আস্তে আস্তে বাইরে অন্ধকারে পা বাড়িয়েছে একলা। একলা এতখানি রাস্তা মাড়িয়ে অনেক রাত্রে বাড়িতে পৌঁছেছে গিয়ে। অনেক রাত্রে ভাত খেয়েছে। অনেক রাত্রে শুতে গিয়েছে নিজের সেই একক বিছানায়। তারপর পরের দিন আবার সকালে উঠে যথারীতি আপিসে গিয়েছে। দিনের কাজ করেছে।

এমনি বছরের পর বছর।

কিন্তু এবার থেকে আর আসবে না সে। সতীর প্রতিদিনের অপরাহ্নের প্রতিটি মুহূর্ত আর এমন করে কাটবে না। দীপঙ্কর চলে যাবার পরও পৃথিবীতে সূর্য উঠবে সকালবেলা, সূর্য ডুববে সন্ধ্যেবেলা, কিন্তু এ-বাড়িতে দীপঙ্কর আর আসবে না। তার আসা এবার থেকে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, সতীর জীবন থেকে দীপঙ্কর হারিয়ে যাবে চিরকালের মত।

সতী ঘড়ির দিকে একবার তাকালে। ঘড়ি যেন আর চলতে চাইছে না। ঘড়ি যেন দীপঙ্করের আসা পেছিয়ে দিচ্ছে মিনিটে মিনিটে।

হঠাৎ বাইরে যেন কার কড়া নড়ে উঠলো। সতী তাড়াতাড়ি সজাগ হয়ে উঠলো।

—রঘু !

রঘু বুঝি কাছাকাছি কোথাও ছিল না। সতী নিজেই গিয়ে দরজা খুলে দিলে। কিন্তু দীপু আজ এত তাড়াতাড়ি এসে গেল যে ! এত শিগগির তার আপিস ছুটি হয়ে গেল ! দীপু কি তার কাছে আসার জন্যে আপিস কামাই করলে !

কিন্তু না। আশ্চর্য ! কেউই না। বাইরের রাস্তার এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেও কোথাও দীপঙ্করের মূর্তি দেখা গেল না। সতী আবার দরজা

বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে এল। হঠাৎ সমস্ত বাড়িটা যেন একটা জেলখানা মনে হলো তার কাছে। তাকে এখানেই থাকতে হবে চিরকাল—চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে। দীপঙ্কর তাকে এই চারটে দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে নিজে পালিয়ে যাবে অনেক দূরে! তারপর বালিশটা আঁকড়ে ধরে হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো সতীর। একটা নিঃশব্দ হাহাকারে সমস্ত অন্তরাত্মা যেন গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। বাইরের কেউ জানতে পারলো না, বাইরের কেউ শুনতেও পেলে না। ঈশ্বরের আদালতে সতী তার শেষ আপীল পেশ করে যেন শেষবারের মত মূহ্যমান হয়ে রইল।

—কে?

আবার উঠলো সতী। তাড়াতাড়ি গিয়ে সদর দরজাটা খুলে দিলে। এবার নিশ্চয়ই দীপু এসেছে।

কিন্তু দরজাটা খুলেই একেবারে দশ হাত পেছিয়ে এসেছে সতী! সনাতনবাবু সামনে দাঁড়িয়ে। আজ সঙ্গে দীপঙ্কর নেই, শম্ভু নেই। আজ সনাতনবাবু একলাই এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।

এক মুহূর্তের মধ্যেই সতী নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললে—তুমি? তুমি যে হঠাৎ?

সনাতনবাবু ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে বললেন—বসবো?

সতী বললে—হ্যাঁ, বসো। কিন্তু তুমি হঠাৎ এলে যে?

সনাতনবাবু বসলেন। বললেন—হঠাৎ তো নয়। আমি সব দিক ভেবেই মাকে জানিয়ে এসেছি, মা জানে আমি তোমার কাছে এসেছি—

—কিন্তু কেন আবার এলে? তোমরা তো টাকা পেয়ে গিয়েছ? পাওনি?

সনাতনবাবু বললেন—তা পেয়েছি—

—টাকা যখন পেয়ে গিয়েছ, তখন কেন আবার এসেছ শুনি? আমার টাকারই তো তোমাদের দরকার ছিল। টাকা যখন পেয়েই গিয়েছ তখন আমার কাছে তোমাদের আবার কিসের দরকার শুনি? আমি তোমাদের আর কী দিতে পারি?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি সবই দিতে পারো—

সতী বললে—সব কি তুমি একদিন নিতে পেরেছিলে? আমি তো আমার সবই তোমাকে দিতে চেয়েছিলুম একদিন—সব কিছু দিতেই তো তৈরী ছিলুম, সেদিন তো আমার দিকে ফিরেও তাকাও নি তুমি? আজ আবার কেন এ-কথা বলছো?

সনাতনবাবু বললেন—অভিযোগ করলে অভিযোগই শুধু বেড়ে যায়, সুতরাং ও-কথা থাক্! অনেক কষ্ট পেয়েছ, এবার তুমি ফিরে চলো।

সতী বললে—এ-কথাও তো তোমার নতুন নয়, এ-কথা তো তোমার মুখ থেকে আমি অনেক বার শুনেছি, শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে

গেছে, আর শুনতে চাই না। তা ছাড়া আমার বুকে অত অপমান সহ্য করবার ক্ষমতাও আর নেই, তা জানো?

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি ভালো করে জানি।

সতী বললে—ছাই জানো তুমি! কতটুকু জানবার ক্ষমতা আছে তোমার? কতটুকু তোমার মন? সেই মন দিয়ে আমার অপমান তুমি কী করে বুঝবে? কী করে বুঝবে মেয়েমানুষের স্বামী, শ্বশুরবাড়ি, টাকা, গাড়ি সব পেলেও তার কিছুই পাওয়া হয় না? কী করে বুঝবে মেয়েমানুষের মন বলে আলাদা একটা জিনিস আছে, তোমাদের মনের সঙ্গে যার অনেক তফাত?

সনাতনবাবু বললেন—তাও আমি জানি।

—তাই যদি জানবে, তা হলে আমি কি সাধ করে প্যালেস-কোর্টে চলে গিয়েছিলুম? সাধ করে আমি চাকরি করতে গিয়েছিলুম রেলের আপিসে? আর সাধ করে আমি এখানে এই পরের বাড়িতে পড়ে আছি বলতে চাও? সবই আমার মন-গড়া? কিছুই সত্যি নেই এর পেছনে?

সনাতনবাবু বললেন—বেশ, তাহলে আজ খুলে বলো কী তুমি চাও? আমার কাছে কী পেলে তুমি সব পাবে? তোমার সাধ মিটবে?

সতী বললে—ছিঃ, তুমি আমার মুখ থেকে সেই কথা শুনতে চাও? আমি মেয়েমানুষ হয়ে মুখ ফুটে তাই বলবো তোমার কাছে আর তুমি আমাকে তাই দেবে? তুমি কি আমাকে সেই রকম মেয়ে পেয়েছ? এর চেয়ে যে আমার মরা ভাল!

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তুমি যদি না বলো তো আমি বুঝবো কী করে?

সতী বললে—যদি বুঝতেই না পারো তো কেন বিয়ে করেছিলে? যখন তোমার মা তোমার বিয়ে দিতে চাইলে তখন কেন তুমি আপত্তি করলে না? কেন আমার গলায় এমন করে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে? আর জন্মে আমি কী পাপ করেছিলুম তোমার কাছে বলতে পারো?

সনাতনবাবু যেন কী বলবেন কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সতী যেন তাঁর সামনে উন্মাদের মত ব্যবহার করছে। তিনি সান্ত্বনা দেবার আশায় বললেন—সত্যিই আমি স্বীকার করছি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

—কিন্তু কেন তুমি বুঝতে পারো না?

সনাতনবাবু তখনও বললেন—বিশ্বাস করো আমাকে, তুমি নিজের মুখে না বললে আমি বুঝতে পারবো না—

—তুমি বুঝতে পারো না, কিন্তু অন্য সব স্বামীরা তো বুঝতে পারে। দীপু তো বুঝতে পারে!

—দীপঙ্করবাবু?

—হ্যাঁ, দীপঙ্করকে তো আমার কোনও কথা খুলে বলতে হয় না। সে তো আমার দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-আনন্দ সব বুঝতে পারে। তাকে তো মুখ ফুটে কিছু

বলতে হয় না? দীপঙ্কর না থাকলে আমি তো কবে আত্মহত্যা করতুম। দিনের পর দিন সে তো ঠিক এসেছে! আমার ভালো-মন্দ নিয়ে তার কত ভাবনা, তা তুমি জানো! আমি তাকে কত বকেছি, কত গালাগালি দিয়েছি, কতবার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তবু তো সে আমাকে ভুল বোঝেনি তোমার মত! তুমি দীপুর মত হতে পারো না? আর সব স্বামী যেমন করে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করে তেমনি ব্যবহার করতে পারো না? তুমি সাধারণ হতে পারো না?

সনাতনবাবু বললেন—সত্যিই দীপঙ্করবাবু খুব ভালো লোক

—কিন্তু দীপু ভালো হয়ে আমার কী লাভ? তুমি কেন অমন হলে? এত অহঙ্কার তোমার কিসের? কিসে আমি তোমার অযোগ্য বলতে পারো? কেন এত অপমান তুমি আমাকে করো?

সনাতনবাবু বললেন—অপমান করতে চাইলে কি বার-বার এমন করে তোমার কাছে আসি?

সতী বললে—আমি তো তোমাকে তাই আসতেই বারণ করি। কেন তুমি এমন করে বার-বার আসো? কেন তুমি বার-বার অপমান করে যাও! একবার তুমি আসো, একবার তোমার মা আসে—কেন তোমরা এমন করো? তোমাদের যা দরকার ছিল তা তো পেয়েছ—

সনাতনবাবু বললেন—মার দরকার মিটেছে, কিন্তু আমার?

—তোমার দরকার আর তোমার মার দরকার কি আলাদা?

সনাতনবাবু বললেন—না—

—তা হলে?

সনাতনবাবু বললেন—তুমি সেই একই প্রসঙ্গ তুলছো। আমার মা তো তোমারও মা। তুমি আমিই কি আলাদা? তুমি, আমি, আমার মা—সকলকে জড়িয়েই সংসার। তোমাকেও যেমন ছাড়তে পারি না, আমার মাকেও আমি তেমনি ছাড়তে পারি না। মাকে ছাড়লে তোমাকেও ছাড়তে হয় যে। আর তোমাকে ছাড়লে আমার নিজেরই তো কোনও অস্তিত্ব থাকে না—

এতখানি কথা সনাতনবাবুর মুখ থেকে সতী আগে কখনও শোনে নি। সনাতনবাবুর মুখের দিকে সতী চেয়ে রইল কিছুক্ষণ. বললে—সত্যি বলছো? সত্যি বলছো তুমি এমন করে চাও আমাকে!

সনাতনবাবু বললেন—তুমি এখানে এমনি করে পড়ে থাকো. এ কে চায়? তুমি আমাদের বাড়ি গেলে বুঝতে পারবে, সেখানে সমস্ত বাড়িটা খাঁখাঁ করছে তোমার অভাবে।

—এত টাকা পেয়েও খাঁখাঁ করছে? এত টাকা পেয়েও সমস্যা মেটেনি?

—টাকায় কি সব সমস্যা মেটে!

সতীর যেন তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। বললে—ওগো, তুমি সত্যি বলছো?

সতী আর দাঁড়াতে পারলে না। সনাতনবাবুর পাশের চেয়ারটাতেই বসে

পড়লো। বললে—কোর্টে তো টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে তোমাদের?

সনাতনবাবু বললেন—শুনেছি হয়েছে—

—শুনলাম, চাকর-বাকরদের বাকি মাইনেও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে?

—হয়ত হয়েছে। ও-সব মা জানে, আমি কিছুই খবর রাখি না।

সতী সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—শুনলাম তোমাদের সরকারবাবুও নাকি আবার এসে কাজে লেগেছে?

সনাতনবাবু বললেন—দেখেছি, এসেছে। কিন্তু সে-সব তো বাইরের জগতের খবর—

—হোক বাইরের জগতের খবর, কিন্তু টাকা পেয়েছ বলেই তো সব মিটিয়ে দিতে পারলে! টাকা পেলে বলেই তো সব দিক বাঁচলো!

সনাতনবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো মা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ!

সতী অবাক হয়ে গেল। বললে—আমার কাছে? কেন?

—বা, তুমিই তো টাকা দিয়েছ! তুমি যদি টাকা না দিতে তো এসব কি হতো?

সতী এবার দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আমি? আমি টাকা দিয়েছি?

—হ্যাঁ, তুমিই তো দীপঙ্করবাবুর হাত দিয়ে এত টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ। নইলে মাকে বড় মুশকিলে পড়তে হতো যে!

সতী আর থাকতে পারলে না। বললে—কী বলছো তুমি? আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি? দীপুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি? আমি?

সনাতনবাবু বললেন—তুমিই পাঠিয়েছ। তুমি তোমার বাবার অনেক টাকা পেয়েছ, সেই টাকা পাঠিয়েছ তুমি! মা তো সেই কথাই বললেন—

সতীর মাথায় যেন তখন ঘূর্ণি-ঝড় বয়ে গেল। বললে—বলছো কি তুমি? আমি দীপুর হাত দিয়ে আমার বাবার টাকা তোমাদের পাঠিয়েছি?

সনাতনবাবু নিজেও তখন অবাক হয়ে গেছেন—কেন? তুমি পাঠাওনি?

সতী তখন আরো সরে এসেছে।

—তাই বুঝি তুমি এসেছ? তাই বুঝি তোমার মা তোমাকে পাঠিয়েছে? তাই বুঝি এত মিষ্টি কথা তোমার মুখে? তাই বুঝি বাকি টাকাটার লোভে আমার এত খাতির? তোমার লজ্জা করে না এত মিথ্যে কথা বলতে? আমার চেয়ে আমার টাকাটাই তোমাদের কাছে এত বড় হলো? তোমরা এত নীচ? এত ছোট তোমাদের মন?

সনাতনবাবু হঠাৎ সতীর এই ব্যবহারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—কী বলছো তুমি, আমি বুঝতে পারছি না—

—তা কেন বুঝতে পারবে? তা বুঝতে পারলে যে অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যায় তোমাদের। টাকা দিয়েই যে তোমরা সব জিনিসের দাম যাচাই করে নাও। টাকাটাই তোমরা ধর্ম বলে মনে করো! আমার বাবা আমার বিয়েতে যৌতুক

বেশী দিতে পারেনি বলেই এতদিন এত অত্যাচার করেছিলে আমার ওপর, আর আজ আমি তোমাদের বিপদের সময়ে টাকা দিতে পেরেছি বলেই এত খাতির? তাই যদি হয় তবে দরকার নেই এত খাতিরের। এ খাতিরের মুখে আমি লাথি মারি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমার মুখও আমি দেখতে চাই না আর —চলে যাও—

সনাতনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

সতী বললে—যাও, চলে যাও—

সনাতনবাবু চলেই যাচ্ছিলেন হয়ত। সতী বললে—তবে যাবার আগে শুনে যাও। টাকা আমি দিই নি, আর দেবও না কখনও। আমার এত অধঃপতন হয়নি যে আমি ঘুষ দিয়ে সুখ কিনবো। এ-জন্মের মত আমি সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো তবু টাকা দিয়ে শ্বশুরবাড়ির সুখ কেনবার দুর্বুদ্ধি যেন আমার কখনও না হয়—। টাকা আমি রাস্তায় ফেলে দেব, জলে ভাসিয়ে দেব, তবু তোমাদের দিয়ে আমি আমার কালো মুখ আরো কালো করবো না—যাও—

সনাতনবাবু এ-কথার উত্তরে যেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই বাধা পড়লো। রঘু হঠাৎ বিব্রত হয়ে ঘরে ঢুকতেই সতী পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলে—কী রে? কিছু বলবি?

রঘু ভয়ে-ভয়ে বললে—বড়দিদিমণিকে পাচ্ছি না—

—বড়দিদিমণি! কেন? কোথায় গেল? এই তো ঘুমোচ্ছিল, কোথায় আবার যাবে?

—না, সব জায়গায় খুঁজেছি কোথাও নেই। বাথরুমে নেই, দোতলায় নেই—

—নেই কীরে? যাবে কোথায়?

কথাটা বলেই সতী তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। যে-ঘরে লক্ষ্মীদি শুতো সে-ঘর ফাঁকা। সতী অবাক হয়ে গেল। এ-ঘর ও-ঘর সব ঘর খুঁজতে লাগলো। শেষকালে ভয় হতে লাগলো। কোথাও বেরিয়ে গেল নাকি? কথাটা ভাবতেই যেন সতীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠলো।

ভূষণ মালী প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। প্রতিদিন সে এই লেভেল-ক্রসিং গেটে পাহারা দিয়ে আসছে। মাসে আঠারো টাকা মাইনে টিপ্ সই দিয়ে নিয়ে সে এই লেভেল-ক্রসিং-এই তার পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছে। যখন সাউথ-কেবিন থেকে করালীবাবু বলেছে,—কে? ভূষণ?

ভূষণ বলেছে—হাঁ বড়বাবু আমি—

করালীবাবু বলেছে—থার্টি থ্রি আপ্ লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, গেট বন্ধ করিস—

—আচ্ছা, ঠিক আছে হুজুর,—

বলে ভূষণ গেট বন্ধ করে দিয়েছে। গেটে ক'দিন থেকেই ভীষণ ভিড় হতে শুরু করেছে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় সব। হাড়-সার চেহারা। কোলে-কাঁখে ছেলে। পায়ে হাঁটা পথে দূর-দূর থেকে সব আসছে। ওদিকে সাহেব-মেমদের গাড়িরও তখন খুব ভিড়। তারা চলেছে ফূর্তি করতে। যোধপুর ক্লাবের সাহেবি আড্ডা তখন জমতে শুরু হবার কথা। ভূষণ ক'দিন থেকেই নিচেয় নেমে এসে ভিড় হাটিয়েছে। ভাগো-ভাগো সব, দেখতা নেই, সাহেব লোক্‌কা গাড়ি আতা হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো, ভাগ্ যাও—

গ্রামের গরীব-গুর্বো লোক সব। জীবনে হয়ত তারা কখনও মোটরগাড়িও দেখেনি। সাহেব-মেমও দেখেনি। তারা শুধু দেখেছে ক্ষিধে। ক্ষিধে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই তারা জানে না। শুধু দুবেলা পেট-ভরা আউশ-চালের মোটা লাল ভাত, আর কচু-ঘেঁচু কাঁচালঙ্কা, যা-হোক একটা কিছু। কিন্তু তা-ও ক'মাস ধরে জোটেনি তাদের। ভূষণ এসব কথা জানে না। সে রেলের গেট্‌ম্যান্। এত কথা জানবে কেন সে? লাইনের ওপর ভিড় করলেই ভূষণ লাঠি নিয়ে তাড়া দিত। বলতো—এ কোম্পানীকা জায়গা, ভাগো হিঁয়াসে—

কবে এই রেলওয়ে ছিল কোম্পানীর হাতে, কবে সরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে, সে-খেয়াল ছিল না ভূষণের। ভূষণ সেই আদ্যিকালের লোক। আদ্যি-কালের আইন-কানুনের প্রতিনিধি। তার ধারণা আজো সেই পুরোন আইনেই পৃথিবী চলছে। সেই যে-আইনে পুব-দিকে সূর্য ওঠে; যে-আইনে পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবে, সেই আইন। সে জানে না পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ যুগ পেরিয়ে এখন টাকার যুগ চলছে। টাকাওয়ালারা সব টাকা মজুত করেছে নিজেদের সিন্দুকে। মানুষের খাবার আজ মুষ্টিমেয়র হাতে চলে গিয়েছে। সে জানে না সে নিজেও আর এক টাকাওয়ালার হাতের যন্ত্র হয়ে গিয়েছে। সে জানে না যে রেলের বড় সাহেবের চোখে তার দাম আজ আঠারো টাকা বার আনা। জানে না বলেই হম্বি-তম্বি করে, মন দিয়ে কাজ করে, প্রাণ দিয়ে গেট বন্ধ করে।

চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। হঠাৎ কী যেন একটা নজরে পড়লো। ভূষণ ভালো করে ঠাহর করে তাকিয়ে দেখলে সেদিকে। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে না? ঠিক গুমটি-ঘরের নিচেয়, অন্ধকার একটা কোণ বেছে নিয়ে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একলা। জেনানা আদমী। আবার ভাল করে দেখলে। হয়ত নজরের ভুল। কিম্বা হয়ত অন্ধকার রাতের ছায়া। ডিউটি করতে করতে আগে এমন অনেক ছায়া দেখেছে ভূষণ।

এবার ভূষণ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—কৌন্ হো ইধার?

ছায়াটা যেন একটু আবছা সরে গেল এবার। আরো পাশে সরে গেল। একেবারে গুমটি ঘরের নিচে কাঁটা ঝোপটার পাশে।

ভূষণ আবার বললে—কৌন্ হো? কৌন্ হো তুম?

ওদিকে তখনই হঠাৎ করালীবাবুর টেলিফোন বেজে উঠেছে। লাইন ক্লিয়ার

হয়ে গেছে। আপ্ সিগ্ন্যাল দিয়ে দিয়েছে করালীবাবু। গেট বন্ধ করো। ভূষণ গেট বন্ধ করেছে। রাস্তার গাড়িগুলো ব্রেক কষে থেমে গেল বাইরে। ভূষণ জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে—আপ্ সিগ্ন্যাল ঠিক পড়েছে। ওদিকে হোম্-সিগন্যালটাও ঠিক পড়েছে। লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেছে। আর দেরি নেই থার্টি-থ্রি আপ্ আসতে—

তারপরেই কয়েকটা মেয়েলি গলার আওয়াজ এল কানে। ওম্নি ঘরের নিচেয় যেন কান্না-কাটি চেঁচামেচি হল্লা শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে থার্টি-থ্রি আপের হেড্-লাইটও দেখা যাচ্ছে। ভূষণ কী করবে বুঝতে পারলে না। কাঠের স্লিপারের ওপর তখন চাকার ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি হ্যান্ড-সিগ্ন্যাল-ল্যাম্পটার রং বদ্লি করে নিচেয় নেমে এল। নিচেয় নেমে এসে দেখে অবাক কাণ্ড!

আর সঙ্গে সঙ্গে থার্টি-থ্রি আপ্ একেবারে হুড়-মুড় করে ভূষণকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে বালিগঞ্জ স্টেশনের দিকে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে থার্টি-থ্রি আপের হুইশল্ বেজে উঠলো—হু-উ-উ-উ-উ-উ—

দীপঙ্কর ঠিক সেই সময়েই এসে পড়েছে। দূর থেকেই দীপঙ্কর দেখতে পেয়েছিল—গেট্টা খোলা। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু মনে হলো যেন অনেক লোক কাকে ঘিরে জটলা করছে। কেউ চাপা পড়েছে? দীপঙ্করের কী যেন একটা সন্দেহ হলো। দম বন্ধ করে দীপঙ্কর এগিয়ে চললো সেই দিকে। কেউ চাপা পড়েছে?

—কী হয়েছে এখানে? এত ভিড় কেন?

হঠাৎ কোথেকে ভূষণ শুনতে পেয়েছে। সেন-সাহেবের গলা। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে লাফিয়ে সামনে এসেই সেলাম করলে—সেলাম হুজুর—

—কী হয়েছে ভূষণ? এত ভিড় কেন এখানে?

—হুজুর এক জেনানা আদমী.......

আর শোনবার ধৈর্য হলো না। একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো দীপঙ্কর। ভেতরে সতী দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মীদিও দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মীদি থর-থর করে কাঁপছে। সতীও যেন দীপংকরকে দেখে অকূলে কূল পেলে। বললে—দীপু, এখ্খুনি সর্বনাশ হয়ে যেত, এই দেখ—

সনাতনবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু সেদিকে না-দেখে দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির দিকে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্মীদি তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আমি মরতে চাইনি দীপু, আমি মরতে চাইনি, এরা আমাকে মিছিমিছি ধরে রেখেছে—

দীপু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একটা ট্যাক্সি সেখানে লাইনের ওপরই এসে থেমে গেল। ভেতর থেকে কে যেন নেমে পড়লো সেইখানেই। তারপর কাছে এগিয়ে এসেই দীপঙ্করের কাঁধে হাত রাখলে। প্রথমটা চিনতে

পারেনি দীপঙ্কর। সেই চেহারা এ-রকম হবে কী করে। কিন্তু তবু যেন খুব চেনা-চেনা মনে হলো—দাতারবাবু আপনি? কখন এলেন? এ কী চেহারা হয়েছে আপনার?

নয়নদি যেন কোত্থেকে খোঁজ পেয়েছিল। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেদিন এসে হাজির। সেইদিনই সন্ধেবেলা। সনাতনবাবু তখন গেছেন বউকে আনতে। নয়নরঞ্জিনী শম্ভুকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন—বলি, খুব যে মাইনে মাইনে করেছিলি সবাই, এবার সব টাকা বুঝে পেয়েছিস্ তো! সব টাকা গুনে নিয়েছিস্ তো?

শম্ভু মাথা নিচু করে বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ মা-মণি!

—খুব যে তখন পাড়ায়-পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছিলি যে ঘোষ-বাড়ি এবার নীলেম হবে, খুব যে তোরা সবাই পাড়ায়-পাড়ায় চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছিলি! দেখি কে তোদের কত কালিয়া-পোলোয়া খেতে দেয়। একবার অন্য বাড়িতে কাজ করে দ্যাখ্ না কেমন সুখটা সেখানে—

শম্ভু প্রতিবাদ করলে—আজ্ঞে, মা-মণি, আমি তো বলিনি—আমি আপনার পা-ছুঁয়ে দিব্যি গালতে পারি—

মা-মণি ধমকে উঠলেন—আল্বাৎ বলেছিলিস্। তোরা ভাবিস্ আমি কিছু খবর পাই না, ভাবিস্ বুড়ী মাগী কালা হয়ে গেছে কানে, কিন্তু আমার কাছে সব খবর আসে—

শম্ভু তবু বললে—আজ্ঞে, মা-কালীর দিব্যি বলছি, আমি অমন কথা কখনও বলিনি—

—তা হলে ডাক্ বাতাসীর মাকে, ডাক্ ভূতির মাকে, ডাক্ কৈলাসকে, কে-কাকে কী বলেছে সব আমার কানে এসেছে। ওরে, এখনও আমি মরিনি! নেমখারামের জাত তোরা, আমার খেয়ে, আমার পরে আমারই গলায় পা দিয়ে আমাকে থ্যাৎলাবি? ডাক্ ওদের সবাইকে, আমি দেখি তাদের কত কেরামতি—

ঝি-চাকর-ঠাকুর মহলে ততদিনে রটে গেছে খবরটা। পাড়াতেও খবর রটে গেছে ঘোষ-বাড়ির গিন্নী আবার চাকর ঝি-দের বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দিয়েছে। পুরোন সরকারবাবুরও বকেয়া মাইনে মিটিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আবার সে এসে কাজ-কর্ম শুরু করে দিয়েছে। আবার বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে। চুন-কাম হচ্ছে দেয়ালে। বাইরে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে। অর্থাৎ আবার অবস্থা ফিরে গেছে ঘোষ-বাড়ির। বকেয়া মাইনে হাতে পেয়ে ঘোষ-বাড়ির চাকর-বাকররাও আবার দেশে টাকা পাঠিয়েছে।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সবাই এল মা-মণির সামনে। নয়নরঞ্জিনী বললেন—কী গো বাতাসীর মা, তোমাকেই বলি, তুমিই তো দলের পাণ্ডা, যত দল তুমিই

পাকিয়েছ—

বাতাসীর মাকে আর বেশি বলতে হলো না। সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আমাকেই তুমি দুষলে মা-মণি, আমিই হলুম দলের পাণ্ডা—

—থামো, ভর সন্ধ্যেবেলায় মড়া কান্না কেঁদো না! বলি, মাইনে সব মিটিয়ে দিয়েছে তো সরকারবাবু?

বাতাসীর মা বললে—আমি তো মাইনের জন্যে কখনও বলিনি মা-মণি তোমাকে—

—বেশি বক্-বক্ কোর না বাতাসীর-মা, নেমখারামের দল যত, আমার বাড়িতে খেয়ে-পরে এ্যাদ্দিন আমারই শতেক খোয়ার করেছ, এ্যাদ্দিন কিছু বলিনি, মুখ বুজে সব সহ্য করিছি। শুধু দেখছিলুম হারামজাদীরা কত বাড় বাড়ে! তা হ্যাগা, এতদিন আমার খেলে-পরলে, মানুষের একটা হায়া বলেও তো জিনিস থাকে! তা তোমাদের কি তাও নেই বাছা? পরের বাড়িতে কাজ করতে এয়েছ বলে কি সেটারও মাথা খেয়ে বসে আছো?

নয়নরঞ্জিনীর লম্বা বক্তৃতায় আর কারো মুখে একটা কথা বেরোবার সাহস হলো না।

—তোমাদের মত নেমখারামের হক্কের টাকা নিয়ে ভেবো না আমি বড়লোক হবো বাতাসীর মা। অমন বাপের জন্মিত্ নই আমি। অমন দুশো-পাঁচশো টাকা আমি খোলামকুচির মত ছুঁড়ে দিতে পারি, তা জানো? এই যে আমার বিপদ গেল এতবড়, সবাই তো হেসেছিল, ভেবেছিল এবার ঘোষ-বাড়ি টস্‌কে যাবে, কই, গেল? তোমাদের সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলাম তো! সরকার-বাবুকে সেই আমার কাছে এসেই দু' মুঠো ভাতের জন্যে চাকরি করতে হলো তো! ওগো, ভগমান বলে একজন মানুষ মাথার ওপর আছেন, তিনি সব দেখছেন, তিনি দর্পহারী মধুসূদন, তাঁর কাছে কিছু অজানা থাকে না, জানো? কে কী-রকম মানুষ তাঁর খাতায় সব লেখা থাকে, বুঝলে বাছা? নইলে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা নিতে পারতুম না? বলো না তোমরা, নিতে পারতুম না?

এ-প্রশ্নের কেউ উত্তর দিলে না। উত্তর বোধহয় তিনি চানও নি।

—আর এই যে আমার বৌমা, বৌমাকে কী সুখে রেখেছিলুম, আর কেউ না-দেখুক, তোমরা তো দেখেছ? তোমরা তো জানো, আমার নিজের মেয়ে ছিল না বলে বৌমাকে আমি পেটের মেয়ের মতন আদর-করতুম! পাড়ার লোকে যা-ই বলুক, তোমরা তো বাপু সে-আদর দেখেছ! আমার ন'দিদিও বলতো—তুই আদর দিয়ে দিয়ে তোর বৌ-এর মাথাটা খেয়ে ফেলবি নয়ন! তা ন'দিদির কথাই তো সত্যি হলো শেষ-পর্যন্ত! ন'দিদিকে আমি দোষ দিলে কী হবে, ন'দিদি তো মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়। তা তোমাদের আমি বলে দিচ্ছি বাপু, বৌমা আজ আসছে, এতটুকু যদি আদিখ্যেতা দেখি তো আমি কারো হাড়-মাস আর এক ঠাঁই রাখবো না—এই বলে দিলুম—

ভূতির-মা বুঝি খবরটা জানতো না, বললে—বৌদিমণি কি আসবে মা-মণি?

—হ্যাঁ আসবে, কিন্তু এতটুকু আদিখ্যেতা যদি দেখি তোমাদের তো আমি বরদাস্ত করবো না, এই বলে দিলুম, যেমন বড়-মুখ করে গিয়েছিল, তেমনি থোঁতা-মুখ ভোঁতা করে আসছে। তা আসুক্, ছেলের বউ যখন তখন আসবার হক্ থাকবে বৈ কি! কিন্তু খবরদার শম্ভু, তোকেও বলে দিচ্ছি, তোরই বেশি বাড়, তুই যেন বৌদিমণি বলতে আদেখ্‌লেপনা করিস্‌নি—আমি এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি—

—বৌদিমণি কি আজ্জই আসবে? কৈলাস জিজ্ঞেস করলে।

নয়নরঞ্জিনী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—আসবে না তো যাবে কোথায় শুনি? যাবে কোথায়? কোন্ চুলো আছে তার? বাপ তো পটোল তুলেছে, এক বাউণ্ডুলে বোন ছিল, তার কীর্তিতে তো মুখ-দেখানো ভার, এখন আমি না ঠাঁই দিলে কোথায় দাঁড়ায় সে? তা আমি ভাবলাম মরুক গে, হাজার হোক, ছেলের বউ তো, এত করে সাধছে, বাড়িতেই ঠাঁই দিই—

বাতাসীর মা বললে—বেশ করেছ মা-মণি, তুমি শাউড়ীর কাজই করেছ—তোমার জন্যে ভগমান আছে—

—না-বাছা, ভগমানের ভরসা আমি রাখিনে। ভগমানের ভরসায় থাকলে কবে আমি সংসার-ধর্ম ছেড়ে কাশীবাসী হতুম, আমার এ পোড়া সংসার নিয়ে আর এত জ্বালায় জ্বলতে হতো না। এই যে তোমাদের মাইনেকড়ি মিটিয়ে দিলুম, এ কি ভগমান দিলে আমাকে? ভগমান টাকা দিলে? ভগমানের কি দশটা হাত আছে না সিন্দুক-ভর্তি টাকা আছে যে চাইলেই হুড়-হুড় করে ঢেলে দেবে? ভগমান মানুষকে হাত দিয়েছে, মানুষের মাথায় বুদ্ধি দিয়েছে, মানুষকে বুদ্ধি খাটিয়ে টাকা উপায় করতে হয় গো, তবে টাকা আসে! বুঝলে? টাকা অত সহজ জিনিস নয় বাতাসীর-মা, আমি বুড়ো মানুষ, উকীল-কাছারি করে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি আজ......

কথা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎ সিঁড়ির সামনে ন'দিদির চেহারা দেখা গেল। নয়নরঞ্জিনী বললে—ওমা তুমি?

মোটা মানুষ, হাঁফাচ্ছিলেন। বললেন—বিপদের ওপর বিপদ চলছিল ভাই, কতদিন আসবো-আসবো করে আসতে পারিনি—তা শুনলুম, তোর দেনাটেনা নাকি মিটে গেছে? বাড়িতে ভারা বাঁধা দেখলুম, মিস্ত্রী খাটছে?

বহুদিন নয়নরঞ্জিনীর মনে একটা অভিযোগ ছিল ন'দিদির ব্যবহারে। একবারও দেখা করেনি। টেলিফোন করেও উত্তর পাননি তিনি। যখন টাকার জন্যে স্বর্গ-মর্ত দৌড়োদৌড়ি করছেন, তখন ন'দিদির টিকিটিরও সাক্ষাৎ পাননি। আজ এতদিন পরে কোত্থেকে শুনেছেন, কোর্টের টাকা জমা দেওয়া হয়ে গেছে, ঝি-চাকর-ঠাকুর-সরকারের মাইনে-কড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওমনি এসে ভালবাসা দেখাতে হাজির হয়েছেন। ধন্যি আত্মীয়-স্বজন, ধন্যি জ্ঞাতি-কুটুম!

ন'দিদি বললে—ওরে না রে নয়ন, না, তুই কিনা আমাকে ভুল বুঝলি শেষকালে? আমি কি বেঁচে ছিলুম রে এ্যাদ্দিন? আমি যে কী জ্বালায় জ্বলেছিলুম তা আমি জানতুম আর আমার ভগবান জানতো রে। আমার বৌ তো আঁতুড় থেকে উঠে মরো-মরো হয়ে গিয়েছিল—শেষকালে ডাক্তার-বদ্যি, যমে-মানুষে টানাটানি চললো এতদিন, শেষকালে তোর জামাইবাবুকে বললুম —আর নয়, আমি নয়নকে একবার গিয়ে দেখে আসি, তার বিপদের সময় আমি না দাঁড়ালে দাঁড়াবার আর কেউ নেই—! উঃ, তোর জামাইবাবু কি আসতে দেয় আমাকে? শেষে জোর করে চলে এলুম—

নয়নরঞ্জিনী তখনও কথা বলছেন না। ন'দিদির আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই ঝি-চাকর সবাই চলে গিয়েছিল। ন'দিদি এবার সামনে বসলো। বললে—যাক্, বিপদ থেকে যে উদ্ধার হয়েছিস এই-ই বড় কথা, আমি বৌ-এর সেবা করতুম আর দিনরাত্র ভগবানকে ডাকতুম। তোর জন্যে কত ঠাকুরকে যে ডেকেছি নয়ন কী বলবো! বলতুম—হে মা কালী, হে মা দুগ্যা, নয়ন আমার বড় দুঃখী, সে যেন সব দুঃখ থেকে রেহাই পায় মা! যাক্, এখন ভালোই হলো, বড় আনন্দ হলো ভাই দেখে—

তখনও নয়নরঞ্জিনী কিছু বলছিলেন না।

ন'দিদি বললে—তা হ্যাঁরে, টাকাটা তাহলে কে দিলে? তোর বৌ? তোর বৌকে তো ভাল বলতে হবে তবে! এত কান্ডর পরেও তো টাকা দিলে তোকে!

—ছাই দিয়েছে! তুমি ভাবছো আমি বৌ-এর কাছে ভিখ্ মাগুবো? বৌ-এর টাকা নিয়ে আমি দেনা শোধ করবো! গলায় দড়ি আমার!

—তাই বল্। আমি ভাবলুম বউএর বুঝি শেষকালে সুমতি হয়েছে!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আমাকে তুমি তেমন মেয়ে পাওনি ন'দিদি! আমি তোমার কাছে হাজারবার যেতে পারি, লক্ষবার খোসামোদ করতে পারি তোমাকে, কিন্তু তা বলে বৌ? তুমি কী বলে ভাবতে পারলে শুনি?

—তা কোত্থেকে টাকা পেলি তুই?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—জুটে গেল ন'দিদি, দীন-দুঃখীরা যার কাছে পায়, আমিও তার কাছ থেকেই পেয়েছি! ভগমান মুখ রেখেছে আমার। নইলে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়ালে তখন তুমিই কি আসতে আর ন'দিদি?

—ওই দ্যাখ, তুই যে কী বলিস্ নয়ন। আমার যে কী-বিপদের মধ্যে দিন কেটেছে তা ভগবানই জানেন। এ ক'মাসে কত টাকা যে জলের মত খরচ হয়ে গেল, তা তোর জামাইবাবুকে তুই জিজ্ঞেস করিস গিয়ে—

—আর জিজ্ঞেস করতে হবে না ন'দিদি, আমি এবার কলকাতাতেই থাকবো না।

—ওমা, কলকাতাতে থাকবি নে কী রে? বাড়ির দেনা মিট্‌লো, ঝি-চাকরদের মাইনে মিটিয়ে দিলি, বাড়িতে মিস্ত্রি খাটাচ্ছিস, আর তুই চলে যাবি মানে? তোর

ছেলে কোথায় থাকবে? ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবি?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বৌ-এর কাছে—

—ওমা সে কী কথা? এত কষ্টে বাড়ি উদ্ধার করলি, সব বৌ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—বাড়ি তো এখনও উদ্ধার হয়নি ন'দিদি, এখনও মামলা চালাচ্ছি—

—তাহলে মামলার কী হবে?

—ওরা যদি মামলা চালাতে পারে তো চলবে। ওরা যদি বাড়ি রাখতে পারে তো বাড়িও থাকবে। ওদের সংসার ওরাই বুঝবে, আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কাশী-বাসী হবো ন'দিদি! আমি সংসার চিনে নিয়েছি, আমি সংসারের মানুষকেও চিনে নিয়েছি, আর আমার কিছু চিনতে বাকি নেই। যথেষ্ট হয়েছে। এই দেখ, আজ বৌ এলে বৌ-এর হাতে এই সব চাবির গোছা তুলে দিয়ে আমি কালই বিদেয় নেব—

—আজ আসবে তোর বউ? আজই?

—হ্যাঁ ন'দিদি আজই, এই এখনি এসে পড়লো বলে! সোনা গেছে তাকে আনতে!

—তা জেনে শুনে তুই ছেলেকে আনতে পাঠালি? ছেলেকে বারণ করতে পারলি নে?

নয়নরঞ্জিনীর চোখ দুটো হঠাৎ ছল্ ছল্ করে উঠলো। বললেন—সোনা আর সে-সোনা নেই ন'দিদি, আমার ছেলে আর আমার বশে নেই! বশে থাকলে আমার আজ ভাবনা? তেমন হলে আমি আজই আবার ওই ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ-কে জব্দ করতে পারতুম, আমার সে পথও গেল! এখন সেই বৌ এসে আমার বুকে ঢেঁকির পাড় দেবে, তা-ও আমাকে সহ্য করতে হবে!

বলে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন নয়নরঞ্জিনী।

ন'দিদি বললে—এই এত দেনা তোর মাথার ওপর, আর এখন কি না বৌ আনতে গেল ছেলে?

—তুমিই বলো ন'দিদি, তুমিই বলো! এই এত দেনা করে সকলের মাইনে-কড়ি মিটিয়ে দিলুম, বাড়িতে মিস্ত্রি লাগালুম। এ সব বউ এসে ভোগ করবে বলে? সবই আমার বউ-এর ভোগে লাগবে ন'দিদি!

ন'দিদি বললে—তা তোরই দোষ! তুই যদি জানিস যে বউ এসে তোর সব ভোগ করবে তো কেন এত দেনা করতে গেলি? এ কে শুধবে? তোর বউ?

নয়নরঞ্জিনী বললেন—আগে কি জানতুম ন'দিদি যে পেটের ছেলে আমার এত শত্রুতা করবে? তাহলে আমি এত উকীল-আদালত করে মরি? আমার কীসের দায় বলো না! একটা তো বিধবার পেট, এটার জন্যে কি আর ভাবনা?

ন'দিদি অনেক সান্ত্বনা দিলে। কত বোঝালে। বললে—এ সংসারে কেউ

কারো নয় রে নয়ন। তুই কত কষ্ট করে টাকা রেখে গেলি, সেই টাকা তোরই ছেলে-বউতে উড়িয়ে দেবে। এই-ই আক্ছার হচ্ছে সংসারে।

জীবন বড় অনিত্য, আগেই বোঝা উচিত ছিল নয়নরঞ্জিনীর। আগেই নিজের কাজ গোছান উচিত ছিল! ছেলে-বউকে ছেড়ে তীর্থধর্মে মতি দেওয়া উচিত ছিল।

নয়নরঞ্জিনী বললেন—এখন আমি কী করি বলো তো ন'দিদি? নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে, এখন কার কাছে নালিশ করি?

হঠাৎ মনে হলো যেন নিচেয় গাড়ির আওয়াজ হলো। নয়নরঞ্জিনী চমকে উঠলেন। বললেন—ওই বউ এসেছে—

ন'দিদি বললে—তুই চুপ করে থাক, রাগের মুখে হুট্ করে কিছু বলে ফেলিসনি, যা বলবার আমি বলবো—

কিন্তু না, বৌ আসেনি। সনাতনবাবু একলা এসে নামলেন ট্যাক্সি থেকে। সদাশিব মানুষ। মুখ দেখে তার কিছুই বোঝবার উপায় নেই। শম্ভু খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিল। বললে—বউদিমণি আসেনি দাদাবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—না—

তারপর সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে যাচ্ছিলেন। সামনেই ন'দিদি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে—কী বাবা, বৌমাকে নিয়ে এলে না?

সনাতনবাবু থেমে বললেন—না।

—এল না বুঝি? তা সে যখন নিজে আসতে চায় না তখন অত খোসামোদ করবার দরকার কী বাবা?

—খোসামোদ? সনাতনবাবু যেন কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন—তার সঙ্গে খোসামোদের সম্পর্ক তো নয় ন'মাসীমা।

—খোসামোদের সম্পর্ক যদি নয় তো কেন তাকে আনতে গিয়েছিলে তুমি? তোমার মা'র কথাও তো শুনতে হয় একটু। তোমার বউ এসে তোমার মাকে লাথি-ঝাঁটা মারবে, সেটাই কি ভাল কথা বাবা?

সনাতনবাবু আরো অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—লাথি-ঝাঁটা মারবে কেন? লাথি-ঝাঁটা কি কখনও মেরেছে সে? আর তা ছাড়া মা-ই তো আমার বিয়ে দিয়েছিল!

—এই তো তোমার মা-ই বলছিল বউ এলেই কাশী-বাসী হবে। কতখানি দুঃখু হলে নিজের মা হয়ে এমন কথা বলে, ভাবতে পারো? তুমি তো সব বোঝ বাবা। এত লেখা-পড়া করে এত শিখেছ আর এই কথাটা বোঝ না?

সনাতনবাবু বললেন—মা কাশী-বাসী হবে? আপনি ঠিক শুনেছেন?

—হ্যাঁ বাবা, আমি এমন ভুল শুনবো কেন?

সনাতনবাবু বললেন—ভুল যদি না শুনে থাকেন তো মা'কে আপনি বলুন গিয়ে যে এ-বাড়িতে মা যদি থাকে তো সতীও থাকবে, আর সতী যদি না থাকতে পায় তো মারও থাকা দরকার নেই, আমারও থাকা মিথ্যে!

—বলছো কি বাবা? তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে?

—না ন'মাসীমা, গোলমাল আমার হয়নি। এ-বাড়ির গৃহলক্ষ্মীকে আজ হোক কাল হোক আমি এ-বাড়িতে আনবোই, তাতে এ-বাড়ির কল্যাণই হবে, আরও অকল্যাণ হবে না!

বলে আর ন'দিদির উত্তরের অপেক্ষা না করে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

নয়নরঞ্জিনী এতক্ষণ নিজের ঘর থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে সব শুনছিলেন। ন'দিদি আসতেই গলা নামিয়ে বললেন—কী হলো? বৌ আসেনি?

ন'দিদি বললে—কই দেখছিনে তো! তা তোর ছেলের যে-রকম মতি-গতি দেখছি, তাতে কোনদিন বউকেই এনে তুলতে পারে বাপু, ও-ছেলের ওপর কিছু ভরসা নেই!

নয়নরঞ্জিনী বললেন—তাহলে কী করি বলো তো ন'দিদি।

—কী আবার করবি? তুই গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাক! তোর টাকা, তোর বাড়ি, এখন তো আর টাকার জন্যে তোর বউকে খোসামোদ করতে হবে না—তোর ভাবনা কী শুনি? তুই এ-বাড়ি ভাড়া দে, ভাড়ার টাকায় তোর জীবনটা আয়েস করে চলে যাবে! কথায় আছে—ঝি জব্দ শিলে আর বৌ জব্দ কিলে! আর যদি তেমন কিছু হয়, আমাকে খবর দিবি, আমি আছি কী করতে? কিছু ভাবনা নেই তোর—

বলে সে-দিনের মত ন'দিদি বাড়ি চলে গেল।

গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতে দীপঙ্কর বাইরের ঘরে চুপ করে তখনও বসে ছিল। সনাতনবাবুকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দীপঙ্কর তুলে দিয়েছিল। সেদিন লক্ষ্মীদির সেই দুর্ঘটনা না-ঘটলে হয়ত সনাতনবাবু থেকেই যেতেন শেষপর্যন্ত। আরো কিছু কথা হতো সতীর সঙ্গে।

দীপঙ্কর বলেছিল—এদিকে আমি চলে যাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে, আমাকে দিয়ে আপনাদের দুজনের কোনও উপকারই হলো না সনাতনবাবু, আমি কিছুই করতে পারলুম না, অথচ আমি আপনাদের এই অশান্তির মধ্যে নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলুম কেবল—

সনাতনবাবু কথাটা শুনে হেসেছিলেন। বলেছিলেন—সংসারে অশান্তি যদি আমরা সৃষ্টি করতে চাই তো তার জন্যে নিমিত্তের কখনও অভাব হয় না দীপঙ্করবাবু—

দীপঙ্কর বলেছিল—তবু আমার নিজেকেই কেবল অপরাধী মনে হয়। মনে হয় সেই প্রথম দিন আমি বোধহয় আপনাদের বাড়িতে না-গেলেই পারতুম! আমি [illegible] না। [illegible] সতী খুব সুখেই আছে। তারপর কখন

কেমন করে আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলুম আজ আর তা মনে নেই। এদের দুই বোনের সঙ্গে আমার জীবন কেমন করে একাকার হয়ে গেল। কেমন করে সমস্ত কলকাতার সঙ্গেই আমি মিশে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সরু গলিটা থেকে শুরু করে প্রিয়নাথ মল্লিক রোড ধরে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, স্টেশন রোড, আর এই গড়িয়াহাটের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম—সব যেন আজ আমার কাছে উপন্যাস বলে মনে হয়—

তারপর একটু থেমে হঠাৎ দীপঙ্কর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে বললে—আমার একটা শেষ অনুরোধ রাখবেন আপনি?

—শেষ কেন বলছেন?

—শেষই তো! আমি চিরকালের মত এখান থেকে চলে যাবো, কলকাতা আর আসবো কিনা তারও কোনও ঠিক নেই। আপনি আমায় কথা দিন আমার একটা উপকার করবেন!

—বলুন কী উপকার?

দীপঙ্কর বললে—সতীকে আপনি সুখী করবেন, এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর নেই। আমি জানি সতী আমার কেউ নয়, তবু মনে হয় অনেকের অনেক দুঃখ আমি দেখেছি, অনেকের অনেক অভাব আমি অনুভব করেছি, কিন্তু সকলের সব দুঃখ সব অভাবের মোচন আমি সতীর মধ্যে দিয়েই দেখতে চাই—

সনাতনবাবু তখনও হাসছিলেন। বললেন—সুখ আপনি কাকে বলেন? সুখের ডেফিনিশন কী আপনার আগে বলুন?

দীপঙ্কর বলেছিল—এ-সব কথা আমি আপনার মুখ থেকে অনেক শুনেছি এখন আর শুনবো না। ছোটবেলায় আমি সোক্রেটিসের একটা কথা পড়েছিলুম—To a good man no evil can happen. আমি চাই সোক্রেটিসের সেই কথাটা সত্যি হোক। আপনার কাছে আমার এইটেই শেষ অনুরোধ,—বলুন আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন?

সনাতনবাবু শেষ পর্যন্ত কথা দিয়েছিলেন—আমি রাখবো—

—সতীকে সুখী করবেন!

—হ্যাঁ সুখী করবো!

বলে ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় এক রহস্যময় হাসি হেসেছিলেন সনাতনবাবু। সেদিন সনাতনবাবুর সে হাসির মানে বুঝতে পারেনি দীপঙ্কর। পরে বুঝেছিল। অনেক পরে। তখন সতী সুখীই হয়েছিল। দীপঙ্কর সে-সুখের মানে না বুঝলেও সতী হয়ত সুখীই হয়েছিল। সনাতনবাবু সুখীই হয়ত করেছিলেন সতীকে। সনাতনবাবু তার অনুরোধ রেখেছিলেন বৈ কি!

সনাতনবাবু চলে যাবার পর দীপঙ্কর আবার লক্ষ্মীদির ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। দাতারবাবু তখনও লক্ষ্মীদির পাশে রয়েছেন। লক্ষ্মীদি তখনও কাঁদছে।

সেইদিকে চেয়ে চেয়ে সতী যেন পাথর হয়ে গেছে তখন। কেন এমন কাজ করতে গেল লক্ষ্মীদি! যখন সনাতনবাবু আর সতী কথা বলছে এক মনে, তখন কখন যে লক্ষ্মীদি নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে খিড়কী দরজা দিয়ে একেবারে লেভেল ক্রসিং-এর গুমটি-ঘরের নিচেয় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউই জানতে পারেনি। অন্ধকার ঝুপসো। রাস্তার লোকরাও কেউ সন্দেহ করেনি। গেট-কীপার ভূষণও সন্দেহ করেনি।

রঘুই হঠাৎ আঁৎকে উঠেছিল প্রথম। সে-ই প্রথম খবর দিয়েছিল সতীকে। সতীও অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে-মানুষ এতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে আর ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে, সে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যাবে!

সতী বলেছিল—নিশ্চয় ওপরে আছে লক্ষ্মীদি, ওপরের ঘরে দেখেছিস?

রঘু বলেছিল—দেখেছি দিদিমণি, কোথাও নেই—

তারপর যখন বাড়ির ভেতর কোথাও পাওয়া গেল না, তখন খোঁজ পড়লো বাইরে। একেবারে রাস্তায়। রাস্তায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে লেভেল ক্রসিং-এর গুমটি ঘরের আড়ালে। তখন সিগ্‌ন্যাল ডাউন হয়ে গিয়েছে। ট্রেন এসে যাবে একটু পরেই। সেই অন্ধকারেই সতী গিয়ে লক্ষ্মীদিকে ধরে ফেলেছিল। তারপর টানাটানিতে আরো অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। সনাতনবাবুও তখন আর কোনও সাড়া-শব্দ না-পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন ট্যাক্সির খোঁজে। হাঁটতে হাঁটতে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে দেখলেন সবাই সেখানেই। আর তারপরেই দীপঙ্কর এসে পড়েছিল, দাতারবাবু এসে পড়েছিল। তখন এক মহা শোরগোল বেধে গিয়েছিল সেইখানে।

ভূষণ শুধু জিজ্ঞেস করেছিল একবার—এ কে হুজুর?

দীপঙ্কর শুধু বলেছিল—এ আমার জানাশোনা, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—তুমি ডিউটি করো—

কোথা থেকে সমস্ত কী হয়ে গেল। কিছুই যেন দীপঙ্করের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু মানুষের অভিপ্রায়ের ধার ধারবে, মানুষের ঈশ্বর হয়তো এত পরনির্ভরশীল নয়। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক কোথায় কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে বার বার হার মানতে হয়েছে তাকে। তবু হার মানবার বেদনাকে সে স্বীকার করেনি। আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। প্রাণ-পণে অমোঘকে পরাজিত করার বাসনা নিয়ে বুক ফুলিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। দীপঙ্করের যেন তাই হলো।

দাতারবাবুকে বললে—এখন ঘুমোচ্ছে লক্ষ্মীদি, এখন একটু বাইরে আসুন—

সতীও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এল। বাইরে এসে সোজাসুজি দাতারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। বোনের স্বামীকে এই প্রথম ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলে। হঠাৎ বললে—আপনিই সেই?

এতক্ষণে যেন দাতারবাবুও সতীর দিকে চেয়ে দেখবার ফুরসৎ পেলে। দুই

হাত তুলে বললে—নমস্কার—আমি আপনাকে এতক্ষণ চিনতে পারিনি—আমায় ক্ষমা করবেন।

সতী আরো গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—এত কান্ডর পরেও আপনার লজ্জা হচ্ছে না? আপনি কি মানুষ?

দাতারবাবু বোধহয় হঠাৎ এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বললে—সব দোষ আমি স্বীকার করছি আজ, আমার অন্যায় হয়েছে, আমি ক্ষমারও যোগ্য নই মিসেস ঘোষ—

সতী বললে—আপনি যদি জানতেন আপনি আমাদের সংসারের কী ক্ষতি করেছেন, তাহলে আজ একথা বলতে আপনার মুখে বাধতো। আপনি যদি সেদিন ধূমকেতুর মত আমার লক্ষ্মীদির জীবনে হাজির না হতেন তাহলে হয়ত তার জীবনও এমন নষ্ট হতো না, আমার জীবনও আজ এমন নিস্ফল হতো না—! আপনি জানেন যে আপনি আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছেন!

—তাই তো ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

সতী ঝাঁজিয়ে উঠলো—আবার ক্ষমা করার কথা বলছেন! রেঙ্গুনের সেই সব দিনের কথা ভাবুন তো। আপনাকে আমি সেদিন সাবধান করে দিইনি? বলিনি যে আমার দিদির সঙ্গে আপনি মিশবেন না, আমার দিদিকে আপনি চিঠি দেবেন না? বলিনি? সাবধান করে দিইনি আপনাকে?

দাতারবাবু এ-কথার কোনও উত্তর দিতে পারলে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। দীপঙ্করের মনে হলো দাতারবাবু বুঝি আবার আগেকার মত পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু সতী ছাড়বার পাত্রী নয়। এতদিন পরে এত বছর পরে যখন সামনে পেয়েছে তখন সে যেন তার প্রতিশোধ নেবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে। বললে—তবু আপনি বার বার দিদিকে চিঠি দিতেন, বার বার দিদির সঙ্গে দেখা করতেন—তার উদ্দেশ্যও কি ছিল এই? এইজন্যেই আপনি আমাদের কারোর ভালো চাননি? এমনি করে আমাদের দু'জনকে পথে বসিয়ে আপনি কার্ কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন? নিজেরই বা কী ভালোটা হলো আপনার?

দাতারবাবু এতক্ষণে ক্ষীণ সুরে কথা বললে—আপনি আমাকে আরো কিছু বলুন, আরো গালাগালি দিন,—

—আপনাকে গালাগালি দিলে যদি আমাদের সব কষ্টের লাঘব হতো তো গালাগালি দিতেও আমি পেছপাও হতাম না। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কী সুখটা পেলেন আপনি আমাদের এই সর্বনাশ করে! দিদিই বা আপনার কাছে কী অপরাধ করেছিল, আর আমিই বা আপনার কাছে কী দোষ করেছিলুম, বলতে পারেন?

বলতে বলতে সতীর গলা ক্রমেই করুণ হয়ে উঠলো। অভিযোগ নয় এবার, যেন অনুযোগ। যেন নিজেকেই ধিক্কার দিতে লাগলো সতী। বললে—আপনাকে এড়াবার জন্যে দিদি কলকাতায় এল, যাতে আপনি না জানতে পারেন তাই

কালিঘাটের গলির মধ্যে বাড়ি-ভাড়া নেওয়া হলো, তবু সেখানেও আপনি কেমন করে দিদিকে খুঁজে বার করলেন, তা ভগবান জানেন। আপনি কি জানেন যে আজ যে শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাকে চলে আসতে হয়েছে তার জন্যেও আপনি দায়ী?

দাতারবাবু বললে—সে শাস্তি আমি নিজেও পাচ্ছি মিসেস ঘোষ!

—আপনি আমাদের তুলনায় কতটুকু শাস্তি পাচ্ছেন, শুনি?

দাতারবাবু তেমনি মাথা নিচু করে বললে—আমার ছেলে আজ খুনের আসামী, তার বোধহয় ফাঁসীই হবে—

সতী রুখে উঠলো—হোক, ফাঁসি হোক, আপনার সঙ্গে যারা মিশেছে, আপনার সংস্রবে যারা এসেছে তাদের সকলের ফাঁসি হোক, তাতেও আমার তৃপ্তি হবে না। আপনার ফাঁসি হলেও আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরুবে না। আমার দিদির ফাঁসি হোক, আমারও ফাঁসি হোক। আমাদের সকলকে ফাঁসি দেয় না কেন বলতে পারেন? আপনার নিজের জীবন নষ্ট হয়েছে, আমাদের জীবন আপনি নষ্ট করেছেন,—আর এই দীপু, এই দীপু আমাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে—এরও জীবন আপনি নষ্ট করেছেন তা জানেন?

দাতারবাবু দীপঙ্করের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো দীপুবাবু—

দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি দাতারবাবুর হাত দুটো নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

সতী বললে—আজ আপনার ছেলের ফাঁসি হবে বলে আমাদের কাছে সহানুভূতি চাইছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার ছেলের ফাঁসি হবে না তো ফাঁসি কার হবে? তার আত্মসম্মানবোধ ছিল, তার আত্মমর্যাদা ছিল, তাই তার ফাঁসি হচ্ছে, আর আপনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত ব্যভিচারের সঙ্গে আপোষ করেছেন, তাই আপনি এখনও ভদ্দরলোক সেজে বেড়াচ্ছেন! ফাঁসি তো আপনাদের হবে না, ফাঁসি হয় তাদের, যারা সত্যি কথা বলে, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, যারা অত্যাচারের প্রতিকার করতে চায়!

দীপঙ্কর এতক্ষণে একটু প্রতিবাদ করতে গেল। বললে—থাক সতী, তুমি ভেতরে যাও, লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে বোস একটু—

—কেন থামবো? কেন ভেতরে যাবো? এতদিন পরে মুখোমুখি পেয়েছি, আমি ছেড়ে দেব বলতে চাও? আমার বাবা কি কম কষ্ট পেয়েছেন এই ভদ্র-লোকের জন্যে? আমার বাবার মৃত্যুর জন্যেও তো এই ভদ্রলোক দায়ী! এত-গুলো মৃত্যু ঘটিয়ে আপনার কী লাভটা হলো? কী সুখটা ভোগ করতে পারলেন? এতগুলো মৃত্যু ঘটিয়ে এখন আপনি আমাদের সহানুভূতি আদায় করতে এসেছেন?

দাতারবাবু বললে—আমার ছেলের যা-হোক একটা কিছু হয়ে যাক, তারপর

আমি এর জবাব দেব—

সতী বললে— কিন্তু আপনার ছেলে একটা খুন করে চুপ করে গেল কেন? আপনাকেও খুন করতে পারলে না সে? তার রিভলবারে আর একটা গুলীও বাড়তি ছিল না? তার মাকেও মেরে শেষ করতে পারলো না সে?

দাতারবাবু বললে—এর চেয়ে হয়ত তাই করলেই আরো ভালো হতো! তাতে আমিও হয়ত একটু শান্তি পেতাম!

সতী বললে—কিন্তু শান্তি তো আপনি চাননি! আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি, আমার বাবাও আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তবু তো আপনার চৈতন্য হয়নি?

দাতারবাবু যেন ক্রমেই মুষড়ে পড়ছিল। নিজের অসংখ্য ঝঞ্ঝাটের ওপর সতীর এই কথাগুলো তাকে যেন আরো পীড়িত করে তুললো। বললে—কিন্তু এখন আমি কী করতে পারি বলুন? আমি আপনার সামনে আমার মাথা পেতে দিচ্ছি, আপনি যা ইচ্ছে করুন আমাকে নিয়ে! ওদিকে আমার ছেলের মামলা, আর এদিকে আমার স্ত্রীর এই অবস্থা। আমি একদিনের জন্যে শুধু আমার স্ত্রীকে দেখতে এসেছিলুম, আমি আবার কালই ফিরে যাবো বলে এসেছি, এখন আমাকে কী করতে হবে, বলুন?

সতী বললে—কাল নয়, আপনি আজই যান, লক্ষ্মীদিকে আমি একলাই দেখতে পারবো, এবাড়িতে আপনার আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না।

দীপঙ্কর এবার এগিয়ে গেল। বললে—সতী, কী বলছো তুমি?

—তুমি থামো দীপু, আমি ঠিক বলছি, আর এক মুহূর্তও এঁর এখানে থাকা চলবে না।

—তুমি অবুঝ হয়ো না। মাথা গরম করে তুমি কী বলছো তার মানে জানো না।

সতী বললে—আমার মাথা যদি গরম হতো দীপু, তাহলে এর আগেই আমি অনেক কাণ্ড করে বসতুম। এখনও আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে, এখনও মাথা ঠাণ্ডা আছে বলেই আমি লক্ষ্মীদির মত রেলের চাকায় মাথা দিতে যাইনি। নইলে এতদিন আমাকে দেখতেই পেতে না এখানে। এই বাড়িতে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একলা কাটিয়েছি, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ট্রেনের চাকার শব্দ শুনেছি, আর নিজের জীবনের কথা ভেবেছি। পাগল যে হয়ে যাইনি, সেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছি বলে। মাথা গরম আর যারই হোক আমার হবে না।

দাতারবাবু বললে—কিন্তু আজ একটা রাত আমাকে থাকতে দিন আমার স্ত্রীর কাছে—আমি কথা দিচ্ছি কালই চলে যাবো দিল্লিতে—

সতী হেসে উঠলো—এতদিন পরের বিছানায় নিজের স্ত্রীকে শুতে দিতে তো আপত্তি হয়নি আপনার? তখন তো কোনও দুর্ভাবনাই হয়নি আপনার মনে? তখন তো নিজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন? আর আজ স্ত্রীর জন্যে

এত দুশ্চিন্তা?

দাতারবাবু যেন চমকে উঠলো। নিজের পরাজয়ের কলঙ্ক যেন এমন করে এর আগে কখনও পরের চোখে ধরা পড়েনি। একটা কথাও মুখ দিয়ে সরলো না। শুধু ফাঁকা দৃষ্টিতে হাবার মত চেয়ে রইল।

দীপঙ্করের আর সহ্য হলো না। বললে—দাতারবাবু আপনি ভেতরে যান, লক্ষ্মীদি একলা রয়েছে, ভেতরে যান—

তারপর দাতারবাবুকে হাত ধরে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে। ফিরে এসে দীপঙ্কর আর একটাও কথা বলতে পারলে না। সন্ধ্যের ঘটনার পর থেকেই যেন এ-বাড়ির রুটিন-বাঁধা জীবনে একটা ছেদ পড়েছে। প্রতিদিন এখানে দীপঙ্কর আসে আর প্রতিদিন পাশাপাশি বসে থাকে দু'জনে। আজ আর যেন কোনও কথা বলবার নেই। আজ লক্ষ্মীদির দুর্ঘটনার পর সব যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সনাতনবাবু এসে ফিরে গেছেন রিক্ত হাতে। আর দু'দিন পরে দীপঙ্করকেও কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে। জীবনে কোথাও যেন সামঞ্জস্য ছিল না। সতী তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে। দীপঙ্কর সেদিকে না তাকিয়ে সোজা সদর-দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই পেছন থেকে সতী বললে—কোথায় যাচ্ছো?

দীপঙ্কর ফিরে দাঁড়াল। বললে—এবার যাই—

—না শোন!

দীপঙ্কর আবার ভেতরে এসে দাঁড়াল। সতী বললে—আজ উনি এসেছিলেন—

দীপঙ্কর বললে—জানি!

—আমাকে আবার নিয়ে যেতে এসেছিলেন!

দীপঙ্কর বললে—তাও শুনেছি।

সতী বললে—তুমি শুনেছ তা আমি জানি। আমি তোমাকে সে-জন্যে ডাকিনি! ডেকেছি অন্য কারণে! তুমি এত টাকা কোথা থেকে পেলে?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। সতীর মুখের দিকে সোজা মুখ তুলে চাইলে।

সতী আবার বললে—বলো, তুমি এত টাকা কোথা থেকে পেলে? তুমি কি ভেবেছ তুমি আমার জন্যে শাশুড়ীকে টাকা দিয়ে আমায় ঋণী করে রাখবে? বলো, উত্তর দাও?

দীপঙ্কর তবু উত্তর দিতে পারল না।

সতী বললে—তোমার সামনেই তো আমি সেদিন বলেছিলুম যে, ঘুষ দিয়ে আমি শাশুড়ীর স্নেহ স্বামীর ভালবাসা পেতে চাই না, তবে জেনেশুনে কেন আমার এ-অপমানটা করলে? আমার মুখ এমনভাবে পোড়াতে হয়?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কে এ-সব বললে তোমাকে?

সতী বললে—যে-ই বলুক, তিনি আর যাই করুন, মিথ্যে কথা বলেন নি।

কিন্তু এই সস্তা মহত্ব দেখাতে কে তোমাকে বলেছিল? এ-বাহাদুরি দেখিয়ে আমার কী ভালোটা হলো?

দীপঙ্কর বললে—না দিলে সনাতনবাবুরা রাস্তায় এসে দাঁড়াতেন।

—ওঁরা রাস্তায় দাঁড়ান বা না-দাঁড়ান তাতে তোমার কীসের মাথা-ব্যথা?

দীপঙ্কর বললে—সে তুমি বুঝবে না!

—তবু একবার বুঝিয়েই দেখ না, বুঝতে পারি কি না!

দীপঙ্কর বললে—এত বছর ধরে আমার সঙ্গে এত মেলামেশার পরেও যদি বুঝতে না পেরে থাকো তো আর বুঝে দরকার নেই। আমি যাই—

সতী সামনে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে—আমার কথার জবাব না দিয়ে তুমি পার পাবে না। বলো, তোমাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে। অনেক দিন ধরে অনেক অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি, তবু তোমার এই হেঁয়ালি আমার কাছে আজো স্পষ্ট হয়নি। বলো, কেন তুমি এত টাকা ওঁদের দিতে গেলে? তোমার এতে কীসের স্বার্থ? তুমি কী চাও আমার কাছে?

দীপঙ্কর চাইলে সতীর দিকে। ঘৃণায় যেন সমস্ত মুখটা কুঁচকে উঠলো। বললে—ছিঃ, পথ ছাড়ো—

সতী পথও ছাড়লো না, মুখও নামালো না। বললে—তুমি তো কলকাতা ছেড়ে চলেই যাচ্ছো?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, সে তো পুরোন খবর!

—কিন্তু কেন চলে যাচ্ছো? কীসের ভয়ে? ভেবেছ আমি তোমার কোনও ক্ষতি করবো?

দীপঙ্কর বললে—ক্ষতি! ক্ষতি তো আমিই করেছি তোমার এতদিন!

—তাই বুঝি এখন ছেড়ে চলে যাচ্ছ আমাকে জব্দ করবে বলে?

দীপঙ্কর বললে—আমি এ-কথার উত্তর দেব না।

—তা উত্তর যদি না দেবে তো কেন টাকা দিতে গেলে ওঁদের? কেন ওঁদের এমন করে বাঁচালে? ওঁদের বাঁচিয়ে তোমারই বা কী লাভ হলো আর আমারই বা কী ভালো হলো? বলো, উত্তর দাও।

দীপঙ্কর চুপ করে রইল। কোনও উত্তর তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সতী হঠাৎ দীপঙ্করের কোটের কলারটা চেপে ধরলো। বললে—বলো, চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও—

দীপঙ্করের সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। এক মুহূর্তে তার সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে এল সে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, সেই ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, সেই ধর্মদাস মডেল স্কুল, সেই প্রাণমথবাবু, সেই মিস্ মাইকেল, সেই কিরণ, সেই লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু, সমস্ত কিছু যেন এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সারা জীবন ধরে সে তো একটা জিনিসই জানতে চেয়েছে। কেন মানুষ দুঃখ পায়, কেন ভালোর এত যন্ত্রণা, কেন সত্যের এত লাঞ্ছনা! তাহলে

এই-ই কি তার উত্তর? এই সতীই কি তার মূর্তিমতী জবাব?

—বলো, জবাব দাও, কেন ওঁদের তুমি টাকা দিতে গেলে? চুপ করে থেকো না, বলো—

দীপঙ্কর চাইলে সতীর দিকে। বললে—তোমাকে সুখী দেখতে চাই বলে!

সতী হঠাৎ কোটের কলার থেকে হাতটা ছেড়ে দিলে। তার চোখ দুটো যেন হঠাৎ বড় কালো হয়ে উঠলো!

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কোত্থেকে টাকা পেলে তুমি?

দীপঙ্কর কোনও জবাব দিলে না।

সতী বললে—বলো, এত টাকা কোত্থেকে পেলে?

দীপঙ্কর বললে—ধার করেছি!

ধার! সতী যেন চমকে উঠলো। এত টাকা ধার করেছে দীপু তার জন্যে? এ যে অনেক টাকা!

—এ ধার শোধ করবে কেমন করে? কত দিনে শোধ করবে?

—সে যেমন করে হোক আমি শোধ করবো! তোমাকে ভাবতে হবে না! আমাকে যেতে দাও—

সতী বললে—না, আমাকে ঋণী রেখে তুমি আমাকে জব্দ করবে, তা হবে না। তোমার এ-ধার আমি শোধ করে দেব, আমি সব টাকা দিয়ে দেব তোমাকে, তুমি আমার জন্যে মনে-মনে বাহাদুরি নিতে পারবে না।

দীপঙ্কর বললে—তা হয় না। ইচ্ছে হলে তুমি তোমার শাশুড়ীকে দিও, তাঁর উপকার হবে তাতে—

সতী বললে—তা দিলে আগেই দিতে পারতুম! তুমি আজই এ-টাকা নিয়ে যাও—

দীপঙ্কর বললে—তা হয় না—

সতী বললে—খুব হয়, তুমি আমাকে টাকা দিয়ে কিনে রাখবে, তাও আমি সহ্য করবো না। তোমাকে টাকা নিতেই হবে—

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সতী বললে—তোমার পায়ে পড়ি দীপু। এত বড় অপমান আমাকে কোর না, টাকা নিয়ে তুমি আমাকে আমার অপমান থেকে বাঁচাও, আমি এখনি চেক-বই নিয়ে আসছি, তুমি টাকা না নিলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না—তোমার পায়ে পড়ি দীপু, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসছি—

বলে তাড়াতাড়ি সতী ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেল। ঘরের আলমারি খুলে তাড়াতাড়ি দুটো ব্যাঙ্কের পাস বই নিয়ে আবার আলমারিটা বন্ধ করলে। পাশেই লক্ষ্মীদির ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল লক্ষ্মীদি বিছানায় শুয়ে আছে আর দাতারবাবু তার পাশেই একটা চেয়ারে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সতী তাড়াতাড়ি আবার বাইরের ঘরে এসে ঢুকলো। কিন্তু, দীপু কোথায়!

সদর দরজাটা খোলা। সতী একবার এদিক ওদিক চাইলে। কোথাও নেই। তারপর সদর দরজা পেরিয়ে বাইরের সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলে। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার চারদিকে। সতী ডাকলে—দীপ্—দীপ্—

তারপর সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়েই লেভেল ক্রসিং-এর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। দীপ্—দীপ্—

দীপঙ্কর তখন সতীর নাগালের বাইরে সুদূর গ্রহ-নক্ষত্র অতিক্রম করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পা চালিয়ে চলেছে। অন্ধকারের আড়ালে সে তখন নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলেছে।

সেদিন মাসীমা জেগে বসে ছিল। রোজ রোজ রাত করে আসে দীপু। এত কাজ তার কীসের—সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল। প্রত্যেক দিন দীপু যখন বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে তখন ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে মাসীমার। সারা দিন সংসারের কাজে আর বিশ্রাম পায় না মাসীমা। কাজও তো একটা নয়। ছোট সংসার হলে কি হবে। একদিন এই মানুষই রোগী স্বামীর সেবা করেছে, কিরণকে ইস্কুলের ভাত করে দিয়েছে, রান্না করেছে, বাসন মেজেছে, ঘর-দোর-উঠোন সব ঝাঁট দিয়েছে—আবার সব কাজের ফাঁকে পৈতের সুতোও কেটেছে। সুতো না কাটলে চলতো না। মাসীমা ভাবতো চাকর-ঝি থাকলে তার কাজ কমে যেত অনেক। কিন্তু এখন দীপুর বাড়িতে আসার পর চাকর-ঝি থাকা সত্ত্বেও কাজও বেড়ে গেছে। অথচ ক্ষীরিই তো বেশি কাজ করে। রান্না করা থেকে শুরু করে পরিবেশন করা-টরা সব কিছু। ঘর-ঝাঁটও দিতে হয় না, বাজার করতেও হয় না—তার জন্যে কাশী আছে। বাসন-মাজা কাপড়-কাচা কয়লা-ভাঙার জন্যে ঝি-ও রেখে দিয়েছে দীপু। আসলে কোনও কষ্টই রাখেনি দীপু। কিন্তু তবু দিতে পারবে না ঠিক মত। এক-এক সময় মাসীমার মনে হয় ঝি-চাকর না-থাকলেই যেন ভালো হতো। তাহলেই যেন স্বস্তি পেত মাসীমা। তাই সন্ধ্যে হতে-না-হতেই মাসীমা আর থাকতে পারে না। চোখ দুটো ঢুলে আসে।

হঠাৎ যেন গায়ে ঠেলা লাগলো। ক্ষীরোদা ঠেলছে। মাসীমা জেগে উঠলো। কে এল? ডাকছিস কেন মা?

ক্ষীরোদাও কিছু কথা বলে না। মুখপুড়ী যেন দিন-দিন বোবা হয়ে যাচ্ছে।

—কে ডাকছে? কী হলো কী?

তখন হঠাৎ খেয়াল হলো রাত অনেক হয়েছে। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে।

—তা দরজাটাও খুলে দিতে পারিস না তুই মুখপুড়ী?—বলতে বলতে মাসীমা নিজেই উঠলো। তারপর সদর-দরজা খুলতেই দেখে দীপু। দীপঙ্করের চেহারা দেখে মাসীমা যেন থমকে দাঁড়ান। ইচ্ছে ছিল অনেক কথা বলবে। কিন্তু

চেহারা দেখে একটু পিছিয়ে এল।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—তোমায় একটা কথা বলবো বাবা দীপু?

দীপঙ্কর একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—কী মাসীমা?

—আমি তোমাকে ধরবো বলেই জেগে বসে আছি। বলি, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমার গলায় পা দিয়ে আমার পিন্ডি চটকাতে চাও?

দীপঙ্কর বললে—ছি, ছি মাসীমা, আপনি আমার মায়ের মতন, আপনি এ-সব কী বলছেন?

—তা বলবো না? তোমার কি মায়া দয়া কিছু থাকতে নেই? দুটো খেতে পরতে দিচ্ছ বলে কি একেবারে মাথা কিনে নিয়েছ? সংসারে খেতে-পরতে দেওয়াটাই কি সব? তুমি না খেতে দিলে কি আমরা কেউ বাঁচতুম না? তুমি মনে করেছ কী? তুমি মনে করেছ সারা দিন-রাত তুমি আপিস নিয়ে থাকবে আর আমরা তোমার ভাত গিলিয়ে যাবো? তোমার আপিসের জন্যেই আমরা আছি?

—কিন্তু মাসীমা...... .

—তুমি থামো। তোমার অনেক কৈফিয়ৎ শুনিছি, সেই সকাল বেলা আপিসে বেরিয়ে যাও, আর রাত পুইয়ে বাড়ি আসো, সংসারে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি, তার খোঁজ নেবারও একবার দরকার নেই? চারদিকে কত কি কান্ড চলেছে, বোমা পড়ছে, চালের দোকানে চাল দিচ্ছে না, এ-সব তো তোমারও দেখতে হয়। আপিস কি আর কেউ করে না? তুমি ভেবেছ কী বলো তো? তোমাকে আজ বলতেই হবে। তোমাকে ধরবো বলেই আমি আজ জেগে বসে আছি—

দীপঙ্কর যেন এতদিনে ধরা পড়ে গেছে হাতে-নাতে। যেন তার সব অপরাধ মাসীমা ধরে ফেলেছে। বললে—মাসীমা আপনি আমায় ক্ষমা করুন, আমি অনেক ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি—

মাসীমার মুখটা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মাসীমা যেন এতক্ষণ অযথা না-জেনে তার দীপুকে মনে ব্যথা দিয়ে ফেলেছে। বললে—তোমার আবার ঝঞ্ঝাট কীসের বাবা? তুমি খাও-দাও আপিস যাও, আর আপিস থেকে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ো, তোমার কীসের ঝঞ্ঝাট শুনি?

দীপঙ্কর কিছু বলতে পারলে না। বললেও হয়ত মাসীমা বুঝতে পারবে না। আর বোধহয় সবটা বলবার মতও নয়। সতী, লক্ষ্মীদি, ঘাতারবাবু, সনাতনবাবুর জন্যে তার এত ভাবনার মানে বুঝতে পারবে না হয়ত মাসীমা। আর শুধু কি তারাই? কিরণ? কিরণের কথাও তো মাথার মধ্যে ভারি হয়ে চেপে আছে সব-সময়। একটা বন্ধ সেলের মধ্যে বসে কিরণ প্রতি-মুহূর্তে ফাঁসির হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। সে ব্যাপারে দীপঙ্করের কিছু করবারও নেই। সে-সব কথাই বা মাসীমাকে কেমন করে বলা যায়। নিজের মা যাকে ভুলে গেছে, দীপঙ্কর কেন

তাকে ভুলতে পারে না কিছুতেই? এ কেন হয়? কেন এমন হয়—দীপঙ্কর তা বুঝতে পারে না। আর পাঁচজন যেমন সংসারে খায়-দায়-ঘুমোয়-চাকরি করে, বিয়ে করে, তারপর একদিন বুড়ো হয়ে মারা যায়, দীপঙ্কর তেমনি করেই জীবন কাটাতে পারে তো! কেন তা হয় না?

মহাত্মা গান্ধী সেদিন ছাড়া পেয়েছেন। তাঁকে একলাই আগা খাঁ প্যালেস থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লী থেকে প্রেস-কমিউনিক বেরিয়েছিল—

In view of the medical reports of Mr. Gandhi's health, Govt. have decided to release him unconditionally. The release takes place at 8 p.m. May 6, 1944.

খবরটা বেরোবার পর থেকেই দীপঙ্করের মনে হয়েছিল একবার মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করে কিরণের কথা বলবে। বলবে—আপনি ভারতবর্ষের পিতা, সমস্ত লোক তাদের মুক্তির জন্যে আপনার দিকেই চেয়ে আছে। আপনার মতন আরো একজন মানুষ ফাঁসির দিন গুণছে জেলখানায়। সেও ইণ্ডিয়ার ভালো চেয়েছিল। সেও আপনার মত নিজের বাবা, নিজের মা, নিজের শরীর, নিজের লেখাপড়া, নিজের স্বার্থ, কিছুর কথাই ভাবেনি। সে ইণ্ডিয়ার লোকদের জন্যেই আজ জেলখানায় পচছে। আপনি জওহরলাল নেহরুর কথা ভাবছেন। আপনি আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেলের কথা ভাবছেন, আপনি সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবছেন, বলতে গেলে আপনি সারা পৃথিবীর কথাই ভাবছেন। কিন্তু কিরণের কথা ভাববার যে কেউই নেই। তার আমিও নেই। আমি সতীর কথা, লক্ষ্মীদির কথা ভাবি, তার কথা ভাবিই না। তার মা-ও তার কথা ভাবে না। নিজের বিধবা মা-ও তার কথা ভুলে গেছে। যাদের নাম খবরের কাগজে রোজ বেরোয়, তাদের কেউ-ই নয় সে। তার নাম ইতিহাস থেকে একদিন মুছেই যাবে। আপনার সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের চিঠি-পত্র চলছে, আপনি অনেক কথাই লিখেছেন তাতে, এবার কিরণের হয়ে কিছু লিখুন। তার মা'কে আমার বাড়িতে এনে তুলেছি। তার মা জানেও না যে সে জেলের ভেতর ফাঁসির আসামী। আমি সে খবর দিইনি। দিতে পারিনি। কিরণের ফাঁসি বন্ধ হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কোনও ক্ষতি হবে না। ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্ট যদি না টেঁকে তো কিরণকে ফাঁসি না দিয়েও টিঁকবে না।

এমনি অনেক কথা, অনেক ভাবনা মাথার মধ্যে জোট-পাকিয়ে থাকে। কিন্তু দীপঙ্করের কিছুই করবার নেই। দীপঙ্কর মাসীমার মুখের সামনে যেতেই ভয় পায়। যদি মাসীমা জানতে পারে। যদি এতটুকু আভাস পায়। মাসীমাকে দেখলেই তাই দীপঙ্কর এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু আজ সেই জন্যেই একেবারে মাসীমার মুখোমুখি পড়ে যাওয়াতে প্রথমে চমকে উঠেছিল। কিরণের ফাঁসির খবর মাসীমা জানতে পেরেছে নাকি?

মাসীমা আবার বলতে লাগলো—আর আমার কথা একবার ভাবো দিকিনি?

আমি কী ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে আমার সংসার করেছি? তুমি তখন ছোট, সে-সব কথা হয়ত তোমার মনেও নেই—। আর পরম শত্রুরেরও যেন তেমন ঝঞ্ঝাট না আসে। তার তুলনায় তুমি তো ভাল আছো বাবা! একে তুমি বলো ঝঞ্ঝাট? এইটুকু ঝঞ্ঝাটেই তুমি হয়রান হয়ে যাচ্ছো?

দীপঙ্কর বললে—না মাসীমা, আপনি সে-সব বুঝবেন না—

—আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলো, ও-সব বুঝেও দরকার নেই। কিন্তু যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? যে আপিস করে সে কি আর সংসার করে না?

দীপঙ্কর বললে—এবার তো আমি চলে যাচ্ছি মাসীমা, আপনাকে তো বলেছি—

—তা বাবা, তোমার চাকরির উন্নতি হোক, তাতে তো আমি কিছু বলিনি, কিন্তু আমাদের তুমি এভাবে আর ঝুলিয়ে রেখো না, আমাকে তুমি আবার সেই নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের বস্তিতে রেখে এসো, আমি সেখানে আরামে থাকবো। এর চেয়ে আরামে থাকবো।

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সন্তোষকাকার মেয়ে একলা এখানে থাকবে, তার কথাটাও তো ভাববেন একবার। তাকে কে দেখবে?

মাসীমা বললে—তার কথা আমি ভাববার কে? আমার পেটের মেয়ে সে, না আমার নিজের কেউ? আমার নিজের ছেলের কথা বলে আমি ভাবি না আর আমি ভাবতে যাবো পরের মেয়ের কথা? তার বিয়ে হলো না-হলো তা নিয়ে আমার কীসের মাথা-ব্যথা? সে-ই বা আমার কে, আর আমিই বা তার কে? আমি মলে ওই মেয়ে কি আমার মুখাগ্নি করবে যে তার কথা আমি ভাববো?

দীপঙ্কর বললে—মাসীমা, আজকে অনেক রাত হয়ে গেল, কাল এ-সব কথা ভাবা যাবে—

মাসীমা বললে—না, কাল-কাল করে অনেকদিন কাটিয়েছি, আর কাল করবো না। আজই যা হোক একটা হেস্ত-নেস্ত করতে হবে তোমাকে—

—কিন্তু আমি কী করবো আপনি বলুন? আমি তো দু'দিন বাদেই চলে যাচ্ছি। আপনি যা বলবেন তাই-ই করবো!

—কিন্তু আমি বলবো তবে তুমি করবে? তোমার নিজের একটা বুদ্ধি-বিবেচনা নেই?

দীপঙ্কর কী যেন ভাবলে খানিক। তারপর বললে—আচ্ছা মাসীমা, আমি কালই সব ঠিক করে ফেলবো!

—কী ঠিক করবে কাল?

—সন্তোষকাকার মেয়ের বিয়ের একটা যাহোক ব্যবস্থা করে ফেলবোই!

কথাটা শুনে মাসীমা যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। এতদিনে যা হলো না, তাই হবে কাল? কালকের মধ্যেই? মাসীমা যেন কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল

আর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের বারান্দায় কী যেন একটা পড়ে যাবার শব্দ হলো। চমকে উঠলো মাসীমা। কী হলো? কী পড়লো ওখানে? কে?

তাড়াতাড়ি দৌড়ে ঘরের বাইরে এসেছে মাসীমা। দীপঙ্করও এসেছে। ঠিক সিঁড়ির গোড়ায়। ক্ষীরোদা সেখানে পড়ে অচৈতন্য হয়ে আছে। ওমা, এ যে আমার ক্ষীরি। হ্যাঁ মা, তুই এখানে এমন করে পড়ে গেলি কেন? কী হলো তোর? অন্ধকারে ব্যাঁঝ ঠাহর করতে পারিস্ নি? দেখ্ তো কান্ড! আলোটা জ্বেলে আসতে হয় তো?

তাড়াতাড়ি মাসীমা ধরে তুলতে গেল ক্ষীরোদাকে। কিন্তু ক্ষীরোদা তখন অজ্ঞান-অচৈতন্য। মাসীমা তাড়াতাড়ি ক্ষীরোদার গায়ের কাপড়টা ঠিক-ঠাক করে দিলে। বললে—ওমা, এ যে একেবারে জ্ঞান নেই বাবা, একটু জল আনো তো, মাথায় দিই—

কাশী তখন ভেতরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, দীপঙ্কর সেই অবস্থাতেই চৌবাচ্চা থেকে এক মগ জল এনে দিলে। মাসীমা সেই জল মাথায় থাবড়ে দিতে লাগলো। মাসীমা কী যে করবে বুঝতে পারলে না।

দীপঙ্কর বললে—একজন ডাক্তার ডেকে আনবো মাসীমা?

মাসীমা বললে—না বাবা, তুমি এখন যাও, আমি বুঝিছি—

মাসীমা কী বুঝলে কে জানে। দীপঙ্কর বললে—যদি কিছু খারাপ হয়, তখন?

—সে-সব তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা, তুমি এখান থেকে সরো দিকিনি। তুমি অনেক ভেবেছ আমাদের জন্যে, আর তোমাকে ভাবতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে—এখন যাও এখান থেকে! খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো গে—

দীপঙ্কর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওপরে চলে গেল। অনেকক্ষণ পরে ক্ষীরোদার যেন একটু জ্ঞান হবার মত হলো। চোখ তুললো। চোখ তুলেই মাসীমাকে দেখে নিজের গায়ের কাপড়টা একটু টেনে আব্রু দেবার চেষ্টা করলে। মাসীমা মুখ নিচু করে বললে—কী হয়েছে মা? কী হয়েছিল তোমার? পড়ে গিয়েছিলে কেন? অন্ধকারে পা পিছলে গেছলো?

ক্ষীরোদার যেন এতক্ষণে হুঁশ্ হলো। উঠে বসতে গেল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো।

মাসীমা বললে—কাকে খুঁজছো মা? কেউ নেই এখানে। শুধু আমি আছি আর দীপুকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার কোনও ভয় নেই। এখন কেমন বোধ করছো?

মুখ নিচু করে মাসীমা প্রশ্ন করছিল। ক্ষীরোদা মাসীমার কথার কোনও উত্তর দিলে না। যেন উত্তর দিতে গিয়ে তার দু'চোখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মাসীমা দেখতে পেয়েছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—ছিঃ, কাঁদে না, কাঁদতে নেই—

তারপর বললে—চলো মা তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই, আস্তে আস্তে চলো, আমি ধরছি—

ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—সংসার তো এখনো করোনি মা, যখন সংসার করবে তখন বুঝবে। এখনি যদি কেঁদে কেঁদে চোখের জলটুকু সব ফুরিয়ে ফেলো তাহলে পরে কী করবে মা? চলো, কাঁদার দিন তো এখনও আরম্ভ হয় নি মা তোমার, এখনও যে সামনে মস্ত সময় পড়ে রয়েছে! তখন অনেক কাঁদার সময় পাবে—চলো ঘরে চলো—

বলে মাসীমা বিছানার ওপর ক্ষীরোদাকে শুইয়ে দিলে আস্তে আস্তে।

দীপঙ্কর ঘরের মধ্যে গিয়েও তখনও জামা-কাপড় ছাড়েনি। চুপ করে বিছানার ওপরই পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। দীপঙ্কর যেন হিসেব মেলাতে পারছিল না। সকলের ভালো করতে গিয়ে যেন সকলের ওপর অবিচার করে ফেলেছিল সে। কেন এমন হয়? এ কি তার নিজের কোনও দোষের অপরিহার্য ফল? এর কি কোনও প্রতিকার নেই?

হঠাৎ মাসীমা ঘরে ঢুকলো। দীপঙ্কর মাসীমার দিকে চোখ তুলে চাইতেও ভয় পাচ্ছিল।

কিন্তু মাসীমা হঠাৎ যেন ফেটে পড়লো। বললে—তুমি ভেবেছ কি বল দিকিনি দীপু, এমনি করে আর কত শাস্তি দেবে তুমি? —

দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—মাসীমা, শেষকালে আপনিও এ-কথা বলবেন?

—তা বলবো না? আমি তো তোমাকে গোড়া থেকেই বলে আসছি, কাজটা তুমি অন্যায় করেছ! কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে বাবা? ঘরে পাপ পুষে রেখে দিয়েছ, তার সাক্ষী রেখে দেবার জন্যে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু মাসীমা, আমি তো আপনার ভালোর জন্যেই এ করেছিলুম--

—আমার ভালোর কথা ছেড়ে দাও। ওই পোড়ারমুখীটার তুমি কী দশা করতে চাও আমাকে তাই বলো আগে, তবে আমি যাবো এখান থেকে? যদি ওর গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে চাও তো তাও খুলে বলো, আমি আজ শুনে যাই—

দীপঙ্কর বললে—আপনার পায়ে পড়ছি মাসীমা, আমাকে আপনি একটা রাত্তিরের সময় দিন, একটা রাত আমাকে ভাবতে দিন, আমি অনেক ব্যাপার নিয়ে বিব্রত, আমি আর পারছি না—

—আপিস তো সবাই করে, আপিস করে আবার সংসারও করে! কিন্তু আপিস নিয়ে তোমার মত এমন করে ঘর-সংসার জলাঞ্জলি দিতে তো কাউকে দেখিনি।

দীপঙ্কর বললে—না মাসীমা, আপিস নয়, সে আপনাকে বোঝাতে পারবো না, বাইরের লোক কেউ তা ব[illegible]ও না—সে বোঝবার জিনিসও নয়, আমি

আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি, আর আমাকে শুধু একটা রাতের সময় দিন—

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। মাসীমাও ক্লান্ত, দীপঙ্করও ক্লান্ত। বোধহয় বেশি ক্লান্ত ছিল বলেই দীপঙ্কর সেইভাবে বিছানার ওপর শুধু এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে লাগলো সে-রাতটা। সে-রাতে দীপঙ্করের মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সবাই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। সনাতনবাবুও এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। নয়নরঞ্জিনী দাসীও হয়ত ঘুমে অচেতন। লক্ষ্মীদিও হয়ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে অচৈতন্য। দাতারবাবুও তার মাথার কাছে হয়ত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সতীও হয়ত কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছে চেক-বই নিয়ে। খুঁজেছে তাকে। সদর-দরজার বাইরের সিঁড়িতে নেমে 'দীপু' বলে ডেকেছেও হয়ত। তারপর তাকে দেখতে না-পেয়ে আবার ফিরে গেছে নিজের ঘরে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। হয়ত নিজের ঘরে মাসীমাও এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়লো। সন্তোষকাকার মেয়েও হয়ত মাসীমার বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর অত কথা কী, কিরণ-যে-কিরণ, সেই কিরণও বোধহয় তার সেলের মধ্যে এখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একলা দীপঙ্করেরই শুধু ঘুম নেই।

কিন্তু দীপঙ্কর জানতো না, সেই ১৯৪৪ সালে সেদিন কেউই ঘুমোয় নি। ফিনল্যান্ড থেকে ইস্ট-প্রাশিয়া পর্যন্ত পোল্যান্ড হাঙ্গারী রুমানিয়া জুড়ে সমস্ত ভূভাগে তখন আগুন জ্বলতে শুরু করেছে সমস্ত দিন-রাত। হিটলার কি ঘুমোতে পারে সেই অবস্থায়? চার্চিল-এরও তখন অনেক ভাবনা। জাপান প্রায় সমস্ত ইস্ট-এশিয়া নিয়ে নিয়েছে। মুসোলিনী মেডিটারেনিয়ান-সী, সিসিলী, সার্ডিনিয়া নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আর কতদিন? টিউনিস্ আর বিজার্তা থেকে জার্মান আর্মিকে চলে যেতে হয়েছে, সুতরাং আর কতদিন ইটালীর হাতে থাকবে সে দেশ? পৃথিবীর কোথাও ঘুম নেই। গান্ধীজীরও ঘুম নেই তখন। তিনিও আশ্রমে বসে রাত জেগে-জেগে মহম্মদ আলী জিন্নাকে চিঠি লিখছেন—

Brother Jinnah—There was a day when I could induce you to speak in the mother tongue. Today I take the courage to write to you in the same language. I had invited you to meet me while I was in jail. I have not written to you since my release. But today my heart says I should write to you. We will meet whenever you choose. Don't regard me as the enemy of Islam or of the Muslims of the country. I am the friend and servant of not only yourself but of the whole world. Do not disappoint me.

Your brother—M. K. Gandhi.

আর শুধু হিটলার, চার্চিল, মুসোলিনী, আইসেনহাওয়ার, গান্ধীজীই নয়, তাদের সঙ্গে মাসীমাও জেগে আছে, ক্ষীরোদাও জেগে আছে। ফাঁসি-সেলের মধ্যে সেদিন প্রত্যেক দিনের মতই সেদিনও জেগে আছে কিরণ। ঘুম আসে না

তার। ইন্ডিয়া স্বাধীন না হলে ঘুম আসবেও না তার আর কখনও। আর,আর একজনও জেগে আছে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে তার অন্ধকার নিঃসঙ্গ ঘরে সতীও জেগে আছে। তার হয়ে দীপঙ্কর ঘুষ দিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্কর তার জীবনের ভবিষ্যতের ভিত্ ঘুষের কংক্রিট্ দিয়ে পাকা করতে চেয়েছে; এর চেয়ে আর কোন্ অপমান এত মর্মান্তিক হয়ে তাকে আঘাত করতে পারে? তাই সারা পৃথিবীর সঙ্গে সতীও বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে দু'চোখ খুলে।

দু'দিন অপেক্ষা করলো সতী! সে-রাত্রের পর থেকে বড় খিটখিটে হয়ে গেল সতীর মেজাজ। দাতারবাবু দু'দিনের জন্যেই এসেছিল। তার মানসের মামলা হয়েছে দিল্লিতে। ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে যদি তাকে বাঁচাতে না পারা যায় তো সম্ভব হলে বাপ তার নিজের জীবন দিয়েও বাঁচাবে। মানস পুলিসের কাছে নিজেই স্বীকার করেছে—সে সুস্থ চিত্তে বহাল তবিয়তে সুধাংশুকে খুন করেছে।

—কিন্তু কেন খুন করলে?

মানস উত্তর দিয়েছে—সে আমার থেকেও বড় খুনী বলে!

—কিন্তু কই, সে তো কই কাউকে মার্ডার করেনি! তার মার্ডারের কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

—আছে!

—দাও! প্রমাণ দাও তুমি?

—প্রমাণ আমার মা। প্রমাণ আমার বাবা। প্রমাণ আমি। আমাকেও সে খুন করেছে। আমাদের ফ্যামিলির সমস্ত প্রেস্টিজকে সে খুন করেছে।

—কী ভাবে মার্ডার করেছে?

—অভাবের সময়ে আমার মাকে টাকা দিয়ে। টাকা দিয়ে আমার মা'র সতীত্ব, বাবার পিতৃত্ব, আর আমার জীবন, সব সে নষ্ট করেছে। আমি শুধু সেই মার্ডারের প্রতিশোধ নিয়েছি তাকে মার্ডার করে। আমি গিল্টী।

লক্ষ্মীদি ছেলেকে মানুষ করেছিল ডেরাডুন স্কুল থেকে পড়িয়ে। কিন্তু আসলে সে মানুষই হয়নি। দিল্লির রাজধানী তার স্টেট্মেন্ট পড়ে হেসেই অস্থির। নির্বোধ, ফুলিশ! বিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীতে এই সামান্য ক্রাইমের জন্যে কেউ মাথা ঘামায়? আমরা তো চাকরিতে প্রমোশন পাবার জন্যে কত কী করেছি। ঘুষ তো তুচ্ছ কথা। ভেট্ দেওয়াও তো পুরোন হয়ে গেছে। ওতে আর মন ভোলে না কারো। নিজের স্ত্রীকেই আমরা মাঝ-রাত্রে বড়-সাহেবের শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি কতদিন। তাতে কী এমন ক্ষতি হয়েছে আমাদের শুনি! কেউ তো তা জানতেও পারেনি। মাঝখান থেকে গ্রেড্ পেয়ে গেছি। গেজেটেড্ পোস্টের জন্যে নমিনেশন্ পর্যন্ত হয়ে গেছে। এবার সেক্রেটারিয়েটে সুপারিন্টে-

স্বেচ্ছ হবো। তখন? তখন কি সে-দাগ গায়ে লেগে থাকবে?

দিল্লির লোক সত্যিই হাসতে হাসতে অস্থির হয়ে গেল। আর এতদিন ধরে যে তোমাকে লেখাপড়া শেখাবার টাকা জুগিয়েছে, সেটা কিছুই না? তোমার বাবা যখন পাগল হয়ে গিয়েছিল তখন কে তার চিকিৎসার খরচ দিয়েছে? তোমার মার শাড়ি, গাড়ি, বাড়ি, গয়না, রেফ্রিজারেটার, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টার, সিগ্রেট—এ সমস্ত কার জন্যে? ব্যাঙ্কে যে লক্ষ লক্ষ টাকা তোমার নামে, তোমার বাবার নামে, তোমার মার নামে, সে কার দৌলতে? তার জন্যে তোমার তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! তা নয় প্রতিশোধ!

দাতারবাবুর যাবার দিন কাছে ঘনিয়ে এল। বললে—আমি চললাম।

সতী সেদিকে মুখ ফিরিয়েও দেখলে না।

—আমার ছেলের মামলার হিয়ারিং আছে সামনে, তাই আর থাকতে পারলুম না, তুমি একটু তোমার লক্ষ্মীদিকে দেখো!

তবু সতী মুখ তুললো না। বাইরে ট্যাক্সি এসে গিয়েছিল। সঙ্গে কিছুই নেবার নেই। বলতে গেলে একেবারে খালি হাতেই এসেছিল মিস্টার দাতার।

—দেখবে তো?

তবু সতী এতটুকু মুখ তুললে না। দাতারবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সতীর সামনে। কোথাও কোনও সহানুভূতির চিহ্ন দেখা গেল না। দাতারবাবু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের স্ত্রীর ঘরে গিয়েও একবার দাঁড়াল। যেন চিনতেই পারলে না তাকে। লক্ষ্মীদিও ওই রকম হয়ে গেছে। বোকা চাউনি লক্ষ্মীদির চোখে। আজকাল যেন সারাক্ষণই কী ভাবে, কী বলে কিছুই ঠিক নেই। কখনও ঘুমোয়, কখনও জেগে থাকে। কখনও আবোল তাবোল বকে। তাকে কিছু বলাও বৃথা। তবু যাবার সময় দাতারবাবু কথা বলে গেল। বললে—আমি যাচ্ছি, তুমি সাবধানে থেকো, খোকাকে যদি খালাস করতে পারি তো আমি জানাবো তোমাকে, কিছু ভেবো না—

তারপর ট্যাক্সি ছেড়ে চলে যাবার শব্দটাও কানে এল সতীর। আর তারপরও অনেকক্ষণ কেটে গেল। সমস্ত পৃথিবী জোড়া হাহাকারের মধ্যে বসে সতী যেন মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে লাগলো।

রঘু দুপুরবেলা একটুখানির জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর কখন বিকেল হয়েছে টের পায়নি। একলা মানুষ। সারাদিন রান্না-করা, বাজার-করা, সবই করতে হয় তাকে। হঠাৎ ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়ফড় করে উঠেই সামনে দেখে দিদিমণি। একেবারে বাইরে যাবার জন্যে যেন তৈরি।

সতী বললে—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি রঘু, বড়দিদিমণি একলা রইল, একটু দেখিস—

—কখন আপনি আসবেন?

সতী বললে—এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো, চোখে চোখে রাখবি

বড়দিদিমণিকে, বুঝলি?

—দেখবো।

—দেখিস সেদিনকার মত যেন হঠাৎ আবার বড়দিদিমণি লেভেল ক্রসিং-এর কাছে না যায়। খুব সাবধান—

রঘুকে সাবধান করে দিয়ে সতী একলাই বেরোল। হাঁটা-পথ। এমনিতে বিকেল বেলা এদিকে আজকাল অনেক লোকজন থাকে। নিজের হ্যান্ড-ব্যাগের ভেতরে দুটো চেক-বই পুরে নিয়েছে। সোজা লেভেল ক্রসিংটা পার হয়ে একেবারে আরো চওড়া রাস্তাটায় পড়লো। অনেকে লেকের দিকে বেড়াতে চলেছে। বাঁ দিকে লেকে যাবার রাস্তা। বুদ্ধ মন্দির, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। সতীর মনে হলো যেন ওই শব্দের তালে তালে তার জীবনের উত্থান-পতনের ছন্দটা একটানা মিলে যাচ্ছে। আশ্চর্য! কোথাকার কোন্ বর্মার জীবন, এতদূরে এখানে এসেও ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। বিকেল পড়ে আসছে। বড় বড় গাছ। গাছের তলা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে নিয়ে সোজা রাসবিহারী এভিনিউতে গিয়ে মিশলো। আর তারপর ডাইনে। আর ডাইনে গিয়েই স্টেশন রোড। দীপুর বাড়ি!

বাড়ির সামনে হাজির হতেই সতী অবাক হয়ে গেল। এত বড় একটা তালা ঝুলছে সদর-দরজায়।

তাহলে ভেতরে কেউ নেই নাকি? নাকি, বাড়ি ভুল করেছে? কিন্তু কই, এই তো, এই সিঁড়ি দিয়েই তো একদিন এ-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল সতী! এই তো সেই বাইরের রোয়াকটা। সামনেই তো সেই বাইরের ঘরটা। ওপরে ওই তো রেলিং দেওয়া বারান্দা! সবই তো সেই রকম! কোথায় গেল তাহলে তারা?

রাস্তাতেও তেমন লোক চলাচল নেই। কাকে জিজ্ঞেস করা যায়। সতী বড় মুশকিলে পড়লো। পাশের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলে, তাদের সদর দরজা বন্ধ। জানালা খোলা। কিন্তু সেখানেও কেউ নেই। কোথায় কাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারা যায় তা বোঝা গেল না। তবে কি দীপঙ্কর এই ক'দিনের মধ্যেই শিলিগুড়ি চলে গেল? যাবার আগে একবার জানিয়েও গেল না? এমন করে ভুল বুঝলো সতীকে! মাথার ঘোমটা নিচু করে টেনে দিলে। কেউ হয়ত দেখলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। ডানদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় একজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণ সতী দেখতে পায়নি তাঁকে। সতীর দিকেই চেয়ে দেখছিলেন।

সেখান থেকেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাকে খুঁজছো মা?

সতী অসহায়ের মত তাঁর মুখের দিকে চোখ তুললো। বললে—এখানে এই বাড়িতে দীপঙ্কর সেন বলে একজন থাকতেন......

বৃদ্ধ বললেন—হ্যাঁ, এ তো আমারই বাড়ি, তিনি আমার বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন, রেলে চাকরি করতেন—

—তা দরজায় তালা বন্ধ কেন? তাঁরা কোথায়?

—তিনি তো চলে গেছেন। পরশু দিন এবাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেছেন। তিনি বদলি হয়ে গেছেন শিলিগুড়িতে—

—তাঁরা এখন কলকাতাতেই নেই?

বৃদ্ধ বললেন—না মা, আমি তো অন্য লোককে এ-বাড়ি ভাড়া দিয়েছি।

সতী আর দাঁড়াল না। তার পায়ের তলার মাটি যেন তখন থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। মাথার ওপর ঘোমটাটা আরো একটু টেনে দিয়ে সতী আবার সেই রাস্তা ধরলে। যে-রাস্তা দিয়ে সে এসেছিল, সেই একই রাস্তা। চলতে চলতে সতীর মনে হলো, মানুষের জীবনে ফেলে-আসা রাস্তায় ফিরে চলার মত দুর্ভোগ বুঝি আর কিছুই নেই। চারিদিকে তখন সন্ধ্যের অন্ধকার আবছা হয়ে নামলো।

সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে এক উৎসবের অনুষ্ঠান চলেছে তখন। বহুদিন আগে এই বাড়িতেই সতী থাকতো, লক্ষ্মীদি থাকতো। সতীর কাকাবাবু কাকীমাও থাকতো। সে কি আজকের কথা। এ উপন্যাস যখন শুরু হয়েছে, সে-সব তখনকার ঘটনা। এতদিন পরে এপাড়ার চেহারাও অনেক বদলে গিয়েছে। সেই মধুসূদনদের বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দিত দুনিকাকা, পণ্টাদা সবাই। সে রোয়াক এখনও আছে। এখনো সেখানে আড্ডা বসে। খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায় সকাল বেলা। কংগ্রেস, জিন্না, শ্যামাপ্রসাদ নিয়ে তুমুল হট্টগোল চলে। আর সামনে ফটিকদের সেই বস্তিটাও ঠিক সেই রকমই আছে পাথরপটির রাস্তার ধারে। কোথায় কোন কারখানায় এখন কাজ করে সে। ভোরবেলা বেরোয়, আর ফেরে রাত্রে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—আর চণ্ডীবাবুর সেই নাতি? সে-কোথায় গেল রে?

ফটিক বললে—জানিস না তুই? সে তো মারা গেছে!

—মারা গেছে? কবে? কী করে?

অত বড় লোকের নাতি। একমাত্র নাতি! স্কুলে তাদের দরোয়ান রামধনি এসে এক গ্লাস দুধ আর চারটে রসগোল্লা খাইয়ে যেত রোজ। একদিন ওই চণ্ডীবাবুর বাড়িতেই কিরণ আর দীপঙ্কর ঢুকেছিল পুলিসের ভয়ে। চণ্ডীবাবু সেদিন দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে-সব কতদিন আগেকার কথা!

ফটিক বললে—মোটরগাড়ি চড়ে যাচ্ছিল, একটা মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেখানেই মারা গেছে—

একটু আহা বেরোল দীপঙ্করের মুখ দিয়ে। একমাত্র নাতি চণ্ডীবাবুর। একমাত্র বংশধর। ছোটবেলায় ওদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, তাতেও কিছু ক্ষতি হয়নি। এবার আরো চতুর ডাকাত এসে সব টাকা সব ঐশ্বর্য নিরর্থক করে ছেড়ে দিলে একেবারে।

দীপঙ্কর বললে—ঠিক যাস কিন্তু তুই ফটিক? সব পুরোন বন্ধুদের খুঁজে-খুঁজে নেমন্তন্ন করেছি, যত বন্ধু ছিল—

—কটার সময় বিয়ে?

দীপঙ্কর বললে—ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায়। গোধূলি লগ্নে—

পুরোন বন্ধু বলতে আর কে-ই বা আছে। কিরণই বলতে গেলে আসল। তা সে-ই তো নেই। মধুসূদনকেও বলে এসেছিল। মধুসূদন এতদিন পরে দীপঙ্করকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এখন মধুসূদন ক্যালকাটা কর্পোরেশনে চাকরিতে ঢুকেছে। বললে—তুই যে আমাদের চিনতে পারবি তা ভাবিনি, তুই এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস ভাই—

দীপঙ্কর হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তা বয়েস হচ্ছে, বড়ো হবো না?

—না না, সে বড়ো নয়, তুই খুব মস্ত বড় চাকরি করিস, আমরা কিছুই হতে পারলাম না।

দীপঙ্কর মধুসূদনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে—মাইনে দিয়েই তোরা মানুষের বিচার করিস? তা যদি করিস তো আমি প্রাণমথবাবুর চেয়েও যে বড় হয়েছি রে! কিন্তু যাস্ ঠিক, ছ'টার সময় বিয়ে—গোধূলি লগ্নে—মনে থাকবে তো?

আসলে কিন্তু ছিটেই ছিল ভরসা। ছিটেই বলেছিল এই বাড়িতে আসতে। বাড়িটা খালি-পড়েই ছিল সৌভাগ্যক্রমে। ভাড়াও বেশি নয়। তিরিশ টাকা। আগে কুড়ি টাকা ছিল। এখন তিরিশ টাকা। ছিটে বলেছিল—জানিস তো জিনিস-পত্রের দাম কী রকম বাড়ছে? তা তুই যা পারবি দিবি, এর ওপরে তো কথা নেই?

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু আমি তো থাকবো না, আমি থাকবো শিলিগুড়িতে—

—তাহলে এবাড়িতে কারা থাকবে?

—এখানে ওরাই থাকবে। ওই কিরণের মা আর ওরা—আমি বিয়ের পরেই চলে যাবো—

সেই ১৯৪৪-এর বাঙলা দেশে তখন ছিটেদেরই অপ্রতিহত ক্ষমতা! কলকাতার লাটসাহেব রাইট অনারেবল আর জি কেসির চেয়েও ক্ষমতাশীল তারা। সমস্ত বাঙলা দেশে তখন ছিটেদের মতন মিলিটারি কনট্রাক্টাররা ইচ্ছে করলে রাতকে দিন করতে পারে। ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, শরৎ বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যা না করতে পারে, তা পারে ১৯৪৪ সালের একজন মিলিটারি কণ্ট্রাক্টার। তাদের কথায় তখন রাজ্য ওঠে, রাজ্য গড়ে। তারা আইন গড়ে, আবার আইন ভাঙেও। কোথাও যখন চাল নেই, কয়লা নেই, পেট্রল নেই, কেরোসিন নেই, হর্লিকস নেই—তখন তাদের ঘরে সব মজুত। তারা ইচ্ছে করলে এক মিনিটে সব সামনে এনে হাজির করতে পারে। তারা কংগ্রেস জানে না, তারা হিন্দু

মহাসভা জানে না, মুসলিম লীগ জানে না, কমিউনিস্ট জানে না, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জানে না, এমন কি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিও জানে না। তারা জানে শুধু প্রফিট। তারা জানে শুধু টাকা। অঘোরদাদুর যে-টাকা ছিল সেই টাকা দিয়ে তারা অঘোর-সৌধ তৈরি করেছিল। টাকা দিয়ে তারা কংগ্রেসকেও কিনে নিয়েছিল। টাকা উপায়ের জন্যেই ছিটে খদ্দর পরতো। আর টাকা উপায় করবার জন্যেই নিজের ভাইকে জেলে পাঠিয়েছিল। টাকা উপায়ের জন্যেই ফোঁটা কালিঘাটের কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। সুতরাং সেই ছিটেই যখন অভয় দিলে তখন আর কোনও ভাবনা রইল না দীপঙ্করের।

সত্যিই, বিয়ের সব সরঞ্জাম যে এক-দিনের মধ্যে কেমন করে জোগাড় করলে ছিটে, সেটাই আশ্চর্য। বাড়িতে এসে শুধু টেলিফোনেই সব কাজ হাঁসিল হয়ে গেল। ম্যারাপওয়ালারা বাড়ির মাথায় পাল টাঙিয়ে দিয়ে গেল। নেমন্তন্নর চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে এল এক ঘণ্টার মধ্যে। দান-সামগ্রী, বাসন, খাট, আলমারি গদী তোশক। তারপর কুশাসন, কলাপাতা, খুরী, গেলাস, মাছ, দই সন্দেশ মিহিদানা, পানের খিলি। দেখতে দেখতে একদিনের মধ্যে উনিশের একের-বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের বাড়িতে মহা-উৎসব শুরু হয়ে গেল। দীপঙ্করের কাছে মনে হলো যেন একটা আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়ে গেল রাতারাতি।

বাড়ির ভেতরে কিরণের মার সময় নেই। সকাল বেলাই গায়ে হলুদ হয়েছে। কোথায় মাছ, কোথায় দই, কোথায় তত্ত্ব, কোথায় লোকজন, কিছুই ভাবতে দেয়নি ছিটে। নিজের ঘরে বসে ছিটে শুধু হুকুম করেছে, আর চোখের পলকে সব কাজ হয়ে গেছে।

আর কাজের লোক বটে লক্কা আর লোটন। দুজনের যেন দশটা হাত। সারা গায়ে গয়না মোড়া। দামী-দামী বেনারসী ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে, তবু কামাই নেই। মাসীমা কনে সাজাচ্ছিল। লক্কা এসে বললে—মাসীমা, আপনি সরুন, আমরা আছি কী করতে শুনি?

সে লক্কা আর সে লোটনকে দেখে আর চেনবার উপায় নেই। টাকার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমাজের বুকে পা দিয়ে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। ঝিরা দুই গিন্নীর সঙ্গে সঙ্গে আঠার মত লেগে রয়েছে। দুজনের মুখে পান জুগিয়ে যাচ্ছে অষ্টপ্রহর।

লোটনের হঠাৎ খেয়াল হলো—হ্যাঁ রে এখনও বরণডালা সাজালি না তোরা? যেদিকে দেখবো না আমরা সেদিকেই চিত্তির?

লক্কা বললে—কইরে, বিকেল হলো, এক কাপ চা দিলিনে তোরা? এদিকে এখুনি যে বর এসে যাবে!

সঙ্গে সঙ্গে দশটা ঝি ছুটলো চা আনতে। ছিটের বাড়িতে লোকের অভাব নেই। একবার হুকুম করলে দশ-বিশ জন দৌড়ে গিয়ে হুকুম তামিল করে। বাড়ির উঠোনে মস্ত শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। ছিটের বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির হয়েছে। দীপঙ্করের বন্ধু-বান্ধব এসে হাজির হয়েছে। যেন ছিটেই বরকর্তা। শামিয়ানার সামনেই খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি-চাদর পরে হাত-জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক ঠাকুর মশাই।

কাউকে কাউকে পায়ের ধুলো নিয়েও আবার প্রণাম করছে।

—ফটিকবাবুর কোনও খবর পেয়েছ নাকি বাবাজী?

ছিটে বললে—আজ্ঞে আমি আর কী খবর নেব। সে দেশনেতা, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে গেছে, দেশের লোকই তার খবর রাখবে, আমি কে?

—কিন্তু গান্ধীকে তো ছেড়ে দিলে?

—আজ্ঞে কী যে বলেন! মহাত্মাজীর সঙ্গে কি আর আমার ভাই-এর তুলনা! যেদিন জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল, আজাদ, সরোজিনী নাইডু ছাড়া পাবেন, ফোঁটাও সেদিন ছাড়া পাবে। আর ছাড়া না-পেলেই বা কী করছি বলুন। দেশের জন্যে যাদের প্রাণ কাঁদে তাদের তো আর জেলের ভয় করলে চলে না!

ভেতর-বাড়িতে উঠোনের ওপর চারদিকে কলাগাছ পুঁতে ছাদনাতলা তৈরি হয়েছে। বর আসতেই শাঁখ বেজে উঠলো। অঘোর-সৌধর ওপরে খাটানো মঞ্চ থেকে নবৎ পোঁ ধরলে বেহাগে। ততক্ষণ বরযাত্রীরা এসে গেছে। চাকর-বাকর ঝি-ঝিউড়িরা ছুটো-ছুটি শুরু করে দিয়েছে চারদিকে। এয়োতীরা বরণ করতে লাগলো বরকে। পিঁড়ির ওপর বসিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরানো হলো। হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে নহবতের শব্দের তলায় একটা হৃদয়ের সব অনুভূতি সব অনুরাগ পিষে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ছাদের ওপর সার-সার লোক খেতে বসেছে। আর দুখানা গরম লুচি এ-পাতে! কী হে মন্মথ, তুমি যে কিছুই খাচ্ছো না। আরে দত্তমশাই যে, কতক্ষণ এসেছেন? আর একখানা মাছ নিন। আমি নিজে সুপারভাইজ করে রান্না করিয়েছি। রসময়, তুমি ও-লাইনে পোলাওটা নিয়ে ঘুরে যাও আর এদিকে পোনামাছের কালিয়াটা একবার রিপিট করে যাক কেশব। কী, আপনার শরীর কেমন বাড়ুজ্জে মশাই? ছেলে চিঠি দিয়েছে? তুমি তো ঘরের লোক হে অক্ষয়, চেয়ে খেতে পারো না?

ভেতরে স্ত্রী-আচারের আসরে খিলখিল হাসি আর হুলুধ্বনি চলেছে। সেখানে একমাত্র পুরুষ পাড়ার নাপিত বঙ্কিম। বঙ্কিম একদিন অঘোর-দাদুর দাড়ি কামিয়েছে।

সে তখন ছড়া কাটছে—

কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু...

তারপর বরযাত্রীরা এক ব্যাচ শেষ হতেই আর এক ব্যাচ বসলো গিয়ে। বাইরে ভিখিরী আর কুকুরের কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এ'টো কলাপাতা নিয়ে। বাড়ুজ্জে মশাই চুপি চুপি কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন—কই হে ছিটে, শুনলাম পঞ্চাশ জনের বেশি খাওয়ানোর নিয়ম নেই, এ যে দেখছি দু'তিন শো লোক—

ছিটে হাসলো। বললে—ওই দেখুন, সামনে চেয়ে দেখুন—

—কী, সামনে কী? বাড়ুজ্জে মশাই সামনে চেয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না।

ছিটে বললে—ওই যে কোণের ঘরে টেবিলে থানার ইন্সপেক্টর খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন না?

শুধু থানার দারোগাই নয়, কনস্টেবল, জমাদার, সবাই এসে গিয়েছে। হয়ত তাদের সকলের বাড়িতে মিষ্টিও চলে যাবে কাল সকাল বেলা। কেউ কিছু জানতে পারবে না, কেউ কিছু বলবার সাহসও করবে না। ফুড-কন্ট্রোল-অর্ডার বর্ণে বর্ণে পালিত হবে বেঙ্গলে। আইন ভাঙলে তার আর রক্ষে নেই।

আর যে-ঘরে একদিন সতী লক্ষ্মীদি শুতো সেই ঘরেই সম্প্রদানের অনুষ্ঠান চলেছে—

—যদিদং হৃদয়ং মম—

লক্ষ্মণ সরকার টোপর মাথায় দিয়ে মাথা নিচু করে আবৃত্তি করছে—যদিদং হৃদয়ং মম—

পুরুত মশায় আবার বললেন—তদিদং হৃদয়ং তব—

—তদিদং হৃদয়ং তব—

বাইরে তখন অঘোর-সৌধের মাচার ওপর থেকে নহবৎ নতুন রাগ ধরেছে—দরবারী কানাড়া।

আর যখন ভিড় হট্টগোল হৈ-চৈ, কোথাও কোনও শান্তি নেই, যখন রাত অনেক বাড়লো, বাসর ঘরে ঢুকলো বর-কনে। কে যেন হঠাৎ এসে বললে—মাসীমা, কনে যে কাঁদছে মাসীমা খুব—

মাসীমা বললে—তা কাঁদুক, বিয়ের দিনে কনে তো কাঁদবেই বাছা!

—কিন্তু আর যে সামলাতে পারা যাচ্ছে না মাসীমা, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে একেবারে! তুমি একটু চলো—বুঝিয়ে বলবে!

মাসীমা বললে—আমি বিধবা মানুষ, বাসর-ঘরে আর না-ই বা গেলুম—ও-রকম একটু সবাই কাঁদে, আহা বাপের কথা মনে পড়েছে হয়ত—

হঠাৎ দীপংকর এসে দাঁড়াল। বললে—মাসীমা আমি তাহলে আসি?

বলে মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। মাসীমা দীপুর চিবুকে হাত-ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললে—আজ না-গেলেই কি নয়, বাবা?

—কিন্তু কাল যে আমার শিলিগুড়িতে জয়েন করতে হবে। আপিসে। ওদিকে সময়ও তো নেই!

মাসীমা বললে—আমি আর কী বলব বাবা তোমাকে। তুমি বড় হয়েছ, তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি যা ভাল বুঝবে করবে!

দীপঙ্কর আবার মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এক-বাড়ি লোক, চারিদিকে উৎসবের কলকণ্ঠ। দীপঙ্করের চোখের সামনে হঠাৎ সব যেন নিঃঝুম নিঃশব্দ হয়ে এল। মা, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তুমি যেখানেই থাকো, আমি ন্যায় করেছি কি অন্যায় করেছি, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। তুমি তো ওপর থেকে সব দেখছো। যদি অন্যায় করে থাকি তো তুমি আমায় ক্ষমা কোর।

দীপংকর আর সেখানে দাঁড়াল না। গাড়ি তৈরিই ছিল। ডাস্টবিনের সামনে যেখানে কুকুরে আর ভিখিরিতে এ'টো কলাপাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, সেই-খানে শুধু গাড়িটা এক মুহূর্তের জন্যে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর আবার চলতে লাগলো সেকেণ্ড গিয়ারে। যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব। লক্ষ্মণ সরকার দীপঙ্করের সব অনুরোধ রক্ষা করেছে। এতটুকু আপত্তি করেনি। এক-কালে ছোটবেলায় দীপঙ্করের হাত থেকে প্রিন্স অব ওয়েলসের কদ্‌মা কেড়ে নিয়েছিল, আজকে সে সেই কদ্‌মার ঋণ বোধহয় এমনি করেই শোধ করলে!

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। রাত্রিবেলা ট্রেন ছেড়েছে। সেন-সাহেবকে স্টেশনে বিদায় দিতে আপিসের কেউ কেউ এসেছিল। কারোর দিকেই ভালো করে চেয়ে দেখতে পারেনি দীপঙ্কর। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। তারাও আবার বাড়ি ফিরে যাবে!

কিন্তু মানুষের যিনি ঈশ্বর, তাঁর কাছে তো কিছুই গোপন থাকবার কথা নয়। তিনি তো অন্তরালে বসে সব হিসেবের অঙ্ক মিলিয়ে নিয়ে তবে খালাস দেবেন। সেখানে তো সংসারের চলনসই জিনিসের কারবার নেই, সেখানে এক মুহূর্তে সব ফাঁকি সব খাদ যে ধরা পড়ে যাবে। সেখানে আমি জবাবদিহি করবো কেমন করে? স্বর্গ তো মাথার ওপরেও নয়, পায়ের তলাতেও নয়। সে যে এই অন্তরের অন্তস্তলে। বাইরে তো আমাদের অনেক বন্ধন, অনেক হিসেব অনেক অঙ্ক। কিন্তু অন্তরে তো সে বালাই নেই। সেখানে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা অখণ্ড তাৎপর্যকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। সেই যেদিন উনিশের একের বি'র বাড়িতে প্রথম ঘুঙুরের শব্দ শুনেছিল, সেই যেদিন সি আর দাশের মৃত্যুর খবর কানে এসেছিল, সেই যেদিন জেলের হাজতে গিয়ে বন্দী হয়েছিল, সেই যেদিন মার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেইদিন থেকেই তো তার জীবনের তাৎপর্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তারপর যেদিন সতী তার জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছিল তার বাড়িতে, যেদিন তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিল, আর তারপর যেদিন......

তারপর যে কত মাস কত বছর কেটে গেল। বাইরের শক্তির সঙ্গে ভেতরের শক্তির সামঞ্জস্য করতে গিয়ে কত আঘাত কত অত্যাচার সইতে হলো তার বুঝি হিসেব নেই। দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে জানালার ধারে বসে একমনে নিজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। একমনে কান পেতে শুনতে লাগলো—যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব। যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং........

ট্রেন চলেছে হু হু করে। বাইরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের সঙ্গে ট্রেনের বিদ্যুৎ-গতির তাল রেখে উর্ধ্বে-অধেঃ-অন্তরীক্ষে দীপঙ্করের একটি প্রার্থনাই শুধু নিঃশব্দে বাঙ্ময় হয়ে উঠলো—তুমি আমায় ক্ষমা কোর—

কলকাতার দিন তখন থম-থমে, রাত তখন নিথর। দীপঙ্কর কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু কলকাতা থেমে থাকেনি। তখনও ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে মিলিটারি-কণ্ট্রাক্টারের বাড়ির সিন্দুকে লক্ষ লক্ষ টাকা এসে জমছে। টাকার স্রোত বয়ে চলেছে। অঘোরদাদুর লক্ষ টাকার সোনা-জহরত ছিল, তাতে এসে মিশলো মিলিটারি ক্যাপিট্যাল। সেই ক্যাপিট্যাল সোনা হয়ে হীরে হয়ে মুক্তো হয়ে জমতে লাগলো দিনের পর দিন রাতের পর রাত। দীপঙ্করের নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ইস্পাতের চাকার শব্দের মত তাতে ঠুং-ঠাং শব্দ হতে লাগলো। কলকাতার অন্ধকার নিথর রাতে কান পেতে থাকলে শোনা যেত সেই অদ্ভুত শব্দ। কিসের শব্দ বোঝা যেত না। কিন্তু মনে হতো—কেউ যেন অতি সন্তর্পণে ধারালো ছুরিতে আরো ধারালো শান দিচ্ছে—

আর শেষ হয়ে গেল মানুষের হাতে গড়া এক ভয়াবহ যুদ্ধ। ছ'বছর একুশ ঘণ্টা তেইশ মিনিটের লড়াই। চার্চিল সাহেব সখেদে বললে—

'What is Europe now? It is a rubble heap, a charnel house, a breeding place of pestilence and hate.'

লক্ষ লক্ষ টন ঘৃণা আর কোটি-কোটি টন প্রতিশোধ-স্পৃহার ভারে মানুষের মনের দরজায় এসে নামলো শান্তি। কবরের শান্তি। কোথাও যুদ্ধ নেই, কোথাও পুলী-বারুদ-বোমার শব্দ নেই, তবু চারিদিকে ধুমায়িত হাহাকার আর আক্রোশ। রুজভেল্ট সাহেব বিবৃতি দিলে—

—The mere conquest of our enemies is not enough. We must go on to do all in our powers to conquer the doubts and fears, the ignorance and the greed, which made this horror possible.

সেই সন্দেহ আর ভয়, অজ্ঞতা আর লোভ দূর করতেই একদিন ওয়ার্ধার আশ্রমের সামনে এসে দাঁড়াল একজন অচেনা মানুষ। কোমরে তার রিভলবার কিন্তু হাতে একটা চিঠি।

—কে চিঠি লিখেছে?

লিখেছে এইচ-ই ফিল্ড মার্শাল দি রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল অফ সাইরেনাইকা এণ্ড উইনচেস্টার পি সি, জি-সি-বি, জি-এম-এস-আই, জি-এম-আই-ই, সি-এস-জি। ইত্যাদি ইত্যাদি। নামের চেয়েও বড় তার পদবী। আর তার পরদিন দেখা গেল একজন ন্যাংটা ফকির ভাইসরয়ের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ময়ূর সিংহাসনের সামনে গিয়ে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন—আমার নাম—এম-কে-গান্ধী!

আর ওদিকে পুণা জেলখানা থেকে ছাড়া পেলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, আচার্য নরেন্দ্র দেও, কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আবুল কালাম আজাদ, প্রাণমথবাবু। আর ছাড়া পেলেন ফটিক ভট্টাচার্য। ফোঁটা। কালিঘাট কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট।

ইতিহাসের নিয়ম বড় অদ্ভুত। সে নিয়ম বাইরে থেকে দেখা যায় না। বাইরে থেকে তাকে বদলানোও যায় না। সে নিয়ম যখন বাইরে প্রকাশ হয় তখন অবাক হয়ে লোকে ভাবে এ কেমন করে হলো। নেপোলিয়নের নিয়মে হিটলার কি চার্চিল কি রুজভেল্টের বিচার করলে তাই ভুল হয়। অথচ শাস্ত্রে বলে বিধাতার নিয়ম বড় যথাযথ, বড় অমোঘ, বড় শাশ্বত। ইতিহাস-বিধাতার সেই নিয়মের যেখানে ব্যতিক্রম করবার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই ঘটেছে বিরোধ। একজন মানুষ যখনই সমস্ত পৃথিবীর মুখের চেহারা বদলে দিতে গিয়েছে, সেই অমোঘ ইতিহাস-বিধাতার বিধানে কখন যে সে নিজেই পৃথিবী থেকে মুছে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে তার হিসেব কোথাও লেখা নেই। একদিন ইণ্ডিয়ার লোক প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিয়েছে চার্চিলকে, অভিশাপ দিয়েছে হিটলারকে, অভিশাপ দিয়েছে মুসোলিনী তোজো সকলকে। তাদের সকলেরই বিচার হয়েছে নুরেমবুর্গ কোর্টে। গোয়েবলস গোয়েরিং রিবেন্ট্রপ—তারাই হয়ে গেল পৃথিবীর এনিমি নাম্বার ওয়ান। আর চার্চিল হলেন পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। মানুষের পৃথিবীর ইতিহাস তাই শুধু বিজেতাদের ইতিহাস, সার্থকনামাদের ইতিহাস, সাকসেসফুলদের ইতিহাস। কিন্তু যারা হেরে গেল? সেই হেরে যাওয়া মানুষদের প্রতিনিধি হারম্যান গোয়েরিং বললেন—আর কেউ দোষী নয়, পৃথিবীর যা কিছু অপকর্ম সমস্তর জন্যেই আমি একলা দায়ী।

I am responsible for German rearmament, I always wanted bombers for bombing the United States. I personally gave the orders to bomb Warsaw, Rotterdam and Conventry. I do not propose in any way to hide behind the fuehrer.

কলকাতার রোয়াকে আবার জটলা। দীপঙ্কর কলকাতায় নেই বলে তো কলকাতা থেমে থাকতে পারে না! মধুসূদনের রোয়াকে দুনিকাকা, পঞ্চাদা, মধুসূদনের বড়দা আবার খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। গান্ধী-জিন্না-ওয়াভেল-এর ব্যাপার নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে আড্ডায়-আড্ডায়।

ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট কি চলে যাবে নাকি! বলে কি? দনিকাকা যেন কেমন ঘাবড়ে গিয়েছে ব্যাপার-স্যাপার দেখে। শেষকালে কি সত্যিই চলে যাবে সাহেবরা আমাদের অনাথ করে?

পণ্টাদা বলে—এইবার? এইবার কী হবে দনিকাকা? সাহেবরা যে চলে যাচ্ছে, তোমার কী হবে?

দনিকাকা বিরস মুখে কাগজ পড়ছিল। বললে—ভালোই তো, ভালোই তো! গেলে তো ভালোই! আমি কি আর স্বরাজ চাই না বলতে চাস্? কংগ্রেস যদি দেশ চালাতে পারে তো চালাক না—আমি কি খারাপ বলছি?

মধুসূদনের বড়দা বললে—আলবাৎ চালাবে! চালানোটা কী এমন হাতী-ঘোড়া কাজ শুনি? সব তো করবে আই সি এস্'রা, দেখবে সব শালাদের মুখ চুন হয়ে যাবে এবারে। এবার গান্ধী আবার চালের দাম তিন টাকা করে দেবে, ভাইসুরয়ের মাইনে হয়ে যাবে পাঁচ শো টাকা মাসে—

—ভাইসরয় কে হবে তাহলে?

—যে-ই হোক, নেহরুই হোক আর গান্ধীই হোক আর বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদই হোক, পাঁচশো টাকার বেশি মাইনে নিতে কংগ্রেস অ্যালাও করবে না—আর যারা অ্যাদ্দিন ব্ল্যাক্-মার্কেট করেছে তাদের কী করবে জানো তো?

—কী করবে?

কী করবে তা জওহরলাল নেহরু বলেই দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৫ই অক্টোবর লখ্নৌতে পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিয়েছেন—There is much talk about war-criminals. The time is not far off when we shall prepare one list of anti-naional criminals, those who mercilessly croushed the spirit of our patriots, who opened fire on them, who accepted bribes and sucked the blood of the poor. We shall never forget them.

রেলের আপিসেও সবাই লাফিয়ে উঠেছে। এবার? এবার সাহেবদের পাত্তাড়ি গুটোতে হবে ইন্ডিয়া থেকে। তিন হাজার চার হাজার টাকা মাইনে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে আর হুকুম করা চলবে না বাছাধনদের। দিনের পর দিন ওয়াগন ভর্তি করে বোমা-বারুদ পাঠিয়েছে আসাম ফ্রন্টে। সেখানে জাপানীরা মণিপুরে এসে ঢুকে পড়েছে। দিন নেই রাত নেই কণ্ট্রোলাররা ট্রেন পাঠিয়েছে সোলজার ভর্তি করে। তোজোকে আসতে দেওয়া হবে না। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার লট্‌কে দিয়েছে—জাপানকে রুখতে হবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেদিন কেউ জানতে পারেনি—সে তোজো নয়, সে সুভাষ বোস। সেই সুভাষ বোসই তখন নেতাজী হয়ে গেছেন।

একদিন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন আবার জমজমাট হয়ে উঠলো। অঘোর-সৌধের সামনের রাস্তায় গাড়ির পর গাড়ি জমে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। ফুলের মালা হাতে

করে কালিঘাট ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা ভিড় সরাতে লাগলো। কালিঘাট কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, নরেন্দ্র দেও, সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে প্রাণমথবাবুও ছাড়া পেয়েছে। আর ছাড়া পেয়েছেন কালিঘাটের ছেলেদের ফোঁটাদা!

ফুলের মালায়-মালায় ফোঁটাদাকে ভালো করে দেখাই যায় না। স্টেশন থেকে গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আসতে আসতে চারদিকের জনতাকে মাথা নিচু করে প্রণাম করেছে। বাড়ির সামনে আসতেই ভিড়ের চাপ আর রোখা গেল না। সবাই এক-সঙ্গে দেখতে চায় শহীদকে। প্রাণমথবাবু বুড়ো মানুষ। তিনি নিজের বাড়ির সামনেই নেমে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির সামনে অত ভিড় নেই। তবু সবাই জানতে চায়—মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা। জিন্নার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে?

সেদিন সবাই মিলে ধরে বসলো—ফোঁটাদা, আপনি দাঁড়িয়ে উঠে কিছু বলুন আমাদের—

ফোঁটা অগত্যা দাঁড়িয়ে উঠলো। সেই ফুলের মালা গলায় দিয়ে নিজের বাড়ির উঠোনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ভাই, আমি আজকে ক্লান্ত। তবু আপনাদের অনুরোধ না রেখে পারছি না। কিছু আমাকে বলতেই হচ্ছে। আমি আজ পঁচিশ বছর ধরেই জেল খেটে আসছি। জেল খাটতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু আজ জেল থেকে বেরিয়ে আমি আপনাদের যে একটা সুখবর শোনাতে পারবো, এইটেই আনন্দের কথা। আমি আজ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আমাদের এই আত্মত্যাগে ব্রিটিশ-সিংহ ভয় পেয়ে আজ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হয়েছে। যে স্বাধীনতার জন্যে দেশবন্ধু সি আর দাশ, বালগঙ্গাধর তিলক, মহামতি গোখলে, লালা লাজপত রায় জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু যে স্বাধীনতা অর্জন হয়নি, সেই স্বাধীনতা আমরা আজ আনতে পেরেছি, অহিংস-সংগ্রাম করে। অহিংসার প্রতিমূর্তি গান্ধীজীর কাছে আজকের ব্রিটিশ-সিংহ নতি স্বীকার করেছে। এখন মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হলেই ব্রিটিশরা এখান থেকে চলে যাবে। মহাত্মা গান্ধীকে লর্ড ওয়াভেল যে চিঠি লিখেছে, সে চিঠিও আমাকে দেখিয়েছেন গান্ধীজী। আমি নিজের চোখে সে চিঠি দেখেছি। আপনারা আর কিছুদিন ধৈর্য ধরুন। অহিংসায় বিশ্বাস রাখুন। তারপরে আমি দিল্লিতে যাবো। তখন আপনারা সমস্ত জানতে পারবেন—বন্দে মাতরম্—

সবাই ফোঁটাদার গলায় সুর মিলিয়ে এক-সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

প্রাণমথবাবুর বাড়ির ঘরখানার ভেতরেও লোক-জনের আনাগোনার শেষ নেই। পাড়ার কংগ্রেসীরা সামনে এসে ভিড় করে থাকে দিনরাত। প্রাণমথবাবু কিছু বলেন। আবার কিছু বলেনও না। বলেন—কিন্তু আমার মনে হয় এর অন্য কারণ। এত লোক জেল খেটেছে বলেই যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স

দিচ্ছে তাও ঠিক নয়—

সবাই জিজ্ঞেস করে—তাহলে আসল কারণটা কি?

প্রাণমথবাবু বলেন—আসল কারণটা সন্দেহ করি অন্য। এতদিনের যুদ্ধের পর আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্মির পঁচিশ লক্ষ লোক দেশে ফিরে আসছে, তারা বেকার হয়ে যাবে তখন, তাদের ভয়েই চলে যাচ্ছে ওরা। আজকাল আর্মির ভেতরেও যে স্বদেশীর বিষ ঢুকেছে। সে ওরা সার্ভে করে দেখেছে। আর তা ছাড়া .....

—তা ছাড়া কী?

—তা ছাড়া, সুভাষবাবুকেই ওদের আসল ভয়। সুভাষবাবুই গান্ধীজীর কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছেন! জেনারেল অকিনলেকের বক্তৃতা পড়েও তাই মনে হয়।

—তাহলে যারা ওয়ার প্রিজনার তাদের কী হবে? অরুণা আসফ আলীর কী হবে? জয়প্রকাশ নারায়ণের কী হবে? তারাও তো ফর্টি-টু থেকে হিংসার পথ বেছে নিয়েছিল?

প্রত্যেক কংগ্রেসী-আড্ডায় এমনি আলোচনা চলেছে। তখন সমস্ত দেশের লোক গান্ধীজীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রাণমথবাবু বলেন—গান্ধীজী কনডিশন দিয়েছেন লর্ড ওয়াভেলকে যে যে-সব লোককে ধরা হয়েছে, তাদের বিচার করতে হবে ওপন্ কোর্টে, তবে তিনি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কথা শুরু করবেন—

সে-সব দিন বড় থম্‌থমে, রাতগুলো বড় নিথর। যারা সুভাষবাবুর দলে যোগ দিয়েছিল তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? শা নওয়াজ খাঁ, ক্যাপ্টেন ধীলন, লক্ষ্মীবাঈ, সর্দার জীবন সিং—সকলকে? সুভাষ বোস যদি ধরা পড়ে—তাকেও?

কলকাতা থেকে ওয়ার্ধা, মাদ্রাজ থেকে ওয়ার্ধা, বোম্বাই থেকে ওয়ার্ধা, লণ্ডন থেকে ওয়ার্ধা। সমস্ত ইণ্ডিয়া তখন ওয়ার্ধায় এসে মিশেছে। সেখানে চার্চিলের ন্যাংটো ফকির চরকায় সুতো কাটতে কাটতে টেলিগ্রাফ আর চিঠিগুলো পড়ে। লণ্ডনের খবরের কাগজের লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে—চার্চিল আপনাকে কী বলেছে, আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি।

তারপর চরকায় সুতো কাটতে কাটতে চিঠির খসড়া লিখলেন,—
Dear Mr. Churchill, you are reported to have a desire to crush the simple "Naked Fakir." I have been long trying to be a Fakir and that naked a more difficult task. I approach you to trust and use me for the sake of your people and mine and through them, those of the whole world.

প্রাণমথবাবু ওয়ার্ধা যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ওদিক থেকে টেলিগ্রাম

মথবাবু ওয়ার্ধা যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ওদিক থেকে টেলিগ্রাম

এসেছে। প্রাণমথবাবুর আর সে-শরীর নেই। সেই পান-ভর্তি মুখ, সেই গোড়ালি দোমড়ানো জুতো। হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গোবিন্দ। বললে—একটা টেলিগ্রাম আছে বাবু—

—টেলিগ্রাম? আবার কার টেলিগ্রাম রে?

তাড়াতাড়ি খামটা খুলে দেখলেন—নিচেয় নাম লেখাঃ দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর মস্ত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে শিলিগুড়ি থেকে। লিখেছে—স্যার, কাগজে দেখলাম আপনি গান্ধীজীর কাছে যাচ্ছেন। আপনার সেখানে অনেক কাজ জানি। কিন্তু আমার একটা কাজের ভার দিলাম আপনাকে। আপনি কিরণকে চেনেন। সে কংগ্রেসের কেউ নয়, কিন্তু আপনার ছাত্র, আর আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ ফাঁসির আসামী। জানি গান্ধীজী অহিংসার পূজারী। কিন্তু তিনি হিম্মতের কদর বোঝেন। তার কথাটাও একবার তুলবেন তাঁর কাছে। তুললে তিনি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন। সে-ও আপনাদের মত দেশকে ভালবেসেছিল—ইতি, দীপঙ্কর।

প্রাণমথবাবুর সব মনে পড়লো। বললেন,—চলো—

গাড়ি চলতে লাগলো। হাওড়া স্টেশনের দিকে চলেছেন প্রাণমথবাবু। সঙ্গে অনেক কংগ্রেসের ফাইল। সেই ফাইলের মধ্যেই টেলিগ্রামখানা ঢুকিয়ে নিলেন। তীর্থে সবই পুণ্য। তীর্থযাত্রীর কাছে পাপ-পুণ্য সব সমান। প্রাণমথবাবু আর একটা পানের খিলি মুখে পুরে দিলেন।

কিন্তু হাওড়া স্টেশনের কাছে গাড়িটা যেতেই হঠাৎ ভিড়ের সামনে গাড়িখানা থমকে থেমে গেল। কী হয়েছে? ট্রেন মিস্ করবেন নাকি? এত ভিড় কীসের হে এখানে? কিন্তু কে-কার কথা শুনছে। হৈ-চৈ হট্টগোল, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি সমস্ত অচল হয়ে গেছে। হঠাৎ যেন বোঝা গেল। আরো কয়েকটা লোক ওদিক থেকে দৌড়ে এল হাত উঁচু করে। টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম!

—কীসের টেলিগ্রাম?

অনেকগুলো হকার চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল—নেতাজী মর গিয়া, নেতাজী মর গিয়া......

সেই আর্তনাদে কলকাতার থমথমে দিন যেন আরো থম্‌থমে হয়ে গেল। কলকাতা এতদিনে সত্যিই যেন থেমে অচল হয়ে গেল। নির্বাক হতবুদ্ধি প্রাণহীন কলকাতার মানুষ ভাবতে ভুলে গেল, কাঁদতে ভুলে গেল। যে-সুভাষ বোসের জন্যে এতদিন প্রতীক্ষা করেছে ইণ্ডিয়ার মানুষ, তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত কলকাতাও নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। কান্নায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। আর্তনাদ করে উঠলো সমস্ত মানুষের অন্তরাত্মা!

রামমনোহর দেশাই ক্যাপিট্যালিস্ট লোক। ব্যবসাদার। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট! দেশে

কংগ্রেসই আসুক আর হিন্দু মহাসভাই আসুক, তাতে কিছু এসে যায় না তার। দেশাইজী ভেতরে-ভেতরে চাঁদা দিয়েছে কংগ্রেসকে। বেয়াল্লিশ সালে কংগ্রেসীরা এসে তার কাছ থেকে হাজার-হাজার টাকা নিয়ে গেছে। গান্ধী-রাজই হোক আর চার্চিল-রাজই হোক, যে-রাজা হবে তাকেই চাঁদা দিতে হবে মশাই। ব্যবসার এই নিয়ম। তোমাদের বাঙলা-মুলুককে কারবার করতে এসেছি, তোমাদের কাছে নিমকহারামী করতে পারবো না। মুসলিম লীগ রাজা হলে তাকেও চাঁদা দেব। আমি কি তোমার পর? শুধু আমার কারখানায় ধর্মঘট হলে তোমরা দেখো। তখন যেন আমায় বিদেশী বলে হেলা-ফেলা কোর না।

সেদিন গদীবাড়িতে ক্যাশ বাক্সের সামনে বসতেই টেলিফোন বেজে উঠলো।

—কে?

ওদিক থেকে উত্তর এল—ঘোষাল স্পীকিং!

—হুজুর, আপনি?

আর একটু হলেই গদী থেকে লাফিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত দেশাইজী। খুব সামলে নিয়েছে।

—কবে ছাড়া পেয়েছেন হুজুর?

—লাস্ট উইকে। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে দেশাইজী! আমার প্যালেস্-কোর্টে একবার আসুন এখনি!

—জরুর, জরুর, আমি এখনি যাচ্ছি হুজুর।

—সঙ্গে করে হাজার পাঁচেক টাকা আনবেন আমার জন্যে দেশাইজী!

প্যালেস-কোর্টের সিঁড়িতে মকবুল, যতীন, জগন্নাথ আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আজ প্রায় আধ-ফাঁকা হয়ে গেছে প্যালেস-কোর্ট। যে-কজন ইউ-রোপীয়ান ছিল এখানকার টেনেণ্ট, তাদের কয়েকজন ইণ্ডিয়া ছেড়ে হোমে চলে গিয়েছে। হোম, সুইট হোম। কেউ কেউ গেছে সাউথ আফ্রিকায়, কেউ গেছে কানাডায়, আবার কেউ গেছে হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ায়। কয়েকজন আবার যাবার তোড়-জোড় করছে। এবার ইণ্ডিয়া যাবার দাখিল।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার এবার কোল্যাপ্স্ করলো বলে। পেথিক্ লরেন্সের কথা-বার্তা শুনে তাই মনে হচ্ছে। আবার নতুন কোনও কলোনীতে গিয়ে সেট্‌ল্ করতে হবে। মিস্টার গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবে কি না ইণ্ডিয়ার ভাইসরয়! হোয়াট্ এ ডিসগ্রেস্! হোয়াট্ এ শেম্! প্যালেস-কোর্টের বয়-বাবুর্চি-খান-সামাদের মুখও চুন হয়ে গিয়েছে। সাহেবরা চলে গেলে খাবো কী? কে এত বখ্‌শিশ দেবে? কারা এত টিপ্স্ দেবে? মকবুল, যতীন, জগন্নাথের মুখও শুকিয়ে গিয়েছে। সাহেবরা চলে গেলে ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট যে কানা হয়ে যাবে। ফিটন্-গাড়িতে চড়ে আর মেম-সাহেবরা ঘুরে বেড়াবে না। সুইটসিক্সটীন বলে আর কাদের তারা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে দালালি করবে? ঘোষাল-সাহেবও ছিল না। বলতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল মকবুলের দল।

কিন্তু ঘোষাল-সাহেব ছাড়া পেতেই যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। দল বেঁধে এসে হাজির হলো পীরালির কাছে। পীরালি গিয়ে খবরটা দিতেই সাহেব ক্ষেপে উঠেছে একেবারে। ভেতর থেকে সাহেবের চিৎকার শোনা গেল—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্, ভাগাও হিঁয়াসে—ভাগাও—

পীরালি সামনে এসে বললে—তুমলোক যাও ভাইয়া, সাহেবের গোসা হয়েছে—

মকবুল বললে—গোসা হয়েছে তো কী হয়েছে? কাজ-কাম্ হবে না? আমরা না-খেয়ে মরবো?

পীরালি বললে—সায়েবেরই কাজ-কাম নেই তো তোদের কথা ভাববে কখন? তোরা এখন বাহার যা—

কিন্তু মকবুলেরা জানে। তাই অত সহজে তারা ঘাবড়ায় না। তারা জানে সাহেব-লোকদের কাজ-কাম একটা জুটবেই। তামাম দুনিয়াটাই সাহেবদের। একটা টেলিফোন করে দেবে সাহেবদের আপিসে আর কাম জুটে যাবে। সাহেবদের নোক্‌রি একটা থাকবেই। তাদের টাকা না-থাকলে তাদের পেটে ভাত জোটে না, কিন্তু সাহেবদের টাকা না থাকলেও হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি-বীয়ার-এর অভাব হয় না কোনওদিন। সাহেবরা বেঁচে থাকবেই। সাহেবরা আছে বলেই তো মকবুলরা আছে। সাহেবরা না থাকলে তারাও থাকবে না।

ক'দিন ধরেই আসা-যাওয়া চলছিল। কয়েকদিন ধরেই সাহেব টেলিফোনে বাত-চিত করতে লাগলো। আবার গাড়ি আসতে লাগলো সাহেবের কাছে। আবার সাহেবের বাড়ি ফিরতে রাত হতে লাগলো। আবার সাহেব ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে যাতায়াত করতে লাগলো। যখন বাড়ি ফিরতে লাগলো তখন আবার বেহেড।

রামমনোহর দেশাইজী আবার টাকা নিয়ে আসতে লাগলো। আবার বখ্‌শিশ দিতে লাগলো পীরালিকে।

মকবুল যতীন জগন্নাথ আবার এসে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ায়।

—কী হলো পীরালি? সাহেবের কিছু হলো?

পীরালি বললে—চুপ, চুপ, আর কিছুদিন চুপ করে থাকো তুমলোক, সাহেবের নোকরি হয়েছে—

নোকরি হয়েছে! সাহেবের নোকরি হয়েছে শুনে মকবুল যতীন জগন্নাথের দল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ইয়া আল্লা! জয়-মা-কালী! ব্যোম ভোলানাথ! তার পরদিন থেকেই বিরাট বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়ায় প্যালেস-কোর্টের সামনে। উর্দি-পরা নতুন ড্রাইভার। প্যালেস-কোর্টের পোর্টিকোতে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। আর গাড়ির খবরটা দিলেই সাহেব তখন ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নেয়। কোট-প্যান্ট পরে নিচেয় গাড়িতে গিয়ে বসে। আর গাড়িটা সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

সেদিন ড্রাইভারটার সঙ্গে ভাব করলে পাঁরালি। জিজ্ঞেস করলে—ড্রাইভার সাব, সাহেবকে কোথায় নিয়ে যাও তুমি রোজ?

ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে বসে ছিল। বললে—ঘোষাল সাব?

—জী হাঁ! ঘোষাল সাহেব নোকরি করছে?

ড্রাইভার বললে—সাব তো আমাদের কোম্পানীর জানরাল মানেজার!

—কেতনা তলব পায় সাহেব?

—তিন হাজার রুপেয়া।

—কোন্ কোম্পানী?

ড্রাইভার বললে—বজবজকা পেট্রল কোম্পানী! বহুত বড়িয়া কোম্পানী। ওই কোম্পানীকা জানরাল মানেজার ঘোষাল সাব।

সেটা পাঁরালি আন্দাজ করতে পেরেছিল ক'দিন ধরেই। রেল-কোম্পানীতে সাহেব পেত হাজার টাকা। এখন তিন হাজার। তিন হাজারের কেতা-দুরস্ত সাহেবের চাল-চলনে। সাহেব আরো গম্ভীর হয়ে গেছে আজকাল। আরো দামী-দামী সুট পরে। আরো দামী-দামী বোতল আসে সাহেবের ঘরে। সকালবেলা খবরের কাগজখানা পড়তে পড়তে আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে! অল্ রট! নেকেড্ ফকিরকে লর্ড ওয়াভেল ডেকেছে। নেহরুকে ছেড়ে দিয়েছে। কংগ্রেসকে ইনভাইট করেছে ভাইসরিগ্যাল লজ-এ! হোয়াট এ ডিসগ্রেস। হোয়াট এ শেম! মিস্টার আমেরী হাউস-অব-কমন্স-এ লেকচার দিয়েছে—

"I understand from published reports that the conversation between Mr. Gandhi and Mr. Jinnah broke down over the issue of Pakistan, but that both gave expression to the hope that this was not the final end of their effort."

রট! ডাউন উইথ গান্ধী! ডাউন উইথ জিন্না! এদের এত ফ্ল্যাটার করে-করেই ব্রিটিশের প্রেস্টিজ চলে যেতে বসেছে! রাগে মিস্টার ঘোষালের গলার নেকটাইটা টাইট হয়ে ওঠে! এরই নাম রুল ব্রিটানিকা! তারপর গট্ গট্ করতে করতে নেমে আসে নিচের পোর্টিকোতে। গাড়ির ভেতর গিয়ে বসে। গাড়িটা চলতে চলতে এসপ্ল্যানেডের মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

—আই সে, ওদিকে যাবেন না। ওদিকে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। বি কেয়ারফুল। মব্ ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠেছে!

—হোয়াট? হোয়াটস্ রং? কী হয়েছে?

ওদিক থেকেই একজন ইউরোপীয়ান গাড়ি চালিয়ে আসছিল। সেই বুঝিয়ে বললে সমস্ত। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে ব্লাডি নেটিভরা ক্ষেপে গেছে। লাঠি নিয়ে চারমটলা স্ট্রীটের আশে-পাশে হাজার-হাজার লোক জড়ো হয়েছে। ইউরোপীয়ান দেখলেই তার হ্যাট খুলে নিচ্ছে, নেকটাই খুলে নিচ্ছে। কোট-প্যাণ্ট সব ছিঁড়ে দিচ্ছে! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য সেদিনকার কলকাতার। পার্ক-স্ট্রীট অঞ্চলের সমস্ত ইউরোপীয়ান অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-কোয়ার্টারের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ক্যালকাটা থেকে ইউরোপীয়ানদের সবাইকে নাকি চলে যেতে হবে। নেটিভরা কাউকে এখানে নাকি থাকতে দেবে না। কাউকে হ্যাট-নেকটাই পরতে দেবে না। কাউকে সুট পরতেও দেবে না নেটিভরা। ইংরেজদের হোটেল-দোকান সব বাড়ির কাচের জানলায় ঢিল ছুঁড়ছে। রাতারাতি ইণ্ডিয়া যেন ফ্রি হয়ে গেছে। রট! অল রট! রটন টু দি কোর! দিস ইজ গান্ধী! দিস ইজ জিন্না! সারা পৃথিবীতে ভিক্টরির পর এখানে এসে এই ডিফিট!

মিস্টার ঘোষাল বললে—গাড়ি ঘুমাও—

গাড়ি ঘুরলো। সাহেব আবার প্যালেস-কোর্টে ফিরে এল! পাঁরালি দৌড়ে এসে হাজির। গাড়ি থেকে নেমেই সাহেব বললে—জগন্নাথকো বোলাও—

খানিক পরেই জগন্নাথ এল হাঁফাতে হাঁফাতে। বললে—সেলাম হুজুর!

—গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর খবর কী জগন্নাথ? তালাস করেছিস?

জগন্নাথ বললে—আছে হুজুর। সব ঠিক আছে!

—আচ্ছা যা!

বলে মিস্টার ঘোষাল চুরোটটা ধরালে আবার। তারপর আবার ডাকলে। বললে—শোন—

জগন্নাথ ফিরে আসতেই বললে—তোকে একবার শিলিগুড়ি যেতে হবে, পারবি? খুব শক্ত কাজ!

—খুব পারবো হুজুর, জগন্নাথ কোনওদিন 'না' বলেছে হুজুর? যে কাজ দেবেন সেই কাজই পারবো আমি হুজুর!

—আচ্ছা তুই যা। মিস্টার ঘোষাল চুরোটটাকে আবার দাঁতে কামড়ে চিবিয়ে নিলে।

রেলওয়ে আপিসেও তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। সাজ সাজ রব চারদিকে। জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার, সি-ও-পি-এস, সি-সি-এস, ডি-টি-এস সবাই ব্যস্ত। বছরে একবার জেনারেল ম্যানেজারের ইনস্পেকশ্যান স্পেশ্যাল যায়। সমস্ত জোনে ঘুরবে স্পেশ্যাল। জেনারেল ম্যানেজার নিজে সব জমিদারী দেখবে। প্রজাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা হবে। এই দিনই প্রথম লোকে তাকে চাক্ষুষ দেখবে। ক্রফোর্ড সাহেব ঘন-ঘন তলব দিচ্ছে মিস্টার ভার্মাকে। ঘন-ঘন তলব দিচ্ছে অভয়ঙ্করকে। সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই এক অবস্থা। ক্রফোর্ড সাহেব অস্থির হয়ে উঠেছে। কে-জি-দাশবাবু, রামলিঙ্গমবাবু ফাইল নিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে পা মাথা করে ফেললে। একবার রেকর্ড সেকশন আর একবার ডি-টি-এস-এর ঘর। জেনারেল-ম্যানেজার সকলকে হয়রান

করে মারবে! তারপর যখন স্পেশ্যাল শেষ হয়ে যাবে তখন আবার কিছুদিনের জন্যে সব ঠান্ডা! আর তারপর তো রাম-রাজত্ব! পাসবাবু একবার এ-সেকশানে যায়, আর একবার ও-সেকশানে! বলে—কিছু শুনলেন নাকি কে-জি-দাশবাবু?

—কীসের কী?

হরিশবাবু বললে—শুনলাম নাকি আমাদের আপিস ট্রানসফার হয়ে যাচ্ছে?

—আরে রাখুন মশাই আপনি, দেখছেন আমরা এখন জেনারেল-ম্যানেজারের স্পেশ্যাল নিয়ে হিম-শিম খেয়ে যাচ্ছি—এখন চাকরি রাখাই আমাদের দায় হয়ে উঠেছে—

ক্রফোর্ড সাহেব কিছুতেই খুশী নয়। ভার্মা গিয়ে ফাইল এগিয়ে দেয় সামনে। অভয়ঙ্কর গিয়ে ফাইল এগিয়ে দেয়। তবু কিছুতেই খুশী হয় না মিস্টার ক্রফোর্ড। বলে—নো নো, দিস ইজ নট দি থিং—

শেষকালে কোনও উপায় না দেখে এসটাবলিশমেণ্ট সেকশানের সুধীর-বাবুকে ডেকে পাঠায়। বলে—সেনকে টেলিগ্রাফ করে দাও হেড ক্লার্ক, তাকে এখনি চলে আসতে টেলিগ্রাফ করে দাও, সেন যাবে স্পেশ্যাল ট্রেনে—এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ—

সুধীরবাবু সেকশানে গিয়ে বলে—কী জ্বালা! সেন-সাহেব না হলে কি আর রেল চলবে না মশাই? ক্রফোর্ড সাহেবের যে কী এক ফ্যান্সি হয়েছে।

সত্যিই অনেক সাহেব দেখেছে সুধীরবাবু। বহুদিন চাকরি হয়ে গেল তার। অস্বরুন সাহেব থেকে শুরু করে রবিনসন সাহেব পর্যন্ত অনেক সাহেব দেখেছে সুধীরবাবু। প্রত্যেক বছরেই এরকম স্পেশ্যাল ট্রেন ছেড়েছে। জেনারেল-ম্যানেজারের টুর-প্রোগ্রাম এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যেন সবই উল্টো-পাল্টা। এবার যেন ক্রফোর্ড সাহেবের মত মানুষও একটু বিচলিত হয়েছে। তা বিচলিত হবার মত দিন-কালও পড়েছে। সেই সব যুগ আর নেই রেলওয়েতে। এখন ক্লার্করা আর আগেকার মত কাজ করে না মন দিয়ে। এখন ইউনিয়ন হয়েছে। এখন কমিউনিস্টরা ঢুকেছে চাকরিতে। নতুন-নতুন ছোকরা সব। সব কথাতেই কোড্ দেখায়। ম্যানুয়্যাল দেখায়। এখন দেয়ালে-দেয়ালে হাতে লেখা পোস্টার এঁটে দেয়। রেলওয়ে-বোর্ড থেকে এখন কড়া-কড়া চিঠি আসে। আগেকার চেয়েও কড়া। পার্লামেণ্টে কোশ্চেন ওঠে। যত স্বদেশী হবার কথা উঠছে ততই যেন চাপ পড়ছে। সব কথাতেই এখন দিল্লি থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। আরে, এতই যদি কৈফিয়ৎ চাওয়া তো এখানে হেড-আপিস রাখা কেন? হেড-আপিস দিল্লিতে উঠিয়ে নিয়ে গেলেই হয়!

সেদিন ক্রফোর্ড সাহেব আবার ডেকে পাঠালে। সুধীরবাবু ঘরে যেতেই সাহেব বললে—লুক হিয়ার হেড ক্লার্ক, সেনকে আর একটা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাঠাও—বলে দাও, ট্রেন থেকে নেমেই যেন ডাইরেক্ট আমার সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত মেস-আপ করে রেখে দিয়েছে এরা—

তা তাই-ই সই। সেইভাবেই সুধীরবাবু টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিল। সেদিন সকাল বেলাই ক্রফোর্ড সাহেব আপিসে এসে হাজির। ব্রেকফাস্ট করা হয়নি। আর কটা দিন। তারপরেই ক্রফোর্ড সাহেব চলে যাবে চাকরি ছেড়ে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানাডায় গিয়ে সেটেল করবে। আর ইণ্ডিয়া নয়। ইণ্ডিয়ায় আর থাকা চলবে না ইউরোপীয়ানদের। ক্লাবের সব মেম্বারদেরও সেই মত। এইবার তার সার্ভিস-লাইফের শেষ ইনস্পেকশন স্পেশ্যাল।

—গুড মর্ণিং মিস্টার ক্রফোর্ড!

সাহেব মুখ তুলতেই সামনে দেখলে সেন দাঁড়িয়ে আছে। বললে—টেক ইওর সীট সেন, হাউ ডু ইউ ডু—

তারপর পাশের ফাইলগুলো টেনে নিলে সাহেব। বুঝিয়ে বললে—কেন সেনকে সোজা আপিসে আসতে বলেছে। জেনারেল-ম্যানেজার বড় রাগ করেছে। সব মেস-আপ হয়ে গেছে। স্টেটমেন্টগুলোও তৈরি হয়নি। কাল রাত দশটা পর্যন্ত টাইপিস্টদের খাটানো হয়েছে। এখনও কমপ্লিট হয়নি। ওদিকে দিল্লির বোর্ড থেকে ন্যাস্টি লেটার এসেছে,—এই দেখ!

দীপঙ্কর দেখলে। ফাইলগুলো পড়লে। টুর-প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু স্টেটমেণ্ট কমপ্লিট হয়নি। দীপঙ্কর বললে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—

বাইরে বেরোতেই অভয়ঙ্কর এগিয়ে এল। বললে—এ রকম চেহারা হলো কেন সেন? ক্লাইমেট কেমন শিলিগুড়ির?

দীপঙ্করের সে-সব কথার উত্তর দেবার সময় ছিল না। ক্রফোর্ড সাহেবের কাজ নিয়ে শেষ করে দিতে হবে। আর বেশী দেরি নেই। চারদিকে খবর চলে গেছে। ওদিকে লক্ষ্মীকান্তপুর, আরো ওদিকে ডায়মণ্ডহারবার। তারপর বজবজ লাইন। স্পেশ্যাল ছাড়বে। টুর প্রোগ্রামটা আবার দেখে নিলে দীপঙ্কর। অনেক দূর যেতে হবে তাকে। যেদিন থেকে দীপঙ্কর এই পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করেছে, আবার সেইদিন থেকেই স্পেশ্যাল স্টার্ট করবে। নিজের নিরিবিলি ঘরটার মধ্যে দীপঙ্কর ফাইলটা তৈরি করতে করতে যেন অনেক শতাব্দী অতিক্রম করে এল। শতাব্দীই বটে। সেই ছোট বেলার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে শুরু করে আজকের এই শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসতে যেন তার অনেক শতাব্দী কেটে গেছে। কত যুগ, কত শতাব্দী অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে। কত উত্থান-পতন। দীপঙ্করের মনে হতে লাগলো—তার এই পরিক্রমায় যেন কেউ তার সঙ্গী নেই। তার নিঃসঙ্গ যাত্রায় একমাত্র সান্ত্বনা যেন সে নিজেই। সে নিজেই সংগ্রাম করে এসেছে নিজের সঙ্গে। সংগ্রাম বৈ কি! নিজের সঙ্গেই সংগ্রাম। সেই কিরণের সঙ্গেই তার প্রথম সাক্ষাৎ সেই যাত্রায়। সেই কিরণকেই একদিন হারাতে হলো। তারপর এল লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিও হারিয়ে গেল। লক্ষ্মীদির পরে এল সতী। সতী, সনাতনবাবু, নয়নরঞ্জিনী, নির্মল পালিত, সন্তোষকাকা, ক্ষীরোদা,

গাঙ্গুলীবাবু সবাই একে একে হারিয়ে গেছে আজ। আর কারোর সঙ্গে কোনও সম্পর্কও নেই তার, আর সম্পর্ক থাকবেও না। শিলিগুড়ি গিয়ে কাউকে কোনও খবর দেয়নি, কারোর খবর রাখেওনি সে।

হঠাৎ দরজাটায় একটা শব্দ হতেই দীপঙ্কর মাথা তুললে। বললে—ইয়েস, কাম ইন—

না, ভার্মা নয়, অভয়ঙ্করও নয়। কেউ না। লক্ষ্মণ সরকার।

দীপঙ্কর মুখ তুলে চাইল। সেই লক্ষ্মণ সরকারের চেহারা এই এক বছরেই বদলে গিয়েছে। বললে—বোসো, কেমন আছো?

লক্ষ্মণ সরকার যেন অনেক সঙ্কোচের পর বসলো। বললে—তুমি কেমন আছো?

দীপঙ্কর বললে—ভালো—

তারপর একটু থেমে দীপঙ্কর আবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ক্ষীরোদা কেমন আছে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—ভালো।

—আর মাসীমা?

—মাসীমাও ভাল আছে।

আর কোনও কথা খানিকক্ষণ কারোর মুখ দিয়েই যেন বেরোচ্ছে না। একটু পরে লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমার চিঠি পেয়েছিলে তুমি?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ পেয়েছিলাম—এই যে পকেটে রয়েছে—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—প্রথমে ভেবেছিলুম তোমাকে চিঠি লিখবো না। ভেবেছিলাম—তুমি বিরক্ত হবে। ক্ষীরোদাও বারণ করেছিল লিখতে—

—বারণ করেছিল? কেন?

—ক্ষীরোদা বলেছিল—তুমি নাকি আমাদের ভুলে গেছ।

দীপঙ্কর কিছু বললে না। তারপর নিজের মনেই যেন বললে—ভুলতে যদি পারতুম তাহলে তো ভালোই হতো!

—কিন্তু যখন শুনলুম তুমি আজ আসছো এখানে, ক্রফোর্ড সাহেব তোমাকে ডেকেছে, তখন লিখলুম। আজকে রাত্তিরে তুমি আসছো তো?

—কেন?

—আজ ক্ষীরোদা তোমাকে আমাদের বাড়ি খেতে বলেছিল! তোমার কি সময় হবে?

—কেন? হঠাৎ আবার খাওয়ার ব্যাপার কেন?

লক্ষ্মণ বললে—তা জানি না। তোমার কি আপত্তি আছে?

দীপঙ্কর বললে—না আপত্তি কেন থাকবে? কিন্তু কেন মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবে আবার?

—না, আমার আর কষ্ট কীসের। তোমার জন্যে আজ সে সারাদিন বসে

বসে রান্না করেছে। তুমি এলে সে খুব খুশী হতো! আমিও......

—আচ্ছা, যাবো, তুমি এখন যাও!

বলে দীপঙ্কর আবার নিজের কাজে মন দিলে। অনেকদিন পরে কলকাতায় এসে যেন সব আবার মনে পড়তে লাগলো। শুধু ক্ষীরোদাই বা কেন? অনেক জায়গাতেই তো যেতে ইচ্ছে করে। প্রাণমথবাবুর সঙ্গেও দেখা করা উচিত। গাড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর বাড়িতেও একবার গেলে ভালো হয়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডেও একবার সনাতনবাবুর সঙ্গে দেখা করা উচিত! সতী কি সনাতনবাবুর কাছে ফিরে গেছে? কে জানে?

দুপুর বারোটা বাজলো। দীপঙ্কর ঘড়ির দিকে চাইলে। তারপর আবার সে নিজের ভাবনার তলায় তলিয়ে গেল। যখন মাথা তুললে তখন একটু-একটু মেঘ করেছে। জানালার বাইরের আকাশটা তার নিজের মনের মতই ভারাক্রান্ত।

ঠিক দেড়টার সময়ই স্পেশ্যাল ছাড়বার কথা। বেলেঘাটা স্টেশনের নর্থ কেবিন থেকে টেলিফোন হলো সাউথ কেবিনে। কে? লাহিড়ী? স্পেশ্যাল ট্রেন ছাড়বে। লাইন ক্লিয়ার দাও—

—এত দেরি কেন হে? দেড়টা তো কখন বেজে গেছে!

নর্থ কেবিন বললে—আর বলো কেন ভাই। জেনারেল ম্যানেজার নিজেই আসতে দেরি করে দিয়েছে—

যখন শেষ পর্যন্ত ট্রেন ছাড়লো, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ট্র্যাফিক ম্যানেজার, ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, সি-এম-ও, ডি-টি-এস সবাই উঠে পড়লো। চার বোগীর স্পেশ্যাল। শেষে একটা অবজার্বেশান কার। প্রথমে বালিগঞ্জ। তারপর সোনারপুর। সকলের শেষে ডায়মন্ডহারবার। বেলেঘাটা থেকে স্পেশ্যাল ঝড়ের গতিতে ছেড়ে দিলে। পাকা ড্রাইভার। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস চালায়। এই কিছুদিন আগে ভাইসরয়ের স্পেশ্যাল চালিয়ে এসেছে। একটা গাড়িতে বয় বাবুর্চি খানসামা চলেছে। বালিগঞ্জ স্টেশনে আফটারনুন-টি দেবে তারা। দীপঙ্কর ফাইল কটা নিয়ে আবার দেখতে লাগলো। ক্রফোর্ড সাহেব বললে—বালিগঞ্জে এই পেপারগুলো জেনারেল ম্যানেজার চাইতে পারে—কীপ দেম হ্যান্ডি—

স্টেশন মাস্টার মজুমদারবাবুর তখন শশব্যস্ত অবস্থা। একবার ইয়ার্ড ঘুরে আসে, আবার একবার গুডস্ শেডে যায়। সব যেন ঠিক-ঠাক থাকে। কোথাও যেন না ময়লা পড়ে থাকে। একটা প্রমোশনের সময় এসেছে। এই সময়ে পার্সোন্যাল ফাইলে একটা দাগ পড়লেই ফিউচার-কেরীয়ার নষ্ট। এমন সময় টিকিট-কালেক্টর দত্তবাবু স্টেশন-মাস্টারকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এসেছে।

—এই দেখুন মাস্টার মশাই, আবার এই লোকটাকে ধরেছি, রোজ-রোজ আউটডাউট টিকিটে ট্র্যাভেল করে।

মজুমদারবাবু দেখলে। এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। ময়লা কোট-প্যান্ট। হাতে একটা নোটবুক। বেশ স্মার্ট চোখ-মুখ। মজুমদারবাবুকে দেখেই পেন্সিল নিয়ে নোটবুকে কী যেন লিখতে লাগলো—কী নাম তোমার। কী নাম?

মজুমদারবাবু বললে—আরে একে ধরেছ কেন? এই সময়ে ঝামেলার দরকার নেই, এখুনি জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যাল এসে যাচ্ছে—

দত্তবাবু বললে—আজ্ঞে, রোজ রোজ এই রকম করে, আবার বললে রুখে আসে—

লোকটা তখন মজুমদারবাবুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। বললে—কী নাম তোমার বলো? তোমার নামেও ভাইসরয়ের কাছে রিপোর্ট করে দেব, সুরেন বাঁড়ুজ্জেকে ধরিয়ে দিয়েছি, বিপিন পালকে ধরিয়ে দিয়েছি—আমি কাউকে ছাড়বো না—ও গান্ধী বেটাকেও রেহাই দেব না আমি, কী নাম তোমার বলো?

মজুমদারবাবু বললে—আরে এই সময়ে পাগলকে নিয়ে তুমি ঝামেলা বাধাচ্ছো, দাও, ছেড়ে দাও ওকে। একে এখন কোত্থেকে ধরলে? কে ও?

—আজ্ঞে, মস্ত বড়লোকের ছেলে, নিজেও ব্যারিস্টার ছিল শুনেছি—রোজ এই রকম করে আসে টিকিট না কেটে—

কিন্তু তখন আর ওসব কথা শোনার সময় নেই। ওদিকে লাইন ক্লিয়ার হয়ে গেছে স্পেশ্যালের। আর খানিক পরেই দেখতে-দেখতে হুড়মুড় করে এসে পড়লো জেনারেল ম্যানেজার। মজুমদারবাবু সামনের প্লাটফরমে রেড সিগন্যাল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর বুকটা দুর-দুর করে উঠলো। এখনি জেনারেল ম্যানেজার নামবে। চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নামবে, ট্র্যাফিক ম্যানেজার নামবে, ট্রান্স-পোর্টেশন ম্যানেজার নামবে। সবাই নেমে স্টেশন ইনস্পেক্ট করবে।

কিন্তু কেউ নামে না। বৃষ্টি তখন বেশ জোরে পড়ছে। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। জোলো হাওয়া। মজুমদারবাবু কি রকম হতভম্ব হয়ে গেল। কেউ নামে না কেন? জেনারেল ম্যানেজারের কম্পার্টমেন্টের সামনে সবাই গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে গিয়ে কী সব কথাবার্তা হলো। সেন সাহেবকে দেখে মজুমদার-বাবু এগিয়ে গেল। বললে—কী হলো স্যর? কেন, নামছেন না কেন?

সেন-সাহেব বললে—জেনারেল ম্যানেজারের জ্বর হয়েছে—বোধ হয় স্পেশ্যাল ক্যানসেল্ড্ হয়ে যাবে!

সে কি! এমন তো কখনও হয়নি আগে! সত্যিই তাই হলো শেষ পর্যন্ত। আবার ডাউন লাইন ক্লিয়ার দিতে হলো। আবার স্পেশ্যাল ফিরে গেল। সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এত তোড়জোড় এত উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা সব চুপ হয়ে গেল এক নিমেষে। ট্রেন ছাড়ার আগে সেন নেমে গেল। অভয়ঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সেন? তুমি ফিরে যাবে না?

দীপঙ্কর বললে—না আমার একটা কাজ আছে এদিকে, আমায় একবার

কালিঘাটে যেতে হবে, ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনএ—

সবাই যখন চলে গেছে, মজুমদারবাবুও একবার নিজের আপিস ঘরে চলে গিয়েছিল। হঠাৎ আবার প্লাটফরমে আসতেই সেন-সাহেবের সঙ্গে দেখা। সেন-সাহেব প্লাটফরম ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলেছে। একটু অবাক হয়ে গেল মজুমদারবাবু। সেন-সাহেব অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছে ওদিকে?

সামনে গিয়ে মজুমদারবাবু বললে—স্যার, আপনি ফিরে যাননি?

দীপঙ্কর বললে—না, আমার এদিকে একটা কাজ আছে—

বলে আর সেখানে দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। যেন সেদিন নিজেকে সকলের চোখ থেকে আড়াল করতেই চেয়েছিল। সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়েই নিতে চেয়েছিল। যেন অনেকদিন পরে গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর দিকে পা চালিয়ে দিয়ে নিজের কাছেও অপরাধ করেছিল দীপঙ্কর।

চলতে চলতে যেন অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক শতাব্দী পার হয়ে যেন আর এক নতুন শতাব্দীতে এসে পদার্পণ করলো দীপঙ্কর। এতদিনের সব সংযম যেন বাঁধ ভেঙে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। দীপঙ্কর কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে চলতে-চলতে যেন অনেক দূরে এসে পড়লো। এই তো! আর তো বেশি দূর নয়। কাঁকুলিয়ার পর এক জোড়া লাইন চলে গেছে ঢাকুরিয়া স্টেশনের দিকে। আর এক জোড়া বজ-বজ। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে স্লিপারগুলো পেছল হয়ে গেছে। ইস্পাতের রেল চকচক করছে। সেই চকচকে স্টীলের ওপর অন্ধকারের আলো পড়ে সব ঝাপসা করে দিয়েছে চারিদিক। হঠাৎ দীপংকরের মনে হলো যেন অনেক রাত হয়ে গেছে। আশে-পাশের ডোবা থেকে ঝিঁঝিঁর শব্দ আসছে। কী যেন একটা রোমাঞ্চ এসে ঘিরে ধরলো দীপঙ্করকে। আর বাধা মানলো না মন। একেবারে উড়ে যেতে চাইল সে। এতদিন নিজেকে আড়াল করে করে যেন তার আগ্রহকে আরো উদগ্র করে ফেলেছে সে। এতদিনের সব সংস্কার যেন ভেসে যেতে বসেছে।

হঠাৎ মনে হলো যেন সামনে একটা ট্রেনের হেড লাইট দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে যেন একটা ট্রেন আসছে তারই দিকে। এত রাত্রে কোন্ ট্রেন আসবে? এখন এ সময়ে তো কোন ট্রেন নেই। তবে? তবে কি সেভেনটিন ডাউন?

দীপঙ্কর আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলে।

মনে হলো যেন ওটা কোনও ট্রেন নয়। বহুদিন আগে ১৯১২ সালের ১৮ই মার্চ যে ট্রেনটা একদিন উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে স্টার্ট করেছিল আজ এতদিন পরে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে, ফ্রী-স্কুল স্ট্রীট, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, স্টেশন রোড সব কিছু ছুঁয়ে আবার এই এখানে গাড়িয়া-হাট লেভেল ক্রসিং-এর কাছে পৌঁছেছে। এই সামান্য দূর আসতে এত বছর

লাগলো? এত পরিশ্রম? এত সময়? এত সংগ্রাম?

দীপঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে দেখলে। পকেটে তার চিঠিটা তখনও রয়েছে। লক্ষ্মণ সরকারের চিঠি। ক্ষীরোদা তার জন্যে আজ সারাদিন রান্না করেছে। তাকে আজ খেতে হবে ক্ষীরোদার বাড়িতে গিয়ে।

ট্রেনটা তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। হেড লাইটটা আরো স্পষ্ট, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। লাইনের ওপর ইস্পাতের চাকার প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হলো ঠিক লেভেল-ক্রসিং-এর গুমটি ঘরের নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে না? হেড লাইটের আলোয় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সামান্য! যেন সারা গায়ে শাড়িটা জড়িয়েছে। যেন মেয়েমানুষের মতো মনে হচ্ছে।

দীপঙ্কর দৌড়তে লাগলো—কে? কে ওখানে?

চীৎকার করতে করতে দীপঙ্কর দৌড়তে লাগলো। লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি কি আবার রেলের লাইনের কাছে এসেছে? গুমটি-ঘরের ডিউটিতে কে আছে এখন? ভূষণ দেখতে পাচ্ছে না? এই শাড়িটাই তো সেদিন দীপঙ্কর সতীকে কিনে দিয়েছিল। লক্ষ্মীদি কি সতীর শাড়িটা পরেছে?

—কে ওখানে? কে? লক্ষ্মীদি? সতী? কে তুমি?

ট্রেনটা তখন আরো কাছে সরে এসেছে। আরো নিষ্ঠুরভাবে এগিয়ে আসছে। দীপঙ্কর আরো জোরে দৌড়তে লাগলো।

—কে ওখানে? সরে যাও! লক্ষ্মীদি? লক্ষ্মীদি আবার এসেছে আত্মহত্যা করতে—ধরো ওকে, ওকে ধরো, ধরে ফেলো—

দীপঙ্কর প্রাণপণে তখন দৌড়চ্ছে, কিন্তু তার আগেই ট্রেনটা একেবারে হুড়-মুড় করে দীপঙ্করের গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সাউথ কেবিনের ক্যালীবাবু শেষ প্যাসেঞ্জারটার লাইন ক্লিয়ার দিয়ে একটু হেলান দেবার চেষ্টা করছিল। চেয়ারটার ওপর বসে আর একটা চেয়ার সামনের দিকে ঠেলে তার ওপর পা-জোড়া তুলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ টেলিফোনের রিং বেজে উঠলো।

—কে রে? আবার কী হলো?

—হুজুর আমি ভূষণ!

—কীরে ভূষণ? কী হলো?

—হুজুর অ্যাকসিডেন!

ক্যালীবাবু চেয়ার থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠলো।—অ্যাকসিডেন্ট? কীসের অ্যাকসিডেন্ট রে? কার অ্যাকসিডেন্ট?

—হুজুর, সেভেনটিন ডাউন।

একদিন যে-জীবন শুরু হয়েছিল ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের একটা অখ্যাত বাড়িতে, অনেক পথ-পরিক্রমার পর তারই উপসংহারে এসে পৌঁছেছি এখন। জীবনের উপসংহার, সংগ্রামের উপসংহারও বটে। দীপঙ্করের জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ইতিহাসেরও উপসংহার। একদিন তার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯১২ সালে। সেদিন জীবন ছিল শান্ত, সংগ্রাম ছিল মৃদু। তারপর আনন্দের প্রাচুর্যে, দুঃখের মহিমায় কখন যে মহাজীবনের সিংহাসনে তার রাজ্যাভিষেক হয়ে গিয়েছিল—তা সে নিজেই জানতো না। দীপঙ্করের এই মহাজীবন তো নদী নয়। নদীর মত পাহাড়-প্রান্তর-মরু-অরণ্য-নগর-গ্রামের তরঙ্গাভিঘাতে ধৌত করে অন্তরের অমূল্য-সঞ্চয়কে মহাসমুদ্রে উৎসর্গ করাও নয়। দীপঙ্করের জীবন যে আকাশ—মহাকাশ! মহাকাশের অনন্ত বিস্তার-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করা। সেই বিস্তার-বৈচিত্র্যের সমুদ্রে অবগাহন করেই নিজেকে প্রকাশ করা। সে-প্রকাশ যেন অসীমের কাছে আত্মসমর্পণ। সে আত্মসমর্পণে যত ভীতি তত আনন্দ। যত উদ্বেগ, তত নির্ভরতা। যত সংগ্রাম, তত জয়। কিন্তু বেদনা? সংসারে কোথায় বেদনা নেই? দীপঙ্কর তো ছোট নয়। দীপঙ্কর যদি ছোট হতো তো সংগ্রামে সে কাতর হতো, দুঃখ তাকে নিঃশেষ করে দিত। কিন্তু বেদনা আছে বলেই তো সংসারে ছোটর স্থান নেই। যে-বেদনা আঘাতে অটল, যে-বেদনা দুঃখে স্থির—সেই বেদনা যে অনির্বচনীয়। সেই বেদনার অনির্বচনীয়তা দীপঙ্করকে যেন মহীয়ান করে তুলেছিল শেষকালে। এই মহত্ত্বই তার কাছে প্রমাণ করেছিল যে সোক্রেটিস যা বলেছিলেন তা ঠিক—

And this one thing hold fast, that to a good man, whether alive or dead, no evil can happen, nor are the gods indifferent to his well-being.

আমরা জিজ্ঞেস করতাম—কিন্তু আপনি এত কষ্ট করে আছেন কেন স্যার?

দীপঙ্করবাবু তখন আমাদের স্কুলের টীচার। আর আমরা ছাত্র। আমাদের কথা শুনে তিনি হাসতেন। আমরা অনেক টীচার দেখেছি। অনেক টীচার আমাদের অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক শাসন করেছেন। কিন্তু এর আগে এমন করে কেউ আকর্ষণ করেন নি। আমরা ছুটির পর তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর বাড়িতেও যেতাম। তাঁর তক্তপোশের ওপর বসতাম। এক-একদিন সবাই মিলে তাঁর খাবার ভাগাভাগি করে খেতাম। আর তাঁর মুখ থেকে গল্প শুনতাম। আর তাঁর বাড়িতে থাকতো কাশী। কাশীই ছিল তাঁর সব। কাশীকে কখনও মনে

হতো তাঁর চাকর, কখনও মনে হতো তাঁর বন্ধু, কখনও বা আবার মনে হতো তাঁর মনিব। দীপঙ্করবাবু কাশীকে হাসতে হাসতে ডাকতেন—কাশীবাবু—

স্কুলে আমাদের এক-একদিন প্রশ্ন করতেন—বড় হয়ে তোমরা কে কী হবে বলো তো?

আমরা কেউ বলতাম—ডাক্তার হবো। কেউ বলতাম—ইঞ্জিনীয়ার হবো। কেউ কেউ বলতো—সাহিত্যিক হবে, কবি হবে। কত সব অদ্ভুত সাধ থাকে মানুষের। উকীল, ব্যারিস্টার, জজ, মিনিস্টার পর্যন্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের। আমরা সে-সব দিন দেখিনি। কেমন করে গোপীনাথ সাহা টেগার্ট সাহেবকে গুলী করতে গিয়ে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিলে, কেমন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেলখানার ভেতরে গুলী চালানোর পর কলকাতার ময়দানে মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। কেমন করে কিরণের মত ছেলেরা স্বার্থের কথা ভুলে ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা আনলে, কেমন করে প্রাণমথবাবুর মত মহাপ্রাণ-মানুষ কংগ্রেসের জন্যে আত্মোৎসর্গ করলেন, কেমন করে ছিটে-ফোঁটার দল সুবিধে-বাদীর মত ঠিক সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে এসে ঢুকলো—সে-সব কথা আমাদের মতন বয়েসের ছেলেদের জানবার কথা নয়। কেমন করে মিস্টার ঘোষালরা সংখ্যায়, প্রতিষ্ঠায়, প্রতিপত্তিতে সমাজের মাথায় উঠে বসলো আবার—তাও আমরা জানতাম না। কেমন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে আমরা ভুলে গেলাম স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে—তাও আমরা জানবার চেষ্টা করিনি। আমরা জানতাম এই বোধহয় নিয়ম। এই স্বার্থপরতা, এই নীচতা, হীনতা এই ঘৃণ্যতাই বুঝি আদর্শ। আমরা জানতাম পরকে ঠকিয়ে, সমাজকে ধাপ্পা দিয়ে সকলের ওপরে ওঠার নামই মনুষ্যত্ব। আমরা জানতাম জীবনে উন্নতি করতে গেলে ছিটে-ফোঁটার মত হওয়াই উচিত। আমরা জানতাম—অর্থই একমাত্র পরমার্থ। আমরাও অঘোরদাদুর মত জানতাম—কড়ি দিয়ে বুঝি সবই কেনা যায়। কিন্তু দীপঙ্করবাবু এসেই আমাদের সব ভুল ভাঙিয়ে দিলেন।

তিনি আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন—সে কি? তোমাদের মধ্যে একজনও কেউ মানুষ হতে চাও না?

তিনি যেন হতাশ হয়ে গেলেন আমাদের মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু আমরা সত্যিই বুঝতে পারতাম না। জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে কী হবে? স্বামী বিবেকানন্দ হয়েই বা কী হবে? আমরা হবো হেনরী ফোর্ড। আমরা হবো রকফেলার, আমরা হবো এণ্ড্রু কার্নেগী। কিম্বা হবো জি ডি বিড়লা, হবো গোয়েঙ্কা, হবো মাহীন্দ্র। তাও যদি না পারি তো হবো মিনিস্টার। কিছু কাজ করতে হবে না—শুধু বক্তৃতা দিয়েই বেড়াতে হবে, আর সরকারী গাড়ি করে উৎসবে-অনুষ্ঠানে সভাপতি হবো। তা-হলেই আমরা মাসে-মাসে ঠিক মাইনে পেয়ে যাবো। শুধু আমরা নয়, আমাদের গার্জেনরাও এই কথাই শেখাতো

আমাদের। আমাদের স্কুলে আমরা লেখা-পড়া করতাম ওই একই উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ওই একই ধারাতে আমরা লেখাপড়া শিখছিলাম। হঠাৎ দীপঙ্করবাবু এসেই আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বদলে দিলেন।

কিন্তু গণ্ডগোল বাধলো কিছুদিন পর থেকেই। হেডমাস্টারের কানে কথাটা গেল। গার্জেনদের কানেও কথাটা গেল। নতুন ইংরেজীর টীচার ছেলেদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই একদিন তাঁকে ডেকে সাবধান করে দিলেন। বললেন—আপনি স্কুলের টেক্সট বুকের বাইরে আর কিছু শেখাবেন না ছেলেদের—

দীপঙ্করবাবু বললেন—কিন্তু টেক্সট বুকে যে সমস্ত ভুল লেখা রয়েছে—

হেডমাস্টার মশাই বললেন—থাক্ ভুল। সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড এ-বই এ্যাপ্রুভ করেছে, আপনি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? আপনি জানেন না এ-বই একজন ডক্টরেটের লেখা?

আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিলাম, শুনতে পাচ্ছিলাম।

দীপঙ্করবাবু বললেন—যিনি ডক্টরেট তাঁর ডক্টরেট কেড়ে নেওয়া উচিত, যাঁরা এই অথরকে ডক্টরেট দিয়েছেন তাঁদেরও ডক্টরেট কেড়ে নেওয়া উচিত—

—তার মানে?

দীপঙ্করবাবু বললেন—তার মানে এই বই তাঁর নিজের লেখা নয়, তিনি নাম ধার দিয়েছেন, লিখেছে অন্য লোকে, আর তিনি নিজের নাম দিয়েছেন অথর হিসেবে অনেক টাকা পেয়ে—

—আপনি এ-কথা বলতে পারছেন?

দীপঙ্করবাবু বললেন—আপনি নিজেই জানেন সে-কথা, সুতরাং আমার বলাতে কিছু দোষ হয়নি—

কিন্তু আশ্চর্য! আমরাও পরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যে-সব বিখ্যাত লেখকের বই আমরা পড়ছি সে-সব তাঁদের নিজের লেখা নাকি নয়। যিনি আসলে বইটা লেখেন তাঁর নাম থাকে না। তিনি যদি পান আড়াই শো টাকা, যাঁর নাম ছাপা হয় লেখক হিসেবে তিনি পান হাজার টাকা। এ-সব আমরা জানতাম না। জানতাম না এই সব বই স্কুলে ধরাবার জন্যে দালাল থাকে। তারা হেডমাস্টারের বউকে শাড়ি কিনে দেয়, স্কুলের সেক্রেটারিকে দামী-দামী জিনিস ঘুষ দেয়। তবে বুক-লিস্টে সেই বই-এর নাম ওঠে। দীপঙ্করবাবুর ঘটনা না-ঘটলে আমাদের এসব জানবার উপায়ও ছিল না। কী জানি কেন, সেই দীপঙ্করবাবুকেই একদিন চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার নোটিশ এল। ছেলেদের তিনি মাথা খাচ্ছেন। ছাত্রদের মনে নাকি বিষ ঢোকাচ্ছেন—এই অভিযোগ! আমরা স্কুলের সব ছেলেরা মিলে প্রতিবাদ করলাম। দরখাস্ত করলাম। কিছুতেই যখন কিছু হলো না তখন স্ট্রাইক শুরু হলো আমাদের। আমরা স্কুলের গেটের সামনে শুয়ে পড়ে রইলাম। কেউ ঢুকতে পারবে না স্কুলের ভেতর। দীপঙ্করবাবুর ওপর বরখাস্তের নোটিশ

প্রত্যাহার না করলে এমনি ধর্মঘট চলবে দিনের পর দিন। রাত্রে পোস্টার লিখে দেওয়ালে-দেওয়ালে এ'টে দিই। তুমুল আন্দোলন চলতে লাগলো। একদিকে সমস্ত স্কুল, সমস্ত গার্জেনরা, আর একদিকে আমরা সবাই ছাত্র। আমাদের দীপঙ্করবাবুকে আমরা চাই। তাঁকে অন্যায়ভাবে ছাড়ানো চলবে না।

আমরা রোজ ভোর বেলা উঠে গিয়ে স্কুলের সামনে গিয়ে চিৎকার করি—সেক্রেটারির বিচার চাই—

সবাই এক সুরে চেঁচিয়ে ওঠে—বিচার চাই—

শেষকালে পুলিস এল লাঠি নিয়ে। সেক্রেটারিই পুলিস ডেকে আনিয়েছিলেন। পুলিসে-ছাত্রে লড়াই শুরু হলো। আমাদের মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়লো। আর কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে দৌড়ে এলেন দীপঙ্করবাবু। তাঁকে দেখেই আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। তিনি এসে বললেন—তোমরা চুপ করো ভাই। আমাকে নিয়েই যখন এত গণ্ডগোল তখন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তোমরা মনে কোর না এই এত বড় পৃথিবীতে আমার কোনও আশ্রয় মিলবে না। পৃথিবী অনেক বড়। তোমরা যত বড় কল্পনা করো তার চেয়েও বড়। আমি আর একদিন আর এক জায়গা থেকে এখানে চলে এসেছিলাম। এখান থেকেও আবার আর এক জায়গায় চলে যাবো। প্রয়োজন হলে পৃথিবীর সব জায়গায় আমি খুঁজবো—দেখবো কোথায় মানুষ পাই। আমি হতাশ হই না, হতাশ হবো না। সনাতনবাবু আমাকে শিখিয়েছেন হতাশ হতে নেই। আমি আশা নিয়ে সারা পৃথিবী খুঁজবো—কোথাও-না-কোথাও মানুষ পাবোই।

এই-ই হলো সূত্রপাত। আমাদের বারাসত স্কুলের টীচার দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে এই-ই হলো শেষ-সাক্ষাৎ। এর পর মাত্র কয়েকদিন ছিলেন। সেই ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সব পরিচয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ধর্মঘট আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁরই কথায়। তিনিই আমাদের ধর্মঘট বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলেন। বলেছিলেন—আজকে এক মিনিটে তোমাদের সব অভিযোগের প্রতিকার হবে না। ইতিহাস পড়ে দেখো। সোক্রেটিসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। গান্ধীজীকেও প্রাণ দিতে হয়েছে। আমি এতদিনের পর বুঝেছি—To a goodman, whether alive or dead, no evil can happen. আমি তোমাদের আশীর্বাদ করে যাচ্ছি। তোমরা ডাক্তার হয়ো, তোমরা ইঞ্জিনীয়ার হয়ো, তোমরা সব কিছু হয়ো, কিন্তু সকলের আগে মানুষ হয়ো—পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরকার আজ মানুষের, মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে—

দীপঙ্করবাবুর ছোট ঘরের ভেতর ছোট তক্তপোশটার ওপর বসে আমরা ক'জন [illegible] তাঁর কথা শুনছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম—মানুষ মানে কী স্যার?

দীপঙ্করবাবু বললেন—ওই দেখ—

আমরা চেয়ে দেখলাম। তিনি দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। ছবিতে কিছুই নেই, শুধু একজোড়া পায়ের ছাপ। দু'পায়ের পাতায় আলতা মাখিয়ে ছাপ নেওয়া হয়েছে। ওটা আমরা প্রায়ই দেখতাম। প্রায়ই কৌতূহল হতো। জিজ্ঞেস করলাম—ও কা'র পায়ের ছাপ স্যার?

দীপঙ্করবাবু বললেন—প্রাণমথবাবুর!

আমরা প্রাণমথবাবুর কথা আগেই শুনেছিলাম। বললাম—কেন স্যার? ওঁর পায়ের ছাপ রেখেছেন কেন?

দীপঙ্করবাবু যেন হঠাৎ বড় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, বললেন—তবে শোন—

আজ দীপঙ্করবাবু কোথায় কতদূরে আছেন জানি না। তিনি তাঁর মানুষ খুঁজে পেয়েছেন কিনা তাও জানি না। আমাদের স্কুল আজো তেমনি চলেছে। টেক্সট্‌ বুকের ভুল আজো পড়ানো হচ্ছে আমাদের স্কুলে। সেই ভুল শিখেই ছাত্ররা ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছে, উকীল হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মাহীন্দ্রও হচ্ছে। দূর ভবিষ্যতে কেউ-কেউ ফোর্ড রকফেলার, কার্নেগীও হয়ত হবে। তারপর কলেজে ঢুকেছি। সংসারে ঢুকেছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর আরো চোদ্দ পনেরো বছর কেটে গেল। দীপঙ্করবাবুর মত আর কেউ প্রতিকার করবার নেই, প্রতিবাদ করবার নেই। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের অঘোরদাদুর মত আমরা সবাই কড়ি দিয়ে সব কিনছি। পাপ কিনছি, পুণ্য কিনছি, ধর্ম কিনছি, অধর্ম কিনছি! গাড়ি বাড়ি রেফ্রিজারেটারের মত সম্মান প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি কিনছি। অঘোরদাদুর সব কথাই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। অঘোরদাদু ভবিষ্যদ্রষ্টা। আজ এই 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর কাহিনী লিখতে লিখতে সেই সব দিনের শোনা কাহিনীগুলোই মনে পড়ছে বার বার।

—তবে শোন!

১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লিতে একদিন মহা-সমারোহে দরবার বসলো। ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী কুইন-ভিক্টোরিয়া বললেন—'আমার আশা ও বিশ্বাস যে বর্তমান উপলক্ষ হইতে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাবৃন্দ ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর স্নেহের বন্ধনে পরস্পর মিলিত হইতে পারিব। এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদস্থ ব্যক্তি হইতে নিম্নতর স্তরের লোকরা পর্যন্ত সকলেই প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন যে আমার শাসনতন্ত্রে তাঁহাদের সকলের জন্য স্বাধীনতা সাম্য ও ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি সম্যক রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের সুখ-শান্তি বিধান, তাঁহাদের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি বর্ধন ও তাঁহাদের কল্যাণসাধনই আমার সাম্রাজ্য পালনের চিরন্তন উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য।'

সেইদিন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সাম্য ও ন্যায়-বিচারের সাক্ষ্য কুরি-

ভুরি ছড়ানো ছিল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। সেই ১৫ই আগস্ট তারিখেই সেই একই দিল্লিতে মহা-সমারোহে আর এক দরবার বসলো রাত বারোটার সময়। সেই কুইন্ ভিক্টোরিয়ার সেই একই আসন থেকেই জওহরলাল নেহর্ বেতারে বক্তৃতা দিলেন—Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe out every tear from every eye.

ইন্ডিয়ার কোটি কোটি লোক রাত জেগে সেই বক্তৃতা শ্নেছিল। ঈশ্বর গাঙ্গ্লী লেনের অঘোর-সৌধের বাড়িতে রেডিও খ্লে দিয়ে শ্নেছিল ছিটে, শ্নেছিল ফোঁটা, শ্নেছিল লক্কা, শ্নেছিল লোটন। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে শ্নেছিলেন সনাতনবাব্, শ্নেছিলেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। উনিশের একের বি ঈশ্বর গাঙ্গ্লী লেনের ভাড়াটে বাড়িতে শ্নেছিল লক্ষ্মণ সরকার আর ক্ষীরোদা। আর লেক হাসপাতালের ছোট্ট কেবিনটাতে শ্য়ে শ্য়ে শ্নেছিল দীপঙ্কর। আর আরো একটা বাড়ির ছোট ঘরের মধ্যে বসে-বসে শ্নেছিল কিরণ আর মাসীমা। আর গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে শ্নেছিল......

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

মধ্স্দনদের রোয়াকেও সেদিন রাত্রে ভিড় কম নয়। সারা কলকাতার রাস্তাতেই ভিড়। কেউ কাজ করবে না। অনেক কষ্টের পর স্বরাজ এসেছে। অনেক কষ্ট স্বীকার, অনেক জেল-খাটা, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে পরম সম্পদ পাওয়া গিয়েছে। পার্টিশান হয়ে গেছে ইন্ডিয়ার। নতুন এক রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে প্থিবীতে। তার নাম পাকিস্তান। সেদিন সেই কলকাতার ব্কের ওপর দিয়ে মান্ষের ম্ত্যু হয়েছে কাতারে-কাতারে। সে-দ্শ্য সবাই দেখেছে। বাড়ির দরজা বন্ধ করে র্দ্ধ-শ্বাসে ম্হ্র্ত গ্ণেছে। রাস্তায় কখনও চিৎকার হয়েছে—বন্দে মাতরম্। কখনও—আল্লা হো আকবর। গান্ধীজীর সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবের কথাবার্তায় কোন ফল ফলেনি। ওয়ার্ধা থেকে হাসিম্খে ফিরেছিলেন প্রাণমথবাব্। হাতে তাঁর ফাইল। তাঁর সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। লর্ড ওয়াভেলও রাজি হয়েছেন গান্ধীজীর কথায়। সবাইকে ম্ক্তি দিতে হবে। আর যারা অপরাধী তাদের বিচার হবে। বিচারও হলো, দোষী প্রমাণিত হলো। কিন্তু তব্ ছাড়া পেলে সবাই। শা নওয়াজ খাঁ, কর্নেল ধীলন, লক্ষ্মী মেনন, সর্দার জীবন সিং। আর ছাড়া পেল কিরণ।

কিরণ ছাড়া পেয়েই সোজা চলে এসেছে একেবারে স্টেশন রোডে। দীপ্ন আছে এ-বাড়িতে? দীপঙ্কর সেন?

অচেনা ম্খ। সামনের ঘরের জানালায় পর্দা টাঙানো। ভেতরের ঘর থেকে ছোট ছেলেমেয়ের গলা শোনা গেল। মহিলাদের আওয়াজ। বেশ জমিয়ে সংসার পেতেছে নাকি দীপ্ন?

—না মশাই, এখানে তো দীপঙ্কর বলে কেউ থাকেন না। অন্য কোথাও দেখ্ন।

—আপনারা কতদিন এসেছেন এ-বাড়িতে?

—তা একবছর আগে, সেই হিন্দ্-ম্সলিম রায়টেরও আগে—

সে-সব কথা কিরণ জানতো না। তখন সে জেলের ভেতর। তাহলে কোথায় গেল সে? হয়ত ঈশ্বর গাঙ্গ্লী লেনের বাড়িতে গেলে খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

কিরণ আবার ট্রামে উঠল। আবার এসে দাঁড়াল সেই প্রোন পাড়ায়। যেখানে বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী করেছিল। ঠিক যেন চেনা গেল না। সব বদলে গিয়েছে। অঘোরদাদ্দের বাড়িটাও আর চেনা যায় না। মাথার ওপরে বড় বড় করে সিমেন্টের কংক্রিটে লেখা রয়েছে 'অঘোর সৌধ'। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্টো সামনের উঠোনে। গেটে দারোয়ান। দারোয়ানের গায়ে খদ্দরের ইউনিফর্ম। কিরণের চোখে যেন আরব্য-উপন্যাসের মত মনে হলো সব। বাড়ির মাথার লম্বা বাঁশের আগায় পত্-পত্ করে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ উড়ছে। এরা কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছে নাকি? অঘোরদাদ্র সেই বখাটে নাতি দ্টো?

—কিরণ না?

কিরণ পেছন ফিরলো। ফটিক। ফটিকের মা ম্ড়ি ভাজতো পাথর-পটিতে। বললে—তুমি তো জেলে ছিলে শ্নেছি—কবে ছাড়া পেলে?

কিরণ জিজ্ঞেস করলে—তোমার কী খবর?

—আমি তো ভাই একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছি। তোমার খবর কী? কোথায় আছো এখন?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে কিরণ জিজ্ঞেস করলে—দীপ্ন কোথায় আছে জানো তুমি? দীপ্কে খ্ঁজছি—

ফটিক বললে—আমি তো ঠিক জানি না ভাই, একদিন একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, তারপর সেইদিনই শিলিগ্ড়ি চলে গিয়েছিল বদলি হয়ে, আর দেখা হয়নি—

—এ-বাড়িটাতে এখন কারা থাকে?

ফটিক বললে—বিয়েটা তো এই বাড়িতেই হলো। লক্ষ্মণ সরকারের বিয়ে হলো কিনা! লক্ষ্মণ সরকারকে মনে আছে তো?

—আর প্রাণমথবাব্? প্রাণমথবাব্র কাছে গেলে হয়ত দীপ্র খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, কী বলো?

—তিনি তো মারা গেছেন! তুমি শোন নি?

প্রাণমথবাব্র ম্ত্যুর খবর কিরণ জানতো না। ফটিক বললে—সে বড় প্যাথেটিক ভাই। বলতে গেলে ইলেক্শন করতে গিয়েই মারা গেলেন।

—কীসের ইলেক্‌শন ?

—কংগ্রেসের। ফোঁটাদাকে চেন তো? সেই ফোঁটাদাই তো এখন এখানকার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। প্রাণমথবাবু অত দিনকার প্রেসিডেন্ট, সকলকে ঘুষ দিয়ে ভোট ভাঙিয়ে প্রাণমথবাবুকে হারিয়ে দিলে।

সত্যিই সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। নিজের জীবনে কখনও প্রতিষ্ঠা চাননি প্রাণমথবাবু। শুধু চেয়েছিলেন ইন্ডিয়া স্বাধীন হোক। ওয়ার্ধা আশ্রম থেকে ফিরে এসেছেন তখন। হঠাৎ ঠিক হলো ইলেকশন্ হবে। কংগ্রেসের নতুন মেম্বাররা চায় ফটিক ভট্টাচার্য হবে প্রেসিডেন্ট। প্রাণমথবাবু বললেন—তা তুমিই প্রেসিডেন্ট হও না, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আমার দ্বারা আর কাজ চলছে না—

কিন্তু ফোঁটা বললে—না, তা হতে পারে না, ভোট হবে—

সেই ভোটই হলো শেষ পর্যন্ত। প্রাণমথবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ভোট হলো। ফটিক ভট্টাচার্য মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চেয়ে বেড়াতে লাগলো। দেশের যুবশক্তিকে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। ক'দিন ধরে কালিঘাটের পার্কে দাঁড়িয়ে খুব বক্তৃতা দিলে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ইন্ডিয়াকে পার্টিশন করা চলবে না। গরম-গরম বক্তৃতায় অনেক হাততালি কুড়োলে ক'দিন ধরে। সেই মিটিং-এ প্রাণমথবাবুকেও বলতে বলা হলো। তিনি বলতে চাননি। বলবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন তাঁকে এবার সরতে হবে। এবার থেকে কংগ্রেসের ভেতরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে লোভ আর স্বার্থপরতা। ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগের তলায়। এবার থেকে তাঁদের চিহ্ন মুছে যাবে। তবু তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল। তিনি টলে পড়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল একটা শতাব্দী। সেই ১৮৮৫ সালে যে-প্রতিষ্ঠানের একদিন পত্তন হয়েছিল ত্যাগ আর সহিষ্ণুতার ভিতের ওপর, তার শেষ স্তম্ভটি এতদিনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল কালিঘাট-পার্কের মীটিং-এ।

দীপঙ্কর যখন খবর পেয়েছিল তখন সবে ছাড়া পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। কালি লেনের বাড়িতে, যখন পৌঁছলো দীপঙ্কর তখন প্রাণমথবাবুকে নিয়ে আসা হয়েছে বাড়িতে। তিনি শুয়ে আছেন। অসংখ্য লোকের জটলা চারিদিকে। মাসীমা নিঃশব্দে বসে আছেন। দীপঙ্কর তারই এক ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তার চোখের সামনে থেকে যেন সব মুছে গেল। মুছে গেল সব ভিড়, সব কোলাহল, সব পৃথিবী। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রাণমথবাবু। চোখ পলকহীন! যেন কালীদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের হেডমাস্টার যেন দীপঙ্করের দিকে চেয়ে-চেয়েই বলছেন—সারা জীবন সত্য কথা বলবে দীপু—সত্য কথার মার নেই সংসারে, সত্যেরই জয় সর্বকালে—

আরো অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। চোখের সামনে সমস্ত অতীতটা যেন একের পর এক স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠতে লাগলো। এতগুলো মৃত্যু দেখেছে

দীপঙ্কর, কিন্তু প্রাণমথবাবুর মৃত্যুকে যেন প্রণাম করতে ইচ্ছে করলো সেদিন। মনে হলো মৃত্যু যে এমন মহিমময় হতে পারে তা যেন এর আগে তার জানা ছিল না!

মাসীমা তারপর প্রাণমথবাবুর দু'পায়ের ছাপ তুলে নিলেন একটা সাদা কাগজে। পায়ের ওপর আলতা লাগিয়ে তারই ছাপ ওঠানো হলো। দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি মাসীমার কাছে গিয়ে বললে—ওটা আমাকে দিন মাসীমা, আমি ওটা পুজো করবো—

—ওই দেখ সেই পায়ের ছাপ্! যেখানেই যাই সেখানেই ওটা আমার সঙ্গে থাকে!

—আর তারপর সেই আপনার বন্ধু কিরণ ?

—কিরণ এখনও বেঁচে আছে। এখনও ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায়। ইন্ডিয়ার মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে দুর্ভাবনা করে! রাত জাগে, বই পড়ে, চেঁচায়, মিছিল করে, চাষী-মজুর নিয়ে দল বাঁধে। সে বলে—এ স্বাধীনতা নয়: সে বলে—এ বড়লোকদের স্বাধীনতা, এ কোটিপতিদের স্বাধীনতা। মানুষের স্বাধীনতার জন্যে তাকে আরো লড়াই করতে হবে। সেই স্বাধীনতার জন্যেই সে এখনও যুদ্ধ করছে, বই লিখছে, প্যাম্ফ্লেট্ লিখছে। দরকার হলে মাঝে মাঝে জেলও খাটে—

—তারপর ?

—তারপর কিরণ উনিশের একের বি'র বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো—লক্ষ্মণ!

যে দরজা খুলে দিলে সে লক্ষ্মণ নয়, সে ক্ষীরোদাও নয়, সে কিরণের মা। কিরণের মা'র তখন চোখে ছানি পড়তে শুরু করেছে। ভালো করে দেখতে পায়নি। বললে—কাকে খুঁজছো বাবা? কাকে চাই ?

কিরণ সেইখানে দাঁড়িয়ে মাকে দেখেই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর বোধ হয় অনেক দেখার অনেক শেখার অনেক কষ্ট পাওয়ার ফলে মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আমি কিরণ!

কিরণের মা আর থাকতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে। বললে—তুই এসেছিস বাবা? তুই বেঁচে আছিস ?

তারপর কান্নায়-হাসিতে-আনন্দে-আবেগে মাসীমার সব কথা যেন ডুবে গেল। বললে—তুই আমাকে এমনি করে ফেলে গেলি বাবা! পরের ছেলে দীপু, দীপুই আমাকে বাঁচালে, দীপু না থাকলে তোকে চোখে দেখাও আমার কপালে থাকতো না বাবা—

বলে অঝোর-ধারে কাঁদতে লাগলো মাসীমা। কিন্তু কিরণের সেদিকে খেয়াল নেই। সে দীপঙ্করকে খুঁজতে এসেছিল। বললে—দীপু কোথায় তুমি জানো?

মাসীমা বললে—সে তো হাসপাতালে রে। রেলগাড়িতে ধাক্কা লেগে পড়ে

গিয়েছিল—

—কোন্ হাসপাতালে?

মাসীমা বললে—লেকের হাসপাতালে—

কিরণ আর দাঁড়াল না। মা'র হাত ছাড়িয়ে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কপাটের আড়ালে থেকে মাসীমা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

কিন্তু যে উত্তর দেবার সে তখন আর চোখের সামনে নেই। রাস্তায় বেরিয়ে একেবারে চোখের আড়ালে চলে গেছে—

আর গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে আরো থম্‌-থমে দিন কেটেছে আগে। সেই যখন কলকাতার উদ্বেগ আর অশান্তির রাজ্য। ক্রীপস্ মিশনের সময় থেকেই থম্‌-থম করতো কলকাতা। যখন দীপঙ্কর সারা দিন আপিসের খাটুনির পর আসতো এ বাড়িতে আর অনেক রাত্রে ফিরে যেত। তখন থেকে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের মাথায় বোঝা হয়ে উঠেছিল ইণ্ডিয়া। বছরে বছরে সমস্ত ঘৃণা সমস্ত হিংসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। শেষে আর ধরে রাখা গেল না। যেটুকু বাকি ছিল সুভাষ বোসের শেষ কীর্তিতে তাও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন-এ লেখা হলো—The British decision to leave India may bring the British more profit than they would win if they could scrape up power to remain for a time. By retiring with grace and expressions of goodwill they may preserve the bulk of their economic interests for a long period.

সতী দোতলার ওপর থেকে অনেক দূরে চেয়ে দেখে, অনেক দূর থেকে একটা ট্রেন আসে। গোল-গোল পেট্রল ভর্তি ওয়াগনগুলো পশ্চিম দিক থেকে এসে পুব দিকে চলে যায়। দুম্ দুম্ করে শব্দ হয় আর অনেকক্ষণ পরে চোখের আড়ালে চলে যায়। আস্তে আস্তে ভোর হয়, আস্তে আস্তে দিন হয়, তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যেও হয়। ওদিক থেকে যেন একটা হল্লা ওঠে—আল্লা হো আকবর। রাত্রের নিস্তব্ধতা সেই চিৎকারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তারপর সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে কারা চিৎকার করে ওঠে—বন্দে মাতরম্! সমস্ত কলকাতা যেন সচকিত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাস্তায় বেরোতে ভয় করে। ভোর বেলা কোন্ ফাঁকে খবরের কাগজওয়ালা নিঃশব্দে কাগজ দিয়ে আবার চলে যায়। সারাদিন ধরে পড়ে পড়ে কাগজখানা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সমস্ত কলকাতা যেন ভয়াল হয়ে উঠেছে। যাবার আগে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট শেষ সর্বনাশ করবে। শেষ বিষ ঢুকিয়ে দেবে। চলে গিয়েও তারা তাদের কারবার পাকা-কায়েম করে রেখে যাবে।

রঘুকে ডেকে সেদিন সতী জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, লোকে রাস্তায় বেরোচ্ছে?

রঘু বললে—না দিদিমণি, সেদিনও বাজারের কাছে একটা লোককে কেটে ফেলেছে, আপনি বেরোবেন না—

কিন্তু আর যেন বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না। কারোর কাছ থেকেই কোনও খবর আসে না। যেন সে হাঁপিয়ে ওঠে। লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হয় না। সে সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকে। তাকেও পাহারা দিতে হয়। রাত্রে দরজার সামনে রঘু শুয়ে থাকে। যদি পালিয়ে যায়। কতবার লক্ষ্মীদি পালিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। অন্ধকারে কেউ কোথাও না থাকলেই লক্ষ্মীদি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সদর-দরজা খুলে রাস্তায় চলে যেতে চায়। এক-একবার রেল-লাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, তারপর রঘু জানতে পেরে আবার ধরে নিয়ে এসেছে, ধরা পড়লেই বলে—আমি মরতে চাইনি, আমি শুধু বেড়াচ্ছি এখানে—

তারপর আবার ধরে নিয়ে এসে ঘরে পুরতে হয়।

সেদিন দুপুর বেলা। সমস্ত কলকাতা যেন তখন ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু ওই ঘুমন্ত কলকাতাই আবার জেগে ওঠে রাত্রে। রাত আরম্ভ হতেই আবার চিৎকার শুরু হয়। সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ বাইরে দরজায় কড়া নড়তেই সতী ভেতর থেকে বললে—কে?

বাইরে থেকে গলার আওয়াজ এল—আমি—

—আমি কে? নাম কী তোমার?

কী যেন উত্তর এল। কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। সতীর কী সন্দেহ হলো। তারপর দরজাটা খুলতেই দেখলে সামনে সনাতনবাবু দাঁড়িয়ে। সনাতনবাবুকে সামনে দেখে যেন কথা বলতেও ভুলে গেল সতী, তাড়াতাড়ি সম্বিত ফিরতেই সনাতনবাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—কী করে এলে তুমি?

সনাতনবাবু বললেন—হেঁটে, গাড়ি পেলুম না—

—কিন্তু যদি কোনও সর্বনাশ হত? কেন তুমি আসতে গেলে এই সময়ে?

সনাতনবাবু বললেন—অনেক দিন থেকেই আসবো ভাবছিলুম, কিন্তু সুবিধে হচ্ছিল না—

—কিন্তু এই সময়ে কেউ আসে? চারদিকে কত খুন-খারাপি চলছে খবরের কাগজে দেখনি?

সনাতনবাবু বললেন—তাতে আমার কিছু এসে যায় না, তুমি চলো, তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি—

—আবার সেই পুরোন কথা তুলছো? একথা তো তুমি অনেকবার বলেছো, সেই একই কথা বলতে এসেছো আবার?

—কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেছিলুম আসবো, তুমি বারণ করলেও আসবো।

—কিন্তু কলকাতার কী মারামারি কাণ্ড চলছে তুমি জানো না? এই সেদিন বাজারের কাছে একটা লোককে কেটে ফেলেছে, রঘু বলছিল—

সনাতনবাবু বললেন—সে আমি সব জানি। আমি জেনে শুনেই এসেছি—এবার তোমাকে নিয়ে যাবোই। তুমি চলো।

—তুমি কি পাগল হয়েছো? এই অবস্থায় আমি যাবো? তুমি কী করে ভাবতে পারলে যে এত কাণ্ডের পরেও আমি তোমার সঙ্গে যাবো? তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে বলেই ধরে নিয়েছি, তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তবু তোমাকে যেতেই হবে—আজ আর আমি তোমার কোনও কথা শুনবো না—

সতী সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত জোরের সঙ্গে কখনও তো কথা বলেন না।

সনাতনবাবু আবার বলতে লাগলেন—এতদিন আমি পরীক্ষাই করেছি শুধু, তোমাকে নিয়েও পরীক্ষা, নিজেকে নিয়েও পরীক্ষা। আমি আজ পর্যন্তও বুঝতে পারলুম না তোমাতে আমাতে অমিলটার সূত্র কোথায়? আমিই বা কীসে তোমার চোখে অপরাধী, আর তুমিই বা সে অপরাধ এমন বড় করে দেখছো কেন? এও কি তোমার এক অহঙ্কার? আমি বুঝতে পারছি না—

সতী বললে—তুমি আমার অহঙ্কারই দেখলে?

সনাতনবাবু বললেন—অহংকে তুমি ত্যাগ করতে পারনি বলেই অহঙ্কার বলছি—! তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে পারতে তো এ অহং থেকেও তুমি কবে মুক্ত হয়ে যেতে! নিজেকে কি তুমি সত্যিই বিলিয়ে দিতে পেরেছ? যেমন করে নদী নিজেকে সমুদ্রে বিলিয়ে দেয়?

—কিন্তু তুমিই সমুদ্র আর আমি নদী, এও তো তোমারও এক অহঙ্কার!

সনাতনবাবু বললেন—আমি তো বলিনি আমি সমুদ্র! তুমি আমি এই সমস্ত মানুষ, সবাই তো আমরা এক অনন্ত সমুদ্রের দিকে চলেছি—যে মানুষ নিজেকে সেই অনন্তর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছে সে-ই তো মানুষ! মানুষের সার্থকতা তো সেখানেই।

সতী বললে—তুমি এখনও সেই পুঁথির মধ্যেই বাস করছো, আমার মত সংসারের জীব হতে পারোনি—

—কিন্তু পুঁথি তো সংসারী লোকেরই লেখা। মানুষ আর পুঁথি কি আলাদা?

সতী বললে—হ্যাঁ আলাদা! আলাদা না হলে কি তোমার কাছ থেকে আমি চলে আসি? আলাদা না হলে আমার সারাটা জীবন এমন করে নষ্ট হয়? আলাদা না হলে তুমিই কি এমন কষ্ট পাও, না আমিই এমন ভুগি? তুমি আমার মত হতে পারো না? তেল-নুন-মশলার সাধারণ মানুষ হতে পারো না?

সনাতনবাবু বললেন—ভালোই হলো, তুমি কথাটা আবার তুললে! তবু আমি বলছি আগে আমি যা ছিলাম তা-ছিলাম, আমি আজ সাধারণ হয়েই এসেছি, সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছি, বলো কী করলে তুমি আমার হবে?

—কী করলে তুমি আমার হবে তা তুমি জানো না?

—বেশ তাই-ই বলো। কী করলে আমি তোমার হবো? কী করলে তুমি আমায় নেবে?

সতী এবার কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। এমন করে এমন সুরে সনাতনবাবু তার সঙ্গে আগে কখনও কথা বলেন নি। তবু যেন কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—আজকে আমি বাড়ি থেকে তোমাকে এই কথা বলবো বলেই বেরিয়েছি। ক'দিন ধরে খুব ভেবেছি। ক'দিন ধরে রাত্রে আমার ঘুম নেই। ক'দিন ধরে ঠিক করেছি আমি তোমার কাছে এসে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবো। বলবো—তুমি আমাকে নাও। একদিন তোমাকেই কেবল নিজের করতে চেয়েছি, এবার আমাকেই তোমার নিজের করে নিতে বলবো। তুমি অস্বীকার করলেও আমি শুনবো না। আমি শুনে যাবো তোমার মুখ থেকে তুমি আমাকে নিয়েছ কিনা!

সতী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—এত কথা তোমার মনে হয়? আমার কথা তুমি এমন করে ভাবো?

—ভাববো না? আমিও তো তুমি! আর তুমিও তো আমি।

—সত্যি বলছো?

—আমি কোনও দিন অসত্য বলি না। আগেও বলিনি, এখনও বলছি না।

—তোমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে? সেই অনেক দিন আগে প্রথম যখন তোমাদের বাড়ি গেলাম, তার এক বছর পরেই...

—এক বছর পরেই...কী বলো?

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো সতীর সমস্ত মুখখানা।

সনাতনবাবু বললেন—কী বলছিলে, বলো? বলো না, আমার সব মনে আছে—

—সেই খোকা হয়েছিল......

আর বলতে পারলে না সতী। বলতে গিয়েই যেন ভেঙে পড়লো। সনাতনবাবুর বুকের ওপরেই কান্নায় ভেঙে পড়লো। সনাতনবাবু ধরে ফেললেন সতীকে। নইলে সতী বোধহয় পড়ে যেত তখনি। এতদিন পরে সনাতনবাবুর মনে হলো সতী বাইরে যতই প্রখর হোক, ভেতরে ভেতরে যেন বড় দুর্বল। দুই হাতে ধরে রাখলেন অনেকক্ষণ। সতীও তাঁর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। সনাতনবাবু সতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। তারপর বললেন—কেঁদো না—চুপ করো—

সতী তেমনি করেই মুখ লুকিয়ে বলতে লাগলো—কিন্তু কেন সে থাকলো না বলো তো? আমি কী অপরাধ করেছিলুম ভগবানের কাছে? কার পাপে এমন হলো? কে এর জবাব দেবে? ভগবান আমাকে সব দিয়েছিলেন, মেয়েমানুষ যা চায় সব পেয়েছিলুম, কিন্তু কেন এমন করে সব হারালুম বলো তো? কেন আবার সব কেড়ে নিলেন তিনি?

সনাতনবাবু কিছু কথা বললেন না। তেমনি করেই সতীকে ধরে রইলেন।

—তুমি তো জানো, আমি ও-সব কিছুই চাইনি, অন্য মেয়েমানুষেরা যা চায় আমি তো তা কিছুই চাইনি, আমি গয়না চাইনি, শাড়ি চাইনি, বাড়ি চাইনি, টাকা-কড়ি, চাকর-ঝি কিছুই চাইনি, তুমি তো তা জানো, শুধু চেয়েছিলুম আমাকে কেউ মা বলে ডাকুক......

বলতে বলতে সতী আবার কাঁদতে লাগলো, তারপর আবার বলতে লাগলো—লোকে বলে আমি খুব জেদী মানুষ, তুমিও হয়ত আমাকে তাই বলে জানো! রাগ হলে আমার নাকি জ্ঞান থাকে না, রাগের মাথাতেই তো আমি তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম, কিন্তু কেন আমার রাগ হলো তা তো তোমরা কেউ কোনওদিন জানতে চাইলে না? কেন আমি এমন রাগী হলুম তা তো আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করোনি কখনও? কই, আগে তো আমি রাগী ছিলুম না? আগে তো লক্ষ্মীদির সঙ্গে, দীপুর সঙ্গে কত ঝগড়া করেছি, কিন্তু এমন করে তো কখনও অন্য কাউকেও কষ্ট দিইনি, আর নিজেও এমন করে কষ্ট পাইনি? খোকা চলে যাবার পরেই বা কেন এমন হলো? সে-কথা তো তোমরা কেউ জিজ্ঞেস করলে না?

সমস্ত পৃথিবী তখন নিস্তব্ধ। সমস্ত চরাচর তখন সতীর মন থেকে মুছে গেছে। সতী যেন এতদিন পরে আবার নিজের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। বাইরে ঘড়ির কাঁটা কতখানি ঘুরলো তখন আর তা জানবার যেন প্রয়োজনও নেই। সতী নিজের মনের সব কথাগুলো যেন এই প্রথমবার নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে।

বললে—ভেবেছিলাম সেবার তোমাকে অত অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি বোধ হয় আর আসবে না! জানো, একলা-একলা এ-বাড়িতে থাকতে-থাকতে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। তুমি না এলে আমি যে কী করতুম!

সনাতনবাবু বললেন—সেই জন্যেই তো আমি এলুম।

—তোমার মা জানেন যে তুমি এসেছ?

সনাতনবাবু বললেন—না।

—কিন্তু তুমি তো তোমার মাকে না জানিয়ে কোনও কাজই করো না। তাহলে আজ কেন এমন করলে?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার জন্যে!

—আমার জন্যে তুমি এত করতে পারো?

—তোমার জন্যে চিরকালই সব করতে পারতুম, তুমি শুধু বুঝতে পারতে না তাই কষ্ট পেতে!

—এবার থেকে আমি যা বলবো তুমি তাই-ই করবে?

—চিরকাল তুমি যা বলতে তাই-ই করতাম। তুমি শুধু ভুল বুঝতে আমাকে।

সতী সনাতনবাবুর বুকের মধ্যে আরো নিবিড় হয়ে এল। বললে—এবার আমি তোমাকে আর ভুল বুঝবো না, জানো। তুমি বিশ্বাস করো, তুমি যা বলবে আমি তাই-ই শুনবো। তোমার সব কথাই আমি রাখবো—

সতী একটু থেমে আবার বললে—তোমার বুকের মধ্যে মুখ রাখতে আমার খুব ভালো লাগছে—আমি আরো একটু রাখি আমার মুখখানা—কেমন?

সনাতনবাবু বললেন—তা রাখো না, আমারও তো ভালো লাগছে—

বলে সতীকে আরো নিবিড় করে বুকে টেনে নিলেন।

প্যালেস-কোর্টের পৃথিবীতে আবার উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। উদয়াস্ত খেটেও পীরালি ঘোষাল-সাহেবের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না। সাহেবের মেজাজ যেন আরো গরম। আবার খানা ঠাণ্ডা হলে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আট মাস ছিল না সাহেব। আট মাস যেন ঝিমিয়ে ছিল প্যালেস-কোর্ট। আবার হুইস্কি বীয়ার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ খেয়ে খেয়ে প্যালেস-কোর্টের চেহারা ফিরে গেছে। বড় খিট্-খিটে, বড় মেজাজী! মকবুল যতীন জগন্নাথের আমদানি-রপ্তানি আবার বেড়েছে। তারা আসে যায় আর সেলাম করে। দেখলেই বোঝা যায় তারা খুশী। ক'দিন গোলমালের চোটে সাহেব বেরোতে পারেনি। দিশী পাড়াতেই ট্রাবল্‌টা বেশি। এ-পাড়ায় কিছু হয়নি, কিন্তু তবু গা ছম্-ছমে ভাব। রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিলই, এখন আরো ফাঁকা হয়ে গেছে। রোজ সকালে কোম্পানীর বিরাট গাড়িখানা এসে দাঁড়ায় পোর্টিকোতে, তারপর মিস্টার ঘোষালকে নিয়ে অনেক রাস্তা ঘুরে আপিসে পৌঁছে দেয়। রাস্তায়-রাস্তায় পুলিস-ভ্যান টহল দেয়। ওয়্যারলেস্ ভ্যানের ভেতরে আর্মড্ পুলিস রাইফেল্ উঁচিয়ে বাইরের দিকে তাগ্ করে থাকে। লালবাজারে পুলিস-ব্রিগেড্ রেডি থাকে দিন-রাত। এমনি করেই সব কাজ-কর্ম চলে শহরের। খিল্-আঁটা মুখে রাস্তার দু'একজন লোক চলা ফেরা করে। ব্ল্যাক্-আউট উঠে গেছে, কিন্তু তবু শহরের ব্ল্যাক্-আউট বন্ধ হয়নি। সিভিক্-গার্ড, এ-আর-পি সব উঠে গেছে। তবু তারাই ইউনিফর্ম পরে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ায়-পাড়ায় ডিফেন্স্ পার্টি হয়েছে। তারা সারা দিন-রাত পালা করে নিজের-নিজের পাড়া পাহারা দেয়।

—পীরালি!

—হুজুর!

সন্ধেবেলা আপিস থেকে এসে আবার বেরোয় সাহেব। গোলমালের জন্যে

কয়েকদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু আবার সন্ধ্যেবেলা বেরোচ্ছে। ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে আরো অনেক মিস্ মাইকেলের আমদানি হয়েছে। হোটেলে হোটেলে আরো অনেক 'বার' হয়েছে। সেখান থেকে অনেক রাতে ফেরে সাহেব। তারপর সাহেব ডাকে—পাঁরালি—

পাঁরালি বলে—হুজুর।

হুকুম দিতে হয় না। পাঁরালি জানে। ডাকলেই পাঁরালি বুঝতে পারে। শোবার পর ঘরের আলো নিবিয়ে দিতে হয়, স্লিপার-জোড়া পায়ের কাছে রাখতে হয়, টেবল্-ল্যাম্পটা বালিশের পেছনে গুছিয়ে রাখতে হয়। অ্যাশ-ট্রে, সিগারেট, ম্যাচেস্—সব কিছু টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে তখন ছুটি। তারপর ভোর চারটে থেকেই পাঁরালির কাজ শুরু হয়। তখন হট্-ওয়াটার, টুথ-ব্রাশ, সিগারেট, ম্যাচেস্, কফি, সব কিছু রেডি করতে হবে।

কিন্তু সেদিন বিকেল বেলা আপিস থেকে এসে সাহেব বেরোল না আর। বললে—জগন্নাথকে ডাক্—

জগন্নাথ এল। একেবারে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। বললে—তৈরি?

—হ্যাঁ হুজুর।

—কে কে আছে দেখলি?

—দুজন আছে হুজুর, দুবোন। আর একটা চাকর। বড় বোনটা পাগলের মতন। মাথা-খারাপের রোগ, প্রায়ই তো রেলের লাইনে মাথা দিতে যায়। তাকে ঘরে পুরে চোখে-চোখে রাখে!

—আর কেউ নেই বাড়িতে?

—না হুজুর, আর কেউ নেই।

মিস্টার ঘোষাল চুরোট ধরালে একটা। বললে—আচ্ছা তোকে আজ আমার সঙ্গে যেতে হবে সেখানে, এখন যা তুই—আর মক্বুল কোথায়?

মক্বুল তৈরিই ছিল। ঘরে ঢুকেই সেলাম করলে। সাহেব বললে—শিলিগুড়ি গিছ্লি?

—গিয়েছিলুম হুজুর। সব দেখে এসেছি—

—পারবি তো?

মক্বুল বললে—খুব পারবো হুজুর। বাঙলোর সামনে বাগান আছে হুজুর, পেছনেও বাগান আছে, লুকিয়ে থাকবার জায়গা আছে, জঙ্গল আছে, মাঠ আছে, কেউ ধরতে পারবে না—

—তাহলে ঠিক আছে, সঙ্গে কোনও লোক লাগবে তোর?

—না হুজুর, লোক কী হবে, আমি একলাই ফরসা করে দেব।

মিস্টার ঘোষাল যেন খুশী হলো। বললে—যা তা হলে এখন। কাল তোকে খবর দেব—

মক্বুল চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার বাইরে যেন কীসের হল্লা উঠলো।

সাহেব জিজ্ঞেস করলে—ও হল্লা কীসের রে?

—হুজুর, কাল থেকে ওই হল্লা শুরু হয়েছে। গুণ্ডারা কোতোয়ালীতে ঢুকে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে—

সত্যিই দাঙ্গা বটে। শ্যামবাজারের মোড়ে লক্ষ-লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে। মিলিটারি ট্রাক দেখলেই কোথা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে ঢিল এসে পড়ে তাদের গায়ে, তারা যেদিকে পারে গুলী চালায়। সেন্ট্রাল এভিনিউ আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে পাঁচখানা মিলিটারি-ভ্যানকে ধরে কারা আগুন জ্বালিয়ে দিলে। আগুন জ্বলতে লাগলো দাউ দাউ করে। কোথা থেকে আর্মির লোক এসে যাকে সামনে পেলে তাকেই গুলী করে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার এসে জড়ো হয়েছে সবাই। জগুবাবুর বাজারের মোড়ে ট্রাম রাস্তার মোড়ে ডাস্টবিন জড়ো করে ট্র্যাফিক বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথমে পুলিস টিয়ার-গ্যাস্ ছুঁড়লো কয়েক-রাউণ্ড, কিছু ফল হলো না। তখন গুলী চললো। একজন মরে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাজরা পার্কের মোড়ে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। আগুনের আলো দেখেই সবাই উঁকি মারলে আশে-পাশের বাড়ি থেকে, দেখলে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে একটা মিলিটারি-গাড়িতে। কলকাতার কোনও জায়গা বাকি নেই। বড়বাজার, ডালহৌসী-স্কোয়ার, হাতীবাগান, কালীঘাট—সর্বত্র শুধু আগুন আর ভিড়। শহরের জীবন অচল হয়ে গেছে একেবারে। ট্রাম-বাস চলে না। কালীঘাট ট্রাম-ডিপোটাই একদিন সন্ধ্যেবেলা আগুনে পুড়ে গেল। ন'খানা ট্রাম ছাই হয়ে গেল আগুনে পুড়ে। ধর্মতলার মেথডিস্ট্ চার্চটায় একদিন আগুন জ্বলে উঠলো—চারদিকে অত লোক, অত ট্রাম-বাস-রিক্সা-ট্যাক্সি, তারই মধ্যে কখন যে কে গীর্জাটার ভেতর ঢুকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে কেউ জানতে পারেনি। আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার স্টুয়ার্ট্ কোর্টে যাচ্ছিল। তাকে ধরে গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিলে লোকে।

মিস্টার ঘোষাল টেলিফোনটা তুললে, পুলিস কমিশনারকে জিজ্ঞেস করতে হবে—ট্রাবল্টা কী? কেন এ-সব হচ্ছে?

কিন্তু এক্সেঞ্জ থেকে কোনও উত্তর নেই। কেউ ধরছে না। ঝপাং করে নামিয়ে রাখলে রিসিভারটা। তারপর স্টেট্সম্যানখানা টেনে নিলে। তার ওপর বড় বড় করে লেখা হয়েছে—মিলিটারি ওপন্ ফায়ার অন্ ক্রাউড্।

আর পড়া হলো না। কাগজখানাকে টেনে ফেলে দিয়ে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। বললে—তুই জগন্নাথকে ডেকে দে—

জগন্নাথ আসতেই সাহেব বললে—চল্ আমার সঙ্গে—

—কোথায় হুজুর?

—গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর বাড়িতে। গাড়ি রাখতে বল্—

জগন্নাথ বাইরে চলে গেল। মিস্টার ঘোষাল তৈরি হয়ে নিলে। সমস্ত কলকাতা পুড়ে যাক্, পুড়ে ছাই হয়ে যাক্, তাতে কিছু দুঃখ নেই। এর পেছনে

আছে সেন। দ্যাট্ ব্যাস্টার্ড। দ্যাট্ রোগ্। সেই-ই এতদিন প্যালেস-কোর্ট থেকে মিসেস ঘোষকে গড়িয়াহাটের বাড়িতে শেল্টার দিয়েছে। সেই সেনই আবার হয়ত একদিন মিসেস ঘোষকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাবে। তার পথ বন্ধ করতে হবে! রিভলবারটা নিজের পকেটে পুরে নিলে। জেলে যাবার পরে লাইসেন্স্ ক্যান্সেলড্ হয়ে গিয়েছিল,.সেটা আবার পাওয়া গেছে।

গট্ গট্ করে মিস্টার ঘোষাল সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এল। বিকেল হয়ে আসেছে।

চৌরিঙ্গী দিয়ে বিরাট লম্বা প্রোসেসন্ চলেছে। মিস্টার ঘোষালের গাড়িটা এসে আটকে পড়লো। কিন্তু আর যেন দেরি সইছে না। সাহেব বললে—ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চলো—পার্ক স্ট্রীটসে গাড়ি ঘুমাও—

পেট্রল কোম্পানীর ড্রাইভার স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল। বললে—জী হুজুর—

সনাতনবাবু বললেন—আমি তোমার অনেক দেরি করে দিলাম—

সতী বললে—এমনি করে তুমি যদি আগে দেরি করিয়ে দিতে তাহলে আমার কপালে এত কষ্ট আর হতো না—

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে তুমি চলো—আর দেরি করছো কেন?

সতী হঠাৎ বললে—তার চেয়ে তুমিই এখানে থাকো না—

—আমি?

—কেন, আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি আছে? তুমি তো বলেছ আমি যা বলবো তুমি তাই-ই শুনবে! এবার থেকে তুমি তো আমার!

সনাতনবাবু বললেন—ক'দিন সারা রাত ঘুমই হচ্ছে না কি না! চারিদিকে যা গোলমাল চলছে!

—তা আমার এখানেই ঘুমোও না। আমার এখানে কি ঘুমোবার বিছানা নেই ভাবো? আমি কি ঘুমোই না মনে করেছ? তুমি আমার বিছানাতেই শোবে চলো না। তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব—

—কিন্তু বাড়িতে মা জানে না যে আমি এখানে আসবো। তারা হয়ত ভাববে!

সতী বললে—তাহলে তুমি চলে যেতে চাও?

সনাতনবাবু বললেন—না না তা কেন, আমি এখানে থাকলে তোমাদের অসুবিধে হবে হয়ত—

সতী বললে—আমাদের যতই অসুবিধে হোক, তোমাকে আমি এ-সময়ে কোথাও যেতে দেব না—

—কিন্তু খবর দিয়ে আসিনি যে আমি!

—সে তারা ভাবুক, কিন্তু এখন এই অবস্থায় আমি তোমাকে কী করে একলা ছেড়ে দিই বলো? তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমি যে কিছুতেই মনে শান্তি পাবো না। তাহলে তুমি এলে কেন? না এলেই তো পারতে!

—তাহলে থাকি!

সতী বললে—হ্যাঁ থাকো তুমি। অনেক দিন পরে তুমি আমি এক সঙ্গে থাকবো, চলো ওপরের ঘরে চলো—আমাদের এ-বাড়িতে কেউ নেই, আমার দিদি আছে, তার ঘরের দরজায় শেকল লাগিয়ে দেবখন। আর আমি রঘুকে বলছি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে আসবে।

—তাহলে চলো!

রঘুকে বলতেই রঘু রাজী। বললে—কেন যাবো না দিদিমণি, আমি তো সে-বাড়ি চিনি—

—সামনে যাকে পাবি তাকেই বলে দিবি যে দাদাবাবু এখানে আমাদের বাড়িতে আজ রাত্রে থাকবে। পারবি তো?

রঘু চলে যেতেই সতী দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। তারপর তাড়াতাড়ি তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সনাতনবাবু তখনও বিছানার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। সতী পাশে বসলো গিয়ে। বললে—জানো, কাল রাত্তির বেলা তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলুম—স্বপ্ন দেখলুম যেন তুমি আমার পাশেই শুয়ে রয়েছ—

সনাতনবাবু বলেন—আমিও তো সারারাত তোমার কথাই ভেবেছি—

—তুমি ভালো করে আরাম করে বোস না, অমন আড়ষ্ট হয়ে আছো কেন?

সনাতনবাবু পা তুলে বসলেন। বললেন—আজ ক'দিন ধরে কলকাতায় খুব মারামারি হচ্ছে, খবরের কাগজে পড়ছিলুম, তখন থেকেই কেবল তোমার কথা ভাবছি, ভাবছিলাম তুমি একলা-একলা কেমন করে এ-বাড়িতে আছো—

সতী আরো কাছে সরে এল। বললে—এবার থেকে আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না—তুমি তাড়িয়ে দিলেও যাবো না, তুমি চলে যেতে বললেও আমি তোমার কাছে থাকবো—

সনাতনবাবু বালিশের গায়ে হেলান দিলেন। সতী বললে—তুমি ভালো করে শোও না, ক'দিন ধরে তুমি রাত্রে ঘুমোও নি বলছিলে?

—না না, শোব না এখন, তোমার সঙ্গে গল্প করবো!

—তা শুয়ে-শুয়েই গল্প করো না। তুমি শোও, আর আমি তোমার পাশে বসে গল্প করি—

বলে সতী সনাতনবাবুর পিঠ থেকে বালিশটা সরিয়ে দিলে। সনাতনবাবু বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুলেন। বললেন—বাইরে বোধহয় বৃষ্টি পড়ছে—না?

সতী বললে—বৃষ্টি হলে খুব ভালো হয়, বৃষ্টি হলে বেশ তাড়াতাড়ি

রাত্তির হবে। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না তো? আজ কিন্তু সারারাত তোমায় জাগতে হবে তা বলে রাখছি—

সনাতনবাবু বললেন—আজকে আর আমার ঘুম পাবে না মোটে, দেখে নিও......

সতী কী যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো বাইরের সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। বোধহয় রঘু এসেছে। বললে—তুমি একটু শোও লক্ষ্মীটি! আমি আসছি—

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এসেই দরজাটা খুলে দিয়েছে। কিন্তু খুলে দিতেই হঠাৎ যেন ভূত দেখে দশ পা পেছিয়ে এল সতী। বাইরে এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আর অন্ধকারের মতই বীভৎস মুখে জ্বলন্ত চুরোট নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষাল। মিস্টার ঘোষালের বিরাট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। অন্ধকারে ভালো করে দেখা গেল না। কিন্তু সতীর মনে হলো গাড়ির ভেতরেও যেন আরো দু'একজন লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে।

মিস্টার ঘোষাল ঘরের ভেতরে ঢুকে নিজেই সদর দরজাটা হাত দিয়ে বন্ধ করে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। সতী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার ঘোষাল সতীর দিকে মুখ তুলে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—

সতী বসলো না। তেমনি পাথরের মূর্তির মতই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিস্টার ঘোষাল বললে—কী হলো, বসবে না?

সতীর মুখে এতক্ষণে যেন একটু কথা বেরোল। বললে—আপনি কবে ছাড়া পেলেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—একদিন আগেও না, একদিন পরেও না—

আর কোনও প্রশ্ন সতীর মুখ দিয়ে বেরোল না। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো তার। সেই রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার ঘোষালের চোখে মুখে যে তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠতে দেখেছিল, আজ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যেন আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি তার চোখে। কিন্তু তবু যেন সন্দেহ হলো। ছাড়া পাবার পর আবার কী উদ্দেশ্যে এলো এখানে। কী চায় মিস্টার ঘোষাল আজ তার কাছে? মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে সেইটেই ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলে সতী। মিস্টার ঘোষাল তখন আরাম করে বসে পড়েছে। চুরোটটা নিবে গিয়েছিল। আবার দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিলে মুখে। পোড়া কাঠিটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কিন্তু আবার এলুম কেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না?

সতী বোবার মত তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি বেশী কথার লোক নই, আর আমারও সময়ের দাম আছে, গোড়াতেই তোমাকে জানিয়ে রাখা ভালো, তুমি যে আমার এগেন্স্টে সাক্ষী দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—

—ধন্যবাদ? কেন?

—আমার কন্‌ভিকশন না হলে রেলের চাকরি আমার ছাড়া হতো না। ওই হাজার টাকার স্যালারিতে আমার আর কুলোচ্ছিলও না। তা ভালোই হয়েছে, আমি এখন তিন হাজার টাকা স্যালারি পাচ্ছি এক মার্কেনটাইল ফার্মে! খবরটা শুনে তুমি খুশী তো? কী? কথা বলছো না যে? কথা বলো! যাকে তুমি চিরকালের মত ক্রাশ করতে চেয়েছিলে, এখন দেখ তার কী অবস্থা হলো? তুমি খুশী হলে কি কষ্ট পেলে সেটা খুলে বলো?

সতী আর পারছিল না। বললে—আপনি আর কিছু বলবেন?

—বলবো না মানে? আমারই তো এখন বলবার দিন এসেছে। তোমরা তো সবাই ভেবেছিলে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্ট চলে যাচ্ছে, এবার আমাদের দশা কী হবে। আমরা বুঝি সবাই উপোস করবো! এখন উপোস করবার নমুনাটা দেখলে তো? না কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বাস যদি না হয় তো আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সঙ্গে করে এনেছি। তাও দেখতে চাও?

মিস্টার ঘোষাল পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করলে। কাগজখানার ভাঁজ খুলে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—দেখ, মুখের কথায় বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখ ভালো করে—

সতী বললে—আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার মুখের কথাই আমি বিশ্বাস করেছি, আপনার আর কিছু বলবার আছে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—কেন, তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও?'

—না, তা নয়, আমার এখন একটু কাজ আছে!

—কিন্তু কাজ থাকলে তো শুনবো না। যেদিন আমার অনেক কাজ ছিল সেদিন তো তোমার কথা আমি শুনেছি।

—সেজন্যে আমি আপনার কাছে গ্রেটফুল। কিন্তু এখন সত্যিই আমি একটু ব্যস্ত, আপনি পরে একদিন আসবেন।

মিস্টার ঘোষাল বললে—পরে তো আমার নিজের সময় হবে না। যা কিছু করবার আজকেই করতে হবে।

—আর একদিনও দেরি করতে পারেন না?

—না।

—কিন্তু এখন যে আমি বড় ব্যস্ত। আমার যে মোটে সময় নেই।

—তা সময় না থাক্। আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি অনেক দিন ওয়েট করেছি, এতদিন রিভলবারটার লাইসেন্স পাইনি। আমার কনভিকশনের সময় ওটা ওরা ক্যানসেল করে দিয়েছিল, এবার পেয়েছি—বলে মিস্টার ঘোষাল

পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে টেবিলের ওপর শুইয়ে রেখে দিলে।

তারপর সতীর দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো—তোমার সময় আজ থাক আর না থাক, আমার কথা তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে এখন শুনতেই হবে, আর আমি যা জিজ্ঞেস করবো তার উত্তর দিতে হবে—

সতী রিভলবারটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। মিস্টার ঘোষাল বললে—মনে রেখো আমি আজ একলা আসিনি, গাড়িতে আরো লোক আছে আমার। দেখেছ নিশ্চয়ই! এখন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো তুমি এবার আমার প্যালেস-কোর্টে যাবে কি না!

সতী চমকে উঠলো। বললে—প্যালেস-কোর্টে? আমি?

—কেন? তুমি প্যালেস-কোর্ট চেনো না? নতুন করে তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে?

সতী আড়ষ্ট হয়ে উঠলো—তা চিনি! কিন্তু আবার?

—হ্যাঁ, আবার। এ আমার রিকোয়েস্ট নয়, আমার অর্ডার। তোমার সাক্ষীতেই আমি জেল খেটেছি। তোমার সাক্ষীতেই আমার কনভিকশন্ হয়েছে, তাই তার কম্পেনসেশন আমি চাই, খেসারত চাই—আজই—

সতী মুখ তুলে চাইলে মিস্টার ঘোষালের দিকে। আবার সেই তীক্ষ্ণ চাউনি, আবার সেই বিষাক্ত দৃষ্টি। মিস্টার ঘোষাল বললে—এ খেসারত না দিলে আমি তোমায় ছাড়বো না আজ। আজ এখনই। হোল ক্যালকাটায় আজ আগুন জ্বলছে, কোনও ল' নেই, কোনও অর্ডার নেই, আসবার সময়ই রাস্তায় প্রোসেসান দেখে এসেছি, এসপ্ল্যানেডের কাচের শো-কেসগুলো সব ভেঙে দিয়েছে মব, ক্যালকাটা আজ আউটরেজড, আজ আমিও তোমার আউটরেজ করবো—

—বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান আপনি! আপনি আজ মদ খেয়েছেন খুব। আপনার সঙ্গে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না।

মিস্টার ঘোষালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। রিভলবারটা তুলে নিয়ে আবার টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

—আপনি বেরিয়ে যান বলছি। বেরিয়ে যান এখুনি!

মিস্টার ঘোষাল গম্ভীর গলায় বললে—চেঁচিও না, তাতে তোমার খারাপ হবে। আমি একলা নই, আমার সঙ্গে আরো লোক আছে—

—কিন্তু আমি আপনার আর কোনও কথা শুনতে চাই না, আপনি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

—তা হলে চেঁচাও, পরে রিপেন্ট করতে হবে তোমাকে, অনুতাপ করতে হবে!

—কিন্তু আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না।

—আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন, আমিও চেঁচাবো না।

—ভদ্রতা সেকেলে জিনিস। ওটা কাওয়ার্ডস্‌। আজকের দিনে যারা দুর্বল তারা ভদ্রভাবে কথা বলবে। আমি কোন দুঃখে ভদ্র হবো? আমি সোজা কথা সোজা করে বলবো, তাতে তুমি খুশী হও বা অখুশী হও, আমার কিছু এসে যায় না।

—তা হলে আপনি কী চান বলুন?

—আই ওয়াণ্ট ইউ। আমি তোমাকে চাই।

সতীর সমস্ত শরীর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে কড়া কথা বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিলে। বললে—সেই জন্যেই আপনি রিভলবার নিয়ে এসেছেন? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না ওটা সেন-এর জন্যে। দ্যাট দীপঙ্কর সেন এখন শিলিগুড়িতে, সে আমার পোস্ট নিয়েছে, আমার চাকরি নিয়েছে, আমাকে জেলে পাঠিয়েছে সেই, এখন তোমাকে নেবার মতলব করছে। আমি এবার তাকে দেখে নেব,—কালই আমার লোক ভোরের প্লেনে শিলিগুড়ি যাবে এই রিভলবার নিয়ে—

—আপনি তাকে খুন করবেন?

—সোজা বাঙলায় তো তাকে তাই-ই বলে!

—কিন্তু সে আপনার কী ক্ষতি করলো? দীপু তো আপনার কোনও অপকার করেনি। সে তো আমাকে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বলে নি। আমি নিজেই সব করেছি, সে এ-সমস্ত কিছুর মধ্যেই নেই! তাকে আপনি কেন শাস্তি দিতে যাবেন মিছি-মিছি? কী করেছে সে আপনার? আপনাকে জেলে পাঠানোর জন্যে তো আমিই দায়ী, আর কেউ নয়! একলা আমি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমি জানি সে-ই তোমাকে পেছন থেকে ইনস্টিগেট করেছিল, উত্তেজিত করেছিল—

—না, সত্যিই না, সে এর বিন্দু-বিসর্গও জানতো না। আমার কথায় আপনি বিশ্বাস করুন, সে কিছুই জানতো না! তার কোনও দোষ নেই। তাকে আপনি চেনেন না মিস্টার ঘোষাল, তার মতন ছেলে হয় না। সে সকলের ভালোই চায়, সে আপনার ভালো চায়, সে আমার ভালো চায়, সে পৃথিবীর সব লোকের ভালো চায়, জীবনে কখনও সে মিথ্যে কথা বলেনি, জীবনে কারোর সে ক্ষতি করেনি, কোনও অন্যায় করেনি কারো, আপনি তার ওপর রাগ করবেন না। আপনার কাছে আমি হাত-জোড় করে বলছি, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না—

মিস্টার ঘোষালের চোখে যেন একটা কটাক্ষ খেলে গেল। বললে—তার ওপর তোমার এত দরদ কেন শুনি?

—দরদ?

—হ্যাঁ, তার জন্যে তুমি আমার কাছে হাত-জোড় করছো কেন? এত দরদ!

তো ভাল নয়! সে তোমার কে?

সতী বললে—কেউ নয় মিস্টার ঘোষাল, দীপু আমার কেউ নয়, আমার ভাই নয়, আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, আমার কেউই নয়। আমার কাছে আপনিও যা, সে-ও তাই।

—তা হলে তার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

সতী বললে—তা আমি বলতে পারবো না, তবু তার আপনি কোনও ক্ষতি করবেন না দয়া করে। সে নিষ্পাপ। আমি আপনাকে বলছি মিস্টার ঘোষাল, পৃথিবীর সকলের কিছু-না-কিছু পাপ আছে, আমার মনে পাপ আছে, আমার স্বামীর মনে পাপ আছে, আমার বোনের মনেও পাপ আছে, আমার নিজের বাবার মনেও হয়ত সামান্য পাপ ছিল, কিন্তু ভগবানের মনেও যদি কোনও পাপ না থাকে তো দীপুর মনেও কোনও পাপ নেই, সে একেবারে নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, সে এই পৃথিবীর মানুষই নয়—

—এতখানি? মিস্টার ঘোষালের কটাক্ষ ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে উঠলো গলার স্বরে। তারপর বললে—তা হলে তুমি চলো—

—কোথায়?

—প্যালেস-কোর্টে। তুমি যদি প্যালেস-কোর্টে যাও তো আমি সেন-কে ছেড়ে দেব। যে-কোনও একটা বেছে নাও—

সতী হতবাক হয়ে গেল। মিস্টার ঘোষাল বললে—খেসারত আমার চাই-ই। হয় তুমি চলো, নয় তো সেন উইল পে দি পেনাল্টি—এনি ওয়ান অব দি টু! আমার কম্পেনসেশন চাই-ই চাই—আজই—

সতী থরথর করে কাঁপছিল। মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি ভাবছো কী? আমার সময় নেই, আমি বেশীক্ষণ সময় দেব না তোমাকে। কোন্‌টা বেছে নেবে বলো—

সতী হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের আরো কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। বললে—আপনি এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন কী করে?

—আমাকে জেলে পাঠানোর সময় তো তোমরা নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলে? তখন তো মায়া-দয়া করোনি?

সতী বললে—কিন্তু দীপুকে দোষ দিচ্ছেন কেন, সে তো এর মধ্যে নেই, এর মধ্যে একলা আমিই আছি, আমিই দায়ী—

—তা হলে ঠিক আছে, ইউ মাস্ট পে দি পেনাল্টি—তুমি প্যালেস-কোর্টে চলো—

—কিন্তু...কিন্তু আমি কী করে যাই!

মিস্টার ঘোষাল রিভলবারটা তুলে নিয়ে একবার নাচিয়ে আবার পকেটে রেখে দিলে। বললে—তা হলে উঠি, কালকে ভোরের প্লেনেই আমার লোক এই রিভলবার নিয়ে শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছে—

সতী ছটফট করে উঠলো। মিস্টার ঘোষাল তখন দরজার দিকে যাচ্ছে। সতী বললে—দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান—

মিস্টার ঘোষাল পেছন ফিরে বললে—কী হলো?

সতী বললে—একটু দাঁড়ান, কিন্তু আপনি এইভাবে শাসিয়ে যাবেন? ভেবেছেন কলকাতা শহরে পুলিস, গভর্নমেন্ট কিছু নেই? আপনি গুন্ডামি করবেন, আর বাধা দেবার কেউ-ই নেই?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যা ঘটছে এখন কলকাতায় তা তো দেখতেই পাচ্ছো, পুলিস, গভর্নমেন্ট, মিলিটারি কিছু কি করছে? আর গুন্ডার কথা বলছো, কিন্তু কে গুন্ডা নয়? ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট গুন্ডা নয়? মুসলিম লীগ গুন্ডা নয়? কংগ্রেস গুন্ডা নয়?

—কিন্তু আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে আপনি এইভাবে ভয় দেখিয়ে যাবেন?

—আমি তো ভয় দেখাচ্ছি না। আমি সোজা সরল ভাষায় তোমাকে সারেন্ডার করতে বলছি। আর তা যদি না পারো তো সারেন্ডার ক'রো না। সেন আছে, হি উইল পে—

সতী বললে—না, না, মিস্টার ঘোষাল, আপনি যাবেন না। আমাকে একটা রাত সময় দিন, একটা রাত ভাবতে সময় দিন শুধু। কালকে সকালটা পর্যন্ত আমি একটু ভাবি, তারপর যা হয় আপনি করবেন।

মিস্টার ঘোষাল কী যেন ভাবলে একবার। তারপর কী সুমতি হলো কে জানে। বললে—একটা রাত? কিন্তু কাল ভোর সাতটায় যে শিলিগুড়ির প্লেন ছাড়বে?

—তার আগেই আপনি আসবেন, তখন আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করবো।

—ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, একটা রাত মাত্র।

—আচ্ছা, ঠিক আছে—বলে মিস্টার ঘোষাল উঠলো। তারপর দরজার দিকে যেতে যেতে বললে—আমি কাল সকাল ছ'টার আগেই আসবো—

মিস্টার ঘোষাল বাইরে গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ হলো। গাড়িটা ছেড়ে দিলে। তখনও সতী সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হলো সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটা বন্ধ করতেও ইচ্ছে হলো না। মনে হলো কোথায় দীপু রয়েছে কোন সুদূর শিলিগুড়িতে, সে কিছু জানতেও পারলে না। অথচ কাল সকালে তার চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে। পৃথিবীর কেউ জানবে না কেন, কীসের জন্যে তাকে চরম দণ্ড নিতে হলো। কেন নিজের জীবন দিয়ে অন্য আর একজনের সতীত্ব কিনতে হলো, অন্য একজনের জীবনের শান্তি, সংসার, সম্ভ্রম, মর্যাদা বাঁচাতে হলো। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র কারোর কাছে কোনও কালে ধরা পড়বে না—এ মূল্য কিসের? এ মূল্য কেন? মিস্টার

ঘোষালের লোকও ধরা পড়বে না। তারা অভ্যস্ত। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট থেকে শুরু করে সভ্য সমাজে সর্বত্র তারা মানুষের চোখের সামনে এই কাজই করে বেড়াচ্ছে, এই-ই তাদের জীবিকা। বিংশ শতাব্দীর ধোপদুরস্ত সভ্যতার তারাই বাহন। তাদের কেউ কিছু বলবে না। শুধু একলা জানবে সতী। আর সতী সমস্ত জেনেশুনেও এই সংসারে বেঁচে থাকবে!

কী মনে হতেই সতী তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবুর কথা এতক্ষণ যেন ভুলেই গিয়েছিল। সব শুনেছেন নাকি তিনি? কিন্তু ঘরের দরজার সামনে এসেই দেখলে সনাতনবাবু তেমনিভাবেই বিছানায় শুয়ে আছেন। সতীকে দেখে একটুও নড়লেন না। সতী আরো কাছে সরে এল। দেখলে সনাতনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। ক'দিন ধরে ঘুমোন নি। জীবনে এই যেন প্রথম শান্তি পেয়েছেন, প্রথম সহানুভূতি পেয়েছেন।

—ওগো, শুনছো?

কিন্তু ডাকতে গিয়েও সতী থেমে গেল। সনাতনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে আর তাঁর ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হলো না।

হঠাৎ সতীর মনে হলো কেমন করে দীপুকে খবরটা দেওয়া যায়! টেলিগ্রাফ করা যায় না? টেলিফোন? ট্রাঙ্ক-টেলিফোন? টেলিফোন করে সাবধান করে দেওয়া যায় না? বলে দেওয়া যায় না যে, মিস্টার ঘোষালের লোক যাচ্ছে শিলিগুড়িতে? সাবধানে থেকো, কিংবা তুমি ওখান থেকে চলে যাও। অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকো। কিংবা পুলিসে খবর দাও। কিছু করা যায় না দীপঙ্করের জন্যে? কিছুতেই দীপুকে বাঁচানো যায় না? চারিদিকে চেয়ে দেখলে সতী! জানালার বাইরে বৃষ্টিটা বুঝি আরো জোরে পড়তে শুরু করেছে। ঘরটা অন্ধকার। হঠাৎ সতীর মনে হলো কেউ নেই ঘরে। সনাতনবাবুও নেই যেন। পাশের ঘরে লক্ষ্মীদিও নেই। এমন কি এই বাড়িটাও নেই। এক অনির্বচনীয় শূন্যতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সতী যেন নিঃশব্দে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে বাঁচাবে না আজ, কেউ তাকে রক্ষা করবে না। সতীর অন্তরাত্মার অন্তস্তলে একটা সৃষ্টিছাড়া আর্তনাদ যেন ভেতর থেকে ঠেলা মারছে। কোথায় তার প্রতিকার? কোথায় তার পরিত্রাণ? কাকে ডাকবে সে? কাকে সে বাঁচাতে বলবে?

—ওগো, শুনছো? তুমি ঘুমিয়ে পড়লে!

কিন্তু ডাকতে গিয়েও যেন গলা আটকে গেল। ডেকে কী বলবে তাকে? কেন সে শাসাবার সাহস পায় এমন করে? কোন্ অধিকার সতী দিয়েছে তাকে? কোন্ সম্পর্কের অধিকারে সে এমন করে এসে শাসন করে গেল? পুলিসে খবর দেবে? কিন্তু পুলিসকে খবর দিতে গেলেও তো থানায় যেতে হবে। থানায় গিয়ে সমস্ত বলতে হবে। সমস্ত খুলে বলতে হবে। কিন্তু কেমন করে যায় সে সব ফেলে? বাড়িতে যে কেউ নেই। কিন্তু টেলিগ্রাফ। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ তো

করে আসতে পারে পোস্ট আপিসে গিয়ে! কাছাকাছি কোথাও পোস্ট আপিস আছে নিশ্চয়ই।

কথাটা মনে পড়তেই সতী আলমারি খুলে শাড়িটা বদলে নিলে। নতুন শাড়ি একটা। কোনও দিন পরা হয়নি আগে। তারপর পাশের ঘরে গেল। লক্ষ্মীদি বিছানায় ঠিক তেমনি শুয়ে আছে। ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। আবার রাত্রে আর একবার খাওয়াতে হবে। আস্তে আস্তে আবার বাইরে এল। বারান্দায় দাঁড়াল খানিকক্ষণ। তারপর কী মনে করে আবার নিজের ঘরে ঢুকলো, সনাতন-বাবু তখনও ঘুমোচ্ছেন।

—শুনছো, আমি একটু বেরোচ্ছি, আমি এখুনি আসবো—

তবু গলা থেকে যেন কথাগুলো বেরোল না।

—আমি যাবো আর আসবো। এসে সারা রাত আমরা গল্প করবো দুজনে। আজ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমি এখুনি চলে আসবো, বুঝলে?

গলা দিয়ে কথা বেরোল না সতীর। তবু যেন সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে ওই কথাগুলোই বলতে চাইলে। তারপর আর একবার বাইরের দিকে চাইলে। জানালার বাইরে সন্ধ্যের অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে টিপ্‌টিপ করে তখনও। কিন্তু রঘু আসছে না কেন? এত দেরি হচ্ছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে খবর দিয়ে আসতে? সে থাকলে তাকে রেখে নিশ্চিন্তে যাওয়া যেত।

তারপর তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সদর দরজা খুলে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। অনেক দূরে চেয়ে দেখলে। কোথাও কেউ নেই। রঘুর কোনও চিহ্নই নেই কোথাও। রাস্তায় লোকজন চলাও কম হয়ে গেছে। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়ি থেকে শেষ রাত্রে একদিন পালিয়ে আসবার সময় কিন্তু এমন ভয় করেনি। প্যালেস-কোর্টে যাবার সময়ও এমন ভয় করেনি সতীর। কিন্তু আজ যেন গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠলো। তারপর সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লো সোজা।

চারিদিকে অন্ধকার। কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই কারো। হাঁটতে হাঁটতে সোজা লেভেল ক্রসিং-এর দিকে চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন মনে হলো পেছনে কার পায়ের শব্দ হলো। ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরতেই মনে হলো অনেক দূরে কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তাকে পেছন ফিরতে দেখেই পাশের অন্ধকার গলির মধ্যে আত্মগোপন করলো। কে ও? কেন তার পেছন পেছন আসছে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই আর পা চললো না। মিস্টার ঘোষাল যদি কাউকে এখানে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? কাউকে পাহারা দেবার জন্যে রেখে দিয়ে গিয়ে থাকে? এমনও তো হতে পারে যে লোক দুটো গাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে ছিল তাদেরই একজনকে যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে। বলেছে—নজর রাখিস একটু, দেখিস যেন কোথাও না পালায়—

সতী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল একদৃষ্টে। গলির ভেতর থেকে লোকটা আর বেরোল না। স্পষ্ট ঝিঁ-ঝিঁর আওয়াজ কানে আসছে তখন দু'পাশ থেকে। তারপর আবার চলতে লাগলো। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল সে। হয়ত অন্য লোক। পাশের গলির ভেতর বাড়ি। নিজের বাড়িতে গিয়েই ঢুকেছে লোকটা—ঘোষালের লোক নয় সে।

আবার পা চালিয়ে দিলে। আবার আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। সতীর মনে হলো এ যেন তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু বাধা, শুধু ষড়যন্ত্র, শুধু শত্রুতা। জীবন তার প্রয়োজন, সুখ তার প্রয়োজন, স্বামী সংসার সবই আজ তার প্রয়োজন। আজ সবাইকে নিয়ে তার বড় বাঁচতে ইচ্ছে করছে। এ পৃথিবী বড় সুন্দর, এ সংসার বড় মধুর। এমন সময় আবার কেন এই উৎপাত! আজ এই মুহূর্তে কেন এলে? এর আগে আসতে পারতে না? যখন কিছুরই প্রয়োজন ছিল না? যখন আমি মৃত্যু কামনা করেছি প্রতি মুহূর্তে। যখন সংসার আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে, যখন বঞ্চনা অভিশাপ কলংক আমার নিত্যসাথী, তখন এলে না কেন?

অন্ধকারে সামনের সব কিছু অস্পষ্ট ঝাপসা দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে লেভেল ক্রসিংটা পার হলো সতী। এখন বোধ হয় কোনও ট্রেন নেই। গেটটা ওঠানো। আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললো সতী। দীপুর ঠিকানা জানা নেই। তবু শিলিগুড়ির নাম দিলেই চলে যাবে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই পৌঁছবে। নাম বললেই সবাই চিনবে নিশ্চয়ই। এতদিন যে কেন চিঠি দেয়নি রাগ করে! কেন চিঠি দেয়নি তাকে। দু-একজন লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ মনে হলো রাস্তার মোড়ে যেন একটা পুলিস দাঁড়িয়ে। পুলিসকে খবর দেবে? খবর দেবে যে, তাকে শাসাতে এসেছিল মিস্টার ঘোষাল! আরো সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু পুলিস তো নয়, একটা গাছ! একটা ছোট গাছ। দূরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়নি।

না, পোস্ট আপিসে গিয়ে টেলিগ্রাফ করে দেওয়াই ভালো। এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ। আজ শেষ রাত্রেই হয়ত পৌঁছে যাবে দীপঙ্করের হাতে। কিন্তু কোথায় পোস্ট আপিস! রাস্তার মোড়ে এসে ডান দিকে যেতে হবে। ডান দিকে ফিরতেই হঠাৎ নজরে পড়লো সেই লোকটা যেন আবার আসছে। যে লোকটা সেই তখন থেকে পেছন-পেছন আসছিল, সেই লোকটা।

সতী এবার সাহস করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। একেবারে সামনা-সামনি। মুখোমুখি। সামনে এলেই বলবে—কেন আপনি আমার পেছনে-পেছনে আসছেন? কী দরকার আপনার? কী চান আপনি?

বৃষ্টিটা বোধ হয় আরো জোরে নামলো। কিন্তু সতীকে থামতে দেখে লোকটাও হঠাৎ থেমে গেছে। আর এগোল না। তারপর পাশের একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো লোকটা কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সতী এবার

আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এবার যেন আর তার ফেরবার উপায় নেই। সামনে পেছনে সব দিকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির ষড়যন্ত্র তাকে ঘিরে ফেলেছে। সতী যেন অসহায়ের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করতে চাইলো সেই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

রঘু প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সদর দরজা খোলা কেন? দিদিমণি কি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে?

—দিদিমণি!

রঘু দরজাটায় খিল বন্ধ করে ভেতরে গিয়ে আবার ডাকলে—দিদিমণি—

কারো কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরের বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল রঘুর জামা-কাপড়। তবু সেই ভিজে জামা-কাপড়েই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। সমস্ত ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালেনি কেন দিদিমণি? অন্ধকার করে ঘরের মধ্যে বসে আছে কেন? কী হলো?

—দিদিমণি!

বড়-দিদিমণির ঘরও অন্ধকার। রঘু গিয়ে ঘরের ভেতরের আলোটা জ্বালতেই লক্ষ্মীদি যেন চমকে উঠেছে।

—কে?

—আমি বড়-দিদিমণি! আমি!

—আলো নেবা, আলো নিবিয়ে দে। আলো ভাল লাগে না আমার, জানিস্ না?

লক্ষ্মীদির আজকাল আলো ভালো লাগে না। সারা দিনরাত ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে রাখে। পৃথিবীর সব আলোকে যেন ভয় লাগে। ভয় লাগে সভ্যতাকে, ভয় লাগে মানুষকে। সভ্য মানুষ-সমাজের ওপরেই তার যেন ঘেন্না ধরে গেছে।

বললে—শীগগির আলো নিবিয়ে দে, শীগগির—

রঘু আলো নিবিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ছোট-দিদিমণির ঘরে ঢুকলো। এ ঘরের মধ্যেও অন্ধকার। আলোটা জ্বালতেই সনাতনবাবু জেগে উঠলেন। একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধ হয়। কয়েক রাত ঘুমোননি।

রঘু জিজ্ঞেস করলে—আলো জ্বালা থাকবে দাদাবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—তা থাক্।

রঘু আবার বললে—আপনার বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি যে, আপনি আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবেন—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—দিদিমণি কোথায়?

সনাতনবাবু বললেন—দিদিমণি! তা তো জানি না।

রঘু বললে—খাবার সময় তো বাড়িতে দেখে গেছি, এখন হঠাৎ কোথায় গেলেন—

সনাতনবাবু বললেন—কোথায় আর যাবেন! আমি একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই হয়ত এখানেই কোথাও গেছেন, তুমি ভেবো না—

তা হবে! রঘুও আর ভাবলো না। ভিজে জামা-কাপড়টা ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। আজ দাদাবাবুও খাবে এখানে। উনুনে আগুন দিলে। তরকারি কুটলো—এখন অনেক কাজ। দিদিমণি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ রঘুকেই সব করতে হবে!

তখন আরো জোরে বৃষ্টি পড়ছে। সতী তাড়াতাড়ি আবার বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো। কয়েকটা গাড়ি হুশ হুশ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। সেই লোকটা আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে সেখানে। যেদিকে সতী গিয়েছে সেদিকেই পিছু নিয়েছে। সেই অন্ধকার সন্ধ্যেবেলায় সতী যেন বড় বিভ্রান্ত হয়ে গেল। কোথায় যাবে সে? কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবে? কে তাকে বাঁচাবে? বাড়ি ফিরেই বা যাচ্ছে কেন সে? সেখানে সনাতনবাবুকে দিয়ে তার কতটুকু সাহায্য হবে? তাঁর কাছে গিয়েই বা কী লাভ? দীপুকে খবর দেওয়া যাবে কেমন করে?

হাতের কাছে পোস্ট আপিস নেই একটাও। থাকলেও এখন কি খোলা আছে? এই সন্ধ্যে ছ'টার পর?

সতীর মনে হলো এই সময়ে একলা বেরোনো তার উচিত হয়নি হয়ত। হয়ত রঘুকে দিয়েই পোস্ট আপিসে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলে হতো! কিন্তু রঘুই বা এত দেরি করছে কেন? প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে খবরটা দিয়ে আসতে কি এত সময় লাগে? বাড়ি ফিরলে তো রাস্তাতেই তার সঙ্গে দেখা হতো। তবু রঘু আসছে কিনা পেছন ফিরে দেখতে গিয়েই হঠাৎ আবার নজরে পড়লো। সেই লোকটা! সেই লোকটা আবার তাকে অনুসরণ করছে।

সতী থমকে দাঁড়াল!

সতীর মনে হলো লোকটা যেন সতীকে তার জন্ম থেকে অনুসরণ করে আসছে। যেদিন তার জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীতে, সেইদিন থেকেই। ওরই নাম বোধ হয় মৃত্যু। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝি ভগবান মৃত্যুকে মানুষের পেছনে লেলিয়ে দেন। মৃত্যুর সঙ্গে বারবার তাই মুখোমুখি হয়ে যায় মানুষ। বারবার মৃত্যুকে দেখে তাই আঁতকে উঠি আমরা। বারবার তাই তাকে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু কার সাধ্য মৃত্যুকে এড়াবে? তার বাবা কি মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন? পৃথিবীর কেউ কি এড়াতে পেরেছে? সতী কি তার খোকাকেও

মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিল সেদিন?

লেভেল-ক্রসিং-এর ওপর তখন এসে পড়েছে সতী। সামনে দু' জোড়া লাইন। ইস্পাতের মজবুত লাইন। এইখান দিয়েই প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কত ট্রেন কত মানুষ বয়ে নিয়ে যায়। সেই সমস্ত মানুষগুলোর পেছনেও তো মৃত্যু অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মত! মৃত্যু কোথায় নেই? এই সংসারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মানুষ। সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত মৃত্যু তাকে কি এই প্রথম অনুসরণ করেছে? লোভের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাকে, রোগ-শোক-কামনা-বাসনা সমস্ত কিছুর সঙ্গেই তাকে প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তারা কি মিস্টার ঘোষালের চেয়ে কিছু কম হিংস্র, কিছু কম নিরাপদ, কিছু কম ভয়ঙ্কর?

একেবারে গুমটি-ঘরটার তলায় এসে দাঁড়াল সতী।

গুমটি-ঘরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একবার পেছন ফিরলো। তাকে অনুসরণ করতে করতে সেই লোকটাও যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো আবার। যেন কুটিল-জটিল এক ষড়যন্ত্রের জালে তাকে ঘিরে ফেলেছে মিস্টার ঘোষাল। এরাই কাল যাবে শিলিগুড়িতে। এরাই শিলিগুড়িতে গিয়ে দীপুকে নিঃশেষ করে দেবে।

হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিস্টার ঘোষালের রিভলবারটা।

সতী চিৎকার করে উঠলো—না—না—

সেই অন্ধকারের পটভূমিকায় সতীর চিৎকার যেন হাহাকারে রূপান্তরিত হয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। না, না, না! কিছুতেই না। দীপু কোনও দোষ করেনি। দীপু নিরপরাধ, দীপু নিষ্পাপ, দীপু নিষ্কলঙ্ক! দীপুকে মারবেন না! দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। দীপু আমার কেউ নয়, দীপু আপনার কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু কারোর কোনও ক্ষতি করেনি। দীপু আমাদের সকলের ভালো চায়। আপনার ভালো চায়, আমার ভালো চায়, আমার স্বামীর, আমার শাশুড়ীরও ভালো চায়।

হঠাৎ নিজের উত্তেজনায় সতী নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল। কই, তার গলা দিয়ে তো এতটুকু শব্দ বেরোচ্ছে না! সে যদি এখন চিৎকার করে কাউকে ডাকে তা হলেও তো কেউ শুনতে পাবে না। সে কী তবে পাগল হয়ে গেল, উন্মাদ হয়ে গেল লক্ষ্মীদির মতন?

অনেক দূরে যেন কাঁসের একটা আলো দেখা গেল!

ট্রেন আসছে নাকি? ইস্পাতের লাইনের ওপর যেন ট্রেনের চাকার শব্দের প্রতিধ্বনি শুরু হলো। প্রথমে মৃদু, তারপর একটু স্পষ্ট। তারপর আরো স্পষ্ট হলো! অনেক দূর থেকে যেন হুইস্‌ল্ বাজলো ইঞ্জিনের। তবে কি ট্রেনটা আসছে এই লাইন দিয়ে? এই গুমটি-ঘরের সামনে দিয়ে?

সতী গুমটি-ঘরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওপরে গুমটি-ঘরের ভেতরে সেই

বুড়ো গেট-ম্যানটা বোধ হয় টেলিফোনে কথা বলছে।

—হ্যাঁ হুজুর, আমি ভূষণ! লাইন-ক্লিয়ার হয়েছে?

তারপর সজোরে যেন একটা কীসের শব্দ হলো। বোধ হয় লিভার টানলে। তারপর ক্রিং-ক্রিং করে গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনও গাড়ি আসতে পারবে না। টপ্‌টপ্‌ করে বৃষ্টি পড়তে লাগলো জোরে। হাওয়া দিচ্ছে পূব দিক থেকে। জলো হাওয়া। সমস্ত শরীর যেন শিরশির করতে লাগলো। থরথর করে কাঁপতে লাগলো। শাড়িটাকে আরো এঁটে গায়ে জড়িয়ে নিলে সতী। মাথার ওপর ঘোমটা টেনে দিলে। তারপর সেইখানে গুমটির নিচে দাঁড়িয়েই ট্রেনের চাকার প্রতিধ্বনি শুনতে লাগলো একমনে। ট্রেনটা আসছে অনেক দূর থেকে। সতীর মনে হলো, ও যেন ট্রেন নয়, ও যেন মিস্টার ঘোষালের পাঠানো মৃত্যু-দূত। সতীর অনাদি অতীত আর অনন্ত ভবিষ্যৎ আজ যেন তার এক মুহূর্তের বর্তমানের কাছে হঠাৎ একেবারে নিরর্থক হয়ে উঠলো। আর সতী সেই অবধারিত ভয়াবহতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুহূর্ত-পল-দণ্ড হিসেব করতে লাগলো অধীর আগ্রহে।

মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতে লক্ষ লক্ষ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা আলো হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে ছোট একটি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বের কোনও মূল্য নেই। কে মরলো কে বাঁচলো তা দেখবার দায় নেই মহাকালের। মহাকালের নিরিখে একটা যুগ কি একটা শতাব্দীর ইতিহাস হয়ত বড়ই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সে জানে যে প্রবল আকর্ষণ সূর্য থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে সূর্যে প্রসারিত তার মহাবিক্রমে মানুষের ইতিহাস অনাদিকাল ধরে অব্যাহত চলবে। সে জানে মানুষের অস্তিত্বরাজ্যের বিনাশ হতে পারে না। তাই গ্রহ-তারা-চন্দ্র-সূর্যের দল আলো হাতে বারবার মানুষের দরজায় এসে উঁকি দেয়। উঁকি দিয়ে দেখে কোথায় কোন্‌ মানুষ জেগে আছে, কোথায় কোন্‌ মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তারা বলে—কোথায় তুমি? তোমার জন্যেই তো অনাদিকাল ধরে আমাদের যাত্রা, তোমার সন্ধানেই তো আমাদের অনন্ত পরিক্রমা! এমনি অনাদিকালব্যাপী সন্ধানের পর কোটি কোটি বছর পার হয়ে যায়। পার হয়ে যায় যুগ-যুগান্তর। হঠাৎ কয়েক শতাব্দীর পরে আবির্ভাব হয় একজন বুদ্ধদেবের, আবির্ভাব হয় একজন যিশুখৃষ্টের, আবির্ভাব হয় একজন মহম্মদের, আবির্ভাব হয় একজন মহাত্মা গান্ধীর। আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোকে জয়ডংকা বেজে ওঠে, মরলোকে জয়-শঙ্খ।

দীপঙ্করবাবুর চলে যাবার আয়োজন হয়েছিল। রাত্রি দশটায় ট্রেন। আমরা তাঁর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর গল্প শুনছিলাম! তিনি বলছিলেন —আমি মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যুকে অনুভব করেছি, মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তা-ও নয়। আমি মৃত্যুকে কিনেছি—

মৃত্যুকে দীপঙ্করবাবু কিনেছেন! আমরা যারা শুনছিলাম তারা সবাই অবাক হয়ে গেলাম।

—হ্যাঁ, আমার টাকা ছিল আমার ধার করা লক্ষ টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি সতীর সুখ কিনতে চেয়েছিলাম, সতীর শান্তি কিনতে চেয়েছিলাম। শুধু সতীর নয়, পৃথিবীর সকলের মঙ্গল কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হলো না। আমি টাকা দিয়ে জীবন কিনতে পারিনি, মৃত্যু কিনলাম—অঘোরদাদু আমাকে ভুল শিখিয়েছিল—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন—যাঁরা তোমাদের টেকস্ট বই লেখেন, যাঁরা তোমাদের টীচার, যাঁরা তোমাদের গার্জেন, তাঁরা সবাই অঘোরদাদু। সেই অঘোরদাদুরাই আজ আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সব জায়গাতেই আছেন অঘোরদাদুরা। আমি বাঁকুড়া থেকে চলে এসেছি, বর্ধমান থেকে চলে এসেছি, হুগলী থেকে চলে এসেছি, সব জেলা থেকেই চলে এসেছি, এবার এখান থেকেও চলে যেতে হচ্ছে। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। পৃথিবীর এক জায়গায় আমি মানুষ খুঁজে পাবোই। আমার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার দলও আলো হাতে খুঁজতে বেরিয়েছে। কোটি কোটি বছর ধরে তারা খুঁজছে, আরো খুঁজবে। আমি হতাশ হই না, আমি হতাশ হবো না—

বললাম—তারপর?

—তারপর?

যে অমৃতময় পুরুষ বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন, তিনি সেদিন সাক্ষী রইলেন। সাক্ষী রইল অনন্ত আকাশ, অসীম দিগন্ত, আর সাক্ষী রইল 'কড়ি দিয়ে কিনলামে'র অসংখ্য পাঠক। তারা জানলো সতী সেদিন মৃত্যু চায়নি। সতী সেদিন সুখ চেয়েছিল, শান্তি চেয়েছিল, স্বামী চেয়েছিল। আর আর একটি জিনিস চেয়েছিল। সে চেয়েছিল মাতৃত্ব। সে চেয়েছিল সন্তান।

হুড়মুড় করে ট্রেনটা আসছে। সামনের হেডলাইটটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর। সতী গুমটি-ঘরের নিচে থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল এক জোড়া চকচকে ঝকঝকে লাইনের দিকে। চাকায় চাকায় তখন দুর্দান্ত বেগ, শিরায় শিরায় তখন দুর্দম উন্মাদনা। কাল সকাল সাতটা! কাল সকাল সাতটার মধ্যেই মিস্টার ঘোষাল এসে জবাবদিহি চাইবে। তার খেসারত চাইবে। হয় দীপঙ্করের মৃত্যু, নয় সতীর সতীত্ব!

এবার ট্রেনটা আরো কাছে এসে পড়েছে।

তুমি আমায় ক্ষমা করো। আজ সারা রাত বৃষ্টি হবে। তুমি বলেছিলে ঘরের ভেতরে আমরা দুজনে মিলে এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করবো। তুমি বলেছিলে তুমি অনেক রাত ঘুমোওনি। আমার কথা ভেবে-ভেবে তোমার ঘুম আসেনি অনেক দিন। আজ তুমি তোমার মাকে না বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে

এসেছিলে আমার কাছে। আমি তোমাকে আমার বিছানায় শুইয়ে এসেছি। আমি তোমাকে বলেছি—আমি এখনই আসবো। আমি বলেছিলাম—আমি যাবো আর আসবো! কিন্তু দীপু? দীপু যে শিলিগুড়িতে, কাল যে ওরা যাবে, কাল যে ওরা শিলিগুড়িতে যাবে। দীপু যে খবর পায়নি, দীপুকে যে সাবধান করে দেওয়া হয়নি! দীপু যে......

হঠাৎ সতীর মনে হলো পুব দিকের লাইনের ওপর দিয়ে কে যেন চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—

—কে? কে ও? মিস্টার ঘোষাল? ঘোষাল কি জানতে পেরেছে? তার চারদিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলেছে ঘোষাল!

সতী চিৎকার করে উঠলো—না, না, দীপুর কোনও ক্ষতি ক'রো না তোমরা, দীপু আমার কেউ নয়, দীপুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, দীপু কিছু জানে না। সে নিষ্পাপ, সে নিরপরাধ, সে নিষ্কলঙ্ক......

ট্রেনটা তখন আরো কাছে এসে পড়েছে। আর ওদিকে মিস্টার ঘোষাল দৌড়তে-দৌড়তে তার দিকে আসছে......আরো কাছে এসে পড়লো......

তখন অনেক রাত। রঘু রান্না সেরে আবার গিয়ে ওপরে উঠলো। সনাতনবাবু চুপ করে তখনও বসে ছিলেন। রঘু আসতেই সনাতনবাবু চেয়ে দেখলেন। রঘু বললে—এখনও দিদিমণি তো এল না দাদাবাবু—

সনাতনবাবু বললেন—আসবেন ঠিক, তুমি কিছু ভেবো না—

—আপনি কি খেয়ে নেবেন? অনেক রাত হয়েছে—

—দিদিমণি আসুন, তারপর খাবো না-হয়।

—কিন্তু তাঁর যদি আসতে দেরি হয়?

সনাতনবাবু বললেন—দেরি হবে কেন? তিনি তো জানেন আমি এখানে আছি—

—তা হলে আমি একটু খুঁজে দেখবো?

হঠাৎ নিচেয় সদর দরজায় কে কড়া নাড়লে। রঘু বললে—ওই দিদিমণি এসেছে, যাই—

বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচের নেমে সদর দরজাটার খিল খুলে দিলে। বললে—কী আক্কেল আপনার দিদিমণি, এত দেরি করতে হয়! আমরা ভাবছি কত। কোথায় গিয়েছিলেন?

—এ-বাড়িতে তোমাদের কোনও মেয়েমানুষ ছিল? সবাই বলছিল—এই বাড়িতে থাকতেন তিনি......

এক দল লোক। সবাই হাঁপাচ্ছিল। দরজা খুলে দিতেই এত লোক দেখে রঘু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। বললে—কী চান আপনারা? কাকে চান?

—তোমাদের বাড়ির কোনও মহিলা রেলে কাটা পড়েছে? জানো তুমি?

—রেলে কাটা পড়েছে? কে?

—তা জানি না। সবাই বলছে তিনি এই বাড়িতে থাকতেন, শীগগির চলো, দেখবে চলো...

রঘুর মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। দরজা খোলা পড়ে রইল। রঘু সেই অবস্থাতেই ছুটলো লেভেল ক্রসিং-এর দিকে। টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। অনেক লোকের ভিড় জমেছে লাইনটার কাছে। ট্রেনটা খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনটা যেন রাগে লজ্জায় অপমানে আঘাতে আপন মনেই ফুঁসছে তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

রাত যখন আরো অনেক গভীর হলো, তখন হঠাৎ ন'দিদির টেলিফোন বেজে উঠলো। ন'দিদি বললে—কে?

—আমি নয়ন। সর্বনাশ হয়েছে ন'দিদি, আমার বউমা রেলের তলায় কাটা পড়েছে—

—বলিস কী তুই?

নয়নরঞ্জিনী বললে—হ্যাঁ ন'দিদি, এই তো এখন পুলিস এসে আমায় খবর দিয়ে গেল। এখন কী করি? হাত-পা আমার থরথর করে কাঁপছে, তাই তোমায় টেলিফোন করলুম—। আমার ছেলেও সেখানে রয়েছে—

ন'দিদি কী বলবে যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে না। বললে—তোর ছেলেকে সেখানে পাঠালি কেন আবার?

—আমি কি পাঠিয়েছি ন'দিদি! কখন গেছে খোকা টেরই পাইনি। বিকেল বেলা একটা লোক এসে খবর দিয়ে গেল খোকা নাকি সেখানে রাতে থাকবে। ভাবলুম সকালবেলাই তোমার কাছে পরামর্শ চেয়ে নেব, তা এখন এই কাণ্ড! এখন কী করি বলো দিদিমণি! যদি একটা পুলিসের হ্যাঙ্গামের মধ্যে পড়ে যাই! তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি আমার কি যাওয়া উচিত?

—তা তোর বউয়ের তো অনেক টাকা আছে শুনেছিলুম। বাপের অনেক টাকা তো পেয়েছিল?

—তা তো পেয়েছিল। দেড় লাখ টাকার মতন—

ন'দিদি বললে—তা হলে এক্ষুনি যা, এক্ষুনি যা, দেরি করিস নে। টাকা-কড়ির ব্যাপার, মরে যাবার পর টাকা হাত-ছাড়া হয় হামেশা—এমন ভুল করিস নে, কোথা থেকে কে এসে জুটবে শেষকালে, তখন হাত-পা কামড়াবি; যা—

নয়নরঞ্জিনী দাসী টেলিফোন রেখে দিলেন। তারপর সেই রাত্রেই শম্ভুকে ডেকে ট্যাক্সি ডাকতে বললেন।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খবর পৌঁছুলো উনিশের একের-বি ঈশ্বর গাঙ্গুলী

লেনের ভাড়াটে বাড়িতে। লক্ষ্মণ সরকার অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। লক্ষ্মণ বলেছিল—তুমি বরং খেয়ে নাও, দীপঙ্কর আর আসবে না হয়ত আজকে—

ক্ষীরোদা সমস্ত দিন ধরে রান্না করেছে। কত দিনের সাধ তার। লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি না-হয় খবর নিয়ে আসছি, একটু দাঁড়াও—

তারপর আপিসে টেলিফোন করে খবর পেলে জেনারেল ম্যানেজারের স্পেশ্যাল ক্যান্‌সেলড্‌ হয়ে গেছে। এবার হয়ত দীপু সোজা এখানেই আসবে। বাড়িতে এসে বললে—তোমার সব তৈরী তো? দীপু এই এসে পড়লো বলে—

কিন্তু তারপর রাত সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো। শেষকালে ঢং-ঢং করে দশটাও বাজলো। আর খাওয়া হলো না। লক্ষ্মণ একলাই খেয়ে নিলে। বললে—তুমি খাবে না? কতক্ষণ আর তার জন্যে বসে থাকবে?

ক্ষীরোদা কিছু বললে না। সারা রাত জেগেই হয়ত কাটতো। কিন্তু অনেক রাত্রে কে যেন দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। গায়ে একটা ঠেলা লাগতেই লক্ষ্মণ ধড়ফড় করে উঠলো। বললে—কে? কে ডাকছে?

ক্ষীরোদা বললে—নিচেয় কে যেন কড়া নাড়ছে—দেখো না—

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি নিচেয় যেতেই সব শুনে অবাক। বললে—সেন-সাহেব? গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এ? কী হয়েছিল?

কিন্তু খবরটা ক্ষীরোদার কানে যেতেই কেমন যেন টলে উঠলো মাথাটা। সেইখানেই পড়ে গেল মেঝের ওপর। সেদিন যে কী বিপদের মধ্যেই পড়েছিল লক্ষ্মণ! এদিকে ক্ষীরোদার মাথায় জল দিয়ে জ্ঞান ফেরানো, ওদিকে দীপঙ্করের অ্যাকসিডেন্ট। দীপঙ্কর যে কেন ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল, কিছুতেই বুঝতে পারেনি সেদিন লক্ষ্মণ সরকার। শেষ পর্যন্ত ক্ষীরোদার যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন লক্ষ্মণ সরকার একলাই যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ক্ষীরোদা ছাড়েনি। বলেছিল—ওগো আমিও যাবো, আমাকেও নিয়ে চলো—

মিস্টার ক্রফোর্ড নিজে এসেছিল খবর পেয়ে। জিজ্ঞেস করেছিল—এখানে তুমি কী করতে এসেছিলে সেন? হোয়াট ব্রট্‌ ইউ হিয়ার?

দীপঙ্কর তখনও কিছু উত্তর দেয়নি। উত্তর দেবার কী-ই বা ছিল! কেউ তো বুঝবে না কেন সে এসেছিল এখানে। সেই অল্প অন্ধকার জায়গাটা তখন লোকে লোকারণ্য। পুলিস এসেছে। মানুষের ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। নয়নরঞ্জিনী দাসী এসেছেন। শম্ভু এসেছে। সনাতনবাবু এসেছেন, রঘু এসেছে। লক্ষ্মণ সরকার এসেছে। ছিটে-ফোঁটাও খবর পেয়ে এসেছে। ন'দিদিও এসে দেখে গেল। দীপঙ্করের তখন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল। পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল। রেলের লাইনের ওপর সতীর দেহটা তখন আড়াআড়ি পড়ে আছে। চাকাগুলো বোধ হয় একেবারে বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। সমস্ত

জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে ভিজে গেছে। মুখখানা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলের খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে ব্যালাস্টের ওপর। দু পাশে দুটো হাত পাতা। সব চাওয়া সব পাওয়া সব কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দীপঙ্করের চোখে জল পড়েনি সেদিন। শুধু মনে হয়েছিল—এই মৃত্যুর মধ্যেই যেন তার জীবনের চরম জিজ্ঞাসার শেষ উত্তরটি পেয়ে গেছে সে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভই যেন তার হয়ে গেল একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যেন জীবনের পরম অর্থ সে খুঁজে পেলে। যে প্রশ্ন সে অমলবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রাণমথবাবুকে করেছিল, যে প্রশ্ন সে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে বিশ্ববিধাতার কাছে নিবেদন করতো, সেই চরম প্রশ্নের পরম উত্তর যেন তাকে সতীই জানিয়ে গেল। সতীই যেন তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল কড়ি দিয়ে জীবন কেনা যায় না। কড়ি দিয়ে মৃত্যুই কেনা যায় শুধু......

তারপরেই তারা দীপঙ্করকে লেক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস রিপোর্ট দিলে—এ কেস্‌ অব্‌ সুইসাইড।

তারপর বছরের পর বছর হোসেনভাই কাশেমভাই-এর আপিসে প্রতি মাসে মনিঅর্ডারে টাকা এসে পৌঁছেছে। কখনও বাঁকুড়া থেকে। আবার কয়েক মাস পরে বর্ধমান থেকে। আবার কখনও হুগলী থেকে। বাঙলার নানা জেলা, নানা গ্রাম থেকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়েছে দীপঙ্কর সেন। লক্ষ টাকার ঋণ। সারা জীবন ধরেই হয়ত ঋণ শোধ করে যাবে দীপঙ্কর। সতীর ঋণ সারা জীবন ধরেই শোধ করে যাবে সে। আপিসে গিয়ে একদিন সে চাকরি থেকেও বিদায় নিয়ে এসেছিল চিরকালের মত। তখন ক্রফোর্ড সাহেব চলে গিয়েছে। অন্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এত ভালো গেজেটেড্‌ পোস্ট্‌ কেউ ছাড়ে? কিন্তু তারা তো এ-ইতিহাস জানতো না। তারা বুঝতে পারেনি। তারপর থেকেই স্কুল-মাস্টারী। অল্প মাইনের চাকরি। কোথাও আশী টাকা মাইনে, কোথাও এক শো, কোথাও দেড় শো। সেই মাইনে থেকে মাসের পয়লা কিংবা দোসরা তারিখে মনিঅর্ডার এসে পৌঁছোয়। কোনও মাসে পঞ্চাশ, কোনও মাসে চল্লিশ, কোনও মাসে ষাট। একদিন এই টাকা দিয়েই সতীর শাশুড়ীকে ঋণমুক্ত করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকা দিয়েই সতীকে সুখী করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, এই টাকার ঘুষ দিয়েই সতীর ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে চেয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু দীপঙ্কর তখন জানতো না যে, পরিবারবোধের চেয়ে বিশ্ববোধে যতই মানুষ বড় হয় ততই তাকে আত্মবিলোপ করতে শিখতে হয়। ততই বৃহৎ ত্যাগের জন্যে তৈরী হতে হয়। ঐক্যবোধের চেষ্টার মধ্যেই যে মনুষ্যত্বের সাধনা নিহিত তা

যেন সতীই তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাত দশটায় ট্রেন ছাড়বে। আমরা সবাই স্টেশনে গেলাম তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে।

কাশী জিনিসপত্র নিয়ে আগেই উঠেছিল। দীপঙ্করবাবু গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে কোনও ক্ষোভ নেই, মনে কোনও দুঃখ নেই। বললেন—তোমরা যারা এখন ছোট, তোমাদের কাছেই আমার বেশী আশা। তোমরা একদিন বড় হবে। তোমরা আমারই মত আরো জীবন দেখবে। আমারই মতন ছিটে-ফোঁটাদের দেখবে, লক্ষ্মীদি, সতীকে দেখবে, নয়নরঞ্জিনী দাসীকে দেখবে, লক্ষ্মণ সরকার, ক্ষীরোদা, কিরণ, সবাইকে দেখবে। দেখবে বিন্তী, লক্কা, লোটন, সবাইকে। আজও যদি গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর সেই বাড়িতে যাও তো দেখবে সেখানে দাতারবাবু আছেন, লক্ষ্মীদি আছে। তাঁদের ছেলে মানস আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে ইণ্ডিয়ারই কোনও জেলখানায়। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে গেলে দেখবে সনাতনবাবুকে। দেখবে নয়নরঞ্জিনী দাসীর মেজাজ এখন আরো উগ্র হয়েছে। বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, শম্ভু আজও সেই শাসনের আওতায় জীবিকার যন্ত্রণা পাচ্ছে। রেলের আপিসে, পেট্রল কোম্পানীর আপিসে আজও ঘোষাল সাহেবরা সশরীরে শাসন-দণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি না-ও দেখতে পাও তো তাদেরই মতন আরো অনেক লোক দেখতে পাবে। দেখবে অঘোরদাদুরা আজও বেঁচে আছে কড়ি দিয়ে সব কেনবার জন্যে। আজকের অঘোরদাদুরাও ঘরের মধ্যে দেবতার নৈবেদ্য চুরি করে পচিয়ে ফেলছে, তবু দেবতার ভোগ দেবতাকেও দিচ্ছে না, মানুষকেও খেতে দিতে অস্বীকার করছে। শুধু আমিই তোমাদের মধ্যে থেকে চলে গেলাম। আর এক জেলায়, আর এক গ্রামে আমি আবার আশ্রয় চাইবো, আবার হয়ত সেখান থেকেও আমায় চলে যেতে হবে। তবু আমি হতাশ হবো না, তবু আমি আশা ছাড়বো না—মানুষ আমি খুঁজে বার করবোই।

আর বেশী সময় ছিল না। প্লাটফরমের ঘণ্টা পড়লো।

একটু থেমে বললেন—একটা কবিতা সেদিন পড়েছিলুম, কবিতাটি বড় ভালো লেগেছিল, সেটার খানিকটা তোমাদের শুনিয়ে যাই। এক বিখ্যাত ইংরেজ কবির লেখা—তাঁর নাম ডবলিউ-এইচ-অডেন—

All that I have is a voice
To undo the folded lie,
The romantic lie in the brain
Of the sensual Man in the Street,
The lie of Authority
Whose buildings scrape the sky;

There is no such thing as the State
And no one exists alone;
Hunger allows no choice
To the citizen or the police,
We must love one another or die.

সমাপ্ত